প্রদত্ত নকশাটি একটি চৌকো কাপড়ের টুকরোয় (৩৫ সে.মি. × ৩৫ সে.মি.) ট্রেস ক'রে নকলটি ক্যামেল ক্রাইলিন দিয়ে রঙ করুন। কাপড়টির চারধার রুমালের মত মুড়ে সুন্দর ভাবে সেলাই করতে হবে। রঙ ক্যামেল ক্রাইলিন মিডিয়ামে তরল ক'রে যতটা সম্ভব পাতলা করা চাই। প্রত্যেক প্রতিযোগী ৩টি ক'রে রঙ করা কাপড় পাঠাতে পারেন, তার বেশী নয়।

পুরস্কার : ১০০ টাকা, ৭৫ টাকা, ৫০ টাকা ছাড়াও ১০টি প্রশংসাপত্র।

নীচে দেওয়া ঠিকানায় আপনার **রঙ করা কাপড়ের টুকরোগুলি পাঠান :**

Public Relation Officer
CAMLIN PVT. LTD.
Art Material Division
J.B. Nagar, Bombay 400 059.

প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ঘোষণার সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা এবং ডাকটিকিট পাঠালে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে নকল তোলার নকশা পাঠানো হবে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের শেষ তারিখ : **[illegible] ১৯৭৭**

VISION2

শুক্রবার, ৩০ বৈশাখ, ১৩৮৪
Friday, 13th May, 1977
১৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা

…দ এঁকেছেন গৌতম রায়
ভিতরে: ছবি এঁকেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত ও সন্তোষ গুপ্ত

আগামী সংখ্যায়

চাণক্য সেনের কলম

সুধেন্দু মল্লিকের কবিতা

গল্প লিখেছেন
সমীর রক্ষিত
কাশীনাথ সিংহ

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজার সঙ্গে দেখা

প্রকাশ কর্মকারের স্কেচ

প্রচ্ছদ কাহিনী

সুন্দরবনের লুপ্ত সভ্যতা

লিখেছেন
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

আলো

আমার আলো

আলোর জন্যে মানুষের তৃষ্ণা মজ্জাগত। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পর থেকে
গতি আর জ্যোতিই হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক যুগের মূল কথা।

কলকাতা শহরেও বিদ্যুতের এই বরাভয় ছিল অবারিত।
কিন্তু কয়েক বছর ধরে খুঁড়িয়ে চলার পর ইদানীং যেন
বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্ত ব্যবস্থাই একেবারে ভেঙে পড়ার মুখে এসে
দাঁড়িয়েছে। কলকাতার নাগরিক জীবন এখন ফিরে যেতে শুরু করেছে
হেস্টিংসের যুগে।

কৈফিয়ৎ অবশ্য অনেক রকমই শোনা যায়। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ইঞ্জিনীয়ার
ও শ্রমিকদের 'নিয়মমাফিক কাজ করার' ঝোঁক নাকি তার মধ্যে
পয়লা নম্বর। তাছাড়া সাঁওতালডিহি ইত্যাদি কোনো কোনো
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যান্ত্রিক গোলযোগের অবদানও কম নয়।

গোটা পরিস্থিতিকেই তাই এখন নতুন করে বিচার করা দরকার। বিদ্যুৎ
যোগানের খামখেয়ালিপনা এবং লোড শেডিং-এর এই
কালব্যাধি নতুন নয়, ক্রনিক। কলকাতার মত বিরাট শহর এবং
এই রাজ্যের ক্রমবর্ধিষ্ণু শিল্প এলাকার দাবী মেটানোর ক্ষমতা উৎপাদন
কেন্দ্রগুলির আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু বিশৃংখলা যখন
অনেকদিনের, নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের ব্যবস্থা কি তখন অনেক আগেই
করা উচিত ছিল না? সে-ব্যাপারে খুব যে একটা
তৎপরতা দেখা গেছে তা বলা যায় না।
তাছাড়া নতুন কেন্দ্রের কাজ যাওবা শুরু হয়েছে, সেখানেও
দেখা যাচ্ছে শম্বুকগতি।
যাই হোক, অবস্থা যখন রীতিমত ঘোরালো হয়ে উঠল, তখন চালু হল
এনার্জি কণ্ট্রোল অর্ডার। এ যেন সেই শেয়ালের কুমিরছানা
দেখানোর মতো।
আসল ঘাটতি একই থাকল, শুধু গোঁজামিল দিয়ে
চেষ্টা করা হল তাল সামলে চলার।
কিন্তু এর ফলে যন্ত্রপাতির ওপর ক্রমাগত চাপ পড়ে
যান্ত্রিক গোলযোগ হয়ে উঠল পৌনঃপুনিক ব্যাপার।
তারই ফলশ্রুতিতে এই বিদ্যুতের দুর্ভিক্ষ।

আলো এবং পাখা ছাড়াও বিদ্যুতের অভাবে শিল্প-উৎপাদনেও
বাধা পড়ছে যথেষ্টই। সমাধানের দায়িত্ব তাই আর এখন রাজ্যস্তরে আবদ্ধ
নেই, এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতীয় সমস্যা।

কলকাতা যে ভারতের চোখের মণি তা তো সকলেই জানি,
সেখানে কি আর 'ব্লাইন্ড স্পট' পড়তে দেওয়া যায়।

মহাকাল মেলের প্যাসেঞ্জার

অমৃত আগের মতই সাদা কাগজে কালো কালিতে ছেপে বেরোবে। আপনার চোখের ওপর চাপ যাতে না-বাড়ে সে জন্যে আমরা যে-টাইপে এতদিন ছেপে আসছি—সেই টাইপেই ছাপতে থাকবো। টাইপ ছোট করা হবে না।

বঙ্গ দর্শন, সবুজপত্র, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, পরিচয়, কল্লোল যেমন সাদামাঠা সাদা কালোয় বেরিয়েছে—অমৃত তেমনই বেরোতে থাকবে। যেটুকু রং—তা লেখাই পাঠকের মনে ধরাবে।

আসল কথা—আমরা পাঠকের বিচারের ওপর সবই ছেড়ে দিচ্ছি। আমাদের কাজ শুধু ধরিয়ে দেওয়া। বাকিটুকু লেখার জোর থাকলে পাঠকের মনে আপনা-আপনি ধরবে। আমরা জানি—আমাদের পাঠক কল্পনাহীন মাটির পাত্র নন। তাঁর মনের আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়ে।

আমাদের জোর লেখায়। লেখার ওপর আমরা সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছি। সেরা লেখা।

কারা লিখবেন ?

নবীন প্রবীণ মিলিয়ে যাঁর কাছে আমরা ভালো লেখা পাবো—শুধু তাই ছাপা হবে অমৃতে। বয়স কোন শর্ত নয়। এর প্রমাণ আমরা দিয়ে আসছি। আশা করি আপনার নজর এড়ায়নি।

এবারের নববর্ষ সংখ্যা তার প্রমাণ। বাজারে পড়তে পায়নি। স্টলে দিতে দিতে উধাও। আঙুরবালার মুখ থেকে শুনে—তাঁর ডায়েরি গুছিয়ে নিয়ে শ্রীযুক্ত বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মেধা ও পরিশ্রম সহযোগে নববর্ষ অমৃতে আঙুরবালার যে-ডায়েরি উপহার দিয়েছেন—তা পরবর্তীকালের জন্যে দলিল হয়ে থাকলো। থাকলো নবীন গল্পকারদের কথা। অগ্রজের দৃষ্টিতে।

গত চার মাসে অমৃত নবীন প্রতিভার সন্ধানে নেমে বিফল হয়নি। তার প্রমাণ কবিতা, তার প্রমাণ গল্প। এঁরাই আগামী দিনের লেখক। এঁরাই বাংলা সাহিত্যে যে যুগ আনতে চলেছেন—সাহিত্যের ইতিহাসে তার নাম হবে—অমৃত-যুগ।

আঠারো বছরের দেবাঞ্জন চক্রবর্তী আমাদের দফতরে একটি গল্প নিয়ে এসেছিলেন। সেটি মুদ্রিত হয়ে অসংখ্য পাঠকের প্রশংসায় ধন্য হয়েছে।

অমৃতে সাহিত্য ও শিল্পে মাস্টারী কিম্বা দারোয়ানীতে বিশ্বাস করে না। অমৃত আসলে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। দরজা খুলে সে বসে আছে। যার যেমন যোগ্যতা সে তেমন ট্রেনের যাত্রী হতে পারবেন। মহাকাল মেলের প্যাসেঞ্জার তো সবাই হতে পারেন না। ভবিষ্যতে অনেককে হয়তো লোকাল ট্রেনের প্যাসেঞ্জার হয়েই থাকতে হবে।

অমৃত টাইম টেবল দেখে সময় মত গাড়ি ছেড়ে যাবে। যে-গাড়িতে যে উঠতে পারেন। পক্ষপাতিত্ব, গোষ্ঠী নির্মাণ অমৃতের ধাতে নেই। তার দরজা সব সময় খোলা। সে মাননীয় পাঠকের ভৃত্য। তবে সে পাঠকের যা দরকার তাই যেমন দেবে—আবার কি দরকার হওয়া উচিত—তাই খুঁজে তাও দিয়ে যেতে থাকবে।

সাদা কাগজে। কালো কালিতে। তাতে মাঝে মাঝে ছাপার ভুল হয়তো থাকবে।

লেখা ভালো হলে পাঠক খুঁজে খুঁটে খুঁটে পড়বেন—এ বিশ্বাস অমৃতের আছে। কারণ, অমৃত সাবালক পাঠকের কাগজ। তাঁকে রং দিয়ে ভোলাতে যাওয়া অর্থহীন।

অমৃত প্রধানত জোর দিয়েছে—নবীন প্রতিভার ওপর। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভিজেদের গন্ধ পাখির গান' কিংবা প্রভাত চৌধুরীর 'ভোলা কঠিন'—তারই প্রমাণ। উদাহরণ বাড়াবো না।

অমৃতের কাছে কবি সমাজের একজন প্রধান মানুষ। শিল্পী একজন অগ্রণী স্রষ্টা। তাই ছবি দিয়ে কবির কবিতা। রেখাচিত্রের সঙ্গে শিল্পীর পরিচয়।

আন্দামান থেকে বেড়াচাপা, গারো হিলস্ থেকে পুণা—সর্বত্র আমাদের পাঠক। আমাদের চিঠির বাক্স খুললে প্রতিদিন তার প্রমাণ পাই আমরা।

আসুন। আমরা সবাই এখন মহাকাল মেলের প্যাসেঞ্জার হব। **বৈকুণ্ঠ পাঠক**

আদিম অসম্মান

১৫ এপ্রিলের অমৃতে বোলান গঙ্গোপাধ্যায়ের "আদিম অসম্মান" পড়লাম। আজকালকার সভ্যসমাজে সর্বজনগ্রাহ্য অথচ নিন্দিত যতগুলি কুপ্রথা আছে প্রাক বিবাহ 'মেয়ে দেখা' তার মধ্যে সবচেয়ে নোংরা। হাটবাজারে মালপত্র নেড়েচেড়ে পরখ করে যাচাই করে সওদা করার মত। ইদানীং কিছু ভদ্রসন্তান এটিকে প্রায় ব্যবসায়ে পরিণত করেছেন। কোনও ভদ্রজন 'শ'পাঁচেক মেয়ে দেখে' বউ পছন্দ করার কৃতিত্ব সগৌরবে জাহির করেন। পাঁচ মিনিটে একটি মেয়েকে চাক্ষুষ দেখে দু-চারটা কথা বলে কিছুই বোঝা সম্ভব নয় বলেই মনে করি। এ বিষয়ে যা দরকার তা হল ভাবী স্বামীস্ত্রীর মধ্যে অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্ষমতা। এটাই সর্বজনসম্মত শ্লোগান হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে পরিমল গোস্বামীর লেখা যুগান্তরে "এককলমীর ইতশ্চেতঃ" হতে কটা লাইন তুলে দিচ্ছি। এটি লেখা হয়েছে ২৭।৩। ১৯৫৫ তারিখে যখন কলকাতায় টেলিভিসন অতিদূরে ভবিষ্যতের জিনিস। লেখাটির শিরোনাম।

"টেলিভিসনে কনে দেখা"

'অতঃপর কনে দেখা চলবে টেলিভিসনের সাহায্যে টেলিভিসন প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট ফী নিয়ে ব্যবস্থা করতে পারবে অনায়াসেই। বরপক্ষের দর্শকদের আপ্যায়িত করতে হবে না, কনেকে পরীক্ষকদের সামনে উপস্থিত থেকে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হবে না। স্টুডিওতে বসে আবৃত্তি কিংবা গান গাইতে গাইতে দাঁত দেখানর ছলে হাস্য, চিরুনির সাহায্যে চুল আঁচড়ানোর ফলে চুলের দৈর্ঘ্য দেখানো এবং দুখানা হাত এবং দুখানা পা ঠিক আছে কিনা তা স্কিপিং করে নেচে দেখান যেতে পারবে। সঙ্গে কমেন্টারী থাকবে—খেলাধুলো বা অন্যান্য উৎসব রিলে করবার সময় যেমন হয়ে থাকে অথবা সিনেমার সংবাদ চিত্রে যেমন হয়ে থাকে তেমনি। কনেরা দাবি করলে বর দেখানোর ব্যবস্থাও ঠিক এভাবে হওয়া সম্ভব।' **স্বপনকুমার গোস্বামী**, বাগনান চৈতন্য বাটি, হুগলী।

সম্পাদকের কলম

মানুষের মর্যাদা

যদি প্রশ্ন করেন, আজকের ভারতবর্ষে সবচেয়ে শোচনীয় দুর্ঘটনা কি ? আমি বলব, তার নাম দারিদ্র নয়, অশিক্ষা নয়, রোগ নয়, নয় দ্রব্যের দুর্মূল্যতা অথবা কালোবাজার অথবা কালো টাকা, তার নাম নয় অনাচার কিংবা বেকারী। আমার কাছে ভারতের সবচেয়ে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঃ মানুষের মর্যাদার দ্রুত অবক্ষয়।

গোটা দেশের যেখানেই দৃষ্টিপাত করুন, বঙ্গে কলিঙ্গে কাশ্মিরে অথবা কর্ণাটকে, সমাজের নিচের তলায়, মধ্য সারিতে অথবা উঁচু স্তরে, দেখতে পাবেন, মানুষ হিসেবে আমরা অন্যের কাছে এবং নিজের কাছে মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছি; মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার, মেরুদণ্ড শক্ত রাখবার শক্তি আমাদের নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

দারিদ্র বহুগুণনাশী: পশ্চিমের লোকেরা মনে করে দারিদ্র ও মনুষ্যত্ব পরস্পরবিরোধী, একে অন্যকে বিনাস করে। কিন্তু আমাদের ভারতীয় সংস্কারে দারিদ্রের মধ্যেও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল বহুকাল। ভোগ্য বস্তুর অভাব আমাদের সংস্কৃতিতে মনুষ্যত্বের অভাব বলে চিহ্নিত ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বর্জনের মধ্যে মাহাত্ম্য ছিল। সহজ সরল জীবন-যাত্রার প্রাচীন মর্যাদা ছিল। আজ যাঁদের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে তাঁরা অনেকেই এখনও স্মরণ করতে পারবেন গ্রামীণ জীবনে সব দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষের অসম্মান ছিল না! যা মানুষের মর্যাদা ও সম্মানকে অস্বীকার করে যেত তা হল আমাদের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। জমিদার তালুকদারগণ গরীব প্রজাদের কখনও মানুষের সম্মান দিতে জানতেন না। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা সংযুক্ত ছিল জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে; বড় জাতের লোকেরা 'অস্পৃশ্যদের' মানুষ মনে করত না, তারা ছিল মনুষ্যেতর একধরনের দ্বিপদ প্রাণী। এই জাতিভেদ+সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি একদিকে যেমন আমাদের চোখে মানুষের মনুষ্যত্ব আড়াল করে রাখত অন্যদিকে ভদ্র সমাজের মূল্যবোধগুলির মধ্যে বর্জন, ত্যাগ, সারল্য ইত্যাদির একটা সার্বজনী লোকায়ত আবেদন ছিল। মোটামুটিভাবে, ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালী, সমাজ যত-না ছিল (এবং আছে) শ্রেণী-সচেতন, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল (এবং আছে) সংস্কৃতি-সচেতন, একই কারণে জাতি-বর্ণ সচেতন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথম আমাদের মানুষ হিসেবে মর্যাদা-বোধ শেখাল। যে মর্যাদাবোধ একদা রাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজি, সিরাজদ্দৌল্লাহ্ এবং নানাসাহেব প্রমুখ সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের জীবনায়নে বিমূর্ত ছিল, স্বরাজ অর্জন করে নেবার সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সংগ্রাম সে মর্যাদাবোধ ভারতবর্ষের লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করল। পরাধীনতা থেকে, দাসত্ব থেকে, অত্যাচার উৎপীড়ন, শোষণ, দুঃশাসন এককথায় মানবাত্মার সর্বাত্মক অবমাননা থেকে মুক্তি পাবার লড়াইএ অংশ নিয়ে আমরা প্রথম বিরাটভাবে সম্মানিত হলাম নিজেদের চোখে, অন্যের চোখে, পৃথিবীর চোখে।

এ মনুষ্যত্ব-মর্যাদাবোধ শিখরে উঠল মহাত্মা গান্ধীর জীবন-দৃষ্টান্তে। তিনি বিশ্বের দরবারে দরিদ্র অর্ধ-নগ্ন ভারতবাসীর অপরাজেয় মানবিক শক্তির প্রতীক হিসেবে ভাস্বর হলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউবা ধনী, কেউবা নিঃস্ব এবং প্রত্যেকেরই মনুষ্যত্ব কিছুটা মর্যাদা পেয়ে গেল।

মানুষের মর্যাদার অবক্ষয় শুরু হল দেশ স্বাধীন হবার পর। একদিকে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের মর্যাদা বাড়ল— ভারতবর্ষ মর্যাদা পেল তার জাতীয় সংহতি ও উন্নয়নের জন্য, তার জোট-নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির জন্য; তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও বলের জন্য। অন্যদিকে আমরা, ভারতবাসীরা, দ্রুত মনুষ্যত্বের মর্যাদা হারিয়ে যেতে লাগলাম এবং এই ভয়ংকর অবক্ষয় আমাদের মানসিকতাকে বিশেষ পীড়িত করল না।

এ দুর্ঘটনার জন্যে অনেক কিছু দায়ী—আমাদের পণ্ডিতগণ এর কারণগুলিকে পুরোপুরি বিশ্লেষণ পর্যন্ত করে উঠতে পারেন নি। সব কারণ বিশ্লেষণের ক্ষমতা আমার নেই। যেটুকু ক্ষমতা আছে তাতে দেখতে পাচ্ছি, সামন্ত-তান্ত্রিক জাতিভেদজর্জর সমাজ ব্যবস্থাকে মূলে পরিবর্তনের পথ পরিত্যাগ করে, তারই ওপরে, সমাজবাদের নকল লেবেল লাগিয়ে, একটা অর্জনেচ্ছু (এ্যাকুইজিটিভ) ধনতন্ত্র গড়ে তোল-বার জাতীয় প্রচেষ্টা আমাদের মানবিক মর্যাদাবোধকে ক্রমে ক্রমে আহত করে সত্তর দশকের মাঝামাঝি একেবারে ধূলিসাৎ করে দেবার উপক্রম করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের মানবিক মর্যাদা অস্বীকৃত থেকে যায়; জমিদার-মহাজনের কাছে প্রজা ও ঋণগ্রস্ত মানুষের আত্ম-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবার কোনও উপায় ছিল না। তাই বার বার তাকে বিদ্রোহী হতে হত, এবং সে বিদ্রোহ দমন করতেও ক্ষমতা-শালীদের বিশেষ বেগ পেতে হত না। (পৃথিবীর সব দেশেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ নিয়মিত ঘটনা ছিল, এবং এসব বিদ্রোহের অধিকাংশই ইতি-হাসে লিপিবদ্ধ হত না।) এই সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির ওপরে আরোপিত হল নতুন এক অর্জনেচ্ছু সম্ভোগী ধন-তান্ত্রিক সংস্কৃতি। আমরা যে যেমনি করে পারি সম্ভোগের সম্ভার আহরণে উঠে পড়ে লেগে গেলাম। রাজপুরুষ, আমলা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ধনী চাষী, বুদ্ধিজীবী, কেউ এই অর্জনের ঘোড়-দৌড় থেকে বাদ পড়ল না।

আমাদের সামাজিক প্রতিপত্তির নির্দেশনগুলিও দ্রুত বদলে গেল। দেখতে পেলাম, সবার ওপরে রাজশক্তি সত্য, তাহার ওপরে নাই। অর্থাৎ যাঁর হাতে শাসন ক্ষমতা, বেশি অথবা মাঝারি অথবা কম, তার পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাকে কুর্নিশ করছে ধনবান, বিত্তবান, বুদ্ধিমান, সবাই; তার চতুর্দিকে স্তাবকের সমাবেশ। রাজশক্তির পরেই ধনশক্তি। বিত্তশক্তি। এবং ক্রমে ক্রমে এই দুয়ের মধ্যে বেশ একটি মিতালি গড়ে উঠল। আমি কেবল রাজনৈতিক মিতালির কথা বলছি না। তারও চেয়ে সাংঘাতিক, সাংস্কৃতিক মিতালি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-উত্তর সংস্কৃতি তৈরী হয়েছে এই ত্রিমূর্তির নির্দেশনায়। এটা রাজত্ব-ধন-বিত্ত সংস্কৃতি।

এই নতুন সংস্কৃতিতে মানুষের মর্যাদা ততটা হীন হতে পারত না যদি আমাদের রাজপুরুষরা, ধনবানরা এবং বিত্ত-বানরা আত্ম-মর্যাদাকে অর্জন, সম্ভোগ ও ক্ষমতার চেয়ে বেশি দাম দিতেন। অন্তত সমান সম্মান।

দেখা গেল, ক্ষমতা, এবং সম্ভোগ ঐশ্বর্য অর্জন ও রক্ষণের প্রয়োজনে এঁরা, কখনও কতিপয় ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, আত্ম-মর্যাদা বিসর্জন দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

আর বুদ্ধিজীবীরা? তাঁদের মধ্যে যাঁরা পিরামিড বেয়ে ওপরের দিকে ধাবমান, তাঁদের মধ্যেও স্তাবকতা, ভয়, সবদিক বাঁচিয়ে-চল। এবং সবরকম-বিপদ-এড়িয়ে-চলার মানসিকতা প্রাধান্য পেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে প্রতিবাদ, প্রতিঘাত, সংগ্রাম পলাতক হল বুদ্ধিজীবীদের জীবনদর্শন হতে; আমরা কর্তার ইচ্ছেমত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে সম্ভোগের মালমসলা অর্জনের মহান কার্যে আশ্চর্য অধ্যবসায়ী হলাম।

তার জন্যে সংগ্রাম সংঘাত কিন্তু নিলুপ্ত হল না আমাদের সমাজ থেকে। হবে কি করে? উন্নয়নের আশীর্বাদ ধনীদের ধন বাড়িয়ে চলল, দরিদ্রদের দারিদ্র। এবং যারা পড়ে রইল সম্ভোগ-প্রাঙ্গণের সংক্ষিপ্ত সীমানার বাইরে, তারা চালিয়ে গেল তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, মনুষ্যত্বের মর্যাদা অর্জনের সংগ্রাম।

কিন্তু একটা সাংঘাতিক দূরত্ব তৈরী হয়ে গেল সংগ্রামী মেহনতী মানুষ ও ভদ্রলোক, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী ভদ্র-লোকদের মধ্যে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে গা ঘেষাঘেষি হলেও দূরত্ব বজায় রইল পুরোপুরি এবং বেড়েই চলল। আপনি যদি মধ্য অথবা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেউ হন, নিজের জীবন দিয়েই ব্যাপারটা যাচাই করুন। ঐ [illegible] যারা [illegible]

ক্ষুধার্ত ইত্যাদি, তাদের কারুর সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় আছে আপনার? চেনেন কাউকে? সারা দিনে দশ মিনিট এদের কারুর সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক মানবিক বাক্যালাপ হয় আপনার? আপনার ছেলেমেয়েরা রোজ কনভেন্ট স্কুলে যাবার পথে দশটা বস্তি পেরিয়ে যায়। বস্তিবাসী একটা ছেলেমেয়েও কি চেনে? কলকাতার ১০ নম্বর লেক রোডের বাড়িতে যেসব স্কলার বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করছেন তাঁদের একজন গবেষণা করে দেখতে পাচ্ছেন কলকাতা শহরে ভদ্রলোক ও শ্রমিকদের মধ্যে মানসিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

ভারতের দারিদ্র্য, অতএব, আমাদের অনেকের কাছেই শুধু একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্রাকশন। পরিসংখ্যান পরিভাষায় পলাতক প্রাচীন পদার্থ। দেশের বিয়াল্লিশ শতাংশ মানুষের দৈনিক রোজগার ষাট পয়সা অথবা চল্লিশ পয়সা! এ-ধরনের শব্দমালা আমাদের মনকে একটুও কম্পিত করে না। অংকের ফাঁকে ফাঁকে চেনা মানুষের মুখ দেখতে পাইনে আমরা। যাদের নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করি, প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা করি, তারা সংখ্যা মাত্র, মানুষ নয়।

সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যেও স্থান নেই তাদের। ভাবতে অবাক লাগে, কি আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে, কুড়ি পঁচিশ বছরে, কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে তাদের যারা কাজ করে মাঠে, বন্দরে, কারখানায়, যাদের গায়ের ঘাম গোটা দেশের জীবনের মেশিন চালু রাখে! শুধু তাই নয়, নিম্ন মধ্যবিত্তদের নিয়েও আজকাল আর কেউ গল্প-উপন্যাস বিশেষ রচনা করেন না। পঞ্চাশ দশকে বাংলা উপন্যাসের স্টেপল ছিল উদ্বাস্তু; তারাও এখন লেখকের উপেক্ষিত। সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের মানসিকতা মধ্য ও উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে দড়ি-বাঁধা।

দেশের বিয়াল্লিশ শতাংশ মানুষের দৈনিক রোজগার ষাট পয়সা

এবং যেহেতু এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে আত্ম-মর্যাদা বোধ সব চেয়ে কম, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগ্রাম নেই বললেই হয়, স্তাবকতা সব চেয়ে বেশি, নিজেরটা-গুছিয়ে-নেওয়া প্রধান জীবনদর্শন, অন্যায় অবিচার দুর্নীতির সঙ্গে পা ও মন মিলিয়ে চলা এদের লাইফ-স্টাইল, সেহেতু কথাসাহিত্য থেকে চলে গেছে মানুষের সেই স্বকীয় মর্যাদা, সেই অবশিষ্ট ভাস্বর-দীপ্তি, যা আমরা বহুদিন পেয়ে আসছিলাম গল্পে উপন্যাসে শরৎচন্দ্র থেকে তারাশংকর পর্যন্ত এক ধারাবাহিক সমাজ-সংস্কৃতি পরিবেশে।

সংগ্রাম, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ইত্যাদি বাস্তব এবং মূল্যবোধের প্রস্থানের সঙ্গে সাহিত্যের আসর জুড়ে বসল সম্ভোগী মানসিকতা, চাই-চাই সংস্কৃতি। যৌনতা, হিংসা, বিচ্ছিন্নতা মনোবিকলন সম্ভোগী মানসিকতার একটা উদভ্রান্ত চটকদার দিকই শুধু খুলে ধরল সাহিত্যের পাতায়, তার সামাজিক রাজনৈতিক দিকটার দিকে লেখকরা অন্ধ চোখ নিক্ষেপ করে রাখলেন।

বুদ্ধিজীবীদের তো স্বকীয় কোনও স্বতন্ত্র ভূমিকা নেই সামাজিক বিকাশ ও পরিবর্তনে। অন্তত নেই ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে আপামর জনসাধারণ দরিদ্র ও নিরক্ষর এবং বুদ্ধিজীবীরা মানসিক ঔপনিবেশিকতার শিকার। অথচ ত্রিশ বছরে তারা তাদের প্রাপ্যের চেয়ে কি বেশিই পাননি সমাজ-কর্তাদের অনুগ্রহে, বিদগ্ধ আনুগত্য অথবা নাবালক স্তাবকতার উদার পুরস্কার? আমরা যারা বর্তমান কালের লেখক আমাদের তো কোনও মতেই বঞ্চিত, উপেক্ষিত বলা চলে না। আমাদের যে ফ্রাস্ট্রেশন তার উৎস, প্রথম, আরও না-পাওয়া; দ্বিতীয়, নিজেদের মানবিক মর্যাদাবোধে ধারাবাহিক অবক্ষয়।

সমালোচনা

প্রাকৃত জনের তরে বাবুদের জন্য নয়

অগ্রজ কবি কৃষ্ণ ধর তাঁর 'যে যেখানে আছো' কাব্যগ্রন্থে কবিকৃতির ঐতিহ্যময় স্বাক্ষরে পুনর্বার একটি মানবতাকে স্বাগত জানালেন। অগ্রজ এই কবি একটি চিন্তার কাছে প্রণত, একটি বিশেষ ধ্যানের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই ধ্যান এবং চিন্তার যে সার্বিক প্রতিফলন তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থটির কাব্য শরীরে। গ্রন্থটিতে পঁয়তাল্লিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে এবং যার প্রতিটি শব্দই একটি অপ্রমেয় চেতনায় মানুষের জন্য, মানুষের কাছে কিছু বলার অধিকারে উৎসর্গীকৃত।

কবি কৃষ্ণ ধর একটি মতাদর্শে বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস মানবমুখী। তাঁর বক্তব্য ঋজু, স্পষ্ট, জীবনের জন্য তাই এই আকৃতি পাঠককে যেন অবলীলায় মানুষের অত্যাচার, পীড়ন এবং নিগ্রহের সামনে দাঁড় করায়। যেন তখন পাঠক চিত্ত এই প্রথাগত জীবনের সর্বপ্রকার তাচ্ছিল্যের বাইরে দাঁড়িয়ে একটি ভিন্ন জীবনের, অন্য প্রাণের স্বাদ পেতে ভীষণভাবে অস্থির হয়। তখন মনে হয় একটি বিশেষ ভাবমূর্তির অঙ্গনে পাঠককে নির্মল চিত্তে দাঁড় করানোর জন্য কবির যে ব্রত, তাতে তিনি সার্থক, সফল ও কৃতদর্শী।

তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দুকে ছুঁয়ে আছে যে দ্বিধাগুলি তা হল, মানুষ কেন নিজস্ব নিয়মে বেঁচে থাকা দরকার বলেই বেঁচে আছে।' উদাত্ত 'শত্রু ফৌজ আচমকা হানা দেবার জন্য তৈরী'। এই বোধ এবং বক্তব্যকে ঘিরেই কিন্তু তাঁর কবিতাগুলি মুহ্যমান নয়। 'আমলকীর মত এই পৃথিবীতে মানুষ অদ্বিতীয়।' মানুষের এই পৃথিবীকে কবি ভালবাসেন। এই ভালবাসার পৃথিবীতেই মানুষ তাই 'অপ্রতিম নিজস্ব ঈশ্বর'।

এই পৃথিবীর মানুষ, মাটি, অপাপবিদ্ধ শৈশবের অন্তরালে আলো যা কিছু, টুকি-টাকি যা মানবিক মূল্যবোধকে বিঘ্নিত করে, কবিকে ব্যথিত করে, পীড়ন করে কবির 'রক্তের ভিতর তারই কথা অবিরাম করে আনাগোনা।' নির্দ্বিধায় কবির বাসনায় জীবনের অস্থির ধূলিকে মুঠো করে ধরে

কৃষ্ণ ধর

রাখব ছন্নছাড়া শিল্পীর আঁকা দুরন্ত প্রচ্ছদ পটে।'
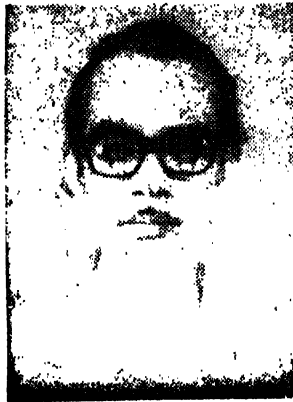
কাব্যপটে তাই চিহ্নিত হয়ে আছে এমন অজস্র প্রতিজ্ঞা। যেমন 'মানুষের ট্র্যাজিক মহিমা', 'এখন ওদের উপোসী দিন', 'ওদের গায়ে শুধু ছেঁড়া কানি,' 'ঘুম নেই বন্দীদের ঘরে' অথবা 'রোজ দেখি মেয়েটাকে ফুটপাতে হাত পেতে থাকে তারও বাঁচতে সাধ।' কিম্বা 'ট্রামে বাসে পা-দানিতে ঝুলে দাঁতে দাঁতে রোষ চেপে এইভাবে প্রতিদিন আছি।' এই শিল্পীর প্রচ্ছদপটে সুচিহ্নিত হয়ে আছে 'কালো অরণ্যের সেই নির্বাসিত মানুষ' যাদের 'থাকতে দেয় নি নাৎসীরা।' কিম্বা সেই 'বুখেনভেল্ট, অসউইজ, বেলসেনে যাদের বর্বরতায় উজাড় হয়েছে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ।' হৃদয় বোধে এ কবির কাব্য তাই কবির ভাষায় 'প্রাকৃত জনের তরে বাবুদের জন্যে নয়'। কবির এই মর্মবোধ মানুষের সঙ্গে একটি নিবিড় সম্পর্কে অচ্ছেদ্য। তাই স্বাভাবিক চিন্তার স্রোতধারায় কবির 'কিছু কথা বলে যেতে ইচ্ছা করে', 'অপরিচিত মস্কোভা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে যে যেখানে আছো সবার জন্যে।' সে জন্যেই কবির শেষ কথা 'কিছু স্মৃতি কিছু বা বিস্মৃতি/সবই অক্ষরের হাতে সঁপে বিনয়ের মতো বসে আছি।'

কবি একটি নিজস্ব অভিজ্ঞতার পরিধি রচনা করে তার মধ্যে পদচারণা করেছেন কিন্তু কোথাও তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর মাত্রা ছাড়িয়ে স্লোগান কিম্বা ঘোষণায় পর্যবসিত হয়নি। বরং তীক্ষ্ণ, তীর্যক ভাষা কাব্যের পরিমন্ডলে সংযোজিত হয়ে একটি মমত্ব-বোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কবি কৃষ্ণ ধরের পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে যে ধ্বনি লক্ষ করা যায় এখানে তার মননচিন্তা আরো গম্ভীর এবং তার ফলশ্রুতি যেন একটি ধ্রুপদী ব্যাঞ্জনায় সার্থকভাবে কৃত।

সত্যেন্দ্র আচার্য

যে যেখানে আছো। কৃষ্ণ ধর। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬।

অজানা অদেখা জীবন

ভ্রমণ কাহিনী আজও আমাদের প্রিয় পাঠ্য। বিচিত্র দেশে, বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অজানা অদেখা জীবনের স্বাদ। মানুষ জানতে চায়, মানুষ মেলাতে চায় মিলতে চায়। এত বড় পৃথিবীর কতটুকুই বা এক জীবনে জানা যায়। অনেকের অভিজ্ঞতায় অনেকের জ্ঞান ভান্ডার সম্পূর্ণ হয়। খন্ডকে জোড়া লাগাতে লাগাতেই হয়তো সম্পূর্ণের জ্ঞান লাভ হয়।

কমল দাশ আমাদের দিয়েছেন ইংল্যান্ডের জীবন সাহিত্য দৃষ্টব্য। দীর্ঘ-দিনের ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতা। মেঘে ঢাকা যার আকাশ, সূর্যের দেখা যে দেশে কদাচিৎ মেলে। যে দেশের অ্যারিস্টোক্র্যাসি প্রায় কিংবদন্তীসুলভ। সে দেশেও মানুষের স্বাভাবিক আবেগ আছে, প্রেম, মৃত্যু, বিরহ, বিচ্ছেদ আছে। সেখানেও প্রকৃতি রূপণ। সেখানেও সম্পদ। মানুষের নিষ্ঠা, শ্রম, দেশ প্রেমে গড়ে তোলা বৃটিশ দ্বীপ-পুঞ্জের অনেক [illegible] খবর, অজানা খাবার, অজানা প্রথার কথা শ্রীমতী দাশ লিখেছেন। অসামাজিক ইংরেজদের সঙ্গে মিশে তাঁদের জীবনের দুঃখ সুখের কথা টেনে বের করেছেন।

ভ্রমণ কাহিনী অনেক লেখা হয়েছে। লেখা হবে। তবে এত সহজ সরল, এত আন্তরিকতাপূর্ণ একটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতা কদাচিৎ মেলে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

জানা অজানা : কমল দাশ। শঙ্খ প্রকাশন। নয় টাকা।

প্রতিবেশী সাহিত্য

মলয়ালম গল্প সাহিত্য বিশিষ্টতায় চিহ্নিত হয়েছে বিশেষ করে গত দু-তিন দশকেই। নিছক সৃষ্টি ধর্মীতায় বাঁধা না থেকে মলয়ালম সাহিত্যিকেরা রূঢ় বাস্তব ও সামাজিক বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন এবং সেগুলিকেই তাঁদের সাহিত্যে

ব্যাপকভাবে ঠাঁই করে দিলেন। ফলতঃ বর্তমান-কাল, সমাজ, দেশ পুরোপুরিই সুস্পষ্টভাবে এসে গেছে তাঁদের সৃষ্টিতে। যা মলয়ালম সাহিত্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

বর্তমান গল্প - সংকলনটি সেই উজ্জ্বলতাকেই চিহ্নিত করে। এতে ঠাঁই পেয়েছেন মলয়ালম সাহিত্যের প্রথম সারির লেখকরাই। ১৭ জন লেখকের একটি করে গল্প। —পি কেশবদেবের 'ভাবী স্বামী' গল্পটিতে চারজন তরুণীর ভাবী স্বামীর ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ চাহিদার মাধ্যমে, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের ফারাককে ও নারীদের জটিল মনস্তত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। কিছুটা একই কাজ করেছেন বৈকম মুহম্মদ বশীর তাঁর গল্পে। নাগ-হল্লী আর এস কুরুপের গল্পে সফলভাবেই উপস্থিত হয়েছে, তার মূল উপজীব্যটি অর্থাৎ মানুষ - মানুষীর শাশ্বত প্রেমের ব্যাপারটি। এম টি বাসুদেবন নায়ারের 'অন্ধকারের আত্মা' গল্পটিতে—মূলতঃ এক সুস্থ মানুষকে পাগল বনে থাকতে হয়। সমাজ - সংসার থেকে দূরে ঠেলে রাখা হয়। সে কিন্তু মুক্তি চায়, সুস্থতার স্বীকৃতি চায় স্বজন - সংসারের কাছে ফিরে আসতে চায়; সুযোগ দেওয়া হয় না; তার করুণ আর্তি পাঠককে নাড়াবে। যেমনটা নাড়াবে মাধবী কুট্টির 'বাধার চিঠি' গল্পের এক ব্যর্থ প্রেমিকার তীব্র যন্ত্রণাবোধের ব্যাপারটা; অন্যান্য গল্পতেও মানুষ-মানুষীর আশা-আকাঙ্খা স্বপ্ন-ভাবনা, সুখ-দুঃখ নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। প্রত্যেকটি গল্পই অল্পবিস্তর বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে।

মোট কথা এই সংকলনটি মলয়ালম গল্প - সাহিত্যের যোগ্য প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি পেতে পারে স্বচ্ছন্দেই। অনুবাদ স্বচ্ছন্দ।

কথা ভারতী: মলয়ালম গল্পগুচ্ছ। সম্পাদক - ওমচেরী এন এন পিল্লে। অনুবাদ নিবেদন পালিত। প্রকাশক - ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি।

পত্রিকা

পোলক বীথী—২। সম্পাদক : দীপক মজুমদার। কলকাতা-৪৭ ২ টাকা।

প্রথম প্রচ্ছদে দেওয়া সম্পাদকীয়টিতে —(১) দখলিতনীতি, আত্মবিকৃত কলকাতা কালচার, এলোমেলো করে দে মা' বর্তমান বঙ্গ সংস্কৃতিকে শুদ্ধীকরণে প্রয়োজনীয় এটা সেটা (২) শংকর-কেরা - যোগসূত্র হারিয়ে যাওয়া (৩) উৎপলকুমার বসুর বাংলা সাহিত্যের মাইফেলখানা থেকে দীর্ঘদিন সরে থাকা—এই তিনটি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গ সময়োপযোগী। সম্পাদককে লেখা বুদ্ধদেব বসুর দুটি চিঠি। —বাস কটি লাইন হল—'স্বাধীনতা—তা শিল্পের রচনায় আচারব্যবহারে যা-হোক না, তার মূল্য বোঝা দূরে থাক, যেটুকু আছে তা-ও বিকিয়ে দেবার জন্য এই দেশ উঠে-পড়ে লেগেছে।' শিল্প সাহিত্য নিয়ে আরও কথা লিখেছেন বুদ্ধদেব, যা চমকে দেয়। সেদিক দিয়ে এই চিঠি দুটো এই সংখ্যার পাঠকদের কাছে একটা রিডিং আইটেম হবে। একটু হাল্কা-ভাবে বললে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সভাকে খালির মাঝিও'। দুর্লভ কমল মজুমদার তাঁর মার্কামারা সেমি-বঙ্কিমী গদ্যের পাঁচ পাতার মতো একটি লেখা দিয়েছেন। যে লেখা নিয়ে কিছু বলা হচ্ছে না এখানে। সন্দীপনের উপন্যাস নিয়ে যমুনা চৌধুরীর দীর্ঘ আলোচনাটি পাঠককে হয়ত কিছুটা বোর করবে। আলোচ্য বিষয়ের জন্যেই হয়ত বা 'ভয় : কলকাতার চিত্রকলা' প্রবন্ধটি তীব্র বিশ্লেষণী হওয়ার জন্যেই পাঠককে ভাবাবে। আলোচ্য বিষয়টিকে পাঠকের কাছে ভালোভাবেই পরিষ্কার করে দেবে। তারাপদ রায় প্রমুখদের কবিতার ভীড়ে গৌরকিশোর ঘোষের 'কলকাতার বাবু-বিবেক' কবিতাটি একচোটে নজর কাড়ে। তার আবার শেষ প্যারাটা সবচেয়ে বেশী। —'যারা ঝোলে আর দোলে। আর ফাঁক পেলে হাপুস নয়নে বলে। এসব ঝকমারি আমার মাইরি একদম সয় না।' —বোধহয় নিজেদের 'জলের মত, যখন যে পাত্রে' মুখটার মুখোমুখি হই বলেই।

গৌতম ভট্টাচার্য

মেছো ধাতের পাঁচালী

বাঙালী মাছখেকো জাত। তার এই মেছো ধাতের জন্য সে ভারতে অনন্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে, যেদিন থেকে বাঙালী জাতের উদ্ভব, সেদিন থেকে তার এই ধাত তৈরী হয়েছে। তৈরী হয়েছে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড আর দ্রাবিড়দের মিশ্রণে। নদী-নালা খাল-বিল জলার অধিবাসী বাঙালীর ভাত যেমন অতি প্রিয় খাদ্য তেমনি মাছও। উত্তর-পশ্চিম থেকে আগত মাংস-ধাত ও পরেকার অহিংস ধর্মের ভিত্তরে ওপর দাঁড় করান শাকাহার অভ্যাস কি করে মেছো ধাতে পরিণত হল, এই প্রবন্ধে তার কাঠামো খুঁজে বার করা হয়েছে।

লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—যার লেখা এর আগে আপনারা পড়েছেন—মানুষ : মাছ : সমুদ্র।

মাছ খাওয়া নিয়ে শুধু বাঙালীরই কোন জাত-বিচার নেই। না হলে তামাম হিন্দুস্থানে উচ্চ কোটির মধ্যে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে মাছ খাওয়া প্রায় গোমাংস ভক্ষণের মতোই ট্যাবু। ব্যতিক্রম শুধু দক্ষিণের কোঙ্কনী গৌড় সারস্বতরা। শোনা যায় তাদের রক্তে আছে নাকি প্রাচীন বাঙালী ঐতিহ্যের ছিটে।

এখনকার শহুরে বাঙালী বামুনদের কথা বাদ দিই। তাদের কাছে শুধু মাছ কেন, যে কোন আমিষ পদার্থ— মেষ-ছাগ থেকে ক্ষেত্রবিশেষে বরাহ-গোমাংস পর্যন্তও সিদ্ধ। পক্ষী মাংসের তো কথাই নেই। কিন্তু তখনকার দিনে, অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর আগেও কোন বাঙালী বামুনের হাঁড়িতে রামপাখি তাকে একঘরে করার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। গোমাংস ভক্ষণ তো দূরের কথা, উচ্চারণেই ছিল মহাপাপ। বামুন বাড়িতে হাঁসের ডিম চালু ছিল কেবল অজাতশ্মশ্রু পৈতে-না-হওয়া বালক আর মা-ঠাকরুনদের জন্যে। উপবীতধারীর পক্ষে স্থলচর ও খেচররা ছিল সম্পূর্ণ অভক্ষ্য। সিদ্ধ ছিল শুধু বলির পাঁঠা আর হরিণ-মাংস। এছাড়া ঢালাও পাসপোর্ট ছিল মাছের বেলায়। মাছের সঙ্গে অন্যান্য জলচরে যে খুব একটা আপত্তি ছিল তা নয়। যেমন চিংড়ি, কাঁকড়া, কচ্ছপ, গেঁড়ি-গুগলি ও কুঁচে (বান জাতীয় এক রকম মাছ)। কিন্তু কট্টর বামুনদের হাঁড়িতে কুঁচে-কচ্ছপ-কাঁকড়া এই তিন 'ক' বড় একটা জায়গা পেত না অযাত্রা বলে। গেঁড়ি-গুগলির চল সুখে-অসুখে যথেষ্টই ছিল, প্রমাণ পরমহংস দেবের জীবনী।

তবে যে সব বাঙালী পণ্ডিতদের কাশীতে নাড়ীকাটা ও টিকি বাঁধাই হত তাদের কথা ভিন্ন। সে সব ক্ষেত্রে কর্তা-গিন্নির বিছানা একটা, কিন্তু হাঁড়ি দুটো। কর্তার কাছে আমিষ ভক্ষণ মহাপাতক, আর গিন্নির কাছে নিরামিষ আহার জলজ্যান্ত বৈধব্য। নির্ভেজাল বাঙালীর পাতে কিন্তু রোজ দু বেলা এক টুকরো মাছ না হলেই নয়। একটু আঁশটে গন্ধ না থাকলে সাধারণ বাঙালীর খাওয়া আর না-খাওয়া সমান। আর এ ব্যাপারে বাঙালীর মধ্যে বামুন-চণ্ডাল ভেদ নেই। সারা ভারতে হিন্দু-অহিন্দুদের মধ্যে আমিষভোজী জাত বহু। কিন্তু বাঙালীর মতো এমন মাছের টান তাদের কারুর নেই। তামিলনাড়ুর খৃস্টান জেলেরা কিংবা কেরলের মুসলমান জেলে মোপলারাও নয়। মৎস্য-প্রিয়তায় বাঙালী এই প্রকাণ্ড দেশ ভারতবর্ষে সব জাতকে ছাড়িয়ে গেছে। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'মেছো ধাতে'র জন্যেই বাঙালী সেরা 'মাছখোর'। তার মৎস্যপ্রীতির তুলনা কেবলমাত্র মার্জারের সঙ্গে।

ইতিহাসের মাছ

বাঙালীর সঙ্গে মাছের নাড়ীর সম্পর্ক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সামগ্রী। এই সুপ্রাচীন সম্পর্কটাই হলো তার মৎস্য-প্রিয়তার আসল কারণ।

নাবাল বাংলাদেশে (অখণ্ড) নদী-নালা-খাল-বিল অসংখ্য। পূব বাংলার বহু জনপদ তো জোয়ারে ডোবে, ভাঁটায় ভাসে। এ রকম একটা দেশ গোটা ভারতবর্ষে 'কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'। ককেশিয় নর্ডিক আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছিল উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে। আর্য সভ্যতা বাংলায় তার দিগ্বিজয় চালাবার বহু আগে থেকেই এখানে যারা বাস করত, তারা ছিল মুণ্ডারী ভাষাভাষী প্রোটো-অস্ট্রালয়েড শ্রেণীর বিভিন্ন জন-গোষ্ঠী ও আর ছিল দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্য সাগরীয় পরি-চায়ী জনগোষ্ঠী। মুণ্ডারী ভাষাভাষী প্রোটো-অস্ট্রালয়েডরাই এদের ভিতর ছিল আবার দলে ভারী। বাঙালী জাতের আদি কাঠামোটা তাই তৈরী হয়েছিল প্রোটো-অস্ট্রালয়েড আর দ্রাবিড়দের মিশ্রণে। যদিও তার সঙ্গে পূব সীমান্ত থেকে এসে পড়েছিল খানিকটা মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর খাদ। আর্যত্ব হলো বাঙালীর একেবারে ওপরের পলেস্তারা, পালিশের বার্নিশ। আর্য অনুদান বাংলায় এসেছে অনেক পরে।

ভাষাতত্ত্বের জোরালো প্রমাণ, বাংলার সেই আদিম সভ্যতার যুগে সমাজের ষোল আনা জান ছিল গ্রামে। গ্রাম

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বাঁচত চাষবাসে। চাষবাসের জন্য দরকার হতো জলের। চাষ-বাসের বাড়বাড়ন্ত সেইখানেই, যেখানে জল প্রচুর। তাই আদি বাংলায় গ্রামের পত্তন খাল-বিল-নদী-নালা ও ঝরনাগুলির ধারে ধারে। যেখানে প্রচুর জল, সেখানে মাছও হরদম। বড় মাছ, মাঝারী মাছ, ছোট মাছ, কুচো মাছ (এই কুচো শব্দটাই দ্রাবিড় 'কুঁচ্চ'র ঈষৎ অদল-বদল), যেখানে জল সেখানেই মাছ। বড়

বড় নদীতে বড় বড় রুই-কাতলা-মৃগেল-কালবোস-চিতল-মাগুর বোয়াল--আড়-টাংই-পাঙ্গাস। ভেটকী, ভাঙ্গন, কইভোলা, ভোলা। মাঝারী ও ছোট নদীতে নানা জাতের পোনা, রিটে, বাচা, গড়চা, পাপদা, পারশে, ট্যাংরা, তপসে। খাল-বিলে শোল, শাল, ল্যাঠা, কৈ, মাগুর শিঙ্গি, সরল পুঁটি, চ্যালা, মৌরলা, বেলে, বাটা আরও কত কি! খানা-ডোবাতে রাশি রাশি চুনো পুঁটি, তেচোকো, চাঁদা, চ্যাং, খলসে নানান জাতের জানা-অজানা গুঁড়ো মাছ। তাছাড়া, কাঁকড়া চিংড়ির তো কথাই নেই। সবার ওপর বর্ষার কটা মাস বাংলার নদীতে বান ডাকে অপূর্ব সুস্বাদ ইলিশের। বারিস্নাত বাংলাদেশের সর্বত্র মাছ-মাছ, এন্তার মাছ। তার সঙ্গে মণিকাঞ্চন যোগ চাষের মোটা সিদ্ধ চালের ভাত। মাছ-ভাতই গ্রাম বাংলার জীবন-সার। তাই আজও এক বাটি মাছের ঝোল আর এক থালা সেদ্ধ চালের ভাত পেলে বেহদ্দ বাঙালী পোলাও কালিয়ার ভোজও অকুণ্ঠায় পাশে ঠেলে সরিয়ে দেবে। পাঁড় মাছখেকো জাত বাঙ্গালী। তাই তাদের মানুষজনের নাম, চিংড়ি, ট্যাংরা, ভোলা, চ্যাং, পুঁটিরাম। জনপদের নাম, সোলমারী, বোয়ালমারী, ভেটকে, বাগদা, ভাঙ্গড়, চেঙ্গোগাড়ী, চিংড়িপোতা, পুঁটিয়ারী, চেতলা, কইমুড়ি।

মাছের আদি যুগ

আদি আর্য সভ্যতার সমাজ ব্যবস্থায় আমিষ ভক্ষণ তথা মাছ খাওয়া যে নিষিদ্ধ ছিল, এমন মনে করার কারণ নেই। প্রোটো-অস্ট্রালয়েড কি দ্রাবিড় সমাজে তো নয়ই। তবে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের ভূ-বৈচিত্র্য সমতট বাংলার বিপরীত। বাংলার চক্রবালে চিত্রে-পড়া নদনদী আর সংখ্যাহীন খাল-বিল-খাড়ির জাল বুনন উত্তর-পশ্চিমে স্বপ্ন-কথা। পঞ্চ নদের সব শাখাতে জল যথেষ্টই, এবং সেগুলিতে মাছও যথেষ্ট। তবু পরিমাণে বাংলাদেশের তুলনায় তা নিতান্ত নগণ্য। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমিষ খাদ্য হিসাবে মাছের চেয়ে ঢের বেশী পছন্দের ছিল চতুষ্পদ তৃণভোজীদের মাংস। বিশেষ করে প্রাচীন আর্যদের রক্তে ছিল গরু-ঘোড়ার মাংস খাবার ঐতিহ্য। প্রোটো-অস্ট্রালয়েডরা আগে থেকেই ছড়িয়ে ছিল সারা ভারতবর্ষে। তাদের হাড়ে হাড়ে ছিল কিন্তু মাছ-মেরে খাবার প্রবৃত্তি সেই মধ্য প্রস্তর যুগ থেকে। মধ্য প্রস্তর যুগের জন্তুর হাড়ের বঁড়শী, কি পাথরের মাছমারা বর্শাই তার প্রমাণ। দ্রাবিড়রা ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল থেকে প্রথমে আসে উত্তর-পশ্চিমে। সমুদ্র পাড়ের জনগোষ্ঠী হিসেবে তাদের আগে থেকেই ছিল 'মেছো ধাত'। প্রমাণ মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সীলগুলি। বারো আনা প্রত্নতাত্ত্বিকেরই মত, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সভ্যতা বর্তমান ভারতীয় দ্রাবিড় সভ্যতার আদি।

দিকপাল বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সূত্র খুঁজে পান মহেঞ্জোদারোর। তাঁরই সাহায্যে খনন কাজ চালিয়েছিলেন আর একজন ঝানু প্রত্নতাত্ত্বিক, স্যর জন মারশাল। স্যর জন মারশালের নামেই প্রথম রিপোর্টটা ছাপা হয় কয়েক ভল্যুমে। নাম, মহেঞ্জোদারো এন্ড দি ইন্ডাস সিভিলিজেশান। এর তিন নম্বর ভল্যুমে যে সমস্ত সীলের প্লেট আছে, তাদের মধ্যে একটিতে আছে নীচের এই চিহ্নগুলি।

৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

বোম্বের সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর রেভারেন্ড এইচ হেরাস এই চিহ্নগুলিকে এইভাবে পড়েছেন ডান দিক থেকে—'পারাওয়া নিলা ইরু মীন মীনা ভান মুন কান। ভাষাটা তামিল। বাক্যটির অর্থ ব্যাপক। সব বাদ দিয়ে জানাই, তামিলে 'মীন' শব্দের অর্থ মাছ

আর 'মীনা ভান' শব্দের অর্থ মীনকেতন (যার অলংকারে বা পতাকায় থাকে মাছের চিহ্ন)।

আর একটি সীলে আছে,

রেভারেন্ড হেরাস এটিকে পড়েছেন, 'উরিল কাল মীনানির' 'নিলা পারওয়া।' এটিও তামিল ভাষা। তামিলে 'মীনানির' শব্দের অর্থ হল 'মাছেরা' (অর্থাৎ মাছ যে জাতের টোটেম সেই জাতের লোকেরা)।

আসলে 'মীন' শব্দটাই দ্রাবিড় শব্দ। পরে আর্যরা তাকে কুক্ষিগত করেছে সংস্কৃতের মধ্যে। যেমন করেছে মুক্ত (মুকুত), মইল (মৈর বা ময়ূর) ইত্যাদি শব্দগুলি।

রেভারেন্ড হেরাসের সীলের লিপি পাঠ ভাষাতাত্ত্বিকরা গ্রহণ করুন নাই না-করুন, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সীলের বহু চিত্রলিপিতে মাছের চিহ্ন যে আকছার। তা মানতেই হয়।

এই চিহ্নগুলি আদি দ্রাবিড়দের মৎসপ্রীতির নিশ্চিত চিহ্ন। এখনকার উচ্চ কোটির দ্রাবিড়দের কথা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। আর্যদের চাপে দ্রাবিড়দের বেশীর ভাগটাই চলে আসে দক্ষিণে। এখন দক্ষিণী বামুনেরা আর শৈব পিল্লে-পিল্লেমাররা মাছ খাওয়ার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় জেহাদী। তামাম দক্ষিণের বামুনেরা বাঙালী বামুনদের বামুন বলে মানতেই চায় না, শুধু এই মাছ খাওয়ার অপরাধে। আর শৈব পিল্লে-পিল্লেমার! তারা বামুন না হয়েও গোঁড়ামীতে বামুনদের দশ গুণ বাড়া। আমিষের নাম শুনলেই তারা নাক টিপে দৌড় মারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আদি ভারতীয় সমাজে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড় বা নর্ডিক আর্য গোষ্ঠীর কেউই মাছ-মাংস বাদ দিয়ে খাদ্য তালিকা বরবাদ করেনি। বৈদিক যুগে গোমাংস, অশ্বমাংস, মৃগমাংস ছাগমাংস ও বরাহমাংসের সঙ্গে বড় বড় মাছের মাংস আর্য ঋষিরা শূল্যপক্ব করে খেতে খুব যে একটা অপছন্দ করতেন তা বলে মনে হয় না।

পুরাণে মাছের কথা :

আপত্তি তুলেছিলেন গোঁড়া আয়ার বংশের দক্ষিণী ব্রাহ্মণ রামলিঙ্গম্ শাস্ত্রী। তাঁর মতে রামচন্দ্র তথা রামকৃষ্ণদেব কখনই আমিষ ভক্ষণ করতেই পারেন না। অতএব বাল্মীকি রামায়ণখানা খুলে তাঁর সামনে ধরতে হল। মহাকবি মাছ খাওয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলা তো দূরে থাক অরণ্য কাণ্ডের ৭৩ সর্গে বনবাসী রামের মাছ

খাওয়ার যে ছবিটা এঁকেছেন সেটি তাঁর মহাকাব্যির উপযুক্ত সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয়। ছবিটা সুস্পষ্ট ও কৌতূহলোদ্দীপক।

রোহিতংশ্চ-তুণ্ডাশ্চ নলমীনাংশ্চ রাঘব।
পম্পায়ামিষুভির্মৎস্য নং স্তত্র রাম বরান্ হতান্।।
নিস্ত্বক্ পক্ষানয় স্তপ্তান্ কৃশানেক কন্টকান্।
তব ভক্ত্যাসমাযুক্তো লক্ষণঃ সম্প্রদাস্যতি।।"

'হে রাম, লক্ষ্মণ পম্পা সরোবর মধ্যে দিব্য বাণ নিক্ষেপ করে চক্রতুণ্ডরোহিত (রুই) ও নলমীন (গলদা চিংড়ি) মেরে তাদের পাখনা কেটে, ছাল ছাড়িয়ে লোহার শলায় গেঁথে আগুনের তাপে ঝলসে তোমাকে ভক্তিপূর্বক প্রদান করবে ভোজনের জন্য।'

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের কাছে যুধিষ্ঠির মার্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অনুশাসন জানতে চান। পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ পদ্ধতি জানতে চাইলে, ভীষ্ম মনুস্মৃতি উল্লেখ করে জানান, কোন দ্রব্যে ব্যপিতৃগণের তৃপ্তি কত কাল।

দ্বৌ মাসৌ তু ভবেৎ তৃপ্তির্মৎস্যৈঃ পিতৃগণস্য হ।
ত্রীন্মাসানাবিকে নাহু চতুর্মাসং শশেন হ।।
অজেন মাসান প্রীয়ন্তে পঞ্চৈব পিতরো নৃপ।
বারাহেন তু ষন্মাসান সপ্তবৈ শাকুলেন তু।।

'মৎস্য দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে দু মাস পিতৃগণ তৃপ্ত থাকেন। মেষ মাংসে তিন মাস ও শশকের মাংসে চার মাস। ছাগ মাংসে পাঁচ মাস, বরাহ মাংসে ছ মাস এবং শকুল (শোল) মৎস্যে সাত মাস যাবৎ পিতৃগণ তৃপ্ত থাকেন।'

এর পরও আছে। যেমন টাটকা বৃষ মাংসে পিতৃগণের তৃপ্তি বারো বছর। এবং গণ্ডারের মাংসে অনন্ত কাল। তবু পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে যে মাছের একটা বিশেষ স্থান সেই প্রাচীন কাল থেকে মনু-শাসিত মহাভারতের যুগেও ছিল ভীষ্মোক্তি তার অকাট্য প্রমাণ। আর এই পদ্ধতি আজও হিন্দু সমাজে উচ্চ বর্ণের শ্রাদ্ধে আগের মতোই অনুসৃত হয়ে আসছে।

কিন্তু শততম অধ্যায়ে এই অনুশাসন পর্বেই ভীষ্ম অহিংসার গুণ ও মৎস্য-মাংস ভক্ষণের দোষ দেখিয়েছেন ঝুড়ি ঝুড়ি। বর্জন করতে বলেছেন আমিষ ভক্ষণ। তবে সে নিষেধ বাক্যে ব্যতিক্রম রেখেছেন যজ্ঞে বা পিতৃকর্মে উৎসর্গ করা মৎস্য-মাংসে। মনু কি ভীষ্মের এই নিষেধ বাক্য থেকেই সে যুগের আর্য সমাজে মাছ-মাংস খাবার প্রবল প্রবৃত্তিটা বেশ সুস্পষ্ট। তাকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই ভীষ্মের এত উপদেশ নিঃসন্দেহে।

ভীষ্ম তাঁর উপদেশে প্রতি পদে অনুসরণ করেছেন মনুস্মৃতি। মনুস্মৃতির পঞ্চম অধ্যায়ে মৎস্য-মাংস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

'যে যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্ব মাংসাদস্তস্মাৎ মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ।।

'মৎস্য ভোজনকারীরা মাংস ভোজকতুল্য, অতএব মাংস ভোজন ত্যাগ করা উচিত।' কিন্তু এই নিষেধ বাক্যের পদার্থটুকু খুবই পাতলা। কারণ ঠিক তার পরের শ্লোকেই মনু বলছেন,

পাঠীন রোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্য কব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাশ্চ সশল্কাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।।

'পাঠীন (বোয়াল মাছ), রোহিত (রুই), রাজীব (রাই খড়া বা রাই বাটা), সিংহতুণ্ড (কাতলা বলেই মনে হয়) এবং অন্যান্য আঁশযুক্ত মাছ পিতৃকর্মে ও যজ্ঞে উৎসর্গ করে ভোজন করা যায়।'

আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমাজ বাঁধবার সবচেয়ে পুরোম ও শক্ত রশি হল মনুস্মৃতি। শোনা যায় মনু একজন নয়, বহু। উইলিয়ম জোন্সের মতে বহু মনুর মতগুলি একত্রে গেঁথে বর্তমান মনুস্মৃতির জন্ম হয় খৃস্ট জন্মাবার তেরশ থেকে বারোশ বছরের মধ্যে। মনুর পরেও আর্য সমাজে বহু স্মৃতি-সংহিতাকার এসেছেন। যেমন শঙ্খ, হারীত, ব্যাস, পরাশর, শাতাতপ, সুমন্ত, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যই সবচেয়ে অর্বাচীন।

মাছ-খাওয়া সম্বন্ধে শঙ্খের মত,

'রাজীবাঃ সিংহতুণ্ডাশ্চ সশল্কাশ্চ তথৈবচ।
'পাঠীন, রোহিতোচাপি ভক্ষ্যা মৎস্যেষু কীর্তিতাঃ।।'

'আঁশযুক্ত রাই খড়া বা রাই বাটা, কাতলা, রুই ও বোয়াল মাছ ভক্ষ্য।'

হারীত বলছেন,

'সশল্কান মৎস্যান ন্যায়োপপন্নান ভক্ষয়েৎ'
'আঁশযুক্ত সব মাছ খাওয়াই ন্যায়সঙ্গত'।

যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন,

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ শ্বাবিৎ গোধা কচ্ছপ শল্যকাঃ।
শশশ্চ মৎস্যেষ্বপি তু সিংহতুণ্ডকরোহিতাঃ।।
তথা পাঠীন রাজীব সশল্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।।'

'পাঁচ নখযুক্ত জন্তুর মধ্যে গোসাপ, কচ্ছপ, সজারু, খরগোস এবং মাছের মধ্যে আঁশযুক্ত কাতলা, রুই, রাইখড়া এবং বোয়াল ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য।'

এর পরের যুগেই আর্যভারতে এসেছে বৌদ্ধ আর জৈন ধর্ম। তাদের আমিষ ভক্ষণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারের মধ্যেই দ্রব্যগুণে বাস্তব জ্ঞান নিয়ে সব রকম কল্পনার ওপরে উঠেছিলেন দুজন মনীষী, আয়ুর্বেদাচার্য সুশ্রুত আর চরক। সুশ্রুতের কাল হলো খৃস্ট জন্মাবার শখানেক বছর আগে, চরক তার কিছু পরেই। সুশ্রুত-চরকের খাদ্যাখাদ্য বিচারের বৈদগ্ধ্য সে যুগে তুলনারহিত। সুশ্রুত সংহিতায় মাছের শ্রেণী বিভাগ ও গুণাগুণ বর্ণনা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট বিজ্ঞান-ভিত্তিক।

তাবৎ মৎস্যকুলকে গুণের বিচারে সুশ্রুত দু ভাগে ভাগ করেছেন, নদীর ও সমুদ্রের। ' মৎস্যান্ত দ্বিবিধা। নাদেয়াঃ

...ণ্ড।' নদীর মধ্যে রোহিত,পাঠীন, পাটলা, রাজীব, বর্মি, ...ল্য, কৃষ্ণমৎস্য, বাগুগুার, মুরল, সহস্রদংষ্ট্র। বর্মি হলো ...মাছ, কৃষ্ণ মৎস্য শোল,. শাল ইত্যাদি,- বাগুগুার বাগুস বা ... মুরল মৌরলা, সহস্রদংষ্ট্র খুব সম্ভবতঃ কামট।

'নাদেয়া মধুরা মৎস্যা গুরবো মারুতাপহাঃ।
রক্ত পিত্তকরাশ্চষ্ণা বৃষ্যাঃ স্নিগ্ধাল্প বর্চসঃ।।'

'নদীর মাছ মধুর, গুরু, বায়ুদোষণাশকারী, রক্ত ও ...কারক, উষ্ণ বীর্যবর্ধক ও তেজস্কর।'

আর সমুদ্রের মাছ,

'সামুদ্রা গুরবঃ স্নিগ্ধা মধুরা নাতি পিত্তলাঃ।
উষ্ণাবাতহরাবৃষ্যা বর্চস্যাঃ শ্লেষ্ম বর্ধনা।।
বলাবহা বিশেষেণ মাংসাশিত্বাত্ সমুদ্রজাঃ।।'

'সামুদ্রিক মৎস্য গুরু, স্নিগ্ধ, মধুর, অল্প পিত্ত-...ক, উষ্ণ বাতহরা, বীর্যবর্ধক, তেজোবর্ধক এবং শ্লেষ্মাবর্ধক। ... মাংস ভক্ষণ করে বলে বিশেষ বল ধারণ করে।' এই সব ... হল, তিমি, তিমিঙ্গিল ইত্যাদি বৃহৎ মৎস্য গোষ্ঠী।

ভাবমিশ্র করে যুগ পরে ধন্বন্তরি, আত্রেয়, সুশ্রুত চরকের মতামত একত্রে সংকলিত করে একটি বৈদ্যক গ্রন্থ ...শ করেন। তার নাম 'ভাব প্রকাশ'। এই ভাব প্রকাশে বিভিন্ন ...র গুণ চুল চিরে বিচার করা হয়েছে:

যেমন, মৎস্যাঃতস্য গুণাঃ। বৃংহণত্বম্ (বৃদ্ধি গুণ)। ...ত্বম্ (গুরুত্ব)। শুক্রবর্ধনত্বম্ (শুক্রবর্ধন গুণ)। ...ত্বম্ (বলবৃদ্ধি গুণ)। স্নিগ্ধত্বম্ (স্নিগ্ধত্ব)। মধু-...ত্বম্ (মধুরতা)। কফ পিত্তকরত্বম্ (কফ ও পিত্তকর গুণ)। ...য়ামাধরত দীপ্তাগ্নীনাং পূজিতত্বম্ (ব্যায়ামাদিতে রত ...দের মধ্যে যে দীপ্তাগ্নি জ্বলে, তাকে জ্বালিয়ে রাখার ...)। বাতরোগহরত্বমচ (বাতরোগ হরণের গুণ)।

অতঃপর বৃহৎমৎস্য গুণাঃ ক্ষুদ্র মৎস্য গুণাঃ কৃষ্ণ ...না গুণাঃ, পান্ডুর মৎস্য গুণাঃ এমন কি কর্থিত মৎস্য গুণাঃ শুষ্ক মৎস্য গুণাঃ (পচা ও শুঁটকী মাছের গুণ ও) ভাব ...শ বর্ণনা করতে ভোলেননি। ভোলেননি লবণ ভাবিতে মাছের ...না মাছের গুণ) বর্ণনা করতে। প্রত্যেকটা বর্ণনা বিস্তৃত ও ...ধ্যের পরিচায়ক।

এক কথায় ভাবপ্রকাশ মাছের গুণ বর্ণনায় শতমুখ। শুধু মাছের গুণেই নয়, ইতর ও ব্রাত্য-জনের আহার কুঁচোমাছের ... বর্ণনাতেও ভাবমিশ্র পিছপা নন। তাঁর মতে যে কোন ...-ই হলো—

বাতঘ্না বৃংহনা, বৃষ্যা, রোচকা, বলবর্ধনাঃ।

বিশেষ করে ছোটো মাছ, 'ক্ষুদ্র মৎস্যাঃস্বাদুরসা দোষত্রয় বিনাশনাঃ।
লঘুপাক রুচিকরাঃ সর্বদা তে হিতা মতাঃ।।'

আরকুঁচো মাছ 'অতি সূক্ষ্মাঃ পুংখ হরা রুচ্যাঃ কাস্যানিলা-...নাঃ।।'

...কী মাছ, 'শুষ্ক মৎস্যা নবলাঃ সুদুর্জরো বিড়ং বন্ধিনঃ।।'

বলকারী তবে হজম করা কঠিন। কিন্তু পোড়া মাছ 'দগ্ধ ...স্যো গুনৈঃ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টি কৃদ্বল বর্ধনং।'

কোন কোন ঋতুতে কোথাকার মাছ হিতকারী সে বিষয়েও ... প্রকাশের নির্দেশ আছে।

হেমন্তে পজা মৎস্যাঃ শিশিরে সারসা হিতাঃ।
বসন্তে তু নাদেয়া গ্রীষ্মে চৌণ্ড্যা (ডোবা) সমুদ্ভবাঃ
তড়াগ জাতা বর্ষাসু তাম্ব পথ্যা নদীভবাঃ।
নিঝর্রাঃ শরদি শ্রেষ্ঠা বিশেষো ধয়দাহৃতাঃ।।

এরপরে ভাবপ্রকাশ কূপ, তড়াগ, নদী, ডোবা প্রভৃতি বিভিন্ন জলাশয়ের মাছের গুণ বর্ণনা করেছেন পৃথকভাবে।

রাজ নির্ঘন্টের মত হল,
নিঃশঙ্কা নিন্দিতা মৎস্যাঃ সর্বেশল্কযুক্তা হিতাঃ।
বপুস্থৈর্যকরা বীর্য বলা পুষ্টি বিবর্ধনাঃ।।

আঁশযুক্ত সব মাছই হিতকর, আঁশ ছাড়া সব মাছই নিন্দিত। আঁশযুক্ত মাছ শরীরের পুষ্টিসাধন করে শ্রীবৃদ্ধি ও বলবীর্য বৃদ্ধি করে।

মাছ ও মনু:

মনুর মাছ খাওয়া নিষিদ্ধকরণ, এখনকার প্রহিবিশনের মতো। অতিরিক্ত ভোজনে কুফল আশংকায় বোধহয় এই নিরোধ। সেটাও শুধু আঁশ ছাড়া মাছ আর বৃথা মৎস্যের বেলায়।

পদ্মোত্তর খন্ডে কিন্তু যেকোন মৃত প্রাণী ভক্ষণ নিষিদ্ধ। বিশেষ করে মরা মাছ। মাংসঃ প্রাণিনঃ সোহপি তস্মান্মৎস্যং পরিত্যজেৎ।'

মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্রমের নিষেধ আরও বেশী অঙ্গুলি নির্দিষ্ট।

গোমীনং চক্র শকুলং বড়ানং রাঘবং তথা।
বামীনং চাকর্ণশ্চ সচক্র বেণ্গমেবচ।।
ভূবিলগতানিরুদ্ধশ্চ গাঙ্গেয়ানি বিবর্জয়েৎ।।

গোমীন, চক্র শকুল (শাল গজার), বড়াল, রাঘব (রাঘব বোয়াল), বামীন (বান মাছ, চলকর্ণ ও সচক্র চ্যাং মাছ বর্জন করবে। আর বর্জন করবে বদ্ধ বিল প্রভৃতি জলাশয়ের মাছ ও গঙ্গা নদীর মাছ।

এর ওপরে আছে নানা স্মার্তদের নানান নিষেধ। জন্ম-তিথিতে মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কোন ঋতুতে খাওয়া মাছ নিষিদ্ধ। বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ।

এসম্পর্কে বিশেষ কোন কারণ কোন স্মার্তই নির্দেশ করেন নি। সব জায়গাতেই আর্ষ প্রয়োগ। সুশ্রুতের নিষেধ কিন্তু সংগত স্বাস্থ্যের কারণে।—শুঁটকী, পচা, পীড়িত, বিষাক্ত, সর্প-দ্বারা হৃত, বিষলিপ্ত, অস্ত্রাদির দ্বারা বিদ্ধ, জীর্ণ বাসি এবং স্ব স্ব প্রকৃতির বিপরীতচারী মৎস্য সকল অভক্ষ্য—ইতি সুশ্রুতঃ।

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের ইতিহাস নানাবর্ণের মিশ্রনের ইতিহাস। এই সভ্যতা আরও বেশী করে প্রকট বাংলাদেশে। আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়-চীন-শক-হূন দল সবাই একদেহে লীন হয়ে গেছে। বাইরে আর্যামীর ভড়ং টুকু বাঁচাবার জন্যে উত্তর পশ্চিমের বামুনেরা মনুর সেই বিখ্যাত এবং সন্দেহভাজন শ্লোকটা বার বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাত।

'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধে সু চ।
তীর্থযাত্রা ন কুর্যাম পুনঃ প্রায়শ্চিত্তমর্হতে।'

এই বাক্যের ধূয়ো ধরেই বোধহয় কোন পুরাণকর্তা লিখে-ছিলেন 'ঋষয়ঃ পশ্চিমে ভাগে মৎস্যভক্ষ পতিতোহজনঃ।' এই শ্লোক বাঙালীদের ওপর অযৌক্তিক গায়ের ঝাল। এবং পরের বহুযুগ ধরেমাছখোর বাঙালী বলে পরিহাস করবার একটা ছুতো মাত্র। এসব হলো অনেক পরের কথা। তবে অনেক আগেই বৌদ্ধ আর জৈন অনুশাসন মাছ খাওয়াটাকে উত্তর-পশ্চিমে এবং সমস্ত দাক্ষিণে উচ্চকোটীর মধ্যে ট্যাবু করে ফেলেছিল।

বাংলার কিন্তু আর্যত্বের শিকড় যেমন ঢিলে, তেমনি ঢিলে বৌদ্ধ জৈন অনুশাসন। বাংলায় উচ্চবর্ণের ভেতর অনুশাসন শুধু বিয়ে-পৈতে-শ্রাদ্ধ-পিণ্ডকরণে। দৈনন্দিন আহারে বিহারে বাঙালী শাস্ত্রের ধার কোনদিনই খুব বেশী ধারেনি। খাল বিল নদী নালার দেশের বাসিন্দা বাঙালী তাই চিরকালই আমিষভোজী। তার মধ্যে আবার মাছ তার নিত্যকার অন্যতম আহার্য। আর্যত্বের আদিকালে বাঙালী বামুনদের ভিতর যেটুকু লুকোছাপা ছিল সেটুকুও পরে রইল না। বাঙালী স্মার্তরা মাছকে নিরামিষের পর্যায়ে তুলে ফেললেন। স্মৃতিসিদ্ধ করে ফেললেন। প্রমাণ বৃহদ্ধর্ম পুরাণ। যদিও পুরাণকাররা বামনাই-এর স্বপক্ষে প্রথমে নানারকম পাঁয়তাড়া কষেছেন। অনামিষ সর্বদেব তপস্যা দেবপূজনম্—নিরামিষ ভক্ষণ তপস্যা ও দেব-পূজনই ব্রাহ্মণের ধর্ম। নাশ্নীয়াৎ মৎস্য মাংসাদ্যাং কালে শাস্ত্রে নির্দেশিতে—পুণ্যদিনে মৎস্য মাংস শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এবং শুধু মৎস্য-মাংসই নয়, মাষ কলাই, মসুর ডাল, নিম ও আদা ভক্ষণও নিষিদ্ধ। তবু শেষ পর্যন্ত বাঙালীপনাই হয়েছে জয়ী।

রোহিতং শাকলশ্চৈব শকরং (পুঁটি) শকরাধিনম্। (ইলিশ)
শুক্লবর্ণং স শল্কঞ্চ মৎস্যং ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণঃ।।

(ইলিশ)

এ হল বাঙালীর অসাধারণ মৎস্যপ্রীতির একটা বড় উদাহরণ।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণের রচনাকার 'দ্বাদশ শতকের আগে নয় এবং চতুর্দশ শতকের পরে নয়!' কিন্তু দশ শতকের চর্যাপদে সাধারণ বাঙালীর ঘরোয়া আহারের যে চিত্রটি পাই তা বড় মনোরম।

'ওগু গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গায়িকা ঘিত্তা দুগ্ধ সজুত্তা।
মোইলি মাচছা নালিচ গঙ্গা দিজ্জই কন্তা খা (ই)
পুনবত্তা।।

কলাপাতার ওপরে গরম ভাত, গাওয়া ঘি, তার সাথে দুধ। মোইলি মাছের ঝোল, (মৌরলা না মোইনি? অধ্যাপক সুকুমার সেন সঠিক বলতে পারেন); নালতে (পাট) শাক ভাজা, স্ত্রী দিচ্ছে, পুণ্যবান ব্যক্তি ভোজন করছে।

ইতর-ভদ্র বাঙালীর এইটাই রাজভোগ। না হলে বাঙালী বামুনদের মুখ থেকে এমন সংস্কৃত প্রবাদ চালু হয়?

ইলিশা খলিশা শৈচব ভেটকি মাগুর এব চ।
(পাঠান্তর বাচা ভাংনা তথৈব
রোহিতো মৎস্য রাজেন্দ্রঃ পঞ্চ মৎস্যাঃ নিরামিষাঃ।।'

বাঙালীর লোকাচার মাছকেও নিরামিষ করে নিয়েছে অথবা,

'ইল্লিশো জিতপা্ট যুষঃ বাচা বাচামগোচরঃ।
রোহিতোহি হিতঃ প্রোক্তঃ মদ্গুরঃ মদ্গুরু প্রিয়।।'

একাদশ শতাব্দীর দুই দিকপাল বাঙালী স্মার্ত ভবদেব ভট্ট আর জীমূতবাহন। ভবদেব ভট্টের 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম্' উচ্চবর্ণের কি কি খাওয়া নিষিদ্ধ তা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন দেবলের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে।

'জলোকা-শুক্তি-শম্বুক-শিশুমারক-কর্কটাঃ।
মৎস্যাশ্চ বিকৃতাকারাঃ সর্পশীর্ষা দরী শয়াঃ।।
জালপাদাশ্চ মার্জারাস্তথা পাণ্ডু কপোতকাঃ।
হারীতো গৃহবশ্চৈব নৈব ভক্ষ্যা দ্বিজাতিভিঃ।।'

'জোঁক-ঝিনুক-শামুক-শুশুক কি উদ্বিড়াল-কাঁকড়া। বিকৃত আকারের মাছ, সাপের মতো মাথাওয়ালা মাছ, গর্তে বাস করে এমন যেসব মাছ। ভোঁদড়, কেলে গোলা পায়রা, হাঁস-হরিয়াল পানকৌড়ি প্রভৃতি জলচর পাখী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের লোক আহার করবে না।'

বিকৃত আকারের সাপের মতো মাথাওয়ালা অথবা গর্তে বাসী মাছ ছাড়া আর সব মাছই ভক্ষ্য বলে ধরেই নিয়েছেন ভবদেব ভট্ট।

জীমূতবাহনের কালবিবেকে ইলিশ তৈল প্রবাদ কল্লোলিত হয়েছে। তার ব্যবহারও ছিল ব্যাপক।

সপ্তদশ শতাব্দীর খাদ্যাখাদ্য বিচারের মুখোমুখি রঘুনাথের ভোজন কুতূহলম্। রোহিতপ্রিয় রঘুনাথ বলেছেন,

'কৃষ্ণশল্কো লোহিতকান্তিশ্চ মৎস্যো।
যঃ শ্রেষ্ঠোঽসৌ রোহিত বৃত্তে...।।
কোমলং বলদং রোহিত সার্ং মাংসং।
বাতং হন্তি স্নিগ্ধ মুখ...ত বীর্যম্।।'

'কালো আঁশ, সাদা কোল, গোল মুখের হাঁ, সেই মাছই শ্রেষ্ঠ মাছ রুই। ঈষদুষ্ণ বলকারী রুই মাছের মাংস বাতরোগ নাশ করে এবং বীর্য বহন করে।'

তবে নিষেধস্বরূপে তিনিও রাজনির্ঘণ্টের বিখ্যাত শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—নিঃশল্কা নিন্দিতা মৎস্যা ইত্যাদি।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালী জাতের মৎস্যপ্রীতির যে বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে তা অনবদ্য। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের কবি বংশীবদনের মনসামঙ্গলে—

ইলিশ তলিত করে বাচা ও ভাংনা।
কাউলের খণ্ড ভাজে আর কাউলপোনা।।'

আর এক কাব্যে— 'থোর ডুমুর ইচলা মাছে-
খাইলে মুখের অরুচি ঘোচে।'

কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল পর্যন্ত মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে এরকম উদাহরণ ভুরি ভুরি।

শাস্ত্রে; স্বাস্থ্যে মাছ..ঃ

অহিংসা ও নিরামিষ ভক্ষণের প্রথম প্রবক্তা মনু নিঃসন্দেহে
'কুহু পূর্ণেন্দু সংক্রান্তাং চতুর্দশ্যষ্টমীষু চ।

অমাবস্যাষ্টমী চতুর্দশী পূর্ণিমা সংক্রান্তি চণ্ডাল যোনিঃ স্যাৎ স্ত্রী তৈল-মাংস ভোজনাৎ।।'

'পূর্ণিমায়, সংক্রান্তিতে, চতুর্দশী ও অষ্টমীতে স্ত্রী-তৈল-মাংস সম্ভোগে মানুষ চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হয়।'

ব্যতিক্রম শুধু, 'শ্রাদ্ধে প্রদত্তং বিধিবদ্
দৈবে চাভ্যর্থিতো দ্বিজৈঃ।
উপাকৃতং মহারোগাম্মাংসং ভক্ষীত মান্যথা।।'

'শ্রাদ্ধে এবং বিধিবদ্ধ দৈব আরাধনায় উৎসর্গীকৃত, মহা-রোগের উপকারের জন্য মৎস্য ভক্ষণ করবে, অন্যথা নয়।'

অথবা, 'যক্ষ রক্ষ পিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্ ব্রাহ্মণৈ র্ন ভোক্তব্যং দেবানাং ভুঞ্জতা হবিঃ।।'

'যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচের অন্ন, মদ্য, মাংস ও সুরাসব ব্রাহ্মণরা ভক্ষণ করবে না, কারণ দেবতাদের খাদ্য শুধু হবি।'

অতঃপর অহিংসা ও নিরামিষ ভক্ষণের স্বপক্ষে পরবর্তী সব স্মার্তই মনুর অনুসারী।

এত কিছু নিষেধের পরেও কিন্তু আর্য উচ্চ কোটীর মধ্যে অন্যান্য আমিষের সঙ্গে মাছের রুচি পুরোপুরি চলে যায় নি। সেটা সমূলে গেল তীর্থংকর পার্শ্বনাথ ও তথাগত বুদ্ধের কট্টর অহিংসা প্রচারে। এই জৈন আর বৌদ্ধ যুগেই ভারতের পনেরো আনা উচ্চকোটী হয়ে গেল চিরকালের শাকাহারী। যেটুকু বাকি রইল তা কেবল বাংলাদেশেই। এখন ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপে এমন কটা বামুন সারা ভারতে আছে তা গুনে বলা যায়। কিন্তু বাংলার বাইরে আহারে নিরামিষভোজীর সংখ্যা গুণে বলা সহজ নয়।

প্রশ্ন, কাকে ফেলি কাকে রাখি! শাকাহার না মৎস্যাহার!

অবশ্য এখনকার সমাজে মনু-পরাশর-যাজ্ঞবল্ক্য একদম পিছনের সারিতে। খাদ্য ব্যবস্থায় এখন গ্রাহ্য শারীর ও পুষ্টি বিজ্ঞানীদের অনুশাসন। তাঁদের মতে, প্রাণী প্রোটিন বাদ দিয়ে মানব শরীরের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশেষ করে রক্তে লোহিত কণার মূল উপাদান যে হিমোগ্লোবিন, সেটি তৈরী করার মূল কারক হলো ভিটামিন বি১২। ভিটামিন বি১২ এর একমাত্র ভাঁড়ার প্রাণীজগৎ। গাছ-গাছড়া-ফলমূলে বা অন্য কিছুতেই এটি পাওয়া যায় না। মানুষ যা খায় সেই গেঁড়ি-গুগলি-চিংড়ি-কাঁকড়া-মাছ-মাংস-ডিম-দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য থেকে সে তার দরকারী ভিটামিন বি১২ সংগ্রহ করে নেয়। শরীরে ভিটামিন বি১২ এর অভাব ঘটলে রক্তশূন্য রোগ অবশ্যম্ভাবী।

বিভিন্ন মাছ, মাংস, দুধ, ডিমে কতটা পরিমাণ বি১২ আছে, তার একটা হিসাব দেওয়া গেল, মাইক্রোগ্রামে।

কাতলা-০,৭, ভেটকী- ৩,৪. রুই-৩,৬, ট্যাংরা-৯১৮, সিঙ্গি-৪.৪, মাগুর-৩.৯, কই-১.৯, পার্শে-৩.৬, বেলে-২.২, শোল-১.০, গুলে-২.৬, বোয়াল-৪.৬, ইলিশ-৪.০, বাগদা চিংড়ি-১.০১, তপসে-৮.০, পাঁঠার মাংস-১.০, মেটেতে-৪.০, সিদ্ধ হাঁসের ডিমে-৬.০, সিদ্ধ দুধে-৪.৮,

দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর ভারতের বামুনেরা আমিষ খান না বটে, দুধ ও দৈ খাওয়ার অভ্যাস তাদের বাঙালীর মাছ খাবার অভ্যাসের মতোই। শেষ পাতে একটু দৈ না হলে দক্ষিণীদের খাওয়াই হয় না। তারপর আঁজলা ভরে ঘোল পান। তাদের কাছে দুধ, দৈ হলো নিরামিষ। এতেই কিন্তু তাদের ভিটামিন বি১২ এর প্রয়োজনটুকু ভালভাবেই মেটে। কারণ পুষ্টিতন্ত্রের কাজগুলি ঠিক মতো চলতে থাকলে সাধারণ স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এক মাইক্রোগ্রাম বি১২এই মোটামুটি কাজ চলে যায়।

শোনা যায় জেদী নিরামিষবাদী নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ' দুধ বা দুগ্ধজাত কোন দ্রব্যই ছুঁতেন না। তাঁর স্বাস্থ্য বজায় রাখতে তাঁর ডাক্তাররা তাঁকে মাঝে মাঝে ভিটামিন বি১২ এর ইঞ্জেকশন দিতেন।

সাধারণ শরীর রক্ষার জন্যে ভিটামিন বি১২ এর কতোটা পরিমাণে প্রয়োজন হওয়া উচিত ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তার একটা অনুমোদিত তালিকা বার করেছেন। সেটি হলো, ০-১২ মাস—০.৩ মাইক্রোগ্রাম, ১-৩ বছর—০.৯ মাইক্রোগ্রাম, ৪-৯ বছর—১.৫ মাইক্রোগ্রাম, ১০ বছর ও তার ওপর—২.০ মাইক্রোগ্রাম, গর্ভবতী স্ত্রীলোক—৩.০ মাইক্রোগ্রাম, দুগ্ধবতী স্ত্রীলোক—২.৫ মাইক্রোগ্রাম।

এই রিপোর্ট থেকে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যা আমাদের চোখ খোলায় কাজ করবে। ইউনাইটেড স্টেট্স-এ দৈনন্দিন গড়ে মাথা পিছু বি১২ গ্রহণের পরিমাণ ধনীদের মধ্যে ৩১.৬ মাইক্রোগ্রাম, মধ্যবিত্তদের ১৬, গরীবদের ২-৭। বৃটেনে মাথা পিছু ৫ মাইক্রোগ্রাম। আর ভারতবর্ষে মাথা পিছু দিনে গড়ে বি১২ পায় ০.৩ থেকে ০.৪ মাইক্রোগ্রাম। মোটামুটি প্রয়োজন যে ১ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন বি১২, নিত্য একজন ভারতীয় যা খায় তা থেকে সেটুকু পাওয়া যায় না।

মৎস্যভুক ব্রাত্য ও ইতর বাঙালী আদিকাল থেকেই দরিদ্র, চিরদিনই সে হাভাতে। কিন্তু তার ভিটামিন বি১২ এর অভাব কোনদিনই খুব বেশী হয়নি। কারণ খানাখন্দের, ডোবা-খাল-বিলের চুনোচাঁদা মাছ আর গেঁড়ি গুগলি। আজকে এই নিদারুণ খাদ্যাভাবে সেই চাঁদা-চুনোতেও টান পড়েছে। ডিম-দুধ-কুলীন মাছ-মাংসের দাম অকটরলোনি মনুমেণ্টকেও ছাড়িয়ে গেছে। কাজেই হাত পড়েছে এখন চুনো-পুঁটিতে। এবং কালোবাজারের কল্যাণে তারও দাম চড়চড় করে চড়ছে দিন দিন। এখন কাঁটার কুড় বলে নাক সিঁটকোনো শিকেয় তুলে মধ্যবিত্ত বাঙালী সেদিকে হাত বাড়িয়ে দেখছে তাও পকেটের বাইরে। বাঘবনোয়ালরা জল থেকে ডাঙ্গায় এসে মাৎস্যন্যায় বাধিয়ে দিয়েছে। দ্রষ্টা কবি বাল্মীকি ঠিকই বলেছিলেন, 'না রাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ।

মৎস্যাইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্।।' (২৯)

বাঙালীর পাতে নেই আর ওগ্‌গরা ভত্তা। সেদ্ধচালের গরম ভাতের কথা ক্রমশ ভুলিয়ে দিচ্ছে রেশনের কদর্য আতপ তণ্ডুল (যাতে ভিটামিন বি-র পরিমাণ সেদ্ধচালের থেকে অনেক কম)। নেই মাছ। বাঙালী এখন ভোজন করে না, গেলে। অনেক দুঃখে, অনেক চোখের জলের সঙ্গে সে গেলে।

কিন্তু তা বলে রক্তশূন্যতা রোগের ভয় অতটা করবার প্রয়োজন নেই। শাকপাতা তো আছেই। আর কলকাতার বাজার-গুলোতে ও পানীয় জলে যে রকম জৈবসংক্রমণ ঘটে তাতে শাক-পাতা হাজার ধুলেও তা থেকে নানারকম জীবাণু, আমিশ, গেঁড়ি-গুগলি, কেঁচো, পোকামাকড়, ক্রিমি ও তাদের ডিম—এসব আমরা নিঃখরচায় যথেষ্ট পাচ্ছি। সেগুলো থেকেই বাঙালী অজ্ঞাতে সংগ্রহ করে নেবে ভিটামিন বি১২। বেঁচে সে থাকবেই নীলকণ্ঠ হয়ে। অতএব মাভৈঃ।

আলোক চিত্র ঃ সুবিমল মিত্র

লীলা মজুমদার

বিশ শতকের সুরু থেকে বাঙালী জীবনের স্মৃতি আলেখ্য

পাহাড়ের মাথায় স্কুল, সেইখানে দিদিকে আমাকে নিয়ে গিয়ে মা ভর্তি করে দিয়ে এলেন। বোধ হয় সাহস দেবার জন্য বড়মাসিমা আমাদের সঙ্গে গেলেন। দিদির বয়স সাত, আমার বয়স ছয়। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে তিন চার অক্ষরের ইংরিজি কথা একটু একটু পড়তে পারি। কিন্তু কেউ ইংরিজি বললে একবর্ণ বুঝতে পারি না, নিজেরা তো বলতে পারি না-ই। মেমদের স্কুল, লোরেটো কনভেন্ট, যাঁরা পড়ান তাঁদের বেশির ভাগই সম্ভবতঃ পাকা মেম, অন্ততঃ সবাই সমান ফরসা। বিশেষতঃ সাদা কালো ঝোলা-ঝোলা পোশাক পরা, কান পর্যন্ত ঢাকা-চাপা দেওয়া—ফিরিঙ্গি সহপাঠিনীরা সানন্দে আমাদের জানাল যে ভেতরে ভেতরে সব নাকি ন্যাড়া-মাথা—নানদের এমনি সাদাতে গোলাপীতে মুখের আর হাতের রং যে আমরা দুই বোন হাঁ করে চেয়ে থাকতাম। ছাত্রীদের গায়ের রং দেখলাম বিচিত্র। খুব সুন্দর গোলাপীও ছিল, তারপর একটু হলদেটে একটু তামাটে করতে করতে আইরিস ডি-সিলভা ছিল আমাদের চেয়েও কালো। কিন্তু ওরা বলত ওরা সবাই খাঁটি মেম, এ দেশের হরিভ্‌ ক্লাইমেটে থেকে থেকে সত্যিকার রং চাপা পড়ে গেছে। তবে আছে ঠিকই তলায় তলায়। আইরিসের আত্মীয়স্বজনরা নাকি পর্তুগালে থাকে, বেজায় বড়লোক। আমাদের মতো নেটিভ নয়। ওরা যা বলত আমরা সব বিশ্বাস করতাম, যদিও মা শুনে হাসতেন।

বলা বাহুল্য এ-সব শুনে মন বড়ই দমে গিয়েছিল। ইংরিজি তো আর জানি না, তাই কথাগুলো অদ্ভুত এক হিন্দীতে বলা হয়েছিল। সেই ভাষায় বাবুর্চিকে বলে 'বোর্চি', জলের কুঁজো হল 'সেরাই'। যাই হক বাইবল্‌ স্টোরিজের ছোট্ট বইখানি খুলে একটা চেনা মুখের ছবি দেখে, মনে কিছু বল পেলাম। ছবিটা নাকি গড্‌-এর। ছয় দিনে তামাম জগৎ সৃষ্টি করে, সপ্তম দিনে মেঘের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে গড একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই লম্বা দাড়ি-গোঁফ, কাঁধ পর্যন্ত কোঁকড়া চুল, টানলে নিশ্চয় আরো লম্বা হয়। পরনে পায়ের কব্জি অবধি ঝোলা একটা জোব্বা। অনেক পরে রবীন্দ্রনাথদের বাড়ির লোকদের ঐ রকম পরতে দেখেছিলাম। সে যাই হক গে, গড্‌-এর মুখখানি দেখে মনে হল একে যেন কোথাও দেখেছি। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ দেখাও নয়, অনেক দিন ধরে দেখেছি। গলার স্বরটাও মনে পড়ল। সেই সঙ্গে মনে হল চোখে ইস্টিলের ফ্রেমের চশমা থাকা উচিত ছিল, তার ভাঙা ডাঁটি সুতো দিয়ে বাঁধা।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করতেই বলল, 'গড্‌'-এর ছবি, দেখছিস না নাম লেখা রয়েছে। গড্‌ হল ভগবান, ভয়ঙ্কর ভালো উনি। আমাদের বানিয়েছেন।'

মনে ভারি খট্‌কা লাগল। ছোটবেলা থেকে শুনেছি ভগবানকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তবে আবার তাঁর ছবি আঁকা হল কি দেখে? দিদি ভুল বলেছে, গড্‌ অন্য কেউ। রাতে শুয়ে শুয়ে হঠাৎ সেই অন্য কেউটিকে মনে পড়ে গেল। তাঁর নাম নীলমণিবাবু, সত্যি ভয়ঙ্কর ভালো, আমাকে ডাঁটা চিবুতে দিতেন। চেরাপুঞ্জিতে থাকতেন। তাঁর একটা সাদা লোমশ কুকুর ছিল, তার নাম ভজহরি। সে বড় দুষ্টু ছিল, আমাদের ছোট ভাই কল্যাণের দুধ খাবার বোতল ভেঙে দিয়েছিল। কল্যাণের মুখে তখনো ভালো করে কথা ফোটেনি। সে ঘোর অনিচ্ছায় দুধের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলেছিল, 'ভজি বোতল খাঁই!' যাক, নীলমণিবাবুই তাহলে গড্‌। এ ভুল ছাড়তে অনেক সময় লেগেছিল। পরে শুনেছিলাম ভজি বেচারা মোটেই বোতল ভাঙেনি। বোতল অভ্যাস ছাড়াবার জন্য কল্যাণকে ঐ রকম বলা হয়েছিল।

সে কথা থাক, এটুকু সত্যি যে নিজেদের বাড়ির লোকদের ছাড়া, প্রথম যে বাইরের মানুষের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে তিনি হলেন নীলমণিবাবু। চেরাপুঞ্জি শিলং থেকে মাত্র ৩৩ মাইল দূরে হলেও সেকালে সেখানে যেতে দুদিন লাগত। মটর গাড়ি বা রেল ছিল না। হয় দুই চাকাওয়ালা এক ঘোড়ায় টানা টাঙায়, নয় তো মানুষে টানা পুশ পুশে যেতে হত। মাঝপথে ডামপেপ বলে একটা জায়গা ছিল, সেখানকার [illegible] ডাকবাংলায় রাত কাটাতে হত।

ডামপেপে পৌঁছনোর কথা আমার খুব মনে আছে। তখনো আমার তিন বছর পূর্ণ হয়নি। পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেছিল, আমাদের গাড়িতে বড়রা কেউ ছিলেন না। কল্যাণ ঘুমিয়ে আমার গায়ে গড়িয়ে পড়ছিল, আমি তাকে সামলাতেই ব্যস্ত। দাদা কাঠ হয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল আর দিদি সে-সময় ফোঁৎ-ফোঁৎ করে একটু কেঁদে নেবার সুযোগ পেলে কখনো ছাড়ত না। চারদিক ভয়ঙ্কর চুপচাপ, আকাশটাকে বেজায় নিচু মনে হচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ দেখি সারি সারি আলো-জ্বলা একটা বাড়ি, লোকজনের হাঁক-ডাক, ঘোড়ার পা-ঠোকার, লাগাম ঝন-ঝন্‌ করার শব্দ। ঐ আরেকটি সুন্দর জিনিস আমার মনের মধ্যে লেগে রইল। বিপদ অন্ধকার কাটিয়ে আলো-জ্বলা ঘরে এসে পৌঁছনো। বলা বাহুল্য, কতক পাকদণ্ডী বেয়ে হেঁটে, কতক ঘোড়ায় চড়ে, বড়রা অনেক আগেই পৌঁছে গেছিলেন।

মা লম্বা কাঠের বারান্দায় আমাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অমনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমাদের কোলে করে নামালেন। মায়ের মতো আছে কি! আলো-জ্বলা ঘরের মতো মিষ্টি আশ্রয় আর কোথায়?

গড্-এর ছবি দেখে ঐ একদিনেই অবিশ্যি এত কথা মনে পড়েনি, থেকে থেকে একটু একটু করে স্মরণ হয়েছিল। নীলমণিবাবু ছিলেন ব্রাহ্ম প্রচারক। চেরাপুঞ্জিতে ছিল তাঁর ডেরা। বহু দুঃখী পর্বতবাসী তাঁর বাড়িতে খেত, খাসিয়া ভাষায় লিখতে পড়তে শিখত। নিরক্ষর গাঁয়ের লোক সব, তখনো সভ্যতার আলো অতদূর পৌঁছয় নি প্রাকৃতিক শক্তির পুজো করত তারা, সাপের পুজো করত, আদিম সব বিশ্বাস ছিল। তাদের মধ্যে নীলমণিবাবু কাজ করতেন। যতদূর মনে হয় যার খুশি তাঁর বাড়িতে যেতে পারত। নিরামিষভোজী সাত্ত্বিক মানুষটি, বিয়ে-থা করেন নি। এ সমস্তই পরে শোনা, এর জন্য তিনি আমার মনে দাগ কাটেন নি। যে-জন্য তাঁকে মনে আছে সে হল তাঁর বাড়িতে যার খুশি আসছে যাচ্ছে আমিও ডাঁটা চিবুতে যাচ্ছি আর তাঁর ঐ অবিস্মরণীয় জটাহরি কুকুরটি।

তার ওপর এতকাল পরে দেখছি গড্-এর ছবির সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য বোধ হয় অন্য লোকের চোখে পড়ে থাকবে, কারণ যখন আমার কৈশোর শেষ হয়ে আসছে, সে সময় একজন ভক্ত ব্রাহ্ম আমাদের বাড়িতে এসে ঐ কথা শুনে গেছিলেন, হ্যাঁ, যদি থাকতেন সত্যি, অনেক গ্রামবাসীকে পাহাড়-পাথর জীব-জন্তুর পুজো ছাড়িয়ে একমাত্র ভগবানের উপাসনা করতে শিখিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় তাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছিল যে নীলমণিবাবুই হলেন সেই একমাত্র ভগবান যার উপাসনা করা উচিত।

যার তিন বছর পূর্ণ হয়নি, সে আবার কতখানি প্রভাবিত হতে পারে? তবে মনে হয় যা দেখা যায়, যা শোনা যায়, যা করা যায়, সব দিয়ে তিলে তিলে একেকটা মানুষ তৈরি হয়। ঐ যে আমার ছোটবেলাটি কেটেছিল পাহাড়ের বুকে, ছোট নদীর কলধ্বনিতে, ঝরনার ঝরঝর শব্দে, বর্ষার প্রচণ্ড বর্ষণে, গ্রীষ্মের মিষ্টি রোদে, শীতের বরফজমা স্পর্শে, দিনরাত অবিরাম সরল গাছের শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যিখানে, জন্তু-জানোয়ার, পাখি-প্রজাপতি পোকা-মাকড় পরিবেষ্টিত হয়ে তখন আমার মনের পটে যে দাগ রেখে গেছিল, কোনো মানুষের প্রভাবের চাইতে সে কম নয়।

বাইরের এই বিশ্বপ্রকৃতি আর ঘরের নিরাপত্তা, মানুষের ছেলেমেয়ের আর কিছুর দরকার নেই। ইঁটকাঠের দেয়াল টিনের ছাদ, ওখানকার বাড়িগুলো খুব যে নিরাপদ ছিল তাও নয়, নিরাপত্তাটা অন্য দিক থেকে আসত। সে মনের জিনিস। তাকে ভাঙা যায় না, কারণ সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। বড় নিশ্চিন্ত সুখে আমাদের শৈশব

দাদা, দিদি আর আমি (১৯০৮)

কেটেছিল। নিরাপদ নিশ্চিন্ত সুখে ছোটবেলাটি কাটলেও, বাবা বেজায় কড়া ছিলেন। তাঁর মনে কোনো সন্দেহই ছিল না যে ছেলেপিলেকে কষে না পেটালে তারা মানুষ হয় না। আমাদের জন্য বাবা সম্ভবতঃ সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁর কথার এতটুকু নড়চড় হলে এমনি এক হুংকার দিতেন যে আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা। সত্যি কথা বলতে কি, ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে আমার একটুও বনত না এবং পরে একেবারে ছাড়াছাড়ি ই হয়ে গেছিল। কিন্তু, তখনো টের পেতাম যে দুজনের মধ্যে একটা ভয়ংকর সাদৃশ্য আছে। সে যাই হক, ছোটবেলায় বাবাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম, আবার বেজায় ভক্তিও করতাম। যেমনি কড়া, তেমনি গায়ের জোর। একবার কলতলা থেকে বাবার এঁটোপাতের কুলের বিচি চুষেছিলাম বলে এইসা চড় মেরেছিলেন যে এখনো মনে করলেই কান ঝিমঝিম করে। যেমনি কড়া, তেমনি গায়ে জোর ছিল। হকি-ক্রিকেট খেলতো ঘোড়ায়-চাপা ইঁটের মতো শক্ত শরীর ছিল। চড়-চাপড়গুলোও নেহাৎ ছেলেখেলা ছিল না। আমার বড় জ্যাঠামশাই সারদারঞ্জন রায় বাবাকে মানুষ করেছিলেন। তিনিও ছেলেদের পিটিয়ে শিখে করার পক্ষপাতী ছিলেন। মেয়েদের কিছু

উপেন্দ্রকিশোর
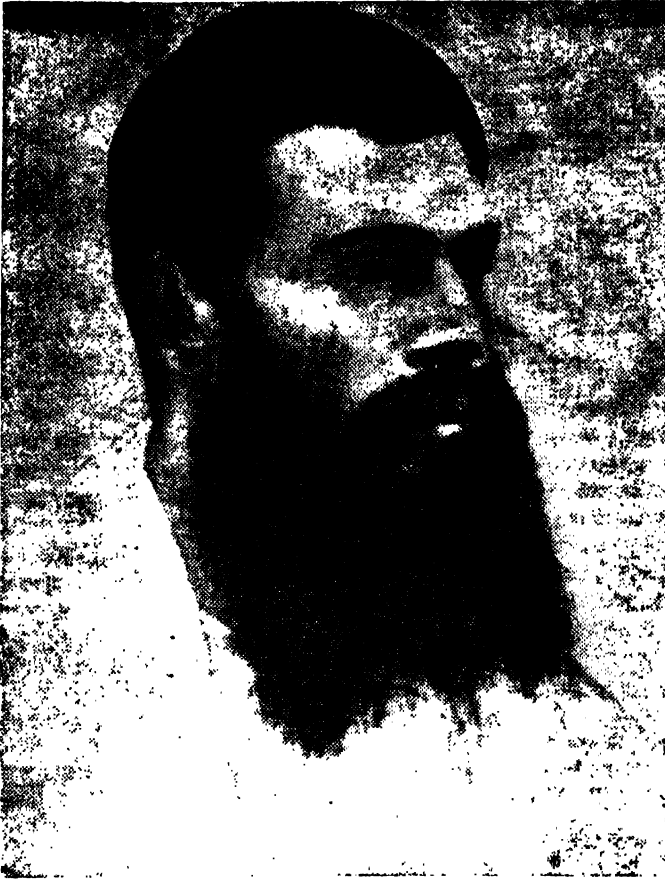
বলতেন না। বাবা ছিলেন আয়েক কাটি ধাড়া।

আরেকটা দিকও ছিল তাঁর। মনে আছে চেরাপুঞ্জিতে আমাদের হাতি চাপিয়েছিলেন। হাওদা-টাওদা ছিল না, বোধহয় হাতির পিঠে কম্বলটম্বল জাতীয় কিছু পাতা ছিল, লবড়-ঝবড় করছিল। দিলেন তুলে আমাদের চার-জনকে। প্রথমটা ভয়ে হাত-পা হিম। হাতিটা দুলে দুলে চলতে শুরু করল। তারপরেই ভয় ভেঙে গেল, অদ্ভুত একটা অহংকারের ভাব এল মনে। কিন্তু নামবার সময় এ-ওকে আঁকড়ে ধরে-ছিলাম। হাতিটা ছিল ভারত-জরীপ-বিভাগের, অর্থাৎ বাবার আপিসের। একটা নয়, অনেকগুলোকে সারি-বেঁধে যেতে দেখেছিলাম শুনেছিলাম ঐ সব হাতি-ঘোড়া আর খচ্চর বলে কিছু নিয়ে বাবারা বন বনে কাজ করতে যান। সেখানে বাঘ ভালুক থাকে। তাই শুনে বুকের ভিতর-টাতে হাতুড়ি পিটতে লেগেছিল। ভয়ে নয়, উত্তেজনায়।

গল্প বলার লোকের অভাব ছিল না আমাদের। অবিশ্যি তার বেশির ভাগ বলত আমাদের খাসিয়া ঝিরা, সবাই তাদের 'কান্থাই' বলত, কিন্তু মা বলতেন, 'কান্থাই বলবে না, নাম ধরে ডাকবে। তোমাদের কেউ যদি মেয়ে! মেয়ে! বলে ডাকে তবে কেমন লাগবে?' তবে খাসিয়া ঝিদের নাম বের করা মুশকিল ছিল। ছোটবেলায় একটা করে নাম থাকত বটে, কিন্তু যেই না বিয়ে হল, ছেলে কি মেয়ে হল, অমনি তাদের সবাই ডাকত অমুকের মা বলে, তাদের নিজেদের নাম কেউ মুখে আনত না, আনলে তারা বিরক্ত হত। আমাদের বাড়িতে কত কাক্-মি উবিন, কাক্-মি ডোরেন, কাক্-মি মেডিলা কাজ করে গেছে তার ঠিক নেই। অথচ তাদের মাতৃ-প্রধান জাত। এরাই আমাদের গল্প বলত, ভয়াবহ সব গল্প, যদি নায়ককে বাঘে না খেত, কি শত্রুরে না তীর মারত, তাহলে অপদেবতারা পিছু নিত, নিদেন হতাশ হয়ে তারা আত্মহত্যা করত। ঐ সুন্দর জায়গায় ওরা বাস করত, অথচ কখনো একটা হাসির গল্প বলত না। হয়তো জীবনযাত্রা বড্ড কঠিন ছিল। যাই হোক, আমরা বিকট গল্প শুনতে বেজায় ভালোবাসতাম।

চেরাপুঞ্জিতে মৌসমাই জল প্রপাতের গল্প শুনেছিলাম। কোনো রাজার মেয়ে তার বাপের শত্রুরের ছেলেকে ভালো-বাসত, কিন্তু তার সঙ্গে বিয়ে হল না, কিম্বা দুঃখময় কিছু একটা ঘটে ছাড়া-ছাড়ি হল। সেই মেয়ে ওই জলপ্রপাতের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে মলো। তাই এখনো নিচে থেকে ধোঁয়ার মতো বাষ্পের বিন্দু ওঠে! যদি কেউ বলে ছোটরা ভালোবাসার গল্প বোঝে না, সে ভুল বলে। ভালো-বাসা দিয়ে মোড়া থাকে ছোটদের জগৎ, ভালোবাসার মানুষকে হারানোর দুঃখ তারা যেমন বোঝে তেমন আর কেউ নয়।

অত ছোটবেলার স্মৃতি সব ভাঙা-ভাঙা একটা দুটো টুকরো কথা, অসমাপ্ত ঘটনা মনের মধ্যে লেগে থাকে। চেরাপুঞ্জি থেকে আমরা শবান পাড়ার ব্রাহ্ম মন্দিরের ওপরে ছোট একটা বাড়িতে এসে উঠলাম। হয়তো প্রথমে কোনো বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে উঠে সেখান থেকে এই বাড়িতে। আমরা চারজন আগে গেলাম মা আর যামিনীদার সঙ্গে। বাবা আসবেন পরে, শেষ জিনিসপত্র ঠেলা গাড়িতে তুলে। কাক-মি-ডাবিনও আসবে সেই সঙ্গে।

পাহাড়ের ঢালের ওপর বাড়ি, নিচে রাস্তা, চারদিকে ইউকালিপটাস গাছ। এককালে কেউ ফুল-গাছও লাগিয়েছিল, এখন সব আগাছায় ভরা। চারধারে ঝোপ-ঝাপ। তাতে লাল-হলুদ গোছা গোছা ফুল, তার বিশ্রী [illegible] গন্ধ। কোনো কোনো ঝোপে ফল ধরেছে, ছোট্ট ছোট্ট আঙুরের মতো থোপা-থোপা, বেশির ভাগই সবুজ। কয়েকটা পেকে টুকটুক করছে। দাদা বলল, 'লাল ফল ভালো।' বলে এক মুঠো তুলে নিজেও খেল, আবার দিদিকেও দিল। বদ্ খেতে, থু-থু করে ফেলেও দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মুখ দিয়ে কেবলি ফেনা উঠতে লাগল। সে আর থামে না। দাদা বলল, 'বিষ ফল। আমরা মরে যাব।' কল্যাণ আর আমি ওদের মরার অপেক্ষা করতে লাগ-লাম। মরা পাখি-টাখি দেখেছি, কিন্তু জ্যান্ত মানুষের মরা দেখিনি। দাদা দিদি ততক্ষণে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছে আর কথাটথা বলছে না। মা আমাদের খুঁজতে এসে ঐ অবস্থা দেখে কেঁদেকেটে একা-কার। যামিনীদা গেল ডাকতার ডাকতে।

এমন সময় বাবার সঙ্গে কাক-মি উবিন জিনিসপত্র নিয়ে এসে হাজির হল। বাবার তো চক্ষু স্থির। কাক-মি উবিন একটুও ঘাবড়াল না। ছুটে রান্নাঘর থেকে মুঠো ভরে নুন এনে ওদের মুখে পুরে

দিল। ওরা ঝমিটমি করে সুস্থ হয়ে উঠল। ততক্ষণে ডাকতার এসে বললেন, 'বিষ হলে, ওতে মানুষ মরে না।'

বাগানের এক কোণে ডালিমগাছের নিচে লম্বা একটা পাথর, তার পাশে কেউ একটা পাহাড়ি গোলাপ লতা লাগিয়েছিল। পাশের বাড়ি থেকে সোনামণি বলে একটা ছেলে এসে বলল, 'ওমা জান না! ওর নিচে মরা মানুষের ছাই আছে! এ-বাড়িটা যাদের তাদের লীলা বলে একটা ছোট্ট মেয়ে ছিল। অনেকদিন আগে বড় ভূমিকম্প হল, সবাই দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঐ ছোট্ট মেয়েটা —মা কোথায়? মাকে দেখতে পাচ্ছি না! —বলে ছুটে যেই না ভিতরে ঢুকেছে, অমনি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। ঐ পাথরটা চাপা পড়ে লীলা মরে গেল। অথচ তার মা বাইরেই ছিলেন।'

মনে আছে সে গল্প শুনে আমরা কেঁদেকেটে একাকার করেছিলাম। তবে গল্প শুনে কাঁদার মধ্যে একরকম মধুর ভাব আছে, কিন্তু সত্যিকার দুঃখ এসে চোখ-মুখ সব তিকততায় ভরে যায়।

সোনামণিরা পাশের বাড়িতে থাকত। তার দাদুর নাম ছিল বোস সাহেব। তাঁদের বাড়িতে সুন্দর একজন মেয়ে ছিলেন, পরে শুনেছিলাম তিনিই নাকি শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রী। সত্যি কি না জানি না। বোস সাহেবের এক ছেলে ভিখারি দেখলেই পয়সা দিতে চাইত, তাকে সবাই ধকাবকি করত। সে নাকি বলত, 'ওরা খায়নি, ওদের খেতে দাও।' সেই ছেলে মারা গেল। বছরে বছরে সেইদিন ওঁদের বাড়িতে কাঙালী ভোজন হত। আমরাও কত সময় গিয়েছি। ঐ সুন্দর মানুষটি আমাদের যত্ন করে খাইয়েছেন। মনে কেমন দুঃখ লাগত।

মাকে খুঁজতে গিয়ে পাথরচাপা পড়ে মরা আমার নামে নাম সেই ছোট্ট মেয়েটির জন্যেও বড় কষ্ট হত। তখন বোধ হয় ১৯১০ কি ১৯১১ সাল, কারণ একটু একটু মনে পড়ে বিলেতে বুড়ো রাজা মরে গেলেন, তাঁর ছেলে রাজা হলেন। তাই চারদিকে আলো জেলে আনন্দ প্রকাশ করা হল। আমাদের বারান্দার কড়িকাঠ থেকেও সুন্দর সুন্দর চীনে-লণ্ঠন ঝোলানো হল। সে বড় সুন্দর জিনিস, আজকাল আর দেখা যায় না, তার কোমল রঙীন আলোতে ছায়ার ভাগই বেশি। কি রস, কি রোমাঞ্চ! ভিতরে একটি ছোট মোমবাতি জেলে, কাগজের ঘেরাটোপটি টেনে দিয়ে, তারের হুকটি কোথাও টানিয়ে দিতে হত। অমনি কাগজের ঘেরাটোপে আঁকা রঙীন ছবিটিও ফুটে উঠত। তার নিচে কেউ দাঁড়ালে আমার তাকে সুন্দর দেখতে লাগত।

বাড়ি সাজিয়ে আমরা গেছিলাম অন্যদের বাড়ি সাজানো দেখতে। ফিরে এসে দেখি মোমবাতি জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেছে, কাগজে আগুন লেগে রঙীন ছবি সব পুড়ে তো গেছেই, কড়িকাঠ শুদ্ধ জায়গায় জায়গায় ঝলসে গেছে। আর যামিনীদা রেগে টং হয়ে আছে।
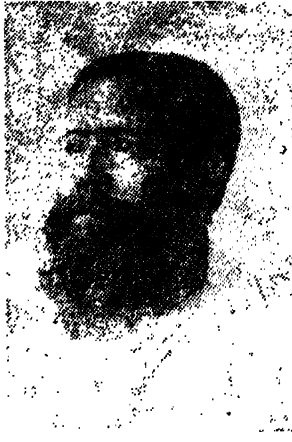
সারদারঞ্জন রায়

ও-বাড়িতে বোধ হয় খুব কম সময় ছিলাম, সেখান থেকে যেখানে উঠে এলাম, তার নিচে দিয়ে কুলকুল করে একটা নদী বয়ে যেত। নদীর ওপর কাঠের পুল, তাতে গাঢ় লাল রঙ করা। নদীর ওপারে ছিমছাম খেলার মাঠ। সেখানে সাহেবরা টেনিস খেলত, ক্রিকেট খেলত, গল্‌ফ খেলত। আমরা বাড়ি থেকে দেখতাম। খেলায় বাবার ভারি উৎসাহ, নিজে ভালো খেলতেন, তার জন্য রুপোর কাপ পেয়েছিলেন। বসবার ঘরের চিমনির ওপরকার তাকে সেটি সাজানো থাকত। আমাদের কি গর্ব! আমার বড় জ্যাঠার খেলোয়াড় বলে খুব নাম-ডাক ছিল। শুধু খেলোয়াড়ই ছিলেন না, এ-দেশে ক্রিকেট প্রতিষ্ঠা করার কাজে তিনি ছিলেন অগ্রণী। তখন সারদারঞ্জন রায়ের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরত। টাউন ক্লাবের গোড়া পত্তন তাঁর হাতেই হয়েছিল। মেট্রোপলিটান কলেজের—এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ—তিনি প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন,

স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশায়ের হাতেগড়া বেপরোয়া বাঙালী ছেলে। তিনিও এক পুরুষ নির্ভীক বলিষ্ঠ ছেলে তৈরি করে দিয়েছিলেন, যারা খেলাধুলোয় কাজেকর্মে জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছিল। বাবা ছিলেন তাদের একজন, আমার ছোট জ্যাঠা কুলদারঞ্জন ছিলেন আরেকজন। এতসব ঐ বয়সে জানতাম না, তবে ক্রিকেট খেলার সঙ্গে যে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তা বুঝতাম। ঐ বাড়িতে আমার সেজভাই অমিয় জন্মেছিল আর সেই দিনই গন্ধরাজ গাছের আড়ালে আমি বাড়ি কাকুমি উবিনকে ছাতাপেটা তো করেইছিলাম, খিমচেও দিয়েছিলাম। বাবা বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে কাথায় ধমকাবেন, না তো তো করে হেসেছিলেন। তবুও কাক-মি উবিন আমাকে টেনে বেড়াতে নিয়ে গেছিল।

লাল পুলের অন্য মাথায় শশীবাবুর দোকান ছিল, সেখানে গোলাপী লজেঞ্জুষ পাওয়া যেত। নিচে লম্বা লম্বা চালাঘর ছিল, সেখানে সপ্তাহে একদিন হাট বসত। তার-ই পাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে নদীটি চলে গেছিল। নদীর ধারে কাঠের বাড়িতে এক পাগলী থাকত। সে দিন-রাত কাঁদত। আর কিছু মনে নেই। এর পরের অনেকগুলো দিন-রাত গুলিয়ে গেছে। তারি মধ্যে কোনো সময় আমরা যে-বাড়িতে উঠে এসেছিলাম, তার নাম ছিল 'হাই-উইণ্ডস'। এমন সুন্দর নাম আর আমি

শুনিনি। কে দিয়েছিল কে জানে। বাড়ির মালিক ছিলেন খালিয়া, কিন্তু তাঁর নাম ছিল জীবন রায়, বড় বড় পাকানো গোঁফ ছিল, সবাই বলত নাকি খুব ভাল লোক। লেখাপড়া জানতেন।

ঐ বাড়িতে আমরা আট বছর ছিলাম, একবারো মনে হয়নি ওটি আমাদের নিজের বাড়ি নয়। এমন বাড়ি আর চোখে দেখলাম না। ৪৫ টাকা ভাড়া ছিল। পাহাড়ের ঢালের ওপর বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকে কাঁকর-বিছানো পথ দিয়ে নেমে বারান্দায় পৌঁছতে হত। একহারা লম্বা বাংলো, সামনে টানা বারান্দা, তার কাঠের রেলিং। বাড়ির তিন দিক ঘিরে বৃষ্টির জল যাবার জন্য নালা কাটা। তার ওপর দুটি চ্যাপ্টা পাথর ফেলা। তার ওপর দিয়ে বারান্দায় উঠতে হত। বারান্দার ছাদ থেকে তারের ঝোড়ায়, কাঠের ঝোড়ায় অর্কিড ফুল ঝুলত। তাদের তলায় সবুজ কাঠের বাকসে জেরেনিয়ম ফুল ফুটত। লোকে এমন বাড়ির স্বপ্ন দেখে।

বাড়িতে কুকুর বেড়াল রাখার জো ছিল না, তবে লাল পুলের বাড়ির বাইরে ছোট একটা খুপরির নিচে আমাদের বড় মোরগ আর কয়েকটা মুরগি থাকত। খ্যাক-শেয়ালের ভয়ে রাতে তাদের ঘরে তুলত কাকু-মি উবিন। সকালে আবার যেই দরজা খুলে দিত ওরা ক'ক-ক'ক-ক'ক করতে করতে বেরিয়ে আসত। এক দিন দেখা গেল তিনটে বাসায় তিনটে ডিম! আমরা তো অবাক। ডিম যে এভাবেও পাওয়া যায় এ আমাদের ধারণা ছিল না; আমরা দেখতাম ডিম-ওয়ালার কাছে 'হালি' হিসাবে ডিম কেনা হয়। চারটে ডিমে এক হালি। পরে শুনেছিলাম এক হালির দাম ছিল ৫ পয়সা।

মা আর বাবা

অনেক দিন পরে কাকু-মি উবিশ হঠাৎ এসে খবর দিল, 'ডিম ফুটে ছানা বেরিয়েছে দেখ গে!' দাদা আগে ঢুকল, ঢুকেই বেরিয়ে এসে আমাদের ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। খালি বলে, 'ঠকরাবে! ঠকরাবে!' দেখলাম আমাদের পেয়ারে লাল মোরগের চেহারা বদলে গেছে, লাল ঝুঁটি উঁচু করে, চোখ পাকিয়ে নখ বাগিয়ে পালক ফুলিয়ে ডবল বড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাদার হাত থেকে রক্ত পড়ছে! তাই দেখে সবাই মিলে সে যা চেল্লালাম!

ছোটদের জীবনের সবটা মোটেই আরামে-আদরে ভরা থাকে না, তার উল্টো-টিও যথেষ্ট দেখা যায়। বাড়িতে সরোজিনী মাসিমা এসে ক'দিন ছিলেন। স্কুল ইন্সপেকশনে এসেছেন, মার বন্ধু। আমাদের শোবার ঘর তাঁকে দেওয়া হল। তাতে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। তবে কোথায় শুতাম মনে নেই। দুপুরে কেউ কোথাও নেই দেখে সরোজিনী মাসিমার ঘরে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপর রাশি রাশি নীল খাম আর চিঠির কাগজ, একটা দোয়াত, তাতে কালি ভরা, দুটি কলম! একসঙ্গে এত আমরা কখনো দেখিনি। দাদা অমনি পোস্টমাস্টার সেজে চেয়ারে বসে, কালি দিয়ে খামের ওপর ঠিকানা, কাগজে লম্বা লম্বা চিঠি লিখে, দিদিকে আমাকে বিলি করার জন্য দিতে লাগল। লিখতে জানত না বলে ওর কোনোই অসুবিধে হল না। দিদি আমি দুজনেই পিওন। চিঠির প্রাপক কল্যাণ! সেদিনের সেই অপ্রত্যাশিত আনন্দের কথা আজ পর্যন্ত মনে আছে। কিন্তু বেশির ভাগ আনন্দের ব্যাপারের মতো এর শেষটিও বড়ই নৈরাশ্যময়। সরোজিনী মাসিমার রাগ-মাগ, কান-মলা, বকুনি, কান্না। বলা বাহুল্য এসব ঘটনার কতখানি আমার মনে ছিল আর কতখানি মার কাছে শুনেছি, সব একাকার হয়ে গেছে। তবে চোখের সামনেই পোস্টমাস্টার আর পোস্টাপিস এখনো দেখতে পাই। (চলবে)

ঢেউটি এসে পায়ের কাছে গুটিশুটি বসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। এবং গড়াতে গড়াতে অনেক দূরে গিয়ে থামে। আর তখুনি জমিলার শরীর দুলকে ওঠে। দুলকে উঠে নতুন জলের শব্দের আশায় কানকো মেলে বাধা চপল মাছের মতো। ওরা যেমন আবলি ভেঙে এপাশ-ওপাশ ছুটে থমকে দাঁড়ায়। তেমনি এদিকে-ওদিকে ছুটতে চায় মন। কিন্তু শব্দ নেই। আসলে শব্দ থাকে না। জমিলা জানে জলের নীচে কালো মাটির গায়ে লাল কানকোঅলা মাছের শরীর পলাতক হয়ে যায়। তবুও ছাউনিতে ফিরে যাবার নামে কিছুতেই ইচ্ছের লাগাম ধরতে পারে না জমিলা।' ইচ্ছেটা গুন টানা নৌকোর রশি হয়ে গভীর থেকে গভীতর জলের দিকে টানতে থাকে।

জল ছাড়া কিছু ভাল লাগে না জমিলার। চরধুমানীর শেষ সীমানায় এই আছড়ে পড়া নদীর কুল নিশির মত টানে। কোন সাধ্য নেই এক মাথা উঁচু হোগলা পাতার ঐ ছাউনীটার মধ্যে নিজেকে ধরে রাখার। উল্টো পিঠ নৌকার মত ভুস করে ভেসে ওঠে শুশুক। ফুটকি দিয়ে দিয়ে ওঠে ফকফকে পোমা ভোল। ভাসতে ভাসতে চলে যায় কত কি। জলীয় লম্বা ঘাস ভিরা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথা দোলায়। মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক মধুচুশকী উড়ে যায়। মধুচুশকীর ছোট ঠোঁটে নিজের মনটা ঝুলিয়ে দেয় জমিলা। জানতে চায় না ওরা কোথায় গিয়ে থামবে। এই সব দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে অনবরত জলের বুকে নিজের ছবি দেখে ও।

মাঝে মাঝে মকবুল পাটারী রাগে বেহুঁশ হয়ে ছুটতে ছুটতে আসে।

—এই জমিলা তোরে নিয়ে আর পারি না।

—না পারলি এই জলের মদ্দি ফালায়ে দাও। আর কনু সময় ফিরা আসব না। জমিলা নির্বিকার উত্তর দেয়।

মকবুল পাটারী সুঁচালো দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। জানে মেয়েটা এমন। আস্তে আস্তে বলে পানিই তোরে খাবে। পানির মদ্দি তোর এত কি?

—আমার মা নাই ক্যান?

—আমিও তো কই তোর মা নাই ক্যান? তাইলে তো এত জ্বালায় জ্বলতাম না। চল ঘরে যাই।

—তোমার ঐ পাতার ছাপরা আমার ইট্টুও ভাল লাগে না বাজান। জমিলা বাবার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

—বাজান তুমি মহাজনের ধান পাহারা দিবার লাগি এই চরে আইলে ক্যান?

মকবুল পাটারী কথা বলতে পারে না। নদীর বুকের ওপর—থেকে ইওল বাতাস ভেসে আসে। আথাই পানির কোন দিশপাশ নেই। ইওল বাতাস যেমন শরীর জুড়ায়, আথাই পানি জুড়ায় দৃষ্টি। মকবুল পাটারীর বুকটা ভার হয়ে ওঠে। জমিলা এক পা এগিয়ে জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দেয়। মধুয়া ঘাগড়ার তলে এসে বসে থাকে বেলে মাছ। স্বচ্ছ জলের তলে আর আঁশঅলা শরীর পরিষ্কার দেখা যায়। আরো দেখা যায় কুচো চিংড়ির ঝাঁক।

—জমিলা?

—কি বাজান?

—মা পান্তা দিবি নে?

বাবার এই দীন কন্ঠ স্বরের পর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব নয়। ফিরতে হয় জমিলাকে। ঘরে ফেরার ডাক জমিলার চেতনায় নেই। ঐ একটা পাতার ছাউনী না থাকলে ভাল হোত। সমগ্র চরের

যেদিকে তাকায় সেদিকেই মনে হয় একটি ঝরে পাতার ছাউনী দাঁড়িয়ে আছে। নদীর বুকেও পাতার ছাউনী। বাবার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ঘরে ফেলে জমিলা। ধূপছায়া রোদের আগুন আভা ওকে তখন জ্বালিয়ে মারে। মনে হয় নদীর বুকে দ্বীপের মত গজিয়ে ওঠা চরটা ওর রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। এর বাইরে জমিলার আর কোন অস্তিত্ব নেই। গাঁয়ে ছিল কেবল শাসন আর পায়ের বেড়ি। এখানে আসার পর ও খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া ময়না হয়ে গেছে। কেবলই উড়ালের সাধ হয়। চরধুমানীর এমন স্বাধীনতা না পেলে ও কোনদিন জলের এত কাছাকাছি আসতে পারত না জল ওকে মায়ের ভালবাসার সুখ দেয়।

পান্তা ভাতের সানকীটা বাবার সামনে ঠেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শূন্য হয়ে যায় জমিলার মন। পান্তা ভাতের সপ সপ শব্দ ওর কানে হিস হিস শব্দ তোলে। ক্ষুধার সাপটা ফণা তোলা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। জমিলা ছাউনীর বাইরে এসে চুপচাপ বসে থাকে। যতদূর চোখ যায় কেবল ধানের নতুন চারা মাথা দোলায়। চরধুমানীতে এসে জমিলার নতুন জন্ম হয়েছে। নদীর পাড়ে অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের কেলিবিলাস মায়ের কথা মনে করায়। বাতাসের নিঃশব্দ হামাগুড়ি আর অজস্র পাখী ওর স্বাধীনতার স্বপ্ন। যে পাঁচ-ছশ ঘর বাসিন্দা তারাও অনেক ভাল হয়ে গেছে।

জমিলার কোন আচরণে রক্ত চক্ষু তুলে শাসন করতে আসে না। বেহায়া বলে গালও দেয় না। গ্রামে থাকতে অনেক গাল শুনতে হয়েছে।

—এ্যাই জমিলা ?

—কি বাজান ?

তুই খাবিনে ?

ভাতের দলা মুখে পুরতে পুরতে জিজ্ঞেস করে মকবুল পাটারী।

—না ভুক নাই।

—ভাত আর আছে নাকি ?

জমিলা লজ্জা পায়। হাঁড়ি উপুড় করে আমানীটুকু মকবুলের সানকীতে ঢেলে দেয়।

ভাত কহানে ?

—আর নাই।

হঠাৎ করে শেষ দলাটা মকবুলের বুকে আটকে যেতে চায়। ভুক নাই বলে মেয়েটা ওকে ফাঁকি দিয়েছে। ক্ষুধার যে তীব্রতা এতক্ষণ মাথায় আগুন জ্বালিয়েছে তা দপ করে নিভে যায়। মনে হয় মেয়ের সামনে থেকে এখন পালিয়ে যেতে পারলেই বুঝি বাপ হওয়ার লজ্জাটা এড়ানো যায়। কোন মতে হাতটা ধুয়ে ঘরের কোণ থেকে বিনখাটা উঠিয়ে নেয় মকবুল পাটারী।

—এই রোদির মদ্দি কহানে যাও বাজান ?

—যাই কাম করিগে। ক্ষ্যাত না নিড়াইলে আমন ধান ভাল অবিনে। এই ভাদাইগুলাই আমার দুশমন।

মকবুল পাটারী অপরাধীর হাসি হেসে বেরিয়ে যায়।

সারা বেলা কোন কাজ নেই জমিলার। সকাল বেলা চাট্টি ভাত বাঁধে আর একমুঠো সুটকীর ভর্তা বাটে। মাঝে মাঝে জোয়ারের জলে ভেসে আসা মাছ ধরে রান্না করে। কুচো চিংড়ি বেটে বড়া বানায়। বাবা মেয়ে মিলে তিন বেলা তাই খায়। মাঝে মাঝে পাশের ঘরের নসুর মা যখন প্রশ্ন করে, কিরে কি রানদিলি ?

উত্তরে যেন জমিলার সক্ষা! অনন্তের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। মনটা কেমন হাঁসফাঁস করে। ভাল কিছু রাঁধতে না পারাটা অপরাধ মনে হয়। ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, কি আর রানদব সুটকীর ভর্তা করছি।

—আমারে কগডা সুটকী দিবি? ঘরে রানদবার কিছু নাই।

জমিলা নিঃশব্দে এক মুঠি সুটকী এনে দেয়। জানে ঐ চাওয়াটুকর জন্যে এত ভণিতা।

সারা দিন কিছু করার নেই বলে বুকটা খা খা করে। মৃত মার কথা মনে হলে মনটা বাউরা হয়ে যায়। তখন ওর জলের কাছে যেতে ইচ্ছে করে। গাঁয়ে থাকলে এ ঘরে ও-ঘরে সারাদিন গালগল্প করে সময় কাটাত। মাকে তেমন মনে পড়ত না। কিন্তু এই চর ওর উনিশ বছরের জীবনটাকে একদম ওলট-পালট করে দিয়েছে। নদীর তীরের খান্দুর মত মিটমিটিয়ে জেগে থাকে স্মৃতি। তখন কষ্ট হয়। কাঁদতে ইচ্ছে করে। বেশী খারাপ লাগলে উঠে হাঁটতে থাকে। তখন ও সারাক্ষণ মনে মনে নতুন জলের শব্দের প্রার্থনা করে। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে যায় জমিলা।

বাশকা ঘাসে পা ডুবিয়ে রাখতে আরাম লাগে। পাশ দিয়ে ছুট করে পালিয়ে যায় ঢউপ্পা। বোয়াইলা ফড়িং কানের কাছে বোঁ করে উড়ে আসে। আবার ডিগবাজী খেয়ে অনেক দূরে চলে যায়। জমিলার মনে হয় গাঁয়ের কথা: চরধুমানীর মত কেউ ওকে এমন করে কাছে টানে নি। এখানে সবাই ওকে ভালবাসে। আসলে চরধুমানী ওর একলার। আর কারো না। দূরের মাঠে কর্মরত বাবা এবং অন্যান্য লোকের মাথা কালো বিন্দুর মতো দেখায়। তখন মনটা আড়মাল পাঁড়ের মত রুখে উঠে। না এই চর আর কারো নয়। শুধু ওর। এখানে কারো দাবী নাই। জোর দখলি নেই। চরধুমানীর কাছে ওরা চায় ফসল। মুঠো মুঠো ধান। ওদের প্রার্থনা কেবল দাও। জমিলা চরধুমানীর বস-নিংড়ানো কিছু চায় না। জমিলা একে ভাল-বাসে। যৌবনের মত ভালবাসে। নীড়ের স্বপ্নের মত ভালবাসে।

অথচ লীলাক্ষীর বুকে সম্প্রতি জেগে ওঠা চরধুমানীকে নিয়ে দুই দলের মধ্যে বিবাদ দানা পাকিয়ে উঠেছে। চর জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এর সবটুকু স্বত্ব দখল করেছে আলীমুদ্দীন। জমিলার বুড়ো বাপ আর ছয় ঘর লোক এসেছে তারই প্রতিনিধি হয়ে চরের জমি আর ধান পাহারা দেবার জন্য। ইতিমধ্যে এ চরের স্বত্ব নিয়ে বিভিন্ন লোকের মধ্যে একটা অধিকারের দাবী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাহের আলী বলে গত বর্ষার আগে তার জমি ছিল। বর্ষার ঢলে সে সব জমি ভেসে গেছে। এখন এ চর তার। কিন্তু আলী-মুদ্দীন অতো কাঁচা লোক নয়। সামান্য মুখের কথায় সরে দাঁড়াবে না। বাহুতে অতো কম জোর নিয়ে সে মাঠে নামে নি। চর জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দখল করেছে। সুতরাং তার দাবী আগে। তাছাড়া কবে কোন যুগ আগে কোথায় কার জমি ছিল সেসব শুনতে আলীমুদ্দীন রাজী নয়। এসব করে করেই তার সম্পত্তি বেড়েছে, ধানের জমি বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বয়স বেড়েছে আর মাথার চুলে পাক ধরেছে। ফলে দুই প্রতিপক্ষ দল পরস্পরের প্রতি মারমুখী হয়ে আছে। কেউ কাউকে ছাড়বে না। মকবুল ওকে প্রায়ই বলে, একদিন দেখবিনে ঘাড়ের পরে মাথাডা নাই।

—এমন কামে আমগার কাম নাই বাজান। তারচে' বাড়ী চইল্যা যাই।

—ফিরে যাবা খাব কি? খালি তো সেই খিদার জ্বালা। এই পোড়া কপাল নিয়াই আমরা আইছিরে জমিলা। আমগার ডাংগায়ও মরণ পানিতেও মরণ।

জমিলা বাবার কথার উত্তর দিতে পারে না। কেবল ঝোপের ভিতর বাবুই পাখীর মত লাফায় মনটা। জানে মা মারা যাবার পর বাবা একদম বদলে গেছে। বেশী কিছু এক-সঙ্গে ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না।

—এই দেহনা মা গেছে—দেখিটর পর থিং তোরে আর কাপড় দিবার পারি নেই।

—তোমার কাছে কি কাপড় চাইছি বাজান ?

—তুই না চাইলে কি? আমার কি আর কিনার সাধ অয়না রে ?

বাবার ছলছল মুখের দিকে তাকিয়ে জমিলার মার কথা মনে হয়। একজন মানুষের জীবন থেকে একজন প্রিয় মানুষ সরে যাওয়ার অর্থ ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। এ নিষ্ঠুরতা ভয়ংকর প্রবৃত্তির মত নয়। বেদনায় আচ্ছন্ন করে রাখে। জীবন নিয়ে কোন বাঁধিবাঁধি চলে না। ফাঁকে পা পড়লেই মরণ। পা টেনে উঠায় কার সাধ্যি। বাবা সে ফাঁকে পড়েছে। আর উঠতে পারছে না। ওঠার মত মনের জোরও নেই।

জমিলা ঘাসের ভেতর পা ডুবিয়ে আবার হাঁটতে থাকে। নদীর কাছাকাছি এসে যায়। চরের পুব দিকটায় সাধারণত কেউ আসে না। রাঁশখমা ঘাস আর উলু ঝাড় বুক সমান উঁচু হয়ে উঠেছে। হেলেঞ্চা ভরা নদীর কিনার সবুজের নিনুনি হয়ে শুয়ে থাকে। জমিলার কেবলই মনে হয় এসবই তার। এদিকে মানুষের চলাচল নেই বলে জমিলার আকর্ষণ এখানে। সন্ধ্যার পূর্বক্ষণের বিরিং লাল আকাশ দেখতে দেখতে উনিশ বছরের যৌবনটা নিস্ফল মনে হয়। মনে হয় আকাশের মত টুকটুকে লাল হতে হতে এক সময় ওটা টুপ করে নদীর বুকে ডুবে যাবে। আর কি! বুকটা মোচড়ায়। ভশালিকের কিচির মিচির তখন যৌবনের শেষ সংগীতের মত কানে বাজে। এই চরের ভালবাসা সান্দ্র হয়ে ওঠে। জমিলা ঘাসের ডগা দাঁতের তলে চিবুতে চিবুতে সেই চিরাচরিত ভাবনাতে ফিরে আসে। যেখানে ওর জন্যে কোন আনন্দ নেই।

জমিলার মনে হয় ওর চারিদিকে একটা নিরানন্দের স্রোত বইছে। জীবন যাপনের সংগে এই চর এবং তার সমস্ত পারিপার্শ্বিকের সংগে কোন সম্পর্ক নেই। সে এই মাটিকে যত ভালই বাসুক ওর বাবা এখানে প্রতিনিধি। অন্যের সম্পদের পাহারাদার মাত্র। এই চরকে কেন্দ্র করে ওর আবেগের কোন মূল্য নেই। এই বোধের সংগে সংগে সমস্ত অনুভূতি পানসে হয়ে যায়। এ দুয়ের সম্মিলনের সম্মিত চেতনা ওকে বিরূপ করে তোলে।

চরধমানী প্রসব করেছে কেমন নিটোল আর পুষ্ট ধানের ছড়া। যৌবন যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে খান খান হয়ে যেতে চায়। জমিলা দেখে স্বর্ণ প্রসবিনী উর্বরা চরে ফসলের প্রাচুর্যময় সমারোহ—সোনালী ধানের শীষে আশ্চর্য জীবন্ত এ চর। অথচ এর একটা ধানও তাদের নয়। এ চিন্তা জমিলাকে পাগল করে তোলে। বুকে আগলে এগুলো পাহারা দিচ্ছে ওর বুড়ো বাপ। অথচ পুরুষ্ট ধানের কণা আলীমুদ্দীনের গোলাই ভর্তি করবে মাত্র।

চরের বুকে জমিলা এখন একটা আলাদা মৌ মৌ গন্ধ পায়। তাতল হয়ে উঠে শরীর। সমুচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হয়ে ও সমীর বরে ধানের ক্ষেতে পা রাখে। নিবর্ষ আকাশটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে চায় যে বৃষ্টি নামুক। একমাত্র বৃষ্টি ওর তাতল ভাব কাটাতে পারে। আর কেউ না। ধানের ছড়া বুকে জড়িয়ে গন্ধ শুকলে মনে হয় এ যেন ওর রক্তের একটা অংশ। তাই কিছুতেই ভাবতে ইচ্ছে করে না যে এ ধানের মালিক শুধু আলিমুদ্দিন। এ জমি চাষ করেছে ওর বুড়ো বাপ, ধান লাগিয়েছে—আগাছা সাফ করেছে—বুকের মমতা দিয়ে পাহারা দিচ্ছে। অথচ সে যখন এ ধানের অধিকারী নয়—তখন ওর কাছে আলিমুদ্দিনও যা তাহের আলীও তা। এ ধান তাহের আলীর গোলায় গেলেই বা কি ক্ষতিবৃদ্ধি ? একদিন বাবাকে একথা বলেছিল। মকবুল কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল, সে আমগার পালক। যার নুন খাই তার গীবত গাইতে নাই জমিলা।

জমিলা অনুভব করেছে মকবুল পাটারী খুব সুস্থভাবে কথাগুলো বলতে পারেনি। গলাটা কেমন ভারী মনে হয়েছিল। মকবুল পাটারীর নির্বোধ অনুভূতি বুঝি চিড় খেয়ে গিয়েছিল সেদিন।

একদিন হেলেঞ্চার গা উল্টিয়ে মলাংগি মাছ খুঁজতে খুঁজতে ও দেখেছিল সেই ডিঙিটা। ভয়ে থমকে গিয়েছিল। মেঘলা ছিল আকাশ। হয়তো বৃষ্টি নামতে পারে। এক ঝাঁক মপুক উড়ছে ওর মাথার ওপর। আঁচলে বাঁধা আটদশটা মলাংগি মাছ তখন নিথর হয়ে এসেছে। লোকটা প্রথমে ওকে দেখতে পায়নি। জমিলা হেলেঞ্চার গা ঘেঁষে চুপচাপ বসে থাকে। উঠে যাবার শক্তিটুকুও নেই। মনে হয় উলোঝাড় যদি ওর চারদিকে নিবিড় বেষ্টনী রচনা করে দিত, তাহলে এ যাত্রা বেঁচে যেত ও। লোকটা খুব কায়দা করে হেলেঞ্চার গা-ঘঁষড়ে কূলে এনে ঠেকালো ডিঙিটা। তখুনি জমিলার সঙ্গে চোখাচোখি হোল ওর। একটু ঘাবড়ালেও নিজেকে সামলে নিল দ্রুত। তারপর লাফ দিয়ে পাড়ে নেমে লগি পুঁতে বেঁধে ফেলল ডিঙি। কাছে ধারে কেউ নেই। যে নির্জনতা জমিলার নিত্যসঙ্গী, তা ওকে পাষাণের মতো জাপটে ধরলো। কানকো মেলে রাখা মাছের কথা বেমালুম ভুলে গেল ও। জলের শব্দও কানে আসছে না। কাদামাখা পা জোড়া কোনমতে থুয়ে উঠে এলো। নদীর বুকে তখন উথালপাথাল ঢেউ। কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে উড়ে গেলো বোয়াইলা ফড়িং। জমিলা দ্রুত হাঁটতে থাকে।

লোকটা তখন এক দৌড়ে ওর সামনে এসে দুহাত প্রসারিত করে দাঁড়ায়—।

—যাও ক্যান ?

জমিলা কথা বলতে পারে না। লোকটার ঠোঁটে চিকন হাসি। ছোটখাটো ঝোপের মত একজোড়া গোঁফ। জমিলার দৃষ্টি গোঁফের ওপর থেকে বুকে নেমে আসে। তারপর সরাসরি পায়ের কাছে গিয়ে থমকে যায়। সে দৃষ্টি আর ওপর দিকে ওঠে না।

—চল, ঐ জাগায় বসি।

লোকটা ওর হাত ধরে টানে। জমিলা ওর হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। মনে দ্বিধা, সংকোচ ইত্যাদি ঢেউয়ের মত গড়াতে গড়াতে থাকলেও, উনিশ বছরের উথালপাথাল যৌবন লোকটাকে সরাসরি অস্বীকার করতে পারে না। লোকটা একটা জোরে টানতেই ও প্রবল আপত্তি না জানিয়ে পিছু পিছু আসে।

ঘাসের ওপর বসেই লোকটা ওকে জিজ্ঞেস করে তুমার বাপ কিডা ?

—মকবুল পাটারী।

জমিলার ভীতু কণ্ঠ কেঁপে যায়।

—হুঁ।

লোকটা টাঁক থেকে বিড়ি বের করে ধরায়। আকাশে মেঘের ঘটা গাঢ় হয়ে ওঠে। এক ঝলক ইলশে বাতাস বয়ে যায়। জমিলা আস্তে করে বলে, তুমি কিডা ?

—আমি কালাম। তাহের আলী আমার বাজান অয়।

—অ্যাঁ।

জমিলার মুখ থেকে অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে আসে।

—ডর পাইলা মনে অয়?

কালাম হো হোক করে হাসে। তাগড়া জোয়ান লোকটার মুখে হাসি ভরা গাঙের মত। কূল ছাপিয়ে ছপছপ করে ওঠে। জমিলার উনিশ বছরের যৌবনে এখন একটা কথাই মনে হয়, এ ধান তাহের আলীর গোলায় গেলেই বা কি ক্ষতিবৃদ্ধি?

কালাম হাত নেড়ে গড়গড় করে যা বললো তার অর্থ এই, ও দেখতে এসেছে ধানের এখন কি অবস্থা। এ ধানের এক কণাও ওরা ছাড়বে না। একদিন রাতে এসে সব কেটে নিয়ে যাবে। আলিমুদ্দিনকে ওরা থোড়াই পরোয়া করে। কারো সাধ্যি নেই তাহের আলী আর তার ছেলেদের বাধা দেবার।
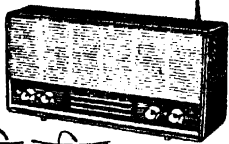
কালাম বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে ওকে একটু কাছে টানে। জমিলা আড়ষ্ট হয়ে সরে যায়। জোর বাতাস বয়। হয়তো এখুনি বৃষ্টি নামবে। কালাম ফিসফিসিয়ে বলে, কাইল আবার এহানে আইসো?

জমিলা ফিক করে হেসে ঘাড় নাড়ে।

—আচ্ছা।

কালাম লগিটা টেনে নিয়ে লাফ দিয়ে ডিঙিতে উঠে যায়। ডিঙি যখন দুলতে দুলতে অনেক দূরে চলে যায় তখনো জমিলা দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসে চুল ওড়ে। তখনো ভাবনা কি হবে তাহের আলী এ ধান নিয়ে গেলে? কিছু না—কিছু না। জমিলার লাভ লোকসানে তা কোন আঁচড় কাটবে না। তার চেয়ে কালামের উপস্থিতি অনেক ভাল।

অর্ধেক পথ আসতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামে। জমিলা একটুক্ষণ দাঁড়ায়। মওসুমের প্রথম বৃষ্টি। তার মানে নতুন জলের শব্দ। জলের শব্দ ওকে মাতাল করে তোলে। ও তখন ধরে নেয় জলের শব্দ মানেই জীবন। নতুন জী[illegible] জলের শব্দ ভালবাসার মত। ও আমোদ করে ভিজতে থাকে। ভিজতে ভাল লাগে: ভিজেখিতুবিতু হয়ে যখন ছাউনীতে ফিরে মকবুল পাটারীর উদ্বিগ্ন মুখে রাগের আগুন আভা।

—কহানে ছিলি এতবেলা?

—মাছ ধরলাম বাজান।

জমিলা আঁচল মেলে মাছ দেখায়। ওর খুব হাসি পায়।

—আইজ আমি মাছ মারলাম বাজান।

জমিলা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—যদি অসুক অয়?

—না বাজান অসুক অবে না।

—না, অসুখ অবে না?

মকবুল পাটারী ভেংচি দিয়ে উঠে।

—তোর জ্বালায় জ্বালায় জ্বলে মলাম। আমি যার চিন্তায় চিন্তায় মরি, সে বেড়ায় ফূর্তি কইরা। যা কাপড় বদলা গে। জ্বর না আইলেই অয়। মওসুমের পয়লা দ্যাওয়া। তোরে নিয়া যে কি করি।

—গাইলাও ক্যান বাজান। [illegible] সুযোগতো আর পালাম না। তা পাওয়ার আগেই তো মা মইল। আমি দ্যাওয়ায় ভেজব। মাছ মারব, যা চাই তাই করব। তুমি গাইলাবার পারবা না। মার সুযোগ তুমি আমারে দিলা না।

জমিলার চোখে জল। মকবুল কথা বলতে পারে না।

বাইরে ক্রমধুমানী বৃষ্টির তোড়ে ভেসে যায়। স্রোত বয় ধান ক্ষেতে, বাশবমা ঘাসের ফাঁকে হেলেঞ্চার চিকন পাতায়, হোগলার ছাউনীর ওপর। স্রোত বয় জমিলার মনেও।

পরদিন ঘাসের গায়ে গা মিশিয়ে জমিলার অস্থিরতা একদম চুপ করে যায়। কান পেতে অনুভব করে একটা নির্দিষ্ট শব্দ কেমন কেঁপে কেঁপে বাশবমার বুকের ওপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। বাশবমার সবুজ নরম শরীরের গন্ধে জমিলার উষ্ণ আমেজ অভিভূত হয়ে থাকে। গড়িয়ে পড়া রোদের বিচূর্ণ কণা জমিলার শরীরের বিষুব রেখা স্পষ্ট করে তোলে। কালামের চওড়া বুকের ঘন লোমে অদ্ভুত ইচ্ছের দপদপানী। সে দপদপানী সম্বল করে শুধু একগাদা ইচ্ছের নিখুঁত রূপায়ণ হয়ে যায় স্যাঁতসেতে মাটির গায়ে। নীলাক্ষীর খোলা জলে তখন ভাল লাগার আঁকিবুঁকি।

এক সময় জমিলা হাসতে হাসতে বলে, তোমার এই মোচের ঝাড়ে মদুর মাছি ঘর বানতে পারে?

কামাল ওর গাল টেনে বলে, পারেই তো, এই মদুর মাছি তো পারে।

—ইস আমার অতো সাধ নাই?

—সাধ নাই? আচ্ছা দাঁড়াও দেহাই।

কালাম ওকে জোর করে ডিঙির উপর উঠিয়ে নেয়।

—সাধ না থাকলে ঐ মন্দি গাঙে চুবাইয়া ধরব।

—আচ্ছা মানলাম এবার ছাড়।

—ঠিক সোজা হয়া চলবা।

জমিলা ওকে ভেংচি কাটে। কাছেই উলোঝাড়ের ফাঁকে একটা মউপপা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এ জমিলাকে ও কোথাও দেখেছে কিনা সে কথা মনে করতে পারে না। মাথার ওপর দিয়ে মধুচুশকী উড়ে যায়।

ছাউনীতে ফিরতে ফিরতে মধুচুশকীর ছায়া আনকোরা মনে হয় জমিলার। এ মাটিকে সঙ্গী করে ঘুরে বেড়ানো পায়ের তলা চিনচিন [illegible]। জ্বালা করে সমস্ত দেহ। হঠাৎ ক[illegible] কান্না পায় জমিলার। কিন্তু না, কান্না আসে না। বাবার মুখটা মনে পড়ে। রোদের কণা আগুন হয়েছে। তারই উত্তাপে চোখ দুটো জ্বালা করে। বাড়ি ফিরে ধপাস করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে ও। বাবা এখনো ফেরেনি। সেই ভাল। জমিলা এখন একলা থাকতে চায়। একদম একলা। সেই মউপপাটার স্থির চাউনী কালামের চকচকে চোখের মত থমকে আছে। ওর মনে হয় তীরে বাধা কালামের ডিঙিটা বুঝি চপল বাতাসে এপাশ ওপাশ করছে।

ধান পাকার সময় হয়ে গেছে। মকবুল পাটারীর বৃদ্ধ দেহে জওয়ানী শক্তি প্রবল হয়ে উঠতে চায়। বয়সের ভারে ক্ষয়ে যাওয়া চোখের মণি দুটো সর্বদা শকুনীর সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে চকমক করে। জমিলা বাবার সামনে সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। কালামের উপস্থিতির কথা কিছুতেই বলতে পারে না। কখনো মুখ ফুটে বলতে গেলে হারাই হারাই ভাবটা ব্যাকুল করে। আর কিছু বলা হয়ে ওঠে না। অথচ প্রতিদিন যখন দেখে কাজে যাবার সময় বাবা দা সড়কি নিয়ে বের হয়

তখন জমিলা অস্থির হয়ে ওঠে। সারাদিনের অস্বস্তি ওকে বিধ্বস্ত করে রাখে।

মাঝে মাঝে মকবুল পাটারী অবাক হয়ে তাকায়, তোর কি অইছেরে জমিলা? চোখ-মুখ লাল ক্যান?

—কিছু না বাজান।

জমিলা সামনে থেকে সরে যায়।

একদিন কাজ থেকে ফিরে গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে মকবুল পাটারী বলে, শুনলাম তাহের আলী আর ছাওয়ালরা ধান কাটবার পাঁয়তারা করতাছে। আউস কত? নেড়ী কুত্তার মনের বাদ অবার হাউস আর কি। আইলে এক একটারে ধইরে খুন করব। এহনও মকবুল পাটারীর পাঁজরে অনেক ত্যাজ।

জমিলা কথার পিঠে কথা বলতে পারে না। বুকের ভেতর ঢেঁকির উঠানামার ধপাস ধপাস শব্দ হয়। শুকনো মুখে বাবাকে ভাত বেড়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। মনের মধ্যে এখনো সে দ্বন্দ্ব। ওর কাছে আলীমুদ্দিনও যা, তাহের আলীও তা। তবে ও কেন আলীমুদ্দিনের পক্ষ নিয়ে কালামকে হারাবে? ধান কাটা শেষ হলে এখানকার ছাউনী ভাঙতে হবে। আলীমুদ্দিন ভালবেসে ওর বাবাকে চরের মালিকানা দেবে না। তবে কিসের আশা? অথচ চরধুমানীতে এসে যৌবনের যে প্রাপ্তি যোগ ঘটলো তাকে কি করে অস্বীকার করবে জমিলা? বরং কালামকে হারাবার চিন্তায় শূন্য চরের মত খাঁ খাঁ করে ওঠে জমিলার মন।

ধান পেকেছে মাঠে মাঠে। চরের ছয় ঘরের জয়জন পুরুষ সবাই ব্যস্ত। আরো

সাত-আটজন লোক পাঠিয়েছে আলীমুদ্দিন। মকবুল পাটারীর চোখে ঘুম নেই। কেবল কচাকচ কাঁচি চালায়। সারাদিন মাঠে কাজ হয়। এখন আর জমিলার বেরুনোর উপায় নেই। খাঁচায় বন্দী পাখী হয়ে যায় ও। কালামের আসাও সম্ভব নয়। হয়তো মাঝ নদীতে ডিঙি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কেবল। অস্থিরতা ওকে ব্যাপ্ত করে রাখে। কালামরা এখনো ধান কাটতে আসেনি ওরা কোন সুযোগের অপেক্ষায় আছে কে জানে। নসুর মার ঘরে গিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকে ও।

—কিরে কি অইছে?
—ভাল্লাগে না চাচী।

—ক্যান? মন পোড়ে বুঝি?
—কি জানি কবার পারি না।

—ও বুঝছি। আচ্ছা ঠিক আছে তোর বাজানেরে কবো এ্যাটা ব্যবস্থা করবার।

—যাঃ আমি কি তাই কইছি নাকি?

তখুনি জমিলার মনে হয় কাঁদতে পারলে ভাল হোত।

দুদিন যাবত মকবুল পাটারীর শরীর ভাল নেই। রাতে জ্বর আর কাশির চোটে ঘুমুতে পারে না। রাত জেগে জমিলা বাপের বুকে তেল মালিশ করে। মনটা কঠিন হয়ে উঠে। আলীমুদ্দিনের গোলার জন্য বাবার এত খাটুনী। এক ফোঁটা ওষুধ নেই। বুড়ো মানুষটা কথা বলতেও হাঁফিয়ে ওঠে। তার উপর ঘুমের মধ্যে প্রলাপ বকে। তাহের আলীর চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়ে। জমিলার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়, আঃ বাবা যে ধান তোমার না, তার জন্যে তোমার এতো দরদ কেন? তার চেয়ে চল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে চরধুমানীর ধান ওর বুকেই রেখে যাই। দুজনের জন্য একমুঠো ভাত কি কোথাও থেকে জোগাড় করতে পারব না?

সব ধান কেটে চরের বুকে বোঝাই করে ফেলেছে ওরা। যেদিকে চোখ যায় সে দিকটাই ধু-ধু করে। জমিলার মনে হয় একটা শূন্য বাতাস ছুটতে ছুটতে এসে হোগলার ছাউনীর মাথায় আছড়ে পড়ে: তখুনি বুকটা চেপে আসে। জানে কালাম কাণ্ডজ্ঞানহীন সাহসী। চোখের সামনে কোন কিছুই ও পরোয়া করে না। কিছুটা বেপরোয়া স্বভাবের লোক ও। বাবার বুকে তেল মালিশ করতে করতে বাবা ঘুমিয়ে গেলে জমিলা বাইরে এসে বসে। মাকড় জোনাক চরধুমানীকে প্লাবিত করে রাখে। জমিলা জানে মাকড় জোনাক রাতে গরম বেশী। তবু মনে হয় শুধু আবহাওয়ার জন্য ঝিঁঝিঁপিও ওকে সারাক্ষণ উত্তপ্ত করে রাখে। ভেতরটা যেন ফুটছে। তখন ওর কালামের কাছে যেতে ইচ্ছে হয়। মাকড় জোনাক রাতটা বুকের ভিতর নিয়ে চলে যেতে সাধ হয় অনেক দূরে। দূরের জমিতে চাষীদের অস্থায়ী ভাওলঘর হতে জমিলা ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্ন কখনো মেঘ। কখনো জোৎস্না।

পরদিন মকবুল পাটারী সারাদিন বাড়ি ফিরল না। ধানের গোছা আঁটি বেঁধে তৈরী করে নিচ্ছে ওরা। সন্ধ্যায় নৌকা বোঝাই হয়ে চলে যাবে আলীমুদ্দিনের বাড়ি। বুকে প্রচণ্ড কাশি আর জ্বর নিয়ে সারাদিন একটানা কাজ করেছে মকবুল পাটারী। জমিলা নসুকে দিয়ে ভাত পাঠিয়েছিল। খায় নি। জমিলার এক একবার ইচ্ছে করে নদীর পাড়ে ছুটে গিয়ে বাবাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে আসতে। পরক্ষণে দমে যায়। বাবা আসবে না উল্টো রাগারাগি করবে। মকবুল পাটারী প্রভুকে অস্বীকার করার ভাষা জানে না।

সন্ধ্যা নেমেছে। চরের ছয় ঘরে কুপি জ্বলছে। সবাই উদ্বিগ্ন। কখন কাজ শেষ হবে। কত রাতে ঘরের লোকেরা ফিরে আসবে কেউ জানে না। চাঁদটা মেঘের আড়ালে, আঁধার ঘন হয়েছে। কাছের বোপাছগুলোও আর পরিষ্কার দেখতে পায় না জমিলা। তখন ওর মনে হয় নদীর দিক থেকে যেন একটা কোলাহলের শব্দ আসছে। ও বাতাসে কান পেতে দাঁড়ায়। ইপাকে-উপাকে তাকায়। কিছু দেখা যায় না। এলোমেলো বাতাসে কখনো শব্দটা চঠাৎ করে জোরে আসে। কখনো একদমই না। জমিলা আর দাঁড়াতে পারে না। কুপিটা হাতে নিয়ে নদীর দিকে হাঁটতে থাকে।

দূর থেকে দেখতে পায় লাঠালাঠির অভিনব দৃশ্যটা। জমিলা কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। মেঘ সরে গেছে। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় মানুষগুলোকে প্রেতের মত দেখায়। এর মধ্যেও কালামকে চিনতে কষ্ট হয় না ওর। বাবার ছোটখাটো অসুস্থ দেহের তুলনায় সর্ড়কিটা বেমানানভাবে বড়। কেমন বিভ্রান্ত দেখায় মকবুল পটারীকে। হতবুদ্ধি জমিলা। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে সে দৃশ্যের দিকে। এবং পরক্ষণে আশ্চর্যভাবে দেখে কালামের [illegible] চকচকে লাঠির [illegible] মকবুল পাটারীর দেহটা টলে [illegible] নদীর কোল ঘেঁষে

কান্না নয় জমিলার দু চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। ছুটে যায় ধানের স্তূপের কাছে। হাতের কুপি দিয়ে আগুন ধরায় শুকনো খড়ে। মুহূর্তে দাউ দাউ জ্বলে উঠে পালা করে রাখা ধানেরআঁটি। দুই প্রতিপক্ষ দল বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

মকবুল পাটারীর মাথাটা নদীর পানি বার বার ছুঁয়ে দেখে। লাল রক্ত জলের সঙ্গে লাল হয়ে ভেসে যায়। জমিলা হাঁটু গেড়ে বসে।

—বা—বা-জা-ন-গো—

নিশ্চুপ দর্শকের মত সবাই দাঁড়িয়ে।

বাবার মাথাটা কোলের উপর উঠিয়ে নিতে নিতে জমিলার মনে হয় বাবার রক্ত নতুন জলের মত তাজা ছিল, আর কি চমৎকার সুবাসিত।

এমন ঘ্রাণ ও আর কোনদিন পায়নি।

ড্যানড্রাফ (খুস্‌কি) ধুয়ে সাফ করে চুল করে তোলে ঝলমলে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল

এখন
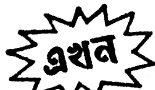
পাচ্ছেন ক্লিনিক ল্যানোলিন :
শুষ্ক চুলের গোড়ার জন্যে

ক্লিনিক কি ভাবে কাজ করে—

বৈজ্ঞানিক ফর্মুলায় তৈরী করা ক্লিনিক ও ক্লিনিক ল্যানোলিন, চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ড্যানড্রাফ (খুস্‌কি) ধুয়ে একদম সাফ করে দেয়।

রাশি রাশি ঘন ফেনা চুলের গোড়া অবধি ঢুকে সমস্ত খুস্‌কি ধুয়ে নির্মূল করে দেয় কিন্তু চুলের নিজস্ব স্বাভাবিক তেলাভাবের কোন ক্ষতি করে না। চুল করে তোলে ঝলমলে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

ক্লিনিক ল্যানোলিন একমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

ক্লিনিক :
স্বাভাবিক চুলের গোড়ার জন্যে

সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে : চুলে ভাল করে ফেনা মাখিয়ে আলতো করে ধুয়ে ফেলুন। দ্বিতীয়বার ফেনা লাগিয়ে মিনিট খানেক মাথাতে থাকুন। এতে ক্লিনিক ফলপ্রদভাবে কাজ করে ও চুলের গোড়ায় নতুন জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনে।

নিয়মিতভাবে ক্লিনিক বা ক্লিনিক ল্যানোলিন ব্যবহার করুন : অন্ততঃপক্ষে সপ্তাহে একবার। ক্লিনিক আপনার চুল থেকে ড্যানড্রাফ (খুস্‌কি) একদম নির্মূল করে দেবে।

ক্লিনিক শ্যাম্পু

এখন আপনি পছন্দ করে নিন।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড-এর এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

যশপাল

জন্ম : ৩রা ডিসেম্বর ১৯০৩
মৃত্যু : ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭৬

হিন্দী সাহিত্যের ক্ষুরধার ক্রান্তিকারী লেখক হিসেবে যশপালের খ্যাতি যেমন সর্বজনবন্দিত—তেমনি মুন্সী প্রেমচন্দের উত্তরাধিকারী হিসেবেও স্বীকৃত।

অল্প বয়স থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। জীবনের মূল্যবান সময়ের অনেকখানি কারান্তরালে থাকার সময় শিখেছিলেন বাংলা, ফার্সী ও ফরাসী ভাষা। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ভালভাবে পড়েছেন। মার্কসীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসী যশপাল ছিলেন কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় ভণ্ডামি ও অনুষ্ঠানের প্রতি খড়গহস্ত। অথচ বেদ উপনিষদ পুরাণ ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়তে ভালবাসতেন। তাঁর চরিত্র গড়ে ওঠে বহু বৈপরীত্যের সমাবেশে তাই তিনি সর্বপ্রথম চরম আধুনিক, বিচারক, সংস্কারক এবং শেষে লেখক। গল্প উপন্যাসের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তিনি তুলনীয়। হিন্দী সাহিত্যে সর্বাধিক বিতর্কিত নিন্দিত ও আলোচিত পুরুষ যশপালের প্রথম উপন্যাস 'দাদা কমরেড' তাঁকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসে। প্রায় ২৫০টি বিভিন্ন মেজাজের গল্প, ১০।১১টি উপন্যাস, খানকয়েক নাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু অনুবাদও তিনি করেছেন। ১৯৭০ সালে তিনি পদ্মভূষণে বিভূষিত হন এবং ঐ বছরই 'সোভিয়েত ল্যান্ড' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে 'মেরী তেরী উসকী বাত' উপন্যাসের জন্য পান সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার।

সচ্চি পূজা

গল্প কেন, আসল ঘটনাটি শুনুন।

কয়েক বছর হল শ্রীরঘুবর দয়াল মিশ্র অবসর নিয়েছেন। ১৯৩১ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে চাকরী পান। চাকরীটা যাতে পাকা হয় এবং তাড়াতাড়ি পদোন্নতি হয় সেজন্য তার যুবাবস্থাতেই কর্মতৎপরতার দুরন্ত আশা ছিল মনে—কিছু বাড়িয়ে দেখাবার উৎসাহও। দয়ালের পিতা গত শতাব্দীর শেষাশেষি ডেপুটি হয়েছিলেন। সেই সময় এই সব শাসন সেবার কাজে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করা হত না—হত খানদানী সম্মান, সমৃদ্ধ কুলশীল ও রাজভক্তির মানদণ্ডে বিচার করে। দয়ালের পিতাও অবসর গ্রহণ করেছিলেন। উনি তাই নিজের উপযুক্ত পুত্রকে শাসকীয় সেবার কাজে যোগ্য, বিশ্বস্ততার এবং সফল হবার সবকটি গোপন চাবিকাঠি বলে দিয়েছিলেন। জেলাধীশ বা উচ্চ পদাধিকারীদের প্রতি বিনম্রতা এবং সদা সেবা তৎপরতার মনোভাব নিয়ে তাঁদের মতামত বা আদেশ সংগত মনে হলে, আজ্ঞানুগত মুদ্রায়—'হুজুরের হুকুম পালিত হবে', বলতে হবে। যদি উচ্চ পদাধিকারীর আদেশ অসংগত মনে হয় তাহলেও, বিনীত চটপট উত্তর—'হুজুর হুকুম দিয়েছেন—আপ্রাণ চেষ্টা করব', বলা উচিত।

১৯৩৪ সালে বরেলীর জেলাধীশ ছিলেন মিঃ ডি, গোর্ডন। অনুশাসন ও ন্যায়ের ব্যাপারে গোর্ডন যথাসম্ভব সংযত, শব্দোচ্চারণে সতর্ক কিন্তু স্বভাবে দয়াশীল ও জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সে সময় শহরে একটি বিকট সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বরেলী শহরে শনৈঃ শনৈঃ ষাঁড়ের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল।

যেমন কিনা বনের রাজা সিংহ জঙ্গলে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করতে পারে না, তেমনি কোন ষাঁড়ই নিজের অঞ্চলে অন্য ষাঁড়ের অনুপ্রবেশ কিংবা কোন সুযোগের ব্যবহার ক্ষমা করতে পারে না।

আহারের অনিশ্চিত ব্যবস্থা এবং কাঁধেপিঠে কোন কাজের বোঝা না থাকার দরুণ নন্দীর বংশধরদের অপূর্ণ আবশ্যকতাগুলি এবং নিষ্ক্রীয় শক্তি নাগরিকদের কাছে রীতিমত সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইচ্ছেমত যে কোন মিষ্টির বা বেনের দোকানে এই ষাঁড়েরা অবলীলাক্রমে মাথা গলিয়ে দেয়। লাঠি ইঁটের প্রহার থেকে অথবা তাড়ানোর প্রচেষ্টা থেকে এদের বাঁচাতে গেলেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যখন কোন গলি, বাজার অথবা দোকানে এরা কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সামনাসামনি ভিড়ে যায় তখনই সংকট চরমে ওঠে। যে যেখানে পারে এলোপাথাড়ি ছুটে পালায়—দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। এই দৌড়োদৌড়িতে, ষাঁড়ের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে অনেকেই আহত হয়ে পড়ে।

এমনই এক পরিস্থিতিতে একটি বালক এবং এক বৃদ্ধ মারা পড়েন। একজন শীর্ণকায় মৌলভীও ষাঁড় দ্বারা পিষ্ট হন। এরকম সংকটজনক মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সম্ভাবনা চরমে উঠল। একটি সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি মণ্ডল জেলাধীশের কাছে দরবার করলেন। পশুদের নিরংকুশ যত্রতত্র বিহার, উচ্ছৃংখলতাজনিত নাগরিকদের বিপদ-আপদ এবং মৃত্যু স্বয়ং গোর্ডনের অসহ্য। কিন্তু গো বংশের সম্পর্ক-সম্বন্ধ মানা না মানা নিয়ে ব্যাপারটা খুব গোলমেলে হয়ে উঠল।

গোর্ডন অদ্ভুত সমস্যার সমাধানকল্পে তিনজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে শলাপরামর্শে বসলেন। গোর্ডন সহৃদয় এবং অহিংস প্রকৃতির ব্যক্তি কিন্তু বৃটিশ শাসন নীতির প্রতি প্রচণ্ড অনুগত। যে কোন সমস্যায় কখনো যদি কোন সাম্প্রদায়িকতার ছায়ামাত্র অনুমান করলেই তিনি নিজে নির্লিপ্ত থেকে হিন্দুস্তানী অফিসারদের ওপর দায়িত্ব দিতেন।

ঐ তিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের গোর্ডন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বললেন : আপনারা কি দেখছেন ? কোন সভ্যদেশে পশু দ্বারা নাগরিকদের এভাবে বিনাশ, হয়রানি কল্পনা করা যায় না। এত কাণ্ডের পরও আপনাদের কানে কিছু ঢোকেনি। চার দিনের মধ্যে কোন বাজার এলাকায় একটার বেশী ষাঁড় থাকতে পারবে না। মারকুটে ষাঁড়েদের এখুনি একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

গোর্ডন আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগার উঁচিয়ে ধরে দয়ালের প্রতি দেখিয়ে

বললেন ঃ তুমি সিটি ম্যাজিস্ট্রেট। এ দায়িত্ব তোমার।

দয়াল একটিমাত্র উত্তর দিতে পারল ঃ ইয়েস স্যার। পুরো চেষ্টা করব।

তৃতীয় প্রহরে দয়াল শহরের ও উপকণ্ঠের নটি পুলিশ চৌকিতে হুকুম জারি করলেন যে, প্রত্যেক চৌকি থেকে দুজন বলিষ্ঠ সাহসী সিপাই নিজের নিজের এলাকার দশ-বারোজন তাগড়া যুবকদের সঙ্গে অমুক বাজার, চক, মণ্ডির মুখে মুখে লাঠি-সোঁটা আর মজবুত দড়ি নিয়ে রাত সাড়ে নটায় জরুরী হুকুম তামিল করার জন্য যেন তৈরি থাকে।

রাত্রে বাজারের বেচাকেনা বন্ধ হতে না হতেই দয়াল স্বয়ং ঘোড়া চেপে পরিদর্শনে বেরুলেন। বিশেষ বিশেষ জায়গায় পূর্ব নির্দেশমত মোতায়েন সিপাই এবং লাঠিয়ালদের হুকুম দিলেন ঃ

যে কোন গলি, বাজার, চক এবং কেনাবেচার জায়গায় ছাড়া ষাঁড় বা বাছুর দেখবে, তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়ামায়া না দেখিয়ে ওদের ভাল করে বেঁধে শহরের বাইরে লাল কুয়া এবং রামনগরের রাস্তায় বিশ মাইল দূরে, জঙ্গলে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

ষাঁড় তাড়ানো কাজটা নিজের চোখে দেখার জন্য দয়াল স্বয়ং ঘোড়সওয়ার হয়ে রইলেন। ষণ্ড বিতাড়নের যজ্ঞপর্বে নিযুক্ত লোকেরা পরের দিন রাত্রে শহরে ফিরে এল।

তৃতীয় দিন জেলাধীশ গোর্ডন স্বয়ং নগর পরিক্রমা করলেন। দয়ালের বিচার-বুদ্ধি ও কাজের প্রশংসা করে পুরস্কার দিলেন মুচকি হাসি হেসে।

আর ঠিক সেদিনের পর থেকেই জঙ্গলে নির্বাসিত ষাঁড়েরা চার-পাঁচটি সংখ্যায় দলে একজোটে শহরে প্রত্যাবর্তন করতে লাগল। সপ্তাহ শেষে নগরে ষাঁড়ের সংখ্যা আগের মতই দাঁড়াল এবং ওদের উপদ্রবও যথারীতি পুনর্বহাল হল।

জেলাধীশ [illegible] দয়ালকে স্মরণ করলেন। এ[illegible] লাল ঃ

এই তোমার সমাধান আর ব্যবস্থা। মানুষের খাদ্য আজ স্বয়ং মানুষকেই খাচছে। সরকার এখন প্রজাদেরই রক্ষা করবে। তোমার জাতের লোকেরা যত্তসব ঝামেলা করবে নইলে এই সব আওয়ারা ষাঁড়েদের আমি গুলি করে উড়িয়ে দিতাম। এ জুলুম চলবে না। কি করে বললে সব ঠিক হয়ে গেছে?

গোর্ডনের রাগ দেখে দয়াল কুলকুলা করে ঘামতে আরম্ভ করলেন কিন্তু ভয়ংকর সংকটে মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধিও খেলে গেল। বললেন : ঠিক আছে স্যার। হুজুর যদি অনুমতি করেন তো সব ফালতু ষাঁড়দের কেঁদো এবং সেন্ট্রাল জেলে পুরে দিই।

ক্ষুব্ধ গোর্ডনের চোখেমুখে বিস্ময় : খলি, তোমার মাথা ঠিক আছে তো! ভারতীয় দন্ডবিধির কোন ধারায় ষাঁড়েদের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে ওদের জেলে পাঠানো যায় শুনি?

দয়ালের ভীরু উত্তর : স্যার। মামলা-মোকদ্দমার কোন দরকার নেই। ওটা জেল নয়। আওয়ারা ষাঁড়েদের রক্ষা করার উপায়—লালনপালন করা—কি বলছ হে যুবক। গোর্ডন অবাক হন। —হুজুর। দয়াল সাহেবকে বোঝায় : জেলে তেল পেষায়ের কল আছে, গম ভাঙার জন্য চাকি আছে, ক্ষেত চাষের জন্য জল দেবার কাজ আছে। এসব কঠিন কাজগুলো কয়েদীরা করে থাকে। ষাঁড়েদের জেলে পুরে দিন—দুদিন উপোষে আপনি ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওদের তেলকল, গমকল, ক্ষেতখামারের কাজে ঘাষ আছে। মানুষ কয়েদী মানুষের কাজ করুক—ষাঁড় ষাঁড়ের মত! —গুড।

সমর্থনের মুচকি হাসি গোর্ডনের : যুবক, তুমি বুদ্ধি ধরো বটে।

সেদিন রাত্ত থেকেই গোর্ডনের অনুমতি প্রাপ্ত এবং দয়ালের পর্যবেক্ষণ মোতাবেক আওয়ারা ষাঁড়বাছুরদের বেঁধে বেঁধে জেলে পাঠানোর কর্মসূচীর রূপায়ণ আরম্ভ হয়ে গেল।

নগর থেকে সহসা ষাঁড়েদের বিলোপে গলি, গঞ্জ বাজার, চৌকি প্রভৃতি সর্বত্র লোকেদের প্রভূত সুবিধা হল—শান্ত প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু শহরে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু আশংকাজনিত অসন্তোষ এবং ক্ষোভ বাড়তে লাগল।

গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, জেলে বেচারা ষাঁড়েদের অভুক্ত রেখে, নির্মমভাবে পিটে কাজে লাগান হচছে। বিধর্মী সরকার গোরা সেনাদল এবং অন্যান্য বিধর্মীদের জন্যই গোবংশকে কসাইখানায় পাঠানো হচছে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের এক প্রতিনিধি মন্ডল এই ব্যাপারে জেলাধীশের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে আবেদন জানালো।

গোর্ডন আবেদন পেয়ে কিছু চিন্তিত হলো। দয়ালকে আবার স্মরণ করলেন তিনি : যুবক, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। তুমি ষাঁড় সংকটের সমাধান করেছ এবার ষাঁড় পুজোরও ব্যবস্থা তুমিই কর। আমি সব দেখব। কাল আমি উত্তরদিশার ট্যুরে যাচছি—শহর তোমার জিম্মায় রইল। এই প্রতিনিধিমন্ডলের সাথে তাড়াতাড়ি দেখা কর।

ডেপুটি দয়াল হিন্দু প্রতিনিধি মন্ডলকে সমাদরে আমন্ত্রণ জানালেন নিজের বাংলোয়, পরদিন সকাল আটটায়।

আর্দালী নিজের সাহেবের পূর্ব আদেশমত অভ্যাগতদের হাত জোড় করে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। ওদের ড্রইং রুমে বসিয়ে করজোড়ে বলল : সাহেব পুজোয় বসেছেন। এখুনি আসবেন।

অতিথিদের জন্য ঝকঝকে গ্লাসে জল এবং চকচকে থালায় পান সুপারি রেখে গেল আর্দালী। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে ও অধৈর্য আগন্তুকদের নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে : সাহেব পুজো থেকে উঠেই সোজা চলে আসবেন।

ন'টার কিছু পর ডেপুটি দয়াল 'শিব-শুম', 'শিব-শুম' বলতে বলতে বৈঠকে এলেন। কপালে পুজোর সমযাকার তেল হলুদ সিঁদুরের চকচকে টিকা, পরনে সাদা ধুতি, গলায় মোটা উপবীত। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করার কষ্টের জন্য আগন্তুকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে কাজের কথায় এলেন।

প্রতিনিধির সদস্যরা কর্মবীর ব্রাহ্মণ ডেপুটির ভক্তিভাব দেখে মুগ্ধ। যা তাঁরা শুনেছেন এবং যেসব গুজব বাজারে ছড়িয়েছে সেগুলি তাঁরা দয়ালকে নিবেদন করলেন। সেবাদিদেব মহাদেবের বাহন নন্দী বংশজাত ষন্ডকুলের প্রাণরক্ষা এবং জেলে তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করাবার প্রয়াসে ধর্মরক্ষক, প্রজাপালক সরকারের প্রতিনিধির কাছে প্রার্থনা জানালেন।

ডেপুটি দয়াল শিব-শুম, শিব-শুম উচ্চারণ করে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। জঘন্য গুজবকে মিথ্যা এবং রাজদ্রোহিতা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করলেন : বৃটিশ সরকার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মতাদর্শ এবং স্বকীয়তাকে সম্মান করে এবং রক্ষা করে। ষন্ডকুল এঁটো কুঁড়ো পাতা, নোংরা কাগজ কাপড়, এঁটো খাবার খায় এবং নির্দয় লোকেরা যখন তাদের এলোপাথাড়ি ইঁটপাটকেল মারে, লাঠি দিয়ে ঘায়েল করে এসবই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এবং আমার খুব খারাপ লাগে—ভীষণ দুঃখ হয়। তাই তাদের জন্য প্রয়োজনীয় দানাপানির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের মধ্যে যে কেউ যদি চান তো আমাদের সঙ্গে এসে দেখে যান সে ওরা কেমন আছে। আর জেলই বা কাকে বলে। নন্দীকুলোদ্ভব ষাঁড়েরা সরকারের অতিথি। কাঁচা ঘাস পাতা টাটকা সরষের খোল, ভুসি ভরপেট খাওয় ওদের। দেখে যান ওদের চেহারা কে নাদুস-নুদুস হয়েছে। অতি সাধারণ কাজ করে দিব্যি আরামে চোখ বুঁজে জাবর কাটে। শিব-শুম.... শিব-শুম....

এক সাহসী সদস্য আপত্তি প্রকাশ করলেন : —পন্ডিতজী, ভগবানের সেবায় নিযুক্ত নন্দীবংশোদ্ভূতদের দ্বারা কাজ করানোই আমাদের ধর্মীয় সংস্কারে আঘাত হানে।

—শিব-শুম.... দয়াল বলেন : লাঙল এবং গাড়ী টানার কাজে নিযুক্ত বলদ গোবংশোদ্ভূত নন্দীর ভাই। নন্দী ভগবানে পুজো এজন্য যে, সে মহাদেবের বাহন সৃষ্টিধর্মে যেকোন জীবের প্রয়োজনী কা এবং সন্তোষনক আহারের বিধান করাই ত তাদের প্রতি সত্যিকারের প্রেম ভালবাসা এ সত্যিকারের আসল পুজো।

দয়াল সাহেব শিব-শুম উচ্চারণ ক ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে, চোখ দুটি মু উর্ধ্ব গগনের দিকে হাত জোড় করলেন।

যশপালের মূল হিন্দি গল্প 'সেক্র পুজা'র বাংলা অনুবাদ করেছেন আন ভট্টাচার্য। এটি যশপালের শেষ রচনা।

নদীর মতন

সুশান্তশঙ্কর দাশ

যেমন তেমন ঘর বাঁধলেই হয় না
আসলে ভিতটা জবর মজবুত হওয়া দরকার
যদি না তেমন মনের মত ঘর হয়
নিরিবিলি নুরমহল ধূপ ছায়ায়
কারো শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি মিহি গন্ধ না ছড়ায়
স্বপ্নের মধ্য দিয়ে হেঁটে যায়
ধুব সুখী এক হারাবী পুরুষ
তবে সে ঘর কীসের? ঘর নয়—ঘরই নয়
যেমন তেমন ছবি আঁকলেই হয় না
আসলে ছবিতে সূর্যমুখী স্বপ্ন ফোটান দরকার
যদি না স্বপ্নে তেমন রঙ থাকে
রঙে তেমন না জৌলুষ
স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ছুটে যায় আন-দপুর লোক্যাল
তবে সে ছবি কীসের? ছবি নয় ছবিই নয়
আসলে আমরা প্রত্যেকে ঘর বাঁধতে চাই
স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ছুটে যেতে চাই আনন্দপুরে
অথচ কখনও কখনও সে ঘরের ভিত ধসে পড়ে
স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ছুটে যায় আনন্দপুর লোক্যাল
তবুও তো ঘর বাঁধার ইমারতি
ইঞ্জেল তুলি কিনতে হয়
ঝরনা হয়ে বিরামহীন নদীর মতন বইতে হয়

তবু কিছু থেকে যায়

নৃপেন চক্রবর্তী

বেশতো কেটে যাচ্ছে দিন .
সকালে সন্ধ্যায়.... ।
জীবনের নাগরদোলায়
প্রতিদিন ভীড় করে
বেশ কিছু চেনা-জানা মুখ।
এ্যালবামে পড়ে থাকে
ব্যবহৃত আঙুলের ছাপ।

এখনো চড়কা থেকে
লাল-নীল সুতো বোনা চলে—
অবিরত কাঁচপোকা ভেসে ওঠে চোখের ওপর।
হঠাৎ কখন যেন—
দু-একটা সুতো ছিঁড়ে যায়।

দরজা খোলাই আছে
আগেকার মতো—
আড্ডা জমাট বাঁধে চায়ের টেবিলে।
দু-হাতের পাতা থেকে কখন হারিয়ে যায়
পরিচিত কিশোরীর মুখ।

তবুও একটা কথা—
মনে হয় এই বুঝি ঠিক,
দু-একটা খড়-কুটো ধুলোবালি নিয়ে,
নিজের জায়গা করে চিরদিন থেকে যাবে
উঠোনের ছড়ানো মাটিতে।

বুঝে নিতে দাও

অরুণ দাস

সব সময় দরজা জানলা খোলা রেখো না
একটুখানি আড়াল করে রাখো
দানের মহিমা আগে বুঝে নিতে দাও।

এত কথা কেন? কোলাহল থেকে নির্জনতা ভালো।
আমাকে বিশ্বাস ক'রে
শব্দহীন হৃদয়ের ভাষা তুমি বুঝে নিতে দাও।

সব সময় দরজা জানলা খোলা রেখো না
কাছেই দস্যুরা আছে
অসাবধান হলে—তোমার অর্ন্তর্কিতে স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

এত কথা কেন? একটুখানি আড়ালে সরে থাকো।
কাছে পেতে গেলে কত ব্যথা
কাছে যেতে গেলে কত বড় হতে হয়—বুঝে নিতে দাও।

সমন্বয়

সীমা মিত্র

যে যেমন ডাকে—
তাকে দাও ডাকতে দাও
রেখে যাক মন তীব্রতার ছাপ।
জীবনের পরমায় মাপ।
অপরিমিতে স্বাদ চৈতন্যে লাগুক।
ইচ্ছেমত চৈতন্য চৈতন্যে খেলুক।

মাটি ও নক্ষত্র ফুঁড়ে চৈতন্যে ব্যাকুল
অনাস্বাদিত সুখ
সৌন্দর্যে ভরাক অনুভব
দর্পণে দেখুক নিজ মুখ।
থাক না সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে একঝাঁক
সমন্বিত সময়—বিস্ময় খেলে যাক।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবিতা

জন্ম : ১৯৪৪

পেশা : পরিচালক : চলচ্চিত্র

বাঘ

শুয়ে শুয়ে, নিজেকে তার বাঘের মতো মনে হয়। দিনেরবেলা
বাঘ ঘুমিয়ে পড়েছিলো
একটা ফাইলের ওপর, আর
বড়বাবুর হাত থেকে একটা ফাইল ছুটে এসেছিলো
জেট-প্লেনের মতো,
তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গিয়েছিলো বহুদূরে,
দূরের দেয়ালে।
এখন খালের ভেতর জোয়ারের জল ঢুকে পড়ার শব্দ শুনতে পায় সে,
আর পুরোনো বাকসের মতো বাড়িটাকে মনে হয় অদ্ভুত এক ঝোপ,
দূর থেকে বাঘিনীর গর্জন ভেসে আসে—রোগা, শান্ত
কালো-চোখের বৌ এগিয়ে আসে
তার দিকে—; খট-খট টাইপ-রাইটার, ঘর-ঘরে ট্রাম, পেটের ভেতর
মুচলে-ওঠা খিদে নিয়ে বাসের পেছনে দৌড়ে দৌড়ে
বাড়ি পৌঁছে যাওয়া, এবং
মানুষের পোষাক খুলে ফেলার যে অসহ্য যন্ত্রণা, সব, সমস্ত কিছুই
ভুলে গিয়ে
সে আশ্চর্য সুন্দর, বিশাল একটা বাঘ শুয়ে থাকে গহন,
গভীর বিছানায়।

চলে যায়

চলে যায় ১৯৭৬। লেখা হয় আরো কয়েকটি পাতা। এইবার, এইবার
কিছু একটা করা চাই, জুতোর দোকানে গিয়ে জুতো বাছা চাই, চাই
ব্যাথাবেদনার মতো কিছু একটা থেকে যাক চিরকাল,
নাহলে কি করে সে
চিঠির উত্তর দেবে, চক-ডাস্টার নিয়ে
তেতালার ক্লাস থেকে লাফ দেবে নিচে। কালো টুপি,
কালো কেডস্, সোয়েটার পরে ভোরবেলা বাবার নোয়ানো পিঠ
একটু একটু করে
কুয়াশায় মিলে মিশে যায়। সাদা বেসিনের গর্তে নেমে আসে মুখ,
কলের জলের মধ্যে
আশ্চর্য জটিল ঢেউ ওঠে,
মুখ উঠে গেলে আয়নার চোখে পড়ে চোখ, পলক পড়ে না আর,
ঝাঁঝরির ভেতর দিয়ে ধুয়ে মুছে বহুদূরে ভেসে যায় নদী।
চলে যায় ১৯৭৬ ধূসর ধূসরতম দেশে।
আসবে নতুন একটা বছর, সে তৈরী হয়, সে দরজা হবার কথা ভাবে,
আগামী বছর
চৌকো কাঠের ফ্রেমে ভারী পাল্লার মতো গম্ভীর হয়ে
সে দাঁড়িয়ে থাকবে বারোমাস।

'গভীর এরিয়েলে' ফর্মা তিনেকের বই নিয়ে ৬১-৬২তে বুদ্ধদেব যখন আত্মপ্রকাশ করলেন তখন নিজের মতন স্টাইল আয়ত্ত হয়েছে, কিন্তু ষাট দশকের কবিতার মঞ্চ জুড়ে যাদের চোখধাঁধানো আনাগোনা তাদের অনেককে পিছনে ফেলে সামনের সারিতে দাঁড়াবেন তা ভাবা একটু কঠিনই ছিলো, একটা দশক যেতে না যেতে পুরোভাগের জমকালো পোষাকপরা অভিনেতাদের অনেকেই বিদায় নিয়েছেন, বুদ্ধদেব এগিয়ে এসেছেন, স্পষ্ট হয়েছেন, অনিবার্য একটি নামও হয়ে উঠেছেন ইতিমধ্যে। এটা সম্ভব হয়েছে বিশেষ একটি ভঙ্গি যেখানে স্যাটায়ার ও বিষণ্ণতা সমন্বিত হয় গভীর কোনো অনুসন্ধানকে সফল রূপ দেবার জন্যে। সরল গদ্যের ঋজুতা ব্যবহার করেন তিনি, অবজেকট কখন সাবজেকটিভ হয়ে পড়ে তা সচেতন না থাকলে ধরা যায় না, এই পদ্ধতিটি বুদ্ধদেবের নিজস্ব, পেটেন্ট করে ফেলেছেন বলা যায় এবং এর অনুকারক মেলাও কঠিন।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

শংকর গুহের ছবি

জন্ম ১৯৪৪। কোলকাতার সরকারী চারু এবং কারু মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯৬৭ সালে মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনীতে পেন্টিং-এ এওয়ার্ড লাভ করেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত [illegible]ীয় বৃত্তি পেয়ে গবেষণামূলক [illegible] করেন। ১৯৭০ সালে এ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস থেকে পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে ক্যালকাটা পেন্টার্স-এর সভ্য। দেশে-বিদেশের ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর কাজ সংগৃহীত আছে। বর্তমানে কোলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলে শিক্ষকতা করছেন।

শংকর গুহ বয়সে তরুণ হলেও রেখায় বলিষ্ঠতায় এবং প্রকাশের ব্যঞ্জনায় সার্থকভাবে আপন বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে এক দানবিক অস্থিত্বের আবির্ভাবে এক ভীত সন্ত্রস্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। কম্পমান বলিষ্ঠ রেখার বাঁধনে শংকর অমানবিক অস্থিত্বের লুব্ধ এবং আগ্রাসী দিকের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। সূক্ষ্ম রেখার বেড়াজালকে কালি দিয়ে ভরাট করে একটা রহস্যজাল তৈরি করা হয়েছে—যা দানবিক অস্তিত্বকে গভীর এবং প্রকট করে তুলতে সাহায্য করেছে। শংকর গুহ তাঁর শিল্পী মেজাজকে যথাসম্ভব পরিমিত রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছেন।

শিশিরকুমার দাশ

রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন, 'একটা কথা বলে রাখি 'কুন্তলা' নামটা ভালো লাগল না। কুন্তল মানে চুল, আ-কার যোগ করে তাতে স্ত্রীত্ব আরোপ করা বৃথা। কেউ কেউ মেয়ের নাম রাখেন অনিলা—অনিল মানে হাওয়া। হাওয়াকে হাওয়ানী বলে ছদ্মবেশে চালানো যায় না, চুলকে চুলো বললে আরো দোষের হয়।' বুদ্ধদেব বসু উত্তরে লিখেছিলেন, 'কুন্তলা নামটি সম্বন্ধে আপনার আপত্তি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। কথাটা শুনতে ভালো, কুন্তি ডাকতে ভালো, সেইজন্যেই নিয়েছিলুম—মানের কথা অত ভাবিনি। নাম নির্বাচনে মানের চোখ রাঙানিকে আমাদের বাঙালিদের বড় বেশি মেনে চলতে হয়, এটা খুব সৌভাগ্যও বিবেচনা করিনে।'

যে সব বাঙালী মহিলাদের নাম 'কুন্তলা' তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য কতটা গ্রাহ্য করবেন জানি না তবে রবীন্দ্রনাথ নাম নির্বাচনে শুধু মানে নয়, ব্যাকরণও মানতেন বড় তীব্রভাবে। শুধু 'কুন্তলা' নয় 'অনিলা' নামটির প্রতিও তাঁর কটাক্ষ বড় তীক্ষ্ণ। 'পয়লা নম্বর' গল্পের পাঠকদের মনে পড়বে—'আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কী তা জানিনে, আমার শ্বশুরও যে জানতেন তা নয়। শব্দটা শুনতে মিষ্টি, এবং হঠাৎ মনে হয়, ওর একটা কোনো মানে আছে।' বিদ্রূপটা আরো শাণিত হয়ে উঠেছে 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থে: 'আকার যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ সংস্কৃত থেকে বাংলা ধার নিয়েছে, যেমন লতা, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় বাংলায় নেই। সংস্কৃতে আছে জানি, এত বেশি জানি যে, আকারান্ত শব্দ দেখবামাত্র তাকে নারী শ্রেণীর বলে সন্দেহ করি। বাংলাদেশের মেয়েদের 'সবিতা' নাম দেখে প্রায়ই আশংকা হয় 'পিতা'কে পাছে কেউ এই নিয়মে 'মাতা' বলে গণ্য করে। মেয়েদের নামে 'চন্দ্রমা' শব্দেরও ব্যবহার দেখছি, আর মনে পড়ছে কোনো দুর্যোগে ভগবান চন্দ্রমা স্ত্রী ছদ্মবেশে বাঙালির ঘরেও দেখা দিয়েছেন, বাঙালির কাব্যেও অবতীর্ণ হয়েছেন: এদিকে 'নীলিমা', 'তনিমা' প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দ আকারের টানে মেয়েদের নামের সঙ্গে এক মালায় গাঁথা পড়ে। 'নিভা' নামক একটি ছিন্নমুণ্ড শব্দ 'শরচ্চন্দ্রনিভাননা' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্ত হয়েছে বাঙালি মেয়েদের নামমালায় আকারের টিকিট দেখিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পর বহুদিন কেটে গেছে, বাংলাদেশের 'কুন্তলা' 'নীলিমা', 'অনিলা', 'সবিতা'-রা যে লজ্জায় অধোবদনা হয়ে আছেন এমন মনে হয় না, এমন কি তাঁদের লজ্জিত হতে হবে একথাও বলতে চাই না। তবে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা একটা ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপারমাত্র নয়, মোটামুটি তাঁর বক্তব্যের পেছনে আছে সাধারণ বাঙালীর সমর্থন। কুন্তলা-নীলিমা-সবিতা বাঙালীর নামের গঠনও ইতিহাসে ব্যতিক্রম মাত্র। বুদ্ধদেব বসু যে নাম নির্বাচনে মানের চোখ রাঙানির কথা বলেছেন তার মধ্যে অবশ্য প্রচ্ছন্ন আছে মানে ও ব্যাকরণকে লঙ্ঘন করার একটা ক্ষীণ চেষ্টা। তবু বলব সাধারণভাবে বাঙালি আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নাম নির্বাচনে অর্থ ও ব্যাকরণের শাসন মেনে এসেছে। সামান্য নিয়মে লঙ্ঘন যদি ঘটে থাকে তার পেছনে বিদ্রোহের কোন সুর নেই, আছে শুধু অর্থে চেয়ে ধ্বনির প্রতি ভালোবাসা, বৈয়াক যদি তিরস্কার করেন, তার প্রতিবাদ বাঙা করেনি, মৃদু কণ্ঠে বলেছে, 'কথাটা শুন ভালো!' ... মন্তব্য থেকে ... মনে ... নাম নির্বাচনে বাঙালী অর্থ ব্যাকরণের দ্বারা বড় বেশী শাসিত ... তার ফলে তার স্বাধীনতা বড় সংক ... তাহলে কিন্তু ভুল হবে। প্রথমত বাঙা ... নামের ইতিহাস চর্চা করলে দেখব বাঙা ... নাম— বিষয়টার সীমানা নির্দিষ্ট কর ... চাইলে বলা ভাল বাঙালী হিন্ ... নাম—অর্থ ও ব্যাকরণের দ্বারা নিদি ... কিন্তু শাসিত নয়। আর স্বাধীনতার ... যদি ওঠে তাহলে বলব আর কোন ... গোষ্ঠীর কথা জানি না যেখানে নাম নি ... চনের স্বাধীনতা এত অবাধ এবং ... স্বাধীনতার এত ক্রম-অবারিত। ... বর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের নামের তা ... প্রস্তুত করলে দেখা যাবে নামের ... কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দের মধ্যেই সীমা ... শিখ সম্প্রদায়ের নাম গ্রন্থ সাহে ... অন্তর্ভুক্ত বিশেষ্য জাতীয় শব্দের ম ... শুধু সীমাবদ্ধ নয়, ধর্মীয় রীতি অনু ... যে কোন বিশেষ্যই মানুষের নাম হি ... ব্যবহৃত হতে পারে। অতি সচ্ছন্দ শি

...ই 'দুর্জন' নাম গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ এ বিষয়ে তাঁর বাঙালীর মত স্বাধীনতা নেই। দুর্জনতম বাঙালীর নাম 'দুর্জন' হওয়া কঠিন। ইংরেজের ক্ষেত্রে অবশ্য নামের অর্থের বালাই নেই, তার একটা অসুবিধে আছে সন্দেহ নেই। ব্যক্তিনাম-বাচক শব্দগুলো সেখানে ভাষার অন্যান্য শব্দ থেকে একেবারে আলাদা, সেই শব্দ-গুলোর একটা অর্থ একদা ছিল, কিংবা ব্যুৎপত্তি অনুসরণ করলে এখনও একটা অর্থ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেই অর্থগুলি নিয়ে কেউ চিন্তিত নয়, কেউ সেই অর্থে শব্দগুলিকে ভাষায় ব্যবহার করে না। 'ফিলিপ' নামটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে হয়ত কেউ জানতে পারেন গ্রীক থেকে পাওয়া এই শব্দটির মানে 'অশ্বপ্রিয়' কিংবা 'ইরিণ' কথাটার মানে 'শান্তি', ডিবোরা মানে 'মৌমাছি', ডগলাস মানে 'অন্ধকার নদী' হেনরী মানে 'গৃহস্বামী' কিংবা থিওডোর মানে 'দেবতার দান।' এই সব অর্থগুলি ভাষার জীবন্ত অর্থ নয়, তারা স্মৃতিমাত্র। এগুলি বহুকাল ধরে নাম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এদের অর্থ নিয়ে কেউ সামান্য মাত্র বিচলিত নয়। আবার অনেক ইংরেজি বা ইউরোপীয় নাম আছে যাদের অর্থ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, যেমন ভ্যালেরি, কিংবা টেরেন্স, কিংবা পার্সিভ্যাল, অথবা অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাম প্যামেলা। মূলে গ্রীক, হিব্রু, ল্যাটিন, কেল্ট এবং অন্যান্য দু-একটি ভাষা সূত্রে এই নামগুলি এসেছে। ইংরেজের সমস্ত নামের একটা তালিকা তৈরী করাও কঠিন নয়, কিন্তু বাঙালী হিন্দুর নামের তালিকা তৈরি করা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন। কারণ নামকরণের পেছনে নানা মনোভাব, নানা রুচি নানা মতই শুধু ক্রিয়াশীল নয়, ভাষার শব্দ সম্ভারের থেকে নাম নির্বাচনের স্বাধীনতা অত্যন্ত বেশী।

তেরোশো আঠারো বাংলা সালে রবীন্দ্রনাথ একটি বালিকার নামকরণ উপলক্ষ্যে বলেছিলেন, 'মানুষের যে শ্রেষ্ঠ-রূপ যে মঙ্গলরূপ তাহা এই নামদেহটির দ্বারাই আপনাকে চিহ্নিত করে। এই নাম-করণের মধ্যে সমস্ত মানবসমাজের একটি আশা আছে, একটি আশীর্বাদ আছে— এই নামটি যেন নষ্ট না হয় ম্লান না হয়, এই নামটি যেন ধন্য হয়....'। এখানে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য শুধু মাত্র নাম শব্দটির অর্থ ও ব্যাকরণেই আবদ্ধ নয় তাকে ছাড়িয়ে গেছে! নামের অর্থ থাকাটাই শুধু বড় কথা নয়, তা যেন জীবনেও অর্থবহ হয়ে ওঠে। এটা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যাখ্যা, নামকরণের ইতিহাসে তার কতটা সমর্থন আছে বলা সহজ নয়। তবে একথা ঠিক যে জনগোষ্ঠী নাম শব্দের অর্থ নিয়ে চিন্তিত, নামকরণের পেছনে তার একটা অভিপ্রায় আছে। শুধু ব্যক্তিকে সনাক্তী-করণের জন্যই নামের মূল্য নয়, তার পেছনে পূর্বজদের কিছু আশা, কিছু আশীর্বাদ যুক্ত থাকে। কথাটাকে আরো প্রসারিত করা চলে। যে সব শব্দের অর্থ আজ লুপ্ত না হলেও গভীরভাবে সুপ্ত, যেমন অধিকাংশ ইংরেজের নামে, সে শব্দের অনুষঙ্গ কিন্তু লুপ্ত নয় এবং সেই অনু-ষঙ্গগুলি এক একটি জনগোষ্ঠীর প্রিয় বা শ্রদ্ধেয় ঐতিহ্যধারাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সমস্ত মুসলমান সমাজে যে নামকরণ —মুসলমান সমাজের নামগুলি সবই অর্থ-ময় এবং শব্দগুলি নাম ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত—তার মধ্যে দিয়ে সমস্ত বিশ্বের মুসলমান সমাজের মধ্যে একটি ঐক্য বন্ধনের চেষ্টা রয়েছে। শুধু ব্যক্তি নয়, নামকরণের পেছনে সমগ্র সমাজের বিশেষ মানসিকতা কাজ করছে। নামকরণের ইতি-হাস আলোচনা করলে তাই দেখা যাবে, নামকরণে ব্যক্তির নিজস্ব রুচি বা ইচ্ছার চেয়ে সবচেয়ে বড় হল সামাজিক রুচি। একটি গোষ্ঠীর নানা ঐতিহ্যের এবং নানা রুচি পরিবর্তনের ছাপ ছড়িয়ে আছে ব্যক্তির নামাবলীতে। শিখদের কথা বলছিলাম, তাঁদের নামকরণ পদ্ধতি গ্রন্থ সাহেব নির্ভর। ইংরেজের নামের দিকে যদি তাকাই দেখব সেখানেও চার্চের শাসন কাজ করেছে, যদিও যাকে খ্রীষ্টান নাম বলা হয়ে থাকে, বহু ইংরেজ বা বহু ইউ-রোপীয়ের নামের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় জগতের নামের সম্পর্ক নেই। অনেক নাম এসেছে প্রাক্-খ্রীষ্টীয় জগৎ থেকে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ট্রেন্ট-এ রোমান ক্যাথলিক চার্চের একটি সঙ্গীতি বসেছিল, সেখানে শাস্ত্রস্বীকৃত সন্ত এবং দেবদূতদের নামে নামকরণ ব্যাপটিজমের অন্যতম সর্ত ঠিক করা হয়েছিল। তখনও জন, পিটার, লূক মার্ক, জেমস ইত্যাদি নাম অবশ্যই প্রচলিত ছিল কিন্তু খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়নি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে এই সব নাম, সেই সঙ্গে বাইবেলে প্রচলিত নামগুলির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হল। আজকের ইউরোপে, আমেরিকায় বা খ্রীষ্টান সমাজে সব চেয়ে বোধ করি বহুল প্রচলিত নাম জন—এর উৎপত্তি একটি হিব্রু পদ-গুচ্ছ থেকে যার মানে 'ঈশ্বর মঙ্গলময়'। জানি না যাঁরা এই নাম দেন বা যাঁরা এই নামে পরিচিত তাঁরা এর অর্থের সঙ্গে পরিচিত কিনা, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে জন শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ধর্মীয় অনুষঙ্গ, যে অনুষঙ্গ খ্রীষ্টীয় জগতের পূর্ববর্তী ধর্মীয় জগতের সঙ্গে যুক্ত এবং তার ফলে জন নামটির দ্বারা একটি ধর্মীয় ধারার প্রবাহকে একটি বিশেষ জন-সমাজ বার বার স্বীকার করে নিচ্ছে। ব্যক্তির নামের পেছনে সমাজের মানসিকতা এইভাবে কাজ করে চলেছে।

(২)

বাঙালীর নামের বৈচিত্র্য এবং নাম-করণের যে বিপুল স্বাধীনতা—তার প্রকৃতি বুঝতে গেলে নামের ব্যাকরণ এবং নামের সঙ্গে জড়িত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচির ব্যাপারটি বুঝতে হবে। নামের আবার ব্যাকরণ কি? শব্দটি ব্যাকরণের নিয়মে নিষ্পন্ন কিনা সে কথা উঠতে পারে অবশ্যই। অধিকাংশ বাংলা নামই ব্যাকরণ সম্মত। দু একটি ব্যতিক্রম সাধারণ নিয়মকে ব্যর্থ করছে না, তার অস্তিত্বকেই প্রমাণিত করছে। বাংলা নামের ব্যাকরণের প্রশ্ন আসলে শব্দগঠনের প্রশ্নের সঙ্গে জড়ানো। বাংলায় নাম যদি একটি মাত্র শব্দ হয় (পদবীর কথা আলোচনা থেকে বাদ দিচ্ছি) তাহলে প্রশ্নটার খুব মূল্য থাকত না; কিন্তু অধিকাংশ বাংলা নামে একাধিক শব্দ থাকে এবং সবকটি পদ মিলে একটি পদ তৈরী হয়। এখানে বাংলা নাম (এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের নাম) এবং ইউরোপীয় নামের বড় পার্থক্য। ইউরোপীয় খ্রীষ্টানের নামের মধ্যে একাধিক শব্দ থাকতে পারে, কিন্তু তারা মিলে একটি সমাসনিষ্পন্ন পদ নয়। তারা প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র নাম: তাদের মধ্যে প্রথম শব্দটি প্রথম নাম বা খ্রীষ্টান নাম, দ্বিতীয় শব্দটি দ্বিতীয় নাম বা মধ্যনাম। দক্ষিণ ভারতের নামেও একাধিক শব্দ আছে, প্রথম শব্দটি হয়ত পিতার নাম, দ্বিতীয় শব্দটি একটি গ্রাম বা অঞ্চলের নাম, আর শেষ শব্দটি ব্যক্তির নাম (দক্ষিণ ভারতে 'পদবী' নেই) বাংলায় যাঁর নাম 'বঙ্কিমচন্দ্র' আমরা বলতে পারি না 'বঙ্কিম' তার প্রথম নাম, আর 'চন্দ্র' তার মধ্য নাম। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নাম 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুরো পদটাই। অর্থাৎ পদবীর আগে যে শব্দগুলি আছে তারা সবগুলি মিলে একটি শব্দ এবং পুরো পদটাই বাঙালীর নাম। কিন্তু আমরা যখন ব্যক্তিটিকে সম্বোধন করি বা তাঁকে 'রেফার' করি তখন সমাসের প্রথম পদটি দিয়ে করে থাকি। বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিম কিংবা রবীন্দ্রকে রবি। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই দেখি বাংলার পদ বিভাগের একটি কৌতুককর ব্যাপার, ভাষাতাত্ত্বিকেরা যাকে বলেন wrong morpheme cut অর্থাৎ মরফিম-এর ভ্রান্ত বিভাজন। সুরেন্দ্র, যতীন্দ্র, রবীন্দ্র, দেবেন্দ্র ইত্যাদি নামে ব্যাকরণ সম্মতভাবে পদ বিভাজন করলে, এই সব ক্ষেত্রে প্রথম পদটি হওয়া উচিত সুর, যতি, রবি এবং দেব। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব নামের ভাগটা হয় অন্য ধরনের, সুরেন, যতীন, রবীন এবং দেবেন। অর্থাৎ নামের পদ-বিভাগের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘিত হয়, কিংবা বলতে পারি নামের ব্যাকরণের একটি স্বতন্ত্র নিয়ম আছে। বাঙালী মুসলমানের নামেও এই ভ্রান্ত পদবিভাজন অনেক সময় উর্দুভাষী কিংবা আরবী-ফরাসী জানা পণ্ডিতের কৌতুক জাগায়। একবার একজন আমায় প্রশ্ন করেছিলেন তোমরা নজরুল ইসলামকে নজরুল বল কেন? পুরো নামটার মানে হল ইসলামের উপহার (নজর)—শব্দটার গঠন হল নজর-উল ইসলাম। হয় বল নজর, নয়ত নজরুল ইসলাম। নজরুল কথাটা অর্থহীন।

পদবিভাজনের ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্য আর একভাবে আমাদের নামের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। (যারা 'বিশৃঙ্খলা' কথাটার মধ্যে গোঁড়ামির সন্ধান পাবেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে পারি) বা নামকরণের একটা প্রাথমিক উদ্দেশ্যের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে। আমরা মোটামুটিভাবে সকলেই পুরুষের

নাম ও নারীর নামের মধ্যে একটি ব্যাকরণ-গত পার্থক্য মেনে থাকি। নারীর নামে স্ত্রীবাচক বা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটা করার দরকার কিনা, এ এরকম করা অন্যায় কিনা সে সব প্রশ্ন অবান্তর। আমাদের আলোচনার জন্য এটা একটা স্বীকৃত তথ্য হিসেবে গ্রহণ করছি। সেই কারণেই পুরুষের নাম সীতা, রাধা, কমলা, দুর্গা কিংবা নলিনী, মোহিনী রাখা হয় না, আবার নারীর নাম সরোজ, স্বর্ণ, হেম, বিন্ধ্য, অশোক, নির্মল রাখা হয় না: এই শব্দগুলির সঙ্গে অন্য কোন শব্দ যোগ করা হয়, কিংবা অনেক ক্ষেত্রে কোন প্রত্যয় যোগ করা হয় এবং তার ফলে নিষ্পন্ন পদটি হয় পুরুষ বাচক অথবা স্ত্রীবাচক। সীতানাথ, রাধারমণ, কমলাকান্ত, নলিনীকান্ত, মোহিনীমোহন, কিংবা সরোজকুমারী, স্বর্ণলতা, হেমনলিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, অশোকা, নির্মলা ইত্যাদি। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা পদবিভাজন করি তখন সৃষ্টি হয় দ্ব্যর্থকার। সীতানাথ যখন 'সীতায়' পরিণত হয়, কিংবা রাধারমণ 'রাধা'য় তখন নাম নির্বাচনের যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য এবং নিয়ম আছে তা বিপন্নবোধ করে। এই ক্ষেত্রে বাংলায় 'বাবু' শব্দটার প্রয়োগ সম্বন্ধেও একটা নতুন নিয়ম মেনে নিতে হয়—শুধু পুরুষ বাচক ব্যক্তি-নামের সঙ্গেই নয়, স্ত্রীবাচক শব্দের উদ্দিষ্ট Reference যদি হয় পুরুষ তাহলেও সেই শব্দের সঙ্গে বাবু যুক্ত হতে পারে। শুধু তাহলেই সীতাবাবু, রাধাবাবু, নলিনীবাবুর অর্থ এবং গঠন স্পষ্ট হতে পারবে। 'নলিনীকান্ত'কে নলিনী এবং কান্ত এই দুটি পদে ভাঙাকে ব্যাকরণের দিক থেকে ভ্রান্তবিভাজন বলব না নিশ্চয়ই, কিন্তু সমাসটি যখন নাম তখন এর কোন বিভাজন করলেই তা ভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে।

পদবিভাজনের ভ্রান্তি ঘটলে অর্থ-হীনতার সৃষ্টি (যেমন সুরেন, দেবেন ইত্যাদি শব্দে), পদবিভাজনের ফলে স্বর্থান্তর সৃষ্টি (যেমন নলিনী, সীতা—শুধু শব্দ দুটি থেকে ব্যক্তিটি নারী বা পুরুষ বোঝা সম্ভব নয়), আর পদবিভাজনের ফলে হতে পারে অভিপ্রেত অর্থের বিপর্যয়। পিতামাতা যাকে 'প্রমথনাথ' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন, পদবিভাজন করে নামটি সংক্ষিপ্ত করা খুবই সম্ভব, কিন্তু যাঁর প্রমথদের ওপর প্রভুত্ব করার কথা, তিনি স্বয়ং প্রমথ-য় পরিণত হন: বলাই বাহুল্য, নামের অভিপ্রেত অর্থ (যদিও তার কোন বাস্তবমূল্য নেই) পদবিভাজনের ফলে সঙ্কুচিত হয়ে আসতে পারে। ইংরেজিতে যখন বেলিন্ডা, সংক্ষেপে হয় লিন্ডা, কিম্বা প্যাট্রিসিয়া হয় প্যাট তখন অর্থের কোন প্রশ্ন ওঠে না, কারণ মূলে শব্দগুলির অর্থ ভাষায় লুপ্ত, তার ধ্বনি-গুণ বা অন্য কোন অনুষঙ্গই সেই শব্দ নির্বাচনের একমাত্র ভিত্তি। কিন্তু বাংলায় দেখা যাচ্ছে নামের মধ্যে দুটি শক্তির বিরোধিতা চলেছে। ব্যাকরণে এবং ব্যাকরণ-হীনতায়, পুরুষবাচক শব্দে এবং স্ত্রীবাচক শব্দে, নামের সামগ্রিক অর্থে এবং নামের খণ্ডিত অর্থে। এই বিরোধিতার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আজকের বাঙালীর নাম, নামের গঠন, তার অর্থের গঠন।

(৩)

বাঙালীর নামের আর একটি দিক দেখা যাক। এই দিকটা উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলের নামের মধ্যেও ধরা পড়ে, তবে বিশেষভাবে এই ব্যাপারটা বাঙালীর নামে। অধিকাংশ বাঙালীর দুটো নাম, একটাকে বলি ভালো নাম, আর একটা ডাক নাম। ভাল নাম আর ডাকনামের সম্পর্কটা তিন শ্রেণীর হতে পারে। প্রথমত হতে পারে যে ডাক নামটা ভাল নাম থেকে নিষ্পন্ন, যেমন রবীন্দ্র থেকে রবি, কিংবা রাম থেকে রামু। দ্বিতীয় ধরনের হল যে ডাকনাম ও ভালনাম দুটো আলাদা শব্দ, ব্যাকরণগত এবং অর্থগত দিক থেকে আলাদা। ভালনাম শশিভূষণ, ডাকনাম অরুণ। তার তৃতীয় সম্পর্ক হল ডাকনাম ও ভালনাম আলাদা শব্দ তো বটেই ডাকনামটা হয় কোন অর্থহীন শব্দ, কিংবা কোন 'মন্দার্থক' শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলে 'পিজোরেটিভ ওয়ার্ডস' কিংবা 'ট্যাবু' জাতীয় শব্দ। যেমন ধরা যাক ঘন্টু, মন্টু, খাঁদু, পাগলা, ফেলনা, পাঁচী। এছাড়া এই শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে আর এক ধরনের শব্দ যাদের 'মন্দার্থক' না বললেও বলা যে তারা ভালনাম হিসেবে সাধারণত মনোনীত হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্গে এদের মৌলিক পার্থক্য হল এইখানে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডাকনামগুলি ভালনাম হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। অরুণ এক-জনের ডাকনাম, আর একজনের ভালনাম। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ডাকনামগুলি সাধারণত কারো ভালনাম নয়। অর্থাৎ ঘন্টু, খাঁদু, পেঁচী, বিট্টু, মুড়কী, টেবিল, পুঁটি ইত্যাদি নামগুলি ডাকনামের সীমানা ছাড়াতে পারে না। ভালনাম-ডাকনামের এই শ্রেণী বিভাগ সূক্ষ্মতর করা চলে, কিন্তু আপাতত আমাদের আলোচনার পক্ষে অবান্তর।

যেখানে ডাকনাম ও ভালনামের মধ্যে সম্পর্কটা সবচেয়ে স্পষ্ট সেটা হল শব্দদুটোর ব্যাকরণগত সম্পর্কে। রবীন্দ্র ও রবির যে সম্পর্ক; যদি সেই সম্পর্ক বাঙালীর ডাকনাম ও ভালনামের মধ্যে সবসময় দেখতে পেতাম তাহলে নামের ব্যাকরণে একটি পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট রীতি খুঁজে পেতাম। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে সেই পরিচ্ছন্ন রীতি খুঁজে পাই না তার কারণ সন্ধানে যেতে হবে সমাজের অন্যান্য আচরণের মধ্যে। অধিকাংশ বাঙালীর নাম নির্বাচনে একটু সময় লাগে এবং তার জন্মের পরে তার নাম ঠিক করা হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই নামটা জন্মের অব্যবহিত পরে ঠিক হয় না। ইউরোপ-আমেরিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা-বাপ ছেলেমেয়ের জন্মের আগেই নাম ঠিক করেন, হাসপাতালে আগেই সেই নাম দিয়ে দিতে হয়, ফলে জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই নবজাতক সেই নামে চিহ্নিত হয়। বাঙালী পরিবারে, সাধারণত, শুধুই যে নাম নির্বাচন জন্মের পরেই হয় তা নয়, নাম নির্বাচনে সময় লাগে। ইতিমধ্যে পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন নামে শিশুকে আহ্বান করেন বা চিহ্নিত করতে থাকেন: নাম নির্বাচনে নানা সমস্যা ভীড় করে আসে, ট্যাবু আছে, আছে পারিবারিক ধর্মীয় বোধ, আছে পারিবারিক রুচি বা কোন বিশেষ অভিপ্রায়। সেই সঙ্গে আছে পরিবারে প্রচলিত অন্যান্য নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার আগ্রহ। তার ফলে অনেকক্ষেত্রে পরিবারের মধ্যে শিশুটিকে বেশ কিছুকাল বহু-নামের পরিবেশে বাস করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

> একজনেতে নাম রাখবে কখন অন্নপ্রাশনে,
> বিশ্বশুদ্ধ সে নাম নেবে—ভারী বিষম
> শাসন এ।
> নিজের মনের মতো সবাই করুন কেন
> নামকরণ—
> বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার, খুড়ো ডাকুন
> রামচরণ।...
> আমি বাপু ডেকেই বসি যেটাই মুখে
> আসুক না—
> যারে ড[illegible] সেই তা বোঝে আর সকলে
> হাসুক না

রবীন্দ্রনাথ যা কামনা করেছেন বহু বাঙালীরই তা অভিজ্ঞতার বিষয়। বহু বাঙালীকেই তার জন্মের পর থেকে বহু নামের আবহাওয়ায় বাস করতে হয়। ধীরে ধীরে কতকগুলি নাম বিদায় নেয়। শে[ষ] পর্যন্ত একটি কি দুটি নাম স্থায়িত্ব লা[ভ] করে, আর ডাকনাম ব্যবহার যাঁরা করে[ন] তাঁরা যদি পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, তাহ[লে] ডাকনামটাও স্মৃতিতে পরিণত হয়, ভালনা[ম] থেকে যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী একক। কিন্তু বহু বাঙালীর জীবনই সাক্ষ্য দেবে যে ভালনা[ম] সব সময়েই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতি-ষ্ঠিত হয় না। আমি এই অবস্থাটা বোঝা[র] জন্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। তার থে[কে] দুটো সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথমত, অনে[ক] বাঙালী দীর্ঘকাল একটা বহু-নাম অবস্থা[র] মধ্যে কাটায়। তার ভালনাম থাকে একটা[,] কিন্তু ডাকনাম থাকতে পারে একাধিক[।] আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনে[কে] তাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকতে পা[রে]

দ্বিতীয়ত, ভালনাম নির্বাচনের পেছনে যেমন থাকে ঐতিহ্য, ধর্মবোধ, রুচি ও অভিপ্রায় কাজ করে, ডাকনাম নির্বাচন বা ব্যবহারের পেছনেও আছে বিচিত্র এবং জটিল মনোভাবের কারণজাল। অর্থাৎ ভালনাম ও ডাকনাম উভয়েরই আছে সমান্তরাল বা প্রায় সমান্তরাল বিন্যাস।

ডাকনামের দুএকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাক, এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভালনামের সঙ্গে এদের পার্থক্যটা স্পষ্ট করে তুলবে। এখানে ডাকনাম বলতে বিশেষ করে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর ডাকনামগুলোরই কথা বলছি। ডাকনামগুলোর মধ্যে, সাধারণভাবে লক্ষ্য করি, নামদাতার অভিপ্রায়ের স্পষ্টতা, তা কখনও অনুরাগে মাখানো, কখনও তির্যক, কখনও তার মধ্যে মিশে আছে কোন দূরে ঘটনার স্মৃতি, কখনও তার মধ্যে আছে ধর্মীয় সংস্কার বা ভয়, কখনও আছে রুচি বিকার, কখনও বা নিছক ধ্বনির সাহায্যে নামদাতার অনুভবের অস্পষ্ট প্রকাশ। ভালনামগুলির মধ্যে তা নেই একথা বলছি না, শুধু অভিপ্রায়ের স্পষ্টতার তুলনাগত তারতম্যের ওপর জোর দিচ্ছি। চাঁদু, বাচ্চু, মিঠু, মিঠি, কানু, রাদু, খোকা, খোকন, মিতুন, তুতুল, কালু, ভুলু ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে বহুদিনের স্নেহ-অনুরাগের অনুষঙ্গ জড়ানো, ভাষার গায়ে যেন এমন স্বচ্ছ জ্যোৎস্নার মত জড়িয়ে আছে যে ভাষাতত্ত্বের কোন যন্ত্রে তাকে ধরতে পারি না। কিন্তু খাঁদা, পুঁটি, টেঁপি, ফেকী, নেকী, পাঁচী, পাগলা শব্দে জড়িয়ে আছে একটা 'শব্দার্থক' আভাস। পচা, ফেলনা ইত্যাদির সঙ্গে ট্যাবু, আবার 'ঝড়ু'র সঙ্গে জড়িয়ে আছে হয়ত বালকের জন্মদিনের কোন ঝড় বাদলের স্মৃতি। এই যে বিন্যাস এটা ভালনামের ক্ষেত্রেও আছে সন্দেহ নেই। সেই জন্যেই বলেছি ডাকনাম ও ভালনামের সমান্তরাল বা প্রায় সমান্তরাল বিন্যাস।

ভালনামের মধ্যেও আছে 'ট্যাবু'র চিহ্ন। এককড়ি, দুকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি সবই বাংলাদেশে ভালনাম হিসেবেও প্রচলিত এবং সব কটির পেছনে আছে ধর্মীয় সংস্কারের ছায়া। তবে সাধারণত 'শব্দার্থক' শব্দ ভালনামে লক্ষ্য করিনি। ঘটনা বা মানুষের স্মৃতি ভালনামের মধ্যেও প্রচুর, বিশেষ কোন ঋতুতে, কিংবা কোন বিশেষ মাসে বা দিনে জন্ম বলে সেই ঋতু, মাস বা দিনের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা নামের সংখ্যা প্রচুর, কিংবা কোন দুর্যোগের দিনে, বিপদের মুখে জন্ম হয়েছে বলে সেই স্মৃতিকে জাগরূক করে রাখা হয়েছে বহু নামে। প্রিয়জনের নামটিকে স্মরণ করার জন্য সন্তানের সেই নাম দেওয়া হয়েছে এমন ঘটনাও কম নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আশুতোষের মৃত্যুর পর কোন বক্তৃতায় বলেছিলেন তাঁরা একদা গভীর বন্ধু ছিলেন, আর সেই বন্ধুত্বের অভিজ্ঞান ছড়িয়ে আছে তাঁদের পুত্রদের নামে। কারো কি খেয়াল হয়েছে হরপ্রসাদের প্রত্যেক সন্তানের নামের মধ্যে রয়েছে—তোষ, আর আশুতোষের প্রত্যেক সন্তানের নামের মধ্যে রয়েছে—প্রসাদ।

যে কথাটার ওপর জোর দিতে চাই তা হল, ডাকনাম ও ভালনাম দুয়েরই আছে স্বতন্ত্র বিন্যাস, দুয়েরই আছে স্বতন্ত্র মূল্য। একটা মানুষ, অথচ তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে স্বতন্ত্র পরিচয়, তার একাধিক নাম যদি থাকে তা নিতান্তই স্বাভাবিক। একটা নামে তার কাজ চলে না সব সময়। অনেক সময় শুধু নিজেরই প্রয়োজনে তাকে নতুন নাম সৃষ্টি করতে হয়। ছদ্মনামে সে আত্মগোপন করতে চায়, আবার গোপন নামেই সে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের কিছু নাম থাকে যা নিতান্তই 'কানে কানে ডাকা'।

(৪)

বাঙালীর নামের প্রধান উৎসগুলির দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা যাক নামে বাঙালীর প্রবণতা কোন দিকে। আমরা কি বলতে পারি জোর করে যে গত যুগের বাঙালীর ঝোঁক ছিল মূলত শব্দের অর্থে, আর এ যুগের বাঙালীর ঝোঁক প্রধানত ধ্বনিমাধুর্যে। গত যুগের কানে সেটা ধ্বনিমাধুর্য ছিল, একালে তা সবসময় যে গ্রাহ্য তা বলা কঠিন। গত যুগের নামে ছিল দেবদেবীর নামের প্রাধান্য। কথাটা সত্য সন্দেহ নেই। কিন্তু নদী, পাখি, ফুল, গাছ, প্রকৃতির নানা বস্তুর নামও ছিল। সেই সঙ্গে ছিল পৌরাণিক চরিত্রের নাম। মহাকাব্যের চরিত্রের নাম। এখনও প্রধান উৎসগুলো একই আছে। কিছুটা বেড়েছে, সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্য। কোন কোন দুঃসাহসিক ইউরোপ থেকেও নাম সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা এত ক্ষীণ প্রচেষ্টা যে তার কোন প্রভাব পড়েনি আমাদের জীবনে। নামকরণের মধ্যে যা দেখতে পাচ্ছি তা হল মানুষের রুচির পরিবর্তন। পরিবর্তন, তার মানে এই নয় যে তা ভাল কিংবা খারাপ। নামের ইতিহাস দেখলে দেখব একটা পরিবর্তনের স্রোত অনেকদিন ধরেই বইছে। নাম অনেক সময়ে ফ্যাশনের মত, একটা বিশেষ নাম হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যেসব নাম এক সময় মনে হত পুরোনো হঠাৎ তা দেখি মানুষের প্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রাচীনকালের শব্দগুলি নবযুগে হঠাৎ মুখর হয়ে উঠেছে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমারের বিশখণ্ডে প্রকাশিত 'বংশপরিচয়' (১৯২১-১৯৩৯) গ্রন্থটির মধ্যে বহু বাঙ্গালী পরিবারের নামের তালিকা পাওয়া যাবে। বংশলতিকাগুলির থেকে নামগুলির উৎস নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখলাম ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যের নামগুলির শতকরা আঠানব্বই হল দেবদেবীর, ঊনবিংশ থেকে বিংশশতাব্দীর মধ্যে (১৯৩৯-এর আগে) দেবদেবীর নামে নাম হল শতকরা পঁচাত্তর। এখন যদি একটা সার্ভে করা যায়, অনুমান করি শহরে, শহরতলীতে, মধ্যবিত্ত বাড়িতে দেবদেবীর নামে নামের সংখ্যা আরো কমেছে; গ্রামে, ইংরেজীশিক্ষা বা কায়দার প্রভাব যেখানে কম সেখানেও কি কমেছে? জানি না। অনুমান করি কমেছে, কিন্তু এখনও আমার বিশ্বাস, ধর্মীয় নামের সংখ্যা অন্যান্য নামের চেয়ে অনেক, অনেক বেশী। পরিশীলিত সমাজেও যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল বা ক্ষীণ, সেখানেও দেখা যাবে ধর্মীয় নাম যথেষ্ট, অবশ্য অনেকগুলি নাম ব্যবহৃত হচ্ছে প্রধানত তাদের অর্থ বা ধ্বনিগুণের জন্য। সোম, রুদ্র, বরুণ, উষা সবাই বৈদিক দেবতা, এই শব্দগুলি আমাদের আধুনিক নামে বহুল ব্যবহৃতও বটে। পৌরাণিক দেবদেবী সম্বন্ধে আমাদের রুচি বদলেছে, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, কমলা, সরস্বতী, দেবী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি নাম এখনও বহুল প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের নাম সংগ্রহ করলে দেখা যাবে হয়ত আমাদের পুরাণে উক্ত মন্দিরে পূজিত সব দেবতার বা গ্রামে গ্রামের নানা স্থানীয় দেবদেবীর নামে বাঙালীর নামকরণ হয়েছে। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে 'দশমহাবিদ্যা'র 'ছিন্নমস্তা' 'খর্পরা' অথবা 'ধূমাবতী' নামে কোন মহিলা কোনদিন বাংলাদেশে ছিলেন কি না?

দেবদেবীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর উপাস্য দেবদেবী বা সাধুসন্তদের নাম। বৈষ্ণব পরিবারে স্বভাবতই বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রাধা, গোবিন্দ, হরি, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, নিতাই, নিমাই, গদাধর এমন কি বৈষ্ণবদাস পর্যন্ত নাম পাওয়া যাবে, আবার শাক্ত পরিবারে স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাবে শক্তিদেবীদের নাম, তান্ত্রিক সাধকদের নাম। ধর্মীয় নামের বিরুদ্ধে একটা নীরব প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল সম্ভবত ব্রাহ্মসমাজে। 'গোরা' উপন্যাসের পাঠকদের মনে আছে বরদাসুন্দরী সুচরিতার 'রাধারাণী' নাম পরিবর্তন করেছিলেন। পরিবর্তনের প্রধান কারণ রাধারাণীর ধর্মীয় অনুষঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে নামের মধ্যে নতুন পরিবর্তনের স্রোত এনেছিল ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজের নারী ও পুরুষের নামে, বিশেষ করে নারীর নামে, একটি দিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায়।

বাঙালীর নামের দ্বিতীয় প্রধান উৎস প্রাচীন সাহিত্য ও কথা কাহিনীর চরিত্রের নাম, বিশেষভাবে রামায়ণ ও মহাভারত। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, সুভদ্রা, মেঘনাদ, ইন্দ্রজিৎ ইত্যাদি নানা নামই বাঙালী বহুকাল ধরে ব্যবহার করছে। কিন্তু কিন্তু মহাকাব্যের কোন কোন নাম ব্যবহৃত হয়েছে খুব কম। কোন কোনটি সম্ভবত ব্যবহৃত হয়নি। শকুনী, দুঃশাসন, দুর্যোধন, রাবণ কিংবা বিভীষণ কিংবা কৈকেয়ী নাম হিসেবে গৃহীত হয়নি। বংশ পরিচয় (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে অবশ্য একটি পরিবারে 'দুর্যোধন' এবং হেড়ম্ব' নাম দুটি পেয়েছি। তা সত্ত্বেও বলা চলে এগুলি ব্যতিক্রম। এইসব নাম যে ব্যবহৃত হয়নি তার প্রধান কারণ অবশ্যই ঐ চরিত্রগুলির প্রতি বাঙালীর মনোভাব। প্রাচীন কথা ও কাহিনী থেকে এখনও বাঙালী নাম সংগ্রহ করে চলেছে, এখন ঝোঁকটা মূলত শব্দের প্রতি। শব্দের ধ্বনিসংগীতের প্রতি। প্রাচীন চরিত্রের সঙ্গে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং স্থানের নামের প্রতিও বাঙালীর আকর্ষণ তীব্র: বুদ্ধদেব, অশোক, কালিদাস, চৈতন্য, কিংবা

মেক-আপ দিয়ে
ত্বকের দোষত্রুটি ঢাকা যায়!

ল্যাক্টো-ক্যালামাইন দিয়ে আপনার রঙরূপের পরিচর্য্যা করুন।
এতে কিছু বিশেষ উপাদান বিশেষভাবে মেশানো হয়, যাতে আপনার রঙরূপ ফুটে ওঠে আর ত্বক লাবণ্যে ভরে যায়।
ল্যাক্টো-ক্যালামাইন হল এক সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রসাধন, অর্থাৎ অ্যাস্ট্রিনজেন্ট, ময়শ্চারাইজার আর ফাউণ্ডেশন ক্রীম—এই তিন গুণের এক অপূর্ব সমন্বয়।
এটি নিয়মিত ব্যবহার করুন—দেখবেন আপনার সহজাত সৌন্দর্য্য কেমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠছে।
৩টি সুবিধেজনক সাইজে পাওয়া যায়: ১১০মি.লি., ৬০মি.লি. আর ২৮মি.লি.
CROOKES
Lacto-Calamine
SOOTHING
REFRESHING
NON-GREASY
ক্রুকস্ ল্যাক্টো-ক্যালামাইন রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেডমার্ক। এই মার্কের কোনো রকম নকল আইনতঃ অপরাধ বলে গণ্য হবে।
আসল ল্যাক্টো-ক্যালামাইন কেনবার জন্যে সর্বদা ক্রুকস্ ছাপ দেখে নেবেন, আর খেয়াল রাখবেন ক্রুকসের সীল যেন ভাঙা না থাকে।
ভুফার-ইন্টারক্র্যাম লিমিটেড
পোস্ট বক্স নং ৬৫৮২, বম্বে ৪০০ ০১৮।

অযোধ্যা, গোকুল, বৃন্দাবন, মথুরা কাশী স্থাননামগুলি (এগুলির সংগে অবশ্য পতি, নাথ ইত্যাদি শব্দ যুক্ত) কিংবা গংগা, যমুনা, নর্মদা নদীর নাম বহুকাল ধরে বাঙালী ব্যবহার করছে। এখন যদি অযোধ্যা, মথুরা ইত্যাদি কিংবা গংগা বা নর্মদার 'ফ্রিকুয়েন্সি' কমে গিয়ে থাকে, বরং দেখা দিয়েছে বিদিশা, শিপ্রা, কাবেরী, কৃষ্ণা।

বাঙালীর নামের তৃতীয় প্রধান উৎস প্রকৃতি, গাছপালা, লতা, ফুল, পাখির নাম। এখানেও প্রধান সর্ত হল নান্দনিক। টিয়া, ময়না, চন্দনা, পাপিয়া নাম আমরা মেনে নিয়েছি নান্দনিক কারণেই। কিন্তু কাক, প্যাঁচা, চিল, চিল, শকুন, এমনকি ঘুঘু কেউ নাম হিসেবে ব্যবহার করেনি। গোলাপ, অতসী, চাঁপা, বেলা, টগর, অপরাজিতা, কুন্দ, মালতী, যূথিকা, শেফালী, মল্লিকা ইত্যাদি বহু অসংখ্য কিন্তু বহু ফুলের নাম আছে যা মানুষের নাম রূপে এখনও দেখা দেয়নি। নান্দনিক কারণটা অত্যন্ত জটিল, তা যেমন শব্দের মানে, ধ্বনি ও অনুষঙ্গের ওপর নির্ভরশীল, তেমন নির্ভরশীল সেই শব্দের নির্দিষ্ট চরিত্র বা বস্তুর আকার, প্রকার বা ব্যবহারের ওপর। তাই জোর করে বলা কঠিন কোন শব্দটি কেন নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি।

নামের চতুর্থ প্রধান উৎস মূল ভাবজগৎ, বোধের জগৎ, চিন্তার জগৎ—নানা ভাববাচক বা প্রত্যয়-বাচক বা গুণবাচক শব্দ সংগ্রহ করা হয় সেই জগৎ থেকে। সত্য, বিদ্যা, জ্ঞান, শান্তি, প্রীতি, দয়া, করুণা ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দ। বলাই বাহুল্য এই সব শব্দগুলি একক শব্দ হিসেবেই নাম হতে পারে, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এদের সংগে আর একটি শব্দ যুক্ত হয়। চরণ, প্রকাশ, ব্রত, রঞ্জন কিংবা প্রসাদ প্রতীপ। এগুলি প্রধান উৎস কিন্তু এগুলি-তেই শেষ নয়। আরো উৎস আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলাসাহিত্যের নানা চরিত্র, বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্যের। অভীক কিংবা [illegible]নিকা, উর্মীর কিংবা মহুয়া নামের সংগে আমাদের আজ যে মধ্যে মধ্যে পরিচয় ঘটে তা শুধু রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চেয়ে বাঙালীর সুবিধে এইখানে যে তার নামের উৎস বিরাট। সমস্ত বাংলাভাষার, এবং আংশিকভাবে সংস্কৃতভাষার সমস্ত বিশেষ্য-বিশেষণ সে নামের জন্য গ্রহণ করতে পারে। সব শব্দ যে নাম হিসেবে আজও ব্যবহৃত হয়নি তার একটা প্রধান কারণ বলেছি নান্দনিক। আর একটা প্রধান শব্দের কোন অপ্রীতিকর অনুষংগ, তাও মূলত নান্দনিক, কিছুটা নৈতিক। যে ভাষায় নামের শব্দে অর্থের ওপর জোর বেশী, সেখানে এই নৈতিক দৃষ্টিভংগী কিছুটা থাকবে। কিন্তু যে শব্দটি এককভাবে অপ্রীতিকর অর্থবাহী বা অনৈতিক অনুষংগ যুক্ত তাও নাম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে আর একটি শব্দযোগে, দ্বিতীয় শব্দটি এসে প্রথম সেই অনুষংগকে লুপ্ত করে দেয় এবং সমগ্র সমাসবদ্ধটির নিষ্পন্ন অর্থকে প্রীতিকর এবং নৈতিক দিক থেকে শুদ্ধ করে তোলে। বাঙালীর নামের দ্বিতীয় পদগুলি কুমার, চন্দ্র, নাথ, দাস, চরণ, পতি, কান্ত, বালা, রাণী, রঞ্জন, মোহন, ভূষণ, জিৎ, ব্রত, প্রসাদ, প্রিয়, ইন্দ্র ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দগুলির সাহায্যে এক-দিকে যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষবাচক শব্দকে স্ত্রীবাচক শব্দে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে, কিংবা স্ত্রীবাচক শব্দকে পুরুষবাচক শব্দে, আর একদিকে এই সব শব্দের সাহায্যে নামের প্রথম শব্দটির মন্দার্থক (বা যে ব্যক্তির নাম তার পক্ষে প্রীতিজনক এমন) অর্থ প্রাধান্য পাচ্ছে না। 'ভূত' কিংবা 'পশু' কিংবা 'অহি' শব্দ দিয়ে নামকরণ সাধারণত হয় না, যদি না তার সঙ্গে যথা-ক্রমে নাথ কিংবা পতি কিংবা ভূষণ জড়িত হয়। বাঙালীর নামে অর্থের প্রাধান্য থাকার ফলেই এখনও শুনিনি কোন পশুর নামে, কোন অপ্রীতিকর পাখির নামে বা ফুলের নামে কারো নাম করণ হয়েছে। ইউরোপে 'বেলিন্ডা' (যার সংক্ষেপিত রূপ লিন্ডা) নাম শুনি, তার মূল অর্থ 'সাপ', রাজপুত নামটাও বেশ প্রচলিত যার মূল মানে 'নেকড়ে বাঘ'। বাংলায় সাধারণত এই ধরনের নাম শুনি না। তবে ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। 'নকুল' কোন অপ্রচলিত নাম নয়।

(৫)

গত শতাব্দীর শেষ দিকে এক গল্পে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল, তখন বাপ-মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন সৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুর দেবতার নামই প্রচলিত ছিল—গণেশ, কার্তিক, পার্বতী তাহার উদাহরণ।' এই শতাব্দীর গোড়ায় আর একটি গল্পে লিখেছিলেন, 'নির্ঝরিণী নামটি হঠাৎ পাঠকদের কাছে প্রচার করিতে সংকোচ বোধ করিতেছি। কারণ তাঁহাদের অনেকেরই বয়স হইয়াছে...'।

কোন নামটি সৌখীন, কোনটি আধুনিক, কোনটি সেকেলে তা বোঝবার কোন স্থির নিয়ম কি আছে? এক একটি গোষ্ঠীতে, রুচিগত, শিক্ষাগত এবং দৃষ্টি-ভঙ্গীগত দিক থেকে অবশ্যই নামের আধুনিকতা ও প্রাচীনতার পার্থক্য করা হয়, কিন্তু কোন একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম বোধ-হয় আমরা রচনা করতে পারি না যার দ্বারা অবিলম্বে নামগুলিকে আধুনিক ও প্রাচীন নাম বলা চলে না। কালী, দুর্গা, মনসা, শীতলা, বিষ্ণু, কৃষ্ণের পাশে পাশেই আছে উষা, সরস্বতী, বাণী, কমলা নাম। স্থান-সূচক নামে অযোধ্যা, বৃন্দাবন, কাশী, মথুরা, দ্বারকা, কামাখ্যার পাশে পাশেই আছে অজন্তা, বিদিশা, উজ্জয়িনী ইত্যাদি নাম। শুধু যেটা বলা চলে তা হল কতক-গুলি নামের মধ্য দিয়ে প্রচলিত নাম ধারার মধ্যে একটা গভীর পরিবর্তন বা একটা 'বেক থ্রু' ঘটেছে—ইতিহাসে তার নজীর আছে। আগেই উল্লেখ করেছি ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট ভূমিকা, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা। মূলত এই দুটি ধারার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে বাঙালীর নামের 'আধুনিকতা', যার ফলে ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রদেশে 'বাঙালী নাম'-কে একটা স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়েছে। বাঙালী সর্বভারতীয় নামের ধারার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকেও একটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। অবাঙালীরা বলেন, তার প্রধান লক্ষণ কোমলতা, ধ্বনি-মাধুর্য এবং কিছু পরিমাণে সাহিত্য-নির্ভরতা। বলাই বাহুল্য এগুলো প্রধান লক্ষণ মাত্র, সার্বিক লক্ষণ নাও হতে পারে।

নামের এই 'আধুনিকত্ব' সন্ধান করলে দেখব নতুন নাম সংগ্রহের লক্ষণ পুরুষদের চেয়ে নারীর নামে বেশী। এর পেছনে কোন বিশেষ সামাজিক কারণ আছে কিনা জানিনা। প্রথমত দেখা যাবে, পুরুষদের চেয়ে নারীর নামে সংস্কৃত শব্দের অসংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য। অসংস্কৃত বলতে মূলত তদ্ভব শব্দের কথাই বলছি। দ্বিতীয়ত বিদেশী শব্দ পুরুষদের নামে খুবই কম ব্যবহৃত। গোলাপ, গরীব, ফকীর ইত্যাদি নাম পুরুষদের দেখেছি। ইংরেজি শব্দের ব্যবহার প্রায় দেখিনি—দু'এক ক্ষেত্রে ডাক নামে ছাড়া। কিন্তু বিউটি, ডলি, কিটি, লিলি, ডালিয়া, জিনিয়া বহুল প্রচলিত না হলেও, একেবারে অপ্রচলিত নয়। ইংরেজি শব্দ মেয়েদের নামে ব্যবহৃত হচ্ছে হয়ত দু-এক ক্ষেত্রে, কিন্তু ফারসী শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ে না—'গোলাপ' ছেড়ে দিলে।

শব্দের উৎসের কথা বাদ দিলেও চোখে পড়ে মেয়েদের নাম নির্বাচনে নতুনত্বের সন্ধান-প্রাধান্য। শব্দের ধ্বনিগত কোমলতা ও মাধুর্যের ওপর ঝোঁক একটা যেমন আছে, তেমনই আছে নামের হ্রস্বতার প্রতি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে পুরুষের নামে শব্দসংখ্যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একাধিক, বিশেষ করে কুমার, নাথ, চন্দ্র, রঞ্জন, মোহন, প্রসাদ, ইত্যাদি শব্দ এখনও নামের দ্বিতীয় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত। ইদানীং এই দ্বিতীয় উপাদানগুলিকে ছাঁটাই করে নাম সংক্ষিপ্ত করার একটা চেষ্টা অবশ্যই লক্ষণীয়। এই ব্যাপারে মনে হয় মেয়েদের নামের 'আধুনিকত্বের' একটা বড় লক্ষণ হল—বালা, সুন্দরী, রাণী, কুমারী ইত্যাদি শব্দগুলি (যেগুলি এককালে মেয়েদের নামে প্রায় অনিবার্যভাবে দেখা দিত) বর্জনে বিপুল সাফল্য। নামের গঠনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা যদি সম্ভব হয় তাহলে মনে হয় পুরুষদের নামের গঠনও সম্ভবত এই পথ অনুসরণ করবে, নামের হ্রস্বতাই হবে একটা লক্ষ্য আর তার জন্য নাম থেকে বিলুপ্ত হবে নাথ, চন্দ্র, কুমার জাতীয় শব্দ। কুমারের জনপ্রিয়তা (ফিল্ম অভিনেতাদের স্নেহপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও) ক্রমশই নিম্নাভিমুখী বলেই মনে হয়।

যে অর্থ নিয়ে নামের ব্যাপারে বাঙালীর একটা তীব্র আকর্ষণ আছে তার বিরোধী ধারা অবশ্যই কিছুটা আছে, আমা-দের ডাক-নামে। ডাক নামে অর্থহীন শব্দের

প্রয়োগ বড় কম নয়। কিন্তু সেই ধরনের ডাক নাম ভাল নামের স্তরে বিশেষ মর্যাদা পায়নি। এখানেও লক্ষ্য করছি যে মেয়েদের নামে অর্থহীনতার স্থান পুরুষের নামের চেয়ে বেশী। সম্প্রতি অনেকগুলি নামের তালিকা আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি (পাঠক-পাঠিকারাও বিষয়টা সন্ধান করতে পারেন) যে মেয়েদের নামে গত বেশী ধন্যাত্মকশব্দ, অর্থহীন কিন্তু কোমল ও মধুর শব্দ, কিংবা কোমলতা ও মাধুর্যের কথা বাদ দিলাম, অর্থহীন শব্দের ব্যবহার, পুরুষের নামে তা নয়। এটা একটা উল্লেখ-যোগ্য লক্ষণ নিশ্চয়ই। হয়ত ভবিষ্যতে এই প্রবনতার গণ্ডি বাড়লে বাঙালীর নামে অর্থ নিয়ে অনর্থক বিচার করা হবে না। নারী-দের নাম এই ছটো দিক থেকে পুরুষের নামের চেয়ে 'আধুনিক'।

(৬)

বাঙালীর নামের আর একটি ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আলোচনা শেষ করতে চাই। এতক্ষণ পর্যন্ত নামের গঠন সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি তা মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু নামের গঠনের একটি পারিবারিক মাত্রা আছে। এই ব্যাপারে মনে হয় বাঙালী নামের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, অন্য কোন গোষ্ঠীর মধ্যে এই ব্যাপারটা এত প্রবলভাবে অনুসৃত হতে দেখিনি। এই লক্ষণটির নাম দিতে পারি পুনরাবৃত্তি। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 'তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিনী রাখে।' রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' গল্পটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন এই মেয়েটির নাম 'সুভাষিনী' তার জীবনের নিষ্ঠুরতম পরিহাস। রবীন্দ্র-নাথ বলেছেন এই নামকরণ হয়েছিল 'মিলের অনুরোধে।' প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর জীবনে নামকরণে এই মিলের ভূমিকাটি কম নয়। একটি ব্যক্তির নামের গঠন অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করে তার পরিবারের পূর্বজদের নামের গঠনে। অর্থাৎ পূর্বজদের নামের কোন অক্ষরের, কোন শব্দের, কোন শব্দাংশের পুনরাবৃত্তি তার নামের মধ্যে হবে। এই পুনরাবৃত্তির একটি দিক হল মিল।

অনেক সময়েই দেখা যায় পরিবারস্থ সকলের নামে একটি কোন বিশেষ অক্ষরের বা ধ্বনির পুনরাবৃত্তি, পাঁচটি ভাইর নাম হয়ত প্রকাশ, প্রতাপ, প্রমথ, প্রসন্ন এবং প্রদীপ। কখনও শব্দগুলির মধ্যে মিল, অরুণ, বরুণ, তরুণ। এই যে পুনরাবৃত্তি এরও দুটো দিক আছে, একটাকে বলতে পারি একই প্রজন্মের মধ্যে ক্রিয়াশীল, আর একটাকে বলতে পারি বহু প্রজন্মের মধ্যে ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ এই পুনরাবৃত্তি কখনও ভাইবোনদের নামের মধ্যে, কখনও পিতামহ-পিতা-সন্তানের ধারার মধ্যে। কুমারের বংশ পরিচয়ে দেখলাম আট প্রজন্ম ধরে পুনরাবৃত্ত

জমিদার বংশের নামের তালিকা লক্ষ্য করুন। রাঘবেন্দ্রনারায়ণ - যাদবেন্দ্রনারায়ণ নরেন্দ্রনারায়ণ - রাজেন্দ্রনারায়ণ - হরেন্দ্র নারায়ণ - মহেন্দ্রনারায়ণ - জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ সুরেন্দ্রনারায়ণ। রাঘবেন্দ্রনারায়ণ সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার লোক, আর সুরেন্দ্রনারায়ণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের। প্রায় আড়াইশ বছর ধরে নামের মধ্যে একটি গঠনের ঐক্য চলে আসছে। শুধু এই বংশের বৈশিষ্ট্য এটি নয়, সাধারণভাবে সম্য চলে বাঙালী পরিবারে নামকরণের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক—

সত্যপ্রসন্ন
।
সত্যশান্তি
।
সত্যকিশোর সত্যব্রত সত্যপ্রিয় সত্যশরণ
।
সত্যপ্রসাদ

এই পরিবারে 'সত্য' শব্দটি পুনরাবৃত্ত হচ্ছে চার প্রজন্ম ধরে। আগের উদাহরণে পুনরাবৃত্তি দেখেছি নামের দ্বিতীয় অংশে এই উদাহরণে প্রথম উপাদানটির পুনরাবৃত্তি। একটি পরিবার বা বংশের সমস্ত ব্যক্তির নামের গঠন যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দুটো ব্যাপার চোখে পড়ে। কখনও কখনও এই রকম নিরবচ্ছিন্ন পুনরাবৃত্তি চলেছে। কখনও বা মধ্যে মধ্যে আসছে একটা বিরোধী গঠন বা নতুন গঠন তারপরেই আবার সেই নতুন গঠনটাই পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি দীনবন্ধু মিত্রের বংশ-লতিকা থেকে—

পরম্পরায়। যে ঐক্যকে স্পষ্টভাবে, আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে আমরা প্রতিফলিত করতে চাই পদবী ব্যবহারে। সেই ঐক্যই প্রচ্ছন্নভাবে শুধু পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে এই পুনরাবৃত্তির সাহায্যে। এই পুনরাবৃত্তির পেছনে আছে তাই একটা ঐক্যের কামনা এবং ঐক্যের প্রচেষ্টা।

নামের আধুনিকতা সৃষ্টির যে সব লক্ষণ এখন দেখছি তার মধ্যে এই ঐক্যের জন্য যে প্রচেষ্টা তা সম্ভবত শিথিল হয়ে আসছে। ঐক্য আছে, পুনরাবৃত্তি আছে নিশ্চয়ই, তবে এখন এক প্রজন্মের মধ্যে বহু প্রজন্মের মধ্যে নামে যে ঐক্য তার প্রতি এখন বাঙালীর আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম মনে হয়। তবে তার প্রতি যে আবার আকর্ষণ জাগবে না তা বলা কঠিন। নামের জগতে বার বার প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন হতে পারে। নামের পুনরাবৃত্তি প্রসঙ্গে একটি নতুন লক্ষণের কথা বলি—একটি পরিবারে এই লক্ষণটি দেখলাম—জানি না এই লক্ষণ এখনও খুব প্রচলিত কিনা। এই লক্ষণটি হল 'জোড়-কলমী' জাতীয় নাম। পিতার নাম রমেশ, জননী বিভা, তাঁদের পুত্রের নাম পিতা-মাতার নামের প্রথম ধ্বনিগুলি দিয়ে তৈরী—রবি। এই রবির স্ত্রী সুমিতা—তাঁদের সন্তানের নাম রমিত। দুটি প্রজন্ম ধরে একটি পদ্ধতির ব্যবহার হয়েছে। যদি কয়েক প্রজন্ম ধরে এই রীতি পদ্ধতি চলতে থাকে এবং যদি এই পদ্ধতি ব্যাপকতা লাভ করে তাহলে পুনরাবৃত্তির আর একটি নতুন মাত্রার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে।

নামের আলোচনার শেষে একটি কথা বোধহয় বলা আবশ্যক। নামের অর্থ, নামের

১ কালাচাঁদ

২ কেশবচাঁদ, যাদবচাঁদ, সুখময়, অবিনাশ, নরেন্দ্র, মরনারায়ণ গন্ধর্বনারায়ণ

৩ চারু শরৎ বঙ্কিম সুশীল কিরণ ললিত জ্যোতিষ
চন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র

৪ তারক সুবোধ রিপন — বলাই রমাই জনাই তপাই গনাই
চন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র — চন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র চন্দ চন্দ্র

হচ্ছে কয়েকটি শব্দ—রংপুরের মান্থানা

কালাচাঁদের প্রথম দুটি পুত্রের নামে পূর্ব প্রজন্মের নামের একটি উপাদান (চাঁদ) পুনরাবৃত্তি হল কিন্তু তারপর তিনটি নামের গঠন স্বতন্ত্র, আবার শেষ দুটি নামে এল নতুন গঠন, নারায়ণ শব্দের পুনরাবৃত্তি। তার পরের প্রজন্মের (৩ এবং ৪) সকলের নামের সঙ্গে পুনরাবৃত্ত হল 'চন্দ্র' শব্দটি। ললিতচন্দ্রের ছেলেদের নামে আর একটি নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দিল, প্রত্যেকটি মিল শব্দ। এইভাবে পরিবারের সমস্ত নামের মধ্যে একটি প্যাটার্ন রক্ষার চেষ্টাও যেমন চলেছে, নতুন প্যাটার্ন সৃষ্টির প্রচেষ্টাও চলেছে তেমনই ভাবে। এটা একটা সচেতন প্রচেষ্টা, আকস্মিক প্যাটার্ন মাত্র নয়। এক প্রজন্মের মানুষদের নামের মধ্যে একটা ঐক্য গেঁথে তোলা হচ্ছে পুনরাবৃত্তির সাহায্যে, কখনও বা

সেই ঐক্য গেঁথে তোলা হচ্ছে বংশ ধ্বনি, নামের সঙ্গীত, নামের ব্যাকরণ এবং তার সঙ্গে জড়িত মনস্তত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব সবই মূল্যবান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নামের সমস্ত গুরুত্ব সব মহিমা, সব মাধুর্য বিশ্লেষণের অতীত। প্রাচীন মানুষ নামের মধ্যে খুঁজেছে এক জাদু শক্তি, বহু আদিম সমাজ নামকে নিরর্থক মনে করে না, মনে করে তার মধ্যে নিহিত আছে গভীর গোপন শক্তি। ধর্মের জগতেও নামের অসাধারণ মহিমা, নামোচ্চারণেরই মুক্তি। আর সাধারণ মানুষ আমরা যাই হোক না কেন নামের অর্থ বা ধ্বনি বা অনুষঙ্গ, নাম আমাদের অস্তিত্বের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভাবতে কি পারি নামহীন এক অস্তিত্ব, নামহীন জীবন। নাম আমাদের বন্ধন। নাম আমাদের অবলম্বন। নামের সেই বিচিত্র রহস্য স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

আর ঘটনাটা দেখতে দেখতে পাড়াময় রটে হয়ে গেল। দলে দলে লোক এসে ভিড় কর দাঁড়াল। পাদরীপাড়া সরগরম। শ্রাবণে বারো ফুট লম্বা একটা বাঘ ধরেছিল এই আবাদের লোকেরা। সেই বাঘ দেখবার জন্য যেমনি ছুটতে ছুটতে লোক এসেছিল, এবারও তেমনি গৌরীকে দেখবার জন্য লোক আসতে লাগল। চোখে চোখে সন্দেহ, কে রে বাবা! এই কাঁচা বয়সের একটা মেয়ে, হোক না রূপসী, কিন্তু কোথা থেকে ওকে তুলে আনল দুর্লভ। তবে কি গোপনে গোপনে অন্য কোন সম্পর্ক আছে ওর সঙ্গে।

কেউ কেউ গৌরীকে উহু আহু করল। কেউ আবার যত রাজ্যের রহস্যময় অলৌকিক ঘটনা শোনাতে বসল। যেমন একজন গল্প-লোক শুরু করল এক মউলির গল্প। সেন অঘ্রাণ মাস। মধু কুড়োবার জন্য মউলিরা মৌমাছির পিছন ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দল ছাড়া হয়ে পড়েছিল এক মউলি। ফেরার পথে হঠাৎ সে দেখে, এক পরমা-সুন্দরী কন্যা। আকুল হয়ে কাঁদছে।

—কাঁদ কেন কন্যা? মউলি শুধাল।

—কাঁদি কেন? কাঁদি দুঃখে। কন্যা বলল।

—কিসের দুঃখ?

কন্যা এবার তার আসল রূপে ধরল। সর্বাঙ্গ উদোম করে দেখাতে শুরু করল। এই দ্যাখো, দ্যাখো। যে স্বামীকে আমি পুজো করতাম গো, সেই স্বামীই আমায় বাঘের হাতে ফেলে রেখে পালিয়েছে। ওনর বাঘ কেমন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে দেখ।

দেখতে দেখতে মউলি বেচারা মূর্চ্ছা। আর কি। এ কি দেখল সে। এ কোন বনদেবী রাতদিন বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। পথ হারানো পথিককে ডেকে নিজের পেটা দেখায়।

মউলি সেবার কোন ক্রমে প্রাণে বেঁচে ফিরতে পেরেছিল।

আর একজন শুরু করল এক ব্রাহ্মণীর গল্প। এক নিচু জাতের মেয়ের প্রেমে পড়ল এক ব্রাহ্মণ। ভাললাগা, ভালবাসার কোন নিয়ম নেই, ব্রাহ্মণের দোষ কি!

কিন্তু সমাজ মানবে কেন! সমাজ ওকে একঘরে করল। আর সেই শোকে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করল ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করেছে, ব্যাপারটা ঐ খানেই মিটে যেতে পারে না। মেয়ের ঘাড়ে ব্রহ্মদৈত্য চাপল। ওঝা এল, ঝাড়ফুক হল। দৈত্য আর টলে না। টলবে কি করে, এ কি আর যে সে ব্যাপার ব্রহ্মদৈত্যের ভর।

সাত গাঁয়ের লোক বলল, প্রায়শ্চিত্ত কর। একশ এক বামুন ডেকে খাওয়া। খাইয়ে দাইয়ে দক্ষিণা দে। একশ এক বামুনের পাদোদক খা, তবে যদি কিছু হয়।

মেয়ের মস্তক মুণ্ডন করা হল। তারপর যজ্ঞের বিধি ব্যবস্থা শুরু করতে যাবে লোকে দ্যাখে, সাত যোয়ানের বল ধরেছে কন্যা। অসুরের বল। কে পেরে উঠবে ওর সঙ্গে। কে ওকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম বিধি পালন করাবে। কন্যা পাগলিনী হয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। তারপর যে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বামুন ঠাকুর আত্মহত্যা করেছিল, সেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। এরপর থেকে প্রায়ই নাকি দেখা যায় মেয়েকে নদীর জলে ভেসে উঠতে। নেয়ে মাঝিদের পথ ভুল করিয়ে দেয় সেই মেয়ে।

ফলে আজ দুর্লভ যে এই পথে কুড়ানো মেয়েকে নিয়ে এল, এই মেয়ে যে আবার ওরকম কিছু করবে না কে বলতে পারে। সন্দেহ যায় না। এতবড় মেয়েটাকে কুড়িয়ে আনা যায়, বিশ্বাসই হয় না। তাও আবার একা একা একটা ডিঙ্গি করে ভেসে এসেছিল, কে বিশ্বাস করবে। বলিহারী বেটি তুই।

কেউ কেউ দুষতে শুরু করল দুর্লভকে। কেউ আবার সাহসের প্রশংসা না করে পারল না। হ্যাঁ সাহস আছে দুর্লভের। শতকে কতজন পারে এরকম কাজ করতে বলো দেখি।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও থিতিয়ে এল। ভিড় হাল্কা হতে শুরু করল। গৌরী বিহ্বল চোখে দেখল, ওর সারা গায়ে চন্দনের প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে কেউ। ভাঙ্গা নিমের ডাল দিয়ে কে যেন বাতাস করে মাছি তাড়াচ্ছে ওর চারপাশ থেকে। মায়ের কাছে মেয়ের কোন ভয় থাকার কথা নয়। কুন্তিকে গৌরী মা ডাকল।

(আট)

চৌধুরীদের দ্বীপের আকৃতিটা অনেকটা শুয়োরের মুখের মতো। একটা ইতিহাস আছে এই দ্বীপের। উড সাহেব নামে কোন এক দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ইংরেজের হাত থেকে সুবেদার মলমল সিং এই জমিটুকু লাভ করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। নামেই কেবল জমিটুকু পেয়েছিলেন। কিন্তু এক কাণা-কড়িও আয় ছিল না জমি থেকে। ভবিষ্যতে কবে কখন জমিতে বসতি বসবে ততদিন অপেক্ষা করার ধৈর্য বোধহয় ছিল না মলমলের। নগদ প্রাপ্তির লোভে ঘটা করে লোক ডেকে দ্বীপটাকে নীলামে ডেকেছিলেন উনি। চৌধুরী রাজাদের খেয়াল. তাঁরা নীলামে কিনে নিজেদের প্রতাপ দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই থেকে এই দ্বীপ চৌধুরী রাজাদেরই সম্পত্তি। কাগজ-পত্র ঘাটলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বোঝা যায় নি চৌধুরীরা এত উপযুক্ত জমি থাকতে এই জমিটার দিকে নজর দিয়েছিলেন কেন! এ ঘটনা কয়েক পুরুষ আগের। ফলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই রহস্যে ঢাকা।

অবশ্য একথা ঠিক, চৌধুরীদের খেয়ালের অন্ত নেই। এবং চৌধুরী রাজাদের সম্পর্কে গল্পেরও শেষ নেই। শোনা যায়, নরেন্দ্রনারায়ণের প্রপিতামহ সুরেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী তার শ্বশুরের কাছ থেকে বিবাহের যৌতুক হিসেবে এই দ্বীপটাকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শোনা কথাই মাত্র। আসল সত্যটা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না আজকাল।

জমিটা যেভাবেই পাওয়া যাক, রঙের ফানুসের মতো নাগালের বাইরেই পড়েছিল দীর্ঘকাল। আর জমির চারদিকে বেড়ি টিকিয়ে রাখার খরচটা চৌধুরী রাজাদেরই জোগাতে হয়েছে। কিন্তু অবস্থা মানুষের চিরকাল এক রকম থাকে না। চৌধুরীদের অবস্থাও পড়তে শুরু করেছিল সুরেন্দ্র-নারায়ণের শেষ দিকে। হাতীশালে যার হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, শেষ পর্যন্ত তাঁকেও এই সুন্দরবনের জমিটুকু বন্ধক দিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছিল। বাতি-ঘরে বাতি আর ঘণ্টি-ঘরে ঘণ্টি বাজাবার খরচ অবধি কমিয়ে ফেলতে হয়েছিল ওঁকে। পুজো-পার্বনের জাঁক-জমকও কমিয়ে দিয়ে-ছিলেন সুরেন্দ্রনারায়ণ। শীকারে বেরুনো বন্ধ করেছিলেন। এমন কি নাচ ঘরের চেহারাও অবহেলায় ভূতে পাওয়া বাড়ির মতো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বন্ধকি জমিটা

কিছুতেই উনি উদ্ধার করে উঠতে পারেন নি। সুরেন্দ্রনারায়ণ ভগ্ন হৃদয়ে মৃত্যু-বরণ করলেন। সুরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণের আমলে জমিটুকু আবার বন্ধন মুক্ত হয়। এখন সেই ধীরেন্দ্র-নারায়ণও গত, এখন তাঁর সুযোগ্য পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণের যুগ। নরেন্দ্রনারায়ণই জমিটাকে জঙ্গল মুক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

কিন্তু সুরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর একটা রহস্যময় গল্প প্রচলিত আছে চৌধুরী মহলে। নায়েব গোমস্তাদের মুখে এখনো শোনা যায় সেই কাহিনী। সত্য মিথ্যা বিচারের বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে না কেউ।

ঘটনাটা এই রকম : সুরেন্দ্রনারায়ণ তার মৃত্যুর দিন কয়েক আগে তাঁর সমস্ত আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব ইত্যাদিদের নামে নামে নিমন্ত্রণ চিঠি পাঠান। চিঠিতে লেখা হয়েছিল এই রকম, আগামী অমুক দিবসে কুলাঙ্গার সুরেন্দ্রনারায়ণ আপন বাসভবনে দেহরক্ষা করিতে চায়। এই উপলক্ষে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ ভিন্ন অন্য কোন গত্যন্তর নাই। অপরাধ মার্জনীয়। ইতি—ভবদীয়—সুরেন্দ্রনারায়ণ।

রানীমা এই অশুভ আমন্ত্রণের বিন্দু-বিসর্গ জানতেন না। যখন জানলেন তখন ব্যাপারটা অনেক দূরে গড়িয়ে গেছে। সুরেন্দ্রনারায়ণ কি পাগল হয়ে গেলেন। পাগল না হলে এমন চিঠি কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক লিখতে পারে।

যাই হোক চিঠি যাঁরা পান, তাঁরা বিচলিত হয়ে সুরেন্দ্রনারায়ণকে দেখতে আসেন। কিন্তু অন্দর মহলে পা দেওয়া দূরের কথা, বড় সড়কের মোড় পর্যন্তই কেউ কেউ এগোতে পারলেন না। রানীমার আদেশে আগে থেকেই লোকজন মোতায়েন করা ছিল ওখানে। তারাই অভ্যাগতদের ফিরিয়ে দেয়।

রানীমা একাই সুরেন্দ্রনারায়ণকে ঘিরে রাত্রি-দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, যে দিনটিতে সুরেন্দ্রনারায়ণ ইচ্ছামৃত্যু কামনা করেছিলেন, সেই দিনটিতেই কান্নার রোল উঠল চৌধুরী বাড়ির অন্দর মহলে। সুরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর মৃত্যুর সময়ে একজন নিমন্ত্রিতকেও নাকি কাছে পান নি।

যাইহোক, সুরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর ধীরেন্দ্রনারায়ণের আমলে আবার ধীরে ধীরে অশুভ গ্রহ কেটে যেতে শুরু করে। ধীরেন্দ্রনারায়ণ পিতার বন্ধকি জমিটুকু আবার নিজের প্রচেষ্টায় উদ্ধার করলেন। পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনারায়ণ জমিটুকুর সংগতির জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

ততদিনে আবার বাতি-ঘরে নতুন করে তেজ গোড়া শুরু হয়েছে। হাতীশালে হাতী আনা হল আসাম থেকে। ঘোড়াশালে মধ্যপ্রদেশের ঘোড়া। দারোয়ান, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা, খানসামা, সকলের গায়ে আবার নতুন চোগা চাপকান উঠল। বাধুনি চাখুনি, ধুনুনি, মুছুনি সকলেরই মুখে হাসি ফুটল। আইন হয়ে গেল, বছরে দু জোড়া করে পোশাক পাবে চৌধুরী বাড়ির কর্মচারীরা। একবার পুজোয়, একবার দোল যাত্রায়। রাতারাতিই বলা চলে নরেন্দ্রনারায়ণ নিজের দক্ষতায় চৌধুরী বাড়ির আগের পরিবেশ ফিরিয়ে আনলেন।

কিন্তু নরেন্দ্রনারায়ণ বিষয়ী পুরুষ যে সন্দেহ নেই। প্রথমেই তিনি নজর দিলেন দ্বীপের দিকে। আবাদ করে জন-বসতি বসাবার নেশায় পড়লেন। লোক লস্কর সংগ্রহ করলেন। দয়াল ঘোষকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন সুন্দরবনের।

পরের ইতিহাস অজানা নয় : মাস-খানেক পেরতে না পেরতেই দয়াল ঘোষ পালিয়ে এলেন দলবল নিয়ে। সঙ্গে এক গাদা রোগী।

—কি ব্যাপার ? কি হয়েছে তোমাদের ?

দয়াল ঘোষ যা বললেন, রজনী বলল তার হাজার গুণ। রজনী বোঝাল সব কাজেরই একটা রীতি আছে ছোটকর্তা। আমরা জঙ্গল কাটার কাজ শুরু করেছি কিন্তু বনবিবির পুজো করি নি। বন-বিবিকে তুষ্ট না করে এ-সব কাজ কোনদিনও হবার নয়।

দয়াল ঘোষ বললেন, কোত্থেকে একটা ছোট জেলে ডিঙি ভেসে এসেছিল। ডিঙিতে একজন মেয়ে বসন্ত আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাচ্ছিল। আমাদের দোষ আমরা কেন তাকে আশ্রয় দিয়েছি।

—রোগটা তা হলে ওখান থেকেই ছড়িয়েছে ?

—হ্যাঁ হুজুর ওখান থেকেই। রজনী উত্তেজিত গলায় বলল, আমরা তো ডিঙিটাকে দেখা সঙ্গে সঙ্গেই ভাসিয়ে দিতে বলেছিলাম আসলে কি জানেন ছোটকর্তা মানুষের রূপ ধরে এক অপদেবী এসেছিল। তার যেটুকু কাজ করার ছিল, সেটুকু করে দিয়ে সে চলে গেছে।

দয়াল ঘোষ স্বাভাবিক গলায় বললেন, আপনি ঐ মেয়েটার চেহারা দেখেন নি। দেখলে আপনিও ওকে তাড়িয়ে দিতে পারতেন না। যার মধ্যে মানুষের রক্ত আছে, সে কখনো এমন সাংঘাতিক কাজ করতে পারে না।

—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, বসন্ত রোগ এত ছোঁয়াচে সত্ত্বেও ওর সঙ্গে এত মাখামাখি করার কি দরকার ছিল ? ওখানে আমরা কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলি নি।

—কোন রকম মাখামাখি তো হয়নি। দয়াল ঘোষ বিরক্তি মিশিয়ে জবাব দিলেন।

—আপনিই নৌকোটাকে ভাসিয়ে দিতে দেন নি। রজনী সরাসরি অভিযোগ জানাল।

—আমার একার ক্ষমতা ছিল না নৌকোটাকে ধরে রাখার। তোরা ভাসিয়ে দিতে গিয়েছিলি, দিলি না কেন ?

—সেটা আমরা ঈশানের জন্য পারি নি।

—ঈশান কে ? নরেন্দ্রনারায়ণ শুধোলেন।

—ঐ ঈশানেরই প্রথম দয়া হয়। ওর থেকে আর সবাই। বিশু মিশ্র তার ...াই দিল।

...কবুলও রজনীর হয়ে অভিযোগ ..., আমরা নৌকোটাকে জোর করে ...য়ে দিতে পারতাম হুজুর কিন্তু ...বাবুর ইচ্ছে নয় বলে আমরা বেশি এগোতে পারি নি।

দয়াল ঘোষ হাসলেন, অবজ্ঞার হাসি, ... যা ভাল বুঝেছি, করেছি। আমি ...র মতো ভয়ে পালিয়ে আসতে চাই ...শেষ দেখাই দেখে আসতে চেয়েছিলাম।

—আমরাও প্রথমে পালিয়ে আসতে ...ন দয়ালবাবু, দলের লোক কমে ...ল বলেই বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে।

—দলের লোক প্রতিদিনই কিছু কিছু কমে যাচ্ছিল হুজুর, আর কদিন ...ন পড়ে থাকলে আমরা চার পাঁচজন ... আর কেউ থাকত না।

—লোক পালাচ্ছিল কেন? কে কে ...য়েছে তার হিসেব আছে?

...য়াল ঘোষ বললেন, হিসেব রাখার মতো ...খা ছিল না।

লোকগুলো মরল কি বাঁচল সে ...ব থাকবে না! আশ্চর্য!

দয়াল ঘোষ জবাব খুঁজে পেলেন না। ...ত দোষটাই যে ও'র ঘাড়ে চাপবে উনি বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু রজনী এখানে দেওয়ার পর থেকেই দয়াল ঘোষ ...র্কে একটু বেশি মাত্রাতেই চুগলি ...তে চাইছে ছোটকর্তাকে। কি মতলব ... কি চায় রজনী!

দয়াল ঘোষ বললেন, ব্যাপারটা যত-... না ঘটেছে, তার চেয়ে বেশি করে ...ছিল ওরাই। ভবিষ্যতে আর এরকম ...তজ্ঞানহীন লোক নিয়ে আমার দ্বারা ... হবে না।

—দায়িত্বজ্ঞানহীন আপনিই ছিলেন ...বাবু। মুখের ওপর জবাব দিল রজনী। ...াদের কথা যদি শুনতেন, বিশু মিশ্রকে ...াদের কবর দিতে হত না। একটা লোকের ...নের যে কি দাম, তা আপনি বুঝবেন ...

—কি বলতে চাস শুনি? আমার ...তজ্ঞান নেই! যা মুখে আসবে তাই ... যাবি। ভেবেছিস কি তোরা?

—আহ! এখন আর মাথা গরমের ... নয়। ছোটকর্তা ওদের থামিয়ে দিলেন। হয়েছে, হয়েছে। এখন কি কি করা যায়, ...ই ভাবো। নতুন করে ভাবুন দয়ালবাবু।

—আমার আর ভাবাভাবি নেই ছোট-...র্তা। আপনাদের বিষয়-সম্পত্তি আপ-...নাই ভাবুন।

পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হয়ে ...ল। নরেন্দ্রনারায়ণ বুঝলেন, অন্তর্কলহ ...কলে আবাদের কাজ একচুলও এগোবে না। ...থচ রজনী আর দয়াল ঘোষ দুজনকেই ওর ...মান প্রয়োজন। রজনী আর যাই হোক ...দো মানুষগুলোকে ঠিক চেনে। আবার দয়াল ঘোষ না থাকলে নথিপত্রই বা কে রাখবে!

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, ঠিক আছে, আমি আলাদাভাবে সকলের কথাই শুনব। এখন সবাই বিশ্রাম করে মাথা ঠাণ্ডা কর দেখি।

নরেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী ঊর্মিবালা এক ফাঁকে দয়াল ঘোষকে ডেকে পাঠালেন, কি সব কথা শুনতে পাচ্ছি নায়েবমশাই?

—কি শুনতে পাচ্ছেন বৌঠান?

—কে একটা মেয়েমানুষ নাকি একা একা ভাসতে ভাসতে এসেছিল?

—হ্যাঁ, এসেছিল।

—ওমা, একা! কি হয়েছিল বলুন না নায়েবমশাই?

দয়াল ঘোষ দাঁড়িয়েই ছিলেন, এখানে এই অন্দর মহলে উনি এর আগেও কয়েকবার এসেছেন, কিন্তু আজ আড়ষ্ট ভাবটা ওর কাটবার নয়। বললেন, কি আর বলব বৌঠান, হতভাগী মেয়েটাকে আমরা ভোরবেলা নদীর ঘাটে আবিষ্কার করলাম। সারা গায়ে মায়ের দয়া। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল মেয়েটা।

—ওমা, আর কেউ ছিল না ওর? কেউ বুঝি অসুখ বিসুখ দেখে ভাসিয়ে দিয়েছিল ওকে?

—হয়তো তাই দিয়েছিল বৌঠান। তবে মেয়েটার মুখ থেকে কিছু শুনবার আর সুযোগ পেলাম কোথায়। তার আগেই তো আমাদের যা অবস্থা।

—মেয়েটাকে আপনারা কি করলেন? নদীর ঘাটে ফেলে রেখেই চলে এলেন?

দয়াল ঘোষ কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাকিয়ে থাকলেন।

—বলুন না নায়েবমশাই, কি হল মেয়েটার?

—কি আবার হবে বৌঠান। আমরা জঙ্গল নিয়ে ব্যস্ত, তার উপর আমাদের দু'-চারজনের মধ্যে যখন রোগটা ছড়িয়ে পড়ল, তখন কে কোথায় গেল নজর দেওয়ার অবস্থা ছিল না আমাদের।

—ওমা, অতগুলো লোক আপনারা, মেয়েটার কি হল খবর রাখলেন না। বয়স কি রকম ছিল মেয়েটার?

—কচি বয়স বৌঠান। কত আর হবে তের-চোদ্দ।

—ওর বর ছিল না?

—সংসারে ওর কে আছে, কে নেই কিছুই বলতে পারব না বৌঠান। তাছাড়া ওর বিয়ে-থা হয়েছিল, না ও কুমারী তাও বলতে পারব না।

—ওমা অত বড় মেয়ে কুমারী! কপালে সিঁদুর ছিল না? সিঁদুর দেখেননি আপনারা?

দয়াল ঘোষ মনে করতে পারলেন না, কপালে সিঁদুর ছিল কি ছিল না। বললেন, যতদূর মনে হচ্ছে ছিল না বৌঠান। তাছাড়া আমি একবার মাত্র এক-পলক ওকে দেখেছি।

ঊর্মিবালার কৌতুক তবু দমবার নয়। বললেন, তবে কে দেখাশোনা করত ওকে?

—কেউ দেখাশোনা করেনি বৌঠান। হয়তো একটু-আধটু পথ্যি পড়লে মেয়েটা বেঁচে যেত।

—তবে যে শুনলাম, ঈশান, না কি নাম যেন, কে একজনকে ওর দেখাশোনা করার জন্য আপনি নৌকোয় রেখেছিলেন।

দয়াল ঘোষ বুঝলেন, চৌধুরীদের অন্দর মহল অবধি ওর সম্পর্কে উল্টো সুর গেয়ে গেছে কেউ। শুধোলেন, কে বলেছে বৌঠান?

—যেই বলুক না কেন, রেখেছিলেন কিনা বলুন না?

—না, কাউকে আমি ঐ রুগীর পাশে বসে থাকতে বলিনি। তবে ঈশান নিজের ঝুঁকি নিজেই নিয়ে গিয়েছিল। ঈশান ছিল ওর নৌকোয়।

—ওমা, জানাশোনা নেই, হঠাৎ ওরকম একটা নৌকোয় রাত কাটাতে গেল। আপনি বারণ করেননি ওকে?

—না, করিনি। ঈশান যা ভাল বুঝেছে করেছে।

—তবে যে শুনলাম, মেয়েটা আসলে ছদ্মবেশী, অপদেবী।

—যার কাছে শুনেছেন, তার কাছেই তো সবকিছু জিজ্ঞেস করে নিতে পারতেন। আমাকে কেন বৌঠান?

—আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন নায়েবমশাই। আসলে মেয়েটার সম্পর্কে

খুব জানতে ইচ্ছে করছে, তাই। বলুন না, সত্যি সত্যি মেয়েটা কে ?

দয়াল ঘোষ হাসলেন, মেয়েটা মেয়েই। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি ও-কথাই বলব। মানুষের মতোই হাত-পা-মাথা, একমাথা চুল, চোখ নাক কান, মানুষের যা যা থাকে সবই আছে। তবে আর বেশি কিছু যদি জানতে চান, তাহলে ঈশানকে ডাকুন, ওই হয়তো আপনাকে নতুন কিছু শোনাতে পারবে।

দয়াল ঘোষ আর অপেক্ষা করলেন না। খানিকটা বিরক্তি আর আক্ষেপ মেশান ভঙ্গি নিয়েই বেরিয়ে এলেন।

ওদিকে রজনী ছোটকর্তাকে তুষ্ট রাখতেই ব্যস্ত। সরাসরি প্রস্তাব রাখল ছোটকর্তার কাছে, হুজুরে, মাত্র তিনটে মাস আমাকে সময় দিন, দেখুন, জঙ্গল আমি পরিষ্কার করে দিতে পারি কিনা।

নরেন্দ্রনারায়ণ বুঝতে পারছিলেন না, রজনী এত জোর গলায় কথা বলছে কি করে ? শুধোলেন, তিন মাস, তিন মাসে আবাদ করে দেবে ?

—হ্যাঁ হুজুর। কাজের কাজ হলে ওর বেশি সময় লাগার কথা নয়।

—তার মানে, এতদিন কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলছ ?

—কিছুই হয়নি হুজুর। সারাটা দিনের মধ্যে দু-তিন ঘণ্টার বেশি কোন-দিনই কাজ হত না হুজুর।

—দু-তিন ঘণ্টা! সেকি! বাকি সময় কি করত সব ?

—নাচ-গান করত হুজুরে। নাচ-গান আর মদ-গাঁজার ছড়াছড়ি। দিনে যদি আট-দশ ঘণ্টা কাজ না হয়, কোনকালেই ফল পাওয়া যাবে না। ফলে কি হত জানেন, একদিক থেকে জঙ্গল সাফা হত, আর একদিকে আবার তা গজিয়েও উঠত।

নরেন্দ্রনারায়ণ বুঝবার চেষ্টা করছিলেন রজনীকে।

—আপনি আমাকে একবার দায়িত্ব দিয়ে দেখুন হুজুরে। তিন মাস পরে যদি আপনাকে আমি বাদায় নিয়ে বসিয়ে দিতে না পারি, আমার নামে কুকুর পুষবেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ নীরব আছেন দেখে রজনী আবার শুরু করল, আসলে কি জানেন হুজুরে, নরম মানুষের কাজ নয় এটা। উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হলে চাবুক হাতে নামতে হবে। অবশ্য দয়ালবাবুর কোন দোষ দেই না আমরা, মানুষ হিসেবে ও'র জুড়ি পাওয়া ভার।

—তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না রজনী।

রজনী হাসল, আসলে একজন শক্ত মানুষের দরকার ঐ জঙ্গলে। দয়ালবাবু হচ্ছেন মাটির মানুষ। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলে আর সইতে পারেন না। নইলে এভাবে আমরা পালিয়ে আসব কেন বলুন।

—তোরা দয়ালবাবুকে চাইছিস না ?

—না হুজুরে, সে-কথা বলছি না। আমাদের কোন জোর নেই কারো উপরে। আসলে আপনি আমাদের পাঠিয়েছেন বাদা তৈরির কাজে, তা বাদাই যদি তৈরি না হল, তাহলে কি লাভ বলুন। মাসের পর মাস আমরা আপনার

পর মাস আমরা আপনার অন্ন ধ্বংস করে যাব এটা কি উচিত ?

নরেন্দ্রনারায়ণ বিজয়ী চোখে হাসলেন, ঠিক আছে, কি করা যায় আমি ভেবে দেখি।

রজনী ছাড়বার পাত্র নয়, বলল, আসলে সবার মনে খানিকটা আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে হুজুরে। একবার যারা ঘা খেয়ে চলে এসেছে তাদের আপনি চট করে ওখানে আবার পাঠাতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

—যাবে না বলছ ?

—যাবে হয়ত, তবে কয়েকটা কাজ করতে হবে তার আগে।

—কি করতে হবে শুনি ?

রজনী বলল, লোকগুলোকে বোঝাতে হবে বনদেবীকে সন্তুষ্ট করেই তবে এবার কাজে হাত দেওয়া হবে।

—সেটা কি ভাবে ?

—বনদেবীর পুজো দিতে হবে ধুম-ধাম করে। বনদেবীর পাকাপাকি একটা থান বানাতে হবে। দু-চার পয়সা হয়তো খরচ হবে কিন্তু দেখবেন তাতে মনে বল ফিরে পাবে সবাই।

—তা আর এমন কি কঠিন কাজ।

—কিছু কঠিন কাজ না হুজুরে তবে এটুকু কাজই আমরা দয়ালবাবুর ক থেকে আদায় করে নিতে পারিনি।

—দয়ালবাবু চিঠিতে এই পুজোর ক আমাকে লিখেছিলেন। কিন্তু কিছু এক ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই তো তোরা চ এলি।

—অনেক আগেই দয়ালবাবু এ করতে পারতেন। যাক গে, পুজো কি আমরা খুব ঘটা করে করব হুজুরে। পুজো দিনে আশপাশের নতুন আবাদের লোক জন ডেকে ঘটা করে সবাইকে জানিয়ে দে চৌধুরী রাজাদের আবাদ পত্তনীর কা শুরু হয়েছে আবার। লোককে লো দেখাতে হবে হুজুরে। নতুন আবাদ থে কেউ যদি আমাদের আবাদে কাজ ক চায়, তাকে সুযোগ সুবিধে দিতে হবে।

—বেশ দেওয়া যাবে।

—কারো যদি অসুখ বিসুখ হ হুজুরে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কলকা আনিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নেব আম লোকে বুঝবে, চৌধুরী রাজারা মানু জন্য ভাবে। কাঠুরেদের জঙ্গলে পা তাদের ভাল-মন্দ চৌধুরী রাজারা ভা বান না।

—তবু ভালো, বলিস নি যে স একজন পাশ করা ডাক্তার দিতে হবে।

রজনী বলল, আর একটা কাজ ক খুব ভালো হয় হুজুরে, খানকয়েক গ যদি সঙ্গে নেওয়া যায় খুব ভালো হ বাদায় গোবরের বড় অভাব।

—গোবর দিয়ে কি হবে ?

—লোনামাটিতে ঘরের যা অবস্থা তা আর বলার নয়। গোবর পেলে গো দিয়ে নিকিয়ে নেওয়া যায়। আর তাছা গরুর দুধও পাওয়া যায়। আর সবচে বড় কথা, গরু লক্ষ্মী। বাদার শ্রী বাড়ে

—বেশ গরুও না হয় হল। আর লাগবে ?

রজনী বলল, আপনি যদি অনু দেন, তাহলে সব কিছুর একটা লিস্টি দিতে পারি হুজুরে।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, ঠিক অ আমি ভেবে দেখি। দয়ালবাবুর স এসব নিয়ে একবার কথা বলতে হবে। হোক দয়ালবাবু নায়েব, একথা ভু চলবে না।

রজনী কিছুটা যেন হতাশ বোধ কর কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে কেন। র বলল, তবে তাই দেখুন হুজুরে। প্রয়ে হলে আমাকে ডাকবেন।

(চলবে)

(৫৫)

বেলুড় মঠ। হাওড়া জিলা।
বাংলাদেশ। ৮ই অকটোবর। ১৯০১

প্রিয় ক্রিস্টিনা,--

তোমার ৯ই সেপ্টেম্বরের চিঠি কাল পেলুম। তোমার রেন লেক-এ যাওয়া সার্থক হয়েছে জেনে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এইরকম আরও কয়েকটি হলে (তোমার চিঠিতে যা বলেছিলাম) তোমাকে আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল হতে বাধ্য করবে। উঃ! সবকটি শ্বাস টানছে, গলে যাচ্ছে, ধুঁকছে—এই অবস্থা।

একটি পাকা ফলের মত সহজবস্তু সংসারে নেই। জাপান যাবার বাসনা ত্যাগ করলুম। প্রথমতঃ এখনও পুরোপুরি কাজ করছি না। দ্বিতীয়তঃ একা-একা লম্বা সমুদ্র যাত্রা (এক মাস ধরে) করতে চাই না। তৃতীয়তঃ ওদের কী আর বলতে পারি তাই ভাবছি! এ বছর গরমটা খুবই বেশী এবং এখনও তার জের চলছে অস্বাভাবিকরকম। এখন আমি একটা নিগ্রোর চেয়েও কালো।

ক্যালিফোর্নিয়ায় কাজ বেশ সফলতার সংগে এগুচ্ছে। ওরা আরও ২।১ জন লোক চায় কাজের জন্য। যদি পারতুম তো নিশ্চয় পাঠাতুম। কিন্তু আপাততঃ ফালতু লোক কেউ নেই। বেচারা তুরীয়ানন্দ ম্যালেরিয়াতে ভুগছে এবং এমনিতেই ওর ওপরে কাজের চাপ খুব বেশী।

তুমি কী জানো আমার জ্ঞানযোগের কোন বই ওরা প্রকাশ করেছে কি না? কর্মযোগের দ্বিতীয় সংস্করণের একটা কপি কেবলমাত্র পেয়েছি।

আমি উপস্থিত জীবনে বুদবুদের মত ওঠানামা করছি। আজকে নেমে আছি। তাই চিঠিটা এখানেই শেষ করছি।

সতত ভালবাসা ও আশীর্বাদ সহ
তোমাদের বিবেকানন্দ

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ উপেক্ষিত ক্রিস্টিন

(৫৬)

১৪ই অকটোবর। ১৯০১
বেলুড় মঠ। হাওড়া জিলা। বাংলাদেশ

স্নেহের ক্রিস্টিনা,—

একমাত্র মিসেস বুলের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। কিন্তু তোমার কাছ থেকে একটিও নয়। অথচ আশা করেছিলাম এই ডাকে চিঠি পাবো।

মিসেস বুল জানাচ্ছেন 'আমি ক্রিস্টিনকে সম্প্রতি একটি চিঠি লিখেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম যদি প্রাচ্যদেশে যাবার সুযোগ আসে তাহলে ও ধাধাময় হয়ে যেতে পারে কি না। ওর উত্তরটি আমি আপনাকে পাঠালাম।'

মিসেস বুলকে লেখা তোমার চিঠিখানি বার-কয়েক পড়লুম। ওফ্! কী সাংঘাতিক! তুমি এতদিন ধরে আমার কাছে সত্য গোপন করে এমনভাবে চিঠি লিখে গেছ যেন কত আনন্দে, সুখে আছ!!

তুমি একটি অত্যুৎকৃষ্ট নির্বোধ যদি মিসেস বুলের অফার গ্রহণ না করে সুযোগটি হারাও। তোমাকে মাত্র বছরখানেকের ছুটি নিতে হবে ব্যস্। বাকী সমস্ত দায়িত্ব—এমন কী যাদের তুমি ডেট্রয়েটে ছেড়ে আসবে তাদেরও,—মিসেস বুল ব্যবস্থা করবেন!

তুমি বড় ভাল। মানুষের পক্ষে এতটা ভাল হওয়া কী করে সম্ভব। এত শান্ত তুমি! কিন্তু নিজেকে অযথা দুঃখী করার

কোন মানে হয় না। যদি আসবার সুযোগ মায়ের ইচ্ছেয় ঘটে—এবং আসবেই। আমি জানি।

আমার স্বাস্থ্যের কথা তোমাকে জানাবো না—তোমার এইসব লুকোচুরির কান্ডের পর। যদিও আমার ভালর জন্যই করেছিলে। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যথার্থ খবর জানবার তোমার কোন অধিকার নেই। কিন্তু একটি বিষয়ে অন্যদের মত তোমার আমার ওপরে চিরন্তনী অধিকার আছে—সে হল আমার তোমার জন্য চিরন্তনী ভালবাসা ও আশীর্বাদ

বিবেকানন্দ

(৫৭)

বেলুড়মঠ। হাওড়া। বাংলাদেশ।
ভারতবর্ষ। ১২ই নভেম্বর। ১৯০১

প্রিয় ক্রিস্টিন,

আজ সকালের ডাকে ডেট্রয়েট থেকে আমার কাছে একটি ফোটো এসেছে। প্রেরকের তৎপরতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগেকারটি প্রোফাইল ছিল, এটা সামনের থেকে।...যাই হোক পুরোনোটিতে আমি বেশী অভ্যস্ত এবং আমি আমার পুরোনো বন্ধুদের অবজ্ঞা করি না। তাই বলব দুটি-ই ভাল। একটি অপরটির ওপর ক্রমপরিবর্তন এনেছে—এবং ভালর দিকে। একছত্র চিঠিও আশা করেছিলুম, কিন্তু পাইনি। হয়ত আগামীকাল পাবো। আমাদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে 'একটা নদী, ৮০ মাইলের সমান।' কলকাতা ও আমাদের মঠের মাঝখানে একটি নদীর ব্যবধান মাত্র কিন্তু চিঠি আসে কত ঘুরে। মাঝে মাঝে কদিন লেগে যায় চিঠি আসতে।

মিসেস বুল ও নিবেদিতা নিশ্চয় এতদিনে যুক্তরাষ্ট্রের পথে পাড়ি দিয়েছেন। নিবেদিতা ডেট্রয়েটে তোমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবে: মিসেস বুলের তোমাকে তাঁদের ভারতে আসবার দলের মধ্যে (জাপান হয়ে) রাজী করাবার জন্য খুবই আগ্রহ। যদি মাস কয়েকের ছুটি নিতে পারো তবে অবশ্যই এসো। 'মা' সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন আমাকে সেজন্য কোন কষ্ট করতে হবে না। মিসেস সেভিয়ার এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছেন,—এবং মনে হচ্ছে একাই।

এ বছর আমাদের মঠে সুন্দর পুজো হল! আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুজো হল মায়ের পুজো। এটি চারদিন চাররাত্রি হয়। আমরা মায়ের একটি মাটির মূর্তি এনেছিলুম (কিনেছিলুম?) দশটি হাত, এক পা সিংহের ওপরে অন্য পা-টি অসুরের ওপরে। মায়ের দুই কন্যা, একটি সম্পদের দেবী, অন্যটি বিদ্যা ও সঙ্গীতের। এঁরা মায়ের দুপাশে পদ্মফুলের ওপরে দাঁড়িয়ে। এঁদের মধ্যে মায়ের দুই পুত্র—একজন যুদ্ধবিদ্যার দেবতা অপরটি জ্ঞানের। হাজার হাজার লোক পুজোতে আপ্যায়িত হয়েছে কিন্তু আমি পুজো দেখতে পাইনি। হায়! কদিন অত্যন্ত জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলাম।

গত পরশু কালীপুজো হল। আমরা একটি কালীমূর্তি এনেছিলুম, ছাগবলি দিয়েছিলুম এবং খুব আতসবাজি জ্বালিয়েছি। এইদিন প্রতি হিন্দুর বাড়ী আলো দিয়ে সাজানো হয়, ছেলেরা বাজি পটকা নিয়ে মাতামাতি করে এবং হাসপাতালে 'পুড়ে' যাবার 'কেস'ও যথেষ্ট যায়।

আমাদের এখানে বাজি-পটকা কমই জ্বালাই এবং পুজো এবং মন্ডপটি ফুল দিয়ে সাজানো, গান, ভোগ ইত্যাদি বেশী হয়। এটি কেবল এক রাত্রির পুজো।

দিন কয়েকের মধ্যে আমি কলকাতা তথা বাংলাদেশের বাইরে যাচ্ছি। বৃষ্টির পরেই এদেশে বড় বেশী ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। এখন আবহাওয়া বেশ মনোরম ও হিমালয়ের উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু হয়েছে। আমরা আমাদের বাগানে বেড়া-জাল লাগিয়েছি আমাদেরই গরু, ছাগল ও ভেড়াদের উৎপাত থেকে তরকারীর বাগানকে বাঁচাবার জন্য।

আমার দুটি পাতিহাঁস এবারে ডিমে তা দিতে বসেছে। এই তাদের প্রথম ডিম। পুরুষ হাঁসগুলো ওদের মোটেও সাহায্য করছে না। আমি যতদূর পারি ওদের ভাল খাবার খাইয়ে সবল রাখতে চেষ্টা করছি। আমরা মুরগী রাখতে পারি না। ওটি আমাদের ——

ভালবাসা সহ বিবেকানন্দ

"His first overwhelming desire was to show us the path to Mukti (freedom),—to set us free. His second object was to train this group to carry on the work in America."

শিষ্যের শিক্ষা

তিনি ব্যক্তিবিশেষে শিক্ষার তারতম্য করতেন। যতক্ষণ না কারো মধ্যে শিষ্যত্ব গ্রহণের ইচ্ছে জাগছে এবং সেকথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছেন,—এবং যতক্ষণ না উনি (স্বামীজী) নিজে ঠিক বুঝতেন যে উক্ত ব্যক্তি সত্যই এবিষয় আগ্রহী, ততক্ষণ সেসব লোকের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে একেবারে নিস্পৃহ থাকতেন। কারুকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন এবং সেই স্বাধীনতার মধ্যেই তারা ফাঁদে ধরা পড়ত। এইরকম কোন লোক যাকে আমরা চিনতাম না, তার কথা বলতে হলে বলতেন, "উনি শিষ্য নন, উনি একজন বন্ধু।" শিষ্য ও বন্ধুত্বের মধ্যে সম্পর্কের পার্থক্য ছিল। বন্ধুর মধ্যে হয়ত অনেক প্রত্যক্ষ দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে, হয়ত তার দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ, হয়ত সাধারণ, প্রচলিত ধারার,—সে বিষয় উনি মাথা ঘামাতেন না। মনে হত ওঁর একটা সামান্য মন্তব্য যদি তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে স্পর্শ করে, তবে সেটা হবে ওঁর পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু যদি তারা তাঁকে গুরুরূপে বরণ করে তবে ওঁর ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। উনি মনে করতেন এদের দায়িত্ব ওঁর। ইচ্ছে করে তাদের সংস্কার, জীবনদর্শন সমস্তকে আক্রমণ করে করে তার আমূল পরিবর্তন সাধন করতেন।

এমনকি ব্যক্তিগত জীবনও। তুমি কি তোমার অপরিণত মনের উৎসাহে জগৎকে সুন্দর দেখতে পাচ্ছ? ভেবেছ যা ভাল তাই সত্য এবং যা খারাপ তা মিথ্যের উৎস। তোমার মনের এই ভুল ধারণা ভাঙতে উনি দেরি করতেন না। ভাল যদি সত্য হয়, তবে মন্দও সত্য। দুটি হল একের বিভিন্নরূপ। ভালমন্দ দুই-ই মায়া! বালুর গাদায় মাথা লুকিয়ে বোলো না সবই ভাল জগতে মন্দ কিছু নেই': সুন্দরের যেমন উপাসনা করো, তেমনি ভয়ংকরেরও করো। এইভাবে ভালমন্দের পারে উত্তীর্ণ হয়ে যাও। তারপর বল—'ব্রহ্মাস্মি।' —ঈশ্বরই একমাত্র সত্য!'

যখন আমাদের জীবনে কোন বিপদ আসে সর্বনাশারূপে, তখন বলতে পারি কি 'জগৎটা কি সুন্দর?' পৃথিবীতে কত লোক সর্বনাশের বলি হচ্ছে না? সংসারটা কি দুঃখপূর্ণ নয়? হাজার হাজার জীবনের কত বিয়োগান্ত ইতিহাস ঘটছে না? রোগ, জরা, মৃত্যু কি ধ্বংসাত্মক কাজ করছে না? এইসব দেখেও যদি কেউ হাল্কা মনে বলে সংসারটা কি সুন্দর, তাহলে বলব, হয় সে অজ্ঞ, নয় আত্মকেন্দ্রিক, অন্যের দুঃখে নির্বিকার।

এইরকমই প্রচন্ড কঠিন ছিল তাঁর শিক্ষাধারা। কিন্তু কিছুদিন বাদেই যেন খানিকটা আভাষ পেলাম জন্মমৃত্যুর পারে অবিনাশী অমরত্বের: স্থির সত্যের; দুঃখকষ্টের পারে সেই 'আনন্দ' যা মানুষের যথার্থ স্বরূপ!

দৃষ্টির অগোচরে যে জীবন তা অপরিবর্তনীয়। মানবাত্মা সেখানে নিজ মহিমায় শান্তস্বরূপ! এই ভাবধারা যখন আমাদের চেতনায় প্রবেশ করল, তখন আমরা দেখলাম এক নতুন স্বর্গ নতুন মর্তকে!

"যে একবার আত্মাকে জেনেছে তার কাছে দুঃখই বা কি,

ই বা কি—সে যে পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছে।" র তিনি বলতেন,

sincere, be true, be singleminded".

কথাগুলি বলে বলে আমাদের মধ্যে নিজেদের এইভাবে া করবার আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন। এটা সম্ভব হল তাঁর নিজের মধ্যে এই গুণগুলি ছিল বলে।

'এই সংসারটা অতি পঙ্কিল।' কথাটা শুনে রীতিমত াত, প্রতিবাদ ও সন্দেহের সঙ্গে হজম করে নিয়েম। বহুদিন পরে এক রবিবারের উজ্জ্বল সকালে ার রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে চোখে গোটা কয়েক মোষ মনের আনন্দে কাদাভরা জলে াড়ি খাচ্ছে। দেখে প্রথম অত্যন্ত বিশ্রী লাগল। মনে হল দের উচিত এই কাদাজলের চেয়ে কোন সুন্দর বিষয় থেকে ন্দ পাওয়া কিন্তু না। এতে ওরা শারীরিক অর্থাৎ স্থূল সুখ হল। হঠাৎ মনের মধ্যে পুরোনো স্মৃতি জেগে উঠল—"এই রটা অতি পঙ্কিল!" হ্যাঁ, আমরাও সংসারের পঙ্কিল জলে গড়ি খেয়ে স্থূলে আনন্দ পেয়ে থাকি! —অথচ সংসারে আমাদের শ্য হওয়া উচিত আরও মহৎ ও শ্রেয় কিছুর জন্য। কারণ আমরা ম অমৃতের সন্তান!

উনি আমাদের কোন সমস্যার সমাধান নিজে করে দিতে তেন না! কি করণীয় তা বলে দিতেন তারপর তার যথাযথ গের দায়িত্ব আমাদের! মেরুদণ্ডহীন, পরনির্ভরশীল মানুষের ন মূল্য ছিল না তাঁর কাছে। কোন সহানুভূতি পাবে না তেমন ! বজ্র নিনাদে বলে উঠতেন, "নিজের পায়ে দাঁড়াও তোমার র মধ্যেই সে ক্ষমতা আছে!" তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সহজ না করে দিয়ে আমাদের ভেতরের শক্তিকে আরও দৃঢ় করে া! "শক্তি! শক্তি! আমি চাই কেবল শক্তি! সেইজন্যই বারবার নিষদের কথা বলি।"

পুরুষের কাছে উনি চাইতেন পৌরুষ আর মেয়েদের কাছে ই সম্পূরক ক্ষমতা যার বুঝি তুলনারহিত। মোটকথা বিশ্বাসহীনতা বা আত্মঅবমাননা হল সব দুর্বলতার সেরা শত্রু। ধরনের কথা আমাদের 'Tonic' এর কাজ করত। সুপ্তোত্থিত উঠত আমাদের শক্তি ও স্বাধীনতার বোধ।

প্রত্যেক শিষ্যের প্রতি ও'র পদ্ধতি ছিল বিভিন্ন! কারুকে অনবরত যেন হাতুড়ির ঘা দিয়ে গড়ে তুলতেন। চূড়ান্ত সাধন তার ওপরে আরোপ করতেন। তার ভোজন, বসন, আচরণ, স বাক্যালাপ সমস্ত কৃচ্ছ্রতায় নিয়ন্ত্রিত। কারো প্রতি বোঝা যেত কেন,—কোনরকম কৃচ্ছ্রতার কড়াকড়ি ছিল না। কারো প্রতি শুধু , স্নেহময় কারো প্রতি কড়া! হয়ত বা এমনি করে তাদের যাক্তি ব্যাপারে অহঙ্কারকে জয় করতে শেখানো!

আমরা লক্ষ্য করতাম এইভাবে যাঁরা া পেতেন, তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে কিরকম বর্তন সাধিত হত। অবশ্য আমরাও অব্যাহতি পাইনি। তাঁর াধারায় আমাদের প্রচলিত ভুল ধারণাগুলির আমূলে সংস্কারন হল। আমরা নতুন করে ভাবতে শিখলাম। অসত্যকে পরিহার সত্যকে নির্ভয়ে গ্রহণ করতে শিখলাম—তার জন্য যে মূল্যই ত হোক না কেন। এই শিক্ষার ফলে সে জিনিস আমাদের কাছে গ সম্পদতুল্য ছিল তা হয়ে গেল নেহাৎ বর্জনীয়। আসলে াদের পূর্বের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল তুচ্ছ এবং বিক্ষিপ্ত। ক্রমেই রা শিখলাম কি করে ছোট ছোট তুচ্ছ উদ্দেশ্যকেও এক বিরাট দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করা—তাদের আরও উচ্চমার্গে তুলে শুদ্ধ তের দিকে পরিচালনা করা—সেই মূল লক্ষ্যে উপনীত হওয়া াদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য—সেই ধ্রুবসত্যকে লাভ করবার াই আমরা বারবার এই জগতে আসি। আমরা শিখলাম এই

ধ্রুবসত্যকে খুঁজতে মরুভূমিতে যেতে হয় না, পর্বত চূড়াতেও যেতে হয় না—তাঁকে অন্বেষণ করতে হয় আপন হৃদয় মাঝে।......

......অতএব এরকম বিশিষ্ট ধরনের শিক্ষার প্রথম ধাক্কাতেই আমরা যদি কুঁকড়ে যাই তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। শুধু যে আমরাই এসবে ঘাবড়ে গিয়েছি তাই নয়। কিছুদিন পরে একজন প্রতিভাময়ী আমেরিকান মহিলা অন্য একজন সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বলেছিলেন (তিনি আমেরিকাতে বেড়াতে এসেছিলেন)—"স্বামী অমুককে আমার স্বামী বিবেকানন্দের চেয়ে বেশী ভাল লাগে।" আমাদের বিস্মিত হতে দেখে তিনি বলেন, "হ্যাঁ, আমি জানি স্বামী বিবেকানন্দ সহস্র গুণে বড়; আসলে উনি এত বেশী শক্তিমান যে আমি বিহ্বল হয়ে যাই!'

পরে ঠিক এই কথাই আর একজনের মুখ থেকে শুনেছিলাম। ইনিও একজন নতুন ভাবধারার বাণীপ্রচারক ছিলেন। এ'র মতামত বেদান্তবাদের দ্বারা খুব প্রভাবিত। লক্ষ্য করে আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম উনি স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত কিনা! উনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি ও'কে চিনতাম। ও'র বক্তৃতাও শুনেছি; কিন্তু ও'র অসাধারণ ক্ষমতা আমাকে বিহ্বল করে তোলে। তার চেয়ে স্বামী 'অমুকে' আমাকে বেশী আকৃষ্ট করেন।' এই স্বামীটি উত্তর ভারত থেকে বেদান্ত প্রচার করতে এসেছিলেন, এবং আমেরিকাতে কিছুদিন ছিলেন। এর কী ব্যাখ্যা হতে পারে? ......এটা কী পাছে নিজেদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়ে হয়ে যায় সেই ভয়?

"Verily he that loseth his life, shall find it". . .

একথা ঠিক যাঁরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন,—এক অদম্য আকর্ষণে, যেমন চুম্বক টানে লোহাকে—তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ,—হাজার হাজার।

ও'র মধ্যে এমন শক্তি ছিল যে যাঁরা ও'র কাছে আসতেন,—নারীপুরুষ, শিশু, সবাই ও'র আকর্ষণীয় যাদুশক্তিতে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত।

তিনি কখনও নিজেকে আমাদের সাধারণের সাধুব্যক্তিদের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করতেন না। বরং নানাভাবে আমাদের অনুভূতিতে ঘা দিয়ে কখনও বা স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। অনেকে হয়ত মাংস খান, ধূমপান করেন, কিন্তু সব আড়ালে। তাঁরা মনে করেন মাংস খাওয়া বা ধূমপান করা কিছুই দোষের নয়; তবে প্রচলিত ধারায় প্রভাবিত দুর্বল লোকেদের মনে আঘাত না দিয়ে এইভাবে গোপনীয়তা রেখে খাপ খাইয়ে নেওয়া ভাল। স্বামীজী বলতেন,

"If I do wrong I shall not hide it; but shout it from the house tops". . . .

...সে যুগে যখন পুরুষেরা মহিলাদের সামনে ধূমপান করতেন না, তখন স্বামীজী একবার সিগারেট খেয়ে ইচ্ছে করে একজনের মুখের ওপরে ধোঁয়া ছেড়ে দিলেন। আর কেউ হলে হয়ত তখনি আমি সেখান থেকে চলে যেতাম এবং কখনও তার সঙ্গে কথা বলতাম না। তবুও প্রথমে আমি মুহূর্তের জন্য বিচলিত হয়েছিলাম। কিন্তু একটু পরেই সম্বিৎ ফিরে পেলাম। ভেবে দেখলাম তাঁর মুখ থেকে আমি যে সত্যের বাণী শুনেছি, তার সম্বন্ধে কোন ধারণা তো পূর্বে ছিল না। ইনি জানেন সত্যের পথে ইষ্টস্থানে পৌঁছবার উপায়, আমাকে ইনি সেই পথ প্রদর্শন করছেন। সামান্য একটু ধোঁয়ার জন্য কী আমি পিছু হটে যাবো? মুহূর্তের জন্য আমার ঐ বিভ্রান্তি! আমি বুঝলাম এসবই আমাদের প্রচলিত সংস্কার ভাঙবার জন্য।

আমরা লক্ষ্য করেছি এই যে মানুষটিকে আমরা আমাদের

হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছি, তিনি সাধারণ অর্থে যাকে আমরা etiquette বলি, তা পালন করেন না। যেমন পাহাড়ে ওঠবার সময় কোন মহিলার কষ্ট হচ্ছে দেখলে তাকে সাহায্য করতে এগুতেন না—যেটা পাশ্চাত্য মতে অ-বীরোচিত। স্বামীজীর মতে 'তুমি যদি বৃদ্ধ, কিংবা দুর্বল, বা অসুস্থ হতে, আমি নিশ্চয় তোমাকে সাহায্য করতাম। কিন্তু নদীটা লাফিয়ে পার হয়ে উঠে আসবার মত সামর্থ্য তোমার যথেষ্ট আছে।

"You are as able as I am."

তবে তোমাকে আমি সাহায্য করতে এগুবো কেন? যেহেতু তুমি নারী? একে তোমরা 'শিভালরি' বল? ভেবে দেখেছ এই শিভালরির মূলে আছে সেকস্? দেখতে পাও না পুরুষের সর্বদা মেয়েদের প্রতি মনোযোগের মূলে কী?

কথাগুলো শুনতে প্রথমে অদ্ভুত মনে হতে পারে; কিন্তু সত্যিকারের নারীর মর্যাদা এবং নারীর প্রতি শ্রদ্ধা বলতে কী বোঝায় এই কথা শোনবার পর প্রথম ধারণা হল।

এই মানুষই, শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ গ্রহণ করতে যখন গিয়েছিলেন তখন সমস্ত পথ গঙ্গাজল ছিটিয়ে ছিলেন যাতে শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখীন হবার সময় তিনি যেন পবিত্র হয়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। একমাত্র শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তিনি মন খুলে নিজের মনের ইচ্ছা জানিয়েছিলেন—তাঁর আশীর্বাদ বিনা তিনি পাশ্চাত্য দেশে যেতে পারেন না। যখনই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যেতেন সবসময় সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতেন।

ঈশ্বরকে তো তিনি (মহামায়া) মারূপেই আরাধনা করেছিলেন। তাই প্রতিটি নারীই তাঁর চোখে ছিলেন সেই মহামায়ার নানারূপের মূর্তিতে—আদ্যাশক্তির প্রকাশ। কাইরোর বাজারের মেয়ে, খেতড়ির বাইজী সকলের মধ্যেই তিনি মহামায়ার রূপ দেখেছিলেন। সেই মেয়ে তার পেশা ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরের উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক জীবনে উত্তরণ লাভ করল। এমন কী ভারতবর্ষে তাঁর সমালোচনা হবে জেনেও তিনি আমেরিকাতে একটি মহিলাকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন; কারণ জানতেন সে যৌনবোধের ঊর্ধ্বে পবিত্র আত্মা!

যদিও তিনি সন্ন্যাসী এবং নিঃস্ব ছিলেন, তবুও কখনও নিজের স্বরূপ ভুলতেন না। তিনি অপরাধীর প্রতি উদার হতে জানতেন; কিন্তু সে উদারতাও অসংযত নয়। কোন কাজে কখনও একটুকু 'লোক দেখাবার' লেশমাত্র স্পৃহা তাঁর মধ্যে ছিল না! ধনীর দান তিনি নিঃসঙ্কোচে সানন্দে গ্রহণ করতেন। কিন্তু দরিদ্রের কাছ থেকে কিছুই তিনি নিতেন না।

. . . "His compassion for the poor, and down-trodden, the defeated was a passion"

যে তাঁকে দেখেছে সেই বুঝতে পারত যে ক্ষুধার্তের ক্ষুধা নিবারণের জন্য তিনি নিজের শরীরের মাংস এবং তার পানের জন্য নিজের রক্ত সাগ্রহে দিতে পারতেন। তাই আজও তাঁর জন্মতিথিতে দরিদ্রদের খাওয়ানো হয়। এই দুস্থ এবং নিম্নজাতিদের সেদিন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ উচ্চজাতির যুবকরা পরিবেশন করে খাওয়ায়। পাশ্চাত্যের লোকেদের এই সেবাধর্মের তাৎপর্য বোঝানো অসম্ভব। ...কে পারত এমন করে বিবেকানন্দ ছাড়া উচ্চজাতির যুবকদের দিয়ে নিম্নজাতির সেবা করাতে—বিনা বাধা, বিনা তর্কে? হৃদয় এবং ভক্তি চল এর মূলে। এমন ছোট ছোট ঘটনা আমেরিকাতেও দেখেছি! আমেরিকাতে যখন ক্লেশ শিখছিলেন (স্বামীজী) কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আপনি ক্লেশ শিখে কী করবেন?' উত্তর দিলেন এইভাবেই এম, এল-এর পক্ষে অনাহার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।'

আর একজনকে একটা দশ ডলারের নোট দিয়ে বলেছিলেন "এ 'এস'কে দিও; কিন্তু খবরদার বোলো না আমি দিয়েছি।

একজন ব্যক্তিকে একবার অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় যে তিনি বেদান্ত সোসাইটির টাকা নিয়ে অপপ্রয়োগ করছেন। উনি বললেন

"I will make good any difficiency."

এরপর ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন উনি বললেন, 'জানি না কোথা থেকে এই ক্ষতিপূরণের টাকা জোগাড় করব। কিন্তু বেচারা 'ভি'কে তো কষ্ট দিতে পারি না।'

এমন কী আমেরিকা থেকে চলে যাবার পরও, যারা সেখানে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে দিন কাটাতো তাদের জন্য খুব উদ্বিগ্ন থাকতেন। বিশেষ করে মেয়েরা যাদের ওপরে ছিল পুরুষের মত কর্তব্যভার।১ উনি আমেরিকা ছেড়ে যাবার পর কোন মহিলা নিজেকে স্বামীজীর 'ফলোয়ার' বলে জানিয়ে নিজের ইচ্ছেমত ধর্ম মত প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন। স্বামীজীকে তাঁর অনুগতের এ-বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, 'পুওর থিং। বেচারী স্বামীকে খাওয়াতে হয়! খানিকটা মাসিক আয় ওর দরকার।'

আর একজন অভিযোগকারী অনুযোগ করলেন 'কিন্তু স্বামীজী, ও যা বলে বেড়ায় আপনি ওকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন আপনার প্রচারকার্যের জন্য ও ছাত্র জোটাচ্ছে? ও বলে আমরা যদি ওর প্রাথমিক ক্লাসে যোগ দিই, তাহলে পরে আপনি আমাদের উচ্চতর শিক্ষা দেবেন।' আরও অনেক কিছু অভিযোগ এঁদের ছিল সব শুনে স্বামীজী শুধু বললেন, বেচারী, বেচারী! শিব, শিব 'শিব শিব' বলবার সঙ্গে সঙ্গে উনি যেন সমস্ত বিষয়টি মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন।

একজন ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল এই শিব শিব বলবার অর্থটা কী? কৌতুক করে চোখ মটকে বললেন,

"Shiver my timbers. Ho, ho, ho, and a bottle of rum. —এটা ঠিক ছ্যাবলামি নয়।

এ ছাড়া আর কোন হাল্কা উত্তর তিনি দিতে পারতেন এরকম আকস্মিক প্রশ্নের! আমরা লক্ষ্য করেছি যখনই কোন বিষয়ে ওঁর মন বিচলিত বা সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ত তখনই 'শিব শিব' উচ্চারণ ওঁর মনকে শান্ত করে দেয়! আমরা বুঝতে পারতাম এরপরে উনি স্বরূপে এসে যেতেন। বাইরের যা কিছু অশান্তি সব শান্ত হয়ে যেত।

একদল বিদঘুটে লোক সর্বক্ষণ ওঁর সঙ্গে চিপকে লেগে থাকত। একবার নিউইয়র্কে যখন উনি হাঁটতে বেরিয়েছিলেন এই রকম একজন এসে ওঁর সঙ্গে জুটল, একটু পরে আর একটি। উনি যখন ৩৮তম রাস্তা, বেদান্ত সোসাইটির বাসাবাড়িতে ফিরে এলেন তখন সঙ্গে ঐ দুই মূর্তিমান! যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকছেন তখন একজন মনে মনে ভাবলেন 'এইসব অদ্ভুত অস্বাভাবিক লোকগুলো ওঁকে দেখে আকৃষ্ট হয় কেন?'

ওদের না-বলা মনের চিন্তা উনি যেন বুঝে ফেললেন বিদ্যুৎগতিতে পেছন ফিরে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানো—ওরা হল শিবের 'ভূত':

(চলবে)

---

১ ভগিনী ক্রিস্টিন ছিলেন এইরকম একজন নারী: পিতৃহীন বোনেদের মানুষ করে তোলবার জন্য খুব খাটতে হোত। তাঁর জন্য স্বামীজীর কী পরিমাণ মমতা বোধ ছিল তা তাঁর চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যায়। তাঁর সাংসারিক কর্তব্য, সম্পাদন করবার জন্যই স্বামীজী তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যেতে দেরি করছিলেন।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণনগর।

নামটি উচ্চারণ করলেই মনের ভেতর অনেকগুলি নরম সুর গুনগুন করে বেজে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সারি সারি চিত্রিত মাটির পুতুল, মাটির হাঁড়িতে সরপুরিয়া-সরভাজার রাশি। মনে পড়ে সদা-হাস্যোজ্জ্বল এক বিখ্যাত মানুষকে—গোপাল ভাঁড়। এবং অবশ্যই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কেও। আরো কতো প্রখ্যাত ব্যক্তিদের স্পর্শধন্য এই ঐতিহাসিক জনপদের মৃত্তিকা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন, স্টেশন এ্যাপ্রোচ রোডে তাঁর বসত-বাড়িতে বর্তমানে একটি আরোগ্যভবন স্থাপিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি' নামক গ্রন্থের লেখক মোহিত রায় (এখানেই তাঁর কর্ম-স্থল) একটি মজার ঘটনা শোনালেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার সময় দ্বিজেন্দ্র-লাল শুনলেন কাছাকাছি কোন্ গ্রাম থেকে জলধর সেন নামে একজন মেধাবী ছাত্র নাকি কৃষ্ণনগরে পরীক্ষা দিতে এসেছে। প্রথম দিন পরীক্ষার পরে একটি গাছতলায় বসে সামান্য জলযোগরত অবস্থায় জলধর সেনকে খুঁজে বের করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। চাকর বাড়ি থেকে তাঁর জন্য জলখাবারের থালা বয়ে এনেছিলো, সেসব দুজনে ভাগ করে খেলেন। সেই বছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুজনে যুগ্মভাবে প্রথম হন। ওঁদের বন্ধুত্ব আজীবন স্থায়ী হয়েছিলো।

আজকের আলোচনায় অতীতকে খুব বেশি টেনে আনবো না। এবারে যাঁদের দেখে এলাম, যাঁদের সঙ্গে কথা বলে এলাম, তাঁদের কথাই মন অধিকার করে রয়েছে। পরে আর একবার কৃষ্ণনগর সম্বন্ধে লিখবার ইচ্ছে

নদীয়া জেলার সদর সহর কৃষ্ণনগর। শেয়ালদা-লালগোলা মেন লাইনে রাণাঘাট থেকে চার স্টেশন পরে অবস্থিত। শেয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগর লোক্যাল, লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরে যাওয়া যায়। আবার রাণাঘাট থেকে ঘন ঘন শাটল-ট্রেনের ব্যবস্থাও আছে। রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর বা শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর বাস সার্ভিস রয়েছে। চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক বেয়ে কোলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর পৌঁছনো যায় সহজেই। শহরের কেন্দ্র থেকে অজস্র বাস বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রতি মুহূর্তে। হাঁসখালি, আড়ংঘাটা, বগুলা, আসাননগর, ভীমপুর, মাজদিয়া, বানপুর, পলাশী, করিমপুর, তেহট্ট, শিকারপুর—ইত্যাদি স্থানে যাবার বাস পাওয়া যায় এখান থেকে। সরকারী রকেট সার্ভিসও আছে। শহরকে প্রায় অর্ধেকটা ঘিরে বয়ে যাচ্ছে জলঙ্গী নদী। জাতীয় সড়কে এ নদীর ওপর একটি সুন্দর মোটর ব্রিজ আছে। বিকেলে বেড়াবার পক্ষে চমৎকার জায়গা। আদিগন্ত প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে জলঙ্গী। দুদিকে বালির চর। অনেক দূরে দেখা যায় বাহাদুরপুর রিজার্ভ ফরেসটের সীমারেখা। একটু দাঁড়ালেই ঘুম পায়।

অম্বুজ মৌলিক মশায় এখানকার খ্যাত-নামা মানুষ। তিনি ব্যবসায়ী অথচ সৎ, ভালো অভিনেতা এবং নিপুন শিকারী। আহার ব্যবস্থা তাঁর গৃহেই। দুপুরে ঠেসে ভালো ভালো রান্না খাবার পরে তস্য পুত্র অমিত আলাপ করিয়ে দিলো স্থানীয় যুবক সৌমেন সিংহরায়ের সঙ্গে। ছিপছিপে গড়নের সুদর্শন যুবক। বললাম, ভাই, একটু ঘূর্ণিতে যাবো মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে। শুনলাম তোমার সঙ্গে ওঁদের কারো কারো আলাপ আছে। নিয়ে যাবে

সৌমেন তৎক্ষণাৎ রাজী। রাজী হওয়ার মধ্যে সুন্দর একটা বিনয় এবং সপ্রতিভ ভদ্রতা রয়েছে, যা কোলকাতার যত কাছে এগিয়ে আসা যায় ততই কমতে থাকে।

অমিত তার বাবার ব্যবসা দেখাশুনো করে, আলাপ করিয়ে দিয়ে আপন ব্যস্ততায় সে চলে গেলে আমি সৌমেনকে বললাম, চলো, তাহলে যাওয়া যাক।

—যাবেন তো, কিন্তু ওদিকে অবস্থাটা দেখেছেন?

তর্জনী নির্দেশ করে আকাশ দেখালো সে। দেখলাম সত্যিই অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। জজ কোর্টের মাথার ওপর দিয়ে ঘন কালো মেঘ আকাশটাকে ঢেকে ফেলবার জন্য উঠে আসছে দ্রুত। ঠান্ডা হাওয়া বইছে, পাখিরা নেমে পড়েছে আকাশ থেকে। বৃষ্টি এলো বলে।

সৌমেন বললো, ঘূর্ণি পৌঁছোবার আগেই বৃষ্টি এসে যাবে। একটু অপেক্ষা করেই যাওয়া ভালো। কি করবেন?

অনেক দিন বাদে সুন্দর মেঘ দেখে আমার তখন একটা নেশা মতো হয়ে গিয়েছে; বললাম, চলো, বৃষ্টির সঙ্গে রেস দিয়ে দেখি কি হয়। আপত্তি নেই তো?

সৌমেন দারুণ স্পোর্টিং। বললো, কিছু না। চলুন।

নেতাজীর আবক্ষ মূর্তিকে প্রদক্ষিণ করে রিক্সা হাই স্ট্রীটে উঠতেই বৃষ্টি এলো। প্রথমে দু'এক ফোঁটা, তারপর হঠাৎ জোরে। রিক্সার হুডে মাথাটা বাঁচছে শুধু দুজনের, কোমরের নিচে থেকে অবিরল ভিজছে। নিতান্ত লজ্জায় পড়ে বললাম, এঃ, আমার জন্য তোমার খুব কষ্ট হলো আজ। খামোকা ভিজে গেলে—

—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। নো ফরম্যালিটি।

বাম দিকে গৌতম পাল, ডান দিকে প্রফেসর লুসিয়ানো মিনগুৎসি ইতালীর স্টুডিওতে।

কৃষ্ণনগরের মানুষেরা বৃষ্টি ভালোবাসেন। এই শহরের ওপর দিয়ে গিয়েছে কর্কটক্রান্তি রেখা, সূর্যের উত্তরায়ণের প্রান্তসীমা। ফলে এখানে যাচ্ছেতাই গরম পড়ে। বৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আবহ ঠান্ডা থাকে।

কাকভেজা ভিজে যখন ঘূর্ণি পৌঁছলাম, তার আগেই বাচ্চাদের মার্বেলের মতো শিল পড়তে শুরু করেছে। পথের ধারের গাছ থেকে ঝরে পড়ছে জলের ধারা ভয়ানক বেগে, বৃষ্টির সময় খোলা জায়গার চেয়ে গাছের নিচে জল পড়ে বেশি।

প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী কার্তিক পালের বাড়ি ও বিপণি সংলগ্ন বারান্দা ঘেঁসে রিকসা দাঁড়াতে আমরা দুজন লাফিয়ে নেমে ভেতরে ঢুকলাম। দুজন মহিলা এবং একজন পুরুষ পুতুল কিনতে এসে দুর্যোগে আটকা পড়েছিলেন, স্লপ্ স্লপ্ আওয়াজ করে ওই অবস্থায় আমাদের ঢুকতে দেখে তাঁরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন।

কার্তিক পালের পুত্র গৌতম আমার সঙ্গী সৌমেনের সহপাঠী ছিলেন। তাঁকে খবর দিতে তিনি অচিরাৎ নেমে এলেন নিচে। ফর্সা, হাল্কা শরীরের মানুষ। দাড়ি রাখেন। মুখ এত কচি যে, মনে হয় নকল দাড়ি। নমস্কার করে পরিচয় দিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

গৌতম আমাদের দোতলায় নিয়ে গেলেন। শিল্পীর বাড়ি বোঝা যায়। সুন্দর কিছু স্কেচ্ ও ছবিতে দেওয়াল ভরে আছে। দোতলার বারান্দা অবধি উঠে এসেছে পিংক বুগেনভিলিয়ার লতা। ঘরের ভেতর বুক কেসে পল হ্যামলিনের শিল্প ও ভাস্কর্য-সংক্রান্ত একটি সেট্, ভ্যান গগ্-এর ওপরে বই, নানারকম বিদেশী জর্নাল, মায় এ্যাটমিক ফিজিকসের কিছু গ্রন্থ। জিজ্ঞাসা করতে গৌতম বললেন, এক্কালে ফিজিকসের ছাত্র ছিলাম। এম, এস, সি পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকিভাবে এ লাইনে আসি।

—এ লাইনে আসি বলতে কি বোঝাচ্ছেন? শিল্পের একটা বংশানুক্রম থাকে জানি, আপনিও কি আপনার বাবার মতো—

কথাটা শেষ করার আগেই ওঁকে হাসতে দেখলাম, খুব সূক্ষ্ম হাসি। সৌমেন বললো, ও দারুণ কাজ করছে তারাদা। বহুদিন স্কাল্পচার শেখার জন্য ইটালীতে ছিলো।

কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে বলি, তাই নাকি? কতদিন ছিলেন বাইরে?

—প্রায় দু' বছর। উনিশশো বাহাত্তরের তেসরা সেপ্টেম্বর যাই, ফিরি চুয়াত্তরের জুলাইতে। ফরেন এক্সচেঞ্জ পাচ্ছিলাম না কিছুতেই, তখন প্রায় হিচ্-হাইকিং গোছের করে টুরিস্ট হিসেবে চলে যাই।

—ইটালীতে কোথায় ছিলেন?

—মিলান শহরে। আমরা মিলান বলি, ওরা বলে মিলানো। ওখানকার আকাদেমীয়া দি বেলে আরতি দি ব্রেরা—তে পাথরের কাজ শিখতাম।

হেঁচকি তুলে বললাম—ওটা কি আর্ট-স্কুলের নাম?

—হ্যাঁ মিলানের নামকরা একটা আকাদেমী।

—আপনি আমার নোটবইতে ক্যাপিটাল লেটারে নামটা একটু লিখে দেবেন? ঠিক বুঝতে পারছি না—

হেসে আমার হাত থেকে নোটবই নিয়ে উনি বড় হাতের অক্ষরে লিখে দিলেন—
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI BRERA, MILANO.

—কার কাছে কাজ শিখতেন মিলানে?

—ওখানকার স্কুলে শিক্ষণরীতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ক্লাস বা রুটিন বলে ঠিক কিছু নেই। ইচ্ছেমতো একজন অধ্যাপক গুরু হিসেবে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে থেকে কাজ করতে হয়।

—আপনি কার কাছে ছিলেন?

—আমার গুরুর নাম লুসিয়ানো মিনগুৎসি।

বলেই সামান্য হেসে হাত বাড়ালেন দিন নোটবইটা।

আবার নোটবই নিয়ে লিখে দিলেন-
LUCIANO MINGUZZI

বললাম, এঁর সম্বন্ধে কিছু বলুন।

—ইনি ইতালীর একজন প্রখ্যাত ভাস্কর একস্প্রেশনিস্ট্ কাজই বেশি করেন বর্তমানে আলো ও ছায়ার যে এফেক্ট, যা ছবিতে ফুটিয়ে তোলা সহজ, তাকে ভাস্কর্যে মূর্ত করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করছেন অসাধারণ প্রতিভা। এখন বয়েস প্রায় পঁয়ষট্টি তবু নিরলস নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন।

আরো অনেক কথা হলো। ইতালীতে তোলা প্রফেসর মিনগুৎসি ও গৌতমের একটি ছবিও পেলাম। স্বয়ং কার্তিক পাল একবার স্টুডিও থেকে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলে গেলেন। মধ্যম উচ্চতার ও প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের অমায়িক মানুষ। আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখছিলাম। এই সেই লোক, যিনি ১৯৪৮ সালে কৃষ্ণনগরে প্রথম পাথরের মূর্তি গড়ার কাজ শুরু করেন। যাঁর হাতের কাজ এখন বিদেশী মুদ্রা আনে। আজকাল আর সূক্ষ্ম কাজের মূল্য নেই বলে দুঃখ করলেন শিল্পী। বললেন—এই সেদিনও সরকারী এক সেল্স্ এমপোরিয়ামের ম্যানেজার এসে কিছু সস্তা ছাঁচের পুতুল কিনলেন। খদ্দেররা নাকি তাই চায়। তাও প্যাকিং এবং পৌঁছে দেবার খরচ শিল্পীর।

কার্তিক পাল এরকম ব্যবসায় রাজী হননি।

গৌতমকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ স্কাল্প্টারের কাজ আপনার ভালো লাগে?

উনি বললেন—সিস্টিন চাপেলের কাজ দেখার পরে আমি মিকালেঞ্জেলোকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলে মনে করি। আধুনিক যুগে পল রোদ্যা ইত্যাদিরা তো প্রিয় বটেই। আর হ্যাঁ, অতি আধুনিকদের মধ্যে ম্যারিনো মারিনির নাম করতেই হবে।

আসবার সময় একবার ওঁদের স্টুডিও দেখতে গেলাম। সেখানে অত্যুজ্জ্বল আলোর নিচে বসে ছেনি-বাটালি নিয়ে কাজ শিখছে কয়েকজন শিক্ষার্থী। অনুকূল ঠাকুরের একটি মূর্তি তৈরি হচ্ছে দেখলাম। আরভিং স্টোনের বইতে যেমনটি পড়েছি, ঠিক সেই পরিবেশ। এ জগতের সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হয় না।

এখানে একটা মজার জিনিস দেখলাম। সেটুকু না বললে বোধহয় বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একটি বিরাট শ্বেতপাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে স্টুডিওর কোনে। প্রায় আট ফুট উচ্চতা। সেই বিশাল মূর্তির পায়ের কাছে গুটিসুটি হয়ে বসে রয়েছে একটি ছোট্ট সাদা বেড়ালছানা। তার সাইজ পাঁচ ইঞ্চির বেশি নয়। ভারি মজা লাগলো। ও না বুঝছে চারদিকের কর্মকান্ড, না বুঝতে পারছে কার পায়ের কাছে ও বসে আছে। সাইজের কনট্রাস্ট্ও মজাদার। অনেকদিন মনে থাকবে এ ঘটনা।

আমাদের জামাকাপড় আবার খড়খড়ে হয়ে গিয়েছে। রিকসা চেপে আমি আর সৌমেন শহরের কেন্দ্রে ফিরে আসি। বৃষ্টি শেষে ভেজা বাতাস সান্দ্র করে রেখেছে আজকের সন্ধ্যেটা। বললাম, ভাই সৌমেন, এখানে সাহিত্যের আবহাওয়া কেমন? ছোট কাগজ-পত্র কিছু বের হয়?

সৌমেন বললো, আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিই চলুন। তাদের মধ্যে শরিফ বলে একজন আছে, সে আপনাকে এ ব্যাপারে অনেক কিছু বলতে পারবে।

আলাপ হলো শেখ মহম্মদ শরিফের সঙ্গে। লম্বা চুল, চোখে চশমা, উজ্জ্বল দৃষ্টিসম্পন্ন তরুণ। আরো অনেকে ছিলেন সঙ্গে। গ্র্যাজুয়েটস কর্ণার বলে ও'রা একটি ক্লাব গড়েছেন। সেখানে শুধুই আড্ডা হয় না, গঠনমূলক কাজে ও'রা সবাই আগ্রহী। একটি পত্রপত্রিকার স্টলও করেছিলেন। সরকারের রাস্তা চওড়া করবার প্ল্যানের আওতায় পড়ে সেটি বর্তমানে লুপ্ত।

ও'দের নিয়ে এলাম অম্বুজ মৌলিক মশায়ের বাড়িতে। এসব ব্যাপারে ও'দের সমগ্র পরিবার অত্যন্ত উৎসাহী। ওখানে বসেই কথাবার্তা বলা যাবে।

প্রশ্নের উত্তরে শরিফ বললেন, দেখুন, কৃষ্ণনগরে চুয়াত্তর সাল পর্যন্ত সাহিত্যের যেন একটা জোয়ার ছিলো, অজস্র ছোট কাগজ বের হতো, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগ ছিলো। কি কারণে জানি না, এখন আর ঠিক তেমন নেই। অনেক পত্রিকারও অকালমৃত্যু ঘটেছে। আমরা একটা সাংস্কৃতিক মেলা চালু করবার চেষ্টা করেছিলুম, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখে বেশিদূর এগুই নি।

বললাম, কি কি লিট্‌ল ম্যাগাজিন এখন বেরুচ্ছে?

শরিফ একটু চিন্তা করে বললেন, খুব বেশি আর কই? আমি নিজে সম্পাদনা করতাম একটা কাগজ, নাম 'অনুস্বার-বিসর্গ', সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 'গ্রামবাংলা' বলে একটি খুব ভালো পত্রিকা মাত্র একটি সংখ্যা বেরিয়েই বন্ধ হয়ে যায়। 'অস্ট্রিক'-ও মৃত। এখন থাকবার মধ্যে আছে দেবদাস আচার্য ও প্রিয় বিশ্বাস সম্পাদিত কবিতার কাগজ 'ভাইরাস', তাছাড়া সুবোধ সরকারের 'একাকী' ইত্যাদি।

—এখানকার মানুষ বই পড়েন কেমন? লাইব্রেরী কি বলে?

এবার সৌমেন উত্তর দিলেন—রিডিং পাবলিক ভালো। যদিও লাইব্রেরীতে হালকা ও চটকদার বইয়েরই চাহিদা বেশি, তবু সেদিন দেখলাম শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত বইখানা দু' বছরের মধ্যে অন্ততঃ ২২।২৩ বার ইস্যু হয়েছে। বড় সোজা কথা নয়। আবার দেখুন না কেন, রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল-একাল' ওই সময়ের ভেতর মাত্র ২।৩ বার বাইরে গিয়েছে। এ রহস্য কে ব্যাখ্যা করবে বলুন? আজকাল অনুবাদ বইয়ের ভয়ানক চাহিদা হয়েছে পাঠকদের মধ্যে। ভালো সাহিত্য নয়—হ্যাডালী চেজ্ ধরণের বই। তবে সিরিয়াস বই পড়ার লোকও আছেন অনেক।

শরিফ এবং সৌমেন দেখলাম বেশ পড়াশুনো করেন। ও'দের দলের ভেতর একজন ওষুধের ব্যবসা করছেন সম্প্রতি। প্রদোষ পাল নামে এক তরুণ ভালো ফুটবল ও হকি খেলেন। অম্বুজবাবুর পুত্র অমিত মৌলিকও একজন কৃতি খেলোয়াড়। তার পাওয়া মেডেল ও কাপে ঘর ভর্তি।

ও'দের বললাম, মোটের ওপর জীবন সম্বন্ধে আপনারা কি আশাবাদী?

ও'রা সমস্বরে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা হয়তো অনেকেই এখনো তেমন কিছু করে উঠতে পারিনি, তবে তাতে আমরা হতাশ বা উদ্যমহীন নই একটুও। সমস্ত কৃষ্ণনগরের যুব সমাজের হয়ে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের শক্তি আছে। আজ হয়নি, কিন্তু কাল হবেই।

ও'দের উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ও'রা সত্যি কথাই বলছেন।

রাত্তির হয়ে যাচ্ছিলো, শরিফ বললেন, এবার আমরা উঠি।

আমিও ও'দের পেছন পেছন রাস্তার মোড় অবধি এলাম। জজ কোর্টের পাশে এইখানে রাস্তা তিন ভাগ হয়ে গিয়েছে। সেই তেমাথার মোড়ে একটা বিরাট ফোয়ারা বসানো হয়েছে। চারটি ঘূর্ণায়মান নল দিয়ে সূক্ষ্ম কণায় জল ছড়িয়ে পড়ছে, চারদিক থেকে বিচিত্র বর্ণের ফ্লাড লাইট তার ওপর ফেলে রঙীন মেঘের এফেক্ট্ তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেদিকে তাকিয়েই আমার মন খারাপ হয়ে গেলো। এখানে ছিলো একটা বিশাল প্রাচীন বটগাছ। সমস্ত তেমাথা আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে ছিলো সেই প্রাজ্ঞ অস্তিত্ব। কত পাখির বাসা ছিলো তার ডালে। এটাকে ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ব্যবহার করে তার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ কোনো জায়গার অবস্থান বোঝাতো। কৃষ্ণনগর এলেই আমি একবার অন্ততঃ এই গাছটির ছায়ায় এসে দাঁড়িয়ে যেতাম। সেই গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে এই রঙীন ফোয়ারা করবার জন্য। কারণ কি সৌন্দর্য সৃষ্টি? হাসি পায় ভাবলে। সেই ঘন-পল্লবে আবৃত বনস্পতির স্বাভাবিক মহত্তের চেয়ে এই ফোয়ারা বেশি সুন্দর? মানুষের সৌন্দর্য জ্ঞান কি অদ্ভুত! কবে আমরা নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ করবো? বৃক্ষ পতনের গম্ভীর শব্দ যে সমস্ত পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে আর্ত ক্রন্দনের মতো ছড়িয়ে পড়ে, তা কি মানুষ শুনতে পায় না?

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, সুন্দর পরিচ্ছন্ন জনপদ স্পন্দিত হচ্ছে। ফ্লুওরোসেন্ট্ আলো জ্বলছে দোকানের শো-রুমে, কেনা-বেচা চলেছে। সুন্দর পোষাক পরা মানুষের ভিড় পথে। শরিফ ঠিকই বলেছেন, কারো মুখে বিশেষ ক্লান্তি নেই, হতাশা ও জটিলতা নেই। ওটা মহানগর নিজস্ব ট্রেডমার্ক করে নিয়েছে।

মৌলিক-গৃহিণী নমিতা দেবী রন্ধন ব্যাপারে একজন প্রকৃত শিল্পী। মুরগীর কি একটা উদ্বেলকারী পদ হচ্ছে দেখে এসেছি। সেটাই এবার অমোঘ আকর্ষণে ফেরবার পথে টানলো।

কৃষ্ণনগরের একজন আশ্চর্য মানুষের সম্বন্ধে বলা বাকি আছে, তিনি গানের গুরু, রাগসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বোদ্ধা। ও'ার নাম অমিয়নাথ সান্যাল। একমাত্র বাঙালী, ওরিয়েন্ট্ লংম্যান ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীত সম্বন্ধে যাঁর ইংরেজী বই অভ্রান্ত মনে করে ছাপতে সাহস পেয়েছে। এখন অশীতিপর বৃদ্ধ (খাঁটি অর্থে, ও'র বয়েস তিরাশি চলছে). অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছেন কৃষ্ণনগরের এক কোণে। বাঙালী কি ও'াকে ভুলে গেলো? সামনের সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা বলবো।

অন্য কোনো স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয় সম্পূর্ণ আহার নয়

তিন কবি

কবি দেবারতি মিত্রের একটি অপুষ্টি রোগাক্রান্ত কথা 'জীবন কবিতার চেয়ে অনেক বড়' সাপ্তাহিক অমৃত'র ১৬ বৈশাখ সংখ্যার 'তিন কবি'তে পড়লাম। দেবারতির দেবীর জীবন বলতে যদি খাওয়া চলাফেরা ঘুমানো হয় তাহলে নিশ্চিত জীবন কবিতার চেয়ে অনেক বড়। আর যদি জীবন বোধ কথাটা যুক্ত থাকে তবে জীবন কবিতার স্নেহসিঞ্চিত সন্তান। প্রথমোক্ত জীবন চেতনায় বিশ্বাসী হলে দেবারতিকে অনুগ্রহ করে 'কবি' আখ্যা দেবেন না এবং কবি পরিচিতির নামে ফিল্মী পত্রিকার কায়দায় রাগ: দর্শন থেকে রোগ ছড়াবেন না। —**রমাপ্রসাদ ঘোষাল;** মীরবাজার, মেদিনীপুর।

(২)

সম্প্রতি অমৃতে প্রকাশিত মানস রায়চৌধুরীর প্রচ্ছদ কাহিনী 'তিন কবি'তে দেবারতি মিত্র এক জায়গায় বলছেন 'জীবন কবিতার চেয়ে অনেক বড়'। এই ধরনের অকবি সুলভ কথা কি দেবারতি দেবীর মুখে শোভনীয়? যাঁরা কবি, যাঁরা কাব্য রচনাকে মুক্তির মাধ্যম বলে স্বীকার করেন তাঁরা কখনই একথা মেনে নেবেন না বলে বিশ্বাস করি।

পৃথিবীতে কবিতায় যত কথা বলা হয়েছে, সাহিত্য বা সংস্কৃতির আর কোন কিছুতেই তত কথা বলা হয় নি। সমাজ-চেতনা বা পারিপার্শ্বিক কথাবার্তা এবং দর্শনকে বাদ দিয়ে কবিতা লেখা হয় না। রূপ এবং রসের জন্যই কবিতা হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকে—কবিতার পংক্তি মানুষের অন্তরে চিরস্থায়ী হয়। কবিতা কখনই উদ্দেশ্যধর্মী নয়। কবিতার জন্ম মানুষের যে কোন বৃত্তি বা উদ্দেশ্য থেকে জাত। পৃথিবীর প্রথম কবিতা উদ্দেশ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিলো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিরা কবিতা লিখেই জীবনকে উপভোগ করেন। অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করেন। কারণ জীবনের চেয়ে কবিতা অনেক বড়। মানসবাবু যখন তাঁর কাছে সাক্ষাৎকার নিতে আসেন তখন দেবারতি মিত্র ভীষণ অসুবিধায় পড়ে যান। তাই তিনি বলেছেন—'সাহিত্যের প্রশ্ন করবেন, আগে জানলে.... বইটই দেখে আসতাম।'

দেবারতি দেবীর কাছে আমার প্রশ্ন উনি কি বই দেখে তৈরী হয়ে কবিতা লেখেন?

কবিতা জীবনবোধের ফলশ্রুতি। তা কোন বইয়ে পাওয়া যায় না।

তাই বলছিলাম—সিনেমা পত্রিকার কায়দায় কারও পরিচিতি এত সুন্দর সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ করে পত্রিকাটিকে রোগাক্রান্ত করে তুলবেন না। আর এই রকম অকবিদেরকে কবি আখ্যায় ভূষিত করে পাঠকদের রুচি বিকৃত করবেন না। **সমীরণ মজুমদার;** স্টেশন রোড, মেদিনীপুর।

আমাদের জীবনে পাখি

অমৃতে সম্প্রতি প্রকাশিত 'আমাদের জীবনে পাখি' প্রচ্ছদ কাহিনী বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। লেখকদের পাখি নিয়ে প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। তবে এই ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হলে অনেক সতর্ক হয়ে লিখতে হয়। পাখি নিয়ে ইদানীংকালে আমাদের দেশে প্রচুর গবেষণা চলছে। সিদ্ধার্থ রায় যিনি প্রথম অংশটি 'চেনা অচেনা' লিখেছেন আমার মনে হয় তিনি শ্রীঅজয় হোমের লেখা 'বাংলার পাখি' বইটি থেকেই বেশীর ভাগ কথা নিয়েছেন। এটা তাঁর (শ্রীরায়ের) জানা উচিত ছিল যে শ্রীহোমের বই ছাড়া আরও অনেক তথ্যবহুল বই আছে। প্রথম অংশে পরিবেশিত কিছু কিছু ভুল তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করলাম।

খঞ্জন পাখি—এদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লেখক লিখছেন যে 'কীটভুক এই পাখি সাধারণতঃ থাকে জলের ধারে এবং এরা সব সময় জোর থাকে।' এই উক্তি মোটেই ঠিক নয়। এই পাখিরা সর্বত্রই ঘুরে বেড়ায়—জলের ধারে, শুকনো মাঠে এমন কি বাড়ীর ছাদেও ঘুরতে দেখা যায়। এরা প্রজনন ঋতু ছাড়া অন্য সময় দলবদ্ধ হয়ে থাকে এবং রাত্রিকালীন আবাসে হাজারে হাজারে একত্রিত হয়ে থাকে। মাত্র দু' একটি প্রজাতি ভারতে প্রজনন করে।

চোর পাখি—লেখক এই পাখিকে অগভীর জঙ্গলের পাখি বলে বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু দেখা যায় যে সাতটি প্রজাতির মধ্যে পাঁচটি প্রজাতিই গভীর জঙ্গলের পাখি। এরা মোটেই মাটিতে গর্ত করে থাকে না। গাছের কোটরেই সাধারণত থাকে।

পানকৌড়ি—লেখক এই পাখির যে পরিচয় দিয়েছেন সেটা ঠিক হয় নি। 'জলে ডুব দিয়ে তাড়াতাড়ি মাছটাকে উপরে ছুঁড়ে দেয়—মাছ এসে টপ করে মুখে পড়ে।' এই ধরনের খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস পানকৌড়ির নেই। অনেকটা এই রকম অভ্যাস যার আছে তার নাম হলো 'গয়ার', ইংরেজী—স্নেক বার্ড বা ডার্টার।

বৰুমাই—পাখিটির সঠিক বাংলা নাম 'বৰুমা'।

মুনিয়া—মুনিয়া পাখি কত প্রকার হয় লিখেতে গিয়ে লেখক 'তেলে মুনিয়া' নামটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য শ্রীঅজয় হোমও একই নাম রেখেছেন। সঠিক নাম হবে 'তিলে মুনিয়া'। এই পাখিটির বুক এবং পেটে আঁশের মত দাগ থাকায় এই নামকরণ।

ফটিক জল—লেখক 'এদের আরেক নাম চাতক' লিখেছেন। ফটিকজল চাতক পাখি নয়।

গাঙশালিখ—লেখক এর ঠোঁটটি হলুদ বলে বর্ণনা দিয়েছেন। গাঙশা ঠোঁটের রং কমলা, হলুদ নয়।

হুতুম প্যাঁচা—এর সম্বন্ধে গিয়ে লেখক লিখছেন যে—'এরা বাঁধার কোন চেষ্টাই করে না।' প্রশ্ন জাগবে যে এই পাখিরা ডিম কোথায়। যতটুকু আমার জানা আ হলো এরা অন্যান্য পাখির মতো খড় দিয়ে বাসা বাঁধে না, তবে নরম প্লেটের আকারে গর্ত করে অথবা ছোট পাথরের আড়ালে জায়গা করে ডিম পাড়ে। এইভাবে ডিম পাড়ার তৈয়ারী জায়গাকেই এদের বাসা বলা

মরাল—মরাল বলতে আমরা রাজহাঁস। লেখক লিখেছেন যে 'এরা উড়তে পারে না।' এটা বোধহয় ঠিক কারণ এরা যাযাবর পাখি। শীতকালে গরমের দেশে অনেকটা পথই উড়ে হয়। ভাল উড়তে না পারলে এতটা ওড়া কি সম্ভব? আর ওড়ার 'সি-সিক, সি-সিক' করে ডাকে না ডাক অনেকটা নাকি সুরে 'আ-আংগা, আংগা।' অবশ্য মরাল বলতে অন্য কোন পাখিকে বোঝাতে চো কিনা বুঝতে পারলাম না।

এছাড়া বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অংশটুকুতে তৃতীয় পরিচ্ছেদে লি যে 'ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল নামে জাতের পাখিকে দেখা যায় জলে নেমে ধরতে।' জলে নেমে সাপ ধরা একে অবাস্তব। অনেক সময় জলের বিচরণরত কোন সাপ, মাছ বা ব্যাঙ ঈগল পাখি ছোঁ মেরে ধরে থাকে। সাপই এদের খা নয়, সাপ, ব্যাঙ, এবং কাঁকড়া ধরে খায়। এর বাংল 'তিলক বাজ'।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে দুই জাতের থেকে পাখির কথা বলেছেন যাদের 'ব্ল্যাক নেপড্ ব্লু ফ্লাই ক্যাচার' 'প্যারাডাইস ফ্লাই ক্যাচার'। এরা দেশীয় পাখি। অথচ দেখা যায় যে এই জাতের পাখি আমাদের দেশে প্রায় পাওয়া যায়—তারা মোটেই ভিন নয়। এদের বাংলা নাম যথাক্রমে মাথা কটকটিয়া' ও শা-বুলবুল অথবা বুলবুল।

এর পরে লেখক কলকাতার কাছ 'এমারেল্ড ডাভে'র ডাক শুনে এমারেল্ড ডাভ সাধারণতঃ জঙ্গলের কলকাতার কাছাকাছি আমি যতদূর পাওয়া যায় না।

কাজল মিত্রের 'কলকাতার বাজার' অংশে ষষ্ঠ স্তরে 'হিমালয়ের বিজ' পাখির কথা লিখেছেন। এ-রকম পাখির নাম পক্ষীশাস্ত্রে আছে বলে জানা নেই। • —**দিলীপকুমার** ফুলিয়া, নদীয়া।

বিচিত্রা

বছরেই স্বপ্ন
চায় গল্প লিখব :

। মজুমদার

াংলার শিশু সাহিত্যে রায় পরি-
সাময়িক অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে
করতে হবে। ঠাকুরবাড়ির বাইরে
পরিবারের বংশানুক্রমিক শিশু-
্য চর্চা ও সাফল্য একমাত্র রায়
রেরই আছে। উপেন্দ্রকিশোর
রঞ্জন, সুকুমার রায়, সুখলতা
লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায় এক
্রত্যেকজন প্রথম সারির শিশু সাহি-
সম্ভবত ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসেও
যাবে না। আটষট্টি বছরের
। লীলা মজুমদারের লেখার সঙ্গে
। হয়নি এমন শিক্ষিত বাঙালী
। ঘরে ঘরে তার শিশুদের জন্য
এই কয়েক দশক ধরে পৌঁছে গেছে,
আর বয়স্ক—সবার কাছেই তিনি
্য গল্পকার।

আমাদের প্রশ্ন ছিলো, লেখিকা
প্রেরণা প্রথম কার কাছ থেকে
ন তিনি। বললেন, জ্ঞানচক্ষু
র সঙ্গে সঙ্গে লেখার অনুপ্রেরণা
ছি জ্যাঠামশাইর কাছ থেকে।
দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, সুকুমার
সুখলতা রাও-এর সন্দেশ যখন
বেরোয় তখন আমার বয়স পাঁচ
। বাবা প্রমদারঞ্জন খুব কড়া মেজা-
মানুষ ছিলেন। গল্প বলতেন,
অদ্ভুত গল্প বলার ক্ষমতা আর
। দেখিনি। সার্ভে অফিসার ছিলেন,
জ্ঞতাও ছিল বিচিত্র। বছরে ছ-মাস
জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন, ছ-মাস
তে। বাড়িতে থাকতেন যখন তখন
মানুষ। কখনো উঁচু গলায় কখনো
গলায় গল্প বলে যেতেন। আমার
বছর বয়স থেকেই স্বপ্ন গল্প
বো।

শিলং-এ শৈশব কেটেছে। একটা
পকেট খাতা সব সময় সঙ্গে থাকতো,
ছ গল্প লিখতাম। বেশীর ভাগই
ু-জানোয়ারের।

প্রথম লেখা ছাপার ইতিহাস ?

বারো বছর বয়সে কলকাতা এলাম।
রজী জানি, বাংলা—একেবারেই না।
মের ছুটিতে ছোট ভাই-এর ব্যাকরণ
া মুখস্থ করে ফেললাম। তার পর
লেখা বাংলায়।

যখন চোদ্দ বছর বয়স, সুকুমার
বললেন, সন্দেশের জন্যে একটা গল্প
খ দাও। আমি খুব ভালো গল্প

বলতে পারতাম। বাচ্চারা এজন্য আমাকে খুব ভালোবাসতো। আর বলতে বসলে ঠিক এসে যেতো এজন্য আগে ভাবতে হতো না। এখনো।

আমার গল্প বলার গল্প তাঁর কানে উঠেছিলো। জ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন মাঝে মাঝে বাড়ি আসতেন। দুটো গল্প লিখে দিলাম। ছাপা হল 'লক্ষ্মী ছেলে সন্দেশ' উনিশ শ বাইশে। তারপর আর লেখা দিইনি। পরের বছর ১৯২৩শে বড়দা মারা যান।

যখন বি এ পাশ করি সুবিনয় রায় এসে বললেন, কথা শুনবো না, গল্প চাই। সেই লিখলাম 'দিন দুপুরে'। সম্ভবত আঠাশ সাল। গল্পটা এমন জন-প্রিয় হল, সুবিনয় ছাড়লো না। আমি প্রতি মাসে একটা করে গল্প দিতে লাগ-লাম। কমসাজ এফাট করতে লাগতো না লিখতে। রাফ করতে হয় না, এক-বারেই ফেয়ার। ওটাই ফাইনাল।

এম এ পাশ করার পরে রবীন্দ্র-নাথের ডাকে শান্তিনিকেতনে গেলাম। বছর খানেক ছিলাম। সন্দেশ, মৌচাকে গল্প লিখি। তখন টাকা পেতাম না। ছোটদের জন্য লেখা, তাতে আবার টাকা কি ?

রবীন্দ্রনাথ কেবলই বলতেন, গল্প-গুলো দিয়ে বই করো, হারিয়ে যাবে।

আমার অনেক গল্প হারিয়ে গেছে।

ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য এলো আমার বাড়ি। সন্দেশের ফাইল দিলাম তাঁর হাতে। সন্দেশের গল্পের ছবি আমি নিজেই আঁকতুম। আমার গল্পের—আমার আঁকা ছবি দিয়ে সাঁইত্রিশ আট-ত্রিশে বই বেরুলো, বাদানাথের বাড়ি।

ভাইপো সত্যজিৎ রায় সিগনেট প্রেসের উৎসাহদাতাদের একজন। বড়োদের জন্য লিখতে শুরু করলাম। ওখান থেকে বেরুলো 'দিন দুপুরে'। ছবি আঁকলো মানিক। রঙমশালে ধারাবাহিক গল্প চাইলো, লিখলাম 'পদী পিসির বর্মী বাক্সো'। বুদ্ধদেব এসে গল্প চাইলেন। বৈশাখী বের করতেন, দিলাম লিখে 'সোনালী রুপালী'।

মোট সাতষট্টিখানি বই এ পর্যন্ত বেরিয়েছে, আর দুখানা যন্ত্রস্থ।

ইংরেজীতে যাকে বলে প্রলিফিক রাইটার এই শ্রদ্ধেয় লেখিকাও তাই। শিলঙে কেটেছে শৈশব, প্রকৃতির কাছ থেকে যেমন প্রেরণা পেয়েছেন—লেখায় তেমনি বাবা প্রমদারঞ্জনের কাছ থেকেও পেয়েছেন সমান অনুপ্রেরণা। শিলং-এর শৈশবের কথা, গাছপালা, পাহাড়ী নদীর কথা বলতে বলতে তিনি যেনো এই অতীতের স্মৃতির জগতে ফিরে গেলেন, সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন আমাদের। ছোট-বেলায় উনি যেমন ইচ্ছে হলেই গল্প বলতে পারতেন, এখনো তেমনি খসড়া করতে হয় না কোনো লেখায়। একদম ভিতর থেকে উঠে আসে ওঁর লেখা।

বললাম, আপনার পরিবার, তৎকালীন বাংলা ইত্যাদি নিয়ে, আপনার শৈশব-দিনের স্মৃতি ইত্যাদি ও পরবর্তী জীবন নিয়ে কিছু লিখুন না। আমরা খুব উপকৃত হবো।

পরে শুনলাম লিখতে শুরু করে-ছেন। ধারাবাহিক বেরুচ্ছে অমৃতে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সজল রায়ের চিত্রকল্প ছবি

কলকাতার ফুটপাতে গুটোমাচামো হয়ে শ্রীকৃষ্ণ শুয়ে আছেন—অন্তিম শয়ন। নির্বাক বিস্ময়ে তা দেখছেন নগরবাসীরা। মহাবীর কর্ণ শ্রমিক হয়ে গাড়ীর চাকা ঘোরাবার চেষ্টা করছেন। ফুটপাতে পড়ে থাকা ম্যানহোলের ভিতর আশ্রয়হীন উদ্বাস্তুদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধরে টেলিভিশন চোখে লাগিয়ে সঞ্জয় শোষিত নির্যাতিত নরনারীর মৃত্যু দৃশ্য দেখাচ্ছেন। ক্যাবারে নর্তকী হয়ে দ্রৌপদী বারের ভিতর নাচছেন, তাঁকে ঘিরে আছে বর্তমান কালের দুর্যোধন, দুঃশাসনেরা। এই রকম মোট বারো-খানি তৈলচিত্রে রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয় ও চরিত্রকে সাম্প্রতিককালের পটভূমিকায় উপস্থিত করে শিল্পী সজল রায় চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে দুঃসাহসিক সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

সজল রায়ের ছবি

তিনি এই প্রদর্শনীতে তাঁর পূর্ব ব্যবহৃত সমস্ত উপাদান ও রূপের আমূল পরিবর্তন করেছেন। উপাদানের ক্ষেত্রে তিনি সামগ্রিকভাবে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতীয় পুরাকল্পে কিন্তু রূপের ক্ষেত্রে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন কখনও পট শিল্পের কাছে—যেমন 'বালি বধ' ও 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম'। কখনও অজন্তার গুহাচিত্রের কাছে—যেমন 'দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ'। কখনও মিশরীয় ভাস্কর্যের কাছে—যেমন 'অভিমন্যু' কখনও তাঁর পূর্ব ব্যবহৃত রূপ ও পট-শিল্পের রূপারোপের সংমিশ্রণে নতুন এক রূপের কাছে—যেমন 'যদুবংশ' ও 'কাল সন্ধ্যা'।

তাঁর তৈলচিত্রগুলির উপাদান ও বিষয়বস্তু উপস্থাপনার বিভিন্ন রূপের আশ্রয় নিয়েছেন, কোন একটি নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে থাকতে চাননি এবং উপাদানের ওজন ও গুরুত্ব অনুযায়ী রূপকে মুক্তি দিতে পারেননি, ফলে উপাদানের অমূল্য অস্তিত্ব রূপের হাল্কা ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে গেছে। উপাদান ও বিষয়বস্তুর পরি-প্রেক্ষিতে রঙ নির্বাচন ও বিন্যাস এবং রূপের মধ্যে তাল সাযুজ্য আনার ক্ষেত্রে যে ভারসাম্য একটি চিত্রের কেন্দ্রীয় মূল্য সৃষ্টি করে সেই মূল্য একমাত্র 'কাল সন্ধ্যা' ও আংশিকভাবে 'যদুবংশ' ছাড়া অন্য কোন তৈল চিত্রে দেখা গেল না: দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ যথাযথ হলেও স্ফীতকায় স্তন ও নাভিদেশের ব্যাপ্তি এবং এক চোখ বন্ধ করে অন্য চোখে তাকানোর প্রবৃত্তি চিত্রটির শৈল্পিক সংযম নষ্ট করে দিয়েছে। একই চিত্রে একাধিক বিমূর্তকরণের পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে বিমূর্ত অবয়বগুলি পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। যেমন 'অভিমন্যু'।

গত কয়েক বছর ধরে শিল্পী সজল রায় বলিষ্ঠ রেখা, উপাদান, রূপ এবং রং নির্বাচন ও বিন্যাসের যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা কারো ভুলে যাবার কথা নয়। কিন্তু বর্তমান প্রদর্শনীটি দেখে (একাডেমি অব ফাইন আর্টস, ১৮ এপ্রিল থেকে ২৪ এপ্রিল) মনে হল তিনি সেখান থেকে অনেকটা সরে এসেছেন কিন্তু স্থিরতা পাননি।

ভারতীয় পুরাকল্পকে যুগ-আবর্তের চিত্রকল্পে উপস্থিত করবার যোগ্যতা যাঁর আছে। তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন। সেই প্রতীক্ষায় থাকবো।

শ্যামল রায়

আফ্রিকা থেকে মানুষের পূর্বপুরুষ

তিনটি লক্ষণের জন্য মানুষ অ সমস্ত জীব থেকে বিশেষ রক বিশিষ্ট। মানুষের কঙ্কাল খাড়া হ হাঁটার উপযোগী। মানুষের চোখ তি বোধের (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা) রঙ দৃশ্য দেখাতে সমর্থ। মানুষের হাত যে শক্ত মুঠি ধরতে তেমনি সূক্ষ্ম ন চড়া করতে সমান পারঙ্গম। এই তিন সঙ্গে যুক্ত করা দরকার মানু মস্তিষ্ক, যার দরুন মানুষ সুকৃতিসম্ চিন্তা করতে পারে ও কথা বলতে পা এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ।

চলাচলের পক্ষে খাড়া হয়ে হাঁট পারার তুল্য উপায় আর কিছু নেই— এক অসাধারণ সার্থক পদ্ধতি। বল বলেছিলেন অধ্যাপক জে বি হলডে একমাত্র মানুষই পারে দুই-কিলোমি পথ সাঁতারে, ত্রিশ-কিলোমিটার হেঁটে, তারপরে একটা গাছে চড়ে বস আর এই খাড়া হয়ে চলাটা মোটেই স ব্যাপার নয়। সময়ের হিসেবে সেকে ভগ্নাংশ মাত্র হেরফের হলে মানুষ ম থুবড়ে মাটিতে পড়ে যেতে পারে। এ জন বিটিশ জীববিজ্ঞানী বলেছে মানুষের প্রত্যেকটি পা ফেলা হ বিপর্যয়ের কিনার ঘেঁষে চলা। পা ফে হিসেবে সামান্য ভুল হলেই খাড়া দাঁড়ানো জীবটির অনিবার্য পতন।

মানুষের হাতে অস্থি-সন্ধি অ ২৫টি এ স্পষ্টরকমের পৃথক গতিতে এই হাত চালিত হতে পা হাতের আঙুলে সমস্ত রকমের কা উপযোগী—কি হাতিয়ার ধরায়, কি কা বোনায়, কি পেন্সিল ধরে লেখায়, বোঝা বহন করায়, কি বাঁশি বাজানো

মানুষের মস্তিষ্কে আছে ১,০ কোটি স্নায়ুকোষ। আধুনিক কা বৃহত্তম ইলেকট্রনিক কম্পিউটারও তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর।

অন্যদিকে, শ্রেষ্ঠত্বের এত ক্ষমতা নিয়েও মানুষ তার স্বভাবের থেকে কখনো কখনো জন্তুজানোয়া শামিল। ঢিবির উইপোকাদের মধ্যে রকম ভেদাভেদ, গ্রাম-জীবনে মানুষে মধ্যেও তাই। ইঁদুর যেমন সর্ব গ্রাস করতে চায়, মানুষও শিম্পাঞ্জীদের দলে শিম্পাঞ্জীর শিম্পাঞ্জীর সম্পর্ক আর মানুষদের মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এ রকম।

এমন যে মানুষ, বিজ্ঞানীরা বলেন 'হোমো স্যাপিয়েন' বা মানুষ, তাকে নিয়ে বিজ্ঞানীদেরও

আগ্রহ। বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে চান মানুষের উদ্ভব কি-ভাবে ও থেকে। তাই অক্লান্তভাবে চলেছে । পূর্বপুরুষের অনুসন্ধান। এক জায়গা থেকে মাটি খুঁড়ে র শরীরের একটা টুকরো হাড়ও ওয়া যায় তো বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঠে। তখন সেই হাড়কে ভিত্তি মানুষের পূর্বপুরুষের উদ্ভব ' নানা তত্ত্ব প্রচারিত হতে থাকে। ধ্যে অনেক উদ্ভট তত্ত্বও অনেক ামায়িক স্বীকৃতি লাভ করে। সম্প্রতি আফ্রিকা থেকে মানুষের রুষের অনেকগুলো ফসিল পাওয়া । তাই নিয়েই এখন রীতিমতো াল। এতদিন ধারণা ছিল মানুষের দশ লক্ষ বছরের মতো, এখন ভাবেই বলা চলে মানুষের বয়স লক্ষ বছর তো বটেই—তারও বেশি।

আফ্রিকা থেকে মানুষের পূর্ব-ষর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ফসিল ত করেছেন বিটিশ নৃ-বিজ্ঞানী ' লিকী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই সতর্ক করে দিয়েছেন যে গোটাকতক টুকরোর ওপরে ভিত্তি করে র পূর্বপুরুষ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা সমীচীন নয়। লেক রুডোলফ-এর যে এলাকায় লিকী খননকার্য চালাচ্ছেন, সালের পরে একমাত্র সেখান ই মানুষের পূর্বপুরুষের একশোটি ন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু মিঃ মনে করেন, এই নিদর্শনগুলির সাম্প্রতিক অন্যান্য আবিষ্কার য়ে বিচার করলেও খুব একটা কিছু মতো হয় না।

বলার মতো কথা কতটুকু পাওয়া ছ? আজ থেকে এক-কোটি থেকে -কোটি বছর আগে মানুষের সম্ভাব্য 'পুরুষ ছিল রামাপিথেকাস'। জীবটি কার আফ্রিকায় ও এশিয়ায় রতের শিবালিক পাহাড়ে রামাপিথে-র ফসিল পাওয়া গিয়েছে)। রাম-কাসের ফসিল, হাতে এসেছে কটি খণ্ড মাত্র, তা থেকে এটুকুও চলে না সে খাড়া হয়ে হাঁটত কিনা। তারপরে ত্রিশ লক্ষ বছরের একটা তা থেকে যাচ্ছে, যে-সময়ের কোনো ন নেই। মনে হয় এই শূন্যতায় ই প্রকৃত মানুষের উদ্ভব।

পরবর্তী নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে থেকে ত্রিশ লক্ষ বছর আগেকার, এই ফ্রিকাতেই। দেখা যাচ্ছে, রামাপেথি-থেকে দুটি প্রধান শাখা নির্গত। টি শাখার নাম 'অস্ট্রালোপিথেকাস'। জীবটির মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা ছিল ০-৫০০ সি সি। কিছুকাল আগেও অস্ট্রালোপিথেকাসকে মনে করা হত ষের সরাসরি পূর্বপুরুষ। কিন্তু ন নিশ্চিতভাবেই জানা যাচ্ছে তার জাতি ছিল।

অন্য শাখাটি হচ্ছে মানুষ, কিংবা অন্ততপক্ষে 'হোমো' পর্যায়ভুক্ত একটি জীব। তার মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা ছিল ৮০০ সি সি (আধুনিক মানুষের ১,৪০০ সি সি)। আকারে খাটো ছিল কিন্তু সাজপোশাক পরিয়ে আধুনিক কালে হাজির করলে আধুনিক মানুষ বলে চলে যেতে পারত।

সে কি আগ্রাসী ছিল? আজ থেকে পঁচিশ লক্ষ বছর আগেকার যে-সমস্ত হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে তা দিয়ে শুধু কাটাছেঁড়া চলে, শিকার চলে না। সবচেয়ে প্রাচীন বর্শার ফলক যা পাওয়া গিয়েছে তা মাত্র এক লক্ষ বছর আগে-কার।

বলা হয়ে থাকে আদি-পুরুষ বা আদি-নারী নাকি সমুদ্রের ডলফিন-এর মতো বিবর্তিত হয়েছে। কথাটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। মানুষের সঙ্গে সামু-দ্রিক স্তন্যপায়ীদের মিল রয়েছে কতক-গুলো ব্যাপারে—যেমন, শরীরে লোম না থাকা, স্ত্রী-শরীরে মেদবহুল অঙ্গ সৃষ্টি, উচ্চ ধী, এমনকি স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক অবস্থান। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে সমুদ্র থেকে বহুবিধ জীবের ফসিল পাওয়া গিয়েছে বটে, কিন্তু কোনোটাই মানুষের মতো নয়।

তাহলে কোথায় এসে মানুষের শরীরের নির্লোম হল? বলা হয়ে থাকে, আফ্রিকায়। এই দেশটি অতি-শয় গরম ও শুষ্ক, খাড়া পায়ে থেকে মানুষকে দীর্ঘ পথ হাঁটতে হত, কাজেই মানুষের শরীরে প্রচুর ঘাম হত। আর শরীরে লোম থাকলে ঘাম হওয়াটা অসু-বিধের ব্যাপার—তাই মানুষের লোক লোপ পেয়েছে। তাই যদি হবে, মিঃ লিকী প্রশ্ন করছেন, একালের মানুষের বগলে (যেখানে যথেষ্ট লোম) এত ঘাম হয় কেন?

মানুষের শব-দাঁত খোয়া গেল কেন, কি করে সে এত বুদ্ধিমান হল, এমনভাবে কথা বলতে শিখল, হাত-দুটোকে এমন কাজের করে তুলল, খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারল—এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এমনকি এই প্রশ্নেরও যে মানুষী কেন রজস্বলা হয়? এসব প্রশ্ন মিঃ লিকী তুলেছেন।

—অমল দাশগুপ্ত

বেড নং ২১

রাজকমল চৌধুরী মারা গেছিল সনে ১৯৬৭। ক্যান্সার হয়েছিল তার। পাটনা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে রাজেন্দ্র ব্লকে ছিল বহুদিন। মৃত্যুর আগের দিন রাত্রে আমি আর মলয়,—মলয় রায়চৌধুরী—গিয়েছিলুম তাকে দেখতে। রাজকমল এমন একটা স্টেজে এসে পৌঁছে ছিল যাঁর চোখের সামনে পরিচিত-অপরিচিত সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। রেণুজীও একদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। রাজেন্দ্রনগর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে রাজেন্দ্র সার্জিকাল ব্লকে। বেশ মনে আছে, রাজকমলের সিটের পাশে রেণুজী, আমরা দুজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে—শায়িত রাজকমল ধীরে ধীরে কথা বলছে। রাজকমলের বেড নং কি ২১? ঠিক মনে পড়ছে না। হাসপাতালের চারিদিকে তখন অন্ধকার ছেয়ে এসেছিল, ব্লকে মড়া আলো জ্বলে উঠেছিল। রাজ-কমলের তখন মুক্তিপ্রসঙ্গ বেরিয়েছে সবে।

১ জানুয়ারি পাটনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেণুজীর এই ছবিটি তোলেন মনী ধর।

রেণুজীও ঐ রাজেন্দ্র ব্লকে, রাজকমল যে বেডে—সেই বেডে। রাজকমলের বেড নম্বর কি ২ ছিল? মনে পড়ছে না। শেষের দিকে তাকে অবশ্য একটা কেবিন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ ২১ নম্বর। হাসপাতালে রেণুও কম আসেন নি। ১৯৫০-এ ফুসফুস ঝাঁঝরা করে হাসপাতালে ঢুকেছিলেন, থাকতেও হয়েছিল বহুদিন। এই তো বছর তিনেক আগেও হাসপাতালে যান, ঐ রাজেন্দ্র ব্লকে। ডাঃ শ্রীনিবাস দেখেছিলেন। পেটের নাড়ি নষ্ট হয়ে গেছিল। ডাক্তার পই পই করে বারণ করে দিয়েছিলেন—খবরদার, অব খানা-পীনা জরা সমঝালকে। খাবার যৎসামান্যই, লঘুপাক ভোজন। রাত্রে দই, কিংবা পায়েস। কিন্তু পান? সেটাই তাঁকে কাবু করে ফেলেছিল। অপারেশনের ফলে টানা বিশ্রাম, আবার বিছানায় শুয়ে থাকা। যার ফলে, সেবার সংস্কৃতি বিনিময় দলের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণ হয়ে উঠলো না।

কফি হাউস থেকে বেরিয়ে কখনও কে জি কাল, বা কখনো ডি লালের দোকানে। কোকাকোলা মুখে ফেলে বলতেন—ডাক্তার এটাই প্রেসক্রাইব করেছে। কিন্তু, এই ক বছরে শরীরের এত অবনতি? জানুয়ারী মাসে জনসাহিত্য সম্মেলনে পাটনা থেকে অনেকে এসেছিলেন, সূর্যনারায়ণ জানালেন—রেণুজীর শরীর ভয়ানক ভেঙ্গে গেছে। জেল থেকে এবার বেরিয়েই শরীরের ভাঙ্গন। চিকিৎসা, পথ্য, খাওয়া-দাওয়া কিছুই ঠিক ছিল না। গ্রাম থেকে তাকে প্রায় জোর করে আনা হয়েছে, রাজেন্দ্র ব্লকে পাটনা মেডিকালে আছেন। অপারেশান হবার কথা। ডাঃ শাহী হয়তো করবেন।

কিন্তু এত সংকটময় অবস্থা—তা কল্পনা করিনি। মা'ও পাটনা থেকে চিঠি লিখেছে— রেণুজীর শরীর খুব খারাপ। রোজই রেডিয়ো বুলেটিনে তাঁর সম্পর্কে খবর বেরোচ্ছে। অপারেশন হয়েছিল ২৪শে মার্চ, তারপর আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। ক্রাইসিস কাটেনি। অর্থাৎ অক্সিজেন সিলিন্ডার টেনে আনার আওয়াজ মেজের উপরে ফুঁড়ে উঠছে না। তবে কি সমাধি? নাকি স্বপ্ন?

মুঝে অব বিশোয়াস হো রহা হ্যায়, য়হ সপনা হী হ্যায়। এবং, এই স্বপ্ন থেকে এখন আমার নিস্তার নেই, নিষ্কৃতিও নেই। কি হবে নিষ্কৃতি পেয়ে? বরং ভাল, গঙ্গার ধারে জলের ওপর নিজের প্রতিবিম্ব একবার মন ভরে দেখে, এই সুন্দর আবরণের স্তুতি করি.... জীবনভর দুনিয়া কী হর চীজ আউর হর আকৃতি মে আপনা প্রতিবিম্ব খোঁজতা রহা, দেখতা রহা, মুগ্ধ হোতা রহা....নারসিসাস (ননসেন্স।

সুবিমল বসাক

প্রতিবেদন

'অমৃত' ২৯ এপ্রিলের সংখ্যায় ফণীশ্বরনাথ রেণু সম্বন্ধে সুবিমল বসাকের লেখাটি পড়লাম। তিনি লিখেছেন—(রেণুজী সম্বন্ধে) 'বাংলা জানতেন ভালো অনেক বাঙ্গালীর চেয়েও।' পরে আর এক জায়গায়—'বাংলা, উর্দু, মৈথিলী, নেপালী ভাষায় অনর্গল প্রায় মাতৃভাষার মত ক বলতে ও লিখতে পারতেন।'

বাক্য দুটো পড়ে বিস্মিত গেলাম তাঁকে (রেণুজীকে) অবাঙ্গা প্রমাণ করার অজ্ঞতা দেখে। তিনি এক বাঙ্গালী—তাঁর আসল নাম ফণীশ্ব নাথ মুখার্জি। তিনি ছিলেন আ মেশোমশাই, তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি লক্ষ্মি দেবী আমার নিজের মাসীমা।

আশাকরি এই ভ্রান্ত তথ্য পরব সংখ্যায় অবশ্যই সংশোধন করবেন- বিশেষতঃ তাঁর আপন ও পরি জনের কাছে আপনাদের পত্রিকার সু রক্ষার্থে। বিশ্বাস করি—রেণুজী একজন বাঙ্গালী এই সংবাদ বাঙ্গা পাঠক ও সাহিত্যিক সমাজে কৌতু সৃষ্টি করবে।

বাসুদেব ভট্টা

বাঙলার বাইরে বাঙালী

হাজারিবাগ (বিহার)

সাউথ ভাগন কয়লাখ আয়োজিত আনন্দানুষ্ঠানের বৈচিত্র বেশ উপভোগ্য। নৃত্যনাট্য গীতাঞ্জলি সংগীত মহাবিদ্যালয়ের প্র জনায় সম্পূর্ণ উদীয়মান শিল্প কৃতিত্বপূর্ণ প্রয়াস। আনন্দম ড্রামা ক্লাব পরিবেশিত নাটক 'সাজাহ আনন্দদায়ক পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান এই সকল অনুষ্ঠানের উল্লে যোগ্য নাম সংগীত পরিচালক রবী সান্যাল, নৃত্য পরিচালিকা পা দাসগুপ্ত ও নাটক পরিচালক কম দত্ত। মে দিবসে ইউনিয়ন ক্লা পরিচালনায় ছায়া অভিনয়ও প্রশংসনী প্রয়াস। কয়েকদিন আগে যদুনাথ বা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ অনু অভিনীত 'বিন্দুর ছেলে' এক আকর্ষ অনুষ্ঠান। ছাত্রীদের অনুষ্ঠান পরিচা করেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃতী ছাত্র

রাঁচি সেন্ট জেভিয়ার্স কলে ছাত্র কোল ইন্ডিয়া লিঃএর আফ টি, এন, বাসুর পুত্র অশোককুমার ১৯৭৬ সালের বি-এ ফাইনাল পরী রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রে অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রথম হয়ে বাঙা ছাত্রছাত্রীদের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

হাজারিবাগ মাউন্ট কারমেল স্কু ছাত্রী সুস্মিতা দাশগুপ্ত ও সে জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্রদ্বয় সুগত ঘে ও অভিজিৎ বসু শ্রেষ্ঠ কিশোর কর্ম হিসাবে গীতাঞ্জলি সংগীত মহাবিদ্যা কর্তৃক রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হয়েছে।

দেবীপ্রসাদ ঘে

ভুলে থাকা অনেক সুবিধাজনক

কবে যে মেয়েদের চাকরী করার রীতি প্রবর্তন হয়েছে, তা আর আমাদের এখন মনে নেই। এখন মেয়েদের চাকরী করাটা মধ্যবিত্ত সংসারে প্রায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলে আর মেয়ে একই সঙ্গে চাকরী খোঁজে, ইন্টারভিউ দেয়—জীবন সংগ্রামের পথে স্বামী আর স্ত্রী পাশাপাশি পথ হাঁটে, বৃদ্ধ বাবার কাঁধ থেকে সংসারের দায়িত্ব ভাই-বোন সমানভাবে ভাগ করে নেয়। চাকরী করা মেয়েদের বিয়ের বাজারেও অগ্রাধিকার—অনেকেই চাকরী করা স্ত্রী বা ছেলের বউ খোঁজ করেন। সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের চেয়ে যে বাইরে কাজ করে মাইনের টাকাটা নিয়ে আসা সংসারের পক্ষে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়, তা এখন অনেকেই বোঝেন।

কিন্তু চাকুরীরতা বউটির প্রতি সাধারণভাবে সংসারের দৃষ্টিভঙ্গী যদি বিচার করা যায়, তাহলে চমকে উঠতে হয়। আর সবচেয়ে মর্মান্তিক মনে হয় যখন এই অসহযোগ মনোবৃত্তির প্রকাশ স্বামীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। সাধারণ মধ্যবিত্ত স্বামীদের কাছ থেকে স্ত্রীরা চাকরীর ব্যাপারে সহযোগিতা ত পায়ই না, উপরন্তু তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকলে, তাঁরা বিরক্ত হন।

একই সঙ্গে অফিস থেকে ফিরে আমার দিদিকেই যে কেন প্রতিদিন ক্লান্তিহীনভাবে রান্নাঘরে ঢুকতে হবে, ছেলেকে পড়াতে হবে, এবং রাতের বিছানা পাতা অবধি সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে আর জামাইবাবু চা খেয়ে আড্ডা মারতে বেরোবে—তা আমি একদম বুঝি না। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা মেয়েদের মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই এক ধরনের আত্ম-মর্যাদাবোধের জন্ম দেয়। কিন্তু আশ্চর্য লাগে সংসারের এই নয়মটাই স্বাভাবিক বলে চলে আসছে দেখে। এই ব্যবস্থার প্রতি স্ত্রীদেরই বা কেন কোন প্রতিবাদ থাকবে না? সাময়িক অশান্তিটা কেন বড় হয়ে দেখা দেবে।

বিনা পরিশ্রমে সংসারের কর্তাটি যেমন টাকা রোজগার করেন না, বাড়ীর বউটিকেও কেউ বসিয়ে টাকা দেয় না। একইভাবে সমান কষ্ট করে টাকা রোজগার করতে হয়। ভীড় বাস-ট্রাম, ট্রেন ঠেলে, বাড়ী ফিরতে হয়। সে কথা সংসারের আর সকলের মত স্বামীও ভুলে থাকেন। কেন না, ভুলে থাকাটা অনেক বেশী সুবিধাজনক। তাতে দায়িত্ব অনেক কম। স্ত্রী যে স্বামীর সমান—এটা মেনে নিতেও অনেক স্বামীর মানসিক বাধা থাকে।

আমার বান্ধবী নীতা ব্যাংকে চাকরী করে, ওর স্বামী প্রাইভেট ফার্মে, নীতা তার স্বামীর সমানই রোজগার করে। আর তাই তার স্বামীর ধারণা যে, নীতা মনে মনে তাকে হেয় করে। তার ফলে তিনি নীতার যে কোন বন্ধুকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে লাগলেন। নীতা বেচারী লজ্জায়, দুঃখে বন্ধুদের সঙ্গে মোটামুটিভাবে সম্পর্ক তুলে দিল—তাতেও ভদ্রলোক সুস্থ হলেন না। নীতার ওপর নানাভাবে মানসিক অত্যাচার করতে লাগলেন। নীতা যেন চাকরী করে অপরাধ করে ফেলেছে এমনি একটা ভাব এখন ওর নিজের মধ্যেও সঞ্চারিত। অথচ সংসারে টাকাটা একবার কাজে লেগে গেলে চট করে চাকরী ছাড়াটাও যে সম্ভব নয়, এটা স্বামীরাও বোঝেন।

কিন্তু এই সমস্ত চাকরী করা মেয়েদের মানসিক দিকটার কথা কেউ ভেবে দেখেন না। শুধু মাত্র তাঁদের নিজেদের জন্য নয়, চাকরীটা তাঁদের সংসারের প্রয়োজনেই করতে হয়।

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

আংকেল এখন ফুটবলের হেড মাস্টার

'ও জমানা থা, যব পসীনা গু…
অব্ আওর ভি মাজে
তো পসীনা মে বু নেহি হ্যা…

টেপ রেকর্ডারের ভেতর বেরিয়ে আসা ভরাট গলার এই শেরটি শুনে সেদিন আমি স্তব্ধ… গিয়েছিলাম। মুখোমুখি বসে দু… তালুতে মুখ ঢেকে উনিও গভীর… যোগ দিয়ে নিজের গলা শুনি… গম্ভীর গলার অনুরনন কেঁপে… থেমে যাচ্ছিল ঘরের ভারী বাতাস… জানলার বাইরে ইস্পাতনগরী বো… একাংশ দেখে মনে হচ্ছিল যেন… এক মায়ালোক, হলদে বাসি… পথ বেয়ে যেখানে পৌঁছে যাওয়া… চোখ তুলে দেখি উল্টোদিকে… লোকটির মুখে লাজুক হাসি। তর্জমা করে দিলেন শেরটির— সময় ছিল যখন ঘামকেও মনে… গোলাপ-গন্ধ, এখন আতর মা… ঘামে সুগন্ধ থাকে না।' পিটার… রাজকে সেই মুহূর্তে আমি ন… আবিস্কার করেছিলাম।

আপনারা সকলেই জানেন… থঙ্গরাজ একদা কলকাতার ম… সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির… ঘোরাফেরা করতেন শুধুমাত্র ও… দেহটির জন্য নয়— ওর বিশা… বিশ্বস্ত …টো থাবা-র কারণেও… দিয়ে উঁন গোলে ভাক্ করা বল… ফেলতেন সহজেই। শুধু হা… ছুঁড়ে মাঝ মাঠে বল পাঠিয়ে… গ্যালারীতে গুঞ্জন তুলতেন থ… ওর গায়ের এক নম্বর জার্সিটা এ… ওকে খ্যাতির এভারেস্টে তুলে… ছিল। এখন থঙ্গরাজের ভূমিকা… কোচের— বোকারো স্টিল… টিমের হেড-মাস্টারের।

বোকারোতে ওর সং… আসবাবপত্রে সাজানো ঘরটাতে বসে… ওর টেপ রেকর্ডার শুনছিলাম। … গলায় পছন্দসই উর্দু শের টে… রেখেছেন থঙ্গরাজ, রেখেছেন… স্বীকারোক্তিও— ঈশ্বর, … সঙ্গীত, প্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে… নিজস্ব অনুভূতির কথা। নি… যখন মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে… একাকী কথা বলেন যন্ত্রটির সাথে, … শোনেন— নিজের হারিয়ে… মুহূর্তগুলো ফিরে পাওয়ার জন্য। … পরিষ্কার বাংলা বলছিলেন… রাজ। চিরদিনই কম কথা বলেন।

দেশের লোক জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিয়েছেন 'ভারতবর্ষের', কি জাত ? ওর হাস্য উত্তর— 'ফুটবলার'। মাতৃভাষা কি এ প্রশ্ন করার সাহস আর আমার হয়নি। মাঠের ভেতরে ও বাইরে থঙ্গরাজকে যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে উনি সত্যিকারের একজন স্পোরটসম্যান। আহত ফুটবলারকে বুকে তুলে নিয়ে মাঠের বাইরে। পৌঁছে দেওয়ার দৃশ্যগুলো মাঝে মাঝে আমার চোখে ভাসে। শুনেছি বাইরে টুর্ণামেন্ট খেলতে গিয়েও টিমের তদারকীর ভার থঙ্গরাজ নিজের হাতে তুলে নিতেন। ঠাট্টা করে সমসাময়িক প্লেয়াররা ওকে ডাকতেন 'আংকেল' বলে।

বোকারোতে চাকরী নেবার আগে থঙ্গরাজ ছিলেন গোয়ায়— ভাস্‌কো ক্লাবকে কোচিং দিতেন। ফুটবল পাগল সেই শহরটি ছেড়ে হঠাৎ বোকারোর মতো রুক্ষনগরীর বাসিন্দা হওয়ার সাধ হল কেন জিজ্ঞাসা করায় থঙ্গরাজ ম্লান হেসে বললেন, 'কলকাতার কাছাকাছি থাকব বলে। গোয়ার চেয়ে, আফটার অল— বোকারো কলকাতার অনেক কাছে।'

ওকে প্রশ্ন করেছিলাম— 'কোন বিশেষ গুন আপনাকে এত বড়ো গোল-কীপার বানিয়েছে ?'

ওর উত্তর— 'কনসেন্টেশন— যেটা এখনকার গোলকীপারদের মধ্যে দেখি না। খেলার আগের দিন থেকে মনটা কনসেন্টেট করতাম। সারা দিন আড্ডা মারতাম না, মাঠে নামার আগে পর্যন্ত কথা বলতাম না কারো সাথে। এমন কি 'গট আপ' ম্যাচের দিন যখন অন্য সবাই ড্রেসিং রুমে বসে তামাশা করত তখনও না। বিদেশে টুর্ণামেন্ট খেলতে গেলেও খেলার পর সবাই যখন শপিং করতে যেত, আমি তখন বিছানায় চিত হয়ে মাঠের ভুলত্রুটি ভাবতাম।'

খুব ভোরে স্টীল প্ল্যান্টের ভোঁ বাজার অনেক আগে থঙ্গরাজ এখন বিছানা ছাড়েন। বরাবরের অভ্যেস— সেকেন্দ্রাবাদে আর্মিতে চাকরী করার সময় থেকে কলকাতায় দাপটে খেলে থাকার সময় পর্যন্ত। তারপর ধূপ জেবলে মোমবাতির শিখার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চলে ঈশ্বর-পুত্র যীশুর ভজনা। দস্তহাতে সরট্‌স, শক্‌স, জুতো পরে দৌড়োতে যান থঙ্গরাজ। সকালে ছেলেদের প্র্যাকটিশ করানো, দুপুরে অফিসের কাজ, বিকেলে কুমার মঙ্গলম স্টেডিয়ামের দেখাশোনা, সন্ধ্যায় নির্জনে টেপ রেকর্ডার খুলে বসা, এবং ছুটির দিনে কলকাতার ট্রেন ধরা— থঙ্গরাজের জীবনের চাকা এখন এভাবেই গড়িয়ে চলে।

থঙ্গরাজের পরিবারে কেউ নেই ? উত্তর পেয়েছি— 'স্ত্রী-পুত্র থাকেন সেকেন্দ্রাবাদে। ওরা ওদের মতো থাকেন আমি আমার মতো। ফুটবলই

খঙ্গরাজের সঙ্গে লেখক

আমার সব, ফুটবলের কথা জিজ্ঞাসা করুন, ফ্যামিলির কথা জেনে কি হবে ?'

খঙ্গরাজ গল্পটা বলেছিলেন এই ফ্যামিলি প্রসঙ্গেই। একবার রোভার্স কাপের ফাইনালের আগের দিন চিঠি এলো খঙ্গরাজের মা মরণাপন্ন। ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা চিঠিটা না লুকিয়ে ওর হাতে তুলে দিয়ে বললেন উনি দেশে ফিরে যাবেন কি না সিদ্ধান্ত নিন! খঙ্গরাজ উত্তর দিয়েছিলেন—'আমি দেশে ফিরে গেলেই কি মা সুস্থ হয়ে উঠবেন ? যা হবার তাই হবেই। গেলে ফাইনাল খেলে তারপর যাব।' সে বার ইস্টবেঙ্গল রোভার্স পায় খঙ্গরাজের জন্যই।

যে কলকাতার জন্য খঙ্গরাজ জীবনের সেরা সময়টুকু ব্যয় করেছেন—উনি না বললেও আমি জানি, সেই কলকাতার কাছে এখন খঙ্গরাজ বাইরের লোক। গত বছরই আই, এফ, এ শীল্ড ফাইনালের একটা টিকিটের জন্য মুখ শুকনো করে ওকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। এ নিয়ে ওর কোন আক্ষেপ নেই। খঙ্গরাজ জানেন— 'একটা সময় ছিল, যখন ঘামের গন্ধও গোলাপ মনে হতো, এখন আতর মাখলেও ঘামে সুগন্ধ থাকে না....।'

রূপক সাহা

হাতী আবার জেগেছে

বাঙালী দর্শকদের কাছে 'নিউ থিয়েটার্স' নামটি একটি রূপকথার মতো; নিউ থিয়েটার্সের সময়টা ছিল বাংলা সিনেমার যৌবন কাল। এই প্রতিষ্ঠান অনেক ভাল ছবি ও ভাল পরিচালক উপহার দিয়েছেন। অনেক দিন অনুপস্থিত থেকে প্রায় কয়েক দশক পরে এই নতুন করে শুরুর মুহূর্তে এ'রা সেই সত্যটাকেই প্রতিষ্ঠিত করলেন যে নাচ, হৈ-হল্লা, বেডরুম, স্টার ইত্যাদি থাকলেই ছবি সার্থক হয় না, যতক্ষণ না সেখানে একটা বলিষ্ঠ গল্প থাকে।

বাংলা ছবির ওপর দর্শকদের হতাশা যখন ক্রমশঃ বাড়ছিল, সে সময় 'শেষরক্ষা' বাংলা ছবিকে এক প্রকার রক্ষা করতে এগিয়ে এল। রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটকটি একটি কৌতুকী প্রেমের গল্প। তথাকথিত কমার্শিয়াল ছবির কোন উপাদানই এর মধ্যে নেই। তবু এই ছবি দারুণভাবে উপভোগ্য। পরিচালক তাঁর প্রথম পরিচালনার সুযোগে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন।। এতে পরিচালকের স্বকীয় প্রয়োগ তেমন কিছু নেই। যার ফলে পরিচালককে আলাদা করে চিনে ওঠাও মুশকিল। সম্ভবতঃ তিনি এটাই চেয়েছিলেন। শিশির ভাদুড়ী এই নাটকটি মঞ্চায়নের সময়ে অনেকটা নিজের ছাঁচে ঢেলে নিয়েছিলেন, তা সফলও হয়েছিল। কিন্তু এখানে এই কাহিনী অপরিবর্তিত থেকেও সার্থক।

শেষরক্ষায় যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, সেই সময়টিকে পরিচালক অনেকখানি ধরে রাখতে পেরেছেন। সাজসজ্জা, আসবাবপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু ছবিটি যখন সংলাপ, গান, ঘটনা প্রভৃতি নানা দিক দিয়েই রবীন্দ্রঅনুগামী, তখন এর অভিনয় অনেকাংশে তা নয়। অনিল, সাবিত্রী, মহুয়া, সন্তু, দীপংকর এবং আরো অনেক শিল্পীর অভিনয় উল্লেখের দাবী রাখে, কিন্তু সেখানে রাবীন্দ্রিক মেজাজ কতটা উপস্থিত ? প্রায় সব ছবিতে এই সব শিল্পীদের যে ধরনের ভঙ্গী দেখে থাকি, এখানেও তাই। একমাত্র অনিল চট্টোপাধ্যায় অনেক জায়গায় এর ব্যতিক্রম।

সেট সেটিংএ সেই সময়কে ধরে রাখার চেষ্টা হলেও তা ভীষণ কৃত্রিম

শেষরক্ষায় সুমিত্রা

ও দুর্বল লেগেছে। দৃশ্যগ্রহণ ও সম্পাদনাকেও 'মোটামুটি' আখ্যা দেওয়া যায়। ছবির চারটি গানই শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু সঙ্গীত পরিচালকের আসল দায়িত্ব যেখানে, সেই আবহ-সঙ্গীত রচনায় তিনি গতানুগতিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ক্যামেরা, এডিটিং, মিউজিক এগুলো ছবির প্রাণ। শুধুমাত্র কোনো ঘটনার চিত্রায়নেই এদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।। তাকে এক গভীর তাৎপর্য এনে দিতেও সাহায্য করে। এখানে তা অনুপস্থিত।

বিকাশ জানা

জীনত আমনের সঙ্গে কৃষ্ণ শাহ

কানাকানি

কিছুদিন আগে বম্বেতে ইন্দো-আমেরিকান কো-প্রোডাকসনে 'শালিমার' নামে একখানি ছবির মহরৎ হয়েছে। চোখ-ধাঁধানো এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ইতালির খ্যাতনামা অভিনেত্রী জিনা লোলোব্রিজিদা। পরিচালক কৃষ্ণ শাহ ছ'জন ভারতীয় এবং চারজন হলিউডের শিল্পীকে নিয়ে এ-ছবিতে কাজ করবেন। মহরৎ অনুষ্ঠানে নায়িকা জিনত আমন যে পোষাক পরে এসেছিলেন তা দেখে নাকি অনেকের চোখই ছানাবড়া। কল্পনা করে নেবার আর কোনো সুযোগ তিনি রাখেননি, চোখের আশ মিটিয়ে সবাই তাঁকে দেখেছেন দেখেছেন দেখেছেন....পলক পড়েনি বোধহয় কারও।

*

একাদিক্রমে চোট খাবার পর বাংলা ছবির 'গুরু' এখন বোধহয় থমকে দাঁড়িয়েছেন। গত বছরেও তাঁকে প্রায় পঁচিশজন প্রযোজকের চুক্তিপত্রে অটোগ্রাফ দিতে হয়েছিল। এবার অবশ্য গুরুকে আর অত অটোগ্রাফ দিয়ে হাত ব্যথা করতে হচ্ছে না। তাই বলে মনে করবেন না যে, প্রযোজকরা তাঁকে এড়িয়ে চলছেন। তা কি হয়? এখনও বাংলা ছবির ব্যবসায়ে তুরুপের তাস ঐ একটিই মাত্র। আসলে গুরুই সই দিতে চাইছেন। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি এখন নতুন ছবি নেবার আগে চিত্রনাট্য দেখছেন না, পরিচালকের হাত দেখিয়ে নিচ্ছেন জ্যোতিষীকে দিয়ে।

*

পরিচালক তরুণ মজুমদার ক'দিন আগে আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে ভাবলেন কালবৈশাখী ঝড়ের দৃশ্যটা এবার টেক্ করা যাক্। নদীয়ায় ছ'সাতজন তো সাইক্লোনে মারাই পড়ল। সুতরাং কালবৈশাখী নিশ্চয়ই তাঁকে বিমুখ করবে না। যেমনি ভাবা অমনি শুরু। মাধবী-শমিত-দেবরাজ আর স্ত্রী সন্ধ্যাকে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে তুলে নিয়ে ছুটলেন মগরার দিকে। শক্তিবাবুও ক্যামেরা নিয়ে বসে আছেন কালবৈশাখীর অপেক্ষায়। কিন্তু কোথায় তিনি? মাথার ওপর তখন ধবধবে নীল আকাশ আর পেঁজা তুলো।

*

কমেডিয়ান আসরানি ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ঢুকে ভেবেছিলেন পরিচালনার কাজটাই শিখবেন। কিন্তু নানা কারণে তা আর হয়নি। এ্যাদ্দিনে সেই শখ মেটাবার পথ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। স্ক্রিপ্টের খাতা হাতে সিমি-বিন্দিয়া গোস্বামীকে দস্তুরমতো নির্দেশ দিচ্ছেন আসরানি। নিজের প্রোডাকসনে 'চলো মুরারী হিরো বনে' ছবির পরিচালনার দায়িত্বটি নিয়েছেন।

হরিপদ দর্শক

বুক ফাটিল তবু মুখ ফুটিল না

হৃদয়কে শাসন করছিল পারিবা... সম্ভ্রম : এই নিয়েই যা ভুল ... বুঝি, এই নিয়েই পথে হল ... অংগারে নামের ছবিটির ছক মোটা... এই রকম।

বিয়ের দিনই ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় শোভা (রাখী) তাঁর স্বামী হারায়। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি তা... অপয়া বলে উপেক্ষা করেন নি। ... লক্ষ্মী হিসেবে বরণ করেছেন ... স্নেহে। ছবির শুরুতে আমরা শোভা... একটি ধনী পরিবারের সর্বময়ী কর্... ভূমিকায় দেখতে পাই।

রোদনভরা এ বসন্তের ... মহিমাই বোঝা যেত না যদি না পথিক... দুর্বৃত্তদের আক্রমণে সহসা বিপন্ন... নায়িকার উদ্ধারে ব্রতী হতেন ... ইঞ্জিনিয়ার রাকেশ (সঞ্জীবকুমার)। ... ঘটনার মধ্য দিয়ে দুটি হৃদয় ... কাছে এসেছে। তবু তাদের মিলন ... না। অভিজাত পরিবারটির একম... পুত্রবধূ শোভা তাঁর শ্বশুরের মান... সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারে...

কি হতে পারে অবশ্য ... জানাই ছিল। প্রেম যেহেতু পাপ ... এবং বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ক... বিধবা বিবাহ যেহেতু অননুমোদিত, ... বক্ষে রাকেশের বুকে শোভার ... বর্ষণকে শেষ পর্যন্ত কোনভা... আটকানো যায় নি।

প্রেমিকার নিরাপত্তা ও ... রক্ষার প্রয়োজনে সঞ্জীবকুমারকে ... মারামারি করতে হয়েছে। হিন্দী ছবি... এই ভদ্রলোক একটু আলাদা। ... এ-সবের মধ্যে দেখলে একটু ... লাগে। এ-সব ছবিতে নায়কের চে... নায়িকার ওপর দায়িত্ব বেশি ... পড়ে। রাখী সেই দায়িত্ব সামলেছেন। 'বুক ফাটিল, তবু মুখ ফুটিল না'— বাক্যাংশের তাৎপর্য তাঁকে দেখে ... কয়েক বোঝা গেছে।

এটুকু থেকে যদি কেউ ভাবেন এ তো নিরামিষ প্রেম, তিনি ঠকবেন। সে অভাব পূর্ণ করেছেন নায়িকার নন... (অলকা) ও তার নবীন প্রেমিক। ... কলেজের অনুষ্ঠানে যেভাবে নেচেছে... তার পরে বিশ্বাস করা শক্ত যে কলেজ মানে মহাবিদ্যালয়, সেখানে লেখাপড়া হয়। প্রেমে সহায়ক শক্তিরূপে ... কিম্বা বান্ধবীর বদলে, এই ছবিতে ... করেছে নায়কের পরিচারক ও নায়িকার পরিচারিকা। গানগুলি সংগীত...

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

"সুলভ সংস্করণ বিভূতি রচনাবলী"

প্রথম খণ্ড গত ১৪ই এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাহকগণকে এই খণ্ড আগামী ১৪ই জুলাই-এর মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কাউন্টার থেকে রচনাবলী সংগ্রহের সময় শনিবার ও ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন বেলা ১২ থেকে সন্ধ্যা ৬৷৷ পর্যন্ত।

॥ পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হলো ॥

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ কুড়ি টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম খণ্ড ॥ সাড়ে বারো টাকা

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের

ধর্ম ও সমাজ ১৮৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

বহ্নিশিখা (উঃ) ১৮৲ ঐ (নাটক) ৩৲

ঘুম নেই ৯৲ কলংক কথা ৮৲

॥ নতুন বই ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ পাঞ্চজন্য ১৬৲
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ আবার কর্ণফুলী আবার সমুদ্র ৮৲
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ সরাইখানা ৮৲
বিমল মিত্র ॥ চলতে চলতে ১৬৲
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ঈশ্বরীতলার রূপোকথা ১৪৲
আশাপূর্ণা দেবী ॥ পাখির খাঁচা ও খাঁচার পাখি ৯৲
প্রশান্ত চৌধুরী ॥ টুকরো কাঁচের ছবি ৮৲
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ॥ রোটারিয়ান ৭৲
জরাসন্ধ ॥ তৃতীয় নয়ন ৬৲
প্রমথনাথ বিশী ॥ বঙ্গভঙ্গ ১৪৲
বিমল কর ॥ কালের নায়ক ১১৲
নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ উল্কা (উপন্যাস) ১০৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কীর্তিহাটের কড়চা

৩০৲

মন্মথনাথ ঘোষের

নতুন রহস্য উপন্যাস

রক্ত গোলাপ ৩৲

শংকর-এর

স্থানীয় সংবাদ ৮৲

নচিকেতার

জাতিস্মর ও মৃতের আর্বিভাব ১২৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট: কলিকাতা-৭৩/৩৪৮৭৯১
৮৬/১; মহাত্মা গান্ধী রোড; কলিকাতা-৯/৩৪৩৪১২

শুক্রবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

Friday 20th May, 1977

১৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা

প্রচ্ছদ এঁকেছেন নিতাই ঘোষ
ভিতরের ছবি এঁকেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত এবং গৌতম রায়

আগামী সংখ্যায়

গল্প লিখেছেন
সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালবাসার গল্প
পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

যাদুপট ও যাদুপটুয়া
লিখেছেন সুধাংশুকুমার রায়

বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পুরোনো ত্রিভুজ

প্রচ্ছদ কাহিনী

ছবির খদ্দের কোথায়?
লিখেছেন
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ

একটি আত্মসমীক্ষা

রবীন্দ্রনাথের প্রতি জাতির প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা কতো গভীর,
এবারের জন্মদিনের অনুষ্ঠানগুলিতে তার প্রমাণ সুস্পষ্ট।
গোটা দেশ এখন এক বিরাট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ভেতর দিয়ে
এগিয়ে চলেছে। তার উপর সামনে রয়েছে নির্বাচন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও
বাঙালি তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে সরে আসেনি।
এইটেই আমাদের গর্ব, এখানেই আমাদের শক্তি।

আসলে বাঙালিরা তো বটেই পৃথিবীর সমস্ত জাতি এবং জাতিগোষ্ঠীই
হয়তো সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সংকট মুহূর্তগুলিতে
সাংস্কৃতিক উৎসের কাছেই বারে বারে উজ্জীবনের প্রেরণা খোঁজে।
আমাদের দেশে এ উদাহরণ প্রথম দেখা গেছে বঙ্গভঙ্গ রোধ
আন্দোলনের সময়। দ্বিতীয়বার এরই পরিচয় পাওয়া গেল বাংলাদেশের
ভাষা-আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের কালে। এবং কী আশ্চর্য,
তিন যুগের এই তিন আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ
নায়ক রবীন্দ্রনাথই।

রবীন্দ্রনাথকে তাই বলা চলে, আমাদের জাতির জীবনে নদীর মতো।
—যে নদী আমাদের জল দেয়, শস্য দেয়, স্বপ্ন দেয়।
রবীন্দ্রনাথই আমাদের চিন্তার জগতে সেই সংযোগ, যাকে অবলম্বন করে
আমরা পৌঁছাতে পারি বিশ্বমানবতার মহাসমুদ্রে।

কিন্তু আত্মপ্রশংসা এই পর্যন্তই, এবার কিঞ্চিৎ আত্মসমালোচনার
দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্র-স্মরণের প্রধান উপাচার গান
তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গানের ভাণ্ডারকে ঘিরে ইদানীং
কিছুটা স্থিতস্বার্থের খেলা শুরু হয়েছে অভিযোগ
শোনা যাচ্ছে, সে বিষয়ে তদন্ত হওয়া দরকার। একথা অবশ্য
ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে অনেক ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকেই সুরের
তালিম পেয়েছেন। কিন্তু অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই প্রাথমিক রূপ
এবং তার পরবর্তী স্বরলিপিতে মিল নেই লক্ষ্য করা গেছে।
অনেক ক্ষেত্রে কবি নিজেই এ পরিবর্তন সমর্থন করেছেন;
কিন্তু সবক্ষেত্রেই তিনি স্বরলিপি থেকে তোলা গানগুলি শুনেছেন
কিনা সেটাও ভাবা দরকার। তাছাড়া স্বরলিপি তো
শুধুই একটা কাঠামো, যিনি গান করেন তিনিই সুরকারের মূল পরিমণ্ডল
থেকে প্রতিমা গড়েন, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।
এবং তা করেন বলেই রক্ষা, না হলে গান না শুনে শুনতে হতো
নামতা পড়া।

বলাই বাহুল্য, কাঠামো শুধু প্রতিমার মূল চেহারার আভাস দেয়,
মূর্তির কাজ এবং রঙের কাজ শুরু হয় শিল্পীর নিজস্ব সৌন্দর্যবোধ
ও পরিমিতিবোধ, অর্থাৎ প্রতিভা দিয়ে।
আর সেইজন্যেই তো শিল্পীতে শিল্পীতে এত তফাৎ।

এই সহজ কথাটা যখন সহজে বোঝানো যায় না, তখনই সন্দেহ হয়,
রবীন্দ্রনাথ যে জীবনের কবি ছিলেন, নতুনের কবি ছিলেন
সেই কথাটাই হয়তো আমরা ভুলে যেতে বসেছি।

হাকাব্যের
র মেটিরিয়াল

বৈকুণ্ঠের বাড়ির উল্টোদিকে একটি আছে। সেখানে পাড়ার কয়েকটি ছেলে। তারা ক্রিকেট, পলিটিকস্, ফিল্ম র, বাজার দর নিয়ে কথা বলে। বৈকুণ্ঠ বয়সে বিয়ে করলে এরা কেউ কেউ তার লেমেয়ের সমবয়সী হতে পারতো।

এরা কেউ এখন আঠারো। কেউ শ। কেউ বা ছাব্বিশ। গায়ে চিকনের জাবি। পরণে হাতির কান প্রমাণ ঢোলা উজার। অনেকেই রাজনৈতিক দলের হয়ে টেছে। যদি একটা চাকরি পাওয়া যায় এই শায়।

নতুন ছবি রিলিজের দিন এরা পাত্তা। সন্ধ্যেবেলা রকে ফিরে এসে রোর ভঙ্গীতে অদৃশ্য তরোয়াল চালাবে উ—কেউ হয়তো হিরোইনের নাচের টা পায়ের দুলুনিতে তুলে দেখাবে। রও মতে নীতু সিংয়ের মত 'খোমা' না। 'খোমা' মানে মুখ বা মুখশ্রী।

এরই ভেতর চাঁদা তুলে নেশা কিংবা কনিক। বন্ধুর দাদার বিয়েতে বরযাত্রী। ড়ার কারও ড্রইংরুমে বসে টি ভি-তে নেমা। খুব বেশি রাতে ঘুম। পরদিন লায় উঠে চা। চারমিনার।

বৈকুণ্ঠ যদি কোনদিন উপন্যাস খে—তবে এরাই হবে তার র মেটিরিয়াল। ভাবে লিখবে তা জানে না বৈকুণ্ঠ। ন্তু বুঝতে পারে এরাই অলিখিত মহা-ব্যের কুশীলব।

যে-মহাকাব্যে রাম দশরথকে বলবে—ম দিয়ে খাওয়াতে পারো না—বনে ঠানোর গোঁসাই।

দশরথ : লেখাপড়া শিখেয়েছি। এখন খাও।

রাম : চাকরি কোথায়? খাবো কি?

দশরথ : ডাহা অপদার্থ।

রাম : মুখ সামলে কথা বলবে।

বৈকুণ্ঠ এদের নাম দিতে চায় : রাম, ক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, যুধিষ্ঠির, ভীম, র্জুন, নকুল, সহদেব, পবননন্দন, র্যোধন, রাবণ, মেঘনাদ, সীতা, দ্রৌপদী, ন্দু, দশরথ, কুন্তী, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, র্ণ, কুন্তী, এটসেটরা।

বৈকুণ্ঠদের পাড়ায় প্রতিনিয়ত এক ড়া মহাকাব্যের রিহার্সেল চলছে। মায়ণ, মহাভারতের মত জোড়া মহাকাব্যে রোল। অত লোক এ-পাড়ায় নেই। ই রকের ওই ভরত-ভীমকে একই সঙ্গে কাধিক রোলে অভিনয় করতে হচ্ছে।

ছবি রিলিজের দিন লাইন ম্যানেজ থেকে শুরু করে ফুটবল টুর্নামেন্টের দিন মিনিবাসের বন্ধু ড্রাইভারকে হাত করে ময়দানে চলে যাওয়া—সবই একসঙ্গে করতে হচ্ছে ওদের।

তবে রঙ্গমঞ্চ প্রধানত বৈকুণ্ঠদের পাড়া। চারটি পিচ রাস্তার ক্রসিং। ফুট-পাথ ধরে বৃদ্ধ বকুলের বীথি। ডাস্টবিনের অভাবে নিয়মিত দূরত্বে গৃহস্থদের ছাই-গাদা। আলু-পটলের খোসা।

১৯৩০-এ তৈরি জীর্ণ সব বাড়ির জীর্ণ ব্যালকনি। সিগারেটের দোকান। চায়ের গুমটি। লোডশেডিংয়ের অন্ধকার। কুকুরের পাল। ছাদে ছাদে টি ভি-র অ্যানটেনা। রাস্তা জুড়ে ক্রিকেট।

এই হল গিয়ে কুরুক্ষেত্র। এই হল গিয়ে দণ্ডক। কৌমার্য, যৌবন, স্বয়ম্বর-সভার চাঁদমারি, নির্ভুল সময়ে সিটি, খুরির চা।

বিশ বাইশ বছর আগে এঁদের যারা বাবা হয়েছেন—তাঁরা এক-একজন ধৃত-রাষ্ট্র, পাণ্ডু। তুলনামূলকভাবে সহজ সময়ের পিতা। এখন সময় কঠিন। স্নেহান্ধ মা ভাত বেড়ে বেশি রাতে রক থেকে ছেলেকে ডেকে পাঠান।

একজন বলল, বৈকুণ্ঠদা। আজ যা ওয়েদার—তাতে একটু চুল্লু হোক।

বৈকুণ্ঠ জানে চুল্লু মানে চোলাই। আমার শরীর খারাপ ভাই।

তাহলে বিলিতি টান্টু হোক।

টান্টু মানে নেশা। না ভাই আমার সইবে না।

তাহলে একখানা গজ ছাড়ো।

গজ মানে একশো টাকার নোট। কোথায় পাবো ভাই!

খুব ঘ্যাম পার্টি তুমি বৈকুণ্ঠদা। ফিস্টি করি এসো।

ঘ্যাম মানে খুব সাবধানী। সতর্ক। বৈকুণ্ঠ বলল, বেশ তো। কবে করবে?

কাপড়ের বিজ্ঞাপনে 'পুরুষের ভেতরকার সিংহে'র গোঁফ ঝোলানো মুখ নিয়ে হাসতে হাসতে একজন বলল, উল্ল; দিচ্ছে বৈকুণ্ঠদা। ও 'কবে' আর আসবে না।

বলেই ছেলেটি নিজের ডান হাতের আঙুল পিস্তল করে মুখে ছ ঘরার কিট কিট আওয়াজ তুলেই বুলেট পাঠালো বৈকুণ্ঠর পেটে। তার মুখে তখন—ডিসক্। ডিসক্। হিন্দি ছবির বুলেটের পদধ্বনি।

তখনই আরেকজন বাঁ পা-খানা নাচের তালে ঝাঁকিয়ে দিয়ে সোর্ড চালালো বৈকুণ্ঠর পেটে। জীতেন্দ্রর ভঙ্গীতে।

বৈকুণ্ঠ অমনি দু হাতে নিজের ঝুটো পেট চেপে ধরে ভিলেনের ভঙ্গীতে ফুটপাথে বসে পড়লো। মুখে মরণকালীন জবানবন্দী। উপজাতি সর্দার প্রাণের স্টাইলে। ইয়ে বুঢ়াপা... ইয়ে নয়জওয়ানী....

তখন রাস্তার দু ধারের বাড়িগুলোতে পরিতৃপ্ত গৃহস্থরা লুঙ্গি পেটে কষে বেঁধে মিঠে পান চিবোচ্ছে।

আর বাইরে রোম জ্বলছিল।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

অন্যত্র

কথাগুলোর মুখগুলোকে ঘুরিয়ে দাও
ঘুরিয়ে দাও নাগরদোলা উল্টোদিকে।
রবীন সুর। **অন্তরঙ্গ**

কবিতার জন্ম এক অশরীরা
উত্তেজনা থেকে।
দেবানু মাহাতো। **পিরামিড**

অস্ট্রিয়ার ইতিহাসে হেইডাম
এক বিখ্যাত গ্রাম.......
মৃতেরা মিছিল করেছিল এখানে।
জয়েশ ভট্টাচার্য। **সাহিত্য সানাই**

চিলির কয়েকজন পর্যটক আমাদের আলিপুরের চিড়িয়াখানাকে একটা বন্টোমোরের ডিম এনে দিয়েছিল।
প্রদীপেন্দু মৈত্র। **বর্তিকা**

দারুন দামী রোদ....অনেকগুলো ফ্রীজের দরজা খোলা যেন চারপাশে—ইউকালিপটাস ঝাউ-এর পাতায় বাতাসের শব্দ....আর দারা সিং।

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। **বোধ**

না

আমার অনুরোধ, আজ রাতে শোবার আগে একটু হিসেব করে দেখুন সারাদিনে ক'বার আপনি ক'জনকে 'না' বলতে পেরেছেন। হিসেব করলে দেখতে পাবেন, আপনার হ্যাঁ-বলার অভ্যেস এত মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, আপনি 'না' বলে উঠতে পারেন না। শুধু তাই নয়, অন্যের মুখ থেকেও আপনি 'না' শুনতে প্রস্তুত নন।

অথচ, 'না' বলতে না শিখলে সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য দেশগুলির মানুষদের সঙ্গে আমাদের যে পার্থক্যটা আমার সবচেয়ে বেশি এবং সহজে চোখে পড়ে, তা হল : ওরা অনায়াসে জোরের সঙ্গে 'না' বলতে পারে। আমরা একদম পারিনে।

আপনার ছেলে বা মেয়ে খেতে বসে বলল, আর পারছি না। আপনি কি তা মেনে নেবেন? আপনি বলবেন, পারছিস না মানে? তোর মোটেই পেট ভরেনি। নে, এ-ভাতটুকু খেয়ে নে। আপনার সন্তান অনিচ্ছা, অক্ষুধা সত্ত্বেও বাড়তি ভাতটুকু খেয়ে নেবে।

আপনি কি করলেন জানেন? তিনটে কাজ একসঙ্গে করলেন : (১) পেট ভরা, না-ভরা বিষয়ে ওর নিজের বিচারক্ষমতাকে হত্যা করলেন; (২) ওর আত্মবিশ্বাসে আঘাত করলেন; (৩) আপনার কর্তৃত্বকে জাহির করলেন।

আপনার কাছে কেউ টাকা ধার চাইল। আপনি জানেন, ধার দিলে অপনাকে কষ্টে পড়তে হবে। কিছুতেই 'না' বলতে পারলেন না। তাতে কি হল জানেন? আপনাকেই হয়তো ধার করতে হল। তারও চেয়ে খারাপ, এই যে আমরা 'না' বলতে পারিনে, এতে করে আমাদের স্বাবলম্বী হবার উদ্যোগে বিশেষ ঘাটতি পড়ে যায়।

যেখানে কাজ করেন, আপনার 'বস' আপনাকে এমন কিছু করতে বলল যা আপনি জানেন অন্যায় ও গর্হিত। আপনি 'না' বলতে পারলেন না। করে গেলেন। এমনকি হামেশাই হয়ে থাকে না?

আপনি একজন পদস্থ ব্যক্তি। অনেকে আসে আপনার কাছে অনুগ্রহের জন্যে। কাউকে আপনি 'না' বলতে পারেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রার্থনা পূর্ণ করার ক্ষমতা বা ইচ্ছে আপনার নেই। তবু আপনি 'না' বলবেন না। বলবেন, নিশ্চয় করব; অথবা বলবেন, সাধ্যমত চেষ্টা করব। যদিও আপনি জানেন কোনও চেষ্টাই আপনি করবেন না। পারবেন না, কিছু করার ক্ষমতা নেই আপনার, অথবা করা সম্ভব নয়, এ-কথাটা পরিষ্কার করে প্রার্থীদের কিছুতেই বলে দেবেন না আপনি।

চাপে পড়ে, অনিচ্ছায়, নিজের অসম্মান সত্ত্বেও অনেক কিছুতে আপনি অহরহ 'হ্যাঁ' বলে যান। আপনার জিহ্বা 'না' উচ্চারণে অভ্যস্ত নয়। 'না' বলতে আপনি ভয় পান, অথবা লজ্জা। আপনার সংকোচ হয়। এবং যেহেতু বাইরের জীবনে আপনি হ্যাঁ বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, পারিবারিক জীবনে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছে আপনি কেবল 'না' বলতে থাকেন।

প্রয়োজনের চাপে সব দেশেই মানুষকে অনেক কিছু করতে হয় যাতে তার চিত্তের সায় থাকে না। অনেক অন্যায়, দুর্নীতি, অবিচারকে মেনে নিতে হয়। বিশেষ করে আমাদের দেশে, যেখানে রুজি-রোজগারের বিকল্প সুযোগের নিতান্ত অভাব। যেখানে কর্তাদের দাপট বড় বেশি। যেখানে মানুষ হিসেবে আপনার আমার মর্যাদা খুব কমই স্বীকৃত হয়ে থাকে।

এসব আমি জানি। তবু ভেবে দেখুন, জীবনে অন্তত দু-একবার বড় একটা 'না' বলতে না পারলে কি মনে হয় না যে, মানুষ হিসেবে আমি বড় বেশি হীন হয়ে গেলাম?

আমি এক ভদ্রলোককে জানি যিনি একটা কারখানায় মধ্য স্তরের কেরাণী। কারখানায় একবার মালিকরা সব কর্মচারীদের দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্র সই করিয়ে নিতে চাইলেন যে তারা কোনও অবস্থাতেই ধর্মঘট করবে না। অনেকের কাছেই মালিকদের দাবিটা অন্যায় জুলুম বলে মনে হল। প্রত্যেকের কাছেই চাকরীর দাম কত বেশি বুঝতেই পারেন। আমার পরিচিত ভদ্রলোকের কোনও রাজনৈতিক আনুগত্য ছিল না। ধর্মঘট করার লোক তিনি নন। তথাপি তাঁর প্রত্যয় হল, মালিকদের দাবিমত কাজ করা তাঁর পক্ষে আত্ম-অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করতে রাজি হলেন না।

তাঁর ওপর অনেক রকমের চাপ এল। নিজের পরিবারে, আত্মীয়বন্ধু মহলে, কারখানায়। সবাই বলল, সই না-করে তোমার যদি চাকরী যায়, সেটা কি ভাল হবে? পারবে আর একটা কাজ জোগাড় করতে? একটা বাজে জিদের জন্যে সর্বনাশ ডেকে আনবে নিজের এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যার? ভদ্রলোক শেষপর্যন্ত সই করলেন। কিন্তু তারপর থেকে কেউ তাঁকে হাসতে দেখল না। একদিন তিনি আমায় বললেন, সই করার পর থেকে নিজেকে আর একটুও শ্রদ্ধা করতে পারছি না। যা বিশ্বাস করি তার জন্যে যদি এতটুকু দাম দেবার সাহস না থাকে, তাহলে আমার আর ঐ জন্তুটার মধ্যে প্রভেদ কোথায়?

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, সব ক্ষেত্রেই না-মানার পরিণাম শাস্তি নয়। এমন অনেক অন্যায় আছে, অবিচার আছে যাকে না-মানলে আমাদের শাস্তি পেতে না-ও হতে পারে। আমরা মেনে নি বলেই অন্যায়-অবিচার বড় বেশি প্রশ্রয় পায়। রুখে দাঁড়ালে, প্রতিবাদ করলে অনেক অন্যায় লেজ গুটিয়ে পালায়।

আমার ধারণা, আমাদের সামাজিক সংস্কৃতি শিশুকাল থেকেই স্বকীয় মত ও চিন্তনের পথে কাঁটা হয়ে থাকে। এখনও অধিকাংশ পরিবারে বড়রা ছোটদের মতামত, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কোনও দাম দেন না। ছেলে কি বিষয় নিয়ে পড়বে, কি চাকরী নেবে, তা নির্ধারণ করেন পিতা অথবা পিতামাতা। মেয়েদের বেলা বিধিনিষেধ কড়াকড়ি আরও অনেক বেশি। স্কুলে শিক্ষকরা নিয়মিতভাবে ছাত্রদের নিজস্ব চিন্তা-বিকাশকে প্রশ্রয় না-দেবার নীতি অনুসরণ করেন। ক্লাশে ছাত্রছাত্রীরা, অতএব, মুখ বুজে শিক্ষকদের বাণী শুনে যায়, প্রশ্নও করে না। কি পশ্চিমে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন অধ্যাপকদের সঙ্গে বিতর্কে মেতে ওঠে। আমাদের দেশে বিতর্ক তো দূরের কথা, কলেজের, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ধারাল প্রশ্ন বিশেষ শোনা যায় না। অধ্যাপকরা সাধারণত ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব মতামতকে আমলই দিতে চান না।

যেহেতু জীবনের অন্য সব ক্ষেত্র থেকে প্রতিবাদ, প্রতিম ইত্যাদি প্রায় নির্বাসিত, আমাদের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়বার প্রবণতা এত বেশি যে এ্যাগ্রেসিভ ইনস্টিনক্ট তাদের রক্তের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, তা প্রকাশ পায় মিছিলে, স্লোগানে, রাজনৈতিক উত্তেজনায়, মাস্তানগিরিতে। তাদের এ্যাগ্রেসিভ ইনস্টিনক্টগুলিকে সৃষ্টিশীল পথে প্রকাশের সুযোগ দিলে আমাদের গোটা সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন আরও ধারাল হতে পারে।

ায় একাধিক সংস্কৃতিতে 'না' বলার রেওয়াজ নেই। ীরা 'না' বলতে চায় না। 'না' বলা শুধু রূঢ়তা নয়, াংস্কৃতিকও। জাপানী সামাজিক সংস্কৃতি কনসেন-র ওপর নির্ভরশীল। সবাই মিলেমিশে মধ্যপথে রত হয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া এই সংস্কৃতির প্রধান রণ। অতএব এতে 'না'-এর স্থান নেই। আপনি ক সময় কোনও প্রস্তাব নিয়ে জাপানীদের কাছে চিঠি লে জবাব পাবেন না। এক্ষেত্রে জবাব না দেবার প্রধান া 'না' বলার অপ্রস্তুতি। জাপানীরা মনে করে, 'না' র চেয়ে নীরব থাকা অনেক রুচিসম্মত।

ররাও সহজে 'না' বলতে পারে না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে । যাতে শ্রোতা আঘাত না পায়, ব্যথিত না হয়। দের সঙ্গে যারা লেনদেন করেন, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ন, তাঁরা নিশ্চয় এটা লক্ষ্য করেছেন। এবং মুস্কিলে ছেন। 'হ্যাঁ' এবং 'না'-র মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখা দের কাছে কিছু অন্যায় নয়। ওটা 'না' বলতে না-র সংস্কৃতি থেকে নির্গত প্রাচীন সামাজিক ব্যবহার। একটা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের লোকেরা অত্যন্ত । অতি সহজে, সরল ভাষায় তারা না বলতে পারে। রতে পারবে না, বা করবে না, তা পরিষ্কার জানিয়ে া পাশ্চাত্য সামাজিক ব্যবহারের স্বাভাবিক অঙ্গ। এবং ারণেই ওদের 'হ্যাঁ'-এর দাম আছে। কেউ যদি বলে হবে' বা 'হ্যাঁ করব', তাহলে তা হবার ও করবার

...মানুষ হিসাবে আপনার মর্যাদা যেন স্বীকৃত হয়ে থাকে

সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

পশ্চিমে একটা চলতি কথা আছে : অ' ঈষ' লোর্ড গড জার্নট্ সে নো। তরুণীদের 'না' বলতে শেখা বিশেষ প্রয়োজন। পরশুরাম বাঙ্গালী মেয়েদের 'না'-র মানে 'হ্যাঁ' ধরে নিয়েছিলেন। এখনও কি তাই আছে ?

আমার কিন্তু ধারণা, স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্মের যুবক-যুবতী ও বালক-বালিকারা অন্তত কিছুটা 'না' বলতে শিখেছে। গৃহে তারা খুব একটা বাধ্য নয়। তাদের আহার, পোষাক, চালচলন ইত্যাদি নিয়ে 'না' বলার অভ্যেস হচ্ছে। অনেক অভিভাবক এ নিয়ে উদ্বিগ্ন, ভীতও। আমি কিন্তু এটাকে সুলক্ষণ বলে মনে করি। অল্প বয়স থেকে ছেলে-মেয়েদের নিজস্ব চিন্তা, বিচার, সিদ্ধান্ত তৈরি হতে দেবার আমি পক্ষপাতী। তাহলে বর্তমান যুগের জটিল জীবনের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে তারা তৈরি হতে পারবে।

আমি মানুষের মধ্যে একটু বেয়াদপি, একটু বিদ্রোহ, কিছুটা প্রতিবাদ দেখতে ভালবাসি। এগুলোর অভাবে জীবন অতি সহজে বাসি আর ভোঁতা হয়ে ওঠে।

দেখুন না, এ-দেশের আম জনতা কি সুস্থির দুঃসাহস আর চমৎকারী দৃঢ়তার সঙ্গে একটা বিরাট 'না' লিখে দিল ভারতবর্ষের আকাশে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে। যতদিন তারা এমনিভাবে 'না' বলতে পারবে, ততদিন আমাদের গণতন্ত্র বাঁচবে, কোনও দলের, কোনও নেতার কোনও প্রচেষ্টাই তাকে হত্যা করতে পারবে না।

সমালোচনা

'মানুষের জন্য' মানুষ

এখনো মানুষের জন্যই অবশিষ্ট আছে মানবতা। এই উপলব্ধির কথা প্রফুল্ল রায় বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন তাঁর সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস 'মানুষের জন্য'-এ। এই প্রফুল্ল রায় 'পূর্বপার্বতীর' কিংবা 'এখানে পিঞ্জর'-এর প্রফুল্ল রায় নয়। যেন অন্য কেউ। যেমনভাবে ফাদার হ্যারিস ম্যাকফারসন চারটে পঞ্চাশের ডাউন লোকাল ট্রেনে নেমে পড়েছেন রাজানগরে। তিন মাস কলকাতার হাসপাতালে কাটিয়ে ছত্রিশ বছরের এক পরিচিত জগতে এসে মুখোমুখি হয়েছেন ভিন্ন এক রাজানগরের সঙ্গে। এই অপরিচয়ের বেদনাই ফাদারকে বিষণ্ণ করেছে, চিন্তিত করেছে এবং অত্যন্ত টান টান দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ঘটনার বা সবসময়ের সঙ্গে। রাজানগরের যুবকেরা ওয়াগন ভাঙে কিংবা চিরস্থায়ী পুজোতে ব্যস্ত থাকে। অসহায় যুবতীর দখল নিতে চায়। ব্যবসায়ী মহাজন মালিক ইনকাম ট্যাক্সের উকিল কিংবা রেলের বাবু রাত্রি যাপন করেন বেশ্যালয়ে। এরাই পরোক্ষে মিউনিসিপ্যালিটির দখল নেন। নির্বাচন লড়েন। ছাত্রেরা রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরে না। বোবা ভিখিরী যুবতী ধর্ষিতা অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকে। স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করে।

এ ছবি রাজানগরের। রাজানগরের কেন, আরো শ' দুই তিন নগরের নাম এই মুহূর্তেই করা যেতে পারে। এই সময়ে অর্থাৎ এই পরিপ্রেক্ষিতে ফাদার হ্যারিস যিনি এসেছিলেন মিশন স্কুলের শিক্ষকতা করতে ইংল্যান্ডের এক চার্চ থেকে, তিনি হয়ে পড়েছেন হরিশচন্দ্র, রাজা হরিশচন্দ্র।

ফাদার হ্যারিসের বাড়িতে স্থান পেয়েছে ধর্ষিতা বোবা ভিখিরী।

ফাদারের আশ্রয়ে সে দুর্গা, দশভুজা। মা-বাপ হারানো ছেলেপিলে। এবং লম্পট জেনারেশনের আক্রমণ থেকে মুক্ত শিবানী, তার বোন।

ফাদার রাস্তার মোড়ে প্রকাশ্যেই পাঞ্জা লড়েন, প্রতিপক্ষকে সচেতন করে তোলেন। দোকান-বাজার করেন। প্রেমিক-প্রেমিকাকে মদত দেন। নির্বাচনে সুযোগসন্ধানীদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য করেন। এবং স্বামী পরিত্যক্ত মহিলার শিশুকন্যা টুকটুকিকে নিয়ে বেড়াতে যান। এসবই মানুষের জন্য। মানুষেরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত দুষ্ট চরিত্র ফাদার হ্যারিস ম্যাকফারসন। বিলেতের পাদ্রী সাহেব রাজানগরের রাজা হরিশচন্দ্র। ফাদার আক্রান্ত হন। তাঁর পিঠে ছোরা বসে যায়। আক্রমণকারীরা হাজতে চালান হন। কোর্টে সাক্ষ্যদানকালে ফাদার আক্রমণকারীদের সনাক্ত করেন না। তারা মুক্তি পায়। ক্ষমা করেন ফাদার।

'ফাদার হ্যারিসের মনে হতে লাগল মানুষের ওপর এখনও বিশ্বাস রাখা যায়।'

'মানুষের জন্য' এভাবেই শেষ হয়েছে। প্রফুল্ল রায় সম্প্রতিকালের একজন বিশিষ্ট কথাশিল্পী একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কাহিনীর বিন্যাসে বিন্দুমাত্র ফাঁক নেই। পড়তে

প্রফুল্ল রায়

আরম্ভ করলে ভুলে যেতে হয় প্রাত্যহিক কাজকর্মের কথা। আকর্ষণের যে মন্ত্র পাঠককে মুগ্ধ করতে সহায়—প্রফুল্ল রায়ের তা কণ্ঠস্থ, কণ্ঠস্থ নয়, কলমের নিব বা রিফিলও সে বিষয়ে শিক্ষিত। এবং দায়িত্ব সচেতনতা ইত্যাদি বহু বাঁধাবুলি সমালোচনায় চালু আছে—একজন লেখক সম্পর্কে, অভিজ্ঞ প্রফুল্ল রায়ের সামনে বা পেছনে এসব বিশেষণ জুড়ে দেওয়াতে কালক্ষেপের প্রয়োজন হয় না। কেননা তাঁর কাহিনী কিংবা চরিত্ররা সবই সাম্প্রতিক সময়ের ওপরই বসবাসকারী কিংবা ঘটনা। চালাকি, শঠতা বা নামাবলী গায়ে চাপিয়ে নিজের আদর্শ প্রচারের চিরকালের বিমুখ এই প্রফুল্ল রায়কে বাঙলা উপন্যাসের যে কোনো পাঠকই চিনে গেছেন, তাঁরা জানেন প্রফুল্ল রায় মানুষের স্বপক্ষেই লেখেন, লিখতে অভ্যস্থ। এবং ফাদার হ্যারিস ম্যাকফারসনকে রাজা হরিশচন্দ্রতে রূপান্তর করেন মানুষের জন্যই। 'মানুষের জন্য' শুধু এই কারণেও মহৎ উপন্যাসরূপে চিহ্নিত হতে পারে।

প্রভাত চৌধুরী

মানুষের জন্য। প্রফুল্ল রায়। শৈব্যা পুস্তকালয়। ৮।১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা ১২। দাম সাত টাকা।

আঠার শতকের বাঙলা

পলাশীর যুদ্ধে ভাগ্য বিবর্তন ঘটে বাঙালীর। আর তারই ফল ভোগ করে চলেছে বাঙালী। ইংরেজরা আসবার পর বাঙালীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারায় এমন আঘাত সৃষ্টি হয় যা বাঙালীকে দীর্ঘকাল মুহ্যমান করে ফেলেছিল। অথচ এই দেশের ওপর ভিত্তি করেই চলত গোটা ব্রিটিশ রাজত্ব। শোষণ ও শাসনের জগদ্দল পাথরে চাপা পড়েছিল বাঙালী। বাঙালীর স্বাধীনতাকে অম্লান রাখতে অপ্রিয় নবাব সিরাজদ্দৌলা আত্মবিসর্জন করেছিলেন। ইংরেজদের কলকাতা ছাড়া করেছিলেন। অথচ একমাত্র ইতিহাসের পাতায় ছাড়া সিরাজের কলকাতা বিজয়ের কোন স্মারকপত্র নেই। সিরাজের কলকাতা অভিযান ছিল বেশ রোমাঞ্চকর। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজের কলকাতা বিজয়' গ্রন্থে আছে তারই উপভোগ্য বিবরণ। কাশিমবাজারের রেশমকুঠি আর জীবনপুরের নীলকুঠি বাঙালীর জীবনে এক কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। তার বিবরণ তুলে ধরেছেন শ্রীঘোষ। নীলচাষ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বেশ আকর্ষণীয় ও মূল্যবান। চন্দননগরে ফরাসীদের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী ইম্পে ও নন্দকুমার প্রসঙ্গ এবং আঠার শতকের বাংলার অর্থনীতিক চিত্র শ্রীঘোষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে তুলে ধরেছেন। বইটির মধ্যে ইতিহাস অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বর্ণনাভঙ্গীই উল্লেখযোগ্য। আঠার শতকের বাংলাকে জানবার পক্ষে বইটির গুরুত্ব অপরিসীম।

সিরাজের কলকাতা বিজয়—হেমচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক : শংকর বসু। নবপল্লী ৭৪৩২০৩। ২৪ পরগণা (উ)। দাম [illegible] টাকা।

পশ্চিমবাংলা কোন্ পথে

প্রচ্ছদে যে-নামটি পাঠক দেখবে বইটির বিষয়বস্তুও তাঁকে সেই দিকে নিয়ে যাবে। আপনি পশ্চিমবঙ্গে শুভাকাঙ্ক্ষী হোন আর নাই হোন, পশ্চিমবঙ্গের অবনতির কারণ হিসেবে যে ত্রিরিশ তথ্যনির্ভর প্রবন্ধমালা এই বইটি উপহার দিয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ আর বৈষম্যমূলক নীতি স্বীকার না করে আপনার কো[illegible] উপায় থাকবে না। প্রবন্ধগুলি বিভি[illegible] সময়ে বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয়ে[illegible] ইংরেজিতে। সংকলনটি প্রবন্ধগুলির অনুবাদ। অনুবাদক বিজন চক্রবর্তী।

বৃটিশ আমল থেকে সিদ্ধার্থশং[illegible] রায়ের মন্ত্রিসভা পর্যন্ত পশ্চিমবা[illegible] খুঁড়িয়ে চলা অর্থনৈতিক আর ক[illegible] অবনতির কারণ বিশ্লেষণ করেছেন লেখ[illegible] এবং এই বিশ্লেষণের ভিতর কোন য[illegible] নেই। তথ্যগত স্বনির্ভরতায় আর যুক্[illegible]

...শোষণে প্রবন্ধগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। ...তিহাসিক পটভূমিটি অন্যান্য প্রবন্ধ-...লিকে অনেক বেশি বিশ্লেষণধর্মী ও ...র্ণপূর্ণ করে তুলেছে। কোন একটি ...শেষ কারণ পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংসের দিকে ...য়ে যাচ্ছে না—অনেকগুলি কারণ ...মিলিত হয়ে এই কাজটি সমাধা করেছে। ...মাত্র বৃটিশ শোষণ ও লুণ্ঠন নয়, ...দ্রীয় সরকারের নীতিও এই লুণ্ঠন-...র্ষে যোগ দিয়েছে। ১৯৫৬ সালে ...মাচারি সারা ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের ...-সমতা স্থাপন করেন। এর ফলে ...র্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে ও পশ্চিমবঙ্গে ... খনিজ পদার্থগুলির সহজলভ্যতা যে ...বিধা প্রদান করেছিল, তা চূর্ণ হয়। ...ঠক পড়তে পড়তে আশ্চর্য হবেন জেনে ... পরিকল্পনা কমিশনের কাছে এমন ...ন তথ্য নেই যার দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যের ...নতি ও উন্নতির পরিমাণ ও তার ...রণ জানা যেতে পারে। আপনি আরও ...শ্চর্য হবেন, যখন জানবেন ১৯৪৭ সালে ...শ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় ছিল ...াধিক, সাক্ষরতায় সে ছিল কেরালার ...রেই। ১৯৫১ সালে কলকাতা ছিল ...রতের বৃহত্তম বন্দর। ১৯৫০ সালে ...শ্চিমবঙ্গ সর্বক্ষেত্রে উৎপাদনে কেবলমাত্র ...ত্তরপ্রদেশের পিছনে ছিল, যদিও উত্তর-...দেশ আয়তনে তিনগুণ ও জনসংখ্যায় ...ড়াইগুণ বড়। পশ্চিমবঙ্গ ১৯৬১ সাল ...নাদ মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে নেমে যায় ...তীয় স্থানে, সাক্ষরতার দিক থেকে ...ম স্থানে আর ১৯৬৮-৬৯ সাল নাগাদ ...লকাতা চতুর্থ বন্দরে পরিণত হয়। ...ন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই ক্রম-অবনতির ...রণগুলি সম্বন্ধে কোন সমীক্ষা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের ধ্বংসের কারণ বিশ্লেষণ ...রতে গিয়ে লেখক কেবলমাত্র কেন্দ্রের ...ীতিগুলিকে তুলে ধরেননি, পশ্চিমবঙ্গের ...ভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দিকটিও বিশ্লেষণ ...রেছেন, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'যুক্ত-...ন্টের মধ্যে মিনিফ্রন্ট' নামক যুক্তফ্রন্ট ...ন্ত্রিসভার সম্বন্ধে আলোচনাটি খুব ...ষ্ট। মন্ত্রিসভার অন্যতম প্রধান শরিক ... পি এম-এর কার্যকলাপের বিশ্লেষণ ...রেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ও ...ষ্ট ভাষায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ... পি এম-এর দলীয় স্বার্থে পুলিশ ...তর কাজে লাগানো বা অন্যান্য দলগুলিকে ...ক্যবদ্ধ না করে পরস্পরবিরোধী করে ...চালায় সি পি এম-এর অগ্রণী ভূমিকা ...হণ ইত্যাদি ঘটনা লেখক দ্বিধাহীন ...বায় ব্যক্ত করেছেন। যুক্তফ্রন্ট ...ন্ত্রিসভা ছেড়ে যাবার পর আমরা জেনেছি ...ন্ত্রিসভা ভাঙার পেছনে সি পি এম-এর ...গত স্বার্থ কত বড় ছিল। বইটির ...লিকত্ব নিহিত এইখানে যে, সত্য ...ঘাটনে বইটি কখনই ঝিমিয়ে পড়েনি। ...নির্ভর এ-সত্য লেখকের স্বাধীন মনের ...রিচয় বহন করে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ...রপেক্ষ।

১৯৭১ সালের নির্বাচনের পর মিসা ...াইন দ্বারা পুলিশ অনেক বেশি ক্ষমতা-সম্পন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীমাত্রই পুলিশের এই অসীম ক্ষমতার কথা জানেন। সেই সময়কার পুলিশী কার্যকলাপ আর আইন-শৃংখলার প্রশ্নে লেখক সত্যনিষ্ঠতার পরিচয় রেখেছেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি তখনকার কাগজ থেকে তুলে একত্র করেছেন। অনেক হত্যার মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ হত্যা হেমন্ত বসু, নেপাল রায় ও চণ্ডীপদ মিত্র। হেমন্ত বসু হত্যা-কাণ্ড সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কাগজ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের কার্যকলাপের প্রতি স্পষ্ট অঙ্গুলি-নির্দেশ আছে। কেস শেষ হবার পর আমরা জানি, পুলিশের ধৃত আসামীরা সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়েছেন। পাঠকের বুঝে নিতে কষ্ট হবে না, কারা এই হত্যার নিয়ন্ত্রক।

লেখকের দৃষ্টির সামগ্রিকতার অভাবও বইটিকে ত্রুটিপূর্ণ করেছে। সাংবাদিকতার বেড়া ডিঙিয়ে কখনও কখনও প্রবন্ধকারের প্রয়োজন পাঠক অনুভব করবেন। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি ও শিল্পে উন্নত—তাই শোষণের স্পষ্ট দিকটি পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত বেশি প্রকট কিন্তু সমগ্র সমাজের গঠনই এর মূল কারণ। এই দিকটির প্রতি লেখকের দৃষ্টিপ্রসার ঘটলে প্রবন্ধগুলি পূর্ণাঙ্গ হত।

যোজন গঙ্গোপাধ্যায়

ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ—রঞ্জিৎ রায়। দেশ প্রকাশন। ৭৯।১বি মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯।

পর্তুগীজ সৈন্য

সুন্দরবনের লুপ্ত সভ্যতা

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

বৈচিত্র্যময় অরণ্য সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে দৈর্ঘ্যে পূর্ব-পশ্চিমে একশ আশি মাইল এবং প্রস্থে ষাট থেকে আশি মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে ভাগীরথী ও পূর্বে মেঘনা নদী প্রবাহিত। অবিভক্ত বাঙলার বাখরগঞ্জ, খুলনা এবং চব্বিশ পরগণার ৩ হাজার ৮৯ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে ছিল সুন্দরবন। দেশ বিভাগে সুন্দরবনও বিভক্ত হয়ে যায়। সুন্দরবনের যে অংশ পশ্চিম বাংলায় পড়েছে তার আয়তন ৯,৬২৯'৯, বর্গ কিঃ মিঃ এবং লোকসংখ্যা প্রায় বাইশ লক্ষ। শতকরা ৪৮-৩ ভাগ এলাকা সংরক্ষিত বনাঞ্চল। মূল ভূখণ্ড ছাড়াও এই এলাকায় আছে ৫৪টি দ্বীপ। নদী, নালা ও খাঁড়ি দিয়ে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন জটিল, তেমনি এখানে জীবনধারণও কষ্টসাধ্য। বন কেটে বসতি ও চাষের জমি তৈরি হয়েছে।

এক শ্রেণীর ভূতত্ত্ববিদদের অভিমত বাঙলাদেশের এই অংশটি খুব প্রাচীন নয়। সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত এই ভূখণ্ড। কিন্তু ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত হল বহু প্রাচীনকালে এই স্থানটি নিমজ্জিত হওয়ায় স্থানটির ভূসংস্থানের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য হালে পাওয়া গেছে বহু প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। গঙ্গাসাগর সঙ্গমতীর্থ ও কপিলমুনির আশ্রম ভারতের সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। বায়দীঘি নদীর পশ্চিম তীরে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার মথুরাপুর থানায় কাঞ্চন দীঘির পশ্চিম তীরে ভাটির সময় ১২ ফুট মাটির নিচে দেখা যায় বড় বড় ইট। এগুলি মৌর্যযুগের ইটের মত। এরকম সুন্দরবনের বহু স্থানেই দেখা যায়।

সুন্দরবন এক সময় ছিল জনবসতিপূর্ণ। সমতট বা বগড়ী বা ব্যাঘ্রতটীর অন্তর্গত ছিল সুন্দরবন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ছিল সব থেকে বেশী। সমতটে বহু দিগম্বর জৈন, বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারাম এবং হিন্দু মন্দির দেখেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ। তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। সম্ভবত এগুলি চলে গেছে মাটির গর্ভে। কারণ, এখানকার নরম মাটির ধ্বসে যাবার প্রবণতা রয়েছে। সাগর দ্বীপের কাছে এবং খুলনা জেলায় বৌদ্ধযুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। মুসলমান আমলে সুন্দরবন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিচিত ছিল ভাটিপ্রদেশ নামে। সুন্দরবনে বহু সমৃদ্ধ জনপদ ও সুন্দর সুন্দর নগরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস অনেকের। সম্ভবত মগ ও পর্তুগীজদের অত্যাচারে এই সব জনপদ ধ্বংস হয়েছিল। এখানকার মাটির নীচে বড় বড় পুষ্করিণী, মন্দির অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। মাটির নীচে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা গাছও দেখা যায়। তবে, সুন্দরবনের ব্যাপকাঞ্চলে জনবসতি না থাকলেও বিক্ষিপ্তভাবে যে জনপদ গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রামায়ণের বালকাণ্ড, হিরণ্যবংশ সর্গ এবং মহাভারতের বনপর্ব ১১৪ অঃ সাগরসঙ্গমের উল্লেখ আছে। পদ্ম পুরাণের ক্রিয়াযোগসার, ৫ অঃ আছে এই তীর্থক্ষেত্রে ছিল বিস্তৃত জনপদ। সেখানে রাজত্ব করতেন চন্দ্র বংশীয় রাজা সুষেণ। তাঁর সভায় এসেছিলেন লঙ্কাদ্বীপের দীপাবতীনগরের রাজা গুণাকরের কন্যা ও তালধ্বজ নগরের রাজপুত্র মাধবের পত্নী সুলোচনা। তিনি বীরবর নামে পুরুষ বেশ ধারণ করে গঙ্গায় জীমনাদকে বধ করেন। এ থেকে বোঝা যায় সুন্দরবনের সাগরসঙ্গমে ছিল জনপদ এবং অরণ্য দুইই।

সুন্দরবনে যেসব প্রাচীন কীর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে, তার সবই গুপ্ত পাল ও সেন যুগের। তার পূর্ববর্তী সময়ের কোন নিদর্শনের সন্ধান মেলে নি। কিন্তু উত্তর চব্বিশ পরগণার বেড়াচাঁপা ও জালালপুরে খ্রীঃ পূঃ ১ম ও ২য় শতকের বেশ কিছু পুরাকীর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। বেড়াচাঁপা গ্রামের চন্দ্রকেতুগড় ও বরাহমিহিরের ঢিবিতে ইট পোড়ামাটির বিস্ময়কর নিদর্শন রয়েছে। এসব নিম্নবঙ্গে সুপ্রাচীন মনুষ্য বসতির নিদর্শন। গুপ্তযুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে কালীঘাটে (মুদ্রা), খুলনা জেলার ভরতভায়নার স্তূপ,

হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত
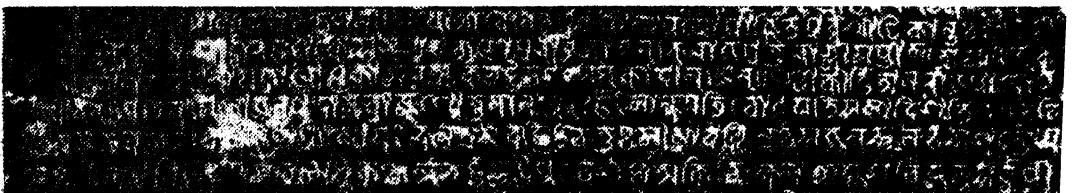
জয়নগরের কাশীপুর ও সরিষাদহে প্রাচীন শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এ সময়ে ছিল সম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল। মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব ঘটেছে। রঘু বংশে রঘু দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে ঐ সময়ে নিম্নবঙ্গের মানুষ নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিল এবং শক্তিও ছিল যথেষ্ট।

গুপ্তযুগের পর মাৎস্য ন্যায় এবং পাল রাজত্বের সৃষ্টি। গোপাল সমুদ্রতীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাছাড়া গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালদেবের ভ্রাতারা নিম্নবঙ্গে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে এসে পূজা দিয়েছিল।

সুন্দরবনের ১১৬ নম্বর লাটে ১০০ ফুট উঁচু জটার দেউলের সন্ধান পাওয়া গেছে। মন্দিরের কাছে যে তাম্রপট্টলিপি পাওয়া গেছে, তার থেকে জানা যায় ৯৭৫ খ্রীঃ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন রাজা জয়ন্তচন্দ্র। জটার দেউলের পশ্চিম দিকে একটি জনপদের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পাল রাজত্বের পর সেন যুগ। সে সময়ে ২৪ পরগণার আলিপুর, বেহালা, ফলতা, ডায়মন্ডহারবার, কুলপী, বেতড়, খান্ডী প্রভৃতি অঞ্চল ছিল সেন রাজত্বভুক্ত।

সুন্দরবনে যেসব পুরাকীর্তির নিদর্শন, তাহলে মুসলমান পূর্ববর্তী যুগের সুতরাং মুসলমান রাজত্বকালের আগেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোন কারণে সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো সুন্দরবনের স্বাভাবিক ঘটনা। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এই অঞ্চলে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় স্বাভাবিক ঘটনা। কখনও কখনও ঘূর্ণিঝড় তীব্র ও মারাত্মক হয়ে ওঠে। ১৭৩৭ খ্রীঃ এবং ১৮৬৪ খ্রীঃ দুটি ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ে যথাক্রমে তিন লক্ষ এবং পঞ্চাশ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। ১৯৪২ খ্রীঃ এবং ১৯৭০ খ্রীঃ দুটি প্রলয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

নিম্নবঙ্গে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গৌড়বিজয়ের অনেক পরে। পরাস্ত সেন রাজারা আশ্রয় নিয়েছিল পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে। নদীবহুল এই অঞ্চলে তারা দীর্ঘকাল মুসলমান আক্রমণকারীদের নানাভাবে প্রতিরোধ করেছিল। সম্ভবতঃ ১৪৬৫ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে সুলতান রুকনুদ্দীন বরাবকের রাজত্ব কালে দক্ষিণ বঙ্গে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময়ে বসিরহাটে নির্মিত শাহী মসজিদটি এখনও বর্তমান।

পাঠান রাজত্বের অবসানের পর শুরু হয় মোগল আমল। সে সময়ে চব্বিশ পরগণার উত্তরাংশ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হলেও দক্ষিণাংশ ছিল অরণ্যাবৃত, কর আদায়ের অনুপযুক্ত। এই সময়ে মগ ও ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে ভাগীরথী তীরবর্তী জনপদগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে থাকে। সেই সঙ্গে বেড়ে যায় সুন্দরবনের আয়তন।

হিন্দুযুগে—বাংলার পাল সেন আমলে দেশের সবচেয়ে বড় বিভাগকে 'ভুক্তি' (প্রদেশের মত স্থান) বলা হত, ভুক্তির অধীনে বিভাগগুলির পরিচয় ছিল—'বিষয়' বা 'মণ্ডল', মণ্ডল ছিল কয়েকটি ছোট ছোট বিভাগ বা 'চতুরকের' সমষ্টি।

ঐ সময় বাংলার ভুক্তিগুলির মধ্যে আয়তনে বৃহৎ ও বিখ্যাত ছিল—'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি' ও 'বর্ধমান ভুক্তি'। এ দুটি ভুক্তিরই সীমা ছিল উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভুক্তি দুটি পাশাপাশি, মধ্যে গঙ্গানদীর ধারার বিভক্ত। গঙ্গার পশ্চিমতীর বরাবর 'বর্ধমান ভুক্তি' ও পূর্বতীরের সকল স্থান 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি'র মধ্যে ছিল। ঐ দুটি ভুক্তির দক্ষিণতম অংশ বা দক্ষিণতম বাংলা ছিল খাটিকা বা খাড়িমণ্ডল বা বিষয়ের মধ্যে, এই মণ্ডলের বিস্তৃতি
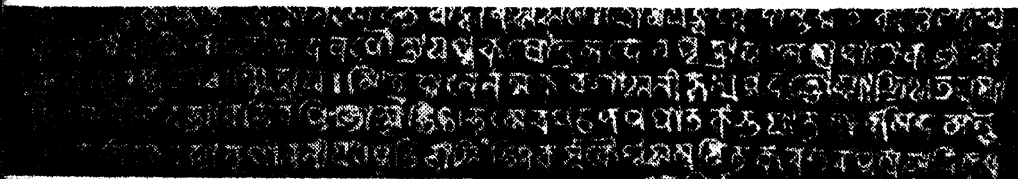
পোড়ামাটির নিদর্শন

বঙ্গোপসাগর কূল পর্যন্ত, তবে এই সমুদ্রতীরে 'ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল' নামে হিন্দুযুগের একটি ক্ষুদ্র বিভাগের কথাও জানা যায়।

খাটিকা (বা খাড়ি) মণ্ডলের সকল স্থানই পরবর্তীকালে সুন্দরবন ভূভাগ বলে পরিচিত হয়।

অখণ্ড বাংলার সুন্দরবন বলতে বোঝাত চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ এ তিনটি জেলার দক্ষিণ প্রান্তিক অংশের বনভূমি। দেশ বিভাগের ফলে, বর্তমানে খুলনা ও বাখরগঞ্জ বাংলাদেশে এবং চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দুযুগে যে স্থানের সীমাভাগের পরিচয় ছিল "খাটিকা বা খাড়ি মণ্ডল' নামে।

সেই খাটিকা বা খাড়ি নামে স্থান আজও আছে সুন্দরবন সীমার মধ্যে--চব্বিশ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার খাড়ি, অতীত দিনের উন্নত সমৃদ্ধ বা একটা শাসন কেন্দ্র রূপ তার নেই, খাড়ি এখন সুন্দরবনের বসতি অঞ্চলের নগণ্য পল্লী মাত্র। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে রচিত তন্ত্রখানি বৌদ্ধদের ডাকার্ণব পুঁথিতে খাড়ির উল্লেখ আছে--৬৪টি তন্ত্রপীঠের অন্যতম বলে। খাড়িতে নারায়ণী নামে একটি লৌকিক দেবীর মাটির মূর্তি বহুকাল আছে, পূর্বে, তান্ত্রিক মতে পূজিত হতেন, প্রাচীন তন্ত্রপীঠের সঙ্গে এই লৌকিক দেবীর সম্পর্ক থাকতে পারে।

খাড়ি মণ্ডলের দুটি বিভাগ। পূর্ব বিভাগ পুণ্ড্রবর্ধন এবং পশ্চিম বিভাগ বর্ধমান ভুক্তির ছিল। তবে শাসন কেন্দ্র ও বন্দর ছিল পূর্ব খাড়িতে। এ অংশ বা এককালের এই শাসন কেন্দ্র খাড়িকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের মধ্যে সে সকল স্থান বা পল্লী হতে পুরাবস্তু বা প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে বা প্রকাশ পেয়েছে সে সবের আলোচনা প্রথমে করছি। খাড়ি পল্লীর পাশ দিয়ে গঙ্গানদীর একটি শাখা ছিল (সে কারণ স্থানটির নাম খাড়ি বা খাটিকা হয়েছিল) তা শুষ্ক হয়ে গেছে। খাড়ি পল্লী আশপাশের স্থান হতে উচ্চ। এখানে প্রাচীন যুগের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি, তবে প্রত্নতত্ত্ব পাওয়া গেছে এমন স্থানগুলি খাড়িকে ঘিরে আছে। এর দক্ষিণ ও পূর্বদিকের স্থানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গজমুড়ি, রায়দীঘি, কংকনদীঘি, জটা, ভরতগড়, বকুলতলা, রাক্ষসখালি, বাড়িভাঙ্গা বাইশহাটা, নলগোড়া, মনিরতট, মৈপীঠ, মাধবপুর, দেলবাড়ী ছত্রভোগ, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, জলখাটা, খাড়ির কিছুদূরে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিমে—সরিষাদহ, কাজির-ডাঙ্গা, মালিপাড়া, কাশিপুর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, শাসন, আটঘরা, বোড়াল প্রভৃতি গ্রাম।

গজমুড়ি—খাসির সংলগ্ন পল্লী, এখানে একটি তিন ফুট উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তরের বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গেছে, স্থানীয় এক ব্রাহ্মণের গৃহে পূজিত হয়।

বকুলতলা—সাধারণ পল্লী, এখানে পুষ্করিণী খননকালে গত শতাব্দীতে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন সম্পাদিত একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়, তা থেকে জানা গেছে—মহারাজ তাঁর রাজ্য শাসনের দ্বিতীয় বৎসরে পুণ্ডবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত খাড়ি মণ্ডলের মধ্যে কান্তাল্লপুর চতুরকে মণ্ডলগ্রাম নামে একটি পল্লীর অংশ শ্রীকৃষ্ণধর শর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করছেন, ঐ গ্রামের সীমান্তে চিত্তরিঘাটা (পল্লী বা শাখা নদী) আছে। বর্তমানে বকুলতলার নিকট 'চিত্তরি' নামে খাল দেখা যায়, বোধহয় আদি গঙ্গানদীর কোন শাখা ছিল। এই তাম্রশাসনটি ঐতিহাসিকদের কাছে 'জয়নগরতাম্রশাসন' বলে পরিচিত।

বাড়িভাঙ্গা পল্লী, খাড়ির উত্তরে, এখানে কয়েকটি বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, পুষ্করিণী খননকালে এ পল্লী থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে—প্রস্তরের একটি দশভুজা দুর্গার এবং তিনটি

র্তি, সবগুলি পালযুগীয় মনে হয়। মূর্তি চারটি ত আছে।

জটা বা জটার দেউল, খাড়ি থেকে ৫।৬ মাইল উত্তর-পূর্বে ক নয়—একটি প্রান্তরের মত স্থান, লোকের বসতি খুব ঠের পর মাঠ বা ধান ক্ষেতের মধ্যে প্রায় তিন বিঘা উঁচু পর বিরাট ও গম্ভীর মূর্তিতে দেখা যায়—হাজার বছরের মন্দির—'জটার দেউল'। মন্দিরের ভিৎ মাটির নিচে কিছু ছ, তবুও এখন প্রায় আশি ফুট দীর্ঘ আকৃতি নিয়ে বহু ী উন্মুক্ত প্রান্তরে সাক্ষ্য দেয়—সুন্দরবন ভূখণ্ডের লুপ্ত বিষয়। এই লবণাক্ত অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর অবহেলা উপেক্ষা করে জটার দেউল প্রায় অক্ষত দেহে র মস্তক ভাগ বা আমলক অংশটি শুধু কিছু দিন আগে আমলে ১৯০৮ সালে তৈরি। শোনা যায়—মন্দিরটির চূড়ার রত্ন আছে ভেবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন কর্মচারী ভেন। মন্দিরটির প্রবেশদ্বার পূর্ব দিকে, উচ্চতা প্রায় ১৬ লান পত্রাকৃতি। মন্দিরটির তলদেশ চতুষ্কোণ, গর্ভগৃহ র থেকে প্রায় ৬ ফুট নিচে, সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। জটার শিল্পশাস্ত্র অনুসারে—শিখর বা রেখ দেউল। এর কোন নে এখনও পোড়ামাটির শিল্পকার্য দেখা যায়। বর্ধমানের বাথের দেউল ও বীরভূমের বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সাদৃশ্য দেখা যায়।

গত শতাব্দীর মাঝের দিকে ইংরেজ সরকার সুন্দরবনের জঙ্গলমুক্ত করার সময় জটার মন্দিরটি প্রকাশ পায়, র সরকারী প্রচার থেকে জানা যায়—ঐ মন্দিরের মধ্যে লাল এবং একটি ৮।৯ বছরের বালকের আকৃতি মূর্তি ক্ষত, পরবর্তীকালে এই মূর্তি ঐ মন্দিরে দেখা যায়নি। জটার দেউল কোন হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ দেবতার তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। স্থানীয় প্রবাদ—শিবের মন্দির। ন্দিরের কাছে সংস্কৃত ভাষায় লেখা বা খোদিত একটি তাম্রপট্টলি পাওয়া যায়। তা থেকে জানা গেছে, ঐ দেউলটি ৮৯৭ শকাব্দে (বা খ্রীঃ ৯৭৫ সালে) রাজা জয়ন্তচন্দ্র তৈরি করেছেন। সরকারী বিবরণ থেকে আর বেশি কিছু জানা যায় না। এই জয়ন্তচন্দ্র কে? পালরাজাদের কোন সামন্ত নৃপতি কিংবা চন্দ্রবংশীয় স্থির হয়নি। ইতিহাস থেকে জানা যায়—পালরাজাদের সময়েই দক্ষিণ বঙ্গের কোন কোন স্থান চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। জটার দেউলের কাছে একটি স্থানে কয়েকটি আরোহীসহ হাতির মূর্তি দেখা যায়। জটার দেউলের এক মাইল দূরে ছাতুয়া নদীর তীরে একটি বিরাট ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ ও তলদেশের বিস্তার চার-পাঁচ বিঘা। কাছে রায়দীঘি-নদী, ভাঁটার সময় পশ্চিম তীরে নদীর বুকে দেখা যায় ইষ্টক-প্রাচীর বা গৃহের ভগ্নাংশ।

ভরতগড় বা ভরতবাজার গড় একেবারে চব্বিশ পরগণা সুন্দরবনের পূর্ব সীমান্তে, জটা মৌজা থেকে সাত-আট মাইল দূরে। এখানে কয়েকটি স্তূপ দেখা যায়, বৃহৎ আকারের দুটিকে দেখিয়ে স্থানীয় লোকরা বলে—ওর একটি ভরতবাজার প্রাসাদ, অপরটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এর কিছু দূরে আর একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তার পরিচয় 'বিরিঞ্চির মন্দির'। স্থানীয় একটি খালের পাড়ে একটি দুর্গের ও দুর্গপ্রাচীরের লুপ্তপ্রায় ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু দেখা যায়। এই ভরত রাজার বিষয় জানা গেছে, তিনি পালরাজাদের সামন্ত নৃপতি ছিলেন, পরে পালযুগের পতনের কিছু আগে স্বাধীনভাবে এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। ভরতগড় থেকে বুদ্ধদেবের মূর্তি পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ভরতগড়ের ও তার নিকটের স্তূপগুলি বৌদ্ধবিহার বা মঠের ধ্বংসাবশেষ। আরও জানা যায়, চব্বিশ পরগণার এই উত্তর-পূর্ব অংশে পালযুগে বৌদ্ধদের প্রাধান্য ছিল। এ-বিষয় স্থিরভাবেও বলা যায়—বৌদ্ধযুগের বিখ্যাত বালাণ্ডা বিহার (বর্তমানে এই জেলার বসিরহাট মহকুমার মধ্যে) এই অঞ্চলের মাইল কুড়ি দূরে ছিল।

খাড়ির কাছে রায়দীঘি পল্লী ও তার মাইল দুই দূরে

বিচিত্র শিল্প নিদর্শন

পোড়ামাটির যোগী মূর্তি

কংকনদীঘি পল্লী রায়দীঘি নদীর পূর্ব তীরে। রায়দীঘি নাম হয়েছে এখানকার বিরাট দীঘি থাকায়। দীঘিটি এখনও আয়তনে প্রায় একশত বিঘা, চারিদিকে পাড় ১৫ থেকে ২০ ফুট উঁচু। রায়দীঘির কাছ থেকে একটি বুদ্ধদেবের ও একটি জৈন তীর্থংকর-পার্শ্বনাথের মূর্তিপ্রস্তর পাওয়া গেছে। কংকনদীঘি ঝোপেঝাড়ে ও ছোট ছোট স্তূপে ভরা, এখানে কয়েকটি বড় বড় দীঘি আছে, সেগুলি প্রায় শুষ্ক আগাছায় ছেয়ে ফেলেছে। এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে পাঁচ ফুট উচ্চ সুন্দর একটি বিষ্ণুমূর্তি ও নবগ্রহ প্রস্তরফলক, এই ফলকটি প্রস্থে প্রায় সাড়ে তিন ফিট ও উচ্চতায় দেড় ফুট, এই দুটিই অতি সুন্দর এবং পালযুগের উন্নত শিল্পের পরিচয় দেয়।

খাড়ি থেকে তিন মাইল পশ্চিমে **নলগোড়া পল্লী**, এখানকার জঙ্গল হাসিলের পর নদীর তীরে কয়েকটি স্তূপ দেখা যায়। বৃহৎ স্তূপটি 'মঠবাড়ী' বলে পরিচিত, এর উচ্চতা প্রায় ত্রিশ ফুট ও তলদেশের বিস্তৃতি সাড়ে তিন বিঘার মত, কিছুকাল পূর্বেও ছিল, কিন্তু ক্রমশ ক্ষয় পেয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। এই মঠবাড়ীর কিছু দূরে একটি বড় পুষ্করিণী আছে আয়তনে প্রায় ৪০ বিঘা। নলগোড়া পল্লী থেকে পাঁচটি ক্ষুদ্রাকৃতি ব্রোঞ্জের ও দুটি প্রস্তরের মূর্তি এবং একটি বিচিত্র হংসাকৃতি ও হংসমূর্তি-খোদিত প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্রোঞ্জে তৈরি মূর্তিগুলির মধ্যে একটি বৌদ্ধদেবী—হারিতির, অপর দুটি বিষ্ণুর ও উমা-মহেশ্বরের, প্রস্তরের ক্ষুদ্র মূর্তিগুলি কোন্ দেবতার বোঝা যায় না।

এখান থেকে কিছু দূরে নলগোড়া ও মণি নদীর মধ্যে চন্দ্রকেতুর গড়ের অনুরূপ সুউচ্চ ও প্রশস্ত দীর্ঘ পাঁচ মাইল-ব্যাপী (দুর্গ) প্রাচীর দেখা যায়, তবে মাঝে মাঝে এর অংশ-বিশেষ লুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও কিছুকাল আগেও এই প্রাচীরের উচ্চতা ছিল—২০ থেকে ২৫ ফুট, তলদেশ বিস্তৃত ছিল ১০০ ফুটের কাছাকাছি। খাড়িকের কাছে এই প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। 'যশোর খুলনার ইতিহাসে' এ-প্রাচীরকে প্রতাপাদি[ত্যের] মণিদুর্গের প্রাচীর বলা হয়েছে কিন্তু কোন কোন ঐতিহা[সিক] ধারণা করেন—প্রাচীরটি হিন্দুযুগে তৈরি। কালিদাস দত্ত ম[হাশয়] দ্বিতীয় মতটির সমর্থন করতেন। কিন্তু স্থানীয় প্রবাদ, 'জয়রাম হাতীর' গড়। জয়রাম ছিলেন প্রতাপাদিত্যের এ[কজন] দুর্গরক্ষক। মণিরতট নামে পল্লীও আছে, এখান [থেকে] আবিষ্কৃত হয়েছে একটি দুর্লভ শিবমূর্তি, ধাতুতে [তৈরি] পাদপীঠে বৃষের মূর্তি উৎকীর্ণ, ভগবান শিব পদ্মের [উপর] দাঁড়িয়ে আছেন। দক্ষিণ বাহু ভগ্ন, বাম বাহু ত্রিশূলের [উপর] স্থাপিত; সারা অঙ্গে বহু অলংকার, উন্মুক্ত নভস্থলের লিঙ্গমূর্তি। বিগ্রহটি গুপ্তযুগের উচ্চাঙ্গ ধাতুশিল্পের পরিচয় [দেয়]।

মৈপীঠ ও দেলবাড়ী—দুটি পল্লী, জটার দেউল [থেকে] দক্ষিণ-পূর্বে ঠাকুরানী নদীর কিছু দূরে। মৈপীঠ পল্ল[ীতে] কয়েকটি বৃহৎ স্তূপ আছে, এখানে কিছুকাল আগে [একটি] প্রাচীনকালের প্রস্তর আসন (জলচৌকির মত) ছিল, এখন [দেখা] যায় না।

দেলবাড়ীতে জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি গৃহের বা ম[ন্দিরের] ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। দেলবাড়ী সংলগ্ন পল্লী **মাধবপুর** [থেকে] ব্রোঞ্জের একটি সিংহবাহিনী দুর্গার মূর্তি পাওয়া গেছে।

খাড়ির কিছু দূরে এক মাইলের মধ্যে **কৃষ্ণচন্দ্র[পুর]** থেকে একটি কুবেরের মূর্তি এবং নিকটস্থ পল্লী **জলঘাটা** [থেকে] গরুড়স্তম্ভের শীর্ষাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে।

ছত্রভোগ—প্রাচীন যুগের একটি তীর্থস্থান ও (বোধহয় খাড়িমণ্ডলের বন্দর ছিল), এখন তার কোন [চিহ্ন] দেখা যায় না, এ-স্থানের গঙ্গা নদীর ধারা বহুদিন শুষ্ক [হয়ে] গেছে, তবে মধ্যযুগে প্রবল ছিল, সে-বিষয় জানা যায়—ঐ [যুগে] রচিত বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্য ও বৈষ্ণব-সাহিত্য হতে। এ-স্[থানের] ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী প্রাচীনকাল থেকে বিখ্যাত। এঁর [প্রাচীন] মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, কেহ কেহ বলেন মন্দিরটি সেন[যুগে] তৈরি ছিল।

বাইশহাটা বা ঘোষের চক পল্লী—এখানে একটি ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়, উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট, তল[দেশের] বিস্তৃতি ৪।৫ বিঘা, স্থানীয় প্রচার, এটি 'মঠবাড়ী'। তত্ত্ববিদ কালিদাস দত্ত মন্তব্য করেছিলেন—এই বাইশ[হাটার] মঠবাড়ী ও নলগোড়ার মঠবাড়ী পরিচিত স্তূপগুলি বৌ[দ্ধ বা] জৈন মঠের ধ্বংসাবশেষ, এবং হাজার বৎসরের অধিক প্[রাচীন] পালযুগের হওয়াই সম্ভব।

পাথরপ্রতিমা—পুরাবস্তুসমৃদ্ধ পল্লী, এখান [থেকে] আবিষ্কৃত হয়েছে বহু হিন্দু বৌদ্ধ জৈন দেবদেবীর [মূর্তি] কিন্তু এ-স্থানের বহনযোগ্য প্রাচীন দ্রব্যগুলি অপসারিত হ[য়েছে]।

রাক্ষসখালি—সুন্দরবনের দক্ষিণতম অংশের দ্বীপ। সপ্তমুখী বা গঙ্গার একটি শাখা নদী এ-দ্বীপটিকে

রেখেছে, এই দ্বীপে সুন্দরবনের লুপ্ত সভ্যতার বহু
ন প্রকাশ পেয়েছে, এখানে দেখা যায় চিত্রখোদিত প্রস্তর-
বহু ধ্বংসস্তূপ—বৌদ্ধ মঠ বা অট্টালিকার পোড়ামাটির
পত্র, বর্তমানে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই দ্বীপটির
আলোচনা ও অনুসন্ধান শুরু করেছেন, তার প্রধান কারণ
ানে পাওয়া অনন্যসাধারণ ও ...সনটি। কলিকাতা বিশ্ব-
দ্যালয়ের চিত্রশালা (বা মিউজিয়াম) পক্ষ দ্বারা ঐ দ্বীপে
খননকালে এই মহামূল্যবান তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত
হ।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে (মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের
ত্বকালে) পূর্ব খাটিকা বা খাড়িমণ্ডলের সামন্ত নৃপতি
দ্মন পাল (বঙ্গাধিপতির বিদ্রোহ করে) নিজ শাসনসীমায়
টিকামণ্ডলে) স্বাধীন মহারাজা হন। আলোচ্য তাম্রশাসনটি
ন পাল দেবের একটি ভূদান ব্যাপারে সম্পাদিত হয়েছিল
১১১৮ অব্দে (খ্রীঃ ১১৯৬ সালে)।

খাড়ির উত্তরদিকে দক্ষিণ গোবিন্দপুর, আটঘরা, সারিসা-
কালীরডাঙ্গা, বোড়াল, মলিহাটী (শরবাড়িয়া) প্রভৃতি প্রাচীন-
। গঙ্গা নদীর উভয় তীরস্থ পল্লীগুলি হিন্দুযুগে খাটিকা
লের মধ্যে ছিল, পরবর্তীকালে বঙ্গোপসাগরকূলের অরণ্য বা
দরবন এসকল স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

দক্ষিণ গোবিন্দপুর (বারুইপুর থেকে মাইল তিন দূরে,
দিকে) একটি উন্নত গ্রাম, এখান হতে আবিষ্কৃত হয়েছে
রাজ লক্ষ্মণ সেনের একটি তাম্রশাসন। উহাতে বর্ণিত আছে
রাজা তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় সংবদে বাৎস গোত্রীয় সামবেদী
ণ উপাধ্যায় শ্রীব্যাসদেব শর্মাকে 'বিজুর শাসন' নামে যে গ্রাম-
র বর্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী পশ্চিম খাটিকামণ্ডলের
ড্ড চতুরক' মধ্যে ইহাতে স্থিত—৬৯ দ্রোণ ভূমি যার
বিক ৯০০ পুরাণ উৎপত্তি বিশিষ্ট, সেই ভূমি দান করা
ছে এই তাম্রশাসন দ্বারা।

প্রদত্ত ভূমিসীমা বিষয়ে এই তাম্রশাসনে গঙ্গা নদী ও
সকল গ্রামের উল্লেখ আছে, ঐগুলির ২-১টির সন্ধান
নও পাওয়া যায়, গঙ্গা নদীর শুষ্ক খাত এ-অঞ্চলে কোন
ন স্থানে আছে।

বারুইপুর রেল স্টেশনের পুষ্করিণী হতে সেনযুগের
টি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। **আটঘরা** বারুইপুরের নিকট
া পল্লী, কিন্তু এস্থান হতে সে-সকল পুরাবস্তু আবিষ্কৃত
ছে, সেগুলি প্রমাণ করে সুদূর অতীতে বাংলার সঙ্গে রোম
প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সামান্য অনু-
ানে আটঘরা থেকে পাওয়া গেছে—মৌর্য কুষাণ সেন যুগের
ত্নের বহু নিদর্শন, কয়েকটি রোমক শিল্পের প্রভাবযুক্ত
া, মৌর্য যুগের পোড়ামাটির যক্ষমূর্তি প্রভৃতি। এখান
ক কয়েকটি রৌদ্রশুষ্ক মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে, সেগুলি
দমযুগীয় মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন, এই আটঘরা
ীন যুগের 'অস্টগোড়া'। শরবেড়িয়ার নিকট **মলিহাটি** গ্রামে
একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে, মন্দিরের দরজার প্রস্তর
নির্মিত বাজুতে হাঙর-মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। মন্দিরটি পাল
বা সেন রাজাদের কালে তৈরি মনে হয়।

সারিষাদহ পল্লী, দক্ষিণ বারাসতের নিকট, এখান থেকে
আবিষ্কৃত হয়েছে পালযুগের একটি পাঁচ ফুট উচ্চ বিষ্ণু-
মূর্তি, একটি প্রাচীন স্তম্ভ, দু-ফুট উচ্চ নৃসিংহ মূর্তি, একটি
ছ'-কোণবিশিষ্ট শিবলিঙ্গ প্রভৃতি। সারিষাদহের নিকট **কাজীপাড়া**
মুসলমান-প্রধান পল্লী থেকে আবিষ্কৃত প্রস্তরনির্মিত বড়
আকারের অতি সুন্দর কারুকার্যবিশিষ্ট বিষ্ণুচক্র। এই চক্রটির
মধ্যে নৃত্যরত বিষ্ণুর মূর্তি বা উৎগত চিত্র দেখা যায়। চক্রটির
ব্যাস দেড় ফুট। এটি গুপ্ত বা পালযুগের উচ্চাঙ্গের শিল্পের
নিদর্শন। সারিষাদহ পল্লীর কিছু দূরে **কাশিপুর**; এ-পল্লী
থেকে গুপ্তযুগের একটি সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।
সূর্যমূর্তি সুন্দরসীমার মধ্যে অন্যত্র পাওয়া যায়নি।

পশ্চিম খাটিকা মণ্ডল ও ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল

হিন্দুযুগে পশ্চিম খাটিকা মণ্ডল ছিল বর্ধমানভুক্তির
অন্তর্গত। গঙ্গা নদীর আদিধারা এ-অঞ্চলে প্রবাহিত থাকায়
সুন্দরবন ভূখণ্ডের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা উন্নত ছিল প্রাচীন
যুগে। পুরাবস্তুসমৃদ্ধ (বা যে-সকল স্থান থেকে পুরাবস্তু
বর্তমান কাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে সেরূপ) স্থানগুলির
মধ্যে উল্লেখযোগ্য : হরিনারায়ণপুর, সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপ,
দেউলপোতা, করঞ্জলি, কাঁটাবেনিয়া প্রভৃতি।

কাকদ্বীপ—অর্ধ-শহর, এখান থেকে কিছু দূরে আদি
গঙ্গা নদীর শাখা কালনাগিণীর কাছে **পাকুড়তলা** পল্লী থেকে
আবিষ্কৃত হয়েছে কুষাণ যুগের পোড়ামাটির মস্তকখণ্ড, গণেশের
বিগ্রহ, পোড়ামাটির সীল (সেনযুগে প্রচলিত) বাংলা অক্ষর
খোদিত, ব্রাহ্মী অক্ষর খোদিত ফলক(এর উপর হাতীর চিত্র
আছে), কয়েকটির তলদেশ ঢালু (স্বর্ণকারদের ব্যবহৃত মুচির
অনুরূপ বা পয়রা গুড়ের নাগরীর মত) জলপাত্র। এই পাকুড়-
তলার নিকট পুকুরবেড়িয়া পল্লীর মজা দীঘিতে প্রাচীন
অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ কিছু দেখা যায়।

কাকদ্বীপ গ্রামের পূর্ব-উত্তরে—**করঞ্জলি**, **কাঁটা-
বেনিয়া**, ঘাটেশ্বরা প্রভৃতি পল্লীতে জৈন যুগের বহু নিদর্শন
দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে কাঁটাবেনিয়ার জৈন তীর্থংকর-
পার্শ্বনাথ, ঘাটেশ্বর গ্রামের আদিনাথের মূর্তি দুটি ও করঞ্জলি
গ্রামের স্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য, এটির শিল্পশৈলী দেখে জৈন-
মন্দিরের বলে মনে হবে।

হিন্দুযুগের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও বর্ধমানভুক্তি দক্ষিণ
সীমান্ত প্রায় সমস্ত খাড়ি বা খাটিকা মণ্ডলের মধ্যে ছিল কিন্তু
একেবারে বঙ্গোপসাগরকূলের কিছু স্থান উত্তরভুক্তির দক্ষিণ
অংশে 'ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল' নামে একটি মণ্ডলের মধ্যে ছিল জানা
যায়। এই ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের উল্লেখ দেখা যায়—ধর্মপালের
(খ্রীঃ অষ্টম-নবম শতকে সম্পাদিত) খালিমপুর তাম্রলিপিতে,
এবং লক্ষ্মণ সেনের (দ্বাদশ শতকে সম্পাদিত) আনুলিয়া তাম্র-
শাসনে, এতে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে ব্যাঘ্রতটীতে অবস্থিত
মাথরাণ্ডিয়া-খণ্ড ক্ষেত্র রঘুদেব শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণকে দান করার
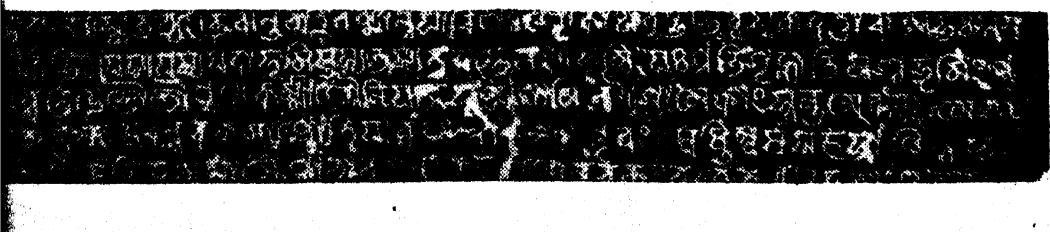
কথা আছে। গৌড়াধিপ দেবপালের (খ্রীঃ নবম শতক) মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) বা নালন্দা তাম্রলিপিতে উল্লেখ আছে : সামন্তরাজা ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলাধিপতি শ্রীবল বর্মার কথা, যিনি তাঁর (দেবপালের) শত্রুদমনে দক্ষিণহস্ত ছিলেন।

অনুমান করা যেতে পারে, অতীত কালে বা পাল-সেন যুগে বা তার পূর্বে সাগরদ্বীপ, হরিনারায়ণ, দেউলপোতা প্রভৃতি বঙ্গোপসাগরকূলস্থ স্থানগুলি ব্যাঘ্র প্রধান ও অরণ্যময় ছিল।

সাগরদ্বীপ (বা গঙ্গাসাগর সঙ্গমতীর্থ), রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে এবং মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যে এ-দ্বীপ তীর্থক্ষেত্র ও মহর্ষি কপিলের সাধনাসিদ্ধির স্থান বলেই উল্লেখ আছে মাত্র। আর্য সাহিত্যে এ-অঞ্চলকে 'রসাতল' 'পাতাল' এ-স্থানের অধিবাসী সকলে ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে। তার কারণ সম্বন্ধে অনুমান করা যায়—এই সাগরদ্বীপ অঞ্চল পূর্ব ভারতের এমনকি সমতটের অন্য স্থান অপেক্ষা নিচু ছিল এবং সে-সময়ে এর অধিবাসীরা ছিল আর্যেতর।

বর্তমানের এই সাগরদ্বীপের মধ্যে মহিষবাড়ী, হরিণবাড়ী, মন্দিরতলা প্রভৃতি স্থান থেকে বহু প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। বিশেষ করে মন্দিরতলা পল্লী থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে : স্বর্ণ অলংকার, স্বর্ণ-ইষ্টক বা ইষ্টকাকৃতি স্বর্ণখণ্ড, এ-দ্বীপের মনসাতিনগরের মাটির নিচে দেখা যায়—বহু গৃহের ধ্বংসাবশেষ। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এ-দ্বীপে অনুসন্ধান ভ্রমণকালে বিস্ময়-জনকভাবে মাটির তলায় একটি উন্নত জনপদের বা নগরীর ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করেন।

সুন্দরবনের ভূখণ্ডের মাটির নিচে যে কয়েকটি নগরী সমাধিস্থ আছে, তার উল্লেখ মধ্যযুগের পর্তুগীজদের (খ্রীঃ ১৫৪০ অব্দের মানচিত্র) ও বিবৃতি থেকে জানা যায়, 'যশোর-খুলনার ইতিহাস' লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র সুন্দরবনের অনুসন্ধান ভ্রমণে পাঁচটি লুপ্ত নগরীর সন্ধান কিছু কিছু পান। পর্তুগীজ ডি, বারোস সম্পাদিত মানচিত্রে দেখানো কয়েকটি লুপ্ত নগরীর বিষয় পরে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ জেনেছেন। পর্তুগীজ ডি, বারোস-এর নকসা বা মানচিত্রটি খ্রীঃ সপ্তদশ শতকে সম্পাদিত এবং লুপ্ত নগরীর নামগুলি পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত সে-কারণ বিকৃত মনে হলেও স্থানগুলির দু-একটির সন্ধান পাওয়া যায় সুন্দরবন সীমার মধ্যে। কোন কোন মনীষী ঐতিহাসিক ধারণা করেন—খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে কয়েক শতক যে গঙ্গারিডিরা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ (বর্তমান চব্বিশ পরগণার ভূখণ্ড ঐ দ্বীপের পশ্চিম-দক্ষিণতম অংশাবশেষ) জুড়ে বাস করতো। তাদের রাজধানী ও বন্দর 'গাঙ্গে' ছিল সাগরদ্বীপের গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থল বা তার নিকট কোন স্থানে। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমির (খ্রীঃ ১ম-২য় শতকে) সম্পাদিত মানচিত্রে—এই 'গাঙ্গে' বা গঙ্গানগরের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার যে নির্দেশ দেওয়া আছে, তা থেকে তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা করা যায়। (গঙ্গারিডি শব্দটি গ্রীক-বিকৃত, সম্ভবত শব্দটি গঙ্গারাষ্ট্র, গঙ্গারাঢ়া বা গঙ্গাহৃদি।) কোন কোন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন : গঙ্গারিডিরা বাঙ্গালী ছিল।

খ্রীঃ ২য় শতকের অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের রচিত 'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী' গ্রন্থে গাঙ্গে বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ত্রিপুরার রাজাদের পূর্বপুরুষ মধ্যভারত থেকে এসে প্রথমে এই গঙ্গাসাগর দ্বীপে বা এ-অঞ্চলে বহু কাল বা বংশ-পরম্পরায় বাস ও রাজত্ব করতেন, পরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কিরাতদের রাজ্য অধিকার করেন, ঐ রাজ্যের নাম হয় ত্রিপুরা, ঠিক এই বিষয়গুলির উল্লেখ আছে, ত্রিপুরা দরবারে রক্ষিত 'রাজরত্নাকর' পুঁথি বা রাজাদের কুলজি গ্রন্থে। শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে এ বিষয়ের স্পষ্ট সমর্থন দেখা যায়।

উক্ত ইতিহাসে একটি মানচিত্রে দেখানো আছে, প্রাচীনকালে বঙ্গোপসাগরকূল পর্যন্ত স্থান ত্রিপুরা রাজ্য মধ্যে ছিল। মধ্যযুগেও সাগরদ্বীপ উন্নত স্থান ছিল—মহারাজা প্রতাপাদিত্যের দ্বিতীয় রাজধানী ও নৌবন্দর ছিল, পর্তুগীজ পাদিরা সাগরদ্বীপকে 'চাণ্ডিকান' ও মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে 'কিং অব চাণ্ডিকান' বলতেন। (সে-সময় বোধহয় প্রতাপাদিত্যের কুলদেবী চণ্ডীর নামযুক্ত কোন শব্দে এই দ্বীপ অভিহিত হত)। সাগরদ্বীপ প্রতাপাদিত্যের দ্বিতীয় রাজধানী হওয়াও সম্ভব, কারণ জানা যায় যে, যশোর ধুমঘাট থেকে বঙ্গোপসাগরকূল পর্যন্ত সকল ভূখণ্ডেরই তিনি অধিপতি ছিলেন এবং এ-সমগ্র ভূখণ্ডে অবস্থিত চব্বিশ পরগণা, খুলনা জেলার স্থানের পরিচয় ছিল-যশোর রাজ্যের অংশ বলে। কোন স্থান বা ভূ-ভাগের নাম খুলনা বা চব্বিশ পরগণা ছিল না। নাথধর্ম বহু প্রাচীন, এ-ধর্মের সিদ্ধাচার্য মৎস্যেন্দ্র নাথ (মহারাজা দেবপালের সময়) ও সাগরদ্বীপবাসী ছিলেন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজ মর্দনদেব, সাগরদ্বীপ ও বঙ্গোপসাগরকূলের বহু স্থান অধিকার করেন, সুন্দরবন থেকে তাঁর মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, উহাতে শকাব্দ খোদিত আছে ১১৩৯ (খ্রীঃ ১৪১৭ অব্দ)। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন-রাজেন্দ্র চোল খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে গঙ্গারাষ্ট্র বা সাগরদ্বীপে গঙ্গারিডিদের রাজধানী ও বন্দর ধ্বংস করেছিলেন।

হরিনারায়ণপুর—হিন্দু রাজাদের কালে ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের মধ্যে ছিল। পরে সুন্দরবনের সীমার মধ্যে হয়ে যায়। বর্তমানে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা শহর থেকে ৫।৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত, বর্ধিষ্ণু সাধারণ পল্লী, কিন্তু সম্প্রতি ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে মহামূল্যবান। এ-পল্লীর পশ্চিমে হুগলী নদীর তীর ভেঙ্গে গেলে পাওয়া যায়—একেবারে আদিম যুগ থেকে মৌর্য শুঙ্গ কুষাণ গুপ্তযুগের বহু নিদর্শন।

এস্থান থেকে পাওয়া আদিম যুগের প্রস্তরের হাতিয়ার কুঠার, মশলা পেষণের চৌকি, হাড়ের তীর-ফলক, রৌদ্রে পোড়া মাটির তৈজসপাত্রাদি, গুটি, কবচ প্রভৃতি, সেগুলি আজ থেকে তিন-চার হাজার বৎসরের অধিক প্রাচীন কালের। পরবর্তী কালের পোড়ামাটির ফলকগুলির উপর খোদিত চিত্রে প্রাচীন কালের গ্রীক-মিশর শিল্পের প্রভাব দেখা যায়, কয়েকটি গোলাকৃতি ক্ষুদ্র ফলক বা সীলে খোদিত দেখা যায়—দু'টি মানবমূর্তি, যাদের মুখাকৃতি পাখীর মত সূচালো, পরিচ্ছদ ভঙ্গী মিশরীয়, এস্থানে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বা শঙ্খাকৃতি শিরোভূষণ প্রাপ্ত তাম্রের ও রৌপ্যের মুদ্রাগুলি মৌর্য শুঙ্গ যুগের। কয়েকটি তাম্রের মুদ্রার উপর সমুদ্রগামী জলযানের চিত্র খোদিত। পোড়ামাটির ফলকের উপর পশুপক্ষী উটের ও বৃহৎকুকুর প্রভৃতির চিত্র দেখা যায়। হিন্দু যুগের পোড়ামাটির খেলনা অশোকস্তম্ভের মত পালিস-করা বা মসৃণ ও উজ্জ্বল তৈজস পাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে।

দেউলপোতা—ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা শহর থেকে কিছু দূরে। এখান থেকে পাওয়া প্রাচীন দ্রব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পোড়ামাটির ফলকের ও মুদ্রার উপর গুবরে পোকার চিত্র। চার হাজার বৎসর পূর্বে মিশরে এই গুবরে পোকার পূজা হত। এস্থানে ঐরূপ মুদ্রাগুলি লক্ষ্য করে কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক মন্তব্য করেছেন—প্রাচীনকালে মিশর ও পূর্ব ভারতের এ-অঞ্চল (যা কিছুকাল পূর্বেও সুন্দরবন সীমার অন্তর্গত ছিল) মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।

সব শুনেও শ্রীপতি বলেন—তুমি ...ব ছেলে।

প্রশ্ন নয় শ্রীপতির সারা মুখে ... : অবনীর ছেলে তার কাছে এসেছে ই ঘটনা এমনই আকস্মিক এবং ...ীয় যে শ্রীপতি সঠিক বিশ্বাস করতে ...ন না। বহুক্ষণ সুবীরের মুখের দিকে ...কে তাকিয়ে থাকেন শ্রীপতি।

পাহাড়ের মাথার পাশ দিয়ে সূর্য ...ছ। সুবীর সরাসরি চোখ ...তে পারে না, কোন কথাও সে বলে না, মাথা নেড়ে জানায়—হ্যাঁ সে অবনী ...লেরই ছেলে।

—তোমার যখন চার বছর বয়েস ... অবনী এই চা-বাগান ছেড়ে চলে ... বলে শ্রীপতি বিষণ্ণ হাসি হাসেন, ...—ভালো নিশ্চয়ই সব?

সুবীর ফের মাথা হেলায়—হ্যাঁ সব ...। এবং আড়চোখে একবার শ্রীপতিকে দেখে নেয়—অনামনস্ক, যেন বা পুরনো দিনে ফিরে যাচ্ছেন।

—কুড়ি বছর বুঝলে! বলে মাথার সোলার টুপীটা খুলে হাতে নেন, বাঁহাতে বিরলকেশ মাথায় হাত বুলোন একবার—এতদিন বাদে অবনীর আবার আমাকে মনে পড়াব ভাবতেই পারি না। যা জেদী অভিমানী—

—বাবা ইদানীং আপনাদের কথা খুবই বলেন। আমাকে তো প্রায় জোর করেই পাঠিয়ে দিলেন। সুবীর মুখের বিনীত ভাবটুকু বজায় রেখে বানিয়ে বানিয়ে বলে কথাগুলো। অবশ্য এর জন্য নিজেকে সে তৈরী করেই রেখেছিল, তার জানাই ছিল এরকম কিছু মিথ্যে কথা তাকে বলতেই হবে।

—খুব ভাল: বড় আনন্দ হচ্ছে হে, তোমাদের সঙ্গে এ জীবনে আর যোগাযোগ ঘটবে এ-আশা তো কবেই ছেড়ে দিয়ে-ছিলাম। বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে শ্রীপতি সস্নেহে সুবীরের কাঁধে হাত রাখেন। একটু চাপ দিয়ে বলেন—কত কথা যে জমে আছে—চলো বাড়ি বসে সব কথা হবে।

সুবীরের গা-টা কেমন শির শির করে ওঠে। প্রণামের ছলে নিজেকে মুক্ত করে নেয়া যেত কিন্তু প্রণামটা সে আগেই সেরে ফেলেছে।

কিটব্যাগটা কাঁধ বদল করবার সুযোগে নিজেকে মুক্ত করে নেয় সুবীর। আর তাকে কিটব্যাগটা ধরতে দেখেই শ্রীপতি উৎসুক গলায় বলে ওঠেন—অবনী কী চিঠিপত্র দিয়েছে কিছু?

সুবীর চমকালো সামান্য কিন্তু অপ্রতিভ হল না।

—আমি বলেছিলাম, বাবা বললেন চিঠির কী দরকার? বলে মুখে বেশ গাম্ভীর্য ফোটায় সুবীর—আসলে আপনার ওপরে যে অন্যায়ভাবে—

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপতি বাধা দেন—না না ওকথা বলো না বাপু। অবনী কোন অন্যায় করে নি। বরং আমিই—বলতে বলতে থেমে যান শ্রীপতি, হাঁটতে শুরু করেন ধীর পায়ে। চা-বাগানের ভেতর দিয়ে পাথুরে চড়াই উৎরাই পথ। মনে মনে সুবীর খুশী হয়, শ্রীপতি যে মনে মনে অনুতপ্ত এটা টের পেয়ে আশা হয় তার কাজের ব্যবস্থাটা হয়তো হয়ে যাবে।

পাহাড়ের গা বেয়ে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে কুয়াশার মতো, চা-বাগানের ভেতরেও গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ছে। বিস্তীর্ণ উপত্যকার ওপর দিয়ে পাখি ফিরে আসছে। গামবুটে ঝপ ঝপ শব্দ তুলে সামনে হাঁটেন শ্রীপতি, পেছনে সুবীর। বস্তুতঃ সুবীরেরও পেছনে যেন আরেক শ্রীপতি পেছনে ছুটে যান।

অবনীর মত বন্ধু, অন্তরঙ্গ মানুষ আর কেউ ছিল না। একই সঙ্গে তাদের পড়াশোনা, একই সঙ্গে একই বাগানে চাকরি। দুজনে ছিলেন ওদের ভাষায় যাকে বলে বুজম ফ্রেণ্ড, অভিন্ন হৃদয়। সুখে-দুঃখে, আশায়-হতাশায় পরস্পরের সঙ্গী। পৃথিবীর কোন দুটি মানুষের বন্ধুত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে এমন ঘটনা বিরল। ওদের দুজনেরও রইল না। কিন্তু সে বড় অদ্ভুত পরিস্থিতিতে দুজনে ছাড়াছাড়ি হল। চা-বাগানের ম্যানেজার টিলো সাহেবের মেজাজের জন্য বলা যায়। সাহেব যে বদমেজাজী ছিল এমন নয়। কিন্তু দিনকাল তখন সাহেবের [illegible]। ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে সবে, [illegible] না বললেও বুঝে [illegible]। অনেকে [illegible] পাড়ি দিচ্ছে। টিলোরও চেষ্টা চলছে। একদিন সাহেবের কাছে [illegible] অফিসে গেলেন শ্রীপতি [illegible] কাজে [illegible]। সাহেব [illegible] অভিনন্দন, সান অফ এ বিচ থেকে শুরু করে [illegible]

বুলেটের মত বেরুচ্ছে লাগল। শ্রীপতি আচমকা আক্রমণে হতবাক। এসব গাল সাধারণতঃ কুলিকামিনদের জন্য বরাদ্দ ছিল এতদিন। হঠাৎ রুখে উঠলেন অবনী, 'হোল্ড ইওর টাঙ' কথাটা বলাই যথেষ্ট অপরাধ তার পক্ষে তারও ওপরে কলার চেপে ধরা। সাহেবকে কিছু করতে হল না, সবাই এসে ঘিরে ধরল অবনীকে। অবনী জানতেন সাহেবরা কাজের লোক, মুখে না মেরে ভাতে মারবেন। 'সাসপেনসন' অর্ডার তৈরী হচ্ছে শুনেই অবনী লিখলেন রেজিগনেশন লেটার। শ্রীপতিকেও বললেন—লেখ্।

শ্রীপতির স্ত্রী তখন সন্তানসম্ভবা। শ্রীপতি গিয়ে সাহেবকে ধরল। তার ফলও হল—দুজনের নামের সাসপেনসন অর্ডার খারিজ হল। কিন্তু অবনীর হাতে-পায়ে ধরেও শ্রীপতি ফল পেলেন না। অবনীর রেজিগনেশন লেটার চলে গেল সাহেবের কাছে। এবং অবনী চলে গেলেন জলপাই-গুড়ির চা-বাগান ছেড়ে মালদায়। শুধু বললেন—চাকরি মানেই গোলামী এটা জানি, কিন্তু গোলামেরও কিছু মান-মর্যাদা থাকে, সেটা না থাকলে গোলামও চাকরি করে না। এসব কথা শুনতে হত বড় কথা মনে হোক অবনীর মুখে তত বেমানান মনে হয় নি। রাস্তা বাঁক ঘুরে ফ্যাক্টরীর পাশ দিয়ে কোয়াটার্সের দিকে চলে গেছে। শ্রীপতি হঠাৎ আত্মমগ্নতা ভেঙে বলেন—আমরা খুব সাধারণ মানুষ বুঝলে সুবীর, কিন্তু তোমার বাবাকে কিন্তু আমাদের দলে ফেলো না কখনো। অবনী ইস্ অবনী—'

—একটু সাধারণ হলে ক্ষতি হত না। এই কথাটা সুবীর বলতে গিয়েও একটু পাল্টে বলে—আরেকটু প্র্যাকটিক্যাল হলে ভাল হত না?

—প্র্যাকটিক্যাল কথাটা আমরা গা বাঁচানোর জন্য তৈরী করেছি বুঝলে। বলে থামেন একটু শ্রীপতি, একটা বড় শ্বাস ফেলেন প্রায় নিঃশব্দে। আকাশে হঠাৎ ফুটে ওঠা একটা বিন্দুসদৃশ তারা দেখেন। বলেন—কত দিন অবনীকে দেখি না। ওর কী আমাদের দেখতে-টেখতে ইচ্ছা হয়?

—দেখবার ইচ্ছা। আপনার নাম শুনলে ক্ষেপে ওঠে। জিভের ডগায় এসে পড়ে কথাগুলো, সে সব বাঁচিয়ে সাবধানে সুবীর বলে—ইচ্ছে হবে না। ঠিক বুঝতে পারি মনে মনে ছটফট করেন।

শ্রীপতি হঠাৎ কিছুটা গদগদ ভঙ্গিতে বলেন—যাব হে যাব, একবার আমি নিজেই চলে যাব। কত কথা জমে আছে যে মনের মধ্যে। আহ্—কুড়ি বছর!

সুবীর হাসবে না কাঁদবে! যদি এই বৃদ্ধ কোনদিন পূর্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করে বন্ধুর কাছে যায় তবে সে-বন্ধু যে অপমান করে তাড়িয়ে দেবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুবীর যে এখানে আসছে সেকথা পর্যন্ত বাড়িতে বলে নি, শুধু মাকে বলেছে—জলপাইগুড়িতে একটা ইন্টারভিউ পেয়েছি।

অথচ বাবার একটা চিঠি নিয়ে এলে এখানে যে একটা চাকরি হয়তো হয়ে যায় একথা কারো অজানা নয়। সুবীর মাকে দিয়ে বলাবারও চেষ্টা করেছে কিন্তু তাতে অবনী সান্যাল নামে এক নিদ্রিত পুরুষ-সিংহ ঘুম ভাঙার ভঙ্গিতে একটা রাগী গর-গর শব্দ মাত্র তুলেছে গলায়। ব্যস ওই-টুকুতেই সব পরিষ্কার। ত্রিভুবনে কার সাধ্য আর টুঁ শব্দটি করে।

কিন্তু সবীর করেছে, ঝগড়াঝাঁটিও। ফল হয় নি। এবং সেই থেকে কাউকে না জানিয়ে চলে আসবে কিনা ভেবে দেখেছে। কিন্তু যার সঙ্গে মান-মর্যাদার প্রশ্নে ছাড়াছাড়ি হয়েছে বাবার তেমন বন্ধুর কাছে গিয়ে কী চাকরির জন্য হাত পাতা যায়, না উচিত?

কিন্তু মানুষের উচিত-অনুচিতেরও একটা সীমা আছে। অবনী সান্যাল যদি একটা পুরুষসিংহ হন তাহলে তার ছেলে তো চব্বিশ বছর বয়সেই একটা জড়দ্গব বুড়ো কুকুর হয়ে গেছে, একটা যে কোন চাকরি-বাকরির কাজকর্মের অভাবে। সেই অকেজো কুকুরের ঘেউ ঘেউ করবার শক্তিটুকুও নেই, যাকে দিয়ে পাহারার কাজটুকুও হয় না, শুধু দুবেলা বাবার অভাবী সংসারে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের গ্লানি-টুকু ছাড়া পাবার মত যার আর কিছু নেই। কার ওপরে কে জানে ভয়ানক আক্রোশে চিৎকার করে বুকের ধুকপুকে কলজেটা ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে শুধু।

তবু কী আশ্চর্য এই জীবন। ব হাত ধরে শরীরে যৌবন আসে। ব খোপে অসুখের মত স্বপ্ন অ আর অদৃশ্য ভাইরাসের চেয়েও মারা প্রেম আসে।

রুমার সঙ্গে তার ভালবাসা থেকে। যখন মনের মধ্যে থাকে সেই আবছায়া অন্ধকার—যা দেখে ভয় অথচ সেই ভয়ের অন্য প্রান্তেই আকর্ষণ; সেই ভয়-ভয় নিষিদ্ধ আন মধ্যে রুমার সঙ্গে কী এক খেলা! দু আগে রুমা শাড়ি ধরেছে। কৈশোরের চা কুঁড়ি ফাটিয়ে এখন ফুটন্ত তার, গতবারে গোড়ে গিয়ে ভাঙ্গা এক প্রাস আধো অন্ধকারে সুবীর জীবনে প্রথম তার খোলা ফর্সা বুক।

জড়দগব বুড়ো কুকুরে নয় মনে হয় সে সত্যি এক সিংহ শিশু বিচিত্র মানুষের জীবন। ভাইরাসের চে মারাত্মক প্রেম আসে সে-জীবনে। পৃথিবীর অর্ধেক জুড়ে পচা অন্ধকার বাকীটাতেই কী ফুটফুটে জ্যোৎস্না

যে-মেয়ে সদ্য যৌবনে পা দিয়ে স্কুল থেকে যে ঢুকেছে কলেজে, যার আছে তাকে নিয়ে বড় ভয়। বাংলা শরীর সন্ধানী ব্যাংকের চাকুরে এঞ্জি বা ডাক্তার পাত্রের খুব অভাব নেই মেয়ে নিজেকে নতুন করে চিনতে করেছে নিজের দামটা বুঝতে শিখ তাকে শুধু পুরোনো সেই দিনের শেকলে কী বেশী দিন আটকে রাখা যা যদি না যায়? তবে আর কী থাকবে ধরা শেষ খড়টুকুও ভেসে যাবে। কর্কশ ডাক ডেকে প্যাঁচা উড়ে যায়। হাতে কাঠের গেট খুলে শ্রীপতি ডাকে এসো।

সুবীর হাস্নাহানার গন্ধ পায়।

*

—দ্যাখো কাকে নিয়ে এ শ্রীপতি যার সামনে দাঁড়িয়ে একথা বল তাকে দেখে সুবীরের দম আটকে এ শয্যাশায়ী এক মহিলা, মণিপুরী ক সর্বাঙ্গ ঢাকা, তার পাণ্ডুবর্ণ মুখে চো নীচে ঘন কালিমাই সবচেয়ে বেশী পড়ে। বলহীন চোখের পাতা নিচে বুজে রয়েছে। অসুস্থ মানুষের স দাঁড়িয়ে থাকতে সুবীরের ভাল লাগে তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে থা হয়।

চোখের পাতা কিছুটা তুল মহিলার দু চোখ যেন যাদুবলে সহসা করে জ্বলে ওঠে। তীব্র চোখে সুবী দিকে তাকিয়ে কী বলেন অস্ফুটে।

শ্রীপতি চেয়ারে বসে বললেন—ন মানু নয়, আমাদের অবনীর ছেলে সু অবনীকে মনে আছে তো?

এ প্রশ্নের কোন জবাব এল না, চোখের নীচের কালি সারা মুখে ছ পড়ল, আরো নিস্তেজ ভঙ্গিতে বুজলেন মহিলা। সুবীরের কিছুই ক নেই, প্রণাম একটা করতে পারতো বি শয্যাশায়ী কাউকে প্রণাম করতে শ্রীপতি যখন ইশারায় সুবীরকে ন

তখন হঠাৎ সুবীরের নজরে পড়ল ...দু চোখের কোণে দুই বিন্দু জল। ...কা চোখে শ্রীপতি বলেন—তোমার বাড়ি চার বছর বেড়িয়েছেন। ...সব অনুমান করেছিল কিন্তু ...নো অজানা তাহলে—মানু কে ...ন্তু সে কি বলবে, কি বলা উচিত ...যখন মাথা ঘামাচ্ছিল তখনই এক ...কে বাঁচালো। পর্দা সরিয়ে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে ঢুকেই সে বলে—

বাবা জানো, ছানুকাদের রান্নাঘরে একটা গোগরা সাপ বেরিয়েছে—বলতে বলতেই থমকে যায়।

সুবীর স্পষ্ট বুঝতে পারে তার শরীরের ওপর দিয়ে এই যুবতীর দৃষ্টি হেঁটে যাচ্ছে। খুব স্পষ্ট করে না দেখলেও ক্ষণিক দৃষ্টিপাতেই সুবীর টের পায় এ মেয়ে শহুরে মেয়ের মত ক্ষীণজীবী নয়, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর।

শ্রীপতি হেসে বলেন—বল তো কে?

সরোদের তারে টংকারের চেয়ে কিছু নরম শব্দের হাসির সঙ্গে শোনা যায়—

—আমি কী করে বলব?

—তা ঠিক। বলে হাসেন শ্রীপতি—অবণীকাকুর কথা বলি না তোর ছেলে সুবীর—

—নমস্কার। হঠাৎ শায়লি দুহাত জড়ো করে নমস্কার করে। এই নমস্কার ব্যাপারটা সুবীরের কাছে বেশ বোকা বোকা লাগে। তবে এও হতে পারে তার বেটপ

জড়তাকে ঠাট্টা করাই শায়লির উদ্দেশ্য। সুবীরও হাত তোলে, পরিপূর্ণ চোখেই তাকায় শায়লির দিকে। এবং মৃদু চমকেও ওঠে। শয়ালির বাঁ চোখের মণির দশ-ভাগের নভাগই সাদা। অথচ তার সারা শরীর ভাস্কর্যের মত।

—বেচারী অনেকদূর থেকে এসেছে—সেই মালদা। তাড়াতাড়ি ওর চা জল-খাবারের ব্যবস্থা কর। শ্রীপতির কথা শেষ হবার আগেই প্রায় উড়াল দিয়ে শায়লি দরজার কাছে চলে যায়। বলে—এক্ষুনি আনছি।

শ্রীপতি ডেকে বলেন—শোন, ও কোথায় থাকবে ঘরটা দেখিয়ে দে।

ফলে শায়লি ফিরে বলে—চলুন।

—বাইরে বারান্দার সঙ্গেই বসবার ঘর, তাতেই একটি খাটও পাতা—অতিথিদের জন্যই।

শায়লি ঘরে ঢুকে বলে—আসুন।

তখনো আলো জ্বলেনি, সুবীর ইতস্ততঃ করে। লাইট জ্বললে সে ভেতরে ঢোকে।

শায়লি বলে—আপনাকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে, স্নান করবেন?

সুবীর বলে—স্নান করাই বোধহয় ভাল।

বোধহয় টোধহয় আবার কী। আপনি কী কুইক ডিসিশান নিতে পারেন না?

—না জলটলের কোন অসুবিধে নেই তো?

—কিছু না। আমাদের চৌবাচ্চা ভর্তি জল। বলেই বেরিয়ে যায় শায়লি, উঁচু গলায় ডাকে—বুধন।

*

বাথরুমটা বেশ বড়। বাড়িতে সোমেনের শোবার ঘরও এতটা বড় নয়। কানায় কানায় ভরা চৌবাচ্চা। মানুষ নিঃসঙ্গ হলে কার কথা সবচেয়ে আগে মনে পড়ে? স্বপ্ন আলোয় এই নির্জনতায় রুমার কথা মনে পড়ে সুবীরের। সত্যি যদি চাকরি হয় এখানে এরকম একটা বাসাও পাওয়া যাবে।

সুখের কোন স্পষ্ট চেহারা নেই। কিন্তু রুমাকে স্পষ্ট চোখের সামনে আনা যায়। নির্জনতায় রুমা সঠিক দূরত্বে এসে দাঁড়ায়, স্পষ্টই হাসে।

—হাসছ কী, এই আমাদের ঘর—বসবার শোবার স্নানের।—বলে সুবীর এক মগ জল তুলে দেয়ালে ছোঁড়ে। দেয়ালে জলের দাগ লাগে। মাথা থেকে সমস্ত শরীরে জলের ধারাপাত। শিরদাঁড়াটা কেমন শির শির করে ওঠে। ভয়ে নয়, জল ঠাণ্ডা। ভয়ে অবশ্য শিরদাঁড়ায় মাঝে মাঝে মৃদু কাঁপন টের পায় সুবীর। রুমাকে কী শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা যাবে?—এ রকম দমআটকা ভয়ে ভাবনায়। গা ছুঁয়ে, কালীবাড়ির মেঝে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা টতিজ্ঞা কত ছেলেমানুষিই করেছে দুজনে, কিন্তু রুমা কথা দিয়েছে একটি চাকরি পেলেই রেজিস্ট্রেশান। আঃ শান্তি—চৌবাচ্চার অর্ধেক জল উড়ে যায় দুমিনিটে। শীত শীত করলে তবে হুঁশ হয় সুবীরের এবার তোয়ালে টেনে নেয়া দরকার।

*

ভোর হবার অনেক পরে সুবীরের ঘুম ভাঙল। প্রায় নটা।

শায়লি চা জলখাবার এগিয়ে দিয়ে বলে—খুব ঘুমুলেন!

—আমি এমনিতেই লেট রাইজার, আটটার আগে ঘুম ভাঙে না। কাল বাস জার্নিতে খুব টায়ার্ড ছিলাম। বলতে বলতে চামচে ওমলেট কাটে সুবীর, ডিম তার প্রিয় খাদ্য কিন্তু খাওয়া হয়ে ওঠে কদাচিৎ।

—আপনার জন্য বাবা আজ সাতসকালে উঠে ম্যানেজারের কাছে দৌড়ল, কী ব্যাপার বলুন তো? সুবীর খানিক অবাক হয়েই শায়লিকে দেখল, সবার আগে চোখ চলে যায় ওর সাদা মণিটাতেই। অথচ এটা শোভন নয়। সে শায়লির শাড়ির প্রিন্ট দেখল—ঝকঝকে লাল হলুদের জ্যামিতিক ডিজাইন।

ম্লান হেসে সুবীর বলে—ওই তো! এর জন্যই তো এদ্দূর আসা। চায়ের কাপ তুলে বলে—এটা চাকরি।

—জানতাম। শায়লি হেসে পেছনে হাত বাড়িয়ে জানলার পাল্লা সরায় রোদ আসছে।

—তবে কেন জানতে চাইলেন? সুবীর চায়ে চুমুক দেয়।

—আপনার মুখ থেকে শুনতে ভাল লাগবে বলে...শায়লি জানলায় বসা কাক তাড়ায় হুস করে।

কথাটা খানিক হেঁয়ালির মত সুবীরের নিজের মুখ থেকেই জান শুনে ভালো লাগবে—এ কেমন ভাল সুবীর কিছু বলে না।

শায়লি বলে—আর কোথাও পেলেন না?

—কোথায় পেলাম। সুবী হাসে।

শায়লি একটুও না হেসে ব বলে এখানে আসতে হবে?

বোঝা যায় এ-মেয়ে রূঢ় কথ সহজে বলতে পারে। খোঁচা খেয়ে হেসে হাসবার চেষ্টা করে বলে— নেই নাকি? আপনারা কী আমাদে

—আপনি অবনী সান্যালের বাবার কাছে চাকরির জন্য আস ভাবাই যায় না। শায়লি এবারে সে হাসি ওর সাদা মণিটার চেয়ে ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি চাপা দি বলে—কেন, এতে দোষের কী

—নেই? বলে দুমুহূর্ত বসে থাকে শায়লি। তারপর চো জানলার উঁকিমারা হাস্নাহানার তাকিয়ে বলে—অবনী কাকুর সঙ্গে ওঁর একটা সুন্দর ছবি ছিল আম মধ্যে, কাল যখন শুনলাম আপনি চাকরির জন্য তখন সেই ছবি কেমন যেন নোংরা লেগে গেল।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা একজোড়া চড়ুই দাপাদাপি করে যায়।

সুবীর আস্তে বলে—খোঁচা চাকরি ছাড়া এমন কী বড় কাজ না। আর সে চাকরি ছেড়ে যদি মত বাঁচতে হয়?

—আপনি ঠিক সেটা বুঝবে না। সম্ভব নয়। শায়লির তাকিয়ে থাকে।

কাপটা নামিয়ে রাখতে সুবী কেন?

শায়লি বলে—ওঁরা অন্য জাত ওঁদের মানসম্মান সেলফ্ রেসপেক্ট

—আপনি কী জানেন, বাবা এখানে পাঠিয়েছে? সুবীরের বলা হতেই শায়লি শব্দ করে হেসে ওঠে হাসি সুবীর তত কুঁকড়ে যায় ভেতরে। সে যেন একটা কোণঠাসা সহসা হাসি থামিয়ে শায়লি বলে একদম বিশ্বাস করি না। বাবার অবনীকাকুর কথা শুনেছি ওঁর প অসম্ভব।

কী পরিষ্কার কথা বলে শ করে চড় মারার মতো। খানিক থাকে সুবীর। বাবার সঙ্গে সে যতই করুক, বাবার ওপর যত দোষারোপ সেও নিজের মনে বাবাকে শ্রদ্ধা ক কত বড় দুঃসাহসী হলে মানমর্যাদা কতটা সচেতন হলে এমন বিপদে মানুষ নিতে পারে। রুমার কাছে গর্ব করে বাবার গল্প করে সুবীর শায়লির কাছে সেরকম ভাবে বলা
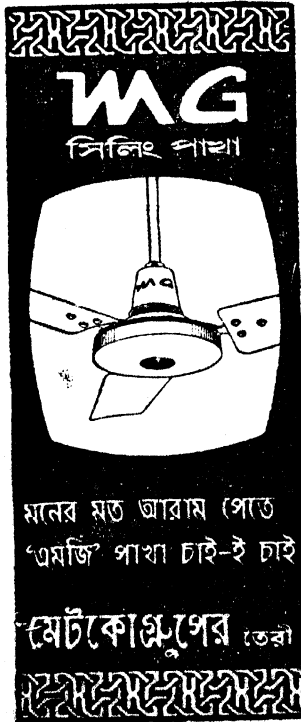
...বড় বেশী ছোট করে ফেলা হবে।
...কাছে ছোট তো হয়েই আছে সে।

...আস্তে সুবীর বলে—আপনি ছেলে ...বুঝতেন।

...অবাক হয় শায়লি বলে—কী বুঝতাম? —একজন জলজ্যান্ত যুবক ছেলে যদি ...না পায়, যদি তাকে সবার কাছে মাথা ...করে—

—বুঝলাম। শায়লির যেন একটু মায়া ...নম্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলে—সে ...আপনার তো ঘুচল, চাকরি আপনার ...যেতেও পারে। বাবার পক্ষে এটা খুব ...কাম্য না।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠবার সাহস ...না সুবীর, শুধু চোখ বুঁজে রুমাকে ...নে দাঁড় করায়, দাঁড় করিয়ে নিঃশব্দে ...—শুনলে তো! এবার তুমি মাথা ...টা তুলে দিতে পারো। দাঁতে ঠোঁট ...কল্পনার রুমা একটা বিলোল কটাক্ষ ...অপাঙ্গে তাকায়। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে ...বীর বলে—না আঁচালে বিশ্বাস নেই। ...লে কোন কিছুতে বিশ্বাস করার মতো ...জোরটাই নেই বুঝলেন! তার কণ্ঠস্বর ...টা ক্লান্ত শোনায়।

...যেন প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য শায়লি বলে ...আপনি আমাকে স্বচ্ছন্দে তুমি বলতে ...রেন।

এতক্ষণে বেশ হাল্কা বোধ করে সুবীর, ...—আমিও তাই ভাবছিলাম।

—চাকরি হলে খাওয়াবেন তো? ...লিও হাল্কা সুরে বলে।

—হোক আগে। সুবীর খুব স্বাভাবিক ...ায় বলে যাতে তার ভেতরের উত্তেজনা ...কাশ না পায়।

শায়লি বলে—মনে হয় হয়ে যাবে, ...ন্তু—

খুব সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে সুবীর ...—কিন্তু কী?

শায়লি হাসে—কিন্তু এতে আপনার ...ল হবে না খারাপ হবে তাই ভাবছি।

ফের শায়লির কথায় হেঁয়ালি ফুটে ...ঠে। ভয়ে ভয়ে সুবীর বলে—কেন ...তো?

শায়লি হাসতে হাসতেই বলে— ...পনাদের মতো আমি দুচোখে দেখতে পাই ...। একটা চোখে পুরো অন্ধকার দেখি ...নেন তো? আমি সব কিছুর অর্ধেকটা ...অন্ধকার দেখি—। এতেও কিছু স্পষ্ট হয় ...। সুবীর শিরদাঁড়াতে কেমন একটা ...পন অনুভব করে। আচমকা শায়লি প্রশ্ন ...রে—বলুন তো আমাকে দেখতে কেমন ...বীর একটুও সময় না নিয়ে বলে—ভালো।

শায়লি আরেকবার জোরে হেসে ওঠে, ...জোরালো সে হাসি যে তার চোখে জল ...যায় সামান্য, কিন্তু সে-জল না মুছলেও ...। হাসি থামিয়ে চোখের উদ্গত জল না ...েই শায়লি বলে—আপনার মনটা বুঝি ...নরম? আপনি খোঁড়াকে খোঁড়া কানাকে ...বলা উচিত নয় এটা বুঝি খুব মানেন? শায়লি এমন সরাসরি কথা বলে সোজা ...এসে লাগে। সত্যি সত্যি শায়লির সমস্যা...

...শিটাকে এতক্ষণে ভীষণ কুৎসিত লাগে সুবীরের।

অথচ কোন রূঢ় কথা কিংবা কোন খোশামুদে কথাও তার বলতে সাহস হয় না। সে নিশ্চুপে বসে থাকে।

আর সহসাই শায়লি বলে—এই যাঃ, বাবাকে ওষুধ খাওয়াতে একদম মনেই নেই। বলেই আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সে ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সুবীর দাঁত বার করা বিরাট একটা বাঘের হিংস্র হাঁ-মুখ দেখে চমকে ওঠে। ক্যালেন্ডারের বাঘ হাওয়ায় নড়ে।

*

—চাকরি তোমার হয়ে যাবে সুবীর, আমি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। কাল সকালে পাকা কথা হবে। শ্রীপতি খুব ধীরে ধীরে বলেন।

খুব জোরালো আনন্দে কিংবা আকস্মিক আঘাতে বোধহয় মানুষ একই রকমভাবে বিমূঢ় হয়ে যায়। সুবীর টের পায় না তার কতটা আনন্দ হচ্ছে, শুধু বাবার কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ায় তার মনটা চকিতে বিষণ্ণ হয়ে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই রুমার নিটোল স্বাস্থ্যভরা শরীর পুষ্ট ফলের মত মুখটা ভেসে উঠতেই তার মনের ওপারে জ্যোৎস্নার প্লাবন লেগে যায়।

কৃতজ্ঞতার কিছু কথা বলা উচিত, মুখে হাসি ফুটিয়ে শ্রীপতির দিকে তাকায় সুবীর। অবনীর ছেলেকে চাকরি জুটিয়ে দেবার আনন্দে শ্রীপতির মুখেও হাসি দেখবে আশা করেছিল সে। কিন্তু শ্রীপতির

কপালে গুটিকয় বলিরেখা কেঁচোর মত পিচ্ছিল।

অস্ত সূর্য নিস্তেজ আলো ফেলছে চরাচরে। বিস্তীর্ণ উপত্যকা, পাহাড়, চা-বাগিচা, গাছপালা সবসুদ্ধ মিলিয়ে কেমন স্থির হয়ে আছে। কাল ঠিক এমনি সময়ে এমনি চাবাগানের মধ্যেই শ্রীপতির দেখা পেয়েছিল সুবীর। সুবীরের কী প্রণাম করা উচিত শ্রীপতিকে?

শ্রীপতি বলেন—চলো সুবীর একটু বেড়িয়ে আসি ঝোরার দিক থেকে।

চড়াই উৎরাই পথ চাবাগান চিরে ঝোরার দিকে চলে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে শ্রীপতি বলেন—তিন মাস বাদে রিটায়ার করব বুঝলে সুবীর। দুবছর একাসটেনশানে ছিলাম, নেহাৎ ওদের গুডবুকে আছি—

—ওরা যেরকম সার্ভিস পেয়েছে আপনার কাছ থেকে গুডবুকে থাকবেন না কেন? এতক্ষণে কিছু বলতে পেরে সুবীর স্বস্তি পায়।

—গুডবুকে থাকতে পারাটা খুব সুখের না হে, চাকরি মানে যে গোলামী সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাই। বলতে বলতে অন্যমনস্ক শ্রীপতি গাছপালার ওপর দিয়ে আকাশ দেখেন। আলো ধুকছে, বিশাল আকাশ যেন ঝুঁকে পড়ছে ধীরে ধীরে। শ্রীপতি চোখ ফেরান না, বলেন—সারাজীবন মনপ্রাণ দিয়ে গোলামী করেছি বলেই আমার একটা ডিমান্ড আছে—একজন ক্যান্ডিডেটকে আমি পুশ করতে পারি।

—এটা তো আপনার লেজিটিমেট ডিমান্ড। সুবীর পাখির ডানায় চকচকে শেষ আলোর চমক দেখে।

—কিন্তু বল তো সুবীর, এই যে সারা জীবন খেটে গেলাম তার বদলে এটুকু ছাড়া কি পেলাম? শ্রীপতি মুখ ঘুরিয়ে একপলক তাকিয়ে ফের বলেন—মানুষ জীবনে কি চায় বল তো? সুখ শান্তি মান সম্মান? কয়েকটি সন্তান? নাকি আর কিছু?

সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। শালিখের বুকের মত ধূসর দেখাচ্ছে চারিদিক। আকাশ নুয়ে পড়ছে।

—আর কদিনই বা আছি বল তো? শ্রীপতি স্বগতোক্তির মত গুনগুন করে বলেন—একটু আনমনা হলেই তো ডাক শুনতে পাই আজকাল—

ঝিঁঝিঁর একটানা শব্দ স্পষ্ট হচ্ছে। সুবীর রাস্তা থেকে একটা শুকনো ছোট্ট ভাঙা ডাল কুড়িয়ে নেয়।

শ্রীপতি বলেন—তোমার কাকিমাকে দেখেছ তো? চার বছর—

সুবীর বলে—বাতটা খুব খারাপ অসুখ।

—সুখ কোথায়? মৃদু হাসেন শ্রীপতি—শুধু বাত তো নয়। মানুটা ওকে মেরে দিয়ে গেছে।

কালও মানুর কথা শুনেছে সুবীর। সপ্রশ্ন চোখে তাকায় সে। শ্রীপতি বলেন—আমার ছেলে, শায়লি আর ওই ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। কপাল—বুঝলে, বানারহাট স্কুলে হোস্টেলে থেকে পড়ত, সঙ্গদোষে ক্লাশ টেনে উঠতে না উঠতে বখে গেল। কোন নেশাই বাদ দেয়নি। একটু শাসন করতে পালিয়ে গেল। তিন বছর কোন খোঁজ নেই।

সুবীর এবং শ্রীপতির বড় দুটো শ্বাসের শব্দ একই সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি করে। অনেকটা আপনমনেই সুবীর বলে—স্যাড।

—তোমার এই কথাটাই যেন একমাত্র খাঁটি বুঝলে সুবীর, অন্ততঃ আমার বেলায়। শ্রীপতি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন না। বলেন—এই শায়লিটাকে দেখেছ তো, কি পাপ করেছি কে জানে! একটা চোখে জন্ম খুঁতো। যত সম্বন্ধ আসে ভেঙে যায়। অথচ—ও কি দেখতে খারাপ বল তো?

সুবীর বলে—না। খারাপ হবে কেন?

—নিজের মেয়ে বলেই বলছি না সুবীর, শ্রীপতি ঘনিয়ে ওঠা অন্ধকারে তাকিয়ে বলেন—ওর মত বুদ্ধিমতী অনেস্ট কাজের মেয়ে খুব কম হয় আজকাল। পাহাড়ী ঝর্ণার সামনে ঈষৎ উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে পড়েন শ্রীপতি। ভীষণ পরিষ্কার জল পাথরের ভেতর দিয়ে শব্দ করে বয়ে যায়। শ্রীপতি জল দেখেন না, সহসা সুবীরের দিকে ফিরে দাঁড়ান, বলেন—তোমার কাছে বলতে আমার লজ্জা নেই সুবীর অবনীর সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। ইয়েস, ইট ওয়াজ এ ড্যাম বিট্রেয়াল।

সুবীর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নতচোখে তীব্র বেগে বয়ে যাওয়া জলপ্রবাহ দেখে। সে কি বলবে?

—কিন্তু কি হল, কেন কি জানো বেঁচে আছি ভেবে ঠিক পাই না। শ্রীপতি খুব আস্তে ঘাসের ওপর বসে পড়েন, সুবীরও।

একটা প্যাঁচা ডেকে উঠেই স্তব্ধ হয়ে যায়। শ্রীপতি আস্তে বলেন—একটা কথা বলব, আমাকে ভুল বুঝবে না তো সুবীর?

সুবীরের শিরদাঁড়াটা বেঁকে যায়। সামনে ঝুঁকে সে বলে—বলুন।

—আমার নিজের বলতে বিশেষ কে নেই। মানুটাও আর ফিরবে কিনা জানি না। এই চাকরিটা আমি তার জন্যই রেখেছি ... আমার শায়লিকে নেবে। জলের দিকে তাকিয়ে বলেন শ্রীপতি—অন্ততঃ সেবক... ভাবে যদি ওর একটা—

শুধু শিরদাঁড়া নয় সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে সুবীরের। হাতের দুটো পাতা মুহূর্তে ঘামে ভিজে যায়। রুমাকে এতক্ষণ পরে ... মনে পড়ে কিন্তু তার মুখ কিছুতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। চোখ বোঁজে সুবীর। তার শ্বাসপ্রশ্বাস কি বইছে না?

শ্রীপতি মাথাটা ঈষৎ নীচু করে বলেন—অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে সেকথা তুমি বলতে পারো। এক্ষুনি তাড়া কিছু নেই। ভেবে নাও কাল সকালে বলো।

সুবীরের বোজা চোখের সামনে—একটা জড়ংগব বুড়ো কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। নিস্তেজ। রোঁয়া ওঠা। তার কুঁ... উঠে যাওয়ার ভঙ্গি গ্লানিভরা উচ্চকিত ভক্ষণের চেহারাটা এত তীব্রভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, চমকে সুবীর দুচোখের পাতা মেলে সামনে তাকায়। ঝাপসা লাগে বয়ে যাওয়া ঝরনার জল, ঝাপসা গাছপালা, ঝাপসা দূরে একটি আকাশের তারা। আর তখনই মনে পড়ে উদগ্রীব উৎকণ্ঠায় রুমা নামে একটি মেয়ে অপেক্ষা করে আছে। কবে সুবীর ফিরবে?

রুমা নিঃশব্দে অন্ধকারের ম... অন্ধকার হয়ে দাঁড়ায়। সুবীর নিঃশব্দে বলে—কি দেখছ? রুমা বলে—তোমাকে। চোখে জল মনে হচ্ছে? সুবীর দুই চোখ পিটপিট করে বলে—কই না তো। আবছা অন্ধকারে টানা ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই।

খুব আস্তে স্বগতোক্তির মত শ্রীপতি বলেন—অবনীর ওপর অন্যায় করেছিলাম তোমার ওপরও বোধহয়—

—না না। সুবীর জোরেই বলে যায় কিন্তু ফ্যাসফ্যাসে একটা অর্থহীন শব্দ ঘুরে ওঠে তার কণ্ঠনালীতে। সে ... পরিষ্কার করে বলে—আমার ভাবা হয়ে গেছে কাকু, আপনি কাল সকালেই সাহেবের সঙ্গে পাকা কথা বলতে পারেন।

শ্রীপতি অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে ছিলেন কিনা বুঝতে পারে না সুবীর, শুধু ভীষণ শীতল একটা স্পর্শ অনুভব করে সে ... একটা হাতে। ভাল করে চেয়ে দেখেও ঠিক করতে পারে না—ওটা শ্রীপতির হাত কিনা। দূরের বয়ে যাওয়া ঝরনার জল সে দেখতে পায় অথচ কাছের হাতটাকে দেখতে পায় না। তার দুটো চোখ কি সুস্থ নয়? সেও তবে শায়লির মতো? নয়তো কেন সে কাছের শ্রীপতির এগিয়ে দেওয়া হাতটা দেখতে পায় না?
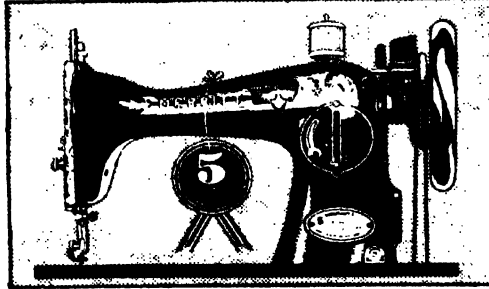
কাশীনাথ সিংহ

কাশীনাথ সিংহ (১৯৩৬) প্রথম গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর লেখায় ঋজু প্রকাশ ও বলিষ্ঠ ভাবনা পাঠককে সচেতন করে তোলে। ১৯৬০ সালে প্রথম গল্প প্রকাশ হলেও, প্রথম গল্প সংগ্রহ 'লোগ বিস্তরে পর' (বিছানায় মানুষ) ১৯৬৭ সালে প্রকাশ পায়। প্রগতিশীল এই লেখক বর্তমানে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

বিজ্ঞপ্তি

মহাশয়, সামনে মারোয়াড়ী ধর্মসংঘের চত্বরে, যেখানে মাঝে মাঝে গরু মোষ বসে জাবর কাটে, কিছুক্ষণ ধরে সেখানে পাড়ার ছেলেপেলেরা খেলা করছে।

গোবর, পাতা, খোয়া, পাথর, কাগজ, ছাই এবং বালি জমা করে একটা সাত বছরের বালক দিগম্বর অবস্থায় আসন গেড়ে বসে আছে। তার হাত-পা সরু ও লম্বাটে, পেটটা পিলের মত বেরিয়ে আছে। সে তার কালো ময়লা চেহারায় চুণ দিয়ে সাদা গোঁফ এঁকেছে। যখনই মাথা নাড়ায়, চুল থেকে চূর্ণ বালি ঝিরঝিরে বৃষ্টির মত উড়ে বেড়ায়।

অনতিদূরে সার বেঁধে কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে বসে আছে। তাদের হাতে শালপাতার ঠোঙা ও ভাঙা ভাঁড়। বালকটি গর্ব ভরে তার ভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টি ফেলে, তারপর জিজ্ঞেস করে—'আর কিছু?'

'কত্তাবাবু, লুচি চাই।'

বালকটি ঠোঙার ওপর তাচ্ছিল্যভরে একটা পাতা ছুঁড়ে দেয়।

অন্য একজন ভাঙা ভাঁড় তোলে—'দই কর্তাঠাকুর।'

'—যা, যা। ভিখিরিদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে গেছি।' বালকটি কানে আঙুল দেয়, চোখেমুখে বিরক্তভাব প্রকাশ করে—'তোদের কি পেট, নাকি জালা? কত আর গিলবি? আঁ, এই নে।'

সে ভাঁড়ে গোবর ফেলে দেয়।

'কর্তা, আপনার ছেলেমেয়ের মঙ্গল হোক, সুখে শান্তিতে থাকুক। টাকাপয়সার আয় বাড়ুক।' একটি মেয়ে এগিয়ে আসে—'তরকারি কর্তা। এঁচোড়ের তরকারি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, একটু তফাতে সরে দাঁড়া। ওমা, ছুঁয়ে ফেলবি যে। এই নে।'

ছেলেটি ওপর থেকে খোয়া ছুঁড়ে ফেলে।

এবার একটা ছেলে উঠে দাঁড়ায়—'তোর টাকাপয়সায় ঘুন ধরুক, তোর ... বাঁগ হোক, মহামারী হোক, কুঠ হোক তোর—একটু চাটনি দিও গো কর্তা।' তারপর সবকটা ছেলে লাফিয়ে, চেঁচিয়ে, হৈচৈ, আর্তনাদে-কোলাহলে বালকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—'মার। মার শালাকে।' বালকটি চত্বরের ওপর ঘুরে ঘুরে পাক খায়, ছেলেরা ততই তাকে ধরার চেষ্টা করে। মহাশয়, এই খেলা এখনও ভালো করে জমে ওঠেনি, এরি মাঝে গলির সামনে হাসপাতালের দিকে দ্রুত গতিতে একটা রিকসা যেতে দেখি।

রিক্সার ওপর একজন শক্ত-সমর্থ পুরুষ এলিয়ে পড়ে আছে, পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে এবং মাথা ঝুলে আছে সীটের পেছনে। ঠিক, সিটের নীচে রক্তে মাখামাখি একজন বসে আছে, সে কাঁধের সাহায্যে পুরুষটির কোমর ঠেকিয়ে রেখেছে, এবং একহাতে তার পড়োনোদ্যত নাড়িভুঁড়ি ধরে রেখেছে। রিক্সার ঘন্টি একনাগাড়ে বেজে চলেছে—শহরের মাঝপথে ফায়ার-ব্রিগেডের গাড়ীর মত।

আমার কেবল এইটুকু মনে ... তলা থেকে লকলকে রোদের একটা ... ফোয়ারা খোলা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছিল ... চা-অলা ছোঁড়া ছুটে গিয়ে ঝপ ... রেডিয়ো বন্ধ ক... ফেলেছিল। অবশ্য ... মনে আছে চত্বর একেবারে শূন্য ... গেছিল। চা-অলা ছোঁড়া আমায় দেখ... আমি তাকে। সে তখন কাঁপছিল।

*

মহাশয়, একটু সময় দিন, আমি এখন আ...

'এই রিকশা।'

বন্যা আসার পর রিক্সা ক... দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। যদিও এই এক ... রাস্তা, বন্যা যাকে বেঁধে রেখেছে। রিক... এক্কা, টাঙ্গা, সাইকেল, কার এবং স্কুটা... ভিড়, হর্ণ ও ঘন্টির মুখরিত শব্দ, সওয়া... লুটপাট—সব আছে কিন্তু রিক্সার ... দ্বিগুণ হয়ে গেছে, ফলে সওয়ারি অবস্থা... আছে, রিক্সাও তাই।

বন্যার জল শ্রান্ত অলস কুমীরের ... পড়ে রয়েছে—কমছে না, বাড়ছে ন... লোকেরা প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে—করতে চায় সে, ইচ্ছেই বা কি?

সহসা একটা রিক্সা এসে দাঁড়... আমি আওয়াজ দিতেই রিক্সাও... ঘাড় ফিরিয়ে দেখে তারপর আবার ছুট... শুরু করে।

কথা।' আবার চেঁচিয়ে উঠি.
দিয়ে সিটের ওপর বসে পড়ি।
র সা'ব ?'
চল কোথাও। আচ্ছা, গোধূ-
।'

টাকা ভাড়া লাগবে সাব।'
?' রিক্সা থেকে আমি লাফিয়ে
চোখে চোখ রেখে দেখি—তুই
থা ?'
'আমার নাম জংগী নয়, আমি

আমার গাঁয়ের জংগী, যার সঙ্গে
া-পড়া, খেলাধূলো করে গোটা
টিয়েছি, কত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের
আমরা একসঙ্গে বাগানে কাটিয়েছি,
রে বেড়িয়ে কত-কত রাত ভাঁড়
র নাচ দেখেছি, নববর্ষ অনুষ্ঠানের
না গোবর ও কাঠ চুরি করেছি,
ড়ো করেছি, ধান কাটা মাঠে জল
মাছ ধরেছি, বন-বাদাড়ে মোষ
কত বিরহ-গীত গেয়েছি—সেই
না রাতারাতি ভোলা হয়ে পড়েছে।
গী, চালাকি করিস না। তুই
লে করে চিনিস।'

জনকে চিনবো সাব। এমন করে
তে থাকি, তাহলে আমার আয়ের
জবে।

, এটা প্রশ্ন নয়। আমি তোকে
সেছি। তুই কি করে ভাবলি,
লা যাবো ? অ্যা ? চল কোথাও
সি, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করি,
ব করি। তোর সঙ্গে দেখা, কথা
যুগ পেরিয়ে গেছে।
ব, আমি জংগী নই, ওকে আমি
।'

'না-ই বা হোক। আমার দিকে চোখ তুলে দ্যাখ্।' আমার হাসি পায়।

আমি তাকে বুকে জড়িয়ে পিঠে একটা কিল মারি, তারপর সিটের দিকে এগিয়ে গিয়ে রিক্সার ওপর বসে পড়ি। 'আচ্ছা, চল।' সে কয়েকবার প্যাডেল চালিয়ে রিক্সার গতি বৃদ্ধি করে, সহসা বুড়ীর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'কিরে, কি হলো আবার ?'

'সা'ব। সত্যি বলবো, আমি গোধূলিয়ায় যাবো না। আমি নেমে পড়তেই সে দ্রুতগতিতে রিক্সা ঘুরিয়ে নেয়। বাতাসে পত্‌পত্‌ করা তার পিঠ দেখা যায়। আমি মাথা ঝুঁকে হাঁটা পায়ে রওনা দিই।

মহাশয়, কে সেইজন, আমার ও জংগীর মাঝখানে যে এসে পড়েছে এবং আমরা এক-অপরের কাছে অপরিচিত থেকে যাই।

★

দশাশ্বমেধ রোড।

নিজের চোখে দেখুন, সেই জনসমূহ, যা রাস্তার দুই ফুটপাথ জুড়ে হাঁটু অবধি ডোবা চৌমুহানী অব্দি সার-সার ছড়িয়ে আছে। লোকেরা সেজেগুজে দোকানের পাটায় দাঁড়িয়ে আছে। ওই পারে এইপারে কত রঙ তামাশা, হাসি-বিদ্রূপ-ঠাট্টা, পিছলে পড়া, জলছোঁড়া, সাঁতার, ছপছপানি এবং পিচকারীর খেলা—আরও কত কি খেলা তাদের মাঝে চলছে। শহরের সবকটা বাউন্ডুলে বন্যা দেখার জন্য দোকানে, পাটায়, চত্বরে, জানালায়, ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—লোকেরা ডিঙি চেপে হৈচৈয়ে কোলাহলে, গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে এপার-ওপার যাতায়াত করছে। এটা একটা উৎসব, হ্যাঁ, এ এক উৎসব—যা

কোন কোন বছরে খুবই দুর্লভভাবে জুটে যায়—বরং নাচ হোক, গান হোক, আনন্দ-উৎসব হোক—এবং কামনা করুন, এমন দিন যেন সর্বদাই ঘটে।

একটি মেয়ে—গ্রাম্য মেয়ে রাস্তার ওপার থেকে এপারে আসতে চায়। সুশ্রী, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এবং সমর্থ শরীর। শহুরে চঙ-নক্‌শা ও স্নো-পাউডারের মুখে ছাই ফেলে ফর্সা-উজ্জ্বল মুখশ্রী, যা থেকে লাবণ্য চুঁয়ে পড়ছে। মেয়েটির বাঁ-হাত কাঁধের কাছে, ডান হাতে সে শাড়ি ধরে আছে। জল পায়ের ডিমের কাছে, শাড়ি হাঁটু অব্দি তোলা।

জল যতই গভীর হয়ে উঠছে, শাড়ি ততই ওপরে উঠে আসে। সবার দৃষ্টি তার দিকে সাঁটা। নানান ধরনের আওয়াজ ছাড়ছে, শিস দিচ্ছে এবং হা-হা সশব্দে হাসছে—মাইরি, খাসা জিনিস।

আমাদের তেওয়ারীর ভাই সম্ভবতঃ। আশপাশে তার বন্ধু-বান্ধবরা ঘিরে আছে, তাদের কয়েকজনের চেহারা আমার চেনা। তারা সিগারেট টানছে, সেই সঙ্গে জুলফি ও গোঁফে তা দিচ্ছে।

—বল তো, ওকে কোলে করে পার করে দিই।' তেওয়ারীর ভাই বলে।

তারা এত জোরে-জোরে কথা বলছে যে আওয়াজ ঐ মেয়েটিকে অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে পৌঁছায় এবং লোকেরা হেসে লুটোপুটি খায়।

মহাশয়, এই গল্প এখনও চলবে, বরং মাঝখানে একটা কৌতুকী শুনুন—

এরি মাঝে একজন মধ্যবয়সী লোক, সম্ভবতঃ মাথবকুলে বসা নাপিত সহসা মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়। ভয়ংকর আর্তস্বরে সে

বিশ শতকের সুরু থেকে বাঙালী জীবনের স্মৃতি আলেখ্য

।। দুই ।।

কারো মনের মধ্যে যদি বাড়ি বানানো থাকে তো আমার মনে হাইউইণ্ডস বাড়িটি তৈরি হয়ে আছে। হঠাৎ একদিনে, প্রথম দেখায় ও বাড়ি আমার মনের মধ্যে গেঁথে যায়নি, তিলে তিলে তৈরি হয়েছে ওর ছাদের নিচে বছরের পর দিন কাটানোর প্রাণশক্তি দিয়ে। কাঠের মেঝে, পা ফেললে একেকটা তক্তা কোঁচ কোঁচ করে, তার ওপর নারকেল ছোবড়ার ম্যাটিং পাতা; ইঁটকাঠের দেয়াল, তার ওপর পলেস্তারা দিয়ে চুনকাম করা, অসমান, করুগেট টিনের ছাদ, তাতে অজস্র ফুটো, বর্ষায় জল চোঁয়াত। টিনের ছাদের নিচে ক্যাম্বিসের সীলিং, তার ওপর খাড়িরা রাতে দোড়োদৌড়ি করত। নবাগত কেউ থাকলে ঘাবড়ে যেত। কাচের দরজা-জানলা। চারদিকে ফলের গাছ, ফুলের গাছ। পিছনে অনেক নিচে, যেখানে তুঁতবনের পরেই আমাদের কাঁটাতারের বেড়া, তার নিচে লাল পুলের তলার সেই নদীই কলকল করে দিনরাত বয়ে যেত। তুঁতগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলে, শুঁয়োপোকাদের পাতা চিবুনোর কচর-কচর শব্দ শোনা যেত। রেশমের দেশ ঐ পাহাড়। ওখানকার লোকে ঘরে ঘরে রেশমের সুতো কেটে মুগা, তসর বুনত।

নদীর ওপারেই লুমপারিং পাহাড়। বন আর বন, রাতে সেখানে হুতুম প্যাঁচা ও কত খ্যাঁক-শেয়াল খ্যাক খ্যাক করে হাসত। পাশে চওড়া ফায়ার লাইন, নদীর ধার থেকে পাহাড়ের মাথা অবধি উঠে গেছে; তার পর হয়তো ও-ধার দিয়ে আবার নেমে গেছে। পাহাড়ের ও-ধারে দেখবার জন্য মন ছটফট করত। ফায়ার লাইনের পর পাহাড়ের খাঁজে লুমপারিং জলপ্রপাত দেখা যেত, জল ঝর ঝর শব্দ শোনা যেত আর ঝরনার নিচে জল জমে সরু নদী হয়ে, আমাদের নদীতে এসে মিশছে, সে-ও আমাদের তুঁতগাছের তলা থেকেই দেখা যেত।

এ-বাড়িতে আসার আগে কোনো বই-টইয়ের ওপর তেমন করে চোখ পড়েনি। ছিল বই অবিশ্যি, মা-বাবার বিয়েতে পাওয়া, কিন্তু তাতে ছবি ছিল না। মার পড়ার শখ ছিল, সেকালের বি-এ পড়া মেয়ে; মাসিক পত্রিকাও আসত, ইংরিজি বাংলা। কিন্তু আমার সেদিকে চোখ পড়েনি। পাঁচ বছর বয়স হতেই শ্লেটের ওপর বড় বড় ক, খ, আর এ বি লিখে, তার ওপর দাদাকে পেনসিল বুলোতে বলা হল।

নদীর ওপারের দিদিমা বললেন, 'প্রভাত ছেলে লেখাপড়া শিখছে, খুব ভালো কথা।' এসব হল গিয়ে লালপুলের বাড়ি ছাড়ার সময়কার কথা। মার কাছে লেখাপড়া। সে বরং ভালো। দিদিমাকে মা ডাকতেন 'মাসিমা', তাঁর নাম ছিল সারদামঞ্জরী দত্ত, নাকি আমার দাদামশাইরা দিদিমাকে চিনতেন। নদীর ও-পারে ওঁদের বাড়িটিও আশ্চর্য। নিচে একটি ঘর, তার পাশে তরকারির বাগান; পাথরের সিঁড়ি; ওপরে তিনটি তিন রকম আলাদা বাড়ি, কোনোটার টিনের ছাদ, কোনটা খড়ের, মধ্যিখানে উঠোন, লেপা-পোঁছা তক-তক করছে। তারি একধারে এমন আশ্চর্য এক জিনিস ছিল যে দেখে দেখে শখ মিটত না। পাহাড়ের গায়ে একটা পাথরের গর্ত, তার তলায় দু তিনটি ফুটো থেকে দিন রাত বুড়বুড় করে জল বেরোচ্ছে। গর্তটার গায়ে ছ্যাঁদা করে পাইপ লাগিয়ে একটা কল বসানো ছিল। দিদিমারা সরকারি জল ব্যবহার করতেন না। এরকম আমরা আগেও কখনো দেখিনি, পরেও দেখিনি, একান্ত নিজের একটা জলের উৎস।

এখন ভাবি দিদিমা মানুষটিও অনন্যসাধারণ ছিলেন। ৬০।৬৫ বছর আগেকার কথা, তখনি কতকগুলি অভিভাবকহীনা বাঙালী মেয়ে দেখেছিলাম যাঁরা পুরুষদের চাইতে কোনো দিক দিয়ে কম ছিলেন না। এঁদের অনেকেই ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে; তার একমাত্র কারণ হিন্দু সমাজের তেজী মেয়েরাও সমর্থনের অভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেতেন না। সারা জীবন তাঁদের কটুভাষী অনিচ্ছুক আত্মীয়স্বজনদের কাছে হাত পেতে থাকতে হত, নয়তো কুলত্যাগিনী হতে হত। শিলংএ সরোজিনী মাসিমা ছিলেন; যামিনী সেন বলে আরেকজন শিক্ষাব্রতীও ছিলেন, তাঁর চেহারাটি ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারি না। তবে সোনার বো-বাঁধা পিন দিয়ে বুকে একটা ছোট্ট সোনার ঘড়ি ঝোলাতেন, তার দিক থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারতাম না। এঁরা ছিলেন অবস্থাপন্ন ঘরের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে। দিদিমার কথা আলাদা।

তাঁর চেহারা আমার ভুলবার কথা নয়, অনেক বছর পরে কলকাতায় মেয়ের কাছে মারা যান। ফুটফুটে ফর্সা ছোট্টখাট্টো মানুষটি অনবরত এবং চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতেন। কারো জন্মদিন, কি শ্রাদ্ধ, কি বিয়ে উপলক্ষে কোনো বইখাতার সাহায্য না নিয়ে টমটমে পাহাড়ে নদীর স্বচ্ছ স্রোতের মতো অপরিসীম ভক্তি সহকারে ভগবানকে ডাকতেন। আমি অবাক হয়ে দেখতাম তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। গোড়ার দিকে তাঁর স্বামীও ছিলেন, গোলগাল, বেঁটে, মাথার সামনে টাক, লম্বা কালো দাড়ি। বোধহয় মানুষটি চুপচাপ থাকতেন। অন্য কোথাও গিয়ে অকালে মারাও গেলেন। মনে আছে একদিন সকালে দিদিমাদের বাড়িতে উপাসনা হল, তার পর রোদে ভরা নীল আকাশের নিচে, একটা ফুলে-ঢাকা জায়গায়, ছোট্ট একটা সুন্দর কৌটো মাটির নিচে রাখা হল। দিদিমা সাদা থান পরে, খালি হাতে, ভগবানের নাম করতে লাগলেন আর তাঁর ছোট মেয়ে মনুদি আমাদের বললে, চুপ

চুপ, কথা বলতে নেই। আমরা ফিস ফিস করে বললাম, 'বল না কি আছে ওতে?' মনুদি বলল, 'বাবার ছাই।' বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সে আমাদের চেয়ে সামান্য বড় ছিল। শুনে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেছিল। মরে গেছেন তো মরে গেছেন, তাই বলে এই সুন্দর সকালে বেচারি দাদামশাইকে কৌটোয় ভরে মাটিতে পুঁতে ফেলবে, এ যে ভাবা যায় না! খুব খানিকটা কেঁদে নিয়েছিলাম, আর বলেছিই তো দিদি কখনো কাঁদবার সুযোগ ছাড়ত না। চোখ লাল হয়ে যেত, নাক ফোলাত, সর্দি গড়াত, ফোঁৎ-ফোঁৎ শব্দ করত, ভারি বিশ্রী লাগত। রাগে আমার কান্না সেরে যেত।

খুব ছোটবেলার কথা সঠিক মনে রাখা শক্ত, কেবলি আগের ঘটনার ওপর পরের ঘটনার ছায়া পড়তে থাকে। তার ওপর গল্প হয় কাটা কাটা, আলাদা আলাদা কয়েকটা ছবি, কারো সঙ্গে কারো কোনো যোগ নেই। কিন্তু তাই দিয়েই একেকটা মানুষের ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়; তার একটা স্বকীয়তা এমনি করেই তিলে তিলে গড়ে ওঠে, একটা দৃষ্টিভঙ্গি রচনা হয়। আমার এই আমিত্বটা ঐ ভাবেই গড়ে উঠেছিল একথা বললে অবিশ্যি সবটুকু বলা হয় না। কারণ পুরুষানুক্রমেও নিশ্চয় কিছু নিয়ে এসেছিলাম আর শুধু মানুষই বা কেন, ঐ নীল পাহাড়ে ঘেরা, মাথার ওপর উপুড়-করা নীল গামলার তলায়, মর্মর-মুখরিত পাখির ডাকে চকিত যে পরিবেশে দিনগুলো কেটেছিল তারাও তাদের ছায়া রেখে গেছে। সরল-বনে যেই না পা দিয়েছি, অমনি টের পেয়েছি শির-শির সর-সর করে ছোট ছোট জানোয়ারের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে, গাছের কোটরে চকচকে চোখ বুজে গেছে, মগডাল থেকে শাঁখের মতো সাদা পাখি উড়ে গেছে—এরাও তাদের চলে যাবার একটু শব্দ একটু ডানার হাওয়া রেখে গেছে। এত কথা কি আর একখানি বইয়ের দুটি মলাটের মধ্যি-খানে ধরে দেওয়া যায়? যা আমার নাগালের বাইরে রয়ে গেল, তাকে কোন ভাষায় বোঝাব, যাকে ভুলে গেলাম তার কি পরিচয় দেব?

দূরে নীল আকাশের ওপর রুপোলী রংয়ে আঁকা ছবির মতো বরফের পাহাড় দেখা যেত তাও সব দিন নয়। যেদিন আকাশে কুয়াশা থাকত না, সেদিন একটু উঁচু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালে তবে দেখা যেত। একজন সুন্দর মানুষ মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে এসে থাকত, সে আমার ছোটমাসি, তার নাম ছিল রমা, সাদা গোলাপের মতো সুন্দর, হাত পাগুলি পদ্মফুলের মতো। তার তখনো বিয়ে হয়নি।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

আমি তার গলা জড়িয়ে ঝুলে থাকতাম, গালে নাক ঘষে বলতাম, 'মন্না, আমি তোমার চশমা হব।' ছোট মাসি কি বলত মনে নেই, তবে আমার ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলে হাত বুলিয়ে দিত মনে আছে। এক চল্লিশ বছর বয়সে ছয়টি ছেলে-মেয়ে রেখে ছোট মাসি মারা গেছিল। মারা গেলে কি কেউ ফুরিয়ে যায়? ছোটমাসির স্মৃতি আমার মনের মধ্যে অফুরন্ত মধুর উৎস হয়ে রয়েছে।

তখন একেবারে মুখ্যু ছিলাম, বইয়ের ধার ধারতাম না। ঠিক সেই সময়ই যে কলকাতায় আমাদের মেজ জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর আর তাঁর বন্ধু যোগীন্দ্র-নাথ সরকার ছোটদের জন্য কেমন বই লেখা হবে, কোথায় ছাপা হবে, কেমন ধারা ছবি হবে, কি করে তার ব্লক তৈরী হবে, এই সব প্রশ্ন নিয়ে ভেবে আকুল হচ্ছিলেন, সেকথা আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। ইতিমধ্যে জ্যাঠামশায়ের বেশ কতকগুলো বই বেরিয়েও গেছিল, হাফ-টোন ব্লকে নিজের ছাপাখানায় তার জন্য চমৎকার সব নিজের হাতে আঁকা রঙীন ছবিও ছাপা হচ্ছিল, তাও জানতাম না। বেল পাকলে কাকের কি? আমরা ছিলাম আকাট মুখ্যু—বইপত্রের সঙ্গে আমাদের কি? আমাদের বাড়িতে কুকুর বেড়াল না থাকতে পারে, দু রকমের টিকটিকি ছিল। ঘরের ভিতরে ফিকে হলুদ টিকটিকি আর ঘরের বাইরে কালচে-পানা টিকটিকি। বাইরের দেয়ালের খাঁজে পেন্সিল-কাটা ছুরি ঢুকিয়ে দাদা তিনটি সাদা ডিম বের করেছিল, এই আমার কড়ে আঙুলের নখের মতো। তার একটা আবার পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল, বাকি দুটো তাড়া-তাড়ি আবার পুরে দেওয়া হল। দাদা বলল না হলে মা টিকটিকির কষ্ট হবে। এই সব নিয়েই আমাদের দিন কাটত।

এই সময় আমার ছোট মাসির অসুখ করল, টনসিল পেকে বিষিয়ে উঠল। সকলের বড় ভাবনার কারণ হল। আমরা এদিকে বাড়িতে দিন-রাত মহাহট্টগোল করতাম, তাই আমাদের কয়েক দিনের জন্য নদীর ওপারে দিদিমার বাড়িতে পাঠান হল। পুল অনেক দূরে, আমরা পাথরের ওপর পা রেখে নদী পার হতাম। যেদিন নদীর মাথায় বৃষ্টি হত, নদীতে ঢল নামত, সব পাথর ডুবে যেত। জল নামার জন্য বসে থাকতে হত। বেশীক্ষণ বসতে হত না, দেখতে দেখতে বৃষ্টি থেমে যেত, ঢলের জল বড়-পানিতে পৌঁছে যেত। আমাদের ছোট নদী যে-কে-সেই। মায়ের অসুখ শুনে ঐ নদী পার হয়ে দিদিমা এসে আমাদের নিয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য দিদি কেঁদেছিল। দিদিমা গরম জলে আমাদের হাত-মুখ মুছিয়ে দিয়ে, গরম লুচি আর মোহনভোগ খাইয়ে, মস্ত একটা খাটে, প্রকাণ্ড এক লেপের নীচে শুইয়ে দিয়ে, তাঁদের দেশের শেয়ালরা কেমন পাকা কাঁকুড় খেয়ে যেত, সেই সব গল্প বললেন। বাড়ির পিছনের নদীর কল-কল আর সরল-বনের শোঁ-শোঁ শব্দ এত দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল না, তবু আমরা খুব ঘুমিয়েছিলাম। সকালে দিদিমার ছেলে দেবপ্রসাদ মামা ওদের খোবানি গাছের পাকা ফল পেড়ে দিয়েছিল।

বাড়ির পিছন দিকে একটা ছোট বারান্দা ছিল, সেখানে একটা দাঁড়-করানো, পায়া দেওয়া টুকরি ছিল, তার মধ্যে নানা রঙের নতুন কাপড়ের ছাঁট ছিল। হয়তো ওগুলো মনুমাসির প্রিয় জিনিস, কিন্তু দিদিমা ওর অনেকগুলো দিদির আমার হাত ভরে দিয়ে বললেন, 'কেঁদো না। এই দিয়ে পুতুলের জামা কর!' জামা করব না আরো কিছু, দিদির সাড়ে পাঁচ, আমার সাড়ে চার বছর বয়স। পরে কাকীমা উ-হিন কাঁচি দিয়ে ছোট্ট চারকোণা ছাঁটগুলোর মধ্যিখানে একটা করে ছ্যাঁদা করে দিয়ে-ছিল। তার মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে আমাদের ইতু-পুতু-এলে-বেলেদের সে যে কি সুন্দর দেখিয়েছিল সে আর কি বলব!

তাছাড়া দিদিমার বসবার ঘরে একটা চার-কোণা জিনিস ছিল, তাতে হয়তো একশো-দেড়শো রঙীন মাথাওয়ালা পিন গোঁজা থাকত। দিদিমা সেটি নামিয়ে দিয়ে-ছিলেন। একটা কাঁচের গোল কাগজ-চাপা ছিল, সেটার ভিতরে ছোট্ট একটা বাড়ি দেখা যেত, তার পাশে একটা ন্যাড়া গাছ। কাগজ চাপাটাকে ঝাঁকালে কাঁচের গোলাটার ভিতরে এক রাশি সাদা বরফের কুচির মত কি যেন উড়ত। এসব দেখে দিদি পর্যন্ত কান্না ভুলে গেছিল। মনে হয় সেই জন্যই দিদিমা তাঁর বাড়ির যা কিছু সুন্দর এবং ভঙ্গুর জিনিস ছিল সব আমাদের নামিয়ে দিয়েছিলেন। দিদিমা ওখানকার মেয়েদের মিডল ইংলিশ স্কুলে পড়াতেন। তাই দিয়েই হয়তো ও'র সংসার চলত। কি করে এত পারতেন, জানি না।

এখন ভাবি কেমন মানুষ ছিলেন এ'রা সবাই? [illegible]

র তলায় জায়গা করে দিতেন,
সব নামিয়ে দিতেন, হয়তো
নো চাবি দিতেন না। আমরা
া কিছু দিয়েছি বলে মনে পড়ে
তেন 'মাসিমা' বলে, নিজের
বিশেষ মনে পড়ত না, সময়ে-
দিমার কাছে ছুটে যেতেন।
মেয়ে সুবর্ণ মাসির সঙ্গে ডঃ
দাশের ছেলের বিয়ে হয়ে-
র মেয়ে লাবণ্য মাসির সঙ্গে
ন্দ্র দাসের বিয়ে হয়েছিল।
র চেহারা ছিল তাঁর। সেজ
মাসির সঙ্গে ডঃ মৃগেন্দ্রলাল
ছেলের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু
লেন অন্য জগতের মানুষ। এক
গ ব্রাহ্ম আর অন্য দিকে
মতো উদার। শিলং-এর
নকালের জীবন নিয়ে সুন্দর
ইও লিখেছিলেন। বইটির নাম
. লেখিকার মতোই সরল,
সঙ্কোচ, সুন্দর লেখা। নিজে
কে দিয়ে একখানা কিনিয়ে-
ই জন্য আমিই ঋণী। আমার
তাঁকে কোন দিনও দিয়েছি বলে
না।

া বলছিলাম দুই-তিন দিন
দিদিমার বাড়িতে। বিকেলে
বিনের সঙ্গে আমাদের বেড়াতে
দয়ে, দিদিমা মাকে দেখে
কাকমি উ-বিনের সঙ্গে ক্রিকেট
ঠ যেতে হলে সেই পাগলীর
নে দিয়ে যেতে হত। এই ছিল
কিন্তু তার পরেই শশীবাবুর
সেখানে বড় বড় গোলাপী
াওয়া যেত, তার মধ্যিখানে এই
করে বাদাম থাকত। পর দিন
রে আসতেই দিদিমা এক গাল
লন, 'ওরে তোদের মা ভালো
তোরা সবাই কলকাতায় যাবি।'

ব আমরা থ! কলকাতায় যাব!
ামড়া, বিলিতী আমড়া পাওয়া
ামশাইরা থাকেন! সে কি আনন্দ,
ওজনা! হয়তো তার পরেই আমরা
রেছিলাম। ভাবতেই পারছিলাম
সত্যি বড় বড় মোটরে চেপে
যাব, সেখান থেকে রেলগাড়িতে
যাব! আমরা সবাই যাব, বাবা
নয়ে যাবেন। তবে কাকমি উ-বিন

গেঁড়া খাসিয়া মেয়েরা পাহাড়
থাও যেতে চাইত না। অন্য
াড়িতে খেত না, রাত কাটাত না।
পোশাক ছাড়া কোনো বিদেশী
রত না। সেলাই করা জামা-কাপড়
করত, ডান বগলের তলা দিয়ে,
র ওপর দিয়ে তাঁতে বোনা
রঙের কাপড় বাঁধত, আবার বাঁ
লা দিয়ে ডান কাঁধের ওপরে
বাঁধত। মাথায় একটা চাদর
বার পিঠের ওপর দিয়ে বড় একটা
নয়ে সামনে মস্ত গিট দিত। বড়
গলায় সোনার আর লাল পলার
পুঁতির মালা পরত, কানে কাঁচা

কুলদারঞ্জন রায়

সোনার চমৎকার গয়না পরত। বিদেশী
জিনিস ওরা ঘেন্না করত। কাকমি উ-বিন
যে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবে না, সে
বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না। বাবা
আমাদের পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে
গেলেন।

সেই কলকাতায় আসা থেকে আমার
বড় হওয়া শুরু হল। আমার মেজ-
জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে উঠলাম, ২২নং
সুকিয়া স্ট্রীটের দোতলা একটা ভাড়া বাড়ি।
সামনে রক, তারপরেই ছাপাখানা, আমরা
ঢুকতাম খিড়কি দোর দিয়ে একটা গলি
পেরিয়ে, পিছন দিকে একটা বারান্দার
পাশের সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির দেয়ালে
উপেন্দ্রকিশোর নিজের হাতে চমৎকার
নকসা এঁকেছিলেন। তাই দেখে বাড়িওয়ালা
মহা খুশী হয়ে, ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছিল,
একথা পরে শুনেছিলাম। বলেছিল অত
কম ভাড়ায় নকসা করা বাড়ি পাওয়া যায়
না।

ঐ সিঁড়িটা অনেক সময় ফেলে
দেওয়া হাফ-টোন ছবির নানা রঙের
চকচকে প্রুফে ভরে থাকত। আমরা
মহানন্দে কুড়িয়ে আনতাম। তার কেমন
একটা গন্ধ ছিল: এখনো কোনো ছাপাখানায়
গেলে ঐ রকম গন্ধ পাই, মন কেমন করে।
নিচে প্রেস চলত তার একটানা ঝমঝম
শব্দ কানে আসত; মনে হত বাড়িটা বুঝি
দুলছে, যে-কোনো সময় ডানা মেলে পাখির
মতো উড়ে যাবে। সে বাড়ির রোমান্সের
কথা মুখে বলার সাধ্য নেই আমার। অথচ

খুব যে একটা সাজানো-গোছানো ছিল তাও
নয়। তার দরকারও ছিল না। উপেন্দ্র-
কিশোর তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব দিয়ে
চারদিক ভরে রাখতেন। ঐ বয়সেও বুঝতাম
ঐ যে ফরসা দাড়িওয়ালা লোকটি ছবি
আঁকেন, বেহালা বাজান, হার্মোনিয়মের
সঙ্গে গান করেন, ছাপাখানার লোকরা যেই
লম্বা লম্বা কাগজ দিয়ে যায়, অমনি হাতে
একটা কলম নিয়ে বসে পড়েন,—উনি
একজন বিশেষ মানুষ। আর কেউ ওঁর
মতো নয়।

এখন বুঝি যে তখনো তিনি ডাই-
বিটিসে ভুগতেন, যার জন্য দুই বছরের
মধ্যে মাত্র ৫২ বছর বয়সে তাঁর অমূল্য
জীবনটি শেষ হয়ে গেছিল। কি রকম
চিকিৎসা হত কে জানে। শুনেছি বিলেত
থেকে কোনো বিশেষ ওষুধ আসত, কিন্তু
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সে ওষুধের চালান
বন্ধ হয়ে গেছিল, তাতেই জ্যাঠামশায়ের কাল
হয়েছিল। মনে আছে বিকেলে তিনি এক
প্লেট টুকরো করে কাটা পাকা পেঁপে আর
কলা খেতেন, কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়ে। কল্যাণ
আর আমি হাঁ করে দেখতাম। তার আগে
কাউকে কাঁটায় ফুটিয়ে কিছু খেতে
দেখিনি। কাছে গিয়ে হাঁ করতাম। জ্যাঠা-
মশাই বলতেন, 'আগে পেঁপে, তারপর
কলা।' সেটা আমাদের খুব পছন্দ ছিল না,
কিন্তু কি আর করা। এখন ভাবি না পেঁপে,
না কলা, কোনোটাই তাঁর পক্ষে খুব
উপযুক্ত খাদ্য ছিল না।

বাবার চাইতে মুখ সুন্দর ছিল
জ্যাঠামশায়ের রঙ অনেক ফরসা ছিল। কিন্তু
বাবা মাথায় ছিলেন প্রায় ছয় ফুট, পিটানো
বলিষ্ঠ শরীর ছিল। জ্যাঠামশাই খানিকটা
বেঁটে শরীরটাও নরম। তবু একদিন বাবার
কাঁধে হাত রেখে কল্যাণকে বলেছিলেন,
'জানিস, আমি তোদের বাবার বড় ভাই!
ইচ্ছে করলে তোদের বাবাকে আমি পেটাতে
পারি।' একথা শুনে হাসব না কাঁদব ভেবে
পাই নি। কল্যাণ তো মুচকি হেসে সজোরে
মাথা নেড়েছিল। বাবাকে পেটাতে পারে সে
আবার কিছু!! পেটানোর ক্ষেত্রে বাবার
বুৎপত্তি নিয়ে সেদিন মনে মনে ভারি গর্ব
হয়েছিল।

বাড়িতে আরো লোক ছিল। আমাদের
ছোট জ্যাঠামশাই, কুলদারঞ্জন, জ্যাঠাইমা
মারা যাবার পর থেকে তাঁর ছেলে আর

স্বল্পমেয়াদী সঞ্চয়ে সবচেয়ে বেশী লাভের উপায়!

ইউবিআই রি-ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান

১০০ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামের রি-ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট আপনি কিনতে পারেন। টাকাটা অবশ্য ১০০-এর গুণিতকে হওয়া চাই। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার রি-ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ১৩, ২৫, ৩৭, ৪৯, ৬২ ও ৭৩ মাসের মেয়াদে পাওয়া যায়। এই সার্টিফিকেট থেকে আপনি স্বল্পমেয়াদে সবচেয়ে বেশী লাভ পাবেন। ৭৩ মাসের মেয়াদ শেষে ১০০০ টাকার একটা সার্টিফিকেট থেকে আপনি পাবেন ১৮৩২·৭৫ টাকা—অর্থাৎ, লাভ হচ্ছে ৮৩২·৭৫ টাকা।

- ব্যক্তিগতভাবে এবং সংস্থা, সমিতি, ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কেনা যায়। নাবালকের নামেও কেনা যায়।
- আয়কর সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজন হলে, সুদের আয় বাবদ বার্ষিক সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।
- সার্টিফিকেটের দামের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়।

সুবিধেমতো টাকার অঙ্ক ও সঞ্চয়ের মেয়াদ বেছে নিয়ে ইউবিআই-এর রি-ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট কিনুন।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী

প্রাপ্য টাকার পরিমান : কয়েকটি দৃষ্টান্ত

ক্রয় মূল্য (টাকা)	সঞ্চয়ের মেয়াদ					
	১৩ মাস	২৫ মাস	৩৭ মাস	৪৯ মাস	৬২ মাস	৭৩ মাস
১০০	১০৯·০৫	১১৮·১০	১৩১·৮৫	১৪৪·২৫	১৬৭·৩০	১৮৩·৩০
৫০০	৫৪৫·১৫	৫৯০·৪০	৬৫৯·২৫	৭২১·১০	৮৩৬·৪৫	৯১৬·[illegible]
৫০০০	৫৪৫১·১০	৫৯০৩·৫৫	৬৫৯২·৩০	৭২১০·৭০	৮৩৬৪·২৫	৯১৬[illegible]·৭০
সরল হারে শতকরা বার্ষিক সুদ	৮·৩৩	৮·৬৭	১০·৩৩	১০·৮৩	১৩·০২	১৩·৬৯

সুদের হার : ১৩ থেকে ২৫ মাস ৮% ; ৩৭ থেকে ৪৯ মাস ৯% ; ৬২ থেকে ৭৩ মাস ১০% ; প্রতি মাসে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ হিসেব করা হয়।

টাকা ফেরত দেওয়ার সময় পাঁচ পয়সার ভগ্নাংশকে পাঁচ পয়সাই ধরা হয়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBIPUB 377 B

মেয়ে দুটিকে নিয়ে ঐ বাড়িতে উঠে এসে-ছিলেন। ছোট জ্যাঠামশাই নাকি বাবাকে ভয় পেতেন, অন্ততঃ তাই বলতেন। দেশে ছোটবেলায় ওঁদের দুই ভাইয়ের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে পাড়ার লোকে ঠাকুমার কাছে দরবার করত। ছোট জ্যাঠামশাইকে ধমক-ধামক দিয়ে যদি বা ম্যানেজ করা যেত, বাবাকে সামলাবার জন্য একজন ষণ্ডামার্কা চাকর রাখতে হয়েছিল। ওঁদের নানান দুষ্টুমির গল্প শুনে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। তার অর্ধেকের অর্ধেক করলেও বাবা যে পিটিয়ে আমাদের মাটিতে বিছিয়ে দিতেন সেটা নিশ্চিত। বলা বাহুল্য বেশির ভাগ গল্প ছোট জ্যাঠামশায়ের মুখেই শোনা।

তিনি আমাদের প্রথম 'বায়োস্কোপ' দেখিয়েছিলেন, প্রথম 'সার্কাস' দেখিয়ে-ছিলেন। কি আশ্চর্য জায়গা কলকাতা, নিত্য নতুন জিনিস দেখতাম। পালকি চড়ে দিদি আর আমি একদিন মায়ের সঙ্গে বড় জ্যাঠামশায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, ২২নং সুকিয়া স্ট্রীটের খিড়কি দোরের বাইরে একটা লম্বা-ঠ্যাং টুলের ওপর তাঁবুর মতো কি একটা বড়সড় জিনিস বসিয়ে, একটা লোক ডেকে ডেকে কি যেন বলছে। মা বললেন, 'বায়োস্কোপ দেখবি?' [illegible] আর বলছে। এ বায়োস্কোপ একজন একজন করে দেখতে হয়। মা লোকটাকে দুটো পয়সা দিলেন, একটা গোল মতো কাচের ভিতর দিয়ে আমি আগে দেখলাম। সে এক স্বপ্ন রাজ্য! সুন্দরী রাজকন্যে, মুখে [illegible] বীর রাজপুত্র, বিকট রাক্ষস, কেউ থেমে থাকছে না, শুধু ছুটছে আর ঘুরছে আর লোকটা সুর করে কি যেন বলে যাচ্ছে তার একবর্ণ মানে বুঝছি না। তারপরেই সব ছবি অন্ধকার হয়ে গেল, আমার পালাও শেষ হল। দিদি এসে চোখ লাগাল। পরশু দেখা সেই বায়োস্কোপের চেয়ে এ যে কত বেশি ভালো সে আর কি বলব। একেবারে [illegible] জিনিস। জোড়াসাঁকোয় উঠেও অনেকক্ষণ ধরে মনে হচ্ছিল এখানে আমি নেই।

সেই বারই বড়দিকেও প্রথম দেখলাম। বড়দির নাম সুখলতা রাও, তাঁর নাম জানে না এমন লোক সেকালে কম ছিল। দেশ-বিদেশের পরীদের গল্প তিনি সংগ্রহ করে যে কি মিষ্টি বাংলায় লিখেছেন সে আর কি বলব। আর অপূর্ব সব ছবি আঁকা। আমার মায়ের চাইতে বড়দি ছিলেন দেড় বছরের ছোট, এক সঙ্গে মানুষ, আপনার বোনের মতো। মা বলতেন বড়দি জীবনে কখনো কোনো স্বার্থপর কাজ করেন নি। কিন্তু সদাই গম্ভীর মুখ। একটা মজার গল্পও শুনেছি। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাব ছিল। সেই সময় রাজর্ষি প্রকাশিত হয়েছিল। জ্যাঠামশাই বড় মেয়ে আর বড় ছেলে সুখলতা আর সুকুমারের ডাক নাম রাখলেন হাসি আর তাতা। সুকুমারের **[illegible] থেকে গেল, কিন্তু সুখলতার** গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ আর তাকে 'হাসি' বলে ডাকবার সাহস পেল না।

তবে এ-কথা আমার খুব ভালো করেই মনে আছে যে আমাদের পুতুল খেলায় সময় বড়দি একবার যোগ দিয়ে, কাঁচি দিয়ে কেটে ছোট্ট ছোট্ট খোল গোলা কাগজের কুঁচি বানিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স হয়তো ২৬ বছর হবে। জ্যাঠামশায়ের সবপায় ছোট মেয়ে শান্তিলতার তখনো বিয়ে হয় নি। আমরা তাকে ডাকতাম টুনিদি বলে। যেমনি সুন্দর দেখতে, তেমনি মিষ্টি স্বভাবটি। রোজ রাতে আমাদের খাইয়ে দিতে দিতে টুনিদি গল্প বলত, ছড়া বানাত। তার লেখা দু-একটা কবিতা সন্দেশে বেরিয়েও ছিল। তার একটি হল, 'ওগো বাঁশুরী শোন গো শোন!' এমন সরস কবিতা খুব বেশি হয় না। ছবি আঁকার হাত ছিল। আমরা শিলং-এ ফিরে গেলে আমাকে একটা পোস্ট-কার্ডে ছোট্ট ছোট্ট ছবি এঁকে লিখে পাঠিয়ে-ছিল : 'পিঠোপিঠি দুই বোন সুরু আর লীলা, পড়তে বসে বই ফেলে করছে পুতুল খেলা। তাই না দেখে প্রভাতরঞ্জন উঠলেন রাগে ফুলে। চুপি চুপি বেঁধে দিলেন দুই জনার চুলে। বাইরে গিয়ে যেই ডেকেছে সুঁচ খাবি আয়! অমনি তারা হ্যাঁচকা টানে নাপরে কি চ্যাঁচায়!'

এই টুনিদিকে আর দেখিনি। মাত্র ২৩ বছর বয়সে নিউমোনিয়া হয়ে, শেষ একটা 'দাদা!' বলে ডাক দিয়ে সে মারা গেছিল। বড়দি আর টুনিদির মাঝখানে ছিলেন মেজদি, পুণ্যলতা চক্রবর্তী। এঁরা সবাই নাম লেখিকা, কাউকে কিছু শেখাবার দরকার ছিল না। সবার ছোট ভাই সুবিমল, আমাদের মানকুদা। এমন সরস, কল্পনা-প্রবণ, খামখেয়ালী মানুষকে সঙ্গী পেলে আমরা আহ্লাদে আটখানা হতাম।

(চলবে)

সুধেন্দু মল্লিকের কবিতা

জন্ম ১৯৩৫।
জীবিকা : সরকারী চাকুরি

পঞ্চাশের কবিতার ঝাঁকালো, আড়ম্বরময় পরিবেশ থেকে নিজেকে দূরে রেখে একধরনের চাপা অথচ বয়স্ক কবিতা সুধেন্দু মল্লিক লিখে গেছেন দীর্ঘকাল। এভাবে মোটা দাগ দিয়ে লিখে দেওয়া ঠিক হবে না হয়তো—তবু মনে হয়, সুধেন্দুর কবিতার প্রধান দুটি অবলম্বন হল প্রেম ও ধর্ম। বাজ পড়ে দু ফাঁক হয়ে যাওয়া একটা বড় বাড়ির মত হা হা করে তাঁর প্রেমের কবিতাগুলো। খুব আন্তরিক ও নিরাবরণ ভাবে সুধেন্দু হঠাৎ আঁত ছুঁয়ে দেন কিছু নির্জন পাঠকের, মাঝরাত্তিরে জলকণ্ঠের মত। ব্যর্থ প্রেমকে বিষয় করে এগোতে এগোতে সুধেন্দু তার পরবর্তী স্তরের কবিতায় পরিত্রাণের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন ঈশ্বরের কাছে। বলা যায়, নিজেকে নিবেদন করেন। কিন্তু এখানেও সন্ধ্যা ভাষা তাঁর প্রকাশরীতির অবলম্বন হয়নি। খুব আটপৌরে কথাও যে অনেক গভীরে যেতে পারে, তার জোরালো নিদর্শন সুধেন্দুর কবিতা।

-অমিতাভ দাশগুপ্ত

গোপালের মালা

এ আনন্দ এলো কোথা হতে!
ছিলো কি আকাশে ব্যাপ্ত, জাহ্নবীর স্রোতে।
দিন গেল অপমানে। খিদে তেষ্টা জ্বালা।
সহসা গলায় কেন গোপাল পরালি তোর মালা।
এ ফুল মানায় নাকি—আমাকে মানায়?
তোর দুষ্টু মুখ দেখে এতো হাসি পায়!

চল তবে ঘুরে আসি। এখানে ওখানে।
মানুষের কাছাকাছি—রাতের উদ্যানে।
কেমন আছো গো সব? ভালো আছে মন?
কাল আমাদের বাড়ি আসা চাই, ক্ষীর নিমন্ত্রণ।

এমন আনন্দ কেন ও গোপাল সমুদ্রের তীরে
শস্যের ক্ষেতের মতো ভালোবাসা মিশেছে গভীরে।

গোপালকে নিয়ে

দ্যাখো আজ বলতে বসেছি আমার কথা।
উজ্জ্বল আকাশের মিষ্টি রোদে
গোপালকে নিয়ে চলেছি তোমার খোঁজে। আমি
দেব না কোন খারাপ খবর, জেনে দেখ না তোমার মন।
তুমি যেমন আছো তেমনই থাকো।

আমি গোপালকে নিয়ে বলতে চলেছি ভিখারীকে—
কেন ভাবো? যদি আমি কিছু পেয়ে থাকি সে সব তোমার।
আমি গোপালকে নিয়ে বলতে চলেছি অবজ্ঞার মূর্খকে—
কেন ভাবো? যদি আমি কিছু জেনে থাকি সে সব তোমার।
আমি গোপালকে নিয়ে বলতে চলেছি বিনষ্ট নিন্দিতকে—
কেন ভাবো? যদি আমার কিছু হয়ে থাকে সে সব তোমার।

দ্যাখো দ্যাখো পৃথিবী [illegible] [illegible] [illegible] নিরপ বৈভবের
চোখে, তিলকে চন্দনে। [illegible] [illegible] মিঠে
গোপালের হাত ধরে আমার এমন করে বিলিয়ে যেতে
ভালো লাগে তোমাদের [illegible] [illegible]।

প্রকাশ কর্মকারের ছবি

ক্যালকাটা গ্রুপের পর ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলায় যে সব কলকাতা তরুণ চিত্রকর তুলিকে বলিষ্ঠ হাতিয়ার করে সোচ্চার হয়েছিলেন ক্যানভাসে প্রকাশ কর্মকার তাঁদের মধ্যে অন্যতম

স্বনামধন্য শিল্পী প্রহ্লাদ কর্ম কারের পু প্রকাশ কর্মকার কলকা গভঃ আর্ট কলেজের শিক্ষা অসমা রেখে নাম লিখিয়েছিলেন মিলিটারীতে কিছু দিন পরই ফিরে এসে পুরোপু ছবি আঁকতে শুরু করেন। তাঁর প্র একক ফুটপাত প্রদর্শনী সে সময় ক কাতার সমস্ত রসিক মহলের দৃ আকর্ষণ করে। এঁর ছবিতে সমকাল যুগযন্ত্রণার কথা নানাভাবে প্রকাশ পা ১৯৬৬ সালে ললিতকলা একাডে পুরস্কার পান। এর পর ফরাসী স কারের বৃত্তি নিয়ে ইউরোপের বিভি জায়গায় ভ্রমণ ও প্রদর্শনী করে বর্তমানে এলাহাবাদ নিবাসী প্র কর্মকার কলকাতার চিত্র শিল্প আন্দো লনের একজন প্রথম সারির যোদ্ধা, ক কাতার চারুকলা মেলার অন্যতম প্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

(নয়)
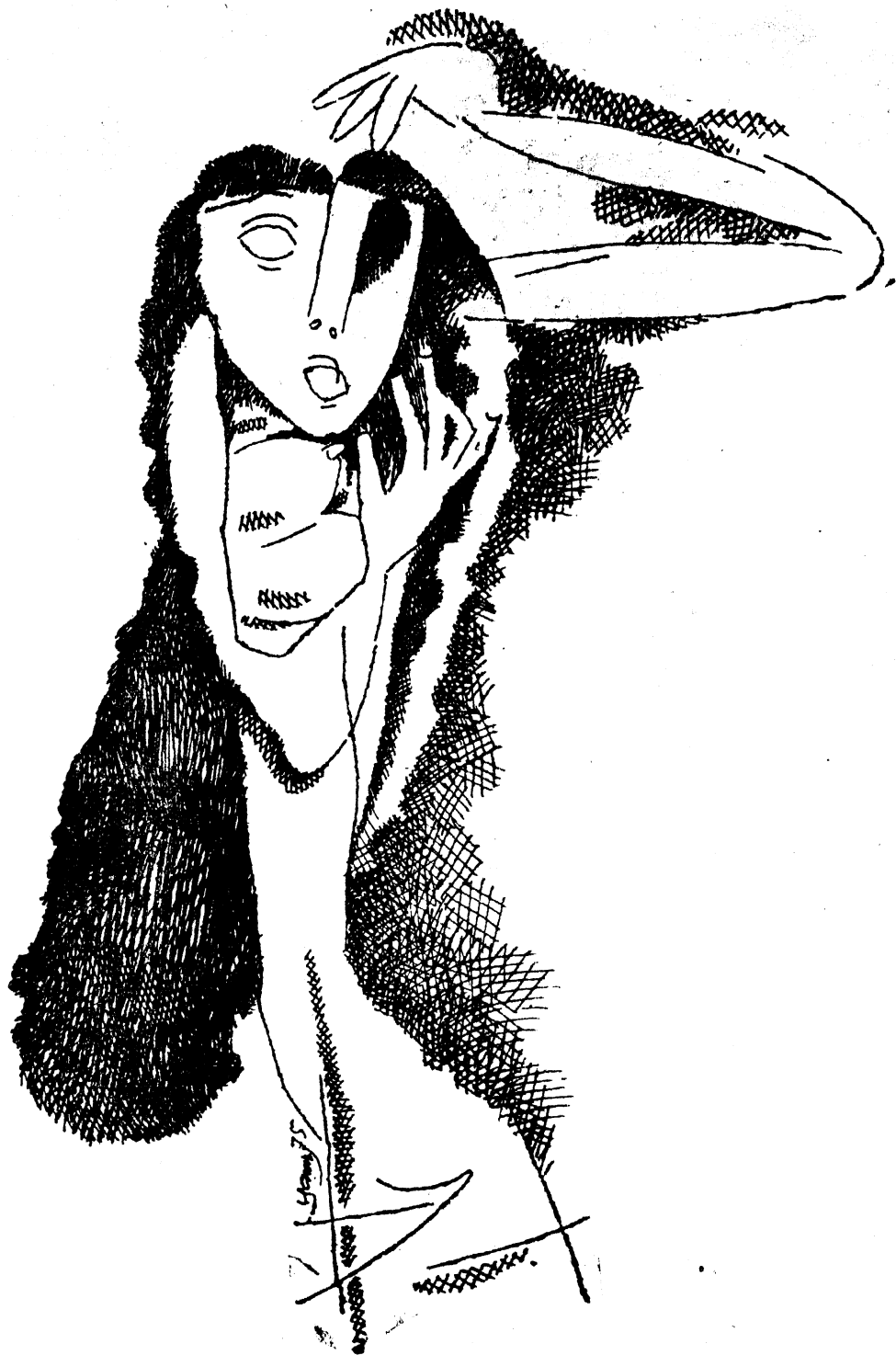
অবশেষে নতুন করে আবার সুন্দরবন অভিযান শুরু হল ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি। লোকলস্কর মালপত্র বোঝাই চারটে বড় বড় নৌকো, একটা বজরা এগিয়ে চলল।

বজরাটার বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। শক্ত ফ্রেমের মাঝারি গোছের একটা কুঠরি। যেন রাজবাড়ির অংশ বিশেষকে বহন করে নিয়ে চলেছে। সারা গায়ে রামধনুর মতো রঙের কারুকাজ। ময়ূরের পাখার মতো গোলাকার কয়েকটা জানালা। জানালার পাল্লা কাচের। কাচের গায়েও ছবি আঁকা। গলুই দুটো পাখির ঠোঁটের মতো ছুঁচলো, সিঁদুরে গোলা টুকটুকে লাল। দেখেই বোঝা যায়, সদ্য রং করা হয়েছে বজরাটাকে। শিবের ঊর্ধ্বনেত্রের মতো পেছনের গলুই উঠে গেছে নৌকার মাথা ছাড়িয়ে। হালের মাচা ওখানেই। মাস্তুলের বল্লীকাঠ এখন ঢেঁকির মতো দু ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে, বাতাস নেই, পালও খাটানো হয়নি তাই। হালের মাঝি গজল, চৌকস হাতে বজরাটাকে হাঁসের মতো ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। বজরার ছাদের চারপাশে রেলিং আর বিশিষ্ট ভঙ্গিমার কয়েকটা কাঠ খোদাই নারী মূর্তি। ঢং ইংরেজি কেতাদুরস্ত। হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়, কে বলবে, ওগুলো সাত্যিকার মানুষ নয়, কাঠের নিষ্প্রাণ মূর্তি। কেবল মাত্র দাঁড়িয়ে থেকে বজরার গাম্ভীর্য বাড়িয়ে তুলেছে। সবুজ রেশমী কাপড়ের পর্দা ঝুলছে জানালায়। তিরতির করে পর্দাগুলি কাঁপছে।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাশীপুর ঘাট থেকে নৌকো ছেড়েছে ওরা। এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সূর্যের আলো তির্যকভাবে নদীর গায়ে আছড়ে পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। আর সামান্য কিছু এগোলেই বাদার মুখ দেখা যাবে। মাতলায় এসে পড়বে ওরা।

রজনীর আজ ব্যস্ততার শেষ নেই। রজনী, মকবুল, জগন্নাথ, ঈশান পুরোনোরা প্রায় সকলেই আছে, নতুন আরো জনাতিরিশেক লোক সংগ্রহ করে নিয়েছে রজনী। এদের মধ্যে জনা কয়েক বেশ পাকা লেঠেল। নতুন পুরোনোয় মিশে নৌকাগুলি বেশ সরগরম।

কিন্তু পুরোনোদের মধ্যে একমাত্র দয়াল ঘোষকেই দেখা যাচ্ছে না। হাজার চেষ্টা করেও রাজি করানো সম্ভব হয়নি ও'কে।

নরেন্দ্রনারায়ণ চেষ্টার কসুর করেন নি। যদিও জানতেন, রজনীদের ওপর দয়াল ঘোষ তেমন প্রসন্ন নয় তবু রজনীকেও বাদ দেওয়া চলে না। রজনী একাই বাড়তি উদ্যমে লোক সংগ্রহ করেছে এ ক'দিন। রজনী যেভাবে লোকগুলোকে হাতের মুঠোয় পুরে রাখতে পারে, এমন ক্ষমতা দয়াল ঘোষের নেই।

ফলে দয়াল ঘোষকে বাদ দিয়েই যাত্রা শুরু করতে হয়েছে ওদের। ছোট নাগপুর থেকে যে আঠারোজন ও'রাও মুণ্ডাকে ধরে আনা হয়েছে তাদের তোলা হয়েছে ভিন্ন একটা নৌকোয়। পুরোনোরা উঠেছে দুটো নৌকোয় ভাগাভাগি হয়ে। একটা নৌকো রাখা হয়েছে কেবল ওদের মালপত্র খাবার দাবার বইবার কাজে।

অতি ভোরে যখন ওরা যাত্রা শুরু করল তখন ঘাটে সে এক দৃশ্য। চৌধুরী রাজাদের কুলপুরোহিত জনে জনে আশীর্বাদ ছড়ালেন, যাত্রা তোমাদের শুভ হোক, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। মেয়েরা শাঁখ বাজাল, উলুধ্বনি দিল। নরেন্দ্রনারায়ণ আশীর্বাদ কুড়োতে কুড়োতে বজরায় এসে উঠলেন।

উঠলেন বটে, তবে দয়াল ঘোষের জন্য মনের মধ্যে একটা খিঁচ থেকেই গেল। দয়াল ঘোষের মধ্যে যেন আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সুন্দরবন থেকে ফিরে আসার পরেই লোকটা যেন পালটে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছেন। কি বেশভূষায়, কি তার আচার-আচরণে, কথায়-বার্তায়। অথচ এই লোকটাই একদিন সুন্দরবন নিয়ে কত উৎসাহী ছিল।

—আপনার কি হয়েছে বলুন তো! চেহারাটা তো সাধু-সন্যাসীদের মতো ক ফেলেছেন। প্রশ্ন করেছিলেন নরেন্দ্র নারায়ণ।

দয়াল ঘোষ মলিন একটু হেসে ছিলেন, বাইরের চেহারাটাই আসল ছোটকর্তা। বাইরে আমরা যা দেখি ত কতটুকুই বা সত্যি!

—তাহলে অমন উদাস উদার হ গেলেন কেন? কি হয়েছে বলবেন তো

—কি আবার হবে! কিছুই হয়নি যা ছিল তাই আছে। পৃথিবী যে নিয় চলা শুরু হয়েছিল সেই নিয়মেই চল আপনার আমার সাধ্য কি তা পাল্টাই।

—মানে!

—মানে বুঝবার এখনো সময় হ আপনার। যে কাজে যাচ্ছেন, যান, ঘ আসুন।

থমকে গিয়েছিলেন নরেন্দ্রনার সুন্দরবনে যাওয়া আমার উচিত হবে বলছেন?

—না না, তা কেন! তবে, ঐ গিয়েই আমার চোখ খুলেছে।

—কি সে হেঁয়ালি করছেন, বি বুঝতে পারছি না।

—হেঁয়ালি করব কেন! আমি কথা বুঝেছি ছোটকর্তা। ঈশ্বরের কেউ পাল্টাতে পারে না।

—তার মানে, আপনি বল সুন্দরবনের জঙ্গলটুকু পরিষ্কার ওখানে আবাদ করা যাবে না?

—না, তা বলি না। তেমন বলার আমার ক্ষমতা নেই।

—তবে?

—কি তবে! আমাকে আমার থাকতে দিন ছোটকর্তা। আপনার লোকের অভাব নেই। আবাদ অ হবেই। আবাদে লাঙলের ফলাও পড়

নরেন্দ্রনারায়ণ দাপটে বলে দেখা যাক, পারি কিনা। হাত যখন শেষ না দেখে আমি ছাড়ব না। নায়েবের টা সমস্যা আপনি তুললেন।

—ইচ্ছে করলে আমাকে ত রেহাই দিতে পারেন ছোটকর্তা। সম্পত্তিগুলি নিয়ে আর মাথা ঘামা নেই আমার।

নরেন্দ্রনারায়ণ আরো অবাক ছিলেন, চৌধুরী রাজাদের নায়েবী সম্মান বড় কম নয়। প্রতিপত্তি কি কিন্তু কি এমন ঘটেছে দয়াল ঘো এত বড় সম্মান উনি এক কথায় দিতে পারছেন।

—আপনার বাপ চোদ্দ ইতিহাস আপনি ভুলে গেছেন দয়া

দয়াল ঘোষ স্মিত হাসলেন, ন নি। এখনো মহাশয়ায় আমাকে তপু'র

—বেশ! যা আপনি ভাল বুঝবেন [তাই] করবেন। হতাশ হয়েছিলেন নরেন্দ্র-নারায়ণ। অন্যদিকে রজনীর উৎসাহ যেন [শত]গুণ বেড়ে গিয়েছিল। রজনী যেন [কোন] রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছে। [ক]দিন শলা পরামর্শের অন্ত নেই। কত [উপ]দেশ নির্দেশ। লোকটার বিদ্যে বলতে আ ক খ, তবু ভাবভঙ্গিতে মস্ত এক [প]ণ্ডিত হয়ে উঠেছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ বলেছিলেন, সবই তো বুঝলুম কিন্তু টাকাগুলো শেষ পর্যন্ত [জলে] যাবে না তো? তিন চার মাস ধরে [এ]তগুলো লোকের মাইনে গোনা, খাইখরচ, [শে]ষে দায়ে মনসা বিকোবে না তো বাপু।

—কি যে বলেন, আমি রজনী মাইতি, [এ]ক মাসেই দেখুন না, কাজ কতটা এগিয়ে [য]াই। আসলে কাউকে জানলে কাজ না হয়ে [পা]রে না। তবে হ্যাঁ, প্রকৃত জল করে [জ]ঙ্গলের সঙ্গে লড়ব, আখেরে আমাকে ভুলে [যা]বেন না যেন হুজুর।

নরেন্দ্রনারায়ণ হেসেছিলেন, এমন [ভা]ব করছিস যেন যেতে না যেতেই আবাদ [হ]য়ে যাবে।

—যেতে যেতে না হলেও মাস [ছয়]েকের বেশি আমি সময় নেব না, [দে]খবেন। আমার চেয়ে ভাল লোক যদি [পে]তে পান হুজুর আমাকে সরিয়ে দেবেন, [দুঃ]খ নেই। আসলে কি জানেন, একটা [জে]দ চেপে গেছে। অমনভাবে নিজেদের [বো]কামির জন্য পালিয়ে না আসলে বোধ [হয়] অমন হত না।

নরেন্দ্রনারায়ণ হিসেব কষে দেখলেন, একটা মাস প্রায় আলোচনা করতে করতেই পার হয়ে গেছে। কেবল জল্পনা-কল্পনা ছাড়া কিছুই হয়নি এই এক মাসে। এখন ডিসেম্বর মাস শেষ হয়ে আসছে। এরপর শীত চলে গেলে বসন্তের বাতাসের সঙ্গে নদীর চেহারা হয়ে উঠবে মারাত্মক। নতুন বাদায় ধুলোর ঝড় নাকি সাংঘাতিক। ঝড়-তুফান শুরু হয়ে যাওয়ার আগেই যা হোক একটা কিছু করে ফেলা উচিত।

অবশেষে তিনি দিন ঠিক করে রজনীকেই সব কিছু গোছগাছ করে নিতে বললেন। দিন সাতেক সময় দিলাম তোকে, এর মধ্যে যতটা পারিস গুছিয়ে তৈরি হয়ে নে। আর, আমার বজরাটাকে গুছিয়ে ফেল।

—আপনার বজরা!

—হ্যাঁ, আমিও সঙ্গে যাব। তোদের কাজ শুরু করিয়ে দিয়েই আমি ফিরে আসব।

ছোটকর্তা সঙ্গে যাবেন। খবরটা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ল। তলব পড়ল ওঁর ঠাকুর চাকরের। তলব পড়ল পানিহাটির কামিনীবালার।

সাতটা দিন যা উত্তেজনার মধ্যে কাটল কে তা বর্ণনা করবে।

যাত্রার ঠিক আগের দিন রাতে, মাঝ রাতেই হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল নরেন্দ্র-নারায়ণের। প্রথম রাতে অল্প অল্প নেশা করেছিলেন, নেশার তরল আমেজটুকু কখন যেন ঘুমের মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল।

ঘুম ভেঙে যেতেই উনি ঝটপট উঠে [ব]সলেন। ঘরে ঝাড় [illegible]

স্বপ্নিল একটা পরিবেশ। মশারীর নেট হালকা কুয়াশার মতো যেন ছড়িয়ে ছিল ওঁর চারপাশে। অথচ ঘরের প্রতিটি আনাচ কানাচও উনি চিনতে পারছিলেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ কৌতুকে দেখলেন, মশারীর ঠিক একটি পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঊর্মি।

—ওকি! ঊর্মি, তুমি!

ঊর্মির দেহে হালকা পোশাক। চোখ দুটো আশ্চর্য শীতল।

—কিছু বলবে?

ঊর্মি ওর পাশটিতে এগিয়ে এল, কবে ফিরবে?

—শুধু এই কথাটি জানার জন্য এত রাত জেগে ঐভাবে দাঁড়িয়ে আছ? কি বলতে চাইছ বল না ঊর্মি?

কাছে টেনে নিয়েছিলেন ঊর্মিকে।

—কিছু না, ঊর্মি মুখ নামিয়ে এনেছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ নিবিড়ভাবে ওকে বুকে টেনে নিলেন, পাগল। চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে দিলেন।

—কথা দাও শরীরের ওপর যত্ন নেবে।

—অযত্ন করব কেন! ঠাকুর চাকর সবই তো সঙ্গে যাচ্ছে।

—শুধু ঠাকুর চাকর, আর কেউ [না]?

—কে আবার! কৌতুকে ঊর্মির মুখখানা সামনের দিকে টেনে ধরেছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

—শুনলাম পানিহাটিতে খবর পাঠিয়েছ?

হেসে উঠলেন নরেন্দ্রনারায়ণ, তাই বলো। এ কথার জন্য এত রাত অবধি জেগে আছ!

ঊর্মির চোখ বেয়ে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল নরেন্দ্রনারায়ণের বাহুর উপর পড়ল। নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, সামান্য একটু ফূর্তি করব, তাতেও যদি তোমার আপত্তি থাকে, বলো নেব না ওকে।

ঊর্মি বাকরুদ্ধ পাথর।

নরেন্দ্রনারায়ণ ওকে আদর দিয়ে ভরিয়ে তুললেন, চৌধুরী বংশের ছেলেরা ঐ ভাবেই তো এতকাল কাটিয়ে আসছে ঊর্মি। কেউ কখনো তার স্বামীকে তো শেকলে বেঁধে রাখেনি।

—আমিও তোমাকে শেকলে বেঁধে রাখব না। তোমার যা খেয়াল তুমি তা করবেই জানি। কথা দাও, শরীরটাকে যত্নে রাখবে।

—রাখব, রাখব, রাখব। স্থির প্রতিজ্ঞা করলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। এই যেমনটি দেখছ ঠিক এরকমটিই আবার ফিরে আসব। তোমার জিনিস তোমার হাতে যখন ফিরে আসবে, দেখ, এতটুকু আঁচড় লাগেনি গায়ে। যাও এখনো রাত আছে, একটু ঘুমিয়ে নাও গে।

—কিন্তু কবে ফিরবে বললে না তো

—দু-চার দিন পরেই ফিরে আসব। মনে কর না বাগানবাড়িতে মাঝে মাঝে যেভাবে গিয়ে থাকি এবারও সেরকমই যাচ্ছি।

—বাগানবাড়ি যাওয়া আর সুন্দরবনে যাওয়া কি এক হল! কত রকমের বিপদ-আপদ ওখানে।

নরেন্দ্রনারায়ণ মৃদু একটু হাসলেন, পাগল! তিন তিনটে বন্দুক থাকছে সাথে। লোকজন যাচ্ছে প্রায় সত্তর জন। তাছাড়া তুমি যার সহায় কে তার ক্ষতি করবে

বলো। যাও, ওঠ এবার। ভোর হয়ে আসছে।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নৌকো ছাড়ল ও'দের। বজরার ভিতরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নরেন্দ্রনারায়ণ জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। নদীর অফুরন্ত জল, যেন বিপরীতমুখী ছুটে যাচ্ছে। দুপারে নতুন নতুন জনপদ, অপরিচিত সংসার। তাকিয়ে থাকতে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

একটানা দাঁড়ের শব্দ হচ্ছে ঝপস্ ঝপ্, ঝপস্ ঝপ্....

অন্যান্য নৌকাগুলি চলেছে মাঝ নদী দিয়ে মিছিলের আকারে। হালের মাঝিরা একে অন্যের দূরত্বটুকু সমানভাবে বজায় রেখে চলেছে। দাঁড়িরা, নিকষ কালো পাথরের মতো চেহারা দাঁড় টেনে প্রায় চিত হয়ে পড়ছে একতালে। দশ দাঁড়ির টান, বারো দাঁড়ির টান: নৌকোগুলি গোঁত খেতে খেতে এগোচ্ছে।

ঝপস্ ঝপ্ ঝপস্ ঝপ্ ..

দুপুর অবধি একইভাবে বসে চুপটি করে কাটিয়ে দিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। বিকেলের দিকে কনকনে একটা ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হল। সমস্ত দেহটাকে যেন শুষে নিতে শুরু করল।

দুপুরে প্রতিদিনই ঘুমোবার অভ্যেস; আজ খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা নভেল নিয়ে বসলেন। কিন্তু বাইরের আকাশটাকে বড় মধুর লাগছে। নাম না জানা কত পাখি লাট খাচ্ছে আকাশে। সন্ধ্যার মুখোমুখি মাতলা ছোঁবে নৌকো। তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে শুরু হবে বাদা। এখন এই যে দুপাশে ধানী জমি দেখছেন কে জানে এখান থেকে সুন্দরবন উৎখাত হয়েছে কবে!

বৃথাই নভেল খুলে বসেছিলেন, একটা লাইনও উনি পড়তে পারলেন না। চোখ থেকে ঘুমও আজ পুরোপুরি উধাও।

আরো একটু বেলা পড়লে নরেন্দ্র-নারায়ণ রজনীর তলব করলেন।

রজনীর ব্যস্ততার সীমা ছিল না। ছোটকর্তার গলা পেয়ে নতজানু হয়ে বজরার ভিতর ঢুকে পড়ল, কিছু বলবেন হুজুর?

—কামিনী কি করছে?

—ছাদে বসে আছে। কি করছে ওখানে। পাঠিয়ে দে, ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেলুম।

—দিচ্ছি হুজুর।

রজনী আবার মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল। সামনের দিকে কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে বজরার উপরে। দু ধাপ সিঁড়ি বেয়ে রজনী কামিনীর দিকে তাকাল।

কামিনী হাঁটু ভাঁজ করে বসে মাথা নুইয়ে জলস্রোত দেখছিল, হঠাৎ চমকে উঠল!

রজনী চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিল, ছোটকর্তা ডাকছেন। তারপর আবার নেমে এল রজনী।

ঠাণ্ডা বাতাসে রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে খারাপ লাগছিল না কামিনীর। মাথায় ঘোমটা টেনে বসেছিল। কমলা রংয়ের বুটিদার শাড়ি পরনে। হাতের কব্জী অবধি জামার ঝুল, কলকা বসানো। আঙুলের নখ রং পালিশে ঝকঝক করছে। হাতের গোছায় দশ গাছা করে কাচের চুড়ি, একটু নড়তেই মিষ্টি একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ে।

চুল বাঁধার সময় ছিল অঢেল, কিন্তু আরশি কাঁকুই নিয়ে বসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। পিঠ ভর্তি খোলা চুলের ঢল নেমে আছে। ভেবেছিল আর একটু পরেই এখানে বসে চুল বেঁধে নেবে। কিন্তু আর দেরি করা যায় না। কামিনী গা গড়িমসি করতে করতে নেমে এল।

—ডাকছিলেন?

নরেন্দ্রনারায়ণ নভেলটাকে এক পাশে ছুড়ে ফেলে একটা হাই কাটলেন, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না? একটা চাদর গায় দিলেও তো পার।

কামিনী আরো খানিকটা এগিয়ে ঘনিষ্ঠতা করল, শীতটা এখন বাইরের চেয়ে ভিতরেই বেশি। বলুন তো বোতল সাজিয়ে দেই।

—তাই না হয় দাও। এখন এ কদিন তো তোমার দয়াতেই এই অধম।

ইস সে, কেবল মুখে মুখেই।

কামিনী একপাশে সরে এসে কাঠের পেটি থেকে একটা হুইস্কির সুদৃশ্য বোতল বার করল। বেতের ট্রে নামিয়ে নিল দেয়াল থেকে। গেলাস বার করল গোটা তিনেক।

নরেন্দ্রনারায়ণ দেখছিলেন, শাড়ি পরা ঘরের গৃহিণীর মতো দেখাচ্ছে এখন কামিনীকে। কে বলবে মেয়েটাকে নিয়ে কিছুদিন আগেও রুটি ছিঁড়ে কুকুর দিয়ে খাওয়ানোর মতো খেলা করেছিল ওরা বন্ধু-বান্ধবরা, মিলে। মেয়েটার সহ্য-শক্তিও অসীম।

এবার আর কদিন পরেই ক্রীসমাস। কামিনীকে নিয়ে বাগানবাড়িতে কাটানোর পরিকল্পনা মনে মনে করে রেখেছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। ভালোই হল কামিনীর সঙ্গে ক্রীসমাসটা এবার সুন্দরবনেই কাটবে

কলকাতার ক্রীসমাসের দিনগুলোর কথা ও'র মনে পড়ল। আলো দিয়ে গোটা কলকাতাকে যেন সাজিয়ে ফেলা হয়। পথে-ঘাটে শুরু হয়ে যায় সাহেব-সুবোদের বেলেল্লাপনা। খোল করতাল নিয়ে পাতি খ্রীশ্চানদের নগর পরিক্রমা এখনো যেন চোখের পাতায় স্বপ্নের মতো জড়িয়ে আছে।

গত বছরও নরেন্দ্রনারায়ণ এমন দিনে বাগানবাড়িতে কাটিয়েছেন। তখনো কামিনীর সন্ধান ছিল না ওর। ভাড়া করা বাইজী এনে গানের আসর বসিয়েছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গলাগলি হুইস্কি পান আর এলোমেলো সাহেবী ঢংয়ে নাচ। এখনো সেসব কথা মনে পড়লে কেমন যেন রোমাঞ্চ বোধ করেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

বোতল থেকে গ্লাসে ঢালার পর কামিনী বেতের ট্রেটা এগিয়ে ধরল। নরেন্দ্রনারায়ণ অবাক হয়ে তাকালেন, সে কি, তুমি খাবে না?

—আপনিই খান না।

—মাথা খারাপ, এসব কি কখনো একা খাওয়া যায় নাকি! দেখি বোতলটা দাও।

বোতল থেকে আর একটা গ্লাসে ঢেলে নিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ, নাও, শুরু কর। চিয়ারস। কিছু খাবার দরকার যে। কিছু খাবার দিতে বল না রজনীকে।

—বলছি। কামিনী ঝুঁকে বজরার বাইরে এল। রজনী তখন বজরার ছাদে। কামিনীকে দেখেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

কামিনী বলল, কেমন আক্কেল হে তোমাদের। বিকেল গড়িয়ে চলেছে সাহেবকে খাবার দেবে না?

ওপাশে ছোট্ট ঘেরা জায়গায় কয়লার উনোন জ্বলছে, রজনী বাবুর্চির দিকে তাকাল, তোমরা কি বেড়াতে এসেছ নাকি হে, ছোটকর্তার খাবার কোথায়?

—এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি রজনী ভাই।

কামিনী বলল, আর দেরি করো না, যা হোক কিছু ভাজাভুজি পাঠিয়ে দাও।

—পাখির মাংস কষে দিচ্ছি কামিনীদি।

'কামিনীদি' ডাকটা বড় বেখাপ্পা হয়ে কানে বাজল। কামিনী তবু গাম্ভীর্য রেখে বলল, তাই দাও, দেরি করো না।

আবার বজরার ভিতরে ঢুকে পড়ল কামিনী। কাশ্মীরী একটা চাদর গায়ের ওপর বিছিয়ে নিয়েছেন নরেন্দ্রনারায়ণ। জানালার পর্দাটা খোলা। বাইরের চলমান দৃশ্যগুলিকে চোখের আড়ালে রাখতে চান না উনি। তাছাড়া জলের একঘেয়েমি শব্দটা বড় ভাল লাগছিল ও'র।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, বেশ আরাম করে বস দেখি। বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে থাকলে খুব জমে যেত আজ কি বলো?

কামিনী মুখোমুখি জানালার বিপরীত পাশে বসে পড়ল। আমার কিন্তু দুজন একজনই ভালো লাগে প্রাণ খুলে তবু দুটো-চারটে কথা ক[illegible] যায়। একগাদা লোক হলে কেমন যেন হাট-বাজারের মতো মনে হয়।

—তাই বুঝি! নরেন্দ্রনারায়ণ নিঃশেষে গেলাসটাকে শেষ করে ফেলতেই আবার ঢেলে দিল কামিনী। জানালার বাইরে আবার চোখ পড়তেই দেখলেন ওপাশের নৌকোয় হাত বদলা-বদলি করছে দাঁড়িরা। গা-হাত-পা বাঁকা করে হাই তুলে আড় ভাঙছে। ঘামে জবজব করছে গায়ের চামড়া। এই শীতের মাঝেও লোক-গুলি ঘেমে উঠতে পারে দেখে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল ও'র। গামছায় গা মুছে নিচ্ছে কেউ কেউ। এই না হলে জংলি বলে ওদের। কেউ আবার থেলো হুঁকোতে ঠোঁট লাগিয়ে তামাক টানছে। আগুনের কণা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে শূন্যে। এ গলুইয়ের হুঁকো ঘুরতে ঘুরতে ও

…য়ে চলে যাচছে। বেশ মজা লাগছিল …নারায়ণের।

—কি দেখছেন ?

—দেখছি, ভগবানের তৈরি কিছু কেমন পরিশ্রম করে বেঁচে আছে।

কামিনী কৌতুকে নরেন্দ্রনারায়ণের তাকিয়ে থাকে।

—দেখছি, কত সুখে ওরা বেঁচে … শীত গ্রীষ্মকে ওরা বশ করে …ছে দেহের ভিতরে। মাঝে মাঝে সত্যি …গুলোর কথা ভাবলে কেমন রূপকথার মতো মনে হয়।

—ভাবেন আপনি ?

নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর দিকে মুখ …য়ে আনলেন, কেন, যদি নাই ভাবব …রি রাখতে পারতাম ! ওদের জন্য কত … খরচ করতে হয় জানো।

কামিনী মিষ্টি করে হাসল, আপনি …রও হিসেব করেন বুঝি ?

—আমাকে কি ভাবো বল দেখি।

…দ্রনারায়ণ নিজেই আবার খানিকটা ঢেলে …ন গেলাসে। তুমি খাচ্ছ না …নী ?

—খাচ্ছি তো ! কামিনী গেলাস … ঠোঁটে ছোঁয়াল।

এমন সময় থালায় খাবার সাজিয়ে …র্চি ঢুকল, সঙ্গে রজনী।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, এই রজনীকেই …স কর না, সুন্দরবনের পিছনে কত … আমি খরচ করছি। যা খরচ করছি … এক কানাকড়িও যদি ফিরে পাই।

রজনী কামিনীর দিকে তাকাল। …নী চোখের ইশারায় জানাল, নেশা, … নেশা। তরল একটু আমেজ এসে …ষ্ট করে তুলতে শুরু করেছে ওঁকে।

রজনী চোখ নামিয়ে আবার ধীরে … কুঠুরির বাইরে চলে এল।

বাবুর্চিও বেরিয়ে যাওয়ার পর …নী আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে এল …ন্দ্রনারায়ণের কাছে, আমি আপনাকে …য় দেব রাজা।

—রাজা ! বাহ্ বেশ বলেছ তো …টির কামিনী।

কামিনী এক টুকরো মাংস তুলে … নরেন্দ্রনারায়ণের মুখের সামনে।

—রাজা বলে যখন ডেকেছ, নিশ্চয়ই …া, দাও।

—উহু, আঙুল সরিয়ে নিল …মনী। দাঁত বসিয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্র- …য়ণ। তারপর হো হো করে উচ্চ স্বরে … উঠেই কামিনীকে আরো কাছে টেনে …লেন।

—কামড়ালে লাগে না বুঝি ? সারা … অভিমান জড়িয়ে অস্ফুট ভাষ করল …মনী।

—লেগেছে, আহা বাট বাট। আঙুলের … যত্ন করে [illegible] খেলেন …দ্রনারায়ণ।

—এদিকে আবার আপনি গ্লাস ফাঁকা করে ফেলেছেন। আরো দেই ?

—দেবে ? দাও। ভর্তি করে ঢেলে দাও। আজ আমি সত্যি সত্যি রাজা।

কামিনী গেলাসটাকে তুলে ধরল নরেন্দ্রনারায়ণের ঠোঁটের কাছে। আর আমি ?

—তুমি ! তুমি কে ? নরেন্দ্রনারায়ণ ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

—আমাকে চিনতে পারছেন না ? দেখুন, ভাল করে একবার দেখুন না আমাকে।

নরেন্দ্রনারায়ণ দু' হাতের পাঞ্জায় কামিনীর মুখটাকে তুলে ধরলেন, হ্যাঁ, চিনেছি; তুমি বাঁদী।

কামিনী সহস্র মণি-মুক্তোর মতো হেসে উঠল, আদাব জাঁহাপনা।

জানালার বাইরে ততক্ষণে তরল একটা অন্ধকার ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে। রজনীর সাহস হচ্ছিল না এই শ্বাসরুদ্ধ সময়ে বজরার ভিতরে ঢুকে ঝাড় লন্ঠনের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায়।

আলোর জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত ছিলেন না নরেন্দ্রনারায়ণ। সমস্ত দেহের ভিতরে সাপের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে নেশার আমেজটা ওঁকে আচ্ছন্ন করে আনছে। নেশা নেশা নেশা। কখন যেন কামিনীর বুকে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

রাত্রির গভীরে হঠাৎ আবার কেমন যেন চমকে উঠলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। স্বপ্ন না জাগরণ উনি বুঝতে পারলেন না। মনে হল, ওঁর শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে শীতল চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে ঊর্মি।

—ঊর্মি, তুমি ? কিছু বলবে ?

কিন্তু সেই মুহূর্তেই ঊর্মি মিলিয়ে গেল।

নরেন্দ্রনারায়ণ পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠলেন। দেখলেন ওরই পাশটিতে কামিনী অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। উদ্ধত আগুনের শিখার মতো ওর সারা গায়ে টলমল করছে যৌবন, চোখ ফেরান দায় হয়ে ওঠে।

কিন্তু কি কথা বলতে এসেছিল ঊর্মি ! কি এমন গুরুতর কথা এতকাল ধরে ও আমাকে বলতে পারে নি। কি কথা ?

(চলবে)

মঠ। পোঃ বেলুড়। হাওড়া
...নভেম্বর। ১৯০১

প্রিয় ক্রিশ্চিনা,—

মনে হচ্ছে তোমার বোতল ভর্তি নার্ভ টনিক তোমার কোনই উপকার করে নি। তুমি যে আশ্বাস দিয়েছিলে কার্যতঃ সেটি বরং উল্টোই। এটা একটা অদ্ভুত রকম ভ্রান্তি। আমার সে সময় জ্বর হবার কারণ হাঁপানী, বা অন্য কিছু হবে। যাক, তবুও হাজার হাজার বার ক্ষমা চাইছি। এই আমার প্রথম এবং শেষ অপরাধ।

তোমার যে চিঠিটা মিস ম্যাকলয়েডকে পাঠান হয়েছিল সেটি এখনও ফেরৎ পাই নি। হয়ত উনি জাপান ভ্রমণ সেরে ভারতে আসবার সময় একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন চিঠিটি আর সঙ্গে আনবেন ধর্মান্তরিত (কনভার্টেড) কোন জাপানীকে (হ্যাঁ,—অবশ্যই কোন পুরুষ—উনি নিজে তো লেডী মিসনারী কিনা!)।

বেশ, বেশ, আমি চাই কাজকর্ম এমন সুষ্ঠুভাবে নিজেরাই নিজেদের পথ করে নেবে যে তোমাকে যেন আর একবার দেখতে পাই। মা জানেন তাঁর ইচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ বলি, আমার ডান চোখটির দৃষ্টি কমে আসছে ভাল করে দেখতে পাই না ঐ চোখ দিয়ে। কিছু দিনের মধ্যেই ঐ চোখ দিয়ে লেখা বা পড়া মুস্কিল হয়ে পড়বে। প্রতি দিনই খারাপের দিকে চোখের অবস্থা। আমার লোকেরা সবাই আমাকে জোর করছে কলকাতায় গিয়ে কোন ডাক্তারকে চোখ দেখাবার জন্য। যাবো। শিগ্‌গিরই যাবো। এই জ্বর সর্দিটা সেরে গেলেই যাবো। তুমি অভেদানন্দের কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছ জেনে খুব খুশী হয়েছি।

বেচারী মিস জো! আমার জাপান না যাবার আসল কারণ উনি জানেন না। তোমার সে জন্য চিন্তিত হবার কিছু নেই। এতে কোন ক্ষতি হয় নি। আর হলেও জো এবং বিশেষ করে মিসেস বুল আমি যাদের ভালবাসি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা তাদের জীবনের কর্তব্য বলে মনে করবেন তাঁরা। তোমার টনিক পৌঁছলে খেয়ে দেখব, আর যে উপহারটির জন্য আমার প্রার্থনা সেটিও নিশ্চয় দাতা এর পরেই এসে হাজির করবেন কারণ জীবন্ত স্পর্শ ঢের বেশী স্বাস্থ্যোদ্ধার করে মৃত ওষুধের চেয়ে।

ভালবাসাসহ
বিবেকানন্দ

মঠ। পোঃ বেলুড়। হাওড়া
২৭শে নভেম্বর। ১৯০১

প্রিয় ক্রিশ্চিনা,

আমি নিশ্চিত জানি সেই কেলেঙ্কারীর ভুলের পর যে সপ্তাহে তোমাকে আমি একটিও চিঠি লিখিনি। তার কদিন আগে তোমাকে দুখানি চিঠি লিখেছি। অতএব আর একখানি লেখবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তাহলে মিস ম্যাকলয়েড নিশ্চয় চিঠিখানি
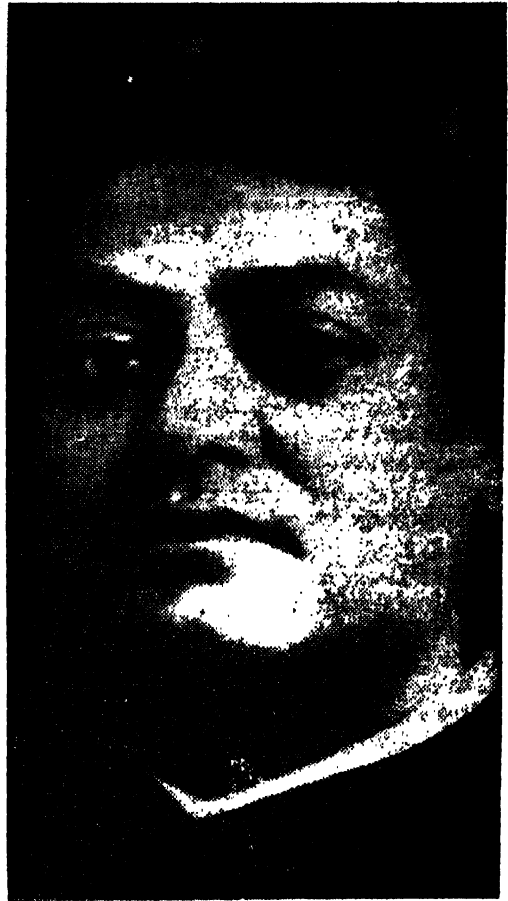
পাঠিয়ে দিয়েছেন। সম্ভবতঃ আমি যে সপ্তাহে মিস ম্যাকলয়েডকে একটি মাত্র চিঠি লিখেছিলাম আমার জাপানে না যাবার কারণ জানিয়ে। আর নিশ্চয় খামের ওপরে ভুল করে অতিপরিচিত নামটি লিখে বসেছিলাম। অতএব তুমি তোমাকে লেখা কোন চিঠি জাপান থেকে রিডাইরেক্ট হয়ে আসবে আশা করে থাকতে পারো না—কারণ তোমাকে কোন চিঠি আদৌ লিখিনি। আর যদি থাকেই, সে তুমি ঠিক পেয়ে যাবে।

আমি আবারও একচোট সর্দি ও হাঁপানীতে ভুগছি। গতকাল ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে এখানে ফলে বেশ কিছু গাছ এবং মঠের ছাতের ক্ষতি হয়েছে। এখনও মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং ঠাণ্ডা যথেষ্ট। বুঝতেই পারছ হাঁপানী নিয়ে চিঠি লেখা রীতিমত অসম্ভব কাজ।

অতএব au revoir

তোমাদের বিবেকানন্দ।

(৬০)

মঠ। পোঃ বেলুড়।
হাওড়া। ভারতবর্ষ।
১২ই ডিসেম্বর। ১৯০১

প্রিয় ক্রিস্টিনা,--

বেশ, তুমি তাহলে আমার স্বাস্থ্যের পুরো বিবরণী চাও এবং তোমার জোর দাবী, তোমাকে জানাতেই হবে। তুমি জানো গত তিন বছর ধরে প্রায়ই আমার albumenuria পাওয়া যাচ্ছে। এটা বরাবর অবশ্য থাকছে না। কিডনি এমনিতে ঠিক আছে। মাঝে মাঝে শুধু album বেরুচ্ছে। এটা ডায়াবিটিসের সুগার বেরুনোর চেয়ে খারাপ মনে করা হয়। এটা রক্তকে দূষিত করে এবং heart অ্যাটাক ও নানাবিধ উপদ্রবের কারণ হয়। সর্দি হলেই বেড়ে যায়। এবারকার আক্রমণে ডান চোখের একটি শিরা ছিড়ে রক্তপাত হয়ে চোখটাতে একেবারেই প্রায় দৃষ্টি নেই। বুক ধড়ফড় করে। ডাক্তাররা আমাকে বিছানায় শুইয়ে রেখেছেন। আমার মাংস খাওয়া, হাঁটাচলা এমনকী দাঁড়ানো পর্যন্ত বারণ। লেখা বা পড়া সব বন্ধ। চুপচাপ শুয়ে থেকে এরই মধ্যে উপকার বুঝতে পারছি। ঘুম হচ্ছে খুব, খিদে ভাল এবং খাবার হজমও হচ্ছে বেশ। আশ্চর্যের কথা যে কাজকর্ম না করে খিদে, ঘুম ভাল হচ্ছে! যাইহোক চিন্তান্বিত হবার মত কিছু নয়।

মিসেস সেভিয়ার তিনদিন আগে কলকাতায় পৌঁছেছেন এবং নিবেদিতার শেষ পরামর্শ অনুযায়ী মিসেস বুল ও মিসেস সেভিয়ার ১৩ই ডিসেম্বর রওনা হবেন। প্রার্থনা করি মিসেস বুল নিশ্চয় এর মধ্যে তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এবং তুমি এক বছরের ছুটি পেয়ে এখানে আসছ এবং এই চিঠিখানি হয়ত তোমার নামে ভারতবর্ষেই redirected হয়ে আসবে। যদি মা এই প্রার্থনা পূর্ণ না না করেন তবে আমাকেই আবার সাগর পাড়ি দিয়ে নিয়ে যাবেন এবং........

ডাক্তাররা বলছেন যদি আমাকে মাস তিনেক শয্যাশায়ী রাখা যায়, আমি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করব। অতএব ভাববে না মোটেও। যদি ভাল দিন নাও আসে আমরা দিনগুলোকে ভালো করে তুলব। অতএব চুলোয় থাক্ ওসব,--আমি এবারে ভালো দিন দেখব, এবং সেদিন আগতপ্রায়।

মিস ম্যাকলয়েড তোমাকে তোমার চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন! কী বিষয় ছিল সেটা?.....................অসমাপ্ত

(৯০)

He (Vivekananda) learned religion may be experienced, not merely believed and that there are methods which give this experience; that man may here and in this body become divine-transfuted from the human into the Superhuman. In Ramakrishna, he saw once who lived "God is the only reality".

সব সময় যে আমরা খালি বেদান্তের কথা শুনেতাম আর গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম তা নয়। ক্লাসের শেষে হাসি, আমোদ যা হত তা আমরা এর আগে কখনও দেখিনি। আমরা সাধারণতঃ জানি যে ঈশ্বরসাধকরা সর্বদা খুব গম্ভীরভাবে থাকেন। কিন্তু এ'র বেলায় দেখলাম ইনি সংসারের সমস্যাকে কত সহজে স্বেচ্ছায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শিশুর মত সরল আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠতে পারেন। বুঝলাম এইরকম প্রকৃতি নিরাসক্ত মানুষের পক্ষেই সম্ভব—যে মানুষ পরম সত্যকে অনুভব করেছেন,- ঈশ্বর দর্শন করেছেন! ফলতঃ আমরাও সাময়িকভাবে বেশ হাল্কা মনে সহজ হয়ে যেতাম।

স্বামীজীর গল্পের ঝুলিতে অনেক মজার মজার গল্প ছিল। প্রায়ই সেগুলি ঘুরেফিরে আমাদের বলতেন। একটা গল্প বলতেন এক মিশনারীর। তিনি এক নরখাদকের দেশে গিয়েছিলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার আগে যিনি এসেছিলেন তাঁকে তোমাদের কেমন লেগেছিল?"

তারা বল্লে, 'চমৎকার সুস্বাদু।'

আর একটি গল্প বলতেন এক নিগ্রো প্রচারকের। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বলছেন,

"God made Adam and put him up against de (the) fence to dry."

শ্রোতাদের মধ্য থেকে প্রশ্ন,

"Hold on dere brudder (brother) who made dat (that) fence?"

নিগ্রো প্রচারক pulpit এর ওপরে ঝুঁকে পড়ে গম্ভীরভাবে বললেন,

"One more question like dat you smashes all teology".

বলতেন সেই মহিলাটির কথা। স্বামীজীকে ইনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন "আপনি কী Buddist'? ('বুদ্ধ' উচ্চারণ 'Bud' (বাড্)!

স্বামীজী দুষ্টুমি করে গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন আজ্ঞে না, florist".

ল্যান্সবার্গের সঙ্গে যে বাড়িতে থাকতেন সে বাড়িতে একটি মেয়ে রান্না করত। তার গল্পও করতেন। স্বামীর সঙ্গে তার প্রায়ই খটাখটি লেগে থাকত! স্বামীটি ভূত-তত্ত্ববিদ্ ছিল। সভা-সমিতিতে যখন অনুষ্ঠান প্রদর্শন করত তখন স্ত্রীটি ছিল তার ভূতের মাধ্যম। ঝগড়া হলেই স্ত্রীটি এসে স্বামীজীর কাছে সহানুভূতি চাইত এবং অনুযোগ করত, "দেখুন তো! ওর কী উচিত আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করাত! কি[illegible] করে আমি যখন ওর 'ভূত আত্মা'?"

ল্যান্সবার্গের সঙ্গে ও'র প্রথম আলাপ হবার গল্পও করতেন। এক থিয়োজফিক্যাল সভায় ল্যান্সবার্গ Devil -এর ওপরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ও'র ঠিক সামনেই একটি মহিলা লাল টুকটুকে ব্লাউজ পরে বসেছিলেন। ঘুরে ফিরে যত বার ল্যান্সবার্গ খুব জোরের সঙ্গে 'Devil' কথাটা উচ্চারণ করছিলেন উত্তেজনায় সামনের সেই মহিলার দিকে আঙুল তুলে বলে উঠছিলেন 'Devil'

অল্পক্ষণের মধ্যেই গল্পের ধারা এবং পরিবেশ বদলে যেতো। বলতে শুরু করতেন শকুন্তলার কাহিনী। কী কাব্যময় কল্পনারাজ্য! এধরনের প্রেমের কোন ধারণা কী কখনও আমাদের ছিল? তাও বলব এতো কেবলমাত্র আসল প্রেমের বিবর্ণ, নিষ্প্রভ একটা বর্ণনা মাত্র। গাছ, ফুল, পাখী, হরিণ সবাই যখন কেঁদে কেঁদে বলছিল শকুন্তলা চলে গেল, শকুন্তলা চলে গেল, তখন সমস্ত প্রকৃতি যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। হ্যাঁ, আমরাও সে কান্নায় যোগ দিতাম। এরপর ক্রমে ক্রমে সাবিত্রী, [illegible] সীতার [illegible]। সাবিত্রী যাঁর

বিশ্বস্ততা,—ভালবাসাপূর্ণ বিশ্বস্ততার কাছে মৃত্যু পরাজয় মেনেছিল। সীতার কথা বলতে অভিভূত হয়ে যেতেন। সাবিত্রীর কথায় ততটা নয়। প্রায়ই কোন কথা উঠলেই বলতেন 'সীতা হচ্ছেন পবিত্রতা ও সতীত্বের প্রতিমূর্তি। সীতা হলেন আদর্শ স্ত্রী।' যখনই কোন কথা হতো একবার করে সীতার আদর্শের কথা উল্লেখ করতেন। বলতেন ভারতের ভবিষ্যতের নারীসমাজ গড়ে ওঠা উচিত সীতার আদর্শে। আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলতেন, 'আমরা সবাই সীতার সন্তান' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর গভীর অনুভূতিতে গাঢ় হয়ে উঠত।

মাঝে মাঝে আমাদের কাছে বলতেন তাঁর ভারতে থাকাকালীন জীবনের কথা। বলতেন ছোটবেলায় গেরুয়া কাপড়ের কী এক মোহিনী শক্তির আকর্ষণ অনুভব করতেন উনি। কোন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বাড়ির উঠোনে দেখা দিলেই তাকে নিজের যা কিছু সব দিয়ে দিতেন। অগত্যা বাড়িতে সাধুসন্ন্যাসী আসতে দেখলেই বাড়ির লোকেরা ওঁকে একটা ঘরে বন্ধ করে দিতেন। তখন উনি জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে সব কিছু দিয়ে দিতেন গেরুয়াধারী ভিখারীকে। ঐ বয়সেই মাঝে মাঝে ধ্যানে বসে আত্মস্থ হয়ে যেতেন। বাহ্যজ্ঞান থাকত না। এদিকে দুষ্টুমি যখন করতেন, তখন ওঁর মা ওঁকে জলের কলের নীচে চেপে ধরে বলতেন, "শিবের কাছে একটা ছেলে চাইলুম, তা পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এক দানব।" যে শক্তি সমস্ত ভারতবর্ষকে নাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে বেঁধে রাখে কার সাধ্য?

মাস্টারমশাই পড়াতে আসতেন, ছাত্র (বিবেকানন্দ) চোখ বুজে একটা মূর্তির মত বসে থাকে। মাস্টারমশাই রেগেমেগে চেঁচাতেন "আমি যখন পড়া বোঝাচ্ছি তুমি বসে বসে ঘুমোও এতবড় আস্পর্দ্ধা!

চোখ খুলে ছাত্র তখন গড় গড় করে পাঠ্যবস্তুটা বলে যায়। মাস্টারমশাই বিস্মিত হয়ে শোনেন।

ওঁর এরকম স্মৃতিশক্তির কথা শুনে অবিশ্বাসের কিছু ছিল না। একজন একবার এবিষয় মন্তব্য প্রকাশ করাতে বলেছিলেন, আমার মায়ের ছিল আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি। একবার তাঁকে রামায়ণ পড়ে শোনালে তিনি তৎক্ষণাৎ তা মুখস্থ বলে যেতে পারতেন।

একদিন সুইডেনের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছিলেন। সেখানে একজন সুইডিশ ব্যক্তি বসেছিলেন। তিনি স্বামীজীর বক্তব্যে কিছু ত্রুটি সংশোধন করে দিলেন। স্বামীজী চুপ করে থাকলেন। কারণ নিজের জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি এত সুনিশ্চিত ছিলেন যে অযথা তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন না। পরদিন সেই ভদ্রলোকটি লজ্জিত মুখে এসে জানালেন, "আমি ঐ বিষয় একবার ভাল করে পড়ে দেখলাম। আপনার কথাই ঠিক স্বামীজী।" এইরকম কত ঘটনাই যে হোত। তাইতে বোঝা যেতো ভাল স্মৃতিশক্তি আধ্যাত্মিকশক্তির

নিজের মা সম্বন্ধে কত গল্প যে আমাদের বলতেন। মাকে কী ভালইবাসতেন। ভারতবর্ষের যেখানেই থাকুন হঠাৎ কখনও কেমন ভয় হত 'মা ভাল আছেন তো?' তাড়াতাড়ি চিঠি লিখে (বা যখন বেলুড়ে থাকতেন লোক পাঠিয়ে) মায়ের খবর জিজ্ঞাসা করতেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা ওঁর মাকে দেখেছিলেন তাঁরা বলেন যে মায়ের কাছ থেকেই উনি উত্তরাধিকার সূত্রে সম্ভ্রান্ত ভাবটি পেয়েছেন। ছোটখাটো মানুষটির চালচলনে ছিল রানীর মত সম্ভ্রান্ত ভাব। পরবর্তী যুগে আমেরিকান পত্রিকাগুলি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে উল্লেখ করে কতবার যে লিখেছে,

'That Lordly monk Vivekananda".

গল্প করতেন নিজের বাবার কথা। অসীম শ্রদ্ধা ছিল বাবার প্রতি তাঁর। বলতেন বাবার দানের কথা। এক মাতালকে মদ খেতে পয়সা দিয়েছিলেন। আত্মসমর্পণের জন্য বলেছিলেন, "সংসারটা এমনই ভীষণ জায়গা যে ও যদি খানিকক্ষণের মত সেইসব দুঃখকষ্ট ভুলে থাকতে পারে, ক্ষতি কী!" ওঁর মরীয়া হয়ে দান করবার রকমসকম দেখে ছেলে একদিন বললেন, "তুমি আমার জন্য কিছু রাখবে না?" বাবা বললেন, 'আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও, তাহলেই বুঝবে আমি তোমার জন্য কী রেখেছি।"

স্বামীজী বলতেন,

"To my father I own my intellect and compassion".

গল্প করতেন কালীর পুরোহিত ঠাকুরকে মেনে নিতে প্রথম কী মানসিক সংঘাত না সহ্য করতে হয়েছিল। ঐ ভয়ংকরী মূর্তির উপাসক! স্বামীজী ছিলেন সংস্কারমুক্ত, agnostic, আধুনিক তথা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি। 'ঐরকম মূর্তি উপাসকের পায়ের তলায় তিনি বসবেন?

"But agnostic or devotee, the search for God was always uppermost in his mind."

ঐ অতি সাধারণ সরল মানুষটির মধ্যেই তিনি পেলেন আসল সত্যের সন্ধান, জীবন্ত পরিপূর্ণ সাধককে—যা তিনি এতদিন খুঁজে ফিরেছেন!

অনেক সংঘাত, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর মেনে নিলেন। গ্রহণ করলেন গুরুরূপে রামকৃষ্ণকে। বিজিত হলেন এক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে। সে বিষয় কখনও কিছু বলতেন না। এমনই পবিত্র ছিল সেই অভিজ্ঞতা।

গুরুর প্রতি ভক্তি ছিল ওঁর অনন্যসাধারণ! ভালবাসা, আনুগত্য এসব যেন নতুন মানে তৈরী হল! গুরুর মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে দেহীরূপে দেখেছিলেন। ওঁর উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ যেন নতুন রূপ পেল' যদিও তিনি নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু স্বামীজী বলতেন এতবড় জ্ঞানীপুরুষ তিনি কখনও দেখেননি।'

বিবেকানন্দ বলতেন,

"If idol worship can produce such a character, I bow down before it".

ভয়ংকরী কালীমূর্তির কাছে নত হলেন। প্রণাম জানালেন। দেখলেন তাঁর মহামায়া রূপ।

.....গুরু দেহরক্ষার পর শুরু হল তাঁর (বিবেকানন্দ) ভ্রাম্যমাণ জীবন। দক্ষিণেশ্বর থেকে হিমালয়, হিমালয় থেকে রামেশ্বর,—পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে, উটের পিঠে, হাতীতে, ট্রেনে রামকৃষ্ণের সন্তানেরা। ঘুরে বেড়িয়েছেন.....এই পরিব্রাজকজীবনে তিনি প্রথমে গেলেন বুদ্ধগয়ায় সেখানকার বোধিবৃক্ষের নীচে বসে ধ্যান করবার জন্য। সেই বোধিবৃক্ষ যার নীচে আড়াই হাজার বছর আগে এক জ্ঞানী মহাপুরুষ এই সংসার অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে বের করেছিলেন।

বুদ্ধদেব স্বামীজীর কাছে কী ছিলেন সেকথা সমস্ত বোঝানো যাবে না। বুদ্ধের নাম করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঞ্চার দেখা দিত। তারপর কদিন ধরে শুধু বুদ্ধেরই আলোচনা করতেন। ওঁর অপূর্ব নাটকীয় দক্ষতায় এমন অলৌকিক যে সমস্ত কাহিনীটির অবতারণা করতেন, যে আমরা যে শুধু সমস্তটা চোখে দেখতে পেতাম, তাই নয়—মনে হত এইসব দৃশ্যের মধ্যে নিজেরাও বসবাস করছি। মনে হত এ সমস্তই আমাদেরই চোখের সামনে ঘটেছে—কেবলমাত্র গতকালের ঘটনা।

.....দৃশ্যের পর দৃশ্য। দিনের পর দিন কেটে যেত। বুদ্ধের জন্ম থেকে তাঁর কুশীনারার শেষদিন পর্যন্ত আমরা প্রত্যক্ষ করতাম।

অবশেষে

"Like the mallas we too wept 'the Blessed one'."

বেনারসে অনেকদিন ছিলেন। সেখানকার সাধুসন্ত এবং পণ্ডিতদের মধ্যে থেকে শাস্ত্রপাঠ ও সেইসব বিষয় আলোচনায় দিন কাটত। একদিন সেখানকার এক প্রাচীন এবং সুপরিচিত সাধু ওঁ'র ওপরে বেজায় ক্ষেপে গেলেন ওঁ'র ধর্মবিষয় মতামত শুনে। দেড় ইঞ্চি ছেলের প্যাকামী! সবাই ওঁকে গালাগালি করলেন। উত্তর তাঁরা শুনলেন "যতদিন, আমার কণ্ঠের বজ্রঘোষে আমি ভারতভূমিকে কাঁপিয়ে দিচ্ছি, ততদিন আমি বেনারসে ফিরব না।"

১৯০২ সালের আগে আর বেনারসে যাননি। ১৯০২ সালে আবার গেলেন নিজের কথার সত্যতা দৃঢ় করতে।

উনি নিজেকে সর্বদা মনে করতেন ভারতের সন্তান—ঋষির বংশজাত উনি। একদিকে ছিলেন চূড়ান্ত আধুনিক, অথচ প্রাচীন ভারতের বনবাসী ঋষিদের জীবনযাত্রা এবং বেদের বাণীকে এমনভাবে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে তো আর কোন হিন্দু পারেন নি। সত্যি এক এক সময় মনে হত ওঁকে,—যেন সেই প্রাচীন যুগের ঋষি আবার বুঝি জন্মগ্রহণ করেছেন।

অধ্যাত্মজ্ঞানের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জীবন্ত হয়ে উঠত! ওকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোথা থেকে শিখে উনি এমন মধুর সুরেলা কণ্ঠে শাস্ত্র-মন্ত্রোচ্চারণ করেন—যা শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যায়? উনি অমায়িক, লাজুকভাবে বললেন স্বপ্নে উনি নিজেকে দেখেছিলেন প্রাচীন ভারতের বনের মধ্যে। সেখানে কোন এক কণ্ঠ—হ্যাঁ ওঁ'র নিজের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হচ্ছিল পবিত্র সংস্কৃত শ্লোক। এই সময়েই আর একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে ঋষিরা একটি পবিত্র কুঞ্জের মাঝে একত্র হয়ে আলোচনা করছিলেন এবং প্রশ্ন করছিলেন পরম সত্য সম্বন্ধে। তাঁদের মধ্যে একজন যুবক সুস্পষ্ট সুরেলা কণ্ঠে বলে উঠল 'শৃন্বন্তুঃ বিশ্বস্য অমৃতস্য পুত্রাঃ' তোমরা যারা অনেক উচ্চস্তরে থাকো তারাও শোনো, আমি সেই পরমসত্য আত্মাকে জেনেছি—যাঁকে জানলে আর মৃত্যুভয় থাকে না, অমৃতত্ব লাভ করা যায়।"

ক্রিস্টিনের চিঠি

(২)

প্রিয় মিসেস ওর, দার্জিলিং। ২৫শে নভেম্বর। '২৪

আপনার কাছ থেকে আবার একটি উপহার এসে পৌঁছেছে। লুয়েলা আমাকে জানিয়েছিল, সে আমাকে গতবার যে ড্রাফটটি পাঠিয়েছিল তার মধ্যে দশ ডলার আপনার দান। এটা আপনার সুন্দর মনের পরিচয়। এটার মূল্য আমার কাছে যে কতখানি, তা যদি আপনাকে বোঝাতে পারতাম। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ছোট্ট মিস উইনর, শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, সে লুয়েলাকে জানিয়েছিল আমাকে কিছু সাহায্যের প্রয়োজনের কথা। আমি এজন্য খুবই দুঃখিত। কারণ আমি কারো কাছে না চেয়ে, বিশ্বাসের ওপরে নির্ভর করে থাকতে ভালবাসি। অন্ততঃ গত বাইশ বছরের মধ্যে আমাকে কারো কাছে কিছু চাইতে হয়নি। (অর্থাৎ এইরকম জীবনযাত্রার আগে পর্যন্ত)। আমার মনে হয় আমাদের এইরকম অনিশ্চিত জীবনযাত্রার ভঙ্গীটি ওকে (মিস উইনর) বিচলিত করেছে। ও নিজেও যথেষ্ট দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে। একটার পর একটা ধাক্কার সম্মুখীন ওকে হতে হয়েছে এবং বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আমরা কঠিনতম ওঠাপড়ার মধ্যে দিনযাপন করছি। আমরা যখন ইউরোপ ভ্রমণ করেছি, তখন প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করেছি অনেক সময়। তখন কী ভেবেছিলাম যে ভারতবর্ষে এসে একেবারে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ব? অথচ এমনটি হবার কথা নয়।

কলকাতায় আমরা রীতিমত ডিলেইলিউশনড্ হয়েছি এবং দুমাসের মধ্যেই অর্থহীন ও গৃহহীন হয়েছি। অতঃপর কেউ আমাদের একটি মোটা অঙ্কের চেক্ দিলেন এবং সেইটির সম্বন্ধে আমরা দার্জিলিংএ এলাম। শেষ পর্যন্ত কারো বিদ্বেষের প্রভাবে আমাদের বন্ধুটি প্রভাবান্বিত হন এবং চেকটি তাঁকে ফেরত দিতে হল। দার্জিলিংএ বাড়ী ভাড়া এত বেশী যে এরপর মনে হল এবারে বুঝি আমাদের গাছতলাকে আশ্রয় করবার সময় এসেছে অথচ এত ঠাণ্ডায়, কী বলি! যাই হোক, বসে থাকলে তো চলবে না! চললাম বাড়ীর খোঁজে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমাদের বর্তমান আস্তানাটি পেয়ে গেলাম। বাড়ীটি সবদিক দিয়ে সুবিধাজনক ও সুন্দর। জল, বিজলী, প্রতিটি ঘরে ফায়ার প্লেস। পাঁচ ঘর ও বারান্দাসহ ভাড়া পঁচিশ ডলার। আজ সাত মাস এ বাড়ীতে বাস করছি এবং প্রতিদিনই বাড়ীটির প্রতি ভালবাসা বাড়ছে। আমেরিকা থেকে যেসব চেকগুলি এসেছিল, এই কমাস তার ওপরে নির্ভর করে কাটিয়েছি। এরপর ব্যাংক থেকে একটা চিঠি পেলাম যে আমেরিকা থেকে কোন বন্ধু আমাদের মাঝে মাঝে কিছু অর্থসাহায্য করবেন। সেটাতে আমাদের স্বচ্ছন্দভাবে চলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট! তিন মাস এই আর্থিক সাহায্যটি পেয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ আমেরিকা থেকে একটা কেবল এল—ব্যবসায় মন্দা পড়বার দরুন টাকা পাঠানো আর সম্ভব হবে না।

জানি না এরপর কী হবে। এখনও ৯।১৫ মাস চলবার মত পয়সা আমাদের আছে। হ্যাঁ, বলব 'বেশ আছে।' পৃথিবীতে লোকেরই বা এটুকু থাকে? কিন্তু এরপর? হয়ত কোন অভাবনীয়ভাবে কিছু পেয়ে যাবো। যদি তার পরিমাণ এক মিলিয়ন হয় তাও আশ্চর্য হব না। আমরা যদি জানি কী করে পেতে হয় তাহলে সীমাহীন সম্পদ মুঠোয় পেতে পারি! কিন্তু আমরা কী নির্বোধ!

ক্যারলিন উইনর তো সেই প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে হয়ত কোন কোটিপতি মহিলা ওকে একদিন সঙ্গী করে নিয়ে ভারতবর্ষ ঘুরিয়ে আনবে। তা সেরকম হওয়া আশ্চর্য কী!

আশা করি আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়েছে। আপনারা ভাল আছেন। মাঝে মাঝে আপনাদের খবর দেবেন। আমার শুভেচ্ছা শ্রীযুক্ত উইলসন মহাশয়কে জানাবেন এবং আপনার জন্য ভালবাসা।

ক্রিস্টিন

পুঃ, আপনি, লুয়েলা এবং অন্যান্যরা, যাঁরা ঠিক দরকারের সময়ে আমাকে সাহায্য পাঠিয়েছেন তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রার্থনা করি, এই দানের ফল আপনারা বহুগুণে ফিরে পান। ক্রিস্টমাসের উৎসব আপনাদের আনন্দোজ্জ্বল হোক কামনা করি। যদি অবশ্য এ চিঠি ক্রিস্টমাসের আগে পৌঁছয়।

(চলবে)

...াধে স্বপ্নে কেবলই করাত

...ত্য গুহ

...ছ কাটা হয়ে গেছে
...াতের শব্দ তবু শুনি সারারাত
...ঠুরিয়াদের কাছে শুধাবো কি প্রেমের সংবাদ

...তিকার প্রতি
... উচ্চারণ ব্যর্থ—সমস্ত সংগীত
...-জনের সাহারা থরের
...কে বুক শূন্যতায় যেন অশ্রুপাত

... আশা ঝরে গেছে.
...ীবন বদল করে পিউ কাহার সঙ্গে হৃদয়
... হা কপে উড়ে ফিরে আকাশের ওপরে আকাশে
...য় 'মনে রবে কি না-রবে আমারে'
...চ্ছ্বাস চমক দিয়ে ওঠে শূন্যতায়
...না মেঘে তেমন বিদ্যুৎ

...র ধ্যান শিল্পের সামর্থ ও সাধ
...কেকে নৈবেদ্য করে গড়ে তোলা ভালোবাসা, হায়
...টির পুতুল নিয়ে খেলতে খেলতে ভেঙে গেলে
...ী কতটা ব্যথা জানে বালিকা বালকে
...ণী দ্বিধা না-রেখে আগবাড়ী চলে গেলে ভালোবাসা ফেলে
...থ্য বেলাকার রোদে রাত্রি হয়ে যায়

...কিতে যাবার বেলা হোলো
...স্যা আমার প্রেমে প্রতিমা হতে হতে
...তিকা বললো মৃদু 'যাই' এবং যাওয়া
...বে রোয়া দেয়া শেষ জমির দলিল বললো 'মালিক তুমি না'

...াছ কাটা হয়ে গেছে
...ঠুরিয়াদের কাছে বলা ব্যথা হৃদয় বেদনা
...তিকার প্রাণ হয়নি এটা তার ঈশ্বর বরাত

...ারারাত শব্দ শুনি কারা যেন সাধে স্বপ্নে করছেই করাত।।

এখন আমার দিন রাখালি

নগেন্দ্র দাশ

বলতে পারলে কেউ ছাড়ে না : লালটা বেশি
হিরণ মেলে না!
অমন কেন গাছের মতোন কেতন ওড়ে?
শোণিত এবং মাংসপেশীর রেষারেষি—
এমনিতরো অনেক কথাই
যেমন-তেমন ঘেঁষাঘেঁষি
রক্তারক্তি ঠায় দুপুরে হরিৎ বুকে ছলকে ওঠে।

বলতে পারলে কেইবা ছাড়ে, কেউ ছাড়ে না :
আলো হাওয়ায় বেড়িয়ে আসুক
চাইর পাবে
বিশ্বভুবন অনেক বড়ো কূপের থেকে।

আনাচকানাচ গাছগাছালি পাখপাখালির
ক্ষেতখামারে জল বাড়ে না।
কোথায় যাবে—অনাসৃষ্টি।
পথের পাশে এখন আমার
দিনরাখালি।

দূরে রেখো

মুজাহিদ আহমদ

বাসাবাড়ি করেছ ঠিক আছে। বাড়ীর
সীমানা সংলগ্ন উঠোনে লাগিয়েছ মেহেদী ঝোপ।
এককোণে আমলকি নিমের বিশুদ্ধ
প্রভুভক্তি আড়চোখে তাকায় তোমার জাঁদরেল
কুকুরটার দিকে। দুটো পাঁচনলা বন্দুক দিয়ে
কোরিয়প্সিস, ক্রিসান্থিমাম গোলাপের সুবাস
শিকার করে এনে সাজিয়েছ ড্রইং রুমের চারদিককার
দেয়াল। দক্ষিণ বারান্দার-
রঙিন পর্দা ধরে খেলতে খেলতে পুতুলের মতো
বাতাস ধরুক ঢুকে
যায় ঘরের ভেতর।

এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক আছে। শুধু
ফুলের বাতি জ্বালিয়ে একাকী যে আগাছা জন্মেছে
দাবীদাওয়াহীন। বাগানের এক কোণে।
মৌমাছির দীর্ঘ যাত্রাপথ
সাড়ে সাত সেকেন্ডের আশ্চর্য স্টেশন।
তার থেকে দূরে রেখো তোমাদের ক্রোধ।

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত বেন্টিক স্ট্রীটের একটি বাড়ী। ১৮৮৫ খৃঃ

বিদেশে ভূমিকম্প এবার কি কলকাতায়?

সংকর্ষণ রায়

গত মার্চে রোমানিয়া ও ইরানে প্রবল ভূমিকম্প হয়েছে। ভূমিকম্পের ফলে ধ্বংস হয়েছে বহু শহর ও গ্রাম, নিহত হয়েছে কয়েকশো মানুষ এবং আহতের সংখ্যা চার হাজারকে ছাড়িয়ে গেছে। গত দু বছরের মধ্যে ইরানে আরও দু-একবার ভূমিকম্প হয়েছে প্রলয়ংকর ভূমিকম্প সংক্ষুব্ধ ইটালি, গ্রীস, তুরস্ক, উজবেক, তাজিক, তুর্কমেন, চীনের তাংশান, ইন্দোনেশিয়া ও হিমাচল প্রদেশের মাটি।

কলকাতার মাটি না কাঁপালেও এইসব ভূমিকম্প কলকাতার তলাকেও স্পর্শ করেছে, কারণ এইসব অঞ্চলে আছে ভূপৃষ্ঠ যেখানে চঞ্চল, যেখানে সর্বদাই আছে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা। এদের মধ্যে একটি আছে প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে। দেশগুলি হল আলাস্কা, ক্যালিফোর্ণিয়া, পশ্চিম মেকসিকো, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, জাপান ও ফিলিপাইনস। দ্বিতীয় অঞ্চলটি ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে বর্মা, হিমালয় পর্বত, বেলুচিস্তান, ইরান, তুরস্ক ও আল্পস্ পর্বতের মধ্য দিয়ে পশ্চিমে স্পেন ও পর্তুগাল পর্যন্ত বিস্তৃত। হিমালয় পর্বতের সঙ্গে তার পার্শ্ববর্তী সমতলভূমিও এই ভূমিকম্প সংক্ষুব্ধ অঞ্চলের আওতায় পড়ে। রোমানিয়া, ইরান, কলকাতা এবং ওপরে যেসব দেশের কথা লিখেছি তারা এই দ্বিতীয় ভূমিকম্প সংক্ষুব্ধ অঞ্চলে অবস্থিত।

সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূমিকম্প সম্মিলনীতে সুইজারল্যাণ্ডের ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ডকটর এইচ টিয়েডম্যান কলকাতায় প্রবল ভূমিকম্পের সম্ভাবনা সর্বদাই আছে বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে দ্বিতীয় ভূমিকম্প-সংক্ষুব্ধ অঞ্চলটির মধ্যে যেখানে ভূমিকম্প ঘটুক না কেন, তার স্পন্দন কলকাতার মাটিতে এসে পৌঁছায় এবং কলকাতার তলাতে ভূমিকম্পের অমোঘ অস্ত্রগুলোকে শাণিত করে তোলে।

কিন্তু আশংকা যতই ঘটুক, কলকাতার মানুষদের তা স্পর্শ করে না। কারণ তেমন কোন প্রলংকর ভূমিকম্পের স্মৃতি কলকাতার মানুষদের ম[...] মাঝে মাঝে মৃদুমন্দ কম্পন ক[...] মাটিকে কাঁপালেও স্থানীয় [...] মনে ভ[...]কম্প সঞ্চার করে না[...]

[...]ন্তু সত্যিই একদিন[...] ভূমিকম্প হয়েছিল কলকাত[...] কথা অবশ্য কলকাতার কোন ই[...] নেই। আলিপুরের আবহাওয়া [...] পুরনো নথিপত্র ঘেটে এই ভূ[...] কথা জানা গেছে। প্রায় আড়াই [...] আগে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ১১ [...] কলকাতা ও তার চারপাশে এম[...] ভূমিকম্প হয়েছিল যে কয়ে[...] লোক তাদের প্রাণ হারিয়ে[...] চার্ণক-এর পত্তন করা শহ[...] মহানগরের আদল ফুটে [...] কলকাতা তখন কয়েকটি গ্রামে[...] ছাড়া আর কিছু নয়। কা[...] হাজার লোকের প্রাণহানি [...] ব্যাপকতা ও প্রচন্ডতারই আভ[...]

এছাড়া মাঝারি মাত্রার [...] বহুবার কলকাতাকে বিপর্যস্ত[...] ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে[...]
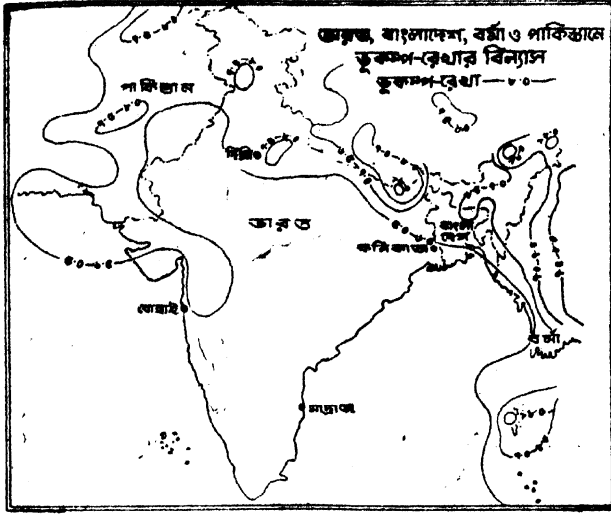
কলকাতার কয়েকটি বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছিল। ১৯৬৪ সালের মৃৎকম্পন কলকাতার মানুষদের হৃৎকম্পন বাড়িয়ে দিয়েছিল—অনেকে সেটাকে প্রবল ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বলে আশংকা করেছিলেন। এই সব ভূমিকম্পের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞরা যে মানচিত্র প্রস্তুত করেছেন তা দেখে বোঝা যায় যে কলকাতায় মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা সর্বদাই রয়েছে।

কলকাতার এই সব ইতিহাস অনুসরণ করে ডক্টর টিয়েডম্যান কলকাতার মানুষদের সর্বদাই সতর্ক থাকতে বলেছেন। কলকাতার 'চরণ মূলে মরণ নাচে' এ কথা মনে রেখে কলকাতাকে ভূমিকম্পের দিক থেকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হতে বলেছেন।

নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মধ্যে অবশ্য প্রতিরোধ সম্পর্কিত কোন পরিকল্পনার স্থান নেই, কারণ ভূমিকম্প প্রতিরোধ করা অসম্ভব ব্যাপার।

প্রতিরোধ না করা গেলেও ভূমিকম্পের দরুণ ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করা যেতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরী হল গৃহনির্মাণে সতর্কতা। উজবেক, তাজিক, তুর্কমেন ও জাপানের মত ভূকম্পন-প্রতিরোধী ঘরবাড়ি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বহুতল ইমারত তৈরির আগে মাটির তলার গঠন ও বিন্যাস পরীক্ষাকে আবশ্যিক করা দরকার।

তাছাড়া নজর রাখতে হবে মাটির দিকে। ভূমিকম্পের আগে মাটির বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে—যন্ত্রপাতির সাহায্যে তার আভাস পাওয়া যেতে পারে। মাটির গভীরে যে জল আছে, তাতে অল্পস্বল্প তেজস্ক্রিয় র‍্যাডন থাকে। ভূমিকম্পের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে র‍্যাডন-এর ঘনত্ব বদলায়। র‍্যাডন-এর মাত্রা পরিমাপ করে উজবেকীয় বিজ্ঞানীরা কয়েকটি ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিয়েছেন। কলকাতার বিজ্ঞানীরাও এ চেষ্টা করতে পারেন।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী তৎপরতা দেখিয়েছেন জাপান ও চীনদেশের বিজ্ঞানীরা। অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জীবজন্তুদের ব্যবহারের তারতম্য পর্যবেক্ষণ করে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে পেরেছেন। ভূমিকম্পের ঠিক আগে মাটির মধ্যে স্পন্দনের পরিবর্তন জীবজন্তুরা বুঝতে পারে। ভূমিকম্পের ব্যাপারে সবচেয়ে স্পর্শকাতর হল ইঁদুর, সাপ, সজারু ইত্যাদি প্রাণী, মাটির কাছাকাছি যাদের বাস। মাটির মধ্যে স্পন্দনের সামান্যতম বৃদ্ধি টের পায় তারা এবং তাদের ব্যবহারে চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। কলকাতায় ইঁদুরের অভাব নেই, তাদের দিকে ভালোভাবে নজর দিলে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া সহজ হবে।

কলকাতায় প্রবল ভূমিকম্পের সম্ভাবনা আছে জেনে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই কারণ 'মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারি নিয়ে ঘর করি'। প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কলকাতাবাসীদের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবে বলে ভূবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন।

রাজার সঙ্গে দেখা

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অমিয়নাথ সান্যাল

অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন মোহিত, রায়কে সঙ্গে নিয়ে অমিয়নাথ সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে যেতে। বয়েস হয়ে গিয়ে এখন অমিয়নাথ আর দর্শনার্থী তত পছন্দ করেন না। মোহিতবাবু এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোক, যা হোক একটা উপায়ে তিনি আমাকে গানের রাজার দরবারে পৌঁছে দিতে পারবেন। কাজেই ঘূর্ণি থেকে ফেরবার পথে সৌমেনকে বললাম, ভাই, আমার আর একটু উপকার করবেন?

উপকার করতে সৌমেন সর্বদাই হাসিমুখে প্রস্তুত। বললেন, কি?

—আমাকে একটু মোহিতবাবুর কাছে নিয়ে যাবেন? মোহিত রায়, যিনি নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি সম্বন্ধে বই লিখেছেন—

মোহিত রায় কৃষ্ণনগরের খুব পরিচিত নাম, সবাই চেনে। সৌমেন বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ—বুঝেছি—চলুন তো দেখি লাইব্রেরীতে আছেন কিনা।

জেলা গ্রন্থাগারের পাঠগৃহে মোহিত রায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা বসে পড়াশুনো করেন। কিন্তু কাজের মুহূর্তে ঠিক মানুষটিকে ঠিক জায়গায় পাওয়া যায় না— এ আমার বহু দুঃখের মূল্যে কেনা অভিজ্ঞতা। লাইব্রেরীতে মোহিতবাবু নেই, সৌমেন আরো কয়েকটা জায়গায় খোঁজ করলেন, কোথাও তাঁকে পাওয়া গেলো না।

আমার মুখ বোধহয় নিতান্ত হতাশ দেখাচ্ছিল। সৌমেন জিজ্ঞাসা করলেন, কি দরকার ওঁর সঙ্গে? আমাকে দিয়ে হয় না?

—তা হতে পারে। আমি কাল সকালে একটু অমিয়নাথ সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনি নিয়ে যাবেন?

মুহূর্তে সৌমেনের হাসি মিলিয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললেন, মানে—হয়েছে কি, ওঁর মেজাজটা আজকাল ঠিক—ভিজিটার গেলে অনেক সময়—কাল সকালে আর একবার মোহিতবাবুকে ভালো করে খুঁজে দেখলে হয় না?

বুঝলাম? সৌমেনের দোষ নেই। স্বেচ্ছায় কে আর বাঘের গুহায় ঢুকতে চায়?

বললাম, ঠিক আছে। দেখছি কি করা যায়।

আরো দু' একজনকে সেই রাত্তেই বলে দেখলাম। প্রতিক্রিয়া সর্বত্রই এক। একজন বললেন, আমি যেতে পারছি না অবশ্য, তবে যার সঙ্গেই যান, হয়তো পৌঁছে যাবেন না—

—সে কি! কেন?

—হয়তো থাকলে তাড়াতাড়ি ছাড়তে পারবেন না।

—এমন ?

—প্রায় এমন।

মনের মধ্যে ধাধা টের পাচ্ছিলাম। নাথ সম্বন্ধে খুব শৈশব থেকে একটা তৈরি হয়ে আছে। আট-ন' নম্বর বাড়িতে মা-মামা-মাসীরা কাড়াকাড়ি স্মৃতির অতলে' পড়তেন। আমিও ন চুরি করে ঝাঁ ঝাঁ গরমের দুপুরে না নিয়ে চিলেকোঠার ঘরে বসে র চেষ্টা করেছিলাম। বুঝি নি বেশি, সেই মায়াময় শৈশবের দুপুর, নির্জন কোঠা, গরম বাতাসের হলকার সঙ্গে নের গাছ থেকে শুকনো নিমপাতা উড়ে নিচের রাস্তায় হেঁকে যাওয়া উদাস শিল-কাটাও'-এর ডাক—সমস্ত কিছুর মাখামাখি হয়ে মিশে আছেন অমিয়-সান্যাল। বাড়িতে মামারা বলতেন, বড় প্রতিভা। ওস্তাদি গানের এমন দার আর হবে না। নিজেও ভালো [illegible]।

বড় হয়ে বাকিটা শুনেছি ও কিছু বুঝেছি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একেবারে প্রবেশ করেছিলেন অমিয়নাথ। রাগের স্বরূপ ও উৎপত্তি নিয়ে তাঁর লক গবেষণামূলক কাজ আছে। ধ্বনি-মূলে পৌঁছে গিয়েছিলো তাঁর হৃদয়।

সেই অমিয়নাথ এখন দর্শনার্থীর সাহিত্যর দ্বারে নিষেধ করে দিয়েছেন ভাবলে লাগে বইকি।...

পরদিন সকালে প্রসূন মুখো-বাড়ি গিয়ে হানা দিলাম। প্রসূন তেরো বছরে, বিদ্যায় ও কীর্তিতে বড়ো, কিন্তু তবুও তিনি আমার বীর ভাষায় বলতে গেলে তিনি অভিনয় করেন, পড়াশুনো করবেন। নাট্য বিষয়ে তিনি এক গ্রন্থ লিখেছেন। লেখেন, আনন্দে থাকেন—এবং এইসব করার পর সময়টুকুতে শান্তিপুর কলেজে পড়ান। তাঁর বাড়ি গিয়ে 'মুখুজ্জে-বলে হাঁক দিতেই অমনি দরজা গেল, দরজায় বাঁধানো মুখুজ্জের মুখ। বললাম, মশায়, একদম সময় পাচ্ছি না। চটপট একটা আমা নিয়ে আমার সঙ্গে এখুনি অমিয় দের বাড়ি যাবেন কিনা বলুন ?

প্রসূন হাসলেন। বললেন, আপনি টা অত্যন্ত প্রচলিত।

আমার চোয়াল ঝুলে পড়লো। মি, সে আবার কি ?

—বুঝলেন না ? কথা ভাষায় ওটার বাদ করুন।

—প্রচলিত মানে চালু।

—তাহলে তো বুঝেই ফেলেছেন।

মুখ বাংলায় প্যাঁচ করে বললাম, কে চালু লোক বললেন ?

—সকালে মৌজ করে চা আর খবরের কাগজ উপভোগ করছি, এমন সময় কেউ এসে যদি বলে—চলো হে, আত্মহত্যা করবে চলো—তাহলে তাকে ও ছাড়া আর কি বলা যায় ? আপনি অবশ্যই অত্যন্ত প্রচলিত। তবে এটাকে গালমন্দ হিসেবে ধরবেন না, সাধু ভাষায় বললে গালমন্দ হয় না।

বন্ধুরা বন্ধুর জন্য অকাতরে প্রাণ দেয়। প্রসূন যেতে রাজি হয়ে আমার সঙ্গে বেরুলেন। একটা ইনটারভিউর সম্ভাবনা কতখানি সে কথা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, বেশি নয়। আশা করে যাবেন না। আমি একবার গিয়েছিলাম। কয়েকটা কথা বলার পর উনি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রায় তাড়া করে আসেন। পালিয়ে বাঁচি সেবার। তবে মেজাজ ভালো থাকলে ঘটনা অন্য রকমও হতে পারে।

অমিয়নাথ বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ। এখনো চিকিৎসা করেন। কঠিন কঠিন অসুখের রোগীরা এখনো এসে হাজির হন সুচিকিৎসার আশায়। আমি আর প্রসূন ঠিক করলাম যদি তেমন বুঝি তাহলে পুরনো আমাশার রোগী সেজে কথাবার্তা শুরু করবো। যথার্থ সাক্ষাৎকার না হোক, একবার দেখা পাওয়াও তো সৌভাগ্যের কথা।

কিন্তু অবাক কান্ড, সবাই এতো ভয় দেখিয়েছিলো—তার কিছুই ঘটলো না। প্রসূন হাই স্ট্রীটে একটি পুরণো আমলের বিশাল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এই বাড়ি।

বৈঠকখানা ঘরে অমিয়নাথের ডিসপেনসারী। চারদিকে পুরণো কাঠের আলমারীতে অসংখ্য ওষুধের শিশি। মাঝখানে একখানি টেবিল, তার ওপরে অগোছালো বহু বই পড়ে আছে। সেই টেবিলের ওপারে বসে আছেন গানের গুরু অমিয়নাথ। পরণে গেরুয়া পাঞ্জাবী, আবক্ষ সাদা ধপ্‌ধপে দাড়ি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বয়েসের তুলনায় দৃষ্টি আশ্চর্য রকম স্বচ্ছ। সারা জীবনের সাধনা, সাত্ত্বিক জীবনযাপন ও সুরের সংসর্গ চেহারায় ঋষির মহিমা এনে দিয়েছে। আমার ইমেজ ভেঙে খান্‌-খান্‌ হয়ে গেলো। ধারণা ছিলো ঝাড়বাতির নিচে পারস্যের কার্পেটের ওপরে পাশে আতরদান নিয়ে বসে থাকবেন অমিয়নাথ, দু' পাশে সারি দিয়ে বসে থাকবেন গাইয়ে-বাজিয়ের দল, সামনে রুপোর থালায় প্রচুর বেলফুলের মালা। আর তার বদলে এ কি দেখছি ! কঠিন তপশ্চর্যার প্রতিরূপের মতো উপবিষ্ট সঙ্গীতাচার্যর অবয়ব, গেরুয়া বস্ত্র বাসনাবিহীন জীবনের ইঙ্গিত দিচ্ছে, আপন সত্যে নিবাত শিখার মতো জ্বলছেন তিনি।

এখনই এই ! তাহলে আগে না জানি কি ছিলেন !

আমরা ঘরে ঢুকে প্রণাম করতেই উনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে ! খপ্‌ করে প্রণাম করালেন যে ? কে আপনারা ? কি চান ?

বুঝলাম আগের পরিচয় সত্ত্বেও উনি প্রসূনকে চিনতে পারেন নি। বয়েস অনেক কিছু হরণ করে নিচ্ছে।

অন্য কোনো স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয় সম্পূর্ণ আহার নয়

প্রসূন মাথা চুলকে বললেন, বিশেষ
: না, এমনি এলাম আর কি।

—এমনি এলেন? আচ্ছা বসুন
খানে—

টেবিলের এপারে বেঞ্চি ছিলো, তাতে
রা সন্তর্পণে বসলাম।

অমিয়নাথের সামনে একটা সাধারণ
নম্বর খাতা খোলা ছিলো, সেটা হাতে
য় উনি বললেন, এসেছেন যখন, একটা
খা শোনাই। অনেক দিন ধরে চণ্ডীর
টা ভাষ্য লিখছিলাম, এইমাত্র শেষ
লা। শুনবেন একটু?

আমরা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে বললাম,
শ্চয় শুনবো।

উনি অনর্গল বিশুদ্ধ উচ্চারণে
স্কৃত শ্লোক পড়ে যেতে লাগলেন।
ছুটা পড়েন, তর্জমা ও ভাষ্য করেন,
বার করেন। প্রসূনও কম প্রগলভ নন,
ঝে মাঝে অমিয়নাথকে খুশি করবার জন্য
লতে লাগলেন, এই জায়গাটা বড়ো ভালো
গেছে, আর একবার পড়ে শোনাবেন?

ঈশ্বর যেন এই তঞ্চকতার জন্য
মাদের মার্জনা করেন। অমিয়নাথ শিশুর
তো হয়ে গিয়েছেন, শিশুর মতোই যেভাবে
াক খুশি করে তাঁর কাছে কিছুক্ষণ
কবার অধিকার পেতে চাইছিলাম আমরা।

পড়া শেষ করে হঠাৎ আমার দিকে
াকিয়ে অমিয়নাথ বললেন, গান শুনবে?
াইবো?

কি আশ্চর্য! আমরা কোথায় জুতো
াতে নিয়ে আসবো ভাবছিলাম, আর উনি
ামাদের যেচে গান শোনাতে চাইছেন!

বললাম, শুনবো বই কি। আপনার
লোয় গান শুনতে পাওয়া তো মহা
ৌভাগ্য। ওরিয়েন্ট লংম্যান আপনার
কখানি ইংরেজি বই প্রকাশ করেছিলো—
পনার লেখা সম্বন্ধেও আমরা খুব
সাহী।

অমিয়নাথ আমার দিকে তাকিয়ে
ালেন, ওরিয়েন্ট লংম্যান! তুমি
দেখেছো সে বই?

আজ্ঞে না। অনেক জোগাড় করতে
ষ্টা করেছি। আজকাল আর বাজারে
ওয়া যাচ্ছে না।

উনি কিছু না বলে টেবিলের গাদা
াকে ঘেঁটে একটি বই আমার হাতে দিয়ে
ললেন, এই নাও, দেখ।

নাড়ানাড়ি করতে গিয়ে একখানি কি
ই গাদা থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো,
সূন তুলে দিলেন। আড়চোখে দেখলাম
ইটি উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপী গাইন বাঘা
ইন'। মজা পেলাম।

লংম্যানের বইটির মলাটে বীণা
াদিনরতা রাগদেবীর স্কেচ, নিচে নাম
লেখা— Ragas and Raginis
ট করে খুলে জ্যাকেটের ভেতর দিকে ছাপা

অমিয়নাথের যুবা বয়েসের ছবি এবং
জীবনীতে একটু চোখ বুলিয়ে নিলাম,
এ-সব জিজ্ঞাসা করলে উনি নাকি রেগে
যান। দেখলাম বইটা প্রথম বেরোয় ১৯৫৯
খ্রীষ্টাব্দে। অমিয়নাথের জন্ম ১৮৯৫ সালে।
যৌবনে বিশ্বনাথ রাও, শ্যামলাল ক্ষেত্রী
বাদল খাঁ—এসব আচার্যদের কাছে
সঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন। ওপরে মধ্য-
বয়স্ক অমিয়নাথের ছবি। হাসছেন। সামনে
তাকিয়ে বর্তমানের মানুষটির সঙ্গে আর
একবার মিলিয়ে নিলাম। কিছুমাত্র মিল
বাকি নেই। কোথায় সেই সুগঠিত মুখাবয়ব,
দৃঢ় ওষ্ঠ, কৃষ্ণবর্ণ চুলের ঢেউ? সময়
সত্যিই অনেক কিছু হরণ করে নেয়।

কিন্তু সময় সব কিছুকে নিঃশেষে
হরণ করে নিতে পারে কি? প্রতিভার
সামনে বোধহয় মহাকালকেও নতজানু হতে
হয়। সেটা আরো গভীরভাবে অনুভব
করলাম যখন অমিয়নাথ গান শুরু করলেন।

বিরাশি বছর বয়েসের বৃদ্ধের এমন
অসাধারণ গলা! চেহারায় আর গলায় যেন
খাপ খাচ্ছে না। চোখ বুজে শুনলে মনে
হয় সামনে বসে কোনো যুবক গাইছেন।
আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছি, উনি তন্ময় হয়ে
গাইছেন—যাকে বৈজয়ন্তীমালা, তাকে মৃগ-
ছালা। তাকে বনশীঅধর, সো যেয়ে
নন্দলালা।

পরিষ্কার গলা, আলাপের শুরুতে
যখন খড়জ লাগালেন, গলা একটুও
কাঁপলো না। দ্রুতে যখন লম্বা লম্বা তান
করছেন, আমরা শুনতে হাঁপিয়ে যাচ্ছি,
অথচ ওঁকে একবারও দম নিতে হচ্ছে না।

গান শেষ করেই বললেন, একখানা
তারানা গাই?

আমাদের আবার অনুমতি। আমরা
তখন সৌভাগ্য রাখবার জায়গা খুঁজে
পাচ্ছি না।

তারানা যা গাইলেন, তাতে বোধহয়
সুনন্দা পট্টনায়ক কিম্বা নিসার হোসেন
খাঁয়েরও হিংসে হবে। ওঁর এই বয়েসেও

থামলে জিজ্ঞাসা করলাম, এ তারানা
কি আপনার গুরু বাদল খাঁয়ের কাছে
শেখা?

অমিয়নাথ আমার দিকে তাকিয়ে রাগ
রাগ গলায় বললেন, আমি কখনো সে কথা
বলেছি?

তারপর একটু থেমে বললেন, হ্যাঁ,
এটা বাদল খাঁয়ের কাছে শেখা।

অর্থাৎ উনি আগে বলবেন, আমাদের
শুনতে হবে। শিশু হয়ে গিয়েছেন আচার্য।
ফিরে যাবার আগে মানুষ বুঝি এমনি
করেই আর একবার শৈশবকে আস্বাদন করে
নেয়।

টেবিলের ওপরের কি একখানা বই
তুলে দেখতে গিয়েছিলেন প্রসূন, উনি
ধমক দিলেন—এই! বইতে হাত দেবেন
না!

প্রশ্নের সময়ে হাত সরিয়ে নিয়ে গুটিয়ে বসলেন।

আমি বললাম, গান করে গেয়ে আপনার ভালো লাগতে শুরু করে?

সঙ্গে সঙ্গে উনি জবাব দিলেন—একেবারে ছোটবেলা থেকে। বাবা আন্দামানে চাকরী করতেন। আন্দামানের ঘটনা মনে পড়ে। বাবা তম্বুরা বাজিয়ে গান করছেন, মায়ের কোলে বসে আমি শুনছি। মায়ের গলা খুব ভালো ছিলো, খুব ভালো গান গাইতে পারতেন। মার কাছ থেকে অনেক গান শিখেছিলাম আমি।

জিজ্ঞাসা করলাম, একটা প্রশ্ন আমার মনে কেবলই ঘুরপাক খায়, জিজ্ঞাসা করবার মতো লোক পাই না। আপনাকে বলবো?

—বলুন।

—মানুষ গান শুনতে ভালোবাসে কেন?

প্রশ্ন শুনে উনি ভয়ানক রেগে গেলেন। বললেন, এটা কি একটা প্রশ্ন হলো নাকি? এর উত্তর হয় না। মানুষ রসগোল্লা খেতে কেন ভালোবাসে? মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিতে কেন ভালোবাসে?

আমি বললাম, তাহলে কারণ না জেনেই মানুষ ভালোবাসে বলতে চান? সঙ্গীতশাস্ত্র অপার ও অগাধ। এক জীবনে তার রহস্য বোঝা যায় না। বোঝা যায় না—তবু ভালো লাগে কেন?

উনি একটা আশ্চর্য উপমা দিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। উনি বললেন, একটি শিশু বিশ্ব-সংসার সম্বন্ধে কি বোঝে? কিছু না। কিন্তু তার জিভে একটু মধু লাগিয়ে দিন, দেখবেন চুকচুক করে চেটে খাচ্ছে। মধু কি জিনিস তা সে জানে না, কিন্তু মধুর রস বোঝে। তেমনি না বুঝেও গানের রস মিষ্টি লাগতে বাধা কোথায়?

তারপরেই অমিয়নাথ একটা কাণ্ড করলেন, মমতায় আমাদের বুক ভরে গেলো। কথা থামিয়ে হঠাৎ উনি বললেন, ওহো, আমি আজই চণ্ডীর একটা ভাষ্য লিখে শেষ করেছি, আপনারা একটু শুনবেন?

হায়! স্মৃতিবিভ্রমের ফলে ওঁর মনে নেই একটু আগেই উনি সেটি আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন। আমরা মনে করিয়ে দিতে উনি বললেন, ও শুনিয়েছি বুঝি? আচ্ছা, তাহলে একখানা গান শুনুন—

'সাকে বিজয়ন্তীমালা' গানটিই উনি আবার ধরলেন। আমরা আর ভুল ধরিয়ে দিলাম না। এ গান হাজার বার শোনা যায়।

গানের শেষে ওঁর পুত্রবধূ এসে ওঁকে খেতে ডাকলেন। উনি উঠে গেলে পুত্রবধূ শ্রীমতী স্বর্ণা দেবী বললেন, বাবা আজ খুব ভালো। কাউকে এমন গান শোনাতে দেখিনি কোনো দিন।

অমিয়নাথের ছবিটি ওঁর পুত্রবধূই আমাকে দিলেন।

মনে মনে গানের রাজাকে প্রণাম করে আমরা ফিরলাম।

অম্বুজ মৌলিক মশাই ফোন করে মোহিত রায়কে খবর দিয়েছিলেন। দুপুরে মোহিতবাবু এসে হাজির। ফর্সা, হাসিমুখ মানুষ। বললেন, সময়ে খবর পেলে আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম।

অম্বুজ মৌলিক বললেন, আর আপনার ওপরেই তো একটা আস্ত লেখা হয়ে যায়। একদিন একে আপনার নিজের মিউজিয়াম দেখিয়ে দিন না।

হ্যাঁ, আস্ত একখানা মিউজিয়াম আছে মোহিত রায়ের। তাতে আছে অসংখ্য হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি, টেরাকোটা ভাস্কর্য প্রচুর খুলেছেন ও ফিল্ড্-ওয়ার্ক করেছেন মোহিতবাবু। বললাম, এর পরের বার এলে আপনার সঙ্গে ঘুরবো। কি কি দেখাবেন?

—মায়াপুরে ইস্কন্ দেখেছেন? ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাস্‌নেস্?

—না। তবে শুনেছি তার কথা।

—তাছাড়া মায়াপুরের হল্লাজানিং নবদ্বীপের সোনার গৌরাঙ্গ—অনেক কিছু আছে। এ অঞ্চলের নবাবিষ্কৃত ধর্মের আচার অনুষ্ঠানও দেখাবো। বহু নবাবিষ্কৃত সম্প্রদায় রয়েছে এখানে, যেমন—সাহেবধনী, বলাহাড়ি, কুলিবিশ্বাসী ইত্যাদি।

বহুক্ষণ গল্প করলেন মোহিত রায়। মাঝে মাঝে অম্বুজবাবুর ছোট মেয়ে মৌমা এসে চা দিয়ে যাচ্ছিল। প্রায় পাঁচটায় তিনি বিদায় নিলেন। আমিও উঠলাম সুটকেশ গুছিয়ে নিতে। ছ'টায় ট্রেন। আজকের মতো বিদায় তো নিই—আবার আসবো কৃষ্ণনগরে। আসতেই হবে অনেক কিছু না দেখা রয়ে গেলো যে!

ইলেকট্রা

ঋশরী রায়

অরুণদিগন্তে তোমার মুখচ্ছবি দেখি,
অগ্নি অবিস্মরণীয়া, ভীষণা মোহিনী
হাতে খড়্গ, মাতৃরক্তে সিক্ত, মুখে হাসি।
নাকি অশ্রু চোখে?
হে কন্যা অপরিণীতা, তোমারই ছায়ায়
নভের পবিত্র নীল আচ্ছন্ন শোণিতে?
না ওই রক্তিম আভা শুধু পূর্বরাগ
উষসীর? এখনই স্নিগ্ধ প্রসন্ন আলোকে
আবির্ভূত হবে সূর্য, অমৃতলোকের
প্রভায় দীপ্ত হয়ে? আলোয় শিশিরে
প্রভাতবায়ুর স্পর্শে অমর প্রাণের
নির্মল আশ্বাস নিয়ে? রৌদ্রে কেন তবু
জ্বলে রোষ, জিঘাংসা, সতীর বিদ্বেষ।
তোমার কৃপাণ বুঝি উদ্ভাসিত উদয়শিখরে
বক্ররেখা রশ্মিমায়ে প্রদীপ্ত ঝলক?

হায় নারী কোন দেবতার আজ্ঞা
শিখায় জননী হত্যা? তুমি কি মানবী
না এক প্রেতিনী যার অতৃপ্ত ক্ষুধিত আত্মা
প্রলয় ঝটিকামাঝে খুঁজে খুঁজে ফেরে
আপন কামনাবেগ? ঝঞ্ঝামেঘে লীন
তোমার পিঙ্গল কেশ, বিদ্যুতের জ্বালা
তোমার নিষ্ঠুর চক্ষে, করালহাসিনী
ঝড়ের হাওয়ায় বাজে ওই কণ্ঠস্বর!

হে বিদেশী রাজকন্যা নরকাগ্নিশিখা
জন্মালো মর্তমাঝে, তবু কেন যুগে যুগে
কালাকাহিনীতে চলে তোমারই আরতি
সে চায় পাপের শোধ পাপেই মিটাতে
কি দেখেছে, কি পেয়েছে তার কাছে কবি?
অভিশপ্ত রাজপুরে নেমে আসে করাল তিমির
তোমারই হিংসার বীজ অংকুরিত সবার শোণিতে
পিতৃহত্যা মাতৃহত্যা একটি লক্ষ্য দেয় আনাদিকে।
হে সঙ্গীবিহীনা বলো
কোন মাদকতা আছে হননের মাঝে?
কেন ভয়ংকরী তুমি যোগালে প্রেরণা
শিল্পীরে? বিনাশে সে কি দেখেছে কখনো
কোনো রূপ, মুগ্ধকর? অথবা বুঝেছে
বড় একাকিনী তুমি, আত্মঘাতী ক্রোড়ে
জ্বলেছে কেমন করে? অয়ি মোহময়ী
তোমার বিকাশ ঘটে মানব সন্তান
আজো তাই হে কুমারী ধমনীর মাঝে
অনুভব করি সেই উষ্ণ রক্তস্রোত
যা ছিল তোমার দেহে হে সর্বনাশিনী!

,৫০০

॥ বৈকুণ্ঠ পাঠক,

আমাদের নাটক 'বারবধূ'র ১৫০১ [রজ]নী সম্পর্কে আপনার লেখা 'সাহিত্য—[২৫]০০' পড়লাম। এর জন্য ব্যক্তিগত-[ভা]বে আমি ও আমাদের সংস্থা আপনাকে [ধন্য]বাদ জানাচ্ছি।

আপনার লেখা অত্যন্ত সময়োচিত [হ]য়েছে। সাংবাদিকদের মধ্যে বেড়া ভেঙে [আ]পনি প্রথম এগিয়ে এলেন।

চতুর্মুখ নিজেকে যেভাবে টিঁকিয়ে [রে]খেছে সেইভাবে নিজেদের দাঁড় করাতে [না] পেরে বহু গ্রুপ থিয়েটার আমাদের [আ]ড়ালে নিন্দা করেন বা প্রকাশ্যে সামা-[জি]ক স্তরে আমাকে একঘরে করে রাখার [চে]ষ্টা করছেন। কিন্তু এতে আমাদের [কি]ছু যায় আসে না। কারণ আমাদের [সা]ধনা নাটকে। আর যারা টিঁকে থাকে [ই]তিহাস তাদেরই মনে রাখে।

শহরে, গ্রামে, গঞ্জে হাজার হাজার লোকের সামনে গত ছ-বছর ধরে 'বারবধূ' করে যাচ্ছি। এক একটি অভিনয়ে ১০।১২ হাজার লোক পেয়েছি। অভিনয় শেষে পেয়েছি তারিফ আর কলকাতায় ফেরার কিছু দিনের মধ্যেই তার কয়েক মাইল দূরে থেকেই আবার ডাক এসেছে। 'বারবধূ' দুর্গাপুরে হয়েছে সাতবার, মেদিনীপুরে তিনবার, বর্ধমানে তিনবার। এছাড়া একাধিক জায়গায় দু-বার অভিনয় হয়েছে। মোট ২৫ লক্ষের ওপর দর্শক পেয়েছি এবং সেই সার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি—'চিরকাল সকলকে বোকা বানিয়ে রাখা যায় না।' আমরা কাউকে বোকা বানাইনি। দর্শক আমাদের যাচাই করে নিয়েছেন। নয়ত 'বারবধূ'র অনুকরণ করে নামী দামী শিল্পী নিয়ে অনেক নাটক হয়েছে কিন্তু চলেনি।

পাঠক মহাশয়, ১৫ অগাস্ট ৭২-এ 'বারবধূ' নাটক আরম্ভ করে সেপ্টেম্বরের শেষে যখন সতেরো হাজার টাকার দেনায় আটকা পড়লাম তখন নাটকটি বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। কাবুলীওয়ালার কাছ থেকে চড়া সুদে শেষে চার হাজার টাকা পেয়ে সারা রাত আমার বাড়ীর বারান্দায় না ঘুমিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। অন্য কোন উপায় ছিল না। নাটকেই থাকতে হবে। নাটক করার জন্য দেড় মাস আগে চাকরী গেছে। আর চতুর্মুখ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

পাঠকমশাই। আপনি কি জানেন ..৬ এপ্রিল '৭৪ ডেবরায় আমন্ত্রিত অভিনয় করতে করতে আমার কার্ডিয়াক এ্যাটাক হয়েছিল এবং আমাকে এক মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। আর বেরিয়ে এসে ডাকতারের নিষেধ সত্ত্বেও দলের স্বার্থে আবার অভিনয় শুরু করতে হয়েছে। ৭১ সন থেকে ডায়াবিটিসে ভুগছি, ৭৪-এ কার্ডিয়াক পেসেণ্ট, ৭৫ থেকে গ্যাসটাইটিস। তবু আমি চলছি আমার বাবরি চুল আর ঈগল নাসা নিয়ে।

পাঠকমশাই। একটা নাটকে যদি চোদ্দবার নায়িকা বদল করতে হত তবে অন্য থিয়েটার কি করত? ছ' বছরে চোদ্দবার নায়িকা বদল করে আমায় নাটক করতে হয়েছে, ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে। আর এতে আমাকে যে পরিশ্রম করতে হয়েছে তার বিনিময়ে আমি বোধহয় আটটি নতুন নাটক করতে পারতাম। গ্রুপ থিয়েটারের ঘনিষ্ঠ কর্মীদের জিজ্ঞেস করবেন—সমস্যার চেহারাটা কিরকম। অবশ্য তাঁরা সঠিক চেহারা তখনই জানবেন যখন বছরে একটি নাটক তিনশ'বার অভিনয় করতে হবে। আর বলবেন 'বার-বধূ'কে গালাগালি দিতে হলে সকলের সামনে একটা আলোচনা চক্রের মাধ্যমে দিতে. আর সেই আলোচনাচক্রে আমি যেন যোগ দেওয়ার সুযোগ পাই। তবু আমি অন্য নাটকও করেছি। যেমন 'বিসর্জন', 'ষোড়শী' জনৈকের মৃত্যু। রিহার্সাল দিচ্ছি 'আলিবাবা' ও 'সম্রাটে'র।

আমার জন্যে আপনি দুঃখ করবেন না। সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' সমালোচকরা প্রথমে বুঝতে না পেরে বাজে রিভিয়্যু করে ফেলেন। প্রাইজ পাওয়ার সংশোধন করেন। আর 'অপরাজিত' প্রাইজ পেতে পারে এই ভয়ে প্রথম থেকে প্রচণ্ড ভালো বলেন।

আমি আমাদের কালের প্রথম ব্যক্তি যে নাটকের জন্য সবকিছু ছেড়ে শুধুমাত্র নাটক ভাল লাগে বলেই নাটক করে যাচ্ছি। কে কি বলছেন বা বলছেন না বা কি পাচ্ছি তা আদৌ ভাবি না। কারণ আমি জানি আমার নাটক করার মধ্যে মুহূর্তের ফাঁকি নেই।

পাঠকমশাই, পরিশেষে চুপিচুপি আপনাকে বলি। আরো দুটো নাটক আছে, প্রয়োজনে তারা আমাকে যে কোনো মাঠে শতেক সেঞ্চুরী করাবে এবং তার মধ্যে 'বারবধূ'র ২৫০০ রজনী পার হয়ে যাবে। নমস্কার জানবেন। ইতি—

অসীম চক্রবর্তী

অভিনব পালাবদল — ১

গৈরিক মলাটের আড়ালে রাজকীয় ঐশ্বর্যের সম্ভার নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হয়েছে 'অমৃত'। সাধারণ সাপ্তাহিক পত্রিকার ফর্মুলায় চলতে চলতে হঠাৎ এ এক চমক-দেওয়া অভিনব পালাবদল।

আমার মত গ্রাম-বাংলার অসংখ্য সাহিত্যানুরাগী 'অমৃত'র এই স্বাদ গ্রহণ করে অভিভূত। নিঃসন্দেহে 'অমৃত' বর্ত-মানের সেরা প্রগতিশীল সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রগতিশীল এই কারণে যে এখানে উগ্র আধুনিকতার দাপাদাপি নেই অথচ বিষয় নির্বাচনে সুস্পষ্ট মননশীলতার ছাপ রয়েছে। তাই 'অমৃত' পরিচালক গোষ্ঠীকে আমার অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবু কয়েকটি বিষয় সংযোজনের ব্যাপারে আমার মতামত জানাতে চাই। প্রথমতঃ দর্শন ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওপর রচনা পত্রিকায় স্থান পেলে এটা প্রবীণ ও বিজ্ঞ পাঠকদের বেশী করে আকৃষ্ট করবে। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী সাহিত্য কোন্ পথে এগোচ্ছে তার সঙ্গে আমরা এদেশের পাঠক যাতে নামমাত্রও পরিচিত হতে পারি সেজন্য পত্রিকায় কিছুটা স্থান সংরক্ষিত

রাখা হোক। দক্ষিণারঞ্জন রায়: গঙ্গাধরপুর; হাওড়া।

২

আমরা খেটেখুটে সংসার খরচের টাকা বাঁচিয়ে সাহিত্য পত্রিকা চালাব আর লোকে জানবে—লিটল্ ম্যাগাজিন! কক্ষনো না, তাই আমাদের পত্রিকা শীর্ষবিন্দুর 'ব্যান্ড-রীকশে' ঘোষণা করেছিলুম এরকম সমস্ত পত্রিকাই 'গেটে' ম্যাগাজিন। গেটেনেস্ তাদের চরিত্রে, সাহিত্যকে আন্তরিক ভালো-বেসে স্বার্থত্যাগের মধ্যে।

এ কথারই ১৪ পয়েন্ট বোল্ড প্রতি-ধ্বনি লক্ষ্য করলাম আপনাদের বড় পত্রিকায় —যা ছড়িয়ে গেল সবখানে....। সত্যি, মন ভিজে ওঠে এই স্বীকারে, সমমর্মিতায়। বস্তুতঃ কিছুদিন ধরেই দেখছি 'অমৃত' কিরকম বদলে যাচ্ছে—দৃষ্টিভঙ্গি, আঙ্গিক, রচনা ও রচনার বিষয় নির্বাচনে ক্রমশঃই পত্রিকাটি একটি অনবদ্য সাহিত্য পত্রিকার রূপ নিচ্ছে।

অমৃত আর আমাদের দূরের নয়, নিজেদেরই কাগজ। অর্থসামর্থ্যে সীমিত আমরা, হৃদয়সামর্থ্যে তো নই, এরকম প্রতিটি ভালো কাজের জন্যে রইল অকুন্ঠ সমর্থন, ভালোবাসা। সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বসুরায়, সুহাস মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর, হুগলী।

৩

বেশ কয়েক সংখ্যা থেকে 'অমৃত'-এর লেখা ও রেখার বৈচিত্র্য ও উপস্থাপনার কৌশলে মুগ্ধ হচ্ছি বলে—পাঠক হিসাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রতিষ্ঠিত কবিদের এক একজনকে নিয়ে গুচ্ছ কবিতার প্রকাশ ও সেই কবির বৈশিষ্ট্যের পরিচিতি এবং বিখ্যাত লেখকদের উপন্যাস নিয়ে আলো-চনার সঙ্গে তাঁদের ছবি ছাপা নিঃসন্দেহে পত্রিকার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। সত্তর দশকের তরুণ কবিদের কবিতা প্রকাশের পৃষ্ঠাব্যাপী দাক্ষিণ্য আর লিটল ম্যাগাজিনের ভাললাগা অংশ লেখকের নাম সহ প্রকাশ বা বৈকুন্ঠ পাঠকের সাহিত্য সম্বন্ধীয় কথার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিচার বেশ ভাল লাগছে। ভাল লাগছে, উল্লেখযোগ্য লেখার নামকরণে প্রচ্ছদ অংকন ও সেখানে দু-একটা বিশেষ রচনার প্রসঙ্গ,—যাতে সূচী না দেখে এক নজরে সেই সংখ্যাটার ওপর একটা ধারণা এনে দেয়। ১১ই মার্চের সংখ্যায় (পৃষ্ঠা—৬৩) 'নায়ক : মেয়েদের চোখে' আলোচনার মধ্যে অন্যান্য ছবির সঙ্গে বাড়তিভাবে কয়েকটি ছবি ছাপা হয়েছে। এক শ্রীমতী ঘোষ উল্লেখে তিন তিনটি ঘোষের ছবি, উপরন্তু চিঠির পুনশ্চের মতো খাপছাড়াভাবে আড়াই লাইন লিখে আরও একটা গৃহবধূর ছবি লাগানো হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ছবি নিশ্চয় ভাল, কিন্তু ছবির অনিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশ খারাপ লাগে বলে মনে করি। বিজলী সিংহ: নারিকেলডাঙ্গা, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

১৫ মার্চ নয় ১২ মার্চ

গত ১১ মার্চ তারিখের অমৃত পত্রিকায় দর্শক এর খেলাধুলা শীর্ষক রচনাতে কিছু ভুল ছিল। তিনি লিখেছেন এই মেলবোর্ণ মাঠেই ১৮৭৭ সালের ১৫ মার্চ ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন হয়।

শ্রীদর্শকের অবগতির জন্য জানাই তারিখটি ১৫ মার্চ নয় ১২ মার্চ।

দেবাশিস ঘোষ শিলিগুড়ি,
দার্জিলিং

তিন কবি

২৯ এপ্রিল অমৃতপত্রিকার তিন কবি প্রচ্ছদ কাহিনীতে যতোদূর মনে পড়ছে, কথাপ্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম— কবিতা হচ্ছে আন্তরিক সত্যভাষণ যা অসহায়ভাবে করুণ।

কবিতা ম্যাজিক মাত্র। এরা রসায়ন। এবং দক্ষতা।—কথাচ্ছলে, এই কথার মধ্যে র‍্যাবো ঢুকে পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, বহু বছর আগে এই কথাটি লিখেছিলেন শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীউৎপলকুমার বসু।

পরিশেষে জানাই, মানুষের দেশে এই নামে আমার কোনো পান্ডুলিপি নেই। ইদানীং—এসো সুসংবাদ এসো—এই নামে একটি কবিতার বইয়ের পান্ডুলিপি তৈরি করবো, এই ভাবতে-ভাবতে সময় কাটাচ্ছি —ভাস্কর চক্রবর্তী।

বই নিয়ে

আপনার সম্পাদকীয় 'বই নিয়ে কিছু ক্ষণ' খুড়ো ভালো লাগলো। আমরা প্রবাসী বাঙালী বাংলা বই সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য করতে চাই।

(১) অনেক বাংলা বই এর হিন্দী অনুবাদ বেরোয় আর তার প্রকাশক হচ্ছে দিল্লী ও অন্যান্য হিন্দীভাষী শহরের যে প্রকাশকেরা বাংলা সংস্করণ ছাপেন তাঁরাই তো হিন্দী সংস্করণ প্রকাশ করতে পারেন।

(২) অনেক সুন্দর হিন্দী উপন্যাস ভ্রমণ কাহিনী ও অন্য বই আছে যার কোন বাংলা অনুবাদ হয়নি। যশপাল, অমৃতলাল নাগর ও আরো অনেকে চমৎকার উপন্যাস লিখেছেন—প্রকাশকেরা চিন্তা করে দেখুন।

(৩) বাংলা বই অর্ডার দিতে হলে একটা অসুবিধায় পড়ি। প্রকাশক খুঁজে বের করতে হয়। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত সব বই যদি এক জায়গায় পাওয়া যায় তাহলে অনেক ডাকখরচ বেঁচে যায় ও অনেক বেশ বই-এর অর্ডার দিতে পারি।

(৪)দিল্লীর হিন্দী প্রকাশক অনেকে পেপার ব্যাক সংস্করণ বের করে যাতে অনেক বেশী বই বিক্রী হয়। সুন্দর নিয়ম করে-ছেন। ১০ টাকা থেকে ১২ টাকার গ্রাহককে হয় নতুন প্রকাশন কিম্বা ঐ দামের পুরোন প্রকাশন কিনতেই হয়। এই বাধ্যবাধকতায় পাঠকেরও সুবিধা। তিনি প্রতি মাসে নতুন বই পাচ্ছেন আর প্রকা-শনেরও নাম হচ্ছে।

(৫) এক হিন্দী মাসিক পত্রিকার প্রকাশক বলেছেন যে কোন গ্রাহক ১০০ টাকা জমা দিলেই বিনামূল্যে পত্রিকা পাঠাবেন। পরে ঐ টাকা ফেরৎ নিলেই পত্রিকা পাঠানো বন্ধ হবে। টাকার যদি সুদ শতকরা দশ কি বারো টাকা হয় তো এই-ভাবে টাকার সুরাহা হতে পারে।

বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

একটি প্রস্তাব

অমৃত সম্পাদক চিন্তা করে দেখতে পারেন সাপ্তাহিক অমৃত ছাড়াও মাসিক অমৃত পত্রিকা বের করার একটা সযত্ন প্রয়াস নিতে পারেন কিনা। এতে থাকবে প্রবন্ধ নির্বাচিত পুরাতন লেখার পুন-র্মুদ্রণ দুষ্প্রাপ্য ছবি এবং দেশ-বিদেশের লেখার কলা-কৌশলগুলি (ক্রিয়েটিভ প্রসেস)। আমরা অনেকদিন এমন কোনো পত্রিকা খুঁজে পাচ্ছি না যা আমরা মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই করে বুক কেসে সাজাই। পুষ্প মিত্র, হাওড়া

বিচিত্রা

লিখব কোনদিন ভাবিনি
ভট্টাচার্য

দ্রসদন রিহার্সেলের জন্য একটা
রছিলেন, আবার বের করে
এখন পথে। এই আমার শেষ
।

াশটা ছেলে হাঁসখালির হাঁস
নয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে
র কি ভয়, আমি তো মাছ-মাংস
...

ণর আন্দোলন, নাটকের আন্দো-
ামি এই আন্দোলন করে
আমার কারো বিরুদ্ধে নালিশ
নীতিবাজদের বিরুদ্ধে নালিশ....

তামরা ঢোল-কাঁসির কাজ করছো,
মুখের ভাষা পড়তে হবে........
াঁসখালির হাঁস, বাদা অঞ্চলের
ারা এই শহর বানায় তারাই
র মতন মরছে....আমার মানুষ কি
তাদের অভিব্যক্তি কতো বড়ো
পারে দেখাতে চাই। কিন্তু কি
? আমার বন্ধু নেই, অর্থ নেই....
াত বছর পাঁচ হাজার টাকা গ্রান্ট
ল সরকার। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
কে অনেক অনেক বেশী পেয়েছে।
াড়া নিয়ে একটা শো দিতেই ওর
খরচ হয়ে যায়। হাঁসখালির
সব চরিত্র-টরিত্র মরে যাবে
কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে।'

উপরের বিশ্বাস, খেদোক্তি, আশা
ভ্রনা বিজন ভট্টাচার্যের, সেই
ভট্টাচার্য, বাংলা নাটকের নবনাট্য
লনের প্রথম পুরোহিত যিনি,
ন ধরে নাটক রচনা, প্রযোজনা
র এবং ব্যক্তিত্ব সব মিলিয়ে
নাট্যজগতের শ্রদ্ধেয় পুরুষ,
ম আলোচিত ব্যক্তিত্ব।

বয়সের ভারে তিনি ক্লান্ত নন,
ালি গায়ে বসে যখন কথা বল-
তখন তাকে একজন কর্মিষ্ঠ
শী যুবক বলেই মনে হচ্ছিল।
মাঝে ডুবে যাচ্ছিলেন স্বপ্ন আর
সের মধ্যে। ফরিদপুরে জন্ম।
দেশ। পদ্মার দাপটে। এক অঞ্চল
আজ, কাল অন্য যায়গা। মানুষজন
গরু এপার ভাঙলে ওপারে
য় দেওয়া হয়। 'সিকস্তিপয়স্তি
দখল নিয়ে জমিদারের দাঙ্গা,
া দেখেছি। ভূস্বামী ছিলাম,
বছর বয়সে কলকাতায় চলে
। ঘুরে বেড়াতাম বাবার সঙ্গে
াট, সাতক্ষিরা। বাবা শিক্ষক
, তাঁর সঙ্গে। তিনি আবার
মৈত্রের ছাত্র, সেকসপীয়রের ভক্ত
। মা ইংরেজী জানতেন না, তবে

শেকসপীয়র পড়তেন অনুবাদে। বাড়িতে জোড়াখাট, বিরাট মশারি, ছেলেরা থাকতুম ওখানে। দুপুরে রিহার্সাল হত। বাবা ডিরেকসান দিতেন। মনে পড়ছে—মা করেছিলেন মার্চেন্ট অফ্ ভেনিসের পোর্শিয়া। ছেলেরা যাতে বাইরে না যায়, তার জন্য বাবার এই ব্যবস্থা।

মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনে রাজবাড়িতে ধরা পড়লাম। সুরেন বাড়ুজ্যের বাড়ি ফরিদপুরে। স্কুলের পড়া প্রায় ছেড়ে দিলাম। একদিনের ঘটনা। খানখানাপুর রেল স্টেশনে গিয়ে-ছিলাম, একদিন গাড়ির কামরায় দেখি এক ন্যাড়ামাথা বুড়ো বসে আছেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনিই মহাত্মা গান্ধী? উনি বললেন 'হ্যাঁ।' তখন আমার তেরো চোদ্দ বছর বয়স। তবে পার্শোনালিটি দেখার ইচ্ছে আমার কোনোদিনই নেই। ও থেকে পাখি দেখলে কাজ হয়। বনে বনে ঘুরেছি, পায়ে কতো কাঁটা ফুটেছে। জঙ্গলে বসে থাকা, পাখি শিয়াল দেখা—এ আমার নিয়মিত প্রোগ্রাম ছিলো।

নাটক লেখার গল্প বলুন—নাটক লিখবো কোনোদিন ভাবিনি। বাবার নাটকে ঝোঁক ছিলো, মামা সতোন মজুমদার, বাড়িতে ছিলো লেখাপড়ার আবহাওয়া। ক্রমশঃ লেখার দিকে ঝোঁক এলো। বিদেশে যাবার ব্যবস্থা হল, যাইনি। বাড়ি পালিয়ে ফরিদপুরে। বাবা দিলেন তাড়িয়ে। কি যে চাইতাম জানি না, তবে কিছু চাইতাম। আনন্দবাজারে কয়েকমাস চাকরি করলাম, ছেড়ে দিলাম।

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলাম। কলেজ স্কোয়ারে এক বয়স্ক ভদ্রলোককে গোরা সৈন্য মারছিল। মনে হল, ভদ্রলোক নির্দোষ। আমার স্বাস্থ্য তখন খুব ভালো। গোরার হাত থেকে ব্যাটন কেড়ে নিলাম, তা দিয়ে মারলাম গোরাকে। মেরে দৌড়োলাম। মারও খেয়েছিলাম। ওই রকমই ছিলাম আমি।

আমি বিশেষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ভাবলাম কি করবো। স্বদেশী আন্দোলন, দেশময় দুর্ভিক্ষ দেখে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। গল্প লিখতাম আগে, প্রবন্ধ, পরে কবিতাও লিখেছি, গানও। গান কবিতা আজও লিখতে চাই। আমি ওইসময় আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম। যে মরে যাচ্ছে, তাঁর জন্য আমি কি করতে পারি, দায় অনুভব করলাম। মুমূর্ষুর মুখের কাছে গিয়ে জবানবন্দী শুনেছি। ভুল বকছে মুমূর্ষু 'অনেক ধান, অনেক ধান, কেটে কেটে তোলো।' এইসব চরিত্র যাদের দেখলাম, শুনলাম তাদের নিয়ে নয় রাত্রির মধ্যে নবান্ন লিখে ফেললাম। প্রথম আগুন, তারপর জবানবন্দী, তারপর নবান্ন। লোকে বললো, আপনার লেখার মধ্যে পেঁয়াজের গন্ধ। নিশ্চয়ই চাষার ছেলে আপনি।

যা লিখেছি, ঠিক অভিনয় হচ্ছে না দেখে অভিনেতা হতে হল। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের নানা অঞ্চল ঘোরার ফল কাজে লেগেছিল। ভদ্রলোকের ছেলেরা আমার নাটকের সংলাপ বলতে পারে না। সঙ্গে ছিলেন তারাশংকর, মানিকবাবু সুভাষ আরো অনেকে।

নবান্ন থেকে বাস্তবধর্মী নাটকের নতুন অধ্যায় শুরু হলো। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য নবনাট্য আন্দোলনের পুরোহিত, অভিনেতা। তার পর বিচিত্র কর্মময় জীবনে তিনি আপোষহীন সংগ্রামী, কোথাও স্খলন নেই তাঁর। মানি মেকিং বিজনেস আমার মধ্যে নেই, বললেন কথা প্রসঙ্গে। এটা মুখের কথা নয়, উনি একথা বলায় সত্যিই উপযুক্ত। শেষতম নাটক হাঁসখালির হাঁসের রিহার্সালের জন্য একটা ঘর চাইলেন, 'পারো একটা ঘর জোগাড় করে দিতে?'

ঋত্বিক সম্বন্ধে কিছু বলুন। থাক ও প্রসঙ্গ, ওটা ব্যক্তিগত হয়েই থাক।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বাঙলার বাইরে বাঙালী

শান-ই-আউধ

আউধের নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ মসনদ ছেড়ে যখন বাংলাদেশে চলে এসেছিলেন তখন সংগে আনতে পারেন নি কিছুই কেবল ঠুংরির সুর আর বোল টুকু ছাড়া। পালছেঁড়া, হালভাংগা, রিক্ত, সর্বহারা নবাব বাংলার হাওয়ায় ছড়িয়ে দিলেন 'বাবুলে মেরা নইয়ারে ছুটি যা।' এই ঠুংরির সুর তাঁর পরেও কতকাল ধরে অনুরণিত হয়ে উঠেছে তাঁর পরিত্যক্ত রাজ্যে আউধের রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরে। একপাশে নবাবদের স্মৃতি সৌধ ইমামবাড়া, ছত্তর মঞ্জিল, অন্যদিকে ইংরাজের পরাজয়ের কলংক রেসিডেন্সি। একদিকে প্রাচীন লক্ষ্ণৌর অস্তিত্ব চক্‌বাজার, অন্যদিকে ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যারিস কলেজ, হজরতগঞ্জ। গোমতী নদী পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে পাবেন হালআমলের আধুনিক লক্ষ্ণৌ মহানগর, নিরালানগর। নবাব গিয়েও নবাবী রেশ এখনও হেথাহোথা পাওয়া যায় স্থানীয় বৃদ্ধ ও প্রবীণ খানদানী বাসিন্দাদের মধ্যে,—
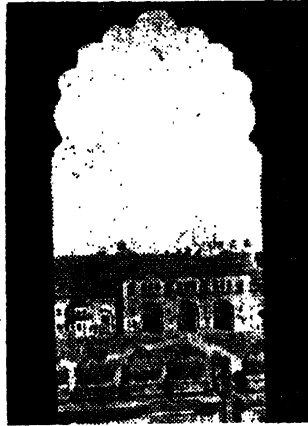
বাঙালী, অবাঙালী হিন্দু অ-হিন্দু নির্বিশেষে। তাঁদের কৃষ্টি—নবাবী-ভংগীতে আদাব, বোলীতে উর্দু, বিনয়ে আভিজাত্যের অভিব্যক্তি।

লক্ষ্ণৌয়ী ঠুংরির কাফি রাগে বত্তরাজাদুলালের সঙ্গে হোলী খেলার শেষে, গ্রীষ্মের ঈষৎ ইঙ্গিতের সংগে বাজারে পুরু গোঁফ, হোঁৎকামোটা। ফেরিওয়ালা হাঁকছে 'রুপেয়া কিলো লায়লা-মজনু।' আপনার পক্ষে চমকে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু না, চমকাবেন না। ওগুলো মোলায়েম কাঁচ কাঁকরী (শশার সমগোত্রীয়)। জলের ছিটে দিয়ে দিয়ে ফেরিওয়ালা চেঁচিয়ে খদ্দের আকর্ষণ করছে। তাঁরা লায়লার মতই পেলব 'নাজুক'। একটুতেই এলিয়ে পড়ে।

আরও গরমে পাবেন বিখ্যাত দশেরী আম যা ওয়াজেদ আলী শাহও তাঁর সুখসম্ভোগের দিনে উপভোগ করেছেন। এরপরেই মিষ্টিরসে পূর্ণ, লক্ষ্ণৌ বেগমের মত কোমল একটু ফ্যাকাশে রংয়ের delicate darling সফেদা আম।

হ্যাঁ লখনৌয়ী খরবুজাও পাবেন খর গ্রীষ্মে—সুগন্ধে মানুষ থেকে মাছি সবাই মাতোয়ারা—আতরের গন্ধকে হার মানায়।

এককালে গোমতী নদীর ওপরে, লক্ষ্ণৌর মর্বক ব্রিজের দুধারে ছিল অসংখ্য কালাজামুনের (কালোজামের গাছ। তাদের ডালে ডালে কালো থুবড়ি, বাদামী বাঁদরের 'rock-in-roll' আজ নেই। গাছগুলি কেটে বিরাট চওড়া ব্রিজ তৈরী হয়েছে, নাম হয়েছে খাঁটি রাষ্ট্রভাষায় 'হনুমান সেতু।' সেইখানেই হনুমানজীর নবনির্মিত মন্দির। ব্রিজের শেষ প্রান্তে হোটেল ক্লার্ক আওধ। শতরঞ্জ কী খিলাড়ীর নির্দেশক সেখানে এসেছেন কিছুদিন আগে।

লক্ষ্ণৌর প্রাচীন শি[illegible] কাজ এখনও দেশীবিদেশী প্রধান আকর্ষণ। পঞ্চাশ টা[illegible] তাঁরা একশ টাকায় কিনে [illegible] ফেরেন তৃপ্ত মনে।

পাবেন প্রাচীন বাঙালী[illegible] হাউস। বাঙালীপাড়া মানেই মাছের বাজার—'কেশরবাগ।' বাগেই বাংগালীর গৌরব, বাংগালীর সম্পদ অতুল[illegible] থাকতো। পরে নিজের এ পি সেন রোডে—তাঁ[illegible] রাস্তায়। বাড়িটি এখন [illegible] ডাক্তারের।

> **নিখিল ভারত সর্বভাষা নাটক প্রতিযোগিতা**
>
> 'নিউদিল্লী বেঙ্গলী কালীবাড়ী আয়োজিত অ[illegible] নিখিল ভারত সর্বভাষা নাটক প্রতিযোগিতা আগা[illegible] জুলাই থেকে ১০ই জুলাই, পর্যন্ত আইফ্যাকস্‌ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি[illegible] যোগদানের শেষ তারিখ [illegible] ১৯৭৭। বিস্তারিত বিবর[illegible] যোগাযোগ করুন :— [illegible] চক্রবর্তী, সম্পাদক, বেঙ্গলী কালীবাড়ী, মন্দির মার্গ, দিল্লী—১১০০০১।'

অতুলপ্রসাদকে কেন্দ[illegible] উঠল সমকালীন একাধিক [illegible] শিক্ষিত, উচচ চাকুরে, বড় [illegible] বাঙালীপাড়া এ পি [illegible] তাঁদের বেশীর ভাগই এখন[illegible] তাঁদের সন্তানেরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে[illegible] বাপের সন্তানেরা তর[illegible] দল তারা বাংলা জানে না, অথবা ইংরাজী স্কুলে, [illegible] হিন্দি। বাংলা যখন [illegible] হিন্দির অনুকরণে হ্যা[illegible] 'হচ্ছে'র অপপ্রয়োগ প্রতি[illegible] অতুলপ্রসাদের গান আ[illegible] বাঙালীর কণ্ঠে গভীর হ[illegible] স্থানীয় বাঙালীরা গায় [illegible] সুর।' অতুলপ্রসাদের [illegible] উপলক্ষে বাংলার বাঙালীর দেখা করতেন দ্বিজু স্যান্না[illegible] অতুলপ্রসাদের সম্বন্ধে বি[illegible] সংগ্রহ করবার জন্য। স্থানীয় দের মধ্যে বন্ধুরা backgro[illegible] নবীনেরা নবযুগের সঙ্গে [illegible] বোম্বাই কৃষ্টিতে আক্রান্ত।

তবে বাংলার নাটক নবীন প্রবীণ সবাই উৎসাহী

কে নাটকগোষ্ঠী মাঝে মাঝে
নয় করছে। স্থানীয় বেঙ্গলী
র উদ্যোক্তা। অবাঙালীরাও
হয়ে উৎসাহী। তাঁদের মধ্যে
ই বাংলা পড়েন বাংলা নাটক ও
ক জানবার জন্য। লক্ষ্ণৌ
লয়ে তৃতীয় ভাষা হিসেবে
ারতীয় ও বাংলাভাষার ক্লাস
ন্দ ভাষী লেখক-লেখিকাদের
বাংলা জানেন। বাংলা সাহিত্য
নিজেদের সাহিত্যকে তাঁরা
করেন।

র্গাপুজোর সময় পুজো
। বাঙালী ও অবাঙালীর
পুজো হয় একাধিক জায়গায়।
র বৈশিষ্ট্য হিসেবে একই
কলহে দুভাগ হয়ে গিয়ে একই
দুধারে মুখোমুখি পুজো হয়।
লোক দু-জায়গায় পুজো এবং দু
নাটক অভিনয় দেখেন বাত
ভীড়ের মাঝে কানের দুধারে
বাজে রাষ্ট্রভাষা মিশ্রিত বাংলা-
ও লরেটোমিশ্রিত বাংলাভাষা।
। বাংলাভাষাও শুনি কিন্তু তাঁরা
ত যা বাবা বা দিদা দাদুর দল।

রবীন্দ্রজয়ন্তী বা পয়লা বৈশাখ
ক গানবাজনার আয়োজন হয়।
নাথ বলতে শুধু তাঁর নাচ
তাঁর সাহিত্যের কোন স্থান
তাঁর জন্মদিনের উৎসবে। নবী
নাচ গানে বেশ উৎসাহসহকারে
গ্রহণ করে। তারা হিন্দি বা
ী অক্ষরে বাংলা গানগুলি লিখে
গায়। তারা তাদের দেশের
তুদের নাচ নাচে; কিন্তু হায়
ও এক রাজপুত্রকে দেখি না যে
বোম্বাই মনের ওপারে বাংলার
। কাঠি ছুঁইয়ে তাদের জাগিয়ে
—তারা চোখ খুলে গেয়ে উঠবে
নবীন এক গুনগুনিয়ে
গানে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।'

প্রণতা দে

র আর্তি যন্ত্রণা

াগরতলা দু তিন বছরের মধ্যেই
ষ্ঠা স্থানীয় রুচিশীল দর্শক-
গছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রতি
রক্ষার নজির সৃষ্টিতে সক্ষম
ন। এই তো সেদিন স্থানীয়
শতবার্ষিকী ভবনে পর পর
সন্ধ্যা তারা নৃত্যনাট্য উপহার
। কলকাতা ও আগরতলার
শিল্পী সমন্বয়ে ঐ পাঁচটি
বহুদিন দর্শকদের স্মৃতিপটে
থাকবে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত
রি নৃত্যনাট্য রূপদান এই রাজ্য-
5 প্রথম। ফলে তুলনার কোন

ক্ষুধিত পাষাণ / সাধনা গুহ
পদ্মিনী চক্রবর্তী

মানদণ্ড বহু দর্শকদের কাছে না
থাকলেও তাদের প্রচেষ্টার ঐকান্তি-
কতায় সবাই মুগ্ধ হয়েছে। শাপ
পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্য আরো মহড়ার
প্রয়োজন ছিল। শ্যামা প্রযোজনায়
অরকেস্ট্রা একটি নিজস্ব ধরানা সৃষ্টিতে
সক্ষম হয়েছে। সঙ্গীত এবং নৃত্যের
যুগলবন্দীতে শ্যামার আর্তি ও যন্ত্রণার
কান্না দর্শকদের স্পর্শ করতে সক্ষম
হয়েছে। তৃতীয় সন্ধ্যায় ছিল
চণ্ডালিকা। এই সন্ধ্যাও জম-জমাট।
পলি গুহ মা'র ভূমিকায় এবং প্রকৃতির
ভূমিকায় পদ্মিনী চক্রবর্তী একই
সঙ্গে যখন মঞ্চে ছিলেন তখন সমস্ত
প্রেক্ষাগৃহ ছিল স্তব্ধবাক। শরৎচন্দ্রের
মহেশ এবং রবীন্দ্রনাথের অভিসার
কবিতার নৃত্য রূপদানও একটি
পরীক্ষামূলক বিশিষ্ট অবদান। মহেশে
আবহাওয়া সৃষ্টিতে সঙ্গীতের ও
আলোর সুষ্ঠু ব্যবহার ছিল লক্ষণীয়।

তবে সর্বভারতীয় নৃত্য পরিবেশনার
শেষ সন্ধ্যাটি ছিল আশাভঙ্গের। বোধ
হয় একটানা চার সন্ধ্যার ক্লান্তি ছিল
এর জন্য অন্যতম দায়ী। অরকেস্ট্রার
এই সাধনার পথে স্থানীয় সঙ্গীত মহা-
বিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী পদ্মিনী
চক্রবর্তীর অবদান সবিশেষ। শ্যামা,
প্রকৃতি, ক্ষুধিত পাষাণের সেই
অতৃপ্তবাসিনী অশরীরী অতৃপ্ত
কামনাবতী অথবা অভিসারের সেই
রাজনটীর ভূমিকায় পদ্মিনী চক্রবর্তী
তার উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রমাণ করে-
ছেন। কলকাতার বাচ্চু পাল, সাধন গুহ,
পলি গুহ তাদের উপস্থিতিতে নৃত্য-
নাট্য সম্মেলনকে প্রাণস্পন্দিত করতে
সক্ষম হয়েছিলেন। সঙ্গীতে ছিলেন
সমীর দাস, মিলি রায় বর্মন সহ
অন্যান্যরা।

অনিল ভট্টাচার্য

শহরতলী মফঃস্বল

ভদ্রকালী থেকে ষোড়শী

চব্বিশ পরগণার মানুষের কাছে
ধন্বন্তরী কালী এক জাগ্রতা দেবীর
নাম। শুধু জেলার মানুষ কেন, অন্য
জেলার মানুষজনও ছুটে আসেন বহু
পথের কষ্ট স্বীকার করে এই জাগ্রতা
দেবীর কাছে রোগ-মুক্তি, সন্তান-
কামনা ও আরও নানা প্রার্থনা নিয়ে।

আজ থেকে প্রায় তিনশ বছর আগে
ভৈরবানন্দ নামে এক সাধু এই জয়নগর-
মজিলপুর গ্রামে এসে বসবাস শুরু
করেছিলেন। অবশ্যই সেটা তাঁর
সাধনার সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে। পুণ্য-
সলিলা ভাগীরথীর মজে যাওয়া
ভূ-খণ্ডের জঙ্গলাকীর্ণ জনবসতি
মজিলপুরের সেই ভৈরবানন্দ একদিন
স্বপ্ন দেখলেন জগন্মাতা তাঁকে
বলছেন, আদি গঙ্গার মজে যাওয়া অংশের
এক ছোট পুকুরের ভিতর তিনি
রয়েছেন। তাঁকে তুলে আনা হোক।
স্বপ্নাদিষ্ট সাধু তখন সেই পুকুর
থেকে জগন্মাতা দক্ষিণাকালীর এক
কালো পাথরে খোদাই করা মূর্তি
উদ্ধার করেন। এ খবর তিনি গ্রাম-
বাসীদের জানান এবং এক জীর্ণ কুটিরে

ধন্বন্তরী কালীমাতা

দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজা শুরু করেন।

বহুকাল পরে এই মন্দিরের সেবায়েত চক্রবর্তী বংশের পূর্বপুরুষেরা পাকা দালান তৈয়ারী করে সেখানে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই পাথরের মূর্তির অনুকরণে দেবীর কাঠে-খোদাই করা বিরাট মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখন সেই মূর্তিই মন্দিরে রয়েছে।

প্রতি বছর বৈশাখী শুক্লা প্রতিপদে এই মূর্তির রূপ পরিবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হয়। পনেরোদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রতি সন্ধ্যায় বিভিন্ন ভাব-ভঙ্গিমায় জগন্মাতাকে সজ্জিত করা হয়। শুরু হয় ভদ্রাকালীরূপে আর বুদ্ধ পূর্ণিমায় দিন শেষ হয় ষোড়শী রূপিণীতে। এইদিন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে এক পংক্তিতে বসে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করে। উৎসব উপলক্ষে এবার মেলায় এসেছিল কলকাতা থেকে কথাবলা পুতুল, বেবী ট্রেন, ম্যাজিক আরও অনেক কিছু। বাদ পড়েছিল জয়নগরের আদিশিল্প পুতুল নাচ। এটা ভালো লাগলো না। বুদ্ধ পূর্ণিমায় উৎসব শেষ হলেও মেলা এখনো চলছে। শেষ দিন মাতৃমূর্তিকে পুষ্পচয়নে ফুল-সাজি হাতে যেতে দেখা যাবে। এবারের মেলা ও উৎসবে সহস্রাধিক মানুষের সমাগম ঘটেছিল গ্রাম-গঞ্জ ও শহর কলকাতা থেকে। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবা বুড়োরাজ

বৈষ্ণবতীর্থ কাটোয়ার কাছাকাছি পবিত্র তীর্থ জামালপুরের পুণ্য মাটিতে 'বাবা বুড়োরাজ' বসে রয়েছেন 'কল্পতরু' হয়ে। হৃদয়ের অকপট ও পবিত্র ইচ্ছা পূরণ করেন তিনি সব সময়ে।

বুড়োশিবের 'বুড়ো' ও ধর্মরাজের 'রাজ' এই মিলে এখানে 'বুড়োরাজ'।

—ভগ্ন, প্রায় ধ্বংসোন্মুখ একটি মাটির ঘরে বিরাজ করছেন তিনি। প্রবাদ,—কোন অবস্থাতেই ঐ ঘরটি পাকা করা চলবে না। জামালপুর-সংলগ্ন 'নিমদহের' কোন এক ভাগ্যবান যদু ঘোষ 'বুড়োরাজের' প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেন।

'বৈশাখী পূর্ণিমায়' (৩ মে) অনুষ্ঠিত হলো ঐ মেলা। স্থিতি প্রায় ১৫ দিন। শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে এসেছিলেন হাজার হাজার ভক্ত মানুষ। কাটোয়া-হাওড়ার মধ্যবর্তী স্টেশন 'পাটুলীতে' দাঁড়িয়ে দেখলাম—শুধু মানুষের মিছিল। উদ্দেশ্য সকলেরই এক, সকলেই একতীর্থের যাত্রী।

জ্যৈষ্ঠ ও মাঘী পূর্ণিমাতেও 'বাবার' স্থানে ধূমধাম হয় প্রচুর,—কিন্তু সারা বছরের ক্লান্তি আর অবসাদ মুছে ফেলে বৈশাখী পূর্ণিমার বিশেষ লগ্নে মুখর হয়ে ওঠে 'বুড়োরাজতলা'। অনন্তদেব ভট্টাচার্য

সেকালের জীবজন্তু একালের শিল্পী

সম্প্রতি একাডেমি অব ফাইন আর্টস এর এক গ্যালারিতে শংকর মজুমদার প্রাগৈতিহাসিক কালের কিছু জীব-জন্তুকে সমকালের মানুষ-মানুষীর আশেপাশে নিয়ে এসে তাদের পিঠে চড়ে বা তাড়া করে বেশ মজা করেছেন। কোথাও টেরোডাকটিস উড়ে যাচ্ছে, কোথাও ডাইনোসরের পিঠে লোক দাঁড়িয়ে আছে আর নীচ থেকে কিছু মানুষের কোলাহল তাদের ভীতসন্ত্রস্ত

শংকর মজুমদ

করে তুলেছে। এইভাবে তিনি গতভাবে চিত্রগুলি তৈরী করেছে

কয়েকটি রঙের ব্যবধানে হাসিক কালের জীবজন্তুকে পা সাজিয়ে নিয়ে কিছু দূরে কোলাহল সৃষ্টি করার শ্রীমজুমদার শিল্পের একটি ধর্মকে রক্ষা করেছেন। সেটি হ চিত্রকে সবাক করে তোলা। নির্বাচনে তিনি প্রাগৈতিহাসি কোন আবহমণ্ডল গড়ে পারেননি ফলে কোন চিত্রক হয়নি। বিষয় এবং রং পরস্প করে আঙ্গিকের বেড়াজালে আ এবং এই আটকে যাওয়া ঘটেছে সর্বত্র। উপরন্তু বিষয়গুলি বিন্যাসের সময় একই রীতির একই উপস্থাপন বুদ্ধিকে ক্লান্ত করেছে। একটি বিশেষ ধর্ম হচ্ছে কে আবর্তন করে সাম্যকে ধরে রাখা। সামঞ্জ ক্ষেত্রে এই ভারসাম্য যদি তবে কোন চিত্রকেই ফ্রেমের ধরে রাখা যায় না, হয় থেকে সরে এসে ছোট হয়ে তাকে কেটে বাদ দিতে হয় ভেঙ্গে চিত্রের বিস্তার অনেক যায়। শ্রীমজুমদার এই সতর্ক হলে ভালো করতে সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুখাবয়ব ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিশেষ কোন ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে জন্তুদের সৃষ্টি হয়েছে। কোন শিল্পীর পক্ষেই সাম্প্রতিক কালের বহু চি লক্ষণের শিকার হয়েছেন। তরুণ শিল্পী আশা কর দিনে তিনি নতুন কিছু দেবেন।

হাওয়ার কথা

হাওয়া সম্পর্কে আরো ভালো- ...ার চেষ্টা করা উচিত আমাদের। ...র ওপরেই নির্ভর করে কোথায় ... কোথায় বন্যা, কোথায় ফসল উঠবে না, কোথায় হবে শীতে ...ধানার মতো অবস্থা। এমনকি ...ভারসাম্য কী হবে তাও আব- ...হাওয়া দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে।

শীতের মার খেয়ে নেপো- ...কী হাল হয়েছিল তা ...র জানা ঘটনা। আমেরিকার সি... পর্যন্ত এখন আবহাওয়ার খবর ...না গোয়েন্দা লাগিয়ে থাকে। ...কিল এই যে আবহাওয়া কেমন আগে থেকে বলা শক্ত। এবং ...তা আরো শক্ত হয়ে উঠছে। বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে ব্যাপারটা খানিক বোঝা যাবে: ...ায় শীত যেন এঁটে বসেছে, ...লে ইউরোপে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি ...শিয়ায় ও আফ্রিকায় খরা চলেছে চলেছেই। মানুষের হাতে ... আয়োজন বড়ো কম নেই, ...নুষ আবহাওয়া সম্পর্কে কত- ...া জানতে পারে, কতটুকুই বা ... সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে— ...করার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক।

...ন্ত্রণ করতে পারলে তার ফল ...া হত? কতখানি নিয়ন্ত্রণ; ...নিয়ন্ত্রণ অদল-বদল? তবে ...য়া নিয়ন্ত্রণের ফল শুধু এই হতে ...া প্রতিবেশী দেশে যে বৃষ্টিপাত ...থা তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা। ...ার প্রাপ্য সূর্যের আলো কেড়ে ...কি হতে পারে জানা নেই। আর ...কথা, আবহাওয়া সম্পর্কে কোনো ...তিক আইন নেই। কৃত্রিম বৃষ্টি- ...নয়ে আমেরিকার ওয়াশিংটন ও ...রাজ্যের মধ্যে যে ঝগড়া চলছে ...হলে সারা দুনিয়া জুড়ে শুরু ...হতে পারে। এ ধরণের ঝগড়ার ...পূর্ণ মীমাংসা হবার কোনো নজির

আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাবার ... পথ এখনো পর্যন্ত কৃত্রিম ...। তবে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা ... শিলাবৃষ্টি ও ঝঞ্ঝা বন্ধ করার উদ্ভাবনের। আরো বৃহৎ পরি- ...ও আছে। তা হচ্ছে গোটা উত্তর ...র্বের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলা, ফসল ফলাবার সময় বেড়ে যায়।

এমনও হতে পারে আবহাওয়ার ... অদলবদল ঘটাতে গিয়ে আব- ...স্থায়ীভাবে বদলে গেল। গ্রীন- ...ক্রিয়া বলতে য বোঝায় তার উল্লেখ করা যেতে পারে। পৃথিবীতে তেল কয়লা ইত্যাদি পুড়ছে, তার ফলে আরো বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই-অকসাইড নিঃসৃত হচ্ছে। বাগান তৈরি করার কাঁচের ঘরে যেমন উষ্ণতা বাড়ে তেমনি এই নিঃসৃত কার্বন ডাই-অকসাইডের ফলেও একই ধরণের ক্রিয়া সৃষ্টি হয় ও পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ে। উষ্ণতা বাড়িয়ে ফলনের সময় বাড়ালে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি আব-হাওয়ার সঞ্চালন বদলে যায় তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনা। হয়তো কোনো দেশে দেশে দেশে বৃষ্টিপাতের মধ্যেই দারুণ রকমের অদলবদল ঘটে যেতে পারে। কিংবা হয়তো তার চেয়েও খারাপ। উত্তর মেরুর বরফ গলে যেতে পারে। উত্তরমেরুর সমস্ত বরফ যদি গলে যায় তাহলে সমুদ্রের জলস্তর ১৮০ ফুট উঁচু হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে বিশ্বের অধিকাংশ শহরই ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা।

সৌভাগ্যের বিষয় বাতাসে ধুলো থাকলে উলটো ক্রিয়াও হয়ে থাকে। বাতাসের ধুলো সূর্যকে আড়াল করে এবং উষ্ণতা কমায়। বাতাসে ধুলো থাকলে বর্ষার মেঘ তৈরি হয় না। কৃষিপ্রধান কোনো দেশের বায়ুপ্রবাহ যদি শিল্পপ্রধান কোনো দেশের দিক থেকে হয় তাহলে সেটাকে কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে খারাপ অবস্থাই বলতে হবে।

তেমনি এক দেশে অরণ্যের বিলোপ সাধনেও প্রতিবেশী দেশে আবহাওয়ার ক্ষতি হতে পারে এবং মরুভূমি দেখা দিতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে চাষের সুবিধার জন্য কোনো কোনো নদীর মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে উত্তরমেরুর সাগরে গিয়ে পড়ছে এমন কয়েকটি নদীর। তার ফল ভালো না হবারই সম্ভাবনা। উত্তরমেরুর সাগরে যদি টাটকা জলের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে উত্তরমেরুর সাগরের লবণতা বাড়ে, লবণতা বাড়লে হিমাঙ্ক নেমে যায় হিমাঙ্ক নামলে বরফ গলতে শুরু করে।

নিত্যকার আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে— কিন্তু খুব যে একটা ফললাভ হচ্ছে তা নয়। যা করলে সাধারণভাবে আবহাওয়াকে বোঝা যায় তার জন্য কিন্তু অর্থব্যয় খুব কম। এটা দুঃখের কথা, কেননা মৌল জৌতিক শক্তিগুলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে তবেই আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষেত্রে সহায়তা লাভ করা যায়।

আবহাওয়া সম্পর্কে মানুষের এই যে বিশাল অজ্ঞতা তার প্রতিকারের দিকে নজর গিয়েছে। যে যে কারণে আবহাওয়ার ক্ষতি হতে পারে সেগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এরোজোল চালিত যান যদি বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরকে ধ্বংস করে তাহলে অবশ্যই তা বন্ধ করা দরকার। ওজোন-স্তরকে ধ্বংস করতে পারে আরো অনেক কিছু। বিজ্ঞানীদের উচিত এ বিষয়ে তৎপর হয়ে অনুসন্ধান চালানো ও কালো একটি তালিকা করা। অবশ্যই সবচেয়ে দায়িত্বশীল হওয়া উচিত জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থার এবং বিশ্ব আবহাওয়া দপ্তরের। আর বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেন্টের উচিত অর্থ সাহায্য ও সহযোগিতা করা। সম্প্রতিকালে আবহাওয়াকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার কথা শোনা যাচ্ছে। ভিয়েতনামে তার মহড়া হয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারটি যাতে না ঘটতে পারে সেই উদ্দেশ্যেও সচেতন তৎপরতা চাই।

অমল দাশগুপ্ত

অভাবী চাষীরাই পাট বোনেন

সবচেয়ে বেশি পাট বীজ বোনা হয় নদীয়া এবং মুরশিদাবাদ জেলায়। সবই প্রায় মিঠা পাট। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাটবীজ বোনার জন্য জমি তৈরি করা দরকার। পাটবীজ বোনার পরে শুরু হবে আউশ ধানের বীজ বোনা।

পাটচাষে আগ্রহ বেশি অভাবী চাষীবাসীদের। কারণ হিসাবে একজন প্রবীণ চাষী বলেছিলেন, পাটচাষে
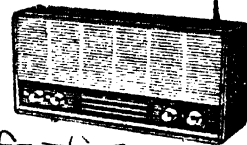
নগদ টাকা খরচ কম হয়। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বনাথ মিত্র। নগদ টাকা বের করা নাকি চাষীবাসীদের পক্ষে কষ্টকর। এক একরে আউশ ধান বুনতে হলে বীজের দাম পড়ে ৮০ থেকে একশ টাকা। আর পাটবীজের দাম পড়ে ১৮ থেকে ২০ টাকা। এমনকি ঘরে বীজধান থাকলে তা খাওয়া হয়ে যায়। তাই অভাবী চাষীবাসীরা ধার-দেনা করেও পাটবীজ বোনেন। পাটশাক খাওয়াও চলে। পাট চাষে বদলা কাজের রেওয়াজ রয়েছে। নিড়ানি খরচ বেশি বলে প্রতিবেশী চাষীবাসীরা একে অন্যের জমিতে বদলা দেন। পাটের দর কম হওয়া সত্ত্বেও চাষ কিন্তু কমে না।

পাটের ভাল দাম পেয়েছেন মুরশিদাবাদের গোপীনাথপুরের রনজিত মণ্ডল। মাসখানেক আগে কুইণ্টাল পিছু ২১৫ টাকা দরে সরেস পাট বিক্রি করেছেন মোড়ল মশাই। কিনেছেন স্থানীয় আড়তদার মহসীন মোল্লা।

অনেকদিন আগের কথা। দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি। পাট খেতে সেবার পোকার উৎপাত খুব বেশি। এখনকার মতো বিষতেল মেলে না। ১৫ বছরের কিশোর রণজিৎ ফিনাইল দিয়ে গরুর কাঁধের পোকা মারতে দেখেছেন বাবাকে। কার্বলিক সাবান জলে গুলে তার সঙ্গে ফিনাইল মিশিয়ে পাটখেতে ভাল করে ছিটিয়ে দেওয়ায় পাটের পোকা দমন হয়। দশখানা গাঁয়ের সকলে স্বীকার করলেন ছেলেটার বুদ্ধি আছে।

রনজিত বাবুর বুদ্ধি না থাকলে তিনি তিনটে ভাইকে মানুষ করতে পারতেন না। আজ তাঁর বয়স ৫৫। চাষবাসের কাজে দক্ষতাই তাঁর ভাইদের প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছে।

সাফল্যের চাবিকাঠি কী জানতে চাওয়া হলে মোড়ল মশাই বললেন, ৪০ বছরের ওপর হাতে হেতড়ে চাষবাস করছি। এখনও সব শিখে উঠতে পারিনি। তবে, একাগ্রতা আছে। আর বাত বুঝি। রণজিৎ বাবুর মতে ভাল ফসল পেতে হলে দরকার ভাল বীজ, জল, বল (সার) এবং যত্ন পরিচর্যা। কিন্তু সবচেয়ে বেশি দরকার একাগ্রতা। আর বাত বা জো বুঝে বীজ বোনা হলে ফসল মার খাবে না। অনেকে ঠিক বাত বুঝতে না পারায় মার খান।

সেই বাত হয়েছে। এখন কথা বলার সময় নেই কাজের লোকের। মাঠের কাজেই বেশি সময় দিতে হবে। পাট-বীজ বুনতে হবে। 'আর একদিন আসবে আলোচনা করা যাবে' বলে নমস্কার জানিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন রণজিৎ মণ্ডল।

কৃষি সংবাদিক

বউমার চাকরি

বিবাহিত চাকরি করা মেয়েদের সবচেয়ে বড় সমস্যা সন্তান পালন। প্রথমত বাচ্চা যখন একেবারে ছোট থাকে তখন তার তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বশীল লোক পাওয়া যায় না। ক্রেশের ভালো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। সামান্য যা আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। যে সমস্ত মেয়ে একান্নবর্তী পরিবারে থাকেন না তাদের সমস্যা এ ক্ষেত্রে আরও জটিল। স্বামী স্ত্রী দুজনেই বেরিয়ে গেলে, বাচ্চার দায়িত্ব পড়ে ঝি-চাকর আয়ার উপর। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব বাচ্চার যত্ন ঠিকমতন হয় না।

যেসব একান্নবর্তী পরিবার বউমার চাকরি করাটা এবং তার বাচ্চা প্রতি-পালনের মোটামুটি দায়িত্ব মেনে নেন সেখানে সমস্যা অন্যরকম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সব শিশু অনেক মানুষের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে যথাযথ স্নেহ ও শাসনের অভাবে। কোন কোন পরিবারে অতিরিক্ত স্নেহ ও প্রশ্রয় দেওয়া হয়—তাদের সর্বদা একটা ভাব থাকে যে যেহেতু ওর মা বাড়িতে থাকে না সেহেতু ওকে কেউ কিছু বোল না। ফলে বাচ্চারা অত্যন্ত জেদি ও মস্তানবী হয়ে ওঠে। আবার কোন কোন পরিবারে এই সমস্ত বাচ্চাদের প্রতি পরিবারের ভাবে অনেকটা অবহেলা মিশে থাকে—তারা যথাযথ স্নেহের অভাবে অত্যন্ত একা হয়ে পড়ে।

দিনান্তে মা বাড়ি ফেরেন যখন, তখন তিনিও শারিরীকভাবে এত ক্লান্ত থাকেন যে বাচ্চাকে যতখানি সঙ্গ দেওয়া প্রয়োজন, তা সবসময় তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে শিশুটি সর্বদা মনে করে যে সে মাতৃস্নেহ বঞ্চিত অথবা তার মা

অন্য আর সকলের মায়ের ম
শীল নন। এইসব ক্ষেত্রে, মা
বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় নেয়।

আমাদের পাশের বাড়ি
বয়েস আট। তার জন্মের আগে
তার মা চাকরি করেন। একেবারে
বয়েসে আয়ার কাছে পরবর্তী
কখনও প্রতিবেশীর কাছে, কখনও
লোকের কাছে থেকে সে বড় হ
পড়াশুনোয় তার মন এবং মেধা
আছে। কিন্তু ছেলেটা
বড় নিঃসঙ্গ। কারো সঙ্গেই সে মন
কথা বলে না। ওর মা সেদিন
বলছিলেন বাচ্চু নাকি শরীর
হলেও, একা একা সেটা সামলে
চায়—মাকে বা বাবাকে কিছু বল
দারুণ সংকোচ। ছেলেবেলা থেকে
মার সঙ্গ না পেয়ে পেয়ে বাবা
তত আপন নন। এতটা সত্য
হলেও, অনেক বাচ্চার মধ্যেই না
মানসিক জটিলতা দেখা যায়।
বাচ্চারা মনে করে তারা তাদের মা
তা পেল না। ছেলেবয়েসে
অভাব বোধ করাটা অত্যন্ত মর্মা

আমাদের চতুষ্পার্শে এমন
সংখ্যা কম নয় যাঁরা সন্তান পা
জন্য চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ
একান্নবর্তী পরিবারে থেকেও
দিদির মেয়েটির দায়িত্ব কেউ
স্বীকৃত হল না বলে আমার
চাকরি ছেড়ে দিল—কিন্তু সং
একসময়ে বড় হয়ে যায়, তখন
মেয়েদের জীবনটা বড় ফাঁকা হয়ে
তাছাড়া বাচ্চা মানুষ করবার
চাকরি ছেড়ে দেওয়াটা সামাজি
কখনই মেনে নেওয়া যায় না।
মেয়ে ত শুধু মা নন, তিনি স্ত্রী
[illegible]
আছে। একথা ভুলে যাওয়াটা স্ব
লক্ষণ নয়। সমাজের পক্ষে মঙ্গল
নয়।

এই সমস্যার একমাত্র স
পরিবারের সকলের প্রতি স
সর্বোপরি স্বামীর সহানুভূতি
মনোভাব এবং স্কুলের স
বিচ্ছিন্নভাবে ক্রেশের সুব্যবস্থা
পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এক
কর্মবিভাগ ছিল—ছেলেরা
করবে আর মেয়েরা সন্তান পা
সংসারের অন্যান্য গার্হস্থ্য দায়িত্ব
করবে। এখন সে ধরনের কর্ম
থাকা আর সম্ভব নয়। কিন্তু
যখন বাইরের জগতে পুরুষদের
পাশি পথ চলতে সক্ষম তখন পু
বা কেন গার্হস্থ্য দায়িত্ব সমানভা
করে নেবেন না? এখনও অ
ক্ষেত্রে সন্তানের দায়িত্ব মায়ের।

বোশান গঙ্গো

...র পরামর্শে ছাড়ছি

হকি টিমের ক'জন ...দের বউয়ের কথা কানে নেয় —তবে ওদের মধ্যে একজন যে পরামর্শ একেবারে উড়িয়ে ... জানলাম কয়েকদিন আগে। ...র নাম মাইকেল কিণ্ডো— ...ছর ধরে ভারতের রাইট ব্যাক। ...ল অলিম্পিকে ভারত যখন ...র সঙ্গে দ্বিতীয় ম্যাচে ...রে হারছিল তখন রাজস্থানের ...রের একটা ফ্ল্যাটে মাঝরাত্তিরে ... ধারাবিবরণী শুনতে শুনতে করছিল কিণ্ডো। বাঁ পায়ের তখনও ঢাউস প্ল্যাস্টার। ... করতে দেখে ওর বউ শীলা ...ল—'ভগবানের দোহাই, তুমি ...যেতে পারনি! বিদেশ থেকে এসে তোমাদের মুখ গুঁজে বসে থাকা দেখতে আর ভালো ...। এই বেলা মান থাকতেই ...ও।'

...কতটা মন্দ মনে হয় নি ... ভারতের হয়ে বিদেশের প্রথম টুর্নামেন্ট (একাত্তর সালে ...রে দক্ষিণ-পূর্ব আঞ্চলিক ... খেলতে গিয়ে কিণ্ডো গোল্ড ...গলায় ঝুলিয়েছিল। ও চায়— ...র খেলাটিও (পঁচাত্তরে কুয়ালা-...র বিশ্ব কাপ হকিতে 'যেখানে চ্যাম্পিয়ান হয়) হয়ে থাকুক ...ত। কয়েকদিন আগে বেটন খেলতে এসে উত্তর কলকাতার ...হোটেলে বসে কিণ্ডো আমাকে —'আমি চাই, নতুন ছেলেরা ...আমার জায়গা নিক। বয়স তো ...লা না—একত্রিশ চলছে। এখন ...বোধহয় সবচেয়ে বয়স্ক প্লেয়ার ... যা খেলার, খেলে নিয়েছি। ...স পাওয়ার জন্য আর হাঁসফাঁস না।' কিণ্ডো ঠিক করেছে, ...তিক ম্যাচ আর নয়—এবার ...ই. এস থেকে ছাপ মেরে করার কথাও ভাববে।

...৬ বছর মণ্ট্রিলগামী ভারতীয় ...কিণ্ডোর জায়গা ছিল একেবারে কিন্তু অলিম্পিকে যাবার সুযোগটি ও হারায় পাতিয়ালার ...ী হাসপাতালের ডাক্তারের গাফিলতিতে। কিণ্ডো এতো ... ডাক্তারের ত্রুটির কথা কাউকে ...—বরং মনে করে পায়ের চোটের ও মণ্ট্রিলে যেতে পারেনি। ওর ঘটনাটি শুনুন—'ইণ্ডিয়ান টিম ...দের এন. আই. এস ব্যাঙ্গে ...শ করছে। নিজেদের মধ্যে ... গিয়ে ভূপালের খুরশেদ আলির আমার পায়ে লাগল গত বছরের ছয়ই এপ্রিল। প্রথমে বুঝতে পারিনি— মিনিট পাঁচেক পর যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় সবাই ধরাধরি করে আমাকে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরের দিন গভর্নমেন্ট হসপিটালে ডাক্তার একস-রে করে বলেন, হাড়ে সামান্য চিড় খেয়েছে। উনি অভয় দেন প্ল্যাস্টার করলে মাস-খানেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। এ শুনে কোচ ও সিলেকটররা আমাকে বলেন, দশই মে-র মধ্যে ফিট হলে আমাকে মণ্ট্রিলে নিয়ে যাওয়া হবে। নয়ই মে প্ল্যাস্টার কাটা হল। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন প্ল্যাস্টার ঢিলে হওয়ার জন্য হাড়ে জোড় লাগেনি। আবার প্ল্যাস্টার করা হলো—এবার ভুল জায়গায়। তৃতীয়বারের সময় আমি কোচ গুরুবকসকে নিজেই বলে দিই মণ্ট্রিলে যাব না। শেষ পর্যন্ত কোটা-তে ঘরে ফিরে যাই।' জিজ্ঞেস করেছিলাম 'মণ্ট্রিলে গেলে, তুমি কি মনে কর— ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে ছয় গোল খেত?

কিণ্ডোর সাফ জবাব—'এখন কোন মন্তব্য করা উচিত নয়। আমি মনে করি, এখন ইণ্ডিয়ার সেরা ব্যাকস-আসলাম শের খাঁ ও সুরজিত। তবে আমার সময় পর্যন্ত ইণ্ডিয়া কখনও দু'গোলের বেশী খায় নি। আমাদের টিমে একটা দোষ, একটা গোল খেলেই আমরা ডিমরালাইজড্ হয়ে যাই। পাকিস্থানের মতো ফাইটিং স্পিরিটের ভয়ানক অভাব আমাদের।'

ভারতের হকির হাল এখন এ রকম কেন—তার উত্তরে কিণ্ডো বলেছে— 'বিদেশী টিমগুলো এখন জিতছে কেন তা বললেই আপনার প্রশ্নের উত্তরটা বোধহয় দেওয়া হয়ে যাবে। মাত্র চারটি কারণে—পেনাল্টি কর্নার, পেনাল্টি স্ট্রোক এবং লং কর্নার থেকে গোল করার দক্ষতা এবং আমাদের চেয়েও ফিজিক্যালি ফিট গোলকীপারের জন্যই ওরা জয়ের মুখ এখন দেখছে। পেনাল্টি কর্নারের সময় ওরা কখনই নিজেদের গোলকীপারকে ডিসটার্ব করে না। আর আমাদের তো বল থামানোই ভাল হয় না। লক্ষ্য করে দেখবেন, ফিল্ড গোলের সংখ্যা ইণ্টারন্যাশনাল ম্যাচে এখন খুব কম।'

একাত্তর সালে বার্সিলোনাতে প্রথম বিশ্ব কাপ খেলা হয়ে যাবার পর ইওরোপের সাংবাদিকরা একটি বিশ্ব হকি দল গড়েছিলেন। তাতে ভারত থেকে তিনজন চান্স পেয়েছিল—কিণ্ডো অজিতপাল সিং ও অশোককুমার। পরের বছর—মিউনিখ অলিম্পিকের হকি ফাইনালের আগে আবার একটি ওয়ার্ল্ড টিম করা হয় এবং সেখানেও কিণ্ডো জায়গা পেয়েছিল স্পেনের রাইট ব্যাক জয়ান আমাতের বাঁ পাশে।

বিহারের রাঁচীর কাছে বাইরামা গ্রামে মাইকেল কিণ্ডোর জন্ম। আদি-বাসী খৃস্টান পরিবারের এই ছেলেটি উনিশ বছর পর্যন্ত গ্রামে দেহাতী-হকি খেলার পর চৌষট্টি সালে ইণ্ডিয়ান নেভিতে চাকরী পেয়ে যায় বম্বেতে। সেখান থেকে ওয়েস্টার্ন রেলে গত চার বছর চাকরী করার পর এখন থিতু হয়েছে রাউরকেল্লা স্টিলের স্পোর্টস অফিসারের দায়িত্ব নিয়ে। বাহাত্তর সালে 'অর্জুন' হবার পরের বছরই কিণ্ডো বিয়ে করে ফেলে। এখন ও অ্যালবার্ট এবং অনীতার বাবা—যদিও খেলার চরকীতে ছেলেমেয়ের সান্নিধ্য পাওয়া খুব একটা হয়ে ওঠে না ওর।

রূপক সাহা।

ছাই নিয়ে যুদ্ধ

গ্রেগ চ্যাপেলের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ১৯৭৭ সালের চারমাসব্যাপী ইংল্যাণ্ড সফর সুরু করে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের এই সফর হল ২৮ বারের ইংল্যাণ্ড সফর। ১৯৭৭ সালের এই ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলে যে ১৭ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ১০ জন খেলোয়াড় এই প্রথমবার ইংল্যাণ্ড সফরে এসেছেন। দলের বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় হলেন উইকেট-কিপার রিচি রবিনসন— তাঁর বয়স ৩৬। দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় ডেভিড হুকের বয়স ২১। দলে তিশ বা তার বেশী বয়সের খেলোয়াড় আছেন চারজন— ম্যাক্‌কস্কার (৩০), ওয়াল্টার্স (৩১), ডাইমক (৩১) এবং রবিনসন (৩৬)। দলের ১৭ নম্বর খেলোয়াড় রিক ম্যাকার অসুস্থতার কারণে দলের সঙ্গে আসতে পারেন নি। তাঁর আগামী ৭ই মে তারিখে ইংলণ্ডে আসার কথা আছে বর্তমান অস্ট্রেলিয়ান দলে পেস বোলার ডেনিস লিলির অভাবই সব থেকে বেশী করে চোখে পড়বে। পীঠের [illegible] জন্য তিনি আসতে পারেন নি।

১৯৭৭ সালের ইংল্যান্ডর বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া পাঁচটা টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা যে মহান ঐতিহ্য বহন করে চলেছে তার গুরুত্বই আলাদা। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার শুভ উদ্বোধন হয় ১৮৭৭ সালের মার্চ ১৫ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার এই খেলাটি আবার পৃথিবীর মাটিতে প্রথম টেস্ট খেলার আসর। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার অপর এক নাম 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ'।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার বয়স একশ বছর। এবং এই দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলার সংখ্যা বর্ত্তমানে দাঁড়িয়ছে ২২৫। এখানে উল্লেখ্য, অপর কোন দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলা ২০০ সংখ্যার ঘরে পৌঁছতে পারেনি।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ফলাফল বর্ত্তমানে দাঁড়িয়েছে : অস্ট্রেলিয়ার 'রাবার' জয় ২৪বার, ইংল্যান্ডের 'রাবার' জয় ২২বার এবং সিরিজ ড্র ৭বার। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার এই ৫৩টি টেস্ট সিরিজের ২২৪টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮৭, ইংল্যান্ডের জয় ৭১ এবং খেলা অমীমাংসিত ৬৬।

তাছাড়া ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে মেলবোর্ণ মাঠে আয়োজিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার সেন্টিনারী টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে জয়লাভের গৌরব লাভ করে করে। এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮৭৭ সালের প্রথম টেস্ট খেলাতেও অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে জিতেছিল।

অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়বৃন্দ

১৯৭৭ সালের ইংল্যান্ড সফরকারী বর্ত্তমান অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের নির্বাচিত ১৭ জন খেলোয়াড় এবং তাঁদের বয়স (নামের পাশে):

ব্যাটসম্যান : গ্রেগ চ্যাপেল (২৮), গ্যারী কোজিয়ার (২৩), ইয়ান ডেভিস (২৩), ডেভিড হুকস (২১), কিম হুগেস (২৩), রিক ম্যাকোস্কার (৩০) ক্রেগ সার্জেন্ট (২৫) এবং ডগ ওয়াল্টার্স (৩১)।

ফাস্ট বোলার : জেফ্ টমসন (২৬), জিওফ ডাইমক (৩১), মিক ম্যালোনি (২৬), লেন প্যাসকো (২৭) এবং ম্যাকস ওয়াকার (২৮)।

স্পিন বোলার : রে ব্রাইট(২২) এবং কেরী ও' কেফী (২৭)।

উইকেট-কিপার : রড মার্শ (২৯) এবং রিচি রবিনসন (৩৬)।

কোচিনে আয়োজিত প্রথম বার্ষিক জাতীয় সাব জুনিয়র ফুটবল প্রতি-যোগিতায় বাংলা এবং মণিপুর যুগ্মভাবে ইকবাল হোসেন ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। বাংলা বনাম মণিপুরের ফাইনাল খেলা অতিরিক্ত সময় সত্ত্বেও গোলশূন্য অবস্থায় অমীমংসিত থেকে যায়। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় সাতটি দল অংশ গ্রহণ করেছিল এবং যোগদানকারী খেলোয়াড়দের বয়স নির্ধারিত ছিল ১৫ বছরের নীচে। যোগদানকারী সাতটি দল এইভাবে দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে, প্রথমে লীগ প্রথায় খেলেছিল : ১নং গ্রুপে মণিপুর, বাংলা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ২নং গ্রুপে কেরল, কর্ণাটক, আসাম এবং তামিলনাড়ু। ১নং গ্রুপে প্রথম স্থান পেয়েছিল মণিপুর (৩ পয়েন্ট) এবং দ্বিতীয় স্থান বাংলা (২ পয়েন্ট)। ২নং গ্রুপে কেরল এবং কর্ণাটক যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান পেয়ে সেমিফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। সেমি-ফাইনালে বাংলা ২—১ গোলে কেরলকে এবং মণিপুর ৩—০ গোলে কর্ণাটককে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

ফেডারেশন কাপ ফুটবল

কোচিনে মহারাজা কলেজ স্টেডিয়ামে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের প্রথম বার্ষিক ফেডারেশন কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ ১—০ গোলে মোহন-বাগানকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরে ফেডারশন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ২০ মিনিটে আই টি আই দলের রাজশেখর অতর্কিতে জয়সূচক গোলটি দেন। মোহনবাগানের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের দোষেই এই গোলটি হয়েছিল। এই গোল খাওয়ার পর মোহনবাগান বিপক্ষ দলের গোল সীমানা বার বার প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেও গোল শোধ দিতে পারে নি। খেলায় মোহনবাগান বেশীর ভাগ সময় কেবল প্রাধান্যই বিস্তার করে নি, গোল দেওয়ারও একাধিক সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেছিল।

বিশেষ করে প্রথমার্ধে হাবিব এবং দ্বিতীয়ার্ধে শ্যাম থাপা হেলাফেলা করে গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ নষ্ট করেন।

সেমিফাইনালে মোহনবাগান ৩-০ ও ৩-৩ গোলে জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবকে এবং ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ (বাঙ্গালোর) ২-০ ও ০-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে [illegible] ফাইনালে উঠেছিল।

ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

বার্ণপুরের ভাতৃভবনে আয়ো[illegible] ২৯তম জাতীয় এবং ১৩তম [illegible] রাজ্য ভারোত্তোলন প্রতিযো[illegible] আসরে জাতীয় খেতাব জয়ী [illegible] সার্ভিসেস দল এবং আন্তঃ [illegible] চ্যাম্পিয়ান হয়েছে তামিলনাড়ু।

জাতীয় চ্যাম্পিয়ানসীপ : ১ম সা[illegible] (১৬৫ পয়েন্ট), ২য় রে[illegible] (১১৬ পয়েন্ট) এবং ৩য় তা[illegible]নাড়ু।

আন্তঃ রাজ্য চ্যাম্পিয়ানসীপ : তামিলনাড়ু (১০৫ পয়েন্ট[illegible] মহারাষ্ট্র (৯৮ পয়েন্ট) এ[illegible] পাঞ্জাব (৩৫ পয়েন্ট)।

ভাল ভাল গান হারিয়ে যাচ্ছে

রবীন্দ্র সদন বলেই কি র[illegible] নাথের গান নাচ ও একক [illegible] আসর বেশি? হতে পারে। কারণও থাকতে পারে। অ[illegible] আসরেই এমন কিছু ভীড় হয় [illegible] কেন? 'সুরঝর্ণার' মত [illegible] ব্যবসায়িক দলগুলো নানা র[illegible] বাংলা গানের পসার সাজাতে [illegible] না? হাসির গান সেকেলে বাংলা [illegible] থিয়েটারি গান। টপ্পা ত শোনাই [illegible] না। পল্লীবাংলার ভাদু গান, তুষু [illegible] নানা চালের কীর্তন, যেমন ময়ন[illegible] মনোহর শাহী, গরাণহাটি এসব [illegible] গানের ডিগিরে পুঁথিতে লেখা থা[illegible] বছর বিশেক আগে জয়নগরের [illegible] গেরস্থবাড়ির দালানে মারাত্মক [illegible] কঠিন তালে [illegible] দাশু রায়ের পাঁ[illegible] শুকসারির [illegible]ন শুনেছিলাম [illegible] গ্রামীণ শিল্পীর গলায়। র[illegible] নজরুলে সন্ধ্যা একটা বাতিকে দাঁ[illegible] প্রচারের কল্যাণে সব হয়। [illegible] ভট্টচায, সুরসাগর হিমাংশু, [illegible] দাশগুপ্ত, সুধীরলাল, অনুপ[illegible] এঁদের সুর-করা লেখা কত ভাল [illegible] গান হারিয়ে যেতে বসেছে। র[illegible] নাথের পাশে পাশে বাংলা গানের [illegible] রোমান্টিক মিঠে সকাল-সন্ধ্যা [illegible] আমাদের শৈশব-যৌবন পর্যন্ত [illegible] ছিল। এই যাঁদের বয়স এখন [illegible] থেকে পঞ্চাশের ভেতর। যূথি[illegible] সুপ্রভা সরকার, জগন্ময় মিত্র, [illegible] ঘোষ, উৎপলা সেন, গায়ত্রী বসু, [illegible] হেমন্ত এঁরা প্রত্যেকে এমন [illegible] করে অন্তত বাংলা কাব্যসঙ্গীত [illegible]

র আওয়াজ রবীন্দ্র নজরুলের
ও কম রমরমে নয়। কানন দেবী
হিট্ বাংলা ছবিতে গেয়েছিলেন
মরু নদী' ভোলা যায় না। ঐসব
য়রা কি সুরের পক্ষাঘাতে
ছেন? গানগুলো 'ও, টি'তে
ন? সুরঝর্ণার কথায় আসতে দেরি
ছি। ও'দের ছয় শিল্পীর আসর
হল সাড়ে ছটারও পর। সাধু
ণ্টা। নতুন দুজনকে দিয়ে শুরু।
ক বটব্যাল গাইলেন 'অনেক দিনের
র মানুষ' 'ফলফলাবার আশা
াদি। ভরাট গলা, স্পষ্ট উচ্চারণ।
নেই, স্বাভাবিক। অলোক নতুন
তু পিছলে যাবেন না। রুমাকে
নও আরো গাইতে হবে। ক্ষমা সিংহ
রলা তবে রবীন্দ্রনাথের গানের বচন-
ত রপ্ত করতে হবে। অশোকতরুর
নামী শিল্পীর গান যত শুনি মনে
উনি সুর দিয়ে গান না, স্বর দিয়ে
। যেটা সময় সময় অনর্থক মোটা,
তা এবং নেশালু। 'ঘোরা রজনী এ মোহ
ঘটা'—গানটির নির্বাচনের জন্য
কে ধন্যবাদ। বললেন, এর স্বর-
চিত্রায় রাগকে পাওয়া যায়। তিন
ইনের গান। কথার চেয়ে তাল ছাড়া
লম্বিত সুরের বিস্তার বেশী। তাও
ক। কিন্তু তাই বলে কোমল গান্ধারে
মীরখানী গলার নকলে শ্রুতির
লন দেখাবার কি দরকার? সুরে
রিয়ে যেতে হবে অহং ভাবটা
ল্পীর নয়। 'কান পেতে রই' বেশ
গল।

সুমিত্রা সেনের 'জীবন আমার
লছে যেমন', 'সখি ভাবনা কাহারে
লে', 'উদাসী হাওয়ার পথে পথে'
নে যদি ফুটলো কুসুম, আমার শেষ
রানির কড়ি বেশ ভাল হয়েছে।

কঠিন তাল কাটু লয় ছন্দ আর
ওস্তাদী খোলা মেজাজে খানিক বাদা
ঙ্গে অথচ মেয়েলি ন্যাকামি নয়, যিনি
অনেককাল থেকে রবীন্দ্রনাথের গানেই
শুধু একনিষ্ঠ তাঁর নাম সুবিনয় রায়।
সুবিনয় জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয়। সেদিন
সদনে শেষ বসন্তের পালায় গাইলেন,
এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে,
'কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান।'
—ভক্তি প্রেম নিবেদনের মালাখানি
সন্ধ্যারতির ধূপের গন্ধে ভরিয়ে তুলে
সুচিত্রা মিত্র সুরের ঝর্ণাকে দূরে দূরে
আরো দূরে নিয়ে গেলেন স্মৃতির
মতো—'এতোদিন তরী বাহিলাম যে
সুদূরে পথ বাহিয়া শতবার তরী ডুবু,
ডুবু করি সে পথে ভরসা নাহি পাই।'

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

মহুয়া চক্রবর্তী ফ্লোরের বাইরে
বসে। একা চুপচাপ। পরের শটে
ডাক পড়লে যাবেন। একজন ফটোগ্রাফার
উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর
দিকে, নীরবতার কারণ জানতে
চাইলেন তিনি—

কি ব্যাপার চুপচাপ বসে যে।

—না, এমনিই, হাতের ছবির
কাজগুলি কি করে তাড়াতাড়ি সেরে
ফেলব ভাবছি।

'কেন, তাড়া কিসের?'

মহুয়া

নির্লিপ্ত সুরে মহুয়া জবাব
দিলেন— 'তিন-চার মাস বাদে তো
লম্বা ছুটি নিতে হবে। ছবিগুলো শেষ
না করে দিলে প্রোডিউসাররা মুশকিলে
পড়বেন না!'

খাঁটি কথা বটে। কিন্তু ফটো
গ্রাফার বুঝতে পারছিল না তিন-চার
মাস বাদে লম্বা ছুটি নেবেন কেন
মহুয়া। তাই তাঁর প্রশ্ন— 'কেন,
লম্বা ছুটি কেন?'

হাসতে হাসতে মহুয়া বললেন—
'রেশনকার্ড বাড়তে চলেছে যে!'

* * *

টালিগঞ্জের এক নম্বর নায়িকা
তাঁর ছবির প্রচারের ব্যাপারে খুব
খুঁতখুঁতে। ছবি বাছাই থেকে শুরু
করে প্রচারপত্রের লে-আউটও নাকি
তাঁকে দেখিয়ে নিতে হয়। তাঁর সবুজ
সংকেত না পেলে কোনো কাজ হয় না।
সম্প্রতি এক প্রযোজক (তাঁর ছবির
নায়িকা তিনি) সেই নায়িকার সঙ্গে
তোলা একটি ছবি নাকি কোন এক
দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য
পাঠিয়েছিলেন। অবশ্যই নায়িকার
মর্জির কথা তাঁর জানা ছিল না। ছবিটি
যথারীতি ছাপাও হয়ে যায়।

নায়িকা তো প্রযোজকের সঙ্গে তাঁর
ছবি ছাপা হয়েছে দেখে রেগে

কানাকানি

অগ্নিশর্মা। প্রযোজককে ঘাঁটাবেন সে
সাহসও নেই। ফোন করলেন তাই
পরিচালককে। বেশ কড়া আর চড়া
গলায় তাঁকে নাকি জানিয়ে দিলেন
নায়িকা: এসব আজেবাজে ছবি বেরোয়
কিভাবে? আপনি দেখতে পারেন
না? ভবিষ্যতে যেন এমন আর না
হয়।'

* * *

সুদূর মধ্য দেশের এক গভীর
অরণ্যে শুটিং চলছে একটি হিন্দী
ছবির। শত্রুঘ্ন সিনহা অন্যতম প্রধান
শিল্পী। জঙ্গলে স্থানাভাবের জন্য
ইউনিটের সদস্যরা বিভিন্ন বাংলো ও
বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন।
অসুবিধে হলেও উপায় কি!

উদয়াস্ত খাটুনির পর একদিন
ইউনিটের সবাই নিদ্রামগ্ন। হঠাৎ প্রায়
মধ্য রাত্রিতে প্রোডাকশন ম্যানেজারের
কাঁচাঘুম গেল ভেঙে। কি ব্যাপার?
না, শত্রুঘ্ন সিনহার 'বিশেষ' অতিথি

শত্রুঘ্ন

এসেছেন বম্বে থেকে। তাঁর থাকার
বন্দোবস্ত করতে হবে, কিন্তু জঙ্গলে
জায়গা কোথায়? ম্যানেজারের অবস্থা
তো কাহিল! বাধ্য হয়ে—

বিছানাপত্র গুটিয়ে ক্যামেরাম্যান
ভদ্রলোককে মাঝরাতে বেরিয়ে আসতে
হলো ঘর থেকে শত্রুঘ্ন সিনহার
বিশেষ অতিথিকে জায়গা দেবার জন্য।
একই ঘরে স্থান হলো দুজনের।

পরদিন সকালেই অবশ্য 'বিশেষ'
অতিথি পাড়ি দিলেন বম্বের পথে।

ইউনিটের সবাই ফিসফিস সুরে
শুনলো সেই 'বিশেষ' অতিথি হচ্ছেন
রীণা রায়।

হরিপদ দর্শক

চেতনার স্পর্ধা আছে

যত অন্যায় যত অবিচারই হোক না কেন তার ওপর প্রতিবাদ অথবা প্রতিরোধের কোন প্রচেষ্টা তার ছিল না। সব কিছু মুখ বুজে মেনে নেওয়াটাই ছিল তার অভ্যাস, দাস মনোভাব ছিল ছিল তার সহজাত। জগন্নাথ দাস-এর এটাই চরিত্র। অথচ এই জগন্নাথ দাসকে ব্রিটিশ শাসক রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেয়।

আবার এই জগন্নাথ দাসই নাটকের প্রারম্ভ মুহূর্তে, যখন বিপ্লবীরা তার ফাঁসির ঘটনা নিয়ে হতচকিত বিস্মিত এবং শোকমগ্ন, তখন সে মঞ্চের অন্য প্রান্তে ফাঁসির আসামীর পোষাক পরে দাঁড়িয়ে কথার ফাঁকে ফাঁকেই ব্যঙ্গাত্মক চুটকি কথা বলেছে, একসময় সরস ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে গুঞ্জরিত দর্শককে শাসন করে বলছে, 'আস্তে আমার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। আর সেই ব্যঙ্গটা যেন আজকের সমাজ ব্যবস্থা এবং মানসিকতাকেই বিদ্ধ করেছে।

আবার ফাঁসিতে যাবার আগে করুণ চিৎকার করে মহামান্য বিচারকের উদ্দেশে বলেছে আমার মরতে বড় ভয় হুজুর। কিন্তু তার আগে (আগে না পরে?) সেই জগন্নাথই চুকলিখোর নন্দ বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও সে তো আর তার মত ফাঁসি যেতে পারেনি ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।

জগন্নাথে স্বপন মিত্র ও অরুণ মুখার্জি

এছাড়াও আছে। নাটকের এক জায়গায়, ব্রিটিশের দালাল জনার্দন যখন বিপ্লবীদের হাতে গুলি খেয়ে মারা গেল, আর তার ফলে তার রিভলবারটা জগন্নাথের হাতে এসে পড়ল, সেই রিভলবার হাতে নিয়ে নিজের ঘরের চৌহদ্দিতে থেকেই মনে মনে তার ওপর যারা অবিচার করেছে তাদের এক এক করে গুলি করে প্রতিশোধ নেবার দৃশ্যটা—। নাট্যকার যেন সেখানে জগন্নাথের ভেতরের 'মানুষটার চেহারাটাই দেখাতে চেয়েছেন।

কিন্তু মনে মনে মনোরমার কাছে তাকে ভালো লাগার কথাটা জানানোর দৃশ্যটাই কি ফ্যালনা? সেই দৃশ্যে তো জগন্নাথ অপূর্ব।

মোদ্দা কথা এই দুই জগন্নাথই মঞ্চে উপস্থিত হয়ে রাগে, অনুরাগে, বিষণ্ণতায়, সামান্য ব্যাপারে প্রসন্ন এবং বিব্রত হয়ে, বিনয়ে বিগলিত আবার আচমকা রোষে জ্বলে উঠে একটি পরিপূর্ণ আটপৌরে সৎ মানুষের রূপ ধারণ করেছে। যে স্বভাবে দাস মনোভাব সহজাত হয়েও মনের গহনে একটা দৃপ্ত প্রতিবাদের সুর লালন করেছে।

চেতনার সাম্প্রতিক নাটক জগন্নাথ বলা যায় ওয়ান ম্যান শোর নাটক। তাকে ঘিরে যে সব চরিত্র এসেছে তারা যেন শুধুমাত্র জগন্নাথকে চিনিয়ে দেবার জন্যেই তার চারপাশে সময়ে সময়ে ভীড় করেছে। অর্থাৎ তাঁরা জগন্নাথ নামক চরিত্রটি বোঝাবার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু জগন্নাথের তুলনায় তারা কেউই প্রয়োজনীয় নয়। এরা না থাকলেও জগন্নাথকে বুঝতে অসুবিধা হত না। তবে এটা নিশ্চিত এই চরিত্ররা আমাদের সমাজের কাঠামো, সমাজ ব্যবস্থা মানসিকতা ইত্যাদি বোঝার সহায়ক হয়েছে অবশ্যই।

এ নাটকে মনে হয় কিছুটা চলচ্চিত্র আঙ্গিকের আশ্রয় নেওয়া

এমন কয়েকটি দৃশ্য আছে যা বাহ্যত অপ্রাসঙ্গিক এবং কাহিনীর সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। যেমন বাবার দেওয়া লতা পাতা আর গাছের শেকড়ের রস খেয়ে ভরে পড়া (আসলে ব্যাপারটা মেকী এবং দৃশ্যান্তরে নিরুদ্দেশ স্বামীর অভাবে কামনায় তাড়িত একটি ব্রাহ্মণ কন্যার মনোভাব বোঝানো হয়েছে) নলিনীর আত্মসমর্পণ ও জগন্নাথ কর্তৃক ভয়ে ভক্তিতে বা শুচিতা রক্ষার জন্য যে নাটকীয় দৃশ্যের মঞ্চে উপস্থিত করা হয়েছে এরা জগন্নাথ চরিত্রের পরিপূরক নয় বলেই মনে হয়। এমন দৃশ্য আরও যে দু-একটি নাই তাও নয়।

এ নাটকের আর এক প্রাপ্তি বিপ্লবী

শক্তি সামন্তের হিন্দী ও বাংলা ছবি [illegible] উত্তম শর্মিলা।

...বিশ্বাসের মারফৎ জগন্নাথকে [illegible] বলার চেষ্টা। [illegible] সংখ্যাতীত বার মঞ্চে আসায় [illegible] বোধহয় কিছুটা ব্যাহত [illegible] তবে স্বীকার করব টেকনিকটি [illegible]।

কাহিনী চীনের বিখ্যাত লেখক [illegible] এর আ কিউ গল্পের [illegible]। ছাড়া জগন্নাথ এর বড় [illegible] নাট্যকার, সুরকার ও নির্দেশক [illegible] মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ [illegible]। বস্তুত তাঁর সহজ সরল [illegible] অভিনয়ের জন্যই যেন [illegible] মঞ্চে প্রাণ পেয়ে স্বাভাবিক [illegible] উঠেছে। কিছু, কিছু দৃশ্য তো [illegible] মধুর স্মৃতি হয়েই থাকবে [illegible] মনে। এবং সেটা জগন্নাথ [illegible] নিম্নবিত্ত সমাজের সঠিক [illegible] কিনা। এ প্রশ্ন সকলের।

শেষ কথা। নাট্য আন্দোলন বা [illegible] নাটক সম্পর্কে যাঁরা দুদণ্ড [illegible] তাঁরা বলতে পারবেন পরীক্ষা- [illegible] নাটক হিসেবে জগন্নাথ কোন [illegible] সার্থক। তবে আবার মনে হয়েছে [illegible] স্পর্ধা আছে ভাল জিনিষ [illegible] দর্শকদের কাছে পৌঁছে [illegible] অন্তত তাতে ফাঁকি নেই [illegible]।

নাট্যসমালোচক

প্রমোদকর মুক্ত ছবি সত্যিই প্রমোদ মুক্ত

সিস্টার ছবিটি অত্যন্ত পরিচিত। ছকে বাঁধা। আগে দেখা কয়েকটি বাংলা ও হিন্দি ছবির কিছু দৃশ্য নিয়ে এই ছবি। যীশুর মূর্তির সামনে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষিকার গান ও তারপর একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর, পিকনিক, পিকনিকে গান, রাতে মোমবাতি নিয়ে ঘুমন্ত ছেলে মেয়েদের দেখা, গ্রামের লোকদের ওষুধ দেওয়া, তাদের উৎসবে যোগদান, নায়িকার নিজেকে অবৈধ সন্তানরূপে জানা, আত্মহত্যা করতে গিয়ে ফিরে আসা, এরকম বহু দেখা দৃশ্য ছবিটির এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। তফাতের মধ্যে শুধু বহিঃশত্রুর হামলা সংযোজিত হয়েছে, হয়তো দেশপ্রেম বা নায়িকার বীরত্ব ইত্যাদি দেখানোর জন্য। সিস্টার ছবিটি রঙীন। অথচ এর রংকে প্রকৃত রঙ বলে মেনে নিলে বলতে হবে এই কলকাতা স্টুডিওর ফসল 'কাঞ্চনজংঘা' বা 'অশনি সংকেত'-এর রঙ একেবারেই যাতা। এখানে আলোর খেলা এমনই যে মাঝে সেটা দিন না রাত্রি, দুপুর না সকাল কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। আবার একই দৃশ্যে ভৌতিকভাবে আলো কম-বেশী হওয়ার ঘটনা শব্দ প্রয়োগে বিশৃংখলা প্রভৃতি অনেক কিছুই ছবিটিকে অতিমাত্রায় দুর্বল করেছে।

এখানে ক্যামেরার কাজ শুধুমাত্র ক্লোজ শটে ছবি তুলে যাওয়া। সম্পাদনার কাজ কত বেশী ক্লোজআপ ছবিটিতে ব্যবহার করা যায় তার

চারমূর্তি ছবিতে রবি ঘোষ, সত্য ব্যানার্জি এবং শম্ভু ভট্টাচার্য

নিরীক্ষা—শুধু যীশুর মুখই প্রায় দশ-পনের বার পর্দায় ভেসে ওঠে।

নায়িকা এখানে তিন রূপে অবতীর্ণা। যুবতী, যৌবনোত্তীর্ণা, বৃদ্ধা। ছবির জন্য এ যতটা না প্রয়োজনে এসেছে, তারচেয়ে বেশী নায়িকার শ্যামার দেখানোর প্রয়োজনে।

অভিনয়ের দিক দিয়ে মুখ্য সব শিল্পীই এক ভয়াবহ প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। কে কত বেশী অতি অভিনয় করতে পারেন। এই ওভার অ্যাকটিং তাঁদের অভিনয় ও সেই সঙ্গে ছবিটিকে আরো বেশী তলিয়ে দিয়েছে। উত্তম, সুপ্রিয়া, উৎপল—যাঁদের নামে আকাশ ফাটে, তাঁদের কাছ থেকে এ রকম শিশুসুলভ অভিনয় দেখব, এ ভাবতেই কষ্ট হয়। এটা কি সত্যিই ১৯৭৭-এর কোন ছবি?

দু-তিনটে ছোট্ট মুহূর্তে ছাড়া প্রধান শিল্পী সুপ্রিয়া এ ছবিতে যা দিয়েছেন, তা তাঁর প্রথম জীবনের ছবি 'বসু পরিবার' এর কাছেও লজ্জা পায়।

এ ছবির একটাই ভাল ব্যাপার, সঙ্গীত। অনেক দিন পরে বাংলা ছবিতে সলিল চৌধুরীকে স্বমহিমায় দেখে ভাল লাগল।

পরিচালনা ব্যাপারটাই এখানে উহ্য। যে ভিস্যুয়েলাইজেশান, নান্দনিক দিক ইত্যাদির মাধ্যমে এক যথার্থ পরিচালককে চেনা যায়, এখানে তার চূড়ান্ত অনুপস্থিতি। পরিচালকের অনেক ছেলেমানুষী আবেগের মধ্যে একটি—শেষ দৃশ্যের ফ্রিজ শট : পায়রা হাতে হাস্যরত সিস্টার। নাচ, গান, যুদ্ধ, বীরত্বপূর্ণ সংলাপ, দেশপ্রেম স্টার ইত্যাদি নানা মাল-মশলা থাকা সত্ত্বেও দুঃখের বিষয় এটি ছবি হয়ে উঠল না।

বিকাশ জানা

অনাদায়ের তিন দৃশ্য

(প্রথম দৃশ্য)

[চিৎপুরের এক যাত্রাদলের গদিঘর। দল-পরিচালক এবং নায়েক পার্টির কথোপকথন]

নায়েক : আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। প্যান্ডেল অবধি বাস যাবে। বড় রাস্তায় মোড়ে আমাদের লোক থাকবে।

দল-পরিচালক : বাকি টাকাটা।

নায়েক : তার জন্য চিন্তা করবেন গান আরম্ভের আগেই সব দেবো। আজ তাহলে নমস্কার।

[নায়েক পার্টির প্রস্থান। দল-পরি সাম্প্রতিক অনাদায়ের ঘটনাব চিন্তিত।]

দল-পরিচালক : (স্বগত) না, না। পুরোনো পার্টি। প্রতিবছর করায়। এদের কাছে এসব ভয়

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

[একটি গ্রামে যাত্রার আসর সাজঘরে দলের সবাই মেক-আপে নায়েক পার্টির প্রবেশ। হাতে বাক্স]

নায়েক : এই বাকস দুটো রাখুন। আছে। সেলের সব টাকা। প্যান্ডেলে যাচ্ছি।

ম্যানেজার : টাকাটা মিটিয়ে দিলে হত।

নায়েক : আমরা বিশ্বাস করে ক্যাশবাকসই আপনাদের দিয়ে আর আপনি টাকা মেটাবার বলছেন। (চড়া সুরে) আচ্ছা তো আপনি।

[দ্রুত প্রস্থা

[তৃতীয় দৃশ্য]

[সেই সাজঘর : ম্যানেজারকে ঘিরে অস্ত্রে সজ্জিত একদল যুবক। শিল্পীরা লাঞ্ছিত হয়েছেন।]

১ যুবক : (নায়কের থুতনি ধরে) ধনকে দেখতে তো বেশ। চাঁদ মুখ। এত খারাপ গান হল কেন

নায়ক : গান তো খারাপ হয়নি।

২ যুবক : ফের কথা। (নায়কের এসে পড়ে সশব্দে এক চড়) ফের চাইলে মেয়েগুলোকে রেখে দেবো।

৩ যুবক : বাসটা জ্বালিয়ে দেবো

ম্যানেজার : (জোড়হাতে প্রার্থ ভঙ্গিমায়) মাপ চাইছি ছেড়ে আমাদের। টাকা চাই না আর।

[পর্দা নেমে আসে]

সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গায় যাত্রাকে করে এ ধরনের তিনটি দৃশ্য দেখা যা নায়েক পার্টির মধ্যে মাস্তানি মস্তামির অনুপ্রবেশ ঘটছে। প্রাপ্য ছেড়ে দিয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হচ্ছেন যাত্রাদল। পুলিশে ডায় হয়েছে প্রচুর। এই সংকট যদি সংক্রা হতে থাকে তাহলে যাত্রা শিল্পে লাল জ্বলবে। এবং এর সঙ্গে যুক্ত প্রায় হাজার পরিবারের কী হাল হবে সকলেরই জানা আছে।

আসুন, সবাই মিলে বসে এর সুষ্ঠু সমাধানের কথা ভাবা যাক।

প্রশান্ত চৌ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৭৫ পয়সা॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা॥ ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

১৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা
৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
27th MAY, 1977

প্রচ্ছদ শিল্পী সন্তোষ গুপ্ত
ছবি এঁকেছেন
দাশগুপ্ত এবং সন্তোষ গুপ্ত

বাজার দরের বিষ ও বিশল্যকরণী

যদি কোনো স্নায়ুতত্ত্ববিদ সমীক্ষা করে দেখতে চান যে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র কতোদূর পর্যন্ত চাপ সহ্য করতে পারে, তবে অনায়াসেই পশ্চিমবঙ্গকে তাঁর ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতে পারেন। গত কয়েক মাস ধরে জিনিসপত্রের দাম এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে, পকেটের সম্প্রসারণশীলতা দেখে অবাক হয় যেতে হয়। সত্যি বলতে কি, বাংলার সাধারণ মানুষের এই পকেটের খেলা যে কোনো মেডেল-পাওয়া ম্যাজিশিয়ানকেও হার মানিয়ে দিতে পারে।

কারণ বিবেচনা করে দেখুন, কয়েক মাস আগেও যে আলুর দাম ছিল কিলোপ্রতি এক টাকা, এখন অর্থাৎ লেখার সময় পর্যন্ত তা দশ-দশ পয়সা করে বেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে এক টাকা চল্লিশ পয়সায়। চিনিও এইভাবে দশ-দশ পয়সার রেটে এগোচ্ছে। আর গুড়? এক সপ্তাহে বেড়ে গেছে চল্লিশ পয়সা। চা অবশ্য অনেক আগেই এসব দর্শমিক পদ্ধতির তোয়াক্কা না করে একেবারে রকেটে চেপে দশ টাকা থেকে উঠে গেছে বিশ টাকায়। এবং আমাদের আর্যভট্টের মতো কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে—অর্থাৎ তার আর পুরনো মাটিতে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

অন্যদিকে কাঁচা বাজারও মূল্যবৃদ্ধির হলকা লেগে পাণ্ডুর। পটল পেঁয়াজ ঝিঙে কোনোটারই মূল্যচিত্র খুব উৎসাহ পাওয়ার মতো নয়। আর তেলের দাম তো বরাবরই খুব পিচ্ছিল। নির্বাচনের মুখে কিঞ্চিৎ ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে এলেও এখন আবার নাগালের বাইরে ছড়কে যেতে শুরু করেছে। ডালের দামও একই রকম চঞ্চল। আর এইসব দর বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায়, প্রধান যে বস্তুটি বাঙালির খাদ্য-তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে সেই চালের দামও কলকাতার 'খোলা' বাজারে এখন দু টাকা ষাট পয়সা থেকে চড়ে তিন টাকায় পোঁছেছে।

মাছ অবশ্য নিজেই একটি মহাভারত। মাছ নিয়ে গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে যতো কাহিনী জমে উঠেছে সেগুলো পর্বে পর্বে ভাগ করে দিব্যি একটি মহাভারত লিখে ফেলা যায় ইদানীং বোধহয় শুরু হয়েছে মহাপ্রস্থানের পর্ব। কাটা পোনার দাম এখন আঠার টাকায় উঠে মর্তলোকের মায়া কাটানোর দিকে।

রাজ্যপাল ইতিমধ্যে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়ে বেআইনী মজুত বন্ধ করার কথা বলেছেন। কিন্তু কোথাও কোনো রকম বিবেকদংশন শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না, এবং বাজারের দামও ম্যালেরিয়া রোগীর জ্বরের মতোই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে।

অচিরাৎ এখন কুইনাইনের মতো কিঞ্চিৎ তিক্ত রসায়ন প্রয়োগ ছাড়া এ ব্যামোর হাত থেকে সহজে রেহাই পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে না।

অনুজ লেখকের বিস্ময়

অমৃত নববর্ষ সংখ্যায় (১৩৮৪) অগ্রজের দৃষ্টিতে অনুজ গল্পকার বিভাগের প্রথম নিবন্ধে শ্রীযুক্ত সুধাংশু ঘোষ যে পাঁচজন অনুজ লেখক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সৌভাগ্যক্রমে আমি তার মধ্যে স্থান পেয়েছি। সুধাংশুবাবু লেখকদের বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন আমাকে দিয়ে, এবং আমার সম্পর্কে তিনি বেশ কিছু ভাল ভাল কথা বলেছেন। শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ লেখকের প্রশংসায় আমার অনুপ্রাণিত এবং উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমি তা হতে পারিনি। আমার মনে হয়েছে তাঁর এই প্রশংসাবাক্যগুলি বানানো, যেমন বানানো আমার বিরুদ্ধে তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ। এই অভিযোগ শুধুমাত্র ভিত্তিহীন নয়, উদ্ভট এবং হাস্যকর।

সুধাংশুবাবু তাঁর আলোচনার এক জায়গায় লিখেছেন, 'শেখর বসুর কতকগুলি গল্পে একটা গা-শিরশির-করা অনুভব ছড়িয়ে আছে। ওই শিরশিরানি প্রায় গল্পেরই শেষের দিকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়। এই জাতের গল্পগুলি এক সময়ের এক ধরনের ইংরেজী কবিতার নকশার সঙ্গে মিলে যায় প্রায় কাঁটায় কাঁটায়। যেমন শেখর বসুর 'টাঙ্গি' এবং ডবলিউ ডবলিউ গিবসনের 'ফ্ল্যানান আইল'।'

ডবলিউ ডবলিউ গিবসনের কোনো কবিতা আমি পড়িনি। কিন্তু পড়িনি বললে কোনো 'অভিজ্ঞ' লেখকের দোষ কাটে না, বোধ হয় আরও বেড়ে যায়। কয়েকদিন ধরে কলকাতার এদিক-সেদিক বিস্তর খোঁজাখুঁজির পরে একটি সংকলনের মধ্যে ডবলিউ ডবলিউ গিবসনের ফ্ল্যানান আইলকে পেলাম।

অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত এবং জে সি স্মিথ সম্পাদিত ছাত্রপাঠ্য এই কবিতা সংকলনটির মধ্যে জন মেসফিলড, টমাস হার্ডি, ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার, রুপার্ট ব্রুক প্রমুখের সঙ্গে উইলফ্রিড উইলসন গিবসন আছেন। সুধাংশুবাবু তাঁর নিবন্ধে এঁকেই সংক্ষেপে ডবলিউ ডবলিউ গিবসন বলে উল্লেখ করেছেন। এই সংকলনটিতে গিবসনের দুটি মাত্র কবিতা আছে, একটির নাম ফ্ল্যানান আইল।

আলোচনার সুবিধের জন্য 'ফ্ল্যানান আইল' এবং 'টাঙ্গির' সংক্ষিপ্তসার দিয়ে দেওয়া ভাল। 'টাঙ্গি' গল্পটি কলকাতার একটি বিশিষ্ট সাপ্তাহিকে ১৯৭৫ সালে ২৭ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ফ্ল্যানান আইল।। ভোরবেলা জাহাজ জানিয়ে গেল যে, ফ্ল্যানান বাতিঘরে আলো জ্বলছে না। জ্বলছে না, তাহলে কি বাতিঘরের কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওদে খবর নেবার জন্যে আমরা সঙ্গে সঙ্গে চড়ে ফ্ল্যানান দ্বীপের উদ্দে হলাম। দ্বীপে নেমে আমরা সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে ওপরের ঘরে উ কেউ কোথাও নেই। শুধু টেবিলে খাবারদাবার পড়ে আছে। তারপ বাতিঘর এবং সারা দ্বীপ তন্ন খুঁজলাম, কিন্তু ওই লোকগুলো হদিশ পাওয়া গেল না। আমরা লোকগুলোর দুর্ভাগ্যজনক কথা ভাবতে লাগলাম চুপ করে।

টাঙ্গি।। গল্পের চারটি চরি নিরিবিলি জায়গায় বেড়াতে গল্পে এই অঞ্চলের নাম বলা হ এই চারজনের মধ্যে কী সম্পর্ক হয়নি স্পষ্ট করে। আদিবাসীদে বাজার করতে গিয়ে এদের এক টাঙ্গি কেনে। যে বুড়োটা এই সে এই টাঙ্গি সম্পর্কে নানা আজগুবি গল্প শোনায়। যেমন, মন্ত্রপড়া। টাঙ্গি গৃহস্থের মঙ্গল ক প্রথম রাতেই রং খাওয়াতে হবে না খাওয়ালে টাঙ্গি ভীষণ ক্ষ রাত্তিরবেলা নির্জন বাংলোর টাঙ্গিকে কেন্দ্র করে এই আজগুবি অবিশ্বাসী চারজনকে ক্রমে ক্র কুসংস্কারগ্রস্ত করে তোলে। গল্পটি এখানেই শেষ।

এই কবিতা এবং এই গল্প বিন্দুমাত্র মিল নেই, উন্মাদ ক কোনোরকম সমদৃশ্য আবিষ্কার ক না। অথচ, সুধাংশুবাবু এই দ মধ্যে শুধু মিল নয়, কাঁটায় কা খুঁজে পেলেন কী করে? মিল কি এই দুটি রচনার মুদ্রিত অংশে সাদা পাতায়? মিল কি এই দু ছাপার কালিতে?

সুধাংশুবাবু মিল আবিষ্কার পাঠকের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও। আইল' পড়ে সুধাংশুবাবুর ঠিক গা-শিরশির করেছে ঠিক সেই শিরশির করেছে 'টাঙ্গি' পড় আবিষ্কারের এই চমকপ্রদ থিয়োরি ব্যবহার করার ভীষণ লোভ হচ্ছে পৃথিবীতে অসংখ্য ভাল ভাল গ আছে, এই গল্পগুলি পড়লে পাঠ পায়। পাঠকের প্রতিক্রিয়া এবার থেকে আমরা বলব, গল্পগুলিতে কাঁটায় কাঁটায় পৃথিবীতে অসংখ্য দুঃখের যেগুলি পড়লে পাঠকের দুঃখবো হয়, সুধাংশুবাবুর থিয়োরি অন গল্পগুলির মধ্যে কাঁটায় কাঁটায়

'গা-শিরশির করা অনুভব' পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত হবে

অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক, রহস্যময় জগতে পৌঁছলে পাঠকের যেমন গা-শিরশির করতে পারে, ঠিক তেমনি গা-শিরশির করতে পারে হত্যা, আত্মহত্যার বিবরণ, কিংবা ভূতের গল্প পড়ে। আরও অসংখ্য কারণে পাঠকের শিরশিরানি আসতে পারে। কিন্তু আমরা এবার থেকে নতুন থিয়োরির সাহায্যে বলতে পারি, আদ্যিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্যে যেসব রচনায় গা-শিরশির-করা অনুভব আছে, সেই রচনাগুলি একে অপরের কার্বন কপি, এদের মধ্যে কাঁটায় কাঁটায় মিল।

সুধাংশুবাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য এবং থিয়োরি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমার মাঝেমধ্যে খুব ক্লান্তি এসে যাচ্ছে। আর, ক্লান্তি এলেই বলতে ইচ্ছে করছে, সুধাংশুবাবু হয় 'ফ্ল্যানান আইল' পড়েন নি, নয় 'টাংগ' পড়েন নি। কিংবা এমনও হতে পারে যে তিনি দুটি রচনার কোনোটাই পড়েননি। একজন শ্রদ্ধাভাজন লেখক সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা বোধ হয় ঠিক নয়। তাছাড়া তিনি যখন অমৃতের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় এই আলোচনাটি করেছেন, ভদ্রতাবোধ থেকে আমার ধরে নেওয়া উচিত যে, তিনি রচনাদুটি পড়েছেন।

আমি খুবই ক্ষুদ্র লেখক, আমার এমন কিছুই নেই যে হারাবার ভয় পাব। সুধাংশুবাবুর অসতর্ক উক্তিতে আমার সম্মানে আঘাত পড়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না, তবে আমি দুঃখ পাচ্ছি অন্য কারণে। তিনি সম্পূর্ণ অকারণে 'তুলনামূলক আলোচনাটি করে ডবলিউ ডবলিউ গিবসনের একটি চমৎকার কবিতার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেছেন।

শুধু 'টাংগ' নয়, সুধাংশুবাবু 'এক সময়ের এক ধরনের ইংরেজী কবিতার নকশার সঙ্গে আমার কতকগুলি গল্পের প্রায় কাঁটায় কাঁটায় মিল পেয়েছেন। সুধাংশুবাবুর কাছে আমার বিনীত অনুরোধ তিনি যেন প্রকাশ্যে জানিয়ে দেন, কোন কোন ইংরেজী কবিতার নকশার সঙ্গে আমার কোন কোন গল্পের মিল আছে। একজন অগ্রজ লেখকের কাছ থেকে অনুজ লেখক হিসেবে আমি কি এই সামান্য সহযোগিতাটুকুও আশা করতে পারি না? সুধাংশুবাবুর কাছে আমার স্বীকার করতে একটুও লজ্জা নেই যে, আমি হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়তে পারি না। আর উদ্দেশ্যহীন কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভব্য ইঙ্গিতের কাছে আমি সত্যিই খুব অসহায় বোধ করি।

তবে এসব কথা আমার লেখা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। কারণ, আমি ভালভাবেই জানি তিনি শিক্ষিত, সৎ দায়িত্বশীল এবং সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। তিনি তো কখনোই সেইসব সমালোচকদের মধ্যে পড়েন না যাঁরা কোনো লেখকের রচনার সঙ্গে সাহেবদের রচনার কাল্পনিক মিল টেনে বার করে একই সঙ্গে সেই লেখককে হেয় করেন এবং নিজেদের পড়াশুনোর বিশাল পরিধি দেখান। তাহলে কেন এমন হল?

শেখর বসু, কলকাতা-১৯

॥ ২ ॥

নববর্ষের অমৃতে প্রকাশিত শ্রীবরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা 'তরুণদের গল্পভাবনা' প্রসঙ্গে এই চিঠি।

এই বিশেষ সংখ্যায় তরুণ গল্পকারদের গল্প এবং তাঁদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার পরিকল্পনায় আপনার শুভ এবং সাহিত্যের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এখন অনুরোধ, আপনার সে মনোভাব উপরোক্ত রচনায় কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তা ভেবে দেখবেন।

ঐ রচনার বিভিন্ন অংশ নিয়ে অনেক আলোচনা এবং প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমন, তরুণ লেখকরা কেন ভবিষ্যতের মানিক বিভূতি হবার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাবেন? মানিকবাবু বা বিভূতিবাবু কি ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথ হবার জন্যে দায়-দায়িত্ব নিয়েছিলেন! অথবা একজন লেখক কি কোন একসময় সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পেয়ে যান? কি সেই সিদ্ধান্ত! ল্যাবরেটরীর ভেতর বসে সাহিত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যাপারটা কি? এ প্রসঙ্গেও বলা যায়, ল্যাবরেটরীতে কেউ ছেলেখেলা করতে যায় না যে একসময় খেলা শেষ হলে গুছিয়ে সাহিত্য করতে বসে যাবে। রহস্যের সন্ধানে যাঁরা ল্যাবরেটরীতে ঢোকেন তা বিজ্ঞানের বা যে কোন শিল্পের সেবা, ল্যাবরেটরী ছেড়ে তাঁদের যে আসা[illegible] আর উপায় থাকে না, বাইরে দাঁড়িয়ে বি[illegible] একথা বোঝা যাবে? আমার প্রসঙ্গেই দেখুন বরেনবাবু একবার বললেন, আমি শক্তি[illegible] মান সন্দেহ নেই, আমার দৃষ্টিভঙ্গিও নাগ[illegible] সঞ্জীব অথচ অন্যান্য জায়গায় বলছেন তে[illegible] শক্তির পরিচয় দিতে পারিনি এব[illegible] পাঠকদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা[illegible] জন্যে যে চার্জ করার ক্ষমতা তা করায়ত্ত হয়নি (জানি না, পাঠকদের ওপর শ[illegible] ট্রিটমেন্টের কথা উনি বলতে চেয়েছে[illegible] কিনা)। কেন এমন পরস্পরবিরোধী কথ[illegible] বলতে হোল বলুন তো? অথচ কো[illegible] উক্তির পেছনে যুক্তি বা তথ্য রা[illegible] নেই, কথাগুলো ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে মাত্র কি বলব তার চাইতে কিভাবে লিখ[illegible] এই সমস্যা আমাকে বেশী পীড়িত কে[illegible] বরেনবাবুর এই বিস্ময়ে আমি আশ্ব[illegible] এই কারণে যে অন্তত একজ[illegible] লেখকের সন্ধান পাওয়া গেল, কিভা[illegible] বলব এই সমস্যায় বিব্রত নন। অবলীলা[illegible] তিনি লেখকের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। অথচ দুঃখের বি[illegible] বরেনবাবু তাঁর নিজের রচনাতে গতানু[illegible] গতিকতার ধারা অতিক্রম করতে পারেন[illegible] এবং ইদানীংকালের গল্পে প্রবেশ করতে [illegible] দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন তাও গ্রহণ করেননি।

যাই হোক এমনি আরো অনেক অ[illegible] নিয়ে আলোচনা হতে পারে কিন্তু বোধ[illegible]

তার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আমার মনে হয়েছে, কতগুলো ব্যক্তিগত ভেসে থাকা চিন্তা-ভাবনা, যা মোটেও যুক্তি-দৃঢ় নয়, জায়গায় জায়গায় স্থাপন করে এই রচনাটি গড়ে তোলা হয়েছে এবং অন্যের তাতে কিছু করার নেই। কিন্তু আমাকে এই চিঠি লিখতে হোল রচনার এই নিচের অংশটুকুর জন্যে ঃ

'ফলে লেখক যত বেশী পরিমাণ বিশেষ এক গোষ্ঠী ভাবনায় অনুগত ঠিক ততখানি তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি যান।'

এবং এ কথাটাও কোন পশ্চাৎপট না রেখে ছুঁড়ে দেয়া গেল মাত্র। পাঠককে এই রকম অসত্য একটা সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবার উদ্দেশ্য আমার কাছে স্পষ্ট নয়। কোন সে বিশেষ গোষ্ঠী এবং কিভাবে তিনি বুঝলেন, আমি সেই বিশেষ গোষ্ঠী ভাবনায় অনুগত, একথা অন্তত আমার জানা দরকার।

যেহেতু কোন ভুল তথ্য পাঠককে দেয়া ঠিক নয়, দিলেও তা শুধরে দেয়া উচিত। অতএব আশা করব, এই চিঠি সাপ্তাহিক অমৃতে ছাপা হবে।

অতীন্দ্রিয় পাঠক, কলকাতা-৯

বারবধূ

৮ এপ্রিল অমৃতে বারবধূ নাটক সম্পর্কে আপনার লেখাটি পড়লাম। আপনার মত অনুযায়ী যে বিশেষ বিশেষ গুণে নাটকটি উৎকৃষ্ট, তার মধ্যে নাটকের বলিষ্ঠ বাস্তবতা, এক বারবণিতার হৃদয়ের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার যথোচিত গদ্যময় উপস্থাপনা, তীব্র জনপ্রিয়তা প্রধান। প্রশ্ন রাখছি ঃ—

১। বলিষ্ঠ বাস্তবতা থাকলেই কি কোন কর্ম শিল্পকর্ম হয়? 'হোটেল স্নোফক্স' ছবিটি এবং 'প্রজাপতি' নাটকটি বাস্তবধর্মী, শিল্পধর্মী কি?

২। নাটকের প্রতিপাদ্য নিষ্করুণ হলে, গঠনরীতিতে সেই তীক্ষ্ম কাঠিন্য থাকলেই কি সেটা সার্থক সৃষ্টি হতে পারে? বারবণিতাদের নিষ্করুণ জীবনালেখ্য 'সংসার সীমান্তে' ছবিটির আঙ্গিকে লিরিকের ছোঁয়া আছে—ছবিটি কোন্ অর্থে অসার্থক?

৩। সবশেষে জনপ্রিয়তাই কি কোন কর্মের গুণাগুণ বিচারের মাপকাঠি? 'সংগম', 'সোলে' এবং 'সব্যসাচী' বেশ জনপ্রিয় হয়েছে, ছবিগুলো কি শিল্পসম্মত?

অসীমবাবু 'জনৈকের মৃত্যু' নাটকটি একদিন করে মার খেয়েছেন, আজ 'বারবধূ' তাঁকে প্রচুর অর্থ ও সম্মান দিয়েছে, দিচ্ছে; এই সম্মান ও অর্থে তিনি কি খুশী? বিবেকের মৃত্যু যদি না হয়ে থাকে, অসীমবাবু বলুন তো, 'জনৈকের মৃত্যু' এবং 'বারবধূ'—এই দুটির মধ্যে কোনটি আপনার নাটক, কোনটি ব্যবসা?—তপতী মোদক, শিবপুর, হাওড়া।

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন

'অমৃত' পত্রিকার ২২।৪ সংখ্যায় 'স্বামী বিবেকানন্দ ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন' লেখাটিতে দেখলাম লেখিকা প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত সিস্টার ক্রিস্টিনের স্বামীজী-স্মৃতির অংশবিশেষের সঙ্গে ডাঃ বশীশ্বর সেনের সংগ্রহে রাখা স্মৃতিকথার ঈষৎ পার্থক্য আছে দেখিয়েছেন। প্রবুদ্ধ ভারতে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত অংশ আমরা দেখেছি, তাতে বেশ কয়েক সংখ্যায় 'অল রাইটস রিজার্ভড' লেখা আছে। বলাবাহুল্য স্বত্ব ডাঃ বশীশ্বর সেনের দ্বারাই সংরক্ষিত। আমি নিজে সে-কথা স্বয়ং ডাঃ সেনের মুখে শুনেছি। এক্ষেত্রে 'প্রবুদ্ধ ভারতে' ১৯৩১ সালে স্মৃতিকথা প্রকাশিত হবার পরে বহু দিন ডাঃ সেন জীবিত ছিলেন। তিনি পাঠ-ভিন্নতার বিষয়ে কিছু বলেছেন বলে জানি না। আমরা ডাঃ সেনের মুখে আরও শুনেছি, তিনি সিস্টার ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথা গ্রন্থাকারে প্রকাশে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু কার্যগতিকে তা হয়নি। সে ইচ্ছা যে ছিল, তা প্রবুদ্ধ ভারতের ১৯৩১ ডিসেম্বর সংখ্যায় সম্পাদকীয় নোটস্ অ্যান্ড কমেন্টস-এর মধ্যে দেখা যায় ঃ

> "We do not mean to continue the memoirs in the next year. A portion is stil left; and the whole thing will soon come out in book form ".

বিমল ঘোষ
হাওড়া-৪

জীবন-শিশি

একজন লেখক যা লেখেন তাই লোকে আদর করে পড়ে। আদর করে বেশি বেশি দরে কেনে। লেখক ছিলেন তেঁতুলতলায়। উঠে এলেন বকুলতলায়। থাকতেন গোলপাতার ঘরে। উঠে এলেন পাকা ঘরে। দক্ষিণ খোলা জানলা। জানলাতেই বকুল গাছটার ফুল। বাতাস উঠলে বকুলের গন্ধে ঘর ভরে যায়।

লেখকের বউয়ের নাম চামেলি। ভাল রান্না করে। স্বামীঅন্ত প্রাণ। লেখককে ছোট্ট হাঁদো বলে ডাকে। লেখকের একটি সন্তান। ছেলে। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে ক্লাশ নাইনে ফার্স্ট হয়। সব সাবজেক্টে আশির ওপর নম্বর।

লেখক তার অফিসে মাস গেলে ডিডাকশনের পর ৯৫৩৪ টাকা মাইনে পায়। বাড়িভাড়া ১৯৭৩ সালের রেটে মাত্র ৪৫ টাকা। ১৯৩৭ সালের দরে একটি মুদির দোকান তাকে মাসকাবারি জিনিসপত্র দেয়। চামেলি খুব ভালো। রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। গলা ভালো। কণিকার অনুরোধে সে রেকর্ড করেনি। রেডিওতে গায়নি। গাইলে কণিকা-সুচিত্রার অন্ন হত না।

নিজে লেখক কণ্ঠে আমির খাঁ, ছোটবেলায় দশ বছর আগের উত্তম, স্বভাবে মনোহর। লেখক বছরে চারখানা উপন্যাস, ষাটটি গল্প আর তিনটি রম্য রচনা লেখেন। সবাই মাথায় ঠেকিয়ে পড়ে।

কোন অভাব নেই। নীরোগ শরীর। প্রচুর সুনাম। জমা সুদের চাপে ব্যাংকে রাখা টাকা ফেঁপে উঠছে। গাড়ি কখনো খারাপ হয় না লেখকের। চালক বড় সুন্দর চালায়। পেট্রল তিনি কিনতে পান ১৯৫৮ সালের দামে। লেখক বলে এই ব্যবস্থা।

ভগবানে বিশ্বাস, সন্তানস্নেহ, পত্নী-প্রেম, উপন্যাসের ঘন ঘন এডিশনের ভেতর লেখক একদিন জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিন ঘন্টা। কোন গল্প মাথায় এলো না।

সেদিনই বিকেলে ট্রাংক কলে বম্বে থেকে শক্তি সামন্ত বললেন, আপনার এই বারো পাতার গল্পটা আমরা ৭৫০০০ টাকার বেশি দিতে পারছি নে। আপনি যদি রাজি হন---

ওটা পুরোপুরি ১ করে দিন। হাফ অ্যান্ড হাফ—

বেশ। হাফ চেকে পাবেন। বাকিটা—

তাহলে কাল সকালেই লিখতে বসছি।

লেখক লিখতে বসলেন। বেলা ন'টায়। আবার টেলিফোন এল।

আপনি গল্পের লোকাল দেখতে একবার দার্জিলিং, শিলিগুড়ি ঘুরে আসুন। ভুটানের পথটাও দেখবেন। মুন্টেসিলাং অব্দি অবশ্য যাবেন। শনিবার বেলা দশটায় দমদম থেকে প্লেন ধরবেন। বাগডোগরায় আপনার জন্যে গাড়ি থাকবে।

সাতদিন ধরে ঘুরে ফিরে লেখক ফিরে এলেন। লিখতে বসলেন। লেখা আর এগোয় না। চামেলিকে বললেন, কি হয়েছে বল তো?

তাই তো দেখছি। লেখা গল্প খেলিয়ে বাড়াতে পারছো না। এমন তো হয় না তোমার ওগো—

তাই তো দেখছি। এক কাজ করি। এ গল্প যেখানে লিখেছিলাম—সেখানে ঘুরে আসি একবার।

সেই তেঁতুলতলায়? চিনে যেতে পারবে?

বাঃ! ওখানেই তো আমি জন্মেছি। বড় হলাম।

সে সময় তো আর নেই।

সেই তখন-এ যদি যেতে পারতাম আবার—

তখন তো তোমার চাল-চুলো ছিল না।

বেশ ছিলাম কিন্তু। কলম ধরলেই লেখা আসতো।

তখন তো তুমি এক জায়গায় বেশি দিন থাকতেও পারতে না।

থাকবো কি করে! ঘরভাড়া বাকি পড়তো। সেই সময় তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল চামেলি।

মনে পড়ছে। তুমি সেই পাড়ার পলিটিকাল দাদাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে। বলেছিলে—লোকালিটির উন্নতির জন্যে দরকার হলে আইন করে বস্তির ঠিকা প্রজা ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে। পরিবর্তন আনতে হবে—

তখন তুমি গরম গরম কাজ করে বসতে—নিঃশব্দে—

হ্যাঁ চামেলি।

এখন পারো না কেন?

অনেকদিন কোন ব্যাপারেই ফুঁসে উঠে প্রতিবাদ করিনি। সব কিছু মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মাথা নিচু করে মেনে নেওয়ার যুক্তিও নিজে নিজে তৈরি করে নিয়েছি। ভেবেছি—এটাই স্বাভাবিক। এমনই হওয়ার কথা ছিল। আসলে তুমি চামেলি—

আমি? আমি কি করেছি?

আমি তোমার জন্যে—তোমাদের জন্যে অনেকদিন সাহস করে জলে ঝাঁপ দিতে পারিনি।

একথা বোলো না ওগো। তুমি সাহস করে ঝাঁপ দাওনি তাই—

দিতে পারিনি। পারিনি তোমার জন্যে চামেলি। খোকনের জন্যে—

একদম বাজে কথা। তুমি ঝাঁপ দাওনি নিজের জন্যে। নিজের আরামের জন্যে—

সেদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর লেখক একা একা বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে।

তেঁতুলতলায় ঘোরাঘুরি করল অনেকক্ষণ। কাউকে চিনতে পারলো না। লোকজন পালটে গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে তেঁতুলতলার শেষ দিকে গাছতলায় এক সাধুর সঙ্গে তার দেখা হল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এই চেহারার কিছু সাধু ছড়ানো আছে। সাধু লেখককে দেখেই বলল, বোস। তোমার মনের অবস্থা আমি জানি।

বলুন তো কি অবস্থা?

তোমার লেখা আসছে না। এই তো—

হ্যাঁ।

জীবনকে যতখানি ব্যয় করবে—ঠিক ততখানিই তোমার লেখায় আসবে বৎস।

জীবন ব্যয় করতে ভুলে গেছি বাবা।

তাহলে এক শিশি 'জীবন' দিচ্ছি। নিয়ে যাও। ঝোলা থেকে বের করে সাধু এক শিশি 'জীবন' দিল। সাত দাগের ওষুধ। সাতদিন সকালে খাবে বৎস।

দাগ দেওয়া আছে?

হ্যাঁ বৎস। পড়ে দ্যাখো।

লেখক পড়ে দেখলো। শিশির গলা থেকে পা অব্দি সাত দাগে সাতটি কথা পর পর লেখা রয়েছে।

কল্পনা। পরিবর্তন। প্রতিবাদ। অনিশ্চিতি। নিরাপত্তাহীনতা। মানবিকতা।

একদম শেষ দাগে লেখা রয়েছে—প্রকৃতি।

লেখক তেঁতুলতলার রাস্তায় দাঁড়িয়েই জীবনের শিশি থেকে পয়লা দাগ খেয়ে নিল।

তখন এই সাধু, গাছতলা, জীবন-শিশি—সবই লেখকের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতে লাগলো। —**বৈকুন্ঠ পাঠক।**

অন্যত্র

কবি কাঁদে দুঃখে নয়, সুখের অতল
ঊর্মিনাদে সমুদ্রের মত কবি গুমরে
কেঁদে ওঠে।

অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। আগুনা

শরৎ তোমার গফুর কাঁদে আমার ঘরে।

ভারতী রুদ্র। স্ফুলিঙ্গ

আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো চুণীর দর্শনীয় গোল, রেফারীর অফসাইডের বাঁশী আর শ্রাবন্তীর হাসি।

জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়। ছন্দিতা

বিস্মৃত হবার নন যোগেন্দ্রচন্দ্র বস

'যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী'র সুন্দর প্রথম খন্ডখানি হাতে নিয়েই আমি চমকে উঠেছিলাম। তাহলে লাভালাভের অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়ে এককালের বিখ্যাত অথচ একালে বিস্মৃত লেখকের রচনাবলী প্রকাশের দায়িত্ব নেবার মতো প্রকাশনী সংস্থা এ রাজ্যে রয়েছে। এই ভেবে 'গ্রন্থমেলা'কে আমি শুধু মনে মনে সাধুবাদ জানিয়েই সন্তুষ্ট হতে পারিনি, 'অব্যবসায়িক' মনোভাবের পরিচায়ক হলেও সৎ ও সাহসিক বলে 'গ্রন্থমেলা' প্রকাশনীকে নিজে গিয়ে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে এসেছি 'যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী' প্রকাশে উদ্যোগী হওয়ায়। আজকের যুব সমাজের কাছে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু নামটি হয়তো তেমন পরিচিত নয় কিন্তু এমন সময় ছিল যখন যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় থাকাটা সকলের কাছেই গৌরবের বলে মনে হতো।

একাধারে সাহিত্যিক, দৃঢ়চেতা সাংবাদিক, বহু পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকের প্রকাশক এবং রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সঙ্গে সংরক্ষণশীলতার ব্যাপারে অনেকের মতভেদ থাকলেও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর দান বিস্মৃত হওয়া অন্যায়। আমার বেশ মনে আছে আমাদের গ্রামের বাড়িতে আমার পিতামহ সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীর নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন এবং অর্ধশতাব্দী পূর্বে এই বঙ্গবাসীর মাধ্যমেই সংবাদপত্রের তথা সাংবাদিকতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। বড় হয়ে জেনেছি, কেবলমাত্র বাঙালী পাঠকের জন্যে সাপ্তাহিক বাংলা বঙ্গবাসীর সাফল্যেই যোগেন্দ্রচন্দ্র সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি, আমাদের দেশে

হিন্দি ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা বেশী, তাই তিনি হিন্দীভাষী ভারতীয়দের সংবাদ-তৃষ্ণা মেটাতে এবং তাঁর মতবাদে সেই বিরাট সংখ্যক লোককে আকৃষ্ট করতে বাংলা সাপ্তাহিকের আট বছর পর অর্থাৎ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কাশীর হিন্দি ও ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিত অমৃতলাল চক্রবর্তীকে সম্পাদক নিযুক্ত করে সাপ্তাহিক হিন্দি বঙ্গবাসী প্রকাশ করলেন। সারা উত্তর ভারত জুড়ে যোগেন্দ্রচন্দ্রের বাংলা ও হিন্দি সাপ্তাহিক দুখানির অভূতপূর্ব প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে অনুভূত হতো। অনেকে মনে করেন, বঙ্গবাসী পত্রিকার এই প্রভাব লক্ষ্য করেই বাল গঙ্গাধর তিলক মারাঠী ভাষায় তাঁর বিখ্যাত 'কেশরী' পত্রিকা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয়েছিল সাহিত্যাচার্য অক্ষয়কুমার সরকারের 'সাধারণী' পত্রিকায়। অক্ষয়কুমারের নীতি অনুসারে যোগেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ

ও উদীয়মান লেখকদের (স্বারিক গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, চন্দ্রশেখর মু পাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, ইন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, পঞ্চানন ত রত্ন, জলধর সেন, অক্ষয়চন্দ্র সর কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গু বিপিনচন্দ্র পাল, দীননাথ সান্যাল প্রভৃ বাংলা বঙ্গবাসীর লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভু করে নিয়েছিলেন। সাপ্তাহিক হিন্দি ব বাসীতেও এসে যোগ দিয়েছিলেন বা মুকুন্দ গুপ্ত ও প্রভুদয়াল পাণ্ডে প্র বিখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিকেরা। এ স কারণেই সে সময়ে এমন প্রভাব-প্রতাপ হ ছিল বঙ্গবাসীর যে হিউম সাহে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস লক্ষ টাকায় বঙ্গবা পত্রিকা কিনে নিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছি কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁর পত্রিকা বি করতে কিছুতেই রাজী হননি। বাংলা ও হিন্দি উভয় 'বঙ্গবাসী'ই যে অত্যন্ত জন হয়েছিল তাদের দীর্ঘায়ুই তার প্রমা বাংলা পত্রিকাখানি ৬৮ বছর এবং হিন্দিখ ৫১ বছর চলার পর 'বঙ্গবাসী' ১৯৪৯ স বন্ধ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য বা বঙ্গবাসীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে যে 'সঞ্জীব তার আবির্ভাবের দু বছর পরে এবং 'হিতবাদী' দশ বছর পরে আত্মপ্রকাশ ক ছিল সেই সাপ্তাহিক দুখানিও আর নেই। কিন্তু শুধু বাংলা ও হি সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' প্রকাশ করেই যোগে চন্দ্র ক্ষান্ত হননি, তিনি 'জন্মভূমি' না একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা বেশ কিছুকা পরিচালনা করেন এবং তাঁর 'দৈনিক' না দৈনিক পত্রিকাটিও চলে বছর এগারো 'দৈনিক'-এর মূল্য প্রথম ছিল এক পয় পরে তার দাম করা হয়েছিল আধ পয়সা। এই 'দৈনিক'ই আদি বাংলা দৈনিক 'ইলাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়ান নিউজ' সচিত্র ইংরে মাসিক পত্রিকা এবং ইংরেজি সান্ধ্য দৈনি 'টেলিগ্রাফ' প্রকাশ করেও যোগেন্দ্রচ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমি গ্রহণ করেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র এমনি একজন কর্মী যিনি সাংবাদিক হিসাবে তো বটেই বাঙালী চরিত মডেল ভগিনী, চিনিবাস চরিতামৃ রাধানাথ ও মহীরাবণের আত্মকথা প্রভৃ গ্রন্থের লেখক হিসেবে এবং বাংলা হিন্দিতে বহু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ সুলভে বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ করে এবং স সঙ্গে বহু মূল শাস্ত্রগ্রন্থেরও সু সংস্করণ ছাপিয়ে দেশবাসীর অশে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ব ইংরেজি গ্রন্থের তিনি যেমন বাংলায় অনু করিয়েছিলেন তেমনি হিন্দি অনুবাদ প্র করে হিন্দিভাষীদেরও কৃতজ্ঞতাভাজন হ ছিলেন। রঙ্গব্যঙ্গাত্মক রচনায় যোগেন্দ্রচন ছিলেন পঞ্চানন্দের অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো

ায়ের সমধর্মী। ঝিমিয়ে পড়া বঙ্গ-ানদের সর্বদা সজাগ-সচেতন রাখার জন্য চেষ্টার অন্ত ছিল না। এমন একজন স্থানীয় বাঙালী স্বদেশপ্রেমিককে লের ও ভবিষ্যতের বাঙালী যাতে ভুলে ায় সে লক্ষ্য সামনে রেখে 'যোগেন্দ্রচন্দ্র রচনাবলী' প্রকাশ করায় 'গ্রন্থমেলা' সমগ্র বাসীরই ধন্যবাদার্হ। রচনাবলীর প্রথম প্রকাশিত হয়েছে, আরো দু'খণ্ড াশিত হবে। প্রতি খণ্ডের সঙ্গেই যোগেন্দ্র র স্বর্গত মহেন্দ্রকুমার বসু রচিত গেন্দ্র স্মরণী'র এক একটি অংশ প্রকাশিত ছে। এই সংযোজনটি বাস্তবিকই এই াবলীর এক অমূল্য সম্পদ। এ পড়লে জেই বুঝা যাবে হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর ুগত্য থাকলেও ধর্মের ধ্বজাধারী হিন্দু-যুক্তি নির্ভর কঠোর সমালোচনা করতে ন কুণ্ঠিত হতেন না এবং কোনো কোনো ত্রে প্রগতিশীল আন্দোলনও তাঁর াবাসী' পত্রিকার সমর্থন লাভ করেছে। হোক, আমার মনে হয় 'যোগেন্দ্র ণী'র তিন ভাগ একত্র করে একটি লা ভূমিকাসহ পৃথক পুস্তিকা হিসাবে াশ করলে মূল গ্রন্থের প্রচারে তা' য়ক হতে পারে। প্রায় সাড়ে ছ'শ' পৃষ্ঠার মলাটে বাঁধানো সুন্দর কাগজে এমনি খানি গ্রন্থের দাম বর্তমান বাজারে ুতেই কুড়ি টাকায় রাখা সম্ভব হয় না নে একটা আদর্শের প্রেরণা না থাকলে। জন্যেই আরেকবার ধন্যবাদ জানাই থমেলা'র কর্তৃপক্ষকে, তবে একটি মাত্র ুরোধ জানাই, মুদ্রণপ্রমাদগুলি যেন বর্তী সংস্করণে যথার্থভাবে সংশোধিত ।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

লেখকের ইচ্ছা পূরণে গল্প

একশো উনসত্তর পৃষ্ঠার একখানা ন্যাস (চার পাতা টাইটেল পেজ ধরে) ং শুরু হয়ে হঠাৎই শেষ হয়ে গেল। পাওয়া গেল গল্পের বিস্তার, না পাওয়া া গল্পের কোন পরিণতি। দিলীপকুমার ন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'জ্যোৎস্নায় অরণ্যে া' স্বপ্নেন্দুর স্বপ্ন ও সংগ্রামের গল্প। ং আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে খকের ইচ্ছা পূরণের গল্প। লেখক র নায়ককে মনের মত করে সাজিয়েছেন। নায়ক স্বপ্নেন্দুকে কেন্দ্র করে পাশা-শি অনেক চরিত্র ভীড় করে এসেছে। ের কারও কোন বৈশিষ্ট্য নেই। একমাত্র শিষ্ট্য এদের অধিকাংশই কামার্ত, লিং ক্যাম্পের সার্ভেয়ার মিঃ দত্ত, লিং এ্যাসিস্ট্যান্ট কমল সিমলাই, ডক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ দীপংকর থেকে ু করে স্বপ্নেন্দু পর্যন্ত (এর কারণটা বোঝা গেল না)। স্বপ্নেন্দুও হাটে া ফর্সা আদিবাসী মেয়েকে নিয়ে ঘর-ধর স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নেন্দুর পারি-র্শ্বকের মধ্যে একমাত্র মিঃ বোসের চরিত্রই জ্জ্বল। কিন্তু তাঁকেই যে হঠাৎ কেন এরকমভাবে মেরে ফেলা হল সে রহস্যও অজানা থেকে গেল। তাছাড়া, গোটা উপন্যাসেই স্বপ্নেন্দুর চিন্তা-ভাবনা আত্ম-কেন্দ্রিক। পারিপার্শ্বিক সমস্যা বা সমাজ তাকে বিদ্ধ করে না। সেই জন্যে স্বপ্নেন্দুর চরিত্রও আমাদের চিন্তা-ভাবনায় কোন অবকাশ দেয় না। মনে হয়, ড্রিলিং ক্যাম্পের সঙ্গে লেখকের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি, ছৌ নাচ বা টুসু উৎসব যেন জোর করে চাপানো। ওটাকে বাদ দিলেও চলত। এর মধ্যে আবার ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য আর সুনীল গাঙ্গুলীকে নিয়েই বা খামোকা টানাটানি কেন? এতসব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর উৎসর্গপত্রে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক বিমল করের হেনস্থা দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়। তবে প্রকৃতির বর্ণনায় লেখকের একাত্মতা প্রশংসনীয়। ভাষাও ঝরঝরে। ছাপার ভুল একেবারে নেই বললেই চলে।

সুগত মিত্র

জ্যোৎস্নায় অরণ্যে একা : দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ২-এ নবীন কুণ্ডু লেন। কলকাতা-৯। দাম আট টাকা।

পত্রিকা

অধুনা সাহিত্য। সম্পাদক, সুধাংশুকর মুখোপাধ্যায়। ষোড়শ সংকলন, ফাল্গুন—১৩৮৩। হালিশহর, ২৪-পরগণা।

দীর্ঘ নীরবতার পর অধুনা সাহিত্যের ষোড়শ সংকলনটি হাতে এল। সমকালের ভাবনা জিজ্ঞাসায় মগ্ন বারোজন গল্পকার কিন্তু নীরব না। এদের সরব অস্তিত্ব চোখে পড়ে। বারোজন গল্পকারদের এক ছিন্ন কোরাস বর্তমান সংখ্যাটি।

উদয়ন ঘোষ নিঃসঙ্গ, জীবনের প্রতি-কূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফলত তিনি অসহায়, মানসিক বিক্ষিপ্ততায় টালটমাল। অমল চন্দের গল্প ছুটছে অথচ ছোটার মধ্যে তার সংগোপন বিশ্রামটি চোখে পড়ার মত। অনুসন্ধিৎসায় হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় শিশুর মত, অর্থাৎ সমুগ্ধ। সমীরকান্তি বিশ্বাস নির্ভয়ে রিপোর্ট পেশ করেছেন। ব্যক্তির মনের চাবি তিনি নিরন্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সুব্রত সেনগুপ্ত সবসময় মগ্ন, সেই মগ্ন-চেতনার তল থেকে সবসময় সর্বত্র আত্মানু-সন্ধান স্বর শোনা যায়। বার বার ভয়ংকর খেলার মাঠে নামতে বাধ্য হন সুব্রত নিয়োগী। উদ্ধার চান তিনি, কিন্তু পান না, কেন না ঘটে যাওয়া তাঁর মুঠোর বাইরে। অরুণেশ ঘোষ তার নিজের অবচেতন থেকে শেকড়-বাকড় শুদ্ধ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। স্বভাবকে নিয়ে ভেঙেচুরে গর্জন করতে করতে ছুটে যাচ্ছেন বলরাম বসাক। ভয়ংকর কথা হচ্ছে লেখায় সমস্ত কাউকে ভয় করেন না শান্তিবিধান হালদার। অশোক বিশ্বাসের কলম পরিচিত হয়ে উঠল। অমর মিত্র গ্রাম্য গাছ-গাছালির চারা নিজের বাগানে পুঁতলেন—আশা ফুল ফোটার। ধনঞ্জয় দাস আমাদের সকলকে অন্য এক মেলায় নিয়ে যেতে চান।

সুধাংশুর মুখোপাধ্যায়ের আলোচনাটি আন্তরিক, কিন্তু 'ষাট সত্তরের গল্প' এবং 'গল্প এক দশক'—এরাই কি শুধুমাত্র 'একটি যুগের গল্পমানসের প্রতিকৃতি'?

মৃণাল সেন

প্রতিশ্রুত সাহিত্য

ফরাসী লেখক অ্যারাগন-এর একখানা উপন্যাস আছে যার নাম 'প্যাসেঞ্জার্স অফ ডেসটিনি'। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একটি পুরুষ যার বিশেষ অহংকার সে রাজনীতিতে সম্পূর্ণ উদাসীন, তার জীবনে রাজনীতি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। সংবাদপত্রে সে একমাত্র ফটকা-বাজারের খবর পাঠ করে। কাহিনীর শেষ দিকে, এই পুরুষটি একটা এ্যাকসিডেন্টে দারুণভাবে আহত হল। আঘাতের ফলে তার দেহ আংশিক-ভাবে অবশ হয়ে গেল। মুখ দিয়ে সে কেবল একটি শব্দই উচ্চারণ করতে পারল পলিটিক। এবং এই একটি মাত্র শব্দের মাধ্যমেই তাকে এখন বুঝিয়ে দিতে হত কি তার চাই—ক্ষিধে পেলে খাদ্য, তৃষ্ণার জল, জামা-কাপড়, বই, রেকর্ড, সবকিছু। অ্যারাগন এই বিশেষ ধারাল উপন্যাসে বোঝাতে চেয়েছেন, বিংশ শতাব্দীর জটিল সভ্যতা সংকটে, রাজনীতি থেকে কোনও মানুষের রেহাই নেই, কেননা যা কিছু ঘটছে এবং ঘটছে না, তার মূলে রাজনীতি।

এ কথাটাই মূর্ত হয়েছে সার্ত্রের অন্যতম উপন্যাসে, যার নাম রিপ্রাইভ। কাহিনীর পরিবেশ ১৯৩৮ সালের মিউনিক ক্রাইসিস—বৃটেন ও ফ্রান্সের অনুমোদন নিয়ে হিটলারের চেকোস্লোভাকিয়া দখল। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র হিটলারের দাবী ও চেম্বারলেন এবং দালা-দিয়েরের আত্মসমর্পণ দ্বারা প্রভাবিত। এর মধ্যে রয়েছে এক নিরক্ষর কৃষক, যার নাম গ্রস লুইস। নেহাৎ সরল গ্রামীণ ভালোমানুষ। সে কারুর ক্ষতি করতে চায় না, কারুর বিরুদ্ধে নালিশ নেই তার। সে শুধু চায় নির্বিবাদ শান্তিতে নিজের স্ত্রীপুত্রকন্যা আর জমি নিয়ে বেঁচে থাকতে। অথচ সেও ধরা পড়ে গেল এবং বিরাট চক্রান্তের ঘূর্ণিজালে, স্থানান্তরিত হল এক শহর থেকে অন্য শহরে এবং সেখান থেকে অন্য স্থানে, এবং অবশেষে নিক্ষিপ্ত হল কারাগারে। কেন? শুধু 'রাজনীতি'র জন্য, যা এই নিরক্ষর চাষী জানে না, বোঝে না, বুঝতে চায়ও নি কোনও দিন। উপন্যাসে সার্ত্রে বলতে চেয়েছেন, তুমি রাজনীতি এড়িয়ে চলতে পার, রাজনীতি তোমাকে এড়িয়ে চলবে না, রেহাই দেবে না।

যে দুজন বিখ্যাত ফরাসীর নাম করলাম তাঁরা দুজনেই সেই জাতের লেখক যাকে ফরাসী ভাষায় বলা হয় engage; ইংরেজীতে কমিটেড। বাংলায় বলা যেতে পারে প্রতিশ্রুত। Literature engagee অথবা প্রতিশ্রুত সাহিত্য প্রথম সংহত অবয়ব লাভ করে যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে। জার্মান দখলের এবং জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের (অকুপেশন এণ্ড রেজিসটেন্স) অভিজ্ঞতা থেকে আধুনিক ফরাসী প্রতি-শ্রুত সাহিত্যের জন্ম। এই দুই পরস্পর-সংযুক্ত অভিজ্ঞতায় বহু ফরাসী বুঝতে পেরেছিল যে বর্তমান সভ্যতার মূল্যবোধগুলিকে পুরোপুরি যাচাই করে না দেখলে, পুনর্বিশ্লেষণ না করলে, বোঝা যাবে না মানুষ তার ভাগ্যকে কি ভাবে বিপন্ন করে তুলেছিল তিরিশের দশকে, এবং পুনরায় অনুরূপে সংকটের হাত থেকে বাঁচবার পথ পারবে না বার করতে। প্রতিশ্রুত সাহিত্যের প্রয়োজন তৈরী হল চারুকলার সমস্যাগুলি সমাধানের জন্যে এবং সমাজে চারুকলার স্থান কি, কি সে দিতে পারে সমাজকে এই প্রশ্নের জবাব সন্ধানে। যদিও প্রতিশ্রুত সাহিত্য যুদ্ধোত্তর ফরাসী পরিবেশে জাত, তথাপি এই চল্লিশ বছরে তার অবস্থিতি এবং পৃথিবীর দেশে দেশে বিকাশ, এই সত্যকেই প্রমাণিত করেছে যে বর্তমান যুগে মানুষের অবস্থা বুঝতে হলে, তার ভবিষ্যত জানতে হলে, কমিটেড লিটারেচর একান্ত প্রয়োজনীয়।

এ নিয়ে অবশ্য বিতর্কের শেষ নেই। সাহিত্যিক জোর গলায় বলেন, বলবেন, আর্ট স্বাধীন চিরকালীন, সাহিত্যিকের কোনও প্রতিশ্রুতি নেই নিজের সৃষ্টিশীলতার বাইরে। প্রতিশ্রুত সাহিত্য বিরোধীদের প্রধান নালিশ, এ সাহিত্য আসলে ছদ্ম রাজনীতি, এর উদ্দেশ্য ক্রিয়েটিভ রাইটারদের কোনও বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের পতাকাতলে সমবেত করা। সাহিত্যের যন্ত্রণা, এঁরা বলেন, আধিবিদ্যক (মেটাফিজিক্যাল); রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির দৈনন্দিন সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবির পথ নয়।

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজ সাহিত্যের উদ্দেশ্য জীবনের অর্থ, তাৎপর্য, রহস্য খুঁজে করা। মানুষ এমনি এক রহস্যময় বিষয়, তার মধ্যে এমনি প্রবৃত্তি, ক্ষুধা, অন্বেষণ ও অনুভূতি বর্তমান যে বাস্তব পরিবেশ বাদ দিয়ে অথবা তুচ্ছ করে, এদের সাহিত্যিক তাঁর, এবং মানুষের, আনন্দ বেদনার করতে পারেন। বিশেষত, মনোবিকলন যান্ত্রিক সঙ্গে হাত মিলিয়ে এমন একটি বাতাবরণ সৃষ্টি সক্ষম, এবং করেওছে, যেখানে গোটা মানুষটাকে বাদ দিয়ে তার খণ্ডিত সত্তাকেই তুলে ধরা সম্ভব সমস্ত হিসেবে। দাবী করা সম্ভব, মানুষ মানে তার লিবিডো; মানুষ মানে, ধ্বংসাত্মক অনুভূতি; মানুষ বিচ্ছিন্নতা; মানুষ মানে সামগ্রিক অবক্ষয়। রাজনীতিকে কুৎসিৎ নিচ ও সংকীর্ণ পেশা ছাড়া কোনও রূপে দেখতে অস্বীকার করে, প্রতিশ্রুত সাহিত্য বিরোধীরা বলতে পারেন, বলে থাকেন, ম্যান ডাজ নট বাই পলিটিকস্ এলোন, অথবা, ম্যান ডাজ নট লিভ পলিটিকস্ এ্যাট অল।

ইস্যুটা আসলে কিন্তু পলিটিকস্ নিয়ে ইস্যুটা জীবন নিয়ে। সমাজ নিয়ে। প্রথম মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ বাদ দিয়ে তার অস্তিত্ব তার অস্তিত্ব, বিকাশ, সার্থকতা, ব্যর্থতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই সামাজিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে পরিবেশের মধ্যে মানুষকে বাঁচতে হয়, জীবনের পথ বার করতে হয়, তাকে সূক্ষ্ম ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে না পারলে, বিশ্লেষণ করতে না পারলে মানুষ ধরা পড়তে হয় অনেক রকম ধোঁয়াসার জালে, যাকে যত রকম বুদ্ধিদীপ্ত নামেই চালাতে চাই নে কেন, ধোঁয়াসাই থেকে যায়। বাস্তব আমাদের পৃথিবীতে এত জটিল এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল যে তার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে তাকে বোঝবার উপায় থাকে না। চলতি জীবনের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে না বোঝা যায় পৃথিবীকে, না মানুষকে, না জীবনকে। সরে দাঁড়ালে আর্টের সর্বনাশ হয়ত হয় না—সৃজনী প্রতিভার বিকাশ কত রকমের হতে পারে!—কিন্তু আর্টের অ্যাপীল ও মাহাত্ম্য দুটোই খর্ব হয়ে যায়। আর্টের রাজ্য তো অপরিবর্তনশীল মানব স্বভাব নয়, আর্টের রাজত্ব সমসাময়িক পৃথিবী, সমাজ দেশ মানুষ। প্রত্যেক যুগের নিজস্ব চরিত্র আছে। এ চরিত্রকে সৃষ্টিশীল রূপায়ণের মাধ্যমে নিজেকে করে তোলে। এক একটি যুগের নিজস্ব মৌলিক যে সাহিত্যে তার রূপরসগন্ধ নিয়ে ফুটে ওঠে, আমরা চিরায়িত সাহিত্য বলি। যুগকে আয়ত্তে না সাহিত্য যুগাতীত হতে পারে না।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, যাকে আমরা ইটারনেল সিস্যু বলি তারও একটা সময়গত আচ্ছাদন আছে : সাময়িক চিরন্তন দুটি আত্মবিরোধী সত্য (প্যারাডক্স) নয়। আমাদের যুগে সাময়িক বড় বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, তার কারণ মানবসভ্যতা নানা দিক থেকে এক মারাত্মক সংকটে ধরা পড়েছে। এ সংকটের জাল থেকে কোনও মানুষ আজ আর বাইরে নেই। একদিকে গোটা মানুষ-জাত আজ নিজের অধিকার দাবী করতে শিখেছে, পৃথিবীর প্রাচীন মাটি কাঁপে উঠছে পদাতিক মানুষের জঙ্গী পদধ্বনিতে; বিমান প্রযুক্তিবিদ্যা সভ্যতার সম্পদ ও সম্ভাবনা দিগন্ত থেকে দিগন্তে প্রসারিত হচ্ছে। অন্যদিকে মানুষের চিত্ত-বিত্তকে নতুন কায়দায় শৃংখলিত করে রাখবার প্রচেষ্টাও অবিশ্বাস্যকম বিরাট, মানুষের বিকাশের পথে সৃষ্ট হচ্ছে নতুন নতুন বলিষ্ঠ অন্তরায়, এবং সর্বোপরি, গোটা সভ্যতাকে ধ্বংস করবার আয়োজন একেবারে তৈরী। আমাদের যুগে সাহিত্যিকের পক্ষে কি সম্ভব পথ না বেছে নিয়ে? সমাজ, মানুষ, নির্মীয়মাণ ইতিহাসের দিকে পিঠ দেখিয়ে সাহিত্য কি আজ দিতে পারে দেবার মত কিছু?

যার কোনও সামাজিক, নৈতিক প্রতিশ্রুতি নেই, তার কাছে আজকের মানুষের কি প্রত্যাশা? প্রতিশ্রুতি যে রাজনৈতিক হতে হবে এমন কথা নেই। অ্যারাগন এবং সার্ত্রের উপন্যাসগুলির রাজনৈতিক তাৎপর্য খুঁজে বার করতে হয়। আসল কথা হল : যুগের সঙ্গে যোগাযোগ। সাহিত্যিক তাঁর সমসাময়িক সমাজ, দেশ ও

সব লেখকেরই কোন না কোন প্রতিশ্রুতি থাকে

দুনিয়ার সঙ্গে সৃষ্টির মাধ্যমে সংযুক্ত কিনা : তাঁর কৃতির মধ্যে যুগের মৌলিক স্বভাব ধরা পড়ল কিনা : যুগের মৌলিক দ্বিধা, প্রশ্ন, সংশয়, সংকট তিনি বোঝেন কি না, মানুষকে বোঝাতে পারেন কি না।

প্রতিশ্রুত সাহিত্যের মূলে দৃষ্টিভঙ্গী যে মানুষ, সে সামাজিক জীব। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সমাজের ওপরে নয়। সামাজিক পরিবেশের দাস সে না হতে পারে, কিন্তু তার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এই পরিবেশের প্রভাব। প্রতিশ্রুত সাহিত্যিক, অতএব প্রধানত যে চোখে মানুষকে দেখেন তাতে সামাজিক ও আর্টিস্টিক দৃষ্টি সংমিলিত। প্রতিশ্রুত সাহিত্যিক আর্টকে সমাজমুক্ত স্বতন্ত্র সার্বভৌম সত্তা হিসেবে স্বীকার করেন না। সমাজ-উত্তর অথবা সমাজ-বহির্ভূত আর্টও, তাঁরা বিশ্বাস করেন, একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি।

সব লেখকেরই কোনও না কোনও একটা প্রতিশ্রুতি থাকে। যিনি বলেন, আমি লিখি কেবল, অথবা প্রধানত, নিজের পরিতৃপ্তির জন্যে, স্বকীয় সৃষ্টিশীলতার চাবুক খেয়ে, তাঁর প্রতিশ্রুতি কি শুধু নিজের সঙ্গে? তাঁর প্রত্যয়ের কি একটা প্রাঞ্জল সামাজিক তাৎপর্য নেই? যিনি শুধু অর্থের জন্যে লেখেন, অথবা জনপ্রিয়তার জন্যে, অথবা উত্তেজনার বশে, তাঁরও তো এক ধরনের কমিটমেন্ট আছে! এবং তিনিও তো কোনও বিশেষ সামাজিক পরিবেশের প্রতি লেখার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য স্বাক্ষর করে রাখেন। রাখেন না কি?

ছবির খদ্দের কোথায়!

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

ছবির বাজার কেমন ? ছবির কারবারিদের কিংবা আঁকিয়েদের বাদ দিলে যদি প্রশ্নটা ভাবৎ দেশের সমস্ত সংস্কৃতিবান লোককে জড়ো করে হাত তুলতে বলেন তাহলে নিরাশ হবেন।

কেউ জানেন না কেউ খোঁজ রাখেন না—প্রায় সমস্ত উচ্চ মধ্য নিম্নবিত্তের সকলেই উদাসীন এ ব্যাপারে। তবু ছবি আঁকা হয়। টগবগে রক্তে সমস্ত বেদনা, ক্ষোভ, সুখ সেঁধ করে সুন্দরের জন্ম দিয়ে চলেছেন চিত্রকরেরা এই অবাক ভূখণ্ডে।

আমাদের চারপাশে প্রচুর পরিচিত মুখস্ত বুদ্ধিজীবী ভাবুক ঘুরে বেড়ান—যদি এমনি প্রশ্ন করেন, তাঁরা কিছু বলবেন—যেমন, আমাদের মত দরিদ্র দেশ...বা জনসাধারণের জন্য শিল্পীরা... ইত্যাদি : কিন্তু এসব কোন কথাই নয়। অর্থনৈতিক দারিদ্র্য কোন অন্তরায়ই নয় এসবের। আমাদের শিক্ষায় জীবনে আলু পটলের প্রয়োজনীয়তার কথা জানলেই হয় আর কিছু না। জানেন পৃথিবীর এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে শিক্ষান্তর থেকে ড্রইং পেনটিংকে বাদ দেওয়া হয়? লক্ষ লক্ষ সজ্জিত গৃহ রয়েছে, যেখানে সবকিছু, সংগ্রহ থাকে মৌলিক কোন চিত্রপট ছাড়া——। লক্ষ লক্ষ টাকায় বাড়ি ঘিরে ফেলছে ক্রমশ শহর থেকে শহরাঞ্চলে কটা চিত্রিত দেওয়াল সেখানে? একটু ভুলিয়ে দেবার কিচ্ছু চিহ্ন নেই কোথাও। আমার রুচির পরিচয় দেয় আমার দেওয়াল, সর্বত্র অসংখ্য দেওয়াল ঘেরা রয়েছে জায়গা জুড়ে—মননের ছাপ নেই কোন।

বহুবার পরীক্ষায় নেমেছেন শিল্পীরা—যদি একটু কাছে পেঁছনো যায় জনসাধারণের। কোলকাতায় আর্ট ফেয়ারের উদ্দেশ্যও ছিল তাই যদিও তুলনায় সে প্রচেষ্টা খুব ছোট। তাতেও ফল হয়েছে উল্টো। যে আঙুলে গোনা শিল্পপ্রেমিক আছেন তাঁরা শহরের নিয়মিত প্রদর্শনী থেকে উপযুক্ত দামে ছবি কেনা বন্ধ রেখে আড়ি পেতে থাকলেন আর্ট ফেয়ারের পাঁচশো টাকার ছবি পঁচাত্তরের সুযোগ নিতে।

বোম্বে দিল্লীর তুলনায় কোলকাতার অবস্থা খুব খারাপ। শিল্প সংস্কৃতির ধারকবাহক হিসাবে বাঙালীদের একটা বিশেষ গর্ব আছে—সেটা একেবারে রকবাজি গল্পো। উর্বর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আমাদের জাতে অন্যান্য দেশের চেয়ে সংখ্যায় কম নন—অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নতুন গড়ে ওঠা পরিকল্পিত শহরাঞ্চলগুলো বা দিল্লীর বাঙালীদের ঘনবসতি অঞ্চল কালকাজির চেয়ে গ্রেটার কৈলাস বা অন্যান্য নতুন গড়েওঠা অবাঙালীদের বাড়িতে ছবির সংগ্রহ অনেক বেশী। কোটি-পতিজিদের কথা ছেড়ে দিন—অসহ্য অর্থভাবে তাঁরা হৃদয়কে চেপ্টে ফেলেছেন, শিল্প অনেক দূরের। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়েই ভাবা উচিত—তাঁরা যদি এগিয়ে আসেন, ছবি সংগ্রহের নিয়ম চালু করেন—তবেই বাজার নিয়ে ভাবা যাবে।

একটু তুলনা করলে বোধহয় কিছুটা ধারণা হবে। যদিও প্যারীস পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জমকালো ছবির বাজার। তবুও তুলনায় দেখা যাক—, শুধু প্যারীস শহরে বেসরকারি চিত্রশালার সংখ্যা হল সাড়ে সতেরোশো। শুধু উত্তর কোলকাতা নিয়ে যে অংশটুকু সেইটুকু হল জেনেভা শহরের মাপ—সেখানে গ্যালারীর সংখ্যা একশত বিরানব্বইটি।

আমাদের কোলকাতায় বর্তমানে একটিও চালু কমার্সিয়াল গ্যালারী নেই। বোম্বাইতে আছে ছটি। দিল্লীতে পাঁচটি, দুরবস্থা এইখানে- তাও অধিকাংশ কমার্সিয়াল গ্যালারীগুলোই বিশেষ দ্রব্যগুণ ছাড়া তাঁদের নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ছবিকে ঠাঁই দেন না।

এসব ছাপিয়ে কিছু কিছু চিত্রকর আছেন যাঁরা আপন

প্যারিসে ঘোড়ার পিঠে নীরদ মজুমদার

চেষ্টায় তাঁদের প্রেমিক ঠিক করছেন। তা বড্ড [illegible]শ্রমের বড্ড দুঃখের। মনে হয় এর চেয়ে বিশেষ পন্থী থাক আমাদের, বাতি জেলে দাঁড়িয়ে থাকব আমরা। একটা এত বড় দেশের পক্ষে একটা ললিতকলা এ্যাকাডেমি যথেষ্ট নয়—একটা জাতীয় চিত্রশালাও যথেষ্ট নয়।

বিভিন্ন পেছিয়ে থাকা দেশ বুঝতে পেরেছে জাতকে পুষ্ট করতে হলে শিল্পী গড়া দরকার। তাই উঠে পড়ে লেগেছেন তাঁরা। চিত্রশিল্পীদের নানান সংগঠন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠছে, সরকার শিল্পীদের নানান কাজের সুযোগ দিচ্ছেন। চিত্রে ভাস্কর্যে সরকারী ভবন সাজাবার প্ল্যান নিয়েছেন তাঁরা। সবচেয়ে দুরবস্থা পশ্চিমবঙ্গের আর বাঙালীদের।

ছবির বাজারের এই বন্ধ্যা অবস্থা দেখে অনেক ভাস্কর চিত্রকর আস্তানা নিয়েছেন দিল্লী, বোম্বাই কিংবা অন্য কোন শহরে।

জনজীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছেন, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রকার যাঁরা চিত্রশিল্পীদের মননের অনেক কাছাকাছি বিচরণ করেন। ইউরোপে বোধ হয় এমন কোন কবি সাহিত্যিক, সাংবাদিক চলচ্চিত্রকার নেই যাঁর দেওয়ালে কোন ছবি শোভা পায় না। অথচ যে কোন চিত্রকরই তার সমকালিন সাহিত্য ও কবিতার নিয়মিত পৃষ্ঠপোষক।

আগে আপন গোষ্ঠীর সমালোচনাই ভাল, কারণ অনেক

ঘোয়া সাহিত্যিকের ধারণায় চিত্রশিল্প তার উপন্যাসের প্রচ্ছদই সীমাবদ্ধ।

ছবির বাজার জমতে শুরু করেছে। ক্যালেন্ডার নয়, বরং দিয়ে ঘর সাজানো হোক—একথা বলা আজ আর দুঃসাহসের নয় কলকাতায়। অথচ, বছর দশেক পিছিয়ে গেলে, ছিল। ক ক্যালেণ্ডারের পাতাতেও খুব আর বিরল নয় সতীশ ল কি মকবুল হুসেন অথবা নীরদ মজুমদারের ছবি। নীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সমালোচনাও তত অনুদার নেই। তার উন্নয়নে ব্রতী হয়ে সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত ভাস্কর্য চিন্তিত হয়েছেন। মোটকথা ছবির জগতের আবহাওয়াটা য় একটু বদলাতে শুরু করেছে। শিল্পীর নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা ন সত্যি সামাজিক মূল্য খুঁজে পেল। অবশেষে নিখিল দের মুখে আর রক্ত উঠবে না, কি আনন্দ! কলকাতা, বড়- আর বেলগাছিয়ার বস্তিতে ধূসর কলকাতা চক্ষুষ্মান হয়েছে। এখন ক্রমশঃ আমাদের প্রিয় শহরের চোখে চোখ রাখব; সূর্যের দিকে অপলক চেয়ে থাকাই যার বাসনা সেই ফুলের ভান গগের সূর্যমুখীর মতো, সে চোখ একাগ্র।

কিন্তু যারা চক্ষু দান করছেন তাঁরা কি ভাবছেন? আসলে কিছুদিন খবরের কাগজ পড়ে কি রেস্তোঁরার তুফান গায়ে আমার জানতে ইচ্ছে করছিল তাঁদের আকৈশোর সংগ্রামের পঞ্চাশোত্তীর্ণ বদ্বীপে কিভাবে মুখর হয়ে উঠেছে। তাঁরা কি তুলনামূলকভাবে নিরুত্তেজ? শান্তভাবে শুধু প্রতীক্ষা করছেন এই মহানগরীকে সাজিয়ে দেওয়া হয় একটি স্থায়ী চিত্র- পাঠক ধাঁধায় পড়লেন বুঝি—তাঁদের বলতে আমি টা গ্রুপের' কথা বোঝাচ্ছি, সে গোষ্ঠীটি অবনীন্দ্র- দ্র-যামিনী রায় উত্তর সময়ে সবচেয়ে বড় ঘটনা। এবার তা দল' প্রসঙ্গে সামান্য দু-চারটি কথা বলে নেওয়া যাক।

অবনঠাকুরের নেতৃত্বে উনিশ শতকের শেষাদ্ধে থেকে য় চিত্রকলা আধুনিকতার স্বাদ পায়। ১৯০৭ সাল নাগাদ পরিবারের সান্নিধ্যে জন্ম হয় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ টাল আর্টের। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর বিখ্যাত উত্তরসূরীরা, নন্দলাল বসু প্রমুখ, চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সরল সমন্বয় রচনা করতে। অন্যদিকে যামিনী রায় ছিলেন ব্যক্তিত্ব, সম্পূর্ণ পৃথক তাঁর প্রতিভা আবিষ্কার করেছিল শিল্পধারার মূল রহস্য। এই হচ্ছে আধুনিকতার প্রথম পর্ব। সামাজিক সংকটে তিরিশ দশকের সূচনা থেকেই এই স্থিতি- নষ্ট হতে থাকল। ছবিতে নয় অবশ্য সাহিত্যে। রবীন্দ্র- সৌরকরময় উপস্থিতি প্রশ্নের সম্মুখীন হল। কল্লোল যুগ গদে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। আর তিরিশের কবিতা অগ্রজের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ। ছবিতে অবশ্য ঝড়টা এলো পরে। একটা মজার জিনিস যে নতুন চেতনার সঞ্চারে আমাদের কিন্তু ছবির চাইতে এগিয়ে থাকে। প্রথম বারেও মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র গগন ঠাকুরের পূর্বসূরী। দ্বিতীয়বারেও মানিকবাবু জীবনানন্দ ক্যালকাটা গ্রুপের পূর্বাভাষ।

যাই হোক, সময়টা তখন কি রকম ছিল? একদিকে সারা জুড়ে যুদ্ধ, অন্যদিকে বাংলাদেশের আকাশে অশনি সংকেত তেতাল্লিশের মন্বন্তরের সূচনা। এই দুটোই কিন্তু ছাপ রেখেছিল আমাদের ছবির জগতে। একদিকে তীব্র সামাজিক ও রূঢ় বাস্তবতা নাড়া দিল চিত্রীর পট অন্যদিকে যুদ্ধের গোরা সৈন্য ও অনেক অনেক বিদেশী লোকজন শিল্পীদের গেলেন আধুনিক ইউরোপের বিশাল শিল্প আন্দোলন- কথা: দেখবার সুযোগ দিলেন সঙ্গে নিয়ে আসা [illegible] প্রতিচিত্র। ফলে শিল্পীদের চিন্তিত হতে হল [illegible]

পরিবর্তমান ও বিপন্ন মূল্যবোধকে দেশ ও কালের মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়া যায়। তখন যাঁরা যেমন প্রদোষ দাশগুপ্ত, শুভো ঠাকুর, গোপাল ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ পাল বা পরিতোষ সেন এবং আরও কয়েকজন রোজ সকালে সন্ধ্যায় কখনও প্রদোশ দাশগুপ্তের স্টুডিওতে, কখনও নীরদ মজুমদার বা রথীন মৈত্রর বাড়িতে একসঙ্গে আড্ডা মারতেন তাঁরাই এই দায়িত্ববোধের সূত্রে জন্ম দিলেন ক্যালকাটা গ্রুপের। বেশ পরে যোগ দিলেন সুনীলমাধব সেন। তখন ১৯৪৩! আমাদের চিত্রকলার বর্তমান নাগরিক পর্যায় শুরু হল। দেখা দিল শাহরিক জীবনের উত্তাপ। অভিশাপ। ক্লান্তি। সঙ্গে ছিল নতুন সমাজ ও সভ্যতা গঠনের প্রতিশ্রুতিও। নষ্ট হয়ে গেল সেই অবনীন্দ্রীয় সরলতা ও শান্তি। বলাই বাহুল্য এই পরি- বর্তনটা খুব সহজে হয়নি। বিক্ষোভ ও তিক্ততা ছিল। রক্ষণশীল মহলের বিদ্রূপ ও আক্রমণ কম বর্ষিত হয়নি। তবু সর্বভারতীয় স্তরে কলকাতা দলের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। বোম্বাইতে অনতিকালের মধ্যেই তৈরী হল অনুরূপ একটি দল যার অন্তর্গত ছিলেন অধুনা বিখ্যাত অনেকেই যেমন হুসেন ও পদমসী।

এ'রা ইতিহাস। আজও এদেশে মুক্ত চক্ষু সেসব শিল্পী স্ব-নির্ভর ভূমি খোঁজবার সংগ্রাম করছেন তাঁদের প্রেরণা।

মাঝে পরিতোষ সেন একটি পত্রিকার পাতাতে লিখেছিলেন—তখনকার আঁকা আমাদের সবাইয়ের কাজের একটা প্রদর্শনী এখন করলে কেমন হয়? সেই সূত্রে মনে হল কেমন হয় এ'দের সঙ্গে দেখা করতে পারলে, অন্তত কয়েকজনের সঙ্গে। এই ভাবনা থেকেই আমি কথাবার্তা বলেছি কুড়ি শতকের দ্বিতীয় দশকে যাঁরা জন্মে-

ছিলেন তেমন চারজনের সংগে। সর্বজ্যেষ্ঠ সুনীলমাধব সেন—১৯১০। সর্বকনিষ্ঠ পরিতোষ সেন—১৯১৮। মাঝে আছেন রথীন মৈত্র—১৯১২ ও নীরদ মজুমদার—১৯১৬। আমি কিছু কথা শুনতে চেয়েছিলাম। শুনেছি। এটা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সাক্ষাৎকার নয়।

শ্রীনীরদ মজুমদার

লেক গার্ডেনসের এই বাড়িটি সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল। এত কুকুর! বাড়িতে ঢুকে সেই ভয় ভাঙল। সকালবেলা। নীরদবাবু আদর করছেন তাদের একজনকে। হঠাৎই মনে এলো অনেক দিন আগে ফ্রাঁসোয়াজ জিলোর বইতে দেখা একটি ছবি—পিকাসো আদর করছেন তাঁর প্রিয় আফগান হাউন্ড কাসবেককে। আর না, এখানকার কুকুরেরাও অতিথি সম্পর্কে তত অনাবশ্যকভাবে কৌতূহলী নয়। কফি এলো। শুরু হল আমার জিজ্ঞাসা।

আচ্ছা, আমাদের এখানে ছবির বাজার কি রকম?

—সত্যি কথা বলতে কি, নেই। প্রায় নেই বললেই চলে।

তার মানে ধরা যায় ছবির দেশীয় বাজার নেই।

—অনেকটা সেই রকম। কে কেনে বল? হ্যাঁ, সাহেবরা কেনে। তাও আগে কিনত না। এখন ওরিয়েন্টাল মিস্টিসিজম, ওইসব কথা-টথা শুনে কেনে।

একবার একটা ব্যাঙ্কের ক্যালেণ্ডারে আপনার ছবি দেখেছিলাম।

—হ্যাঁ, ইউকো ব্যাঙ্ক বোধহয়, ওরা, এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো কেনে কখনও সখনও।

গ্যালারিগুলো?

—তুমি ললিতকলার কথা বলছ কি? কেনে। সে আর কটা? নমুনা রাখার জন্য কেনা তো।

ছবির সেই অর্থে দেশীয় ক্রেতা নেই।

—কম। খুবই কম, যেমন ধর আমার একজন ক্রেতা আছেন। বি চৌধুরী। বোম্বাইয়ের বাঙালী। বোঝে টোঝে: বেশ আধুনিক। সে আমার ছবি নিয়ে যাওয়া থেকে, এগজিবিশন করা থেকে, অনেক কিছু করেছে। তারপর এখানে লেডী রাণু: তাঁর অবদান তো জানই।

আগের থেকে এখনকার ছবির বাজার—

—বোধহয় একটু ভাল। মনে আছে সতেরো-আঠারো বছর বয়সে আমার একটা ছবি বিক্রী হয়েছিল। নূরজাহানের ছবি। জলরঙে করা। হয়েছিল আড়াইশো টাকায়। সেটা একটা হৈ চৈ ফেলেছিল, একটা সেনসেসান। এখন কি আর আর সে অবস্থা আছে?

ফ্রান্সে তো আপনি অনেক দিন ছিলেন, বিদেশে নিশ্চয়ই এরকম নয়?

একেবারেই নয়। ফ্রান্সে একটা প্রোফেশন্যাল আছে। ওদেশে, একটা শিল্পীর সংগে তোমার পরিচয় সামাজিক সম্মান বেড়ে যাওয়া। ছবি কিনলে স্ট্যাটাস বাড়ে। কত আর্ট ডিলার আছে যারা ছবির করে। এমনকি বইয়ের বাজারও অন্য রকম। ন্যুমারোত ব্যবস্থা আছে। তাতে ধর জাঁ জেনের বই, প্রথম সংস্করণে কয়েকটা দামী কপি বেরোল। সেগুলো কালচার্ড, লোকে এতে লেখকের একটা গ্যারাণ্টি থাকে, ইকনমিক গ্যারান্টি অনেক ভালো অবস্থা।

আমার একটা জিনিস মনে হয় নীরদদা, আধুনিক অবস্থাটা এর থেকে ভালো তার কারণ শুধু এই নয় যে কম। লেখকেরা ক্রিয়েটিভ লেখা ছাড়াও জনসংযোগ করেই নিজেদের পত্রিকা বের করেই বলুন সাহিত্যের স্বপক্ষে এক গড়ে তুলতে পারছেন। ছবি আঁকিয়েরা সেরকম ব্যাপারে নি

—খানিকটা সত্যি। আমাদের দেশটা ভার্বাল এখানে ওইসব 'প্রণতির প্রেম' ছাড়া কিছু কেউ দেখবে শিল্পশিক্ষা এত কম যে ভাবা যায় না। আর সমালোচকরাও পেয়েছে এক পিকাসোকে। এক সময় বলছিল যামিনী পিকাসো। ভাবতে পারো? আজ বলছে হুসেন আর কাল আবার আরেকজনের মধ্যে পিকাসোকে Judgement of values বলতে কিছু নেই। লোচকদের দোষ দিয়েই বা লাভ কি, শিল্পীরাই বিভ্রান্ত দেখলাম একটা কাগজে লেখা হয়েছে দাদাইজম এখন দিল্লীতে গিয়ে আসর জমিয়েছে! ইউরোপ যা বাতিল অনেক দিন এরা তা নিয়েই নাচানাচি করছে। শেষ হয়ে যায় প্যারিসে ১৯৪৯-এ এখানে এখনো তবে শিল্পী দিকটাও ভেবে দেখায়। যখন তুমি মালরো বলেছিলেন না— You find yoursel a grave yard.

সমালোচনা খুব সাহায্যে আসছে না সেক্ষেত্রে।

—পরিচয় করাচ্ছে। প্রচারও করছে। সমালোচনা দিক আছে। কিন্তু আর্টে সেটাই সব নয়। একটা ছবি নিয়ে কথা বলা মানে ছবিটা কি বিষয়ে আঁকা হয়েছে ফর্ম মানে শুধু এখানে এই রং সেখানে গ্রাফিকস, নয়। আরও অনেক কিছু আছে। যেমন যামিনী রায় কিন্তু জীবনে একটা পিকটোরিয়াল সমস্যা জানে নি। ডিসব্যালান্সের সমস্যা। এই মজাটা যামিনী রায়তে নেই।

ন্তু কোথায়, কিভাবে কোথায় ভাঙলে ভালো হত সেটা সমালোচককে ধরতে হবে। আজকাল আবার আরেক গণ্ডগোল আছে। বি পপুলার করতে হবে সুতরাং মুড়ি মিছরির একদর। কোনটা ভালো ছবি কোনটা খারাপ সেসব গুলিয়ে ফেলছে। কিন্তু বিদেশে দেখ, সমালোচকের কথায় ছবির দাম নির্ভর করে। সমালোচকরাও অনেক মনোযোগী। শিল্পশিক্ষা কত উন্নত মানের। লণ্ডনে ক্লাস র। বক্তৃতা। যদি শোন, সে সে কোন্ স্তরের বিশ্লেষণ—গোটা ইতিহাসটা গল্পের মতন নয় ছবির মতন চোখে ভাসে।

আপনি এরকম কোন সমালোচকের নাম করবেন।

—যেমন আমাদের লণ্ডনের এগজিবিশন। জায়গা ছিল না। আমার মোটে দুটো ছবি। ৩৯ সালে আঁকা—সে সব আমি স্বীকারও করি না এখন। বার্জার ব্যাটা—জন বার্জার কিন্তু ঠিক ক্য করেছিল। ফিরে গিয়ে লিখল

rench formalisation with a poignant sense of ystery.

অথচ আমাদেরই একজন যে অনেক জায়গা জুড়ে ছিল তাঁর সম্বন্ধে ছু, লিখলই না।

বার্জার কি খুব ভালো লেখক? লেখা আমি পড়েছি। ন্তু এদেশে সবচেয়ে বিখ্যাত পিকাসোর ওপর লেখাটা আমার ভালো লাগেনি। পিকাসোকে ধোঁকাবাজ মনে হয়।

—তাই কি? আমি অত খুঁটিয়ে দেখিনি। সেটা যদি করে তা পাকামি করেছে। সমালোচকদের ওরকম পাকামি থাকে। বার্জারকেও। খুব খারাপ ছবি। আমায় নেমন্তন্ন করেছিল। আমি তা বলেছিলাম—তোমার ছবিটবি হয় না। তবে সমালোচনাটা য় হয়। থার্ড রেটেড পেইন্টাররাই তো ফার্স্ট রেটেড ক্রিটিক হয়। ও তো এদেশে নেই। হয় ওই তোমাকে যা বলছিলাম প্রগতির প্রেম নয় মার্কস। বলে নীরদ মজুমদার ধর্ম করছে, বোঝে না ট্র্যাডিশনটা। এই যে তোমাকে যে ছবিটা দিলাম, তন্বিতা, নবমী। পুরুষ প্রতি কলায় ভোগ দান করছেন ও উনি সেটা গ্রহণ করছেন। পুরুষ ও প্রকৃতি, প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তমান চৈতন্য-এর মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে খুঁজে পাই। তবে কাব্য বেশী। আমি বেহুলো বা কথাসারিৎ। সাগরকেও বিষয় করেছি। ঐতিহ্যটাকে আমি বুঝতে চাই।

আপনি কবিতার পাঠক তাহলে।

—তুমি রামপ্রসাদের কবিতা নিয়ে আমার ছবি দেখেছো নিশ্চয়। কিন্তু এখনকার কবিতা? কোথাও রঙ নেই, একটা ভালো ইমেজ নেই। আমি তো বিষ্ণুবাবুকে বলি—মশাই আপনার মার্কসবাদ আমি বুঝি না। ওঁর লিরিকের মেজাজটা আমার বেশ পছন্দ। আমার তো মনে হয় উনি রিশিয়ায় থাকলে দেখতে পান, গাছপালা প্রকৃতি, লেখা 'মাচ মোর কালারফুল' হয়। আর এখানে শুধু আবেগ নয়তো মেধা। তারপর জীবনানন্দ। একটা বই দেখছিলাম। ভালো লাগেনি।

কোন্ বইটা? রূপসী বাংলা বোধহয়।

আমার, যাই বলো, ভালো লাগেনি। তারপর অনেকে বলছে শক্তি চাটুজ্জে। ভালো লিরিক আছে ঠিক কিন্তু বড্ড রিপিট করে। মনে হয় একটা 'অয়েল কালার'-এর ছবি, রঙ জাবড়া করে গেছে। তারপর তো সব বিপ্লবী গর্জন। বিষ্ণুবাবু আমায় মাও-ৎসে-তুঙের কবিতা পাঠিয়েছেন। সে সব কবিতার কথা বলছি না, কিন্তু পুরোন ফর্ম নিয়ে কথা আছে। আমি লিখে দিয়েছি—মশাই, এটা ওই বন্দুকের শব্দের মতোই সত্যি। এত কথা কিসের?

তার মানে আপনি ছবি আঁকিয়ের চোখ দিয়ে কবিতা দেখেন।

—বলতে পারো। জেনে, নাট্যকার জাঁ জেনে, একদিন আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন ফরাসী কবিতা কার কার ভালো লাগে। আমি বললাম মালার্মে, নিস্তব্ধতার মধ্যে কেমন বেহালার ছড় টেনে যায়। জেনে কিছু বললেন না। বললাম পল ভালেরীর ছোট কবিতাগুলো। ধর লে পা (পদক্ষেপ) এ মোঁ ব্যর নেতে ক্যভোপা—আমার হৃদয় তোমার পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই তো নৈশব্দের সৌন্দর্য। জেনে বললেন—বাঃ, তুমি তো কবিতা বোঝ। একটা গতিশীলতাকে একটা ইমেজের মধ্যে ঘুমিয়ে দেওয়া, এটা ছবির সমস্যা।

অন্যান্য শিল্পরূপ আপনাকে কিভাবে প্রভাবিত করে ?,

—তুমি জাঁ ককতোর সিনেমা দেখেছো ?

হ্যাঁ।

—ঐ ককতো আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে। ওর মধ্যে ডাচ ইনটিরিয়র পেইনটিং দেখতে পাবে। অরফিতে দেখো—আলো আঁধারিতে একটা আয়না কি একটা পর্দার পর্যন্ত কি প্রচন্ড রহস্য আর স্তব্ধতা। আমি ককতোকে এসব বলেছিলাম। ককতো খুশী। আমায় বললেন—প্যারিসের লোকজন এসব বোঝে না। হিন্দুরা আমার ছবি বুঝতে পারবে।

এলিয়টের মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল দেখেছিলাম ইংল্যান্ডে। সিনেমার চাইতে নাটকটা আমায় মুগ্ধ করেছিল। স্টেজের জন্যেই হয়ত।

আচ্ছা, প্যারিসে আপনার সঙ্গে সমকালীন কোন কোন শিল্পীর পরিচয় হয় ?

জর্জ ব্রাক। ব্রাকুইস। পিকাসোর সঙ্গে আলাপটা দাঁড়ায়নি। ও তখন আবার মেয়েমানুষের ঝামেলায় জড়িয়ে আছে।

একটা সময় তো ছিল যখন আপনি নীরদ মজুমদার হননি। তখন প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়নি ?

নীরদ মজুমদারের ছবি

—তেমন কিছু মনে পড়ে না। তবে যামিনী রায়মশায় আমা বন্ধুদের সঙ্গে তুলনা করে নাকি বলেছিলেন—নীরদের হবে না ও গরীবের ছেলে। তার (তুমি নাম ছাপতে পারবে না।) হবে, বড় লোক, পয়সা আছে।

আমার কেন যেন মনে হয় ছবির দাম আর কমলে ভালো হয়। আপনি কিভাবে দাম ঠিক করেন ?

—দ্যাখো, নানারক ব্যাপার আছে। ছবির দাম কেউ অঙ্ক ক বার করে না। রং-তুলির খরচা, ভবিষ্যতের ভাবনা আরও কত কি দেশের ভেতরে একটা সমঝদার লোকের জন্য আমি দাম কমা পারি। কিন্তু সাহেব ব্যাটাদের অনেক পয়সা। ছাড়ব কেন ? আমি বেশী দামেই বেচব।

শুনলাম আকাদেমি আপনার 'ত্রিপুরা সুন্দরী' সিরিজে ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী করছে। ললিতকলা আকাদেমিরও নানারক উদ্যোগ আছে। আপনার মনে হয় এভাবে জনসাধারণের মনো পালটাবে ?

—তাড়াতাড়ি বেশী আশা করা যায় না। তবে দেখা যাক না এ দেশটা বড্ড ভাবপ্রবণ। একটু তো চুপ করে দেখতেও শিখ বুঝুক বা না-বুঝুক।

এর একটু পরেই আমি বিদায় নিলাম। নীরদবাবু অনে কথা বললেন। কিন্তু খুব কি আশান্বিত তিনিও ? বুঝলাম না হয়ত বয়স ও অভিজ্ঞতা তাঁকে চঞ্চলতা মুক্ত করেছে।

শ্রীসুনীলমাধব সেন

জার্মান কলা সমালোচক ডকটর ক্লাউস ফিসার লিখেছে

The expression of Eastern mind is not by imitati Ajanta, Elura and other glories of past but b adding new moderns. Mervellous nude compositio by Sunil Madhav Sen proves that there are forms o International understanding in modern imaginati art.

সুনীলমাধববাবুর বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে নজরে আসে এইরকম একটি নগ্নিকাবয়ব। আমি বসবার ঘরে ব মোজাইক চিপসে করা একটি রিলিফের কাজ লক্ষ্য করছি, এম সময়ে সুনীলমাধব সেন এলেন।

আপনি তো 'কলকাতা-দলে' সবচেয়ে পরে আসেন ?

হ্যাঁ, প্রদোষের সঙ্গে আমার আগে থেকেই আলাপ ছিল, কিন্ত পাকাপাকিভাবে যোগ দেই ১৯৪৯-৫০ নাগাদ। তবে আমার ছবি আঁকা শুরু হয় ১৯১৯ সাল থেকে। তখন ন' বছর বয়েস। আ সেই গল্পই আপনাকে শোনাই।

আমার দাদু হরিনাথ রায় ছিলেন বাঁকুড়ায় পুলিশ অফিসার জবরদস্ত লোক। ইনিই আমার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। আ মামাবাড়িতে থাকতাম। পুজো আসছে। একদিন হঠাৎ বেড়া বেড়াতে চোখে পড়ল একটি মহাদেবের মূর্তি। গ্রাম্যশিল্পী। কি সে যে কি হল, সেই প্রথম ইমোশনাল পাঞ্চ, আমি দৌড়ে বাড়ি ফি এলাম। এসেই কয়লার ঘর থেকে একটা কাঠকয়লার টুকরো জোগা করলাম। কিন্তু কোথায় আঁকি ? দাদামশাই আরাম কেদারায় বি করতেন, তার ঠিক পেছনে ছিল চওড়া একটা দেওয়াল। আ আরামকেদারায় উঠে দেওয়ালেই আঁকতে শুরু করলাম। সবে ম দেবের মুখটা আঁকা হয়েছে, এমন সময়ে অঙ্কনে বাধা প দিদিমা কান টেনে নামালেন।

দাদামশাই কাজ সেরে ফিরলেন। জলখাবার খেয়ে যথারী সেই আরাম কেদারায় বিশ্রাম করছেন। দিদিমা নালিশ করলে আমি তো ভয়ে কাঠ। কি আশ্চর্য, দাদামশাই কিন্তু বকলেন শুধু বললেন—দাদুভাই, তুমি তো জানো আমি দেওয়াল নো করা পছন্দ করি না। কাল থেকে তোমাকে খাতা-কাগজ এনে দে তুমি তাতে আঁকবে, তারপর আর্দালিকে ডেকে বললেন, কখ চুনকাম না করা হয়। সেই শুরু। দাদামশাই বরাবর উৎসাহ দি এসেছেন।

কতদিন হয়ে গেল। গ্রাম্যশিল্পী কিন্তু তাঁর কাজ এখনোও হন্ট করে। এরকম আর দেখলাম না।

আপনি পারিবারিক উৎসাহ পান তখন থেকে?

মোটেই না। দাদু যতদিন ছিলেন ততদিন। ১৯২২ সালে ইর মৃত্যুর পর আমরা কলকাতায় আসি। তখন উত্তর কল- থাকতাম। দিদিমা এসব পছন্দ করতেন না। স্পষ্ট জানিয়ে -ছবিটবি চলবে না। লেখাপড়া কর। সুতরাং ছবির দিন ল। এভাবে আমহার্স্ট স্ট্রীটের সিটি কলেজ থেকে বি-এ পাশ তারপর এম-এ পড়া শুরু করি। মন একদম চাইত না। তবু ম। আমরা ছিলাম বাংলায় এম-এ'র ফোর্থ ব্যাচ। পাশ করলাম। সন্ধ্যাবেলায় শুরু করলাম আইন পড়া। আর পারলাম না। আর্ট কলেজ হয়নি। দুপুরবেলায় মাঝে মাঝে আর্ট স্কুলে। সতীশ সিংহ ছিলেন। তাঁর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ড্রইং খুব ভাল লাগত। তখন থেকে আবার লুকিয়ে ছবি আঁকা করি। ১৯৩৪এ আইন পড়া শেষ হল। ১৯৩৭এ অ্যাডভোকেট রমাপ্রসাদ মুখার্জির জুনিয়ার হয়ে হাইকোর্টে যেতে থাক।

কথার মাঝখানে ঘরে ঢুকলেন শ্রীমতী অরুণা সেন। সঙ্গে মিষ্টিসহ পরিচারিকা। পরিচিতির পালা শেষ করে প্রবীণ আবার কথার আনন্দে মজে গেলেন।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ১৯২৩ বা ২৪ সালে শিল্প- অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ন জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি অনেকে বসে আছে। কর হাতেই কাগজ-পেনসিল। আমাকেও দেওয়া হল। ঠিক মিনিটের মধ্যে তাঁর একটি স্কেচ করতে হবে। অ্যালারম ঘড়ি নিয়ে বসে আছেন অবনীন্দ্রনাথ। আলবোলা হাতে সেই ত ভঙ্গীটি। কাঁটায় কাঁটায় পনেরো মিনিটের মাথায় কাগজ নেওয়া হল। কাউকে কাউকে বললেন, তোমাদের আর আসতে না। আমায় বললেন—তোমার হবে। উনি আমাকে কলাভবনেও যেতে চেয়েছিলেন। বাড়ির কথা ভেবে যাওয়া হয়নি।

কিন্তু আপনি ছবিকে কবে থেকে অস্তিত্বের প্রধান অংশ ভাবতে শুরু করলেন?

আশুতোষের একটি তৈলচিত্র একটু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রমা- মুখার্জি একদিন আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করছিলেন কাকে এটি ঠিক করা যায়। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেই রিটাচ দিই। এতে স্যার খুশী হয়ে আমাকে শ্রদ্ধেয় অতুল বসুর পাঠান। তিনি আমার হাত কেমন বোঝবার জন্য তাঁর যে কোনও কাজের স্কেচ করতে বলেন। মাত্র চোদ্দ দিন সময় দিয়েছিলেন। স্কেচ নয়, রবীন্দ্রনাথের একটি তৈলচিত্র অবিকল কপি করে। তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখন থেকেই তৈরী হচ্ছিলাম। ছবির জগতে আমার পুরোপুরি চলে আসা নাটকীয় ঘটনার দিয়ে।

নাটকীয়!

এতদিন পরে বলতে পারা যায়। আমি আপনাকে আগেই আমার বাড়িতে দিদিমা, এমন কি আমার প্রথমা স্ত্রী কল্যাণীও আঁকা পছন্দ করত না। তবু আমি লুকিয়ে-চুরিয়ে আঁকতাম। কিছু কাজ ছিল। এমনকি স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের কয়েকটি স্কেচও ছিল। একদিন আমি কোর্ট থেকে সবে ছি। পরনে উকিলে পোশাক। দেখি উঠোনে সবগুলোকে গাদা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখনও আগুন জ্বলছে। আমার র জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু অবনঠাকুর ও নন্দলাল বসুর হাতের! এত দুঃখ হল!

আসলে কল্যাণীর অনুযোগে দিদিমা রেগে যান, এবং চাকরকে দিয়ে এই সর্বনাশটি করেন!

াই হোক, আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। দিদিমার মুখে মুখে কোনদিন কথা বলিনি। আজ বললাম। বললাম—ছবিগুলো জ্বলুক। কিন্তু এতে আমার ওকালতিও জ্বলবে। আগে গোপনে আঁকতাম। এখন থেকে জানিয়ে আঁকব। আইন ব্যবসাও আর করব না।

এই বলে গায়ের গাউনটা ওই আগুনে ছুঁড়ে ফেললাম।

রাত্রে স্ত্রীকেও সেই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলাম।

সেই আমার ওকালতির শেষ। এর পরদিন থেকেই ছবির রাজত্বে চলে আসি।

'কলকাতা-দল' সম্পর্কে কাগজে-টাগজে কি রকম লেখা হত তখন?

একটা নতুন হাওয়া এসেছে—সবাই বুঝতে পারছিল। তবে খারাপ মন্তব্যও কম আসেনি। যেমন শরৎ বসুর নেশন কাগজেই প্রচন্ড খারাপ সমালোচনা বেরোয়।

তখনকার 'কলকাতা-দল' সম্পর্কে আপনার মতামত জানাবেন?

প্রদোষ অবশ্য ভাস্কর, কিন্তু সে যে কি অসামান্য প্রচেষ্টা, আপনাকে বলে বোঝান যাবে না। আর আমার ভালো লাগত খুব পছন্দ ছিল পানু, প্রাণকৃষ্ণ পালের কাজ। ওর মধ্যে অবশ্য একটু মোদিগিয়ানির প্রভাব ছিল। তবু তাতে কিছু এসে যায় না।

আপনি কবে প্রথম প্রদর্শনী করেন?

সে ১৯৫১য়। এক নম্বর চৌরঙ্গী টেরেসে যতীন মজুমদারের বাড়িতে হয়েছিল। দর্শক অনেক ছিল। সমালোচনাও ভালো হয়। স্টেটসম্যান ভালো বলে। অমৃতবাজারে পি সি এল লেখেন 'মডার্ন বাট নট ওয়াইল্ড' এমন কি ও. সি. গাঙ্গুলী মশাইও প্রশংসা করেন।

বিক্রী হয়েছিল কিছু?

না। একদম না।

সুনীলমাধব সেনের ছবি

এক্ষুনি আমি লক্ষ্য করছিলাম আপনি সন্ত মাইকেলের বিদেশী কাহিনীটিকে মুঘল মিনিয়েচার স্টাইলে নিয়ে এসেছেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। এ আমার মুখ্য সাধনা। মহাভারতকেও আমি লোকশিল্পের আঙ্গিকে নিয়ে এসেছি। আমার কাজের মধ্য দিয়ে আমি দেশীয় আঙ্গিকটি পেতে চাই। তবে এ বিষয়ে আমায় অসম্ভব উপকার করেছেন এক জার্মান সমালোচক। ক্যাউস ফিসার তাঁর নাম। তিনি ১৯৫২য় আমায় বলেন—আপনিই ক্যালকাটা গ্রুপের সবচেয়ে সফল শিল্পী। তিনিই, অজন্তা, কোনারক এসবের কথা তুলে, আমায় প্রথম ভারতীয় প্রথার আধুনিকীকরণের প্রতি জোর দিতে বলেন।

শিল্প-সমালোচনা, মানে আমি এ দেশের লেখকদের কথা বলছি, আপনাকে বা সাধারণভাবে শিল্পকর্মকে কিরকম সাহায্য করে

দেখুন, সমালোচনা আগের চাইতে নিশ্চয়ই অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক; অর্থাৎ আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে কি শত্রুতা আছে, এসব খুব সক্রিয় হয়ে আছে। এটা ঠিক নয়। সমালোচকের নিরপেক্ষতা জরুরী।

কবি বা গল্পলেখকদের সঙ্গে ছবির দূরত্ব বেশী মনে হয়। তাই না ?

ঠিক। কারণটা নিয়ে খুব ভেবে দেখি নি। তবে সে যুগে কবি বিষ্ণু দের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর এখন বলতে পারেন কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের উৎসাহ আছে।

অন্যান্য শিল্পরূপ আপনার কাজে ছায়া ফেলেছে ?

না। আমি পাই। ক্রিয়েটিভ সাহায্য পাই না। একবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে আরণ্যকের কাজ করে দেই। বইটা ভালো, পথের পাঁচালির কথাও বলব। কিন্তু আমি তো সৃষ্টির আনন্দ পাই নি। আসলে শিল্পী খুব একা। আপনাদের পরবর্তী শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম কারা ?

তেমন নাম করে বলতে গেলে বিকাশকে আমার সব থেকে পছন্দ। বিকাশ ভট্টাচার্যর ড্রইংটা দেখবার মতো; নিখুঁত।

ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে আপনি কি ভাবেন ?

ছবির দাম না কমালে কোন উপায় নেই। ছবিটা ঘরে রেখে তো লাভ নেই। কম টাকা ? তো কি হয়েছে। ক্রেতারও সাধ্যের কথাটা ভাবতে হবে।

যামিনীবাবু প্রথম জীবনে মাত্র কুড়ি-পঁচিশ টাকায় ছবি বেচেছেন। শেষ জীবনেও কখনো কখনো মাত্র আড়াইশোতেও বেচেছেন। উনিই আমায় ছবির দাম কমাতে বলেন। আমার কাছে ক্রেতার বাজেটটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি নির্দ্বিধায় দেড়শো বা একশোতে ছবি দিয়ে দিতে পারি।

রাত প্রায় পৌনে নটা বাজে। সুনীলমাধববাবুকে ক্লান্তও মনে হল। আমি চলে আসি।

রথীন মৈত্র :

টোকা দেওয়ার অল্প একটু পরে যিনি দরজা খুলে দিলেন তিনিই সৌম্যদর্শন রথীন মৈত্র। তাঁর সমস্ত মুখে স্বাক্ষরিত শান্তির সঙ্গে ঘরের নৈঃশব্দ্যের মিলটি লক্ষ্য করবার মতো। দু-চারটি অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা সেরে আমি শিল্পীর মুখোমুখী হলাম।

আপনারা যখন ছবি আঁকা শুরু করেন তখনকার থেকে এখনকার পরিস্থিতি পালটেছে কি ?

হ্যাঁ, সন্দেহ নেই পালটেছে। পরিস্থিতি বদলেছে। রুচী ও সমাজের কাঠামোটাও খানিকটা বদলেছে। আমাদের প্রথম প্রথম খুবই মার খেতে হয়েছে। তখন লোকে একটা ফুল বা সিক্তবসনা নারী বা কোন রিয়ালিস্টিক ল্যাণ্ডস্কেপ দেখতে অভ্যস্ত ছিল। এসবই বিক্রী হত। ওরিয়েন্টাল স্কুলও পরিচিত ছিল। আর ছবির মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ফিউডাল লর্ডরা, রাজন্যবর্গ। একটা জিনিস লক্ষ্য করবে, আমরা কিন্তু এ'দের কাছ থেকে সহায়তা পাই নি।

আপনাদের ছবি বিক্রী হয় কেমন ?

কলকাতায় তখন ছবি কেনার লোক খুবই কম তার ওপর আমাদের পরীক্ষা-টরীক্ষা, আধুনিকতার সরা উপস্থিতিটা অনেকের কাছেই প্রীতিকর ছিল না। ফলে অনে তখন বলতেন—কি হ..তা সাপ-ব্যাঙ আঁকছে, মন্বন্তর. এসব ছাড়া কি বিষয় নেই ? আর ছবিও তেমন বিক্রী হয়নি। আশ্চর্যের কথা, বোম্বাইতে কিন্তু তখনই (১৯৪২-৪৫) হয়; বাজার পাই। আশ্চর্য বলছি তার কারণ, হুসেন নিজেও এ জাতীয় ছবি শুরু করেন নি।

তারপর যুগ বদলাল। স্বাধীনতা এলো। রাজন্যবর্গের ক্ষমতা লোপ হল। আস্তে আস্তে উচ্চমধ্যবিত্তরাও আমাদের কেনা শুরু করলেন। ফিউডালদের বদলে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট উৎসাহী হলেন। এসব বিষয়ে টাটাদের খুব আগ্রহ। তোমরা বোধহয় জানো না, বিজ্ঞানী ডক্টর ভাবা একজন উঁচু শিল্প-প্রেমিক ছিলেন।

আপনি যে হাওয়াবদলের কথা বলছেন তাতে ছবি জনজীবন কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে ?

আসলে গত কুড়ি-বাইশ বছরে শিল্পের যে বিবর্তন পরিবর্তন ঘটেছে তার পেছনে আছে সামাজিক মূল্যবোধের অদলবদল বা ভাঙচুর। জনজীবনেও তার প্রভাব পড়েছে।

আমরা যখন আর্ট কলেজে ঢুকলাম তখন শেখা পদ্ধতিও বদলাল। সিদ্ধান্ত অ্যাকাডেমিক পঠন-পাঠন থেকে করে কিছুটা স্বাধীনতার সুযোগ দিলাম। এতে কতটা লাভ হয় সে প্রশ্নের জবাব না দিয়েও বলা যায় ছাত্ররা নতুন নতুন নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে।

তারপর এগজিবিশনগুলোরও দাম আছে। এই যে প্রদর্শনী, আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এসব দে দেখতেও লোকজনের রুচীর উন্নতি আমি নিজে দেখেছি। ছবি আরও জনপ্রিয় হতে পারে যদি উপযুক্ত প্রচার পায়।

প্রচার বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন ?

দ্যাখো, গান এত জনপ্রিয় হত না যদি না রেডিও, এসব থাকত। আমাদের প্রদর্শনী করা ছাড়া কোন উপায় এমন কি কালার প্রিণ্ট যে করব তাও ... প্রচুর পয়সা দ্বিতীয়ত নিখুঁত হয় না। আর ছবি নিয়ে লেখালেখি যদি এ তো বেশীদিন শুরু হয়নি। আরেকটা কথা, কিছু মনে না, সমালোচনা খুবই কম ভূমিকা পালন করে এখানে।

আপনি কিন্তু ছবির দাম নিয়ে কোন কথা বললেন

বুঝতে পারছি তুমি বলতে চাইছো ছবির দাম আমিও মানি যে এখানে ইউরোপের মত আর্ট-পারচেজার ইত্যাদি যখন নেই, তখন ছবির দাম যতটা সম্ভব কম ভালো হয়। ওজন বাড়াবার প্রবণতাটা খুব ভালো নয়। উল্টোদিক থেকে দেখলে সব শিল্পীই সহৃদয় বা বোদ্ধা কাছে অল্প দাম দাবী করেন, এটাও তোমাদের স্বীকার উচিত।

আপনারা কি সাহিত্য বা অন্যান্য শিল্পরূপের কর্মী কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পান ?

সাহিত্য-কর্মীরা শিল্পীদের কাছেই আসে না। সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, অশোক মিত্র—এ'দের কথা আলা বিশেষ করে বিষ্ণু দে চেষ্টা করতেন আন্তরিকভাবে মিশতে।

কবিদের সঙ্গে, লেখকদের সঙ্গে শিল্পীদের আঁতাতটা স্বাস্থ্যকর সেটা ফরাসী দেশের দিকে তাকালেই বোঝা এদেশে হয় না। কি করা যাবে ?

আপনাদের পরবর্তী শিল্পীদের কাজ আপনার আছে ?

লো। প্রশংসা করবার, মুগ্ধ হওয়ার অনেক দিক
অনেক কথা। কিন্তু ভয়ের দিক হল দুর্বোধ্য হয়ে
ক। আমি আমার বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যে আর্টকে
াধারণের মনোভাবে কি এসে যায়—এই ধারণা আছে
শিল্পীর। সেটা ঠিক নয়। মানুষকে বোঝবার জন্য
কবি, আমাদেরও একটু সরল হওয়া দরকার।

পনার কথা শুনে মনে হল এখনকার আবহাওয়ায়
ন। আমি বুঝতে ভুল করিনি বোধহয়।

। আমি বলেছি আগের থেকে অবস্থা ভালো হয়েছে।
হওয়া দরকার তার কিছুই হয় নি। আর্টটা এখনো
রের অলংকার হয়ে রয়েছে। আমরা এককালে প্রগতি
পী সংঘ করেছিলাম তাতেও কিছু হয় নি। শিল্পকে
ৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে হবে। চলনে বলনে রক্তে
তে হবে। প্রাচীন ভারতে যেমন ছিল।

ন্ শ্রীরথীন মৈত্র অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায় কম
কেননা তিনি যে পরিস্থিতির আশা করেন তা অনেক
অনেক মনীষীর কাজ। তা শিল্পীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য;
তব্য নয়।

সেন ঃ

রিতোষবাবু কারুর সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন। আমি
জ করছিলাম ঘরের বইগুলো। ইতিমধ্যে চোখে পড়ল
এশিয়ান ড্রামা। আমি আরেকবার শিল্পীর দিকে
গ্রন্থসংগ্রহ থেকেই বোঝা যাচ্ছে ইনি নানাবিধ সমাজ-
ন্তিত। ইতিমধ্যে ফোন শেষ হল। পরিতোষ সেন
াকে কিছুটা বিরক্ত, শ্রান্ত ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।
শ এসে বসলেন। চার্মিনার ধরালেন। সমস্ত ঘরের
একটা উপলক্ষ্য হয়ে উঠছে দেখে বোধহয় নিজেই
ড়ে দিলেন।

—আসলে নানারকমের ঝামেলা। কিন্তু আপনি কথা-
করতে পারেন।

মি আপনার কাছে জানতে চাই যে, শিল্পীদের
অবস্থাটা কিরকম?

ব খারাপ। উঞ্ছবৃত্তি না করে উপায় নেই। ফিল্ম
একটা ঋত্বিক ঘটক সংখ্যা করবে। আমি সেখানে
ায় এ নিয়ে বলেছি। এটা একটা সামাজিক সমস্যা।
সমস্যা আসলে সমস্ত শিল্পীরই সমস্যা। শুধু আর্ট
থাকা অসম্ভব।

ক বলব আপনাকে, মাঝে রেডিওতে চিন্ময় লাহিড়ীর
শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি ওঁকে একটা চিঠি লিখে
য়েছিলাম ওঁর রেকর্ড কোথায় পাওয়া যাবে। উত্তর
র্ড এখনোও হয়ই নি। এতদিনের সঙ্গীত সাধনার
দি এই হয়, তবে বুঝে নিন শিল্পের অবস্থা।
র মানে ধরে নিতে হবে ছবির বাজার ভালো হয় নি?

ছুমাত্র ভালো হয় নি। বরং খারাপ হয়েছে। যামিনী
র অনেক চেষ্টায় তবু রুচী একটা গড়ে উঠেছিলো।
হত।
র জন্য কি আপনি অর্থনৈতিক সংকটকে দায়ী করবেন?

ধু অর্থনীতি নয়। তাহলে ভারতবর্ষে এত লোক
ছবির বাজারের প্রশ্নই উঠবে না। আমি বলতে চাইছি
সাংস্কৃতিক দারিদ্র্য অসম্ভব বেড়ে গেছে। সর্বস্তরে
চিন্তার দৈন্য। এখন শুধু চটকির যুগ। চটকি গান

দিন চলবে। চটকি সাহিত্য চলবে। চটকি সিনেমা চলছে। অবাক লাগে রাজনীতিটাও চটকিতে ভরে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে ললিতকলা আকাদেমির ভূমিকা?

ছবি কেনে। তাও বছরে কটা কেনে? কজনের কেনে? এতে সমস্যা মিটবে না। মনে হয় মানুষের শিল্পবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে সমালোচনা সহায়তা করতে পারে। আপনি কি বলবেন?

নিশ্চয়ই পারে। সমালোচক দর্শক ও শিল্পীর মধ্যে একটা সেতু তৈরী করে দিতে পারে। কিন্তু এখানে সেসব কিছু নেই। সমালোচককে ইনভলভড্ হতে হবে: ছবি আঁকার ভেতরকার সমস্যা বুঝতে হবে। না হলে যা হয় তাই হবে। অর্থাৎ ওই ওপরে চালাকি, কথার জাল বোনা।

অন্যান্য স্তরের সংস্কৃতি-কর্মীদের সঙ্গে শিল্পীদের যোগাযোগটা শিথিল কেন?

এটাও আরেক দুর্ভাগ্য। এক সময়ে ছিল। বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। অথচ পারস্পরিক আলোচনা থেকে খুব লাভ হয়। শিল্প-মাধ্যমগুলির মধ্যে আদান প্রদান দরকার। অন্তত, মানে ইংরেজিতে যাকে বলে কনসেপ্ট, সে বিষয়ে মতামত বিনিময় খুব জরুরী।

আমার কিন্তু ছবির দাম সম্পর্কে একটা অভিযোগ আছে। ছবির দাম কি আর একটু কমালে চলে না?

ছবির দামের ব্যাপারটা পুরোপুরি খেয়াল খুশীমত ঠিক হয়। পুরোপুরি আরবিট্রারি ব্যাপার। কেননা কমালেও ছবি বিক্রী হবে না। তাতে অনেকের ধারণা হয় দাম বাড়ালে বোধহয় লোকে তবু ভাবতে শুরু করবে বড় পেইন্টার। একটা গল্প বলি। আমি নিজেও জানি না। এই গল্পটা সত্যি কি না। হুসেন নাকি একবার এগজিবিশনে একটা ছবির দাম রেখেছিলেন চল্লিশ হাজার টাকা। এত দাম নিয়ে একজন প্রশ্ন তোলাতে তাঁর বক্তব্য—যে এই ছবি তো বিক্রী হবেই না। তবু দামটা দেখে লোকে ভাববে হুসেন সত্যিই দামী শিল্পী। প্রায় সকলেই এইরকম। কেউ মুখে বলে, কেউ বলে না। আমিই তো যে ছবির দাম এগজিবিশনে পাঁচশো টাকা রেখেছি, তা পরে দুশোতে বিক্রী করেছি।

অন্যান্য শিল্পরূপ কি আপনাকে প্রভাবিত করে?

বিশেষ করে সাহিত্য বা ফিল্ম করে। জীবন-দর্শন, মানে আমি ভাবং চিন্তা-টিন্তা বলছি না। সেসব বইতে আছে, অস্তিত্ব চিন্তা নিয়ে যেসব বই মাথা ঘামায়, তারা আমাকে প্রভাবিত করে।

এই পর্যায়ের শিল্পীদের মধ্যে শ্রীসেন সর্বকনিষ্ঠ। অথচ তাঁর হতাশা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর থেকে অন্ততঃ একটা প্রমাণ পাওয়া যায় শিল্পের প্রদেশের অন্ধকার এখনো কাটেনি।

অতএব সেই দুর্ভাগ্যজনক সত্যটিই মেনে নিতে হবে। আমরা বহিরঙ্গ নিয়েই জীবিত। মূল সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাচ্ছি। শিল্প এবং জনসাধারণের মধ্য দিয়ে একটি বিচ্ছেদের নদী বয়ে যাচ্ছে। আর্ট গ্যালারি করে দিলে, রেস্তোরাঁ বা পার্কগুলোকে সাজিয়ে দিলে কি সেতু রচনা সম্পন্ন হবে? মনে হয় না। এমন কি শিল্পের ধাত্রীস্বরূপা ফ্রান্সেও তো, বছর আটেক আগেকার পরিসংখ্যান থেকে বলছি, শিক্ষিত জনসংখ্যার মাত্র শতকরা সাড়ে বারোজন আর্ট-গ্যালারিতে যায় বছরে! সে-ক্ষেত্রে বরং বিষ্ণু দের, শিল্পীদের প্রিয় সেই কবিকেই মনে পড়বে, 'বিবাহের সকলই প্রস্তুত; এমনকি বরযাত্রী এসে গেছে শুধু বর নেই।'

কোথায় সেই দেখার চোখ ও পরিবেশ? কবে আমরা দেখতে শিখব?

যাদুপট ও যাদুপটুয়া

সুধাংশুকুমার রায়

ঘাঁড়পুর গ্রামে প্রাপ্ত চক্ষুদান পট। শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। দুটি ভূমিজ পুরুষ ও নারীর পারলৌকিক চিত্র: পনের বৎসরের পুরোন পট। যাদুপটুয়ার অংকিত।
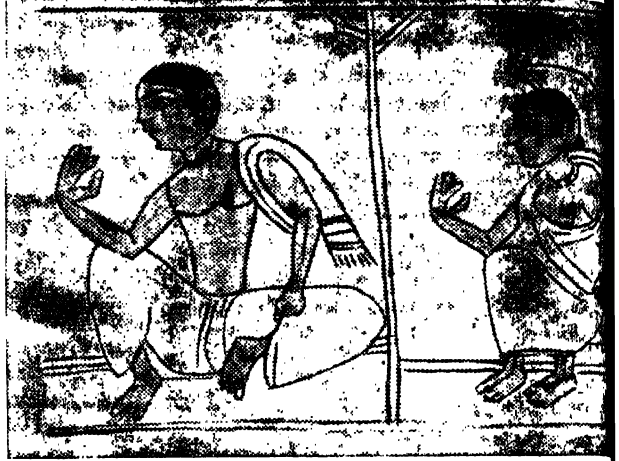
বাংলার পটুয়া বা চিত্রকর জাতির সম্বন্ধে লিখতে বসে দুটি বিষয়কে মনে রাখতেই হবে—(১) পটুয়া বা চিত্রকর জাতীয় লোকেরা শুধুমাত্র বাংলাদেশে বাস করেন না, তাঁরা সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন। তাঁদের আমি দক্ষিণে তাঞ্জোরে, মহীসুর শহরে, তিরুপতি গ্রামে, মসুলিপত্তনে, উড়িষ্যার পুরী শহরে, রাজস্থানের বুন্দিতে, জয়পুরে কিষণগড়ে, হরিয়ানার কাংড়া শহরে বাস করতে দেখেছি। (২) চিত্রকর জাতির ও তাঁদের পটের উল্লেখ বহু প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ ও নাটকে আছে। সুতরং বর্তমান বাংলার চিত্রকরদের জাতি-বিচারে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর একান্তই প্রয়োজন, সে জাতিতে ভুঁইফোঁড় তো নয়ই, বিশাল বিশ্বকর্মাজাত চিত্রকরগোষ্ঠীর বঙ্গীয় শাখার অধস্তন পুরুষ। তাঁদের ঠিকুজি ও জন্মপত্রিকা শাস্ত্র ও পুরাণে পরিষ্কার করেই লেখা আছে, এমনকি বর্তমান অবস্থার মূল কারণও লেখা আছে।

পুরী শহরের দোলমণ্ডপশাহীতে উড়িয়া চিত্রকরদের বাস। সেখানে অনুসন্ধান করলেই জানা যাবে যে তাঁদের তথা সমগ্র-ভারতীয় চিত্রকর জাতির সামাজিক অবস্থা ঠিক। যজ্ঞোপবীতধারী বিশ্বকর্মা-ব্রাহ্মণ, উড়িয়া চিত্রকরেরা জগন্নাথদেবের সেবায় নিয়োজিত — মূর্তির প্রসাধনের ও অলংকরণের জন্য দায়ী। এঁরা চিত্রাংকন ও মূর্তি গঠনে সমান পটু। এই উড়িয়া চিত্রকরদের দেখেই আমরা বাংলাদেশের চিত্রকর জাতির উৎপত্তি ও ইতিহাসের হদিস পাব। তাঁদের স্থান প্রাচীন বাঙালী সমজে কোথায় ছিল তাও জানতে পারবো। আমেরিকান ট্যুরিষ্ট-দের মত একদিন চিত্রকরদের গ্রামে ঘুরে এসে তাঁদের সম্বন্ধে নানা গল্প রচনার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ বাঙ্গালী চিত্রকরদের [illegible]

দুঃখ ও অপমানের ইতিহাস লুকান রয়েছে। না জেনে, না বুঝে সেই সব কথা লিখে, বলে আমরাই আবার তাঁদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছি। গুরুসদয় দত্ত ও আমি যে চেষ্টা করেছিলাম—এই সব আধাধর্মান্তরিত চিত্রকরদের, সত্য পূর্ব-ইতিহাস বুঝিয়ে হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে আনতে—তা অত্যন্ত ব্যাহত হচছে। হিন্দু মিশনের স্বামীজিরাও অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ফলও পেয়েছিলেন। এবার শুনুন সেই প্রাচীন অভিশাপের করুণ কাহিনী।

দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। তাতে সুন্দর করে স্পষ্ট করেই লেখা আছে যে বিশ্বকর্মার নয়টি সন্তানের মধ্যে একটি চিত্রকর। সূত্রধর, কুম্ভকার, কর্মকার, স্বর্ণকার, কাংসকার, শংখকার, মালাকার, তন্তুবায় ও চিত্রকর, এই নয়টি সন্তানের নাম একত্রে বিধিবদ্ধ দেখি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। আর তার পরই এই পুরাণ সেই শ্লোকটি, যা আমাদের দুঃখের ইতিহাস জানায়, লিপিবদ্ধ করেছে :

ব্যতিক্রমেন চিত্রানাং সদ্যাচিত্রকরস্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রহ্মমানাঞ্চ কোপতঃ।।

অর্থাৎ চিত্রাংকনে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে চিত্রকরেরা ব্রাহ্মণদের কোপে পড়ে শাপগ্রস্ত হয়ে সম্প্রতি (সমাজে) পতিত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এই শ্লোকটির মধ্যে সদ্যঃ শব্দটির ব্যবহার থাকায় এবং ঐ পুরাণের রচনার কাল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন সময়ে হওয়ায়, আমরা ধরে নিতে পারি যে, এই শাপশাপান্তের মহাকর্ম ব্রাহ্মণেরা মুসলমান যুগের প্রারম্ভেই করেছিলেন।

আমরা, শহুরে বাঙালীরা এই [illegible] প্রকৃত অর্থ, এর মধ্যে যে [illegible] অপমানের বিষ লুকানো আ[illegible] অনুধাবন করতে পারি না। [illegible] করদের বাড়ীতে যজন-যাজন [illegible] নিত্যনৈমিত্তিক পূজাপাঠের [illegible] করতে অস্বীকৃত তো হলেনই, তাঁদের ধোবা-নাপিতও বন্ধ [illegible] কিন্তু কেন ? কি এমন ব্যতিক্র[illegible] চিত্রকরেরা [illegible] চিত্রধারায় ? [illegible] এ বিষয়ে [illegible]বেষণা ও অনুসন্ধান[illegible] খবরটি দলিল-দস্তাবেজসহ [illegible] ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় কারণে [illegible] করতে পারেন নি। তবে তাঁর [illegible] প্রকাশ করা যেতে পারে।

মুসলমানেরা যে কো[illegible] সাহায্যে ধর্ম প্রচার করেছিলে[illegible] তাঁরা, অন্ততঃ বাংলাদেশে, [illegible] মাধ্যম হিসাবে পটের প্রচলন [illegible] ছিলেন এবং এই মাধ্যমের [illegible] গ্রহণ করেছিলেন। মনে [illegible] ইথিওপীয়ায় পটুয়া আছে, [illegible] প্রচারের মাধ্যম হিসাবে [illegible] প্রচলন এখনও আছে। মহম্মদ[illegible] দেশেও হয়তো পটের প্রচল[illegible] বর্তমান ছিল। সে যাই হোক, থেকেই অনুপ্রেরণা এসে থাক[illegible] মুসলমানী পটের প্রচলন [illegible] প্রমাণ গাজীর পট, পীর-গো[illegible] কিন্তু এরচেয়েও বেশী দূরে [illegible] করে ফেলেছিল চিত্রকরেরা। [illegible] ছিল হিন্দু ধর্মের চেয়ে মুসল[illegible]

এমনকি তা অনেক উদার ও অসংকীর্ণ! ...গেরা ক্ষেপে লাল। ধ্যা—তোরা আজ ...ক সমাজে পতিত। যাদের জন্য এতসব ...ল তারাই তোদের দেখবে, আমরা আর ...দের জলও খাব না, বাড়িও যাব না, ...-পাঠ বন্ধ।' এ বিংশ শতাব্দীর বিষ-...ভাঙ্গা ব্রাহ্মণ নয়, ত্রয়োদশ শতকের ...ণ, তার মাথায় কুলোপানা চককোর!

যাঁরা পট ও পটুয়াদের সম্বন্ধে ...তে চান তাঁরা যেন বুঝে লেখেন; ...মানী, অর্ধধর্মত্যাগী সন্তানকে ...বনা দিয়ে ফিরিয়ে আনার কথা লিখতে ..., সামাজিক অনুশাসন তুলে নিতে ...বন্ধুত্বের সঙ্গে। হিন্দুর চিরকালের ...পী, তাঁদের ফিরিয়ে আনতেই হবে ...মাজের মধ্যে। বাঙালীর ঘরে দুর্গাপূজো, ...পূজো, সরস্বতীপূজো চলবেই, কিন্তু ...ব মূর্তি যাঁরা গড়েন, গড়ে আসছেন ...র হাজার বছর ধরে, তাঁরা কেন ...মাজের বাইরে শাপগ্রস্থ হয়ে পড়ে ...বেন—সাতশ বছরেও কি সে শাপ-...চনের সময় আসেনি?

এবার পটুয়াদের পট সম্বন্ধে বলি। ... নিয়ে যাঁরা লিখছেন তাদের এই ...টা মনে রাখতে হবে যে বৃটিশ ...উজিয়ম ও ভিকটোরিয়া এণ্ড অ্যালবার্ট ...উজিয়ম, লণ্ডনের এ দুটি সংগ্রহশালার ...চীন বাংলার অমূল্য পটচিত্রগুলি না ...খে বর্তমান বাংলার পটের উপর মন্তব্য ...া বা লেখা একেবারেই অসম্ভব। সে ...ন্য জগৎ। অষ্টাদশ শতকের দেওয়ান ...রেজের, নীলকুঠির জমিদার সাহেবদের ...গৃহীত পট; তেমন পট আমাদের চোখেই ...ড়েনি। তার রং আলাদা, ডিজাইন ...লাদা, গল্পও আলাদা। হঠাৎ দেখলে ...লা দুষ্কর। একটা সত্য ঘটনা বলি, ...াহলে কথাটা পরিষ্কার হবে। ডঃ স্ট্যালা ...ামরীশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-...ল্পের অধ্যাপিকা ছিলেন বহুকাল। পট ...য়ে নাড়াচাড়াও করেছিলেন, আশুতোষ ...উজিয়মের সংগ্রহ পট দেখেও ছিলেন, ...র্ণালে ছেপেও ছিলেন। অবসর গ্রহণের ...র আমেরিকায় চাকরি নিয়ে চলে যান। ...খানে ভারতীয় ফোক-আর্টের এক ...দর্শনী করার ভার পড়লো তাঁর উপর। ...বৃটিশ মিউজিয়মকে বলতে তারা দুখানি ...াংলার পট প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু ... ছবির পরিচয় লিখতে গিয়ে বিপদ বাধলো, ...োঝাই গেল না গল্পটার বিষয় কি, রামপট ...া কৃষ্ণপট, না অন্য কোন লোকগাঁথা। ...টো তুলে পাঠালেন আশুতোষ মিউজিয়মে ...স ফটো তারা পাঠালেন দিল্লীর ক্রাফটস ...মিউজিয়মে। সেখানেও হোল না, এলো ...আমার কাছে। ভাগ্যিস এ পট আমার ...ণ্ডনে খুঁটিয়ে দেখাছিল। তাই শেষ রক্ষা ...হোল। পটটি ছিল শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক—...াঁর জন্ম বৃত্তান্ত। গল্পটা অত্যন্ত ভাগবত ...ঘেঁষা; তার উপরে প্রাচীন বাংলার অধুনা ...লুপ্ত পারিপার্শ্বিক দৃশ্য এবং অচিন্তনীয় ...[illegible] ভঙ্গী এমনই এক অপরিচিত পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল যে তা ডঃ ক্রামরীশের মত ভারত তত্ত্ববিদকেও দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল। সে পট, সে পটুয়া, সে আর্ট আমরা চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছি। তবুও বলবো, বীজ মরে না, তা আমাদের চিত্রকর জাতির হৃদয়ে এখনও সুপ্ত রয়েছে। তা যদি না থাকতো তবে উনবিংশ শতকে কালীঘাটের পটুয়ারা কি করে সেই বিশ্ব বিখ্যাত কালীঘাট পটের 'স্কুল' গড়ে তুলেছিল? আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার গোড়াপত্তন কালীঘাটেই, আমাদের জাতীয় চিত্রকরেরাই করে গেছেন। আমি বিশ্বাস করি, যদি অনুকূল বাতাস বয়, তবে নতুন আর্টের সৃষ্টি আবার এই পটুয়ারাই করবেন। তার জন্য চাই সর্বাগ্রে শাপমোচন, আদর, আপ্যায়ন।

গত ১৯৫১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে আমি পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকরদের তিনটি বিশেষ 'স্কুলে' ভাগ করে দেখিয়েছি। এই ভাগাভাগির কারণ দুটি (১) চিত্রকর-দের আভ্যন্তরিন জাতিগত বৈষম্য এবং (২) চিত্রগত ধারার তারতম্য। জাতিগত বৈষম্যের জন্য, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী-হাওড়া, মেদিনীপুর (ঝাড়গ্রাম বাদে), চব্বিশ পরগণার চিত্রকরদের বাঁকুড়া, ঝাড়-গ্রাম, পুরুলিয়া, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার চিত্রকরদের মধ্যে বিভেদ বর্তমান। এ দুটি সমাজের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নেই। পটের মূল বক্তব্যের মধ্যেও বিস্তর ফারাক আছে। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, সিংভূমের চিত্রকরদের বলা হয় যাদু যাদব বা দোয়ারী পটুয়া। এদের সম্পর্ক স্থানীয় বাঙ্গালীদের সঙ্গে থাকলেও তা কেবল সাংস্কৃতিক, কিন্তু আদিবাসীদের, বিশেষ করে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজদের সঙ্গে তা গভীর ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ। তাই যাদু পটুয়াদের কিংবা তাদের পটের আলোচনা আর্টের বিচার-বিবেচনা আলাদা করেই দেখতে ও করতে হবে।

অন্যদিকে বীরভূম-বর্ধমান ও মেদিনীপুর-চব্বিশ পরগণার চিত্রকরেরা একই গোষ্ঠীর হলেও তাঁদের চিত্রগত ধারার তারতম্যানুসারে দুটি আলাদা 'স্কুলে' ভাগ না করে উপায় নেই। আসলে একজন উচ্চ মালভূমিবাসী, অন্যজন নিম্ন ব-দ্বীপবাসী। এই ভৌগোলিক অবস্থানের বিভিন্নতা তাদের পটের গল্প, রং ও অংকনরীতির মধ্যে বৈসাদৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। যেমন তমলুকের পটুয়া সিন্ধুদেশের গল্প বলে; বলে এমন সব দেশের কথা যা কেবল প্রাচীন বাংলার নৌবাণিজ্য ও সমুদ্র যাত্রার কালেই তাদের গোচরে এসেছিল। কিন্তু বীরভূমের পটুয়া অত্যন্ত রক্ষণশীল, গোঁড়া ও প্রাচীন পন্থী, তার পট পুরাণ-ঘেঁষা, ঐতিহ্যবাহী এবং দেশজ কলা-কৌশলের অনুগত ধারক। সে যাই হোক, বাঙালীসমাজের সঙ্গে তাদের পটের সাক্ষাৎ সম্পর্কের জন্য এই পটুয়াদের নামকরণ আমি আদমশুমারির রিপোর্টে করেছি 'সামাজিক চিত্রকর' বা 'সামাজিক স্কুল'। এই সামাজিক স্কুলকে তাই দুভাগ করে দুটি আলাদা নামও দিতে হয়েছে। (১) তমলুক-কালীঘাট-ত্রিবেণী সামাজিক স্কুল, (২) বীরভূম-কাঁন্দি-কাটোয়া সামাজিক স্কুল। কিন্তু আজ আমি এই সামাজিক স্কুলের বিষয়ে কিছু লিখতে বসিনি; আমার বর্তমান প্রবন্ধ যাদু পটুয়াদের নিয়ে।

একশত বছরের পুরোন চক্ষুদান পট। ঝাঁড়পুর গ্রামের (বিনপুর) যাদুপটুয়ার অঙ্কিত, শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। লেখকের সংগৃহীত পটটি আছে আশুতোষ মিউজিয়মে।

সে বহুদিন আগের কথা, হয়তো ১৯৩৫-৩৬ সালেই, কে একজন আমায় খবর দিয়েছিল যে বিনপুরের নিকটে ভাণ্ডারপুর মৌজার ঝাঁড়পুর গ্রামে যাদুপটুয়ারা থাকে। ঝাড়গ্রাম স্টেশনে নেমে, বাসে করে সেখানে যেতে হয়, তাও বলেছিল। একদিন সন্ধ্যায় হাওড়ায় ট্রেনে চেপে রাত তিনটায় এসে পৌঁছেছিলাম ঝাড়গ্রামে। বাসের খবর নিতে যেয়ে শুনলাম বাস তখনই ছাড়বে। সে বাস রাত চারটায় আমায় নামিয়ে দিল এক অন্ধকার জনমানবহীন রাস্তার মোড়ে। বলে দিল এই পুবের রাস্তা ধরে দু মাইল গেলে ঝাঁড়পুরা গ্রাম পাবেন। কিন্তু অন্ধকার রাস্তায় যাব কি করে? অগত্যা সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হোল।

যত ভয় আর যত কষ্টই আমার হয়ে থাকুক না কেন সে রাত্রে, সকালবেলায় নবঅরুণোদয়ের সঙ্গে আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান আবিষ্কার বাঙ্গালী জাতির এক অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত শিল্প-ধারার সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিল। এ আবিষ্কার, এ পরিচয় আমায় অতি মাত্রায় চিন্তিত করে তুলেছিল, আর এখনও উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। গুরুসদয় দত্তের সাঁওতাল পরগণার যাদুপট আমার দেখা ছিল, সাঁওতালদের জন্য চিত্রিত সে পট বাহুল্য বর্জিত ও আদিবাসীজনোচিত সারল্যে সংক্ষিপ্ত। কিন্তু বিনপুরের পট প্রশস্ত, বর্ণাঢ্য; তার গল্প নাটকীয়। আর সে নাটক ইহজগতের নয়, পরলোকের। এখানেও সাঁওতালদের জন্য যে পট রচিত হয় তা বাহুল্য বর্জিত ও সরল, কিন্তু ভূমিজ জাতির জন্য চিত্রিত পটই ঐ সব-গুণসম্পন্ন। তাই মনে হয় ভূমিজ জাতির সঙ্গে যাদুপটের ও যাদুপটুয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল বা এখনও আছে। কিন্তু চিন্তা ও উদ্বিগ্নতার কারণ হচ্ছে, ইহ-কালের ছবি না করে যাদুপটুয়া কেন পরকালের ছবি আঁকে? স্বর্গে দাস-দাসী [illegible] ভূমিজ নারী এই পৃথিবীর মনুষ-

শাস্তি ভোগ করছে, অর্থাৎ স্বশরীরে স্বর্গবাস করছে, এ প্রসঙ্গ চিত্রে বর্ণনার কারণ কি?
এ অধিকারই বা যাদুপটুয়াকে কে দিল? এতো হিন্দুধর্ম বিরুদ্ধ, প্রচলিত বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং বিচার বিরুদ্ধ এক মতবাদ যা সামাজিক পটুয়ার কাছে অজ্ঞাত, অভাবনীয় ও দুঃসাধ্য।

সংস্কৃত নাটকে চিত্রকরদের বলা হয়েছে 'যমপটিক', অর্থাৎ যম-পট আঁকা বা দেখানই তাঁদের পেশা ছিল বা এখনও আছে। প্রাচীন ভারতের পটুয়ারাই আমাদের সামাজিক পটুয়াদের পূর্বপুরুষ। কারণ আমরা আজও দেখি তাঁদের প্রতিটি জড়ান পটের (স্ক্রোল) শেষ ছবিটি যমরাজ ও তার বিচার সভার এবং বিচারান্তে পাপীর শাস্তি ও পুণ্যাত্মার স্বর্গারোহন দৃশ্যের। এখানে যমরাজই পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা—পটুয়া নয়। কর্মফলে কে স্বর্গে যাবে কে নরকে যাবে তা বিচার করবার, হুকুম দেবার অধিকার একমাত্র যমরাজের—সামাজিক পটুয়ার সেখানে নাকগলাবার কারণও নেই, অধিকারও নেই। সামাজিক পটুয়া যমের ধর্ম ও ক্ষমতার প্রচারক, তাঁর নিজের কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই। তিনি পাপ-পুণ্যের বিচারকও নন-বিচারালয়ের হেরাল্ড মাত্র।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক যাদু-পটুয়ার ক্ষমতা কি ও কতো। যাদুপটুয়ার পটে যম নেই, যমের বিচার সভাও নেই। তার যে পটটি এখানে ছাপা হোল তাতে দেখা যাবে একটি ভূমিজ নারী মৃত্যুর পর পরলোকে চারজন সেবাদাসী পরিবৃত্যা হয়ে রাজরাণীর মত সুখে জীবনযাপন করছেন। তাঁর কোঠাবাড়ীর ঘরে জাজিম বিছান, তার উপর তাকিয়া, পাশে পিলসুজ, জলের জন্য কমণ্ডলু। এক দাসী খাবার আনছে, এক-জন পান। এক দাসী চামর দুলিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে, অন্যজন পাখা হাতে হা[ওয়া] করছে। তাঁর গায়ে প্রচুর অলংকার, পরনে কাঁচুলি ও রঙিন শাড়ী। এ যেন স্বর্গবাস কালের গৃহস্থালির এক ফটোগ্রাফ তুলে সেই ভূমিজ [illegible]

জন্য পৃথিবীতে পাঠান হয়েছে। স্বর্গের খবর যাদুপটুয়ার নখদর্পনে। কা[কে] স্বর্গে পাঠাবেন, কি পাঠাবেন না তা তি[নি] জানেন। তাঁর নরক নেই, পারের কড়ি পে[লে] তিনি সবাইকে স্বর্গে পাঠাতে রাজী। [এ] সে ক্ষমতার তিনি পূর্ণ অধিকা[রী]। সামাজিক পটুয়ার মতো যম নির্ভর নন।

যাদু পটুয়ার এপট কেবলমাত্র মহিলার স্বর্গবাসের ফটোগ্রাফ নয়—[...] চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান পারলৌ[কিক] ও ভৌতিক যন্ত্র বিশেষ। এপটের না[ম] 'চক্ষুদান পট'। যখনই কোন পুরুষ, না[রী] বা শিশুর মৃত্যু ঘটবে তখনই যাদু পট[ুয়া] তার এক ছবি এঁকে সে বাড়ীতে হা[জির] হবে। কিন্তু সে ছবিতে স্বর্গ বাসের ব্যবস্থা থাকলেও, সেই মৃত মানু[ষের] চোখের মণি আঁকা থাকে না। যাদুপট[ুয়া] বাড়ীর আত্মীয় স্বজনদের বলবে—[...] তোমাদের অমুক স্বর্গে গেছে বটে, [...] চোখে দেখতে পাচ্ছে না বলে কষ্টে আ[ছে।] গরু, থালা, বাটি, কাপড়-চোপড়, দা[ন] দক্ষিণার ব্যবস্থা কর, আমি তার চক্ষু দা[নের] ব্যবস্থা করবো।' এসব পেলেই—আর আজও পায়—যাদুপটুয়া তখনই [...] বাঁশের চোঙা থেকে তুলি টেনে বের [...] কাল রং দিয়ে চোখে মণি বসিয়ে দে[য়।] বাড়ীর লোক হাফ্ ছেড়ে বাঁচে। এমনি মৃত্যু শোক তারপর স্বর্গে তা[...] আত্মীয়ের বিপদ যত শীঘ্র কাটে [ত]তই মঙ্গল।

কিন্তু বাড়ির লোকের বিপদ কাটে আমার বিপদ ঘনিয়ে আসে। মনে [...] প্রাচীন মিসরের কথা মনে পড়ে এইচ. [...] হলের লেখা 'চক্ষু দানের' কাহি[নী] (মিসরের) মামি ও কবরের অন[্যান্য] আনুষঙ্গিক মূর্তিগুলির উপর যে পবিত্র ক্রিয়াকর্ম করা হয় তার এ[কমাত্র] উদ্দেশ্য হোল মৃতদেহে স্বর্গীয় আ[ত্মার] পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, যখন পুরোহিত [...] [illegible]

ঝাঁড়পুর গ্রামে প্রাপ্ত চক্ষুদানপট।
পাশে দুটি ভূমিজ নারী, পুরুষের চিত্র,
মধ্যে একটি সাঁওতাল নারীর স্বর্গবাসের
চিত্র। যাদুপটুয়ার অঙ্কিত দশ বছরের
পুরোন পট। শিল্পী অজ্ঞাত। যে
তিনটি ঘটি ও জামবাটির ছবি, মূর্তি-
টির সঙ্গে আঁকা আছে তা যাদুপটুয়ার
দাবি ও অবশ্য প্রাপ্তব্য দক্ষিণা।

অর্থাৎ সেই মৃত ব্যক্তি 'চক্ষু
পেয়েছে' তখন তারা অনুভব করে যে
মৃতদেহে ফিরে এসেছে এবং তাদের
মৃত ব্যক্তি চিরকালের মত
ও সুখ-শান্তি লাভের অধিকারী
এই চক্ষু দান করতেন মিসরের
তরা, আর আমাদের করেন যাদু-
যাদুপটুয়া কে? তিনি কি
প্রাচীনকালের পুরোহিত বংশের
? তাই যদি হয়, তবে যাদুপটের
পাত ধারা সামাজিক পটের ধারার
প্রাচীন। কারণ যাদুপট এমন এক
কিক ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বা
যা শব-সমাধির ইঙ্গিত করে, কিন্তু
র নয়। আমরা প্রাচীন বাংলার শব-
প্রথার কিছুমাত্র জানি না, এ বিষয়ে
র প্রত্নতত্ত্বীয় জ্ঞান একেবারেই
। যাদুপটুয়া কি আমাদের প্রাচীন
নীল আগলে বসে আছেন, পাহাড়ের
তিনি কি সেগুলি লুকিয়ে
ন? তবে কেন তিনি পাহাড়ের
য় বাড়ী করে বাস করেন, পাহাড়
দিন আদিবাসীদের সঙ্গে কেন তিনি
পাহাড়ে থাকেন, অন্য বাঙালীদের
পাহাড়ে চড়া নিষিদ্ধ কেন? অন্য
বাঙালীর পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্য,
করে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ পাহাড়ের
পিটুলির ছবি (পাহাড়) গড়ে
হয় কেন? পাহাড়ের সঙ্গে আমাদের
পুরুষের কি এমন সম্পর্ক ছিল যে
কে ছবি-পাহাড় কপালে ছুঁইয়ে
দ কুড়াতে হবে? যাদুপটুয়ার
য় ক্রিয়াকলাপ, তাঁর পারলৌকিক
মায় তাই শুধু চিন্তিত করে নি,
করেই রেখেছে।

চীন বাঙালীর ইতিবৃত্ত যাদু-
গাঁটছড়ায় বাঁধা। পৃথিবীর
কি করে হয়েছিল সে খবর তাঁর

জড়ান-পটে (স্ক্রোল) আঁকা আছে। কি করে আদিবাসী সাঁওতাল জাতির জন্ম হোল, কি করে তাদের ক্রানগুলির সৃষ্টি হোল, এমনকি সাঁওতাল আদিপুরুষ ও আদি স্ত্রী পিলচু হাড়াম ও পিলচুবুড়ী কি করে নিজেদের পুত্র-কন্যাদের বিয়ে দিয়ে সংসার বাড়িয়ে, গুছিয়ে নিয়েছিলেন, তাদের তিন আদি দেবতা ও দেবী— সিংবোঙা, মারাংবুরু ও জাহেরএরা—কি কারণে সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হন, কি কারণে অতি পাপিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর 'পিশাচ' ঘরের জিনিসপত্র অপবিত্র করে সাঁওতালদের মৃত্যু ঘটায়, এসবই যাদুপটুয়া তাঁর পটে লিখে রেখেছেন। এসব সাঁওতালী পটের গান সাঁওতালী ভাষায় যাদুপটুয়ারই রচনা। যাদুপটুয়া দোভাষী, বাঙালী বলে বাংলা ভাষা তো জানেনই, তাঁর শিষ্যদের জন্য সাঁওতালী ভাষাও মাতৃভাষার মত সড়গড় রাখতে হয়। এই সব সাঁওতালী পটের গান আদিবাসীদের বেদ-পুরাণ, তাদের ভাষায় আদিকাব্য, বেসাডস বা আদি সাহিত্য। এগুলি শিক্ষিত আদিবাসীদের সংগ্রহ করে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

সাঁওতালী ভাষায় যাদুপটুয়ার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে 'প্রথম সাম গান' সাঁওতালী ভাষায় তাঁরাই গেয়েছিলেন 'তব বনভবনে।'

ত্রয়োদশ শতাব্দীর অভিশাপ এখানেও লেগেছিল। কারণ ঐ একই—সেই মুসলমানী পট। সব পটের দেখা পাই না, তবে সত্যপীরের পট গুরুসদয় দত্ত পেয়েছিলেন সাঁওতাল পরগণার দুমকা থেকে; বীরভূমের সামাজিক পটুয়ারা সংগ্রহ করে এনে দিয়েছিল। ওখানে রয়েছে বহু যাদুপটুয়া, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা কেউ সুযোগ পাইনি সে সবের খোঁজ-খবর নিতে। গুরুসদয় দত্তের লেখা 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার, নভেম্বর, ১৯৩২ সনের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'দ্য টাইগার্স গড ইন বেঙ্গল আর্ট' আমাদের একমাত্র সম্বল। সেই কারণে যাদুপটুয়া ও তাঁর পটের পরিচয় যা পেয়েছি তা আংশিক মাত্র; বাংলার বাইরে তাঁর ও তাঁর প্রভাব আদিবাসী অধ্যুষিত বিহার প্রদেশে বহু বিস্তৃত।

শহরের মানুষ কিছুই কেনেন না \ শ্রীশ চিত্রকর

প্রভাত চৌধুরী

টিনের চালা. অনেকটা লম্বাটে। পেছনের দিকে ইঁটের গাঁথনি দিয়ে আলাদা করা। ওটাই বাসস্থান। শোবার ঘর, রান্নাঘর, ড্রইংরুম—ওই একটাতেই। ওপরে মাচা—জিনিসপত্র রাখা কিংবা শোয়াও চলে।

একটা টুল. একটা বেঞ্চি। দুটোতেই শুকনো মাটির দাগ। শ্রীশ চন্দ্র চিত্রকর আমার মুখোমুখি।

বাংলা ১৩২৭-এ শ্রীশবাবুর জন্ম। মেদিনীপুরের সুতাহাটা থানার আকুবপুর গ্রামে।

বাবা রজনীকান্ত চিত্রকরের সঙ্গে ১১ বছর বয়সে এই কালীঘাটে আসেন। কালীঘাটই তৎকালীন পট-শিল্পের একমাত্র বাজার ছিল। শ্রীশবাবু বললেন, 'কালী-ঘাটের মাকালী মন্দিরে যে সব যাত্রী আসতেন তারাই ছিল পটের মূল ক্রেতা। স্থানীয় লোকজনেরাও কিছু কিছু কিনতেন। তখন দাম ছিল দু পয়সা এক-একটা পট। বিক্রী ভালোই হত। না হলে সংসার চলতো কি করে।

কিছু কিছু পুতুল বা প্রতিমাও অবশ্য সিজনের সময় বা পুজোর আগে তৈরি করতে হত। তার জন্য অস্থায়ী চালা ভাড়া করে কাজ করার রীতি ছিল তখন। অন্য সময় দেশে ফিরে যেত প্রায় সকলেই।

শ্রীশবাবু মূলত তাঁর বাবা রজনী-কান্ত চিত্রকর যিনি জগন্নাথের পট এঁকে রাষ্ট্রপতির পদক পেয়েছিলেন ১৯৬৫ তে, মামা খগেন্দ্রনাথ চিত্রকর এবং হরিজীবন পাল—কুমারটুলি থেকে কালীঘাটে চলে আসা এক কৃষ্ণনগরের মূর্তিশিল্পীর কাছেই শিখেছেন যাবতীয় কাজ-কর্ম।

শ্রীশবাবু বললেন, 'আরচার যখন কালীঘাটে আসেন তার পরই ওপর দৃষ্টি পড়ে রসিকজনের।

ডাবলু জি আরচার ১৯ কালীঘাটে আসেন। তাঁর 'বাজার পে অফ ক্যালকাটা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৩

শ্রীশবাবু বললেন, এখন কোনো ক্রেতা নেই। বছরে ৫-৬টার পট বিক্রী হয় না। কেননা এক-এক দশ টাকার কমে বিক্রী করলে পোষায় না। দশ টাকা দিয়ে পট লোক কোথায়। কালী মন্দিরের এখন মা কালীর বা সাঁইবাবার ফটো কিনে বোতলে গঙ্গাজল নিয়ে ফেরে। ক্যালেণ্ডারের ছাপা ছবির ছবির দাম যেখানে আট আনা-এক যেখানে দশ টাকা দিয়ে পট। শহরের মানুষ কিছুই কেনে না।

[illegible]
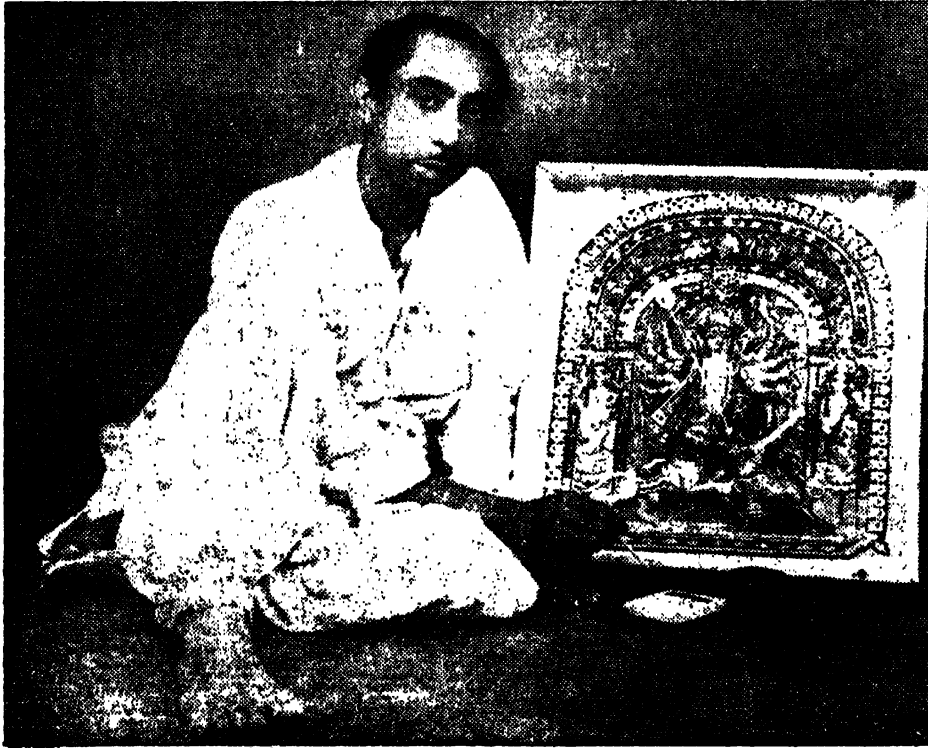
শ্রীশ চিত্রকরের পট

বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসবে বারণপুর ছিলেন শ্রীশবাবু, কাগজে আঁকা কিছু নিয়ে গিয়েছিলেন। কর্মকর্তাদের কাছে ী হয়েছে ২-৩টে। সাধারণ ক্রেতা নি একজনও।

উৎসব কমিটির দেওয়া মানপত্র য়ে বললেন, 'এতে কি পেট ভরে।'

তবু এখনো পট এঁকে চলেছেন । রঞ্জিৎ গুপ্ত-র স্ত্রী কিম্বা মাদ্রাজের না অভিজাত গৃহস্থ-র মতো দু-একজন তা মাঝে মধ্যে আসেন। তা নেহাতই । মূলত মৃত-শিল্প বা প্রতিমা তৈরি ই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়।

সরকার এক সময় শ্রীশবাবুর বাবা ী চিত্রকরের তত্ত্বাবধানে একটা পটের লের ব্যবস্থা করেছিল। রজনীবাবুর াতে তা বন্ধ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় কার শ্রীশবাবুকে ৩০০ টাকা মাসিক নে ৪-৬ জন ছাত্রের ৪০ টাকা থেকে ৬০ া মাসিক স্টাইফেন্ডে পট শিক্ষণের একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। তাও শেষাবধি হয় নি, পটের বিক্রী বাজার না থাকায়।

শ্রীশবাবু বললেন, বর্তমান সামাজিক অবস্থাকে পটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারলে ক্রেতা পাওয়া যেতে পারে। কেননা প্রাচীন পটে তো সে-সময়েরই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। ওই সব পট এখনকার মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে না।

আর সে সব চিন্তা করতে গেলে প্রতিমা তৈরি বন্ধ রাখতে হয়। প্রতিমা করা বন্ধ হলে পেটও বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ না খেয়ে থাকতে হবে। সরকারের মদত থাকলে সাহস পাওয়া যেতো।'

অবশ্য শ্রীশবাবু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পট শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছেন শুনলাম। বললেন মধুবনী পেইন্টিং যেভাবে টিকে আছে এখনো, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কালিঘাটের পটকেও বাঁচানো সম্ভব।

ভালো কাগজে বা কাপড়ের ওপর কাজ করবেন শ্রীশবাবু। ফ্রেমিং করে পেইন্টিং-এর মতো বাঁধাবেন। ক্যানভাসে কাজ করার কথাও ভাবছেন। সবই পট, সাম্প্রতিক সমাজ জীবনের ওপর ভিত্তি করে নবযুগের পট।

শ্রীশবাবু বললেন, পটের ধরণ বা আদল ঠিক রেখে, প্রতিমার আকারে রিলিফ ওয়ার্ক করবেন মাটির, টেরাকোটার মতো, বিদেশে এবং দেশেও ভালো বাজার বা ক্রেতা পাবেন এতে।

শ্রীশবাবু দুঃখ পেয়েছেন, দমদম এয়ারপোর্ট হোটেলের বিভিন্ন জায়গায় পট দিয়ে সাজানো হয়েছে বলে শুনেছেন, অথচ কালিঘাটের পট হিসেবে যদি সেগুলো টাঙানো হয়ে থাকে, তাহলে উচিত ছিল কালিঘাটে এসে তা সংগ্রহ করা। এ রকম কেউ আসেন নি।

জানি না ইন্টিরিয়ার ডেকরেটর সংস্থা যদি কালিঘাটের পটুয়াদের কাছ থেকে দশ-পনের টাকা দিয়ে পট সংগ্রহ করতেন, তাহলে তাঁদের কতটা আর্থিক ক্ষতি হত। পট শিল্পীদের বাঁচাবার কিছু দায়িত্ব কমার্শিয়াল শিল্পীদের কাছে আশা করা খুব একটা অন্যায় নয়। এরাই পারেন সহযোগিতা করতে—এখনো, এই মৃত-প্রায় শিল্পটিকে বাঁচাতে।

রজনীকান্ত চিত্রকরের সুযোগ্য পুত্র এবং উত্তরসূরী ১৯৬৮-র রাষ্ট্রপতি পদক-প্রাপ্ত (প্রতিমার জন্য) শিল্পী শ্রীশ চন্দ্র চিত্রকরের পক্ষেই সম্ভব পট-শিল্পের নব-জাগরণের। আসুন না কালিঘাটের পটুয়া-পাড়ায় দু একটা পট কিনুন, যা আপনাদের ড্রইং রুমের সৌন্দর্য বাড়াবে।

উত্তর পুরুষ

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যা
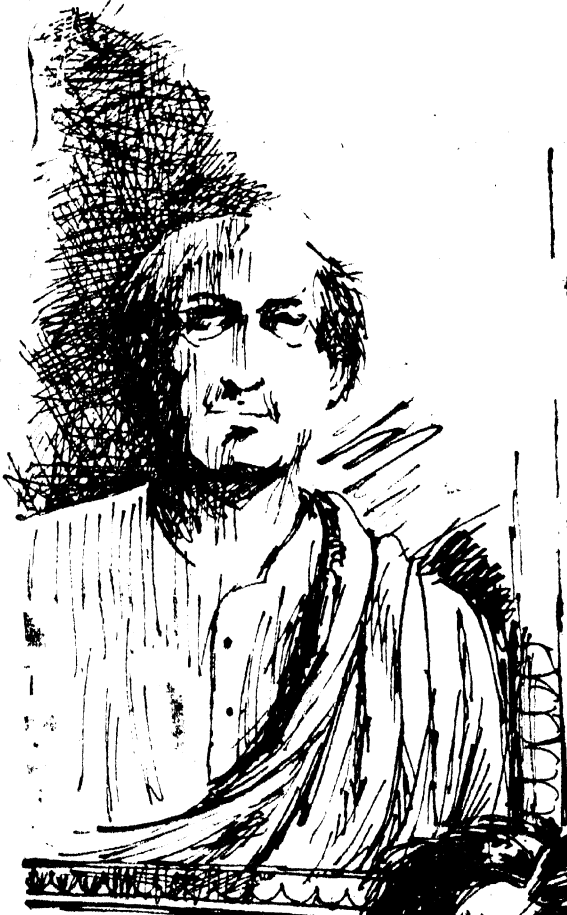
অশোকনারায়ণ রায় যখন তাঁর বাড়ি থেকে বেরোলেন তখন আকা থেকে সূর্য পশ্চিমে হেলতে সুরু অশোকনারায়ণ আই আই টি খড়্গ অঙ্কের অধ্যাপক। অধ্যাপক হিসাবে সুনাম। অশোকনারায়ণ তাঁর এই সুনা সহজভাবেই গ্রহণ করেছেন। সাফল্য বিচলিত করে না। স্কুল কলেজে ছাত্র প্রচুর সুনাম ছিল। এক ধরনের মা ভাল ছেলে আছে যাদের সমস্ত জগ পড়ার বই-এ মেশে। অশোকনারায়ণ দিন সেরকম ছাত্র ছিলেন না। তিনি ধূলায় খুব উৎসাহী ছিলেন। গান বাসতেন। ছবি আঁকায়ও সুন্দর হাত একেবারে চৌকস বলতে যা বোঝায় সত্যি কথা বলতে কি তাঁর আত্মী বন্ধুবান্ধব সকলেই একটু অবাক ছিলেন যখন তিনি তথাকথিত বড় চা দিকে একদম না ঝুঁকে অধ্যাপ জীবিকা হিসাবে বেছে নেন। একমা হ'ন নি অশোকনারায়ণের পিতৃদেব। জানতেন, অশোকনারায়ণ সওদাগরী তা বড় সাহেব হবার মন নিয়ে জন্মান নি। কোন বাধা দেন নি। বাধা দিলে বি বলা যায় না। অশোকনারায়ণ অংক করেন। তিনি জানেন অংক মেলে। জিনিষ মেলে না যে জিনিষে নীচতা অশোকনারায়ণ চিরকাল সে সব সযত্নে এড়িয়ে এসেছেন। এই ঋজু চা জন্য অশোকনারায়ণ একটু একলা। জগতে প্রবেশ করবার আগে তাঁর যে ছিল শিক্ষাজগতের সঙ্গে পরিচয়ের পর অনেকটাই তিনি বদলিয়েছেন। শিক্ষকের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর মনে এঁরা আসলে শিক্ষাজগতের মুদী রতী নয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন বন্ধুবান্ধবরা সব কুটিল কুটিলতর জাল ব ব্যস্ত থাকেন মারপ্যাঁচ কোন দিনই অশোকনারায়ণ বো নি বা বুঝতে চেষ্টাও করেন নি। নিজের বিশাল শিক্ষায়তনের সীমানার আনমনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অনে তাঁর অংক কষা মন দিয়ে হিসাব কর এই চত্বরের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কতজন উচ্চশিক্ষিত লোক বাস করেন। তাঁর তাঁকে বলেছে এইখানে একটা বিরাট মন্তর চলতে পারত। বিভিন্ন তপ

…তিতে বজ্ঞাগ্নি পুষ্টি লাভ করতো। …তা হয় নি। অংক মেলে নি। জীবনের …ক্ষেত্রে অশোকনারায়ণ দেখেছেন অংক …না। তাই অশোকনারায়ণ গণিত …ত্রর মধ্যে ডুবে যান।

…গাড়ী নিমপুরার কাছে এসেছে। …পুরার রেলওয়ে কলোনীর বাড়ীগুলি …ক ছেলেরা ছুটে এসে পথে নামে। তাই …যান হ'লেন অশোকনারায়ণ। ছোট ছোট …কামরার পাকা বস্তীগুলি দেখে …াকনারায়ণের মনে পড়ে গেল তিনি …যায় চলেছেন। ছোট্ট ফিয়াট গাড়িটিকে …একলাই বেরিয়ে পড়েছেন।

…যাবেন বন্ধু। রাঁচীর পথে নামকুমের …ছ গ্রাম। সেখানকার পাগলা ডাক্তার অতীন …রী অশোকনারায়ণের বন্ধু। অতীন …ডাক্তারী পড়ত তখন পড়ার চাইতে …নীতিতেই ওর আগ্রহ বেশী ছিল। …তু একদিন ও রাজনীতি একদম ছেড়ে …। কলকাতাও ছাড়ল। বন্ধু বলে যে …নো জনপদ আছে অশোকনারায়ণ তা …তেন না। অতীন ওখানে কুড়ি বছর …দারী করছে। বিয়ে করে নি। খবরের …জ পড়ে না। সাইকেল চেপে গাঁয়ে গাঁয়ে …বেড়ায়। বলে নিজের দেশটাকে তো …বরই চেনবার চেষ্টা করেছি রাজনীতির …দের বক্তৃতা শুনে আর কলকাতার কাগজ …ড় এখন নিজের চোখে দেখে চিনবো। ওর …যে কবে শেষ হবে কেউ জানে না। …হিসাবী অতীন আর গণিতবিশেষজ্ঞ …াকনারায়ণের অগাণিতিক কোনো কারণে …ন করে জানি বন্ধুত্ব জমে গিয়েছিল। …সব সমস্যার কথা অন্য কাউকে বলা যায় না …বন্ধু সেই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা …তেন।

…আজকেও অশোকনারায়ণ চলেছেন তাঁর …সমস্যার কথা বন্ধুকে বলতে। তাঁর …না তাঁর পুত্র অর্কনারায়ণ। অর্কনারায়ণ …র কলেজে ঢুকবে। অর্ক বিজ্ঞানের ভাল …। অশোকনারায়ণ ভেবেছিলেন তাঁর মতোই …নারায়ণও বিজ্ঞান সাধনা বেছে নেবে। …াপুরে না পড়ুক অন্য কোনো বিদ্যা-…ষ্ঠানে পড়বে। অর্ক কিন্তু তাঁর সমস্ত …ব তুচ্ছ করে বলেছে সে পড়াশোনা …বে সংস্কৃত কলেজে। পড়বে সংস্কৃত এবং …ন নিয়ে। সাধারণভাবে কোনো ব্যাপারেই …জ মত অন্যদের ওপরে চাপানো পছন্দ …ন না অশোকনারায়ণ। কিন্তু কিছুতেই …ন নিতে পারছেন না এ ব্যাপারটা। …কের দিনে সংস্কৃত চর্চা এবং দর্শন চর্চা …করী নয় এই কথাটা তাকে পীড়া দিচ্ছে। …এই চিন্তা পীড়া দিচ্ছে বলে তিনি …র কাছেও লজ্জিত বোধ করছেন। কিন্তু …ন অনেক বেশী বিচলিত বোধ করছেন …কারণে। তাঁর বার বার মনে হচ্ছে যে, …ন তাঁর আত্মজকে চিনতে পারছেন না। …ত তাঁর ধারণা ছিল তিনি তাঁর পুত্রকে …ই চেনেন। আজ দুপুরের খাওয়ার পর …ই এ চিন্তাটা তাঁকে অস্থির করে …ছিল। তাই তিনি একদম হঠাৎই স্থির করে ফেলেছেন অতীনের সংগে পরামর্শ করবেন।

তাঁর গাড়ি এতক্ষণে রেলওয়ে কলোনী পেরিয়ে এসে পড়েছে বোম্বে রোডে। এই রাস্তাটা বোম্বাইও যায়। আবার মাদ্রাজও যায়। কিন্তু লোকে বলে বোম্বাই রোড। রাস্তার দুধারে খেত। এখনো বর্ষা জেঁকে পড়ে নি। বেশ ভ্যাপসা গরম। খেতে এখনো হাল পড়ে নি। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে কোনো কোনো জায়গায় ধান বা গম নিবিড় চাষ পরিকল্পনায় ফলেছে। ফাঁকা বিবর্ণ মাঠের মধ্যে ওই রকম সবুজ দ্বীপ-গুলি কেন জানি না মনে পড়িয়ে দেয় মরূদ্যানকে। নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এই সবুজ দ্বীপগুলি তাঁকে যথেষ্ট আনন্দ দিচ্ছিল। এই রাস্তা অশোক-নারায়ণের বহু দিনের চেনা রাস্তা। তিনি জানেন একটু পরেই শুরু হবে ঘন শালবন। ঘন বনের মাঝখান দিয়ে কালো চকচকে ফিতার মতো শানবাঁধানো রাস্তা চলে গিয়েছে দেখতে ভারী ভাল লাগে। মাঝে মাঝেই মাথার ওপর প্লেনের আওয়াজ হচ্ছে। সরদিয়া আর কলাইকুন্ডার কাছে বিমান-ঘাঁটি আছে। সেখান থেকে প্লেন ওড়ে। হিজলীতেও এ আওয়াজ আসে এখানে নিস্তব্ধতা বেশী তাই শব্দটা জোরে শোনায়। শালবনের ফাঁক দিয়ে রুপোর মতো চকচকে প্লেনগুলিকে মাঝে মাঝে পাখি বলে ভুল হয়। রাস্তা ফাঁকা গীয়ার বদল করতে হয় না বেশী বার। স্টিয়ারিংয়ের ওপর হাত রেখে অন্য কথা ভাবার কোনো বাধা নেই। মাইলপোস্টগুলিতে লেখা রয়েছে লোধা-শুলি কতদূরে। লোধাশুলি নামটা ভারী মিষ্টি। লোধাশুলি থেকে ডানহাতি রাস্তা ধরে গেলেই ঝাড়গ্রাম। ওখানে তাঁর বন্ধুপুত্র শানু থাকে। ভারী ভাল ছেলে শানু।

শানুর কথায় আবার অর্কনারায়ণকে তাঁর মনে পড়ল। না সংস্কৃত বা দর্শন পড়তে চাচ্ছে বলে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। তাঁর নিজের পিতামহ দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই তাঁর মনে হচ্ছে অর্ক আসলে বিদ্রোহ করতে চায় তাঁর বিরুদ্ধে। সংস্কৃত পড়াটা সেই বিদ্রোহেরই প্রকাশ। কিন্তু কেন। তিনি তো কিছুতেই বাধা দেন নি। কোথায় তবে তাঁর ভুল হ'লো? কি ভুল কাজ করেছেন তিনি?

নিজের চিন্তায় এতই ডুবে ছিলেন অশোকনারায়ণ যে, কখন তিনি লোধাশুলি পেরিয়েছেন সে খেয়ালই তাঁর হয় নি। আবার খোলা মাঠ এসেছে। মাঠের মাঝে মাঝে এখন বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড়গুলিকে দেখতে ভারী অদ্ভুত লাগে। কোনো কোনো-টাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট ময়ূর পুচ্ছ মেলে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যরাও কি এটা দেখতে পায় কে জানে? বিকেলের পড়ন্ত আলোয় মাঠঘাট সব কেমন একটা মোহময়ী রূপ দিয়েছে। মাইলপোস্টগুলিতে এখন বড়োগোড়া কত কিলোমিটার তাই দেখাচ্ছে। হঠাৎ অশোকনারায়ণের হাসি পেল। মাইল গেছে কিন্তু মাইলপোস্ট আছে। তারপর মনে হ'ল সত্যিই কি গেছে। তিনি তো এখনো ১৬ কি মি এ মোটামুটি দশ মাইল এই হিসাব করেই চলেন।

বিহার-বাংলা সীমান্ত এগিয়ে আসছে। দূর থেকে তাঁর পরিচিত তোরণটি তিনি দেখতে পেলেন। ওখানে ইংরাজীতে লেখা আছে—আপনারা বিহারে প্রবেশ করছেন আপনাদের স্বাগত জানাই। অশরীরি সীমানা রেখায় গাড়ীটা থামালেন অশোক-নারায়ণ। গাড়ী থেকে নেমে হাত পা একটু খেলিয়ে নিলেন। তারপর চারপাশ তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। হাতে সময় কম। তবু এখানে তাঁকে থামতেই হবে। সীমান্ত তাঁকে চিরকাল বিস্মিত করে। এদিকটা বাংলা আর ওদিকটা বিহার। তাঁর ডান পা বাংলায় আর বাঁ পা বিহারে। ভারী অদ্ভুত। মাটির যদি

মন থাকত তবে সে কি ভাবত মানুষের এই ভাগাভাগির পাগলামোকে? তাঁর মনে পড়ে গেল একবার তিনি বনগাঁ গিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক সীমারেখায় দাঁড়িয়েও তাঁর এই কথাই মনে হয়েছিল। পাশে ছিল রেল-লাইন। সে রেললাইন দিয়ে তখন আর রেল-গাড়ী চলতো না। হঠাৎ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন একজন বৃদ্ধা মাথায় ঘাসের বোঝা নিয়ে সেই পরিত্যক্ত রেললাইনের ওপর দিয়ে সোজা হেঁটে চলেছেন।

অশোকনারায়ণ উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন সীমান্তরক্ষীকে—ওই যে যিনি চলেছেন ওঁর পাশপোর্ট ভিসা আছে?

সীমান্তরক্ষীরা খুব হেসেছিলেন। বলেছিলেন—'না ওঁর ওসব বালাই নেই। উনি এখানকারই মেয়ে ছিলেন। কয়েকটি গোরু ছাড়া ওঁর আর কেউ নেই। উনি দেশ বিভাগ মানেন না। হেঁটে চলে যান যেখানে ওঁর গোরুর জন্য ভাল ঘাস পাওয়া যাবে। তা এ পারেই হোক কিংবা ও পারেই হোক। আমরা একদিন আটকাতে গিয়ে-ছিলাম। বললেন—এডা আমার দেশ নয় বললেই হ'লো? চিরকাল জানি বনগাঁ আমার দেশ এখন উল্টোলিই হবে নাকি? আমরা কিছু বলি না। অশোকনারায়ণের গল্পটা খুব ভাল লেগেছিল। ভাগাভাগির অট্টরোলে এরকম আরো পাগলী থাকলে কি ভালই না হ'তো। আজ বিকালবেলা বাংলা-বিহার সীমান্তে দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধাকে তাঁর মনে পড়লো।

কিন্তু না অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। এখনো অনেকটা পথ। গাড়ীতে উঠে অশোকনারায়ণ গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন। ছোট ছোট জনপদ দু চারটি চোখে পড়লো। বিহারে প্রবেশ করেছেন বুঝলেন দোকান-পত্রের দেবনাগরী অক্ষরে নাম দেখে। বহড়া-গোড়া এসে গেল। বহড়াগোড়া থেকে বাংলা এবং ওড়িশা দুটোই খুব বেশী দূরে নয়। বহড়াগোড়া থেকে ডান দিকের রাস্তা চলে গেছে একদম জি টি রোডে। এই রাস্তার ওপরই ঘাটশীলা, ধলভূমগড়, জামশেদপুর, নামকুম, রাঁচী। রাস্তা অপূর্ব সুন্দর। দুধারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কখনো শ্যামল কখনো নীল পর্বতরাজি। অস্তরবির আভা পাহাড়গুলিতে যেন কি একটা মায়া লাগিয়ে দিয়েছে। পাহাড় দেখেই মনে হয় এখানে দুদন্ড দাঁড়িয়ে যাই। হেঁটে মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের তলায় গিয়ে একটু বসি। কিন্তু না এখন আর সময় হ'বে না। সেই সঙ্গে অশোকনারায়ণের এটাও মনে হ'ল এখান দিয়ে যতবার তিনি গেছেন কোনোবারই তাঁর সময় হয় নি।

সূর্য অস্ত গেছে। কিন্তু এখনো অন্ধকার হয় নি। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। এই প্রথম অশোকনারায়ণের অস্বস্তি লাগলো। একলা এতটা পথ এমনি করে বেরিয়ে আসা উচিত হয় নি। অন্ধকারে এ রাস্তায় গাড়ী খারাপ হ'লে কিছু করার নেই। ভোর বেলার জন্য কিংবা চলতি গাড়ী লরীর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই। এ রাস্তায় চুরি ডাকাতির কথাও তিনি শুনেছেন।

আবারো গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিলেন অশোকনারায়ণ। এতক্ষণে অন্ধকার জেঁকে নেমেছে। আজ চাঁদ উঠবে একটু দেরিতে। এখন গাড়ীর হেডলাইট জ্বালাতে হ'বে। গাড়ী অন্ধকার কেটে এগিয়ে চলেছে। অনেক রকমের পোকা দেখা যাচ্ছে আলোর সামনে। এ ছাড়া আর কোনোপ্রাণী কোথাও নেই। ধলভূমগড়, ঘাটশীলা কি খুব দূরে? রাস্তা যেন একটু দীর্ঘ মনে হচ্ছে অশোক-নারায়ণের।

গাড়ীটা হঠাৎ ধাক্কা দিতে শুরু করলো। এরকম তো কখনো ব্যবহার করে না তাঁর গাড়ী। অশোনারায়ণের কপাল চিন্তায় একটু কুঁচকে গেল। কিন্তু না গাড়ীটা আবার ঠিক চলতে সুরু করেছে। মনে একটু খচখচ করলেও আপাতত নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। গাড়ী এক-দম থেমে গেল। অশোকনারায়ণ দুচারবার গাড়ী চালাবার চেষ্টা করলেন। কোনো ফল হ'ল না। অশোকনারায়ণ বুঝলেন তাঁর কিছু করার নেই। গাড়ীর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। খোলা আকাশের দিকে চোখ পড়লো। এক নিমেষে সমস্ত দুশ্চিন্ত। দূরে হয়ে গেল। কি সুন্দর। তারায় ভরা আকাশের রূপই আলাদা। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক শুনলেন। পথ চলতি লরী পান কি না তার জন্য অপেক্ষা করলেন। অন্ততঃ গাড়ীটা যদি জামশেদপুর অবধি টেনে নেওয়া যেত। জামশেদপুরে তাঁর দু'একজন বন্ধুবান্ধব আছেন। রাত্রিটাও কাটানো যেতো। গাড়ীটার কি হয়েছে তাও বোঝা যেত। কিন্তু এখন অস্থির হয়ে কোনো ... হ'বে না।

গাড়ীর কাঁচ ওঠালেন। গাড়ী ... করলেন। তারপর সন্ধ্যার ঠান্ডা হাওয়া ... বেড়াতে লাগলেন। বারবার তাঁর চো... ফিরে ফিরে যেতে লাগলো তারাদের রাজ্যে... মনে পড়লো ছোটবেলায় ঠাকুমা বলতে... মানুষ মরে যাবার পর আকাশে তারা হ... থাকে। ঠাকুমা কোন্ তারাটা?

কতক্ষণ চলেছিলেন কতটা দূরে গিয়ে... ছিলেন অশোকনারায়ণের কোনো খেয়া... ছিল না। হঠাৎ খেয়াল হলো যখন তি... বাঁদিকে একটা বাড়ীতে আলো দেখলেন... এখানে বাড়ী থাকতে পারে এ ধারণাই তা... ছিল না। তাড়াতাড়ি পা চালালেন। আজ... ওঁর বিস্ময়ের অনেক বাকি আছে। ... চওড়া একটা পাকা রাস্তা পেরিয়ে আ... আস্তে একসময় বাড়ীর সামনে এ... দাঁড়ালেন। ধবধবে সাদা রঙ বাড়ীর... ভীষণ সাদা, অন্ধকারেও তার রং চোখে এ... লাগছে। আর বাড়ীটা সম্পূর্ণ গোলাকা... সেই গোল বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে গে... বারান্দা। বাড়ীটার গঠনভঙ্গী চোখে লাগে... তারপর অশোকনারায়ণ দেখলেন দূরে দূ... আরো বাড়ী আছে সবই এইরকম গোলা... কার। অশোকনারায়ণ উঠলেন বারান্দা... ওপর। দরজায় টোকা দিলেন। ভেতর থে... ভরাট গলায় আওয়াজ এলো 'কাইরে... শংকর?' অশোকনারায়ণ জবাব দিলেন আ... অচেনা লোক একটু বিপদে পড়ে এসেছি... এবার দরজা খুলে গেল। সামনে এক... সৌম্য বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। মাথার চুল ধপধপে... সাদা। খালি গা পরণে লুঙ্গির মতন কাপড়... বললেন 'কি কান্ড হলো?' কানে ... খটকা লাগলো অশোকানারায়ণের। তারপ... মনে পড়ে গেল জায়গাটা ওড়িশা, বিহা... বাংলার সঙ্গমস্থল। ...দের কথা সংক্ষে... শোনালেন। ভদ্রলোক বললেন, 'এতে ... কি হয়েছে আপনার সব ব্যবস্থা হবে। ... নাতির ব্যায়রামই হোল পুরানো জিনিষ নি... ঘাঁটাঘাঁটি করা। তবে আপনার কাছে ... গাড়ী আছে শুনলে তাও আবার চা... অবস্থায় ভীষণ খুশি হবে। আমরা শোনে... এধার-ওধার দু-চারটে গাড়ী চলে। কি... বেশী দেখতে পাই না। আমার না... নাতিনরা বিশ্বাস করে না আমার ছোটবে... এখান দিয়ে পেট্রোল ডিজেল গা... চলতো। অশোকনারায়ণ চমকালেন। ভ... লোকের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাতে... কিন্তু বৃদ্ধ তখন বলেই চলেছেন ... কিসব ভাল দিনই না ছিল। তার... সামলে বললেন 'অদ্ভুত ব্যবহার আ... আমি আপনাকে বসতে বলি নি। আ... বোসন বোসন। আজ মোর বড় ভাল ... আপনি কাম করলেন। আমার আজ বড় ... দিন। আমার নাতির একটি কন্যা হ... অনেকদিন বাদে বাড়ীতে নুয়া বাচ্চা ... বড় খুশীর দিন আজ। আপনি যদি স... এলেনই তবে আমাদের সঙ্গে আজ খেয়ে... আমাদের আনন্দের ভাগ নেন। এই ম... ওরা কেউ বাড়ী নেই। আসবে যে... সময়ে। ওরা ধলভূম হস্পতাল ...
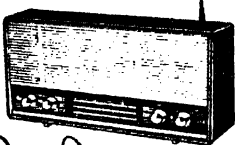
মার নাতবউ-এর কন্যা হয়েছে। লে হাসপাতাল। ভদ্রলোক কি ক? মোটরগাড়ী চালু অবস্থায় অবাক হলেন। শিক্ষিত লোক হচ্ছে কিন্তু এ কি ভাষা। ও'র শব্দ ব্যবহার দেখে হোঁচট শাকনারায়ণ।

ক্ষণ পরে হৈ হৈ করতে করতে লো। হঠাৎ এসে যেন হাজির ড়ির সামনে। বৃদ্ধ দরজা লন। নানা বয়সের ছেলেমেয়ে রা ঘরে ঢুকে পড়লো। সবাই থা বলতে গিয়ে হঠাৎ অশোক- দখে একটু থমকে গেল। একটি মেয়ে যাকে দেখে কেমন যেন হল অশোকানারায়ণের বলে দা তোমার ঘরে গেস্টো এসেছে। কি মিষ্টি বাচ্চা যে হয়েছে ম জান না। বৃদ্ধ বললেন, এই র নামই তো জানা হয়নি। কনারায়ণ নিজের নাম বললেন। লন, বাঃ বাঃ কি সুন্দর। ড়ীর সঙ্গে নামের মিল আছে। ন্দীপনারায়ণ। আমার ছেলের নাম । আমার নাতির নাম আনন্দ- অশোকনারায়ণ নমস্কার করলেন। হাত বাড়িয়ে ও'র কনুই ধরতে বোধহয় ও'র নমস্কার করা দেখে গেল। অশোকানারায়ণ জানতেন ড়িশা বাংলার সংযোগস্থলের বাংলা যেমন কেমন হয় নারায়ণ তেন কিন্তু এরা নমস্কার জানে ন।

বললেন যা ঠান্ডা জল পাঠিয়ে থেকে আর খাবার হলে ডাকিস। লের সঙ্গে এলো মিষ্টি। খেতে ন ধরনের বরফি। বৃদ্ধ এতক্ষণ প করতে বসলেন। বললেন, আসে তখন ঝাঁকে আসে। ছেলেমেয়ে নাতিনাতনীরা এসেছে ন, অন্যসময় কেউ থাকে না। থাকি। আজ আমার বড় সুখের খের দিন! জানেন ছেলেমেয়েরা আমি পুরাতনপন্থী। হয়তো কিন্তু এই বাড়ীতে আমি একটি কক্ষ রেখেছি। সেখানে আমার পুরুষের অয়েল পেন্টিং আছে। বিও কেউ আঁকায় না—পূর্ব- খবরও কেউ রাখে না। কিন্তু আমরা তো ভূঁইফোড় নই। দের খবর রাখতে হয়। ছেলে- নাতনী সবাই আমার ভাল। এই সব। হয়তো ধলভূমের হপতাল ই এসেছে। কিন্তু সবাই তো আমার ওই নাতনীকে দেখলেন দের। মেয়েটাকে আমার খুব । ও এলে বলে এই জায়গার লে ওর ছুটে তার কোলে যেতে এমনিতে ভীষণ বকবকিয়াল বড় ভাল। দুদিন বাদে ওরা আমি আবার একলা থাকবো।

একসময় ওই সিঁদুর মেয়েটি ওদের ডেকে নিয়ে গেল খাবার হয়ে গেছে। রান্নায় কোন তেল ব্যবহার করা হয়েছে অশোক- নারায়ণ ধরতে পারলেন না। খাবার মধ্যেও দু একটা তরকারী চিনতে পারলেন না। কিন্তু ততক্ষণে অশোকনারায়ণ প্রায় কোনো জিনিষেই আর অবাক বোধ করছেন না। তাছাড়া খাবার খেতে অতি সুস্বাদু। সিঁদুর পরিবেশন করছিল। হঠাৎ বলে উঠল—রাঙাদা দেখেছো তোমার গেস্টো কেমন জানি কথা বলে। যেন পুরাতন দিন থেকে উঠে এসেছে। আবার বলছো ওর নাকি সত্যি মটোরগাড়ী আছে। সত্যি নাকি গো? শেষ প্রশ্নটা অশোকনারায়ণকে। বৃদ্ধ সস্নেহ ভৎর্সনা করলেন নাতনীকে। তার- পর বললেন সত্য বলতে কি ও ভুল বলছে না। আপনি প্রাচীন ভাষায় কথা বলেন, যে ভাষা আমরা পাই আমাদের পুরানো সাহিত্যে। অশোকনারায়ণের হাসিও পেল রাগও হলো। ভদ্রতার খাতিরে বলতে পারলেন না তোমরা বাংলা ভাষা জান না। আমি যে বাংলা বলছি সেটাই আজকের চালু বাংলা।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে বৃদ্ধ অশোক- নারায়ণকে বললেন, চলুন আপনাকে আপনার ঘরে নিয়ে যাই। বাড়ীটার যে দোতলায় ঘর আছে বুঝতে পারেন নি অশোকনারায়ণ। এখন বুঝলেন বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও বাড়ীটা আসলে দোতলা। তবে তলাগুলি অনেক নীচু। হাত বাড়ালেই ছাদ পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই চোখে পড়লো দেওয়ালজোড়া ছবির সারি। সন্দীপ নারায়ণ ছবিগুলি দেখেই বেশ খুশী হয়ে গেলেন। সগৌরবে বললেন এই আমার পূর্বপুরুষ কক্ষ।

এই দেখুন আমার বাবা প্রণবনারায়ণ; উনি মহাপন্ডিত ছিলেন। আসলে আমাদের রক্তে অধ্যাপনা আছে। আমিই অন্যরকম। এই দেখুন আমার পিতামহ স্বদেশনারায়ণ; দেশ যখন পশ্চিমীয়ানার স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল আমার পিতামহ নিজের পিতৃদত্ত নাম বদল করে নাম রাখেন স্বদেশনারায়ণ। একটু থেমেই বললেন তিনি উপাধিও বদল করেন। আমাদের পৈতৃক রায় পদবী ত্যাগ করে নারায়ণকে পদবী করে নেন। এই আমার পিতামহ গৌরবনারায়ণ রায়। আর এই আমার বৃদ্ধ পিতামহ অর্কনারায়ণ রায়। অনেকক্ষণ ধরে যে সন্দেহ হচ্ছিল এবার সে সন্দেহটুকু আর রইলো না। আস্তে আস্তে তিনি সন্দীপনারায়ণের বৃদ্ধ পিতামহের ছবির দিকে এগিয়ে গেলেন। কোনো সন্দেহ নেই তাঁরই পুত্র অর্কনারায়ণের ছবি। আজকের কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো অর্কনারায়ণকে এই পরিণত বয়সের ছবিতেও চিনতে কষ্ট হয় না। অশোক- নারায়ণ ঘুরে দাঁড়ালেন তাঁর প্র প্র প্র পৌত্রের দিকে। প্রশ্ন করলেন আপনি আপনার অতিবৃদ্ধ পিতামহের নাম জানেন? সন্দীপনারায়ণ মাথা নাড়লেন। না আমার মনে নেই। তবে আমার পারিবারিক খাতায় আমাদের বংশলতিকা আছে তাতে লেখা আছে। কিন্তু কেন করছেন এই প্রশ্ন? অশোকনারায়ণের অ-নে-ক প্রশ্ন ছিল। কিন্তু কোনো প্রশ্নই করলেন না। সিঁদুর এসে ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে অশোক- নারায়ণ বুঝলেন ওকে তাঁর কেন চেনা মনে হয়েছিল। এ মুখ তাঁর বাড়ীতে অনেকবার এসেছে। নানাভাবে আরেকবার দেখলেন অশোকনারায়ণ। দাদুকে ধমক দিল নাতনী— তুমি ও'কে বিশ্রাম করতে দাও। তারপর তাঁর দিকে ফিরে বললো আপনি পুরানো দিনের ভাষায় কথা বলেন একটা পুরানো নাম দিন না আমার ভাইঝির। অশোকনারায়ণ চমকে উঠলেন। তাঁর কি অসীম সৌভাগ্য তাঁর সপ্তমতম উত্তরপুরুষের নাম রাখার তিনি সুযোগ পাচ্ছেন। তাঁর নিজের স্ত্রীর কথা মনে হল তাঁর নাম শাশ্বতী। বললেন তোমার ভাইঝির নাম রাখ শাশ্বতী। তারপর বললেন আমার গাড়ীতে আমার শোবার কাপড় আছে নিয়ে আসি।

বেরিয়ে এসে আবার চোখ পড়লো আকাশভরা তারার দিকে। ধ্রুবতারা জ্বল- জ্বল করছে। ওই তারাটিকে দেখে অশোক- নারায়ণের মন আনন্দে আর বিষাদে ভরে গেল। ধীর পায়ে হেঁটে এসে তাঁর গাড়ীর পাশে দাঁড়ালেন। সাত পুরুষ আগেও আকাশ এমনই সুন্দর ছিল। সুন্দর আকাশের কিছুতেই আসে যায় না। দরজা খুলে তিনি গাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন। রাতটা তিনি গাড়ীতেই কাটাবেন। ভবিষ্যত সম্বন্ধে তাঁর বেশী আগ্রহ নেই। কাল সকালবেলা যে করেই হোক তিনি খড়্গপুরে ফিরতে পারবেন। অর্কনারায়ণের সম্বন্ধেও তাঁর কোনো চিন্তা নেই। অতীতের কাছে তাই যাওয়ারও তাঁর দরকার নেই। এতক্ষণে চাঁদ উঠেছে। পাহাড়ের ওপর চাঁদ দেখে এই পৃথিবীটাকে বড় ভাল লাগলো অশোক নারায়ণের।

লীলা মজুমদার

বিশ শতকের শুরু থেকে বাঙ্গালী জীবনের স্মৃতি আলেখ্য

(তিন)

নানকুদা বেজায় ভালো সঙ্গী হলেও বেশ একটু যে নিষ্ঠুর ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের বয়স চার, পাঁচ, ছয়, ও যা বলত সব বিশ্বাস করতাম, একরকম বলতে গেলে ওর অনুগত ভক্ত ছিলাম। রোদে তাতানো ছাদে আমাদের খালি পায়ে হাঁটাত। অন্ধকার লোহার সিঁড়ি দিয়ে এক তলায় নামাত। বিকট সব গল্প বলে আলো নিবিয়ে ঘর থেকে চলে যেত। আবার কেউ পড়ে গেলে, ছুটে এসে কোলে তুলে ওষুধ দিত। তখনো সে স্কুলের গণ্ডী ছাড়ায়নি। ওর সমবয়সী পানকুদা ছিল ছোট জ্যাঠার ছেলে, বড় বেশি ভাবিক্কে ধরনের। ছোট বেলায় মা হারিয়ে কেমন যেন নিজের মধ্যে নিজে বন্ধ হয়ে গেছিল, সে-কথা পরে বুঝে ছিলাম। এরা দুজনে আমার মাকে বড্ড ভালোবাসত, ডাকত 'মান্তু' বলে। সুকুমার তখন বিলেতে। সুবিনয় নিশ্চয়ই বাড়িতেই থাকত, কলেজে পড়ত, আমাদের সঙ্গে খুব একটা মিশত না। তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হত না। জ্যাঠামশায়ের বুড়ো চাকর প্রয়াগ আমাদের গল্প বলত। দেশের গল্প, জন্তু-জানোয়ারের গল্প।

মনে আছে আমরা আসার কিছুদিন পরেই দেওয়ালী হল। সুকিয়া স্ট্রীটের সব বাড়িতে তেলের পিদিম জ্বালা হল, আমাদের বাড়িতে ছাড়া। শুনলাম ব্রাহ্মদের কালীপুজোয় আলো জ্বালবার দরকার নেই। শুনে অবাক হলাম। শিলং-এ আমাদের পাড়ার কাউকেই কালীপুজোয় আলো জ্বালতে দেখিনি। লাবানে নিশ্চয়ই পুজো হত, কিন্তু তার কিছুই মনে নেই। আলো দিতে না পেরে মনমরা হয়ে ছাদে গিয়ে চক্ষুস্থির! চারদিক আলোয় আলোময়! আর মাথার ওপর এত ফানুস উড়ছে যে আকাশটা প্রায় ঢেকে গেছে। মনে আছে একটা ফানুস ঠিক একটা হাতির আকারে তৈরি। সেটা আমার খুব নিচে দিয়ে উড়তে উড়তে হঠাৎ জ্বলে উঠল আর দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমাদের সে কি দুঃখ!

আরো মনে পড়ে আমার পিসতুতো বোন ময়নার দুই বছরের জন্মদিন খুব ধুম করে হয়েছিল। আগাগোড়া অনুষ্ঠানটি ছিল রীতিমতো এর্সাইজ। পিসেমশাইকে চিনত না এমন লোক ছিল না। তাঁর নাম ছিল হেমেন্দ্রমোহন বসু, কুন্তলীন তেল আর দিলখোস সেন্ট তৈরি করে তিনি বিখ্যাত হয়ে গেছিলেন। সে সময়ে আমাদের দেশে ও-সব বিলাসদ্রব্য হতই না প্রায়। পিসেমশাই ছিলেন অগ্রণী-দের একজন।

নানান বিষয়ে উৎসাহ ছিল তাঁর। তখন গ্রামোফোনের জন্য ডিস্কের বদলে সিলিণ্ডার ব্যবহার হত। পিসেমশাই সেই সময় রবীন্দ্রনাথের গাওয়া বঙ্কিমের বন্দে-মাতরম গানটি রেকর্ড করেছিলেন। তাঁর ছেলেদের কাছে ঐ সিলিণ্ডারটি এখনো আছে, তবে কেমন অবস্থায় তা জানি না। বাড়িতে বায়োস্কোপ দেখাবার ব্যবস্থা কর-তেন তিনি। ময়নার জন্মদিনেও দেখানো হয়েছিল। তখনো পিসেমশায়ের নিজের বাড়ি হয়নি, কোনো আত্মীয়ের বাগানে জন্মদিন করা হল।

বাগানের মাঝখানে দেখলাম সবুজ একটা কাঠের টবে একটা সত্যিকার গাছ পোঁতা রয়েছে। তার ডালে ডালে রঙীন কাচের গোলা মোমবাতি আর অজস্র খেলনা ঝুলছে। গাছের মগডালে একটা পরী পুতুল। সব খেলনায় একটি করে নম্বর দেওয়া ছিল। সকলকে একটা ঝুড়ি থেকে ইচ্ছেমতো টিকিট তুলতে বলা হল।

সুবিনয় রায়

টিকিটের যে নম্বর, সেই নম্ব[র]
সবাই পেল। পরী-পুতুল কে[উ]
নেই, কিন্তু আমি পেলাম বু[ক]
চমৎকার ছবি দেওয়া এ-বি-সি[র]
খুশী হয়েছিলাম যে তার পর
বসে এ থেকে জেড্ পর্যন্ত শেখা
ততদিনে বাংলা অক্ষরও চিনতে
বড়দি আমাদের 'হাসিখুসি' আ[র]
ভোগ' বলে দুখানি বই দিয়ো[ছিল]
আমার নিজের প্রথম বই।

তারপর বাবা তাঁর বনে ব[নে]
কাজ সেরে ফিরে এলেন। বাড়ি
থেকে ক্ষীরের ছাঁচ আর নারকে[ল]
নিয়ে ফিরল। আমাদের শিল[ং]
সময় হয়ে এল। তার আগে হা[তি]
পিসেমশায়ের ভাড়াবাড়িতে কয়ে[ক]
হল। কি প্রকাণ্ড বাড়ি আর
দুরন্ত পিসেমশাইয়ের যে-সব
আমাদের সমবয়সী, বিশেষতঃ গু
কার্তিকদা বলে দুজন। তারা আ
বলে এক হাটে কিনে আরেক
আসতে পারত। কিন্তু ও-বাড়ি
বেজায় ভালো লাগত। ওদের
ছিল সব আমাদের নিতে দিত।
যা খুশি নিজেরাও খেত, আম
সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা, কুলপী-ব
বড়রা যেমন ভালো, ছোটগুলো
বাঁদর ছিল। মনে আছে, আ
পেয়ারের ভাগ্নি ছিল। একদি
বলল, 'বুঁদি একটা চোর
হবে।' কার্তিকদা বলল, 'হ্যাঁ
হবেই, চুরি করবে আর তার বি
বুঁদি ভেবেছে কি! চল ওকে ধ
চল।' এই বলে বুঁদি কে
ধরে ঝুলিয়ে ছাদে নিয়ে
দেখলাম দাদাও কিছু ব
আমি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে
সঙ্গে গেলাম। বলা বাহুল্য
সুযোগ হল না। পিসিমার মে
প্রায় আমার সমান বয়স, আমার
এক বছরের ছোট, এরা হল নী
বিচারে বুঁদির ফাঁসির হুকুম
তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ছিকে ছাদে
শিকলিতে দড়ি বেঁধে লটকেও
তবু মরছে না দেখে, কিলো
ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ওর হাত-পা খ
হতে লাগল।

আমি আর সইতে না পে
করে কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি
নিচে নামতে লাগলাম। মু
নিজের ঘরে ছিল। সে আমাকে
চোখ মুছিয়ে, তার সত্যিকার ব
টানা ট্রেন চালিয়ে দেখাতে ল
দূরে গিয়ে এঞ্জিনটা আবার লাইন
হুড়মুড় করে পড়ল। তত
চোখের জল শুকিয়ে গেছি
মুকুলদার বয়স হয়তো তেরো
এই মুকুলদা অন্য সকলের থে
একজন বিশেষ মানুষ। খু
হাঁটু জখম হয়ে ওর একটা পা
হয়ে গেছিল। সারা জীবন ও সে

রেছে। সিনেমা জগতে ফটোগ্রাফির জন্য ভারত-জোড়া নাম। আমার চাইতে বছর ...কের বড় হবে, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান। ...রেও আমার প্রয়োজনের সময় আমার এসে দাঁড়িয়েছে। সুদর্শন এই ...তির তুলনা নেই। আমি ওকে কখনো দিইনি। দেওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য গণেশদাদের যথেষ্ট বকা-করা এবং আমাকে একটা চমৎকার চোখ-...-চোখ-বোজা ডলি কিনে দেওয়া হয়ে-...। এমনি করে তিলে তিলে আমাদের ...ন রস-রোমাঞ্চের অবতারণা হয়েছিল। ফিরে যাবার আগে আরেকটি ঘটনা ...ছল, আমাদের ওপর যার প্রভাব ছিল ...র্ঘ ও সুদূরপ্রসারী। সে হল উপেন্দ্র-...বাবুর 'সন্দেশ' পত্রিকা। ১লা বৈশাখ ...। সেদিনটি আমার এখনো মনে আছে। ...বেলা আমরা সকলে দোতলার বসবার ...বসে আছি। দিদির আমার হাতের সোনার চুড়ি হয়েছে, তার চকচকে ...র দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। ...সময় জ্যাঠামশাই হাসতে হাসতে ওপরে এলেন। হাতে তাঁর 'সন্দেশের' প্রথম ...। কি চমৎকার তার মলাট! গাল-ভরা ...শ, হাতে 'সন্দেশ' ভাই-বোন শোভা ...ছে। যতদূর মনে হয় এইটেই ছিল প্রথম ...ট। পরের বছর বোধ হয় দাদু-প্যাটার্নের ...ন সন্দেশের হাঁড়ি আর 'সন্দেশ' উঁচু ...ধরে রেখেছে আর ভাই-বোন সেগুলো ...র জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। প্রতি বছর ...মশায়ের আঁকা নতুন রঙীন মলাট, ...তোলে ছাপা, সাল তারিখ গুলিয়ে যায়।

...মা, বড়দিদি, টুনিদিদি সবাই মিলে ...রকম আনন্দ কোলাহল করে উঠলেন, ...ই আমাদেরো বুঝতে বাকি রইল না যে একটা বিশেষ দিন। কবিতা গল্প আমা-...পড়ে শোনানো হয়েছিল, কিন্তু তার ...ই মনে নেই। 'সন্দেশের' ছোট হরপের ...না সুবিধা করতে পারতাম না। ঐ যে ...মশাই 'সন্দেশ' ঢুকিয়ে দিলেন আমা-...জীবনে, আমার মনে হয় কালে কালে ...আমাকে যতখানি প্রভাবিত করেছিল, ...না আর কিছু নয়। এমন কি জ্যাঠামশাই ...ও না। ১৯১৩ সালের এই ঘটনার পর ...মাত্র দু বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু ...র সমস্ত শৈশবের চিন্তার কেন্দ্র ছিল একটি ছোট মাসিক পত্রিকা, তার কবিতা ...ছবি ধাঁধা; কোনো ...মানুষ না। ...মশাই পরলোকে যাবার পরেও সে প্রভাব ...কে স্তিমিত হয়নি। কবে যে নিজে বাংলা ভাষার রস গ্রহণ করতে শিখে-...ম সে আর মনে নেই। কিন্তু সে যে ...শ' এবং জ্যাঠামশায়ের ইউ রায় অ্যান্ড ...র প্রকাশিত নানান অবিস্মরণীয় বইয়ের ...ই সাহায্য হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ ...। কারণ ১৯১৪ সালে দিদি আমি ...রেটো কনভেন্টে ভরতি হয়েছিলাম।

মানকুদা
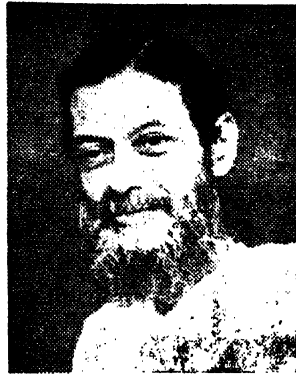
সেখানে বাংলা তো পড়ানো হতই না, তার ওপর সহপাঠিনীরা আর কানো কোনো মাস্টারনীরাও যে 'নেটিভ'দের এবং নেটিভ ভাষা, নিয়ম চালচলনকে ঘৃণা করে, সেটা বুঝতে আমাদের দেরি লাগেনি। এর ফলে আমাদের কেমন একটা জেদ চেপে গেছিল। ইংরিজিতে তো ওদের সমান সমান হয়ে উঠলামই, তার ওপর বাড়িতে বাংলা বইয়ের সংগ্রহটি দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল। ছেলেদের রামায়ণ, তার ছবিই বা কি অপূর্ব, অমন বিকট তাড়কারাক্ষসী অমন রং দিয়ে এঁকে কটামিলেড কাগজে অমন চমৎকার করে আজ পর্যন্ত কেউ এঁকেছে বলে শুনিনি। ছেলেদের মহাভারত আর সেই কবিতায় ছোট্ট রামায়ণ, বাংলা ভাষায় যার তুলনা নেই। ছোট জ্যাঠামশায়ের 'ইলিয়াড' 'ওডিসিয়ুস' 'রবিন-হুড' 'বেতাল পঞ্চ-বিংশতি' 'বত্রিশ সিংহাসন' 'কথা সরিৎসাগর'। বড়দির 'আরো গল্প' ইত্যাদি।

আগাছের চোটে সময়কে ছাড়িয়ে যাচ্ছি, এসব হল ১৯১৪-১৫-র কথা। আমরা হয়তো ১৯১৩-র শেষের দিকে শিলং এ ফিরেছিলাম। মনে আছে কোনো কারণে বাড়ি পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেছিল। তখন একে দিন ছোট হয়ে এসেছিল, তার ওপর পাহাড়দেশের সূর্য বিকেল শেষ না হতেই টুপ করে পাহাড়ের পিছনে নেমে পড়ে। চূড়োয় চূড়োয় রোদ লেগে থাকে, অনেক উঁচুতে যেসব বাড়ি তাদের জানলার সার্শিতে পড়ন্ত রোদ ঝিকমিক করে ওঠে, চোখ ঝলসে যায়। পাহাড়তলিতে তখন ঝোপেঝাড়ে জোনাকিপোকা জ্বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে, গাছের তলায় তলায় অন্ধকার জমেছে। তারপর হঠাৎ কখন সব লেপেপুঁছে একাকার হয়ে যায়। পথের তেলের বাতি টিমটিম করে আর মাথার ওপরকার নীল আকাশটাকে গাঢ় বেগুনি দেখায়, তার ওপর লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলতে থাকে। সে তারার আলোই বা কি! চাঁদ না থাকলেও চারদিক ফুটফুট করে।

এই রকম দিনে, এই রকম সময়, আমরা ক্লান্ত শরীরে হাই-উইন্ডস্-এ এসে পৌঁছলাম। লাল গেটের কাছ থেকে দেখতে পেলাম কাচের জানলার পিছনে সারি সারি তেলের ল্যাম্প জ্বলছে, সামনের দরজা খোলা, বারান্দায় লোকজন। সব মিলিয়ে, যেন হাত বাড়িয়ে আমাদের কোলে তুলে নিল। অমনি সব ক্লান্তি, সব বিরক্তি দূর হয়ে গেল। আমরা গেট থেকে এক দৌড়ে কাঁকর দেওয়া পথ দিয়ে নেমে বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। সেখানে অমর কাকাবাবু, খুড়িমা, হরিচরণ, নন্দ আমাদের জন্যেই পথ চেয়ে ছিলেন। গত ছয়টা মাস সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে মুছে গেল। এই তো আমাদের নিজেদের জায়গাটিতে ফিরে এসেছি। এত আরাম, এত নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা আর কোথাও নেই।

অমর কাকাবাবু বাবাদের অফিসের অফিসার। তাঁরা যে আমাদের সত্যিকার কেউ নন, এ জ্ঞান যখন হয়েছিল, তখন বুকটা টনটন করে উঠেছিল। অন্যদের কি হয় জানি না, ছোটবেলা থেকে আমার কিন্তু বেজায় দুঃখ হলে বুকের ভিতর সত্যি সত্যি ব্যথা করতে থাকে। আমাদের বাড়ির সামনেই মিশনারিদের সরকারি স্কুল, পাইনমাউন্ট স্কুল। সেখানকার মেমরা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন। তার পরেই 'নরেস্ক', প্রায় অবিকল হাই-উইন্ডস্-এর মতো, দুই বাড়ির একই মালিক। নরেস্ক্-এ অমর-কাকাবাবুরা থাকতেন। ভারি ফ্যাশানেবল্ ছিলেন ওঁরা। কেমন সাদাপোষাক পরা বাবুর্চি ওঁদের রান্না করত। কাকাবাবু কাঁটাচামচে দিয়ে খেতেন আর খুড়িমা যে কি সুন্দরী ছিলেন সে আর কি বলব। কি সুন্দর সব গোলাপী, নীল রেশমী শাড়ি পরতেন, দেখে দিদি আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আমাদের বাড়িতে যে বাঙালী ব্যবস্থা এটাও তখন বুঝতাম না। শীতের দেশ, টেবিলে খাওয়া হত, এই যা তফাৎ। ২২নং সুকিয়া স্ট্রীটে পিঁড়ি পেতে বড় বড় কাঁসার থালায় সবাই খেতাম। তা হক গে। কাকাবাবুদের বাড়িতে কিছু ভালো রান্না হলে, আমরা ভাগ পেতাম। মাঝে মাঝে পার্টি হত, যা ঝড়তি-পড়তি বাকি থাকত, পরদিন তার খানিকটা আমাদের বাড়িতে আসত। রোজ দুবেলা যদি দেখা না হত, সে বড় আশ্চর্য ব্যাপার হত। থাকতাম দুই বাড়িতে, ওঁরা যে যার নিজেদের জীবন কাটাবেন, কিন্তু আমাদের দিন কাটত এক সঙ্গে গাদাগাদি করে। শুধু খাবার সময় যে যার বাড়ি যেতাম।

(চলবে)

দিলীপ কুণ্ডুর ছবি

কলকাতায় কর্মরত চিত্রকরদের মধ্যে দিলীপ কুণ্ডু একটু পৃথক। কোন আড্ডায় তাঁকে খুঁজে পাওয়া বিরল ব্যাপার।

বলিষ্ঠ রং ও রেখায় তাঁর বন্দী পাখি নামের ছবিগুলি রসিকমহলে বিশেষ সুপরিচিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে নিয়মিত অংশ গ্রহণ ছাড়াও নিয়মিত একক প্রদর্শনী করে থাকেন। নয়াদিল্লীর আধুনিক চিত্র সংগ্রহশালায় তাঁর ছবি স্থান পেয়েছে। বর্তমানে কলকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন।

ভট্টাচার্যের

লীন তরুণ চিত্রকর-
চিত্রশিল্পী ভারতীয়
ক্ষেত্রে বিশেষভাবে
চার্য তাঁদের মধ্যে
বলিষ্ঠ রেখায় ও
কেন। মানুষ তাঁর
গত বিমূর্ত অর্থে
শ ভট্টাচার্যর ছবি সে
ভ্যস্ত চোখের বাইরে
রা হই, নিশ্চিন্তে
, সেখানেই সোচ্চারে
য়ালা ট্যাঁপখোট বাদক
রিবন্ধ শ্রেণীর কোন
য়নি। অজস্র ছবিতে
নানাভাবে। এই
চিত্ররসিকেই, অনু-
বে।

ম পুরস্কার ছাড়া
প্রদর্শনীতে তাঁর
স্কৃত হয়েছে। বর্ত-
রু ও কারু মহা-
ও কেন্দ্রীয়
একজন নির্বাচিত

আমাদের স্বভাব চরিত্র

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

সশস্ত্র বিপ্লবের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে, বুঝতে পারি। স্কটিশের দেয়ালের লিখন পালটে একেবারে অন্য রকম; খবরের কাগজে ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ হয়ে সবুজবিপ্লব প্রত্যেক দিন গ্রেট টাইপ পাচ্ছে। প্রতিদিনই মনে পড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের সামনে আমাদের সেই বসে থাকা—টিয়ারগ্যাস-গেট ভাঙা-শলাপরামর্শ—হিন্দু স্কুলের পাঁচিলে 'বুর্জি ডুংসকে লাল সেলাম' পোস্টার এঁটে দেওয়া; কিন্তু কাছে কোনো পুরোনো বন্ধু নেই—অধ্যাপক হয়ে গিয়েছে দু-তিনজন, রোমহর্ষক সরকারী চাকরি পেয়েছে কয়েক-জন, গ্রামে-মফস্বলে মরেছে কেউ কেউ, পাগল হয়েছে অনেকে। আমি নতুন বন্ধুদের সংগে। তাদের সংগে যখন থাকি তখন নিজেকে খুব একটা বুড়িয়ে-যাওয়া নিশ্চয়ই লাগে না; একা থাকলেই বুড়ো হয়ে যাই, যেতে বাধ্য হই।

সেই অবস্থায়, এক চৈত্রের দিনে কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলাম অর্পিতার কাছে। আট বছর আগে মাস-তিনেকের সহপাঠিনী ছিলো সে; বছর তিন হলো বিয়ে হয়েছে তার, একটি ছেলেও হয়েছে বছরখানেক হলো—বাবার মতোই নরম ধরনের ছেলে। ইদানীং এই দম্পতির সংগে দেখা হচ্ছিলো দেশবন্ধু পার্কের দিকে, বরের সংগে বেড়াতে আসে অর্পিতা—সুদর্শনা অর্থাৎ আমার সঙ্গিনীটির সঙ্গে সেখানে গিয়ে পড়তে দেখা হয়ে যায়। নডিং হয়েছিলো ঠিকই, রমণীদ্বয় পরস্পরকে লক্ষ্যও করেছিলো। এর বেশি কোনো কৌতূহল ছিলো না। অন্তত সুদর্শনার সংগে থেকে অর্পিতাকে দেখে, মনে হয়েছিলো, সদ্য কলেজে ভর্তি হবার সেইসব দিন সত্যিই চলে গিয়েছে—ভালোভাবেই আসর শেষ করায় প্রসন্ন মনে বিদায় নিয়ে তারা এখনকার স্কুল-ছাড়া সদ্য-কলেজে যাওয়া ছেলেমেয়েদের কাছে রঙ-ডানা-ঠোঁট পালটে চলে গিয়েছে।

—কেমন আছো? গরমে অনেকক্ষণ হাঁটছো মনে হচ্ছে।

তার কথা শুনে একটু হেসে, বিদায় নেবার ভঙ্গিতে পা বাড়ালাম। অর্পিতা আবার বললো খুব কাজ? চলো না বসি?—দিন দশ আগে দেখা হয়েছিলো যখন—সুমানা চিনতেও পারেনি সে; তার আগেও অনেকবার চেনেনি—কিন্তু এরকমই চমকে দিতো অর্পিতা—সে-ও একান্তর সাল পর্যন্ত; তাকে যতোটা জানি সমস্তটাই মনে করতে করতে বললাম, চলো! কোথায় বসবে?

অর্পিতা কি জবাব দিলো শুনতে পেলাম না—শোনবার ততোটা ইচ্ছেও ছিলো না। মনে করতে ভালো লাগছিলো যে কোনোদিনই এই মেয়েটির সংগে আমার প্রণয়বিনিময় হয়নি; তার চেহারা ভালো লাগতো আমার, চেহারা বলতে তার দীর্ঘ দুর্লভ চুল মনীষাময় কপাল, প্রায়-বিষণ্ণ বনার মতো তাকানো। চলাফেরায় এক ধরনের মৃদু আত্মনির্দিষ্টতা ছিলো তার—খেয়াল করলাম, তা এখনো আছে; বরং জেদী বাচ্চা মেয়ের মতো আগে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ছুটতো কিংবা ধমক লাগাতো সহপাঠীদের—তাতে একটু বেমানানই লাগতো, এখন প্রায় তিরিশে পৌঁছনোর ক্লান্তির দরকারী রুপোটান লেগেছে তার হেঁটে যাওয়ায়। তার চুলে আর তেমন লম্বা বিনুনি নেই, ঘাড়ের কাছে এলো খোঁপার চুল দেখে বোঝাও যাচ্ছে যে এখন খুব একটা কেশবতী তাকে বলা যাবে না। বিয়েটিয়ে করে বোধহয় সাংসারিক হয়েছে একটু—বোধহয় জেনেছে যে অফিস ফেরত বরের সামনে উনুনের কাছে বসে থাকাই মেয়েদের শ্রেষ্ঠ প্রসাধন। হঠাৎ বলতে ইচ্ছে করলো, অর্পিতা, তুমি কি জানো আমি তোমাকে তিনবার স্বপ্নে দেখেছিলাম? এরকম বললে, অবশ্য সত্যি কথাই বলতাম কলেজে তখন একটা গুজগুজে যাচ্ছে—আমাকে নিয়েই, সেসময়, একদিন স্বপ্নে দেখেছিলাম অর্পিতা একটা বড়ো জানলা বন্ধ ঘরে ঢুকছে, ঘরে আমি, বাইরে দুপুর, অর্পিতা এক গ্লাস জল চাইলো। জানালার নিচে রাখা কুঁজো আমি দেখিয়ে দিলাম। জল খেলো সে, গ্লাস নামালো, বাঁদিকে মাথা হেলিয়ে ক্লান্ত-বিষণ্ণ অথচ এখনো-সতেজ চোখে তাকিয়ে কিছু বলতে গেলো। তার গায়ে জটিল সবুজ-কালো শাড়ি... সে কিছুই বলেনি। নিজে কোনো লোক পেয়ে, সে সান্ত্বনার ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে আছে ...

স্বপ্নটপ্ন দেখে অবশ্য ভেবেছিলাম আমি অর্পিতার প্রেমে পড়তে চাইছি। দিন কতক আলগা মেজাজে ভেবেছিলাম প্রোপোজ করি। কিন্তু ওর মুখোমুখি হয়ে সেসবের ইচ্ছেই আসেনি, বরং, ভিতরে কোনোরকম কষ্ট না নিয়েই ওর এখনকার স্বামী—যিনি তখন প্রেমিক ছিলেন—তাঁর সম্পর্কে দু-একটা তামাসা করে [illegible]। এই তো, প্রায় বছর তিন দেখা হয়নি অর্পিতার সঙ্গে এবং এর মাঝে যখন ওর কথা মনে পড়েছে তখন দেখা না হওয়ার জন্যে কোনোই অস্বস্তি হয়নি।

মোটমাট, কিছুই ভাঙলাম না। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ভেতর একটা দোকানে অর্পিতা ঢুকলো। কেবিনের পর্দা সরাচ্ছে দেখে একটু অবাক হলাম। বসে, সিগারেট ধরিয়ে, বললাম, কেবিনে তো আগে বসতে না?

অর্পিতা মৃদু গলায় বললো, আগে সত্যিই ইচ্ছে করতো না। যারা বসতো তাদেরও ভীষণ বাজে লাগতো—তুমি তো জানো।

—এখন লাগে না?

—না।

টেবিলের দিকে অর্পিতা ঝুঁকে বসতে আমি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। যাতে একটু দূরত্ব থাকে। অনেক কথা মনে আসছে অর্পিতার পুরোনো কাণ্ড, আগে

ফিল্মও যার ভালো লাগতো সেই মেয়েরই রবীন্দ্রবিরোধী হয়ে যাওয়া, রাজনীতি অর্পিতা আর করছে না জানি কিন্তু কেন করছে না—এইসব কথা, কিন্তু, পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়ছে চৈত্রের হাওয়া—হাওয়ার উন্মন চিন্তা এলোমেলো কথাকে উড়িয়ে-সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একএকবার অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছি চুপচাপ চা খাওয়ার জন্যে—আবার চুপচাপ থেকে যাচ্ছি নিঃশব্দে চা খেতে খেতে হয়তো অপ্রস্তুত হয়ে পড়বার জন্যেই। মাঝ-খানে ব্যাগ হাতড়ালো অর্পিতা কি একটা কারণে, দেখলাম, ব্যাগে চার অধ্যায় রয়েছে। আমার তাকানো নজর করে, কি ভেবে অর্পিতা সামান্য একটু হাসলো। তারপর সোজা তাকিয়ে বললো, তোমার চেহারা—মানে, তুমি একটু কেমন হয়ে গেছো।

—সব দিক থেকেই?

—তা বলছি না তো। আরো সিগারেট খাচ্ছো নিশ্চয়ই—

অনেকক্ষণ ধরে প্যাকেট নাড়াচাড়া করছে অর্পিতা; হঠাৎ প্যাকেটটা মুঠোয় চেপে ধরলো। খোঁপা আর একটু ভেঙে পড়লো তার; শাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আজো সে দামী শাড়ি পরেনি, কিন্তু শাড়ির রং সেইরকমই ঘন কালোসবুজে ডোরাকাটা—স্বপ্নে, যেমন দেখেছিলাম। শ্রাবণ মাসে জন্ম এমন লোকমাত্রের সঙ্গেই শ্রাবণের অনুষঙ্গ থাকে না কিন্তু, অর্পিতার সঙ্গে বরাবর রয়েছে।

—চলো!

শুনে, সে ক্ষমার চোখ তুলে তাকায়, তারপরই কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়ে।

—যাবে? আচ্ছা—গলা থরথর করে ওঠে তার—এই যে, প্যাকেটটা নাও!

প্যাকেটটা নিতে গিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। কিছুই না, তার হাত ধরেছি নানা সময়েই—রাস্তা পার হবার সময়, জ্যোতিষ চর্চার কারণে। কিন্তু প্যাকেটটা দেখে ছুঁয়ে আশ্চর্য লাগে। তার হাত তো ঘামতো না কখনো?

—তোমার হাত ঘামছে আজকাল?

অল্প মাথা নাড়ায় অর্পিতা, তার উড়ো চুল গান হয়ে ওঠে।

—হুঁ।

রাস্তায় নামবার সময় তার দুই পায়ের দিকে তাকিয়ে, তার কোলের কথা ভাবি। মনে হয়, সেখানে শান্তি আছে।

—এই তাহলে....

সে আবার সামান্যই মাথা হেলায়।

দিনটা বৃহস্পতিবার দেখে আমার মনে পড়ে, সুদর্শনা আজ আসবে বাস স্টেন্ডে। কষ্ট আর লোভ একসঙ্গে সংগত করে উঠলো। সুদর্শনার সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র ছমাসের। অর্পিতা আমারই সহপাঠিনী ছিলো—কিন্তু সুদর্শনা সবেমাত্র একটা কলেজে ঢুকেছে। অর্পিতার বাবা ছিলেন মধ্যবিত্ত অধ্যাপক, সুদর্শনার বাবা একজন জ্যাক অব অল ট্রেডস—সচ্ছল বাড়ির মেয়ে

সে। পঁয়ষট্টি থেকে বাহাত্তরের প্রথম নয় মাস পর্যন্ত আমি কেমন ছিলাম কি ছিলাম সুদর্শনা জানে না জানতেও চায় না; সে আমার সঙ্গে ফুর ফুর করে উড়তে চায়—ফুচকা খেতে চায়। বেশিক্ষণ থাকবার জন্যে করলে, সন্ধ্যে ছটা নাগাদ মন খারাপ করে চলে যায়। অন্য কোনো মেয়েকে কখনোই চুমু খাইনি বলেই, প্রেমিক হিসেবে সাতদিন আলাপের পরই তাকে চুম্বন করেছিলাম। ভেবেছিলাম সেই চুমুতে বাঙালি ধারণার প্রেমই থাকবে। হয়েছিলো উল্টো। সবকটা

শিরায় টংকার পড়েছিল, নিজের গলা নিে কথা শুনে নিজেই বিশ্বাস না করতে পেরে বসে থাকতাম—কোন ধরনের যোগাযে আমি বিশ্বাস করি। এরকম হবার কারণ আছে। সুদর্শনার চুল খুব লম্বা নয়, মু শরীরেও কোনো আলাদা মহিমা নেই। এ ধরনের কিছু কিছু মুখ আছে যাতে পু মানুষটা নিজেকে না লুকিয়ে উঠে অ সুদর্শনার মুখ ঠিক সেরকম। তার শারীরি গঠন অনেকটাই অর্পিতার মতো প্র দীর্ঘাঙ্গী আর তবতরাট হলেও শারীরি আবেদনের দিক থেকে সে অনেক তফাতে সুদর্শনাকে দেখে যে কোনো ছেলেই চ হয়ে উঠতে পারে। কারণ আর কিছ না—শরীরে সে বা অর্পিতা কেউই ভি মানে রোগাটে নয়, সঠিক যুবতী; কি অর্পিতার কপালের দীপ্তি চো ছায়া অর্পিতার আবেদনকে একটু ছুঁতে ইচ্ছে করার জায়গায় নিয়ে গেছে, যেখা সুদর্শনার মুখের সরলতা সরাসরি এক যুবতী শরীরের খবর দিতে পারে, মনে হ তাকে না ছুঁয়ে পরিত্রাণ নেই। তাকে ছু দেখলাম, মনে হলো, শেষ পর্যন্ত না যাব অবধি, নিস্তার নেই।

সে একবারই নিজেকে ছাড়িয়ে নি ছিলো। এমনিতে সে খুব; তখন প্রৌঢ় ঘেঁষা যুবতী হয়ে উঠেছিলো। সে স মায়ের শেষ জানালার অল্প একটু আলোয় দেখেছিলাম, তার দুই চোখে নির

হিসেব। আমার চূড়ান্ত প্রস্তাব শুনে, সে বিবেচনা করছে।

কোকে প্রমোনিশন হয়তো হয়েছিলো ার; আঁচ করতে পেরেছিলো যে, আমি যা ইছি তা একবারও দিতে গেলে, সেই াল্লাই তার বাইশ বছরের ভাসান হয়ে যাবে। মি বুঝতে পারিনি, ছেলেদের সিকসথ নস কম; তাছাড়া তাকে দেখলেই আমি স্ত শরীরের তীব্র ও পবিত্র চাপে পড়ে তাম। অথচ, অন্য কোনো মেয়ের দিকে াভাবে তাকাবার চেষ্টা করেও আমি রিনি। বাঙালি মেয়েরা দেখতে এতো খী হয়! সে-ও তা জানতো: রাস্তায় টতে হাঁটতে আমাকে সে পরীক্ষা করেছে নেকবার। আমার এ-ও মনে হচ্ছিলো যে, টা দ্রুত বয়স্কত্ব পাবার লোভ আমাকে সলে উড়ে-পড়া জীবনযাপনের ক্লান্ত নে নিয়ে গেছে; সেই জীবন আসলে চে থাকার বিরুদ্ধে; তা-র ন-য়— মাকে যদি বাঁচতেই হয় ঠিক একজন শ বছরের যুবকের মতোই আমি চবো। কিন্তু আমি খুব রোগা—এতো শি রোগা চেহারায় পৌরুষ থাকলেও তা খা যায় না বোঝানো যায় না। অথচ, মামার পেশীরা কাজ করতে চাইছে—কিছু কছু লেখার চেষ্টা আর লেখা পড়ে যাবার তো কাজ নয় তা। সম্ভব হলে মাটি কাপাতাম। একটা কাজ পাবার দরকার। কিন্তু চাকরি দিচ্ছে কে? এক বছর ড্রপ দিয়ে তার তিন বছর পর প্রাইভেটে বি-এ-বে পাশ করে বসে আছি—ইনটারভিউ যাঁরা নেন তাঁরা তো প্রথমেই বলবেন, তুমি তো বাপু নকশাল করতে। সুতরাং চাকরি পাচ্ছি না কিছু এখনি। সরকারী চাকরির চেষ্টা অবশ্য করা যায়—তাতে তো রোজকার এই শরীরের খিদে আমি মেটাতে পারবো না। নিজের বিরুদ্ধে নিজের সশস্ত্র ব্যক্তিগত বিপ্লবের মহড়া নিয়ে থাকছি তখন—সে বিপ্লব, অন্ততপক্ষে, এক বাকসবস্বকে খানিকটা কেজো খানিকটা শরীরী করার বিপ্লব। এর মধ্যেই হাতে এসেছিলো হেনরি মিলারের ওয়ারলড অব সেকস—পড়ে ভিতরে ভিতরে লাফিয়ে উঠেছিলাম। এমন সময় সুদর্শনার সঙ্গে আলাপ। ভালোভাবে তাকে গ্রাহ্যই করিনি, হঠাৎ আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব বললো, কিরে, মেয়েটা যে তোর দিকে বহু দূরে এগিয়ে গেছে!

শুনে, রাগই হয়েছিলো আমার। রাগ চেপে রেখেছিলাম বন্ধুবান্ধবের কারণেই। এরকম একটা ক্যারিয়ারলেস ছেলের সঙ্গে প্রেমটেম করতে আসার উদ্দেশ্যই হলো কয়েক মাস মজা মারবার প্রকল্প—এটা বোঝাতে গিয়ে দেখলাম বন্ধুবান্ধবরা সমর্থন করছে না। কাজেই, কতকটা এক্সপেরিমেন্টের ঝোঁকেই একদিন জানিয়ে দিলাম আমরা এনগেজড, সেই অবস্থার সাত দিন বাদে ঠোঁট ক'রে চুমু খেতে গিয়েই, শরীর জ্বলে উঠলো। বন্ধুরা যে এটা সমর্থন করবে না তা-ও জানতাম। প্রতিবিশনের স্বাদ এখান থেকেই টের পেলাম আমি। একমাস পর, ঐ যুবাপুরুষোচিত প্রস্তাব করলাম তাকে।

মেঝের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে সুদর্শনা তাকিয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু সে যায়নি। চলে যেতেই পারতো। বুঝেছিলাম, সে দুর্বল। এরপর, সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম, আর, সাধ্যমতো, নিজেকে তাতিয়ে তুলতাম। কিন্তু, একা হলেই স্মৃতি ফিরতো। আর স্মৃতি কখনোই একা ফেরে না। আরো ভাবতাম, অনেকটা বেঁচে থাকার পরে যে রাখে না, সে কি সত্যিই সঙ্গী বা সঙ্গিনী হতে পারে?

সুযোগ পেলামও একদিন। জানলাম, তার ভিতরে চুম্বক। শেষ হতে, সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আর পারবো না—আর সত্যিই আলাদা হতে পারবো না।

পালটা জড়িয়ে ধরে আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব চাপা গলায় বললাম, কিছু অন্যায় মনে হলো তোমার? উঃ? যা আমি এতোক্ষণ করলাম—বলো। বলো —ঠিক, না ভুল।

জবাব দিচ্ছে না দেখে তার মুখ সোজাসুজি ফেরালাম। সে কাঁদছে না, চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে। বললো, থাক, প্রেমিক-প্রেমিকারা এতো তাড়াতাড়ি বুঝি কিছু করে?

যাকে আমরা ফিউডাল সেন্টিমেন্ট বলতাম তার কোঠা থেকে একটি শব্দ সেই প্রায়ান্ধকার দুপুরের ঘরে আমার কাছে এক টুকরো বেনারসী জড়িয়ে ইথারে ভেসে এলো। আমি বললাম, উঁ-হু। প্রেমিক-প্রেমিকা ওসব সাহেবী কথা বুঝি না। তুমি আমার বৌ।

সুতরাং আজ বৃহস্পতিবার যে সুদর্শনা আসবে, সে আমার বৌ। আমাদের কিছুই মিল নেই—আনুষ্ঠানিক বা আইনানুগ কোনোরকম বিয়েও আমাদের হবে কিনা আমরা জানি না, তার পুতুল খেলা তার ঘুমোতে ভালোবাসা তার ভাইপো-ভাইঝির কীর্তির কথা শুনে আমার মাথা ধরে যায়—এইসব গল্প শুনলেই আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি আমাকে বিয়ে করবে ভেবে সে ভুল করছে; আমার বন্ধুদের কাছে থাকলে বা আমার পুরোনো গল্প শুনলে তার মন খারাপ হয়ে যায়—এইসব হলেই সে দেখা করার সময় দেরি করে।

স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দেখি, তখনো আসেনি। ওহ্। মনে মনে একটা জুয়ো খেলছিলাম —যদি দেখি এসে পড়েছে তাহলে আজকের দিনটা পুরো ভালো কাটবে। এক মুহূর্তেই রেগে উঠলাম। দাঁতে নোখ কাটতে কাটতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ উলটো দিকের রাস্তা থেকে সুদর্শনা এগিয়ে এলো। রাগতমুখে আমি বলে উঠলাম, তোমার স্ট্যাণ্ডে থাকার কথা।

—তিন মিনিটও দেরি করিনি। এই, এ-ই, কোনদিকে যাবে? অনেক ব্যাপার হয়েছে—

টালা পার্কের দিকে আমরা যেতে থাকি। বাদাম কিনে খেতে থাকে সুদর্শনা। অনেক ব্যাপারগুলো খুব নতুন কিছু না। অভিভাবকেরা কিছু আঁচ করে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছেন। এই কাহিনী—এই ঘটনা আমার আন্দাজ করাই ছিলো, কথা আর না শুনে আমি তাকে দেখতে থাকি। টালা পার্কের ঘাস, বসন্ত বাতাস, ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার জন্যে মনে হয়, আমি এই যুবতীকে যুবকের মতোই দেখছি।

—অতো দেখছো কি? শাড়িটার রঙ ভালো লাগছে?

সুদর্শনা কখনোই ডোরাকাটা পরে না। তার শাড়ির রঙে সবসময়ই একটা স্বাস্থ্যের স্পর্ধা থাকে—দেখে ভিতরে ভিতরে নড়ে উঠতে হয়।

—দেখা ছাড়া আর ঠিক এক্ষুনি কি করতে পারি বলো?

—আবার।

সে শাসন করে। আরো পরে, আমরা যখন অন্ধকারের প্রশ্রয়ে নিতে নিতে হাঁটতে থাকি তখনো অস্পষ্ট জোৎস্নায় তার শাড়ির তীব্র শিমুল রঙ বুঝতে পারা যায়। শাড়ির রক্ত রং বেড়ের পাশে তার চমৎকার গ্রীবা যুদ্ধের মধ্যে প্রেমের অশান্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। তাকে নিয়ে অনেক দুর্ভোগ অনেক অশান্তি হবে আমার—আমি জানি। কিন্তু এই বসন্তে আরো এক বসন্ত হয়ে সে কাছে রয়েছে—এক যৌবনের পক্ষে, তা কম নয়, তা যথেষ্ট। এবার তাকে ছেড়ে দিতে হবে

—আরেকটু থাকো। মাত্র এই দু ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা—আমি কি হাসপাতালের রোগী নাকি? খিল খিল হেসে সুদর্শনা প্রায় গায়ে গড়িয়ে পড়ে, তারপর মিনতি করে—না। এমন করে বললে দ্যাখো যেতে পারি না, অথচ—

আমি একইরকম জেদী ভঙ্গিতে বলি, ঠিক আছে, বেশিক্ষণ থাকতে বলবো না, তাহলে কালই রেজিস্ট্রি অফিসে চলো?

—আবার শুরু করলে? তুমিই না আগে বলতে বিয়েটা গোল-গোল লোক-জনে করে।

—শুরু করার তো কিছু নেই। বিয়ের প্রস্তাবটা, ম্যাডাম, প্রথমে আপনিই দিয়েছেন। এখন পিছিয়ে যাচ্ছেন কেন?

সুদর্শনা ঘামছে আমি বুঝতে পারি। উঁ। উঁউঁ ওই কাগজকলমের বিয়েটাকে একটা বিয়ে বলেই মনে হয় না—

—কেন ? সেখানে আমি নেই ?—
ত অভিমানের চোখে আমি তার দিকে
কাতে যাবো, তৎক্ষণাৎ একটা বছর চার
গের ঘটনা মনে পড়লো। সেই সালটা
সত্তর। শ্যামবাজারের সিনেমাপাড়ায়
খা হলো অর্পিতার সঙ্গে। অর্পিতা
লো, শোনো, কথা আছে।

—কি ব্যাপার ?

সটান মুখ তুলে অর্পিতা বললো,
য়ে করবে আমাকে ?

চমকটা ধরা পড়তে না দিয়ে আমি
লাম, হঠাৎ একথা কেন ?

শাড়ির খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে
র্পিতা বলেছিলো, আমি চাই।

—তুমি কমিটেড, এরকম জানতাম
—

—ও। তীব্র চোখে তাকিয়ে সে বলে-
লো, সেজন্যে খুব ব্যথা পাবে তুমি ?

শান্তভাবেই আমি বলেছিলাম, না।
ন্তু তোমার দুটো ধারণা পরিষ্কার
য়া দরকার। এক নম্বর, আমি তোমাকে
নোভাবেই ভালোবাসি না। দু নম্বর,
য় তুমি কেন করতে চাইছো ? একটা
লেভড স্টে-টুগেদার—কোনো ছেলের
দ, নিশ্চয় এরকমই চাইছো বলেই তো ?
মি ঠিক এই লাইনে ভাবছি না। ওয়েল,
ই ডু য়্যু লাইক স্যুসাইড ?

—পরামর্শ দিচ্ছো ?

—নিশ্চয়ই না। অন্তত প্রেম করতে
য়ে তুমি হাফসোল খেয়েছো বা
য়েছো—এজন্যে নয়। শুধু আমার
ম্পথাটাই জানাচ্ছি।

—রিফিউজ করছো তাহলে ?

—ভুল বলছো। যারা প্রেমে পড়ে যা
বে তারাই অ্যাকসেপ্ট করে বা রিফিউজ
র। আমি পারি না।

এখন, জেদী অভিমানের ভঙ্গিটা আমি
র বজায় রাখতে পারি না। বলি,
াচ্ছা, কাল এসো। ঠিক দেড়টায়—
হলে থাপ্পড় খাবে।

সুদর্শনা চলে যায়। হাঁটতে হাঁটতে
মি আবিষ্কার করি, আমি একা। এই
কা মনে হওয়ার কথা বলে, বন্ধুদের ও
দর্শনার সমবেত প্রশ্ন শুনেছি—
থনো ? তোর মনে রাখা উচিত তুই আর
কা নয়। তাহলে, তুমি আমাকে ভালো
সোই না....

কিন্তু, মনে হলে কি করবো ?
িব্বশ বছর বয়েস পর্যন্ত, আমি
দর্শনাকে দেখিনি। ঘরের বাইরের
থিবীর যোগাযোগে এর অনেক আগেই
মি এসেছি; যাকে দুনিয়াদারি বলে সেই
নিয়াদারি করে চলেছি চোদ্দ বছর
য়েস থেকে। বন্ধু গোষ্ঠীই পালটেছে
রবার। বারবারই মনে হয় যে
যে ঘটনা দিয়ে আমার শুরু হয়েছিলো
তার পরিণতি অন্য রকম হওয়া উচিত
ছিলো; হঠাৎ একটা খাপছাড়া দৃশ্যে
আমি এসে পড়েছি—এখানকার পাত্রপাত্রীদের
সংলাপ চরিত্র অভ্যেস সমস্তই আলাদা।
আর চব্বিশ বছরে এসে প্রথম শারীরিক
ঘটনা ঘটিয়ে, আগেকার দশ বছরের আমির
সঙ্গে আমি নিজে আর কোনো যোগাযোগ
রাখতে পারছি না—আমারও ভাসান
হয়েছে। আর অতো লাইব্রেরিতে যাই না
আমি—আর তীক্ষ্ণ কথায় লোককে বিঁধতে
ইচ্ছে করে না। এই দশটা বছর তবে কি
একেবারেই ভুল ? দশটা বছর জলাঞ্জলি
গেলো ? আমার চোখের তারা হিংস্র হয়ে
ওঠে।

আদৌ ভুল হবে না—যদি, এখনি,
পুরোনো-চেনাদের মধ্যে চলে যাই আবার।
ভালো, যদি অর্পিতাকেই প্রোপোজ করি ?
সুদর্শনা আমার চাকরির প্রত্যাশা করছে—
অর্পিতা করেনি, করবেও না, আহা—কাল
যখন দেখাই হলো তখন ঠিকানা নিলাম না
কেন—এইসব ভাবতে থাকলাম আমি, আর
হুমড়ি খেলাম এক সদ্য যুবার গায়ে—
মসৃণ শ্যাম রং ত্বকে স্বাস্থ্যে শাদা চাপা
প্যান্টে হাত কাটা হাওয়াই শার্টে তার
যৌবন সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে ধাক্কা
মারলো। হুঁ, অর্পিতা। কিন্তু আমার
শরীর.... ? অ-স-ম্ভ-ব, যে মূর্তি আমার
কাছে এখনো স্বপ্নে সেই সবুজ কালো
শাড়িতে অনেক হেঁটে আসা ক্লান্ত ভঙ্গিতে
জল চায়, সেখানে আমি অন্য কিছু করতে
পারবো না। একজন মেধাবী সহপাঠী
হিসেবে অর্পিতা আমাকে দেখেছিলো—
লেখা-রাজনীতি-নাটকের দলে উড়ে
বেড়ানো - পুড়ে যাওয়া একজন ছেলেকে
সে জেনেছিলো, কিন্তু সুদর্শনা আমাকে
যখন কোনো জেদের বশেই নির্বাচন করেছে
তখন আমার সব কটি পালক খসে গেছে,
বিরসাতিতো মুখে অ্যাকাডেমিক যুদ্ধে
হেরে-যাওয়া ছাত্রের মতো আমি শুকিয়ে
উঠেছি। হয়তো এ জন্যেই আমার শেষ অস্ত্র
আমি সুদর্শনার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছি—
যাতে, মানুষ হিসেবে অত্যন্ত অসৎ না
হলে, সে পালাতে না পারে। কিন্তু, এটা

কি আমি আমার নিজের কাছেই পরিষ্কার করতে পারবো যে কেন আমি বারবারই অর্পিতার কাছ থেকে সুদর্শনার দিকে যেতে চাই !

তা কি শরীরের জন্যই ! এক মুহূর্তে সব কিছু হাতড়ালাম আমি—কোনো কিছুই আঁকড়ে ধরতে পারলাম না। শুধু সুদর্শনা। কঠিন হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই মেয়েটি যদি রোগা-কালো-শ্রীহীন হতো—তাহলে কি তুমি এর প্রেমে পড়তে ডিয়ার ? কিন্তু, এভাবে নিজেকে ঠিক কায়দা করা গেলো না। উত্তরটা, ভিতরে খুব স্পষ্ট আকারে ছিলো—হ্যাঁ ? মাস চারেক আগে, আমাদের আড্ডায়, সুদর্শনা এসেছিলো। কম আসে সে: তার বলবারও বেশি কোনো কথা নেই—তাকে খুব বুদ্ধিমতী হিসেবেও কেউ মনে করতো না যে কথা বলবার জন্যে তাকে ঘাঁটাবে। সেই আড্ডার আকর্ষণ ছিলো আর একটি মেয়ে। পরিবারের সূত্রে, সুদর্শনা তাকে চেনে, এইমাত্র। হয়তো দুজনেই মেয়ে বলে আর একটু বেশি অন্তরঙ্গতা আছে। এইটুকু সূত্র সম্বল করে আড্ডায় আসা—এসে পড়া কেউই খুব ভালো চোখে দেখেনি। কারোর মনে হয়েছে অভদ্র, কারোর মনে হয়েছে কান্ডজ্ঞানহীন। এর উপরে, তাকে আমরা সবাই জানতাম আমাদেরই এক বন্ধু গৌতমের প্রেমিকা হিসেবে। আলাপ হয়ে বোঝা গিয়েছিলো, সেই পরিচয়টা সে খুব পছন্দ করছে না। এক মাস বাদেই, অন্য বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে জানাতে শুরু করলো মেয়েটির আসা-যাওয়া ঘটছে আমার কারণে। ভিতরে ভিতরে আমি খুব তিতো হতে শুরু করেছিলাম। আমি কখনো ভাবিনি, তিন বছর নষ্ট হয়ে খুব খারাপ রেজাল্ট করবো বি-এ পরীক্ষায়—পার্ট-ওয়ানে অনার্স পেয়েও আমাকে পার্ট-টু প্রাইভেটে পাস কোর্সে দিতে হবে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন কম্বিনেশন থাকার জন্যে সাংবাদিকতাও পড়তে দেবে না আর প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হবার জন্য রেগুলার কোর্সে এম-এও পড়তে দেবে না। যাদবপুরে অবশ্যই পড়তে পারতাম, কিন্তু প্রথম কলেজ ছাড়া অন্য কোনো কলেজে আমার কোনো বন্ধু হয়নি—হাড়ে হাড়ে আমি জেনে গিয়েছিলাম কলেজে সহপাঠীরা বন্ধু না হলে কি কি বিপদ হতে পারে। বিধান রায়ের আমলের ফুড মুভমেন্ট থেকে আমি যে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় মানুষ—তা হলো কংগ্রেস-বিরোধিতার রাজনীতি; সেই আবহাওয়া বাহাত্তরে এসে পুরো উল্টো দিকে ঘুরে যাবে—এ-ও আমি কখনো ভাবিনি। যাদের সঙ্গে এখন আড্ডা দিই, তারা যে মানুষ হিসেবে আগে যাদের সঙ্গে আড্ডা দিতাম তাদের তুলনায় অনেক বেঁটে মাপের—একথা প্রায়ই মনে হতো। কাজেই, ঘটনাটা শুনে আমার গা জ্বলে গিয়েছিলো।

একটা টেবিলের ওপর বসেছিলো সুদর্শনা—জানালার কাছে, ঘরের অন্ধকার কোণে আমি। আমার সামনে আরেকজন বন্ধু—এই দুজনই কথাবার্তা বলছিলাম। বন্ধুদের কথাবার্তা যেমন হয়, সামনে একজন মেয়ে আছে বলে আমরা অশ্লীল কথাগুলো বলতে পারছিলাম না—তারপর হঠাৎ আমাদের আড্ডার সেই আরেক আকর্ষণ প্রতিমার বিয়ের কথা উঠে পড়লো। দীপক বললো, আচ্ছা তোর কি সত্যিই মনে হয় ওদের সে রকম অ্যাডজাস্টমেন্ট হতে পারে ? প্রতিমাদি যথেষ্ট বড়োলোক—আর অমিতাভ তো বড়োজোর একটা প্রফেসার হবে ! আসলে, দীপকের একটু রাগ ছিলো অমিতাভের উপরে। প্রতিমার প্রেমিক হিসেবেই অমিতাভ আমাদের আড্ডায় এসেছিলো। এসেই, প্রথমে দীপক ও পরে সবার পরেই কিছু-কিছু তাচ্ছিল্য ছুঁড়েছিলো সে। তার স্মার্ট প্রেমিকাটি চার-পাঁচজন সহপাঠীও নয় এমন ধরনের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে—এতে তার একদমই ভালো লাগেনি, কিন্তু সে-ও কো-এডুকেশনের ছেলে। এটা সে খোলাখুলি বলতে চায়নি। তাহলে তার প্রেমিকা ও বন্ধু-বান্ধবরা তাকে পসেসিভ বলতো, জেলাস বলতো। অথচ সে যা আন্দাজ করেছিলো, তা ঠিক। প্রতিমাকে নিয়ে তখন অন্তত তিনজন সদ্য যুবকের মধ্যে এক রকমের অদৃশ্য টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। আমিও জানতাম যে দীপক অন্য মেয়ের সঙ্গে এনগেজড থাকলেও প্রতিমার সম্পর্কে যথেষ্ট দুর্বলতা আছে তার, কাজেই কথাটাকে এড়িয়ে গিয়ে আমি বললাম, প্রতিমা অমিতাভকে ভালোবাসে কি না এইটাই পয়েন্ট হলেও হতে পারে। এক সঙ্গে সংসার করবে কিনা সে সবে আমার ইনটারেস্ট নেই।

দীপক আমার মনোভাব বুঝবার জন্যেই বলেছিলো, কেন ?

—দ্যাখ দীপক, আজকালকার একটা কাপল্ সেটল্ করতে পারে কিসের জোরে ? ক্যারিয়ারের পরে তো ? ক্যারিয়ারটা তাদের দিচ্ছে কোন্ ব্যবস্থা, কোন্ সোশ্যাল অর্ডার ? তুই নিশ্চয়ই মানবি, অমিতাভ প্রতিমাকে কাপল্ হিসেবে অপারেট করবে যা তা দিস্ প্রেজেন্ট অর্ডার—

—প্রেম যারা করছে তারা বিয়ে করবে না নাকি ?

দীপক নিজেও বিয়ে করবে, আর দীপক আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুও নয়। বোমার রাজনীতির সময়ে দীপক বলতো যে পার্টির অর্থাৎ নকশালদের কোনো রকম সমালোচনা চলবে না। এই রকম দীপক বাহাত্তর থেকেই ঠান্ডা বনে শুধু প্রেম করছে আড্ডা দিচ্ছে। এই কথাটা দীপক জিজ্ঞাসা করছে—এর যা জবাব আমি দিতে পারি, সেটা শুনে দীপক আমাকে সুবিধা-বাদী বলার চেষ্টা করবে। কাজেই, আমি বললাম, সেটা তাদের পর। আমি এ পর্যন্ত বলছি যে কেউ প্রেম করলে আমার একটা কৌতূহল আছে, কারণ, ইকনমিক আন্ডারটো সেই জায়গায় অতোটা ভাইটাল রোল করে না। বিয়ে করলে, করে। ক্যারিয়ার ছাড়া লোকে বিয়ে করবে কিভাবে ? এসব তো জেনে নিয়েই এগোনো উচিত।

—তোকে যে বিয়ে করবে তার তো মজা, তুই এক ছেলে। আমার দাদাটাই চাকরি পেয়ে লাইন ক্লিয়ার করছে না—

—হুঃ, মজা। আর আমার চোতা-পত্রের ক্যারিয়ারটি ! বলে, আমি সুদর্শনার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে একটু ছুরি-খেলানো মজা এনে বলে উঠলাম, কি হে, তুমি জানো তো ?—আমার তাকানোয় নিশ্চিত অবজ্ঞা মেশাচ্ছিলাম আমি।

সুদর্শনা হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিলো। প্রশ্ন শুনে, মুখ তুলে চিবুক হাঁটুতে রেখে, মায়েদের মতো—প্রেমিকাদের মতো—কিংবা ঠিক মেয়েদের মতো আশ্চর্য নরম স্বরে বললো, আমি সব জানি। তার গলার আওয়াজে মনস্থির করার দৃঢ়তা ছিলো।

সব জানে ? শুনে প্রথমটা বিশ্বাস হলো না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো, আমার বন্ধুরাই তাকে বলতে পারে। রং ফলিয়ে বলতে পারে। তারপরও এই মেয়েটি কোন বুদ্ধিতে কোন্ জেদে প্রায়ই অপমানিত হতে এখানে আসে ? দীপককে খেয়াল রেখে হতবুদ্ধি চোখ আমি নামিয়ে নিয়ে সিগারেট খুঁজতে থাকলাম—আমার বেখেয়ালে আমার চোখ তার দিকে বার বার যেতে থাকলো আমি হারতে থাকলাম; নিজেকে বকতোপ রোমান্টিক— সেকসস্টার্ভড বলে গালাগাল দিতে দিতেও হারতে থাকলাম, কারণ তখন একটা জট পাকানো তালগোল বুক থেকে গলা পর্যন্ত উঠছিলো, আর ঠোঁট তা করছিলো সে ওই যুবতীর পা একবার আলতো ছোঁবে, তার মুখ—মুখের সব শান্ত হাসি বারবার আমার চোখ দেখা

চাইছিলো। আর আমি আরো ভিতরে ভিতরে ভাবছিলাম, সব জানে! তাহলে কি, পরে কী আছে, তা-ও এ জানতে পারে। জানতে পারবে!

তাই ঐ একই প্রশ্ন আবার নিজের কাছে রেখে, শ্যামবাজারের দশকর্ম ভাণ্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে একই উত্তর আমি পাচ্ছিলাম—হ্যাঁ, সে যদি রোগাকাৎ হতো অসুস্থ হতো তাহলে তার সেবাই করতাম বেশি, বাড়ি থেকে তাকে বেরোবার জন্যে জেদাজেদি করতাম না। এখন যেমন হঠাৎ সকালবেলা দেখতে ইচ্ছে হলে হুশ করে একটা বাসে চাপি—বাস দেরি করলে মাথার ভিতরটা ড্রাইভারের মাথা না ভাঙতে পারার অসহ্য রাগে ফেটে যায়—বীরবিক্রমে এসে তার পাড়ার স্টপে নেমে যতোদূর সম্ভব উদাসীন থাকবার চেষ্টা করে পাড়ার ভিতরে ঢুকে তার বাড়ির সামনে দিয়ে ভাব-লেশহীন মুখে হেঁটে যাই—কেউ লক্ষ্য করছে না বুঝলে বারবারেক এদিক-ওদিক একটা একটা করে সিগারেট কিনি—তখন একরকমই সন্তর্পণে, চোরের মতোই আমি এসে দেখে যেতাম। আর কাছে পেলে, ছেলেরা যা করতে পারে, অর্থাৎ ছেলেরা তো সেই চুমোখাওয়া—জড়িয়ে ধরা—আদর আর আদরের জন্যে আবদার-জোরখাটানো ছাড়া আর কিছুই পারে না, তা-ই করতাম, শুধু, শুক্রবারটি চুমু খাবার সময় মনে মনে বলতাম এই চুম্বনে আমার প্রাণের সব উত্তাপ তোমাকে ভালো করুক, খুশী করুক—আবদার আর জোরখাটানোর সময় বলতাম, আরে, জানো না, এতে মেয়েদের স্বাস্থ্য ফিরে যায়।

ট্রামটা গায়ের কাছে এসে পড়তে-না-পড়তেই, যেন বহুদিন জিমনাস্টিক করেছি এমন কসরতে সরে গিয়ে এই ট্রামটাতেই উঠে পড়লাম। আমার ভিতরে একটা হরিণ চোখ বড়ো বড়ো করে ভাবছে লাফ দেবে, একটা সিংহ খুশী হয়ে খেলছে একটা বিড়াল গড়াচ্ছে আরামে আর একটা বাঘ বাঘিনীকে ডেকে ডেকে ঘুরছে। ট্রামে এক-জন বুড়োমানুষ উঠতেই, আমি তড়াং করে সিটটা ছেড়ে তাঁকে বসিয়ে দিলাম।

(২)

আবার যখন জেগে উঠলাম তখন রাত দুটো বেজে গেছে। সাবধানে সুইচ হাতড়ে বাইরে গিয়ে কাপড় বদলাতে হলো বাথ-রুমেও গেলাম। তখনি স্বপ্নটা মনে পড়—ঝর্ণা, পাথর, সুদর্শনার মতো মন, শরীর, আর আমিই, বা একজন যুবক, যারা জানে তারা কি করবে। ওঃ, প্রায় রোজ হচ্ছে একরকম। ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু ঘুমের ঝাঁঝটা এখনও শরীর জুড়ে। জল বেশি করে দিতে, সেটা একটু কাটলো। অভ্যাস মতো এক গ্লাস জল খেলাম আর তখনি জলের গ্লাস দেখে অর্পিতার কথা মনে পড়লো—অর্পিতা শব্দটা মনে আসলো, তার ছবিটা ভাবতে ইচ্ছে করলো আমার। ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে একটা সবুজ কালোর নকসাদার শাড়ি

মনে পড়লো শুধু মনে পড়লো তাঁর চশমার কোণ, উড়ো চুল দু-একটা, মনে পড়লো তার কোলের শান্তিকে। কিন্তু, এখনি শান্তি কেন!

একা জেগে দাঁড়িয়ে, আমি মাথা নাড়লাম। অর্পিতা সব সময়ই ভুল অ্যাপিল নিয়ে আসে। সে দূরে, সে অনেক দূরে.... তার এইসব টুকরো ছবি আমার ভালো লাগছে, স্তব্ধতা যেমন ভালো লাগে....তাকে মনে পড়ছে না আমার....গানের নেশার মতো তাকে কোনদিনই ভালো লাগেনি আমার? হঠাৎ কখনো কখনো, কিছু কিছু অর্পিতা আছে....

এরকমই থাকবে নাকি? উঁহু। চারের চেয়ে একের পরেই আমার অভিরুচি—মনে মনে বলতে বলতে আমি আবার বিছানায় আসি

(৩)

—ভীষণরকম বাড়াবাড়ি শুরু করেছো তুমি—খুব মজা, না?

সত্যিই মজা। কারণ, ফুঁসছেন যিনি তিনি আমার দু হাতে বন্দিনী। খুব সহজে তা হননি। ভাগ্যিস, হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ছিলো। ধস্তাধস্তি করার উপক্রম হতে, সেটা ওঁকে দেখিয়ে বলি, মাদমোয়াজেল, মানেনই তো, প্রেমে পড়লে আর কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—বেশি ধাক্কাধাক্কি করলে ছ্যাঁকা দিতে বাধ্য হবো। মেয়েদের বুদ্ধি তো, তখন সিগারেটটা হাত থেকে ফেলে দিতে গেছে—এজন্যে যে কাছেও এগিয়ে এসেছে তা আর খেয়াল ছিলো না। সুতরাং সাম্রাজবাদ-দমন-পীড়ন বা শোষণ সবই অকাতরে আমার তরফ থেকে চলছে, এবং ওপক্ষ থেকে, চুম্বিত হবার চাকরিটি করার পর, তর্জনগর্জন। কর্মসূচী অক্ষুণ্ণ রেখে আমি বললাম, এরকম একটা সময়ে এতো বড়ো বাক্যটা পুরো বলতে পারলে?

সে খুশী হলো না, মেয়েরা যেভাবে নিজেদের ছাড়িয়ে নেয়, সেভাবেই আস্তে আস্তে মৃদু চাপ দিলো নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে। ছেড়ে দিতে, বাধ্য হলাম। আমার মুখে সোজা চোখ রেখে একটুও সরে না গিয়ে সে বললো, এভাবে বেশি দিন থাকা যায় না। আমি যে একটা বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে—সে কথা ভুলে যাচ্ছো কেন?

আরো এক বছর কেটে গিয়েছে। এর মধ্যে, একটা বিষয়ে আমি তার সঙ্গে একমত হয়েছি। রেজিস্ট্রি করার পর, আলাদা-আলাদা ভাবে—ঠিক এইভাবে থেকে কোনো লাভ নেই। সুদর্শনা থাকতেও পারবে না। অন্য কয়েকজন এমনধারা দম্পতির কথা হবার সময় সুদর্শনা বলেছেন, সত্যিই ওরা কি করে পারে! আমি সুদর্শনার দিকে পরীক্ষার চোখে তাকিয়েছি। না সে ভুল বলছে না। তার চলায় ফেরায় তার দাপাদাপিতে এক ধরনের ঘোষণা আছে। সে বাঁচতে চায়, আনন্দ করতে চায়। সে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় বুঝিয়ে দেয় যে সে প্রেম করছে। এমনকি দেখে আমার কোনো কোনো বন্ধু-বান্ধব বলছে, সুদর্শনার মধ্যে এই লোকদেখানে পাবলিসিটির ব্যাপারটা ঠিক সমর্থনযোগ্য নয়। তার শরীর তার হাত-পা-নাড়া দেখে, তার কথা শুনলে বোঝা যায়, সে কায়মনোবাক্যে সত্যি কথা বলছে। অনেক সময়ই তাকে তামাশা করে বলেছি, তোমার এই প্যার কিয়া তো ডর্‌না ক্যায়া-গোছের ভাবসাব একটু বদলাও। সে বুঝতে পারেনি। বুঝতে না পারার কারণ হয়তো এইটাই যে সুদর্শনাকে ঠিক বাঙালি বলা যাবে না। তাদের দেশ কুমিল্লার একেবারে পূর্ব সীমান্তে, তিনপুরুষ আগে তারা মণিপুরী ছিলো। তার সঙ্গে থাকার সময় সত্যিই মনে হয়, নিজেকে ঘোষণা করার মধ্যে কোনো দোষ নেই. এবং গোপনে রেজিস্ট্রি করে দুজন সাক্ষীকে প্রাণপণ চেপে যেতে বলায়, আর, নিজেরাও নির্বিকার মুখে চেপে যাওয়ার, কোনো পৌরুষ নেই, কোনো রমণীয়তাও নেই। সেটা সম্বন্ধ করে বিয়ে করার থেকেও বেশি ব্যবসাদার সম্বন্ধ। ক্যাজেই, আইনানুগ বিয়ে আমরা করিনি। কিন্তু এটাও ঠিক যে অন্তত আমাদের বন্ধুবান্ধবদের থেকে অনেকটা বেশি এগিয়ে গিয়েছি আমরা—সেটাই আমাদের দলছাড়া করে দিয়েছে, তাই, আমরা বাসা চাই। প্রত্যেকটা দিন দ্রুত চলে যাচ্ছে—এমন সব দিন—যাদের প্রত্যেকটাই আমাদের আরো সুখে আরো আনন্দে কাটানো উচিত। তার মনও ভেঙে যাচ্ছে একটু একটু করে। সে ভেবেছিলো, তাকে ভালোবাসলে অন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে নিজেকে আমি তার আমার ও আমাদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্যে তৈরি করে তুলবো—সে তো খুব একটা বড়লোক হতে চায় না। আর কিছুই না, রেস্তোঁরা সিনেমায় বসে একটু-আধটু পেটিং চুরি করার মতো আমাদের কারোরই মেজাজ নয়, এবং, আমার যে বন্ধুর বাড়িতে তার সঙ্গে আমি দেখা করতাম, সেই বন্ধুটি ব্যক্তিগতভাবে উদার হলেও এবং মাতৃহীনতার জন্যে তাদের পারিবারিক নিশ্চয়তার পর্দাটা সরে গেলেও, তার কাছ থেকে সুযোগ নেবারও একটা সীমা আছে। কিন্তু, একটা সোমবারই যেখানে হুশ করে উড়ে যায়, সেখানে তার পরের মঙ্গলবারটা আমি কি করবো? বন্ধুবান্ধবরা জানেও যে আমি প্রেম করছি—তারা যে যার মতো, ভদ্রতাবশতই হয়তো, উড়ে গেছে য়ুনিভার্সিটির চত্বরে কি কফিহাউসে—আরো পরিচিত বাড়ছে তাদের, তাদের সঙ্গে সময়ও দিতে হচ্ছে। দু-একদিন সুদর্শনার সঙ্গেই সেসব দিকে গিয়েছিলাম, পেয়েওছিলাম কয়েক জনকে, আরো বাজে আড্ডা—মাথামুণ্ডুহীন কথাবার্তা, বোলচাল দেখে অনবরত মনে হচ্ছিলো এরা জীবনে একটুও আনন্দ পেতে ও দিতে শেখেনি—সারা জীবনটাই এরা অন্যের চক্রান্ত ভেবে আর নিজেরা চক্রান্ত করে কাটিয়ে দেবে। কবিদেরও পাওয়া যায় কফিহাউসে—কিন্তু তারা আড্ডা জমাতে পারে না, সঙ্গে একজন স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী মেয়েকে দেখে হয় বাচ্চাদের মতো হাল্কা-লাজুক হেসে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ে কিংবা আড়ষ্ট বসে থাকে। আমারই আফসোস বাড়তে থাকে। দু-একদিন আগে গঙ্গার ধার দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম, একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা আমাদের উল্টোদিক থেকে আসছিলো। পাশের একটা গলি থেকে একটা বল রাস্তায় দুবার লাফ করে গঙ্গাতেই পড়তো, প্রেমিকটি হঠাৎ একটা অদ্ভুত কৌশলে লাফিয়ে উঠে শূন্যে ডান পা তুলে বলটাকে আটকে থামালো, তারপর ড্রিবল করে বলটাকে ফেরত পাঠালো গলিতে। এক মুহূর্তে রোদে ঝিকিয়ে উঠলো তার একরাশ চুল, বুকখোলা শাদা সার্ট আর প্যান্ট—দু-এক মুহূর্ত বাদে প্রেমিকার কাছে ফিরে এসে সে বাহাদুরি নেবার ভঙ্গিতে সবকটা দাঁত বার করে হাসলো, তার স্বাস্থ্য তার আনন্দ তার খেলোয়াড়ি সমগ্রতা একসঙ্গে সে উৎসর্গ করে দিলো। তার দিকে তাকিয়ে আমি খুশী হই, আমার ঈর্ষা হয়। নিজেকে সুদর্শনার কাছে আমি এইভাবেই রাখতে চেয়েছিলাম। সুদর্শনাও বুঝতে পেরে বলেছিলো, তোমরা কেউ ঠিক এরকম নও। না, সত্যিই তা নই। অন্তত এরকম ছিলাম না। এখন এরকমই হতে চাই। এবং জানি যে তা পারবো না। সাহিত্যটাহিত্য কি রাজনীতি সত্যিই খেলার মাঠ নয়, কারণ, সেখানে যশ শব্দটা আছে। এমনকি পৃথিবীর চাকরিগুলোও সত্যি সত্যিই বন্ধুবান্ধবদের জন্যে কোনো খেলার মাঠ রাখেনি যেখানে সুদর্শনারা তাদের বরেদের প্রেমিকদের খেলা দেখতে পারে আর জ্ঞান করে মুখ বেঁকিয়ে কিংবা শাসন করে তারিফ করতে পারে। তাই, সুদর্শনা ছাড়া, আমার কোথাও আর কোনো খেলা নেই, যার জন্যে, রোজই, যতোক্ষণ পারা যায় তাকে আমার দরকার, খুব দরকার। কারণ একটি ছেলের শরীরের প্রতিভা আসলে খেলারই প্রতিভা। খেলোয়াড় মেয়েরা যে জন্যে পুরুষালি ... ধা এই জন্যেই তারা ছেলে-হর্মোনের সাহায্যও নিয়ে থাকে। সোমবার যদি তাকে কাছে পাই মঙ্গলবার পাবো না কেন? কোনো যুক্তি আছে?

এখন যে সুদর্শনা রাগারাগি করছে তা কারণ দুটো। চাকরি-টাকরির চেষ্টা আমি আদৌ করছি না, খালি তাকে জানালা আর অবসর সময়ে যে আড্ডা দিতাম তা দিচ্ছি। অ্যাপ্লিকেশন ছেড়ে যাওয়ায় আমি আদৌ বিশ্বাস করতাম না: সেই মহাভারতের আমল থেকে সোর্স-রেকমেন্ডেশন শুরু হয়েছে, আর, এখনি তা থামছে না। আমার ওসব কিছুই নেই। গজাতে পারে। যদ্দিন গজায় ততোদিন বসেই থাকতে হচ্ছে। ব থাকে এক সরকারী চাকরির পরীক্ষার জ পড়াশুনো। আসলে সুদর্শনা ভাবছে. হচ্ছে কি হ্যাঁ যদি এ ভালোবাসো তাহলে দু মাস চেপে একটু পড়াশুনো করে এ পড়াশুনো করে একটা পরীক্ষা পারবো না? আমি নিজেও সেটা ভাব কিন্তু কিছু করে উঠতে পারছি না। ব খুলেছি মাঝে মাঝে। পি এস সি পা

কেরানীদের রুস্বস ঠিক কেন জানতে হয়? অনবরতই এই সমস্ত প্রশ্ন জাগছে, আমি বুঝতে পারছি, কোনো ভাবেই এইসব ভুল-ভাল কাজকর্মে আমি মন বসাতে পারবো না। তাহলে আমার নিজের ভিতর এখনি অন্য কিছু ভুল থাকা দরকার ছিলো—যেমন, এস্টাবলিশড হতে চাই কি সুদর্শনার মন জয় করতে চাই কি নিজের যোগ্যতায় একটা চাকরি পেয়ে আমি দেখিয়ে দেবো—ধরনের ভুল স্বপ্ন বা ভুল ধারণা, থাকা উচিত ছিলো। তবেই পারতাম। কিংবা, বয়সটা বুকের ভিতর এখন যতোই সতেরো-আঠারো হয়ে উঠুক না কেন, আসলে তো চব্বিশ পঁচিশ—ঠিক আঠারো হলেও, পারতাম, যদি তখনি ষোল বছরের সুদর্শনার দেখা পাওয়া যেত। অস্বীকার করে লাভ নেই, তাকে বুকে মিশিয়ে নিয়ে জেনেছি সমস্ত ক্ষতি সহ্য করেও মানুষ কোন্ কারণে বেঁচে রয়েছে, একটা অসার্থক জীবনও কেন বেঁচে থাকে। আগে জানতাম না, পরে জেনেছিলাম, ঈশ্বর অ্যাডম আর ইভকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন যৌন ঈর্ষার জন্যে—ঈশ্বরের কোন ঈশ্বরী ছিলো না বলে। আঠারো বছর বয়েসে এই বোধটা হলে নিজের পরিচিতের বন্ধুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতাম না, সুখ-দুঃখে মায়া-মমতার সঙ্গে আরেকটু ভেবেচিন্তে লেখালেখি কি নাটকের দল করা কিংবা রাজনীতিতে জড়াতাম। অন্তত এই জ্ঞানটা হতো যে এরা যতোটা গর্জায় ততোটা বর্ষায় না। অনবরত সেই সতেরো বছর বয়সকে ফিরে পেতে ইচ্ছে করে আমার—চব্বিশ-পঁচিশে এসে এই বুড়ো বয়েসে প্রেম করা কি পোষায়। যাকে বারবারই ভুল পথে হাঁটতে হয়েছে, ঠিক পথে এসে সে যেমন বারবারই সন্দেহ করে এটা ঠিক পথ কিনা, বারবারই নিজের ভুল ভাঙিয়ে খুশী হয় আর চট করে চলে যেতে চায় না, আমারো তার মতোই অবস্থা। এক বছরে সাহসও একটু বেড়েছে, নানা ছুতোয় তার বাড়িতে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছি।

—কি হলো, চুপ করে বসে আছো যে? ছেলেরা এরকমই? দায়িত্ব এসে পড়লেই, ব্যাস, আর ভাল্লাগে না, না?

আমি সরল মুখে বললাম, সে কি, দায়িত্ব-টায়িত্ব কি বলছো? তুমি বললে, এভাবে বেশি দিন থাকা যায় না, কারণ, তোমার বয়েস বাইশ-তেইশ। তোমার বয়েস বাড়লে বোধ হয় বেশিদিন থাকতে পারবে—এইসব ভাবছিলাম আর কি? এর মধ্যে দায়িত্ব কোত্থেকে এলো?

উঁ খুব শয়তানি শিখেছো।

সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার তার কাছে ঘন হয়ে বললাম, শিখবো না? কে শেখাচ্ছেন সেটা দেখতে হবে তো?

সুদর্শনার মেজাজ আবার পাল্টে যায়।

—না এসব আমি শেখাইনি। তুমি জানো লোকে তোমার সম্বন্ধে কি বলছে?

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, জানি কি বলছে। দায়িত্বহীন। হে ডিয়ার, দায়িত্ব ও একটু চাকরিঘেঁষা তাদের বোলো পাওয়ার পর যদি বুঝিয়ে আমি আমাকে

সত্যিই তাই। বেকার-টেকারদের সম্পর্কে এসব কথা ওঠে না। চাকরি পাওয়াটা লাক, সেটা দায়িত্ব নয়।

—সেটা তোমার বন্ধুদের বুঝিয়ো! তারা তো এমন কথা তোমার সামনে মেনে নেয়, আড়ালে অন্য কথা বলে কেন?

বলেই, ফুঁৎ করে একটু কেঁদে ফেললো সুদর্শনা ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বললো, এতেই নাকি বোঝা যায় তুমি আমাকে মোটেই ভালোবাসো-টাসো না, শুধু ঐসব চাও। ভালোবাসলে অন্যরকম হতো....

তৎক্ষণাৎ ইচ্ছে করলো সবটা তাকে জানাই। জড়িয়ে ধরলেই, বুঝতে পারতো যে খুব একটা ঠিক নই আমি। সারা শরীরে, ভালোবাসার অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু এর বদলে, নিজেকে ঠিক করে নিয়ে আমি একটু সরে গেলাম, সিগারেট ধরালাম, তাকে ফুঁৎ ফুঁৎ করে কাঁদতে দিলাম খানিকটা। তারপর বললাম, তোমার সঙ্গে অনবরতই কি ওরা এই কথা বলে?

—হ্যাঁ বলে। আমি তো অনেকবারই বলেছি ওর সামনে বলো এসব—সে ধার দিয়ে কেউ যায় না।

বুঝতে পারছিলাম, প্রায় দেড় বছর ধরে এই সম্পর্কটা বন্ধুরা ঠিক সহ্য করতে পারছে না। তাদের একেবারেই দোষ নেই। তারা তো এর আগে আমাকে ঠিক প্রেম করতে দেখেনি—আমি কি করবো তা তারা সত্যিই জানে না। অথচ তারা এটা জানে যে শেষ পর্যন্ত আমরা এগিয়েছি। সুদর্শনা আমার সহপাঠিনী নয় যে কলেজটা যাক, য়ুনিভার্সিটিটা যাক, তারপর একটা দুটো বছর তো দেখতেই হয়-গোছের যুক্তিগুলো তারা মনে মনে মেনে নেবে। তারা এ-ও জানে যে সরকারী চাকরির পড়াশুনো আমি করতে পারছি না। আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কিন্তু আমার মেজাজ শাহী হয়ে উঠেছে।

যে সম্পর্কই থাকুক না কেন আমাদের, সুদর্শনার চলাফেরা আর আমার মেজাজ খুশ সেই সম্পর্কটাকে খুব একটা লুকো-ছাপা করেও রাখেনি। অর্থাৎ, যেভাবে আমরা চলছি তাতে তাদের স্বামিত্বে লাগছে, প্রেমে লাগছে, অর্থোডক্সিতে লাগছে, নিরাপত্তাবোধে লাগছে। কিন্তু, এরাও কি ঈর্ষা থেকেই সুদর্শনাকে ইঙ্গিত করে যাচ্ছে? আমি উত্তর খুঁজছিলাম। না। এগুলো ওরা বলতে বাধ্য। সুদর্শনার প্রতি কোনো রাগ থেকে নয়, আর কি বলবে। বহু প্রেমিক প্রেমিকা আছে যারা বকরবকর করেই বিস্তর সময় কাটিয়ে দেয়—আমরা তা কখনোই করে উঠতে পারিনি। কারণ সুদর্শনাই। তার কাছাকাছি এলে বোঝা যায় একে এইসব ছেঁড়া মন ভারিকরা কথা খুব হালকা মেজাজে বলে কোনো লাভ নেই। সে কারণে, তারাও কথা খুঁজে পায় না। অথচ, কথা না বলে বসে থাকাটাও সহ্য করা যায় না। আমি বন্ধুদের কোনো দোষ দেখতে পেলাম না সুদর্শনারও না। সুতরাং, একসময় তাকে আদর করতে করতে আমি বলতে লাগলাম, ঠিক আছে, আপাতত ওগুলো ভুলে যাও লক্ষ্মীটি।

সুদর্শনকে ভোলানো সহজ, কিন্তু নিজেকে ভোলানো বেশ কঠিন। আমি লক্ষ্য করছিলাম, চারপাশ থেকে একটা বিদ্রূপ দিনের পর দিন তৈরি হয়ে উঠছে। সুদর্শনা যখন আমাকে নির্বাচন করে, তখন এই বিদ্রূপটা থাকলেও, একটু অন্যভাবে ছিলো। বড়োলোকের খাম-খেয়ালি মেয়ে একটু সিনেমাটিক প্রেম করছে—এটাই ছিলো তার ভাষা। এখন বিদ্রূপটা দুজনকেই বিঁধবার জন্যে অপেক্ষা করছে। এই কি নয় যে এই লম্বা বুকনি-দার ছেলেটি কয়েকদিন মজা মেরে কেটে পড়বে, অথবা, মেয়েটিও তাই?

যে স্ট্র্যাটেজি আমি নিচ্ছিলাম, তা আমার মতো হলেও, তা সম্পূর্ণ ভুল হলো। আমার উচিত ছিলো আর পাঁচজন প্রেমিকের মতো প্রেমিকাসর্বস্ব বনে যাওয়া, তাকে লোকের সামনে বেশি না আনা। তাহলে, কিছুদিন নিন্দেতামাশা হয়ে, থেমে যেতো। সেই জায়গায়, আমি ঠিক ঠিক এর উল্টো কাজগুলোই করলাম। আমাদের একজন কমবয়সী বন্ধু, যে, কোনো মেয়ের সম্পর্কেই ঠিক মনস্থির করতে পারেনি আর মেয়েমাত্রেই তার ফেভারিট—তাকি হাসতে হাসতে একদিন বললাম, সত্যিই, প্রেমটেম কর না! খারাপ নয়। বেশ মনে হয় ফিলমে নেমেছি—

আমার কথাটা সে ঠাট্টা হিসেবেই নিতে পারতো। নেয়নি, কেন না, মানুষ হিসেবে তখন আমি অত্যন্ত সন্দেহজনক হয়ে উঠেছি। এরকম আরো কথা ধরে সন্দেহ ঘনাতে লাগলো। সেটা হতোই; কারণ সুদর্শনা ঠিক আমার উপযুক্ত নয়! আমিও তার উপযুক্ত নই—এইটাই ধরে নেওয়া হচ্ছিলো। আমাদের একজন বন্ধু একদিন খোলাখুলিই বললো, পার্থ-সুদর্শনার এই অ্যাফেয়ারটাই একটা টিপিক্যাল ব্যাপার। এটা একদম ম্যাচলেস, কিংবা এইটাই পারফেক্ট ম্যাচ। আচ্ছা পার্থ, অনেস্টলি একটা কথা বলবি? তোকে কোনটা ডমিনেট করে? প্যাশন অর টেনডারনেস?

আমি পরিষ্কার গলায় বললাম, কালিদাস।

যে বন্ধুটি আমাকে সুযোগ দিতো তার নাম অরূপ। অরূপও একদিন বললো, পার্থ, তুই খুবই প্যাশনেট, কিন্তু সেটা এভাবে সবাইকে জানিয়ে দিস না। তোদের নিয়ে অন্য কিছু বলার নেই—যদি এই অবস্থাটা তোদের সত্যিই ভালো লাগে, ওয়েল, তোরা প্রিকশনস নিস তো?

আমি একটু থেমে গেলাম। বললাম, না?

অরূপ নড়ে উঠে বললো, সে কি রে? তারপরেও তুই রিস্ক নিচ্ছিস?

—কি করবো। ও চায় না।

—না না ওকে বোঝা। আমার বাড়িতে তোরা দেখা করিস। কিন্তু হলে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছিস?

অরূপ আমার সবথেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু, প্রায় প্রতিদিন বন্ধুতা—যা পাঁচ বছর ধরে চলছিলো—তার ভারে সে একটু ক্লান্ত। অরূপই প্রথম সুদর্শনার মনোভাব আমাকে জানায়। আমি যে আরো চটে গিয়েছিলাম, তার পিছনে আমার একটা ধারণাই ছিলো যে একটি মেয়েকে আমার জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়ে অরূপ নিজে পালিয়ে যাচ্ছে। বললাম, তুই নিজে থাকিস না কেন? শুধুমাত্র দুজনে থাকলে নিজেকে কনট্রোল করা যায়!

অরূপ কথাটা গ্রাহ্য করলো না। বললো, গড় সেভ যে এই দেড় বছরে কিছু হয়নি। আমি সঙ্গে সঙ্গে জানালাম, দ্যাখ, সেফ ডেট কাকে বলে জানিস কি? আমরা যখন মীট করি তখন এই ব্যাপারটা মনে রাখি। তুইও কি ভাবছিস আমি একটা ইরেসপনসিবল? সুদর্শনাকে বিপদে ফেলার কোনো ইচ্ছে নেই আমার—নিজেরও পড়বার ইচ্ছে নেই। তুই জানিস, আনএমপ্লয়েড থাকা ছাড়াও আমার কি কি ফ্যামিলি অবলিগেশন আছে—

—জানি। অরূপ আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, সে জন্যেই ভাবছিলাম কি ভেবে এতোটা এগোলি—মানে এতোদূর এগোলি। তুই জানিস কি তোর যা যা ট্রাবল রয়েছে, তার অনেকটাই সুদর্শনা বোঝেনি?

—জানি। একদিন বুঝবে।

—থাকগে। কিন্তু মাইরি, একটু সাবধান থাকিস—আচ্ছা, তুই যে আগে মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো ইনটারেস্ট পেতিস না, এখন পাস? তুই সুখী?

আমি গড়গড় করে অনেক কথা বলে গেলাম। অরূপও সে সময় একজন সহপাঠিনীর সম্পর্কে একটু ভিজেছে। আমার কথা শুনে অরূপ নিশ্বাস ফেললো একবার, তারপর বললো, তোর মতো ওতোটা সাহস আমার নেইও, বা অতোটা অ্যাপাথিও আমার ছিলো না, কোনো কারণেই হোক—আমি এতোটা এগোতে পারি না। ভিতর থেকে বাধা আসে একটা—

—কিন্তু এভাবে না এগোলে তুই কিছু পাবি না!

—হয়তো। অরূপ অন্যমনস্ক চোখ জানালায় ফেরালো, তারপর একটু হেসে বললো উদ্যোগী পুরুষটিই লক্ষ্মীলাভ করুক। কিন্তু, এবার তুই সামলা। তোর বৌ পুরো জুলাই মাসটা কোথায় যেন চলে যাচ্ছে।

—সামলাতে কেন পারবো না?

—কতো পেরেছিলি মনে আছে। তেয়াত্তরের পুজোটা এক সঙ্গে কাটাতে পারলি না বলেই তো জিন খাইয়েছিলি। তারপর সমস্তক্ষণ বৌ-এর জন্যে তোর বুকের কষ্ট বুঝতে হয়েছে।

—মাইরি, মদ খেলে আমি এতোটা বোর করি না।

—ইউজুয়ালি। কিন্তু সেদিন করেছিলি।

আমি অপরাধীর মতো একটু বিব্রতমুখে হাসলাম। একটু বাদে সুদর্শনা আসতে অরূপ তার খুব প্রশংসা টশংসা করে বেরিয়ে গেলো।

—কি, তুমি নাকি যাচ্ছো?

—হুঁ। আগরতলা।

—যেতেই হবে?

—হবে না?

—তোমার না গেলেও চলে।

—দ্যাখো, না গেলে বাড়ির সবাই খুব রাগ করবে। এমনিতেই নানা সন্দেহ করছে।

আমি আর খুঁচিয়ে ঘা বাড়াবো না।

—কতোদিন থাকবে?

—এক মাস তো বটেই। বলে, সুদর্শনা কিলবিল করে আরো অনেক কথা বলতে যাচ্ছিলো, থামিয়ে দিয়ে বললাম, এক মাস!

—প্লিজ, বারণ কোরো না। দেখতে দেখতে এক মাস কেটে যাবে।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললাম, না কাটবে না! তোমার বেড়ানোটাই বড়ো হলো, না?

সুদর্শনা ঘাড় নিচু করে বসে থাকলো। খানিকটা পায়চারি করার পর আমি তার সামনে নিলডাউন হয়ে বললাম, যেয়ো না উঁ? আচ্ছা ওটা সাতদিন করা যায় না?

—পাগলামি কোরো না। একমাস তো থাকতেই হবে। আগরতলার প্লেন ফেরার কতো জানো না? তুমি বারবার খালি এরকম করো। আমি তো এখনো ওদের মেয়ে।

—জানি, জানি। তার কোলে মাথা ঘষতে ঘষতে আমি বললাম, জানো, আমার কেমন মনে হচ্ছে ওখানে তোমার যাওয়াটা ভালো হবে না।

—মশাই, এরপরে তুমি যদি এমন চাকরি পাও যাতে তোমাকে বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়—তখন তুমি কি করবে? আমাকে দেখতে পাবে না বলে যাবে না?

আমি তার কোমর আঁকড়ে ধরে বললাম, না, সত্যিই যাবো না!

সুদর্শনা একটু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতেই হাসলো।

—ছেলেরা এরকমই! নিজেরা যখন চান্স পাবে তখন ফিরেও দেখবে না যে বৌ-এর কি হলো। কিন্তু বৌকে আর যেতে দেবে না কোথাও, যদি নিজে চান্স না পায়।

রেগেমেগে উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, বেশ, যাও! —কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার বললাম, না, যাবে না। দেখি তুমি কেমন করে যাও!

আমাকে অবশ্য রাজি হতেই হয়েছিলো। এয়ারপোর্টে ইচ্ছে করেই যাইনি।

এর দুদিন বাদে, প্রবল জ্বর হলো। যেদিন গিয়েছিলো সুদর্শনা সেদিন শরীরের চাপে পড়েছিলাম সারারাত। সমস্ত রাত্রিটাই হাওয়ায় ঘুরেছি কানে-মুখে জল দিয়েছি। তারই ফলাফল বেরোলো দুদিন বাদে।

চার। পাঁচ। নানারকম কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোতে চাইছে। ছয়। কথা বেরিয়ে আসছে আমি সামলাতে পারছি না। প্রচণ্ড কাঁপুনি আসছে, থেমে যাচ্ছে, তারপরই কথা মুখ ফাটিয়ে বার হচ্ছে। ওহ আমি কি সুদর্শনার কথা বলে ফেলবো নাকি? আমার ডিলিরিয়াম চলছে

মেক-আপ দিয়ে
ত্বকের দোষত্রুটি ঢাকা যায়!

CROOKES
Lacto-Calamine

বুঝতে পারছি। না, না! কোনোভাবেই আমার বাড়িতে এখন তার কথা বলা যাবে না।

জ্বর সেরে গেলেও আচ্ছন্নের মতো দিন দুয়েক আমি বসে থাকলাম। সুদর্শনা গেলো, কিন্তু কেন গেলো? আমার সন্দেহ হলো, তাহলে হয়তো ভালো লাগছিলো না তার—তাকে ভালো লাগাতে পারিনি আমি, মেয়েরা তো আর স্মৃতিজীবী হয় না। এমন কি-আমি নিজেও তা নই আর। বাহাত্তর পর্যন্ত আমাকে আমি চিনতে পারি, কিন্তু আর ছুঁতে পারি না, ছুঁয়ে আর রস পাই না। সুদর্শনাকে ছোঁবার পর, মাত্র দেড় বছর আমি জন্মেছি।

কয়েকদিন বাদে, অরূপের ঠিকানায় তার চিঠি এলো। সেখানে তার কেমন কাটছে। পড়ে, গা জ্বলে গেলো। কবে আসবে কিসসু লেখেনি। সেই মেজাজেই চিঠি দিলাম তাকে। পরের চিঠি পেলাম আরো দেরিতে। জবাব দিইনি। কয়েকদিনের মধ্যে সুদর্শনা এসে পড়লো। সময় লাগলো একমাসের কিছু বেশি।

যখন সে এলো তখন নিজের সম্পর্কে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি। সুদর্শনার দিকে অসংকোচে, আমি তাকাতে পারতাম। পরীক্ষা করার জন্যেই তখন অন্যান্য মেয়েদের দিকে তাকিয়েছি, কিছু মনে হয়নি কখনোই। কিন্তু এই একমাসের মধ্যেই, আমি দেখ-ছিলাম, আমার স্বভাব বদলাচ্ছে। মাঝে মাঝেই আমার স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটছে, ঘটছে আরো খারাপভাবেই। যেভাবে আমি কোনো কোনো পথচলতি মেয়েকে দেখচি তার মধ্যে একটি মেয়েকে পুরো না দেখে, সুবিধেজনক অংশটার দিকেই দৃষ্টিপাত বেশি ঘটছে। সুদর্শনা আসতেই, আমি চটে উঠলাম। এই সেই মেয়ে যার সঙ্গে থেকে শরীর কি তা আমি বুঝেও উপোসী থেকে যাচ্ছি। অবশ্য, রাগটাগ আর কতোক্ষণ করে থাকা যায়। খানিকটা ঝাল মিটিয়ে তাকে ব্যাপারটা খুলে বললাম।

সুদর্শনা বললো, ওরে বাবা, আর মড়ছি না! না, শুধু তোমার জন্যে নয় মশাই—আমার জন্যেও। জানো, মফস্বলের ছেলেরা এতো বিচ্ছিরি হয় যে ওখানে একটা মেয়েকে কথা বলতে দেখলেই সবাই ভাবে যে মেয়েটার কনসেন্ট আছে।

—মানে? তুমি আবার কি বাধিয়েছো?

—তোমাকে দেখাবো। তুমি কিছু মনে করবে না বলো।

—না। কই দেখি।

সুদর্শনা তখন ব্যাগ খুলে গোটা-চারেক ফুলস্কেপ কাগজ বার করলো। বিশাল উচ্ছ্বসিত সব প্রেমপত্র, যাতে নানারকম দাবি প্রতিশ্রুতি আছে। এরকম চিঠি আমি কখনো লিখিনি।

—মানে? এই ভদ্রলোক তো তোমাদের আগরতলার ঠিকানার কাছেই থাকতেন? প্রশ্নটা বুঝতে পেরে সুদর্শনা বললো, হুঁ, বলেছি না তোমাকে সম্পর্কে [illegible]

বাড়িতে এরই সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চায়—

মুখে বললাম, তা তো চাইতেই পারেন। ইঞ্জিনীয়র। মনে মনে, বেশ একটু টলে গেলাম। সুদর্শনার যাবার দিন, ওদের তিনতলার একজন মুন্না, তাকে সুদর্শনা দাদা বলে, আমাকে ডেকে পাঠিয়ে প্রচুর সদুপদেশ দিয়ে রিয়েলিটি ফেস করতে বলেন। রিয়েলিটি হলো এই যে কয়েকদিন আগেই সুদর্শনাকে যে পাত্রপক্ষ এসে দেখে গেছে, সুদর্শনা নাকি তাদের সম্পর্কে খুব আগ্রহী। কথাটা তখন উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু আগরতলা গিয়ে সুদর্শনা ব্যাগে চিঠি নিয়ে এসেছে। এ কি আমাকে তাতাবার জন্যে?

বললাম, ভদ্রলোক এতোটা আশা করছেন কেন?

সুদর্শনা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, দ্যাখো না—তোমার চিঠিও আমি ওকে দেখিয়েছি, তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তারপর দু-একদিন তোমার সম্পর্কে সব বললাম। ইনি নাছোড় হয়ে লেগে আছেন।

আস্তে আস্তে জানা গেলো ভদ্র-লোকের একটি স্কুটার বা বাইক গোছের কিছু আছে। তিন-চারটি বিকেল, সুদর্শনা আগরতলার পাহাড়ি পথে সেই বাইকের পিছনে বসে ঘুরে বেড়িয়েছে।

ভদ্রলোককে বিশেষ দোষ দিতে পারলাম না। আসলে, সুদর্শনার দিকে যখন অন্যান্য পথচলতি ছেলেরাও খিদে-পাওয়া চোখে তাকায়, তখনো আমি রাগ করতে পারি না। সুদর্শনার কোনো দোষও দেখতে পেলাম না। আমাদের আড্ডায় এসে এসে তার যে অভ্যেস দাঁড়িয়েছে তাতে আগর-তলার মতো জায়গায় গিয়ে শুধুমাত্র আত্মীয়দের সঙ্গে যৎসামান্য কথাবার্তা বলে তার সময় কাটার কথা নয়। এইসব ভাব-ছিলাম—খুব লুকিয়ে ভাবতে পারিনি, সুদর্শন বুঝে ফেলেছিলো। তার দিকে তাকিয়ে দেখি, কারোর প্রতি অভিমানে, সে চুপ করে আছে। তার দিকে এগিয়ে একটু দাঁড়ালাম আমি, নিচু হয়ে তার গ্রীবায় চুমু খেলাম। সুদর্শনা আস্তে আস্তে বললো, ছেলেরা বরাবরই এমন পাগলামি করে কেন বলো তো আমাকে নিয়ে? আমি আবার চুমু খেয়ে বললাম, সেটা তুমি বুঝবে না। আমি বুঝতে পারি। আমারই যদি এহেন হাল হয়, ম্যাডাম, অন্য সব ছেলেদের দোষ কি।

—আমি কিন্তু অন্য জিনিষটাই চেয়েছিলাম।

আমি বকে উঠলাম, সামনে তুমি থাকতে তোমাকে মনে-মনে ভালোবাসবো নাকি? তোমরা খালি ভাবের ঘরে চুরি ভালোবাসো!

(৪)

কয়েকদিন বাদে আমার টিউশনিটা চলে গেলো। দু-একদিন পরে, অরূপের কল্যাণে এম-এর নোট টাইপ করার একটা [illegible] টাইপ শিখছিলাম বটে, সে

ঐ পর্যন্তই। সকালবেলা এইট বি থেকে কাঁকুড়গাছি ঠেঙিয়ে ফিরে পাড়ার কাছাকাছি একটা স্কুলে যাওয়া। বিকেলবেলা গেলে সুদর্শনাকে ছেড়ে দিতে হয়। এর মধ্যে, দাঁতে পোকা লেগেছে—সব কটা কষের দাঁত। টাইপ একদিন থামলো। তখন পুজো এসে পড়েছে। চুয়াত্তরের সেই অনবরত বর্ষানামা পুজোয় খুব খুশী হয়ে অনেক খরচা করা গেলো।

"টাকা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, হঠাৎ একদিন সুদর্শনা বললো, জানো, আর সত্যিই আসা সম্ভব নয়। ভাই বাজে রেজাল্ট করেছে—বাড়িতে বলছে তোর আর পড়াশুনো কিসসু হবে না, বাইরে অতো ঘোরাঘুরি কেন? আসলে, ঐ লোকটার সঙ্গে বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছে—

ঐ লোকটা মানে আগরতলার সেই ইঞ্জিনীয়র। যে মুহূর্তে সুদর্শনা এ কথা বললো ঠিক তখন আমি হাওয়ায় উড়ছিলাম। হাওয়া থেকে নেমে এসে তার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, মেয়েটি মেয়েদের মতোই হিসেবী। এখনো কলেজ ছাড়েনি সে, এখনো নানাভাবে অন্তত তিনটে বছর সে আমাকে সময় দিতে পারে, খুঁচিয়ে উত্যক্ত না করতে পারে। তা কিন্তু করছে না। প্রত্যেকদিন এসে মুখ কালো করে থাকছে, মন কালো করে চলে যাচ্ছে কেন, এগুলো আগে ভাবেনি? সে কি ভেবেছিলো চাকরি পাওয়ার মতো এক লটারির সৌভাগ্য সে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দুম করে আমার হাতে পড়বে? এক প্রায় ভবিষ্যৎহীন ছেলেকে আঁকড়ে ধরা আমি শুধু সবাই একে বারণ করেছিলো, কারোর কথা সে শোনেনি। বেশ, তারপর তার ভবিষ্যতের অনিশ্চিতি নিয়ে, তাকে কেন এ খুঁচিয়ে যাচ্ছে?

কঠিন ও ঠাণ্ডা গলায় আমি সেদিন আঘাতের পর আঘাত করলাম। তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত না করছিলো। বাড়ি থেকে নেমে যাবার সময় মৃদুভাবে তাকে বললাম, আর কখনো দেখা কোরো না।

আটদিন সত্যিই আসেনি। আমি যাইনি। সমস্তটাই খুলে বলেছিলাম অরূপকে। অরূপ আর অরূপের বান্ধবী মৃদুলা শুনে বললো, পার্থ, সুদর্শনার বাড়ি তো ঠিক ততোটা কালচার্ড নয়, কাজেই, একটা চাপ ওর ওপর পড়ছে। এ জন্যে এতোটা রেগে যাওয়া ঠিক না।

—ও, তাহলে প্রত্যেকটি ঘণ্টা মিনিট এই নিয়ে আমার কানের কাছে টিকটিক করাটাই ঠিক?

মৃদুলা হেসে বললো, তা ঠিক, তুমি—তোমার ছেলেরা একটু বেশি ইমো-শনালিসটিক আর স্বার্থপর—যাই বলো কেন।

মৃদুলার মুখে এই কথাটা শুনে আমার আরো রাগ হলো। মৃদুলা কি অরূপ আর অরূপের এক সহপাঠী দোটানায় ঘুরছে—তার মুখে এতো বড়ো বড়ো কথা কিসের? কে জানে, মৃদুলাকে দেখেই হয়তো সুদর্শনা বিগড়েছে। কি

চারদিনের দিনও যখন সুদর্শনা এলো না, তখন, নিজের মাথাটা খুব শান্ত মনে হতে লাগলো, চারপাশের মানুষজন রোদ-জ্যোৎস্না-হাওয়া-বেঁচে থাকার মধ্যে একটা মর্গের ভাবলেশহীনতাকে আমি দেখতে পেলাম। পরের দিনই ধরে নিলাম, সে আর আসবে না।

আটদিনের দিন একা-একা অরূপের ঘরে বসে তাস খেলছি, হঠাৎ সুদর্শনা এসে ঢুকলো। তাকে এক সেকেন্ড দেখতে পেয়েই রাগে-অভিমানে আবেগে ভালোবাসায় জড়িয়ে গেলাম আমি—এক মুহূর্তে তাকে পিষে ফেলতে ইচ্ছে করলো—সেই মুহূর্তেই রাগে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করলো। অতএব, কি করবো ঠিক না জানতে পেরে মুখ নামিয়ে নিলাম আমি, তাস তুলতে সুরু করলাম। সুদর্শনা দরজা ভেজিয়ে অরূপের টেবিলে বসলো। আড়চোখে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারলাম, সুদর্শনাও একবার উঠতে গিয়ে উঠলো না। দেখে আরো রাগ হলো; আমার রাগ বেশি হয়েছে, তুই কাছে আয়। সাধাসাধি কর। তা না, গ্যাঁট হয়ে টেবিলে বসে আছে। আসলে, প্রথমদিকটায় তো আমাকে এগোতে হয়নি—সেই পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছেন বলে ওনার কাছে চিরকাল কৃতার্থ হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু নিজেকেই ধমকালাম আমি: সেদিন বাস থেকে যখন নেমে এলাম, সে তো বাধা দিতে পারতো। দেয়নি কেন?

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর গলা খুব ক্যাজুয়াল করে আমি বললাম, কি ব্যাপার! এসে চুপচাপ রয়েছো যে।

—এমনি।

—আমার কাছে তোমাকে আসতে বারণ করেছিলাম। সুদর্শনা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে পড়ে এগিয়ে এলো।

—আমার, আমার খুব খারাপ খবর—তুমি এরকম কোরো না—

—কি? বিয়ে ঠিক হয়েছে?

সুদর্শনা মুহূর্তের মধ্যে সোজা কঠিন দাঁড়িয়ে বললো, না। আমার দুটো ডেট পার হয়ে গেছে।

পৃথিবী ঘুরছে, আমি টের পেলাম। অনেকক্ষণ বাদে বলতে পারলাম, কি করে? কোনো ডেনজার পিরিয়ডে আমরা মীট করিনি। তুমি শিওর যে অন্য কোনো কারণে....

—কি জানি! আমি বুঝতে পারছি না! সুদর্শনা ভেঙে পড়লো, আমি কি করবো বুঝতে পারছি না।

টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো মেয়েটি চোরের কান্নায় গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে' আহ্ এই দায়িত্ব তো আমি নিতে পারবো না। কি করে পারবো? কিন্তু আমার চোখের সামনে এভাবে সে গুঁড়িয়ে যাবে? তা-ও আমি কিভাবে হতে দিতে পারি? আমার চোখের সামনে যে পৃথিবী ঘুরেছিলো সেই হঠাৎ সোজা হয়ে আমাকে বললো, রাখো, রাখো, একে বাঁচাও। এ-ই তোমার শেষ দেখাবে।

আমি তাকে তীব্রভাবে জড়িয়ে ধরলাম, আদর করলাম। কিন্তু কোনো বাজে সান্ত্বনা দিলাম না। নষ্ট করা ছাড়া যে কোনো উপায় নেই, সেটা সে-ও জানতো। বুঝলো। আসলে সে সুখী হলো এই ভেবে যে দায়িত্ব আমি অস্বীকার করলাম না। আমিও সেটা বুঝতে পারলাম। একটু বাদে, আলিঙ্গনাবদ্ধ আমাদের ধারণা হলো যে ব্যাপারটা ততোখানি গুরুত্বের নয়—অন্তত উনিশশো চুয়াত্তর সালে। কিন্তু, এ-ই আমাদের প্রথম বাচ্চা হলেও হতে পারতো!

কাছাকাছি আমাদের এক ডাক্তারি পড়া বন্ধু আছে, তার কথাই ভেবেছিলাম। তার সঙ্গে আমার আলাপ খুব বেশি নয়। তবে সে নিজে কবি না হলেও, কবিদের সঙ্গেই ওঠাবসা করে—আর এটা আমি খুব ভালোভাবেই জানি যে কবিরা এসব ব্যাপারে যথেষ্ট উদার হয়। অরূপও কবি। তা না হলে কি সে এই ধরনের সুযোগ দিতে পারতো?

তা-ও, ডাক্তার বন্ধুটিকে হাতে রেখে, নার্সিংহোমে-টোমে আমি খোঁজ নিলাম। আমি যা জোগাড় করতে পারি, দেখা গেলো, তার ছ-সাতগুণ বেশি খরচ। নাজেহাল হয়ে আমি ডাক্তার বন্ধুটিকে প্রথমদিন থেকেই সব বললাম। এসব ব্যাপার নিয়ে কোনো রকম আশঙ্কা করার মতো স্বভাব নয় তার। কিন্তু দেখা গেলো, ইম্পর্ট্যান্ট দিনে তার দেখা পাচ্ছি না। ঠিক মতো যোগাযোগ হতেও দিন পনেরো গেলো, তখন জানা গেলো, কি সব কারণে বিভাগীয় ওয়ার্ড বন্ধ আছে। বিভাগীয় ওয়ার্ড খুললে আবার দৌড়োদৌড়ি শুরু করে জানতে পারলাম, কুমারীদের এ ধরনের অবস্থায় সাইকিয়াট্রির চ্যানেলে ব্যাপারটা ঘটে থাকে। যাতে আরো সন্ধান কেউ না কেউ দিতে পারে, এজন্যে ততোদিন আরো চার-পাঁচজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে ঘটনাটা বলেছি। আমার ধারণা ছিলো, কেউই চমকাবে না। এ কারণে, খ[illegible] স্বাভাবিক ও সাধারণভাবে তাদের জা[illegible]য়েছি। কিন্তু তারা চমকেছে বেশি; দু-এ[illegible]জন আমার নির্লিপ্ত সুর সম্পর্কেও প্র[illegible] রেখেছে। এদিকে, হয়রাণ হতে-হতে, নিজে[illegible] অক্ষমতা বুঝতে বুঝতে আমার বির[illegible] চড়ছে। যাকে মেরেই ফেলতে হবে, তার জ[illegible] আবার স্নেহটেহ কিসের? অনেক জায়গ[illegible] এমনিতেই অ্যাবরশন হচ্ছে—তার জন্যে আবার সম্পর্ক চিড় খায় নাকি?

সুদর্শনা মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন মু[illegible] আসে যায়। তার উদ্বেগের দিকে তাকি[illegible] আবার বিরক্তি বাড়ে। যখন একটা ডেট ক[illegible] করেছিলো তখনি বলেনি কেন? টাকাপয়[illegible] তখনো কিছু হাতে ছিলো। এতোটা প্যা[illegible] পড়তে হতো না। যখনি সে আসে তখ[illegible] আমি আশা করি সে আমাকে এব[illegible] সান্ত্বনা দেবে। কারণ সে দেখতে পা[illegible] আমি নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি, অথচ কি[illegible] করতে পারছি না। সে তা করে না, তিক্ত[illegible] বাড়িয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে বলে, হা[illegible] পাতালে কে কখন দেখে ফেলবে—

সাইকিয়াট্রিতে এরপর আরেক অভিজ্ঞ[illegible] হলো। সুদর্শনাকে বলা হলো, সে [illegible] আনম্যারেড, সে বাবা কিংবা দাদার কনস[illegible] আনুক। না হলে সম্ভব নয়। বুদ্ধি খাটি[illegible] সুদর্শনা বলতে পারলো না যে তার বা[illegible] দাদা কেউ নেই; সুতরাং, আমাদের [illegible] ডাক্তার বন্ধুটি ভিতরে ভিতরে কি ব্যব[illegible] করতে পারে তারই পর বরাত দিতে হা[illegible] আমাকে। সে আমাকে মাঝে মাঝেই বল[illegible] থাকলো, ইয়া, পার্থ, আপনারা দুজনেই যার বাড়িতে জানিয়ে দিন না। কি লা[illegible] ফার্স্ট ইস্যু, নষ্ট করা তো রিস্কি, কা[illegible] এরকম একটা কেসে ডাক্তাররা চট করে র[illegible] হতে চায় না! পার্টিকে কোনো-না-কো[illegible] কম্প্রোমাইজে আসতে বলে—

অ-স-ম্ভ-ব! আমার তেমন কো[illegible] সংগতি নেই, আমার নিজের কোনো ভবি[illegible] নেই, সুদর্শনাকে আমার বাড়িতে কেউ জ[illegible]

—হঠাৎ এরকম একটা খবর নিয়ে গেলে ান, ব্যবস্থা হবে? তা-ছাড়া, আমি জানি, মাকে জানতে হয়েছে, এই যে বিয়ে বা মের দোল-খেলা, এতেও, বড়োর ঘব গড়ানো আছে। ছেলের মায়ের বা মেয়ের েরের ঘর ছেলে-মেয়ের বিয়ে বা প্রেমে ড়ে যায়, যদি তারা সত্যিই বড়ো হয়ে কেন। সুদর্শনার মা নেই, কিন্তু আমার আছেন, অভাব আর দুর্ঘটনা যাকে বড়ো রে দিয়েছে।

আমি আমাদের ডাক্তার বন্ধুটির সরল খের দিকে তাকিয়ে বললাম, না, তা সম্ভব য়! কোনো মতেই তা সম্ভব নয়! সুদর্শনা নেছিলো আমাদের কথা, আমার কথা, শুনে খ ফিরিয়ে নিলো আমার দিক থেকে।

এর আরো কিছুদিন বাদে হাসপাতালে রীক্ষার জন্যে সুদর্শনা ঢুকলো, সঙ্গে মি। সামান্য নীল পর্দার আড়ালে দর্শনাকে একটু বেড়ে শুতে হলো। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে বললেন, একি, এতো ার মাস পেরিয়ে গেছে!

মানে? আমার চোখ ফেটে যেতে চাইলো। জুলাইতে আমার সঙ্গে সুদর্শনা তো কোনো দনই দেখা করেনি?

সুদর্শনা প্রায় কেঁদে উঠে বললো, না, না, অতোদিন হয় নি।

—আমরা যা বুঝতে পারছি।

আমি বেরিয়ে এলাম। আগরতলার সেই ইঞ্জিনিয়র ভদ্রলোকের চিঠির কথা আমার মনে পড়লো। যদিও আমি জানি—তার সঙ্গে কোনো কিছু হওয়া সম্ভব নয় সুদর্শনার পক্ষে, কিন্তু এই একটা মাস ধরে প্রত্যেক-দিন যে অদৃশ্য আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, এই যে এই সে, আনন্দ করে এখন তার দায়িত্ব নিতে চায় না—যে দায়িত্ব নিতে পারবে না জেনেও, এই সে—যে আনন্দ করেছিলো, সেই অদৃশ্যকে সায়েস্তা করার পথ খুঁজে পেলাম আমি। দ্বিতীয়ত, আমি এ-ও বুঝেছিলাম, আমি খুব অনুগত থাকলে সুদর্শনা আবর্শন করাতে চাইবে না, কাণ্ডজ্ঞানহীন এই মেয়েটি তখন আমাকে আমার বাড়িতে জানাবার জন্যে চাপ দেবে, বিয়ের জন্যে চাপ দেবে। অথচ, আমি সত্যিই কোনো টাঁ-টাঁ চাই না—তাতে কৃতকৃতার্থ হবার মেজাজ আমার নয়, কখনোই কোনো বাচ্চাকে আলাদাভাবে ভালো লাগেনি আমার, নিজের জীবনই আমার কাছে এতো যথেষ্ট হয়ে ওঠেনি যে এসবের দায়িত্ব নিয়ে, আসলে নিজেকেই নিজের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবো। তাহলে, একটা-ই পথ, সুদর্শনাকে সন্দেহ করতে শুরু করার পথ। না হলে, শেষ পর্যন্ত যে আমিই সুদর্শনার আবর্শনের দিন অন্য কিছু করে বসবো না তাকি আমিই জানি।

সুদর্শনার সঙ্গে আমি একটিও কথা বললাম না। সে বাড়ি চলে গেলো। আমি অরূপের কাছে এলাম, তাকে একটা খবর দেওয়া দরকার।

অরূপ আমাকে দেখতে পেয়েই বললো, পার্থ, কাল আমার কাছে তোর বৌ খুব কান্নাকাটি করছিলো। যা-ই ঘটুক না কেন সেটা তো আলাদা কথা—তাই এরকম ইনডিফারেন্ট ব্যবহার করছিস কেন?

—কেন, যা যা করা দরকার তা কি আমি করছি না?

—সে কথা বলছি না। সুদর্শনাকে তোর একটু কনসোল করা উচিত—আফটার অল, ও তো মা হতে যাচ্ছিলো।

হিংস্র গলায় আমি বললাম, না, সেটা আমি পারবো না। সুদর্শনা, জুলাইতে কনসীভ করেছে। ওর প্রেগন্যান্সির জন্যে আমি দায়ী নই। ওর সঙ্গে আমার কো-হ্যাবিটেশন হয়েছিলো, একমাত্র সেই দায়িত্বে—সেই সম্পর্কে আমি ওকে অ্যাসিস্ট করছি। দিস মাচ। অরূপ আমার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বললো, ঠিক বলছিস এগুলো?

—গো টু ডক্টরস অ্যান্ড আস্ক দেম! অরূপের অবস্থা লক্ষ্য করে আমি ভিতরে ভিতরে সুখ পেলাম। এই প্রথম, আমার অভিনয় ওরা ধরতে পারছে না। আমাকে বুঝতে পারছে না। আমি একা।

—ডাক্তারেরা আন্দাজেও বলতে পারেন।

—না। তাহলে, তাঁরা ডাক্তার নন। আমি তো একারণেই ভাবছি, যে কি করে হলো। আমি তো কোনো ঝুঁকি নিইনি। সুদর্শনাই নিতে দেয়নি, সুতরাং সে ঝুঁকির দায়িত্বটা আমার একার নয়। আর এখন তো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি। অরূপ, তা-ও আমি কোনো অভিযোগ করছি না। আমার শুধু একটাই প্রশ্ন—যদি অন্য কারোর সঙ্গে কোনো উইক মোমেন্টে সুদর্শনা কিছু করেও থাকে, সে আমাকে সেটা বলছে না কেন? সুদর্শনা খুব ভালোই জানে যে আমি এমন ধরনের ছেলে নই যে এসব শুনলে মরে যাবো কি প্রেমিকাকেই মেরে ফেলবো! অথচ, বলছে না!

অরূপ অনেকক্ষণবাদে গম্ভীর থেকে উঠে আসা গলায় বললো, আমাকে যা বলছিস তার দায়িত্ব নিতে পারবি?

—ইয়েস। কেননা, আমি ভুল বলছি না।

—পার্থ, তুই পাগলামি করছিস।

আমি আমার কণ্ঠস্বরকে রাজনৈতিক নেতার মতো পরিষ্কার আর স্মার্ট করে নিলাম।

—অরূপ, যা যেমন তাকে সেইভাবেই নে না। সুদর্শনার কাছে আমার সম্পর্ক ভাঙলে আমি তো তোর সময় ডিমান্ড করবো না!

অরূপ পায়চারি করতে করতে বললো, বেশ। তাহলে, ব্যাপারটা হওয়ার আগেই ওকে এটা আমি জানিয়ে দিতে চাই। হঠাৎ ছটফট করে উঠে অরূপ বললো, পার্থ, তুই ভুল করছিস, সু তোকে পাগলের মতো ভালোবাসে।

জানি, তা আমিও জানি। আমার বলতে ইচ্ছে করলো, অরূপ, আমি জানি। কিন্তু কোনো উপায় নেই, বলবো একথা। অরূপ ভিতরে ভিতরে পুড়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে। বলবো? না। আমার অবস্থা না বুঝে ওরা সেন্টিমেন্টাল হয়ে আমাকে চাপ দেবে। ওরা দুজনেই ছেলেমানুষ, ওরা জানে না আমার বাড়ির অস্বাভাবিকতা, ওরা জানে না পৃথিবীর বড়োরা কতোদূর অবস্টিনেট। আমি হেসে বললাম, ওদার্যের সুযোগ নেওয়াটাকেই তো ভালোবাসা বলে না? অরূপ চুপ হয়ে গেলো।

বাড়ি ফিরছিলাম। বাঃ আমার জীবন শুরু হলো তাহলে। লাইফ স্টাটস উইথ অ্যাডালটারি অ্যান্ড মার্ডার—কোথায় যেন পড়েছিলাম না। যদিও সুদর্শনাকে সন্দেহ করার ঘটনাটা আমি বানাচ্ছি, অরূপ ছাড়াও আরো কয়েকজনকে আগরতলার কাহিনীসহ আরো অনেক কিছু বলবো, এটা তো ঠিক যে বানিয়েও অন্তত সন্দেহ আমি করতে পেরেছি—সেই সূত্রেই সে এখন আমার কেউ নয়, পরস্ত্রী, যার সঙ্গে শরীর বিনিময় হয়েছে বলেই, অ্যাডালটারি হয়েছে। এবং, এখন যা ঘটতে চলেছে তা একটা খুন। সে হলোই বা মেটাফিজিক্যাল খুন।

অরূপ যদি এখন সুদর্শনাকে জানায়, সুদর্শনা কি আমাকে মেরে ফেলতে পারবে? হঠাৎ সুদর্শনাকে আমি মনে করলাম, তার কোনো জটিলতাকে না-বুঝে উঠতে পারা মুখ মনে পড়লো, তাকে মনে হলো সদ্য-যুবকের মতো সরল, অনভিজ্ঞ রাজার মতো সরল, যে তার নর্তকী-প্রণয়িনীর দিকে আহত হয়ে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে। নর্তকীর ভূমিকায় আমি নিজেকে দেখতে

গেলাম তক্ষুনি, আর মন-গড়া এই দুই মূর্তি আবার প্রেমবিনিময় করে নিলো চোখের পলকের মধ্যে, যেন প্রেম এখনো সম্ভব! বাড়ির সবাইকার দিকে একবার আড়ালে তাকালাম, এরা এসবের বিন্দু-বিসর্গ জানে না, জানতে চায় না, জানানো উচিত নয়। আরো কুৎসিত ব্যাপার ঘটবে।

কিন্তু খুব খারাপ লাগছে না আমার। হয়তো বাড়াবাড়ি হয়েছে কোথাও, হয়তো বাইবেলের ক্ষমতাহীন ঈশ্বর প্রতিশোধ নিয়েছেন—হয়তো প্রকৃতি ফাঁস করে দিয়েছে। সে যাই হোক, আমাকে এবার অবস্থার চাপ মেনে নিতে হবে, আমার সন্দেহটা অরূপ ছাড়াও আরো অনেকের মধ্যে ছড়াতে হবে, যাতে আমাদের সমাজ খুশী হয় এই ভেবে যে মানুষ প্রেমের থেকেও নিরাপত্তা বেশি চায়—এই ঘটনায়, ওই ধারণাই আবার সমর্থিত হচ্ছে। কম বয়সে আমারো স্বপ্নটপ্ন ছিলো দেশের জন্যে কিছু করার—এখন, এইভাবে, সত্যিই তা আমি করতে পারছি।— দিনকয়েক বাদে, মিসলেনাস পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে এলাম।

অরূপ সুদর্শনাকে সত্যিই কিছু বলেছে কি না জানি না। এক বিকেলে, লরেঙ-পত্তোদির খেলা নিয়ে কথাবার্তা চলছে, সুদর্শনা এলো। অরূপ ছাড়াও, ততোদিনে আমার সন্দেহ-সংবাদ আরো চার-পাঁচজন জেনে গেছে! উশখুশ করে উঠে, আমি আর অরূপ ছাড়া, বাকি দুজন বন্ধু বেরিয়ে গেলো।

আমি নিস্পৃহস্বরে বললাম, আচ্ছা সুদর্শনা ভালো খবর। ওটার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তবে, হাসপাতালে তো খানিক-ক্ষণ ওয়াচ না করে ছাড়বে না। অন্তত একটা রাত বেডরেস্ট নিতে হবে।

—না না! সুদর্শনা লাফিয়ে উঠলো, তা কি করে হয়! আমার তেমন কোনো বন্ধু নেই; বাড়ির লোক ছাড়া আমি বাইরে কোথাও কখনো থাকিনি, কি বলে আমি বেরোবো?

অরূপ বোঝালো কেন, ধরো মৃদুলা যদি যায়, যদি বলে যে সুদর্শনা আজ আমাদের বাড়িতে থাকবে? একটা রাত্তিরের তো মামলা।

সুদর্শনা ঝাঁপিয়ে উঠে বললো, মৃদুলা কদিন গেছে আমাদের বাড়িতে? না ছাড়লে মৃদুলা কি জোর করতে পারবে? তখন?

অরূপ চুপ করে থেকে বললো, কিন্তু, এছাড়া উপায় কি।

—উপায় আছে। সুদর্শনা এক ঝলক আমার দিকে ধকধকে চোখে তাকিয়ে বললো, টাকা আমি জোগাড় করেছি।

—সে কি। কি করে করলে।

—বালা বেচে দিয়ে। সুদর্শনা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, এই টাকাটা পরে ফেরৎ দিতে হবে না। অরূপ, তুমি একটু খোঁজখবর করতে পারবে!

আমি একইরকম ভঙ্গিতে বললাম, না, ওকে করতে হবে না। কাছাকাছি পেয়াল-দহেই একটা আছে। [illegible] এসো।

নার্সিংহোমে দুদিন লাগবে। প্রথমদিন কি সব ইনসার্ট করা; পরের দিন ইভ্যাকুয়েশন। অরূপ আর আমি গিয়ে জেনে এলাম। অরূপ বললো, বিকেলে তোরা দুজনেই যাস—আমি পারবো না বোধহয়।

কিন্তু প্রথম দিনের সিটিংএর পর সুদর্শনা যখন বেরিয়ে এলো, ভয়ে আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। রীতিমতো স্বাস্থ্য-বতী সুদর্শনা হাঁপাচ্ছে, মুখচোখ অস্বাভাবিক টলছে। বসা গলায় বললো, একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারবে?

—বোসো। তোমার কি মাথা খারাপ নাকি যে এই অবস্থায় যাবে?

আমার কথার ভঙ্গি থেকে যে উৎকণ্ঠা বেরিয়ে এলো তা সুদর্শনা বুঝতে পারলো, আর সেজন্যেই, বসে-যাওয়া নীল-হয়ে-যাওয়া মুখে একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসলো। ডাক্তারকে বলে-টলে অবশ্য আমি বসিয়ে দিলাম ঠিকই, বলে গেলাম, আসছি, ট্যাক্সি নিয়ে আসছি।

ওঃ, কাছাকাছি একটা-ও ট্যাক্সি নেই। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ঝাঁ করে একটা বাসে চেপে অরূপের বাড়িতে গিয়ে দেখি, অরূপ নেই, গৌতম আছে। গৌতমই সেই বন্ধু, সুদর্শনাকে আমরা যার প্রেমিকা হিসেবে প্রথম জানতাম। গৌতম সমস্তই জানে—আমার সন্দেহও জানে।

—গৌতম, এখনি আয়। বুঝতে পারছি না কি হয়েছে। একটা ট্যাক্সি দরকার।

গৌতম আরো নার্ভাস হয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত, আমিই ট্যাক্সি জোগাড় করলাম। তারপর সুদর্শনাকে দুজনে ধরে নিয়ে এনে ট্যাক্সিতে বসালাম। পাড়ার কাছাকাছি স্টপে নেমে, সুদর্শনা টলে টলে চলে গেলো। সিগারেটটা আমি বেশিই খাই —আমি খেতে থাকলে গৌতমও পাল্লা দিয়ে খায়। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আবার আমরা দুজন হেঁটে গেলাম, আমি সিগারেট খেয়ে যাচ্ছি, গৌতম একটাও ধরালো না।

পরের দিন আমি অরূপ আর সুদর্শনা তিনজনে একসঙ্গে এলাম। তুলো ওষুধ অনেক কিছু কেনার আছে, ফলটল কেনা আছে। আমি বেরিয়ে গেলাম সেইসব দেখতে। আমাকে আবার সাড়ে বারোটার মধ্যে বাড়িতে খেতে হবে। প্রায় বারোটা বেজে গেলো এইসব কেনাকাটায়। অরূপ থেকে গেলো, শুনলাম, মৃদুলাও আসছে। অরূপ একবার জিজ্ঞেস করলো ডাক্তারকে, কোনো রিস্ক নেই তো?

—তা তো একটু আছেই।

এর একটু আগেই, যে ঘরে অরূপ আর সুদর্শনা ছিলো, আমি ঢুকে পড়ে

বুঝতে পেরেছিলাম, সুদর্শনাকে অরূপ সমস্তই বলেছে।

বাড়ি ফিরলাম। স্নান-খাওয়া করতে করতে বুঝতে পারলাম, আমার এই বাড়ির সিকি মাইল দক্ষিণে—এই সময়ে কোনো একটা সময়, আমাদের দেশ, ঈশ্বর বা আমরাই আমাদের রক্তে চান করছি, আমাদেরই মাংস খাচ্ছি। খুব স্বাভাবিক লাগলো। কিন্তু না। যা গেছে তা যাক। সুদর্শনার রিস্ক আছে। আমি যাবার আগেই সে মরে যাবে না তো? যদি আমার যাওয়ার পর মরে, তাহলে, নিশ্চয়ই ঘেন্না করেও একবার আমার দিকে তাকাবে।

হয়তো, কিছু বলবার চেষ্টা করবে। সেটা পেতেই হবে—অন্তত ওর মৃত্যুর দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখতে হবে আমাকে। এই ক দিন যে আমাদের কোনো কথা হয়নি, একে অন্যের দিকে এই কদিন যে খুব কমই তাকিয়েছি।

হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ভাবলাম, আচ্ছা ঠিক এ মুহূর্তে অর্পিতা যদি সামনে এসে পড়ে? কি বলবো তাকে? হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি যা বলার তা বলবো। শুনে, কি বলবে সে? কি বলতে পারে? কিছু আন্দাজ করতে পারলাম না। সমস্তটা পথ পলকহীন চোখে হেঁটে গেলাম। বুকের ধুকধুকিটা আওয়াজও করছে না তো। একই অবস্থায় নার্সিং হোমের দোতলায় উঠে গেলাম। চোখে প্রথম পলক পড়লো অরূপ আর মৃদুলাকে দেখে। মৃদুলা মলিন হাসলো। অরূপ একবার ফাঁকা চোখে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললো, সুদর্শনা ঠিক আছে। একটু ড্রাউসি আছে। তুই বোস। আমরা ঘুরে আসছি।

আমি সুদর্শনার দিকে ফিরে তাকালাম। চোখ বোজা। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। তার পায়ের কাছে একটা টুল নিয়ে বসলাম। তার শরীর দেখলাম খুঁটিয়ে। ইদানীং লক্ষণগুলো খুব বেশি বোঝা যাচ্ছিলো। এখন আবার, এই দেড়-ঘন্টার মধ্যে সেই শরীরকে লক্ষণবিহীন করা হয়েছে। আলাদা আমি, আর আলাদা সুদর্শনা, এখন নিরাপদ।

কোনোক্রমে একবার অল্প একটু চোখ খুলতে পারলো সে। ইঙ্গিতে বললো, জল দেবে?

ঠিক তখনি আমার মনে হলো, কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অর্পিতা. রোদে অনেক পথ হেঁটে এসে, জল চাইছে। রোদ্দুর থেকে সদ্য কেউ এলে, তাকে কি সঙ্গে সঙ্গে জল দিতে আছে? সুদর্শনা বিছানায় একটু পাশও ফিরতে পারছে না। আস্তে আস্তে তাকে জল খাওয়াই। সে জলটাও বেশি খেতে পারে না।

কান্না আসছে নাকি বুক ঠেলে? বাঃ, মানুষের শরীর তো খুব চমৎকার! যেন কেঁদেই সব মুছে ফেলা যাবে, কূল পাওয়া যাবে। কাঁদতে দেবো কেন আমি নিজেকে? দরজা ঠেলে আমি বাইরে এলাম। বারান্দার রেলিং ধরে অরূপ আর মৃদুলা দাঁড়িয়ে।

অরূপ আমার বাড়িয়ে দেওয়া সিগারেটটা নিলো না। বললো, শোন, সুদর্শনাকে কিছু বলতে হয়নি। ও বুঝতেই পেরেছে, তুই ওকে সন্দেহ করছিস। ও বলছে, তাহলে তুই আছিস কেন। আর যদি থাকিসই, তাহলে ওর কাছে যাচ্ছিস না কেন, ওকে কিছু বলছিস না কেন। প্লিজ, তুই ওর কাছে গিয়ে একটু বোস। বলে, অরূপ নিজেই সুদর্শনার কেবিনের দিকে চলে গেলো।

আমি মৃদুলার দিকে সোজা সটান চোখ রেখে বললাম, মৃদুলা, আশা করি তুই কিছু মনে করিসনি।

—না পার্থ। এটা তোদের ব্যাপার বলেই মনে করিনি। আমি জানি, তোর চাকরি থাকলে এটা তুই-ই হতে দিতি না। আর কি জানিস, আমরা সবাই খুব ছেলে-মানুষ। ছেলেমানুষ না হলে কি আর একটা ছেলেমানুষকে এভাবে মারাটা সম্ভব হতো?

অরূপ বেরিয়ে আসতে, আমি আবার সুদর্শনার কেবিনে ঢুকলাম। সামান্য একটু রং ফিরেছে সুদর্শনার মুখে, বোঝা যাচছে, আরো আধঘন্টা পর সে উঠে হয়তো বসতে পারবে। যথেষ্ট স্বাস্থ্য ছিলো বলেই এই ফাঁড়াটা কাটাতে পারলো। ওর পায়ে কি চুমু খাবো? ভাবতেই, ইচছের ঠোঁট ফেটে যেতে শুরু করলো। এবারে ও পাশ ফিরে শুয়েছে, ওকে আমি আবার দুচোখে দেখতে লাগলাম। বুঝতে পারছিলাম, আবার, আমি শরীরের চাপে পড়তে শুরু করেছি, ওর পাশে, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে আমার। শেষ পর্যন্ত সংলগ্ন হয়ে বলতে ইচছে করছে, না, না, যা হয়েছে, এসো, এভাবে আমরা তার প্রতিবাদ করি... ওহ্ ঈশ্বর, একসঙ্গে এতো চুমু কখনো খেতে ইচছে করেনি, একসঙ্গে এভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিতে আর কখনো চাইনি। থরথর করতে থাকা হাত তার পায়ের কাছে বাড়িয়ে দিয়েই আমি ফিরিয়ে নিলাম। না, তাহলে, এখনি, আমার সব কথা তাকে খুলে বলতে হয়। শুনে সে বিশ্বাস করবে আমি জানি. সে আমাকে বিশ্বাস করতেই চায়। কিন্তু আমি চাই না, যে, এখনি সে আমাকে বিশ্বাস করুক। কোনো কথাই তার কাছে লুকোইনি, এতোদিনে, তার কাছ থেকে আমি কিছু লুকিয়ে রাখতে পারবো যদি আমার শরীর-মন যা চাইছে তাকে কোনোক্রমে থামাতে পারি। আহ্, এতোদিনে তার কাছে চরম অপরাধ করতে পেরেছি—আর সেই পাপ করার আনন্দ তো আমার একার—একমাত্র এইভাবেই, তার কাছে নিজেকে আমি ছোটো করে রাখতে পারবো ঋণী করে রাখতে পারবো। না, দুজনেরই আনন্দ। কতোদিন চুমু খেয়েছি তাকে, সেসব মুহূর্ত তার মনে থাকবে কি, আমার মনে থাকবে কি থাকবে না। কিন্তু সম্পর্ক ভাঙুক বা জোড়া লাগুক, এর স্মৃতি দুজনকেই ছায়া দেবে—যতোদিন আমরা বাঁচবো।

সুদর্শনা তাকাতে পারলো। কাঁপা হাতে নিজের মাথার দিকটা দেখিয়ে বললো, এখানে একটু বসবে?

যে চোখে আমি একই সঙ্গে তার দিকে মেয়ের বাবার মতো স্নেহে আর মায়ের ছেলের মতো দাবি নিয়ে তাকাতাম, সেই চোখেই, এবার ঠিক স্বামীর মতো দৃষ্টি আমি অর্জন করতে পারলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমাদের প্রেম শেষ, এবার, দাম্পত্যের শুরু। আস্তে আস্তে বললাম, হ্যাঁ। আমি এখানেই বসবো।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গাড়ি ছাড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ড়ো ভদ্রলোক কামরার জানালা দিয়ে তরে উঁকি দিলেন। আমরা ছোকরা াক, আমাদের দেখে ভরসা করার মতো ছু পাবার কথা নয়, তবু ভদ্রলোক মাকে বললেন, কতদূরে যাবেন ভাই ?

আপনি সম্বোধন করায় খুশি হয়েলাম, কারণ আমরা তখন যে বয়েসে াঁড়িয়ে আছি, সে সময়ে বেশির ভাগ াকই 'তুমি' সম্বোধনে কথা বলে। লাম, শিলিগুড়ি অবধি যাবো। কেন লুন তো ?

—আমার মেয়েও শিলিগুড়ি যাবে। াৎ যাওয়া ঠিক হয়েছে, রিজার্ভেশনের ময় পাইনি। সব কামরায় ভয়ানক ভিড়, াছাড়া সঙ্গেও কেউ যাচ্ছে না—যদি দয়া রে শিলিগুড়ি পর্যন্ত একটু ওকে নিয়ে ান—

রণজিৎ আমাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দয়ে জানালার কাছে এসে বললো, হ্যাঁ, া, তাতে আর কি ? ঠিক নিয়ে যাবো খন। কই আপনার মেয়ে ?

—এই যে, দিচ্ছি উঠিয়ে তাহলে ই কামরাতেই। ওর মামাকে টেলিগ্রাম রা আছে, শিলিগুড়িতে ওকে রিসিভ রতে আসবে। একটু দেখেশুনে নিয়ে াবেন ভাই—চিন্তায় থাকবো—

—কোনো চিন্তার কারণ নেই, উঠে াসতে বলুন।

দরজার ভিড় ঠেলে মেয়েটি উঠে লো, ঘণ্টা দিয়ে ট্রেনও ছাড়লো প্রায় সে সঙ্গেই।

ছিমছাম চেহারার তরুণী, সুন্দরী য় কোনোমতেই। কিন্তু যৌবনে সবাই ন্য। যতই সাদামাটা চেহারা হোক, আমরা জন মনে মনে দারুন খুশি হয়ে উঠেছি মেয়েটিকে পেয়ে। আগামীকাল সকাল র্যন্ত একটা আস্ত মেয়ে আমাদের সঙ্গে াবে, একি চাট্টিখানি কথা! আর আলাপ কছুটা জমবেই—চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে থাকলে একটা কাঠের পুতুলও দু' একটা কথা বলে ফেলবে, এতো রক্তমাংসের মানুষ। যাত্রা শুভ বলেই তো মনে হচ্ছে।

জানালার ধারে আমাদের বসার জায়গা। রণজিৎ নিজের সিট্ উৎসর্গ করে চোখের পলকে বীরপুরুষ হয়ে গেলো। আমিই কি ছেড়ে দিতে পারতাম না আমার জায়গা? রণজিতের অতো তড়বড় করার কি প্রয়োজন ছিলো? কিন্তু আমি তখন মেয়েটির গন্ধমাদনের মতো ভারী সুটকেস তুলে রাখছি বাংকে, তার মধ্যেই রণজিৎ কর্ম সেরে ফেলেছে। সবকিছুতে ওর তাড়াহুড়ো।

এবারে রণজিৎ জানালা নিয়ে বসেছে। আমার পাওনা জানালা। রাগে ওকে গুঁতিয়ে জানালার সঙ্গে একেবারে সেঁটে দিয়ে বসলাম। রণজিৎ খেয়ালই করলো না। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার নামটা জানা হলো না যে! কি নাম আপনার ?

মেয়েটি বললো, অঞ্জলি রায়চৌধুরী।

—আমার নাম রণজিৎ কর।

অঞ্জলি কিছু না বলে চুপ করে রইলো। রণজিতও আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার কোনো উৎসাহ না দেখিয়ে পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই বের করে একটা সিগারেট ধরালো। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাবার ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, সিগারেট খাবি ?

বললাম, নাঃ। তুই খা—

—কেন কি হলো তোর ? সিগারেটে অরুচি!

—এমনিই, ইচ্ছে করছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েটিকে খুশি করবার এক অঘোষিত প্রতিযোগিতায় আমরা দু'জন মেতে উঠলাম। সিগারেট যখন অর্ধেক খাওয়া হয়েছে, ঝুঁকে পড়ে আমি বললাম, আমরা সিগারেট খেলে আপনার অসুবিধে হচ্ছে না তো ? বলেন তো ফেলে দিই।

—নাঃ, অসুবিধে হবে কেন ? খান্ না—

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে রণজিৎ বললো, আমরা আপনার সামনে সিগারেট খাচ্ছি, আপনি চুপ করে বসে রয়েছেন। এটা ভালো নয়। কি খাবেন বলুন ? একজন খাবে আর একজন খাবে না—এরকম হয় না।

অঞ্জলি বললো, আমার তো খিদে পায়নি। তাছাড়া আপনারা তো ধোঁয়া খাচ্ছেন, ধোঁয়া দিয়ে কি পেট ভরানো যায় ? এতে কোনো দোষ হয়নি।

কি একটা স্টেশনে ট্রেন থামলো।

রণজিৎ বললো, আসলে আমার অনুরোধে আপনি খাবেন না, সেইটেই আসল কথা, না ?

—অমন করে বলছেন কেন ? আমি কি তাই বললাম ? আচ্ছা, কি খাওয়াবেন খাওয়ান—

খাঁ করে হাত বাড়িয়ে কামরার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা শোনপাপড়িওয়ালার কাঁধ খামচে টেনে আনলো রণজিৎ, চারখানা শোনপাপড়ি পাতলা কাগজে মোড়াই হয়ে উঠে গেলো অঞ্জলির শ্রীহস্তে।

গাড়ি ছেড়েছে আবার। অঞ্জলি কাগজের মোড়ক খুলে একখানা শোনপাপড়ি রণজিতের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, নিন্, আপনিও খান—

—না না, আমি কেন! আমাকে আবার—খামোকা—

—আমার অনুরোধে খাবেন না, সেইটেই আসল কথা, না ?

নিজের প্যাঁচে মার খেয়ে রণজিৎ একবার একটু চমকালো, তারপর হেসে বললো, বাঃ! ভালো কায়দা। আচ্ছা দিন, একটা খাওয়াই যাক—

রণজিৎ কচ্মচ্ করে চিবিয়ে একেবারেই সবটা গিলে ফেললো। আমার হুঁশ ছিলো না যে আমি তাকিয়ে আছি, নিজের ভাগ মুখে তুলতে গিয়ে আমার দিকে চোখ পড়ায় থমকে গেলো অঞ্জলি, যেন এতক্ষণে খেয়াল করলো আমিও সঙ্গে রয়েছি। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, খাবেন ?

নেহাৎ কথার কথা—জিজ্ঞাসা করতে হয়, তাই করা। যেন ওর পোষা পিকিনিজ কুকুরকে বলছে। নাঃ, উপমাটা লাগসই হলো না, নিজের পোষা কুকুরকে লোকে এর চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

বললাম, আমি শোনপাপড়ি খাইনা।

দ্বিতীয় অনুরোধ না করে ও খেতে শুরু করলো। আমি জ্বলন্ত কয়লার মতো চোখে রণজিতের দিকে তাকালাম, কিন্তু ও তখন মুগ্ধ হয়ে অঞ্জলির খাওয়া দেখছে।

দু'টো স্টেশন বাদ দিয়ে আমি লেমোনেড্ওয়ালাকে ডেকে স্পেন্সারের আইসক্রিম সোডা কিনে অঞ্জলির হাতে ধরিয়ে দিলাম। ও খুব ক্যাজুয়ালি নিলো, যেন আমার তো দেবারই কথা, এতে

আর আশ্চর্য হবার কি আছে—এমন ভাব খানিকটা। রণজিৎ কিন্তু আমার ওপরে আদৌ রেগে গেলো না। পরিস্থিতির ওপরে ওর সুপিরিয়রিটি ও ব্যাটা ঠিক বুঝে ফেলেছে। এখন সুতোয় ঢিলে দিয়ে উদারতা দেখাচ্ছে আমাকে। শালা!

পরের স্টেশনে রণজিৎ অঞ্জলিকে চাট-গরম চানাচুর কিনে দিলো। তার পরের স্টেশনে আমি কিনলাম ক্ষীরের প্যাঁড়া। অঞ্জলি প্রথমে রণজিৎকে দিলো, তারপর আমাকে। হায়! ভাগ্য কি এমনিই হতে হয়! মেয়েটা এমন কি দেখলো রণজিতের মধ্যে, যা আমার নেই? আমাকে কি খুব বোকা বোকা আর যাচ্ছেতাই দেখাচ্ছে নাকি?

চুপি চুপি বাথরুমে গিয়ে দেওয়ালে আঁটা আয়নায় একবার নিজের মুখখানা দেখলাম। হুঁ, গোঁফ ছাঁটতে একটু গোলমাল হয়েছে বটে! ডানদিকের তুলনায় বাঁদিকে সামান্য বেশি লম্বা হয়ে রয়েছে। এইজন্যেই পাত্তা পাচ্ছি না নাকি? হবেও বা। এখন কি করা? চলন্ত ট্রেনে কি গোঁফ ছাঁটা সম্ভব? সুটকেশে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম আছে বটে, কিন্তু এখন তাহলে ফিরে গিয়ে অঞ্জলির সামনেই সব বের করে আনতে হয়। গাড়ি যে পরিমাণ দুলছে, তাতে সমান না হয়ে বেশি কেটে যেতে পারে, তখন আবার বাঁদিকের তুলনায় ডানদিক বড়ো হয়ে একই সমস্যার সৃষ্টি করবে। তাছাড়া অতক্ষণ দেরি হলে অঞ্জলি ভাবতে পারে আমি বড়ো-বাথরুম করতে এসেছি। নাঃ, সে ভয়ানক লজ্জার কথা হবে। তার চেয়ে এই ভালো।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলাম রণজিৎ মহাআড়ম্বরে অঞ্জলির হাত দেখছে।

উঃ! কি চালাক রণজিৎ! ঠিক ঠিক কায়দাগুলো জেনে বসে আছে। যতদূর সম্ভব ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আড়চোখে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগলাম।

—ছোটবেলায় একবার কোনো উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন না?

—হ্যাঁ, সিঁড়ি থেকে।

—আট থেকে দশ বছর বয়েসের মধ্যে একবার আপনার বড়োরকমের অসুখ হয়েছিলো, ঠিক কিনা?

—আশ্চর্য! সাত বছর বয়েসে আমার টাইফয়েড্ হয়েছিলো, বাঁচবার আশা ছিলো না। আপনি কি করে—

—আপনি সবাইকে ভালোবাসেন, বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেন, কিন্তু বন্ধুরা আপনাকে কেবলই ভুল বোঝে। ঠিক?

—ঠিক তো! এই তো সেদিন ছবির সঙ্গে—যাক্ গে—অদ্ভুত হাত দেখেন কিন্তু আপনি! আচ্ছা, কি করে হাত দেখতে হয়? আমাকে শিখিয়ে দেবেন?

রণজিৎ তক্ষুনি রাজী। আবার নির্দ্বিধায় অঞ্জলির হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ও গড়গড় করে কোনটা শিরোরেখা, কোনটা ভায়া ল্যাস্‌সিভা, কোনটা মঙ্গলের দ্বিতীয় ক্ষেত্র, শনির ক্ষেত্রের নিচে মিস্‌টিক ক্রশ থাকলে কি হয়—এসব বোঝাতে শুরু করলো। এর মধ্যে আবার অঞ্জলির হাত কোলের ওপর নামিয়ে রেখে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা সিগারেটও ধরিয়ে নিলো। আর কতো কায়দাই যে ও দেখাবে! এদিকে আমার বুকের ভেতরে যে কি হচ্ছে সে আমিই জানি। অঞ্জলি যে আমার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, সেজন্য আমার একটুও রাগ হয়নি। আমি চটে যাচ্ছি কেবল রণজিতের ওপরে। ও এমন সব দখল করে বসে না থাকলে অঞ্জলি কি একবারও আমার দিকে তাকিয়ে হাসতো না?

—আপনার বন্ধু খুব ভালো হাত দেখেন, না?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি একজন মধ্যবয়স্ক ভালোমানুষ চেহারার লোক, মাঝখানে সিঁথি করা, ভক্তিভরে রণজিতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সংক্ষেপে বললাম, হ্যাঁ।

—আমার হাতটা একটু দেখে দিতে বলবেন?

এক একজন এইরকম জ্যোতিষ-পাগল মানুষ থাকে, কেউ হাত দেখতে জানে শুনলেই অমনি 'নাড়ু দাও' ভঙ্গিতে তার সামনে হাত মেলে ধরে। দু'চক্ষে দেখতে পারি না এগুলোকে। বললাম, ওই তো সামনেই বসে রয়েছে, আপনি নিজেই বলুন না।

লোকটা গদগদ হয়ে বললো, আপনার বন্ধু, আপনি বললেই ভালো হয়—

—ওর এখন মেজাজ ভালো না, আমি জানি। মেজাজ খারাপ থাকলে ও হাত দেখতে চায় না, চটে যায়। দেখি, পরে সুবিধেমতো বলবো। আপনি কোথায় যাবেন?

—কাটিহার।

—ওঃ, তাহলে তো অনেক সময় আছে।

লোকটা গোল [illegible] বোকাটে [illegible] রণজিতের দিকে [illegible] আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি যে বলছেন উনি মেজাজ খারাপ থাকলে দেখেন না, তাহলে ওই ভদ্রমহিলার হাত দেখছেন যে—

আমি রেগে চাপা গলায় বললাম, ওই মেয়েটি আমার প্রেমিকা, ওর হাত দেখবে বলে আপনার হাতও দেখতে হবে?

লোকটার মুখ হাঁ হয়ে গেলো। বললো, উনি—

—আমার প্রেমিকা। আমায় ভালোবাসে। আমার সঙ্গে বিয়ে হবে। বুঝেছেন?

লোকটা ঘাড় কাত করে জানালো, বুঝেছে।

সাহেবগঞ্জে গঙ্গা পার হতে হবে। স্টীমার দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘাটে। ট্রেন থেকে নেমে সবাই প্রাণপণে দৌড় লাগালো স্টীমারে ভালো জায়গা পাবার জন্য। ঘণ্টাখানেকের যাত্রা নদীর বুকে, এর হাত-পা খেলিয়ে নিতে না পারলে গরমে পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি অনিবার্য।

রণজিৎ আর অঞ্জলি থালির ওপর দিয়ে প্রায় ছুটতে লাগলো। আমি কুলি ধরবার জন্য থামতে পারছি না, তাহলেই ওরা চোখের আড়াল হয়ে যাবে। ফলে নিজেদের এবং অঞ্জলির—দুই গন্ধমাদন হাতে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছি ওদের পিছু পিছু।

স্টীমারে মাল নিয়ে ওপরের ডেকে উঠতে দিলো না। লোয়ার ডেকে বাক্সে-বিছানায়-তোরঙ্গে ছয়লাপ। কোনোরকমে ইঞ্জিনঘরের পাশে সামান্য জায়গা পেয়ে সেইখানে সুটকেস দুটো নামিয়ে তার ওপর বসে হাঁপাতে লাগলাম। চোখের সামনে পরিষ্কার দেখলাম রণজিৎ অঞ্জলিকে নিয়ে ওপরের ডেকের ফুরফুরে হাওয়ায় উঠে গেলো।

ইঞ্জিনঘরের ভেতরে যেন নরকের আগুন জ্বলছে, তার পাশে বেশিক্ষণ বসার সাধ্য কি! কিন্তু উঠে যাবারও কোনো উপায় নেই, তাহলে আমাদের সুটকেশ পাহারা দেবে কে? বসে বসে দরদর করে ঘামতে লাগলাম।

ওপরের ডেকে রণজিৎ এতক্ষণে না জানি কতো ফুর্তি করে ফেললো! অল্পবয়েসের গভীর ঈর্ষায় তখন আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে। রণজিৎ আমার বন্ধু না—কেউ না।

হঠাৎ আমার পাশে মাঝখানে সিঁথি করা একখানি গদগদ মুখ। —আপনার বন্ধুকে এখন একবার বলবেন?

মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো। বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। এমন গঙ্গার হাওয়া! এখন ওর মেজাজ ভালো হয়ে গিয়েছে। আপনি আমাদের সুটকেস দুটো একটু দেখবেন? তাহলে দৌড়ে ওকে বলে আসি?

—নিশ্চিন্তে যান! আমি থাকতে কোনো চিন্তা নেই।

সে আমিও জানতাম। চোর-বাটপাড় হতে হলে কিঞ্চিৎ বুদ্ধি এবং ক্ষিপ্রতা দরকার। চুরি করে মাঝগঙ্গায় পালাবেই বা কোথায়?

তিন-চার লাফে ওপরে উঠে দেখি ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা মেলে রেলিংয়ে ভর দিয়ে সদ্য-ওঠা চাঁদ দেখতে দেখতে রণজিৎ আর অঞ্জলি ডিমের অমলেট খাচ্ছে।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে ভীষণ গম্ভীর গলায় বললাম, নিচে ইঞ্জিনঘরের পাশে আমাদের সুটকেস রয়েছে। একজন অচেনা লোককে রেখে এসেছি পাহারায়, সে তোকে হাত দেখাতে চায়। তুই এক্ষুনি নিচে চলে যা—

রণজিৎ আপত্তি করে কি বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু অঞ্জলি বললো, ওমা চুরি গেলে কি হবে? আমার সুটকেসও যে ওখানে! প্লিজ, আপনি একটু যান না—

শোঁ করে একটা শব্দ হলো, তাকিয়ে দেখলাম রণজিৎ নেই। ভালোই হয়েছে, বেঁচেছি।

বললাম, কফি খাবেন?

—কফি? তা—

দৌড়ে গেলাম স্টলে, পয়সা দিয়ে এক কাপ কফি নিয়ে আসতে গিয়ে ডেকে বিছিয়ে রাখা কাছিতে না কিসে যেন পা আটকে হোঁচট খেয়ে পড়পড় হলাম, খানিকটা কফি চলকে পড়ে গেলো। দূরে থেকে দেখতে পেয়ে অঞ্জলি খিলখিল করে হেসে উঠলো। আমার কান লাল!

ওপারে মিটার গেজের ট্রেনে বাংকে ঘাড় গুঁজে সারারাত্তির বসে শুনলাম নিচে রণজিৎ আর অঞ্জলি গুজগুজ করে গল্প করছে। ঠিক আছে, কাল সকালে শিলি-গুড়িতে বিদায়ের সময়ে আমি শেষ মার দেবো। ওস্তাদরা মারটা দেরী করেই দেয়। উস্কোখুস্কো চুলে আঙুল চালাতে চালাতে উদাস চোখে অঞ্জলির চোখে তাকিয়ে গভীর গলায় বলবো—জানি না আবার কবে আমাদের দেখা হবে, কিন্তু যদি কালকে রাতের মতো চাঁদ কোনোদিন ওঠে, তাহলে আপনি নিশ্চয় জানবেন আমি আপনার কথাই ভাবছি। আমিও কি আপনার সম্বন্ধে একই আশা করতে পারি?

এই কথা বললে আমি অঞ্জলির চোখে হিরো হতে পারবো না? নিশ্চয় পারবো। মেয়েরা এই ধরনের কথা খুব পছন্দ করে। আমি লুকিয়ে আমার মামতুতো বোনের ডায়েরী দেখেছি, তাতে অনেক রোম্যান্টিক কোটেশন টোকা আছে। যেমন—মাউণ্টেন ক্যান ফল, রিভার ক্যান ড্রাই/ইউ ক্যান ফরগেট মি, বাট নেভার ক্যান আই—এই ধরনের। কাজেই এটাকে স্ট্যাণ্ডার্ড মনে করা যেতে পারে।

কিছুই হলো না। দুর্ভাগার সাগর সর্বদাই শুকনো। সকালে শিলিগুড়িতে নেমেই আবার প্রবল বড়ো-বাথরুম পেলো। যে ভয় করেছিলাম! অঞ্জলি ওর মামাকে খুঁজছে, রণজিৎ লেগে আছে ওর সঙ্গে, আমি দৌড়ালাম যথাস্থানে। দশ মিনিট বাদে ফিরে এসে দেখি একটা জিপ মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে, আর সেদিকে তাকিয়ে কোমরে হাত দিয়ে রুমাল নাড়ছে রণজিৎ।

অঞ্জলি চলে যেতেই হঠাৎ আমরা দুজন আবার আগের মতো হয়ে গেলাম। রণজিৎ আমাকে একটা সিগারেট দিলো, আমি নিয়ে সুটকেসটা হাতে তুললাম। রণজিৎ বললো, তুই কেন? আমাকে দে, আমি নিচ্ছি বরং—

আমি বললাম, থাক্না, এমন কিছু তো ভারী নয়।

(দশ)

রাতের দিকে বাতাসে খানিকটা জোর বাড়ায় নৌকায় নৌকায় পাল খাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম রাতে কুয়াশা তেমন ঘন ছিল না, কুয়াশা কতটা জমবে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। শেষ রাতের দিকে এমন কুয়াশা পড়ল যে দশ হাতের জিনিসও ভালো করে মালুম হয় না। এ কুয়াশায় দিক নির্ণয় করা কঠিন কাজ, তবু জলের টান বুঝে বুঝে নৌকা বাওয়া হয়েছে। আর কুয়াশার দাপটে শীত কমে যাওয়ায় মাঝিদের একদিকে বরং লাভই হয়েছে।

নৌকো বুড়ো বাসুকিতে ঢোকার পর বোঝা গেল, নদীর চেহারা ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। ঢেউ তেমন বেশি নয়, কিন্তু জলের ঘোলাটে ভাবটা বাড়ছে। উত্তর দিকে কিছু কিছু বাদা ঠাহর করা যাচ্ছে, দক্ষিণ দিকে টানা অরণ্য।

রজনী অনেক রাত অবধি বজরার ছাদে কম্বল গায়ে বসে কাটিয়ে দিল। লক্ষ্যস্থান যত এগিয়ে আসছে ততই যেন ওর দুশ্চিন্তা বাড়ছে। আজ ভালো মন্দ সব দায়িত্বটাই ওর। মাথার উপর দয়াল ঘোষ থাকলে হয়তো এতখানি অতন্দ্র থাকতে হত না ওকে। তাছাড়া নরেন্দ্রনারায়ণ সংগে আছেন বলে দুশ্চিন্তাটা যেন হাজার গুণ ছড়িয়ে যাচ্ছে।

নরেন্দ্রনারায়ণ খেয়ালি লোক, সুন্দরবনের মাটিতে পা দেওয়ার পর হঠাৎই যে তাঁর মতি পালটে যাবে না, কে বলতে পারে। ফলে নরেন্দ্রনারায়ণকে সারাক্ষণ খুশী রাখার চেষ্টা করতে হচ্ছে রজনীকে। তবুও স্বস্তি নেই। সারাক্ষণ ছটফট করল রজনী।

ভোর রাতের দিকে অবশেষে শুয়োরের মুখের মতো দ্বীপটাকে ওরা খুঁজে পেল। নৌকায় নৌকায় কলরব শুরু হতেই টান টান হয়ে উঠে বসল রজনী।

—হ্যাঁ, ঐ তো সেই পুরনো কাছারি বাড়িটাকে দেখা যাচ্ছে। এত কুয়াশার মধ্যেও বাড়িটাকে ওরা চিনতে ভুল করল না। বাড়ির চারপাশে পরিখা কাটা। কিন্তু সেই তকতকে উঠোনটা গেল কোথায়! সেই বাঁশ বেখারির ঘেড়াটা। মনে হল জঙ্গলে যেন গ্রাস করে নিয়েছে সব। জঙ্গল যে এত দ্রুত বেড়ে উঠবে কে জানত। আর কিছুদিন সময় পেলে বোধহয় পুরো কাছারি বাড়িটাকেই গিলে খেত জঙ্গল।

মনে পড়ল দয়াল ঘোষের কথা। ঐ কাছারিবাড়িতে দয়াল ঘোষকে আর দেখা যাবে না। এখন থেকে ও ঘরে থাকবে রজনী। দয়াল ঘোষের জায়গায় এখন রজনী, কথাটা ভাবতেই বেশ একটু উত্তেজনা এসে আচ্ছন্ন করে রজনীকে।

দেখা গেল, মাঝিরা গোরাফি ফেলছে। রজনী সিঁড়ি বেয়ে বজরার ছাদ থেকে নিচে নেমে এল। এখন ভাটা চলছে নদীর। মাঝ-ভাটা। নৌকো থেকে নামতে গেলেই এক হাঁটু কাদার মধ্যে ডুবে যেতে হবে। কাদা আর জল আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। আর একটু ফরসা হয়ে রোদ উঠলে দেখা যাবে, কাদায় নোনা কুচে আর লাল কাঁকড়া ছুটোছুটি করছে। ভেড়ির গায়ে চন্দনের মতো প্রলেপ লেগে আছে কাদার। আহ্‌ কী নরম! কিন্তু এই ভোরে মাটি যে এখন বরফের মতো শীতল হয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই।

রজনী চমকে উঠল, এই কাদার মধ্যেই ঝপাঝপ করে কেউ কেউ নৌকো থেকে নেমে পড়েছে। চেঁচিয়ে সবাইকে বারণ করতে ইচ্ছে হল ওর, কিন্তু বজরায় দাঁড়িয়ে চেঁচালে নরেন্দ্রনারায়ণ জেগে উঠবেন। এত ভোরে ওঁকে জাগিয়ে তোলা উচিত হবে না। তাছাড়া এত ভোরে কাছারিবাড়ির দিকটাও স্পষ্ট নয় যে ওঁকে ডেকে তুলে সব দেখান যাবে।

রজনীকে তাই বাধ্য হয়েই কাদায় নামতে হল। নরেন্দ্রনারায়ণের দেহরক্ষী প্রসাদ সিংকেও নেমে আসতে ইশারা করল রজনী।

বন্দুক হাতে লাফিয়ে নেমে এল প্রসাদ সিং। কিন্তু কাদায় পা পড়তেই গা ছমছম করে উঠল। এত ভোরে কোথাও কিছু ঘাপটি মেরে থাকলেও টের পাওয়ার উপায় নেই।

রজনী এক হাঁটু কাদা নিয়ে তরতর করে ভেড়ির উপর উঠে এলো। ভেড়ির ওপাশ থেকেই শুরু হয়েছে কোমর উঁচু জঙ্গল। জঙ্গলের দিকে একবার তাকাল রজনী. কুয়াশায় স্পষ্ট ঠাহর করা যায় না। কেমন যেন জালের মতো দৃষ্টি জুড়ে ছড়িয়ে আছে গাছ-পালা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আগন্তুকদের যেন ওরা লক্ষ্য করছে।

রজনী ভেড়ি ধরে খানিকটা এগিয়ে এল অন্যান্য নৌকাগুলির কাছে। মকবুলের গলা শুনতে পেল রজনী। মকবুল গলা তুলে চেঁচিয়ে কি যেন সব বলছে। কি বলছে মকবুল! রজনী দাঁড়াল। প্রসাদও থমকে রজনীর পাশে দাঁড়াল।

এই অন্ধকারে হুট করে অমন ডাঙায় নামা যে উচিত হয়নি সেই কথাই বলতে চাইছে মকবুল।

রজনী তৎপর হয়ে উঠল, এই ওঠ ওঠ। কে হে তুমি? কি সাহস তোমার! সবাইকে আবার তাড়া করে ডাঙা থেকে নৌকায় তুলে দিল রজনী।

তারপর বারকয়েক ভেড়ির এপাশ ওপাশ করল। কাছারিবাড়িরজীর্ণ চেহারাটা এখান থেকে আরো স্পষ্ট।

ঈশানের গলা শুনতে পেল রজনী। ঈশান বলছে, আবার গোড়া থেকে সবকিছু শুরু করতে হবে গো রজনী ভাই। দেখেছ কি হাল হয়েছে বাড়িটার।

রজনী বলল, নৌকো থেকে এখন কেউ যেন না নামে লক্ষ্য রাখিস ঈশান। কেউ নেম না হে সাবধান করে দিচ্ছি।

ভেড়ি ধরে আরো খানিক এগিয়ে রজনী হঠাৎ প্রসাদকে আঙুল তুলে দেখাল, ঐ যে ভাঙা বাড়িটা দেখছ ওখানে আগে দয়াল ঘোষ থাকত। এক মাসের মধ্যেই বাড়িটার কি চেহারা হয়েছে দেখ।

প্রসাদ ভাল মন্দ কি বুঝল কে জানে. তাকিয়ে থাকল।

রজনী শুধাল, বন্দুকে গুলি ভরা আছে তো? চল না একবার দেখে আসি।

প্রসাদ বলল, চলুন।

এক হাঁটু জঙ্গল। গাছের পাতা জলে ভিজে জবজব করছে। দু হাতে সেই ভেজা পাতা সরাতে সরাতে রজনী কাছারিবাড়ির বেড়াটাকে ডিঙিয়ে এল। কিন্তু বেড়া পার হয়েই পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রজনী।

—কে?

প্রসাদ কিছুই বুঝতে পারল না। বন্দুকটাকে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল, কি রজনী ভাই?

না, না চোখের ভুল রজনীর, ও কিছু না। কিন্তু কাছারিঘরের দরজাটা অমন হাট করে খুলে রাখলে কে? ওটা তো ভাল করে দাঁড় আর তার দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল বলে স্পষ্ট ওর মনে পড়ছে। তবে কে খুলল!

রজনীর সন্দেহটা কেন গভীর হতে শুরু করল।

আবার কেমন চমকে উঠল রজনী। কেমন একটা শব্দ আসছে না ভিতর থেকে!

কিসের শব্দ!

—প্রসাদ সিং! রজনী ফিসফিস করে ডাকল।

—জী!

—কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? কি যেন একটা চলাফেরা করছে না ঘরের ভিতরে?

—জী রজনী ভাই।

—তবে কি কোন মানুষ! কিন্তু কোন মানুষের এমন সাহস হবে এই সুন্দরবনের জঙ্গলে ঐ ঘরে বাস করবে। একা একা!

—বন্দুকটা এদিকে দাও তো প্রসাদ সিং। রজনী বাহাদুরের হাত থেকে বন্দুকটা তুলে নিল।

—চল দেখি, ভেতরে একবার দেখার চেষ্টা

র ঘোড়ায় আঙুল তুলে রেখে
কবল রজনী।
একটা গরানের ডাল কুড়িয়ে নিল
শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে রজনীর
গাতে শুরু করল।
কাঁপছে কি! রজনী ঠিক
ল না। সতর্কভাবে বন্দুকটাকে
ধরল।
দু-এক পা এগোবার পর আবার
তে হল. কাছারিঘরের দিক থেকে
গন্ধ ভেসে আসছে। ঝাঁজাল গা
। কাপড় তুলে নাক ঢাকল ওরা।
? তবে কি কিছু মরে পড়ে
ন. বুঝতে পারল না।
রি দরজার কাছাকাছি এসে এপাশে
কে উঁকি দেবার চেষ্টা করল ওরা।
কার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না।
সময় হাত থেকে কিছুটা ঝুলে
আর ঠিক এই সময়েই ঘোড়ায়
চাপ লেগে গেল।
র শব্দে লাফিয়ে উঠল দুজনে।
প্রত্যাশিত এই শব্দ।
করে গাঝাড়া দিয়ে কেঁপে উঠল
উঠল। গাছের ডালপালা
লাগে পাখি ঝাপটিয়ে লাফিয়ে
।
নজরে পড়ল. ঘরের ভিতর
একটা জন্তু বেরিয়ে

ওঃ! চিৎকার করে উঠল রজনী,
...
থমকে খেয়ে গেল প্রসাদ সিং।
এক মুহূর্তের সময়, কি যে করবে
ওঠার আগেই জন্তুটা ওদের
র উপর দিয়ে প্রচণ্ডভাবে লাফিয়ে
এসে আছড়ে পড়ল।
বোধ হয় থমকে দাঁড়াল, তারপর
একটা দীর্ঘ লাফ দিয়ে জঙ্গলের
গেল।
একটুক্ষণ পরে বাঘের গর্জন
ওরা। আক্রোশে যেন গর্জে
। আকাশে পাখির ঝাঁক আবার
। অসংখ্য পাখির চিৎকারে
উঠল সমস্ত বনভূমি। যেন
টাই বিভৎসভাবে অট্টহাস্য করে
হা হাহাহা...
রপর যে কি ঘটল রজনী মনে
না। অকস্মাৎ ওর সমস্ত দেহটা
য়ে গেল। ধীরে ধীরে চেতনা
গলের উপর ঢলে পড়ল রজনী।
সিংয়ের এরকম জঙ্গলের কোন
ই। চোখের সামনে দেখল, রজনী
যাচ্ছে। প্রসাদ ঝট করে ওর হাত
টা তুলে নিল। শেরটা কি এখনো
মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে। এখনো
রেখেছে ওদের দিকে। নেহাতই
ছিল ওদের। করুণা করেই
উপর আছড়ে না পড়ে ঐ
কে চলে গেল। নেহাতই যেন
র এযাত্রা হাতে প্রাণ ফিরিয়ে

প্রসাদের ঘোর কাটতে একটু সময় লাগল। মাটিতে পা দিতে না দিতেই যে শের দেখা যাবে তা ও কল্পনাও করেনি। ঘরের ভিতর আরো কিছু আছে কিনা কে জানে। পচা গন্ধটা এখনো ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

একবার রজনীর দিকে তাকাল। ওকে টেনে হিঁচড়ে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াও সোজা নয়। কি করবে ঠিক মাথায় আসছিল না প্রসাদের। ঘরের মধ্যে আরো কিছু লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে। ঘরের দিকেই উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করল. আবছা আবছা অন্ধকারে ঘরের ভিতর কি যেন একটা ক্ষতবিক্ষত বস্তুকে ও দেখতে পাচ্ছে! কী ওটা! গরু না অন্য কিছু! গাইয়া না ভৈঁসা এখান থেকে বোঝার উপায় নেই। বিপুল দেহটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে গেছে বাঘে। পচা গন্ধটা যে এরই এতক্ষণ পর ও বুঝতে পারল। আর ঠিক এ সময়ই ওর মনে হল

বাঘের মুখের গ্রাস ওরা ছিনিয়ে নিয়েছে। বাঘটা কি আশেপাশে গা ঢাকা দিয়ে ওদের ওপর নজর রাখেনি। নির্ঘাৎ ধারে-কাছেই কোথাও লুকিয়ে থেকে ওদের দিকে নজর রেখেছে বাঘটা।

চারপাশে জঙ্গলের আনাচে কানাচে আঁতিপাতি করে তাকাল প্রসাদ। কুয়াশা আর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

রজনীকে ছেড়ে আরো দু-এক পা ও-ঘরের দিকে এগোল। সত্যি সত্যি মৃত জন্তুটাকে চিনবার উপায় নেই। ইস্, দম ফেটে পড়ার মতো গন্ধ! অথচ গন্ধটাকে তেমন গ্রাহ্য করল না প্রসাদ। ঘরের চারপাশে এক-বার চোখ বুলিয়ে হঠাৎই আবার ও চমকে উঠল। ওটা কি। কড়িকাঠ বেয়ে কি ওটা ঝুলছে। সাপ কি. হ্যাঁ সাপই।

শক্ত একটা দড়ির মতো অর্ধেক ঝুলে আছে সাপটার। পাক খেয়ে খেয়ে অর্ধেক ঝুলে আসতে চাইছে যেন। বন্দুকের শব্দে

বোধ হয় সাপটা বুঝতে পেরেছে, ওর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

বন্দুক তুলে এবার সাপটার দিকে তাক করল প্রসাদ। অব্যর্থ টিপ। সাপটা ছিটকে পড়ল নিচে। দোমড়াতে শুরু করল। পাক খেয়ে খেয়ে গুটিয়ে যেতে শুরু করল। বেড়ার গায় লেজের ঝাপটা মারতে শুরু করল।

একটা গুলিতেই যে কাজ হয়েছে বুঝতে পারল প্রসাদ। ঘরের কাছ থেকে আবার ফিরে এল রজনীর কাছে। এভাবে এখানে আর বেশিক্ষণ রজনীকে ফেলে রাখাটা উচিত হচ্ছে না। প্রসাদ রজনীর মুখের কাছে মুখ এগিয়ে আনল, এই রজনীভাই! এই—

না কোন সাড় নেই। মাথাটা এপাশ থেকে ওপাশে সরে গেল।

রজনীর হাত ধরে ঝাঁকি দিল প্রসাদ। ওকে এখন কাঁধে তুলে নিতে পারলে কাজ হত। কিন্তু হাতের বন্দুকটাকে নিয়েই সমস্যা। না, বন্দুকটাকে হাতছাড়া করা উচিত হবে না। প্রসাদ আবার জঙ্গলের মধ্যে আঁতিপাতি করে বাঘের হদিশ খুঁজবার চেষ্টা করল। ওর মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে ওটা এবার ওদের লক্ষ্য করেই লাফাবে। এ অবস্থায় বন্দুকটাই একমাত্র ভরসা।

আরো দু-এক মিনিট ঐভাবে কাটল। তারপর এক দঙ্গল মানুষের হৈ-হল্লা শুনতে পেল প্রসাদ। নৌকার লোকগুলোর এতক্ষণ পর যা হোক ওদের কথা মনে পড়েছে।

রজনীর নাম ধরে ডাকাডাকি করছে, শুনতে পেল প্রসাদ। আর ঠিক এই সময় প্রসাদের চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে কি রকম একটা অবসাদ নামতে শুরু করল। নিজেকে এই আচ্ছন্নতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য প্রসাদ ককিয়ে উঠল, এখানে। আমরা এখানে। লোকগুলো লাঠিসোটা নিয়ে হৈ হৈ করে ছুটে এল। এসে ছেঁকে ধরল প্রসাদকে, রজনীকে।

—কি, কি, কি হয়েছে?

কিন্তু কি যে হয়েছে কিছুই বোঝাতে পারল না প্রসাদ। ওর গলা কাঠের মতো শুকনো। ওর পা দুটো কেমন যেন টলছে।

—কি হয়েছে বল না? রজনীকে ততক্ষণে মাটি থেকে কাঁধে তুলে ধরেছে দু-তিনজন মিলে।

প্রসাদ অনেক চেষ্টা করেও বোঝাতে পারল না ওরা বাঘের মুখে পড়েছিল। অবশেষে অসহায় অবস্থায় ও আঙুলে তুলে কাছারি ঘরের ভিতর দিকটা দেখিয়ে দিয়ে টলতে টলতে মাটিতে বসে পড়ল।

তারপর হাঁপাতে শুরু করল প্রসাদ।

প্রসাদকেও ওরা টেনে তুলল কয়েকজন। তারপর ধরাধরি করে ফিরিয়ে নিয়ে এল নৌকোয়।

আর মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাটা মুখোমুখি ছড়িয়ে পড়ল। ভয় আতঙ্ক কৌতুক ঘুরতে শুরু করল চোখেমুখে। প্রসাদ সিং সঙ্গে ছিল বলেই রজনী আজ প্রাণে বেঁচেছে। নেহাতই পরমায়ু ছিল রজনীর নইলে এভাবে কেউ বেঁচে আসে।

মকবুল সেই থেকে বিড়বিড় করছিল, হবে না, তখন কত করে ডাঙ্গায় নামতে বারণ করলাম, হবে না! অমনভাবে অন্ধকারে জেনে-শুনে কেউ জঙ্গলে পা দেয়! তাছাড়া রজনীভাই তো আর নতুন নয়। জঙ্গলের প্রকৃতি ওর না-জানা নয়।

তৎপরতা বেড়ে গেল ঈশানের। ঈশ্বর, গজল, জগন্নাথ জটলা করে নতুনদের সব বিপদ আপদের কথা বোঝাতে শুরু করল।

আর একটু বেলা হলে হৈ হৈ করে কাছারির চারপাশে একবার খোঁজাখুঁজি করা হল। বাঘটা ধারে কাছেই যে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। মরা সাপটাকে বাঁশের ডগায় তুলে মজা করতে করতে নিয়ে এল কাঠুরেরা। বাঘের মুখের গ্রাস আধ খাওয়া জন্তুটাকে টেনে বার করে আনা হল। কি এটা! হরিণ নাকি!

—হরিণ! কিন্তু সিং কোথায়?

কে একজন বলল, মাদি হরিণের সিং থাকে না। চামড়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে হরিণ।

—হবে হয়তো!

কেউ এ নিয়ে বড় একটা প্রতিবাদও করল না। কিন্তু পচা জন্তুটাকে একেবারে নদীতে এনে ভাসিয়ে না দেওয়া অবধি গন্ধে এখানে বাঁচা যাবে না।

নাকে-মুখে কাপড় চাপা দিয়ে জন্তুটাকে টানতে টানতে নদীতে এনে ফেলা হল। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওটাকে ভাসিয়ে দেওয়া হল স্রোতের সঙ্গে।

একটু একটু করে আবো বেশ খানিকটা ফরসা হয়ে উঠল চারদিক। কুয়াশার ভেজা মাটি আর গাছপালা জঙ্গল সব কিছুই এখন স্পষ্টত চোখের সামনে ভাসতে শুরু করেছে। আর একটু পরেই রোদ উঠবে। দিগন্তের ফরসা দিকটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল পুব কোন্ দিকে।

জঙ্গল থেকে আবার সবাই জেটির উপর উঠে আসছিল একে একে। রজনীরও পুরো-পুরি জ্ঞান ফিরে এসেছিল। এর মধ্যে অনেকখানি ও নিজেকে প্রকৃতিস্থও করে ফেলেছিল।

ওদিকে নরেন্দ্রনারায়ণের বজরায় তখনো কোন সাড়া-শব্দ নেই। এখনো উনি অকাতরে ঘুমোচ্ছেন বোধ হয়। বাইরে এত উত্তেজনা অথচ নরেন্দ্রনারায়ণকে ডেকে ঘটনাটা জানাবার মতো কারো সাহস ছিল না। একটু পরে ঘুম থেকে উঠলে উনি সবই জানতে পারবেন।

রজনীও নরেন্দ্রনারায়ণকে খবর দেবার জন্য আগ্রহ দেখাল না। হিতে তাতে বিপরীত হবে কিনা কে জানে। সুন্দরবনে বাঘ সাপ থাকবেই কিন্তু জঙ্গলে পা দিলে না দিলেই যে বাঘের মুখে পড়ে যেতে হবে কল্পনাও করা যায়নি। রজনী বাঘের কাহিনীই শোনাতে শুরু করল, বাপরে কী বিরাট চেহারা! গা দিয়ে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছিল। অত বড় বাঘ রজনীর চোদ্দ-পুরুষেও দেখেছে কিনা সন্দেহ।

—জেনেশুনে ওদিকে যাওয়া কেন? নিজে তো সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছিলে নৌকো থেকে না নামতে।

—কাছারিঘরের দরজাটা অমন হাট করে খোলা দেখেই তো সন্দেহ হয়। রজনী নইলে কি এগোতাম নাকি! তা ছাড়া যে ওখানে লুকিয়ে থাকবে কে জানে

—আমার মনে হয়, বাঘটা হয় গিয়েই পালিয়েছে। নইলে নির্ঘাৎ তো উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।

রজনী ফ্যাকাশে চোখে হাসল। নিজের বোকামিটুকু হজম করে সাবধান দিতে শুরু করল সবাইকে, যা হবার এখন থেকে কিন্তু সবাইকে সাবধান হবে। বাঘের ক্ষুধা যদি না মিটে থাকে ঝামেলা। সুন্দরবনের বাঘ মানুষেও হার মানায়। ও এসে যখন ওর খাবার উধাও, তখন নির্ঘাৎ যাবে। তাই কি নৌকোতেও ও ঝাঁপিয়ে পারে।

রজনী বলছিল বটে, কিন্তু ওর ভিতরে এখনো ঝিম ঝিম করে কাঁপ উঠছিল। কি বাঁচাই না আজ বাঁচা

কে একজন আবার প্রশ্ন করে দেখনি তো রজনীভাই?

—ভুল দেখেছি মানে?

—না, মানে বাঘ না হয়ে অন্য তো হতে পারে।

—তা পারে। তবে বাঘ আমি আমি একা দেখিনি, আমি একা বলতে পারতাম চোখের ভুল, কিন্তু সাক্ষী আছে।

তবু যেন সন্দেহটা কাটে না অনেকের। বাঘই যদি হবে তবে জ্যান্ত মানুষকে পেয়েও ছেড়ে দিল হতে পারে!

—কেন, হবে না কেন! বাঘেরও ভয় আছে হে। পাল্টা তর্ক জুড়ে দিল একজন।

রজনী আর এখানে বকবক করে মনে করে তার এপাশ ওপাশ সরে ধীরে।

নরেন্দ্রনারায়ণের ঘুম ভাঙল একটু পরে। অতি কষ্টে উনি চোখ দেখলেন, বজরার ভিতরে অল্প অল্প ঢুকতে শুরু করেছে। তাই কাটলেন। যে কখন উঠে গেছে কে জানে? জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। এ কি নোঙ্গর করা সব নৌকো! তবে কি পৌঁছে গেছি!

উত্তেজনায় উনি চাদর গায়ে উঠলেন, তারপর বাইরে এসে দাঁড়া ব্যাপার? কি হয়েছে?

জেটির ওপর থাকায় লোকজন নরেন্দ্রনারায়ণ চারপাশে একবার তবে কি পৌঁছে গেছি। অথচ ডাকাই হয়নি।

ঈশান ঝটপট এগিয়ে এল হুজুর রজনীকে আর একটু হলে তুলে নিয়ে যেত!

নরেন্দ্রনারায়ণ ঈশানের কথা কিছু বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? কোথায়?

—ঐ যে হুজুর, ভেড়ির ওপর!

নরেন্দ্রনারায়ণ দেখলেন, সবার চোখে খই বেশ আতঙ্ক। রজনীকে একগাদা ক ঘিরে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি চ্ছে ওখানে?

ঈশান ঘটনাটা বোঝাবার চেষ্টা করল, দ্বরে, রজনী আর প্রসাদ সিং কাছারি ঘরের ক গিয়েছিল, ঘরের মধ্যে অর্ধভাগে কিয়ে ছিল হুজুর।

—বাঘ! কোথায় বাঘ! গাঁজা খাসনি তো?

—বিশ্বাস করুন হুজুর, বিরাট বাঘ। কের গুলির শব্দে ঐ জঙ্গলের দিকে লয়ে গেছে হুজুর।

—ডাক রজনীকে। কামিনী কোথায়?

দেখা গেল, কামিনীও বজরা থেকে ভোড়িতে উঠছে। গল্প শুনেছে।

ঈশান তরতর করে রজনীকে ডাকবার জন্য রা থেকে নেমে ভেড়িতে উঠল, চিৎকার করে লল, রজনী, এই রজনীভাই।

—এই শুয়ার। নরেন্দ্রনারায়ণ হুমকি য়ে উঠলেন। সিঁড়ি কাঠ পেতে দে, আমিও ব।

বজরার একপাশে উনুনে গরম জল ফুটছিল। বাবুর্চি উনুনের কাছ থেকে উঠে সিঁড়ি কাঠ সাজিয়ে দিতে এগিয়ে এল। নরেন্দ্রনারায়ণ ঈশানের কাঁধে ভর দিয়ে নামলেন। আর ওঁর নামার সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড় করে এগিয়ে এল।

—হুজুর, সর্বনাশ হয়েছিল।

—কি সর্বনাশ! সত্যি সত্যি বিপদজনক কিছু একটা ঘটেছিল নরেন্দ্রনারায়ণ তা তে পারছিলেন। কিন্তু—

রজনী উত্তেজিত গলায় বলল, হুজুর, পা দিতে না দিতেই বাঘ। এত বড় আমি কোন কালেই দেখিনি হুজুর। প্রাণে বেঁচেছি।

—শুধু বাঘ না হুজুর, প্রকাণ্ড একটা সাপ।

—এই সাপটাকে ঐদিকে আন।

হিড় হিড় করে টানতে টানতে একটা এনে ফেলা হল। নরেন্দ্রনারায়ণের গা শির করে উঠল। সতেজ দীর্ঘ চেহারা। জ্যান্ত নয়।

—কি সাপ? কোত্থেকে মারলি?

—কাছারিঘরে ছিল হুজুর। প্রসাদ করে মেরেছে।

নরেন্দ্রনারায়ণ কাছারিঘরের দিকে লেন। কোমর উঁচু জঙ্গলের মধ্যে জীর্ণ র একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশে কয়েকটা লুজবুজে চেহারার গোল- ঘর।

রজনী বলল, ঐটাই আমাদের কাছারি হুজুর। উঠোনটা একদম ঝকঝকে ছিল। কিন্তু এই এক মাসে আবার জঙ্গল এসে গ্রাস করে ফেলেছে। সাপে বাঘে আবার দখল নিয়ে সব।

নরেন্দ্রনারায়ণ দেখলেন, কিন্তু কিছুই পারছিলেন না। জঙ্গল যে এখানে দিন কাটা হয়েছিল তার চিহ্নই নেই। যেন দুর্বোধ্য লাগল ওঁর।

মকবুল বলল, হুজুর, এই যে ছোট ছোট গাছ যতদূর দেখছেন ততদূর কাটা হয়েছিল হুজুর। আরো এক মাস পরে এলে এটুকুও চেনা যেত না। কাছারি ঘরটার সবকিছু জঙ্গলের মধ্যে চাপা পড়ে যেত।

আবার সাপটার দিকে তাকালেন, এরকম সাপের মুখে পড়লেই হয়েছিল আর কি।

মকবুল বলল, সাপের হাত থেকে তবু সাবধান থাকলে বাঁচা যায়, কিন্তু বাঘের মতো খচ্চর আর দুটি নেই।

—কাজটা কিন্তু মোটেই ভাল হয়নি হুজুর। ঐ বাঘ কিন্তু অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। ধারে-কাছেই কোথাও হয়তো লুকিয়ে থেকে ও আমাদের লক্ষ্য করছে।

—মানে!

মকবুল ওর যুক্তির সমর্থনে বলতে শুরু করল, বাঘের মুখের গ্রাস আমরা কেড়ে নিয়েছি। ও ছেড়ে কথা কইবে না।

—কি করতে হবে তা হলে? নরেন্দ্র-নারায়ণের গলার স্বর কেঁপে উঠল।

রজনী বলল, একটু শুধু সাবধানে থাকতে হবে হুজুর। কেউ যেন একা একা কোথাও না যায়। দু-চার দিন এখন আমাদের নৌকোতেই কাটাতে হবে। রাতে ভেড়িতে আশেপাশে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

—আগুনেই হচ্ছে ওদের ওষুধ।

রজনী বলল, আজকের দিনটা বিশ্রাম-টিশ্রাম করে কাল থেকেই আমরা জঙ্গলে নেমে পড়ব দা-কুড়াল নিয়ে। দু দিনেই কাছারি বাড়ি পর্যন্ত সাফ করে ফেলব।

মকবুল বলল, বাড়িটাকে আবার নতুন করে বানাতে হবে হুজুর। খুঁটি অবধি ওর পচে গেছে।

এমন সময় ধীরে ধীরে নরেন্দ্রনারায়ণের কাছটিতে এগিয়ে এসেছিল কামিনী। বলল, ওখানে একটা লোকের সঙ্গে কথা হল, বাঘ-বন্দী করে রাখতে পারে।

সবাই এক সঙ্গে উৎসাহে তাকাল। বাঘবন্দী জানে, ওঝা?

—রসিক না কি যেন নাম বলল।

সঙ্গে সঙ্গে ঈশান আর রজনী ছুটে গেল। কালো পাথরের মতো গায়ের রং, একটা লোককে ওরা টানতে টানতে নিয়ে এল।

লোকটার দু চোখে ভয়, ছাড়ো ছাড়ো, ছেড়ে দাও।

—এই যে হুজুর, এর নাম রসিক। সটান নরেন্দ্রনারায়ণের পায়ের কাছে এনে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হল ওকে।

—কি নাম তোর? জিজ্ঞেস করলেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

—আজ্ঞে রসিকলাল!

—ওঝা?

—না হুজুর। আমি ওঝা নই হুজুর। আমার বাবা কিছু মন্তর তন্তর জানত। বাবা মরে গেলে সে সব পাট চুকে গেছে।

রজনী আর এককাঠি উপরে গর্জে উঠল, ফের মিথ্যে কথা, বাপের কাছ থেকে শিখিসনি কিছু?

লোকটা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল, অল্পস্বল্প জানি হুজুর।

—ঠিক আছে ওতেই হবে। বাঘবন্দী করে দেখা। বাবু তোকে ঢেলে বকশিস দেবে।

—বাঘবন্দী জানি না হুজুর। খারাপ বাতাস-টাতাস হলে তাড়িয়ে দিতে পারি।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, বাঘবন্দী করে না দেখাতে পারলে তোকে শূলে চড়াব।

কামিনী অনুনয় করল, একটু মন্তর-তন্তর ছুঁড়ে বাঘটাকে যদি ঘায়েল করতে পার দেখ না। এতগুলো লোকের উপকার হত তা হলে।

লোকটা বলল, ঠিক আছে, মন্তর আমি ছুঁড়ব, কিন্তু বাঘের গায় না লাগলে আমি জানি না।

—ঠিক আছে তাই কর। ভাগ!! নরেন্দ্রনারায়ণ ওকে তাড়ালেন। আমাদের বন্দুকগুলো সব ঠিক আছে তো রজনী।

রজনী বলল, আমি সব দেখে-টেখে রাখছি। এবার আপনারা সবাই ডাঙা ছেড়ে উপরে উঠুন। সুন্দরবনের বাঘকে একদম বিশ্বাস নেই হুজুর।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, চল তবে বজরায় উঠেই কথা বলি।

সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে এলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। বাঘটা যদি ধারে-কাছেই থাকবে, ওর গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন!

(চলবে)

(৬১)

মঠ। বেলুড়। হাওড়া। বাংলাদেশ
ভারতবর্ষ। ২৫শে ডিসেম্বর। ১৯০১

'মেরী ক্রিসমাস' ও 'শুভ নববর্ষ' জানানোটা হল প্রচলিত অভিনন্দন।

হায়! শুরুতেই তোমাকে এতবড় আঘাত পেতে হল! ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করো। তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ হোক—আমরা শুধু তাঁর শরণাগত! তোমাকে সান্ত্বনা জানিয়ে অপমান করব না। শুধু এইটুকু মনে করিয়ে দেব যে তোমার জন্য পূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে একজন আছে এবং যে জানে তোমার সমস্ত পরিকল্পনা সার্থক হবে সুখে হোক বা দুঃখে হোক!—কারণ তুমি মহামায়ার শ্রীচরণে নিবেদিতা। জাগতিক মা মহামায়ার মধ্যে বিলীন হয়ে মিশে গেলেন। তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ হোক। এতদিনে তুমি নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ কিংবা বলা যায় 'মা' তোমাকে এবারে পথ দেখাচ্ছেন। নিশ্চয়। আমার স্থির বিশ্বাস।

রানীর সৈন্য বিদেশে গিয়েছে রানীর হয়ে যুদ্ধ করতে—তার যা কিছু প্রিয় এবং ভালবাসার ধন সব রানীর হেফাজতে রেখে। যোদ্ধার কাজ হল শুধু কর্তব্য করে যাওয়া—বিশ্বের রানী জানেন তিনি কী করবেন।

চির ভালবাসা—
বিবেকানন্দ।

নিম্নোক্ত চিঠিগুলিতে 'ক্রিস্টিন' সম্বোধন।

(৬২)

মঠ। বেলুড়। হাওড়া জিলা
২৩শে জানুয়ারী, ১৯০২

স্নেহের ক্রিস্টিন,

এতদিনে নিশ্চয় তুমি তোমার পরিকল্পনা স্থির করে ফেলেছ। আমার সম্বন্ধে চিন্তার কিছু নেই। আমি তোমাকে নিশ্চিন্তভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই—সে যেখানেই হোক।

চিঠি লিখতে দেরি করেছি বলে মার্জনা চাইনি। নানা কারণে লিখে উঠতে পারিনি এতদিন তবে সর্বদা তোমাকে মনে মনে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। মিস ম্যাকলয়েড দুই জাপানী বন্ধুসহ এসে পৌঁছেছেন। একজন মিঃ ওকাকুরা, আর্টের অধ্যাপক এবং শ্রীযুক্ত হরি একজন ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয়জন ভারতবর্ষে এসেছেন সংস্কৃত এবং ইংরাজী-ভাষা পড়াশুনো করতে। প্রথমজন এসেছেন ভারতবর্ষকে দেখতে—যা জাপানী শিল্প ও কৃষ্টির মাতৃভূমি। নিবেদিতা ও মিসেস বুল কয়েক দিনের মধ্যে এসে পৌঁছবেন। মনে হচ্ছে পুরো দলটি জাপানে যাবেন কেবল নিবেদিতা বাদে। সে এখানকার কাজের … থাকবে। এবারে আমি চেষ্টা করছি জাপানের দিকে হাত বাড়াতে … সম্ভব হলে চীনদেশও। ইস্, আমার কী ইচ্ছেই না হচ্ছে … তুমিও নিবেদিতার সঙ্গে এসে পড়তে এবং জাপানে দলের সঙ্গে যোগ দিতে। তবে এজন্য নিজেকে অযথা অসুবিধের মধ্যে জড়িও না। এদিকে জাপান ওদিকে যুক্তরাষ্ট্র—কোথাও না কোথাও আমাদের দেখা হবে। বেশী তাড়াহুড়ো করে নিজেকে শেষ কোরো না। কোনো তাড়া নেই। কোন চিন্তা নেই। তোমার কাছ থেকে কয়েক সপ্তাহ কোন খবর না পেয়ে আমি বরং চিন্তিত তুমি কেমন আছ ভেবে। প্রার্থনা করি আর যাই হোক তুমি অসুস্থ নও। আমি মায়ের কাছে তোমাকে সমর্পণ করেছি। তাঁর নিজের জিনিস তিনি ঠিক রক্ষা করবেন। বরাবর করবেন। আমি নিঃশঙ্ক।

ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ
বিবেকানন্দ

(৬৩)

মঠ। হাওড়া জিলা। বাংলাদে…
৩০শে মার্চ। ১৯…

স্নেহের ক্রিস্টিন—

তুমি জানো তুমি কতখানি স্বাগত। সেকথা আমার লেখ… দরকার নেই। এদেশে বহিঃপ্রকাশকে সর্বদা চেপে রাখা হয়। মা… এবং জো আগেই চিঠি লিখে বম্বেতে সমস্ত ব্যবস্থা করেছে। অ…

াশা এবং অপেক্ষা করে আছি কবে তুমি কলকাতায় আসবে। আমার চ্ছে করছে আমি যদি বম্বে গিয়ে তোমাকে অভ্যর্থনা করতে ারতুম- কিন্তু আমাদের সব ইচ্ছে তো পূর্ণ হয় না। সোজা এখানে লে এসো তবে প্রচন্ড গরম থেকে বাঁচবার জন্য মাথার পেছন দকটা ঢেকে রাখবে। এদেশের ট্রেনগুলি তোমাদের দেশের মত নিরাপদ নয় তাই রাত্রির যাত্রায় জিনিসপত্রের প্রতি খেয়াল রেখো। দি ক্লান্ত বোধ কর তবে বম্বেতে বিশ্রাম নিও। জো আর মার্গট বে উদগ্রীব হয়ে তোমার প্রতীক্ষা করছে আর করছে--

—বিবেকানন্দ।

ক্রিস্টিনের চিঠি

(৩)

8, Bose Para Lane,
Baghbazar, Calcutta. India.
Christmas Day.

Dear,

I cannot find words to express what is in my eart. Today is Christmas Day, and no little part of he joy of it is due to the devinely general gift that as sent to me prompted by the love of the senders —not only prompted but made possible by that love. am so touched by this expression. Luella told me hat your part in it was and how it was planned at lgonac. Are things really going better with you that ou have twice been able to send such a sum or is simply your great heart and boundless generosity r perhaps both? But I do hope that you are free om financial anxiety. May it be so and may all ood be yours always.

I have no plans and I am doing nothing — just aiting for the next step. I am living a very secluded fe. When I make the next move, it will be be- use I have had a dear call and there will be no istake about it. I was *determine to come to India.* as it a mistake? Who knows. In the beautiful ashmere shawls' produced in this country, there e many black threads. It gives tone and distinction the pattern. How common place the bright colours ne would look ! But fate is again weaving the ight colours into my pattern.

The miracle I spoke of in the end of my last tter concerned not me but Boshi Sen. He is doing dependent research work now in his laboratory ivekananda Laboratory). It simply eats up money d brings in nothing. A few weeks ago, he was most in despire and thought he would be obliged give it up and take a position again, when a subs- ntial cheque from a New York millionaire came, w he can go on for two or three years, at least. was superstitious about telling it to any one, and en now he does not wish me to name the sum. It lly is a miracle.

I heard Major Bruce and Somer Vell lecture in rjeeling just after the Mt. Everest expedition trned. They showed pictures too. It was a thrill- story.

Tell me more about Dinshah. It was so inte- ting. Do you still think as you did about him and work. Since Abrams, I am inclined to be sceptical out such things. It does look as if there were "The touch of Destiny" in this as you say your dream and the words you heard cannot but make one feel, that and yet, is it not possible that your dreams are of the prophetic type and you read the future in the astral plane ? So after all this time what do you think of it all ?

May this New Year bring you all blessings, all the good in the world.

Dear love from Christina

(৪)

৪ নং বোসপাড়া লেন
১০ই জানুয়ারী, ১৯২৩

প্রিয় মিসেস অর্,

আপনার ১০০্ শেষ উপহার আমাকে অভিভূত করেছে। জানি না কীভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো। না, সে চেষ্টা করব না। আশা করি আপনার উদার দানের ফল আপনাকে অপরিসীম ঐশ্বর্যে ভরে দেবে। প্রকৃতির নিয়ম বেশ রহস্যময়,—যা আমরা দিই, আবার ফিরে পাই এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে—যখন সত্যিই তার প্রয়োজন দেখা দেয়। বহুবিধ অভিজ্ঞতার আমি এই জ্ঞান লাভ করেছি। শুনুন প্রিয়, এটা যদি আমার ফিরে যাবার পথখরচা মনে করে এমন উদার হাতে পাঠিয়ে থাকেন তবে জেনে খুশী হবেন যে আমি সেই সিদ্ধান্তই নেব। আমি তো ইচ্ছে করলে কালই চলে যেতে পারি। সে বিষয় আগে আপনাকে জানিয়েছি। প্রথম ছ'মাস এখানে ভয়াবহভাবে কেটেছে, যদি আমি কখনও বিশ্বাস হারাইনি। আমি জানতাম একদিন সবই ঠিক হয়ে যাবে। তারপর এইভাবে পাওয়া শুরু হল! বলব ঐ অভিজ্ঞতা সার্থক হয়েছে!

আমার এখানে আসবার একটা উদ্দেশ্য আছে। সেটা এখনও সুস্পষ্ট হয়নি তবে হবে,—যদি একটু ধৈর্য ধরে থাকতে পারি। আমি বিশেষ কোন কাজ করিনি এবং একটু নির্জনে বিচ্ছিন্নভাবে থেকেছি।...এখনও কিছুই কর্মি না, লোকের সঙ্গে বড় একটা দেখা করি না এবং কদাচিৎ বাড়ি থেকে বেরুই।
I hope I am absorbing something of which I am not aware to justify this inactivity.

ছোট্ট উইনার ৩।৪ সপ্তাহের জন্য উত্তর ভারত ভ্রমণে গিয়েছে উপস্থিত সে বেনারসে আছে। সেখান থেকে আগ্রায় যাবে 'তাজ' দেখতে। তারপর দিল্লি, জয়পুর, এলাহাবাদ। শুনে মনে হচ্ছে বাঃ, খাসা' তাই না? কিন্তু ভারতে এসে ওর অভিজ্ঞতাটা সুখের হয়নি। আমার মনে হয় প্রথম ছ' মাসের অভিজ্ঞতার ধাক্কা ও কোনদিনই সামলে উঠতে পারেনি। বেচারী ছোট্ট পুতুল।

কারো নাম করতে চাই না তবুও বলব, 'ওত' ক্লাসগুলো ভেঙে দিল! আমি ওখান থেকে চলে আসবার অনেক আগে থেকেই এটা আমি লক্ষ্য করছিলাম কিন্তু কখনও একথা ওকে জিজ্ঞাসা করিনি। আপনার পাশে দাঁড়াবার যোগ্য হতে ওর অনেক দেরি আছে। বলবার মত কোন বিষয়বস্তুও ও জানে না!

আপনি কী জানেন—আমি আপনাকে অনেক সাহায্য করেছি —এই কথা আপনি লিখেছেন পড়ে কী খুশী আমি হয়েছি?

(শহর থেকে এইমাত্র একজন বন্ধু এলেন—এবং ডাক পাঠাবার সময় হয়ে গেছে)।

আপনি জানেন কেন গত চিঠিতে 'নাগের' স্বপ্নের কথা লিখেছিলাম। এটা সত্যিই প্রতিভার কথা। পরোক্ষভাবে আপনি যেভাবে আপনার জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাকে মুগ্ধ করেছে! প্রার্থনা করি আপনি স্বপ্নে যা' দেখেছেন আমি যেন তাই হতে পারি। লক্ষ্যে উপনীত হওয়াটাই তো আদর্শ। কখনও একথা ভুলব না!--

আশীর্বাদ জানাচ্ছি তোমাকে
প্রিয় বন্ধু
ক্রিস্টিন।

বিচিত্রা

বোম্বাই-এর ব্যস্ত বাঙালী

বোম্বাই শহরে অনেক গুণী, সাহিত্যিক এবং শিল্পী আছেন যাঁরা আপন প্রতিভায় এখানে বিশেষ আসন পেয়েছেন। নবেন্দু ঘোষ এমনি একজন কৃতী সাহিত্যিক, সফল চিত্রনাট্যকার, চিত্রকাহিনীকার এবং চিত্র - পরিচালক। বর্তমানে তিনি বিখ্যাত হিন্দী লেখক ফণীশ্বরনাথ রেণুর অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস মহলা আঁচলের চিত্ররূপ 'ডাগদারবাবুর' পরিচালনায় ব্যস্ত আছেন।

ঢাকায় জন্ম হলেও পাটনায় বড় হয়েছেন। ১৯৩৯ সালে পাটনা থেকেই ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পাশ করেন। সাহিত্য চর্চা এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ সুরু করেন ১৩-১৪ বছর বয়স থেকেই। প্রথমে তিনি স্যার যদুনাথ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র ওংকারনাথের সঙ্গে 'ঝরণা' নামে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রের সম্পাদনা করতেন। পরে এটি প্রভাতী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এই পত্রিকার মাধ্যমে, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকদের স্নেহধন্য হন।

শিক্ষা জীবন শেষ করার পর তিনি বিহার সেক্রেটারিয়েটে চাকরিতে ঢোকেন। এই সময় প্রভাতী পত্রিকায় তাঁর 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাস প্রকাশিত হলে তিনি জানতে পারেন যে দেশদ্রোহমূলক রচনার জন্যে তাঁকে চাকরী থেকে সরান হবে। এই কথা জেনে তিনি নিজেই চাকরীতে ইস্তফা দেন এবং সেই থেকেই লেখাকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় আসেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে তিনি চিত্রজগতে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম চিত্রনাট্য রচনা—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'। এর পরই দেশ বিভাগ হয় এবং বাংলা ছবি পূর্ব পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

১৯৫১ সালে পরিচালক বিমল রায়ের ডাকে বোম্বাই আসেন। সেই থেকে সিনেমায় যুক্ত আছেন। তাঁর ভাষায় —বোম্বাইতে চলচ্চিত্রের সেবা করতে করতে সাহিত্যকর্ম প্রায় বন্ধ। দুঃখ হয় কিন্তু থামবার উপায় নেই। জীবন

নবেন্দু ঘোষ

আমাকে সিনেমার দ্বারস্থ করেছে, মানুষও সিনেমা পছন্দ করে, সুতরাং আমার লজ্জার কিছু নেই। জীবন দেবতা ভবিষ্যতে আমাকে কোন পথে নিয়ে যাবেন তা তিনিই জানেন।

তিনি বহু গল্প, উপন্যাস, চিত্রকাহিনী ইত্যাদি লিখেছেন। তার লিখিত কাহিনী সংগ্রহ—মানুষ, এই সীমান্তে, পোস্টমর্টেম, ইস্পাত, কান্না, পুষ্পরাগ, সিঁড়ি, প্রাসুর দ্বীপের কাহিনী, রাতের গাড়ী, এবং সুখ নামে শুকপাখী।

উপন্যাস—নায়ক ও লেখক, কালো রক্ত (১ম খণ্ড), প্রান্তরের গান, ডাক দিয়ে যাই, আজব নগরের কাহিনী, পৃথিবী সবার, দ্বীপ, পলাশের রং, ভালবাসার অনেক নাম, যেন এক নদী, ভুল ঠিকানা, কায়াহীনের কাহিনী ও আগুনের উক্তি।

চিত্রকাহিনী—বাপ বেটি, শতরঞ্জ, আলসারা, রাজা রানি, জমানা, জোত জ্বলে ইত্যাদি

চিত্রনাট্য লিখেছেন বহু,—পরিণীতা, সুজাতা, দেবদাস, বন্দিনী, ইনসান জাগ উঠা, চৈতন্য মহাপ্রভু, মঝলি দিদি, অভিমান, তিসরি কসম, আদি বহু কাহিনীর চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং সম্মানিতও হয়েছেন। মাঝলি দিদির চিত্রনাট্যের জন্য ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার পেয়েছেন, তিসরি কসম এবং মাঝলি দিদির জন্য বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশন থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। এছাড়া উল্টোরথ প্রদত্ত স্বর্ণপদক পেয়েছেন দুবার। গত বছর বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে নবেন্দু ঘোষকে 'অমৃত' পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁর সাহিত্যে অবদানের জন্য।

এখানে আসার পর তিনি প্রগতিশীল বাঙালী সমিতির একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এই সমিতি প্রবাস ... সাইক্লোস্টাইলে ছাপা একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন, যার সম্পাদক ছিলেন নবেন্দু ঘোষ। নির্বিবাদি এবং ... স্বভাবের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন।

নিজস্ব সংবাদদাতা

একটি যৌথ প্রদর্শনী

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইয়ং আর্টিস্ট ফেডারেশনের দশজন তরতাজা শিল্পী একাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারিতে ৪ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত একটি যৌথ রেখাচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন।

তপনকুমার বিশ্বাস তাঁর ... একদিকে পুরাকল্প ও ... আধুনিক নগর-সভ্যতার ... তুলে ধরেছেন। রেখার ... আঙ্গিকের উপস্থাপনা ... পোস্টারধর্মী বলে মনে হয়েছে।

কাজল দাশগুপ্তের ... গুলিতে রেখার কোন স্পষ্ট ... গেল না। সমীর ঘোষ সাদা ... সরল ও নরম বাঁকা রেখার ... সৃষ্টি করে যে নিপুণ রেখাচিত্র ... করেছেন তাতে বাস্তব ... জটিলতা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ... রেখাচিত্রগুলি অনেক ... স্বপ্নময় রাতের কথা মনে করিয়ে ...

মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়ের ... গুলির মধ্যে স্বকীয়তার অভাব ... গেল। অসিত মণ্ডলের রেখাচিত্র ... মণ্ডনধর্মী। কালো জমির উপর ... ও সাদা রেখার মণ্ডন। ... রূপারোপে প্রাচীন রীতির ... থাকলেও তিনি তা ভেঙে ... নিজের মত করে নিয়েছেন। ... পালের পেনসিলে করা রেখাচিত্র ... মনে করে রাখার মত। ... অনিল সেন এবং বরুণ ... কাজ মোটামুটি ভালো।

পৃথ্বীশ সেন একটিমাত্র ... দিয়েছেন। বর্ণময় সরল ও ...

আবেষ্টনে ও কালো রেখার মধ্যে দিয়ে যে মানুষ অন্ধকার বেরিয়ে আসছে তাকে ভোলা রঙ ও রেখার ভারসাম্য ও য়ার ঘনত্বের মধ্য দিয়ে এমন কেন্দ্রীক গতি সত্যই খুব
শ্যামল রায়।

কাপ
ওতা নেই

সোনা বুবু টা টা, লক্ষ্মী বুবু বলতে বলতে ব্যস্ত ছিল ভোলা খুট খুট শব্দ সিঁড়ি দিয়ে নীচে যেতে যেতে ক্রমশ মিলিয়ে গেল ওদিকে বুবুর চোখে তখন জল মাথা লাল রঙের মুখের মধ্যে পুরে কখনও কোঁপাচ্ছে। মনার মা ভোলাচ্ছে—আবার বিকেল হলেই দেখো তোমার জন্যে কত খেলনা নিয়ে আসবে। তার-ও এসে যাবে, দিদি আসবে থেকে তোমরা সকলে ট্যাক্সি চড়তে যাবে—কত মজা হবে!' চোখের জল এসব সান্ত্বনার শুনলো কিনা জানি না। কিন্তু ওকে চোপ করাতেই হবে—ও পারবে কেঁদে কোন লাভ না দিলে রোজ এরকম করে বেরিয়ে যাবেই।

ভীড়ের বাসের হাতল ধরে মনে পড়ল স্কুলের ক্লাস-পরীক্ষার খাতা লকারে পড়ে আছে—দেখা হয়নি—ক্লাসের মধ্যে অনুপস্থিত প্রায়ই ঘাড়ে এসে রোজ ছয় পিরিয়ড ক্লাস করতে—একতলা, দো-তলা, তিনতলা বিল্ডিং—লিফট নেই ওঠানামা, চিৎকার করে পড়ানো এক পিরিয়ড ছুটি আর অবকাশ যেন নিমিষেই শেষ এমন খাতা দেখার আর না আর বাড়ী বয়ে নিয়ে তো পণ্ডশ্রম। একে বাসের মুশকিল, তারপর সাত দিন অবস্থার খাতার বাণ্ডিল বয়ে আনতে হয় আবার—দেখার সময় কোথায়।

চারটে ক্লাস নেওয়ার পর বসে খেলে পাঁউরুটি চিবোতে মনে হয় আহা বড় মেয়ে খুকু টিচ আলুর দম নিয়ে যেতে জোপা নাকি রোজ নানা আনে তাই দেখে খুকুর এসে যায়—একঘেয়ে জেলি খেতে ভাল লাগে না—প্রায়ই

না খেয়ে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে আসে। স্বর্ণ আবার কোন টিফিনই নিয়ে যান না। রোজ ক্যান্টিনে ভাজাভুজি খেয়ে অম্বল হয়—রাঁধুনির যাওয়াটা নষ্ট হয়—আটার কয়েকটা পাতলা রুটি, একটু আলু চচ্চড়ি বা সেদ্ধ মটর জাতীয় কিছু আর ঘরে কাটা ছানা করে দিলে শরীরটা ভাল থাকে, পেটও ভরে—কিন্তু একই সমস্যা—সময় কোথায়, সময় কোথায় আর সময় কোথায়।

বাড়ী ফেরার পথে অসম্ভব মাথা ধরে যায়। ঘরে স্বাগত সম্ভাষণ নেই। তার ওপর খুকু মুখ ভার করে বসে আছে—অংকয় পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায়নি—যত দোষ মার। বাবা কি করবে বাবার তো অফিস আছে—মা কেন ক্লাসের অঙ্কগুলো বাড়ীতে ভাল করে বুঝিয়ে দেয়নি। বুবু কাঁচের গেলাস ভেঙে রেখেছে—কাঁচের টুকরো গুলো কুড়োতে গিয়ে মনার মার হাত কেটে গেছে—অর্থাৎ রাতে আর রুটি বেলতে পারবে না। খুকু আরও বলল আজ যদি মা ইংরিজি আর ইতিহাস না পড়িয়ে দেয় কালকে ওই দুটোরই ক্লাস ওয়ার্ক আছে দিদিমণিরা সে লেখার ওপর নম্বর দেবেন—দুটোই খুব খারাপ হবে। অন্যদের মারা কেমন পড়া বুঝিয়ে দেয়—আর তার মা শুধু স্কুলে অন্য মেয়েদের পড়ায়—নিজের মেয়েকে দেখে না। ওদিকে বুবু এসে কাপড় ধরে টানাটানি করে—বেড়াতে নিয়ে চল—মাঠে গিয়ে বল খেলব।' না যেতে চাইলে চিৎকার করে—সারাদিন পরে মাকে দেখে যত বায়না সুরু হয়ে যায় তার। অগত্যা কাপড় না ছেড়েই বাইরে বেরোতে হয় আবার—খুকুকে বলে—'তুইও চল্ না সঙ্গে।' খুকু ঠোঁট উল্টে বলে, 'ফুঃ ভারি তো বাইরে যাওয়া—যাবে তো ওই সামনের পার্কে—ওকে আবার বেরোনো বলে নাকি! কত ভাল হাতির সিনেমা এসেছে নিউ এম্পায়ারে—ক্লাসের সব মেয়েরা মা বাবার সঙ্গে দেখে এসেছে—আমাকে আর কে নিয়ে যাবে!'

বুবুকে পার্কে নিয়ে গিয়ে বল এদিক থেকে ওদিকে গড়িয়ে দিতে দিতে ক্লান্তিতে শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল নামহীনার। বাড়ী ফিরে এসে দেখে কর্তা ফিরেছেন অফিস থেকে। ওকে দেখেই হাঁকডাক সুরু করে দিলেন—'কি সারাদিন বাইরে কাটিয়ে এসেও বেড়াবার সখ মেটে না। হাড়ভাঙা খাটুনির পর বাড়ী এসে দেখা পর্যন্ত পাই না। এ কি বাড়ী, না হোটেল মেস—কি চাকরের দয়াতে রয়েছি।' চুপ করে থাকে নামহীনা। নিজেকে যেন চোরের সমগোত্রীয় মনে হয়—সারাদিন যেন কত স্ফূর্তি করে এসেছে সে স্বামী ও কন্যা-

দের বঞ্চিত করে। স্বামী বলেন, 'এবারে দয়া করে একটু রান্না ঘরের দিকে যাও —যা হোক কিছু রাঁধো। সকালে তো অখাদ্য আধপেটা খেয়ে অফিসে গিয়েছি।'

রান্নাঘরে বসে বঁটি দিয়ে আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে মনে হল—ওই যাঃ গরম মশলা তো আনানো হয়নি—হলুদও বাড়ন্ত—সকালে কর্তা বাজারে যাওয়ার সময় তাড়াতাড়িতে বলতে মনে ছিল না—রান্না যা হবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কর্তার কাছে আবার বকুনি খেতে হবে আবার অশান্তি হবে—খুকু আর বুবু তো খেতেই চাইবে না। কয়েকটা ডিম আছে সেগুলোর অমলেট বানিয়ে আর একা হাতে কয়েকটা পরোটা বেলে ভেজে, স্টোভে দুধটা পায়েসের জন্যে ঘন করে রাত্তিরের রান্নাটা ম্যানেজ করতে করতে মনে হল কাল ক্লাস নাইন আর টেনের নতুন সিলেবাসের পড়াগুলো ভাল করে দেখে রাখতে হবে—আর তখনই মনে পড়ল স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে এসে এখনও এক কাপ চাও খাওয়া হয়নি তার—কেউ সহানুভূতিময় এক কাপ উষ্ণতা তার দিকে এগিয়ে দেবে পরম স্নেহে ভালোবাসার এতোটা আবদারের প্রত্যাশা করাই তো ঘোরতর অন্যায়। —সাধনা মুখোপাধ্যায়

এশিয়ার সবচেয়ে লম্বা লোকটি

ব্যাংককের রাস্তায় সেদিন দারুন হৈ চৈ। প্রচন্ড ট্র্যাফিক জ্যাম—যার সামনের দিকে বেশ কিছু গাড়ী ভোবড়ানো, আশে পাশের বাড়ীর বারান্দায়, জানলায় ফুটপাত লোকে গিজগিজ করছে। ইদানীংকালে নাকি এরকম ঘটনা ঘটেনি। জনপ্রিয় নেতা, অভিনেতা বা কেতাদুরস্ত কেউ রাজধানীর রাস্তায় ঘোরাফেরা করবেন, এমন কথা ছিল না—অথচ ব্যাপারটা কি? ট্র্যাফিক কন্ট্রোল রুমে টেলিভিসনের পর্দার সামনে ছুটে এলেন পুলিশের বড়কর্তা। দেখলেন প্রায় টাওয়ারের মত লম্বা দুজন লোক জ্যামের পুরোভাগে—ভ্রতচকিত, চারপাশে অসংখ্য লোক ওদের ঘিরে ধরেছে।

অবাস্তব সেই দুই লম্বা-মানুষের একজন প্রদীপ শ্রীবাস্তব এই কয়েকদিন আগে বর্ধমানেত অরবিন্দ স্টেডিয়ামের তলার ঘরটিতে বসে ব্যাংককের মজাদার গল্পটি যখন আমাকে শোনাচ্ছিল তখন বাইরে কালবৈশাখী প্রাক-এশীয় বাস্কেটবলে সার্ভিসেস-বিহার খেলাটি উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। প্রদীপ বলছিল, "বিহার টিমের হয়ে থাইল্যান্ড ট্যুর করতে গিয়েছিলাম আমরা। আমি আর সুনীল পান্ডা সেদিন রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়েই ওই বিপত্তি। চলন্ত গাড়ীর

প্রদীপ শ্রীবাস্তব

কোনো ড্রাইভার হয়ত মুখ বাড়িয়ে আমাদের দেখতে গিয়ে অসতর্ক হয়ে পড়েছিল, ব্যস্ পেছন থেকে অন্য গাড়ী ধাক্কা—এইভাবে ট্র্যাফিক জ্যাম। সে এক শোচনীয় অবস্থা। চতুর্দিকে লোক। লাফিয়ে লাফিয়ে কেউ আমাদের আবার ছুঁয়েও দেখছিল। ইতিমধ্যে পান্ডা দৌড়ে পালাতে গিয়েও ফিরে ফিরে এলো। কতক্ষণ ওরকম মবড্ হয়েছিলাম জানি না—শেষ পর্যন্ত পুলিসের গাড় এসে আমাদের উদ্ধার করে হোটেলে পৌঁছে দেয় আমাদের।'

কথা বলার সময় আরেক কীর্তিমান —সুনীল পান্ডাও পাশে বসেছিল। প্রদীপের চেয়েও এক ইঞ্চি খাটো—সাত ফুট তিন ইঞ্চি। এক হাতে নাকি তালি বাজে না কিন্তু সুনীল ওর ডান হাতের বিশাল থাবা দিয়ে তালি বাজিয়ে দেখিয়ে দিল প্রবাদ বাক্যটা মিথ্যে। চোখ ছানাবড়া করে আশে পাশে আমরা কিছু লিলিপুট তাই দেখলাম।

দুজনের মধ্যে বর্ধমানে সবচেয়ে বেশী সোরগোল তুলেছিল বিহার রাজ্য দলের টাওয়ার ম্যাগনেট প্রদীপ শ্রীবাস্তব। প্রতিযোগিতার শেষদিনে তো কার্জন গেট থেকে পুলিসের জীপে কুঁজো হয়ে ওকে ফিরতে হয়েছিল প্লেয়ার্স ক্যাম্পে।

ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এশিয়ার সবচেয়ে লম্বা লোক—এ তথ্যটি পেলে কোথায়?

—খবরের কাগজেই তবে এ কথাটা লিখতে পা পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা হ ওর গর্ব করার ধরনটা ফেললাম। বিহার দলের ব সকলেই শিক্ষিত। প্রদীপকে জনই ইঞ্জিনিয়ার, একজন এ বাকী চারজন গ্র্যাজুয়েট। ও চাকরী করে টিসকো কম্পুটার ডিভিসনে সিসটে হিসেবে।

একাত্তর সালে বাস্কে প্রথম নামে প্রদীপ। কে তো ওর এককথার উত্তর—'আম

এই 'হাইট' নিয়ে গল্প শোনাল প্রদীপ, 'এক দেখতে গিয়েছি। অন্ধকার সিট থেকে ক্রমাগত আও শেষে রেগে গিয়ে ঘা পেছনের লোকটি বলেছিল আপনাকে বসতে বলছি আছেন কেন, আমরা দেখ না যে! বাধ্য হয়ে উঠে দা দেখাতে হয়েছিল কোন দা ছিলাম।'

প্রদীপের বয়েস এ গত একদশক বাস্কে পারে নি। জামসেদপুরে অ রাতের জন্য ওর স সাইকেল-টাই। টিসকো একলা থাকে প্রদীপ। মিউজিক শোনে। ওর ওয়েস্টার্ণ ও ইন্ডিয়ান মিউজিকের এতো কালেক ছয়দিন একটানা বাজালেও না। সময় পেলে প্রবন্ধ লে বেড়ায় বাস্কেট কোর্টে ফেলা ছাড়াও প্রদীপ খেলে বিলিয়ার্ড। কখনও কখনও সুইমিং পুলে ও জল দাপা

লম্বা লোকেরা চট জ বটে তবে ওদের জীবনে অনেক। 'তোমাদের চেয়ে ধারনের খরচ অনেক বেশ ট্রাউজার তৈরী করাতেই চার মিটার কাপড়, জামায় জুতোর মাপই ষোলো। অর্ডার না দিলে পাওয়া যা কোম্পানী ক্রমাস ঘুরিয়ে জুতো তৈরী করে দেয়। হয় এমন সব কিছু জিনিষ অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে

এবার কুয়ালালামপু বাস্কেটবলে যাবার জন্য যে প্লেয়ারকে ট্রেনিং ক্যাম্পে তাদের মধ্যে ওর নাম নেই দুঃখিত নয়। বলল, 'শর্ট চটপটে করে তুলতে পার ডাক পড়বেই। কারণ বাস্কে একটা বড়ো এ্যাডভানটেজ

বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন

সুইডেনের ম্যালমোতে আয়োজিত বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন (ব্যক্তিগত) প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী আসরে পাঁচটি খেতাব তিনটি দেশ এইভাবে জয়ী হয়েছে ডেনমার্ক তিনটি এবং একটি করে খেতাব জাপান এবং ইন্দোনেশিয়া। অথচ গত মার্চ মাসে ১৯৭৭ সালের ৬৭তম অল্-ইংল্যান্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার আসরে এশিয়া মহাদেশ খেতাব জয়ের তালিকায় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। পাঁচটি খেতাবের দুটি পেয়েছিল জাপান এবং একটি করে খেতাব জয়ী হয়েছিল ইন্দোনেশিয়া, ডেনমার্ক এবং ইংল্যান্ড। এতদিন এই অল্-ইংল্যান্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় খেতাব বিজয়ীরা বে-সরকারীভাবে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন খেলার আসরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান আখ্যা পেয়ে এসেছেন। যেহেতু ১৯৭৭ সালের আগে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়নি। অবশ্য দলগত পর্যায়ে বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার দুটি আসর ছিল—পুরুষদের দলগত বিভাগের টমাস কাপ এবং মেয়েদের দলগত বিভাগের উবের কাপ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা।

আলোচ্য প্রথম ব্যক্তিগত বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে ডেনমার্কের খেলোয়াড়রা তিনটি বিভাগের ফাইনালে খেলে তিনটি খেতাব জয়ী হয়েছেন—পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস খেতাব। তাছাড়া প্রতিযোগিতায় দুটি খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন একমাত্র ডেনমার্কের কুমারী লেনি কোপেন—মেয়েদের সিঙ্গলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস খেতাব। ফাইনালে একটি দেশেরই খেলোয়াড় পরস্পরের সঙ্গে খেলে অটুট প্রাধান্যের নজির গড়েছিলেন—পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে ডেনমার্কের খেলোয়াড়রা এবং পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার খেলোয়াড়রা।

পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে আটজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ছিলেন ডেনমার্কের তিনজন, ইন্দোনেশিয়ার দুজন, সুইডেনের দুজন এবং ভারতের একজন (প্রকাশ পাড়ুকোন)। সেমি-ফাইনালে খেলেছিলেন ডেনমার্কের দুজন এবং একজন করে সুইডেন এবং ইন্দোনেশিয়ার।

মেয়েদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে আটজন খেলোয়াড়ের চারজনই ছিলেন জাপানের। বাকি চারজন—ইংল্যান্ডের দুজন, ডেনমার্কের একজন এবং কানাডার একজন। সেমি-ফাইনালে খেলেছিলেন ইংল্যান্ডের দুজন এবং একজন করে ডেনমার্ক এবং জাপানের।

প্রতিযোগিতায় সবথেকে উল্লেখযোগ্য অপ্রত্যাশিত ফলাফল : মেয়েদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে ইংল্যান্ডের শ্রীমতী গিলিয়ান গিল্কসের কাছে তিনবারের (১৯৭৪-৭৫ ও ১৯৭৭) অল-ইংল্যান্ড সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং ১নং বাছাই জাপানের হিরো ইউরীর পরাজয় এবং পুরুষদের সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউন্ডে সুইডেনের অখ্যাতনামা খেলোয়াড় টমাসের কাছে ১নং যুগ্ম বাছাই খেলোয়াড় ইন্দোনেশিয়ার লিম সুই কিংয়ের পরাজয়। কিং ১৯৭৭ সালের অল-ইংল্যান্ড সিঙ্গলসের ফাইনালে হেরেছিলেন।

ভারতের চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র প্রকাশ পাড়ুকোন (৫নং বাছাই) কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার ইজি সুমিরাত কোয়ার্টার ফাইনালে ১৫-৬, ১০-১৫ ও ১৫-১১ পয়েন্টে পাড়ুকোনকে পরাজিত করেন। অপরদিকে পার্থ গাঙ্গুলী ২য় রাউন্ড এবং উদয় ও প্রদীপ ১ম রাউন্ডের খেলায় বিদায় নিয়েছিলেন। ডাবলসের খেলায় প্রকাশ-পার্থ জুটি এবং উদয়-প্রদীপ জুটি ২য় রাউন্ডে হেরে যান।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : ১৯৭৭ সালের অল্-ইংলন্ড চ্যাম্পিয়ান ফ্লেমিং ডেল্‌ফস (ডেনমার্ক) ১৫-৫ ও ১৫-৬ পয়েন্টে স্বদেশের স্বেন প্রিকে পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : কুমারী লেনি কোপেন (ডেনমার্ক) ১৩-৯ ও ১২-১১ পয়েন্টে শ্রীমতী গিলিয়ান গিল্কসকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : তিন বারের অল্-ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ান জুন জুন এবং জোহান ওয়াজুদি (ইন্দোনেশিয়া) ১৫-৬ ও ১৫-৪ পয়েন্টে স্বদেশের ক্রিশ্চিয়ান এবং অ্যাড চন্দ্রাকে পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : কুমারী ইতসুকো তোগানু এবং কুমারী এমিকো ইউনো (জাপান) ১৫-১০ ও ১৫-১১ পয়েন্টে জোক ভ্যান বিউসেকোম এবং অর্জন রিডার লুয়েস কেনকে (হল্যান্ড) পরাজিত করেন।

মিকস্‌ড ডাবলস : কুমারী লেনি কোপেন এবং স্টিল স্কোগার্ড (ডেনমার্ক) ১৫-১২ ও ১৮-১৭ পয়েন্টে ১৯৭৭ সালের অল্-ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ান শ্রীমতী গিল্কস এবং ডেরেক ট্যালবোটকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

দর্শক

আলোকের ঝর্ণাধারায়…

কিন্তু শান্তিদেব সবিনয় তারো কেউ কেউ বিশুদ্ধ রাবীন্দ্রিক ছাঁদে গান করেন। আচার্য শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি নাম নয়, ঐতিহ্য। শুধু আসরে নয় স্বরেও তিনি একক। বলতে দ্বিধা নেই সাতাত্তরের আট এপ্রিলের বেলা দশটার আগে পর্যন্ত আমার মনে শান্তিদেব সম্পর্কে শ্রদ্ধা ছিল। আগ্রহ ছিল না। রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিষদের নিবেদন। আবৃত্তি সহযোগে রবীন্দ্রনাথের গান। শিল্পী শান্তিদেব ঘোষ। পঁচিশটি গানের দল একটি একটি করে তিনি খুললেন। রবীন্দ্র সদনে বসে অনেকদিনের সুরে সৌরভ সকালটা মধুর লাগল। কবির একটা কবিতার লাইন মনে পড়ছিল 'সকাল বেলায় আলো দেখি তোমার সুরে সুরে/ভরা আমার গানে।' শান্তিদেবের বয়স ভোলা মুক্ত উচ্চ কণ্ঠে ছিল আলোর চমক। 'আজ আলোকের এই ঝর্ণাধারায়' দিয়ে শুরু। ভৈরবীর ঋষি রবীন্দ্রনাথ। কী একটা ভৈরবী সুরের রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে হার্মোনিয়ম থামিয়ে চিন্ময় বলেছিলেন কথাটা। বছর দশেক আগে, মনে আছে। ভাল লেগেছিল। সন্ধি প্রকাশ রাগের আভাষ ও মেজাজ দিয়ে গাঁথা রবীন্দ্র-

সঙ্গীতগুলির তুলনা নেই। ভৈরব ভৈরবী পূরবী। শান্তিদেবেরে গাওয়া তেরোটি ভৈরবী সুরে রবীন্দ্র সঙ্গীত ভাবে ছন্দে রূপে রসে বিচিত্র। ভৈরবীর মূল রাগ প্রকাশক স্বর কোমল রে গা ও ধা কী সাবলীল আনাগোনার নূতন, নূতনতর। আলোকের ঝর্ণাধারায় ধুয়ে যাবার আবেদন। চড়ার কোমল গা রে সা থেকে উথলে উঠে অতি তীব্রতায় (বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া....) সূর্য আকাশের দিকে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে। সস্মিত প্রসন্ন আনন্দে পাই নব আম্র মুকুলের গন্ধে কোমল গান্ধারকে 'কাহার গলায় পরাবি গানের রতন হার' গানখানিতে। ভৈরবীর নাম কোমল গান্ধার। ভৈরবীতে সকালবেলায় অরূপকথা শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'আকাশের ওই অরুণ রাগে মধুর তান করুণ লাগে' 'কানন পরেছে শ্যামল দুকূল, আমের শাখাতে নূতন মুকুল' 'হৃদয় শতদলের সকল দলগুলি এই ফুটল রে' 'মিনতি করি হে করজোড়ে জুড়াও সংসার দাহ'—এক একটি গানের ঐ লাইনগুলো সুরের রেখায় আমার মনে দাগ দিচ্ছিল। ভকত প্রেমিক-বাউল শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি গান নি, বলা যায় গনিষ্ঠ ভাবগায়ক। কেমনে ফিরিয়া যাও, জীবনে যত পূজা, ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে প্রভৃতি গানের তাল মাত্রা ছন্দ ঠিক ঠিক এ্যাক্সেণ্ট দিয়ে গলায় বাজিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের রসসৃষ্টি করতে হয়। শান্তিদেবের গায়নরীতি থেকে এ শিক্ষার দিন কি শেষ? ছন্দ আর প্রায়শ টপ্পার অলংকার, এ ছাড়া শুধু মেলোডি দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত ক্ষীণায়ু। যত ভাল গলাই হোক। 'হে বসন্ত হে সুন্দর।' নটরাজ ঋতুরঙ্গশালার, বসন্ত, কবিতা। শিল্পী নিজেই আবৃত্তি করলেন। 'প্রদীপের মত সুকণ্ঠ কাউকে দিয়ে করালে ভাল হত। বসন্ত কবিতার মর্মবাণী এগারোটি গানে খুঁজলে পাওয়া যায়। বসন্ত রাগের মদির বর্ণছটা আবার বৈরাগ্য বেদনায় ধূসরতা ছিল গানগুলিতে। দূর স্মৃতির অবুঝ বেদনার ভাবটি শান্তিদেববাবু আবেগ দিয়ে গাইছিলেন, 'মাধবী মঞ্জরী মনে আনে বারে বারে বরণের মালা গাঁথা স্মরণের পর পারে।' শেষ গান শুনে ঘড়ির দিকে তাকাই, বুঝি আর একটি বসন্ত চলে গেল।' 'চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন।'

কিন্তু শান্তিদেবই পিতামহ তুল্য রবীন্দ্রনাথের মাথার দিব্য নিয়ে বিশুদ্ধ রাবীন্দ্রিক ছাঁচে গান শোনালেন আর একবার। জানি না আমার মত কজন শ্রদ্ধা বেয়ে আগ্রহের সিঁড়িতে উঠতে থাকবেন। তবে মঞ্চের চৌতাল রূপকড়া প্রভৃতি তালে নিপুণ খোল তবলা সঙ্গতের সঙ্গে সঙ্গে আমার পিছন সীটে নগাড়ে চলছিল আর একটি তাল। চটি তাল। হায় রবীন্দ্র সদন। তুমি এত আরামের এত নরম। —কঙ্কলাল মুখোপাধ্যায়

মুনওয়ার আলি খাঁ

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর

নর্থ ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেল আয়োজিত ৯ম বার্ষিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ৮ এবং ৯ এপ্রিল 'অনন্যা' সিনেমা হলে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—ওস্তাদ মুনওয়ার আলী খাঁ, মুসারৎ আলী খাঁ, ওস্তাদ সৌকত আলী খাঁ, পদ্মশ্রী ফৈয়াজ আহমেদ, ওস্তাদ নিয়াজ আহমেদ, প্রফেসর সুভাষ চাকলাদার, প্রফেসর কালিদাস সান্যাল, শিশিরকণা ধরচৌধুরী, শিপ্রা বসু, দীপালি বর্মন, প্রফেসর ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, প্রফেসর মণিলাল নাগ, কানাই দত্ত, পণ্ডিত মহাপুরুষ মিশ্র, গোবিন্দ বসু, সুনীল দত্ত, চণ্ডী সরকার, মহম্মদ আসলাম খাঁ, মেহমুদ খাঁ বাচচেলাল মিশ্র, স্বর্ণেন্দু চ্যাটার্জি, অরুণ সাহা ও অরূপ দে প্রভৃতি।

ওস্তাদ মুনওয়ার আলী খাঁ, প্রফেসর সুভাষ চাকলাদার ও প্রফেসর কালিদাস সান্যালের রাগশ্রেয়ী কণ্ঠসঙ্গীত খুবই উচ্চ পর্যায়ের হয়। মণিলাল নাগের সেতার মুসারৎ আলী খানের স্বরোদ এবং শিশিরকণা ধরচৌধুরীর বেহালা সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। কানাই দত্ত, পণ্ডিত মহাপুরুষ মিশ্র এবং গোবিন্দ বসুর তবলা সবাইকে প্রচুর আনন্দ দেয়।

কানাকানি

পৃথিবীর অন্যতম সেরা ফিল্ম পত্রিকা সাইট এণ্ড সাউণ্ডের সমালোচকদের বিচারে ১৯৭৬ সালের সেরা দশখানি ছবি হোল—সেলিন অ্যাণ্ড জুলিয়া গো বোটিং (জ্যাক রিভেৎ), ফ্যামিলি প্লট (হিচকক), অল দি প্রেসিডেন্টস মেন (এলেন জে পাকুলা), সানসু দায়ো (কেনজি মিজোগুচি), ব্যারি লিন্ডন (স্টানলি কুব্রিক); ডাই ম্যারকুইস ভন ও (এরিখ রোহমার), এফ ফর ফেক (অরসন ওয়েলস), ডগ ডে আফটারনুন (সিডনী লুমেৎ), মিস্টেরী বেত্রকস (আর্থার পেন) ও মেন হু ফেল টু আর্থ (নিকোলাস রোয়েগ)।

*　　*　　*

চিত্রনাট্যে আছে নায়ক নায়িকাকে হোলির দিন রং মাখাচ্ছে। সারা মুখে লাল নীল রং, দৃশ্যটি গ্রহণের আগে নায়িকা নায়ককে বলল—'মুখে বেশী রং দেবেন না কিন্তু, আগে থেকেই বলছি।' চোখ মটকে পরিচালকের দিকে তাকিয়ে নায়ক জবাব দেয়—'স্ক্রিপ্টে যেমন বলা আছে তেমন করেই মাখাব। রিয়্যালিস্টিক ছবি এটা।'

আরতি

নায়িকা চিন্তিত হয়ে পড়েন। বলে ওঠেন—'না-না, মুখে রং দিলে কিন্তু খুব খারাপ হবে!' নায়ক রসিকতার সুরে বলেন—'রং মাখাবার সিনটা আসুক, মুডের মাথায় তখন কি করব, কিছু বলতে পারি! এখন।'

হাসি হাসি মুখে নায়িকার পাল্টা জবাব—'আমিও দেবো তাহলে আচ্ছা করে।' এই সংলাপের নায়ক-নায়িকা যদি সৌমিত্র-আরতি হয় তাহলে ভাবুন একবার দৃশ্যটি।

*   *   *

সম্প্রতি রাজ্য সরকার বাংলা
ত্র উন্নয়নের জন্য শিল্পী ও
নরদের পুরস্কৃত করেছেন। প্রায়
মুড়কির মত বিতরণ করা
হ পুরস্কারগুলি। পুরস্কার
ঘোষিত হবার পর যখন দেখা গেল
জনদের অনেকেই তো অসম্মানিত
, তখন ব্যবস্থা করা হোল
 'বিশেষ' পুরস্কারের। আরতি
য়কে দেওয়া হলো চরিত্রাভিনেত্রীর
কার। যতদূর জানা যায় যে,
র জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করা
হ তিনি তার নায়িকা চরিত্রের
। ব্যাপারটা এমন উল্টো হলো
 কানাকানিতে শোনা যাচ্ছে
কদের দু তিন জনই নাকি কোন
 একটা পুরস্কার ধরিয়ে দিয়ে
কে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন,
ু আরতি সান্ত্বনা পাননি। তিনি
খ্যান করেছেন পুরস্কার। যোগ্য
 বটে!

*   *   *

কিশোরকুমারের তিন নম্বর স্ত্রী
গতবেলাও এমন তাঁর হাতছাড়া
। বোধহয়। দাদা অশোককুমারের
 দণী দিয়েও যদি একটা সুবিধে
ও পারেন কি কিশোরকুমার।
গতবেলা গাঁটছড়া ছিঁড়ে ফেলতে
ছেন। মার কাছে খুব
কাটি করছে সে। অমন নিষ্ঠুর
ুষের সঙ্গে ঘরকরা তাঁর সাধ্য
 টুকটাক মনোমালিন্য তো
লই, এ বছর যোগিতার জন্মদিনে
 উঠলো নাটকীয় পর্যায়ে। আগেই
ব কথা হয়েছে জন্মদিনে কিশোর
 ওঁর বাড়ীতে। আনন্দ অনুষ্ঠান
 যোগিতার বাড়ীতেই। সকাল
 বাড়ীর সবাই অপেক্ষা করছে
রের। সকাল গড়িয়ে দুপুর
য় বিকেল হোল। কিশোরের
 নেই। সন্ধ্যেবেলা যোগিতা
তে এসে হাজির—
'ব্যাপার, আজ আমার জন্মদিন,
াড়িতে তুমি গেলে না কেন?'
া কাঁদো সুরে বলেছিল যোগিতা।
তে হাসতে নির্লিপ্ত সুরে কিশোর
 জবাব দিয়েছিল—'জন্মদিন
র আলাদা কিসের? জন্ম মৃত্যু
প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের ব্যাপার,
 আমার ভাল্লাগে না।' তখনই
ন্ত নিয়েছিল যোগিতা—'আর
 যথেষ্ট হয়েছে সংসার করা.......'

হরিপদ বর্মণ

শুভসংবাদ ছবিতে রাজশ্রী দীপঙ্কর

রূপ-রম্য-বীণা

২৩শে এপ্রিল, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে 'রূপ-রম্য বীণা' শিল্পীগোষ্ঠী নিবেদিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপনিষদের মন্ত্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে গীতি আলেখ্য নতুনত্বের দাবী রাখে। মন্ত্রগুলির সরস ব্যাখ্যা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করে। একক সঙ্গীতে বিশেষভাবে স্পর্শ করে খ্যাত-নামা বেহালা শিল্পী সলিলকুমার মিত্রের দরদী কণ্ঠে 'যায় যেন মোর সকল ভালবাসা' গানটি। একক সঙ্গীতে গীতা ব্যানার্জি ও গোপাল পাত্রের গান বিশেষভাবে মনকে আকৃষ্ট করে। পাঠে সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুনন্দিতা চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। যন্ত্র-সহযোগিতায় ছিলেন সলিল মিত্র ও অসিতকুমার ঘোষাল। গ্রন্থনা ও সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা বসু। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ।

কবি প্রণাম সংগীত

সংগীতা স্কুলের প্রাঙ্গণে (৩বি ললিত মিত্র লেনস্থিত কলিঃ-৪) রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে ২৫শে বৈশাখ-এর অনুষ্ঠান শুরু হল 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' বহুবিধ যন্ত্র এবং 'হে নতুন' সমবেত গান দিয়ে। দশ বছরের নীচে শিশু বিভাগের শিল্পীদের অনুষ্ঠান সত্যিই প্রশংসনীয়। এতে অংশ গ্রহণ করে নাচে শর্মিলা আঢ্য, গীটারে গৌতম শীল ও গানে লিপিকা, কৃষ্ণা, পাপীয়া, তরুণা ও সুমিত্রা চৌধুরী। এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানে গানে মাধুরী, শর্মিলা, উৎপলা, সতীনাথ দত্ত ও অবাক্ষা দাশগুপ্তা সাহা এবং অনিল দাসের পরিচালনায় নাচে চন্দ্রিমা, অনুরাধা ও শোভনা ঘোষ এবং শিবনাথ সাহার পরিচালনায় গীটারে আরতি, শোভা ও বীণা দাস সুশিক্ষার পরিচয় দিয়াছে।

নয়াগ্রাম-এর নয়া বসতি

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জীবনের সমস্যার ওপর তথ্যচিত্র তৈরি করা এ যাবৎকাল পর্যন্ত কতগুলি হয়েছে তার সঠিক হিসেব জানা না থাকলেও এ কথা সহজেই বলা যায় যে, তার প্রায় কোনটাই প্রতিনিধিত্বমূলক নয়। অথচ সরকারী প্রচার ভান্ডার থেকে অর্থ ঠিকই ব্যয় হয়েছে।

নয়াগ্রাম তথ্যচিত্রটি সেদিক থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। এ ছবি অন্ততঃ বাস্তবতাকে স্পর্শ করেছে। খড়গপুর থেকে একশো কিলোমিটারের মত দূরে নয়াগ্রাম গোপীবল্লভপুর বেল্ট। সেই অঞ্চলের মূখ্য বাসিন্দা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক। যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে জলের জন্য শহরের সঙ্গে সংযোগের এবং উপার্জনের সুযোগের অভাবে মৃতপ্রায় হয়ে ছিল। সরকারী তরফের একটি দল গিয়ে কি করে তাদের পানীয় এবং সেচের জল, কৃষি কাজের সুবিধা, শহরের সঙ্গে সরাসরি পথ সংযোগ ও আয়ের ব্যবস্থা করে সেই মৃতপ্রায় গ্রামকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলল দুই রিলের মধ্যে তাই ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন পরিচালক মৃণাল গুপ্ত। তাঁর পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা সুন্দর। ছবিটি একটি পরিবারের গল্পের মাধ্যমে বলা হয়েছে বলে আলাদা একটি স্বাদও পাওয়া যায়। আর তাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে ক্যামেরাম্যান তপন বাগচী চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। বস্তুত তাঁর ক্যামেরার গুণেই ছবিটি বাস্তব এবং হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট ডিটেলের কাজ লক্ষ্য করার মত।

সুকুমার সেনগুপ্তের সম্পাদনার কাজ মোটামুটি পরিচ্ছন্ন।

তবে একটি কথা। তথ্যচিত্র প্রচারমূলক হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই প্রচারের প্রচেষ্টা আর একটু সংযত করে রিয়েলিটির ওপর জোর দিলে বোধহয় এই ধনের ছবি আরও প্রতিনিধিত্বমূলক হয়। বিশেষ করে আদিবাসী অঞ্চলের জীবন যাপন, সামাজিকতা, তাঁদের সংস্কৃতি ইত্যাদির খুঁটিনাটি নিয়ে ছবি তৈরির ব্যাপারে তাঁদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও সমস্যার মূলকে স্পর্শ করার সর্বাধিক। আরও সচেষ্ট হবার অবকাশ থেকেই যায়। যেটা শুধুমাত্র কয়েকটি রেখাচিত্রে এবং নাচ, গান, মাদল ও বাঁশি বাজানো দেখিয়েই বোঝানো সম্ভব নয়।

ছবিটি প্রযোজনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তোলা হয়েছে ইস্টার্ণ সিনে কো-অপারেটিভ লিঃর ব্যানারে।

শান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জি

নায়ক মরে গেলে সিনেমা হয় না

এমনিতে হিন্দী সিনেমা বেশ ভালো। চোদ্দতলা হোটেল থেকে লাফিয়ে পড়ে নায়ক যখন নায়িকার কটি বেষ্টন করে নাচতে থাকে তখন খারাপ লাগে না। নাচ আছে, গান আছে, মারামারি আছে, সুন্দরী মেয়ে আছে, আর কি চাই? আমাদের পয়সা উঠে আসে। কিন্তু মুস্কিল হয় যখন পরিচালক গম্ভীরভাবে যাকে বলে পারিবারিক চিত্র। তা পরিবেশন করতে চান।

হাই ওঠে, কান চুলকোয়, হাসি এলেও হাসা যায় না। মুক্তি এইরকম। হল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলে নিজেকে সত্যিই মুক্ত মনে হয়।

কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে—তেমনভাবেই সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন কৈলাস শর্মা (শশী কাপুর) ও তাঁর তরুণী স্ত্রী (বিদ্যা সিনহা), ছোট্ট ভালোবাসা, অভিমান, ছোট্ট সন্তান ও বড় বা... এক কথায় ছবির মত জীবন। হঠাৎ ... কিশোরীকে লাঞ্ছনার হাত থেকে ... করতে গিয়ে শশী কাপুর ... পড়লেন মিথ্যা খুনের মাম... আদালতে বিচারের বাণী প্রথম ... নীরবে নিভৃতে কেঁদেই থাকে ... পর্দায়। এখানেও ব্যতিক্রম ঘটল ... প্রাণদন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত স্বামীর শেষ ... রোধে সীমা তাদের একমাত্র সন্ত... নিয়ে বোম্বাই শহরে এসে অন্য... বাঁচবার চেষ্টা শুরু করলেন।

ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে ... সেলাইয়ের কাজ—আপাতদৃষ্টিতে ... গুপ্ত পাথর-প্রতিমার জীবনে ... ছন্দপতন ছিল না। এই সরল ... নষ্ট করে দিলেন প্রতিবেশী ... (সঞ্জীবকুমার)। বাইরে থেকে ... মদাপ কিন্তু হৃদয়বান এক ... এইবার নায়িকার সমস্যা দেখা ... একদিকে বিগত বসন্ত ও কৈশ... স্মৃতি অন্যদিকে কৃতজ্ঞতা ও ... ভালোবাসার প্রতিদান।

নায়ক মরে গেলে সিনেমা হয় ... শশী কাপুর এদিকে ফাঁসির ... বদলে চোদ্দ বছর কারাবাস করে মু... পেলেন। স্ত্রী-কন্যার সন্ধানে বোম্বে এসে গোপনে দেখলেন জীবন ... প্রকৃতই চোদ্দ বছর অতিক্রান্ত। ... দ্বিতীয় জীবনে প্রবেশ করেছে সে... নায়ক তিনি নন। আর গল্প ... দরকার নেই। শুধু একটা কথা। ... চালক শ্রীরাজতিলক ... সে ভারতীয় নারী আদর্শ ... সাবিত্র, তারা পতি-চারিনী হতে ... না। বেচারা সঞ্জীবকুমার। তার ... উপায়ও ছিল না।

ছবির প্রথম পর্ব মন্থরগতি ... মোটামুটি সংহত। দ্বিতীয় পর্বে ... চালক তালগোল পাকিয়েছেন। সঞ্জ... কুমারের চরিত্র কিছুটা রক্ত-মা... যুক্ত। শ্রীমতী বিদ্যা সিনহা ... ফাটিল তবু মুখ ফুটিল না ... একটি ভূমিকার পক্ষে কোনক্রমে ম... সই, তবে প্রচুর কেঁদেছেন। এই ... প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চোখের ... স্যাঁৎসেতে। এমনকি শশীকাপুরের ... স্মার্ট লোকেরও নিস্তার ছিল ... রাহুল দেববর্মন ছবির প্রয়োজনে স... সংগত রচনা করেছেন।

শান্ত ধরনের বোকামি—এ... প্রসঙ্গে এটাই শেষ কথা।

সঞ্জয় মুখোপা...

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

আপনার ত্বকের সবচেয়ে ভালো যত্ন নেয়-
ল্যাক্টো-ক্যালামাইন

ক্রুকস
ল্যাক্টো-ক্যালামাইন মুখশ্রী পরিচর্য্যার গোপন রহস্য

১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা
২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
3rd, JUNE, 1977

প্রচ্ছদ শিল্পী নিতাই ঘোষ
বি এঁকেছেন
গুপ্ত এবং সন্তোষ গুপ্ত

জাতীয় গ্রন্থাগারে ত্রিশংকুর রাজত্ব

জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠানটিতে বিজাতীয় কাণ্ডকারখানা শুরু হয়েছে বহুকাল আগেই. ইদানীং বোধ করি চলছে সেখানে কলাগ্রাসের পালা।

গ্রন্থাগারে কোনো গ্রন্থাগারিক নেই, কাজ চালাচ্ছেন সহকারী গ্রন্থাগারিক। কর্মচারীদের ১০০টি শূন্য পদ পড়ে রয়েছে বছরের পর বছর। পুস্তক তালিকা 'অসম্পূর্ণ' এবং অগোছালো। নতুন বইয়ের সংখ্যাও ক্রমক্ষয়িষ্ণু।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে স্বয়ংপরিচালিত করার জন্যে একটি আইন পাশ করেছেন। তারপর আট-ন'মাস গদিতে আসীন থাকা সত্ত্বেও সেদিকে আর দ্বিতীয়বার দৃকপাত করেননি। ফলে গ্রন্থাগারটির অবস্থা হয়েছে এখন ত্রিশংকুর মতো। না আছে সেখানে পুরনো অবস্থা, না ঘটেছে নতুন পরিবর্তন।

স্বয়ংপরিচালিত প্রতিষ্ঠান তৈরি করার আইন অবশ্য পাশ করানো হয়েছিল খুবই তাড়াহুড়ো করে। আগে একবার '৭২ সালে এই বিল পাশ করানোর চেষ্টা বাধা পেয়েছিল লোকসভায়। হয়তো সেই কারণেই জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে পুরনো সরকার তাঁদের জেদ রক্ষা করেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ের দ্বিধা এবং দীর্ঘসূত্রতা দেখে সন্দেহ জাগে, তাঁদের সুচিন্তিত কোনো পরিকল্পনা ছিল কিনা, কিংবা তা থাকলেও সে বিষয়ে তাঁরা আন্তরিক ছিলেন কিনা।
এর আগে '৭৩ সালেও একবার একটি পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়েছিল, তাতে ছিলেন একজন সরকারী ও দু'জন বে-সরকারী প্রতিনিধি। পরিষদের সভাপতি ছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। কিন্তু গত চার বছরে পরিষদের অধিবেশন বসেছে মাত্র একবার, যদিও ডাঃ রায় কলকাতায় থাকলে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকেন গ্রন্থাগারে। প্রতিষ্ঠানটি চলছে যথারীতি আমলাতান্ত্রিক উপায়েই।

কিন্তু বিশৃংখলার ফিরিস্তি লম্বা করে লাভ নেই। আসল গোলমাল ঘটেছে চিন্তার অপরিচ্ছন্নতার জন্যে।
জাতীয় গ্রন্থাগার বলতে কী বুঝব আমরা, সেইটেই আসলে অস্পষ্ট। গ্রন্থাগার তো দেশে কম নেই, এবং কোনো-কোনোটি খুব ছোটোও নয়। তাহলে বিশেষ একটি গ্রন্থাগারকে 'জাতীয়' আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করব কেন? বইয়ের সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ বলে?, খুব জাঁকালো একটি বাড়ি এবং মস্ত বড় বাগান আছে বলে? এসব তো গুণগতভাবে কোনো গ্রন্থাগারকে বিশেষ কৌলীন্য দিতে পারে না! কেননা বছরে মাত্র ৫ লক্ষ টাকার বই কিনে কতো দিন পাল্লা দেবে এ-গ্রন্থাগার অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে? আমাদের দেশেই তো কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এর চেয়ে বেশি টাকা দিয়ে বই কেনা হয়। আর বাড়ি বাগান?—এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা না করাই ভাল।

দেশের বর্তমান সরকার এবং তার শিক্ষাবিভাগ যদি এখন নতুন করে কর্মনীতি ঠিক করে দেন ভালো হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের মতো একটি প্রতিষ্ঠানকে হালহীন নৌকোর দুর্গতিতে [illegible] মজতে দেওয়া ঠিক হবে না।

বৈকুণ্ঠকে নিবেদন

'অমৃত' পত্রিকায় বৈকুণ্ঠ পাঠক মাঝে মাঝেই আর এক সাপ্তাহিকের বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি' সুলভ চরিত্রহননে ব্রতী হন। তাতে সেই সাপ্তাহিকটির কতটা ক্ষতি হয় জানি না, তবে অমৃতের দীর্ঘ সতেরো বছরের পাঠক হিসাবে অস্বস্তি বোধ করি।

বৈকুণ্ঠ পাঠক বলেছেন বঙ্গদর্শন সবুজপত্র, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, কল্লোল যেমন সাদা কালোয় ছেপে প্রকাশিত হত অমৃতও ঐতিহ্য অনুযায়ী সেইভাবেই প্রকাশিত হবে। কিন্তু ঐতিহ্য মেনে চললে প্রচ্ছদেও মেনে চলতে পারতেন, রঙীন অফসেটের বিড়ম্বনা কি অমৃতের সহ্য করা উচিত? ঐতিহ্যানুসারী কাঠের ব্লক ব্যবহার করা যায় না?

উনি লিখেছেন 'অমৃত' 'সাবালক পাঠকের কাগজ'। তাই যদি হয় তবে অন্য সাপ্তাহিকের অন্তঃসার শূন্য (!) রঙীন হাতছানিতে এত ভয় কি? সাবালক কি কখনো মাকাল ফলের লোভে হাত বাড়ায়? দু' একটা সংখ্যা ভুল করে পড়ে ফেললেও ফের তো ভালো লেখার খোঁজে অমৃতের পাঠক হবেই।

নবীন প্রতিভার খোঁজ 'অমৃত' মাত্র গত চারমাস ধরেই করছে, এ-কথা বৈকুণ্ঠ পাঠক কোথা থেকে জানলেন? অমৃতের শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত যাঁর নাম সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত সেই শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারতেন, 'অমৃত' চিরকালই তথাকথিত খ্যাতিমানদের পেছনে না ছুটে নবীন লেখকের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন খ্যাতিমান।

নতুন কিছু দেখলেই 'গেল গেল' রব তোলা সুস্থতার লক্ষণ নয়। অমৃত সাহিত্য শিল্পে দারোয়ানী বা মাস্টারীতেও বিশ্বাসী নয়, ভালো কথা, কিন্তু পরশ্রীকাতরতা কিন্তু বৈকুণ্ঠের সাবালকত্বের পরিচায়ক নয়, যখন অপর সাপ্তাহিকটি তাঁদের সৌজন্য বজায় রেখেছে। সুকুমার রায় কি বৈকুণ্ঠ পাঠক সম্বন্ধেই লিখেছেন—'আকাশের গায়ে কিবা রামধনু খেলে। দেখে চেয়ে কতলোক সব কাজ ফেলে। তাই দেখে খুঁৎ ধরা বুড়ো কয় চটে। দেখছ কি, এই রং পাকা নয় মোটে।।'

অশোক চট্টোপাধ্যায়,
১২বি, হেমচন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-২৩।

মনে প

১৯৭০ সালে যখন আমি ...টি কলেজে ভর্তি হতে যাই সেদিনকার আমার জীবনে কেয়াদির জন্য স্মরণীয় আছে। দুপুর দেড়টা নাগাদ কলেজে ... হওয়ার জন্য যাই, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ... মার্কসীট দেখছিলেন এমন সময় ... সুশ্রী মতোন মহিলা চশমা চোখে এ... বই হাতে ঘরে ঢুকলেন, পরণে হলুদ শাড়ী, একটু যেন ক্লান্ত। অধ্যাপক ব... "দ্যাখোতো কেয়া একে ভর্তি করা ... কিনা?" বলে আমার মার্কসীট ... দিলেন। তখনই চিনলাম শ্রীমতী ... চক্রবর্তীকে। মৃদু হাস্যে মার্কসীট ... দেখতে হাসিমুখে আমার দিকে ... বললেন, তোমার বাড়ী কোথায়। ম... বাংলার ছেলে আমি, মাথানীচু করে ... দিলাম। তারপর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ... বের হবো এমন সময় কিছু ছেলে ... নিয়ে কলেজ আক্রমণ করলো। প্র... উল্লেখ্য উক্ত কলেজ তখন এস এফ ... ইউনিয়নের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ... মেয়েদের তখন ভীষণ ভীতি, সবাই ... ঝাঁপ শুরু করল। আমিও নার্ভাস ... করছিলাম। বারান্দার এক কোনে দাঁ... ছিলাম। কেয়াদি কোত্থেকে এসে ব... 'কী এখানে দাঁড়িয়ে কেন হলঘরে ... পরে অন্যান্যদের উদ্দেশ্য করে ব... বেচারা আজই প্রথম দিন কলেজে ... হতে এসেছে আর আজই এই ... এরপর প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হ... বিকালের দিকে প্রায় তিনটা নাগাদ ... এলে আমরা কলেজ থেকে বের হতে পা...

ক্লাসে আমি ছিলাম ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে বয়সে বড়ো, বোধহয় ৩।৪ ব... বড়ো। স্বভাবতঃই ... সময় পিছনের ... বসতাম; আর ... খুব লাজুক ছি... কিন্তু কেয়াদি ক্লাসে এসেই বলতেন ... পিছনে বসো কেন? কিছু বুঝতে অ... হলে জিজ্ঞেস করবে। মনে আছে ক... বা পথে বা কলেজ গেটে দেখা হলে ... জিজ্ঞাসা করতেন। মাঝে মধ্যে ... 'তোমরা নাটক দ্যাখো না? আমরা ... করছি, দেখতে এসো।' তখন উনি না... নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতেন। ওঁর ... বার্নার্ড শ'এর আর্মস অ্যান্ড দি ... আজো কানে বাজে। কলেজ ছেড়ে চা... প্রয়োজনে পুরুলিয়া জেলায় ... আসি। ওখানে উনি ১৯৭৪এ তিন ... পালা করতে আসেন। এবং খুবই আ... বিষয় ষ্টেশনের কাছে আমাকে ... থাকতে দেখে হাসিমুখে কাছে ড... এবং কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই ... 'দীপক তুমি এখানে?' হাজার ... ছেলেমেয়ে প্রতি বছর কলেজ থেকে ... করে বের হচ্ছে তার মধ্যে আমার না... মনে থাকায় খুব অবাক হলাম।

চাকরী করি জেনে খুশী হলেন। বললেন সন্ধ্যাবেলা আসছো আমাদের নাটক দেখতে? তখন সদ্য রেল ধর্মঘটে যোগ দিয়ে চাকুরী গেছে তা বলা হয়নি, শুধু বললাম, না কেয়াদি নাটক দেখা হবে না। একটু অসুবিধা আছে।" যারা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তারা আমাদের বিরোধী পক্ষ। একথা বলা হয়নি।

পরে কতোদিন ভেবেছি কলকাতা গিয়ে ভালোমানুষ, আন্তিগোনে, তিন পয়সার পালা, ফুটবল দেখবো। কিন্তু আজ তা আর হলো না। কতোদিন কফিহাউসে মাননীয় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে দূরে থেকে দেখেছি, ভেবেছি কেয়াদিকে বলবো একটু আলাপ করিয়ে দিতে তা আর হয়ে ওঠেনি। কলেজে সহপাঠী ও সহপাঠীনিদের মধ্যে কেয়াদিকে নিয়ে কতো আলোচনা হতো—বিশেষতঃ ও'র নাটক পড়ানো নিয়ে। —আজ উনি নেই, কিন্তু ও'র স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সব সময় মনে হচ্ছে নিশ্চয় বেঁচে আছেন, আবার ভালোমানুষ দেখা সম্ভব হবে।

যাইহোক যাঁরা সুটিং করতে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ না কেউ কেয়াদিকে জলে পড়তে নিশ্চয় দেখেছিলেন। যদি তখন-ই ওরা ব্যবস্থা নিতেন তবে কেয়াদি বাঁচতেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কেয়াদি যে জীবনকে বড্ডো ভালোবাসতেন। বেঁচে থাকার সংগ্রামকে উনি খুব মূল্য দিতেন! স্টীমার থেকে (নাকি নৌকা?) জলে পড়ার শব্দ কেউ কি শোনেনি? তাছাড়া ছবির নায়িকা বা অভিনেত্রী সঙ্গে রয়েছেন কেউ না কেউ ঠিক তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখছিলো সুতরাং হঠাৎ উধাও হলেন এ অবিশ্বাস্য! আবার কেয়াদির মতো অতি প্রাণবন্ত সাবধানী মহিলা অসম্ভব কিছু করবেন এও অবিশ্বাস্য। যদি সত্যের খাতিরে বলা হয় উনি ইচ্ছা করে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন পরিচালকের নির্দেশে তবে কী উনি সাঁতার জানতেন? অবশ্য চোরা স্রোতের টানে সাঁতার জানা না জানা সমান কথা।
—দীপককুমার ঘোষ, আদরা।

শেষ সাক্ষাৎকার

২৫ মার্চের অমৃততে, শ্যামাপ্রসাদ সরকারের শেষ সাক্ষাৎকারে কেয়া দেবী দুই রূপে প্রতিফলিত। তাঁর এই প্রতিফলন পাঠকের হৃদয়কে শ্রদ্ধায় পূর্ণ করেছে, মাত্র দুটো সংলাপে—(১) "যে সব ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকে ইংরেজি ভাষা শেখার ঠিকমত সুযোগ পায়নি, তাদের হঠাৎ জোর করে ধরে (পার্সেন্টেজ এবং পরে চাকরীর লোভ দেখিয়ে) শেকসপীয়র শেলী, কীটস্ পড়ানো আমার হাস্যকর প্রহসন বলে মনে হত"।

(২) "বার্নার্ড শ'-এর সেন্ট জোন নাটকের জোন্ অভ আর্ক এবং বার্কের 'মাদারের' মা চরিত্র আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়"।

এঁর মতো প্রতিভাকে অকালে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিতে নিশ্চয়ই মন সায় দেয় না, দেওয়া উচিতও নয়।

আজ, ক্ষতবিক্ষত মুখ, ভাঙ্গা হাত নিয়ে তার মৃতদেহ পাওয়ার পরও তাঁর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে মেনে নিতে পারি না।

আমার দুটো অনুরোধ রাখছি যথাক্রমে কমিশন ও শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে।

যিনি চিরকাল প্রহসন বিরোধী, তাঁর মৃত্যু রহস্য যেন প্রহসনের প্রদীপ হাতে নিয়ে খুঁজতে না যাওয়া হয়। তাঁর মৃত্যুর সঠিক খবর যেন সাহসের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদবাবুর লেখায় মূর্ত হয়ে ওঠে।
—দেবেশ চক্রবর্তী, কলকাতা-৩১।

অমৃত প্রসঙ্গে

'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। বর্তমানে 'অমৃত' নতুন নতুন বিচিত্র লেখার সম্ভার নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে। এর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলা ভাষায় এরকম ভাল পত্রিকা নেই বললেই হয়। ১৬ বর্ষ ৩৯ সংখ্যাটির জন্য আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সংখ্যা থেকে লেখক বিভূতিভূষণ এবং তাঁর লেখা সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। ভবিষ্যতে এরকম সুসাহিত্যিক এবং তাঁর লেখা সম্বন্ধে আলোচনা 'অমৃতে' উপহার দেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। ১১ মার্চ, '৭৭ সংখ্যাটিতে 'নির্বাচনে নারী' লেখাটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে।—সমীরকুমার চাকী, মসাট, হুগলী।

ডিজেলের গন্ধ পাখির গান

অমৃত নতুন চাকচিক্যে অঙ্গসজ্জা প্রচ্ছদে খুবই সুন্দর ও মনোরম হয়ে উঠেছে একথা স্বীকার্য, তাছাড়া ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা বৈকুন্ঠ পাঠকের সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা তো আছেই। ১ এপ্রিল ১৯৭৭ (১৬ বর্ষ, ৪৫) সংখ্যা হাতে পেয়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি। বিশেষত তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডিজেলের গন্ধ পাখির গান' লেখাটি পড়ে। তিনি একদিকে যেমন তুলে ধরেছেন ডিজেলের গন্ধে ভরপুর ব্যারকপুর শহরের কর্মচঞ্চলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, পুরানো গীর্জা, সাধু বথলমরের উপাসনা গৃহের কথা। তেমনি তুলে ধরেছেন পাখির গানে ভরপুর সবুজ গ্রামের কথা, এরফান মিয়ার কথা, সাহিত্য সভার কথা, ইস্কুল মাস্টার শিবদাস সান্যালের কথা।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা মাঝে মাঝে উপহার পেলে আমরা পাঠকরা খুশী হব। গোপাল ঘোষ, সমীর ব্যানার্জি, আতপুর, ২৪ পরগণা।

অভিনব

'বিভূতিভূষণ' সংখ্যা থেকে 'সক্রেটিসের জবানবন্দী',— অমৃতের অভিনবত্ব ও স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি, স্পষ্ট করে তুলেছে আমার মত একজন তরুণ লেখককে। সত্যিকথা বলতে অমৃত একসময় আংশিক ভালবাসার আড়ালে রাখতাম। এই কটি সংখ্যায় তাকে নতুন রকতে অনুভব করতে পেরেছি বলে নিজের গর্ব হচছে নতুন করে। কেবল আমার মত মফঃস্বলের একজন লেখকের কাছে অমৃতের আত্মপ্রত্যয় নিবিড় হয়ে উঠেনি। যেখানেই গেছি—অর্থাৎ স্টল, বইয়ের দোকান, হকারের কাছ থেকে অমৃত কিনছেন অজস্র পাঠক। মফঃস্বল শহরে যেতে একদিন দেরী হলেই অমৃত হুশ করে নাগালের বাইরে। গত ৮ এপ্রিলের অমৃতে 'সক্রেটিসের জবানবন্দী' পড়ে খুব বেশী আনন্দ পেয়েছি। এ সংখ্যার 'সিনেমা, মুনাফা এবং জনরুচি', 'এক টাকায় সন্তোষকুমার, গৌরকিশোর', 'সাহিত্যে গুদাম সাবার সেল' আমাকে চাওয়ার থেকে অনেক বেশী দিয়েছে। দেবাঞ্জনের ভালবাসা, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আলতামিরার সেই কুকুরটার জন্যে' ('ইচ্ছে ছিলো') আমিও সমান কষ্ট পেয়েছি। এছাড়া কবিতা সিংহের কবিতা, সুরজিৎ দাশগুপ্তের 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' নিবন্ধ স্মরণীয়। শোভন মহাপাত্র, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর।

বাহার চাচার নাম মুস্কিল আসান

বাহার আলি শা। ওরফে বাহার ফকির। গাঁয়ের কেউ কেউ বলে বাহার চাচা। আবার কেউ বলে বাহার দাদু। বয়স প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই। বয়সকালে যে বাহারের রূপের জলুষ ছিল এই আশিতেও তার আঁচ মেলে। জন্ম থেকেই আল্লা একটা চোখ নিজের কাছে গচ্ছিত রেখেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল বাহার চাচাকে। বাহার পৃথিবীর আলো দেখেছিল এক চোখে। বয়সের চাপে গায়ের মাংস লোল হয়েছে। বয়সই লম্বা দেহটা নুইয়ে দিয়েছে খানিক। গায়ের রঙে ছেদ পড়েছে। সব কিছুই যেন বদলে গেছে। বাহার চাচা কিন্তু এখনও ওই দোমড়ানো-তোবড়ানো শরীর নিয়ে বাস্তুঠাকুর 'ওলাবিবির' পুজোর জন্যে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে পয়সা-চাল-ফল-ফসল জোগাড় করে বেড়ায়। হাতে থাকে একটা চ্যাঙারি। তারই ভেতর বসান থাকে সিঁদুর মাখানো ঠাকুর। গাঁয়ের কেউ ফেরায় না চাচাকে। কেটেদল গাঁয়ের একেবারে শেষ মাথায় বাহার চাচার তালপাতার কুঁড়ে। তারই সঙ্গে লাগোয়া বাস্তুঠাকুর 'ওলাবিবি'র আটচালা। কতগুলো বড় বড় গাছে ঘেরা জায়গায়টার সব সময়ই একটা ছায়া ছায়া ভাব।

ভিন গাঁয়েও এই 'ওলাবিবি'র নাম ডাক আছে। সেই সঙ্গে বাহার চাচাকেও চেনে অনেকে। অরও বেশী চেনে, ওঝা বলে। সাপের ওঝা। শোনা যায় চাচার বাপঠাকুরদাও নাকি সাপের বিষ নামাতো। তবে বাহার চাচার মত এত নাম ডাক তাদের ছিল না। মন্তর-টন্তর চাচা অনেক জানে। শোনা যায় বোড়া কেউটে এই রকম ভয়ানক সব সাপের বিষ চাচা তুরন্ত নামিয়ে দিতে পারে। অনেক শেকড়-বাকড় দিয়ে ওষুধও তৈরী করে। চাচার কাছে কি সব জড়ি-বুটিও অছে। গ্রাম গঞ্জ চুঁড়ে, খোল-কাড় আর জঙ্গল থেকে সে সব জোগাড় করে চাচা। তার ছেলেরা কিন্তু তার পথ মাড়ায়নি। সবাই পরের জমিতে মুনিষ খাটে। মাঝে মাঝেই চাচা বলে, 'ছেলেদের মধ্যে একজনকেও আমার কাজে লাগাতে পারলুম নি।'

মনে আছে আমাকে একবার একটা বিছে কামড়েছিলো। জ্বালা আর যন্ত্রনায় ছটফট করছি। তখন বাহার চাচাকে খবর দেওয়া হয়। চাচা এসে কি একটা কালো রঙের পাথরের মতন বুলিয়ে দিতেই কাটা জায়গায় মনে হল বরফের মতন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

বাহার চাচা এমনি আরও [illegible]নেক কিছুই তাকতুক জানে। সব সময়েই বাহারের মুখে লেগে থাকে বাহারী হাসি। এ এলাকার অনেক খবরই রাখে সে। শুধু রাজনীতির কথা বাদে। রাজনীতি সে বোঝে না। রাজনীতির নেতাদের নাম চাচা বড় একটা জানে না। দু-একজনের নাম প্রায়ই শোনে। মনে রাখতে পারে না। সিনেমা-থিয়েটার দেখে না। গান ভালবাসে। এই বয়সেও যাত্রা দেখার ঝোঁক আছে। কাছাকাছি কোথাও যাত্রা হলে এখনও আগে গিয়ে নিজের বসার ঠাঁইটি করে নেয়। চাচার অনেক যজমান আছে। তারা চাচাকে ভালও বাসে। জমির আলুটা-মুলোটা মৌসুমের যা আনে চাচার জন্যে। রাত্রিতে কোথাও বেরুলে বাহার চাচা একটা কালো লাঠি নিয়ে বেরোয়। বলে ওই লাঠিটাকে নাকি মা মনশার পোলারা খুব ডরায়। এই বয়সেও কোন কিছুকেই ভয় নেই। ডাক পড়লে অন্য গাঁয়ে এখনও যায়। গাঁয়ের অনেকেই চাচাকে বলে 'মুশকিলের আসান।'

নারায়ণরঞ্জন দত্ত

গত জন্মের রাস্তা

প্রত্যেক মানুষ একবার তার নিজের মুখোমুখি হয়। সারা জীবনে অন্তত একবার। তখন তার মনে হবে—সে বুঝি একদম আচমকা তারই গত জন্মের রাস্তায় এসে পড়েছে। প্রায় পথ হারিয়ে।

এ জন্মের সঙ্গে সে-জন্মের যোগ এই রাস্তাটুকু। যার আগাগোড়া গোধূলি লগ্নে আচ্ছন্ন। শুরু দেখা যায় না। শেষটুকু ঝাপসা। মাঝখানে কেবল খানিক জায়গা ঝকঝকে উজ্জ্বল—লাল সুরকি বিছানো—যার ওপর শেষ রাতের জ্যোৎস্না কিংবা বেলা শেষের ভোঁতা রোদ চৌকো হয়ে পড়ে আছে।

রাস্তার গায়েই একটা ভাঙা সুরকি কল। অনেক দিন সেখানে কাজ বন্ধ। ফেলে যাওয়া সুরকির খানিকটা মাটি হয়ে যাচ্ছে। তাতে আকন্দ জন্মেছে। দুধ-বেগুনি ফুল। সবুজ পাতা। নরম ডাল ভাঙলে সাদা কষ। সেখান থেকে পথের ওপর বুনো গাছপালার টক গন্ধের ঝাঁঝ ছড়িয়ে পড়ছে।

পাশের মাঠটায় একটা বাতাবি লেবু গাছ। তাতে প্রমাণ সাইজের বাতাবিরা ঝুলে আছে। আরেকটু দূরে বিশাল বকুল গাছ—তার গোড়ায় একদল ছেলেমেয়ে ফুল কুড়োচ্ছে। ঝরা বকুল। বুনো লতাকে সুতো করে সবাই যেন কম্পিটিশনে মালা গেঁথে চলেছে। মর্নিং স্কুল। আজ সামার ভ্যাকেশন শুরু হবে। সবাই গিয়ে স্যারের গলায় মালা দেবে। হাতে দেবে টগরের তোড়া।

রাস্তার যেখানটায় শেষ—সেই ঝাপসা মত জায়গা থেকে অনেকক্ষণ হল একটা ঘোড়ার গাড়ি রওনা হয়েছে। যাবে রাস্তার শুরুতে। মাঝে আছে আলোর চৌকোর ভেতর সুরকি বিছানো সেই উজ্জ্বল জায়গাটুকু। টক বুনো গন্ধে বাতাস ভারি। হাড় বের করা প্যাটকেল রঙের দুটো ঘোড়া অনেকক্ষণ ধরে দুলতে দুলতে নিয়মিত তালে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু এসেও আসে না। কিছুতেই উজ্জ্বল পথটুকুতে গাড়িটা এসে পৌঁছয় না। পৌঁছতে পারছে না। যেন অনেকটা পথ। অথচ পরিষ্কার দেখা যায়—পথ তো তেমন নয়। তবু কেন এমন হয়?

কতকাল পরে বাতাবি পেড়ে নিয়ে এইমাত্র একদল ছেলে মাঠ জুড়ে খেলতে শুরু করেছিল। তাদের একদিকের গোলকি এগেইনসট্ পায়রার ফরোয়ার্ডের পা থেকে বাতাবি কেড়ে নিয়ে মাঝ মাঠে ছুঁড়ে দিল।

অমনি ধড়মড় করে সুরকি কলটা চালু হয়ে গেল। আর জলদাগী, ঝামা, কালচে পোড়া বদখদ খোয়াগুলো বিশাল লোহার চাকার নিচে ছাতু হতে হতে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল ভীষণ শব্দ করে। চাকার জিভ দিয়ে তখন সুরকি রঙের রক্ত গড়াচ্ছিল।

এই সময় অতীতকাল থেকে ফেলে আসা একটা বাতাস উঠলো। তাতে গত জন্মের রাস্তার দু' ধারে সবুজ শিয়াল-কাঁটার বেঁটে বেঁটে চারার মাথায় হলুদ বরণ এক রত্তি ফুলগুলো ঝলমলিয়ে উঠেই আবার অন্ধকার নিল।

তখনো ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়িটা এসে পৌঁছয় নি। সেই কখন রওনা দিয়েছে। অথচ এসেও আসে না। ওর আর রাস্তা ফুরোয় না। কত যে রাস্তা—

কিন্তু পরিষ্কার দেখা যায়—সব মিলিয়ে রাস্তা বড়জোর আধ মাইল। এই সময় মনে পড়বে—এ পথ দিয়ে আমি হেঁটেছি একদিন। ওই মাঠে আমিও বাতাবি পিটিয়ে কলতান তুলে বল খেলেছি। ওই ফুলগুলো দিয়ে আমারও একটা মালা গাঁথা ছিল। ওই সুরকি কলের সুরকি ছত্রিশ বস্তা বাবা কিনে এনেছিলেন গরুর গাড়ি বোঝাই দিয়ে। তাই ছিল আমাদের বাড়ির গাথুনির মশলা।

এইমাত্র ঘোড়ার গাড়িটা আলোর চৌকোর ভেতর ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে গাড়িটা আর বেরোতে পারছে না। প্রায় যেন জায়গায় দাঁড়িয়েই চলছে। ঘোড়া দুটো নিয়মিত তালে দুলছে। বর্ষাকালে ভিজে ঘাসের ওপর চলন্ত মোটরের চাকা এভাবেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পিছলে গিয়ে ঘুরতে থাকে। অনেকটা সে রকম।

তখুনি গাড়ির দরজা খুলে একজন নেমে এল। সিঁথি কেটে আচড়ানো মাথা। ধুতি পাঞ্জাবি। পাম্প সু। ভারি মুখ। বুক পকেটে কলম। একটা পকেট বেশি ঝুলে পড়েছে। ওখানে অফিসের ড্রয়ারের চাবির গোছা।

জোরে ডাকলাম। এই বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ—

বৈকুণ্ঠ কিছুই শুনতে পেল না।

আলোর চৌকোর বাইরে দু' দিকেই গোধূলি এসে পথের বাকিটা ঝাপসা করে দিয়েছে। এইমাত্র।

মাঠে দাঁড়িয়ে তবু ডাকলাম। বৈকুণ্ঠ। এদিকে তাকিয়ে দ্যাখ। দ্যাখ কে ডাকছে তোকে। চিনতে পারিস?

ও তাকালো। ফ্যাল ফ্যাল করে। কিছুই চিনতে পারলো না।

আমি আমাকে দেখতে পেলাম। আয়না ছাড়াই। সেই শেষবার। সেই প্রথম-বার।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

আধুনিক কবিতা

অমৃতের পাতায় সমর সেন বলেছেন—কবিতা খুব জটিল হয়ে গেছে। সবারই লেখা একরকম মনে হয়, আলাদা করে কাউকে চেনা যায় না। আমাদের সময়ের কবিদের আলাদা করে চেনা যেতো।

সবার লেখা (কবিতা) একরকম মনে হয়, আলাদা করে কাউকে চেনা যায় না—মন্তব্যটি নতুন নয়। আগেও ঠিক এই মন্তব্য আরো দু-একজন 'গুণী' ব্যক্তির মুখে শুনেছি আমরা। কিন্তু সত্যিই কি তা-ই? আলাদা করে চেনার কি উপায় নেই? তবে কি অমৃতের বিভিন্ন সংখ্যায় মানস রায়চৌধুরী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, কবিতা সিংহ, রাম বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কবির কবিতাগুচ্ছ কবি-পরিচিতিসহ আলাদা আলাদা করে যেভাবে চিহ্নিত হয়েছে, তা-কি আজগুবি? নিরপেক্ষভাবে বিষয়টিকে একটু বিচার করে দেখা যাক।

আধুনিক কবিদের কবিতা আলাদা করে চেনা যায় না, (ব্যতিক্রম ভিন্ন) তার প্রধান কারণ পাঁচটি। এক—বর্তমানের প্রায় সব কবিতাই যুগমানসের ছবি। কবি নামক ব্যক্তিটি সেখানে থেকেও অনুপস্থিত। দুই—কারো কারো কবিতায় দুর্বোধ্য শব্দের ঘনঘটা। এবং কবিতার বক্তব্য অস্পষ্ট। তিন—গদ্য ছন্দ। চার—কবিতা নিয়ে চলেছে হাজারো রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভাঙাচোরা। পাঁচ—কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে ক্রোধ, ক্ষোভ, জীবনযন্ত্রণা, হাহাকার এবং আরো কিছু। এদের অনেকগুলিই, বৈকুণ্ঠ পাঠকের ভাষায় বলি, 'ঠোঙা' হয় জন্ম মুহূর্তেই। কিন্তু তবু, কোন কোন আধুনিক কবিকে (যুগসন্ধিক্ষণের কবিকে) আলাদা করে যদি চিনতে না পারি, তবে সে দোষটা আমাদের, তাঁদের নয়। সমর সেনের সময়ে কবিদের আলাদা করে যে চেনা যেত তার কারণ তাঁদের সময়ের কবিদের সংখ্যা এবং সন্ধিকালের কবিদের সংখ্যার মধ্যে ফারাক বিস্তর।

শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলা রকেটের মধ্যে বসে রকেটের গতি বোঝা যায় না। রকেটের গতিকে বুঝতে হলে রকেট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়। ঠিক সেই রকম এই সন্ধিক্ষণের কবিতাকে সঠিকভাবে বুঝতে আরো বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে। এই যুগের কবিদের মূল্যায়ন, সু-ঠিক মূল্যায়ন, এই মুহূর্তেই সম্ভব নয়। সন্ধিক্ষণের অবসানেই স্পষ্ট করে বোঝা যাবে, এঁদের সৃষ্টি আলাদা কিনা।

সবশেষে আরও কটা কথা বলার আছে। 'কবিতা খুব জটিল হয়ে গেছে'—উক্তি প্রসঙ্গে বলি, একথা ঠিক। যে-যুগে আমরা আছি, সে-যুগটা কি জলবৎ তরলম্? নাকি জটিল? সৃষ্টি তো বাস্তববিহীন হতে পারে না। যুগের প্রভাব পড়েনি, এমন কোন সাহিত্য আছে বলে আমাদের জানা নেই। সুতরাং কবিতাকে জটিল না বলে যুগের প্রতীক বলাই ভালো।—সত্য রায়, মহেশতলা, ২৪-পরগণা।

বাঙালীর বিপ্লব সাধনা

যার আত্মপরিচয় নেই, এমন মানুষ মনুষ্যসমাজে অবাঞ্ছিত। যে জাতির ইতিহাস নেই, তার আছে দৈন্যদশা। বাঙালীর ইতিহাস নেই বলে বঙ্কিমচন্দ্র একদা যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, তার উষ্ণ করুণ তাপ এখনও আমাদের হৃদয়কে আবেগমথিত করে। একটি জাতির ইতিহাসের উপাদান নিহিত তার জাতীয় জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে। ভারতের ইতিহাস, ভারতীয়ের আত্মপরিচয়ের সম্পূর্ণতায় জাতীয় আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ তাই অনিবার্য উপাদান। অথচ এইসব উপাদান সংগ্রহ করে জাতীয় জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। বলতে কি, ইতিহাস সম্পর্কে পুরনো ধারণা থেকেও আমরা এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারিনি। কয়েকটি ঘটনা আর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাই ইতিহাস নয়। ইতিহাস বলতে নিশ্চিতভাবেই বোঝায় একটি কালের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে ঘটনা পরম্পরার তাৎপর্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী শাসন থেকে মুক্তিলাভের জন্য বাঙালী বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড সামগ্রিক জাতীয় ইতিহাসেরই এক উজ্জ্বল অধ্যায়। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের কাহিনী ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে অদ্যাপি লেখা হয়নি। পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা অনেকে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সে সব গ্রন্থকে বলা যেতে পারে স্মৃতিচারণা। ইতিহাস বলতে যা বোঝায়, তার চেষ্টা বড় একটা হয়নি। পুলকেশ দে সরকারের 'বাঙলার বিপ্লব সাধনা' সে অভাব পূর্ণ করেছে। বিপ্লবীদের কর্মসাধনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই বইটিতে পাওয়া যাবে। আমরা যারা স্বাধীন ভারতে প্রথম সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তাদের কাছে এই বইটি কেবল পূর্বপুরুষের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীই নয়, এই বইটি পাঠ করলে স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের আত্মপরিচয় সম্পূর্ণতা পায়। পিতৃতর্পণের পুণ্যলাভ হতে পারে। এই বইটির বড় প্রয়োজন ছিল। পুলকেশবাবু এই দুরূহ কর্তব্য পালন করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

বিপ্লবীদের কর্মসাধনা ছিল হিংসার আশ্রয় নিয়ে বিদেশী শাসনের উৎখাত এবং বন্দিনী মায়ের শৃঙ্খলমুক্তি এবং স্বাধীন জাতির পুনরুত্থান। স্বাধীনতা সংগ্রামে হিংসার পথ আবশ্যিক কি না, তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। সে বিতর্কের মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছে আমারও নেই। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাবলীই প্রমাণ করে, প্রয়োজনে ও সময় বিশেষে হিংসা দূষণীয় নয়। এই সত্যটুকু স্বীকার করে নিয়ে দেখতে হবে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বিপ্লবীদের কর্মসাধনার কোন সঙ্গত তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় কি না। পুলকেশবাবু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সুনিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে সেই তত্ত্বটি আমাদের কাছে প্রাঞ্জল করতে পেরেছেন। যাঁরা আমাদের এই পর্বের ইতিহাসকে লঘু করে দেখতে চান, তাঁরা কারা? পুলকেশবাবুর মতে তাঁরা 'দিশেহারা হয়ে জন্মান্ধের মতো পরদেশে অর্ঘ্য নিবেদনের নায়ক হাতড়ে বেড়ান, পৌত্তলিকতার নিন্দা করেও পরদেশী নেতার পটে কক্ষ সজ্জা করেন।' অর্থাৎ, স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর নিয়ে যাঁরা মেতে ওঠেন। স্বাভাবিক কারণেই এই বই তাঁদের জন্য নয়। অথচ এই বই-এ তাঁদের ভূমিকার কথাও অত্যন্ত
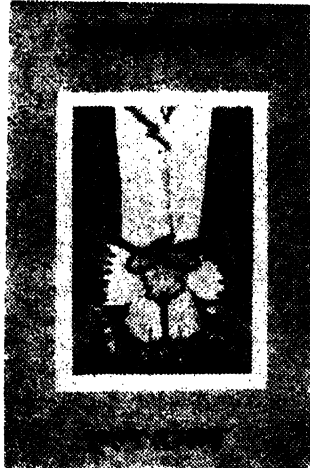
স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। তাঁদের কথাও জানা দরকার সবিস্তারে, জানা দরকার স্বদেশের জন্য তাঁরাই বা কী রেখে গিয়েছেন।

পুলকেশবাবুর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি এই বইটিকে তথ্যের ভারে পাথর করে তোলেন নি, ব্যক্তি নিরপেক্ষ যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে একটি যুগের ইতিহাসকে বিবৃত করেছেন পূর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেক্ষাপটে। মোট পনেরটি অধ্যায়ে তিনি বিপ্লব সাধনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রচনা করেছেন আমাদেরই অনতিপূর্ব এক গৌরবময় ইতিহাস। ১৯০৮ থেকে ১৯৪২—এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র ঘটনার ঘনঘটা। দু' দু'টো বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বকে তোলপাড় করেছে। তখন কি ঘটেছিল আমাদের এই বাঙলাদেশে? চিন্তায় ও কর্মে সর্বদা অগ্রগামী—বাঙালীরা কোন ভূমিকা পালন করেছিলেন? মুক্তির মন্দির সোপানতলে কারা দিয়েছিলেন আত্মবলি? কেনই বা?

দিঘিরিয়া পাহাড়ে বোমা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যার সূচনা, বোধকরি তারই শেষ ৪২-এর নৌবিদ্রোহে। তার মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ। এর মধ্যে একদিকে বুড়ি বালামের তীরে বাঘা যতীনের আত্মোৎসর্গ, অন্যদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। একদিকে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লর ইতিহাস, অন্যদিকে প্রীতিলতা, শান্তি, সুনীতি, বীণা প্রমুখের অসম সাহসিকতা। এর মধ্যেই আছে, ভারতের নানা প্রান্তে গোপনে অস্ত্র নির্মাণ, অন্যদিকে ভারতের বাইরে থেকে গোপনে অস্ত্র আমদানির দুঃসাহসিক কার্যাবলী। রাসবিহারী বসু, অবনী মুখার্জি, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি যখন বিদেশে, তখন যাদুগোপাল মুখার্জিরা স্বদেশে একই লক্ষ্যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। মানিকতলা বোমার মামলা, অরবিন্দ, বারীন্দ্র জনজীবনে তুলেছেন ঝড়, আবার দেখি কিশোর সুশীল সেনকে—এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বিনয়, বাদল, দীনেশের কাহিনী, আবার বিশ্বাসঘাতকের সঠিক পরিণাম—নরেন গোঁসাই। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর আরও কত প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড—যাদের সকলেই জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সংগ্রামে। অজস্র ঘটনা, অজস্র কাহিনী, অজস্র প্রাণদান। এ সব আমরা জানি, অল্পবিস্তর ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে। পুলকেশবাবুর সেইসব গেঁথেছেন এক সুতোয়—যার মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিশাল অধ্যায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে গর্বে ও গৌরবের আলোকশিখায়। আর এর মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসু রবীন্দ্রনাথ, যিনি বিপ্লবীদের মত ও পথ—কোনটাই সমর্থন করেননি, কিন্তু যখনই কোন অন্যায় দেখেছেন, তখনই তাঁর কণ্ঠ বজ্রের মতো ধ্বনিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সে সময়ে সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা কি ছিল? পুলকেশবাবু প্রকৃত গবেষকের মতোই অতীতের ভাণ্ড থেকে সযত্নে আহরণ করেছেন সেসব তথ্যও। জেনেছি, অমৃতবাজার পত্রিকার নির্ভীক সাংবাদিকতা এবং স্টেটসম্যান পত্রিকার আসল রূপ।

ঐতিহাসিকের কাজ বহু বিচিত্র তথ্যের মধ্য থেকে সত্যকে উদ্ধার করা। পুলকেশবাবু প্রথম থেকেই এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন। সত্যমূল্য নির্ধারণে লেখকের এতো সযত্ন প্রয়াসের কারণ, বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রথম থেকেই একটা অপপ্রয়াস দেখা যায়, বহু ঘটনার বিকৃতিও ঘটতে থাকে। সরকার ও সরকারের পদলেহনকারীরা সত্যকে ঢাকবার অপচেষ্টাও কম করেনি। লেখক কোন তথ্যই বাদ দেননি, কিন্তু বিশ্লেষণ করে তার থেকে গ্রহণযোগ্য

কতটুকু তাও দেখিয়েছেন। এইভাবেই প্রমাণ করেছেন, নরেন গোঁসাইকে হত্যার জন্য জেলে পিস্তল পাঠানো সম্পর্কে গল্পগুলির কোন ভিত্তি নেই। এইভাবেই দেখিয়েছেন, নেতাজী সম্পর্কে বৃটিশ ও স্বদেশীয় এক শ্রেণীর বিশ্ববিপ্লবীদের সকল অভিযোগই মিথ্যা। এইভাবেই দেখিয়েছেন বিপ্লবীদের বিচার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতটা হাস্যকর। নৌ-বিদ্রোহের ঘটনাও কীভাবে বিকৃতি লাভ করেছে।

বইটি পড়তে পড়তে কত অজানাকে জানা যায়। সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যাকারীর নাম চারুচন্দ্র। ভাগ্যের পরিহাস, বিশ্বাসের পুত্রের নামও চারুচন্দ্র। অনুশীলন সমিতির সদর দফতর ছিল যে বাড়িটিতে, তার প্রসিদ্ধি ছিল ভূতের বাড়ি বলে। জার্মান থেকে মৌজার পিস্তল আসছে। কীভাবে এই পিস্তল খালাস করে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসলো ছাতাওয়ালা গলির একটি ছোট পার্কে। হরিদাস দত্ত মূক ও বধির হিন্দুস্থানী গাড়োয়ান সেজে পিস্তলের বাকসগুলি ট্রাঙ্কে ভরে নিয়ে যান কলকাতার রাস্তা দিয়ে। সে আমলে স্বদেশীরা ট্যাক্সি করে ডাকাতি করতেন। বাংলার রাসবিহারী অমৃতসরে গিয়ে দুটি বোমা তৈরির কারখানা খুললেন। সত্য আলোকে উদ্ভাসিত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ইতিহাস। কীভাবে বিপ্লবীরা জার্মান, জাপান থেকে আমেরিকা পর্যন্ত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন, পুলকেশবাবু লিখেছেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সঠিক তথ্যের সমাহারে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও রুদ্ধশ্বাস-কাহিনী : কী করে নেতাজী ভারতের বাইরে একটি সশস্ত্র ভারতীয় সেনাদল গড়ে তুললেন। এই প্রসঙ্গে পুলকেশবাবু তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন, জার্মান ও জাপানী সরকারের কাছে নেতাজী কখনও কোন 'নতি স্বীকার' করেননি। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, 'ভারতবাসীর জন্যই ভারতবর্ষ'। যাঁরা সাহায্য করছেন, নেতাজীর মতে তা হলো বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্তব্য। এর বেশি কিছু নয়। জাপান সরকারের একটি প্রস্তাবের উত্তরে নেতাজী বলেছিলেন : 'জাপানীদের সাহায্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ হলে সে হবে পরাধীনতার চেয়েও অধিকতর ঘৃণ্য।......ভারতের পবিত্র ভূমিতে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম রক্তবিন্দু দেবে ভারতীয়রা।'

আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী আমরা অল্পবিস্তর জানি। স্বদেশের মাটিতে তাঁদের ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গেই যে সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি, পরবর্তী নৌবিদ্রোহের ঘটনাবলী তার প্রমাণ।

বাংলার বিপ্লব সাধনা বস্তুত বিপ্লবীদের বিচ্ছিন্ন ইতিহাস নয়। তা আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত। কেবল ইতিহাস নয়, ইতিহাসের সত্যমূল্য এতে বিধৃত। অবশ্যই এই বিরাট সত্য ইতিহাস ৯৮৭ পৃষ্ঠায় ধরে না, ধরা উচিত নয়। লেখক সে ব্যাপারে সচেতন। কিন্তু পুস্তক প্রকাশনার আর্থিক দায়িত্ব যাঁরা পালন করেন তাঁদের পক্ষে বোধহয় এর চেয়ে বেশি ব্যয় করা সম্ভব নয়। কাজেই, একে ঠিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলা যায় না। ইতিহাসের রূপরেখা বলাই ভালো। কিছু না করার চেয়ে, পুলকেশবাবু যেটুকু করেছেন, তারজন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর কাছেই আছে এই ইতিহাসের বিপুল মালমশলা। এ ইতিহাস রচনার দায়িত্ব নিতে পারেন সরকার। এতদিন সরকার এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেননি। এখনও উদ্যোগ নেবেন কি? ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুলকেশবাবুর এই দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন সবাই, এই আশা করি। পূর্বপুরুষের কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না জন্মালে জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। জাতীয় চরিত্র নির্মাণে জাতির আত্মপরিচিতি সম্পূর্ণ করতে, সন্দেহ নেই পুলকেশ দে সরকারের 'বাঙলার বিপ্লব সাধনা' প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য।

—সরল সিদ্ধান্ত

বাঙলার বিপ্লব সাধনা ।। পুলকেশ দে সরকার ।। দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স। কলকাতা—৭। মূল্য দশ টাকা।

খুশি বিপ্লব

কে যেন একজন বলেছিলেন, মার্কস না লেনিন না মাও সে-তুং, বিপ্লব বৈঠকখানায় আরাম কুরশিতে বসে খোস-মেজাজী তর্ক-বিলাস নয়; বিপ্লব বড় সাংঘাতিক ঘটনা। কথাটা নিশ্চয় মিথ্যে; তা না হলে, আমরা বিপ্লব শব্দটিকে এমন সহজ অনায়াসে জিভের আগায় রেখে দিতাম না। কোন-কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকেই, অনেক সময় অপরিবর্তনকেও, আমরা এমন তাৎক্ষণিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে 'বিপ্লব' বলে সনাক্ত করতাম না। বিপ্লব যদি সত্যি এক সাংঘাতিক ঘটনা, তাহলে তাকে নিয়ে আমরা এমন সুমধুর সাংবাদিক গদ্য রচনা করে উঠে পারতাম না।

দেখুন না, এই প্রাচীন, শ্লথপরিবর্তনশীল ভারতবর্ষেই সামান্য পঁচিশ-ত্রিশ বছরে কতগুলি 'বিপ্লব' পর পর ঘটে গেল, এবং প্রত্যেকটি 'বিপ্লব'কেই আমরা কত খুশির সঙ্গে স্বাগত করে নিলাম। বিদেশী শাসক প্রথম ঔদার্যে পরাধীন উপনিবেশকে স্বাধীনতা দান করে ইতিহাসের স্তুতির মালা গলায় পরে বিদায় নিল; আমরা হর্ষধ্বনি করে উঠলাম, আহা, কি শান্তিপূর্ণ বিপ্লব।

দেশের জনসংখ্যার এক নগণ্য অংশ দ্বারা 'নির্বাচিত' সংবিধান সম্মেলন তখনও-উপস্থিত ইংরেজ প্রভুর অনুকরণে কয়েক মাসের বিপুল মস্তিষ্ক-শ্রম দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহদাকার সংবিধান প্রণয়ন করল, ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত হল দুনিয়ার বৃহত্তম গণতন্ত্র। আমরা পরমানন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'গণতান্ত্রিক বিপ্লব।'

সংসদে পাঁচশত সদস্য একমত হয়ে আইন বানিয়ে অস্পৃশ্যতা 'হটিয়ে' দিলেন; আমরা আবার করতালি দিয়ে ঘোষণা করলাম, 'সামাজিক বিপ্লব'। উক্ত মহোদয় ও মহোদয়াগণ পুনরায় আইন করে সারা দেশব্যাপী পঞ্চায়েৎ রাজ স্থাপন করলেন; কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের আশীর্বাদ ছড়িয়ে দিলেন গ্রামগঠনে। আমরা পুলকিত-কণ্ঠে নিনাদ করে উঠলাম, 'গ্রামীণ বিপ্লব।'

তারপর একদিন বিদ্যুৎ, বৈজ্ঞানিক সার ও ট্র্যাকটর একত্র হয়ে আমাদের মাঠে উন্নতমানের বীজ বপন করে সোনা ফলিয়ে পৃথিবীশুদ্ধ মানুষকে আহ্লাদে অবাক করে দিল। আমরা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠলাম, 'সবুজ বিপ্লব।'

এমনি করে যখনই কোনও কিছু বৃহৎ ঘটনা ঘটেছে, অথবা অঘটনকে বৃহৎ ঘটনা ব'লে চালান হ'য়েছে, আমরা শুনে এসেছি, 'বিপ্লব' হল। 'বিপ্লব' হল যখন ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসকে দু-টুকরো ক'রলেন; 'বিপ্লব' ঘটল, যখন তিনি 'গরীবি হঠাও' ধ্বনি তুলে নির্বাচনে বাজিমাৎ করলেন; এবং 'বিপ্লব' অতি অবশ্য ঘটল, যখন তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে এই এত বড় কোলাহল-মুখর বাদবিবাদ প্রতিবাদ-সরব দেশটাকে পরিচিত প্রথায় রাতারাতি নীরব এবং বশংবদ ক'রে তুললেন। আবার 'বিপ্লব' ঘটল, এই তো সেদিন, চৈত্র-বৈশাখের। দীপ্তচক্ষু দিনগুলিতে, যখন এদেশের জনতা ভোটপত্রের মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহারে দিল্লির অন্টম সাম্রাজ্যের সমাধি সাধন করলেন। বর্ষার রাজা নির্বাচন প্লাবনের পরও আমরা শুনতে পাব, পুনরায় 'বিপ্লব' ঘটল।

এই তো গেল ভারতবর্ষের কথা। গোটা পৃথিবীতেই বিপ্লব শব্দটিকে নিয়ে প্রতি বছর কিছু-না-কিছু বাদুকরী খেলা দেখতে পাওয়া যায়। আমরা তো ভুলে যাই নি এ-কালের বহু-প্রচারিত 'বিপ্লব'গুলির স্মৃতি—যাদের অধিনায়ক ছিলেন সুকর্ণ, এনক্রুমা, নাসের প্রমুখ ইতিহাসের একদা-নায়কগণ, আজ যাঁদের কীর্তির বিবর্ণ অবশিষ্টটুকুও ঐ সব দেশের পত্র-পত্রিকায় উল্লিখিত হ'তে পারে না। ১৯৭৩ সালে থাইল্যান্ডে যুব সম্প্রদায় যখন সামরিকতন্ত্রের অবসান ঘটাতে সার্থক হল, ধ্বনি উঠল গণতান্ত্রিক 'বিপ্লবের'; আবার ১৯৭৬ সালে যখন সামরিক নেতারা এক দুর্বল গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা ক'রে সামরিকতন্ত্রকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করল, আমরা শুনতে পেলাম, 'সুরক্ষ বিপ্লব।' লাতিন আমেরিকায় আঠারটি দেশে নানাবিধ কংসেরা নানারকম 'বিপ্লব' ঘটিয়ে ব'সে আছেন; আফ্রিকার অবস্থাও অনেকখানি অনুরূপ।

আসলে কিন্তু বিপ্লব ব্যাপারটা দু'রকমের। একটা হচ্ছে খুশি বিপ্লব; অন্যটা সাংঘাতিক। খুশি বিপ্লব মানে সেই-সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, যাতে সমাজের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ে না। সাংঘাতিক বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্যকে ধ্বংস ক'রে নতুন ভারসাম্য গ'ড়ে তোলে। আরও সহজ ভাষায় বলা যায়, খুশি বিপ্লব মালিকদের বিপ্লব; সাংঘাতিক বিপ্লব শোষিত, প্রবঞ্চিত, উৎপীড়িত মানুষের।

ইতিহাসে যে-কটি বিপ্লব গভীর ও স্থায়ী চিহ্ন রাখতে পেরেছে, তাদের মধ্যে মার্কিন একমাত্র বিপ্লবকেই বলা হয়, আশাবাদী, মনখুশি। তাই না মার্কিন সংবিধানই পৃথিবীতে একমাত্র সাংবিধানিক দলিল যাতে নাগরিকদের 'সুখের সন্ধান'—পারস্যুট অব হ্যাপিনেস—অন্যতম অধিকার বলে স্বীকৃত। বৃটেনের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মার্কিন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতায় পুনঃ জন্মকে বিপ্লবই বলব, কেননা শাদা শাসকের হাত থেকে শাদা শাসিতের মুক্তির এই প্রথম বাস্তাবায়ন। (আলস্টারের শাদা মানুষরা এখনও মুক্তি পেল না ইংলন্ডের শ্বেত-ঔপনিবেশিকতা থেকে)।

মার্কিন বিপ্লব খুশিকর ছিল খুব সঙ্গত কারণে। যারা স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল তাদের মুখে ধ্বনিত হয় নি লিবার্টি, ইকোয়ালিটি, ফ্রাটার্নিটি। অথবা, ল্যান্ড ফর দ' সোভিয়েতস। অথবা, ল্যান্ড এ্যান্ড লিবার্টি। তাদের দাবী ছিল, আমাদের আরও কিছু পয়সা কামাতে দাও, আর যে পার্লামেন্টে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই, আমরা মানি না আমাদের জন্যে তার আইন প্রণয়নের অধিকার। তারা নতুন সমাজ গড়তে চায় নি, স্বপ্ন দেখে নি নতুন মানুষের; তাদের তেরটি উপনিবেশকে কাঁপিয়ে তোলে নি কোনও রোবেসপীয়র অথবা লেনিন।

মার্কিন বিপ্লব ছিল খুশি বিপ্লব, কেননা তার সীমানা আবদ্ধ রাখা হ'য়েছিল শুধু শাসক শ্বেতকায়দের মধ্যে—যারা উৎপাদন ব্যবস্থায় ছিল মালিক, যাদের স্বপ্ন ছিল ক্ষমতা-বিস্তার। কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসদের সরিয়ে রাখা হ'য়েছিল বিপ্লবের সীমানার বাইরে। হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক আডাম উলাম সোভিয়েত বিপ্লবকে নাম দিয়েছেন 'অসমাপ্ত বিপ্লব'। (কোনও বিপ্লবই সমাপ্ত নয়, একথা মার্কস থেকে মাও পর্যন্ত সবাই বলে গেছেন)। যদি কোনও বিপ্লবকে আখ্যা দেওয়া যায় 'সমাপ্ত বিপ্লব', তাহলে মার্কিন বিপ্লবই সে আখ্যা দাবী করতে পারে।

ভারতবর্ষে যে-কটি 'বিপ্লব' রাজনৈতিক সুভাষণে, জ্যোতিষীর সাংবাদিকতায় এবং সুশীল-সুবোধ-

ভোট দেবেন কাকে ?

সুবাধ্য পান্ডিত্যে বিঘোষিত হ'য়েছে, তারা সবই খুশি-বিপ্লব, কেননা তাতে সমাজের রূপান্তর ঘটে নি, প্রতিষ্ঠিতদের প্রাধান্য প্রসারিত হয়েছে মাত্র। 'সাংঘাতিক' বিপ্লব 'নীরব' নয়, 'সবুজ' নয়, শালীন নয়। তার পদচিহ্ন এই প্রাচীন মহামানবের সাগরতীরে এখনও প'ড়ে নি।

চৈত্র-বৈশাখের তৃষ্ণার্ত দিনগুলি থেকে আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষাঘন দিনগুলির মধ্যে যে 'বিপ্লব' ঘটতে চলেছে তাও মন-খুশি, কেননা তাতে আমাদের চার ও পাঁচ দশকের প্রাপ্ত সামাজিক বাস্তবের ধারাবাহিকতারই প্রতিশ্রুতি, সমাজকে 'সাংঘাতিক'ভাবে বদলে দেবার অঙ্গীকার অনুপস্থিত। তাই, দেখুন না, কত অনায়াসে পার্টি-বদল হচ্ছে, একই নাটকে কি সুন্দর অভিনয় ক'রে যাচ্ছেন এক এক অভিনেতা আপাত-বিভিন্ন ভূমিকায়।

দর্শকরা কি শুধু রম্য আস্বাদ পাচ্ছেন নাটকের বিচিত্রায়ণ থেকে ? মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় এসে যে ট্যাক্সিখানায় প্রথম বসবার সুযোগ পেলাম, তার চালককে প্রশ্ন করলাম, 'ভোট দেবেন কাকে ?' অতি সহজ সপ্রতিভতার সঙ্গে জবাব পেলাম, 'জনতাকে একটা চান্স দিয়ে দেখা যাক, বাবুজি ; পরে, দরকার হলে ইন্দিরা গান্ধীকে ফিরিয়ে আনব।'

এরা, এই সাধারণ মানুষরা, নিজেদের ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছে। শাসক বদল, এরা জেনেছে, এদেরই কব্জায়। কিন্তু, কি ভীষণ অবস্থা, ভেবে দেখুন, এদের দৃষ্টিপথে বিকল্প মাত্র : হয় এ'রা, নয় ও'রা। সাংঘাতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনার সংকেতটুকুও এদের দৃষ্টিপথে উদিত হয় নি।

চাণক্য সেন

সেনাপতির স্বামী

মানুষটা থাকেন হুগলী জেলায়। নাম সতীনাথ ভট্টাচার্য। বয়স—রেলের গত মাসের মান্থলিতে লিখেছিলেন— ফরটি সেভেন ইয়ারস থ্রি মান্থস। মাথায় নাইনটি পার্সেন্ট জমিতে তেলালো সুন্দর দ্যাখনধারি টাক। চোখে চশমা। মুখে রহস্যময় মৃদু-মন্দ হাসি।—ওনার ওয়াইফ আছে। একটা ওয়াইফ। উনি ডাকেন সেনাপতি বলে। —'সেনাপতি চা কর' কি 'বুঝলে সেনাপতি পেটটা আজ বড় ভুট্‌ভাট্ করছে....'—অ্যামনটা। ওনার দু-মেয়ে পার হয়ে গেছে। ছোটটা আছে। ইস্কুলের ফার্স্ট গার্ল, রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখছে। সন্ধ্যে হলেই হারমোনিয়াম নিয়ে বসে। ঘ্যাম মুখ করে হারমোনিয়ামের বেলো টানে, তার সঙ্গে গলা ছেড়ে গায়— 'হে ক্ষণিকের অতিথি....'। ছেলে হেভলি চেল্লা পড়ে কি তবলা বাজায়। ও এখন তবলায় 'কায়দা' আর 'রেলা' প্র্যাকটিশ করে। সন্ধ্যেবেলাটা সেনাপতির ফ্যান-গাল্প ভাজ-সাঁতলানোর টাইম।

সেনাপতির স্বামী খাঁটি সাহিত্য প্রেমী। একটা ডিমের মতই খাঁটি। আজ একুশ বছর ধরে লিখছেন। এযাবৎ বারো খানি উপন্যাস, দুশো দুটি ছোট গল্প, পাঁচশো একটি কবিতা, চারশো দশটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলির বেশ কিছুই পোকাদের খাদ্য হয়েছে, কিছু সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে, আর কিছু সন্দীপন, সাহিত্য-বাণী, শঙ্খ, কাকলি—এ জাতীয় নামধারী কিছু লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়ে সেনাপতির স্বামীর উৎসাহ যথেষ্ট পরিমাণেই বর্ধন করেছে। উনি লেখেন ছদ্মনামে—সতী চট্টোপাধ্যায়। নামটা দেখেই একবার এক লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক (পুরুষ) তাঁকে সুন্দর একটা প্রেমপত্র লিখেছিলেন। যার একটা অংশ এরকমটা ছিল—'....আচ্ছা সতী-দেবী আপনি কি বিবাহ-আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়াছেন ? কিংবা প্রেমালিঙ্গনে কখনও ? আসুন আমরা সাহিত্য-পথের মতই, জীবনপথেও একই সঙ্গে অগ্রসরমান হইয়া জগতের সম্মুখে প্রেমের ও যুগল-বন্দীর স্বর্গীয় আদর্শ সৃষ্টি করিয়া যাই। ....' চিঠিটা সেনাপতির হাতেই পড়েছিল। চিঠিটা সারাটা দিন সেনাপতিকে এমন সুড়সুড়ি দিয়ে অন্যমনস্ক করে রেখেছিল যে তিনি ডালে ফোড়ন দিতে ভুলে গিয়েছিলেন।

সেনাপতির স্বামী একবার এক পঁচিশে বৈশাখে, কয়েকজন তরুণ কবিকে নিয়ে জোড়াসাঁকো থেকে রবিঠাকুরের পুজো দিয়ে, একটা মিছিল বার করে-ছিলেন। কলকাতার সাউথ টু নর্থ আর নর্থ টু সাউথ—বারদুই করেছিলেন। তারই মধ্যে স্ট্রীট-কর্ণার করেছিলেন কয়েকটা, যেগুলোয় সেনাপতির স্বামী বক্তব্য রেখেছিলেন—আসলে কবিরাই শুধুমাত্র কবিরাই, দেশকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারেন। স্রেফ কবিতার সাহায্যে। কান্ট্রি লিকারের ভেন্ডার থেকে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সবাইকে কবিতা লেখা প্র্যাকটিশ করতে হবে। কবিতার সাহায্যেই প্রতিটি কাজকর্ম করতে হবে। নির্দেশ দিতে হবে। ....ইত্যাদি। কিভাবে ? সেনাপতির স্বামীর উদাহরণ ছিল— ধরুন আপনি আলু কিনতে গেছেন বাজারে।

কবিতা করে দাম শুধোন, আলু-ওলাও কবিতা করে উত্তর দেবে। 'হেই ভাই আলু, কেজিতে পড়বে কত ? দাম হেঁকোনা, দরটা বল ন্যায্য মত—' —'আমি বাবু দিই না ধোঁকা। ঠিক পড়বে একটি টাকা।' ... তারপর মিছিলটা রবিঠাকুরকে সামনে রেখে মার্চ-পাস্ট করতে করতে একটি পাঁচমাথা মোড়ে এসে সমাপ্ত হয়েছিল। এবং সেখানে এক ট্র্যাফিক কনস্টেবলকে ঘিরে চারপাশ থেকে চারজন আধুনিক কবি সমানে আধুনিক কবিতা শুনিয়েছিলেন। পুলিশটি ভিরমি খেয়ে গিয়েছিল। তাকে ঘিরে সব কবিরা 'আয় তবে সহচরী.... নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান..' গানটা গেয়েছিলেন। তারপর বৃন্দগীতির শুরু করেছিলেন ও'রা—'তাতা থই থই, তাতা থই থই....'। ও'দের বৃন্দগীতির তালে-তালে পাঁচমাথার তাবৎ দুনিয়াটা নেচে উঠেছিল। নাচছিল সিংজি বাস ড্রাইভার, বাঙালী কণ্ডাকটর, ট্র্যাফিক পুলিশ তার ভারী মেদবহুল শরীরটা নিয়ে...সবাই। এবং রবিঠাকুরের ছবিকে রেলিংয়ে ঝুলিয়ে তারা সবাই তাঁকে হেভী গর্জাস একটা গার্ড-অব-অনার দিয়েছিল। নেতা ছিলেন বলাই বাহুল্য সেনাপতির স্বামী। —অ্যামনই হিটিয়ালি পাবলিক।

সেদিন দেখি গঙ্গার ধারে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। মুখোমুখি হতে বললেন, এইমাত্র মা-কালী এই সিগেটটা অফার করে গেলেন আর বললেন—বাবা সতু, তোমার তো বয়স হয়েছে....। এবার একটু স্থিরধিতু হও। এবার আর কোন এঁচড়েমি কোর না।

গৌতম ভট্টাচার্য

আমাদের জঙ্গল

অরণ্য আমাদের সকলকে হাতছানি দেয় না। কাউকে কাউকে ডাকে। অরণ্য যাকে ডাকে সে তার ডাকে সাড়া দিয়ে ঘরছাড়া হয়। জঙ্গলের গাছ-পশু-পাখি এদের সকলের ভাষা সে বুঝতে পারে। পাহাড়ী নদীর জলের কলতান সেই ঘরছাড়া অরণ্যপ্রিয় মানুষকে পাগল করে তোলে। কিন্তু তেমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। হাত গুনে বলে দেওয়া যায়। আমরা যারা নাগরিক জীবনে ইঁট-কাঠ-কংক্রীটের দেওয়ালে আবদ্ধ থেকে জীবনের মানে বুঝতে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত, তারা সময় পায় না গাছের কথা, পাখির কথা, পশুর কথা ভাবতে। খাঁচার পাখি, টবের গাছ আর শেকলবাঁধা ঘরের পশু দেখে আমরা তৃপ্ত হই। তৃপ্ত হতে ভালবাসি। সময় অনুমতি দিলে বড় জোর কোন এক অভয়ারণ্যে গিয়ে পিকনিকে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে মেতে থাকি। তখনও ভাবি না গাছ-পাখি-পশুর কথা। বনসম্ভার আমাদের জীবনে কত বড় উপকার করতে পারে তা খতিয়ে দেখার সময়টুকুও আমরা পাই না। এই বাড়ির দরজা-জানলা, সিঁড়ি-পার্টিশন থেকে শুরু করে যায় ট্রাম-বাস-ট্রেনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত সর্বত্রই যে অরণ্যের অবদান ছড়িয়ে রয়েছে সেকথা আমরা ভাবিও না। অথচ অরণ্য না থাকলে বিকল্পে কী হবে তা ভাবতেও ভয় করে অনেকের। তাই নতুন করে ভাবতে হবে অরণ্যের কথা। আর সে ভাবনায় থাকা চাই আন্তরিক সহানুভূতি ও মমত্ববোধ।

সমগ্র দেশের কথা থাক। শুধু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কথাতেই আসি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমরা আমাদের জঙ্গল রক্ষায় কতটুকু কি করতে পেরেছি? নতুন বনভূমি হয়েছে কতটা? বন থেকে কতটা বেড়েছে জাতীয় আয়? এখন গাছপালার চেহারা কী রকম? বন্য জন্তু-জানোয়ারদেরই বা খবর কী? পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন পর্ষৎ আমাদের জঙ্গল রক্ষায় এ পর্যন্ত কতদূর কী করেছেন? প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা যাক একে একে।

পশ্চিমবঙ্গে বনজঙ্গল নেহাৎ কম নয়। প্রায় ১২000 বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। এর মধ্যে সমতলে ৭000 বর্গ কিলোমিটার এবং পাহাড়ে ৫000 বর্গ কিঃ মিঃ। এ রাজ্যে বন আছে তিনটি অঞ্চলে। বলতে গেলে, তিনটি প্রান্তে। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে। এই তিনটি অঞ্চলই আয়তনে প্রায় সমান—১২০০ থেকে ১৭০০ বর্গমাইল। পশ্চিমবঙ্গে ছটি জেলায় বন বলতে কিছু নেই। বনভূমির প্রধান অংশ উত্তরবঙ্গে।

আমাদের বনভূমির বয়েস কত? সৃষ্টির শুরু থেকেই তো বনের সঞ্চার। আগে বন তারপর মানুষ। আমাদের জঙ্গলগুলি আগে ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ১৮৬৪ সালে প্রথম কিছু কিছু বনাঞ্চল সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫৩ সালে সরকার সমস্ত জঙ্গল নিয়ে নেন। বর্তমানে আমাদের বনাঞ্চলের প্রায় সবটাই সরকার নিয়ন্ত্রিত ও সংরক্ষিত। বন থেকে আয় আমাদের জাতীয় আয়।

রাজ্যের তিনটি বনাঞ্চল আয়তনে প্রায় সমান হলেও তিনটিই সমান মূল্যবান নয়। উত্তরে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির বনাঞ্চল

থেকে একর পিছু গড়ে পনের থেকে ষোলো টাকা আয় হয়। পশ্চিম অঞ্চলের বন থেকে আয় হয় আট কি ন' টাকা। আর দক্ষিণের, অর্থাৎ সুন্দরবনের বনাঞ্চল থেকে একর পিছু বাৎসরিক গড় আয়ের পরিমাণ দু' টাকারও কম। ১৯৭৪ সালে বন উন্নয়ন পর্ষৎ গঠনের পর আমাদের জঙ্গল থেকে আয় বেড়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে আয় হয়েছিল ৫০ লাখ টাকা। গত '৭৫-'৭৬ সালে আয়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৮৫ লাখে। বন উন্নয়ন পর্ষৎ আশা করছেন বন থেকে আয় আরও বাড়বে। চলতি বছরে ওই আয়ের অঙ্ক বেড়ে দাঁড়াবে এক কোটি আশী লাখ টাকায়। পর্ষদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে নতুন বনভূমি সৃষ্টি করা হয়েছে ৫৬,০০০ হেক্টর জমিতে।

আমাদের বনভূমিতে নানা জাতের গাছপালা। শাল, সেগুন ছাড়াও ফার, ওক, পাইন, দেবদারু, পোনা, জারুল, গর্জন, বাঁশ, বেত আরও কত কি। এইসব গাছগাছালির একটা প্রধান অংশ যায় আসবাবপত্র তৈরির কাঠ হিসেবে। বাকিটা জ্বালানির জন্যে। জ্বালানির প্রায় সবটাই কাঠে। উত্তরবঙ্গে কিছু পরিমাণ কাঠ-কয়লাও তৈরি হয়। বন উন্নয়ন পর্ষৎ সম্প্রতি কাঠকয়লা উৎপাদনের দিকে নজর দিয়েছেন। তাঁরা এখন কাঠকয়লা বিদেশে রপ্তানি করার জন্যেও তৈরি।

আমাদের বনাঞ্চল দিনে দিনে বাড়ছে। এপর্যন্ত নতুন বনভূমি সৃষ্টি করা হয়েছে পঞ্চান্ন হাজার হেক্টর জমিতে। এর সবটাই কিন্তু পতিত জমি দখল করে নয়। কিছুটা পতিত জমি। আবার কিছুটা জঙ্গল এলাকার জীর্ণ গাছপালা ছেঁটে ফেলে নতুন গাছ বসানো হয়েছে।

এছাড়া, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বনসম্পদ আহরণের এবং নতুন বনভূমি রচনার জন্যে বন-উন্নয়ন পর্ষৎ ২৫ কোটি ৩২ লাখ টাকার একটি দশ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই দশ বছরে আরও ন' হাজার হেক্টর জমিতে নতুন বনভূমি হবে। আরও পাঁচশো কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হবে দুর্গম বনভূমিতে পৌঁছতে। বনাঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী এলাকায় ভাল রাস্তাঘাট তৈরি হলে এ অঞ্চলের বনসম্পদ আরও ভালভাবে আহরণ করা সম্ভব হবে। জীবনের ঝুঁকি কমবে।

বনসম্পদে পশ্চিমবঙ্গ খুব সমৃদ্ধ তা বলা চলে না। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের জন্যে মাথা-পিছু বনাঞ্চলের গড় পরিমাণ হলো ১১ শতক। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছ' কাঠার মতো। সারা ভারতে এই গড় হল আধ একর (প্রায় দেড় বিঘা)। আমাদের জাতীয় বননীতি অনুসারে পাহাড় অঞ্চলে ৬০ শতাংশ এবং সমতলে ২০ শতাংশ জমিতে বন থাকা উচিত। সে জায়গায় এ রাজ্যে এই দুটির হার হলো পাহাড়ে ২০-১ শতাংশ এবং সমতলে ১১-৫ শতাংশ। তবে পশ্চিমবঙ্গে বনসম্পদ উন্নয়ন ও ওই সম্পদকে কাজে লাগাবার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

বন-পরিচয়

এখন আমাদের তিনটি জঙ্গল-প্রধান অঞ্চলের দিকে চোখ ফেরানো যাক। দেখা যাক, আমাদের জঙ্গলে কোথায় কোন গাছ আছে। কী তাদের উপকারিতা। সেসব গাছপালা কোথা থেকেই বা এল।

হিমালয়ের দক্ষিণে যে অংশে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটে, সেখানে রয়েছে গভীর অরণ্য। দার্জিলিং-এর এই অরণ্যাঞ্চল তরাই নামে পরিচিত। এই তরাই অঞ্চলে ফার, ওক, পাইন দেবদারু, পোনা, শাল, শিশু, বাঁশ, জারুল, গর্জন, বেত ও নলখাগড়ার বন। জল-পাইগুড়ির অরণ্যাঞ্চল পরিচিত ডুয়ার্স নামে। ডুয়ার্সের জঙ্গলে আছে শাল, শিমুল, বাঁশ ও বেত। উত্তরবঙ্গের এই দুটি জঙ্গলের মূল্য সবদিক থেকেই অপরিসীম। আয়ও প্রচুর।

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে মাইল চোদ্দ দূরে বামুন পোখরীর জঙ্গল। ১৮৬৫ সালে সরকার বামুন পোখরীর রক্ষণা বেক্ষণের ভার নেন। পরে ১৯৪১ সাল থেকে এখানে নতুন করে সেগুনের চাষ শুরু হয়। এখন সেইসব সেগুন গাছের খুবই বাড়বাড়ন্ত। আর্থিক দিক থেকেও বেশ মূল্যবান। বামুন পোখরী জঙ্গল ছাড়া ভারতের দক্ষিণাংশেও সেগুনগাছ দেখা যায় প্রচুর। সেগুন কাঠ খুবই মজবুত এবং দামী।

রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তে প্রায় ফরাক্কার কাছ থেকে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলা জুড়ে রয়েছে প্রধানত শালের জঙ্গল আর তার সঙ্গে মেশানো কিছু পিয়াশাল, মহুয়া ও অন্যান্য গাছ। এইসব জেলায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় অরণ্যও খুব গভীর নয়। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় পাওয়া যায় লাক্ষা ও তসরগুটি। পশ্চিমপ্রান্তের জঙ্গলে যেসব গাছপালা তার মূল্য প্রধানত জ্বালানি হিসেবে। এসব গাছের কোনটিই করাতে চিরবার মতো নয়। তবে খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা চলে। বেশ দীর্ঘস্থায়ী।

এবার আসা যাক দক্ষিণে। দক্ষিণে বিশাল সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বৃষ্টিপাত বেশি। তাই এখানে অরণ্যও গভীর। এখানে গরান, সুন্দরী, গর্জন, গেঁওয়া, কেওড়া প্রভৃতি গাছের জঙ্গল। এই জঙ্গল থেকে আমাদের লভ্য শুধু জ্বালানি, গোলপাতা ও মধু।

নদী নালা ও খাঁড়ি দিয়ে বিচ্ছিন্ন সুন্দরবন অঞ্চলের যোগা-যোগ ব্যবস্থা যেমন জটিল, তেমনি আয়াসসাধ্য এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা। এখানে ভূমিক্ষয় খুবই প্রকট। সুন্দরবনের জলাভূমি জোয়ারের সময় পূর্ণ হয়ে যায়। এইসব জায়গায় সুন্দরী, গরান, কেওড়া, গর্জন, গেঁওয়া প্রভৃতি গাছগাছালির জঙ্গল। সুন্দরী-গাছের কাঠ শক্ত ও মজবুত। আসবাবপত্র তৈরির কাজে লাগে। সুন্দরবন গোলপাতা ও হোগলায় পূর্ণ। আর আছে অসংখ্য তাল, নারকেল ও সুপারিগাছ। সুন্দরবনে জঙ্গল হাসিলের কাজ শুরু হয়েছিল ১৮৫৫ সালে। ব্রিটিশ আমলে। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষৎ গঠিত হয় ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি।

বিচিত্র অরণ্য সুন্দরবন। তার রূপের তুলনা মেলা ভার। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে দৈর্ঘ্যে পূর্ব-পশ্চিমে একশ আশি মাইল এবং প্রস্থে ষাট থেকে আশি মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে ভাগীরথী। পূর্বে মেঘনা। সুন্দরবনের যতটুকু অংশ পশ্চিম-বঙ্গে পড়েছে তার আয়তন ৯,৬২৯-৯ বর্গ কিলোমিটার। আর লোকসংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ। এখানে শতকরা ৪৪-৩ ভাগ এলাকা সংরক্ষিত বনাঞ্চল। মূল ভূখণ্ড ছাড়া সুন্দরবনে আছে ৫৪টি দ্বীপ।

বাঁশ পশ্চিমবাংলার নিজস্ব সম্পদ। বাঁশের জঙ্গল এ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি। এবং বাঁশবন প্রায় সর্বত্র। পৃথিবীতে শ'পাঁচেক রকমের বাঁশ আছে। এর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই আছে তিনশ কুড়ি জাতের বাঁশ। আমাদের দেশে ডাঙ্কি জাতের বাঁশের দাম সবচেয়ে বেশি এবং এই বাঁশ আকারেও বেশ বড়। বাড়ি তৈরির ভারা এবং মই তৈরি হয় এই বাঁশ দিয়ে। বাঁশের প্রয়োজনীয়তা বলতে গেলে অজস্র রকমের। আমাদের দেশে কাগজ তৈরির অন্যতম মুখ্য কাঁচামাল বাঁশ। কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন তৈরি হয় বাঁশ থেকে। বাঁশের চাটাইয়ে সিমেন্ট লাগিয়ে পাকা বাড়ি তৈরি হয় আসামে। বাঁশবন সহজে নষ্ট হয় না। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।

সমভূমির উত্তরভাগে পশ্চিম দিনাজপুরে ও মালদহ জেলায় আছে আমের জঙ্গল। এই দুটি জেলার আমবাগান বলতে গেলে জগদ্বিখ্যাত। একশ বছরের ওপর এর বয়েস। আমবাগানগুলির প্রায় সব ক'টাই বেসরকারী মালিকানায়। বিদেশে আম রপ্তানি করে বেশ কয়েক কোটি টাকা আমাদের ঘরে আসে। বর্তমানে আম-বাগানগুলি ফাঁকা হয়ে আসছে।

পশ্চিমবাংলায় জঙ্গল কম রয়েছে। তাই একজন সাধারণ মানুষের কাছে বন-জঙ্গলের গুরুত্বও কম। তবে কোন লোকের জীবনেই বনজ বা বনে উৎপন্ন জিনিসের চাহিদা কিন্তু কম নয়। এটা প্রমাণ করতে একজন লোকের সারা দিনের কাজের হিসাব নিয়ে দেখা যেতে পারে। সকালে যে খাট বা চৌকি থেকে তিনি উঠলেন সেটা বনের কাঠ দিয়ে তৈরি, তারপর তিনি মুখ ধোবেন—দাঁত মাজবার ব্রাশ— হাতলটা তৈরি প্লাস্টিক দিয়ে যা পাইন জাতীয় কাঠ থেকে পাওয়া যায়, তাঁর খবরের কাগজ—অফিসের কাজের কাগজপত্র সবই এসেছে কাঠজাত মণ্ড থেকে, তাঁর যাতায়াতের ট্রেন

বা বাস তারও অনেক অংশ বনের কাঠ থেকে তৈরি। এমনিভাবে হিসেব নিয়ে দেখা যাবে যে একজন সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক দিনের নানা কাজে প্রায়ই বনজ সম্পদ ব্যবহার করছে। অথচ এ রাজ্যের মানুষের মনে বন-জঙ্গল সম্বন্ধে কোনো সচেতনতা নেই। যেহেতু এখানে বন কম।

সত্যি কথা বলতে কি এ রাজ্যে বনাঞ্চল বাড়ানোই কঠিন কাজ। কারণ চাষবাসের জন্যে, কলকারখানার জন্যে, ঘরবাড়ি তৈরির জন্যে এখানে জমির চাহিদা খুব বেশী। পতিত জমি সামান্য যা আছে সেগুলো এমন টুকরো টুকরো যে সেখানে বন তৈরি করলে তা বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। এদিকে রাজ্যের জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঠ বা কাঠজাত জিনিসের চাহিদা প্রচণ্ড রকম বেড়ে চলেছে। মাত্র গত পাঁচ বছরে আসবাবের কাঠের দাম বেড়ে তিনগুণ হয়ে গেছে। এই চাহিদা মেটানোর উপায় একই জমিতে বেশী করে কাঠ উৎপাদন। ঠিক এই উপায়ে এ রাজ্য কৃষি উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়েছে। তবে বনের উৎপাদন বাড়ানোর কাজে যে পরিমাণ টাকা ঢালা দরকার, সেটা জোগাড় করা কঠিন। বছর তিনেক হল একটা বন-উন্নয়ন কর্পোরেশন উত্তর বাংলায় কিছু এলাকার বন নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছে। এর পাশাপাশি দরকার বন সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা।

বন-গবেষণা

বন সম্বন্ধে গবেষণা প্রথম আরম্ভ হয় উত্তর বাংলায় বৃটিশ আমলে। উত্তরবঙ্গের বনে বিচিত্র গাছের মেলা, কিন্তু ভাল কাঠ জোগান দেওয়ার মত গাছ বেশী নেই। আবার যে কটা দামী কাঠের গাছ আছে সেগুলো কেটে নিলে পুরনো গাছের জায়গায় স্বাভাবিকভাবে সেই দামী কাঠের গাছ জন্মাচ্ছে না। তার জায়গায় জন্মাচ্ছে অন্য কোনো গাছ বা কিছু আগাছা। তাই কাঠের চাহিদা মেটাতে পারে এমন গাছ জন্মানোই বন-গবেষণার প্রথমের দিকে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তখন গবেষণাটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নেওয়া হল। কিভাবে বনের ভালো-মন্দ পাঁচমেশালী গাছগুলো কেটে নেওয়া হবে। তারপর দ্বিতীয়ত তার জায়গায় কি জাতের গাছ লাগানো হবে। পরীক্ষায় দেখা গেল বনাঞ্চলের এক-একটা অংশের যাবতীয় গাছপালা কেটে ফেলে, মায় তার গোড়া ও শেকড়গুলো শুদ্ধু উপড়ে ফেলে সেই জায়গায় সারি দিয়ে নতুন গাছ লাগানো উচিত। অনেক বাছাইয়ের পর যেসব গাছ নতুন করে লাগানোর জন্যে নেওয়া হল সেগুলো হল পাহাড়ী চাঁপা (এই চাঁপারই সগোত্র, ফুলও হয় তবে আকারে অনেক বড়), কাপাসি, পিপলি—এগুলো পাহাড়ী এলাকার বনের জন্যে: ডুয়ার্সের তরাই এলাকায় প্রায় সমতল বনে শাল, স্বর্ণচাঁপা বা চাঁপ, চিকরাসি, পানিসাজ ইত্যাদি। এসব গাছ এই এলাকার বনে স্বাভাবিকভাবেই জন্মায় এবং দামী কাঠও দেয়। এর সঙ্গে তরাই এলাকায় (প্রায় এখন থেকে একশ বছর আগে) ব্রহ্মদেশের সেগুনগাছও লাগানো হতে লাগল। সেগুনগাছ পরিণত হতে অনেক সময় লাগে, প্রায় সত্তর-আশী বছর। তরাই-এর বামন-পোখরী এলাকায় তখন থেকে প্রতি বছর সেগুনগাছের আবাদ চলেছে এখনও। এখন সেখানকার পুরনো পরিণত গাছগুলো থেকে খুব ভাল জাতের সেগুন কাঠ পাওয়া যাচ্ছে।

পাহাড়ী এলাকার বনের জন্যে যে গাছগুলো বেছে নেওয়া হয়েছিল কিছুদিন বাদে দেখা গেল সেগুলোর বাড় ততটা বেশী নয়। তাই তখন খোঁজ পড়ল তাড়াতাড়ি বাড়ে এমন গাছের। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল একটা পাইন গাছ—জাপানী পাইন নাম ক্রিপ্টোমেরিয়া জ্যাপোনিকা যা পাহাড়ী এলাকার বনে খুব মানিয়ে নিতে পেরেছে এবং বাড়েও খুব তাড়াতাড়ি। দার্জিলিং অঞ্চলে এখন যে সব পাইন গাছ দেখা যায় তার সবই এই গাছ যার চলতি নামও একটা চালু হয়েছে—ধূপি। ক্রমে এই ধূপি গাছের বন বাড়তে লাগল আর উত্তর বাংলায় বনের উৎপাদন ক্ষমতার বিরাট উন্নতি দেখা গেল। দেখা গেল যে স্বাভাবিক বনের তুলনায় এসব আবাদী বনে অনেক তাড়াতাড়ি অনেক বেশী কাঠ পাওয়া যায়। স্বাভাবিক বনে একশো বছরে যতটা কাঠ পাওয়া যায় আবাদী বনে মাত্র কুড়ি বাইশ বছরে ততটা কাঠ পাওয়া যায় অর্থাৎ উৎপাদন প্রায় পাঁচ গুণ বেশী হয়।

এ রাজ্যে যেমন বন কম তেমনি তার বৈচিত্র্য বেশী। উত্তর বাংলায় পাহাড়ী এলাকায় যে গবেষণার ফল তা তরাই এলাকায় খাটে না, আবার দক্ষিণ বাংলায় ওই দুটোর কোনটাই খাটে না। তাই সমতল ও উষ্ণতর দক্ষিণ বাংলার জন্যে চাই অন্য কোন গাছ যা তাড়াতাড়ি বাড়ে—গবেষণার ফলে পাওয়া গেল ইউক্যালিপটাস ও সোনাঝুরি।

ওদিকে তরাই অঞ্চল সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, বক্সা-দুয়ার এলাকার মাটি বাঁশের খুব উপযোগী। এখানে মাত্র দশ হাজার একর বনের জমিতে মুলী বাঁশ করতে পারলে তার ফলন যে কোন বড় কাগজ কলকে সারা বছরের জন্যে কাঁচা-মাল যোগাতে পারে। বীজ থেকে এ বাঁশ জন্মায়। বিহার থেকে নাগাভূমি পর্যন্ত সর্বত্রই এ বাঁশ ব্যাপকভাবে জন্মায়—স্বাভাবিক বনে।

অনেকে হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় বহু জায়গায় শাল-পিয়াশাল-আগাছার মেলানো বনগুলোকে কেটে, গোড়া পর্যন্ত তুলে ফেলে সেখানে ইউক্যালিপটাস ও সোনাঝুরি গাছের আবাদী বন তৈরী করা হয়েছে। ওগুলো বন গবেষণারই ফল। স্বাভাবিক বনের চেয়ে ওই আবাদী বনের উৎপাদন তিন থেকে চার গুণ বেশী।

ইউক্যালিপটাস-এর আদি বাস অস্ট্রেলিয়া। ওদেশে প্রায় চারশো জাতের ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। প্রায় পঞ্চাস বছর আগে মহীশুরে ইউক্যালিপটাস গাছের একটা হাইব্রিড তৈরী করা হয় সেখানকার বন গবেষণার অঙ্গ হিসাবে। দেখা গিয়েছিল যে ওই গাছ ভারতীয় উষ্ণ অঞ্চলের জল-হাওয়ায় বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। বাড়ছেও খুব তাড়াতাড়ি। গাছটার বিশেষ নাম দেওয়া হল 'মাইশোর হাইব্রিড।' পশ্চিম বাংলায় এখন যে সব ইউ-ক্যালিপটাস গাছ দেখা যায় তা ওই মাইশোর হাইব্রিড থেকেই এসেছে। এ ছাড়া, মেদিনীপুরের সমুদ্র তীর অঞ্চলে (দীঘা ইত্যাদি) লাগানো হয়েছে ঝাউ বা ক্যাসুয়ারিনা ইকুইসেটি-ফোলিয়া—এ গাছের আদি বাস প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল অস্ট্রেলিয়াও তার মধ্যে পড়ে। ঝাউ গাছেরও বাড় ভাল। ওই সব অঞ্চলের জ্বালানির চাহিদা ঝাউ গাছই এখন মেটাচ্ছে।

বন গবেষণার ঠাণ্ড এলাকার পাইন ছাড়া অন্য ধরনের পাইন নিয়েও কাজ চলেছে। তা হল ট্রপিক্যাল পাইন অর্থাৎ উষ্ণ (ক্রান্তি রেখা) অঞ্চলের উপযোগী পাইন গাছ। অনেকে হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চলে সুন্দর সুন্দর পাইন গাছের বন তৈরী করা হচ্ছে। এখানে যে পাইন গাছ লাগানো হচ্ছে তার নাম পাইনাস ক্যারিবিয়া। আদি বাস ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ। স্বাভাবিক বনের গাছের চেয়েও এ গাছের বাড় বেশী। কিন্তু এর একটা অসুবিধাও আছে। বনে আগুন লাগলে পাইনের পুরো আবাদকে আবাদ পুড়ে সাফ হয়ে যায় সেদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, স্বাভাবিক বনের শাল পিয়াশাল, কেন্দু গাছ আগুনে পুড়েও কোন রকমে বেঁচে থাকে আবার ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের খুব খারাপ একটা বদ অভ্যাস হচ্ছে বনের ভেতর দিয়ে যেতে শীতে ঝরে পড়া শুকনো

পাতার আগুন ধরিয়ে দেওয়া। এর ফলে বনের খুব ক্ষতি হয়, পাতাগুলো পড়ে সার হয়ে বনের গাছগুলোর যে পুষ্টি যোগাত তা সম্ভব হয় না, বনের মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায়। বহু চেষ্টা করেও এ অঞ্চলের লোকের এই বদ-অভ্যাস বন্ধ করা সম্ভব হয় নি। অথচ ওই সব অঞ্চলে মানুষের অনেকেরই রুজি-রোজগার এ সব বনাঞ্চল।

বন থেকে রুটি

প্রতি বছর বনের কাজে প্রচুর লোকজন দরকার হয় আর বনের কাজে যাদের লাগান হয় তারা সবাই ওই বনের আশে-পাশের গাঁয়ের গরীব লোক।

সাধারণত বন তৈরীর মোট খরচের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ টাকা মজুরী বাবদ খরচ করা হয়। এখন পশ্চিম বাংলায় প্রতি হেক্টার জমিতে নতুন বন তৈরীর খরচ ধরা হয় মোট নশো টাকা, এর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ অর্থাৎ ছশো পঁচাত্তর টাকা খরচ করা হয় মজুরী বাবদ। এই টাকাটা সোজাসুজি ওই খেটে-খাওয়া লোকগুলোর হাতে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। এখন গড়ে প্রতি বছর পশ্চিম বাংলায় দশ হাজার হেক্টার জমিতে নতুন বন তৈরী করা হচ্ছে।

মোটামুটি হিসেব করে দেখা গেছে যে কেবল বন তৈরীর কাজে বছরে হাজার দশেক লোককে প্রায় সারা বছর ধরে দিন-মজুরের চাকরি দেয়। এই খরচটা আরম্ভ হয় সাধারণত কালী পুজোর পর থেকে। জোর কদমে চলে পরের বছরের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। আসম-দুহিমাচল সর্বত্রই। তাছাড়া বনের চারা গাছের পরিচর্যা, আগাছা কাটা ইত্যাদি কাজেও প্রতি বছর অনেক লোক-জন লাগে। তারপরেও লোক লাগে বনের গাছ কাটা, ডালপালা ছাঁটাই, কাঠগুলো গাদা করা এবং লরিতে তোলার কাজে। অবশ্য এই খরচগুলো করে বনের ঠিকাদাররা, যারা প্রতি বছর বনের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের গাছ কাটার জন্যে নীলামে ডেকে নেয়। এগুলো হল বনের প্রধান উৎপাদন অর্থাৎ কাঠ থেকে মানুষের রুজি-রোজগারের উপায়। এই কাঠ আবার কোথাও কাগজ কলের কোথাও দেশলাই কারখানার বা করাত কলের, কোথাও বা আসবাব তৈরীর কাঁচামাল হিসাবে লাগছে। সেখানেও বন থেকে বহু লোকের রুজি-রোজগারের পরোক্ষ ব্যবস্থা হয়। গাছের কাঠ বাদ দিলে বনে অন্য অনেক ছোটখাট রোজগারের পথও আছে। যেমন উত্তর বাংলার কোন অঞ্চলে খয়ের গাছ এ্যাকেসিয়া ক্যাটেচু যা থেকে খয়ের তৈরী করে বনের ঠিকাদাররা। এ কাজেও অনেক লোকজন খাটে বছরের প্রায় ছ মাস। সুন্দরবনের মৌচাক থেকে পাওয়া মধু ও মোম বিক্রি ওই অঞ্চলের বহু লোকের রোজ-গারের পথ। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বনাঞ্চলে কেন্দু গাছের পাতা তুলে শুকিয়ে বিড়ি তৈরীর পাতা বানান, বাবুই ঘাস থেকে দড়ি বানান, মহুয়ার ফুল থেকে মদ ও ফল পেষাই করে তেল তৈরী করেও অনেক স্থানীয় লোক রোজগার করে। এসব নানা কারণে একটা ধারণা চালু হয়েছে যে বনের কাজে এক হাজার টাকা খাটালে একটা লোককে সারা বছরের জন্যে চাকরি দেওয়া যায়। তাছাড়া, ওই বন থেকে বিশ-তিরিশ বছর পরে বহু হাজার টাকার কাঠও পাওয়া যায়।

আজকাল চাষবাসে দেখা যায় একই জমিতে বছরে দুবার (কখনো কখনো তিনবার পর্যন্ত) ফসল তোলা হচ্ছে। বনের জমিকেও দো-ফসলী করার কাজ চলছে। শাল, সেগুন ইত্যাদি দামী কাঠের গাছগুলো বেশ বড় বড় হয় বলে ওগুলো বেশ কয়েক ফুট তফাতে তফাতে লাগান হয়। একটা গাছ থেকে আরেকটা গাছের মধ্যের জমিটা এতদিন অনাবাদী পড়ে থাকত। গত কয়েক

বছর ধরে ওই মাঝের জমিটাতে ছোটখাট ফসল ফলানো হচ্ছে। কোথাও কোথাও প্ল্যানটেশনের চারা ছোট থাকার সময় ভুট্টা, গম, শন, পাট ইত্যাদির চাষ করা হয়েছে। তরপর বনের গাছগুলো বড় হয়ে যাওয়ার পরও আদা হলুদের চাষ হচ্ছে। এর ফলে আসল গাছগুলোর কোন ক্ষতি হচ্ছে না বরং দুটো গাছের মাঝের মাটিটাতে চাষ দেওয়া ও কিছু কিছু সার দেওয়ার ফলে গাছগুলোর পরোক্ষ উপকারই হচ্ছে। এই চাষকে বন-বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ইন্টার প্ল্যান্টিং, এর উৎপাদনকে বলা হয়েছে মাইনর ফরেস্ট প্রোডিউস। এতে যেমন আয় হচ্ছে তেমনি বহু লোকের জীবিকার ব্যবস্থাও হচ্ছে।

বন থেকে যে মানুষটি সারা বছরের রোজগার করে সে রকমের মানুষও কিন্তু বনকে মনে মনে ঘেন্না করে—এ রাজ্যের বনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্কের এটাই স্বরূপ। সাধারণত এখানকার বন শহর থেকে অনেক দূরে রয়েছে তাই শহরের সভ্য-শিক্ষিত মানুষ বন নিয়ে যত কাব্যই করুক বনের তাতে কোন লাভ নেই। অবশ্য শহরের কজন মানুষই বা বন নিয়ে ভাবছে। কিন্তু বনের ঠিক প্রতিবেশী যে চাষী সে বনকে তার শত্রু বলেই মনে করে। কারণ বন থেকে জন্তু-জানোয়ার এসে তার ফসল নষ্ট করে দিতে পারে, বনটা কেটে তার জমির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারলে তার জমি খানিকটা বেড়ে যেতে পারে। তাই বন তার শত্রু—অন্ততঃ বন্ধু তো কখনোই নয়। অথচ এই বন না থাকলে তার জমিতে জল ধরে রাখা যেত না, তার জমিতে অনেক বেশী সার দিতে হোত, তার দেশ খরায় পুড়ত অথবা বন্যায় ডুবত—এসব কথা তাকে কেউ বুঝিয়ে বলেনি কখনো। কেবল তার বাড়িতে জ্বালানীর অভাব হলে চাষী বনের কাছে হাত পাতে। এই হোল বনের সঙ্গে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের সম্পর্ক। কেবল বনই নয় সাধারণভাবে গাছপালাকে সে এই চোখে দেখে।

বনোন্নয়ন

অরণ্য আহরণ, বাণিজ্যিক কাঠ সংগ্রহ, বন সৃষ্টি ও বনজাত দ্রব্য সরবরাহের জন্যে ১৯৭৪ সালে গঠন করা হয়েছে বন উন্নয়ন করপোরেশন। করপোরেশন গত তিন বছরে আশাতীত না হলেও উল্লেখযোগ্য কাজ দেখিয়েছেন। করপোরেশনের উদ্যোগে ১৯৭৪-৭৫ সালে ২,৬৭০ হেক্টর জমিতে চারা গাছ লাগান হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে লাগান হয় আরও ২,৮৪০ হেক্টর জমিতে। বর্তমানে নতুন বনভূমি ৫৫,০০০ হেক্টর জমি নিয়ে। এছাড়া, করপোরেশন প্রবেশের অগম্য জঙ্গলগুলিতে রাস্তা-ঘাট তৈরীর কাজে হাত দিয়েছেন। ১৯৭৪-৭৫ সালে বনভূমিতে রাস্তা তৈরী হয়েছিল ৬ কিলোমিটার। গত ৭৫-৭৬ সালে আরও ১৪ কিলোমিটার পথ হয়েছে। এ পর্যন্ত আমাদের বনভূমিতে মোট নতুন রাস্তা তৈরী হয়েছে ২৮ কিলোমিটার। খরচ পড়েছে ২৮ লাখ টাকা।

বন উন্নয়ন করপোরেশনের ম্যানিজিং ডিরেক্টর শ্রী পি কে রায় জানান, বনভূমিকে ঢেলে সাজাতে এখনই ৬-৮০ কোটি টাকা চাই। করপোরেশনের বছরে ৪৮ কিলোমিটার রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে। করপোরেশন আগামী দশ বছরে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে বনভূমিতে মোট পাঁচশ কিলোমিটার রাস্তা তৈরী করবে। পাহাড়ী এলাকার বনাঞ্চলে রাস্তা তৈরীর কাজ আমরা আগে করব। উত্তরবঙ্গের অনেকগুলি জঙ্গলের পথ এখনও দুর্গম রয়েছে। সেখানে ভাল পথঘাট তৈরী হয়ে গেলে বনসম্পদ আরও ভালভাবে আহরণ করা যাবে। জীবনের নিরাপত্তাও বাড়বে।

'গাছ বাঁচান—কয়লা ব্যবহার করুন।' আমাদের বন বিভাগ এই শ্লোগানটি নতুন করে তুলেছেন। আজ বাংলার সাঁইত্রিশ হাজার গ্রামের মানুষ জ্বালানি কাঠের অভাবে ভুগছেন। জ্বালানি কাঠের সমস্যা মেটাতে জঙ্গলের পর জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। সে-জায়গায় নতুন করে গাছ লাগানোর কথা এতদিন কেউই ভাবেনি। কাজেই এখন বেশি করে গাছ লাগানো দরকার। গাছ রক্ষা করা দরকার। জ্বালানি হিসেবে কাঠ না ব্যবহার করে এখন কয়লা ব্যবহার করা যেতে পারে। কাঠের চেয়ে কয়লায় অনেক বেশি সাশ্রয়। বন উন্নয়ন করপোরেশন কাঠ কয়লা তৈরীর ব্যাপারেও এখন বেশি করে গরজ দেখাচ্ছেন। কাঠের চেয়ে কাঠ কয়লার আগুন অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী। পাহাড়ী এলাকায় কাঠ কয়লার খুবই চাহিদা। সমতল এলাকায়ও গ্রামেগঞ্জে এখন কয়লা ব্যবহারের চল বাড়ছে। জ্বালানি কাঠের জোগান অব্যাহত রাখতে হলে নতুন করে গাছ লাগানো ছাড়া উপায় কি? সুখের কথা, সরকারের বন-মহোৎসবের ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকেই পতিত জমিতে গাছ লাগাচ্ছেন। বাড়ির পাশের টুকরো জমি, খেতের আল, পুকুরের পাড়, রাস্তার ধার কোথাও আর খালি পড়ে থাকছে না। বাগান করার দিকে লোকের ঝোঁক বাড়ছে। এখন আর যথেচ্ছভাবে গাছপালাও কেটে ফেলা হয় না।

অরণ্যে অভয় চাই

জঙ্গল বাঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারদের কথাও ভাবতে হবে। অরণ্যের সঙ্গে অরণ্য প্রাণীদের জীবন রক্ষাও খুবই দরকার। দুঃখের কথা, আমাদের জঙ্গলগুলি থেকে বন্য প্রাণীদের সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। মানুষের হাতেই বধ হচ্ছে তারা। আগেকার দিনে জমিদাররা খুব ঘটা করে শিকারে বেরুতেন। সেই সময় নির্বিচারে পশু হত্যা চলত। মানুষের শিকারের লালসা মেটাতে বহু বন্য প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বাঘ, সিংহ গণ্ডারের মতো বড় বড় জন্তু-জানোয়ারদের সংখ্যাও আজ খুবই অল্প। পশুপাখি প্রায় সবই নিঃশেষ হতে বসেছে। জঙ্গলগুলির অধিকাংশই এক রকম ফাঁকা।

অরণ্য প্রাণীদের জীবন রক্ষায় সরকার বিলম্বে হলেও এগিয়ে এসেছেন। জঙ্গলের গাছপালা কাটা এবং প্রাণী হত্যা আজ দুই-ই নিষিদ্ধ। দণ্ডনীয় অপরাধ। বন্য জন্তুদের রক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অভয়ারণ্য। এই অভয়ারণ্য গড়ার কথা আরও আগেই চিন্তা করা উচিত ছিল। আমাদের জঙ্গলে সিংহ আজ নেই বললেই চলে। বাঘের অবস্থাও তাই। সুন্দরবনে গায়েশা গণ্ডার দেখা যেত। এখন কোথায় গণ্ডার? মেদিনীপুরের জঙ্গলে যে চিতাবাঘ, হরিণ, ভালুক ছিল একথা আজ আর কেউই বিশ্বাস করবে না। উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে ছিল হাতির ঘর-সংসার। আজ সেখানে কোথায় হাতি? দুরন্ত শিকারীদের বাসনা চরিতার্থ করতে বন্য জন্তু প্রায় সবই সাবাড়। জঙ্গল এক রকম শূন্য।

পশ্চিমবঙ্গে আজ আটটি অভয়ারণ্য। উত্তরবঙ্গে পাঁচটি এবং সুন্দরবনে তিনটি। পৃথিবীর আর পাঁচটা দেশের মতো ঐগুলি আকারে খুব বড় না হলেও, এখানে অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। উত্তরবঙ্গে পাঁচটির মধ্যে তিনটি জলপাইগুড়ি জেলায় এবং দুটি দার্জিলিংয়ে। জলপাইগুড়ির তিনটি অভয়ারণ্যই সমতল ভূমিতে। এগুলি হলো—জলদাপাড়া, গোরুমারা এবং চাপড়ামারী।

জলপাইগুড়ি জেলার তিনটি অভয়ারণ্যের মধ্যে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যটিই ঘুরে দেখবার মতো। ট্যুরিস্ট ব্যুরো জলদাপাড়া ঘুরে দেখার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। প্রতি বছর অসংখ্য পর্যটক জলদাপাড়া দেখতে আসেনও। এখানে এলে যেটি সবার আগে দেখবেন তা হলো, অরণ্যের নিজস্ব সৌন্দর্য। সেই বিখ্যাত বৃহৎ এক শৃঙ্গ গণ্ডার জলদাপাড়ায় আপনাকে স্বাগত জানাবে। আর দেখবেন বাঘ, হাতি, সম্বর, গউড়, বারসিঙ্গা, চিতল, কাকর হরিণ, বরা হরিণ, গয়াল বা মিথুন। অসংখ্য পাখি এখানে-ওখানে উড়ে বেড়াচ্ছে। সবুজ গাছপালা। হরেক রকমের ফুল। জলদাপাড়া সত্যিই পর্যটক আকর্ষণের ক্ষমতা রাখে।

দার্জিলিং জেলায় দুটি অভয়ারণ্য—মহানন্দা ও সিঞ্চল। মহানন্দা সমতল ভূমি থেকে তিন হাজার ফুট উঁচুতে। সুকনা থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অভয়ারণ্যটি আকারে এমন কিছু বড় নয়। এখানে এলে দেখবেন বাঘ, হাতি, হরিণ ও বেশ কিছু ময়ূর। আকাশে মেঘের অপেক্ষা না রেখেই ময়ূর পেখম তুলে খুশিতে নাচে। হরিণ ছুটে বেড়ায়। মাঝে মাঝে বাঘের গর্জন।

সিঞ্চল অভয়ারণ্য দার্জিলিংয়ের খুব কাছেই। আট হাজার ফুট উঁচু টাইগার হিল-এ। এখানে বাঘ-সিংহ নেই। আছে কয়েকটি ভালুক, জংলী ছাগল আর কিছু হরিণ। এছাড়া অজস্র পাখি।

সুন্দরবনে তিনটি অভয়ারণ্য—সজনেখালি, হ্যালিডে দ্বীপ ও লোথিয়ান দ্বীপ। এই তিনটির মধ্যে বেশি নামকরা সজনেখালি। এটি একটি ট্যুরিস্ট স্পট। এটিই পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে বড় অভয়ারণ্য। সজনেখালির আয়তন একশ চল্লিশ বর্গমাইল। সজনেখালি বিখ্যাত পাখির আশ্রয়স্থল হিসেবে। শামুকখোল, পানকৌড়ি, তিতি, হাট্টিমাটিম দাঁড় কাক এবং শাদা বক সজনেখালির বারো মাসের বাসিন্দে। আজকাল অবশ্য সজনেখালি পিকনিকের সেরা জায়গা হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছে।

পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে ছোট অভয়ারণ্য হ্যালিডে দ্বীপ। ওর আয়তন ২·৯৩ বর্গমাইল হ্যালিডে দ্বীপ বিশেষ করে বাঘ, শুয়োর ও চিতলের আড্ডা। লোথিয়ান দ্বীপের আয়তন অনেক বেশি। প্রায় পনের বর্গমাইল। সেখানেও রয়েছে ঐই একই ধরনের জন্তুজানোয়ার।

এই সুন্দরবনেই রয়েছে ভারতের নবম ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র। রয়েল বেঙ্গল টাইগার এখানে দিব্যি বহাল তবিয়তে রয়েছে।

এ রাজ্যে আর আছে তিনটি মৃগদাব। এগুলি শান্তিনিকেতনের কাছে বল্লভপুরে, নদীয়া জেলায় বেথুয়াডহরীতে এবং চব্বিশ পরগণায় পাড়মদনে। এই তিনটি মৃগদাবে হরিণের সংসার খুবই বাড়বাড়ন্ত। নানা জাতের হরিণ রাখা হয়েছে এখানে।

বনকে বাঁচাতেই হবে

আমাদের অধিকাংশ জঙ্গলের বর্তমান যা হাল তাতে শঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। জংগল রক্ষার ব্যাপারে সরকার নজর দিচ্ছেন না তা নয়। দশ বছর আগের তুলনায় আমাদের বন বিভাগ আজ যথেষ্ট তৎপর। পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন করপোরেশনও হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। তাঁরাও জঙ্গল রক্ষায় ইতিমধ্যে অনেকগুলি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। কাজও হয়েছে কিছু কিছু। সংরক্ষণ ব্যবস্থাও চোখে পড়ছে। নতুন বনভূমিও হয়েছে অনেকগুলি। আমাদের যেটুকু জংগল আছে সেটুকুও যাতে লোকবসতির চাপে অবৈধ ব্যবহারে নষ্ট না হয় সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন গাছ লাগানো ও জীর্ণ গাছ কেটে ফেলার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে বন বিভাগ বা বন উন্নয়ন পর্ষৎকে শুধু দায়ী করলে চলবে না। দায়িত্ব আমাদেরও। সরকারী উদ্যোগ তো আছেই, সেই সঙ্গে আমাদেরও কিছু কর্তব্য থেকে যায়। মনে রাখতে হবে, আমাদের জংগল সে শুধু আয়েরই উৎস নয়, মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষেও ভীষণভাবে অপরিহার্য। নগরজীবনে কংক্রীটের জংগলে অতিষ্ঠ হয়ে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ জানিয়ে লিখেছিলেন : 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।' আফসোসের কথা, আজ আমরা সেই অরণ্য থেকেই মুখ ফিরিয়ে রয়েছি।

বন ও বনমহোৎসব

জংগল বা বনের সংগে বনমহোৎসব নামক অনুষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক নেই। এদেশের সাধারণ মানুষের মনে এ সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণা আছে যে বনমহোৎসবের উদ্দেশ্য আরো বন-জঙ্গল তৈরী করা। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। বন অর্থাৎ সরকারী জংগল তৈরী করবার কাজ সরকারের বন বিভাগ প্রতি বছর পরিকল্পনামত করে থাকে। এর সরকারী নাম প্ল্যানটেশন বা নতুন তৈরী বন, যার কাজ সারা বছর ধরেই চলে। কখনো মাটি তৈরী করা হচ্ছে, কখনো বীজতলার কাজ হচ্ছে, কখনো চারা লাগানোর জন্যে গর্ত খোঁড়া হচ্ছে, কখনো গাছ লাগানো হচ্ছে আবার কখনো আগাছা কাটা, বনের গাছ পাহারা এসব হচ্ছে। বনমহোৎসব অনুষ্ঠান যা প্রতি বছর পয়লা জুলাই শুরু হয় তার সংগে সরকারের বনাঞ্চল তৈরীর কোনো সম্বন্ধ নেই। তবে সরকারের বন বিভাগই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বনমহোৎসব অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা।

বনমহোৎসবের উদ্দেশ্য হোল দেশের সাধারণ মানুষকে গাছপালার উপকারিতা ও বৃক্ষরোপণ সম্বন্ধে সচেতন করা। এই বৃক্ষরোপণ হবে বাড়ির পাশের পোড়ো জমিতে, খাল-ক্ষেত-নালা-রাস্তা ইত্যাদির পাশে, স্কুল-কলেজ-অফিস-কারখানা ইত্যাদির জমিতে এবং পঞ্চায়েতের জমিতে। যার ফলে দেশে গাছপালার সংখ্যা বাড়বে, ভবিষ্যতে গাঁয়ের জ্বালানী কাঠের অভাব দূর করা যাবে। মাটিতে গাছপালা থাকার জন্যে মাটি ধুয়ে যাওয়া কমবে, বাতাসে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়বে, গাছ-পালা বৃষ্টিকে আকর্ষণ করে বৃষ্টিপাত বাড়াবে, বন্যা বা খরা রোধ করবে। এই গাছপালা লাগানোর কাজটা সাধারণ নাগরিকের কাছে একটা নীরস দায়িত্ব। বনমহোৎসব নামের একটা অনুষ্ঠান করে, নাচ-গান-বক্তৃতার সংগে গাছপালা লাগানোর ফলে সাধারণ মানুষের কাছে দায়িত্ব পালনটা অনেক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

এই বনমহোৎসব অনুষ্ঠান কিন্তু আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের কাছে এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। এটা আমাদের দেশের প্রাচীন উৎসবগুলির অন্যতম। বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে

বৃক্ষরোপণ একটা ব্রত হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষরোপণ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের অনুষ্ঠান ছিল, এখনও আছে। এদেশের রাজা-বাদশারা বৃক্ষরোপণ করেছেন প্রজা পালনের অঙ্গ হিসাবে। আবার প্রতি বছর রথের মেলা থেকে গাছ কিনে জিটেতে লাগানো গাঁয়ের মানুষেরও পুরানো অভ্যাস। বাড়িতে ছেলেমেয়ের জন্ম হলে তার নামে দু'একটা করে গাছ লাগানো বহু বনেদী বাড়ির প্রথা, যা এখনো গ্রামের দিকে টিঁকে রয়েছে। সাধারণত এ উপলক্ষে লাগানো হয় আমগাছ যার ফল ওই নবজাতক সারাজীবন খায় এবং তার দেহান্তর ঘটলে তাকে পোড়ানোর জন্যে কাঠেরও অভাব হয় না।

লিখেছেন : অশোককুমার চক্রবর্তী/বংশী মান্না

দূরত্ব

বলরাম বসাক
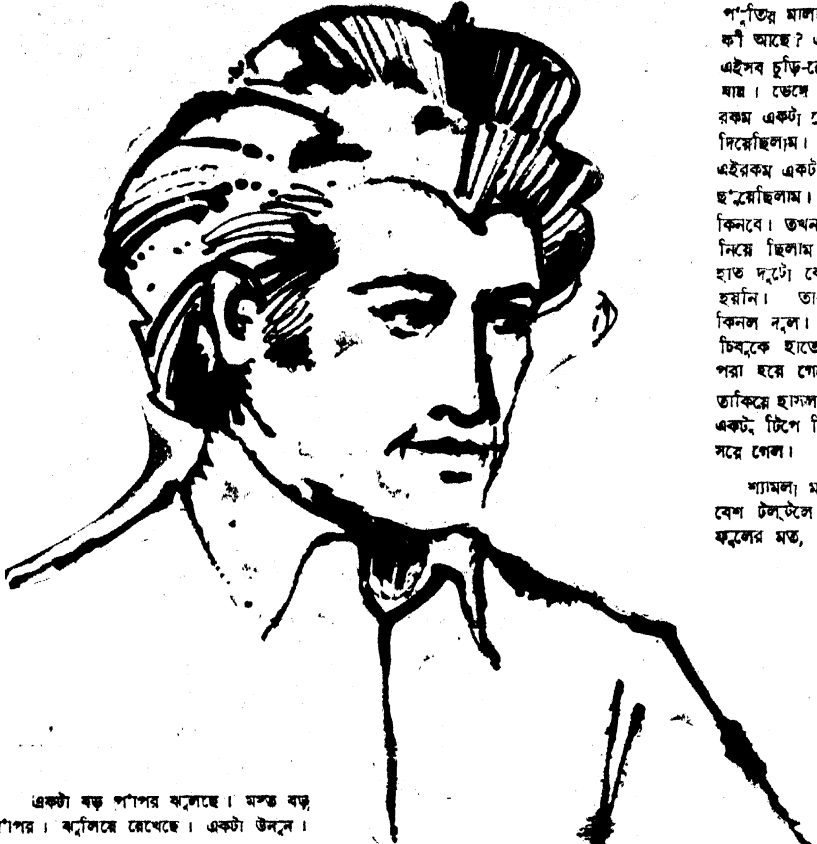
একটা বড় পাঁপর ঝুলছে। মস্ত বড় পাঁপর। ঝুলিয়ে রেখেছে। একটা উনুন। উনুনের ওপর কয়লা সাজানো। ভেতরে অন্ধকারে একটা ছেলের পা শুধু দেখা যাচ্ছে। তার মানে পাঁপরওয়ালা তক্তপোষে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ছেলেটার গায়ের রং নিশ্চয়ই কালো। তাই অল্প আলোয় গাটা তেমন চোখে পড়ছে না। বাইরে কিন্তু বেশ রোদ। মাঝ দুপুরের খাড়া রোদ। চারদিকটা তেপ্‌পেল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে, উপরে টিনের চালা। ভেতরে আলো ঢুকতে না পারলেও একটা অ্যালুমিনিয়ামের কড়াই চকচক করছে। তার সঙ্গে একটা খুন্তি। একটা ঝাঁটা। ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। একটা মেয়েও ঘুমোচ্ছে মনে হয়। ছেলেটার বৌ। একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীতে পাঁপর ভাজার দোকান দিয়েছে। এখন দুপুর বলে ঘুমিয়ে পড়েছে, একটু পরে উঠে উনুনে ধরাবে। লোক বাড়লে কড়াই চাপাবে। তেল পড়বে কড়াইটিতে। কী তেল? বাদাম তেল? [illegible] তেল পাবে কোথায়? [illegible] [illegible]

ওদের পাশের দোকানটার কতগুলো পেতলের চুড়ি ঝকমক করছে। বাঁশের খুঁটির সঙ্গে চট লাগানো। অর্থাৎ চটের দেয়াল। সেই দেয়ালে পেতলের চুড়ির সঙ্গে অজস্র কাচের চুড়ি ঝুলছে। লাল নীল সবুজ চুড়ি। কাচের বাকস। শাঁখা সিঁদুরও আছে দেখেছি। পুঁতির মালাও রয়েছে। ব্রেসলেট? আর কী কী আছে? ঐ ধরনের মেয়েদের গয়না এসব। এইসব চুড়ি-ব্রেসলেটে ঐ সব মেয়েদের পাওয়া যায়। ভেঙে গেলে ওরাও ভেঙে পড়ে। এই রকম একটা দোকান থেকে একটা দুল কিনে দিয়েছিলাম। সবুজে নীলে মিনে করা। এইরকম একটা দোকানের সামনেই ওকে প্রথম ছুঁয়েছিলাম। প্রথম ও ঠিক করল চুড়ি কিনবে। তখন ওর হাত দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে ছিলাম চুড়ি পরানোর ছলে। আমার হাত দুটো কেঁপেছিল কিন্তু ওর কিছুই হয়নি। তারপর চুড়ি আর কিনল না। কিনল দুল। ফলে ওর গালে কানে চুলে চিবুকে হাতের ছোঁয়া দিয়েছিলাম। দুল পরা হয়ে গেলে ও যখন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল তখন ইচ্ছে করছিল ওর গালটা একটু টিপে দিই। তা আর হল না। ছিটকে সরে গেল।

শ্যামলা মতন দেখতে ছিল, চোখ দুটো বেশ টলটলে ছিল, গোল মুখখানা ছিল ফুলের মত, নিটোল নিখুঁত ঢলঢলে

থতে, সুমা সে, মনোহরদের ছোট মেয়ে ত্য সত্যি ছিটকে সরে গেল।

গেছে তো গেছে। আমার ভারি বয়ে ছে। আমি এগিয়ে যাব। আমি হাঁটছি। নদিকে একটা লোক পায়ের ওপর পা থেছে। কালো পা। কালো উরু। গায়ে ঘাম। লো বুক। বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে সছে। হাতে একটা বাঁশের সরু নলি। লটার নীচে একটা পোড়ামাটির বাটি গানো রয়েছে। তার ওপর পাৎলা চামড়া গানো। তাতে, লাল রংয়ের ফুল আঁকা য়েছে। পাতাও আঁকা রয়েছে। নকশা কাটা। াকটা বাঁশের নলির ওপরের দিকে একে-রে মাথায় কান লাগিয়ে তার বাঁধছে। এই-বে বেহালা বানাচ্ছে। অনেকগুলো াল বাটি পোড়ামাটির তৈরি একদিকে ক করে সাজানো রয়েছে। অন্যদিকে গোল াল চাকতি। টুমটুমি। ডুগডুগি। টুমটুমি সানো গাড়ি। মাটির চাকা। বাঁশের কঞ্চি ার কাঠি। অনেকগুলো চাকতিতেই পাতলা চামড়া লাগানো রয়েছে, তাতে লালরংয়ের ফুলপাতাও আঁকা রয়েছে। একটা কি কিনে িয়ে যাব? নমিতার বাচ্চার জন্যে। নমিতা খুশি হবে। নমিতার বর ব্যাপারটা বাঁকা চোখে দেখবে। একটা টুমটুমি দিয়ে নমিতার মন খানিকটা ভাড়া পাওয়া যাবে। নমিতা এককাপ চা করে খাওয়াবে। হাঁটতে লাগ-লাম। পুতুলগুলো চোখ পাকিয়ে দেখছে। বুদ্ধ যীশু রাধাকৃষ্ণ পুলিশ ন্যাড়া।

হাঁটতে লাগলাম। একটা মেশিন। মেশিনের ধারে কতগুলো লম্বামত আখ জড়ো রয়েছে। সবুজ রংয়ের আখ আর খুব সরু। মেশিনের চাকায় ঘন্টা বাঁধা। আখ-গুলো মেশিনে ঢুকিয়ে চাকা চালালে ঠুং ঠুং ঠুং ঠুং শব্দ হবে। এখন কোন শব্দ হচ্ছে না। মেশিনওয়ালা নেই। বালতি ভরতি আখের রস নেই। কাঁচের গেলাস ভরতি সাদা জল তার সঙ্গে সাদা ধবধবে ফেনা উপচে পড়া চোখে ভাসছে, চোখে ভাসছে মারোয়ারি বৌদের নধর ত্বক অবাক সুধাপান। কিন্তু এখন কেউ নেই। মেশিনওয়ালা কোথায় কী পান করে ঘুমোচ্ছে কে জানে। শুধু এক বুড়ি ঠাকুমা লালপেড়ে শাড়ি পরে ছোট্ট ছেলের হাত ধরে যাচ্ছে। ছেলেটা নিশ্চয়ই ওর নাতি। নাতিটি বেশ লালটু লালটু আর কী ফরসা। ঠোঁট দুটো কী রকম টুক-টুকে লাল যেন এক খোক রক্ত ঐখানে আটকে গেছে। নাতি যখন অত সুন্দর নাতির মা না জানি আরও কত সুন্দর। আহা বুড়ি ঠাকুমার বৌমা নিশ্চয়ই তার মনের মত বৌমা—নিশ্চয়ই ঐ নাতির মতই বৌমার গোলগাল মুখ টকটকে রঙ, টুকটুকে ঠোঁট। বৌমা যখন এমন রূপবতী তখন নিশ্চয়ই ছেলে দারুণ কিছু একটা চাকরি বাকরি করে কিংবা অনেক টাকা কামায়। ভাল চাকরি আর ভাল মাইনেতে ভাল দেখতে ভাল মেয়ে পাওয়া যায়। ভাল সংসার করা যায়। খারাপ চাকরি ও খারাপ মাইনেতে খারাপ দেখতে খারাপ মেয়ে পাওয়া যায়। সংসারও খারাপ হয়। অবশ্য সব সময় কি এরকম ঘটে? যারি চাকরিই নেই। তার তো মেয়ে-বিয়ে-সংসার সম্পর্কে কোন প্রসঙ্গই উঠতে পারে না। তাকে মেলার শূন্য দুপুরে বিচরণ করতে হয়। অবশ্য দেখতে পাচ্ছি ছেলের মাও লালটু লালটু নাতিকে নিয়ে শূন্য দুপুরে শূন্য মেলায় পান চিবুতে চিবুতে মানে অনেকটা গোজাতির মত মুখ করে জাবর কাটতে কাটতে বিচরণ করছে।

আমার ঠাকুমা দশ বছর হল পটল তুলেছে। আমার হাত ধরে রাধাগোবিন্দের নাটমন্দিরে যেত। ঠাকুমার বান্ধবী মানদা ঠাকুমা তার সঙ্গে তার নাতনি, লাল ফুল নীল ফুল মাক্কা ফ্রক পরে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াত—এখন কোথায় গেল সেই মেয়েটি—কোথায় গেল সেই ছেলেবেলা? মেয়েটি কত বড়ই বা হয়েছে? হয়েছে, অনেক বড় হয়েছে হয়ত বিয়ে হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই এতদিনে দু-তিন ছেলের মা হয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকেই যদি ওর সঙ্গে লেগে থাকতাম, মানে একমাত্র একনিষ্ঠ প্রেম নিয়েই যদি থাকতাম...

অনেক দূরে নাগরদোলা স্তম্ভিত হয়ে আছে। তার ওপরে একখণ্ড মেঘ। এমন ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে একখণ্ড ছুটকো কালো মেঘ দেখতে মন্দ লাগছে না। দুপুর রোদে ছুটকো মেঘ দেখলে সরবত খাওয়ার কথা মনে পড়ে। ঐ যে সরবতের দোকান যদিও যদিও সরবত নেই, শুধু লাল নীল সবুজ নানা রংয়ের বোতল। তার পাশে সার্কাসের তাঁবু। তার সঙ্গে ওটা কি? সার্কাস না যাদু? মাকড়সা-কন্যা। একটা শরীরে দুটো মাথা। মানুষের শরীরে কুকুরের মাথা। ভোজবাজি। ঐখানে দাঁড়িয়ে একটু চা খেলে হয়। দারুণ দেখতে একটা মেয়ে যাদু খেলার তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চা অবশ্যই খেতে হবে, আর ওকে দেখতে হবে। এতক্ষণ ধরে রোদে রোদে শূন্য মেলায় হাঁটছি। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। মেয়েটা চুলের খোপা কী রকম করে যেন বেঁধেছে টান মেরে খুলে দিতে ইচ্ছে করে। মাকড়সা-কন্যার ছবি হা করে দেখছে। আহা, গায়ের গঠনটা যা-না—দু-হাতে টেনে নিয়ে এক্ষুনি যা খুশি করতে ইচ্ছে করছে। একটা শরীরে দুটো মাথা —ঐ ছবিটাও হা করে দেখছে। মজা পাচ্ছে বোধহয়। ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকব? কি করে ওর সঙ্গে কথা বলব? গিয়ে বলব 'দেখবে নাকি?'

তক্ষুনি ভুরু কুঁচকে টুঁচকে, নাক-ফাক সিঁটকে সরে যাবে। হয়ত কথাই বলবে না। কাদের বাড়ির মেয়ে? কে আছে ওর সঙ্গে? একা একা কুকুর মাথা মানুষের ছবি দেখছে। কেউ বোধহয় ওর সঙ্গে নেই। এই ভর-দুপুর বেলা একা একা এখানে এসে কী করছে? মেলা তো বিকেলে। তখন রাজ্যের লোক আসবে। একেবারে রাত দশটা পর্যন্ত হৈহৈ-রৈরৈ চলবে। তখন ঐ মেয়েই হৈহৈ-রৈরৈ-এর মধ্যে কোথায় তলিয়ে যাবে।

বাঁ দিকে একটা গলি। মেয়েটা গলির মধ্যে ঢুকল। আমি কি ওর পিছু নেব? নিই না। নাহ্ নিলে কি হবে? মেয়েটা কোথায় যাচ্ছে? বাড়ি যাচ্ছে? এদিকে ওর বাড়ি? কোন বাড়িটা? না বোধহয় অন্য কোন ব্যাপার এদিকের সব কটা বাড়িই আমার চেনা। গলিটার অনেকেই আমাকে চেনে। ঐ মেয়েটাকে তো কখনো এখনো দেখিনি। মেয়েটি নিশ্চয়ই অন্য কোন পাড়া থেকে এসেছে। বেপাড়ার মেয়ে মেলা দেখতে এ পাড়ায় এসেছে। ভরদুপুরে কি কেউ মেলা দেখতে আসে? নিশ্চয় কোন ছেলের কাছে এসেছে। কার কাছে এসেছে দেখলে হয়। পিছু নেব? নাহ্। যাচ্ছে যেখানে খুশি যাকগে।

ঝট করে আমিও গলিতে ঢুকলাম। দুপুর বেলা প্রেম মারতে যাচ্ছে দেখা যাক কি করে। পাশে খড়ের চালার ঘরগুলি। পেছনে দুপুরের ঝিমুনি খাওয়া মেলা। দুটো একটা টুমটুমির শব্দ। মেয়েটার ফিগারটা কিন্তু বেশ লাগছে। যদি একবার আড়ালে পাই—একবার কি পাওয়া যায় না? ওর যদি কেউ না থাকে মানে ওকে যদি কেউ না নিয়ে থাকে—তাহলে আমি যদি ওকে নিই...মেয়েটা কি খারাপ মেয়ে? যাচ্ছে কোথায়? কী রকম জায়গা দিয়ে যাচ্ছে? ওকে দেখতে যেরকম, যেরকমভাবে হাঁটছে, বেশ বড়ঘরের মেয়ে মনে হচ্ছে, কিন্তু ও এ পাড়া দিয়ে কোথায় যাচ্ছে? মেলা থেকে বেরিয়ে এই গলিতে ঢুকল কেন? খোপাটা ওরকম করে বেঁধেছে কেন? টান মেরে খুলে দিতে ইচ্ছে করছে। পুরো মুখটা এখনো দেখিনি। যতটুকু দেখেছি তাতেই খুনসুটি করতে ইচ্ছে করেছিল ওর সঙ্গে।

এই গলিটা দিয়ে সোজা হাঁটলে একটা কাঁচা নর্দমা পড়বে ডানদিকে। বাঁদিকে নিম-গাছের হালকা ছায়া। কাঁচা মাটির উঠান। বাংলা মালের গন্ধ। ছেঁড়া মাদুর পাতা একটা বুড়ি বাচ্চা কোলে করে বসে আবোল-তাবোল বকছে। নর্দমাটা লাফিয়ে পার হল। মেয়েটা সত্যি লাফিয়ে পার হল। তাহলে দেখছি এ পাড়াটা ওর চেনাই। এখানকার কোন দিকে কী তা সবই জানে দেখছি। এখন আমাকেও নর্দমাটা লাফিয়ে পার হতে হবে? নাহ্, বরং মেলাতেই ফিরে যাই। মেয়েটা দেখছি ওদিকের বেড়ার দিকে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে বুঝেছি। বেড়াটা ডিঙিয়ে যেতে পারলে নালার দিকের রাস্তাটা পাওয়া যাবে। ঐ রাস্তা ধরে যাবে। আমিও কি যাব? আমার বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। এক লাফে নর্দমা পার হলাম।

আমিও বেড়া ডিঙিয়ে নালার দিকের রাস্তায় চলে এলাম। মেয়েটা ফিরে তাকাল। আমাকে দেখল। এইবারে ওর মুখটা পুরো দেখতে পেলাম। মুখখানা মন্দ না। তবে। আহামরি কিছু নয়। পুরুষ্টু ঠোঁট। আমাকে টানছে। ওকে ছাড়া চলবে না। নেশা যখন পড়েছি তখন কিছুতেই ছাড়ব না। একেবারে এসপার ওসপার হয়ে যাক। বোধহয় ও বুঝতে পেরেছে আমি ওর পিছু নিয়েছি, তাই ও জোরে জোরে হাঁটছে। বুকের লো।

তবু দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। যাক বেশ কিছু দূরে চলে যাক। বেশ দূরত্ব রেখে ওর পিছু পিছু ছুটবো। কোথা থেকে একটা কুকুর এল। কুকুরটা ধুঁকছে। পাশের বাড়িতে রেডিও বেজে উঠছে। আমি হাঁটতে লাগলাম। একটা ছোট্ট ছেলে একা একা গুলি খেলছিল। আমাকে দেখে গুলিটা তাড়াতাড়ি হাতে নিল। গুলিটা হাতে নিয়ে শক্ত করে মুঠো করল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে সতর্ক চোখে তাকাল। একটু পরে রাস্তার ধারে সরে দাঁড়াল। ছেলেটার একটা চোখের তারায় তিল। এখানে অনেকেই আমাকে ভয় পায়। এ পাড়ার মাস্তান হাজা বাবুজ্যে আমাকে বলে, 'গুরু কেমন চালাচ্ছো?' মেয়েটা দেখছি অনেক দূরে চলে গেছে।

গা এখন ঘামছে। বাতাস নেই। গাল ঘাড় রোদে ঝলসে গেছে। কপাল পুড়ে গেছে। মাথার চুল বেশ গরম গলিটিতে আর্ধেক জায়গা জুড়ে ভাগ্যিস এক ফালি লম্বা ছায়া ছিল। তাই ছায়া ধরে হাঁটছি। একটা কাঠ চাঁপার গন্ধ নর্দমার গন্ধের সঙ্গে আর তার সঙ্গে অল্প একটু বাংলা মালের গন্ধ—সত্যি এমনভাবে মিশেছে—অদ্ভুত একটা গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। তার উপর যদি ঐ মেয়েটাকে দুই হাতে সাপটে নিয়ে, কোলে নিয়ে বসলে, এই অদ্ভুত গন্ধের সঙ্গে ওর চুলের গন্ধ, ভেজা ব্লাউজের ঘামের গন্ধ, মুখের আঁশটে গন্ধ সব মিশে আরো অদ্ভুত ধরনের গন্ধ—সেটা কী ধরনের গন্ধ—একবার যদি একটু সুযোগ হয়—তাহলে পরীক্ষা করে দেখা যেত। আমার নিজের গায়েও ঘামের গন্ধ—ঘামে জামাটা ভিজছে। পেছনে একটা কিসের শব্দ হল। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম একজন হাতে বালতি। তার হাতে জল ভরতি বালতি কাঁখে কলসি। কোমর বেঁকিয়ে কলসি নিয়েছে। কাঁধ হেলিয়ে বালতি ধরেছে। কলসি উপচে জল পড়ছে। রংটা কালো। চাউনিটা টেরচা। বৌটা চলে গেল। বৌটার সঙ্গে বেশ ঠাণ্ডা জল ছিল। হাঁটতে লাগলাম।

কাঁচা ড্রেনের পাশে একটা কুকুর শুয়ে আছে। চারটে পা একদিকে ফেলে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে। ছাইগাদার ওপর শুয়ে আছে। মাথা তুলল। তাকাল। তাকিয়েই থাকল। অনেক দূরে একটা কাক ডাকছে। কা—

বিচ্ছিরি গন্ধ। নর্দমার জল। নর্দমার পাশ দিয়ে গলিটা বেঁকে গেছে। কতগুলো ছুটকি মেয়ে, চুলে খাড়া খাড়া লাল ফিতের ফুল পাতা, লাফিয়ে লাফিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলছে। একটা আমগাছ। এই সেই পুকুর। এই পুকুরের সিঁড়িতে বসেই আমি একবার—সিঁড়িটা কোথায়? পুকুরের জল অনেক কমে গেছে। চারদিকে শ্যাওলা। সবুজ রং। জলটা কাঁপছে। যদিও দেখলে মনে হয় স্থির। আসলে একটা পোকা লাফিয়ে পড়েছে। তাই অস্পষ্ট গোল মতন হালকা ঢেউ মিশে যাচ্ছে। কী রকম মন্থরভাবে আরেকটা ঢেউ হালকা মতন, গোল হয়ে বৃত্তাকারে বড় হচ্ছে। সবুজ শ্যাওলার তলায় ঢুকে পড়ছে। ঐ তো সিঁড়ি। আমি সিঁড়িতে ধুপ করে বসে পড়েছি। মেয়েটা কোথায় গেল। যাকগে যেখানে খুশি। আমি আর যাব না। অনেকক্ষণ হেঁটেছি রোদের মধ্যে ভীষণ টায়ার্ড। সিঁড়ির ওপর আম-গাছের ছায়া। আর বেশ নির্জন। পুকুরের ভেতরে একটা বিশাল বাড়ি চুপ করে ডুবে আছে।

আমি এই অঞ্চলে এই পুকুর পর্যন্ত এসেছিলাম। তাও দিনের বেলা নয়, রাতে। সঙ্গে একটি মেয়েছিল, পাঁচ টাকাতেই রাজি হয়ে গেল, তাই টেনে এখানে নিয়ে এসে-ছিলাম। ভাবতেই মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। অন্ধকার রাত, আকাশে মেঘ ছিল, আম-গাছটার ঝাঁকড়া মাথায় জোনাকি পোকা জ্বলছিল। জলের মধ্যে আয়না ডোবানো ছিল হয়ত, তাই একটু আলোর আভা ছিটকে আসছিল। আজ এই দিন-দুপুরে এই পুকুরে একা বসে থেকে কী করব—মেয়েটা কোথায় গেল বোধহয় চলে গেছে। ঐ যে সবুজ মতন থামের আড়ালে। নাহ্, ভুল দেখছি। যদি থাকত ভালই হত। ওকে টেনে নিয়ে এই সিঁড়িতে বসালে, না আসতে চাইলে জোর করে টেনে কিংবা ভুলিয়ে-ভালিয়ে ভয় দেখিয়ে---অসুবিধে কিছু নেই, জায়গাটা বেশ নির্জন--নিরিবিলি। সেদিন অন্ধকারে বসে, এখানে কত কি করেছি—ভাবতেই লজ্জা লজ্জা করল। তারপরই মনটা কেমন করে উঠল। অন্ধকারে মেঘের নীচে বসে প্রথমে, ও তারপরে আমি, আমরা চুমু খেয়েছিলাম। ওর আবেগ দেখে মাঝে মাঝে চমকে চমকে উঠছিলাম। ওতো আবেগ দেখা-বেই পাঁচটা টাকা পাচ্ছে। দুই হাতে অনেক-ক্ষণ জাপটে ধরার পর ছেড়ে দিতেই, মেয়েটা প্রথম শাড়ি ঠিক করল, তারপর আচমকা ঘোমটা পরে আমার সামনে ঝুপ করে বসল 'কেমন লাগছে আমাকে? মানাচ্ছে?

আরে ঐ তো সবুজ মতন থামের আড়ালে। মেলায় পাওয়া মেয়েটা ওতো চলে যায়নি। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছে। আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে? আমার জন্যে? কী ব্যাপার, দেখতে হয়তো। মাথায় রক্ত খেলে গেল মনে হচ্ছে কপালের শিরাগুলো দপদপ করছে। উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটা তাহলে পালিয়ে যায়নি আজ এসপার ওসপার হয়ে যাবে।

আমাকে কি ভালো লেগে গেছে? না-কি খারাপ মেয়ে? প্রস্? নাহ্ সেরকম কিন্তু মনে হয় না দেখলে। দেখা যাক, কী হয় আমি এগিয়ে গেলাম। মেয়েটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল কি জানি না। কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে নাকি অন্য কারো জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে যেতেই মেয়ে হাঁটতে শুরু করল। এ কি রে বাবা! দেখা যাক কি হয়। এর শেষ দেখে ছাড়ব। হাঁটতে লাগলাম।

এইবারে নালাটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তা নালা পর্যন্ত এসে নালার ধার দিয়ে এঁকে

থেকে গেছে। এদিকে কোন দিনই আসিনি। জল কম ভাটা চলছে। চারদিকে খড়ের আঁটি পড়ে আছে। এদিক ওদিক খড়ের গাদা। অনেক দূরে একটা নৌকো ভরতি খড়। পেছনে রেলব্রিজ। কয়েকজন খড়ের আঁটি মাথায় নিয়েছে। কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে—নৌকো থেকে নামছে। দুলকি চালে হাঁটছে। কাঠের তক্তা বেঁকে যাচ্ছে। আরে মেয়েটা অনেক দূর চলে গেছে।

ও এতক্ষণে খড়ের ছাউনির দিকে গেছে। খড়ের ঘর। খাটিয়া। একটা গামছা। একটা পেতলের ঘটি। একটা গরু জাবর কাটছে। কচ্ কচ্ শব্দ হচ্ছে। লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে। আমি দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। ওকে ধরে ফেলা চাই।

ও এখন কতগুলো ঠেলাগাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তিনটে ঠেলাগাড়ি পরপর। পাশে আরেকটা ঠেলা গাড়ি। একটা ঘরের দাওয়ায় তিনটে খোট্টা। পেতলের উঁচু-কানা থালায় ছাতু মাখছে। দুজন বসে কথা বলছে। দুজন খাটিয়ার ওপর বসেছে। একটা ঠেলা-গাড়ির চাকা দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখেছে। কাঁচা মাটির দেয়াল। চারদিকে ফাটা ফাটা। মেয়েটা আমাকে লোভ দেখিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

খড়ের গাদায় একটা কুকুর শুয়ে আছে। আরেকটা বসে জিব বার করে হাঁপাচ্ছে। তারপর একটা গাছ। কি গাছ? কি গাছ তা জেনে কী হবে? মেয়েটা কিন্তু অনেক দূর চলে গেছে। ওদিকে একটা দোতলা বাড়ি। বোধহয় তেতলা হবে। সামনের বাড়িটা একেবারে কাঠের তৈরি। টিনের চালা, কাঠের দেয়াল। ভেতরে অল্প আলো। দেয়ালে রাম সীতা লক্ষ্মণ। রামের কাঁধে ধনুক। পাশে একটা হনুমানের ছবি। একপাশে একটা মেসিন। খড়কোটার মেসিন। মেসিনটা চলছে। একটা খাটিয়ায় একটা বুড়ো—তার চোখে পিচুটি ভরতি। মাথা ন্যাড়া অল্প অল্প পাকা চুল। বুড়োর গাল তুবড়ে গেছে।

অনেক দূরে একটা গাছ। একটা রাস্তা। একটা বাড়ি। দোতালা বাড়ি। তলায় দোকান। মুদিখানা। চায়ের দোকান। বাড়ি-টার পাশে কচুগাছ। কচুবন। মেয়েটা বোধহয় ঐ বাড়িটার দিকেই যাচ্ছে। না শেষ পর্যন্ত ঐ বাড়িটাকেও পাশ কাটিয়ে বড় রাস্তা ধরল। কতগুলো মোষ দাঁড়িয়ে আছে। মুখে ফেনা। মেয়েটা মোষগুলোর ওপারে চলে গেছে।

আমি এখনো মুদি দোকানটার কাছে। দোকানটার সামনে চট ঝুলছে। রোদের জন্য। চায়ের দোকান, ঠিক তার পাশে—বেঞ্চি কেঞ্চিও পাতা আছে। আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। চায়ের দোকানের সঙ্গে রেস্টুরেন্টও আছে। এখানে বেশ লোকজন আছে। রেস্টুরেন্ট না, বাঙালি হিন্দু হোটেল। হলদে রঙের সাইনবোর্ড। লালরঙের হরফ। ভেতরে অন্ধকার। উঁচু [illegible] বাঁচু বেঞ্চি। একটা কলের গানও বাজছে। মাস্তান ফাস্তানও আছে বেঞ্চিতে পা বা তুলে, বসে, সিগারেট খাচ্ছে। মাটিতে একটা ভাতের দানা। দানাটার ওপর মাছি বসেছে। ঠ্যাঙ তুলে ডানা ঝাড়া দিচ্ছে। কুকুরগুলো হাড় চিবুচ্ছে। আর না থাক, আর যাব না। মেয়েটা অনেক দূরে চলে গেছে। আমি বরং দোকানটাতেই ঢুকি। একটু চা খাই। কে কোথাকার মেয়ে তার পিছু নিয়ে কী হবে। এইতো আমাকে এতদূর টেনে আনল। আমার কি দোষ। এসে যখন পড়েছি আরেকটু দেখা যাক না। ঐ যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে নিয়ে সম্ভবতঃ খেলছে। এর একটা শেষ দেখা দরকার। আমি দাঁড়ালেই ও দাঁড়ায় কেন? এর মানে কি?

আমি হাঁটতে লাগলাম। ও লরিটার পেছনে। রাস্তার পিচ গলে গেছে। চট্ চট্ করছে। হাঁটা যাচ্ছে না। এরকম পিচ গলা রাস্তা দিয়ে কি করে ও হেঁটে যাচ্ছে। আমি তো পারছি না। ও এবার আস্তে আস্তে হাঁটছে। সামনে একটা তিনতলা বাড়ি। বাড়িটার দিকেই যাচ্ছে। বেশ বড় বাড়ি। এটা কাদের ফ্লাট বাড়ি। মেয়েটা বোধহয় ফ্ল্যাটে থাকে। কোন ফ্ল্যাটে থাকে? বাড়িটায় ঢুকবার সময় আমার দিকে তাকাল। আমি মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর দিকেই বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছি। মনে হচ্ছে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসল। হ্যাঁ মুচকে হেসেছে। আমার তাই মনে হল। আমি নিশ্চয়ই ঠিক দেখেছি। মেয়েটা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। আমি পাগলের মত ছুটবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। পা তুলতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। চটিটা পিচের মধ্যে আটকে গেছে।

উবু হয়ে পিচ থেকে চটিটা টেনে তোলার চেষ্টা করছি, পারছি না। এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি অন্য পা কোথায় রাখব, যা গরম পিচে—আলতো করে পাটা পিচের ওপর রেখে চটিটা আবার টেনে তোলার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। এক সময় সেই তিনতলা বাড়িটার ঝুল বারান্দায় সেই সবুজ মেয়েটা এসে দাঁড়াল। অনেক উঁচু থেকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। হাত নাড়াল। মনে হচ্ছে আমাকে ডাকল। ছুটে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করল। এতদূর যখন এসে পড়েছি ঢুকেই পড়ি না বাড়িটার মধ্যে। চটিটা থাক না পড়ে। খালি পায়েই চলে যাই। আমি পাগলের মত ছুটবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। পা-টা-ই পিচের মধ্যে আটকে গেছে। এবং পুড়েও গেছে।

অপরাধী না পেয়ে স্বদেশ সমাজপতির মনের অবস্থা তখন এমনই যে ও নিজেই একটা অপরাধ করে ফেলতে পারে। পুলিশের চাকরি, ওখানে কাজ ছাড়া আর কোন কথা নেই। ওপরওয়ালাও বড্ড কড়া, শুধু চেয়ারে বসে কাজ দেখতে চান। কাজ দেখাও বাবু খুশী, না দেখাতে পারলে অখুশী তো হবেনই এমনকি সাসপেন্ড বা অন্য কোন ছুতো-নাতায় চাকরিটা চলেও যেতে পারে। দয়া করে এত কিছু না করলেও প্রমোশনটা পারেন বন্ধ করে দিতে।

এসবের কোনটাই যে হওয়া উচিত নয়, স্বদেশ তা জানে, তাই আরো বেশী চিন্তিত। সাড়ে পাঁচটা বাজে, অথচ এখন পর্যন্ত কালিগঞ্জ থানায় কোন কেস এলো না। সেই সকাল থেকে কাস্টমারই তারা নেই। অন্যান্য দিন এমন সময় কালিগঞ্জ থানার দুটো ঘরই ঠাসা থাকে, সেই ভিড় সামলাতে হিমসিম খায় সবাই। কত লোকের কত সমস্যা। কোন ঝামেলা হলেই যাও থানাতে। পুলিশ নগররক্ষক, সে ঠিক দেখবে তোমায়। জনগণের সেবা করা মানেই তো দেশের সেবা করা। ঐ সৎকর্মের জন্যই তো পুলিশ মাইনে পায়। তবে হ্যাঁ, পুলিশ সব পারে, পারে না কেবল মনের সমস্যাগুলো মেটাতে। ওসব ব্যাপারে পুলিশ চিরকালই অকেজো। সূক্ষ্ম ব্যাপার-স্যাপার পুলিশ কখনই প্রশ্রয় দেয় না।

এই যেমন কয়েকদিন আগেই একজন মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা এসেছিলেন থানাতে: এসেই সে কি দারুণ কান্নাকাটি। কি ব্যাপার? না স্বামী বাড়ি আসে না। থাকে অন্যজনের সঙ্গে। পড়বি তো পড় কেসটা স্বদেশের কাছেই এসেছিল। তার কিন্তু কিছু করার ছিল না। এসব ব্যাপারে পুলিশ করবেই বা কি? কোনরকমে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে ভদ্রমহিলাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল ও। লাস্ট উইকে ঐ মহিলাটিকে স্বদেশ দেখেছে ট্যাক্সি চড়ে যেতে। সঙ্গে প্রায় জড়াজড়ি অবস্থায় বসেছিল একটি যুবক। ওটি যে স্বামী নয়, স্বদেশ সে ব্যাপারে সিওর। আরে বাবা, এ হোল পুলিশের চোখ। মানসিক সূক্ষ্ম সমস্যা মেটাতে না পারলে কি হবে? যে কোন খুঁটিনাটি ব্যাপার তারা বুঝে ফেলতে পারে। পুলিশ যে কোন নোংরা সম্পর্ক চট করে ধরে ফেলে।

আজ কিন্তু কালিগঞ্জ থানায় এসব অচল কেসও নেই। দু-চারটে ফালতু ঝামেলাও তো আসতে পারতো। যাকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা জব্বর কোন কিছুতে দাঁড় করিয়ে দিতো স্বদেশ। পরে সুযোগ-সুবিধামত ঐ কেসে কারোকে ভিড়িয়ে দেওয়া যেত। এমন কত হয়েছে?

শুধু আজকের দিনটার জন্য কালিগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ হয়েছে স্বদেশ। কাল থেকে আবার সেকেন্ড অফিসার। ও-সি একদিনের ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছেন তাই ঐ উন্নতি। আর আজই যত গণ্ডোগোল। ভালো কাজ না দেখাতে পারলে প্রমোশন হবে কি করে শুনি? সারাদিনে এ এলাকার কেউ কোন অপরাধ করছে না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? ডায়েরীতে এনকোয়ারি করার মত যে দু-চারটে কেস ছিল এস আই অর্ধেন্দুকে পাঠিয়েছিল স্বদেশ। সে খালি হাতে ফিরে এসেছে। ইনফরমারগুলোও আজ নিরামিষ।

সকালে যে কার মুখ দেখে উঠেছিল স্বদেশ, কে জানে? হঠাৎ-ই মনে পড়লো সকালে চোখ খুলেই সিলিং-এর উপর একটা টিকটিকি দেখেছিল সে। কে যেন বলেছিল, ঘুম থেকে উঠে টিকটিকি দেখলে দিনটা ভালো যায়। এই কি তার নমুনা? প্রমোশন পাওয়ার এতবড় সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল বলে।

গত রাত্রের এক আসামী এসেছিল কিছুক্ষণ আগে। রাস্তায় মদ খেয়ে মাতলামো করার জন্য সারারাত লক-আপে ছিল। দশটার সময় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কোর্টে। দেওয়া হয়েছিল আরো দু-তিনটে মামলা। তবু জামিন পেয়ে গেল। ছাড়া পেয়েই ফিরে এলো থানায় নিজের আংটি ঘড়ি ফেরত নিতে। মক্কেলের কথা বলার সে কি ভঙ্গী? দেখলেই রাগে গা জ্বলে,—দিন তো স্যার, আমার ঘড়ি, আংটি কি কি সব আছে? বেকার বেকার আমাকে হ্যারাস করলেন তো? দিন মশাই তাড়াতাড়ি দিন, দেরী হয়ে যাচ্ছে, বৌ ওদিকে চিন্তা করবে।

রাগে গা জ্বলছিল সমাজপতির। অন্য কোন কেসে আবার ফাঁসাবে কিনা ভাবছিল। শেষ অবধি অবশ্য কিছুই করা হয়নি, লোকটা নিজের জিনিষপত্র বুঝে নিয়ে চলে গেল। সেই থেকে কালিগঞ্জ থানা ফাঁকা। কোনদিন তো এমন হয় না। আজ যে কেন হলো কে জানে? সারাদিনে একটাও কেস নেই। প্রমোশন হবে তো?

এই প্রশ্নটি যখন আরো বড় হয়ে উঠলো, স্বদেশ সমাজপতি তখন বেরুলো অপরাধ খুঁজে বের করতে। যেভাবেই হোক কেস চাই। থানার সামনে থেকে যখন কালোরথ স্টার্ট নিল, ঘড়িতে তখন বাজে সাতটা। গাড়িতে উঠে স্বদেশ সমাজপতির হলো একটাই লক্ষ্য, একটাই জপ করার মন্ত্র, অপরাধী চাই, অপরাধী!

খোঁজ খবর; এক।

আলাদা কোন জায়গায় ওদের বাস করা উচিত ছিল, ওরা করতোও তাই। জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে! কোন তফাৎ নেই। বাড়ির সদরে তাই লিখে জানাতে হয়, 'গৃহস্থের বাড়ি।'

বেশ কিছু রং মাখা মেয়ে সদরে দাঁড়িয়েছিল। প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর ওদের এই দাঁড়ানোর ব্যাপারটা বদলে যায়। বাড়িটার সব মিলিয়ে বাসিন্দা যদি হয় তিরিশ তাহলে তারা তিন ভাগ হয়ে নেয়। দশজন করে এসে দাঁড়ায় দরজায়। পনেরো মিনিট পর অন্যদল আসে। এভাবেই চলে। স্বদেশ এ তথ্যটা জানে। 'পারুল' নামে একজন এ এলাকার ঐ একটা বাড়ি চালিয়ে থাকে। ছাত্রজীবনে স্বদেশ একবার পারুলের ঘরে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ঢুকেছিল, সে যুগে দশ টাকা দিতে হয়েছিল একবারের জন্য ঐ সব ব্যাপারে পারুলবালার তখন প্রচণ্ড নাম-ডাক। ওর মা তখন চালাতো সব কিছু। কি যেন নাম ছিল সে বুড়ির? আজ আর তা মনে না থাকলেও এটা মনে আছে যে বুড়ি স্বদেশের চিবুক ধরে বলেছিল, আবার এস কিন্তু বাছারা। বিকেল বিকেল এসো, সময় পাবে অনেকক্ষণ।

ঐ একবারই স্বদেশ গিয়েছিল, পরে আর যাওয়া হয়নি। সাহসে কুলোয়নি, কেবলই ভয় যদি অসুখে ধরে যায়?

পুলিশ এসেছে দেখে দরজায় দাঁড়ানো মেয়েগুলোর তেমন কোন চেঞ্জ হলো না, দু-একজন মুচকি হাসলো শুধু। ভাবখানা, স্বদেশ এবং তার সাঙ্গো-পাঙ্গোদের এ বাড়িতে বাধা মেয়েছেলে আছে, তারা যেন রোজই আসে। এমনই মেয়েগুলোর ভঙ্গী।

রাগ হলেও হজম করে নিতে হলো, কিছু করার নেই। পারুল হুড়মুড় করে নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে। যাই যাই করেও এখনও কিছু ব্যাপার রয়ে গেছে পারুলের। স্বদেশ চোখ দিয়ে সেটুকুই গিলে ফেললো। এপাড়ায় স্বদেশের উপরি পাওনা এইটুকুই। একদিন এসেছিল পারুল তাই আর এখন চিনতে পারে না স্বদেশকে।

চিনলে মুশকিল হতো ঐ থানায় থাকা। ব্ল্যাকমেল করার এমন সুযোগ কি ছাড়তো সে ?

ঃ কি ব্যাপার মেজোবাবু হঠাৎ যে ?

ঃ এই এদিক দেখতে শুনতে।

ঃ তা আসুন না ভিতরে। আপনার ওটাও নিয়ে যাবেন।

পারুলের বলার ধরণটা বড্ড বাজে, তার ওপর 'ওটাও' শব্দটা কানে কেমন যেন ভালগার লাগলো স্বদেশের। প্রথমে 'ওটাও' শুনে ও চমকে গিয়েছিল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই মনে পড়ে হাওয়ায় চেপে গেল। মুখে বললো, না, ওপরে যাব না। কেমন চলছে সব ?

ঃ ভালো বাবু ভালো। আপনারা থাকতে এখানে গণ্ডোগোল করবে কে শুনি ? দাঁড়ান দেখি—আপনারটা কাছেই আছে কিনা ? হতভাগারা সব গেল কোথায় একটা বসবার জায়গা।

ঃ না, না এই ঠিক আছে।

ওদিকে কিন্তু কথাটা বলেই বুকের মধ্যে হাত চালিয়েছে পারুল। বুকের অনেকখানি বেরিয়ে পড়লো তার ফলে। তাকাব না, তাকানো উচিত নয় ভেবেও কয়েকবার দেখলো স্বদেশ। বহুদিন পর শরীরটা আবার শিরশির করে উঠলো। এসব দেখা উচিত নয় ভেবে অন্যদিকে তাকাতে গিয়ে স্বদেশ বারান্দার কোণের দিকে আলো-আঁধারীর মধ্যে একটা বেশ সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেল। এবাড়িতে অমন রূপ চট করে দেখা যায় না। কিন্তু মেয়েটা অন্ধকারে কেন ? গণ্ডোগোলের ব্যাপার মনে হচ্ছে। কিডন্যাপের কেস নয় তো ?

ঃ এই নিন আপনার তিরিশ টাকা।

একটা ঢোক গিলে টাকাটা নিয়েই পকেটে পুরে ফেললো স্বদেশ। সঙ্গীরা বাইরে, স্বদেশ বললে তবেই আসবে ভিতরে। কেউ দেখলো না তো ঘুষ নিতে ? দেখলে অবশ্য বয়েই গেল। ঘুষ পেলে এদেশের কে ছেড়ে দেয় শুনি ?

ঃ মেয়েটি কে ?

ঃ ওমা, মুখপুড়ি আবার বেরিয়ে এসেছে। এই যা ভেতরে যা।

ঃ ব্যাপারটা কি ? ও ওখানে কেন

ঃ ওর বাজে অসুখ হয়েছে, ডাক্তার আলাদা করে একমাস রাখতে বলেছে। তাই দিয়েছি নীচের ঘরে নামিয়ে। ওর ঐ অসুখ সবার হওয়াটা কি ভালো ? কে যে ঢোকালো এ রোগ ! এখন বদনাম না হলে বাঁচি।

ঃ ও এই ব্যাপার। আমি ভাবলাম কিডন্যাপ কেস।

ঃ কি যে বলেন কর্তা। আপনাদের না জানিয়ে কখনও কিছু করেছি বলুন ? আর করবই বা কেন ? আপনারা কি কখনও উপায় থাকলে বাধা দিয়েছেন। ওসব আমার দ্বারা হবে না। তা আপনি কি দাঁড়িয়ে

থাকবেন, পায়ের ধুলো একটু দিন না ঘরে। একটু বসে, দুটো মিষ্টি খেয়ে যাবেন।

ঃ না থাক। আজ চলি। ছোটখাট কেস হলেই খবর দেবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ ছোট মাপের কেস হলে ঠিক খবর পাঠাব। মাসে পাঁচটা কেস পাবেনই। গত মাসে দিইনি বলুন ?

ঃ তা দিয়েছো, তবে মেয়েদের রাস্তার মোড়ে দাঁড়াতে দিও না। লোকে রিপোর্ট করছে।

ঃ না, না ওতো শুধু মাসের শেষে দুটো-একটা দিনের জন্য দাঁড়ায়। ওটুকু না ছাড়লে ওদেরই বা চলে কি করে বলুন ?

উচিত কথা তাই আর কিছু না বলে চলে আসে স্বদেশ সমাজপতি।

নীচু জমির উপর দোকানটা। পাশেই গাঙ্গা। শোনা যায়, বর্ষাকালে জোয়ারের সময় ঐ দোকানে মাঝে জল ঢোকে। তবু কিন্তু কোন সময়েই এই দেশী মদের দোকানটায় বিক্রী বা ভিড় কখনও কমে না। সকাল দশটা থেকে রাত্রি দশটা এবং বেআইনীভাবে সারারাত ভিড় লেগেই আছে। দোকানের পিছন দিকের ঘরে পাতা গোটা কুড়ি টেবিল সব সময়েই ভর্তি। বেশী ভিড় তাই মালিক বঙ্কিম মুৎসদ্দী অল্প দূরে একটা ঘর ভাড়া করে রেখে দিয়েছেন। অবস্থা বুঝে সেখানে খদ্দেরদের বসতে দেন। জমাটি ব্যবসা। এতটা জমার কিন্তু কথা নয়। সমাজপতিরা অনুগ্রহ করে বলেই দোকানের এত বাড়ন্ত। কথায় বলে, শুঁড়িখানার মালিক কখনও মদ ছোঁয় না। স্বদেশ কিন্তু যতদিন এখানের অবস্থা-টবস্থা দেখবার জন্য এসেছে, ততদিনই বঙ্কিমের মুখে মদের গন্ধ পেয়েছে। একদিন প্রশ্নও করেছিল এ নিয়ে। বঙ্কিম বলেছিল, নিজে টেস্ট না করে লোকজনকে সে মাল খাওয়াই কি করে বলুন ? শেষে সবাই পটলডাঙার টিকিট কাটলে, আপনারা কি আমায় ছেড়ে দেবেন ? কত ভেজাল মাল বেরিয়েছে জানেন ? তাই নিজে টেস্ট করে তারপর টেবিলে ছাড়ি।

আমার দোকানে কোন [illegible] পাবেন না স্যার।

আর গাড়ি থেকে নামতেই খবর চলে গেল বঙ্কিম মুৎসুদ্দীর কাছে। গলির মধ্যে দিয়ে অল্প একটু হেঁটে যেতে হয়। ঐ গলির মুখেই দেখা হয়ে গেল বঙ্কিমের সঙ্গে।

: একি স্যার, আপনি এ সময়ে ?

: এলুম দেখতে শুনতে।

: তার মানে ? আমি তো স্যার টাকা-পয়সা দু তারিখই পাঠিয়ে দিয়েছি।

: তাতে কি হয়েছে ? এমনি আসতে নেই নাকি ?

: ছিঃ ছিঃ তা থাকবে না কেন ? কিন্তু আপনারা এলে ক্ষতি হয় আমার। এই দেখুন না, সেদিন চাকিবাবু এলেন আর খদ্দেরগুলো ভয় পেয়ে সব কেটে যেতে লাগলো। রাত দশটা অবধি বিক্রীই হলো না কিছু।

: তারপরে তো হয়েছে।

: সে তো আপনাদেরই দয়া স্যার। একটা কথা বলবো ?

: কি ?

: ড্রেস পরে ভিতরে না গেলে খুব উপকার হয়। আপনাকে দেখলেই সব খদ্দের ভেগে যাবে।

: আমি আপনার খদ্দের তাড়াতে আসিনি, এসেছি খোঁজে ?

: কার বংশীর তো ?

চকিতে মনে পড়ে যায় বংশীর নামে ওয়ারেন্ট আছে। কথাটা খেয়াল ছিল না। স্বদেশ কিন্তু তা বুঝতে দিলে না, মাথা নাড়লো শুধু।

: না স্যার আসেনি। এলে তো আমি বলেছি খবর দেব। আর যাবেন না স্যার প্লিজ।

: বেশ আমি যাব না। সমীর তো প্লেন ড্রেসে আছে, ও ঘুরে আসুক। সমীর যাও তো দেখে এস। বাগী কারোকে দেখলেই তুলে নিয়ে আসবে।

সমীর চলে যায় বঙ্কিমকে নিয়ে। মিনিট তিনেক বাদে ঘুরে আসে। সঙ্গে নতুন কারোকে না দেখে, স্বদেশ বোঝে লাভ হয়নি কিছু।

বঙ্কিম মুৎসুদ্দী মুখ ব্যাজার করে বললো, আমি বললাম বিশ্বাস হলো না তো ? আচ্ছা আপনারা কি লাভ পান বলুন তো, গরীব দোকানদারদের হেনস্থা করে ?

খোঁজ খবর ; তিন।

গাড়িতে যেতে যেতে স্বদেশ বললো, বর্মন একটু দেখ না, পাঁচ আইন যদি পাওয়া যায় ? বর্মন শব্দ করে হাসলো, পাঁচ আইন গাড়িতে বসে কোথায় পাবেন ? ওসব কেস ধরতে গেলে তককে-তককে থাকতে হয়।

: তা যা বলেছো। পাঁচ আইন ব্যাপারটা বেশ প্যানিক এনেছে না ?

: ওতেই তো ক্ষতি হয়েছে। এখন চট করে কেউ আইন ভাঙে না। তবে বিশু আর শম্ভু এসব কেস ধরায় এক্সপার্ট। ওরা বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই দুটো-একটা ধরে আনবে।

: ধরে আনলেই ভালো। কি যে দিন পড়লো? সারাদিনে একটাও কেস নেই। এমন কথা কি কখনও শুনেছে ? দেশের লোকজনেরা কি সব সাধু হয়ে গেল?

: আমরাও দাদা ব্যাপারটা কেমন অ্যাবনর্মাল লাগছে। এমন তো কখনও হয় না। দেশের লোকজনের হলো কি? তবে আপনি ভাববেন না সব ম্যানেজ হয়ে যাবে। থানায় গিয়েই হয় দেখবেন, লাইন পড়ে গেছে ডাইরি লেখানোর জন্য। এ তো মফঃস্বলের ব্যাপার নয় রীতিমত কলকাতা শহর।

: হলেই বাঁচি। আচ্চা বর্মণ, টিকটিকি কি শুভ?

: ঠিক বুঝলাম না, আপনার কথাটা।

: মানে আমি বলতে চাইছি, কোন কিছু শুরু করার আগে তুমি যদি টিকটিকি দেখ তা কি ভালো?

: শুনেছি তো ভালো হয়। কেন আপনি দেখেছেন নাকি?

দেওয়া হলো না উত্তর, তার আগেই বর্মণ বলে উঠলো, এই দেখুন স্বদেশদা।

বর্মণ সদ্য ট্রেনিং নিয়ে এস-আই হয়ে এসেছে থানাতে। বয়স কম, খাটতে পারে ভীষণ। ছেলেটাকে মন্দ লাগে না সমাজপতির। ওর কথামত স্বদেশ তাকিয়ে দেখলো, রাস্তার মোড়ের একটা দোকানের সামনে বেশ ভিড় হয়েছে। নিশ্চয়ই গণ্ডগোলের কোন ব্যাপার?

ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললো স্বদেশ। ভিড়ের কাছে গিয়েই ব্রেক কষলো গাড়িটা। হুড়মুড় করে কালো গাড়ির দরজা খুলে নামতে গিয়ে স্বদেশ শুনলো, ড্রাইভার বলছে, ও কিছু নয় স্যার। টি-ভি দেখছে।

এ অবস্থাতেও হাসি পেয়ে গেল সমাজপতির। এমন ভুলও মানুষের হয়। ইদানীং ঐ একটা ব্যাপার ঘটছে। রাস্তাঘাটে ভিড় করে টি-ভি দেখা। হা-ঘরে দেশবাসী, যা পায় তাই দেখে। গরীব-গরীব দেশে অমনই হয়ে থাকে। লেখাপড়া না-জানা, অল্প জানা লোকজন রাস্তায় চলমান কোন একটি কিছু দেখলেই যে দাঁড়িয়ে পড়বে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

আবার গাড়ি চলতে শুরু করলো। এবার কোথায় যাওয়া যায়? সমাধানটা বর্মণকে করতে দেওয়া যাক ভেবে সমাজপতি বললো, কি হে বর্মণ, এখন কোথায়?

: তাই তো ভাবছি।

: বাজারে গেলে তো কিছু হকার পাকড়ানো যেতে পারে?

: না দাদা, বাজারে গিয়ে কোন লাভ হবে না।

দারুণ অবাক হলো সমাজপতি। এমন কথা আগে কখনও শোনে নি। বাজার তো পুলিশদের লক্ষ্মী। প্রশ্ন করলো, সে কি কেন?

: আপনি জানেন না, গত তিন দিন ধরে ফুটপাতে আর বাজার বসছে না।

: ও মা, কেন? তাহলে বসছে কোথায়?

: সবাই বাজারের ভেতরে। আগে যারা ভেতরে বিক্রী করত তাদের ইনকাম কমে যাচ্ছিল তাই বাজারের ইউনিয়ন থেকে ঐ ব্যবস্থা নিয়েছে, বাইরে আর কারোকে বসতে দিচ্ছে না।

: বল কি? এত কিছু হয়েছে, আর আমি জানি না।

: শুনেছেন ঠিকই, এখন হয়ত মনে নেই। তবু চলুন যদি কোন কেস পাওয়া যায়।

ড্রাইভারকে তেমনই বলা হলো। সামনে বর্মণ আর সমাজপতি বসে। জানলার ওপাশে অন্যান্যরা। এমন নিরামিষ দিন কি এর আগে কখনও এসেছে? অনেক ভেবেও সমাজপতি এহেন দিন তার দীর্ঘ কর্ম-

জীবনে আর খ'ুজে পেল না। ফুটপাথ এক দম পরিষ্কার। পথ চলতি মজুর ছাড়া আর কেউ নেই যাকে এই কালো গাড়ির সোয়ারি করা যায়। বেকার আসা। সমাজ-পতি তাকালো বর্মণের দিকে, বর্মণ তাকালো ওর দিকে। দুজনে চোখাচোখি হলো শুধু।

গাড়ি চলছে, সামনের দিকে উদ্দেশ্য-হীনভাবে।

সমাজপতি শুধু একবার বলেছিল, সাবধানে দেখে যাও আশপাশ। তেমন কিছু দেখলেই গাড়ি থামাবে।

সেই থেকে সমাজপতি আর বর্মণ দুজনেই শিকারের খোঁজে ওৎ পেতে রয়েছে শকুনের মতন। কখন যে ভাগাড়ে মড়া আসবে কে জানে? মড়া এলো না, এলো 'স্বপ্না' সিনেমা হল। দূর থেকে হলের আলোটা দেখতে পেয়ে সমাজপতি বললো, গাড়িটা একটু দূরে রেখ বাহাদুর। বর্মণ তুমি আর আমি কিন্তু নামবো না বুঝেছো।

: কেন দাদা?

: ড্রেস পরে আছি না। আমাদের দেখলেই ব্ল্যাকারগুলো ভেগে যাবে। পিছনের ওদের নামতে বলো। যে কজনকে পারে তুলে নিয়ে আসে যেন।

: কিন্তু দাদা ওদের ধরে কি কোন লাভ হবে? বড়বাবুর সঙ্গে নাকি একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে ওরা। মাঝখান দিয়ে উনি চটে যাবেন।

: তাই নাকি? জানতাম না তো? যাকগে দাদা তো আজ নেই। এক রাত্রি তো লক-আপে রাখা যাবে। মারধোর না করলেই হলো।

পিছনের দরজা দিয়ে জনা চারেক সাদা পোসাক নেমে গেল এবং ফিরেও এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। কেউ নেই। পুরনো বাংলা ছবি চলছে। ভিড় নেই এক-দম, তার আবার টিকিট ব্ল্যাক? কেন যে এ সব হলে সময়মত বাংলা ছবি আসে তা বুঝে উঠতে পারলো না সমাজপতি। হিন্দী ছবি চললে কত দিকে কত লাভ? হাউস ফুল হয়, টিকিট ব্ল্যাক হয়, পুলিশে ব্ল্যাকার অ্যারেস্ট করে। সবাই লাভবান হয়। তা নয় যত রাজ্যের অচল বাংলা ছবি চালানো হচ্ছে। ও হ্যাঁ, বর্মণ একটা ভাল খবর দিয়েছে। বড়বাবু ফিরলে কালই ব্ল্যাকারদের সঙ্গে বোঝাপড়ার শেয়ারটা চেয়ে নিতে হবে। দেরী হলে এ মাসটা আবার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

খোঁজ খবর; চার।

প্রেম এবং প্রেমের পরে অন্য কিছু করার যোগ্য জায়গা হলো, লেক। দিনের বেলা প্রমোদ উদ্যান। রাত্রে ঐ লেকই পাল্টে যায়। অন্ধকারে লেকের মাঝ বরাবর লম্বা দীঘিটার রঙ-ও যায় বদলে। ঐ লেকে দাঁড়িয়েই সমাজপতি ঠিক করলো, যেভাবে হোক এখান থেকে কেস নিতেই হবে। মেয়েমানুষের শরীর নিয়ে এখানে অনেক কিছুই শুধু নয়, সব কিছু হয়ে থাকে। কত ঘটনা যে সমাজপতি নিজেই দেখেছে

তার ইয়ত্তা নেই। অনেক দিন এখানে হাত পড়ে নি। আজ সবশুদ্ধ ঝেড়ে-পুছে তুলতে হবে গাড়িতে। তবে এসব জায়গায় ডিউটি করার সময় একটা ভয়ই কাজ করে, যদি চেনা-জানা বেরিয়ে যায়? তা সমাজপতি সেদিক থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত। গিন্নী মানে সুরমা ভীষণ ভালো। পরপুরুষের মুখ দেখে না বললেই চলে। ছেলে আছে বোর্ডিং-এ। আর তার মা ব্যস্ত ঘর-কন্নার কাজে। তাতেই সে সুখী। স্বদেশ চোর-ছ্যাচড় শাসন করে আর গিন্নী করে চাকর শাসন। ঐ নিয়ে বেশ আছে। কয়েকজন অফিসার আছে, যারা এখানে ডিউটি পেলে লাফিয়ে ওঠে। উপরিটা ভাল পাওয়া যায় বলে।

রাত হয়েছে অনেক। হলে কি হবে? এখনও নিশ্চয়ই জোড়ায়-জোড়ায় অনেকে আছে, গাছ-টাছ ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে। অমনই থাকে। চোখের আড়ালে না গিয়ে কি আর ঐ সব খেলা জমে?

অনেক খোঁজাখুজি করে মোট পাঁচটী পার্টি পাওয়া গেল কিন্তু আরেস্ট করা গেল না কারোকে। তিনটি পার্টি জলের ধারে বেঞ্চে বসে ছিল। তার মধ্যে প্রথম দলটি হলো, এক বুড়োবুড়ির। দ্বিতীয়টি দুটি যুবক ছেলে, ব্যবসা সংক্রান্ত কথা-বার্তায় ব্যস্ত। আর তৃতীয়টি হলো, এক রান্নার ঠাকুর, বেঞ্চে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল। সে বেচারা ঘুম চোখে পুলিশ দেখে একেবারে কেঁদে ফেললো! এদের সবাইকে বাড়ি চলে যেতে বলা ছাড়া আর কিছু করতে পারলো না সমাজপতি।

গাছের আড়ালে বসেছিল দুটি দল। প্রথম দলটিতে ছিল তিনটি ছেলে। আড়ালে বসে মদ্যপান করছিল তারা। তবুও অ্যারেস্ট করা গেল ন। প্রথমেই সমজপতি তার পাঁচ ব্যাটারি টর্চ থেকে যে ছেলেটির মুখে আলো ফেলেছিল তাকে একনজরেই চেনা গিয়েছিল। ছেলেটি আর কেউ নয় এ এলাকার মুকুটহীন সম্র্যাট পণ্ডা। স্থানীয় এম এল এ রমাকান্ত বসুর ডান হাত। একে চটিয়ে কোন লাভ নেই বরং বিপদ আছে। মুখে টর্চের আলো পড়তেই যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিল পণ্ডা।

ঃ কোন শালা টর্চ মারছে রে?

ঃ আমরা।

ঃ আমরাটা কে? ও স্বদেশদা। কি ব্যাপার দাদা, অসময়ে এখানে কেন?

ঃ দেখতে এলাম তোমরা কি করছো?

ঃ মাল খাচ্ছি স্যার। খাবেন নাকি একটু। টেষ্ট করে দেখুন একেবারে বিলাতি।

ঃ তোমরা গিলছো, তোমরাই গেলো। আমার আর দরকর নেই। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, ঘর থকতে এই লেকে কেন? একট ঘর তে স্ফূর্তি করর জন্য ভড় নিয়েছে। সেটর কি হল?

ঃ আর বলবেন না, বিয়ে করে ফেঁসে গেছি। শালা, শালার পরিবার সব এসেছে বেড়াতে। ঘরটা তাই ওদের ছেড়ে দিয়ে আমি পথে নেমেছি।

ঃ বেশ ভালো।

ঃ আপনি তো ভালো বলেই খালাস। আর আমি মরছি আমার জ্বালায়। ও হ্যাঁ, আপনি নাকি আজ বংকিমের দোকানে রেডে গিয়েছিলেন। কি ব্যাপার দাদা?

সঙ্গে জুনিয়র লোকজনেরা রয়েছে, বাধ্য হয়ে তাদের সামনে মিথ্যে বলতে হলো স্বদেশকে, খবর ছিল বংশী এসেছে।

আর কথা না বাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল স্বদেশ সমাজপতি। এ নবাব এম এল এ-র চামচা হয়ে নিজেও যেন একটা এম এল এ হয়ে গেছে। কথাবার্তার ঢং সেই রকম। কোন উপায় নেই বলে, সহ্য করে যেতে হয়। প্রতিবাদ করলেই হয়ত অজ পাড়াগাঁয়ে বদলী করিয়ে দেবে। এগিয়ে যেতে যেতে স্বদেশ শুনলো, পিছনে পণ্ডা বলছে, ও তাই বলুন আমি ভাবলাম আপনি বোধহয় ব্যাগর-বাই করছেন।

বর্মণ চুপচাপ ছিল এতক্ষণ, এবারে মুখ খুললো, পণ্ডার সাহসটা কেমন বেড়েছে লক্ষ্য করেছেন আপনি

ঃ হু করেছি। এম. এল. এ'র গণেশ উল্টাক তারপরে ওই হবে আমার প্রথম টার্গেট। আর ক'টা দিন, ইলেকশন তো এসে গেল।

জানালো. স্যার এই ঝোপটার আড়ালে একটা কিছু হচ্ছে।

ঃ তোমরা দাঁড়াও আমি দেখছি।

বলে এগিয়ে গেল স্বদেশ। বিরাট ঝোপটার ওপাশে বসে আছে ওরা মানে একটি ছেলে, একটি মেয়ে আবছা চাঁদের আলো। মেয়েটির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে ছেলেটি। নীচু গলায় আবৃত্তি করছে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ বসন্ত'। মুহূর্তটা খুব সুন্দর। দেখলেই বোঝা যায়, এক নিষ্পাপ পবিত্রতা ওদের ঘিরে রয়েছে। পিছনে যে কালিগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার স্বদেশ সমাজপতি এসে দাঁড়িয়েছে, সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে আবৃত্তি শুনলো স্বদেশ। সেই কলেজ লাইফ থেকে কবিতাটা ওর খুব প্রিয়। সে সময় প্রায় দিনই মনে মনে আবৃত্তি করতো। কবিতাটা। বড় দুর্বল জায়গা। সময়মত দুর্বল জায়গায় সবাই কেন যে আঘাত করে বোঝা যায় না। কোন নোংরামি নেই, স্বপ্নে দেখা দৃশ্যের মতনই নিষ্কলঙ্ক। বাধা না দিয়ে যেমন এসেছিল, তেমন নিঃশব্দেই ফিরে গেল স্বদেশ সমাজপতি।

থানায় ফিরে শুনলেন না, কোন কেস আসে নি। এস আই অর্ধেন্দু বসে বসে মাছি তাড়িয়েছে এতক্ষণ। বিশু আর শম্ভুও ফিরে এসেছে খালি হাতে। এমনই দিন পড়েছে, পাঁচ আইনও কেউ ভাঙছে না। কি আর করা যাবে? প্রমোশনের এত বড় সুযোগটা হাত-ছাড়া হয়ে গেল, এই যা দুঃখ। আবার কবে সুযোগ আসবে কে জানে?

রাত সাড়ে দশটা। খিদে-খিদে পাচ্ছে, খাওয়াটা সেরে এলে হয়। কিন্তু এসেই বা কি হবে? মাছি তাড়ানো বা নিদ্রা দেওয়া ছাড়া! তবু তো খেতে হবেই। টুপিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে স্বদেশ বললো, অর্ধেন্দু তুমি আর একটু থাক। আমি খাওয়াটা সেরেই চলে আসছি।

থানার লাগোয়া কোয়ার্টার। দোতলার ফ্ল্যাটে থাকে স্বদেশ। সিঁড়িগুলো ভীষণ খাড়া উঠতে কষ্ট হয়। কোন ফ্ল্যাটে যেন বিবিধ ভারতী চলছে রেডিওতে। 'বাবা এসেছে, বাবা এসেছে সঙ্গে কি এনেছে?' অনেকদিন ছেলেকে দেখা হয় নি। এবার একদিন ছেলেকে গিয়ে দেখে আসতে হবে বোর্ডিং-এ। পুলিশের চাকরির এই এক ঝামেলা বাবার কর্তব্যটুকুও ঠিক মত করা হয়ে ওঠে না।

নিজের নেম প্লেট লাগানো সদর দরজাটা খোলা দেখে প্রথমে কেমন সন্দেহ হলো স্বদেশের। এত রাতে দরজা খোলা কেন? কে এল আবার?

এই জিজ্ঞাসাটা মনে নিয়েই স্বদেশ হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকলো এবং দেখলো, শোওয়ার ঘরে সুরমা হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। চাকরটা কোথাও নেই।
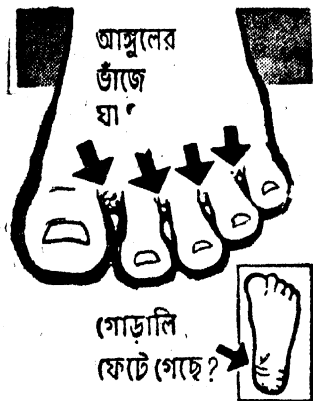
বিশ শতকের শুরু থেকে বাঙালী জীবনের স্মৃতি আলেখ্য

ঐ বাড়িতে যাওয়াটা একেবারে নিরাপদ ছিল না। পাইন মাউন্ট স্কুলের মেট্রনের একপাল রাজহাঁস, বিলিতী মুরগি আর মস্ত মস্ত পেরু ছিল। হরিচরণ, নন্দ, দাদা, কল্যাণ, আমাদের একটা খেলাই ছিল তাদের তাড়িয়ে বেড়ানো। তার ফলে সব কটা পাখির মেজাজ একেবারে খিঁচড়ে গেছিল। বেঁটে কাউকে দেখলেই গলা বাগিয়ে, ঠোঁট এগিয়ে, সাপের মতো হিস্-হিস্ শব্দ করতে করতে তেড়ে আসত। আর ধরতে পারলে তো কথাই নেই, গোড়ালি ঠুকরে রক্তারক্তি করে দিত। দিদি, আমি ওর মধ্যে ছিলাম না, তবু আমাদের বাদ দিত না। এমন কি সম্পূর্ণ অচেনা বেঁটেখাটো কাউকে দূর থেকেও দেখতে পেলে তেড়ে আসত। হাঁস পেরু যে কি ভয়ংকর রকমের হিংস্র জানোয়ার তা খুব কম লোকেই জানে। হরিচরণদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়িতে যাওয়া-আসাটা তাই সাধারণ ঘটনার পর্যায় থেকে একটা উত্তেজনাময় অভিযানে দাঁড়াত। ক্রমে দুই পক্ষই দক্ষ গেরিলা যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলাম। অতর্কিতে আক্রমণ ও পশ্চাদ-পসরণ। বলা বাহুল্য বড়রা এর কিছুই জানতেন না।

আরো সব কাকাবাবু ছিলেন আমাদের। তাঁদের অযাচিত স্নেহের কথা ভুলবার নয়। সবাই বাবাদের আপিসে কাজ করতেন। প্রফুল্ল কাকাবাবুরা লালপুলের ওপর আমাদের সেই পুরনো বাড়িতে থাকতেন। ও-বাড়ির নাড়ু নীলু হরিচরণ নন্দর মতোই আমাদের খেলার সাথী ও সমবয়সী। সারাজীবন আমরা এদের কাছাকাছি বাস করেছি। আজ পর্যন্ত এরা আমাদের অন্তরের অন্তরঙ্গ। কে বলেছে এরা আমাদের সত্যিকার আত্মীয় নয়? কয়েক বছর পরের ঘটনা মনে পড়ছে। আমরা সকলেই তখন কলকাতার বাসিন্দা। ভবানী-পুরের অধিবাসী। মায়ের হল নিউমোনিয়া, যায় যায় অবস্থা, চারবেলা ডাক্তার আসেন। কিন্তু টাকার টানাটানি পড়ল। কাকাবাবুরা বাবার জুনিয়র, তাঁদের সাহায্য নেবার কথা বাবা মনেও স্থান দিতে পারেন না। তাঁরা দুজনেই চুপিচুপি নোটের তোড়া এনে দিদির আমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছিলেন, বলেছিলেন, 'বাবাকে বলিস না।' আমরা একটি কথাও বলতে পারিনি। বাবা যখন শুনলেন, আমাদের একটুও বকলেন না, অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। মা ভালো হয়ে গেলে সেই টাকা কাকাবাবুদের দিয়ে আসা হয়েছিল। এইরকম নিশ্চিন্ত নিরা-পত্তায়, স্নেহে-প্রেমে আমার ছোটবেলাটা কেটেছিল। তাই আমার আজ পর্যন্ত যত লোক দেখি, প্রায় সক্কলকে ভালো লাগে। ঐ ভালো-লাগাটা এক-তরফা হলেও ভালো লাগে। আমার সব চিন্তা, সব কাজের পিছনে সবইকে আর প্রায় সব কিছুকে এই ভালো-লাগাটা কাজ করে। আমার ব্যাং পর্যন্ত ভালো লাগে। মাকড়সাও ভালো লাগে, তবে একটু দূরে থেকে।

কলকাতা থেকে ফিরেই আবার শিলং-এর পুরনো জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। বাড়ির পাবে সিসল-ঝোপের বেড়ায় দিনের বেলাও ঝিঁঝিপোকা ডাকত। তার পিছনে বন-বিভাগের বড় সায়েব মিঃ কাউই থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পাগল। তাঁকে বন্ধ করে রাখা হত, একেক দিন পালিয়ে এসে মায়ের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করতেন: একবার বলেছিলেন, 'আমাদের বাড়িতে পার্টি হয়, সবাই আসে। কিন্তু আমাকে ওরা যেতে দেয় না।' অপূর্ব সুন্দরী মানুষটি। মায়ের খুব দুঃখ হয়েছিল। একটু পরেই আয়া, নার্স, বেয়ারা সবাই ছুটে এসে তাঁকে বাড়ি নিয়ে গেছিল।

কাউই সাহেবের গোটা দশেক সোনালী রংয়ের বিলিতী বেড়াল ছিল। তাদের কি আহ্লাদ! দেখে আমাদের গা জ্বলে যেত: তারা টিনের মাছ খেত। গাছে চড়তে পারত না। পাড়ার বেড়ালরা তাদের ওপর হাড়ে চটা ছিল, দেখলেই তাড়া করত। তারাও ম্যাও ম্যাও করতে করতে ঘরে পালাত আর বয়-বেয়ারা ঠ্যাঙা নিয়ে পাতি বেড়ালদের ভাগাত। বিশেষ করে একটা ছাই রংয়ের হুলো ছিল সব চাইতে গোঁয়ার-গোবিন্দ। একদিন একটা হলদে বেড়ালকে একলা পেয়ে হুলো তাকে তাড়িয়ে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এল। সে বেচারা গাছে চড়তে পারে না, তবু মরিয়া হয়ে তরতর করে আমাদের সরল গাছের মগডালে চড়ে বসল। হুলোর গাছে চড়া হল না। হাঁকডাক শুনে বয়-বেয়ারারা বাঁশ নিয়ে এসে তাকে তাড়াল। তারপর হল মজা। আহ্লাদে আর নামতে পারে না! সাহেবের পেয়ারের চাকররা গাছে চড়তে পারে না! শেষটা একটা লম্বা মই এনে তাকে নামানো হল।

ঐ হুলো কিন্তু মহাপাজি ছিল। মাঝে-মাঝেই আমাদের মাছ খেয়ে যেত। সেকালে ওখানে সপ্তাহে দুদিন বাজার বসত, তখন মাছ পাওয়া যেত। সকলে মাছ ভেজে দু-তিন দিন ধরে খেত। ঠান্ডা জায়গা, নষ্ট হত না। আমাদের রান্নাঘরের ছাদ থেকে শিকে ঝুলত, শেষটা বামিনীদা সেই শিকেতে ভাজা-মাছ তুলে রাখল। হুলোও হন্যে হয়ে, স্কাই-লাইটে চড়ে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে, মাছ নামিয়ে, কতক খেয়ে, কতক নষ্ট করে দিয়ে চলে গেল। ভয়ানক রেগে গেছিলাম।

সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম আমি বসে আছি, একেবারে আমার গা-ঘেঁষে হুলো যাচ্ছে। হাতে কোন হাতিয়ার নেই, কিন্তু এমন সুযোগ তো ছাড়া যায় না, দিলাম কষে হুলোর গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত! দিদি শুত আমার পাশে, মস্ত বড় একটা লেপের নিচে, ওর নরম-গরম পায়ে পা লাগিয়ে আমার ঠান্ডা গা গরম করতাম বলে এমনিতেই এ ব্যবস্থা ওর পছন্দ ছিল না। তার ওপর আজ রাতের চড়টা গায়ে ওর গালে পড়াতে, ঠান্ডা মানুষটা রেগেমেগে উঠে বসে বলল, 'ও কি হচ্ছে! আমাকে চড় মারছিস কেন?' আমি বললাম, 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। স্বপ্নে মারছি রে, ও সত্যিকার চড় নয়।' দিদি বলল, আমিও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে তোকে মারছি।' এই বলে আমাকে দুঘা দিয়ে পাশ ফিরে শুল! এরপরে জালের ডুলি কেনা হল, তাতে মাছ বন্ধ করে রাখা হত।

এর মধ্যে কলকাতা থেকে চিঠি এল বড় মাসিমা তাঁর ছোট্ট মেয়ে নোটনকে নিয়ে শিলং-এ আসছেন। মেসোমশাই তখন বিলেতে, তিনি না ফেরা অবধি মাসিমারা আমাদের সংগে থাকবেন। খুব খুশি হয়েছিলাম: সেকালে কেউ বড় বড় পরিবারে আপত্তির কারণ দেখত। আমরাও ততদিনে বাড়তে বাড়তে দুই বোন চার ভাইতে দাঁড়িয়েছি। বোনের সংখ্যা এবার বাড়বে জেনে দিদির, আমার মহা উৎসাহ। আর মায়ের নিজের মানুষ বলতে ঐ দুটি বোন, আর তাঁর কেউ ছিল না। সেই বোন দুটি মায়ের চোখের মণি। বড় মাসিমা মায়ের চেয়ে দু বছরের বড় ছিলেন। আমরা মোটর-আপিসে আনতে গেলাম। মস্ত গাড়ি থেকে নামলেন। এখন হলে বলতাম বাস, কিন্তু তখনো বাস্ কথাটার চল হয়নি। কলকাতার রাস্তাতেও বাস চলত না শুধু ট্রাম চলত।

বড়মাসিমার চমৎকার চেহারা ছিল, মার চাইতে মাথায় সামান্য লম্বা, শক্ত বলিষ্ঠ শরীর, চোখে সোনার চশমা, মায়ের মতো অতটা ফরসা না হলেও খুবই সুন্দর রং। আর নোটন একটা মোমের ডলির মতো

দুলতো। বড়দের বিয়ের, আমরা কেঁদে কেঁদে ঢেঁকী করলে, চ্যাঁ-চ্যাঁ করে, মুখ ফিরিয়ে ঝাড় দিয়ে আমাদের ঠেলে দিল। মাসিমা তাড়াতাড়ি এসে তুলে নিয়ে বললেন 'আহা, ওকে বিরক্ত কর না, তোমাদের তো আর ছেলে না।' আমাদের হাতে কোথায় উবে গেল।

ওর স্বভাব ছিল আলাদা, যেমনি নাক-মুখ, তেমনি সুন্দর কোঁকড়া চুল, ছুঁচ যেন তুলি দিয়ে আঁকা, বড় বড় চোখ দুটো জড়োলে, পল্লবগুলো ভুরুতে ঠেকত। এমন সুশ্রী মেয়ে আমি কম দেখেছি। তবে ঐ যা বললাম, বেজায় আহ্লাদী, নিজের মাকে ছেড়ে এক মিনিট থাকবে না, আমাদের খেলায় যোগ দেবে না। বয়স প্রায় তিন। ওর সঙ্গে ভাব করতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। পরে দেখলাম স্বভাবটাও তেমনি মিষ্টি। কারো সঙ্গে ঝগড়া করে না, কটু কথা বলে না। আমার সেজ ভাই অমিয় ওর চাইতে তিন মাসের বড়, সে কেবলি ওর পেছনে লাগত। ভাবও ছিল যথেষ্ট, একসঙ্গে খেলাধুলো হ'ত, পরীদের মতো দেখতে নোটন আর কালো-কোলো গাঁট্টা-গোট্টা অমি। মনে আছে সেই সময় আমাদের নিজেদের চেহারা সম্বন্ধে আমাদের চোখ ফোটেনি। একদিন শুনেছিলাম মাসিমা মাকে বলছেন, 'এইসব কালো মেয়ে নিয়ে তোকে মুস্কিলে পড়তে হবে।' মা সেদিকে কান-ই দিলেন না, বললেন, 'কিচ্ছু মুস্কিলে পড়তে হবে না। ওরা খুব ভালো।' কিন্তু আমার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়েছিল। হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেছিল। নোটনের সুন্দর চেহারায়, আমাদের ভারি আনন্দ, ভারি গর্ব ছিল।

আমাদের বলা ঐ একটি বাক্যে বড় আঘাত দিয়েছিল।

(চার)

বড়মাসিমা লোকটি সাধারণ লোকদের থেকে একটু আলাদা ছিলেন। সে সময় ভাবতাম তাঁকে বেজায় বেরসিক; ঠাট্টা বুঝতেন না, যা বলা যেত অমনি তাকে বাস্তব সত্য বলে ধরে নিতেন। পরে বুঝে-ছিলাম ছোটবেলায় যে স্নেহের পরিবেশে সব মানুষের ছেলেমেয়েদের বড় হওয়া উচিত, বড়-মাসিমা তার কিছুই পাননি। পাঁচ বছর বয়সে মাকে হারিয়ে, কুড়ি বছর বয়সে, বি-এ পাশ করে, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে বিয়ে হওয়া অবধি, মধ্যিখানের অতগুলো বছর স্নেহশূন্য বোর্ডিং-এ কেটেছিল। সেখানে শারীরিক যত্ন পেয়েছিলেন, শিক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু বড়দের ভালোবাসা পাননি। তবে বন্ধুবান্ধব অনেক জুটেছিল। পরে দেখেছিলাম কল-কাতার শিক্ষিত সমাজে এমন মানুষ কম ছিল, মাসিমা যাদের চিনতেন না। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত। কিন্তু আমরা ভাবতাম কাঠখোট্টা। নিজের মেয়েকে ছাড়া কাউকে আদর করতেন না, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেন না। তবে মাকে যে কত ভালো-বাসতেন, সেটা আর বলে দিতে হত না।

ভারি জ্বালাতনও করতাম। তরতর করে বাঁদরের মতো একটি ন্যাসপাতি গাছে উঠতাম। বাকি দুটিতে সুবিধা করতে পার-তাম না। অমনি নোটনকে নিয়ে গাছতলায় এসে মাসিমা বলতেন, 'ওরে নুটুর জন্য একটা ভালো দেখে পেড়ে দিস তো।' 'নুটু' শুনলেই পিত্তি জ্বলে যেত। তার ওপর সরোজ আরো দু বছরের ছোট, তার নাম করছেন না

বলে আরো রেগে যেতাম। সরোজের তখন হয়তো দেড় বছর বয়স, ন্যাসপাতির ওপর আগ্রহ নেই। তবু। ভালো দেখে একটা ন্যাস-পাতি পেড়ে, মাটিতে থেকে বলতাম, 'এটা দেব? ভালো হয়েছে।' মাসিমা বলতেন, 'ভালো বলে সে খাবে না।' আমি খুব ভাল করে দেখেছি। বলে এক কামড় দিয়ে আবার বল-তাম খুব ভালো, এই খাও না।' বলে ছুঁড়ে ফেলতাম। জানতাম আমার মুখেরটা কখনোই নোটনকে দেবেন না। যদিও আমরা অকাতরে পরস্পরের মুখেরটা খেতাম। মাসিমা আমাকে বকতেন। তাই শুনে ঘর থেকে মা বেরিয়ে আসতেন। অমনি আমি তিন চারটে ভালো ফল ছুঁড়ে দিয়ে, গাছের আরো মগ-ডালে চড়ে ফল বাছতে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। মাকে ভয় করতাম না, বেজায় ভক্তি করতাম আর ভয়ঙ্কর ভালোবাসতাম। মা মুচকি হেসে আবার ঘরে ঢুকে যেতেন। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন আমাদের এই মা-টি। আমাদের পাঁচ ভাই তিন বোনকে, তার ওপর বাড়তি আরো জনা দুইকে দিব্যি সুন্দর মানুষ করে দিয়ে গেলেন, কাউকে চড়-চাপড়টা পর্যন্ত না দিয়ে। হয়তো ভাবতেন সে-কাজটি বাবার হাতে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দেওয়া যায়। 'কাউকে না' বলতে অবিশ্যি আমাকে বোঝায় না। যার হাতে চড় কানমলা খাবার গৌরব আমার একার ছিল। একবার স্নানের ঘরে বন্ধও করে রেখেছিলেন। সেবার কল্যাণকে পিটিয়ে-ছিলাম। খুব জল ঘেঁটেছিলাম, সাবান গুলে হাত দিয়ে চোঙা বানিয়ে বুদ্বুদ উড়িয়েছিলাম। লাল নীল রামধনুর রং ধরে সেগুলো ঘরময় উড়ে বেড়িয়েছিল। বাইরের দরজার চৌকাঠে ফিকে হলুদ ফিকে গোলাপী ছাই রংয়ের ছোট্ট ছোট্ট ব্যাংয়ের ছাতা দেখেছিলাম। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদ এসে টিনের টবের জলে পড়ছিল। টবটাতে একটু ঠেলা দিতেই হাজার হাজার ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ তৈরি হয়ে, যেই সেই রোদের কাছে আসছিল, ঝিক-মিক করে উঠছিল। দেখে দেখে আর আশ মিটছিল না। একা কত দেখব? কাঁধ দিয়ে দরজায় ঠেলা দিতেই, বাইরের ছিটকিনিটা পড়ে গেল, বেরিয়ে এসে ডাক দিলাম, 'ওরে তোরা মজার জিনিস দেখবি আয়।' অমনি যে যার জল-খাবার ফেলে, টেবিল ছেড়ে ছুটে এসেছিল। নোটনও, তার পিছন পিছন মাসিমাও। কেন জানি মনে হয়েছিল আমার শাস্তি পাওয়াটা তাঁর পছন্দ ছিল না। কিন্তু আমি ভালো করেই জানতাম মা ঠিক কাজই করেছিলেন। লোক আমি ভালো ছিলাম না। আমার কথামতো না চললে দাদাকে পেটাতাম, দিদিকে পেটাতাম। ওরা মাথায় আমার চাইতে লম্বা, বয়সে বড়, গায়ে জোর বেশি। তবু পেটাতাম। দাদা উল্টে মারত আর দিদি ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদত। তাই দেখে বলতাম, 'ছিঃ! ছিঁচকাঁদুনি!' বলে আরো দু-এক ঘা দিয়ে দিতাম। তবু দিদিকে বেজায় ভালোবাসতাম। সে না হয় বোঝা গেল। ও যে কেন আমাকে ভালোবাসত সেটা আজ পর্যন্ত ভেবে পাইনি।

সেই জন্যই আজ পঁচাশি ও, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার অন্তরের দোসর।

বলেছি তো মাসিমা আমাদের খুব ভালো ছিলেন। রাতে আমার পা কামড়াত, আমি কাঁদতাম। আমাদের আয়া ইলাবন নিচে বিছানা করে শুত। তাকে বলতাম, 'ও ইলাবন, আমার পা টিপে দাও। ভয়ঙ্কর ব্যথা করছে।' ইলাবন বলত 'পায়ে এঁটে দড়ি বেঁধে, পা টান করে শোও, ব্যথা সেরে যাবে।' কিছুতেই উঠত না। কিন্তু মাসিমা উঠতেন। শীতের রাতে গরম বিছানা ছেড়ে এসে আমার পা টিপে দিতেন। আমি ঘুমোলে তবে আবার শুতে যেতেন। এর অনেককাল পরে, আমার আদরের ছোট মাসিমা ৪২ বছর বয়সে পাটনায় মারা গেলে, বড়মাসিমা তাঁদের বাড়িতে একখানা চিঠিও লেখেননি। ছোট মেসোমশাই দুঃখ করে আমাকে লিখেছিলেন। তখন আমি কলেজে পড়ি।

বড়মাসিমার সঙ্গে দেখা হতেই সে-কথা বলেছিলাম। তাঁর চোখের কোণে জল দেখলাম। বললেন, 'ওরে, আমি ছোটবেলায় ভালোবাসার কথা শুনিনি বলে দুঃখ কিম্বা ভালোবাসা প্রকাশ করতে শিখিনি। বড্ড দুঃখ হয়েছিল, মনে হয়েছিল এ কেমন দুঃখী যে ভালো করে কাঁদতেও শেখেনি।

চমৎকার গানের গলা ছিল বড়মাসিমার। লাটনও সেটি পেয়েছিল। আমার বড় মেসোমশাই সুরেন মৈত্র যেমন ভালো গাইতেন, তেমনি ভালো লিখতেন। সুরেশ্বর শর্মা নামে তাঁর কবিতা প্রবাসী ইত্যাদি কাগজে বেরুত। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন; পি-ই-এনের সভ্য; সব গাইয়ে, আঁকিয়ে, লিখিয়েদের পরম বন্ধু। ওদিকে বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপক। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এঁরা সব মেসোমশায়ের ভক্ত ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাড়িতেই এঁদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। মেসোমশাই বিদেশী কবিদের রচনার তর্জমা করতেন, বাংলা কাব্যে। আশ্চর্য ছন্দে লেখা। তিন-চারখানি বইও বেরিয়েছিল। তার মধ্যে 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা' আর জাপানী ঝিনুকে'র নাম না করে পারছি না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ৬৭ বছর বয়সে হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আমিও একটি ব্যথার ব্যথী, রসের রসিক, আজন্মের বন্ধু হারিয়েছিলাম। তাঁর কাছে কত যে ভালোবাসা পেয়েছি সে আর গুণে বলা যায় না।

আমার কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে শিবপুরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তাঁর কোয়ার্টারে লাটনের সস্নেহ সঙ্গতে, মাসিমার যত্নে, আর মেসোমশাইয়ের সান্নিধ্যে ছুটির পর ছুটি কাটিয়েছি। তাঁর হৃদয়ের একরকম উদারতা ছিল, যাতে তিনি যেমন গুণগ্রাহী তেমনি বিচক্ষণ সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। কোনো ভালো জিনিসকে তিনি অশ্রদ্ধা করতেন না, তা মতের যতই অমিল থাকুক। বাড়িতে দেয়াল-জোড়া বইয়ের আলমারি ছিল, তার বেশির ভাগ ইংরিজি বইতে ঠাসা। আমার মন গড়ে তুলতে এই মেসোমশায়ের অনেকখানি হাত ছিল। বলতেন, তোমার উচিত ছিল আমার মেয়ে হয়ে জন্মানো। তা কিন্তু নয়। আমার ঐ ভীষণ বুদ্ধিমান, অসহিষ্ণু, রাগী বাবা ছাড়া, কেউই আমার বাবা হতে পারত না। কি গুণজ্ঞান, কি ছবি আঁকার হাত, কি গল্প বলার নেশা। প্রচণ্ড শক্তির কি অবাধ প্রকাশ।

এমনিতে তো আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত, কিন্তু যেই না সন্ধ্যেবেলা আমাদের স্কুলের পড়া তৈরি হয়ে যেত, বালিশে ঠেস দিয়ে বসা বাবা অন্যমানুষ হয়ে যেতেন। তখন আমরা তাঁর কোলে, পিঠে, পেটের ওপর চেপে বসে, গল্প শুনতাম। সব সত্যি গল্প। দেশে বাবাদের ছোটবেলার গল্প: জরীপ বিভাগে কাজ করতে গিয়ে ঘোর বেঘো জঙ্গলে বাবার নানান লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার গল্প; কত হাসির, কত কান্নার গল্প। অমন গল্প বলতে পারে আমি সারা জীবনে আর একটিও লোক পাইনি। বাবার ডাইরি থেকে তুলে 'বনের খবর' প্রকাশ করেছিলেন সিগনেট প্রেস। বাবা তখন ইহলোকে নেই। একাধিক সংস্করণ হয়েছিল তার। এখন আর পাওয়া যায় না। এমন তথ্য, এমন সরলতায়, এমন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বই বাংলায় বেশি নেই। আমাদের ছোটবেলার অনেক কিছু কিছু আমার বাবার বইতে ভরে দিয়েছি। কিন্তু বাবার সেই চোখের দৃষ্টি, গলার স্বর, ঘরের সেই নিস্তব্ধতা আর ঘরের বাইরের সেই জোছনা রাত্রির পাতা পড়ার শব্দ দিয়ে যে ইন্দ্রজাল তৈরি হত, সে আমি কোথায় পাব? বাবার সঙ্গে আমার চিরদিনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল, কিন্তু ঐ একটি অভাবে মানুষ ছাড়া কেউ আমার বাবা হতে পারত না।

ঐ বাড়িটি, বাকিসব ঐ মানুষগুলি, বাইরের ঐ বিশেষ বিশ্বপ্রকৃতি, সব মিলে একটা পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্যিখানে আমাদের নিজেদের জায়গাটি খুঁজে পেয়েছিলাম। আর কোনো জায়গার কথা ভাবতেই পারতাম না।

দিন-রাত ছোট নদী কলকল করে বয়ে যেত। বর্ষায় সে কি ভীষণ চেহারা হত!

তীর ছাপিয়ে, পাথর ডুবিয়ে, ফেনা ছড়িয়ে, গর্জন করে ছুটে যেত। আবার বৃষ্টি থামলেই আস্তে আস্তে জল নেমে যেত। তখন দেখতাম, এখানে ওখানে, পাহাড়ের খাঁজে, পাথর-এর গর্তে, জল আটকা পড়ে, ছোট-বড় পুকুর তৈরি হয়েছে। তাতে ছোট মাছরা খেলা করছে। মুগ্ধ হয়ে দেখতাম। তারপর দিন জল আরো শুকিয়ে যেত, পুকুর আরো ছোট হত, মাছদের জায়গা কমে যেত। আরো দুদিন যেতেই পুকুরের জল শুকিয়ে যেত, মাছরা মরে যেত, পচা দুর্গন্ধ বেরোত। আমাদের সে কি দুঃখ।

নদীর ধারে ধারে একটুখানি জায়গা, তারা পাশ দিয়েই আমাদের বাড়ির ঢালু জমি উঠে গেছে। সেইখানে নদীর ধারে নিচু একটা গুহামতো। তার ভিতর উঁকি মেরে দাদা বলল, 'কি জানি চকচক করছে।' দেখলাম একটা নয়, দুটো চকচকে জিনিস। ধনরত্ন নয় তো? অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে দেখলাম একটা চকচকে-চোখ মেঠো ইঁদুর, কোলের কাছে চারটে বাচ্চা নিয়ে, সামনের দুটো নখওয়ালা ছোট্ট ছোট্ট থাবা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওর বাচ্চাদের কেউ ধরতে গেলে মজাটা টের পাবে!

আরেক দিন এক নির্জন জায়গায় পাহাড়ের গায়ে একটা গর্তে দেখেছিলাম সবুজ একটা সাপ, নীল দুটি চোখ খুলে, চুপ করে পড়ে আছে। আমাদের চাকর পান্নু বলেছিল, 'ও ঘুমোচ্ছে। সারা শীত ওরা ঘুমোয়।' আমরা অবাক! 'ঘুমোচ্ছে তো চোখ খোলা কেন?' পান্নু বলেছিল, 'ওদের চোখের ঢাকনি থাকে না, তাই চোখ বন্ধ করতে পারে না। শীত কাটলে জেগে উঠবে, ঐ খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। ওটা পড়ে থাকবে, সাপের নতুন নরম খোলস হবে। তখন ওর গায়ে জোর থাকে না, যে কেউ ওকে মেরে ফেলতে পারে।'

পান্নুর বাড়ি ছিল হাজারিবাগের দিকের কোনো গ্রামে। ওরা নাকি সাপ খেত। আমরা বললাম, 'তোমরা তখন ওদের মেরে ফেল বুঝি?' পান্নু চটে গেছিল, 'দুবলা শত্রু কখনো মারতে হয়? মোটা হলে তবে মেরে খাই।'

আমরা বললাম, 'বিষ লাগে না?' পান্নু আশ্চর্য হয়ে গেছিল। 'বিষ লাগবে কেন? মুণ্ডুতে তো বিষ, সেটা কেটে ফেলে দিলেই হল।'

প্রকৃতির বড় কাছাকাছি থাকতাম। টোমাটো গাছে, গায়ে নীল চোখ আঁকা, ল্যাজের দিকে সবুজ শুঁড়, চার পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, সবুজ শুঁয়োপোকা থাকত। তাদের গায়ে একটাও লোম ছিল না। পুষেছিলাম একটাকে। সাবানের বাক্সের ঢাকনিতে ছ্যাঁদা করে, তাতে রেখেছিলাম, ইস্কুলের মেয়েদের দেখা-দেখি। তাকে রাশি রাশি টোমাটো-পাতা খেতে দিতাম। রাশি রাশি ময়লা পরিষ্কার করতাম। তা সে কিছুতেই গুটি বাঁধল না। আইরিস বলল, 'খেতে দিও না, গুটি বাঁধবে। আমারটা বেঁধেছে।' দিলাম খাওয়া বন্ধ করে। কিন্তু মা শুনে রেগে গেলেন, 'তোদের একবেলা খাওয়া বন্ধ করলে কেমন লাগবে? যা, টোমাটো-গাছে ছেড়ে দিয়ে আয়।' তাই দিতে হল। মার কথা না শুনবার সাহস পেতাম না। পরে ন্যাসপাতি গাছ থেকে একটা সোনালী গুটি ছেড়ে এনেছিলাম। জালি-জালি দেখতে, ভিতরের মরু-কীটটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই গুটি কেটে প্রকান্ড বড় প্রজাপতি বেরিয়েছিল। ফিকে সবুজের ওপর গোলাপী চোখ আঁকা। মাসিমা বলেছিলেন, 'ওটা মথ, তাই ডানা পেতে বসেছে। প্রজাপতি ডানা তুলে রাখে। তাই মথের ডানার ওপরে নকসা, প্রজাপতির ডানার তলায়।' জানতেন অনেক রকম মাসিমা খুব পড়াশুনো করতেন।

একটা ড্র্যাগন-ফ্লাইকে দেখেছিলাম মুখে করে কি যেন এনে, আমাদের বসবার ঘরে সাজানো শিংয়ের খেলনার কলসীতে ভরে, তার ওপর কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার উড়ে গেল। ভারি কৌতূহল হল, কলসীটা তুলে দেখি মাটি দিয়ে মুখটা বোজা। কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে সেটা বের করে ফেলতেই একটা মরা মাকড়সা বেরুল, তারপর আরেকটু মাটি, তারপর আরেকটা মাকড়সা। আমি তো অবাক! মাসিমা বললেন, 'দুর্দিনের জন্য খাবার জমা করে রাখছে। ভগবানের এইরকম ব্যবস্থা।'

ভগবানের ব্যবস্থায় আরো প্রমাণ পে[...] ছিলাম। একদিন স্কুলে আমাদের [...] বললেন, 'বাইরে থেকে যার যা ইচ্ছে, [...] ফল, পাতা এনে আঁকো।' আমি পাথ[...] খাঁজ থেকে একটা শিকড়শুদ্ধ ফার্নের উপড়ে, আশ্চর্য হয়ে দেখলাম প্রত্যে[...] সুতোর মতো মিহি শিকড়ের আগায় [...] ছোট্ট টুপি পরানো। টিচার বললেন, [...] জলের খোঁজে পাথরের মধ্যে নেমে ওর [...] না লাগে, তাই ভগবান ওর আগায় পরিয়ে দিয়েছেন। তিনি সব জানেন, পারেন।'

সবাই বললেও কিন্তু কথাটা মেনে [...] পারতাম না, কারণ ভগবানের অব্যবস্থ[...] অনেক নমুনা চোখে পড়ল। একবার [...] বলেছিলাম, সবাই যদি পারেন ত[...] আমাকে শিলাকের মায়ের ছেলের [...] ফরসা করেন নি কেন? তাহলে বো[...] দয়ালু নন?'

মা বলেছিলেন, 'দয়া দিয়ে তৈরি [...] আমাদের মা মরে গেল, বাপ সন্ন্যাসী [...] চলে গেল, কই তবু তো আমরা [...] পড়লাম না। তিনি আমাদের এখানে [...] ব্যবস্থা করে দিলেন। ওকথা বলিস [...] তবু আমার খটকা যায় নি বলেছি[...] 'হয় পারেন না বলে ফরসা [...] না হলে খুব নিষ্ঠুর [...] ইচ্ছা করে কালো করেছেন। বেশি কথা বলতেন না, তবু বিরক্ত হয়ে ছিলেন, 'শিলাকের মায়ের ছেলের সায়েব বলে সে ফরসা। তোদের বাঙালী।' শিলাকের মায়ের ছেলের সায়েব শুনে এমনি অবাক হয়ে গেছিল[...] ফরসা হবার কথা ভুলে গেছিলাম। ওদের বাড়িতে তো কত গিয়েছি [...] টায়েব তো দেখিনি। শিলাকের মা আ[...] জামাটামা সেলাই করত। [...] বাড়ি ছিল, ভারি মিষ্টি [...] তার, তাকে আমার বেজায় ভালো [...] সায়েবের রহস্যটা কেউ আমাকে খুলে [...] না।

এখনজানি ওদের ছিল মাতৃপ্রধান জাত, মায়ের পরিচয়ে ছেলে-মেয়েদের পরিচয় ছিল। অবাঞ্ছিত শিশু বলে কোনো কিছু ছিল না ওদের। সব শিশুই বাঞ্ছিত শিশু। সে জন্মালেই তার মা নিজের নাম ছেড়ে দিয়ে, তার মা বলে পরিচিত হত। বাপের সম্পত্তি পেত মেয়েরা, কিন্তু তাদের ছেলেরা। অবিশ্যি কাজ কর্মেরও বেশির ভাগ করত মেয়েরা, পুরুষেরা বড় শৌখীন ছিল। রাস্তায় পাথর ভাঙার কাজ করত মেয়েরা, অথচ তারা রোজ পেত চার আনা পয়সা, পুরুষেরা পেত ছয় আনা-আট আনা। সেখানে পয়সা দেবার মালিক ছিল সভ্যভব্য শিক্ষিত মানুষরা কিনা। এতদিনে হয়তো ওখানকার হালচাল সব বদলে গেছে। ষাট বছর কি কারো একভাবে চলতে পারে?

ভয়ংকর ভালোবাসতাম জায়গাটাকে। নদীর ওপারেই সুম্পারিং পাহাড়ের ফায়ার-লাইনের খাস-জমি।

ছুটির দিনে মাঝে মাঝে দুপুরেখাবার আগে, আমরা বড়রা পাঁচজন নদী পার হয়ে ফায়ার-লাইন বেয়ে উঠতাম। কোনো পথ-টথ ছিল না, সোজা খাড়া উঠে যেতাম, দেখতে দেখতে অনেকটা উপরে পৌঁছে যেতাম। সেখান থেকে আমাদের বাড়িটাকে ছোট্ট খেলনার বাড়ি মনে হত। দেখতাম ন্যাসপাতি গাছতলায় মাসিমা, নোটন, ছোট্ট সরোজ দাঁড়িয়ে আমাদের পাহাড়-চড়া দেখছে।

ফায়ার-লাইনটা একেবারে ন্যাড়া হলেও ভারি আশ্চর্য জায়গা। নদী পার হয়েই দেখতাম কেমন মোলায়েম দেখতে কালচে সব পাথরের টুকরো, অনেকটা মোমবাতির গা দিয়ে গড়িয়ে পড়া গলা মোমের মত চেহারা। কেউ বলেছিল ওগুলো নাকি 'লাভা'র টুকরো। আগে এখানে সব আগ্নেয়-গিরি ছিল, এখন নিবে গেছে। এ তারি গলন্ত পাথর, জমে শক্ত হয়ে পড়ে আছে। পাহাড়টা বাস্তবিকই অদ্ভুত। জোরে পা ফেললে মনে হত জায়গায় জায়গায় ফাঁপা। বর্ষায় কোথাও কোথাও ওপরের মাটি ধসে যেত, তলাকার হলদে হলদে কালচে কালচে কালচে মাটি বেরিয়ে পড়ত। সে মাটিগুলো বেজায় তেল-তেলা, জুতোর তলায় চটচট করত। আমরা বলা-বলি করতাম ওখানে মাটির নিচে তেলের খনি আছে। সত্যিই আছে হয়তো। পোলো-গ্রাউন্ডের ওদিকে একটা নদী বয়ে যেত, তার জল থেকে আমাদের স্কুলের বড় মেয়েরা একবার শিশিতে ভরে ঝকঝকে পারা এনেছিল। আছে হয়তো তারো খনি। তবে সে নদীটা যে ঠিক কোথায় সে আর এখন মনে নেই। বড় ভালো এই পৃথিবীটা, আশ্চর্য জিনিস দিয়ে ঠাসা। সরল-গাছে একরকম বিকট শুঁয়ো-পোকা গাছের সঙ্গে গায়ের রঙ মিলিয়ে থাকত। তাদের গায়ে কাঠি ছোঁয়ালে, ফ্যাশ করে একটা শব্দ হত, পিঠে সারি সারি খবে ঢোকানি খুলে যেত। তার মধ্যে থেকে তিনটে করে লোম বেরুত, তার আগায় আঠা মতো লাগা। সে আঠা নাকি ভারি বিষাক্ত। শুঁয়ো-

করত; রাজারা মন্দিরে গিয়ে দেখা-যায়-না, ছোঁয়া-যায়-না এক ভগবানের, তাঁর উপাসনা করত। আমার ভক্তি-টক্তি হত না। ব্রাহ্মোৎসবের সময় যখন প্রার্থনা হত, আমি আস্তে আস্তে বেঞ্চিতে পা ঠুকতাম। কিন্তু যখনি চারদিকে চেয়ে দেখতাম গাছপালা ফুল-ফল, নদী, ঝর্ণা, পোকা, পাখি, নীল আকাশ আর তার বুকে আঁকা রুপোলী হিমালয়, আর হাতের কাছে এই আমাদের বাড়ি, মা, বাবা, ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব, কি এক গভীর নিশ্চিন্ত আনন্দে মন ভরে যেত।

আজ পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মে আমার মন সায় দেয় না। এ সমস্ত ঘটনার সময় মেসোমশাইকে চোখে দেখিনি। আমরা যখন কলকাতায় গিয়েছিলাম, তিনি বোধ হয় সেই সময়ই বিলেত যান। যতদূর মনে হয় ফিরেছিলেন ১৯১৬ সালে, আই-ই-এস হয়ে। তাঁর ফেরার আগে পর্যন্ত মাসিমারা আমাদের কাছে ছিলেন; এক দিনের জন্যেও মনে হত না তাঁরা বাইরের কেউ। এর-ও অনেক পরে, আমার যখন ১৭ বছর বয়স, মেসোমশাই আমার অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দিয়েছিলেন,

'গ্রামোফোনের চাকতিখানার
নানান রেখার ফাঁকে
সুরের পাখি গুটিয়ে পাখা
লুকিয়ে যেমন থাকে,
তেমনি তোমার খাতার পাতার
হিজিবিজি লেখায়
আমার গানের মৌন তানের
সুরের লিপি ঘুমায়।
যদি সে ঘুম তা ভাঙতে পার,
খুলে যাব কান,
শুনতে পাবে জড়ের ফাঁকে
পরমাণুর গান।'

আমি হয়তো সেই ছোট বয়সেই গাছ-পালায় ফুলে-ফলে, হাওয়ায়, নদীর জলে, আকাশে, রাতদিনে, দূরের পাহাড়ে পর্বতে সেই পরমাণুর গান শুনেছিলাম অথবা শুনতে পেতে থাকতাম।

চারদিকের পাহাড়-বন-ঝরনার ধারে চড়ি-ভাতি করা হত। কি যে ভালো লাগত বলতে পারি না। একবার আমরা 'লাইকর পীকে' পিকনিক করতে গেলাম। অনেকটা ওপরে উঠতে হল। ঠিক আগেই ভারি এক পশলা বৃষ্টি পড়ে গেছিল। তখনো সরল-গাছের ছুঁচলো পাতা বেয়ে টুপ-টুপ করে জল পড়ছিল। লুচি মাংস ভাগ করা হচ্ছিল। হঠাৎ চারদিকে চেয়ে দেখি আকাশটা ধোয়া-মাজা নীল ঝক-ঝক করছে আর তার তলায় মাইলের পর মাইল সারি সারি সাজানো বন সবুজ গাছে ঢাকা পাহাড়ের পর পাহাড়, শুধু দুটি পহাড় ছিল, তাতে একটিও গাছ নেই। বনের মধ্যে কু-কু পাখি ডাকছিল। কোকিলের মতো মিষ্টি ডাক। শিলং থেকে চলে এসে অবধি এ-ডাক আর শুনিনি। সে-দিন আরো দেখেছিলাম আগের মার্চ মাসের দাবানলে মাইলের পর মাইল ধরে যে গাছপালা ঝলসে লাল হয়ে গেছিল, তাদের ওপর আবার সবুজের ছোঁয়া লেগেছে। সেই বিশাল প্রকৃতির মধ্যে এই আমরা কটি মানুষ কি নিশ্চিন্ত নিরাপদ, এ-কথা যতবার মনে হত, মনের মধ্যে কি একটা কোমল উষ্ণ ভাব জাগত, কথায় তাকে প্রকাশ করা এখন পর্যন্ত শক্ত। আর তখন তো গলা অবধি কথা এসে মুখ দিয়ে আর ঝরত না। তবু আমি ঠোঁট ফাঁক করলেই মা-মাসি ধমক দিয়ে বলতেন, 'জ্যাঠামি করো না!'

(চলবে)

গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতা

জন্ম : ১৯৩০
পেশা : সাংবাদিকতা

সৌম্যদর্শন কবি গৌরাঙ্গ বাঙলার পাঠকের অতি পরিচিত, অনেককাল। চাঁছা-ছোলা, ঋজু, তীক্ষ্ম ও মর্মভেদী বক্তব্যে কবির পরিচয় স্বতন্ত্র। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী কবি সমাজ ও জীবনে আস্থা না হারিয়ে শব্দের মুন্সিয়ানায় এক তীব্র ঠাট্টা, জ্বালা ও আবেগকে রূপকল্পে ভাস্বর করেছেন। তার শব্দমালা সমকালীন, দুরূহতা নেই কোথাও, ঝকঝকে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' 'অশান্ত সঙ্গীত' এবং 'অন্তহীন দৃষ্টির উৎসব'-এ সমস্ত নৈরাশ্যকে দু' হাতে দুমড়ে মুচড়ে এগিয়ে চলেছেন আত্মসমালোচকের মত। কবি উচ্ছ্বাসপ্রবণ নন, শান্ত নীরব, কিন্তু জীবন নিয়ে উজ্জ্বল তিনি।

কিছু স্থির এবং অস্থির চিত্র

১॥ পেছনে এসেছি ফেলে আদিবাসী ঘাসের দুনিয়া
হয়তো-বা আজও সেই প্রাচীন জঙ্গলে
ওড়াউড়ি করে পাখি, হলদে নীল, নির্দোষ মুনিয়া,
পানকৌড়ি ডুব দেয় আকাশের ছায়া-পড়া জলে।

[এ দৃশ্য অঙ্কনযোগ্য নয়,
এই দৃশ্যে ফেরা যায় না হৃদয়ের দোষ ঘটে গেলে।]

২॥ এখন উদ্বিগ্ন আমরা, নাগরিক,
নই কেউ ততটা বর্বর,
পাখি ও গাছের সঙ্গে প্রতিদিন দিয়ে যাচ্ছি আড়ি,
অরণ্য করেছি ত্যাগ, অরণ্যের ছায়াচ্ছন্ন বাড়ি,
সমস্ত দুঃখের উৎস আমাদের ছোট রান্নাঘর।

[অথচ দূরের গান ভেসে আসে অতিদূরে অন্ধকার থেকে
ভেসে আসে দক্ষিণের বায়ু।
হঠাৎ নির্জনে পেলে বলে কারা অতিশয় মৃদু কণ্ঠস্বরে,
ফুরোয় না পৃথিবীর বসন্তের আয়ু।]

৩॥ এখন জ্যোৎস্নার রাতে নিদ্রাহীন কুকুরেরা
কাকে যেন দেখে দেখে অবিরল ডাকে!
ছায়া বুঝি প্রতিপক্ষ?
ভয় পায় তারা বুঝি অতিকায় নিজেরই ছায়াকে।

হায় জ্যোৎস্না, মধ্যরাত, হায় রে কুকুর!
প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল, এমন সময়ে আমরা
পর্যটনে যাব বহুদূরে।

নৈঃশব্দ্য শুরু হয় না,
জ্যোৎস্নাতকে ভীত-ত্রস্ত মুহুর্মুহু ঘেউ ঘেউ ডাকে।

অনিতা রায়চৌধুরীর ছবি

১৯৬২ সাল থেকে কোলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ শহরে একাধিক একক প্রদর্শনী করেছেন। সর্ব-ভারতীয় প্রদর্শনীগুলির প্রায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এক সময় কোল-কাতার প্রগতিশীল শিল্প সংস্থাগুলির সংগে জড়িত ছিলেন। দেশে বিদেশে একাধিক ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর শিল্পকর্ম রক্ষিত আছে।

গত ষাট দশকের গোড়ারদিকে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী থেকেই তিনি কোলকাতার কলারসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। রেখার দুর্দম গতিবেগ এবং বর্ণের বিচিত্র সমাহার প্রধানতঃ তিনি নিসর্গ-চিত্র এঁকে থাকেন। তাঁর রচনা রেখাপ্রধান হয়েও সামগ্রিকভাবে এক ঐক্যতানিক সুরের সৃষ্টি করে যা তাঁর বিশিষ্টতাকে উজ্জ্বল করে রাখে। এখানে তাঁর রচনাটি একটি নিসর্গ চিত্রের স্মৃতি-বাহক। কিছু চলমান, বিচ্ছিন্ন রেখার সমন্বয়ে তিনি এক ছন্দময় জগতের সৃষ্টি করেছেন।

কমলেশ্বর

জন্ম : ৬ই জানুয়ারী ১৯৩২ (উত্তর প্রদেশের মৈনপুরে)
শিক্ষা : এম, এ (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়)

হিন্দী সাহিত্যে নবনিরীক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ তরুণ যুবা, ক্ষুরধার লেখক এই কমলেশ্বর। বলতে গেলে, ষাটের দশকের গোড়াতেই সাহিত্যের আঙ্গিনায় হাজির হয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করেছেন ইনি। প্রাচীন মূল্যবোধকে ভাঙ্গতে এ'র কলমের শক্তি বেশী ক্ষয় করতে হয়নি। এ'র আগের হিন্দী কথাসাহিত্যের যে চেহারা ছিল, কমলেশ্বর ও তদানীন্তর 'নবনিরীক্ষার' একদল দক্ষ কারিগরের আবির্ভাবে সে কাঠামো যেন আপনি ভেঙ্গে পড়ে। মোহন রাকেশ, রাজেন্দ্র যাদব, কমলেশ্বর প্রভৃতি কিছু অসাধারণ মেধাবী যুবকেরা, শাস্ত্রবিরোধী বলব না—হিন্দী সাহিত্যকে গতানুগতিকতার শৃংখলাপাশ থেকে টেনে আনলেন সর্বসমক্ষে আন্দোলনের মাধ্যমে। এ'রা সোচ্চার হলেন : নতুন গল্পের (নই কাহানী) কথাকারগণ, পূর্বসূরীদের মত নিজেদের সমাজ নিয়ামক, পথপ্রদর্শক এবং ভবিষ্যদ্রষ্টা মনে করেন না- বরং এ'রা সকলেই নিজেদের চলার পথের জীবন্ত সাথী, সহভোক্তা, পরিস্থিতির বিশ্লেষক এবং রচয়িতা মনে করেন। তাই 'নই কাহানী' চিরাচরিত গল্প বলার পরম্পরাগত রূপ নয়।

কমলেশ্বর নিজের জীবনের সত্য বলেন না—বলেন নি। বলেছেন নিজের যুগের, নিজের সমবয়সী যুবকদের গোপনতম সত্যগুলি। সোচ্চার হয়েছেন সামাজিক ন্যায়নীতির তথাকথিত বিচার পদ্ধতির হাস্যকর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। তাই তিনি যে কোন ঘটনা পরিস্থিতি, চরিত্র, ভাব অত্যন্ত সুন্দর এবং নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলেন- প্রাণ আরোপ করেন শিল্পীর মত। কারণ তিনি জানেন, কোথায়, কখন, কোন্ কথা বলতে হয়। এতবড় আত্মবিশ্বাস দুঃসাহসের নামান্তর মাত্র নয় কি? এবং এইভাবে তাঁর অক্লান্ত লেখনী জন্ম দিয়েছে প্রচুর আধুনিক ছোটগল্পের যেগুলির প্রত্যেকটিই বক্তব্যে, ভাষায়, রচনাসৌকর্যে এক একটি উৎকৃষ্ট রত্নবিশেষ। লিখেছেন আট-দশটি উপন্যাস—এ ছাড়াও আরো অনেক ভিন্নধর্মী স্বাদের রচনা।

তাই, তাঁর আজকের এই গল্পটি 'যা লেখা যায় না' প্রেমচন্দের 'কফন'—রেণুর 'তিসরী কসম'—যশপালের 'হোলি নহী খেলতা' প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় গল্পের সঙ্গে সমভাবে তুলনীয়—হিন্দী সাহিত্যে আদৃত—সর্বজন বন্দিত।

কমলেশ্বর নিজের জীবনের সত্য বলেন না—বলেন নি। বলেছেন নিজের যুগের, নিজের সমবয়সী যুবকদের গোপনতম সত্যগুলি।

যা লেখা যায় না

প্রত্যেকটি মানুষই নিজের নিজের ইতিহাসের নিঃসঙ্গ নায়ক... আজ বারবার এটাই মনে হচ্ছে। আর এই সঙ্গে মনে পড়ছে সুদর্শনাকে। ওই তো সেদিন বলেছিল : এই স্মৃতি আমাদের কোথাও নিয়ে যায় না...কিন্তু এমনই আমার স্মৃতি যা কাউকে বলাও যায় না। বলতে পারি না।

—কেন, আমায় বলতে পার না?

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

যে, কেউই কারুকে সব কিছু বলতে পারে না। প্রত্যেকের কাছে এমন 'কিছু' থাকে যা কোনদিনও বলা যায় না। কাউকেও না। বলতে বলতে ওর চোখে যেন অতীত স্মৃতির ছায়া নাচতে লাগল এবং ও জানলার বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার ধুলো ওড়ার দিকে অপলক তাকিয়েছিল।

আমি চুপ করে বসেছিলাম। পরি-

আমরা বসেছিলাম তার পাশের ঘরেই ছিলেন সুদর্শনার স্বামী—মহেন্দ্র।

সকালে চায়ের টেবলে আমরা একত্রিত হয়েছিলাম। মহেন্দ্র চুপ করে ছিলেন। উনিই কেন সবাই চুপ করে ছিল। চুপচাপ থেকে নিজের নিজের মনের ভাবগুলো লুকোবার সুযোগ ছিল। সুদর্শনার বাবার মৃত্যুজনিত কোন দুঃখদ ঘটনা যদি না ঘটত, তাহলে হয়ত আমিও এখানে আসতাম না—সুদর্শনার স্বামী মহেন্দ্রও আসতেন না। অদ্ভুত অসহায়তার মাঝে আমরা বসেছিলাম। আমরা তিনজন, যারা একে অপরকে খুব ভালভাবে জানে চেনে, এখন ভেতর ভেতরে কেমন যেন অশ্রদ্ধার ভাব, রাগের ভাব পোষণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে এমন এক জায়গায় আমরা নিরুপায় হয়ে আবদ্ধ যে, কেউই নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি কথাও বলতে পারছিলাম না।

এই পাঁচ বছরের মধ্যে যেদিন সুদর্শনা নিজের স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছিল—আমি মহেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করিনি। দেখা করা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু মহেন্দ্র বরাবর এই সন্দেহ করেছেন যে সুদর্শনার এভাবে চলে আসার একমাত্র কারণ হলাম আমি।

এবং যখনই আমি একথা ভাবি তখনই মনে হয় : হায়! যদি এটা সত্য হত! কিছুদিনের জন্য না হয় বদনামী হতাম। তাহলে কিন্তু সুদর্শনার দুচোখের এই অনড় উদাসীনতার দুঃখ-বেদনা তো চলে যেত।

ওর বাবার মৃত্যুর পর যখন মহেন্দ্র এবং আমি এসে পৌঁছলাম তখন মনে হল, আমরা দুজনেই সুদর্শনার কাছে কিছু যেন চাইতে এসেছি। মৃত্যুর পর, শোকের জন্য আসা যেন একটা অজুহাত মাত্র! আমার এই চেষ্টাই ছিল যে, আমার করুণা, দয়া বেশী প্রকট হয়ে কৃত্রিমরূপে প্রতিভাত

উঠল তখন অনেক কষ্টে নিজের চোখের জল সম্বরণ করেছিলাম।

অশ্বথ গাছের বাঁধান চৌতারার বসেছিল সুদর্শনা। ওর পেলব শরীর পেঁচিয়ে ছিল ফিনফিনে সাদা একটি শাড়ি—আঁচলের একটা কোণ ঠোঁটে চেপে ভিজে ভিজে চোখে তাকিয়েছিল। চোখের জল ওর শুকিয়ে গিয়েছিল এবং কাজল-রেখাও মুছে গিয়েছিল। চুল এলোমেলো। সামনের প্রশস্ত শ্মশানের দিকে ওর নজর নিবন্ধ হলেও দৃষ্টি যেন কোথায় উধাও—যেন কিছুই দেখছিল না। অশ্বথ গাছের কচি কচি রেশমী পাতার তিরতিরে ছায়া ওর ওপর পড়ছিল...ঐ অশ্বথগাছ থেকে অদ্ভুত ধরনের এক সবুজ আভা বেরুচ্ছিল... এবং সুদর্শনা সম্পূর্ণ একা তার তলায় বসেছিল। আমরা দুজনেও ওখানে কাছাকাছি ছিলাম—কিন্তু, বোধ হয়, আমাদের একের অপরের জন্য কেউই ওর কাছে সান্ত্বনা দিতেও যেতে পারছিলাম না। কি অদ্ভুত বিড়ম্বনা।

জ্বলন্ত চিতার কিছু দূরে সিমেন্টের বেঞ্চের উপর মহেন্দ্র বসেছিলেন, আর পাথরের ঢিবির কাছে আমি। মহেন্দ্রর চোখে-মুখে শ্মশানের আগুনের শিখার নাচন।

অন্যদেরও ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকেছিল। মৃত্যুর পর এই সময়টিতে মহেন্দ্রর উচিত সুদর্শনার কাছে থাকা।... যত যাই হোক না কেন ও তো ওর স্ত্রী। পাঁচ বছর না হয় আলাদা আছে—তাতে কি হয়েছে? এমন সময় তো এটা হওয়া উচিত নয়।

হাজার চাইলেও আমি সুদর্শনার কাঁধে ভরসার হাত রেখে বলতে পারছি না: সুদর্শনা, বাবা নেই তো কি হয়েছে, আমি তো আছি। ঘাবড়িও না....

কিছুতেই কিছু হল না। দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছেই। পাঁচজন ব্রাহ্মণ মিলে শ্মশানের সংকারের কাজগুলো করে দিলেন। আর আমরা সবাই নিজেদের আগুন চেপে চুপচাপ ফিরে এলাম। সারা পথে কেউ কোন কথাও বলল না। উড়ন্ত ধুলোর আবর্তগুলি যেন সারসের মত পাখনা মেলেছে—তাই দেখতে দেখতে আমরা সবাই ফিরে এলাম।

পরের দিন, যখন পুষ্প চয়নের জন্য যাবার কথা, তখনও সকলে বলেছিল: জামাই তো ছেলের মতো। ওরই চয়নে যাবার কথা। এ ব্যাপারেও সুদর্শনা হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি, কিন্তু নিজেই বাড়ির চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ফুল আনতে গিয়েছিল।

তৃতীয় দিনে ওখানে থাকা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। মনে হল, কি এক অদৃশ্য জ্বালায় সর্বাঙ্গ যেন জ্বলছে আমার। মনে হয়, ঠিক একই অবস্থা মহেন্দ্ররও হচ্ছিল। সুদর্শনা যখন বারান্দায় চেয়ারে হতাশ হয়ে বসেছিল তখন আমি তাকে বলতে গিয়েছিলাম:

সুদর্শনা, আমি বরং রাতের গাড়িতে ফিরে যাই....

ঠিক তখনই অন্যদিক থেকে মহেন্দ্র আসছিলেন। আমি তাকে আসতে দেখে চুপ করে গেলাম।

মহেন্দ্র আসতেই সুদর্শনা উঠে দাঁড়াল এবং মহেন্দ্র বললেন : ভাবছি, কাল সকালেই চলে যাই....

—কেন, এমন কি হল ? একদিন পরেই যাবেন না হয়।

সুদর্শনা একথা বলায় আমি কেন জানি না, হঠাৎ আঘাত পেলাম। তাহলে, সুদর্শনা মহেন্দ্রকে আটকাতে চাইছে। হতে পারে, এবার দুজনে আপস করে নেবে। হয়ত এটা হবেই—অন্তত হওয়া উচিত ছিল। এবং পুনরায় ওরা একসঙ্গে ঘর করবে। মুহূর্তের জন্য মনে হল, এটা যেন ভালই হল। আর তাছাড়া ওর জন্য আর আছেই বা কি ! বাবা ছিলেন—যাঁর ভরসায় ও এতবড় ঝুঁকির কাজটা করতে পেরেছিল। কিন্তু আর তো তিনি নেই—সুদর্শনা তাহলে করবেটা কি !

আর এজন্যই ঐ সময় আমার থাকার আর কোন ঔচিত্য না দেখে আমি নিজেকে খুব সংযত করে বলেছিলাম : সুদর্শনা, আমি রাতের গাড়িতে যেতে চাই।

—কেন ? আরো দু-একটা দিন থাকতে পার না ?

সুদর্শনার এই কথা আমাকে আরো সংকটে ফেলে দিল। ভাবছিলাম, দুঃখের ছায়াতলে এ কেমন মোজালে আটকে পড়ছে সুদর্শনা ! নাকি, ও ভেতরে ভেতরে একদম ভেঙে পড়েছে ? নাকি, যাহোক কাউকে ও পেতে চাইছে ?

আমরা দুজনেই থেকে গেলাম। একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা—বিচ্ছিন্নভাবে।

এবং ঐ বাড়িতে আমরা তিনজনেই পুরনো স্মৃতি নিয়ে চারণা করছিলাম। এজন্যই ওখানে থেকে যাওয়া এত কষ্টকর হচ্ছিল। এই তো সেই ঘর—যেখানে আমি সুদর্শনার সঙ্গে রোজ ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতাম নানান গল্প-গুজবে, কথাবার্তায়। এর এক-একটা দেওয়াল আমাদের প্রথম প্রেমের সাথী। সেই দেওয়াল তো এখনও এখানে মৌজুদ রয়েছে যার পিঠে ঠেস দিয়ে সুদর্শনা দাঁড়িয়েছিল এবং আমি ওকে আমার দুটি বাহুতে বেঁধে ফেলেছিলাম। প্রথম বার। তারপর দেওয়ালে হাত দুটি রেখে যখন ওকে ঘিরে দাঁড়ালাম তখন সুদর্শনা লজ্জায় রাঙা হয়ে বলেছিল :

তোমার এ বাহু-বন্ধন চিরদিন এমনই থাকবে তো ! আমার কাছে এটি চিরদিনের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লেখা রইল কিন্তু....

আমি মৌন মিষ্টি হেসেছিলাম।

এবং এই সেই ঘর যেখানে সব কিছু আস্তে আস্তে বদলে গেছে। মাত্র একদিন মহেন্দ্রকে এখানে দেখা গিয়েছিল এবং সেইদিন থেকে সব কিছুই বদলাতে লাগল। ঘরের লোকজনেরাও অন্যভাবে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেছিল এবং তখন আমি এখানে যাওয়া-আসা করতে অপমানিত বোধ করতাম। এখন অবিশ্যি এসব ভাবলে আমার হাসি পায়। তবু সেদিনের সেই কাঁটা আজও আমি অনুভব করি—ভুলতে পারি না।

আমাদের পথ বদলে গিয়েছিল। এবং মনে হয়, আমি ও সুদর্শনা একে অপরকে যেন ভুলতেই চেয়েছিলাম—ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, সেই সব দিনের ঐ সম্পর্ক যেন ছেলেমানুষি ব্যাপার ছিল। দুজনেই মনে হয়, এমনভাবে বোঝাপড়া করে নিয়েছিলাম।

সুদর্শনা বেশ সুখে ছিল। নিজের স্বামীর সঙ্গে বেশ সুখেই ছিল। যখন প্রথম আমার সঙ্গে সুদর্শনা ও মহেন্দ্রের দেখা হয় তখন আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আবছা স্মৃতির ছবি যেন ওর চোখে ভেসে উঠেছিল। কিন্তু মহেন্দ্রের চোখে-মুখে ছিল বিজয় গৌরবের দীপ্তি। কিছু যেন জয় করেছে ও। একটা যেন দর্প....অহংকার। আর তখন আমার নিজেকে মারখাওয়া বলে মনে হয়েছিল।

—আপনার কথা কখনও কখনও আমাদের এখানে হয়....মহেন্দ্র আমার সঙ্গে করমর্দনের পর বলেছিল : এমনিতে আমাদের দুজনের কথার শেষ নেই—ফুরসৎ হয় না। আমরা দুজনেই অনর্গল কথা বলি ....বলেই ও হাসছিল।

আমি জোর করে কথাগুলো হজম করেছিলাম কিন্তু চোখে চোখে সুদর্শনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম যে এভাবে আমাকে অপমান করা হচ্ছে কেন ? পতিদেবতার কথাগুলো ব্যঙ্গ বলে মনে হচ্ছে না ? সুদর্শনা মহেন্দ্রর কথা বলার ধরণধারণ জানত। কথার হুলও জানত আর তাই না বুঝেই কথার ঘা-টাকে আরো যেন খুঁচিয়ে দিল :

—আপনার প্রশংসাই আমরা করি—মানে, আপনার বিষয় ভাল কথাই বলি আমরা।

—ঠিক বুঝলাম না, ভাল কথার মানে কি।

অত্যন্ত কষ্ট করে, হেসে আমি বলেছিলাম—কিন্তু কোন জবাব পাইনি। সুদর্শনা এবং মহেন্দ্র কোথায় বেরুবে বলে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল।

আমি কষ্ট পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তবু ভাল লেগেছিল এই দেখে যে ওরা সুখী হয়েছে।

ওদের বিষয় ক্রমে অনেক কথাই কানে এসেছিল। ওদের দুজনের সফল জীবনের গল্প....কি সুন্দর ঘর-সংসার করছে ওরা.... গাড়ি কিনেছে....তিন তিনটে চাকর-বাকর। জীবনের প্রায় সব আয়েশ ও আরাম ওদের করায়ত্ত। আমাদের এখানে ওদের নানান জায়গা বেড়াতে যাবার খবর আসত—দীর্ঘ পত্রে ঐ সব জায়গার বর্ণময় মনোরম বিবরণ। দু-চার লাইন লেখা পিকচার পোস্টকার্ড আসত। ডাকে আসত উপহার সামগ্রী।

ঐ সময়ের পর সুদর্শনা একদিন আমাদের এখানে এসেছিল। জানি না কেন, কাউকে কোন খবর না দিয়ে হঠাৎই ও চলে এসেছিল। মাত্র কিছুক্ষণের জন্য দেখা হয়েছিল আমার সঙ্গে। আর তখনই ও নিজের চাপা দুঃখ আর চাপতে না পেরে বলে ফেলেছিল—ধীরে ধীরে :

মানুষেরা, বিশেষ পুরুষেরা বড্ড সন্দেহবাতিক হয়—না ?

—কেন ?

জানি না, কোন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে সে ঐ সময় নিজের কথা বলে গিয়েছিল আমায় :

দেখ চন্দর, আমি ওখানে, আমার বাড়িতেও কাউকে একথা বলতে পারিনি, কিন্তু তোমাকে বলতে আমার কোন সংকোচ নেই....দুঃখ আমার কিছুই নেই, কিন্তু কেন জানি না, মনে হচ্ছে, এরপর আর আমি টানতে পারছি না।

—কি ব্যাপার সুদর্শনা ! খুলে বল। বললে হয়ত তোমার মনের বোঝা হাল্কা হয়ে যেতে পারে। আমি বলেছিলাম।

—তেমন কিছুই নয় চন্দর ! ফ্যাকাসে হেসে সুদর্শনা বলেছিল : ছোট্ট একটা কথা। একদিন হোটেলে আমরা দুজনে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম। আমি ওর বুকে মাথা রেখে শুয়েছিলাম। ওর হাত ছিল আমার পিঠে। তখন ও নিজের ব্যর্থ প্রেম ও ভালবাসার গল্প বলছিল। আমার দারুণ মজা লাগছিল এবং হৃদয়ের অন্তস্তলে একটা গর্ব অনুভব করছিলাম, এই ভেবে যে, আমি ওকে জিতে নিয়েছি। গভীর প্রেমে আমায় আদর করে ও জিজ্ঞাসা করল : দর্শী। তুমিও তো জীবনে কাউকে না কাউকে চেয়েছিলে।

ঐ সময় আমি মিথ্যে বলতে পারতাম কিন্তু বলতে পারিনি—কারণ, আমরা তখন সত্যের খুব কাছাকাছি ছিলাম এবং প্রাণখুলে কোন কিছু গোপন না করে কথা বলছিলাম। সব কিছু মেনে নেবার মুডে আমিও ছিলাম। তখন আমি তোমার কথা বলেছিলাম। এই কি, তুমি আমায় খুব ভালবাসতে যেজন্য এখন পর্যন্ত তুমি বিয়ে করনি। বিশ্বাস কর চন্দর ! সে সময় একথা বলতে আমার দারুণ ভাল লেগেছিল। অন্তুত এক তৃপ্তি পেয়েছিলাম, এই ভেবে যে, তুমি আজও আমায় মনে রেখেছ—আমার স্মৃতি তোমার হৃদয়ে অম্লান।'

তারপর উনি আমায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরো কিছু জিজ্ঞাসা করেন। আমি আমার ভাবাবেগে সব কিছু বলে গিয়েছিলাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি অনুভব করেছিলাম যে, আমাদের মধ্যে অদৃশ্য—তৃতীয় কোন ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে....

আমি বুঝতেও পারিনি কখন ওর হাত আমার পিঠ থেকে সরে গেছে—কখন আমার মাথা ওর বুক থেকে সরে গিয়ে

বন্ধনার বালিশে ঠাঁই নিয়েছে। আমরা দুজনেই পরস্পরের স্পর্শের সীমারেখার অনেক বাইরে চলে এসেছিলাম....

সেদিন থেকেই সেই তৃতীয় অদৃশ্যমান ব্যক্তিটি আমাদের দুজনার সামনে দাঁড় হয়ে থাকে। সত্য যদি বিশ্বাস কর, সেই তৃতীয় জনটি কিন্তু তুমি নও। কখনও কখনও সে অবশ্য তোমার চেহারার আদলে আমার কাছে ধরা দেয় মাত্র। কিন্তু ওর কাছে যে ব্যক্তির নাম তোমার নামই হয়ে যায়। আর এখন ঐ ছায়ামূর্তি সবসময় আমাদের মাঝে থাকে.... বলতে বলতে সুদর্শনার দুচোখে জলের ধারা নামল।

সুদর্শনা একটু স্থির হলে আমি বললাম :

ঐ অদৃশ্য ছায়ামূর্তি তোমাকে বড্ড পীড়ন করছে। না ?

—দুঃখের কথা, কষ্টের কথা কি জান, যত আমরা দুজনেই খুব ভাল। আমাদের মধ্যে কারুর প্রতি কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু তবু, মন খুলে কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। যদি কখনও আমি ওর সঙ্গে কথা বলিও বা তখন ওর চোখে সন্দেহের ছায়া নাচতে দেখেছি। আমার সব কথা, সব চিন্তা-ভাবনার রূপই বদলে গেছে ওর কাছে। বুঝতে পারছি না, এভাবে আর কতদিন চলবে!

বাস। সেবার সুদর্শনার সঙ্গে এতটুকু কথাই হয়েছিল। আমার মন সংশয়াবিষ্ট হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, ওদের ভাঙ্গনের দিন বুঝি হু-হু করে এগিয়ে আসছে। আমি খুব নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম এবং অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বলেছিলাম : আমি তো ভেবেছিলাম যে তুমি খুব সুখী হয়েছ। আজ সব শুনে বড্ড কষ্ট পেলাম....কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কিই বা বলতে পারি। এমন একটা অবস্থায় আমার বিবেচনার মূল্যই বা কে কতটুকু দেবে? নিজের নিজের জীবনের সমস্যার সমাধান প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে পেতে চায়। নিজের ভাল-মন্দ নিজে ছাড়া আর কে জানে ...

—কি বলব চন্দর, মনে হচ্ছে, জোয়ারের দিন শেষ হয়েছে। এখন শুধু কিছু গুগলি শামুক আর নোনাজলের চিহ্নমাত্র সমুদ্রতটে পড়ে আছে....ধীরে ধীরে এগুলোও যাবে শুকিয়ে।

—নিজেকে আজ বড় অক্ষম মনে হচ্ছে। করতে আমি কিছুই পারি না সুদর্শনা—কিন্তু, বিশ্বাস কর, তোমার জন্য ভেতর ভেতর আমার যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ, যত যাই হোক না কেন সামাজিক স্বীকৃতি তো আমার নেই—আমি তো তোমার কেউ নই।

—এ কেমনতরো কথা চন্দর। এ তো নিয়তি। নিয়তি আমায় ওদের বাড়ির বৌ করে নিয়ে গেছে। অর্থ সম্পত্তির সুখ ইত্যাদির বিনিময়ে আমি হয়ত নিয়তির সঙ্গে শঠতা করতে চেয়েছি তাই হয়ত সেই নিয়তি আমার সঙ্গে ছলনা করছে। সুদর্শনার দুচোখের জল বাধা-বন্ধনহীন হয়ে ঝরে পড়তে লাগল আর ওর সুন্দর দুটি হাত হঠাৎ আমার সামনে মেলে ধরে করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল : এবার তো বলে দাও গো আর কি কি লেখা আছে এতে ?

—এতে কিছুই লেখা নেই সুদর্শনা।

—আমি ফিরে যাই তাহলে। আর কি করব....

—যদি কোন চাকরি পাও তো তার চেষ্টা করে দেখ—তাহলে মন ভাল থাকবে। কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকবে—দুঃখ-কষ্ট অনেক ভুলতে পারবে।

—এটা তো আমিও জানি। কিন্তু এটা তো সমস্যার সমাধান নয়....না না.. আরো কিছু বল চন্দর। অত্যন্ত অসহায় হয়ে আকুল কণ্ঠে আমার কাছে আবেদন জানাল সুদর্শনা। কিন্তু আমার বলবার আছেই বা কি।

ফেরার পথে, চলতে চলতে একবার বলেছিলাম :

—খবরাখবর মাঝে মধ্যে দিও... সুখ-দুঃখের কথা জানিও।

এবং শ্বশুরবাড়ি ফিরে গিয়েছিল।

তারপর, ওর চিঠিপত্র আসত—কিন্তু অত দীর্ঘ নয়। চিঠি লিখে ও নিজের অতীতের সুখের স্মৃতিগুলো ঝালিয়ে নিত। নিজের হারিয়ে যাওয়া সুখৈশ্বর্যের আস্বাদনের যেন অক্ষম একটা প্রয়াস মাত্র।

ওর জীবনে আরো একবার জোয়ার এসেছিল। পাঁচ বছর আগে ও বাবার কাছে ফিরে এসেছিল। তারপর আর ফিরে যায়নি। ওর বাবা প্রথম প্রথম সবাইকে বলতেন : মহেন্দ্র একটা ট্রেনিং-এ বছরখানেকের জন্য বিদেশ গেছে—এজন্যই সুদর্শনা আমার কাছে এসেছে। কিন্তু এক এক করে যখন চার-চারটে বছর কেটে গেল তখন সবাই কানাঘুষা যা শুনেছে তাকেই স্বীকার করে নিয়েছিল।

কিন্তু আমি ওর এই অবস্থাকে মেনে নিতে পারছিলাম না। একবার ওর জন্যই বিশেষভাবে আমি এখানে এসেছিলাম এবং ওর চলে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

ততদিনে ও হয়ত অনেক কিছুর হাত থেকে নিস্তার পেয়ে গিয়েছিল। মৃদু হেসে আস্তে আস্তে বলেছিল :

—বিশেষ কোন কারণে নয়....মনে কর, আমরা দুজনেই খুব ভাল এবং কেউ কাউকে কষ্ট দিতে চাই না। তাছাড়া আমার যন্ত্রণা এমনই যে কারুর সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করতেও পারি না....বলতে বলতে খোঁপা থেকে একটা একটা কাঁটা দিয়ে লনের মাটিতে আঁচড় কাটছিল।

চতুর্দিকে অদ্ভুত একটা অসহায়তার করুণ পরিবেশ। প্রদোষের অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসছে বিশ্বের ওপর। গাছপালা নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে—ঘরে ঘরে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে চলেছে। সুদর্শনার বাবা বারান্দার আলো জেলে ভিতরে চলে গেছেন। কে জানে কেন সুদর্শনা হঠাৎ কি মনে করে ধীরে ধীরে বলেছিল :

—এবার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত নেমে গেছে। চলো বারান্দায় যাই।

জানি না, এই পাঁচটা বছর সুদর্শনা কিভাবে কাটিয়েছে। কারণ ওর সংসারে, ওর বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণী ছিল না। বাপ ও মেয়ে—এই দুজন। ব্যস।

তাই যখন ওর বাবার মৃত্যু সংবাদ আমি পেলাম তখন ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। অন্তরে অন্তরে এজন্য শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম যে, সুদর্শনার এবার কি

হবে? কোথায় যাবে ও। নাকি মহেন্দ্রর কাছেই ফিরে যাবে? এছাড়া আর কি উপায় আছে? যাবার সময় আশা করিনি যে মহেন্দ্র আসবেন। কিন্তু যখন পৌঁছলাম তখন দেখি মহেন্দ্র উপস্থিত। ওর আত্মীয়-স্বজনেরা ভেবেছিল, বাবার শ্রাদ্ধশান্তির সময় হয়ত ওরা আবার মিলে-মিশে যাবে। ওরা আবার বিকশিত হয়ে উঠবে। সুদর্শনা হয়ত ইচ্ছা করেই মহেন্দ্রকে কোন কাজ-কর্ম করতে দেয়নি কিংবা হয়ত ও চেয়েছিল নিজের নিঃসঙ্গতা ভেঙে মহেন্দ্রই প্রথম এগিয়ে আসবে। কিন্তু....

তাই সেদিন দুপুরে মহেন্দ্র যখন পাশের ঘরে, আমরা তখন এঘরে কথা বলছিলাম: কবে যাচ্ছ তুমি?

—কোথায়! সুদর্শনা অবাক হয়।

আমি হেসে ফেলেছিলাম। সুদর্শনাও হেসে ফেলে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশ কণ্ঠে বলেছিল: এখানে আর ওখানে তফাৎটা কি। এখানে দুঃখ এই যে, আমার সময় আপনি ক্ষয় হয়ে কাটছে আর ওখানে জোর করে আমার সময় কাটাতে হয়।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু নিজের জন্য একটা উপায় তো বের করতে হবে। বোধহয় মহেন্দ্র এজন্যই এসেছেন।

—তুমি কি জন্য এসেছ? ও হঠাৎ কথাটা বলেছিল।

আমি কোন জবাব দিতে পারিনি। কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতা নেমে এল। জানলার ফ্রেমের বাইরে সারসপাখী হয়ে মেঘ ধুলোগুলো উড়ে উড়ে যাচ্ছে—সেদিকে একমনে দেখতে লাগল সুদর্শনা। কপালে ঘাম ও চুলের মাখামাখি। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ভারী।

নিস্তব্ধতা ভেঙে ওই বলল: দেখ চন্দর! সব কথা সবাইকে বলা যায় না। এত খোলাখুলিভাবে জীবনে পথ চলা যায় না। কিছু সুন্দর ছলনা, মিষ্টি কিছু গোপনতা, মনে হয়, খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

যতই সুদর্শনাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, ততই ও অবিশ্বাস ও সন্দেহের জালে নিজেকে ভীষণভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। মারাত্মক বোঝার মত কষ্টের সে সব দিনও একদিন যেমন-তেমনভাবে কেটে গেল।

মহেন্দ্র বিকেল অবধি নিজের ঘরেই বন্দী ছিলেন।

পরের দিন সকালে মহেন্দ্রর যাবার কথা। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আমার ঘরে চলে এসেছিলাম। পাশেই মহেন্দ্রর ঘর থেকে কিছু শব্দ কানে আসছিল। কথাবার্তার— কিছু ফুঁপিয়ে কান্নার—কিছু ফিসফিসিয়ে কথা বলার—তারপর মাঝে মধ্যে নিস্তব্ধতার শব্দ! সেই রাতটি ছিল ভয়ংকর রকমের অনিশ্চিতের রাত।

সকালে সব কিছু শান্ত—চুপচাপ। আমি বাথরুম থেকে বেরিয়েই দেখি সুদর্শনা মহেন্দ্রের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের কামরায় যাচ্ছে। সর্বাঙ্গে তার আলস্য—বেশভূষা আলুথালু!

সকাল দশটার গাড়িতে মহেন্দ্রর চলে যাবার পর আমি অত্যন্ত বিশ্রী ও বিব্রত অবস্থায় আছি মনে হল। মনে হল, সুদর্শনাকে বলি: তুমি নিজের চেহারার ওপর দুঃখের ঐ দার্শনিক খোলস কেন পরিয়ে রেখেছ? তুমি কি এতেই আনন্দ পাও?

আমার ধারণা হল, সুদর্শনা এরকমই সাক্ষাৎ দুঃখের প্রতিমূর্তি হয়ে আমার জীবনেও তো আসতে পারে!

বেলা একটায় আমার দরজায় টোকা পড়ার শব্দ হল। দরজা খুলেই দেখি, সুদর্শনা সেজেগুজে দাঁড়িয়ে। দশ বছর আগে যেমন দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি। ওকে দেখে মনে হল, অতীতের সেই সময়গুলো ফিরে গেছে এবং আবার নতুন করে আর এক ইতিহাস শুরু হতে চলেছে! ঐ কেন্দ্রবিন্দু থেকেই, যেখান থেকে ওর জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল।

—চলো, বাইরে কোথাও খেয়ে নেব'খন সুদর্শনা বলল: তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

খেতে খেতে আমরা আমাদের সম্বন্ধ-সম্পর্ক নিয়ে স্মৃতির-চারণা করলাম। আমি যদি ওর সঙ্গে থেকে যেতাম তাহলে কি হত! মানুষের জীবনে বন্ধ সম্পর্কের কি দাম? কিংবা কোন মূল্যে সম্বন্ধ গড়ে ওঠে? মনে হল, ফেলে সেই প্রেমের ছায়া যেন ওর চোখে বলতে চায়।

ফিরে এসে আমি ভুলেই গিয়েছি যে, মাত্র কিছুদিন আগে এখানে মৃত্যু ঘটে গেছে যার শোকছায়ার পরিস্থিতিতে আমরা সবাই আবদ্ধ ছি

বিকেলে ফিরে যাবার জন্য আমি তৈরী হচ্ছিলাম তখন মনে হ সুদর্শনা এসে আমার পথ আগলে দা —অনুনয় করবে না যাবার জন্য— সেসব কিছুই হল না। গাড়ি ছাড়ার কিছু আগে ও আমার ঘরে এসেছিল বলেছিল:— চল, আমি স্টেশনে পৌঁছে আসি। অনেক সংকোচ ও বিপর্যয়ের বাধা কাটিয়ে পথে বলেছি প্রিয়তমে সু, এবার তো কিছু একটা নিজের কথা বলছি না। কিন্তু....

—শোন চন্দর, মনে হচ্ছে, আর হবার নয়। মনের দিক থেকে আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি। কোন কিছু করে নেবার বা মানিয়ে নেবার সামর্থ আমার নেই।

লক্ষ্মীটি সুদর্শনা! তোমার ঘটনা সব ব্যাপারটা একবার খোল বলছ না কেন?

—এটাই তো সম্ভব হচ্ছে শীর্ণ হাসি হেসে সুদর্শনা এমন কে আছে বলতে পার যে, নি কথা বলেছে? মাত্র দশটা কথা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব—তা থেকে হয়ত তিনটে বলতে পারি—অন্য হয়ত চারটে, আর একজনকে হয়ত বলতে পারি। কিন্তু তাবলে, কেউ নেই যাকে সব কথাগুলো বল পারে। বললে যে বা যারা মনে কা যায় বা হাল্কা হয়ে যায় তারা কিন্তু নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। সম্পূর্ণ এক পড়ে। তার চতুর্দিক নিঃসঙ্গতায় ভ এখানেই আমার অক্ষমতা চন্দর।

বলতে বলতে ও আমার হা ছিল। অল্প অল্প ঘামে ভেজা ওর আঙুলগুলো কাঁপছিল। চোখদুটি জলে ভিজে উঠেছিল।

ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে যার বলেছিল: তোমায় চিঠি দেব। অন্য কিছু মনে কর না।

আমার গাড়ি চলা শুরু প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে ও ধীরে ধী হয়ে গেল।

কিছুদিন আগে ওর একটা চি ছিল। খামের ওপর ওরই হাতে ঠিকানা—ঐ শহরের ডাকছাপ। ভিতর শুধুমাত্র একটা সাদা কাগ করা। ভাঁজ করা দাগ ছাড়া ত কিছু লেখা ছিল না।

অনুবাদ: শ্যামানন্দ।

টোটোদের কথা

দলগাঁও অথবা মাদারীহাট স্টেশনে নেমে টোটোপাড়ায় যাওয়া সুবিধা। টোটোপাড়া থেকে মাত্র ৬ মাইল উত্তর-পূর্বে তোর্ষা নদীর পাশে ভুটানের ছোট্ট শহর ফুন্টশোলিং। তারই আগে জয়গাঁও। শোনা যায় টোটোরা নাকি কোচবিহারের কোচ জাতির বংশধর। কোন কারণে কোচবিহারের মহারাজা কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে এই জয়গাঁওতে চলে আসে এবং ভুটানের মহারাজার শরণাপন্ন হয়। সেই সময় ভুটানরাজ বর্তমান টোটোপাড়াটি ওদের দান করে দেন। আর ১৮৮৯—৯৪ সালে জরীপের সময় স্যাণ্ডার্স সাহেব এই টোটোপাড়াকেই টোটো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি টোটো মণ্ডল-এর নামে নথিভুক্ত করে নেন।

এককালে শুধুমাত্র কমলালেবুর উৎপাদনই ছিল টোটোদের জীবিকা সংগ্রহের হাতিয়ার বা পাথেয়। তারা ছিল কমলালেবু সাম্রাজ্যের রাজা। এখন আর সেদিন নেই। তাই টোটোদের অনেকেই আজ পরিণত হয়েছে লেবু বহা শ্রমিকে। তামাকের চাষও একসময় টোটোরা করত। বর্তমানে ধান, ভুট্টা, কাউন আর মাড়ুয়া চাষ করে থাকে। নেপালীদের কাছ থেকেই চাষবাসের কাজ ওরা রপ্ত করেছে। মার্চ থেকে এপ্রিল এবং আগস্ট থেকে অকটোবর পর্যন্ত তারা চাষ করে থাকে। 'টোটো মাড়ুয়া' আর ভুট্টার চাষ করে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। 'নেপালী মাড়ুয়ার' স্থায়ী চাষের সময় হচ্ছে ডিসেম্বর-জানুয়ারী।

টোটোদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য রাজ্য সরকার যথেষ্ট সচেষ্ট। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার থেকে বিগত ১৯৬৫ সালে ৩৯.৭২০ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি বিশেষ পরিকল্প রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩৯,৫০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। এই টাকা থেকে ১৫টি পরিবারের প্রত্যেকটি পরিবারকে ২টি করে দেশী গরু দিতে খরচ হবে ২১,০০০ টাকা। ৩০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ১৫টি পরিবারকে ২০০ টাকা করে দিয়ে ওই গরুগুলির জন্য গোয়ালঘর তৈরি করাতে। এছাড়া ১৫টি পরিবারের প্রত্যেকটি পরিবারকে ১০০ টাকা করে দেওয়া হবে গবাদি পশুর খাদ্য বাবদ। ২৬টি পরিবারকে বাড়িতে শূকর পালনের উৎসাহ দেবার জন্য ৭৮০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই টাকায় পরিবার পিছু ৩টি করে শূকরছানা পালন করা যাবে। চাষের বলদ কেনবার জন্য ৮৪০০ মঞ্জুর করা হয়েছে ১২টি পরিবারকে। বীজ, সার এবং কৃষির সরঞ্জাম কেনবার জন্য পরিবার পিছু ১০০ টাকা করে ১৭টি অনুষ্ঠানের জন্য ১০০০ টাকা ও ভূমি সমীক্ষার জন্য ১০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। টোটোপাড়ার আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্রটি পুনর্গঠনের জন্য ১৭৫০ টাকা মঞ্জুর করা ছাড়াও জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য ধরা হয়েছে ৮৪৭ টাকা। ৫০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে টোটো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের বই, পোশাক পরিচ্ছদ ও খেলাধুলোর সরঞ্জাম কেনার জন্য।....

মণ্ডল গাঁও, পঞ্চায়েত গাঁও, মিত্রং গাঁও, সুব্বা গাঁও, পূজা গাঁও এবং দুমাটি গাঁও এই ছটি পাড়া টোটো অধ্যুষিত। এছাড়াও আছে পোয়ার গাঁও, পাখা গাঁও, মগর গাঁও এবং কারাবতী। পাখা গাঁও এর একদিকে টোটোরা বসবাস করলেও অন্য গাঁওগুলিতে বাস করে নেপালীরা।

বোদ্দুবে, নুবিবে, দোদবে, ম্যাংকোবে, গোমোবে, দামকোবে, মণ্ডোবে, পিশু চাং কাঞ্জিবে, লেম্বা জিবে, দান জোবে, মাং চাংবে, নুবে চাংবে ও মিত্রং চোবে কুবে এই তেরটি গোত্রে টোটো পরিবার বিভক্ত। দামাংকোবে হচ্ছে বৃহত্তম গোষ্ঠী। এরপরই দানজোবে। তারপর আসে বোদ্দুবে, দোদবে ও নুবে চাংবে গোষ্ঠী।

টোটোদের বাড়ি-ঘরের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বেশীর ভাগ বাড়িই মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচু বাঁশের মাচানের উপর তৈরি হয়। কাঠের টুকরোর মধ্যে খাঁজ কেটে কেটে তৈরি করা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় এই বাড়িতে। একে বলা হয় কাইবু। বাড়ি বলতে একটা ঘর। বারান্দা তৈরি হয় বাঁশের মাচা দিয়ে। টোটো ভাষায় একে বলে 'দুই'। তিন ভাগে বিভক্ত ঘর। সিরি বা ঘুমানোর জায়গা, দাইচাকো সিরি বা অতিথিদের ঘুমানোর জায়গা আর জিবি বা গৃহদেবতার কোঠা। টোটোদের কুল-দেবতা পিশু আর ওজা এই জিবিতেই করে অধিষ্ঠান। জিবির আর এক নাম চিমা। সমস্ত ঘর জুড়ে একটা মাত্র চিবেয় বা জানালা। বারান্দা বা দুই এর ওপর তিন ফুট লম্বা আর এক ফুট চওড়া কাঠের খুঁটি কুঁদে তৈরি করে শূকরের জন্য 'জাতি' বা খাবার রাখার জায়গা। বনকচু আর মাড়ুয়া সিদ্ধ করে সাধারণত এই খাবার তৈরি করা হয়ে থাকে।

উপর্যুপরি কয়েকদিন ভাত বা খাবার না খেয়ে থাকলেও হাঁড়িয়া বা 'ইউ' ছাড়া টোটোরা কয়েক ঘণ্টাও কাটাতে পারে না বলে শোনা যায়।

টোটোদের বিয়ের রীতিতে দেখা যায় যে দু রকম রীতিরই প্রচলন বেশী।

সাধারণ বিয়ে বা ছোট বিয়ের রীতি হচ্ছে সম্বন্ধ করে বিয়ে হওয়া। এই রীতিকে টোটো ভাষায় বলা হয়ে থাকে 'ডিপকা বেহোইয়া'। ওদের সমাজে এই বিয়ের চলই বেশী। এই বিয়েতে অবশ্য বর-কনের স্বাধীনতা নেই পছন্দ [illegible]

সম্মত হলে যারা সম্বন্ধ করতে আসেন তাদের সঙ্গেই কনেকে চলে যেতে হয় ভাবী বরের বাড়িতে। রীতি অনুযায়ী কনেকে রাত্রিবাস করতে হয় বরের সঙ্গে। দেহে মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা দিলে তবেই হবে কনের সঙ্গে বরের আনুষ্ঠানিক বিয়ে। অন্য রীতি হচ্ছে 'দাবা বেহোইয়া' অর্থাৎ বরের থেকে কনেকে বয়সে বড় হতে হবে। আজকাল অবশ্য অন্য আর একটা রীতিও চালু হয়েছে। এই প্রথায় নিয়াংকোয়া অর্থাৎ খামারবাড়িতে পালিয়ে যায় প্রেমিক-প্রেমিকা। দিন তিনেক সেখানে থাকে ওরা। সে সময় চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যায়। এক সময় অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায় ওদের, তারপর বিয়েও হয়ে যায়। এছাড়া অন্য যে বিয়ের রীতি আছে তাকে বলে 'দেব বিহো' বা বড় বিয়ে। এই বিয়েতে কিন্তু 'ডিপকা বেহোইয়া'র মত সন্তান সম্ভাবনা বা মাতৃত্বের লক্ষণ বিয়ের শর্ত হিসাবে ধরা হয় না। পাঁচ সাতটি বড় বড় গরু, দশ বার মণ চাল যোগাড় করে সারা গাঁয়ের লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে পারলেই সম্পন্ন হয় 'দেব বিহো।'

বিয়ের অনুষ্ঠান কিন্তু খুব সহজ। সমস্ত গাঁয়ের লোকজনের উপস্থিতিতে পুরোহিত বর-কনেকে বসিয়ে মহাকালের উদ্দেশ্যে সম্প্রদান করা মাত্রই শেষ হয় বিয়ে। শুরু হয় খাওয়া-দাওয়া। বৌকে অবশ্য সতী লক্ষ্মী হয়ে থাকবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। স্বামী স্ত্রী হিসাবে থাকাকালীন কোন সময়েই কোন রকম ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া অপরাধ। যদি কেউ এ রকম কাজ করে ফেলে তবে সে হয় সমাজ থেকে চ্যুত। আর টোটো পাড়ায় সমাজচ্যুতের কোন স্থান নেই।

টোটো বিবাহিতা মেয়েরা যত রূপবতী আর সুন্দরী হয় তাদের পোষাকে থাকে তত ময়লা আর দুর্গন্ধ। পোষাকের চাকচিক্য আর সৌন্দর্যের ছটায় মুগ্ধ হয়ে ভিন্ন সমাজের লোকেরা যাতে টোটো বৌদের হরণ করে নিয়ে না যায় সে জন্যই এই ব্যবস্থা।

ইসকা বা মহাকালীর পূজাই হচ্ছে টোটোদের সব থেকে বড় উৎসব।

ভাদ্র মাসের শেষে শুরু হয় এই উৎসব, চলে নয় দিন ধরে। দেবীর প্রতীক হিসাবে দুটি ঢোল থাকে মন্দিরে। পূজারী বা পুরোহিত দেবীর উদ্দেশ্যে মদ, মাংস বা চাল নিবেদন করে পূজা দিয়ে থাকে। পূজা শেষে হয় প্রসাদ বিতরণ। উৎসব চলাকালীন সময়ে নাচ গান হয়ে থাকে। *

দেবাশিষ ঘোষ

---

* নিবন্ধ রচনায় যে সমস্ত বইয়ের [illegible]

(৬৪)

মঠ। ১৫ই মে। ১৯০২

স্নেহের ক্রিস্টিন,—

মায়াবতী তোমার পছন্দ হয়েছে জেনে আনন্দিত হলাম। এখানে গরম যথেষ্ট অথচ প্রত্যাশিত বৃষ্টির নাম নেই। যদিও আমি জল খুব কম খাই। আমি মায়াবতী বা আলমোড়া যাবার ইচ্ছে ত্যাগ করেছি। গরমটা যা হোক সহ্য করে নিই। কিন্তু বর্ষাটা এড়াতে চাই। অন্য কোথাও চলে যাবো তখন। কলকাতা থেকে কোন সংবাদ নেই। ওখানকার মানুষজন এবং অন্যান্য জিনিস যা দেখছ এবং কেমন লাগছে সব বিশদ লিখো আমাকে।

সতত ভালবাসাসহ—
বিবেকানন্দ

(৫)

মঠ। ২৭শে মে। ১৯০২

স্নেহের ক্রিস্টিন,—

এবার আর আমার পাহাড় দেখতে যাওয়া হ'ল না।—দুঃখ হচ্ছে সেজন্য। আমার শরীর যতটা ভাল হবে আশা করেছিলাম ততটা হয়নি, তবুও মন্দ নেই। লিভারটা ভাল আছে—সেই মস্ত লাভ। পাহাড়ে শীঘ্রই বৃষ্টি নামবে অতএব ঐ দুর্গম রাস্তায় যাবার ঝামেলা ঘাড়ে নেবার কোন মানে হয় না এখন আমার পক্ষে। পাহাড়ে থেকে তোমার ভাল হয়েছে জেনে ভারী আনন্দিত হয়েছি! খুব খাবে, ঘুমোবে যাতে মোটা হয়ে যাও। খুব ঠুসে খাবে যাতে মোটা হবে নয়ত ফেটে যাবে।

জায়গাটা তাহলে মিঃ ওকাকুরার সহ্য হ'ল না! কেন? ওখানে এমন একটা কিছু ঘটে থাকবে যা তাঁকে ক্রুদ্ধ করে তোলে

এবং তিনি হঠাৎ চলে গেলেন। ওখানকার দৃশ্যাবলী ও'র পছন্দ হয়নি? ও'র পক্ষে সেগুলি যথেষ্ট সাবলাইম নয়,—না কী? অথবা জাপানীরা সাবলাইমটি একেবারে পছন্দ করে না? তারা শুধু সৌন্দর্য ভালবাসে? ছেলেদের মধ্যে একজন চিঠি লিখেছে ছোট ছেলেটি অবাধ্যপনা করছে ইত্যাদি। মিসেস সেভিয়ার চাইছেন আমি ওকে সমতলে আনিয়ে নিই। তাই করছি। আমি সদানন্দ ও আর একজন সন্ন্যাসীকে (যাকে আমি এখানকার কাজের জন্য চাই) আলমোড়াতে পাঠাচ্ছি এবং যত দিন না বৃষ্টি নামে ওখানে থাকবে। বৃষ্টি নামলে সমতলে নেমে আসবে।

যদি তোমার মনে হয় তুমি মিসেস সেভিয়ারের ওপরে সামান্যতম বোঝা হয়ে আছ, তৎক্ষণাৎ জানাবে আমাকে। ও'র ওপরে আর চাপ দেওয়া অত্যন্ত পাপ হবে। এমনিতেই উনি আমার জন্য এত করেছেন: উনি কিন্তু তোমাকে খুব পছন্দ করেন। আমাকে লিখেছেন তোমাকে শাড়ি পরলে খুব সুন্দর দেখায়!

এইমাত্র আমাদের পরিবারের সংখ্যায় দুটি...এবং তিনটি ভেড়ার বাচ্চার আগমন হল! আরও একটা... হয়েছিল। সেটা হলদে মাছের জলাধারে ডুবে গেছে।

মার্গট কেমন আছে? ও কি এখনও ওখানে আছে না মিঃ ওকাকুরার সঙ্গে চলে গেছে? ওখানকার ছেলেদের সঙ্গে ও'র

কেমন বনছে? সারা দিন কী কর? সময় কাটাও কী করে? সমস্ত বিশদ জানাবে এবং ঘনঘন লিখবে—তবে আমার কাছ থেকে লম্বা চিঠি মোটেও আশা করবে না আর।

মিসেস সেভিয়ার, মার্গট ও অন্যান্যদের আমার ভালবাসা জানাবে...আর যদি ইচ্ছে করো তুমিও কয়েক চামচ নিতে পারো।

ব্যস, আজ এই পর্যন্ত
বিবেকানন্দ।

পুঃ—ছোট ছেলেটির ওপরে একটু নজর রেখো। ছেলেরা ওকে হিংসে করে। এইভাবে আর একটি ছেলেকে ওরা নষ্ট করেছে এর আগে।

(৬৬)

মঠ। ১৪ই জুন। ১৯০২

স্নেহের ক্রিশ্চিন,—তোমার চিঠিটি এসে ক'দিন আমার অপেক্ষায় ছিল কারণ আমি দিনকয়েকের জন্য গ্রামে গিয়েছিলুম। সমস্ত খবরগুলি পেয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মিঃ ওকাকুরা মঠে এসেছিলেন। তারপর চলে গেছেন। কয়েক সপ্তাহ কলকাতায় থেকে বম্বে যাবেন। উনি শহর-কলকাতায় একটা বাড়ি নিয়ে থাকতে চান যাতে বাঙালীর জীবনযাত্রা, প্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন।

মার্গট মায়াবতীতে আরও কিছুদিন থাকতে চায় জেনে আনন্দিত হলাম। ওর বিশ্রাম খুবই দরকার এবং ইউরোপে ওর কেউ নেই, সেকথা আমি ভাল করে জানি। যদি ও একজন বয়স্কের উপদেশ হিসেবে আমার কথা গ্রহণ করে তাহলে আমি ওর সব বই এবং কাগজপত্র কেড়ে নিয়ে ওকে বলব হাঁটো, খাও আর ঘুমাও। আর কথা বলবার জন্য আমি সব সময় হাসির আনন্দের, গল্প করবার জন্য প্রস্তুত।

মিসেস সেভিয়ারের কাছ থেকে একটি সুন্দর চিঠি পেলাম। ভারী আনন্দ হল জেনে যে তিনি তোমাকে ক্রমেই বেশী ভালবাসছেন। তবে মোটা না হলে কেমন করে বোঝা যাবে মনআমির, ক্রাইটেরিয়ান কী? আমাদের পায়রার খুপরীতে আমার চিঠিখানি বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে তাহলে? তবে এতদিনে আশা করি আবার সব যথাপূর্বং অবস্থায় এসেছে।

আমার ভাই-পো (ভূপেন?) শিল্পীর আশ্রমে যাবে। তাকে ভাল অ্যাকসেন্ট-এ ভাল ইংরাজী বলতে শিখিও। কোন বিদেশী-ভাষা ভাল করে শেখা যায় না যদি না বাল্যকাল থেকে বলার অভ্যাস করা হয়।

মিঃ বোস এখনও ওখানে আছেন আশা করি। তোমার ও'কে খুবই ভাল লাগবার কথা। উনি একজন মজবুত ব্যক্তি। ও'কে আমার শ্রদ্ধা জানাবে। জানাবে তো?

লেকে এখন জল আছে কী? পরিষ্কার বরফের দৃশ্য পাচ্ছ? এখানে পুরো গ্রীষ্মকাল ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। প্রখর রোদ হলই না এবার। বরং গুমোট দিন গেছে ক'দিন। আমাদের বর্ষাও তো এসে পড়ল। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ভীমবেগে প্লাবন নামবে। নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি আগের চেয়ে অনেক সুস্থ ও সবল হয়েছি—বিশেষ করে সাত মাইল গরুর গাড়ির ঝাঁকানির যাত্রা এবং চৌত্রিশ মাইল রেলযাত্রা সত্ত্বেও আমার পা ফোলেনি। আমি সুনিশ্চিত যে আর পা ফুলবে না।

তবে একটা কথা, মঠেই আমি সবচেয়ে ভাল থাকি।

ভালবাসাসহ—বিবেকানন্দ।

(৬৭)

মঠ। ১৫ই জুন। ১৯০২

প্রিয় ক্রিশ্চিন,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। যতক্ষণ তুমি মিসেস সেভিয়ারের কাছে মায়াবতীতে আছ ততক্ষণ আমি খুব নিশ্চিন্ত। তুমি জানো সুস্থ হয়ে উঠতে হলে দুশ্চিন্তা জিনিসটাকে আমার সবচেয়ে বেশী পরিহার করে চলতে হবে। তুমি যদি কলকাতার বাগবাজারে থাকতে তাহলে আমার দারুণ দুশ্চিন্তা হ'ত। যতদিন পারো মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে থাকো। মার্গটের সঙ্গে নেমে এসো না।

ভালবাসাসহ বিবেকানন্দ

"Give me five women and I can solve the problem of India." —(VIVEKANANDA)

নারীশিক্ষা

(১১)

সেবার গ্রীষ্মকালে উনি গ্রীনএকরে গিয়েছিলেন। জায়গাটা মেইন এর সমুদ্রতীরে অবস্থিত। সেখানে বছরের পর বছর সত্যানুসন্ধানীরা যান সবরকম ধর্মমতের ও পদ্ধতির শিক্ষকদের কথা শুনতে। এখানে একটা পাইনগাছের নীচে (পরে সেই গাছটিকে বলা হত দি সোয়ামিস পাইন) বসে উনি প্রাচ্যের বাণী শোনাতেন। এখানে উনি এক নতুন ধরনের আমেরিকান জীবনের সান্নিধ্যে এলেন। এখানকার নির্ভিক কোনরকম প্রচলিত সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন নয়, সংযত যুবক কটি ও'র সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। সেখানকার নারীপুরুষের মধ্যে সহজ মেলামেশা, যা ছিল অবিমিশ্র পবিত্রতা, ও'কে বিস্মিত করেছিল। উনি বলতেন, 'আমি এদের সহজাত বন্ধুজনোচিত মেলামেশা পছন্দ করি।' দিনের পর দিন এদিক-ওদিক পায়চারী করতে করতে, আপন মনে বলে যেতেন 'কোনটা ভাল' আমেরিকার এই স্বাধীন মেলামেশা, না, ভারতের বাধাব্যবধানপূর্ণ সামাজিক প্রথা? আমেরিকার প্রথাটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে কেউ ইচ্ছা করলে এর দরুন হীনতম স্তরে পৌছে যেতে পারে। কিন্তু একথাও ঠিক স্বাধীনতা ছাড়া কোন উন্নতি হয় না। তবে তার বিপদও সুস্পষ্ট। অপরপক্ষে বলা যায়, ব্যক্তিগত ব্যাপারে মানুষ ভ্রান্তির মধ্য দিয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করে। আমাদের ভারতবর্ষে সমাজের ভালমন্দ বোধের উপরেই ব্যক্তিকে নির্ভর করতে হবে। তাকে যেভাবেই হোক (ক্ষতি স্বীকার করেও) তাকে সমাজের প্রথার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। ভারতবর্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই—যতক্ষণ না মানুষ সমাজকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। এই প্রথাই আমাদের দেশে।

"Produced towering individual, spiritual giants". Has it been at the expense of those less spiritual than themselves?

জাতির পক্ষে কোনটা ভাল? আমেরিকা তার জনগণকে নির্বিচারে স্বাধীনতার সুযোগ দিচ্ছে। এটা প্রসারতার পরিচয়—কিন্তু গভীরতার পরিচয় আছে ভারতের সমাজ প্রথায়। কী করে এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় আনা যায়? কী করে পাশ্চাত্যের প্রসারতার সঙ্গে ভারতের গভীরতাকে রক্ষা করে চলা যায়?

এইভাবে চিন্তাধারা যে কেবলমাত্র খানিকটা বিশ্লেষণের কাজ তা নয়। এটা রীতিমত মানসিক কসরৎ (জিমনাস্টিক): ভারতের উন্নতিসাধনের জন্য এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন। আমেরিকার সামাজিক স্বাধীনতার মূল্য যেমন উনি বুঝবেন, তেমনি ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় কত যে মূল্যের জিনিস গড়ে উঠেছিল, দেশকে যুগযুগান্তর সজীব রেখেছিল, দেশের কত

উত্থানপতনের মধ্যেও সে অমর হয়ে থেকেছে—সে কথাও তিনি ভুলতেন না।

আসলে ও'র সমস্যা ছিল কী করে ভারতের সমাজ সংগঠনের ক্ষতি না-করে, অন্য দেশের ভাল দিকটা তার সঙ্গে যুক্ত করা যায়? কদিন ধরে শুধু এইসব কথা যেন ধ্যানের গভীরতা থেকে বলে যেতেন।........

........এর পরেই মনে আসত ভারতীয় নারীসমাজের কথা। এমন একজন নারী চাই যে হবে ভবিষ্যতে ভারতীয় নারী-সমাজের আদর্শ। ভাবতেন। ভেবেই চলতেন। নিপুণ ভাস্কর্য শিল্পীর মতন একটু একটু করে সেইরকম এক নারীকে মনে মনে গড়ে তুলতেন (সেরকম নারী কোন শিল্পী কখনও ভাবতেও পারেনি) যে নারীর মধ্যে থাকবে

"An expression of the Divine Mother through which the light of spirituality shines".

........নারীর কার্যাবলী সম্বন্ধে ও'র কীরকম পরিকল্পনা ছিল? কেবলমাত্র বাচ্চাদের স্কুল নয়। তেমন স্কুল হাজার হাজার আছে। বোর্ডিং স্কুলও নয়। এমন কী কোন মেয়ে যাদের মা বাবা তাদের বিয়ে দিতে পারছেন না বলে এইরকম একটা স্কুল থাকলে তাঁদের সুবিধে হয়, তাও নয়। এমন কী বিধবাশ্রমও নয়।

........এর উত্তর ছিল যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী যে সমগ্র জগতে বিশেষ করে ভারতে যে নতুন ধারায় অধ্যাত্মবাদের ব্যাখ্যা করে নতুন শক্তি, নতুন জীবনের পথপ্রদর্শন করেছিলেন সে কেবলমাত্র পুরুষের জন্য নয়। ভারতীয় নারীদের মধ্যেও সেই চিন্তাধারা, জীবনদর্শন কীভাবে জাগ্রত করা যায়?

("How could they be set on fire and become torches from which millions of others might light their flames?") ......

কী করে তাদের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে দেওয়া যায় যাতে তারা দীপশিখা হয়ে আরও কোটি কোটি মানুষকে সেই আলোকে আলোকিত, প্রজ্জ্বলিত করে তুলতে পারে? এই কাজের জন্য চাই একজন নারী। কোন পুরুষ এ কাজ করতে পারে না। কিন্তু কোথায় সেই নারী?

(নারীশিক্ষা ও তাদের সংগঠন সম্বন্ধে ভগিনী ক্রিস্টিন ডেট্রয়েটে তাঁর 'হিজ মিশন' বক্তৃতাতেও কিছু বলেছিলেন। এখানে সেই বক্তৃতা থেকে কিয়দংশ যুক্ত করা হল)

পাশ্চাত্য দেশে যাবার বহু আগে থেকেই—যখন তিনি কেবলমাত্র একজন ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী ছিলেন—তাঁর মনের মধ্যে একটি ইচ্ছে সংগোপনে ছিল;—কেমন করে তাঁর বাণী ও পরিকল্পনাকে কার্যে পর্যবসিত করবেন।

একবার নিজের বাংলাদেশে তিনি একজন সন্ন্যাসিনীকে পেয়েছিলেন, যিনি দেশের নারীসমাজের জন্য স্বামীজীর কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরে স্বামীজী এঁর সম্বন্ধে হতাশ হয়েছিলেন।

পরবর্তী দিনে পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে যথার্থ নারী কর্মী খুঁজেছিলেন। তাঁর সর্বাগ্রে দাবী ছিল পবিত্রতা।

"Is she pure,—pure in heart?"

এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। পবিত্রতা শিষ্যত্ব এবং ভক্তি এই ছিল তাঁর কাজের প্রথম দাবী।

"Intellectual attainment was secondary".

........স্বামীজী বারবার বলতেন আমাকে পাঁচজন নারী দাও, আমি ভারতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেব। কিন্তু কোথায় সেই পাঁচজন? অন্তত একজন তেমনই বা কোথায় যে কিছুসংখ্যক নারীকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে যাদের মধ্য থেকে সেই পাঁচটিকে গড়ে নেওয়া যায়? কী ধরনের শিক্ষাই বা তাদের হওয়া উচিত?.........সে শিক্ষা কেবলমাত্র পুঁথিগত হবে না। সে হবে এক নতুন আঙ্গিকের শিক্ষা যা সেই পাঁচটি নারীকে কাজের যোগ্য করে তুলবে।

('It must be intellectual, national, spiritual, unless) those who initiate it, have lighted their torch at the alter where burns the fire, that was brought from above, the work will be of little value!')

এ শিক্ষা হওয়া উচিত বৌদ্ধিক, জাতীয়, আধ্যাত্মিক। এবং এই ভাবকে যতক্ষণ না প্রবর্তন করা হবে এবং স্বর্গীয় বেদীর আগুন থেকে যতক্ষণ না তারা তাদের দীপ প্রজ্জ্বলিত করছে, ততক্ষণ এ কাজ হবে অর্থহীন, মূল্যহীন।'

এজন্যই শিষ্যের প্রয়োজন। সবাই একই বেদীমূলে উঠতে পারে না। কিন্তু একটি প্রজ্জ্বলিত শিখা একাধিক দীপ জ্বালাতে পারে,—শত থেকে হাজারকে আলোকিত করে তুলতে পারে। এই হাজারের সংখ্যা তখন নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে, যার থেকে জন্মাবে এক নতুন জাতি।

"A race of super men and women—a new order."

...মহাভারত ও রামায়ণের আদর্শ চরিত্রগুলি মেয়েদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। গল্পচ্ছলে, বই পড়ে, শুনিয়ে, অথবা যাত্রা, কথকতা ইত্যাদির মাধ্যমে। যাতে এইসব শুনতে শুনতে এই চরিত্রগুলিকে তারা সর্বদা মনে মনে ভাববে এবং নিজেদের এই চরিত্রের আদর্শে সংগঠন করবে। চরিত্রগুলি যেন তাদের রক্তে মিশে যাবে, এবং এর ফলে পরবর্তীকালে এক সুমহান, নবীন নারীজাতির জন্ম হবে।

বারবার বলতেন

"All attempts must be based upon the ideal of Sita. Sita purer than purity, chaster than chastity, all patience, all suffering, the ideal of womanhood."

বলতেন কেবলমাত্র একজন সাবিত্রী তাঁর ভালবাসা দিয়ে মৃত্যুকে জয় করবে না, হাজার হাজার সাবিত্রী চাই। কেবলমাত্র একজন সীতা নয়, হাজার হাজার সীতা চাই। নতুন যে নারীজাতি নতুন শিক্ষায় জন্ম নেবে, নিজেদের গড়ে তুলবে, সেও এক তপস্যা। তাদের একের মধ্যেই সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী-দ্রৌপদী সকলের গুণের সমন্বয় হবে।

বলতেন 'আমি ভালবাসি পবিত্রতা,—সীতার পবিত্রতা, সাবিত্রীর পতিব্রাত্য, দময়ন্তীর ভক্তি।—হ্যাঁ বীরনারী পদ্মিনীকেও তিনি এই মহীয়সী নারীদের শ্রেণীভুক্ত করতেন। পবিত্রতার কথা সর্বক্ষণই বলতেন। নারীর আর একটি গুণের কথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় না বললেও—গল্পের ছলে বলতেন। এটি নারীর স্বাভাবিক প্রকৃতি নয়। তবুও গৌরবের কথা। এঁরা হলেন রাজপুত নারী, বীরনারী। এঁরা স্বামীকে যুদ্ধের বেশে সাজিয়ে দিয়ে বলতেন "Come back with your shield or on it."

বলতেন রূপসী সাহসিনী পদ্মিনীর কথা যিনি মুসলমানের কামের স্বীকার হবার আগেই আগুনে প্রাণ দিয়ে নিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে গিয়েছেন।

ভারতবর্ষ এখন একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। …াচীন প্রথা থেকে আধুনিক ও নতুনের পথে। যতই এগিয়ে আমরা …য় হায়' করি না কেন, যতই আমরা প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে পরি-…তনকে বাধা দিই না কেন, আমরা কিছুতেই সেটা আটকাতে পারি …। অতএব এটা সম্পূর্ণ আমাদের ওপরে নির্ভর করছে আমরা …ভাবে এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করব। আমরা কী বিনা প্রস্তুতিতে …জ্ঞানভাবে একে গ্রহণ করব; কী আমরা নির্ভিকভাবে বীরের মত …র সম্মুখীন হব? আমরা বরং আমাদের ভবিষ্যতের প্রয়োজন …নুযায়ী তাকে সেইভাবে গড়ে নিয়ে গ্রহণ করব।……যদি ভারতবর্ষ …ই বিশ্বপ্রসারী (বিশেষ করে এশিয়া) পরিবর্তনকে এড়াতে …পারে, তার অন্ততঃ উচিত পরিস্থিতিকে সামলে নেওয়া।

("The new must grow out of the old, naturally …nd in harmony, with the law of its growth. Shall the lotus became the primroze? Rather let us make …he condition by which the lotus can became a more …erfect lotus which shall live for ever as the symbol …f a great nation and while it has its roots in the …ud of world, flower in a rarer, purer atmosphere.")

'পুরাতনের মধ্য দিয়েই নূতনের জন্ম হোক স্বাভাবিক এবং …মঞ্জস্য রক্ষা করে। এইটাই বিবর্তনের নিয়ম। পদ্ম তো …প্রিমরোজ হতে পারে না। বরং আমাদের উচিত পরিবেশকে এমন-…ভাবে গড়ে নেওয়া যাতে পদ্মফুল আরও পরিপূর্ণ ও সুন্দর হয়ে …ঠে একটি মহৎ জাতির প্রতীক হয়ে থাকুক! মূল হোক তার জগতের …াঁক, কিন্তু অসাধারণ ফুল হয়ে ফুটে উঠুক পবিত্র পরিবেশে।'

নানা বিষয়ে এই পরিবর্তন দেশের নারীদের সবচেয়ে বেশী …পর্শ করেছে। নগর গড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে নারীরা গ্রামের …বে মুক্ত জীবন থেকে জনবহুল শহরের ইঁটের দেওয়ালের বাঁধনে …টকা পড়েছে। যদি তারা গরীব হয়, অথচ উচ্চজাতির (সাধারণত …ই) তাহলে অনেক সময় তারা এই বদ্ধজীবনের বাইরে পা বাড়াতে …রে না হয়ত মাসের পর মাস। অর্থনৈতিক চাপ অবিশ্বাস্য রকম …রূপে। দুশ্চিন্তা, অপুষ্ট খাদ্য দূষিত বাতাস এবং আবদ্ধজীবন …কে আনে রোগ, অকালমৃত্যু এবং অসুখী জীবন।

বিধবাদের অবস্থা সধবা মেয়েদের চেয়েও শোচনীয়। শহরে …জীবনযাত্রায় তাদের কোন স্থান নেই। প্রাচীন গ্রামে তাদের একটা …শ্রদ্ধাপূর্ণ সামাজিক মর্যাদা ছিল। তাদের প্রয়োজনীয়তাও ছিল। …কিন্তু শহরে তারা হচ্ছে ভারবাহী জীব। খাওয়া-পরার পরিবর্তে …তাদের দায়িত্ব হল সংসারে ঝি-চাকরের খরচ বাঁচিয়ে দেওয়া।… …তারা অনুভব করে সংসারের অর্থ উপার্জনের কোন কাজেই …তারা লাগে না।

সমাজের এই শ্রেণীর জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ করে …বলেছিলেন

"They must be made economically independent.") স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করবার ক্ষমতা তাদের হওয়া দরকার।" …এই কাজের দায়িত্ব যে গ্রহণ করবে তার পক্ষে এটা একটা মস্ত …সমস্যা কীভাবে এই কাজে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। স্বামীজী …এ-বিষয়ে বললেন, 'এদের লেখাপড়া শেখানো দরকার।' কিন্তু এদের …শিক্ষা পাশ্চাত্য ধারায় দেওয়া হবে না,—হবে ভারতীয় ঐতিহ্যের …ধারায়। কেবল লিখতে পড়তে জানাটাই এদের শিক্ষার শেষ কথা …নয়। লেখাপড়াটা হল উচ্চমার্গে চালিত হবার বস্তু মাত্র। যদি …মেয়েরা লেখাপড়া শিখে অশ্লীল, চটুল, লোমহর্ষক কাহিনী পড়ে …দিন কাটায় তবে নিরক্ষর থাকা অনেক শ্রেয়। যদি লিখতে পড়তে জানবার ক্ষমতা দিয়ে তার নিজের দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, চারু-কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় জ্ঞান আহরণ করে তবে সে শিক্ষা হবে আশীর্বাদের তুল্য।! প্রথমে হবে মাতৃভাষার শিক্ষা। তারপরে সংস্কৃত। এরপরে আসবে ইংরাজী, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্ক এবং ভূগোলের পাঠ। সঙ্গে সঙ্গে চলবে সেলাই, সূচীশিল্প, তাঁত বোনা, রান্না, সেবার কাজ এবং নানাবিধ হাতের কাজের কারিগরী বিদ্যা।

পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা কেবল মনের ব্যাপার। মনের শিক্ষা এবং নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি।

This is a very limited conception. Man is not mind only. Why not build upon a new education based upon the true nature of man?

জগতে যখন নতুন আলোক দেখা দেয়, তখন সে জীবনের সমস্ত দিকগুলিকেই আলোকিত করুক না কেন? মানুষ যদি পবিত্র হয় তবে শিক্ষা তার ভেতরকার জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্মোচিত করুক।

উনি বলতেন, শিক্ষা জিনিসটা হচ্ছে মানুষের ভেতরে যে জ্ঞান আছে তারই বহিঃপ্রকাশ। একটা নতুন একসপেরিমেন্ট করা যাক। একটা ব্যাপক এবং বৃহত্তর লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি না কেন?……

……কোন পুরুষই নারীর সমস্যা সমাধান করতে পারে না। এক-মাত্র নারীর দ্বারাই একাজ সম্ভব। এ বিষয় উনি একেবারে দৃঢ়মত ছিলেন। উনি বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক নারীই মহামায়ার অংশ, শক্তির আধার। যে নারীসমাজ এতদিন দমিত ছিল আজ তার মধ্যে জেগে উঠুক সিংহের প্রকৃতি। তার হাতের বেড়ি খসে পড়ুক। যুগ যুগ ধরে নারী অনেক কষ্ট ভোগ করেছে। এই কষ্টের ভেতর দিয়ে সে অসীম ধৈর্য ও চেষ্টার পরিচয় দিয়েছে।

সাধারণ মতে বলা হয় মানুষ হচ্ছে পাপ ও দুঃখজাত সন্তান। না। স্বামীজীর মতে সে হল ঈশ্বরের সন্তান—পবিত্রতা ও পরিপূর্ণতা থেকে। তবে কেননা আমরা শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করে প্রমাণ করি, বিশ্বাস বা জ্ঞানীব্যক্তি আলোকের অধিকারী এবং তার পরমগতি মুক্তি, সৌন্দর্য ও পরমানন্দের মাঝে; সব ধর্মমত তো সেই শিক্ষাই দিচ্ছে—'তোমারই মাঝে স্বর্গরাজ্য।'

যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নারীশিক্ষা সম্বন্ধে করতে চেয়েছিলেন সে-বিষয় ক্রিস্টিন বলছেন, যদি একসপেরিমেন্ট সফল না হয়, তবুও সেটা পুরোপুরি ব্যর্থ হবে না। কারণ শক্তি, উদ্যোগ নিজের সম্বন্ধে দায়িত্ব বোধ তো খানিকটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আর সফল যদি হয়,—সেইটাই অবশ্যম্ভাবী,—লাভের পাল্লা অবিশ্বাস্য রকম বেশী হবে। উপস্থিত পরিস্থিতিতে অবশ্য ফলাফলটা সঠিক বলা যাবে না। যে নারী এই শিক্ষায় উত্তীর্ণ হবে সে যে একজন অসামান্যা নারী সেকথা হলপ করে বলা যায়। এইরকম ২।৪ জনের একান্তই আবশ্যক আজকের সঙ্কটের দিনে।

আমাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করতেন স্বামী বিবেকানন্দের নারীশিক্ষার পরিকল্পনাটি যদি ঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়, তবে যে নারী এই শিক্ষায় গড়ে উঠবে সে হবে জগতের ইতিহাসে একটি অভিনব কীর্তি। প্রাচীন গ্রীকদেশে নারীকে বলা হত শারীরিক যোগ্যতায় একেবারে নিখুঁত! স্বামীজীর পরিকল্পনায় নারী হবে Intellectually and spiritually a woman gracious, loving, tender, long suffering, great in heart and intellect, but greatest of all in spirituality.

(চলবে)

।। এগারো ।।

সকাল বেলাটা উত্তেজনায় কাটল, দুপুরে যুদ্ধক্ষেত্রের শিবিরের মতো থমথমে চেহারা। আর বিকেলে সেই উত্তেজনা পুরোপুরি থিতিয়ে এল।

রজনী এ নৌকো থেকে সে নৌকোয়, এর কাছ থেকে ওর কাছে, সারাক্ষণ ছুটোছুটি আর ব্যস্ততা দেখিয়েই কাটাল।

রসিকলালের পেছনে লেগে রইল মকবুল, দীননাথ। মন্ত্রফন্ত্র পড়ে বাঘকে যদি ঘায়েল করে দেখাতে পারে রসিকলাল ওকে আর পায় কে!

রসিকলালের অবস্থাটা হচ্ছে, ছুঁচোর হাতি গেলার মতো। তবু বোঝাবার চেষ্টা করে, বাঘের যদি প্রাণের ভয় থাকে, তা হলে আর বাছাধন এমনিতেই এগোবে না। মন্ত্র-ফন্ত্র পড়ে ভূতপ্রেত ঠেকান যায়, বাঘ ঠেকান যায় না।

—যারা সত্যিকার ওঝা তারা বাঘও ঠেকাতে পারে। বাঘকে বশ করে ছাগলের সঙ্গে এক ঘাটে জল খাওয়াতে পারে।

রসিকলাল বলল, পারে হয়তো। তবে আমি তো আর ওঝা নই, আমি কি করে ঠেকাব?

—যার বাপ ওঝা ছিল, সে কি আর বাপের বিদ্যে কিছুই পায়নি?

—না পাইনি। নেইওনি। বাপও আমাকে দিতে চায়নি।

—কেন, দেয়নি কেন?

—সে অনেক কথা। দেখ ভাই, বাপ যখন মারা গেল, তার দু-একদিন আগে বাপ আমাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিল। তার একটা হচ্ছে, দেখ্ রসা, চোখে যদি কখনো সাপ পড়ে, লাঠিই হচ্ছে তার প্রধান ওষুধ। সাপের জায়গায় এখন বাঘ পড়েছে, এখানকার এত-গুলো লোক দা-কুড়াল লাঠি বন্দুক নিয়ে তেড়ে গেলেই বাঘ পালাতে পথ পাবে না।

দীননাথ লম্বা একটা বিড়ি ধরিয়ে অনেক-ক্ষণ ধরে টানছিল, হাসল, বাঘের আবার প্রাণের ভয়, তাও কিনা মানুষকে। একবার ও ধারে কাছে এগিয়ে গর্জন করে উঠলেই তো বাবা আট দশটা লোকের পেচ্ছাব বেরিয়ে যাবে।

—তা পারে। তবে আট-দশটা লোক এক-সঙ্গে তেড়ে গেলে বাঘেরও আর হাসিমুখ থাকবে না। আসলে সাহস আর গায়ের জোর থাকলে কে হারায় বল দেখি।

গাছের গুঁড়ির মতো গাঁট গাঁট শরীর নিশিকান্ত এতক্ষণ বসে বসে সব শুনছিল, এবার সেও কথা না বলে পারল না। বলল, গায়ের জোর আর সাহসেই সব হয় না রসিক-ভাই, একটু মগজও দরকার। বুদ্ধি থাকলে বাঘ তো বাঘ, বাঘের বাপ ঠাকুর্দাকে অবধি বশে আনা যায়।

—এনে দেখাও না।

নিশিকান্ত বলল, তা হলে আমারই জীবনের একটা গল্প শোন।

জুত করে সবাই ঘন হয়ে বসল, বলো।

টনটনে রোদ লাগছে পিঠের ওপর। শীতের রোদ, এ রোদে আলসেমী করে বসে বসে গল্প শোনায় বেশ একটা আমেজ আছে। ভেড়ির ওপারে জঙ্গলের গায়ে রোদ, অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে দৃশ্যটা।

নিশিকান্ত শুরু করল, সে প্রায় পনের বিশ বছর আগের কথা। চুনোখালির বাদায় তখন আমি কাজ করি।

—চুনোখালি! কোন চুনোখালি নিশি-কান্ত?

—বিদ্যাধরী দিয়ে যেতে হয়। তখন ওখানে বন সাফাইয়ের কাজ চলছে। বন প্রায় তিনপোটেক খতম করা গেছে। বাকি যা আছে মাসখানেক আর কাজ হলেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এমন সময় একদিন সন্ধ্যের সময় কি একটা কাজে যেন একা একা জঙ্গলের ধারে ভেড়ির দিকে যেতে হয়েছিল। ভেড়িতে উঠে দেখি নদী পেটে পিঠে প্রায় সমান সমান। ভেড়ি থেকে প্রায় হাত তিরিশেক নিচে নেমে গেছে নদী। আর সেই তিরিশ হাত কি পরিমাণ কাদা হয়েছে তা বুঝতেই পারছ।

ভেড়ি ধরে হাঁটছিলাম, হঠা
দাঁড়াতে হল। পাশেই ঝোপের ভিতর
একটা নড়ে উঠল। বাতাস বইছে না।
গাছালি কাঁপতে শুরু করবে। বুব
করে ঝাঁকি খেয়ে উঠল। ঝোপটা কি
ক্ষণে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে
একটা যে ঘাপটি মেরে ওর ভিতর
আছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু
চোখে পড়ল না। এ অবস্থায় কি
ঠিক ভেবে পেলাম না। পাথরের মতো
একটুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আর না
লাম ঝোপটার দিকে। নাহ্ আর কো
শব্দ নেই।

হঠাৎ দেখলাম, একরাশ বেলে হ
যাচ্ছে। এদিকে কাদার ওপর শা
পোকা মাকড় ধরার কথা ভুলে গি
উঁচু করে অপেক্ষা করছে। কিছু এক
যেন আঁচ করেছে।

আবার ঝোপের দিকে তাকালাম
আর সন্দেহ রইল না, কিছু এব
যেন ঝোপের ভিতর থেকে আম
তাক করে রয়েছে। জন্তুটা যে বা
ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু যদি
এই দুশ্চিন্তাতেই বোধ হয় আর
দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। ভে
নিচে নামতে গিয়ে কাদার
হড়কে গেলাম এমন সময়
হয় হাত থেকে শিকার
যাচ্ছে দেখে বাঘটা প্রকাণ্ড একটা
ভেড়ি ডিঙিয়ে আমার দিকে ছ
কিন্তু গড়িয়ে পড়ার জন্যই হোক,
জন্যেই হোক, বাঘটা আমার থেকে ত
দশ হাত নিচে গিয়ে পড়ল। কাদ
কাদায় অর্ধেক ডুবে গেল বাঘটা।
ভারে আরো বেশ খানিকটা ওর কাদ
মাখি হয়ে গেল।

আমি প্রাণের ভয়ে কার ক
একটু উপরে সরে এলাম। কিভা
তা ঈশ্বরই জানেন।

ওদিকে বাঘের তখন ভিন্ন অব
তর্জন গর্জন, উপায় নেই ঐ কাদা
থেকে ও উঠে আসে। আমি আ
উপরে উঠে অবশেষে কাদা থেকে
ভেড়ির উপরে। আর এসময়ই অ
পড়ল, হাতে ধারাল কুড়ালটা এ
আছি। বাঘটার দিকে আমি তাক
করে ঐ কাদা থেকে ওঠা ওর স্বা
নয়। ব্যাস্ ব্যাপারটা যখন আমার ক
ব্জার তখন আর পায় কে আমাকে।

কুড়াল উঁচিয়ে তেড়ে গেলাম।

বাঘটা প্রাণপণে কাদা থেকে উ
চেষ্টা করছে। দু'পা একপা করে
বাঘটাকে লক্ষ্য করে কুড়াল চালাে
করলাম। ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠল
কি দাঁত খিঁচুনি। কিন্তু আমি
নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি। বাঘটাকে কু
কুপিয়ে কুপিয়ে শেষ করে ফেললাম

এইভাবে একদিন বাঘ মেরেছিলাম, জানো।

নিশিকান্ত তার জীবনের রোমহর্ষক কাহিনীটা শুনিয়ে একটু থামল। তারপর বিজয়ীর হাসি হাসতে লাগল।

মকবুলে বলল, রাখে কৃষ্ণ মারে কে।

ঈশান বলল, বাঘ মেরেছিলে বলে বাবুরা তোমাকে খেতাব দেয়নি?

—কি খেতাব?

—আরে ঐ যে খেতাব টেতাব দেয়, রায়-বাহাদুর না কি যেন। ওরকম একটা খেতাব পাওনি তুমি? বলেই ঈশান হাসতে শুরু করল।

—তোমরা ঠাট্টা করছ। নিশিকান্ত একটু গম্ভীর হল।

এমন সময় বোস্ট চৈতন্য এসে হাজির। কে কাকে ঠাট্টা করছে গো ঈশান?

ঈশান বলল, ঠাট্টা নয়, নিশিকান্ত একবার কুড়াল দিয়ে বাঘ মেরেছিল, আমি বললাম, বাবুরা তোমাকে খেতাব টেতাব কি দিল গো? আর অমনি ও ভাবছে ঠাট্টা।

চৈতন্য বলল, বাঘের গপ্পো ছাড়া আজ আর গপ্পো নেই। যেখানেই যাই বাঘ। কিন্তু ও দিকে যে আবার রসিকলালের ডাক পড়েছে গো!

রসিক চমকে উঠল, কেন?

—কেন আবার, বাঘের গলায় দড়ি বেঁধে ধরে এনে ছোটকর্তাকে দেখাতে হবে।

—এটা কি জুলুম বল দেখি। রসিক-লালের দেহটা একটা ঝাঁকি খেয়ে কেঁপে উঠল।

—জুলুমের কি আছে! তুমি বাঘবন্দী জানো বলেই না তোমাকে ডাকা। আমরা জানলে আমাদের ডাকতেন।

—আমি জানি না।

—না জানলেও এখন জেনে নিতে হবে। ফ্যা ফ্যা করে হাসল চৈতন্য।

মকবুল শুধাল, কে কে আছে ওখানে?

—ঐ তো বজরার ছাদের দিকে তাকাও না, ওখানে বসে এখন বাঘের পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে।

বজরাটা এখান থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে। কিন্তু সবাইকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। তবে ঐ মেয়েমানুষটা কেমন ছোটকর্তার গায়ে গায়ে লেগে বসেছে দেখ।

—দেখে শালা পিত্তি জ্বলে যায়।

মকবুলে বলল, যাও না রসিকলাল, ঘুরে এস।

—কি ঝামেলায় পড়লাম বল দেখি। এমন জানলে কে আসে এখানে। সুন্দর-বনের খুরে প্রণাম, আমি চলে যাবো এথান থেকে।

—এখানে আসা বড় সোজা হে। যাওয়া কঠিন। আন্দামানের নাম শুনেছ! এও হচ্ছে এক ধরনের আন্দামান।

রসিকলাল ফ্যাকাশে চোখে তাকিয়ে থাকল, নিশিকান্ত ওকে ঠেলে তুলে দিল, যাও না, কি বলে, শুনে আসতে ক্ষতি কি!

রসিকলাল না উঠে পারল না। হাজার হোক ছোটকর্তা ডেকে পাঠিয়েছেন, ওর না গিয়ে উপায় নেই।

চারপাশে ছড়ানো শীতের রোদে মিষ্টি একটা আমেজ। বাতাস নেই। পিঠের দিক থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে উত্তাপ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। ভারী রোমাঞ্চকর লাগছিল নরেন্দ্র নারায়ণের। পাশে পেথম তুলে বসে আছে কামিনী। বসার ভঙ্গিতেই পেথম তোলা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ও গুটিয়ে একশা হয়ে আছে।

আজ সকাল থেকেই এখানকার এই জংগলের রহস্য বুঝবার চেষ্টা করছে কামিনী। কিন্তু কেমন একটা গা ছম ছম ভাব সারাটি দিন ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

নরেন্দ্রনারায়ণ বার কয়েক রসিকতা করে ওর ভয় ভাবটা কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কামিনী মুখে যতই সাহস দেখাবার চেষ্টা করুক, ভিতরে ভিতরে ও গুটিয়েই এসেছে। গুটিয়ে পড়াই স্বাভাবিক, সুন্দরবনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম ওর। তাছাড়া নরেন্দ্রনারায়ণকে খুশী করার জন্য আর যাই হোক জীবনটা তো আর খোয়ান যায় না। কী কুক্ষণেই যে ও ঘর ছেড়ে এখানে এসেছিল। যে কদিন এখন এখানে কাটাতে হবে নৌকাতেই ও শুয়ে বসে কাটিয়ে দেবে! বাব্বাহ্ সাপটাকে যদি চোখে না দেখতাম, এক কথা ছিল।

কে যেন বলেছিল, এ সাপের বিষ নেই। বিষ থাক আর নাই থাক সাপ সাপই। চোখের সামনে অত বড় একটা সাপ দেখলে কার মাথার ঠিক থাকে।

সাপটাকে মেরে ফেলার জন্য কে যেন খুব মাথা গরমও করেছিল সে সময়। সাপ স্বয়ং ভগবান, মা মনসা। অমন করে তাকে মারার কি যুক্তি থাকতে পারে! মানুষ এই ভাবেই যত পাপ কুড়ায়।

এ যদি সুন্দরবন না হয়ে অন্য কোথাও হত, সাপটাকে নাকি দুধ কলা খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে ছেড়ে দেওয়া হত।

সাপটাকে মারা নিয়ে যে যাই বলুক কামিনী অখুশী নয়। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। সাপ কখনো মানুষের বন্ধু হতে পারে না। সাপ চিরকালই শত্রু।

নরেন্দ্রনারায়ণ তাকিয়ায় গা এলিয়ে বসেছিলেন। নদীর জলের অল্প অল্প শব্দ ভেসে আসছে। নদীর ওপারের জংগলে শান্ত থমথমে একটা চেহারা। এপারে কাছারিবাড়ির চারপাশে মাঝে মাঝে চোখ পড়ছিল ও'র। এই জংগলের দেশে দিনের পর দিন কাটাতে হলেই হয়েছিল আর কি! ভাগ্যিস আবাদ করার জন্য ও'কেও এদের সঙ্গে এখানে কাটাতে হবে না।

কামিনীর দিকে তাকালেন, কি হল, পেনেটির কামিনীর যে রা বন্ধ হয়ে গেল!

কামিনী জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করল। শুনছি। সবাই যদি বলবে তবে শুনবে কে!

—না হয় আমরা চুপ করছি, তুমিই বলো।

কামিনী বলল, আমি আবার কি বলব। আপনি সেই বাঘিনীর গল্প শোনাবেন বলেছিলেন, সেটা বলুন।

ওপাশে একটু তফাতে রজনী রামায়ণ শোনার ভঙ্গিতে বসেছিল, রজনীর পাশে শুকদেব। রজনী কথা লুফে নিল কামিনীর। হ্যাঁ হুজুর, আপনার সেই বাঘিনীর গল্পটা এবার শোনান।

নরেন্দ্রনারায়ণ এপাশে ওপাশে চোখ বোলালেন, সে এক জব্বর কাহিনী।

—কি রকম, কি রকম?

নরেন্দ্রনারায়ণ চোখমুখে একটু কৌতুক ছড়ালেন, সে বাঘিনীর ছিল দুটো হাত, দুটো পা।

দু হাত দু পাওলা আবার বাঘ হয় নাকি! কিন্তু নরেন্দ্রনারায়ণ বলছেন তাই আর প্রতিবাদ করা গেল না।

—তার মেঘের মতো এক রাশ চুল ছিল মাথায়। চোখ ছিল কোকিলের মত কালো। তিরতির করে সেই গভীর চোখের পাপড়ি কাঁপত। কি বুঝছ?

বাঘের মতো ভয়াবহ নয় এ গল্প। নরেন্দ্রনারায়ণের বলার বিষয়টা বুঝবার জন্য হাঁ করে সবাই তাকিয়ে থাকল।

নরেন্দ্রনারায়ণ আবার শুরু করলেন, সে বাঘিনীর নাম ছিল মধুলতা।

এ গল্প অনেকটা মাঝিমাল্লাদের মুখে শোনা কেচ্ছার মতো মনে হচ্ছিল রজনীর। যা হোক নরেন্দ্রনারায়ণের মুখে এ কেচ্ছার আলাদা একটা স্বাদ আছে।

—কিন্তু নামে মধুলতা হলে কি হয়, ভেতরটা ছিল ভীষণ হিংস্র। একদিন এক পথশ্রান্ত পথিক পথ চলতে চলতে রাত্রি হয়ে যাওয়ায় মধুলতার কুটিরে এসে আশ্রয় ভিক্ষা করল। এই পথিকের নাম ছিল ইন্দ্রনাথ। দিব্যকান্তি চেহারা, সুপুরুষ বলতে যা বোঝায়, তাই।

—মধুলতার আর কেউ ছিল না? স্বামী, শ্বশুর? প্রশ্ন করল কামিনী।

হাসলেন নরেন্দ্রনারায়ণ, না। তা হলে আর মজা কোথায়! তা হলে আর গল্প শোনাব কেন? যাক গে, পথিককে ঘরে এনে বসালো মধুলতা। পা ধোয়ার জল এগিয়ে দিল। পাখা দিয়ে বাতাস করল। যত্ন আত্তির একটুকু ত্রুটি রাখল না।

শুকদেব বিড় বিড় করে বলল, কি কপাল করেই জন্মেছিল লোকটা।

নরেন্দ্রনারায়ণ শুধোলেন, কিছু বলছিস?

—মা মা। শুকদেব ফ্যাকাসে হয়ে উঠল।

নরেন্দ্রনারায়ণ আবার শুরু করলেন, তা মধুলতা রান্নাবান্না করে আসন পেতে বসিয়ে ইন্দ্রনাথকে পরিতৃপ্তি করে খাওয়াল। অবশেষে বিছানা পেতে ওকে শুতে দিল। আর এরপরই সেই ঘটনাটি ঘটল।

কামিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে নরেন্দ্রনারায়ণ ইঙ্গিতময় চোখে হাসলেন।

কি ঘটল? কামিনী শুধোল।

—রাত্রি গভীর হলে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ইন্দ্রনাথের। কে? কে ওখানে?

—আমি। উত্তর করল মধুলতা।

—তুমি? কি চাও?

—চাই! মধুলতার চোখ মুখ তখন দগ দগ করে জ্বলছে। ঘন ঘন শ্বাস টানছে মধুলতা। ঠোঁট দুটো গরম লোহার মতো টক টক করছে লাল। চাঁপার কলির মতো তার হাতের আঙুলে ধারালো নখ ঝলসাচ্ছে।

ভয়ে বুক শুকিয়ে এল ইন্দ্রনাথের।

মধুলতা অর্থপূর্ণ চোখে হাসল. আপনাকে এই যে আমি আশ্রয় দিয়েছি, আপনি আমাকে কি দেবেন?

—কি চাও তুমি?

মধুলতা বলল, আমি অনেকদিন ধরে একটা ভ্রমর খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনার বুকের ভেতর লুকোন আছে সেই ভ্রমর। তাকে দিন।

—এ আবার কি কথা?

—কেন বিশ্বাস হল না। ধারালো হাতের আঙুলগুলো ও ইন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে দিল।

ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল ইন্দ্রনাথ।

আর ঠিক এই সময়ই হিংস্র বাঘিনীর মতো মধুলতা ঝাঁপিয়ে পড়ল ইন্দ্রনাথের বুকে। ইন্দ্রনাথকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল। তারপর ও রক্তাক্ত হাতে ইন্দ্রনাথের বুকের ভেতর থেকে একটা কালো ভ্রমর বার করে আনল।

বেচারা ইন্দ্রনাথ ককিয়ে উঠল, ও কি, ঐ ভ্রমরের মধ্যেই তো আমার প্রাণ। ওটা ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও।

মধুলতা বলল, এ আমার মজুরি। এখন থেকে এটা আমার।

ইন্দ্রনাথ ভ্রমরটাকে ফেলে রেখে আর কোথাও যেতে পারল না। বাঁধা পড়ে গেল মধুলতার কাছে।

গল্পটা বলা শেষ করে নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর চুলে একবার এলোমেলো হাতের আঙুল বুলিয়ে নিলেন।

গল্পটা কেমন ধোঁয়াটে থেকে গেল। তবু কামিনী এর তারিফ না করে পারল না।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, আসলে বাঘিনীর খপ্পরে যে পড়েছে তার আর গতি নেই। তা সে সত্যিকার বাঘিনীই হোক আর মানুষের মতো চেহারার বাঘিনীই হোক।

কামিনী প্রতিবাদ না করে পারল না, আর বাঘেরা বুঝি সব ধোয়া তুলসী পাতা?

—তা কেন, সময় বিশেষে বাঘও মারাত্মক, তবে সব সময় নয়।

রজনী এতক্ষণ কথা বলে নি। কথা বলার মতো প্রসঙ্গও খুঁজে পায় নি। এবার বলল, বাঘই বলুন আর বাঘিনীই বলুন, পেছনে লাগলে আর রক্ষে নেই। সকালে যে চেহারা আজ দেখলাম ছোটকর্তা, অত সহজে ও ছেড়ে দেবে বিশ্বাস হয় না।

নরেন্দ্রনারায়ণ আবার কাছারি বাড়ির দিকে চোখ ফিরিয়ে আনলেন, রোদের তেজ ক্রমশ আরো কমে আসছে। এই পড়ন্ত রোদে সবুজ গাছগাছালির একটা আভা চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা নামলেই বনের চেহারাটা পুরোপুরি পাল্টে যাবে। গোপন এক ষড়যন্ত্রে যেন লিপ্ত হয়ে যাবে অরণ্য।

দেখা গেল, ভোঁড়টা এখন ফাঁকা। কেউ সাহস করে ভোঁড়তে উঠে চলাফেরা করবে সে ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া বারণও আছে আজ।

ওদিকে নৌকায় নৌকায় জটলা।

নরেন্দ্রনারায়ণ রজনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তা রাতটা কিন্তু আজ খুব সাবধানে থাকতে হবে। চারপাশে পাহারা রাখতে হবে।

রজনী অভয় দিল, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না ছোটকর্তা। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোঁড়ের ওপর দফায় দফায় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হবে। তা ছাড়া আজ সবাই

পাহারা করে রাত জাগব। বন্দুকে তিনটে বজরাতেই রাখব।

কামিনী বলল, সুন্দরবনের বাঘের অভিজ্ঞতা আছে, এমন লোক কিন্তু বজরায় রাখতে হবে।

রজনীর বলতে ইচ্ছে করছিল, সাক্ষাৎ বাঘিনী থাকবে যে নৌকোর, সেখানে আবার লোক কেন! কিন্তু এমন কথা বললে ওর গর্দান যাবে। রজনী হাসল, বলল, ভয় নেই মকবুলকে বলে রেখেছি, মকবুল থাকবে। ঈশান থাকবে। দরকার হলে আরো দু-একজনকেও রাখব। তা ছাড়া আমি তো থাকবই।

এমন সময় হঠাৎ বোধ হয় আবার রসিকলালের কথা মনে পড়েছিল নরেন্দ্র-নারায়ণের। বললেন, কৈ রসিক এল না তো? ওকে না ডাকতে বললাম।

—ঠিকই তো! রসিক এল না কেন! বজরা থেকেই চেঁচিয়ে উঠল রজনী, কি হল রসিক এল না?

শুকদেব উঠে দাঁড়াল, দেখছি, আমি দেখে আসছি।

কিন্তু না, কোথায় রসিকলাল! খোঁজ খোঁজ, কোথায় রসিকলাল! এ নৌকো সে নৌকো তন্ন তন্ন করা হল, লোকটা কি বেমালুম উবে গেল নাকি!

বেঁটে চৈতন্য বলল, ওতো এখানে ছিল। আমরাই তো ওকে তুলে পাঠিয়ে দিলাম বজরায়।

—বজরায়, কৈ যায় নি তো!

—কতক্ষণ আগে পাঠিয়েছ?

—সে তো অনেকক্ষণ হল মশাই। ব্যাটা কি বাঘবন্দী করতে হবে বলে গা ঢাকা দিল নাকি!

সব কটি নৌকায় তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। নৌকোর পাটাতন তুলে দেখা হল, সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাতেই তছনছ করে ফেলা হল, কিন্তু না, রসিকলাল বেপাত্তা।

—তা হলেও বাঘবন্দী করার জন্য একা একা জঙ্গলে ঢোকে নি তো?

—কি জানি! আমার কিন্তু সুবিধের মনে হচ্ছে না রজনী ভাই।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখনি আবার ভেড়ির ওপর কাঠকুটো জড় করে আগুন জ্বালাতে হবে। রজনী, মকবুল, ঈশান ভেড়ির উপর নেমে এল। ওদের দেখাদেখি নেমে এল আরো অনেকেই। কারো কারো হাতে লাঠি, কারো বা হাতে দা কাটারি।

মকবুল বলল, ধারে কাছে একটু খুঁজে দেখলে হত।

নিশিকান্ত বলল, তোমার যেমন বুদ্ধি। এখন অন্ধকার হয়ে আসছে এখন জঙ্গলে ঢোকা মানে ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনা।

—তা হলে কি করব বল!

—কি আবার করব! কেউ যদি সাধ করে মরতে যায়, তার জন্য তো আর সবাই মরতে পারে না।

চৈতন্য এসময় গলা তুলে চিৎকার করে ডাকল, রসিকলাল, ও রসিকলাল।

জঙ্গলেও যে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় এই প্রথম শোনা গেল। বার দু-তিনেক রসিক-লালের নামটাকে জঙ্গল নৌকার দিকে ফিরিয়ে দিল।

—চল, ভেড়ি ধরে বরং কিছুটা এগিয়ে দেখি। একদল ওদিকে যাক, একদল এদিকে।

তাই ঠিক হল। হৈ হৈ করতে করতে ভেড়ি ধরে দুটো দল দুদিকে এগোতে শুরু করল। মাঝে মাঝে চিৎকার রসিকলাল, ও রসিকলাল।

আর অরণ্য সেই ডাকটাকে ব্যঙ্গ করে ফিরিয়ে ফিরিয়ে দিতে লাগল, রসিকলাল, ও রসিকলাল।

কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মকবুল, খবরদার।

—কি, কি, কি হয়েছে?

ফিসফিস করে মকবুল রজনীকে কাছে ডাকল, ঐ, ঐ যে।

—কি ঐ যে! কিছুই বুঝতে পারল না রজনী। শ্বাসযন্ত্রটা দপ দপ করে লাফাতে শুরু করল। গা ছমছম করে উঠল রজনীর।

মকবুল বলল, ঐ দেখ, একটা গাছ হেঁটে আসছে।

—গাছ হেঁটে আসছে! গাছ হেঁটে আসে কি রকম?

—দেখ না, ঐ যে ভেড়ির গা ধরে ধরে নিচে একটা গাছ হেঁটে আসছে না?

এতক্ষণ পর, তাইতো কি আশ্চর্য! রজনী দেখল, সত্যি সত্যি একটা গাছ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

বেশ কিছুক্ষণ ওরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। গাছটা আরো কিছুটা এগিয়ে আসতেই রহস্যটা পুরোপুরি ধরা গেল।

রজনী লাফিয়ে উঠল, শালা রসিকলালের কীর্তি। এই শুয়োরের বাচ্চা রসিকলাল, কি করছিস?

রসিক গাছের ঝাপড়ানো ডালটাকে ফেলে দিয়ে ভেড়িতে উঠে এল। অদ্ভুত রক্তশূন্য ওর চোখ মুখ।

আবার হুমকি দিল রজনী, কি করছিলি ওভাবে?

—জঙ্গলে ঢুকেছিলাম।

—জঙ্গলে ঢুকেছিলি? কেন?

—বাঘটাকে দেখা যায় কিনা, দেখছিলাম।

—তোর কি মাথা খারাপ! ইচ্ছে হচ্ছিল ওর চোয়ালে একটা ঘুষি বসিয়ে দেয়।

—বারে বাঘটাকে না দেখতে পেলে মন্ত্র পড়ব কি করে! যাকে চোখেই দেখলাম না, তাকে বন্দী করব কি করে!

—তবে যে বললি, মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানিস না তুই?

—জানি না তো ঠিকই। জোর করে আমাকে বাঘবন্দী করাতে চাইলে বলে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছিলাম। একটু একটু যা জানি, তাই নিয়ে চেষ্টা করব ঠিক করেছিলাম।

—তবে গাছটা নিয়ে হাঁটছিলি কেন?

—বাঘের সাড়াশব্দ পেলে গাছ হয়ে যেতাম।

—বটে! পেটে পেটে তো বেশ বুদ্ধি। চল শালা, ছোটকর্তার কাছে তোকে নিয়ে গিয়ে আজ জবাই করব।

হিড় হিড় করে ওকে টানতে টানতে বজরার দিকে এগিয়ে এল রজনীরা। এনে বজরায় তুলে ছোটকর্তার সামনে ওকে আছড়ে ফেলল।

হাউমাউ করে ককিয়ে উঠল রসিকলাল।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, একা একা জঙ্গলে ঢুকেছিলি। বাঘ তোকে বন্দী করত, না তুই বাঘকে?

কেঁদে উঠল রসিকলাল আপনি মা বাপ হুজুর!

—বটে আমি মা বাপ;

নিধি বলল, বন্দুক দিয়েও বাঘের সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না, আর ও কিনা খালি হাতে লড়তে গিয়েছিল।

—বেটাকে শূলে চড়ান দরকার।

কামিনী বলল, আহা, ওর কি দোষ? ওতো স্বীকারই করেছে ও মন্ত্র তন্ত্র জানে না, তবু যদি সবাই ওকে বাঘ ধরতে বলে ও কি করবে।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, কিছু যখন করতেই পারবে না তখন জঙ্গলে ঢুকেছিল কেন। যা ভাগ। মেয়েছেলের মতো এখানে বসে কাঁদবি তো তোর চামড়া তুলে নেব।

রসিকলাল প্রায় নাকে খত দিতে দিতে বজরা থেকে ডোঙিতে নামল, তারপর এক ছুটে আর একটা নৌকায় উঠে গা লুকোল।

দৃশ্যটা বড় মজার। রসিকলালের ছুটে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে না হেসে পারলেন না নরেন্দ্রনারায়ণ, শালা বড় জোর আজ বেঁচে গেছে। জেনে শুনে ওভাবে যে কেউ একা একা জঙ্গলে ঢোকে আমি ভাবতেই পারি না।

লোকটা চলে যাওয়ার পর হঠাৎই খেয়াল হল নরেন্দ্রনারায়ণের সারা আকাশ পাখিতে পাখিতে ছেয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ আগেই সূর্যটা নদীর নিচে আশ্রয় নিয়েছে। অন্ধকার নামছে, আর সেই সঙ্গে কন কন করা ঠাণ্ডা জোলো বাতাস।

ডোঙির ওপর তখন কাঠের গুঁড়িতে আগুন জ্বালাবার জন্য এক দঙ্গল লোক। রজনী ওদের কি সব যেন বোঝাচ্ছে। নরেন্দ্রনারায়ণ তাকিয়ে থাকলেন।

—আর এখানে বসা উচিত নয়। কামিনী বলল, চলুন আমরা নিচে যাই।

নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর দিকে একবার তাকালেন, চল। এই বাতাসে কি যেন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে টের পাচ্ছ?

—কি রহস্য? কামিনী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, বুঝতে পারছ না। তোমাকে দেখছি বোঝাবার জন্য আর একটু লোকের দরকার।

—কি বললেন না? গায়ে ঢলে পড়ল কামিনী।

নরেন্দ্রনারায়ণ ওর চিবুকে একটা টোকা দিয়ে হাসলেন, নেশা গো নেশা। গলার নলিটা কেমন শুকিয়ে শুকিয়ে আসছে, টের পাচ্ছ না?

কামিনী নরেন্দ্রনারায়ণের চোখে অন্য কোন নেশার ইঙ্গিত যেন দেখতে পাচ্ছিল; এক হাতে ওঁর কোমরটাকে জড়িয়ে ধরে মিষ্টি করে হেসে বলল, চলুন আমরা নিচে যাই।

বজরার ভিতরে নেমে এল ওরা। ভেতরে ঝাড় লণ্ঠনের আলো। এসে দেখল, ওদের নেশার সব জিনিসই সুন্দর করে সাজান। ঠিক এই না হলে জীবন। নরেন্দ্রনারায়ণ মনে মনে খুশী হলেন। তারপর বসে, গড়িয়ে, শুয়ে বকে সত্যি সত্যি এক সময় নেশার জলে পড়লেন। বিরাট লাশটাকে টেনে টুনে গুছিয়ে শুইয়ে দিল কামিনী। তারপর একটু একটু করে রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হতে শুরু করল। সমস্ত চরাচর নিস্তব্ধ হয়ে গেল এক সময়।

মাঝরাতে হঠাৎই কামিনী চমকে উঠল। কোন একটা নৌকা থেকে এক সঙ্গে অনেকগুলি লোক চেঁচিয়ে উঠেছে।

—কি হল? কি হয়েছে?

কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আতঙ্কিত চোখে কামিনী উঠে বসল। কিন্তু সাহস হল না দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতে। জানালার ফাঁক গলিয়ে দেখবার চেষ্টা করল কামিনী। ও কি, মাঝের নৌকায় লোকগুলি ছুটোছুটি করছে কেন। কি হয়েছে?

ডোঙির দিকে তাকাল, দগদগে আগুন জ্বলছে কয়েকটা। কিন্তু ডোঙিতে একটা মানুষও ও দেখতে পেল না কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল, কি বলাবলি করছে লোকগুলি। কিছুই বুঝতে পারল না।

বজরাতে সারা রাত্রি কাটাতে এসেছে যারা তারাও যে এখন সবাই ছাদে, কাঠের শব্দেই তা বুঝতে পারল কামিনী।

ভয়ে বুকের ভিতর ভীষণ কাঁপুনি শুরু হয়েছিল ওর। ছোটকর্তা বেঁহুস হয়ে পড়ে আছেন। এই নেশাগ্রস্ত লোকটাকে ডেকে কোন লাভ নেই। বরং একটু বাইরের দিকেই বেরিয়ে দেখা যাক!

দরজার পাল্লা খুলে দেহের খানিকটা বার করে আনল কামিনী। আর বাইরে বেরুতেই রজনীকেও চিনতে পারল। বন্দুক হাতে রজনী কি যেন দেখাচ্ছে।

—কি হয়েছে ওখানে? প্রশ্ন করল কামিনী।

রজনী এক পলক পিছন ফিরে তাকাল, বাঘ, সেই বাঘটা!

—বাঘ!

—হ্যাঁ, বাঘটা নৌকো থেকে একজনকে তুলে নিয়ে গেছে।

—মানে!

রজনী আঙুল তুলে দেখাল, ঐ দিকে। ঐ জঙ্গলের দিকে পালিয়েছে বাঘটা।

মশাল হাতে নৌকো থেকে লোক নামতে শুরু করেছে দেখতে পেল কামিনী। আর সর্বাঙ্গ যেন হিমেল একটা বাতাসে কুঁকড়ে ছোট হয়ে আসতে লাগল ওর। দরজার বাইরে আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। টলতে টলতে বজরার মধ্যে ঢুকে পড়ল কামিনী।

নরেন্দ্রনারায়ণ শিশুর মতো মুখের ভঙ্গি করে এখনো ঘুমুচ্ছেন। লোকটাকে সত্যি সত্যি ডেকে কোন লাভ নেই বুঝতে পারল ও।

(চলবে)

গরমের দিন। ইস্কুল ছুটির পরে হজমিগুলি খেতে খেতে বাড়ি ফিরছি আমি আর রতন। রতন এখন ভালো ডাক্তার হয়েছে। আমাদের ছুটি হতো সাড়ে-তিনটের সময়। দুপুরের আগুন হাওয়া বইছে এলোমেলো, আমরা দুজন হাঁটছি আমবাগানের মধ্যে দিয়ে। আমার বগলে ক্লাশের বই-খাতার সঙ্গে রয়েছে এইচ জি ওয়েলসের গল্প-সংগ্রহ। ইস্কুলের লাইব্রেরী থেকে নেওয়া।

বিরাট আমবাগান। নিবিড় পত্র-বিন্যাস আকাশকে প্রায় আড়াল করে রেখেছে। চারদিকে কেমন ছায়া ছায়া শান্তি। মাঝখানে পৌঁছে রতন বললো, আম পাড়বি তারাদাস?

—আম? এখনো তো কাঁচা—

—তাতে কি? নুন দিয়ে খাবো। পাড়বি?

—নুন পাবি কোথায়?

—এই দেখ—

পকেট থেকে একটা ছোট্ট পুরিয়া বের করে দেখালো রতন। তার সরঞ্জাম সব তৈরি থাকে।

বললাম, কি দিয়ে পাড়বি?
—কেন, ঢিল ছুঁড়ে!

—তুই ছোঁড় তাহলে, আমার হাতে তাক হয় না একদম। আমি কুড়িয়ে এনে দেবো।

এক গাদা ঢিল জড়ো করে রতন পটাপট ছুঁড়ে যেতে লাগলো। ওর টিপ খুব ভালো ছিলো, দেখতে দেখতে টিপ টাপ করে এখানে-ওখানে অনেকগুলো আম পড়লো। চেঁচিয়ে বললাম, আর না, থাম। অনেক পড়েছে।

ঝরে-পড়া শুকনো আমপাতা আর নানান আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দুজনে আম খুঁজতে লাগলাম। রতন ছটা, আমি চারটে পেলাম। রতন তাও খুঁজছে দেখে আমি বললাম, আর নেই রে। দশটাই পড়েছিলো।

—না, এগারোটা। আমি দেখেছি।
রতন এত জোর দিয়ে বলল যে, আমি ভাবলাম—হবেও বা। বললাম, পেলে আমার তো?

—তুই পেলে তোর। খোঁজ।

আবোল-তাবোল হাওয়ায় পাক খাচ্ছে শুকনো পাতা, একটা কাঠঠোকরার শব্দ পাচ্ছি অনেকক্ষণ থেকে— ঠকঠো, ঠকঠো, ঠকঠো। মায়াময় নির্জন দুপুর। দুহাতে আগাছা সরিয়ে আমরা হারানো আমটি খুঁজে চলেছি।

একটা গাছের নিচে অনেক পাতার রাশি জমে। সেগুলো হাত দিয়ে নাড়া দিতে গিয়ে দেখলাম পাশেই কি যেন একটা চকচক করছে। সেই মুহূর্তেই ওদিক থেকে রতন চিৎকার করে উঠলো— পেয়েছি! এটা কিন্তু আমার!

তাকিয়ে দেখলাম ও পকেট থেকে পুরিয়া বের করে আমে কামড় দিতে শুরু করেছে। ওকে না ডেকে চুপিচুপি আমি চকচকে জিনিসটা হাতে তুলে নিলাম।

একটা চাবি।

মিতান্ত সাধারণ চেহারায় ইঞ্চি দেড়েক লম্বা চাবি। বোধহয় এলুমিনিয়ামের তৈরি, কারণ রংটা সাদা এবং ওজনে খুব হাল্কা। আগার দিকটা ফাঁপা, পুরনো যুগের হবসের তালায় যেমন চাবি লাগতো। যেগুলো ছোটবেলায় ঠোঁটের কাছে নিয়ে জোরে ফুঁ দিয়ে আমরা বাঁশি বাজাতাম। এখানে কি করে এলো চাবিটা? পথ-চলতি কারো হাত থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে। সকালে বিকেলে অনেক লোক যাতায়াত করে এখান দিয়ে। স্টেশনে যাবার এটা একটা সর্টকাট রাস্তা।

একন কিছু জিনিস নয়। চাবিটা আমার ফেলে দেওয়াই উচিত ছিলো। কিন্তু চাবিটার সাদা রং, হাল্কা ওজন— এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, কি একটা রহস্যময় অনুভূতি যেন আমাকে বারণ করলো ওটা ফেলে দিতে। চাবিটা পকেটে রেখে আমার ভাগের চারখানা আম নিয়ে ও রতনের পাশে গিয়ে বসলাম।

বাড়ি ফিরে আমার রঙিন পেন্সি বাকসে চাবিটা রেখে দিলাম। ও বয়সের ব্যাপার, কিছুদিনের ম আমার একথা আর মনে রইলো না।

সময় কারো অনুরোধেই থাকে না। সে এক বুড়ো জিপসী, ক তার তালিমারা বিরাট ঝোলা। মানু জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি সে করে ঝোলায় পুরে নিয়ে দৌড়ে পার চলেছে পৃথিবীর নদী-প্রান্তর-উপত্যক আকাশে-বাতাসে অহর্নিশি বাজে পায়ের ক্লান্তিহীন শব্দ। কালের নি সময় আমার সাধের শৈশব চুরি করে নি গেল একদিন।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পা কলেজে গরমের ছুটি। বন্ধুরা কেউ সবাই বেড়াতে গিয়েছে কোথাও- কোথাও। বই পড়ি সারা দিন, বিকে তে-মোহনী ঝিলের ধারে গিয়ে বসি।

কোন কাজ না থাকলে পুর জিনিসপত্র ঘাঁটা আমার ছোটবেলার শ সেদিন দুপুরে একেবারে অসহ্য হাওয়ায় বাইরের ঘরে দাদুর পুরনো কা আলমারীর ভেতরের জিনিসপত্র নেড়েচে দেখছিলাম। কিছু দিন আগেও দাদু ঘরে থাকতেন, কান পাতলে ঘরের বাতা এখনো যেন তাঁর কাশির শব্দ শুনা পাওয়া যায়। সেই বাস্তব মানুষ হঠা একদম 'না' হয়ে গেল।

আলমারীর নানা ফাইলপত্র, আজে বাজে কাগজের মধ্যে একটা রং-চটা টিনে বাকস। কি আছে এতে? নাপিতের যন্ত্র পাতি রাখার হাতবাকসের মত দেখা অনেকটা।

ডালায় হাতের চাপ দি খোল চেষ্টা করলাম। খুললো না। চাবি দেও আছে নাকি? চাবির ফুটো তো রয়েছে এর চাবি পাই কোথায়? দাদু মারা গেছে বছরখানেক হলো, তাঁর হাতবাকসে চাবি কি আর কেউ জমিয়ে রেখেছে এত দিন?

ভেতরে প্রয়োজনীয় কিছুই নে আমি জানি, কিন্তু ওই যে ডালা খুলে না—ওটাই মহা আকর্ষণ। আমাকে দেখতেই হবে কি আছে এর ভেতরে।

ঘুমন্ত মায়ের আঁচল থেকে চাবি গোছা খুলে নিয়ে এলাম। এইটুকু ফুটো লাগতে পারে এমন চাবির সংখ্যা কম তাদের সবগুলো দিয়ে এক-এক করে চেষ্ট করে গেলাম। ফল সমান।

হঠাৎই মনে পড়ল ছোটবেলায় এম এক গরমের দুপুরে আমবাগানে কুড়িয়ে পাওয়া সেই ছোট্ট চাবিটার কথা। সেটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখলে হয় না? কোথায় রেখে ছিলাম সেটা? হাঁ, আমার রঙি

'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে
Weight when Packed 135 gm net
Supreme
det
detergent washing cake
for whiteness that 'Glows'
সুপ্রীম ডেট ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার কেক

পেন্সিলের বাকসে। বাকসটা আছে বোধহয় এখনো।

মায়ের বাসনপত্র রাখার কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক থেকে বের করলাম পুরনো বাকসটা। ওপরে চার-পাঁচটা উড়ন্ত হাঁসের ছবি। লর্ডসের লজেন্সের বাকস, কে যেন দিয়েছিল আমাকে। সব লজেন্স ফুরিয়ে গেলে এতে পেন্সিল রাখতাম।

চাবিটা রয়েছে। হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে এলাম। একবার চেষ্টা করতেই কড়াৎ করে খুলে গেল ডালাটা।

ভেতরে রয়েছে দাদুর ব্যবহার করা পুরনো একখানা নস্যিমাখা রুমাল, এক বাণ্ডিল নীল সুতোয় বাঁধা চিঠি, মরচে-ধরা তিনটে ব্লেড, ডাঁটির বদলে সুতোবাঁধা দাদুর প্লাস পাওয়ারের চশমা—এই সব।

কিছুই নয়—কোন কাজের জিনিস নয়। কিন্তু এদের সঙ্গে ফিরে এলো আমার শৈশবের গন্ধ। রাতে দাদুর কাছে পড়তে বসা, সকালে দাদুর সঙ্গে ইস্কুলে যাওয়া। ওই চশমা, ওই নস্যিমাখা রুমালের সঙ্গে আমার শৈশব মিশে আছে।

এই চাবিটা এ জিনিস আমাকে এনে দিলো।

চাবিটা এবার আমার রিং-এ রেখে দিলাম। সম্পত্তির মধ্যে আমার তখন একটা বইয়ের আলমারী আর একটা তোবড়ানো সুটকেশ। কিন্তু সেগুলোতে তালা দিয়ে রাখলে আমার অধিকারবোধ শান্ত থাকত।

দিন কাটে। বুড়ো জিপসী দৌড়ে যায় পাহাড়-প্রান্তর পেরিয়ে।

বিয়ের পরে নতুন বৌকে নিয়ে দীঘা বেড়াতে গিয়েছি। হাতে সময় কম, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কাজেই দূরে কোথাও যাবার প্ল্যান করিনি। উঠেছি নীলাচল হোটেলে। মধ্যবিত্তের জন্য মধ্যবিত্ত হোটেল। দোতলার ঘর, জানালার নীল কাঁচের ভেতর দিয়ে গর্জমান সমুদ্র আর ঋজু ঝাউয়ের সারি দেখা যায়। সব কিছু গুছিয়ে আমরা সাময়িক সংসার পেতে ফেললাম।

পরদিন সকালে বিপদে পড়লাম। আমার সঙ্গে একটা বিদেশী এটাচি-কেস ছিল, তাতে আমার দাড়ি-কামানোর সরঞ্জাম, ডায়েরী, জামা-কাপড়, টাকা পয়সা—সব। সেটার চাবি ফেললাম হারিয়ে। বৌয়ের সুটকেস ও ভ্যানিটি ব্যাগ আমার পকেট, সব তোলপাড় করে ফেললাম—কোথাও নেই। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ চাবিটা রিং থেকে আলাদা করা ছিল।

সত্যিই বিপদ হলো। দাড়ি না হয় তিন দিন কামাবো না, কিম্বা সেলুনে কামাবো, একটা ট্রাউজার আর শার্টেই না হয় চালিয়ে দেবো এ ক'দিন—কিন্তু টাকা না হলে হোটেলের বিল দেবো কি দিয়ে? ফেরার ভাড়াই বা কই? খোঁজ নিয়ে জানলাম দীঘাতে কোন তালাওয়ালা নেই। তাহলে এখন একমাত্র উপায় এটাচির গা-তালাটা ভেঙে ওটাকে খোলা। বহু দাম দিয়ে কেনা শখের জিনিস—ভাঙতে খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু তাছাড়া আর তো কিছু করার নেই।

বৌ হঠাৎ বলল, এটা কিসের চাবি? এটা দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখ না—খুলতে পারে বোধহয়।

তাকিয়ে দেখলাম বৌয়ের হাতে আমার চাবির রিং, বৌ ছোট্ট এলুমিনিয়ামের চাবিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

বললাম, ওটা দিয়ে কি আর—ওটা তো—

তারপর থেমে গিয়ে বললাম, আচ্ছা দাও, দেখি।

কুট্ করে শব্দ হয়ে খুলে গেল এটাচি, যেন চাবিটা এর জন্যেই তৈরি হয়েছিল!

ভাল মজা তো। এটা দেখছি মাস্টার কি হয়ে উঠল। আট আনা সিরিজের গোয়েন্দা গল্পের বইয়ে ডিটেকটিভদের যেমন থাকে। সংকটের মুহূর্তে বার বার বাঁচিয়ে দিচ্ছে আমাকে।

আমার বিয়ের পর তৃতীয় বছরে আমার মায়ের খুব বড় অসুখ করে। প্রথমটা কিছু টের পাওয়া যায় নি, হঠাৎ এক ঘন্টার নোটিশে মাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। আচমকা ব্যাপারটা ঘটে। আমার [illegible] তখন টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না, অথচ সেদিনই বিকেলের মধ্যে ওষুধপত্রের জন্য আমার বেশ কিছু টাকা প্রয়োজন। মাস ফুরোতে তখনও হপ্তাখানেক দেরি।

আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে এক কথায় মাসের শেষে টাকা ধার দিতে পারে। কি করা যায়? আর তিন-চার ঘন্টার ভেতর আমার অন্ততঃ শ তিনেক টাকা দরকার।

সংসার খরচের টাকা থেকে মেয়েরা আশ্চর্য কৌশলে কিছু কিছু করে সরাতে পারে। মা এভাবে পাঁচ-ছ মাসে বেশ মোটা টাকা জমিয়ে মাঝে মাঝে আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। মায়ের হলুদ ট্রাংকটার কি কিছু থাকতে পারে? অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় মা হাসপাতালে গিয়েছেন, যাবার সময় আমাদের কিছু বুঝিয়ে দিয়ে যাবার মত অবস্থা ছিল না তাঁর। আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা তাঁর সঙ্গেই রয়েছে।

আজ বিকেলে সে চাবি এনে ট্রাংক খোলা যায় বটে, কিন্তু তাহলে টাকা পেলেও কাল সকালের আগে সে টাকা কোন কাজে লাগে না।

বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে আমার সেই ছোট্ট চাবিটার কথা মনে পড়ল। কিন্তু মায়ের ট্রাংকে লাগান তালাটা বিরাট বড়, এতটুকু চাবি এমনিতেই ঘুরে যাবে, লিভারগুলোকে সরাতে পারবে না বোধহয়।

কিন্তু প্রত্যেক বারের মতই এবারেও চাবিটা লাগাতেই তালা খুলে গেল মসৃণ-ভাবে। একটু খুঁজতেই মায়ের লাল পাড় গরদের শাড়ির ভাঁজে আমি বার শ' টাকার নোট পেয়ে গেলাম।

এভাবেই বহুবার, বহুভাবে।

চাবিটার সম্বন্ধে আমার মনে এক রকমের অলৌকিক ভালবাসা দানা বেঁধে উঠেছে। কে এটা আমাকে পাইয়ে দিয়েছিল আমার শৈশবেই সেই আমবাগানে, ঝিম-ঝিম-করা নির্জন দ্বিপ্রহরে?

কত দরকারী জিনিস আমি হারিয়ে ফেলেছি কতবার, কিন্তু কে এই ছোট্ট এল্যুমিনিয়ামের চাবিটা কিছুতেই হারিয়ে ফেলতে দিল না?

সে যে-ই হোক, তার উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক। শুধুমাত্র কয়েকটা সুটকেশ্-আলমারী খোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

এ বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হল স্বপ্নটা দেখার পর।

কিছুদিন আগে দেখেছি স্বপ্নটা। একটা বিশাল পুরনো বাড়ির মধ্যে যেন আমি একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছি। সময়টা দিনও নয়, রাত্রিও নয়। আবছামত চাপা আলোয় ভরে আছে সে বাড়ির শূন্য অলিন্দগুলি। গোলোকধাঁধার মত অনেক সরু সরু বারান্দা। আমি দিশাহারা হয়ে ঘুরে মরছি কেবল। বারান্দার দু দিকে সারি সারি অনেক দরজা। তার সব কটাই বন্ধ। কেউ এসে আমাকে বলে দিচ্ছে না আমি কেন এখানে এসেছি—এখানে আমার কি প্রয়োজন। বাড়িটাই বা কার? সব কিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা কেমন যেন অর্থহীন। ঘুরতে ঘুরতে লম্বা করিডরের শেষে একটা কারুকার্য করা বড় দরজার সামনে এসে আমি দাঁড়ালাম। সে দরজায় একটা বিরাট তালা ঝুলছে। মনের ভেতর থেকে যে যেন আমাকে বলল, এই দরজাটা খুলে ফেললেই তুমি সব কিছুর অর্থ জানতে পারবে। এই বাড়ি কার, কেন তোমার এখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ান — সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

স্বপ্নেই পকেট হাতড়ে আমি চাবিটা খুঁজি।

এক একদিন রাত্তিরে ছাদে একা বসে মাথার ওপরে বিস্তৃত সৌরচরাচরব্যাপী বিশাল নাক্ষত্রিক জগতের দিকে তাকিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে—কোথা থেকে জীবন এল এই জড়জগতের অন্ধ আবর্তনের মধ্যে? কি সার্থকতা জীবনের? না হয় অনেক টাকা হবে আমার, অনেক দেশ বেড়াবো, অনেক ভোগ করবো, লিখে খ্যাতি পাবো, যা যা কামনা আছে তার সবই ধরা যাক আমার জীবনে হবে—কিন্তু তাতে কি এসে যায়? কি করছি আমি এখানে? এই বিশ্বজগতে? প্রাণ কোথা থেকে এল? শূন্য বস্তু কোথা থেকে এলো? সবটাই আমার ওই স্বপ্নের মত অর্থহীন।

কেবল এক ভরসা চাবিটা। নিশ্চয় একদিন-না-একদিন ওই বন্ধ দরজাটা আমি কোথাও পেয়ে যাব, যার ওপারে আমার প্রশ্নের উত্তর, আমার জীবন-মরণের সার্থকতা। সেদিন শেষবারের মত এ চাবি আমার কাজে লাগবে।

জীবনে ৩টি বাঘ মেরেছি

আপনাকে আমরা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী হিসেবেই জানি। অনেকেই জানি না, কোনো এক সময়ে আপনি একজন বড় খেলোয়াড় ছিলেন। বড় আগ্রহ হয় আপনার সেই জীবনের কথা শুনতে।

নির্মলেন্দুবাবু হাসতে হাসতে বললেন, হ্যাঁ ভাই, শৈশব, তারপর স্কুল এবং কলেজ জীবনে খেলাধুলো আমাকে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই ঘিরে ছিল।

আমরা সিলেটের মানুষ। ওখানেই আমার শৈশব এবং ছাত্রাবস্থা কেটেছে। প্রকৃতি বলতে যা বোঝায় সেটা ওখানেই উপলব্ধি করেছি। একদিকে নীল পাহাড়, অন্য দিকে সবুজ বনভূমি, তারপর কুলকিনারাহীন জল তো আছেই। সিলেট টাউনটাও ছিল খুব সুন্দর। সাংস্কৃতিক দিক থেকে ছিল অনেক বেশী উন্নত। ১৯২৮-৩০ সালেই আমাদের ওখানে রিভলভিং স্টেজ ছিল। সেখানে নিয়মিত নাট্য-চর্চা হত। ১৯৪০ সালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন সাহিত্য সভা করতে। রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ—এঁরাও গিয়েছিলেন। জাতি বিদ্বেষ আমাদের ওখানে ছিল না।

সেই উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশেই খেলাধুলোর আগ্রহ জন্ম নিয়েছিল এক সময়।

ফুটবল, বাস্কেট বল, ভলি বল, সবই খেলতাম। ভালো সাঁতারুও ছিলাম। সেই সময়ে সুর্মা ভ্যালি এবং আসামভ্যালি-র মধ্যে স্পোর্টস হয়। আমি আমার জেলার হয়ে খেলতাম। বেশ নাম-ডাকওয়ালা খেলোয়াড় ছিলাম তখন। ভবিষ্যতে গানটান গাইব, শিল্পী হবো,—এমন কেউ ভাবত না। এমন কি আমিও না। কারণ সে রকম কোনো লক্ষণ তখন পর্যন্ত আমার মধ্যে ছিল না। আমার বাবা আমাকে দেখিয়ে বলতেন, 'খোকন খেলাধুলো করে, ও বড় হইলে ভালো দারোগা হইব।' উনি ছিলেন জেল খাটা মানুষ:

নির্মলেন্দু চৌধুরী

খেলাধুলোকে বড় একটা পাত্তা দিতেন না।

আপনার বাবা জেল খেটেছিলেন? —প্রশ্ন রাখলাম নির্মলেন্দুবাবুর সামনে।

উনি সহজভাবেই উত্তর দিলেন হ্যাঁ। আমাদের পরিবারের প্রায় সকলেই জেল খেটেছিলেন। মা-ও। একমাত্র কাকা ছাড়া আমাদের সবাই ছিলেন কম্যুনিস্ট। বাবা শিকার ভালোবাসতেন। ভীষণ উৎসাহ দিতেন শিকারে। সেই সময়ে আমি একজন বড় শিকারীও ছিলাম। আমাদের গ্রাম ছিল পাহাড়ের ঠিক নিচে। সুতরাং বনাজন্তুর চলা-ফেরা ছিল। এছাড়া আমাদের যে ডোবা ছিল, সেখানে আসত সাইবেরিয়ার হাঁস। এই হয়ত আকাশ একেবারে ফরসা, হঠাৎ দেখতে পেতাম দূরে যেন মেঘ করেছে। এবং সেই মেঘ দ্রুত এগিয়ে আসছে। আসলে ওগুলো মেঘ নয়, আকাশকে পাখনায় পাখনায় ঢেকে উড়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস। উড়ন্ত অবস্থায় আমি ওদের মারতাম। শুধু হাঁস পাখিই নয়, বড় শিকারও করেছি। একটা ঘটনা বলি, আমাদের দেশ তো জলা জায়গা, বন্যা হলেই জঙ্গল থেকে জন্তুরা গ্রামে ঢুকে পড়ত। সেবার এক চিতাবাঘ এল। আমার বাবা আমার হাতে বন্দুক দিয়ে ওটাকে মারতে বললেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, গাছে ওঠা অবস্থায় আমি ওকে মেরেছিলাম। তখন আমার বয়স ম[illegible] দশ। এছাড়া আরও দুটো মাঝারি বা[illegible] মেরেছি। বন্য মোষ, বাইসন ছাড়া একটা কুমীরও মেরেছিলাম একবার। কথায় কথায় মারতাম হরিণ। হরি[illegible] মারবার ঠিক পরেই প্রচণ্ড আঘা[illegible] পেতাম। ওদের দাঁড়ানোর ভঙ্গী, অন্তু[illegible] করুন চোখে তাকানো, মনকে বিষ[illegible] করত।

—এখনো শিকার করেন নির্মলেন্দুবাবুর কাছে জানতে চাইলাম

—সহাস্যে উনি বললেন, না ভা[illegible] এখন আর সেই হাত নেই, সেই চোখ[illegible] নেই। মাঝখানের তিরিশ বছরে [illegible] আর বন্দুক ধরিনি। তবে গত বছ[illegible] ধরেছিলাম। গত বছর ফেব্রুয়ারীতে দিনহাটায় গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিল কাজী, মানে কাজী সব্যসাচী। ওখানে কাছাকাছি একটা ঝিল আছে। সেখানে পাখি আসে। কাজী বলল, 'চল দেখি তোর কেমন হাত।' স্থানীয় একজনের বন্দুক নিয়ে সেখানে যাওয়া হল। বেল[illegible] হয়ে যাওয়ায় পাখিরা তখন ঝিল ছেড়ে ওপরে ঘুরছে। চারপাশে লোকে লোকারণ্য। আমি তো গুলি ছুঁড়লাম কিছুই হল না। লোকের সে কি হাত তালি আর চিৎকার। কাজী বলল[illegible] এত লোকের সামনে কি বেইজ্জত করলি বল তো। এই তুই শিকারী? [illegible] তারপরেই আবার গুলি ছুঁড়ে কাজী[illegible] পায়ের কাছেই শিকার ফেললা[illegible] ও তে[illegible] থ।

আমি পাল্টা প্রশ্ন রাখলাম 'খেলাধুলো আর গান কি এই সময় পাশাপাশিই চলছিল?

না না গানে তখন মাতিনি। খেলাই তখনও পর্যন্ত আমাকে মাতিয়ে রেখেছিল— নির্মলবাবু বললেন। তিনি আরও বললেন, এই খেলাধুলো আমার বিয়াল্লিশ সালে অগাস্ট আন্দোলনের সময়েই শেষ হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়লাম আমি: কেন?

দুটো কারণে। প্রথমত বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। বাড়ীর বড় ছেলে হিসেবে কিছুটা চাপ এসে পড়ল আমার ওপর। দ্বিতীয়ত রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম এই সময়। —নির্মলেন্দুবাবু তাঁর খেলাধুলোয় ইতি দেওয়ার দুটো স্পষ্ট কারণ রাখলেন আমার সামনে।'

খেলার প্রেরণা পেয়েছিলেন কার কাছ থেকে?

নির্মলেন্দুবাবু উত্তর দিলেন, আমার স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরী আমাকে নানানভাবে উৎসাহ দিতেন। আমার ভিতরকার আবেগকে তিনি জাগাতেন। সাহিত্য প্রেমী মানুষ ছিলেন তিনি। ভালো ছোট কবিতা লিখতেন।

ফেলে আসা সেই খেলোয়াড় জীবনে একবার মনে মনে বোধ হয় ঘুরে এলেন নির্মলেন্দুবাবু। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মৃদু গলায় বললেন, সেই জীবনটার জন্যে আজও কষ্ট হয়। মনে হয় চর্চা রাখলে আমিও বড় খেলোয়াড় হতে পারতাম।

প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে প্রশ্ন রাখলাম, গানের জগতে এলেন কেমন করে?

রাজনীতিতে ঢোকার পর গান শুরু হল। এর আগে অবশ্য রবীন্দ্রসংগীত গাইতাম। আমার বাবার সংগীতের ওপর ভীষণ ঝোঁক ছিল। মা-ও ছিলেন সুগায়িকা। বাবার ইচ্ছে ছিল আমাকে শান্তিনিকেতনে দেওয়ার। কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের জন্যে তা হয়নি। তাই বাবা পড়াশুনো এবং সংগীতের জন্যে একজন শিক্ষক রাখলেন। তাঁর নাম শ্রীঅশোকবিজয় রাহা। গানের প্রেরণা তিনি দিয়েছিলেন। যাই হোক, রাজনীতিতে ঢুকে আমি গানের দিকে যাই। লোকসংগীত গাইতে শুরু করি। আমার জ্যাঠামশাই এমন গান গাইতে উপদেশ দিতেন, যে গানে মানুষ জেগে ওঠে। তবে লোকসংগীতের সুর, ভাটিয়ালী-র টান, এইসব আমার ভিতরে লুকিয়েছিল সেই শৈশব থেকে। খুব আবেগপ্রবণ ছিলাম। নদীর শান বাঁধানো ঘাটে বসে শুনতাম, মাঝ নদী দিয়ে নৌকা নিয়ে যাওয়া গান। সেই গানের জন্যে পাগল হতাম। তখন-ই সেই সুর আমার ভিতরে গেঁথে যায়। এছাড়া বিভিন্ন লোকাচার, লোকাচারের গান আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করত।

খেলাধুলো দিয়েই আমার প্রশ্ন শুরু করেছিলুম। সমাপ্তিতে আবার সেই খেলাতেই ফিরে প্রশ্ন রাখলাম খেলার মাঠে গেলে কমন মনে হয়?

নির্মলেন্দুবাবুর উত্তর—'দেখুন পৃথিবীর ভালো ভালো খেলা আমি দেখেছি। ওয়ার্লড কাপ দেখেছি, চায়না টিমের খেলা দেখেছি, পুশকাসের খেলাও দেখেছি। এই সব বড় বড় খেলা দেখে আমার সেই সময়ের কথা মনে পড়ে যায়। সেই সময়ে আমরা কোথায়। কি ভুল করতাম সেটা টের পাই। আরো বিভিন্ন শিক্ষা নিই। কিন্তু কি লাভ?—আমি তো এখন সংগীত শিল্পী।

এখনকার খেলাধুলো সম্পর্কে আমার প্রশ্নের উত্তরে নির্মলেন্দুবাবু বললেন, এ বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে। ইস্টবেঙ্গল এবং মস্কোর টর্পেডোর খেলা দেখে আমার মনে হয়েছে, আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের অনুশীলন, শারীরিক পটুতা ওদের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু কৌশল নিঃসন্দেহে ভালো। আমাদের খেলোয়ারদের মাথার কাজ অনেক ভালো। চুণী, পি কে, বলরাম, অরুণ ঘোষ—এদের অসাধারণ ক্ষমতা। কিন্তু ভুলটা হল, বিদেশের খেলোয়াড়রা নিজেকে প্রাধান্য না দিয়ে দলগতভাবে আক্রমণ করে। এ তো হোল একটা দিক।

অন্যদিকে আমাদের খেলোয়াড়রা অনুশীলন করে খুব কম। তুলনায় মেয়েরা অনেক বেশী খাটছে। খেলাধুলার মান উন্নত করতে হলে অনেক বেশী অনুশীলন করতে হবে। নতুন খেলোয়াড় তৈরী করতে হবে।

নির্মলকুমার দাস

চারু ও কারুশিল্প প্রদর্শনী

গত ৪ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল একাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারিতে বাঁকুড়া জেলার কয়েকজন চিত্রশিল্পী ও কারুশিল্পী অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন।

শিল্পী উৎপল চক্রবর্তী, নীহার ঘোষ, করুণা ভুঁই রাজারাম খাঁড়া, গৌতম বসু এবং রঞ্জিত হীরার কাজ ভাল লাগলো। উৎপলবাবু মূর্ত ও অর্ধমূর্ত আদলে কিছু বিমূর্ত ও অর্ধবিমূর্ত কাজ করেছেন। যে কোন কারণেই হোক পাটের উপর রঙের স্বাভাবিক রূপ না থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পট, রং ও রেখা পরস্পরের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি বলে মনে মনে হয়েছে।

নীহার ঘোষের কাজে রূপকে ভাঙার পদ্ধতিতে পিকাসোর প্রভাব আছে বলে মনে হল। তাঁর কাজগুলি বেশ পরিণত এবং সুন্দর। করুণা ভুঁই তাঁর কাজে সামগ্রিকতা আনতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর ছবিগুলির মধ্যে মুখকে লুকিয়ে রাখার প্রবণতা স্পষ্ট। রাজারাম খাঁড়া কংসাবতী অঞ্চলের ল্যান্ডস্কেপ করেছেন। গৌতম বসুর কাজে এক ধরনের আভিজাত্য আছে। রঞ্জিত হীরার জল রঙের কাজগুলি প্রশংসনীয়।

কারুশিল্পী রঞ্জিত কর্মকার শোলা ঘাসের শাঁস গাছের গুঁড়ি ইত্যাদি দিয়ে কাজ করেছেন, তাঁর লাউয়ের মানুষ বেশ ভালো কাজ। শীতলা চৌধুরী ও লক্ষ্মী সুর ধান, জল ঘাসের শাঁস, কুঁচফল ও শ্লেটের উপর সুন্দর কাজ করেছেন। আভা হাজরা ও ভারতী মুখোপাধ্যায়ের খই ধান ও তার সুতোর কাজ প্রশংসার দাবী রাখে। ছায়া ঘোষ ও আনন্দময়ী প্রতিহার তার সুতো, ধান, ঘাসের ফুল এবং শ্লেটের উপর কাজ করার সুন্দর নিদর্শন রেখেছেন। অশ্বিনী দে চক ও মোমবাতির কাজ সুদেক্ষা চক্রবর্তীর আপেল বীজের মালার কাজ পান্না মিশ্রের ধান ও শ্লেটের কাজ, কুমারী সবিতার মালার কাজ এবং সমরেন্দু মিত্রের শ্লেট, চাঁজি ও সাবানের কাজ সবার ভালো লাগবে। স্বপন সূত্রধর ও মধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোড়া মাটির কাজ এবং মিহির পালের কাটুমকুটুম বেশ পরিণত ও ঐতিহ্যবাহী। দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ভগবানদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি মোটা-

মূর্তি ভাল। শিশু শিল্পী দেবোপম চক্রবর্তী ও দীপালোক চক্রবর্তীর শহর কেন্দ্রিক ছবিগুলি বেশ স্বতঃস্ফূর্ত ও সুন্দর হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার চারু ও কারু শিল্প যখন অজ্ঞতা ও অবহেলায় ধীরে ধীরে নষ্ট হতে চলেছে সেই সময় তাকে পুনঃরুদ্ধারের কাজে হাত দিয়ে শিল্পী উৎপল চক্রবর্তী অসাধারণ কাজ করেছেন। আমরা আগ্রহের সঙ্গে পরবর্তী প্রদর্শনীর অপেক্ষা করবো।

শ্যামল রায়

বাঙলার বাইরে বাঙালী

দিল্লী

বলা যায় পথেই পরিচয়। মাথায় একরাশ কালো চুল। এলোমেলোভাবে দাঁত উপড়ে নেওয়ায় মুখটা এবড়ো-খেবড়ো। স্বাস্থ্যটা ভালো না। একটু ঝুঁকে হাঁটেন। যৌবনে দাঁত খারাপ হলে এমন স্বাস্থ্যই বিধিসম্মত। ভদ্রলোক রিটায়ার করেন নি, করবেন। দীর্ঘকালের প্রবাসী। প্রথম জীবনে এলাহাবাদ, তারপর দিল্লি।

—গ্রীন পার্কের এক রেস্তোরাঁয় এসে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পড়ছিলেন। আমার আলাপের সূত্র সেখান থেকেই। তিনি গ্রীন পার্কে থাকেন না। প্রথমটায় ছিলেন কাশ্মিরী গেট এলাকায়। তারপর করোল বাগ। এখন চিত্তরঞ্জন পার্কে। অর্থাৎ বাঙালীরা দল বেঁধে দিল্লির এক একটি এলাকা ছেড়েছে, তিনিও তারই পিছু পিছু গেছেন। কারণ কিছু না, বললেন, 'আমি একটু বেশি বাঙ্গালী।'
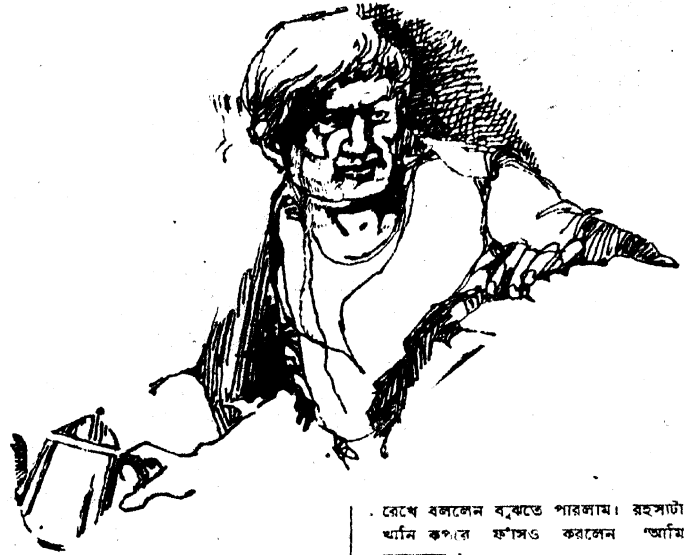
আমি অবাক হলাম। ভদ্রলোক সরকারী দফতরে কাজ করেন। বিশারদ নন। কোন টেকনোলজিস্টও নন। তবে অপেক্ষাকৃত দামী দামী এলাকার বাসা-বদল সম্ভব করলেন কি করে ?

'কাশ্মিরী গেটে ছিলাম দুই ঘরে। করোল বাগেও তাই, তবে আকারে ছোট। চিত্তরঞ্জন পার্কে আছি একটি ঘর নিয়ে। ভদ্রলোক চোখে আসল রহস্যটা গোপন রেখে বললেন বুঝতে পারলাম। রহস্যটা খানি কপারে ফাঁসও করলেন 'আমি ব্যাচেলার।'

কয়েকদিন বাদে তার বাসায় গেলাম। ওয়ানরুম সেট। সুদৃশ্য একটি বাড়ির পিছন দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়। বাড়ির আসল লোকদের একজন পথ দেখিয়ে দিলেন। গোটা ছয়েক বাড়িকে পাক খেয়ে পিছনের গলি মিলল। কাঠের দরজায় নেম-প্লেট। পাশে বেলের সুইচ।

'পাজামা পরে গেঞ্জি গায়ে তিনি রান্না করছিলেন। রান্না ঘরের দরজার কাছে একটা মোড়া টেনে বসতে দিলেন, বললেন, অল্প সময় নেব। চা খাওয়াব।

ভদ্রলোকের কথায় ভালো লাগল। দিল্লির আধুনিক জীবনে, পরিকল্পিত সমান ব্যবস্থায় আতিথেয়তার [illegible] বস্তু চা। কাছে পিঠে দোকান নেই। বাজার সবসময়ই দূরে, নির্দিষ্ট এলাকায়। তাই কিছু আনিয়ে খাওয়াবার চেষ্টা কেউ করেন না। অতিথিরাও তাতে ক্ষুণ্ণ হন না। তবু ভাল লাগল, ভদ্রলোক চা খাবেন গোছের অপ্রস্তুত করে দেওয়ার মতো প্রশ্ন ছুড়লেন না।

আমি বসতে বসতে বললাম, আপনার মুখে দিল্লির গল্প শুনতে এলাম। ভদ্রলোক আগ্রহ দেখালেন না। বিনয় না করেই বললেন, আমার দেখা আপনার কাজে লাগবে না। কারণ আমি কোনদিনই জীবনের গভীরে ডুব দিইনি। প্রবাস নিয়ে আমার গর্ব নেই। দুঃখও নেই। ঘৃণাও না।

ভদ্রলোককে আমি যা ভেবেছিলাম, দেখছি সেটাই ঠিক। ষাট বছরের প্রান্তে এসেও যে অবিবাহিত থাকে, সে সাধারণতঃ একটি বিশেষ চরিত্র এমন ধারণাটা সবসময় খাটে না ভদ্রলোককে দেখে এবং

কথাবার্তা শুনে তাই মনে হল। ঘরে একটি মাত্র খাট। চৌকি নয়। তাতে পুরু তোষকের গদি। মোটা নকশা-কাটা সুজনির কভার মেঝে ছুঁই ছুঁই। পাশে বেতের আরাম-চেয়ার। পিঠে নরম তুলোর বালিশ। এ পাশে কাঁচে ছাওয়া লম্বা সেন্টার টেবিল, তার চারপাশে খান কটা মোড়া। দেয়ালে শুধুই দুটো ল্যাম্প-শেড। চারপাশে দেয়ালে বৈধব্য। একটা নিরাসক্তি। একপাশে ওয়াল-কাপবোর্ড। শক্ত করে আঁটা। কোথাও কোন বই বা ম্যাগাজিনের চিহ্নমাত্র নেই। সেদিনের সাপ্তাহিকটাকেও খুঁজে পেলাম না।

এমন শূন্যতায় একটু মুশকিলে পড়লাম। স্বভাবতই একটা নৈঃশব্দ জায়গা নিচ্ছিল, ভদ্রলোক কম কথা বলেন। আমি রাজনীতির কথা পাড়লাম। এমন মসৃন বিষয়বস্তু আর হয় না। আমি এমন কাউকে পাইনি যে বর্তমান রাজনীতিতে ওয়াকিবহাল নয়। ভদ্রলোক কিন্তু আশ্চর্যভাবে অসচেতন। একজন দল-ত্যাগী বিশিষ্ট নেতার সবচেয়ে আলোচিত ঘটনার প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে বিষয়টাকে এলোমেলো করে দিলেন। আমার মধ্যে বিরক্তি পাখা নাড়তে শুরু করল।

জিজ্ঞেস করলাম সরাসরি : আপনার হবি কি ?

ভদ্রলোক হাসলেন। মনে হল উনি আমার বিরক্তিটাকে বুঝতে পেরেছেন। আরাম-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন, তেমন কিছু নেই। কোন কিছু নিয়ে পড়ে থাকা পোষায় না। আপনি আজ খেয়ে যান।

ভদ্রলোক জোর করে প্রসঙ্গ পাল্টা-লেন। আমি হাসলাম, বললাম : আর একদিন আসব। আজ গল্প করি। কিন্তু কি গল্প করব, সেটাই ভেবে পেলাম না। বিছানার চাদর ? ভদ্রলোকের দাঁত ?

বললাম, এতদিন প্রবাসে আছেন তবু বাঙালী পাড়ার প্রতি আপনার এত দুর্বলতা কেন ? বাঙালীর কৃষ্টি সংস্কৃতি আপনি এত ভালবাসেন কেন ?

ভদ্রলোক দুহাত তুলে না না করে উঠলেন। যেন বাধা দিলেন, কৃষ্টি-সংস্কৃতি—অতসব বড় বড় কথা বলবেন না। তারপর হঠাৎ চুপ করে গেলেন। বেশ খানিকক্ষণ। আমি ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। ওকে আগে বলতেই হবে।

আসলে ভদ্রলোক তখন উত্তরটা সাজাচ্ছিলেন বোঝা গেল। কেননা, শেষ-টায় বললেন : কেন বাঙালী পাড়ার প্রতি দুর্বল তা বলতে পারব না। কারণটা কোনদিনই ভেবে দেখিনি। তবে বলতে পারেন, অবাঙালীদের চালচলন আমার পছন্দ হয় না। ওদের বেশভূষা, ব্যবহার, কথা বলার ভঙ্গি কেন যেন পছন্দ হয় না। ভাষা তো আলাদা হবেই। ভঙ্গির কথা বলছি। তাছাড়া, আটপৌরে শাড়ি পরা বৌ, জ্বলজ্বলে সিঁদুর আর চওড়া পারের শাড়ি পরা মা-মাসী, ধুতি-চাদর পরা জেঠা-কাকা দেখতে ভাল লাগে। বাংলা শুনতে তো ভাল লাগেই।

'তবে তো কলকাতা আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা।' আমার মন্তব্য।

না না না। সেটা ভুল। কলকাতা ভাল, রাইট। কিন্তু সেখানেই পড়ে থাকতে হবে মানে নেই। তাছাড়া চাকরিটা এখানে—কলকাতার কথা সেভাবে ভাবিনি।

বললাম, প্রবাসী বাঙালীদের তো বেশভূষা, ব্যবহার, কথা বলার ভঙ্গি সবই দ্রুত পাল্টাচ্ছে। তা হলে কি করবেন ?

ঠিক। দ্রুত পাল্টাচ্ছে। কিন্তু আমিও দ্রুত রিটায়ার করছি। হাসলেন আপন মনে।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর ?

সুভাষগ্রামে একটা জায়গা কিনে রেখেছি। দক্ষিণ ২৪ পরগণায়।

চক্রবাক

বোম্বাইয়ের চোখে কলকাতা

বেশ কিছুদিন পর বোম্বাই থেকে কলকাতা এলাম। মেল ট্রেন হাওড়া স্টেশন ছুঁতেই কুলিরা ট্রেনে উঠে পড়িমরি করে মালপত্র হাটকাতে লাগল। আমাদের সমস্ত জিনিসপত্র নামানো হতেই আমি এদিক ওদিক চাইলাম। আমার চোখে খুঁজে দেখার ভঙ্গি দেখে আমাদের নিতে আসা কলকাতার ছোট মামা বললেন, বুঝেছি সাবওয়ে খুঁজছিস তো ? আছে আছে ঘাবড়াস না। তবে আপাতত সাবওয়ের ভেতর দিয়ে যাবার দরকার নেই। ট্যাক্সির জন্যে আমরা যাব তাই ওদিকে না গেলেও চলবে। উৎসাহ থাকলেও খুব ক্লান্ত ছিলাম বলে আর সাবওয়ের ভেতর দিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম না। খুবই ইচ্ছে হল একদিন এসে দেখব।

প্ল্যাটফর্মের জনসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকলাম ট্যাক্সির লাইনে। গোটা কয়েক দূরের গাড়ি একসঙ্গে আসায় ট্যাক্সির লাইনে বেশ ভিড়।

কলকাতায় এখনও রিক্সা চলছে। সার সার দাঁড়িয়ে আছে তারা সওয়ারীর অপেক্ষায়। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম কলকাতায় মানুষে টানা রিক্সার কথা। অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ল। ছেলেবেলায় কলকাতায় জীবনে কত চড়েছি এই রিকশায়। আমার পাড়ার মোড়ে টাকমাথা একজন রিক্শাওয়ালা বাবার খুব প্রিয় ছিল। আমরা কোথাও গেলেই বাবা সেই রিক্শাওয়ালার রিক্শাতেই উঠতেন। তার হাসি হাসি মুখ আর 'খোকা' বলে ডাকার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একটু দূরে চোখে পড়ল মিনি বাসের স্ট্যান্ড। কলকাতায় এটা নতুন আমদানি।

হাওড়া ব্রিজের ওপর উঠতেই পড়লাম জ্যামের কবলে। না এগোনো যায় সামনে না এগোনো যায় পেছনে। এদিকে আগে পিছের গাড়ি সব নট নড়ন চড়ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে। ঢিমে তেতালে দয়া করে একটু চলছে আবার দাঁড়িয়ে পড়ছে। আমাদের ট্যাক্সিও এই যান-সমুদ্রে পড়ে ঐ একই অবস্থা। মামার মুখে শুনলাম উড়াল পুল প্রায় হয়ে এসেছে। সম্পূর্ণ চালু হলে এই ভিড়ের অনেকটা সমাধান হবে। বাঁদিকে চোখ রাখতেই বেবোর্ণ রোড মুখো উড়াল পুল চোখে পড়ল। শেষ পর্যায়ের কাজ পুরোমাত্রায় চলছে।

হঠাৎ পায়ের তলা থেকে 'কিঁউ কেঁউ' আওয়াজ। চমকে পায়ের নীচে দেখি। তখনই ট্যাক্সি ড্রাইভার বিনয় করে বল্লে, 'দিদি ভয় পাবেন না, ওটা আমার কুকুরছানা। ওকে এই গাড়ী করে একটু বেড়াতে নিয়ে বেরুই। এখনও দুধ ছাড়া কিছু খেতে শেখেনি। দাঁতও নেই। কামড়াবে না। এতক্ষণ পরে এই প্রথম ড্রাইভারের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম। বেশ ছিপছিপে চেহারা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সার্ট এবং ট্রাউজার, বয়স ২৪।২৫ বছর হবে। জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি বুঝি বম্বে থেকে এসেছেন? তা আমি ড্রাইভিং শিখে প্রথম বম্বেতেই যাই। ওখানে ফিল্ম একট্রেস জয়া ভাদুড়ীর গাড়ীর ড্রাইভার হয়ে মাসখানেক ছিলুম। জিজ্ঞাসা করলাম 'কেন চলে এলেন?' ড্রাইভারের উত্তর বম্বে আমার পোশাল না। ওখানে থাকবার জন্য ভাল ঘর পাওয়া যায় না তারপর ফিল্ম একট্রেসের ড্রাইভার হয়ে যেন আত্মসম্মানে লাগছিল। ঐ নিয়ে বন্ধু-বান্ধবের ঠাট্টা আর কত সহ্য করা যায়? যদি কোনো একটরের ড্রাইভার হতে পারতুম তো থেকে যেতুম বম্বে। সে যাত্রা বম্বে থেকে পালিয়ে বেঁচেছি। আমি এদিকে কুকুর ছানার ভয়ে পাসরিয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছি দেখে ছেলেটি ট্যাকসি থামালে মাঝখানে এবং সিটের তলা থেকে কুকুর ছানাকে তুলে নিয়ে আদর করে নিজের পাশে বসালে।

সেদিনই বিকেলে ননদকে নিয়ে বেরোলাম। উদ্দেশ্য দোকানপাট দেখব এবং কিছু পছন্দমত জিনিসও কিনব। শ্যামবাজারের মোড়ে নেমে হকচকিয়ে গেলুম। চারদিকে সমস্ত ফুটপ্যাত জুড়ে দোকান পাটের মেলা। ননদকে জিজ্ঞাসা করলাম প্রতিদিনই কি এমনি হাট-বাজার বসে না সেদিন কোনো বিশেষ দিন। ননদ হেসে বলে, 'সেকি বৌদি কলকাতায় স্পেশাল অকেসন কি বলছ। তুমি যদি সত্যি কোনো বিশেষ দিনে আসতে তাহলে সত্যি দেখতে এখানকার আর এক অন্য চেহারা। আমিতো ঐ দেখেই বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি চারিদিকে। ক্রেতা আর বিক্রেতার মধ্যে যেন কথার ফুলঝুরি। নিজের জিনিসের পঞ্চমুখে প্রশংসায় বিক্রেতা উন্মত্ত প্রায়।

ফুটপাতের এক-একটা দোকানের সামনে থমকে দাঁড়াই। কত কষ্টে এরা ফুটপাতের এক চিলতে জমির ওপর দোকান সাজিয়েছে। নন্দাইয়ের মুখে শুনলাম অনেক শিক্ষিত বেকারও আজ-কাল এই ব্যবসায়ে নেমেছে।

ভাবছিলাম বৃষ্টি হলে কি দুর্দশাই না হয়। ননদকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম এই প্লাষ্টিকের যুগে তারও সমাধান হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে হেসে-খেলেই উড়িয়ে দিতে জানে এই সব খুদে ব্যবসায়ীরা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়েও। সাবাস না বলে আর পারছিলাম না। এরকম বুকের পাটা ভয়-ভাবনাহীন যারা তাদের আবার ভাবনা কি?

এই ফুটপাতেই আবার কত রকম গালগল্প আর মজার রিমার্ক শোনা যায় কানকে একটু সজাগ রাখলেই। দুটি বেশ ডেঁপো ছেলে বলছে 'দারুন সিনেমাটা মাইরি। মালা সিনহা আর রঞ্জিত যা পার্ট করেছে না দম্পতিতে ফাটাফাটি। দেখে মনে হয় স্কুল-কলেজের পড়ুয়া।

তা যে যাই বলুক কলকাতার একটা ম্যাগনেটিক পাওয়ার আছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। আর এই আকর্ষণেই সবাই এখানে পড়ে আছে ফুটপাতে শুয়েও। এখান থেকে এই আকর্ষণ কাটিয়ে নড়বার উপায় নেই। ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকেই লোক একবার এখানে আসছে সেই এই আকর্ষণের টানে জড়িয়ে পড়ছে আর তাইতেই দিনকেদিন হু হু করে লোক বেড়ে চলেছে কলকাতায়।

গানের ভেতর দিয়ে

'এক যে ছিল বেদের মেয়ে' ধরণের নেহাতই গ্রাম্য ছড়া দিয়ে রবি ঠাকুরের গানের 'হাতে খড়ি বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে। পরে গানের পাঠ নিয়েছেন যদু ভট্ট, শ্রীকন্ঠ সিংহ জ্যোতিদাদার কাছে।

'ইন্দিরা'র প্রদর্শনী শুরু এখান থেকেই। এরপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সাধনার বিভিন্ন পর্যায়গুলি যত্ন করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে চোখের ওপর। সেদিকে চোখ ফেলতে কয়েকবারই বিস্ময় উঠে এসেছে। প্রথম বিস্ময় 'গায়ক রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক অংশটিতে। এখানেই জানা গেল, ১৮৯৩ সালে কলকাতার এক জনসভায় রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধটি পড়েন। সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমবাবু রবি ঠাকুরের গলায় গান শুনতে চান। রবীন্দ্রনাথের গলায় তখন ক্লান্তি। বঙ্কিমবাবুর কথা রাখতেই সেই পরিশ্রান্ত গলায় গান গেয়েছিলেন রবিবাবু। অত্যধিক শ্রমে রবীন্দ্রনাথের জাদুগরী কন্ঠ সেই থেকেই হারিয়ে গেল। পরে যে গান রবীন্দ্রনাথের গলায় শোনা গেছে তা তাঁর ভাঙা গলার গান।

প্রদর্শনীর সাজানো তথ্যে চোখ চোখ রেখে যেতে যেতে জানা গেল রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের একটি মাত্র স্বরলিপিই নিজে করেছিলেন। গানটি হল 'এ কি সত্য সকলি সত্য'। জনগণ মন অধিনায়ক গানটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ও আগ্রহী দর্শকদের কাছে যথেষ্ট [illegible]-ধান মনে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন কুড়ি তখন তিনি দ্বিতীয় কিস্তির ধর্ম-সংগীত রচনা করেন। ঐ গান যাঁদের শিখিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত—পরবর্তীকালে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ। নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-নাথের ঐ ব্রহ্ম সংগীতগুলি বাইরের অনুষ্ঠানেও গেয়েছেন। কবির বয়স তখন বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। ঠাকুরবাড়ির চত্বর পেরিয়ে ঐ সময়েই রবীন্দ্রনাথের গান বাইরে চলে গিয়ে-ছিল—এটি অনিবার্যভাবেই একটি স্মরণীয় সংবাদ।

রবীন্দ্রনাথ নিজের গান ছাড়াও অন্যের লেখা কয়েকটি গানে সুর দিয়েছেন। সে তালিকাটিও আছে ইন্দিরার প্রদর্শনীতে। জানা গেল বিদ্যাপতির ও ভরা-ভাদর গোবিন্দ দাসের 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি' পদ দুটি ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম কবিতার আংশিক সুর দিয়েছিলেন কবি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রদর্শনীতে কবির পাণ্ডুলিপি, কবির নানা বয়সের ছবি ও বিভিন্ন গায়ক ও চলচ্চিত্র শিল্পীদের প্রতিকৃতি
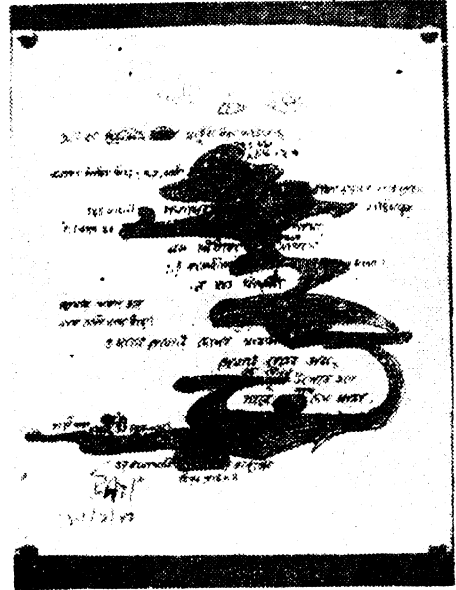
চারত সন্তান' অক্ষয় বড়ালের বুঝাতে নারি নারী কি চায়, সুকুমার রায়ের মন জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে' হেমলতা দেবীর গ্রহে সুনির্মল এবং বালক প্রাণে আলোক জ্বালি কবিতাগুলিতেও সুর সংযোজনা রবীন্দ্রনাথের। কয়েকটি বৌদ্ধ এবং বেদ মন্ত্রেও কবি সুর দিয়েছিলেন।

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রয়োগ সম্পর্কে পঙ্কজ মল্লিকের ভূমিকার স্বীকৃতি আর একটু বিশদ হতে পারত। গ্রন্থ প্রদর্শনীতে তখন দুষ্প্রাপ্য কিছু বইয়ের প্রথম সংস্করণের কপি ছাড়াও রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে লেখা বিভিন্ন লেখকের বেশ কিছু বইও আছে।

প্রদর্শনীর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল পুরোনো শিল্পীদের গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত। এই প্রদর্শনীতে কে মল্লিক থেকে শুরু করে হরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিজয়া দাস, রমা মজুমদার রেণুকা দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রমোহন বসু এবং পঙ্কজ মল্লিকের গান শোনা গেল। রেকর্ডের প্রদর্শনীতে রেকর্ডগুলি দেখার এবং শোনার আরও একটু স্বচ্ছন্দ সুযোগ থাকা দরকার। রেকর্ডের ওপর রেকর্ড সাজিয়ে না রেখে ছড়ানো জায়গায় প্রত্যেকটি রেকর্ড সাজিয়ে রাখলে একটু সুবিধা হয়। সব শেষে ক্লান্তিহীনভাবেই বলা যায় এমন প্রদর্শনী বড় একটা দেখা যায় না।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

অসমান বিয়ে

কিছুদিন আগে পর্যন্ত 'অসবর্ণ বিবাহ' আমাদের সমাজে একটা বিরাট সমস্যা ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে বৈদ্যর মেয়ে বা ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে কায়স্থ ছেলের বিয়ে হওয়া একটা বিশেষ ঘটনা ছিল। এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা, পরচর্চা-নিন্দার শেষ থাকত না। এখন, 'অসবর্ণ বিবাহ' সামাজিক কারণেই আর সমাজের সমস্যা নেই। কিন্তু বিয়ের যেদিকটা এখন সামাজিক সমস্যায় রূপান্তরিত হতে চলেছে তা 'অসম-বিবাহ'।

'অসম-বিবাহ' যে আগে ছিল না, তা নয়। এখনকার মতন সমস্যা তখন এত জটিল ছিল না। তার একটা কারণ অবশ্য মেয়েদের আত্ম-সচেতনতার অভাব। আগেকার দিনে স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ীকেই মেয়েরা চরম ও পরম বলে মনে করত। এখন, শিক্ষার প্রভাবে এবং অবস্থার পরিবর্তনে সেই ভাবটা অনেকাংশে অন্তর্হিত। ফলে 'অসম-বিবাহ' অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর চিরকালীন বিচ্ছেদের কারণ হয়।

সামাজিক অসমতা 'অসম-বিবাহে'র একটা বড় দিক। বিয়ের আগে, মেয়েরা সাধারণতঃ বাবার সম্মানকেই নিজের সম্মান বলে মনে করে। ফলে, বাপের বাড়ীর সামাজিক সম্মানের তুলনায় শ্বশুরবাড়ীর বা স্বামীর সামাজিক সম্মান যদি কম হয়, তাহলেও মেয়েরা তাকে নিজের অসম্মান মনে করে। অনেক ক্ষেত্রে, ছেলেদের মধ্যেও

এই ধরণের হীনমন্যতা কাজ করে ফলে স্বামী-স্ত্রীর সহজ-সম্পর্কে ফাটল ধরে। আবার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ী যদি বাপের বাড়ীর তুলনায় বেশী সামাজিক সম্মানের অধিকারী হয় তাহলে বাড়ীর বউটির শ্বশুরবাড়ীতে আত্মবিকাশ ঘটে না।

অর্থনৈতিক অসমতার জন্য যে কত স্বামী-স্ত্রীর সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না, তার ইয়ত্তা নেই। অর্থনৈতিক অসমতার নগ্নপ্রকাশ ঘটে একান্নবর্তী পরিবারে। দুই ভায়ের শ্বশুরবাড়ীর অর্থনৈতিক অবস্থায় যদি বিরাট ফারাক থাকে তাহলে যৌতুক ইত্যাদি এক বাড়ীতে থাকলেও অসম হয়ে পড়ে। ফলে অনেক মেয়েকেই এ ব্যাপারে সংসারের পাঁচজনের হেয় দৃষ্টি আর স্বামীর তাচ্ছিল্য সহ্য করতে হয়।

অনুর বাপের বাড়ীর অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয় অথচ তার জায়ের বাবা বড়লোক এবং তার শ্বশুরবাড়ীও বেশ অবস্থাপন্ন। অনু বেচারীকে যখন দেখি সারা মাসের হাত খরচ বাঁচিয়ে, স্বামীর কাছে লুকিয়ে বাবার কাছে টাকা দিয়ে আসতে আর ভদ্রলোককে চোখের জল লুকিয়ে মেয়ের বাড়ীতে জিনিষপত্র পাঠাতে, তখন সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্যের গার্হস্থরূপ দেখে চমকে উঠতে হয়। সম্মান রাখার জন্য আরও বড় এক অসম্মানের বোঝা মাথায় নিতে হয়।

শিক্ষাগত অসমতাও স্বামী-স্ত্রীর মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চ-শিক্ষিতা স্ত্রীর প্রতি স্বামীদের মনোভাব অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক বিকার দোষে দুষ্ট। অন্য উচ্চশিক্ষিত স্বামীর সঙ্গে অশিক্ষিতা বা অর্ধশিক্ষিতা স্ত্রীর সম্পর্কে কখনই সমভিত্তিক হয় না। এসব ক্ষেত্রে স্বামীরা পূজ্য দেবতার মতন দূরে থাকেন আর স্ত্রীদের মনোভাব সেবাদাসীর মত হয়। মানসিকতার ফারাক থেকে যায় অনেকখানি আর ফলে স্বামীরা কখনই স্ত্রীর বন্ধু হয়ে ওঠেন না। ফলে পারস্পরিক আত্মবিকাশ ঘটে না।

আমার বান্ধবী রঞ্জনা স্কুল ফাইন্যাল পাশ আর ওর স্বামী ইউনি-ভার্সিটিতে পড়ান—চিন্তা জগতে ওর সঙ্গে ওর স্বামীর কোন যোগাযোগ নেই। ফলে, রঞ্জনার প্রতি ওর স্বামীর ব্যবহার কখনই বন্ধুর মত নয়, যার ফলে নানা-রকম মানসিক বিকারের সম্মুখীন হতে হয় রঞ্জনাকে। ওর স্বামীও যেমন নিঃসঙ্গ, ওরও তেমনি ধারণা হয়েছে যে ও খুব অবহেলিত। ঐ সমস্তই 'অসম-বিবাহে'র ফলস্বরূপ।

'অসম-বিবাহ' অসম-সমাজেরই প্রতিবিম্বিত রূপ। প্রত্যেক মানুষের ভেতরকার মানসিক সত্ত্বাকে শ্রদ্ধা করতে পারার মধ্যেই একমাত্র মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ, অনাবিল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক অসাম্য এবং সামাজিক অসাম্যের ধারণা দূর না হলে কখনই কি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সহজ সমভিত্তিক হয়? কিন্তু তার মধ্যেও যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধা সেই সঙ্গে নিজে-দের প্রতি শ্রদ্ধা আর আস্থা থাকে এক-মাত্র তাহলেই যে কোন অসমতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।

বোলান্ গঙ্গোপাধ্যায়

মা আমার
সবচেয়ে বড় কো

মফঃস্বল শহর। জুট মিল, পা হাউস, কাপড়ের দোকান, বাজার, অফিস পেরিয়ে রিকসা বাঁক নিল একটি রাস্তায়। নতুন জনবসতি। প পাশি—ঘেঁষাঘেষি বাড়ীর সারি। ডা বি এন ৭৭৮৮ নম্বরের বুলেট মো বাইকটি একটি দোকানের সামনে অ স্কার করল রিকসাওয়ালাটি,—

ওইতো বাবলুবাবুর গাড়ী, ত এখানেই আছেন।

টালি আর বাঁশ-বাখারি দিয়ে ছোট্ট দোকান। রিকসার প্যাঁক হর্নে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো এ ছেলে, ওদের মধ্যে সুব্রত— স ভট্টাচার্য। ১৯৭৭ সালে মোহনবাগান ফুটবল অধিনায়ক। সবুজ গ্যাবাডি প্যান্ট, পিংক হাফ শার্ট আর মাথায় রঙের ক্যাপ। ছটফটে, চঞ্চল, সরল বলার সুব্রত ভট্টাচার্য।

আমার ইন্টারভিউ? সোজা দাঁড়ালো সুব্রত। পাশের সঙ্গী সাথ বললো—দেখছিস আমি কি রকম ভি পি, কোলকাতা থেকে রিপোর্টার এ আমার ইন্টারভিউ নিতে। আচ্ছা রি টাঁরা, ইন্টারভিউটা পরশু কলকাতায় করলে হয় না, এখন কি বলতে কি বসবো, তুমি তো জানোই আমা ইংগিতে মাথা দোলাল সুব্রত।

তোমার মনপ্রাণ যা চায় তাই এটা আসলে কোন ইন্টারভিউই নয়।

আমার কথা শুনে যেন স্বস্তি বোধ করলো সুব্রত। তাহলে এই দো বসেই কথা শুরু হোক। এটা মুদীর দোকান। পাড়াটার নাম গান্ধী তপু, আমার ফার্স্ট ফ্রেন্ড। দোকা আমার হেড কোয়ার্টার। এই প বলেই জিভ কাটলো সুব্রত,—

এসব কথা আবার লিখনা যেন, খ খেললেই তাহলে পাবলিক বলবে সুব দোকানে বসে উচ্ছন্নে গেছে।

আমাদের জন্য এনামেলের ততক্ষণে চা এসে গেছে। বিস্কুটের জারটা আমার সামনে বসিয়ে দিয়ে স বললো,—

নাও শুরু করো, একসঙ্গে ইন্টার আর বিস্কুট।

সুব্রত ভট্টাচার্য মোহনবাগ স্টপার। উচ্চতা ছ ফুটের আধ ইঞ্চি ওজন ছেয়াত্তর কিলোগ্রাম। জন্ম নগরের গান্ধীনগরে। বয়স প (সুব্রত কিন্তু নিজেই স্বীকার ক ফিল্মস্টারদের আর প্লেয়ারদের বয়স

না)। বাবার নাম জয়গোপাল ভট্টাচার্য, মা লতিকা ভট্টাচার্য। বাবা কাজ করতেন নিক্কোতে। এখন রিটায়ার্ড, সুব্রতরা চার ভাই—দু বোন। খুব ছোটবেলায় মামাদের আর দাদা জ্যোতি ভট্টাচার্যকে খেলতে দেখে সুব্রত ফুটবলকে ভালবেসে ফেলেছিল। সেই ভালোবাসা এখনও অটুট। ১৯৬৬ সালে শ্যামনগরের যুবশ্রী প্রতীক ক্লাবে সুব্রত প্রথম খেলা সুরু করে। ১৯৬৯ সালে কলকাতার প্রথম বিভাগে আত্মপ্রকাশ বালী প্রতিভার হয়ে। ১৯৭১-৭৩ বি এন আরে খেলে ১৯৭৪-এ আসে মোহনবাগানে। সেই থেকে সবুজ মেরুন আর সুব্রত একাত্ম। এবার ১৯৭৭ সালে গুরুদায়িত্ব। সুব্রত ক্যাপ্টেন।

আজ এই সুব্রত ভট্টাচার্যকে লোকে একডাকে চেনে। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে লোকে আঙুল তুলে আমাকে দেখায়। কিন্তু এই অবস্থায় আসার জন্য আমাকে যে কি ভীষণ সংগ্রাম করতে হয়েছে সে কথা ভাবা যায় না। আমার সাফল্যের ভিত তৈরী হয়েছে আমাদের পরিবারের প্রতিটি মানুষের আত্মত্যাগের মধ্যে। না খেয়ে মা তার বরাদ্দ মাছটুকু আমার পাতে তুলে দিয়েছেন। একজোড়া ফুটবল বুট ছিল আমার স্বপ্ন। ১৯৬৭ সালে আমি আমার জীবনের প্রথম ফুটবল বুট পেলাম। মা এনে দিলেন ধার-দেনা করে। আজো মা ফুটবলে সমান উৎসাহী। খারাপ খেললে সান্ত্বনা দেন, ভালো খেললে আরো ভাল খেলার জন্য উৎসাহ দেন। তুমি লিখো জয়ন্ত, আমার মা-ই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কোচ।

আমি : তুমিতো সেন্ট্রাল একসাইজের ইন্সপেক্টর। অফিস তোমার কেমন লাগে?

সুব্রত: ১৯৭৪-এ আমি সেন্ট্রাল একসাইজে ঢুকি। তার আগে ছিলাম বি এন আর-এ। তবে আমার প্রথম চাকরী কিন্তু বি এস এফ-এ। ব্যারাকপুরে। সব কাজই আমার ভালো লেগেছে। খেলে বলে চাকরীতে দারুণ ফেসিলিটি।

আমি : তুমি অবসর কাটাও কি ভাবে?

সুব্রত : সিনেমা দেখে আর গান শুনে। ইংরেজী বুঝি না তাই শুধু বাংলা আর হিন্দী ছবি দেখি। হিন্দীছবি বেশী ফেভারিট। বেছে বেছে দেখি আঁধারি গোলী রিভলবার রাণী, শোলের মত ফাইটিং পিকচার। সিনেমা হলে গিয়ে কে কাঁদতে চায়? রাজেশ খান্না আমার প্রিয় তারকা।

আমি : আড্ডা?

সুব্রত : আমি দারুন আড্ডাবাজ, হৈ-চৈ করে সময় কাটাতে দারুন লাগে;

সুব্রত ভট্টাচার্য

আমার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা এত বেশী যে সবার নাম দিলে অমৃতর পুরো একটা সংখ্যা লেগে যাবে। তবে আমি একজনেরও নাম বলবো না কারণ যার নাম বাদ পড়বে সে ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার হয়ে যাবে।

আমি : সবই তো পুরুষ বন্ধুর কথা বললে, বান্ধবী?

সুব্রত : এখন দু-একজন হচ্ছে। খুব কাছে আসারও চেষ্টা করছে কজন। দেখছোই তো আমাদের পাড়াটা কিরকম। পুকুর, আমবাগান দিয়ে সাজানো, রোমান্টিক পরিবেশ। এই পরিবেশে কার না প্রেম করতে ইচ্ছে করে? কিন্তু করছি না, কেন বলতো?

আমি : কেন?

সুব্রত : আমি তো ডিফেন্ডার, সব অ্যাটাকগুলো ডিফেন্ড করতে করতে যেই দেখবো একজন গুড স্কোয়ার— অমনি গো-ও-ল। তবে তাকে হতে হবে নম্র, ধীর, শান্ত, বেশী লেখাপড়া না জানলেও চলবে।

আমি : তোমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের আর দুঃখের ঘটনা কি?

সুব্রত : একটি ঘটনা, একই সঙ্গে দুঃখের আর আনন্দের। ১৯৭৫ সালে রোভার্স খেলে ফিরছি। ডাউন বম্বে মেলের ফার্স্ট ক্লাশ কুপ থেকে আমার টেপরেকর্ডার, মারডেকার ব্লেজার, জামা কাপড় সব চুরি হয়ে গেল। বাড়ী ফিরলাম খেলার হাফপ্যান্ট আর প্রশান্ত মিত্রের একটা বুশশার্ট পড়ে। ঘটনাটা দুঃখের না?

—জয়ন্ত চক্রবর্তী

বেটন কাপ

১৯৭৭ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ২—১ ও ১—১ গোলে বোম্বাইয়ের ওয়েস্টার্ণ রেল দলকে হারিয়ে মোট ১২ বার বেটন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, এ বছরের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতার মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়নও হয়েছে। একই বছরে একটি দলের পক্ষে হকি লীগ এবং বেটন কাপ জয় নিঃসন্দেহে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়।

এ বছরের বেটন কাপের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ২—০ ও ০—০ গোলে ইস্টার্ণ রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনকে এবং বোম্বাইয়ের ওয়েস্টার্ণ রেল দল ১—০ ও ১—১ গোলে গত বছরের বেটন কাপ জয়ী জলন্ধরের আর্মি সার্ভিস কোর সেন্টারকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। ওয়েস্টার্ণ রেল দল শেষ বেটন কাপ জয়ী হয়েছে ১৯৭০ সালে, ইস্টবেঙ্গলকে ২—১ গোলে হারিয়ে।

সর্ব ভরতীয় মুক্ত অ্যাথলেটিকস্

চন্ডীগড়ে আয়োজিত সর্বভারতীয় মুক্ত অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস এবং মহিলা বিভাগে

রেলওয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এবারের আসরে নতুন রেকর্ড হয়েছে মোট ১৪টি। এর মধ্যে আছে একটি নতুন জাতীয় রেকর্ড—পুলিশের লাম্বার সিং ৪০০ মিটার হার্ডলসে ১৪ বছর আগে অমৃত পাল প্রতিষ্ঠিত ৫২-২ সেকেণ্ডের জাতীয় রেকর্ড ভেঙ্গে দেন। আসরে দর্শকদের কাছে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন দুই খ্যাতনামা অ্যাথলীট—শিবনাথ সিং এবং শ্রীরাম সিং।

চিঠির জবাব

১২ মার্চ নয় ১৫ মার্চ

গত ১১ মার্চ তারিখের অমৃত পত্রিকার খেলাধুলো বিভাগে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গে লিখেছিলাম '১৮৭৭ সালের মার্চ ১৫ তারিখে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন হয়। এ সম্পর্কে গত মে ২০ তারিখের অমৃত পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে শিলিগুড়ির শ্রীদেবাশিস ঘোষের একটি চিঠি ছাপা হয়েছে দেখলাম। এই চিঠিতে শ্রীঘোষ আমার প্রদত্ত মার্চ ১৫ তারিখটি ভুল বলেছেন এবং লিখেছেন "শ্রীদর্শকের অবগতির জন্য জানাই তারিখটি ১৫ মার্চ নয় ১২ মার্চ"। শ্রীঘোষ এই "মার্চ ১২ তারিখটি" কোথায় পেয়েছেন তার উল্লেখ চিঠিতে করেননি।

অমৃতের পাঠকবৃন্দ এবং শ্রীঘোষের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমার লেখায় কোন ভুল ছিল না। আবার বলছি, ১৮৭৭ সালের মার্চ ১৫ তারিখেই ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন হয়েছিল। বিশ্বখ্যাত ক্রিকেট লেখকদের রচিত একাধিক প্রামাণ্য পুস্তকে ১৮৭৭ সালের মার্চ ১৫ তারিখটি ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধনী দিবস হিসাবে মুদ্রিত হতে দেখেছি। অমৃতের ১৬ বর্ষ ৩৮ ও ৫০ সংখ্যায় শ্রীঅজয় বসু এবং "স্পোর্টস উইক" পত্রিকায় (মার্চ ১৩, ১৯৭৭) অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান ১৮৭৭ সালের মার্চ ১৫ তারিখে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন হয়েছে লিখেছেন।

শ্রীঅজিতকুমার রায় রচিত "দি স্টোরী অব টেস্ট ক্রিকেট" গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলার যে স্কোর কার্ড আছে তার মাথায় খেলার তারিখ এইভাবে আছে—মার্চ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮৭৭।

অমৃতের সম্পাদকীয় বিভাগের অবগতির জন্য আমি উপরে যে-সব তথ্যের উল্লেখ করেছি তা পাঠিয়ে দিলাম।

শ্রীদর্শক
(শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়)
২১।৫।৭৭

কানাকানি

কলকাতার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দুজন পরিচালক নাকি খুব স্পর্শকাতর। নিজেদের ছবির সমালোচনা তো নয়ই, এমনকি ছবির সংবাদ পরিবেশনেও তাঁরা খুব ছুৎমার্গী। তাঁদের ছবিকে প্রশংসা না করলেই তাঁরা গোঁসা করেন। আলোচকের যুক্তিপূর্ণ মতামতকে তাঁরা আমলই দেন না। স্নেহ-শ্রদ্ধাভাজন সমালোচকরা তাই তাঁদের কাছে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা স্নেহ পান আর অন্যান্যরা অভ্যর্থিত হন বিমাতৃসুলভ আচরণে।

* * *

উত্তম

টালিগঞ্জের চিরকুমার নায়ক উত্তমকুমার এবার বুঝি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেলেন! তরুণী নায়িকাদের চোখে চোখ রেখে যদিও প্রেম করার ব্যাপারে তিনি এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং সিদ্ধহস্ত কিন্তু বাড়িতে তাঁকে 'দাদুমণি' ডাকার লোক আসছে শুনছি। সুপ্রিয়া-কন্যা সোমা খুব শিগ্‌গির নাকি মাকে একটি নাতি কিংবা নাতনী উপহার দিতে চলেছে। সুতরাং উত্তমকুমারও দাদু হতে চলেছেন। সম্প্রতি বিদেশ থেকে সোমা ফিরেছে এই সুসংবাদটি নিয়ে।

* * *

মিঠু মুখার্জির 'প্রিয়তম' বন্ধু অভিজিৎ সেন নাকি কলকাতার এক যাত্রাদলে নাম লিখিয়েছেন? এটা কেমন হোল? বম্বের ইঁদুর দৌড়ে কি তিনি পেরে উঠলেন না? বাংলা ছবিতেই বা তাঁর ঠাঁই হলো না কেন? স্বয়ংসিদ্ধা তো অভিজিতের পাশেই ছিলেন। তবুও।

যাত্রিক এখন নীরব কেন—এ প্রশ্নটা আজ টালিগঞ্জের সবার মুখে। এক সময় একই সঙ্গে তিন-তিনখানা ছবি করেছেন যাত্রিক। অবশ্য আজকের যাত্রিক আগের যাত্রিক ছিল না। এখনকার যাত্রিক ছিল দিলীপ মুখার্জির এক-মানুষ প্রতিষ্ঠান। পর পর কয়েকটি ছবি ফ্লপ করার জন্যই কি যাত্রিক ওরফে দিলীপ মুখার্জি এখন কিঞ্চিৎ ভেঙে পড়েছেন। শোনা যাচ্ছে মানসিকভাবেই শুধু নয়, শারীরিক-ভাবেই যাত্রিক এখন অসুস্থ।

* * *

হৃষিকেশ মুখার্জি 'আনন্দ' ছবির পরিকল্পনা করেছিলেন ১৯৬৫ সালে। স্থির ছিল রাজকাপুর নায়ক হবেন, কারণ হৃষি-রাজের বন্ধুত্ব নিয়েই এ-ছবির ঘটনা। কিন্তু তখন ছবিটা হয়নি। কারণ নাকি হৃষিবাবু বলেছিলেন, সত্যিই যদি রাজকাপুরের কোনো অঘটন ঘটে। সেই সেন্টিমেন্ট কাটিয়ে উঠে যখন তিনি ছবিটি করবেন স্থির করলেন, তখন রাজকাপুরের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। অগত্যা রাজেশ খান্না এলো।

* * *

গায়ত্রী

'বাবুমশাই'-এর গায়ত্রী মুখার্জির কি খবর এখন? আমাদের দপ্তরে প্রচুর চিঠি আসছে ওঁর সম্পর্কে জানাবার জন্য। সুতরাং সরেজমিনে তদন্ত করতে একজন সাংবাদিক নাকি গিয়েছিলেন গায়ত্রীর বাড়িতে রাত আটটা নাগাদ। কিন্তু দেখা মেলেনি। এদিকে কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে পরবর্তী আরেকটি ছবির নায়িকা হবার জন্য প্রযোজক-পরিচালকের সঙ্গে তিনি নাকি 'ঘনিষ্ঠ' বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন।

—হরিপদ দর্শক

গণদেবতায় সন্ধ্যা রায়। সমিত ভঞ্জ

বহুদিন এমন ছবি দেখিনি

এমন কাঁচা ও অগোছালো ছবি দেখার সুযোগ বহুদিন হয়নি। এ সময়ের একটি তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দী ছবির সঙ্গে তুলনা করলেও 'জীবন মরুর প্রান্তে' পেছনের সারিতে বসতে বাধ্য (যদিও ছবিটি হিন্দী ছবি অনুকরণে আন্তরিক চেষ্টা করেছে)। না, কোন শিল্পগত গুণাগুণের বিচারে এই মন্তব্য নয়। মোটামুটিভাবে এমন একটা ছবি আশা করেছিলাম যা আড়াই ঘণ্টা চেয়ারে বসিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। কিন্তু চোদ্দ রীলের কোথাও কোন মুহূর্ত নেই যা আমাদের ইন্দ্রিয় সামান্য সময়ের জন্য সজাগ করতে পারে।

'জীবন মরুর প্রান্তে' যে ঘটনা ও বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছে তার পরিবেশনা এতই বিশৃঙ্খল ও নড়বড়ে যে ছবিটিকে কখনো স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় না। এর পরিবেশ, সমাজ, জীবন কোনো কিছুই মাটির ওপর পা রেখে চলেনি। সবকিছু এমন যুক্তিহীনভাবে হঠাৎ হঠাৎই এসে গেছে যে, তা 'গল্পের গরু গাছে চড়ে' এই প্রবাদবাক্যটি মনে করিয়ে দেয়। পরিচালক যে আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছেন, সেখান থেকেও তিনি বিচ্যুত। যে অনাথ শিশুর জন্য শৈবাল গৃহত্যাগ করল, পরিচালক তাকে শেষ পর্যন্ত অবৈধ রাখেননি। নায়ককে যে ভিন্ন জাতের দরিদ্র মেয়েটি ভালবাসত, পরিচালক তার জন্য এনেছেন মৃত্যু। কেন! এ কি কোনো যৌক্তিক কারণে, না কোন সংস্কারবোধে।

সাধারণতঃ কমার্শিয়াল ছবিতে যে সব মালমশলা থাকে, এখানে তা সবই উপস্থিত। গান, নাচ, প্রেম, অত্যাচার, দ্বন্দ্ব, মৃত্যু, জলকেলি, বিরহ, অলংকার—কি নেই! কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক গানের একটাও শোনার মতো নয়, অনেক নৃত্যের একটাও দেখার মতো নয়! ছবিতে বৈষ্ণবের বেশে এক মহাজন আছে কিন্তু তার উপস্থিতি অনেকটা ম্যাজিকের মতো। যেমন চাষীদের দাঙ্গা। এরকম আরো অনেক হঠাৎ গজিয়ে ওঠা দৃশ্য শেকড়হীনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ছবির এলোমেলো শট ডিভিশান, চরিত্রদের সাজসজ্জা ইত্যাদিতে সতর্কতার অভাব, অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যের কনটিনিউটি বজায় না থাকা, আলোকসম্পাতে দুর্বলতা ইত্যাদি বেশ কৌতুক সৃষ্টি করে। তা না হলে চোদ্দ-পনের বছর পরে শৈবালের একই চেহারা ও পোশাক দেখতে পেতাম না। শৈবাল মনে হয় এখানে অক্ষয় যৌবনের অধিকারী।

ওই গ্রামে সম্ভবতঃ মাঝে মাঝে রাত্রে সূর্যোদয় হয়। নইলে রাত্রে দিনের মতো এত জোরালো আলো কেন! পিয়ারীদের প্রতি আধঘণ্টা অন্তর পোশাক পরিবর্তনের অভ্যেস আছে। নয়তো একই ঘটনার মধ্যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে দেখতাম না। এ ছবির অভিনয়, সংলাপ সবকিছু জোলো আবেগসর্বস্ব।

দর্শক, সরকার, পত্রপত্রিকা প্রত্যেকেই যখন বাংলা ছবিকে বাঁচানোর কথা ভাবছেন, তখন এজাতীয় ছবিগুলোই তাকে আরো দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

বিকাশ জানা

নতুন যাত্রাদল—নতুন চ্যালেঞ্জ

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন চেয়েছিলেন—এ বছর কোনো নতুন দলকে তাঁরা স্বীকৃতি দেবেন না। ব্যাপারটা আদৌ ধোপে টেকেনি।

কোম্পানী বাগানের মুখে অর্থাৎ নতুন বাজারের এলাকায় জ্বল জ্বল করতে দেখছি 'যুগযাত্রা'র সাইনবোর্ড। সোনালি এনগেভিং করা উঁচু অক্ষর। একপাশে নটরাজ। ভেতরে একদিকে অফিসঘর। অপরদিকে গদিঘরে ঢোকার প্যাসেজ।

অক্ষয় তৃতীয়ায় পুজোর আমন্ত্রণ ছিল। পরিচালক যামিনী গুপ্ত মশায় বার বার করে বলেছিলেন প্রসাদ খেয়ে যেতে। অফিসে গিয়ে দেখি অফিস-ইনচার্জ সজল সামন্ত বসেছেন। সামনে টেলিফোন। বললেন, বাঃ ভালোই।

গদিঘরে প্রাজ্ঞ নট ও নির্দেশক মোহিত বিশ্বাস, সুগঠনা ইন্দ্রাণী দেব এবং আরো অনেকে।

নতুন রংকরা দেওয়াল. উৎসবের সাজে উজ্জ্বল। মোটামুটি চোখ জুড়িয়ে যায়। যুগযাত্রা প্রথম বছরে নির্বাচন করেছেন ভৈরব গাঙ্গুলীর মীনাবাজার, প্রসাদবাবুর আগ্নেয়গিরি এবং রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্গমর্তপাতাল। প্রথম দুটো পালার নির্দেশক মোহিতবাবু। শেষটির জ্ঞানেশ মুখার্জি। অভিশপ্ত চম্বলের মানসিং-এর অভিনেতা সুনীলেশ ভট্টাচার্য এ দলের গৌরব। নারায়ণ গোস্বামী, সাধন দাস, অমর রায়চৌধুরী, সুধীর মুখার্জি, মেঘ মুখার্জি, ধীরেন ঘোষ, সোনা দেবনাথ, যশোদা চক্রবর্তী, অবনী চন্দ, রঞ্জিত ব্যানার্জি গোপাল দে, রঞ্জন রায়, সন্তোষ দে, কাজরী ব্যানার্জি, অরুণা গোস্বামী, বেলা ব্যানার্জি, বৃষ্টিকা দেবী, সন্ধ্যা দাস, তাপসী ভট্টাচার্য ছাড়াও গোষ্ঠ দাস বাউলের গান সম্বল করে নামছে যুগযাত্রা।

এখান থেকে মানু ভট্টাচার্য আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন এরই দোতলায়। শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানীর গদিঘরে। গান্ধার, চারণদল প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠিতে নাটক করেছেন মানু। নিউ প্রভাস আর নিউ আর্যতে যাত্রাও। এবার শ্রীনাথ নট্টতে। শ্রীনাথ নট্টর সুযোগ্য পুত্র বীরেন নট্ট দলের নতুন নামকরণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন কথাবার্তা বললেন। নট্টকোম্পানী (বিষ্ণুগ্রাম) দলের আদি নাম। যারা এক সময় ব্রজেনবাবুর ভাওয়াল সন্ন্যাসী বা রাজা সন্ন্যাসী করে যাত্রা জগতে আলোড়ণ তুলেছিল। আগেকার সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করতেই পুনরায় চিৎপুরে এসেছেন বীরেন নট্ট। দল পরিচালক অনিল রায়। পালাকার প্রসাদ ভট্টাচার্য মশাই বসেছিলেন। ওনার পালা পৃথিবীর পাঠশালা ছাড়াও শ্রীদর্পণের লক্ষহীরাকে নিয়ে শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানী আসর জয় করতে চায়। নির্দেশনায় আছেন মোহিতবাবু এবং জ্ঞানেশ মুখার্জি। মঞ্চের অন্যতমা অভিনেত্রী পুতুল চক্রবর্তী, অনিল রায়, দেবজিৎ রায়, কেয়া রায়, হরিগোপাল এবং শম্ভু ব্যানার্জিও দলে আছেন। ওপেন এয়ার থিয়েটারের প্রবক্তা বীর সেন এই দলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। শম্ভুবাবু, কথাসাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিক্ষকতা করতেন এক সময়। নাটক করেছেন পেশাদারী মঞ্চে।

শ্রীনাথ নট্টকোম্পানী তার পুরোনো ঐতিহ্য ফিরে পাক আমরা এ কামনাই করি। ব্রজেনবাবুর শেষ স্মৃতির পালা শয়তানের দরবার ও দলের গৌরব।

পান্না চক্রবর্তী এবং চিত্রা মল্লিককে চুক্তি করিয়েছে নতুন দল নাগ কোম্পানী। এদের পালা বেইমান বিধাতা, সংযমা এবং নাগ নন্দিনী।

প্রধান নট ভোলা পাল, তারারাণী পাল, ফিরোজবালা, স্বর্ণালী মিত্র এবং নন্দিতা দাশগুপ্ত এসেছেন, নতুন দল শিল্পী মহলে। এদের পালা দস্যু রত্নাকর, নবাব ঈশা খাঁ এবং পাপপুণ্য নারায়ণ।

আর একটি নতুন দল জনতীর্থ চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে প্রেয়সী, আনারকলি, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা এবং সিঁথিতে সিঁদুর দাও পালা তিনটি নিয়ে।

মূল কথা, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের পক্ষে সম্মানজনক কাজ হবে নতুন দলগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া। এদেরও সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত করা। কেননা নায়েক পার্টি যখন এদের বায়না করছেন দল বেঁধে তখন স্বীকৃতির অসুবিধা কোথায় ?

প্রভাত চৌধুরী

খালি চোখে ৬০০০ নক্ষত্র

পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগে প্রকাশিত রচনাগুলি নিয়মিত পাঠক হিসাবে আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে। বিশেষ করে ভালো লাগছে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে 'সাহিত্য' বিভাগে শ্রীবৈকুণ্ঠ পাঠকের লেখা বিশেষ রচনাগুলি। সত্যি শ্রী পাঠকের রচনাগুলি খুবই হৃদয়গ্রাহী। তাঁর সরস অথচ বাস্তবধর্মী রচনাগুলি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। সব থেকে ভালো লাগল ২৫ ফেব্রুয়ারীর 'অমৃত' সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী পাঠকের 'খালি চোখে ৬০০০ নক্ষত্র'। লঘু পরিহাসের সঙ্গে তিনি যেভাবে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের করুণ অসহায় ছবিটি তুলে ধরেছেন পাঠক মাত্রেই তার প্রশংসা করবেন। জানি না শ্রীবৈকুণ্ঠ পাঠকের নামের আড়ালে কে এই রচনাগুলি লিখে চলেছেন, তবে তিনি যে-ই হোন তাঁর কাছে আমার একান্ত অনুরোধ তিনি যেন এইভাবে সাহিত্যের ভালো-মন্দ বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখে যান এবং আমাদের পরিতৃপ্ত করেন। শিবকুমার রাহা, রাণাঘাট, নদীয়া।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৭৫ পয়সা॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুলে ৭ পয়সা॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

১৭ বর্ষ ৫ সংখ্যা
২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
10th JUNE 1977

এবারের প্রচ্ছদ এঁকেছেন নিতাই ঘোষ

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর আমাদের মধ্যে নেই। সাতাশী বছরের কর্মময় জীবনের অবসান অস্বাভাবিক নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু সুনীতিকুমারের প্রতিভা শেষ দিনটি পর্যন্তও এত বিচিত্রগামী ছিল যে, তাঁর এই চিরবিদায়ে বিরাট এক জ্যোতিষ্ক পতনের শূন্যতা দেখা দিয়েছে।

সুনীতিকুমার ছিলেন উনিশ শতকের ভারতীয় রেনেশাঁসের শেষ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। বাংলা ভাষার উৎস ও ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই যদিও তাঁর মনীষার প্রধান ক্ষেত্র, কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়েও পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর অসাধারণ। তাছাড়া শিল্পকলা, ইতিহাস, ভারততত্ত্ব, আদিবাসী সংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব, আফ্রিকীয় সভ্যতা, ইরানী সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতা, স্লাভ জাতিতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য ও কিংবদন্তী ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর এই বিশ্ববিজয়ী মনস্বিতার ফলে পৃথিবীর প্রায় এমন কোনো দেশ নেই যেখান থেকে তিনি আমন্ত্রিত হন নি, সম্মানিত হন নি। তাঁর অন্বেষণের ক্ষেত্র ছিল মেক্সিকো থেকে মঙ্গোলিয়া, আফ্রিকা থেকে আর্মেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন, মানবিক বিদ্যাসমূহের জাতীয় অধ্যাপক এবং সাহিত্য আকাদমীর সভাপতি। ভারত সরকার তাঁকে সম্মানিত করেছেন পদ্মবিভূষণ উপাধি দিয়ে। আর ভারতবাসী দিয়েছে তাঁকে অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। জীবিতকালেই সুনীতিকুমার ছিলেন ইতিহাস, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে

আচার্য সুনীতিকুমার

সুনীতিকুমারের কোনো জুড়ি নেই। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে তাঁর অসাধারণ চর্চা ও অনুশীলনের পরিচয় নিয়ে আজ থেকে একান্ন বছর আগে ইংরেজিতে বেরোয় বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নামক আকর গ্রন্থ। সংক্ষেপে ও ডি বি এল নামে এটি সমস্ত শিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে ফেরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভাষাচার্য আখ্যা দিয়েছিলেন। মহান কবির সঙ্গে মহান গবেষকের ছিল আশ্চর্য প্রীতির ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

সাধারণ বাঙালী সাহিত্য নিয়ে যতটা মাতামাতিতে অভ্যস্ত ভাষা গবেষণায় তার আগ্রহ সে পরিমাণ নয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শব্দতত্ত্বের ভিতরকার রস ও মাধুর্য খুব সহজভাষায় প্রকাশ করে গেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও তার ক্রমবিবর্তনের রূপটি তিনিই প্রথম তুলে ধরেন। তাঁর বইটি বাংলা ভাষার ওপরে হলেও আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা বিষয়ে যে-কোনো গবেষকের কাছেই তা মূল্যবান। তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান দেওয়া হয় যখন তাঁর বয়স ছিয়াত্তর। এ-সম্মান অনেক আগেই তাঁর প্রাপ্য ছিল।

তিনি যখন বাংলার বিধান পরিষদের সভাপতি ছিলেন তখন অনেক সময়েই মনে হয়েছে এটা তাঁর কাজ নয়। এতো তাঁর মতো মহাপণ্ডিতের অযথা সময়ের অপচয়। তাঁর কাছ থেকে আমরা আরও অনেক কিছু আদায় করে নেবো। তাঁর বিদ্যাচর্চা অবশ্য কোনো সময়েই ক্ষান্ত থাকেনি। আসলে তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তিনি মেলাতে পেরেছিলেন জীবনের রস ও মাধুর্য। সঙ্গীত, নাটক, মজলিসী গল্প সব কিছুতেই ছিল তাঁর একান্ত আগ্রহ। মালকোচা মেরে কাপড় পরতেন। ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি এবং মোটা কাঁচের চশমা। গট গট করে হাঁটতেন। কখনো লাঠি ব্যবহার করতে দেখিনি। আলাপচারিতায় সুদক্ষ এবং সুরসিক। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বলে প্রচুর অ্যানেকডোট খুব সরসভঙ্গিতে বলতে পারতেন। সুনীতিবাবুর বক্তৃতা শোনা ছিল একটা সরস ও রমণীয় অভিনেতা। যত কঠিন বিষয়েই বলুন না কেন, তিনি তাকে রসসিক্ত করে তুলবেনই তাঁর বহুবিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের খনি থেকে কথা ও কাহিনীর মণিমুক্তো আহরণ করে।

একালের শিক্ষিত বাঙালীর একটা বৃহৎ অংশই তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র। যাঁরা তাঁর কাছে পড়েননি, পড়বার সুযোগ পাননি তাঁরাও সুনীতিকুমারকে গুরু মানতে কোনো দ্বিধা দেখাননা। এর কারণ সুনীতিকুমারের কাছে বাঙালীর ঋণ। এ বাংলা এবং ওপারের বাংলার বঙ্গভাষী মাত্রেই এই ঋণ স্বীকার করেন।

এক মৈথেলী অধ্যাপকের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলুম, আপনাদের বিদ্যাপতিকে তো আমরা বাঙালীরা আত্মসাৎ করে ফেলেছিলুম। ভদ্রলোক জবাবে বললেন, আপনাদের সুনীতিকুমার চাটার্জিই তো বিদ্যাপতিকে মিথিলায় ফিরিয়ে দিলেন। সুনীতিকুমার গবেষণার ক্ষেত্রে ছিলেন সত্যসন্ধানী। কবি জয়দেব সম্পর্কে ১৯৭৩ সালে সাহিত্য আকাদেমি থেকে তাঁর একটি বই বেরিয়েছে। জয়দেব বাংলাভাষায় না লিখলেও তিনি যে বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামের লোক এ বিষয়ে বাঙালীর মনে কোনো সন্দেহ নেই। সুনীতিকুমার সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেও তার বইয়ে একথা লিখতেও দ্বিধা করেননি যে জয়দেবকে ওড়িশা এবং মিথিলাও নিজেদের কবি বলে দাবি করে। এ বিষয়ে বিপরীত মতাবলম্বী গবেষকদের রচনরও উল্লেখ করেছেন তিনি। গবেষণর ক্ষেত্রে কোনোরূপ সংকীর্ণতা তাঁর প্রশ্রয় পায়নি। চলনেবলনে এবং চরিত্রে তিনি ছিলেন বাঙালী। মনোভঙ্গিতে তিনি ছিলেন বিশ্বজনীন চিন্তার অনুগামী। যেমন বিদ্যাচর্চায় তেমনি ছিল বিশ্বজনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার অসাধারণ আগ্রহ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সহযাত্রী করে নিয়ে গিয়েছিলেন জাভা বালিদ্বীপ। মালয়, শ্যামদেশ ভ্রমণের সময়ে ১৯২৭-এ। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারিত দিগ্বলয়ের সন্ধান আমরা পাই তাঁর সেসময়কার লেখা দ্বীপময় ভারত গ্রন্থে। পরে তিনি বইটির নাম পাল্টে দেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্বজাতির স্বাধীনতা ও জাগরণের যুগে ওই নামকরণ যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে না পারে। ভারতীয় সংস্কৃতি কিভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছিল এবং তার রূপ কী, সুনীতিকুমারের লেখায় তাঁর পরিচয় পেয়েছিলাম আমরা।

বিচিত্রগামী ছিল তাঁর অনুসন্ধিৎসা। আফ্রিকার জাগরণে ভারতবর্ষের আগ্রহ গোড়া থেকেই। কিন্তু আফ্রিকার জনমানস কিভাবে তার শিল্পে ও সমাজতন্ত্রে প্রতিফলিত হয়েছে তা আমরা পাই সুনীতিকুমারের গ্রন্থে। আফ্রিকানিজম এবং আফ্রিকান পার্সোনালিটি তাঁর এমনি দুটি বই। পুরাণ ও লোকগাথা বিষয়েও ভাষাচার্যের আগ্রহ ছিল। ১৯৫৮ সালে রুশ দেশে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে সেখানে ইগর লোককাহিনীর ওপর রুশভাষায় এক চমৎকার তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেন। বিশ্বমানসিকতার অধিকারী সুনীতিকুমারের জ্ঞানস্পৃহা পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষের কীর্তি ইতিহাস ভাষা ও শিল্প সম্পর্কেই ছিল সমান আগ্রহী। ভারত ও ইথিওপিয়া কিংবা ইরানীয়বাদ নিয়ে তাঁর গ্রন্থে সুনীতিকুমারের বিশ্ববীক্ষার এই পরিচয় পাই।

ভারতের সব কটি ভাষা সম্পর্কেই তাঁর আগ্রহ এদেশে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চাকে প্রাণবন্ত করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই চর্চাকে তাঁর পরে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে জানি না! ভারতবর্ষে পারস্পরিক ভাষাচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি সব সময়েই বলতেন। হিন্দী ভাষার ওপর তিনি এককালে খুবই গুরুত্ব দিতেন। সতীনাথ ভাদুড়ি[illegible] জাগরীর হিন্দী সংস্করণের ভূমিকা লি[illegible] দিয়েছিলেন তিনি অতি সুন্দর ও সরল হিন্দীতে। হিন্দী নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু হলে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার ওপর জোর দেন ইংরেজিকেও বরবাদ করতে চাননি।

প্রচলিত চিন্তার বিরুদ্ধে হলে[illegible] তথ্যভিত্তিক সত্যপ্রকাশে তিনি কখন[illegible] ভয় পাননি। চীনের সঙ্গে ভারতের যখ[illegible] সম্পর্ক খুব খারাপ তখনও তিনি একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন যে মেঘকে দূত ক[illegible] পাঠানোর কল্পনা কালিদাসের অনেক আগে চীনদেশের কাব্যে পাওয়া যায়। চীনের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় প্রসঙ্গে এই রচনা। সাম্প্রতিককালে রামায়ণের রাম চরিত্রের ঐতিহাসিকতা বিষয়ে চাঞ্চল্যকর ম[illegible] প্রকাশ করে এই জ্ঞানতপস্বী প্রমাণ ক[illegible] গেছেন যে সত্যের সঙ্গে অন্য কিছুরই আপো[illegible] চলতে পারে না না লোকাচার, না ধর্ম বিশ্বাস। রামকথার প্রাচীন উৎস তাঁর ম[illegible] রামায়ণেরও আগে দ্বিতীয় বা তৃতীয় খ্রী[illegible] পূর্বাব্দের পালিতে রচিত জাতক কথায়। দশানন রাক্ষসের কল্পনাও ভারতীয় কো[illegible] পুরাণে ছিল না বলে অভিমত দেন তিনি। এ-কল্পনা গ্রীক পুরাণের ছায়ায় রচিত ব[illegible] তাঁর অনুমান। এইরকম মত প্রকাশের জ[illegible] তাঁকে অনেক কটুকাটব্য ও শাপশাপান্ত শু[illegible] যেতে হয়েছে শেষ বয়সে। তিনি [illegible] পাননি।

সুনীতিকুমারের বিদ্যাবত্তা বিষ[illegible] পৃথিবীর গুণীজনরা অনেক লিখেছে[illegible] আরও লিখবেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি[illegible] অধিকারী যে অল্প কজন বাঙালী আছে[illegible] তাঁদের অগ্রণী পুরুষ চলে গেলে[illegible] বছরে মৃত্যু নিয়ে শোক করা [illegible] না কিন্তু আমাদের দুঃখ বোধহয় এই জন্য জ্ঞানচর্চার প্রবহমনতা রক্ষায় তাঁর জু[illegible] একালের বাঙালী আর তৈরি করতে পারেনি। তাঁর জীবিত শ্রেষ্ঠ শিষ্য বাঙালীদের ম[illegible] ডঃ সুকুমার সেন। কিন্তু তারপর ত[illegible] কারো নাম মনে করতে পারছি না। আ[illegible] তাঁর কাছে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল[illegible] আগামীকালের বাঙালী শুধু তাঁর [illegible] জানবে। কেননা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিচিত্র বিষয়ে রচনা পড়বার মা[illegible]সিকতা একালের বাঙালী পাঠক[illegible] কজনেরই বা আছে? সুনীতিবাবুকে বাঁচি[illegible] রাখতে পারেন তাঁর ছাত্র ও শিষ্যরা বিদ্যাচর্চায় এবং বাংলা ভাষার নির্মাণ গবেষণাকর্মকে শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে এগি[illegible] নিয়ে।

সুনীতিকুমার তাঁর বাড়ির নাম রে[illegible] ছিলেন সুধর্মা—যার অর্থ সুরসভা, ইন্দ্রে[illegible] সভাগৃহ। সুনীতিকুমারের সুধর্মার অ[illegible] ষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। সারস্বত সাধ[illegible] হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি দেশবাসীর প্র[illegible] শ্রদ্ধানিবেদন।

কৃষ্ণ

আনসেনসরড্ দৃশ্যই লোক টানে

মাননীয় বৈকুণ্ঠ পাঠক,

বারবধূ সম্বন্ধে আপনার আলোচন পড়ার পরও ইতস্ততঃ করছিলুম, কিন্তু অসীমবাবুর বক্তব্য পড়ে এই চিঠিখানা না লিখে পারলুম না। আগেই বলে রাখি বারবধূ আমি দেখিনি। কি করবো বলুন? যে নাটক বিজ্ঞাপিত হয় 'ভালোবাসার ব্রোহট্ হাই ফাই নাটক' বলে, বা যার প্রতিটি দৃশ্যই 'কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে'? বা কাগজে এবং হোর্ডিং-এ যে নাটকের নায়িকার শরীরের অংশবিশেষ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় করে তোলা হয়, সে নাটকের রুচি সম্বন্ধে একটু সন্দেহ জাগেই। আপনি বলবেন, আসল নাটকে এসব দৃশ্য নেই কিংবা উপস্থাপনার গুণে এইসব ব্লো হট্ ব্যাপার থেকে কাব্যিক সুষমা বেরিয়ে এসেছে। হতে পারে। সে তো [illegible] এবং তার পোস্টারে সেই আনসেনসরড্ দৃশ্যগুলো তুলে ধরেই লোক টানে।

আপনি প্রশ্ন করেছেন যতো দর্শক এই নাটক দেখতে গেছলেন তাঁরা কি শুধু খোলাপিঠ দেখতেই গেছলেন? আমি সবিনয়ে প্রতিপ্রশ্ন করি, তবে তাঁরা কি দেখতে গেছলেন? গিয়ে কি দেখেছেন সে আলাদা কথা, কিন্তু নাটকের বিজ্ঞাপন পড়ে (বা দেখে) যারা লোকে নাটক দেখতে যায়। সেক্ষেত্রে তাঁরা ব্লো হট্ কিছু আশা করেই গেছলেন নিশ্চয়ই। আর আমাদের দর্শকের রুচি? আপনার মতো আমারও ভাবতে খুব খারাপ লাগে যে এতো বিকৃত বা সস্তা রুচির দর্শক বাংলাদেশে আছে। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে অশ্লীলতম বোম্বাই ছবির বাংলাদেশে বিরাট মার্কেট আছে। এবং এটাও নিশ্চয়ই জানেন যে বিদেশী ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সময় যারা টিকিট পাবার জন্যে উন্মাদ হয়ে ওঠে তারা সবাই ত্রুফো বা গদারকে দেখতে যায় না।

তবে এরা ছাড়াও আর এক শ্রেণীর দর্শক আছেন যাঁরা 'চার অধ্যায়ে'র টিকিটের জন্যে রাত্তির থেকে লাইন দেন। যাঁদের মুখ চেয়ে নান্দীকার কেয়া চলে যাবার পরও নতুন প্রোডাকশনের কাজ চালিয়ে যাবার প্রেরণা পান। বৈকুণ্ঠ পাঠক, আপনি প্রশ্ন করেছেন গ্রুপ থিয়েটারগুলো এখনো কেন দর্শক তৈরী করতে পারলো না। আপনার কাছ থেকে এমন প্রশ্ন আমরা আশা করি না। দর্শক কি তৈরী হয়নি? সব দেশেই তো ভালো শিল্পের বোদ্ধা মুষ্টিমেয়। যেখানে শেকস্‌পীয়ার নন্দিত সেখানেই 'হেয়ার' বছরের পর বছর চলে। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় দর্শক তৈরী করতে পারলেই তো দেশ বেঁচে যায়। তাঁরাই তো দেশের কৃষ্টি ধারণ করে থাকেন।

বারবধূ তো বহু দর্শকের আনুকূল্য পেয়েছে। যার বাড়া নেই সেই আমাদের অত্যন্ত নাট্যরসিক মন্ত্রীমহোদয়দের বিশেষ বিশেষ রজনীতে নেমন্তন্ন করে এনে তাঁদের আশীর্বাদধন্য হয়েছে। আর কি চাই? আমাদের ছোটো ছোটো গ্রুপগুলোকে জনসাধারণের গলায় আটকেই থাকতে দিন না। তাঁরা যখন রসিকতা, অশ্লীলতা এবং সর্বোপরি জোলো সেন্টিমেন্টের রস ঢেলে ভালো পাঞ্চ তৈরী করতে পারছেন না, তখন বরং তাঁদেরই একঘরে হয়ে থাকতে দিন। তাঁদের অনুকূল অভিমত পাবার জন্যে এতো ব্যাকুলতা কেন?

অসীমবাবুর বক্তব্যে তাঁর অসুস্থতা ও সমস্যার কথা আমরা সবাই জানলুম। তিনি আরোগ্য লাভ করুন, কিন্তু এভাবে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো প্রকাশ করার মধ্যে পৌরুষ নেই, মর্যাদাও নেই। ব্যবসায়িক বলুন আর বৈপ্লবিক বলুন, মঞ্চ জগতের কোন মানুষটার সমস্যার অভাব আছে? আমাদের শুধু তাঁদের সৃষ্টিগুলো নিয়েই কারবার। তাঁরা মঞ্চের ওপর যা ধরে দিচ্ছেন অমারা শুধু তাই বিচার করবো, গ্রীনরুমের কথা তো আমাদের জানবার নয়।

অসীমবাবু অক্লেশে বলেছেন, তিনি তাঁদের কালের প্রথম ব্যক্তি যিনি নাটকের জন্যে সব ছেড়ে শুধুমাত্র নাটক করে যাচ্ছেন। একথা পড়ে আমরা স্তম্ভিত। তিনি কি তাঁর আশেপাশে এমন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দেখেননি যিনি বা যাঁরা নাটকের প্রতি উৎসর্গীকৃত? কী বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যাঁরা সৎ নাটক ক্রমান্বয়ে আমাদের দিয়ে গেছেন? যেসব নাটক দেখে সারা ভারত অভিভূত হয়েছে, আলোড়িত হয়েছে, বাংলাদেশের নাট্যশিল্পকে প্রণাম জানিয়েছে, সে সব নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্যে কী প্রচন্ড ডেডিকেশানের প্রয়োজন তা কি অসীমবাবু—মঞ্চজগতের মানুষ হিসেবে নয়, একজন সাধারণ দর্শক হিসেবেই—অনুভব করেন নি? কিন্তু তিনি তো বারবধূরে সঙ্গে পথের পাঁচালীর তুলনা করেছেন, তাঁর এই অটল আত্মবিশ্বাসের সামনে আমি আর কি বলতে পারি?

জনৈক পাঠিকা

'সাহিত্য' বিভাগে বৈকুণ্ঠ পাঠকের নিবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ। (অমৃত ২২-৪-৭৭) এ-প্রসঙ্গে শ্রীপাঠকের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। শ্রীপাঠক বলেছেন:

(১) এরা সবাই বারবধূ'র খোলা পিঠ দেখতে গিয়েছিলেন? মঞ্চে চুম্বনের স্বাদ পেতে?

(২) আমাদের দেশে সচিত্র যৌন পত্রিকা তো তাহলে সবচেয়ে বেশী চলতো। তা তো চলেনি। বরং উঠে গেছে।

(৩) 'নবান্ন' থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত আপনারা রুচি তৈরী করতে পারেন নি।

(১) প্রথমতঃ যদি শ্রীপাঠকের মতকে স্বীকার করে নিই যে, বারবধূ'র দর্শকেরা 'খোলা পিঠ' আর 'চুম্বনের স্বাদ পেতে' যান নি, তাহলে পাশাপাশি আর একটি কথা মনে আসে: বারবধূ'র বিজ্ঞাপনে তাহলে ঐ জাতীয় বিশেষ দৃশ্যগুলির চিত্র গুরুত্ব পায় কী জন্য? আর বিজ্ঞাপনের ভাষাটিও অমন কেন?—নাটকে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে স্বর্গীয় নট-নাট্যকার-নির্দেশক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এক যুগান্তর এনেছিলেন;—ভাষা ব্যবহারে ও চিত্রউন্নয়নে। বিজ্ঞাপন দর্শক-আকর্ষণের একটি বড় মাধ্যম সন্দেহ নেই কিন্তু বারবধূ'র বিজ্ঞাপনের চিত্র ও ভাষা ব্যবহারের ভেতর দিয়ে প্রযোজক দর্শককে আগেভাগেই তার এক বিশেষ ধরণের প্রত্যাশার ব্লু-প্রিন্ট দিয়ে দিচ্ছেন নাকি? এ নাটক সম্পর্কে অসীমবাবু বলেছেন: 'আমাদের নাটকে তার (সমাজের) একটা বাস্তব এবং দুঃসাহসিক চিত্র আছে....' (অমৃত। ক্রীড়া বিনোদন। ১৩৮০)। কিন্তু আমি এবং আমার মত আরো অনেক পাঠক। দর্শকের কাছে এই দুঃসাহসিকতার প্রকৃত স্বরূপটি আজও অস্পষ্ট। বিটিশ শাসিত ভারতে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' থেকে শুরু ক'রে 'জমিদার দর্পণ', 'চা-কর দর্পণ' ইত্যাদি আরো আরো দর্পণ' নাটকের যে প্রতিবাদী ভূমিকা কিংবা 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' 'শরৎ সরোজিনী' ইত্যাদি নাটকের মধ্যে যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় 'বারবধূ'র দুঃসাহসিকতা কি তার সমগোত্রীয়'—আর একালের পটভূমিতে যদি দেখি তাহলে প্রথমেই মনে পড়ে ঋত্বিক ঘটকের "সুবর্ণরেখা'র কথা। দুঃসাহসিকতা এতে কম ছিল না। তাই এসব দুঃসাহসিকতার পাশে বারবধূ'র দুঃসাহসিকতার স্বরূপটি অস্পষ্টই থেকে যায়। আশাকরি শ্রীপাঠক সহৃদয়ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

(২) শ্রীপাঠকের দ্বিতীয় বক্তব্যের উত্তরে জানাই যে, এ দেশে সচিত্র যৌন পত্রিকার হার কমে যাচ্ছে বলে তিনি এ মতামত পোষণ করেন, তা নিতান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত। এর কোন বস্তুগত সত্য

নেই। দগদগে অশিক্ষার অন্ধকারে ডোবা এই দেশে এ ব্যবসা আজও রমরম ক'রে চলছে।

(৩) শ্রীপাঠকের তৃতীয় বক্তব্যের উত্তরে জানাই 'নবান্ন' নয় 'নীলদর্পণ' থেকেই বাংলা নাটকের সৎ-সংগ্রামী ভূমিকার সূত্রপাত। 'নবান্ন' 'নীলদর্পণে'রই উত্তরসূরী। কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর পর যদি ধরেই নিই যে, 'নবান্ন' থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দর্শকের রুচি তৈরী হয়নি, তাহ'লে আর একটি প্রশ্ন পাশাপাশি আসে, গ্রামে-গঞ্জে শহরে এতগুলো গ্রুপ থিয়েটার বেঁচে আছে কীভাবে? আর 'জগন্নাথে'র মত সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত নাটকের দর্শক আসে কোথা থেকে? শ্রীপাঠককে বিনীত অনুরোধ: ক'লকাতা এবং বিশেষতঃ মফস্বলের প্রতিযোগিতা মঞ্চের নাটকগুলি দেখুন তাহ'লে অনুভব করতে পারবেন দর্শক তৈরী হয়েছে কি না? তাহলে খোলা মাঠে বারবধূ'র দর্শক আসে কোথা থেকে? —এ প্রশ্ন আসা সঙ্গত। শ্রী পাঠক জানাচ্ছেন: আনন্দ ওর (বারবধূর) বিজ্ঞাপন নেয়, কিন্তু সমালোচনা লেখে না—এখানে একটি কথা সবিনয়ে বলি, গ্রামবাংলার মানুষ শিক্ষিত রুচিবান হলেও কলকাতার থিয়েটার সম্পর্কে আজও নিরাসক্ত হ'তে পারে নি। আর কাগজে কোন সমালোচনা না দেখতে পাওয়ায় দর্শক চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন ক'রে একবার পরখ ক'রে নিতে চান প্রকৃত ঘটনাটি সত্যি কি না?—এভাবেই বারবধূ'র দর্শক বেড়েছে। কোন দুঃসাহসিকতার জন্য নয়।

অসীমবাবু জানিয়েছেন: নাটকে ভাল কিছু দেবার চেয়ে নাটক নিয়ে ব্যবসা করার দিকেই ঝোঁক দেখা যাচ্ছে (অমৃত। ক্রীড়া বিনোদন। ১৩৮০)। শ্রী পাঠক লিখেছেন: 'টিকিটঘরের নিরাপত্তা আপনাকে গত পাঁচ বছরেও যখন নতুন পরীক্ষায় নিয়োজিত করতে পারেনি, তখন আপনি আপনার নিয়তির জন্যে অপেক্ষা করুন।'—পাশাপাশি দুটি উক্তি থেকে কিন্তু আসল সত্যটি প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে যে, 'বারবধূ' কোন শ্রেণীর নাটক? কীসের জন্য এ-নাটক?—শ্রী পাঠক এই উক্তিটির জন্য ধন্যবাদ।

পরিশেষে বলি, সংস্কৃতি সমাজেরই দর্পণ। সমাজসংস্কার নাটকের পক্ষে সম্ভবপর নাও হ'তে পারে, কিন্তু তার ক্ষেত্র নির্মাণে নাটক এক শক্তিশালী অস্ত্র। চিত্তের প্রসার এবং বিনোদন এই আদর্শের মধ্যেই 'চিত্তবিনোদন' কথাটির স্বরূপটি লুকিয়ে আছে।

'অমৃত' পত্রিকার সততায় আমরা বিশ্বাসী। তাই আমার পত্রটি পত্রিকাস্থ না হ'লেও বারান্তরে শ্রীবৈকুণ্ঠ পাঠকের মতামত জানতে পেলে খুশী হব। সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিম পুঁটিয়ারী, কলিঃ—৪১।

কলকাতার যমজ বোন

২৯ এপ্রিলের 'অমৃতে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'কলকাতার যমজ বোন'। কলকাতার সঙ্গে হাওড়া শহরকে এমনভাবে তুলনা করতে সচরাচর দেখা যায় না। তাই একজন হাওড়ার অধিবাসী হিসাবে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। হাওড়া ও কলকাতা—পাশাপাশি দুটি শহর। মাঝখানে হুগলী নদী। কিন্তু কত তফাৎ এই দুটি শহরের মধ্যে। কলকারখানায় ভরা হাওড়ার মতো একটি ছোট্ট শহরে বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ গাদাগাদি হয়ে বসবাস করছেন। অপ্রশস্ত ভাঙাচোরা পথঘাট। তার উপর অসংখ্য বস্তি। খোলা নর্দমা ও খাটা পায়খানা সর্বত্র। কলকারখানার ধোঁয়ায় বাতাস বিষাক্ত। সি এম ডি এ এই শহরের নাগরিক জীবনের মান-উন্নয়নের জন্য যা করেছেন বা করছেন তাতে এই শহর কোনদিনই কলকাতার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। বস্তি অপসারণ ছাড়া সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। হাওড়া পৌরসভা শহরকে জঞ্জালমুক্ত ও পানীয় জলের জোগান দিতেই যেখানে অপারগ, সেখানে তার উপর উন্নত জীবনযাপনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার আশা কেউ করেন না। আপনারা ঠিকই লিখেছেন—'হাওড়াকে যদি আলাদা শহর না করে কলকাতার সঙ্গে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়, দুটি শহরই তা হলে হতে পারে সুখী ও সুসমৃদ্ধ। অজিতকুমার দাস, হাওড়া—৬।

(২)

সম্প্রতি অমৃতে প্রকাশিত 'কলকাতার যমজ বোন' সম্পাদকীয়টির জন্য সম্পাদককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বঞ্চিত হাওড়া শহরের জন্য তাঁর এই সহানুভূতি প্রশংসার যোগ্য। আমরা হাওড়া শহরের অধিবাসী। নোংরা পরিবেশের মধ্য থেকে কলকাতার উন্নতির চেষ্টার গন্ধ পাই। কলকাতার 'মহানগরী' আখ্যা পাবার পিছনে হাওড়ার দান অনেক। কিন্তু কোন দিক থেকেই হাওড়ার উন্নতির কোন চেষ্টা করা হয়নি। হাওড়া একটি বিরাট শিল্পনগরী। বিলেতের শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে এর তুলনা করা হয়। ভারতের শিল্পাঞ্চল জামসেদপুর, বোকারো, রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর আমি দেখেছি, কি সুন্দর সাজানো গোছানো সুস্থ পরিবেশ সেই শহরগুলিতে। আর সেই তুলনায় হাওড়াকে নরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। হাওড়ার জন্য সি, এম, ডি, এ, অবশ্য কিছুটা তৎপর হয়েছেন।

হাওড়ায় পরিবহণ ব্যবস্থা খুবই খারাপ, ট্রাম তোলার পরিবর্তে নতুন কোন বাসরুট বা বাসের সংখ্যা কোনটাই বাড়েনি। নোংরা পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর নর্দমা এখানকার মানুষকে ঘিরে রেখেছে। দেবব্রত ঘোষ, সালকিয়া, হাওড়া।

(৩)

আপনারা আশ্চর্য হয়ে গেছেন (কলকাতার যমজ বোন ২৯-৪-৭৭) যে, যাঁরা পরিকল্পনা তৈরী করছেন তাঁরা হাওড়ার সমস্যাটা মোটেই ভাবছেন না।

আমরা আশ্চর্য হচ্ছি যে, হাওড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবর না নিয়েই এ রকম মন্তব্য আপনারা করলেন কিভাবে।

হাওড়া সাবওয়ে (তিন কোটি টাকা), দ্বিতীয় হুগলি সেতু (৭৫ কোটি টাকা), বঙ্কিম সেতু (দেড় কোটি টাকা), দৈনিক চার কোটি গ্যালনের হাওড়া জল প্রকল্প (১০ কোটি টাকা), মলশোধন প্রকল্প (তিন কোটি টাকা) এবং দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে কোনা পর্যন্ত একটি রাস্তাসহ উপনগরী স্থাপনের (২০ কোটি টাকা) কথা কি আপনারা জানেন না? এর মধ্যে কয়েকটির কাজ শেষ আর বাকীগুলির কাজ চলছে। যেহেতু গ্র্যান্ডট্রাংক রোডকে চওড়া করা হয়নি সেহেতু কি এই দেড়শো কোটিরও বেশী টাকার প্রকল্পগুলি নিরর্থক?

এত কথা বলতে হল কারণ, সুবিচারের কথা আপনারা বলেছেন। আপনারা যা চান তাতে আপত্তি করছি না, আমরা যা করছি সেটা জানেন না বা জানবার চেষ্টা করেন না বলেই আপসোস হচ্ছে। সমর বসু, জনসংযোগ অফিসার, সি, এম, ডি, এ।

সমসাময়িকতা

আজকে কলকাতার রাস্তায় ঘুরলে চললে একজন কবি বা ঔপন্যাসিক অবশ্যই মনে মনে আন্দোলিত হবেন। সমসাময়িক ঘটনা বহু সময় লেখকের কলমে ভর করে।

এসব কথা মনে আসছে একটি কারণে।

পরাধীন ভারতে মুক্তির জন্যে আন্দোলন চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। তখন কোন লেখক তা নিয়ে গল্প লিখেছেন। কেউ লিখেছেন উপন্যাস। কেউ বা প্রবন্ধ। কারও বা হাতে এসেছে কবিতা।

এই লেখাগুলির একটি ধর্ম ছিল।

কোন কোন লেখায় তখনকার ঘটনার নির্যাস উঠে এসেছিল। কোন কোন লেখায় আগাগোড়া ঘটনাই উঠে এসেছিল।

২৫। ৩০ বছরের ব্যবধানে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল।

যেসব লেখায় ঘটনা আগাগোড়া উঠে এসেছিল—সেসব লেখা এখন আর পড়তে ভালো লাগছে না। বাসি লাগছে। মনে হচ্ছে—এর চেয়ে ইতিহাস পড়াই ভালো।

যেসব লেখায় তখনকার ঘটনার নির্যাস উঠে এসেছিল—সেসব লেখা তবু পড়া যায়। তুলনায়—মন্দের ভালো।

ব্যাপারটা এরকম হোল কেন?

আমাদের প্রিয় গ্রন্থগুলি আবার নাড়াচাড়া শুরু করে দিলাম। ধাত্রীদেবতা, অনুবর্তন, পুতুলনাচের ইতিকথা, নীলাঙ্গুরীয়, এমন ইত্যাদি।

বইগুলোকে দেখলাম—যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, সে সময় আর এ-পৃথিবীতে নেই। তবু এর ভেতর কোন লেখা আগের মত প্রিয় বোধ হচ্ছে না। আবার কোন লেখা আগের মতই সমান প্রিয় মনে হচ্ছে।

কারণটা খতিয়ে দেখতে শুরু করলাম। অনুসন্ধানে যা জেনেছি, তা হল—

(১) ঘটনা যেখানে প্রধান এবং বেশি করে সমসাময়িকতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে—সেখানে আর পড়তে ভালো লাগছে না। বুঝলাম, তখনকার সমস্যা, তখনকার যন্ত্রণা এখনকার সময়ের সঙ্গে মিশে যাবার মত সার্বজনীন হতে পারেনি।

(২) অনুবর্তনের যদু মাস্টার এখন আর সম্ভবত হয় না। কিন্তু পড়লে মন আচ্ছন্ন হয়। কেন হয়? খুঁজে দেখলাম। কারণ একটাই। যদু মাস্টারের লোভ, দুঃখ, মৃত্যুর কাছাকাছি হওয়া—সবই চিরকালীন। তাই যদু মাস্টারের মত চরিত্র আর না হলেও, এখনো আমায় স্পর্শ করছে।

(৩) ঘটনায় অনেক সময় স্থূলতার ধুলো মাখানো থাকে। যথার্থ শিল্পী ধুলো বাদ দিয়ে, বস্তুপুঞ্জ বাদ দিয়ে নির্যাসটুকু তুলে নেন। যেমন নিয়েছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুতুলনাচের ইতিকথায়। শশীর মৃত্যু কিংবা কুসুমের প্রত্যাখ্যান তাই এমন সময়োত্তীর্ণ লাগে। মনে হয় সমগ্র ব্যাপারটাই সমসাময়িকতা থেকে মুক্ত।

(৪) বনফুল পড়তে এখনো ভালো লাগে। বিস্ময় বোধহয় এই প্রবীণ শিল্পীর শক্তি দেখে। কিন্তু এ-কথাও বলা দরকার—তাঁর উপন্যাসের বিষয় সমসাময়িকতামুক্ত নয়। চরিত্রের বৈচিত্র্য আকর্ষণ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয়—এইসব চরিত্রের জগৎ তো আর নেই। এরা এখন কোন একটা বিশেষ সময়ের চরিত্র বলেই যা-কিছু মনোযোগ পেতে পারে। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

(৫) ধাত্রীদেবতায় প্রধান চরিত্রের আদর্শবাদ, ক্ষোভ, সংগ্রাম—সবই সমসাময়িকতায় জীর্ণ। রচনাটি শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আজও নবীন বলে মনে হচ্ছে না।

(৬) নীলাঙ্গুরীয় রবীন্দ্রোত্তর প্রথম যুগের ভালোবাসার গল্প। অনেক জায়গা পড়ার সময় মন ভার হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই পৃথিবী তো আর নেই। এই বর্ষীয়ান শিল্পী বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে বহু রচনা আজ আর পড়া যায় না। পড়তে ভালো লাগে না। অথচ নেকী, মতিলাল, কিন্নরদল অর্জুন মণ্ডল কিংবা মধুলিড় আজও পড়তে ভালো লাগে। বিভূতি বন্দ্যো, তারাশঙ্কর, মাণিক, বনফুল, বিভূতি মুখোর এই লেখাগুলিতে কোন আদর্শ, সংগ্রাম কিংবা ক্ষোভের কথা নেই। তবু কেন ভালো লাগছে?

ভালো লাগছে—কারণ, সমসাময়িক হয়েও এই রচনাগুলি সমসাময়িকতাকে পার হয়ে উঁচুতে উঠে গেছে।

এই প্রসঙ্গে আমার আরও কয়েকটি মহৎ লেখার কথা মনে পড়ছে। যেমন শবাগার (মতি), মহাপৃথিবী (সুনীল), নীলুর দুঃখ (শীর্ষেন্দু), একটি বৃক্ষের গল্প (সিরাজ), কানি বোষ্টমীর গঙ্গাযাত্রা (বরেন), মানুষের জন্য (প্রফুল্ল), জননী (বিমল কর), দিনকাল (রমাপদ চৌধুরী) ঈশ্বরের হাসি (সন্তোষকুমার), লোকটা (গৌরকিশোর), রাণু যদি না হোত (নরেন্দ্রনাথ), সব হিসেবের বাইরে (কবিতা সিংহ)।

কিছুকাল আগে দিব্যেন্দু পালিতের 'আমরা' গ্রন্থটি পড়বার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে দেখলাম—আমাদের যৌবনেরই ছবি। কখনো অপমান, কখনো গ্লানি, কখনো কিছু না হতে পারার গভীর দুঃখ কী গভীরভাবে দিব্যেন্দু তুলে ধরেছেন। বৈকুণ্ঠ অনেকদিন পরে দিব্যেন্দুর আঁকা চরিত্রের ভেতর নিজেকে দেখতে পেল।

প্রিয় পাঠক, কয়েকটি নামের দিকে লক্ষ্য রাখুন। শৈবাল মিত্র, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ রায়, শচীন দাশ, হীরক রায়, বিজনকুমার ঘোষ ও নবকুমার বসু।

এঁরা বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছেন। আরও ঘটাবেন। খুব শীগ্গিরি।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

সমালোচনা

অন্তরঙ্গ শরৎচন্দ্র

মেয়েমানুষের পেটে কথা হজম হয় না, ব্রহ্মশাপ আছে। এটা শরৎচন্দ্র বলেছিলেন রাধারাণী দেবীকে। ভাগ্যিস এই ব্রহ্মশাপটা ছিল। তাই তো রাধারাণীর লেখা শরৎচন্দ্র-বিষয়ক বইটিতে আমরা এমন অনেক খবর জানতে পারি যা হয়তো কখনো জানা হোতো না। মা সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অতো ভালো নয়। চেহারা আচরণ বিদোবুদ্ধি কিছুতেই তিনি অসামান্য নন। একজন লেখক, যিনি মহাকবি নন, ঋষি নন, গুরুদেব নন।

রাধারাণীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক কেমন ছিল এই বইয়ের ২৭ থেকে ২৯ এই চারটে পাতা পড়লেই সেটা বোঝা যাবে, যেখানে তিনি বিবাহের জন্য স্নেহের বাঁধনকে মর্মান্তিক করে ফেলতে বলছেন।

শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনটাই ছিল গল্প উপন্যাসের মতো। সেই আশ্চর্য জীবন থেকে কিছু টুকরো টুকরো ঘটনা বেছে নিয়েছেন রাধারাণী। তিনি শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'আমার মুখ থেকে আপনার যা একান্ত গোপন, তা বাইরে আসবে না।' সেই কথা তিনি রাখতে পারেননি। সেই শপথ ভঙ্গ করে রাধারাণী বাঙালীর বড় উপকার করেছেন।

রাধারাণীর নোতুন সংসারে শরৎচন্দ্র রাসের মেলা থেকে টোকা চুবড়ি আর কুলো নিয়ে আসেন। ময়রার দোকান থেকে রসগোল্লার সামাজিকতা করতে গেলে গেরস্ত ফতুর হয়ে যাবে, তাই শরৎচন্দ্র অর্ডার দিয়ে ওঁদের জন্যে কর্পূরে এলাচ দেওয়া খোয়া এনে উপহার দেন। ঐ বাউণ্ডুলে

লোকটার যে সংসারের সব প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটিতে এত নজর কে জানতো।

বইয়ের ১৯৪ পাতা রাধারাণীর লেখা। বাকি দশ পাতায় তাঁর সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কিত বিষয়ে গুণীজনদের যুক্তি বিচার মন্তব্য। 'বন্ধনহীন গ্রন্থি' 'অদৃশ্য তর্জনী' 'শেষের পরিচয়' এই তিনটি ভাগে বইটি সাজানো হয়েছে। হিরন্ময়ী দেবীর বিষয়ে মতামত জানাতে গিয়ে তিনি শরৎচন্দ্র নামক ব্যক্তিমানুষটির অস্তিত্বের সত্য পরিচয় রেখেছেন। যে-দেশে চরিত্র মানেই চরিতামৃত, সে-দেশের পাঠকের এটা ভালো না লাগারই কথা। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরন্ময়ী দেবীর আনুষ্ঠানিক কিম্বা আইনগত বিবাহ হয়নি। যিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনী তিনিই সব, তাই তিনি শালগ্রাম সাক্ষী রাখেননি। রাধারাণী এমন ঘটনাও উল্লেখ করেছেন যা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যিনি বিদ্রোহ করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে খুব শোভন নয়। প্রতিদিন তাঁর চরণামৃত মুখে ঠেকিয়ে তারপরে হিরন্ময়ী উপবাস ভঙ্গ করতেন। দৃশ্যটা ভাবুন। হিরন্ময়ী শরৎচন্দ্রের পায়ের কাছে একটা বাটি ধরেছেন, শরৎচন্দ্র বাটির জলের মধ্যে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে, আবার চটির মধ্যে পা'টা লুকিয়ে ফেলছেন।

রাধারাণীর লেখা কোনো গবেষণা নয়। সত্যের আলোয় একটা মানুষের সামান্য কিছু অংশ তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন। কারণ, মেয়েরা নিজেদের মনটা স্পষ্ট করে না চিনলেও, পুরুষের মনটা সহজেই বুঝে নেয়। যে জীবনযাপনে শরৎচন্দ্র ছিলেন অভ্যস্ত, সেই জীবনের ধ্যানধারণাটা তিনি যেমন বুঝেছেন, তেমনিই লিখে যাবার চেষ্টা করেছেন। কোনোরকম ভণিতা করেননি।

এ সেই সময়কার কথা যখন লোকে হাওড়া ব্রিজটা হেঁটে পার হোতো। শরৎচন্দ্র ইলিশ নিয়ে শোভাবাজারে যাচ্ছিলেন, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সেই ইলিশ নিয়ে লিলুয়ায় চলে এলেন। বালকের মতো অভিমানী এই লোকটা জীবনের বহু জায়গায় বারবার এভাবে 'হাইজ্যাকড' হয়েছেন। ভিতরের মানুষটাকে রাধারাণী বাইরে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন। এ-কথা বলতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি যে, এমন চড়া গুণের আর বেপরোয়া দোষের মানুষ তিনি বেশি দ্যাখেননি। এটা বুঝেছেন যে, সবটাই তাঁর বলা উচিত কিন্তু কোথায় যেন আটকে যায়, সবটা বলতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের সামনে এই লোকটি বিনয়ে নম্র, ভক্তের মতো মৌন। আর এই লোকটাই নিষিদ্ধ পল্লীতে কাটিয়েছেন রাতের পর রাত। কিন্তু রাধারাণী বিশ্বাস করেন শরৎচন্দ্র ওতো পল্লীতে ওদের ক্রেতা হয়ে আনাগোনা করেন নি। শরৎচন্দ্র সাপ ধরতে পারেতন, কি করে বিষদাঁত ভাঙতে হয় জানতেন। কিন্তু বিষকন্যায় এত আতংকিত কেন? তিনি সত্যিই বিষকন্যা ছুঁয়ে দ্যাখেননি? রাধারাণী বলেছেন শরৎচন্দ্র পতিতাদের সঙ্গে দেহের মোহে জড়িত ছিলেন না। তাঁর ধারণা, দেহের জন্য লোভী হলে পতিতাদের তিনি এত আন্তরিকভাবে দেখতে পেতেন না। আমার মনে হয়, এমনও হোতে পারে, দেহের সম্পর্ক ছিল না বলেই তাঁর পতিতারা কেউ পতিতা নয়, সকলেই উন্নীতা।

এই বিদ্রোহী যুবক এক অন্তঃপুরিকার বিভ্রান্ত চিত্তের ব্যথিত নির্দেশ মাথা নত করে পালন করে গিয়েছেন। কয়েকটি পরিচ্ছেদে রাধারাণী শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগটা বোঝাতে চেয়েছেন। ঠিকমত বোঝাতে পারেন নি। নিরুপমাই শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন, এখানে কখনো আসবেন না।

অনেক দূরে চলে যান, আমায় নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন। রাধারাণী দেখেছিলেন, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর ন'বছর পরে নিরুপমা তাঁর উপবাস শীর্ণ বুকে হু-হু করে কেঁদে ফ্যালে। এই নারী ঐ পুরুষের জন্য মর্মন্তুদ বেদনায় নিঃশব্দে নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে চলে গেলেন লোকচক্ষুর আড়ালে। বড় মমতায় এসব কথা বলতে বলতেই, এমন নিষ্ঠুর সত্যও তিনি স্বীকার করেছেন যে, যিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের লেখার প্রেরণা, তিনিই ছিলেন তাঁর শিল্পপথের বাধা। রাধারাণীর দৃঢ় বিশ্বাস শরৎসাহিত্য প্রবাহিত হত ভিন্ন খাতে, যদি নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের শিল্পযাত্রার প্রথম দিকেই অন্তর্হিতা হতেন।

পরিচ্ছেদের দিক থেকে আর পৃষ্ঠা-সংখ্যায় 'শেষের পরিচয়' নামক এই পুস্তকের তৃতীয় ও শেষ অধ্যায়টি সবচেয়ে দীর্ঘ।

শরৎচন্দ্রের মতো এমন অমধ্যবিত্ত অসামাজিক অথচ অপার্থিব মানুষ রাধারাণী তাঁর জীবনে আর কাউকে দ্যাখেননি। এই মানুষটিকে তিনি এঁকেছেন। ভারি সুন্দর হয়েছে সেই ছবিটা। সেই ছবিটা আছে বইয়ের প্রথম ১১০ পাতা জুড়ে।

প্রণয় শূর

শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প—রাধারাণী দেবী। দাম পনের টাকা।

ঋজু স্বচ্ছন্দ গদ্য

মোট দশটি গল্প আছে এই সংকলনে। এই দশটির মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে নিছকই 'ভালো হয়েছে'—এমনটা বলে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে স্বচ্ছন্দেই। পড়ে মনে বিশেষ কোন দাগ কাটে না। ঘটনা, চরিত্র ইত্যাদি কিছুই ভাবায় না। আবার কয়েকটি গল্প ঠিক বিপরীত। পড়ার পর মনে দাগ কাটে। ঘটনা বুকে মোচড় দেয়। চরিত্রগুলো, অন্তত মূল চরিত্রটিও তার জ্বলজ্বলে অস্তিত্ব নিয়ে চোখের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যেমন—বিশ্বাস, চুক্তি, নিষিদ্ধ শিকার, শবদ।

মা দাদা....সারা পরিবারের মনের গভীরে শেকড় গেড়ে ফেরার একটি তরুণের অস্তিত্ব টিকে আছে তারই কাহিনী বিশ্বাস। একসময় তার অস্তিত্ব প্রাত্যহিক জীবন আর চরিত্রগুলোকে তুচ্ছ করে বড় দারুণ হয়ে যায় তার মায়ের চোখে। এবং সেই মুহূর্তে পাঠক বড় রকমের এক ধাক্কা খেয়ে যান। পেটের জ্বালায় বোয়ের ইজ্জতের থেকে একেবারে শেষে 'ভাত'টা কি করে অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায় এক ভীষণ স্পর্শকাতর মানুষের কাছে, এবং তার মন মরে যায় তারই কাহিনী 'চুক্তি'। এই সমগ্র ব্যাপারটা পাঠককে এমন নিদারুণভাবে 'হন্ট' করে যে বলার নয়।

ঐ একই রকমটা হয় পাঠকের, চরম ক্ষুধার্ত পিতা ও কন্যার হাত থেকে লোভ জাগিয়ে দিয়ে নধর শূকরছানাটি যখন পালায়। এ যেন দুঃখে নির্দিষ্টকে, একবার দেখা দিয়েই আরও নিস্পিষ্ট করে সুখের পালিয়ে যাওয়া। (নিষিদ্ধ শিকার)

এক দুঃখী বাপ আর তার দুঃখিনী মেয়ে ময়না। অমানুষ স্বামীর যে ঘর করেনি উথালি-পাথালি বয়সের বয়সী মেয়ে, যার জীবনে শেষ পর্যন্ত এক প্রেমিক(!) পুরুষ আসে। এবং তাকে কিছুদিনের মতো ভরিয়ে দিয়ে চলে যায়। আর ফিরে আসে না। ময়নাকে দ্বিগুণ শূন্য করে দিয়ে। তবুও ময়না প্রত্যাশা করে 'এমন একটা ট্রেন সুখের ঠিকানা নিয়ে তাদের জন্যও আসবে।' যাতে চেপে সে আর ঠাকুর সিং চলে যাবে। কিন্তু সে ট্রেন আর আসে না। ময়নার ব্যর্থ প্রত্যাশা পাঠককে মনে মোচড় দেয়।

'শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র রায়, আই, এ (ক্যাল), এল, ডি, সি, পূর্ত ও গৃহ-নির্মাণ বিভাগ' হাত-পা বাঁধা মূর্খ সংসারী তাবৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে জ্বলজ্বল করে ওঠেন পাঠকের চোখের সামনে তীব্রভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। (আবার একজন)

দীপংকর দাসের গল্পকে হয়ে গেছে জটিল বিষয়ের থেকেও বেশি তাঁর ঋজু স্বচ্ছন্দ গদ্যের জন্যে। চৌকস প্রোডাকসন হিসেবেও বইটি পরিচ্ছন্ন মানের।

—গৌতম ভট্টাচার্য

দীপংকর দাসের গল্প। দীপংকর দাস। আবর্ত প্রকাশনী। কলকাতা-৪৭। পাঁচ টাকা।

আজ্র ঘ্মটা ভেঙে গেল।

সেই আগেকার রাত্রিগর্নলির মত অসোয়াস্তিকর অস্পষ্ট আশংকা। হঠাৎ মনে হলো মশারির চালটা যেন একটু একটু করে নিচের দিকে ঝুলে পড়ছে!....

কী আশ্চর্য! সমস্ত ঘরময় একটা প্যাতলা মিষ্টি গন্ধ যেন হাল্কা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। গলা সমেত মিষ্টি হয়ে আসে। ক্ষীণ অবসন্নতা একটা যেন পাতলা ঘুমের মত সমস্ত শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

মশারির চালটা নামছে, নামছে কাছে, আরো কাছে, একেবারে নাকের ডগা এবার ছোঁবে বুঝি!

কেমন সব গুলিয়ে আবছা হয়ে আসছে। তারপর?

তারপর এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের কিনারা করতে গোয়েন্দা আর পুলিশের দুর্ধর্ষ অভিযান। শেষ পর্যন্ত কানের পাশ দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী বেরিয়ে গেলেও অক্ষত গোয়েন্দা রহস্যের উদ্ঘাটন করে হত্যাকারীকে ধরে ফেললেন।

বাংলা সাহিত্যের অনেক নামী লেখকই একদা গোয়েন্দা কাহিনী লিখেছেন। তাঁদের নিয়েই আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি এ-লেখা লিখেছেন।
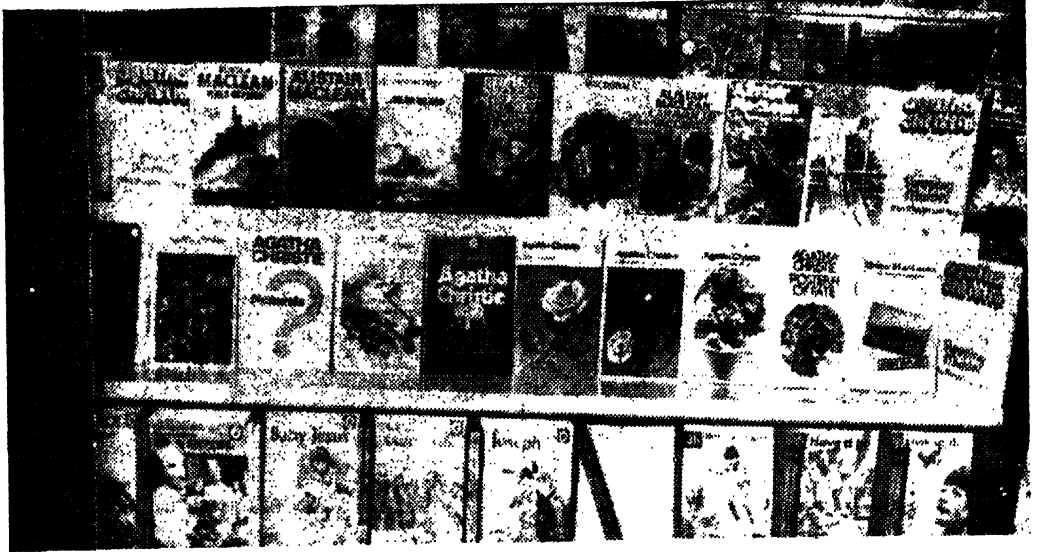
রহস্য সিরিজের রহস্য

"শয়ন কক্ষে মিরিয়ম বাঈ নিহত হইয়াছে। দেখিলাম, তাহার রক্তাক্ত দেহ তখনও রক্তপ্লাবিত গৃহতলে পড়িয়া রহিয়াছে। ছুরিকাঘাতে বক্ষঃস্থল দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর সেই ক্ষত মুখে চাপ্ চাপ্ রক্ত জমাট বাঁধিয়াছে। এবং উন্মুক্ত বিপুল কেশদাম রক্তে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। অনিন্দ্যসুন্দরী মিরিয়মের এই পরিপূর্ণ বিমল সৌন্দর্য রক্ত বিভীষিকায় এরূপ আচ্ছন্ন করিয়াছে যে, দ্বিতীয়বার সেদিকে চাহিতে ইচ্ছা করে না। আমার পৌঁছিবার অনতিবিলম্বে লাস সেখান হইতে চালান দেওয়া হইল।"

ওপরের ঐ শ্বাসরোধকারী বর্ণনা কে দিচ্ছেন? আধুনিক পাঠক তাঁর নাম শুনে থাকতে পারেন কিন্তু হয়তো ঠিক চিনতে পারছেন না। বর্ণনাটি দিচ্ছেন তরুণজী বলবন্ত কীর্তিকর। লেখক বলছেন, "বৃদ্ধ তরুণজী বলবন্ত কীর্তিকরের নাম জানে না—বোম্বে শহরে এমন লোক খুব কম। তিনি একজন নামজাদা ডিটেকটিভ। জটিল রহস্যপূর্ণ চুরি, জাল, খুন, ডাকাতি সংক্রান্ত যাবতীয় মোকদ্দমা তাঁহারই হাতে আগে আসিয়া পড়ে।"

কিন্তু লেখক কে? চিনতে পারলেন কি? নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত? যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু? দীনেন্দ্রকুমার রায়? না। এঁরা কেউ নন। লেখক হলেন সুবিখ্যাত পাঁচকড়ি দে, একদা যিনি ছিলেন গোয়েন্দা উপন্যাসের জনপ্রিয়তম লেখক এবং গোয়েন্দা বইয়ের বাজার তিনিই প্রায় একা দখল করে রেখেছিলেন। তখনকার দিনে তাঁর বই হাজার হাজার বিক্রি হত, সব বয়সের পাঠকপাঠিকাই তাঁর বইগুলি রুদ্ধশ্বাসে গিলতেন। পাঁচকড়ি দে আটাশখানি বই লিখেছিলেন, অনেকখানি হিট বই। উল্লেখযোগ্য বই হল 'মায়াবী', বারোটি সংস্করণ হয়েছিল এবং ছাপা হয়েছিল চব্বিশ হাজার; 'মায়াবিনী', বইটিরও বারোটি সংস্করণ হয়েছিল এবং ছাপা হয়েছিল চব্বিশ হাজার, 'নীলবসনা সুন্দরী'-র দশটি সংস্করণ বিশ হাজার ছাপা হয়েছিল। তাঁর বইগুলির মোট বিক্রয়সংখ্যা দুই লাক্ষেরও বেশি। তবে তখন বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকলেও পাঠকসংখ্যা এখনকার মতো এত ব্যাপক ছিল না।

তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত বই হল 'রঘু ডাকাত', 'পরিমল', 'হত্যাকারী কে?' 'সেলিনা সুন্দরী', 'মৃত্যু বিভীষিকা' ইত্যাদি। নির্বাকযুগে মায়াবী ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। বাংলায় ডিটেকটিভ কাহিনীর পাঠক পাঁচকড়ি দে মশাইই তৈরি করেছিলেন। তা নইলে পরবর্তী লেখকদের জন্যে আর পাঠক খুঁজে পাওয়া যেত না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ-এর দশকে তাঁর বইগুলির বিপুল চাহিদা ছিল। ত্রিশের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত তাঁর পাঠকসংখ্যা ছিল প্রচুর। তাঁর প্রধান ডিটেকটিভের নাম ছিল গোবিন্দরাম। যদিও এই গোবিন্দরামের সঙ্গে অবিস্মরণীয় সার্লক হোমসের সাদৃশ্য আছে এবং অনেক কাহিনীর সঙ্গে স্যার আর্থার কনান ডয়েলের কাহিনীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

কোনো কোনো বই তো প্রায় অনুবাদ বললেই হয়। কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণভাবে বঙ্গীকরণ করা হয়েছিল। পড়ে মনে হত ঘটনাস্থল এবং পাত্রপাত্রী যেন আমাদের দেশেরই। যেমন ধরুন 'মৃত্যু বিভীষিকা'। যদিও এর ঘটনাস্থল বীরভূম, কিন্তু বই পড়লেই বোঝা যাবে যে ইংলণ্ডের বাস্কারভিলকে পাঁচকড়ি দে নিয়ে এসেছেন সিউড়ির কাছে এক অরণ্যভূমিতে। কনান ডয়েলের হাউন্ড অফ বাস্কারভিলের সঙ্গে পাঁচকড়ি দের মৃত্যু বিভীষিকার কোনও পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু স্থান ও পাত্রপাত্রীর নামে। তা হক, তখনকার দিনে পাঁচকড়ি দে আমাদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন।

তাঁর লেখনী যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। তিনি হয়তো আরও লিখতেন কিন্তু শোনা যায় যে 'গল্প লহরী' সম্পাদক ফণীন্দ্র পালের ভাই ধীরেন পাল ছিলেন তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু, তাঁর লেখার প্রেরণা, উৎসাহদাতা। পাঁচকড়ি দের লেখা ধীরেনবাবু নাকি সংশোধন করেও দিতেন। এ হেন বন্ধুর মৃত্যুতে পাঁচকড়ি দে এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে তিনি লেখা ছেড়ে দেন, আর লেখেন নি।

তবে মানুষের রুচি পাল্টে যায়, নতুন লেখক ও নতুন রচনারীতির দিকে পাঠক আকৃষ্ট হয়, নতুনকে স্থান করে দিতেই হয়। তাই একদিন পাঁচকড়ি দে মশাইকেও বিদায় নিতে হল কিন্তু রেখে গেলেন কতকগুলি অবিস্মরণীয় বই। নীলবসনা সুন্দরী নামটি আমরা আজও ভুলি নি।

পাঁচকড়ি দের বইগুলি যদি বর্তমান প্রচলিত ভাষায় রূপান্তরিত করে নতুন করে প্রকাশ করা যায় তাহলে সেগুলি কি চলবে? চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? তবে আজকাল ক্রিমিনোলজির অনেক উন্নতি হয়েছে। গল্প বলার ধারাও পাল্টেছে। আজকালকার ডিটেকটিভরা অনুমান বা বুদ্ধি অপেক্ষা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। ক্রাইম ডিটেকশনে আজকাল ফোরেনসিক ল্যাবরেটরি, পুলিসের কুকুর ও অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ্যা সহায়তা করছে। ওদিকে অপরাধ ও অপরাধীদের কাজের ধারাও বদলে যাচ্ছে। নতুন নতুন রহস্য ও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

রবার্ট ব্লেক:

পাঁচকড়ি দে থাকতে থাকতেই আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন পল্লীচিত্র ও পল্লীবৈচিত্র্যের লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় রবার্ট ব্লেককে নিয়ে। রবার্ট ব্লেক অবশ্য তাঁর একমাত্র নায়ক ছিল না। 'জাল মোহন্ত' 'তিব্বতের বিভীষিকা' ইত্যাদি মোটা মোটা বেশ কয়েকখানি থ্রিলার তিনি লিখেছিলেন। যাদের নায়ক ছিল ডাক্তার ওকুমা। 'ওয়াইড ওয়ার্ল্ড' ম্যাগাজিন থেকেও তিনি প্রচুর অনুবাদ করেছিলেন।

রবার্ট ব্লেক সিরিজের প্রথম বই হল 'বিধির বিধান'।

সেকালে কলকাতার বাজারে 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামে একটি বিলিতি পত্রিকা পাওয়া যেত। নতুন দাম ছিল ৬ পেনি। আমরা ওয়েলিংটনের মোড়ে পুরনো বইয়ের দোকান থেকে এক আনায় অর্থাৎ এখনকার ৬ নয়া পয়সা দাম দিয়ে একসঙ্গে পাঁচ সাতখানা কিনে চার আনা ছয় আনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়ে বইগুলি বন্ধুবান্ধব মিলে পড়তুম। প্রতি সংখ্যায় একটি করে ডিটেকটিভ উপন্যাস থাকত। সেই সব ডিটেকটিভ উপন্যাসের ডিটেকটিভ থাকত সেকসটন ব্লেক, তার সহকারীর নাম ছিল টিংকার।

এই ইউনিয়ন জ্যাক ছিল দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "রহস্য-লহরী" সিরিজের মূল উৎস। 'ইউনিয়ন জ্যাক' ছাড়া 'সেকসটন ব্লেক' নামেও একটি সিরিজ প্রকাশিত হত। সেকসটন ব্লেক সিরিজ এবং 'ইউনিয়ন জ্যাক' পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক উপন্যাস 'রহস্য লহরী' সিরিজে অনূদিত হয়েছে। রহস্য-লহরী সিরিজ নদীয়া জেলার মেহেরপুরে রহস্য-লহরী প্রেসে ছাপা হত ও সেখান থেকেই প্রকাশিত হত। মেহেরপুর এখন বাংলাদেশে।

ইউনিয়ন জ্যাক বা সেকসটন ব্লেক সিরিজের উপন্যাসগুলি বিভিন্ন লেখক লিখতেন এবং প্রতিটির ডিটেকটিভ ও সহকারী সেকসটন ব্লেক এবং টিংকার। তবে লেখকদের নিজস্ব নায়ক নায়িকা ছিল। যেমন কারও ছিল পল মাইনস, কারও জর্জ মার্সডেন প্লামার, কারও র‍্যাট, ওয়াল্ডো বা মাদাময়জেল ইকোসেন।

কাহিনী অপরিবর্তিত রাখলেও দীনেন্দ্রকুমার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর নাম বদলে দিতেন। বইগুলির নামও ছিল বেশ মজার, যেমন সর্পের মধ্যে ভূত, ঝোপে ঝোপে নেকড়ে, পেত্নীদহে হীরা, রূপসীর প্রতিহিংসা। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কিছু কিছু বই এখনও পাওয়া যায়। দু-একজন প্রকাশক সেগুলি নতুন করে প্রকাশ করেছেন।

দীনেন্দ্রকুমার আক্ষরিক অনুবাদ করতেন না, যথেষ্ট স্বাধীনতা নিতেন, মাঝে মাঝে আবার মূল বই থেকে ইংরেজি

লাইন বা শব্দ তুলে দিতেন। ভাষা সরল ও দ্রুত পড়া যেত তাই বইগুলির পাঠক ছিল সর্বজনীন। তবে সেসময়ের কাহিনী এখনকার পাঠকেরা পছন্দ করবেন কি না তা তাঁরাই বলতে পারেন।

তখন প্রতিটি রহস্য-লহরী বইয়ের দাম ছিল বারো আনা অর্থাৎ পঁচাত্তর পয়সা। কাপড়ে বাঁধাই মলাট, তবে মলাটে বা ভেতরে কোনো ছবি থাকত না। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সমসাময়িক হলেন আর এক রায়, নাম হেমেন্দ্রকুমার রায়। হেমেন্দ্রকুমার মূলতঃ বড়দের জন্যে নানা বিষয়ে লিখতেন, উপন্যাস, গল্প, কাব্য, ফিচার। ছোটদেরও নিরাশ করতেন না।

ছেলেদের জন্যে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক থ্রিলার লিখলেন, নাম 'যকের ধন' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল ছেলেমেয়েদের পত্রিকা মৌচাকে আর সেই সঙ্গেই বিমল, কুমার, রামহরি ও বাঘা কুকুরের দুঃসাহসিক অভিযান শুরু হল। তারা 'আবার যকের ধন'-এ ফিরে এল, প্রফেসর বিনয়বাবুর সঙ্গে গেল মঙ্গলগ্রহে। সে কাহিনীর নাম হল 'মেঘদূতের মর্তে আগমন'।

যকের ধন, আবার যকের ধন, মেঘদূতের মর্তে আগমন ছাড়া 'মানুষ পিশাচ', 'রহস্যের আলোছায়া' এবং 'ড্রাকুলা' অবলম্বনে 'বিশালগড়ের দুঃশাসন' আজও জনপ্রিয়।

এ সময়ে সন্দেশ পত্রিকায় কুলদারঞ্জন রায় জুলে ভার্ণ-এর দি মিস্টিরিয়াম আইল্যান্ড-এর বাংলা আশ্চর্য দ্বীপ এবং স্যার আর্থার কনান ডয়েলের দি লস্ট ওয়ার্ল্ড-এর বাংলা আশ্চর্য দ্বীপ ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করে ঐ দুই লেখককে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের কাছে পরিচিত করিয়ে দেন। জুলে ভার্ণের কয়েকখানি বই এই সময়ে রাজেন্দ্রলাল আচার্যও অনুবাদ করেছিলেন।

বাংলা গোয়েন্দা পত্রিকা ঃ

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গোয়েন্দা-কাহিনী প্রকাশিত হতে থাকলেও বিদেশের মতো এদেশে কোনো গোয়েন্দা পত্রিকা ছিল না। অবিশ্যি বহুকাল পূর্বে ছিল 'দারোগার দফতর'। এই অভাব দূর করলেন মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। ১৯৩২ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে 'সাপ্তাহিক রোমাঞ্চ' প্রতি সপ্তাহে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করল। এই পত্রিকার বাজার ধরতে কিছু সময় লেগেছিল কিন্তু আজও পত্রিকাটি বেঁচে আছে সাপ্তাহিক আকারে নয়, মাসিক আকারে।

অনেক বিখ্যাত লেখক যথা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রণব রায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, রোমাঞ্চের পাতা ভরিয়েছেন। রোমাঞ্চক ঘিরে কিছু লেখকও গোয়েন্দা সাহিত্যে হাত পাকিয়েছেন যেমন মণি বর্মা, কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধর সেনাপতি, শোভন সোম ইত্যাদি। আরও দুখানি পত্রিকা দীর্ঘদিন চলছে, একখানি হল মাসিক রহস্য পত্রিকা এবং অপরটি হল মাসিক গোয়েন্দা। ইতিমধ্যে আরও কয়েকখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু সেগুলি উঠে গেছে। তবে ওপরের তিনখানি পত্রিকা ছাড়া বর্তমানে আরও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

সেই ত্রিশের দশকের যুগে শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীরাধারমণ দাশ প্রমুখ কয়েকজন প্রকাশক অগ্রণী হয়ে গোয়েন্দা সিরিজের বই চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই সব প্রকাশকদের জন্যে বেনামে প্রচুর বই লিখে দিয়েছিলেন। তবে ভাল গোয়েন্দা কাহিনী লেখকের অভাবে বা অন্য কোনো কারণে সিরিজ-গুলি চলে নি। অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মশাই স্বনামে ও বেনামে আজও লিখছেন।

এই সময়ে ছেলেদের জন্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কেউ কেউ রহস্য বা গোয়েন্দা লিখতেন। পরে ধীরেন্দ্রলাল ধর ছেলেমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

নতুন ধারা ঃ শরদিন্দু, শশধর

'প্রিজনার অফ জেন্দা' অবলম্বনে রহস্য-কাহিনী ঝিন্দের বন্দী নামে একখানি বই প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল চাহিদা। লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময়েই মাসিক পত্রিকার পাতায় সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সি আত্মপ্রকাশ করেছে।

সাহিত্য-পদবাচ্য বাংলা গোয়েন্দা-কাহিনীর প্রথম সার্থক লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। নিঃসন্দেহে তিনি নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন। কথায় কথায় পিস্তল, ছোরা বা বোমা পটকা বর্জন করে অথবা গোয়েন্দাকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী না করেও যে রুদ্ধশ্বাস কাহিনী লেখা যায় তার প্রবর্তন করেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারপর তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল মোহন সিরিজের বইগুলি। লেখক ছিলেন শশধর দত্ত। যুদ্ধের বাজারে 'মোহন' চমক সৃষ্টি করেছিল। মোহন সিরিজের বই ব্যতীত পাড়ার লাইব্রেরি চালানো সম্ভব ছিল না। মোহন সিরিজের বই আজও পাওয়া যায় কিন্তু তার সেই বিপুল জনপ্রিয়তার আংশিক পরিমাণও আজ আর নেই।

মোহন ছিল একটি কাল্পনিক চরিত্র, বাস্তবে যাদের দেখা পাওয়া যায় না। সে ছিল সর্ববিদ্যায় পারদর্শী সব্যসাচী এমন বিদ্যা ছিল না যা তার জানা ছিল না, এমন কৌশল ছিল না যা তার আয়ত্বে ছিল না। এমন কি এমন ভাষা ছিল না যা সে জানত না।

লেখক অনেক অবাস্তব ঘটনার অবতারণা করতেন, কাল্পনিক এমন সংকটের সৃষ্টি করতেন, যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু সেই সব সংকট হেলায়, তুচ্ছ করে, শত্রুকে বোকা বানিয়ে মোহন অবলীলাক্রমে বেরিয়ে আসত।

যেমন একবার এক দস্যু মোহনকে ভীষণ বিপদে ফেলল। একটি ঘরের চারদিক বন্ধ, মোহনের হাত বাঁধা, সামনে সাইলেনসার লাগানো রিভলবার হাতে মুখোশধারী দস্যু। পালাবার কোনো পথ

নেই, সবদিক বন্ধ, মোহনের আর উপায় নেই, তাকে এবার দস্যুর হাতে মরতেই হবে। এরপর কি হল?

মোহনের চোখ তো বন্ধ ছিল না। সে দস্যুকে হিপনোটাইজ করে ফেলল। দস্যু রিভলবার নামিয়ে রেখে মোহনের হাতের বাঁধন খুলে তো দিলেই এমন কি নিজের রিভলবারটি মোহনের হাতে তুলে দিল। তারপর? তারপর আর কিছু থাকতে পারে না।

রহস্যভেদী কিরিটি রায়ঃ

অপ্রতিহত গতিতে না হলেও জোর কদমে মোহন হয়তো আরও কিছুদিন চলত কিন্তু বাজারে এসে গেল কীরিটি রায়। তাকে আনলেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত। তাঁর ডিটেকটিভ উপন্যাস কালো ভ্রমর' পাঠক গ্রহণ করল কিন্তু অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভের জন্যে নীহাররঞ্জন গুপ্তকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাঁর 'উল্কা' নাটক মঞ্চে অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে নীহাররঞ্জনেরও জয়যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল।

মোহন যেমন এক শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ব্যোমকেশ বা কীরিটি রায় তা ছিল না। তাদের ভক্ত আরও ব্যাপক কারণ তাদের নিয়ে যেসব কাহিনী রচিত হত তার মধ্যে অবাস্তবতা বড় একটা দেখা যেত না। নীহাররঞ্জন গুপ্ত পেশায় চিকিৎসক এবং সেজন্যে তাঁকে বেশ কিছু সময় দিতে হয় তথাপি হোলটাইমার লেখক অপেক্ষা তিনি কিছু কম লেখেন না, বরঞ্চ বেশিই লেখেন। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ তাঁর লেখা দ্রুত পড়া যায়। কাহিনী রহস্যঘন এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য। বই বিক্রির হিসেব ধরলে কীরিটি রায় বোধহয় বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তম ডিটেকটিভ।

সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই ডিটেকটিভ উপন্যাস, থ্রিলার, মিস্ট্রি বা সায়েন্স ফিকশন লেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। প্রথমেই নাম করতে হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের। বোধহয় ১৯৩৩ সালে তিনি লিখেছিলেন ইয়েতি' নিয়ে কাহিনী হিমালয়ের চূড়োয়।' তখনও ইয়েতির নাম শোনা যায় নি। ইয়েতির ধারণাও জনসাধারণের ছিল না। তিনি লিখেছিলেন হিমালয়ের তুষাররাজ্যে এক জাতীয় মানুষ বিচরণ করে যারা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের 'ক্যামোফ্লেজ করে রাখে তারা তুষারের সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে থাকে। তাই তাদের দেখা যায় না কিন্তু তাদের উপস্থিতি অনুভব করা যায়, নিঃশ্বাস শোনা যায়, তুষারে পায়ের ছাপ পড়ে।

সায়েন্স ফিকশন ব্যতীত প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ডিটেকটিভ পরাসর বর্মাকে নিয়ে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসুও থ্রিলার লিখেছেন তবে তা ছেলেদের জন্যে। বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' এবং বুদ্ধদেবের 'ছায়া কালো কালো' বোধ হয় সকলেই পড়েছেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীও গোয়েন্দা উপন্যাস লেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি তবে একখানি। বইখানির নাম 'অবিশ্বাস্য'।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মূলতঃ কবি কিন্তু পাঠকমহলে তিনি ডিটেকটিভ অনুকূল বর্মাকে হাজির করেছেন। একদা তিনি ও প্রেমেন্দ্র মিত্র 'মৃত্যুচক্র সিরিজ' নামে নিয়মিত গোয়েন্দা উপন্যাস প্রকাশ করবার বাসনা করেছিলেন। প্রধান ডিটেকটিভ হবে পরাশর বর্মা।

আরও একজন কবি, তুষার রায়, মাঝে মাঝে গোয়েন্দা-কাহিনী লিখে থাকেন।

বিমল কর তো একদা প্রচুর গোয়েন্দা কাহিনী লিখেছেন আজ-কাল কমিয়ে দিয়েছেন। ছদ্মনামেও তিনি কিছু লিখেছেন। বিমল মিত্রকেও এই দলে ধরা যায়। তিনি মাঝে মাঝে রহস্য-কাহিনী লেখেন।

ইদানিং সমরেশ বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও মাঝে মাঝে গোয়েন্দা উপন্যাস লিখছেন।

প্রণব রায় প্রধানতঃ 'রোমাঞ্চ' পত্রিকাতেই গোয়েন্দা কাহিনী লেখেতেন এবং তাঁর উপন্যাসগুলি 'রোমাঞ্চ' প্রকাশনালয় থেকেই প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তাঁর এই বইগুলির যথেষ্ট প্রচার হয়নি। তিনি গীতিকাররূপেই অধিকতর পরিচিত।

গোয়েন্দা উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে সত্যজিৎ রায় ইদানীং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ছায়াছবির জগৎ থেকে অবসর পেলেই তিনি কলম ধরেন। গোয়েন্দা কাহিনী ব্যতীত তিনি সায়েন্স ফিকশনও লিখছেন। গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্তির ওরফে ফেলুদা, তপসে এবং জটায়ু নামগুলি ইতিমধ্যে মুখে মুখে ফিরছে। জটায়ু চরিত্রটি একটি অভিনব সৃষ্টি।

গোয়েন্দা কাহিনীর আরও লেখক আছেন যাঁরা প্রধানতঃ গোয়েন্দা, ভৌতিক, স্পাই কাহিনী, রহস্য বা থ্রিলার লিখে থাকেন। এঁদের মধ্যে নাম করতে হয় বীরু চট্টোপাধ্যায়, অদ্রীশ বর্ধন, দেবেশ দেববর্মা, কৃশাণু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশাচর, রবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর সেনাপতি, মণি বর্মা, রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, অমিত চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ চক্রবর্তী, সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ইনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নন), স্বপনকুমার, চিরঞ্জীব সেন, শোভন সোম এবং আরও অনেকে।

স্পাই, স্পাইচক্র যথা সি আই এ কেজিবি ইত্যাদির গোপন কার্যকলাপ ও স্মাগলিং চক্র নিয়ে 'বিক্রমাদিত্য' বেশ কয়েক দিন

তথ্যমূলক বই লিখেছেন। এইসকল বিষয়ে চিরঞ্জীব সেনের বই-গুলিও জনপ্রিয়। স্পাই-থ্রিলার ব্যতীত চিরঞ্জীব সেন গোয়েন্দা-কাহিনীও লেখেন।

কিছু বিখ্যাত বিচার-কাহিনী যেমন পাকুড় হত্যা মামলা, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা, পাগলা হত্যা মামলা, ইত্যাদি সারা দেশে যেমন সাড়া জাগিয়েছিল তেমনি এগুলি লেখকদেরও খোরাক যুগিয়েছে। চম্বলের দস্যু, শিকার-যুদ্ধ, ঠগী, পর্বত অভিযান ইত্যাদি নিয়েও যেসব বই লেখা হয়েছে সেগুলির বিপুল চাহিদা। অভিশপ্ত চম্বল, চম্বলের আতঙ্ক, রূপকুণ্ড রহস্য। নন্দাঘুণ্টি অভিযান, ঝিলে জঙ্গলে শিকার ইত্যাদি বইগুলি উল্লেখযোগ্য।

পুলিশ অফিসাররাও কলম ধরেছেন। অগ্রণী হলেন পঞ্চানন ঘোষাল। 'আনন ঘোষাল' ছদ্মনামে তিনি প্রথম বই লেখেন 'পিকপেকট'। শোভাবাজারে পাগলা হত্যাকে কেন্দ্র করে তাঁর বই 'রক্তনদীর ধারা' বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আরও কয়েকটি হত্যা কাহিনী অবলম্বন করে তিনি আরও কয়েকখানি বই লিখেছেন তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল 'অপরাধ বিজ্ঞান' এবং 'পুলিশ কাহিনী'। অপরাধ জগতের বহু তথ্যে ভরা বই দুখানি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের মধ্যে বিভূতি চক্রবর্তী, শশী রায়, এস নটরাজন এবং আরও কেউ কেউ লিখছেন। কয়েকজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার 'আরক্ষা' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করছেন।

বিদেশী লেখকদের মধ্যে আমাদের দেশে যাঁরা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন এডগার অ্যালান পো স্যার আর্থার কনান ডয়েল, এডগার ওয়ালেস, আগাথা ক্রিস্টি এবং জেমস হ্যাডলি চেজ। মূল ইংরেজি বইগুলি অপেক্ষা বাংলা অনু-বাদগুলির দাম বেশি তবুও অনুবাদ বইগুলির চাহিদা যেন বেশি।

হিসেব নিলে বোধহয় দেখা যাবে যে গোয়েন্দা বা রহস্য কাহিনীর চাহিদা বোধহয় শীর্ষে কিন্তু এইসব বইয়ের বিক্রি সংখ্যা যে কত তা একমাত্র প্রকাশকরাই বলতে পারেন কারণ বিক্রি রহস্য প্রকাশকরা কখনও ফাঁস করেন না।

রয়ালটি এবং কপিরাইট প্রথা দুই-ই চালু আছে। কপি-রাইটের বা সংস্করণ বাবদ টাকার হার হাস্যকর। জনপ্রিয় সিরিজের লেখক প্রতি বই বাবদ মাত্র পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা পেয়ে থাকেন। বই মোটামুটি বিক্রি হয় এবং বাজারে নাম আছে এমন লেখককে বই বাবদ মাত্র দুশো টাকা থোক দেওয়া হয়। তবে কপিরাইট লেখকেরই থাকে। অধিকাংশ গোয়েন্দা কাহিনী লেখকের এই হল শোচনীয় অবস্থা। বই বিক্রির পরিমাণ দেখে লেখকের আর্থিক সঙ্গতি বোঝা যায় না।

গোয়েন্দা-কাহিনীর একজন জনপ্রিয় লেখক দুঃখ করে বলেছিলেন, আমরা মশাই রেলওয়ে সাহিত্যিক। ট্রেনে ভ্রমণের সময় কোনো কোনো লোক রেল-স্টেশনের বুকস্টল থেকে আমাদের এক আধখানা বই দয়া করে কেনেন। ট্রেনে সময় কাটাবার জন্যে আমাদের বইখানা পড়েও ফেলেন। ভ্রমণ শেষ হয় বইখানার আর খোঁজ রাখেন না; সব ভুলে যান। আমাদের মশাই কেউ সম্মান দেয় না, না পাঠক না প্রকাশক।

খুন জখম বা অন্যান্য মামলার একবার উল্লেখ করেছি। আমাদের দেশে কতকগুলি বিচার সারা দেশে সাড়া জাগিয়েছিল

যেমন বম্বের বিখ্যাত মামলা 'বাওলা মার্ডার কেস' বা খুনী রামন রাঘবের হত্যালীলা, নানাবতীর মামলা, দিল্লির জৈন হত্যা, কলকাতা বা ঢাকায় ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা হত্যা রহস্য, রোশনলালের মামলা, পাগলা মার্ডার কেস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব মামলা নিয়ে কিছু বই প্র হয়েছে এবং বইগুলি পাঠকরা আগ্রহ সহকারে পড়েছেন।

গোয়েন্দা বা রহস্যকাহিনীর পাঠক সমাজের পাওয়া যায়। দিবানিদ্রাসুখ উপভোগ করবার আগে গৃহিণী একখানি গোয়েন্দা উপন্যাস বেছে নেন তেমনি একজন বিজ্ঞ ল্যাবরেটরির কাজ থেকে একটু অবসর পেলেই পকেট থেকে খানা রহস্য কাহিনী বের করে তার রহস্যে মগ্ন হয়ে বিজ্ঞানী যেমন একটা কোনো সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা ডিটেকটিভও তো তাই, সেও চেষ্টা করে একটা হত্যা সমাধান করতে। দুজনেরই লক্ষ্য এক। 'অমৃত' শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ একজন আগ্রহী পাঠক। রাজশেখর বসু ডয়েল ও জুলে ভার্নের একজন ভক্ত ছিলেন। কনান রহস্য-কাহিনীর রচনা সমগ্র তো তিনি কিনে পড়তেন। বঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল কৈলাশনাথ কাটজুকে কনান অথরিটি বলা হয়। 'অন্তর্জলী যাত্রা'-এর লেখক কমলকুমার মজুমদার আর একজন। অবসর পেলেই ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়েন। শুধু পড়া নয়, এক সময়ে নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতেন এবং কিছু ডিটে কাহিনীও লিখেছেন।

গাড়িটা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই যেন অবাক হয়ে তাকালাম। আমি জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম। জানালা দিয়ে বিল্টু ওর মুখটা বাড়িয়ে দিল। শুক্লা বিল্টুর গা ঘেঁষে তাকিয়ে। পাহাড়টা কাছে এগিয়ে আসছে। আর কয়েক মিনিটের ভেতরেই আমরা টানেলে প্রবেশ করব। টানেলের ভেতরটা ঠাণ্ডা। কেমন যেন স্যাঁতস্যাঁতে, দুদিকে পাথরের দেয়াল, দেয়ালের উপরে অন্ধকার। অন্ধকারের কথা ভেবেই সুরমা জানালার দিকে হাত বাড়াল। শার্সিটা টেনে নামিয়ে দিল।

গাড়িটা পাহাড়ের মুখে এসে গেছে। সুরমা আমাকে দেখল। আমি ক্লান্ত চোখে ওর দিকে তাকালাম। বিল্টুরা অবাক হয়ে পাহাড় দেখছে। পাহাড়টা যেন আকাশ ফুঁড়ে উপরে উঠে গেছে। উপরে পাহাড়ের মাথায় গোলাপী রোদ। রোদের ভেতরে মেঘের ছায়া। ছায়াগুলো উড়ে আসছে। মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে।

জানালা থেকে আমি ভেতরে সরে এলাম। সরে এসেই পেছনের দেয়ালে মাথাটা ঠেকিয়ে দিলাম।

শুক্লা বলল, 'বাবা, তোমার মনে আছে বাবা ট্রেনটা সেবার এখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল।'

সেবার লাইনে হাতি পড়েছিল। কোথা থেকে একটা দলছাড়া হাতি নেমে এসে-ছিল। গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তীব্র সিটি বাজিয়ে ইঞ্জিনটা শ্বাস ফেলছিল। আমরা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছিলাম নীল টুপি-পরা ড্রাইভার মাথা উঁচু করে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে কী দেখছে। একটু পরেই আমরা মুখ সরিয়ে এনেছিলাম। ততক্ষণে গাড়িটা আবার নড়ে উঠেছিল। নড়ে উঠেই চলতে শুরু করে-ছিল।

গাড়িটা ট্যানেলে ঢুকে পড়েছে। ভেতরটা এখন গমগম করছে। যেন রক্তের ভেতরে ঝমঝম শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সুরমা আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে আনল। আমার দু'চোখে ক্লান্তি জড়িয়ে আসছে। ক্লান্তিতে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সমস্ত দেহের ভেতরে যেন অবসাদ। খুব ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে বললাম, 'আমাকে একটু জল দাও না রমা। গলাটা যেন শুকিয়ে আসছে।'

সুরমা জল নিয়ে আমার কাছে এসে বসল। কপালে হাত রেখে বলল, 'তোমার কি শীত করছে? চাদরটা জড়িয়ে নেবে?'

জলের গেলাসটা ফিরিয়ে দিয়ে আমি মাথা নাড়লাম।

'তাহলে জানালাটা খুলে দিই। হাওয়া আসুক। একটু হাওয়া পেলেই—'

সুরমা জানালার দিকে হাত বাড়াল। শুক্লা চট করে শার্সি'টা তুলে দিল। তুলে দিতেই উড়ে এল হাওয়া। আমার ভাল লাগল। আমি ক্লান্ত শ্বাস ফেলে তাকালাম।

'এবার কিন্তু তুমি ছোটাছুটি করবে না বাবা। রেস্ট নেবে। বই পড়বে। আমি তোমার জন্য অনেক বই নিয়ে এসেছি।'

আমি শুক্লার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। শুক্লা আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে। ওর মুখের ডানদিকে আবছা অন্ধকার। অন্ধকারটা মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে। চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। শাড়ির উপরে কয়লার গুঁড়ো। বললাম, 'তুই একটু সরে বোস না শুক্লা, গায়ে কয়লা পড়ছে।'

শুক্লা একটু সরে বসল। আমি জানালা দিয়ে তাকালাম। গাড়িটা যেন থেমে আসছে। আস্তে আস্তে গতি কমে আসছে। বোধহয় কোন স্টেশন এল। 'বিল্টু দেখ তো এটা কোন্ স্টেশন?' সুরমা জিজ্ঞেস করল।

বিল্টু ঝুঁকে পড়ল।

ট্রেনটা সাপের মত গড়িয়ে চলেছে। একটা লাইন ছেড়ে আর একটা লাইনে ঢুকে পড়েছে। শব্দ হচ্ছে ঘটাঙ ঘটাঙ।

'বিল্টু এটা কোন্ স্টেশন?' সুরমা চোখ তুলে বিল্টুর দিকে তাকাল। বিল্টু আরও ঝুঁকে পড়ে মাথাটা বাড়িয়ে দিল।

'বই না পড়লে তুমি আমার সঙ্গে দাবা খেলবে বাবা। একটা কিছু না নিয়ে থাকলে তোমার শরীর ভাল থাকবে না। বিকেলে আমরা তোমাকে নিয়ে পাহাড়ে যাব। বাবা তুমি আস্তে আস্তে হাঁটবে। ডাক্তাররা বলেছে হাঁটতে। এক-আধটু না হাঁটলে—'

আমি শুক্লাকে দেখলাম। শুক্লা—সেই শুক্লা, কোমল লাবণ্যে ভরা একটা নিষ্পাপ মুখ, আমার মেয়ে শুক্লা কত বড় হয়ে গেছে। কতসব বুঝে ফেলেছে। ঠিক যেন ওর মায়ের মত। আমার স্ত্রী সুরমার মত।

সুরমার চুড়িতে ঠিন ঠিন শব্দ হচ্ছে। সুরমা কিসব টুকটাক গুছিয়ে নিচ্ছে। শুক্লা হঠাৎ হেসে উঠল।

'বাবা তোমার মনে পড়ছে সেবার ঝর্ণা দেখে ফেরার সময় তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েছিলে। ভয়ে 'আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।'

আমি প্রথমে অবাক হলাম। তারপরেই মনে পড়ল, হাঁটতে হাঁটতে সুরমার পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। আঙুলের মাথায় ঘষা লেগে ফোসকা পড়েছিল। ফোসকাটা আঙুরের মত—যে-কোন মুহূর্তেই টুসকি দিলে ফেটে যেতে পারে। তাই ফেরার সময় আস্তে আস্তে হেঁটে ফিরছিলাম আমরা। শুক্লা আগে আগে ছুটছিল। সবুজ ঘাসের ভেতরে ওর হলদে জামাটা ফুরফুর করে উড়ছিল। মনে হচ্ছিল যেন একটা প্রজাপতি উড়ছে। হঠাৎ আমার একটা মজা করতে ইচ্ছে হল। হাতটা গোল করে মুখের কাছে নিয়ে আমি চিৎকার করে ডেকে উঠলাম, 'শুক্লা রে বাঘ—বাঘ—পালিয়ে আয়—' শুক্লা হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। ভয় পেয়ে ছুটে এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। আমি তখনো হাসছিলাম। সুরমা আমাকে বকেছিল। ছেলেমেয়েদের অমন করে ভয় দেখাতে নেই। আমি কথা না বলে নিশ্চুপ হেঁটে ফিরছিলাম। তারপর পাহাড়ী রাস্তাটায় বাঁক নিতেই চোখে পড়ল এক মন্দির। সুরমা গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করল। তখন সন্ধে হয়ে আসছে। চারদিক নিস্তব্ধ। আকাশে কমলা রঙের মেঘ। শুধু মন্দিরের ভেতরে একটানা ঘণ্টা বেজে যাচ্ছিল।

ঢঙ ঢঙ করে স্টেশনে ঘণ্টা পড়ল। সবুজ ফ্ল্যাগটা উড়িয়ে হাত নাড়ছে গার্ড। তারপরেই বাঁশি বাজল। গাড়িটা আবার নড়ে উঠল। আমি বাইরে তাকালাম। বাইরের দৃশ্যটা বড় সুন্দর এখন। দূরে মাঠের ভেতরে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। রোদের ভেতরে একদিকে পাহাড়ের লম্বা ছায়া। সেই ছায়া ধরে হেঁটে যাচ্ছে একটা দেহাতি ছেলে। ছেলেটার মাথায় একটা গামছা আর হাতে লাঠি। লাঠিটার উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটা হঠাৎ অবাক হয়ে দাঁড়াল। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়চ্ছে একটা লোক। জল আনতে গিয়েছিল বোধহয়। দেরি হওয়ায় এখন দৌড়ে আসছে।

সুরমা বলে উঠল, 'বিল্টু দ্যাখ দ্যাখ—'

দেখতে গিয়েই আমি প্রথমে চমকে উঠলাম। জানালার উপর ঝুঁকে পড়ে লোকটাকে দেখে নিলাম। লোকটা দৌড়ে আসছে। অনেকটা ছুটে আসছে। ছুটতে ছুটতেই একটা হাতল ধরে ফেলল সে। তারপর একটা কামরার ভেতরে ঢুকে গেল। 'বিল্টু দেখলি না লোকটা কেমন ভয় পেয়েছিল। আর একটু দেরি হলেই—'

বলতে বলতেই সুরমা হঠাৎ হেসে উঠল। আমার দিকে তাকাল একবার। তারপরেই আবার বলল, 'তোর বাবাও এমনি নেমে পড়েছিল একবার। নেমে জল আনতে গিয়েছিল। হঠাৎ গাড়িটা ছেড়ে দিল। ভয়ে

আমি চমকে উঠেছিলাম। ততক্ষণে তে বাবাও দৌড়ে এসেছে। তারপর আ একটা হাতল ধরে ঝুলে পড়েছে। ট্রেন তখন বেশ স্পীড নিয়েছিল।'

গাড়িটা হঠাৎ স্পীড নিল। ঝমঝ করে এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে তী সিটি বাজিয়ে আবার ছেড়ে দিচ্ছে লাইনের উপরে শব্দ হচ্ছে। শব্দটা এক ঘেয়ে। কেমন বিরক্তিকর। জানালা থেকে আমি মুখটা সরিয়ে নিলাম। গাড়ি ঝাঁকুনিতে আমার কষ্ট হচ্ছে। এমনি কষ্ট হয় আজকাল। দেহটা যেন ভে পড়ে। পা কাঁপে। দু'চোখে জড়িয়ে আ ঘুম। ঘুমোবার জন্যই আমি দেহটা এলি দিলাম। আস্তে আস্তে চোখদুটো বু ফেললাম।

কিন্তু বুজতে না বুজতেই বিল্টু ডেকে উঠল, 'বাবা—বাবা—'

বিল্টুর চোখে কয়লা পড়েছে। আঙু দিয়ে চোখ রগড়াতে গিয়ে বিল্টু জিজ্ঞে করল, 'আমরা কখন পৌঁছব বাবা?'

'এখনও অনেকটা দেরি আছে— আমি ওর দিকে তাকালাম। তাকি বললাম, 'তুই এভাবে আর চোখ রগড়াস ন বিল্টু। রুমাল দিয়ে ভাপ দে। ভাপ দিলে দেখবি কমে যাবে।'

বিল্টু রুমাল খুঁজল। পকেটে হা ঢুকিয়ে তারপর রুমালটা টেনে আনল।

কামরাটা এখন ফাঁকা ফাঁকা। যাত্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একটা অবাঙা পরিবার অদূরে খাবার নিয়ে বসে। চোখে ফ্রেমের চশমা-পরা এক যুবতী সিনেম কাগজের ভেতরে মুখ ডুবিয়ে কি পড়ছে মাঝে মাঝেই হাওয়ায় কাগজের পাতাটা উ যাচ্ছে। উড়ে গেলেই কস্ট্যুম-পরা এক মেয়ের ছবি ভেসে উঠছে।

আমি ঘাড় ফিরিয়ে আবার কামরা দেখে নিলাম। কামরার ভেতরে এখন অন্ ছায়া। বাইরের আকাশটা কেমন মেঘলা মাঝে মাঝেই রোদ পড়ে আসছে। আব ফুটে বেরোচ্ছে। ওপাশে [illegible]না কম উত্তেজিত স্বরে কথাবার্তা বলছে। খনি ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটেছে। চাসনালায় এখ আকণ্ঠ জল। পাম্প করে আগে জল তো হবে। পরে উঠবে লাশ—পচাগলা দুর্গন্ ময়। ওরা পাতালে নেমেছিল। মন্ন কালো ভাঙাচোরা মানুষগুলো লিফটে ক আস্তে আস্তে নেমে গিয়েছিল। আর যে ফিরে আসেনি। ওরা কেউ আর ফি আসবে না।

টেলিগ্রাফের তারের উপর দি কেঁদে উড়ে যাচ্ছে এক চিল। দূ টিলার মাথায় রোদ চিকচিক করছে জানালা থেকে হাতটা আমি সরিয়ে নিলাম আমার হাতটা গুটিয়ে নিলাম। হাতটা রুগ্ন। শিরা-ওঠা দুর্বল একটা হা আমি ভয় পেলাম। ভাবলাম, আ আস্তে কত বয়স হয়ে গেল। আমি ব বুড়ো হয়ে গেলাম।

ট্রেনটা আবার থেমে আসছে। জানা দিয়ে বিল্টু মুখটা বাড়িয়ে দিল। শুে
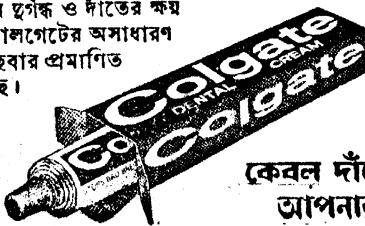
ওকে টেনে আনল, 'কি হচ্ছে কি বিল্টু?'

বিল্টু একটা হাসল। তারপরেই বলে উঠল, 'বাবা ওখানে মাঠ আছে বাবা? ছোট্ট একটা মাঠ থাকলেই চলে যাবে। রোজ সকালে উঠেই আমি প্র্যাকটিশ করতে পারব। বুকুদা বলেছে এই একটা মাস এখন ভাল করে বল নিয়ে দৌড়তে হবে। ভাল করে খেলতে হবে। তবেই আমাকে বুকুদার টিমে নিয়ে নেবে।'

বিল্টুটা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। বলবেই। এই তো বলার বয়স। এখনই তো তুরতুরিয়ে কথা বলবে। অথচ আমি কথা বলতে পারছি না। বলতেও ইচ্ছে করছে না। কেমন নিশ্চুপ ঝুম মেরে পড়ে থাকতে ভাল লাগছে।

'বাবা সেই বলটা আমি নিয়ে এসেছি। সেই যে তুমি সেবার কিনে দিলে। হ্যাঁ বাবা, এখনো ভালই আছে। একটুও নষ্ট হয়নি।'

বিল্টুটা এখনো বকে যাচ্ছে। ওর হয়তো ভাল লাগছে। কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। দেহের ভেতরে নেমে আসছে অবসাদ। গলাটা যেন শুকনো শুকনো। আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। আমি দেয়ালের গায়ে মাথাটা ঠেকিয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে তারপর শ্রান্তিতে চোখ বুজলাম।

চোখ বুজতেই চোখের ভেতরে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এল। অন্ধকার ঠিক নয়। কেমন আশ্চর্য একটা ছায়া-ছায়া ভাব। যেন অন্য এক বনভূমি।

বনভূমির ভেতরে শব্দ হচ্ছে। চারপাশে এখনো কারা ফিসফিস করে কথা বলছে। সুতোর মত জট পাকিয়ে যাচ্ছে কথাগুলো। হঠাৎ কোথাও একটা মৃদু শব্দ উঠল। অনেকটা শুকনো পাতার উপর দিয়ে হেঁটে গেলে যেমন শব্দ হয়। তবে কি কোন জানোয়ার? হাঁটতে হাঁটতেই এক সময় আমি থমকে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে পেছনে তাকালাম। অথচ কেউ নেই।

ঝরুকা বলেছিল এই বনে কোন জানোয়ার থাকে না খোকা। থাকার মধ্যে শুধু পাখি আর খরগোস। মাঝে মাঝে মহুয়ার লোভে দু'-একটা ভল্লুকও বেরিয়ে আসত। তাও আজকাল আর দেখা যায় না।

পাতার উপরে খস্‌খসে শব্দটা বাড়ছে। মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। আবার বাড়ছে। আমার একটু ভয় হল। ভয়ে ভয়েই আমি পা টিপে টিপে এগোলাম। কিন্তু কয়েক পা এগোতে গিয়েই হঠাৎ নজরে পড়ল ঝোপের আড়ালে একটা খরগোস। বোধহয় আমার পায়ের শব্দ পেয়ে গেছে। শব্দ পেয়েই কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি চট করে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম।

ডালিমের দানার মত লাল চোখদুটো ঘুরিয়ে খরগোসটা হঠাৎ চারদিকে তাকাতে লাগল। আমি চুপ করে তখনও দাঁড়িয়ে। ধবধবে খরগোসটা দেখে আমার লোভ লেগে গেল। ভাবলাম ধরি। কিন্তু ধরব কি করে। ঝরুকা থাকলে অন্তত ধরা যেত। ঝরুকার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। আস্তে আস্তে আমি পা বাড়ালাম।

কিন্তু শব্দ পেয়েই খরগোসটা তত-ক্ষণে দৌড়ল। আমিও ছুটতে লাগলাম। খরগোসটা লাফাচ্ছে। লাফাতে লাফাতে ছুটছে। আমি দৌড়লাম। ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে এদিক-ওদিক দিয়ে খরগোসটার পেছনে ছুটতে লাগলাম।

এক সময় ছুটতে ছুটতেই জঙ্গলের ভেতরে মিলিয়ে গেল খরগোসটা। হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালাম। তারপর চারপাশে অনেকক্ষণ খুঁজলাম।

ততক্ষণে বিকেলের আলো পড়ে এসেছে। বনের ভেতরে নেমে এসেছে অন্ধকার। চারদিকে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কোথাও একটা হরিয়াল ডেকে উঠল। এখন আমার ফেরা উচিত। এতক্ষণে সবাই আমাকে খুঁজছে। কিন্তু ফিরতে গিয়েই আমার ভয় হল। গা ছমছম করে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম।

বনের সরু পথটায় নেমে এসেছে অন্ধকার। চারদিকে পিনপিন করে মশার ঝাঁক উড়ছে। খরগোসটার পেছনে ছুটতে ছুটতে কখন যে এতটা ভেতরে চলে এসে-ছিলাম বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন একটু হেঁটে আসতেই দেখি রাস্তা নেই। তবে কি রাস্তা ভুল করলাম? ঝরুকা বলেছিল, জঙ্গলে কখনো একা একা যাবি না খোকা। রাস্তা ভুলে যাবি। একবার রাস্তা ভুললে—

কথাটা মনে পড়তেই আমি চমকে উঠলাম। আমার মুখটা ভয়ে শুকিয়ে গেল। এখন কি করব, কোথায় যাব বুঝতে পারলাম না। একবার ভাবলাম চিৎকার করে উঠি। চিৎকারটা আশেপাশের কেউ-না-কেউ ঠিক শুনে ফেলবে।

অথচ চিৎকার করতে গিয়েই ভয়ে চমকে উঠলাম। চোখে পড়ল দুটো নীল চোখ যেন অন্ধকারে এগিয়ে আসছে। যেন হুড়মুড় করে জঙ্গল কাঁপিয়ে ছুটে আসছে কেউ। আমার পা কাঁপতে লাগল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বুকের ভেতরটা যেন ভয়ে হিম হয়ে আসছে। মাথার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে অন্ধকার। বুঝতে পারলাম এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ত একটু পরেই আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাব। তার চেয়ে একটা কিছু করা দরকার।

কথাটা ভেবেই আমি দৌড়লাম। কিন্তু দৌড়তে গিয়েই মনে হল কে আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে। কারা যেন চিৎকার করছে। আর সামনে সেই দুটো নীল চোখ। চোখজোড়া আগুনের মত জ্বলছে। সামনে এগিয়ে আসছে। আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম। অথচ গলা থেকে কোন শব্দ বেরোল না। তবুও আবার চেঁচাতে গেলাম।

কিন্তু ততক্ষণে অনেকটা দূর থেকে যেন কার গলার শব্দ ভেসে এল—খোকা-আ-আ—খোকা-আ—

—বাবা-বাবা—

হুড়মুড়িয়ে হঠাৎ জেগে উঠেই দেখি ট্রেণটা আবার থেমে আসছে। শুক্লা আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে।

'বাবা, আমরা এসে গেছি বাবা। এবার আমরা নেমে পড়ব—'

জানালা দিয়ে তাকিয়েই দেখি গাড়িটা স্টেশনে ঢুকছে। এতক্ষণ তন্দ্রার ভেতরে কখন যে স্বপ্ন দেখছিলাম বুঝতে পারিনি। এখন একটু খেয়াল হতেই একটু লজ্জা পেলাম।

গাড়িটা একটা লাইন ছেড়ে আর একটা লাইনে এগিয়ে গেল। আস্তে আস্তে আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবার আমাদের নেমে পড়তে হবে। নেমেই প্ল্যাটফর্মটা পার হয়ে বাইরের ইউক্যালিপটাসের নিচে গিয়ে আমরা দাঁড়াব। ঝরুকা আমাদের জন্য টাঙ্গা নিয়ে আসবে। আমি এগিয়ে গেলাম। শুক্লা আমার হাতটা ধরল।

শুক্লার দিকে তাকিয়ে হাসলাম আমি। মেয়েটা যেন লক্ষ্মী। সবদিকেই ওর কড়া নজর। বললাম, 'এবার হাতটা তুই ছেড়ে দে না শুক্লা। এখন শরীরটা খুব ভাল লাগছে। হাঁটতে ইচ্ছে করছে।'

শুক্লা আমার হাতটা ছেড়ে দিল। গাড়িটা স্টেশনে দাঁড়াল।

কিন্তু প্ল্যাটফর্মে নেমেই দেখি ঝরুকা নেই। আমরা অবাক হলাম। ঝরুকার হল কি। এখানেই তো ওর আসার কথা ছিল। আমাদের জন্য এখানেই টাঙ্গা নিয়ে অপেক্ষা করবে লিখেছিল।

আমি সুরমার দিকে তাকালাম। 'কি হল বল তো রমা?'

বলতে না বলতেই ঝরুকা এসে হাজির। সেই সদাহাস্য প্রসন্ন মুখ। সেবার মহাল থেকে ফেরার সময় দাদু ওকে নিয়ে এসেছিল। হাঁটুর উপরে ছেঁড়া নোংরা ধুতি আর মাথার চুল কদম করে ছাটা—ঝরুকা মুখে হাসি ফুটিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল। আমি ঝরুকার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, দাদু ওর নাম কি দাদু? দাদু বলেছিল ওর নাম ঝরু। তোমরা সবাই ওকে ঝরু-কাকা বলে ডাকবে। তারপরেই দাদু হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে ঝরুকার পিঠে একটা হাত রেখে বলেছিল, ঝরু তুই ওদের দেখাশোনা করবি ঝরু। ওদের সঙ্গে খেলবি। চোখে চোখে রাখবি।

আশ্চর্য। ঝরুকার দিকে তাকিয়েই আমি অবাক হলাম। সেই ঝরু—ঝরুকারও মাথার চুলগুলো সব শাদা হয়ে এসেছে অথচ কালো দেহটা এখনো নীরেট, যেন পাথর কেটে বানানো একটা মূর্তির মত।

ঝরুকা বলল, 'খোকা একি চেহারা করেছিস তুই। কই সেবারও তো এমন ছিল না খোকা।'

আমি আপন মনে হাসলাম।

না না হাসি নয়। দাঁড়া খোকা এবার তোকে এখানে রেখে এমন মোটা বানিয়ে দেব যে তুই নিজেই চিনতে পারবি না।

চিনব কি—শহর আমাকে জীর্ণ করেছে। আমার যৌবন বয়সটা নিঙড়ে নিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে এই অকাল বার্ধক্য। এখন আমি প্রায় বৃদ্ধ। রক্তে তেমন আর জোর নেই। সবসময় মনে হয় যেন মাথার ভেতরে কে ঝিম মেরে বসে আছে।

ঝরুকা বলল, 'থাক খোকা এসব ভেবে আর লাভ নেই। এখানে দু'দিন বিশ্রাম নিলেই দেখিস সব সেরে যাবে। চল এখন যাওয়া যাক। চল বাবু—

বলতে বলতেই বিল্টুর একটা হাত ধরে ঝরুকা সামনে এগিয়ে গেল। আমরা এগিয়ে গেলাম।

সেবারও যখন এসেছিলাম বিল্টু তখন এক বছরের। ঝরুকা ওকে সারাদিন পিঠে নিয়ে ঘুরত। ওর সঙ্গে কথা বলত। ওকে ডাকত, বাবু—আয় বাবু—। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। সুরমা আমার দিকে চোখ তুলে হাসত।

বিল্টুটা প্রায় দৌড়চ্ছে। দৌড়ে গিয়েই টাঙ্গার উপরে উঠে পড়েই বিল্টু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা, দেখ কত বড় মাঠ পড়ে আছে বাবা।'

আমি বিল্টুর দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

ঝরুকা বলল, 'শুধু মাঠ নয়। মাঠ ছাড়াও এখানে ঝরণা আছে। পাহাড় আছে। তুমি যাবে বাবু—দাঁড়াও কাল বিকেলে তোমাকে নিয়েই আমি পাহাড়ে যাব। ঝরণা দেখিয়ে আনব।'

ঝরণার কথায় মনে পড়ল, একদিন ঝরণা দেখে ফেরার পথে আমরা থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম দুই পাহাড়ের মাঝখানে জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা ট্রেন আসছে। কেমন গমগমে শব্দ হচ্ছে। আর ইঞ্জিনের জোরাল আলোয় অদ্ভুত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চারদিকটা। যেন সমস্ত জঙ্গলটা কেউ আলো দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। যেন একটা নেশায় পেয়েছিল আমাদের। তাই আমরা রোজ সেখানে যেতাম। গিয়ে দেখতাম সেই দৃশ্য।

বাইরের দৃশ্যটা বড় সুন্দর এখন। বিকেলের আলো ফুরিয়ে এসেছে। চারদিকে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। আর সেই আধো অন্ধকারের ভেতরেই একটু একটু করে আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে একটা অপুষ্ট চাঁদ।

আমার ভাল লাগল। দৃশ্যটা মাথার ভেতরে যেন ছবি হয়ে বসে গেল। তারপরেই আমি দেহটা এলিয়ে দিলাম। এলিয়ে দিয়েই চোখদুটো বুজতে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে চলন্ত টাঙ্গার সামনে থেকে যেন বিল্টুর গলা ভেসে এল। বিল্টু বলল, বাবা, দেখ কতবড় পাহাড়। কালকে আমরা সবাই মিলে ওই পাহাড়ে যাব। বাবা, তুমি যাবে বাবা ?

পরের দিন সবাই আমরা পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। তখনো বিকেল ফুরোয় নি। আকাশটা ঝকঝকে। অদূরে পাহাড়ের মাথায় সোনালী রোদের আভা।

হাঁটতে হাঁটতেই আমরা অনেকটা এগিয়ে গেলাম। সেখানে পৌঁছে গেলাম। আর একটু হাঁটলেই আমরা টিলার উপরে পৌঁছে যাব। টিলার ওপাশেই সেই ঝরণা। ঝরণার ভেতর থেকে দুদিকে দুটো পাহাড়ের রেঞ্জ। আর তারই ভেতর থেকে লাইনের উপর দিয়ে যখন গাড়ি আসে তখন অপূর্ব লাগে। একটা গমগমে শব্দ চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। ইঞ্জিনের আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমি তাড়াতাড়ি পা চালালাম। আমার আগে আগে বিল্টু। বিল্টুটা মাঝে মাঝে দৌড়ে যাচ্ছে। ফাঁকা মাঠ পেয়ে মনের সুখে ছুটছে। আমার ইচ্ছে হল বিল্টুর মত আমিও ছুটে যাই। ছুটে গিয়েই ওকে ধরে ফেলি।

কিন্তু সুরমা বলল, তুমি জোরে জোরে হেঁটো না। আস্তে হাঁটো। ডাক্তাররা বলেছে তোমাকে আস্তে হাঁটতে।

আমি একটু থমকে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়েই সুরমার দিকে তাকিয়ে কি বলতে গেলাম। কিন্তু তার আগেই শুক্লা বলল, একটু ভাল থাকলে আর তোমার মনে থাকে না বাবা।

সত্যিই মনে থাকে না। আজ আমার কিছুই মনে থাকছে না। সব কিছুই ভাল লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে অনেক দূরে কোথাও চলে যাই। ইচ্ছে মতন যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই।

বললাম, এখন আমার ভাল লাগছে শুক্লা। তাই একটু জোরেই হাঁটছি।

কিন্তু ঝরুকা বলল, না খোকা অত জোরে হাঁটিস না। এখনো শরীরটা তেমন সারে নি।

ঝরুকার কথায় আমি একটু দমে গেলাম। ততক্ষণে পাহাড়ের পেছনে ডুবে গেল সূর্যটা। বিকেলের আলোটাও দ্রুত গলে গলে চকলেটের মত। একটু পরেই আবার নেমে আসবে অন্ধকার। নেমে এলেই আমাদের ফিরে যেতে কষ্ট হবে।

কথাটা ভেবেই আমি একটু দাঁড়ালাম। হয়ত দাঁড়িয়েই কিছু একটা বলতে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটা দূরে থেকে বিল্টুর গলা ভেসে এল। 'বাবা কিসের শব্দ হচ্ছে বাবা ?'

শুনেই আমি চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখলাম বিল্টুটা সেই টিলার উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে।

আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। আমি কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম। হুঁ, কেমন একটা শব্দ হচ্ছে। বোধহয় একটা ট্রেন আসছে।

'দাঁড়া বিল্টু আমি আসছি'—হঠাৎ আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। তারপরেই হঠাৎ টিলার দিকে ছুটে গেলাম।

'বাবা একি করছো বাবা ?' শুক্লা আচমকা চেঁচিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠেই আমার দিকে এগিয়ে এল।

আহ্! মেয়েটা যেন সবসময় পিছু নেবে। এই একটা স্বভাব ওর। সবসময় আমাকে চোখে চোখে রাখবে। আমি একটু জোরে পা চালালাম। গাড়িটা বোধহয় এসেই গেল। গমগমে শব্দটা বাড়ছে।

'খোকা একটু আস্তে খোকা'

ঝরুকা আমার পেছনে আসছে। সুরমা বোধহয় কি যেন বলে উঠল। সুরমার কথাগুলো কান্নার মত শোনাল। কিন্তু আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আমি ছুটতে লাগলাম।

'বাবা! বাবা ওই যে সেই শব্দটা!' বিল্টুটা এখনো আনন্দে চেঁচিয়ে উঠছে।

বিল্টুর গলার স্বরটা যেন অনেকদূর থেকে ভেসে আসছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, বিল্টু দ্যাখ ট্রেন আসছে। এবার দেখবি কি মজা হয় বিল্টু।'

বলতে বলতেই আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। বিল্টুর কাছে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়লাম।

গমগমে শব্দটা বেড়েই চলেছে। পাহাড়টা যেন গুড়গুড় করে কেঁপে উঠছে। যেন এখুনি একটা তাণ্ডব এসে গড়িয়ে পড়বে।

অথচ আমি হাঁপাচ্ছি। ভাল করে কথাও বলতে পারছি না। সারা শরীরটা ঘামছে। বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছে। টিলার উপরে উঠেই আমি মাথা গুঁজে বসে পড়লাম। এখুনি না বসলে—

কিন্তু সেই মুহূর্তেই ট্রেনটা হঠাৎ বেরিয়ে এল।

'বাবা-বাবা ওই দেখ ট্রেন—' বিল্টুটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

'ইস্!' ঠোঁটের উপরে আঙুল তুলে আমি বিল্টুকে থামিয়ে দিলাম। তারপরেই নিচু হয়ে মাথাটা বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু একি!

একটা অন্ধকার সরীসৃপের মত ট্রেনটা গড়িয়ে আসছে। অথচ একফোঁটা আলো নেই। শব্দও হচ্ছে না এখন। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না আমি। 'বাবা—বাবা এটা কোন ট্রেন বাবা ?' বিল্টুর গলাটা তৎক্ষণে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল।

লীলা মজুমদার

॥ ৫ ॥

১৯১৪ সাল, ছয় বছর বয়স। পড়ি কিণ্ডারগার্টেনে : ইংরেজি, অঙ্ক, ছবি আঁকা, নেচার স্টাডি আর রঙিন রেশমী সুতো দিয়ে কার্ড বোর্ডে আঁকা ছবি সেলাই, হলদে কেটলি, গোলাপী টিকটিকি, এইসব। ভয়ানক ভালো লাগত। আস্তে আস্তে স্কুল অভ্যাস হয়ে গেল, সকাল ন'টা থেকে বেলা তিনটে, মধ্যিখানে বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা টিফিনের ছুটি, তখন ক্লাসে বসে থাকা বারণ। পড়ার নিয়ম ভালোই বলতে হবে। দিদিকে আমাকে আলাদা বসিয়ে কয়েক মাসের মধ্যে ইংরিজিতে রপ্ত করে দিল। বছর শেষ হবার আগেই আমরা গড়গড় করে ইংরিজি বলতাম। বছরের শেষে আমাদের একটা ক্লাস ডিঙিয়ে স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ানে তুলে দিল। তখন আর আলাদা বসানো নয়।

ততদিনে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব জুটেছিল। আরো ক'টি বাঙালী মেয়ে জুটেছিল, প্রায় সবাই আমাদের চেনা। দশ বছরের নিচে ছেলেরাও পড়ত, বোর্ডিং-এও থাকত। তারা প্রায় সবাই খুব ভালো ছিল। মেয়েগুলোর মধ্যে কেউ কেউ আমাদের নেটিভ নিগার বলত, ব্ল্যাক বলত। টিচার-দের মধ্যেও কেউ কেউ নিগার না বললেও, ভারি অসম্মানজনক ব্যবহার করতেন। রাগে আমার গা জ্বলে যেত। মাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'নেটিভ তো খারাপ কথা নয়। নেটিভ মানে এই দেশে যাদের জন্ম।' মানেটা ভালো হতে পারে, কিন্তু ঘৃণাটা চিনতে একটুও দেরি লাগত না। খানিকটা হিংসার ব্যাপার ছিল এর মধ্যে, কারণ বাঙালী মেয়েরাই সব ক্লাসে প্রথম স্থান, দ্বিতীয় স্থান নিত।

আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম পাকা মেমরা ভালো আর আমাদের ঘৃণা করে যত ফিরিঙ্গী টিচাররা। ঐটুকু বয়সে এই নিয়ে আমার মনে যে কত তিক্ততা জমে ছিল, এখন ভাবলে নিজেরি আশ্চর্য লাগে। আমিও ফিরিঙ্গীদের কম ঘেন্না করতাম না। ভারি লোভী ছিল ওরা! কারো কাছে কোনো ভালো জিনিস, রিবন, ক্লিপ, পুঁতির মালা রঙীন পেন্সিল, যাই হক না, দেখলেই বলবে, দাও দাও, আমাকে দাও। যীশুর কাছে একটা পাপ স্বীকার করে, আমাকে ওটা দিলেই তোমার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে। যীশু বড় দয়ালু। তা না-হয় বুঝলাম, কিন্তু যীশু দয়ালু বলে তোকে আমার জিনিস দেব কেন, সেইটে বুঝতে পারতাম না। তাছাড়া সে-রকম পাপটাপের কথা মনেও পড়ত না। বাবা পাপের জায়গা রাখলে তবে তো, কিছু করলাম কি না-করলাম, এক চড়ে ভূত ভাগিয়ে দিতেন। মেয়েগুলো জিনিস আদায় করতে না পারলে চটে গিয়ে আমাদের টুপি, বই, শ্লেট লুকিয়ে রেখে দিত। তখন আমার বেজায় কান্না পেত। ঐ একটা শিক্ষা হয়ে গেছিল, লোককে ঘৃণা করা। আবার বেজায় ভালো সব ছেলেমেয়েও ছিল। একদিন মিছিমিছি ড্রইং ক্লাসে বকুনি খেয়েছি, কিছুতেই কাঁদব না, গলার ভিতরে ব্যথা করছে। এমন সময় ওলাম সিং নামের একজন ছেলে, সে নাকি খাসিয়া রাজার ছেলে, আমার হাতে ছোট্ট একটা পেতলের ক্রুশ গুঁজে দিয়ে বলল, 'তোমার রবারটা দিয়ে এই দাগটা একটু মুছছি, কেমন?' ওর দিকে চেয়েই বুঝলাম, আমার জন্য ওর দুঃখ হয়েছে বলে ক্রুশটা দিচ্ছে। বলা বাহুল্য, দু'জনার মধ্যে কেউ-ই খ্রীশ্চান ছিলাম না।

খ্রীশ্চান না হলেও বেজায় যীশু-ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম দিদি আর আমি। রোমান ক্যাথলিকরা ধর্ম জিনিসটাকে রূপ-রস দিয়ে এমন সুন্দর করে ঘিরে রাখে যে, ভক্ত না হয়ে উপায় ছিল না। ফিরিঙ্গী মেয়েরা গলায় চওড়া নীল রিবনে সেন্টদের নাম-লেখা দস্তার মেডেল, পেতলের ক্রুশ ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখত। আমাদেরো বড্ড ইচ্ছা করত, কিন্তু বাড়িতে যে ও-সব চলবে না, সেটা ভালো করেই জানতাম। চমৎকার সব সোনালী পাড়-দেওয়া ছবি রাখত মেয়েরা, ওদের প্রেয়ার-বুকের পাতায় পাতায়। আমি আর প্রেয়ার-বুক কোথায় পাব, একটা বিস্কুটের টিনে অনেক ছবি জমিয়েছিলাম। কি সুন্দর যীশুর মায়ের মুখ, তাঁর দুঃখে আমাদের বুক ফেটে যেত। কত যে চমৎকার সব গল্প বলতেন নানরা, মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। ভগবানের জন্য কত বেদনা সয়েছিলেন সেন্টরা, কিন্তু মা মেরীর মতো কেউ নয়। আজ পর্যন্ত যীশুর প্রেমের মন্ত্রের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা। মাদার মার্গ[...] একদিন বাইবেল থেকে বলেছি[...] 'চাইলেই, লাভ করবে। খুঁজলেই, প[...] দরজায় ঘা দিলেই, দরজা খুলে যাবে।' [...] যে ভালো লেগেছিল কথাগুলো, ব[...] পারি না। তার ওপর স্কুলবাড়ি [...] বোর্ডিং-এর মধ্যিখানে কতকগুলি [...] ছিল তাতে নানরা থাকতেন। তারি [...] ছিল চ্যাপেল, প্রার্থনার ঘর। সে[...] খ্রীশ্চান অ-খ্রীশ্চানের অবাধ গতি। [...] সে কি চমৎকার জায়গা সে আর কি ব[...] মেঝের ওপর পুরু গালচে, চারি[...] সুন্দর সব মূর্তি, ছাদ থেকে ঝাড়[...] ঝুলছে, বেদীর ওপর সোনালী-রূপে[...] সব সামগ্রী, যেদিকে চোখ ফেরানো [...] কেবলি যীশুর মুখ। মায়ের কোলে [...] যীশু, পণ্ডিত সমাজে কিশোর যীশু, [...] রাতে শিষ্যদের নিয়ে টেবিলে বসে আ[...] যীশু আর সবচাইতে বেদনাময় কাঁ[...] মুকুট পরে ক্রুশ কাঁধে যীশু, তা[...] ক্রুশবিদ্ধ যীশু। কি যেন একটা সু[...] ভাবে আকণ্ঠ ভরে যেত। ছোট-বড় ফু[...] দানিতে ফুলের গোছা, ধূপ-ধুনোর গ[...] নানদের দীক্ষার দিনে তাঁদের জন্য প্রা[...] হত, আমরা ফুল নিয়ে যেতাম, তাঁ[...] দেবার জন্য। বলতেন, 'যাও, চ্যা[...] গিয়ে দিয়ে এসো, তবেই সবচাইতে ভ[...] হবে।' চ্যাপেলের দরজা বন্ধ থাকত, কি[...] ঠেললেই নিঃশব্দে খুলে যেত। এ[...] নান অমনি এগিয়ে আসতেন, তাঁর হ[...] ফুল দিতাম, তিনি আমাদের কপালে [...] ফোঁটা জর্দান নদীর জল ছুঁইয়ে দিতে[...] মন ভরে যেত!

মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্মদের [...] ফুল দিয়ে সাজানো ন্যাড়া মন্দির[...] আকর্ষণীয় কিছু পেতাম না। কলকা[...] পাড়ায় দুর্গাপুজোর সময় ঠাকুরকে [...] ঢাক-ঢোল পেটানোর মধ্যে রঙ[...] থাকলেও, চ্যাপেলের সেই নিবিড় শা[...] লেশমাত্র পেতাম না। অথচ যীশ[...] ঈশ্বরের পুত্র বলেও মন মান[...] না। [...] পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানি[...] ধর্ম অ[...] মনে স্থান পায় না। শুধু মাঝে [...] রবীন্দ্রনাথের গানের সেই কথাগুলি [...] হয়, 'এসো আমার ঘরে এসো, [...] আমার ঘরে, বাহির হয়ে এসো তুমি [...] আছ অন্তরে।' আমাদের ক্লাসের দে[...] একটা মস্ত রঙীন ছবি ঝোলানো [...] ছোট্ট একটা ছেলে পুকুরের জলের [...] বড্ড বেশি ঝুঁকেছে আর তার পি[...] দাঁড়িয়ে, তার গার্ডিয়ান এঞ্জেল [...] ধরবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। ন[...] বলতেন, সক্কলের একজন করে গার্ডি[...] এঞ্জেল থাকে, তাকে বাঁচাবার জন্য, সৎ[...] রাখার জন্য। ভাবতাম তাহলে গার্ডি[...] এঞ্জেলরা সবাই নিশ্চয় সমান দক্ষ [...] আমার গার্ডিয়ান এঞ্জেল নিশ্চয় অ[...] ওপর খুব চটা।

এইভাবে সে বছরটা শেষ হয়ে ১[...] সাল শুরু হয়ে গেল। বাড়িতে মা-ম[...] মুখে মাঝে মাঝে শুনতাম ইউরোপে [...] হচ্ছে। আমাদের নতুন আয়া ই[...]

প্রায়ই বলত, 'আমার ভাই ফ্রাংস-এ গেছে লড়াই করতে। আমার ছেলে হেডিক্সনের বাপ ফ্রাংস-এ গেছে, এখন আর তার কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।' আমাদের গায়ে লাগত না, এ যুদ্ধ রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধের মতো অনেক দূরের জিনিস। তারপর একদিন স্কুলের পাশে বড় গির্জাতে যুদ্ধে যারা প্রাণ দিচ্ছে তাদের জন্য উপাসনা হল। যুদ্ধটা যেন একটু কাছে সরে এল। আজকাল আমাদের সেলাই ক্লাসে উল-বোনা শেখানো হত। শুনলাম সোলজারদের জন্য গলা-বন্ধ বোনা হবে, ফ্রান্সে লড়াই হচ্ছে, সেখানে বড্ড শীত।

আরো শুনলাম মেমরা, অর্থাৎ আমাদের ফিরিঙ্গি সহপাঠিনীরা, বুনবে সায়েব সোলজারদের জন্য, স্কুল থেকে তাদের খাকি উল দেওয়া হল। মাদার হায়াসিন্থ নিয়ে ফরাসী মেয়ে, তিনি আমাদের সেলাই শেখাতেন, এমন চমৎকার সেলাইয়ের হাত কম দেখেছি। তিনি বললেন, 'তোমরা ইন্ডিয়ান সোলজারদের জন্য বুনবে। বাড়ি থেকে উল কিনে নিয়ে এসো।' বাবা তখন ট্যুরে, যামিনীদা উল কিনে এনে দিল। সে আমাদের রান্নার লোক হলেও, বাবা-মার পরেই তার প্রাধান্য ছিল। আমাদের দেশের গ্রামেই বাড়ি, হয়তো ঠাকুমা ওকে দিয়েছিলেন। অন্তত হাবভাব দেখে তাই মনে হত। যামিনীদাকে খাকি উলের নমুনা দেওয়া সত্ত্বেও, গাঢ় লাল উল এনে দিল। এবং বদলে আনতে অস্বীকার করল। ভয়ে ভয়ে মাদার হায়াসিন্থকে উল দেখালাম। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। সব রঙ-ই সমান গরম।' তাই বোনা হল; সাদা কালো মেমের মেয়েরা বুনল সায়েবদের জন্য খাকি গলাবন্ধ আর আমরা বুনলাম আমাদের দেশীভাইদের জন্য লাল, নীল, হলদে, সবুজ, যার যেমন ইচ্ছে, কিম্বা যামিনীদা-দের যেমন ইচ্ছে। এই ব্যাপারে অনেক দিন পর্যন্ত মনে একটা খটকা থেকে গেছিল। বলেছি তো যা দেখা যায়, শোনা যায়, ভাবা যায়, সব মিশে একেকটা মানুষ তৈরি হয়। তবু যুদ্ধটা দূরেই থেকে গেল। যতদিন না মিস লেভেন্স এসে আমাদের সেলাইয়ের ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন। এই মানুষটিকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। বয়স হয়তো বছর কুড়ি, অদ্ভুত ফ্যাকাশে রং, ফিকে সোনালী চুল, তাতে এতটুকু জেল্লা নেই, পালকের মতো পাতলা শরীর, চোখ দেখে মনে হত সর্বদা জলে ভরে আছে। ক্লাসের বেকুফ মেয়ে-গুলো বলল, 'বেলজিয়াম থেকে এসেছে। জার্মানরা ওর চোখের সামনে ওর বাপ ভাইদের মেরে ফেলেছে, বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিচ্ছু নেই ওর। রেড-ক্রসের লোকরা ওকে পাঠিয়েছে। ওর কাপড়চোপড়-গুলো পর্যন্ত অন্য লোক দয়া করে কিনে দিয়েছে।'

আমরা শুনে স্তম্ভিত। ঐ মানুষটিকে মেয়েগুলো এমনি জ্বালাত যে কতবার সে কেঁদে ক্লাস ছেড়ে চলে গেছিল। শেষে একদিন শুনলাম সে চলে গেছে। মেয়ে-গুলোর কি হাসি। 'টিকতে পারলে তো থাকবে।।' আবার মাদার হায়াসিন্থ ক্লাস নিতে লাগলেন। এর মধ্যে বুড়ি মাদার জোসেফ মারা গেলেন। স্কুল ছুটি হয়ে গেল। আমরা ফুল নিয়ে চ্যাপেলে গিয়ে দেখলাম, চমৎকার একটা কাঠের বাক্সে, সুন্দর বিছানায় মাদার জোসেফ চোখ বুজে শুয়ে আছেন। মাথার কাছে, পায়ের কাছে, প্রকান্ড সব মোমবাতি জ্বলছে। মনে হল মৃত্যু তাহলে এমনি সুন্দর। কিন্তু যুদ্ধে যারা মরে, তাদের কি হয়?

আসলে দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাচ্ছিলাম। ছোটদের জন্য যত বাংলা বই বেরুত, সব বোধহয় আমাদের বাড়িতে আসত। যোগীন সরকারের শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী, ছোট জ্যাঠামশায়ের নতুন নতুন অনুবাদের বই। গল্পে ঠাসা হয়ে থাকত জীবনটা। আমাদের খাসিয়া আয়ারা বিকট দুঃখের সব গল্প বলত, তাতে মজার কথা একটাও থাকত না। বেশির ভাগই হিংস্র জন্তু, শত্রু ভূত-প্রেতের অত্যাচারের গল্প। অসহায় মানুষের ওপর অবুঝ দেবতার প্রকোপ। ভীষণ খারাপ লাগত, কিন্তু খারাপ লাগার চাইতেও সে গল্পের মোহিনী শক্তিটা বেশি ছিল। মাসিমাও জন্তু-জানোয়ারের বিষয় বলতেন। আপিস ফেরত আমাদের বাড়িতে এক আধ ঘন্টা বসে পাতানো মামারা, কাকারা নানারকম গল্পে বসে যেতেন। এমনি করে জুল ভার্নের অনেক গল্প শুনেছিলাম। স্কুলের বইগুলিও সংখ্যায় কম হলেও, সুন্দর সুন্দর গল্প কবিতায় ভরা ছিল। শেষটা আর থাকতে না পেরে ছোট একটা খাতা বানিয়ে ইংরিজিতে জন্তু-জানোয়ারের গল্প লিখতে শুরু করে দিলাম। আর ভাই-বোনদের বানিয়ে বানিয়ে অজস্র গল্প বলতে লাগলাম। দেখলাম গল্পের কি আশ্চর্য ক্ষমতা। আমার শ্রোতারা গল্প শুনবার লোভে আমি যা বলতাম তাই করত। একমাত্র দাদা মাঝে মাঝে খুঁৎ ধরত, বাকিরা আমি যা বলতাম হাঁ করে শুনত। সমা-লোচনা করার কথা ওদের মনেও হত না। বেপরোয়াভাবে সত্যি মিথ্যা খানিকটা শোনা কথা বদলে, একটার পর একটা গল্প বলতাম। বাজে গল্প সব, এখন তার কিছুই

ভালো করে মনেও করতে পারি না। তবু এইটুকু জানলাম যে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে মানুষকে বশ করা যায়। বাকিরা আমার অন্ধ ভক্ত, শুধু দাদাই মাঝে মাঝে জ্ঞান দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, গল্পের খুঁটি নাড়িয়ে দিত। তাসের বাড়ির মতো গল্প ভেঙে পড়ত। সুখের বিষয় আমার কাঁচা শ্রোতারা সব সময় সেটা টের পেত না।

এর মধ্যে একদিন একটা গোলাপী টেলিগ্রাম এল। মা সেটি হাতে নিয়ে এতক্ষণ পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলেন যে আমরা কেঁদে কেটে একাকার। জ্যাঠামশাই নাকি মারা গেছেন। জ্যাঠামশাই মানে আমার মেজ-জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর। মা বললেন, "আমার মা যখন মারা গেলেন, বাবা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন, তখন আমার তিন বছর বয়স। পাশের বাড়িতে থাকতেন তোদের জ্যাঠামশাই, জ্যেঠিমা আর তাঁদের একটি মেয়ে, সুখলতা। তাঁরা আমাকে নিয়ে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করেছিলেন। দাদাবাবুর মুখে আমি ভালোবাসার কথা ছাড়া কখনো কিছু শুনিনি। পরে নিজের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। তখন আমার বাবাও বেঁচে নেই।"

মা ও বড়মাসিমা

মার মুখে এই রকম সাংঘাতিক কথা শুনে আমাদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেছিল। মা না থাকলেও মানুষ বাঁচে, তা জানতাম না। মা বলেছিলেন, "নিশ্চয় বাঁচে, ভগবান বাঁচান। বাঁচাবার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন। তোদের ছোট-মাসিকে শিবনাথ শাস্ত্রী নিয়ে গিয়ে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করেছিলেন। সে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত জানত-ও না ওঁরা ওর নিজের মা-বাবা নন। আমাকে দাদাবাবু নিয়ে গেলেন। খালি তোদের বড়-মাসিকে কেউ নিল না। সে সারা জীবন বোর্ডিংএ মানুষ হল। তার খরচপত্র দিতেন আমার বাবার শিষ্য প্রফুল্ল ঠাকুর। দাদাবাবু আমার বাবার মতো ছিলেন।" কাঁদেননি মা। পাথরের মতো হয়ে গেছিলেন। ভালো করে মনে পড়ে না, তবে আমার ধারণা, সেই সময় বড়-মাসি কাছে থাকাতে মা মনে জোর পেয়েছিলেন। ছোটবেলায় যখন কাছাকাছি থেকেছি, বড়-মাসিকে ঠিক বুঝিনি। কিন্তু যতই আমার বয়স বেড়েছে, ততই তাঁর সঙ্গে সহানুভূতি হয়েছে।

সেদিন থেকে দাদামশাই সম্বন্ধে অশেষ কৌতূহল জন্মেছিল। বড়-মাসিমা বলেছিলেন, "ছোটবেলায় বাবার ওপর বেজায় রাগ ছিল। ছোট ছোট তিনটি মেয়ের যেই না মা মরে গেল, অমনি তাদের বিলিয়ে দিয়ে দিব্যি ভগবানকে খুঁজতে চলে গেলেন! ভাবতাম এরকম লোকরা ভগবানকে পায় না। কারো কাছে একটু আদর পাইনি সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে। শাস্তি পেয়েছি ঢের। বেজায় ঠেঁটা হয়ে গেছিলাম শেষ পর্যন্ত। কিছুতেই বেগুন খাব না। অথচ বোর্ডিং-এর নিয়ম সব খেতে হবে। বারবার বললাম, 'ও আমাকে দিও না, ওর বদলে আমি কিছু চাই না, শুধু ওটি দিও না।' লাবণ্যদিদি ছিলেন বোর্ডিংএর কর্ত্রী। ইনি ছিলেন স্যার জগদীশ বসুর বোন। তিনি বললেন, 'না, খেতেই হবে, অবাধ্য হলে চলবে না।' দিল আমার পাতে, দেবামাত্র তুলে মাটিতে ফেলে দিলাম। শাস্তি হল সাত দিন নুন ভাত। সাত দিন দুবেলা নুন ভাত খেলাম। তারপর আবার আমার পাতে বেগুন দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে আবার তুলে মাটিতে ফেলে, লাবণ্যদিদির মুখের দিকে চাইলাম। আশ্চর্য হয়ে একটু চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'থাক্, ওকে মাছ দাও।' এমনি লড়াই করে করে বড় হয়েছি বলে কাউকে আদর করতে জানি না।' কথাটা ঠিক নয়। আদর করতে জানতেন বৈকি, কিন্তু সেটাকে বাইরে দেখাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমরাও ছোট-মাসির গলা জড়িয়ে ঝুলতাম, মন্না বলে ডাকতাম, কিন্তু বড়-মাসিমাকে কখনো আদর করেছি বলে মনে পড়ে না। এখন বড় খেদ হয়। ১৯৫২ সালে আমার মা মারা যান ৬৭ বছর বয়সে, বড়-মাসিমা গেলেন তার পরের বছর, ৭০ বছর বয়সে। শোকে ক্লিষ্ট, সঙ্গীহীনা। একেকটা মানুষ বোধ হয় কষ্ট পেতেই জন্মায়, কিন্তু বড়-মাসিমার মুখে কোনো দুর্বলতার চিহ্ন দেখা যেত না। কেমন একটা প্রসন্ন গম্ভীরতা, দেখে লোকের শ্রদ্ধা হত। কখনো কারো নিন্দা করতেন না, গুণগ্রাহী, সত্যিকার ইনটেলেকচুয়েল। কিন্তু সে দিকটাও প্রকাশ পেত না।

বুড়ো বয়সে আমাকে বলেছিলেন, "একবার বোর্ডিং থেকে বলল, 'তোমার বাবাকে লেখ তোমার জন্য কম্বল পাঠাক, সব জিনিস কি অন্য লোকে দেবে নাকি?' তাতে আমার আঁতে ঘা লেগেছিল। বাবাকে খুব রাগ আর দুঃখ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। বাবা খুব দামী কম্বল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো শিষ্যের উপহার। সেই শিষ্যই কম্বল দিয়ে যাবার সময় বলেছিলেন, 'তোমার চিঠি পেয়ে স্বামীজি কেঁদেছিলেন।' তখন কিছু মনে হয় নি। এখন ভেবে বুক ফেটে যায়। এত বোকা ছিলাম যে এ-ও জানতাম না ডাক এলে আর থাকা যায় না।" সবাই তাঁকে বলত রামানন্দ ভারতী। বিধিমতে নিজের শ্রাদ্ধ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। নাম ছিল রামকুমার ভট্টাচার্য। পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, বিদ্যারত্নমশাই বলে লোকে জানত। মাইকেলের শেষ বয়সে, চন্দননগরে যে ক'জন পণ্ডিতকে রেখেছিলেন, দাদামশাই তাঁদের একজন ছিলেন এ খবর সম্প্রতি আমি শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধারমণ মিত্র মশায়ের কাছে শুনেছি। মাইকেলের স্বাস্থ্য ভেঙে গেছিল, অথচ সুরাপান ছাড়েননি। বন্ধুবান্ধবরা দাদামশাইকে বলেছিলেন, "ওঁকে বুঝিয়ে বলুন। আপনাকে ভালো-

বাসেন, হয়তো আপনার কথা শুনবেন।" বলেও ছিলেন দাদামশাই। মাইকেল নাকি মুখ গম্ভীর করে বলেছিলেন, 'আপনাকে যতই ভালবাসি না কেন, পণ্ডিতমশাই, ও-কথা বললে আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে।" সকলেই জানেন যে মাইকেল আর সেরে ওঠেননি।

কাশীতে আশ্রম ছিল দাদামশায়ের। কালী-ভক্ত ছিলেন, তন্ত্র-সাধনা করতেন। কোতরঙের অচলানন্দের জামাই, কিন্তু পরে তাঁর সঙ্গে মুখ দেখা-দেখি ছিল না। কারণ দাদামশাই কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে, প্রচারকার্য করতেন। রাগে দুঃখে অচলানন্দ মেয়েকে আটকে রেখেছিলেন। বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রীকে নিয়ে একটা থার্ড ক্লাস ঠিকে গাড়ি করে, দাদামশাই স্ত্রীকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। মায়ের কাছে শুনেছি কিছু দূরে ঠিকে গাড়ি ও শিবনাথকে দাঁড় করিয়ে রেখে, দাদামশাই বাড়ির খিড়কি-পুকুরের ধারে গেলেন। দিদিমার সতেরো বছর বয়স, পরমাসুন্দরী। পুকুর ঘাট আলো করে বাসন মাজছিলেন। ওঁদের বাড়িতে রান্না-খাওয়ার জিনিস চাকর-বাকর ছুঁত না। দাদামশাই গিয়ে বললেন, "যাবে আমার সঙ্গে? তোমাকে নিতে এসেছি।" দিদিমা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই এঁটো কাপড়ে যাব?" দাদামশাই বললেন, "আমি ও-সব মানি না।" ব্যস্, আর ভাবনা কিসের? দিদিমা হাত ধুয়ে ঠিকা গাড়িতে গিয়ে বসলেন। বাসন পড়ে রইল। আমার মনে হয় শিবনাথকে ওপরে গাড়োয়ানের পাশে বসতে হয়েছিল। গেলেন তো গেলেন দিদিমা, আর কখনো বাপের বাড়ির লোকদের চোখে দেখলেন না। এর নয় বছর পরে ঠোঁটের ওপর ব্রণ বিষিয়ে, তিনটি মেয়ে রেখে, দিদিমা ২৬ বছর বয়সে মারা গেলেন। মায়ের কাছে শুনেছি দাদামশাই কাছে ছিলেন না। মেদিনীপুরে বন্যা হয়েছিল, স্বেচ্ছাসেবীর দল নিয়ে সেখানে গেছিলেন। সেবার দিদিমা কেন জানি আপত্তি করেছিলেন, রাগ করে বলেছিলেন, "যাচ্ছ, যাও। ফিরে এসে আমার মরা মুখ দেখবে।" তাও বোধ হয় দেখতে পাননি দাদামশাই। অচলানন্দ তবু মেয়েকে ক্ষমা করেননি। দাদামশাই সন্ন্যাস নিলে, অনাথা মেয়ে তিনটিকে আনবার জন্য দিদিমার মা নাকি কেঁদে আকুল হতেন, তবু তাঁর মন গলেনি।

আমরা এসব দুঃখের কাহিনী শুনে রেগে বলতাম, "কেন বল ভগবান দয়ালু! দয়ালু হলে এসব হতে দিতেন না।" মায়ের মনে অপরিসীম ভক্তি। কেবলি বলতেন, "ওরে সব অবলম্বন খসে গেলে তিনি নিজে এসে ভার নেন।"

বড় হয়ে দাদামশাইকে আমার বড় ভালো লাগত; বড় নিজের বড় আপনার বলে মনে হত। তাঁর একটা পুরনো ফটো ছিল মায়ের কাছে, ফিকে বিবর্ণ। সন্ন্যাসীর বেশে পুজোয় বসেছেন। সেটি দেখে আমি ক্রেয়ন দিয়ে বড় করে এঁকে মাকে দিয়েছিলাম। আমার তখন ১৫ বছর বয়স। জানতাম যে আমি জন্মাবার আট বছর আগে পিঠে কারবাঙ্কল হয়ে কাশীতে তিনি দেহ রেখেছিলেন। সন্ন্যাসীদের পোড়াবার নিয়ম নেই আমাদের দেশে, তাই তাঁর দেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন তাঁর ৬২ বছর বয়স। তবু মনে হত তাঁকে খুব কাছে পাচ্ছি। ঐ রকম সময়ই তাঁর শিষ্যরা তাঁর একখানি জীবনী প্রকাশ করেছিলেন, সেটি পড়ে অনেক ছোট-খাটো তথ্য আর তাঁর হিমালয় ভ্রমণের কথা, পায়ে হেঁটে মানস-সরোবর যাবার কথা জেনেছিলাম। তবু সবখানি পাইনি। সেকালে বিদ্যাসাগর মশায়ের জামাই সুরেশ সমাজপতি 'সাহিত্য' বলে একটি পত্রিকা সম্পাদন করতেন। তাতে 'হিমারণ্য' নাম দিয়ে দাদামশাই তাঁর মানস-সরোবর ভ্রমণের কথা লিখেছিলেন। সে বড় অপূর্ব কাহিনী। দুঃখ এই যে শিষ্যরা কয়েক অধ্যায় মাত্র উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। অনেক পরে কালিদাস নাগ মহাশয় আমাকে বলেছিলেন ঊনিশ শতকের একেবারে শেষ বছরের কি তার এক আধ বছর পরের 'সাহিত্য' পত্রিকার সংখ্যাগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কিংবা চৈতন্য লাইব্রেরিতে থাকলেও থাকতে পারে। এই আমার একটা আর্ষ ঋণ থেকে গেছে, যার জন্য একটা কিছু করতেই হবে। দাদামশায়ের জীবনীর একটিমাত্র কপি আমার কাছে আছে। সেটিরও সামান্য সংশোধন ও সংযোজন করে পুনঃপ্রকাশ হওয়া উচিত। আশ্চর্য আধুনিক দাদামশায়ের চিন্তাধারা আর বাচন-ভঙ্গি; এতকাল আগের রচনা সহজে বিশ্বাস হয় না।

আসতেন মাঝে মাঝে আমার জ্যাঠা-মশায়ের বাড়িতে মাকে দেখতে। উপেন্দ্র-কিশোরের ছোট ছেলে, সুবিমল, আমার নানকুদার কাছে শুনেছি, এসে তিনি মাটিতে বসতেন আর আমার মা তাঁর পাশে বসে পাখার হাওয়া করতেন আর শাড়ির আঁচল দিয়ে তাঁর গায়ের ঘাম মুছিয়ে দিতেন। নানকুদা মাকে বেজায় ভালোবাসত, মান্তু বলে ডাকত। তার কেবলি ভয় হত বুড়ো যদি মান্তুকে নিয়ে যায়? মান্তু তা হলে নিশ্চয়ই চলে যাবে!! যাতে যেতে না পারে, তাই নানকুদা তার মান্তুর শাড়ির একটা কোণা আঙুলে জড়িয়ে রাখত। (চলবে)

ভালবাসার গল্প

গেট টুগেদার / তুলসী সেনগুপ্ত

মানবের ওপর দায়িত্ব পড়ল সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করার। কেননা, লিয়াজঁ-র ব্যাপারে ওর মতন আর কেউ নেই। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সুধাংশু বাড়ি ফিরল। সবে পরশু দিন আমেরিকা থেকে এক মাসের ছুটিতে এসেছে ও। পড়াশুনো, কাজের চাপের মধ্য দিয়ে আশ্চর্যরকমভাবে দু দুটো বছর পার হয়ে গেল, অথচ, ভাবতে এখনও আশ্চর্য লাগে, এই তো সেদিন। অদৃশ্যভাবে সুকৌশলী যাদুকরের মত সময় তার কাজ করে যায়। ঘরে ঢুকে ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে দিয়ে জামা-প্যান্ট খুলতে শুরু করল। এ-রকম আবহাওয়া দু বছর আগেও কিছুমাত্র মনটাকে বিরক্তিতে ভরিয়ে দিত না, এখন এই আবহাওয়া কেমন যেন অসহ্য বিশ্রী মনে হল। এই মনে হওয়াটা নেহাতই তাৎক্ষণিক। তখনের মত পাখার বাতাস শরীরে ছুঁয়ে গেলে পর, নিজেকে নিজেই তিরস্কার করল, ব্যঙ্গ করল। লাটসাহেবের নাতি হয়ে গেলে নাকি হে এই দু বছরেই? আরও তো দিন পড়ে রয়েছে। তখন তো সারা দেশটাই তোমার কাছে অপরিচিত, কদাকার, কুচ্ছিত মনে হবে। মনে মনে এই কথাগুলো ভাবার সময় ঠোঁট সুঁচলো করে শিস দিল সুধাংশু। মিনিট দশ-পনেরো জড়দগবের মত খাটের এক-পাশে হেলান দিয়ে বসে থেকে এবার উঠে দাঁড়াল। বাথরুমের ভেতরে গিয়ে সাওয়ার-এর নিচে দাঁড়িয়ে পুরোপুরি নিজেকে উলঙ্গ করে ফেলল। এখানে থাকার সময় এমন অভ্যেস তার ছিল না। এ-সবই এখন কেমন করে যেন মনের মধ্যে অধিকার গেড়ে বসেছে। এর অন্যথা এখন ও করতে পারে কি? সাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিজেকে শীতল করে নিল। ওখান থেকে চলে আসার আগের দিন হাওয়াই দ্বীপের সেই শান্ত মেয়েটির গলায় সে অঞ্চলের ফোক মিউজিক শুনেছিল, এ-সবই ওর মনে পড়ে গেল। গানটার অর্থ এ সময় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। 'যদি তুমি যাবেই তবে অন্ততঃ ঘাড়ের গামছাটা রেখে যাও'— এ ধরনেরই ভাব ও গানটাতেও। আশ্চর্য, ভৌগলিক দূরত্ব কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে কোন দূরত্বই নয়। সময় কাল ও সীমানা ছাড়িয়ে সেখানে সব মানুষই এক। ভাষার ব্যবধান নেই, মানসিকতারও বৈপরীত্য নেই। প্রচন্ড এক নৈকট্যের উত্তাপ ওকে ভীষণভাবে জড়িয়ে তুলতে লাগল। মেয়েটার চোখের ভাষা অনুচ্চারিত হলেও কেমন যেন প্রগাঢ় উষ্ণতা ওকে সে সময় ভীষণ টানতে লাগল। মেয়েটার পাতলা ঠোঁটের মাঝে সরু সরু পাখির আঁচড়ের মত দাগ স্পষ্ট ফুটে উঠল ওর চোখে। আবার পর মুহূর্তে মানব অজিত আর নান্টুদের মুখগুলো স্পষ্ট ভেসে উঠলে ও মনে মনে কেমন রোমাঞ্চ অনুভব করল। 'মানবটা এখনও সে রকমই আছে।' ভাবল সুধাংশু। কেমন এক দুঃখীর প্রগাঢ় ছায়া ওর দু চোখে, বুক সরল নিষ্পাপ ও মায়াময় মনটা ওর। সকলকে আপন করে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার মধ্যেই যেন মানবের সব অস্তিত্ব। এখনও এব নিঃসঙ্গ নয় মানব। আর অজিত নান্টু ওরা পুরোন বাসা বদল করে অন্য কোথা চলে গেছে। প্রথম প্রথম চিঠিপত্রের লেনদে থাকলেও পরের দিকে কেমন যেন সাড় পেত না ওদের দুজনের কাছ থেকে সুধাংশু। দূরে থেকে ও ওদের দুজনকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে—কেমন যে মাঝপথে খেই হারিয়ে বিষণ্ণ হয়ে গেছে তাহলে কি সত্যি সত্যি ওরা সেই প্রবা বাক্যের শিকার হয়ে গেছে? ভাবতেও ব রকম কষ্ট হয় সুধাংশুর। মুহূর্তের মধ্যে এ-সবই ভেবে নিয়ে নিজেকে ঋজু করে তুলল ও। খাওয়া-দাওয়া সেরে ছোট্ট এক ভাত ঘুম দিয়ে ফেলল। বিকেলে ও আ কোথাও বেরুবে কিনা, মার এই প্রশ্নে উত্তরে ও মাথা নেড়ে সংক্ষেপে জানি দিয়েছে, হ্যাঁ। মার চোখে রাশি রা প্রশ্নকে কেমন যেন উপেক্ষাই করে সুধাংশু। 'দু দিন বিশ্রাম নে, তারপর হয়'....মার এই প্রশ্নকে শেষ করতে দেয় ও। স্বভাবসুলভ জোরে হেসে উ দিয়েছে, থাকছি তো মাত্র মাসখানেক। এ মধ্যে দুটো দিন ঘরে শুয়ে বসে কাটা কি চলবে, বলতে চেয়েছে, 'মাগো, ধাঁড়ভাই তো আমাদের বিশ্রাম।' কিন্ ও কথাগুলো বলে মার মনকে কষ্ট দি যায় নি ও। বরং খুব সরল সহজভা

গলেছে, ঝটপট সব যোগাযোগগুলো সেরে নি, তারপর যখন সবাই জানবে আমি এখানে, তখন আগের মত সবাই এসে এখানে আসর গাড়বে—তখন অঢেল বিশ্রাম। কথাগুলো শেষ করে স্নিগ্ধ হাসি হেসেছিল সুধাংশু।

ঠিক সাড়ে চারটের মধ্যে ঘুম থেকে উঠে তৈরী হয়ে নিল সুধাংশু। দুপুরে মা ঘুমোয় না; সারা দুপুর বিনা কারণে এটা ওটা নিয়ে খুটখাট করে সময় কাটায়। এ সবই একেবারে মুখস্থ সুধাংশুর। ওর পায়ের শব্দে মা চোখ তুলে তাকালেন। ছেলে আর মায়ের মধ্যে চোখে চোখে কথা চালাচালি হলো। শুধু বলল সুধাংশু, 'ফিরতে দেরী হলে চিন্তা কোর না, তুমি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পোড়।'

*

মানব আজ অফিস যায়নি। সে সুধাংশুর দেয়া দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে। সেই কোথায় রিষড়া, সেখানে গেছে অজিতকে ধরতে। নামী বিলিতি কোম্পানীতে চাকরি করে ও এখন। প্রায় আধ ঘণ্টা রিসেপসনিষ্ট মেয়েটার মুখোমুখি বসে থেকে যখন সে প্রায় মনে মনে অস্থির, তখন ছিপছিপে বেতের মত চেহারা নিয়ে অজিত এসে দাঁড়াল। 'কি রে শুয়োর, হঠাৎ কী মনে করে।' ওর কথা বলার ঢং-ই এই রকম। নতুন কারো কাছে এ ধরনের সম্ভাষণ অস্বস্তিকর হলেও মানবের কাছে তা নতুন নয়। সে উঠে দাঁড়িয়ে একটা জোর থাপ্পড় কষাল ওর পিঠে। বলল, 'শালা সুধাংশু ফিরেছে জানিস ?'

'আই সি! মানে সুধাংশুবালা ?' অজিত জোরে উচ্চারণ করল।

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ।' মানব সম্মতির ঘাড় নাড়িয়ে বলল, 'এখনও তুই ওকে সুধাংশুবালা বলে ডাকবি নাকি ?'

'আলবাৎ ডাকবো। ও তো জানে, ও ডাকে আমার আন্তরিকতা কতখানি। আমার ঠাকুমার নাম ছিল সুধাংশুবালা। ওই এক ডাকে আমি দুজনকেই মনে করতে পারি। বলেই হি হি করে হাসল অজিত। একটুক্ষণ থেমে হাতঘড়িতে সময় দেখল। বলল, 'তুই একটু বোস, আমি আসছি, একেবারে কেটে পড়ব।'

ওর কথা বলার ভঙ্গিতে রিসেপসনিষ্ট মেয়েটা ঈষৎ হাসল। মেয়েটার দিকে চোখ যেতেই অজিত মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েই সহজ সুরে বলল, 'মিস সোম, আমাদের কথায় কিছু মনে করবেন না, এই শুয়োরটা আমার এতটুকুন বেলার সঙ্গী বন্ধু এনিমি সবই বলতে পারেন—তাই......।

মিস সোম উপরের ঠোঁটটা দাঁতে কামড়ে ধরে গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করল: নাকের ডগায় ঈষৎ ঘাম, নজরে পড়ল মানবের। 'আঃ তুই যা তো। আমার আবার নাণ্টুর কাছে যেতে হবে।'

অজিত মানবকে একটু দূরে টেনে নিয়ে বলল, 'মিস সোমকে মনে ধরছে নাকি রে। তাহলে, আমি যতক্ষণ না আসছি, ততক্ষণ পান কর ওর রূপ সুধা।' বলেই শব্দ করে হাসল অজিত। একদণ্ডও না দাঁড়িয়ে বড় বড় পা ফেলে উধাও হয়ে গেল অজিত। অজিত চলে গেলে পর মানব সত্যিই এবার কেমন এক সংকোচ বোধ করতে থাকল। এই একটু আগেই তো প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর ও মেয়েটার মুখোমুখি বসেছিল, তখন তো এমন মনে হয়নি। খুব সতর্কতার সঙ্গে গোপনে মিস সোমকে দেখতে গিয়েই বুঝতে পারল, মেয়েটা ওকে তীক্ষ্ন সতর্ক চোখে নজর করছে। কেমন এক অজানা বোধ বুকের মাঝে অনুভব করল মানব। তা হাল্কা শূন্য খা খা করা ভাব। মিস সোম নিঃসন্দেহে সুন্দরী। বাঁকা ধনুকের মত ভুরু জোড়ার মাঝে ছোট্ট সবুজ টিপ, বেশ ঘন চোখের পল্লব চোখ দুটোকে অসম্ভব উজ্জ্বল করে তুলেছে। কচি কলাপাতা রং-এর শাড়ি, ওকে আর দশ জনের থেকে পৃথক করে তুলেছে নিশ্চিত। এক মুহূর্তে এ-সবই দেখে নিল মানব। যেন এইমাত্র সবে ওকে চোখ মেলে দেখছে। আশ্চর্য। মিনিট কয়েক কী সব ভেবে ইতস্তত করল ও। তারপর এক সময় ও নিজেই বলল, 'অজিতের কথায় কিছু মনে করবেন না। ওর মুখের কোন লাগাম নেই। মনে যা আছে ঝটপট তাই বলে ফেলে।'

মিস সোম সরাসরি মানবের মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হেসে জবাব দিল, 'আসলে মিঃ দত্তকে কোনদিনই এত হাল্কা মেজাজে দেখিনি। সারা ডিপার্টমেন্টের লোকই বলে, উনি নাকি ভীষণ রাশভারি।'

মানব কেমন যেন একটু প্রশ্রয় পেয়ে গেল ওর কথায়। ইচ্ছা করেই শুধোল, ভীষণ বদনাম বুঝি ওর ?

মুহূর্তেই অসম্ভব ফ্যাকাশে হয়ে গেল মিস সোম। বললো, না না, বদনাম হবে কেন ? ওঁকে সকলেই ভীষণ রেসপেক্ট করে।'

মানবের ইচ্ছে হল মেয়েটাকে আরও একটু ঘাটায়। বলল, 'ভয় নেই আপনার, আমি ওকে বিন্দুবিসর্গও বলব না। আপনি নির্ভয়ে সব কিছু বলতে পারেন আমাকে।'

মিস সোম ঠিক সেই সময় একটা ফোন পেয়ে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খুব সুন্দর ঢং-এ নির্ভুল ইংরেজীতে কথার উত্তর দিচ্ছিল মিস সোম। মানব বুঝল, উপরঅলা কেউ-কেটা গোছের কারো সঙ্গে জরুরী কিছু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে হাওয়া বাঁচিয়ে সন্তর্পণে সিগারেট ধরাল মানব। মনে হল, এমন মিষ্টি যার গলা, সে গান না শিখে এইসব চাকরি করতে আসে কেন ? গান জানে কি না, জিগোস করবে নাকি মিস সোমকে ? কি জানি কেমন যেন সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকল। হাতঘড়িতে চোখ রেখে দেখল, সময় খুব দ্রুতপায়ে ছুটে চলেছে। কতদিনই তো ভেবেছে মানব, ঘড়ি পরা ছেড়ে দেবে ? বিনা কারণে যে সব জিনিস মানুষকে শাসায়, সে সব না রাখাই ভাল: আশ্চর্য, এ-সব সে এখন ভাবছে কেন ?

ফোন রেখে দিয়ে মিস সোম সরাসরি চাইল মানবের দিকে। মানব তখন চোখ বুজে কী সব যেন ভাবছিল। মেয়েটি কলিং বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলে মানব চোখ খুলল। খুব স্পষ্ট গলায় বলল মিস সোম, 'আপনি চা খান ?'

মানব সে মুহূর্তে কেমন যেন বিস্মিত হয়ে পড়ল। এতখানি স্মার্টনেস মোটেই আশা করেনি ও মেয়েটার কাছ থেকে। গলায় মৃদু আপত্তি তুলে বলল, 'অজিত তো এখুনি এসে পড়বে, সুতরাং চায়ের অর্ডার দিয়ে আনতে আনতে বেশ কিছু সময় লাগবে, না থাক, বরং এরপর ফের যখন আসব তখন না হয় জেনেই চা খাব।' মেয়েটি ঠিক আগের মত করেই

উত্তর দিল, 'সেদিন হয়তো আমি নাও থাকতে পারি ?'

'কেন ? কোথায় যাবেন ? চাকরি ছেড়ে দেবেন নাকি ?'

সে কথায় মিস সোমের গলা থেকে একরাশ চুড়ি ভাঙার রিনরিন আওয়াজ বেরুল। বেশ কিছুক্ষণ সে হাসির রেশ ঘরের মাঝে বন্দী হয়ে গেল যেন। হাত-ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে মিস সোম কিছুটা গাম্ভীর্য এনে জবাব দিল, 'আপনি অন্য কেউ হলে অফার করার কোন প্রশ্নই আসতো না, নেহাত মিঃ দত্তের এই এতটুকুন বেলার বন্ধু বলেই সেই ছোট-বেলার মাপটা হাতের ইশারায় দেখিয়ে হাসতে থাকল।

মিস সোমের ওরকমভাবে ভঙ্গী দেখে না হেসে পারল না মানব। মনে মনে অনাস্বাদিত খুশীর ঢেউ, আবার নান্টুর সঙ্গে দেখা করার তাগিদ, এই দুই-এর টানা-পোড়েনে বড় বেশী বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে থাকল। মানব তবু একটু সংকোচ রেখে বলল, 'তাহলে বলুন, চা খেয়েই না হয় যাবো।'

'আপনি পারমিশান দেবার আগেই আমি বেয়ারাকে দু' কাপ চায়ের কথা বলে দিয়েছি।'

মানব তার উত্তরে বলল, 'ঠিক এ-সময় যদি আপনার মিঃ দত্ত এসে পড়েন ?'

'আসুন না। নিজের কাপটা অফার করে তাঁদরেল সাহেবকে অয়েলিং করার সুযোগ পাবো।' খুব সহজভাবে উত্তর দিল মিস সোম।

মানব ভুরু কোঁচকাল সে কথায়। বলল, 'অয়েলিংটা কী সকলের আসে মিস সোম ? সকলের দ্বারা সব কাজ কি সম্ভব ?'

মিস সোম সে কথার জবাবে না গিয়ে চুপ করে বসে রইল।

ঠিক সেই সময় অজিত খুব হন্তদন্ত হয়ে রিসেপ্‌সন রুমে ঢুকে বলল, খুব দেরি করিয়ে দিলাম রে তোকে ? শালার রাজ্যের যত কাজ যেন আর সময় পেল না আসতে। ভীষণ বিরক্তি আর রুখখু স্বরে 'কথাগুলো বলে মানবের দিকে চেয়ে বলল, 'কী রে চল।'

মানব ম্লান হাসল সে কথায়। বলল, 'দ্যাখ অজু, এই প্রথম একজন ভদ্রমহিলা আমাকে চা অফার করছে। তা অ্যাকসেপ্ট না করে যাই কী করে বল ? আর তাছাড়া, উনি বললেন, এর পর আর হয়তো দেখা নাও হতে পারে ?'

অজিত এ কথায় পদমর্যাদার গাম্ভীর্য প্রায় ভুলেই গেল। সহজ সরল পরিহাসের পরিমন্ডল রচনা করে স্বভাবসুলভ উত্তর দিল অজিত, 'সে কি মিস সোম, কেমন যেন রোমান্সের গন্ধ পাচ্ছি' বলে হো হো করে হাসল অজিত।

মিস সোম সে কথায় কোন গুরুত্ব দিল না। এমন উত্তরই যেন সে আশা করছিল এ সময়। স্নিগ্ধ হেসে মাথা নিচু করে বসে রইল মিস সোম।

বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেলে পর মিস সোম বলল, 'নিন।'

—আপনার ? অজিত শুধোল।

—'আসছে। আপনাদের তাড়া আছে তাই....'

মানব এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। পরে মিস সোমের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনার নিশ্চয়ই একটা গেলাস আছে। আসুন, আমরা ভাগাভাগি করে প্রথম দিনটা সেলিব্রেট করি।'

অজিত সে কথায় কৃত্রিম রাগ গলায় তুলে বলল, 'শুয়োর তুই কি ফের এখানে এসে মিস সোমকে জ্বালাবি নাকি ?'

মিস সোম মৃদু হেসে বলল, 'এতদূর যদি আসেনই তবে গ্যারান্টি দিচ্ছি চা আপনার কপালে এক কাপ জুটবেই।'

'ও কি শুধু.... না থাক' কথা শেষ করল না অজিত। কেমন রহস্যের রেশ রেখে মাঝপথেই থেমে গিয়ে মানবের পকেটে হাত দিয়ে কী যেন হাতরাতে হাতরাতে বলল, 'কার মুখ দেখে যে আজ উঠেছিলি না খোঁজ কর, রোজ যেন তার দেখা পাস।' চা শেষ করে ওরা দুজনেই উঠে দাঁড়াল। যাবার মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে মানব বলল, 'এরপর আবার আমি আসব। এবং নিশ্চিন্ত আপনাকে এখানে ঠিক এমনি দেখতে পাবো।' কথা শেষ করেই সুইং ডোর ঠেলে ওরা বেরিয়ে গেল। সেদিকে অপলকে চেয়ে রইল মিস সোম।

হাওড়া স্টেশনে নেমেই মানব বলল, 'এখন তো চারটেও বাজে নি, নান্টুকে অফিসেই পেয়ে যাবো।'

পাবলিক টেলিফোনের সামনে ছোট্ট মতন একটা কিউ দেখতে পেয়ে অজিত সামান্য মুখ বিকৃতি করে ঘাড় নাড়ল।

মানব সে সবকে এক রকম অগ্রাহ্য করে বলল, 'দূর ! এমন বুদ্ধি নিয়ে কী করে যে এতবড় পোস্টে চাকরি করছিস বুঝতে পারি না।' এক কথায় সরাসরি অগ্রাহ্য করল মানব অজিতকে। কিউর সামনে এসেই বড় বেশী উৎকন্ঠা আর বিচলিত ভাব নিয়ে ও ভিড় ঠেলে ভেতরে যে ফোন করছিল তাকে বলল, একটু তাড়াতাড়ি করুন ভাই, ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি। এক্ষুনি এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে।

এ্যাম্বুলেন্সের কথায় ভেতরের ভদ্রলোক যত দ্রুত সম্ভব বার কয়েক হ্যাঁ হ্যাঁ না না করে ফোন রেখে দিলে, মানব পেছনের কিউর দিকে তাকিয়ে করুণ মুখে বলল, 'এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হচ্ছে, কিছু মনে করবেন না।'

লাইনের কেউই কোন রকম আপত্তি করল না। মানব খুব পাকা অভিনেতার মত মুখভঙ্গী করে ছোট্ট কাচের ঘরে ঢুকে গিয়ে নান্টুর অফিসে ফোন করল। সত্যি আজ সে যে কার মুখ দেখে উঠেছিল। একবারেই নান্টুর অফিসে লাইন পেয়ে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যে নান্টুর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে আগের মত করুণ বিষণ্ণ মুখ করে বেরিয়ে এসে লাইনে দাঁড়ানো লোকদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'নাঃ পেশেন্টটাকে বাঁচান গেল না। ডিপোতে নাকি একটাও এ্যাম্বুলেন্স নেই। দেখি কী করা যায়।' ওর কান্ড দেখে অজিতের শব্দ করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হলেও, হাসল না। পেটের ভেতর থেকে গুর গুর করে একটা হাসির ঢেউ, ওকে ভীষণ রকমভাবে বেসামাল করে তুলেছিল। অনেক কষ্টে সেটাকে দমন করল। দ্রুত ওরা ওখান থেকে সরে এসে বাইরে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে লোকজন সব কিছুকে উপেক্ষা করে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে মানব বলল, 'ধুস, কিন্তু কারণে এই যে সব অভিনয়, এতে আমার সব প্রতিভা নষ্ট হয়ে গেল। শ..., এদেশে না হয়ে যদি বিলেত ফিলেতে জন্মাতাম তাহলে কী, আর আমার এমন দশা থাকতো—স্যার টাইটেল কপালে জুটে যেত'।

'তা ঠিক'। অজিত ওর কথায় সম্মতি জানাল।

মেট্রো সিনেমার লবিতে সুধাংশু অপেক্ষা করবে এবং সেইমত নান্টুকেও সেখানে আসতে জানিয়ে দিয়েছে। হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে অজিত বলল, হাতে এখনও সময় আছে, তাতে বাসের আশা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। চল, একটা ছোট গাড়ী করি। এসময় ট্যাকসি পাওয়া খুব কষ্টকর নয়। সামান্য কয়েকজনের পেছনে দাঁড়িয়ে মিনিট দশেকের মধ্যেই ট্যাকসি পেয়ে গেল ওরা। ট্যাক্সির নরম সিটে দুজনেই যথাসম্ভব শরীর হাল্কা করে বসে সিগারেট ধরাল। আজ যে নরক গুলজার হবে বুঝতে পারা

সুতরাং প্রথম কাজই হল বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া।

মানব মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলল, শালা করে থেকে এত বাড়িমুখো হলি রে?

'একটু একটু করে সংসারি হবার চেষ্টা করছি, নিরুত্তাপ ভঙ্গীতে উত্তরটা দিয়ে দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে কান খুঁচতে খুঁচতে বলল, সুধাংশুবালা খুব মুটিয়েছে নাকি রে?

'নাঃ। যেমন ছিল তেমনি আছে'। মানব উত্তর দিল।

নেহাতই সময় কাটাবার মত কথা এসব। হঠাৎ কী হলো, অজিত মানবের মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। চোখ দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল হয়ে উঠল সে সময় ওর। মানবের দিকে চেয়ে ভুরু নাচাল। তারপর এক সময় বলল, 'কিরে শুয়োর! অনিন্দ্যকে একটু বুকটা দেখিয়ে আসবি নাকি? অনিন্দ্য ওদের সহপাঠী ছিল, এখন বড় ডাক্তার, হার্ট স্পেশালিস্ট।

মানব কিছুই যেন বুঝল না। ভাবলেশহীন মুখ করে জবাব দিল, 'আমার হার্ট খুব স্ট্রং, যেতে হয় তুই যা'।

হো হো করে হাসল সেকথায় অজিত। বলল, 'নাঃ, শুধু দেখতাম, মিস সোম তোর হার্টটা ফুটো করেছে কী না'!

'ওরে শালা, এ হার্টে শুধু কি মিস সোম, কত চেনা'-জানা-অচেনা-অজানা ললনারা রয়েছে, দেখলে এম আর সিপি অনিন্দ্যও হার্ট ফেল করবে'।

সাবাস। বলেই প্রচন্ড একটা থাপ্পড় কষাল অজিত মানবের পিঠে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অনেককাল আগে দেখা একটা হিন্দি ছবির গান আপন মনেই গেয়ে উঠল, 'আচলি আচলি যায়রে। জোয়ানী কী রেল চলি যায় রে!'

মনে আছে তোর! মানব কেমন যেন বিষণ্ণতা নিয়ে শুধোল। মুহূর্তেই ওরা দুজন বড় বেশী গম্ভীর; বড় বেশী স্মৃতি-চারণায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

*

পার্ক স্ট্রীটের ছিমছাম একটা রেস্তোরাঁয় একটা কোণের দিকের টেবিল বুক করে রেখেছিল সুধাংশু। এক এক করে সবাই এল, নান্টুও। সঙ্গে ওর একজন নতুন বন্ধু। সুধাংশুদের অপরিচিত। রুণু লাহিড়ী। দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ শরীরের মানুষ লাহিড়ী। বয়স অনুমান করা কঠিন। প'য়তাল্লিশও হতে পারে, আবার তিরিশও। এমন চেহারার মানুষ সচরাচর এদেশে দেখা যায় না। উন্নত নাক, চওড়া কপাল আর ব্যাক-ব্রাশ করা চুল। খুব সতর্কভাবে নজর করলে বয়সের ছাপ চোখের নিচে, কপালের ভাঁজে কুচি কুচি দাগগুলোতে ধরা পড়ে। লেক টেরাসে যেখানে নান্টুরা উঠে গেছে, সেখানেই থাকে লাহিড়ী। নামকরা অ্যাডভারটাইজিং ফার্মের সিনিয়র একসি-কিউটিভ। মোটা টাকার মাইনে, অবিবাহিত। সংসারে দায়িত্ব বলতে বিধবা পিসী আর মা। অত বড় মানুষটা খুব ধীরে সুস্থে কথা বলে, ঘন ঘন সিগারেট খায়। এক কথায়, চেন স্মোকার বলতে যা বোঝায় তাই। দু দুটো ইন্ডিয়া কিংস-এর প্যাকেট টেবিলের ওপর রেখে লাহিড়ী বলল, একটা কাজে অ্যাকসিডেন্টালি নান্টুবাবুর, অফিসে গিয়েছিলাম—সেখানেই শুনতে পেলাম আপনাদের একটা গেট টুগেদার হচ্ছে, কেমন লোভ হল, মনটাও ভাল না, ভীষণ একা, নিঃসঙ্গ লাগছে, তাই অযাচিতভাবে আপনাদের মধ্যে এসে পড়লাম'।

মানব স্মিত হেসে বলল, নান্টুর কাছ থেকে আপনার কথা আমি আগেই শুনেছি। বলেই গড় গড় করে রুণু লাহিড়ীর বায়োডাটা মুখস্থ বলে গেল এক নিঃশ্বাসে।

কোন সংকোচ বা দ্বিধার বিন্দুমাত্র প্রকাশ ঘটল না রুণু লাহিড়ীর। মানবের সব বলা হয়ে গেলে পর লাহিড়ী নতুন করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'তবু অনেক কিছু গোপন রাখতে হয়— একেবারে গভীর গোপন থাকে বলে'।

ইতিমধ্যে বেয়ারা সম্মুখে রাখা গেলাসগুলোতে মেপে মেপে হুইস্কি ঢালল, খুব সামান্য সোডা মিশিয়ে রুণু লাহিড়ী বলল, চীয়ার্স।

চীয়ার্স।

সকলেই অল্প অল্প ঠোঁটে ঠেকাল গেলাসগুলো। লাহিড়ী এক চুমুকে গেলাস শেষ করে ফেলে বলল, এই যে আপনারা এত ঘনিষ্ঠ, জানেন কি আপনারা সকলে সকলকে? নান্টু একটু বিরক্তি প্রকাশ করে জবাব দিল, 'কি হচ্ছে লাহিড়ী, এত সিরিয়াস টোনে কথাবার্তা আমার একদম পছন্দ নয়'। অজিত বলল, 'সিরিয়াসলি বলছি, সিরিয়াস কথা আমার একদম আসে না।' কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে সুধাংশুর দিকে চেয়ে বলল, 'হ্যাঁ গো সুধাংশুবালা, আমেরিকা থেকে অত বোলচাল মাখা চিঠি লিখিস কেন? সভ্যতা, সংস্কৃতি এসব কে চায় শুনতে?' কথা থামিয়ে গেলাসটা শেষ করে বলল, 'ওই জন্যই শেষের দিকে তোর চিঠির আমি জবাবই দিতাম না।'

সুধাংশু সেকথায় ম্লান হাসল। বলল, 'এক একটা পরিবেশে এক একরকম মানসিকতার জন্ম হয়; আমিও না ভেবেছি তা নয়, কিন্তু পারিনি। এবার থেকে, ভাল আছি, তুই কেমন আছিস গোছের চিঠি লিখব।'

মানব সুধাংশুর থুতনিটা ধরে বলল, 'রাগ করলে সুধাংশুবালা'। অজিত অমনি খিঁচিয়ে জবাব দিল, এই শুয়োর সুধাংশু-বালা ডাক শুধু আমি ডাকব, ওখানে আমার এ্যাবসলিউট মনোপলি।'

বেয়ারা ফের গেলাস পাল্টে নতুন করে হুইস্কি ঢালল। নান্টু হাতের সিগারেটটার শেষ টান দিয়ে এ্যাসট্রের মাঝে গুঁজে দিয়ে বলল, 'ওখানকার টক ঝাল, মিষ্টি দুচারটে কথা শোনা তো?'

সুধাংশু এক চুমুকে প্রায় অর্ধেক গেলাস শেষ করে বলল, ওসব তো অনেক শুনেছিস।'

'না না, তার চেয়ে ওখানে একটু আধটু কেমন ফ্লার্টিং করেছিস শোনা।' অজিত ভুরু নাচিয়ে শুধোল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিন তিন পেগ হুইস্কি শেষ হয়ে গেল। বেয়ারা পাশে এসে দাঁড়াতেই রুণু লাহিড়ী সকলকে লক্ষ্য করে বলল, শেষবারের মত গলাটা আর একটু ভিজিয়ে নেবেন নাকি?

মানবের গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল ঘন ঘন। কথাও কেমন জড়িয়ে এসেছে। কান দুটো থেকে গরম ভাপ বেরুচ্ছিল। সিগারেট ঠোঁটে না লাগিয়েই দেশলাই জেললে জ্বলন্ত কাঠিটা ঠোঁটের কাছে এলোমেলো ঘোরাচ্ছিল। তাই দেখে নান্টু ফু দিয়ে দেশলাই-এর কাঠিটা নিভিয়ে দিয়ে বলল, 'মানব, চল একটু মুখে-চোখে জল দিবি চল'।

মানব কেমন ফ্যাকাশে শূন্য চোখে তাকাল ওর দিকে। শূন্য গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে মানব বলল, লাহিড়ী আপনি মাইরী বড্ড ড্রিংক করেন, আমারটাও শালা ফাঁকা করে দিয়েছেন।'

লাহিড়ী ধীরে শান্ত গলায় বলল, ভুলে খেয়ে ফেলেছি, মাপ করবেন?

নান্টু সুধাংশুদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'মানবটা আজকে ভোগাবে।'

অজিত বারণ করল নান্টুকে ওভাবে কথা বলতে। পাছে শুনে বুঝে ফেললেই হয়েছে আর কি!

বেয়ারাকে ইশারা করে বিল আনতে বলে অজিত বলল, মনুমেন্টের নিচে বসি গে চল। অনেকদিন তোর গান শুনি না।

বিল পেমেন্টের দায়িত্বটা পুরোপুরি রুণু লাহিড়ী নিজে নিয়ে নিল। কারুর কোনরকম ওজর আপত্তি শুনলো না। সুধাংশু বলতে চেয়েছে, আজকে আমার ইচ্ছেতেই এই গেট টুগেদার। আর আপনি তো আমাদের অনারেবল গেস্ট। না না সে হয় না।'

রুণু লাহিড়ী বলল, সে জন্যই তো আজকে আমি আপনাদের সকলকে এন্টারটেন করাব। ফের দেখা সাক্ষাৎ ঘটলে তখন না হয়, আমি আপনাদের গেস্ট হব।

ওরা সকলেই বুঝল, ভীষণ একগুঁয়ে লাহিড়ী। অনাবশ্যক আর কথা না বাড়িয়ে ওরা লাহিড়ীর প্রস্তাব মেনে নিল।

নান্টু ইতিমধ্যে মানবকে সঙ্গে করে ল্যাভেটরিতে গেছে। সেখানে ভাল করে চোখে মুখে জলের ঝাঁপটা দিয়ে মানবকে বেশ কিছুটা সুস্থ করে তুলে ধীর শান্ত গলায় বলল, একেবারে আদেখলার মত মাল খেলাম আজ। এতে কি কোন সুখ আছে। শরীরটা কেমন খারাপ হয়ে গেল দেখ। ফূর্তি করতে এসে এভাবে শরীরটাকে নাজেহাল করার কোন মানে হয় না'।

মানব খুব সন্তর্পণে নান্টুর হাত ধরে বলল, 'কষ্ট হচ্ছে তোর নান্টু। আমাকে ভাল করে ধর। ভোল্ট কিরেট এনি সিন।'

নান্টুর ওকথায় খুব জোরে শব্দ করে হেসে ফেলতে ইচ্ছে হল। মানবের অবস্থা ভাল করে উপলব্ধি করে নিয়ে বলল, আজ সেই গানটা গাইবি তো মানব।'

'কোন গানটা রে? বহুদিন কোন গান গাই না। কেমন যেন ভোঁট হয়ে যাচ্ছি দিন

দিন'—কেমন করুণ সুরে বলল কথাগুলো মানব।

নান্টু বলল, কেবল তুই শুধু সেই পুরোন পাড়ায় আছিস এখনও। আমরা সবাই এখানে ওখানে ছিটকে পড়লাম—নতুন করে এ বয়সে কী কোন বন্ধু পাওয়া যায় রে?

ধীর পায়ে বেরিয়ে এল ওরা রেস্তোরাঁ থেকে।'

পথে নেমেই অজিত একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। 'লোকজন গাড়ি সব কিছুকে উপেক্ষা করে নিজের মত করে গেয়ে উঠল, 'সে কেন দেখা দিলরে, না দেখা ছিল যে ভাল।......'

দুচারজন পথচারীরা একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে ওদের কাণ্ডকীর্তি দেখছিল। কেউ কেউ দ্রুত পাশ কেটে চলে গেল। একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সুধাংশু সিগারেট কিনল। মানব ওকে সিগারেট কিনতে দেখে জোরে বলে উঠল, 'চারমিনার কেন—' সিগারেট কেনা হয়ে গেলে সুধাংশু বলল, চল, রাস্তা পার হই'। বিশাল শরীরের মানুষ লাহিড়ী কী মনে করে কেমন যেন সজীব হয়ে উঠল। খুব সাবধানী ভঙ্গিতে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্র্যাফিক পুলিশের মত গাড়ি মানুষজন পার করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল লাহিড়ী।

মানব জোরে চীৎকার করে বলে উঠল, সাবাস, লাহিড়ীর মাইরী জোর নেশা হয়েছে। নান্টুর শালা অরিজিন্যালিটি আছে। এমন একজন ক্লাসিক্যাল ড্রাংকার এর আগে আর চোখে পড়েনি।

সুধাংশু সে কথায় হেসে ফেলল। বলল, তুই শালা বারে বসে যা খেল দেখালি না—হ্যাটস অফ টু ইউ'।

অজিত আর নান্টু যথাসম্ভব গোপনীয়তা রেখে মুখ টিপে হাসল। মানব বোকার মত চুপ করে থেকে সুধাংশুকে বলল, 'দে চারমিনারের প্যাকেটটা।'

ওর কথায় চারমিনারের প্যাকেটটা মানবের হাতে দিয়ে ওর একটা একটা হাত শক্ত করে ধরে বলল, 'চল রাস্তা পার হই। মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে লাহিড়ী আলফাল হাত ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে। এ সময় যদি পুলিশভ্যান আসে লাহিড়ীকে তবে এক রাত্তির হাজত বাস করতে হবে। আয়।

মানবকে ধরল সুধাংশু। অজিত আর নান্টু বেশ সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে গেল।

ওপারে এসে সবুজ ঘাসের ওপর ধীর পায়ে এগুতে এগুতে এই প্রথম যেন ওরা আবিষ্কার করল, মাঠের ভিতরটা ভীষণ অন্ধকার। বহু যুগ ধরেই যেন অন্ধকার এক এক জায়গায় ভীষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে গেছে। কোনদিনই যেন এই অন্ধকার দূরে করার চেষ্টা নেই। আর এরই মাঝে অনেকেই কেমন নির্বিকার আশ্রয় নেয়। ঠিক এই মুহূর্তে অজিতের মনে হল, অন্ধকারটাকে এত সহজে তাই কী ওরা বেছে নিল? আবার এই ভাবনাও তার মাথায় এল, এত-ক্ষণ তারা যেখানে ছিল, সেখানে কত কোলাহল, কত আলো! সত্যিই সেসব অকৃত্রিম প্রাণের বিকাশ; সুন্দরের প্রতীক ওই আলো? কেমন যেন মাথাটা মুহূর্তে ঝিমঝিম করে উঠল। অসহ্য একটা চাপ ব্যথা বুকের মাঝে অনুভব করল অজিত। সমস্ত শরীরটা গুলিয়ে পেঁচিয়ে তালগোল পাকাবার দশা। কিন্তু কাউকেই কিছুই জানান দিল না। দু ঠোঁটের মাঝে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে দেশলাই জ্বালল। এক বুক ধোঁয়া জমাট করে রেখেছিল বেশ কিছুক্ষণ। পরমুহূর্তেই একটু হালকা বোধ করলে পর, একটু আগের মনোভাবটাকে তাৎক্ষণিক বলে উড়িয়ে দিল।

লাহিড়ী একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে বসে পড়ল। তার দেখাদেখি অন্য আর সকলেই লাহিড়ীকে ঘিরে বসল। সুধাংশু সেই অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে সতর্ক চোখে লাহিড়ীকে দেখে নিয়ে বলল, 'যা ট্র্যাফিক কন্ট্রোল করছিলেন না, পুলিশের নজরে পড়লে মজা দেখাত।'

সরল শিশুর মত হি হি করে হাসল লাহিড়ী। কোন উত্তর দিল না। ঘনঘন সিগারেটে টান দিতে দিতে একসময় মানবের দিকে চেয়ে বলল, 'কী মশাই একটা গান গাপবেন বলেছিলেন, জম্পেস করে একটা শোনান দেখি।'

মানব অজিতকে লক্ষ্য করে শুধোল, 'অজু, তুই হঠাৎ ওই গানটা গাইতে গেলি কেন রে? ও গান তো শালা, আমার গাইবার কথা।'

'মাইরী আর কি? মিস সোমকে কতদিন ধরে তাক করে রেখেছি, তুই একদিনেই ওকে পেয়ে যাবি। সে চলবে না।'—অজিত স্পষ্ট উত্তর দিল মানবকে।

অন্যান্যরা থম মেরে বসে রইল। কিছুই মাথায় ঢুকছিল না ওদের। এদের দুজনের

মাঝখানে মিস সোম বলে যে কেউ একজন রয়েছে তা বুঝতে পারলেও, সব কিছুই কেমন যেন রহস্যময় ধোঁয়াটে থেকে যাচ্ছিল।

লাহিড়ী লাইটার জেলে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাবার মত অজিত আর মানবের মুখের কাছে ঘোরাল। 'আপনারাও শেষ অবধি সেই ওল্ড ট্র্যাপে পা দিলেন।' মানবের মাথাটা মুহূর্তেই কেমন জট পাকিয়ে গেল। অনেক যন্ত্রের ঝম ঝম শব্দ অসম্ভব অস্থির করে তুলতে থাকল। চোখ দুটো ভীষণ করকর করছিল। আকস্মিক লাহিড়ীকে আক্রমণ বসল মানব। 'বাপের বিধবা ছেলে হয়ে ঘুরেছেন, জীবনের কোন সংবাদ কখনও রেখেছেন কী? কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করলেই মানুষ হয় না, মানুষ হতে গেলে আরও কিছু থাকা চাই।' লাহিড়ীর লাইটারটা তখনও জ্বলছিল। সেই ক্ষীণ আলোতেই ওরা দেখতে পেল লাহিড়ী প্রসন্ন মুখে চেয়ে আছে মানবের দিকে। প্রতিবাদ করার মত সামান্যতম মনোভাবও লাহিড়ীর আছে বলে মনে হল না।

সুধাংশু আর নান্টু বুঝতে পারল, এ সময় নতুন কিছু বলা মানেই জটিলতা বাড়ান। নান্টু একটা ফুঁ দিয়ে লাহিড়ীর লাইটারটা নিভিয়ে দিয়ে বলল, আয় সুধাংশু আমি আর তুই একটু টুইস্ট নাচি, এমন খোলামেলা আকাশের নিচে কতদিন আসিনি বল তো। পৃথিবীতে কত কী ঘটে যাচ্ছে, এর বিন্দুবিসর্গও আমরা ধরতে পারছি না। সময়গুলো আঙুলের ফাঁক দিয়ে সুট সুট করে বেরিয়ে যাচ্ছে।'

সুধাংশু বলল, কার যেন একটা লেখায় পড়েছিলাম, সময় নিষ্ঠুর ব্যাধের মত আমাদের সব কিছুকে হরণ করে।'

নান্টু ফ্যাচ করে হাসল ও কথায়। বলল, আমেরিকায় গিয়ে তোর মেমারিটা বড্ড ভাল হয়ে গেছে। আমরা জানি না, তুই কোটেশান মাস্টার ছিলি? তুই তো কতবার পরীক্ষার খাতায় নিজের কোটেশানে নাম না উল্লেখ করে 'বিখ্যাত দার্শনিক বলিয়াছেন' বলে চালান দিয়েছিলি।'

ওকথায় হো হো করে হাসল লাহিড়ী। অজিত আর মানবও হাসল।

নান্টু এবার একটু সাহস পেয়ে গিয়ে বলল, একটা কথা বলব রাগ করিস নি। ওই যে গোলপোস্টটা দেখা যাচ্ছে, তোরা দুজন একসঙ্গে দৌড়ো। যে প্রথম পোস্ট ছুঁতে পারবে, সেই মিস সোমকে মালা পরাবে।'

লাহিড়ী এবার ফোড়ন কেটে বলল, মিস সোমকে যে কেউ এতদিন রিজার্ভ করে রাখেনি, সে রকম পাকা খবর আপনাদের আছে কি?'

নান্টু লাহিড়ীকে ধমক দেবার ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'আপনি চুপ করুন তো মশাই, ফের মানবটা আপনাকে দুচার কথা শুনিয়ে দেবে।'

এবার যে কান্ড ঘটল তা অভাবিত। অজিত হাত দুটোকে আকাশের দিকে তুলে বলল, 'আমার কাজ শেষ। আমি মানবের কাছে সারেন্ডার করলাম।'

মানবও সেকথায় উত্তর দিল, 'না তা হয় না।'

'আরে বাবা, একটা মেয়েকে তো দুজন বিয়ে করতে পারে না—

সুধাংশু মৃদু হেসে বলল কথাকটি।

অজিত এবার সবিস্তারে যা বলল তার মর্মার্থ এই: মানবকে ভাল করে যাচাই করার জন্যই ও নিজে একজন কমপিটিটার হয়ে দাঁড়িয়ে মানবের মনটাকে পরীক্ষা করল। নেহাতই একটা খেলা, এর বেশী আর কিছু নয়।

'শালা শুয়োর, তোকে আজকে মেরেই ফেলব—বলে মানব প্রচন্ড জোরে অজিতের পিঠে একটা ঘুঁষি মারল। আবার পরমুহূর্তে অজিতের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'বিলিভ মী, মিস সোমকে আমার ভাল লেগেছে, তার মানে কী এই, ওকে আমি মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছি।' সকলের দিকে চেয়ে ফের বলতে থাকল মানব, 'আজকেই অজিতের অফিসে মেয়েটাকে প্রথম দেখলাম। দু-চারটে কথাও হয়েছে। কেমন সব কথা বলল মিস সোম। কেমন যেন দুর্বল হয়ে গেলাম মুহূর্তে।'

'হয়। এমনটা আমারও হয়েছিল।' লাহিড়ী উত্তর দিল। কিছুক্ষণ থেমে বলল, বড় পাপ, বড় অন্যায় আমি করেছি জীবনে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে বের করে দিয়ে বেশ কিছুটা হালকা হয়ে গেলে পর বলতে থাকে লাহিড়ী, 'সে কোন কুমারী মেয়ে নয়, একজন বন্ধুর বৌ। প্রথম দেখার পর থেকেই ভীষণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম ওর জন্য। অনেক নিচে নেমে গেলাম। মেয়েটা ডুবতে জানতো, ভাসতে জানতো না; আর আমার ঠিক ছিল তার বিপরীত। যখন জানাজানি হল তখন আমি অনেক দূরে, ওদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। পরে শুনেছি, বৌটা আত্মহত্যা করেছে।' শেষের দিকে কথাগুলো বলতে বলতে, কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠল লাহিড়ী। কণ্ঠনালীর কাছে কোন কিছু যেন আটকে গেছে বলে মনে হল তার। ওই অন্ধকারের মাঝে যেন ওরা অনুভব করল, লাহিড়ীর ভীষণ কষ্ট। নিঃশব্দ কাতর গোঙানির মত কিছু একটা লাহিড়ীর থেকে ভেসে আসছিল।

অজিত সেই সময় লম্বা হয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। উপরের আ এর অজস্র নক্ষত্রগুলোর দিকে তন্ময় চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। মানব ঝুঁকে বলল, 'কীরে অজু, শরীর খারাপ না তো?' অজিত সংক্ষেপে উত্তর দিল, এবং নিজের মনেই বলে উঠলো, 'আকাশ সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ.... পুরো মুখস্থ নেই, যতটুকু মনে ছিল তত খুব নিবিষ্ট মনে আবৃত্তি করল। কয়েক চুপ করে থেকে ফের বলল, 'হা সুধাংশুবাবু, এখন এ বয়সে কোনটা পথ, সপ্তর্ষিমন্ডল, চিনতে পারবে? দিন এমন সুন্দর আকাশের দিকে দেখিনি। সেই কোন ছেলেবেলায় চিনিয়ে দিয়েছিলো, তারপর কোন একদিন আমরা সবাই লায়েক হয়ে গে বড় তাড়াতাড়ি লায়েক হয়ে গেলাম

অজিতের কথা বলার ঢং-এ কেমন দুঃখ মাখান; সবাই সে মুহূর্তে নিজ ভাবনা দিয়ে দুঃখকে ছুঁয়ে যেতে পার নান্টু খুব যেন বিরক্ত এরকম ভাব নিয়ে ফেলল, 'এজন্য মালফাল আমি খেতে না। এসব খেলেই শালা হারানো ছোট স্মৃতি সব কেমন ভক্ ভক্ করে বেরিয়ে আসে।' সবাই সে-কথায় হা

আগের থেকে লাহিড়ী অনেকটা হয়ে গেছে। নিজস্ব ভঙ্গিতেই ধীরে নান্টুকে শুধোল, 'হ্যাঁ নান্টুবাবু, আপনাকে খুব বেশি পাড়ায় দেখি না ব্যাপার বলুন তো? আমার খুব সন্দে যে আপনি......

কথাটা শেষ করতে দিল না নিজেই। ঘাসের ওপর পড়ে থাকা থেকে সিগারেট বের করে আগুন একমুখ ধোঁয়া বের করে বলল, 'হ্যাঁ একটা বাজে বিশ্রী ব্যাপারে ফেঁসে যা কখনো কল্পনাও করিনি আমার জীবনেই ঘটল। এক থেমে ভাবল—খুব বেশি হলে দু মিনিট সময় নিল ও। তারপর বলতে থাকল মেয়েকে এই এতটুকু বেলা থেকে জা মেয়েটার দাদা আমার বন্ধু। মেয়েটা আমার বোনের বন্ধু। ওদের বাড়ি একরকম আত্মীয়তার সম্পর্কই যে উঠেছে ইদানীং। ছোট বোনটার একদিন জানলাম, ওই মেয়েটা নাকি মনে মনে ভালবাসে। প্রায় বারো তফাৎ ওর সঙ্গে আমার। প্রথমটা আমি হেসেই উড়িয়ে দিলাম, কিন্তু বুঝলাম এটা হাসার ব্যাপার নয়। করে বন্ধুর কাছে মুখ দেখাব ক যে এত বিশ্বাস করেছে, যে বাড়িতে ছেলের মত যাতায়াত করেছি... এ সাংঘাতিক অন্যায়। ওকে দায়িত্ব নিতে গিয়েই ভুল করে রোজ রোজ এই যে লুকিয়ে-চুরি করা, এর মধ্যেই কোন ফাঁকে আমি করলাম, আমার সমস্ত অস্তিত্বে

মেয়েটা তার নির্দিষ্ট জায়গা দখল করে বসেছে। এখন ওকে ছাড়া আমার একদিন এক মুহূর্ত চলবে না। এই যে আজ এখানে, ও ঠিক নির্দিষ্ট জায়গায় এসে ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করে চলে গেছে। অথচ, যতক্ষণ ওকে না দেখতে পাবো, ততক্ষণ আমারও স্বস্তি নেই!' একটানা নিজের কথা বলে চুপ করে গেল নান্টু। একসময় খুব করুণ মুখ করে শুধোয়, 'তোরা কে পারবি এ-বিষয়ে আমাকে হেলপ করতে?'

সেই যে বন্ধুটার কথা বললি, ওকে কি আমরা চিনি'—সুধাংশু শুধোল।

—না। আগে যে পাড়ায় থাকতাম, সে-পাড়ার বন্ধু মান্টু উত্তর দেয়।

রমেন বোস। এল-আই-সিতে যে চাকরি করে এখন।'—অজিত জিগ্যেস করল।

'—হ্যাঁ। ঠিক বলেছিস। ওকে দু-একদিন তুই তো দেখেছিস।'—নান্টু উত্তর দিল।

এই মুহূর্তে সুধাংশুর হাওয়াই দ্বীপের সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল। আজ-কালের মধ্যে ওর একটা চিঠি আসবে নিশ্চিত। খুব শান্ত ধীর স্থির। অসম্ভব সুন্দর গান গায়। 'তোমাদের দেশে আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে। শুনেছি, বাংলার মেয়েরা, ভীষণ ভালো। ওদের মত লাবণ্য, ওদের মত শান্ত ধীর স্থির মেয়ে নাকি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের তুমি কী চোখে দেখো জানি না। মনে হয়, তুমি খুব বেশি পছন্দ কর না আমাদের।' ম্লান বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে রোজালিন কথাগুলো বলেছিল একদিন। সেদিন ওকে হাসিতে ঠাট্টাতে উপেক্ষা করতে চেয়েছে। ক্রমে ক্রমে ও লক্ষ্য করেছে, রোজালিন কেমন যেন পালটে যাচ্ছে। সুধাংশুর কাছে এলেই ওর ভাবান্তর ঘটে। সুধাংশুর এ মুহূর্তে বড় বেশী ওর কথা মনে হতে থাকল। মেয়েটা একদিন বলেছিল, 'একদিন তোমাকে আমাদের ওখানে নিয়ে যাবো। মাকে দেখবে, ঠাকুমা ঠাকুর্দাকে দেখবে। খামারে সারাদিন আমার ঠাকুর্দা কী কঠিন পরিশ্রম করে—বাড়িতে এলেই সে মানুষটা একেবারে পালটে যায়। আমার বাবা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। বাবার কথা আমার খুব একটা মনে নেই। মা বাবাকে খুব ভয় পেতো। আমার মা খুব দুর্বল আর রোগা। মনে হয়, বাবা মাকে মারধর করতো! মা একবারের জন্য ভুল করেও এসব কাউকে বলে না। আচ্ছা! তোমাদের দেশে এরকম হয়? স্বামী স্ত্রীকে ধরে মারে! আমার খুব খারাপ লাগে। স্বামী স্ত্রী যখন, তখন ফুলেস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকাই তো স্বাভাবিক।' এসব কিছু ছায়া-ছবির মতো স্পষ্ট ভেসে উঠতে থাকল সুধাংশুর চোখের সামনে। রোজালিন যেন খুব কাছে থেকেই এসব একটানা শুনিয়ে গেল। আশ্চর্য! ওখানে থাকার সময় মেয়েটার কথা তো এত করে মনে পড়ত না। বরং ওর ঘন ঘন আসা-যাওয়া একরকম মনে মনে অপছন্দই করেছে।

সুধাংশুকে গম্ভীর থাকতে দেখে মানব শুধোল, 'কী রে কী হলো তোর?'

—'না কিছু না।' পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'এক মাসের মধ্যে তিনটে দিন পার হয়ে গেল। এমনি করে একটা একটা করে দিন পার হয়ে যাবে, আমি ফের আমেরিকায় চলে যাবো। আবার কেমন এক-ঘেয়ে হয়ে উঠবে সব। তোরা অফিস যাবি, বাড়ি আসবি। কোনদিন হয়তো প্রজাপতি আঁকা নান্টুর বিয়ের চিঠি পাবো। মানবটা কী করবে কে জানে? অজিত তো ভীষ্মের পণ করে বসেছে—নো ছাতনাতলা; লাহিড়ীর দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যি লাহিড়ী, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে গভীর গোপন কিছু না-বলা কথা থেকে যায়। আপনি, ওই ঘটনাটা নিয়ে অত বেশি আর বদ্ভ করবেন না—যা হবার তা হয়েছে। সারা জীবন অ্যানসিয়ান্ট মেরিনারের মত পাপের বোঝা বয়ে বেড়ানোর কোন মানে হয় না। জীবনটাকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন।

এক সময় ওরা দেখল, আশেপাশের লোকজন কখন চলে গেছে। ওরাই এই বিশাল ব্যস্ত মাঠের মধ্যে, অজস্র নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে এখনও বসে আছে। হাত-ঘড়িতে সময় দেখে লাহিড়ী বলল, 'কী মশাই, বাড়িঘর আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। চলুন। এত রাত্তির হয়ে গেল, বুড়ীটা এখনও ছানি পড়া চোখ নিয়ে চেয়ে আছে। মশাই, যত বয়স বাড়ছে, যতদিন যাচ্ছে, বেঁচে থাকার তাগিদ বড় বেশী অনুভব করি। জানেন, মাঝে মাঝে মনে হয়, কিছু একটা করি, কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু কী যে পথ খুঁজে পাই না।'

"আপনার জীবনে এমন একজনের দরকার যে 'পথ হারাইয়াছে' জিগ্যেস করে সঠিক পথে নিয়ে যাবে।'—অজিত স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে বলল কথাগুলো।

ও কথায় সবাই হো হো করে হাসল। লাহিড়ী হঠাৎ ভেঙে পড়ল কান্নায়। সবাই কেমন বোবা হয়ে গেল, লাহিড়ীর এই আকস্মিক পরিবর্তনে সবাই কেমন যেন অভিভূত।

নান্টু বলল, 'লাহিড়ী কী হচ্ছে কী?'

লাহিড়ী কোন উত্তর দিতে পারল না। তখনও সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ওকে আর তেমন কেউ-ই বাধা দিল না। বেশ কিছুক্ষণ একটানা কাঁদল লাহিড়ী। অবশেষে নিজেকে শান্ত করে নিয়ে বলল, সরি! একস্ট্রিমলি সরি! আজ বহু বছর পর, এই প্রকাশ্যে সকলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি—ঘৃণা নয়, পারেন তো ভালবাসার হাত বাড়িয়ে দিন।'

ওর কথায় বিনা দ্বিধায় সকলেই হাত বাড়িয়ে দিল লাহিড়ীর দিকে। লাহিড়ী খুব জোরে শব্দ করে হাসল। নিঃশব্দ চরাচরের মধ্যে বাতাসের তরঙ্গে সে হাসি ভেসে বেড়াতে থাকল।

এবার সবাই ধীর পায়ে ওখান থেকে উঠে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

ফের দেখা হবে।

নিশ্চয়ই!

গুড নাইট।

ওকে।

এমনি ধারা কথা হবে পর অজিত সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে মানবকে শুধোল, 'এই শুয়োর, কী করবি ভাবছিস?'

মানব একমুখ হেসে বলল, 'কালকেই দশটার ট্রেনে বিষড়ায় যাবো ভাবছি। রাতটা বড্ড বড় রে!

রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা

সেটুকুই নয়

সবাই আরোগ্য নই   অথচ আরোগ্য হতে প্রত্যেকেরই ইচ্ছা থাকে
অধিকারও থাকে
আমরা সেকথা জানি—জেনেও অসুখ হই প্রত্যহ প্রত্যহ—
আমাদের মধ্যে শুধু একজন দুজন পিতামহ
অন্যরা সবাই বংশধর
যেমন আনন্দ হয় আমাদের কেউ কেউ
বাকিরা সবাই অনুগামী।
অর্থাৎ যে যা হয় তাই সে হয়েছে—তার বেশি কিছু নয়
যদিও অনেক বেশি হতে সে পারতই, কিন্তু
হতে সে পারেনি।

সবাই মহৎ নই   যদিও মহান হতে প্রত্যেকেরই ইচ্ছা থাকে
অধিকারও থাকে
এবং সেকথা জানি—জেনেই বিখ্যাত হতে চাই, কিন্তু
সবাই পারি না—
তেমন বিরাট হয় কোনো কোনো গাছ, আর
অনেকেই শুধু গুল্ম লতা
আমরা সবাই আসি—কিন্তু আবির্ভাব হয় কদাচিৎ কেউ।
আমাদের ইচ্ছা থাকে ধ্যান থাকে
এবং কিছু না কিছু হই, হয়ে যাই
তবু যা হয়েছি কিংবা হব—শুধু
সেটুকুই হতে যে চেয়েছি   তাই নয়।

যখন আসবো

যখন আসব তখন আসবো খুব হঠাৎ   তখন
সবুজ সিগন্যাল লাল করে রেল লাইন পার হবে শিশুরা
তাদের হাতে রঙের বাক্স   তুলি ভেজানো কুয়াশায়
পকেট-ভরা পাকা জলপাইয়ের গন্ধ লুকিয়ে দেখছে বাতাস।
যখন আসব তখন দুঃখেরা বলবে   অসময়
তার আগের রাত্রে বাল্ব থেকে বিদ্যুৎ সরিয়ে
জায়গা দখল করেছে নক্ষত্র—
তখন কাঁচা হলুদের রসে অঙ্গ ডুবিয়ে
পথে বেরিয়েছে মেয়েরা
তাদের বুকের উপর বৃন্তের মতো পরিপূর্ণ
বাচ্চা মেঘের শরীর—
তখন হলুদ রেখায় নদী বইছে বৃহস্পতির ভূগোলে
মঙ্গল আর শুক্রে চলছে বন্দীবিনিময়....

যখন আসব তখন আসবো খুব হঠাৎ   তখন
আকাশ দিয়ে মুখ ধুয়েছে অহংকার—
তখন চক্ষুব্যাংকে অন্ধদের জন্য চক্ষুদান করছে পক্ষীরা
পারের কাছে শব্দ রেখে শংখেরা ফিরে যাচ্ছে বাড়ি।
যখন আসব তখন ক্যানভাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে চতুর্দিক
আমার মুখের ছবি এঁকে দাঁড়িয়ে আছে দ্রাঘিমা
তখন শিশুদের হাতে রঙের বাক্স তুলি ভেজানো কুয়াশায়।

জন্ম— ১৯৩৭
পেশা—চাকরি

কবিতা রচনার শুরুতেই প্র[illegible] রীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে অ[illegible] সচেষ্ট ছিলেন রত্নেশ্বর। সে-সময় [illegible] তিনি গঠনশৈলীতে মনোনিবেশ দিে[illegible] বেশী পরিমাণে। নিজেকে চিহ্নিত [illegible] প্রকল্পে পঙক্তিকে ভেঙে ভেঙে [illegible] করতেন কবিতাশরীর, ফলত সে সময় [illegible] কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিচিতি হয়ে[illegible] 'জলবায়ু'র কবিতাকে কেন্দ্র [illegible] কবিতাপাঠকের [illegible] রত্নেশ্বর। স্বীকৃতি অর্থে নিজস্ব ভ[illegible] বিচরণ করার কথা-ই বলতে চাই। [illegible] ভূমিতে, অর্থাৎ চিত্রকল্প এবং [illegible] আঙ্গিকে ছড়িয়ে থাকে দুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদ।

প্রভাত চৌধ[illegible]

অমিতাভ ব্যানার্জি

ছবি

মাঝে কিছুদিন নাম শোনা যাচ্ছি[illegible] হয়ত একটু ব্যস্ত ছিলেন অন্যমনে। পূর্ণ কাজে এমনিই হয়। কিন্তু আ[illegible] বেশী সময় চাপা থাকে? সুযোগেই পড়েছে তা। অমিতাভ ব্যানার্জি পূর্ণ আঁকছেন তেলরঙয়ে, জলরঙয়ে আর ছবি সমান তালে। কিছুদিন আগে পেলেন সর্বভারতীয় দুটি পুরস্কার। কার ছবি সত্যিই পরিণত আর [illegible] দক্ষতায় বর্ণোজ্জ্বল। সোসাইটি অফ পোয়ারি গ্রুপের একজন কর্মঠ বিদেশে প্রদর্শনী ছাড়া ভারতের জায়গায় একক প্রদর্শনী রসিকে[illegible] আকর্ষণ করেছে। স্ত্রী মৈত্রেয়ী ব্যা[illegible] একজন সুপরিচিত চিত্রকর—অফিসে কাঁকে সর্বক্ষণ চিন্তায় আছে প্রদর্শনীর দাবি নিয়ে।

(বারো)
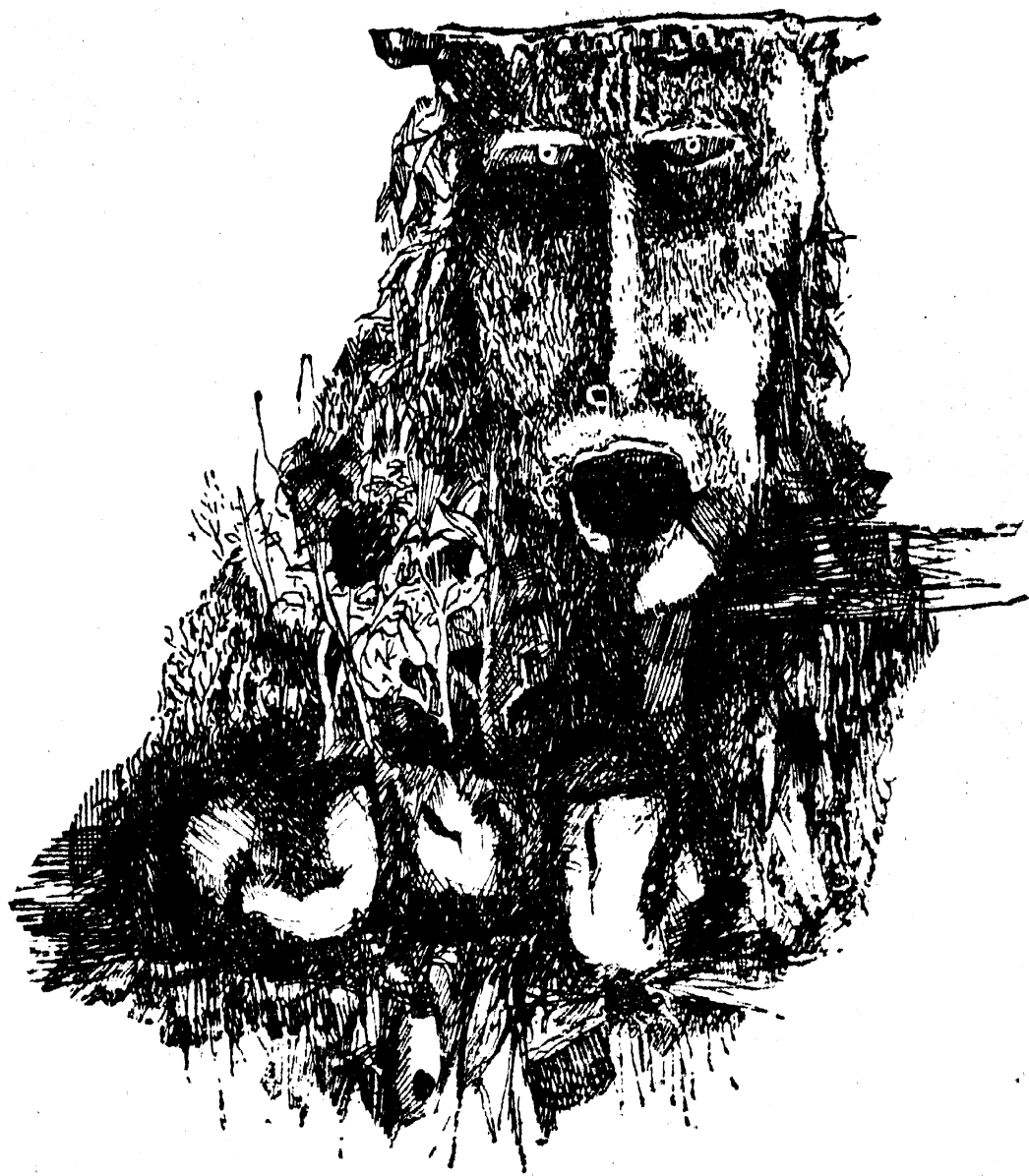
গৌরী যেদিন ঘোষবনে আশ্রয় পেল, ফাদার গ্যাব্রিয়েল সেদিন ঘোষবনে ছিলেন না। থাকলে ঘটনাটা অন্যরকম ঘটতে পারত। হয়তো গৌরীর সমস্ত ঝক্কি ফাদার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। নিজের হাতেই সেবা শুরু করতেন উনি। ফাদার এই সামান্য একটা ঘটনার সুযোগ নিয়ে আরো দশজনকে মানবধর্ম বোঝাতে পারতেন। যীশুর মহিমা বোঝাতে পারতেন। বলতে পারতেন, দেখ মানুষকে এইভাবে নিস্বার্থ সেবা করার শক্তি মানুষ কোথা থেকে পায়! দেখ, যীশুই সেই মহান শক্তির আধার। দেখ, এই যীশুই একদিন অসুস্থ এক মহিলাকে কেমনভাবে সুস্থ সবল করে তুলেছিলেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই ঘটনাটি তখন সবাইকে শোনাতে পারতেন গ্যাব্রিয়েল। যীশু ছাড়া মানুষের যে গতি নেই একথাটা না বোঝাতে পারা অবধি স্বস্তি কোথায়!

ফাদার ঘোষবনে ছিলেন না, কলকাতা গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে এখানকার পাঠশালার জন্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনতে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ক্রিশ্চান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে হাসপাতাল গড়ার ব্যাপার নিয়েও কথাবার্তা বলবেন বলেও ঠিক ছিল।

ফাদার ঘোষবনে ছিলেন না বলেই দুর্লভের যেন রোখ চেপে গিয়েছিল। হোক না ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ দুর্লভ পরোয়া করে নি। কুন্তির ওপরই পুরোপুরি আস্থা রেখেছিল দুর্লভ। কুন্তি মুখে যাই বলুক ওর মতো দয়ালু সেবাপরায়ণ মহিলা দুর্লভ খুব কমই দেখেছে। কুন্তির হাতে রাধাকে তুলে দিয়ে ও স্বস্তিই পেয়েছিল।

ফাদারের অনেক উপদেশই ওর এসময় মনে পড়ে গিয়েছিল, ফাদার একদিন বলেছিলেন, কোন ঘটনাই নিজে নিজে বিলীন হয়ে যেতে পারে না। প্রত্যেকটি ঘটনাই জন্ম দেয় আর একটি ঘটনার। ঘটনার ভিতর দিয়েই ঘটনা বেঁচে থাকে। ফলে গৌরীকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারে দুর্লভ, এই সামান্য ঘটনাই আরো দশটা ঘটনা তৈরি করে বেঁচে থাকবে। এবং শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। ঐ কুৎসিত রোগাক্রান্ত মেয়েটাকে কি সুন্দর তরতাজা ফুলের মতো তৈরি করে ফেলল কুন্তি। আর কি তৃপ্তি এই ঘটনায়। জীবনে অনেক বড় বড় ঝুঁকির কাজ করেছে দুর্লভ, কিন্তু এর মতো তৃপ্তি কোথায়!

সামান্য একজন মাঝির ছেলে ছিল দুর্লভ। মনে পড়ে যাচ্ছে হুগলিতে ওর ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা। মাঝির ছেলে বলে দরিয়ার সঙ্গে খেলা করেই এত বড়টি হয়েছে ও। দরিয়ার কি আশ্চর্য খেলা! এই আছে শান্ত ধীর স্থির, এই আবার দামাল। নদীর চরিত্র বুঝতে হলে সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয় নদীর। দুর্লভ ওর বাপের সঙ্গে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নদীতে কাটাবার সুযোগ পেয়েছে। ছবির মতো সেই স্মৃতিগুলো ওর মনে পড়ে। ওর সেই বাজান আজ আর বেঁচে নেই। মাও বেঁচে নেই। গত বছর ঠিক এমনি সময়ে মাকেও গোড় দিয়েছে মাটির নিচে। আজ দীর্ঘ এক যুগ ধরে পাদরি পাড়ায় ও পড়ে আছে। ওর ওপরে খবরদারি করার কেউ নেই। দুর্লভ ভাল বুঝেছে, হিন্দু থেকে খৃস্টান হয়েছে। উপাধীটা পাল্টে নিয়ে ম্যাকডোনাল্ড হয়ে গেছে ও।

হ্যাঁ, এই নিয়ে কম গঞ্জনা সইতে হয়নি ওকে। হিন্দুপাড়ায় কালাসাহেব নাম হয়েছে ওর। কালাসাহেব নামের মধ্যে ব্যঙ্গ আছে, থাকুক, গাহ্য করে না দুর্লভ। করেনি কখনো। ফাদার ওকে বুঝিয়েছিলেন, চামড়ার রং যাই থাক গো বাবু, চামড়া খুলে দেখ দেখি, কি পাও। সেই লাল রক্তই চলাফেরা করছে তোমার দেহে, আমার দেহে।

আর তোমার দেহেও যে কলকব্জা, আমার দেহেও তাই। তুমি যেমন দুঃখে কাঁদো, আনন্দে হাসো, আমিও তেমনি দুঃখে না-কেঁদে, আনন্দে না-হেসে পারি না। আসলে চামড়াটা তো বাইরের খোলশ, ভেতরটাকে মহান করে তোল, মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় জাতেই। যীশু এই শিক্ষাই মানুষকে দেন, যীশুর ওপর ভরসা এগিয়ে যাও।

কত সব অজস্র প্রশ্ন দু গ্যাব্রিয়েল তার সমস্ত কিছুই খুঁটিয়ে উত্তর দেন। দুর্লভ অব শোনে, পরম শ্রদ্ধায় যীশুর সুন্দর পবিত্র মুখের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তিতে সুন্দর হয়ে ওঠে।

দুর্লভ আবাদে এসেছিল নিঃস্ব সর্বশান্ত সেদিনকার সেই দুর্লভ আজকের দুর্লভের মধ্যে আকাশ তফাত। আজ দুর্লভ ঘর তুলেছে পাড়ায়। এক চালা গোলপাতার ঘ দুর্লভ বারোশ' মনী নৌকো ভাড় হুগলি অবধি গিয়ে সওদা করে পারে। সবই যীশুর করুণা।

ফাদার গ্যাব্রিয়েল কলকাতা থেকে এসে গৌরীর কথা শুনে বিস্ময়ে পড়েছিলেন। কুন্তির মুখেই সব কি নিলেন উনি। শুনতে শুনতে মনে যেন একটা ইন্দ্রজালের দৃশ্য দেখছেন মেরে কেউ যেন দেখাচ্ছে, এই দ্যাখো দেখছ? এক মুঠো মাটি আমার হাতে দেখ এই মাটি একটা সোনার গেল। কিংবা এই দেখ, দেখছ? কাপড় পেতে রাখলুম তোমার সামনে কাপড়টা সরিয়ে দিতেই একখানা কান্তি মানব দেহ।

গৌরীর আবির্ভাবটা তো ভগবান যেন ওদের পরীক্ষা করার গৌরীকে ওভাবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন

গৌরীকে ফাদার কাছে টেনে ছিলেন। দীক্ষা দিয়ে নিলেন খৃস্টমন্ত্রে। কিন্তু তার আগে ওর ভাল করে জেনে নিয়েছিলেন ফাদার

মেয়েটার বাঁধন কি রকম জান কুন্তিকে প্রশ্ন করেছিলেন ফাদার, ওর কে কে আছে?

কুন্তি বলেছিল, কথা শুনে যা এক মা ছাড়া তেমন কেউ নেই। ত ওকে ত্যাগ করেছে এখন যার এভাবে ওকে ভাগিয়ে দেওয়া হ বলুন।

মা ত্যাগ করেছে, কথাটা ভাবতে একটু খটকা লেগে থাকে ফাদারের। আর বেশি জানতেও সাহস হয় না। করলেন, কি জাত? হিন্দু?

—হ্যাঁ ফাদার, হিন্দু। শীল।

শীল। মানে ক্ষৌরকার?

—হ্যাঁ ফাদার নাপিত। চুল দাড়ি আমরা ওকে আশ্রয় দিয়ে ভাল ফাদার?

ফাদার গদগদ চোখে তাকিয়েছিলে করনি মানে, এইতো মানুষের ধর্ম হয়ে এটুকু কাজও যদি করতে না প আর বেঁচে থাকা কেন।

—তা হলে ওকে পাদরিপাড়া তো জমির বন্দোবস্ত করে দে ফাদার? একটু আশ্রয় পেলে ও বে

—নিশ্চয়। নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো সব বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে; আমরাও ওকে নৌকায় তুলে ভাসিয়ে দেব না।

গৌরী একটু সুস্থ হতেই ওকে পাদরিপাড়ার আশ্রমে এনে রাখা হল। বিঘা চারেকের ওপর আশ্রমের এলাকা। চারপাশে সবজির বাগান, আশ্রমের বাগান আশ্রমেরই ছেলেমেয়েদের দেখতে হয়। ছেলেদের থাকার জায়গা মেয়েদের থাকার জায়গা আলাদা। মাঝখানে গোলপাতার ছাউনি দেওয়া টানা লম্বা একটা ঘর। ওখানে তাঁত বসানো আছে কয়েকটা। ছেলেরা মেয়েরা একসংগে কাপড় বোনে, সুতো টানে। এছাড়া চাটাই ঝুড়ি বেড়া বোনার কাজেরও আলাদা আলাদা জায়গা আছে। হাতের কাজ শিখলে নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়িয়ে যাবে ওরা।

আশ্রমে প্রথম দিকটা খুব বিমর্ষ কেটেছিল গৌরীর। কি হওয়ার কথা ছিল, কি হল। তবু যে ও প্রাণে বেঁচেছে এজন্যও ভগবান যীশুর ওপরই কৃতজ্ঞ। প্রথম দিন থেকেই ওর সংগী হয়ে গেল চিন্ময়ী আর ঊষা। চিন্ময়ী ওর সমান বয়সীই হবে, কিন্তু ঊষা ওর দিদির মতো। প্রথম দুদিন চিন্ময়ীর সংগেই শুতে হয়েছিল ওকে। পরে ওর জন্য আলাদা বিছানা-পত্র আশ্রম থেকে দেওয়া হল।

ফাদার ঘন ঘন এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন গৌরীর। টকটকে ফরসা সুন্দর এই মানুষটাকে দেখে গৌরীর বিস্ময় যেন কাটতে চায় না। ফাদারকে দেখলেই ওর ভক্তিতে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। ফাদার কত সরল মানুষ। দুম করে আশ্রমে ঢুকে হয়তো ওর বিছানাতেই বসে পড়লেন। হয়তো নিজের হাতেই চাটাই বোনবার কাজে বসে গেলেন। কাজে কখনো লজ্জা রাখতে নেই, তা সে যে ধরনের কাজই হোক।

বড় অদ্ভুত ভঙ্গি করে সাহেব মাঝে মাঝে গানও গেয়ে ওঠেন, গাও, গাও; আমার সংগে গাও,

এসো খ্রীষ্টের দল,
এসো ভকত সকল।
প্রেম সুরে ভরি প্রাণ
গাহ প্রেম সুধা গান
যীশু জয় দেশময় বল অবিরল।

আশ্রমের সকলেই এক সংগে গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে ফাদারের সঙ্গে। গৌরীর সঙ্কোচ কাটতে চাইত না, চিন্ময়ী, বেলা, ঊষা সবার দিকে তাকিয়ে থেকে কেমন অবাক হয়ে যেত গৌরী।

চিন্ময়ী বলত, গা না গৌরী। গেয়ে দেখ, ভাল লাগবে।

—জানি না যে।

—আমরাও কি জানতাম নাকি। শুনে শুনে করে গাইতে গাইতেই শিখে গেছি। এখন অনেক গান আমাদের মুখস্ত।

—বেশ তো আমাকে অন্য সময় শিখিয়ে দিস, আমিও গাইব।

চিন্ময়ী বলল, আর কিছুদিন পরেই তো বড়দিন, তখন দেখিস সারা পাদরিপাড়া গানে নাচে কেমন জমে থাকে। আমরা ক্যারল গাইতে বেরুব। চার্চে গিয়ে প্রার্থনা গাইব। আমরা সবাই নতুন নতুন জামা-কাপড় পাব।

বড়দিন সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই গৌরীর। জিজ্ঞেস করল, ক্যারল কি?

চিন্ময়ী বলল, যীশু বেথেলহামে গোশালাতে জন্ম গ্রহণ করেছে, আমরা এই খবরটা গান গেয়ে গেয়ে সবাইকে জানিয়ে দেব। বলেই গুন গুন করে গান গেয়ে উঠল চিন্ময়ী,

প্রেমের রাজা জন্ম নিল
বেথেল গোশালাতে
অন্ধভাবনা দূর হল ভাই
আলোর মহিমাতে।

—গা না, আমার সঙ্গে সঙ্গে গা, তুইও শিখে যাবি।

চিন্ময়ীর সংগে গলা মিলিয়ে গাইতে খারাপ লাগে না গৌরীর। গুন গুন করে গৌরীও গাইবার চেষ্টা করে।

আশ্রমের জীবনটা খারাপ লাগে না গৌরীর। কেমন সব নিয়মে বাঁধা কাজ। সেই কাকভোরে উঠতে হবে, হাত মুখ ধুয়ে প্রার্থনা সভা; প্রার্থনায় হারমোনিয়াম বাজে, বাঁশি, খোল, করতাল জমজমাট লাগে তখন। তারপর শুরু হয় সাফাই. বাগানের কাজ। ছেলেরা মাটি কোপায়, আগাছা বাছে, বালতি বালতি জল ঢালে গাছের গোড়ায়। মেয়েরা, ঝাড় দেয়, ঘর মোছে, রান্নার আয়োজন করে। তরিতরকারি কোটে। সবাই মিলে কাজ করতে কি মজা।

একটু বেলা হলে হাতের কাজে লেগে পড়তে হয় সবাইকে। লক্ষ্মণদা ওকে চাটাইয়ের কাজ শেখাচ্ছে এখন, এরপর শেখাবে ঝুড়ি বোনা, পেটরা বোনা। চিন্ময়ী ওসব শিখে গেছে বহুকাল আগে। এখন ও তাঁতের কাজে এগিয়ে গেছে! খট খট করে মাকু চালায় চিন্ময়ী! চোখের সামনে কাপড় বুনতে দেখাও কত ভালো!

চিন্ময়ী বলে, তাঁত বুনবার আগে সুতো তোলা শিখতে হবে। যাদের আঙুল খুব সুন্দর হয়, তাদের সুতোও হয় সুন্দর। দেখি তোর আঙুলে দেখি? এরকম আঙুলে লক্ষ্মণদার খুব পছন্দ হবে। দেখিস, আমি বলে রাখলাম, লক্ষ্মণদা তোর আঙুল খুব পছন্দ করবে।

—তোর আঙুলই বা কি খারাপ শুনি?

—সুন্দর না ছাই। লক্ষ্মণদা আমাকে দেখতেই পারে না।

গৌরী চুপ করে থাকে।

লক্ষ্মণ বারিক আর ভদ্রেশ্বর বেরা ছেলে-মেয়েদের হাতের কাজ শেখায়। ভদ্রেশ্বরের বেশ বয়স হয়েছে, বুড়ো, চোখে কম দেখে। বেশ মজার মজার কথা বলতে পারে ভদুদা। ওর কথা শুনলে হাসবে না এমন কেউ জন্মায়নি পৃথিবীতে। আর সে তুলনায় লক্ষ্মণদা কিছুটা অন্যরকম। গৌরীকে সত্যি সত্যি লক্ষ্মণদা বেশ পছন্দ করে। ঘটনাটা গৌরী প্রকাশ করতে চায় না। চোখ টাটাবে অন্যদের।

বিকেলে আশ্রমের মেয়েরা দল বেঁধে রুমাল চোর খেলে। ছেলেরা খেলে কাবাডি, ধারিয়াবান্দা।

তারপর অল্প অল্প করে সন্ধ্যা নামে। পাদরিপাড়ার সন্ধ্যায় কেমন যেন একটা বিষণ্ণতা ছড়িয়ে থাকে। কনকনে শীতের বাতাস এসে আঁকড়ে ধরে সবাইকে। এই সন্ধ্যার পর থেকেই মনটা কেমন ভার হয়ে যায় গৌরীর। মনে পড়ে যায় দেশের কথা। মায়ের কথা। মনে পড়ে যায় নৌকায় কাটান ভয়াবহ রাত্রিগুলোর কথা। সেই জংগলের ধারে নৌকাটা যখন আটকে গিয়েছিল, সেই কালো মতো লোকটা, ঈশান, হ্যাঁ সেই ঈশান নামের লোকটা কোথায় যে হারিয়ে গেল কে জানে। শেষ পর্যন্ত নিমাই বা কোথায়! নিমাই কি বেঁচে নেই, না কি মজা দেখার জন্য ওকে ঘর থেকে বার করে এনে পালিয়ে গেল।

কি জানি কিছুই বুঝতে পারে না গৌরী। বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে গৌরীর। বার বার ইচ্ছে হয়, মায়ের কাছে ছুটে যায়। শতহোক মা, ওকে ফেলে দিতে পারবে না মা। যত নিশ্চিন্তেই এখানে থাকি না কেন, মায়ের কাছে থাকা অন্য রকম। কিন্তু মায়ের কাছে কি আর কোনদিন ফিরে যেতে পারবে গৌরী! কে জানে, দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসে ওর। কোন কোন দিন আকুল হয়ে বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে ও কাঁদে। কোন কোন দিন এমন হয়, রাত্রে ছট-ফট করে বিছানায়, ঘুমই আসে না।

রাত্রি এলেই বড় ঝামেলা হয়। রাত্রি নামলেই গুটিয়ে যায় গৌরী।

এর মধ্যে একদিন দুর্লভদা এসে হাজির। কি গো মেয়ে, কি করছ? আশ্রমের আর দশটা মেয়ের কাছ থেকে উঠে এসেছিল গৌরী। দুর্লভদা এসেছ!

—আয় বোন, বাইরে চাঁদ উঠেছে, আয় বসে একটু গল্প করি।

গৌরীকে নিয়ে বাইরে পুকুরের ধারে বাঁধানো ঘাটে বসেছিল দুর্লভ। মুখখানা অত শুকনো শুকনো কেন গো? কি হয়েছে?

—কৈ কিছু না তো। হেসে নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করেছিল গৌরী। শুকনো কোথায়, আজ সারাদিন কাজ করেছি। কি সুন্দর একটা আসন বুনেছি। নেবে আসনটা?

—পাগলী, আশ্রমের জিনিস দান করতে নেই। ওটা বাজারে বিক্রি হবে। সেই পয়সায় আশ্রমের খরচ চলবে।

—আমার কিন্তু খুব ইচ্ছে করছিল কুন্তিদিকে আসনটা দেই।

দুর্লভ ওকে কাছে টেনে নিল। মেয়ের মতো আদর করে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিল। আমরা তাহলে তোর ভালই করেছি কি বলিস! ভাগ্যিস তোকে নৌকো সমেত নিয়ে এসেছিলাম।

হঠাৎ একথা কেন! গৌরী কেমন থমকে গেল।

দুর্লভ বলল, আসলে পাদরিপাড়ার বাইরের লোকেরা নানা জনে নানা কথা বলছে। শুনলে বড় খারাপ লাগে, তাই বলছিলাম।

—কি হয়েছে দুর্লভদা? গৌরী আগ্রহে তাকিয়ে থাকল।

দুর্লভ বলল, আমাদের ভালো হক এট
অনেকেই চায় না, তাই বলছিলাম।

—ভালো চায় না মানে, কে? কা
কথা বলছ?

—কার কথা আর বলব। কাল ঘোষবনে
হাটে গিয়েছিলাম, সেখানেই শুনে এলাম।

গৌরীর বুকের ভেতর কেঁপে উঠল। কি
জানি কি হয়েছে আবার। ওর যা কপাল
আবার কি বিপদ আসছে কে জানে।

দুর্লভ বলল, না থাক, ওসব কথা থাক
ওদের কথায় কান দিলে আমাদের চলবে না

গৌরীর ব্যাপারে দুর্লভকে অনেক কথা
কথাই শুনতে হচ্ছে। পাদরিপাড়ার বাইরে
লোকগুলি ভীষন হিংসুটে। পাদরিপাড়া
লোকদের ভাল হোক এটা ওরা একদম চা
না। ওদের যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে
লাগে। গৌরী দুর্লভের হাত দুটো জড়িয়ে
ধরে, বল না দুর্লভদা? কি হয়েছে বল না

—ওসব নোংরা কথা আর বলতে ইচ্ছে
করে না। নকুলবাবুর সংগে দেখা হয়েছিল
আমাকে দেখার সংগে সংগেই যেন চিড়বি
করে জ্বলে উঠলেন।

—কেন?

—কেন আবার। আমরা নাকি ছেলেমে
ধরে এনে তুকতাক করে খ্রীষ্টান বানাই
আমরা নাকি তোকে চুরি করে ধরে এনে ভ
দেখিয়ে খ্রীষ্টান করেছি।

—না তো! আমি নিজেই হয়েছি।

—সে কথা আর কে বুঝতে যাচ্ছে। ব
কোথেকে নাকি একটা কুমারী মেয়েকে চু
করে এনেছে দুর্লভ। শোন কথা! সত্যি স
যা ঘটেছে আমি খুলে বললাম। তা কি অ
বিশ্বাস করে। ওদের ধারণা, আমরা না
হিন্দু বাড়ি থেকে মেয়ে চুরি করে আ
তারপর তাদের খারাপ করে ফেলি।

—ওদের সংগে কথা বোল না দুর্লভদ

—আমি বলি কোথায়। ওরাই তো গা
এঁটুলির মতো লেগে থাকে। ওরাই খুঁচি
খুঁচিয়ে ঝগড়া করতে চায়।

গৌরীর খুব খারাপ লাগে। ওর জ
দুর্লভদাকে অনেক গঞ্জনা সইতে হচ্ছে।
দরকার ছিল দুর্লভদার। নৌকাটাকে ঠে
জলে ভাসিয়ে দিলেই তো ওর চলে যে
যেমনি করে ওকে ছেড়ে পালিয়ে গে
নিমাই, যেমনি করে জঙ্গলের ধারের
লোকগুলি ওকে ভাসিয়ে দিয়েছে। অনায়াসে
তো দুর্লভদা ওরকম করতে পারত। পারে
এই ওর দোষ।

গৌরী দুর্লভের হাতটাকে মুঠে
তুলে নিল, তুমি ওদের কথায় আর কি
মনে করো না দুর্লভদা।

দুর্লভ গৌরীর দিকে তাকাল, না
পাগলী! ঠিক করেছি, আর ওদের সা
কথাই বলব না। নেহাত ঘোচবনের না
নকুলবাবু কথা বলেছিল তাই।

—তুমি বললে পারতে, গৌরীর
ওদের না ভাবলেও চলবে। গৌরী মিশ
থেকে এখন হাতের কাজ শিখছে।

—বলেছি। ওরা মনে করে ওসব ...মাদের চালাকি। ওরা বিশ্বাস করবে কি ...র, পাদরিপাড়ায় ঢুকতেই সাহস পায় না। ...সময় ভয় পায় এই বুঝি ওদের আমরা ...খ্রীষ্টান বানিয়ে দিলাম।

গৌরী আর কথা বলল না। এমন সময় ...ৎ শোনা গেল নিকটেই কে যেন একা ...া গান গাইছে। ভারি মিষ্টি গলা। ...কান পেতে ওরা দুজনই কিছুক্ষণ ...মল,

গাও রে মধুর স্বরে
যীশু নাম ভক্তি ভরে
যার নামে প্রেম ঝরে
অবিরত ধারে—

—কে গাইছে? প্রশ্ন করল দুর্লভ।

গৌরী বলল, লক্ষ্মণদা। রোজ রাতে ...দিকে ঐ গাছতলায় বসে একা একা গায়।

...নকুলবাবুকে ধরে এনে একবার এই ...া শুনিয়ে দিলে হত। বুঝত, মনে খোর- ...চ থাকলে কেউ এভাবে গাইতে পারে না।

গৌরী চুপ করেই থাকল।

দুর্লভ বলল, আমাদের এই গান গাওয়া ...রেও ওরা কেচ্ছা করে। কি বলে জানো, ...ল, ও কালাসাহেব তোমরা নাকি পালা ...ধছ?

ভালো মনে উত্তর দিলাম, বাঁধতে পারি।
—তা কি পালা? নিমাই সন্ন্যাস না ...ীকা বিলাস?

...জানা কথাই আমরা ওসব গান গাই না। ...লাম, এবার বড়দিনে যীশু যাত্রা গাইব।

—বটে, তোমাদের যীশুর তো এখন ...াপিনীর শেষ নেই, ভালোই হবে।
...কি রকম রাগ হয় বলো দেখি, বললাম, ...আনা দেই করি। পার কর তাড়াতাড়ি ...ব প্যানপ্যানানি গান আমরা গাই না। ...দিনে যখন পালা গাইব তখন শুনে ...ও।

সত্যি সত্যি গায়ের ঝাল মেটে না ...লভের। জমে থাকা অনেক ক্ষোভের কথাই ফাদারকে গিয়ে বলে হাল্কা হয়।

ফাদার অন্য ধাতে গড়া মানুষ। আমলই ...ন না এসব কথা। কে কি বলছে তাই ...রে যদি মাথা খারাপ করব, তবে বাপু ...জ করব কখন! ওসব ভাবনা আমল না ...য়ে কাজ কর দেখি। কথায় জবাব দিলে ...ঠেলাঠি হবে; কাজে জবাব দাও, ওদের ...থা আপনিই নিচু হয়ে যাবে।

ফাদার সত্যি সত্যি এক আশ্চর্য পুরুষ। ...মনভাবে পাদরিপাড়াটাকে মাথায় করে ...রেখেছেন যা ভাবতেও অবাক লাগে। গৌরীর ...ঝে মাঝে মনে হয়, দেশ থেকে মাকে ...কবার নিয়ে এসে এই মহাপুরুষকে দেখাতে ...ারলে যেন শান্তি হত। সাক্ষাৎ এক দেবতা ...মন এই পৃথিবীর মাটিতে হেঁটে চলে ...ড়াচ্ছেন।

দুর্লভদা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ...কা একা ঐ পুকুরপাড়ে বসেছিল ...গৌরী। বারবার কেবল মায়ের কথাই মনে ...আসছে। মা। মাকে এমন করে দেখতে ইচ্ছে করছে কেন। অতবড় মেয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল, আবার সেই গ্রামে ঢুকতে গেলে কেউ কি ওকে কাছে ডাকবে! একঘরে করবেই।

করুক একঘরে। তবু মার কাছে তো ফেরা যাবে। মা, মা! মার চিন্তায় কখন এক সময় ওর চোখ দুটো ভিজে জল গড়িয়ে এল।

—আর এমন সময় ও চমকে উঠল, কে?

দেখল, ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্মণদা।

—তুমি কাঁদছ? কি হয়েছে?

গৌরী আঁচলে চোখ মুছল, কিছু না। অমনি।

—এমনি কেউ কাঁদে বুঝি? লক্ষ্মণ ওর পাশটিতে বসে পড়ল। কি হয়েছে বল না গৌরী? তোমাকে কাঁদতে দেখলে আমারই দিন খারাপ যাবে।

—ছাই দিন খারাপ যাবে। মুখ ঘুরিয়ে নিল গৌরী।

লক্ষ্মণ ওর ঘোরানো মুখটাকে টেনে সামনের দিকে আনল, ছাই মানে! তার মানে আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না?

—বিশ্বাস করব না কেন, তবে আমি বুঝে গেছি, আমার জন্য কেউ ভাবে না।

—কি হয়েছে বলবে তো?

—আমাকে দেশে নিয়ে যাবে বলে-ছিলে, তার কি হল? সরাসরি প্রশ্ন করল গৌরী।

—এই আস্তে। শুনতে পাবে। শুনতে পেলে আর রক্ষা থাকবে না।

গৌরী চারপাশে তাকাল। সত্যি সত্যি ও পালানর কথাটা বড্ড জোরেই বলে ফেলেছিল। জিভ কাটল।

লক্ষ্মণ ওর নরম হাতের আঙুলগুলো মুঠোয় চেপে ধরল, বড়দিনটা যাক গৌরী, আমি একটু গুছিয়ে নেই, ঠিক পালাব। তোর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার ভাগ্য কজনের হয়।

গৌরী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

(চলবে)

(৬৮)

মঠ। ২১শে জুন ।১৯০২

স্নেহের ক্রিস্টিন,

তোমার দুশ্চিন্তা করবার মত কোন কারণ ঘটেনি। আমি ভালই আছি এবং যথেষ্ট সবল। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে দেখছি নিজের ইচ্ছেকে সংযত করে ডাক্তারের পরামর্শ মত চলতে হচ্ছে। পিল এখনও চলছে! তুমি ছেলেদের জিজ্ঞাসা কোরো তো আমলকী এখন ওখানে পাওয়া যাচ্ছে কিনা। সমতলে এখন ওগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। ওগুলো টক এবং শুকিয়ে কাঁচা খেতে হয়। কিন্তু যদি মার্মালেড করো তবে চমৎকার সুস্বাদু। এবং পেটে অম্বল ইত্যাদির পক্ষে খুব ভালো।

মেরী লুইর কলকাতায় আসা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এখন পর্যন্ত কোন গোলমাল কিছু করেনি।

এখানকার খবর পূর্ববৎ। আমি শিশ্গির মুঙ্গেরে যাবো ভাবছি। জায়গাটা কলকাতার কাছেই এবং খুব স্বাস্থ্যকর।

তোমার বাগবাজারে আসা সম্বন্ধে আমরা পরে স্থির করব। আগে নিবেদিতা এসে কাজ শুরু করুক। ততদিন চুপচাপ থাকো এবং মোটা হও।

মা (মিসেস সেভিয়ার) ছেলেদের ও তোমাকে ভালবাসাসহ

বিবেকানন্দ

* সম্ভবত এইটি শেষ পত্র।

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন

ক্রিস্টিনকে লেখা স্বামীজীর চিঠিগুলি পড়ে মনে হয় তিনি যেন সর্বদা একটা কিসের যাতনা, অস্থিরতা এবং চিত্তের ভাবসাম্য-হীনতায় ভুগতেন! এ অস্থিরতা যাতনা কী কেবলমাত্র শারীরিক কষ্টের প্রতিক্রিয়া? এ ভারসাম্যহীনতা কী আত্মবিশ্বাসের অভাব? বারবার ক্রিস্টিনকে স্বামীজী লিখছেন 'আমি নারভাস'। 'আমি worried', 'My fear', 'My anxiety'. কিসের এই দুশ্চিন্তা? কিসেরই বা ভীতি? যে নিঃস্ব মানুষ একদিন ভিক্ষাপাত্র হাতে শিকাগোর ধর্মসভায় গিয়ে সিংহনাদে বলতে পেরে-ছিলেন 'শৃন্বন্তু বিশ্বস্য অমৃতস্যঃ পুত্রাঃ!' যিনি সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে তিনি সংসারে এসেছেন মানুষকে তার স্বরূপের পরিচয় জানতে সাহায্য করতে, তাকে অজ্ঞানতার তমসা থেকে জ্ঞানের আলোকে নিয়ে যেতে, তাকে অসত্যের অন্ধকার [illegible] লক্ষে উপনীত হতে—বারবার ঘোষণা করেছেন তোমরা তোমরা মহত্তের প্রকাশ, তোমরা স্বয়ং পরমানন্দ ও অবিন[illegible] অংশ,—শুধু সেইটুকু বোঝা, বুঝতে শেখো,—উত্তি[illegible] প্রাপ্য বরান্ নিবোধতে।' সেই মানুষের কাতর, অসহা[illegible] তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক। এ মানুষ সবকিছু থে[illegible] সরিয়ে নিয়ে হাঁস, হরিণ, ময়ূর, কুকুর, ছাগল, শান্তিতে জীবন কাটিয়ে চলে যেতে চান! এ কী বাধ[illegible] এ কী জীবনের প্রতি বিরাগ? না। এর উত্তর একমা[illegible]

মনে পড়ছে ক্রিস্টিন বলেছেন,

"It often seemed to us that Swami Vivekan[illegible] not consistent......If we did not think him [illegible] what was that to him ? As Emerson says [illegible] consistence is the hobgoblin of little minds

আমরা জানি দক্ষিণেশ্বরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ত[illegible] নরেন্দ্রকে তাঁর সব শক্তি দান করে বললেন, "আমার [illegible] সব তোকে দিয়ে দিলুম।' কী সেই দান? তাঁর আধ্যা[illegible] সবকিছু শক্তি। কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি নিজের [illegible] একটু অন্যভাবে রেখেছিলেন। নিজে ছিলেন সর্বদা এব[illegible] মানুষ। মনুষ্যদেহধারী হয়েও তিনি প্রায় সর্বদাই [illegible] 'মায়ের ভাবে' 'মায়ের ঘোরে' থাকতেন। কদাচিৎ সংগ[illegible]

নেমে আসতেন যখন সাংসারিক লোকের সঙ্গে বার্তা আলোচনা করতেন।'

কিন্তু নরেন্দ্রকে তিনি রেখে গেলেন সংসারের সাধারণ মানুষের মধ্যে। সংসারের মানুষের জন্য তাদের সুখদুঃখের ভাগী হয়ে, তাদের সমস্যা যাতনার সাথী হয়ে, তাদের প্রয়োজন, সময় এবং সম্ভাবনা বুঝে তাদের মধ্যে গুরুর বাণী প্রচার করবেন, গুরুদত্ত জ্ঞান বিতরণ করবেন। তাদের সাধারণ স্তর থেকে চেতনার রাজ্যে তুলে নিয়ে যাবেন। তাই একদিকে গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন নরেন্দ্র অপরদিকে সংসারের পাপীতাপী দুঃখদারিদ্র্যনিপীড়িত মানুষের ত্রাণকর্তা বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব। একজন চান সব ছেড়ে গুরুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে লীন হতে। অপরজন বলেন, এখনও সময় হয়নি তোমার,—আরও কাজ আছে! যেন নিজেকে ভোলবার জন্য বারবার বলেন, মা জানেন, মায়ের ইচ্ছে! শুধু মা নয় নিজেও জানতেন—আরও থাকো, সংসার তোমাকে চায়, পাশ্চাত্যের মোহে ভেসে যাওয়া দেশে প্রাচ্যের বাণী নতুন করে, নতুন যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রতিষ্ঠা করো, অসত্যকে বিনাশ করো, সত্যকে পরিত্রাণ করো—গুরুদক্ষিণা দাও, মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করো। অন্তরের ঐশিক আত্মা চায় ঐহিক দেহের বেড়া ভেঙে মুক্ত হতে। জীবাত্মার অশান্ত অস্থিরতা পরমাত্মার সঙ্গে মহামিলনের প্রতীক্ষায়। হৃদয় বলে আর কতকাল থাকব বসে এমন করে—প্রভু আমার!'

এই স্বদেশ দেহ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, অসুস্থ। ১৮৯৩ সালের শিকাগো ধর্মসভার পশুরাজ সিংহ এখন চায় মহামায়ার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। খেলা শেষে শ্রান্ত শিশু যেমন চায় মায়ের কোলে গিয়ে ঘুমতে। তাই বারবার পত্রাবলীতে ক্রিস্টিনকে বলছেন, 'এসো কার্যভার তুলে নাও, আমাকে ছুটি দাও, এবার যাই ঘরে ফিরে মায়ের কোলে—প্রভুর পদতলে।

ক্রিস্টিনকে লিখছেন জাপানে যাবার ইচ্ছে। সেই পত্রেই আবার জানাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে কী বা বলব। যে মানুষ একদিন বাগ্মীতায় বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিলেন 'লাভা'র স্রোতের মত যাঁর মুখ থেকে অগ্নিগর্ভ বাণী নিসৃত হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে আজ তাঁর উক্তি কী বা বলব—কী বলবার আছে!! এ আর এক রূপ! বাগ্মী বিবেকানন্দ এখন অন্তরালে গিয়েছেন, ভক্ত নরেন্দ্র পূর্ণতার এমন এক গভীর স্তরে যেখানে ভাষা পৌঁছয় না। ভাষা দিয়ে যার গভীরতাকে ব্যক্ত করা যায় না। জানাচ্ছেন 'আজকাল আমি মঠেই সবচেয়ে ভাল থাকি।'

বুঝেছিলেন ঘরে ফেরবার দিন আসন্ন, তাই মঠে থাকাই শ্রেয়। এই মঠ গুরুর নামে প্রতিষ্ঠিত। তাই এর গাছ-পালা, পশুপাখী সবই বড় আদরের বড় পবিত্র! মহাপ্রয়াণে যাবার জন্য এর চেয়ে বড় তীর্থস্থান আর কোথায় আছে—এর চেয়ে উচ্চধাম বা স্বর্গ কোনখানে? শুধু, ক্রিস্টিন তুমি এসো, কাজের ভার নাও, ভারতীয় নারীর চায় এমনি এক পবিত্র শুদ্ধচিত্ত নারীকে যে তুমি,—যে প্রতিদানের আশা না-করে নিজের সত্তাকে উজাড় করে ঢেলে দেবে জগজ্জননীর চ। এসো,—আমি যাই,—মা ডাকছেন। ক্রিস্টিন ভারতে এলেন এপ্রিলে—অশান্ত জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হলেন ৪ঠা জুলাই।

"He was not a reformer. He believed in growth, not destruction. He studied the history of Indian Institutions and found that in the beginning, they invariably filled a need. As time went on, the need had passed, the institutions remained while evil has been added to them".

"Marriage is a great austerity". এটা কেবলমাত্র নিজের জন্য নয় সমাজের জন্যও। এবিষয় বাক্য, চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সততা ও পবিত্রতা থাকা চাই। Monogamy বা একটিমাত্র বিবাহ প্রথায় পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা না থাকলে সে বিবাহে পবিত্রতা থাকে না। এমনকী যখন আবেগ থাকে না, তখনও বিশ্বস্ততা থাকা দরকার।

Chastity is the virtue which keeps the nation alive. তিনি (বিবেকানন্দ) বলতেন এই গুণের জোরেই ভারতবর্ষ আজও বিদ্যমান, যেখানে অন্য জাতিগুলি ভারতবর্ষের চেয়ে নবীন হয়েও আজ বিস্মৃতির অতলে। একটা জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় তার উত্থানপতনের ঘটনাবলী। প্রথম জাগরণের সময় দেখা যায় আত্মত্যাগ, সংযম এবং কৃচ্ছ্রতা। তারপর জাতি যত বৃদ্ধি পায়—এসে পড়ে আত্মসুখের বিলাসিতা, অলসতা, ফলে ক্রমশঃ পতনোন্মুখ ধ্বংসের পথে। ব্যাবিলন, গ্রীস, রোমে যা হয়েছে সকলের বেলাতেই সে ঘটনার কাহিনী। কিন্তু ভারতবর্ষ চিরজীবী। ব্যক্তিগতভাবে হয়ত কারো পতন হয়েছে; কিন্তু জাতি হিসেবে ভারত তার জীবনদর্শনের মান নীচু করেনি।

অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন যা তা'তো দেশে ঘটেই থাকে। সে বিষয় উনি (স্বামীজী) বলছেন "কোনটা ভাল? অভিভাবকের নির্বাচিত বিবাহ কী পাশ্চাত্য দেশের মত স্বমনোনয়ন? আমাদের যুব সমাজ কিন্তু আজকাল স্ব-মনোনয়নের অধিকার দাবী করছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিবাহ সম্বন্ধে বলতেন, 'এই দুটি জাতির সংমিশ্রণে যে সন্তানসন্ততিরা সংসারে এসেছে তারা বড়ই অভাগা। কিন্তু যদি এই মিলনের ফলে একটি উৎকৃষ্ট জাতির উৎপত্তি হতে পারত? হতে পারে কী? এই মত গ্রহণ করা উচিত?

নিজের দেশ বলতে কী গৌরব বোধই না ছিল তাঁর। How to preserve the great race which given to the world some of its most transcendental ideas, which is still the custodian of spiritual treasures which the world is in need".

এরপর বাল্য বিবাহের কথা উঠত। এমন কোন বিষয়বস্তু ছিল না যার ওপরে ওঁর আলোকিত চিত্ত আলোকপাত না করেছে! প্রতিটি সমস্যার বিষয়গুলি যেরকম গভীর মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করতেন আমাদের পক্ষে সেটা একটা নতুন দিক উন্মোচন

করত। একটা সামান্য প্রশ্ন বা মতবাদ কেউ প্রকাশ করলেই সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে এদিক ওদিক অস্থিরভাবে পায়চারী করবেন খানিকটা। তারপর যেন গরম গলিত 'লাভার' মত কথা বেরুবে মুখ দিয়ে। কোন একটা বিষয় নিয়ে কোন সংশয় বা সমস্যা একবার যদি মনে উদয় হল, ব্যস্! যতক্ষণ না তার মূলে প্রবেশ করে তার সব কার্যকারণ খুঁজে বের করবেন,—থামবেন না।

লোকে ও'কে দোষারোপ করে যে উনি নিজের মহানবাণীর মতামত থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজের মতবাদের খেলাপ করছেন। উনি নাকি বাল্য বিবাহ, জাতিভেদ ও পর্দাপ্রথার সমর্থন করছেন। আমরা যারা ও'কে দেখেছি এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে কী পরিমাণ মানসিক সংঘাত ভোগ করছেন উনি, তাঁরা জানি এই দোষারোপ কতদূর অসত্য। কোথাও এতটুকু অন্যায় অবিচার, মানুষের আধিপত্য প্রিয়তায় অন্যের কষ্ট দেখলে কীরকম বীরোচিত আবেগে উনি বিচলিত হয়ে পরতেন—সেই মানুষ কিনা শৃঙ্খলিত অসহায়দের আরও একটি 'হাতকড়া' পরাতে এগিয়ে আসবেন? তাঁর হৃদয়টি ছিল মাখনের মত। দুঃখদারিদ্র্য-নিপীড়িতদের জন্য ছিল হৃদয়াবেগ। বদ্ধ জীবকে পরমমুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল যাঁর জীবনের উদ্দেশ্য, তাঁকে কিনা লোকে মনে করে—

"He would not prove himself the master of compassion the Deliverer?"

তবে হ্যাঁ, সংস্কার ও সংস্কারকদের প্রতি ও'র কোন সহানুভূতি ছিল না। কারণ এই সংস্কারকরা যখন কিছুর সংস্কার করেন তখন তাঁরা অনেক কিছুর আমূলে উৎপাটন করতে গিয়ে অনেক মূল্যবান এবং সুন্দর জিনিসের ক্ষতি করে ফেলেন কার্যপ্রথার কলে পড়ে থাকে খানিকটা শ্রীহীন-নিস্ফল পরিণতি। তাঁর মতে দেশের যেকোন পরিবর্তন আমরা আনতে চাই না কেন সেটা দেশের আত্মসম্মান অথবা তার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে নয়। নিজের দেশের প্রথা ও সনাতনী ধারাকে গালাগালি করে পাশ্চাত্যের সব অবিমিশ্র ভাল, আর যে দেশে তুমি জন্মেছ তার সব খারাপ এই বিকৃত মনোভাব নিয়ে দেশের সংস্কারসাধন করতে হবে? পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে এই ইন্দ্রজালমুগ্ধ মনোভাব কেমন করে হয়? যদি ভারতের সবই খারাপ এ ধারণা সত্য হয় তবে যুগ যুগ ধরে ভারত বেঁচে আছে কী করে? ভারতের হৃদয় খাঁটি! মন্দ কিছু থাকতে পারে। কিন্তু এমন কোন দেশ আছে যা সম্পূর্ণ দোষত্রুটিমুক্ত? পাশ্চাত্য দেশে খারাপ কিছু নেই? ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারী করে করে উনি এমনি করেই ভারতের সমস্যা নিয়ে যুঝতেন।

আজকের দিনে সব দেশেই একটা জিনিস খুব দরকার বিশেষ করে ভারতবর্ষে—যে কারো বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাকে ধ্বংস করতে নেই। একটা খারাপকে নির্মূল করতে গিয়ে যে আর একটা অধিকতর খারাপকে প্রতিষ্ঠা করছ এমনও তো হতে পারে? প্রাচীন ভারতে বাল্য বিবাহ, বা পর্দাপ্রথা কোনটাই ছিল না। এমনকী ভারতের সর্বত্র এ প্রথার প্রচলন আজও নয়। এ প্রথা একমাত্র সেইসব জায়গায় প্রচলিত যে জায়গাগুলি মুসলমান আধিপত্যে ছিল। এ প্রথা কী উপকার করেছে? জাতির পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষা করেছে। কেবলমাত্র যে নারীর পবিত্রতা তা নয়। পুরুষের পবিত্রতাও। সতী নারী যেমন অন্য পুরুষের দিকে তাকাবে না, তেমনি তার মুখও যেন কেউ দেখতে না পায়। একটা জিনিস ও'র কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় যে কেমন করে মানুষ তার নিজের ধর্মমতকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারে! তারা যে এই ধর্মমতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে!! তাই বলে নিজেদের ত্রুটি সম্বন্ধেও উনি অন্ধ ছিলে[illegible] বলতেন শারীরিক ক্ষমতায় আমরা ক্রমেই অবনতির পথে [illegible] সেইটাই কী এইসব মনোভাবের কারণ? এর প্রতিকার কী?

বাল্য বিবাহের দরুণ যেসব বিষময় ফল দেখা দি[illegible] বিষয় উনি নীরব থাকতেন। এসব কথা তো এমনিতেই স[illegible] বিদিত। কখনও মুখ ফুটে বলতেন না এ প্রথার অবসান উচিত। আসলে অবসানের দিন যে এসে গেছে সেটা সুস্পষ্ট দেখতে পেতেন।

..... বেশ খানিকটা এসব নিয়ে চিন্তা করে উনি [illegible] অর্থনৈতিক চাপ আপনিই পরিবর্তন আনবে। এর সঙ্গে শিক্ষার প্রসার। শিক্ষা—লেখাপড়া। আমাদের কর্তব্য অ[illegible] মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো। তবে যে ধরনের শিক্ষা এখন [illegible] তেমন শিক্ষা নয়। এরকম শিক্ষার ফল আরও বিষময় হবে।

মাঝে মাঝে মনে হত ও'র মতের ঠিক নেই। কদিন ধ[illegible] আবেগভরে হয়ত বাল্য বিবাহ, জাতিভেদ, পর্দাপ্রথা, ধর্ম[illegible] ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি নিয়ে খুব আলোচনা করবেন এবং এ[illegible] যুক্তি প্রতিষ্ঠা করবেন যে শেষ পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাস ছাড়বেন যে উনি যা বলছেন সেইটাই একমাত্র ঠিক কথা। কোনদিক এবিষয় থাকতেই পারে না। তারপর যখন দেখতে[illegible] সহজে ও'র মত সবাই মেনে নিল, তখন যারা ও'র স্ব-মত[illegible] বলছিল তাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আচমকা বলে বসবেন এ[illegible] যা বলেছেন তা সব ভুল, তার উল্টোটাই বরং ঠিক। একজন বিচলিত হয়ে বলে ফেলে 'কিন্তু স্বামীজি। কাল যে আজকের উল্টোটাই ঠিক বলেছিলেন।' উনি ছোট্ট একটিমা[illegible] হয়ত দেবেন "সে কালকের কথা।" ব্যস্। এই দুই মতে কোন সামঞ্জস্য আনবার বা এর কোন ব্যাখ্যা করবার দরক[illegible] করতেন না। যদি ও'কে আমরা দো-মনা মনে করতুম, তা[illegible] কী এসে যেত? Emerson বলতেন "A f[illegible] consistency is the hobgoblin of little min[illegible]

আসলে উনি নিজেকে নিরাসক্ত রেখে দূরে থেকে যে[illegible] উচ্চ স্তম্ভ থেকে পারিপার্শ্বিককে যেভাবে দেখতেন দৃশ্যাবলী ছিল অন্যরকম। আমাদের বেলায় আমরা সেই প[illegible] অংশবিশেষ। বড় জোর এইটুকু কথ[illegible] "Don't you see I am thinking out [illegible]d".

শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতুম, সবকিছুর ভালমন্দের পিছের ওজন করে উনি একটা সিদ্ধান্তে আসতেন। কখনও না একটা মত সম্পূর্ণ খারাপ বা একটা মত সম্পূর্ণ ভাল মতের মোটামুটি একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ মত প্রকাশ করতেন। একদিকে ও'র মত একটু বেশী ঝুঁকত; তার কারণ উনি [illegible] সেইটাই সময়োপযোগী। একবার সিদ্ধান্তে পৌঁছে উনি এবিষয় আলোচনা করতেন না। শুধু ভাবতেন কীভাবে এই [illegible]টাকে কার্যকরী করা যায় বা পরিবর্তন আনা যায়।

সমালোচনা জিনিসটাকে তিনি মনে করতেন [illegible] সংস্কারসাধন অনেক সময় ভালর চেয়ে মন্দ ফল দেয়। "It always begins with condemnation".

ভারতের মত দেশের পক্ষে এটা অত্যন্ত অসম্মানের ব্যাপার এদেশের জন্য আমাদের চাই সুপ্ত বিশ্বাসকে ব্যক্তি তথা মধ্যে পুনরুদ্ধার করে আরও বেশী গভীরভাবে জাগরু[illegible]

"All change of value must be a growth".
ওপর থেকে জবরদস্তি করে সেটা চাপিয়ে দেওয়া যায় না। অবতারের মননশক্তি দিয়ে উনি দেখতে পেতেন যে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী যে পরিবর্তন কাম্য সেটা ভেতর ভেতর শুরু হয়ে গেছে আগেই। এর কারণ মূলতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা। এটা ভাবা কিছুই মুস্কিল নয় যে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য স্বতঃই পর্দাপ্রথা, জাতিভেদ ও বাল্য বিবাহ প্রথায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য।

একজন একবার ও'র কথায় প্রতিবাদ করতেই উনি ফিরে তাকিয়ে বললেন 'কোন স্পর্ধায় আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসেছ? মানে আমার বংশ পঞ্চাশ পুরুষ ধরে আইনজ্ঞ?" তারপর একেবারে যোদ্ধার ভঙ্গীতে নিজের যুক্তিগুলি এমন তীক্ষ্ণভাবে বলে যেতে লাগলেন যে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কালোকে সাদা বলে মেনে নিলো। কিন্তু যদি কেউ বলত 'স্বামীজী আমি আপনার সঙ্গে তর্কে পারব না; কিন্তু আপনি নিজেও জানেন যে অমুক অমুকটা সত্যি ঠিক।" এরকমভাবে বললে উনি অত্যন্ত নরমভাবে বলতেন "হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ।"

এসবই ছিল ও'র খেলা। সর্বক্ষণ উনি এবং ও'র সংগে আমরা যেরকম টেনশন-এ থাকতুম তার থেকে একটু হাল্কা হবার জন্য এই আর কী!

উনি শুধু যে সমস্যাকে দেখতে পেতেন, তাই নয়, তার সমাধানও বের করতেন। সে সমাধান অভিনব। সমস্ত আচার প্রথার আদি ইতিহাস বের করতেন। দেখা যেতো কোন এক প্রয়োজনের তাগিদে এর প্রবর্তন হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সেটা কেবলমাত্র একটা প্রচলিত প্রথাতে পর্যবসিত এবং ফলে যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে যার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেলেও থাকে তার নিষ্প্রাণ খোলসটা!

....বর্ণবৈষম্য সম্বন্ধে বলছেন---এমনকী আমেরিকা যা মাত্র দেড়শ বছরের বেশী আগে স্বাধীনতা লাভ করেনি সেখানেও দুটি পৃথক জাতির অস্তিত্ব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। ভারতবাসী সম্বন্ধে একটা কথা বলা যেতে পারে যে তারা তাদের দমিত শ্রেণীকে কখনও পীড়ন করেনি। এমনকী ঐ দুটি জাতি ছাড়াও আমেরিকাতে আরও শ্রেণী ভাগ আছে---যেটা প্রধানতঃ ভাগ হয় আর্থিক ক্ষমতার ভিত্তিতে। পয়সার ক্ষমতাকে উচ্চবর্ণের মানদণ্ড হিসাবে দেখবার চেয়ে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে উচ্চবর্ণের সম্মান দেওয়া ভাল হয় কী?

এইসব দেখে কী মনে হয় না মানুষ নিজের সুবিধার জন্য বিশেষ বিশেষ সময় কোন-না-কোন প্রথার প্রবর্তন করেছিল? এমনি করে তাদের মূল কারণ ও ইতিহাস খুঁজে বের করে, স্বামীজী তার মধ্যে আপত্তিজনক অংশ কোথায় আছে সেটা বুঝে তাকে নিন্দে না-করে কীভাবে তার সংশোধন করা যায়---এইটাই বের করে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। কোন কোন স্থানে এইভাবে কাজ হয়েছে। ফল পাওয়া গেছে। অন্যত্র

"The forces at work in India today will bring it to pass".

কিন্তু এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে পুরাতনকে নিন্দে না করে নতুন ধর্মমত বা আচার, প্রচার করা যায়। যা ক্রমে ক্রমে কালের সংগে সংগে আপনিই পুরাতনকে অপসারিত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে---ধীরে, সবার অলক্ষ্যে।

গোখলের চিঠি

Telegraphic address :
C/o. "Enelesee London'
National Liberal Club.
Whitehall Place. S.W.
23rd July '08.

Telephone No. :
3181 Gerrard.—4500.572 Victoria

শেষ ডাকে আপনার ২৮শে জুনের চিঠি পেয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ সকালের খবরের কাগজে মিঃ তিলকের জেলে যাবার খবর দেখলাম। ব্যাপারটা শান্ত হয়ে গেলেই কর্তৃপক্ষ ওকে মুক্তি দেবেন এবং ফিরিয়ে আনবেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। তবে আপাতত বলা যাচ্ছে না যে এর পর কী ঘটতে পারে। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমার মনে কোনদিনই কোন মোহ জন্মায়নি। এটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে খুব; কিন্তু এতে গভীরতার অভাব এবং যথেষ্ট মজবুত নয়।

"And vigorous repression (provided it is vigorous) is bound to put an end to it at any rate for another generation."...........
"We have to acquire greater strength of character, greater capacity for sustained active and greater self-restraint, before we can achieve any solid result. There will have to come greater powers of organisation, a greater sense of discipline and a greater realisation at responsibility. It is all slow work and it is nonsense growing impatient, for impatience is bound to recoil upon our own heads. However we can talk over these matters prsonally when we meet".

সেদিন হাউস অব কমন্সে ভারতবর্ষের ব্যাপারে আলোচনাটা একেবারে বিশ্রী হল। তবে মিঃ বুকানান-এর (?) বক্তৃতাটা মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল। একটা ভাল কথা উনি জানালেন যে (যে জন্য আমরা জনাকয়েক এখানে বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করছিলাম) পার্লামেন্টে রিফরমের প্ল্যান সরকার অটাম সিজন-এর আগেই সাবমিট করবে। ওরা ওদের প্রস্তাব যতক্ষণ না সামনে এনে রাখছে ততক্ষণ আমরা আমাদের জাজমেণ্ট স্থগিত রাখব। তবে আমার মনে হয় ওদের প্ল্যানটা একেবারে অসার হবে না।

আগেই জানিয়েছি আগামী মাসের শুরুতে আমি ভিকিতে যাচ্ছি। পঁচিশ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসবার পর, জীবনে এই প্রথম একটু ছুটি উদযাপন করতে চলেছি। আশা করি, এতে আমার উপকার হবে। নেহাৎ যদি না হয় সেটাও আমার দোষ নয়।

এবারে বল, তুমি কী চাও যে আমি তোমাকে চিঠিতে 'সিস্টার ক্রিস্টিন' বলেই সম্বোধন করব? কারণ তোমার চিঠিগুলি অন্যের দ্বারা খোলার সম্ভাবা আছে?

With affectional regards
Your ever,

পুঃ—মাদ্রাজের জি, এ, নেলসন আমার বক্তৃতাগুলির একটি সংকলন করেছেন। তাঁকে জানিয়েছি তোমাকে একটি সংকলনের কপি পাঠাতে।

(উপরিউক্ত পত্রের সম্বোধন এবং নীচে নাম সইর অংশটুকু কেটে দেওয়া হয়েছে)।

(চলবে)

বাঙলা চিত্রজগতের প্রথম সারির পরিচি ছিলেন হীরেন্দ্রকুমার বসু। ১৯৩৮ খৃঃ ঋষির প্রে কানন দেবীর বিপরীতে নায়ক চরিত্রে অভিনয় কে অনেক ছবি প্রযোজনা, পরিচালন ১৯৩৯ খৃঃ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন ছবি 'একটি পয়সা দাও গো বাবু',—এক সময় হীরেনবা এই গান মুখে মুখে ফিরত। তাঁর আফ্রি সচিত্র কাহিনী

সাফারির বাংলা এককথায়—মৃগয়া। অর্থাৎ বনাঞ্চলে বন্যজন্তুদের পিছন পিছন ছুটে তাকে বন্দুকের গুলিতে বা তীরে বা বর্শায় বিদ্ধ করার নামই মৃগয়া। বনে-জঙ্গলে ঘোরার জন্যে সাজসরঞ্জাম নিয়ে দলবদ্ধ মিছিলের নাম তাই ইংরাজিতে 'বা উর্দু ভাষায় বলা হয়—সাফারি।

ভাগ্যক্রমে প্রথম সাফারিতে যাবার সুযোগ আমি পাই ১৯২৫ সালে। ময়ূর-ভঞ্জের ছোট রাজকুমারের বিবাহ। সেই উপলক্ষে এই সাফারির প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর গণ্যমান্য অতিথিদের নিয়ে শিকারখেলার আয়োজনে। আমিও একজন ছিলাম নগণ্য অতিথি। গানবাজনার আসর থেকে হঠাৎ উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সাফারিতে যোগ দিতে রাজি হয়ে গেলাম....অথচ আমি একজন শিকারী নই। তবে রাইফেল যে চালাতে জানতাম না তা নয়। এটা আমাকে প্রায় জোর করেই শিখতে হয়েছিল, মহিষা-দলের রাজকুমারদের দাক্ষিণ্যে। মহিষা-দলের গর্গভ্রাতারা ছিলেন আমার গানের শিষ্য। গান শেখার অবকাশে রাইফেল শিক্ষাও ওঁদের সঙ্গে আমায় নিতে হয়েছিল, কলকাতার রাইফেল ক্লাবে।

আটটি হাতির হাওদায় চড়ে আমাদের এ-সাফারি শুরু হয়েছিল—রাজোচিত গাম্ভীর্যে। বারিপোদা থেকে টাটানগরের পাহাড়ী পথের দুপাশেই গভীর অরণ্য। এরই মাঝে অজস্র বন্যজন্তুদের বাস.... বুনোশুয়োর, ভাল্লুক থেকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পর্যন্ত। এই প্রশস্ত জঙ্গলে তিন-দিন ধরে দাপাদাপি করে আমার মনে জঙ্গল অভিযানের যেন রং ধরে গেল। অথচ আমি শিকারী নই, কাজেই এ-সুযোগের পর আর এমন সুযোগ আমার জীবনে আসবার সম্ভাবনা কম।

নিউ থিয়েটার্স চিত্র প্রতিষ্ঠান ১৯৩৩ সালে যখন আমায় 'মহুয়া' ছবি তোলার দায়িত্ব দিলেন, তখন গারো পাহাড়ের বন্যবেদে হুমড়ো সর্দারের উপখ্যানে জঙ্গলের বন্যজন্তুদের আবির্ভাব ঘটাবার চেষ্টা আমি করি এই নেশারই দায়ে। এইটিই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জঙ্গলের ছবি —যাতে ছিল ঘাটশিলা অঞ্চলের হাজার সাঁওতালদের সোনাগড়ার মেলা—গভীর জঙ্গলের মাঝে বেদেদের উন্মত্ত অভিযান— কণিকা স্টেটের ব্রাহ্মণী ও বৈতরণীর গহীন জলের মানুষখেকো কুমীর—তাল-চর স্টেটের হরিণ ও অন্যান্য বন্যপশু— কটক সম্বলপুর অরণ্যের ভয়াবহ সাত-কুশীয়া গর্জের বাঘ-হাতি সবই দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তবে রাইফেল সুটিং-এর সাফারির বদলে এ ছিল আমাদের ক্যামেরা সুটিং-এর প্রশস্ত সাফারি। এই ছবিরই খ্যাতি শুনে বোম্বাই-এর আদর্শ চিত্রপ্রতিষ্ঠান ১৯৩৯ সালে আমায় আহ্বান জানিয়েছিলেন, আফ্রিকায় ঘন জঙ্গলে ছবি তোলার জন্যে। এ-অভিযান ছিল সর্বপ্রথম হিন্দী প্রযোজকের ভারতের বাইরে চিত্রগ্রহণের প্রচেষ্টা—তার উপর আবার পূর্ব আফ্রিকার ভয়াবহ অরণ্যে।

আদর্শ চিত্র প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেকটর ছিলেন শেঠ গোবিন্দদাসজী (দিল্লির পার্লামেন্টের সদস্য) এবং মিঃ ডি পি মিশ্র (মধ্যপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী)। শেঠ গোবিন্দদাসজীর সঙ্গে আমার পুরোন পরিচয়। তিনি বলেন—'ট্রেডার হর্ণ' ছবিতে দেখলাম যে, ইংরাজরাই প্রথম আফ্রিকার জঙ্গলে আফ্রিকান কাফ্রিদের সঙ্গে যোগাযোগ সূত্র রচনা করেছে....এযে কতদূর ভুলে তারই প্রামাণ তৈরি করতে চাই।

গুজরাটের কাথিওয়াড়ী পালতোলা জাহাজে চড়ে প্রথ সফর করে গেছেন। ওঁদের লবণ, মসলাপাতি, যেম এলাচি প্রভৃতি; ছুঁচ ের ব্যবহারিক দ্রব্যাদি । আদ দেশে বাণিজ্য স্থাপন কে গিয়েছেন। অর্থাৎ আমাদের পরিবর্তে ওদের দেশের সংগ্রহ করতেন, যেমন—হ বাঘের নখ, হীরে-জহরত, ইত্যাদি। এ-ব্যবসারীতি বহু আগেই ভারতীয়রা ছিলেন। বহু প্রাণ তাঁরা ব শুধু যে বন্যজন্তু, কীট সরীসৃপদের কাছে নিজেদের তা নয়, আফ্রিকার নরখা বহু প্রাণ বিসর্জন গেছে। এ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও কম আগ্নেয় উদ্গীরণ, কোথাও কোথাও অথৈ বরষা, আবার ধু মরুভূমি। তবু তাঁরা প্রতিটি জাতের সঙ্গে সৌ করে অসাধ্য সাধন করে তারি ছবি তুলতে চাই।

মন দিয়ে তাঁর ব বললাম—আমাদের দেশে

র উদ্যমী প্রযোজক বা অর্থবান
তের খুবই অভাব।
তিনি বলেন—না, এ-কথা সত্যি না,
কেও আছেন, ধনীও আছেন, তবে
দুঃসাহসিক চিত্রপরিচালক।
আমি বলি—কেন ?

তিনি বলেন—আমি এ-বিষয়বস্তুর
বই লিখেছি কিন্তু পরিচালক
র তার রূপ দিতে পারছি না।

আমি বললাম—জানি না কাদের সঙ্গে
নি এ-বিষয়ে আলাপ করেছেন, তবে
র এ-কাজে অত্যন্ত উৎসাহ আছে।
তিনি আমার হাতদুটি ধরে বলেছিলেন
বে আপনি কথা দিচ্ছেন যে, যদি
এর ব্যবস্থা করতে পারি, আপনি
ফ্রিকার ঘন জঙ্গলে গিয়ে ছবি উঠিয়ে
বেন!
আমি সম্মতি জানিয়েছিলাম....

তাই ২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ সালে
শেঠজী একটা লম্বা টেলিগ্রাম
ন—৩১ জানুয়ারি ১৯৩৯ তারিখে
জ ছাড়ছে, কাজেই ২ জানুয়ারি
াই রওনা হোন। এর পরের জাহাজে
ওখানে বর্ষা নেমে যাবে। —ইতি
গোবিন্দজী।
অতঃপর!
আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত কথাটা
ীয়স্বজনের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। সবাই
কো বললেন—অসম্ভব, ওখানে গেলে
আর বাড়ি ফিরবে না। ওখানে
যার তো ছেড়েই দেওয়া যাক, মানুষে
ত মানুষ খায়।

াকে জিজ্ঞাসা করলুম। মা বলেন—
নই তো ?
আমি বলি—ভয় তো জীবনের প্রতি
...
তিনি একটু চুপ করে থেকে বলেন—
সাবধানে থেকো—হঠকারিতা করো

* * *

বোম্বাই পেঁছে গোবিন্দদাসজীর লেখা
ই পেলাম, তা ফুলস্কেপ কাগজে
করা ৫।৬ খানি পাতা....সঙ্গে
ছেন, গল্পাংশ তো মুখে মুখেই
াকে বলেছিলাম, তা থেকেই একটা
সাজিয়ে নেবেন। দুজন হিরোইন—
ভিলেন, একটি কমেডিয়ান
করে রাখা হয়েছে—এর বেশি যা
করে নেবেন। তবে ছবিখানার নাম-
করে ফেলেছি—নাম হবে 'আফ্রিকামে
স্থান'—'ইন্ডিয়া ইন আফ্রিকা'।

মনে মনে প্রমাদ গনলাম। দুর্বোধ্য
শেঠ গোবিন্দদাসজীর পত্র...দুর্ভোগ
ন আফ্রিকার ঘন জঙ্গল....কিন্তু
ছিল আমার মনের বল, তাই এগিয়ে

অডিও ক্যামাকস সাউন্ড মেশিন, সঙ্গে
ড এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পরিতোষ বসু,
যুক্ত জগতাপ। ক্যামেরায় শ্রীযুক্ত
র বসু ও তাঁর দুজন এ্যাসিস্ট্যান্ট,

আমি ও আমার দুজন এ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত
এস ব্যানার্জি (পিটুবাবু) ও শ্রীঅশ্বিনী
মিত্র মহাশয়—এই ছিল আমার টেকনি-
শিয়ানের দল।

সে-সময়কার নামী নায়ক নান্দেকার
ও দুজন নবাগতা হিরোইন ঊর্মিলা দেবী
ও বিদ্যা দেবী ছাড়া পিটুবাবু ও
অশ্বিনী মিত্রও ছবিতে অংশগ্রহণ
করবেন। এছাড়া ভিলেন ছিলেন একজন
মিঃ ত্রিপাঠী (অনামী)। মোট টেকনি-
শিয়ান ও অভিনেতা-নেত্রী মিলে বারজনের
টিম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম।

৩১ জানুয়ারি ১৯৩৯ সালের অপরাহ্ন
...দূরে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে....
ওরই সামনে এ্যালিফেন্টা দ্বীপের পাহাড়-
তলীর ভাস্করমণ্ডিত শিলামন্দির....শেষ
সূর্যের রক্তিম কিরণে ঝলমল করে
উঠেছে। এরপরই সন্ধ্যা নামছে....জাহাজ
খানি ক্রমেই যেন অন্ধ আবরণের মাঝে
নিজেকে হারিয়ে ফেলছে, সামনে পেছনে
ঘন অন্ধকার...ঢেকে আমরা ক'জন ডাক'
'কন্টিনেন্টের যাত্রী', তমসাবৃত হয়ে
দাঁড়িয়ে রইলাম।

সাড়ে সাতটা বাজতেই জাহাজে
ডিনারের ঘণ্টা হল। যথারীতি আহারান্তে

মিঃ এস এন ব্যানার্জি অর্থাৎ পিটুবাবু
আমার প্রধান সহায়ক আমাকে একটি
ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।
নাম আলিভাই। ইনি আফ্রিকার অধি-
বাসী। তবে কাফ্রী নন, জাতে আরবী
মুসলমান বলা চলে। ইনিই পথপ্রদর্শক
হিসাবে আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন।
শুনলাম যে, শেঠজী আফ্রিকায় কেনিয়ার
অনতিদূরে থিকাবাসী মিঃ প্যাটেল এবং
ইউগেন্ডায় কিসিমুবাসী মিঃ সাহার সঙ্গে
বন্দোবস্ত করেছেন আমাদের সাফারির।
অর্থাৎ এঁরা দুজন হচ্ছেন আদর্শ চিত্রের
এই ছবিখানির পার্টনার। আলিভাই
এঁদেরই রিপ্রেজেন্টেটিভ। কেনিয়ার প্রধান
শহর 'নাইরবী'...থিকা এর একশ মাইল
দূরে....ইউগেন্ডার প্রধান শহর হচ্ছে
'কাম্পালা'...এরই অনতিদূরে হচ্ছে
'কিসিমু'। কিসিমু লেক ভিকটোরিয়ার
তীরে অবস্থিত। মিঃ প্যাটেল এবং মিঃ
সাহা (দুজনেই গুজরাটি) হচ্ছেন 'ইন্টার-
ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট অটোমোবাইল'-এর
ইস্ট আফ্রিকার এজেন্ট।

আলিভাই-এর হাতে মিঃ প্যাটেল একটি
প্রোগ্রাম পাঠিয়েছেন...লম্বা সাফারির—তাতে
চোখ বুলিয়ে বুঝলাম—আমাদের এ সফর

কমসেকম ৫।৬ হাজার মাইল কভার করবে। অর্থাৎ কেনিয়া, এবিসেনিয়া, ইউগেণ্ডা, ট্যাঙ্গানাইকা, সুদান এবং বেলজিয়াম কঙ্গো পর্যন্ত বিস্তারিত। প্রোগ্রামটি হাতে গুঁজে দিয়ে যে যার মত শুতে চলে গেলেন। আমি বিস্ফারিত চোখে প্রোগ্রামের পাতায় মনোনিবেশ করেছি। ঘুম বেচারি হয়ত অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোন অবসরে গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছিল। আমি ডেকে পায়চারি শুরু করলাম। ভাবছি এতগুলো লোক নিয়ে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে অক্ষত দেহে সবাইকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব কেবল আমারই...কারণ আমি পরিচালক। সুটিং-এর সময় কিছু বিপদ ঘটলে আইনত দায়ী থাকেন পরিচালকই। কাজেই লোমহর্ষক উপখ্যান যতই স্ক্রিপ্টে লেখা থাক না কেন, তাকে পর্দায় রূপ দিতে গেলে যে কতখানি বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় সেই ভাবনায় বিনিদ্র রাত্রি পায়ে পায়ে গেল। ভোর রাত্রে ডেক চেয়ারে এলিয়ে কখন বসে পড়েছিলাম জানি না—তবে ডেক ধুতে এসে খালাসীরা আমায় ডেকে তুলেছিলেন... ধড়মড়িয়ে উঠে কেবিনে চলে যাই।...

জাহাজের প্রথম প্রভাত ১ ফেব্রুয়ারী! পাখির কাকলীগানে ঘুম ভাঙেনি... শুধু শোনা যাচ্ছে একটানা ইঞ্জিনের খস্‌-খস্‌ শব্দ। কেবিনে ঘুমুতে ইচ্ছা হল না...

বাইরে এসে ভিজে ডেক ছেড়ে উঠে গেলাম সারেঙের উপর কেবিনে। কেবিনের সামনেই ছোট্ট বারান্দা—সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেয়ে আছি সূর্যোদয়ের আশায়...চারিদিকে রাশি রাশি জল। সূর্যোদয় হয়েছে অনেকক্ষণ। —সারেঙকে বললাম—ক্রমেই আলোর তেজ বাড়ছে—তবু সূর্য উঠছে না কেন?...ব্যাপার কি?

সারেঙ হেসে উত্তর দেয়—এ সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখা যায়—সূর্যোদয় হয় না বাবু।

কেন?

সারেঙ বলল—এ যে পশ্চিমের আরব সাগর। এখানে সূর্যোদয় কোথায় পাবেন! ভারত মহাসাগরে পড়লে তখন সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দুই-ই দেখতে পাবেন। লজ্জা পেলাম।

বেলা দশটায় পোর-বন্দরে জাহাজ পৌঁছাবে...পোরবন্দরের আর এক নাম সুদামাপুরী। এরপর বেলা এগারটায় পোরবন্দর ছাড়লে জাহাজ আর ন'দিন কোথাও থামবে না। আজ-ই সন্ধ্যায় আরব-সাগর ছেড়ে আমরা পড়ব ভারত মহাসাগরে। আড়াআড়ি কেটে জাহাজ এগিয়ে যাবে— 'মোমবাসা' পোর্টের দিকে। মোমবাসা পূর্ব আফ্রিকার একমাত্র বড় পোর্ট।

২ ফেব্রুয়ারী.... সকাল হয়েছে....চেয়ে আছি দিগন্তের দিকে। আকাশ জলের একপাশ থেকে মাথা তুলে অপর পাশের জলে এসে মিলিয়ে গেছে। তীর বলে কোন কিছু নেই। আমাদের জাহাজখানা মোচার খোলার মত শুধু ভাসছে পাঁচগোলা কালো জলে ভেঙে-পড়া সফেন তরঙ্গের ওপর।

হঠাৎ চোখে পড়ল এক ঝাঁক রূপোর কুচি সাগরজল থেকে যেন ফোয়ারার মত উঠে অদূরের সমুদ্র-তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো... স্তব্বাক হয়ে চেয়ে থাকি...আবার...আবার...

তাড়াতাড়ি কেবিনে গিয়ে...পিটুবাবুকে বলি—সুধীরকে ক্যামেরা ফিট করতে বলুন—ছবি তুলবো।

—কি তুলবেন?

আমি বলি—ফ্লাইং ফিস ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেছে। এগুলো আমাদের কাজে লাগবে।

পিটুবাবু বলেন—কী কা
বসু—যদি আমাকেও একটু

আমি বলি কাথিওয়া
পালতোলা জাহাজ যাত্রায় ইন
লাগবে।

পিটুবাবু ছুটলেন সুধী

জাহাজের পেছনে বড়
তরঙ্গমালা ভেদ করে ছিটকে
রুপালী ফোয়ারা। তারই ছ
সুধীর। সুধীর বললে—ক্যা
উঠে, ক্যামেরা ফিট করলে
সমুদ্রের প্যানিং শটের চেষ্টা

ব্যবস্থা তাই হল...ভা
চারিদিক থেকে ঘনঘন রূপো
ঝলক উঠতে থাকে। এবং স
খাসে তুলে নেয়। ২য়া ফেব
প্রথম ক্যামেরা চালিয়ে আমা
যানের মহরৎ শট নি
ক্যান্টিন থেকে কেক সংগ্র
বাটা হল।

৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি এ
ঘটনা ঘটে গেল—... অভি
চিরদিন স্মরণে থাকবে।

রাত দুটোর পর হঠাৎ
গেল। বদ্ধ কেবিনে গত দু'দি
রাত দুটোর পর ঝড়ের তা
গিয়ে আশ্রয় নিলাম। কেবি
জানলা দিয়ে আসছিল বি
ঝলক। রাত পুইয়ে সকাল
বেরিয়ে ডেকে দাঁড়াবার উপ
উত্তাল তরঙ্গমালা একের প
ওপর দিয়ে ঝাপটা স্রোত
আকাশ ছেয়ে কালো মেঘ...
জাহাজখানাকে বার বার স
দিচ্ছে।....কাপ্তেনের কাছে
সাত মাইল দূরে টাইফুন উ
এসে লাগছে আমাদের জাহা

কেবিনে কেবিনে অস্থি
রুমে উপাসনার ধুম পড়ে
জেলায় মুসলমানরা নামাজ
চারিপাশের সর্বনাশের মা
ক্যামেরায় ছিল ঘটনাগুলি

কথায় বলে কারো সর্বনাশ—কারো পৌষ মাস।

৪ঠার বেলা বারটায় হাওয়ার জোর কিছুটা কমে গেল। সবাই অন্তরে অন্তরে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাল—প্রণাম করল। কাপ্তেন জানালেন—আর ভয় নেই... হাওয়ার বেগে আমরা প্রায় তিন ঘন্টা এগিয়ে গেছি অর্থাৎ তিন ঘন্টা পূর্বেই আমরা মোমবাসায় পৌঁছে যাব।

৫ তারিখে হঠাৎ শুনতে পেলাম.... আমাদের জাহাজকে হাওয়ার বেগ ৩ ঘন্টা এগিয়ে দিয়ে গেলেও আমরা হয়ত সাত দিন পেছিয়ে গিয়ে ৯ তারিখের জায়গায় ১৫।১৬ তারিখে মোমবাসাতে পৌঁছাবো।

কি ব্যাপার —?

ডাক্তার বললেন, নীচের ডেকে বসন্ত দেখা দিয়েছে জিপসীর দলের একটি মেয়ের গায়ে। কাজেই—কাজেই জাহাজকে নিকটের সেসিল দ্বীপে আটক করে রাখা হবে—যত দিন না এ ঘা শুকোয়। অর্থাৎ কোয়ারেনটাইন করা হচ্ছে।

সারা জাহাজে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল—যাত্রীরা সবাই ত্রস্ত—বিব্রত।

আধ ঘন্টার মধ্যেই সেসিল দ্বীপে এসে জাহাজ নঙ্গর করল। দ্বীপ উপকূলে রাশি রাশি নারিকেল গাছ। সেই নারিকেল কুঞ্জে দেশীয় আদিবাসীদের ঝুপড়ি। ধানের মরাই-এর মত গোলগোল ছাউনি।

আলিভাই জাহাজ থেকে নেমে জরিপ করে এলেন—বললেন—এখানে অস্টিচের ছবি নেওয়া দরকার, বিশেষ করে যখন সুযোগ মিলেছে। আফ্রিকার প্রতি অঞ্চলেই যদিও অস্টিচ দেখতে পাওয়া যায় তবে এক সঙ্গে এত হয়ত সেখানে নাও পেতে পারেন।

আফ্রিকার যেখানে যে জন্তুর বাহুল্য সেখানে সেই জন্তুর ক্যাম্প বলে অভিহিত হয়। কাজেই অস্টিচের ক্যাম্প সেসিলেই সবচেয়ে বিখ্যাত। এরা রাতে এসে এক জায়গায় জড় হয়....দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই লম্বা সফর শুরু করে। মনে হয় লাইট রেলওয়ের ছোট ছোট গাড়িগুলি দুলে দুলে ছুটেছে।

আলিভাই ছিলেন আমাদের পথ প্রদর্শক ও দোভাষী। ইস্ট-আফ্রিকাঞ্চলের জংলী অধিবাসীদের যদিও বিভিন্ন ভাষা তবু সোহালী ভাষা এ অঞ্চলের সব আদিবাসীই কিছু না কিছু বোঝে। ....যে সোহালী ভাষাটার চলন মোমবাসার সোহালী জাতের।

আলিভাইকে সঙ্গে নিয়ে আমি-পিটু-বাবু-অশ্বিনী-সুধীর (ক্যামেরাম্যান) মিঃ জগতাপ সবাই বেরিয়ে পড়লাম সেসিল দ্বীপ দেখতে। নারিকেলের কুঞ্জের মাঝে গোলপাতার মত ছাউনি-আঁটা, ধানের মরাই-এর মত অত উঁচু নয়—ঝুপড়ীর সারি কে যেন পরপর মাটির ওপর থেবড়ে দিয়েছে। মাঝে পরিষ্কার নিকানো উঠান। ... তার উপর বসে আদিবাসিদের শিশুর ভিড় জমে উঠেছে শ্বেত পাথরের বড় বড় ডিমের মত খেলনা নিয়ে। এক একটা ডিম্বাকৃতি পাথর শিশুদের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। এই-গুলি হচ্ছে অস্টিচের ডিম্। আমাদের দেখে অধিবাসী মহিলারা ছুটে নিয়ে আসে কচ্ছপ সেলের তৈরী বহুবিধ খেলনা, ঝিনুকের সঙ্গে মাদার অফ পার্লস—অস্টিচ ডিমের গহনার বাকস....ইলেকটিক টেবিল ল্যাম্পের অস্টিচ ডিমের শেড—এমনি কত কি।

ভেবেছিলাম এটা একটা জংলী দ্বীপ মাত্র—এখানে যে এমন সুন্দর সুন্দর কিউরিও পাওয়া যায় আমাদের ধারণাই ছিল না। মৃৎপাত্র, হাতির দাঁতের খেলনা ছাড়াও পাওয়া গেল প্রচুর সামুদ্রিক প্রবাল, শঙ্খ, নাভিশঙ্খ—মুক্তার আধার যার মাঝে মুক্তা সবে জন্ম নিচ্ছে।....আমরা তাদের আপ্যায়িত করলাম ছুঁচ-সুতা দিয়ে। এটা অবশ্য আলিভাই শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

আলিভাই ওদের এক সর্দারের সঙ্গে অস্টিচের ফোটো নেওয়ার প্রসঙ্গ পাড়লো। বললেন—দিনের আলো ফোটার সঙ্গেই যদি ওদের দল যে যার পথে চলে যায় তবে ছবি উঠানো যাবে কি করে....তখনও তো আধ-আলো আধো ছায়া অবস্থা, তাতে তো ভাল ফোটো উঠবে না। ওদের সর্দার অনেক ভেবে বললেন—ওদের কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি যদি খরচ করেন।.... আমি বলি এ আর বেশী কথা কি। কি ব্যবস্থা শুনি? সর্দার বললে—আলো-নাচের আয়োজন করতে হবে।

আলোনাচের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি....

সেসিলের আদিবাসীরা বন্যজন্তু শিকার করে এই আলোনাচের শুরু করে। আলোনাচ করে তিনটি লোক।—তার মধ্যে দুজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক। একটি পুরুষ খালি গায়ে কালো জন্তুর ছাল পরে বাঁশী বাজায়....এদের বাঁশিটা অনেকটা সাপুড়ের বাঁশী....দ্বিতীয় পুরুষ বাজায় দামামা—হাতে থাকে তীর, ধনুক বা বর্শা...বুকে ঝোলে দামামা। তৃতীয় স্ত্রী-লোকটি লাল পাখীর পোষাকে সজ্জিত—মাথায় তার থাকে ডালা—ডালায় সাজানো থাকে মাটির জ্বলন্ত প্রদীপের চক্র—দুহাতে জ্বলন্ত মশাল। বাঁশীর ও দামামার সঙ্গে এই মেয়েটি ঘুঙুর পায়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে জঙ্গলে প্রবেশ করে। আশ-পাশের বন্যজন্তুরা আকৃষ্ট হয় সংগীতের তালে-সুরে ও ঘুঙুরের ঝঙ্কারে।....অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সেই জ্বলন্ত মশালের দিকে। ঘুরন্ত নৃত্যে শিল্পীর ছায়ায় ঘোরে দামামা বাদক। হতবাক জন্তুদের দিকে তীর নিক্ষেপ করে নয়ত বর্শা। এমনি করেই ওদের জন্তু শিকার সম্পন্ন করে।

আমাদের ফোটো তোলার সময়—

অন্ধকার থাকতেই ওরা শুরু করবে আলো নৃত্য। ওরই নেশায় মুগ্ধ হয়ে অস্ট্রিচের দল থাকবে অনেক বেলা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। ভোলো করে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ছবি তুলতে শুরু করে দিতে হবে।

সম্পূর্ণ ব্যবস্থা সেরে জাহাজে ফিরে এলাম। এবার ক্যাপ্তেনের অনুমতি দরকার। আমি নিজে গিয়ে সাহেবকে নিমন্ত্রণ জানাই। বলি তুমিও চলো না আমাদের সুটিং-এ। তিনি জাহাজ ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না, তবে আমাদের পারমিশন দিলেন হাসতে হাসতে।

সত্যিই অন্ধকার রাত থেকে প্রায় সূর্যোদয়ের সময় পর্যন্ত আলো নৃত্য আকৃষ্ট করে রাখলে অস্ট্রিচের দল। আমাদের ক্যামেরার ঘর ঘর আওয়াজে তারা সচকিত হয়ে দলে দলে ছুটে চলে তাদের পথে....

ছবি তোলা সুন্দরভাবেই হ'লো.... বুঝলাম জঙ্গলে ছবি নিতে হ'লে এই আদি-বাসীদের নির্দেশ মতই চলতে হবে আমাকে—তাতেই কাজ সহজ সাধ্য হবে।

জাহাজে থাকতেই তিন দিন সুটিং হল নির্বিবাদে। বুঝলাম আমাদের যাত্রা হয়ত সফল হবে।

(২)

ম্যাডাগাস্কারকে বাঁয়ে রেখে আজ জাহাজ ভিড়ছে মোম্বাসা পোর্টে...আজ ১১ জানুয়ারী কোয়ারেনটাইনে মাত্র দুরায় নষ্ট হল। ডাকতারবাবু ছাড়ার অনুমতি দিয়ে-ছিলেন ওটা পানিবসন্ত বলে।

পাহাড় ঘেরা খাঁড়ি-পথ এঁকেবেঁকে এসে ঢুকছে নারিকেল কুঞ্জের জল-পাক-দণ্ডীর মাঝে। সমুদ্র কিনার থেকে শুরু করে পাহাড় চূড়া পর্যন্ত শুধু নারিকেলের বন। এ পথেরও দৃশ্যটুকু ক্যামেরায় তুলে নেওয়া হল। ক্যামেরা বন্ধ করার আগেই প্যাসেঞ্জারদের হুড়োহুড়ি, দাপাদাপি শুরু হয়েছে—লাইন করে তারা নেমে চলেছেন। পথে ডাকতারবাবুর দল সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে গাত্র আবরণ খুলে পরীক্ষা করে একে একে ছাড়ছেন—পাছে বসন্ত রুগী আফ্রিকায় না ঢুকে পড়ে।

মিঃ প্যাটেল ও মিঃ সাহা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন পোর্টে দাঁড়িয়ে..প্রায় ১ ঘন্টা পরে আমাদের দুদলের সামনা সামনি দেখা হলো—এরপর কাস্টম।.... অর্থাৎ ঝাড়া ঘন্টা তিনেক বাদে পরস্পরের হ্যান্ড-সেক বা অভিবাদনের অবকাশ ঘটল।

রেহাই পেলাম বেলা আড়াইটায়....

দুখানি প্লেজার কার, দুখানি ষ্টেশন ওয়াগেন ও দুটি লরীর সুবন্দোবস্তে আমরা আধঘন্টার মধ্যেই বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। বাড়িটি একটি পুরানো পর্তুগীজ ফোর্টের ভগ্নাংশ বলা চলে। বিরাট বটবৃক্ষের শেকড়ে শেকড়ে সারা বাড়ীখানাকে যেন আটকে রেখেছে।....

কলে জল ছিল। তবে তা নাম মাত্র। কাকস্নানেই নিজেদের তৃপ্ত করে আহারে যেতে গেলাম। আহারান্তে আমরা মিঃ প্যাটেল ও সাহার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ীতে রইলেন মহিলা দুজনে। আর রইল আমার পুরুদ্ধ আর্টিস্ট ও সাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার পরিতোষ বসু।

মোম্বাসা শহরটী ইংরাজী ধাঁচের.. সমুদ্রধার ধরে লম্বা স্ট্র্যান্ড। পর্তুগীজ আমলের চার্চ, রাস্তার দুপাশে বড় বড় দোকান—অলস্টোর বিদেশীদের জন্যে বড় বড় হোটেল।

সাফারির জন্য খাদ্যাদি কেনাকাটা, ফর্দ মিলিয়ে কিনতে মিঃ সাহা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন...মিঃ প্যাটেল অনাত্র দৌড়ালেন বোধকরি অন্যান্য ব্যবস্থায়। আর আলিভাই আমাদের ক'জনকে নিয়ে মোম্বাসায় পল্লী অঞ্চল দেখাতে চললেন।

পাহাড় পথে গাড়ী চড়াই পথে উঠতে শুরু করল—দুপাশে নারিকেলের সার। তার ভেতর দিয়ে গলিপথ। গলিপথ ধরে কিছুটা নেমে গেলেই কাফ্রী পল্লী। পল্লী পথে কাফ্রী সুন্দরীরা জলের কলসী নিয়ে ঝরনায় জল আনতে চলেছে। পরণে তাদের কোমরের নীচে সিসিল ফাইবারের...(পাটের মত) ঝুরী। ওপর ভাগে এক ফালি বস্ত্র দিয়ে বুকটা বাঁধা। সারা অঙ্গে রাশি রাশি আভরণ। কারো কারো বা মুখ বা বুক নানান আলপনায় চিত্রিত।

এমনি একটি পল্লীর সামনে গি আমাদের মোটরটি দাঁড়ালো...আলিভ নেমে গিয়ে তাদেরই মধ্যে এক প্রবীনার স কথা কইলেন। প্রায় মিনিট পনের পরে-এসে আলিভাই বললেন—আজ রাত্রে এ ওদের সোহালি নাচ দেখার ব্যবস্থা করলা ঠিক আছে না? আমি বলি, খুব ভ করেছেন, নাচ ভাল লাগলে কিন্তু ক সকালেই আবার বড় করে উদ্যোগ কর হবে, যাতে করে ক্যামেরায় তুলে নি পারি। ক'টায় শুরু করতে হবে সেটা রা বলে দেবো।

ওদের ছেড়ে গাড়ি পাহাড় চূ উঠেছে...রাত সাড়টা বেজে গেছে অ দিনের আলোয় এতটুকু বেশ কমেনি পশ্চিমের আকাশ সবে রং ধরতে শু করেছে। আফ্রিকায় সন্ধ্যা হতে প্রায় সা আটটা বাজে...আমাদের দেশে রাতের প্রহর শেষ হতে চলে। পাহাড় চূড়া থে যাচ্ছে...পাশে লাল বাঁধানো স্ট্যাণ্ড অদূরে নীল সমুদ্রের তটরেখা দে পথ—ঠিক যেন মেখলার মত সারা মোম্বা শহরকে ঘিরে রেখেছে..তারই অনতিদূ দেখা যাচ্ছে ডকের কর্মব্যস্ততা।

সন্ধ্যাভোজের কিছুটা দেরি হয়ে গে তাই পাহাড়তলীতে পৌঁছবার আগেই দূ থেকে শোনা যাচ্ছিল...এক অনবদ্য ছান্দ টিম্ টিম্—টিম্‌টাম, তার সঙ্গে চলে ছরুরা ছরুরা-ভর। বুঝলাম নাচ শুরু হ গেছে। আলিভাই বলেন এই হোলো আস সোহালি-নাচ যা ভেঙ্গে আপনাদের হুলো হুলো, বেরিওবো—রুম্বা সুম্বা নাচ তৈর করেছে পোর্তুগীজরা।

পাহাড়তলীর অঙ্গনের সামনে অপেক্ষ দাঁড়িয়েছিল কতগুলি মেয়ে...আমাদে পৌঁছনোর খবর নিয়ে তারা কলহাসে ছু চলে অঙ্গনতলে। অঙ্গনের মাঝে লাইন ধ অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশজন মহিলা— ব সাজসজ্জায়, চিত্র-বিচিত্র হ না চালিয়েছে।... পাশের বনান্তে চাঁদ উঠেছে.. যেন একখানা মস্ত সোনার থালা...তার কনকাভায় নাচওয়ালিদের আবলুস কাে দেহগুলি যেন স্বপ্ন রাজ্যের সচল পাথ প্রতিমূর্তি। এদের মাঝের রাণী সেজেছে যে সে কিন্তু ধবধবে-সুন্দরী!...এটী নাকি 'লামু গার্ল'...লামু পোর্টের আরবী আফ্রিকার সংমিশ্রণে এর জন্ম....তা আফ্রিকার জলহাওয়ায় পুষ্ট হলেও নিজে বাপের দেশের অঙ্গসৌন্দর্য পেয়েছে।.. এদের সবার নাচের বিশেষত্ব হচ্ছে—এর নিক্ষেপে প্রতিটি অঙ্গ কাঁপাতে থাকে ছন্দ তালে...যার গতি যেমন সূক্ষ্ম তেমনি রুচিকর।

রাত বারটা নাগাদ বাড়ী ফেরা হলো.. বাড়ীর সবাই তখন শুধু জেগে নয় হুল স্থূল বাধিয়েছে...সবারই মুখ যেমন সাদ ফ্যাকাসে তেমনি ত্রস্ত। তারা নাকি সন্ধ থেকেই সারা বাড়ী ঘুরে ছোট ছেলের ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ শুনছে—তার মাঝে হঠাৎ হঠা

ভাসে ভেসে উঠছে বিকট হুম্-হুম্ ধ্বনি। এটা যে জন্তুর ডাক—তারা স্বভাবত বলে মেনে নিয়েছে....এমন সময় ঐই ট্যা ট্যা শব্দ সঙ্গে সঙ্গে হুম্ হুম্ ধ্বনি। কান খাড়া করে সবাই শুনলাম। মিঃ প্যাটেল বললেন, এতো হুমো পাখী ডাকছে যাকে বলেন আপনারা পেঁচার দল ...ওদেরই বাচ্চারা অমন ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করছে।....সবাই হেসে উঠি....পরদিন,—

বেলা দশটায় সোহালি নাচের সুটিং করে ১১টা নাগাদ মোম্বাসা ত্যাগ করলাম। যাত্রা এবার নৈরবী হয়ে থিকা অভিমুখে। নৈরবী কেনিয়ার রাজধানী.... এখান থেকে পাঁচশো মাইল।....নৈরবীর এক মাইল দূরে 'থিকা'—এইখানেই মিঃ প্যাটেলের বাড়ী। ঠিক হয়েছে এই থিকা শহরে মেয়েদের ও অ-দরকারি শিল্পীদের রেখে আমরা বনসম্পদ আহরণে বার হব। কারণ বিষুব রেখাকে ঘিরে যে সমস্ত দেশ সেখানে মাত্র দুটি ঋতু—বর্ষা ও শীত। —এর আবার সময় আছে...যেমন এখন দুমাস শীত—তারপর দুমাস বর্ষা নামবে... তারপর চার মাস শীত—সঙ্গে সঙ্গে আসবে চার মাস বড় বর্ষা। বর্ষা মানে প্লাবন বন্যা চলে তখন যাত্রীদের যাতায়াত প্রায়ই সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে—কাজেই সবাইকে থিকায় রেখে আগেই জঙ্গলের কাজ সেরে নিতে হবে।

বলেছি তো, যে জন্তু বেশী যেখানে পাওয়া যায়—সেই জায়গাটিকে সেই জন্তুর ক্যাম্প বলে।—যেমন সিংহের ক্যাম্প—সেরেঙ্গেটি প্লেন—ট্যাঙ্গানাইকায় অবস্থিত। কেনিয়াতে জলহস্তী, কুমীর—এটি উগান্ডায়। টোরা ফরেস্টে হাতীর ক্যাম্প —এটি বেলজিয়াম কঙ্গোর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই নাচ সংগ্রহেও বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রা করার আছে—যা এ্যাবিসেনিয়া সুদান অঞ্চলেও বিস্তৃত। সবটারই একটা সুষ্ঠু প্রোগ্রাম রচনা করা হবে থিকায় বসে... সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ক্রিপ্টটাও।

পাহাড় চূড়ায় যখন গাড়ি গিয়ে উঠলো তখন চারিদিকে জ্বলন্ত রৌদ্র.... সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়—পথ চলেছে বেঁকে লালমাটিতে এঁকে।....সোজা নীচের সমতলে নেমে গিয়ে দূরে পাহাড় চূড়ায় আবার ঠেলে উঠেছে....তারপর দীগন্তে মিলিয়ে গ্যাছে সে পথ। পথের দুপাশে ছোট ছোট বাব্লার বন-প্রান্তর। ঘন্টাখানেক তীর বেগে গাড়ী চলার পর পেলাম ঘন জঙ্গল—দেবদারুর মত লম্বা লম্বা আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইউক্লিপটাসের ঘন বন।...শুনলাম এ দেশে জ্বালানী কাঠ হিসাবে ইউকিল্পটাসের গাছ ব্যবহৃত হয়....এমন কি ট্রেন চলে ইউকিল্পটাসের জ্বালানীতে.... কয়লায় নয়।....পথে জানোয়ার বলতে বিশেষ কিছু নেই....খালি পেলাম ২০০।২৫০ বানরের দল, গায়ে ঠিক জেব্রার মত ডোরা কাটা...ওদের অনুসরণ করে কিছু স্টক শট নিলাম। এরপর নীচের প্রান্তর—শুধু হালকা পাতার ঝাবলা বন...

এখানে পেলাম দলে দলে জিরাফের দল.... গাড়ীর শব্দ পেয়ে সচকিত হয়ে উঁচু গলা-গুলো হাওয়ায় দোলাতে দোলাতে ছুটতে থাকে....মনে হয় যেন হলুদ-কালোর ঢেউ ছুটেছে সবুজ প্রান্তরে।....সংগ্রহ করার মত ছবি।....অস্টিচের রেলগাড়িও পথে পাওয়া গেলো, তবে তার পেছনে আর সময় নষ্ট করা হলো না।

প্রান্তরের পথ ছুটে চলেছে এবার পাহাড় চূড়ায়....বেলা দুটো বাজে। পাহাড় টপকে পৌঁছলাম এক নদীর ধারে.... জায়গাটির নাম 'ভয়'। খাবার জন্যে এইখানে অবসর নেওয়া হ'লো।

দুরন্ত গরম। সবাই নিজেদের পোষাক খুলে ছুটে গিয়ে পড়ি নদীর বুকে...কিন্তু কোমর পর্যন্ত জল, তবে স্বচ্ছ। গর্ত খুড়ে ডুব দেবার ব্যবস্থা শুরু হলো, ফলে সারা গায়ে বালি বোঝাই হয়ে গেল। হঠাৎ আবিষ্কার করা হলো যে সবার গাগুলো সোনার মত চকচক করছে সূর্য কিরণে। ভাবছি...জলে কোনো ধাতু বা অভ্র হয়ত মিশিয়ে আছে, তাই বুঝি এমনি চমকে উঠেছে...সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি এমন সময় তকমাধারী দুটি পেয়াদা এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো।...'এ নদীর জলে স্নান করতে আপনাদের কে পার্মিশন দিয়েছে'...কথা কটা ইংরাজীতে বললেন পেয়াদা মশাই।

ভগবানের দেওয়া নদী প্রকৃতির বুক ফেড়ে ছুটে চলেছে....তাতে স্নান করার আবার পারমিশন লাগে এই প্রথম শুনলাম তাই জিজ্ঞাস করলাম—পারমিশনটা কিসের সাহেব তোমার কথাটা একটু বুঝিয়ে বল ভাই।

আমাদের মিষ্ট সম্বোধনে সন্তুষ্ট হয়ে একজন এগিয়ে এসে বল্লেন—'কি জানেন 'ভয়' জায়গাটির অধিকাংশই গোল্ড-ডিগার্সদের অধিকৃত। এর জলে স্থলে পাহারে সোনা আছে—দেখছেন না আপনাদের গায়ে সোনার কুচি লেগে রৌদ্রে কিরকম জ্বলছে—পাছে কেউ এর এক কণাও চুরি করে নিয়ে যায়—তাই পাহারাদার বসানো সারা জায়গাটিতে। আপনারা ওপরে উঠুন আপনাদের গায়ের সোনার কুচী এখনি ব্রাশ করে ঝেড়ে নিতে হবে নইলে আমাদের চাকরি যাবে।

কথা বলতে বলতে ওপরের ক্যাম্পে নিয়ে এলো এবং এক লালমুখো সাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। আমরা নতুন এ দেশে এসেছি শুনে তিনি স্মিত হেসে আতিথ্য করলেন। তাঁর ক্যাম্পে বসেই আমাদের মধ্যাহ্ন আহারাদি সমাপন করলাম—সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও দেওয়া হলো।

খেতে খেতে তিনি বললেন—'এ সব বনাঞ্চলে যে শুধু সোনাই পাওয়া যায় তা নয়। আরও পাওয়া যায় ম্যাঙ্গানিজ। বাকসাইট, হীরা প্রভৃতি। বছরে এখান থেকে ২৮৬,০০০ মেট্রিক টন ম্যাঙ্গানিজ, ১৬৭০০০ মেট্রিক টন বাকসাইট, ২৪,৪৮১ কিলোগ্রাম সোনা আর ২,১৫৯,০০০ মেট্রিক ক্যারেট ওজনের হীরা চালান হয়।'

চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল......

পশ্চিম আফ্রিকার গিনি সৈকতের 'অশ্বিনী' থেকে শুরু করে পূর্বাঞ্চলে ভোল্টা নদীর উৎপত্তি স্থান 'কুইটা' পর্যন্ত বিস্তার করেছে এই স্বর্ণসৈকত। তিনশ সত্তর মাইল বিস্তৃত এই স্বর্ণসৈকত। কাজেই সেই সমস্ত সৈকতগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে রয়েছে হাজার হাজার 'গোল্ড্ ডিগারস্' অর্থাৎ পাহারাদার।

ভোল্টা ছাড়াও আরও দুটি বড় নদী ওরই আশেপাশে বইছে...'আন্কোব্রা' আর প্রা। আন্কোব্রার আর এক নাম 'স্নেক-রিভার—অর্থাৎ সাপের নদী—জলে তার অজস্র সাপ—তবে বিষাক্ত নয়। এই তিনটি নদীর সমুদ্র মোহনার নাম 'থ্রি-পয়েন্ট'... এই তিনটি নদীর বনাঞ্চল ঘিরেই স্বর্ণ সৈকত। পঞ্চাশ-ষাট মাইল অন্তরই জংলী নিগ্রোদের বাস—যারা বনের জন্তু, মানুষের মাংস ছাড়া কিছুই খেতে জানে না, বেলজিয়াম কঙ্গোয় ঘন বনাঞ্চলে পিগ্মীদের বাস—তারাও নরখাদক। কাজেই গোল্ড ডিগার্সদের খুবই সাবধানে থাকতে হয়। অসতর্ক হলেই নরখাদকরা বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ করে পুড়িয়ে খায়, ভাবুন কী বিভৎস কান্ড।...তবে রক্ষে, বন্দুককে ওরা খুবই ভয় করে, ওদের অগ্নি হচ্ছে দেবতা...তাই বন্দুকধারীদের ওরা ভাবে দেবতার দূত। তবু সুবিধা পেলেই ওদের কাজ ওরা করে চলে।'

জিজ্ঞেস করলাম—'তবে তো এই বিশাল জায়গাটা জুড়ে যারা কাজ করেন তারাই আফ্রিকার বাইরের লোক?'

তিনি বল্লেন—না—ভোল্টার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 'এ্কিম' বলে একটা নিগ্রো জাত আছে—তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব

...াপনা করে রেখেছি। এরা না থাকলে ...মাদের কাজ করা সম্ভব হোতো না।'

জিজ্ঞাসা করি—'ওরা আপনাদের কি ...াহায্য করে?'

সাহেব হেসে বলেন—'ওরাই নদীর ...াহনার বালি থেকে সোনা সঞ্চয় করে যেমন ...রা আপনাদের গা ঝেড়ে করলো তাছাড়া ...রকার হলে কিছু কিছু সোনার আকর ...ড়েও বার করে।'

খেতে খেতে এমনি কত গল্প বলে ...লেন—মনে হয় যেন স্বর্ণ লঙ্কাতে আমরা ...সেছি—এখানকার মানুষগুলো রাক্ষসের ...ত—মেয়েগুলো চেড়ীর দলের মত—ঢেউ ...গেছে সোনায়...তাইতো মনে হয় এইটাই ...বহয় রামায়ণে বর্ণিত স্বর্ণ-লঙ্কা।'

ভদ্রলোক সুইজারল্যান্ডবাসী হাঙ্গা-...রান। খাওয়া শেষ করে তিনি একটি ছোট ...নার পাথর আমাকে উপহার দিলেন—...লেন—এই সব পাথর টুকরো করে ...লিয়ে সোনাটুকুকে আলাদা করে নেওয়া ...।

আমাদের লম্বা প্রোগ্রামের কথা মিঃ ...টেল ওকে জানালেন। তিনি বিদায়কালে ...মায় বলেন—ঘুরতে এসেছেন—নিজেই ...খে যান—আফ্রিকা জগতের যত কিছু শ্রেষ্ঠ ...দের আকর। এখানে আছে সোনা, রুপো, ...মা, টিন, ইউরেনিয়াম—এমনি কত কি—...ছে সালফার সোডিয়াম প্রভৃতি—তা ছাড়া ...লে হীরা-জহরতও প্রচুর।

অভিবাদনান্তে ভয়' যখন আমরা ত্যাগ ...লাম তখন ঘড়িতে ৫টা বাজে...অথচ ...লোর তেজ এতটুকু কমেনি।

(৩)

সারারাত মোটর চলেছে...নৈরবীতে যখন ...ছালাম তখন সবে সূর্যোদয় হচ্ছে. ...নে চারটায় সূর্য উঠে যায়।

নৈরবী শহর মনে হয় যেন বিলাতী ...র। একটি হোটেলে আস্তানা নিয়ে ...জেদের কিছুটা চাঙ্গা করে নিলাম। পরে ...ীর (ক্যামেরাম্যান) আমি আর পিটু-...কে সঙ্গে নিয়ে মিঃ প্যাটেল চললেন ...ন্স এন্ড জোন্স কোম্পানীতে...এখানকার ...াত ক্যামেরার দোকান। মিঃ সাহা ...মাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে—কিসিমুর ...পা বাড়ালেন। মিঃ সাহার কিসিমুতে ...ী ও দোকান। যাবার সময় বললেন—...রবী অঞ্চলের কাজ শেষ করে যখন ...গান্ডায় আসবেন তখন আবার দেখা ...।

জোন্স এন্ড জোন্স একটি আমেরিকান ... প্রতিষ্ঠান। এ'রা ছবি সংগ্রহকারী ...দের সমস্ত জিনিস ভাড়া দিয়ে ...হায্য করেন। ক্যামেরা, লেন্স নিজেদের ...ত লেবরেটারীতে ডেভলাপিং পর্যন্ত অর্থ ...নিময়ে করে দেন। তাছাড়া জঙ্গলের কোন ...লে কি কি ছবি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ...ং তার পদ্ধতিও তাঁরা বোলামিটার ছবির ...াধ্যে দেখিয়ে-বুঝিয়ে দেন। আবার সারা ... তাঁরা নিজেরাই বনের জন্তুর বিভিন্ন শট তুলে আমেরিকান কোম্পানীগুলিকে সাপ্লাই করে থাকেন। জার্মানীর বিখ্যাত সার্কাস হেগেনবেগ কোম্পানির সঙ্গে এ'দের চুক্তি আছে। এ'রা যে সমস্ত বন্যজন্তু যেমন জেব্রা, জিরাফ, হরিণ, ব্ল্যাক টাইগার, সিংহ, হাতী প্রভৃতি জন্তুদের জীবন্ত অবস্থায় ধরে এই সার্কাস কোম্পানীকে পাঠিয়ে দেন। সার্কাস পার্টি এদের যথাযত ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়ে দেন আমেরিকান ফিল্ম কোম্পানির মালিকদের যার যেমন দরকার।

সন্ধ্যা ছটায় (বিকেলই বলা উচিত) টাইম দিলেন যে খোলা জঙ্গলের জন্তুদের ছবি তোলার পদ্ধতি ও'রা আমাদের দেখাবেন।

সারাদিন নৈরবী শহর দেখে বেড়ালাম। এখানে একটি ফ্লোটিং আইলেন্ড আছে অর্থাৎ ভাসমান দ্বীপ...ব্যাপারটা খুবই চমকপ্রদ। একটা বিশাল লেকের মাঝে এই ভাসমান দ্বীপটি রয়েছে। আমরা সবাই বোটে করে সেই দ্বীপে পৌঁছালাম, সত্যি দ্বীপটি ধীরে ধীরে দোলা খায়। তার উপর মানুষের বসতি রয়েছে, গরু ছাগল চরছে, কিছু হরিণও সেখানে দেখলাম। মানুষের রচিত ছোট্ট জঙ্গলে তারা দলে প্রায় ১০০।১৫০টি বসতি করেছে। প্রকৃতির সব-কিছুই এই দ্বীপটিতে পাওয়া যায়। এক বর্গ ফারলং প্রশস্ত হবে এই দ্বীপটি। প্রায় সারাটা দিনই কেটে গেলো আমাদের এইখানে।

ছটায় এসে উপস্থিত হলাম জোন্স এন্ড জোন্সের মিনি প্রেক্ষাগৃহে। সিংহ, জেব্রা, হাতি, গন্ডার ইত্যাদিদের বন্যজীবন কি রকম তারই পূর্ণ আভাষ ছবিগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে....এদের স্বভাব, বাস করার রীতি, এদের কাছে যাওয়ার নীতি সবই বুঝিয়ে বলতে থাকেন জোন্স এন্ড জোন্সের একটি অফিসার।

সিংহের যেমন রাজসিক স্বভাব। অর্থাৎ বনের রাজাকে খাবার সংগ্রহ করে উদর পূর্তি করতে নিজের মানে বাঁধে। তাই তাদের যদি কেউ এই কাজটা নিত্য জুগিয়ে যায় তাহলে তারা ভাবে এরা আমাদের খাদ্যশালার বন্টনকারী, তাই তাদের চিনে রাখে, তাদের কিছু বলে না। ট্যাঙ্গনাইকার গেমওয়ার্ডেনরা পোষাকে সাহেব তারা নিত্য-এদের জন্তু মেরে খেতে দেয় অতএব এই কোটপ্যান্টধারীদের দেখলেই তারা দাঁড়িয়ে উঠে সম্ভাষণ জানায় এবং অপেক্ষা করে নিজেদের ভোজের জন্য। এই সংস্কারকে হাতে নিয়ে ছবি তুলতে হয়, আবার এদের খাবার দিয়ে বা করাবে তাই তারা করছে প্রস্তুত, যেমন 'কিল'কে গাছে বেঁধে দিলে এরা গাছে ওঠার চেষ্টা করবে, তাঁবুর মধ্যে রেখে দিলে—সেখান থেকে 'কিল'কে ঘাড়ে ফেলে নিয়ে যাবে, ছুঁড়ে দিলে এরা তা লাফিয়ে ধরে নেবে এই রকম। এদের ইনসটিংক্ট অসম্ভব, এরা যাকে একবার শত্রু ভেবেছে, তার প্রতি প্রতিশোধ নেবেই এবং এদের তারা চিরদিন স্মরণ রাখবে। তেমনি এদের মিত্রদেরও চিনে রাখে এমন করে যে খাদ্যবন্টনকারীদের কেউ কাছে গেলেও কিছু বলে না।

হাতির জঙ্গলে হাওয়ার গতি বুঝে ঢুকতে হয়, অর্থাৎ এদের কাছে ছবি নিতে গেলে হাওয়ার গতি লক্ষ্য করতে হয়। হাতির ওপর দিয়ে যে হাওয়া বহে আমাদের দিকে আসে—সেইরকম হাওয়া থাকলেই এদের কাছে গিয়ে ছবি নেওয়া যায়। অর্থাৎ হাওয়া গন্ধ-বাহী....আমাদের ওপর দিয়ে যে হাওয়া বয়ে ওদের কাছে পৌঁছায়—সে হাওয়ার গন্ধে ওরা সজাগ হয়ে ওঠে। তখন তারা হয় পালাবে, নইলে আক্রমণ করবে। হাতির দৃষ্টি উল্টো—মানে ওরা বড় জিনিসকে ছোট দ্যাখে আর ছোটকে বড়; এরও সুযোগ সুবিধে নিয়ে ওদের ছবি ওঠাতে হয়।

গন্ডারদের পাশ ধরে ছবি তুলতে হয়, সামনে পড়লে ওরা মানুষকে ওদের সিং দিয়ে দু ফাল করে রেখে দেয়। এমনিতর এক এক জন্তুর এক এক রীতি।

জলহস্তীদের ছবি নিতে গেলে... জলহস্তীপূর্ণ লেক বা নদীর ধারে গিয়ে সমস্বরে মুখে হু-হু' আওয়াজ তুললেই ওরা ঝপঝাপ করে জলের ওপর , গা তুলে, দেখে ছুটে পালায়।

বুনো মহিষদের ত্রিসীমায় যখন যেতে নেই গাছে উঠে টেলিফোটো লেন্স দিয়ে এদের ছবি তোলাই রীতি।

এমনিতর নানান বিষয়ে উপদেশ দিলেন। বিশেষ করে জানালেন ছবি তোলার সময় কোনরকম শব্দ করতে নেই, সবই আকার

ইঙ্গিতে বা ইসারায় জানাতে হয়। সর্বশেষ জানালেন যে শিকারি পথপ্রদর্শকদের কথা কায়মনবাক্যে শুনতে হয়, এতে বিপদের সম্ভাবনা প্রায় থাকে না নইলে বিপদ অনিবার্য।

এ ছাড়া আরও সাবধান হতে বললেন স্লীপিং বীজকে। জঙ্গল এলাকার প্রারম্ভেই বোর্ডে লেখা থাকে স্লিপিং বীজ এরিয়া—সাবধান। এটি লক্ষ্য করে প্রত্যেক সাফারিদল চলে। স্লীপিং বীজ মানে ঘুমপাড়ানি মাছি। এরা পতঙ্গের মত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে। এদের মধ্যে কতগুলি আছে বিষাক্ত আর কতগুলি আছে বিষহীন। বিষাক্ত মাছি কোনো জন্তুজানোয়ারদের কামড়ে বিষ ছড়ালে সেই জন্তুকে যদি বিষহীন মাছি কামড়ায় তবে সেই মাছিটিও বিষাক্তের দলে নাম লেখায় এমনি করে দলে দলে মাছিরা বিষাক্ত মাছি গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে। এদের বিষে মানুষের দিবারাত্র ঘুম পায়, অথচ তিলার্ধও ঘুমতে পারে না, সারা শরীরের চামড়া কালো হয়ে যায়। ঘুম পাওয়া ও না ঘুমানোর মাঝে পড়ে মানুষ শেষে পাগল হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। এর কোন প্রতিষেধক ওষুধ নেই। কামড়ালে তার চিকিৎসা নেই। এই সব কারণে মাথার শোলা হ্যাটের সঙ্গে জাল লাগিয়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে জঙ্গলে ঢুকতে হয়।....অপর একটি সর্বনেশে পোকা আছে যা এঁটুলির মত পায়ে লেগে গিয়ে সেখানে ধীরে ধীরে গর্ত খনন করে চলে এবং যতক্ষণ না পাটীর সেই অংশ পুরো অপারেশন করে সারা এঁটুলিকে বার করে দেওয়া হয়—সে তার কাজ চালিয়ে যায়—এর নাম "জু-জু"। তাই পায়ে ফুল মোজা ও গামবুট—পরণে বিচেস : হাতে গ্লাবস্—মাথায় জাল সমেত শোলা হ্যাট হচ্ছে জঙ্গলে ঢোকার একমাত্র নিরাপদ পোষাক।

ছবি দেখে এবং ইনসট্রাকশন শুনে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো জঙ্গলের জীবনের ভয়াবহ ছবি। মিঃ প্যাটেল বলেন, ভয় নেই 'থিকায়' পৌঁছেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।....সেই রাত্রেই আমরা 'থিকায়' পৌঁছে গেলাম।

মিঃ প্যাটেলের সুন্দর বাংলো.. এমনিতর বাংলো দিয়ে সাজানো সারা থিকা শহরতলী—চারি পাশে অপূর্ব বন-শোভা।

থিকা শহরতলীর ওপরই দুটী বিরাট ঝরণা দিবারাত্র ঝরঝর ঝরে পড়ছে—একটি 'চেনিয়া', অপরটি 'থিকা'। প্রকৃতির এই রম্য রচনার মাঝে থিকোর বাসিন্দাদের বাংলোবস্তী।....এ যেন আলিবাবার আমলের মত সব বাড়ীগুলি একই রকম দেখতে।...এখানকার ধোপা, নাপিত, পাচক জমাদার সবাই কোটপ্যান্টধারী...দোকান-পসার সবই ইংরাজী অনুকরণে সুসজ্জিত।....ব্যবসাবাণিজ্য যত কিছু সবই দেখলাম গুজরাটিদের হাতে।

রাত্রে পূর্ণ বিশ্রামের পর দিনের আলোয়....এই গুজরাটবাসীদের সঙ্গে আলাপ হ'লো। এঁদের মুখে খবর পেলাম যে, এখানে মেট্রোগোল্ডুইনের দল ছবি তুলছেন। এই খবরটুকু আমার কাছে যেমন চমকপ্রদ তেমনি আকর্ষণীয়। মিঃ প্যাটেলকে বললাম—যে করেই হোক এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন—ওঁদের সুটিং পদ্ধতি কিছুটা জানতে পারলে আমাদের প্রভূত উপকার হবে।

নিমেষের মধ্যে নিজেকে তৈরী করে নিয়ে মিঃ প্যাটেলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়া হ'লো।

পাথর ছোঁড়ার দূরত্বেই দেখতে পেলাম—চেনিয়া আর থিকা নদীর জলরাশি আকাশে বাতাসে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে আবর্তে পাথরের দেয়ালে আক্ষেপে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে। দুরন্ত স্রোতবেগে দুপাশ দিয়ে দুটি নদী এসে একই গভীর খাদে প্রপাত রচনা করছে। জায়গাটাকে দেখেই মনে পড়ে গেল....টারজান ফাইন্ডস্ হিজ সান—ছবিতে এ দৃশ্য দেখা গিয়েছিল—হ্যাঁ..হ্যাঁ....ঐ যে চেনিয়ার স্বচ্ছ স্রোতে টারজানের ছেলেকে পদ্মপাতায় ভেসে আসতে দেখা গিয়েছিল....আর ঐ গভীর খাদে টারজেনকে নামিয়ে ক্ষণিকের জন্যে বন্দী করে রেখেছিলো আফ্রিকার কাফ্রী-বুনোরা। শেষে টারজনের প্রিয় হাতি এসে এই খাদ থেকেই উদ্ধার করে টারজনকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছিল।

'চেনিয়া' নদীর অপর পাশেই ইংরাজ-দের হোটেল—ওখানেই মেট্রোর দল আস্তানা গেড়েছেন...অপর পারে থিকা নদী....তার পাশে প্রেমজীভাই এর ফ্লাওয়ার মিল। পথে একটি ইওরোপীয় ক্যামরার দোকান—মিঃ প্যাটেলের জানিত। এখানে পেঁছেই ভেবেছিলাম মেট্রোর খবরাখবর নেবো কিন্তু ভাগ্যক্রমে ওখানে পেঁছাতেই হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল মেট্রোর একটি অপারেটিং ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে। উনি বললেন—মাত্র সাত দিন এখানে এসেছেন.. এখান থেকে সমস্ত আয়োজন শেষ করে সারা ইস্ট আফ্রিকার বনাঞ্চলে ওরা ছটি মাস ভ্রমণ করবেন। এঁদের সঙ্গে মাত্র একটি শিল্পী আছেন—তিনিই ছবির হিরো। আর আছে পূর্ণ যান্ত্রিক আয়োজন।....মুভিং লেবোরেটারি, মুভিং জেনারেটর—লাইট—প্রোজেক্টার ইত্যাদি ইত্যাদি....যায় এডিটিং ইকিউপমেন্ট পর্যন্ত। সমস্ত শুনে মনে মনে কেমন দমে গেলাম। তবু লড়তে হবে যখন

যুদ্ধে নেমেছি...মিঃ প্যাটেল বল 'আমাদের সাহস ও কেরামতি ওদের অনেক বেশী মিঃ ঘোষ। কারণ ছবি কাজে ওরা যা যা সুবিধা পা শতাংশের একাংশ পেয়ে ভারতীয় ছ পাশে গিয়ে কম্পিট করে আসে না।'

সারাদিন বসে সাফারি প্রোগ্র করা হ'লো...প্রথমে শিল্পীদের থিকাতে বসেই সুটিং শুরু হবে. Fourteen falls (চোদ্দ বলে একটি স্থান আছে সুটিং এর লোকেশন... এছাড়া থিকা চেনিয়া প্র আছেই। এখান থেকে এবিসেনিয়ার দের বাটা সিসটেমের হাট ও তা নেওয়া হবে। পরে কেনিয়ার 'নেইর' রাইনো ক্যাম্প বিখ্যাত। 'নেইর মাউন্ট হেনিয়ার অবস্থিত....১৮০ উঁচু। এই পাহাড়টির মাথা বরে ১০০০০ ফিটের মত উচ্চতায় হচ্ছে

কেনিয়ায় কাজ সেরে ইউগেণ্ড পর....ট্যাঙ্গানাইকা....হয়ে সুডানের বেলজিয়াম কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে 'টে যেতে হবে।....মোটামুটি আমাদে প্রোগ্রামেই 'সাফারি' রচনায় ঠিক মিঃ প্যাটেল বললেন, আমার মাত্র সময় দিন আমি সমস্ত জায়গায় করে এর পূর্ণ ব্যবস্থা করে নি। বলি....এ দুটো দিনে আ গল্পাংশের রূপ খাড়া করে নি—যা সুটিং শুরু করতে পারি....তবে ফলস্‌টা কাল সকালেই আমাকে দিন এবং আরও একটা কাজ আপনা হবে—সেটা হচ্ছে যে, আপনাদে থেকে আমাদের আস্তানা তুলে নদীর ধারে প্রেমজী ভাই-এর মিলের বাংলোয় এবং তার আশেপ লাগিয়ে আমাদের ওখানে ব্যবস্থাপনা।

দুদিনের ছুটিতে আমি একটা স্ক্রিপ্ট লিখে ফেললাম সেটাই টুকু ছোট করে আপনাদের জানা কোথায় কিভাবে সুটিং করবো পাবেন না।...গল্পাংশ—

কাথিওয়াড় গুজরাটি বণিক শেঠ দেওজীভাই প্যাটেল তাঁ জাহাজ ভাসিয়ে প্রতিবছরই আ কূলে ব্যবসা করে বেড়ান। বাড়ী তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে উ হঠাৎ তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায় ব যাত্রা স্থগিত ছিল। কিন্তু বণিক বিনা ব্যবসায় দিন কাটে না। একমাত্র ষোড়শী মেয়েকে সঙ্গে নি যাত্রা শুরু করলেন।...সঙ্গে নি বন্ধুপুত্র রণমলজীকে নিজের প্রতিষ্ঠিত করে...তার সঙ্গেই মে মনে মনে ইচ্ছা রাখেন।

আফ্রিকায় থাকেন বনোয়া শেঠজীর পুরাতন ভৃত্য জুলুয়া জীই আপাতত শেঠজীর মোম্বা

অধিকর্তা হয়েছেন। গত তিন বছর ধরে আফ্রিকায় সংগ্রহের কাজ চালাচ্ছেন। ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, কিছুটা রুক্ষ স্বভাবের....ছবির ভিলেন বলা চলে। জঙ্গল-অভিজ্ঞ একটি দেশপর মেয়েকেও সাফারিভুক্ত করেছেন শেঠজী-নাম নীলা। নীলাই করবে দোভাষী আর জংলীদের সঙ্গে দৌত্যের কাজ। এছাড়া থাকছে আফ্রিকার নিগ্রোভৃত্যের দল...মোট সংখ্যায় প্রায় ২০।৩০ জনের এক সাফারি রচনা করেছেন শেঠজী।

ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে পুরানো যুগের পালতোলা জাহাজে যাত্রা শুরু করেছেন। (এই অংশটুকু আমরা চাটগাঁর বিখ্যাত জাহাজ ব্যবসায়ী—দোভাষী সাহেবের সাহায্যে সুটিং করেছিলাম। নাট্যাংশের উদ্যোগপর্ব শুরু হয়েছিল রাঙা-মাটি-ককসবাজার-চাটগাঁর বন্দর থেকে)। আফ্রিকায় সাফারির দল কী অসম্ভব কষ্ট করে দিনের পর দিন মোম্বাসা থেকে কেনিয়া, ইউগান্ডা, সুদান হয়ে কঙ্গোর গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেছেন তাই দেখানো হবে ছবিতে। বিভিন্ন দেশ থেকে কী ভাবে বিভিন্ন বিপদসংকুল এলাকায় নিজেদের রক্ষা করে, সংগ্রহ করছেন-হাতীর দাঁত, পশুর চামড়া—জলহস্তী গন্ডারের চামড়ায় লাঠি, হীরা-জহরৎ, সোনা-রূপা তাও দেখানো হবে ছবিতে। পথিমধ্যে ভারতীয় ধনিক বিখ্যাত আলিভাইকে মাউন্ট কিলি মেনজারোর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে জীবনমৃত অবস্থায় সাহায্য করে বাঁচিয়ে আনছেন ইত্যাদিও দেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। আরো দেখানো হচ্ছে নীলার সুন্দিত্তৎপরতার মুগ্ধ হয়ে রণমলজী কিভাবে এই জংলী মেয়েটির দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে—যার ফলে ঊর্মিলা ও রণমলের মাঝে ঘটে ভুল বোঝা-বুঝি...যার ফায়দা আদায় করতে বনোয়ারিজী হয়ে ওঠেন পুরোপুরী একটি শয়তান। ঊর্মিলাকে তাঁর চাই-ই চাই...এমনকি সারা যাত্রীকে বিপদে ঠেলে দিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন না। তাঁর এই গোপন চক্রান্তের ঘৃণ্য জাল ছিঁড়ে ফেলে তাকে সপ্রকাশ করে তোলে নীলা...নীলা হীরা সংগ্রহে কিভাবে রণমলজীর বিপন্ন প্রাণ রক্ষা করে—শেঠজীর ও ঊর্মিলার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে—এইসব নাটকাংশে দেখানো হচ্ছে। সর্বশেষ নীলার আত্মত্যাগ এবং ঊর্মিলা ও রণমলজীর মিলন—এই নিয়েই খসড়া স্ক্রিপ্ট তৈরী হলো।

অভিনয়াংশে শেঠজীর ভূমিকায়—এস এন ব্যানার্জি (পিটু বসু)—আমার প্রধান সহকারী পুরাতন ভৃত্য ভুলুয়ার (কমেডিয়ান) ভূমিকায় অশ্বিনী মিত্র (আমার দ্বিতীয় সহকারী) ....বনোয়ারীর ভূমিকায় শ্রীত্রিপাঠিজী...রণমলের ভূমিকায়—নারেন্দ্রকার ঊর্মিলার ভূমিকায় ঊর্মিলা—এবং নীলার ভূমিকায় বিদ্যা দেবী অভিনয় করবেন স্থির হলো।

*   *   *

দু'দিনের বিরতির পর—আজ আমাদের নতুন প্রভাত। ...

সকালে উঠেই থিকা নদীর আশপাশ ঘুরে দেখাও শুরু করলাম।—দেখলাম থিকার গভীরতা কম কিন্তু স্রোত অত্যধিক। ...প্রবাহের ওপরাংশ গর্জের সৃষ্টি করেছে... অর্থাৎ পাহাড়ী পথের গলি ধরে থিকা নেমে আসছে। সিঁড়ি ভেঙে।...নীচের দিকে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে নীচের গভীর চত্বরে প্রপাত সৃষ্টি করে।

টেস্টে অভিনেতাদের মেকআপ শুরু হয়ে গেছে—বিশেষ করে পুরাতন ভৃত্য ভুলুয়ার—ভুলুয়ার ভূমিকায় অশ্বিনী মিত্র অভিনয় করছেন আগেই বলেছি। ওকে নিয়েই আজকের ছবির নাটকাংশের মহরৎ শট শুরু হবে। থিকা শহরের বন্ধুর দল—গণ্যমান্য ব্যক্তিরা...মেট্রো গোলডুইমের ক্যামেরাম্যান সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে এই মুহূরতে ...তাই সবাই এসে জড়ো হয়েছেন থিকা নদীর দু'পাশে।

ভুলুয়া মেকআপ নিয়ে বেশভূষা করে পাহাড়ের গলিপথ ধরে ওপরে উঠে গেল। নীচে নদীর পাশ ঘেঁসে একটি বড় পাথরের ওপর ক্যামেরা ফিট্ করা হয়েছে...দু'পাশে লম্বা লম্বা গাছের থেকে লতাগুল্ম নেমে এসেছে...ভুলুয়া সেই লতার গুচ্ছ ধরেই নদী পেরুতে চায়।...

চিৎকার শোনা গেল...'অ্যাকশান' ক্যামেরা ...শুট্...

ভুলুয়া লতার গুচ্ছ ধরে নদীর ওপর দিয়ে ঝুল দিয়ে পার হতে গিয়ে হঠাৎ ছিঁড়ে ছিটকে পড়লো নদীর খরস্রোতের মুখে...মাথার পাগড়ী নিমেষে জলের আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে ছাড়িয়ে যায়... স্রোতের অবাহিকায় গাড়িয়ে চলে ভুলুয়া—নীচে অগাধ খাদ। দু 'পাশের দর্শক আতঁথিরা চেঁচিয়ে ওঠেন—'গেল—গেল'...।

নিমেষের মধ্যে প্রলয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেল...নিঃশ্বাস রোধ করে সবাই অপেক্ষা করছে এই বুঝি ভুলুয়া থিকার নীচের উদ্দাম জলের আবর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম—'কাট্'...সবাই ভয়ে সিটকে রয়েছে হঠাৎ ভুলুয়া খাদের পাশ থেকে উঠে এসে দাঁড়ালো...বললো—ঠিক হয়েছে তো হীরেনদা?...নইলে আবার করতে পারি—আমার এতটুকু লাগেনি...বিশেষ করে জলের নীচে এই বোতের বেতটা থাকায় অশেষ সুবিধা হয়েছে।

ইতিমধ্যে পার্বতোষবাবু ও জগতোপ বলে উঠলো—সাউন্ড ইজ ও-কে, অর্থাৎ শব্দটা অপূর্ব হয়েছে। সুধীর বললো আইমো দুটোও চলেছিল তো?

আমি বলি—হ্যাঁ।

উত্তরে সে বলে—তাহলে ও-কে, নেক্সট শট্।

মুহরতের মিষ্টিমুখ না করিয়ে তো নেক্সট শট হতে পারে না।...মেট্রোর ক্যামেরাম্যান এগিয়ে এসে আমার—সুধীরের আর অশ্বিনীর সঙ্গে করমর্দন করলো... বললো—ওয়াণ্ডারফুল এ্যারেঞ্জমেন্ট। দর্শক-বৃন্দেরা সবাই প্রফুল্লমুখে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

সবার কাছ থেকে একই কথাটুকু শুনে আমি অন্তত ওয়াণ্ডারফুল উৎসাহ পেলাম।

*   *   *

মুহরতের চা মিষ্টির পর...আবার শুরু হলো শুটিং...

চোনিয়া আর থিকার গভীর খাদে যেখানে দুটি স্রোতে প্রপাত সৃষ্টি করে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় পাহাড় গায়ে শেওলা ধরিয়ে তুলছে—সেই দুরন্ত জলধারায় গড়িয়ে পড়লো ভুলুয়া-বেশী তৈরীকরা কাপড়ের ডামি-পুতুল। এটাও দুটি ক্যামেরাতে উঠানো হলো।

দুটি শট তুলে নিয়ে আমরা আপাতত প্যাকআপ করলাম...নৈরবীর জোন্স এন্ড জোন্স স্টুডিওতে ফলাফলের জন্যে সবাই চলি। দু ঘন্টা পরে আবার শুটিং যাতে চালু করা যায় তার ভার দিলাম—পিটুবাবুর ওপর।

নৈরবীর জোন্স এণ্ড জোন্সের ল্যাবরেটারিতে দেড় ঘন্টা অপেক্ষায় বসে আছি—এমন সময় পিটুবাবু শিল্পীদের নিয়ে এখানে এসে হাজির হলেন। মিঃ প্যাটেল বললেন আমি এদের নিয়ে লোকেশনে চলছি... আপনি টেস্ট দেখে আসুন।...আজকের সারা দিনের লোকশন হচ্ছে ভাসমান দ্বীপের অভ্যন্তরের জংগলীপথ। আফ্রিকার আসার পথের এক্সপোজড ফিল্মের রেজাল্ট দেখলাম—তাতে হতাশ হবার কিছু নেই... এবং দু ঘন্টা পরে আজকের যে টেস্ট পেলাম তা মন-মুগ্ধকর উজ্জ্বল নেগেটিভ।

অল্প কিছু আহারাদির পর মধ্যাহ্ন শুটিং আরম্ভ হলো। বড় বড় শাল বনের মাঝে লাল সরু পথগুলি হলো আজকের অভিনয়াংশের দৃশ্যাবলী। সাফারির আসা-যাওয়া—রণমলজীর চোরা বন-গলি-পথ দিয়ে ছুটে যাওয়া-আসা ইত্যাদি শট নিতে নিতে বেজে গেল বেলা ৬-৫০ অথচ অফুরন্ত আলো.... ভারতের মত তিননটে বাজতেই সূর্য ঢলে পড়ে না। সাতটায় প্যাক-আপ করে জোন্স কোম্পানীর হাতে ফিল্ম তুলে দিয়ে থিকায় যখন ফিরে এলাম তখন রাত দশটা বাজে। (চলবে)

ফুটবল কার্নিভাল শুরু হল

ভবতোষ রায়। বয়স এখন আটান্ন। নামকরা একটি লজেন্স উৎপাদন সংস্থায় হেড-ক্যাশিয়ারের কাজ করতেন। সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। মধ্য কলকাতায় নিজের বাড়ী। একমাত্র ছেলে ব্যাংকের কেরাণী। বছর চারেক আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। গত পৌষে ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ এনেছেন। বিপত্নীক ভবতোষ বাবুর নিভৃত নিরিবিলি জীবন। অন্যান্য রিটায়ার্ড বৃদ্ধদের মত রামকৃষ্ণ কথামৃত, জনতা পার্টি-কংগ্রেস, রেডিও আর বৈকালিক ভ্রমণ নিয়ে মেতে থাকেন না ভবতোষবাবু। দুটি মাত্র নেশা তাঁর—শানজর্দা আর ফুটবল। গত তিরিশ বছর ধরে কলকাতার গড়ের মাঠে ফুট-বল দেখে আসছেন ভবতোষবাবু। গত ১৬ মে, যেদিন ১৯৭৭-এর ফুটবল লীগ শুরু হলো, ইস্টবেংগল বনাম হাওড়া ইউনিয়নের খেলা দেখার জন্য লাইন লাগিয়েছিলেন দুপুর দুটো থেকে। মোহনবাগান যেদিন চন্দ্রমেমোরিয়ালের বিরুদ্ধে প্রথম মাঠে নামলো সেদিন লাইনে এসেছিলেন তিনটেয়। দুদিনই টিকিট পেয়েছিলেন। টিকিটের অভাব হয় না ভবতোষবাবুর। ইস্টবেংগল মোহনবাগান কিংবা মহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলা থাকলে সকাল দশটা থেকে সারিবদ্ধ হয়, তাদের অধিকাংশই ভব-তোষবাবুকে খাতির করে। 'দাদুর' জন্য লাইনের দরজা তাই সদাই উন্মুক্ত। ভবতোষবাবু সব দলের খেলা দেখেন। বড় দলের তো বটেই, ছোট দলেরও, কোন বিশেষ দলের সাপোর্টার নন কল-কাতার আদি বাসিন্দা ভবতোষ রায়। মোহনবাগান-চন্দ্রমেমোরিয়ালের খেলার শেষে ইডেনের ক্যান্টিনে বসে কথা হচ্ছিলো ভবতোষবাবুর সঙ্গে। বললেন—'ভালো লাগে, ফুটবল আমার ভালো লাগে, তাই প্রতিদিন মাঠে আসি, এ নেশা বুঝি মদের নেশার থেকেও ভয়ংকর। তাই গত তিরিশ বছরে ফুটবল মাঠে আমার কামাই হাতে গুণে বলা চলে।'

ভবতোষবাবু মাঠে আসছেন গত তিরিশ বছর ধরে। অমুক চন্দ্র অমুক মাঠে আসছেন গত সাত বছর ধরে। এই রকমভাবে কলকাতা মাঠের ফুটবল দর্শকদের কুলজী ঘাঁটলে দেখা যাবে দশ-সতেরো-উনিশ বছর ধরে একটানা ফুটবল দেখছেন অসংখ্য মানুষ। ফুটবল থেকে এঁরা কি পান এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুব গভীরে না গিয়েও বলা চলে যে ফুটবলের তাৎক্ষণিক উত্তেজনার সাগরে ডুব দিয়ে অনাবিল আনন্দের

সন্ধান পাওয়া যায় বলেই ফুটবল এত বেশী ফেভারিট। কলকাতা মাঠে সত্তর মিনিটের এক একটি খেলায় হারিয়ে গিয়ে বেকার ভুলে যায় বেকারত্বের যন্ত্রণা। সংসারী মানুষ ভুলে যায় প্রাত্যাহিক সমস্যার কথা। ব্যবসায়ী ভুলে যায় অর্ডারের অভাবে তার ব্যবসা সংকটের মুখোমুখি। ফুটবল মাঠে—'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।'

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। ফুটবল নিয়ে কলকাতা কল্লোলিনী হয়েছে গত ১৬ মে থেকে। প্রতিদিন বিকেলে ধর্মতলা-এসপ্ল্যানেড, কার্জন-পার্কের সামনে দাঁড়ালেই দেখা যায় সেই চেনা-জানা পুরনো ছবিটি। হাজার মনুষ, নানা বয়সের—নানান পোষাকে ছুটে চলেছেন মাঠের দিকে। এ দৃশ্য দেখলেই বাঙালীর রক্তে দ্রিমি-দ্রিমি সুরে বাজনা বাজে। ফুটবল এসেছে। শুরু হয়েছে ফুটবল কার্নিভাল।

এ লেখা যেদিন লিখছি (বৃহ-স্পতিবার, ২৬ মে) সেদিন পর্যন্ত কল-কাতার ফুটবলের তিন [illegible] মোহন-বাগান, ইস্টবেংগল [illegible] মহামেডান স্পোর্টিং লীগ ফুটবলে তাদের চলার গতি অপ্রতিহত রেখেছে। গত বছরের লীগ বিজয়ী মোহনবাগান দুটি ম্যাচের দুটিতেই জিতেছে। ইস্টবেংগল এবং মহামেডান তিনটি করে ম্যাচ খেলেছে। বলাই বাহুল্য যে সবকটি ম্যাচই তারা জিতে নিয়েছে। অন্যান্য দলগুলির খেলাও সমান তালে চলেছে। মোট তেইশটি দল এবার প্রথম বিভাগে খেলছে। ছোট দলগুলির কিছু কিছু খেলা মোহনবাগান মাঠে রাতে হচ্ছে। পুলিশের অনুমতি পেলে বড় দলের খেলাও রাত্রে হতে পারে।

বড় তিনটি দল এত অল্প ম্যাচ খেলেছে যে এখনই তাদের খেলার সাম-গ্রিক মূল্যায়ন কিছুটা অসুবিধাজনক। তবু 'মর্নিং শোজ দা ডে' এই ইংরাজী

াকাটি যদি মেনে নেওয়া যায় দলগুলির খেলার সামান্য না করা চলতে পারে। মোহন- থেকেই আরম্ভ করি। চন্দ্র- খেলেন বিরুদ্ধে মোহনবাগান গাল দিয়ে লীগ খেলা শুরু করল। সেদিন মাঠে যাঁরা উপস্থিত , আমি মোহনবাগান অনুরাগী- থা বলছি, তাঁরা কিন্তু কেউই মনে ঘরে ফিরতে পারেননি। বাগান এবার প্রায় ভারতের সব নের খেলোয়াড়দের নিয়ে দল স্বভাবতই সমর্থকদের মনের সীমাহীন। কিন্তু প্রথম দিন ভুগলেন আশাভংগের বেদনায়। র্ডে মোহনবাগান দলে খেলেছে াপা, হাবিব, আকবর আর মানস । এ'দের মধ্যে প্রথম তিনজন । মানস প্রান্তিক খেলোয়াড়। প্রদীপ ব্যানার্জি শ্যামকে খেলালেন । কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল লে আসছেন স্ট্রাইকারের জায়- —বামপ্রান্ত কানা। গোল তিযোগিতায় মত্ত শ্যাম, হাবিব, । দ্বিতীয় ম্যাচে, কাস্টমসের মোহনবাগান অবশ্য অনেক পরি- লে খেলেছে। কোচ প্রদীপের মতে , দল থেকে এসেছে, শ্যাম সেটল েটু সময় নেবে।'

না দল থেকে এসেছে গৌতম , সুধীর কর্মকারও। দুজনেই সেরা। বিশেষ করে গৌতম ব্যানার্জি আর গৌতম সরকার— েমাম জুটি মোহনবাগানের মস্ত

বেংগল তিনটি ম্যাচ খেলেছে। রেছে বারোটি। খেয়েছে দুটি। ম্যাচে দুটি গোল হজম করা ইস্টবেংগল রক্ষণভাগের প্রকাশ পাচ্ছে। ইস্টবেংগলের খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্যামল কিছুটা চিন্ময় চ্যাটার্জি ছাড়া অপেক্ষাকৃত নতুন। সম্ভবত বড় বেশীদিন না খেলায় এদের এখনও তৈরি হয়নি। ইস্ট ডিফেন্সে, তিনটি খেলাতেই নেসের অভাব ফুটে উঠেছে। গোলেই হয়েছে এই ডিফেন্স । ডিফেন্সকে সাহায্য করার জন্য ম্যানদের নামতে হচ্ছে। ফর- দল সরবরাহে এ কারণেই ঘাটতি তবে ইস্টবেংগলের দুই উইংগার এবং সুরজিত সেনগুপ্ত তাদের গতি দিয়ে সব ঘাটতি দিচ্ছেন। পাশে তাঁরা পেয়ে- এন আর আগত মিহির বসুকে, বেলের বিমল দাসকে। রণজিত তো আছেনই। মিহির এদের থেষ্ট প্রতিশ্রুতিবান।

অনেক দিন বাদে মহামেডান স্পোর্টিং এবার সত্যি ভালো দল গড়েছে। গোলে তরুণ বসু দুর্গ আগলাচ্ছেন। ইস্টবেংগলের অশোক ব্যানার্জি, যে এবার ফেডারেশন কাপে 'সেরার' মর্যাদা পেয়েছে, তিনটি ম্যাচেই ভালো খেলেছে। মহামেডানের দুর্বলতা তাদের লিংকম্যানে। চন্দন গুপ্ত আর মোহনবাগান থেকে আসা সুকুমার মুখার্জি প্রথমে মহঃ স্পোর্টিং-এর লিংকম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিল। সুকুমার তো একেবারেই খেলতে পারে নি। তৃতীয় ম্যাচে সার্ভিসেস দলের খেলোয়াড় পলরাজ এসেছে লিংকম্যানের জায়গায়। সার্ভিসেসেরই যালসুব্রাহ্মণ্যম এদিন প্রথম নেমেছে রাইট স্ট্রাইকারের জায়গায়। দেখা যাক এরা কেমন খেলে। তিনটি খেলার সব কটিতেই মহামেডান এখন পর্যন্ত জিতেছে। গোল করেছে তারা সাতটি, তাদের গোলে বল এখনও একবারও ঢোকেনি।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

সেরা লিংকম্যান হতে চাই

বছর কয়েকের মধ্যে কলকাতার ফুটবলে বিপ্লব আনতে চায় যে ছেলেটি—তার নাম বিপ্লব দাস। বয়েস—পনের ছুঁতে আর ওর মাত্র তিন মাস বাকী। এবারে এর্নাকুলাম থেকে বাংলার সাব-জুনিয়রদের যে দলটি মীর ইকবাল হোসেন ট্রফি জয়ের আধখানা সম্মান ঘরে নিয়ে এলো, বিপ্লব ছিল তার ক্যাপ্টেন। ওখানে বয়েস ভাঁড়ানোর কচাকচির ঢেউও ওকে টলাতে পারেনি। বাকী আধখানা সম্মানে যারা ভাগ বসিয়েছিল—সেই মনিপুর দলের হাসিমুখ অধিনায়কটির পাশে যখন ও ট্রফিটি নেবার জন্য দাঁড়ায় তখন প্রেস ফটোগ্রাফাররাও পর্যন্ত শাটার টেপার ফাঁকে মুখ টিপে হেসে ফেলেছিলেন। কারণ তার পাশে বিপ্লবকে সত্যিই তখন বাচ্চা মনে হচ্ছিল।

আগামী দশকে যারা চুনী-প্রদীপ-বলরাম-থঙ্গরাজ-ইন্দার সিং হতে যাচ্ছে তাদের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ফুটবল সংস্থার চাঁই-রা ফেডারেশন কাপের সংগেই করে-ছিলেন যাতে বড়দের খেলা দেখে ছোটরা উদ্বুদ্ধ হয়। সেই উদ্দেশ্যটা কতটুকু সফল হয়েছে সে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেওয়া মাত্রই বিপ্লবের মুখে খই ফুটেছিল—'বোম্বেস টাটা স্পোর্টস আর কেরালার প্রিমিয়ার টায়ার্সের মধ্যে খেলাটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। প্রিমিয়ার শেষ কয়েক মিনিটে তিনটে গোল করে খেলা ড্র করেছিল। ওদের খেলা দেখে শিখে আত্মবিশ্বাসটাই আসল, তিন গোলে পেছিয়ে থেকেও ম্যচ ড্র করা যায়।'

'তবে টিম হিসেবে ব্যাংগালোরের আই টি আই ছিল বেস্ট। ওদের প্রত্যেকটা প্লেয়ারই দারুন ইন্টার-চেঞ্জ করেছে, বোঝাপড়াও সুন্দর। বেশীর ভাগ সময়ই গ্রাউণ্ডে খেলেছে ছোট ছোট পাশে। ভেবেছিলাম মোহন-বাগানই ফেডারেশন কাপ নিয়ে আসবে কিন্তু কলকাতায় ফিরে যখন কাগজে দেখলাম ওরা হেরে গেছে তখন মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ফাইনাল অবশ্য আমাদের ভাগ্যে দেখা হয়ে ওঠেনি কারণ ছোটদের টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে যাওয়ায় ফেরত পাঠানো হয়েছিল আমাদের।'

'বিকেলে আমাদের খেলা শেষ হয়ে যাবার পর সাইড লাইনে বসে রাতে বড়দের খেলা রোজ দেখতাম। তবে বেশীর ভাগ সাব জুনিয়র প্লেয়াররা মাঠে থাকত না। সুধীর কর্মকারের খেলার তুলনা নেই। বিশেষ করে ওর ট্যাকলিং। মনজিত সিং-এর পাসিং বেশ ব্রেন খাটানো আর ফিনিশিংও দারুন। ওর সংগে আলাপ হয়েছিল হোটেলে। বলেছিলেন—তোমরা তো ট্রফি জিতবেই। বেংগল প্রথম যেখানে যায় সেখানেই জেতে। আমার খুব গর্ব হচ্ছিল ওর কথা শুনে। লীডারসের হরজিন্দারের খেলাও চোখে পড়েছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সেই সাত নম্বর হাফ ব্যাকটার নাম মনে নেই, কিন্তু রোজ ওর খেলা মন দিয়ে দেখতাম। এখন থেকে বড়দের ভালো জিনিসগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করব।

নিজেদের টুর্নামেন্টের খেলা কেমন হলো জিজ্ঞেস করায় বিপ্লব বলল, 'খেলায় খুব একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, ছিল কোন টিম বয়েস ভাঁড়িয়ে কতোজন বড় ছেলে নামাতে পারে। মনিপুর দলে তো কয়েকজন কুড়ি বছরের বেশী ছেলে খেলেছে নরজনকে বাতিল করে দেওয়া সত্ত্বেও। ওদের বিরুদ্ধে ফাইনালের দিন আমার টিমের সবাইকের তো মুখ আমসি হয়ে গিয়েছিল। সকালে প্রদীপ ব্যানার্জি আমাদের ক্যাম্পে এসে বললেন—তোমরা জার্সিটার সম্মান রেখো, বাঙ্গালী ফুটবলের জন্মদাতা, ফুটবল তোমাদের রক্তে একথা ভুলো না। চুনী গোস্বামীও উৎসাহ দিয়েছিলেন—যা বলার তোমাদের কোচ সুশীল ভট্টাচার্যই বলবেন, মনের জোরে খেলবে, এর উপর কোন জিনিস নেই।'

'মোহনবাগানের সব প্লেয়াররা আমাদের খেলার দিন মাঠে গিয়ে সাহস দিতেন। হাবিব একদিন আমাদের ক্যাম্পেও এসে-ছিলেন যেদিন অন্ধ্রের সংগে খেলা। বলে-ছিলেন—অন্ধ্র আমার দেশ হলেও আমি চাই বাংলা জিতুক, তোমরা জান দিয়ে খেলবে। যেদিন আমরা ট্রফির জয়েন্ট উইনারস হলাম সেদিন রাত্তিরে মোহনবাগান ক্লাব আমাদের নেমতন্ন করে বিরিয়ানি খাইয়েছিল।'

বিপ্লব প্রথমে 'হায়ারে' খেলায় নামত সিঁথির বিশ্বনাথ পার্ক এ্যাথঃ ক্লাবের হয়ে। ওখান থেকেই গত বছর যায় ময়দানে ভেটা-রেন্স ক্লাবের ফুটবলার তৈরীর কারখানাতে। ওর নিজের পজিশন লিংম্যানের, তবে এর্না-

কুলামে বাধ্য হয়ে ওকে খেলতে হয়েছে স্টপার ব্যাকে। 'আমি চাই গৌতম সরকারের মতো স্ট্যামিনা আর সমরেশ চৌধুরীর মতো স্কিল। তাহলে আমাকে কেউ রুখতে পারবে না। ইস্টবেঙ্গল মাঠের গেটে আমার একজন চেনা লোক দাঁড়ায় তাই মাঝে মাঝে খেলা দেখার সুযোগ হয়। রোজ লাইন দিয়ে মাঠে যাওয়া হয়ে ওঠে না। শুনেছি নাকি আই এফ এ থেকে এবার আমরা যারা সাব-জুনিয়রে খেলেছি—তারা একটা করে কমপ্লিমেন্টারী কার্ড পাবো, যা দেখিয়ে সব মাঠে ঢুকতে পারব।'

বিপ্লবের হাইট মাত্র পাঁচ ফুট, সেজন্য ও বিশেষ চিন্তিত। বলল, 'রাম বাহাদুর, সুধীর কর্মকার—এরা অল্প হাইট নিয়েও মাঠে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সত্যি, তবুও এখনকার খেলার যা ধরন তাতে লম্বা হলে সুবিধে বেশি। ফরোয়ার্ডদের ডিসটার্ব করা যায়। অবশ্য আমার এখনও লম্বা হবার যথেষ্ট বয়েস রয়েছে।'

পাইকপাড়ায় গোষ্ঠ পালের বাড়ীর কাছেই বিপ্লবরা থাকে। দমদম কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন থেকে এবারই ওর মধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। কিন্তু দলের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হবার পর ও দোটানায় পড়ে। অভিভাবক ঠাকুরদার কাছে প্রশ্নটা তুলতেই উনি পরীক্ষা শিকেয় তুলে এর্নাকুলামে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। ট্রফি জিতে পঁচিশ দিন পর বাড়ী ফিরে ওর আর আনন্দ করা হয়নি। কারণ ও এর্নাকুলামে থাকার সময়ই হঠাৎ ঠাকুরদা মারা যান।

রূপক সাহা

ক্রিকেটের ভবিষ্যত

ইংল্যাণ্ডের মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব এবং টেস্ট কাউন্টি ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাব্যক্তিদের রাতের সুখের ঘুম ছুটে গেছে। তাঁদের এই অনিদ্রা এবং দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন অস্ট্রেলয়ার এক টেলিভিশন সংস্থার মালিক মিঃ কেরী প্যাকার। সংবাদে প্রকাশ মিঃ প্যাকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের বর্তমান আর্থিক অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে সুপার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলার আয়োজন করেছেন। তাঁর এই প্রস্তাবিত সুপার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলার আসর বসবে অস্ট্রেলিয়াতে আগামী নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত। এই সুপার টেস্ট সিরিজ খেলা হবে অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশ দলের। মিঃ প্যাকারের এই সুপার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে খেলতে বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ৩৫ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় তিন বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এই ৩৫ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় চুক্তিমত ২৫ লক্ষ ডলার পারিশ্রমিক হিসাবে প্যাকারের কাছ থেকে পাবেন। প্যাকার বলেছেন, চুক্তিপত্রে সই করতে কোন খেলোয়াড়ই কোন রকম ইতঃস্তত করেন নি। কারণ, টাকাকড়ি নিয়ে খেলোয়াড়দের মধ্যে অসন্তোষের আগুন দীর্ঘকাল চাপা ছিল।

এই রকম একটা লাভজনক প্রস্তাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খেলোয়াড়রা তা সানন্দে গ্রহণ করেছেন। অপর দিকে কিন্তু ক্রিকেট ক্রীড়রত দেশগুলির ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কর্তাদের মাথা ঘুরে গেছে। কি প্যাকারের এত বড় আস্পর্ধা! তাঁরা থাকতে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের রাজা-উজির করার অধিকার আর কারও নেই। তাঁদের কথাবার্তায় এবং চালচলনে এমনই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। সব থেকে বেশী আঁতে ঘা লেগেছে ইংল্যাণ্ডের এম সি সি এবং টেস্ট ও কাউন্টি ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের। তাঁদের রোষানলে পড়ে টনি গ্রেগ ইংল্যাণ্ডে টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়কের পদ হারাতে বাধ্য হয়েছেন। সারা ইংল্যাণ্ডের পত্র-পত্রিকায় ক্রিকেট খেলার ভাষ্যকাররা প্যাকারের এই প্রস্তাবিত টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। টনি গ্রেগ তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। গ্রেগ একমাত্র সহানুভূতি পেয়েছেন লেবার এম পি মার্কাস লিপটনের কাছ থেকে। গ্রেগকে অধিনায়কের আসন থেকে পদচ্যুত করায় বৃটিশ পার্লামেন্টের সভ্য লিপটন বলেছেন ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট কাউন্সিল গ্রেগ সম্পর্কে যে প্রতিশোধ নিয়েছে তা খুবই নীচু মনের পরিচয়।

অস্ট্রেলিয়াতে প্যাকার প্রস্তাবিত সুপার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডের দৈনিক পত্রিকায় ক্রিকেট খেলার বিশিষ্ট সমীক্ষক এবং প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়রা কোমর বেঁধে আক্রমণ চালিয়েছেন। তাঁরা ব্যঙ্গ করে প্যাকার প্রস্তাবিত সুপার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের নাম দিয়েছেন 'ক্রিকেট সার্কাস।' তাঁদের মূল বক্তব্য হল প্যাকার প্রস্তাবিত সুপার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ চালু হলে ক্রিকেট খেলার সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং জাত-ধর্ম গোল্লায় যাবে। সুতরাং আর দেরী না করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্সের জরুরী সভা ডেকে প্যাকার প্রস্তাবিত সুপার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত 'দি টাইমস' দৈনিক পত্রিকার মে ১১ তারিখে একটি বিদ্রূপাত্মক শোক সংবাদ বিজ্ঞাপন হিসাবে ছাপা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ১৯৭৭ সালের ৯ মে তারিখে হোভে (ইংল্যাণ্ড) ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের মৃত্যু ঘটেছে। তার চিতাভস্ম অস্ট্রেলিয়াতে নিয়ে গিয়ে স্টুডিও টি সি এন ৯-এর চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হবে। (এই টি সি এন-৯ টেলিভিশনের মালিক হলের মিঃ কেরী প্যাকার—প্রস্তাবিত সুপার টেস্ট ক্রিকেটের উদ্যোক্তা।

বর্তমানে জাতীয় দলে টেস্ট ক্রিকেট খেলার সূত্রে টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়রা যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পান তার থেকে অনেক বেশী অর্থ উপার্জন করাবেন প্যাকার প্রস্তাবিত টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে যোগদানকারী খেলোয়াড়রা। বর্তমানে আন্তর্জাতিক টেনিস এবং গলফ খেলার আসর থেকে খেলোয়াড়রা যে বিপুল পরিমা[ণ] উপার্জন করেন সে তুলনায় আন্[তর্জাতিক] খ্যাতিমান ক্রিকেট খেলোয়াড়দের অবস্থান মান নিদারুণ শোচনীয়। খেলোয়াড়দের এই শোচনীয় আর্থি[ক] সম্পর্কে সমালোচকরা কিন্তু সমবেদনাশূন্য আচরণের পরিচয় দি[য়েছেন।] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোর্ডের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেফ মেয়ার কিন্তু ক্রিকেট খেলোয়াড়দে[র] খুবই সহানুভূতিশীল।

আগামী নভেম্বর থেকে ফেব্রু[য়ারী] এই চার মাসে অস্ট্রেলিয়াতে যখন [অস্ট্রে]লিয়া বনাম অবশিষ্ট বিশ্ব দলের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের আসর ব[সবে সেই] সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কন[ফারেন্স] কর্তৃক অনুমোদিত এই সব ক্রিকে[ট] আসরও বসবে—অস্ট্রেলিয়াতে ভারত অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে অ[স্ট্রেলিয়া] বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পাকিস্তানে [ইংল্যাণ্ড] বনাম পাকিস্তান এবং নিউ[জিল্যাণ্ডে] ইংল্যাণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ড। আগাম[ী] ১৪ তারিখে ইংল্যাণ্ডের লর্ডসে [ইন্টার]ন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্সে[র] সভায় কেরী প্যাকারের প্রস্তাবিত সুপার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ [সম্পর্কে] আলোচনা হবে।

প্যাকার প্রস্তাবিত সুপার [টেস্ট] ক্রিকেট সিরিজে যে ৩৫ জন [ক্রিকেট] খেলোয়াড় চুক্তিপত্রে সই করেছেন [তাঁদের] মধ্যে আছেন ইংল্যাণ্ডের ৪ জন, [ওয়েস্ট] ইণ্ডিজের ৪ জন, পাকিস্তানের ৪ জন[, দক্ষিণ] আফ্রিকার ৫ জন এবং অস্ট্রেলিয়া[র ১৮] জন। অস্ট্রেলিয়ার ১৮ জন খেলো[য়াড়ের] মধ্যে ১৩ জন খেলোয়াড় বর্তমানে ইং[ল্যাণ্ড] সফরে আছেন।

প্যাকার প্রস্তাবিত সুপার টেস্ট [ক্রিকেট] সিরিজে চুক্তিবদ্ধ ৩৫ জন [ক্রিকেট] খেলোয়াড় :

অবশিষ্ট বিশ্বদল

ইংল্যাণ্ড (৪) : [টনি] গ্রেগ (অধিনা[য়ক]), অ্যালান নট, জন স্নো এবং [ডেরেক] আণ্ডারউড।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (৪) : ক্লাইভ লয়েড, রিচার্ডস, মাইকেল হোল্ডিং অ্যাণ্ড রবার্টস।

পাকিস্তান (৪) : আসিফ ইকবাল, খান, ইমরান খান এবং ম[ুস্তাক] মহম্মদ।

দক্ষিণ আফ্রিকা (৫) : বেরী রিচা[র্ডস], মাইক প্রোকটর, এডি বার্লো, গ[্রেম] পোলক এবং ডেনিস হবসন।

অস্ট্রেলিয়া দল

ইয়ান চ্যাপেল (অধিনায়ক), [ইয়ান] রেডপাথ, রস এডওয়ার্ডস, গ্রেগ চ্যা[পেল], ডেনিস লিলি, জেফ টমসন, ইয়ান [ডেভ]িক ম্যাককস্কার, ডেভিড হুকস, [ডাগ] ওয়াল্টার্স, রড মার্শ, রিচি রবিনসন, [কেরী] ও-কেফী, গ্যারী গিলমোর, ম্যাকস ওয়া[কার,] মিক ম্যালোন, লেন পাসকো এবং [ব্রুস] ব্যাইট।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে রিচার্ড অ্যাটেনবোরো
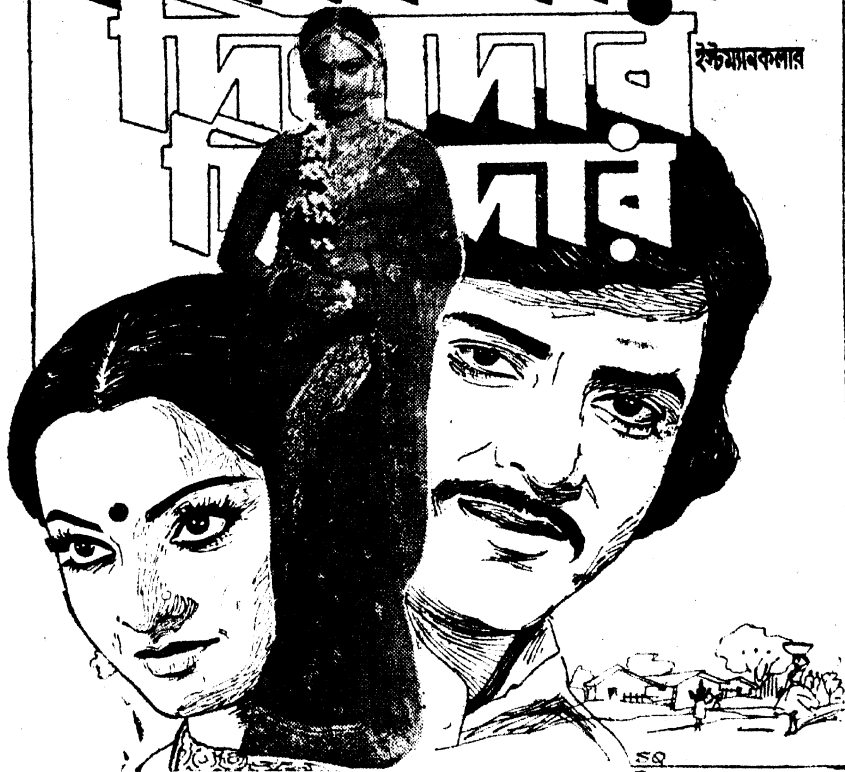
গ্র্যান্ড হোটেলে জেনারেল আউটরাম ঘুমিয়ে আছেন

হ্যাঁ, সত্যিই। এখন, এই রাত এগারটায় নিশ্চয়ই গ্র্যান্ডের ২৮০ নম্বর ঘরে জেনারেল আউটরাম গত তিনদিনের পরিশ্রমটা ঝেড়ে ফেলার জন্য ঘুমিয়ে পড়েছেন। তুফানী ব্যস্ততায় কেটেছে তাঁর কটা দিন। ঘন্টা চারেক আগে ব্যাংকয়েট হলে ঢুকেই তাই তিনি বলেছিলেন—'লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক-লস এঞ্জেলস হয়ে আমি কলকাতায় এলাম মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে। কাল সকালেই আবার শুটিং। কাইন্ডলি এক ঘন্টার বেশী সময় দিতে পারছি না আপনাদের: ভেরি সরি।'

মাত্র ঐ এক ঘন্টাতেই তিনি মন জয় করে নিয়েছেন উপস্থিত সাংবাদিকদের। কাঁচাপাকা চাপ চাপ দাড়ি আর সাদা পাঞ্জাবী প্যান্টে ব্যাংকয়েটে হাজির হতেই পাশে বসা সতীর্থ বলে উঠলেন —'ব্যানিগানে'র সি-আই-ডি অফিসার না?'

বললাম—ধরেছেন ঠিকই। উনি তো রিচার্ড অ্যাটেনবোরো। 'সতরঞ্জ কে খিলাড়ি'তে জেনারেল আউটরাম সাজতে এসেছেন। বিলিতি সময়ানুবর্তিতাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েই তিনি গ্র্যান্ডের ব্যাংকয়েট হলে কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় এসে হাজির। নিমন্ত্রিত সাংবাদিকদের চেয়ারে অনেকগুলিই তখনও শূন্য।

অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুরু সে কারণে অবশ্য বিলম্বিত হয়নি। বেটার লেট দ্যান নেভার আপ্ত বাক্যটি আউড়ে প্রযোজক সুরেশ জিন্দলও ভারতীয় চরিত্র বজায় রাখেননি সৌভাগ্য।

অপর্ণা সেন অতিথিকে মাল্যদান করার পরই আরম্ভ হোল আসল পর্ব। সাংবাদিকদের ছোট্ট একটি প্রশ্নকে লুফে নিয়ে স্যার রিচার্ড কি দারুণ মমতায় আর আগ্রহে লম্বা লম্বা উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। শোনাচ্ছিলেন গান্ধীজীর ওপর তাঁর ছবি করার ইচ্ছের কথা, অভিনয়ে নিজেকে প্রস্তুত করার নানান ভংগীর গল্প, নিজের ছবি পরিচালনা, অভিনয়ের প্রতি আত্মপ্রেম ও আরও কত কি। মশগুল হয়ে শোনার মত।

জেনারেল আউটরামের চরিত্রে অভিনয় করার কথা স্থির হতেই সত্যজিৎ রায়ের সংগে কয়েক ঘন্টা আলোচনা করেছেন তিনি চরিত্রটি নিয়ে। তারপরই দৌড়ে গেছেন লণ্ডনের ন্যাশনাল পোর্টেট গ্যালারীতে, ন্যাশনাল বায়োগ্রাফী সেন্টারে। উটরামের নানা বয়সের ছবিকে তিনি স্টাডি করেছেন, জেনেছেন তাঁর বাল্য ও কিশোর ইতিহাস। চরিত্রটির কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি আঁতিপাতি করে খুঁজে বার করেছেন যেমন তাঁর চুরুট খাওয়া কিংবা ঠোঁটের তলার ছাগল দাড়িটি নিয়ে নাড়াচাড়া করা বা ধীরে-সুস্থে কথা বলার ভংগী।

মনেপ্রাণে খাঁটি জেনারেল আউটরাম হয়েই হাজির হয়েছেন স্যার রিচার্ড কলকাতায়। কেটে-ছেঁটে সাইজ করে নেবার দায়িত্ব এখন সত্যজিৎ রায়ের। বছর তিনেক তিনি অবশ্য ক্যামেরার সামনে আসেননি, পেছনে দাঁড়িয়ে অন্য শিল্পীদের পরিচালনা করেছেন। সম্প্রতি যে তারকাবহুল ছবিটি তিনি শেষ করেছেন সেটি হচ্ছে 'এ ব্রিজ টু ফার।' এ ছবিতে তিনি কত নামী-দামী শিল্পীদের পরিচালনা করেছেন শুনুন—ডার্ক বোগার্ড, মাইকেল কেইন, জেমস কান, জীন হেকম্যান, লিভ উলম্যান, ম্যাকসমিলিয়ন সেল, অ্যান্থনি হপকিনস, সিন কনোরি, রায়ান ও'নীল, রবার্ট রেডফোর্ড ও লরেন্স অলিভিয়ের।

এহেন পরিচালক এখন সত্যজিৎ রায়ের একটি ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার জন্য সাত-সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছেন এই কলকাতায়। স্বীকার করলেন স্যার

'সত্যজিৎ রায়ের ছবি বলেই আমি হয়েছি, নচেৎ হতুম কিনা না।'

পরিচালক-অভিনেতা স্যার রিচার্ড নবোরো এখন শুধু অভিনেতা। রীর সেটে তাঁকে জেনারেল রাম সেজে সত্যজিতের আদেশ-াধ তামিল করতে হবে। কাল ই শুটিং শুরু। নিজের পরিচালন তত্ত্বটিকে সরিয়ে রেখে শুধু য় ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি হাজির। মাঝে মধ্যে প্রথম সত্তাটি উঁকি-মারলেও তাঁকে কি করে পোষ ত হয় তা তিনি জানেন। তাইতো বললেন—'আই প্রেফার টু ডাই-বাট লাভ টু অ্যাকট্।'

নির্মল ধর

কা পেলেও
াল ছবি
া না

া। সিনেমার দুনিয়ায় নাকি ল্যাকআউট চলছে? জানতুম না। মনোযোগ দিয়ে দেখা হয় না বাংলা ম. দৈবাৎ হিন্দি, আর ইংরেজি ছবি দেখাটা অভ্যেস। বন্ধুদের পাল্লায় ফার্টনানি হলে ঢুকে পড়েছিলাম (১৩-৫-৭৭) বিকেলে। কলকাতা ক্লাবের সেমিনার, বিষয়: ক্রাই-ইন বেঙ্গলি ফিল্ম। ফার্টনানি হলের র আছেই সারদুয়ারি। সিনে ক্যাবের সেমিনার ছেড়ে সেখানে চলে গিয়ে পার্সোনাল সেমিনার করার ইচ্ছে তীব্র হচ্ছিল প্রথম দিকে, সিনে দেওয়া চা খেতে খেতে। পরে খারাপ হয়ে গেল। এমন অনেক জেনে ফেললুম যা আগে জানতুম । পথের পাঁচালী সরকারের কাছ থেকে যা টাকাপয়সা পেয়েছিল তা নাকি ওয়া হয়েছিল রোড ডেভেলপ-মেন্ট ফান্ড থেকে। পশ্চিমবঙ্গে ৬৭২টা সিনেমা হলের মাত্র ১৭টায় রেগুলার লো বই চলে। চুয়াত্তর সালে অনেক তিশ্রুতি দিয়েও কিছুই করেননি সর-র শুধু কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া ড়া। পুরস্কারে তো ইণ্ডাস্ট্রির াকাল ঘুচবে না। বেশ তো, সমস্যা-গুলো কি রকম? বাংলা ছবির বাজার নই, ভালো বাংলা ছবি বাজারে নেই, ছবি তৈরির পর সময়ে রিলিজ হয় না, প্রযোজকদের দরজে বেড়াতে হয় প্রদর্শক-দের দোরে দোরে, হাতে কালো টাকার বাণ্ডিল নিয়ে; ভালো ছবি তৈরি

করার মত উন্নত স্টুডিও নেই, কালার ল্যাবোরেটরি তো নেই-ই। স্টার সিস্টেম। প্রযোজকদের লোভ। ব্যবসা। এমন অনেক কারণে মার খাচ্ছে বাংলা সিনেমা। প্রতিকার কী? শমিতা বিশ্বাস বললেন, এমন ছবি করতে হবে যাতে মাটির গন্ধ আছে। তাহলেই লোকে দেখবে। বিজয় বসু বললেন, অবস্থাটা জটিল। টেকনিশিয়ান পারিজাত বসু বললেন, টালিগঞ্জে যদি অনেক ছবি তৈরির ব্যবস্থা করা যায়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ছবি যদি টালিগঞ্জে তৈরি হয় তাহলে ইন্ডাস্ট্রির হাতে টাকা আসবে, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বড় হবে, আর বেশি ছবি করতে পারলেই, ভালো ছবিও বেশি হবে, তিন হাজার টেকনিশিয়ান রেগুলার কাজ পাবে, লোকে হিন্দির বদলে বাংলা ছবি দেখবে—খুব খারাপ ছবিগুলো গ্রামে দেখানো হবে, কি আছে। সরকারী সাহায্য ছাড়া বেশি ছবি করা যাবে না। রঙীন ছবি তৈরির স্টুডিও করা যাবে না। প্রধান অতিথি শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সবশেষে সাম আপ করে বললেন—বেশি ছবি করতে দিলেই ভালো ছবি বেরুবে এটা খুব বাজে কথা। আর খারাপ ছবিগুলো গ্রামে দেখাবেন? তারা দেখবে না। তাদের যাত্রা আছে, যাত্রার রিহার্সাল আছে, আরো অন্য এনটারটেনমেন্ট তারা তৈরি করে নেবে। আর সরকারি সাহায্য নিয়ে একমাত্র সোসালিস্ট স্টেট ছাড়া কোনো দেশে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বাঁচেনি। আমেরিকায় সরকারী সাহায্য ছাড়াই ভালো ছবি হয়। শুধু পয়সা আছে বলেই নয়। আগে, হিন্দির পাশাপাশি বাংলা সিনেমার বাজার ছিল, পূর্ববঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, বিহারে বাংলা সিনেমা চলত। এখন চলে না। বাংলার বাইরে এখন শুধু রবিবারে কোনো কোনো অঞ্চলে বাংলা বই দেখানো হয়। কমপালসারি স্ক্রীনিং, সেনসর ডেট-ওয়াইজ রিলিজ, হাউস তৈরি, সংগৃহীত ট্যাক্স থেকে পরি-চালকদের সাবসিডি দেওয়া, এসব করেও বাংলা সিনেমার বাজার বাড়ানো যাবে না, দর্শক তৈরি করা যাবে না যদি না সত্যিকার ভালো বাংলা ছবি তৈরি করা হয়। এ ব্যাপারে ফিল্ম সোসাইটি লড়ে যাবে।

তরুণ তথ্যচিত্র নির্মাতা গৌতম ঘোষ বললেন, আমাদের দেশে বোকা বোকা লোকদের দিয়ে বোকা বোকা মার্কা ডকুমেন্টারি করা হয়। কাশ্মীরের শালকরদের নিয়ে, বা কৃষ্ণনগরের পুতুল যারা তৈরি করে, তাদের জীবন-যাপন নিয়ে কেন ডকুমেন্টারী হয় না? বললেন, প্যারালেল অর্গানাইজেশন করে পর্দা টাঙিয়ে গ্রামে গিয়ে ভালো ছবি দেখানো যেতে পারে। ভালো ছবি মানে অবশ্যই মিনিংফুল সিনেমা।

—সোমক দাস

কানাকানি

'সতরঞ্জ কি খিলাড়ি'র প্রধান চরিত্র-গুলির শিল্পীদের নামগুলো একবার দেখুন। সঞ্জীবকুমার, শাবানা আজমী, আমজাদ খান, সাঈদ জাফরী, ফরিদা জালাল, ডেভিড, আগা, লীলা মিশ্র, ভীষ্মা, নানা পালশিকর ও ভিক্টর ব্যানার্জি। সম্ভবতঃ ছবির সংলাপ উর্দুঘেঁষা হিন্দী বলেই উর্দু-ভাষী শিল্পীর এই প্রাধান্য। একমাত্র ব্যতিক্রম শেষ নামটি—ভিক্টর ব্যানার্জি।
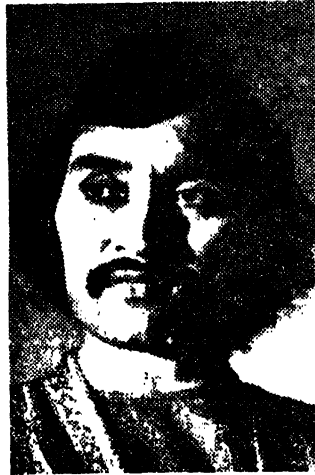
আমজাদ খানের অমাত্যের ভূমিকায় তিনি কাজ করছেন। ইংরেজী নাটকের মানুষ ভিক্টর ব্যানার্জি উর্দু বলছেন চমৎকার। কানাকানিতে শোনা গিয়েছিল প্রোডাকশনের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির নাকি আপত্তি ছিল ওঁর সম্পর্কে। কিন্তু চলচ্চিত্র জগতের দীর্ঘতম ব্যক্তিত্বের সামনে কোন আপত্তিই শেষ অব্দি টেঁকেনি। যথাবিহিত স্ক্রীন টেস্ট ইত্যাদির চৌকাঠ পেরিয়ে এখন ক্যামেরার সামনে তিনি।

ইছাপুর টিটাগড়ের কাছে ইছামতী নদীতে শুটিং চলছিল একটি ছবির। কলকাতার নামী-দামী দুই নায়িকা অংশ নিচ্ছিলেন। শুটিং শেষ হবার পর ফেরার পালা। নৌকোবেয়ে শিল্পীরা সবাই আসছেন। পাড়ের কাছাকাছি এসে দেখা গেল কয়েক হাজার উৎসুক গুণমুগ্ধ গভীর ঔৎসুক্যে দাঁড়িয়ে। চিৎকার, হৈ চৈ, কটুকাটব্য ছোঁড়ার বিরাম নেই। অবস্থা দেখে পুলিশ কর্তৃপক্ষ নাকি শিল্পীদের নৌকোটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পাড়ে না এসে মাঝ নদীতে চলে যেতে।

কিন্তু সেখানেও বিপদ। হঠাৎ নাকি কিছু অতি উৎসাহী ফ্যান আরেকটি নৌকো নিয়ে মাঝ নদীতে হাজির এবং তাদের নির্দেশ মত নৌকার মুখ ঘোরাতে বলা হয়। রাজী না হওয়ায় চলে আক্রমণ। সময়মত পুলিশের আরেকটি নৌকো হাজির না হলে শিল্পীদের দশা কি হতো নাকি বলা যায় না। সসম্মানে তাঁরা ফিরতে পেরেছেন এটাই নাকি অনেক।

শিল্পীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রযোজকরা এত উদাসীন কেন? সাম্প্রতিক কেয়া চক্রবর্তীর ঘটনা থেকেও কি শিক্ষালাভ হয়নি?

* * *

টালিগঞ্জের এক নায়িকার খেদোক্তি—প্রেসের সব লোকের সংগেই তো আমার ভালো পরিচয় আছে। দু একজন এমন কি এই দু-একজনেরই ওপরই তাঁর রাগটা বেশী। আমার বাড়িতে এসে আতিথ্য গ্রহণও করেছেন। কিন্তু লেখার বেলায় সবাই আমার ব্যাপারে এত খড়গহস্ত কেন বুঝতে পারি না। সেই নায়িকা এখন নাকি ভাবছেন আর ভাব রাখবেন না সাংবাদিকদের সংগে। কি লাভ?

ছবিপদ দর্শক

বিদেশী ছবি

সম্প্রতি কলকাতায় যে বুলগেরিয়ার সাম্প্রতিক ছবির উৎসব (একটি জাপানী ও একটি হাঙ্গেরীয় ছবিসহ) হয়ে গেল সিনে সেন্ট্রালের উদ্যোগে, তার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। অনুষ্ঠানে নয়াদিল্লীস্থ বুলগেরিয়ান পিপলস রিপাবলিকের ফার্স্ট সেক্রেটারী প্রধান অতিথি এবং বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা নিউ থিয়েটার্সের বীরেন্দ্রনাথ সরকার সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকেন।

উদ্বোধনের দিন 'বার্ডস ফ্লাইং টু আস' ছবিটি দেখানো হয়। রঙীন এই ছবিটি অনেকটা ডকুমেন্টারী ধরণের হলেও এর বিষয়বস্তু অভিনব। সমস্ত ছবিটিই পাখিদের নিয়ে। বিভিন্ন ঋতুতে অন্য দেশ থেকে (ভারতবর্ষ থেকেও) যে সব বিভিন্ন জাতের পাখি বুলগেরিয়ায় যায়, বিশেষ করে জলা পাখি, তাদের নিয়ে ছবি তৈরী। নানা জাতের পাখি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। ছবিটির পরিচালক জাহারি ঝানদভ এবং ক্যামেরাম্যান ইভান বলেভ।

প্রণয়পাশা ছবিতে সৌমিত্র-সুচিত্রা

উৎসবের অন্য চারটি ছবির নাম ন্ড অব সং', 'উইথ চিলড্রেন সোর ক্যাসল অব স্যান্ড স্কাইলাক'।

'উইথ চিলড্রেন এ্যাট সীসোর'ও শিশু চিত্র। পরিচালনায় মিকিনি সমুদ্র তীরে কিছু বেড়াতে এবং কিছু স্থানীয় ছেলেদের কৌতূহল, বিস্ময়—সব র বড়ীন ছবিটি দেখতে ভালই ছবিটিতে একটি সততার শিক্ষা করা যায়। তবে ছবির কিছু কিছু কি যেন ছোটদের জন্য নয়।

'রেন্ড অব সং' মোটা দাগের প্রধান ছবি। ঠিক মন ভরে না। অনেকটা আমাদের দেশের মজনু' ইত্যাদি ছবির মত। লীও চলচ্চিত্রের প্রথম দিককার যাতে আবেগই বেশী স্থান ছ। আর নায়ককেও রোমান্টিক কষ্ট হয়েছে। এ ঠিক উৎসবে নার ছবি নয়। এতে বলার কথাও নয়। পরিচালক মিলেন নিকলভ। 'ক্যাসল অব স্যান্ড' সেদিক থেকে ভাল ছবি। সাধারণ গল্প এবং তের ছবি হলেও পাহাড় পরিবেশে ভালই লাগে। তবে কোন না নেই। পালক বাপকে খুন করা বর গল্প। এটি জাপানী ছবি।

'স্কাইলাক' সামাজিক ছবি। গল্পে যে সব জটিলতা, সামাজিকতা ও মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করা হয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবনের আপাত মিল না থাকলেও মূলগত একটা মিল লক্ষ্য করা যায়। ছবিটির পরিচালক লাজলো রেনোভি। ছবিটি হাঙ্গেরীর।

সব মিলে এবারের উৎসবের ছবিগুলি আমাদের মন না ভরালেও বিদেশী ছবি দেখার, (বিশেষ করে উৎসব ছাড়া যে সব দেশের ছবি এখানে আসেই না) লাভটুকুই কি কম? সিনে সেন্ট্রাল আয়োজিত হাঙ্গেরীয়ান পিপলস রিপাবলিক দিবস উদযাপন ও সেই উপলক্ষে 'স্কাইলাক' ছবি প্রদর্শন উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন যুগান্তর সম্পাদক শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ।

শা. র. চ

নাটকের নাম অভিনয় দর্পণ

দক্ষিণ কলকাতার প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা রাজাসাজার পুরস্কার প্রাপ্ত প্রযোজনা 'অভিনয় দর্পণ' মঞ্চস্থ হল ১৮ এপ্রিল, শিয়ালদার নেতাজী মঞ্চে।

এই নাট্যগোষ্ঠীর বারো বছর বয়েস হতে চলল। অর্থাৎ কৈশোর প্রায় পেরিয়ে এল। একটা অ্যামেচার নাটকের দলের ক্ষেত্রে বারো বছর বয়েস রীতিমত যৌবন বলা যায়। 'রাজাসাজা'র যৌবনের এই প্রযোজনা কিন্তু খুবই হতাশাজনক। নাটকটি দর্শন এবং প্রয়োগে পরিকল্পনায় আধুনিক নাট্যকলাকৌশলের উল্লেখ করার মতো কোন চিহ্ন পরিচালকের কোন কৃতিত্ব চোখে পড়েনি।

নাটকের প্রথম ভাগে দেখা যায়, মঞ্চের বাইরে একটা নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে। রাজাসাজার এই প্রযোজনা দেখার পরও মনে হল একটা নাটকের রিহার্সাল মাত্র দেখলাম। নাটকের কুশীলবেরা কেউই না সংলাপে না চালচলনে মোটেই স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি— শুধুতির স্বাক্ষর আছে।

যেমন ত্রুটিপূর্ণ আলোর প্রয়োগ, তেমনি ত্রুটিপূর্ণ রূপসজ্জা। মঞ্চ ও সঙ্গীত স্বাভাবিক নয়। খারাপ লাগে এই প্রযোজনার কিছুই প্রশংসা করতে পারা যায় না বলে। দীর্ঘ বারো বছর একটা নাট্যগোষ্ঠী টিকে আছে এটা অবশ্যই প্রশংসার দাবী করে। রাজাসাজা তার এই প্রযোজনা অভিনয় দর্পণ-এর দর্পণে নিজেদের দুর্বলতা, দোষ-ত্রুটিগুলো দেখে নিয়ে ভবিষ্যতে একটা ভালো প্রযোজনা নাট্যরসিকদের পরিবেশন করুণ বর্তমানে এইটুকু আমাদের বক্তব্য।

চণ্ডী মণ্ডল

বিচিত্রা

বেগার রিসার্চ ব্যুরো

সামান্য সূত্র নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে গণেশ এভিন্যু-এ সি এস টি সির হেড অফিসে যাই। ঢুকে, সামনে পেয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি জানান, 'ও, শ্যামবাবু? দাড়ি আছে? উনি এখন হাওড়া স্টেশনের ডিপোতে থাকেন। বিকেলে গেলেই পেয়ে যাবেন। যাকে বলবেন, দেখিয়ে দেবে।'

এইভাবে সত্যিসত্যিই পেয়ে যাই শ্রীশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে। হাওড়ার সালকেতে যখন অরবিন্দ নার্সিং হোমে গেলাম, উনি একজন বৃদ্ধ ভিখিরীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। উচ্চতায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির মতো। মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ। খুবই সাদাসিধে পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে তিনি বসেছিলেন। কথায় কথায় বলেন, 'আমি তো শ্রমিক।'

কেবলমাত্র ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে আত্মনিবেদিত এই মানুষটি দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা, হাওড়া ও তার আশপাশ অঞ্চলের এক বিরাট সংখ্যক ভিখারীর সঙ্গে মিশেছেন; তাঁদের দুঃখের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে ভিখারী হওয়ার কারণটিও শুনেছেন। প্রয়োজন হলে রেকর্ড করেও রেখেছেন। এবং এঁদের বাস্তব চরিত্র নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন।

১৯৭০ সালে তাঁরই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বেগার রিসার্চ ব্যুরো।' তারও আগের কথা, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাঃ সুভাষ ভদ্রর সাহায্যে ১৯৬৫ সালে গড়েছেন 'অরবিন্দ নার্সিং হোম।' তিনি এখন লণ্ডনে। অন্য ডাক্তারের সাহায্যে শ্যামবাবু এখন এই নার্সিং হোমে গরীব ও ভিখারীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের উনি বারবার বলে দেন, 'ডাঃ সুভাষ ভদ্রের কথা যেন অবশ্যই থাকে। ও না থাকলে আমি এসব কিছুই করতে পারতাম না।'

দেশ থেকে, বড়ো করে বললে, পৃথিবী থেকে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করাই শ্যামবাবুর এখন প্রধান কাজ। মানুষ যেন ভিখারী না হয়, একজন মানুষ যেন আর একজন মানুষের কাছে হাত না পাতে—এই তাঁর লক্ষ্য।

এ বিষয়ে আরো কিছু জানার জন্য আমি তাঁকে অসংখ্য প্রশ্ন করি। তার থেকে নির্বাচিত কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর নিচে দেওয়া হল।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ভিখারীর সাক্ষাৎকারের
সঙ্গে শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি: আচ্ছা শ্যামবাবু, এই 'বেগার রিসার্চ ব্যুরো' বা ভিখারী নিয়ে গবেষণার ব্যাপারটা আপনার মাথায় এলো কী করে?

শ্যামবাবু: বললাম না? ঐ যে, মাথায় ঢুকলো, আমিও যে কোনোদিন ভিখারী হয়ে যেতে পারি। ঐ ভয় মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো। সেইখান থেকেই এর জন্ম। ভেবে দেখুন আপনিও যে কোনোদিন ভিখারী হয়ে যেতে পারেন।

আমি: এ পর্যন্ত আপনি কতটা কি করতে পেরেছেন?

শ্যামবাবু: কতটা কি করেছি, সেটা বড় কথা নয়। চেষ্টা করে যাচ্ছি। এই তো, ৩২৭৪ জন ভিখিরীর সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের জীবন-কাহিনী নিয়েছি। ছবিও আছে, দেখাচ্ছি। আর তাছাড়া ২৫ জনের মতো ভিখারীর কাজের ব্যবস্থা করেছি। অনেকের সাহায্য নিয়ে ৭৫টি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। এরা এখন আর কেউ ভিক্ষে করে না। কিন্তু এতে তো হবে না। সে ... পরিকল্পনা আমি ... পশ্চিমবঙ্গের কথা, এখানে ... ১৬ কোটি ..., না, না, ... দিতে হবে না, নিজেই ... আমার পরিকল্পনা মতো, ... পশ্চিমবঙ্গে আর ভিখিরী ... এইভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের ... যেতে পারে। এটা হবে বিভিন্ন ... সংস্থানের দ্বারা। মানুষ আজ ... চরম উন্নতি নিয়ে হৈ-চৈ করা ... পৃথিবীতে ভিখারী বাড়ছে। এটা ... সইতে পারি না। এর বিরু... বলবো, আমার বিপ্লব। সশস্ত্র ... আমার এতোটুকু বিশ্বাস নেই। রাজনীতি মানেই তো হিংসার ... আমি ওদিকে যেতে চাইছি না। ... কতো রকমের ভিখারী ... স্বাধীনতা সংগ্রামী, নকসাল, ... কৃষক নানারকমের ভিখারী ... বিচিত্র ব্যাপার। বাড়ি থেকে পা... অনেকে ভিখারী হয়ে যায়।

আমি: এই মুহূর্তে ... কাজ কী?

শ্যামবাবু: আমি ধীরে ধীরে একটি অরাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তুলতে চাই, যার সদস্য হবেন শুধু যুবকেরাই। কেননা, তাঁদের ইমোশন আছে। ইমোশন না থাকলে তো কিছু করা যায় না। এই ফাঁকে একবার রাশিয়া ও চীন ঘুরে আসতে চাই। ওদের দেশের ব্যাপারটা দেখবো। বই পড়ে হবে না; ওখানে ভিখারী আছে কিনা নিজের চোখে দেখতে হবে। অবশ্য সরকার যদি যেতে দেন। এছাড়া, আমি তো ভিখারীদের জীবন নিয়ে গল্প লিখছি। একে আপনারা সাহিত্য নাও বলতে পারেন। এমন কি আমিও দাবী করছি না। এটার একটা আলাদা নাম আমি দিয়েছি, ভিখারী সাহিত্য। আমি ভিখারী সাহিত্যিক। শরৎবাবুর 'মহেশ' কল্পিত সত্তা, আমার 'হালিম শেখ' বাস্তব সত্তা। আর ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক হৃদয়টাকে ধরতে হবে। এটা না হলে তো কিছু হবে না। এটা তো আমেরিকা বা চীন নয়। এখানকার নিজস্ব একটা ব্যাপার আছে, যা আর কোথাও নেই। আর, শুনুন, গল্পগুলো লিখছি, সাহিত্যিক হবার জন্য নয়। ভিখারীদের সম্বন্ধে মানুষকে ভাবানোর জন্য। অনেকেই তো আমাকে সাহায্য করছেন। বেশ সাড়া পাচ্ছি। আরও বড়ো কিছু করতে হবে। আমার বিশ্বাস আছে, হবেই। আপনারা লিখুন না, ভিখারীদের নিয়ে আপনারাও লিখুন।

একরাম আলি

চাকরির ঝকমারি

মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারে, অর্থনৈতিক কারণে আর পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনে বউমার চাকরি করাটা রীতি-নীতি বহির্ভূত কোন ঘটনা নয়। কিন্তু চিরকালীন সংস্কার থেকে আমরা যখন নিজেদের মুক্ত করতে পারি না, আর মানসিকতায় যখন সত্যি সত্যি প্রগতির হাওয়া লাগে না, তখন আমাদের জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাতেও তার ছাপ থেকে যায়।

আমাদের সামাজিক কাঠামো সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় গঠিত আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন। সংসারের ভেতরে আমরা এখনও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সম্পর্কে বিশ্বাস করি। কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামো যেহেতু সামন্ততান্ত্রিক নয়, তাই ঠিক সেই সম্পর্ক থাকা আর সম্ভব নয়।

ব্যক্তি হিসেবে কারো প্রাপ্য আমরা দিতেও শিখিনি, নিতেও শিখিনি। ব্যক্তিসত্তাকে শ্রদ্ধা করতেও শিখিনি। যিনি আমার মা তিনি যে মা ছাড়াও একজন সম্পূর্ণ মানুষ, তাঁর যে
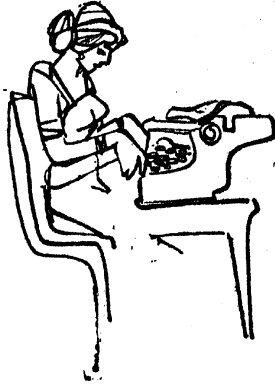
অন্যত্রও চাওয়া বা পাওয়া থাকতে পারে, সে বিষয়ে তিনিও উদাসীন—আমিও। এটা নিশ্চয়ই অপরিপক্কতার লক্ষণ।

আমাদের জীবনধারায় বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটেছে সামন্ততান্ত্রিক আর ধনতান্ত্রিক ধারার। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই অনেক প্রগতিকে মেনে নিতে হচ্ছে কিছুটা বাধ্য হয়ে। বউমার চাকরিটাও সেইভাবেই মেনে নেওয়া।

একান্নবর্তী পরিবারের একটা প্রতিকূল আবহাওয়াকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে এইসব মেয়েদের ঘরে-বাইরে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। ঘরে মানসিক--বাইরে অর্থনৈতিক। সাধারণভাবে, একান্নবর্তী পরিবারে বাস করে তাঁদের যে সহযোগিতা পাওয়া উচিত তা তাঁরা পান না। যেমন, অফিস থেকে এসে ছেলেরা যে বিশ্রাম পান, মেয়েরা কি তাই পান? সংসারের বাকী বরাদ্দ কাজটা তখন সেরে ফেলতে হয়। একান্নবর্তী পরিবারের কাছে তাঁর আশা করাটা যেন অন্যায় যে ঐ কাজের হাত থেকে তিনি রেহাই পাবেন। সংসারের সকলের ভাবটা এই যে, 'তোমার যেটুকু কাজ এ সংসারে বরাদ্দ আছে, সেটুকু তোমায় করতেই হবে; তা তুমি বাইরে ছ'ঘণ্টা পরিশ্রম কর আর যাই কর।'

আমার এক মাসি সকালের স্কুলে পড়াতেন আর তাই তাঁর দায়িত্ব ছিল রাতের রান্নার। মাসি আমাকে বলেছিল, আমার বিয়ের আগে কি ওদের বাড়িতে রান্না হোত না? আমি কিন্তু একদিনও ছুটি পাই না। সংসারে মোটামুটিভাবে ভাবটা ছিল এইরকম যেন সকালে স্কুলে যাওয়াটা মাসির বিলাস—বেড়ানোর মতন। সেখানে যে চাকরি করতে যাচ্ছে এটা মনে থাকত না।

বাড়ির বউয়ের দায়িত্ব সকলের মানসিকতার সঙ্গে তাল দিয়ে চলা—তার মানসিকতার খোঁজের প্রয়োজন নেই। ত্রুটি ঘটলে সকলের ভাবটা যেন চাকরি করার অধিকারেই সে ত্রুটি ঘটিয়েছে। চাকরি করাটা তার অপরাধ, অতএব সেই অপরাধ স্খালনের জন্য তাকে সতর্ক থাকতে হবে। আমার বান্ধবী স্বাতী কোলকাতার উপকণ্ঠে শ্বশুরবাড়িতে থাকে—ডেলি প্যাসেঞ্জারী করতে করতে বেচারী ক্লান্ত। প্রতিদিন ছটার পরে বাড়ি ফিরে রান্নার দায়িত্ব তার। স্বাতী আজকাল পারে—অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সে রান্না সংসারের ছজনের জন্য চার-পাঁচ রকমের। তা না হলে তাঁদের মুখে রোচে না। তার ওপর এক-একজন এক এক সময়ে ফিরবে—হেঁসেল আগলে বসে থাকতে হবে রাত এগারোটা পর্যন্ত। কারও একবারও মনে হয় না স্বাতীর দিনটা কিভাবে কাটে।

বাড়ির বউয়ের প্রতি আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাবটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরকম আর বউমারাও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে দেখেন না। কিংবা উল্টে বলতে পারি, অধিকারের কথাটাই তাঁরা জানেন না। আর সেই সুযোগে, মধ্যবিত্ত মানসিকতা তাঁদের ওপর পরোক্ষ অত্যাচার চালায় আর নিজের অ-মানবিকতার চরম দৃষ্টান্ত রেখে যায়।

মোনান গঙ্গোপাধ্যায়

সবজি কাদের ডোবাচ্ছে

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ থেকে ১৯৪৮ সালে সৌরীন্দ্রমোহন চৌধুরী ঘুরতে ঘুরতে বহরমপুরের কাছে সলরামপুরে এসে হাজির হয়েছিলেন। শহর থেকে ৪ মাইল দূরে। ম্যাট্রিক পাশ। খানিকটা সরকারি জায়গাও পেয়েছিলেন। ২৬ বছর বয়সে বৌ নিয়ে কুঁড়ে ঘর বাঁধলেন।

১৯৫৩ সালে বুড়ো বাবা চার ভাই ও দু' বোনকে নিয়ে হাজির। সৌরীনবাবু তখন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। বেতন ৪৮ টাকা। বিরাট সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ায় তিনি কিন্তু একটুকুও ঘাবড়ালেন না।

ডিপ লিটারে মুরগি খামার করলেন। সবজি চাষ শুরু করলেন। বাড়িতে গাই পুষলেন।

উদ্যোগী পুরুষের সহায় ভগবান। দুধ বিক্রি হল। ডিম বিক্রি হতে লাগল। সবজিতে বাড়ির খাওয়ার কাজ চলল। তারপরে স্ত্রীও প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি পেলেন।

ভাইবোনেদের লেখাপড়া, চাকরি-বাকরি বিয়ে থা সবই হল। নিজের

এক ছেলে কাজল পাশ করেছে টেকস্টাইল ইনস্টিট্যুট থেকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌরীনবাবু আজও সবজি চাষে উৎসাহী। জমি আছে ৪ বিঘের মতো।

স্প্রে করা হচ্ছিল ঢেঁড়শ খেতে। দু' বিঘার বেশি ঢেঁড়শ। চলতি নাম ভেন্ডি। বহরমপুর থেকে বেলডাঙ্গা যাওয়ার পথে মাইল চারেক দূরে জাতীয় সড়কের পাশেই তাঁর জমি। সেখানেই দেখা হল সৌরীনবাবুর সঙ্গে।

তাঁর বিষের গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এনড্রিন স্প্রে করেছেন। স্প্রে করবার আগেই তোলা হয়েছে সবজি। ৩৬ কেজি কাঁচা ঢেঁড়শ। যাঁরা খুচরো বিক্রি করেন তাঁরাই তুলেছেন। পাল্লা চার টাকা। ওজন ৫ কেজি। ২৮ টাকা দাম। এক কেজি ফাও। একদিন অন্তর বাড়িতে টাকা দিয়ে যায়।

শ্যালো রয়েছে। পাম্প নেই। অন্যের পাম্প ভাড়া নিয়ে সেচ দেন। ঘণ্টা পিছু ভাড়া ৬—৭ টাকা পড়ে। তেল-মোবিলের দাম দিতে হয় না।

মাঘের প্রথমে নড়েকি বেগুনের চারা বসিয়েছেন। এখন তোলা হচ্ছে কম। গাছের চেহারা ভালই। পৌনে দু'বিঘার বেগুন চাষ।

বিঘা পিছু ৮—১০ গাড়ি গোবর বা কম্পোস্ট দিয়ে ১৫ : ১৫ : ১৫ সুফলা দিয়েছেন ৬০ কেজি। খোল ৬০ কেজি। এক মাস পরে ইউরিয়া ২০ কেজি। সেচ দিয়েছেন ছয় বার। আরও ২।৩ বার দিতে হবে।

ফসল তোলার খরচ নেই। চৈত্রের প্রথম থেকে ঢেঁড়শ উঠছে। বেগুন উঠছে মাঝামাঝি থেকে। সপ্তাহে একদিন বেগুন ওঠে গড়ে দশ কেজি। আরও বাড়বে শিগগির। ঢেঁড়শ ওঠে একদিন অন্তর। গড়ে ৪০—৫০ কেজি। এখন ও বাড়বে।

বেগুনের দর ৯০ পয়সা। ঢেঁড়শ ৮০ পয়সা কেজি বিক্রি হয়। বিঘা পিছু খরচ হয় মোটামুটি ৫০০ টাকা। খরচ বাদে আয় হাজার টাকা।

বিষাক্ত কীটনাশক দেওয়া সবজি নিজেরা খান না। কাছাকাছি নিরাপদ ধরনের কোন কীটনাশক না থাকায় এনড্রিন কিনে এনেছিলেন। শেষ হয়ে গেল।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার সঙ্গত কিনা। উত্তরে জেনেছেন সবজিতে এণ্ড্রিন ব্যবহার না করাই ভাল।

এরপর থেকে মাস্টার মশাই ৫০ শতাংশ সায়থিয়ন অথবা ম্যালাথিয়ন সবজি খেতে ব্যবহার করবেন। থায়োডেনও ব্যবহার করেছেন। এণ্ড্রিনের বিপদ কম। মানুষের পক্ষে কিছুটা নিরাপদ।

শহর অথবা শহরতলীতে সবাইকেই সবজি কিনে খেতে হয়। যে ধরনের বিষাক্ত কীটনাশক স্প্রে করে সবজির পোকা দমন করা হয় তা জানতে পারলে অনেকেই তাজা টাটকা সবজি খাওয়া বন্ধ করবেন। এই বিষ সহজে নষ্ট হয় না। এবং ক্ষতির হাত থেকে বংশ পরম্পরার মুক্তি নেই।

একজন শিক্ষক সেটা বুঝেছেন। পত্র-পত্রিকা পড়েন। রেডিও শোনেন। কৃষি কথার আসরের মোড়ল গোবিন্দ-কাশীনাথকে ভাল লাগত। হাতের কাছে কীটনাশক না থাকায় যেটা স্প্রে করলেন, পরের দিন বাদ দিয়ে তাঁর ঢেঁড়শ যারা খাবেন তাঁদের যে কী ক্ষতি হবে সেটা হয়তো তিনি বুঝলেন। এবং লজ্জিত হলেন। ভবিষ্যতে আরো সতর্ক হবেন বললেন।

কিন্তু সাধারণ চাষীবাসীরা এই ক্ষতির পরিমাপ করতে পারবেন না। বুঝতেও পারবেন না তাঁদের সবজি কাঁদের ডোবাচ্ছে। এব্যাপারে সতর্ক হওয়া দরকার।

সন্তোষ রায়চৌধুরী

বাঙলার বাইরে বাঙালী

লখনৌ

উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরে প্রথম যে কজন বাঙালী এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্র সান্যাল, রাজগোপাল বিদ্যান্ত এবং অতুলচন্দ্র সিংহ প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতুলপ্রসাদ সেন এঁদের পরবর্তী আগন্তুক। বাংলার বাইরে বাঙালী সর্বত্র গিয়ে ভিত গাড়েন বেঙ্গলী ক্লাব ও কালীবাড়ির মাধ্যমে। লক্ষ্ণৌ শহরও তার ব্যতিক্রম নয়। রাজেন সান্যালের পুত্র সান্যাল পরিবারের কৃতী ব্যক্তি দ্বিজু সান্যাল মহাশয় এখন স্থানীয় বাঙালীর এনসাইক্লোপিডিয়া, অতুল-প্রসাদের অতুলনীয় সঙ্গীতের অথরিটি। নিজে ইঞ্জিনিয়ার, সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্য-রসিক, বাঙালীর সর্বপ্রকার উদ্যোগে উৎসাহী পঁচাত্তর বৎসরের যুবক!

লক্ষ্ণৌ শহরে বাঙালীর সংখ্যা এখন ৭০।৭৫ হাজারের কাছাকাছি। বেশীর ভাগই সরকারী চাকুরে।

প্রশ্ন করলাম বেঙ্গলী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট শ্রীরবীন্দ্র মিত্র মহাশয়কে—'লক্ষ্ণৌর সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, সঙ্গীত ও বুদ্ধিজীবী জীবনে অসিত হালদার ললিতমোহন সেন, বীরেশ্বর সেন, রাধাকমল ও ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় নির্মল সিদ্ধান্ত ও অতুলপ্রসাদের পর আর কেউ দেখা দিচ্ছেন না কেন ?

মিত্র মহাশয় জানালেন, 'আছেন। ঠিক অতখানি না হলেও আছেন বৈ কী! বিশেষ করে চিত্রশিল্পী—এই তো ইনফরমেশন সেন্টারে প্রসিদ্ধ শিল্পী এন এন রয় আছেন। আর্ট কলেজে আছেন বীরেশ্বরের সুযোগ্য পুত্র সুরেশ্বর এবং শিল্পী হিরন্ময় রায়চৌধুরীর পুত্র সুদেব রায়-চৌধুরী। এখানকারই ছেলে চিত্রশিল্পী সনৎ চ্যাটার্জি এখন দিল্লিতে থাকেন। এছাড়া নামী ফটোগ্রাফার চিরঞ্জিৎ ঘোষ। পাওনিয়র পত্রিকায় ইনিই ছবি দেন।'

একটু থেমে বলেন, 'হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইরকম বাঙালীর গ্রুপ আর নেই মশাই। কিন্তু ধূর্জটীপ্রসাদের রচনা তো একটি মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর জন্য ছিল—জনসমাজ নিয়ে তো তিনি কিছু লেখেন নি।' শেষ পংক্তিটিতে একটু ক্ষোভের সুর ছিল।

প্রশ্ন পালটাই, 'অতুলপ্রসাদ, সাংবাদিক রামানন্দ, দুই বিভূতি, সতীনাথ ভাদুড়ি এবং শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের মত লেখক বাংলার (তথা কলকাতার) বাইরে আর পাওয়া যাচ্ছে না কেন?'

এ প্রশ্নের উত্তরে সান্যাল মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র (এ-কালীন যুবক) এক কথায় জানালেন, 'এখানকার সাধারণ বাঙালীর সমাজচেতনা খুব উচ্চস্তরের নয়। অনেকেরই মন রাজনীতির দিকে ডাইভারটেড—যদিও সে রাজনীতি কোন গঠনমূলক কাজের সহায়ক নয়।'

কথাটার প্রতিবাদ করলেন প্রবীণ মিত্র মহাশয় 'তা কেন? এখানেও অনেক প্রবাসী বাঙালী সাহিত্য চর্চা করেন। অবশ্যই বিভূতিদ্বয়রা সতীনাথের পর্যায়ে উঠতে পারেননি এখনও। নাম করলেন প্রবোধ মজুমদারের। ইনি বাংলা ও হিন্দি উভয় ভাষাতেই লিখে থাকেন। হিন্দিতে পুরস্কার পেয়েছেন।

এছাড়া আছেন শ্রীমতী মানসী মুখোপাধ্যায়। ইনি অতুলপ্রসাদ ও বাংলার বাইরের বাঙালীর বিষয়ে বই লিখেছেন। আছেন ডেপুটি সেক্রেটারী শিবাজী মুখার্জি—বই লিখেছেন হিমালয় ভ্রমণের ওপরে।

ইংরাজী সাংবাদিকতায় খ্যাতনামা ব্যক্তি এন এন ঘোষ মহাশয় এখন পায়োনিয়র পত্রিকার পরামর্শদাতা। এছাড়া আছেন নাট্যকার সাহিত্যরসিক কমলাকান্ত বন্দোপাধ্যায়। রচনা, নির্দেশনা সব তাঁর।

বেঙ্গলী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, সদস্যরা এঁদের নাটক সম্বন্ধে খুব গৌরবান্বিত। শীতের সময় নাটকের প্রতিযোগিতা হয়। অন্যান্য প্রদেশ থেকেও প্রতিযোগীর দল আসেন, অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের আতিথ্যে তৃপ্ত হয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক চিঠি লেখেন। সগর্বে জানান, মিত্র মহাশয় 'আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। শুধু ...পাড়া বা রবীন্দ্র-জয়ন্তী নয়। অতুলপ্রসাদ, নজরুল, সুভাষ, এমন কি কবি সুকান্তের জন্মদিবসও পালন করি। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা। চাই একালের ইংরাজী বা হিন্দি স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েদের বাংলায় বিতর্ক সভায় যোগ দেওয়া। শেষেরটায় ঠিক সফল হই না। তবে একবারে সুভাষচন্দ্রের ওপরে বলবার জন্য একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা আহবান করেছিলাম। প্রথম পুরস্কার ৫০১ ও সুভাষের প্রতিকৃতির একটি রানিং শীল্ড। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ২০১ ও ১০১। এছাড়া, বাইরের ছেলেমেয়ে যাঁরা আসবেন তাঁদের থাকা খাওয়া ফ্রি।

এতদ্‌সত্ত্বেও প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ!! রবীন্দ্রভারতী থেকে একজন, বিশ্বভারতী থেকে দুজন এবং স্থানীয় দুজন,—ব্যস্‌! বিচারক এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌতম চট্টোপাধ্যায়। প্রথম দুটি স্থান পেল লক্ষ্ণৌর ছেলেমেয়ে। দ্বিতীয় স্থান অধিকারিণী মেয়েটি এখনও স্কুলে পড়ে। প্রতিযোগিতার টাকা দিয়েছিলেন দে'জ মেডিক্যাল স্টোরস এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া ফারমাসিটিক্যাল।'

প্রশ্ন—'বাংলার বাঙালীর জীবনের সংঘাত বা সমস্যা বাংলার বাইরের বাঙালীকে বিচলিত বা স্পর্শ করে কী?'

নির্দ্বিধায় জবাব আসে—করে। কলকাতায় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি বা ট্রামের টিকিটের দাম এক পয়সা বাড়লো, এখানকার বাঙালীরা তা নিয়ে বিচলিত হন, আলোচনা করেন। শম্ভু মিত্র নতুন নাটক করছেন শুনলে আমাদের আলোচনা সভা সরগরম হয়। আর মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল খেলার রেজাল্ট এখানে কলকাতার ময়দানের উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

সকৌতুকে একজন তরল প্রশ্ন করে বসলেন, 'আচ্ছা, যদি লক্ষ্ণৌ ভার্সাস মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচ হয় এবং লক্ষ্ণৌ হেরে যায় তাহলে লক্ষ্ণৌর বাঙালীর কী প্রতিক্রিয়া হবে?'

মিত্র মহাশয়ের তাৎক্ষণিক স্ফূর্ত জবাব, 'খুশী হবে।'

বুঝলাম—শান্-ই-আওধ লক্ষ্ণৌএ বসে মিত্র মহাশয় লখনৌয়ী নবাবী কালচার ভালরকম আয়ত্ত করেছেন। মেহ্‌মানকে যথাযথ খাতির দেবেন।

প্রশ্ন: রাজনীতির জগতে স্থানীয় বাঙালীর কোন অবদান নেই কেন? উৎসাহের অভাব না যোগ্যতার অভাব?'

উত্তর: আজকে হয়ত নেই। কিন্তু এককালে ছিল। পাহাড়ী সান্যালের দাদা ধীরেন সান্যাল, বীরু রায়, হোমিওপ্যাথ এস এন বসু—এঁদের যথেষ্ট অবদান ছিল এবং উত্তরপ্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী সি বি গুপ্তা এঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মিত্র মহাশয় নিজেও ছাত্রাবস্থা থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। আজাদ হিন্দ ও কম্যুনিস্ট আন্দোলনে সামিল ছিলেন। রেলকর্মী অবস্থায় জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দাশপুরে রেল ধর্মঘটের মিটিং-এ ছিলেন। তারপর জেল। জেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়—আবার ছাত্র ইউনিয়ন-এর আন্দোলন। অবশেষে এখন পেশা ওকালতী, নেশা বেঙ্গলী ক্লাবের উন্নয়ন।

লখ্‌নোবক্তী

ভানুতীর্থ নিবেদিত

'সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা'—রাত্রি নয়, কাল সন্ধ্যা এবং ধারা শ্রাবণের নয়, বৈশাখের—অকাল বর্ষণ। তবু সে তো এক বাদল-দিনের বৃষ্টি-নেশাভরা সন্ধ্যা, শ্রোতৃমণ্ডলী সুনির্বাচিত এবং শিল্পী শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস—তাই প্রত্যাশা ছিল অনেক।

শিল্পী তাঁর একক গানের অনুষ্ঠান শুরু করেন পূজা পর্যায়ের
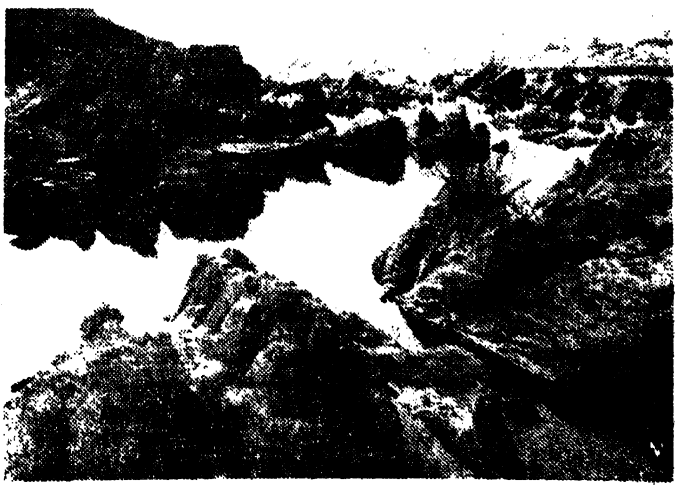
গান গেয়ে। 'জগতে তুমি রাজা'—'এ পরবাসে রবে কে হায়!'—'এ মোহ-আবরণ খুলে দাও, দাও হে', 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'—। শিল্পীর কণ্ঠের জাদুতে রবীন্দ্রনাথের গানের দুয়ার খুলে গেল, আমরা কথা ও সুরের এক বিপুল ঐশ্বর্যময় মন্দিরে প্রবেশের সুযোগ পেলাম। 'মন্দিরে মম কে আসিল হে।....সকল দুয়ার আপনি খুলিল/সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল/সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে—।' শ্রোতাদের মুগ্ধ হৃদয়ের বীণাতেও শিল্পীর সুরের ছোঁয়া লাগল। 'এমন দিনে তারে বলা যায়/এমন ঘন বরিষায়।'—এল প্রকৃতি, তার মোহময় ভাবরস আর সুরে ভরা অপরূপ রূপ নিয়ে। 'পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে'—'যা না চাইবার তাই আজি চাই গো, যা না পাইবার তাই কোথা পাই গো—পাব না, পাব না।'—শিল্পী তার অন্তরের আবেগ আর কণ্ঠের সুর নিয়ে সেই অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে। তারপর ধরা দেয় কি দেয় না সেই 'কৃষ্ণকলি'—তার কালো হরিণ চোখ। আমাদের মনে এক আশ্চর্য খুশী ঘনিয়ে আসে, হৃদয়ে সুখের ঢেউ খেলে যায়।

তারপর প্রেম — 'তোমায় নতুন করে পাব বলে'—। এবং 'মরণ'—মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।' আমরা মোহিত হই। মর্ম মুখর হয়ে ওঠে আনন্দ-অনুভূতিতে। এবং স্বদেশ পর্যায়ের একটি গান—'কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখপানে।' আমাদের চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ের একটি গান—'আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন—।' শিল্পী শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাসের বিশিষ্ট শিল্পী ব্যক্তিত্বটি শতদলে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে এই গানে, ভাব ও সুরের নিবিড় মিলনে—'সুরগুলি তার নানা ভাগে পুষ্পরাগে। মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণ লেখায়—।' আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয় প্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে।

৩০ এপ্রিল, বিড়লা অ্যাকাডেমীতে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ভানুতীর্থ' নিবেদিত একক রবীন্দ্র সঙ্গীতানুষ্ঠান ও আবৃত্তির আসরের অপর শিল্পী ছিলেন শ্রীপ্রদীপ ঘোষ।

শ্রীপ্রদীপ ঘোষ 'বর্ষামঙ্গল' কবিতা পাঠ দিয়ে তাঁর আবৃত্তির আসর শুরু করেন এবং 'দেবতার গ্রাস' কবিতা পাঠ করে অনুষ্ঠান শেষ করেন। মাঝখানে তিনি আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্যায়ের কয়েকটি কবিতা। মৃত্যুচেতনা বিষয়ক কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা, 'শ্যামলী'র একটি কাহিনী কবিতা—'হঠাৎ-দেখা', কথার 'দেবতার গ্রাস'। রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট গানও শ্রীঘোষ আবৃত্তি করে শোনান।

শিল্পীর 'বর্ষামঙ্গল' কিন্তু আমাদের তেমন স্পর্শ করেনি। ব্যঙ্গ কবিতার পাঠও সাধারণ মানের মনে হয়েছে। অথচ শ্রীপ্রদীপ ঘোষের কণ্ঠস্বর খুব ভাল, মাত্রাজ্ঞান চমৎকার, ভাব এবং আবেগের প্রকাশে শিল্পী অকৃপণ। এই আবেগের আতিশয্যই 'দেবতার গ্রাস' তাঁর আবৃত্তির একটি আশ্চর্য নিদর্শন হয়ে ওঠার পথে বাধা হয়ে রইল। তবু তাঁর 'দেবতার গ্রাস' আমাদের স্মরণে থাকবে দীর্ঘদিন। এই দীর্ঘ কবিতার পাঠ কোথাও কোথাও অসাধারণ পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

তবু সামগ্রিকভাবে শ্রীপ্রদীপ ঘোষের এই অনুষ্ঠান আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করেনি। অমন 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি—' তাঁর কণ্ঠে কেন ব্যর্থ হল, কেন বার বার তাঁর পাঠ এক বিশিষ্ট শিল্পীর গাওয়া ওই গানটিকে স্মরণ করিয়ে দিল।

চণ্ডী মণ্ডল

স্বজন বিয়োগ

মৃত্যু শোকবহ নিঃসন্দেহে। কিন্তু যাঁর জন্যে ভালবাসা বহু মানুষের, তাঁর প্রয়াণ আরও মর্মান্তিক। অমৃতের দীর্ঘদিনের শুভানুধ্যায়ী এবং সকলের প্রিয় শ্রীরবি বসুমল্লিকের অকালপ্রয়াণে আমরা ব্যথিত ও বিস্মৃত। সব কাজেই এমন কিছু মানুষ থাকেন, যাঁদের দৃশ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু অন্তরালে তাঁরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। শ্রীবসুমল্লিক ছিলেন এমনই একজন। একসময় বাঙলার সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র জগতের তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সম্প্রতিকালে যাত্রাজগতে যে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে, তার পিছনেও ছিল শ্রীবসুমল্লিকের গৌরবজনক ভূমিকা। তিনি দীর্ঘকাল অসুস্থ থেকেও কর্মহীনভাবে দিন কাটা[illegible] পারেননি। একান্ন বছর বয়সে যে[illegible] তিনি চলে গেলেন, সেদিনও অফিসে[illegible] কাজ সেরে বাড়ি ফিরে সিনেমা দেখতে যান। এবং সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই মিষ্টভাষী সুপুরুষ মানুষটি ছিলে[illegible] অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর ও অমৃতের আপনজন।

আমাদের মফঃস্বল

গ্রামের নাম তালডাঙ্গা। ডায়মণ্ড হারবার থানার ছোট্ট একটি গ্রাম। পৌষের শেষ তারিখ পার করে দি[illegible] মাঘের শুরুতেই জেগে ওঠে তালডাঙ্গা। হাজার মানুষের ভিড়ে ছোটট গ্রামটি ভ[illegible] যায়। গ্রামের লোকজন তো আছেনই, আশ পাশের গ্রাম থেকে এমন কি দূ[illegible] দূরান্ত থেকেও বহু মানুষ আসে এখানে।

পয়লা মাঘ ভোর থেকেই কি নারী কি পুরুষ দল বেঁধে স্নান করে ছোট্ট একটা পুকুরে। গাজীপীরের পুকুর নাম[illegible] খ্যাত এই ছোট্ট পুকুরটি ঘিরেই স্নান পর্ব চলে। স্নান শেষে বাতাসা জলে ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি আছে।

প্রত্যেকেই প্রথমে ডুব দেয় তারপর বাতাসা ভাসিয়ে দেয়। প্রবাদ আছে ভাসিয়ে দেওয়া বাতাসা ডুবে আবার ভেসে উঠলে স্নানার্থীর মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

স্নান পর্ব সেরে দলে দলে মানু[illegible] হাজির হন গাজী পুকুর পাড়ে পীরের থানে। এখানে বাবা গাজীর পুজো দে[illegible] প্রত্যেকে। পুজোর মধ্যে বাতাসা, সন্দে[illegible] ফল ছাড়াও মোরগ উৎসর্গ করে[illegible] অনেকে। কয়েক শ উৎসর্গ করা মোর[illegible] ঐদিন জবাই করে মাংস রান্না হয়। সেই রান্না ভোগ হিসাবে বিলি করা হয়।

এখানকার গাজী পীরের না[illegible] রক্তেশ্বর গাজী। এঁর নামে প্রায় তিন[illegible] বছর ধরে পুজো হয়ে আসছে। মানুষে[illegible] বিশ্বাস, গাজী পীরের পুকুরে স্নান [illegible] পীর সাহেবের থানে পুজো দিলে অনে[illegible] কঠিন রোগ নিরাময় হয়। তবে রক্ত[illegible] আমাশয় রোগে নাকি সবচেয়ে বেশি সুফল দেয়। সম্ভবতঃ সেই কারণেই এ[illegible] পীরের নাম হয়েছে রক্তেশ্বর গাজী পীর।

গাজী পীর ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁর থানে মোল্লাই হলে[illegible] পুরোহিত। এই থানের মালিক [illegible] স্বত্বাধিকারী হলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী স্থানীয় নিয়োগী পরিবারের সম্পত্তি[illegible] অন্তর্ভুক্ত। মোল্লার দ্বারা পুজো হলেও হিন্দুরাও ভক্তি নিয়েই পুজো দেয়।

পয়লা মাঘ স্নান ও পুজো[illegible] নির্দিষ্ট দিন হলেও প্রতি সপ্তা[illegible] বৃহস্পতিবারও পুজো হয়ে থাকে। পয়লা মাঘের স্নান ও পুজো উপলক্ষে তিন দিনের বিরাট মেলা বসে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৫ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

১৭ বর্ষ ৬ সংখ্যা
২ আষাঢ়, ১৩৮৪
17 JUNE 1977

...মী সংখ্যায়

...খ্যায় প্রচ্ছদ এঁকেছেন ধ্রুব রায়
...ের ছবি এঁকেছেন সুধীর সরকার
...সুবোধ দাশগুপ্ত

উচ্চ শিক্ষায় নিম্নচাপ

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার আবহাওয়ায় গভীর একটি নিম্নচাপ দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি তাঁদের সপ্তাহ পাঁচেকের ধর্মঘটে বিরতি দিয়ে ঝটিকাকেন্দ্রকে কিছুটা পাশ কাটিয়ে যেতে দিয়েছেন বটে, কিন্তু আকাশ এখনো মেঘাচ্ছন্ন—বিপদের সম্ভাবনাও প্রবলই রয়ে গেছে।

একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, কর্মচারী সমিতি ধর্মঘট তুলে নিয়ে ভাল কাজই করেছেন। কিন্তু সরকারের সঙ্গে তাঁদের মিটমাটের ফলে তাঁরা যখন নগদ বিদায় হিসাবে কিছুই পাননি, পেয়েছেন শুধু প্রতিশ্রুতি, তখন পাঁচ সপ্তাহ ধরে এমন একটি সংকটকে জীইয়ে রাখার কী দরকার ছিল, এ-প্রশ্নেরও কোনো সদুত্তর পাওয়া শক্ত।

অন্যদিকে সরকারও যে খুব সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন তা বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা যা মেনে নিয়েছেন তা হল—ধর্মঘট শেষ হবার পনের দিনের মধ্যে একটি বেতন কমিটি বসিয়ে কর্মচারীদের অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা দেবার প্রশ্নটিকে বিচার করে দেখবেন তাঁরা, এবং কমিটির সিদ্ধান্তমত ভাতার হার স্থির করবেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সরকার আর্থিক দায় এখন কিছুই গ্রহণ করেননি, দিয়েছেন শুধু ভবিষ্যতের আশা। বাস্তবিক, দেড় মাস পর কিছু একটা হবে একথা বলার জন্য দেড় মাস ধরে মস্তিষ্ককণ্ডূয়ন করতে হল কেন, এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যই।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা স্থগিত রাখতে হয়েছে ৫০টির মত। অজস্র ধরণের জরুরী গবেষণার কাজ স্থগিত রাখতে হয়েছে মধ্যপথেই। গবেষণার যন্ত্রপাতি অচল থাকার জন্য কিছু কিছু সূক্ষ্ম বিচারের কলকব্জা নষ্ট হয়ে গেছে; পরীক্ষাসংক্রান্ত নানারকম জীবন্ত প্রাণীও মারা গিয়েছে। ফলে সমস্ত কিছু মিলিয়ে এ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা এমন একটি বেড়াজালের বিপাকে পড়েছে যেখান থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা খুবই কঠিন ব্যাপার। অথচ এ সংকট যে অপরিহার্য ছিল তা নয়। সরকার এবং কর্মচারী সমিতি যদি প্রথম দিকেই তাঁদের অনমনীয়তা কাটিয়ে উঠতে পারতেন, একমাস আগেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

এঁরা এবং সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যেরা নিজের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক এবং অভিযোগ-আত্মাভিমান নিয়ে একই ব্যস্ত ছিলেন যে এঁদের বাইরে আরো একটি পক্ষ যে বিনা দোষে শাস্তি পেয়ে যাচ্ছে সেকথা তাঁরা চিন্তা করে দেখারও সময় পাননি। এই পক্ষটির নাম ছাত্রসমাজ। তাদের যা ক্ষতি হল তা অপূরণীয় বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশটি স্থগিত পরীক্ষা চালু হতে শুরু করলে ভবিষ্যতেও অনেক পরীক্ষাকে পিছু হঠতে হবে। এবং প্রক্রিয়াটি চক্রবৃদ্ধি হারে পশ্চাদগতির মাত্রা বাড়িয়ে দিলেও অবাক হওয়া যাবে না।

অথচ শিক্ষার অগ্রগতি নিয়ে অশ্রুপাতের অধিকার এদেশে সর্বজনীন। সত্যই সেলুকাস........!

এত বাগ বিস্তার কেন

অমৃতের নববর্ষ সংখ্যায় সুধাংশু ঘোষের একটি প্রবন্ধ পড়েছিলুম আমি দিন কয়েক আগেঃ 'রীলে রেসে তরুণদল': খুব মার্জিত এবং সংযত লেখা। ২৭ মে-র অমৃতে পড়লুম, তার প্রতিবাদে শেখর বসুর তপ্ত চিঠি। পড়েই মনে হলঃ শেখর বসু রেগে গেছেন।

কেন রাগ? চিঠির প্রথম অনুচ্ছেদেই তিনি জানিয়েছেন, সুধাংশু ঘোষ 'বেশ কিছু ভাল কথা' লিখেছেন তাঁর সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে। এমন কি 'একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ' পর্যন্ত উথাপন করেছেন—যা শুধু 'ভিত্তিহীন নয়, উদ্ভট এবং হাস্যকর।'

চিঠিটি পড়ে আমি বিভ্রান্ত হয়েছি শেখর বসুর মতিচ্ছন্নতায়। যা হাস্যকর এবং ভিত্তিহীন, তাকে নিয়ে এত বাগবিস্তার করতে পারেন তিনি? তাতে কি লাভ? নিজের তৈরি কুয়াশার ভেতরে তিনি আমাদের অক্লেশে ঠেলে দিয়েছেন।

১।। সুধাংশুবাবুর লেখাটি পড়ে আমার কখনো মনে হয়নি যে, শেখর বসুর বিরুদ্ধে তিনি কোনো 'সুনির্দিষ্ট অভিযোগ' উথাপন করেছেন। গিবসনের 'ফ্যানান আইলে'র সঙ্গে 'টাঙ্গি' গল্পের রীতি সাদৃশ্যের কথা বলেছেন অবশ্য। বিষয়-সাদৃশ্যের কথা বলেননি। শেখর বসু দুটি রচনার সারাংশ দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছেন, বুঝতে পারলুম না। রীতি-সাদৃশ্যের কথা বললে কি তিনি বিষয়-সাদৃশ্যের কথা বোঝেন?

২।। চিঠির তৃতীয় অনুচ্ছেদে জানিয়েছেন তিনি,—গিবসনের কোনো লেখা পড়েননি। নাও পড়তে পারেন। সেটা দোষের নয়। কিন্তু কয়েকদিন ধরে কলকাতার এদিক-সেদিক বিস্তর খোঁজা-খুঁজির পর একটি সংকলনের মধ্যে ডাবলু ডবলিউ গিবসনের ফ্ল্যানাল আইল' পেয়েছেন—কথাটা কি সত্যি?

৩।। চতুর্থ অনুচ্ছেদে শেখর বসু বলেছেন, জে জে স্মিথ সম্পাদিত বইটি (এ বুক অফ মডার্ন ভার্স) একটি ছাত্রপাঠ্য সঙ্কলন। নিশ্চয়ই ছাত্রপাঠ্য। কিন্তু কোন্ অর্থে?

'ছাত্রপাঠ্য' শব্দটির একটি বিশেষ অনুষঙ্গ ও অর্থ আছে—শেখর বসু নিশ্চয়ই তা জানেন। যেমন ধরুন, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' এখন পড়ানো হয় কলেজে. 'আরণ্যক'কে কি তিনি ছাত্রপাঠ্য উপন্যাস বলতেন? রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' এই সেদিনও পড়ানো হত হায়ার সেকেন্ডারীর ছাত্রছাত্রীদের। তাহলে 'গুপ্তধন' কি ছাত্রপাঠ্য গল্প? এখনো শেকসপীয়রের নাটক পড়ে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় পাশ করে শেকসপীয়রের নাটকগুলি তাদের জন্যেই লেখা?

বুঝতে পারছি না, ঠিক বুঝতে পারছি না—ছাত্রপাঠ্য বলতে শেখর বসু কি বোঝাতে চেয়েছেন?

৪।। 'অগ্রজ লেখক' সম্বন্ধে অনুজ গল্পকার যেসব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, সেগুলির সম্বন্ধে আমার কিছু মন্তব্য করা উচিত নয়। সেগুলি তাঁর ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার।

৫।। সুধাংশুবাবুর লেখাটি পড়ে আমার মনে হয়েছে, তিনি বলতে চেয়েছেন, লেখালেখির কোনো নির্দিষ্ট শাস্ত্র নেই। একেকটি সন্ধিক্ষণে তরুণ লেখকদের মধ্যে কিছু নতুন প্রবণতা দেখা যায় মাত্র। সেগুলি স্থায়ী হয় না: প্রসংগক্রমে বলেছেন, শংকা-শিহরের কাহিনী লেখা হয় মূলত দুই রীতিতে। এক রীতিতে ভূত-প্রেত-ছায়াশরীর ইত্যাদি সরাসরি উপস্থাপিত। অন্য রীতিতে কেবল পরিবেশ রচনার মাধ্যমে, যা অতীন্দ্রিয়, তাকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করে তোলা যায়। 'টাঙ্গি' গল্পটি এই দ্বিতীয় রীতির। গিবসনসহ কিছু জর্জিয়ান কবির কবিতায় এই রীতি প্রযুক্ত।

শেখর বসু ক্ষুব্ধ হয়েছেন হয়তো এই মিলের কথা বলায়। তাহলে কি সমালোচকের এতটুকু স্বাধীনতাও আর থাকবে না?

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' পড়লে এডগার অ্যালান পো-র 'দি ফল অফ দি হাউস অফ দি আসার' গল্পটি মনে পড়ে। একথা বললে, 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর প্রতি অমর্যাদা করা হয়? অথবা 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি'—জীবনানন্দের পংক্তি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কীটসের থাউস্যান্ড ইয়ার্স হ্যাভ আই রোমড' লাইনটি মনে পড়ে। একথা বললে কি বনলতা সেন কবিতাটির প্রতি অমর্যাদা করা হয়?

শিল্পসাহিত্যে নতুন আন্দোলন যা হোক না কেন, উত্তরাধিকার নামে এক বস্তু আছে, একথা অস্বীকার করা যাবে না এবং যতটুকু জানি, একালের শিল্পসাহিত্য বিচারে 'অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সাইকোলজি' একটি অপরিহার্য হাতিয়ার—যার ... মানুষের 'রেসিয়েল মেমারি' এবং ... বিশেষত কবিতায়, আর্কেটাইপ্যাল ইমেজারি বা পুরাণ-প্রতিমার ব্যবহার।

—গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কলকাতা

পাঠকের আক্ষেপ, অনুশোচনা

২৭ মে-র অমৃতে শেখর বসুর চিঠি 'অনুজ গল্পকারের বিস্ময়' পড়লাম। ... মনে হল, কী আশ্চর্য! সুধাংশু ঘোষের 'রিলে রেসে তরুণ দল' তো আমিও পড়েছি, তবে আহত হইনি কেন? হওয়া উচিত ছিল। কেননা, শেখর বসু একজন লেখক এবং আমি তাঁর লেখা পড়ি। তিনি ... হলে, আমার আহত না হওয়ার ... কারণ থাকতে পারে না।

কিন্তু সময় অতিক্রান্ত। বড় বেশি ... হয়ে গেছে। এখন আহত হলে, সুধাংশুবাবু ভাবতেন, আমি শেখর বসুর নকল করছি। শেখর বসুও ... পছন্দ করেন না। সে জন্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দূরে দাঁড়িয়ে বলছি, এখন আমি অনুতপ্ত। কেননা মানুষ অনুতপ্ত হয় কৃতকর্মের জন্যে—ঘটনা ঘটে যাবার পর। প্রবন্ধ পড়ার পর, প্রথমে ভেবেছিলাম, সুধাংশুবাবু শেখর বসুকে ভালোবাসেন, প্রশংসা করেন এবং আলোচনার যোগ্য মনে করেন।

ভুল করেছেন সুধাংশুবাবু? নিশ্চয় করেছেন। ভুল করেছি আমিও। এখন ... মনে পড়ছে, সুধাংশুবাবু গল্পকার। ... বানিয়ে থাকেন। বানিয়ে বানিয়ে প্রশংসা করার, এমনকি গরজ পড়েছিল তাঁর? ... ক জানতেন না শেখর বসুও গল্প বানিয়ে থাকেন? সেজন্যেই ধরা পড়ে গেছেন হাতে নাতে।

এখন শেখর বসুর চিঠিটি পড়ে ... হচ্ছে, সুধাংশু ঘোষের উদ্দেশ্য ভালো ... না। 'টাঙ্গি' গল্পের সঙ্গে তিনি গিবসনের 'ফ্ল্যানান আইলে'র কাটায় কাটায় মিল দেখিয়েছেন। তাও কি সম্ভব? দেশী-বিদেশী ... ছবির প্রিন্ট দেখেছি আমি। ...

ছবিতে কখনো প্লটের চেয়ে মূল্যবান ভাবিনি। এমনকি নিজের ছায়াও আমার কাছে আমার চেয়ে মূল্যবান নয়। সুধাংশুবাবুর উচিত 'কাটায় কাটায়'—এই শব্দ দুটিকে প্রত্যাহার করে নেওয়া।

শেখর বসু ক্ষুব্ধ হয়েছেন অবশ্যি মিলের জন্যে নয়—'গিবসনের একটি চমৎকার কবিতার প্রতি' অবিচারের জন্যে। তাঁর এই মনোভাবে আমি মুগ্ধ। পূর্বসূরীর এক ইংরেজ কবির কবিতার প্রতি তিনি যেভাবে সম্মান জানিয়েছেন, তাতে তাঁকে আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে ভাবতে পারছি। এখন আমার বলতে ইচ্ছে করছে : 'সুধাংশুবাবু, মিল আবিষ্কারের মোহ থেকে আপনি মুক্ত হোন। তুলনাবাচক শব্দ কেবল কাব্যেরই অলঙ্কার—কাব্যে চলে।'

—শুভংকর পাঠক। কলকাতা-৩।

সমালোচনা, না ছেলেখেলা

অমৃত সাপ্তাহিকের ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ সংখ্যায় আমার লেখা উপন্যাস 'জ্যোৎস্নায় অরণ্যে' একার সমালোচনা করতে গিয়ে সুগত মিত্র সমালোচনা করেন নি, ছেলেখেলা করেছেন। ব্যঙ্গ করে ব্যানার হেডিং দিয়েছেন 'লেখকের ইচ্ছা পূরণের গল্প'। সমালোচককে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, উপন্যাস লেখা কি লেখকের ইচ্ছেতেই হয় না। নাকি প্রকাশক বা পাঠকের অথবা সমালোচকের ইচ্ছে পূরণ করতে হয় লেখককে? কিন্তু শ্রদ্ধেয় সমালোচককে এসব প্রশ্ন করে বিব্রত করবার ইচ্ছে নেই, কারণ উনি তো নিজস্ব কোন সংগোপন ইচ্ছে পূরণ করতেই কলম ধরেছেন। ওর হাতেই তো ভেটো, প্রশ্ন করবার কোন এক্তিয়ার নেই লেখকের; নিষ্কাম পৃথিবীতে বাস করতে সুগত মিত্রের বোধহয় মনে হয়েছে, উপন্যাসটির নায়ক স্বপ্নেন্দু সমেত অধিকাংশ চরিত্রই নাকি কামার্ত। এ নিয়েও কোন প্রশ্ন তুলব না, কারণ সুগতবাবুর পবিত্র বিশ্বাস, কোন চরিত্র যদি মনা সেক্সের কাব্যে কথা ভুলেও চিন্তা করেন, তাহলেই তিনি কামার্ত। অপূর্ব! আরেক জায়গায় সুব্রতবাবু বলেছেন, নায়ক স্বপ্নেন্দু নাকি আত্মকেন্দ্রিক, খালি নিজের কথা ভাবে। সুগতবাবুকে ভুলেও প্রশ্ন করছি না, দেখান তো পৃথিবীর কোন লোকটা আত্মকেন্দ্রিক নয়, কেবলমাত্র পরের চিন্তায় নিজের জীবন জাইয়ে রাখছেন। এমন লোক গোটা পৃথিবী চুঁড়লেও জনা দশেক পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তবে কি শুধু এই দশজনকে নিয়েই উপন্যাস লিখতে হবে। বাহ্!

তবু সুগতবাবুর কাছে আমার একমাত্র প্রশ্ন, উপন্যাসটি শ্রীবিমল করের নামে উৎসর্গ করায় কোন হেনস্থার পরিচয় পেলেন, বুঝিয়ে বলবেন কি? হাল আমলে বইয়ের সমালোচনার সঙ্গে কি উৎসর্গপত্রের সমালোচনাও চালু হয়েছে? সন্দেহ নেই, এভাবে চলতে থাকলে কোন দিন দেখব, যে পেপার মিল বা কাগজের কলে উপন্যাসটির জন্য কাগজ তৈরি হয়েছে, তার ম্যানেজারকেও হেনস্থা হতে হবে সুগত বাবুদের কাছে। একটা গল্প মনে পড়ছে,'তুই জল ঘোলা করিস নি তো তোর বাবা...' —দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০, মদন চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৭০০০০৭

রবীন্দ্রসঙ্গীত

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচ্ছদ কাহিনীর জন্য ধন্যবাদ। তবে বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম লিখছেন,—শান্তিদেব ঘোষ, কানন দেবী, দেবব্রত বিশ্বাস, একরাম আলি এবং বিশ্বজিৎ রায়। কিন্তু কার্যত দেখা গেল কানন দেবী ও দেবব্রত বিশ্বাস নিজে লেখেন নি, এঁদের সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, লিখেছেন যথাক্রমে সন্ধ্যা সেন এবং শচীন দাস। শান্তিদেব ঘোষ এবং বিশ্বজিৎ রায়ের লেখা খুব ভাল। সন্ধ্যা সেনের লেখার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কিছু গোলমাল আছে। 'দিনের শেষে' গানটি নিজের সুরে গাইবার অনুমতি ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিক স্বয়ং, কানন দেবী নন। শচীন দাসও কিছু গোলমাল করেছেন, তৃতীয় অনুচ্ছেদে তিনি লিখছেন যে ১৯৭১-এর পর দেবব্রত বিশ্বাসের কোন রেকর্ড হয়নি। তারপরই ৪র্থ অনুচ্ছেদে লিখছেন 'সুতরাং ১৯৭০ সাল থেকেই তাঁর রেকর্ড করা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হল।' এটা কি লেখকের ভুল না প্রুফ দেখার ভুল। তাছাড়া লেখককে আরো জানাই যে রাসবিহারী এ্যাভেনুর বাড়িতে দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি নিজেকে তাঁর যমজ ভাই রূপে পরিচয় দেন, এটাও তাঁর এক ধনের অভিমান। 'ছবিতে' এবং 'গানের স্কুল' এই দুটি লেখার লেখকের নাম পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা মারফৎ জানিয়ে দিলে বাধিত হব। 'ছবিতে' লেখার লেখককে জানাই আমার প্রাণভরা অভিনন্দন তাঁর সত্যানুসন্ধানের জন্য। তাঁকে আরো জানাই যে ১৯৫০ সালে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর শেষ ছবি 'প্রিয় বান্ধবী'তে' (নিউ থিয়েটার্সের ছবি) নায়কের মুখে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত "পথের শেষে কোথায় কি আছে

শেষে ছবির চেয়েও সুপারহিট হয়েছিল। হিন্দী 'অভিমান' ছবির 'তেরে মেরে মিলন কে য়ে রয়না' এই গানে স্বর্গত শচীন দেব-বর্মন রবীন্দ্রসঙ্গীত 'যদি তারে নাই চিনি গো'-এর সুর হুবহু নকল করেছেন কেবল মাত্র এই গানের আভোগের প্রথম লাইনের সুর 'সে কি আপন রঙে ফুল রাঙারে' ছাড়া। লেখকের কাছে আমার আর একটি জিজ্ঞাসা যে অনিল বিশ্বাসের 'আব তেরে সিবা' এই গানটি কি কোন ছায়াছবির গান না এমনি আধুনিক? ছায়াছবি হলে কোন ছবির গান? —শোভন গুপ্ত, ২৪ পরগণা।

বাসী রুটি

পর পর কয়েকটি সংখ্যা 'অমৃত' পড়ে আমার ধারণা হয়েছে, 'অমৃত' সম্পাদক মহাশয় মূল্যবান লেখা সংগ্রহ করতে পারছেন না। তারাদাস বন্দোপাধ্যায়ের এই-সব ন্যাকামি মার্কা লেখা প্রকাশ করে অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার কি উপকার তিনি করছেন জানি না। সরপুরিয়ার দেশ কৃষ্ণ-নগরে যাবার পথঘাট টাইম টেবিলে পাওয়া যায়, এ নিয়ে 'অমৃত'র মূল্যবান পৃষ্ঠা নষ্ট করবার কোন যুক্তি আছে কিনা বুঝলাম না। নববর্ষ সংখ্যায় সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পরমা সুন্দরী' কবিতাটি সসম্মানে কোন স্থান পত্রিকায় স্থান পেতে পারত এবং এই কবিতাটি ছাপার জন্য সম্পাদক মহাশয়ের কোন মাথা বাথার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। বোলান গঙ্গোপাধ্যায় যা লিখছেন তা বাসী রুটির মতন আহার্য ছাড়া অন্য কোন পর্যায়ে পড়ে না। পর পর কয়েকটি সংখ্যা 'অমৃত' পড়ে মনে হচ্ছে একই পরিবারের কিছু লোক একই বারান্দায় বসে প্রতিদিনের রুটিন মাফিক চা-বিস্কুট, ডাল-ভাত, রুটি-তরকারি খেয়ে যাচ্ছেন। বাইরের অতিথিরা উপোস করে দেখে যাচ্ছেন তাদের কাণ্ড-কারখানা। পার্থ-প্রতিম কাঞ্জিলাল ক'লাইন কবিতা লিখেছেন জানি না কিন্তু হঠাৎ তাঁর ছবি অমৃতের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপার কি প্রয়োজন ছিল এও বুঝলাম না।

'এই দশক'-এর লেখকদের লেখা অন্য পত্রিকায় ইতিপূর্বে পড়েছি। তাঁদের ভাল-ভাবেই চিনি। 'অমৃত' পত্রিকা তাদের বিখ্যাত করবার জন্য ফোটো ছেপে এত উঠেপড়ে লাগলেন কেন তাও বুঝতে পারছি না। শুনেছি 'অমৃত' পত্রিকার কর্মকর্তা বদল হয়েছেন। তিনি কি চান বাজারে আর পাঁচটা পত্রিকার প্রতি বিমুখ আমাদের মতন পাঠকরা আর একবার 'অমৃত' পত্রিকার প্রতি বিরূপ হয়ে যাক? নতুন লেখকদের মুখ দেখতে পারছি এটা খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু লেখায় যদি নতুন বিষয়বস্তু না পাই তবে ভূতের গল্প বা রাক্ষসের গল্প পড়তে দোষ কি?

অন্ততঃ আমাদের মতন পাঠক-পাঠিকারা আশা করব সম্পাদক মহাশয় এমন কিছু আমাদের পরিবেশন করবেন যা দক্ষিণ ভারতের খাদ্য সামগ্রীর মত সব কিছুতেই শুধু মাত্র টকের বাহুল্য থাকবে না। কেননা দ্বিতীয়বার 'অমৃত' পত্রিকার কাছ থেকে বিরূপ হতে মন চাইবে না। প্রদীপ বাগ, কলকাতা—২০।

অমৃত আর পড়ব না

২০ মে আপনার পত্রিকায় সুখেন্দু মল্লিক এর কবিতা, এটা কী বাজার থেকে গামছায় ভরে নিয়ে এসেছিলেন?—সুখেন্দু মল্লিকবাবু নিঃসন্দেহে আপনার সংগে ইয়েটিয়ে করে, তাই না? ওঁকে যদি কবি বলে এই মহান পত্রিকায় মৃদঙ্গ বাজান, তার চেয়ে এক পৃষ্ঠায় কবিতা না ছেপে বৈকুণ্ঠ মশাইয়ের বাড়িতে গৃহপালিত পশুর বর্ণনা দিলে বাহবা পেতেন। সেই সংগে অমিতাভ দাশগুপ্তের ন্যাকামি আর চটকদারি কৌশল সংলাপ একজন কবিতার পাঠককে গোরস্থানে নিয়ে যাবে। কবিতা নিয়ে আপনারা কী শুরু করেছেন এসব? সেদিন সেই তিন কবির কেচ্ছা আবার কাগজে ছেপেছেন। ওর থেকে সাহিত্য পত্রিকায় মশাই বৃক্ষের চাষ কাজ শুরু কোরে দিন। বোবা বোকা অশিক্ষিত মনুষ্যরা সেলাম ঠুকবে। মর্যাদা! কবিতার মর্যাদা! এটা কী বান্নাঘরের বাসী পান্তা ভাত। লজ্জা থাকা উচিত আপনার!

এদিকে সাহিত্য বিচারে বৈকুণ্ঠ পাঠক-এর ইমারত পক্ষ-এর রায়। বাঃ বাঃ, হাততালি দিচ্ছে কারা?—একটা ফাজিল-খানা বানিয়েছেন, তাই না? সাহিত্য নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যপ্রিয় এবং সুরুচির নির্দেশক। এখানে দেখতে পাচ্ছি কতোক-গুলো সস্তা শিক্ষানবীশরা আনছান লিখছেন। তার মদত দিচ্ছেন বৈকুণ্ঠ পাঠক। এক কথায় বলা যায় যে, এই সব সাহিত্যের দৃষ্টিভংগীকে আপনারা এক শ্রেণীর মধ্যে কবায়ও কোরে রেখেছেন।

ভালো কবিতা না পান। ভালো কবিকে খুঁজে বার করুন। ঠিক পেয়ে যাবেন। আর যারা নতুনরা লেখা পাঠায়, তাদের লেখা তো একবারো খুলেও পড়েন না—তাই না? হয়তো সময় নেই। —, আর অমৃত পড়বো না ভাবছি। সত্য দেবনাথ, রামনগর রোড, বনগাঁ, ২৪ পরগণা।

অমৃত আমাদের প্রিয় পত্রিকা

১৩ মের অমৃতে বৈকুণ্ঠ পাঠকের 'মহাকাল মেলের প্যাসেঞ্জার' পড়লাম। বৈকুণ্ঠ পাঠকের কাছ থেকে এরকম ছেলে-মানুষী আশা করিনি। গত ৭ মে থেকে অন্য একটি পত্রিকা তার রূপ কিছু বদলেছে। বৈকুণ্ঠ পাঠক নাম উচ্চারণ না করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আক্রমণটা সরাসরি একটি বিশেষ পত্রিকাকেই।

বহুদিন থেকেই অমৃত এবং অন্য একটি সাপ্তাহিক আমাদের সাহিত্যের তেষ্টা মিটিয়ে আসছে। দুটো পত্রিকাই পাঠকদের কাছে সমান আদরের। আপনারা নতুনদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন, সেজন্য ধন্যবাদ অবশ্যই আপনাদের প্রাপ্য। লেখা ভালো হলে পাঠক খুঁজে খুঁজে খুঁজে পড়বেন এটা 'অমৃতে' কেন গরলেও যদি পান তো পাঠক তার থেকে অমৃত তুলে নেবেন। দিয়ে ভোলাতে যাওয়া অর্থহীন কি? প্রকৃতির দিকে একবার চোখ তুলে তাকান বৈকুণ্ঠ পাঠক। সেখানে যে রূপের সমারোহ, সেকি শুধু নাবালকদের জন্যই? 'অমৃত' আমাদের প্রিয় পত্রিকা। সেখানে সাংবাদিকদের মুখ থেকে এ রকম ছেলেমানুষী অহংকারের কথা শুনলে লজ্জা হয়। বাইরের আবরণই যে সব নয়, তার প্রমাণ অমৃত। সেখানে অজস্র ছাপার ভুল থাকা সত্বেও (যদিও সেটা পীড়াদায়ক) আমরা একে আপনার করে নিয়েছি। এই ত্রুটিটা কি সংশোধন করা যায় না? মনের সঙ্গে পাঠকের চোখের দিকেও একটু দৃষ্টি দেবেন বৈকুণ্ঠ পাঠক। কৃষ্ণা গুহ, যাদবপুর, কলিকাতা—৭০০০৩২

(২)

'অমৃত' এখন দারুণ লাগছে। স্মার্ট আর ঝকঝকে। ফিচারগুলো মনে রাখার মত। বিশেষ করে কবিতার সমালোচনা, সাহিত্যের জন্য এক সিকি, ছবি এবং বইয়ের মনোজ্ঞ আলোচনা। তরুণদের লেখার অগ্রাধিকার দেখে আনন্দ পেয়েছি। জানি, অমৃত ঘরে ঘরে পৌছে যাবে। আমাদের শুভেচ্ছা রইলো। —বিমল দেব, গড়িয়া।
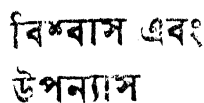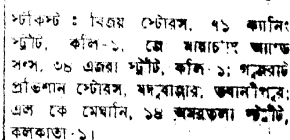
সমালোচনা

যে উপন্যাসের পাঠক গোনা যায় না

তিনি জানেন কি করে গল্প বলতে হয়।—সেই গল্প যা পাঠক পড়া শুরু করার পর শেষ পাতায় না আসা পর্যন্ত বইটা মুড়ে রাখতে পারেন না। কিছুতেই না। এবং তাঁর সাত-আটটা টাইটেল—ইত্যাদি পেজ সমেত একশো তেতাল্লিশ পাতার, আলোচ্য এই উপন্যাসটির ক্ষেত্রেও ঐ কথাটি পুরোপুরি প্রযোজ্য।

সাতাশ বছর বয়সী তরুণী মীনা। যেহেতু সে নায়িকা, সে বলাই-বাহুল্য বুদ্ধিমতী, মেধাবী সর্বোপরি দারুণ সুন্দরী। তার কিশোরী বয়সে মা স্বামীকে ছেড়ে অন্য এক পুরুষের কাছে চলে যান। ফলতঃ মীনার বাবা নষ্ট হয়ে যান, এতটা যে—মেয়ে বাইরে রাত কাটিয়ে এলেও তার উপরি আয়ের কথাতেই খুশী হয়ে উঠেন।

রজত এক যুবক। যেহেতু সে নায়ক বলাই বাহুল্য সে সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, আত্মভোলা, প্রেমিক এবং অবশ্যই পুরুষও, এবং বিত্তবান পরিবারেরই সন্তান।

যেহেতু প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ব্যাপারটা গুণবতী, সুন্দরী মেয়েদের কাছে হাতের মোয়ার মতই, সেহেতু মীনা তা সহজেই পেল, হৃত-সর্বস্ব হয়ে যাওয়া পিতার কন্যা হওয়া সত্ত্বেও। প্রতিষ্ঠিত সমাজে প্রবেশাধিকার পায় এবং সেই সমাজের কয়েকটি চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে যার মধ্যে তার ম্যালটি-মিলিওনার বস কমল গাঙ্গুলি, প্রাক্তন-বস বীরেন গুপ্ত, কমলের কাকা সমরবাবু প্রমুখেরা আছেন। নীচু-তলার মানুষরূপে এসেছে মীনার পিতৃবন্ধু ইন্সিওরেন্স-দালাল প্রমথ-কাকা প্রমুখেরা। প্রমথ-কাকা মীনার জীবনে কুগ্রহ যিনি তাকে একবার নোংরা লাইনে নামিয়েছিলেন, যিনি তার স্বামীত্যাগী মায়ের কথা তার প্রেমিকের কানে তুলে দিয়ে মীনার প্রথম প্রেমের ও বিবাহের নিশ্চিত সাফল্যের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছিলেন। ঠিক পাশাপাশি সমর গাঙ্গুলি নেপথ্যে, প্রকাশ্যে মীনার জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বিরাট ও একমাত্র সাহায্যকারীর ভূমিকায় এসেছেন। পরে মীনা তাঁর এই সহায়তার কারণ হিসেবে জানতে পেরেছে—সমরবাবুই সেই পুরুষ যার জন্যে তার মা তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং ফলতঃ তার বাবা তাদের সংসার সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এবং তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমরবাবু মীনাকে সাহায্য করে গেছেন। সমরবাবুর পরিচয় পাবার পর মীনা যথাপরিমাণেই ক্ষুব্ধ হয়ে, তাঁকে মানসিক শান্তি দিতে তাঁরই সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভাইপো রজতকে শেষ করার ব্যাপারে তার বৈমাত্রেয় ভাই কমলের পরিকল্পনার অংশ নিতে যায়। অবশ্য কমলের প্রদত্ত মোটা টাকার পারিশ্রমিকেরও লোভ ছিল। কমল রজতের শেষ চায়, সব সম্পত্তি হস্তগত করার জন্যেই। যাই হোক মীনা শেষ পর্যন্ত রজতকে শেষ করতে পারেনি: তার প্রেমে পড়ে গেছে। রজতও শেষ পর্যন্ত সে প্রেমের স্বীকৃতি দেয়। এবং মীনা-রজতের মিলন হয়ে যায়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সমগ্র কাহিনীরই সব চরিত্রই মোটামুটি সুষ্ঠুভাবেই উপস্থাপিত। সবচেয়ে বড় কথা হল কাহিনী কোথাও শ্লথগতি হয়ে পড়েনি। একটার পর একটা ঘটনা ঘটে গেছে। অবশ্যই সে ঘটনা পাঠককে টানে।—সামগ্রিকভাবে সমগ্র উপন্যাসটি পাঠককে টানবে, দারুণভাবেই। এটা নিশ্চিত।

গৌতম ভট্টাচার্য

মীনার শেষ ঠিকানা। —আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সমকাল প্রকাশনী। আট টাকা।

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস

উনিশ শতকে বাংলাদেশের নবজাগরণকে কেন্দ্র করে এপর্যন্ত প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। এইসব আলোচনায় বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই নবজাগরণকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। হালফিল আবার নামজাদা ঐতিহাসিকেরাও নেমে পড়েছেন এই নবজাগরণের নবমূল্যায়নে। দীর্ঘদিন-পোষিত চিন্তাকে তাঁরা একটা মোচড় দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের যুক্তিতর্ক দিয়ে। স্বভাবতই বলা যায়, উনিশ-শতকী বাংলার চিন্তাজগতের পরিবর্তন সম্পর্কীয় আলোচনারও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিশ শতকের সত্তর দশকে, যার সূচনা হয়েছিল ষাটের দশকেই। এই ধরণের নতুন চিন্তা-ভাবনা তথা নবমূল্যায়ণের অন্যতম ফসল শ্রীস্বপন বসুর 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস'।

লেখক ১৮২৬ থেকে ১৮৫৬ এই তিরিশ বছরের বাংলার সামাজিক, অর্থনীতিক এবং ধর্মীয় চিন্তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থটিতে। এই হিসাবে গ্রন্থটিকে বাংলার নবজাগরণের প্রথম পর্বের ইতিহাস হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। আর, এই ইতিহাস রচনায় লেখকের শ্রমনিষ্ঠার পরিচয় আছে সর্বত্র। অজস্র মূল্যবান উদ্ধৃতির মাধ্যমে তিনি তাঁর গবেষণাকে পরিপুষ্ট করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তও নিয়েছেন বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে, যদিও সব সিদ্ধান্ত সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

এই গবেষকের মতে বাংলাদেশে যথা-অর্থে নবজাগরণ বা নবচেতনা লক্ষ্য করা যায় হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর নিয়োগের পর থেকেই। সেই সময় থেকে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন চালু হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা তিনি লক্ষ্য করেছেন। বস্তুতঃ বাংলাদেশের চিন্তা-চেতার নাভিকেন্দ্র কোলকাতা এখন বিভিন্ন ঘটনা আর আন্দোলনে মুখর। লেখক সেই সব ঘটনা এবং আন্দোলনের কথা নিষ্ঠার সঙ্গে তুলেছেন এবং একটা বিচার-সহ সিদ্ধান্তে পোঁছোবার চেষ্টা করেছেন। বলা যায়, গ্রন্থটিতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উনিশ শতকের বাংলাদেশের এই সংকটময় পর্বটিকে ধরতে পেরেছেন, বিশেষতঃ এই সময়ের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস এবং সেই বিন্যাস-অনুসারী আন্দোলনের চেহারাটি যে নৈপুণ্যের সঙ্গে বিচার করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। লেখক শুধু ঘটনা-পঞ্জী উদ্ধার করে ইতিহাস রচনা করেন নি সেই সঙ্গে একটা নির্মোহ দৃষ্টিতে সবকিছুকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।

তাঁর এই বিচারগত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সর্বত্র একমত হতে পারি না। প্রথমতঃ ডিরোজিও খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন—এই বক্তব্য তথ্যভিত্তিক নয়। নব্যবাংলার নবচেতনার ঘোষক এই পরম যুক্তিবাদী মানুষটিকে আকস্মিকভাবে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ভাবার পেছনে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, তা যথেষ্ট নয়। কেন না, মৃত্যুকালের সেই দুর্বলতম মুহূর্তে কোনো এক ব্যক্তির কানে কি বলেছিলেন, তাকে তথ্য হিসাবে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বোধহয় সঙ্গত নয়।

তাছাড়া, রামমোহন সম্পর্কেও যেন লেখক একটু অসতর্ক। অবশ্য রামমোহন সম্পর্কে অনেক প্রখ্যাত ঐতিহাসিকও

ব্রন্টোসরাস

ষোল কোটি বছর আগে

অমল দাশগুপ্ত

বড়পা এই নামেই শুরু। ১৯৫৮-৫৯ সালের শীতকালে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের একদল ভূতাত্ত্বিক গবেষক দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী উপত্যকায় ফসিল খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। কাজটি বড়ো সহজ ছিল না। ফসিলের সন্ধান সাধারণত পাওয়া যায় পাথুরে পার্বত্য অঞ্চলে। ইনস্টিটিউটের গবেষকরা বাছাই করেছিলেন প্রাণহিতা ও গোদাবরী নদীর উপত্যকা। তাদের ধারণা হয়েছিল এই অঞ্চলে মধ্যজীবীয় যুগের কিছু ফসিল পাওয়া যেতে পারে, যে যুগ শুরু হয়েছিল আজ থেকে ২০ কোটি বছর আগে আর শেষ হয়ে গিয়েছে ৭ কোটি বছর আগে। বিপুল এই সময়-কাল ধরে ব্যাপ্ত এই যুগ সম্পর্কে এখনো অনেক কিছুই অজানা, ফসিল যদি পাওয়া যায় তাহলে হয়তো হারানো কোনো সূত্র পাওয়া যেতে পারে। তাই তাঁরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। নদীর ওপরে কোনো পুল ছিল না। নদী পার হতে হত ডিঙিতে, কিংবা পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে, কিংবা মোষের গাড়িতে। যেখানকার পাথরে সন্ধান চালাবার কথা সেখানে বহু বর্গ-কিলোমিটার জুড়ে ছিল ঘন জঙ্গল আর সেই জঙ্গলে হিংস্র সব জন্তু-জানোয়ার। প্রাণ হাতে করে ফিরতে হত। বাঘের ডাক শুনে ছুটে পালাতে গিয়ে পা ভাঙার ঘটনাও ঘটেছে। তবুও সেই গবেষক দল সন্ধান করে ফিরছিলেন। কিন্তু যা সন্ধান করছিলেন তা পাচ্ছিলেন না। অনেক ঘোরাঘুরি করেও অনেক কাল শুধু পাওয়া যাচ্ছিল মাছের ফসিল, আর কিছু নয়। অথচ আজ থেকে ১৬-১৭ কোটি বছর আগেকার মাছের ফসিল মোটেই অজানা কোনো ব্যাপার নয়। ইউরোপে প্রচুর পাওয়া গিয়েছে—কোনটা পমফ্রেটের মতো, কোনোটা ছোট কাৎলার মতো আরো নানা চেহারায়। আজ থেকে ১৬-১৭ কোটি বছর আগে সমুদ্রের জীবন কেমন ছিল সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি ওয়াকিবহাল। কিন্তু আজ থেকে ১৬-১৭ কোটি বছর আগে ডাঙার জীবন কেমন ছিল তা বহুলাংশেই অজ্ঞাত। গোদাবরী উপত্যকায় পাওয়া মাছের ফসিলও ইউরোপে পাওয়া ষোল কোটি বছর আগেকার মাছের ফসিলের মতো। এদিক থেকে ভারতীয় ও ইউরোপীয় ফসিলের মধ্যে বড়ো রকমের তফাৎ কিছু নেই। বরং বলা চলে, গোদাবরী উপত্যকার যে পাথর থেকে এই বিশেষ মাছের ফসিল পাওয়া গিয়েছে তারও বয়স ১৬ কোটি বছর। কিন্তু তফাৎ আছে অন্য একটা দিকে। ইউরোপের পাথর সবই সমুদ্রের, আর গোদাবরী উপত্যকার পাথর ডাঙার। গোদাবরী উপত্যকায় মাছের ফসিল সৃষ্টি হয়েছে অগভীর টাটকা জলের হ্রদের নিচে (সমুদ্রের নিচে নয়), কিংবা নদীতে। গোদাবরী উপত্যকার এইসব পাথরকে বলা হয় 'কোটা'। সেটি ছিল এক বয়সের ও ঠিক ধরনের পাথর যা থেকে মধ্যজীবীয় যুগের অজানা সূত্র পাওয়া সম্ভব। কাজটি অবশ্যই প্রচুর সময় ও কঠোর শ্রম-সাপেক্ষ।

একদিন অনুসন্ধানী দলটি ঘুরতে ঘুরতে এক গ্রামে এসে হাজির। গ্রামের নাম পোচমপল্লী, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রের সীমানায় গোদাবরী নদীর তীরে। এক জায়গায় তাঁদের চোখে পড়ল, স্থানীয় এক চাষী বর্ষার জল ধরে রাখার জন্য পাথরের চাঁই সাজিয়ে সাজিয়ে ছোট একটি বাঁধ তুলেছেন। আর সেই বাঁধের ঠিক মাঝ-খানটিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অন্য নানা পাথরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ফসিল-পাথর। চিনতে ভুল হল না, ফসিলটি শিরদাঁড়ার একটি খণ্ডের। মাপ নিয়ে দেখা গেল ২৫ সেন্টিমিটার। অনেকেই ভাবলেন, যার সন্ধান চলছিল তাই এতদিনে পাওয়া গেল বুঝি। জন্তু হিসেবে মহিষ ছোট নয়, সেই মহিষের শিরদাঁড়ার একটি খণ্ডের মাপ এদিকে-ওদিকে পাঁচ সেন্টিমিটার মাত্র। তার মানে, এমন একটি জীবের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে যার শিরদাঁড়ার একটি খণ্ড মহিষের শিরদাঁড়ার একটি খণ্ডের চেয়ে পাঁচগুণ বড়ো। এতবড়ো একটা পাথর নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকে বয়ে আনা হয়নি, এই

…রে অনুসন্ধানকারীরা আশেপাশের এলাকায় সন্ধান শুরু করে …লেন। একটা পোড়ো জমিতে এসে দেখা গেল, চারদিকে শুধুই …থর ছড়ানো। শুধুই পাথর কি? বুঝতে …টু সময় লাগল, কিন্তু বুঝতে ভুল হল না যে প্রত্যেকটি পাথর …চ্ছে ফসিল। যে-জীবের ফসিল তার শরীরের হাড় অতি প্রকাণ্ড। …খনই ধারণা হল জীবটি সম্ভবত ডাইনোসর-জাতীয়। উরুর …ড়ের ফসিল পাওয়া গেল লম্বায় দেড় মিটার। এত বড় পা!

কিছু ফসিল সংগ্রহ করে এনে কলকাতার ল্যাবরেটরিতে …রীক্ষা করে দেখা হল। এবং সুনিশ্চিতভাবেই জানা গেল ফসিলের …ড়গুলো ডাইনোসরের কঙ্কালের।

অনুসন্ধানকারীরা বুঝতে পারলেন, বিরাট এক আবিষ্কার …তে চলেছে এবং তার জন্য বিরাট এক কাজের দায়িত্বও হাতে …সেছে। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইউনিটের জিওলজিক্যাল …ডিস ইউনিটের পক্ষ থেকে খননকার্যের অভিযান শুরু করার …রিকল্পনা হতে লাগল। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ডঃ …মেলা রবিনসন গোড়া থেকেই এই কাজে নির্দেশ ও পরামর্শ …য়ে আসছিলেন। তিনিও যুক্ত রইলেন। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি …কে খননকার্যের যন্ত্রপাতির জন্য কিছু অনুদান পাওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও লোকজন সমেত অভিযান শুরু …ল ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে। আবার সেই পূর্বনির্দিষ্ট …মিতে, যেখান থেকে ডাইনোসরের কিছু ফসিল পাওয়া গিয়েছিল। …তর্কভাবে বিবেচনা করার পরে খননকার্য শুরু করার সবচেয়ে …পযুক্ত স্থানটি নির্বাচন করা হল। শুরু হল মাটি সরাবার কাজ। …ড়ির পর ঝুড়ি মাটি উঠতে লাগল। জমির মালিক সেই যে চাষী …ই একটি বাঁধ তুলে ছোট একটি জলাধার নির্মাণ করতে …য়েছিলেন তাঁর আর আনন্দের সীমা রইল না যখন দেখলেন যে …টি ক্রমেই বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত প্রায় ৮০ মিটার …ম্বা হয়ে দাঁড়াল।

খননকার্যের পরে দেখা গেল, এমন এক জায়গায় পৌঁছনো গিয়েছে যেটাকে বলা চলে ডাইনোসরদের পুরোদস্তুর এক কবর-খানা। চারদিক অজস্র ফসিল হাড়। সেই সঙ্গে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের গুঁড়ি, কোনো কোনোটা তিন-মিটার পর্যন্ত লম্বা। কাঠের গুঁড়ি ও হাড় এমনভাবে ছিল যা থেকে মনে হয় প্রাচীন নদীতে কাঠের গুঁড়িগুলো এখানে আটক পড়েছিল। আর সেই নদীর ধারে বাস করত ডাইনোসররা। হাড় ও কাঠের গুঁড়ি ঢাকা পড়ে গিয়েছিল নদীর বালুতে ও কাদায়। খননকার্য চালানো হল এই বালু ও কাদা সরাবার জন্যই।

ডাইনোসরের ফসিল-হাড় খুঁড়ে বার করার জন্য চাই অসাধারণ কলাকৌশল ও দক্ষতা—সেই সঙ্গে অবশ্যই প্রচুর সময়, ধৈর্য ও অর্থ। অধিকাংশ ফসিল-হাড়কেই দেখা যায় পাথরের মধ্যে থেকে একটুখানি বেরিয়ে থাকতে। প্রথমে সেই হাড় সম্পূর্ণ অনাবৃত করতে হয়। এ-কাজ সময়সাপেক্ষ, অনেক অনেক ঝুড়ি মাটি সরাতে হয় এজন্য। হাড়ের ওপরে লেগে থাকা মাটির শেষ পরতটি তুলতে হয় অতি ধীরে ধীরে সূচাগ্র কোনো হাতিয়ারের সাহায্যে। প্রায়ই দেখা যায় হাড়টি এক বা একাধিক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। তখন ভাঙা হাড় জোড়া লাগাবার জন্য কাঠের ঠেকা দিয়ে প্যারিস-প্লাস্টারের ব্যাণ্ডেজ করতে হয়। ডাইনোসরের অঙ্গের হাড় কখনো-বা কয়েকশো কিলোগ্রাম ওজনের হতে পারে। এই সমস্ত হাড়কে প্যারিস-প্লাস্টার দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করতে হয়, তারপরে কুশন-মোড়া দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বাক্সে ভরতে হয়, তারপরে চালান দিতে হয়।

এতখানি মেহনৎ ও কসরৎ করে ডাইনোসরের একটি কঙ্কাল যাঁরা মাটির তলা থেকে তুলে আনলেন ও কলকাতার ল্যাবরেটরিতে হাজির করলেন তাঁরা সবাই ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের জিওলজিক্যাল স্টাডিজ ইউনিটের গবেষক ও কর্মী। তাঁদের উৎসাহ দিয়েছিলেন ডঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলনবিশ ও ডঃ

পৃথিবীর বয়স

পৃথিবীর সৃষ্টি আর মানবজাতির উৎপত্তি নিয়ে চিন্তানায়কদের মতপার্থক্য বিস্তর। বৈদিক ধর্ম-গ্রন্থে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে নির্দেশ আছে। তা থেকে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকরা গবেষণার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, প্রায় দুই শত কোটি বৎসর আগে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছিল। যেদিন সূর্য বা অন্য কোন নক্ষত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর জন্ম হল, সেদিন থেকেই একটি অব্দ গণনা করছেন ভারতীয় ঋষিরা। এমনি একটি মতবাদ হল 'শ্বেতবরাহকল্পাব্দ'। সেই মতানুসারে ১৯৭৭ খৃঃ পৃথিবীর বয়স হল ১৯৭,২৯,৪৯,০৭৭ বৎসর। আর একটি মত অনুসারে পৃথিবীর জন্ম হল, যেদিন মৃত্তিকায় উদ্ভিদের সৃষ্টি হল সেদিন থেকেই। পঞ্জিকা মতে এই মতবাদ ভূমেবতীতাব্দঃ। সেই হিসাবে ১৯৭৭ খৃঃ পৃথিবীর বয়স হল ১৯৫,৫৮,৫,০৭৭ বৎসর। বায়ু পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পৃথিবীতে প্রথম মানুষের সৃষ্টিকাল উল্লেখ করা হয়েছে ৭২, কোটি বৎসর আগে। হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখ আছে বর্তমান সূর্য ও পৃথিবী সৃষ্টির আগেও ছিল অন্য সূর্য ও পৃথিবী। এক কল্পকাল টিকে থাকবার পর এইরূপে সৌর জগৎ ধ্বংস হয়ে নতুন সৌর জগৎ সৃষ্টি হয়। প্রতিটি কল্প হল চৌদ্দটি মন্বন্তরে বিভক্ত। প্রতিটি মন্বন্তর আবার বিভক্ত একাত্তরটি চতুর্যুগে। চতুর্যুগ বলতে বোঝায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের সমষ্টি। দৈব ১২০০০ বৎসর হল চতুর্যুগের পরিমাণ। আর মানুষের হিসাবে চতুর্যুগের পরিমাণ হল ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। অর্থাৎ এইরূপে একাত্তরটি চতুর্যুগের সমষ্টি মন্বন্তরের দীর্ঘতা সহজেই অনুমেয়। আর ১৪টি মন্বন্তর কাল অবস্থানের পর ধ্বংস হয় পৃথিবী ও সৌর জগৎ। বায়ু পুরাণে উল্লেখ আছে বর্তমান শ্বেতবরাহকল্পের আগে আরও ৫০টি কল্প অতিক্রান্ত হয়। শ্বেতবরাহ কল্পের আগে ছিল বিশ্বরূপ ও পদ্ম-কল্প। প্রথম কল্পের নাম ভব।

জানা যায় খৃঃ পূঃ ১০০০০ অব্দে মিশরে ছিল উন্নত সভ্যতা। মিশর শব্দটা এসেছে সংস্কৃত মিশ্র বা মৎস্য শব্দ থেকে। প্রাচীন মিশরীয়রা স্বীকার করে গেছে দক্ষিণ-পূর্ব দেশ থেকে আগত মানুষেরাই তাদের দেশে সভ্যতা বিস্তার করেছিল। আর মিশরীয়দের ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে ভারতীয়দের। সুতরাং ভারতীয় হিন্দুরাই দশ হাজার বৎসরেরও অনেক আগে গিয়ে মিশরে প্রথম সভ্যতার বিস্তার ঘটায়। আর খৃঃ পূঃ দশ হাজার বৎসরের অনেক আগে যে ভারতে উচ্চ স্তরের মানব সভ্যতা ছিল তার প্রমাণ কেবল ভারতীয় সাহিত্যে নয়, বহু বিদেশী পর্যটকদের বিবরণেও লিপিবদ্ধ আছে।

সি আর রাও, পরিচালনা করেছিলেন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের ডঃ পামেলা রবিনসন।

দশ টনেরও অধিক হাড় এসে পৌঁছল কলকাতার ল্যাবরেটরিতে। দেখা গেল, হাড়ে হাড়ে জোড়া লাগিয়ে ডাইনোসরের পুরো কঙ্কালটি খাড়া করা যেতে পারে। কঙ্কাল খাড়া করার কাজকে ইংরেজিতে বলা হয় মাউন্টিং। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, ডাইনোসরের একটি কঙ্কাল মাউন্টিং করার জন্য অন্ততপক্ষে দশ-বারো বছর সময় দরকার। অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছেন গবেষক-দলের অন্যতম শ্রীপ্রণবকুমার মজুমদার। এই মাউন্টিং-এর উচ্চপ্রশংসা করে গিয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত পুরাজীব-বিজ্ঞানী ডঃ এডউইন এইচ কোলবার্ট, যিনি ১৭-২২ জানুয়ারি ১৯৭৭ তারিখে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক গোণ্ডয়ানা সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন।

মাউন্টিং-এর পরে দেখা গেল দাক্ষিণাত্য থেকে পাওয়া প্রথম ভারতীয় ডাইনোসরটি ১৮ মিটারেরও অধিক লম্বা। উচ্চতায় সাড়ে তিন মিটারেরও অধিক। বিশেষ একটি কামরা তৈরি করা হয়েছে তার ঠাঁই করার জন্য। বিরাট এক ডাইনোসর—বড়ো বড়ো পা। ডাইনোসরটির নাম দেবার সময়ে এই লক্ষণটি কেই ধরে রাখা হয়েছে—'বড়পা'। যেহেতু ডাইনোসর, অতএব 'সরাস'। দুয়ে মিলিয়ে 'বড়পাসরাস'। আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৬১ সালে, রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর বছরে। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর নামটিও এই নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অতএব, পুরো নাম 'বড়পাসরাস টেগোরাই'।

বলা হচ্ছে, এই ডাইনোসরটি ষোল কোটি বছর আগেকার। ভূ-বিজ্ঞানীরা যে-সময়কালকে বলেন 'জুরাসিক' তার গোড়ার দিকের। ডাইনোসরের ফসিল বিশ্বের নানা অংশেই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু জুরাসিক কালের গোড়ার দিকের ডাইনোসর অতি-মাত্রায় বিরল। এই কারণে আবিষ্কারটি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে প্রথমত জানা যাবে ডাইনোসরদের আদি ইতিহাস। দ্বিতীয়ত জানা যাবে গোণ্ডয়ানাল্যাণ্ডের ভাঙচুর সম্পর্কে কিছু তথ্য।

গোণ্ডয়ানাল্যাণ্ড কোথায়? জুরাসিক কাল কখন? ডাইনোসর কী? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে কিছুটা আলোচনা করলে গোটা বিষয়টি বুঝতে সুবিধে হয়। সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি।

জীবন্ত প্রাণীর কাল

আমাদের এই পৃথিবীর বয়স প্রায় ৫০০ কোটি বছর। আর পৃথিবীতে মানুষ এসেছে দশ লক্ষ বা বড়োজোর কুড়ি লক্ষ বছর আগে (সম্প্রতিকালে আফ্রিকায় আবিষ্কৃত মানুষের ফসিল থেকে ধারণা করা হচ্ছে কুড়ি লক্ষ বছর)। মানুষের ইতিহাস পুরোটা কি আমরা জানি? না। মানুষের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে হাজার পাঁচেক বছরের। তার আগের কালের মানুষ সম্পর্কে আমরা জেনেছি তার ফসিল থেকে, তার ব্যবহার করা হাতিয়ার ও অন্য নানা নিদর্শন থেকে। পুরোপুরি জানা অবশ্য নয়, তবুও অনেকটাই। যেমন, আমরা বলতে পারি, আজ থেকে ছ-লক্ষ বছর আগে বিরাট এক হিমযুগ চলছিল ও মানুষ তখন লোমশ গণ্ডার ও গুহা-ভালুক শিকার করত। মানুষের লিখিত ইতিহাসের কালকে আমরা চিহ্নিত করি বিখ্যাত কোনো রাজা বা মহাত্মা বা যোদ্ধার নামে। আর লিখিত ইতিহাসের আগে মানুষের অস্তিত্বের কালকে চিহ্নিত করি মানুষ কোন সময়ে কি হাতিয়ার ব্যবহার করেছে তাই দিয়ে। কিন্তু এত করেও কতটুকু সময়কালকে ধরা গেল? দশ লক্ষ

বা বড়ো জোর কুড়ি লক্ষ বছর। কিন্তু পৃথিবী রয়েছে পাঁচশ কোটি বছর ধরে। আর পৃথিবীর সমুদ্রে প্রাণের উদ্ভবের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আজ থেকে দুশো কোটি বছর আগে। পৃথিবীতে জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব অন্তত ৬০ কোটি বছর আগে থেকে। পৃথিবীর জীবনের ইতিহাসে মানুষ কতটুকু অংশ জুড়ে আছে? প্রায় কিছুই নয়। জীবের অস্তিত্বকালকে যদি ঘড়ির বারোটি ঘণ্টা হিসেবে কল্পনা করি তাহলে মানুষ এসেছে মাত্র বারো সেকেণ্ড আগে। কাজেই জীবের অস্তিত্বকাল সম্পর্কে জানতে হলে মনুষ্যেতর জীবের দিকেই তাকাতে হয়।

তখন ধরা পড়ে, বিগত পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে নানা ধরনের জীব পৃথিবীতে বাস করে গিয়েছে এবং জীবের লক্ষণ দিয়ে এই সময়কালকেও চিহ্নিত করা চলে।

তিনটি বড়ো রকমের ভাগ করা হয়েছে—নবজীবীয় (সাইনোজোয়িক), মধ্যজীবীয় (মেসোজোয়িক) ও পুরাজীবীয় (প্যালিওজোয়িক)। এক-একটি ভাগ এক-একটি যুগ। নবজীবীয় হচ্ছে স্তন্যপায়ীদের যুগ, সাত কোটি বছর আগে শুরু, যা এখনো চলছে। মধ্যজীবীয় হচ্ছে সরীসৃপদের যুগ, কুড়ি কোটি বছর আগে শুরু হয়ে সাত কোটি বছর আগে শেষ। পুরাজীবীয় হচ্ছে আদিম প্রাণীদের যুগ, পঞ্চাশ কোটি বছর আগে শুরু, কুড়ি কোটি বছর আগে শেষ।

প্রত্যেকটি যুগকে কতকগুলো পিরিয়ড বা কালে এবং ইপোক বা পর্বে ভাগ করা হয়েছে। নবজীবীয় যুগের কাল দুটি—কোয়াটারনারি ও টার্শিয়ারি। পর্ব ছ'টি—হোলোসিন, প্লাইস্টোসিন, প্লাইওসিন, মাইওসিন, ওলিগোসিন, ইওসিন ও প্যালিওসিন। মধ্যজীবীয় যুগের কাল তিনটি—ক্রিটাশাস (১১ কোটি বছর আগে শুরু), জুরাসিক (১৭ কোটি বছর আগে শুরু), ট্রায়াসিক (২৯ কোটি বছর আগে শুরু)। পুরাজীবীয় যুগের কাল ছটি—পার্মিয়ান, কার্বনিফেরাস, ডেভোনিয়ান, সিলিউরিয়ান, অর্ডোভিসিয়ান ও ক্যামব্রিয়ান। শেষোক্তকালের শুরু ৬০ কোটি বছর আগে। তারও আগের কালকে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান।

এখানে লক্ষ করার বিষয়, যুগের বিভাগটি জীবনের লক্ষণ থেকে, কিন্তু কালের বিভাগটির সঙ্গে জীবের কোনো সম্পর্ক নেই—সম্পর্ক শিলাস্তরের। জীববিজ্ঞানীরা শিলাস্তরের বিন্যাসের হিসেব থেকে এক-একটি যুগকে কতকগুলো কালে ভাগ করেছেন

পৃথিবীতে যখন থেকে সমুদ্র রয়েছে তখন থেকেই সমুদ্রের জলের সঙ্গে ও অন্য নানাভাবে ধুলো ও মাটি সমুদ্রের জলে পড়ছে। এই ধুলো ও মাটি সমুদ্রের তলদেশে থিতিয়ে পড়ে ও পাললিক শিলা হয়ে ওঠে। এমনিভাবে সমুদ্রের তলদেশে স্তরের পর স্তর পাললিক শিলা তৈরি হয়। স্তরবিভক্ত পাললিক শিলার অন্য নাম স্তরীভূত শিলা। কোন স্তর কতখানি পুরু, তা থেকে বয়সের একটা হিসেবও পাওয়া সম্ভব।

অধিকাংশ ফসিল পাওয়া যায় এই স্তরীভূত শিলা থেকে। যে স্তর যতো প্রাচীন সেই স্তর ততো নিচে। কোন বিশেষ স্তর থেকে ফসিল পাওয়া গিয়েছে তা থেকে ফসিলের বয়স সম্পর্কেও ধারণা হতে পারে।

তার মানে, আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর জীব জগতের ইতিহাস এই পৃথিবীরই শিলার স্তরে স্তরে যেন লেখা হয়ে আছে বিরাট মোটা একটা বইয়ের মতো। তবে দুঃখের বিষয়, এই বইয়ের অনেকগুলো পৃষ্ঠা হারিয়ে গিয়েছে, কখনো-বা পুরো এক একটি অধ্যায়।

তার কারণ, ফসিল খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত। [illegible] কোটি বছরের সমস্ত জীব মরার পরে ফসিল হয়েছে এমন [illegible] পারে না। কোটি কোটি জীবের মধ্যে ফসিল হয়েছে একটি কি দুটি, বিশেষ কতকগুলো শর্ত পূরণ হবার পরে। কিন্তু সেই ফসিল হয়তো এমন এক গভীর শিলাস্তরে থেকে গেল যে কোনো [illegible] [illegible] পাওয়ার নয়। কিংবা পৃথিবীর উপরিতলের [illegible] [illegible] সেই ফসিল হয়তো [illegible] [illegible] যেখানে সেখানে মাটি কোপালেই ফসিল পাওয়া যায় না। [illegible] বিবেচনা করে অনেক ধৈর্য নিয়ে ফসিলের সন্ধান [illegible] সন্ধান সফল হবে কিনা সেটা অনেকটা ভাগ্যের উপরে নির্ভর করে।

[illegible] ইনস্টিটিউট [illegible] [illegible] হবে। তাঁরা এমন এক [illegible] [illegible] [illegible] বিবরণ শিলার স্তরে স্তরে লেখা [illegible] [illegible] একটা ফাঁক পূরণ করবে [illegible]

শিলার স্তরে স্তরে লেখা এই বইয়ের [illegible] [illegible] আগে শুরু হয়নি। [illegible] [illegible] ফসিল কি তার আগে পাওয়া [illegible] [illegible] নিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক [illegible] [illegible] গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিবর্তনবাদ স্বীকৃতি লাভ করে। তারপর থেকেই ধারণা হয় যে ফসিল হচ্ছে অতীতের জীবন্ত প্রাণীদের নিদর্শন। অতীতের জীবজগতের একটি ছবি দাঁড় করাতে হলে এই ফসিলের চিহ্ন ধরে ধরেই এগোতে হবে।

তাহলে এই ফসিলের চিহ্ন ধরে এগিয়েই ডাইনোসরদের জগতের দিকে তাকানো যাক।

জলে থেকে ডাঙায়

ত্রিশ কোটি বছর আগেও পৃথিবীর সমস্ত জীব বাস করত সমুদ্রে। ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের মাছ নদীতে ও উপসাগরে এসেছিল এবং টাটকা জলে বাস করতে শুরু করেছিল। এমনিভাবে পুকুর হ্রদ ও খালবিল হয়ে উঠেছিল মাছের আস্তানা।

তারপরে ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটেছিল বলা শক্ত। হয়তো বছরের কোনো সময়ে পুকুর ও খালবিল শুকিয়ে যেত। কাদায় আটক পড়ে যেত মাছগুলো, সাঁতার কাটতে পারত না। এই অবস্থায় মাছগুলো বেঁচে থাকত কি করে? সবাই নয়, বাঁচত শুধু তারাই যাদের শরীরে ফুসফুসের আয়োজন ছিল। অর্থাৎ, বাতাস থেকে নিঃশ্বাস নিতে পারত (এমনি ফুসফুসওয়ালা মাছ এখনো আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় দেখতে পাওয়া যায়, তারা বাতাস থেকে নিশ্বাস নিতে পারে)। বেঁচে থাকত বটে কিন্তু ডাঙায় নড়াচড়া করা সেই ফুসফুসওলা মাছেদের পক্ষেও কষ্টকর ছিল। কিছুটা নড়াচড়া করতে পারত একমাত্র তারাই যাদের পাখনার জোর ছিল। মাছের শরীরে দু-জোড়া পাখনা থাকে, জলের মধ্যে এই দু-জোড়া পাখনার সাহায্যেই মাছের চলাফেরা। কিন্তু ডাঙায় এই পাখনা অচল। মাছের পাখনায় থাকে সারি সারি কাঁটা, পর্দা দিয়ে [illegible] কাঁটাগুলো সরাসরি মাছের শরীর থেকেই বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই প্রাচীন ত্রিশ কোটি বছর আগে কোনো [illegible] মাছের পাখনা [illegible] ছিল অন্যরকম। শরীর থেকে [illegible] বেরিয়ে আসা কাঁটা নয়, প্রথমে এক ঢিবি [illegible] সেই মাংস থেকে কাঁটা। আর ঢিবিও শুধুই মাংসের নয়, তার মধ্যে হাড়গোড়ও। এমনি ঢিবি-পাখনাওলা মাছ, নাম সীলা-কান্থ সম্প্রতি [illegible] দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্র-উপকূল থেকে ধরা পড়েছে। সেই যুগে এই ঢিবি পাখনাওলা মাছের জল শুকিয়ে গেলেও মাটি ঘষটে চলাফেরা করতে পারত, এক জায়গার জল

চার কোটি বছর আগে

কেন্টাকিতে মাটির নীচে পাওয়া গেছে তিন-চার কোটি বছর আগেকার [illegible] পাথরে বাঁধানো পথ। প্রায় দেড় কোটি বছর আগে নেভাডার ফিসার ক্যানিয়নের কয়লার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল জুতো পায়ে মানুষ। এই ছাপও আছে গোবি মরুভূমির বেলে-পাথরের স্তরে। উটার ডেল্টায় অনুরূপ জুতোর ছাপের ওপর পাওয়া গেছে জলজপ্রাণী ট্রাইলোবাইটের কঙ্কাল। তানজানিয়া, কেনিয়ায় মানুষ ছিল [illegible] [illegible] বছর আগে। প্রায় পাঁচ শত লক্ষ বছর আগে মানুষকে আগুন জ্বালাতে শিখিয়েছিল প্রমিথিউস। কয়েক লক্ষ বছর আগেকার একটি [illegible] পাওয়া গেছে ইতালির খনিতে। ৪৫০০০ বছর আগে রোডেশিয়ার লোহার খনি থেকে বের করা হত লোহা। উটার ওয়াটিসের কয়লা খনি এত পুরোনো তা এখন সম্পূর্ণ ব্যবহারের অযোগ্য। ক্যালিফোর্নিয়ায় পাওয়া স্ফটিকের মধ্যে লোহার পেরেক, নেভাডার খনিতে স্টেনলেস পাথরে গাঁথা [illegible], অস্ট্রিয়া সোয়োডর্ফ গ্রামের কয়লা খনি থেকে পাওয়া মিহি কোণে কাটা ফলের মত একটা জিনিস, [illegible] কয়লা খনিতে পাওয়া লোহার পেরেক লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার মানব সভ্যতার নিদর্শন। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগেকার মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে জাম্বিয়ার একটি গুহায়। খুলিতে আছে বন্দুকের গুলিতে বিদ্ধ হওয়ার অনুরূপ ফুটো। একরকমভাবে ফুটো হওয়া একটি বাইসনের খুলি আছে মস্কো যাদুঘরে। এই খুলিটা অন্তত দশ হাজার বছর আগেকার। পারমাণবিক [illegible] ব্যবহারের নিদর্শন আছে পৃথিবীর সর্বত্র। ইরাকে, মঙ্গোলিয়ায়, সাইবেরিয়ায় এবং কলোরেডোয়। [illegible] পারমাণবিক [illegible] ব্যবহারে সৃষ্টি হয়েছিল পথ, মরুভূমি এইভাবে সম্ভবত ধ্বংস হয় মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পা। [illegible] কারণ ওখানে পাওয়া কঙ্কাল ভয়ংকরভাবে তেজস্ক্রিয়।

শুকিয়ে গেলে অন্য জায়গার জলে চলে যেত। তারপরে আস্তে আস্তে এই ঢিবি-পাখনা আরো বড়ো ও আরো জোরদার হতে থাকে। শেষকালে একসময়ে এই ঢিবি-পাখনা হয়ে ওঠে না। এমনিভাবে জলের মাছ হয়ে ওঠে ফুসফুস ও পা-ওলা ডাঙার জীব। কিন্তু তখনো পুরোপুরি ডাঙার জীব নয়। ডিম পাড়বার জন্য তাদের যেতে হত সেই জলেই ডিম থেকে ছানা বড়ো না হওয়া পর্যন্ত জলেই থাকত।

এ জীবদের আমরা বলি উভচর—তারা জলেরও বটে, ডাঙারও বটে। উভচর জীবের দৃষ্টান্ত এখনো আছে—যেমন, ব্যাঙ। আরো সময় পার হয়। উভচর জীবদের পা ও শিরদাঁড়া আরো শক্ত হয়। তখন আর তাদের ঘষটে ঘষটে চলতে হয় না। পায়ে হেঁটেই চলাফেরা করে। তবুও ডিম পাড়বার প্রয়োজনে জলের ধারেই থাকতে হয় তাদের। ওদিকে পৃথিবীর উপরিভাগেও বড়ো রকমের অদলবদল হয়ে চলছিল। জলের নিচের জমি হয়ে উঠেছিল উঁচু ডাঙা, জলাভূমি শুকিয়ে যাচ্ছিল। এমনি সময়ে উভচর জীবদের জীবনে বড়ো রকমের একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। তারা ডিম পাড়তে শুরু করে শক্ত খোলার মধ্যে। সেই শক্ত খোলার মধ্যে যেমন থাকে ভ্রূণ তেমনি তার প্রয়োজনীয় জল ও খাদ্য। ছানা বড়ো হলে তবেই বেরিয়ে আসে ডিমের খোলা থেকে।

এই পরিবর্তন ঘটে যাবার পরে উভচর জীবদের পক্ষে জলের কাছাকাছি থাকার আর কোনো বাধ্যবাধকতা থাকল না। শুকনো ডাঙাতেও তারা ডিম পাড়তে পারে, যেখানে খুশি যেতে পারে। তারা হয়ে ওঠে পুরোপুরি ডাঙার জীব, এক নতুন ধরনের জীব। এই জীবদেরই আমরা বলি সরীসৃপ।

মধ্যজীবীয় যুগ এই সরীসৃপদেরই যুগ। কিছু কিছু সরীসৃপ এখনো থেকে গিয়েছে—গিরগিটি, সাপ, কুমির, কাছিম ইত্যাদি।

থেকোডোন্ট

সরীসৃপরা কেউ খায় মাংস, কেউ গাছপালা। কে কি-ভাবে থাকছে ও কী খাচ্ছে তারই দরুন আস্তে আস্তে তাদের শরীরের গড়নও বদলিয়েছে।

যারা মাংস খায় তাদের আমরা বলি মাংসাশী। শিকার করতে হয় তাদের, তাই তারা হিংস্র। মাংস ছিঁড়েকেটে খেতে হয়, তাই তাদের দাঁত ধারালো ও লম্বা। শিকারের পেছনে ধাওয়া করতে হয়, তাই তাদের পা ক্ষিপ্র।

যারা গাছপালা খায় তাদের আমরা বলি তৃণভোজী। তাদের প্রকৃতি হয় শান্ত, দাঁত হয় ঘাসপাতা চিবোবার পক্ষে উপযোগী চ্যাটালো ও থ্যাবড়া, আস্তে আস্তে পরিপাক করার জন্য পাকস্থলী হয় বিরাট।

কোনো কোনো সরীসৃপের বেলায় দেখা গেল, তাদের চোয়ালের হাড়ে গভীর কোটর রয়েছে আর তাদের দাঁত সেই কোটরের মধ্যে আঁটোসাঁটোভাবে বসানো। বিজ্ঞানীরা কুড়ি কোটি বছর আগেকার এই জাতীয় সরীসৃপদের গোটা দলকে নাম দিলেন 'থেকোডোন্ট'। কথাটার অর্থ 'কোটরবদ্ধ দাঁত'।

এই থেকোডোন্টরা বেশির ভাগই ছিল ছোট ছোট জীব। তাদের শরীরের হাড় হালকা। দাঁত ধারালো। পিছনের দুটি পা শক্তসমর্থ। পিছনের দুটি পায়ে ভর দিয়ে শরীরের সামনের অংশ মাটি থেকে তুলতে পারত। ক্ষিপ্র দৌড়তে পারত। ফলে বেঁচে থাকার সংগ্রামে সফল এই জীবদের [illegible]।

আর এই থেকোডোন্টদের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এসেছিল ডাইনোসররা।
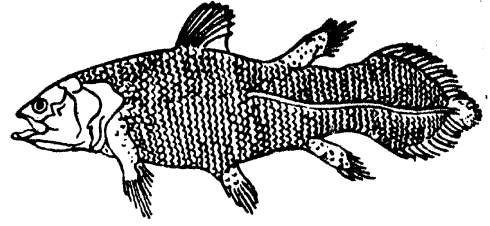
ডাইনোসর

ডাইনোসর কী? বিজ্ঞানীরা যখন এমন সব জীবের ফসিল-হাড় পেতে লাগলেন যারা আকারে অতি প্রকাণ্ড, তখন ভেবেই পেলেন না জীবগুলো কী হতে পারে। অথচ সেই হাড়ের গড়ন একালের গিরগিটির (লিজার্ড) হাড়ের মতো। যদিও গিরগিটির চেয়ে অনেক অনেক বড়ো। বিজ্ঞানীরা অজানা এই জীবদের নাম দিলেন 'ভয়ংকর গিরগিটি' বা ডাইনোসর। দুটি গ্রীক শব্দ থেকে নামটি তৈরি—'ডাইনোস' (ভয়ংকর) ও 'সরোস' (গিরগিটি)।

তাই বলে ডাইনোসররা কদাচ গিরগিটি নয়। সবাই যে ভয়ংকর তাও নয়। সবাই যে আকারে প্রকাণ্ড তাও নয়। সবাই যে একই দলের তাও নয়।

ডাইনোসরদের দল আছে দুটি। ক্ষিপ্রগতি, হালকা-হাড়, 'কোটরবদ্ধ দাঁত' সেই সরীসৃপদের থেকে শুরু। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পেছনের দু-পায়ে ছুটত কেননা সেটাই তাদের পক্ষে সুবিধের ছিল। সামনের দুটি পা তারা ব্যবহার করত খাদ্য তুলে নেবার জন্য। বহু হাজার বছর এমনি চলতে চলতে এই সরীসৃপদের সামনের পা দুটি আরো ছোট হয়ে গিয়েছিল। শরীরের ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে সেজন্য লেজটি প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছিল।

যে জীব পিছনের দু-পায়ে দৌড়য় তার শরীরের ভার থাকে ওই দুটি পায়ের ওপরেই। অতএব পা-দুটি থাকা দরকার শরীরের নিচের দিকে, যেমন থাকে পাখির। টিকটিকি বা গিরগিটির মতো পা-দুটো যদি শরীরের পাশ থেকে বেরিয়ে আসত তাহলে ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের হত না। পা-দুটো শরীরের নিচের দিকে থাকার দরুন তাদের পায়ের ও কোমরের মাংসপেশী এবং এমনকি কোমরের হাড়ও বদলে গিয়েছিল।

পিছনের দু-পায়ে হাঁটা চলতে চলতে কালক্রমে তাদের কোমরের হাড় বা শ্রোণীচক্রের গড়ন হয়ে উঠেছিল পাখির মতো। এই হল গিয়ে ডাইনোসরদের একটি দল, বলা যেতে পারে 'পাখি-কোমর' ডাইনোসর। পাখি-কোমর হওয়ার বিশেষত্ব এই যে পায়ের হাড় ও শিরদাঁড়া যাতে খুব শক্তভাবে কোমরের হাড়ের সঙ্গে এঁটে থাকতে পারে তার একটা নিপুণ আয়োজন কোমরের হাড়ে থাকে। পাখি-কোমর এই ডাইনোসরদের বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন অর্নিথিস্কিয়া।

অন্য ডাইনোসরদের কোমরের হাড়ের পরিবর্তন ঘটেছিল ভিন্নভাবে। এই হল গিয়ে ডাইনোসরদের ভিন্ন একটি দল, বলা যেতে পারে 'সরীসৃপ-কোমর' ডাইনোসর। বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন সরিস্কিয়া।

এবারে তাহলে ডাইনোসরদের বংশধারার একটি ছবি আঁকা যেতে পারে। একেবারে গোড়ায় থেকোডোন্ট। তার দুটি প্রধান শাখার একদিকে পক্ষীসদৃশ শ্রোণীচক্রের ডাইনোসর, অন্যদিকে

সরীসৃপসদৃশ শ্রেণীচক্রের ডাইনোসর। পাখি-কোমর থেকে বেরিয়েছে অর্নিথোপড বা হাঁস-ঠোঁট ডাইনোসর, অ্যাংকাইলোসরাস বা বর্মযুক্ত ডাইনোসর, সেরাটোপ্‌সিয়ান বা শৃঙ্গযুক্ত ডাইনোসর, স্টেগোসরাস বা অস্থিমালাযুক্ত ডাইনোসর। সরীসৃপ-কোমর থেকে বেরিয়েছে সরোপড বা অতি-বৃহৎ আকারের উভচর ডাইনোসর, থেরোপড বা মাংসাশী ডাইনোসর।

প্রধান শাখা এই দুটি—ডাইনোসরের। এ ছাড়া আরো তিনটি শাখা থেকে গিয়েছে—একটি উড়ন্ত সরীসৃপের দিকে, একটি আদি পাখির দিকে, একটি কুমিরের দিকে।

ডাইনোসরদের জগতে

আজ থেকে ষোল কোটি বছর পিছিয়ে জুরাসিক কালের একটি ছবি কল্পনা করা যাক।

তীর-ভূমিতে ছলাৎ ছলাৎ জল আছড়ে পড়ছে। অগভীর হ্রদে ও সমুদ্রে ঢাকা পড়েছে অধিকাংশ স্থলভাগ। রোদের তেজ কড়া। জলের ওপরে ঝাপ্‌সা বাষ্প। ভ্যাপ্‌সা গরম। আবহাওয়া উষ্ণ। চারদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ-পাম ও ফার্ণের মতো। মাটিতে ঘন সবুজ উদ্ভিদ।

একটা গাছের চুড়োয় পাখির ডানার মতো কী যেন নড়ছে মনে হয়। পাখিই বটে, কিন্তু আকাশে উড়ে বেড়ায় না। ডানার নখরের সাহায্যে গাছের গা বেয়ে বেয়ে ওপরে ওঠে। নিচে পড়তে পড়তে কখনো-বা ডানা মেলে হাওয়ায় গা ভাসায়।

এই হচ্ছে 'প্রাচীন ডানা' বা আর্কিওপ্‌টেরিক্‌স। প্রথম সত্যিকারের পাখি। আকারে পায়রার মতো।

যদিও পাখি কিন্তু আর্কিওপ্টেরিকস-এর পায়ে এখনো আঁশ আছে, মুখে দাঁত। লেজটি হাড়ের ও সরীসৃপের মতো প্রকাণ্ড লম্বা। কিন্তু সেই লেজে পালক আছে। আর্কিওপ্টেরিকস যদিও পাখি কিন্তু সেটি বেরিয়ে এসেছে সরীসৃপ থেকে। জুরাসিক কালেই প্রথম দেখা যাচ্ছে উড়ন্ত সরীসৃপ শুধু নয়, সত্যিকারের পাখিও।

একটা ডাইনোসর ছুটে আসছে, পাখিটার প্রাণ যায় বুঝি। ডাইনোসরটাকে বলা হয় 'পাখি-চোর' বা অর্নিথোলেসটিস। লম্বায় দেড় মিটার, হাল্‌কা শরীর, লম্বা পা। সামনের পা-দুটো ছোট, পায়ের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা। নিঃশব্দে ছুটে এসে লম্বা লম্বা আঙুলে দিয়ে পাখি ধরতে পারে। পাখিটা কিন্তু এ-যাত্রায় বেঁচে গেল।

পাখি-চোর ডাইনোসরের নাগালের বাইরে জলের ওপরে উড়ে বেড়াচ্ছে আরো একটি জীব, নাম 'গলুই জীব' বা র‍্যামফোরিংকাস। এটি পাখি নয়, উড়ন্ত সরীসৃপ। ডানায় পালক নেই, তার জায়গায় চামড়া। র‍্যামফোরিংকাসের ডানায় একটি আঙুল অনেক বড়ো, সেই আঙুলের সঙ্গে চামড়া লাগানো, চামড়ার অন্য দিক র‍্যামফোরিংকাসের পা বরাবর আঁটা। আঙুল তুললেই ডানা তৈরি হয়ে যায় আর র‍্যামফোরিংকাস তখন হাওয়ায় গা ভাসিয়ে উড়তে পারে। মাঝে মাঝে ঝাঁপ দেয় জলের ওপরে, তারপরেই দেখা যায় বড়ো দাঁত দিয়ে চকচকে একটা মাছ ধরে আছে।

র‍্যামফোরিংকাস অদৃশ্য হয়ে যেতেই সমুদ্রের জল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে ছুঁচলো একটি নাক। তারপরে যে জীবটিকে দেখা যায় সেটিকে মনে হতে পারে মুখভর্তি ধারালো দাঁতওলা প্রকাণ্ড একটি মাছ। আসলে সরীসৃপ। এটিকে বলা হয় 'মেছো গিরগিটি' বা ইকথিওসরাস। এই সরীসৃপটি ডাঙা থেকে সমুদ্রে ফিরে এসেছে। তবুও কিন্তু ফুসফুস দিয়ে বাতাস থেকে নিঃশ্বাস নেয়, মাছের মতো কানকো এদের নেই। মাছের মতো ডিমও [illegible] না। [illegible] মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে।
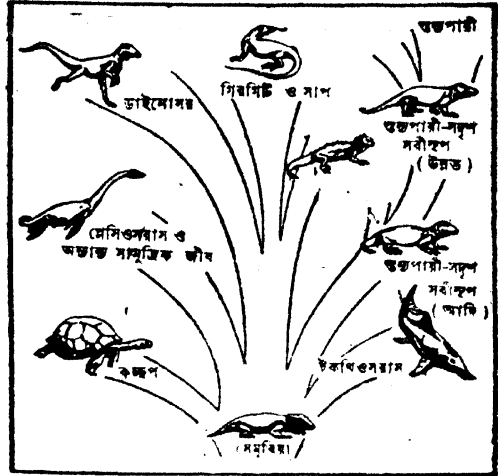
আরো একটি সরীসৃপ সমুদ্রে ফিরে গিয়েছে। নাম 'হ্রদ-গিরগিটি' বা জিওসরাস। সামুদ্রিক কুমিরও বলা হয়ে থাকে। আজকের দিনের কুমিরের সঙ্গেও এই কুমিরের সম্পর্ক আছে।

এবারে নদীপথ ধরে আরো ভিতরের দিকে যাওয়া যাক। জল অগভীর আর সেই জলের ওপরে জেগে আছে একজোড়া চোখ ও একজোড়া নাকের ফুটো। নাকের ফুটোর চারদিকে হাড় উঁচু হয়ে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

এই হচ্ছে 'বিশাল বাহু' ডাইনোসর বা ব্রাকিওসরাস। ডাইনোসরদের মধ্যে এই ব্রাকিওসরাসের ওজন সবচেয়ে বেশি—প্রায় পঞ্চাশ টন। তার গলা প্রকাণ্ড লম্বা ও প্রচণ্ড ভারী। গলা তুললে তার মাথা গাছের চুড়ো ছাড়িয়ে যায়। পিছনের দুটি পায়ের চেয়ে সামনের দিকের দুটি পা বা বাহু আরো বেশি লম্বা ও আরো বেশি ভারী। 'বিশাল বাহু' বা ব্রাকিওসরাস নামও এই কারণে।

ব্রাকিওসরাসের শরীর এত ভারী যে থামের মতো চারটি পায়ের ওপরে ভর রেখেও ঠিক যেন সামলাতে পারে না। এই কারণে অধিকাংশ সময় জলে গা ডুবিয়ে থাকে। জলের মধ্যে শরীরটা হালকা হয়ে যায়, তাতে তার সুবিধে।

তাছাড়া, জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে থাকলে শত্রুর চোখ এড়ানো যায়। ব্রাকিওসরাস তাই এমন জলাভূমিতে থাকতে ভালোবাসে যেখানে প্রচুর জলজ উদ্ভিদ পাওয়া যায়। গলাটি লম্বা, তাই বহুদূর পর্যন্ত গলা বাড়িয়ে সেই উদ্ভিদ মুখে তুলতে কোনো অসুবিধেই নেই। ডাঙায় উঠে এলে ব্রাকিওসরাসের পক্ষে অত বড়ো শরীরটা নিয়ে চলাফেরা করা খুবই কষ্টকর। আক্রান্ত হলে ছুটে পালাতে পারে না। বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করবে সেই বুদ্ধিও তার নেই—তার ছোট্ট মাথায় ঘিলু ছিটেফোঁটা।

ব্রাকিওসরাস তাই চায় নিরুপদ্রব কোনো জলাশয়ে শান্ত জীবন। প্রচুর উদ্ভিদ থাকবে তার নাগালের মধ্যে। সারাক্ষণ সে শুধু খেয়েই চলবে। খেতে তার সময় লাগে, আর অত বড়ো শরীরটার পুষ্টির জন্য খাওয়াও চাই প্রচুর।

প্রায় একই দশা আরো একটি তৃণভোজী ডাইনোসরের, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ডবল বীম' বা ডিপ্লোডোকাস। এটি লম্বায় সোয়া-ছাব্বিশ মিটার পর্যন্ত হতে পারে, তবে ওজনে ২৫ থেকে ৩৫ টনের মধ্যে। লেজটি অতি প্রকাণ্ড। ডাঙায় চলাফেরা করার সময়ে এই লেজের সঙ্গে ভারসাম্য রাখার জন্য গলাটি সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতে হয়। তবে চলাফেরা করাটা তার তেমন পছন্দ নয়। তার মাথা ছোট, মুখ ছোট, দাঁত দুর্বল। অল্প অল্প করে অনেক

খেতে হয়। প্রকাণ্ড শরীরটার পুষ্টির জন্য সারাদিন সে শুধু খেয়েই চলে।

এমনি অতিকায় শরীরের আরো একটি তৃণভোজী ডাইনোসরকে একই সময়ে দেখা যাচ্ছে। তার নাম 'বজ্র গিরগিটি' বা ব্রন্টোসরাস। লম্বায় ২০ মিটারেরও বেশি, ওজনে ৪০ টন। জলে থাকতেই ভালোবাসে, অত বড়ো শরীর নিয়ে জলে থাকাটাই তার পক্ষে সুবিধের। শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে দিন কাটাতে চায়।

তবুও মাঝে মাঝে ডাঙ্গায় উঠতেই হয়, আর কিছুর জন্য না হোক অন্তত ডিম পাড়বার জন্য। আর তখনই হয়তো মাংসাশী এক ডাইনোসরের শিকার হয়ে পড়ে। এমনি এক শিকারী ডাইনোসর হচ্ছে অ্যাল্লোসরাস।

অ্যাল্লোসরাসের সারা গা বড়ো বড়ো আঁশে ঢাকা, মুখের হাঁ মস্ত, সারি সারি ধারালো দাঁত। পিছনের দু-পায়ে ভর রেখে চলাফেরা করে। মাটি থেকে মাথার উচ্চতা প্রায় চার মিটার। সামনের দুটি পা খুবই ছোট।

অ্যাল্লোসরাসের নজরে পড়ে গেলে ব্রন্টোসরাসের আর রক্ষা নেই। চল্লিশ টন ওজনের শরীর নিয়েও ব্রন্টোসরাস অ্যাল্লোসরাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না।

এই হচ্ছে ষোল কোটি বছর আগেকার জুরাসিক সময়কালের কয়েকটি ডাইনোসর। সকলেই অতি প্রকাণ্ড। সেখানে সব সময়েই চলেছে প্রচণ্ড হানাহানি। পাহাড়ের মতো বিশাল এক-একটা জীব মাটি কাঁপিয়ে দাপাদাপি করত।

তবুও শুধু ডায়নোসররাই নয়, আরো কিছু ছিল। ছিল পাখি। আর সম্ভবত এই সময় থেকেই পৃথিবীতে ফুল ফুটতে শুরু করেছিল।

সরীসৃপ, পাখি ও ফুল—এই তিন নিয়ে জুরাসিক কালটি জীববিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে।

এই কারণে, ভারতের দাক্ষিণাত্য থেকে এই জুরাসিক কালেরই একটি ডাইনোসরের ফসিল আবিষ্কৃত হওয়াটা বিরাট এক ঘটনা।

জুরাসিক কালের তৃণভোজী কয়েকটি ডাইনোসরের কথা আমরা বলেছি। তাদের বলা হয় সরোপড ডাইনোসর—যথা, ব্রাকিওসরাস, ডিপ্লোডোকাস, ব্রন্টোসরাস। এমনি সরোপড ডাইনোসরের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে। এবারে আবিষ্কৃত হল ভারত থেকেও।

সরোপড ডাইনোসরদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে এই ডাইনোসরদের উদ্ভব প্রোসরোপড থেকে। ভারতে আবিষ্কৃত ডাইনোসরটি—বড়পাসরাস টেগোরাই—যদিও সরোপড, কিন্তু প্রোসরোপডের কিছু কিছু লক্ষণযুক্ত। এই কারণে বলা হচ্ছে, ডাইনোসরের এই ফসিল থেকে সরোপডের উদ্ভব সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে।

আরো জানা যাবে গোণ্ডয়ানাল্যাণ্ডের ভাঙ্গন সম্পর্কে। ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা, পুরাজীবীয় যুগ যখন শেষ হচ্ছে তখনো পৃথিবীর সমস্ত ভূখণ্ড একসঙ্গে জোড়া ছিল—সব মিলিয়ে এক অতি-মহাদেশ, যাকে চারদিকে ঘিরে ছিল অখণ্ড এক মহাসমুদ্র। ভারতীয় উপদ্বীপটি সে-সময়ে ছিল একটি গোঁজের মতো—তার একদিকে আফ্রিকার ভূখণ্ড, অন্যদিকে কুমেরু ও অস্ট্রেলিয়ার ভূখণ্ড। ট্রিয়াসিক কালে এই অতি-মহাদেশ ভেঙে যায় এবং পৃথক পৃথক ভূ-খণ্ডগুলো বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। ভারতীয় ভূখণ্ড পৃথক হয়ে যায় ও উত্তরদিকে সরতে শুরু করে। সরতে সরতে টার্শিয়ারি কালে ধাক্কা মারে এশীয় ভূখণ্ডের দক্ষিণ দিকে। এই ধাক্কার ফলেই (আজ থেকে প্রায় ছয় কোটি বছর আগে) হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি। এখন, এই যে দাক্ষিণাত্য থেকে ডাইনোসরের ফসিলটি পাওয়া গিয়েছে তাও সাক্ষ্য দিচ্ছে, একসময়ে ভারতীয় উপদ্বীপের সঙ্গে অন্যান্য মহাদেশের ডাঙ্গার যোগ ছিল। ডাইনোসরের ফসিল এই বিষয়েও আরো কিছু জানতে সাহায্য করবে, এমন আশা নিশ্চয়ই করা চলে।

বড়পাসরাস টেগোরাই শুধু ডাইনোসরের ফসিল নয়, আংশিক ইতিহাসও।

দূর মফঃস্বলের কবি

বিগত ১৫ এপ্রিল 'অমৃত'-এ গৌতম ভট্টাচার্যের 'দূর মফঃস্বলের কবি' পড়ে একটি কথাই মনে হলো, তিনি বলতে চেয়েছেন, মফঃস্বলে পাঠক তো নেইই, এমন কি যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরাও কবি সাহিত্যিকদের নাম পর্যন্ত জানেন না। তিনি বলেছেন, 'প্রফুল্ল -শীর্ষেন্দু -অতীন-বরেণ কি শক্তি- প্রণবেন্দু- তারাপদ'র নামও পর্যন্ত শোনেননি। শুনলেও আবছা আবছা।' এরকমভাবে মফঃস্বলের কবি শিরোনামে কোনও রচনা লেখা ধৃষ্টতারই নামান্তর। আমার মনে হয় গৌতমবাবু জানেন না, যে মফঃস্বল থেকে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন তাঁরা খুবই নিষ্ঠাবান। পিঠ-চাপড়ানো, অথবা বাহবায় ভোলেন না। তারাশঙ্কর, সতীনাথ মফঃস্বলেরই সাহিত্যিক ছিলেন। অমিয়ভূষণ, অশ্রু শিকদার আজও উত্তরবাঙলার মফঃস্বলে থেকে নিয়মিত সাহিত্য করে যাচ্ছেন। কোনও কাগজের অফিসে ধর্ণা দিয়েছেন এ কথা শোনা যায়নি কদাপি। বরং এঁদেরকে কলকাতা শহরের অনেকেই শ্রদ্ধা জানান। পত্রিকা অফিসে ধর্ণা দেওয়া কিছু লেখকের [illegible] হবে, [illegible] যে কলকাতা শহর এমন আঞ্চলিকতা টেনে এক অংশের লেখককে হেয় প্রতিপন্ন করা অমার্জনীয় অপরাধ। আমি শুনেছি কলকাতা শহরের বেশীর ভাগ লেখকই পত্রিকা অফিসে নিয়মিত যান এবং নিজের লেখা ছাপাবার নিমিত্ত অনুরোধ রাখেন। কোনও অঞ্চলকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রচনা লেখার আগে সে সম্পর্কে পূর্বাহ্ণে নিজের মানসিকতা তৈরী করা দরকার। গৌতমবাবু কেন যে এরকম একটা অশ্লীল রচনা লিখলেন এবং 'অমৃত' পত্রিকার মতো উচ্চমানের একটি পত্রিকায় তা নির্দ্বিধায় ছাপা হলো, ভাবতে লজ্জা হয়। **শাশ্বতী দেবনন্দী।** রবীন্দ্রনগর, কুচবিহার।

(২)

অমৃতে গৌতম ভট্টাচার্যের 'দূরে মফঃস্বলের কবি' পড়লাম। খুব ভাল লাগল। ফিচারটিতে গৌতমবাবুর নিপুণ পর্যবেক্ষণ, সত্যনিষ্ঠা এবং মফঃস্বলের কবি ও লেখক চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি পাঠকদের অবশ্যই মুগ্ধ করবে। দূর মফঃস্বলের কবি হওয়া এবং তার পরিণাম সম্পর্কে গৌতমবাবুর অভিজ্ঞতা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু মফঃস্বলের কবি লেখকদের সম্পর্কে গৌতমবাবু যে অভিজ্ঞতা পরিবেশন করেছেন তা বোধ হয় যথেষ্ট নয়। রচনার প্রথমাংশে তাঁর পর্যায়ে [illegible] বিয়াল্লিশ বছরের মানুষটিকে কেন্দ্র করে অফিস থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতাকে গৌতমবাবু রচনার দ্বিতীয়াংশে 'ওনারা' পর্যায়ে সাধারণীকরণ করতে চেয়েছেন। বয়সের উল্লেখে তাঁর রচনা ত্রুটিহীন। কিন্তু মফঃস্বলের তরুণ কবি ও লেখকদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতার সংযোজন থাকলে রচনাটি সম[illegible] হত। আশা করি গৌতমবাবু নিশ্চয়ই জানেন, মফঃস্বলের তরুণ পদ্য-গদ্যকারেরা তাঁর অভিজ্ঞতার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। দূর মফঃস্বলের অনেক তরুণ পদ্য-গদ্যকার এই দশকের (সত্তর দশক) গৌতমবাবু বর্ণিত সমস্যা, বাধার পথ অতিক্রম করে বাংলা কাব্য ও গল্প সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' 'রূপসী বাংলা'র পাণ্ডুলিপি'র নাম না শোনার অপবাদ তাঁদের অনেকের উপরই খাটে না। শক্তি চট্টোপাধ্যায় পদ্যকার না গদ্যকার এ সংশয় তাদের অনেকের মধ্যেই নেই। গৌতমবাবুর কাছে আশা করি তিনি দূর মফঃস্বলের লেখক-কবি হিসাবে বয়স্ক শ্রেণীর সমস্যা হতাশা—প্রাপ্তিহীন লিখে যাওয়ার বেদনা যেমন প্রকাশ করেছেন, অমৃতের পরবর্তী কোন সংখ্যায় দূর মফঃস্বলের শক্তিশালী প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ পদ্য-গদ্যকারদের সম্পর্কে সুন্দর অভিজ্ঞতা পরিবেশন করবেন। **—লক্ষণ কর্মকার, পি কে এইচ এন কলেজ, [illegible]।**

রামরতন তিনতলা বড় বাড়িটার নিচে বারান্দায় গিয়ে বসল। হোটেল ভর্তি মানুষ আজ। মেয়ে পুরুষ। যুবক-যুবতী ঘরে ঘরে। এখনো বারান্দায় বসে কেউ কথা বলছে। রামরতন কোটের বোতাম গলা পর্যন্ত লাগিয়ে নিল। শীতটাও পড়েছে আজ জব্বর। চাঁদ এখন আকাশের মাঝামাঝি প্রায়। কলকাতার আকাশে শীতের জ্যোৎস্না এত স্পষ্ট নয়। রামরতন বিয়ের পর বৌ নিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়। ময়দানে দাঁড়ালে শীতের জ্যোৎস্না অনেক মলিন দেখায়। সেই সব দিনের কথা কখনো কোনো মুহূর্তে মনে পড়ে যায়। বিয়ের পর কটা দিন ওর ভাবনায় আটকে আছে। তেরো নম্বর ঘর থেকে কলিং বেল বেজে উঠতেই রামরতন বিরক্তবোধ করে। এত রাতে কি দরকার বাপু ডাকাডাকি করার। বেয়ারা-গুলো যে কোথায় যায় কে জানে।

রামরতন মৃদু পায়ে হাটতে হাটতে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। গেটে আজ তালা দেবার প্রয়োজন নেই। সারারাত ধরে পুলিশের গাড়ি ঢুকবে বেরুবে। পুলিশের ছোট-বড় সবাই মন্ত্রীমশাইকে নিয়ে ব্যস্ত। অথচ রামরতনকেও বলা হয়েছে সজাগ থাকতে। রামরতন এ ক্ষেত্রে খুবই অকিঞ্চিৎকর।

গেটের দুপাশে বাচচা কোলে মেয়ে-পুরুষ। ডাইনিং হলের বেয়ারা কখন কিছু দেবে তার আশায়। এলাকাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে গতকালই। রামরতন যে গ্রামে বিয়ে করেছে সে গ্রামে অনাহারে একজন মারা গেছে। কাগজের খবর। তাই নিয়ে বিধানসভায় হৈ-চৈ। বাক-বিতণ্ডা। রামরতন ভাবল গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো এসব খবর রাখে না। বিধানসভা যদি কলকাতায় না হয়ে এই গ্রামে বসতো তাহলে হয়তো ওদের মধ্যে কেউ কেউ গিয়ে ভিড় জমাতো।

রামরতন সুখীবৌদির কথা ভাবলো। পাশের গ্রামের মেয়ে সুখীবৌদি। সুখী-বৌদির অনেকদিন কোনো খবর রাখে না। এক সময় বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠলে কিছুই না ভালো লাগার মুহূর্তে সুখীবৌদির কাছে ছুটে যেতো। জন্মের পর মা-বাবা সুখের মুখ দেখেছিল। পরিবারের সুখ এনেছে ওই মেয়ে। তাই মেয়ের নাম সুখী রাখা হয়েছিল। অথচ ওর কপালেই সুখ নেই। বিয়ের ক'মাস পরই বিতাড়িত হয়ে চলে এলো বাপ-মায়ের কাছে। সুখী-বৌদির কাছে রামরতন কী পেতো জানে না। তবু মাঝে মাঝে ছুটে যেতো। ভালো লাগবে বলে যাওয়া। অথচ গিয়েও অনেক-দিন ভালো লাগেনি। তখন ভেবেছে কেন এমন হয়। কেউ-ই বোধহয় ভালো নেই। সব ভালো থাকা বোধহয় যায়ও না। কোনো কোনোদিন ফেরার পথে মনে হয়েছে না এলেই পারতো। আবার একই কারণে ছুটে যাওয়া। সেই সুখীবৌদির গ্রামে আজ দুর্ভিক্ষ। সুখীবৌদি কোথায় কে জানে।

এই রামরতনের ভেতরে আবেগ ছিল। দুঃখবোধ ছিল। আজ অন্য মানুষ। অনেক পরিবর্তন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যদি পাশ করতে পারতো। তারপর কোনো একটা চাকরি বা এ্যাপ্রেনটিস হয়ে ঢোকা। হয়তো জীবনযাপনটাই পাল্টে যেতো। অন্যরকম। অন্য ভাবনা।

এখানে সেখানে খুবই অস্থায়ী চাকরি করেই কাটলো। স্থায়ী হয়ে থিতিয়ে বসা হলো না আর। ইতিমধ্যে বিবাহ। বৌ। খেলতে খেলতে দুটি সন্তানের পিতা। এখন বয়সের বিকেল নেমেছে শরীরে।

'এই নীরা একটা গান গাইবি। জ্যোৎস্নায় তোকে দারুণ দেখাচ্ছে।' দোতলার বারান্দায় বসে ও দাঁড়িয়ে সতেরো আঠারো উনিশ নম্বর ঘরের ভিজিটরেরা। 'পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে—'

সেই মেয়েটি নীরা নাম যার হয়তো গান ধরেছে। রামরতন দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পাথরের মূর্তি সিঁড়ির কাছে। টবে ঝাউগাছ। দুটো ঝাউয়ের ফাঁকে এসে রামরতন দাঁড়াল।

'যেথায় চলে গেছে আমার হারা ফাগুনরাতি।' গলায় আবেগ, একটু আধো আধো ধরা ভাব। সেই মেয়েটি গাইছে। রামরতন দাঁড়িয়ে আছে। স্থির। 'এ ব্রাইট স্টার এ্যান্ড এ নিউ স্টার ইজ সাইনিং ইন দি স্কাই।' এখনো মনে আছে রামরতনের। কবে পড়েছে ম্যাট্রিকুলেশনে। পাশ করতে পারেনি। সারা আকাশ জুড়ে অসংখ্য তারা। রামরতনের সেদিনের ব্রাইট স্টার নিউ স্টার হারিয়ে গেছে। কী যেন নাম ছিল কবিতাটার। 'ক্যারল অফ দি পুওর চিলড্রেন।'

'তোর গলা দারুণ। এবার সুমন্ত তোমার একটা হোক।'

দাড়িওয়ালা ছেলেটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ চাঁদ ধুসর মাঠ এদের উন্মনা করে। আবেগে এরা চন-মনে। রামরতন আকাশ থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল। তিনতলার সিঁড়ির দি[illegible] এগিয়ে গেলো। গোটা হোটেল পাহারা দেওয়াই ওর কাজ। কিছু হারালে ম[illegible] তলব পড়বে ওর।

তিনতলার বড় বারান্দায় গিয়ে [illegible] জ্যোৎস্না বাঘবন্দির ছক কেটেছে।

রামরতন বারান্দা পেরিয়ে প্রায় [illegible] প্রান্তে এসে দাঁড়াল। ঘরের দরজা [illegible] রেকর্ড প্লেয়ারে কোনো হিন্দি [illegible] ভেতরে গানের তালে তালে নাচছে [illegible] রামরতন বুঝতে পারে খুব চাল[illegible] গানের সঙ্গে স্বর মিলিয়েছে দু-এক[illegible] কাঁচের গেলাস ভাঙলো একটা। খুব মে[illegible] চলছে সব কিছু।

রামরতনের ইচ্ছে হলো দরজায় [illegible] মেরে ডেকে বলে দেয় 'আজ [illegible] মন্ত্রীমশাই আছেন। চেঁচামেচি করবেন বেশী।'

রামরতন দরজায় কান পাতে[illegible] নারী-পুরুষের সমবেত কণ্ঠস্বর। [illegible] শব্দ।

রামরতন মুহূর্তের মধ্যে দরজার থেকে সরে এলো। 'থাক ওরা ওদের [illegible] থাক।'

রামরতনের মনে পড়ে পঁচিশ [illegible] ভয়ঙ্কর উঁচু সেই শিখর—' মুখস্থ, [illegible] মুখস্থ আছে। পরীক্ষায় এসেছিল [illegible] বয়সে এই রামরতন কবিতার লাইন [illegible] কথায় কথায় বলে দিতো। [illegible] আবৃত্তির জন্য দুবার পুরস্কারও [illegible] ছিল। [illegible] বিবাহ। আজ ওর [illegible] তারিখ। এমনি এক রাতে [illegible] নেওয়া। গোটা একটা মেয়ে [illegible] শরীরের গন্ধ-স্বাদ পাওয়া। তবু [illegible] না কিছুই। মিলল না কোথাও।

রামরতন তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকের বারান্দায় এগিয়ে গেলো।

'কে বাবা তুমি? [illegible] ইতিহাস শোনাবে নাকি দর্শন [illegible] ওড়াবে। কবিতা।'

'ভাস্কর বাজে বকিস না। [illegible] বোতলটা সরালে কে রে?'

চারজন যুবক সবাই মুড়ি উঠেছে।

'ওই রবীন্দ্রনাথ এখনো ডমিনেট [illegible] এ আমার সহ্য হয় না।'

'আসলে আমরা মানুষ নই। জীবনে হরিনাম করবো। নাকি [illegible] লিখতে লিখতে মরবো।'

'ভাস্কর, আমার ভীষণ কাঁদতে [illegible] করছে। আসলে আমরা সবাই সন্তান, প্রেমজ নয়।' কার লাইন যেন [illegible] লিখেছে বুঝলি।'

'ধ্যাত, দু নম্বর বাংলা মাল [illegible] লেবু দিয়ে যে আবিষ্কার করেছে সেও [illegible]

'দ্যাখ, কবিতা নিয়ে ইয়ার্কি হয় না।'

একটি যুবক মাথা গুঁজে [illegible] আরেকজনের বুকে।

'আমি কেন কবিতা লিখতে পারছি না, আমাদের জীবন মানে কিছু না। কি-ই বা করার আছে। রিমেনিং বলতে কিছুই রেখে যাচ্ছি না।'

'কাঁদিস নে ভাস্কর। আমরা না পেতে পেতে নিশ্চয়ই কিছু একটা পেয়ে যাবো।'

আবার কলিং বেলের শব্দ। রাত দুপুরেও ডাকাডাকির বিরাম নেই। রামরতন বিরক্ত বোধ করে। রামরতন ওদের পাশ কাটিয়ে নিশব্দে হেঁটে গেল। একজন ছুটে এসে রামরতনকে জড়িয়ে ধরলো—'দাদা জীবন মানে কি বলতে পারেন।' জীবন মানে কি মন্ত্রী পাহারা দেওয়া। আমাদের পাহারা দেওয়াই শুধু। আপনার বয়স কতো ছাই ? কটা বিয়ে, কটা প্রেম জীবনে ?

'কি মাতলামি করছিস। ছেড়ে দে।'

আরেকজন এসে ওকে টেনে নিয়ে গেলো। 'কিছু মনে করবেন না দাদা।'

রামরতন এসবে অভ্যস্ত। রামরতনের বলতে ইচ্ছে করল 'আপনারা শুয়ে পড়ুন। চাওয়া-পাওয়ার হিসেব কাল সকালে করবেন। এখন শুয়ে পড়ুন।'

রামরতন আবার দোতলার বারান্দায় দুটো ঝাউয়ের মাঝে এসে দাঁড়াল। দূরে আকাশ মাঠ দেখল। অনেক দূরে ছায়ার মতো তালগাছের সারি। ওর কাছেই রামরতনের ঘর-গেরস্ত পাড়া। বৌটা কেমন কাছে থেকেও আস্তে আস্তে দূরের মানুষ হয়ে গেলো। রামরতনের মতই ও কিছু একটা জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল। একান্ত নিরম্ব মনে। কি জানি কোথাও কোনো গোলমাল হয়ে গেছে। বড় বিস্ময় লাগে ভাবতে গেলে। বড় অসহায় মনে হয়।

'এই সুমন্ত, আমার অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে।'

'কৃষ্ণ, তুমি ভয়ঙ্কর ইমোশোনাল হয়ে পড়ছো।'

'আমরা এক ভাই এক বোন। ভাইটা পাগল। বাবা প্রতি সপ্তাহে তারাপীঠে গিয়ে বসে থাকেন। মা মহিলা সমিতি করেন। মহিলাদের সংগ্রামী করে তুলছেন। কিন্তু আমি জানি বাবা যে কারণে তারাপীঠে যান মা একই কারণে মহিলা সমিতি করেন। ভাইটা যদি কোনোরকমে ভালো হয়ে যেতো হয়তো সবকিছু অন্যরকম হয়ে যেতে পারতো।'

সেই দাড়িওয়ালা ছেলেটা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'দুজনে দেখা হল মধু যামিনীরে'— পুবের খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি এখনো গান গেয়ে চলেছে। এসব কথা তার কানে যাচ্ছে না নিশ্চয়ই। বিশ্ব চরাচরের কোনো সমস্যাই ওকে এখন স্পর্শ করে নেই। রামরতন রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটা অপলকে দেখল। গিরজা টপকে জ্যোৎস্না রবীন্দ্রনাথকে দ্বিখণ্ডিত করে আছে।

আজ জ্যোৎস্না-আকাশ-আদিগন্ত মাঠ রামরতনকে উন্মনা করে। কিছু একটা [illegible] [illegible] ব্যাকুলতা ওকে বিষণ্ণ করে।

রামরতন আস্তে আস্তে নিচে নেমে এলো। পর পর অনেকগুলো ঘর নিঃশব্দ। একটি ঘরে এখনো তর্ক চলেছে। 'বুঝলেন কমরেড মুখার্জি, সবকিছু ডায়ালেকটিক্যালি মেথোডে ভাবতে হবে। এই যে মিডল ক্লাশ সম্প্রদায় এদের কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ অন্তর্গতভাবেই ঘটছে। বাইরে বোঝা যাচ্ছে না। কিছু হচ্ছে না। সবকিছু স্ট্যাগনেন্ট ভাবাটা কিন্তু ঠিক নয়।'

রামরতন সারা হোটেল প্রদক্ষিণ করে। কখনো গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

দুটো পুলিশ বাঁহাতে বন্দুকের বাঁট মাটিতে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যোৎস্নায় রামরতনের পাশাপাশি ওদের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে মাটিতে। রাত বাড়ছে। আরও বাড়ছে। রাত এখন গভীর। কোলাহল নিস্তব্ধ। এতক্ষণের একটা যুদ্ধক্ষেত্রে সহসা নৈঃশব্দ্য নেমে আসার মতো।

রামরতন আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ছাদে এসে দাঁড়াল। চাঁদ এখন আকাশের এক পারে। রামরতন সারা ছাদে পায়চারী করে। পুব থেকে পশ্চিমে। উত্তর থেকে দক্ষিণে। 'এ ব্রাইট স্টার এণ্ড এ নিউ স্টার ইজ সাইনিং ইন দি স্কাই।' মাধ্যমিক-এর সেশনে মুখস্থ করতে হয়েছিল। রামরতন দ্রুত পায়ে পায়চারী করে। আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত খুঁজে কোথায় সেই দুটো তারাকে। আকাশভরা তারা। তার মধ্যে সেই দুটো তারা ওর খুব চেনা। খুঁজতে খুঁজতে রামরতন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নিশ্বাস খুব দ্রুত বইতে থাকে। অকস্মাৎ রামরতন অনেক পায়ের মৃদু শব্দ শুনতে পায়। রমরতন দেখে ছায়ার মতো সিঁড়ি বেয়ে কারা যেন ওঠে আসছে। রামরতন অবাক হয়ে দেখল ছায়ার মতো ওঠে আসছে সতেরো-আঠারো-উনিশ নম্বরের ভিজিটারেরা। উঠে আসছে সেই যুবক কবিরা। আরো অনেকেই। বুঝিবা সবাই। মন্ত্রীমশাইকে এত কাছাকাছি কোনোদিন দেখতে পায়নি। দেখতে দেখতে ছায়ার মতো মানুষ ঘেষাঘেষি দাঁড়িয়েছে ছাদে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ওরা কী খুঁজছে।

রামরতন ছাদের মানুষগুলো দেখতে দেখতে কোনো মুহূর্তে দূরের জ্যোৎস্না প্লাবিত মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখল। শীর্ণকায় ছায়ার মতো মাঠ পেরিয়ে সারিবন্ধ মানুষ চলেছে। মানুষ রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে খাবার জোগাড়ের আশায়। কে জানে ওর মধ্যে তার সুখীবৌদিও থাকতে পারে।

সারি সারি মানুষ। মানুষ। ছাদে একগুচ্ছ মানুষ। মাঠে সারিবন্ধ মানুষ। রামরতন আরেকবার আকাশের দিকে তাকাল। আরেকবার চেষ্টা করল, খুঁজে বের করতে তার সেই দুটো নক্ষত্র। বড় চেনা, ভীষণ ভালো লাগার বড় আশার সেই দুটো তারা।

সে রা যাত্রী

সে. রা. যাত্রী (১৯৩৩), হিন্দী ছোট গল্পকারদের মধ্যে বিশিষ্ট নাম। তাঁর গল্পে মধ্যবিত্ত সমাজ, মানুষ এবং মানুষের ছোট ছোট কল্পনা, ও কল্পনার মৃত্যু ফুটে ওঠে। বর্তমান সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তিমানুষের অসহায়ত্ব তাঁর লেখার উপজীব্য। প্রথম কাহিনী সংগ্রহ 'দুসরে চেহরে' (অন্য মুখ)। বর্তমানে, মহানন্দ মিশন কলেজ, গাজিয়াবাদ-এ অধ্যাপনা করেন।

ব্যবস্থা

গোটা বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—অর্ডিনান্স চালু হওয়া সত্ত্বেও ব্যবস্থাপকেরা তাদের প্রতি সামান্যতম লক্ষ্য দেয়নি। আমরা সকলে, কখনও ইঙ্গিতে, কয়েকবার মুখর হয়ে এক-অপরকে জিজ্ঞাসা করি, 'আজ কি সম্ভাবনা আছে?'

কিন্তু, প্রকৃত উত্তর দেয়ার অবস্থা কারুর থাকে না। দু-একজন এমন লোক, যারা অফিসে ঢুকেই বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করত। বড়বাবুর ডান চোখের কাছে টাকার চাকতি আকারে একটা কালো দাগ ছিল, চোখেমুখে সর্বদা একটা বিরক্তি ছেয়ে থাকত। ফাইলে ঘেরা সেই বদমেজাজী লোকটাকে সকলেই দুর্ভাগ্যজনক মনে করত। প্রশ্নকারীদের কথা সে কানেই তুলতো না। রেজিস্টারের আড়ালে থেকে সে যে কি করত, জানি না। কর্মচারীদের বেতন যখন দু মাস ধরে পাওয়া যাচ্ছে না, তার অযথা কাগজ কালো করার অর্থ কি? কর্মচারীরা বিক্ষোভে, সসংকোচে তাকে জিজ্ঞাসা করত, যদিও জানা ছিল, সে তাদের কোন কথার জবাব দেবে না, কালো দাগের পাশে অনামনস্ক চোখ দুটি উপরে তুলবে, তারপর নিজের ব্যস্ততায় ডুবে যাবে। অবশ্য তার এই ভঙ্গীটুকু কৃত্রিম মনে হতো না—আসলে, সে দেখাতে চাইত, এমন এক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে—যার সূত্র বহুদূরে অদৃশ্য কোন ব্যক্তির হাতে। বড়বাবু নামে বিচিত্র জোক-টির কাছ থেকে কোন উত্তর না-পেলে, আমরা মর্মান্তিকভাবে আহত ও অপমানিত বোধ করতাম, এবং নিজেদের হীন মনে করে সেখান থেকে সরে পড়তাম।

প্রথম দিকে আমরা এই অবস্থার কল্পনাও করতে পারিনি। নইলে, এ কি করে সম্ভব হয় যে, অফিস নিয়মিত সময়ে খোলে, লোকেরা নির্দিষ্ট সময়ে এসে চেয়ারে বসে, রেজিস্টারের উপর সই করে টাইম নোট করে এবং সামান্য দেরী হলে ভীতশংকিত হয়ে পড়ে—চেয়ার-টেবিল নিয়মিত ঝাড়াপোঁছা হয়, চাপরাশী মাঝে-মাঝে এসে স্টাফদের জল খাওয়ায়—'বসে'র চেম্বারে টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ বাজতে থাকে এবং চাপরাশীকে তলব করার কলিংবেল প্রায়শ বাজতে থাকে। কোম্পানীর বিল ডাক মারফৎ নিয়মিত আনাগোনা করে এবং অফিস-প্রেমিসেসের বাইরে কয়েকটা ছোট-বড় গাড়ী সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকে—অথচ, কর্মচারীদের বেতন কয়েক মাস ধরে দেয়া হয় না।

অতিরিক্ত সতর্কতা বা সাবধানতা মানুষ তখনই অবলম্বন করে, যখন বস্তু বিক্ষিপ্ত এবং অ-ব্যবস্থা হয়ে পড়ে—কায়দা-কানুনে কোন বিশিষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন বোধ করে না। প্রতিটি ঋতুতে পোশাক-পরিবর্তন করার সুবিধে যেখানে আছে, সেখানে ধৈর্য এবং হাসি সহজে ভেঙ্গে পড়ে না। সূর্যের আলোয় মানুষ সর্বশ্রান্ত হবার বিপদগ্রস্ত বোধ করে না। লেখাপড়া জানা লোকেরা মাইনে নিয়ে বেশী আলোচনা করা সভ্যতা ও সংস্কারের বিরুদ্ধ মনে করে—তারা মজুরদের মত মজুরী-রোজ নিয়ে অতিরিক্ত উৎসুক্য বা জিজ্ঞাসাবাদের পথও গ্রহণ করতে পারে না।

কেউ জানে না, গোলমালটা কোথায়! কিন্তু, কোথাও এক ভয়ংকর জটিলতা আছে। ব্যবস্থাপকেদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার কোন পথ ছিল না। বসে'র সঙ্গে বেতন সম্পর্কে কথা বলতে লোকেরা কাতর বোধ করত। আমার চাকরীর প্রথম দিকে মাইনে পেয়ে অফিসের পরিবেশ এবং ব্যবস্থা বিষয়ে এতো বেশী প্রভাবিত হয়ে ছিলাম যে, বেতন সম্পর্কিত নির্দিষ্ট ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র ভাবিনি।

*

যখন আমরা একেবারে রিক্ত হয়ে উঠি, এবং নিজেদের লজ্জা ঢাকতে অসমর্থ হয়ে যাতায় আর্থিক মহাভারতের গল্প আওড়াতে থাকি, তখন অবস্থা বাস্তবিক দারুণ ডেলিকেট হয়ে পড়ে। এক বিচিত্র 'সীন' সৃষ্টি হয়, লোকেরা তখন নিজেদের আর্থিক অনটনের ক্রন্দনকালে এত বেশী তন্ময় হয়ে পড়ে যেন সমবেত হরিসংকীর্তন করছে। আমরা নিজেদের দুর্দশার কথা বয়ান করতে করতে ভুলে যাই যে জমায়েতে সব লোকেরাই কিছু-না-কিছু বলছে, এবং অপরের কথা শোনার জন্য কারও বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই: এমন কি, নিজের প্রভাবের স্রোত অন্বেষণ করার উৎসাহ কারও মাঝে নেই।

আমাদের মাঝে প্রত্যেকেই নিজের ধারণা আঁকড়ে স্থিত ছিল। কয়েকজন

নিম-উৎসাহে মাইনে ছাড়া দিন কাটিয়ে শহীদ হবার ভূমিকা নেয়। ব্যাপারটা সে রকমই ঘটছিল, আকস্মিক ওয়াটার সাপ্লাই বন্ধ হলে লোকেরা যেমন অর্ধেক বালতী জলে সমস্ত কাজকর্ম সেরে নিজের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। এবং এই অনটনে বেঁচে থাকার অভ্যাস ঘোষিত করে। এমন কি তারা, ঐসব লোকেদের চেয়ে অনেক উপরে থাকার গৌরব অনুভব করে—যাদের কাছে এরকম সময়ে এক ঘটি জলের জোগাড়ও হয় না। এমারজেন্সীর বিশেষত্ব এই যে, লোকেরা এত বেশী ব্যক্তিবাদী হয়ে পড়ে যে, তার চেতনা অস্তিত্ব রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজের পিঠে নিজেই চাপড় মারে।

*

দু' মাসের বেতন একসঙ্গে পাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়—যদিও স্পষ্ট আশ্বাস কোন তরফ থেকে পাই না। বড় খিটিমিটি সময় কাটছিল—প্রতিটি প্রয়োজন এবং চেষ্টা ভবিষ্যকালের জন্য তুলে রাখা হচ্ছিল। বেশ কয়েকবার আমি মনে মনেই হিসেব করে দেখেছি, দু' মাসের মাইনে একসঙ্গে পেলে, কিছুটা এসময় সঞ্চয় করা যেতে পারে। কয়েকজনকে আরো কিছুদিন দূরে সরিয়ে রাখা চলে। অফিসের সহকর্মীদের অর্ধেক বকেয়া শোধ করা যেতে পারে এবং যদি আবার এমন অবস্থার পুনরাবির্ভাব ঘটে, তাহলে আপদকালীন স্থিতির জন্য অন্তত কিছু রাখা যেতে পারে।

প্রাপ্তি ছাড়াই সঞ্চয় করার কল্পনা আমায় বেশ উৎসাহিত করে তুলত, এবং সেই আনন্দে আমি অন্যান্য সহকর্মীর কাছ থেকে নিঃসংকোচে কিছু ধার চেয়ে নিতাম। চাইবার লজ্জা-হায়া এখন সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। অফিস ছুটির পর, আজও আমি তেওয়ারীর কাছ থেকে দু' টাকা ধার চেয়ে নিয়েছি। টাকা-পয়সার ব্যাপারে তেওয়ারী বড্ড চিপ্পু। টাকা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করে ডায়রীতে টিপ নিয়ে নেয়, কিন্তু চাইলে কখনও ফেরায় না। মাইনের জন্য ততটা পরোয়া নেই; কোন রকমে একটা বাড়ী দাঁড় করিয়েছে, তাতে আটদশজন ভাড়াটে বসিয়ে রেখেছে। মাস গেলে তিন চারশ টাকার আমদানী। বেতন পেলেই আমাদের কাছ থেকে ধার উসুল করে সমস্ত টাকা ব্যাংকে ফেলে দেয়। এই টুপি-পায়জামাধারী তেওয়ারীর সাহায্যে ছুটকো-ছাটকা খরচ চলে। এতদিনে মজুরী না পেলে মজদুর-রা নিশ্চিত হরতাল কিংবা অন্য ঝামেলা বাঁধিয়ে ফেলত কিন্তু আমরা লেখাপড়া জানা লোক, আমাদের কথাই আলাদা। আমরা প্রতিটি ব্যাপারেই সন্তুষ্ট—আমাদের শরীর ঢাকা থাকলে, ছেঁড়া মনও তাতে আড়াল করার চেষ্টা করি।

*

বাড়ীতে ঢোকার মুখে দেখি, দরজার সামনে একটা 'আমবাসাডার' গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে এবং ছেলে দুটো পেছনের সীটে লাফালাফি করে খেলছে। সামনের সীটে ড্রাইভার বসে সিগারেট টানছে। ছেলেদের সঙ্গে খুনখুঁটি না করেই চুপচাপ ঘরে ঢুকে পড়ি। ছেলেরা সম্ভবত কিছু বলার জন্য উৎসুক ছিল। তারা চেঁচিয়ে কিছু একটা বলে। সম্ভবত আমার পেছন-পেছন আসার চেষ্টা করে, কিন্তু গাড়ীর দরজা বন্ধ থাকার ফলে সেখানেই থাকে। আমার জুতোর শব্দ শুনে সবিতা বাইরের ঘরে বেরিয়ে আসে, আমাকে দেখতে পেয়েই বলতে শুরু করে, 'এসে পড়েছ ? জ্যাঠা-মশাই গাড়ী পাঠিয়েছেন—রীনার যে বিয়ে। আমি ভাবছিলুম, কি জানি অফিস ফেরত তুমি আবার অন্য কোথাও না চলে যাও।'

সবিতার বাবা আপার ডিভিসন ক্লার্ক, কিন্তু জ্যাঠামশায় ডেপুটি সেক্রেটারী পদে আসীন। বার কয়েক বিদেশে ঘুরে এসেছেন, এবং এও তাঁর কম করুণা নয় যে, কেরানী জামাইকে আনার জন্য গাড়ী পাঠিয়েছেন। সপ্তাহ-খানিক আগেই বিয়েতে উপস্থিত হবার

[illegible] ছিল, কিন্তু গত দুদিনে সেই আশা সব দিক থেকে নির্মূল হয়ে গেছে।

বড়লোকদের তরফ থেকে পাওয়া 'গ্রীটিংস কার্ড' এবং 'ইনভিটেশন কার্ড' আমি আলমারির মাথা-তাকে এমনভাবে সাজিয়ে রাখি, যাতে আনাগোনাকারী প্রতিটি লোকের দৃষ্টি সেখানে থেমে পড়ে। বস্তুত এই ধরনের আমন্ত্রণ অপরের কাছে আমার গৌরব বৃদ্ধি করে। ডেপুটি সেক্রেটারীর নিমন্ত্রণ পত্রখানি আমি রেডিয়োর ওপর দাঁড়িয়ে রেখেছি। আমার দৃষ্টি ঐ নিমন্ত্রণ পত্রে একটুক্ষণ থামে, সহসা মগজে অন্য উপায় বার হয়ে পড়ে।

উল্লাসে মগ্ন সবিতার দিকে আমি চেয়ে দেখি—আলমারি থেকে সে সবকটি শাড়ি বার করে খাটে বিছিয়ে রেখেছে। তার ভেতর থেকে দু-তিনটি শাড়ি সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য সম্ভবত আমার পছন্দ-অপছন্দের প্রতীক্ষায় আছে। অ-চেনার মত আমি সেই সব শাড়ি দেখি—দশ বারো বছর আগেকার কেনা—কেনাই বা বলি কেন, আসলে ওর মা-বাবা, দিদি-দাদার কাছ থেকে উপহারে পাওয়া। সেইসব শাড়ির চটে যাওয়া রঙ, ও ফেঁসে যাওয়া শরীর দেখে, কারুর মুখ থেকে হিম করুণ শব্দ বেরিয়ে পড়তে পারে। এই সব শাড়ি বিগত দিনের সোনালী স্বপ্নে মোড়া। আমি জোর করে সেখান থেকে চোখ সরিয়ে নিই, কিছু ভাবতে থাকি। অজান্তেই কোটের ভেতর-পকেটে হাত ঢুকে পড়ে। কয়েকটা খুচরো পয়সা ও তেওয়ারীর কাছ থেকে ধার করা দু-টাকা ছাড়া আর কিছু সেখানে নেই। সবিতা অবশ্য এই পরিস্থিতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞাত। যদিও তার জানা ছিল, গত দু' মাস ধরে আমি মাইনে পাচ্ছি না, কিন্তু যে রকমভাবে তাকে ভরসা দিয়ে আসছিলাম, স্বভাবতঃই সে আশ্বস্ত ছিল, রীনার বিয়ের জন্য ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি।

কাপড়ে ভর্তি একটা অ্যাটাচী খালি করতে-করতে সবিতা বলে, 'ড্রাইভার অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। তাড়াতাড়ি করো। রীনার জন্য শাড়ি দিল্লী থেকে কিনে নেবো—সেখানে ভ্যারাইটিজ্ পাওয়া যায়। ভালো একটা শাড়ির সঙ্গে একচল্লিশ বা একান্ন টাকা দিলেই চুকে যাবে। এমনিতে সঙ্গে দেয়ার জন্য অরনামেন্টসের দরকার।'

সবিতার কথাবার্তায় আমার মাথা ঘুরে যায়। ছেলেরা বাইরে গাড়ীর ভেতর বসে আছে। হয়তো, আমাদের বেরনোর পথ চেয়ে আছে।

আমি মিনিট দুই-তিন ভাবতে থাকি, তারপর, বাইরে বেরোবার আগে সবিতাকে বলি, 'দশ মিনিটে আমি ফিরে আসছ—ছেলেদের ভেতরে পাঠিয়ে দিচ্ছি—গাড়ীর দরজা খোলা-বন্ধ করতে গিয়ে না-আবার আঙুল-টাঙুল কেটে ফেলে।'

সবিতার উত্তর শোনার আগেই আমি বাইরে বেরিয়ে পড়ি, গাড়ীর দরজা খুলে ছেলেদের বাইরে বার করে দিই। অনিচ্ছা সত্ত্বে তারা বেরিয়ে যায়। বাইরে বেরিয়ে তারা সসংকোচে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি ড্রাইভারের পাশে বসে বলি, 'কিছুটা দূরে যেতে হবে—মিনিট দশ লাগবে।'

ড্রাইভার 'আচ্ছা' বলে গাড়ীতে স্টার্ট দেয়। ছেলেরা ঘরের ভিতর যায় না, চেয়ে থাকে গাড়ীর দিকে। আব্দারের মত ধরা গলায় বলে—'পাপা, আমরা যাবো।'

আমি জানালার বাইরে মুখ বার করে কঠিন গলায় বলি—'না, তোমরা মাম্মীর কাছে যাও, আমি এক্ষুনি আসছি।'

গাড়ী বড় রাস্তায় এসে পড়লে, ড্রাইভারকে বলি—'ঘণ্টাঘরে নিয়ে চলো।'

মিনিট পাঁচে গাড়ী ঘণ্টাঘরে এসে পৌঁছয়। ড্রাইভারকে দু-মিনিটে ফিরে আসার কথা বলে, আমি ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে পড়ি। ডাক্তার সম্ভবত এখনই চেম্বার খুলে বসেছে—কোন রোগী নেই। ডাক্তারের সামনের চেয়ারে বসে ব্যস্ত গলায় বলে ফেলি, 'ডাক্তারবাবু, একটা আট বছরের ছেলের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দরকার, আশিস কুমার।'

ডাক্তার আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না, মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের ফাইল টেনে তার ওপর কিছু লেখে মাঝপথে থেমে খুবই ব্যস্তভাবে—যেন সেখানে আরও কয়েকটা রোগী বসে আছে এবং সে ভয়ানক ব্যস্ত—এমনভাবে জিজ্ঞেস করে 'কত তারিখ থেকে কত তারিখ শুনি?'

'আজকের ডেটেই করে দিন, কিন্তু রোগটা এমন লিখে দিন যাতে অন্তত তিন-চারদিন নড়াচড়া করা একেবারে বারণ।'

ডাক্তার মাথা ঝাঁকিয়ে সার্টিফিকেট তৈরী করতে থাকে। পরে, সে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে, ফাইল থেকে [illegible] করে আমার হাতে দেয়। অফিসের সহকর্মী তেওয়ারীর কাছ থেকে পাওয়া টাকা কোটের পকেট থেকে বার করে ডাক্তারের হাতে তুলে দিই, তারপর [illegible] এসে দাঁড়াই।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে কিছুটা দূরে একটা বইয়ের দোকান, সেখান থেকে আমি একটা ছোট [illegible] খাম কিনি। তারপর সবিতার [illegible] ডেপুটি সেক্রেটারি সাহেবের নাম ও ঠিকানা [illegible] খামের ওপর লিখে ফেলি।

*

ফিরে এসে দেখি, ড্রাইভার গাড়ীর মুখ আমার বাড়ীর দিকে [illegible] এবং সে গাড়ীর গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। আমাকে [illegible] এগিয়ে এসে গাড়ীর দরজা খোলে। গাড়ীতে 'উঠবো না' জানিয়ে আমি বলি, 'না, না তোমার এখন কষ্ট করার [illegible] নেই। কয়েকটা জরুরি কাজে আমি [illegible] সম্ভব হবে না, তুমি এই চিঠি জ্যাঠামশায়কে দিয়ে দিও।'
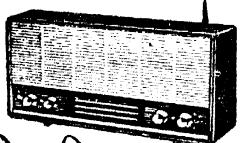
ড্রাইভার অদ্ভুত [illegible] দৃষ্টিতে আমাকে দেখে, তারপর খুশিতে হাত ধরে খামটা আমার হাত থেকে নেয়। গাড়ীর সামনের দিকের দরজা খুলতে খুলতে বলে 'ছেলেপেলেরা যাবে না?'

'মনে হয়, যাবে না। তুমি বেশ দেরি করো না। হয়তো, সেখানে গাড়ী দরকার পড়তে পারে। তুমি সেখান থেকে এসেছো অনেকক্ষণ হলো।'

চিন্তিত মুখে আমার দিকে চেয়ে দেখতে-দেখতে সেই মাঝবয়েসী লোকটি স্টিয়ারিং হুইলের সামনে গিয়ে বসে পড়ে এবং দিল্লী যাবার রাস্তায় গাড়ীর মুখ ঘোরাতে থাকে।

অনুবাদ : সুবিমল বসাক

He knew that the remedy is not money, not even education in the ordinary sense, but another kind of education. Let man remember his true nature, divinity. Let this become a living realisation and everything else will follow—power, strength, manhood. He will again became MAN.

গুরু

আমেরিকাতে তিনি শুধু অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন। কদাচিৎ নিজের গুরুর কথা বলতেন। তবু কারো কারো সন্দেহ ছিল দক্ষিণেশ্বরের এক সাধারণ ব্রাহ্মণ ওঁর জীবনে কী সত্যিই প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন? এমনকী যাঁরা ওঁর খুবই অনুগত ছিলেন তাঁদের কাছে উনি অত্যন্ত বিনীতভাবে কথাটার উত্থাপন করতেন। তবুও উভয়ের সম্পর্কের গভীরতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যেত। এইসব আলোচনার মধ্যেই আমরা প্রথম বুঝলাম 'গুরু' শব্দের গুরুত্ব। এই সঙ্গে শাস্ত্রের কথা শোনালো, যুগ যুগ ধরে ভারতের পুণ্যাত্মা ঋষিরা যে শাস্ত্রধারা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন সেসব কথাও বলেন। একদিকে ওঁর বিশ্লেষণধর্মী মন, অন্যদিকে গুরুর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য গভীর অর্থময় হয়ে উঠেছিল আমাদের কাছে।

আমাদের মধ্যে সেইরকম মনোভাব দেখা দিল। জন্ম নিল [illegible] সঙ্গে আমাদের সেইরকম সম্পর্ক। কী মহান ছিল সেই [illegible]। কী [illegible] তখন আমাদের। গুরুকে গ্রহণ করতে [illegible]।

This is the most important qualification for only the knower of Brahman has the power to transmit spirituality.

[illegible] থেকে শিষ্য আধ্যাত্মিকশক্তি আহরণ করে এই চিন্তাধারা [illegible] কাছে যেমন বিস্ময়কর, তেমনি [illegible] মতো। [illegible] মতে [illegible]

প্রণতা দে

আধ্যাত্মিকশক্তি পোপ-পরম্পরায় সঞ্চালিত হয়েছিল। কিন্তু এ যুগে আজও ভারতবর্ষের মানুষ বিশ্বাস করে—না, শুধু বিশ্বাস নয় সুনিশ্চিত জানে যে গুরুর শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চালিত হয়!

আরেকটি সত্য—

"Each has an individual path which is known to the Guru."

অর্থাৎ শিষ্যের স্বভাব অনুযায়ী সে ভক্তিমার্গে চলবে, না জ্ঞানমার্গে না ত্যাগের পথে এসব গুরুই বলে দেবেন। সব পথেরই লক্ষ্য এক কিন্তু পথ ভিন্ন। পথ নির্দেশ করে দিয়ে গুরু তাকে তখন মায়ের স্নেহে বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দেবেন, [illegible] অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করবেন যাতে সে শঙ্কিত বা নিরুৎসাহিত না হয়।

"He is the guardian of the threshhold, not to forbid entrance, but to protect the neophyte against groundless fears."

গুরু হলেন আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে দেবার অভিভাবক। তিনি ঢুকতে বাধা দেবেন না, বরং নবাগতকে ভিত্তিহীন শঙ্কা থেকে রক্ষা করবেন। তাঁর কাছে শিষ্য যায় সাহস সঞ্চয় করতে। তাঁর কাছে শিষ্য বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার কথা নিঃসঙ্কোচে উজাড় করে দেয়। কিন্তু এসব কথা অন্যকে বলবার নয়। তার মন্ত্র, ইষ্ট, অভিজ্ঞতা স্বামীজীর ভাষায় "গোপনীয় নয়—পবিত্র!" গুরুর প্রতি অতন্দ্র(?)

সম্ভব ভক্তি এবং পরিপূর্ণ দ্বিধাহীন বিশ্বাসের প্রয়োজন। একবার উনি কয়েকজন যথার্থ ভক্তিমান শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "আমি যদি বলি তুমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে রাজী আছ?" নিজের কাজের জন্য ঐরকম গুণসম্পন্ন লোককে উনি চান। বারবার গুরু নানকের গল্প বলতেন। শিষ্যদের বিশ্বাসের চরম পরীক্ষা নেবার জন্য একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, ওঁর কাজে যদি তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয় তবুও তারা রাজী কিনা? একজন এগিয়ে এল। তাকে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গেলেন। একটু বাদে বেরিয়ে এলেন হাতে কৃপাণ,—তার থেকে রক্ত ঝরছে। আবারও জিজ্ঞাসা করলেন কে তার বিশ্বাসের পরীক্ষা দিতে রাজী আছ?

আরও একজন এগিয়ে এল। এইভাবে পাঁচজনকে নিয়ে পাঁচবার তাঁবুতে ঢুকলেন এবং প্রত্যেকবারই রক্তঝরা তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলেন।

তারপর তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দিলেন। অন্যেরা দেখল সেই পাঁচজন বসে আছে এক জায়গায় অক্ষত দেহে এবং গুরু একটি ছাগ বলি দিয়েছেন। এরকম গুরুভক্তির নিদর্শন কী সম্ভব? যদি গুরু হয় গুরুর মত তাহলে শিষ্যও হবে তেমনি। বলতেন 'ঈশ্বররূপে গুরুকে পূজা করো, তিনি তোমাকে অন্য পারে নিয়ে যাবেন। পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখো তাঁর ওপরে, সর্ব বিষয়।'

যদ্যপি গুরু মোর শুঁড়িবাড়ী যায়
তদ্যপি গুরু মোর নিত্যানন্দ রায়।'

এই রকম গুরুভক্তি ও বিশ্বাস চাই। যারা সুষুম্নার পথে যেতে পারে তারাই আত্মাকে লাভ করতে পারে। সেজন্য গুরুর কাছে যাওয়া দরকার।

("The Guru is the conveyance in which spiritual influence is brought to you.")
'গুরুরূপী গাড়িতে করে আধ্যাত্মিক শক্তি তোমার কাছে আসে।'

এমনই মহৎ ছিলেন তিনি যে তাঁর সামনে কেউ কখনও নিজেকে ছোট মনে করতে পারত না। বলে বোঝানো যাবে না কী এক মহত্ত্ব ছিল তাঁর, যার জন্য তাঁর সংস্পর্শে যারা আসত তারাও নিজেদের উচ্চস্তরের মনে করত। এর কারণ, কী এই, যে উনি নিজেকে এমনভাবে তৈরী করেছিলেন যে সকলের মধ্যে কেবল তাদের ভালটাই দেখতেন, মন্দ বা দুর্বলতাগুলো দেখতেন না? মনে হয়, না। তার চেয়েও গভীর কোন কারণ আছে। নিজেকে সেই পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম উপলব্ধি করে উনি সকলের মধ্যে সচ্চিদানন্দ শিবকে দর্শন করেন—সামান্য ত্রুটিগুলি কোথায় তলিয়ে যায়, উজ্জ্বলিত হয়ে থাকে পরমাত্মার প্রকাশ। আমরা আমাদের যতটা জানি, উনি আমাদের তার চেয়েও বেশী জানেন। ক্রমান্বয়ে তিনি সজোরে বলে যেতেন পরম সত্যের বাণী—নিজেকে দুর্বল মনে করা সবচেয়ে বড় পাপ। কেউ অমনিই মহৎ হয় না। উপলব্ধি করো তুমি সেই ব্রহ্ম।

Nothing has power except what you give it. We are beyond the Sun, the Stars, the Universe".

"Blessed is the country in which he was born. Blessed are they who lived on this earth at the same time and Blessed, thrice Blessed are the few who sat at his feet."

স্বামীজী বলতেন যিনি সব বস্তুতে, সর্বভূতে দেখতে পান একইভাবে ঈশ্বর বিরাজমান,—নিত্য, অনিত্য, সবকিছুতে, তিনিই আসল দ্রষ্টা। ঈশ্বরকে সর্বত্র বিরাজমান দেখবার দরুন

"He does not destroy the self by the self and then he goes to the highest goal".

এই সময় নিজের সাম্প্রতিক রচিত একটি কবিতা বলতেন—
'ভাল মন্দ প্রেম আর ঘৃণা। সুখ তথা দুঃখ যাহা বলি
একে ছাড়ি অন্য নাহি থাকে। যুগ্মভাবে বাঁধা তো সকলি।'

দেখতুম এই মন্ত্র তিনি কীভাবে নিজের জীবনে পালন করেন।... উনি যার সঙ্গে থাকতেন সে বড় রাগীমানুষ ছিল। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ওর সঙ্গে থাকেন কেন?'

উত্তর দিলেন, 'আহ্। আমি ওকে আশীর্বাদ করি। আমার সহ্যশক্তি ও সংযম চর্চার ও সুযোগ দিচ্ছে।'

আমরা পাশ্চাত্যবাসীরা—যারা যে-কোন মূল্যে আরামকে লক্ষ্মী করি, তাদের সামনে এ কোন্ সত্যের উদ্ঘাটন?

এমনি করেই প্রতিদিন দেখতাম গীতার মহান তত্ত্বকে দৈনন্দিন জীবনে কী করে পালন করা যায়! পরম আত্মাকে কেমন করে শত্রু মিত্র সকলের মধ্যে একভাবে দেখতে হয়। গুণগ্রাহীর প্রশংসায় অভিভূত না-হয়ে এবং নিন্দুকের নিন্দায় বিচলিত না-হয়ে থাকবার নিয়ত সাধনা চলত তাঁর মধ্যে!...

.....সেই পার্লামেন্ট ধর্মসভায় প্রচণ্ড হর্ষধ্বনির ও প্রশংসার মধ্যেও তিনি অবিচলিত শান্ত ছিলেন—হিমালয়ের গুহায় যেন একাকী বসে আছেন,—এমনই।

মাঝে মাঝে উনি ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। একদিন আমাদের রীতিমত চমকে দিয়ে বললেন, 'এরপর যে নতুন যুগটি শুরু হবে তার ঢেউ আসবে রাশিয়া কিংবা চীনদেশ থেকে। ঠিক কোন দেশটি তা' আমি সঠিক দেখতে পাচ্ছি না। তবে হ্যাঁ, হয় রাশিয়া নয় চীন। একথা তিনি বলেছিলেন ৩২ বছর আগে (১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে) যখন চীনদেশ ছিল মাঞ্চু সম্রাটের শাসনাধীন। সে সময় সে দেশের জনগণের কোন সম্ভাবনা দেখা দেয় নি এবং 'জার' শাসিত রাশিয়া তাদের শ্রেষ্ঠ লোকেদের হাজারে হাজারে সাইবেরিয়ার খনিতে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। যে কোন সাধারণ লোকের পক্ষে এরকম সম্ভাবনা চিন্তা করা অসম্ভব যে ঐ দুটি দেশের দিক থেকে জগতে নবযুগের অভ্যুদয় হতে পারে!

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে উনি বলতেন, এককালে পৃথিবীর সমাজে আধিপত্য করতেন ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতেরা, তারপর ক্ষমতা গেল দেশের যোদ্ধাশ্রেণী বা দেশের ক্ষত্রিয়দের হাতে। এখন আমরা বৈশ্য বা ব্যবসায়ীর ক্ষমতাধীনে। আসলে দেশের অর্থনৈতিক দিকটার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই বৈশ্য শাসনের দিন শেষ হয়ে এল। সে জায়গায় আসছে শূদ্র বা শ্রমিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে উনি কী করে বুঝতে পেরেছিলেন যে বৈশ্যরাজের দিন এখন পতনোন্মুখ? তার চেয়েও বড় বিস্ময় চীন বা রাশিয়ার মত দেশ জগতে অভ্যুদয় করবে নবযুগের, নব জীবনের? জিজ্ঞাসা করলে অত্যন্ত সাধারণভাবে বলতেন, 'আমার মনে হয়।' কিন্তু বলবার ভঙ্গীতে মনে হত উনি এ বিষয় সুনিশ্চিত। একটু পরে বলতেন 'ইউরোপ এখন একটা আগ্নেয়গিরির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। যদি না কোন আধ্যাত্মিক মতবাদের বন্যা এসে এ আগুন নিভিয়ে দেয়, তাহলে এরা পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।' এ ছিল ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ইউরোপ—যখন কিনা সে ছিল শান্তি সমৃদ্ধির শিখরে। কুড়ি বছর বাদে হল সেই বিস্ফোরণ!!

গীতার বাণী : যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্,
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

এই বাণীতে ছিল তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা। পৃথিবীতে যখন ধর্মবোধ লোপ পায়, অথচ জগতে তার প্রয়োজন থাকে সেই সময় দেখা দেন মনুষ্যরূপী ঈশ্বর। আমাদের মাঝখানে অবতীর্ণ হন,—প্রবর্তন করেন নতুন জীবনের যুগ। এই অবতার পুরুষ কেবলমাত্র ধর্মজীবনেই নয়, আমাদের মানসিক, বৌদ্ধিক ও সাংসারিক জীবনেও প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, জ্ঞান সর্ব বিষয়ে নবজীবনের অভ্যুদয়ের প্রকাশ দেখা যায়। জন্ম নেন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা, যাঁরা এইসব বিভিন্ন বিষয়ে খ্যাতিলাভ করেন। ফিজিক্যাল জগতে এই শক্তি প্রকাশ খুব তীব্র নয় কিন্তু ব্যাপক এবং প্রত্যক্ষ।

এই শক্তির প্রভাবে আমাদের মধ্যে স্বাধীনতার ইচ্ছে, জাতীয়তা বোধ ইত্যাদির জন্ম হয়, এককথায় জাতির মধ্যে জাগরণ

(রেনেশাঁস) দেখা দেয়। এই শক্তির প্রভাব স্বামী বিবেকানন্দের মতে প্রায় ছ'শ বছর ধরে থাকে। তারপর ক্রমশঃ সেটা স্তিমিত হয়ে আসে। জগত অবনতির ধাপে নেমে যায় এবং তখন একজন অবতার পুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন দেখা দেয়।

বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে ভারতবর্ষ বস্তুবাদীর স্তরে নেমে গিয়েছিল। সর্ববিষয়ে আধিপত্য করতেন ব্রাহ্মণেরা—যাঁরা নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন যে শূদ্রেরা যদি শাস্ত্রের আলোচনা শোনে তাহলে তাদের কানে গরম তেল ঢেলে দেওয়া হবে। কাজেই একজন অবতারের আবির্ভাবের সময় এসেছিল,—এবং জন্ম নিলেন গৌতমবুদ্ধ।

তিনি মুক্তহস্তে তাঁর জ্ঞানের বাণী ছড়িয়ে দিলেন সকলের মধ্যে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, পুণ্যবান, চোর, সকলেই তাঁর চোখে সমান। নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন হল—হাজার হাজার লোক এই মতবাদ গ্রহণ করল। ধর্মজগতে সাত্ত্বিক এবং শ্রেষ্ঠ ঐশীশক্তির প্রকাশ দেখা দিল। নতুন যুগের অভ্যুদয় হল। রাজপুত্র, নাপিত, প্রভুভৃত্য, কত লোক যে সন্ন্যাস গ্রহণ করল। সংসার ত্যাগ করবার পর তারা সবাই সমগোত্র। রাজপুত্র পুরোহিতের নাপিতের পদতলে অবনত হয়—কারণ নাপিতই দীক্ষা গ্রহণ করেছে আগে।

পালি শাস্ত্রে একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়—প্রবল প্রতাপান্বিত শাক্য বংশের কয়েকটি রাজপুত্র ঠিক করলেন সন্ন্যাস গ্রহণ করে বৌদ্ধসংঘে যোগদান করবেন। সঙ্গে চলল তাঁদের এক নাপিত। সে তাঁদের রাজবেশ ও অলংকারাদি নিয়ে ফিরে আসবে এই ব্যবস্থা হল। পথে যেতে যেতে নাপিতেরও কেমন ইচ্ছে হল সেও রাজপুত্রদের মত বৌদ্ধভিক্ষু হবে। তখন রাজপুত্রেরা তাঁকে উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং বললেন তুমি তুমিই আমাদের আগে ভিক্ষু হও যাতে তোমাকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি।

....অশোকের ২০০।৩০০ বছর পর থেকেই বৌদ্ধযুগের অবনতি দেখা দিল। বৌদ্ধ ধর্মমতের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হল। বোঝা গেল এর অবসান একান্তই প্রয়োজন। পরবর্তী যুগে দেখা দিলেন শংকরাচার্য।

বুদ্ধের ছ'শ বছর পরে এলেন নাজারাথের যীশুখৃষ্ট। চারদিকে এমন শোচনীয় অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে সর্বশ্রেণীর লোকেরা চাইছিল আসুন একজন ত্রাণকর্তা—মেসিহ্—ওদের ত্রাণ করতে। দেহত্যাগের অল্প দিনের মধ্যেই সেই ঈশ্বরের সন্তানের মতবাদ সমস্ত বিশ্বকে নাড়া দিয়ে সচেতন করে তুলল।... রোম-সাম্রাজ্যের পতন হল আর প্রতিষ্ঠিত হল খৃষ্টধর্ম।

এর ছ'শ বছর পরে দেশে এলেন মহম্মদ। দেশকে অন্ধকার ও অবনতি থেকে উদ্ধার করলেন। এল ইসলাম শক্তি যা পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকাকে এমন কী দক্ষিণ ইউরোপকেও প্রভাবিত করল। স্পেনও ওরা জয় করেছিল; কিন্তু পরে সেখানে ওদের প্রভাব প্রায় মুছে গেল।

এদিকে দক্ষিণ ভারতে এলেন শংকরাচার্য—পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্। এ সময় (অর্থাৎ ৮০০ খৃষ্টাব্দে) বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটেছে। নানা রকম কুপ্রথা এই ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যা তাকে কেবলমাত্র ধ্বংসাত্মক কাজের যোগ্য করে তুলেছে।

শংকরাচার্য ভারতকে পবিত্র উন্নত আত্মার বাণী শোনালেন। বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে বিতাড়িত হল।

ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন তখন আবির্ভূত হলেন সেন্ট ফ্রান্সিস (অ্যাসিসি)। আধ্যাত্মিকতার ঢেউ খেলে গেল দেশের ওপর দিয়ে। সেই যুগে একে একে এলেন মাইকেল এঞ্জেলো, লেন-ডেনতো সিজিনি, দান্তে প্রমুখ ব্যক্তি। অন্ধকার যুগ কেটে গিয়ে রেনেশাঁসের যুগ দেখা দিল।

বিংশ শতাব্দীতে দেশময় যুদ্ধ, ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি। দেশের সুন্দর জিনিস কত কী-ই মুছে গেল। জাতির সঙ্গে জাতির লড়াইয়ে ইউরোপে ধর্মবোধ লোপ পেল। বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার অস্তিত্ব হয়ে উঠল সন্দেহজনক। অতএব দেশে একজন অবতার পুরুষের প্রয়োজন দেখা দিল।...

......'সময় এসেছে',—তার পরিচয় কী করে বোঝা যায়? ঊনিশ শতকে একাধিক জ্যোতিষ্ক ছোট বড় যাই হন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং কমবেশী যাঁর যতটা ক্ষমতা তাই দিয়ে পৃথিবীকে ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করেছেন। প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে পারশ্যেতে বাব্ এবং বাহ্উল্লা এবং ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ।

এঁদের মধ্যে যথার্থ অবতার কে? বাহিস্টরা বলবেন বাব্ এবং বাহ্উল্লা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসকরা বলবেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। কোন চিহ্ন দেখে আমরা সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছব? এদের মধ্যে কার বাণী সবচেয়ে সময়োপযোগী? কে বাণী কেবল একটিমাত্র জাতির প্রতি নয়, সমস্ত বিশ্বের প্রতি? কে সেই রকম সার্বজনিকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী প্রচারিত করেছিলেন? কে তিনি যিনি নতুন আধ্যাত্মিক যুগের অভ্যুদয় করেছিলেন? কে সেই জ্ঞানের আলো এমনভাবে জ্বালালেন যা কখনও নিঃশেষ হবার নয়? কে তিনি যে এমন শক্তির পরিচয় দিলেন, যিনি নতুন স্বর্গ এবং নতুন মর্তের দিশা দেখালেন? ভবিষ্যৎই এ প্রশ্নের উত্তর দেবে।

ক্রিস্টিনের চিঠি

(৫)

৮নং বোসপাড়া লেন। বাগবাজার
কলিকাতা। ২০শে আগস্ট। '২৪

ওগো প্রিয়,

আবার ৫০ ডলার পাঠিয়েছ! তোমার চিঠি এক সপ্তাহ পরে এল। তোমার চিঠি পেতে বড় ভালবাসি।......

তুমি শুনলে অবাক হবে কেন এতদিন আমার চিঠি পাওনি। গত ৪ঠা জুলাই থেকে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম। এবারও অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে। তবে শরীরে শক্তি পাচ্ছি তাড়াতাড়ি এবং মনে হয় বাল্যকালাবধি এই যন্ত্রণা (My thorn in the flesh) থেকে মুক্তি পেয়ে যাবো। বুঝতেই পারছ এই রকম অবস্থায় অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থ সাহায্যের মূল্য কতখানি। তুমি এত দামী—এমন এক উচ্চশিখরের মানুষ যে সেখান থেকে তোমাকে টেনে নামানো সংসারের কোন ক্ষুদ্রবস্তুর পক্ষে সম্ভব নয়। আমি জানি যেমন সাবলীল গতিতে পয়সা আমার কাছে এসে যাচ্ছে তেমনিভাবে সে যাবে সর্বদা। সেই প্রার্থনাই করি—তাই হোক। তবে টাকার চেয়েও বেশী যে জিনিষটা সেটা তোমার হৃদয়; যার জন্য আমার প্রার্থনা। সে কথা জানানো বড় কঠিন।

এই গ্রীষ্মে Wind Mill Pointe -এ বসে বসে এবারকার গ্রীষ্মকালে তোমার কথা খুব মনে হোত। আশাকরি তুমিও গ্রীষ্মকালটা উপভোগ করেছ আমার মত।

আশীর্বাদ ও অনেক ভালবাসাসহ
ক্রিস্টিনা

(৬)

৮নং বোসপাড়া লেন। বাগবাজার
কলিকাতা। ১২ই নভেম্বর। ১৯২৫

ওগো আশীর্বাদধন্য প্রিয়,—

তোমার সুন্দর চিঠিখানি ও উপহার পেয়ে পরিপূর্ণভাবে অভিভূত হয়েছি। কী কোমলতা। কী সূক্ষ্মতা। ভাষায় বোঝাতে পারব না। তোমার কাছে যে আত্মাটি আসছে তুমি তাকে যতটা দিতে পারবে ততটাই তার প্রয়োজন! জীবন বা সংসার তোমাকে যতটা দিতে দেবে—ততটাই। আর হ্যাঁ, সেইটুকুকে সামান্য মনে করে তাকে অবহেলা কোর না। এরকম মা-বাবা, এরকম দেহ এবং এরকম পরিবেশ যা' তুমি তাকে দেবে তা' খুব কম আত্মাই পেয়ে থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন,

"It is very difficult for the most highly evolved souls to find suitable bodies and they usually end by being obliged to take one that carries with it handicaps—which make life difficult."

তোমার গত চিঠিতে (যার সঙ্গে ১০০ ডলারের একটা draft পাঠিয়েছিলে) যে অন্তর্নিহিত একটা (depression) অবসাদের মনোভাব ছিল তা কী আমি ধারণা করতে পেরেছিলাম? তোমার উদারদানে আমি যে কী রকম বোধ করি তা' ভাষায় তোমাকে বোঝাতে পারব না! এই কারণেই তোমাকে আরও আগে চিঠি লিখতে পারিনি। একলা একটা ডাক ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর গত সপ্তাহে আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।

দেখতে পাচ্ছ আমি এখনও এখানেই আছি। গত চিঠিটা তোমাকে লেখবার পর ভাবলাম পরের সপ্তাহে পুরুলিয়া পৌঁছে তোমাকে সবিস্তারে একটি বড় চিঠি লিখব! দেখলাম ভালই তো আছি! তারপর বোধহয় যাবার ব্যবস্থার জন্য একটু উত্তেজনা হয়েছিল অথবা তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিলাম বলে অথবা এইটাই হবার ছিল বলে, যাই হোক—আবিষ্কার করলাম আমি ভাল নেই এবং tavel এর উপযোগী সুস্থ নই। অতঃপর নিজের ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরাও বন্ধ। আমার ওপরে ডিক্রিজারী হয়েছে যে, আগামীকাল থেকে, বিছানা থেকে উঠে ঘরের মধ্যেই একটু চলাফেরা করতে পারি মিনিট কয়েকের জন্য। তারপর প্রতিদিন একটু একটু করে চলাফেরা বাড়ানো। কিন্তু এবারে সতর্ক থাকতে হবে 'বাড়াবাড়ি' যেন না-করি!

এ বড় বিচিত্র যে যতক্ষণ আমি আমার Chause bounge a la Madame Recanier' -এ থাকি বেশ ভালোবোধ করি এবং তুমি যা দেখেছ আমাকে তার চেয়ে চেহারাও ভাল হয়। কিন্তু একটু যদি কোন পরিশ্রমের কাজ করতে যাই—চিন্তাশীল লেখাপড়া তাহলেই বুক ধড়ফড় করে এবং আমার যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন (শয্যাশায়ী) যেখানে মাসকয়েক আগে ছিলাম। তোমার এটা জানতে মনে হতে পারে যে, ছমাস ভোগবার পর আমি এখন অনুভব করছি যে এটা ঠিক অসুস্থতা নয়। এটা হচ্ছে জবরদস্তি খানিকটা বিশ্রামের সময় লাভ করে সে সময়টা হবে

a period of devine renewal—At last something is coming back to me which I lost two or three years before I left America. If that comes back it is worth everything.

তোমার কথা খুব ভাবব,—আগামী ১২ই মার্চ পর্যন্ত ভাবব।—অবশ্য তারপরেও নিশ্চয়।

তোমার উপহারটি পেয়ে আমার কী রকম মনের অবস্থা হয়েছিল তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ! প্রথমে মনে হল এ আমি নিতে পারি না। এটা খুবই বেশী পাওয়া! মনে হ'ল তুমি নিজেকে বঞ্চিত করে আমাকে দিলে। কিন্তু তারপরই বিষয়টি অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলাম। আমি, মুক্তকণ্ঠে তোমাকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম তোমার এটা আমাকে দিতেই হোত,—কারণ তুমি একটি উদারহৃদয় পাবার মত আশীর্বাদধন্য এবং সেই হৃদয় তোমাকে দিয়ে এটুকু করাবেই।

কিন্তু আর পাঠিও না। এই তো যথেষ্ট,—প্রচুর, বিশ্বাস করো। এমন একটা মানসিক অবস্থায় ছিলাম যখন এটা এসে পৌঁছল! আঠারো সপ্তাহ পর কেবলমাত্র গত সপ্তাহে ঘর থেকে বেরুবার মত সুস্থ হয়েছি। এ সপ্তাহে তিনদিন গাড়িতে করে বেড়াতে বেরিয়েছি। আজও যাচ্ছি। এখনও ২।৪ কদমের বেশী হাঁটতে পারি না!..... আগামী সপ্তাহের মধ্যেই কলকাতা ছাড়ছি। পুরুলিয়া থেকে তোমাকে চিঠি লিখব!

আমার বোনের মৃত্যু সংবাদ মার মনকে বড় বিচলিত করেছিল। সেই থেকে heart এর গোলমাল, তাইতেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম দুমাস আগে। সে ভাবটা কেটে গেছে। আবার নতুন দেহ নতুন মন নিয়ে শুরু করেছি। অনেক কিছু ত্যাগ করতে পেরেছি মনে হয়!

২।১ সপ্তাহের মধ্যে আবার লিখব।
আন্তরিক ভালবাসা। ক্রিস্টিনা।

(৭)

৮নং বোসপাড়া লেন। বাগবাজার।
কলিকাতা। ৩১শে ডিসেম্বর। ১৯২৫

Radiant souled one,

এইভাবেই আজকাল তোমাকে চিন্তা করি। তোমার লেখা ৩০শে সেপ্টেম্বরের সুন্দর চিঠিটি পেয়ে পর্যন্ত মনে হচ্ছে ওপরের আবরণটি একটা বোধহয় উন্মোচিত হয়েছে। একটা পাতলা জালের মত যা' জানিয়েছিলাম,—সে রকম আগে কখনও বুঝিনি। এটা আমাকে বিশেষ mood এ নিয়ে আছে! আমি জানি তোমার কাছে যে (সন্তান) আসছে তার মধ্যে অসাধারণ রকমের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে। তোমার ও অন্যান্যের জীবনের মধ্যে আমি এখন খুবই নিখুঁত পরিবেশে আছি। আমি না চাইলে, আমাকে কারো সঙ্গে দেখা করতে হয় না! আমাকে যতদূর সম্ভব দূরে [illegible] রাখা হয়েছে এবং মানুষের যতটা ক্ষমতা সম্ভব ততটাই আ[illegible] জমা করা হয়। জানিনাতো বলতে পারবে এই সময়টা আমার পক্ষে উপকারী না অপকারী কী হয়েছে!—

আবহাওয়া এখন কী সুন্দর যে বলা যায় না! সমস্ত দরজা-জানালার মধ্যে দিয়ে উজ্জ্বল সূর্যের আলোর ছটা (আমার ঘরে ছ'টি দরজা জানালা), ফুল ফুটেছে, পাখীরা গাছে গান গাইছে। দিনের গরম সূর্যের যা কিছু ত্রুটি রাতের ঠাণ্ডা চাঁদ পুরো করে দেয়!

আবার যখন গরমকাল দেখা দেবে তখন তোমার দেওয়া টাকাটির সদ্ব্যবহার করব—কোন ঠাণ্ডা জায়গায় যাবো। ও টাকা আশীর্বাদের ধন। দানের ফল তুমি ফিরে পাও এই প্রার্থনা করি যতক্ষণ না সেটা তোমারই ভাষায় Cool Million হয়ে ওঠে! আর তোমার জন্য চিন্তা ও আশীর্বাদ সতত করব—সে তো উপহার পাওয়ার জন্য নয়—সেটুকু করি তোমাকে আমি ভালবাসি বলে।

ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন, ভাল রাখুন।

অনেক ভালবাসা
ক্রিস্টিনা

(চলবে)

!! তেরো !!

[illegible] হদিশ পাওয়া গেল না। পাওয়া [illegible] বিক্ষত দেহের অবশিষ্ট, তাও [illegible] পরে। লোকটাকে বাঘে বয়ে নিয়ে [illegible] সুতোর মুখ অবধি। জঙ্গল [illegible] খুঁজতে খুঁজতে ওকে একটা [illegible] কাদামাটিতে পড়ে থাকতে [illegible] উপায় নেই, তিন দিনের [illegible] উঠেছিল। দুর্গন্ধে কেউ [illegible] সাধ্য কি!

[illegible] ছিল লোকটার?

[illegible] পর জানা গেল, [illegible] নাম ভাসান। নিবাস ছিল চব্বিশ [illegible] কাছাকাছি একটা [illegible] নামটা কেউ বলতে পারল না। [illegible] যে একটা খবর পাঠানো [illegible] পাওয়া গেল না।

[illegible] ভালই হয়েছে হুজুর, [illegible] লোক রইল না কেউ।

[illegible] কি ভাবছিলেন কে জানে, [illegible] না করে পারলেন [illegible] থাকলে সত্যি সত্যি [illegible] ঝামেলা পোহাতে হত। [illegible] সহজে মুখ বুজে [illegible] পারল ওর পক্ষে তা কিছুতেই [illegible] চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ [illegible] বললেন, ঝামেলার কথা নয় [illegible] মানুষ হিসেবে আমাদেরও একটা [illegible] থাকা উচিত। [illegible] ওর শ্রাদ্ধ-[illegible] একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া কে জানে লোকটার সংসারপাতি ছিল কিনা, [illegible] ছেলেমেয়ে বউ থাকলে তারা সারা জীবন [illegible] কোন হদিশ জানবে না, এটা ভাল [illegible]।

রজনী বলল, আমাদের এখানে সব্বই [illegible] লোকেরই কোন দায়-দায়িত্ব নেই [illegible]। যারা এই জঙ্গলে কাজ করতে [illegible], তাদের বাড়ি-ঘরের মায়া থাকলে [illegible] না। এখানে জীবন মুঠোয় করেই [illegible] করতে হয়।

[illegible] না, এটা ঠিক নয়। কারো কোন [illegible] থাকবে না, হিসেব থাকবে না এটা ঠিক নয়। তুমি প্রতিটি লোকের নাম-ধাম, বাপের নাম, সাকিন সব লিখে রাখবে। ভবিষ্যতে কেউ যেন কিছু না বলতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। আচ্ছা ভাল কথা, লোকটাকে ভাল ভাবে সৎকার করা হয়েছে তো?

রজনী মাথা ঝাঁকাল, আমাদের সাধ্য মতো তো করে এলাম হুজুর। বামুন পুরুত তো আর পাওয়ার কথা নয় এখানে, ও ব্যাপারটাই কেবল বাদ গেল।

নরেন্দ্রনারায়ণ কি ভাবলেন কিছুক্ষণ, পরে বললেন, বামুন ঠাকুর একজন কাউকে সঙ্গে নিয়ে এলে পারতে। বনবিবির পুজো করতে গেলেও তো লাগবে।

রজনী বলল, সে আমরা ঠিক আনিয়ে নেব হুজুর। দিনে বিঘাটেক করে জঙ্গল সাফ হচ্ছে এখন, আর কছুটা এগোলেই আমরা ঘটা করে এখানে পুজো লাগিয়ে দেব। আশে-পাশের আবাদের লোকদেরও আমরা নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসব।

—সে তো বিরাট খরচের ব্যাপার হে। খরচের কথা ভেবেছ?

রজনী হাসল, যার খরচ সেই দেবে হুজুর। আপনি কিছু ভাববেন না।

—মানে?

—বনবিবির পুজো। দেখবেন হুজুর, বনবিবিই তা জোগাড় করে দেবেন।

—বড্ড হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে না।

রজনী বলল, আপনি অত ভাবছেন কেন ছোটকর্তা। দেখবেন যাচ্ছের ফেলেই মাছ-ভাজা হয়ে যাবে। এখানকার খরচ থেকে বাঁচিয়েই পুজোর খরচটা আমি তুলে নেব। আর সেই জন্যই তো একটু দেরি করতে চাইছি।

নরেন্দ্রনারায়ণ বোধহীন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

রজনী বলল, অবশ্য আপনি এখানে থাকতে থাকতেই পুজোটা সেরে ফেললে ভাল হত। কিন্তু এখন যে ভাবে কাজ এগোচ্ছে হুজুর, তাতে এখনি পুজোর হুজ্জোত লাগিয়ে দিলে কাজে ঢিলে পড়ে যাবে।

—না না পরেই করো। তোমাদের সুবিধে মতোই করো। আর ভাল কথা কাল পরশুই আমি কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছি।

—আর দুটো দিন থাকবেন না হুজুর?

—কাজ তো শুরুই হয়ে গেছে। মিছি-মিছি আমাদের বজরায় শুয়ে বসে কাটাবার কোন মানে হয়!

এতক্ষণ কামিনী চুপচাপ বসে শুনছিল, বিষয়-সম্পত্তির আলোচনায় ওর নাক গলাবার কথা নয়, কিন্তু এবার যেন ও-কথা বলার সূত্র খুঁজে পেল। বলল, তাছাড়া আর দু'দিন বাদেই বড় দিন আসছে। ও সময়টা আমাদের কলকাতাতেই থাকতে হবে।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। রজনী ভ্রূ বাঁকা করে কামিনীকে একবার দেখল।

কামিনী বলল, কি? বড়দিনে কলকাতায় থাকবেন না?

—থাকব না কেন! নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, ইচ্ছে তো সে রকমই। তবে সব কিছুই এখন আমাদের রজনীর উপর নির্ভর করছে। কি বলিস রজনী, আমরা না হয় কালই রওনা দেই।

রজনী ঠোঁট কামড়িয়ে কি ভাবল। বলল, কালই যাবেন, হরিণের মাংস খাবেন না?

—হরিণের মাংসের কথা তো প্রথম দিন থেকেই শুনে আসছি, কবে যে হরিণ ধরা পড়বে তার কি ঠিক আছে?

—ঈশানকে লাগিয়েছি হুজুর। আজ-কালের মধ্যেই পেয়ে যাবো। ঈশান কোন চেষ্টার কসুর করছে না।

—সবই তো বুঝতে পারছি, তবে কাল-পরশুর মধ্যে পাওয়া যায় ভাল, না হলে আর কি করা।

রজনী বলল, ঠিক আছে হুজুর, কাল-কের মধ্যেই যে ভাবে পারি আপনাকে হরিণ খাওয়াবো। এখন একবার জঙ্গলের দিকটা ঘুরে আসি। লোকগুলোর পেছনে লেগে না থাকলেই ওরা কাজে ফাঁকি দেবে।

নরেন্দ্রনারায়ণ রজনীকে আর আটকালেন না। শীতের রোদে ভারী চমৎকার একটা আমেজ ছড়িয়ে আছে। পাশেই কামিনী পিঠ-ভর্তি চুল ছড়িয়ে দিয়ে পানের কৌটো নিয়ে পাকাগিন্নীর মতো বসেছে। নরেন্দ্রনারায়ণ একবার ওর বসার ভঙ্গিটা দেখে নিলেন, তারপর জঙ্গলের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, যাই বল কামিনী, এই রোদটার কিন্তু তুলনা নেই।

কামিনী উচ্চারণ করল, হুঁ।

এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, কাছারি বাড়ির উঠোনটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। নতুন করে বাড়িটার আবার মেরামতি কাজ শুরু হয়েছে। পরিখার পাশ দিয়ে মজুরদের জন্য সারসার ঘর বানানো হচ্ছে। আর জঙ্গল কাটার কাজ এখন এগিয়ে চলেছে পরিখা ছাড়িয়ে পেছন দিকে। গাছ কাটাই, কাঠ বাছাই; ভেড়ির একদিকে থাক থাক কাঠ

ঈশান প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি কি দেখাতে চাইছে শুকদেব। কিন্তু শুকু ওকে আঙুল তুলে ওপরের দিকে দেখাচ্ছে।

ঈশান উপরে তাকাল, কি?

—দেখছ না মৌমাছি উড়ছে, ধারে কাছে কোথাও চাক আছে।

ঈশান দেখল, ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি উড়ে যাচ্ছে ওদের মাথার ওপর দিয়ে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। মউলি থাকলে হাঁড়ি হাঁড়ি মধু পাওয়া যেত গো।

শুকু বলল, চল না, আমরাই একবার চেষ্টা করে দেখি। দেখবে?

—মাথা খারাপ, ঢাল নেই তরোয়াল নেই, চাক ভাঙা কি সোজা কথা। তাছাড়া কত দূরে চাক রয়েছে কে জানে। এখন আর ছুটতে পারব না আমি।

শুকু অনেকক্ষণ ধরে মৌমাছিদের লক্ষ্য করল, তারপর বলল, চলো, ঠিক আছে।

আবার ওরা হাঁটতে শুরু করে। বুনো পাতার গন্ধ, পায়ের নিচে নরম কাদামাটি। গুল্মলতা সবই যে ওপর দিকে উঠে আছে এমন নয়, কিছু কিছু বাঁকা ত্রিশূলের মতো কাঁটাও আছে। একটু সাবধান না হলেই এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে।

খুব সাবধানেই ওরা পা টিপে টিপে এগোতে থাকে। যতদূর সম্ভব কম শব্দ করা যায়, তাই চেষ্টা ওরা করতে থাকে। মাঝে মাঝে পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ ওঠে। এ-ডাল থেকে ও-ডালে দৌড়ে দৌড়ে [illegible] কাঠবেড়ালিগুলো জানে না এই চৌধুরী রাজাদের জঙ্গলে একটাও গাছ থাকবে না। যদি জানত ওদের এই নিশ্চিন্ত ভঙ্গিটা বোধ হয় থাকত না।

অদ্ভুত লাগে ঈশানের। মানুষের কাছে শেষ পর্যন্ত হারতেই হবে জঙ্গলকে। জঙ্গলের হম্বিতম্বি আর ক'দিন। এরপর জঙ্গলের জমা পড়বে এই কোম্পানিতে। প্রয়োজনে দু'টি চারটি গাছও হয়তো নতুন করে লাগানো হবে। সবই মানুষের মর্জিমাফিক।

শুকু হঠাৎ একটা ঝটকা টান দিল ঈশানকে, কি ভাবতে ভাবতে চলেছ বলো দেখি। আর একটু হলে গর্তটার মধ্যেই পড়ে যেতে।

ঈশান দেখল, সামনেই একটা ছড়ানো গর্ত। জল আর কাদা থিকথিক করছে। একগাদা ব্যাঙ আস্তানা গেড়েছে এখানে। একটু থমকে দাঁড়িয়ে বলল, তবু ভালো গর্ত। আমি ভাবলাম বাঘফাগ দেখে বোধহয় টান মেরেছ আমাকে।

—এসব গর্ত বড় খারাপ। আর ব্যাঙ থাকা মানেই ধারে কাছে সাপও থাকতে পারে।

ঈশান বাঁদিক দিয়ে গর্তটা পেরিয়ে এল। পেরিয়েই কিছুটা ঢাল মতো জায়গা, তরতর করে নিচে নেমে এল।

সুন্দরবনের জঙ্গলে সচরাচর এরকম ঢাল চোখে পড়ে না। গোটাটাই প্রায় সমতল থাকে। ঢালটার জন্যই একটু অদ্ভুত লাগছিল ঈশানের।

শুকু বলল, ঐ যে ফিরিঙ্গি দেউলটা দেখা যাচ্ছে। মাটি কেটে এখানে বোধ হয় ফিরিঙ্গিরাই ঢাল বানিয়েছিল এককালে। দেয়াল-টেয়ালও হতে পারে। জলে আর ঝড়ে এখন ঢাল হয়ে রয়েছে।

ঈশান ফিরিঙ্গি দেউলের দিকে হাঁটতে শুরু করে। বহু পুরনোকালের কিছু ইঁটের গাঁথনি। ঢিবি মতোন। জঙ্গল এসে গ্রাস করে নিয়েছে। কে বলবে এককালে ওখানে মগ বা ফিরিঙ্গিরা বহাল তবিয়তে বাস করে গেছে। এককালে এখানেও লোক-জনে গমগম করত। কে বলবে ফিরিঙ্গিরা শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে নির্মূল হয়ে গেছে এখান থেকে। জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে পারেনি ওরাও।

ওরা পারেনি বলে আর কেউ পারবে না এমন কথা নয়। ঈশান জানে, কয়েক মাসের মধ্যেই এই জঙ্গলের সব জারিজুরি শেষ হয়ে যাবে আবার।

—ওপাশে চল। ওদিকে কেওড়া গাছের জঙ্গল শুরু হয়েছে।

ঈশান দেখল, সরু সরু পাতা, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। ওরকম থাকে থাকে গাছ-গুলোকে দাঁড়িয়ে দেখে বেশ লাগছিল ওর।

—এত গাছ! এখানেই কিন্তু হরিণ আসার কথা। অথচ নাম-গন্ধ নেই।

—আমাদের কপালে থাকলে এখানেই পাবো, নইলে কোথাও নয়। আমরা বরং দেউলের ঐ ইঁটের পাঁজার ওপর উঠে বসি চলো?

ঈশান আপত্তি করল না। হরিণ একটা না পেলে কিন্তু ইজ্জত থাকবে না আমাদের।

শুকু হাসল, আমাদের আবার ইজ্জত। বাবুরা হরিণ খাবে, আর প্রাণের ঝুঁকি নেব আমরা।

—না না, তা ঠিক না। আসলে হরিণের দেশে এসে একটা হরিণ মারতে পারব না, এটাই বা কি কথা!

ইঁটের পাঁজার কাছাকাছি এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল শুকদেব।

—কি হল?

—সাপ! আস্তে।

—সাপ, কোথায় সাপ?

—ঐ যে পাঁজার গায়ে জড়িয়ে আছে, দেখছ না?

সাপটাকে চিনতে বেশ খানিকক্ষণ সময় গেল ঈশানের। ইঁটের গায় অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে গাছের শেকড়, ইঁটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

কি সাপ?

রং দেখে ধরার উপায় নেই। শুকু বলল, যে সাপই হোক চেহারা দেখেছ?

মোটা রংয়ের গা, তেলে জলে যেন চকচক করছে। ঈশান তাকিয়ে থাকল।

—এই শীতের দিনে সাপ সাধারণত গর্তে থাকে। কিন্তু এ শালা বাইরে যখন বেরিয়েছে পড়েছে ব্যাটাকে আমি ধরব।

(চলবে)
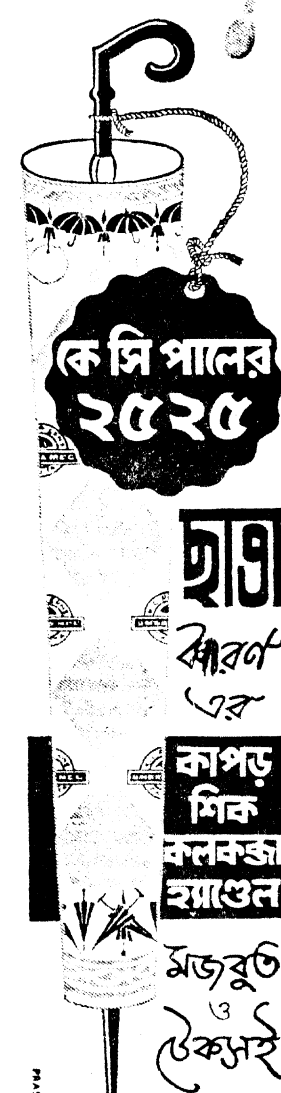
শিল্পকলা

আকাঙ্ক্ষা না হইলে পূর্তি হয় না। দেশের লোকের মধ্যে চাহিদা না থাকিলে, শিল্প অথবা অন্য কোনও বস্তুরই প্রসার বা উন্নতির সম্ভাবনা হয় না। ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশে, শিল্পের সমঝদার এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, উভয়েরই অভাব। শিল্পের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে যে ভাগ্যবান, ব্যক্তি সমর্থ, অধিকাংশ স্থলে তাঁহার রুচি বিকৃত, এবং স্বদেশী শিল্পী ও শিল্প-দ্রব্য দুই-ই তাঁহার অনুগ্রহ হইতে প্রায়ই বঞ্চিত হয়। দেশের সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্প-শিক্ষারও অভাব এবং দেশ নিতান্ত দরিদ্র।.... বাঙালীর শিল্পকে জীবন্ত করিতে হইলে, বাঙালীর জীবনের মধ্যে নিহিত সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা, আদর্শবাদ ও বাস্তবিকতা —এই সমস্তকেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ......বাঙালীর জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যদি কিছু বড়ো জিনিস থাকে—এমন জিনিস যাহা সত্য-সত্যই সমগ্র জাতির দেহ মন ও প্রাণকে নাড়া দেয়, তবে সর্বদর্শী এবং কৃতী শিল্পী থাকিলে তাহার উপযুক্ত শিল্পময় প্রকাশ হইবেই।....

সুনীতিকুমার
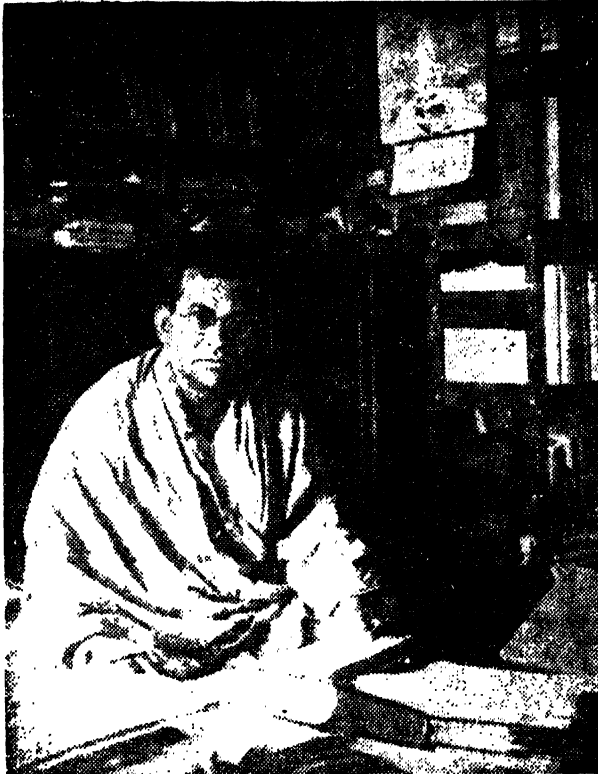
'তাঁহার কোন গোঁড়ামি নাই। তিনি ন্যাকামি সহ্য করিতে পারেন না। 'আদিখ্যেতা' কথাটা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনি. এটা তাঁহার বরদাস্তের অতীত। কিন্তু তাই বলিয়া কোন নিষ্ঠাবানের আচরণে তাঁহাকে কটাক্ষ করিতে শুনি নাই। পরমত সহিষ্ণুতা তাঁহার একটি প্রধান গুণ। নিজ আচরণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, নিজ মতবাদে অবিচল থাকিয়াও, ভিন্ন আচারী, বিভিন্ন মতাবলম্বী পাঁচজনকে লইয়া তিনি ঘর করিতে জানেন। নিজের জন্য অপরকে ব্যতিব্যস্ত বা আপনার ক্রিয়াকলাপে একটা দৃশ্য সৃষ্টি করা, এটাও তাঁহার ধাতুতে নাই।'

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

'সুনীতিবাবুর পাণ্ডিত্য তাঁর গায়ের জামা-জোড়া নয়। সে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল। এ পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রমধ্যে যিনি এসেছেন তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন কেমন সহজে তাঁর পাণ্ডিত্যের রশ্মি বিকীর্ণ হয়। বস্তুত, সুনীতিবাবু যেন একটি ব্যক্তি নন, একটি ইনস্টিটিউশন, একটি আসর। সে শুধু বিদ্যার ও জ্ঞানের রঙ্গভূমি নয়, সেখানে নানা দেশের নানা অভিজ্ঞতার ও জ্ঞাতব্যের পরিচিত অপরিচিত অনেক কিছুরই পরিচয় পাই। জীবনকে তলিয়ে না দেখেও এমন সহজভাবে ভালবাসা আমি আর বড় কোথাও দেখিনি।'

সুকুমার সেন

'শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বহুবার বহু বইতে একটা কথা পড়িয়াছি, তাহা হইল এই যে, এক বিষয়ে বিশেষ করিয়া জানা, আর সঙ্গে সঙ্গে সব বিষয়েই কিছু কিছু করিয়া জানা—ইহাই হইল আদর্শ শিক্ষা। এইভাবে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে আমরা কম আসিয়াছি; যে কয়েকজনের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে আচার্য সুনীতিকুমারকে তাহার মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য করি। তাঁহার নিজের বিশেষ বিষয় ভাষাতত্ত্বে তাঁহার কি অধিকার আছে এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজে কাহারও কোনও সংশয় নাই; কিন্তু সেই সঙ্গে বিস্মিতভাবে লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার আশপাশের অন্য সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান। সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, শিল্প-সংস্কৃতি যে কোন বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ, অনুশীলন এবং অধিকার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ......আচার্য সুনীতিকুমার তাঁহার জীবনে যত দেশবিদেশ ঘুরিয়াছেন বাঙালীদের মধ্যে তাহা একান্ত বিরল না হইলেও সংখ্যায় অতি অল্প। এত দেশ ভ্রমণ এবং সর্বদেশের মনীষী এবং মোটামুটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় সুনীতিকুমারের মানসিক পরিমণ্ডলকে বিরাট বিস্তৃতি দান করিয়াছে। মানুষকে সংস্কার মুক্ত দৃষ্টিতে মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করিবার প্রবৃত্তি তিনি লাভ করিয়াছেন,—আবার তাহার মধ্যেই তিনি রক্ষা করিয়াছেন প্রবল জাত্যভিমানকে। সে জাত্যভিমানে তিনি শুধু একজন ভারতীয় হিন্দু নন, তিনি বিশেষভাবেই একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ; সেই বাঙালী ব্রাহ্মণের প্রতীক চিহ্ন চাদর-খানিকে আজ পর্যন্ত সেই জাতীয় গর্বেই বহন করিয়া বেড়ান। কিন্তু একটি মানুষকে দেহে মনে খাঁটি বাঙালী ব্রাহ্মণ হইয়াও আবার নিখিল মানুষের সঙ্গে অকুণ্ঠভাবে বিশ্বনাগরিক হইয়া উঠিতে যে কোথাও কোনো বাধা নাই এইটাই যেন সুনীতি-কুমারের প্রতিপাদ্য। জাতীয়তা এবং বিশ্ব-নাগরিকতাকে যে সর্বদা পরস্পরবিরোধী করিয়া তুলিতে হইবে এমন কথা নাই; উভয়ের মধ্যে যে একটি স্বচ্ছন্দ গমনাগমনের সম্ভাবনা রহিয়াছে এই সত্যের প্রতিই তাঁহার ইঙ্গিত।'

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

'শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমার জীবনে পাণ্ডিত্য প্রতিভা, বুদ্ধির বলে শ্রদ্ধা সম্মান প্রণাম তত্ত্ব তথ্য অনেকই পেয়েছেন, তার উপরেও একটি আশ্চর্য প্রাপ্তি তাঁর হয়েছে, সেটি এই জগৎ ও জীবনের মধ্যে সকলতত্ত্ব ও তথ্যের বাইরে বা ঊর্ধলোকে একটি আনন্দময়তার পরিবেশ আছে সেই পরিবেশের বাতাস থেকে নিশ্বাস নিতে পেরেছেন—তার আলো থেকে তিনি একটি প্রসন্ন প্রশান্ত দৃষ্টি পেয়েছেন, যাতে তিনি অবগাহন করে তার পুণ্য ফল বাঙালী জীবনকে দিয়ে গেলেন।'

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

'পাণ্ডিত্য ছাড়াও সুনীতিকুমার বিবিধ সামাজিক গুণের অধিকারী। যেমন বড় সভায় তেমনি ছোট অন্তরঙ্গ আসরেও তিনি তাঁহার সরল সংলাপচাতুর্য ও সামাজিক সহৃদয়তার পরিচয় দেন। অতি জটিল তত্ত্বকেও সহজবোধ্য করিয়া উপস্থাপিত করায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য। তাঁহার বিপুল পাণ্ডিত্য ও বহুমুখী জ্ঞানসম্ভার তাঁহার মনের সহজ স্বচ্ছন্দতা ও লঘু চালকে বিন্দুমাত্র নষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার রসিক, মজলিসী মন তাঁহার জ্ঞান-প্রকাশকে দীপ্ত ও উপভোগ্য করে। তিনি শুধু জ্ঞানী নহেন, জ্ঞানের রুচিকর পরি-বেশনেও সিদ্ধহস্ত।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(কথা সাহিত্য থেকে)

আচার্য

আচার্য সুনীতিকুমার সাতাশি বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। সাতাশি বছরকে স্বল্পায়ু বলা চলে না—তবু এ ক্ষেত্রে মৃত্যু অপ্রত্যাশিত। কারণ সুনীতিকুমারের অটুট স্বাস্থ্য প্রবীণদের ঈর্ষার ও নবীনদের বিস্ময়ের বিষয় ছিল। এই বয়সেও তাঁর চলন বলন উদ্যম ও কর্মক্ষমতায় ভাটার টান দেখা দেয়নি। সকলেরই আশা ছিল তিনি পরমায়ুর দশক পূর্ণ করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিরর্থক। তাঁর লোকান্তর প্রয়াণ আকস্মিকের বজ্রপাতের মতো সমস্ত বাঙালী সমাজকে অভিভূত করে ফেলেছে, আর শুধু বাঙালী সমাজই বা বলি কেন, ভারতীয় বিদ্বৎসমাজকেও এই দুর্ঘটনার তরঙ্গ আঘাত করবে, এমন কি এই তরঙ্গের শেষ প্রান্ত পৃথিবীর বিদ্বদসমাজেও গিয়ে আঘাত করবে। এই বাঙালী মনীষী শেষ জীবনে বিশ্বমনীষীতে পরিণত হয়েছিলেন।

সুনীতিকুমারের পাণ্ডিত্যের সূত্রপাত বাংলাভাষাতত্ত্ব থেকে, কিন্তু কালক্রমে তা জ্ঞানের বহুবিধ শাখাকে আয়ত্ত করে নিয়েছিল—শেষ পর্যন্ত অল্প বিষয়ই তাঁর অনায়ত্ত ছিল। এইরকম বহু শাখাসম্পন্ন জ্ঞানকে ইংরাজি ভাষায় এনসাইক্লো-পিডিক বলা হয়ে থাকে। বাংলাভাষায় কি বলবো জানি না, জ্ঞানের বিশ্বরূপদর্শন বললে বোধকরি অন্যায় হয় না। তাঁর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করেছেন, আরও অনেকে করবেন, আর এ বিষয়টি চিরকালের আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকবে। আমি এ বিষয়ে আলোচনার অনধিকারী, জ্ঞান বলতে যা বোঝায় তার সঞ্চয় আমাতে এতই অল্প যে, তাঁর জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ দূরে থাক সামান্য একটি সূচীপত্র রচনাও আমার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই সে দুরাশা পরিত্যাগ করে সুনীতিকুমারের চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের অন্য কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

সুনীতিকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে একটিমাত্র কথা বলবো। ঐ একটিমাত্র কথার মধ্যেই সমস্ত কথা আছে অর্থাৎ তার বেশি আর বলা সম্ভব নয়। আমি কখনো তাঁকে এমন কাজ করতে বা এমন বাক্য উচ্চারণ করতে দেখিনি যাতে অপরের অপকার হয়। সম্ভব হলে লোকের সাহায্য বা উপকার করেছেন, তবে অপকার কখনো নয়। অপকার করতে দেখিনি বললে যথেষ্ট বলা হল না, বোধকরি, তাঁর দ্বারা অপরের অপকার হয়েছে এমন কথনো শুনিনি। এমন কথা ক'জন লোক সম্বন্ধে বলা যায় সকলকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। তাঁর সঙ্গে আমার সুদীর্ঘকালের পরিচয়, পঞ্চাশ বছরের বেশি। প্রথমে যে পরিচয় চাক্ষুস মাত্র ছিল কালক্রমে তা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কাজেই আমার এই উক্তির মূল্য সামান্য নয়। এমন কি করে সম্ভব হয় অনেক সময় চিন্তা করেছি, পরে মনে হয়েছে এর মূলে আছে আত্মপ্রসন্নতা। যে ব্যক্তির মন সদাপ্রসন্ন তার পক্ষে অপরে অপ্রসন্ন হতে পারে এমন কিছু করা সম্ভব নয়। এই আত্মপ্রসন্নতা প্রতিফলিত ছিল তাঁর মুখে চোখে হাসিতে।

এবারে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এক বস্তু নয়। আমাদের দেশে দেখতে পাই মানুষের ব্যক্তিত্ব একপেশে বা এক বগ্গা হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি পণ্ডিত সে দুর্ধর্ষ পণ্ডিত, পাণ্ডিত্য ছাড়া আর তার কোন মূলধন নেই। যে ব্যক্তি ধার্মিক, অষ্টপ্রহর ধর্মের কথা বলে সে। এমনধারা শিক্ষক অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হতে পারে। বেশ চৌকষভাবে বেড়ে উঠেছে এমন ব্যক্তিত্ব বড় দেখতে পাওয়া যায় না। অন্যদেশ সম্বন্ধে বই পড়ে যে জ্ঞান হয়েছে তাতে দেখেছি তাদের ব্যক্তিত্ব বেশ চৌকষ। আমাদের দেশে যে একেবারে নাই তা নয় তবে খুব বিরল সেটা যেন স্বভাবের ব্যতিক্রম। এরূপ ব্যতিক্রমের একজন উদাহরণ সুনীতিকুমার। যে ক্ষেত্রেই গিয়ে তিনি পড়ুন না কেন দেখা যায় বেশ মানিয়ে গিয়েছে। ইংরাজি প্রবাদের গোলাকার গর্তে চৌকোণা কীলক মোটেই নন। তাঁর জনপ্রিয়তার এটি প্রধান কারণ। তাঁকে সভাস্থলে দেখেছি, ক্লাসে দেখেছি, অধ্যাপকদের বিরাম কক্ষে

দেখেছি, স্বভবনে দেখেছি, কোথাও বেমানান নন। আরও দুটি ক্ষেত্রে দেখেছি তার মধ্যে একটি পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতির আসনে। সবাই জানেন বিধান পরিষদের সদস্যগণ সবাই শান্তশিষ্ট নন, সুযোগ পেলে প্রবীণেও নবীনের মতো আচরণ করে থাকেন। কিন্তু কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে দেননি সভাপতি। দেশের হিতের জন্য বদ্ধপরিকর সদস্যদের ঠেকিয়ে রাখা বড় সামান্য কথা নয়। তিনি যে সক্ষম হয়েছেন তার কারণ একসঙ্গে ধার ও ভার দুই-ই ছিল তাঁর মধ্যে। পাণ্ডিত্যের ভার, ব্যক্তিত্বের ধার। কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আসন, কোথায় বিধান পরিষদের সভাপতির আসন। কোথাও বেমানান নয়—এতো চোখের উপরে দেখা।

সুনীতিকুমারের আর এক রূপ সাহিত্যিকদের আড্ডায়। প্রথমে আড্ডা জমতো শনিবারের চিঠির অফিসে মোহনবাগান রো-তে। তিনি তখন সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ী থেকে উঠে গিয়েছেন বালিগঞ্জে। আড্ডার টানে আসতেন দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তরে। তারপরে আড্ডা জমতো বঙ্গশ্রী পত্রিকা অফিসে, সেটা ধরমতলা স্ট্রীটে। মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরতি পথে এসে জুটতেন, কাগজের ঠোঙায় চানাচুর, কিনেছেন ওয়েলিংটন স্ট্রীট আর ধরমতলার উত্তর-পশ্চিম কোণের এক দোকান থেকে—সেদিন দেখলাম দোকানটা এখনো আছে।

সবাই বললাম, খান নি যে।

মা এখন পথেঘাটে সব ছাত্র কেমন লজ্জা করে।

আড্ডাতেও ছাত্র ছিল, কিন্তু তারাও আড্ডাধারী চানাচুরের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলেন। তাঁর গল্প বলবার টেকনিকটা আরব্যোপন্যাসের অন্তহীন গল্পমালার মতো। গ্রীক কোটেশন, বাংলার কাঁথাশিল্প, ভাষাতত্ত্ব, একটু বা রাজনীতির চাটনি। পাশের লোকটিকে লক্ষ্য করে একটা ল্যাটিন কবিতা বা ফারসী বয়েৎ আবৃত্তি করলেন, হতভাগা লোকটা কিছুই বুঝলেন না, কিন্তু তাঁর ধারণা সবাই তাঁর মতো পণ্ডিত। এরকম ব্যবহারের মূলে সমদর্শিতা, সবাই তাঁর কাছে সমান শুধু সামাজিক অবস্থায় নয় পাণ্ডিত্যেও। তাঁর চারিত্র্যের মূলে আত্মপ্রসন্নতা, ব্যক্তিত্বের মূলে সমদর্শিতা। সবাইকে বলেন আপনি, তা ছাত্রই হোক বা ছাত্রের ছাত্রই হোক, কেউ তাঁর কাছে ছোট নয়। পাণ্ডিত্যে চারিত্র্যে ব্যক্তিত্বে এমন দ্বিতীয় একটি লোক আমার আর চোখে পড়ে নি। আমরা কি হারালাম এখনো সম্যক বুঝতে পারছি না, বড় ক্ষতি বুঝতে সময় লাগে।

তাঁর সন্তানগণ পিতৃহীন হল, সঙ্গে সঙ্গে পিতৃহীন অগণিত ছাত্র, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানভিক্ষুর দল। আমাদের শাস্ত্রে জ্ঞানদাতাকে বলা হয়েছে পিতা। সাধারণ্যে লোকের কাছে দাঁড়িয়ে এর অধিক কথন অমার্জনীয় বাচালতা গণ্য হবে আশঙ্কায় এখানেই নিরস্ত হলাম।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

আচার্য সুনীতিকুমার

বাঙালীর ভাষাপ্রীতি সুবিদিত; কিন্তু ভাষাতত্ত্বের প্রতি তার কৌতূহল যৎসামান্য। আর ভাষাতাত্ত্বিকের যে মূর্তি আমরা মনে মনে তৈরী করেছি তা হল এক রসবোধহীন দুর্দান্ত পণ্ডিতের, শব্দের কচকচি নিয়ে তাঁর কারবার। বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে দু-একজন ব্যাকরণকার পণ্ডিতের নাম অবশ্য আমরা শুনি, তারা মূলত জনচক্ষুর আড়ালে নিভৃতে কাজ করেছেন এবং নিঃশব্দেই আমাদের জীবন থেকে সরে গেছেন। বার্নার্ড শ হেনরী সুইটের জীবন ও কর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে পিগম্যালিয়নের প্রফেসর হিগিনসকে সৃষ্টি করেছিলেন। কোন বাঙালী লেখক কোন বৈয়াকরণকে তাঁর রচনার নায়ক করেননি। ব্রাউনিং তাঁর 'এ গ্রামারিয়ানস ফিউনারাল' কবিতায় এক বৈয়াকরণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছিলেন, কোন বাঙালী কবি আমাদের দেশের কোনকালের কোন ভাষাবিদের প্রতি এমনভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেননি। তবু আশ্চর্য যে সেই বাংলাদেশেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুর বহুপূর্বেই বাঙালীর গভীর শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন এবং তাঁর বিদ্যাবত্তা ও ভাষাজ্ঞান প্রায় কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। উনিশশ' ছাব্বিশ সালে যখন সুনীতিকুমারের ইংরেজিতে লেখা বাংলাভাষার উৎপত্তি এবং বিকাশ নামে বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে কয়েকজন সুধী পণ্ডিতের সামনে সুনীতিকুমারকে অভিনন্দন জানান। সেদিন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন, 'এই ছোকরা মাতৃভাষার একটি সম্পূর্ণ ভাষাতত্ত্বমূলক ইতিহাস লিখিয়াছে, তাহা আমাদের সকলেরই গ্রহণযোগ্য। আমরা পুরাণ পদ্ধতিতে মাতৃভাষার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এ নূতন পথ দেখাইয়াছে। সেইজন্য বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে এই ছোট ঘরোয়া মিলনে ইহাকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে সেদিন একজন যুবক ভাষাতাত্ত্বিককে, যিনি 'নূতন পথে' ভাষাচর্চা করেছিলেন, সমগ্র বাঙালীর পক্ষ থেকে অভিনন্দিত করেছিলেন এজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বাঙালীর ভাষাচিন্তার ইতিহাসে সুনীতিকুমারের আগে মাত্র [illegible] মাত্র ভাষা [illegible] স্বাধীনচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন রামমোহন রায়। আর একজন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সুনীতিকুমারের ভাষা সুপ্রসন্ন। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, সম্ভবত আমাদের দেশের একমাত্র সাহিত্যিক যিনি বাংলাভাষার প্রকৃতিরহস্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং ব্যাকরণচর্চায় তাঁর জীবনের কিছু সময় ব্যয় করেছিলেন, তিনি সুনীতিকুমারের গ্রন্থের মহত্ত্ব বুঝেছিলেন। সুনীতিকুমারের গ্রন্থ প্রকাশিত হবার মাত্র তিন বছর পরেই অনুমান করি তখন ঐ গ্রন্থের পাঠক সংখ্যা অঙ্গুলিমেয় ছিল—শেষের কবিতায় [illegible] ঐতিহাসিক উল্লেখ—'ও পড়তে লাগলো সুনীতি চাটুজ্জের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মতভেদের দাঁড়ের ঐ [illegible] কাঁধে নিয়ে।' সেদিন সুনীতিকুমারের রচনা ও [illegible] তাঁর সঙ্গে কার কতটা মতান্তর ঘটেছিল আমরা স্পষ্ট করে জানি না, কিন্তু এটুকু জানি সুনীতিকুমারের প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধা ও কৌতূহল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এক অসামান্য মহিমায় প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে চলল। সুনীতিকুমারের বাংলাভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ গ্রন্থটির বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। সুনীতিকুমার এই পঞ্চাশ বছরে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এক মনীষীরূপে স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁর বিদ্যাচর্চার সমস্ত সাফল্য ও অপূর্ণতাকে ছাড়িয়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিত্ব। আজ তাঁর কর্মবহুল দীর্ঘ জীবনের অবসানের পর সেই বিশাল ব্যক্তিত্বই আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে আছে। সেইটেই স্বাভাবিক।

সুনীতিকুমার শুধু ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না, যদিও তাঁর অন্যান্য সমস্ত কাজের ওপরে তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়টাই অধিকাংশ বাঙালীর কাছে সবচেয়ে বেশী পরিচিত এবং সম্ভবত ভবিষ্যতের মানুষ তাঁর প্রধান পরিচয় জানবে ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে হয় সুনীতিকুমার কি ধরনের ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন, ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্থান কি ছিল। যাঁরা যথার্থ পণ্ডিত, ভাষাতত্ত্বে যাঁদের অধিকার তাঁরাই এর উত্তর দিতে পারবেন। আমরা শুধু এইটুকু জানি তিনি ভাষাতত্ত্বের

আলোচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এমন একটা সময়ে যখন ভারতবর্ষে নতুন করে ভাষাচর্চার জোয়ার দেখা দিয়েছে এবং সেই ভাষাচর্চায় অগ্রণী ছিলেন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা। সুনীতিকুমারের ভাষাচর্চা শুরু করার বহু আগে ১৮৫৬ সালে রেভারেণ্ড রবার্ট কলডওয়েল, দ্রাবিড় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, আর ১৮৭২ সালে জন বীমস আধুনিক ভারতীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তার শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৯। আর ১৯২০ সালে সুনীতিকুমার যখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিএন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর ছাত্র তখন জুল ব্লক-এর গ্রন্থ 'লা ফরমাশিওঁ দ্য লা লাং মারাৎ' (মারাঠী ভাষার গঠন) প্রকাশিত হল। সুনীতিকুমারের সুবিখ্যাত 'বাংলাভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থটিকে এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বলা যায় যে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব চর্চার ধারায় এটি স্বাভাবিকভাবেই পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করেছে। বাংলায় এই ধরনের কোন বই ইতিপূর্বে লিখিত হয়নি। অন্য কোন ভারতীয় ভাষাতেও নয়। কিন্তু কলডওয়েল, বীমস এবং ব্লক—এই তিন পণ্ডিতের লেখাতেই ভারতীয় ভাষাচর্চার পথ তৈরী হয়েছিল। কলডওয়েল আর বীমস একগোষ্ঠীর অনেকগুলি ভাষাকে তাঁদের আলোচনার বিষয় করেছিলেন, ব্লক একটি ভাষাকে, তার গঠন, তার বিবর্তনকে আলোচনার ক্ষেত্রে রেখেছিলেন। সুনীতিকুমার মূলত ব্লকের পথ অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর আলোচনার কেন্দ্র বাংলা, কিন্তু বাংলাকে অবলম্বন করে সাধারণভাবে আধুনিক ভারতীয় ভাষার ইতিহাসের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। সেদিক থেকে সুনীতিকুমার কোন মৌলিক পথ দেখাননি। কিন্তু তিনি বাঙ্গালী পণ্ডিতদের সামনে জুল ব্লকের কর্মপদ্ধতি বাংলাভাষায় প্রয়োগ করে ভাষাচর্চার নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সুনীতিকুমার কোন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবক নয়, কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতির একজন নিপুণ প্রয়োগক।

সুনীতিকুমার যখন তাঁর গ্রন্থ রচনা করছেন, তার বেশ কিছুদিন আগে ফার্দিনাঁদ দ্য সস্যুর-এর ছাত্ররা, সম্ভবত ১৯১৬ সালে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর একটি বই বার করেন। ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এই বইটির গুরুত্ব অসাধারণ। সুনীতিবাবু ফরাসী জানতেন এবং ভাষাচর্চার সূত্রে কয়েক বছর ফরাসী দেশে ছিলেন। অনুমান করি সে সময় সুনীতিবাবু এই বইটি পড়েছিলেন। এই বইতে ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে এককালীনতা এবং বহুকালীনতার প্রসঙ্গ তুলেছেন দ্য সস্যুর। একটা ভাষাকে দেখা যেতে পারে বহমান ধারা হিসেবে। ভিন্ন ভিন্ন কালে তার পরিবর্তনের রূপ এই ভাষাতাত্ত্বিকের আলোচনার প্রধান লক্ষ্য। বলা বাহুল্য ভাষার পরিবর্তন এবং তার ইতিহাস ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ব্যাকরণকারদের প্রায় সমস্ত শক্তি ও কৌতূহল অধিকার করেছিল। সুনীতিবাবুও মূলত এই পথের পথিক। দ্য সস্যুর বলেছিলেন, ভাষা বিচারের বা বিশ্লেষণের আর একটা পথ আছে, তা হল একটি ভাষাকে একটি নির্দিষ্টকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা, সেখানে অন্য কালের প্রসঙ্গ আনা হবে না। সুনীতিকুমার ভাষাকে 'বহতা নদী' হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। ভাষা-বিচারে এককালীনতার প্রসঙ্গ তাঁকে খুব চিন্তিত করেনি।

দ্য সস্যুর ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষার বাইরের ইতিহাস আর ভেতরের ইতিহাসের পার্থক্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাংলা তথা অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় ভাষার ইতিহাস সম্পর্কিত বই দেখলে দেখা যাবে এই বাইরের এবং ভেতরের ইতিহাসের পার্থক্য সম্বন্ধে বোধ প্রায়ই অস্পষ্ট। সুনীতিকুমার এই পার্থক্যটা স্পষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁর গ্রন্থে। ভেতরের ইতিহাসটাই ভাষাতাত্ত্বিকের কাছে সবচেয়ে দরকারী। কিভাবে গঠনের পরিবর্তন হয়েছে। কোন কোন পরিবেশে কোন কোন অবস্থায় গঠনের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে নতুন গঠনের উদ্ভব হচ্ছে—এই হল ভেতরের ইতিহাসের মূল প্রশ্ন সুনীতিকুমার সেই ইতিহাসের কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। সম্ভবত সেই জন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এখানে নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

সুনীতিকুমারের গ্রন্থের একটা প্রভাব পড়েছিল ভারতবর্ষে। তাঁর বইটির মডেলে কয়েকটি ভারতীয় ভাষার ইতিহাস রচিত হয়েছিল। তাদের মূল্য কতটা জানি না। এই বইটি সুনীতিকুমারকে ভারতবর্ষে খ্যাতিমান করেছিল এবং তাঁকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্ব চর্চার এক নতুন যুগের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য সুনীতিকুমার তাঁর বিপুল প্রতিভা ও মেধা সত্ত্বেও সেই নতুন যুগের সৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত আর উৎসাহী হননি।

অমিয় রায়ের সঙ্গে সুনীতিকুমারের মতান্তর শেষ পর্যন্ত হয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু মতান্তর হবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। যখন সুনীতিকুমার বাংলাদেশে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ঠিক সেই সময়েই ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে একটা বিরাট দিক পরিবর্তন ঘটেছিল। বিশেষভাবে একজন ব্যক্তির কথা যদি উল্লেখ করতে হয় তিনি লেওনার্ড ব্লুমফিল্ড। সুনীতিবাবু ভাষাতত্ত্বের এই দিক পরিবর্তনের সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন কিন্তু আগ্রহের সঙ্গে এই নতুন রীতি ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে চান নি। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে যখনই কোন কথা হয়েছে তখন দেখেছি বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব বা গঠনতাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত। ব্লুমফিল্ড বা ব্লক বা হ্যারিস সম্বন্ধে—তাঁদের বিশ্লেষণ পদ্ধতির সম্বন্ধে তিনি প্রায় উদাসীন ছিলেন। অর্থাৎ আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জগৎ থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। আর উনিশ শ সাতান্ন সালে নোয়াম চমস্কির 'সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার' গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হল আর তার ফলে ভাষাতত্ত্বের জগতে আর একবার যে বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল তার গুরুত্ব সুনীতিকুমার আদৌ অনুধাবন করতে পারেন নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে সুনীতিকুমার আমাদের ভাষাচর্চার ইতিহাসে একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও উনিশ শ ছাব্বিশের পর ভাষাতত্ত্বে তাঁর কোন উল্লেখযোগ্য দান নেই। আর আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সুনীতিকুমার ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে কোন মৌলিক পদ্ধতি বা মৌলিক চিন্তার জনক নন। বিংশ শতাব্দীর কোন শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিকের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে আমরা কোন আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি না। এমন কি যে ব্যাপারে তাঁর প্রতি আমাদের আশা ছিল সবচেয়ে বেশী, যে তিনি একটি সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর সার্থক বাংলা ব্যাকরণ লিখবেন, সেখানেও তিনি আমাদের আশা পূর্ণ করেন নি।

সুনীতিকুমারের শক্তি এবং প্রতিভা সত্ত্বেও এই ব্যর্থতার অনেক কারণের প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে তিনি শুধু ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না। তিনি তাঁর প্রতিভাকে নানা পথে চালিত করেছিলেন। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও তিনি বাংলাকেই তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র করেন নি। বিভিন্ন ভারতীয় আর্য ভাষা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, হিন্দী সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। দ্রাবিড় ভাষাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল, ভোট-চীনা গোষ্ঠীর ভাষা সম্বন্ধেও তিনি পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু শুধু ভারতীয় ভাষা ও ভারতীয় ভাষাতত্ত্বকেই তাঁর চিন্তা-ভাবনার জগৎ করতে তিনি রাজী হননি। বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন, সেখানেও তাঁর প্রতিভার অস্থিরতা কিংবা তাঁর আগ্রহের ও ক্ষমতার বহুমুখিতা। মধ্যযুগ, ঊনবিংশ শতাব্দী, বিংশ শতাব্দী—সমস্ত যুগের লেখক ও লেখায় তাঁর আগ্রহ। শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যকেও তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু করতে চেয়েছেন, যার ফল তাঁর ইংরেজিতে লেখা আধুনিক ভারতবর্ষের ভাষা ও সাহিত্য বইটি।

এবং ভারতীয় সাহিত্যই শুধু নয়, বিশ্বসাহিত্যের নানা প্রসঙ্গে তাঁর কৌতূহল ছিল, অধিকারও ছিল।

কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যই শুধু নয়, সুনীতিকুমারের আগ্রহ সংস্কৃতির ইতিহাসে। শিল্পসাহিত্য দর্শন, মানুষের খাদ্য পরিচ্ছদ গৃহনির্মাণ, ইতিহাস ও সমাজ—সব মিলিয়ে মানুষের যে বিরাট ব্যাপ্ত সাংস্কৃতিক জীবন এবং সামাজিক জীবন তার প্রতি সুনীতি-কুমারের বিপুল আগ্রহ। তাই একদিকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে মোঙ্গোলোয়েড্-এর দান ও স্থান নির্ণয় করছেন, অন্যদিকে বল্টদের সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করছেন, একদিকে লিখছেন আফ্রিকার সংস্কৃতি সম্বন্ধে আর একদিকে দ্বীপময় ভারতের কথা। একটা অসাধারণ ব্যাপ্তি, অসাধারণ কৌতূহল এবং প্রায় অনন্য-সাধারণ জিজ্ঞাসা। সুনীতিকুমারের এই ব্যাপ্তি, কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা তাঁর সেই ব্যক্তিত্বকে এত আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। তিনি যেকোন সাধারণ কথাবার্তায় তাঁর সেই ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন অনায়াসে, তাঁর শ্রোতারা মুগ্ধ, চকিত এবং প্রায় বিমূঢ় হয়ে যেত তাঁর তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিতে, তিনি কখনও ঋগ্বেদ, কখন ইলিয়াড থেকে আবৃত্তি করতে পারেন, কখনও ইথিওপিয়ার ইতিহাস বলে যেতে পারেন অনর্গল, কখনও মেক্সিকোর রন্ধন-প্রণালী সম্বন্ধে বলতে পারেন, কখনও চন্দ্রগুপ্তের আমলের সৈনিকদের বেশভূষা, আবার কখনও অতি পরিচিত বাংলা শব্দের ইতিহাসের পশ্চাদ্ধাবন করে পৌঁছে যেতে পারেন ইন্দোইউরোপীয় উৎসে। এবং যে কোন আলোচনা সভায় সুনীতিকুমার প্রায় জাদু-করের মত তাঁর শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। তবু শেষ পর্যন্ত সুনীতিকুমার ভাষাতাত্ত্বিক বা ফিলোলজিস্ট। আজকের দিনের ভাষাতাত্ত্বিকেরা নিজেদের সঙ্গত কারণেই ফিলোলজিস্ট বলেন না, আজকের দিনের ভাষাতাত্ত্বিকের ক্ষেত্র ভিন্ন। এবং ফিলোলজিস্টের থেকে স্বতন্ত্র। সুনীতিকুমারের সমস্ত কর্মজীবন অনুধাবন করলে তাঁকে খুবই সঙ্গতভাবে ফিলো-লজিস্ট বলব কারণ তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় প্রেরণা জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা, লিখিত সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা।

আমাদের অনুজেরা সুনীতিকুমারকে জানবে একজন বহুমুখী বহু জিজ্ঞাসু ব্যাকরণকার হিসেবে। তাঁর ব্যক্তিত্বের যে জাদু আজ আমাদের কাছে এত স্পষ্ট তা তখন আর থাকবে না। আমরা যে সুনীতিকুমারকে দেখেছি তাঁর বহু লক্ষণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয় তাঁর চরিত্রের তারুণ্য এবং প্রতিপক্ষের প্রতি মর্যাদাবোধ। সেই জন্যই তাঁর সঙ্গে মতান্তরে বিরূপতা ছিল না। ছিল সংঘাতের উত্তেজনা। সুনীতিকুমারের বিপুল ব্যাপ্তি ও বহুধা বিস্তৃত জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র বাঙালীর সামনে শুধুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় হয়ে যেন না থাকে, তা যেন বাঙালীর তারুণ্য ও মনীষাকে উদ্বুদ্ধ করে মতান্তরে, সুনীতিকুমারের দৃষ্টান্ত প্রসারিত করুক নতুন চিন্তার ক্ষেত্র; তাঁর ব্যর্থতা ও অপূর্ণতা উন্মোচিত করুক আজকের বাঙালীর পূর্ণতা ও সফলতার সাধনা। সুনীতিকুমারের প্রতি সেই হবে আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শিশিরকুমার দাশ

প্রণামাঞ্জলি

১৯৭২ সালের জুন মাসই হবে বোধহয় তখন। সূর্য-দেবের দারুণ অগ্নিবানে যেন গোটা দেশটা জ্বলে যাচ্ছে। আকুল আকাশে মেঘের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু প্রবীণ আচার্যদেব সেই দারুণদহনজ্বালা অগ্রাহ্য করে যথাসময়ে (তিনটে নাগাদ) বাগনানের 'আনন্দ-নিকেতনে' এসে হাজির হলেন। শাঁখ ঘণ্টার মাধ্যমে উদ্যোক্তারা অভ্যর্থনা করলেন আচার্যদেবকে ও ঘোষণা করলেন তাঁর আগমনের আনন্দসংবাদ। সভার কাজ শুরু হল। ভাষণ দিতে উঠে তিনি ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন যে আনন্দ-নিকেতনের প্রাঙ্গণ জুড়ে বসে রয়েছে শ্রদ্ধাশীল জনমণ্ডলী। প্রসন্ন হাসি হেসে তিনি আরম্ভ করলেন। —'আজ এই দুরন্ত গরমের দিনে আপনারা কষ্ট করে আমার কথা শুনতে এসেছেন দেখে আমি আনন্দিত। আমার জীবনের প্রথমদিকের অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের বলছি। তখন আমার কথা শুনতে বড় একটা কারুর গরজ ছিল না। তাই উদ্যোক্তারা আমার বক্তৃতার পর একটি ম্যাজিক বা অভিনয়ের ব্যবস্থা রাখতেন। লোক জড়ো করা ও তাদের আটকে রাখার কৌশল আর কি? বক্তৃতা শুনতে শুনতে ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই অস্থির হয়ে পড়ত। তখন তাদের সামলাতে বেশ বেগ পেতে হত শিক্ষকদের। তাঁদের কথার দু'চারটে টুকরো বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে আমার কানে ভেসে আসতো—মন দিয়ে শোনো, সব। ইনি একজন প্রচণ্ড পণ্ডিত লোক। তবে দু'চারখানা এমন বিদ্ঘুটে বই লিখেছেন যার একবর্ণও বোঝা যায় না।' তারপর তিনি বাংলার কৃষ্টি, সাহিত্য ও সাধনার প্রসঙ্গে চলে গেলেন। দ্বিতীয়বার তাঁর সান্নিধ্য পাবার সৌভাগ্য হয় রবিবার ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৬ সাল। প্রায় ৯টা নাগাদ তাঁর বাড়ীতে গেলাম—'সুধর্মা'য়। স্বনামখ্যাত ডঃ মদন-মোহন কুমার আমাকে সঙ্গে করে দোতালার একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী জ্ঞানবৃদ্ধ সুনীতিকুমার বসে আছেন একটি হাতলহীন চেয়ারে; অটুট স্বাস্থ্য, খালি গা এবং পরনে একটি ফিকে বাদামি রঙের সাদামাটা লুঙ্গী। আমি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই আমাকে বসতে বললেন।

। আচার্যদেব বেশ তেজী গলায় ও সাবেভঙ্গীতে কথা বলে চলেছেন। কথার টানে যখন যে বিষয় তাঁর মনে আসছিল, তাই তিনি বলছিলেন। একফাঁকে একটি বই তাঁর হাতে তুলে দিলাম এবং ডঃ কুমার বইটি সম্পর্কে দু'চার কথা বলেও দিলেন। আচার্যদেব বললেন—'বেশ! ভালো কথা।'

সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন পণ্ডিতদের কথায়—'পণ্ডিতেরা কথার ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নিয়ে কতই না মাথা ঘামান। কিন্তু তাতে লাভ কি? এই যে আমাদের ঝি-বেটি—সে তো লেখাপড়ার কোনো ধারই ধারে না। সে কিন্তু পাড়ার দুর্গা প্রতিমা দেখে এসে বলে বেড়াচ্ছে—'সর্বজননী পুজো দেখে এলাম'। দেখুন, মায়ের আসল রূপটি কেমন সহজে সে ধরে ফেলেছে। সার্বজনীন না সর্বজনীন—কোন কথাটা ব্যাকরণসম্মত শুধু এ সব তত্ত্ব সে জানে না বলে কি তার এসে [illegible]?' তারপর তিনি বইটি দেখতে লাগলেন। 'বৃহৎকুলার্ণব তরঙ্গ'এর পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিটির শেষে 'ওঁ তৎসৎ' এই কথা কটি দেখে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—'হ্যাঁ, এইটুকুই ঠিক। তিনিই আছেন। আইনস্টাইনও তাই বলেন। তাঁর কথা চিন্তা করলে আমাদের মনে যে ভাব জাগে তাকে 'Rapturous amazement' বলা যেতে পারে।' ইংরেজী কথা দুটির ওপর যেন তিনি হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উজাড় করে দিলেন। এমন সময় বিশ্ববাণীর 'মহাভারতম্'এর প্রথম খণ্ডটি এগিয়ে দিলাম। তিনি কয়েক মিনিট থেমে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের উদ্দেশ্যে বললেন—'একজন নীরব কর্মী। এমন লোক আজকাল আর হয় না।' বইটি দেখতে দেখতে তিনি বলে চললেন—'তিনি ছিলেন একজন four—dimenstional figure গোটা মহাভারত সভায় বসে তিনি পাঠও করেছেন অনেকবার। ....তাঁর সব বইগুলি কি দেখেছেন? প্রতিটি বইতে একটি করে মঙ্গলাচরণ আছে। চমৎকার রচনা। সবগুলি এক জায়গায় করলে একটি অপূর্ব স্তোত্রমালা হয়ে যায়।' এই বলে তিনি সিদ্ধান্ত-বাগীশ মশায়ের 'মহাভারতম্'এর 'ভারতকৌমুদী' টীকার প্রারম্ভিক শ্লোকটি উদাত্ত গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করে ব্যাখ্যা করলেন। (মূর্তিশূন্যোঽপি সর্বমূর্তিকং মৃত্যুহীনমপি শাশ্বতং

শ্রোতশান্তমপি চোগ্ররূপিণং নৌমি চিত্রচরিতং [...]। হাতে-লেখা মহাভারতের প্রতিলিপি দেখে [...] করলেন—'কার লেখা?'। বললাম—'সিদ্ধান্তবাগীশ [...] পিতামহ কাশীচন্দ্রের'। পুরো মহাভারতই তিনি এমন [...] করে পুঁথির আকারে লিখে রেখে গেছেন শুনে আবিষ্ট- [...] বললেন—'এসব লোকের নাম করলেও পুণ্য হয়।' তারপর [...] সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের পূর্বপুরুষ পূজ্যপাদ মধু- [...] কথায় এসে গেলেন—'তাঁর 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র [...] তো? এমন মহাগ্রন্থ খুব কমই আছে।' এরপর [...] রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলে শ্রদ্ধাসিক্ত গলায় [...] দেবকে আমরা পেয়েছিলাম বহুপুণ্যফলে। আবার [...] মহামানবের জন্যে পৃথিবীকে বহু যুগ অপেক্ষা [...] হবে।' শিখধর্মের প্রতিও কথায় কথায় তিনি শ্রদ্ধা [...] করলেন। এদিকে বেলা বেড়ে চলেছে দেখে তাঁকে প্রণাম [...] আমরা বিদায় নিলাম।

পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য

[...]চার্য সমীপে

[...] মৃত্যু হবে বিদেশে, ভারতের বাইরে। একজন [...] আমাকে একথা বলেছেন।...স্মৃতিশক্তি বিভ্রম হয়ে, অথর্ব [...] চেয়ে মরাই ঢের ভাল। আমাকে যেন ওভাবে [...] না হয়।'—ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে [...] দিনই এই কথাগুলি উনি আমাকে বলেছিলেন তাঁর [...] বারান্দায় বসে।

[...] বছর আগে রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন সামান্য [...] তাঁর কাছে গিয়েছিলুম এক সমস্যার সমাধানে [...] হয়ে। কাজের কথা শেষ হতেই উনি প্রশ্ন [...] জগতের বাইরের কোনো বিষয়ের ওপর আপনার [...] আছে? প্ল্যানচেট এস্ট্রলজি এসব 'আপনি' বিশ্বাস [...] মুখে এই জাতীয় প্রশ্ন শুনে একটুও আশ্চর্য [...] হলুম জাতীয় অধ্যাপকের মুখে 'আপনি' সম্বোধন [...] পরে বুঝেছিলুম, সকলকে 'আপনি' সম্বোধন করা [...] দিয়ে প্রণাম করতে না দেওয়াটাই তাঁর চারিত্রিক [...]।

[...], আমার এসব বিষয়ের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ আর [...] আছে। তবে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, আবার অবিশ্বাসও [...] পারি না।

[...] বললেন—আমি এসব বিশ্বাস করি না। একজন [...] বলেছেন আমার মৃত্যু হবে ভারতের বাইরে। হয় হোক, [...] মরতে পারি। ডঃ সুশীল দের মতো স্মৃতিবিভ্রম হয়ে, [...] হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ঢের ভাল। আমাকে [...] বেঁচে থাকতে না হয়। একটু থেমে বললেন, আমার [...] বয়স হল, এখনো স্মৃতিশক্তি লোপ পায়নি।...

এই বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে প্রথম সাক্ষাতের দিনই [...] সঙ্গে তর্ক করেছি। কথাবার্তায় তিনি এত অন্তরঙ্গ [...] কাছে সংকোচ কাটিয়ে সহজ হয়ে গেছি তা নিজেও [...] পারিনি। বলেছি, যা কিছু চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা [...] কি সব মিথ্যে? আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতাই তো [...] হিউস্টনের বিজ্ঞানীরাও আশ্চর্য হচ্ছেন সেই [...] কথা স্মরণ করে যা কোটি কোটি সূর্য বা সান- [...] নিজের চারপাশে ঘোরাচ্ছে। আমরা কি সেই অপার্থিব [...] অস্বীকার করতে পারি? আচার্য ঘাড় নেড়ে একথার [...]। বললুম, এমন জ্যোতিষী দেখেছি যার বহু কথা মিলেছে আবার ভুলও হয়েছে। আর প্ল্যানচেটে ভৌতিক শক্তির শক্তি পরীক্ষা করতে একদিন কাঁচের গোল বড় পেপারওয়েট এক খণ্ড কাগজের ওপর চলাফেরা করিয়েছিলুম দুই বন্ধুতে মিলে। আপনি আমাকে বলুন, এটা কি করে সম্ভব হল? অদৃশ্য শক্তি একটা কিছু আছেই।

আচার্য বললেন—এ ব্যাপারে সম্প্রতি কোন বই পড়েছেন—অমিতাভ চৌধুরীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা' পড়েছেন?

পড়েছি—ভীষণ ভাল লেগেছে!

বললেন—আমার খুব ভাল লাগল। তবে রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করতেন না। ভূমিকাতে অমিয় চক্রবর্তী সেকথা লিখেছেন।

আমি বললুম, বইটা পড়ে আমার কিন্তু উল্টোটাই মনে হয়েছে। দশ বছর আগের রবীন্দ্রনাথ আর দশ বছর পরের রবীন্দ্র-নাথের প্ল্যানচেট করার মধ্যে কোথায় যেন একটা পার্থক্য আছে। পরলোকগত আত্মাকে প্রশ্ন করার ধরণ দেখলে বোঝা যায় রবীন্দ্র-নাথ যেন অবচেতন মনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন।

আচার্য বললেন—এটা একটা সাময়িক ব্যাপার! জীবনের বিভিন্ন সময়ে এক-একটা পাগলামি তাঁর মাথায় চেপে বসতো। আসলে তিনি ওসব বিশ্বাসই করতেন না।

বললুম রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের কথা বাদ দিলুম। কিন্তু মিডিয়াম করে প্ল্যানচেট যদি মিথ্যে হয় তবে সতেরো বছরের মেয়ে বুলার (মিডিয়াম) পক্ষে কি করে সম্ভব রবীন্দ্রনাথ যাঁর সঙ্গে যে ভঙ্গীতে কথা বলতেন সেই ঢঙ নকল করে কথা বলা? বুলার জন্মের আগেই তো অনেকে মারা গেছেন। কিংবা আত্মার স্বরূপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এধরনের দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সতেরো বছরের মেয়ের পক্ষে কি করে সম্ভব? তাছাড়া ব্যক্তিগত বহু ঘটনার কথা বইতে আছে যা রবীন্দ্রনাথ ও পরলোকগত আত্মা ছাড়া তৃতীয় কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বাস্তবে যার ব্যাখ্যা করা যায় না তাকে কি করে অবিশ্বাস করি?

সুশান্তকুমার মিত্র

।। ৬ ।।

১৯১৫ সালে জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর একটা কারণ শুনেছিলাম যে যুদ্ধের জন্য বিলেত থেকে ওষুধপত্র আসা বন্ধ হয়েছিল। দেশে তখন বিশেষ ওষুধপত্র তৈরি হত না। আর শুধু ওষুধ কেন সাবান, এসেন্স, ক্রীমও খুব কমই তৈরি হত। তাই পিসে-মশাই যখন এইচ বোস, পারফিউমার বলে প্রসাধনী জিনিস, পানের মশলা ইত্যাদির কারখানা ও দোকান খুলেছিলেন লোকে ধন্য ধন্য করেছিল। মাথার তেল 'কুন্তলীনে'র কি সুখ্যাতি! অত্তকাল আগেও পিসেমশাই বিজ্ঞাপন দেবার গুরুত্ব বুঝতেন। 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র ব্যবস্থা করেছিলেন। ছোট গল্পের প্রতিযোগিতা। সব চাইতে ভালো গল্পগুলি খুদে এক বই হয়ে বেরুত। বইয়ের নামও ছিল 'কুন্তলীন পুরস্কার'। যতদূর জানি দুটি মাত্র নিয়ম ছিল: গল্প মৌলিক হওয়া চাই। আর কোথাও না কোথাও 'কুন্তলীন' বা 'দেলখোসে'র উল্লেখ থাকা চাই। আরেকটু বড় হয়েই পড়তে শুরু করেছিলাম বইটাকে। বেজায় ভালো লাগত। কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রসাধনী ব্যবসার সুবিধা হলেও জ্যাঠামশায়ের অমন ভালো জীবন ৫২ বছর বয়সেই শেষ হয়ে গেল।

পরে শুনেছিলাম তাঁর মৃত্যু বড় সুন্দর। কোনো ক্ষোভ, অভিযোগ ছিল না, শান্ত প্রসন্নভাবে নিজেকে সমর্পণ করে-ছিলেন। তাঁর লেখা একটি গান আছে...,

'হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা,
আমি তো পথ চিনি না...।'

তবে আর ভাবনা কিসের? মৃত্যুর দিন, ভোরে একটা ছোট্ট পাখি এসে ঘরের জানলায় বসে ডাকছিল। মনে হচ্ছিল বলছে পথ পা। পথ পা!' জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমাকে বলে-ছিলেন, 'ঐ শোন, আমার ডাক এসেছে।' তারপর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, সোনার সংসার, কত আশা নিয়ে কত কষ্টে গড়ে-তোলা 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স', সব ফেলে রেখে দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে স্বর্গে চলে গেলেন। আমার বড়দা, সুকুমারের বয়স তখন ২৮ বছর।

শিলং-এ আমরা ছোটরা এসবের কিছুই বুঝতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যক্তিগতভাবে জ্যাঠামশায়ের অভাব আমাদের স্পর্শ করেনি। আমাদের জীবন যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। শুধু মায়ের মুখখানিকে বড্ডই ম্লান দেখাত। বোধহয় কলকাতায় এসে সকলের সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করত। কিন্তু ছয়টি ছেলেমেয়ে নিয়ে সেতো চাট্টিখানিক কথা নয়। বলতেন, 'ঐ আমি সত্যিকার বাপকে হারিয়েছিলাম। নিজের মা-বাপের বাড়ছাড়া হলাম যখন তখনো জ্ঞানচক্ষু ফোটেনি।' নিজের মায়ের কথা আমার মনে পড়ত না, খালি মনে হত একটা বন্ধ দরজা, তার ওপর থেকে শিকল তোলা। তার বাইরে মা আর বড়-মাসিমা দাঁড়িয়ে আর বড় মাসিমা মাকে বলছেন, 'ঐ ঘরে মা আছে। ওরা আমাদের মার কাছে যেতে দিচ্ছে না!' লাফিয়ে লাফিয়ে কেবলি শিকল খোলার চেষ্টা করে, কেঁদে মাকে বলছেন, 'ওরে তুই কাঁদছিস না কেন? তুই ছোট, তুই কাঁদলে ওরা নিশ্চয়ই দরজা খুলে দেবে। আমি যে বড় হয়ে গেছি।' বড় মাসিমার বয়স তখন পাঁচ বছর। এখন ভাবি ঐ মা-মাসির মেয়ে হয়ে সারাজীবন ছোটদের জন্য বই লেখা ছাড়া আমার উপায় কি ছিল?

আমাদের কাছে জ্যাঠামশাই ছিলেন একটা সুন্দর ছবির মতো। এই বই দেখ-ছেন, এই বেহালা বাজাচ্ছেন, এই ঈজেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছেন। ম[illegible] তেল-রঙের ছবিও আঁকতেন, প্রাকৃ[illegible] দৃশ্যেরই বেশির ভাগ। আমার কাছে [illegible] আঁকা উম্রী নদীর ছোট একটি তেল[illegible] ছবি আছে। তার সঙ্গে কত কথা জ[illegible] আছে। বিয়ে হয়ে বাবার সঙ্গে মা যে[illegible] চলে যাচ্ছেন। জ্যাঠামশাই একাধারে [illegible] কর্তা, কন্যা-কর্তা। বিদায় দেবার [illegible] জিজ্ঞেস করেছিলেন 'কি দেব তোমায়?' [illegible] বলেছিলেন, 'ছোট একখানি ছবি। বড় [illegible] নিয়ে যেতে অসুবিধা হবে।' এই সেই [illegible]

ছবির মতো হলেও, দিনে দিনে [illegible] পারি আমার মন তাঁর হাতেই গড়া হয়ে[illegible] উনি পারেননি। লেখা পড়তে গিয়ে [illegible] গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। দেখেছি [illegible] ভাষাকে আমি নিঃশঙ্ক মনে নিজের [illegible] ভাষা বলে অনেকদিন ধরে জেনে [illegible] তাও জ্যাঠামশায়ের দেওয়া। তিনি [illegible] ভালো বলেছেন, আমারো তাই [illegible] লাগে। তিনি যাতে মজা পেয়েছেন [illegible] পাই।

এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধ তখনো [illegible] ১৯১৬ সালের শেষে স্কুলের পু[illegible] বিতরণের দিন আমাদের সকলকে ছবি[illegible] খেলনা, পুতুল না দিয়ে, বড় [illegible] দেওয়া হল। তাতে ইউরোপের মান[illegible] মাঝখানে ইউনিয়ন জ্যাক [illegible] নিয়ে একজন স্কুলের মেয়ে দাঁড়িয়ে[illegible] শুনলাম আমাদের পুরস্কারের টাকা [illegible] জানাদের সাহায্যে গেছে। বড়রা কেউ [illegible] বললেন, 'নিশ্চয় সোলজারদের সাহায্যে [illegible] নিশ্চয়ই!' মনের মধ্যে খচ খচ করে [illegible] তাই যদি সত্যি হয়?

এর মধ্যে এক সময় বাবা বলে [illegible] 'যুদ্ধে যাব।' আমরা তো [illegible] আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে বাবার [illegible] কথা একবারে মনে [illegible] না, বাব[illegible] পোষাক পরে বন্দুক [illegible] ঘাড়ে ল[illegible] যাবেন ভেবেও আমাকে সেদিন [illegible]

বন্দুক বাবার একটা ছিলই। যেখো বনে কাজ করতে হত, বন্দুক ছাড়া চলবে কেন? সেটাকে বাবা মাঝে মাঝে তেল দিয়ে, ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কারও করতেন। তুলে দেখেছি বেজায় ভারি। এখন বাঘ না মেরে বন্দুক তুলে বাবা গুড়ুম গুড়ুম করে দুষ্টু জার্মান মারবেন ভেবেও গা শির-শির করে উঠল। প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন বাবা। আপিসের ছোট সায়েবরা দুজনে চলেও গেল। তবু বাবাকে নিল না। বাবার রাগ দেখে কে! ঐ সায়েবগুলো কুঁড়ে মদ খায়, কোনো কাজ জানে না, ওদের নিল আর বাবাকে বাদ দিল!! কই দাঁড়াক তো ওরা বাবার পাশে খেলার মাঠে, বন্দুক ছোঁড়াক তো বাবার মতো, দেখা যাক কার শরীর বেশি শক্ত!!

বলা বাহুল্য হম্বিতম্বি করে কোনো লাভ হল না। বড়-সায়েব ডেকে বললেন, 'আমরা তো যাচ্ছি না। আমাদের হল গিয়ে এসেন্‌শিয়েল সার্ভিস। ম্যাপ তৈরির লোক যুদ্ধের কাজে লাগে। যুদ্ধ ছড়ালে পরে, একদিন যে এদিকেও আসবে না, তা কে বলেছে?' তবু বাবা বাড়িতে গজগজ করতেন। আমরা শুনতাম। কাজে বড় সুনাম ছিল বাবার। আগে রায় সাহেব, পরে রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন। তাই নিয়ে ভারি গর্বিত ছিলেন, কেউ খেতাবটা লিখতে বা বলতে ভুলে চটে যেতেন। কোনো বড়-সায়েবের বাড়ি যেতেন, ভেট পাঠাতেন না। তেমন ভালো কাজ [illegible]

অবসর নেবার কয়েক বছর আগে [illegible] অফিসে উন্নতি হয়েছিল [illegible]। খোশামোদ দেখাতে পারতেন না। তবু একদিক দিয়ে ইংরেজদের ভারি ভক্ত ছিলেন। বলতেন, ওরা পরিশ্রমী, ওরা নিয়মনিষ্ঠ, ওরা কথা দিলে কথা রাখে, ওরা [illegible]। আমার কথাগুলো [illegible] না লাগলেও, বুঝতাম ওর মধ্যে খানিক সত্যি আছে। এমন অনেক পরে ১৯৬৫ সালে এ সবের মানে বুঝতাম।

ছোটবেলার কথা বলা বড় শক্ত, তার কতখানি বাস্তব আর কতখানি কল্পনা, কিংবা বড়দের মুখে শোনা, তা বলা শক্ত। আমার মনে তো আরো বড় হবার পরের ঘটনা সম্বন্ধেও কিছু নিশ্চয়তা আছে। যদিও আমার স্মরণশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ, তবু সাল তারিখ গুলিয়ে যায়, ঘটনার পারম্পর্য ঠিক থাকে না, লোকের নাম ভুলে যাই, উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাই আর সব চাইতে বড় অসুবিধে হল যে সে কথা আমি শুধু নিজের মনে ভেবেছি, অনেকদিন পর তাকেই সত্যি বলে মনে হয়। কোনো ঘটনা বা কাহিনি কখনো, নিজের কল্পনার সঙ্গে মিশিয়ে সাজাবার কোনো চেষ্টাই করিনি। আমার পাথেয় শুধু আমার স্মৃতিশক্তি আর আমার সততা। কত ছবি পাশাপাশি এখন সাজাবার সময় খুঁজে পাচ্ছি না। তখন ঘরে ছবি তোলার রেওয়াজও ছিল না। ছোট প্রফুল্লকাকাবাবুর একখানি ছবি থাকলে

বেশ হত। নাম ছিল বোধহয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

এঁকে বাবাদের আপিসের বড় প্রফুল্ল-কাকাবাবুর সঙ্গে ভুল করলে চলবে না। ইনি বোধহয় সেক্রেটারিয়েটে কাজ করতেন, বয়স নিশ্চয় খুব কম ছিল। ছোট-খাটো পাতলা মানুষটি, ধবধবে ফরসা রঙ। বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে আমাদের বাড়িতে আসতেন মাঝে মাঝে। আমরা অমনি ছুটে গিয়ে, তাঁর কোলে-পিঠে চড়ে, পকেটে হাত পুরে দিয়ে, নানারকম মজার কথা লেখা পেপারমিন্ট লজেঞ্চুস বের করতাম। তাই দেখে বড়-মাসিমা শকড্! আমার সাত বছরের জন্ম-দিনের আগের দিন এসেছেন, আমিও অভ্যাসমতো ময়লা পায়ে কাকাবাবুর কোলে চড়ে বসে, পকেটে হাত পুরেছি। এই বড় একটা পেপারমিন্ট পেলাম। তাতে লেখা ছিল 'চ্যাটারবক্স'! সকলের কি হাসি! এমন সময় মাসিমা বললেন, 'ওকি! ময়লা পায়ে কাকাবাবুর কোলে উঠেছ, দেখ তো ওঁর কাপড়চোপড় ময়লা হয়ে যাচ্ছে!' তাকিয়ে দেখি, ওমা, সত্যি তো! আমার পায়ের ধুলো ওঁর কালো প্যান্টে লেগে গেছে। ভারি লজ্জা পেলাম। কি করব ভেবে না পেয়ে, দুহাতে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললাম, 'কাল আমার জন্মদিন, তুমি বিকেলে নেমতন্ন খেতে এসো!'

কাকাবাবু চলে গেলে বড়রা সবাই মিলে আমাকে সেকি বকুনি! তুমি ভালো করেই জান বড়দের বলা হচ্ছে না, তবু কেন ওঁকে নেমতন্ন করলে?' কেন করলাম সেটা কেউ বুঝছে না দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ওঁর গায়ে ধুলো লাগিয়েছি, তবু নেমতন্ন করব না? সে আবার কি! যাই হক, প্রফুল্লকাকাবাবু খুশী হয়ে চলে গেলেন। তার পরদিন আপিস থেকে ফেরার পথে নিশ্চয়ই জামাতুল্লার দোকান থেকে আমার জন্য চমৎকার একটা পেয়ালা-পিরিচ কিনে নিয়ে এলেন। এমন সুন্দর জিনিস তার আগে কেউ আমাকে কখনো দেয়নি! চারকোণো মতো আকার, সোনালী পাড় দেওয়া, নীলেতে গোলাপীতে সোনালীতে ফুলের তোড়া আঁকা। এমনকি ভিতরেও একগোছা ফুল এমন জায়গায় আঁকা ছিল যে হাতল ধরে চুমুক দিয়ে দুধ খাবার সময়, একটু আড়চোখে চাইলেই আমি ফুল-গুলোকে দেখতে পেতাম। মনটা ভরে যেত। সুন্দরের চোখ ফুটতে শুরু করেছিল।

কালামানিকেরো ছবি রাখা উচিত ছিল। কালামানিক বাবার টাট্টুঘোড়া, বাবার সঙ্গে বনে বনে ঘুরত। কুচকুচে কালো রঙ, কপালে একটা সাদা রুহিতনের মতো দাগ। কিযে ভালোবাসতাম ওকে। আমাদের দূরে থেকে দেখতে পেলেই নাক দিয়ে ফড়র-ফড়র শব্দ করে ডাকত। দানা দেবার দেরি হলে সহিসকে চিঁহি করে ডাকত, এ ডাক

তার থেকে একেবারে আলাদা। বাবা মাঝে মাঝে কুমড়ো পাতায় করে ওকে করকচ নুন খাওয়াতেন। বলতেন ওটা ওদের দরকার। কুমড়োপাতাটাও ও খেয়ে ফেলত। আমা-দেরও বড্ড ইচ্ছা করত একদিন আমরাও খাওয়াই। হঠাৎ সেই সুযোগ পাওয়া গেল। দৈবাত আস্তাবলের দরজা খোলা পেয়ে কল্যাণ একমুঠো করকচ নুন সরাল। তার-পর যখন কেউ দেখছে না, ওর হাতের লেখার খাতার পাতায় করে কালামানিককে নুন খাওয়ালাম। কি খুশী সে। কিন্তু নুন খাওয়া হয়ে গেলে পর, কিছুতেই কাগজটাকে ছাড়ল না। বড় বড় চারকোণা দাঁত বের করতে লাগল। শেষটা কাগজটাও চিবিয়ে গিলে ফেলল। বুঝলাম কাজটা ভালো হয়নি, তাই কাউকে কিছু বললাম না।

সন্ধ্যেবেলায় তেলের বাতির আলোয় আমরা পড়তে বসেছি, এমন সময় সইস ছুটতে ছুটতে এসে বাবাকে যেন কি বলল। বাবাও ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে রেগে বললেন, 'কে কালা-মানিককে কাগজ খাইয়েছে? এখন কাগজ বেরুচ্ছে!!' আমরা চুপ, একেবারে কাঠ। শেষে বাবা নিজেই বললেন, 'বোধহয় কেউ খাওয়ায়নি। ও নিজেই দুর্বোঘাসের সঙ্গে খেয়ে ফেলেছে। তোমরা যেখানে-সেখানে কাগজ ফেলো না।'

আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতে পাইন মাউন্ট স্কুলের মেমরা থাকত। চমৎকার টেনিস কোর্ট ছিল ওদের। বিকেলে টেনিস খেলা হত, অনেক সাহেব-মেম আসত। সারি সারি টেবিলে চা-কেক স্যান্ডউইচের ব্যবস্থা হত। আমরাও সারি সারি দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। মা-মাসিমা খুব বিরক্ত হতেন। এর চাইতে শৌখীন জীবন আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না।

শিলং-এ সেকালে বায়োস্কোপ দেখিনি, থিয়েটার তো বাচ্চারা দেখে না বলেই জানতাম, তার অভাবও বোধ করতাম না। বছরে একবার ফুলের প্রদর্শনী হত, সে এক এলাহি কান্ড। কতরকম বিলিতী ফুল ফুটত ওখানে তার লেখা-জোখা নেই।

মায়ের বড় ফুলের শখ ছিল। তাই আমাদের বাড়িতে চমৎকার সুইট-পী হত, ঝাউ গাছের গোড়ায় উঁচু করে মাটি ফেলে বেগুনী রঙের ভায়োলেট ফুল লাগানো হয়েছিল। এদের যেমন রঙ, তেমনি গন্ধ। এর চাইতে সুন্দর কিছু হতে পারে আমি ভাবতে পারি না। এককেটা গল্পের সঙ্গে এককেটা জায়গার এককেটা মানুষের স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। সেই মা চলে গেছেন ২৫ বছর হয়ে গেল, কিন্তু কিছুদিন আগেও পাটনায় একজনদের বাড়ির পুরনো বাগান দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় যেতে গিয়ে হঠাৎ মার কথা, মায়ের ভায়োলেট ফুলের কথা মনে পড়ে গেল। পরদিন ভোরে খুঁজে দেখি, সেখানে অযত্নে আগাছার তলায় রাশি রাশি ভায়োলেট ফুল ফুটে রয়েছে। কে কবে শখ করে লাগিয়েছিল। তাদের মৃদু সুগন্ধে শ্যাওলা ধরা পথটি ভরে আছে। মনটা কেমন হয়ে গেল।

রূপে রসে দিনগুলো এমনি ভরে থাকত যে বায়োস্কোপ থিয়েটারের অভাব টের পেতাম না। তবে একেবারে যে নাটক হত না, তা-ও নয়। আমাদের স্কুলেই এককেটি বিশেষ ধর্মোৎসবের দিনে সাধু-সন্তদের জীবন নিয়ে নাটক হত। তার কি চমৎকার সাজসজ্জা! মঞ্চ সাজানো হত কি সুন্দর করে। প্রকান্ড প্রকান্ড কার্ডবোর্ডের স্ক্রীনে দৃশ্যপট আঁকা হত। শিক্ষিকাদের সঙ্গে মেয়েরা সেসব আঁকত। এইরকম ব্যবস্থাপনার যে রোমাঞ্চ, তার তুলনা নেই। তারপর চারপাশের গাছপালাগুলোই বা কম কি। আমাদের তিনটি ন্যাসপাতি গাছের কথা অনেকবার বলেছি। শীতের আগে সব পাতা শুকিয়ে পড়ে যেত। ন্যাড়া ডাল আকাশের ওপর উঠে থাকত। ভালো করে দেখলে মনে হত ছোট্ট ছোট্ট কেঠো গুটি ধরে রয়েছে। তবে সে এতই উঁচুতে যে নাগাল পাওয়া যেত না। নীল আকাশের গায়ে ন্যাসপাতির ডালের কঙ্কাল দেখতে ভারি অদ্ভুত লাগত। তারপর যেই না শীত কাটল, মার্চ মাসের হাওয়া বইল, অমনি দেখি রাতারাতি সাদা ফুলে ন্যাসপাতি গাছের ডাল ভরে গেছে, মোমের মতো সুন্দর ফুল, তার মিহি একটু মিষ্টি গন্ধ। দেখে দেখে চোখ ফেরাতে পারতাম না। একটা পীচ গাছ ছিল, তার গোলাপী ফুল, প্লামের সাদা ফুলও সুন্দর, কিন্তু ন্যাস-পাতির ফুলের কাছে কেউ লাগত না। মনে হত গাছতলায় কে সাদা সুগন্ধী গালচে পেতে রেখেছে, রোজ রাশি রাশি পাপড়ি ঝরে পড়ত। শেষটা একদিন সব ঝরে যেত, গাছের ডালে ছোট ছোট ফলের গুটিগুলো ন্যাড়া হয়ে দেখা দিত। সঙ্গে সঙ্গে সারা শীত ঘুমিয়ে থাকা পাতার কুঁড়ি ফুটে গিয়ে, কচি ফলের মাথায় ছাতা বানিয়ে তাদের ঠান্ডা হাওয়া, ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করত। ফলগুলো কিছু বেড়ায় পাকত, কষা, কিষ্টি, গাছে সব কামড়ে খেয়ে দেখেছিলাম। সেই পাকতে আদ্যোস পড়ে না। তখন বড় লেবুর চাইতে বড়, কি। সোনালী রঙের ভারে ডালগুলি নেমে আসত মাটির কাছা-কাছি। আমি, নোটন, সরোজ এমনি খেত। সোনালীর ওপর সাদা সাদা ফুটকি, রসে ভরপুর, খেতে মধু। ক্যাচ্ ক্যাচ্ করত বটে, কিন্তু তেমন জিনিস পৃথিবীতে কোথায়ই বা আছে। বলতেন, 'ঐ দেখ, গুণীরা কেমন মাথা নিচু করে থাকে।'

বাড়ির চারদিকে ঝোপের বেড়া ছিল মে-ফ্লাওয়ারের ঝোপ। সেও বসন্তকালে ফুটত, সাদা, থোপা-থোপা। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত ছড়া ছড়া গোলাপ-লতা ফুল। এককেটি বোঁটায় সাতটি করে ফুল এখনো যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। বাড়ির সামনে তিনটি গন্ধরাজ লেবুর গাছ ছিল। তাদের মধ্যিখানে লালমাথা সবুজ বড় বড় মাকড়সারা শক্ত মজবুত জাল বুনে রাখত। তাতে প্রজাপতি পড়ত, ফড়িং পড়ত। সময়মতো দেখতে পেলে আমরা কাঠি দিয়ে ছাড়িয়ে দিতাম। মা হত প্রজাপতির ছাড়া পেয়েও উড়তে

চেয়েছে। আশ্চর্য জিনিস ঐ প্রজাপতি, ধরেছি মাঝে মাঝে। দুটি ডানা একসঙ্গে জুড়ে ফুলের ওপর যখন বসে থাকে, তখন পেছন থেকে চুপি চুপি এসে ধরা যায়। আবার ছেড়ে দিতাম, হাতে ওদের ডানা থেকে রঙীন গুঁড়ো লেগে থাকত। দাদা বলত, গুঁড়ো উঠে গেলে ওরা আর উড়তে পারে না। তখন বেজায় কষ্ট হত। একবার ঝাউ-গাছের মগডালে প্রকাণ্ড ফুটবলের মতো চাক বেঁধেছিল বোলতারা। কাকে কাকে যেন কামড়েও ফুটিয়েছিল। শেষটা একদিন রাতে দলে দলে গ্রামের লোকরা এসে, বাঁশের আগায় মশাল জ্বালিয়ে, চাকে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুনের গোলার মতো জ্বলতে জ্বলতে মোমে ভরা চাকটা মাটিতে পড়ে গেল। আর গ্রামের লোকরা অমনি তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আধ-পোড়া বোলতার বাচ্চাদের টপাটপ খেতে লাগল। দাদা বলল, বড় বোলতাদের ডানা পুড়ে গেছে, মাটিতে পড়ে মরে গেছে। কয়েকটা ধোঁয়ার মতো উড়ছিল, দাদা বলল, 'ওরা আর ফিরতে পারে না।' মনে আছে এসব দেখে আমার গা-বমি করেছিল। দিদি কেঁদে ফেলেছিল। কাঁদবার সুযোগ ও কখনো ছাড়ত না।

ছোটবেলায় আনন্দ করবার কিংবা দুঃখ করবার খুব বেশি উপকরণের দরকার হত না। যখন আমার বছর পাঁচেক বয়স হবে তখন একবার মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্ম-মন্দিরে গিয়ে দেখি একজন লোক হার্মোনিয়াম বাজাচ্ছে, একজন তবলা বাজাচ্ছে আর কীর্তন করতাল বাজিয়ে, গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে গান গাইছে, 'প্রেম-সলিলে স্নান করিলে পাপের জ্বালা দূরে যায়।' হঠাৎ দাদা আমাদের দল ছেড়ে গাইয়েদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে তারস্বরে গান ধরল, 'প্রেম-সলিলে স্নান করিলে পেটের জ্বালা দূরে যায়।' বড়রা ওকে বকবে কি, নিজেরাই হেসে লুটোপুটি। সেই কয়েক মুহূর্তের জন্য মাঘোৎসবের গাম্ভীর্য দূরে হয়েছিল। ভগবান যেমন হয় সেটা বেশ উপভোগই করেছিলেন। নইলে পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে এত মজার জিনিস ঠুসে দেবেন কেন?

দুঃখের ব্যাপারও হত। গুরুচরণ নামে একজন দপ্তরি ছিল, সে বোধ হয় ব্রাহ্ম ছিল। ঠিক বলতে পারি না। তার গোবিন্দ বলে একটি ছেলে ছিল। আমার চাইতে কিছু ছোট হবে। গোবিন্দর মা ছিল না। ছিল সৎমা। সৎমার কয়েকটা ছেলেমেয়ে ছিল। গোবিন্দ তাদের কোলে পিঠে নিয়ে বেড়াত। একবার একটাকে ফেলে দিয়েছিল বলে, ওর মা গোবিন্দর গালে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়েছিল। গোবিন্দ গালে পোড়া-ঘা নিয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের 'সান্ডে-স্কুলে' এসেছিল। তাই দেখে বড়রা ওর বাবাকে ডেকে খুব ধমকে দিয়েছিলেন। গোবিন্দর সেই গাল-পোড়া চোখ ছল-ছল মুখটা আমার এখনো মনে পড়ে। আশা করি পরে সে সুখী হয়েছিল। পরে যখন বইতে পড়েছি রবীন্দ্রনাথ বলতেন প্রকৃতির বুকের মধ্যে ছেলে-মেয়েরা মানুষ হক, তখনি আমার মনে হয়েছে আমরা তাই হয়েছিলাম। কৃত্রিম জিনিস খুব কম ছিল আমাদের বাড়িতে, লোক-দেখানো জিনিস একেবারেই না। সাদা-সিধা কাপড়-চোপড় পরতাম, শীতকালে গরম মোজা, উলের সোয়েটার, মোটা মোটা ওভারকোট। বাড়িতে ঠনঠনের চটি পড়তাম; একটা লোক বাঁকে করে ঝুলিয়ে বেচতে আসত। সত্যি কথা বলতে কি, আমার চোখে ওগুলোকে বেশ সুন্দর লাগত; বিশেষতঃ নতুন অবস্থায়। কেমন কুচকুচে চকচকে। দুঃখের বিষয় এক মাসে তাদের চেহারা বদলে যেত। মাকে বড়-জোর গরদের শাড়ি পরতে দেখেছি। বাবা আপিসে কোট-প্যান্ট পরে, টাই বেঁধে গেলেও বাড়ি ফিরেই চটি, সাদা পাজামা, গরম জোব্বা প্যাটার্নের একটা কোট। ভাত খেয়ে উঠে পান খাওয়া চাই—ফ্যাশানেবল্ হব কি করে? তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ থাকত না, যদি না কলকাতা থেকে বেড়াতে গিয়ে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা আমাদের সাজ-পোশাকের বহর দেখে নাক সিঁটকাত!

আমরা গল্প শুনতে পেলেই খুশী। অতুলভূষণ সরকার বলে একজন ফরসা, টাক-পড়া, দাড়িওয়ালা মানুষ আসতেন। আমরা তাঁকে বড়মামা বলতাম। কেন বলতাম তা জানি না। শুনেছিলাম ওঁর বেশি টাকা-কড়ি ছিল না, বুড়ি মা আর বুড়ো বোন ছিল। বোধহয় সেক্রেটারিয়েটেই কাজ করতেন। কিন্তু মানুষটা গল্পের জাহাজ ছিলেন। কত বিখ্যাত ইংরিজি বইয়ের গল্প যে ঐ বয়সে ওঁর কাছে শুনেছিলাম, কাউন্ট-অফ-মন্টে-ক্রিস্টো ডাসড ফ্রম দি ক্লাউডস, টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগস আন্ডার দি সী, রবিনসন ক্রুশো, ট্রেজার-আইল্যান্ড, কিডন্যাপড, টেল-অফ-টু সিটিজ, ইত্যাদি অজস্র বই। কি ধৈর্য, কি অপরিসীম স্নেহের সঙ্গে যে তিনি এই কয়েকটা অপোগণ্ড ছেলেমেয়েকে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, গল্প বলে যেতেন, এখন ভেবে অবাক হই। ভাবি মানুষের কাছে ঋণের জালে জড়িয়ে আছি। একবার একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। শীতকাল, বড়মামা আমাদের গল্প বলছেন, এমন সময় আমাদের ধোপা সোনেলাল একটা গরম কোট গায়ে দিয়ে জোগান নিয়ে এল। বড়-মামাকে সে লক্ষ্য করেনি। মাকে কাপড় গুনে দিচ্ছে, হঠাৎ বড়মামা বললেন, 'আরে সোনেলাল, তুম যে হামারা কোট পিনকে আয়া!' আর বলা-কওয়া নেই, দুমদাম করে সোনেলাল ভাগল। পর-দিন জোগান নিয়ে যাবার জন্য আবার এসে অম্লানবদনে বলল, 'না মা, ওটা আমারি কোট, ঠিক ওর কোটের মতো দেখতে!' আমরা মোটেই বিশ্বাস করলাম না, বললাম 'তবে পালালে কেন?' সোনেলাল ফিক্ করে হেসে বলল, 'সরম লাগা!' আমাদের ভারি মজা লেগেছিল। বড়মামাও পরে খুব হেসেছিলেন।

(চলবে)

(৪)

আজ চোদ্দ ঝোরার ছবি তোলার প্রোগ্রাম। এটি একটি পাহাড়ী সমাবেশে ঘন-চত্বর। অর্ধ-চন্দ্রাকারে চত্বরটি ঘুরে গেছে—আর তারই বেড় বেয়ে পাহাড়ী নদীগুলি চোদ্দ-ঝোরার সৃষ্টি করে নীচে ঝরে পড়ছে ছোট বড় মাঝারি প্রপাতে।

প্রথম দৃশ্য তোলা শুরু হলো—নীলার ঝরণায় স্নানের সাথে ওদের ভাষায় গান। নীলা স্নান করছে একটি ছোট প্রপাতের তলায় স্নান করছে আর গান গাইছে। জলের ঝাপ্টা বাঁচাতে দূরে ক্যামেরা রেখে আমি টেলিফোটো লেন্স ফিট করতে বললাম। এটিতে ৩০০ ফিট দূর থেকেও ক্লোজ-আপ নেওয়া যায়... এটিকে সদ্য সদ্য কাল জোন্স কোম্পানী থেকে ভাড়া এনেছি। অ্যাসিস্টেন্ট ক্যামেরাম্যান সেটিকে ফিট করতে গিয়ে হঠাৎ হাত থেকে ফেলে দিলেন—লেন্স গড়িয়ে গিয়ে প্রবেশ করলো ঝোরার অতলান্ত তলে...এখন উপায়? জোন্স কোং-র কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবো?

প্যাটেল সাহেব বললেন...কাথিওয়াড় থেকে যে গুজরাটি কুক্ এনেছি—সে খুব ভালো সাঁতারু। দেখি তাকে দিয়ে যদি কিছু উপায় হয়...সঙ্গে সঙ্গে খিকায় গাড়ী পাঠিয়ে তাকে আনিয়ে নেওয়া হলো।...সে এককথায় ঝোরার অতলন্তে ডুব দিল—প্রায় আধ ঘন্টা চেষ্টার ফলে সত্যিই সে সেই লেন্সটিকে উদ্ধার করলো। মিঃ প্যাটেল তার হাতে দশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন। সে মহাখুশী...আমি কিন্তু কুকের এই অদ্ভুৎ সাহস দেখে মনে মনে একটু নতুন সিন্ রচনা করে তাকে বললাম—শোনো সব থেকে বড় যে প্রপাত—তার পাশেই ঝুলেছে বটের ঝুরীর মত বুনো পাহাড়ী লতা—তুমি নীচে থেকে ওই লতা ধরে ঝোরার ওপরে উঠে যেতে পারো?—যদি পারো তো আমি তোমায় কুড়ি টাকা বকশিস দেবো।

কুক রাজী হয়ে গেলো...

আমাদের হিরো নান্দ্রেকার সাহেবের পোশাকটিকে খুলে ওকে পরিয়ে দেওয়া হলো।

ক্যামেরা রেডি করে ওকে বলা হলো—তিন মিনিটের মধ্যেই তোমায় ওপরে উঠে যেতে হবে। কুক সত্যিই ডগলাসের মত ঝরণায় প্রবল ঝোরাকে মাথায় নিয়ে ওপরে ঠেলতে ঠেলতে উঠতে লাগলো। মাঝ পথে প্রায় এলিয়ে পড়েছিল কিন্তু সবার উৎসাহ ধ্বনিতে কোনরকমে হেচড়ে পিচড়ে ওপরের চাতালে উঠেই জ্ঞান হারালো। ...বহু শুশ্রূষায় তাকে সুস্থ করে তোলা হলো।

সবাই এখন ওপরে...নীচের খাদে রাশি রাশি স্তূপীকৃত পাথরের পথে হঠাৎ গর্জন শোনা গেল। নীচে চেয়ে দেখলাম একটি পাহাড়ী টিলায় দাঁড়িয়ে কেশরী সিংহ একটি, বনের জন্তুমহলকে সজাগ করে তুলছে তার ওই ভয়ঙ্কর ডাকে। টেলিফোটো লেন্স দিয়ে ততক্ষণ জগতাপ সাইমো দিয়ে তার ছবিটা তুলে নিচ্ছে। আমি বললাম—সবাবাস।

ওপর মহলে হঠাৎ হুলুস্থূল পড়ে গিয়েছে, বিদ্যাদেবী নাকি জ্ঞান হারিয়েছেন। তাকে ঘিরেই এই কোলাহল। আমি স্থিরুক্তি না করে বিদ্যাদেবীকে কোলপাঁজা করে তুলে স্টেশন-ওয়াগনে উঠিয়ে খিকায় রওনা দিলাম। পিটুবাবু প্যাক-আপ করে ফিরে এলেন খিকার টেন্টে।

পথেই বিদ্যাদেবী জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন তবে বোধহয় চোখ খুলতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। ক্যাম্পে এসে বললেন—আমার শরীরটা খারাপ আগেই হয়েছিল ঝরণার নীচে মাথা পেতে যদি কারোকে দাঁড়াতে হোতো তো বুঝতেন। আমার অজ্ঞানের সঙ্গে সিংহের গর্জনের কোনো সম্বন্ধ নেই। কথায় বলে—ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি।

চোদ্দ ঝোরার কাজ শেষ হয়েছে, তাই রাত্রে বসে পরদিনের প্রোগ্রাম ঠিক করা হলো মিঃ প্যাটেলের সঙ্গে। তিনি বললেন কেনিয়া পাহাড়ের নীচেই 'নেইরী'—সেখানে হচ্ছে 'রাইনো ক্যাম্প'। সেখানে যাবার আগে তিনি যেতে চাইছেন এখান থেকে ২০০ মাইল উত্তরে এ্যাবিসেনিয়ায়—'কিটুই' গ্রামে ও অঞ্চলটা আমাদের সামনের প্রোগ্রামের রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে পড়ে, তাই ওটাকে সেরে একেবারে যাত্রা শুরু করলে ভালো হয়। মিঃ প্যাটেল বলেন—'কিটুই' গ্রামের আদিবাসীদের নাচ যেমন বিশেষ দেখার জিনিস তেমনি ওখানকার বাটা সিস্টেমে হাট। হাটে নিগ্রো আদিবাসী, জংলীরা নিয়ে আসে হাতীর দাঁত, হাতীর পায়ের চামড়ার তৈরী বড় বড় ড্রাম, সিংহের নখ, কিবকে স্টিক জলহস্তীর চামড়া থেকে তৈরী তাছাড়া নানা জন্তুর ছাপ ইত্যাদির পরিবর্তে ওরা সংগ্রহ করে লবণ, ছুঁচ, সুতো ইত্যাদি। এ দৃশ্য আমার ছবিতে বিশেষ দরকার তাই ঠিক হলো যে আমাদের [illegible] নেতাদের তৈরী করে কাল ভোরে ভোরে বেরিয়ে পড়তে হবে, শিল্পীদের স্ত্রী-পুরুষ সবাই সেখানে যাবে, ওদের ওই হাটে সওদা কেনাবেচা করতে।

পরদিন বড় বাসে করে সমস্ত শিল্পীরা স্টেশওয়াগনে টেকনিশিয়ানরা এবং দুখানি প্লেজার কার করে আমরা যাত্রা শুরু করলাম ভোর ছয়টার মধ্যে অর্থাৎ ওখানকার ভোর হওয়ার দু ঘন্টা বাদ।

খিকা থেকে এ্যাবিসেনিয়ার পথ খুবই সুন্দর—এ দেশের ভি-আই-পি রোডের মত।

'কিটুই' গ্রামাঞ্চলের পথে যখন বাঁক নিলাম, অর্থাৎ কিটুই পৌঁছবার প্রায় ১০০ মাইল দূর থেকে শুরু হলো মরু-প্রান্তর, বনস্পতির অবসান ঘটিয়ে মোটর ছুটেছে শুকনো প্রান্তরের রাস্তা ধরে। বেলা দুটো নাগাদ কিটুই গিয়ে পৌঁছলাম। গ্রামের বাইরেই মস্ত বড় হাট, সত্যই বহু ব্যাপারীর সমাবেশ, আমরা ওদের সঙ্গে একটু বোঝা-পড়া করে নিয়ে...বাটা সিস্টেমে আমাদের

রা বেচাকেনায় দৃশ্যপট সাজিয়ে —প্রায় এক ঘণ্টার ওপর শুটিং। এরপর আকৃষ্ট হলাম কিটুইর নাচের শব্দে... প্রায় ১০০ স্ত্রী-র মিলে গড়ে তুলেছে এই রাসনর্তন।

দের পরনে উপরাঙ্গে নিরাবরণ বেলজ জাতীয় ছোট ছোট হাঁটু ঢাকা অঙ্গাবাস। হাতে-পায়ে বালার রণ, যা এক এক হাতে ৩০।৪০টি পায়েও তাই, পায়েরগুলোয় পায়েলের সংযুক্ত। সারা বুকের ওপর, থেকে নাভির ধার পর্যন্ত পোড়া-কালো কালো বেড়। জিজ্ঞেস করতে বললেন—যা আমাদের আলি-বুঝিয়ে দিলেন যে ওগুলো সত্যই গরম প্রয়োগে পুড়িয়ে দেহে চিহ্নিত করা যার বুকে যত বেশী দাগ সে তত সুন্দরী। কি সর্বনাশ!

কে এক সারে ২৫।৩০ জন করে স্ত্রী-একসঙ্গে নাচের তালে তালে এগিয়ে তাদের দুপাশে ও পেছনে উলঙ্গ বাদ্যযন্ত্র যা বাজনা পিটে চলেছে। ৫০।৬০টি পায়েলে মিলিত সারা আকাশ-এক রকম শব্দ ছড়িয়ে দিচ্ছে, তা অন্য বিশেষণও তার দৌড়ে চলেছে নাচ দেখে সত্যিই ... আমাদের ... দ্ভুতের শব্দ তুলে নেওয়া

... নাচের ... এক ... এই ... ও ... আছে। ... সঙ্গে যে নাচ—তা যেমন প্রাণ ... করে তোলে—এ নাচের মাঝে ... বিস্ময় ও ভীতির এক ... সংযোগ।

... হলো ৬টায়, এতক্ষণ কাজের ... ভুলেছিলাম—শেষ সবাই খাবার জন্যে অধীর হয়ে পড়ি। ... পেট পুর্তি হলো বটে, ঘটলো জলাভাব। শুনলাম এ অঞ্চলের মাইলের মধ্যেও জল নেই। আলিভাই জলের ... ঘটবে বুঝে আগেই ... নিয়ে দৌড়েছেন। সবাই ... রইলাম, সঙ্গের যা জল আনা ছিল তা নিঃশেষ হয়েছিল শুটিং-এর ... সবাই মুখে রবার চিবুচ্ছি, হ্যাঁ ... ভুলে গিয়েছি, আফ্রিকার বহু জায়গাতেই জলাভাব বলে রবারের টুকরো ... পাওয়া যায় যা মুখে রেখে চিবুতে যাতে নিজের মুখের লালায় নিজের ... মিটে যায়।

সন্ধ্যা সাতটায় আলিভাই ফিরে এলেন, বস্তা জলভরা কাদা নিয়ে, বস্তা টুঁপিয়ে জল যা ঝরে পড়ছে তাই গেলাসে ধরে, দাঁড়ি কামাবার ফিটকিরি দিয়ে কিছুটা থিতিয়ে নিয়ে, মেজর প্লাসের এক গেলাস করে সবার ভাগে জুটলো। ফিরবার পথে ২০০ মাইল পার হয়ে জলের সন্ধান পেলাম, যা খেয়ে সবার মুখে হাসি বেরুলো। আজও রাত সাড়ে ১০টায় থিকায় এসে পৌঁছনো হলো। খাবার টেবিলে ভবিষ্যৎকালের প্রোগ্রাম ঠিক হলো। নিইরীর রাইনো ক্যাম্পেই যাওয়া হবে, তবে শিল্পীরা কেউ যাবেন না, শুধু যাবেন ক্যামেরাম্যান ও মিঃ প্যাটেল সহ পরিচালক গ্রুপের দল। সঙ্গে পথপ্রদর্শক মাখন সিং।

মাখন সিং-এর কিছুটা পরিচয় জানিয়ে রাখি। মিঃ মাখন সিং হচ্ছেন একজন এ অঞ্চলের বিখ্যাত হান্টার-কাম-পথ-প্রদর্শক। সাফারিতে অঞ্চল অনুসারে এই-সব পথ-প্রদর্শক হান্টারদের সঙ্গ নেওয়াই রীতি। এই অঞ্চলে অর্থাৎ নেইরী ও কেঙ্গো অঞ্চলের মাখন সিংই প্রসিদ্ধ হান্টার। আমাদের এখানে মাখন সিংকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মিঃ সাহ ইউগাণ্ডা থেকে আমাদের নেইরীর রাইনো ক্যাম্প সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। খাওয়ার টেবিলে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ প্যাটেল। কাল সকালে বাস হবে সকালের মধ্যেই নেইরীতে ... নিয়ে আমরা সটান নেইরীর পথে যাত্রা করব।

পরদিন ভোরে আলোক ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা শুরু হলো—মাখন সিংকে সম্মুখে রেখে পথ চলেছি, সঙ্গের সাথী মাখন সিং ব্যতীত মিঃ প্যাটেল আলিভাই কিন্তু পরের ব্যবস্থার জন্যে এখানেই রয়ে গেলেন। ক্যামেরাম্যান সুধীরবাবু তার দুটি সহকারী, আমার দুটি সহকারী অর্থাৎ পিটুবাবু ও অশ্বিনী, এই কয়জনই চললেন আমার সঙ্গে—সাউণ্ড ডিপার্টমেন্ট থিকাতেই রয়ে গেলেন অভিনেতৃবৃন্দদের নিয়ে আমাদের ফেরার অপেক্ষায়।

সূর্য উঠেছে, মাউণ্ট কেনিয়ার বরফের চূড়াটি দেখা যাচ্ছে, যেন হীরকের মুকুট পরে, এমনি সমুজ্জ্বল যেন চোখ ফেরানো যায় না। ধীরে ধীরে পথ ওপরে উঠে চলেছে, বনস্পতিদলের সবুজ সতেজ শীর্ষগুলি আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে, আর তারই ছায়ায় ছায়ায় পথ এঁকেবেঁকে ধীরে ধীরে ওপরে ঠেলে উঠছে। মাউণ্ট কেনিয়ার উচ্চতা ১৮০০০ ফিট, আমরা পরপর উঠে চলেছি নেইরীর পানে—উচ্চতায় সে ৫০০০ ফিট। অফুরন্ত শীতে দেহগুলি আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে, পথে মাঝে মাঝে পাহাড়ী স্রোতস্বতী উদ্দাম স্রোতে ছুটে নেমে চলেছে। এদের পাশে রেখেই পথ ছুটেছে, এবার পার হলাম একটা ছোট ব্রীজের ওপর দিয়ে। পাহাড় এলাকার ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করলাম। বেলা তিনটা বেজে গেছে।

নেইরীতে মাখন সিং-এর আত্মীয়ের টিম্বার চেরাই-এর ফ্যাক্টরী। সেইখানেই আমরা আমাদের রাত্রিবাসের পান্থশালা ঠিক করেছি। বেলা সাড়ে ৪টা পাঁচটা নাগাদ আমরা সেই সর্দারজীর চেরাই অঙ্গনে গাড়ী-গুলিকে দাঁড়িয়ে দিলাম। সর্দারজী মাখন সিং-এর সঙ্গে করমর্দন শেষ করেই আমাদের আতিথ্যে মনোযোগ দিলেন। 'আইয়ে বাবুজী, ইয়ে মেরা তস্থাকি ডেরা হ্যায়'।

সামনেই একখানি কাঠের তৈরী বাংলো। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সেই ঘরে ঢুকে গেলাম
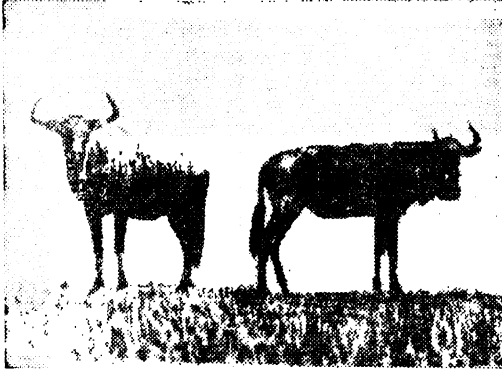
আমরা। ঘরের মধ্যে তিনটি ছেলেমেয়ে সহ সর্দারপত্নী বিরাজ করছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন,—'আচ্ছা করকে চায় বানাও জী!' আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'বাবুজী, হাত-মু ধো লেঙ্গে না আইয়ে, মেরা সাথ [illegible]। আমাদের ক্যামেরা ইত্যাদি নামিয়ে [illegible] সবাই সর্দারজীকে অনুসরণ করলাম।

একটি বিরাট ট্যাঙ্কের মত তামার হাণ্ডা ঝুলা চলে—শূন্য পথে কাঠের সাহায্যে ঝুলছে, তার তলায় গর্তে ধড়াধড় পাতলা চেরা-ফাটাচোটা লকড়ী ফেলতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাতে কেরোসিন এক বোতল ঢেলে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করলেন, দেখতে দেখতে দাউ দাউ জ্বলে ওঠে শুকনো কাঠ। বলেন, 'পানি বরফ হো কর হাণ্ডামে রহ গয়া অভি নিকাল আয়ে গা, বাবুজী সব তৈয়ার হো যাই-এ গরম পানিসে হাতমু ধো লিজিয়ে।' অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ী করি। সত্যিই দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাইপ বেয়ে কলের মুখে গরম জল বেরিয়ে আসে। আমরা এই দারুণ শীতে গরম জল পেয়ে বর্তে গেলাম। হস্ত-পদ প্রক্ষালনের পরেই টামলার গেলাসের এক গেলাস করে দুধ-চা হাতে পেলাম এবং এর [illegible] মোটা মোটা দুখানি করে নির্মাক-রুটি। অর্থাৎ নুন দিয়ে নির্মাকির মত তৈরী করা। তবে রুটির মত নরম। জলযোগ সম্পূর্ণ করতে করতে আমাদের পুরো প্রোগ্রাম তাঁকে মাখন সিং শুনিয়ে দিলেন।

পাহাড় অঞ্চলের জঙ্গলে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই রাত ঘনিয়ে এলো। এবং সর্দারজী সবার জন্যে বোতল নিয়ে বসে গেলেন। বললেন—'এতনা ঠাণ্ডামে হামারা বাচ্চা তক পিতে হায়।' আমাদের মধ্যে দু-একজন এর সদ্ব্যবহার করলেন। পানীয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাতের রুটি টমেটো প্যাজ এবং মাংস এসে জুটলো। সর্দারজী বললেন—'জলদি জলদি খানা খতম করকে শো যাইয়ে। রাত দো বাজেতক আপ লোগোকো নিকালনে পড়ে গা।'

রাত দুটোর সময় গরমের বস্তার পর বস্তা গায়ে চাপিয়ে যখন রাস্তায় বেরোলাম তখন মনে হলো কে যেন আমাদের ধাক্কা মেরে বরফের গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। এবার আমাদের পদব্রজ ছাড়া গতি নেই। কারণ গাড়ীর গতি সর্দারজীর কাঠের অঙ্গন পর্যন্ত, তারপর গাড়ীর রাস্তা নেই। অগত্যা পদব্রজেই যাত্রা শুরু করা হলো। গায়ে গরম বস্তা, পায়ে চামড়ার গাম-বুট সত্তেম নিজে-দের বোঝাই যেন এক একটা দশ-মণি হয়ে উঠেছে। শীতের প্রকোপ তবু সারা দেহটাকে যেন কুঁকড়ে দিচ্ছে। ভার বাইবার মত পথ চলেছি। সুখের মধ্যে ছিল পথটা উৎরাইয়ের।

মাইল দু-এক চলার পর পেলাম একটি নদী। নদীর ওপরে ব্রিজের মত একফালি কি যেন ঝুলছে। মাখন সিং বললেন—'থোড়া হুঁসিয়ারী সে কদম বাড়হানা, ইএ রোপ ব্রীজ হ্যায়—মায়নে উপরকে রোপ পাকাড়নে কে লিয়ে, নীচেকো রোপ কদম রাখনে কে লিয়ে।

এযে বাবা তারের খেলা...

ক্যামেরার বোঝা যতদূর পারা গেল পিঠে আর বাকী ক্যামেরা স্ট্যাণ্ড-বাক্স-গুলো মোটা দড়িতে বেঁধে [illegible] স্লাইড করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো—ওগুলো মাখন সিং নিজেই টেনে নিয়ে যাবেন। আমরা সার্কাসের তারের খেলা দেখাতে দেখাতে পড়ি কি মরি করতে করতে ব্রীজে পার হতে চললাম। নীচের খর স্রোতায় পড়লো নাকি হাতী পর্যন্ত ভেসে চলে যায়। এমনি প্রবল তার বেগ। [illegible] সামাল করতে করতে নদী পার হলাম—[illegible] তখন চারটে। এবার চড়াই-এর পথ, সামনে বিরাট পাহাড় তারই গা দিয়ে পথ ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের অপরাংশে নিয়ে যাবে। সেই পথে যাত্রী আমরা। অপরঅংশে পৌঁছতে পৌঁছতেই সূর্যোদয় হলো। কিছুটা যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। [illegible] দেখতে পেলাম কোথা দিয়ে [illegible] এলেছি। [illegible] যা চলছিলাম তা শুধু মাখন সিংকে অনু-গমন করে। অপরাংশে পৌঁছেই পাওয়া গেল উৎরাই-এর পথ। এ পথ অতিক্রম করে নীচের সমতলে নামতেই বেজে গেল [illegible] আটটা।

আবার নদী...

এ নদীতে বুক-প্রমাণ জল। হেঁটেই পার হতে হবে। গরমের বোঝা একে একে অপসারিত হলো—উর্ধাঙ্গে কিছুটা রয়ে গেল—খুবই সলজ্জে অর্থাৎ কেউ কারো দিকে দৃষ্টিপাত না করেই বিবস্ত্রে নদী পার হলাম এবং তীরে উঠে রণসজ্জায় পুনর্বার সজ্জিত হলাম। শীত কিছুটা উপশম হয়েছে। নদীতে উদম ল্যাংটো হয়ে পার হতে গিয়েই আমাদের গায়ের ও মনের শীত—নদীর শীতল জলে ধুয়ে নিয়ে গেছে। যাইহোক, কিছুটা শীতবস্ত্র মাখন সিং-এর পরামর্শে এখানকার গাছের ওপরই পুঁটলি বেঁধে রেখে যাওয়া হলো। [illegible]

এগুলোর আবার সদ্ব্যবহার হবে। কারণ যাতায়াতের এই একটিই রাস্তা।

অতএব কিছুটা হাল্কা হয়ে জোর কদমে চলতে আরম্ভ করা হলো।সামনেই চড়াই—এ পাহাড়ের পেছনেই রাইনো ক্যাম্প।

ঘন্টা তিনেক ধরে হেচড়া-হেচড়ী করে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছালাম এক অজগর বনে—তারই মাঝে খানিকটা ফাঁকা জমি। ওরই পাশ থেকে এক বিরাট বনস্পত বট-বৃক্ষের মত শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে —তারই মাঝ ডালে রচনা করা হয়েছে এক কাঠের প্রশস্ত ঘর; এরই নাম—রাইনো হোটেল।

হোটেল নামেই। কাকস্য পরিবেদনা। জনমানবহীন কাঠের বাড়ীতে তিন-চারখানা কামরা। সেখানে খাবার সাজিয়ে কোনো আর্দালীই বসে নেই। তবে ঘরগুলি নিখুঁতভাবে গড়ে তুলেছে। মাসের পর মাস এখানে অনায়াসে থাকা চলে। মাখন সিং বললেন—আপনারা টারজানের বই দেখেছেন? এটাকেই ওরা টারজানের বাড়ী বলে ছবিতে দেখিয়েছে।'

এই হোটেলে মুনলিট নাইটে গেস্টরা এসে থাকেন—নীচের জমিতে ছড়িয়ে দেন ছোলা—রুটি নানান খাবার আর তাই খেতে আসে গণ্ডারেরা। যাত্রীরা তাই দ্যাখেন বসে বসে। তাই এর নাম হয়েছে রাইনো ক্যাম্প। এখানকার রাইনোর আবার দুটি শিং। ডবল হর্ন রাইনো পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না। বড্ড ফেরোশাস হয়।

আমাদের আগমন মুনলিট নাইটে তো নয়—আর রাতে ফোটোগ্রাফীর সুবিধাও নেই। কাজেই দিনে ছবি তোলার কী হয়?

মাখন সিং বলেন, চলুন নীচে ঐ খোলা জমিটাতে যাই, ওরা এই সময়ই দলে দলে চরতে বেরোয়।

ঘড়িতে তখন ১১টা। আমরা খোলা জায়গাটাতে এসে দাঁড়ালাম সামনেই একটি গাছ। নীচে থেকেই সেটা ডাল বিস্তার করেছে। সেইখানে আমাদের ক্যামেরা ফিট করা হলো। আর দুটো আইমো দুজনের হাতে টেলিফোটো লেন্স ফিট করা।

এই অবস্থায় রেডি হয়ে আমরা প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষায়। হঠাৎ দূরবীন হাতে মাখন সিং বললেন—সারা জঙ্গলে ঘূর্ণি উঠেছে। ওরা আসছে। আপনারা রেডি হোন। আর যাঁরা নীচে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা সব গাছে উঠে পড়ুন। বলার সাথে সাথেই জঙ্গল তোলপাড় করতে করতে এক সারিতে ৫।৬টি গণ্ডার খোলা পথে ছুটে বেরিয়েছে। পিটুবাবু অশ্বিনী টপাটপ গাছের ডাল ধরে দোলা খেয়ে ওপরে উঠে পড়ে—পড়ে থাকি কেবল আমি।

ভাগ্য ক্রমে আমাদের ক্যামেরার সামনের দিক থেকেই ছুটে ওরা আসছে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে আসছে ছুটে আমারই দিকে! এখন উপায়?

হঠাৎ পিটুবাবু হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি পড়ি কি মরি করে ওঁর হাতটি ধরে ঝুলে পড়লাম—উনি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আমায় টেনে তুললেন—খালি উপলব্ধি করলাম, আমার বুকটা গাছের ছালে ঘষড়া খেয়েছে। কারণ জ্বলছিল। নিমেষের মধ্যেই ওরা সদলে আমাদের গাছের তলা দিয়ে ছুটে পথ্য অন্বেষণে চলে গেল।

ওরা দূরে মিলিয়ে গেল গভীর জঙ্গলে। সুধীর বললে — ওয়ান্ডারফুল শট হয়েছে...

আমার বুকটার মধ্যে জ্বলছে। পিটুবাবু গাছ থেকে নেমে আমায় নামিয়ে নিলেন। চমকে উঠে বলেন—একি রক্ত কেন? আপনার জামাটার বুকের দিকে যে রক্তে রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। জ্বালা কমাতে ওরা হ্যাভারস্যাক থেকে টিনচার আইডিন ঘষে দিয়ে সারা বুকখানাকে শীতল করে দিল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল—সেকি রাইনোর ছবি ওয়ান্ডারফুল হয়েছে বলে। না, রামজলুলির আফটার এফেক্ট বলে।

যাই, বেলা ৩টা প্রায় পার হতে চলেছে। রাইনো হোটেলে ওঠে খাবার খাওয়া হলো। সর্দার গৃহিণী প্রেরিত রোটি ভাজি। তৃপ্তিতে সব জ্বালারই অবসান ঘটলো। মাখন সিং বললেন—এখানে আসার সীজন আছে। সে সময় যাত্রীদের সঙ্গে আসে বয়, কুক, হোটেলকীপার সবাই। এক মাসের জন্যে পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা। তারপর আবার নিঝুমপুরী।

খাওয়া শেষ করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে নজর পড়লো একটি বোর্ডের দিকে তাতে বড় বড় করে লেখা রয়েছে—
give them fool — And they will allow you to photograph

পেছনের কাঁটা জঙ্গলে কিসের হুড়োহুড়ি—শোনা যায়....

মাখন সিং বললেন, ওরা গন্ধে গন্ধে এসে গেছে....পাশের বারান্দার তলায় দেখুন না। ওপরে আবার উঠে এসে পাশের বারান্দার ধারে দাঁড়াতেই দেখা গেল তিনটি বড় বড় গণ্ডার জঙ্গল শুঁকে বেড়াচ্ছে। আমাদের পথ চলতে হবে বলে সবাই কিছুটা কম খেয়েছি কাজেই উদ্বৃত্ত রোটি আমাদের বেশ ছিল তাই ছড়িয়ে দেওয়া হলো। মাখন সিং বললেন—ওরা এখন অন্যমনস্ক এই সুযোগে আমরা নেমে গিয়ে উঁচু টিলাটায় সরে পড়ি....

সুযোগের কথাটা শুনতে যেমন মধুর কার্যক্ষেত্রে তা যে কঠিন দুরূহ সেটা সবার মুখ দেখেই মাখন সিং বুঝে ফেলেন—মৃদু হেসে তখন তিনি রাইফেলের টিগারে হাত রাখলেন....উপর্যুপরি ৩।৪টি ফাঁকা আওয়াজে ওরা শংকিত হয়ে দৌড়তে শুরু করল... ওরা তিনটা নয় সারা দলটাই ছিল ওখানে....ওরা যখন ছোটে শুধু সামনে ছোটে, কোনো দিকে চায় না।

বেশ কিছুক্ষণ সময় দিয়ে আমরা পথ ধরলাম....বেলা পড়ে যাচ্ছে এবার ফিরতে হবে। আসার পথে ছিল উদ্দীপনা—যাবার পথে সবই বোঝা হয়ে পড়েছে। তবু চড়াই পথ শেষ করে উৎরাইতে নেমে নদীর ধারে

এসে পূর্ববৎ গাছের পোশাকের পুঁটলী হাতে নদী পার হওয়া গেলো। তারপর যখন পোশাক পরে রেডি হলাম তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে....বেশ শীত করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার চড়াই.... ক্লান্ত পদক্ষেপে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরের দিকে এগিয়ে চলি। সম্মুখে মাখন সিং.... তাঁকেই অনুগমন করছি আমরা—চারপাশে বিকট অন্ধকার নেমে আসছে চাঁদ উঠল রাত নটায়। কানে আসছে কটকটে ঝিঁঝির ডাক...তার সঙ্গে হঠাৎ শব্দ উঠলো.... আকাশ বাতাস ফাটিয়ে—ক্যাঁও-ক্যাঁও-ক্যাঁও! বৃংহীত...অর্থাৎ হাতীর ডাক.... সবাই চমকে উঠি...মাখন সিং বলেন—ডর নহি উহ হাতিকি পুকার!.... ডাক বাড়তে বাড়তে যেন এগিয়ে আসছে... আশেপাশে—ক্রমে যেন চারপাশ ঘিরে ডাক উঠেছে। মাখন সিং-এর মিলিটারী বুটের আওয়াজ কিন্তু থামে না...কাজেই আমাদের গতিও তার পেছু লক্ষ্য করে চলেছে...

পাশ থেকে হুম হুমহুম হুম....সবার গা শিউরে ওঠে....

মাখন সিং বলেন—বড়ি বদ সোগন—অর্থাৎ অলক্ষণে আওয়াজ।

আমি বলি—হুতুম পেঁচার ডাক না?

মাখন সিং বলেন—হ্যাঁজী বড়ি বদ সোগন

হঠাৎ মাখন সিং থট করে দাঁড়িয়ে পড়েন...সামনেই একজোড়া চোখ ভাঁটার মত জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। বন্দুকটা তুলে নিয়ে মাখন সিং গোঁ-গোঁ—বুঝি মরণ কাতরানি। আবার বন্দুক গর্জে ওঠে।....

উত্তরে—সবই নিশ্চুপ! কেবল একঘেঁয়ে কট কট ধ্বনি...হাতীর বৃংহিত দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে....

আমরা সবাই নিশ্চুপ....কেবল কোমরের কুকরীগুলো হাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকি। মাখন সিং চুপি চুপি বলেন—আভি চন্দ্রমা আ জায়গি! ইহাই ঠাহরিয়ে। অন্ধকারে বনানী রূপে দেখা যাচ্ছে—কালো চাদরে ঢাকা বনস্থলেও আলোর আভাষ পাওয়া যাচ্ছে....তার মাঝে আমাদের দলটি যেন ছায়াচ্ছন্ন অশরীরী দল।

হ্যাভারস্যাকের জল ফুরিয়েছে....রবার চিবুচ্ছি।

আধঘন্টা এইভাবে কেটেছে হঠাৎ বনস্পতিদের মাথায় সত্যিই আলো জ্বলে উঠলো....মনে হলো রবীন্দ্রনাথের কবিতার অংশ—পরদিন মরুশিরে জাগিল প্রভাত... আমাদের হয়েছে তরুশিরে জাগিল চাঁদিনী। তৃপ্তির নিঃশ্বাস সবারই পড়ে। মাখন সিং বললেন—ইহা ঠাহরিয়ে এগিয়ে চলেন বনাভ্যন্তরে তাঁর নিশানার দিকে...হ্যাঁ নিহত হয়েছে জন্তুটি...তবে?

মাখন সিং বলেন—ছিঃ

আমরা এগিয়ে গিয়ে দেখি...অন্ধকারের মিথ্যা ভীতিতে মাখন সিং একটি গরুকে গুলি বিদ্ধ করেছেন।

রাত ১২টা পার হয়ে গেছে তবু দ্বিতীয় নদীর দর্শন মিললো না...উল্টো পথ ধরে নেমে চলেছি...উৎরাই-এর টানে। নিজেদের যেন শক্তির অবশেষ পর্যন্ত দেহে আর নেই। আরও আধ ঘন্টা পরে নদী পেলাম। নদীর বরফ শীতল জলে হাতে মুখে চোখে দিলাম—পান করলাম। তারপর হঠাৎ সবারই এক সঙ্গে সেকি কাঁপুনী এমন কাঁপুনী কম্প জ্বরেও ধরে না। মাখন সিং পর্যন্ত সে কাঁপুনীতে কেঁপে উঠেছেন বলেন—সবাই থপে গিয়ে বরফ জল খেয়ে এই অবস্থা হয়েছে। যাক একটু অপেক্ষা করে নিয়ে নদীর ওপর তারের খেলায় সবাই ধীরে ধীরে উত্তীর্ণ হলাম।

আরও তিন ঘন্টার পথ পা আর চলে না....কতক বসে, কতক ঝিমিয়ে সর্দারজীর ডেরায় যখন পৌঁছালাম তখন ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। পৌঁছানের সঙ্গে সঙ্গেই সর্দার গিন্নি সবার মুখে মুখে গরম চা ঢেলে দিয়ে সেই ভোরে যে কী সেবাই করেছিলেন তা হয়ত জীবনেও ভুলব না।

দুপুরের ডাল রুটি মাংস না খাইয়ে সর্দার গিন্নী ছাড়লেন না...যত্নের এতটুকু ত্রুটি রাখেননি সেকথাও চিরদিন মনে রাখবো।

বেলা ২।।টায় সময় আমরা নৈইরী ত্যাগ করে ইউগাণ্ডার পথে পা বাড়ালাম।.... আলিভাই থিকা থেকে যাদের সংগ্রহ করবার করে ইউগাণ্ডার পথে রওনা হয়ে যাবার ব্যবস্থাই মিঃ প্যাটেল করে এসেছেন.. তাই আর আমরা থিকায় ফিরে গেলাম না....তাতে পথের কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে।

(৫)

রাত চারটায় আমরা নৈরবীর পথ ছেড়ে কিসিমুর পথ ধরলাম। কিসিমু ইউগেণ্ডার লেক ভিকটোরিয়ার ধারের একটি পরিচ্ছন্ন শহর....এইখানেই মিঃ প্যাটেলের বন্ধু মিঃ সাহার বাড়ি। আমাদের ছবির আরও একজন মালিক।

মিঠেন জলের লেক বলতে ভিকটোরিয়ার চেয়ে বড় লেক পৃথিবী জুড়ে আর নেই...এরই কিনার ধরে স্টীমার সার্ভিস রয়েছে—যা কিসিমু থেকে রওনা হয়ে অপর পারের শেষ বন্দর হয়ে ফিরে আসতে সময় লাগে এক মাস।

লেক ভিকটোরিয়ার কিবাকো অর্থাৎ জলহস্তী বিশ্ববিখ্যাত বলা চলে। এদের ছবিও নেওয়া ঠিক হয়েছে...চাঁদনী রাতে এদের যুগল বন্দী প্রেম দৃশ্য তুলতে পারলেই দেখানোর মত ছবি হোতো... কিন্তু তাতো সম্ভব হবে না। কিবাকোরা জোড়ায় জোড়ায় একসঙ্গে চাঁদের কিরণে মাথা তুলে লাফিয়ে ওঠে একরকম খলখল করে হাসে সে এক অপূর্ব দৃশ্য...পথ চলতে চলতে মিঃ প্যাটেল ও মিঃ সিং আমাদের গল্প বলে চলেছেন।

নিবরী থেকে কিসিমুর দূরত্ব ৫০০ মাইল—আবার নেইরো থেকেও তাই.... সারাদিন মোটর চলেছে বিরাম নেই.... পথের পাথেয় পাহাড়ী সর্পিল পথগুলি.... যেমন ভয়াবহ তেমনি নয়ন সুখকর। দেখলে চোখ জুড়ায় আবার কাছে গেলে ভয়ে প্রাণ শুখায়। কোথাও গভীর খাদের গা ঘেঁষে পথ চলেছে কোথাও বা দুটি পাহাড় তাঁবে তারের ব্রীজের ওপর দিয়ে...কোথাও নদীর খাড়া বাঁকে পড়তে পড়তে পথ নিজেই আবর্ত সৃষ্টি করে তুলেছে। দুপুরের খাওয়ার জন্য যে জায়গাটিতে মটর থামানো হলো—সেটি একটা বিরাট জলাভূমি.. বড় বড় হোগলার মত একরকম উদ্ভিদের ঘন বন তারই ওপর দিয়ে দলে দলে পিকক-পিজিয়েন ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথায় তাদের সোনার পাউডারের পাফের ঝুঁটি...অদূরের জলাপথে দেখা যাচ্ছে ক্ষীণ নদী প্রবাহ নাম তার নীল নাইল

নাইল নদীর ওপরের অংশ এমনিতর রাশি রাশি পাহাড়ী সর্পিল জলাভূমি বেয়ে এগিয়ে চলেছে মারচিশন প্রপাতের দিকে... এরই নাম নীল নাইল প্রপাত অন্তে রিভার মাউথ দু মাইল লম্বা যা গিয়ে মিশেছে লেক এলবার্টে...লেক এলবার্ট থেকে আবার নদীর প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে সুদান ইজিপ্টের মধ্যে দিয়ে (মেডিটারেনিয়ন) ভূমধ্যসাগরে পড়েছে এর নাম হোয়াইট নাইল....এই হোয়াইট নাইলে জাহাজ চলে। এটা যেন ব্লু নাইলের মধ্যাংশ কারণ প্রথমাংশ এবং এর উৎস লেক ভিকটোরিয়া থেকেই।

ভোর পাঁচটায় আমরা কিসিমু শহরে পৌঁছে গেলাম। মিঃ সাহার বাড়িটা লেক ভিকটোরিয়ার ধারে বারান্দা বা ছাদে দাঁড়ালে সামনেই লেকের নীল জল—টলটল করছে দেখা যায়। মিঃ সাহা আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন—পৌঁছনার সঙ্গে সঙ্গে আতিথ্য করলেন বর্ণনাতীত তারপর ব্রেক-ফাস্টের প্রচুর আয়োজন....। গিয়ে দেখি আমাদের দলের বাকী টেকনিশিয়ানরা ওখানে পৌঁছে গেছেন, সঙ্গে আলিভাই।

ব্রেক ফাস্টের পর মাখন সিং বিদায় নিলেন—বলেলেন, ফুটিয়াবার পথে আমায় আবার তুলে নেবেন এখনকার মত চলি।

মাখন সিং চলে গেলেন আমরা তাঁর যাত্রাপথের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকি.... তাঁর মোটর দৃষ্টির বাইরে গেলে ফিরে চাই সামনেই নীল ভিকটোরিয়া। অদূরে একটি দ্বীপে গাছের মাথায় সাদা সাদা বকেরা সভা বসিয়েছে। ক্যামেরা ফিট করে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে তাদের সন্ত্রস্ত করে দি.... তারা আকাশ ছেয়ে এক ঝাঁকে উড়ে চলে.... সত্যিই এরকম শট পাওয়া দুর্লভ।

এরপর বৈঠক বসলো বৈঠকখানায় ঠিক হলো আমরা মাউন্ট কিলিম্যানজারোর আশপাশের কাজ সেরে মোশী থেকে সারেঙ্গাটি প্লেনে যাবো—সারেঙ্গাটি প্লেন হচ্ছে আসল সিংহের ক্যাম্প এবং ওয়ারলডস জু।

মোসী টাঙ্গানাইকার একটি প্রসিদ্ধ শহর....মাউন্ট কিলিম্যানজারোর উপত্যকায় অবস্থিত। তখনি মোসীর ইমিগ্রেশন অফিসে একটি তার করে দেওয়া হলো—এবং দুপুরের লাঞ্চ শেষ করে বেলা তিনটের সময়েই মোটরে চড়ে বসলাম। এবার সঙ্গে গাইড হিসাবে আছেন মিঃ প্যাটেল, মিঃ সাহা—আর আলিভাই। মোসী এখান থেকে ১৭৫ মাইল মাঝে পড়ে আমাদের পূর্ব বর্ণিত ভয়।

মাউন্ট কিলিম্যানজারো—হিমালয় অফ আফ্রিকার উচ্চতা হচ্ছে ১৯২০০ ফিট বরফে চূড়া ঢাকা এরই শাখা-প্রশাখা ঘিরে পথ দৌড়েছে...সে পথ যতদূর আঁকা-বাঁকা ততদূর ভয় সংকুল। তাই আমাদের গাড়িগুলো কখন আকাশ ছোঁয়া উচ্চতা থেকে অতলস্ত গভীর খাদে নেমে চলেছে—পরক্ষণেই আবার ইঞ্জিন মাথা উঁচু করে গোঁ-গোঁ করতে করতে আকাশ পানে ঠেলে উঠছে....এই সব সর্পিল পথ জুড়ে আবার কোথাও বা বেড় দিয়েছে খরস্রোতা নদী।

রাতের ঘন অন্ধকারে চালকেরা অতি সন্তর্পণে গাড়ি চালাচ্ছেন। আমাদের গাড়িগুলিই যেন একটা দুরন্ত সাফারি....

এএমটি। প্রিও-৭

অর্থাৎ সামনে ইন্টার ন্যাশনাল লরী এক-খানা যাচ্ছে করে আমাদের রসদ-ক্যাম্প এবং ক্যাফ্ বয়রা চলেছে....দুখানি ইন্টার ন্যাশনাল বাস যার মধ্যে রয়েছে টেক-নিসিয়ান এবং ক্যামরাসহ যন্ত্রপাতী এবং দুখানি পেজোর কার যাতে ওপরওয়ালা যাত্রীসহ মেন গাইডরা। মেন গাইডরাই আবার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তখন অলিভাই-এর হাতেই আমাদের গাড়িখানা চলচাচ্ছিল সবার আগে রাত্রের সূচীভেদ্য আঁধারের সামনে হঠাৎ মনে হলো একটা প্রকাণ্ড দেয়াল আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে....গাড়ির মাথার সার্চ লাইটটা জ্বালতে দেখলাম কি সর্বনাশ—একটা মস্ত বুনো হাতী দাঁড়িয়ে। মস্ত হাতী মানে মাতাল হাতী এরা সত্যিই মত্ত হস্তী যা ইচ্ছা তাই করে বসে। অতএব বিনা বাক্য ব্যয়ে সমস্তগুলি গাড়ির আলো নিভিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া গোত্যন্তর কোথায় !....

সারারাত একইভাবে কেটে গেল... ভোরের আলোর দেখা পেয়ে মত্তহাতী ধীরে ধীরে জঙ্গলে নেমে চলে—আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে মোটর স্টার্ট করলাম। ওপরেই ঘূর্ণি পথ...পথের একপাশে নীচু খাদ অপরাংশে আকাশ ছোঁয়া পাথরের বেড়া...হঠাৎ বাঁক নিতেই পেলাম পাহাড়ী সেতু. অত্যন্ত সুদক্ষ চালক ছাড়া এ বাঁকে গাড়ি সামলানো দায় হয়ে ওঠে অতি সন্তর্পণে সেতু পার হতেই এসে পড়লাম মাউন্ট কিলিম্যানজারোর উপত্যকায়।

রোদ উঠেছে মাউন্ট কিলিম্যানজারোর মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে প্রশস্ত মূর্তি ঋষির মতই দাঁড়িয়ে রয়েছেন যেন আফ্রিকার পর্বতেশ্বর।

উপত্যকায় শুধু বাবলা বন এদের ঝিরঝিরে পাতার ফাঁকে ফাঁকে লম্বা লম্বা হলুদ বর্ণের শীর্ষ দোলা খাচ্ছে....সে দোল হাওয়ার সাথে বেরিয়ে এলো—জিরাফের লম্বা যূথ অপূর্ব দেখতে। ওপাশে অস্ট্রিচের টেন ছুটেছে এদের পিছু নিয়ে কিছু কিছু ছবি সংগ্রহ করলাম।

সারা দুপুর গাড়ি ছুটেছে....বিকেল চারটায় এসে পৌঁছলাম একটি পাহাড়ী নদীর বাঁকে...নদীর কিনার ধরে দলে দলে জেব্রারদল জলে নেমেছে তৃষ্ণায় জলের আশায়। এসব দৃশ্য আমাদের কল্পনার অতীত....ছবির পর্দায় হয়তো দেখাতে পারবো কিন্তু চোখের পর্দাতে এ যেন চিরদিনের মত লেগে থাকতে চায়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মোসী শহরের মসিরেখায় নিশানা পেলাম।

রাত্রি নটায় মোসীর আলোক দীপমালা পূর্ণভাবে দৃষ্টি গোচর হলো....এবং দেখতে দেখতে শহরের তোরণদ্বার পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। ইমিগেশন অফিসে পৌঁছতেই অফিসার সাহেব বললেন—you are late by 8 Hrs........ প্যাটেল সাহেব বললেন, সারারাতই প্রায় দাঁড়িয়ে ছিলাম...বুনো মত্তহাতীতে পথ-রোধ করেছিল। উনি হেসে বলেন ওহ্ আই সি। যাক সব ভালয় ভালয় পৌঁছে গেছেন তো আর কোনো বিপদ হয়নি। সঙ্গে আপ্যায়িত করলেন গরম চা আহারাদি দিয়ে...। আহারান্তে সবাই গল্পেতে চাই গৃহস্বামী হেসে বলেন সঙ্গে কম্বল এনেছেন তো ?

আমি বলি—বলেন কী মশাই এমন ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে পারলে বেঁচে যেতাম।

উনি বলেন—না কালই স্নান করবেন চলুন বিছানা প্রস্তুত।

বাইরের হল ঘরে লম্বা সারি সারি বিছানা পাতা—সবার পায়ের কাছে দুখানি করে কম্বল রাখা।

নিরালায় পরস্পরের মুখ চেয়ে বলি—না ভদ্রলোক নেহাতই শীতকাতুরে।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে দু রাত্রের অবসাদে। গৃহস্বামী ভৃত্যবাহিত বড় টেতে করে চা এনে আমাদের ঘুম ভাঙালেন। বললেন—একি সবাই দুখানা কম্বলেই নিজেকে মুড়ে রেখেছেন যে।... সবাই সবার দিকে চেয়ে অধোবদনে বসে থাকি...কি দুরন্ত শীতই না রাত্রে পেয়েছি রাত্রে মনে হয়েছে আরও দুখানা করে কম্বল পেলে ভাল হতো।

আমি বলি—রাত্রে কিন্তু পায়ের কাছে দুখানা করে কম্বল রাখা দেখে হাসি পেয়ে গিয়েছিলো।

গৃহস্বামী বলেন—আমার কিন্তু আপনাদের এ অবস্থায় দেখে হাসি পেয়ে যাচ্ছে হাসির ফোয়ারায় সাথে হ্র দেখছ

চললো—এক-একজন দু-তিন কাপ করে চা খেলাম তবে শীত কিছুটা যায়।

গৃহস্বামী বলেন— কি জানেন—মোসী শহরের টেমপারেচারের কোন ছন্দিস থাকে না উপত্যকায় দারুন গরমের মাঝে হঠাৎ এমন হিমেল হাওয়া বয়ে যায় যে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করে পরক্ষণেই আবার এমন গরম চলে যে তিষ্ঠানো যায় না। আর রাত্রি বেলায় তো শীতের অন্ত বারমাসই নেই।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বাইরের দারন্দায় দাঁড়াতেই চোখের সামনে দেখা গেল ধবল তুষারে মোড়া মাউন্ট কিলিম্যানজারো বিষ্ণুব রেখার উপর দাঁড়িয়ে মাথায় তুহীন জটা...পদমূলে নানা সন্ন্যাসীদের মতই রিক্ত...ধূ-ধূ বালু প্রান্তর অপূর্ব দৃশ্য।

বাড়ির অনতিদূরে মোসী নদী আমরা স্নানাদির কাপড় তোয়ালে হাতে নিয়ে নদীর পথেই যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হই ভাবি প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি সেরেই ফিরব। গৃহস্বামী বলেন—নদীতেই স্নান করছেন সব বেশ বেশ তাই ভালো।

আমরা নদীর ধারে পৌঁছে প্রাতকৃত্য সেরে শৌচ করতে গিয়ে দেখি যে আমাদের নীচের অঙ্গটিকে বৃশ্চিক কেটেই নিয়েছে মোসী নদী অগত্যা ওইটুকু কোনোক্রমে সেরে নিয়ে বিনা স্নানে বাড়ি ফিরে আসা হলো।

গৃহস্বামী যেন আমাদের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিলেন মৃদু হেসে বলেন—স্নানাদি সারা হলো ?

আমরা বলি—ভাবছি আজ আর স্নান করব না...যদি ঠান্ডা লেগে যায় কাজের ক্ষতি হবে। গৃহস্বামী হেসে বলেন—ঠান্ডা লেগে যাতে না যায়—তার জন্যে গরম জলেরই ব্যবস্থা আছে—কাজেই অনায়াসেই স্নানাদি করে সুস্থ হোন—পরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে কাজে বেরোবেন।

আবার উচ্চ্বসিত হাসি উঠে....।

স্নান আহারাদি সেরে আজকের প্রোগ্রাম হলো মাউন্ট কিলিম্যানজারোর ছবি তোলা...তার গা বেয়ে সাফারির দল কিভাবে ওপরে চড়ছে...ইত্যাদি।

দূরে নিকটে, সূর্যালোকে, রাত্রে চন্দ্রালোকে এই বিরাট সন্ন্যাসীর যোগমৌন দূরূপ ক্যামেরায় তুলে নিলাম বিভিন্ন শটে...আফ্রিকার এটি হিমালয়, উচ্চতায় ১৯০০০ ফিট, মাউন্ট কেনিয়া ১৮০০০ ফুট আর রিয়াজারো অথবা মাউন্ট অব দি মুন হচ্ছে ১৫০০০ ফুট। তিনটির মাথাতেই বরফ ঢাকা.... কাজেই হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে বলা চলে এখানকার গৌরী-শৃঙ্গ হচ্ছে কিলিম্যানজারো...মাউন্ট কেনিয়া ধবলগিরি আর চাঁদের পাহাড় হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

কিলিমানজারোর বাবলা ছাওয়া ফিকে সবুজ উপত্যকায় জিরাফ, জেব্রা, হরিণ অস্ট্রিচের খেলায় উপবন বলা চলে... এদের

ভিড়ে সময় সময় গাড়ীতে পর্যন্ত ঢোকে এবং সজাগে—কেননা এরা এখানে আছে হাজারে হাজারে লাখে লাখে—আবার মানুষের আসার আওয়াজ পেলে নিমেষে মিলিয়ে বনান্তরালে। কিলিম্যানজারোকে অবরোধ করে ঘিরে আছে লম্বা লম্বা ইউক্যালিপটাসের ঘন বন। এরই মধ্যে ডেরা গেড়েছে বুনো হাতীর দল....কিছু কিছু গণ্ডারও। বন্য রাজত্ব পার হলে ওখানকার আদিবাসীদের ক্ষেতখামার....এরা প্রায়ই ৩।৪ হাজার ফুট উচ্চতায় বাস করে....এদের ছাড়িয়ে ওপরে উঠলে পাওয়া যায় রাশি রাশি বরফ ছাওয়া গুল্মলতার বন যার মধ্যে বসতি করে লাখ লাখ সাপ....উড়ন্ত সাপ থেকে শুরু করে অজাগর পাইথন পর্যন্ত। সন্ন্যাসী তুষারধবল গিরিশংকর নীলকন্ঠের মত এই-সব সাপেদের মুখ থেকে বিষ হরণ করে নিয়েছেন বলে কিলিম্যানজারোর সাপেরা বিষাক্ত নয়। তবে কামড়ালে বা ছোবল মারলে যে ঘা হয় তা পচনশীল। বাদামী রং-এর দুহাত লম্বা উড়ন্ত সাপগুলো ল্যাজে-মুখে সংযোগ করে আকাশ বেয়ে ছিটকে পড়ে ১০০ গজ দূরের ব্যবধানে.. অজাগর পাইথন তার চোখের মণিতে চুম্বকী শক্তি দিয়ে দূরের পশু কাছে টেনে এনে নিবৃত্ত করে নিজেদের ক্ষুধা।

মোসী শহরে আমরা দু' রাত্রি দুদিন ছিলাম। দ্বিতীয় দিন আমরা কিলিম্যানজারোর গা বেয়ে উঠে আদিবাসীদের পল্লী অঞ্চলে কিছুটা শুটিং করি। উদ্দেশ্য আমাদের ছবির শেঠজির সঙ্গে হঠাৎ মোলাকাত ঘটে আর একটি ভারতীয় সাফারির বৃদ্ধ বণিকের...কিলিম্যানজারোর প্রচণ্ড শীতে যিনি দেহ বিসর্জন দেন শেঠজীকে তাঁর ব্যবসার উত্তরাধিকার দিয়ে। সারাদিন শুটিং করে রাতে খাওয়া দাওয়া করে আমরা মোসী ত্যাগ করলাম।

মোসীর ১০০ মাইল দূরে আরুষা শহর....তারই উদ্দেশে পথ চলি—রাত্রের নিজের পথে গাড়ির গতি বাড়ে....ভোরবেলাই 'আরুষা' পেঁছে যাবো।

রাত দুটো নাগাদ আমাদের রসদের লরীটি থেমে গেল....তারই পেছুতে আমাদের অন্যান্য গাড়ী কাজেই হঠাৎ সবাই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অন্ধকারে টর্চ হাতে রসদের লরীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম—হঠাৎ এক মরণ-গোঙানী শুনে চমকে যাই...লরী থেকে আওয়াজ আসে সামনে এগুবেন না...গাড়ীতে গিয়ে বসুন—আমাদের লরীর চাকার তলায় রয়েছে একটা প্রকাণ্ড চিতে।

রাস্তা পার হতে গিয়ে চিতাবাঘটি লরীর তলায় চাপা পড়েছে.. তারই কাতরানী কানে আসছে....বুঝলাম চাকার তলায় পড়ে এখনও সে বাঁচার প্রয়াসে যুঝছে...এখনও মরে নি।

অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই...লরী আগে গেলে যদি সে জীবন্ত থাকে তবে নিশ্চয়ই চাকার তলা থেকে বেরিয়ে বনান্তরালে নেমে যাবে না। পাছে উল্টো বিপত্তি ঘটে তাই লরীর চাকাটা তার ওপরেই রেখে ভোরের অপেক্ষায় থাকা সমীচীন বলে বোধ করলাম।

ভোরের আলোয় দেখলাম চিতাটি চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছে অতএব লরী সরিয়ে মৃত চিতাটিকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে আমরা আরুষার পথে পুনঃযাত্রা করলাম।

ভোরের আকাশে আলো ফুটেছে... সূর্যও উঠেছে... তবে যাকে বলে কুজ্ঝটিকা তাতেই আকাশ ঢাকা....আকাশের সূর্যকে চাঁদের মত দেখাচ্ছে—যেন মেটেসিঁদুর রং-এর একটা গোলাকার চাকতি। কুয়াশার ভেদ করে দিয়ে অত্যন্ত মন্থর গতিতে গাড়ী এগুতে থাকে....আফ্রিকায় এসে এই সর্বপ্রথম কুয়াশা পেলাম...এ যে বিষুবরেখায় অবস্থিত শৈলপুঞ্জ—এখানে কুহেলিকা না থাকাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

আরুষা মাউন্ট মেরুর নীচে অবস্থিত মাউন্ট মেরুর উচ্চতা ১৪০০০ ফিট তবে তার চূড়ায় বরফ নেই। গাড়ী আরুষা শহরে প্রবেশ করেছে....আকাশের সূর্য এখন ভরসায় আত্মপ্রকাশ করেছে। ঘড়িতে এখন বেজেছে বেলা সাড়ে আটটা।

ইস্ট আফ্রিকার এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে চলে গেছে এক আগ্নেয়গিরির রেখা—যাকে ইংরাজীতে বলে 'ভলক্যানিক জোন'। এই রেখাকে অবলম্বন করে তিনটি বিরাট গিরিশৃঙ্গ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে....তার মধ্যে দুটি বরফে আচ্ছন্ন আর একটি হচ্ছে এই মাউন্ট মেরু। এই পাহাড় কটির মাঝের উপত্যকাগুলির উচ্চতা হচ্ছে তিন হাজার ফুট থেকে উনিশ হাজার ফুট পর্যন্ত। পূর্ব-পশ্চিমে মাউন্ট কিলিম্যানজারো উত্তরাঞ্চলে মাউন্ট কেনিয়া—পশ্চিমাঞ্চলে মাউন্ট মেরু। তিনটি কিন্তু ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। বহুযুগ আগে এদের অগ্নি-ধূম বর্ষণ শেষ করে এখন বরফ মাথায় বিরাজ করছে....কিন্তু মাউন্ট মেরুর অগ্নি-বর্ষণ আজও বোধকরি শেষ হয়নি তাই তার আশপাশের পরিস্থিতি কেমন যেন ধূম্রবর্ণ ...আকাশের সূর্যটা পর্যন্ত মেটে সিঁদুর রং-এর।

আরুষার বসতি হবে ক্যাম্পে....তাই সেগুলোকে গাড়তে শুরু করেছে বয়রা.. পাহাড়ী নদীর এ্যানিকটকে পাশে রেখে যাতে জলাভাব না ঘটে।

আরুষা শহরটাকে লন্ডনেরই রিপ্রিকা বলা চলে....সাজসজ্জায় বাড়িঘরে—হোটেল-ইনে, ঋতুতে ও প্রাকৃতিক সংস্থিতিতে। দেশীবিদেশীর ভিড়....এদেশের অধিবাসীদের বলে 'মাসাই'। এদের পরণে একটি জন্তুর চামড়া....কোমর থেকে একদিকের বুকপর্যন্ত ছাওয়া। লম্বায় এরা সাত ফুট বললে চলে। হাতে দোধারী বর্শা। গায়ের রং ব্রঞ্জের মত... পায়ের গোড়ালীর কাছে পাখীর পালকের মোজার মত পায়ের সঙ্গে সংলগ্ন। এদের মত বীর আফ্রিকায় কোন জাতই নয়। এরা এক আঘাতে একটি সিংহ না মারতে পারলে কোন মাসাই যুবতী তাকে বরমাল্য পরাবে না।

গত সংখ্যায় শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসুর পরিচিতিতে সামান্য ভুল ছিল। কানন দেবীর বিপরীতে নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ১৯৩১ খৃঃ। তাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত গান হল 'শেফালী তোমার আঁচলখানি' এবং 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ'।

(চলবে)

মোহনবাগানকে ভয় পেতাম, যদি.....

সেদিন ছিল ইস্টবেঙ্গল-ক্যালকাটা জিমখানার খেলা। সকাল থেকে দুরন্ত গরমে কলকাতা আইঢাই। মাথার ওপর চড়া রোদ্দুর নিয়ে জিমখানার বিরুদ্ধে খেলতে নামলো ইস্টবেঙ্গল। জিমখানা এমন কিছু আহামরি দল নয়, সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল হয়তো গোলের মালা পরিয়ে দেবে ইস্টবেঙ্গল জিমখানাকে। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতিটা হলো অন্যরকম। প্রতি মিনিটেই নিজেদের ভুলের ফাঁদে জড়াতে লাগলেন ইস্টবেঙ্গলের স্টার খেলোয়াড়রা। খেলা দেখে মনে হল এ যেন লাল হলুদ জার্সি গায়ে দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগের মাঝের সারির কোন দল খেলছে। সুরজিত, সমরেশ অথবা উলগা কাউকেই আলাদা করে চিনে নেওয়া গেল না। সত্তর মিনিটের খেলার শেষে ইস্টবেঙ্গল নামমাত্র একগোলে জিতে তাঁবুতে ফিরলো। গ্যালারি ফেটে পড়লো ক্ষোভে, উত্তেজনায়। রোদে পুড়ে, সকাল নটা থেকে লাইন লাগিয়ে আমরা এ খেলা দেখতে চাইনি। উত্তেজনা সংক্রামক। রক্ত-বীজের মত ছড়িয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। তাঁবুতে ফেরার পথে ক্লান্ত-শ্রান্ত সুরজিত নিগৃহীত হলেন। কোচ অমল দত্ত হাতজোড় করে সমর্থকদের বললেন,—'দয়া করে ওদের ছেড়ে দিন, ওরা তো সাধ্যমতো চেষ্টা করছে।'

ইস্টবেঙ্গলের চারটি খেলা হয়ে গেছে। চারটিতেই তারা জিতেছে। তবু, হায় ভাবনা না চিন্ত। যারা খেলা দেখেন সেই সমস্ত ইস্টবেঙ্গল অনুরাগী যারা কাগজ পড়ে খেলার খবর রাখেন সেই সমস্ত ইস্টবেঙ্গল সমর্থক খুশী নন। তাঁরা আরো কিছু চান। তাঁরা আরো ভালো কিছু চান। তাঁরা আরো ভালো খেলা দেখতে চান।

ইস্টবেঙ্গলের খেলা এখনও সমর্থকদের মধ্যে আস্থা জাগাতে পারেনি। কেন? একথা জানতে সেদিন গিয়েছিলাম কোচ অমল দত্তর কাছে। অমল দত্ত রীতিমত সিরিয়াস। এখন তার প্রাণ মন, ধ্যান, জ্ঞান, ধারণা সবই ইস্টবেঙ্গল। অমল দত্ত খেতে খেতে ইস্টবেঙ্গলের কথা ভাবেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ইস্টবেঙ্গলের স্বপ্ন দেখেন। স্কুটার চালাবার সময় কতবার তো স্ট্র্যাটেজি ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন। অমল দত্ত কি ইস্ট-বেঙ্গলের সাম্প্রতিক ফর্ম দেখে কিছুটা চিন্তিত?

আমি কি জানতে এসেছি সেকথা শুনেই অমলবাবু বোধহয় একটু উত্তেজিত হয়ে গেলেন। পাল্টা প্রশ্ন করলেন—'আমরা খারাপ খেলছি তার প্রমাণ কোথায়? তিনটি ম্যাচে আমরা পরপর জিতেছি ৪—০, ৪—১,

অমল দত্ত

আর ৪—১ গোলে। শুধু জিমখানাকেই হারিয়েছে একগোলে। গোল করাই যদি ফুটবলের লক্ষ্য হয় তাহলে আমরা খারাপ খেললাম কোথায়?' একটানা কথাগুলো বলে বোধহয় দম নেবার জন্য থামলেন অমল দত্ত। তারপর হাতের তালুর দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললেন—'আসলে কি জানেন, এখনই, মাত্র তিন চারটি খেলা হবার পর ইস্টবেঙ্গল খারাপ খেলছে এইরকম একটা নিশ্চিত ধারণা করা ঠিক নয়। ইস্টবেঙ্গল দলে এবার নতুন খেলোয়াড় অনেক। এদের সেট করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। লীগের আগে মাত্র মাস দেড়েক অনুশীলনের সময় পাওয়া যায়। সেটাই যথেষ্ট নয়। খেলতে খেলতে একটা দলের পারফেকশান আসে। হয়তো দশটা ম্যাচ হবার পর বলা যাবে ইস্টবেঙ্গল এবার কেমন খেলবে। নাউ ইট ইজ টু আর্লি। আপনিই বলুন না নামী দামী শিল্পী নিয়ে যখন থিয়েটার হয়, তখন প্রথম রজনীতেই কি পারফেকশান আসে? হয়তো পাঁচটা নাইট হবার পর ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে যায়।

ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের নৈরাশ্যে ভুগতে বারণ করেছেন অমল দত্ত। তাঁর মতে 'ইস্টবেঙ্গল চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটিই এমন দিনে খেলেছে যখন বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ। এই গরমে শারীরিক শক্তির পুনর্বিন্যাস (রিগেন অফ এনার্জি) হয় না। স্বাভাবিকভাবেই তাই খেলোয়াড়দের দক্ষতায় ঘাটতি আসে। আবহাওয়ার একটু রকমফের হলেই ইস্টবেঙ্গল ভালো খেলবে।'

আত্মবিশ্বাসী অমল দত্তর দিকে এবার মোক্ষম সেই প্রশ্নটি ছুঁড়লাম—'ইস্টবেঙ্গলের প্রধান দুর্বলতা ডিফেন্সে, এ সম্পর্কে আপনার মত কি?'

অমল দত্ত অল্প ভাবলেন। তারপর বললেন,—'এবার প্রথম থেকেই আমি ঠিক করেছিলাম ছেলেদের দিয়ে অ্যাটাকিং ফুটবল খেলাবো। তাই গোটা দলটিই প্রথম দিন থেকে আক্রমণাত্মক রীতি আঁকড়ে ধরেছে। অ্যাটাক করতে গিয়ে গোটা দলটিই ওপরে উঠে যাচ্ছে। আমার ডিফেন্সের খেলোয়াড়রা অধিকাংশই নতুন, অভিজ্ঞতাও কম। তাই কোন সময় নেমে আসা উচিত সেটা ঠিক ওরা বুঝতে পারছে না। সেই কারণেই এর মধ্যে আমরা দুটো গোল খেয়েছি। এই দুর্বলতাটা আমাকে কাটাতে হবে। আমি এ সম্পর্কে কনশাস। নতুন স্ট্র্যাটেজিও ঠিক করছি।'

মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংই এবার লীগে ইস্টবেঙ্গলের প্রধান অন্তরায়। দুটো দলের খেলাই নিয়মিত দেখছেন অমলবাবু। অমলবাবু বললেন যে মোহন-বাগানের আক্রমণ এখনও হাবিব নির্ভর। হাবিব খেলছে উইথড্রয়াল লেফট আউট হিসেবে। ১৯৫৮ আর ৬২ সালে ব্রাজিল এই পদ্ধতিতে খেলেছিল। কিন্তু উইথড্রয়াল খেলায় উইং দিয়ে আক্রমণের সংখ্যা কমে গেছে। অমলবাবু বললেন—'ভয় পেতাম যদি মোহনবাগানের রাইট ফ্ল্যাঙ্ক সাউন্ড হতো।'

মহামেডানের আক্রমণেও তেমন ধার নেই বলেই মনে করেন অমল দত্ত। সাব্বির যদিও ভালো খেলছে তবু লাতিফুদ্দিনকে খেলা-বার লোক নেই। অবশ্য কয়ার জায়গায় তরুণ দাস মহামেডানের মস্ত আসেট।

যাই হোক, এবার লীগের মুখে পেতে অমল দত্ত বদ্ধপরিকর। তাঁর শেষ কথা—'ট্রাই, ট্রাই, ট্রাই এগেন।'

এখন পর্যন্ত (৩ জুন' ৭৭) লীগে তিন প্রধান চারটি করে খেলা শেষ করেছে। চার-টিতেই তারা জিতেছে। শুধু সবচেয়ে ইস্ট-বেঙ্গল জিমখানাকে হারিয়েছে এক গোলে মোহনবাগান খিদিরপুরকে দু গোলে এবং মহামেডান স্পোর্টিং টালিগঞ্জকে এক গোলে। মোহনবাগানকে খিদিরপুর যথেষ্ট বেগ দিয়েছে। ওই দিনের খেলায় প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন এক স্টপারের খোঁজ পাওয়া গেছে। আমি খিদিরপুরের তরুণ মুখার্জীর কথা বলছি। শিবপুরের ছেলে মুখার্জী দারুণ খেলেছেন।

তিন প্রধান ছাড়াও মোটামুটি লীগে এখন পর্যন্ত ভাল খেলছে লাইটার্স ইউনিয়ন। চারটি খেলার সবকটিতে তারাও জিতেছে। আটটি গোল করেছে তারা। এখনও একটিও গোলও খায়নি। এছাড়াও জর্জ টেলিগ্রাফ এবং বি এন আর ও ভালো খেলছে। দুটি দলই এখনো অপরাজিত। চারটি ম্যাচের দুটিতে জিতেছে এবং দুটি ড্র করেছে দল দুটি। সঙ্গীন অবস্থা সালকিয়া ফ্রেন্ডস আর কাস্টমসের। কাস্টমস চারটি আর সাল-কিয়া পাঁচটি ম্যাচ খেলার পর এক পয়েন্টও ঘরে তুলতে পারে নি।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

আমার গ্লাস ফাইবার ধনুক চাই

'বিয়ে দেবার জন্য যে টাকা খরচা করবে তা না করে, সেই টাকাটা আমাকে দাও—আমি খেলার সরঞ্জাম কিনব'—বাংলা দেশে ক'টা অনঢ়া মেয়ে তার অভিভাবককে মুখের ওপর এ কথাটা বলতে পারে আমার জানা নেই, তবে সম্প্রতি একটি এমন ডাকাবুকো মেয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছি যে তার বাবাকে এ ধরনের একটা ইচ্ছে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে। মেয়েটির নাম নন্দা মজুমদার—রাজ্যের এক নম্বর মেয়ে তীরন্দাজ।

কাশীপুরে বি টি রোডের ধারে সি আই টি বিল্ডিংসের একটা ফ্ল্যাটে ওদের বাসাতে সেদিন পৌঁছে দেখি—উনুনের পাশে বসে ঘেমে নেয়ে নন্দা রুটি সেঁকছে। বুলস-আই ভেদ করার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির রান্না করার ব্যাপারটাও নাকি ওর প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যে পড়ে। এ নিয়ে ছোড়দির সঙ্গে একেক দিন ঝগড়াঝাঁটিও নামাতে হয়।

ঝগড়া করার সময় ওকে কোমর বেঁধে লাগতে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবে কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম এ মেয়ে অনায়াসে সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। কাঁধ অবধি কোঁকড়ানো চুল—গায়ে [illegible] চোখ [illegible] নেওয়া যায়। ওর সাড়ে পাঁচ ফিটেরও বেশী লম্বা মেদহীন গড়ন যে কোন বাঙালী মেয়েরই ঈর্ষার যোগ্য।

তীরন্দাজীর আঙিনায় নন্দাকে নিয়ে আসেন ওর এক সম্পর্কিত দাদা। বাড়ির পাশের বড় রাস্তা ডিঙোলেই [illegible] দত্ত স্কুলের মাঠ—সেখানে বাঁশের ধনুক আর কাঠের তীর নিয়ে মকসো করত ক্যালকাটা আর্চারী ক্লাবের ছেলেরা। সময়টা তিয়াত্তর সালের গোড়ার দিক। মেয়েদের হাতে ধনুক তুলে দেবার কথা ক্লাবের সেক্রেটারী অমিত বিশ্বাসের মাথায় তখন ঘুরছে। নন্দা ধনুকে প্রথম টংকার দেয় এই ক্লাবেই—যাকে এ বছরই এনে দিয়েছে রাজ্য খেতাব।

রাজ্য তীরন্দাজীর লড়াইয়ের প্রথম দিনটা ছিল নন্দারই, একটা জাতীয় রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার নিরিখেই শুধু নয়, সব মিটার ইভেন্টে আশাতীত স্কোর করার সুবাদেও। উক্ত আবেগ নিয়ে ও ফিরেছিল তৃতীয় দিনেও— যে দিন চারটে মেডেল একসাথে গলায় ঝুলিয়েছিল তার মধ্যে তিনটেই ছিল সোনা। ও বলল, 'আমার

নন্দা মজুমদার

জয়ের জন্য ধন্যবাদার্হ হলেন একজন সাংবাদিক যিনি এক দিন বলেছিলেন আমার মতো ছটফটে মেয়ের দ্বারা নাকি আর্চারী হতে পারে না। একটা অদম্য জেদ নিয়ে প্র্যাকটিস করেছিলাম, ফল পেতে শুরু করেছি।'

এত খেলা থাকতে তীরন্দাজী ওকে টানল কেন একথা জিজ্ঞাসা করতে নন্দা বলল—'আমাদের দেশে এটা নতুন করে শুরু হলেও মনে রাখবেন আর্চারী একটা অলিম্পিক ইভেন্ট। পুরোপুরি লক্ষ্যভেদের ব্যাপার। সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে নিজেরই আত্মবিশ্বাস, মনঃসংযোগ আর পরিশ্রমের ওপর। মনে আছে, যে দিন ধনুক তুলে নিয়েছিলাম সেদিন ছোঁড়া তীরগুলোকে সঠিক ধারা দিতে দৃঢ় সংকল্প করেছিলাম [illegible] সবচেয়ে দামী [illegible] আমার কাছে টেনে আনব। নিশানার হলদে-কালো-নীল লাল-সাদা বৃত্তগুলো সে সময় আমার চোখের সামনে কেবলই ঘুরতো। তিলে তিলে এখন অভিজ্ঞতা জমিয়েছি। এই মুহূর্তে যে কোন মেয়ে-তীরন্দাজকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারি।'

জেদটুকুই যে ওর মূলধন—ওদের সংসারের হাল শুনেই তা বোধগম্য হলো। বাবা সুনীল মজুমদার, কাশীপুর গান এ্যাণ্ড শেল ফ্যাকটরীর কর্মী, খেলাধুলোর ব্যাপারে উদাসীন—চান নন্দাকে এখনই পাত্রস্থ করতে। দুই দাদা এখনও চাকরি খুঁজছেন। দিদি চোখের সমুখ দিয়ে ইদানীং গটগট করে বেরিয়ে যান নার্সিং শিখতে। নন্দা মায়ের ফটোতে ধূপধুনো দেয়। সকালে বিদ্যাসাগর উইমেন্স কলেজে [illegible] মারা—ফিরেই টাইপ কলেজে 'হবু-স্টেনো' হবার কসরত করা, দুপুরে বই নিয়ে বসা—বিকেলে প্র্যাকটিশ, রাতে টিউশনী সেরে হেঁসেলে ঢোকা—এসব করেও রাজ্য চ্যাম্পিয়ন।

মাঝে মাঝে বিরক্তি আসে না তা নয়—নন্দা হৈ-হুল্লোড় করে সেসব উড়িয়েও দেয়। কাশীপুরে ওকে চেনে না এমন লোক নেই। যাবতীয় পুরুষালী কাজে ওর আগ্রহ—পড়শীদের মেয়ে মহলে ওর চাহিদা [illegible] দিয়েছে। বিপদ-আপদে নন্দা ছোটে সবার আগে। প্রেম পছন্দ করে না—তাই ও ছেলেদের সমীহ করে না। পাউডার মাখে না, কলেজের মেক-আপ সর্বস্ব মেয়েরা কেন যে খেলাধুলো করে না সেজন্য কোন কোন সময় রাগও হয় ওর।

নন্দার জীবনে সমস্যা অনেক। কিন্তু তার মধ্যে একটা এখন ঘুম কেড়ে নিয়েছে ওর। নিজের ধনুক নেই, গত চার বছরও ছিল না। ধার করা বাঁশের ধনুকে ওর তীরন্দাজী জীবন শুরু—যা দিয়ে তিনটে জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলার হয়ে লড়ে এসেছে। গতবার পাতিয়ালায় অন্য মেয়েদের হাতে বিদেশী গ্লাস ফাইবার ধনুক দেখে বুঝে গিয়েছে বাঁশের ধনুকটার জলাঞ্জলি হিসেবে কাজ চালাবার সময় এসে গেছে। রাজ্য প্রতিযোগিতায় বাংলার হয়ে লড়ে এসেছে। রাজ্য প্রতিযোগিতার ক্লাবের শিশির দাসের কাছে একদা ধরনা দিয়েছিল তার গ্লাস ফাইবার ধনুকটা ব্যবহারের অনুমতির জন্য। শিশিরবাবুই ওর গুরু। দুজনে ভাগাভাগি করে প্র্যাকটিশ কিছু দিন করার পর নন্দা বুঝতে পারে ওর দিন এসেছে। ভারত চ্যাম্পিয়ন কৃষ্ণা দাসকে কোণঠাসা করে ফেলে ও শিরোপাটি অর্জন করে ঘরোয়া লড়াইয়ে। ওর উল্লাস এখন অনুশোচনায় ডুবে যাচ্ছে—কারণ ধনুকে ধার দেওয়ার জন্য কোচ শিশিরবাবু নিজে চ্যাম্পিয়নশীপে ভাল স্কোর করতে পারেননি।

'এই মুহূর্তে আমার একটা গ্লাস ফাইবারের কম্পোজিট বো চাই। ভারতে এই ধনুক পাওয়া যায় না। ক্লাবের ছেলেরা গাঁটের পয়সা খরচ করে বাইরে থেকে ধনুক আনিয়েছেন। সানফ্রান্সিসকোর এক প্লাস্টিক কোম্পানীর একটা ধনুক হয়ত আসবে শীঘ্রই। দাম দেড় হাজার টাকা। একজন সাংবাদিক কিছু টাকা দিয়েছেন আমাকে, নিজেও টিউশনীর কিছু টাকা জমিয়েছি—চেয়ে চিন্তে যোগাড়ও করেছি কিছু। এখনও দরকার পাঁচশো টাকা। ক্লাবের সামর্থ্য নেই এই টাকাটা দেয়। বাংলা দেশে এমন কি কেউ নেই যিনি এই সামান্য টাকা আমাকে দিতে পারেন? অন্য রাজ্যের মেয়েরা গত তিন বছরের সেরা বাংলার মেয়েদের শুধুমাত্র ভাল ধনুকের জোরে এবারের ন্যাশনালে হারিয়ে দেবে—এ ভাবা যায় না'—নন্দার মুখে সত্যিই সে সময় দুঃখ ও ক্ষোভ ফুটে উঠেছিল।

রূপক সাহা

উইম্বলেডন টেনিসের একশত বছর

আন্তর্জাতিক খেলাধূলার মানচিত্রে ১৮৭৭ সালটি লাল অক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ঐ বছরে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা এবং অল্-ইংল্যান্ড তথা উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন হয়। জুন ২০ তারিখে লন্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের ঐতিহাসিক উইম্বলেডন শহরতলীতে ১৯৭৭ সালের তথা উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার শতবর্ষ পূর্তির ঐতিহাসিক খেলার আসর বসছে।

আন্তর্জাতিক টেনিস খেলার আসরে দুই প্রধান প্রতিযোগিতা—পুরুষদের দলগত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা এবং পুরুষ ও মেয়েদের ব্যক্তিগত বিভাগ নিয়ে উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা। এই দুই প্রতিযোগিতায় খেতাব জয় টেনিস খেলায় বিশ্ব খেতাব জয়ের সমতুল্য। এই দুই প্রতিযোগিতার সুমহান ঐতিহ্য এবং বিপুল আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তার দরুন বিশ্ব পর্যায়ে পৃথকভাবে লন টেনিস আসরের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে টেনিস খেলার অনুরাগীরা মাথা ঘামান না।

প্রাচীনত্ব, ঐতিহ্য এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকে এই উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার সমকক্ষ টেনিস খেলার দ্বিতীয় আসর নেই। পৃথিবীর ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছে ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক লর্ডস ক্রিকেট মাঠ যেমন মহা তীর্থস্থান, তেমনি টেনিস খেলোয়াড়দের কাছে লন্ডনের শহরতলী উইম্বলেডনে অবস্থিত অল্-ইংল্যান্ড টেনিস ক্লাবের সুরম্য খেলার আসর। এখানে শুধু খেলার সুযোগ পেয়েই টেনিস খেলোয়াড়দের জীবন ধন্য হয়; এখানের আসরে কোন খেতাব জয় হাতে আকাশের চাঁদ পাওয়ারই সমান। স্থান মাহাত্ম্যে প্রতিযোগিতার সরকারী অল্-ইংল্যান্ড টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ নামটা মুছে গিয়ে উইম্বলেডন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ নামে পৃথিবী জুড়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। টেনিস খেলা ছাড়া উইম্বলেডনের আর এক বিশেষ আকর্ষণ তার প্রাকৃতিক পরিবেশের মনোহারিত্ব—সবুজ তরুছায়া এবং তৃণাচ্ছাদিত খেলার আসরের স্নিগ্ধ পরিবেশ। মনোহারিত্ব এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভূস্বর্গ এই উইম্বলেডন টেনিস কোর্টের যেমন বিশ্বজোড়া খ্যাতি তেমনি আয়োজন - ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও। এইখানেই শেষ নয়। খেলার দিনগুলিতে মহিলাদে ... চিত্র নয়নাভিরাম সাজ-সজ্জা, পরিপাটি ... ন, কাকলি কণ্ঠে বাক্যালাপ এবং চটুল ... হাসি বোল সমস্ত মিলিয়ে উইম্বলেডনের খেলার আসর যে মোহিনী-রূপে ধারণ করে তার আকর্ষণ উপেক্ষা করার মত বে-রসিক খুবই কম আছেন! তাই উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় খেলা দেখার টিকিটের চাহিদা কোন সময়েই পূরণ করা সম্ভব হয় না। টিকিটের মূল্য আগাম পাঠিয়েও হাজার হাজার টেনিস অনুরাগী টিকিট না পেয়ে শেষ পর্যন্ত হতাশায় ভেঙে পড়েন।

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ একশত বছরের ঘটনাবহুল ইতিহাসে যে-সব খেলোয়াড় অসাধারণ ক্রীড়া-নৈপুণ্যের দৌলতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম ঃ ইংল্যান্ডের কুমারী চারলোট ডড্, উইলিয়াম এবং আর্নেস্ট রেনশ (দুই যমজ ভাই) আর এফ এবং এইচ এল ডোহার্টি (দুই ভাই) এবং ফ্রেড পেরী, আমেরিকার কুমারী এলিজাবেথ রায়ান, শ্রীমতী বিলি জিন কিং, শ্রীমতী হেলেন উইলস মুডী, উইলিয়াম টাটেম টিলডেন এবং ডোনাল্ড বাজ; ফ্রান্সের মাদমোয়াজেল সুজান লংলে এবং ফোর মাস্কেটিয়ার্স—জাঁ বোরোত্রা, রনে লাকোস্ত, জাক ব্রুনো এবং অঁরি কশে; অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার এবং শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট।

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে নিগ্রো খেলোয়াড় হিসাবে সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন মাত্র দুজন — মহিলা বিভাগে আমেরিকার শ্রীমতী এ্যালথিয়া গিবসন (উপর্যুপরি দুবার—১৯৫৭-৫৮ সালে) এবং পুরুষ বিভাগে আমেরিকারই আর্থার এ্যাস (১৯৭৫ সালে)। এপর্যন্ত কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ের পক্ষে উইম্বলেডন টেনিস আসরে কোন খেতাব জয় সম্ভব হয়নি। রমানাথন কৃষ্ণান যা উপর্যুপরি দুবার (১৯৬০-৬১) পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিলেন।

বিবিধ রেকর্ড

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার একশত বছরের ইতিহাসে যে-সব অসাধারণ নজির এবং রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নীচে দেওয়া হল :

সর্বাধিক খেতাব

মোট খেতাব ঃ ১৯টি—কুমারী এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)— মহিলাদের ডাবলস খেতাব ১২টি এবং মিকস্‌ড ডাবলস খেতাব ৭টি। কুমারী রায়ান প্রথম খেতাব পান ১৯১৪ সালে এবং শেষ ১৯তম খেতাব ১৯৩৪ সালে। ১৯৭৫ সালে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে আমেরিকারই শ্রীমতী বিলি জিন কিং মোট ১৯টি খেতাব জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করেন।

মোট খেতাব জয় (পুরুষদের পক্ষে) ঃ ১৪টি উইলিয়াম সি রেনশ (ইংল্যান্ড)— ৭টি সিঙ্গলস এবং ৭টি ডাবল খেতাব (যমজ ভাই আর্নেস্ট রেনশ-র জুটিতে)।

সিঙ্গলস খেতাব জয় ঃ ৮টি—আমেরিকার শ্রীমতী হেলেন উইলস মুডী রোয়ার্ক। ১৯২৭ সালে প্রথম খেতাব এবং ১৯৩৮ সালে ৮ম খেতাব জয়ী হন।

সিঙ্গলস খেতাব জয় (পুরুষদের) ঃ ৭টি— উইলিয়াম সি রেনশ (ইংল্যান্ড)। ১৮৮১ সালে প্রথম খেতাব এবং ১৮৮৯ সালে ৭ম খেতাব জয়ী হন।

সর্বাধিক উপর্যুপরি পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয় ঃ
৬বার (১৮৮১-৮৬)—উইলিয়াম সি রেনশ (ইংল্যান্ড)

সর্বাধিক উপর্যুপরি মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয় ঃ
৫ বার (১৯১৯-২৩)—মাদমোয়াজেল সুজান্ লংলে (ফ্রান্স)

সর্বাধিক পুরুষদের ডাবলস খেতাব জয় : ৮টি—দুই সহোদর আর এফ এবং এইচ এল ডোহার্টি (ইংল্যান্ড)

সর্বাধিক মেয়েদের ডাবলস খেতাব জয় : ১২টি—এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)

সর্বাধিক মিকস্‌ড ডাবলস খেতাব জয় : ৭টি—কুমারী এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)

সর্বকনিষ্ঠা চ্যাম্পিয়ান ঃ কুমারী চারলোট ডড্ (জন্ম ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর ২৯)। ১৮৮৭ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি সিঙ্গলস খেতাব পান। পুরুষ এবং মেয়েদের মধ্যে তিনিই সব থেকে কম বয়সে উইম্বলেডন খেতাব জয় করেছেন।

সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ চ্যাম্পিয়ান ঃ উইলফ্রেড ব্যাডলি (ইংল্যান্ড) ১৮৯১ সালে তাঁর ১৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিন বয়সে সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন।

স্বামী-স্ত্রীর মিকস্‌ড ডাবলস খেতাব জয় ঃ ১৯২৬ সালে এল এ গডফ্রি এবং তাঁর স্ত্রী মিকস্‌ড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির সৃষ্টি করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে দুই বোন ঃ ১৮৮৪ সালে লিলিয়ান এবং মাউড ওয়াটসন প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির সৃষ্টি করেন।

উপর্যুপরি দুবার 'গ্রিনস্লাম' সম্মান ঃ ১৯৩৭-৩৮ সালে আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির সৃষ্টি করেন।

উইম্বলেডনের আসরে প্রথম যোগদানের বছরেই 'গ্রিনস্লাম' সম্মান লাভ ঃ ১৯৩৯ সালে আমেরিকার ববি রিগস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির সৃষ্টি করেন।

দর্শক

জমা টাকা বেড়ে উঠবে
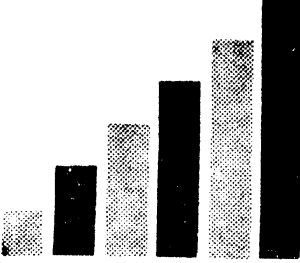
ইউবিআই ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন

এক হাজার টাকার একটি ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২০ বছর পরে পাবেন ৭৩২৮.১০ টাকা!

ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ইউবিআই ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন। দেখবেন আপনার টাকা কীভাবে বেড়ে ওঠে।

১০০ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৭, ১০, ১৫ কিংবা ২০ বছরের মেয়াদে কিনতে পারেন। টাকাটা অবশ্য ১০০-এর গুণিতকে হওয়া চাই। নির্দিষ্ট মেয়াদের শেষে আপনি একসঙ্গে মোটা টাকা হাতে পাবেন। সেটা আপনার জমা টাকার ৭ গুণেরও বেশি হতে পারে।

আপনার সুবিধেমতো টাকার অঙ্ক ও সঞ্চয়ের মেয়াদ আপনিই বেছে নিন। আজই ইউবিআই ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন।

প্রাপ্য টাকার পরিমাণ : কয়েকটি দৃষ্টান্ত

সার্টিফিকেটের দাম	আপনার প্রাপ্য টাকার পরিমাণ			
	৭ বছর পরে	১০ বছর পরে	১৫ বছর পরে	২০ বছর পরে
১০০	২০০.৮০	২৭০.৭০	৪৪৫.৪০	৭৩২.৮৫
৫০০	১,০০৪.০০	১,৩৫৩.৫৫	২,২২৭.০০	৩,৬৬৪.০৫
৭০০	১,৪০৫.৫৫	১,৮৯৪.৯৫	৩,১১৭.৭৫	৫,১২৯.৬৩
১,০০০	২,০০৭.৯৫	২,৭০৭.০৫	৪,৪৫৩.৯৫	৭,৩২৮.১০
৫,০০০	১০,০৩৯.৫০	১৩,৫৩৫.২০	২২,২৬৯.৬০	৩৬,৬৪০.৩৫
১০,০০০	২০,০৭৯.২০	২৭,০৭০.৪০	৪৪,৫৩৯.২০	৭৩,২৮০.৭০
সরল হারে শতকরা বার্ষিক সুদ	১৪.৪%	১৭.১%	২৩.০%	৩১.৬%

বার্ষিক সুদের হার ১০ শতাংশ। প্রতিমাসে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ হিসেব করা হয়।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBI 7752

বাংলা সিনেমার রাহুর দশা

বাংলা সিনেমার কি সত্যি সত্যিই রাহুর দশা চলছে? একের পর এক ছবি তৈরি হচ্ছে, মুক্তি পাচ্ছে, দু-তিন সপ্তাহ টিকিট ঘরে মাছি তাড়াচ্ছে, তারপরেই উধাও হয়ে যাচ্ছে কোন সাড়া-শব্দ না তুলেই। মনে হয় কোন অপদেবতা ভর করেছে বাংলা ছবির ঘাড়ে, আর তার অভিশাপেই এই মড়ক। বাংলা ছবির সমস্যা নিয়ে এতদিন এতকথা বলা হয়েছে, দিস্তে দিস্তে খাতা লেখা হয়েছে, সরকারী ফাইলের গাদা গড়ে উঠেছে, কমিশন-কমিটির এত ছড়াছড়ি, তবুও অবস্থা একই রকম সঙ্গীন। অথচ কেন এই হাঁড়ির হাল। অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় ভালো ভালো ছবি তৈরি হচ্ছে সে সব ছবি পয়সাও পাচ্ছে, তার ফলে নতুন রক্ত আমদানী হচ্ছে সিনেমায়। কানাড়ী, মালয়ালম ছবির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে সে সব জায়গায় কি রমরমা অবস্থা। হিন্দী ছবিতেও নতুন ধারা দেখা দিয়েছে। স্টার-সিস্টেমের কড়াকড়ি। বাঁধাধরা ফরমূলা এবং লাখ লাখ টাকার অবাস্তব জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরই চেনাশোনা জগৎ-এর ছোটখাট সুখ-দুঃখ নিয়ে ছবি করছেন নতুন নতুন পরিচালকেরা। আনন্দের কথা যে এ-সব ছবির বেশির ভাগই দর্শকের সমাদর পাচ্ছে। ও-সব অঞ্চলে অবস্থা এতই আশাপ্রদ যে অনেক বাঙালী চলচ্চিত্রকারও অন্যান্য ভাষায় ছবি করা শুরু করেছেন বা করার কথা ভাবছেন। বছর কুড়ি আগে বাংলা সিনেমা যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে শুধুমাত্র দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিল তাই নয়, দেশের সিনেমাতেও নতুন প্রাণ এনে দিয়েছিল। তখন সবাই বাংলা ছবির দিকেই তাকিয়ে থাকতো নতুন প্রেরণার জন্যে। কিন্তু প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই ধস্ করে সব যেন ফুরিয়ে গেলো। দু-চারজন চলচ্চিত্রকার যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এত বছর কেটে যাবার পর তাঁরাই এখনও অবধি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, নতুন কোন নাম আর যোগ হয়নি তালিকায়। এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে। অথচ ছবি যে কম তৈরি হচ্ছে বা নতুন লোকেরা যে ছবি করছেন না তা নয়। কিন্তু সব নতুনেরা শুধু নামেই, ছবির ধরণ-ধারণ সবই সেই মান্ধাতা আমলের। নতুন যাঁরা আসছেন, তাঁদের মধ্যে নবীনত্বের কোন তেজ নেই, আছে শুধু কাঁচা হাতের কালিমা। এঁদের হাতে পড়ে বাংলা সিনেমার নাভিশ্বাস উঠেছে। এঁরা না পাচ্ছেন সরস্বতীকে তুষ্ট করতে, না পাচ্ছেন লক্ষ্মীকে বশ করতে।

টোটকা বেরোচ্ছে অবশ্য অনেক। তার মধ্যে একটা হল কলকাতা থেকে হিন্দী ছবি করা। কিন্তু, হিন্দী ছবির বিরাট বাজারের সাথে পাল্লা দেবার জন্যে ছবি তৈরির যে সব কারিগরি দক্ষতা দরকার, সেটা কি কলকাতায় বসে সম্ভব। কলকাতার অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলকাতার স্টুডিও-ল্যাবরেটরী সবই দর কচ্চা মারা। বলা যেতে পারে যে এসব বাধা সত্ত্বেও তো কলকাতা থেকেই অনেক ভাল ছবি হয়েছে। নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু, যে ধরনের শিল্প প্রতিভা থাকলে যান্ত্রিক অসুবিধের মধ্যেও সৃষ্টিশীল ছবি তৈরী করা যায়, বলুন পরিচালকের তা আছে? আর তাছাড়া দেখাই তো যাচ্ছে প্রথম শ্রেণীর যে দু-তিনজন প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্রকার আছেন, চলচ্চিত্র নির্মাণের নানা পর্যায়ে তাঁদেরকে বোম্বে ছুটতে হচ্ছে। কলকাতার এমনই দুরবস্থা। আসলে আজকের দিনে ছবি তৈরীর ব্যাপারে শিল্পীর নিজস্ব প্রেরণা ও অনুভূতির সাথে দরকার ঠিক ততটাই দরকার পেশাদারী দক্ষতা এবং যান্ত্রিক পরিপাট্য। এক সময় সত্যিই ছিল যখন শুধু চলচ্চিত্র শিল্পী শুধুমাত্র তাঁর প্রেরণা ও সৃষ্টিশীল মন সম্বল করে ভাঙ্গা ক্যামেরা নিয়ে আবছা টুকরো টুকরো নেগেটিভ জোগাড় করে ছবি করতেন। সে সব ছবি অনেক যান্ত্রিক ত্রুটি সত্ত্বেও নিশ্চয়ই সেগুলো সিনেমার ইতিহাসের দিকনির্দেশক। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ছবি তৈরীর যান্ত্রিক দিকটাও অনেক বেশি জরুরী হয়ে উঠেছে। [illegible] চলচ্চিত্র যেহেতু যন্ত্র নির্ভর শিল্প তাই উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ শিল্পের সম্ভাবনা বাড়বে বই কমবে না। সেই জন্যে প্রত্যেকেই চান ভাল ছবি করবার জন্যে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি। সেখানে কলকাতার একেবারে বাংলা সিনেমার মুমূর্ষু অবস্থা কাটানোর জন্য [illegible] অবশ্য আর একটা ওষুধ বার করেছেন [illegible] যেটাতে অবশ্য অমঙ্গলের আশংকাই [illegible] সেটা হচ্ছে বক্স-অফিস সফল হিন্দী ছবির ধরন অনুকরণ করে বাংলা ছবি তোলা। এ-রকম আত্মঘাতী নীতি কেবল এদেশেই সম্ভব। যাঁরা একথা বলেন, তাঁরা বোঝেন না যে হিন্দী ছবি যেখানে [illegible] লাখ টাকা খরচা করে লোকের চোখ ধাঁধিয়ে পয়সা করবার চেষ্টা করে এবং [illegible] হাতে সফল হন, মোট ৫।৬ লাখ টাকা [illegible] করে বাংলা ছবি কি করে তার [illegible] পৌঁছবে? সুতরাং ফল হয় না [illegible] ঘাটিক! ইদানীংকালে [illegible] যে কটি বাংলা ছবি তৈরী [illegible] সব কটিই ফ্লপ। নামী-দামী [illegible] সত্ত্বেও। একমাত্র বক্স অফিস [illegible] বোধহয় 'অমানুষ' কিন্তু সেখানে [illegible] বহুলাংশে [illegible] কোন [illegible]

অবশ্য [illegible] বিশেষ কিছু [illegible] হয় না। এমন নয় যে কলকাতা [illegible] গাদা গাদা হিন্দী ছবি হলেই [illegible] সোনায় সোহাগা হবে, কিন্তু [illegible] স্টুডিও-ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতির [illegible] হলেই একের পর এক [illegible] চাহিদা [illegible] উদয় হবে। পরিবর্তনটা [illegible] বেশি মৌল ভিত্তিতে হওয়া দরকার [illegible] সমস্যার শেকড় অনেক গভীরে।

বাংলা সিনেমার [illegible] দশা ও সংকটের দুটো দিক। একটা হচ্ছে ছবির আর্থিক সংকট যেটার খানিকটা সুরাহা হয়ত [illegible] ফিল্ম-ফাইন্যান্স [illegible] সম্ভব। কিন্তু আর একটা ব্যাপার যেটা, অর্থাৎ শিল্পের সংকট, তার সমাধান অত সহজ নয়। কিন্তু [illegible] গোড়ায় গলদ দূর না হলে তো কিছুই হবে না। এই সংকটের মূল [illegible] আমাদের অনেকটা তলিয়ে ভাবতে হবে বাংলা ছবি তৈরী হবার প্রথম থেকে [illegible] পর্যায় সমস্তটা পর্যালোচনা করে। [illegible] সপ্তাহগুলোর আলোচনায় এই সংকটের বিভিন্ন দিকগুলো বিশ্লেষণ করব। অবশ্য বলা যায় লিখেই বা কি হবে? কিন্তু কলম ছাড়া তো আমাদের আর কিছুই নেই আর প্রবচন অনুযায়ী কলমের ধার [illegible] অনেক অস্ত্রের চাইতে বেশি। দেখা যাক সেই ধারে বাংলা সিনেমার আগাছার [illegible] কেটে পরিষ্কার করা যায় কি না?

মৃগাঙ্কশেখর রায়

জননা ছবিতে রঞ্জিত - সুমিত্রা

জায়ন্ত কালারে ডবল ভার্শান ছবি করছেন উত্তমকুমার-শর্মিলা ঠাকুরকে নিয়ে। তাও বাংলা গল্পে। ফলে যখন 'ডাক্তার' রিলিজ হবে—দর্শক হৈ হৈ করে দেখবে একবার। আরেকবার 'আনন্দ আশ্রম' রিলিজ হলে। এই সুযোগ আমরা নিতেই পারি। কারণ এখানে বাছাই গল্প আছে, ভাল শিল্পী আছেন, টেকনিশিয়ানও আছেন। টাকা? কেন, এখান থেকে বোম্বে গিয়ে যারা হিন্দীর ইস্টার্ন সার্কিট কিনে এনে ব্যবসা করছেন —তাঁরাই জোগাবেন। বোম্বের যে-কোনও বিগ বাজেট ছবির শতকরা প'য়তাল্লিশ ভাগ টাকা তো এই ইস্টার্ন সার্কিটই জুগিয়ে থাকে। তাহলে অক্ষমতাটা কোথায়?

রঞ্জন মজুমদার

উদ্দেশ্যহীন পথ পরিক্রমা

বাস্তবিক 'ট্যাক্সি-ট্যাক্সি' সামান্য বুদ্ধিমান পরিচালকের হাতে পড়লে একটি সুন্দর ছবিতে পরিণত হতে পারত। হিন্দী ছবির রান্নাঘরে যেসব মশলা সাজানো থাকে, তা এই ছবিতে নেই। মানে যৌন অলঙ্করণ বা রক্তের স্রোত বইয়ে দেওয়া মারা-মারি আমরা দেখতে পাইনি। একজন তরুণ ট্যাক্সি চালকের চোখ দিয়ে বোম্বাইয়ের মতন একটি বিশাল মহানগরীর জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো উপকরণ খুব সহজেই তুলে আনা যেত। তা ...বি মহৎ না হতে পারে কিন্তু প্রাতিভ সাময়িকতার স্বাদু প্রায়।

অথচ পরিচালক সে সবের ধার কাছ দিয়েও না হেঁটে নির্ভর করে রইলেন একটি অগোছালো ও নির্বোধ চিত্রনাট্যের ওপরে। যাক, যা হয়নি তা আমাদের আলোচ্য নয়।

ছবির নায়ক ট্যাক্সি চালায়। গাড়ি-ভাড়া না দিতে পারলেও জীবনের সুকুমার অনুভূতিসমূহকে সে হারিয়ে ফেলেনি। ছোট পরিবারই যে সুখী পরিবার-এ নিয়ে সে যেমন যাত্রীকে বোঝাতে পারে, তেমন-ভাবেই অভিভূত হয় দেহ পসারিণীর দুর্ভাগ্যে। কখনও বা প্লে-ব্যাকের গ্ল্যামারে লুব্ধ। কোন তরুণীকে জীবনের পিচ্ছিল পথ থেকে সরিয়ে আনে। আর তারই মাঝে ছোট্ট একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবির দিকে তাকিয়ে ভাবে নিজের ব্যর্থ প্রেমের কথা। কারুর প্রতি তার কোন অভিযোগ নেই। সকলকে সে সুখী করতে চায় আর শুভেচ্ছা জানায়। কিন্তু নিজের সুখ লুকিয়ে রাখে অজানা রহস্যের আড়ালে। ছবির শেষে কোনরকমে গোজামিল দিয়ে পরিচালক অবশ্য ঝামেলা মিটিয়েছেন।

নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন করেছেন অমল পালেকর। এই মারাঠি যুবকের ভীরু রোমান্টিকতা এবং লিরিক্যাল স্নিগ্ধতা ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। আলোচ্য ছবির ক্যামেরা মুখ্যত তাঁকে ঘিরে আবর্তিত। তবু এখানে তাঁর স্বাভাবিক অভিনয় নৈপুণ্যের ছাপ অনুপস্থিত। এই সৌভাগ্যের জন্য তিনি কতটা দায়ী কতটা পরিচালক, সেটা যদিও বিচার্য বিষয়। পণ্যা-নারীর ভূমিকায় শ্রীমতী রমা ভিজ এবং নেপথ্য গায়িকার ভূমিকায়

জহিরা তেমন কোন অবদান রাখতে পারেননি।

কলা-কৌশলের মান অত্যন্ত সাধারণ। সংগীত পরিচালনায় শ্রীহেমন্ত ভোঁসলে মানানসই, এই পর্যন্ত।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

হাসির ছবি না হাস্যকর ছবি?

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ বাংলা সিনেমা সম্পর্কে এক দারুন অভিজ্ঞতা ছিল—পরিচালক হাসির ছবি করতে চেয়েছেন না হাস্যকর ছবি? ছায়াদেবীর বীভৎস ও অশ্লীল নাচ এবং অজস্র রবি ঘোষ, চিন্ময় চ্যাটার্জি, হারাধন ব্যানার্জিদের নানা কেরিকেচার, স্বামীর স্ত্রীকে বারবার মিসেস চ্যাটার্জি সম্বোধন, অবাস্তব অসম্ভব সব সংলাপ প্রয়োগ এমনি আরো অনেক উদ্ভট কাণ্ড ঘটিয়েছেন। তবুও হাসতে পারলাম না। বাঙালীরা যে স্বাভাবিক রুচিবোধের জন্য গর্ব করে, এ জাতীয় ছবি সেখানে ভীষণ লজ্জা দেয়।

এ ছবির গল্প বা ঘটনা এতই কাঁচা ও জোলো যে তা নিয়ে আলোচনার আদৌ কোন ইচ্ছে আপাততঃ নেই। বাংলা সিনেমার এমন অসংলগ্ন ঘটনা নিয়ে ছবি খুব কমই হয়েছে। পরিচালক ছবির মধ্যে হঠাৎ একটা সিনেমা স্যুটিং-এর ঘটনা জুড়ে দিয়েছেন তা কি রবি চিন্ময় আরতির জন্য? সবিনয়ে জানতে ইচ্ছে করে ওঁরা যে পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তা কি এ...র ছবির পরিচালক ও কলাকুশলী অনুকরণ করে? অবশ্য অভিনয় শব্দটা এখানে না বলাই ভাল। এই ছবির চরিত্রগুলো যেখানে কোনটা সম্পূর্ণ উন্মাদ, কোনটা অর্ধ উন্মাদ, সেখানে শিল্পীরাও ঘটনার সঙ্গে তাল রেখে জোকারী করে গেছেন। অভিনয় নয়।

গল্পের কথা বাদ দিয়ে যদি এর প্রয়োগের দিকে আসি, তাহলে প্রথমেই বলতে হয় এর শব্দ নিয়ন্ত্রণের কথা। তা এতই কুশলতার পরিচয় দিয়েছে যে বেশীরভাগ সময় চরিত্রগুলো বাংলা না উর্দু ভাষায় কথা বলছে তার কিছুই বোঝা যায় না।

পরিচালক কিন্তু সত্যিই ভাগ্যবান। যে ইণ্ডাস্ট্রিতে ঋত্বিক ঘটক প্রযোজক পাননি, মৃণাল সেন টাকার অভাবে তেলেগু ছবি করেন, রাজেন তরফদার প্রায় বেকার হয়ে যান, সেখানে এই জাতীয় ছবি করতে

বেশ কয়েক লাখ টাকা জোগাড় হয়ে যায়। পরিচালক অনুগ্রহ করে বলবেন কি, এই ছবিটি কেন করেছেন, কার জন্য করেছেন, কোন যুগের জন্য করেছেন? বাংলা ছবির প্রতি যাতে দর্শকেরা একেবারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন তার জন্য তাঁদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টায় অভিনন্দন জানাতে পারলাম না।

বিকাশ জানা

ভূপেন হাজারিকার অরুণাচল

আমরা সাধারণত যে সব হিন্দী ছবি দেখে থাকি. মেরা ধরম মেরি মা জাতের দিক থেকে সম্পূর্ণ তার বিপরীত। এ ছবি যাদের নিয়ে তোলা তারা কেউ-ই হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের লোক নন। হিন্দী তাদের মাতৃভাষাও নয়, শুধুমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা। হিন্দী গত ১৯৫২ সাল থেকে সেখানকার কিছু কিছু স্কুলে পাঠ্যভাষা হয়েছে।

এ ছবির পটভূমি পূর্ব ভারতের অরুণাচল প্রদেশের সুবর্সিরি জেলার নিসি উপজাতি অধ্যুষিত একটি গ্রাম। যেখানে এই ছবির গল্পের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত আধুনিক কালের চিকিৎসা ও শিক্ষার মত কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের কিছুই পৌঁছয়নি। অজ্ঞতা এবং অন্ধ সংস্কারের শিকার ছিল সবাই। সেই গ্রামের লোকে কি করে একদিন অন্ধকার কাটিয়ে উজ্জ্বল সূর্যালোকের মত আধুনিক শিক্ষা ও জীবনের মুখ দেখল, তাই নিয়েই ছবির গল্প।

মূলত এটি শিক্ষামূলক ছবি (শ্রীনোবোম তাতা নামক একটি নবম শ্রেণীর ছাত্রের গল্প অবলম্বনে ছেলেটি ছবিতে অভিনয়ও করেছে) হলেও শিক্ষা-লাভ ও সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে আধুনিক শিক্ষার সুফল, দেশাত্মবোধ ইত্যাদিও ছবিতে স্থান পেয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দী ছবির স্পর্শও লক্ষ্য করা যায়। সেটা হয়তো পরিচালক পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের ছবির দর্শকদের দিকে তাকিয়েই করেছেন। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, স্বনামধন্য সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী ডঃ ভূপেন হাজারিকা (যিনি একাধারে চিত্র-নাট্যকার, পরিচালক ও সুরশিল্পী এ ছবির এবং একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন) একটি জাতীয় কর্তব্য করেছেন।

ভারতের আর কোন প্রদেশের অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের কথা ভেবে আর কেউ এমন ছবি করার স্পর্ধা করেননি। ডঃ হাজারিকা সেদিক থেকে অবশ্যই পথ-প্রদর্শক। যাঁরা কোনদিন ক্যামেরাও চোখে দেখেননি তাঁদের নিয়ে ছবি করা এবং তাঁদের মুখ দিয়ে অন্য ভাষায় কথা বলানো, এ এক অসাধারণ ব্যাপার। ডাঃ হাজারিকা প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন সেদিন থেকে। রঙীন এই ছবিটির প্রায় সবটাই পাহাড়, জঙ্গল ও ঝর্ণা অধ্যুষিত অপরূপ প্রকৃতি পরিবেশে তোলা।

ছবিটির প্রযোজক অরুণাচল প্রদেশ সরকার। তাঁদের ধন্যবাদ এমন একটি সময়োচিত ও প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র উপহার দেবার জন্য।

ছবি প্রদর্শনের বিশেষ অনুষ্ঠানে ডঃ হাজারিকা ও অরুণাচল প্রদেশ সরকারের চীফ সেক্রেটারী মিঃ গুপ্তা উপস্থিত ছিলেন। প্রদর্শনীর আয়োজন করেন সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা।

শা. ব. চ

দস্যু রত্নাকর ছবিতে রেহানা সুলতান - সুশোভা চৌধুরী

কলকাতায় ত্রুফো

ত্রুফোর 'ডে ফর নাইট' কলকাতায় আসছে। নিউ এম্পায়ারে। এর আগে, কলকাতায় কমা-র্শিয়ালি দেখানো হয়েছে 'দি ব্রাইড য়োর ব্ল্যাক' এবং 'মিসিসিপি মারমেড'। কল-কাতার বিভিন্ন ফিল্ম ক্লাব দেখিয়েছে 'জুলে অ্যান্ড জিম' আর 'ফোর হান ড্রেড ব্লোস'। আলিয়াঁস ফ্রাঁসেসে ত্রুফোর 'টু ইংলিশ উওমেন অ্যান্ড দি কন্টিনেন্ট' দেখানো হয়েছে। দিল্লির ফেস্টিভ্যালে এসে-ছিল 'ওয়াইল্ড চাইল্ড' আর 'স্টোলেন কিসেস।' এই ছবিদুটি কলকাতায় এখনো আসেনি।

দি ব্রাইড য়োর ব্ল্যাক ছবিটি অ্যাল-ফ্রেড হিচককে উৎসর্গ করা। যেন ক্রাইম ছবির একচেটিয়া দুঁদে পরিচালকের দিকে একটা ছোট ঠাট্টা। সদ্যবিবাহিতা কালো পোশাকের এক রমনীর স্বামীকে দূর থেকে খেলাচ্ছলে, হাতের টিপ ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যেই যেন, পাঁচজন লোক রাইফেল তুলে পরিস্কার গুলি করে বসল। স্বামীস্ত্রী নদীতীরে সুখী পায়রার মতন ঘুরে বেড়া-চ্ছিল। হঠাৎ স্বামীকে ঢলে পড়তে দেখে দেখে মেয়েটির সবে-তৈরি স্বর্গ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। নিষ্ঠুর হত্যাকারীরা ছুটি কাটানো ভুলে গিয়ে বিপদ বুঝে যে যেখানে পারে উধাও হয়ে গেছে ততক্ষণে। তারপর এই কালো পোশাকের কনে কিভাবে সই পাঁচজন পুরুষকেই ছলে-কৌশলে খুঁজে বার করল আর একে একে খুন করল— এই নিয়ে ছবি। মিসিসিপি নদীর ধারে মিষ্টি প্রেমের ছবি 'মিসিসিপি মারমেড'। 'জুলে অ্যান্ড জিম' ত্রুফোর অন্যতম বিখ্যাত কাজ। জুলে ও জিম দুই বন্ধু একই সঙ্গে ভালো-বাসলো একজন নারীকে। সেই যৌথ প্রেমিকা ও একজন পুরুষ ঘটনাচক্রে মারা যায়। দ্বিতীয় বন্ধুটি অন্তহীন যত্নে তাদের ভস্মাবশেষ রেখে দিয়েছে নিজের কাছে। সে-ই পুরো গল্পটি বলে যাচ্ছে দর্শকদের। আমাদের দেশে কোনো সিনেমাই আসলে সিনেমার মত হয় না, দু-একটা ছবি ছাড়া। সব ছবিই আসলে দৃশ্যের দৃশ্য সাজিয়ে পদার্য় গাঁথা নাটক হয়ে যায়। ফিল্ম ল্যাংগুয়েজের ব্যবহার যেসব রপ্ত নেই বহু পরি-চালকের। ত্রুফোর ছবিকে কোনোভাবেই এই পর্যায়ে ফেলা যাবে না। 'জুলে অ্যান্ড জিম' তার আশ্চর্য সার্থক উদাহরণ। 'ফোর হান ড্রেড ব্লোস ওপেন এক-এন্ড ছবি। ওপেন এন্ডের ছবিতে কোনো কমপ্লিট স্টোরি লাইন থাকে না। একটা সমস্যা তুলে ধরা হয় শুধু। ফোর হানড্রেড ব্লোস-এ প্রকৃতি পালিত একজন বন্য বালক মানুষের

সমাজে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছে না, এ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই। শেষ পর্যন্ত সে আবার তার নিজস্ব প্রাকৃতিক পৃথিবীতে ফিরে যাবে কিনা, ছবিতে তা দেখানো হচ্ছে না। টু ইংলিশ উওমেন অ্যান্ড দি কন্টিনেন্ট—দুই নারী একসঙ্গে একজন ফরাসী শিল্পীকে ভালোবাসত। অপেক্ষাকৃত উচ্ছল মেয়েটির সঙ্গে ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এসে সেই শিল্পী আবিষ্কার করলো সে আসলে শান্ত সংযত ও গভীর স্বভাবের অন্য মেয়েটিকেই ভালোবাসে। অরণ্য থেকে পাওয়া একটি অসামাজিক বালককে সুস্থ মানুষ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন একজন সাইকিয়াটিস্ট—এই নিয়ে ছবি দি ওয়াইল্ড চাইল্ড।

এই সাইকিয়াটিস্টের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ত্রুফো নিজে। স্টোলেন কিসেস কিশোর প্রেমের ছবি। দোকানের কর্মচারী মালিক কন্যার ভালোবাসা পেয়ে ক্রমশঃ পাল্টে যাচ্ছে, শয়তানের হাতছানি উপেক্ষা করতে শিখছে। প্রেমের ওপর গভীর বিশ্বাস ও মানবতার ওপর অন্তর্নিহিত আস্থা ত্রুফোর ছবিতে বারবার ফিরে আসে। ডে ফর নাইট আমি দেখিনি।

সোমক দাস

নায়কের জন্ম

সাফল্যের জন্যে, পেশাদার দলগুলোর মতোই, অপেশাদার গ্রুপ থিয়েটারগুলোরও কাছে যেটা সর্বপ্রথম ও প্রধান ব্যাপার তা হল 'নাটক নির্বাচন'। দ্বিতীয় শ্রেণীটার কাছে ব্যাপারটি আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ খালি যা দৃষ্টিকোণের তফাৎ। যাই হোক ব্যাপারটা হ'ল নাটক নির্বাচন—গত ১ জুন মুক্তাঙ্গনে শুভরূপ-এর 'নায়কের জন্ম' দেখে প্রথমেই যে কথাটি মনে হয়েছে তা হ'ল তাদের ওই নির্বাচন সঠিকই হয়েছে। কেননা তাঁদের 'নায়কের জন্ম' (নাটক—কৃষ্ণ ধর) দর্শকদের শেষ পর্যন্ত টেনে রাখবে। তার জোরালো সংলাপ, বক্তব্যের ধারালো ইঙ্গিতময়তার জন্যেই।

আমাদের জীবনে কোনটা যে নাটক আর কোনটা নয়!—আমাদের সবটাই সবকিছুই তো অভিনয়। 'ভীষণ' একঘেয়ে, ক্লান্তিকর, আর যন্ত্রণাদায়ক। নাটকের এই মূল বক্তব্যটি শুভরূপের সামগ্রিক উপস্থাপনায় দর্শককে কিছুক্ষণের জন্যেও অন্তত বিদ্ধ করতে পেরেছে। যদিও দু-একটি দৃশ্য 'বোর' করে। দর্শকদের মধ্যে থেকে উসখুসুনির শব্দ ভেসে আসে।

স্বচ্ছন্দ অভিনয়ের জন্যে যে কজন দর্শকদের মনোযোগ বেশী টেনেছেন, তারা হলেন অলোক রায়চৌধুরী (শুভ), বাসব মিত্র (সৌম্য), তপন বিশ্বাস (যন্ত্রী), বিমল কুমার সরকার (পুলিশ অফিসার), অপিতা ঘোষ (মালা)। কাজল চট্টোপাধ্যায় (মাস্টার) সুদীপ্ত নাগচৌধুরী (সমীর), কাজল চৌধুরীর (বনানী) অভিনয় কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। বাকিরা মোটামুটি। তবে এ নাটকে অভিনয়ের ব্যাপারটা প্রশংসা পেতে পারে মূলতঃ ভালো টিম-ওয়ার্কের জন্যেই, নির্দিষ্ট এক বা একাধিক জনের অভিনয়ের জন্যে নয়।

একটা নাটকের মঞ্চোপস্থাপনের সাফল্যের জন্যে রীতিমতভাবে নির্ভর করতে হয় আলোকসম্পাতকারী, মঞ্চ-পরিকল্পনাকারী শব্দসংযোজক—এঁদের সহায়তার ওপর। এ নাটকের পরিচালক (জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়) সে সহায়তা পুরোপুরিই পেয়েছেন। আলোকসম্পাতে ছিলেন—তাপস সেন। মঞ্চ পরিকল্পনায়—তড়িৎ চৌধুরী। ও শব্দ সংযোজনে—প্রদীপ্ত দাস।

—গৌতম ভট্টাচার্য

ঋত্বিকের নাটক

রঙমহল মঞ্চে পারিবারিক নাট্যগোষ্ঠী ঋত্বিক-এর দ্বিতীয় বার্ষিকী মিলনোৎসব উপলক্ষে মনোজ মিত্র রচিত ও পরিতোষ-কুমার বসু পরিচালিত শিবের অসাধ্য নাটক ২৭ মে ৭৭ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এদের প্রথম নাট্য প্রয়াস কৈকুণ্ঠের উইল এবং দ্বিতীয় নাটক শিবের অসাধ্যর অভিনয় সাফল্য অনেক সৌখীন নাট্য সংস্থাকেও হার মানায়। প্রথমেই মনে জাগে মঞ্চমায়ার কুশলতা যা নাটকটিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। অভিনয়ে প্রথমেই শিবের ভূমিকায় সুব্রত মিত্রের সাবলীল ও মনোগ্রাহী অভিনয় সারা প্রেক্ষাগৃহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাখে। মাঝে মাঝে এর অভিনয় অনেক উঁচু দরের অভিনেতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দুই সহচর নন্দী ও ভঙ্গীর ভূমিকায় প্রদীপ ও শুভঙ্কর নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছে বিশেষ করে ভঙ্গী চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নন্দীর কাছ থেকে আরও একটু প্রত্যাশা ছিল। নারদের চরিত্রে রাম সরকার চলনসই কিন্তু হাদু সিংহের ভূমিকায় বিশ্বনাথ মিত্রের অভিনয়ে প্রত্যাশা ছিল বেশী কারণ মাঝে মাঝে তাকে খুবই দুর্বল অভিনেতা হিসেবে মনে হচ্ছিল, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও পুরোহিতের ভূমিকা চলনসই; বিশেষ করে গ্রামবাসীদের দলগত অভিনয় কিছু কিছু দৃশ্যে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। সতী চরিত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসিনী ও সবিতা রাণা দুর্গার ভূমিকায় অভিনয়ে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখে দর্শকদের যথেষ্ট তৃপ্তি দান করে। আবহসঙ্গীত মঞ্চোপযোগী তবে মাঝে মাঝে মঞ্চে নিষ্ক্রিয়তা দর্শকদের পীড়া দেয়। পরিতোষ বসুর পরিচালনায় মুন্সীয়ানার পরিচয় এবং ইয়াসীনের ভূমিকাভিনেতা হিসেবে তার কৃতিত্ব এক কথায় অনবদ্য।

সাংস্কৃতিক সম্মেলন

সম্প্রতি রবীন্দ্রপক্ষে ওরিয়েন্টাল গ্যাস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সাংস্কৃতিক শাখা রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করলেন পার্ক স্ট্রীটস্থ অফিসে। ক্লাবের সদস্য রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রালোচনা ইত্যাদি পরিবেশন করেন। আসরটিকে অ... মনোজ্ঞ হয়ে উঠতে সাহায্য করে অভিনেতা দেবরাজ রায়ের আবৃত্তি, আবু আত্তাহার সরস আলোচনা, জোভিয়ালস অর্কেস্ট্রা এবং অচিন্ত্য মজলিস শিল্পী গোষ্ঠীর (কলিকাতা সমাজসেবী ও সাংস্কৃতিক পরিষদের সাংস্কৃতিক শাখা) গীতি বিচিত্রা। সভাপতিত্ব করে সন্ধ্যার প্রশংসা এন আর হালদার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক সত্য মিত্র।

কানাকানি

কলকাতার প্রথম সারির
এক নায়কের বাড়িতে রাত-বিরেতে যে
কোন সময় ফোন করলেই আপনি
(তা আপনি সাংবাদিক হলেও)
বাড়ির ভৃত্যের গলায় জবাব পাবেন—
'দাদা নেই।' এমন কি চির পরিচিত
অতি জনপ্রিয় উত্তম কণ্ঠস্বরটিও মাঝে
মাঝে বলেন 'উনি শুটিংয়ে চলে
গেছেন।' অথচ স্ক্রীপ্টের কথা বলতে
গেলে সবিনয়ে সেই নায়ক বলে
দেন 'এসব কথা কি এই আবহাওয়ায়
বলা যায়। সকাল বেলা
ফোন করে একদিন বাড়িতে আসুন
না!' আর ফোন করলে একই
উত্তরের পুনরাবৃত্তি।

বাঙলার বাইরে বাঙালী

দিল্লি

দিল্লির বাসে ভিড় থাকে না। কলকাতার বাসের দৃশ্যগুলোকে মনে রাখলে দিল্লির বাস সম্পর্কে সাধারণভাবে এ মন্তব্য খাটে। বস্তি ভেঙে শহর থেকে দূরে বস্তিবাসীদের যে নতুন কলোনী—সেই রুটের বাসগুলো এ থেকে অবশ্য বাদ পড়বে।

এমনি একটি বাসে দিল্লির বৃহত্তর প্রবাসী বাঙালী কলোনী চিত্তরঞ্জন পার্ক থেকে সেদিন যাচ্ছিলাম। উত্তরে। আমার আগেই বাসের বেশ খানিক জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল একদল মেয়ে। সকলের পরনেই প্যান্ট। গায়ে গেঞ্জী বা ট্যাপার্ড শার্ট। বব চুল। কারো এলোমেলো—কারো সযত্নে গার্ডারে বাঁধা। কাঁধে ঝোলা সবার। কারো চামড়ার, কারো জিনের। কারো কাঁধে এয়ার ব্যাগ। দিল্লিতে যা স্বাভাবিক—কোন রাজ্যের মানুষ সহজে চেনা দায়। এখানেও তাই। মেয়েগুলো ইংরেজীতে কথা বলছিল। আমি ওই ভিড় থেকে বাঙালী মুখ খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম।

বেশ কয়েকটা লেডিজ সীটে পুরুষেরা বসে আছে। সাধারণতঃ লেডিজ সীট ছেড়ে দেওয়ার রেওয়াজ এখানে অচল। কলকাতার মতো এখানে কোন মহিলাকে বসাবার তাগিদে সহযাত্রীরাও আকুল হয়ে ওঠেন না। অবশ্য ব্যতিক্রম সর্বত্রই আছে। এখানেও অমন ঘটে, তবে খুব কম।

কালকাজীর বাজার ঘুরতেই বাসটাতে ঈষৎ ভিড় দেখা দিল। সামনের গেট দিয়ে নামতে হয়। পিছনের দরজা শুধু যাত্রীদের ওঠার জন্য। তাই দলা পাকালো। মেয়েগুলোকে ঘিরে প্রয়োজন, অপ্রয়োজনে ভিড়টা সামনেই এবং তাদের গায়ে গায়ে প্রায় লেপটে।
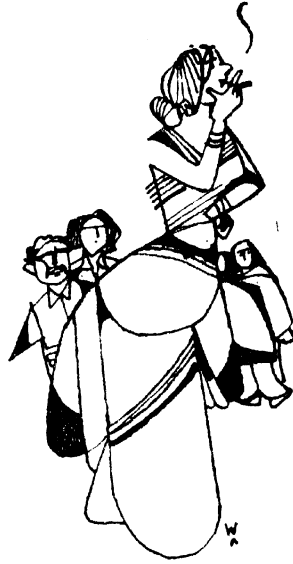
মেয়েদের কলধ্বনি তখন থেমে গেছে। সম্ভবত সবাই নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত। এবার পরিচয় মিলল আংশিক। অন্তত দুজন বাঙালী মেয়ে। একজনকে বাংলায় বলতে শুনলাম, 'বাসটা দুলছে ভীষণ। দাঁড়াতেই পারছি না।'

আরও পরে জানতে পারলাম ওই দলে একজন ছাড়া সবাই বাঙালী। কেননা ভিড়ের চাপে সুখের ভাষা মিলিয়ে গেছে। মুখের ভাষায় প্রায় সবাই নিজেদের নানা অসুবিধার কথা বলছে এখন।

আমার পাশে একটি মেয়ে। সামনের সিটে বসে থাকা ভদ্রলোকের মাথাটা আচ্ছাদন করে ঝুঁকে দাঁড়ালো। হাত জানলার শার্সিতে প্রসারিত। আমি সরে জায়গা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভিড়টা এ ধারেই জট পাকিয়েছে বেশি। মেয়েটির ব্যাগে কোন এমব্যাসির লাইব্রেরীর ঝকঝকে বাঁধাইয়ের বই। বোধহয় কারিগরীর। আমি 'এক... পড়তে পারছিলাম।

সিটের ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন একজন যুবক। পাজামা শার্ট পরনে বুক পকেটে কালো নোট বই, কলম মাথায় কোঁকড়ানো চুলে তেল আতিশয্য। বিনীতভাবে মেয়েটি বলল, আইয়ে আপ বইঠিয়ে....

এধারে সার বেঁধে দাঁড়ানো তিনটে মেয়েই হেসে উঠল। যেন এ হাসির জন্য ওরা প্রস্তুতই ছিল। আমার পাশের মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে 'যাক কী-করা-যায়' গোছের ভঙ্গীতে ব... পড়ল। ছেলেটি আমার পাশে দাঁড়ি... বাসের ঝাকানিতে দুলতে লাগল।

প্রান্তের মেয়েটি শুদ্ধ বাংলা ঠোঁট চিরে চিরে বলে ফেলল, 'হতভা... যুবক! বীরত্ব দেখাইতে গিয়া আসন হারাইল!' তিনটি মেয়েই একসা... খিলখিল করে হেসে উঠল। সিটের... মেয়েটি বুক পকেটে রাখা উইলস... প্যাকেটটা ঠিক করতে করতে আড়চো... ছেলেটির দিকে তাকাল। দেখলা... ছেলেটি জানলা দিয়ে কৈলাসের রাস্তা... ধারের পাথরের চাঁই গুনছে।

মুলচাঁদের মোড় পেরোতে ভিড়টা কমে এলো। আমিও বসলা... ওই আটটি মেয়ের দুজন বাদে ... সবাই-ও। আমার সামনের সি... সিগ্রেট-পকেটে সেই বাঙালী তন... এখন জানালার ধারে। হাওয়ায় চু... উড়ছে পত পত করে। ও নিয়ে মাথা... নেই।

এদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে... সর্বপ্রথম নভেম্বরে। রবিশংকরের সারারাতব্যাপী সেতার বাদনের অনুষ্ঠানে। একসঙ্গে অত বাঙালী যুবক-যুবতীর সমাবেশ তার আগে দেখিনি... প্রতি রাগের ফাঁকে ... কটু করে সময় মিলত। বাইরে এসে দেখতাম, সিগ্রেটের ধোঁয়ায় একাকার প্যাসেজটুকু। ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সিগ্রেট ফুঁকছে। আমি প্রাচীনপন্থী নই, আমার এতে চোখ টাটায়নি। মাঝে মধ্যে দুঃখ পেয়েছি এই যা। যেমন, একটি সাধারণ সু... শাড়ি পরনে, পায়ে প্লাস্টিকের চটি পরে, অতি সাধারণ মধ্যবিত্তের একটি মেয়েকে নির্বিবাদে চারমিনার ফুঁকতে দেখে দুঃখ হয়েছিল। রাগ হয়নি।

দেখলাম, আটটি মেয়ে এতক্ষণে আবার ইংরেজী কথা বলতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক কোন ছবি, পড়াশুনো, নিজেদের ব্যক্তিগত গল্প ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে কানে বাজছিল ওদের মধ্যে সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলতেও খুব উৎসাহী দেখাচ্ছিল... মুখের মধ্যে হাওয়া ভরে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তা দিয়ে শব্দ উচ্চারণ করছিল ওরা। অবাঙালী মেয়েটাও সমান গতিতে কথা বলছে। তবে দিল্লির বাঙালী

যুবক-যুবতীদের ইংরেজী উচ্চারণে নয়।

কিছুদিন আগে বাংলা সাহিত্যের পরলোকগত এক বিশিষ্ট লেখকের নাতনির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বব চুল। কপাল থেকে দু'চোখকে আঁধার-আঁধার করে ওই চুলেই তার কণ্ঠ ছোঁয়। ইংরেজী অনর্সের ছাত্রী। বাংলা উচ্চারণে কখনো মারকিন এ্যাকসেণ্ট, কখনো হিন্দির। গল্প করছিলাম এখনকার দিল্লির বাঙালী কিশোর-কিশোরীদের কথা। কলকাতার সঙ্গে তুলনামূলক প্রসঙ্গ আসেই। মেয়েটি মায়ের সাহচর্য নিয়ে রীতিমত লড়াই জুড়ল, বলল : ক্যালকাটা ডার্টি। একদম ভালো লাগে না। দু' দিনেই হাঁফিয়ে উঠি। না না না, শুধু শহর হবে কেন ? সেখানকার মেয়েগুলোকে দেখুন। নাইণ্টি পার্সেণ্ট ডারটি।....কে বললে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটায় ছিলাম ? আমি হাজরার কাছে ছিলাম। সেটা না। সর্বত্রই তাই। ঘেন্না লাগে।........

চক্রবাক

একা হয়ে যেতে হয়

ঘরে ঢুকেই বণ্টু আমার ওপর ফেটে পড়ল। প্রথমে ওর রাগের কারণটাই বুঝলাম না। তার পরে ওর কাঁধের ঝোলান ব্যাগে দুটোরটে কাপড়-জামা দেখে বুঝলাম বণ্টু এ'বাড়িতে দু'-একদিন থাকবে এবং সে এসেছে রাগ করে। এই প্রথম নয়—এর আগেও বণ্টু অনেকবার রাগ করে আমাদের বাড়িতে অর্থাৎ ওর মামাবাড়িতে এসেছে। রাগটা বেশীর ভাগ সময়েই ওর মায়ের অর্থাৎ আমার দিদির ওপর। বণ্টু আমার দিদির একটাই ছেলে। মাধ্যমিক পাশ করে এবারই সে কলেজে ভর্তি হয়েছে। এবং সে একটু স্বাধীন-চেতা, রাগী-উগ্র স্বভাবের। তার নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাটা সে অত্যন্ত অপছন্দ করে। অথচ আমার দিদি মনে করে যে, সে এখনও আগের মতই ছোট আছে। মানুষ যে একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠেছে, দিদির স্থান যে সেখানে নেই বললেই চলে—এটা দিদির ঠিক পছন্দ নয়। ফলে, প্রায়ই রাগারাগি। এবং বণ্টুর মামাবাড়িতে এসে আশ্রয় নেওয়া। আমরা কখনও বণ্টুকে ধমকে কখনও দিদিকে বুঝিয়ে ব্যাপারটা মেটাতে চেষ্টা করি।

কিন্তু এ'সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে। দিদির বিয়ে হয়েছে কুড়ি বছর বয়েসে—বি এ পাশ করেই। তার কিছু-দিনের মধ্যেই বণ্টু হয়েছে। দিদি তার সমস্ত শক্তি, ভালোবাসা, শ্রম দিয়ে

বণ্টুকে বড় করে তুলেছে। দিদির জীবনে বণ্টু ছাড়া আর কিছুই তেমন জরুরী নয়। নিজের চারিদিকে সংসারের যে পরিমণ্ডল ও সৃষ্টি করেছে বণ্টুই তার কেন্দ্রবিন্দু। বণ্টুই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বণ্টু বড় হয়েছে, স্কুলে, কলেজে তার অন্য জগৎ গড়ে উঠেছে; সেখানে আর পাঁচজনের মত ও-ও স্বনামে প্রতিষ্ঠিত। আগে যেখানে মা ছাড়া বণ্টুর জগৎ ছিল না, এখন সেখানে মায়ের স্থান তার জগতে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। ফলে দিদির জীবন অনেকটা উদ্দেশ্যহীন হয়ে যাচ্ছে। একা হয়ে যাচ্ছে। জামাইবাবু তার বাইরের জগত নিয়ে ব্যস্ত। দিদির গার্হস্থ-জীবন তাই নিঃসঙ্গ। এতদিন পরে, নতুন করে বাইরের জীবন গড়ে নেওয়াও আর তার পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধু যে ছেলেরা বড় হয়ে গেলে, মায়েদের এ সমস্যা তা নয়। মেয়েরা বড় হয়ে গেলেও, মায়েদের এ-সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মেয়ে তার নিজস্ব জগত গড়ে নিলে পর সম্পূর্ণভাবে আর মায়ের সঙ্গী থাকে না। তবে একথা ঠিক যতদিন না মেয়েদের বিয়ে হয় ততদিন মেয়েরা অনেক বেশী মায়েদের বন্ধু থাকে। সংসারের সুখ-দুঃখের গল্প, মনের অনেক কথা মায়েরা একমাত্র মেয়ে-দের কাছেই উন্মুক্ত করতে পারেন। মা-মেয়ের যোগাযোগটা অনেক বেশী।

আমাদের বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে, অধিকাংশ মা-ই চাকরি করেন না। ছেলেমেয়েরাই তাঁদের জীবনের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু যার চারপাশে আবর্তিত হয় তাদের প্রাত্যহিক জীবন। ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে গেলে, তারা তাই একা হয়ে যান। একান্নবর্তী পরিবারের মায়েদের এই নিঃসঙ্গতা অনেক কম। পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তিমানুষের প্রাধান্য অনেক বেশী। আমাদেরও অনেক উচ্চ-বিত্ত পরিবারে, বাবা-মায়ের সঙ্গে ছেলে-মেয়ের সম্পর্কটা অনেকটা ছাড়াছাড়া। সেখানে ছেলেবেলা থেকেই ছেলে-মেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনে বাবা-মায়ের ভূমিকা খুব বেশী থাকে না। ছেলে-মেয়েদের আর বাবা-মায়ের জগতের একটা অলিখিত দূরত্ব থেকেই যায় প্রথম থেকে। ফলে বিশেষ একটা বয়েসে এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু মধ্যবিত্ত মায়েরা নিজের হাতে ছেলেমেয়ের সব কাজ করেন—এমন কি, কিছু দিন পর্যন্ত পড়ানোর দায়িত্বও তাঁদের। ফলে, ছেলেমেয়ের সঙ্গে মায়ের সম্পর্কটা অনেক বেশী জড়ানো। তাই ছেলেমেয়ের নিজস্ব জগৎ এবং ব্যক্তি-সত্তা গড়ে ওঠার সময় তাদের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা স্বন্দ্ব, পরে নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে হয়।

বোধন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাণের শুরু কোথায় ?

পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব কিভাবে ? এ-প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরে ভেবে আসছেন ও নানা জবাবও দিয়েছেন। মোটামুটি ধরে নেওয়া হয় প্রাণের উদ্ভব আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে, আদিম সমুদ্রের জলে। উপাদানগুলো এই পৃথিবীতেই ছিল, পরিবেশ অনু-কূল হতেই প্রাণের রূপধারণ করেছে।

জৈব একটি ব্যবস্থা বাইরের মহাশূন্য থেকে এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছিল এমন কথা মনে করার কোনো কারণ এত-কাল ঘটেনি। কিন্তু সম্প্রতিকালে মহাশূন্য থেকে আগত উল্কা নিয়ে যেসব পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালানো হয়েছে এবং মহাশূন্যের ধূলো ও গ্যাসের মেঘ যা থেকে তারা গড়ে ওঠে সম্পর্কে যতো তথ্য জানা গিয়েছে তা থেকে মনে হয় প্রাথমিক জৈব ব্যবস্থার উদ্ভব এই মহাশূন্যেই, পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে উল্কার মাধ্যমে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক চন্দ্রবিক্রম সিংহী (কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ফলিত গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক)। সংক্ষেপিত আকারে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করছি।

পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব কিভাবে? এই মৌলিক প্রশ্নের জবাব দিতে হলে প্রথমেই ব্যাখ্যা করা দরকার জীবদেহের আয়োজনটি কিভাবে তৈরি হয়। আয়োজন বলতে প্রোটিন ও নিউক্লিইক অ্যাসিড। আবার এই প্রোটিন ও নিউক্লিইক অ্যাসিড তৈরি হয় অপেক্ষাকৃত সরল পদার্থ যুক্ত হবার ফলে—যথা, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও নিউক্লিওটাইড। এগুলো সবই জৈব পদার্থ। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এই জৈব পদার্থই বা তৈরি হয় কিভাবে? বিজ্ঞানীরা বলেন, জৈব পদার্থ তৈরি হয় অজৈব অণুর মিশ্রণ থেকে। অজৈব অণুর মিশ্রণ ঘটে আণবিক হাইড্রোজেনে (এইচ-টু) জলে (এইচ-টু ও), মিথেনে (সি এইচ-ফোর) ও অ্যামোনিয়ায় (এন এইচ-থ্রি)। লক্ষ্য করার বিষয়, এই অজৈব পদার্থগুলোতে সংযুক্ত হয়েছে চারটি মৌলিক পদার্থ—হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। আদিম সেই পৃথিবীতে যে তাপমাত্রা, ঘনত্ব ও চাপের অবস্থা বজায় ছিল তাতে এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।

অজৈব পদার্থের এই অণুগুলো গড়নের দিক থেকে খুবই সরল। কিন্তু এই সরল অণুগুলো থেকে যদি অ্যামাইনো অ্যাসিড ও নিউক্লিওটাইড পেতে হয় তাহলে এমন প্রচণ্ড একটা শক্তির উৎস থাকা প্রয়োজন যা রাসায়নিক বন্ধনকে চূর্ণ করতে পারে। পৃথিবীর আদিম সেই বায়ুমণ্ডলে অবশ্যই মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক ঘটত। ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, অজৈব অণুর (হাইড্রোজেন, জল, মিথেন ও অ্যামোনিয়া) যথাযথ একটি মিশ্রণে যদি বিদ্যুতের প্রবাহ ও অতিবেগুনী বিকিরণ থাকে তাহলে প্রচুর পরিমাণে অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় আরো দেখা গিয়েছে, অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংযোগ এমনই হতে পারে যে প্রোটিন-সদৃশ কাঠামো পাওয়া যায়, নিউক্লিওটাইডের সংযোগ এমন হতে পারে যে নিউক্লিইক অ্যাসিড সদৃশ অণু পাওয়া যায়।

হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন সহযোগে তৈরী অজৈব অণুর একটি প্রাথমিক মিশ্রণ থেকে শুরু করা কেন দরকার তার কারণ স্পষ্ট নয়। এমনও হতে পারে, ভূত্বকের বেশির ভাগটা তৈরি হয়েছিল ধূমকেতু ও উল্কার ধূলো থেকে। এমনকি বর্তমান কালেও প্রতিদিন প্রায় ১০০ টন উল্কা-কণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। আগেকার কালে হয়তো আরো বেশি পরিমাণেই করত। এই সমস্ত কণার মধ্যে প্রধানত রয়েছে নানা ধরনের লোহ ও সিলিকেট ও তারই মধ্যে আটকে পড়া কিছু কিছু উদ্বায়ী পদার্থ। বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে এই উদ্বায়ী পদার্থের মধ্যে থাকতে পারে নানা জটিল জৈব পদার্থ, নিষ্ক্রিয় গ্যাস ও তৎসহ জল, মিথেন, অ্যামোনিয়া।

এক শ্রেণীর উল্কা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাকে বলা হয় কার্বন-সমৃদ্ধ কণিকা-উল্কা (কন্ড্রাইট)। যতো রকমের উল্কা পাওয়া যায় তার মধ্যে অর্ধেকই এই শ্রেণীর। এটিকে মনে করা হয় সৌরমণ্ডলে প্রাচীনতম কঠিন বস্তু। এতে আছে উচ্চমাত্রার কার্বন ও তৎসহ অ্যামাইনো অ্যাসিড, পলিফর্মালডিহাইড ও অন্যান্য জৈব পদার্থ।

কৌতূহলের বিষয়, এই সমস্ত উল্কাকণায় কুড়িটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই কণাগুলোকে নানাভাবে পরীক্ষা করে এমন ধারণা করার লক্ষণ পেয়েছেন যে তারপর বিস্ফোরণ (নোভা ও সুপারনোভা) থেকে নিঃসৃত বস্তুতে এই কণাগুলোর উদ্ভব। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ধূলো ও গ্যাসের যে ঘন মেঘ থেকে তারা গড়ে ওঠে তারই মধ্যে এই কণাগুলোও থাকে। এমনি একটি মেঘ দেখতে পাওয়া যায় কালপুরুষ তারামণ্ডলে। এই মেঘের ভর সূর্যের ভরের চেয়ে ১০,০০০ থেকে দশ লক্ষ গুণ বেশি হওয়া সম্ভব। গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় তল বরাবর এই মেঘগুলো প্রায় সমানুভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

তারা তৈরি হবার সময়ে এই মেঘে সংকোচন শুরু হয়। এমনি অবস্থায় অজৈব ধূলোর কণায় জটিল জৈব পদার্থের আবরণ পড়ে। তারপরে যখন তারায় দহন শুরু হয় তখনো এই কণাগুলো টিকে থাকে ও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তারা গড়ে ওঠার আগের অবস্থায় যে ধূলো ও গ্যাসের মেঘ থাকে তাই হচ্ছে প্রাণের লালনাগার। শুরুতে অজৈব ধূলোর কণা—সিলিকেট, গ্রাফাইট, লৌহ কণিকা ও অজৈব গ্যাস। তারপরে মেঘের সংকোচন শুরু হলেই তৈরি হয় নানা জটিল জৈব অণু। অণুগুলো অজৈব কণায় স্থিতিলাভ করে। সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে যখন গ্যাসের ঘনত্ব আরো বাড়ে তখন কণাগুলো পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায়। কণায় কণায় জোড় লাগে, তারই মধ্যে থাকে জৈব পদার্থ। এ থেকেই বিবর্তন চলতে চলতে গড়ে ওঠে জৈবকোষ সদৃশ কাঠামো।

পৃথিবীতে আগত কণা-উল্কায় এমনি জৈব কোষসদৃশ কাঠামো পাওয়া গিয়েছে।

অতঃপর পৃথিবীর অনুকূল জল হাওয়ায় এই জৈব অংকুর থেকেই প্রাণের শুরু।

অমল দাশগুপ্ত

গঙ্গা থেকে গোদাবরী

আমাদের গঙ্গা আছে। গঙ্গার ওপর আছে বিখ্যাত হাওড়া পুল এবং ইদানীং কালে ফারাককায় বিরাট ব্যারেজ ও পুল। তেমনি অন্ধ্র প্রদেশে রয়েছে গোদাবরী নদী। গোদাবরীর ওপর নতুন [illegible] পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ পুল। প্রযুক্তি বিদ্যার বিস্ময় এই পুলটি [illegible] হেঁটে পার হতে আমার সময় লেগেছিল পুরো এক ঘণ্টা। আমাদের গঙ্গার ভরা যৌবন। আর গোদাবরীর [illegible] সুস্পষ্ট লক্ষ্য করেছি। এই একমাত্র সান্ত্বনা।

অন্ধ্রের মহকুমা শহর রাজমহেন্দ্রীর [illegible] ওপর থেকে পুলটি [illegible] উঠে ছিলাম পুলের কাছাকাছি শহরের এক হোটেলে। হোটেলের তিনতলায় [illegible] ঘরের সামনে খানিকটা ফাঁকা [illegible] পায়চারি করে বুক ভরে [illegible] নেওয়া যায়। পাশের হোটেলে [illegible] ব্যবস্থা রয়েছে। দল বেঁধে বরসহ [illegible] এবং কন্যাসহ পাত্রীপক্ষ আসেন। [illegible] হয়। খানাপিনা সেরে সকলেই [illegible] নেন। আশপাশের বাড়ি ছাদ [illegible] ছুঁই নারকেল গাছ। সুপারি [illegible] পড়ে। প্রাকৃতিক পরিবেশ [illegible] দেয়। [illegible] লোকের [illegible] যেন দাঁড়িয়ে আছি। [illegible] বিকেলে দলে দলে [illegible] সিনেমা [illegible] কিছুটা বেশি। [illegible] হাজার বাসিন্দার শহর [illegible] সিনেমা হলের সংখ্যা ২৮। [illegible] মধ্যে গোটা কয়েক [illegible] একটা [illegible] শেষে সিনেমা দেখে রাত একটায় হোটেলে ফিরেছিলাম। বেশ ভিড়। দেখার মতো ব্যাপার হল মহিলাদের [illegible] ফুল-সাজ। বিবাহিতা অন্ধ্র মহিলারা বাঙালী মহিলাদের মতই শাড়ি পরেন। চুল বাঁধার ছাঁদও একই রকম। কুমারী মেয়ে চেনা যায় [illegible] অথবা [illegible] মাথার ওপর ওড়না গোছের চাদর কোমরে প্যাঁচে কাঁধের ওপর তুলে দেওয়া দেখে বেণী দুলিয়ে তার গোড়ায় কায়দা করে ফুলের মালা ঝুলিয়ে চলা মেয়েদের দেখতে ভালই লাগে।

ফুল অন্ধ্র রমণীদের খুব প্রিয়। ওড়িশা পার হবার পর থেকে রেল স্টেশনে ঠেলা গাড়িতে ফুল ফেরি করা হয়। চাঁপা আর বেলই বেশি। বাস স্টপেজেও ফুল আর বেলের মালার পসরা হাতে নিয়ে ডাক ছাড়েন বিক্রেতা। বিকিকিনি হয় বেশ। ক্রেতারা অধিকাংশই মহিলা। রাস্তার ঝাড়ুদারণীর খোঁপাতেও সাত সকালে বেল ফুলের মালা জড়ান দেখতে পাওয়া যায়। মহিলারা রাতেও ফুল সাজে শুয়ে থাকেন কিনা খোঁজ নিতে পারিনি।

মেয়েদের মনের খোঁজ নেবার মতো দুর্বুদ্ধি আমি নই। তাছাড়া ভাষার বাধাই বড় বাধা। তেলেগু যাদু। তেলেগু জানি না। অবাক মানতে হয় তখন যখন দেখি সিনেমা হলে হিন্দী ছবি চলছে, রেস্তোরায় চলছে হিন্দী গান। অথচ কেউ হিন্দীতে রা-টি কাড়ছে না। দুটো হলে চিতচোর এবং আদালত চলতে দেখেছি রাজমুন্দ্রিতে।

কিন্তু দেখিনি কোনও বাঙালী। বোস মেডিক্যাল স্টোরস দেখে পুলকিত হয়েছিলাম। বোস মশাইয়ের সঙ্গে মাতৃভাষায় মন খুলে কথা বলার বাসনা নিয়ে গিয়ে ফিরে আসতে হল হতাশ হয়ে। অন্ধ্রেও নাকি অনেক সুভাষ বোস আছেন। এবং সেই বোসেরা সকলেই তেলেগুভাষী অন্ধ্র সন্তান। বাংলায় কথা বলতে না পারলেও সুভাষ বোসের নাম শুনে মানসিক তৃপ্তি নিয়ে ফিরে এসেছিলাম।

তৃপ্তি পাইনি রামকৃষ্ণ দেবের নামের সঙ্গে জড়ান মদের দোকান 'রামকৃষ্ণ ওয়াইন শপ দেখে। সেখানেও গিয়েছিলাম, তবে রামকৃষ্ণ দেবের নাম নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে নয়। কলকাতার নয় টাকার বিয়ার সে দোকানে পেয়েছিলাম মাত্র ছয় টাকায়। দাম সস্তা। লোকে খায় খুব। রাস্তাঘাটে হামেশাই সোডা খেতে দেখেছি ওখানকার সাধারণ বাসিন্দাদের। অসাধারণ যাঁরা, তাঁরা খান বিয়ার। সেখানে বার আর হোটেলের ছড়াছড়ি। হুইস্কি, ব্রান্ডি, রাম ইত্যাদি পানীয়ের দাম খুবই কম।

খাওয়ার খরচও কম। নিরামিশাষী
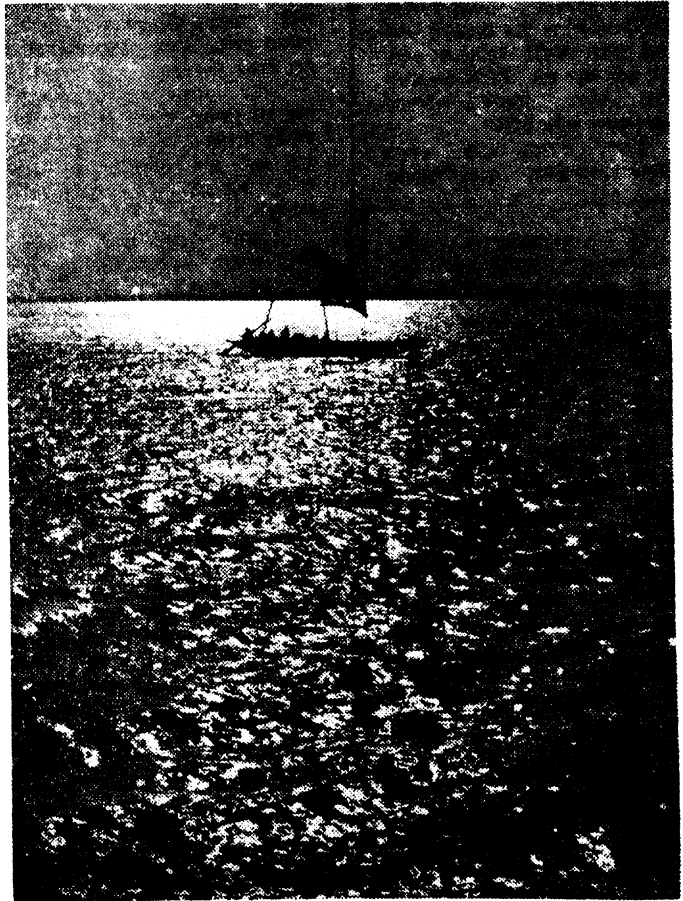
মানুষদের পক্ষে এ্যালকোহলের প্রোটিন সহজেই শরীর গ্রহণ করতে পারে বলেই কী মদের দোকানের এত ছড়াছড়ি? দু টাকা থেকে চার টাকায় ছোট-বড় হোটেলে ভরপেট ভাত খাওয়া যায়। এয়ার-কন্ডিশনড হোটেলে চার টাকায় ভাত, তরকারি, সম্ভর, রসম, চাটনি, পাঁপড়, ঘোল, দই এবং কলা খেয়েছিলাম মনে আছে।

মনে থাকার আরো কারণ ছিল। মহকুমা শহর কেন, কলকাতা বাদে পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনো জেলা শহরে এমন সাজান-গোছান হোটেল আছে বলে জানা নেই। দুধের মতো শাদা সরু চালের ভাত দেখলেই মন ভরে। ভাতের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় ঘি। রান্নায় টক আর ঝালের দৌরাত্ম্য কিছুটা বেশি তবু তৃপ্তি সহকারে খাওয়া যায়। এবং খাবার পরে বখশিসের প্রশ্ন নেই। টিকিট কেটে খাবার ঘরে ঢুকে পড়লেই হল। দিনে-রাতে মেনু থাকে প্রায় একই রকমের। সকালে বিকালে ইডলি-ধোসা-কফি। এক টাকাতেই ভাল খাওয়া চলে। স্থানীয় বাসিন্দারা রাতে প্রায়ই ভাত খান না। ইডলি-ধোসাতেই চলে। কফি সস্তা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জুড়ি নেই।

যদিও খোঁড়া খুড়ি চলছে এন্তার। রাস্তা চওড়া হচ্ছে। দোকান পসার ভাঙ্গা পড়ছে। সি এম ডি এ নেই। তবু কাজ চলছে দ্রুত তালে। অত খোড়াখুড়ির মধ্যেও পরিষ্কার থাকাটাই বিশেষত্ব।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যে শুধু শহরেই সীমাবদ্ধ তা নয়। গাঁয়েও তাই। সকাল বিকেল বাড়ির সামনে ঝাট দিয়ে আলপনা দেওয়ার রেওয়াজ ওদেশে সর্বত্রই। আলপনাতে রয়েছে শিল্পীর রুচি বোধ। আর রয়েছে দরজার সামনে বেশ কায়দা করে ঝোলান নারকেল।

অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলার আর্থিক অবস্থার উন্নতির চাবি-কাঠি এই নারকেল। নারকেল চাষ যে সাজিয়ে-গুজিয়ে করা হয় অন্ধ্রে না এলে তা বুঝতাম না। লাইন করে সোজা বসান হয় নারকেল গাছ। সেচ, চাষ ও সার ইত্যাদি প্রয়োগ করার ফলে নারকেল গাছে ফলন হয় অপর্যাপ্ত। একরে আয় হয় ৩।৪ হাজার টাকা। দশ একর জমির মালিকের বাড়িতে এয়ার কুলার, ফ্রিজ, স্কুটার ইত্যাদি আধুনিক জীবনযাত্রার সবই রয়েছে। বাড়ির দরজার কাঠে পালিশ দেখলে মাথা ঘোরে। ঐশ্বর্য যেন উপচে পড়ছে।

বাসে যাবার সময় মনে হয়েছে যেন ২৪ পরগণা, হুগলি বা বর্ধমানের রাস্তায় চলেছি। পরিচিত ফসলে ভরা মাঠ। ধান, আখ, কলা, পেয়ারা, আম আরো কত কী। মাটি তো নয় যেন সোনা।

সোনার বাংলায় গঙ্গার পাড়ের ঐশ্বর্য-লক্ষ্মী যেন স্থায়ী আসন পেতেছেন গোদাবরী নদীর পাড় বরাবর। গোদাবরী নদীর জলে সবুজের সমারোহ সেই সাক্ষ্যই বহন করছে।

সুভাষ রায়চৌধুরী

আবার পড়লাম

'তেলাকুচো ফুলের দুলুনিতে অনন্তের সে সুর কানে আসে'।

এ রকম একটা লাইন পড়ার পর মনে হয় না বনবাদার খুঁজে খুজে তেলাকুচো ফুল দেখবার জন্যে যে কোনো রিস্ক নেওয়া যায়? তেলাকুচো ফুল যদি দেখে থাকেন, এক্ষুণি দেখা করুন আমার সঙ্গে। আমি দেখিনি।

আরো কত কি যে দেখিনি: কাকজঙ্ঘা, কুঁচকাঁটা নাটা আর বন-মরিচের জঙ্গল। বনোবুড়ো, গামার, তিক্তিরাজ গাছ। ওকড়াফলের বন। রাধালতা। নাক জোয়ালে ফুল। যা তোলবার লোভে গরীব কবিরাজ রাম-কানাই অতি কষ্টে কাঁটার জঙ্গলে ঢুকে যায়। প্রাতঃস্নানের পর গাঁয়ের কুমোরের তৈরি রাধাকৃষ্ণের একটা পুতুলের পুজো হবে সেই ফুলে।

সম্পূর্ণ নিজের, একদম একলার একটা দুনিয়া ছিল বিভূতিভূষণের। শুধু গাছপালাপ্রকৃতির দিকে নয়, মানুষপ্রকৃতির দিকেও অন্য রকম মমতা নিয়ে তাকাতেন তিনি। খুব দুর্লভ এক আশ্চর্য দরদ দিয়ে ইছামতীর তীরের কয়েকটি মানুষের ছবি এঁকে রেখেছেন এখানে। ১২৭০ সালের বন্যার জল নেবে গেছে, নীলকুঠির সাহেবরা অত্যাচারে অভ্যস্ত হচ্ছে, 'আউশচালের পালি ছেল দুপয়সা'।

দূরের হাটে পান-সুপুরি বেচতো নালু পাল। সে কেমন করে বিরাট-মুদিখানা দিল, সম্পন্ন গেরস্থ হয়ে গেল। কেমন করে কুলনী ব্রাহ্মণ ভবানী, সন্ন্যাসী হতে গিয়ে তিলু-নিলু-বিলু এই তিন বৌ নিয়ে ঘোর সংসারী হয়ে গেলেন, জড়িয়ে পড়লেন শান্ত অলস উত্তেজনাহীন পরচর্চাময় গ্রামজীবনে। শুধু ভালো লাগত খেপী সন্নেসিনী আর রামকানাই কবি-রাজের সঙ্গে কথা বলতে। আর দেওয়ান রাজারাম—সারারাত রসিক সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের পর মানুষ খুন করে লাশ গায়েব করে ভোরের আগে বাড়ি ফিরলে বৌ-এর প্রশ্নের উত্তরে শান্ত ভঙ্গিতে বললেন—হিসেবনিকেশের কাজ চলছে কিনা। খাতাপত্তরের ব্যাপার, এ কি সহজে মেটে? পরে তাকে গাঁয়ের লোক পিটিয়ে মেরে ফেললে একদিন।

অথচ চুনের গুদামে তিনদিন পড়ে থেকেও, শ্যামচাঁদ খেয়েও সাহেবের পক্ষে মিথ্যে সাক্ষী দিতে রাজী হয়নি, রামকানাই কবিরাজ। খুব গরীব রাম-কানাই। ছাত্র নিমাই এলে জল-ভাতে সর্ষেবাটা দিয়ে আর কাঁচা লংকা দিয়ে ভাত খেয়ে সারাদিন পাঠচর্চা চলল।

আর বৃদ্ধ নিঃসংগ প্রসন্ন আমীন, গয়া মেম কেন যে তাকে সুনজরে দেখে না। সেই গয়া মেম যখন মাছি তাড়াবার জন্যে পিঠে আলতো একটা চাপড় মারলো প্রসন্নর, আমীন অনেকদিন ধরে ভাবলো, মাছি কি তখন সত্যিই বসেছিল পিঠে! অনেকদিন পরে রাস্তা ভুল করে প্রসন্ন আমীন এসে পড়েছিল নীলকুঠির কবরখানার কাছে, সেখানে, শিয়াটন সাহেবের কবরের কাছে জ্যোৎস্নায় একা গয়া মেমের সঙ্গে দেখা, দুই ক্ষুধার্ত নিঃস্ব আতুর পরস্পরকে দুঃখ জানানোর মত তাদের আলাপ—পড়তে পড়তে কোথায় যেন পৌঁছে যাই আমি। বিভূতিভূষণ যে জায়গা থেকে লিখতেন তার খুব কাছাকাছি চলে যাই হয়তো।

সোমক দাশ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

১৭ বর্ষ ৭ সংখ্যা
৯ আষাঢ়, ১৩৮৪
24 JUNE, 1977

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
[illegible]দের কথা
লিখেছেন অজিত চক্রবর্তী
বুদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্প
[illegible] রায়ের ছবি

এ সংখ্যায় প্রচ্ছদ এঁকেছেন নিতাই ঘোষ
[illegible]ভেতরের ছবি এঁকেছেন সমীর সরকার,
[illegible]বোধ দাশগুপ্ত এবং গৌতম রায়

পুর সভার দূরদৃষ্টি

ভারতে প্রাচীন শহর অনেক আছে—যেমন কাশী বা দিল্লি। কলকাতা সে তুলনায় নতুনই বলতে হবে; তিনশো বছরও পূর্ণ হয়নি এখনো। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার মধ্যে জরার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। অন্তত কয়েকটি এলাকার বাড়িগুলোর দিকে তাকালে সেই কথাই মনে হয়।

সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার জনৈক কর্মকর্তার মারফৎ জানা গেছে, এই শহরে হাজার খানেক বাড়ির এমন অবস্থা ঘটেছে যে অবিলম্বে সেগুলোকে ভেঙে না ফেললে আগামী বর্ষাকালেই সেগুলো দেহরক্ষা করতে পারে এবং অধিবাসীদেরও দেহান্ত ঘটাতে পারে।

এমনিতে অতিশয়োক্তি মনে হলেও আশংকাটা যে সম্ভাবনার দিক দিয়ে শতকরা একশ ভাগ সত্যি তাতে সন্দেহ নেই। শুধু কলকাতার উত্তর অঞ্চলের প্রাচীন পল্লীগুলোতেই নয়, শহরের অন্য অংশে, এমনকি পুরসভা এবং সরকারী মহাকরণের নাকের ডগাতেও মুমূর্ষু ইমারত সংখ্যাতীত। পৃথিবীর প্রবল মহাকর্ষ শক্তি উপেক্ষা করে কী করে এই বাড়িগুলো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে এক রহস্য বটে।

অনেক আগেই ভেঙে ফেলা উচিত ছিল বাড়িগুলোকে। ভাঙা হত, যদি না পুরনো আইনের মধ্যে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকত। কিন্তু কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট সংশোধিত হওয়ার পর পুরসভার হাতে এমন ক্ষমতা এসেছে যাতে বিল্ডিং বিভাগ যদি বিপজ্জনক মনে করে তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আর কঠিন হবে না এখন।

এছাড়া নতুন নতুন বহুতলবিশিষ্ট ইমারত এবং অনুমোদনবিহীন বাড়িও কলকাতার আর দুটি সমস্যা। গত সপ্তাহেই অননুমোদিত বাড়ি ভাঙা হয়েছে পঞ্চাশটি, তার মধ্যে ফ্যাক্টরির ছাউনিও আছে। ওদের প্রধান অপরাধ ছিল আগুন লাগার বিষয়ে নিরাপত্তার অভাব। এ ব্যাপারে আপত্তি ছিল ফায়ার বিগেডের তরফ থেকেই। পুলিশও সক্রিয় ছিল সেই সঙ্গে।

কলকাতার বহুতলবিশিষ্ট বাড়িগুলোর বিষয়েও প্রধান অভিযোগ অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে সতর্কতার অভাব। এর ফলে ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটে গেছে অনেকগুলো। আরো যাতে না ঘটে, সেইটেই এখন প্রধান দুশ্চিন্তা।

সমস্ত সমস্যাগুলোকে তাই একসঙ্গে বিচার করে দেখার জন্যে কলকাতা পুরসভা একটি সেল তৈরি করবেন বলে স্থির করেছেন। তাতে থাকবেন—পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ, কলকাতা ফায়ার বিগেড এবং পুলিশের প্রতিনিধি। এই শহরের পুরনো বাড়ি ও নতুন বাড়ির বাড়াবাড়ির ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত হবে তাঁদেরই।

হোক, তাতে ক্ষতি নেই। শুধু একটি কথা—যেখানেই যাঁরা নিরাশ্রয় হবেন তাঁদের আশ্রয়ের কথাও যেন চিন্তা করা হয় সেই সঙ্গে।

পাত্ত নাই পরিচয়

সম্প্রতি অমৃতে প্রকাশিত 'ভালো ভালো গান হারিয়ে যাচ্ছে' শীর্ষক লেখাটি সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সমালোচক শ্রীকৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত একটি গানের আসরের সমালোচনা প্রসঙ্গে অবতরণিকায় এমন কয়েকটি কথা লিখেছেন যা অপ্রাসঙ্গিক এবং সৎ-সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকর। রবীন্দ্র-সদনে রবীন্দ্র-অনুষ্ঠান কেন প্রাধান্য পায় না—এ ক্ষোভ সকল রবীন্দ্র অনুষ্ঠান-কারীর। রবীন্দ্রসদন প্রতিষ্ঠার আদর্শও তাই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানের প্রাবল্য কি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এক দুর্ঘটনা? 'অমৃত' পত্রিকার নীতি যদি রবীন্দ্র বিরোধী না হয় তবে এই মনোভাবে সম্পাদকের হস্তক্ষেপ প্রত্যাশিত ছিল।

রবীন্দ্রসঙ্গীত আজও এমন কিছু লাভজনক পণ্য নয়। 'সুর-ঝর্ণা' যে এক বিখ্যাত সঙ্গীত অনুষ্ঠানের ব্যবসায়ী সংস্থা তা-ও মনে হয় না। বর্তমানকালে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি শ্রোতাদের আগ্রহের জন্য অহেতুক উষ্মা কোন 'রাগী' সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর পত্রিকায় মানালেও অমৃতের মত সাপ্তাহিকে মানায় কী?

এবার আমি গানের অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে আসছি। কোন বিশেষ গায়কের বিশেষ দিনের গান সমালোচকের ভাল নাও লাগতে পারে। কিন্তু তার জন্য শিল্পীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে কিছু এলোমেলো মন্তব্য করা কেন? কটি লয়, ছন্দ, তাল সেদিনের কোন গানে সমালোচক খুঁজে পেয়েছিলেন জানি না। সম্ভবত তার সদুত্তর তিনিই দিতে পারবেন। অনর্থক মোটা নেশালু বা ভোঁতা স্বর কাকে বলে সুর না পেয়ে স্বর দিয়ে গাওয়া জিনিসটা কেমন তা আমার জানা নেই। আমীর খানের মত কানাড়ার গন্ধার যদি কেউ ব্যবহার করতে পারেন সেটা দোষনীয় কোন্ অপরাধে? এবিষয়ে সমালোচক ভদ্রলোক একটু আলোকপাত করলে ভালো হয়।

আমি যতদূর জানি শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের একনিষ্ঠ শিল্পী। সঙ্গীতই তাঁর জীবনের ধ্যান। আশৈশব তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাণসম্পদ খুঁজে বেড়িয়েছেন। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের তালিম নেওয়া তৈরী গলা মূলধন করে অশোকতরু-বাবু রবীন্দ্রসঙ্গীতের রাগভিত্তিক গান, দুরূহ তাল লয়ের গান অসাধারণ কৃতিত্বে শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন। শিল্পীর যে অতিরিক্ত উপলব্ধি থাকলে গানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় অশোকতরুবাবুর গানে তা সব সময়েই পাওয়া যায়। মেগাফোন রেকর্ডে করা প্রথম রেকর্ড 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' তো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এক সময়।। আজও অশোকতরুবাবুর প্রতিটি রেকর্ডে আমি সেই অতিরিক্ত প্রাপ্ত পেয়ে থাকি। 'আঁধার রাতে একলা পাগল' তিনিই গাইতে পারেন। এতসব কথা বলতে হল কৃষ্ণলালবাবুর এলোমেলো সমালোচনা প্রসঙ্গে।

কুশল পাত্র
কলকাতা-২৬।

১৫০০

আপনার ১৫০০ পড়লাম। সততার জন্য অভিনন্দন নিন। যদিও নাটকটি আমি দেখিনি তবে যারা দেখেছে এমন অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা প্রশংসা করেছে। কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে আয়োজিত এক সেমিনারে আমি অসীম চক্রবর্তীর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম আজকাল অন্তত এপার বাংলায় অসীম চক্রবর্তী এবং বারবধূ শব্দ দুটি সমার্থক হয়ে যাচছে ক্রমশই। বস্তুত বারবধূ বলতে আমরা অসীম চক্রবর্তীকে বোঝাই এবং অসীমকে বিশেষিত করতে হলে বারবধূর উল্লেখ করি। অর্থাৎ আমি বারবধূ হয়ে যাচ্ছেন! এ সম্পর্কে তিনি কি ভাবছেন। তখন তিনি স্মার্ট রাজনীতিকদের মত উত্তর দেন 'এ সম্পর্কে আমি গভীর চিন্তা করছি। সম্রাট বলে একটা নাটক শিগগীরই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শন শুরু হবে। সেই সেমিনারে বুদ্ধপ্রসাদ সেনগুপ্তকে আমি তাদের নাটকগুলির অসাফল্যের জন্য মূলত অনুবাদ প্রবণতাকে দায়ী করেছিলাম। এটা সম্ভবত তার মনে আছে। অবশ্যই সফলতা বলতে আমি উচ্চ আদর্শগত সফলতার কথা বলছি না— অর্থকরী সফলতাই আমার বক্তব্য। সম্ভবত দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কেউ আর্থিক সাফল্যের স্বাদ পাননি। এবং এটা অনস্বীকার্য সুস্থ মনন ও তার বিকাশ এবং প্রচারের জন্য টাকার যথেষ্ট প্রয়োজন।

এ সম্পর্কে তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা এবং মতামত অমৃত প্রকাশ করুক। আমাদের জীবনে পাখি সংখ্যার প্রচ্ছদ অপূর্ব হয়েছে।

আর পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা আরো দ্রুত বাড়াবার জন্য আপনারা এ সপ্তাহ কেমন যাবে প্রকাশ করতে পারেন। যেহেতু অমৃত প্রায় এক সপ্তাহ আগে প্রকাশিত হয় অতএব আপনরা লাভবান হবেন আমার বিশ্বাস। দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, বেলগাছিয়া রোড, কলিঃ-৩৭।

(২)

আমি বম্বেতে থাকি। বাংলা খবরের কাগজ বা পত্রিকা কদাচিৎ দেখতে পাই সেজন্য, ওদিকে কি হচছে বিশেষ জানতে পারি না। হঠাৎ ২২ এপ্রিলের অমৃত

অসীম চক্রবর্তী

পত্রিকাখানা আমার হাতে এসে গেল। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আপনার প্রবন্ধটা চোখে পড়লো। এ কী দেখলাম? আপনি ঐ অনাদৃত বাদকদের আদর করেছেন! নতুন বটে। এর আগে তো শুনেছিলাম ও নাটকটা এখানেই অপ্রাকৃতের যদিও ওর ১০০০তম অভিনয় হয়ে গেছে।

আপনি বাদকদের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে লিখেছেন। পড়ে ভাল লাগলো। ঐ জনপ্রিয়তার একটা দৃষ্টান্ত আপনার সম্মুখে পেশ করবার জন্যই এ চিঠি লিখছি।

১৯৭৬ সালের মে মাসে আমি বাংলা মুলুকে [illegible]। সে সময় কালনাতে ঐ [illegible] অভিনয় দেখেছিলাম। পাঠক-মশাই শুনুন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল তার বৃত্তান্ত নিচে দিচ্ছি:—

নাটক শুরু হবার সঙ্গে অকাল বর্ষণ শুরু হলো, প্রথমে আস্তে তারপর জোরে এবং শেষে ঝড়ের বেগে চললো সমানে। দর্শকদের মাথার উপর কোনও আচ্ছাদন ছিল না। ভেবেছিলাম নাটক বন্ধ হল। কিন্তু তা হলো না। নাটক সমানে চললো এবং যথা সময়ে তার যবনিকা পড়লো। অবাক হয়ে দেখলাম একটি দর্শকও ঐ প্রবল বর্ষণে [illegible] সত্ত্বেও সিট ছেড়ে উঠলেন না।

আমার মনে হয় ওপরের এই ঘটনাটাই বাদকদের জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ প্রশংসাপত্র।

পাঠক মশাই নিশ্চয়ই জানেন না হলে আমাদের দেশে গুণীর সম্মান হয় না। অন্য দেশ হলে এই রকম চমকপ্রদ নাটক করার জন্য অসীম চক্রবর্তী সম্মান ও পুরস্কার পেতেন। কিন্তু এ দেশে তিনি পেয়েছেন লাঞ্ছনা এবং অবহেলা। তথাপি তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন এটা একটা মস্ত কথা। অমিয়কুমার চক্রবর্তী জওহরনগর, বোম্বাই-৬২।

টোটোদের কথা

৩ জুনের 'অমৃত' পত্রিকায় 'টোটোদের কথা' একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত নিবন্ধের দুটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দুচারটি কথা আপনাদের পত্রিকা মারফত বলতে চাই।

দেবাশিস ঘোষ লিখেছেন : 'টোটোরা কোচজাতির বংশধর এবং কুচবিহারের মহারাজ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ভুটানের মহারাজার শরণাপন্ন হলে ভুটানরাজ বর্তমান টোটোপাড়াটি দান করেন এবং সেখানেই ওরা বসবাস করেন।' এই ধরনের মন্তব্য উপস্থাপনা করবার আগে যুক্তির অবতারণা করা উচিত ছিল। কুচবিহারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এখানকার রাজারা সকল ধর্মের প্রতি আর বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর প্রতি সমান সহিষ্ণু ছিলেন। এখানে একদিকে যেমন বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল, অপরদিকে ছিল শাক্ত ব্রাহ্মপন্থী ধর্মসমাজ। রাভা, গারো উপজাতি এখনও নির্বিবাদে বাস করছে। এদের উপর কোনও সময় কোনও অত্যাচার হয়েছিল এরকম কোনও প্রমাণাদি নেই। টোটোদের উপরই যে একমাত্র নির্যাতন বিতাড়ন চলেছিলো, এরকম সংশয়াতীত প্রমাণ লেখক কোথায় পেলেন?

কোচরা ভুটান থেকে এসেছিলেন এরকম প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু টোটোরা যে কোচদেরই বংশধর এবং কুচবিহার থেকে ভুটানে ও ভুটান থেকে টোটোপাড়ায় গিয়েছিলেন এরকম কোনও মন্তব্য করা অযৌক্তিক। কোন্ রাজার সময় এই ঘটনা ঘটেছিল লেখক তারও উল্লেখ করেননি। সকল ধর্মের প্রতি গোষ্ঠীর প্রতি এখানকার রাজাদের যে সমউদারতা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বহু ক্ষেত্রে। শংকরদেব আসামরাজ কর্তৃক বিতাড়িত হলে নরনারায়ণ তাঁকে আশ্রয় দেন। শংকরদেব কায়স্থ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ, কোচ, কৈবর্ত কোলতাকে সমান শ্রদ্ধা জানিয়ে ধর্মপ্রচার করছিলেন— এ কারণেই তাঁকে আসাম থেকে বিতাড়িত হতে হয়। শংকরদেব গ্রন্থেও লিখেছিলেন

'কৈবর্ত কোলতা কোচ ব্রাহ্মণ সমস্ত।
এক লগে খাই দধি চিড়া কলা যত।।'

যে শংকরদেব কোচজাতিকে একাসনে বসাবার পক্ষপাতী তাঁকে নরনারায়ণ তদীয় ভ্রাতা শুক্লধ্বজের চেষ্টায় নিজ রাজ্যে বসবাসের সুযোগ করে দেন এবং নির্দিধায় ধর্ম প্রচার যাতে করতে পারেন তারও ব্যবস্থা করেন। এই শেষ কথা নয়, রাজা নিজে শংকরদেবের কাছে 'শরণ' নিতে (দীক্ষা) বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু শংকরদেব কিছুতেই রাজী হননি। একথা শংকরচরিতেও লিপিবদ্ধ আছে :

'রাজা স্ত্রী কর্মকাণ্ডিত ব্রাহ্মণ সবর।
কদাচিতো আমি গুরু নহু ঈশ্বর।।'

অবণীন্দ্র শিষ্য কথা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক নম্বর শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বাস্তবিক, এখনকার এই আমরা তাঁকে চিনি না, জানি না। এর একটা কারণ, তিনি মাত্র চব্বিশ বছর বেঁচেছিলেন। এই অল্প বয়সেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। কিন্তু, এটাই দ্বিতীয় কারণ, ছবি দেখার চোখ এখনও আমাদের তেমন হয়নি। যদি হতো, তাহলে সুরেন্দ্রনাথ এমন করে চোখের আড়ালে থাকতে পারতেন না। স্মৃতি খুঁজে সেই অপরিচয়ের ধন আমাদের সামনে এনে উপস্থিত করেছেন সুধা বসু। তাঁর রচিত 'অবনীন্দ্র-শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি কেবল অকালে প্রয়াতসুরেন্দ্রনাথের জীবনী মাত্র নয়, এই গ্রন্থটি সেকালের চিত্রকলার ইতিহাসের নানা মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ।

সুরেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু সহ-পাঠী। গুরুর কাছে দিনের পর দিন তালিম নিয়েছেন। স্বভাবেও দুজনের মধ্যে আছে সৌসাদৃশ্য। দুজনেই স্বল্পভাষী, কর্মনিষ্ঠ, একাগ্রচিত্ত ও ভক্তিমান। তবু, সুরেন্দ্র-নাথ ও নন্দলালের মধ্যে ভেদ আছে, তা হলো শিল্প সৃষ্টির বিচারে। গোড়া থেকেই সুরেন্দ্রনাথ নিজস্ব ধারার প্রবর্তক।

অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার শুকতাগড় গ্রামে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১২৯২ সালের ১৬ কার্তিক জন্মগ্রহণ করেন। আর ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন ১৩১৬ সালের ৪ অগ্রহায়ণ। মাত্র ২৪ বছরের জীবন। অথচ এর ইমধ্যে তিনি সেকালের শিল্পরসিক মহলে কেবল পরিচিত নন, বকতব্যে অঙ্কন রীতিতে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। যেমন লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন চিত্রটি। এই নিয়ে সেদিনকার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মহলে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। সেকালের খ্যাতিমান ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র থেকে শুরু করে রমেশ-চন্দ্র মজুমদার, ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী প্রমুখ এই একটি ছবিকে কেন্দ্র করে তর্ক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কার্তিকেয় সে আমলেই দেশ-বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। হ্যাভেল সাহেব ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর রচনার প্রশংসা করেছেন।

রেখাঙ্কনে চিত্র পরিকল্পনায় ও বিষয় বিন্যাসে সুরেন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিষয়বস্তু ভারতীয়ত্ব বোধ। তাঁর উপ-শব্দজাত সত্তা তিনি প্রকাশ করতেন সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে। এ ব্যাপারে তিনি অবনীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরাধিকারী তো

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সতীর্থও বটে। ভারতীয় চিকলরা ইতিহাসে পুনরুত্থান আন্দোলনের পুরোধা হিসাবেও সুরেন্দ্রনাথের নাম স্মরণযোগ্য।

এই সুরেন্দ্রনাথকে আমরা চিনি না। চিনিয়ে দিলেন সুধা বসু। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বহু শ্রম স্বীকার করে তিনি সুরেন্দ্রনাথের জীবনের ও শিল্প সাধনার যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও সুষ্ঠু পর্যালোচনার পরই সেগুলি রচনার মধ্যে স্থান দিয়েছেন। ফলে, গ্রন্থটি একটি জীবনকথা না হয়ে যথার্থই শিল্পীর জীবনকাব্য হতে পেরেছে। আমি নিশ্চিত যে, সুধা বসুর এই আন্তরিক প্রয়াস পাঠক দরবারে উপযুক্ত মূল্য পাবে।

অমিতাভ চক্রবর্তী

অবনীন্দ্র-শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ। সুধা বসু। বাক সাহিত্য। দাম দশ টাকা।

দুঃসাহসিক প্রয়াস

প্রিয় সঞ্জয়,

আমি তোমাকে চিনি না। 'স্থানাঙ্ক নির্ণয়' তোমার প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্য ও বেদনায় আহত চিন্তা ও বোধগুলির প্রথম প্রকাশ। বহু ঝড়, জল ও শিলাবৃষ্টিতে চিন্তা ও ভাবনার যে চুতমুকুলগুলিকে তুমি অনাহত রাখতে পেরেছ, তার গন্ধ পেতে আমি ভুল করিনি।

কিন্তু ভাই, গোটা কয়েক কথা আছে। নীরব কবি কি কোন কবি হতে পারেন? ঠিক তেমনি যে চিন্তা-ভাবনা বা আবেগ এমনভাবে সাজান হল যা বসন্তের কি শরতের আগমন বার্তার মত অবলীলায় মানুষের হৃদয়ে পৌঁছল না, তার প্রকাশের ব অপ্রকাশের কি সার্থকতা? নীরব কবির অন্তরের সহস্র উদ্বেগের মত তা যদি লেখকের বুকের ভেতরই ঢাকা পড়ে থাকে

দেখো ভাই সঞ্জয়, যতই র‍্যাবো ব্যোদলেয়র কামু, সাঁতরে গোদার ফেলিনির তত্ত্ব আওড়াও না কেন ভাই, মূল সত্য কথাটা হল, সব দেশে সব কালে সব শিল্পের একমুখী বাসনা হল—মানুষের মনে সঞ্চারিত হওয়া। আরো সরল করে বললে বলা যায় পাঠকের অবয়বের তলের নিখাদ মানুষটার শ্রদ্ধা ভালবাসা আলিঙ্গন বেষ্টন চুম্বন লাভই শিল্পের মধ্যে বিদেহী শিল্পীর সারা জীবনের একান্ত কামনা।

কাজেই ভাই, পাঠক-নিরপেক্ষ সাহিত্য রচনার কথাটা শুধু অসত্য নয়, ভারি বোকার মত কথাও বটে। অতএব আমাদের যদি নিতান্তই কিছু লিখতে হয়, তা সহজ করে সরল করে কোন রকম পাণ্ডিত্য না-ফলিয়ে বলতে হবে। যা বলতে চাইছি সেটার দিকেই নজর রাখতে হবে। বাচ্চা ছেলেদের মত বল খেলতে গিয়ে পথে কুল পেড়ে খেলে হবে না। অর্থাৎ মূল বক্তব্য থেকে সরে গিয়ে মার্কস এঙ্গেল ফ্যার্নাথিসকো গোইয়া ব্রেখট লুকাস ইত্যাদি নামের জলতরঙ্গ বাজালে চলবে না।

সত্যি কথা বলতে কি, তোমার বইটা আমি একটানা পড়তে পারিনি। হোঁচট খেতে খেতে অনেক জায়গায় বই বন্ধ করেছি। কয়েকটি জায়গায় তোমার বক্তব্যের গভীরতা বুঝতে না বুঝতে তুমি জার্মান বা ইতালিয় এমন এক লেখকের নাম অথবা মন্তব্য ছুঁড়ে মেরেছ যে আমি আহত হয়ে অসুস্থ বোধ করেছি।

আমি অন্ধ আধুনিকতা বিদ্বেষী নই। আমি সঙ্গতি ও ভারসাম্য রক্ষাবাদী। তাই তোমার লেখার দুর্বল দিক আমার চোখে পড়লেও, আমি বিনা দ্বিধায় বলছি তোমার গ্রন্থের নয়টি প্রবন্ধের মধ্যে অনেক জায়গায় ক্ষমতার পরিচয় থাকলেও একমাত্র 'ঋত্বিকতন্ত্র' নামক প্রবন্ধটির জ[illegible] তোমার বই বিক্রি হওয়া উচিত এবং [illegible]ার সুনাম হওয়া উচিত। ঋত্বিকতন্ত্রে তোমার দৃষ্টির নিজস্বতা চিন্তার [illegible] এবং হাড়ভাঙ্গা প্রকাশ ক্ষমতার পরিচয় আছে। ঋত্বিক বাংলা সিনেমা জগতের প্রাণপুরুষ। বাংলা-দেশের যুবক-যুবতীদের প্রতপ্ত ভালবাসার 'ইনকারনেশান'। এই ভালবাসার মধ্যে প্রচণ্ড প্রেম আছে কিন্তু অযৌক্তিকতা নেই। একথা তুমি 'রোমান্টিক মন্বন্তর বনাম হাঘরে রোমান্টিকতা' প্রবন্ধে সত্যজিৎ রায়ের অশনি সংকেত ছবির সমালোচনায় আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বলেছ। অশনি সংকেত ছবির যা মূল সমস্যা তাকে যেভাবে সত্যজিৎ রায় পাশ কেটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন তুমি তা যথার্থ ধরেছ। এবং প্রসঙ্গত মাত্র একটি স্তবক আলোচনায় ঋত্বিক সত্যজিতের মধ্যে যে পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করেছ—আমাদের পেশাদারী চিত্র-সমালোচকদের তা লিখতে গিয়ে হাত থেকে কলম খসে পড়বে। গা হিম হয়ে যাবে। অথচ তুমি কি সহজ করে বলেছ 'আসলে সত্যজিৎ রায় ঝুঁকি নিতে সাহসী নন। আসলে অপরাজিত ছাড়া আর কোথাও সত্যজিৎ রায় আধুনিক নন। এবং একদা

মর্মে প্রোথিত কালজ্ঞানের ইসারায় ঋত্বিককুমার ঘটক, অসংগতি সত্ত্বেও উৎকেন্দ্রিকতা সত্ত্বেও অসংলগ্নতা সত্ত্বেও শিল্পের যে মহান প্রদেশে প্রবেশ করেছেন, অপরাজিত ছাড়া অন্যত্র, সত্যজিৎ রায়, সমসাময়িকতার চিত্রণে তার সাক্ষ্য পাননি। পৃঃ ৮২।

আমাদের, হ্যাঁ আমাদের, সমসাময়িক রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি চর্চার অন্তঃসার শূন্যতার প্রেক্ষাপটে ঋত্বিকের কথা বলতে গিয়ে তুমি যে 'কামান দাগা' ভাষায় কথা বলেছ আমি নিজে তার সঙ্গে একমত হই বা না-হই, তা বাংলা সিনেমার আলোচনায় তুলনা-রহিত। 'দাউ দাউ করে উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল তাঁর রুশ চীন কিউবা সমগ্র বিপ্লবের স্তনাগ্র চূড়োয় নতুন দুধের উল্লাসে নবীন পৃথিবীর জন্য। এর পর বিপ্লবীরা সোনা-রূপোর দোকানে চলে যায়। স্যানফরাইজড মধ্যবিত্ত এবং অ্যানফেক্টের প্রয়োগ; ভিয়েৎনাম ও বাঁকুড়ার ঘোড়া....এবং ইত্যাদি দেখতে দেখতে শান্তিপূর্ণ পিস্তল চর্চার অব্যাহত প্রবাহে মার্কসবাদ মহেন্দ্র দত্তের ছাতার মতই ব্যবহৃত হচ্ছে, একথা জানবার পর তিনি, শ্রীঋত্বিককুমার ঘটক, একদা মন্তব্য করেন....দেশটি ক্রমশই ইতরের দেশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর, কোন সৎ শিল্পীর নিজের দেশকে ইতর বলে দেখান উচিত নয়। ব্যাপারটা অধার্মিক। সুতরাং এই ইউ পি আই শহরের লুম্পেন শিল্পচর্চায় তাঁকে উন্মাদ শেষ পর্যন্ত হতেই হত।'

তুমি বলেছ অতএব সেই উজ্জ্বল চক্ষু মাতাল আর নিজেকে ক্ষয় করবে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হল আর একটি নাম।'

তুমি লিখেছ 'প্রকৃতই আজ প্রমাণিত হয়েছে যে কমার্স করাপসন ও বেশ্যাপল্লীতে কৌমার্য অক্ষত রাখা সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে।'—প্রত্যেকটি মন্তব্য আজকের যে-কোন চূড়ান্ত বুদ্ধিজীবীকে মানা-না-মানার ঊর্ধ্বে ভাবিয়ে তুলবে।

আমার বলতে দ্বিধা নেই, ঋত্বিক সম্পর্কে তোমার অবজারভেশান কোথাও কোথাও অর্জুনের শরসন্ধানের মত লক্ষ্যভেদী, কোথাও কোথাও বেদবাক্যের মত তীব্র। যেমন, 'শিল্পের যে প্রদেশ তিনি রচনা করেন তা এত গভীর মর্মান্তিক ও বিপজ্জনক, রমণীয়তা থেকে এত দূরে, যে আজও তিনি অনন্সৃত রয়ে গেলেন।' অথবা 'অন্যান্য বাজার চালু বিপ্লবী শিল্পী বন্ধুদের মত, (ঋত্বিক) ব্যক্তি-জীবন ও শিল্পী-জীবনের মধ্যে নির্মাণ করতে পারতেন এক ধূর্ত চীনের প্রাচীর যার ওপরে বসে যুগপৎ দুধ ও তামাক খাওয়ার অপরূপ কৌশল আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু মর্মে প্রোথিত সত্যের প্রহার তাঁকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, কোন সচেতন মানুষের পক্ষেই ব্যক্তিগত জীবন বলে কোন কথা নেই।'

অমল মুখোপাধ্যায়

স্থানাঙ্ক নির্ণয়। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। এল-ডোরোডো। পরিবেশক দে বুক স্টোর। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা —১২। দাম পাঁচ টাকা।

খণ্ডিত রাজনীতি

রাজনীতিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার প্রকৃত চেহারা এবং চরিত্র ধরা পড়ে না। সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই রাজনীতির শিকড়; বাইরে থেকে যাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সার্বভৌম মহীরুহ মনে হয় আসলে তা সমাজেরই অন্যতম, প্রকৃতপক্ষে প্রধানতম বিকাশ। ধনতান্ত্রিক দেশের পণ্ডিতরা সমাজের বিভিন্ন বিকাশগুলিকে পৃথক পৃথক দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। তাঁরা বলেন, অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই; রাজনীতির সঙ্গেও সমাজকে টেনে আনবার নেই প্রয়োজন। তাঁরা সমাজকে দেখতে চান রাজনীতি অর্থনীতি থেকে আলাদা ভাবে, যেন সমাজ নিজস্ব সম্ভার-দোলাতে সার্বভৌম। তাঁরা বোঝাতে চান, শিল্প বাণিজ্য ব্যবসার সঙ্গে রাজনীতির গভীর কোনও সম্পর্ক নেই, থাকার প্রয়োজনও নেই। এ যুক্তিকে প্রসারিত করে তাঁরা বলেন, শিল্প-মালিকরা এবং ব্যবসায়ীরা রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন, রাজনীতিকে প্রভাবিত করেন না; আবার তেমনি যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের উচিত শিল্প বাণিজ্য নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামানো, তাকে নিজস্ব ক্ষেত্রে বিচরণের পূর্ণ অধিকার দেওয়া।

এই দৃষ্টিকোণটিও যে রাজনৈতিক তা আজ আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অন্যতম নির্দেশিত নীতি : ন্যূনতম শাসন, মিনিমাম গভর্নমেণ্ট। অর্থাৎ রাজশক্তি, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ নিয়ে নাক গলানো মানসিকতা পরিত্যাগ করে শুধু ল অ্যাণ্ড-অর্ডার সংরক্ষণ করে যাক, তাহলেই সমাজের ভারসাম্য বজায় থাকবে। অতএব দেখতে পাচ্ছেন, পাণ্ডিত্যী রাজনীতিকেও সমাজ থেকে বাদ দিয়ে ঠিক ঠিক বুঝতে পারা যায় না।

১৯৭৭ সালের গ্রীষ্মকালে ভারতীয় রাজনীতির একটা বিশৃংখল চেহারা ও চরিত্র আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, না জনতা পার্টি, না কংগ্রেস কর্মীদের আনুগত্য আদায় করতে পারছে। কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হবার পর অন্তত উত্তর ভারতে তার পুরো কাঠামোটাই ভেঙে গেছে।

জনতা দলের অবস্থাও তুলনায় খুব একটা ভাল নেই। নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে একদিকে ছোট বড় বিদ্রোহ, অন্যদিকে খোলাখুলি অসন্তোষ। এবং অনেকখানি বিশৃংখলা। কি বিহারে, কি উত্তরপ্রদেশে অথবা বঙ্গে কাঁলক্ষে মার্চের বিস্ময়কর রাজনৈতিক সাফল্যের পরেও, জনতা পার্টি নেতা ও কর্মীদের মধ্যে শৃংখলা আনতে পারে নি। অনেক নির্বাচন-কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে কর্মীরা বিকল্প প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কর্মীরা প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ করে বসেছেন। উপদল, ভিন্ন-দল গঠনে আশ্চর্য তৎপরতা লক্ষিত হয়েছে রাজ্যে রাজ্যে। কয়েকটি রাজ্যে গণতন্ত্রী কংগ্রেসীরা সি-এফ-ডি ও জনতার একীকরণের বিরোধিতা করে নিজেদের দলীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। একদিকে যেমন এক দল ত্যাগ করে অন্য দলে যোগ দিতে অসুবিধা হচ্ছে না, অন্যদিকে ভিন্ন দল গঠনের তৎপরতাও আশ্চর্যভাবে প্রসারিত হচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে একমাত্র সি-পি-এম ছাড়া, এবং পশ্চিমবঙ্গে বামজোট ছাড়া, বিভিন্ন রকমের বিশৃংখলা প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকেই আক্রমণ করে বসেছে। নির্বাচন সম্বন্ধে নানাবিধ নীতিগত সিদ্ধান্ত, প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনী প্রসারে নেমে পড়া : সব বিষয়ে একমাত্র বামজোটই শৃংখলা ও ঐক্যের সঙ্গে পদক্ষেপের ক্ষমতা দেখাতে পেরেছে। সি-পি-আই নেতৃত্বন্দ ও কর্মীদের অন্তর্বিরোধে জর্জরিত হলেও, এবং অন্তত একটি রাজ্য কমিটির নেতৃত্বন্দ দুভাগে বিভক্ত থাকা সত্ত্বেও, যতখানি শৃংখলার সঙ্গে নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত করতে পারছে ততটা কিন্তু কংগ্রেস মোটেই পারে নি, যদিও কংগ্রেসের মত নির্বাচনী বিপর্যয় সি-পি-আইকেও সামলাতে হয়েছে।

এই যে ব্যাপক রাজনৈতিক বিশৃংখলা এর কি কোনও মৌলিক সামাজিক কারণ আছে? ভারতীয় সমাজে কত-গুলি ঘটনা ও পরিবর্তন ঘটে গেছে বলেই কি এই বিশৃংখলার সৃষ্টি? কেরল ও তামিলনাড়ুতে দেখতে পাচ্ছি এক অভূতপূর্ব খণ্ডিত রাজনীতির আবির্ভাব। তামিলনাড়ুতে ডি-এম-কে এই কয়েক বছর আগেও একক ছিল, আজ ভেঙে চার খণ্ডে বিচ্ছিন্ন। কেরলে এখন একটি অবামপন্থী দল নেই যা ভেঙে টুকরো হয়ে যায় নি। বর্তমান কেরল মন্ত্রিসভা আট-দশটি দল নিয়ে কোয়ালিশন। খণ্ডিত হয় নি কেবল সি-পি-এম ও সি-পি-আই, যদিও দুর্বল হয়েছে উভয়ই। গুরুতর সামাজিক কারণ ছাড়া কি এই ধরনের খণ্ডবিখণ্ড রাজনীতি সম্ভব?

খণ্ডিত রাজনীতির বৈশিষ্ট্য, আমরা দেখতে পাচ্ছি, চেপে বসেছে সে শ্রেণীগুলির ওপর যাকে এককথায় বলা যেতে পারে বুর্জোয়া। অর্থাৎ বুর্জোয়া রাজনীতিই আজ বিশৃংখলা ও খণ্ড-বিখণ্ডতা দ্বারা বিশিষ্ট। তুলনাক্রমে উভয় কম্যুনিস্ট পার্টি এ ব্যাধি থেকে অনেকখানি মুক্ত।

এর কারণ, আমার মনে হয়, প্রধানত চারটি। প্রথম কারণ হল, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিস্তার ও প্রসার। দ্বিতীয় কারণ, এই শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন উপশ্রেণীর জন্ম এবং তাদের ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক দাবী। তৃতীয় কারণ, বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক নির্ভরভূমি ধ্বসে ভেঙে পড়া। চতুর্থ কারণ, সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব।

কারণগুলি এবার একটু তলিয়ে দেখা যাক।

বুর্জোয়া শ্রেণী সংখ্যায় যে বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে তার প্রমাণের অভাব নেই। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে শ্রমিকের চেয়ে মধ্যবিত্তের সংখ্যা স্বাধীন ভারতবর্ষে বেড়েছে বেশি। সংখ্যায় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্তরভেদও ঘটেছে বিস্তর। পঁচিশ বছর আগেও আমাদের দেশে শিল্পপতির সংখ্যা ছিল সামান্য। এখন শিল্পপতির সংখ্যা শুধু বৃদ্ধিই পায় নি, তার স্তরভেদও হয়েছে বিস্তর। বৃহৎ শিল্পপতি, একচেটিয়া শিল্পপতি, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পপতি, গ্রামীণ শিল্পপতি প্রভৃতি স্তরে এ শ্রেণী বিভক্ত। বিভিন্ন স্তরের স্বার্থ-সংঘাত ও প্রতিযোগিতাও নতুন সামাজিক সংকট।

পঁচিশ বছর আগে আমাদের গ্রামীণ সমাজ জমিদার ও রায়ত এই দুই ভাগে মোটামুটি বিভক্ত ছিল। আজ গ্রামীণ বুর্জোয়া শুধু সংখ্যায় বাড়ে নি, স্তরভেদও বৈচিত্র্য অর্জন করেছে। জমিদার প্রায় নেই, কিন্তু জমিদারী স্বার্থ ও মানসিকতা পুরো বজায় রয়েছে। জন্মেছে বড় চাষী, মাঝারি চাষী, জোতদার এবং নতুন এক শ্রেণীর ধনতান্ত্রিক চাষী ইংরিজিতে যাদের বলে ফার্মার।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বিশেষ বিস্তার লাভ করেছে এবং সঙ্গে স্তর-বিভিন্নও হয়ে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে বহু নতুন স্বার্থের, যার ইংরিজী নাম ইন্টারেস্ট গ্রুপ। মধ্যবিত্ত সমাজে কলেজ পড়া যুবশ্রেণী একটা স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তা পেয়ে গেছে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর পুরাতন সংহতি আজ আর নেই। সংহতির যে সামাজিক ভিৎ ছিল, তাও ধ্বসে পড়েছে। সমাজে বহুকাল উচ্চস্তরের মানুষদের বাকি মানুষেরা মেনে চলত। ধন, শিক্ষা, পেশা, চাকরি, বংশ ও সবই ছিল সমাজে নেতৃত্বের সর্বস্বীকৃত প্রতীক। আজ এসব প্রতীকগুলির জোর অনেক কমে গিয়েছে। একদা প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ নেতাদের প্রভাব হয় নিশ্চিহ্ন নয় অস্তগত। প্রভাবের জন্যে প্রতিযোগিতা এখন ব্যাপক। কিন্তু পুরাতন সামাজিক কাঠামো ও ভারসাম্য অনেকখানি ভেঙে পড়লেও, সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার দাপট বিশেষ কমে নি। জাতি বোধ তাই এখনও প্রবল। আনুগত্য, তাই, এখনও জাতি দ্বারা নির্দেশিত। অথবা ব্যক্তি দ্বারা। যে ব্যক্তির খানিকটা অবশিষ্ট প্রভাব বর্তমান, সেই চায় উপদল অথবা নতুন দল গড়তে। বহুর মধ্যে একক্কে অন্তর্লীন করে দেবার ধনতান্ত্রিক মানসিকতা এখনও আমাদের বুর্জোয়া সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। যে মানসিকতা এখনও প্রবল তা হচ্ছে ফিউডাল লর্ডের মানসিকতা। অথবা ফিউডাল সার্ফের।

চাণক্য সেন

অন্য কোনো স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয় সম্পূর্ণ আহার নয়

নারকেলের ছায়া। ঘাসের ছাদ। কাঠের মেঝে

হুগলী মোহানা থেকে ৬০০ মাইল দূরে
সমুদ্রের মধ্যে ছড়ানো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের শুরু।
আরও প্রায় ৩৫০ মাইল পরে শুরু নিকোবর।
সেখানে অনেক দ্বীপেই মানুষ
নেই। শুধু ১২টি দ্বীপে ২৬,০০০ তামাটে রংএর হাসিমুখ
মানুষ থাকে। তাদের চারপাশে নারকেলের বন,
হাওয়ায় সমুদ্রের গান।

বাইরের মানুষকে তারা বলে হোলচু। মানে বন্ধু,
আপনজন। সেখানে কাটিয়ে এলেন মনোজিৎ মিত্র।

আমার নাম হোলচু

আর একটু হলেই সুমাত্রা পৌঁছে যাচ্ছিলাম। আর মাত্র নব্বই মাইল সমুদ্র পেরোলেই ছোঁয়া যেত ম্যাপে দেখা সুমাত্রার সেই এক ছুঁচোলো কোণ। কিন্তু গ্রেট নিকোবর দ্বীপে সমুদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে মনে হল, আর কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। নীল সমুদ্র সবুজ বনে ঘেরা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কারুর চেয়ে কম নয়। আর কোথায় দেখেছি নারকেলের পাতায় পাতায় এক রকম ধারালো উজ্জ্বল সবুজ, একসঙ্গে এত মানুষের শরীর থেকে উপচে পড়া স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য, এত মানুষের মুখে অকারণ হাসি যখন তখন, আর শিশু বৃদ্ধ যুবা আকাশ বাতাস বন পাহাড় সমুদ্র দিন রাত সব মিলিয়ে নিশ্চিন্ত আনন্দে শুধু বেঁচে থাকার এমন নিটোল ছবি?

গ্রেট নিকোবর অবশ্য পৌঁছলাম একদম শেষে। ম্যাপের দক্ষিণ পূবের কোণে অতি অবহেলায় সমুদ্রের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সেই ফোঁটাগুলোর শেষেরটি হল গ্রেট নিকোবর। কলকাতা থেকে উড়োজাহাজে, পথে আধ ঘন্টার জন্য রেঙ্গুন ছুঁয়ে পোর্টব্লেয়ার। এই আটশ মাইল আসতে সাড়ে তিন ঘন্টা, তারপর সারারাত জাহাজ চলল। আরও প্রায় তের ঘন্টা পর, দেড়শ মাইল পেরিয়ে কার নিকোবর—নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসনিক রাজধানী। সেখান থেকে কাচাল, কামোর্তা, টেরেসা, নানকৌড়ি—এ রকম পর পর দ্বীপ। আধ বর্গমাইল থেকে চারশ বর্গমাইল পর্যন্ত আয়তনের অজস্র দ্বীপ চারিপাশে, অধিকাংশেই অবশ্য মানুষ থাকে না।

এখানে জাহাজ সারারাত চলে, সারাদিন থেমে থাকে কোন না কোন দ্বীপে। সাত আটদিন ধরে বেশ কয়েকটি দ্বীপ দেখে আবার ফিরে আসতে হয় পোর্টব্লেয়ারে। আর যদি কোন দ্বীপে নেমে মনে হয় কদিন থেকে যাই, তাহলে অন্ততঃ তিন সপ্তাহের নির্বাসন মেনে নিতে হবে। জাহাজ কখনও তিন সপ্তাহে একবার, কখনও পাঁচ সপ্তাহে একবার এসে থামবে।

নির্বাসন—শব্দটা মনে আসবেই। আন্দামান নিকোবর মানেই সেলুলার জেল, নির্জন সেলে বন্দীজীবনের কাহিনী। নিকোবর যেতে হলে পোর্টব্লেয়ারে আসতেই হবে। কথায় কথায় কানে আসবে অভিশপ্ত কালাপানির গল্প। নিকোবর কিন্তু কালাপানি নয়, কালাপানি পেরিয়ে সমুদ্রের বেড়াজালে আর এক রাজ্য। এখানে সে যুগে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ লাগে নি, এখানে এখনও পৌঁছয় নি নির্বাচনী পোস্টার নকশাল বিকৃতি পো[illegible]পটেজলোর গন্ধ। এখানকার মানুষের কাছে এসব হল সুদূর 'মেনল্যান্ড'-এর ব্যাপার।

ধীরে ধীরে অবশ্য এখানেও এসে লাগছে "ডেভেলপমেন্ট"-র ছোঁয়া, কিন্তু মাঝখানে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, তাই এখনও নিকোবরের সমুদ্রতীরে খবরের কাগজের টুকরো আর আইসক্রীমের বাকস দেখতে হয় না। এখনও ঢেউ-এর মাথায় চড়ে যখন সুঠাম নিকোবরী যুবক ক্যানো চালিয়ে দিগন্তে যায়, হঠাৎ তাকিয়ে মনে হয় বিংশ শতাব্দীকে উপেক্ষা করে আপনমনে অজানার পথে চলেছে কোন উদ্ধত ভাইকিং।

কার নিকোবরে জাহাজ থামল তীর থেকে অনেকদূরে। লনলে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হল লঞ্চে, কিন্তু লঞ্চও তীরে যাবে না, কারণ জেটি ঘাট কিছুই নেই। লঞ্চ এসে থামল একখানা প্রকাণ্ড ভেলার গায়ে। কাঠের তক্তা আর বড় বড় ড্রাম দিয়ে তৈরী। জিনিস-পত্র বাকস প্যাটরা কলার ছড়া এবং জ্যান্ত মুর্গী পর্যন্ত নিয়ে যাত্রীরা সবশুদ্ধ সেই ভেলায় নেমে দাঁড়ালেন। ইউনিফর্ম পরা পুলিশ, প্রকাণ্ড দেশী চুরুট মুখে নিকোবরী বৃদ্ধ, গম্ভীর সরকারী অফিসার, উচ্ছল নিকোবরী মেয়ে, সবাই গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে। পাড় থেকে দড়ি টেনে টেনে ভেলাকে নিয়ে গেল চার পাঁচটি নিকোবরী ছেলে, বয়স ষোলর নীচে। মাঝে মাঝে পা পিছলে তাদের এক একজন জলে পড়ে, আর সবাই মিলে হৈ হৈ করে হাসি। সকালের সূর্যের আলোয় তখন চারদিক ঝকমক।

পাড়ে নেমে জানলাম, আমি হচ্ছি হোলচু। নিকোবরী ভাষায় হোলচু মানে বন্ধু, আপনজন। ওরা নিজেদের বলে তারিক। সমুদ্র হল মায়ে জমি হল তোমলুক। নারকেলকে বলে কক (কোকোনাট থেকে?), হাওয়া হল কোফাং, নৌকো—হোড়ি, স্ত্রীলোক—ইউং নিয়ে, শিশু—নিয়ে, জামা—ইনিউৎ, কুকুর—আম। এক দমে এর চেয়ে বেশী স্থানীয় ভাষা শেখার চেষ্টা খুব বুদ্ধির কাজ বোধ হল না। যে ছেলেটির কাছ থেকে শব্দগুলো শেখা গেল সে হেসে কুটিপাটি। আশেপাশে অনেক লোক। এখানে যেদিন জাহাজ আসে, সেদিন শুধু জাহাজ দেখতেই অনেক লোক এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের সঙ্গে একদল নিকোবরী ছেলে এসে নামল। এরা পোর্টব্লেয়ারে আন্তঃ স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় শীল্ড জিতে এসেছে। তাদের অভ্যর্থনা জানাতে একদল এসে জুড়েছে চেঁচামেচি। তামাটে গায়ের রং, দৈর্ঘ বেশী নয়, কিন্তু রোগা মানুষ চোখে পড়ল না। এবং চর্বিঠাসা ভুঁড়িওলাও নয়। প্রায় প্রতিটি লোকের শরীর পেশল, বলিষ্ঠ। চলাফেরা স্বচ্ছন্দ, চোখের নজর সোজা, হাসি উচ্চকিত।

নারকেল বনের মধ্যে দিয়ে জীপ ছুটল। রাস্তার পাশে পাশে বোর্ডে প্রতিটি গ্রামের নাম লেখা—পার্কা, মালাকা, তামালু। তার সঙ্গে গ্রামের জনসংখ্যা এবং ক্যাপ্টেনের নাম। প্রতি গ্রামের একজন ক্যাপ্টেন আছেন, কতকগুলো গ্রাম মিলিয়ে আছেন চীফ ক্যাপ্টেন ও একজন ভাইস চীফ। নিকোবরে এখনও প্রশাসন এঁদের উপরেই নির্ভরশীল। ডেপুটি কমিশনার ও এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হয়ে যাঁরা দিল্লী থেকে আসেন, তাঁরা এই ক্যাপ্টেন ও চীফ ক্যাপ্টেনদের সহায়তায় প্রশাসন চালান। উদ্দেশ্য—নিকোবরীরা যাতে তাদের সনাতন ধারা বজায় রাখতে পারে।

নিকোবরের অজস্র দ্বীপের মধ্যে মোট বারটিতে জনবসতি আছে। সবাই খৃষ্টান। গীর্জা আছে, নিকোবরী ভাষায় ইংরাজী হরফে লেখা বাইবেল আছে। গীর্জা ও পাদরীর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রবল। কিন্তু তার পাশে পাশে আছে সনাতন রীতিতে পিতৃপুরুষের পুজো—এখন 'এ্যানসেসটরস্ ডে' হিসাবে পালন করা হয়। কার নিকোবরে ক্যাপ্টেনের দেখা পাওয়া গেল না, ঢুকে পড়লাম হাসিমুখ এক যুবকের বাড়ীতে। তাঁর নাম মোজেস। এখানে অতিথি আপ্যায়নের রীতি হল ডাবের জল খাওয়ান। আমাদের দেখেই মোজেস দুতিনটি ছেলেকে গাছে তুলে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে অজস্র ডাব এল, জল খেতে খেতে প্রাণান্ত। তার পরে এল "কোকোনাট টোডি"—নারকেলের ফুল থেকে তৈরী স্থানীয় পানীয়। একটু মিষ্টি মিষ্টি ঝাঁজালো স্বাদ। বোতল দেড়েক খেলে একটু ঝিম লাগে। অত বড় মাপের বোতল আমি জীবনে দেখি নি। নিকোবরের সর্বত্রই ঐ মাপের বোতল। ওগুলো নাকি আমেরিকান এবং জাপানী

হয়ত কোনোকালে বর্মার দক্ষিণতম বিন্দু, কেপ নেগ্রাইস যুক্ত ছিল সুমাত্রার কেপ পেদ্রোর সঙ্গে। কোন সামুদ্রিক বা ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয়ে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল টুকরো টুকরো হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল আজকের আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। এখনও ভারতবর্ষে অনেকের, এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকেরও নিকোবর সম্বন্ধে ধারণা খুবই ধোঁয়াটে। কেউ কেউ সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, আন্দামান জানি, ওখানে সেলুলার জেল ছিল, কিন্তু নিকোবর জায়গাটা কি আমাদেরই?

কাগজপত্র ঘাঁটলে অবশ্য সব হিসাবই পাওয়া যাবে। ভৌগোলিকেরা গম্ভীরভাবে বলছেন, ৬° থেকে ১৪° অক্ষাংশ এবং ৯২° থেকে ৯৪° দ্রাঘিমাংশের মধ্যে এই দ্বীপপুঞ্জ। মোট ভৌগোলিক আয়তন ৮,২৯৩ বর্গ কিঃ মিঃ। উত্তরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণে নিকোবর। এর মাঝখানে সেই কুখ্যাত ১০° চ্যানেল যা নাবিকেরা ভয়ে ভয়ে পার হয়। এ জায়গায় সমুদ্র ১৪৫ কিঃ মিঃ চওড়া, ৪০০ ফ্যাদম গভীর।

মোট দ্বীপের সংখ্যা ৩১৯। এর মধ্যে উত্তর আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান, কার নিকোবর, গ্রেট নিকোবরের মত বড় দ্বীপও আছে, আবার খুব ছোট্ট এক একটা পাথরকেও দ্বীপ হিসাবে ধরা আছে। দক্ষিণতম বিন্দু গ্রেট নিকোবর, হুগলীর মোহানা থেকে প্রায় ১২০০ মাইল দূরে। উত্তরতম হল ল্যাণ্ডফল আইল্যাণ্ড, মোহানা থেকে ৬০০ মাইলের কাছাকাছি। ৩১৯টির মধ্যে মাত্র ৩৮টি দ্বীপে মানুষের বাস আছে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দুটি মহকুমা: কার নিকোবর ও নানকৌড়ি। মোট আয়তন ১,৯৫৩ বর্গ কিঃ মিঃ। মোট জনসংখ্যা ২৬,০০০-এর কিছু বেশী। তার মধ্যে শোমপেন উপজাতির মানুষ ৮৯। জনবসতি আছে ১২টি দ্বীপে, ১৫৮টি গ্রামে। দ্বীপওয়ারি হিসাব:

দ্বীপের নাম	আয়তন	জনসংখ্যা
১। কার নিকোবর	৪৯ বর্গমাইল	১৫,০০০
২। গ্রেট নিকোবর	৪০৩ ,, ,,	৫,০০০
৩। কাছাল	৬৭ ,, ,,	১,৯০০
৪। কামোর্তা	৭২ ,, ,,	১,৩৫০
৫। চৌরা	৫ ,, ,,	১,০০০
৬। টেরেসা	৩৯ ,, ,,	৮০০
৭। নানকৌড়ি	২৩ ,, ,,	৬৫০
৮। লিটল নিকোবর	৬১ ,, ,,	২০০
৯। কোনডুল	১-৭০ ,, ,,	১২৭
১০। ট্রিংকেট	১৪ ,, ,,	১৫০
১১। পুলোমিলো	১/২ ,, ,,	৮০
১২ বোমপোকা	—	৬০

জাহাজের সম্পত্তি। খালি হবার পর নাবিকেরা সমুদ্রে ফেলে দেয়, নিকোবরীরা সমুদ্র থেকে কুড়িয়ে আনে।

নিকোবরে কেউ বাড়ীতে "ঢোকে" না, বাড়ীতে "ওঠে।" মোটা মোটা কাঠের থামের উপরে বড় বড় তক্তা, আর ঘাস দিয়ে ঘন করে বোনা গোল ছাদ। মই বেয়ে উঠতে হয়। উপরে একখানাই প্রকাণ্ড ঘর। দেওয়ায় কোনায় জিনিসপত্র রাখা, মস্ত মস্ত সামুদ্রিক শাঁখ, চাটাই। সরকারী পরিভাষায় এগুলোকে বলে "ভার্নিকুলার" প্যাটার্নের বাড়ী। দিনের বেলাটা সবাই কাটায় বাড়ীর নীচে, মেঝেটা তখন ছাদ। ওখানেই বাচ্চারা খেলে, পোষা শুয়োরগুলো ঝিমোয়, মেয়েরা বসে ঝুড়ি বোনে। কিংবা কেউড়ী ফল থেকে খাবার বানায়। মেনল্যাণ্ড থেকে নিয়মিত চাল আসতে শুরু করার আগে পর্যন্ত এখানে প্রধান খাদ্য ছিল কেউড়ী। দেখতে অনেকটা নিটোল গোল কাঁঠালের মত, ভিতরে বাদামের কোয়ার মত কোয়া, আর গুড়ের মত আঠালো, সুস্বাদু, এক ধরনের রস। সেটাকে জ্বালিয়ে জমাট করে গুড়ের তালের মত জিনিস তৈরি হয়। নিকোবরী গিন্নীরা খিল খিল হাসতে হাসতে খাওয়ালেন। বেশ খেতে।

মোহেদের বাড়ীর পাশে প্রকাণ্ড উঁচু এক গাছ। নাম হল দানাক। ১৯০২ সালে তাঁর ঠাকুরদা ক্যানো নিয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিলেন হাওর মুখে। বহুদিন কোন খবর নেই। তাঁর কল্যাণ কামনা করে বাড়ীর সবাই ঐ গাছ পুঁতেছিলেন। অনেকদিন পর তিনি ফিরে এলেন। ক্যানো নিয়ে ঠেকেছিল বর্মার এক প্রান্তে। ঠাকুরদা অনেকদিন গত হয়েছেন। গাছ নাতিকে ছায়া দিচ্ছে।

কার নিকোবর, নানকৌড়ি, কাচ্চাল, টেরেসা সব দ্বীপেই দেখা গেল অনেক বাড়ীর নীচে ক্যানো রয়েছে। বাংলাদেশে যেমন তালগাছের গুঁড়ি খোপরা করে ডোঙা তৈরি হয়, এখানে প্যাডক গাছের গুঁড়ি থেকে হয় ক্যানো। বড্ড টলমল করে, তাই সঙ্গে লম্বা কাঠের ডাণ্ডা বাঁধা থাকে। চওড়া খুব কম, অতি কষ্টে একজন বসতে পারে। চড়তে মজা, কিন্তু দুই কিনারায় সমান ওজন না থাকলেই টুপ করে জলের তলায়। একবার ক্যানোয় চড়ে জলে উঠতে গিয়ে প্রায় সলিল সমাধি হয়েছিল আর কি। ক্রীসমাসের সময় ক্যানোর বাইচ খেলা হয়। নিকোবরী ভাষায় তাকে বলে হেলিওয়াক্তী।

শহুরে জিনিসপত্র পাওয়া যায় শুধু কোঅপারেটিভ স্টোরে, এখানে যাকে বলে পানাম তিকোলংগো। ম্যানেজারের নাম ডিক ইসরায়েল। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মানুষ নিশ্চিন্তে বসে আছেন। দোকানে লোকজনের কথা কাটাকাটি নেই, ঝামেলা নেই। হেসে বললেন, হ্যাঁ আমরা এখানে ভালই আছি। আড্ডা দিতে বসা গেল ফিলিপের সঙ্গে। ফিলিপ সরকারী তহশীলদার, কাড়ী জোয়ান, প্রাণবন্ত আমুদে মানুষ। নিকোবরে ছেলেমেয়েরা প্রেম করে কি না জিজ্ঞাসা করাতে লজ্জায় কান লাল টকটকে হয়ে একাকার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কোনমতে বললেন, হ্যাঁ প্রেম হয়, নির্জনে দেখা-সাক্ষাৎও হয় এবং বিয়েও হয়। যদি না ছেলের বাবা আপত্তি করেন। অবশ্য আপত্তির ঘটনা কম। বিয়ে অবশ্যই গীর্জায় হয়, খৃষ্টান মতে।

প্রত্যেক গ্রামে কমিউনিটি হাউস আছে, বার্থ হাউস আছে। কমিউনিটি হাউসে উৎসবের সময় সবাই একত্র হয়। সন্তান হবার কয়েক মাস আগে মেয়েরা গিয়ে থাকে বার্থ হাউসে, সন্তানের বয়স কয়েক মাস হবার পর বাড়ী ফেরে। বাড়ীর লোকেরা অবশ্য যাওয়া-আসা দেখাশুনো করেন। আগে নিয়ম ছিল, অতি বৃদ্ধ এবং অসুস্থ যাঁরা মরণ পথযাত্রী, তাঁরা গিয়ে থাকবেন "ডেথ হাউসে" কিংবা কমিউনিটি হাউসে। কিন্তু এই হৃদয়হীন রীতি এখন উঠে যাচ্ছে। আমরা সংশোধক ফিলিপ বললেন।

শুয়োর সম্বন্ধে দুর্নামটা কিন্তু বদলায় নি। বাংলার চাষীর শুয়োর সম্বন্ধে যে মনোভাব সাধারণ নিকোবরীর সেই মনোভাব তার শুয়োর সম্বন্ধে। এখানে শুয়োরগুলো অত্যন্ত বেয়াড়া রকমের হৃষ্টপুষ্ট, নিরীহ এবং অলস। এরা সেই গালাগালির শুয়োর নয়। ক্রীসমাসের সময় নিকোবরীরা পরস্পরকে কাঁচা শুয়োর উপহার দেয়। তাছাড়াও হয় পিগ্ ফেস্টিভ্যাল। কোন গ্রামে শুয়োরের সংখ্যা অত্যধিক হলে ক্যাপ্টেন সভা ডাকেন, শুক্লপক্ষের মধ্যে দিন ঠিক হয় এবং তখন নির্দিষ্ট সংখ্যক শুয়োর মারা হয়। নিকোবর সম্ভবতঃ এখন পৃথিবীর একমাত্র অঞ্চল যেখানে বন্য গরু আছে। এরা এককালে পোষা গরুই ছিল, সাহেবরা কোন আমলে নিকোবরীদের গরু রাখায় উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। গোমাতাকে শেষ পর্যন্ত বনে আশ্রয় নিতে হল। এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সাহেব জানালেন, একটি বিশেষ প্রকল্প নিতে হয়েছে—বন থেকে গরু ধরে এনে স্থানীয় লোকেদের দুধ খাওয়ার অভ্যাস করান এবং গোপালন শেখানর জন্য।

কার নিকোবর নাম সাহেবদের দেওয়া। স্থানীয় ভাষায় নাম হল পু। এখান থেকে গেলাম কাচ্চাল দ্বীপে, নিকোবরী ভাষায় যার নাম তেহ্‌ নিউ। এখানে স্থানীয় লোকেরা ছাড়াও আছেন সিংহল থেকে আসা ভারতীয়রা যাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে ভারত-সিংহল চুক্তি অনুসারে। গ্রামের নাম মিসাডেরা। এখানে তিনশ পরিবার রয়েছেন। জাতে সবাই তামিল, করেন পুরুষে সিংহলে ছিলেন। এঁদের মুখপাত্রের কাজ করলেন ওয়াদিভেল, নামে যুবক। বললেন, ওখানেও আমরা রবার বাগানে কাজ করতাম, এখানেও সেই কাজই পেয়েছি। কাচ্চাল দ্বীপে প্রায় সাড়ে বারোশ একর রবার বাগান আছে, বাড়ানর পরিকল্পনা আছে ছ হাজার একর পর্যন্ত। মোট এক হাজার সিংহলফেরা পরিবারের এখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে। ওয়াদিভেল তিক্ষ্ণ বলতে পারেন, অন্যদের কাছ থেকে তামিল ভাষা ছাড়া আর কিছু পাবার উপায় নেই। এঁদের জন্য এখানে ক্যাম্প ও এ্যাসেম্বলিসের বাড়ি বানান হয়েছে। প্রত্যেক পরিবারের দুজন প্রাপ্তবয়স্ককে রবার-বাগানে চাকরী দেওয়া হয়—আট টাকা দিনপ্রতি। মাথা পিছু সিংহলে পাওয়া যেত পাঁচ টাকা। এঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি প্রাইমারী স্কুল হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যম তামিল। সবার রং কালো, মুখে হাসি।

ওখান থেকে কাচ্চাল গ্রামে গিয়ে পাওয়া গেল চীফ ক্যাপ্টেন হ্যারির সঙ্গে। বাড়ীর বাইরে নেম-প্লেট আছে। বাড়ীটা একটু আধুনিক ধরনের, খুঁটির উপরে চড়ান নয়। এক গম্ভীর, অল্প কথার লোক, সৌম্য চেহারা, দাড়ি আছে। প্রশাসন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, তেমন বড় সমস্যা কিছু নেই। মাঝে মাঝে ডাব নারকেল চুরি বা একটু-আধটু মদ্যপানের পরে গোলমাল ছাড়া। খুন জখম বড় ধরনের মারামারি বিশেষ হয় না। জীবন-যাত্রা একটু একটু করে বদলাচ্ছে। এখন আর কেউড়ী ফল আসল খাবার নয়। রেশন কার্ডে মাথাপিছু প্রতি মাসে ৪,৮০০ গ্রাম চাল আসে। কাচ্চাল হল নানকৌড়ি তহশীলের এগারটি দ্বীপের একটি। আগে এখানকার সমাজের প্রধান ছিলেন রাণী চাংগা নামে এক মহিলা। তাঁর কথাতেই সব কিছু চলত। ১৯৭০ সালে তিনি মারা গিয়েছেন।

নানকৌড়ি আর কামোর্তা মুখোমুখি দুটি দ্বীপ। সমুদ্র এখানে খাঁড়ির মত হয়ে এসেছে। এই খাঁড়ির ভিতরে ঢুকলেই চোখে পড়বে ভারতীয় নৌবাহিনীর কয়েকখানি জাহাজ। এ অঞ্চলে নৌবাহিনীর বড় ঘাঁটি। এবং অতি প্রয়োজনেই। নানকৌড়ি বন্দরে নামলে প্রথমেই চোখে পড়ে ডুবে-যাওয়া একখানি ছোট জাহাজের বিচুয়াী। একেবারে জেটির গা ঘেঁষে ডুবে আছে। আশেপাশে আরও তিন-চারখানি জলের তলায় আছে এখানে ওখানে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, বিভিন্ন দেশ থেকে ছোট ছোট মাছ ধরার ট্রলার এসে নিকোবরের সমুদ্রে প্রায়ই ঘুরে বেড়ায়। কাজ অবশ্যই শুধু মাছ ধরা নয়; কোন কোন ক্ষেত্রে মাছ ধরাটা একেবারেই

উপজাতি এখনও সভ্যজগতের আওতার বাইরে এবং সংখ্যায় কমতে কমতে ১৫ থেকে ৫০০-এর মধ্যে এসে ঠেকেছে, তাদের একমাত্র এই শোমপেনরাই নিকোবরে থাকে। বাকী চারটি থাকে আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপে। গ্রেট নিকোবর পাহাড়ী দ্বীপ, গভীর জঙ্গলে ঢাকা। তার মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ী নদী আছে। এই নদীর আশেপাশে শোমপেনরা থকে। কিন্তু একজায়গায় বেশীদিন ডেরা বাঁধে না, সরে সরে যায়। এদের রং তামাটে, মংগোল ধরনের চেহারা। শান্ত নিরীহ স্বভাব। খাদ্য হল নারকেল, বুনো পেঁপে, মধু, শুয়োরের মাংস, আর যা কিছু জংগলে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে ক্যামবেল বে আসে। জংলী জিনিস দোকানদারদের দিয়ে তার বদলে শহুরে জিনিস দু-একটা নিয়ে যায়। বাঙালী এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার চক্রবর্তী সাহেব জানালেন, সরকার থেকে কিছু জিনিস ওদের এমনিই দেওয়া হয় দেশলাই আর বিড়ি খুব প্রিয়। পান খায়, সবারই দাঁত লাল। কেউ কেউ তামাকের চাষও করে এক-আধটু, তামাক চিবোনের অভ্যাসও আছে। কুড়ি-পঁচিশ মাইল হাঁটা ওদের অভ্যাস আছে।

শোমপেনরা এতদিন কোন ভাষা বুঝত না, ইদানীং কেউ কেউ এক-আধটু হিন্দী বুঝতে শুরু করেছে। শরীরের ঊর্ধাংশ খোলা রাখে, ছেলেদের নীচে সংক্ষিপ্ত আবরণ, মেয়েরা লুংগি পরে। আন্দামানের উপজাতিদের মত এদেরও বংশবৃদ্ধির হার খুবই কম, যার ফলে মোট জনসংখ্যা ১০০র নীচে। অধিকাংশেরই নানা ধরনের চামড়ার রোগ আছে। সরকার খুব ধীরে ধীরে এদের সভ্য জগতের সংস্পর্শে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। ব্যাপারটা সহজ নয়। একবার কয়েকজন শোমপেনকে শহর দেখানর জন্য পোর্ট ব্লেয়ার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে তারা ফিরে এল।

গ্রেট নিকোবরে আমরা ছিলাম ঘণ্টা দশেক। তার মধ্যে একটা চেষ্টা করলাম শোমপেনদের সাক্ষাৎ পাওয়ার। চক্রবর্তী সাহেব জীপ তৈরি রেখেছিলেন, জাহাজ থেকে নেমে এককাপ চা খেয়েই বেরিয়ে পড়া গেল। গভীর জংগলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা ঘুরে ঘুরে কখনও উপরে উঠছে, কখনও নামছে। জায়গায় জায়গায় বর্ডার রোডসের কর্মীরা ব্যস্ত। দুপাশের বন নিঝুম নিস্তব্ধ, দূর থেকে কোথাও কোথাও পাহাড়ী নদীর কুলকুল শোনা যায়। দুদিন আগেই নাকি কয়েকজন শোমপেন ক্যামবেল বে এসেছিল। বনের মধ্যে ওদের খুঁজে বার করা খুব শক্ত। আমাদের ড্রাইভার জায়গায় জায়গায় জীপ থামিয়ে বনের দিকে মুখ করে হাঁক ছাড়ল, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই। যেতে যেতে দ্বীপের আর এক কোণায় এসে পড়লাম। আবার সমুদ্র। শক্ত বালির উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে জীপ চলল আরও কয়েক মাইল। পথে আমরা দুটি নিকোবরী ছেলেকে তুলে নিয়েছিলাম, শোমপেনদের ডেরা দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে। প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর জীপ আর চলল না। তখন নেমে জংগলের মধ্যে হাঁটা। এ জংগলে নীচে ঝোপঝাড় নেই, শুধু উঁচু উঁচু গুরজন গাছ। মাটিতে শিকড়ের জাল বোনা। মাঝে মাঝে ছোট নদী, তার উপরে শুধু একখানা করে গাছের গুঁড়ি ফেলা আছে। পার হতে হৃৎকম্প হয়। ও-পাশে সারাক্ষণ সমুদ্র এসে আছড়ে পড়ছে জংগলের ধারে ধারে। নীল আর সবুজ দেখতে দেখতে মাইল পাঁচেক হেঁটে এসে পৌঁছলাম এক টুকরো ফাঁকা জায়গায়। আর চেষ্টা করতে গেলে ফিরে গিয়ে জাহাজ ধরা যাবে না। সুতরাং শোমপেনের সন্ধান এখানেই শেষ। এখানে শুধু দুখানি বাড়ী, দুটি নিকোবরী পরিবার থাকে। আশেপাশে কোথাও জনবসতি নেই, কিন্তু এদের কোন মাথাব্যথাও নেই। সেই প্রকাণ্ড বোতলে ভরা কোকোনাট টোডি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করল। দূরে সমুদ্রে তখন দুখানা ক্যানো ভাসছে। আশে-পাশে জঙ্গল। হু-হু করে সমুদ্রের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। এই দুটি পরিবারের এই হল পৃথিবী।

এ জায়গাটাকে বলে কোশিনটুথ। আরও অনেক জায়গার মধ্যে দিয়ে বাঁ পাশ কাটিয়ে আমরা গেছি—লাফুল, চাকানচেন, ইওহিয়ার, রাপাংগ, রাকাপ্পি, চুলিকোয়া, বেতেলেশোন, চাগারা। ক্যামবেল বে অবশ্য একটু অন্যরকম দেখতে। খাবারের দোকান, পোষ্ট অফিস, সিগারেটের দোকান এসব আছে। সাইকেলে করে সর্দারজীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জাহাজ থেকে যখন ডাকের থলি নামল তখন সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মাসে একবার কি দুবার ডাক আসে, মেনল্যান্ড থেকে আত্মীয়স্বজনের চিঠি পাওয়া যায়। যাঁরা চিঠি পেলেন, তক্ষুনি খুলে পড়তে লাগলেন। কয়েকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করে হতাশ হয়ে করুণমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। এবার চিঠি আসে নি।

আমাদের জাহাজ থেকে একখানি অ্যামবুলেন্স ভ্যান নামল। শুনলাম এটি হচ্ছে গ্রেট নিকোবরের প্রথম অ্যামবুলেন্স ভ্যান। এখানে গাড়ী রাখার সমস্যা হচ্ছে খারাপ হলে কোন উপায় নেই, কবে জাহাজে করে পার্টস আসবে তার অপেক্ষায় থাকতে হয়। একটি কুড়ি বেডের হাসপাতাল আছে। পাঁচটি ডিসপেনসারি আছে, পাঁচটি ছোটদের ও বড়দের স্কুল আছে। চাষবাসের উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে, যদিও জমি খুব ভাল নয়। ১৯৭৫ সালে চাষ করার জন্য জাহাজে করে মোষ নিয়ে আসা হয়। ১৯৬৯ সালে ১০০টি শি[illegible] পরিবারকে নিয়ে পাইলট প্রোজেক্ট সুরু হয়েছিল। প্রতি পরিবার ১০ একর ধানী জমি ও এক একর বসত জমি পেয়েছিল। তারপরে আরও ১৩৮টি পরিবারকে পাঁচ একর ধান+পাঁচ একর বাগান+এক একর

বেঁটে, তামাটে

আন্দামান আর নিকোবরের মানুষদের মধ্যে তফাৎ অনেক। আন্দামানের যারা আদিবাসী—অর্থাৎ আন্দামানী ওংগে, জারোয়া ও সেন্টিনেলিজ—এরা হল নেগ্রিটো শ্রেণীর। এদের দৈর্ঘ্য মাঝারি, রং ঘোর কালো, চুল কোঁকড়া, ঠোঁট পুরু। নিকোবরী ও শোমপেনরা হল মংগোলয়েড শ্রেণীর। এরা বেঁটে ও তামাটে, চোখ নাক চাপা।

নিকোবরের আদিবাসীদের চেহারা ও ভাষায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের সঙ্গেই বেশী মিল। নিকোবরী ভাষা 'মন খমের' শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, অর্থাৎ এর উৎস হল অস্ট্রিক পরিবারে। নিকোবরের বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন উপভাষার উৎপত্তি হয়েছে, যদিও পারস্পরিক মিল স্পষ্ট। বহুকাল আলাদা আলাদা দ্বীপে থাকতে থাকতে আদি নিকোবরী ভাষা ভেঙে এই উপভাষাগুলোর সৃষ্টি।

আন্দামানের উপজাতিরা এখনও মূলতঃ শিকারী ও অরণ্য নির্ভর। এরা তীরধনুক দিয়ে শুয়োর মারে, বর্শা দিয়ে মাছ গাঁথে, মধু ভাঙে, বুনো ফল পাড়ে, শিকড় বাকড় খুঁড়ে খায়। নিকোবরীরা কিন্তু নারকেল, সুপারি, বুনো লেবু, কেউড়ি, কলা, শাকসবজির চাষ শিখেছে অনেক আগেই। শুয়োর পুষতে শিখেছে। তাই এদের মধ্যে গ্রাম গড়ে বহু মানুষ একসঙ্গে থাকার প্রবণতা রয়েছে। নিকোবরে শুধু শোমপেন উপজাতির মানুষ কটিই এখনও বনচারী। আন্দামানের উপজাতিরা কিন্তু সবাই এখনও বনচারী ও ভ্রাম্যমান। বড় বড় আদিবাসী গ্রাম সেখানে নেই। আন্দামানের গ্রামগুলোর বাসিন্দারা বাইরের লোক, বাঙালী, তামিল, কেরলী।
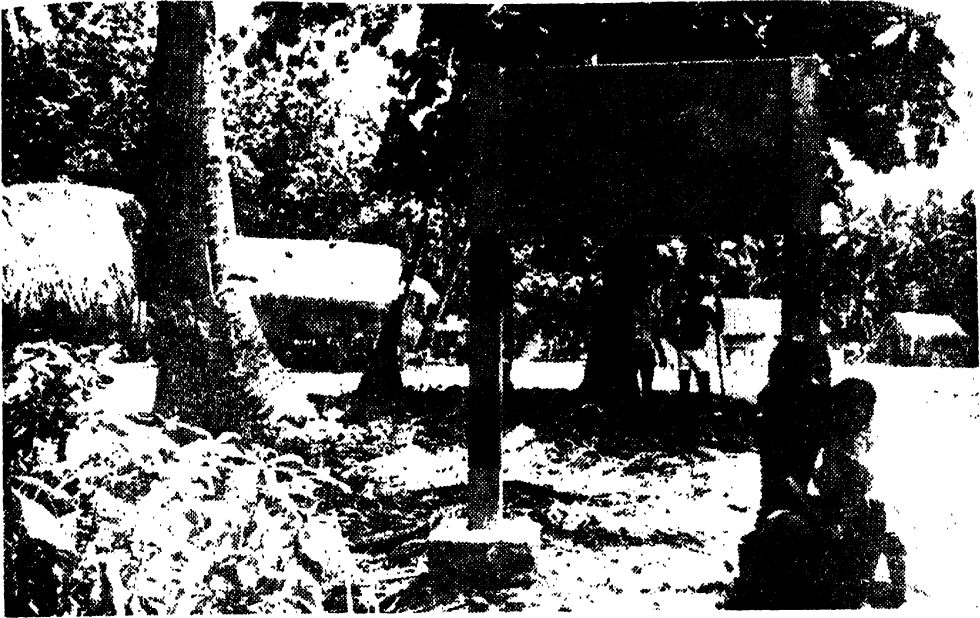
গাঁয়ের নাম মালাক্কা : ১৯৬৯ জনের বসতি, গাঁয়ের মোড়ল আলবেন

বাস্তু হিসাবে জমি দেওয়া হয়। বাড়ী বানানর জন্য দেওয়া হয় পাঁচ হাজার টাকা পরিবার পিছু। এছাড়া বীজ, মোষ, সার, কীটনাশক ইত্যাদির জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে। তিন বছর বিনা পয়সায় রেশনও দেওয়া হয়েছে।

পোর্টব্লেয়ারে এক সরকারী অফিসার গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, ভারত হচ্ছে ফ্রম কাশমীর টু গ্রেট নিকোবর। কাশমীর টু কেপ কমোরিন বলা ভুল, কারণ গ্রেট নিকোবর আরও দক্ষিণে। এর দক্ষিণতম কোণটির নাম হল পিগম্যালিয়ন পয়েন্ট। সেখানে আমাদের যাওয়া হল না।

নিকোবরের জঙ্গলে বুনো জানোয়ার কম। কিছু শুয়োর আছে, এক ধরনের বাঁদর আছে, রং ঘোর কালো, আওয়াজ কর্কশ। এছাড়া প্রচুর পাখী আছে, বিশেষ করে ঘুঘু যা কলকাতার চিড়িয়াখানায় "নিকোবরীস্ পিজিয়ন" লেখা আলাদা খাঁচায় থাকে। অজগর সাপ আছে। এক জায়গায় বর্ডার রোডসের ক্যাম্পে বসে গল্প করছিলাম। ও'রা বললেন, মাঝে মাঝে অজগরগুলো এসে রাস্তার উপর শুয়ে থাকে, আমরা তুলে সরিয়ে দিই। জঙ্গলে কোন ভয় নেই।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বিকালবেলায় গ্রেট নিকোবরের এক নির্জন সমুদ্রতীরে বসেছিলাম। বিরাট বিরাট ঢেউ এসে গর্জন করে আছড়ে পড়ছে বালির উপর। এখানে এখনও টুরিস্টের আক্রমণ সুরু হয়নি। শুধু কয়েকটা সামুদ্রিক পাখী আপনমনে কখনও বালি খুঁটছে, কখনও পাখা গুটিয়ে ছোঁ মারছে ঢেউ-এর মাথায়। মানুষের মত এখানে ওদেরও কোন ভয় নেই• কোন উদ্বেগ নেই। প্রচুর জল, খাবার, সূর্যের আলো, জঙ্গল :

ম্যাউন্ট ব্যাটেন টকিজ

আন্দামান নিকোবরে বছরে গড়ে ৪।৫টি খুন হয়। প্রায় সবই আন্দামানে। নিকোবরে খুনের ঘটনা খুবই কম। ১৯৭৪ সালের তথ্য পাওয়া গেল : খুন ৪, চুরি ৫৮, ছিঁচকে চুরি ১৩৭ এবং অন্যান্য আইন ভঙ্গের ঘটনা মিলিয়ে মোট অপরাধের সংখ্যা ১,৩৮৬। আলাদা করে নিকোবরের হিসাব পাওয়া গেল না, তবে খুবই সামান্য।

১৯৭৪—৭৫ সালে আন্দামান নিকোবরে যানবাহন দুর্ঘটনায় মোট পাঁচজন মারা যান, ৮৫ জন আহত হন। বাস ট্রাক জীপ ইত্যাদি নিয়ে মোট ৫৬টি দুর্ঘটনা হয়েছিল। অধিকাংশই আন্দামানে।

নিকোবরে সিনেমা হল নেই। আন্দামানে দুটি আছে : লাইট হাউস সিনেমা ও মাউন্ট ব্যাটেন টকিজ। অবশ্যই পোর্টব্লেয়ারে। ওখানে বাঙ্গালীরা ধুমধাম করে দুর্গাপুজো করেন। বিসর্জনের দিন বিরাট শোভাযাত্রা করে প্রতিমা যায়। কারণ অনেক বাঙ্গালী আছেন। নিকোবরে এসব নেই। বাঙ্গালী কিছু সরকারী অফিসার সাময়িকভাবে থাকেন সংখ্যা কম।

দেশ প্রেমের গান

আন্দামান নিকোবর মিলিয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা ৪৩-৫৯ শতাংশ। মোট ২০২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে— প্রি-প্রাইমারী স্কুল ৪, জুনিয়র বেসিক স্কুল ১৫১, সিনিয়র বেসিক ৩০, হায়ার সেকেন্ডারী ১৫, কলেজ ১, টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ১। একমাত্র কলেজটি অবশ্যই পোর্টব্লেয়ারে। নিকোবরে কলেজ বা ইন্সটিটিউট নেই, হায়ার সেকেন্ডারী আছে ২টি। স্কুলে প্রচুর খেলাধুলো হয়, স্কুলের ভেতরে অনেক নারকেল গাছ আছে। প্রত্যেকদিন ক্লাস সুরু হবার আগে দেশ প্রেমের গান গাওয়া হয়, মাস্টারমশাইরা ছাত্রদের দেশবিদেশের খবর দিয়ে দেন। বাঙালী ছাত্রেরা বাংলা পড়তে পায়।

[illegible] কোন হারানো দিনে নৌকো করে এসেছিল মানুষ

রবীন রায়

আলোকচিত্র : তুষার পত্রনবীশ

উদ্ভিদ

রঞ্জিত রায়চৌধুরী

সব ঘটনা খুব একটা গুছিয়ে বলে উঠতে পারছিলেন না মনিময়।

বিশেষ করে সেই অংশটা যেখানে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর মানুষটার মাথা ক্রমশ ঝুঁকে আসছে, সে জায়গায় পেঁছে প্রতিবারই কেমন যেন অসহায় বোধ করছিলেন। সব কিছু বাদ দিয়ে ঐ অংশটা নিয়েই বরাবর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন ডাক্তার ভদ্রলোক। শেষের দিকে মনিময় নিজেই আর তেমন সাহস পাননি। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে তিনি যা জানেন না ডাক্তার তাকে দিয়ে সেটাই কবুল করিয়ে নিতে চায়। মনিময় হঠাৎ করেই আলোচনা ভেঙে উঠে পড়েছেন। পাছে ডাক্তার কোন প্রসঙ্গ তুলে বাধা দেয় তাই আগ বাড়িয়ে নিজেই বলেছেন :

আজ তবে উঠছি।

পথে নেমে নিজের ওপর নিজের রাগ হয়েছে। কিছুর মধ্যে কিছু নয় অথচ নিজেই খুঁজে পেতে ডাক্তারের পরামর্শ চাইতে এসেছিলেন। ঐ দুর্বলতা [illegible] কী? আসলে নিখিলেশ আর বৌমার ব্যস্ত হয়ে ওঠার দরুন এটা তাঁকে করতে হয়েছে। আজকাল তাঁকে নিয়ে ওদের দুটির যেন দুশ্চিন্তার শেষ নেই। পর পর কদিন ওদের কথা মতো সারারাত ধরে আলোটা জ্বালিয়ে রাখতে হয়েছে তাঁকে। মাঝে মাঝে বৌমা ঘ্যানর ঘ্যানর করতে ছাড়েনি। সেই এক কথা।

'বাবা ডাক্তার দেখালেই তো পারেন।'

অনেকটা বৌমার কথা মনে করেই ডাক্তার দেখানো। এরি মধ্যে রীতিমতো অসুস্থ মেয়েটা। প্রথম মা হতে চলেছে—ভীষণ দুর্বল। এ অবস্থায় যত কম দুশ্চিন্তা করতে হয় ততই ভালো। কিন্তু এ ধরনের চিকিৎসা। যে ঘটনা মনিময় জানেন না—সেই মিথ্যে ব্যাপারটাই তাকে মেনে নিতে হবে। যা তিনি স্পষ্টতই স্বপ্নে দেখেছেন—ডাক্তার তাকে খবরের কাগজের সংবাদ বলে চালাতে চাইছে!

বৌমা আর নিখিলেশ অনেক সময় পর্যন্ত ঘর ছাড়েনি। স্পষ্ট মনে আছে মনিময়ের, ওরা দুটিতেই ভয় পাওয়া গলায় শুধোচ্ছিল।

'বাবা : অমন করছেন কেন বাবা?'

[illegible] কিছুতেই বলে উঠতে পারেননি মনিময়। শুধু বহু সময় দুটির দিকে তাকিয়ে থেকেছেন।

সকাল দশটার রোদের নিচে শহর।

সবুজ আলো [illegible] ওঠার মু[illegible] উত্তর থেকে দক্ষিণ, [illegible]ণ থেকে উত্তর ঊর্ধ্বশ্বাস গাড়িগুলো হুসহাস এগিয়ে শুরু করেছে। ফুটপাথের গা ঘেঁ[illegible] চ্যানেলটা কিছুটা গিয়ে বাঁয়ে মোড় নি[illegible] সেই চ্যানেলের ওপর তখনও ঠায় [illegible] দাঁড়িয়ে। ফলে পেছনে একসার গাড়ি[illegible] পর। সেই সব গাড়ির ভেতর থেকে অ[illegible] সমানের লোকটার এহেন বেল্লিক খিস্তি দিয়ে উঠেছে। থর থর থ[illegible] সমস্ত শরীর অস্থির ভঙ্গিতে কাঁ[illegible] যাচ্ছে স্টার্টে থাকা গাড়িটা। [illegible] দৃশ্যের কোনখানে ছিঁটে-ফোঁটা [illegible] নেই। শুধু একজন—যেন বহু পথ [illegible] হয়ে ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে স্টিয়ারিং হুইলের [illegible] নিঃশব্দে হাজার মানুষের চোখের একটু একটু করে মৃত্যুর মধ্যে যাচ্ছে একজন মানুষ।

অনেক খবর রাখে নিখিলেশ।

একবার ভেবেছিলেন মনিময় ছে[illegible] জিজ্ঞেস করবেন। ডাক্তারের কথায় আস্থা নেই। কিন্তু এমন একটা

ছাপিয়ে কি লাভ পত্রিকাগুলোর। তাছাড়া মনিময় প্রকৃতই একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি দেখছিলেন....। এখানটিতে পৌঁছেই ইতস্তত করতে হয়। ঠিক গুছিয়ে কোন কিছু ভাবতে পারে না তিনি। ডাক্তারের মত এটা কোন স্বপ্ন নয়, ডাক্তারের একটা খবর মাত্র। মনিময় স্থির জানেন, এটা একটা দুঃস্বপ্ন।

লিখতে বসে দু চোখ কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

বহুকাল হলো কোন কিছু লেখার অভ্যাস নেই আর। ছাত্র অবস্থায় প্রতিদিনের ডাইরী রাখার সখ ছিল। এরকম কত অভ্যাসই না মানুষকে ছাড়তে হয়। সুধাহাসির অসুখের সময় সম্ভবত এ ডাইরীটা ব্যবহার করা হয়েছিল। তারপর গত পাঁচ বছর ধরে এটা টেবিলের ওপর চশমার বাকস আর সেফটিরেজারের নিচে একইভাবে পড়ে আছে। প্রথম কখানা পৃষ্ঠায় কিছু লেখা নেই। তারপরই পর পর কতগুলো পাতায় সংখ্যা লেখা। টেম্পারেচারের চার্ট। একেবারে শেষ পাতায় এক কোণে বড় মাসিমা। দত্তবাড়ি। সুখচর শব্দগুলো লেখা।

এক সময় মনিময় লেখা বন্ধ করে বহুবার নাড়াচাড়া করা খবরের কাগজটা খুলে বসেন। এইভাবে কিছু পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ার স্বভাব তাঁর। আজকাল কাগজ খুললেই নানা দুর্ঘটনার সংবাদ চোখে পড়ে।

মনিময় লক্ষ্য করে দেখেছেন আজকাল খবরের বড় আকাল। সেই অভাব মেটানোর জন্যই যেন খবরের কাগজের পৃষ্ঠা জোড়া কোন লোমনাশক ওষুধ বা কাপড় কোম্পানীর বিজ্ঞাপন থাকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এখনো বিজ্ঞাপনের মতো বিলোল ঢং-এ শাড়িপরা বা চোর-ডাকাত মার্কা প্যান্ট-শার্ট চাপানো এর কোনটাই বৌমা বা নিখিলেশ ব্যবহার করতে শেখেনি। মনিময় জানেন এ পরিবারের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সারা জীবন সরকারী খাদ্য বিভাগের চাকরি করেছেন। আত্মীয়-স্বজনেরা এনিয়ে বক্রিকতা করতো বরাবর। বন্ধুরা প্রত্যেকেই সন্দেহ করতো। তিনি জানতেন—প্রায় প্রত্যেকেরই ধারণা ছিল মণিময় নিখিলেশ বা স্ত্রী সুধাহাসির নামে কোথাও জমিজমা কিনে রেখেছেন। এর জন্য কোন কালেও কোন দুঃখ বোধ করেননি মনিময়। শেষের দিকে সুধাহাসি অনুযোগ দিত।

'একটা মাত্র ছেলে। কিছুই করলে না তুমি।'

আসলে ছোটখাটো একটা বাড়ির সখ ছিল সুধার। তবু মনিময় প্রসঙ্গটা উঠলেই হেসে উঠেছেন।

'অত টাকা কোথায় ?'

জমি অবশ্য আগেই কেনাছিল এক-টুকরো। ঠিক করেছিলেন রিটায়ার করার মুখে জমা ছুটি নিয়ে বাড়িটা তুলবেন। সেভাবেই শুরু হয়েছিল। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই সুধা অসুস্থ। সব গোলমাল হয়ে গেল। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন মনিময়। ডাক্তার ওষুধ নার্সিংহোম সব কিছুই করা হয়েছিল।

'মা আজকের এই তিথিতে পাঁচ বছর আগে তুমি আমাদের কাঁদিয়ে চলে গেছো। আজ অশ্রুসিক্ত চোখে আমরা তোমায় স্মৃতি বাসরে মিলিত হয়েছি। তোমার—রুমা, ঝুমা, ইরু, কমল ও শিবানী।'

ছাপার কোন গোলমালের দরুন ছবিটা ঝাপসা।

ছবির ওপরে জ্বলজ্বল করছে 'মাতৃ-স্মৃতি' শব্দ দুটো। বহু সময় ছাপানো অংশটার দিকে তাকিয়ে থাকেন মনিময়। ভাবতে চেষ্টা করেন একটা বিরাট জম-জমাট সংসার সর্বক্ষণ ব্যস্ত একজন রুগ্না মহিলার মুখ। কাগজের মাথায় তারিখটা দেখলেন। একুশে আষাঢ়। এখন শ্রাবণের শেষ সপ্তাহ। কোনকালেও তেমন শক্ত অসুখ হয়নি তাঁর। কাজেই নিজেকে নিয়ে কোন দুর্ভাবনা নেই মনিময়ের। ডাক্তার যাই বলুক মৃত্যু সম্পর্কে আদৌ তিনি চিন্তিত নন। সুধাহাসির মৃত্যুর পর কটা দিন এক ধরনের শূন্যতা বোধ করতেন।

তখন মনে হতো সম্ভবত তিনি সামলে উঠতে পারবেন না। মনে হতো ছেলে বৌর কাছে বোঝা হয়ে গেলেন। সে অবস্থা খুব দ্রুত কেটে যায়।

'হারাইয়াছে'

আবারেও পড়লেন মনিময়।

'গত ৭ই আষাঢ় রাত্রি নয় ঘটিকায় সরকারী হাসপাতাল হইতে দক্ষিণ শহরতলিগামী বাসে আমার একটি এ্যাটাচিকেশ হারাইয়াছে। কাগজপত্র সহ ব্যাগটি ফেরৎ দিলে পুরস্কৃত করিব।

তার অর্থ মূল্যবান কিছু ছিল।

মনিময় ভেবে পান না এমন করে কোন কিছু কি করে হারায় মানুষ। এতবড় জীবনে কখন সেরকম কিছু ঘটেনি তাঁর। আসলে চিরকাল নিয়মের মধ্যে কাটিয়েছেন তিনি। সব কিছুরই একটা বাধা ছক ছিল। এমন কি স্ত্রী সুধাহাসির মৃত্যুতেও না। কষ্ট হয়েছে। দীর্ঘকাল, প্রায় চল্লিশ বছর সেই যে সতেরো বছর বয়সে সঙ্গিনী হয়ে এসেছিল—সেই থেকে চল্লিশটা বছর দুঃখে-সুখে কাটিয়ে গেছে সুধা। তবু অতবড় ঘটনাভাকে মেনে নিয়েছেন মনিময়। কথনো তা মূল্যবান কিছু হারানোর [illegible] মনে হয়নি তাঁর।

মনিময়ের মনে হয় এই [illegible] এতকাল সংবাদপত্র চাকরি অভ্যাস তাঁর [illegible] কোন কালেও তিনি কোন জন্ম গ্রহণের খবর পাঠ করেননি। অথচ মৃত্যুর খবর প্রায়ই লক্ষ্যে পড়ে। যতদূর মনে আছে—একবার একটা জন্তুর জন্ম বৃত্তান্ত ছিল পত্রিকায়।

সংসারে মানুষের জন্ম গ্রহণের খবর হয়তো বড় পুরোনো হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করেন মনিময়। ঘুম আসে না এখন শ্রাবণের শেষ। তবু কেমন যেন একটা গুমট গুমট ভাব। কবে যেন নিখিলেশ ফ্যানের কথা বলেও ছিল। মনিময় রাজী হননি। বরাবর তাঁর সর্দির ধাত।

স্টিয়ারিং হুইলের ওপর একটি মানুষ যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। দুপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে অবিশ্রাম জীবন স্রোত। কেউ টের পাচ্ছে না সকাল দশটার আলোর নিচে মানুষটা একটু একটু করে মারা যাচ্ছে।

হয়তো আর মাত্র কয়েক মিনিটের পথ পার হতে পারলে—মানুষটি তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যেতো—হয়তো কাছেই কোন ইংরাজী স্কুলের দরজায় একটু আগে তিনি তার একমাত্র নাতিকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিলেন। কিম্বা জীবনে এই প্রথম সবকিছু জানা সত্বেও ট্রাফিক রুলের প্রতি আর তিনি আস্থা রাখতে পারেননি। যারা কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অধৈর্য হয়ে গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে—উচ্চস্বরে খিস্তি কাটবে তারা জানতেই পারবে না—এখন আর কোন শব্দই তাঁকে অপমানিত করতে পারে না! ডাক্তারের বিশ্বাস এটা একটা সংবাদ মাত্র। মনিময় বুঝতে পারেন—একটা দুঃস্বপ্ন কোনভাবে তাকে গত কিছুকাল ধরে তাড়া করে ফিরছে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর একটা মাথা ক্রমশ নেমে আসছে।

কোথাও সামান্য একটু শব্দ পর্যন্ত উঠছে না।

লেখা শেষ হতে উঠে জানলাটার পাল্লা ভেজিয়ে দেন মনিময়। প্রায় সারাদিনই ঘরটায় কোন না কোন ভাবে রোদ ঢোকে। অন্যদিন সাধারণত এই সময়টা বৌমার ঘর থেকে রেডিওর শব্দ ভেসে আসে। আজ কোন সাড়া পর্যন্ত নেই। শরীর বেশী খারাপ হলো কিনা কে জানে। অফিস বের হওয়ার সময় নিখিলেশ যখন চৌকাঠের ওপার থেকেই

'বাবা বের হচ্ছি বলে গলিতে নেমে যায়—মনে মনে ছেলের কথা ভেবে হাসেন মনিময়। বৃদ্ধ বাপের ওপর এতটুকু ভরসা নেই। যেন তাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমি চললুম—ওকে একটু দেখবেন। এ ঘরটাতে বাড়ির মধ্যে সব চাইতে বেশী সময় রোদের আনাগোনা। বৌমার আঁতুড় উঠলে মনিময় ঠিক করে রেখেছেন এঘরটাকে ছেড়ে দেবেন, যাতে যে বৌমার কোল জুড়ে আসছে সে এই আলো-বাতাসে বেড়ে উঠতে পারে।

এক সময় শিয়রে ফেলা ডাইরী নিয়ে ঘুমিয়ে পরেন মনিময়। আলো আর বাতাসের ভেতর ডাইরীর সদ্য শেষ করা অংশটা পড়ে থাকে।

ডাইরী

তখন নিতান্ত বালক বয়স। বৎসরের যে সময়টুকু পিতাঠাকুর তাঁহার ব্যবসা বন্ধ রাখিয়া গ্রামে থাকিতেন—সেই সময় কোথাও যাইতে হইলে প্রায়শ আমাকে সঙ্গে লইতেন। দূর পাহাড়ভূমির অরণ্যে বর্ষা আসিয়া উপস্থিত হইলে—তিনি সমতলে চলিয়া আসিতেন। গ্রামের পরিবেশে পিতাঠাকুরকে একজন ভিন দেশী বলিয়া মনে হইত। তাঁহাকে দেখিয়া গ্রামস্থ কেহ কেহ এরূপ ভঙ্গি করিতেন যেন মানুষটা নিতান্তই অবাঞ্চিত। তিনি পারত পক্ষে এই সকল বিষয় লইয়া ভাবিতেন না। বাটীর বাহির হইলেই তিনি আমার সহিত বাড়ির অরণ্যভূমি পাহাড়ী কাঠুরিয়াদিগের সারল্য বড় হইলে আমাকেও তথায় লইয়া যাইবেন এই সকল বিষয়ে কথা বলিতেন। সাধারণত তিনিই বক্তা তিনিই শ্রোতা।

একবারের কথা স্মরণ হয়। তখন শরৎকাল। কয়েক দিবস পরই পিতাঠাকুর কর্মস্থলে চলিয়া যাইবেন। বেলা দ্বিপ্রহরের কিছু পর আমরা তাঁহার এক বাল্যবন্ধু বাটি অভিমুখে যে রওনা হইয়াছি। তিনি আসে আগে, আমি পশ্চাতে। গ্রামের সীমানা পার হইলেই গাবগাছিয়ার সুবিশাল প্রান্তর। আয়োজন বিস্তৃত সেই প্রান্তরের কোন স্থানে কোন জনমানুষ লক্ষ্য পরে না। প্রায় শব্দহীন চতুর্দিক। রৌদ্রের ভেতর দিয়া সমস্ত কিছুই অস্পষ্ট দেখাইতেছে। সহসা তিনি পথিপার্শ্বস্থ একটি উদ্ভিদ দেখিয়া আমাকে ডাকিয়া লইলেন।

গাছটা চিনে রাখো মনি। এর পাতার রস সাতদিন পর পর লাগালে— শ্বেতি কিম্বা ধবল যাহাই হউক তার দাগ মিলিয়ে যায়।

সেই বয়সে তৎপূর্বে শ্বেতি বা ধবল রোগ বিষয়ে কিছুই জানতাম না। তাহা ভিন্ন একটি মাত্র উদ্ভিদ ভিন্ন কোন দিনও ঐরূপ দ্বিতীয় কোন উদ্ভিদ দেখিয়া রাখিবার অবসর হয় নাই। রক্তবর্ণ সেই উদ্ভিদ যতদূর স্মরণ হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র সকলের ভিতর দিয়াও বর্ণছটায় উজ্জ্বল ছিল। সমস্ত জীবন ধরিয়া পরে কত মানুষকেই না ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখিয়াছি। তথাপি কস্মিনকালেও আর সেই উদ্ভিদের কথা মনে পড়ে নাই। এক্ষণে বুঝিতে পারি, কোনক্রমেই আর সেই হারানিধি ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। রক্তবর্ণ সেই উদ্ভিদ অলক্ষে সম্পূর্ণ অবহেলায় আজ বহুকাল হইল শুকাইয়া গিয়াছে।

এতটুকু আশা

শক্তিপদ রাজগুরু

মানুষ জীবনের অনেক ব্যর্থতা আর দুঃখের মাঝে একটি আশ্বাস, সান্ত্বনা খুঁজে নেয়, আর সেই আশ্বাসটুকুকে নানা যুক্তি দিয়ে অমোঘ সত্যে পরিণত করা, তাই নিয়েই পথ চলে। দিশাহারা অকূল গাং-এ বাওয়ালীদের দেখেছি বাদাবনে-নোনা গাং-এ তুফানে রাত-বিরেতে। তারা কোন দূর আকাশের তারাকে নিশানা রেখে ওই নদী পাড়ি দেয়।

ভদ্রমহিলাকে দেখে তার কথাগুলো শুনে মনে হয়েছিল ও যেন এমনি কোন একটি আশ্বাসকে অবলম্বন করে এতবড় দুঃখকে সয়। কবে জীবনের কঠিন পথটা অতিক্রম করে চলেছে। ওই ভদ্রমহিলা মুখে চোখে কথায় সেই আশ্বাসটুকুকে নিজের যুক্তি দিয়ে সত্যে পরিণত করে ওই নিয়ে সব দুঃখ ভুলেছে।

বিপিনবাবুর ছেলে অমিয়কে আমি দেখেছি এর আগেও। মুখ চেনা। পাড়ার অন্যান্য সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে দেখেছি খেলার মাঠে, ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। দল বেঁধে স্কুলে যেতেও দেখেছি। সহজ সরল সাধারণ চেহারা, চোখ দুটো বেশ বড় বড় আর মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, ফলে ওর মুখ চোখের সারল্যটুকু সহজেই চোখে পড়ে। শুনেছি অমিয় নাকি পড়াশোনাতেও ভালো। প্যান্ট-সার্ট-এর চেয়ে ওকে ধুতি পাঞ্জাবিই পরতে দেখেছি। ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সলজ্জ ভঙ্গীতে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ তেজদৃপ্ত স্বরে সুকান্তের কবিতা আবৃত্তি করেছে।

ওর বাবা বিপিনবাবুও খুব চেনা। আমার বাড়ির লাগোয়া মাঠের পরেই দত্তদের বাড়িতে একতলায় ভাড়া থাকেন ভদ্রলোক। ছোট্ট এলাকা, কলকাতার এক প্রান্ত হলেও এখানে সহরের অচেনা ভাবটা কম। প্রায় সকলেই সকলকে চেনে। ফলে বিপিনবাবুর খবরও আমাদের জানা।

শান্ত নিরীহ ভদ্রলোক, কথা কম বলেন। সাতে-পাঁচেও থাকেন না। মাঝে মাঝে ছুটির দিন আমার এখানে এসে দু-চারটে কথা বলেন, কাগজটা দেখে শুনে বাজারের পথে বের হয়ে পড়েন।

বিপিনবাবু সেদিন জানান—এবার রিটায়ার করছি, কর্তাদের বলে রেখেছি ছেলেটা পাশ করলেই চাকরিতে ঢুকিয়ে দেব। একটা মাত্র ছেলে, ও নিজের পায়ে দাঁড়ালে আমাদের দিন ঠিক চলে যাবে। কি বলেন?

এ স্বপ্ন প্রতিটি মানুষই দেখে। আজীবন কঠিন পরিশ্রম করার পর ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিজে এবার বিশ্রাম নিতে চায়। বিপিনবাবু বলেন, ছেলেকে তো চেনেন? অমিয়ও বলছিল—ও অবশ্য অনার্স পাবেই। পড়াশোনাতে ভালোই।

বিপিনবাবু স্বপ্ন দেখেন। অবশ্য পাড়ার অনেক বয়স্ক লোককেই এ-সব স্বপ্ন দেখতে—এসব পরিকল্পনা করতে শুনেছি। বিধুবাবুর ছেলে দুটো মানুষ হয়ে গেছে। নিশীথবাবুর ছেলে ডাক্তার। বিপিনবাবুও ভাবেন এবার তার ছেলেও নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

বাজারে বের হয়ে গেছেন বিপিনবাবু আমার ঘর থেকে।

গিন্নী ঘরে ঢুকে বলে—কি ভাগবত শোনাচ্ছিল বিপিনবাবু? সুরমার কথায় চাইলাম। জানাই—ছেলের কথা বলছিল। রিটায়ার করছে ছেলেকেই চাকরিতে বসিয়ে দেবে। তারপর কর্তা-গিন্নি দুজনে দেশের বাড়িতে ফিরে যাবেন।

গিন্নী বলে ওঠে—বিপিনবাবুর বৌটিকে তো চেনো না। একটি চীজ। আর ভদ্রলোককে নাকে দড়ি দিয়ে উঠ-বোস করায়। ছেলেটিও তো আধ-পাগলা

আমি জানাই—অর্থাৎ স্ত্রৈন! অবশ্য মেয়েরা তাই-ই চায়।

সুরমার কথাটা হয়তো ঠিক মনে ধরে না। আমি বোধহয় একটু ব্যঙ্গের সুরে কথাটা বলেছি। তাই গিন্নী তাড়া দেয়।

—অপিস বেরুবে না? ওঠো।

হঠাৎ সেদিন সকালে চীৎকার শুনে চমকে উঠলাম। কি যেন একটা কিছু ঘটেছে। সেই শান্ত ছেলেটাকে বিকট চীৎকার করে ওদিকের একটা রিকসাওয়ালার দিকে লাফ দিয়ে যেতে দেখে চাইলাম। অমিয়কে ওভাবে উত্তেজিত হতে দেখিনি, চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। ওর মা চীৎকার করছে, মাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে ওই রিকসাওয়ালাকে ধরেছে, লোকটা বিনা কারণে ওইভাবে আক্রান্ত হতে চীৎকার করে ওঠে।

এদিক ওদিক থেকে দু-চারজন এসে পড়ে। বিপিনবাবুও বের হয়ে যান। পাড়ার মণিলালবাবু—আরও অনেক ছেলের সমবেত চেষ্টায় কোন রকমে ছাড়ানো গেল অমিয়কে।

জানলা থেকে ব্যাপারটা দেখেছি, সুরমাও এসে পড়েছে। ওই-ই বলে—ওটা তো বদ্ধ পাগল, জানো না? সেদিন বিপিনবাবুকেই টুঁটি টিপে ধরেছিল।

অবাক হই কথাটা শুনে। বেশ কিছুদিন বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি। তার মধ্যে এমনি একটা ব্যাপার ঘটেছে জানতাম না। সুরমা বলে—হবে না? সবই বরাত। ভদ্রলোক তো নিরীহ গোবেচারা। ওই মেয়েটাই হাড়বজ্জাত। মায়ের পাপের ফল ভোগ করছে ছেলেটা।

একটু অবাক হই। বিপিনবাবু যেন অনেককেই এড়িয়ে চলছেন এটা বুঝতে পারি। সকালে পার্কে এ পাড়ার বয়স্কদের অনেককেই দেখা যায়। এর আগে বিপিনবাবুও বের হতেন ওদের সঙ্গে। সময় থাকলে আমিও বেরুতাম। ফাঁকা পার্কের গাছ-গাছালি—ঘাস ঢাকা এতটুকু সবুজ স্নিগ্ধতার আবেশ ইঁট কাঠের শহরে তবু ঋতু পরিবর্তনের খবরটা আনে। বাতাসে কখন উদাস মুচকুন্দ চাঁপা ফোটে গ্রীষ্মের সকালে, কখন বর্ষার ক্লান্ত অপরাহ্ণে বকুল ফুলের খবর পাওয়া আসে—আবার বিলের ধারে কাশ ফুল ফোটে এ খবরগুলো এখানে এলে পাই। তাই বের হই মাঝে মাঝে।

সেদিন দেখি বিপিনবাবু পার্কের এক পরিত্যক্ত কোণে একা বসে আছেন এদের সাহচর্য এড়িয়ে। বিপিনবাবু আমাকে দেখতে পান নি, ওর চোখে মুখে দেখেছি বিষণ্ণতার থমথমে আভাস। পরণে আধ-ময়লা ধুতি, একটা ময়লা পাঞ্জাবি—কাঁধের কাছটায় ফাটা, পায়ে সোল খেয়ে যাওয়া এক জোড়া হাওয়াই চটি। আর হাতে এর আগে লাঠি দেখিনি, আজ দেখলাম জীর্ণ দেহের ভার কিছুটা সহজভাবে বইবার জন্য লাঠিরও প্রয়োজন হয়েছে। সারা দেহে মনে একটা যেন ঝড় বয়ে গেছে ওর।

আমাকে দেখে চমকে ওঠেন বিপিনবাবু! যেন কি একটা অন্যায় কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন। সপ্রতিভভাবে হাসবার চেষ্টা করেন তিনি, কিন্তু সেই হাসি কান্নার চেয়ে ও করুণ বলেই বোধ হয়।

বিপিনবাবুর মুখে চোখে আগেকার সেই ঔজ্জ্বল্য নেই। তবু শুধোই ওকে—কেমন আছেন? অনেক দিন দেখিনি—

বিপিনবাবু বলার চেষ্টা করেন—আর আছি! কোন রকমে বেঁচে আছি মাত্র। রিটায়ার করে গেলাম—এদিকে ভগবানও মায়লো। খাই, বাড়িতে না থাকলে আবার হুলস্থূল কান্ড বেধে যাবে।

কোন রকমে এড়িয়ে গেলেন তিনি।

ছোট এলাকাটায় হঠাৎ যেন ডাকাত পড়েছে। হৈ-চৈ পড়ে যায়—পার্ক থেকে বেড়িয়ে ফিরছি, লোকজনের চীৎকার শুনে এগিয়ে গেলাম। রাস্তার ধারেই কেষ্ট মুদীর দোকান। লোকটা ক'বছরেই বেশ শাঁসেজলে ফুলে উঠেছে, দোকানের পরিধিও বেড়েছে তার ভুঁড়ির পরিধির সঙ্গে সঙ্গে। আর এদিকের কোন রাজনৈতিক দলের মাতব্বর হৃদয়বাবুর সঙ্গে হৃদ্যতা বেড়ে উঠেছে।

সেই কেষ্ট মুদীকেই প্রকাশ্য দিবালোকের রাস্তার উপর চিৎ করে ফেলে তার বুকের উপর বসে হুঙ্কার ছাড়ছে সেই অমিয়, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে, মুখ দিয়ে গাঁজলা বের হচ্ছে আর সম্পূর্ণ চেহারাটা বদলে গিয়ে একটা নৃশংস জানোয়ারে পরিণত হয়ে হুঙ্কার ছাড়ছে আর বেপরোয়াভাবে ঘুঁসি কিল মেরে চলেছে, প্রাণ ভয়ে কেষ্ট মুদীও চীৎকার করছে, লোকজন ছেলেপুলের ভিড় জমে গেছে রাস্তায়। ওই উম্মাদের হিংস্র মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেছে অনেকেই। কেষ্ট মুদীর দু-চারজন কর্মচারী আর কিছু ছেলের দল ওকে ধরে কোন রকমে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছে, কিন্তু ছেলেটার সারা দেহে এসেছে মত্তহাতির শক্তি, ওরা কে একজন হুড়কো দিয়ে উন্মাদটার পিঠে প্রচন্ড আঘাত করতে সে ছিটকে পড়ে—তখন ওরা ছেলেটাকে দড়ি দিয়ে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে ফেলেছে, একটা পশুকে যেভাবে বাঁধে ঠিক সেইভাবে। তখনও বন্দী অবস্থায় গর্জাচ্ছে সে—খুন করেসা! করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

স্বয়ং হৃদয়বাবু—পাড়ার অনেকেই এসে পড়ে। ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনে তখন কেষ্টবাবুর ফাটা নাক কপালের পরিচর্যা হচ্ছে। আর বন্দী ছেলেটা যেন রক্তের গন্ধে উন্মাদ হয়ে দাপাচ্ছে।

চোরের মত একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন বিপিনবাবু, হৃদয়বাবুই শাসান, অনেক সহ্য করেছি ওই পাগলামী, এবার ডান্ডা বেড়ি দিয়ে ছেলেকে বেঁধে রাখুন—তার ব্যবস্থা আমিই করছি। আর এইসব খুন-খারাপি চলতে থাকলে—এপাড়া থেকে উঠে যেতে হবে।

অমিয়ের ওই পাগলামীর ঘটনা অনেকেই জানে। পথে ঘাটে অনেককেই মারাত্মকভাবে জখমও করেছে। ও যেন সারা পাড়ার একটা মূর্তিমান আতঙ্ক তাই বসন্তবাবু, নিশীথ সেন, সরকারমশাই সকলেই আজ সায় দেয়—ঠিক বলেছেন হৃদয়বাবু, এর পর কিছু ঘটলে ওকে বের করে দিতে হবে এখান থেকে। খুন-খারাপিই না করে বসে শেষকালে।

ছেলেটা তবু এখান থেকে যাবে না। গর্জাচ্ছে আর চীৎকার করছে।

—পৃথিবীর সমস্ত বর্বরতাকে আমি ঘুচিয়ে দেব। আমি সূর্যের সন্তান, কোথা সুদর্শন। সুদর্শন চক্র দিয়ে খান্ খান্ করে দোব এই পৃথিবীর সব পাপকে। সুদর্শন—কোথা সুদর্শন—

ওরা কে ছেলেটার কপালেই একটা লাঠির ঘা মেরেছে, তবু থামে না সে। বাধ্য হয়ে দড়ি বেঁধে ওকে বন্দী জানোয়ারের মত টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে। হাঁটু-হাত-পা ছড়ে রক্ত পড়ছে। ও যেন আর মানুষ নয়—মানুষের সব পরিচয় হারিয়ে একটা পশুতে পরিণত হয়েছে।

কতকগুলো মানসিক স্থিতিশীলতা আর সামাজিক রীতিনীতির বেড়া দিয়ে তৈরী মানুষের পরিচয়, যখন সেইগুলো মানুষের মন থেকে যে কোন কারণে হোক মুছে যায়, তখন সে পরিণত হয় পশুতে। মানুষ আর পশুর মধ্যে আদিম ব্যবধান খুবই সামান্য, মানুষ তাই ভয় করে এই অসহায় অবস্থাটাকে। তাকে এড়াতে চায়—নজরের বাইরে নির্বাসিত করে রাখতে চায়। তাই বোধহয় মানসিক ভারসাম্যহীন এদের মত অসহায়গুলোকে এরা বন্দী করে রাখে মানুষের সব অধিকার মর্যাদাটুকু কেড়ে নিয়ে।

ওরা অতীতের সেই হাসি-খুশী ছেলেটাকে আজ তেমনি আপাংক্তেয় করে পশুত্বের ছাপ এঁকে দিয়েছে।

....চুপ করে বসে আছি ঘরে। রাত্রির অন্ধকার স্তব্ধতা ছাপিয়ে কানে আসে সেই উন্মাদ ছেলেটার অসহায় অব্যক্ত আর্তনাদ। মনে পড়ে বিপিনবাবুর বিবর্ণ ম্লান চাহনিটা, ভদ্রলোকের সব আশা-স্বপ্ন ওই বেদনার্ত আর্তনাদে পরিণত হয়েছে। আজ ওকে পাড়া থেকে দূর করে দেবার ব্যবস্থাদিও পাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চাকরি নেই—রিটায়ার করেছেন, যোগ্য ছেলেটাও অমনি বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে।

বিপিনবাবুকে সকালবেলায় আমার এখানে দেখে একটু অবাক হই। বেশ কিছুদিন পর ওঁকে দেখলাম এখানে।

—বলুন! কি ব্যাপার!

বিপিনবাবু চাইলেন আমার দিকে অসহায় নীরব চাহনি মেলে। পাড়ার অনেকের কাছেই কি ব্যবহার পেয়েছেন তা জানি, আমি অবশ্য ওদের মত বিপিনবাবুর সম্বন্ধে ওই ধরনের বিশ্রী মন্তব্য করিনি। ভদ্রলোক সেটা জানেন—ইতিপূর্বে তিনি পাড়ার অন্যত্র বিশেষ যেতেন বলে আমার জানা নেই, এখানেই আসতেন। পরে হয়তো লজ্জায় পড়ে এখানেও আসেন নি।

আজ এসেছেন বাধ্য হয়েই! বিপিন-বাবু জানান।

—ছেলেটার ব্যাপারে ডাঃ মিত্রের কাছে একবার যাবো ভাবছি। ওঁকেই দেখাই। আপনার তো বিশেষ বন্ধু প্রায় মিত্র, তাই এসেছিলাম যদি ওকে একটু বলে কয়ে দেন।

আমিও ছেলেটার জন্য দুঃখ বোধ করি। তাই ডাঃ মিত্রকে চিঠিটা লিখে দিলাম। 'ফিস্'-এর ব্যাপারটাও একটু বিবেচনা করতে বললাম নিজে থেকেই।

বিপিনবাবু হতাশা-ভরা স্বরে জানান।

—সবই আমার অদৃষ্ট নিমেষবাবু, না হলে এক তরকারি তাও নুনে পুড়ে গেল। ওই একমাত্র সন্তান—আজ ওর জন্যে লোক সমাজে আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই।

ওকে সান্তনা দেবার ভাষাও পাই না। কথাটা বেদনাদায়ক হলেও নিষ্ঠুর সত্য। আজ বৃদ্ধ বয়সে ভদ্রলোকের শেষ অবলম্বনটুকুই কি দুঃসহ গ্লানিময় বোঝায় পরিণত হয়েছে। তবু জানাই।

—দেখুন ডাঃ মিত্রকে একবার। ওর তো এ লাইনে খুব পসার। এর আগেও দু-চারজনকে পাঠিয়েছি ওর কাছে। তারা সকলেই ভালো হয়ে গেছে। বিপিনবাবুর চোখ দুটো ছলছল হয়ে ওঠে। অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠে বলেন তিনি।

—সেই আশীর্বাদই করুন। বেচারা সেরে উঠুক। ওর যন্ত্রণা আমি দেখতে পারছি না। ওদের শাসানিতে ডান্ডা বেড়ি শিকল পরিয়ে একটা জানোয়ারের মত ঘরে বন্দী করে রেখেছি। হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে ঘা হয়ে গেছে—

ভদ্রলোক কথাগুলো শেষ করতে পারেন না। কি বেদনায় দু' চোখ জলে ভরে আসে।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে ও-পাশের ঘরে সুরমার সঙ্গে এক গোল গোল ভদ্রমহিলাকে কথা বলতে দেখে দাঁড়ালাম। ওর পরণে চওড়া লাল পাড় শাড়ি, কপালে সিঁদুরের বেশ বড় সড় টিপ। ঠোঁট মুখে পানের জ্বলচে আভা। চেনা চেনা মুখটা মনে হয়।

সুরমা কিছু বলার আগেই ভদ্রমহিলাই জানান।

—আমাকে দেখেছেন দাদা, আমি অমিয়ের মা। ওই যে পিছনের বাড়ি—

এতক্ষণে খেয়াল করতে পারি। সুরমাও জানায়।

বিপিনবাবুর স্ত্রী!....

অমিয়ের নামটা বেশ কিছুদিন পাড়ার চেনা নামগুলোর ফর্দ থেকে মুছে গেছে। আজ তবু ভদ্রমহিলা বেশ সহজভাবেই পরিচয় দেন সেই পাগল ছেলেটার মা বলে। চা এসে গেছে। ভদ্রমহিলা বেশ জাঁকিয়ে বসে বলেন—

—আমার ছেলে কিন্তু পাগল নয়। ওর বন্ধু-বান্ধব বলেছেন তাই স্পেশালিস্টকে দেখাচ্ছি। তবে আমি জানি আমার ছেলের আসল ব্যাপারটা। ওর দিকে চাইলাম। ভদ্রমহিলা বলেন—

—এ ওর অগ্নি-পরীক্ষা দাদা। দিব্যত্বের দীক্ষা নিতে গেলে এসব প্রস্তুতির দরকার।

অবাক হই ওর কথায়। ভদ্রমহিলার চোখে মুখে কি যেন অতীত স্মৃতির নীরব নিবিড় উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। তিনি বলে চলেছেন—

প্রথম থেকেই আমার ছেলে খুবই নিষ্ঠাবান ভক্ত। উপনয়নের পর থেকেই পূজো আসা এসব বেড়ে যায়। একদিন সন্ধ্যা আহ্নিক করার সময় চোখের সামনে কি এক বিরাট মূর্তির আগুনের আভা দেখে বিকট চীৎকার করে ফিট হয়ে গেল। তারপর থেকেই ভদ্রমহিলা চুপ করে যান। সারা ঘরে যেন কোন এক অশরীরীর উপস্থিতির স্তব্ধতা নেমেছে। ভদ্রমহিলা বলেন উত্তেজিত স্বরে। —ওকে উপনয়নের সময় অদৃশ্য দীক্ষা দিয়েছেন এক দেবর্ষি! ওর জীবনে এই অগ্নি-পরীক্ষা আসবেই দাদা।

ভদ্রমহিলা চলে যাবার পরও চুপ করে বসে আছি। সুরমা তাড়া দেয়।

—খাবে-দাবে না তুমিও ধ্যানে বসবে? ওঠো দিকি। যত্তোসব ঢং। বুঝলে ওই মহিলার জন্য ছেলেটার এই দশা। বুজরুকি!

এসব কথা অবশ্য আমি ভোরের পার্কের বেঞ্চে বসেও শুনেছি। বিষ্টুবাবু, নিশীথ সেন, সরকারমশাইও বলেন।

—এসব রক্তের দোষ মশাই। না হলে এমন সুস্থ ভালো ছেলেটা দুম্ করে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়?

নিশীথবাবু বলেন— ও সব আপদকে পাড়া থেকে দূর করতে পারলে বাঁচি, কবে কখন কি সর্বনাশ করে ঠিক আছে? ওর বাড়িওয়ালা নিতাই ঘোষকে হৃদয়বাবুও বলেছেন। সোজা কথায় না যায় পাড়ার দলবল লেলিয়ে এইবার উৎখাত করবো।

বিধুবাবুর বয়স ষাটের কোঠা ছাড়িয়ে যেতে বসেছে। তবু তার জীর্ণ দু' চোখে কি একটা লোলুপতা ফুটে ওঠে। গলা নামিয়ে বিধুবাবু বলে,

ওই গিন্নী, মানে বিপিনবাবুর ওয়াইফ তো শুনেছি দোজপক্ষের, বয়স তেমন কিছু বেশী নয়। আর দেখতে শুনতে ত—চুপচাপ উঠে আসি। বিপিনবাবু আর সকালে পার্কে আসেন না বোধহয় এইসব বিশ্রী কথাগুলো শুনে তিনিই লজ্জায় অধোবদন হয়ে সরে গেছেন এদের কাছ থেকে।

তবু আশা করেছিলাম হয়তো ডাঃ মিত্রের চিকিৎসায় ছেলেটা সেরে উঠবে। কিন্তু কদিন বিপিনবাবুকেও দেখিনি।

ডাঃ মিত্রের সঙ্গেই সেদিন দেখা হয়ে যায় একটা অনুষ্ঠানে। তিনিই জানান খবরটা। তাঁর মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকেই বলেন কথাগুলো।

অনেক ধরনের মানসিক রোগীর রোগের মূলটা থাকে মনোজগতের বহিরাঙ্গে। তারা সেরে ওঠে। কিন্তু যাদের রোগের মূল নিহিত থাকে অবচেতন মনের অতলে তাদের রোগ সারা খুবই কঠিন। সব অবদমিত বাসনা—কামনাগুলো মাঝে মাঝে সোচ্চার হয়ে তাকে আদিম হিংস্র কোন পশুতে পরিণত করে। তাদের রোগ সারা কঠিন।

ওই ছেলেটি নাকি সেই ধরনের রোগী।

ওকে কোন আশা দিতে পারেন নি ডাঃ মিত্র।

কথাটা শুনে আমিও দুঃখ বোধ করি। হয়তো বিপিনবাবুও আর আসেন নি চরম দুঃসংবাদটা আমাকে জানাতে।

তবু রাতের অন্ধকারে সেদিন ওই পিছনের বাড়ির উঠানে এক ফালি আলো দেখে চাইলাম। আঁধারে ভালো ঠাওর হয় না, দেখা যায় শিকলে বাঁধা এক যেন পশু চার পায়ে হাঁটছে আর অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকার করছে মাঝে মাঝে।

বিপিনবাবু ওই অদ্ভুত বন্দী প্রাণীটাকে টেনে টেনে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁপাচ্ছে, আর বন্দী প্রাণীটা কাতর আর্তনাদ করছে।

সরে এলাম জানলা থেকে।

এ দৃশ্য দেখতেও খারাপ লাগে।

হঠাৎ সেদিন পাড়ায় কাদের চীৎকারও শুনেছি। হৃদয়বাবুকেও দেখেছিলাম এক নজর। জিপ থেকে নেমে ওর বশংবদ কিছু ছেলেদের কি বলছেন। কেষ্ট মুদিও রয়েছে সেখানে। কিছু একটা ব্যাপারের পত্তন হতে চলেছে বোধহয়।

আর ব্যাপারটা জানতেও দেরি হয় না। পরদিন সকালেই বিপিনবাবু এসেছেন। ক্লান্ত শ্রান্ত বিবর্ণ চেহারা, যেন ওর দেহ মনের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। উনিই জানান—আমরা চলে যাচ্ছি নিমেষবাবু। হৃদয়বাবু-বিধুবাবুরা দলবল নিয়ে এসে শাসিয়ে গেলেন। কেষ্ট মুদীও বাকী টাকার নালিশ করবে না গেলে, বাড়িওয়ালাও নোটিশ দিয়েছে। অন্যত্র বাড়ি ভাড়া নেবার সামর্থ্যও নেই। এক এক সময় মনে হয় রেকে গলা দিয়ে এই পোড়া জীবনটাকে শেষ করে দিই। কিন্তু পারি নি—

ওদের প্রস্তুতির কারণটা জেনে চুপ করে থাকি। বিপিনবাবু বলেন—দেশেই ফিরে যাচ্ছি।

—ছেলের চিকিৎসা!

আমার কথায় বিপিনবাবু বেদনার্ত স্বরে জানান।

ও সারবে না নিমেষবাবু। দেশে গ্রামে গিয়ে যা হবার হোক। আমিও এদের বিশ্রী কথার জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাবো এখান থেকে চলে গেলে।

সব আমার ফুরিয়ে গেল নিমেষবাবু! চলি!

ওর থমথমে চোখ মুখে কি ম্লানি আর বেদনা ফুটে উঠেছে। মনে হয় এই মানুষটা জীবনের দুঃসহ বোঝা টেনে টেনে আজ পরাজিত, ক্লান্ত।

সুরমাও জানিয়েছিল কথাটা। ওরা নাকি চলে যাচ্ছে এখান থেকে। সন্ধ্যার পরই বোধহয় বিদায় নিতে এসেছে বিপিনবাবুর স্ত্রী। এ পাড়ায় সুরমার কাছে আসে মাঝে মাঝে। ওকে দেখে চাইলাম। ভদ্রমহিলার মুখ চোখে বিপিনবাবুর মত কোন হতাশা-বিষণ্ণতার ম্লানি নেই। এত ভেঙে পড়ে নি ভদ্রমহিলা। পরনে চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি, কপালে দগদগে সিন্দুরের টিপ, মুখে পানের লাল আভা। ওকে দেখে একটু অবাক হই।

ভদ্রমহিলা বলেন।

—আমরা দেশের বাড়িতে চলে যাচ্ছি দাদা, তাই যাবার আগে দেখা করতে এলাম।

সন্ধ্যা নেমেছে। এদিকটায় গাছ-গাছালি কিছু রয়েছে। আর নির্জনও। সন্ধ্যার পর ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, স্তব্ধতা নামে। ভদ্রমহিলা আজ যাবার আগে যেন একটা কি কথা জানাতে এসেছেন। সারা পাড়ার লোকের নানা বিশ্রী মন্তব্য, ছেলেটার এই সমূহ সর্বনাশ, ওর মনের ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করেনি, ওর চোখ মুখ দেখলে সেটা বোঝা যায়।

কি এক রহস্যময় পরিবেশ নেমেছে ঘরে। ভদ্রমহিলার চোখে মুখে তেমনি এক নিবিড় উত্তেজনার ছায়া। আমার ভাবনা চিন্তা দিয়ে এর অর্থ খুঁজে পাই না।

কিন্তু ভদ্রমহিলা বলে চলেছে এক বিস্ময়কর আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

—আমি নিজের চোখে দেখেছি দাদা। আমার ছেলেই আমাকে দেখিয়েছে, কোথাও প্রকাশ করতে নিষেধ করেছে। তবু আপনাকে না জানিয়ে পারলাম না।

ওর সেই কল্পনার মূর্তরূপে সে দেখেছে কোন বিরাট এক তেজপুঞ্জময় দেবতার বিশ্বরূপই ছেলের মধ্যে। ওর এই দুঃখ হরণ—বন্দীদশা, এই শৃংখলের সব ক্ষত-গুলোর যন্ত্রণা যেন যুগ যুগান্তরের মানুষের বুকের সঞ্চিত দহন জ্বালা। এসব কিছু সহ্য করে তাকে এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই দুঃখভোগ ওর তপস্যা—কোন অমৃত সন্ধানের জন্য এই তপস্যা।

অবাক হয়ে ওর কথাগুলো শুনছি। প্রতিবাদ করতেও মন চায় না। ওর বিশ্বাসের জগতটাকে আঘাত দিয়ে ওর স্বপ্নভংগ করতে চাই না।

ভদ্রমহিলা বলে।

—আমার কোন দুঃখ নেই দাদা। ওই ছেলে একদিন তপস্যা শেষে আবার ফিরে আসবে মানুষের সমাজে, মানুষের দুঃখে—তাদের পথ দেখাবার জন্য। যে মহাদেবতা ওকে উপনয়নের সময় অদৃশ্যভাবে দীক্ষা দিয়েছেন—এ তাঁরই নির্দেশ। আমি ওর মা হয়ে সেই নির্দেশ পেয়েছি।

তাই আমার কোন দুঃখ নেই, এতটুকু ভাবনা নেই ওর জন্য।

ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে থাকি। ডাঃ মিত্রের ডাক্তারী শাস্ত্রজ্ঞান, এতদিনের অভিজ্ঞতা সব যেন মিথ্যা হয়ে গেছে ওই মহিলার কাছে, এত মানুষের ব্যঙ্গ-আঘাত-নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ব্যবহার ও মায়ের হৃদয়ে গিয়ে বাজেনি কোন যন্ত্রণা নিয়ে। সংসারের সব নিরাশা-ব্যর্থতাও এখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

অন্ধ মাতৃস্নেহ সমাজ পরিত্যক্ত ওই বন্দী জানোয়ারটাকেও কি যেন দেবত্বে উন্নীত করে—তাকে অকৃত্রিম স্নেহের বর্মে ঘিরে রেখেছে। এখানে কোন যুক্তিই অর্থহীন। আমি চুপ করে ওর কথাগুলো শুনেছিলাম সেই সন্ধ্যায়।

আমার বন্ধু পিনাকী দিল্লীতে অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা করে। সে আর আমি একই কলেজ থেকে পাশ করেছিলাম, তবে পিনাকী আমার দু বছরের ..জুনিয়র—দাদা বলে ডাকে। ওকে একবার চিঠিতে লিখেছিলাম—আমাদের গেছে যে দিন, তা একেবারেই গেছে। কিছুমাত্র চিহ্ন রেখে যায়নি · আর কি ফিরে পাবো বেলা দশটার অনার্স ক্লাশ ধরবার জন্য শেয়ালদা থেকে হনহন করে হেঁটে আসবার সেই ব্যস্ত মুহূর্তগুলো? কিম্বা কলেজ পালিয়ে যাদুঘর অথবা চিড়িয়াখানা বেড়াতে যাবার সেই রঙীন সময়?

উত্তরে পিনাকী লিখেছিল—তারাদা, দিন চলে যায় কথাটা ভুল। দিন কোথাও যায় না, দিন আমাদেরই বুকের মধ্যে জমা থাকে পরবর্তী অনেকদিন কষ্ট দেবার জন্য।

কথাটা বড়ো সত্য। এখনো চৈত্রের শেষে বাতাসে উষ্ণতার আঁচ লাগলে, এদিকে-ওদিকে দু' একটা কোকিল ডেকে উঠলে যখন বুকের মধ্যে পুরনো ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে যাবার শব্দ পাই, চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিস্তীর্ণ বালির চরে গা ঢেলে শুয়ে থাকা শীর্ণ দামোদর, আকাশের একদিক আড়াল করে অদূরে দন্ডায়মান পঞ্চকূট পাহাড়, তার পায়ের কাছে ছোটমামার সাদা রঙের কোয়ার্টার—তখনই বুঝতে পারি সময় কোথাও চলে যায়নি, পিনাকী বড়ো খাঁটি কথা বলেছিলো, সব জমা রয়েছে বুকের গভীরে।

পুরুলিয়া জেলায় পাঞ্চেৎ পাহাড়ের নিচে নেতুরিয়া নামে জায়গায় ছোটমামা তখন বড়োদরের সরকারী কর্মচারী। আমি তখন সেভেনে পড়ি, বেড়াতে গিয়ে কান্ড-কারখানা দেখে হাঁ। বাড়িতে ছোটমামা আমাদের নিয়ে হাতে লেখা পত্রিকা বের করেন, শক্ত করে গিঁট দিয়ে লুঙ্গির মতো করে ধুতি পরে লম্বা বারান্দায় রবারের বল দিয়ে আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেন—সেই ছোটমামাকেই তো চিনি। কিন্তু এ আবার কি? এখানে উঠতে সেলাম, বসতে সেলাম, আর্দালীরা সাহেবের হাসিমুখ দেখবার জন্য থামচে বুকের ভেতর থেকে কলজে তুলে আনতে পারে, কিম্বা হুকুম দিলেই আঁকশী নিয়ে চাঁদ পেড়ে আনতে যায়—এইরকম ব্যাপার।

আদরে-যত্নে আছি। রোজ সকালে উঠে বংকুবাবু বলে ছোটমামার অফিসের এক ক্লার্কের সাইকেল নিয়ে বেড়াতে যাই। সাহেবের ভাগ্নেকে নিজের সাইকেল দিতে পেয়ে বংকুবাবু রীতিমতো জাতে উঠে গেলেন। অফিসে সবাই সমীহ করে কথা বলতো। এমনকি হেডক্লার্ক স্বয়ং একদিন নিজের মসলার কৌটো থেকে বংকুবাবুকে ছাঁচা সুপুরী খেতে দিয়েছিলেন বলে গল্প চালু আছে।

ডানদিকে আদ্দেকটা আকাশ আড়াল করে পঞ্চকূট, তার গায়ে নীল বন। উঁচু-নিচু লাল মোরমে ছাওয়া পথ, সে পথের দুধারে সারি সারি মহুয়া গাছ। পাকা মহুয়া ঝরে পড়েছে গাছের তলায়। মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে। মানুষজন নেই কোনোদিকে. সাইকেল থেকে নেমে পড়লে এক আশ্চর্য স্তব্ধতায় গা ছমছম করে ওঠে। পাকা মহুয়াফুল হাতে তুলে দু' একখানা মুখে পুরে দিই। বিচিত্র স্বাদ! মিষ্টিও বটে, আবার না-ও বটে। ভালো বটে, আবার একটু কেমনও বটে। দুটো খেয়ে ভয়ে আর খাইনি। মহুয়া খেলে নেশা হয় ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। ক'টা খেলে হয়—এ পরীক্ষা নিজের ওপরে করবার মতো সাহস খুঁজে পাইনি।

এইরকম একটা মহুয়া গাছের [illegible]তে দাঁড়িয়েই সেই গিরগিটিটাকে দেখেছিলাম।

দু' হাতে অনেক মহুয়াফুল জড়ো করে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকছি, হঠাৎ কালো ব্যাসাল্ট পাথরের একটা স্তূপের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো ওটা। প্রায় আধ হাত লম্বা। লেজ সরু হতে হতে প্রায় মিলিয়ে গিয়েছে। পিঠের কাছে কাঁটা কাঁটা মতো। সাপের মতো জিভ বের করছে একটু বাদে বাদেই। গায়ের রঙ নীলচে মতো, কেবল গলার কাছটা লাল ধুকধুক করছে।

ভয়ে থুম্বো মেরে গিয়েছিলাম। তখনো আমরা এ জাতীয় জীবকে রক্ত-চোষা বলে জানতাম। অদ্ভুত উপায়ে ওরা দূর থেকেই মানুষের রক্ত শুষে নেয়। সেইজন্যেই নাকি গলার কাছটা লাল, আর রক্ত গেলবার সময় ধুকধুক করে। হাতের সব মহুয়াগুলো ছুঁড়ে মারলাম প্রাণীটার দিকে, গায়েও লাগলো দু' একটা। জীবটা কিন্তু একটুও নড়লো না, একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে হাতে াম। আমার টিপ্ খুব ভালো না হলেও কাছ থেকে ফস্কাবার প্রশ্ন ওঠে না। গিটটা সেদিন নিশ্চয় মারা পড়তো। তু আমি হাত তুলেছি, অমনি মাথার রে গাছের ডালে বসে একটা পাখি অদ্ভুত দর সুরে শিস্ দিয়ে উঠলো। পাথর ড়ার কথা ভুলে অবাক হয়ে ওপরে কালাম। নাঃ, পাখিটা দেখা যাচ্ছে না, ধু ডাক শোনা যাচ্ছে। লম্বা, টানা না সুরের ডাক। চার-পাঁচ সেকেন্ড র দুলিয়ে দুলিয়ে ডেকে থেকে যাচ্ছে। নত ভারি মজা, ঠিক যেন বলছে— মি নিইচি তুই দেকিচিস্।

চোখ নামিয়ে দেখি শত্রুর অনবধানতার যোগে গিরগিটিটা তীব্রগতিতে ফের াথরের ফাটলে ঢুকে যাচ্ছে। আমি কেবল জের ডগাটুকু দেখতে পেলাম। যাক্ গে, মারতাম না ওটাকে। পাথরের করোটা ফেলে দিয়ে সাইকেলে উঠে ড়লাম। রোদ চড়ে উঠছে মিনিটে মিনিটে, ার বেশিক্ষণ বাইরে থাকা যাবে না।

উৎরাইয়ের পথে প্যাডেল ছেড়ে দিয়ে হে করে যখন অনেকটা নেমে এসেছি, খনো পেছন থেকে ভেসে আসছে ডাক— ুই দেকিচিস্? তুই দেকিচিস্?

ছোটমামার রান্না করতো রামস্বরূপ লে এক বুড়ো ব্রাহ্মণ। একমাত্র এই কটাই দেখতাম ছোটমামাকে বিশেষ ভয় া না। ভালোবাসতো খুব—কিন্তু দির মতো সাহেব ডাকলেই ঠকঠক্ করে াতো না। উচিত কথাও দু' একবার ত শুনেছি। বুড়োমানুষ, ছোটমামার র বয়েসী। ছোটমামা ওর কথা বা না ত্রুটি গায়ে মাখতো না। আমার খুব ক লাগতো, অন্যেরা ছোটমমাকে খুশি ার জন্য প্রাণ দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু এ কটার কোনো আতিশয্য নেই কেন? এর ণ এখন অবশ্য একটু একটু আন্দাজ ত পারি। রামস্বরূপের তিনকুলে কেউ লা না, নিজেও খুব বুড়ো হয়ে গিয়ে- া। আসলে পৃথিবীর কাছে ওর বোধ- আর কিছু চাইবার ছিলো না। প্রমোশন, শিস, গুড সার্ভিস রেকর্ড, সাহেবের স—এসব দিয়ে ও কি করবে?

প্রথম যেদিন পৌঁছোই, রামস্বরূপের

দিন জ্বর। উঠোনে একটা ছারপোকা- ালা খাটিয়া পেতে শুয়ে কোঁ কোঁ করছে। টমামা গিয়ে বললেন—রামস্বরূপ, আমার েন এসেছে, আর ভাই (বড়মামা আমাকে য়ে গিয়েছিলেন)। ওঠো, ঝটপট্ মুর্গীর াল আর ভাত রেঁধে দাও দিকি—

লাল লাল চোখ মেলে রামস্বরূপ বলো, হাম্‌রা বুখার চড়্ গিয়া হ্যায় লিক, হাম নেহি সেকেঙ্গে—

—না পারলে চলবে কি করে? এরা খাবে তাহলে?

—হ্যাম্ ক্যা জানে। চড়্‌ড়া না করবে লিজিয়ে আজ—

কে একজন আর্দালী আমাদের জিনিস বয়ে ঘরে তুলছিলো, সে বললো, ও ব্যাটার জ্বর-টর সব মিথ্যে। কাজ করতে বললেই ওর যত শরীর খারাপ। এই তো ওবেলা বসে একগাদা ভাত খেলো।

তারপর ছোটমামার দিকে তাকিয়ে আশান্বিত মুখে বললো, রিপোর্ট করে দেবেন নাকি সাহেব?

ছোটমামা হঠাৎ কট্মট্ করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার তাতে কি, এ্যাঁ? বুড়োমানুষ, সত্যি সত্যি জ্বর হতে পারে না? যাও, নিজের কাজ করো—

লোকটা দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলতো লাগলো, হ্যাঁ সাহেব, এমনিতে রামস্বরূপ মানুষটা কিন্তু খুবই ভালো আর ইয়ে—

তিন-চারদিন পরে পড়লো রাম- নবমী। রামচন্দ্রের জন্মদিন—চৈত্র মাসের শুক্ল-নবমীতে রামের জন্ম বলে কথিত। নেতুরিয়াতে পাঞ্চেৎ পাহাড়ের নিচে রাম- নবমীর দিন মেলা বসে। ছোটমামা বললেন, কিরে? মেলা দেখবি নাকি? বেলাবেলি

বেরুলে মেলা দেখে একটু পাহাড়েও চড়া যায়। যাবি?

যাবো মানে? এসব করতেই তো এসেছি।

—কিসে যাবো ছোটমামা?

—জিপ দিতে পারি। কিন্তু জিপের চাইতে গরুর গাড়িতে গেলে ভালো লাগবে। যেখানকার যা—

গরুর গাড়িই ঠিক হলো।

রামনবমীর দিন বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা রওনা হলাম। মেলা দেখার চেয়ে পাহাড়ে চড়াটাই আমার কাছে বেশি কাজের কথা বলে মনে হয়েছে। নেভি-ব্লু হাফপ্যান্ট আর সাদা সার্ট আমার পরণে। পায়ে ছোট মামার কাছ থেকে ধার করা হাঁটু অবধি খাকি মোজা। ব্রাউন রংয়ের বুট, পাহাড়ে উঠতে হবে বলে দারুণ কষে তার ফিতে এঁটেছি। এখন পা টনটন করছে। মাথায় মিলিটারী গ্রীন রংয়ের একখানা হ্যাট। ছোটমামার অফিসে একখানা সরকারী শটগান ছিল, সেটা নেওয়া হল সঙ্গে, আর কয়েক

গ্রাউন্ড শর্লীল। বন্দুকটা নেবার সময় ছোট মামা বললেন, নিচ্ছেন তো, কিন্তু ছু'ড়তে জানেন কেউ? তা না জানলে খামোকা ও বোঝা বয়ে কি লাভ?

কেউ আর সাড়া দেয় না। বংকুবাবুর দিকে ফিরে ছোটমামা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি পারেন?

থতমত খেয়ে বংকুবাবু বললেন, হ্যাঁ—তা ধরুন না কেন, ওর মধ্যে আর কি আছে? ছু'ড়ে দিতাম না হয়। কিন্তু এই কাঁধে ব্যথাটা হঠাৎ—কালও সারারাত ওয়াইফ রসুন তেল মালিশ করেছে। ছোঁড়ার সময় রিক্রেকশনটা—বুঝলেন না, স্যার?

ক্লাক' বিমলবাবু এগিয়ে এসে বললেন, হ্যাঁ, পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে। তবে বন্দুকটা সঙ্গে নেওয়াই ভালো। নিজেদেরও ভরসা, আর ছু'ড়তে না পারি জানোয়ার এলে বন্দুক দেখেও তো কিছুটা ভয় পাবে।

পথঘাটের বেজায় অবস্থা। গাড়ি যেন আর টানতেই পারে না। চার মাইল রাস্তা যেতে একঘণ্টা লাগিয়ে দিল। পঞ্চকূটের পায়ের কাছে যখন পৌঁছোলাম, তখন বেলা গড়িয়ে গিয়ে অন্ধকার নামবো নামবো করছে. মেলা ভেঙে গিয়েছে। শূন্য, নির্জন মেলাতলায় কেবল একখানা খড়ের চালা দাঁড়িয়ে। শুনলাম সেখানে পুজো হয়।

আকাশে সুন্দর চাঁদ। সন্ধ্যা হলেই জ্যোৎস্না স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মেলা দেখা হলো না, তাতে কি? পাহাড়েই ওঠা যাক তাহলে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটা মোহ আছে। পঞ্চকূটের পাদদেশে সেই মেলাতলা এতো নির্জন, চারদিকের নিবিড় শাল-মহুয়ার বন এতো সুন্দর হয়ে রয়েছে যে, নিতান্ত বাস্তববাদী অকবিরও দু'দণ্ড বসে ভাবতে ইচ্ছে করবে। আমরা পাহাড়ে চড়তে শুরু করলাম।

দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে। অরণ্যের নিবিড় পত্রজালের প্রহরা এড়িয়ে তেমন চাঁদের আলো প্রবেশ করতে পারেনি। মাঝে মাঝে কেবল একটু পরিষ্কার জায়গায় মাটিতে আলোছায়ার আঁকিবুঁকি। বড় মামা শারীরিক কসরতের ব্যাপারে তেমন উৎসাহী নন। তিনি থেমে থেমে উঠতে গিয়ে পিছিয়ে পড়েছেন। তাঁর সঙ্গে আসছে একজন আদালী।

ওঠবার সময় বিমলবাবুর পরামর্শে মাঝে মাঝেই কিছু শুকনো লতাপাতা এক-জায়গায় করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে রেখে যাচ্ছি। যাতে নামবার সময় পথ ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা না থাকে।

চির-র-র চিটু চির-র-র চিটু করে কি পোকা ডাকছে জঙ্গলের মধ্যে। মাথার ওপরে ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে চৈত্ররাত্রির চাঁদ। বনের মধ্যে একটু বাদে বাদেই অরণ্যের দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। নেশার মতো আনন্দ আবহাওয়ায় হাত-পা এলিয়ে নিশ্চেষ্ট বসে শুধু তাকিয়ে দেখার মতো একটা নেশা-নেশা আনন্দ।

এদিকটায় পাহাড়ে ওঠার কোনো পথ নেই। এর ঠিক উল্টোদিকে বিখ্যাত পাঞ্চেৎ বাঁধ, কলোনী, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। সেদিকে পাহাড়ে ওঠার জন্য এমনকি মোটরপথও আছে শুনেছি। আমরা উঠছি পাথরের কোণে পা রেখে, গাছের শেকড় ধরে ঝুলে, নানা কস[রৎ] করে।

খুব তেষ্টা পেয়েছিলো, বিমলবাবু[কে] বললাম, জল আনা হয়েছে সঙ্গে? এক[টু] জল খাবো।

তখন আবিষ্কার করা গেলো, স[ব] তোড়জোড়ই করা হয়েছে, কেবল জলে[র] বোতলদুটি পড়ে রয়েছে ছোটমাম[ার] কোয়ার্টারে।

বিমলবাবু বললেন, কুছ পরোয়া নেই চলো, আর একটু ওপরে উঠলেই গোমুখ বলে একটা ছোট্ট ঝরনা আছে। গরুর মুখে[র] মতো একটা ন্যাচারাল ফর্মেশনের পাথরে[র] গ্যাপ[ের] মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে আসছে জল সেই জল খাওয়া যাবে।

কয়েক গজ উঠেই গোমুখী। রূপোল[ি] চাঁদের নিচে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে জল খেলাম।

নামবার সময় বিপদ। আমাদে[র] জ্বালা আগুন নিভে গিয়েছে অনেকক্ষণ সত্যিই আর পথ ঠিক করতে পারি [না] আমরা। মাঝে মাঝে পা হড়কে যায় [আল]গা নুড়িতে। তখনো বংকুবাবু নিজে[র] প্রাণ বিপন্ন করেও আমার প্যান্টের [পেছন] আঁকড়ে ধরে সাহেবের ডাগনের প্রা[ণ] বাঁচান। উঠতে যত সময় লেগেছিলো, প[থ] খুঁজে খুঁজে নামতে সময় লাগলো তা[র] ডবল।

বিপদ কি একটা। চাঁদের আলো[য়] দিব্যি টুকটুক করে গাড়ি চলেছে। ছোট-মামার কোয়ার্টার যখন আর মাইলখানেক দূর, হঠাৎ গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। কি ব্যাপার? না, গরুর গাড়ির মালিকদের ব[াড়ি] পাশেই। গরু নিজের গোয়াল চিনে ফেলেছে—এই রাতে আর যাবে না কিছুতেই।

গেল না তো গেলই না। নেমে পড়ে বাকি পথটুকু আমাদের হেঁটে সারতে হল। এ যাত্রায় রামস্বরূপ আর ও গরু দুটি—এদেরই মাত্র দেখেছিলাম যারা সাহেবকে ভয় করে না।

অত শক্ত করে বুট বাঁধার দরুণ পায়ে একটা বিরাট ফোসকা হয়েছিল আমার। সেটা বিষিয়ে গিয়ে খুব ভুগতে হয়েছিল আমাকে। বাড়ি ফিরে আসার পর অপারেশন অবধি করতে হয়। সেই অপা-রেশনের দাগ ছাড়া সবকিছু ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গিয়েছে। দাগটা দেখলে মনে পড়ে আজও।

সুযোগ পেলেও আর নেতুরিয়া যাবো না কোনোদিন। যদি আর তেমন ভালো না লাগে? সেখানে সবই যথাযথ আছে জানি, এখনো মেলা বসে, চৈত্রমাসের চাঁদ ঝিকিমিকি আলপনা আঁকে বনের মাটিতে, মহুয়ার ডালে বসা পাখি আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে—তুই দেখেছিস? কে দেখেছিস? কিন্তু আমার ক্লাস সেভেনে পড়ার সেই অবোধ উল্লাসের দিন? সে কি আর ফিরবে? সে পাখি বেঁচে নেই, সে চাঁদ মারা গেছে। থাকার মধ্যে কেবল পায়ের অপারেশনের দাগটা।
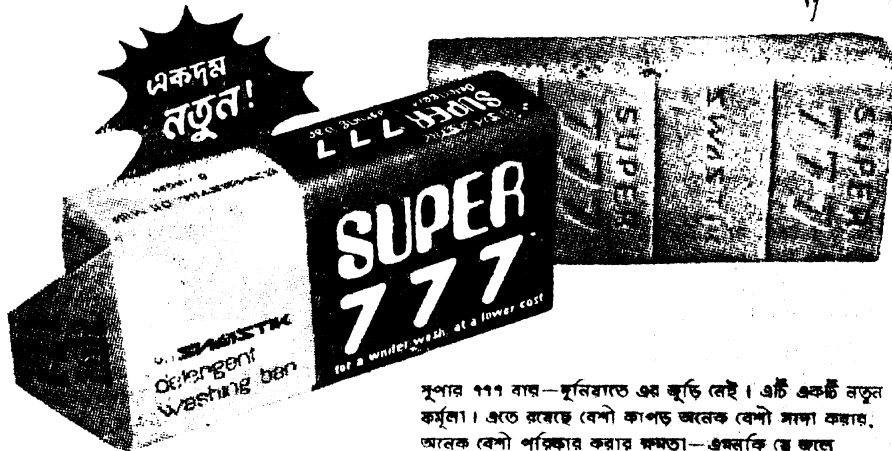
বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

জন্ম : ১৯৩৭।

পেশা : ঘর-গেরস্থালি

বিজয়া যখন দাশগুপ্ত, তখন থেকে তাঁর পদ্য পড়ছি। মহিলারা গদ্য বা কবিতা কিছুই লিখতে পারেন না, এই দুর্নাম ঘোচানোর জন্য যাঁরা লেখালেখি চালিয়ে যাচ্ছেন, বিজয়া তাঁদের অন্যতম পরিচিত নাম। তাঁর প্রথম বই 'আমার প্রভুর জন্য' পড়ে তাঁকে খুব একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হয় নি। কয়েক বছর পরে হাতে আসে তাঁর 'যদি শর্তহীন'। বইটি আমাকে খানিকটা টানে। লক্ষ্য করি, নিরাভরণ ভাষায় অথচ ঘন গলায় কথা বলতে চেষ্টা করছেন বিজয়া। পরবর্তীকালে তাঁর লেখা অনেক কবিতায় এক ধরনের ম্লান, পুরবীর সুর এসে লাগে, কোথাও বা চৈত্রের বাতাসের ছোঁয়া। যাবতীয় সমঞ্জস্যের মধ্যে কোথায় অল্প একটু বিবাদী হাহাকার, আমর মনে হয় না এর বেশি কিছু পদ্যে ফোটাতে চেয়েছেন বিজয়া। তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 'ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম'-এর নামকরণটি আমার খুব খারাপ লাগলেও বইটির বেশ কিছু লেখায় ধানকাটার পর মাঠের চেহারা দেখতে পেয়েছি আমি।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

এমনি করেই লেখো

এক হাতে পরিকল্পনা
অন্য হাতে হিসেব
ঘুরেছো শুধু এঘর থেকে ওঘর
কয়লা চিনি চালের থলে
তাছাড়া চাই ওষুধ—
মাথায় এত অল্প পরিসর!
স্কুলের তাড়া বিষম, ছাত্র পড়তে অনিচ্ছুক
কাঁদাও, ভোলাও, আবার ছাড়তে শেখো।
সন্ধে হলে তৈরি থেকো, অভ্যাগত এলে
হয়তো পাবে প্রাপ্য নিরাময়।

পদ্য লেখার সময় তবে, সময়?
তিনি বলেন, লিখতে হলে
এমনি করেই লেখো।

কোন্ দিকে

সম্প্রতি একজন কবি ঘোষণা করলেন,
পূর্বসূরীদের শব্দ
বার বার ব্যবহার আর চলবে না
জীবনানন্দের থেকে ধার বন্ধ করো
'রক্তের ভিতরে' ফেলে দাও
স্বকীয় ভাণ্ডার তোলো গড়ে'।

তোলো। কিন্তু কী পাত্রে, কীভাবে?
প্রসিদ্ধ কবির হাতে 'অশনায়া'
প্রসিদ্ধ কবির হাতে 'উদ্‌ভ্রান্ত' দিন—
কোন্ দিকে যাত্রা শ্রেয়, কীরঙা নিশান
লক্ষ্য হবে পরবর্তীদের?
হাটুরে বাটুরে শব্দ, ত্রিরায়তনিক নাম
কিংবা মিশ্র নতুন বপন?

কাঁচরা বিভ্রান্ত বড়ো—
আরাধ্য কি শক্তি নাকি অলোকরঞ্জন?

*

করুণা সাহার ছবি

ভারতে হাতে গোনা মহিলা শিল্পী-দের মধ্যে করুণা সাহা অন্যতম। ড্রইং-এর বলিষ্ঠতা অনেক যৌবনকে লজ্জা দেয়। সেকি আজকের কথা যখন ছবি আঁকায় ইটালি সরকারের বৃত্তি নিয়ে বিদেশ পাড়ি দিলেন সে সময় ক'জনই বা ছবি আঁকেন। বিশেষত মেয়েদের জগতে। যৌবনে গান গাইতেন। বেশ কয়েকটি ফিল্মে প্লে-ব্যাক গেয়েছেন। বহুবার একক প্রদর্শনী করেছেন—দেশে-বিদেশে। কথা হচ্ছিল জয়নুল সাহেবের। হ্যাঁ জয়নুল আবেদিন-করুণা সাহা তাঁর প্রিয় ছাত্রী। ময়মনসিংহের লোক উনিও। চিন্তা করছেন কয়েকজন মহিলা চিত্রকরকে জড়ো করে কোন নিয়মিত প্রদর্শনী করা যায় কিনা। কিন্তু সকলেরই বয়স অঙ্কে নয়, অন্য হিসেবে বেশী। কাজেই দায়িত্ব পড়বে করুণা সাহার ঘাড়েই। ইস্কুল, ছাত্রছাত্রীদের শেখান আর নিজস্ব ছবি আঁকা এই নিয়ে সংসারে প্রতিদিন ডিউটি দেন যিনি, তিনি প্রখ্যাত আলোক-চিত্রী শম্ভু সাহার ঘরণী চিত্রকর করুণা সাহা।

শ্যামাচরণ লাহিড়ী

মনোরঞ্জন বসু

যুগ ধর্মের দাবি একেবারে অস্বীকার করে সংসারে বাস করা যায় না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবনে নানা দিক থেকে পরিবর্তন দেখা দেয়। ভারতের অন্তরাত্মার মূলে আছে ধর্ম—যে ধর্ম ধারণ করে আছে ভারতের মূল কেন্দ্র-সত্তাকে— ভারতের সমাজ চেতনা ও অধ্যাত্ম সাধনা এই কেন্দ্র-সত্তার দিক থেকে এক সূত্রে গাঁথা। অধ্যাত্ম তথা সমাজ চেতনার বিবর্তনের ইতিহাসে ঐ ধর্ম যুগে যুগে নানা রূপে দেখা দিলেও তার গতিপ্রবাহ কখনও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। ভারতের মাটিতে ভারতীয় ধর্মের জন্ম—এ-ধর্ম কোন বাহিরা-গত সামগ্রী নয়। ভারতের রাজনৈতিক পতন-অভ্যুত্থানের ইতিহাসে নানা জাতি পৃথিবীর নানা দিক থেকে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করেছে, অধীনতার শৃঙ্খলে ভারত-বাসীকে বদ্ধ করেছে, নানাভাবে ভারতবাসী উৎপীড়িত হয়েছে, কিন্তু মৌনী ভারত-বর্ষের উদাসী মন আজও স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতের আকাশে, বাতাসে, নদ-নদী, পর্বত অরণ্যে এমন এক মোহিনী শক্তি আছে, যা সব কিছুর মূল গ্রহণ করেও আত্ম-সমাহিত থাকতে পারে। এখানেই ভারতের স্বাতন্ত্র্য। পূর্ণতাই ভারতীয় জীবনের মূল লক্ষ্য। পূর্ণতা ও ঐক্য অঙ্গাঙ্গী যুক্ত—ঐক্যের দৃষ্টিতে বৈচিত্র্য অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। পূর্ণতায় আরূঢ় হওয়া বা মূল লক্ষ্যে পৌঁছিবার নানাপথ ভারতীয় ঋষিরা বলে গেছেন। যোগ-পথ ঐসকল পথের একটি। যোগ-পথ অতি প্রাচীন। অধুনা আবিষ্কৃত মোহেঞ্জদরো ও হারাপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যোগাসনে উপবিষ্ট পশুপতির প্রতিকৃতি প্রাচীনতার একটি প্রমাণ। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ, নানাপ্রকার হঠযোগ, তন্ত্রোক্ত কুণ্ডলিনী লয়যোগ, যোগ সমন্বয় প্রভৃতি যোগ-পথের নানা ধারা, উপধারা।

ভারতের সমাজ জীবন কতকগুলি মৌল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব-মানবতা বোধে প্রতিষ্ঠিত সামান্য ধর্ম এবং ব্যক্তিধর্ম ব্যবহারের দিক থেকে ঐসকল মৌল নীতির আচরণ বিধি। ভারতীয় সাধন ধারায় একদিকে যেমন আছেন নানা সম্প্রদায়ভুক্ত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী,—সমাজের কল্যাণ চিন্তা যাঁদের জীবনের একটি ব্রত, অন্য দিকে আছেন গৃহী সন্ন্যাসী যাঁরা গার্হস্থকৃত্য সম্যক পালন করেও অধ্যাত্ম রাজ্যে স্বাচ্ছন্দ্য বিহার করতে পারেন।

পৌরাণিক যুগের রাজর্ষি জনকের ন্যায় আধুনিককালে শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীর আবির্ভাব ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনে ও যোগ রাজ্যে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বিস্ময় এই অংশে যে একজন আদর্শ গৃহী হয়েও যোগ সাধনার মধ্য দিয়ে অধ্যাত্ম স্তরে একজন মানুষ কতখানি উন্নত হতে পারে তার নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন। মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামী কোন একজন শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাচরণ লাহিড়ীর অধ্যাত্ম স্তর সম্পর্কে বলেছিলেন, সাধন রাজ্যে যে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাঁকে (ত্রৈলঙ্গ স্বামী) কৌপীনত্যাগী পর্যন্ত হতে হয়েছে, গৃহস্থ হয়েও ঐ পুরুষ (শ্যামাচরণ লাহিড়ী) সে অবস্থা লাভ করেছে। অধুনা লুপ্তপ্রায় যোগ সাধনাকে তিনি সাধারণের নিকট সহজগ্রাহ্য করে গেছেন। লাহিড়ী মহাশয় প্রবর্তিত যোগ 'ক্রিয়াযোগ' নামে প্রচলিত, শাস্ত্রীয় দিক থেকে এ-যোগ 'কেবলী' প্রাণায়ামের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ-যোগ যথাসম্ভব সাধনার জটিলতা মুক্ত ও সাক্ষাৎ ফলপ্রসূ।

কোন ব্যক্তির পরিচয় দিতে গেলে দেশ, কাল, পাত্র অর্থাৎ ঐতিহাসিক দিক সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা, মানসিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শ্যামাচরণ লাহিড়ীর ন্যায় লোকোত্তর প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবন-কথা আলোচনা আরও কষ্টকর। কারণ, তাঁদের জীবনের একটা বড় অংশ থাকে রহস্য ঘেরা। রহস্যের কোন যৌক্তিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, কারণ রহস্য সীমিত বুদ্ধি-গ্রাহ্য নয়। তবে অনুভূতিতে রহস্য সম্পর্কে যে আভাস পাওয়া যায় সে সম্পর্কে এটুকু বলা যায়, লৌকিক অনুভব যেমন কর্ম সাপেক্ষ, অলৌকিক অনুভবও সেইরূপ। ত্বক ও বাহ্য বস্তুর সংযোগ না হলে, যেমন স্পর্শানুভব হয় না, সেইরূপ ক্রিয়াতে এক বিশেষ অবস্থা লাভ করে অপেক্ষা করতে করতে নবীন সাধকের নিকট কখন কখন অলৌকিক ব্যাপার সকল হঠাৎ আপনা আপনি এসে ইন্দ্রিয় গোচর না হলে অলৌকিক বোধ হয় না। এখানে উল্লেখ্য, যোগ, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি কঠোর দুঃসাধ্য সকলকে সাধারণ বোধগম্য ও সক্রিয় করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করবার যে আয়াস শ্যামাচরণ করে গেছেন সেখানেই তাঁর অলৌকিকতা, এবং তাঁর জীবনের সাধন রহস্য ঐসকল ক্রিয়ার মাধ্যমে অনেকখানি উদ্ঘাটিত হয়েছে। তা ছাড়াও এই কথাসর্বস্বের যুগে শাস্ত্রের দোহাই না দিয়ে সাধন ক্রিয়ায় সচেষ্ট হওয়া, পরোক্ষ চিন্তার চেয়ে অপরোক্ষ অনুভূতির দিকে অধিকতর যত্নশীল হওয়া, মনুষ্য জীবনের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরাভিমুখী হওয়া এবং ভগবৎ প্রেরণা লাভের দিকে আকুতি প্রভৃতি মূল্যবান নির্দেশ দিয়ে নব যুগধারাকে তিনি সঞ্জীবিত করে গেছেন।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকট ঘূর্ণি গ্রামে শ্যামাচরণ লাহিড়ী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন গৌরমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের দ্বিতীয়া পত্নীর প্রথম সন্তান। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে বলা যায় বাংলা ১৩৩৫ সালের ১৬ আশ্বিন সপ্তমী তিথিতে তাঁর জন্ম। ভারতীয় সাধু-সন্তরা নিজেদের সম্পর্কে এত উদাসীন ছিলেন যে আত্ম-জীবনী লেখা ত দূরের কথা নিজেদের ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে তাঁরা কখনও কিছু বলতেন না। লাহিড়ী মহাশয়ের যোগ্য শিষ্য স্বামী যুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ ঐ সময়কে যুগ সন্ধিক্ষণ আখ্যা দিয়েছেন। এ-কথা ঠিক ঐ সময় থেকেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লবে যুগ পরিবর্তনের ধারা সূচিত হতে দেখা দেয়, আজ যা স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। ফলে স্পন্দ মুখর কালিক গতি লক্ষ্য করলে ঐ সময়ে শ্যামাচরণ লাহিড়ীর আবির্ভাব একটি স্বাভাবিক

ঘটনা বলেই মনে হয়। যুগান্ধ ভারতবাসীর পক্ষে ঐ সময়ে লাহিড়ী মহাশয়ের মত একজন দিগদর্শকের প্রয়োজন ছিল।

শ্যামাচরণের পিতা গৌরমোহন লাহিড়ী শ্যামাচরণের জন্মের অল্পদিন পরেই নদীয়া ত্যাগ করে সপরিবারে কাশীবাসী হন। শ্যামাচরণের শৈশব, বাল্য ও যৌবনকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বালক শ্যামাচরণ পিতার নির্দেশে কাশীধামে পাঠশালায় হিন্দি ও উর্দু শিক্ষা আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের স্কুলে এবং সংস্কৃত কলেজে বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষা শিখেছিলেন। বেদ ও দর্শনাদিও তিনি নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই পণ্ডিত দেব-নারায়ণ সান্যাল মহাশয়ের অষ্টম বর্ষীয় কন্যার সহিত শ্যামাচরণের বিবাহ হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ ইংরেজ সর-কারের অধীনে সামরিক বিভাগে চাকুরি নেন। এই কাজের জন্য তাঁকে গাজিপুর, মীর্জাপুর, দানাপুর, নৈনিতাল, বেনারস প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরতে হত। চাকুরি গ্রহণের প্রায় আড়াই বছর পরে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়, ফলে সংসারের যাবতীয় কৃত্য তাঁকেই করতে হত। কঠোর পরিশ্রমে প্রয়োজন মত অর্থোপার্জন করে সংযত, মিতবায়ী, অনাড়ম্বর জীবন তিনি যাপন করতেন। পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ আচার্যের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েও তিনি সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতেন। শিক্ষামূলক কার্যে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। কাশীতে কোন কোন স্কুল, পাঠশালা বিশেষভাবে বাঙালী টোলা হাইস্কুল প্রভৃতির উদ্যোগ, আয়োজনে তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

কালের অমোঘ নিয়ম লঙ্ঘন করবার সাধ্য মানুষের নেই। কাল পরিপক্ব হলে ঘটবার যা তা ঘটবেই। আমাদের অলক্ষ্যে প্রারব্ধ আমাদের হাত ধরে যথাসময়ে যথা-স্থানে নিয়ে যায়। লালাবাবুর জীবনে 'বেলা গেল' একটা প্রতীকী সংকেত মাত্র। ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে কোন-না-কোন দিক থেকে সংকেত আসে। লাহিড়ী মহাশয়ের অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত। তাঁর জীবনে পটপরিবর্তনের ক্ষণ সমাগত। বিধির অপূর্ব বিধান, লোকচক্ষুর অন্তরালে কিভাবে চালিত হয় আমরা তা বুঝি না। আমরা বুঝতে পারি ফলের উৎপত্তিতে, আমরা ধন্য মনে করি ফলের আস্বাদনে।

লাহিড়ী মহাশয়ের বয়স তখন ৩০ পার হয়েছে। হঠাৎ তিনি হিমাচল প্রদেশের নৈনিতালের নিকট রাণীখেতে বদলী হন। রাণীখেতে তখন রেলযোগে যাওয়া যেত না। লাহিড়ী মহাশয় বহু কষ্ট স্বীকার করে রাণীখেতে গেলেন, এবং একজন ভৃত্য-সহ সেখানে তাঁবুতে বাস করতে লাগলেন। অফিসের কাজকর্ম সামান্য অল্প সময়ের মধ্যে তা শেষ করে তিনি পার্বত্য অঞ্চলের চার দিকে ঘুরতেন এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য তিনি উপভোগ করতেন। সত্যান্বেষণের ইচ্ছা লাহিড়ী মহাশয়ের সহজাত। তাই সম্ভবত প্রকৃতি তাঁকে পরম সত্যের মুখোমুখি করবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। ঐ সময় একদিন তাঁর ভৃত্য তাঁকে বলল, ঐ পাহাড়ের উপর অনেক সাধু বাস করেন —এ কথা শুনে লাহিড়ী মহাশয়ের চিত্ত চঞ্চল হল, তাঁর মন পাহাড়ের উপর সাধু-দর্শনের জন্য প্রস্তুত হল।

কয়েক দিনের মধ্যে পর্বতের উপর থেকে তিনি একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। কে যেন তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকছেন। সেই নির্জন অপরিচিত স্থানে ঐ কণ্ঠস্বর তাঁর চিত্তে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগাল। তিনি এগিয়ে চললেন, সন্ধ্যা পার হয়ে গেল, নৈশ অন্ধকার পৃথিবীকে আবৃত করল। লাহিড়ী মহাশয় চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি পর্বতোপরি এক গুহার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জনৈক দিব্যকান্তি, সহাস্য বদন, উন্নত দেহ সাধুকে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। মনে হল ঐ দিব্যপুরুষ যেন তারই জন্য অপেক্ষা করছেন। সাধুজী স্মিতহাস্যে হিন্দীতে বললেন, 'শ্যামাচরণ, তুমি এসেছ, আমিই তোমাকে ডাকছিলাম, বিশ্রাম কর।' শ্যামাচরণ স্তম্ভিত হলেন, সাধুজীর প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ তিনি অনুভব করলেন। সাধুজীর সঙ্গে তিনি গুহার ভিতরে ঢুকলেন, দেখলেন সেখানে কতকগুলি আসন ও কমণ্ডলু সাজান রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট আসনের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে সাধুজী জিগ্যেস করলেন,—'চিনতে পারছ এই আসন।' শ্যামাচরণ স্তব্ধ, সাধুজী তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করলেন, মাথায় হাত দিলেন, হঠাৎ যেন শ্যামাচরণের নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তিনি চিনলেন এই তাঁর সাধনার স্থান, তিনি উপলব্ধি করলেন এই অদ্ভুত মহাত্মা তাঁর গুরু, চিরপূজ্য, জীবন্মুক্ত পুরুষ। গুরুর পায়ে শ্যামাচরণ নিজেকে সমর্পণ করলেন, তিনি আশ্রয় পেলেন। পূর্ব জন্মের সব কিছু গুরুর আশীর্বাদে তাঁর স্মরণে এল, এই আসনেই তিনি পূর্ব জন্মে সাধনায় মগ্ন থেকে দেহরক্ষা করেন।

গুরুর আদেশে তিনি আবার রাণী-খেতের দপ্তরে ফিরে এলেন। প্রতি দিনই

তিনি একবার গুরুর সঙ্গে দেখা করতেন। গুরুর সংস্পর্শে শ্যামাচরণের দেহ সুস্থ ও শুদ্ধ হল, সাধুজী পুণ্যক্ষণে তাঁকে আসনে বসালেন এবং ক্রিয়াযোগ সাধনায় দীক্ষিত করলেন। শ্যামাচরণের চিত্তমালিন্য ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞানের অন্ধকার দূরে হল, দিব্যজ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হল, শ্যামাচরণ দীক্ষিত হলেন। তিনি তখন প্রাণায়াম ক্রিয়াযোগের নানা স্তর পার হয়ে অদ্ভুত অনুভূতি রাজ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। বহির্মুখী ইন্দ্রিয় সকল অন্তর্মুখীন হল, অপূর্ব ধারণার উপলব্ধিতে গভীর ধ্যানে তিনি মগ্ন রইলেন, শ্যামাচরণ সমাধিস্থ হলেন। অফিস, চাকুরি, সংসার সব কিছুই তিনি ভুলে গেলেন। ব্রহ্ম বস্তুর আস্বাদনে বাকী জীবন কাটাবার অভিপ্রায় তিনি গুরুর নিকট জ্ঞাপন করলেন। গুরু মহামুনি বাবাজী মহারাজ সস্নেহে তাঁকে আরও কিছুদিন সংসারধর্ম পালন করবার নির্দেশ দিলেন। এবং লোক-কল্যাণের জন্য ক্রিয়াযোগ সাধনে তাঁকে তৎপর হতে বললেন। প্রথমে বাবাজী মহারাজ ক্রিয়া-যোগ সাধনে দীক্ষাদান সম্পর্কে লাহিড়ী মহাশয়কে কঠোরতা অবলম্বনের কথা বললেন। কিন্তু উদার হৃদয় কৃতী শিষ্যের বিশেষ আবেদনে তিনি অনেকখানি নরম হলেন এবং অল্পায়াসে সাধারণ মানুষ যাতে এই দুর্লভ রত্ন লাভ করতে পারে সে বিষয়ে সম্মতি দিলেন। দীক্ষা স্থান ত্যাগের পূর্বে পুণ্য হিমাচল গিরি গুহাবাসী উন্নত সাধকরা যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়কে অভিনন্দিত করেন। গুরু বাবাজী মহারাজ সম্পর্কে শোনা যায় তিনি যোগ-বিভূতিসম্পন্ন একজন জীবন্মুক্ত পুরুষ এবং বয়স প্রায় তখন ৬০০ বৎসর।

ফুল ফুটলে গন্ধ চাপা থাকে না। লাহিড়ী মহাশয়ের ভাব পরিবর্তন অনেকে লক্ষ্য করলেন, অফিসের বড়সাহেব তাঁকে পাগলাবাবু বলতেন। লাহিড়ী মহাশয়কে কেন্দ্র করে তখন বহু অলৌকিক ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে সে সকল বিষয় উল্লেখ করবার অবকাশ নেই। তবে কাশীধামে বসবার পরেই বহু লোক তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাধনার প্রভাব দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের কৃষ্ণনগর ও বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বহু লোক ক্রিয়াযোগ সাধন সম্পর্কে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছে দীক্ষিত হন। মুঙ্গের ও ভাগলপুরে ঠাকুরের বহু গুপ্ত শিষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

স্বামী ভাস্করানন্দ পরমহংস, মহাত্মা বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ প্রভৃতি অতি উচ্চ কোটির সন্ন্যাসীগণও যোগীবর লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে ক্রিয়াযোগ সাধন গ্রহণ করেন। সাধু ব্রহ্মচারী ছাড়াও পরেশ কবিরাজ, কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি, কাশী নরেশ, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে ক্রিয়াযোগ সাধনে দীক্ষিত হন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি আত্মপ্রচারের পক্ষ-পাতী ছিলেন না। তাছাড়াও যোগাবতারের বিভিন্ন উন্নত শিষ্যদের মধ্যে অদ্বৈত, দ্বৈত, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব দেখে সহজেই অনুমান করা যায় সত্যদ্রষ্টা, উদার হৃদয় শ্যামাচরণ আত্মোপলব্ধির পথ দেখিয়ে সাধকদের নিজস্ব ভাব সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে চলতে দিতেন। তিনি নিজে মোটামুটি বংশের ধারা অনুসারেই সমাজে চলতেন। গঙ্গা স্নান, বেদ পাঠ, প্রাতঃ নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান যথাবিধি তিনি পালন করতেন। তবে শোনা যায় শেষদিকে তিনি অধিকাংশ সময় আসনে মৌনভাবে যোগারূঢ় হয়ে থাকতেন। তাঁকে দেখে মনে হত তিনি যেন ক্ষুদ্রত্বের সীমা অতিক্রম করে পূর্ণতম সমতার ভিত্তিতে ব্রাহ্মীস্থিতির উচ্চ অনন্ত চৈতন্যের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাস করছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একমাত্র শিব-চতুর্দশীর উপবাস পালন করতেন এবং উপবাসের পর দিন সারনাথের দিকে যেতেন। কোন কোন ভক্তের ধারণা ঐদিন তিনি তাঁর গুরুদেব বাবাজী মহারাজের সঙ্গে মিলিত হতেন।

বাংলা ১৯০২—মহাষ্টমীর দিন যোগী-রাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় স্বেচ্ছায় কাশীধামে মহাসমাধি মগ্ন হন।

এখন প্রশ্ন ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতিতে লাহিড়ী মহাশয়ের অবদানের স্বাতন্ত্র্য কোথায় ?

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে পাশাপাশি চলেছে। নিঃশ্রেয়স বাদ দিলে অভ্যুদয় অর্থহীন, আবার অভ্যুদয় ছাড়া সমাজজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। বিগ্রহের আশ্রয়স্থল যেমন মন্দির, সমাজকেও তেমনি আশ্রয় করে আছে ধর্ম, ভারতের গার্হস্থ জীবন সেই সমাজের অঙ্গ। গঙ্গা যমুনার মিলনের ন্যায়, শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে ভারতীয় সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। ব্যবহারভূমিতে তিনি প্রধানভাবে গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী, আবার সংস্কারের দিক থেকে তিনি মূলত সন্ন্যাসী হয়েও গৃহী। ফলকথা লাহিড়ী মহাশয়ের স্বাতন্ত্র্য ঐ মিলনেই। আবার ভারতীয় মুনি-ঋষিরা সাধনার কোন দিকই অগ্রাহ্য করেন নি। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে সাধনার নানা স্তর ও ধারার কথা তাঁরা বলে গেছেন। যেমন যোগ সম্পর্কে নানা প্রামাণিক গ্রন্থের মধ্যে পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র একটি। কিন্তু পাতঞ্জলের যোগ ধারার পূর্ণ অভ্যাস সাধারণ মানুষের কাছে একপ্রকার দুঃসাধ্য। যোগীরাজ শ্যামাচরণ সেই কষ্টসাধ্য সাধনার নবরূপায়ণ করে জনসাধারণের বোধগম্য করে গেছেন। যোগরাজ্যে শ্রীশ্রীশ্যামাচরণের যুগান্তকারী আবিষ্কার এক অভূতপূর্ব বিস্ময়।

ঈশান শুকদেবের দিকে তাকাল, মাথা [illegible]রাপ নাকি। আমরা সাপ ধরতে আসিনি।

শুকদেব হাসল, সাপের দেশের মানুষ [illegible]গো আমি। তুমি আমার বন্দুকটা ধর [illegible]খি।

—না না, ভাল হচ্ছে না শুকু। সাপ [illegible]রে কি হবে?

—কি হবে! শুকদেব বন্দুকটা [illegible]শানের হাতে ধরিয়ে দিল, দেখ না কি [illegible]রি!

অগত্যা ঈশানকে বন্দুক হাতে সরে [illegible] হল। শুকদেব ছোট মতো একটা [illegible]ছের ডাল ভেঙ্গে নিল। ডালটাকে বাগিয়ে [illegible]রে সাপটার কাছে এগিয়ে গেল।

কোন দিকটায় মাথা কে জানে! সাপের [illegible]য়ে একটু খোঁচা দিতেই ইটের গায়ে তরতর [illegible]রে এগোতে শুরু করল।

বেশি দূরে এগোতে দিল না শুকদেব। [illegible]তর্কিতে ওকে ইটের গা থেকে টেনে এনে [illegible]মনের দিকে ছুঁড়ে ফেলল।

চেঁচিয়ে উঠল ঈশান, এই শুকু! কী [illegible]?

শুকদেব বলল, ভয় নেই, তেজি না। [illegible] বাতাসে ঝিম ধরা। মজাটা দেখ না।

ঈশানের কিছুই করার ছিল না। সাপটা [illegible]ঝিমমারা ঠিকই কিন্তু দিব্যি ও এগিয়ে [illegible]লাবার চেষ্টা করছে। কি আশ্চর্য! সাপে [illegible]ক সাপুড়ে চেনে। এখনি তো ও ঘুরে [illegible]ণা তুলে ছোবল বসিয়ে দিতে পারে [illegible]শুকুকে, কিন্তু—

শুকদেব হা হা করে এক লাফে এগিয়ে [illegible]র মাথার ওপর লাঠিটা চেপে ধরল। আর [illegible]সঙ্গে সঙ্গে সাপটা মুচড়ে বাঁক খেয়ে শুক- [illegible]দেবকে পেঁচিয়ে ধরতে গেল।

[illegible] লাঠির দু প্রান্তে পা চেপে শুকদেব [illegible] লেজের অংশটা ধরে ফেলল। তারপর [illegible]জের এই সাফল্যে ও হা হা করে কেমন [illegible]একটা শব্দ করে উঠল। ওর চোখ দুটো [illegible]এখন ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠেছে।

—আমার গামছাটা কোমর থেকে খুলে দাও ঈশানভাই। জলদি, জলদি।

ঈশানের শরীরের ভিতর সিরসির কর-ছিল। কাঁপতে কাঁপতেই ও এগিয়ে এল। গামছাটা সাবধানে ও শুকুর কোমর থেকে হেঁচকা মেরে খুলে ফেলল। কি হবে গামছায়?

—আগে সামনের এই মাটির ওপর বিছিয়ে দাও। দেখতেই পাবে কি করি।

কি করতে চায় শুকু বুঝতে পারল না ঈশান। গামছাটাকে মাটিতে বিছিয়ে দিল।

—এবার দুদিকে দুটো হুটকা বেঁধে ফেল। এ ব্যাটাকে গামছায় বেঁধে নিয়ে যাবো।

—তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

—আহ্, যা বলি কর না। আর বেশি-ক্ষণ ধরে রাখতে পারছি না।

ঈশান গিঁঠ বাঁধল গামছায়।

শুকদেব বলল, সাবধান, সাপটাকে এবার আমি গামছায় ঢোকাব, শক্ত করে ওকে বেঁধে ফেলতে হবে।

—মাথা খারাপ, আমি নেই।

—আমি সাপের বিষ তুলতে জানি ঈশান ভাই। যা বলছি করে ফেল।

ঈশান গতিক না দেখে বলল, কি করতে হবে বল।

শুকদেব এবার ঝুঁকে সাপের মাথার একটু নিচে শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলল। তার-পর ধীরে ধীরে লাঠিটাকে পা দিয়ে সরিয়ে ফেলল। এক হাতে লেজের দিকটাও ধরা। সাপটা দড়ির মতো পাক খেয়ে যাচ্ছে!

ঈশান শুকুর কথা অনুযায়ী গামছাটাকে তুলে ধরল। আর হাতের কবজী দিয়ে শুকদেব ওটাকে ছোট করে নিমেষেই সাপটাকে ভেতরে ছুঁড়ে ফেলল। দু-এক মুহূর্ত লাগল গামছার মুখটাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলতে। তারপর লাঠির ডগা দিয়ে গামছার গিঁঠের সঙ্গে জড়িয়ে বিজয়ীর হাসি হাসল শুকদেব, হল তো!

ঈশানও কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। হল তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এবার কি হবে?

—ছোটকর্তাকে উপহার দেব।

—পিঠের চামড়া তুলে নেবে।

—তবে ছোটকর্তার ঐ মেয়েছেলেটাকে।

ঈশান হাসল, তা যা বলেছ, ওকেই দেওয়া ভাল। হে হে—

শুকদেব বলল, জীবনে এরকম কত সাপ ধরেছি তার ইয়ত্তা নেই। আগে আগে সাপ ধরতাম, আর বিষ বার করতাম। সাপের বিষ বিক্রি হয় জানো?

ঈশান বলল, দুনিয়ায় কি না বিক্রি হয়। কিন্তু সাপ তো হল, হরিণ?

শুকদেব সাপের গামছা বাঁধা লাঠিটাকে বাঁকের মতো পিঠে ফেলে বন্দুকটা হাতে তুলে নিল। জঙ্গলে যদি হরিণ না থাকে, আমরা কি করব! চল, ছোটকর্তাকে গিয়ে বললেই হবে এ জঙ্গলে হরিণ নেই।

—বিশ্বাস করবে না।

—কেন বিশ্বাস করবে না। আমরা কি গড়ে আনব নাকি? তবু ভালো, বাঘের দুধ খেতে চাননি ছোটকর্তা!

—হরিণ তা হলে হবে না বলছ?

শুকদেব হাসে, হবার হলে এতক্ষণ হয়ে যেত। চলো।

শুকদেব আর দাঁড়ায় না। অগত্যা ঈশানও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

আর ওদিকে ভেড়ির ওপর তখন পায়-চারি করছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। পাশে তাঁর কামিনী আর রজনী। ও'রা কাছারি বাড়ি ছাড়িয়ে কিছুদূরে বনের ভিতর ঢুকে-ছিলেন, ফিরে এসে ভেড়ির ওপর পায়চারি করছিলেন। শুকদেব আর ঈশান জঙ্গলের ভেতর থেকেই ওদের দেখতে পেল। আর খানিকটা দূরে বজরার কাছাকাছি পাথরের স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে প্রসাদ সিং, বন্দুক হাতে।

ঈশান এগিয়ে এল। সাপ বাঁধা গামছার পুঁটলিটা হাতে তুলে নিল শুকদেব। লাঠির আর প্রয়োজন নেই, ফেলে দিল।

ভেড়ির ওপর উঠে আসতে যেটুকু সময় রজনীর নজরে পড়ে গেল ওরা।

—কি হল? হরিণের কি হল? উৎসাহে রজনী এগিয়ে এল।

ঈশান বলল, পাইনি। হরিণের নামগন্ধই নেই জঙ্গলে। শুকদেব একটা সাপ ধরে এনেছে। দেখার মতো।

—সাপ! নরেন্দ্রনারায়ণ কৌতুকে গামছাটার দিকে তাকালেন, কোথায় সাপ?

গামছার পুঁটলিটা সামনে রাখল শুক-দেব, এই যে হুজুর এর ভেতর রয়েছে।

—গামছার ভেতর! কামিনী কেমন আঁৎকে উঠল; অসম্ভব নয়, গামছাটা নড়ছে।

—গামছায় বেঁধে এনেছিস? কোথাকার ভূত সব।

—শুকু সাপের বিষ বার করতে জানে হুজুর। সাপে কাটা বাঁচাতে পারে।

রজনী দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল ভাই বলে গামছায় বেঁধে আনবি। মারতে পারলি না।

শুকদেব বলল, চটছ কেন রজনীভাই, সাপের খেলা দেখাব।

চোখমুখ শুকিয়ে এসেছিল কামিনীর। মাগো, কী সর্বনেশে লোক এরা!

নরেন্দ্রনারায়ণের বেশ মজাই লাগছিল, শুধোলেন, বিষ নেই? কি সাপ?

—মেটে সাপ হুজুর। শীতে আর নোনা হাওয়ায় ঝিম মেরে গেছে। বিষ থাকলেও ভয় নেই হুজুর, আমি আছি।

শুকদেব গামছার গিঁঠটা খুলবার জন্য হাত বাড়াল।

কামিনী দুপা পিছিয়ে এসে হা হা করে উঠল। শুকদেব ওর অবস্থা দেখে হাসে, মজা পায়। ভয় পাচ্ছেন কেন গো, দেখুন না।

গিঁঠটা খুলেই গামছাটাকে একটা ঝাড়া দেয় শুকদেব। আর সঙ্গে সঙ্গে চকচকে মেটে রংয়ের সাপটা ভেড়ির ওপর আছড়ে পড়ে। কিন্তু তার চেয়েও দ্রুতগতিতে শুকদেব ওর লেজের দিকটা শক্ত মঠোয় চেপে ধরে। তারপর দানবীয় ভঙ্গিতে মাথার ওপর তুলে নিয়ে বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে শুরু করে ও সাপটাকে।

—আহা হা করে কি, করে কি! নরেন্দ্রনারায়ণও দুপা পিছিয়ে আসেন। কামিনীও আরো খানিকটা দূরে সরে যায়। ঈশান মাটি আঁকড়ে বসে পড়ে। রজনী চেঁচায় এই শুকদেব।

কিন্তু শুকদেব যেন এতে আরো উৎসাহ পেয়ে যায়। দড়ির মতো সাপটাকে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে নাচে, নাচতে নাচতে হাসে, হা হা হা—

নরেন্দ্রনারায়ণ চেঁচাতে থাকেন, ফেলে দে হারামজাদা, ফেলে দে।

শুকদেবের কোন পরোয়া নেই। নাচতে নাচতে ভেড়ি থেকে নদীর দিকে ঢালে নেমে পড়ে। তারপর সরাৎ করে একসময় সাপটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নদীর জলে। ঝপাৎ করে একটা শব্দ উঠে, সাপটা জলের মধ্যে মিশে যায়।

আর শুকদেব দু হাতের তালি বাজিয়ে চেঁচাতে থাকে, খা, খা, কুমীরে খা।

ষোল

পর দিন ভোর হতে না হতেই ঘুম ভেঙে গেল নরেন্দ্রনারায়ণের। বজরার ভেতর ঝাড় লণ্ঠন জ্বলছে। আলোয় দেখলেন, উনি একাই শুয়ে আছেন। কামিনী নেই।

মাথার কাছে জানালাটা খুলে দিতেই চোখে পড়ল, কী ভীষণ কুয়াশা, কুয়াশা আর দাঁত বসানো শীত। এত কুয়াশা যে নিচে নদীর জলের চেহারাও স্পষ্ট দেখা যায় না। সারারাত যেন বরফ পড়েছে। গল গল করে কুয়াশা বজরার ভেতর ঢুকতেই উনি আবার জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে ঝাড় লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলেন, ছাদে শব্দ হচ্ছে, কেউ ওখানে চলাফেরা করছে। মনে পড়ল, রাতে অনেকেই ছাদে বসে বজরা পাহারা দেয়। তবে কি তারা এখনো ছাদেই রয়েছে। সারারাত নরেন্দ্রনারায়ণ নেশার ঘোরে থাকেন, টের পান না। এই ঠান্ডায় কয়েকটা লোক যে ছাদে বসে ওরই জন্য রাত কাটায় এটা ভাবতেই বেশ চাঙ্গা বোধ করলেন উনি।

কিন্তু কামিনী কোথায়? নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর নাম ধরে ডাকলেন।

বজরার পর্দা সরিয়ে যে ঢুকল সে কামিনী নয়, রজনী। রজনীর চোখে বেশ উত্তেজনা।

নরেন্দ্রনারায়ণ শুধোলেন, কি হয়েছে?

রজনী বলল, তিন চারটে কুমির এসে বজরার চারপাশে ঘুরছে। ওদের মতলব ভাল নয় হুজুর।

নরেন্দ্রনারায়ণ অবাক হয়ে তাকালেন। কুমির! কোথায় কুমির?

—বাইরে ছাদে এসে একটু বসুন হুজুর, দেখতে পাবেন।

—বটে বটে! নরেন্দ্রনারায়ণ আ অপেক্ষা করলেন না। কম্বলটা গায়ে জড়ি বাইরে বেরিয়ে এলেন।

—ছাদে উঠুন হুজুর। ছাদ থে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে।

নরেন্দ্রনারায়ণ ছাদে উঠলেন কামিনীকেও এখানেই দেখা গেল, জলে দিকে তাকিয়ে হুমড়ি খেয়ে আছে। বন্দু হাতে ওপাশে প্রসাদ সিং। বন্দুকটা এমন ভাবে ও ধরে রেখেছে যেন যে কো মুহূর্তে ও গুলি ছুঁড়তে পারে।

—কোথায় কুমির? নরেন্দ্রনারায় কামিনীর পাশে এগিয়ে এসে গা ঘেঁ দাঁড়ালেন।

কামিনীর গলায় উত্তেজনা। বলল, ভেড়ির ওপর উঠে শুয়েছিল একটা আমি বজরা থেকে বেরিয়েই প্রথ একটা দেখতে পেলাম। লেজের খানিকটা জলের ভেতর ডোবানো ছিল।

—কি রকম দেখতে? প্রশ্নটা এমন ভাবে করলেন নরেন্দ্রনারায়ণ যেন জীবনে কখনো কুমির দেখেননি।

কামিনী বলল, কুমির যে রকম দেখতে হয়। প্রথম দিকে আমি ভেবে ছিলাম, বুঝি একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, কিন্তু খানিকক্ষণ পর যখন ওটা নড়ে উঠল, তখনই আমার খেয়াল হল, গাছের গুঁড়ি নড়ে কেন! আমি চেঁচিয়ে রজনীকে ডাকতেই রজনী ছুটে এসে লাফিয়ে উঠল, কুমির!

রজনী বিপরীত দিকে জলের ওপ তাকিয়ে আছে। বলল, হুজুর, দশ-বারো হাতের কম নয় এক একটা।

—মারলে না কেন?

রজনী নরেন্দ্রনারায়ণের কাছাকাছি এগিয়ে এসে আবার জলের দিকে তাকা কুমির চট করে মারা যায় না। ওদের চো ভেতর গুলি করতে না পারলে সুবিধে কর যায় না। মিছিমিছি কেবল গুলি নষ্ট হত।

—কেন, গায়ে লাগলে মরে না?

কামিনী রজনীর দিকে তাকাল।

—সারা গা তো পাথর। গুলি ঢুকবেই না। এই পাথরের মধ্যে যে সব জায়গা ওদের নরম, সেখানে গুলি লাগলে ফল পাওয়া যায়।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, কিন্তু কুমির যে নৌকার আশেপাশেই ঘুরছে বুঝলে কি করে?

—শুধু একটা কুমির নয় হুজু ঝাঁক বেঁধে এসেছে। মাঝে মাঝে ভে ওঠে আবার জলে তলিয়ে যায়। এক দাঁড়ান না দেখতে পাবেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ জলের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজতে শুরু করলেন। কুয়াশায় সব কিছুই অস্পষ্ট। কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখছেন বলেই কি সাদা দুধের মতো দেখাচ্ছে নদীর জল, ঠিক ধরতে পারছিলেন না। এখন জোয়ার না ভাঁটা কে জানে। বজরাটা জলের উপরই ভেসে আছে, ভাঁটা হলে আর কিছুক্ষণ পর চরায় ঠেকে যাবে। আর জোয়ার হলে পুরোপুরি ভাসতে শুরু করবে।

—ঐ ঐ! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রজনী।

নরেন্দ্রনারায়ণ তাকালেন, হাঁ হাত দশেক দূরে কি যেন একটা ভেসে উঠেছিল, চেহারাটা পুরোপুরি মালুম হওয়ার আগেই আবার তলিয়ে গেল।

—যাঃ, দেখতে পেলুম না তো। বন্দুকটা নিজের হাতে তুলে নিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। এলোপাথারি কয়েকটা গুলি ছুঁড়লে কেমন হয়। কি বলো?

রজনী নরেন্দ্রনারায়ণকে বাধা দিল, মিনতি, গুলি ছুঁড়ে লাভ নেই হুজুর। পালিয়ে যাবে। বরং একটা টোপ দিতে পারলে ভাল হত।

—টোপ?

—টোপ মানে একটা জন্তু জানোয়ার যদি দড়ি বেঁধে নামিয়ে দেওয়া যেত তা হলে মজা দেখা যেত।

হাতের কাছে জন্তু জানোয়ার এখন কোথায় পাওয়া যাবে! নরেন্দ্রনারায়ণ একটুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন, একটা মানুষকেই দড়ি বেঁধে নামান যাক না।

—মানুষ! রজনী কেমন অবাক হয়ে তাকাল।

—মানুষের অভাব কি! হাতের কাছে তো পেনেটির কামিনীই রয়েছে। ওকেই ঝুপ করে ফেলে দিলে কেমন হয়।

কামিনী হাসল, আমাকে ফেললে কামিরে পিঠ পেতে দেবে। কুমিরের পিঠে চেপে আমি সটান কলকাতা চলে যাবো।

—তাই বুঝি! তবে ফেলে দেই?

যতই রসিকতা হোক, গা শিরশির করে উঠল কামিনীর। দু পা পিছিয়ে এল।

নরেন্দ্রনারায়ণ উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। তারপর দুম দুম করে দুবার গুলি ছুঁড়ে ফাঁকা আওয়াজ করলেন। তারপর বন্দুকটা লোফফা করে রজনীর দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

—আসলে বাঘ কুমির হরিণ কোনটাই আমার ভাগ্যে নেই, থাকলে ঠিক দেখতে পেতুম।

গুলির আওয়াজে জঙ্গলের দিকে অসংখ্য পাখি লাফিয়ে উঠেছিল। একে কুয়াশা তায় এখনো সূর্য ওঠে নি, ভেজা জঙ্গলের এক পাশটা ডিমের কুসুমের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত রহস্যময় একটা পরিবেশ।

যাওবা কুমির দেখা যেত, গুলি ছোঁড়াতে তা গেল। মনে মনে ভাবল রজনী। কিন্তু নরেন্দ্রনারায়ণের ইচ্ছার অনিচ্ছার ওপর খবরদারি চলে না। বলল, হুজুর কুমিরগুলি সব পালিয়ে গেল।

—বাঁচা গেল। ওরা থাকলেও যা না থাকলেও তা, চোখে তো আর দেখা দিল না।

কামিনী বলল, আমার কপাল ভাল, আমি দেখেছি।

রজনী জলে চোখ রেখে আঁতিপাতি করে কুমির খুঁজছিল তবুও। বলল, আর দু একটা দিন থেকে যান ছোট কর্তা, কুমিরগুলো আবার এদিকে আসবে।

নরেন্দ্রনারায়ণ বজরার ছাদে বসে পড়লেন, তার মানে এখনো ভাগ্যে আছে বলছ? কাল তো হরিণের বদলে সাপের খেলা দেখালে।

কামিনী বলল, ভাগ্যে থাকলে কলকাতা গিয়েও হরিণের মাংস পাওয়া যেতে পারে।

—আমিও সে কথাই ভাবছিলাম কামিনী। নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, আমি তো কালকেই কলকাতার পথে বজরা ভাসাতে চাই। তুমি কি বলো?

কামিনী বলল, আমি এক পায় দাঁড়িয়ে আছি, যখন যেতে বলবেন তখনই রাজি।

রজনী বলল, কালই চলে যাবেন হুজুর?

নরেন্দ্রনারায়ণ কম্বলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে বললেন, কালই। আজ একবার বিকেলের দিকে তোমরা কয়েকজন এসো, দরকারি কিছু কথাবার্তা সেরে নেব। আর আমার মাঝিদের গোছগাছ করে নিতে বলো।

রজনী খুশী কি অখুশী বোঝা গেল না। মাথা নাড়ল, ঠিক আছে, বিকেলে সবাই আসবে। আজ সারাটি দিন খুব ঝামেলা যাবে। আজ নৌকার আবাস ছেড়ে কাছারি ডেরায় সবার নেমে পড়ার কথা। রজনীও আজ নৌকা খালি করে কাছারি ঘরে আশ্রয় নেবে। কাল থেকে খালি নৌকায় কাঠ তোলা হবে। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই দু নৌকো কাঠ কলকাতার পথে যাত্রা করিয়ে দেওয়া যাবে।

নরেন্দ্রনারায়ণ আবার বজরার চার পাশে জলের দিকে তাকালেন। ঘোলা, দুধ সাদা জল। সূর্যের রক্তিম আভা তার ওপর বিছিয়ে পড়ছে। কানের লতি দুটো ঠান্ডায় জমে আসছিল, কম্বলটাকে মাথা মুড়ি দিয়ে উনি আয়েশ করে বসলেন। কতকাল যে সূর্যোদয় দেখেন না কে জানে।

কামিনীও পাশে বসে পড়ল। রোদে গা পিঠ গরম না হওয়া পর্যন্ত নিচে নেমে লাভ নেই।

প্রায় এক দুপুর অবধি ওরা ঐভাবেই বজরার ছাদে বসে আলসেমি করে করে কাটিয়ে দিলেন। এ ছাড়া কিছুই করার নেই।

দুপুরে পাখির মাংস দিয়ে গরম গরম ভাত, বেশ রসিয়ে রসিয়ে খেলেন নরেন্দ্র-নারায়ণ। নৌকায় রান্না-বান্না, নৌকাতেই খাওয়া। স্নান, বাথরুম সবই ওঁদের নৌকায়। বেশ কেটে গেল ক'দিন। বন্ধু-বান্ধব কিছু নিয়ে এলে জমিয়ে আড্ডা মারা যেত, কিন্তু এখন একমাত্র কামিনীকে নিয়ে যেন ক্লান্তি ধরে গেছে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে পান চিবোতে চিবোতে নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, নৌকায় নৌকায় বেশ ক'টা দিন কেটে গেল, কি বলো? একার একবার জঙ্গলের ভেতরটা ঘুরে দেখে এলে হত না! আবার কবে আসব।

কামিনীর-পিঠ ছড়ানো খোলা চুল। রোদে পিঠ এলিয়ে বসে দুপুরের ভাত-ঘুমটাকে দমন করার চেষ্টা করছিল, বলল,
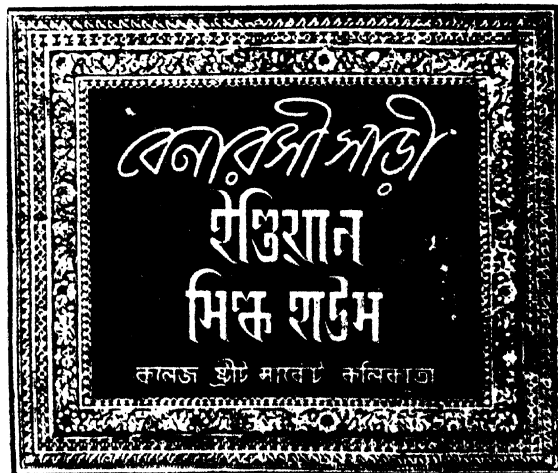
জঙ্গল তো এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। এত দেখার পর আর কিছু বাকি থাকে না।

—থাকে গো থাকে! নরেন্দ্রনারায়ণ চটুল একটু রসিকতা করলেন, মেয়েমানুষ যেমন দেখে দেখে শেষ করা যায় না, বনও তেমনি। রোজই মনে হয় নতুন।

—ভালোই বলেছেন। কামিনী মিষ্টি করে একটু হাসল।

—তা ছাড়া বাইরে থেকে দেখা আর ভেতরে ঢুকে দেখা, বুঝলে না।

—বুঝলাম।

—বুঝে থাকলে এবার চটপট তৈরি হয়ে নাও। বনের ভেতর ঢুকে দুপুরের আলসেমীটা একবার কাটিয়ে আসি চল।

—ও মা গো! ঐ জঙ্গলে ঢুকলে আর রক্ষা থাকবে না।

—কেন, রক্ষা থাকবে না কেন?

—জানেন না কেন! বাঘটাকে তো কিছুই করতে পারলেন না আপনারা। মানুষের স্বাদ পাওয়া বাঘকে বিশ্বাস করি না।

—বাঘ! নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, হাসিটা বড় দাম্ভিক। ভয় নেই, বন্দুক-টন্দুক নিয়েই বেরুব। রজনী মকবুল ছাড়াও আরো দু একজনকে নিয়ে নেব।

কামিনীর তবু ভরসা হয় না। নিজের অসহায়তা ও প্রকাশ করতে মলিনভাবে একটু হাসল। আপনারাই ঘুরে আসুন না, আমি একটু বসি।

—মাথা খারাপ, তোমাকে একা রেখে আমি নড়তেই পারব না। ওঠ ওঠ, একবার গা তোল মা ভবানী।

কামিনী বুঝল, মাথায় যখন একবার ঢুকেছে তখন আর উপায় নেই। অথচ এই অদ্ভুত জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানর কি আছে কে জানে। জমিদারী খেয়াল। মনে মনে বিরক্ত হলেও ওকে উঠতে হল।

নরেন্দ্রনারায়ণ হাঁক-ডাক শুরু করে দিলেন, তিনটে বন্দুকই সঙ্গে নেওয়া হল। ডাক পড়ল শুকদেবেরও। সাপ নিয়ে যা কীর্তি দেখিয়েছে ও, তাতে ওরকম লোকই এখন সঙ্গে দরকার।

তৈরি হয়ে ভেড়ির ওপর জটলা শুরু করে দিল কয়েকজন। ঈশান একটা বন্দুক তুলে নিল। প্রসাদ সিংয়ের হাতে একখানা, বাকিখানা রইল রজনীরই হাতে।

নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীকে নিয়ে ঘাট-সিঁড়ি বেয়ে বজরা থেকে ভেড়িতে নেমে এলেন। সব ঠিক আছে তো? নরেন্দ্র-নারায়ণ শুধোলেন।

—সব তৈরি হুজুর। রজনী উত্তর করল। আমরা যতক্ষণ সঙ্গে আছি, কিছু ভাববেন না হুজুর।

—বটে! তোমাদের মাঝখান থেকেই তো কি নাম যেন তুলে নিয়ে গেল। কামিনী আবার আক্রমণ করল রজনীকে।

রজনী নির্বিকার। বলল, সে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই।

—অ! ঘুমিয়ে না পড়লে যেন চড়-চাপড় মেরে বাঘকে তাড়িয়ে দিতে! যাক গে, চল, কোন দিকে যাবো?

শুকদেবের চোখেমুখে সারাক্ষণ একটা হাসির ছোঁয়া লেগেই আছে, বলল, যাবার তো একটাই জায়গা হুজুর, ফিরিঙ্গি দেউল।

—ফিরিঙ্গি দেউল মানে সেই সাপের জায়গা?

শুকদেব হাসে, শীতকালে বড় একটা সাপ থাকে না হুজুর। কপাল ভালো বলেই আমরা একটা পেয়ে গিয়েছিলাম।

কামিনী একবার ভেড়ির নিচে বনের দিকে তাকাল, বাব্বা, এর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে পারব তো?

—পালকি থাকলে পালকির বন্দো-বস্ত করে দিতাম, কিন্তু নেই যখন কি আর করা। নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর কাঁধে হাত রেখে এগোতে শুরু করলেন, আসলে একটু ভিতরে ঢুকলেই বুঝতে পারবে কিছু কঠিন না।

কিন্তু তবু বনের মধ্যে প্রথম পা দিতেই কামিনীর শাড়ি আটকে গেল কাঁটায়।

হা হা করে উঠল ঈশান। ঈশান আর শুকদেব পেছনে পেছনে, সামনে রয়েছে রজনী, মকবুল আর প্রসাদ সিং।

—শাড়িটা একটু তুলে হাঁট না, এই জঙ্গলে কি এসে যায়।

কামিনী অন্য সময় হলে চোখে কপট তিরস্কার ছড়াত, কিন্তু এখন রঙ্গ রসিকতাও ও ভুলে গেছে। হাঁটুর ওপর শাড়ি তুলে ধবধবে পা দুটো নগ্ন করে দিল। পায়ে সরু ফিতের চটি। পা টিপে টিপে ও এগোতে শুরু করল।

জঙ্গলের আকৃতি দেখে শিউরে উঠতে হয়। গাছের ডালে পাতায় যেন জাল সৃষ্টি করে রেখেছে। নিচে মাটি কি নরম। কখনো কখনো মনে হচ্ছে পা যেন কাদার মধ্যে গেঁথে যাবে। আর কাদা ভেদ করে বেরিয়ে আসা শুলোগুলো কি ছুঁচলো। চামড়ায় একটু ছোঁয়া লাগলেই কেটে দরদর করে রক্ত বেরুতে শুরু করবে।

অবস্থা বুঝে খুব সাবধানে পা মেপে মেপে এগোতে শুরু করলেন নরেন্দ্র-নারায়ণ। কামিনীর চোখেমুখে বিরক্তি ছড়িয়ে রইল, নরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে এসে কি ঝামেলাতেই না পড়া গেছে।

পাতার খস খস শব্দ হতেই আবার চমকে চমকে উঠতে হয়। ঈশান পেছন থেকে বলে, ও কিছু নয় হুজুর, আমরা আছি।

নরেন্দ্রনারায়ণ সামনের দিকে তাকান এই হারামজাদা রজনী, তোরা অত জোরে হাঁটছিস কেন?

রজনীরা দাঁড়ায়। মকবুলের হাতে বল্লমের মতো একটা লাঠি। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে শব্দ করে ও এগোচ্ছিল। শব্দটা অদ্ভুতভাবে চারপাশে ছড়িয়ে যেতে শুরু করেছিল। মাঝে মাঝে ভয় পাওয়া পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ ওদের কানে আসছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ এক পলক আকাশের দিকে তাকালেন, আকাশ সূর্যের আলোয় বেশ পরিষ্কার। জঙ্গলের সহস্র বাধা যেন সেই আলোকণা ভিতরে ঢুকতে দিতে নারাজ। কেমন একটা স্যাঁতসেতে অন্ধকার পরিবেশ জঙ্গলের ভেতর। কখনো বা ছিটে ফোটা আলো জঙ্গলের ফাঁক ফোকর গলিয়ে নিচে এসে পড়েছে। কখনো আবার পাতার আড়ালে সূর্যের আলো বাধা পেয়ে সহস্র ধারায় ছড়িয়ে গিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা যেন।

হঠাৎ এক সময় থমকে দাঁড়ালেন নরেন্দ্রনারায়ণ, ওটা কি হে ?

শুকদেব লাফিয়ে এগিয়ে এল, কি হুজুর ?

—ঐ যে কি একটা লম্বা মতো দাঁড়িয়ে আছে না ?

ভয়ে চিৎকার করে উঠল কামিনী।

রজনীরা পিছিয়ে এসে বন্দুক তুলে ধরল, কি, কোথায় ?

নরেন্দ্রনারায়ণ আঙুল তুলে দেখালেন, ঐ যে লতা ঝোঁপটার পিছনে।

ঈশান বন্দুক হাতে লতা ঝোঁপের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বন্দুকের নল দিয়ে ঝোঁপের গায়ে নাড়া দিল, কিছুই নেই।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, ঐ যে ঝোঁপের পাশে।

—ঝোঁপের পাশে, ঈশান ঝোঁপের পাশে একটা মাথা ভাঙ্গা মরা গাছ দেখতে পেল ওটা ?

—হ্যাঁ, কী ওটা ?

ঈশান হাসবে না কাঁদবে। এটাতো গাছ।

—গাছ। নরেন্দ্রনারায়ণ যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না, একটা গাছ অমন চারপেয়ে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

—গাছটা হয়তো ঝড়-ঝাপটায় ভেঙ্গে পড়ে ওরকম হয়ে আছে।

রজনী বলল, অনেক সময় এ রকম চোখের ভুল হয়। এই জন্য গভীর জঙ্গলে কেউ একা ঢুকতে চায় না।

কামিনীর আতঙ্ক এখনো সারা চোখে [illegible] আছে, বলল চলুন না আমরা ফিরি এবার আমার ভীষণ ভয় করছে।

নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর দিকে অভয় দিয়ে তাকালেন, তুকোচ যখন ফিরিঙ্গি দেউলটা দেখেই ফিরব। কতদূর হে তোমাদের ফিরিঙ্গি দেউল ?

—বেশি দূরে নয় হুজুর। শুকদেব বলল আমরা আগের দিন ঘুর পথে গিয়েছিলাম আজ সোজা যাচ্ছি।

কামিনী বিরক্ত গলায় বলল, পথ কোথায়। বনের মধ্যে আবার ঘুর পথ সোজা পথ আছে নাকি ?

ঈশান হাসল, ঐ সূর্যদেব আছেন [illegible] ঐ তো বনের মধ্যে পথ দেখায়। চলুন না হুজুর আর সামান্য দূরেই ফিরিঙ্গি দেউল।

নরেন্দ্রনারায়ণ আবার কামিনীকে অভয় দিলেন ভয় নেই কামিনী, আমরা একগুলো লোক সঙ্গে আছি, ভয় কি।

কামিনী আবার শাড়ি সামলাতে সামলাতে হাঁটতে শুরু করল। সতর্ক দৃষ্টি সতর্ক কান, কী ঝামেলাতেই পড়া গেছে আজ।

আরো খানিকটা এগোতে মকবুল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। মাটিতে ঝুঁকে কী যেন দেখাতে শুরু করল।

বুকের ভেতর আবার সন্ত্রাস করে উঠল নরেন্দ্রনারায়ণের কি ওখানে ?

—হুজুর, পেয়েছি। হরিণের পা।

—হরিণের পা। সেটা কি জিনিস ?

নরেন্দ্রনারাণ এগিয়ে এলেন, অসংখ্য পায়ের ছাপ।

—এখান দিয়ে নিশ্চয় হরিণ গেছে হুজুর।

—হরিণের পায়ের ছাপ এরকম ? কৌতুকে ছাপগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তবে তোমরা হরিণ নেই বলছিলে ?

শুকদেব বলল, আমরা কিন্তু সারা জঙ্গল তোলপাড় করেও ওদের পাইনি হুজুর। ভীষণ চালাক জাত। হুজুর, একবার এই ছাপ ধরে এগিয়ে দেখব ? এই দিক দিয়েই ওরা গেছে।

—মাথা খারাপ নাকি ! আমাদের ফেলে রেখে কোথাও এগোবার দরকার নেই।

রজনীও শুকদেবকে থামিয়ে দিল। হরিণ এখান দিয়ে গেছে ঠিক, কিন্তু কোথায় গেছে তা তো জানা নেই। আর মানুষের সাড়া পেলে ওরা নিশ্চয়ই ধারে কাছে থাকবে না। অগত্যা হরিণ সন্ধান থামিয়ে রাখতে হল। ঈশান ফিসফিস করে বলল, আমাদের কপালে নেই। কপালে থাকলে আগেই পেতাম।

—কপালটা আমাদের নয় ঈশান ভাই। আসলে ছোটকর্তারই কপালে নেই। তবে জঙ্গল কাটতে কাটতে একদিন না একদিন সব হরিণ আমাদের হাতে ধরা পড়বে। আমাদের কপালে ঠিকই আছে, তবে আজ আর কাল।

রজনীর গলা পাওয়া গেল, বাঁদিকে বানরের ঝাঁক আছে। ওদের পেছু লাগবেন না কেউ।

নরেন্দ্রনারায়ণ বাঁদিকে তাকালেন, কোথায় বানর। কিছুই চোখে পড়ল না ও'র।

কামিনী বোধহয় নিজের মধ্যে সাহস সঞ্চারের চেষ্টা করে বলল, কাশীতে হনুমান দেখেছি। সে কি হনুমান, জোর জুলুম করে মানুষের পেছন লাগে।

ঈশান বলল, এখানকার বানর বাঘ মারতে পারে।

ঈশান রসিকতা করল কিনা ধরা গেল না। নরেন্দ্রনারায়ণ তখনো বানর দেখার জন্য ব্যস্ত। এপাশে-ওপাশে খুঁজছিলেন। কামিনী পিছন ফিরে একবার ঈশানকে দেখে নিল। ঈশানের চোখে হালকা একটু ঠাট্টা যেন ঝরে পড়ছে।

শুকদেব আঙুল তুলে দেখাল, ঐদিকে দেখুন, ঐ যে।

নরেন্দ্রনারায়ণ এবার দেখে চমকে উঠলেন, সত্যি হাজারে হাজারে বানর।

—ওরা একসঙ্গে সবাই দল বেঁধে থাকে। একবার তেড়ে এলে কার বাপের সাধ্যি সামলায়। নরেন্দ্রনারায়ণ চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। অদ্ভুত কুতকুতে চোখে বানরগুলি এখন মানুষ দেখছে। চাহনিগুলো মোটেই ভাল নয়। বুকের ভেতর গুড়গুড় করে উঠল। আমাদের এই ছ-সাতটা মানুষের দিকে সত্যি সত্যি ওরা তেড়ে এলে বাঁচার আশা থাকবে না। সামান্য তিনটে বন্দুক দিয়ে যে ওদের ঠেকান যাবে না, বুঝতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না।

শুকদেব বলল, বানরগুলো না দেখার ভান করে এগিয়ে যান হুজুর। ওদের আমরা তেড়ে না গেলে ওরাও আমাদের তাড়া করবে না।

মাথা নিচু করে মিত্রপক্ষের ভঙ্গি করে এগোতে শুরু করল সবাই। আরো খানিকটা এগিয়ে রজনীর মনে হল নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেছে। বলল, আর ভয় নেই হুজুর, সামনেই ফিরিঙ্গি দেউল দেখা যাচ্ছে।

—ফিরিঙ্গি দেউল কোথায় ? কেবল জঙ্গলের গাছপালা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না নরেন্দ্রনারায়ণের।

ঈশান আঙুল তুলে একটা ঢিবি দেখাল, ঐ যে ঢিবিটা দেখছেন, ঐটে; ঐখানে ঐ ইঁটের গা থেকে সাপ ধরেছিল শুকদেব।

—ওখানে কি এগোন ভাল হবে ? কামিনীর গলা দিয়ে ফ্যাসফেসে শব্দ বেরুল।

নরেন্দ্রনারায়ণ ইটের ঢিবিটাকে আলাদা করে দেখবার চেষ্টা করছিলেন। কে জানে, এই ইঁটের ঢিবির পেছনে কত কালের ইতিহাস লুকোন আছে। অথচ সবটাই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ! ওটা আসলে ফিরিঙ্গিরাই তৈরি করেছিল না মগেরা তাও আর জানার উপায় নেই। যেই বানিয়ে থাক ঐ ঢিবি, আগে ওখানে লোক যাতায়াত ছিল এটা ভাবতেই কেমন গা ছমছম করে উঠল নরেন্দ্রনারায়ণের। এখানে পথঘাটও তৈরি হয়েছিল এককালে। কিন্তু সব কিছুই কালে কালে জঙ্গল গ্রাস করে নিয়েছে। জঙ্গলের শক্তিই বা কম কি।

রজনী বলল, হুজুর, মাত্র মাসখানেক আমাকে সময় দিন, দেখুন এই অবধি আমি জঙ্গল সাফ করে আপনাকে দেখাচ্ছি। আর এই ফিরিঙ্গি দেউলের এখানেই আমরা বনবিবির থান বানাব। বনবিবি যদি আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন, দেখবেন হু-হু করে কাজ এগোচ্ছে।

—এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন ? কামিনী অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর দিকে চোখ রাখলেন, বসার জায়গা থকলে বসতাম।

কামিনী কিছুটা অসহায় বোধ করল। ঠিক আছে, আপনি বসুন।

নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, কেন যে এত ভয় পাচ্ছ বুঝতে পারছি না। আমার তো বেশ লাগছে জায়গাটা।

—তা তো লাগবেই। আপনার সম্পত্তি এসব, ভাল লাগবে না ?

—তা যা বলেছ ! নরেন্দ্রনারায়ণ দমলেন না, বললেন, আমার কি মনে হচ্ছে জানো ? মনে হচ্ছে, এত যে সব গাছপালা আর এই গাছপালার আড়ালে লুকোন এত জন্তু-জানোয়ার পশু-পাখি, এরা সবাই কিন্তু আমার দয়ায় বেঁচে আছে। আমি ইচ্ছে করলেই এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারি, আবার ইচ্ছে করলেই—

—এ সময় একটা বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেই বোঝা যেত।

নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, আসবে না। বাঘেরও প্রাণের ভয় আছে। আসলে মানুষকে যে ভগবান শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে তৈরি করেছেন এখানে এসে বেশ তা বুঝতে পারছি।

রজনী দোহারকি দিল, হ্যাঁ হুজুর, মানুষের বুদ্ধির কাছে হার স্বীকার না করে কারো উপায় নেই।

—তাই যদি হবে, তবে ফিরিঙ্গি দেউলের এই অবস্থা কেন ? মানুষেই তো বানিয়েছিল এসব।

—মানুষেই বানিয়েছে, কিন্তু প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর আর এদিকে কেউ ফিরে তাকায়নি। তা ছাড়া সব মানুষ তো আবার একরকম নয়।

মকবুল বলল, হ্যাঁ হুজুর, মানুষের মধ্যেও হের-ফের আছে, কি বলো ঈশান, নেই ?

—নিশ্চয়ই আছে হুজুর। রজনীর গলাতে তোষামোদী ঝরে পড়ল। আমাদের ছোটকর্তার যুগ্যি একজনও নেই।

নরেন্দ্রনারায়ণ পরিতুষ্ট হলেন কিনা বোঝা গেল না। মনে হল উনি প্রসঙ্গটা ঘোরাতে চাইছেন, বললেন, সবই তো বুঝলাম, তা আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব না কি ? চল, দেউলটা একবার ঘুরে দেখি।

কামিনী বলল, এখান থেকেই তো দেখা যাচ্ছে, আবার কি দেখার আছে বুঝি না।

—ঘুরে না দেখলে বুঝবে কি করে, চলো এগোও।

দলটা এগোতে শুরু করল।

রজনী বলল, পুরনো এই সব ঢিবির নিচে অনেক সময় অনেক ধনরত্ন চাপা পড়ে থাকে বলে শুনেছি। এই ঢিবির নিচেও তেমন কিছু যদি থাকে হুজুর, তাহলে আর পায় কে।

নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, এ ঢিবির নিচে মাটি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ফিরিঙ্গিরা অত বোকা নয়, ধন-দৌলত ফেলে রেখে চলে যাবে। মানুষের জান যায় তবু ভি আচ্ছা, কিন্তু ধন-দৌলত ছাড়ে না।

শুকদেব বলল, অনেক সময় হুজুর সেফ কঙ্কাল জমা পড়ে থাকে এই সব ঢিবির নিচে। হি-হি করে হাসল।

—কঙ্কাল, কিসের কঙ্কাল। কামিনী শুকদেবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

শুকদেবের চোখে-মুখে কৌতুক। কার কঙ্কাল আবার, মানুষের। অনেককাল আগে জন্মালে আমার কঙ্কালও পড়ে থাকতে পারত।

—তুই থামবি ? রজনী ওকে ধমকে উঠল।

শুকদেবের বিন্দুমাত্র ভয়-ডর আছে আছে বলে মনে হয় না। শুকদেব বলে অত ধমকাচ্ছ কেন গো রজনীভাই, তোমারও কঙ্কাল থাকতে পারত।

রজনী ঈশানের দিকে তাকায়, এ হারামজাদার জ্ঞান-গম্যি বলে কিছুই নেই। কোথায় ছোটকর্তাকে চারপাশটা ভাল করে ঘুরিয়ে দেখাবি তা না যত বাজে অলুক্ষণে গল্প।

শুকদেব হাসে, ওটাই তো আসল কথা গো ! তারপর ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ে।

নরেন্দ্রনারায়ণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখেন।

রজনী আবার ওকে ধমকায়, ওই থামবি ? আসলে হুজুর ও একটা জানোয়ার। ওর আসল ইতিহাস যদি শোনেন, ওটাকে মানুষ বলেই মনে হবে না আপনার।

শুকদেব গাছের ডাল ধরে আচ্ছা করে ঝাঁকি দিতে থাকে। ঝরঝর ঝরঝর একটা অদ্ভুত শব্দ হয়। সেই শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শুকদেব হাসে, মাথা ঝাঁকায়, হাত-পা বাঁকায়, তারপর হঠাৎ থমকে গিয়ে বলে, হুজুর এই যে গাছপালা দেখছেন, এদের খবরদার বিশ্বাস করবেন না হুজুর।

নরেন্দ্রনারায়ণ কৌতুকে তাকিয়ে থাকেন।

—এরাও বদলা নিতে জানে হুজুর। সুযোগ পেলেই বিষ দাঁত মেলে দাঁত তেড়ে আসবে। এদের বিশ্বাস নেই হুজুর।

রজনী এবার নিজেই কেমন থমকে যায়। কি সব বলতে চাইছে শুকদেব, কে জানে।

ঈশান বলল, ওর সব কথা কখনো বোঝা যায় না। জানোয়ার।

শুকদেব আবার মাতালের মতো গাছের ডাল ধরে লাফায়, বুঝবি না, বুঝবি না, বুঝবি না।

(চলবে)

(৭)

১৯১৬ সালে কলকাতা থেকে কয়েকজন ...ষ্ট ব্যক্তি শিলং গেছিলেন। সাল-...খের এক আধ বছর আগে পরেও হতে ...র, মোট কথা বড় মাসিমারা তখনো ...ং-এ ছিলেন। প্রথমে গরমের ছুটিতে ...কুদা, পানকুদা গেছিল। দুজনে দুটি ...পর ঝুড়ি। তাছাড়া এক গাদা বাংলা ...পর বই নিয়ে গেছিল। তাতে ...শকের নাম দেখেছিলাম, ইউ রায় ...ন্ড সন্স আর সিটি বুক সোসাইটি। এরা ...ন আসাতে মা যে কি খুসি সে আর কি ...ব। এক বাড়িতে মানুষ, এরা বড় না ...বোপা, তার চাইতে ছোট ভাইয়ের মতো। ...ও মাকে বেজায় ভালোবাসত। মান্তু বলে ...ডাকত, নানকুদার দেওয়া নাম। ...কুদা হল উপেন্দ্রকিশোরের ছোট ছেলে ...মল আর পানকুদা কুলদারঞ্জনের একমাত্র ...লে, পড়াশুনোয় ভারি ভালো, তার ওপর ...দারুণ, ছোটবেলায় মা-মরা, কেমন ...ট চাপা স্বভাবের ছিল, বেশি আজে-...জে বকত না। নানকুদা আর আমরা ...নে বকতাম।

...দের কথা বলবার আগে আমাদের ...বয়সীদের কথাও কিছু বলা দরকার, ...া আমাদের সুখ-দুঃখের গল্প শোনার ...হত। নরেন্দ্রে হরিচরণরা থাকত, তার ... বাড়িতে কাঞ্জিলাল জ্যাঠামশাই ...তেন। তাঁর দুই নাতি সতু আর দুখু। ... আমাদের বয়সী, দুখু বছর দুই-...নের ছোট। ওর বোধ হয় মা ছিল না। ...ভায় বোকা। দাদা, কল্যাণ, সতু ওখানকার ...কারি হাইস্কুলে ভরতি হল, কিন্তু দুখুর ... মনে করতে পারি না। তবে একদিন সে ...টা গোটা তামার পয়সা গিলে, খাবি ...তে লাগল, একথা মনে আছে। মুখ ...ল, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, খালি ...ক আঁক করছে আর নাল পড়ছে। ...রা সবাই থ'।

এমন সময় বড় প্রফুল্ল-কাকিমা ছুটে ...সে দুখুর ঠ্যাং ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে, ...ভাগে এমনি জোরে এক থাবড়া ...লেন যে তার চোটেই পয়সাটা ঠক করে ...তে পড়ল আর দুখু এতক্ষণ পরে বিকট চেঁচিয়ে উঠল। আমার তো ব্যাপার দেখে হাত-পা ঠাণ্ডা! জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমা বড্ড ভালো ছিলেন। ওঁদের বাড়ির দরজায় বড় বড় পাঁউরুটির মালার পরদা ছিল। এমন আর কখনো দেখিনি, শুধু বইতেই পড়েছি। জ্যাঠামশাই বন-বিভাগে কাজ করতেন। ওঁরা বোধ হয় বেশ গোঁড়া ছিলেন। মা একদিন বললেন, "তোরা যে ওঁদের বাড়ির সব ঘরে ছুটোছুটি করিস, তাই বলে যেন ওঁদের রান্নাঘরে যাস্‌নি।" আমরা বললাম "কেন?" মা বললেন, "তোমরা গেলে ওঁদের খাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে।" এমনি অবাক হয়ে গেছিলাম যে কি বলব। আমরা গেলে কারো খাওয়া নষ্ট হবে ভেবেও বেজায় কষ্ট হয়েছিল। মা আরো বলেছিলেন, "তোমরা যে ব্রাহ্ম। গোঁড়া হিন্দুরা ব্রাহ্মদের সঙ্গে খায় না।" কিন্তু পাড়ার বন্ধুরা তো সবাই হিন্দু ছিল, কই ওরা তো আমাদের সঙ্গে খেত-টেত। সতু দুখুও তো খেত। মনে আছে ভারি গোলমাল লেগেছিল। পরে বহু গোঁড়া হিন্দুদের ভালোবাসায় আমার জীবন কেটেছে।

সেবার হরিচরণরা শীতের সময় কলকাতায় গিয়ে, সে-বছর আর ফিরল না। অমর কাকাবাবুকে হয়তো অন্য কোথাও পাঠানো হয়েছিল। 'নরেন্দ্র' বাড়ি খালি রইল। তারপর হঠাৎ একদিন সতু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, "নরেন্দ্রে বাংলার বাঘ এসেছে। চল, দেখে আসি।" আর যায় কোথা! আমরা সবে স্কুল থেকে এসে হাত-মুখ ধুয়ে ভাত খেতে বসেছি। বড্ড সকালে স্কুল বসত, তাই ডিম রুটি খেয়ে, টিফিন নিয়ে চলে যেতাম, বিকেলে ভাত খেতাম, রাতে কিছু জলখাবার খেতাম। গরম গরম লুচি দিয়ে লাল চিনি দিয়ে কি ছক্কা দিয়ে। সেদিন খাওয়াই হল না, যে যার দুদ্দাড় করে উঠে পড়ে সতুর সঙ্গে ছুটলাম। বড় মাসিমা রাগ করতে লাগলেন, তা কে কার কথা শোনে!

নরেন্দ্রের গেটের বাইরে থেকে দেখতে পেলাম বারান্দায় একটা জল-চৌকিতে একজন ঝুলো-গোঁফ ভয়ঙ্কর মোটা বুড়ো-মতো মানুষ বসে আছেন, গায়ে একটা গেঞ্জি, সেটার পিঠের দিকটা তুলে একটা লোক দলাই-মলাই করে দিচ্ছে! ঐ নাকি বাংলার বাঘ!! আমাদের রাগ দেখে কে! ছোটবেলা থেকে সন্দেশে জীবজন্তুর গল্প পড়েছি আর বাঘ চিনব না! রেগেমেগে সতুর দিকে ফিরতেই, সে আমতা আমতা করে বলল, "তবে যে দাদু বললেন—"

আমরা সবাই হাঁসের আক্রমণের কথা ভুলে গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে বাড়ি ফিরলাম। শেষের দিকে দৌড়তে হল, কারণ আমরা ভুললেও হাঁসরা ভোলেনি। মা-মাসিমাকে সব কথা বলতেই উল্টো ফল হল। "বলিস্‌ কি রে! উনি যে দেবতুল্য মানুষ! চল, প্রণাম করে আসি।" আশু মুখুজ্জেকে ঐ একবার কাছে থেকে দেখেছিলাম। অন্যদিন মা আমাদের নানান্‌ ইংরেজি বই থেকে গল্প বলতেন, সতুও বসে শুনত। সেদিন আশু মুখুজ্জের তেজের গল্প বললেন। কেমন 'রেড্‌ রোড' বলে কলকাতায় একটা রাস্তা আছে, আগে সেখান দিয়ে কোনো ভারতীয়কে যেতে দিত না। আশু মুখুজ্জে তখন হাইকোর্টের জজ, তিনি নিয়ম অমান্য করে, তবু গেলেন। ব্রিটিশ সার্জেন্ট জজ সায়েবকে চিনতে না পেরে, তাঁর নামে মামলা করতে গিয়ে কি হয়রাণ হয়েছিল, সে গল্পও শুনলাম। সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশায়ের আত্মসম্মান সম্বন্ধে নানা রকম গল্প শুনে আমরা তাজ্জব বনে গেলাম। আমরা যে পরাধীন, একথা এতদিন ঠিক জানতাম না। পরাধীন কথাটার মানেই ভালো বুঝতাম না। এর আগেই দেশের জন্য কতজন প্রাণ দিয়ে-ছিলেন, দ্বীপান্তরে গিয়েছিলেন, সব বললেন মা সেদিন। খুদিরামদের উল্লাসকর দত্তদের বাড়ির সঙ্গে বোধ হয় জ্যাঠামশাইদের যাওয়া আসা ছিল। মার চোখে জল দেখেছিলাম।

ঐ কটি ঘরে আমাদের আর কুলোচ্ছিল না। ১৯১৬ সালে আমাদের সবার ছোট ভাই যতির জন্ম হয়। জীবনে বড় দুঃখ পেয়ে ৫৯ বছর বয়সে যতির মৃত্যু হয়। দেখতে বড় সুন্দর ছিল। মনে আছে ওকে টেনে নিয়ে বেড়ালে আমার কালো হওয়ার দুঃখ ঘুচে যেত। সে যাই হক, আরেকটি ঘর না হলে চলছিল না।

বাড়ির মালিক চন্দ্রনাথ রায় বললেন, "আপনারা বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। আমি আরেকটা ঘর করে দিচ্ছি।" লম্বা এক-হারা বাংলোর পশ্চিম দিকের শোবার ঘরের লাগোয়া আরেকখানি ঘর হল, সামনের বারান্দার জায়গায় একটি খুদে পড়ার ঘর হল, তাতে বই রাখবার তাক হল। পিছনে একটি স্নানের ঘরও হল। আমাদের সে কি উত্তেজনা! বাড়ির ভিৎ খোঁড়া হচ্ছে; এদিকে বড়মামা আপিস ফেরৎ এসে, ট্রেজার আইল্যান্ড শেষ করে, গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত একটু একটু করে বলে যাচ্ছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এতখানি মাটি খোঁড়া হচ্ছে, নিশ্চয়ই হয় মোহরের কলসিতে ঠুং করে কোদাল লাগবে, নয়তো পিল-পিল

করে চার ইঞ্চি লম্বা মানুষেরা বেরিয়ে আসবে।

বেরুলো একটা পিঁপড়ের বাসা। সে-ও এক আশ্চর্য জিনিস। বেশ বড় বড় পিঁপড়ে। তাদের বাসার সামনে থেকে এক চাকলা মাটি কেটে নিতেই, ওদের ঘর-গেরস্থালি বেরিয়ে পড়ল। সে কি হৈ চৈ! ডিম নিয়ে ছুটোছুটি লেগে গেল। পিঁপড়ের বাসার এমন সুন্দর ব্যবস্থা হতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

নতুন ঘর হল, ঘরে বইয়ের তাক হল। মায়ের বাকস থেকে অনেকগুলি বই বেরুল, সেগুলি ঐ তাকে সাজিয়ে রাখা হল। তার মধ্যে পাৎলা মলাটের একটা সরু বই ছিল, তার নাম 'খেয়া'। শুনলাম রবিবাবুর লেখা বই। তখন সবাই বলত 'রবিবাবু', কেউ তাঁর কথা বলতে গেলে 'রবীন্দ্রনাথ' বলে উল্লেখ করত না। তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেও, সব বাঙালীর মধ্যে একজন ছিলেন, তাই তাঁকে বলা হত 'রবিবাবু', যেমন বলা হত 'বঙ্কিমবাবু' 'দ্বিজুবাবু।' এসব ডাকের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা ছিল।

যাই হক রবিবাবু বলে কাউকে আমি চিনতাম না। স্কুলে বাংলা পড়ানো হত না, বাড়িতে বিদ্যাসাগর মশায়ের ১ম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা শেষ করে, আখ্যান-মঞ্জরী ধরে যেমন কষ্ট পাচ্ছি, তেমনি আনন্দও পাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি রবিবাবুর লেখা কিছু আমি পড়িনি। মা ঐ বইটা আমাকে দিয়ে বললেন, "এটা তোমার।" পড়বার চেষ্টাও করেছিলাম, এক বর্ণ মানে বুঝিনি। বই তাকে তোলা থাকল। পরে আচার রাখবার জন্য পরিষ্কার কাগজের দরকা হলে, ওর একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়েছিলাম। তাই নিয়ে আমাকে যথেষ্ট 'হেনস্থা' হতে হয়েছিল। আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। তাও সব পাতাটা নিইনি, খানিকটা ছিঁড়েছিলাম মাত্র।

সেই সময় আমাদের বাড়িতে প্রশান্ত-চন্দ্র মহলানবিশ বলে একজন লম্বা সুন্দর মানুষ এসে কয়েক দিন থেকে গেলেন। মাসিমা তাঁর কাছে ঐ পাতা ছেঁড়ার গল্প করলেন। তিনি আমাকে বললেন, "এখন বুঝতে পারছ না রবীন্দ্রনাথ কত বড় কবি, কিন্তু পরে বুঝতে পারবে। কেউ তোমাদের ও'র কবিতা পড়ে শোনায়নি?" আমরা মাথা নাড়লাম। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর স্যুট-কেশ থেকে দুটি চটি বই বের করে আমাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে শোনালেন। আগে ঘরের বড় তেলের ল্যাম্প নিবিয়ে, চারটে মোমবাতি জ্বাললেন। সেই মোমবাতির আলোয় কবিতা পড়লেন। সত্যি বলব, কিছু বুঝিনি। তবে আসলে যা বোঝাতে চেয়ে-ছিলেন সে-কথাটি ঠিকই ধরেছিলাম। রবিবাবু আর সব মানুষ থেকে আলাদা। সেই শীতের সন্ধ্যার সেই দৃশ্য এখনো চোখের সামনে ভাসে।

তবে যে কারণে প্রশান্তদাকে আরো বেশি মনে পড়ে, তার সংগে রবীন্দ্রনাথের কোনো সম্পর্ক ছিল না। উনি বোধ হয়, সম্প্রতি কেম্ব্রিজ থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছিলেন, তাই সেখানকার নানারকম মজার গল্প বলে নিজেও ভারি মজা পেতেন। এরপর আরো ৫৫-৫৬ বছর ধরে তাঁকে নানান্ সময় দেখেছিলাম, কিন্তু শিলংএর সেই আমুদে মানুষটিকে আর খুঁজে পাইনি। তবে তাঁর রবীন্দ্র-ভক্তির যে একটুখানি আভাস দেখে-ছিলাম, তার পরিপূর্ণ রূপটি অনেকবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

সেই কবিতা গল্পের রবীন্দ্রনাথ শিলং-এ বেড়াতে এলেন। শহরসুদ্ধ সব বাঙালী তাঁকে দেখবার জন্য ভেঙে পড়ল। কেণ্টেস্ স্ট্রেসে আধা বনের পরিবেশ। সেইখানে ব্রুক-সাইড বলে এক বাড়িতে এসে অনেকজন উঠলেন। কারা কারা তা বলতে পারব না। ও'র পত্রাবলী থেকে মনে হয় রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীও সংগে ছিলেন। আমার যাঁকে মনে পড়ে তিনি হলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমন মোটা মানুষ আগে কখনো দেখিনি। পরেও দেখেছি বলে মনে হয় না। বড় মাসিমাকে দেখে কি খুসি! 'সুষমাদি!' বলে ঐ অতবড় শরীর নিয়ে ছুটে এলেন। গান গেয়েছিলেন দীনেন্দ্রনাথ, বাজের মতো গমগম্ করেছিল সুর, গলার মধ্যে। এখন পুরনো রেকর্ডে সেই কন্ঠ শুনলে কষ্ট হয়, কারণ তার কিছুই ধরা যায়নি। কোথায় সমুদ্রের নিনাদ আর কোথায় টিনের ডেংপু। রবীন্দ্রনাথ "পুরাতন ভৃত্য" আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। বাংলা ভাষা যে কি আশ্চর্য জিনিস হঠাৎ বুঝতে পেরেছিলাম। সেদিন থেকে তাঁর ভক্ত চ্যালা হয়ে গেছিলাম:

রবীন্দ্রনাথের সুন্দর চেহারা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। আমার মনে হয় এমন সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে কম জন্মেছে। ঠাকুরবাড়ির লোকরা নাকি বলত, "আমাদের রবি কালো।" ও'র মা ছোটবেলায় ছুটির দিনে তাঁর কালো ছেলেটিকে জল-চৌকিতে বসিয়ে গায়ের ময়লা তুলে, 'রূপটান' মাখিয়ে স্নান করাতেন। তার ফলেই অমন উজ্জ্বল মসৃণ গা হয়েছিল কি না কে জানে। 'রূপটান' তৈরি করতে নাকি ৬৪ রকম উপকরণ লাগে এবং গায়ে মেখে স্নান করতে দু' ঘন্টা সময় লাগে। কিন্তু ফল ভালোই হয়েছিল বলতে হবে। অবিশ্যি রূপটানের কথাটা আমি বিশ্বাস করি না। ওপর থেকে কোনো প্রলেপ লাগিয়ে, ভিতর থেকে অমন আলো ফোটানো যায় কখনো? কি সুন্দর মুখ, কি গলা, কি উদ্ভাসিত দৃষ্টি।

এরপর থেকে খুঁজে খুঁজে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। ক্রমে তার রসে মন ডুবে যেতে লাগল। ওদিকে আখ্যানমঞ্জরী ১ম, ২য় ভাগ শেষ করে ৩য় ভাগ ধরেছি। কিন্তু ব্যাকরণ বলে কোনো জিনিসের ধার ধারতাম না। মনে আছে স্কুলে ইংরিজি গ্রামার কত সহজে শিখে ফেলেছিলাম। ওরা গ্রামারের কোনো আলাদা বই পড়াত না, কিন্তু রোজ রু যেটুকু পদ্য কি গদ্য পড়ানো হত, তার : দিয়েই যা কিছু শিক্ষণীয় সব শিখিয়ে দি আমরা টের-ও পাইনি যে জটিল কিছু জড়াচ্ছি।

আর বইগুলিও কি চমৎকার, 'স্টেপ টু লিটারেচার', তাতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থান পেয়েছিল। রামায়ণের গল্পও ছি তার নাম ছিল, দি স্টরি অফ রামা। শুনে বেজায় হাসি পেয়েছিল। কিন্তু যে চমৎকার সেটুকু তখনি বুঝেছিল ইতিহাসের বই ছিল, 'গেটওয়েজ টু হিস্টরি' নানান্ ঐতিহাসিক গল্প। ভারতের ক নিশ্চয় ছিল, কিন্তু খুব বেশি থাকলে পড়ত। এইভাবে গল্পের নেশা ক্রমে বে চলেছিল। জীব-বিদ্যা পড়ানো হত, দিয়ে বোর্ডে রঙীন খড়ি দিয়ে ফু বীজের অঙ্কুরিত হওয়ার, প্রজাপ পোকা-মাকড়ের চমৎকার ছবি এঁকে। টই ছিল না। এভাবে জীব-বিদ্যা মোহ আজ অবধি আমার মনে লেগে আ ভূগোল আর অংক, এ দুটি খুব ভ পড়ানো হত না। তবে বাড়িতে যত্নে ও তাড়নায় অংকে সবাই দক্ষ উঠেছিলাম।

বাবা চমৎকার অংক শেখাতেন। আরেকটু বড় হলাম, জিওমেট্রি ধরলাম আছে বাবা আমাদের বিন্দু, রেখা বোঝাতে বসলেন। সে এক মনোজ্ঞ বাবা বললেন, 'বিন্দুর একটা অ আছে কিন্তু মাপ নেই। রেখার দৈর্ঘ্য কিন্তু প্রস্থ নেই। বলা বাহুল্য কথা ইংরিজিতে বলা হয়েছিল, কারণ ওসব ইংরিজিতেই হত। বাবা বললেন মেনে নিলাম। দাদা দি, আমি, কল্যাণকেও ডেকে নিলেন। আমাদের তখন ১১, ১০, ৯ আর ৮। বাবা ছাড়েন না। বললেন, 'কই দেখাওতো বার লম্বাত্ব আছে, কিন্তু চওড়াত্ব 'আমরা' বোকা বলে গেলাম। একটা দেখিয়েছিল দাদা। বাবা বললেন ওটা রঙের, ওর খুব সরু একটু প্রস্থ খালি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, ম্যাগনি গ্লাস দিয়ে দেখতে পাবো। যন্ত্র যন্ত্রপাতির বাকস্ থেকে ম্যাগনিফাইং এনে দেখালেনও। বাবা শেষ পর্যন্ত ড্রইং-বুকের ওপর লাল অংকের বইটা দিয়ে বললেন, "লাইন দেখতে পা আমরা দুটোর মাঝখানের ল দেখালাম। বললেন, 'কত লম্বা?' মেপে বলল, "৭ ইঞ্চি।" বাবা বললেন, রঙের?" আমরা তাজ্জব বনে গেলাম। কি? না তো, লাল নয়। তবে কি নীল' তাও নয়। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

বললেন, "রঙ থাকলে তো বলবে। ওর চওড়াই নেই তো রঙ লাগবে কিসে?" বিন্দু শিক্ষাটা অতটা নাটুকে ছিল না। যতদূর মনে পড়ছে দুটো মিহি সুতোকে একটার ওপর অন্যটা আড়ভাবে বসিয়ে বললেন, "কোথায় ক্রস করেছে?" আমরা দেখালাম ঠিক অবস্থানটি। বললেন, "এবার সুতো দুটো তুলে নিলে, যা থাকবে সেইটে বিন্দু। অবস্থান আছে, মাপজোখ নেই।" এখন সেরকম প্রত্যয়জনক মনে না হলেও বিন্দুর স্বভাবটি ঠিক বুঝেছিলাম।

এমনি করে ১৯১৬, ১৯১৭ এগিয়ে চলতে লাগল। আবার পুরস্কার বিতরণের সময় ঠিক সেই একই রকম মস্ত কার্ড পেলাম। পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিলাম, সর্বদা প্রথম হতাম তবে গোড়া থেকেই গুরুজনরা একটা ভুল করেছিলেন। দিদিকে আমাকে এক সঙ্গে অক্ষর পরিচয় করিয়ে দিয়ে, একই ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। দিদিও পড়ায় ভালো ছিল, কিন্তু আমার নিচে হত। কখনো তৃতীয়, কখনো চতুর্থ। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হল যে তাতে আমার এতটুকু অহংকার কিম্বা ওর এতটুকু ক্ষোভ দেখা যেত না। ওর ভাবখানা ছিল—তুই বেশি চালাক, তাই তুই তো প্রথম হবি-ই। আর আমি ওকে ছোটবেলা থেকে ধমক-ধামক করতাম, পেটাতাম পর্যন্ত, কিন্তু আর কেউ কিছু বললে রেগে চতুর্ভুজ হয়ে যেতাম। ও যে কত ভালো, সে আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না। হিংসে নেই, অহংকার নেই, লোভ নেই। কিন্তু কোনো উচ্চাশাও কোনো দিন দেখিনি। কর্তব্যপরায়ণ, নির্বিকার। রাগমাগ করত না, খুব কদাচিৎ আমাকে উল্টে মারত। আর যদি না আমার ওপর অসন্তুষ্ট হল, গল্প বলে বশ করতাম।

স্কুলের বন্ধুবান্ধবদের বেশির ভাগ লাবানে থাকত, আজীবনের বন্ধু সব, আজ পর্যন্ত তাদের কথা মনে পড়লে মনের মধ্যে একটা কোমল উষ্ণ ভাব টের পাই। কত খেলা, কত ঝগড়া, কত চড়িভাতি, কত জন্মদিনের নেমন্তন্ন। সাদাসিধে পোষাক সবার, দু-এক টাকার উপহার আদান-প্রদান। তারি মধ্যে কত স্নেহের স্মৃতি। তবে দুজন আই-সি-এসের মেয়েও পড়ত, তারা সাহেব-পাড়ায়, ফ্যাশানেবল্ বাড়িতে থাকত। কি চমৎকার কাপড়চোপড় পরে স্কুলে আসত। একজন একটি জামা পরে এসেছিল একখন, সাদা রেশমের, তাতে নকল মুক্তোর বোতাম দেওয়া। ঠিক করেছিলাম বড়লোক হয়ে ঐ রকম একটা জামা কিনব। কাউকে কিছু বলিনি। এখনো জামাটার কথা মনে আছে, কিন্তু শখটা কবে চলে গেছে।

একটা বিষয় তখন অত কিছু মনে হত না, এখন ভেবে আশ্চর্য লাগে। আসামের পাহাড়ী শহর, সেখানে বাঙালী বাসিন্দারা সকলেই বহিরাগত, অথচ নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকতেন না। অনেক সিলেটী ছিলেন শিলং-এ, সিলেট তো আর খুব দূরে ছিল না। শুনতাম শিলং পীক থেকে নাকি সিলেটের পাহাড় দেখা যেত। আমাদের সুমপারিং নদীর ওপারে, যেখানে দিদিমারা থাকতেন, সেটাকে সিলেটী পাড়া বলত। আরো উঁচুতে কলকাতী পাড়া ছিল। সেখানে দুর্গো-পুজো হত, মহিলা সমিতির মিটিং হত। আর পুলিনবাবু বলে একজন খুব ভালো ডাক্তার ছিলেন, তাঁদের বাড়ির ছেলেরা সাণ্ডে স্কুলে আসত। প্রকাশদা, প্রাণেশদা, প্রফুল্লদা। প্রত্যেক রবিবার সকালে সাণ্ডে স্কুল বসত, নানা রকম গল্প বলা হত, গান হত, কবিতা বলা হত। মাঘোৎসবের সময় বালক-বালিকা সম্মেলন হত, তখন নানান প্রতিযোগিতা হত। আমি একবার ইংরিজি কবিতা বলার জন্য পুরস্কার পেয়ে বেজায় অবাক হয়ে গেছিলাম। কারণ শেষের দিকে আর থাকতে না পেরে ফিক করে হেসে ফেলেছিলাম আর সব্বাই বলেছিল 'ছিঃ হেসে ফেলে সব মাটি করে ফেললে। আর দুটি পুরস্কার ছিল সব চাইতে ভালো মেয়ের আর সব চাইতে ভালো ছেলের। আমরা সকলে প্রাণেশদাকে ভোট দিতাম। তাকে আমাদের বড্ড ভালো লাগত। শিলং ছেড়ে আসার পর আর তাদের কোনো খবর রাখিনি।

লাবানবাসী আর কটি মানুষের কথা না বললে এ কাহিনী সম্পূর্ণ হয় না। তাদের মধ্যে দুজনের কথা বলি। তারা বড় ভালো। আমরা তাদের ডাকতাম সুতুদি আর অমলদা। আমার ছোটমেসোমশায়ের প্রথম স্ত্রীর ছেলে-মেয়ে, ছোটবেলা থেকে মা-মরা জ্যাঠা-জেঠির কাছে মানুষ। এরা দেখতেও যেমন ভালো ছিল, তেমনি স্নেহশীল ব্যবহারও ছিল। বিশেষ করে অমলদা।

আমার মনে হয় সারাজীবনে যত ভালো লোক দেখা যায় তারা সবাই মনের ওপর একটুখানি ছাপ রেখে যায়, প্রজাপতির ডানা যেমন একটুখানি রং রেখে যায়।

সুতুদিদের বাড়ির কাছে থাকতেন বড়দার অর্থাৎ সুকুমারের খুড়শ্বশুর কৈলাস জ্যাঠামশাই, তাঁর নয়-দশটি ছেলে ছিল। আর সবার শেষে দুটি মেয়ে। ওদের বাড়িটা খুশিতে ঠাসা ছিল, যদিও সড় খুকু বলে আমার সমবয়সী ছেলেটা আমাকে মহা জ্বালাত। নিজে বেজায় দুষ্টু, আবার আমাকে দুষ্টু বলত! লাবান প্যাহড়ের আরো উঁচুতে থাকত শিউলী বেলিরা তাদের সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতাও ছিল, ভালোবাসাও ছিল।

তবে এদের সকলকে ছাপিয়ে যে দুটি মানুষের স্মৃতি আমার মনকে উদ্ভাসিত করে রাখে, তাঁদের নাম ছিল মিঃ স্টিভেন ও মিসেস স্টিভেন। মিশনারি সাহেব-মেম, বয়স হয়ে গেছিল, ছেলে-মেয়েরা বিলেত থেকে কেবলি চিঠি লিখত, আর কতদিন থাকবে এসো, দেশে আমাদের কাছে ফিরে এসো। শেষ জীবন আমাদের কাছে কাটাও। কিন্তু কি করে যান তাঁরা, গরীব মুখ্যু পাহাড়ীদের স্কুল কে চালাবে ছোট্ট হাসপাতাল কে দেখবে, কে ওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিচ্ছন্নতা শেখাবে, খুদে গির্জায় কে ভগবানের নামগান করবে? আর যাওয়া হয় না।

শেষটা যখন বুড়ো-বুড়ির শরীর ভাঙল, তারা জোরজার করে তাঁদের ধরে নিয়ে গেল। স্কুলের ভার কয়েকজন পাড়ার লোক নিল, হাসপাতাল দেখবে বলে কেউ কথা দিল, জিনিসপত্র, ঘরের সামান্য আসবাব সব বিলিয়ে দিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন।

এক বছরও গেল না। একদিন হঠাৎ শুনলাম মিঃ আর মিসেস স্টিভেন ফিরে এসেছেন। আহ্লাদে আটখানা হয়ে বন্ধু-বান্ধব তাঁদের বাড়ি খুলিয়ে, পুরনো জিনিসপত্রগুলি ফিরিয়ে এনে যেখানকার যেটা সাজিয়ে দিলেন। মিসেস স্টিভেন অমনি স্কুল নিয়ে মেতে উঠলেন, মিঃ স্টিভেন গির্জা আর হাসপাতাল নিয়ে। বললেন, কোথায় যাব? এই আমাদের মনের নিবাস, এ ছেড়ে কি থাকতে পারি? জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওঁরা ঐখানে ছিলেন। তাদের কথা মনে করে একটা ছোট কালো মেয়ের বুক যে ভরে উঠত সেকথা তাঁরা ভাবতেও পারেননি।

চলবে

এদের এক সর্দারের সঙ্গে আলিভাই আমার পরিচয় করে দিলেন—পাশে দাঁড়িয়ে যখন তার তার সঙ্গে করমর্দন করছিলাম মনে হলো আমি গ্যালিভার্স ট্র্যাভেলের লিলি-পুটিয়ান দেশের লোক।

বাজার সেরে আমরা রওনা হলাম আরুষার ইংরাজী হোটেলে। হোটেলের ম্যানেজার আমাদের অরণ্য সফরের ব্যবস্থা-পনা করে দেবেন এবং একজন শ্বেতাঙ্গ পথপ্রদর্শক ঠিক করে দেবেন কথা আছে। হোটেলে পৌঁছে দেখলাম যে তিনি আমাদের টেলিগ্রাম পেয়ে আমাদেরই অপেক্ষায় বসে আছেন। সাধারণ পরিচিতির পর ম্যানেজার আমার সঙ্গে এক শ্বেতাঙ্গ হি-ম্যানের পরি-চয় করিয়ে দিলেন....বললেন...মিঃ বোস মিট্ মিঃ একম্যান—দি ফেমাস সাইটিস হান্টার অফ টাঙ্গানাইকা।

মিঃ একম্যান অতি সজ্জন...মুহূর্তেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল।...মিঃ এক-ম্যানই আমাদের সাফারির অগ্রণী হয়ে আমাদের লাইওনস্ ক্যাম্প নিয়ে যাবেন...

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ম্যানেজার আমাদের হোটেলে নিমন্ত্রণ জানালেন ১৬ মিলিমিটারে 'ওয়াইল্ড লাইফ' বলে একখানি ছবি দেখার জন্যে। বুঝলাম জোনস্ কোং-এর মত এঁরাও আমাদের ছবি দেখিয়ে জঙ্গলে ভ্রমণ করার রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কচ্ছেন।

মিঃ একম্যানের আমন্ত্রণ পেয়ে আমরা তাঁর বাড়ীতে সবাই যাত্রা করলাম। রাজ-পথ ছেড়ে অরণ্যপথে গাড়ি মোড় বেঁকলো। পারিপার্শ্বিক দৃশ্য এতই নয়নাভিরাম যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দেখতে দেখতে তিনি আমাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন একটি পাহাড়ঘেরা লেকের উপর....লেকের জল স্বচ্ছ....তকতকে। তারই চারপাশে শাল পিয়ালের বন...এবং এরই মাঝে একটি কাঞ্চকানন ঘেরা বিলাতি হাট্। মিঃ এক-ম্যান বলেন...এইটি আমার গরীবখানা।

দরজা বলতে কুঞ্জপ্রবেশ দ্বারে আঙুরের বরজ্ঞা—থোকা থোকা কালো আঙুর ঝুলছে...হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দুটো ছিঁড়তে যেতেই কানে এলো—'ডোন্ট প্লাক ইট'...গুরুগম্ভীর আওয়াজ। চমকে উঠি। মিঃ একম্যান হেসে ফেলেন. বলেন— নিন্ নিন্—বারণ করছে আমার কজোর কাকাতুয়া।

সবাই হেসে ওঠেন।

প্যারটের আওয়াজ শুনে বেরিয়ে আসেন মিসেস একম্যান আর তাঁর সঙ্গে তাঁর ষোড়শী সুন্দরী মেয়ে মিস একম্যান।

মিষ্ট পরিচয়ের পর ঘরে ঢুকলাম.... ঘরটি যেন একটি বড় জাহাজের কেবিন.... দেওয়ালের ধারে ধারে কাঠের বেঞ্চ ফিট করা. পিঠের কাছে কাঠের ঠেস...কিন্তু সেগুলি সমস্তই বনজন্তুর চামড়া দিয়ে ঢাকা। মেঝেতে বিছানো রয়েছে বড় বড় চামড়া....যেটুকু পাশের দেয়াল দেখা যাচ্ছে সেগুলিও ঢাকা রয়েছে ক্যালেন্ডারে বিভিন্ন জন্তুদের প্রতিকৃতিতে। ঘরের বাইরের বারান্দার দেয়াল বর্শা-ভল্ল-রাইফেল দিয়ে সুসজ্জিত—যথার্থই শিকারীর বাড়ির সন্নিবেশ।

পাশের ঘরে ডিনার টেবিলে বসে কফি ও পেসট্রি খাওয়া হলো। মিসেস একম্যান স্বহস্তে তৈরী করেছেন। সত্যই জাভলি ফ্যামিলি।

বেলা পাঁচটায় আবার হোটেলে পৌঁছালাম। হোটেল ম্যানেজার বললেন— এখানকার চীফকে খবর দিয়ে আনিয়ে বসিয়ে রেখেছি। ইনি হচ্ছেন মেসাই জাতিদের চীফ। এঁরা সুন্দর 'লায়ন ডান্স' নৃত্য করেন।

আমি জিজ্ঞাসা করি—লায়ন্ ডান্সটি কি?

উত্তরে তিনি বলেন—মেসাই জাতির পুরুষরা এক আঘাতে একটি জীবন্ত সিংহের প্রাণ সংহার করে। সিংহের সঙ্গে যুদ্ধের আগে এরা দলবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে নৃত্য করে এবং নাচতে নাচতে যার সবচেয়ে বেশী মত্ততা আসে সে হয় সেবারকার সিংহশিকারী। জানেন তো...এক আঘাতে সিংহ মারতে না পারলে এদের বিয়েই হয় না।

মিঃ একম্যান বললেন—এদের চীফকে ২।১শো শিলিং বকশিশ দিলেই এরা এসে উন্মুক্ত মাঠে নাচবে—এবং ঐ লোকটিকে ৫।৬শো শিলিং দিলেই ও আমাদের সঙ্গে গিয়ে এক আঘাতে সিংহ শিকার করে দেখিয়ে দেবে তার বীরত্বের প্রমাণ।

মিঃ প্যাটেলের সঙ্গে যথাযথ পরামর্শের পর দুটি প্রোগ্রামই আমাদের কাহিনীতে সন্নিবেশিত করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। ঠিক হলো পরদিন দুপুরে লায়ন ডান্সের ছবি নেওয়া হবে। এখন আমরা ওয়াইল্ড লাইফ ছবিখানা দেখতে বসলাম।

ওয়াইল্ড লাইফ ছবিখানিতে খোলা জঙ্গলে বুনো জন্তুরা কিভাবে জীবন যাপন করে, মানুষকে বনের সব জানোয়াররা কিভাবে ভয় করে, মানুষের ভয়ে কীভাবে প্রথম পালাবার চেষ্টা করে.. পরে অনন্যোপায় তারা কিভাবে ফিরে রুখে দাঁড়ায়... এই সবই দেখানো হয়েছে। তবে সমস্ত জন্তুর মধ্যে সভ্রজাতি পেঙ্গনের সিংহ ক্যাম্প সম্বন্ধেই বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছে বলা যায়।

সিংহেরা সত্যিই রাজার জাত। এরা আহারের জন্যে নিজেরা ছুটে জন্তুর পেছনে কখনও ধাওয়া করে না। সন্ধ্যায় অবকাশে পানীয় জলাশয়ের পারে ওত পেতে অপর জন্তুর আশায় অপেক্ষা করে—এবং সুযোগ বুঝে কীভাবে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে. যদি এক ঝটকায় শিকার না পায়— কীভাবে অলস অপেক্ষায় উপবাস করে— এইসব ছবিতে দেখানো হয়েছে।

১৯১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধের পর তানাইকা যখন জার্মানদের অধীনে চলে যায় তখন থেকে আজ অবধি জঙ্গলের গেম ওয়ার্ডেনরা এইসব অঞ্চলে তদারকি করে বেড়ান.... তাঁরাই প্রত্যহ হরিণ জেব্রাদি মেরে এদের খাইয়ে খাইয়ে এমন অভ্যস্ত করেছে যে ওদের ধারণা হয়েছে যে কোট-প্যান্ট পরিহিত মানুষগুলো তাদের 'ফিডার' অর্থাৎ খাদ্য পরিবেশক। কাজেই গভর্মেন্টের বলছেন ওদের খেতে দিন ওরা আপনাকে আপনার মনমত ছবি দেবে। অন্যান্য উপদেশাবলী নৈরবীতেও ছবি যথাকালে পেয়েছিলাম।

পরের দিন সকাল আটটায় প্রাতঃরাশ সেরে আরুষা হোটেলের সামনে খোলা ময়দানে আমরা মিঃ একম্যানের সঙ্গে ছবি তুলতে এলাম। সেদিন সুদিন ছিল বলতে হবে কারণ মাউন্ট মেরুর উপত্যকায় সেদিন সূর্যদেব তার পূর্ণ আলোকধারা ছড়িয়ে দিয়েছিল।

মেসাই দলের সর্দার তাঁর সারাটি দল নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়েই ছিল ক্যামেরা ফিট করে—আমার ইশারা পাওয়া মাত্রই তাদের রণ-বিউগলু (রাম সিঙের মত) এক সঙ্গে বেজে উঠলো. তার সঙ্গে কাঁচা চামড়ায় ঢাকা জয়ঢাকগুলো গর্জে উঠলো....

সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াররাও প্রস্তুত ছিলেন... তাঁরাও তাদের কাজ শুরু করে দিলেন... কিন্তু এই রণবাদ্য আমাদের সবার বুকের মধ্যে এক ভয়াবহ আলোড়ন তুলতে থাকে... তার সঙ্গে হঠাৎ শুরু হয়ে গেল হাজার সাপের ফোঁসফোঁসানি শব্দ... নাচিয়ের দল সংখ্যায় একশজন হবে... সকলেই মুখ দিয়ে ঐ হিস্ হিস্ শব্দ উচ্চারণ করে পাশের পাহাড় বনস্থলীকে যেন প্রতি-ধ্বনিত করে তুললো... সঙ্গীতের তালে তালে কারা যেন হাজারখানা চাবুক এক সঙ্গে হাঁকড়াচ্ছে।

হঠাৎ নৃত্যকারীরা মার্চ করে নাচতে নাচতে ক্যামেরার সামনের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। পরণে তাদের লোমশ কাঁচা চামড়ার অঙ্গবাস....গোড়ালিগুলো ঢাকা লোমের এংকলেটে... হাতে কব্জি আর আর কনুইয়ে বাঁধা লোমযুক্ত চামড়ার মোটা ব্যান্ড....গলায় সিংহ-নখ-মালা ও সিংহ কেশরের একটি করে মাফলার। মাথায় পাখীর পালক—হাতে দোধারী বর্শা।

একই অঙ্গ বিক্ষেপে নাচ শুরু হলো—নড়াচড়া - লাফানো—ঘুরপাক সবই এক সঙ্গে হচ্ছে এই একশজনার... ক্যামেরাটাকে তারা সিংহজ্ঞান করে বার বার তারই দিকে এগিয়ে আসছে মুখ ব্যাদন করে। অপূর্ব ছান্দিক কসরৎ।

দলের মধ্যে একটি বীরপুঙ্গব হঠাৎ এক লাফে ঘুরপাক খেয়ে উন্মত্ত নৃত্যে খ্যাক খ্যাক করে ক্যামেরার দিকে আক্রমণ করতে থাকলো বার বার ... অথচ এরা বেশ জানে ক্যামেরা কি... কিভাবে ছবি তোলা হচ্ছে।

মিঃ একম্যান বলেন—দে আর একাসটামড্ উইথ দি ক্যামেরা বাই দি গেস্ট্স অফ অ্যামেরিকান কোম্পানীজ।

এই বীরপুঙ্গব শেষে পাগলের মত বিক্ষিপ্ত নাচে সারা দলের মাঝে একটা ঘূর্ণাবর্ত রচনা করল এবং নিজের ঘুরে নিজেই শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে ভূমে লুটালো। ওদের সর্দার বলল—এই এবার আপনাদের সঙ্গে যাবে সিংহ শিকার করতে।

শুটিং শেষ করে আমরা ওটার মধ্যেই ক্যাম্পে ফিরে এলাম। মিঃ একম্যান বললেন, কালই তাহলে আমরা অঙ্গরোঙ্গরো যাত্রা করছি... অঙ্গরোঙ্গরো পাহাড় টপকালেই সারেঙ্গাটি প্লেন—যা ওয়াইল্ডস জু নামে আখ্যাত।

অঙ্গরোঙ্গরো পাহাড়টি চূড়াবিহীন অথচ উচ্চতায় ৮০০০ ফুট। এটির চূড়া অগ্ন্যুদ্গার করে উড়ে গেছে তাই পাহাড়ের বেড়টা ঘিরে অর্ধ চন্দ্রাকারে ক্রেটার জঙ্গল রচনা করেছে। এই ক্রেটার জঙ্গলে এক লক্ষ জন্তুর বসবাস। অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি আট হাজার ফুট উঁচু, দেওয়ালের বেড়টি পার হয়ে নামলেই নীচে সারেঙ্গটি মরুপ্রান্তর, এখানে জলাভাব... অর্থাৎ পানীয় জলের অভাব যদিচ ওখানে কর্দমাক্ত জল পাওয়া যায় যা প্রান্তরের জন্তু জানোয়াররা খেয়ে অভ্যস্ত। কাজেই সঙ্গে করে অন্ততঃ ২০ ব্যারেল জল নিতে হবে। অঙ্গরোঙ্গরোর পাদপীঠে মটুয়াম্বা নদী ... এরই মিষ্টি জল যাবে আমাদের পানীয় হিসাবে... কাজেই লরী বোঝাই করে খালি ব্যারেলগুলি নিয়েই আমরা যাত্রা করব ঠিক হলো।

গাড়ি মিঃ একম্যানকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিল—গাড়ি ফিরে এলো। তাতে এলেন মিঃ একম্যানের ষোড়শী কন্যা মিস্ একম্যান। তিনি এসেই আমাদের অর্থাৎ মিঃ প্যাটেল, মিঃ সাহা, আমায়, পিটুবাবু ও সুধীরকে রাত্রের ডিনারের নিমন্ত্রণ জানালেন। আমরা সাদরে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। তাঁকে আমাদের যৎসামান্য আতিথ্য করে গল্পে বসে গেলাম। ভারী সুন্দর কথা কন মিস্ একম্যান। তাঁর কাছে তাঁর বাবার শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে বসি।

তিনি বল্লেন—সারেঙ্গাটি এখান থেকে মাত্র ৩০০ মাইল কিন্তু এই সামান্য দূরত্বের অন্তরালে এমন দুরন্ত মৃত্যুর আবাস বোধ-হয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আড়াইশো বর্গমাইল জুড়ে শুধু বালির মরুপ্রান্তর। বালি মানে ব্ল্যাক-কটন-সয়েল অর্থাৎ আগ্নেয়গিরি নিসৃত লাভা মাটি। বৃষ্টিতে আঠারমত গায়ে জড়িয়ে ধরে—গ্রীষ্মে চোরাবালির চোরা গহ্বরে গাড়ির চাকা-গুলোকে গিলে নেয়। কত সাফারি যে এই প্রান্তরে বিনা জলে—বিনা খাদ্যে...পথ হারিয়ে জীবন দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তিন তিনবার বাবা মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছেন। তাই খুব সাবধানে চলা ফেরা করবেন। ওখানে দেখবেন বালিয়াড়ি থেকে আকাশ উঠে বালিয়াড়িতেই মিশেছে... মাঝে শুধু ধুধু মরু। পঞ্চাশ-ষাট মাইল অন্তর পাবেন পাথরের স্তূপ...পাথরের ওপর পাথর চাপিয়ে প্রকৃতি যেন প্রেতশিলা রচনা করে রেখেছে, যাতে এতটুকু সবুজের স্পর্শ নেই। সবুজ বলতে মাঝে মাঝে বটল গাছ শাখা বিস্তার করে একাই

দাঁড়িয়ে অনেকটা বড় বাবলা গাছের মত তবে নিষ্কণ্টক এরই ডালে বড় বড় পিঁপা ঝুলছে হিংস্র পশুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে পাখিদের বাস বাসের ডেরা।

বললাম—পথ খুঁজে পাওয়া যায় না কেন?

উত্তরে উনি বলেন—কি করে পাওয়া যাবে—সবই যে বালি। বালির ওপর দিয়ে কিছু গেলে তার দাগ বসে বটে তবে মরুঝড়ে তা তখনি বিলীন হয়ে যায়।

বললাম—অমন জলবিহীন জায়গায় অত জন্তুদের কি করে বাস হোলো। উনি বলেন—ওখানকার খারাপানিতে ওরা অভ্যস্ত—আমাদের জন্যে পানীয় হিসেবে সেগুলি অচল। তাইতো ব্যারেল করে জল নিয়ে তবেই সাফারিরা চলতে পারে।

বললাম—হ্যাঁ তাই অঙ্গরোঙ্গরোর পথে মটুয়াম্বা নদী থেকে জল তুলে নেওয়া হবে ঠিক হয়েছে।

মিস্ একম্যান হেসে বলেন—মটুয়াম্বা মানে জানেন?

বললাম—ওটা তো একটি নদীর নাম।

উনি বলেন—হ্যাঁ, নদীর নাম বটে তবে ওটার মানে হচ্ছে—যে নদীতে মাছিরা বাস করে।

বলি—মাছি?

হুঁ মাছি—শিলপিং বিস্। তবে টুয়াম্বার মাছিগুলো এখনোও বিষাক্ত হয়নি। তবু খুব সাবধানে থাকবেন।

মিঃ প্যাটেল ও মিঃ সাহা এসে বলেন-চলুন আমরা মিস্ একম্যানকে পেঁছে দিয়ে একবার বাজার ঘুরে আসি....পায়ের ম বুট আর নেট ক্যাপ্ নিয়ে আসি....

মিস্ একম্যান হেসে বলেন—মাথার হ্যাটের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এই নেটগুলো যাতে করে স্লিপিং বীস্ কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

আমরা রওনা দিলাম.......

রাত্রে ডিনার টেবিলে মিঃ একম্যান বললেন—মিঃ জোন জঙ্গলে পেঁছলে এক-জনের ক্যাপ্টেনসিপে আপনাদের দলের সবাইকে আসতে হবে নইলে বিপদ ঘটবে।

আমি বলি, জঙ্গলের ক্যাপ্টেন আপ-নাকেই হতে হবে মিঃ একম্যান। আমার ছবির জন্যে যে রকম শট্ দরকার তা রাত্রে ডিস্কাস্ করে আপনাকে জানিয়ে রাখবো.... আপনি তার বন্দোবস্ত করে দেবেন....কিন্তু ক্যাপ্টেনসিপ ইজ ইয়োরস্।

(৬)

পরের দিন সকালের নাস্তা শেষ করে আটটার মধ্যেই লরী, গাড়ি, স্টেশন ভ্যান সাজিয়ে মিঃ একম্যানের কর্তৃত্বে আমরা রওনা হলাম সারেঙ্গাটির উদ্দেশে। সঙ্গে বারজন আফ্রিকান বয় ও সিংহ শিকারী মেসাই বীর সর্দার হিসাবে যোগ দিয়েছে। আমরাও সংখ্যায় বারজন....এই চব্বিশজনের কাপ্তেন হচ্ছেন মিঃ একম্যান এবং তাঁর সহকারী হলেন আলিভাই।

আরুশা শহর ছাড়িয়ে গাড়ি বনপথে প্রবেশ করেছে....দুধারে পাহাড় ভেদ করে পথ ছুটেছে....পাশে পড়ে থাকছে পল্লী-বাসীদের আফ্রিকান ঝুপড়ীগুলি। গাড়ির গতি উপরের দিকে....সোজা লালপাথুরে মাটির পথ—যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে ততদূরই ছুটে ওপরে উঠছে। বেলা সাড়ে বারটার সময় আমরা উপস্থিত হলাম অঙ্গরোঙ্গরোর তোরণ দ্বারে। এখানে সারেঙ্গাটি যাত্রীদের জন্যে দু-একখানি দোকান রয়েছে—বিশেষ করে মোটর পার্টস এবং পেট্রোলের।....

গাড়ি তরাতি ও বাড়তি টিনে টিনে পেট্রোল মোবিল ইত্যাদি ভরে নেওয়া হলো। কিছু কাঁচা ফলও পাওয়া গেল—এছাড়া চা ও বিস্কুট কিনে একপ্রস্ত তেষ্টা মেটানো হলো। এরই এক মাইল দূরে মটুয়াম্বা নদী....দূরের ঘন বনাঞ্চলে স্বচারী নীলগাই দেখা গেল....এরা নাকি এ অঞ্চলের নির্ভরী বাসিন্দা।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই মটুয়াম্বা নদীর ধারে পেঁছলাম....নদীর ধার ঘেঁসে ঘন বন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—তার বেশীর ভাগই তমাল ও পিয়ালের বন। নদীর জল সুমিষ্ট ....স্নান করতে আরাম....পান করেও আরাম। এমনি এক কুঞ্জবনে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রাম করা হলো....ব্যারেলগুলোতে বয়রা নদীর শীতল জল ভর্তি করে নিচ্ছিল, তাই খাওয়ার পর ঘন্টা দুই বিশ্রামের সময় পাওয়া গেল। বিশ্রাম অবসরে মিঃ একম্যান আমাদের অঙ্গরোঙ্গরোর কাহিনী বলতে থাকেন।

বললেন—অঙ্গরোঙ্গরো জগতে সবচেয়ে লম্বা পাহাড়ী পাঁচিলের অংশ বিশেষ... পাহাড়ী পাঁচিলের আত্মপ্রকাশ হয়েছে রোডেশিয়া থেকে—দৌড়ে চলেছে ট্যাঙ্গে-নাইয়া, সুডান, কেনিয়া, এ্যাবিসেনিয়া, ইজিপ্ট ধরে ভূমধ্য সাগরের তলা দিয়ে গিয়ে মাথা উঁচু করেছে অপরপারে ইয়ো-রোপের রেড্ সিতে—এই পাহাড়ী পাঁচিল ভৌগলিক আখ্যায় নাম পেয়েছে গ্রেট রিফ্ট ওয়াল—পৃথিবীর সারকমফারেন্সের এক তৃতীয়াংশ। এত উঁচু শিখরগুলির মাঝে রয়েছে কিছু কিছু আগ্নেয়গিরি.... যার ধুম্রোদ্গীরণের ফলে এখানে কিছুদূরে অন্তর পাবেন ক্রেটার লেক বা অঙ্গরো-ঙ্গরোর মত ক্রেটার জঙ্গল। অঙ্গার উদ্গীরণ করেছে বলে এ পাহাড়ের নাম অঙ্গরোঙ্গরো হয়েছে।

বেলা সাড়ে তিনটার সময় আমরা অঙ্গরোঙ্গরো পাহাড় পাদপীঠের চড়াইপথ ধরলাম যা শুরু হয়েছে মটুয়াম্বার ওপর দিয়ে লোহার ব্রীজ পার হয়ে। মটু-য়াম্বার উচ্চতা মাত্র ২০০০ হাজার ফিট—আরও ছ' হাজার উঁচুতে আমাদের উঠতে হচ্ছে।

ঘূর্ণির পথ ধরে গাড়িগুলি ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে....যত ওপরে উঠছে ততই শীতের প্রখরতা টের পাচ্ছি.... এমনিতর ঘূর্ণাবর্তে উঠতে উঠতে সন্ধ্যা নেমে এলো। নীচের বনাঞ্চলে সন্ধ্যা নেমেছে....সারা খাদের জঙ্গলে জোনাকীর চুমকী স্ফুরণ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে....কিন্তু আমাদের কাছে এখন প্রদোষ বলা চলে.... উপরের আকাশের দিকে চাইলে দেখা যাচ্ছে রক্তাভ মেঘের ধারে ধারে রূপালি কিরণ-ছটা....এ যেন সারা দৃশ্যকে তিনভাগে বিভক্ত করে স্ব স্ব রূপ নিয়ে আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হতে থাকে।
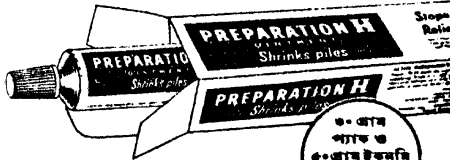
(ক্রমশঃ)

মুঘল ইতিহাস স্বামীজীর উপরে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতের তৎকালীন ইতিহাসকে উনি এমন জোরালো নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করতেন যে মনে হত উনি যেন নিজেরই পূর্ব জীবনের কথা বলেছেন। আমরা প্রশ্ন করতাম, 'আমরা কী শাহেন্-শা-আকবরকে আবার নবকলেবরে দেখছি ?' উনি বলতেন, 'মানুষ যতক্ষণ না জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতা, শোক-দুঃখ তীব্র দারিদ্র্য এবং পরিপূর্ণ ভোগ, ঐশ্বর্য, খ্যাতি, ক্ষমতা, জমিদারী এবং বিলাসসুখ উপভোগ না করছে, ততক্ষণ পরিপূর্ণ নির্বাণ লাভ করতে পারে না।' তারপর নিজস্ব হাস্যময় ভঙ্গীতে বলতেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়, আমি অসংখ্য জন্মে সম্রাট ছিলাম।'

আবার বলতেন যদি কেউ জন্মজন্মান্তর ধরে চেষ্টা করেও পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে না পারে, তখন তাদের বৈষয়িক ভোগের জীবনে আবার একবার, শেষবারের মত আসতে! তারাই তখন হয় সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী। এই জন্মের পরের জন্মে সে তার কাম্য পরম লক্ষ্যে উপনীত হয়। ভারতের মানুষেরা বিশ্বাস করে যে সম্রাট জন্মের আগের জন্মে তিনি খুব ধার্মিক লোক ছিলেন। কিন্তু নির্বাণ লাভ করতে পারেন নি। শেষ জন্মে তাই রাজা হয়ে এসে সব বাসনা চরিতার্থ করে গেলেন! এমনিভাবেই বলে যেতেন হুমায়ুন কথা, আকবরের কথা। আকবরের সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা সহকারে বর্ণনা করতেন। উনি বলতেন ভারতবর্ষ কেবলমাত্র হিন্দুর দেশ নয়, আমার মুসলমান ভাইদেরও। ওদের ধর্মবোধ, কৃষ্টির সম্বন্ধে ও'র মনে খুব শ্রদ্ধার ভাব ছিল। ও'র ইউরোপ সহযাত্রী এক মুসলমান ভদ্রলোক আমাদের কাছে গল্প করেছিলেন, 'জিব্রাল্টারে জাহাজ পৌঁছানো মাত্র লস্করেরা মাটিতে নেমে বলে উঠল 'দিন্, দিন্।' শুনে স্বামীজী রীতিমত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন।...

...মহম্মদ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাভরে বলতেন ও'কে (মহম্মদকে) প্রথমে অনেকেই বুঝতে পারে নি। মনে করত 'পাগল'। অনেক বছর ধরে দেখা গেল সামান্য মুষ্টিমেয় লোক ও'কে এবং ও'র ধর্মমতে আস্থাবান।

একজন মন্তব্য করলেন 'কিন্তু উনি বহু বিবাহের প্রচারক ছিলেন।' স্বামীজী বললেন, 'না। তখনকার আরব সমাজে খুব ধারাপভাবে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল বলে উনি বলেছিলেন কোন পুরুষ চারজনের বেশি স্ত্রী রাখতে পারে না।' উনি সংখ্যা সীমিত করে দিয়েছিলেন।'

একজন মহিলা তীব্রভাবে বলে উঠলেন 'উনি (মহম্মদ) সকলকে বলতেন নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, আত্মা নেই।'

এর উত্তরে স্বামীজী ইসলাম সমাজে নারীর স্থানের যে ব্যাখ্যা করলেন তাতে আমেরিকার শ্রোতারা স্তম্ভিত হয়ে গেল শুনে যে মুসলমান মেয়েরা সমাজে যে অধিকার পেয়ে থাকে তথা-কথিত স্বাধীনা আমেরিকান মহিলারা তা পান না।

এই সমস্ত তুচ্ছ তর্ক প্রশ্ন থেকে আমরা আবার উঠে যেতাম এক অন্য পরিবেশে। অনেক গভীর দূরদিগন্তে যেন। দেখা যেতো আপাতঃদৃষ্টিতে মহম্মদের মতবাদ যতই সঙ্কীর্ণ এবং অজ্ঞতাপূর্ণ মনে হোক না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে মহম্মদ যে শক্তির প্রকাশে সমস্ত পৃথিবীকে নাড়া দিয়েছিলেন, যে শক্তির প্রভাব আজও পর্যন্ত অম্লান হয়ে আছে, তার জোরে তিনি বিশ্ব-বরেণ্য ব্যক্তি হয়েছিলেন।

স্বতঃই প্রশ্ন আসে উনি কী ইচ্ছে করে একটা স্বতন্ত্র ধর্মমত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন? মনে হয় এবিষয় একটা সচেতন মন বা নিশ্চিত উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ-কাজে অগ্রসর হননি। প্রথমে উনি নিজের মহান অভিজ্ঞতায় এমনভাবে আবিষ্ট হয়েছিলেন যে চেয়েছিলেন তাঁর মহামূল্য উপলব্ধির খানিকটা ভাগ অপরকে দিতে! আবারও প্রশ্ন জাগে এর ফলে ইসলাম ধর্ম যে রূপ নিল সেটা কী তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে হয়েছিল? এ-বিষয় নিশ্চিত বলা যায় যে, যে সংঘর্ষ এই ধর্ম প্রবর্তনের অব্যবহিত পরেই দেখা দিল সেটা কখনই ও'র পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়। একবার যদি একটা বিরাট শক্তি বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে তবে তাতে লাগাম দিয়ে বাঁধতে কোন মানুষ পারে না।

ক্রিস্টিনের চিঠি

(৮)

গেস্ট হাউস। মঠ। বেলুড়। হাওড়া
বাংলাদেশ। তারিখ নেই

Beloved little mother,

ইদানীং তোমার কথা খুব চিন্তা করি। গত ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগে (২৫শে ও ২৬শে রাত্রের মাঝে সম্ভবতঃ) একটা স্বপ্ন দেখেছি যার অর্থ আমার কাছে খুব সুস্পষ্ট নয়। খুব ভাবলাম এ বিষয়। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, ভাবী সন্তানটি (The expected one) এসে গেছে! এও হতে পারে যে তার আসবার চিন্তা এখন তুমি খুব বেশি করে করছ এবং সেইটাই আমার মনে প্রতিফলিত হয়েছে! সেই দিন থেকে তোমার চিন্তা মনের মধ্যে অহরহ! এতদিনে সেই ভাগ্যবান শিশুটি নিশ্চয় তোমার কোলে: ভাগ্যবান এজন্য বলব যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন ঠিকমত পিতামাতা থেকে ঠিকমত দেহ প্রাপ্ত হওয়া এবং উচ্চ-স্তরের মানসিকতায় গড়ে ওঠবার জন্য সেই রকম পরিবেশের প্রয়োজন। তোমরা দুজনেই তোমাদের সন্তানকে তা দিতে পারবে। এই জন্মদানের জন্য বিশ্বসংসার ঐশ্বর্যলাভ করবে—তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। তোমার ভাল হোক।

আমি সম্প্রতি গঙ্গার ধারে একটি সুন্দর জায়গায় সপ্তাহ দুই কাটিয়ে এলাম। আমার ঘরের একদিকে অরণ্য অন্যদিকে গঙ্গা! ছাতের ওপর যখন চাঁদের আলোয় ভরে যেতো—সে দৃশ্য কখনও ভুলব না! আঃ! স্বর্গীয়!—

জায়গাটা কলকাতা থেকে c৪ এ গেলে ১০ মাইল। ভেবে দেখলাম কলকাতার কাছাকাছি কোথাও যাওয়া ভাল যাতে বুঝতে পারি কতখানি পথ চলার ধকল কতখানি শরীরে সহ্য হয়। প্রায় ন'মাস আগে সেই যে অসুস্থ হয়েছিলাম তারপর তো আর যাইনি কোথাও। তোমাকে 'অসুস্থ' কথাটা লিখছি কিন্তু মনে মনে হাসছি। কারণ জানি ওটা অসুস্থতা নয় ওটা আর কিছু। ও সময় আমার কোন ব্যথা বা কষ্ট ফষ্ট ছিল না! কেবলমাত্র কোন কাজ কিছু করতে গেলেই অত্যন্ত অবসাদের বোধ! যতক্ষণ ঘরের মধ্যে চুপচাপ একা শুয়ে থাকি, ভাল থাকি! এমন কী হাঁটতেও পারি না। মাঝে-মাঝে চিঠি লেখা পর্যন্ত কঠিন কাজ। তবুও যেন একটা 'inner healing' আমি অনুভব করি। শরীর ও মন সেরে উঠছে। .....

.......আমি মাদ্রাজে যাইনি। সে সময় হার্ট বড় দুর্বল ছিল আর পথযাত্রা বড় লম্বা। ওখানে সমুদ্রের ধারে আমার থাকবার একজন ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছিলেন তাই ভেবেছিলাম হয়ত তাইতে আমার 'healing' তাড়াতাড়ি হবে।

I did not hear that the world teachers would be proclaimed at Adyar at Christmas until Americans came back from the convention and told of it. People came in great numbers, many of them from the U.S. Maxwardell came to Calcutta afterwards and lectured in several places. Once quite close to us. He had a letter of introduction to Boshi Sen but did not avail himself of it. What they say happened at Adyar is : One day while Krishna Murti was lecturing, a change came over him, for a minute or two he spoke in a voice not his own. It sounds rather like spiritualism. I am afraid the Avatar of this age like those of past ages will have to come through the doorway of human birth and 'betempted in all points like as we are, yet without Sin". Which means I suppose that he must take upon himself all the disabilities of the body and yet be God. May that be true of the little one who has come to you.

With hearts love,
Christina.

গোখলের চিঠি

(৮)

SERVANTS OF INDIA SOCIETY,
POONA CITY, NATHERAN (?)
27TH MAY, 1910

প্রিয় ভগিনী ক্রিস্টিনা,—

তোমার নেপল্‌স্ থেকে লেখা ৬ই মের চিঠি এই সপ্তাহে পৌঁছেছে। জাহাজ থেকে লেখা তোমার দুখানি চিঠিও যথাসময় পেয়েছিলাম; কিন্তু কোন ঠিকানায় উত্তর দেব বুঝতে না পেরে উত্তর দিতে পারিনি। এখন তুমি আমেরিকাতে গিয়েছ অতএব ডেটয়েটের ঠিকানায় (যে ঠিকানা আমি ভারতবর্ষ থেকে আসবার আগে তুমি দিয়েছিলে) চিঠি দেব—যতক্ষণ না তুমি অন্য নির্দেশ দাও। তুমি ভারতবর্ষ থেকে যাবার পর এখানকার ব্যাপার খুব শান্ত হয়ে গেছে। আমিও যথাপূর্বং আমার গতানুগতিক জীবনযাত্রায় চলেছি। দুদিন আগে এই শান্ত পাহাড়ী জায়গাটিতে এসেছি দিনকয়েকের একটু পরিবর্তনের জন্য। আগামী মাসের দোসরা তারিখে পুণায় ফিরে যাবো। আমাদের সোসাইটির বার্ষিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে। এটি বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় কাজ। আগামী ১২ই জুন সোসাইটির পাঁচ বছর পূর্ণ হবে এবং সেদিন এর ম্যানেজমেণ্ট আমার একক-ক্ষমতা থেকে একটি কাউন্সিলের ওপরে ন্যস্ত হবে এবং তার প্রধানের পদে থাকব আমি। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আমরা আমাদের অন্যান্য কাজের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে করব—কিন্তু বড় দুঃখের সঙ্গে। কারণ আমাদের একজন খাঁটি সদস্য যাঁর ট্রেনিং ঐদিন পূর্ণ হবার কথা তিনি,—মাদ্রাজের মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—গত ৬ মাস হল প্লুরিসীতে ভুগছেন এবং সন্দেহ হচ্ছে এই থেকে তাঁর যক্ষ্মা না হয়ে যায়! তাঁর জন্য যতদূর সম্ভব যত্ন নিতে হবে যাতে এই বিপদ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন। তবে আমার ভয় যে এর পরে তিনি আর কোন কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। আর একজন সদস্য তাঁরও মিঃ শাস্ত্রীর সঙ্গেই ট্রেনিং পূর্ণ হবার কথা,—তিনি হলেন মিঃ দ্রাভিদ; তাঁর স্ত্রী গতকাল প্রসবকালে মারা গেলেন। মিঃ দ্রাভিদ্ স্ত্রীর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন। এ আঘাত

তাঁর পক্ষে বড় মর্মান্তিক। মিসেস দ্রাভিদ আরও চারটি সন্তান —তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে গিয়েছেন। সর্বজ্যেষ্ঠটি মাত্র দশ বছরের। দ্রাভিদ, শাস্ত্রী এবং দেবোহন এই তিনজনের মুখ চেয়ে আজ দু বছর ধরে বসে আছি যাতে ও'রা আমার সোসাইটীর কাজের দায়িত্ব লাঘব করে দিতে পারবেন। এই তিনজনের মধ্যে একজন শারীরিক অসুস্থ, আর একজন মানসিক।

কলকাতা এখন মৃত রাজার জন্য জাতীয় শোক প্রদর্শন করছে—ওদিককার খবরের কাগজে তারই খবর ছড়াছড়ি। অরবিন্দ ঘোষকে এখনও পাওয়া যায়নি এবং ও'র প্রেসের মুদ্রকের কেসটা পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে বারবার যাতে দুজনের কেস একসঙ্গেই উপস্থাপিত করা যায়। 'বেঙ্গলী' পত্রিকাতে দেখলাম সি আর দাশের ভাই ভোলা দাশ দার্জিলিংএ মারা গিয়েছেন।

আমি আজকাল নিমপাতা ও দুধের ওপরে বেঁচে আছি এবং তাতে স্বাস্থ্য বেশ ভাল আছে। এত বছর বাদে নিজের বোনেদের এবং অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছে গিয়ে নিশ্চয় খুব আনন্দে আছ। আমেরিকা নিশ্চয় তোমার সব ক্লান্তি অপসারিত করে তোমার শরীর ও মনে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করবে। আশা করি তোমার সব খবর ভাল এবং স্নেহ ও শ্রদ্ধাসহ

জি কে গোখলে

পুনঃ—

(As regards mentioning to Sister Nivedita the little assistance that it was my privilege to give you, do as you think best. Personally I would greatly prefer your not mentioning it to her or to anybody else. But in a matter of this kind your judgment must necessarily prevail.)

যে সামান্য কাজটুকু তোমার জন্য করবার গৌরব আমি লাভ করেছি সেকথা ভগিনী নিবেদিতাকে বলা সম্বন্ধে তুমি যা ঠিক বোঝো তাই কোরো। তবে আমি নিজের তরফ থেকে বলব যে আমি চাই একথা নিবেদিতা বা অন্য কারুকে তুমি না-বলো। তবে এই ধরনের ব্যাপারে তোমার বিচারই অগ্রগণ্য।

(৯)

Servants of India Society
Poona City, 8th July 1910

প্রিয় ভগিনী ক্রিস্টিনা,—

শেষ ডাকে তোমার ২রা জুনের চিঠি পেয়ে খুশী হলাম। অতঃপর ডেটয়েটে পৌঁছলে। কল্পনা করতে পারছি এতদিন বাদে বোন ও বন্ধুদের কাছে পৌঁছে তোমার নিজের অনুভূতির কথা যা লিখেছ এবং তোমাকে পেয়ে তাদের আনন্দ কতখানি। আমাদের ভারতবর্ষে তুমি তো জানো আমরা পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষের চেয়ে ঢের বেশী রকম ঘরোয়া জীবনে অভ্যস্ত—এবং তাই অনেক দিনের ব্যবধানে আত্মীয় বা প্রিয়জনকে পেলে খুব স্নেহোচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ি।....তুমি তো এখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দু রকম অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করেছ!—

তোমাদের ওখানে যারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী আমি তাদের কথা আর একটু খোলসা করে জানতে চাই। ওরা আমাদের কী ভাবে? এবং এই যে আমাদের সম্বন্ধে ওদের জানবার আগ্রহ সেটা কী কেবলমাত্র নিছক খানিকটা কৌতূহল না তার চেয়ে বেশী কিছু? ক্রিশ্চান মিশনারীর লোকেরা নিশ্চয় ভারত সম্বন্ধে বিকৃতভাবে প্রচার কার্য চালাচ্ছে। নিউইয়র্কে কয়েকজন চরমপন্থী ও গুটিকয়েক স্বামী ছাড়া আর কী কোন ভারতীয় কাজের কর্মী ওদিকে আছেন? জিজ্ঞাসা করছি কারণ এ বিষয় আমি ভালভাবে জানতে ইচ্ছুক! বছর দুই আগে আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন আমাকে কোন আমেরিকান বন্ধু বলেছিলেন যে আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে আমাদের সম্বন্ধে মনোভাব বদলে যাচ্ছে। অর্থাৎ আগে তাদের আমাদের সম্বন্ধে যে উঁচু ধারণা ছিল সেটা এখন কমে যাচ্ছে।

তারপর ডেট্রয়েটে তো ফিরে গেলে—এবারে আগামী ছ মাস কী করবে কোন পরিকল্পনা করেছ কী? তোমার ভগ্নিপতি—যাঁর জন্য তুমি খুব চিন্তিত ছিলে কলকাতায়—তিনি কেমন আছেন?

আশা করি তুমি নিজে বেশ ভাল আছ! কলকাতায় তোমার যে সর্বক্ষণ একটা ক্লান্তির ভাব থাকত ডেট্রয়েট সেটা অপনোদন করে তোমার আমেরিকান স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করে দেবে!

আমি গতবার কলকাতায় যা ছিলাম তার চেয়ে কিছু ভাল আছি। নিমপাতা আর দুধ আমার খুব স্যুট করেছে। এখন দেখছি শরীর ভাল থাকুক বা না থাকুক আমি নিমপাতা ও দুধ এই দুটি নিয়মিত মেনে চলব। অবশ্য সব সময় সেটা সম্ভব হয় না।

সোসাইটির কাজ এখন পুরোদমে চলেছে এবং সব কিছুই যতটা সম্ভব বেশ সচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। পাঁচ বছরপূর্তির পর যে কাউন্সিল গঠনের কথা ছিল সেটিও গড়ে উঠেছে। তবে যে সবকিছু আশা করেছিলাম তা পাই নি। অনেক শুভেচ্ছা এবং অনেক স্নেহশ্রদ্ধাসহ—

জি কে গোখলে।

(১০)

বম্বে। ৪ঠা মে। ১৯১২

প্রিয় ভগিনী ক্রিস্টিনা,—

দশ-বার দিন সামান্য জ্বরে ভুগলাম। গত দুদিন জ্বরটা ছেড়েছে। আজ ১২-৩০ মিনিটের সময় জাহাজে চাপব। কলকাতার মিস্টার পি সি রায় ও মিস্টার সর্বাধিকারী এই জাহাজে যাচ্ছেন। জাহাজে উঠলে তবে আমার আসল বিশ্রাম হবে এবং সমস্ত ভাবনা ও কাজের চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলতে পারব।

তোমার শেষ চিঠিটি আমার কাছে যথাসময়ে পৌঁছেছে। তাতে লিখেছ যে তুমি বোসেদের সঙ্গে যাচ্ছ এবং জুনের শেষে কলকাতায় ফিরে আসবে। জানি না তুমি কোথায় গিয়েছ—মায়াবতী, না দার্জিলিং না পুরী না অন্য কোন জায়গায়। তবে খবরের কাগজে পড়লাম ডাঃ ও মিসেস বোস মায়াবতী যাত্রা করেছেন এবং তুমি যে উপন্যাসটি দয়া করে আমাকে পাঠিয়েছ তাতে মোগলসরাই স্টেশনের হুইলারের ছাপ আছে দেখলাম। তাই চিঠিখানি মায়াবতীতে পাঠাচ্ছি।

লণ্ডনে আমার ঠিকানা হবে

National Liberal Club, Whitehall Place, SW.
London

আশা করি মায়াবতীতে তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। উপস্থিত আমার শরীর খুবই দুর্বল। তবে আগামী ছ মাসের মধ্যে উন্নতি হবে বলে আশা করি। এখন good bye ঈশ্বর তোমাকে ও তোমার কাজকে আশীর্বাদ করুন। মিসেস সেভিয়ার ও ডাঃ মিসেস বোসকে আমার কথা বলো—

From ever.
G. K. Ghokhale

(চলবে)

অর্জুনের ক্ষোভ

অনিল মন্ডল

মন্ট্রিল অলিম্পিক থেকে ফিরে এসে একটি বিস্ফোরক খবর দিয়েছিল একমাত্র বাঙালী প্রতিযোগী—ভারোত্তোলক অনিল মন্ডল। ক্ষোভে দুঃখে বলে ফেলেছিল, কোচ ও ম্যানেজার বিহীন অবস্থায় প্রতিযোগিতা থেকে ওর ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার কথা। মাঝে প্রায় একটি বছর ওর জীবন থেকে ক্ষয়ে গেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে গেছে ওর উদ্যম—ভারোত্তোলনে ভারত চ্যাম্পিয়নের তকমাটা কুক্ষিগত করে রাখার বাসনাও। ভবিষ্যতে ওজন তোলার ইচ্ছেটাও ওর এখন গলে গলে যাচ্ছে।

এবারের বার্নপুর জাতীয় ভারোত্তোলনে পদকপ্রাপ্ত স্ট্রংম্যানদের তালিকায় অনিল মণ্ডলের নাম নেই দেখে খোঁজ করেছিলাম ওর। শুনলাম ফ্লাই ওয়েট বিভাগের মোট ছ'বারের চ্যাম্পিয়ান অনিল এবার ন্যাশনাল লড়েনি। যদিও বার্নপুরের ভারতী ভবনে সে সময় ও হাজির ছিল এবং দেখেছিল ওর অন্ধ্র নিবাসী প্রতিদ্বন্দ্বী জয় ভিট্টলকে চোখের সামনে শিরোপাটি ছিনিয়ে নিতে।

ভারোত্তোলনে এই হঠাৎ বৈরাগ্য কেন সেদিন অনিল মণ্ডলকে যখন এ প্রশ্ন করলাম পূর্ব রেলওয়ের সদর দফতরে বসে তখন পাশেই ছিলেন ওর কোচ—মোট এগারো বারের জাতীয় সেরা ভারোত্তোলক অরুণ দাস। অনিল কোনো উত্তর দেবার আগেই অরুণবাবু বললেন, 'মন্ট্রিল থেকে ফিরে খবরের কাগজে বিবৃতি দেবার পর অনিলের ওপর কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি রুষ্ট হন। মনে হয় এ জন্যই গত বছর অক্টোবরে ভারতীয় ওয়েট লিফটিং দলের তুরস্ক ও রাশিয়া সফরে ও বাদ পড়ে। যদিও তখনও পর্যন্ত ও ছিল ফ্লাই ওয়েটে সেরা।'

কেবলমাত্র বিদেশ সফরে না যেতে পারার জন্যই কি অনিল হতাশায় ভুগছে—জিজ্ঞেস করায় ও উত্তর দিল—'এটা অন্যতম কারণ তো বটেই। কে না চায় দেশের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বাইরে যেতে। আমার দোষ—রেখে ঢেকে কিছু না বলে সব ফাঁস করে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, নিজের ক্ষতি করেছি স্বীকার করছি এবং এর জন্য কাউকে দোষারোপও করতে চাই না। শুধু ভাবছি ওজন আর তুলব কি না।

'অলিম্পিক থেকে ফিরে এসে ভেবেছিলাম বারবেলে আর হাত ছোঁয়াব না। মনে একটা অশান্তি সব সময়ই পাক খেয়ে বেড়াতো। জিমন্যাসিয়াম থেকে অনেকদিন দূরেও ছিলাম। রাশিয়া ট্যুরে ইন্ডিয়া টিম থেকে বাদ পড়ার পর ওয়েট লিফটিংকে গুড-বাই জানানোর ইচ্ছেটা চেপেও বসেছিল। কিন্তু মাদ্রাজে ইন্টার-রেল কম্পিটিশনের আগে অরুণদা জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন প্র্যাকটিশে। ওখান থেকে ফিরে আসার পর আবার ন্যাশনালের আগে অরুণদার কথামত কয়েকদিন ওজন তুলেছিলাম। এখন জোর করে বলতে পারছি না—যে উৎসাহ নিয়ে ওয়েট লিফটিং শুরু করেছিলাম তা ফিরিয়ে আনতে পারব কিনা।'

ওকে বাধা দিয়ে অরুণ দাস বললেন—'অনিলকে নিরুৎসাহ দেখে লোকের দারুণ কৌতূহল। কৈফিয়ত দিতে দিতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে আমার। বাধ্য হয়ে অনেককে বলেছি অনিল ম্যালেরিয়ায় কাবু তাই জিমন্যাসিয়ামে যাচ্ছে না। জানি অনেক কারণে ও ক্ষুব্ধ তাই বলে কোনমতে ওকে হাতছাড়া করতে আমি রাজি নই। কারণ আমি বিশ্বাস করি ফ্লাই ওয়েটে ওর মতো স্ট্রংম্যান ভারতে এখন নেই।'

ভারোত্তোলনে অনিলের বীতস্পৃহ হবার কারণটা আর্থিকও। ওর বাবা ৫ বছরের গোড়ায় চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। চার ভাই তিন বোন নিয়ে মোট ন'জনের সংসারটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনিল এখন ওর আয়ের সিংহভাগটাই তুলে দেয় মায়ের কাছে। গত জানুয়ারী অবধি ওকে দিতে হতো না। রেলের টিকিট কালেকটরের চাকরি করে অনিল। বনগাঁ, রাণাঘাট আর শেয়ালদা ছোটাছুটির মাঝেও আগে দিনে ঘন্টা দুয়েক মন দিয়ে প্র্যাকটিশ করত ও। কারণ খাওয়াটা ভাল জুটত। এক কেজি মাংস রোজ বরাদ্দ ছিল ওর, সেই সঙ্গে কিছু ফল, হাই প্রোটিন ও ভিটামিনের মেডিসিন। এখন ওসব জোটে না, মাংসের বদলে কোনরকমে জোগাড় হয় টেংরির জুস—শুধু এই খেয়ে আর যাই হোক ওয়েট লিফটিং করা চলে না।

বাহাত্তরে ভারোত্তোলনে 'অর্জুন' অনিল বলল, 'নিজের খাওয়ার কথা ভাবলেই এখন সংসারের কথা মনে ভেসে ওঠে। মনের মতো ফুড পেলে আমি আরো ওজন তুলতে পারতাম। গতবার অলিম্পিক যাওয়ার আগে রেল আমাকে খাওয়ার খরচা দিয়েছিল। তার আগে এর্ণাকুলাম ন্যাশনালে মোট ওজন তুলেছিলাম ১৯৭½ কেজি। বোম্বাইয়ের সিলেকশন ট্রায়ালের আগে খাওয়া-দাওয়া মনোমত হতেই তুলেছিলাম ২১২½ কেজি অর্থাৎ পনের কেজি বেশী। এতে কি প্রমাণ হয়নি সুযোগ দিলে আমাকে দিয়ে আরও অনেক কিছু সম্ভব।'

অনিলের গলায় ক্ষোভ—'আসলে আমাদের এই ওয়েটলিফটিংয়ে কোন গ্ল্যামার নেই। অন্য খেলায় ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হলে প্লেয়ারদের কপালে অনেক কিছু জোটে। আর দেখুন, আমি দুটো অলিম্পিক (মিউনিখ ও মন্ট্রিল) দুটো কমনওয়েলথ গেমসে (এডিনবরা ও ক্রাইস্টচার্চ) দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছি—তা সত্ত্বেও শিয়ালদা স্টেশনের গেটে দাঁড়িয়ে বিনা টিকিটের যাত্রী ধরতে হয় আমাকে। বলছি না—রেল আমার জন্য কিছু করেনি বরঞ্চ রেলে চাকরি নেবার পর থেকেই আমার যতো উন্নতি। তাছাড়া স্পোর্টস ক্লাবের সেক্রেটারী আর কে চট্টোপাধ্যায়ও আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। তবুও অন্যদের সঙ্গে তুলনা করে কি জন্য যেন মনটা খচ করে ওঠে। মনের ভারটা তুলে ফেলে দিতে পারি না।'
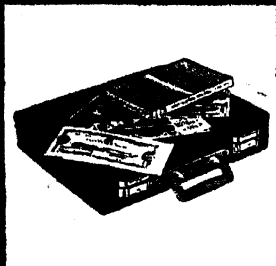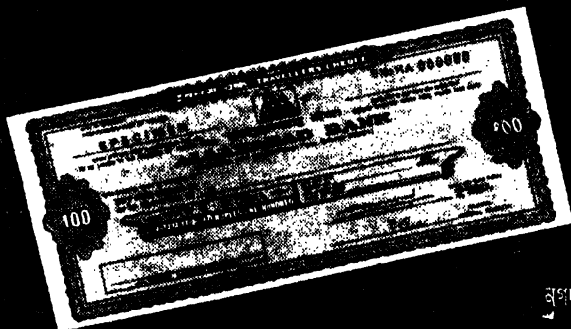
রূপক সাহা

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

আই এফ এ পরিচালিত ১৯৭৭ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা আরম্ভ হয়েছে গত মে ১৬ তারিখে। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় প্রতিযোগী দলের সংখ্যা ২৩। গত বছরের দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান ক্যালকাটা কাস্টমস এবার প্রথম বিভাগের নবাগত দল। ১৯৫৩ সালে তারা দ্বিতীয় বিভাগে নেমে ছিল। দীর্ঘ ২৩ বছর পরে তাদের প্রথম বিভাগে পুনরায় খেলতে দেখা গেল। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ছ'টা খেলে পুরো ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। গোল করেছে ১৫টা এবং এখনও একটা গোলও খায় নি। মোহনবাগান দলের আকবর উপর্যুপরি চারটে খেলায় গোল দিয়ে বর্তমানে দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট পাঁচটা গোল করেছেন। মোহনবাগানের নবাগত খ্যাতনামা খেলোয়াড় শ্যাম থাপা গোল দেওয়াতে বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না। এ পর্যন্ত পাঁচটা ম্যাচ খেলে মাত্র একটা গোল দিয়েছেন (টালীগঞ্জ অগ্রগামীর বিপক্ষে)। মোহনবাগানের এ পর্যন্ত সর্বাধিক গোলে জয়লাভের রেকর্ড—নবাগত কাস্টমস দলের বিপক্ষে ৫—০ গোলে। মোহনবাগান ৩—০ গোলে চন্দ্র মেমোরিয়াল, ৫—০ গোলে কাস্টমস, ৪—০ গোলে টালিগঞ্জ অগ্রগামী, ২—০ গোলে খিদিরপুর স্পোর্টিং এবং ১—০ গোলে এরিয়ান্সকে পরাজিত করেছে। খেলায় অনুপস্থিত রাজস্থানের বিপক্ষে তারা পুরো পয়েন্ট পেয়েছে। গত বছরের রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গল ছ'টা খেলায় ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগের তালিকায় বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। তারা ১৮টা গোল দিয়ে ৩টে গোল খেয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ৪—০ গোলে হাওড়া ইউনিয়ন, ৪—১ গোলে উয়াড়ী, ৪—১ গোলে বাটা, ১—০ গোলে ক্যালকাটা জিমখানা এবং ২—১ গোলে ইস্টার্ন রেল এবং ৩—০ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ দলের বিপক্ষে জয়ী হয়। দলের পক্ষে এ পর্যন্ত সর্বাধিক গোল করেছেন রঞ্জিৎ মুখার্জী—পাঁচটা। মহমেডান স্পোর্টিং পাঁচটা খেলায় ৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তারা হারিয়েছে সালকিয়া ফ্রেন্ডসকে ৩—০, স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ১—০, ভ্রাতৃসংঘকে ৩—০ এবং পোর্ট ট্রাস্টকে ১—০ গোলে। বি এন আর দলের বিপক্ষে তাদের খেলা ১—১ গোলে ড্র গেছে। এরিয়ান্স ছ'টা খেলায় ১০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ চ্যাম্পিয়নশীপের লড়াই চাঙ্গা করে রেখেছে। তারা ৯ গোল দিয়ে একটা গোল খেয়েছে মোহনবাগানের কাছে। বর্তমানে লীগের তালিকায় প্রথম স্থানে আছে মোহনবাগান, দ্বিতীয় স্থানে ইস্ট-বেঙ্গল, তৃতীয় স্থানে এরিয়ান্স এবং চতুর্থ স্থানে মহমেডান স্পোর্টিং।

উইম্বলেডনের টেনিস আসর

১৯৭৭ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার ঐতিহাসিক শতবার্ষিকী আসরে পুরুষ এবং মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব কে পাবেন? এই আন্তর্জাতিক উইম্বলেডন টেনিস আসরে সিঙ্গলস খেতাব জয়েরই গুরুত্ব সব থেকে বেশী—বেসরকারীভাবে বিশ্ব খেতাব জয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ৩১ বছরের খেলার আসরে (১৯৪৬-৭৬) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ১৪বার, আমেরিকা ১২বার এবং একবার করে ফ্রান্স, ইজিপ্ট, স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়া এবং সুইডেন। অপরদিকে এই সময়ে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছে—আমেরিকা ২২বার (এর মধ্যে উপর্যুপরি জয় ১৩বার: ১৯৪৬-৫৮), অস্ট্রেলিয়া ৪বার, ব্রেজিল ৩বার এবং গেট ব্রিটেন ২বার। গত ৩১ বছরে (১৯৪৬-৭৬) কোন খেলোয়াড় খেতাব জয়ী হয়নি। উপর্যুপরি দুবার করে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন একমাত্র অস্ট্রেলিয়ারই এই চারজন খেলোয়াড়—লুই হোড (১৯৫৬-৫৭), রড লেভার (১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৮-৬৯), রয় এমার্সন (১৯৬৪-৬৫) এবং জন নিউকম্ব (১৯৭০-৭১)। সর্বাধিক পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন রড লেভার—চারবার। তারপরই নিউকম্বের তিনবার উল্লেখযোগ্য। উপর্যুপরি তিনবার করে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন একমাত্র আমেরিকারই এই তিনজন খেলোয়াড়—লুসী ব্রাউ (১৯৪৮-৫০), মোরীন কনোলী (১৯৫২-৫৪) এবং বিলি জিন কিং (১৯৬৬-৬৮)। সর্বাধিকবার মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং। সুতরাং উপর্যুপরি তিনবার সিঙ্গলস খেতাব জয় এবং সর্বাধিকবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের ব্যাপারে মেয়েরা দারুণ টেক্কা দিয়েছে পুরুষদের ওপর। একই বছরের আসরে পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছে মাত্র এই দুটি দেশ—আমেরিকা ১০বার (এর মধ্যে উপর্যুপরি ৫বার—১৯৪৭-৫১) এবং অস্ট্রেলিয়া ২বার। ১৯৭৬ সালে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন সুইডেনের বিয়রন বর্গ এবং মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছিলেন আমেরিকার কুমারী ক্রিস এভার্ট। বর্গের এটা ছিল প্রথম সিঙ্গলসের ফাইনাল খেলা। তাছাড়া তাঁর আগে সুইডেনের অপর কোন খেলোয়াড় এই আসরে পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে খেলেননি।

বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতা

আগামী বছর আর্জেন্টিনায় ৪র্থ বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতার আসর বসবে। বসবে। এখন থেকেই দেশে-দেশে তার সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতায় এপর্যন্ত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান, ১৯৭৩ সা হল্যাণ্ড এবং ১৯৭৫ সালে ভারত। আগা চতুর্থ বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতা অংশ গ্রহণ করবে চোদ্দটি দেশ।

ভারতীয় বিশ্ব হকি দল তৈরী উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্গালোরের কোচিং ক্যাম্পের জ ৩৫ জন খেলোয়াড়কে নির্বাচিত ক হয়েছে। বলা হয়েছে, জাতীয় হকি প্রতি যোগিতা, বোম্বাই গোল্ড কাপ, বেটন কা এবং আগা খাঁ কাপ হকি প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের খেলা বিচার বিবেচনা করে এই ৩৫ জন খেলোয়াড় বাছাই করা হয়েছে। মাদ্রাজে জাতীয় হকি খেলার পর যে ২৬ জন খেলোয়াড়কে ভারতীয় বিশ্ব হকি দল গঠনের জন্য বাছাই করা হয়েছিল তাদের থেকে কয়েক জনকে বাদ দিয়ে এবং কয়েকজন নতুন খেলোয়াড় দলভুক্ত করে এই ৩৫ জন খেলোয়াড়ের নামের একটি বাছাই তালিকা তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু আগের ২ জনের বাছাই তালিকায় অশোক দেওয়ান অশোককুমার, আসলাম শের খাঁ, হরিচরণ হরমিক সিং, অজিতপাল সিং, গোবিন্দ প্রভৃতি যে-সব খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের নাম বাদ পড়েছিল তা ৩৫ জন নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নামের তালিকায় নেই। এ নিয়ে খুবই অসন্তোষের ঝড় বয়ে গেছে।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

গোলরক্ষক : বি এস ছেত্রী (বাংলা), মন সিং, এম ফ্রেডেরিকস, আন (সার্ভিসেস) এবং ফ্রেডারিক ডি সুজা (এয়ারলাইন্স)

রাইটব্যাক : জন টপ্পো, ডুং ডুং (সার্ভিসেস) এবং বলদেব সিং (পাঞ্জাব)

লেফটব্যাক : ভেংগড়া (সার্ভিসেস), জন শেখর (তামিলনাড়ু) এবং সরজিৎ সিং (এয়ারলাইন্স)

রাইটহাফ : রবার্টস ক্রুডিয়াস (এয়ারলাইন্স), বীরেন্দ্র সিং (রেলওয়েজ) এবং রাম (তামিলনাড়ু)

সেণ্টারহাফ : রাজশেখরন (রেলওয়েজ), মেহবুব (এয়ারলাইন্স) এবং কেরকাট্টা (সার্ভিসেস)

লেফটহাফ : লুইস গ্যাবরিয়েল (বোম্বাই), বিশ্বনাথন (তামিলনাড়ু) এবং চোপড়া (রেলওয়েজ)

রাইট আউট : ভি জে ফিলিপস (রেলওয়েজ), চরঞ্জিৎ কুমার (পাঞ্জাব) এবং পরমিন্দার সিং (পাঞ্জাব)

রাইটইন : প্রভাকরণ (রেলওয়েজ), জন উইলসন (সার্ভিসেস) মারভিন ফার্ণাণ্ডেজ (এয়ারলাইন্স)

সেন্টার ফরোয়ার্ড : ভিনসেন্ট লাকড়া (সার্ভিসেস), ইবোপিশাক (মণিপুর), চেঙ্গাপ্পা (সার্ভিসেস)

লেফটইন : জাফর (বিশ্ববিদ্যালয়), সামুয়েল তপনো (সার্ভিসেস), সুরীন্দার সিং (পাঞ্জাব)

লেফট আউট : সৈয়দ আলী (উত্তরপ্রদেশ), ইম্তিয়াক হোসেন এবং কামার জা (রেলওয়েজ)
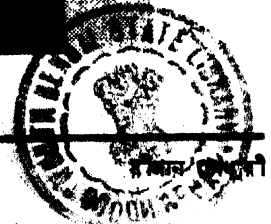
দর্শক

সত্যজিৎ রায় / টম অলটার / অ্যাটেনবরো

ইন্দ্রপুরীতে অ্যাটেনবরো

রঞ্জন চৌধুরী

লক্ষ্ণৌ-এ গিয়ে রেসিডেন্সি না দেখা আর আগ্রায় গিয়ে তাজমহল না দেখার সামিল। অবিশ্যি ১৮৫৭-র সিপাই বিদ্রোহের ফলে সাহেবদের এই অতি প্রিয় আস্তানাটি এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অক্ষত অবস্থায় এই বাড়িটি যে কত বাহারের ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুরোনো বইয়ের পাতের এনগ্রেভিং-এর মারফতে। এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহের ঠিক আগে এই রেসিডেন্সিতে বাস করতেন জেনারেল স্যার জেমস উট্রাম। তাঁর কাজের ঘরের যে কেমন চেহারা ছিল তার মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া গেল সেদিন—অর্থাৎ ২৭শে মে—ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে গিয়ে।

সাত নম্বর ফ্লোরের মাঝখানে প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মাঝারি আকারের ঘরের সেট। ঘরে ঢোকার তিনটি দরজা—তার মধ্যে দুটির উপর হরিণের ও একটির উপর লাগানো বাইসনের মাথা। দেওয়ালে টাঙানো পুরোন আমলের ছবি ও দেওয়ালগিরি। একদিকে একটি ফায়ারপ্লেস। ঘরের এক কোণে রাখা একটা হ্যাটর্যাক—সেখানে ঝুলছে সেকেলে টুপি—ও আরেকটি কোণে একটি লেখার টেবিল। মাঝখানে সোফা, চেয়ার ইত্যাদি। জানলার ধারে রাখা উট্রামের চেয়ারে বসে সামনের বিরাট টেবিলের উপর বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম গোছাচ্ছেন 'শতরঞ্জকে খিলাড়ী'র পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়। তখনকার জোড়া কালির দোয়াত, পালকের কলম, ক্যালেন্ডার, ঘড়ি, পেপারওয়েট, ফাইল, চিঠি, সংবাদপত্র ইত্যাদি কিছুই বাদ রাখেনি বলে মনে হল। সহকারী পরিচালক রমেশ সেন দেখলাম দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো দুই বিশাল আলমারিতে বই গোছাতে ব্যস্ত। পরে জেনেছিলাম যে এর মধ্যে অধিকাংশ বই-ই ঊনবিংশ শতাব্দীর। উট্রামের চেয়ারের পিছনের দেওয়ালে একটি প্রাচীন মানচিত্রও চোখে পড়ল। সেটি নাকি শ্রীরায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। সুতরাং এক কথায় বলা যায় যে পরিচালকের ডিটেলের প্রতি যে কতটা লক্ষ্য, তার এক চূড়ান্ত উদাহরণ হল এই সেটটি। ওদিকে ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায় তাঁর সহকারীদের নিয়ে ঘরটি আলো করতে ব্যস্ত।

সবে ন'টা বাজে। শুটিং শুরু হতে বেশ দেরী। ভিতরের তাপমাত্রা এখন থেকেই বাড়তে শুরু করেছে। বাইরে বেরিয়ে এলাম। দূরে দেখি উট্রামের এ ডি সি ক্যাপ্টেন ওয়েস্টনের রঙচঙে পোষাক পরে হাতে কফির পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের স্বর্ণপদক পাওয়া টম অল্টার। টমের জন্ম যদিও ভারতবর্ষে, কিন্তু জাতে খাঁটি আমেরিকান। অথচ এ ছবিতে তিনি এক পাক্কা ইংরেজ সাজছেন। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি হেসে জানালেন যে আমেরিকানদের পক্ষে খাঁটি ব্রিটিশ উচ্চারণে কথা বলাটা এক মহা ঝামেলার ব্যাপার। 'তবে আমার হাতে প্রচুর সময় ছিল। সুতরাং বেশ কিছু সাধনার ফলে এখন মোটামুটি ইংরেজদের মতন উচ্চারণটা করে আনতে পেরেছি। মাস দুয়েক আগে মাণিকদাকে টেপ করে তার একটা নমুনাও পাঠিয়েছিলাম—তিনি পাশ করে দিয়েছেন।"

ছয় নম্বর ফ্লোরে ঢুকলাম। সেখানেও চলছে এ ছবির তোড়জোড়। এক নতুন দরবার সেটের কাঠামো লেগে গেছে। শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত এখন এই বিশাল ঘরটির রং বাছতে ব্যস্ত। ওদিকে তাঁর সহকারী অশোক বোস মেঝেতে কি জাতীয় ফ্লোরিং লাগবে সে বিষয়ে মিস্ত্রীদের নির্দেশ দিচ্ছেন। এই দরবারেই লক্ষ্ণৌ-এর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ (আমজাদ খান) ও উট্রামের মোলাকাতের দৃশ্য তোলা হবে। ওই একই ফ্লোরের এক কোণে আরেকটি ছোট্ট সেট নজরে পড়ল। বংশীবাবু বললেন যে ওটিও "শতরঞ্জ"-এর জন্য। ১লা তারিখে চরিত্রাভিনেত্রী বীণা ওয়াজিদের মা আলিয়া বেগমের ভূমিকায় অভিনয় করতে আসছেন বম্বে থেকে। এই আলিয়া বেগম ও উট্রামের এক সাক্ষাৎকারের দৃশ্য তোলা হবে এই সেটে। মাত্র ছয় দিন সময়ের মধ্যে এতগুলি সেট দাঁড় করাতে হবে শুনে বংশীবাবুর অবস্থাটি বেশ সহজেই অনুমান করতে

পারলাম—"একটুও দম ফেলার সময় নেই মশাই!"

কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ভাবতে ভাবতে, সবে বাইরে বেরিয়েছি, এমন সময় সশব্দে স্টুডিওর গেট খুলে। এক পেল্লায় অ্যামেরিকান গাড়ি এসে থামতেই পিছনের দরজা খুলে নামলেন স্বনামধন্য বিটিশ পরিচালক, প্রযোজক ও অভিনেতা স্যার রিচার্ড অ্যাটেনবরো—অর্থাৎ রেসিডেন্সী জেনারেল স্যার জেমস উট্রাম। সাধারণ কুর্তা, পায়জামা পরা এই বেঁটে খাটো, মাঝবয়সী, চুল পাতলা ভদ্রলোকটি যে কী প্রতিভাবান অভিনেতা তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে প্রচুর ছবিতে। এখানে যাঁরা 'দ্য গেট এস্কেপ', "দ্য স্যান্ড পেবলস", বা সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত "ব্র্যানিগান" দেখেছেন, তাঁরা চট করে বোধহয় তাঁকে ভুলতে পারবেন না। সাথে শ্রীরায় লন্ডন অবধি গিয়েছিলেন এই অসাধারণ অভিনেতাকে চুক্তিবন্ধ করতে।

টম অলটার / অ্যাটেনবরো

রেসিডেন্সি ঘরের সেটে গিয়ে ঢুকলাম। শ্রীরায় উঠে দাঁড়িয়ে স্যার রিচার্ডের সঙ্গে করমর্দন করে তাঁকে অভ্যার্থনা জানিয়ে, দুজনে মিলে আলোচনার জন্যে মেক আপ রুমের দিকে রওনা হলেন। যাবার সময় স্যার রিচার্ড উট্রামের টেবিল থেকে কিছু চুরুট কুর্তার পকেটে পুরে নিয়ে গেলেন। এমনিতে তিনি একেবারেই ধূমপান করেন না—তবে উট্রাম ছিলেন প্রচন্ড চুরুট ভক্ত। কাজেই চরিত্রের খাতিরে কিছুদিনের জন্যে যে তাঁকে এই অভ্যাসটি করতে হবে সেটা বেশ ভালো ভাবেই জেনে তিনি লন্ডনে থাকাকালীন আঙ্গুলের ফাঁকে চুরুটের বদলে তাঁর কলমটি ধরে প্র্যাকটিস করে নিয়েছিলেন। লন্ডনের "ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারী"তে গিয়ে উট্রামের বিভিন্ন বয়সের ছবি দেখা থেকে শুরু করে 'ডিকশনারি অফ ন্যাশনাল বায়োগ্রাফী' ঘেটে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে নানান খুঁটিনাটি তথ্যও আবিষ্কার করে-ছিলেন। অ্যাটেনবরো যে উট্রামের চরিত্র ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর, সে বিষয়ে আর আমাদের কারুরই মনে কোন সন্দেহ থাকে না।

এদিকে শুটিং-এর সব তৈরি। ক্যামেরাও জায়গায় এসে গেছে। শ্রীরায় মেক আপ রুম থেকে ফিরে এসে ক্যামেরার পিছনে বসলেন। তার খানিকবাদে সেকেলে সাজপোষাক পরে এসে ঢুকলেন স্যার রিচার্ড। হাতে আধ খাওয়া জ্বলন্ত চুরুট। সেটে ঢুকেই তিনি উট্রামের চেয়ারটি অত্যন্ত দৃঢভাবে দখল করলেন। লাইট জ্বলে উঠল। চোখের নিমিষে কলকাতার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে স্যার রিচার্ড

অ্যাটেনবরো

অ্যাটেনবরো, শ্রীরায়ের 'শতরঞ্জকে খিলাড়ী''তে তাঁর প্রথম শট দিয়ে ফেললেন। ছবির ঘটনা ঘটেছে শীতকালে। অথচ কলকাতার এই মে—জুন মাসের ঘেমো, প্যাচপ্যাচে গরমে এক নাগাড়ে ছয় দিন ধরে গরম জামাকাপড় গায়ে চাপিয়ে বিনা দ্বিধায় অ্যাটেনবরো শুটিং করে গেলেন। একটিবারও কোনোরকম বিরক্তি প্রকাশ করেননি। শ্রীরায়ের উপর যে তাঁর কতখানি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সে কথা সাংবাদিকদের কাছে তিনি বারবার জানিয়েছেন—কিন্তু শুটিং দেখার সময় সেটা আরও পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেল। সকলকে তাক লাগিয়ে তিনিও শ্রীরায়কে "মাণিকদা" বলে সম্বোধন করতে শুরু করলেন। শ্রীরায়ের কাছেও স্যার রিচার্ড হয়ে গেলেন শুধু 'ডিক'। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দুজনে মিলে গল্প আড্ডায় মেতে থাকতেন। এমন কি দিন যেতে না যেতেই সাহেব শ্রীরায়ের পুরো ইউনিটের সঙ্গেও বেশ রীতিমত ভাব জমিয়ে ফেললেন। ক্যামেরায় কি লেন্সের ব্যবহার এবং কেন, বা কোনদিকে তাকালে এডিটিং-এর সুবিধে হবে—এইসব জেনে রাখা যে একজন অভিনেতার পক্ষে কতটা জরুরী তা স্যার রিচার্ডের অভিনয় দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়। তার উপর স্যার রিচার্ড ও শ্রীরায়ের মধ্যে যে কতখানি মনের ও মতের মিল তা যাঁরা এই কদিনের শুটিং দেখেননি, তাদের বোঝানো অসম্ভব।

এই শুটিং-এর অধিকাংশ কাপড়জামা-ই এসেছে লন্ডন থেকে। এনেছেন সাংবাদিক লেখিকা মারী সীটন। যাঁরা শ্রীরায়ের জীবনী "পোরট্রেট অফ এ ডিরেকটর" পড়েছেন তাঁদের কাছে মারী সীটনের নাম নিশ্চয়ই অজানা নয়। মারী বেজায় ফুর্তিতে বললেন—"বহুদিন বাদে আবার কলকাতায় এসে সত্যজিৎ-এর শুটিং দেখতে পারছি বলে যে কি আনন্দ হচ্ছে!"

"শতরঞ্জ"-এ উট্রামকে ঘিরে দুটি পূর্ণ ইংরেজি সংলাপের দৃশ্য আছে। একটি ওয়েস্টন, অর্থাৎ এম অল্টারের সঙ্গে। অন্যটি রেসিডেন্সির ডাক্তার জোসেফ ফেরারের সঙ্গে। ডঃ ফেরারের ভূমিকায় অভিনয় করলেন দিল্লীর প্রখ্যাত নাট্য পরিচালক ব্যারি জন। এই দুটি দৃশ্য তুলতে লেগে গেল মোট চারদিন। আমজাদ বনাম উট্রামের দৃশ্য তুলতে লাগল মাত্র একদিন। এবং শেষ দিনে—অর্থাৎ ১লা জুন, সকাল বিকেল মিলিয়ে দুটি ছোট্ট দৃশ্য অনায়াসে তোলা হয়ে গেল। একটিতে অংশগ্রহণ করলেন নবাবজাদের প্রধানমন্ত্রী আলি নকী খানের ভূমিকায় ভিকটর ব্যানার্জি, ও অন্যটিতে ...ণা।

...না হতে হবে বলে ১লা তারিখ রাত্রে দুই তারিখে ভোর রাত্রে তাঁকে লন্ডন

অ্যাটেনবরো তাঁর "গ্রান্ড হোটেল"-এর ঘরে শ্রীরায় ও তাঁর ইউনিটের জন্যে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। সেখানেই বোঝা গেল ভারতবর্ষের প্রতি অ্যাটেনবরোর টান—"হিয়ার, আই রিয়েলি ফিল অ্যাট হোম"। তাঁর এত তাড়াতাড়ি কুর্তা, পায়জামা ছেড়ে স্যুট-প্যান্ট পরার যে মোটেই ইচ্ছে নেই তা বোঝা গেল। কিন্তু সামনে প্রচুর কাজ; না গেলেই নয়।

সবাইকে বিদায় জানাবার সময় অ্যাটেনবরো শ্রীরায়ের হাত ধরে বললেন "আই হ্যাভ ফলেন ইন লাভ উইথ দ্য "শতরঞ্জ" ফ্যামিলি"। তারপর আলতো করে ২৪০ নম্বর ঘরের দরজাটি বন্ধ করে বোধহয় রাত দেড়টার প্লেন ধরার জন্য তৈরী হতে বেডরুমের দিকে পা বাড়ালেন।

ফটো : সন্দীপ রায়

নির্মীয়মাণ একটি ছবিতে সৌমিত্র চ্যাটার্জি এক দুশ্চরিত্র মাতালের চরিত্রে অভিনয় করছেন। সেদিন ফেয়ার শুটিং হচ্ছিল সহ-নায়িকার সঙ্গে। গনগনে গরমে গান গেয়ে সেই নায়িকাকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে সে কি ক্লান্তি! একটু ফাঁক পেতেই সৌমিত্রবাবু চলে গেলেন বাইরে। খোলা হাওয়ায় বুক ভরে নিয়ে বললেন—'ওহো! আজ মাতাল, কাল লম্পট সাজতে সাজতে গেলুম! আর পারি না!'

দুঃখ করে আর কি করবেন দাদা! ইঁদুর-দৌড়ে যখন নাম লিখিয়েছেন তখন আর ঠগ বাছতে যাবেন না, গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

রবার্তো রসেলিনি

শ্রীযুক্ত সঞ্জয় খান সুপুরুষ এবং রূপবান, একথা মেনে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দেখতে মিষ্টি হলেই কেউ গুণবান হয় না। চাঁদি সোনা মানে সোনা-রুপো ছবিতে সঞ্জয়ের স্বয়ংম্ভরতার প্রমাণ একটু বেশিই। তিনিই প্রযোজক, তিনিই পরিচালক, তিনিই কাহিনীকার ও তিনিই নায়ক। আমার মনে হয় নিজের প্রতি অতিরিক্ত আস্থাই ভদ্রলোককে ডোবাল এবার।

অনেকদিন আগে একটি বিদেশী ছবি দেখেছিলাম। নাম ম্যাকেনাজ গোল্ড। একবার মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল সঞ্জয়ের সুবর্ণ স্পৃহা বোধহয় অনুরূপ। হায় কপাল। নায়ক ও তাঁর সহকর্মীরা যে সুরঙ্গ রচনা করলেন তার মধ্যে বুদ্ধির ছিটেফোটাও চোখে পড়ল না। চাঁদি সোনা, না রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার না জমজমাট প্রেম না স্নায়ুবিদারক সংঘর্ষ। অথবা আমারই ভুল হচ্ছে, ছবির প্রধান মানুষটি হয়ত অর্থের চাইতে পরমার্থকেই গুরুত্ব দেন। না হলে আর তাঁর প্রচেষ্টা একজন সর্বজন পরিচিত ধর্মগুরুর প্রতি নিবেদিত হবে কেন?

এবার তাহলে গল্পের সূত্রটা ধরিয়ে দেওয়া যাক। মানিব্যাগ খালি থাকলে প্রেম ও যৌনতা সবই উবে যায়—এই সরল সত্যটি উপলব্ধি করে নায়ক গোপন ভাণ্ডারে রক্ষিত ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। বলা বাহুল্য, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পথটি সে বেছে নেয় তা আইন বহির্ভূত। অবশেষে স্বপ্ন সফল হয়। তারপরে যথারীতি মূর্তিমতী বিবেকের মত এক বৃদ্ধা চলে আসেন ঘটনা স্থলে। এবং তাঁর উপদেশ শিরোধার্য করে নায়ক লক্ষ্মীছেলের মত লুণ্ঠিত মণি-মাণিক্য অনাথ শিশুদের উপকারার্থে দান করে। মধ্যে ফর্মুলা মাফিক পুলিশী বোকামি ইত্যাদি সাজিয়ে নিতে হবে।

কয়েকটি সুশ্রাব্য গান ও একটি উদর নৃত্য, ইংরেজীতে যাকে বলে বেলী ডান্স, রয়েছে। একটাই সুসংবাদ যে অভিনয় করবার চেষ্টা কেউ-ই করেননি। নায়িকা পরভিন বাবি মোটামুটি ধৈর্যশীলা, অত্যন্ত শান্তভাবে প্রেমিকের যাবতীয় কাজকর্ম লক্ষ্য করেছেন।

তবে সংগীত পরিচালক রাহুলদেব বর্মনের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

রবার্তো রসেলিনি

ডি-সিকা, পাসোলিনি, ভিসকন্তি ...... অবশেষে ইতালিতে চতুর্থবার নক্ষত্র পতন হল চলচ্চিত্রের ইতিহাস চিরদিনের মতন বরণ করে নিল রবার্তো রসেলিনিকে। রবিবারের খবরের কাগজ আমাদের জানিয়ে গেল হৃদরোগের আক্রমণে হার মেনেছেন রসেলিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছেল একাত্তর বছর। শেষ হয়ে গেল একটি যুগ যার নাম নতুন বাস্তবতা বা নিও রিয়ালিজম। আর আধুনিক ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অন্ততঃ শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়ের চরিত্র সন্ধানে এই ডি-সিকা রসেলিনির ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা কে না জানে।

জন্ম ১৯০৬ সালে। বাবার প্রভাবে চলচ্চিত্রের দিকে আকৃষ্ট হন। কিন্তু প্রায় আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত রসেলিনি নিজের মহিমা খুঁজে পান নি। কয়েকটি ছোটখাট কাজের মধ্য দিয়ে শুধু বেরিয়ে আসছিল ডিটেল অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ সম্বন্ধে তাঁর অভিনিবেশ। কেননা উপায় ছিল না। ইতালির আকাশে তখন কালো বাদুড়ের মতন বিরাজ করছেন মুসোলিনি। প্রচুর নামী দামী অভিনেতা ছিলেন। পরিচালক ছিলেন, পয়সা ঢালা হচ্ছিল আরও বেশী। তবু স্বাধীনতা ছাড়া শিল্প! আশ্চর্য কখনোও সম্ভব নাকি তা?

অবশেষে এল মুক্তি। রসেলিনি ও তাঁর বন্ধুরা অল্প পুঁজি নিয়েই ঝাঁপ দিলেন। সৃষ্টি হল সেই বহুশ্রুত কিম্বদন্তী ওপেন সিটি (১৯৪৫)। সে অলীক প্রয়াণ ও অভিশাপ মধ্যযুগ কখনো দেখেনি, যুদ্ধক্লান্ত মানব সভ্যতা তাকে বিবৃত দেখল সেলুলয়েডের পর্দায়। লাঞ্ছিত অপমানিত একটি জাতি পেল তাদের আত্মার প্রতিলিপি, এই ছবির প্রধান যেটি গুণ তা হল স্টার্ক রিয়ালিটি, সত্যের চামড়া ছাড়ান অবয়ব। স্রষ্টা কখনোই অতি নাটকীয় কিংবা মূল্যবান ঘটনার ওপর জোর দেন নি, কিংবা সোভিয়েত ছবির মত প্রতিবাদ মুখরও হয়ে ওঠেন নি কিন্তু তারই ফলে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে কান্না আমাদের চোখ আবছা করে দিয়েছে। রসেলিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন।

দ্বিতীয় ছবি আরও গুরুত্বপূর্ণ পইসা (১৯৪৬)। চলচ্চিত্রের সম্প্রসারণের দিক থেকে কেউ কেউ এই ছবিটিকে সের্গেই আইজেনস্টাইনকৃত ব্যাটলশিপ পটেমকিনের সঙ্গে তুলনা করেন।

ছয় ভাগে বিভক্ত ছবিটি সিসিলিতে মার্কিন ও ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে। শেষ ইতালির মুক্তিতে। আপাতভাবে ছবিটি যুদ্ধ সম্পর্কিত কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে সে কোন মহৎ শিল্পীর মতই রসেলিনি মানব অস্তিত্বের মূলে পর্যন্ত শিকড় চারিয়ে দিয়েছেন। একদিকে আনছ তথাকথিত সভ্যতা গর্বিত মার্কিনীরা, অন্যদিকে দরিদ্র ও অশিক্ষিত ইতালিয়রা। আসলে রসেলিনি নতুন মানুষের কথাই ভাবতে চেয়েছেন: মায়া সভ্যতার বদলে অন্য কিছু। ফলে শেষ পর্যন্ত পইসা তে না বলা কথা থাকে এবং সেই কথা মানুষের পাপগ্রস্ত রক্তাক্ত হৃদয়ে সুবাতাস ও স্নিগ্ধতা প্রবাহিত করে।

এরপরে একটানা অবরোহন পর্ব। পরের সব ছবিতে তিনি ব্যক্তিগত না[...] প্রসঙ্গ এনেছেন। অথচ বোঝা যায় সেটা[...] তার ছিঁড়ে নেছে। রসেলিনি ফুরি[...] গেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ১৯৫৭ স[...] ভারতবর্ষে এসে তিনি ইণ্ডিয়া (১৯[...] নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন।

বস্তুতঃ নিওরিয়ালিজমের পিতামহ সদৃশ ভিত্তোরিও ডি-সিকা ও রবার্তো রসেলিনি দুজনেই খুব অদ্ভুতভাবে দু[...] করে উল্লেখযোগ্য ছবি করেছেন। অন[...] তাঁরা হয় বাণিজ্যিক নয়তো ব্যর্থ। এ[...] ঘটনাটি প্রায় অনিবার্যভাবে প্রমাণ ক[...] নয়া-বাস্তবতা শিল্পান্দোলন হিসেবে যত[...] প্রভাবশালী হোক, শিল্পসত্তো কুশাকার[...] কেননা তার কোন দর্শন নেই। দর্শন শিল্[...] নয় ঠিকই। কিন্তু একটি গভীর দার্শনি[...] উপলব্ধি ছাড়া কোন শিল্পীই বেশিদ[...] এগোতে পারেন না, তাঁর ক্ষমতা ও মান[...] প্রীতি যতই দৃঢ় হোক না কেন।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যা[...]

ফিল্মের আরতি মঞ্চে

বাংলা ছবির পর্দার আরতি ভট্টাচা[...] অ্যাকাডেমির মঞ্চে 'বনলতা' বা ব[...] সেজেছিলেন গত ১৯ মে। প্রেম [...] মাতৃত্বের আকুতিতে সে ছিল [...] আগুন, স্বামী [...] প্রতি ভালো[...] বাসায় অভাব ছিল না বটে, কিন্তু [...] বাল্যবন্ধু পরমের পোর্সিসিভ [...] কাছে সে স্থির থাকতে পারেনি। নাট্য[...] কার (ডঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষ) অনন্[...] দেখিয়েছেন স্বামীকে [...] উদ্ধারের জন্যই বনলতার এই প্রেম বিতরণ, কিন্তু পরমের প্রতি তাঁ[...] দুর্বলতাটি কি শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতাই, না গভীরে কোনো কোমল জায়গা ছিল বনলতার?

ত্রিকোণ এই নাটকটি অভিনীত হয়েছে একবারে সাদা আলোয়, আর[...] একতারে পরিবেশে। তিনটি চরিত্রে[...] মধ্যে যখন সন্দেহ অবিশ্বাস অন্ধকার জমতে শুরু করেছে আলো তখন মঞ্চকে করেছে আলোকিত। প্রয়োগ শৈলী কোনো অভিনবত্বকে আমল দেননি নির্দেশক (আরতি ভট্টাচার্য)। শুরুতে যে দু-একটি ঝলকানি দেখা গিয়েছিল তা হঠাৎ ব্লটিং কাগজের মত অমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেল কেন? এমনিতে তো নাটকে তেমন জীবনের গভীর কোনো কথা নেই নিতান্তই প্যাসেনেট ড্রামা। কোনো বিদেশী নাটক [...] স্বদেশী গল্পের ছায়াও কখনও কখনো এসে পড়ছে মঞ্চের ওপর, চরিত্রের বিন্যাসে।

তবুও একশ চল্লিশ মিনিট চেয়ার বসে থাকা যায় একমাত্র বল্লরীর রীতি ভট্টাচার্য) জন্য। ফিল্মের রীতি এখানে একবারে অন্য চেহারায়। স-কান্না নীরবতায় তিনি বল্লরীতে মাদের পাশের চেয়ারে এনে বসিয়েছেন, সমবেদনার স্বরে মাথায় হাত লয়ে চাকতে বলে উঠতে ইচ্ছে করে বিনের পথ একটু ঘোরানো। এইতো বন!' চরিত্রটির অসহায়তা মানসিক দ্ব তিনি তাঁর ছয় ইঞ্চি ব্যাসার্ধের থটায় তুলে ধরেছেন, সারাটা শরীর সংলাপ তখন নীরব। শেখর রূপে শিল্পী নিমু ভৌমিক পাল্লা দিয়ে লড়ে গেছেন আরতির সঙ্গে। তবে ড়োলি ঠেকিয়ে পায়ের পাতা উঁচু রে থাকা কিংবা ছটফটানি ভাবটা একটু মনো দরকার। এ দুটো অভ্যাস ওঁর মুদ্রার স্বভাব। পাল্টাতে পারবেন পরমেশ ভূমিকায় শম্ভু বন্দ্যো-পাধ্যায় ভালো অভিনয় করেছেন। স্ক্রিপ্টকে ভালো করে বুঝে তাঁকে দেহটিকে একটু কম ব্যবহারের অনু-রোধ জানাই। তাঁর চোখের কাজ অবশ্য ভালো। অজয়দার চরিত্রে শিল্পী সুনীল রক্ষিত একেবারে পাকাপোক্ত অভিনয়ই করেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন নন্দিনী ঘোষ ও সোনালী দাস।

নির্মল ধর

নান্দীকারের ফুটবল

গত দশ-বারো বছর ধরে বাংলা গল্প-উপন্যাসে এবং পিছু পিছু নাটকে সিনেমায় যুবসমাজের দিকভ্রান্তি, ছন্নছাড়া জীবন, নিশ্চিন্ততা। এইসব নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। একদল সমস্যাটির বুড়ি ছুঁয়ে গেছেন মাত্র। রূপকে গল্পে কেঁদে-ছেন। অন্য গোষ্ঠী ধোঁয়ার আড়ালে রোমান্টিক লোফালুফি খেলেছেন, কফি-হাউসের বাইরে কেউ জানতেও পারেনি। কোথাও সমস্যাটা সোজা চোখে দেখা যায়নি, যাতে আহত হতে হয়।

নান্দীকারের ফুটবল পর্দা খুলেই বিপদটাকে একেবারে উলঙ্গ করার চেষ্টা করেছে। দর্শকদের টেনেছে সোজা খেলার মাঠে। এক চিলতে গ্যালারীর ছবিটা গোটা দেশের বিকৃত যুব উল্লাসকে যেন মুঠোয় নিতে চায়। সেখানে ইস্টবেঙ্গল সমর্থক পতাকাধারী একদঙ্গল যুবকযুবতী আনন্দে উন্মত্ত, হতাশায় ক্ষিপ্ত, বিদ্রূপে কুৎসিত। তারা চেঁচায়, নাচে, কাঁসর-ঘণ্টা-সিটির সঙ্গে খিস্তি মিশিয়ে উদ্দাম হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে এই অতিকায় বেলেল্লাপনাকে মঞ্চের সীমায় বেঁধে ফেলেছে নান্দীকার। অথচ কত সহজে। বাস্তব এখানে ক্যামেরারও ঈর্ষা। স্বভাবতঃই আশা জাগে—আয়তন তো গভীরতা নিশ্চয়ই খুঁজবে নান্দী-কার। ঠিক তখনই সামনে আসে হরি পুর-কায়স্থ। ইডেনীহুল্লোড় থেকে এখন সে দলছুট, একলা: স্কুলের শিক্ষক জানিয়ে যান, হরি অতি সাদামাটা ছাত্র, পরীক্ষায় টোকে এবং বিকৃত অভ্যেসে পেনসিল চোষে। মারাত্মক ইঙ্গিতটা এইখানেই।

হরি মাদার-কমপ্লেকসের রুগী। বাবা-মাকে তার মনে পড়ে না। বেড়ে উঠেছে মাসীর বন্ধনহীন আস্কারায়। নাট্যকার আমাদের বেশী টেনেছেন এই দিকটায়। যুবসমস্যার কয়েকটা ঘটনাকে বড় করেননি, কারণ ঘটনা কেবলই মালমশলা। তিনি চেষ্টা করেছেন রোগটার মূল খুঁজতে। ভিত খুঁড়েই দেখাতে চেয়েছেন গলদটা একেবারে গোড়ায়। আমাদের প্রাথমিক পরিবেশে। আমাদের ঘরে। যেখানে সম্পর্কগুলো কেবলই চেনামুখ, আসলে অচেনামানুষ।

মাসী তাই টেরও পান না, হরি বয়সে বাড়লেও বড় হচ্ছে না—থেকে গেছে জড়-বুদ্ধি। ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ধরা-ছাড়ার বোধ তার জন্মায়নি বলেই 'গুরু' কালীদাকে ছেড়ে বিনয়দাকে আঁকড়াতে দেরী হয়।

এই পর্যন্ত রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত একডুবে তুলেছেন। মুশকিল হলো আরো একটু তলিয়ে খুঁজতে। হরির প্রাথমিক পরিবেশ, তার সংসারকে বিকৃত দেখাতে তিনি মাসীকে আধাবেশ্যা করে এঁকেছেন। এটা ওঁর ভাষাতেই বলি, একটু 'শরৎচন্দ্রমার্কা'। মাসী ও খদ্দেরদের বার কয়েক লেনদেন ও হরির অভিনয়ের নেপথ্য বেশ কয়েকবার 'বেজন্মা তুই বেকারী' গানটা হরিকে হঠাৎই আলাদা করে ফেলে। মনে হয় হরি আমাদের কেউ না। বিশেষ জাতের বাংলা গল্পের সেন্টিমেন্টাল নায়ক, যার ভাঙ্গাগড়ায় আমার কোন ভাগ নেই।

রুদ্রপ্রসাদবাবু, হরিকেতো আমার ভাই অথবা ছাত্র অথবা পাড়ার ছেলে করেই আঁক-ছিলেন—খুব চেনা ছেলে। হঠাৎ ওকে ঐরকম সেকেলে কায়দায় আলাদা করলেন কেন? আমাদের ঘরে তো অন্য অসুস্থতা অনেক।

এইটুকু সরিয়ে রাখলে অভিনয়ে রণজিৎ চক্রবর্তী (হরি) চমকে দিয়েছেন। এটাই তাঁর প্রথম বড় কাজ। কেবল সীতার সঙ্গে সম্পর্কে তাঁকে একটু প্রাণহীন লেগেছে। আসলে মূল নাটকেই হরিদের জৈবিক চেহারাটা বড়ই এক দিকে থেকে দেখা। নাকি যৌন জড়তার ইঙ্গিত?

রুদ্রপ্রসাদ ওয়ফে ব্যোমকালী কথোপ-কথনে হাঁটাচলায় নিখুঁত চরিত্র দাঁড় করালেন অথচ কোরাস হতে গিয়ে তাঁর বিশেষ বাচনভঙ্গী এড়াতে পারলেন না। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বিনয়দা', বুটলেটু সুখী মধ্যবিত্তটি, আমাদের টানে। আর একটু মন-যোগ দিলে আরও কাছের হতেন। মাসীর চরিত্রে কাজল চৌধুরী বেশ স্বাভাবিক, ভাঙ্গার মুহূর্তে যে কান্নাটা বেছে নিলেন সেটা অত্যন্ত সাবেকী মেলোড্রামা ঘেঁষা। দৃশ্যটা একটু বেশী কান্না নিঙড়োতে চায়।

শব্দে কৌতুক অথবা উদ্ভট আনতে পারেন হিমাদ্রী ভট্টাচার্য অথচ ট্রামবাসের আওয়াজ পেলেন না কোলকাতায়? তাপস সেনের আলো বহুবার আলাদা হয়ে চোখ টানে। আলোতো শুধু দেখায় না, ঢাকেও।

সবচেয়ে জোরালো এর নিয়মভাংগা ফর্ম। যেখানে মঞ্চ কখনও বাস্তব আঁকে কখনও আভাষ দেয়, অভিনয় কখনও স্বাভাবিক কখনও প্রতীকধর্মী অথবা মাইমঘেঁষা, যেখানে নাচ, প্যারডি, রোমাঞ্চ, আতঙ্ক, মেলোড্রামা মিশিয়ে সবকিছু এলোমেলো।

কেউ কেউ খুঁত খুঁত করবেন এর পাঁচমিশেলী নাট্যকৌশলে। তাঁদের বলি, এটাই দরকার। যাদের ছবি এতে ধরা হলো তাদের জীবন তো আসলে ছকের ধার ধারে না সবই তো তাদের এলোমেলো।

উদয়ভানু ভট্টাচার্য

মেঘে ঢাকা তারা

২৭ মে শুক্রবার প্রেসিডেন্সী কলেজ হলে এই নাটকটি অভিনয় করলেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট শিল্পী গোষ্ঠী। অতীতের মত এবারও এঁদের নাট্যানুষ্ঠান স্মরণীয় হয়ে থাকবে আপন বৈশিষ্ট্যে। নাট্য-নির্দেশক নীহার কুন্ডু তাঁর চিন্তাভাবনাকে সার্থক-ভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন সমগ্র নাট্যা-নুষ্ঠানের মাধ্যমে। স্থানে স্থানে নির্দেশকের বৈচিত্রময় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রসানুভূতির প্রকাশ দর্শকচিত্তকে মুগ্ধ করেছে, সফল করেছে নাটকের মূল বক্তব্যকে। নাটকটিকে তিনি সাফল্যের সঙ্গে দুর্বার গতিতে পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন, কোথাও এতটুকু শ্লথ হতে দেন নি। সে-দিনের অভিনয়ে শিল্পীদের ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। অভিনীত চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে চরিত্রগুলিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করে এরা কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। নীতার চরিত্রে আরতি ঘোষ অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। এক অসাধারণ চরিত্রে স্মরণীয় অভিনয়ে তিনি সার্থক। 'শঙ্করের' ভূমিকায় শম্ভু মুখোপাধ্যায় চরিত্রের বিশিষ্ট-রূপটি সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছিলেন। তাঁর সহজ সরল অভিনয় তাঁর শিল্প প্রতি-ভার স্বাক্ষর রেখেছে। 'মাধব মাস্টারের' ভূমিকায় ধীরেন দত্ত চরিত্রানুযায়ী অভিনয়ে কৃতিত্বের অধিকারী হলেও মাঝে মাঝে অতি-অভিনয়ের ঝোঁক শিল্পীকে হাতছানি দিয়েছে, যার ফলে চরিত্র-সৃষ্টির সফলতা মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়েছে। 'গীতা'র চরিত্রে লেখা চট্টো-পাধ্যায় স্বার্থ সর্বস্ব একটি মেয়ের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়ে আপন প্রতিভার পরিচয় দেন। 'সনতের' ভূমিকায় মণিলাল মল্লিক ও মদন ডাক্তারের ভূমিকায় সিদ্ধেশ্বর সেন আপন আপন চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেন। 'কাদম্বিনী'র চরিত্রে ইলা বসু চৌধুরী চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেন।

আমি সম্পূর্ণ কবি সম্মেলন বিরোধী

বেশি দিন নয়, বছর সাত-আট হলো সাধারণ 'সাহিত্য সভা' বলে যে জিনিসটি ছিল তা থেকে ছিটকে একটি নতুন উপগ্রহ তৈরি হয়েছে যার নাম 'কবি সম্মেলন'। 'কবি সম্মেলন' যে আগে ছিল না ঠিক তা নয়, তবে গত কয়েক বছরে এই বস্তুটির প্রসার সারা পশ্চিম বাংলায় ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। আগে বঙ্গ-সংস্কৃতিতে এক সন্ধ্যা কিংবা ওয়াই এম সি এ'তে কৃত্তিবাসের আসরে, কিংবা থিয়োসফি হলে, এই কবিতা পাঠের আসর জমত, কিন্তু এখন 'কবি সম্মেলন' একটা ইনস্টিটিউশন। গ্রামে-গঞ্জে, ঘাটে-মাঠে, অলিতে-গলিতে—প্রায় সমস্ত মফঃস্বল শহরগুলিতে (কলকাতাকে তো বাদই দিলাম) ফি-বছর অন্তত ষাট-সত্তরটা 'কবি সম্মেলন' হয়। ব্যাপারটা কিছুই নয়, কয়েকজন কবি একত্র হন এবং যাঁকে এক-এক করে নাম ঘোষণা করা হয়, কেউ উদাত্ত বা কেউ মিনমিনে কণ্ঠে কবিতা পড়ে নেমে আসেন।

সাহিত্য-সভার একটা কড়া ঐতিহ্য বাংলাদেশে চিরদিনই ছিল। তার ফর্মটা মোটামুটি এই রকম বলা যেতে পারে : (১) সভাপতি (যিনি সাধারণত সাহিত্যিক নন, কিন্তু কোনো বিদগ্ধ সাহিত্য-রসিক (অধ্যাপক সাধারণত), (২) প্রধান অতিথি (পঞ্চাশোর্ধ্বের কোন লেখক, যাঁর খুব নাম), (৩) আলোচকবৃন্দ অনামী লেখকসহ। বিষয় : 'বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি' কিংবা কোন সদ্য-প্রয়াত লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি' ইত্যাদি। শতবার্ষিকী হলে তো কথাই নেই, তাঁকে নিয়েই পড়বে সবাই। সাহিত্য-সভায় সাধারণত বক্তৃতা হয়, প্রধান অতিথি সেটা কম-পক্ষে ঘণ্টা দেড়েক চালান, তাতে 'আমি শেষ যে কথাটি বলে আমার বক্তব্য শেষ করব' এই কথাটি ১৮ থেকে ২০ বার বলে দর্শকদের ঠাণ্ডা করে বসিয়ে রাখেন। এই বক্তৃতায় সাধারণভাবে 'আজকের যুগচেতনা' শব্দটি থাকবেই, থাকবে আধুনিক সাহিত্যে ঐতিহ্য ভাঙার অভিযোগ, 'অত্যাধুনিকদের' সাহিত্যের নামে 'বেসাতি' করার অভিযোগ এবং কিছু শেকসপিয়র বা বার্নার্ড শর উদ্ধৃতি। (যেহেতু এই পক্বকেশ অতি কট্টর বক্তা বাংলায় এম-এ, সেহেতু ইংরিজি উদ্ধৃতি দিতেই হয়)। এর পর আলোচনা হয়, অনেকে আগ বাড়িয়ে এসে 'কথা রাখেন' একটা দুটো ছোকরা লেখক—বক্তার সঙ্গে তর্কও করে—এবং সেই সময়ই সভাপতি স্পীকার-টাইপ ক্ষমতাবলে গানের অর্ডার দিয়ে দেন, এবং একটি তরুণী হারমোনিয়ামসহযোগে নজরুল বা অতুলপ্রসাদের একটি গান ভয়াবহ সুরে লাগিয়ে দেয়। সভাশেষে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সিঙ্গাড়া, মিষ্টি, কচুড়ি ও চা খেয়ে রওনা দেন। — উপরোক্ত বিবরণটি সঠিক স্বীকার করবেন সাহিত্য-সভায় চিরায়ত রূপ।—এবং এ কথাও বোধহয় অস্বীকার করা উচিত হবে না যে, প্রকৃত-প্রস্তাবে সাহিত্য-সভা ব্যাপারটা খারাপ নয়, এর চেহারাটা এ রকম ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আজকে দেখা দিলেও, সুষ্ঠুভাবে এবং 'ক্লিশে'—বহির্ভূত চেহারায় যদি সাহিত্য-সভা আয়োজন করা যায় তাহলে তার একটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছেই।

কিন্তু আমার আপত্তি আজ বিশ শতকের সাহারায় 'কবি-সম্মেলন' নামক র‍্যাকেটটি বিষয়ে। কেন তা আমি বলছি। এক সময়ে মহাকাব্যও শ্রুত হতো। একতারা বাজিয়ে হোমারও তো 'ইলিয়ড' বা 'অদিসি' পড়ে শোনাতেন — 'র‍্যাপসোড' বলে একটি সম্প্রদায়ও তো গড়ে উঠেছিল যাঁদের আমরা বলতে পারি 'মোহোগ্রস্ত আবৃত্তিকার'। কিন্তু তখনকার কবিতার ধারণা ছিল অন্য রকম—কবিতা তখন আখ্যান-বস্তু নির্ভর, লোক ভিড় জমাতো প্রধানত গল্প শোনার জন্য, এবং রচনাকার কবিত্বের চেয়ে জোর দিতেন গল্পের উপর। তাছাড়া ছাপাখানাও তো তৈরি নেই, গল্প মানব জাতির ভাতের খিদের মতই একটা ঘটনা। প্রাত্যহিক জীবনে এখনো যে-লোক গল্পের মত করে আড্ডা দেয় তার বাড়িতে লোক জমে। যে ছেলে ভাল গুল মারে বা গল্প বানায়, না হোক তার কালো রঙ, খর্বকায়, তবু মেয়ে তুলতে তার অসুবিধে হয় না। আপনি ভেবে দেখুন সত্যি বলেছি কি না!

তৎসত্ত্বেও আজকালকার কবি-সম্মেলন র‍্যাকেট বরদাস্ত করা যায় না। এখনকার কবিরা আখ্যানবস্তু থেকে বহু দূরে সরে এসেছেন—কবিতা অভিধান-বহির্ভূত এক ভাষা যা মনের শিকড়ে বাকড়ে প্রবেশ করে 'অব্যয় কস্তুরির' মত—তাতে স্বাদ গন্ধ সব থাকলেও অনিঃশেষ, অনশ্বর। সম্পর্কটা কবি এঁটে দেন পাঠক ও কবিতার মধ্যে। কবিতার মূল ধর্ম এখন প্রতীক, এবং তা বারংবার পাঠে দ্রৌপদীর শাড়ির মত অন্তহীন অর্থবহ। কবিতা এখন গোপন, প্রেমের মত নিবিড়। আপনি একা কবিতা একা—আপনাদের পরস্পরে সম্পর্ক তৈরি হবে রহস্যের মধ্যে, রহস্যে-রহস্যে কাছে আসবেন। এখন 'মোহগ্রস্ত আবৃত্তিকার' বা 'র‍্যাফসোড' দরকার নেই। দরকার বরঞ্চ নীরবতার, কবিতার সঙ্গে একা থাকার। তাই বলে কিন্তু এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে সব 'আধুনিক' কবিতার সঙ্গে আপনার একা থাকতেই হবে এবং খুঁড়ে-খুঁড়ে অর্থ বের করতেই হবে।

যে কবিতা আজকাল লেখা হয় তার পদশব্দ অতি মৃদু, ফ্রী-ভার্সে বা জটিল পয়ারে ঘন সন্নিবিষ্ট অভিজ্ঞান — সংহত, ছোট, আবৃত্তিকারের ডামাডোল এড়িয়ে সে আসে বুকের ভেতর—শব্দে লেখা 'মন দিয়ে' গড়া এটা—অতি ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই যেখানে অবস্থা সেখানে কবি-সম্মেলন আসে কি করে?

অথচ প্রকৃত-প্রস্তাবে হাটে-ঘাটে, মাঠে-গঞ্জে, চলেছে এই উৎসব। কলকাতায় এখনকার দু-একজন কবি-তারকা আছেন, তাঁদের ফার্স্ট-ক্লাস ভাড়া ও সন্দেশের পর কারণবারির আশ্বাসে নিয়ে যাওয়া হয় শিউড়ি বা বর্ধমানে, শিলিগুড়ি বা বালুরঘাটে। এবং তাঁদের ছত্র-তলে স্থানীয় কবিরা মঞ্চে উঠে কয়েকটি কবিতা পড়ে ফেলেন। তারকা-কবিরা কলকাতা থেকে নেবে 'মদ্যপান ছাড়া কবিতা লেখা হয় না', এই সব বলে স্থানীয় ভাইদের আধুনিকতার আঁচ দেন, রাতারাতি বিশ-দফা কর্মকুচীর মত গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যুৎ বয়ে যায়, কবিতা মরে কাঠ হয়ে ফাঁসিতে লটকে থাকে।

কিন্তু সৎ-কবিরা অনেকেই (কেন, বেশির ভাগই) তারকা-কবি নন, মৃদুভাবে অনেক সময় তাঁদের কবিতা পড়তে দেখেছি—খুব ভালো কবিতা, কিন্তু কবিতা পড়া শেষ করতে পারেন নি যেহেতু যথেষ্ঠ স্মার্ট নন। রবীন্দ্র-সদনে একবার প্রণবেন্দু দাশগুপ্তকে আওয়াজ দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অনুরূপ অবস্থা আমি ভাবতে পারি শংখ ঘোষের বা আলোক সরকারের বিষয়ে।

কবিতাকে কিন্তু আমি ঘরের বউ থাকতে বলছি না, কিন্তু থাকতে বলছি একটু অহংকারী, ঋজু ও গভীর। কবি-সম্মেলনে খুব ভাল ও লাজুক কবিরা আওয়াজ খান, হাততালিতে বসে যেতে হয় কিন্তু দু-একজন চারিত্রিক মিষ্টত্বে বেরিয়ে যান, যাঁরা মান্না দে হয়ে পড়েন। আর পপুলার হবার সুইচ একবার জানা হয়ে গেলে, কে না তা খাটায়! —কিন্তু কবিতা সে তো এই সুইচে জ্বলে না বরঞ্চ তার ফিয়ুজ কেটে যায়। তাই কবিতা সম্মেলনের আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। যেহেতু আমি কবি নই তাই সাহস করে লিখলুম এই নিবন্ধ।

শুদ্ধশীল বসু

বিচিত্রা

ডি কে

অনেকে মুদ্রণের কলাকৌশলের দিকটা ভালো জানেন, অনেকের মাথায় তার নান্দনিক মাত্রার ঝাপসা একটা কল্পনা থাকে। ডি কে-র মধ্যে এই দুটো দিক সবসময় পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিতো। প্রায়ই বলতেন, মুদ্রণের সম্ভাবনা অপরিসীম, কোনো গণ্ডিতেই তাকে ধরা যায় না। তাঁর মুখে ওইসব শুনতে শুনতে, দিনের পর দিন তাঁর কাছে কাজ শিখতে-শিখতে মুদ্রণ ব্যাপারটাকে রামায়ণের কবির মতন আমার মনে হতো আকাশমিব দুষ্পারম্। কোনো যুগেই একথা সাজে না, কারো মুখেই একথা মানায় না যে, মুদ্রণের তাবৎ ভবিষ্যৎ আমরাই দেগে দিলাম।

কলাকৌশলের আঁটো বাঁধুনি আর নান্দনিক আলো-হাওয়ার সীমাহীন, সুষম প্রতিযোগিতা, রেসিপ্রসিটি, এই ছিলো তাঁর মুদ্রণকল্পনার মূল ধরন। বইয়ের মাপজোক, হরফের রূপ-আকার, আভ্যন্তর বিন্যাস, পাতার মুদ্রিতাংশের আয়তন, ছবির রংচং, রেখার স্বভাবচরিত্র—সব ব্যাপারেই, ইতিহাস নখের ডগায় রেখেও, তিনি মৌলিক কল্পনার হাত ধরে পথ চলতেন। ছাপাছাপির জগতে অভিধানের মতন তাঁকে ব্যবহার করবো না তো কাকে করবো!

কখনো-কখনো তর্কও করেছি। গদ্য গড়নের একটি কবিতা লাইনে আকস্মিক এক জায়গায় একটু বিরতি চেয়েছিলাম। কমা, কোলন, সেমি-কোলন, কি অগতির গতি ড্যাশ আমি সেখানে যথেষ্ট মনে করিনি, বরং দুটি শব্দের মধ্যে হঠাৎ চার এম (আগাগোড়া ঘন সেটিং বলেই চার এম, পাতার মুদ্রিতাংশে শাদা শাদা ভারটিকাল নদীনালা তিনি ঘৃণা করতেন।) স্পেশ ওই আকাংক্ষিত বিরতি ফোটাতে পারবে বলে আমার মনে হয়েছিল। ডি কে মানেননি। তাঁর যুক্তি আদর্শ লাইন গঠনের মূল কথাই হচ্ছে, শব্দের মধ্যে ইউনিফর্ম স্পেশিং। হঠাৎ দুটি শব্দের মধ্যে বাড়তি স্পেশ যেন লুকোনো গর্ত, পুরো লাইনটা ওতে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে।

আমার অল্প বয়সের ঔদ্ধত্য, আমি পাল্টা যুক্তি দেখিয়েছিলাম : লাইন গঠনের আদর্শের চাপে বাক্যের বাসনা

কেন পিষ্ট হবে? বাক্যের বাসনা আর লেখকের বাতিক যে এক জিনিস নয়, সেদিন তিনিই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু বিরতির তাগিদেই নয়, আরো অনেক ক্ষেত্রেই এটা একটা জরুরি প্রশ্ন।

পৃষ্ঠার শুরুতে ভাঙা লাইন, কি অনুচ্ছেদের শেষ লাইনে একটি কি দুটি মাত্র শব্দ দেখলে তাঁর চোখ কড়কড় করতো। কিন্তু ওই দুরবস্থা যদি অনিবার্য হয়? ডি কে-র পরামর্শ, লেখার গায়ে হাত না দিয়ে যে-কোনো উপায়ে এটা রোধ করতে হবে। 'সারস্বত প্রকাশ'-এর এক বছরে এরকম কতো যে উপায় আমাদের বার করতে হয়েছিল, তার কোনো ছোটো তালিকা হয় না।

কবিতার সমস্যা আরো বেশি। এক-একটি স্তবকের শেষে খানিকটা স্পেশ দেয়াই রীতি, না হলে আর স্তবক চাক্ষুস করা যাবে কী করে? কিন্তু কোনো স্তবক যদি পৃষ্ঠার শেষ লাইনে শেষ হয়? পরের স্তবক তো পরের পাতার মাথা থেকেই শুরু করতে হবে, লেখা যখন মাঝখানে পৌঁছেছে, পাতার মাথায় তখন তো আর স্পেশ দেয়া চলে না। বুদ্ধদেব বসু এই অবস্থায় পরের পাতার প্রথম লাইনে গদ্যপ্যারা শুরু হওয়ার মতন ইনডেন্ট দিতেন; আমাদের অনুবাদ সংখ্যায় তাঁর রিলকে অনুবাদে ঠিক এই সমস্যাই হয়েছিল। পরম খুঁতখুঁতে বুদ্ধদেব প্রুফে তাঁরই উদ্ভাবিত রীতি প্রয়োগ করে পাঠালেন। ডি কে বললেন, এ হয় না। অন্য উপায় খুঁজতে হবে। আগের পাতার স্তবকগুলির মধ্যে স্পেশ সামান্য একটু বাড়িয়ে দিয়ে তিনি পাতার শেষ স্তবকটির অর্ধেক অংশ পরের পাতায় নিয়ে গেলো। ফলে আগের পাতার পায়ের দিকে বা পরের পাতার মাথায় স্পেশ দেয়ার আর দরকারই রইলো না।

এসব খুঁটিনাটির শেষ নেই। মুদ্রণশিল্পও নিছক এইটুকুই নয়। এটা একটা রুচি। তাঁর সাহিত্যরুচির কথাও সকলেই জানেন। এই রুচির আভায় আমাদের প্রকাশনশিল্পের একটা যুগ তাঁর নামে চিরকালের মতন চিহ্নিত হয়ে গেল।

তাঁর আর একটা বড়ো পরিচয় বোধহয় লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর প্রেরণাদায়ী সম্পর্ক। তরুণ লেখক-চিত্রকরকুলের কাছে তিনি ছিলেন অবিচল প্রেরণার উৎস, শিল্প-সাহিত্যের যে-কোনো নবীন উদ্যোগ তাঁর ভালোবাসার প্রশ্রয় পেয়েছিল।

সেই ডি কে আর নেই, একথা মেনে নেয়া আমার পক্ষে একটু বেশি কঠিন। ঠিক যে, গত ক'-বছর তিনি একরকম রোগশয্যাতেই কাটিয়েছেন, তাঁর নিজস্ব সংসার—বাংলা প্রকাশন ও প্রচারশিল্প ছেড়ে তিনি যাপন করছিলেন বানপ্রস্থ, তবু এতোদিন তাঁর সেই হৃদয়বিদারক নীরবতার দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে আমরা এই আশাটুকু করতে পারতাম, একদিন তিনি ভালো হয় উঠে আবার তাঁর সংসারের হাল ধরবেন। আশা করতে পারতাম, সিগনেটের নতুন গ্রন্থ-পরিকল্পনায়, 'সারস্বত প্রকাশ' কি 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদনায় আমার সেই কর্মে ও স্বপ্নে টইটম্বুর মানুষটিকে আমরা দেখতে পাবো। সেই আশাটুকুও কেড়ে নেবার অধিকার আমাদের প্রিয় ডি কে, আমার পরম শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার গুপ্তকে আমরাই কি দিয়েছিলাম? তাঁর নামের আগে এতো তাড়াতাড়ি আমাদের স্বর্গীয় চিহ্ন বসাতে হবে কে ভেবেছিল?

আমাদের প্রকাশনশিল্পে তিনি একটি ফিনোমেনন। তাঁর একার রুচি বাঙালী জাতির রুচি হয়ে উঠেছিল, তাঁর একার সাহিত্য-অনুরাগ সকলের পক্ষে গৌরবের হয়ে উঠেছিল। আর এই সবই পঞ্চাশে পা দেবার আগেই। ১৯৬৭-৬৮তে দিনের পর দিন, সন্ধ্যে থেকে রাত বারোটা পেরিয়ে, তাঁর সঙ্গে কাজে ও

আড্ডায় কতো যে পরিকল্পনা শুনেছি, সাহিত্য-সংস্কৃতির কতো দিকে কতো যে তিনি ভেবেছিলেন, ভাবছিলেন, সেসব আজ তাঁরই সঙ্গে আকাশে-বাতাসে মিলিয়ে গেছে। যাঁর স্বপ্নের শেষ ছিলো না, কল্পনার পাড় দেখা যেতো না, তাঁর কেন এই কালাত্যয়, এমন অকালে?

সিগনেট তাঁর একটি বড়ো কীর্তি সন্দেহ নেই। প্রচারশিল্প, আরেকটি। জুতোরও বিজ্ঞাপন কী করে এদেশের পথে-ঘাটে জুতোর নয়, রুচির ছাপ ফেলতে পারে, তিনিই দেখিয়েছেন। এসব নিয়ে আমার দেশ তাঁর প্রশংসায় আরো অনেক দিন মুখর হবে, মুগ্ধ থাকবে। কিন্তু ডি কে বলতেই আমার মনে যে ছবি ফুটে ওঠে, সেটা এসবের চেয়ে বড়ো, দশভুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মী বললেও তাঁর সবটুকু বলা হয় না, তিনি আমার কাছে এক মনোমুগ্ধকর মানসতা, রুচির খনি। দু-বছরে দুশো বার তিনি বলেছিলেন, অমরেন্দ্র, আমরা একদিন বাংলাদেশ বদলে দেবো! অনেক কিছু করবার আছে। মানিককে আবার আমি দলে টানবো।

মানিক মানে সত্যজিৎ রায়। তাঁর কথা ডি কে'র মুখে কতো যে শুনেছি! তাঁর মানসিক অবসাদের দিনগুলোয় যখন তিনি নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম, প্রায় কারো সঙ্গে কথা বলেন না, কারো সঙ্গে দেখা করেন না, যোগাযোগহীন তাঁর একবালপুরের বাড়িতে থাকেন, আমি শুধু দূর থেকে ছটফট করি, একদিন থাকতে না-পেরে সত্যজিৎ রায়কে ফোনে অনুনয় করি, উনি যদি ডি কে কে আবার কাজের দিকে উস্কে দিতে পারেন। সত্যজিৎ নিজেও নাকি সেই চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, জানালেন।

রঘুনাথ গোস্বামীর ৬ হেস্টিংস স্ট্রিটে সারস্বতের সন্ধ্যাগুলোই আজ আমার সম্বল। আমার মতন অর্বাচীনকেও তিনি যে তাঁর সঙ্গে ওই পত্রিকার সম্পাদক বানিয়েছিলেন, সেটা তাঁর উদারতা। ঠিক যে, আমার অল্প বয়েসের ঝোঁকে, অবিদ্যায় কখনো- কখনো তাঁর সঙ্গে আমি তর্ক করেছি। ঠিক যে, হেরমান হেসসে কি কমলকুমার মজুমদার, গ্রেহাম সাদারল্যান্ডের ছবি কি আর্ডিজনের ইলাস্ট্রেশন-রীতি নিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের মতান্তর হয়েছে। ঠিক যে, লোকসাহিত্যের সঞ্জীবনী সরলতা, কি একালের লেখার অন্ধকার ভাঙচুর থেকে আমি তাঁর মতো মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারিনি। কিন্তু এসবই পাহাড় প্রসঙ্গে দুয়েকটা নুড়ির আলোচনার মতন। আমার পঁয়ত্রিশ বছরের সর্বৈব বিফল জীবনে একমাত্র গৌরব এই যে, এক অসাধারণ, দেবতুল্য পাগলের সঙ্গে আমি কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সুযোগ আমি কাজে লাগাতে পারি নি, সেটা আমারই অক্ষমতা, স্বভাবদোষ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

বিশ্বপরিবেশ দিবস

আমাদের ক্ষমতাবানরা যখন গ্রহান্তরে প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন, আর, কলকাতার এলিট সিনেমা হলে দুই যিশুর কিশোর-কিশোরী নিজেদের পৃথিবী চাইছে, তখন কলকাতারই একশোদশ নম্বর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুর তিনশো এক নম্বর ঘরে অনতিপঞ্চাশ এক দল মানুষ সবাইকার চেনা পৃথিবীর বসবাসযোগ্যতা বাড়াবার কথা আলোচনা করছিলেন। এঁদের সেমিনারের আয়োজন ঘটিয়েছিলেন ইন্সটিট্যুশন অব পাবলিক হেলথ ইনজিনিয়ার্স। প্রায় দু দিন ধরে তাঁদের সেমিনার বসলো মেডিক্যাল কলেজের উল্টো দিকে।

'অ্যাফরেস্টেশন' বা জঙ্গল-কায়েম-এর শ্লোগান ছিল এঁদের আলোচনার মূল ঐকমত্য। মানুষের স্বভাবের মতো পরিবেশেও গাছ সরে গিয়ে ইমারত বাড়ছে—এই অবস্থাটার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, আবার, বিন্যস্তভাবে, গাছেরা ফিরে আসুক। ওরা জুন এঁদের সঙ্গে সমবেত হয়ে প্রথমেই মনে পড়ছিল সতীনাথ ভাদুড়ির কথা। তিনি এ সময় নশ্বর থাকলে, এই সভায় তাঁকে নিশ্চয়ই চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হত।

দেখা যাচ্ছিল যে, ছোট এই আলোচনাচক্রটি প্রায় মহিলাবর্জিত। হলের কাছাকাছি কাউন্টারে দুটি সুশোভিত দীর্ঘ পুস্তিকা বিকি-কিনি করা হচ্ছিল। সবুজ মলাটের একটি পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কয়েকজনের অরণ্য প্রকল্পের আনুষঙ্গিক চিন্তা—তার প্রকাশ ইংরেজি ভাষায়। যাঁরা বললেন, তাঁরা এই পুস্তিকারই লেখক এবং যে বিষয়ে তাঁরা লিখেছেন সেই বিষয়েই তাঁরা বক্তৃতা করলেন। অবশ্যই অনেক সংক্ষেপে। প্রত্যেকে উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

কিন্তু ব্যবস্থাপনা জানতেন যে, এভাবে কাজ চালালে তা নিষ্প্রাণ হতে বাধ্য। তাঁরা সে কারণে একটি সিম্পসিয়ামের চেহারায় আলোচনাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রশ্ন ও বিতর্ক হচ্ছিল। সভা পরিচালক এ এন ব্যানার্জি এই সেমিনারের তৃতীয় বক্তা, কলকাতা মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা সংস্থার প্রধান আর্কিটেকট সন্তোষ ঘোষকে প্রশ্ন করলেন— সি এম ডি এ কেন এই অরণ্য প্রকল্পের মনোযোগী নয়?

আরো বক্তৃতা দিলেন এ কে মুখার্জি, মাথুর, টিটওয়াডগী। মাঝখানে অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল সুন্দরবনের একটি ফিল্ম।

৬ঠা জুন এই আলোচনাচক্রে প্রথম ও একমাত্র বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বক্তা অন্নদা মুন্সী। 'রাম ভগবান হয়েও বনে গিয়েছিলেন'—এই কথা বলে উনি ইঙ্গিত দিতে চাইলেন, বনজ পরিবেশ ছাড়া রামের ভগবৎ-সত্তা প্রতিষ্ঠিত হত না। অধিকাংশ বক্তার সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ছিল না, নানা নজির দেখিয়ে তিনি বোঝাতে পেরেছিলেন যে একটা বিপুল বেকারত্বকে দেশের সামগ্রিক অরণ্যচর্চা ঘুচিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তার জন্য দরকার একটা যুদ্ধকালীন অবস্থার প্রস্তুতি। অন্নদা মুন্সী আরো বললেন, বাইরের লোকের ধারণা, কলকাতা আবর্জনার ঘাঁটি। পরিষ্কার হয় না, হবে না। হয় কি না হয় সেটা আমরা দেখিয়ে দেব— অ্যাফরেস্টেশন অব সুন্দরবনের মিডিয়ামে।

এদিন আরো পাঁচজন বক্তৃতা দেন। তাদের মধ্যে গত দিনের সন্তোষ ঘোষও ছিলেন। বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান, বন নষ্ট করতে করতে আমরা এমন এক অবস্থায় এসেছি, যেখানে শুধুমাত্র হাওয়া দূষিত হয় নি, শুধুমাত্র প্রকৃতি অসমতাপ হয় নি, 'ইসথেটিক পলিউশান' যেখানে ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে।

মাটি বাঁচাতে, বেকারী হটাতে, পৃথিবী ও মানুষের যোগাযোগের পর্দাটাকে স্নিগ্ধ সতেজ রাখতে, হাওয়াকে টাটকা রাখতে বন বৃদ্ধির দরকার। ৬ঠা জুনের সেমিনার-পরিচালক সুধানন্দ মুখোপাধ্যায় বললেন, এ জন্যে সরকার ভরসা হয়ে থাকবেন না। নিজেরা এগিয়ে আসুন।

এঁদের বক্তব্যের গুরুত্ব যাঁরা বুঝেছেন তাঁদের জন্য একটি সংবাদ: এঁদের পরবর্তী সেমিনার কলকাতায় অক্টোবরের মাঝামাঝি হতে চলেছে।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

কবিতা কবির গলায়

কবিতা পাঠের আসরে কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন এবং প্রতিমা রায়

পর্দা উঠতেই দেখা গেল মঞ্চের মাঝখানে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, ডান দিকে ছোট চৌকিতে তিনজন মহিলা, কবি। কমা, কারণ মহিলা কবি কথাটার আর মানে কী? মেয়েরাও এখন কবিতা থেকে সব রকম কোমলতা ও প্রথাসিদ্ধ কবিত্ব খসিয়ে দিয়েছেন। যদিও কবিতা সিংহ তাঁর রাগী কবিতা একটাও পড়েন নি, গ্রীষ্ম জ্বালার পক্ষে মানানসই বিবেচনা করে তিনি 'ছন্দের কবিতা' পড়লেন, সাঁপুড়ের ঝাঁপান খেলার ছন্দ, খোল-করতালের ছন্দ, 'বাবুদের তালপুকুরে'ও আমার মনে পড়েছিল, কিন্তু ওই দুলুনি সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে আমাদের আগেকার আমলের মহিলা কবিদের মারাত্মক ব্যবধান খুব সুখের হয়েছিল। 'আমিই প্রথম' সবশেষে পড়লেন, সবাই মুগ্ধ। এটি কিন্তু, এক হিসেবে, নারী বিদ্রোহের কবিতা। কবিতা রাগলে ছন্দ হারালে সত্যিই তাকে ভয় পায় না।

নবনীতা দেবসেন পড়েন আরো ঝরঝরে গলায়। তাঁর কবিতায়ও বুদ্ধিই বেশি উসখুস করে। একটু নিষ্ঠুরও। ভারি ভারি শব্দ বসাতে কষ্ট পান না। শ্রোতারা ভালোমন্দ মেশে একটু বিচলিত, কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে আগাগোড়া উৎকর্ণ। হঠাৎ, এক সময়, ওই সব টান মনোযোগ ভেঙে খুশির হাওয়া বয়ে যায় মুক্ত অঙ্গনে, যখন তিনি 'নারী বর্ষে' পড়েন:

অধরোষ্ঠে ধরা আছে ষোলো
নয়নে এখনো বুঝি দশ।
হৃদয় একুশ পার হলো—
যোগ দিলে আমার বয়স
নারীবর্ষে কতটি দাঁড়ালো?

শুরুতে পড়েছিলেন প্রতিমা রায়, শুধু তাঁরই পড়ার ভঙ্গি ছিলো নাটকীয়। তাঁর কবিতাও অনেকটা তাই। নবনীতা বা কবিতার বুদ্ধি বা ব্যঙ্গের পাশে তাঁর ছিল কাতর হৃদয়, তিনি আবেগে কেঁপেছিলেন। তাই বলে তাঁর পদ্যের প্রকরণ পুরোনো কালের নয়, তাঁর নারীত্ব একালের, এই কলকাতারই।

স্বরচিত কবিতা পাঠের পর নাটক। সুনীত মুখোপাধ্যায়ের 'বিষণ্ণ সকাল'। এক ধরনের নৈপুণ্য ছিল, কিন্তু রচনা ও প্রযোজনা মোটামুটি কাঁচা, আমি খুঁটিনাটির মধ্যে গেলাম না।

উদ্বোধনী ভাষণে সন্তোষকুমার ঘোষ গান্ধারের ষোল বছরের নাট্যচর্চার কথা বললেন। বাংলা নাট্য প্রযোজনার গৌরবময় দিকগুলিও মনে করালেন। নাটক গান কবিতা ছবি এখন আর পাশাপাশি নেই ভেবে তিনি পুরনো দিনের জোড়াসাঁকোর আর ফ্রান্সের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। বাংলায় উৎকৃষ্ট মৌলিক নাটকের অভাব নিয়ে আমাদের যে মৌলিক দুঃখ, তাকেও এক সুযোগে তিনি উসকে দিলেন।

এই সবই গান্ধারের ষোড়শ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে। মুক্ত অঙ্গনে।

তিব্বতে ডাইনোসর আবিষ্কার

চীনা বিজ্ঞানীরা তিব্বতের চামদো এলাকায়, সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৪,২০০ মিটার উঁচুতে, ডাইনোসরের ফসিল আবিষ্কার করেছেন। এই সংবাদ জানিয়েছেন সরকারি চীনা সংবাদ এজেন্সি 'সিনহুয়া', লাসা থেকে। চিঙ তিব্বত মালভূমিতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাবার যে বিরাট কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, তারই একটি ফল এই ডাইনোসর আবিষ্কার। কর্মসূচীতে নানা বিষয়ে অনুসন্ধানের কথা আছে—যথা ভূ-গত বিকাশ, জীব-গত বিবর্তন, আবহাওয়া, ভূ-সংস্থানগত প্রজনন, ইত্যাদি। পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমিতে এইটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ।

এত অধিক উচ্চতায় ডাইনোসরের ফসিল আবিষ্কার আগে কখনো হয়নি। তার অর্থ এই নয় যে, ডাইনোসররা পর্বতে বাস করত। যে সময়ে এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ধাক্কা লেগেছিল এবং হিমালয়ের জন্ম হয়েছিল তার অনেক অনেক আগেই ডাইনোসররা পৃথিবী থেকে লুপ্ত।

চামদো এলাকায় প্রথম ডাইনোসর আবিষ্কার করেছিল রাস্তা-নির্মাণকারী স্থানীয় তিব্বতীরা। তারপরে চীনা বিজ্ঞান আকাদেমির পুরাজীব গবেষকদের দল স্থানীয় তিব্বতীদের সহযোগিতায় পাঁচটি বিভিন্ন স্থানে খননকার্য চালান। তার ফলে পাওয়া গিয়েছে ডাইনোসরের ও মাছের কয়েক টন ফসিল—পঞ্জরাস্থি, করোটি, দাঁত ইত্যাদি। এখনো পর্যন্ত এগারটি বিভিন্ন পর্যায়ের ফসিল পাওয়া গিয়েছে, তবে বেশির ভাগ ফসিলই—যে ডাইনোসরদের বলা হয় 'সরোপড'—সেই জাতীয়। এই ডাইনোসরের আকৃতি বিশাল, চারটি পা, পায়ে পাঁচটি করে আঙুল, লম্বা গলা ও লেজ এবং ক্ষুদ্র মস্তক। সম্ভবত তারা বেঁচেছিল আদি ও মধ্য জুরাসিক কালে, ১৬ কোটি থেকে ১৪ কোটি বছর আগে। ব্রন্টোসরাস নামে যে ডাইনোসররা পরিচিত, তারাও এই একই জাতীয় অর্থাৎ সরোপড।

মোটা ও রোগা সম্পর্কে অন্য মত

কোন মানুষকে মোটা বলব? একটি অংকের হিসেবে মোটা মানুষের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। একজন মানুষের যা ওজন (কিলোগ্রাম) তাকে যদি তার উচ্চতার বর্গ (মিটারে) দিয়ে ভাগ করা যায় এবং ভাগফল যদি হয় পুরুষের ক্ষেত্রে ২৭·৫-এর বেশি এবং নারীর ক্ষেত্রে ২৭·০-এর বেশি, তাহলে ধরে নিতে হবে মানুষটি মোটা। মোটা হওয়ার দরুন মানুষটির নানা রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা—যথা, ডায়া-

বিটিস, হার্টের ও কিডনির অসুখ ইত্যাদি।

মানুষ মোটা হয় কেন? মনে হয় মোটা হওয়ার কারণ প্রজননগত। অভিন্ন যমজদের পৃথকভাবে মানুষ করে দেখা গিয়েছে, তাদের ওজন মোটামুটি একই রকম থেকে যায়। আর ভিন্ন যমজদের একই সঙ্গে মানুষ করে দেখা গিয়েছে, একজনের মোটা ও অপরজনের রোগা হওয়া অসম্ভব নয়। কেউ কেউ প্রচুর খেতে পারে, খায়ও, কিন্তু তবুও মোটা হয় না। আবার কেউ কেউ পরিমিত খেয়েও ভীষণ মোটা।

আজকাল শোনা যায়, শিশু বয়সে যাদের বেশি খাওয়ানো হয়েছে, তারাই বড়ো হয়ে মোটা। এই উক্তির সপক্ষে কোনো সাক্ষ্য নেই। ৮০ শতাংশ মোটা শিশু বড়ো হবার পরে রোগা হয়। মোটা শিশু বড়ো হয়েও মোটা থেকে যাওয়ার ঘটনা এক-তৃতীয়াংশের বেশি নয়। বলা হয়ে থাকে, শিশুকে অতিরিক্ত খাওয়ালে মেদকোষের সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু একথাও সঠিক কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থাকে। মেদকোষের সংখ্যা শৈশবেই নির্ধারিত হয়ে যায়, কিন্তু শিশু বড়ো হয়েও মোটা থাকবে কিনা সেটা তখনই নির্ধারিত হয় বলে মনে হয় না।

হয়তো সমস্যাটি এই যে, মেদকোষ তখনই মেদকোষ হিসেবে গণ্য হয় যখন তা মেদে পরিপূর্ণ থাকে। সেটা ঘটাতে হলে সবসময়ে যে অতিরিক্ত খেতে হয় তা নাও হতে পারে। তাহলে রোগা ও মোটার পার্থক্যটা কোথায় এসে দাঁড়ায়? কতখানি শক্তি বিপাক-ক্রিয়ায় ক্ষয় হচ্ছে—তাতেই কি?

মোটারা যা খায়, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে, কেননা আশু প্রয়োজন না থাকলেও তারা মজুদ করতে সমর্থ। রোগারা যা খায় তার সবটাই খরচ করে। এ-ব্যাপারটার সঙ্গে শারীরিক বিপাক-ক্রিয়ার কিছু একটা সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। শুধু একথা বললে চলে না, রোগারা বেশি শরীরচালনা করে, তাই খাদ্য থেকে কিছুই তারা মজুদ করতে পারেনা। অবশ্য একথা ঠিক, মোটারা নড়াচড়া করতে চায় না। কিন্তু নড়া-চড়া করতে না চাওয়ার জন্যই কি তারা মোটা, নাকি মোটা হওয়ার জন্যই তাদের নড়াচড়া করতে না চাওয়া?

বেশি নড়াচড়া করলেই যে মোটা হওয়া রদ হবে তারও কোনো প্রমাণ নেই। সামান্য মেদ কমাতে হলেও প্রচুর কায়িক শ্রম দরকার। তবে একথাও ঠিক, নিয়মিত ব্যায়াম যে করে তার স্বাস্থ্য ব্যায়াম যে করে না অথচ একই খাদ্য খায়, তার চেয়ে অনেক ভালো। তবে এটা স্বাস্থ্যের কথা।

খাওয়া কমিয়ে বা অনেক কিছু খাদ্য থেকে নিজেদের বঞ্চিত রেখে যারা রোগা হতে চায়, তাদের জানা ভালো এতে যতোটা সদিচ্ছা প্রকাশ পায়, ততোটা ফললাভ হয় না। এমন একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে তাদের থাকতে হয় যা মোটেই ভালো নয়। তার চেয়ে বরং উচিত মাত্রার চেয়ে কিলো পাঁচেক ওজন বাড়ুক, কোনো ক্ষতি নেই।

উপোস দিলে ওজন অবশ্যই কমে। কিন্তু তার ফলে প্রাণসংশয়ও হতে পারে। অতএব ধৈর্য দরকার। আর ওজন কমলেই যে তা কমিয়ে রাখা যাবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। স্থূলবপু মহিলারা অনর্থক নানা রসালো খাদ্য থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখছেন। মাত্রা না ছাড়িয়ে রসনার তৃপ্তি হোক। জীবন অনেক উপভোগ্য হবে।

তাহলে প্রশ্ন এই: (১) কোন অবস্থাকে মোটা হওয়া বলব? (২) মোটা কারা? (৩) শরীরচালনার কি ওজন কমে? (৪) মোটা হলে স্বাস্থ্যের কী ক্ষতি? (৫) ওজন কমানোর উপায় কী?

একথাটি সবসময়েই বলতে হবে, শরীরের ওজন কমাতে পারলে বহু রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

মানুষ কেন মোটা হয়, মোটা হলে কিভাবে ওজন কমানো যেতে পারে, এ-বিষয়ে প্রচলিত একটা মত আছে। ওপরে উল্লিখিত মতটি তা থেকে ভিন্ন। প্রচলিত মতটি যে সর্বদা গ্রাহ্য নয়, একথা জানাবার জন্যই ভিন্ন মতটি উপস্থিত করলাম। মনে হয় এই ভিন্নমতাবলম্বীরা বলতে চাইছেন, মোটা হও, রোগা হও, আনন্দ নিয়ে বাঁচো।

অমল দাশগুপ্ত

কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের গান

অধ্যাত্মভাবসম্পন্ন গান অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীতের যে গানগুলিকে পূজা পর্যায়ভুক্ত করা হয় এবং প্রণয়ী হৃদয়ের যে আকৃতিগুলি প্রেম নামে শ্রেণীবিন্যস্ত, এই দুটি জাতের কিছু বাসিন্দা নিয়ে কুমকুম রবীন্দ্রসদনে তাঁর গানের উপনিবেশ গড়ে নিলেন। কুমকুম অর্থাৎ কুমকুম চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীতের আঙিনায় যাঁর পদ-সঞ্চার লঘু হলেও, অনতিশুদ্ধ নয়। তাঁর কণ্ঠের ব্যাপ্তি লক্ষণীয়, কণ্ঠের মাধুর্যও মর্মস্পর্শী। তবে প্রকাশ্য আসরে একা গান শোনাবার উপযোগী অভিজ্ঞতা অপ্রতুল। কিন্তু তাঁর রূপা-য়ণের সবচেয়ে আকর্ষণীয় লক্ষণ গানের কথামিশ্রিত ভাবের অন্তরঙ্গ উপলব্ধি। বাণী ও ভাব যখনই রূপান্তরিত গায়িকার গায়নভংগিমা তখনই তার অনুসারী। অভিজ্ঞতার সম্বল বাড়লে কুমকুমের প্রতিষ্ঠার পথ সুগমতর হবে। এটা কেবল আশা নয়—আশ্বাস।

পত্রাণু আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অমিয় চট্টোপাধ্যায় গানগুলির মাঝে মাঝে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক ভাষাপাঠ করেন। গায়িকার সঙ্গে যাঁরা সরসরি সহযোগিত করেন, তাঁরা গৌতম বন্দ্যো-পাধ্যায় (হারমোনিয়াম), দিলীপ রায় (বেহালা-, নির্মল বিশ্বাস (সেতার), বাবু চক্রবর্তী (তবলা-পাখোয়াজ) ও নীলু মিত্র (মন্দিরা)।

আশিস চট্টোপাধ্যায়

রবিমল্লারের রবীন্দ্র সন্ধ্যা

৪ঠা জুন সন্ধ্যায় বিড়লা এ্যাকা-ডেমিককে রবিমল্লারের সপ্তম বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। প্রারম্ভের বেদ-মন্ত্রের মূলে সংস্কৃত শ্লোকের সংগীত রূপ, সঙ্গে সঙ্গে তার বাংলা রূপান্তর, সুরসংযোগ—এক অসামান্য আবহ রচনা করেছিলো। বাণী ঠাকুরের কণ্ঠে 'আমায় অনেক দিয়েছ নাথ, গেল যে খেলার বেলা, ভুল করো না ভালো-বাসায়, ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি' রবীন্দ্রসংগীত অন্তর্গত বোধ ও বেদনার মাধুর্য নিয়ে বেজে উঠেছিলো। রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখি' কবিতার সংগীতরূপ পরিবেশিত হবে জেনে সংশয় যদিবা ছিলো, শুনে মনে হল—একটি নতুন অভিজ্ঞতা এনে দিলেন রবিমল্লার। যোগ্য পরিচালক অধ্যক্ষ-শিল্পী রাজেশ্বর ভট্টাচার্য সব সময়েই সাধ ও সাধ্যকে মেলাতে চেষ্টা করেন আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দিয়ে। তাঁর পরিচয় পেলাম যেমন 'দুই পাখি'র সংগীত রূপান্তরে, তেমনি সিংহের পদাবলী নৃত্য-গীত রূপায়ণে। শিবাণী রায়ের পরিবেশিত 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' শুনে মনে হলো না তিনি মঞ্চশিল্পী নন, একান্তই একজন ছাত্রী। বনানী মজুমদার 'সংশয় তিমির মাঝে' গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। রাজেশ্বর ভট্টাচার্য ভরাট গলায় গাইলেন 'আজি ঝরিঝর মুখরিত শ্রাবণ রাতি, কিছুই তো হলো না, ভানু সিংহের পদাবলীর শিশু নৃত্যশিল্পীদের অনেকেরই নৃত্য উপভোগ করার মতন।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩
হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

১৭ বর্ষ ১১ সংখ্যা
৬ শ্রাবণ, ১৩৮৪
22 July, 1977

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
ক্যাপ্তেন মোনা
লিখেছেন কালীশ মুখোপাধ্যায়
কাজল মিত্র
তাছাড়া বারবিলাসীর বিলাস
জারের আমলে রুশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ
লিখেছেন অমিতাভ গুপ্ত
কবিতা লিখেছেন
রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী
শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের ছবি

এ সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন গৌতম রায়
ভিতরের ছবি এঁকেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত

তুমি কি কেবলই ছবি

কবি-সাহিত্যিকেরা ইচ্ছে করলে কবিতা গল্প বা নাটক লিখে নিজের কাছে রেখে দিতে পারেন, তাতে কারো কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু সিনেমা কেউ নিজের জন্যে তুলে রেখে দেন না। কেননা তাত টাকা খরচ হয় বিস্তর। ছবিটিকে হল-এ মুক্তি দিতে না পারলে পুরো টাকাটাই নষ্ট।

সিনেমা সেই জন্যে, সকলেই জানেন, একই সঙ্গে শিল্প এবং ব্যবসা। খরচের সময় নজর রাখতে হয়, সেটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, ক্ষতির চাপে যেন প্রযোজককে বাজার ছাড়া হতে না হয়, বরং বেশ কিছুটা লাভ থাকে।

বাস্তবে অবশ্য অনেক সময়েই তা ঘটে না; আঞ্চলিক ছবির বেলায় তো বটেই। অন্তত পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ছবির বাজার এখন এই রকমই। গোনা-গুণতি কয়েকজন প্রযোজক বক্স অফিসের আশীর্বাদ পেলেও, বেশির ভাগ সিনেমা-প্রতিষ্ঠানেরই একটি মাত্র ছবি করে কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটে।

ফলে স্টুডিওগুলিতে প্রযোজকের সংখ্যা ক্রমক্ষয়িষ্ণু। দিনের পর দিন ফ্লোরগুলি থাকে অন্ধকার; কলাকুশলী এবং শিল্পীরা থাকেন কর্মহীন।

এই পরিস্থিতিতে সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টায় কিছুকাল ধরে নতুনভাবে কাজ শুরু করার চেষ্টা চলছিল পশ্চিমবঙ্গে। তাতে বাংলা ছবির লোকসানের মাত্রা না কমলেও সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে নতুন কিছু প্রযোজক-পরিচালকেরও দেখা মিলছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এক নতুন বিপদের অশণি-সংকেত।

কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, ছবি তোলা হয়েছে এমন ফিলমের ওপর শতকরা ১০ ভাগ লেভি ধার্য করা হবে। বলাই বেশি যে, আইনটি চালু হলে পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা-শিল্পে ভরাডুবি হতে যেটুকু বাকি আছে তাও পূর্ণ হবে। নতুন ছবি তৈরি করার মতো মনের জোর কম প্রযোজকেরই থাকবে। বিপন্নের তালিকায় স্থান পাবেন ফিল্ম শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি মানুষ এবং তাঁদের পরিবার, যাঁদের সংখ্যা হাজার হাজার।

সে জন্যে খবরটি প্রচারিত হওয়া মাত্রই ইস্ট ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশান থেকে জোরালোভাবে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এবং প্রতিবাদের নিদর্শন হিসাবে সিনেমা হলগুলি বন্ধ রাখারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দেবার পর সে সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছেন তাঁরা। সঙ্গত কাজ হয়েছে সন্দেহ নেই। এখন কেন্দ্রীয় সরকারকেও পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে তাঁদের প্রস্তাবকে। কেননা ছবি তো কেবল ছবি নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের রুচি এবং হাজার হাজার পরিবারের রুজিরও উৎস।

আলোকবর্ষ

একজন লেখক পঞ্চাশে পৌঁছে দেখলেন—গত বিশ বছরে তিনি যা-কিছু লিখেছেন তা লোকে পড়ে আসছে। ফুটপাথে দু'একখানি বই পাওয়া যায়। কিন্তু সব দোকানেই লেখক তাঁর কোন না কোন বই পেলেন। পাড়ার লাইব্রেরিতে তেতাল্লিশখানা পেলেন। বইগুলো ইস্যু হয়। কারণ, পাঠকরা পড়তে চান।

এই লেখক সদাসর্বদা জ্বলজ্বলে রয়েছেন।

নানারকম বিশেষ সংখ্যা ধরলে বছরে তিনি গড়ে চারখানি করে উপন্যাস নামে পরিচিত টানা লেখা লিখেছেন। এভাবে তাঁর ৮০টি লেখা বেরিয়েছে। সেগুলি বই হয়েছে। তার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। তার ভেতর থেকে দু'চারখানি সিনেমা হয়েছে। সংস্করণ হয়েছে। সেই সংবাদে পুরস্কার, প্রশস্তি, সভা—সবই হয়েছে।

এই আশিখানি বই বাঙালীর ঘরে ঘরে।

প্রতিটি বই বেরোবার সময়—বিজ্ঞাপন হয়েছে।

প্রকাশিত হল। অনুপম সাহিত্যকীর্তি। অনন্য সৃষ্টি।

সমালোচনাও বেরিয়েছে। বাংলা উপন্যাসে এক বিশিষ্ট সংযোজন।

বিয়ের উপহারে এই লেখকের একই বই ৬।৭খানি করে প্যাল্য পড়ে। বৌদিরা বলেছেন, উঃ! আপনি তো ভীষণ দুষ্টু! এতসব জানলেন কি করে? আমরা তারিয়ে তারিয়ে পড়েছি।

কিশোরী পাঠিকা পড়তে পড়তে কোন কোন বই বুকে চেপে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত চোখের নিচে জলের শুকনো দাগ।

জামশেদপুর থেকে সদাযুবা ছুটে এসে বলেছে, শ্যামলদা—এ-বই আপনি লিখলেন কি করে? এ তো আমাদের প্রাণের কথা।

দাগী সম্পাদক বছর বছর বরাত দিয়েছেন, শ্যামল—এবারেও তোমায় পুজোয় লিখতে হবে। একটা জমাট লেখা দাও। পড়তে গিয়ে আর ছাড়া যাবে না।

ফলে, শ্যামল বসু রায় গত বিশ বছর ধরে বছরে অন্তত চারখানা করে এমন আঁঠা-লেখা লিখে এসেছেন। ছ-ছাড়া গল্প লিখেছেন। লিখেছেন অন্যের জন্যে প্রশস্তি। অফিস ক্লাবের সাহিত্য সভায় গিয়ে লিফটের মুখে নিজের নাম দিয়ে লেখা পোস্টারের বিশেষণ তাঁর চোখে পড়েছে। প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক।

এই বিপুল সৃষ্টির জন্যে ৭১৮ জন অধ্যাপিকা, শ্বশুরবাড়ির পাড়ার লাজুক ছেলেটি, বসিরহাটের বিনয় রায় এবং অগণিত বৌদি, ভাস্করদা, ক্লাবের সেক্রেটারি তাঁকে দেখলে হেসে উইস করে। অটোগ্রাফ নেয়। পরিচিতদের মধ্যে এঁরা ওই লেখকের কথা উঠলে শ্যামলদা, শ্যামলদা করে। শ্যামলদা বড় নিকটের মানুষ। পাটনা, জঙ্গীপুর, লখনউ থেকে আমন্ত্রণ আসে। স্থানীয় সাহিত্যসভার। এছাড়া রামপুরহাট, বসিরহাট, মাদারিহাট এবং দিনহাটার ডাক তো আছেই।

সদা প্রশান্ত, কদাচ কুপিত, হাস্যমধুর মুখশ্রী, সবাইকে আপনি—যাকে বলে সর্বনাশী অল্ সুগার অ্যান্ড নো পাওয়ার—সেই প্ল্যাসিড পার্সোনালিটি অর্থাৎ প্লাস্টিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে শ্যামল বসু রায় ইন্টারভ্যু দেন। মসৃণ গদ্য, সপ্রেম ব্যবহার—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অবশ্যই থাকবেন।

বন্ধুরা তাঁকে ভালবাসেন। তিনি তাঁদের ভালবাসে। শ্যামলের কণ্ঠের গান—তাঁর কয়েক বন্ধুর অতি প্রিয় জিনিস। ঝড়বৃষ্টি, সাধারণ নির্বাচন, চাঁদে মানুষের পদার্পণ তাঁকে টলাতে পারে নি। তিনি লিখে চলেছেন।

ভদ্র, বিনয়ী, পরিশ্রমী, সংযত এই মানুষটি লেখক হিসেবে একদিন তাঁর নিজের লেখার কথা মনে করার চেষ্টা করলেন।

করতে গিয়ে ভয় পেলেন। কত চরিত্র। কত ঘটনা। কত কাহিনী। তিনি তাঁর সৃষ্টির স্রষ্টা।

সারাটা দিন সম্পাদক-প্রকাশক, চিত্র-পরিচালক, নাট্যরূপদাতা, বেতার, টি ভি অনুবাদকের ভিড় গেল। সবাইকেই তিনি হ্যাঁ বললেন। সন্ধ্যায় সস্ত্রীক নাটক দেখলেন। গ্রিনরুমে গিয়ে প্রশংসা করলেন। বেশি রাতে সবান্ধব আড্ডায় তরল আগুন খেয়ে অটল থাকলেন। বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এইভাবেই দিন যাচ্ছিল। সারা রাত সাউন্ড স্লিপ। পরদিন বেলায় লেখার টেবিলে তিন ঘন্টা।

সেদিন কিন্তু ঘুমের ভেতর একটা আশ্চর্য জিনিস দেখতে পেলেন শ্যামল বসু রায়।

ঝুলবারান্দার রেলিংয়ে তিনি নিজে দু'খানা হাত ভাজ করে কনুইতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। নিচে তাঁর পায়ের কাছে একটি

বালতি। সেখানে সেই দাগী সম্পাদক প্রায় গোয়ালার ছদ্মবেশে বসে। হাতে একটি ভোঁতা সিরিঞ্জ। প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিকের তলপেটে গোয়ালা-বেশী সম্পাদক কি একটা ইনজেকশন দিলেন। তারপর দুটো গুঁতো। শ্যামল বসু রায় কোৎকা খেয়ে চনচন করে বালতিতে কি দিতে লাগলেন। আর মনে মনে ভাবলেন—ও হরি! ওখানটায় আমার সৃষ্টির থলি থাকে। জানতাম না তো।

গোয়ালারূপী সম্পাদক আরেকটা কোঁৎকা দিয়েই তার পেটের নিচে দু' হাতের বুড়ো আঙুলে কি টানতে লাগলেন। আর অমনি বালতি থেকে চন্‌চন্ করে আওয়াজ উঠতে লাগলো।

শ্যামল বসু রায় বলে উঠলেন, আস্তে। আস্তে। লাগছে বড়।

গোয়ালারূপী সম্পাদক বললেন, এই তো হয়ে এল। সবে বড় গল্প হয়েছে শ্যামল।

ওই দিয়ে চালিয়ে নিন এবারটা। বিজ্ঞাপন দিয়ে চেলে নিয়ে উপন্যাস বলে চালিয়ে দিন। ব্যথা করছে।

না শ্যামল। বড্ড পাতলা দেখছি। আরেকটা ইনজেকন দিয়ে দিচ্ছি।

না না। বড় ব্যথা করে শেষে। পাবেন—কিন্তু পড় পাতলা হয়ে যাবে।

তাহলে বালতিটা ভরে দাও অন্তত। অমনি উপন্যাস হয়ে যাবে।

নাঃ। আর পারছি না। বড় ব্যথা করছে ক'দিন।

আমার বালতিটা তো ছোট। এটা ভরে দিলেই উপন্যাস। দাও না শ্যামল—

আমার লাগছে। মাথায় আর কিছু নেই আমার। আর বানাতে পারছি না।

এইতো খানিক বাদে ছেড়ে দেব শ্যামল। চরে ফিরে বেড়াবে। ঘাস জল পাবে। আবার মাথায় কত কি আসবে। দেখবে—

এভাবেই আমি উপন্যাস দিয়ে যাচ্ছি?

হ্যাঁ। তুমি তো বছরে আমায় চার বালতি উপন্যাস দিয়ে আসছো।

কোনদিন টের পাইনি তো:

পেতে দিই আর কি। আজ যে কেন তোমার ঘুম ভেঙে গেল বুঝছি না। বিজ্ঞাপন দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখি। যুগন্ধর! যুগপুরুষ। উপন্যাসের পিতৃপুরুষ!! পিতৃব্য!

পিতৃব্য?

হ্যাঁ। এসবই তো ঘুমপাড়ানি বড়ি। আজ যে কেন তোমার ঘুম ভেঙে গেল—

আমিও তো ভাবছি। সারাদিনই ভাবছি। আমার এই আলি বালতি উপন্যাসের কি হবে তাই ভাবছি।

কেন? তুমিই তো ইন্টারভ্যুতে বলেছো শ্যামল—'আমি টাকার জন্য লিখি'—

টাকার জন্যে সবাই লেখে। তবু এত গুলো উপন্যাস—এদের ভবিষ্যৎ। কার কাছে রেখে যাবো।

কেন? পাঠকের স্মৃতিতে—। ওসব নিয়ে ভাবছো কেন শ্যামল?

সেসব পাঠক তো মরে যাবে একদিন।

তাহলে নতুন নতুন পাঠক চাই তোমার।

সব লেখকই তা চায়। তার সঙ্গে যদি টাকা আসে তো মন্দ কি।

নতুন নতুন পাঠক—আগামী দিনের পাঠক পেতে হলে তো এগিয়ে গিয়ে লিখতে হবে। এগিয়ে গিয়ে লিখলে তো শ্যামল—এখনকার পাঠক আসে না। নগদ বিদায়ও জুটবে না।

তাহলে কি আমি বালতি বালতি উপন্যাস দিয়ে যেতেই থাকবো।

হ্যাঁ। তোমার একটা বাজার তৈরি করেছি আমি। সেখানকার চাহিদা তোমাকে মেটাতে হবেই তো। এত দিনের লেন-দেন। ভবিষ্যৎ নিয়ে এত ভাবছো কেন শ্যামল। আর—

আর কি?

বালতি ভরাট না করে এখন কি আর তুমি আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারবে?

কেন?

আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে এখন কি তুমি আর আগেকার শ্যামল বসু রায় হতে পারবে ভেবেছো।

অসুবিধা কিসের?

ন' মাসে ছ' মাসে পোয়াটাক সৃষ্টি নিয়ে টিকতে পারবে? না, টিকতে ভাল লাগবে।

ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যতের পেটেই থাকুক। তাকে নিয়ে টানাটানি কোরো না।

গোয়ালারূপী সম্পাদক আরেকটা ইনজেকশন দিতে এগিয়ে এলেন। ব্যথায় ঘুম ভেঙে গেল শ্যামলের। পাশে প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিকের বউ ঘুমোচ্ছিলেন। দেওয়ালে শ্যামলের নিজের একটা অয়েল পেন্টিং। ঝুলবারান্দায় গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। নিশুতি রাতের কালো আকাশ ফুঁড়ে কয়েকটি উপন্যাস ফুটে উঠেছে। তাদের হলদে লাগলো।

একটিকে শ্যামল বসু রায় চিনতে পারলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস। বেহালার দিককার আকাশে জ্বলজ্বল করছিল। অজ্ঞাতবাস। নামটা বড় পছন্দ শ্যামলের। লিখতে লিখতে তিনি পায়চারি করতেন। ভাবতেন। লিখতে বসে অনেক সময় জানলা দিয়ে পেঁপে গাছের কাঁচ সবুজ ডাঁটিতে কালো দোয়েলকে দুলতে দেখেছেন। দেখতে দেখতে এক-একটা লাইন খুঁজে পেয়েছেন। তখনো তিনি বালতি ভরে উপন্যাস করেন নি। সৃষ্টির থলিটা কোথায় থাকে—তাও জানতেন না। কিন্তু হয়ে যেত—

শ্যামল বুঝতে পারলেন না, তিনি ওই হলদে তারা থেকে ঠিক কত আলোকবর্ষ দূরে আছেন।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

মেয়ে ১৯৭৩

শ্যামল রায়

মে: ১৯৭৩ নকসালাইট স্কোয়াডের ও-সি এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটিকে আমি চিনি। কাল রাতে ওয়াটগঞ্জের বেশ্যাদের সঙ্গে পাশের লক-আপে ছিল। পরে আমাদের সরিয়ে নিয়ে চারজন ওয়াগন ব্রেকার আর ছয়জন ডাকাতের মধ্যে ওকে ছেড়ে দেয়। সারারাত ও ওখানে ছিল। সারারাত।

আমাকে যে ইন্সপেকটর জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ও-সি নিজের চেয়ারে বসে আমাকে একটা অকথ্য ভাষা বলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওর কাজ হয়ে গেছে।' ইন্সপেকটর বললেন, 'না স্যার. খালি থানাই পানাই, খুলছে না কিছু।' ও-সি বললেন, 'পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে খোল। এখানে আমার কাজ আছে। ছেলে দুটো আর মেয়েটিকে ঘরের কোনে মেঝেতে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

আমার কোমরে দড়ি। তবু একজন কনেস্টবল আমার ডান হাতটা মুচড়ে ধরল। আমি বললাম, 'ছাড়ুন। প্রয়োজন নেই।' ও আরো একটু জোরে মুচড়ে দিয়ে আবার স্বাভাবিক করল। কয়েকটা পা এগিয়েই পাশের ঘর। একটি টেবিল আর দুটো চেয়ার নিয়ে শূন্য ঘর। মাথার ওপর হু হু করে পাখা ঘুরছে। ইন্সপেকটর কনেস্টবলকে পাখাটা বন্ধ করতে বলে চলে গেলেন। কনেস্টবল পাখাটা বন্ধ করে বলল, 'নীচে ওই কোনে গিয়ে বোস।' আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বললাম 'ঠিক আছে।' কনেস্টবলটি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে, একটা পা টেবিলের ওপর তুলে নিল। বলল, 'কি করা হয়?'

'কিছু নয়।'

'কিছু নয় মানে এতদিন হাওয়া খাওয়া।'

আমি চুপ করি রইলাম।

দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের ছেলে।

আমি চুপ করে রইলাম।

বিয়ে টিয়ে হয়েছে।

না।

ও-তাই। মেয়েছেলেটেলে নেই।

ঠিক করে কথা বলুন।

বাইরে একটা চীৎকার হল। পাশের ঘরে। মেয়েটা চীৎকার করছে। কনেস্টবলটি নড়েচড়ে বসল। বলল, ছুঁড়িটা কে?

জানি না।

পার্টিতে এই রকম কত মেয়ে আছে?

আছে কিছু!

সবার বিয়েটিয়ে হয়েছে তো?

না।

তবে ওদের চলে কি করে?

আমি চুপ করে রইলাম।

পাটা একবার নাড়িয়ে নিয়ে কনেস্টবলটি বলল, ওই মেয়েটি সব বলে দিয়েছে। আসলে ও পার্টি ফার্টি করে না। রোগা চশমা চোখে যে ছোঁড়াটিকে দেখলেন। ওই ছোঁড়াটার কাছেই ও থাকে। বলছে ভাই-বোন। পুলিশ কি এতই। ...(ছাপার অযোগ্য)

পাশের ঘরে একদিকে চীৎকার হচ্ছে। আর একদিকে হাসির হুল্লোড়। চেয়ার নিয়ে একটা লোক পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। ইন্সপেকটর। সেই দুটি, ছেলেকে নিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকলেন।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি কথা হচ্ছিল!'

'কিছু নয়।'

'কিছু নয় স্যার, নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছিল।' বলে কনেস্টবলটি উঠে গিয়ে পাশে দাঁড়াল।

ইন্সপেকটর পাখা চালিয়ে দিয়ে রোগা চশমা পরা ছেলেটিকে চেয়ারে বসতে বললেন। আবার ছেলেটিকে চুলের মুঠি ধরে কয়েকবার টেবিলের চারপাশে ঘোরালেন। 'তুই শালা নীচে বোস।' ছেলেটির খালি গা। পরনে একটি জাঙিয়া। রোগা লিকলিকে বুক। হাড় কয়টা গোনা যায়। সে জোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে ঘরের এক কোনে গিয়ে বসল। বাতাস গলতে থাকলো বুকে।

ঠিক তখনি একটি ছেলে ঘরে ঢুকলো। সম্ভবতঃ কোন ক্যান্টিনের ছেলে। এক হাতে দু কাপ চা অন্য হাতে একটি বড় কেক। ইন্সপেকটর নিজে এক কাপ চা নিয়ে কেক আর অন্য কাপটি চশমা পরা ছেলেটিকে দিতে বললেন।

ছেলেটি বলল, আমি কিছু খাবো না।

খান খান। সেই আটটায় এসেছেন এখন দুটো খান।

ছেলেটি ওগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। ইন্সপেকটর কয়েক চুমুকে চা শেষ করে ঘরের কোনে বসা ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেল। বলল, উঠে দাঁড়া ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো।

জাঙিয়া খোল।

ছেলেটি মুখের দিকে চোখ তুলে নামিয়ে নিল। হাত দেব না—খোল। ছেলেটি দাঁড়িয়ে রইল।

ইন্সপেক্টর কনেস্টবলটিকে ইঙ্গিত করলেন। কনেস্টবলটি এগিয়ে এসে ওর কোমরে হাত দিল। তারপর টেনে টেনে জাঙিয়া খুলতে থাকলো। ছেলেটি দাঁড়িয়ে রইল।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'বিশাল ব্যাপার। তা তোর উদোম হতে লজ্জা করছে না।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে রইল।

এই তোদের নেতা। তোকে ফেলে খেতে পারছে না। এবার নেতার পা ধরে বল ছেড়ে দিতে।

ছেলেটি একবার টেবিলের দিকে তাকালো। আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি। কনেস্টবলের দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল।

পাশের ঘরে মেয়েটি আ করে জোরে চীৎকার করে উঠলো। এ ঘরের ছেলেটি মেঝের ওপর চায়ের কাপ ছুঁড়ে মারলো। ইন্সপেক্টর বললেন - তেজ দেখিয়ে লাভ নেই। এদিকে উঠে আসুন। ওর কাছে একটা থ্রি এইট আছে। ওকে বলুন কোথায় আছে কার কাছে আছে বলে দিক। ছেড়ে দেব।

রোগা উলঙ্গ ছেলেটি নড়ে দাঁড়ালো। একবার বসতে যাবার চেষ্টা করাতে কনেস্টবল ওকে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ইন্সপেক্টর একবার সব কিছু দেখে নিলেন। তারপর ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে সমস্ত ঘর নিথর চুপ। মাথার ওপর পাখা ঘোরার শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না। পাশের ঘরে কোন শব্দ নেই। একটা নির্জন রকতস্রোত বইতে থাকলো ধমনীতে। দূরে অস্পষ্ট বুটের শব্দ বাতাসে দুলতে থাকে। আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। পায়ের নীচে মাটি নেই মাথার ওপরে আকাশ আমি কোথায় আছি।

সেদিন ছিল বর্ষার রাত। রাত বারোটায় যখন বাড়ী ফিরছি। কলকাতা তখন ডুবে গেছে। কয়েকটা ট্যাকসি জলকেটে যাচ্ছিল উওরে। ফুটপাতের বাসিন্দারা, উঁচু রোয়াকে শোয়ার আয়োজন করছিল, আমি রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকি। আকাশের গায়ে নিয়ন আলো জ্বলছিল নিভছিল। আমাদের গলিতে আলো নেই। পাশের বাড়ীর আলো এসে পড়েছে গলিতে। জলের উপর

জ্যোৎস্নার ঢেউ যেমন খেলা করে ঠিক সেইভাবে খেলছিল গলি। একটা ভূতুড়ে নির্জনতা পেরিয়ে বাড়ীর কড়া নাড়তে থাকি।

রাত তখন চারটে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আমার নাম ধরে কে ডাকছিল বাইরে। আশ্চর্য পরিচিত সুরে কিন্তু চেনা যায় না। কার স্বর। অতিন যতিন নাকি পেরিমল—কে?

আমি উত্তর দেই—যাই।

দু একটা খুটু খাটু শব্দ তারপর জোরে কড়া নড়ে ওঠে।

দরজা খুলে দেই। কয়েকজন ভদ্রলোক নিঃশব্দে উঠে আসেন ঘরে।

আপনার নাম কি?

নাম বলি।

অবিনাশ দত্ত এ-বাড়ীতে থাকেন?

না।

এ-বাড়ীতে কে থাকে? আমরা থাকি?
আমরা মানে কে?

আমি। আমার মামা মামীমা মামাতো ভাইবোনেরা থাকি?

আপনার মামার নাম কি?
নাম বলি।
কি করেন?

সরকারী কর্মচারী। ডাকুন তকে।

মামা নীচে নেমে এসেছিলেন। চোখে মুখে একটা অপরিচিত বিহ্বলতা ফুটে উঠেছিল। অনেকটা স্বগতভাবে উচ্চারণ 'আপনারা কারা।'

আমরা পুলিশের লোক। এ-বাড়ীতে অবিনাশ দত্ত বলে একজন থাকেন। বিপদ-জনক লোক। নকসালদের নেতা। কোথায়, দিন তাকে।

মামা খুব বিচলিত হয়ে বললেন, 'এ-বাড়ীতে ওই নামে কেউ ছিল না কোনদিন।'

'ছিল না কিন্তু আজ আছে!'
'তাহলে আপনারা দেখুন।'

যারা এসেছিলেন। তাঁরা ইতস্তত করতে লাগলেন। যেন ঠিক জায়গায় আসেন নি। অথবা ঠিক সময়ে। একজন অফিসার মামাকে ডেকে পাশে একটু দূরে নিয়ে গেলেন। কি সব বলতে লাগলেন। কয়েকজন ঘরের জিনিসপত্র তোলপাড় করতে লাগলেন। একজন আমার কাছে এগিয়ে এলেন।

'কি করা হয়?'
'কিছু নয়।'
'কিছু নয়। যাদবপুরে কাল মিটিং করেছিল কে?'
'আমি জানবো কি করে'
'রাজনীতি করেন?'

'না।'

এর মধ্যে একজন বলে ওঠে, 'স্যার পেয়েছি। সে ড্রয়ারের ভেতর থেকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, একটা পার্টির কাগজ একটা চিঠি নিয়ে এগিয়ে আসে।

'রাজনীতি করেন না তবে এসব কি?'
আমি বলি 'এসব তো সবাই......'

আমার কথা শেষ না হতেই কয়েকজন আমার দিকে ছুটে আসেন। বলেন—'আপনিই অবিনাশ দত্ত'।

না।
আপনি যাদবপুরে কাল মিটিং করেছেন।

না।

'ঠিক আছে চলুন। আপনার কমরেডরা সব গাড়ীতে বসে আছে। গেলেই দেখতে পাবেন। ওপর থেকে একটা কান্নার রোল ভেসে আসে মামা পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছেন। দেয়ালে সিঁড়ির গায়ে কয়েকটা ছায়া নড়তে থাকে।

'ঘড়ি খুলুন। টাকা পয়সা যদি কিছু থাকে রেখে যান।

আমি বিছানার ওপর ঘড়ি খুলে রাখি। পায়জামার ওপর একটা সার্ট পরে নেই। কয়েকজন আমাকে ঘিরে ধরে। আমি এক গ্লাস জল চাই। বাড়ীতে যে ছেলেটি কাজ করে সে ছুটে জল নিয়ে আসে। আমি জল খেয়ে ঘরের বাইরে পা রাখি।

কালরাত্রে সারা গলিতে জ্যোৎস্নার ঢেউ খেলা করছিল। আজ এখন সি আর পিরা সেই খেলা ভেঙে দিচ্ছে। জলের ওপর পা টানার সপ্ সপ্ আওয়াজের মধ্যে কে একজন বলল 'ও কোথায়'

গলির মুখে নামতেই একজন সি আর পি আমার কলার চেপে ধরল। আমি হাত দিয়ে ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি। আমার হাত অবশ হয়ে আসে। মেরুদণ্ডের নীচে প্রচণ্ড আঘাতে আমার পা টলতে থাকে। রাইফেলের শিতল যন্ত্রণা পিঠ বেয়ে উঠে আসে মাথায়। আমি পড়ে যাই। ওরা আমার দু হাত ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি গলি পেরিয়ে রাস্তার দিকে এগুতে থাকি। পেছন থেকে কে একজন বলে ওঠে 'বড় গাড়ীতে'। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি বড় রাস্তার ওপর একটা কালো ভ্যান আর একটা এমবাসিডার দাঁড়িয়ে আছে। কালো একটা বোরখা পরা কে একজন দ্রুত পায়ে উঠে যাচ্ছে এমবাসিডারে। আমার ভিতর চীৎকার করে ওঠে কে? কে?

আমাকে কালো ভ্যানে তোলা হল। অন্ধকার ভ্যান। বাইরে ভোরের আলো ফুটছে। টুপটাপ শব্দ করে দু'একটা তারা তলিয়ে যাচ্ছে আকাশে। অন্ধকার ভ্যানের ভেতর একটা ছেঁড়া টায়ার, কিছু জুতো আর লাঠি। দু পাশে দুই বেঞ্চে কয়েকজন সি আর পি সারি দিয়ে বসল। আমার ঘাড়ে কয়েকবার রাইফেল ছুঁইয়ে বসতে বলল নীচে। ভ্যানে আর কেউ ছিল না। কয়েকটা ছোট জানলা দিয়ে আকাশের আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার পরিচিত শহর কলকাতা। এখন গতি ছাড়া কিছুই অনুভব করা যায় না। গাড়ি দুলছে। একটা অপরিচিত শব্দ। মনে হল গাড়ী যাচ্ছে ময়দানের দিক। একবার মনে হলো। ময়দানে হয়তো ওরা আমাকে নামিয়ে দেবে।

দশ বছর আগে কবি আর শিল্পী বন্ধুদের সংগে যেভাবে শুয়ে থাকতাম। বন্ধুরা আমার আঁকা ছবি দেখে বলেছিল, তুই এবারে একটা এক্জিবিশন কর। কয়েকবার করেওছিলাম। আজ হয়তো সেই ভাবে নয় অন্য ভাবে শুয়ে থাকাতে হবে আমাকে। একটা শব্দ হবে। খুব পরিচিত শব্দ। তারপর অপরিচিত হয়ে যাবে সবকিছু। কেউ জানবে না। আমি হারিয়ে যাচ্ছি। আমি পিঠ সোজা করে বসতে চেষ্টা করলাম। একজন সি আর পি রাইফেলের গুঁতো দিয়ে আমাকে কোনের দিকে পাঠিয়ে দিল। পিঠের দিকে জামাটা ভিজে ভিজে লাগছে। হাত দিয়ে মনে হল রক্ত। চোখের সামনে হাত নিয়ে দেখি কালো একটা কিছু হাতে লেগে আছে। অন্ধকারে রক্তের রং কালো হয়ে যায়।

গাড়ি একটা ঝাকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ধুপধাপ সব নেমে যাচ্ছে গাড়ি থেকে। কয়েকজন সি আর পি গাড়িতে বসে থাকলো। আর সব যেন কোথায় নেমে গেল। কিছুক্ষণ পর ওরা ফিরে আসে। আবার গাড়ি চলতে থাকে একটা বড় বাঁক নিয়ে তারপর গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। গাড়ির দরজা খুলে যায়। ওদের নামার ভঙ্গী দেখে মনে হল ঠিক জায়গায় এসে গেছি। ময়দান নয়, লোকাল থানা। ওরা আমাকে নামতে বলল। আমি নেমে এলাম। আলোয় [illegible] হয়ে গিয়েছে আকাশ। কয়েকটা ছেঁড়া [illegible] কাক উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে. দূরে থেকে সান্টিংয়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। একজন আমার ডান হাতটা মুচড়ে ধরল। তারপর ঠেলে দিল সামনের দিকে। এমবাসিডারটাকে আর দেখতে পেলাম না। একজন অফিসার ভ্যান থেকে নামলেন। আমি অফিস ঘরে উঠে গেলাম। টেবিলে মাথা রেখে কে একজন ঘুমুচ্ছিল। খালি গা পরনে ধুতি। সে একবার আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলে কি কেস্। তারপর যেন বুঝতে পেরেছে এইভাবে উঠে গেল পাশের ঘরে। যে অফিসার আমাকে নিয়ে এসেছেন, তিনি সেই চেয়ারে বসলেন। আমার নাম লিখলেন। এলায়িস অবিনাশ দত্ত লিখলেন। বললেন, 'পার্টির নাম কি।'

আমি চুপ করে থাকি। উনি খুব বিরক্ত হন। তারপর ক্লান্তভাবে শরীরটাকে পিছনের দিকে এলিয়ে দেন। বলেন 'এখন না বললেও চলবে...তাড়াহুড়োর কিছু নেই। নতুন জায়গায় এসেছেন দেখুন শুনুন তারপর একদিন বলবেন।' উনি উঠে

পড়লেন। কোমরের পেছন থেকে রিভলভার খুলে নিয়ে খুলেই কয়েকটি গুলে দেখলেন। তারপর সাজিয়ে রাখলেন দেয়ালে। ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসলেন। বললেন, 'এখানে থাকুন কোন অসুবিধে নেই। খান-দান ঘুমোন, মাঝে মাঝে গাড়ি করে বেড়িয়ে নিয়ে আসবো। চিন্তা কি? তারপর বললেন ওকে ওর ঘর দেখিয়ে দাও। যে কনেস্টবল আমাকে ধরে ছিল, সে আমাকে ঠেলে দিল সামনের দিকে। দুদিকে সারি সারি ঘর। কোনটা অফিস কোনটা গুদোম। তারপর লক আপ। একটা লক আপে কিছু মেয়ে আছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে শুয়ে ছিল ওরা। ওদের পেরিয়ে গিয়ে আর একটা লক আপ। লক আপের মুখে অনেকগুলো তরতাজা ছেলে বসেছিল। ওরা আমাকে দেখে সরে বসল। তারপর লক আপের দরজা খুলে গেল। আমাকে লক আপের ভেতর ঠেলে দিল। কে একজন বলে উঠলো, 'কি কেস দাদা'।

আমি ওর দিকে ফিরে তাকালাম। ও ভুরু নাচিয়ে ইঙ্গিত করল, 'কি কেস?'

আমি বললাম 'পলিটিক্যাল'।
'রাজনীতি'।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।
লক আপের ভিতর ছেলে বুড়ো মিলিয়ে জনা বারো লোক যে যার মত বসে আছে। একদিকের কোনে একটা খোলা টিন। প্রথমে ভেবেছিলাম ময়লা ফেলার টিন কিন্তু পরে দেখলাম ওকে খাবার জল আছে। তার পাশে উঁচু বেদীর মত একটা জায়গা, ওখানে মল-মূত্র ত্যাগ করা হয়। শালপাতা আর মাটির ভাঁড়ে দুর্গন্ধ ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছে, নাকি ওসবই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বোঝা যায় না। আমার নাক ও গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। ভিতরে আলো নেই। ওপরে ঘুলঘুলি দিয়ে একটা আলোর আভা ভিতরে এসেছে। আমি একবার ঘুলঘুলির দিকে তাকিয়ে সেই লোকটির দিকে তাকালাম। লোকটি আমাকে একটা বিড়ি দিল। বলল 'খান সিগারেট নেই, নিজের মনে করে খাবেন।' আমি মুখে দিতে খুব সতর্কভাবে ও নিজেই ধরিয়ে দিল। আমি সবে একটা টান দিয়েছি ও ত্রস্ত হয়ে মুখ থেকে বিড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে দূরে কোনায় ফেলে দিল। আমাকে তিরস্কার করে বলল, এখুনি দেখে ফেললে সব তল্লাসি করে নিয়ে যাবে—আপনি তো মশাই আচ্ছা লোক।' আমি বললাম—'ক্ষমা করবেন।'

'ক্ষমা করার কি আছে। নতুন লোক।'

আমি হাসলাম। সেও হাসলো। বলল 'কি রাজনীতি করেন'

নকসালবাড়ীর রাজনীতি।

আমার সম্পর্কে সমস্ত কিছুই জানে এমন ভাব করে বলল...'সে আমি দেখেই বুঝেছি।' তারপর কি চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা...আপনারা তো কমিউনিস্ট'।
'না'!
'চীনা'।
'না। কমিউনিস্টদের দেশ নেই।'
লোকটি এবার একটু বিব্রত বোধ করলো। বলল, 'আপনারা খুন করছেন কেন?'
'কমিউনিস্টরা খুন করে না।'
'তবে এতো যে খুন করছে'।
'যারা করছে তারা কমিউনিস্ট নয়।'
'তবে ওরা কারা?'
জানি না। কেউ হবে।

'সে তো নিশ্চয়ই'। বলে লোকটি আমার কাছে সরে এলো। বলল, 'যাকগে আপনি এই এলেন। উল্টো সিধে অনেক কথা বলে ফেলেছি।' আমি বললাম, 'তাতে কি আছে ...আপনার নাম কি?
'শ্রীহারাধন মালাকার।'
কি করেন!

আমার একটা চায়ের দোকান আছে।
এখানে এসেছেন কেন?

এবার লোকটি একটু অন্য রকম হয়ে গেল। বলল, আপনাদের জন্য। আমার দোকানে নকসালরা আড্ডা দিত। পুলিশ ভেবেছে আমিও তাই। ধরে নিয়ে এল।' তারপর কি চিন্তা করে বলল, 'কি করলেন বলুন তো, কি করলেন এই দেশটাকে।'

আমি চুপ করে থাকি। পাশ থেকে একটি ছেলে এগিয়ে আসে। বলে, 'চুসকিটা দেবেন।'
'মানে!'
ছেলেটি আমার নিভে যাওয়া বিড়ির দিকে দেখিয়ে দেয়। আমি বিড়িটা ওকে দিয়েদি। ও অনায়াসে সরে গিয়ে বসে। আসেপাশে সবাই প্রায় ঘুমোচ্ছে। পেচ্ছাপে ভেসে আছে একদিক, ওদিকটা কিছুটা ফাঁকা। লক আপের মুখে ভীড় বেশী। সবাই উসখুস করছে। আমি সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেউ আসবে নাকি?'

ও বলল, 'আসবে হরমদম। এখন চা আসবে।'

চা এল লক আপের মুখে সবাই দাঁড়িয়ে উঠি এ-ওর ওপর দিয়ে চা নিতে লাগলো। ছোট্ট মাটির ভাঁড়ে চা। সঙ্গে একটা নোনতা বিস্কুট। আমি বসে বসে দেখছিলাম। হারাধনবাবু আমার চা বিস্কুট নিয়ে এলেন। বললেন, 'এ-ভাবে বসে থাকলে পাবেন না। আপনারটা অন্য কেউ খেয়ে নেবে।'

আমি বললাম, আচ্ছা জানা রইল।'

লক আপের মুখে যে কনেস্টবল ছিল সে ওখানকার জটলা হুল্লোড় থামাবার চেষ্টা করছে। কয়েকজনকে গালিগালাজ করে কয়েকজনকে লাঠির গুঁতো দিয়ে ভিতরের দিকে ঠেলে দেয়। হারাধনবাবু বললেন, 'এরা কেউ ভদ্রলোকের ছেলে নয়। কেউ চোর কেউ পকেটমার [illegible] আমি মশায় [illegible]। একটা কথা বলার লোক পাচ্ছি না। [illegible] আপনি আসাতে বেঁচে গেছি। ওই যে আপনাকে বিড়ি দিলাম ওতেই বুঝতে পারছেন...এখানে মাথা ঠুকে মরে গেলেও পাবেন না। কেউ দেবে না...হ্যাঁ।'

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। হরিদাসবাবু বললেন, 'এখানে যে আসবেন জানা ছিল?'

'হ্যাঁ'।

'মরে যেতে পারেন জানা আছে?'
'হ্যাঁ'।

'তবে এ-পথে আসা কেন?'

আমি চুপ করে থাকি।

'কি দরকার মশাই রাজনীতি করার। রাজনীতি না করলে কি বেঁচে থাকা যায় না?

আমি বলি 'না—শিশু আর উন্মাদ ছাড়া সবাই রাজনীতি করে।'
'মানে'।

'মানে। প্রত্যেক মানুষেরই দিন যাপনের জীবন যাপনের একটি দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর নামই রাজনীতি। তা সঠিক হতে পারে বেঠিক হতে পারে। কিন্তু রাজনীতি।'

'কিন্তু এই সবের পথে—এত খুনোখুনি—'

'নতুন কিছুর শুরুতে রক্ত তো হবেই, —মৃত্যুও হতে পারে। প্রতিটি মেয়ে জানে, মা হতে গেলে—রক্ত আছে—মৃত্যুও হতে পারে। তবু তো আমরা জন্মেছি।

আমাদের চেয়ে বছর বারো বড় হরিদাসবাবু মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। বললেন, কথায় মশায় আপনারা ভালো ভেজাতে পারেন কিন্তু করে দেখাতে পারেন না।

আমি বললাম ঠিক। সবাই পারে না।' আমার মনেই ছিল না। আজ আমি ভোর-রাতে ধরা পড়েছি। পুলিশ লক আপে বসে আছি। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। আকাশে তারা ছিল না। হরিদাসবাবু বললেন, 'আপনি বেরুবেন না?' আমি বললাম, 'কোথায়?'
বাইরে।

কেন?
সকালের কাজ করবেন না।
দেবে।

'হ্যাঁ। সবার হয়ে গেছে। আমরা দুজন বাকি। আমি বললাম আপনি যান আমি পরে যাবো।' হরিদাসবাবু লক আপের দিকে এগিয়ে গেলেন। কনেস্টবলটি খেঁকিয়ে উঠলো... এতক্ষণ কি করে বসেছিলে।'

হরিদাসবাবু বললেন 'না দাঁড়া'।
'আমাই আর।' বলে কনেস্টবলটি লক-আপ খুলে দিল।

(চলবে)

পাঠশালার চেয়ে কে জি ভাল?

কাজল মিত্র

'টর্চটা নিয়ে এস। যা কুয়াশা। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।' নীচে থেকে চেঁচিয়ে অমল সুজাতাকে বললে। ওদিকে গাড়িটা সমানে হর্ণ দিয়ে চলেছে। খানিকটা পরেই সুজাতা বুবাই-এর হাত ধরে প্রায় হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে এল। গাড়িটা হর্ণ দিয়েই চলেছে। অমল দুহাতে চোখ কচলে নিয়ে বললে—'কাঁদছ কেন বুবাই? গাড়িতে উঠলেই ঘুম ছেড়ে যাবে। স্কুলে অ্যাবসেন্ট হলে কাল আন্টি ভীষণ মারবে। এস, গাড়িতে চল।' একটা লম্বা গোছের হাই তুলে সুজাতা বললে, 'রোজ স্কুলে যাবার সময় ছেলের কান্না। কাঁদছ কেন তুমি? তুমি কী ন্যাটি নয়? ন্যাটি বয়রা কাঁদে। যাও, ড্যাডির সঙ্গে গাড়িতে যাও।'

বুবাই, অর্থাৎ অমল-সুজাতার সাড়ে চার বছরের ছেলে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ড্যাডি, অর্থাৎ বাবার হাত ধরে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। গাড়িটা বুবাইকে তুলে নিয়ে স্টার্ট দিল। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সুজাতা তারস্বরে টাটা, বাই বাই বলে হাত নাড়তে লাগল। তার সঙ্গে অমলও। গাড়ির জানলার ধারে ঘুমে জড়ানো একদল শিশুর ক্লান্ত করুণ মুখ রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল।

অমল সরকার রাইটার্স-এর করণিক। অবশ্য আপার ডিভিশনের। সুজাতা সরকারী দপ্তরের ডিপোয় চাকরি করে। ইংরিজি জানা ডিপো অ্যাসিস্ট্যান্ট। ভাড়াবাড়ি। পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবা। রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার। ভূগোল পড়াতেন। বিধবা দিদি। সংসারের অবস্থা জটিল করে তোলার সব পথই প্রশস্ত। কিন্তু ছেলেকে ইংরাজী শেখাতেই হবে। না শিখিয়ে উপায় কী? বুবাই-এর মামার বাড়ি, মানে সুজাতার বাপের বাড়ির সব কটা ছেলে-মেয়েই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে। সুজাতার ছোড়দার ছেলে বিল্টু তো একেবারে সেরা স্কুল হিন্দ হাইস্কুলের ছাত্র। তা সুজাতারা অতখানি টাকা খরচ করতে না পারলেও মোটামুটি একটা ভাল স্কুলেই দিয়েছে বুবাইকে। দারুণ পড়াশুনো। এরই মধ্যে বুবাই বাবাকে কেমন সুন্দর ড্যাডি বলতে শিখে গেছে। তাছাড়া অঙ্ক টঙ্কও [illegible] করছে। স্কুলের আন্টিরা দারুণ পড়ায়। এই সকালে যাবে আর ফিরতে ফিরতে সেই বিকেল। শীতকালে বিকেল ছোট, তাই সন্ধে। তখন আর বুবাই-এর দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ইংরিজি শিখতে গেলে এটুকু কষ্ট করতেই হবে। তাই অমল-সুজাতাও কষ্ট করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। মাইনেটা অবিশ্যি বড্ড গায়ে লাগে। সব মিলিয়ে মাসে ষাট টাকা। কিন্তু বিল্টুর স্কুলে তো আরও বেশি। একশো টাকার ওপর। সেইটাই সুজাতার সান্ত্বনা। আর এই সান্ত্বনা নিয়েই সে ভোর চারটে হতে না হতেই উঠে পড়ে ধড়মড়িয়ে। মাথার কাছে টেবিল ঘড়ির অ্যালার্মটা শেষ হবার আগেই হাত দিয়ে সেটাকে চেপে বন্ধ করে দেয়। তারপর টেনে তোলে বুবাইকে। ইংরিজি না শিখলে সভ্যতা শিখবে কী করে? তাই ইংরিজি শিখতে গিয়ে সারাদিন প্রায় অভুক্ত থেকে বিকেলে বাড়ি এসে বুবাই আর খেতেই চায় না। জোর করে ধমক দিয়ে সুজাতা ওকে খাওয়ায়। তারপর স্কুলের টাস্ক তৈরি করানোর জন্যে বই নিয়ে বসায়। বুবাই ঢুলতে থাকে। ফ্লুরেসেন্ট টিউবের [illegible] আলোর ছটার মধ্যে [illegible] এর [illegible] দেখতে পায়। চোখ দুটো খুলতে পারে না ও। শুধু টেনে টেনে ক্লান্ত গলায় পড়ে 'হিকরি ডিকরি ডক, দি মাউস র‍্যান আপ দ্য ক্লক...' সুজাতা বসে বসে উল বোনে তিনটে উল্টো দুটো সোজা। খানিক পরেই বুবাই বইয়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। ওর নিষ্পাপ [illegible]

ওপর ভিটামিন ভির্ফিসয়েন্সির চক্রাকার সাদা দাগগুলো ফ্লুরেসেন্ট আলোর চকচক করতে থাকে।

কলকাতায় ডিসেম্বর-জানুয়ারিকে ফেস্টুনের মাস বলা যায়। শহরের বড় বড় রাস্তায় এই সময় একদিকে যেমন জলসা, যাত্রা থিয়েটার আর স্টার নাইটের ফেস্টুন, অন্যদিকে জয়নগরের মোয়া, পাটালিগুড়ের গুণগান লেখা ফেস্টুন। এরই মাঝখানে জায়গা করে নেয় আর এক ধরনের নানারঙের ফেস্টুন। সেগুলো কে জি স্কুলের। ফেয়ারেটস্, ফ্লুরেসেণ্ট, কিডিজ্ কর্ণার, টাইনি টট্, ব্লু অ্যাঞ্জেল এই সব নানা ধরনের নাম। এর সঙ্গে আছে সেন্ট অমুক, সেণ্ট তমুক ইত্যাদি খ্রীষ্টান সন্তদের স্মরণে সরস্বতীকে সামনে খাড়া করে লক্ষ্মীর আরাধনার বিপুল আয়োজন। কলকাতার আকাশ ফেস্টুনের রঙে রঙীন। ছেলে-মেয়েদের ইংরিজি শেখানোর উৎসাহে মধ্যবিত্ত বাপ-মা'র টেনসম্‌নিয়ার মাস এই ডিসেম্বর-জানুয়ারি। কলকাতার শ' আষ্টেক কে জি স্কুলের দরজায় এসময়ে দেখা যায় উদ্‌গ্রীব অভিভাবকদের মুখের মিছিল।

ইংরেজরা এদেশে কোম্পানির পত্তনকে ভালমত মজবুত করার পর সুসভ্য জাতির পবিত্র কর্তব্য হিসেবে 'দরিদ্র ভারতীয়দের' ইংরিজি শেখানোর জন্যে চেষ্টা শুরু করেছিল। বাংলাদেশ যেহেতু বরাবরই সবদিক দিয়ে অগ্রণী তাই বাংলায় ইংরেজদের একটুও বেগ পেতে হয়নি ইংরিজি শিক্ষা চালু করতে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এদেশে ইংরিজি শিক্ষার বীজ বপন করা হয়। ফল ফলতে শুরু করে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। এর আগে ছিল পাঠশালা আর টোলে পড়ার ব্যবস্থা। বিশপ ওয়ার্ডের বিবরণ থেকে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতার যেখানে যে অধ্যাপকের টোলে যে কজন ছাত্র পড়ত তার উল্লেখ পাওয়া যায় এইভাবে :— হাতিবাগানে অনন্তকুমার বিদ্যাবাগীশের টোলে পনেরোজন ছাত্র, রামকুমার তর্কালঙ্কারের টোলে আটজন, রামকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কারের টোলে আটজন, রামদুলাল চূড়ামণি, হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন ও গৌরমণি ন্যায়ালঙ্কারের টোলে ৪-৫ জন করে ছাত্র ছিল। বাগবাজারের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ও রামকুমার শিরোমণির টোলে যথাক্রমে পনেরো ছয় ও চারজন ছাত্র ছিল। এছাড়া সিমলার রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, আরকুলির কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির টোলেও ছাত্ররা পড়ত। মলঙ্গা, এন্টালি, ঠনঠনে, হর্তুকিবাগান, শোভাবাজার, সিকদারবাগান ও টালায় টোল ছিল। কোম্পানি আর স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যে টোলগুলো চলত। টোলে অল্প ছাত্র হওয়ার কারণ সাধারণ ছাত্রেরা অধ্যাপকদের টোলে লেখাপড়া শিখত না। তারা গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় বর্ণপরিচয়, চাণক্যের শ্লোক, শুভঙ্করী, গঙ্গার বন্দনা আর হাতের লেখা শিখত। যাত্রা আর কবির দলের কথকতায় হিন্দুধর্মের আদর্শ চরিত্রের মধ্যে ধর্মতত্ত্বের আস্বাদন মিলত। ছড়ায়, গল্পে, প্রবাদে-প্রবচনে পুরনো কথা শোনাতেন দাদু-দিদিমারা। টোলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য পড়াতেন। আর্চার সাহেব ১৮০০ সালে কলকাতায় যে স্কুল খোলেন সেখানে বাঙালীর ছেলেরা ইংরিজি শিখতে যেত না। কাজ চালাবার জন্যে লোকে ইংরিজি শিখত। কোম্পানির নুনের গোলায়, কোর্ট-কাছারিতে কাজের সুবিধের জন্যে ইংরিজি শেখার প্রয়োজন হত। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ইংরিজির বর্ণপরিচয় না জেনেও সেকালের সুপ্রীম কোর্টের জজ্ হয়েছিলেন। এই শ্রুতিধর পুরুষের অসামান্য স্মৃতি আর ধীশক্তি একটা ইতিহাস হয়ে আছে। তাছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার থেকে শুরু করে তাবং পণ্ডিতকুলের কেউই ইংরিজির ধারে কাছে যাননি। যাঁরা ইংরিজি শিখেছিলেন তাঁরা মনপ্রাণ দিয়ে বিদেশী শিক্ষার সাধনায় ইংরিজিকে আয়ত্ত করেছিলেন। তাই তাঁরা ইংরিজি শিখতে গিয়ে বাংলাকে ভুলে যাননি। উজ্জ্বলতম উদাহরণ রাজা রামমোহন রায়। যিনি ইংরিজি শিক্ষা বিস্তারে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে। তিনিই রচনা করেছেন বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন আর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষার শিক্ষা আর প্রচারের জন্যে তাঁরা অনুগত ছাত্রের মতই সাধনা করে গেছেন।

আমাদের ছাত্রজীবনেও ইংরিজির আসন ছিল অনেক উঁচুতে। স্কুলে তখন লেখাপড়া হত। মাস্টার মশাইদের শাসনের ভয়ে আমরাও পড়া করে আসতুম রোজ। ইংরিজির মাস্টার মশাই যতীনবাবুর ক্লাসে শৈলেন ম্যাথামেটিকস্ বানান ভুল করেছিল বলে যতীনবাবু স্কুল ছুটির পর শৈলেনকে টীচার্স রুমে বসিয়ে

পাঁচশো বার সেই বানানটা লিখিয়েছিলেন। তখনও ইংরিজি শেখার জন্যে প্রয়োজন ছিল না কে জি স্কুলের। বাংলা স্কুলে পড়েও আমরা ইংরিজি শিখেছি। ইংরেজ বনে যাবার জন্যে নয়। বাবাকে ড্যাডি বলার জন্যে নয়। ইংরিজি ভাষা শেখার জন্যে। তাই পাঠশালা আর গুরু গৃহে প্রথম জীবনের পাঠ নিয়েই এদেশে ঋষি অরবিন্দ পরবর্তী জীবনে ইংরিজির ছাত্র আর শিক্ষকদের কাছে 'ডয়েন অফ ইংলিশ ল্যাংগোয়েজ' হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। ইংরিজি অধ্যাপনা জগতের স্তম্ভস্বরূপ শিক্ষকদের কেউই কে জি'র চৌকাঠ ডিঙোন নি। তাঁদের হাতেখড়ি হয়েছে সাড়ম্বরে। শ্লেট-পেন্সিল আর জল ন্যাকড়া দিয়ে। আজকের প্রজন্মে রক এন রোল-এর বন্যায় সেসব জিনিস হারিয়ে গেছে। আমাদের ছাত্রজীবন শুরু হয়েছে প্যারীচরণের ফার্স্টবুক আর বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় দিয়ে। স্কুল জীবনে আন্টি বা মিস্-এর প্রয়োজন হয়নি। যতীনবাবু-রামচরণবাবুরাই যথেষ্ট ছিলেন। সন্ধে হলেই গ্যাসের আলো জ্বলা গলির মধ্যে পড়ার আওয়াজ শোনা যেত : ওয়ান মর্ন আই মেট্ এ লেম ম্যান ইন এ লেন কেম্‌ক্রাজ টু মাই ফার্ম।। যে বইখানা পড়লে ইংরিজি শিক্ষার প্রাথমিক স্তর জলের মত সহজ হয়ে যেত সেই ফার্স্ট বুক আজ নির্বাসনে চলে গেছে। অনেক খুঁজে পেতে একখানা পেয়েছিলুম। দেখে চিনতে পারিনি। আমাদের আমলের সেই সিলভার প্যারট এডিশনের বইটা অস্বাভাবিক বেঁটে হয়ে গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজি শিক্ষাব্যবস্থারও যে এই দশা ঘটেছে সেটা সন্দেহের অপেক্ষা রাখে না।

শিশুশিক্ষা যে কোনও জাতির শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড : এখানকার শিক্ষার যা হাল তার কারণ খুঁজতে গেলে একেবারে গোড়ায় যেতে হবে। গোড়া মানে প্রাথমিক শিক্ষারও আগের স্তর। এর নাম দেওয়া হয়েছে প্রি-প্রাইমারী বা প্রাক-প্রাথমিক। আমাদের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

Pre-Primary Schools were first established to meet social needs such as looking after the children of working mothers or providing a suitable environment to little boys and girls from urban families whose small tenements or flats were hardly appropriate for the children's proper growth. Modern researchers have shown that the years between three and ten are of greatest importance in the child's physical emotional and intellectual development. It has also been found that children who have been to a pre-primary school show better progress at the primary stage and help in reducing wastage and stagnation The modern trend in educational policy therefore is to emphasize pre-primary education especially for children with unsatisfactory home backgrounds.

খুব সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সব মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা দেবার জন্যে কার্যক্ষেত্রে যা করা হয় সেটা কী যথেষ্ট? স্বাধীনতার আগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কেউ বড় একটা ভাবেননি। ভারতে যুদ্ধোত্তর শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের রিপোর্টেই প্রথম প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৫০-৫১ সালে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০৩টি। শিক্ষক ছিলেন ৮৬৬ জন আর ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ২৮ হাজার। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল বারো লক্ষ টাকার মত। ৬৫-৬৬ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিন হাজারে। শিক্ষকও ছিলেন সাড়ে ছ'হাজার আর ছাত্রসংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। ব্যয়ের টাকার পরিমাণও দাঁড়িয়েছে এক কোটি দশ লক্ষে। শিক্ষাক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে অগ্রগতি। কিন্তু, বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা তো শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এখনও ভালভাবে মজবুত পায়ে হাঁটতে দেখিনি। শিশুদের করুণ মুখ এখনও প্রকৃত শিক্ষার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। এটাই সবচেয়ে বড় দুঃখের আর লজ্জার কথা।

কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—

(১) শিশুর সুস্বাস্থ্যের অভ্যাস গড়ে তোলা। ব্যক্তিগত কাজে আবশ্যক মৌল দক্ষতা, যথা সাজ-পোশাক আর প্রসাধন, স্নান আহার, পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তোলা।

(২) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আর সৌজন্য বোধ জাগিয়ে তোলা। দলবদ্ধ কাজে অংশ গ্রহণে শিশুদের উৎসাহ দেওয়া। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

(৩) সুকুমার বৃত্তির বিকাশে উৎসাহ দান।

(৪) প্রতিবেশ সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসার শুরুতে সেই বোধকে জাগিয়ে তুলতে উৎসাহ দান। অন্বেষণ, অনুসন্ধান আর নিরীক্ষার সুযোগ দিয়ে শিশুর মধ্যে নতুন নতুন আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।

(৫) আত্মবিকাশে শিশুকে সাহায্য করে তার সৃজনধর্মী চিন্তাকে বিকশিত করা।

(৬) শিশুদের স্বাস্থ্যকে সম্পদের মত মূল্যবান করে গড়ে তোলা।

আরও অনেক তত্ত্ব আছে। অনেক ফর্মুলা আছে। কিন্তু চব্বিশপরগণা আর মেদিনীপুরের পিছিয়ে থাকা গ্রামের ছেলে-মেয়েদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ কতটা হয়েছে আর স্বাস্থ্যের সম্পদ কতখানি গড়ে উঠেছে তার হিসেব মেলা কঠিন।

আর শুধু গ্রামে কেন, শহরের ছবিও প্রায় একইরকমের ধূসর, নিরস্ত। কর্পোরেশন স্কুল এখনও তার বদনাম কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অথচ কর্পোরেশনের তদারকীতে কলকাতায় ২৭[illegible] স্কুল আছে। নাইট স্কুল আছে ৯টা। ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ হাজারের ওপর। কিন্তু এখনও লোকে জানে এই সব স্কুলে সুকুমার বৃত্তির বিকাশ হয় কাঁচা মুখ খারাপে আর স্বাস্থ্যের সম্পদ উকুনের রূপ ধারণ করে ছাত্রদের মাথায় চেপে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঢুকে পড়ে।

বাগবাজার মাল্টিপারপাস্ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অনিমা মুখোপাধ্যায় আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, দেখুন, শিশুদের লেখাপড়া শেখানোটা আর যাই হোক না কেন ব্যবসার মধ্যে পড়া উচিত নয়: অথচ দুঃখের কথা এদেশে ঠিক এটাই ঘটেছে। যে স্নেহ আর মমতা নিয়ে ছোট ছেলে-মেয়েদের ট্রিট্ করা উচিত সেটা প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। অভিভাবকেরা কিন্ডার গার্টেন বলতে পাগল। অথচ তাঁদের খুব কম লোকই কিন্ডার গার্টেন-এর জনক ফ্রয়েবেল্-এর আদর্শের কথা জানেন। তাঁরা শুধু চান ইংলিশ মিডিয়ম। আর বাবা-মায়েদের এই অত্যুৎসাহের সুযোগ নিয়ে শহরের অলি-গলিতে নিত্য নৈমিত্তিক গজিয়ে উঠছে কে জি স্কুল। বৌবাজার আর চুনাগলির অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাদের টীচার হিসেবে রেখে এই সব স্কুলের মালিকেরা বলে বেড়ান—'এখানে মেম-সাহেবরা ইংরিজি শেখান।' বাবা-মায়েরা সেই সব স্কুলে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করতে পারলে ভীষণ খুশী হন।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বললেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন পাঠশালায় যাবার বয়স ছিল পাঁচ বছর কিংবা তার ওপরে। বড় বড় স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক স্তর একটা ছিল। একে বলা হত শিশু শ্রেণী। একালের কে জি স্কুলের সঙ্গে তার কোনও মিলই নেই। কে জি স্কুলে তিন বছরের পর থেকেই ছেলে-মেয়েদের পাঠানো যায়। জার্মানীর ফ্রেডারিখ্ উইল হেলম্ ফ্রয়েবেল ছেলেবেলায় বিমাতার অবহেলায় যে নিদারুণ দুঃখ পেয়েছিলেন তা থেকেই পরবর্তী জীবনে তিনি গড়ে তুললেন কিণ্ডার গার্টেন বা শিশু উদ্যান। বাগানের শিক্ষিত মালী যেমন সযত্নে গাছকে বাড়িয়ে তোলে তেমনি যত্ন আর মমত্ববোধ নিয়েই শিশুদের গড়ে তুলতে হবে কিণ্ডার গার্টেনে। এটাই হল ফ্রয়েবেল-এর আদর্শ। এই আদর্শ নিয়েই তিনি ব্ল্যাংকেনবুর্গ-এ গড়ে তুললেন বিশ্বের প্রথম কিণ্ডার গার্টেন। ইংল্যাণ্ডে এখন ফ্রয়েবেল সিস্টেম শিশু শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ।

শিশু শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বললেন—কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে ইংরিজি মিডিয়মের প্রয়োজনটা বাধ্যতামূলক একথা একেবারেই ভুল। এর প্রমাণ আমার স্কুলেই পাওয়া যাবে। আমাদের এখানে ইংরিজি শেখান হয় সবরকমের যত্ন নিয়ে। কিন্তু মাধ্যম মাতৃভাষা। ছোটরা এখানে প্রতিদিন অন্তত ঘন্টাখানেক খেলাধুলো করে। এই এক ঘন্টার মধ্যে কিছুক্ষণ ইচ্ছামত খেলা বা ফ্রী প্লে আর কিছুক্ষণ নির্দিষ্টভাবে খেলার জিনিস নিয়ে খেলা। এতে নিশ্চিতভাবে তার টোটাল বিহেভিয়ার প্যাটার্ন ভালর দিকে মোড় নেয়। সে দেখে, বিচার করে, মিলে-মিশে খেলতে শেখে। তার জিনিসপত্র নাড়াচাড়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাস আর ক্ষমতা আসে। এরই নাম মোটর কো-অর্ডিনেশন।

এরপর পড়াশুনো আর স্বাস্থ্যরক্ষার অভ্যাস গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া হয়। ছড়া, গল্প, ছবি দেখা, গাছ-পালা আর পশু-পাখির সঙ্গে যথাসম্ভব পরিচিত হওয়ার ভেতর দিয়ে তার জ্ঞানের জগৎ তার কাছে খুলে দেওয়া হয়। লেখা শেখানো হয় ছবি আঁকার মত করে। গণিতের পাঠ একেবারেই কাল্পনিক সংখ্যা দিয়ে হয় না। হাতে ধরে জিনিস গুনেই তারা গুনতে শেখে। পরিবেশ পরিচিতি দিয়ে বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ হয়। ছোটরা গান গায়। এক সঙ্গে দলবেঁধে সুশৃঙ্খলভাবে নাচে। শৃঙ্খলাবোধের প্রথম পাঠ এখানেই। রিদমিক এক্সারসাইজ দিয়ে শরীর গঠন হয়। এছাড়া তারা পরিচ্ছন্ন হয়ে এক সঙ্গে বসে টিফিন খায়। সব মিলিয়ে একটা সামঞ্জস্য পূর্ণ জীবনের ছবি তার সামনে তুলে ধরা হয়। ঘরে ফিরে সংসারের ছবি এর সঙ্গে মিলুক বা না মিলুক এই ডিসিপ্লিনড্ প্রোগ্রামের মধ্যে তারা তাদের জাগ্রত জীবনের বেশির ভাগটা কাটায় বলে তাদের আচরণ পদ্ধতিতে এক পরিবর্তন আসে। আর সেটা নিঃসন্দেহে চেঞ্জ ফর দি বেটার। এই শৃঙ্খলাবোধ শেখাতে ইংলিশ মিডিয়মের প্রয়োজন কী তা বুঝে উঠতে পারি না। ইংরিজি একটা ভাষা। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা। সেই ভাষা শেখার জন্যে মাতৃভাষাকে সযত্নে ভুলতে শেখানোটা শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও। আমরা এত সহজে মধুসূদনকে বরখাস্ত করব কী করে?

আলোকচিত্র : চণ্ডী ঘোষ

সেদিনের কথা আমার বারবার মনে পড়ে। ঠিক এই রকম রোদ ঝলসানো নিঝুম দুপুর, চারপাশ চুপচাপ, রাস্তায় লোকজন কম, মাঝে মাঝে কাকের ডাক। জানলার একটা পাল্লা খুলে বাসস্টপের দিকে তাকিয়ে আছি। ঘরের মধ্যে আমি একা, দরজা বন্ধ। এখন আমি পলাতক। তাই সব সময় খুব সতর্ক, সাবধান। রাস্তা থেকে কোনো সন্ধানী চোখে যেন দেখে না ফেলে!

একটা বাস এসে থামলো। উদগ্রীব চোখে তাকিয়ে থাকি। ধুলো, শালপাতা আর কাগজের ঘূর্ণি উড়িয়ে চলে গেল বাসটা। নামলো একজন বয়স্কা মহিলা, সংগী এক কিশোর। মঞ্জরী এলো না। মুখে হৃৎপিণ্ড নিয়ে আবার দশ মিনিট বাসের প্রতীক্ষা! বুঝতে পারছি, আমার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। এবার আমায় ধরা পড়তে হবে। পরপর আমার সবকটা গোপন ডেরা জানতে পেরেছে পুলিশ। কিট্ দেওয়া জানোয়ারের মতো আমি এখন কোণঠাসা। নজর এড়িয়ে আর বেশি দিন পালিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

রাস্তার দুপাশে সার-সার বাড়ি। সামনের বারান্দায় এক মহিলা ভিজে কাপড় মেলছে। নীচে রাস্তায় চোখ বুজিয়ে জাবর কাটছে একটা মোষ, ল্যাজের ঝাঁটা দিয়ে মাছি খেদাচ্ছে।

আজ থেকে দুমাস আগে ঠিক এমনি সময়ে এসেছিল মঞ্জরী। সেদিনও ঠিক এমনি নির্জনতা, ঝলসানো রোদ, কাকের ডাক। কিন্তু সেদিন আমার এত উদবেগ বা অস্বস্তি ছিল না। নরম বিছানায় বুকে বালিশ দিয়ে শুয়েছিলুম; এতো নরম বিছানায় শুইনি অনেক দিন। মাথার কাছে খোলা জানলা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। বাসস্টপটাও চোখে পড়ে। ঘন্টা দুই আগে প্রণব এই ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়েছে আমাকে। এখন গেছে মঞ্জরীকে আনতে। বালিশের পাশে আমার সংগী বইগুলো। কম্যুনিস্ট পার্টির ইস্তেহার, নয়া গণতন্ত্র রাষ্ট্র ও বিপ্লব।

বাইরে ঘন রোদ, বারান্দায় কয়েকটা চড়াই খুশীর হাট বসিয়ে দিয়েছে। নয়া গণতন্ত্রের পাতায় চোখ রেখে নানা কথা ভাবি। অসংখ্য টুকরো স্মৃতি, স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। মঞ্জ সঙ্গে বর্ধমানের গ্রামে চলে যাবো। স্বা স্ত্রী। আরো কিছুকাল আত্মগোপন থাকতে হবে। তাতে কোনো ক্ষতি মঞ্জরী থাকবে। মঞ্জরী আর আমি। গণতন্ত্র মুড়ে রাখি।

বিছানার পাশে একটা ম্যাগা স্ট্যান্ড। পুরোনো পত্রপত্রিকা নিয়ে দেখি, পাতা ওল্টাই। হঠাৎ পেলুম এ ছোট সাইজের বই। হলদেটে মোটা প কেমন নরম নরম স্যাঁতসেঁতে। ছাপ ভালো নয়। নাম, ভানুমতীর খেল। একটা পাতায় চোখ বোলাই। এ জাতের আগে পড়িনি। কি এক প্রচণ্ড ক্ষি পাতার পর পাতা শেষ হয়, রক্ত গরম নিঃশ্বাসে আগুন ছোটে, অদ্ভুত এক যন্ত্রণা জাগে শরীরে। ইচ্ছে সত্ত্বেও ফেল পারি না। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে য মাথার কাছে প্রিয় বইগুলো সাজানো থা হঠাৎ মনে হয়, মঞ্জরী বড়ো দেরি করছে

মঞ্জরীর ভীতু ভীতু চোখ, পা টিপে সতর্ক ভঙ্গীতে আসা দেখে অ ফেলেছিলুম।

'হেসো না রত্না জয় করে'—নীচুগলায় মঞ্জরী বলেছিল।

'প্রণব কোথায়—জানতে চাই।'

দুপুর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল—মঞ্জরী জানায়—সন্ধ্যা নাগাদ আসবে।'

'ভয় কাটলো'—ওকে খোঁচা দিই।

'উঁহু!' শব্দ তুলে মঞ্জরী চোখে আলো ছড়ায়।

মঞ্জরীর নরম শরীর থেকে একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল। চাঁপা রঙের শাড়ি কপালে কুমকুমের লাল ছোট টিপ, মঞ্জরীকে দেখাচ্ছিল টাটকা চাঁপা ফুলের মতো। বোধহয় কিছু আগে ও স্নান করেছে। ভিজে চুলের হাল্কা গন্ধ ওড়ে। চুল খোলা। হাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে তলার দিকে সংক্ষিপ্ত বিনুনি।

হাতের প্যাকেটটা টেবিলে রেখে মঞ্জরী ঘুরে ফিরে ঘরটা দেখলো। বেশ বড়ো ঘর। গোটা চারেক জানলা, দুটো দরজা সঙ্গে বাথরুম, কিচেন। ঢাউস খাটে পরিপাটি বিছানা। ড্রেসিং টেবিল আলমারি আলনা পড়ার চেয়ার টেবিল। এতো আসবাবপত্র সত্ত্বেও সাজানোর গুণে ঘরটা খালি খালি দেখায়। হাল্কা সবুজ প্ল্যাস্টিক ডিসটেম্পার করা দেওয়াল। খাজুরাহোর যুগল মিলনের ছবির একটা ব্লো আপ ঝুলছে দেয়ালে। সস্ত্রীক অমলেশদার একটা ছবি ড্রেসিং টেবিলে রাখা।

ফ্ল্যাটটা অমলেশদার। অফিসের কাজে মাস ছয়েকের জন্যে বৌ নিয়ে ও রাজস্থান গেছে। ফ্ল্যাট দেখাশোনার ভার প্রণবের। ওর কাছেই চাবি। প্রণব, অমলেশদার মামাতো ভাই। আমার বন্ধু। ওরা দুজনেই আমাদের দরদী, সমর্থক।

ফ্ল্যাটটা বেশ—মঞ্জরী বলে। তারপর প্যাকেটটা খুলে সামনে ধরে। একগাদা চীনে খাবার। প্রণবের মুখেই ও খবর পাঠিয়েছিল।

'এতো'—জিজ্ঞেস করি আমি।

মঞ্জরী হাসে। 'এমন কিছু নয়'—ও বলে।

কাগজের থালায় খাবার সাজিয়ে দেয়। চারপাশ সুন্দর হয়ে ওঠে। খেতে খেতে মঞ্জরীর মুখে দু-এক গ্রাস ঢুকিয়ে দিই। আপত্তি শুনি না। মুখে রাগ, চোখে হাসি নিয়ে ও খায়। ওর সরু চিবুকে কি এক লাবণ্য টলটল করে। বাইরের পৃথিবী, বাসের আওয়াজ, ডিজেলের গন্ধ, সবকিছু মুছে যায়।

ঝলসানো রোদ মরে গিয়ে কখন যেন মেঘ জমতে শুরু করেছে। ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা গায়ে এসে লাগে। মঞ্জরী জানলা দিয়ে আকাশ দেখে। বলে—ইস্, কি মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে।

আমি জানলার দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। আমার কাঁধ ধরে মঞ্জরী সরিয়ে দেয়।

'জানলার কাছে যেও না' —কেউ দেখে ফেলবে—সতর্ক করে ও। অথচ এখন আমার মেঘ দেখার, বৃষ্টিতে ঝুপঝুপে হয়ে ভেজা দরকার। আমার রক্তে ভানুমতীর খেলা লেগেছে। বড়ো তেতো আছি আমি। এসব কথা মঞ্জরীকে বলতে পারি না। বালিশের তলা থেকে ভানুমতীর কিস্সা' বইয়ের কোণাটা উঁকি মারে। খালি থালা, প্যাকেট একপাশে সরিয়ে, বাথরুমে ঢুকি। মাথায় একটু ঠান্ডা জল লাগাতে হবে।

ঘরে ঢুকে দেখি মঞ্জরী আকাশের দিকে তাকিয়ে বিছানার ওপর বসে আছে। ফ্যানের হাওয়ায় একগুচ্ছ দলছুট চুল ওর কপালে মাতামাতি করছে। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসি। বড়ো বড়ো ফোঁটার চড়বড় শব্দ শুরু হয়। হাঁকিয়ে বৃষ্টি নামে। তেতে থাকা পীচের রাস্তা থেকে ধোঁয়া বেরোয়। গন্ধ পাই। বৃষ্টির ফোঁটা সাবানের বলের মতো ফাটতে থাকে।

'বাড়ী ফিরব কি করে' আক্ষেপ করে মঞ্জরী।

'নাই বা ফিরলে'—আমি বলি।

'আহা'—মঞ্জরী আমার কাঁধে ঘুষি মারে।

তারপর নীচুগলায় জিজ্ঞেস করে—বালিশের তলায় ওটা কি বই?'

সামান্য চমকে উঠি আমি। সংগে সংগে সহজ গলায় বলি—দেখো না।

'অসভ্য'—মঞ্জরীর কণ্ঠস্বরের রং বদলায়।

আমি ওর মুখের দিকে তাকাই। ওকে দেখি। ওর চোখের মণি দুটো কেমন গলা-গলা, শুকনো ঠোঁট, নাকের ডগায় ঘাম। আমার রক্ত বেসামাল হয়। সবকিছু হঠাৎ কেমন গুলিয়ে যায়। এতো দিনের সংযম, বিবেক, যুক্তি ধসে পড়ে। ভুলে যাই গত ছ'মাস আমি ফেরার। হন্যে হয়ে পুলিশ খুঁজছে আমাকে। ঘরের মধ্যে ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকার। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। কড়কড় শব্দে বাজ পড়ে।

মঞ্জরীর বুকে, মুখে, কালো জ্যোৎস্নার মতো গভীর উজ্জ্বল চুলে ওকে খুঁজতে থাকি। তরমুজের ফালির মতো মঞ্জরীর ঠোঁট ভিজে, লাল। সময় বয়ে যায়। দেওয়ালে টাঙানো খাজুরাহোর যুগলমূর্তির মতো আমরা পরিতৃপ্ত, পবিত্র হয়ে শুয়ে থাকি। ছ'মাস ধরে জমে থাকা আমার রাগ, উত্তেজনা, ক্লান্তি কেটে যায়।

মঞ্জরীর ভিজে চুল শুকিয়ে গেছে। লালচে রেশমের মতো চুলে ও বিনুনি বাঁধে। বাইরে তখনও বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ।

এতক্ষণে অন্ধকার নেমেছে ঘরে। মঞ্জরী শাড়ীর ভাঁজ মিলিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসে। কেমন যেন চুপচাপ। আমিও কথা বলতে পারি না। জানলার দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে থাকি। কি এক দারুণ কষ্টে আমার কান্না পেতে থাকে। সেই গুমোট স্তব্ধতাকে ভাঙবার জন্যে হঠাৎ জিজ্ঞেস করি, তুমি বাড়ী যাবে কি করে? চমকে ওঠে মঞ্জরী। আমার দিকে তাকায়। ওর চোখ, মুখ আবছা দেখা যায়। নিজের বোকামিতে আমি মুষড়ে পড়ি। বিছানায় বসে একটা সিগারেট ধরাই। মঞ্জরী উঠে দাঁড়ায়।

দরজায় বেল বাজছে। আমার বুক কাঁপে। দরজায় বেল থামলে বা কড়া নাড়ার শব্দ হলে আমি ভয় পাই। মঞ্জরী দরজা খুলে দেয়। প্রণব ঢোকে। জল গড়াচ্ছে ছাতা দিয়ে। জামা-কাপড় ভিজে। কেমন ফ্যাকাসে দেখায় ওকে।

'বিমল আর গৌতম কাল রাতে ধরা পড়েছে' —ও বলে।

আমার বুকের রক্ত চলকে ওঠে। শীত-শীত করে। গত সপ্তাহে প্রাচী সিনেমার পেছনে একটা বাড়ীতে বসেছিলুম আমরা তিনজন। বর্তমান পরিস্থিতি আর সংগঠনের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা ছিল। ভাগ-বাটোয়ারা হয়েছে কাজের দায়িত্ব। হঠাৎ নিজেকে ভয়ঙ্কর অসহায় লাগে।

'কাল রাতে কি এক মিটিং সেরে ফেরার সময় এই দুর্ঘটনা'—প্রণব যোগ করে।

ঝিমেতালে বৃষ্টি পড়ে। সেইদিকে তাকিয়ে বসে থাকি। ঘরের মধ্যে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা। প্রণব হঠাৎ উঠে গিয়ে আলো জ্বালায়। মঞ্জরীর দিকে তাকাই। কি এক লজ্জা আর দুঃখে বুকটা ভারী হয়ে থাকে। মঞ্জরীর চাঁপা রঙের শাড়ী, শিথিল বিনুনি, টিপ মুছে-ফেলা পরিষ্কার কপালের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়, এ আমি কি করলুম! মঞ্জরী যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলে, 'আসি'। বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। হুহু হাওয়া! বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে। মঞ্জরী চলে গেলে প্রণব বলে—ছাতাটা নিয়ে মঞ্জরীকে তুলে দিয়ে আসা উচিত ছিল।

আমি কোন জবাব দিই না। আমার সমস্ত চেতনা হঠাৎ যেন অসাড় হয়ে গেছে।

মেঘ আর অন্ধকার মিশে ঘনীভূত রাত। বৃষ্টি ধরেছে এতক্ষণে। বাইরে সিক্ত পৃথিবীর টুপটাপ, ছপছপ, কুলকুল আওয়াজ। পকেট থেকে ডায়েরী বার করে প্রণব হিসেব লিখছে। চেয়ারে বসা ওর শরীরটার ছায়া পড়েছে দেয়ালে। কেমন যেন তালগোল পাকানো। লম্বা খুঁটিনাটি বলে আছে। কলমটা পকেটে রেখে ও শোনায়—গ্রেপ্তার, বাইশ হাজার তিনশো সাতাত্তর। জেলে আর জেলের বাইরে মৃত, সাতশো ছিয়াশি জন।' আমি ফাঁকা চোখে প্রণবের দিকে তাকিয়ে থাকি। ডায়েরীর হিসেব শুরু হয়েছে ওর দাদা উৎপলের নাম দিয়ে। বছর চারেক আগে পিল্টু খুন হয়েছিল। ওর খাতায় এই সংক্রান্ত আরো নানা হিসেব আছে। এখন আমার কিছুই শুনতে ইচ্ছে করছে না। কি এক আগুনে আমি জ্বলতে থাকি। প্রণব বলে—ভুল হয়ে গেছে একটা। পরশু দিন সাতটা বেওয়ারিশ লাশ পাওয়া গিয়েছিল। লেখা হয়নি। প্রণব ডায়েরী বার করে। আমার দিকে ঘোলাটে চোখে তাকায়। প্রণবকে ঠিক সুস্থ মনে হয় না। এবার আগে ও আমাকে বলে—আমি যদি মারা পড়ি হঠাৎ, তুই কিন্তু হিসেবটা রাখিস?

ঠান্ডা হাওয়া ছুটে আসে। আমার জামা

হাত, বুকে মঞ্জরীর চুলের মিষ্টি গন্ধ। সেই গন্ধে ক্রমশঃ ঘরটা ভরে যায়।

রাতে আজকাল বারবার ঘুম ভেঙে যায়। বিশেষ করে রাস্তায় হঠাৎ কোনো গাড়ি থামলে টানটান হয়ে ওঠে শরীর। দরজায় একটা নৃশংস ধাক্কার শব্দ শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকি। সে সব কিছু হয় না। ঘন নীরবতার মধ্যে নানা ধ্বনি ওঠে। ঘুম চটে যায়। বিছানা, বালিশ নিয়ে ছটফট করি। মঞ্জরীর কথা মনে হয়। ভাবি, প্রেম, ভালবাসা, নারী সংসর্গ আমার জন্যে নয়। অনেক বড়ো কাজ আছে আমার। চারপাশে অহরহ এক মহাযুদ্ধ চলেছে আমি সেই লড়াই-এর সৈনিক।

মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোনো উৎসাহ ছিল না। অন্ততঃ দিনের বেলাতে নয়। সারা দিন কাজের চাপে নাস্তানাবুদ। সহকর্মী মেয়েদের দিকে পর্যন্ত দেখার ফুরসৎ ছিল না। শুধু রাতে বিছানায় শুলে আমি বদলে যাই। রক্তের মধ্যে এক ক্ষুধার্ত কুমীর সাঁতার কাটে। স্নায়ু, শিরায় দপদপানি জাগে। রক্ত-মাংসের নিবিড় অন্ধকারে ডুবে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু রাতের আকাঙ্ক্ষা দিনের আলোয় মরে যায়। দিনমানে আমি অন্য মানুষ, শুদ্ধ, সাত্ত্বিক। এইভাবে দিনের পুণ্য আর রাতের পাপ নিয়ে সময় কাটছিল। সেই আমি আজ দিনের বেলাতেও পাপ করে ফেললুম। হাতে-কলমে সত্যিকারের পাপ। কষ্টে বুক ফেটে যায়।

শ্রীলেখা, দময়ন্তী, কেয়ার কথা মনে পড়ে। কতবার, কতদিন তাদের সঙ্গে নিভৃততর সময় কেটেছে। কিন্তু কাজের কথার বাইরে এক পাও যাইনি কখনো।

নিজের তথাকথিত কপটতা সম্পর্কে দারুণ অহমিকা ছিল আমার। ওরা ভাবতো, লোকটার রসকস নেই, পাথরের তৈরী।

একটা ঘটনার কথা মনে আছে। আমার সহকর্মীদের মধ্যে কে একজন, বোধহয় তরুণ, আমার নামে একটা ভুয়ো প্রেমপত্র লিখেছিল শ্রীলেখাকে। শ্রীলেখা রীতিমত সুন্দরী। তরুণের দুর্বলতা ছিল কিছু। শ্রীলেখা বোঝেনি চিঠিটা জাল। হঠাৎ একদিন হাতে পেলুম শ্রীলেখার এক চিঠি। কলেজের সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে, নির্জনে আমার হাতে চিঠিটা ও গুঁজে দিয়েছিল। অবাক হয়ে পড়লুম, আমার প্রস্তাবে ও রাজী, আত্মসমর্পণ করতে চায়। অস্বীকার করি না, ওর দিকে চোরা চোখে তাকিয়েছি কয়েকবার। ভালো লাগতো ওকে দেখলে। তবুও কেন যেন ভয়ানক রেগে গিয়েছিলুম। বিকেলে, সকলের সামনে চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললুম। তখন ফাগুন মাস। দক্ষিণের হাওয়ায় কাগজের টুকরোগুলো রাস্তায় মাথা খুঁড়তে থাকলো। শ্রীলেখার মুখে লাল। মাথা নীচু করে ও দাঁড়িয়েছিল। তারপর শুরু হলো তরুণের সঙ্গে ওর জমজমাট প্রেম। কলেজের শেষ পরীক্ষা হয়ে গেছে তখন।

কেয়া, দময়ন্তীর সঙ্গেও ছোটখাট কিছু স্মৃতি আছে। কিন্তু সবগুলোই একতরফা।

দিনের বেলার এই বীরত্ব রাতের অন্ধকারে গলে যায়। সারা শরীর জ্বালা করে। যে কোনো একজন মেয়ের শরীর ছুঁয়ে ভিজে যেতে ইচ্ছে করে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। সিগারেট ফুঁকি পরপর। রাজনীতি, আদর্শের কথা ভাবি। লেনিন, স্তালিন, মাও সে তুং-এর লেখা পড়ে নিজেকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু সেই সব মুহূর্তে কি দুর্বোধ্য যে লাগে লেখাগুলো! একটা লাইনও মাথায় ঢোকে না।

য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকে ঠিক করলুম এইবার একটা প্রেম করা দরকার। মঞ্জরীর কথা আমার মাথায় ছিল। মঞ্জরীকে খুঁজতে শুরু করলুম। য়ুনিভার্সিটিতে তখন ভর্তির হুল্লোড়। টাকা জমা দেওয়ার কাউণ্টারে একগাদা ফি বুক রয়েছে। আমার ফি বুকটা নিতে গিয়ে দেখলুম মঞ্জরীর বইটাও সেখানে রয়েছে। দুটো ফি বুকই পকেটে ঢোকালুম।

মাস কয়েক আগে মঞ্জরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল হঠাৎ। মিনিট দশেকের জন্যে। অনেক রাস্তা হেঁটে, সারা রাত প্রায় না ঘুমিয়ে, এক বুক উদ্বেগ নিয়ে সেদিন প্রথম গিয়েছিলুম ওদের বাড়ি। মঞ্জরীর ফি বুকটা পকেটে নিয়ে ওর প্রতীক্ষায় রোজ দুপুরে য়ুনিভার্সিটির সদর দরজায় বসে থাকি। নিশ্চয়ই ও আসবে একদিন। কখনও মনে হয়, মঞ্জরীকে চিনতে পারবো তো? কিংবা মঞ্জরী আমাকে? মঞ্জরীর মুখটা মনে আনার চেষ্টা করি। একটা অস্বচ্ছ পেন্সিল স্কেচের মতো কখনও ওর চোখ, কখনও বা নাক কিংবা চিবুক চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বেঞ্চে বসে আমার ঝিমুনি ধরে। বাইরে খাঁ খাঁ রোদ। হঠাৎ মেঘ জমে কোনোদিন। তুমুল বৃষ্টিতে ধুসর দেখায় চারপাশ।

তখন চারপাশে ব্যাপক ধরপাকড়, সন্ত্রাস। আমাদের দলের অনেক নেতা আর কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে। পালিয়েছে অনেকে। যারা আছে, তাদের মুখে তালা, কানে তুলো। আমার মন্ত্রগুরু পাড়ার হরিপদ দা সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে গলির মুখে দাঁড়িয়েছিল। চাপা গলায় ডাকলো আমাকে। বড়ো খারাপ ছিল মনমেজাজ। শ্রীলেখার চিঠি নিয়ে সেই বিকেলে কেলেঙ্কারিটা হয়েছে। আমি খুব অনুতপ্ত। কেননা, অনেক রাত বিছানায় শুয়ে শ্রীলেখার কথা ভেবেছি। তাকে কব্জা করার নানা ফন্দি এঁটেছি। স্বপ্নের মধ্যে কতো বেআইনী খেলা খেলেছি শ্রীলেখার সঙ্গে। সেই শ্রীলেখাকে নিয়ে এরকম একটা বাজে নাটকীয় কাণ্ড বাঁধিয়ে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল আমার। শ্রীলেখার কাছে মাপ চাইবো, কাঁদিবো পায়ে ধরে, এইসব ভাবছিলুম। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো। অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুলে বেশ খোলসা হয়ে যায় আমার মাথাটা। ভাবনা চিন্তাগুলো পরিষ্কার, যুক্তিসম্মত হয়।

হরিদার ডাকে দাঁড়াই।

'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল' হরিদা ফিসফিস করে—চলো, কোথাও গিয়ে বসা যাক।' হরিদা চারপাশ ভালো করে দেখে নেয়। কাছাকাছি একটা অন্ধকার পার্কে আমরা বসি। সিগারেট ধরাতে চাই। হরিদা বারণ করে। 'আমার নামে ওয়ারেন্ট আছে'—হরিদা বলে—সিগারেটের আলোয় কেউ দেখে ফেলতে পারে।

ঘাসের ওপর আমরা বসি। অদূরে অন্ধকার দোলনায় বাচ্চারা মাতামাতি করে। ফুচকাওলাকে ঘিরে একদল কিশোরী হেসে কুটিপাটি। কাজের কথাটা হরিদা গুছিয়ে বলে। রোগা, কালো ছোটখাট মানুষটার বোঝানোর ক্ষমতা আছে।

সাঁতোরাগাছি রেলওয়ে কোয়ার্টারের কাছে কোনো এক মুদীর দোকানে একটা কিডস্ ব্যাগ বোঝাই নিষিদ্ধ দলিল আর কাগজপত্র রাখা আছে। খবর এসেছে, আজ মাঝরাতে পুলিশ সে দোকানে হানা দেবে। কাগজপত্রগুলো সরানো দরকার। দোকান বন্ধ হয় রাত দশটায়। তার আগেই সেখানে পৌঁছোতে হবে আমাকে।

হরিদা পকেট থেকে একটা খাম বার করে আমার হাতে দেয়। 'এ চিঠিটা দিলেই ব্যাগটা পেয়ে যাবে'—হরিদা যোগ করে। চিঠিটা দেখি। অন্ধকারে খামের ওপরের লেখা অস্পষ্ট। বুঝতে পারি, দোকানের নাম ঠিকানা লেখা আছে।

'দশটার আগেই একটা টেম্পো আসবে দোকানের সামনে' হরিদা বলে, ওটা ডান কাঁনির এক কমরেডের গাড়ি। ব্যাগটা নিয়ে তুমি উঠে পড়বে গাড়ীতে।' এবার ছোট একটা কাগজের টুকরো আমার হাতে গুঁজে দিয়ে

হরিদা বলে—'এ ঠিকানায় ব্যাগটা পেঁছে দেবে ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছে।'

অন্ধকারে হরিদার মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না। আকাশের দিকে তাকাই। কয়েকটা ফ্যাকাসে তারা জ্বলে।

'ভয় পেলে নাকি'—জিজ্ঞেস করে হরিদা।

আমি জবাব দিই না। হরিদা পাঁচটা টাকা আমার হাতে গুঁজে দেয়। রাহা খরচ। আমরা দুজনে পার্কের বাইরে আসি। ঘড়ি দেখে বুঝি, এখনি রওনা হতে হবে। বাড়ি ঢোকা হয় না। এক প্যাকেট চারমিনার আর দেশলাই কিনে পকেটে ঢোকাই।

খাঁতরাগাছিতে সেই দোকান খুঁজে পেতে রাত নটা বেজে গেল। দোকানী মোটা, কালো এক লোক। মাথার গোটা দশেক চুলে সন্নেহে চিরুনি বোলাচ্ছিল। ফেত্তা দিয়ে কাপড় পরা, আদুল গা। দোকানের ভেতর ঝোলা গুড় আর কেরোসিনের গন্ধ। খদ্দের ছিল না। চিঠি পড়ে লোকটা এক-চমক দেখলো আমাকে।

'ঠিক সময়ে এসেছেন'—সে জানায়—ঝাঁপ ফেলার জোগাড় করছিলুম। ভেতর থেকে সে ব্যাগটা এনে দেয়। বেশ বড়ো, ভারী ব্যাগ। ব্যাগের মুখে চেন লাগানো। দোকানের বাইরে নিকষ অন্ধকার। সন্ধানী চোখে একটা টেম্পোকে দেখার চেষ্টা করি। সাড়ে নটা নাগাদ লোকটা দোকান বন্ধ করে চলে যায়। সেই কাগজের বোঁচকা নিয়ে অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে থাকি। রাস্তায় লোকজন নেই। একটা সন্দিগ্ধ কুকুর মাঝে মাঝে দেখছে আমাকে। রেল ইয়ার্ডে শান্টিং এর শব্দ, ইঞ্জিনের হাঁসফাঁস।

ক্লান্তিতে মাথা ঝিমঝিম করে। দুটো পা ভারী। আকাশে তখন অনেক তারা। ঠান্ডা হাওয়া ছেড়েছে। গাছের পাতায় ঝিলমিল শব্দ।

এগারোটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে টেম্পোর আশা ছেড়ে দিই। স্টেশনে এসে শুনি, শেষ গাড়ি চলে গেছে পাঁচ মিনিট আগে। এতক্ষণে আমার কেমন অস্বস্তি হয়, শিরশির করে বুক। দুজন টহলদার রেল পুলিশকে দেখে তাড়াতাড়ি রাস্তায় এসে নামি। ফাঁকা রাস্তা। জোরালো হেড লাইট জেলে ঝড়ের গতিতে একটা লরি ছুটে যায়। সেই ভারী ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে নির্জন, স্তব্ধ রাস্তায় হাঁটতে থাকে। পথ চলতি দু-একটা লোকের মুখোমুখি হই। তারা দেখে। আমি সিগারেট টানি। বুকের কমছমানি কাটাতে চাই। পুলিশের টহলদার গাড়ি দেখলেই লুকিয়ে পড়ি। কোনো বাড়ির রকে বসে যাই, কখনো ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকি। একসময় হাওড়া ব্রিজের মাথার লাল আলো চোখে পড়ে। বুকে বল পাই। মাথার ওপর ব্যাগটা পাহাড়ের মতো ভারী ঠেকছে। দুটো হাত, পা, কাঁধ টাটিয়ে উঠেছে যন্ত্রণায়। তবু ওই লাল আলো লক্ষ্য করে হাঁটতে থাকি। লাল আলোটা আমাকে পথ দেখায়।

হাওড়া ব্রিজের কাছে এসে ঘড়িতে দেখি, রাত একটা। ব্রিজের মুখে দুটো পুলিশ ভ্যান মোতায়েন। আর এগোতে ভরসা পাই না। স্টেশন চত্বরে লোকজন নেই। জনা পাঁচেক কুলি গোল হয়ে গাঁজা টানছে। স্টেশনের ভেতরে ঢুকি না। শুনেছি, ওখানে সব সময় সাদা পোশাকের পুলিস থাকে। গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়াই। ভিজে হাওয়ায় শরীর জুড়োয়। ঢেউয়ের ছলছল শব্দ শুনি। স্রোতের জলে তারা নাচে। ঘাটে বহু লোক ঘুমোচ্ছে। মাথার নীচে ব্যাগ রেখে তাদের মধ্যে আমিও জায়গা করে নিই।

অনেক সকালে ঘুম ভাঙে। তখনও সূর্য ওঠেনি। ঘাটে স্নানার্থীর ভীড়। ভীষণ খিদে পেয়েছে। একটা খাবারের দোকানে ঢুকি। গরম কচুরি, চা খাই। ঢাকুরিয়ার ঠিকানাটা পেতে কপালে ঘাম জমে গেল। তখন সূর্য জেগেছে। খর রোদ, তাপ। কড়া নাড়তে এক তন্বী দরজা খুলল। বিস্ময়ের চোখে সে দেখলো আমাকে। নিশ্চয়ই আমাকে তখন চোরের মতো দেখাচ্ছিল। চিরকুটে যে ভদ্রলোকের নাম ছিল তিনি এলেন। ভেতরে ঢুকলুম। আমার ভাইঝি, মঞ্জরী—ভদ্রলোক জানালেন—তোমার তো কাল রাতেই আসার কথা।' সব ঘটনা শুনে তিনি অবাক। মঞ্জরী ডাগর চোখে দেখছিল আমাকে। কথাপ্রসঙ্গে জানলুম, মঞ্জরীও এ বছর য়ুনিভার্সিটিতে আসছে।

সেই কয়েক মিনিটের দেখা মঞ্জরীকে বৃষ্টির অজস্র কুয়াশার মধ্যে মনে আনার চেষ্টা করি। আমি জানি, অসুবিধে হবে না। সে চোখদুটো ভোলার নয়।

মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা হলো শেষ পর্যন্ত। ফি বুকটা এগিয়ে দিতে ও বললো—আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান। ভয় হলো বোধহয় হারিয়ে গেছে। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলুম।

রাগ নেই তো—জানতে চাই। মঞ্জরী চোখে আলো ছড়িয়ে হাসে। মঞ্জরীর ওপর পুরোনো আকর্ষণটা কয়েকদিনেই গাঢ় হয়ে উঠলো। কোমর বেঁধে সাতদিনের মাথায় প্রেম নিবেদন করলুম। তড়িঘড়ি করা আমার স্বভাব। দেরি করলে সব কিছু হয়তো ফসকে যাবে, হারিয়ে যাবে, এই রকমের একটা ভয় ছেলেবেলা থেকে আমার আছে। ব্যাপারটাকে আরো পাকাপোক্ত করার জন্যে রেস্টুরেন্টের অন্ধকার কামরায় চুমু খেলুম প্রথম হপ্তায়। দ্বিতীয় মাসে ছুঁয়ে দেখলুম, ওর শরীরের চড়াই উৎরাই। তৃতীয় মাসে জড়িয়ে ধরলুম। পরের মাসে হঠাৎ একদিন মাঝরাতে পুলিস বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেল আমাকে।

এই কয়েক মাস মঞ্জরীর সঙ্গে নিয়ম মাফিক প্রেম করেছি। পাশাপাশি দুটো বাড়িতে ক্লাস হতো আমাদের। হপ্তায় একদিন দেখা করতুম আমরা। হঠাৎ কোনদিন বা করিডরে দেখা হয়ে যেত। কিন্তু

কথা বলার সুযোগ হতো না। রাজনীতির উথর্ম তুলকালাম অবস্থা। দম ফেলার সময় নেই। বুঝতে পারতুম মঞ্জরী রাগছে। ওর মনে জমছে ক্ষোভ, অভিযোগ। কিন্তু মঞ্জরী নির্বাক। বলতো না কিছু। নিঃশব্দে হজম করতো আমার জবরদস্তি।

আমার ধারণা ছিল মঞ্জরীকে আমি পরিষ্কার বুঝি। ওর বানানো সংকট দেখে তাই হাসি পেত। ওর দিকে বেশী সময় বা মনোযোগ দেওয়ার অবস্থা তখন ছিল না। সেই ঘাটতি মেটাবার জন্যেই অন্ধকার কেবিনে ওর শরীর নিয়ে নিঃশব্দে হৈ চৈ করতুম। অবশ্য সেটা একেবারে ওপর ওপর। মঞ্জরী সীমান্ত পেরোতে দেয় নি।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন কাঠ কাঠ, যান্ত্রিক লাগতো। চোখের আড়ালে গেলেই ভুলে যেতুম মঞ্জরীকে। দেখা হলে, ঢাকা কেবিনে না বসা পর্যন্ত আমার প্রেমে জোয়ার আসতো না। প্রাণপণে নিজেকে আদর্শ প্রেমিক বানাবার চেষ্টা করতুম। মনে মনে কার কাছে যেন প্রার্থনা করতুম, আমায় একটু প্রেম দাও, গাঢ় গভীর প্রেম।

মঞ্জরী বুঝতো আমার সংকট। আমার প্রেম যে নকল, লোক দেখানো ব্যাপার, এতে তার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই বাবদ আমার লজ্জা আর কষ্টের তীব্রতা ও ধরতে পারতো। ওর ধারণা ছিল, আমি চেষ্টা চালাচ্ছি, একদিন সত্যিকার প্রেমিক হবো। ও আমায় মেনে নিত।

এই সময় পরিচয় হলো কণিকার সঙ্গে। এক ক্লাসে আমরা পড়তুম। বড়ো অদ্ভুত মেয়ে কণিকা, চুপচাপ শান্ত। কম কথা বলেও যে অনেক বেশী আকর্ষণ করা যায়, এটা কণিকা জানতো। কণিকার শরীরে, মুখে ছিল চাপা রোদের স্নিগ্ধ জ্বলজ্বলে ভাব। গান গাইতো ভালো। সেই সুবাদে পরিচয়। তারপর ও এলো আমাদের সংগঠনে। য়ুনিভার্সিটিতে সারাদিন ও ছায়ার মতো লেগে থাকতো আমার সঙ্গে। কাজের জন্যে যেদিন বাইরে থাকতুম, সেদিন ও একা একা নিজের মনে পাক দিতো য়ুনিভার্সিটি চত্বর। সংগঠনের অনেক দায়িত্ব নিশ্চিন্তে চাপিয়ে দিয়েছিলুম ওর ঘাড়ে। প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত ও থাকতো। দু-চারটে মামুলী কাজের কথা হতো। রোজ রাতে কণিকা ফোন করতো আমাকে। রাত দশটা সাড়ে দশটায় রিসিভার বাজলে বুঝতুম কণিকার

ডাক। নানা ব্যক্তিগত কথা হতো তখন। অবশ্য তার একটিরও প্রেমের কথা নয়। যেমন, 'একটা গান শুনবে নাকি?'

'শোনাও।'

'তুমি কানে রিসিভার লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়।'

'সে কি?'

'গান গেয়ে তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দেবো।' প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো না ওর টেলিফোন। কিন্তু আতংক ধরে গেল শেষ পর্যন্ত। রোজই দেখা হতো, কথা হতো টেলিফোনে। হঠাৎ দুদিন অন্তর খামে মোড়া মোটা মোটা চিঠি পাঠাতে লাগলো ও। খুঁটিনাটি নানা কথা, জীবনের কিছু সমস্যা আর প্রশ্ন, এইসব হলো ওর চিঠির বিষয়। এক লাইনও প্রেমের কথা নেই। কণিকাকে আমার কেমন রহস্যময় লাগতো। বুঝতে পারতুম না ঠিক। বিরক্ত হতুম, অথচ এড়ানো যেত না। কোনদিন ফোন ধরেই কেটে দিতুম। কড়া কথা শোনাতুম। কাজ হতো না। আবার ফোন বাজতো।

সব চিঠিতেই ও লিখতো, জবাবের আশায় থাকবো। সাড়া করতুম না আমি। কণিকার সঙ্গে সম্পর্কটা এক কষ্টকর ধাঁধার মতো হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু আমার অবহেলা বা বদমেজাজ টলাতে পারলো না ওকে। একইভাবে ছায়ার মতো ও অনুসরণ করতে থাকলো। মঞ্জরী আর কণিকা পরস্পরকে চিনতো, কিন্তু কথা বলতো না কেউ।

মঞ্জরীর সঙ্গে একটু ভুল বোঝাবুঝি হলো। আমার সঙ্গে কণিকাকে জড়িয়ে নানা গুজব ছড়িয়েছে বন্ধুরা। মঞ্জরী সে সব শুনেছিল। কণিকার সঙ্গে ওর ঠাণ্ডা লড়াইটা বরফের মতো কঠিন আর ধারালো হলো। কণিকা ছিল খুব ফর্সা। সাদা তাঁতের শাড়ি পড়তো। আড়ালে ওকে সকলে ডাকতো সিস্টার নিবেদিতা। মঞ্জরীর বন্ধুরা বলতো—সিস্টার নিবেদিতা একটা ছিনে জোঁক। সব সময় গায়ে লেপটে থাকে। 'প্রশ্রয় দেওয়াই বা কেন'—ফোড়ন কাটতো কেউ।

একদিন শেষ বেলায় আধো অন্ধকার এক কেবিনে বসে এইসব কথা বলতে গিয়ে মঞ্জরীর চোখ ভিজে গেল। গলা প্রায় বুজে যাওয়ার অবস্থা!

'এসব কি'—কৈফিয়ৎ চাইলো। সে—এভাবে নাচাবার মানে কি?'

খুব রাগ হচ্ছিল আমার। এক ক্ষুব্ধ অভিমান ঘিরে ধরছিল আমাকে। আমার যে কিছু করার নেই, এটা মঞ্জরী বোঝে না কেন। মেয়েরা বড়ো স্বার্থপর। আমি গুম হয়ে বসে থাকি। হঠাৎ দারুণ রাগ হয়। সেই নির্জন কেবিন, গোপনীয়তা আর রহস্য আমার ক্রোধের সঙ্গে মিলে-মিশে সটান উত্তেজনার চেহারা নেয়। আমি ভালো কথা ভুলে যাই। আদিম জংলীদের মতো নিষ্ঠুর হাতে আমি মঞ্জরীর শরীরে বেপরোয়া দামামা বাজাতে থাকি। রেস্টুরেন্ট থেকে যখন বেরোলুম, চারপাশ অন্ধকার, রাস্তায় আলো জ্বলছে। মঞ্জরীর রাগ জল। মিটমাট হয়ে গেছে সব।

পার্টি মহলে ইতিমধ্যে আমাকে নিয়ে গুজগুজ ফুসফুস শুরু হয়েছিল। বেশীর-ভাগ সহকর্মী আর সংগঠনের ওপর আমার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। তাই চট করে কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায়নি।

দলের ওপর মহলের এক নেতা একদিন বললেন—এসব কি শুনছি হে? নেতার গায়ের রং রোলিং মিলে সদ্য তৈরি স্টীল প্লেটের মতো ঝকঝকে কালো। পরনে পরিষ্কার ধুতি, পাঞ্জাবী। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। খৈনি বানাচ্ছিলেন তিনি। হাতের চেটোয় গুঁড়ো দোক্তার ওপর দুই চাপড় বসিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজলেন।

'কি ব্যাপার'—জানতে চাইলুম।

নেতা একপলক চেয়ে থাকলেন আমার দিকে। জিভের ডগা থেকে গুঁড়ো দোক্তা থুথু করে ফেললেন মেঝের ওপর। তারপর বললেন—রাজনৈতিক আদর্শ পবিত্র জিনিস। খুব সহজেই জাত যায়। মেয়ে-মানুষ আর আদর্শের দ্বন্দ্ব বড়ো সাংঘাতিক। ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়া-লিজমের নিয়ম মানে না। কিছু বলার ছিল না। বসে রইলুম চুপচাপ। নেতা সুরুৎ করে খৈনির রস টেনে বললেন—তোমায় বিশ্বাস করি। আদর্শ জলাঞ্জলি দিও না।

নীচে রাস্তায় তখন বাঁদর নাচ হচ্ছিল। ডুগডুগি বাজছিলো তালে তালে। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল আমার।

সেই রাতে পুলিশ তুলে নিয়ে গেল আমাকে। মনে অনেক অভিমান জমে ছিল। জেলখানায় একা একা বসে সে সব কথা ভেবে মনটা হু-হু করতো। চারপাশে লাল ইঁটের উঁচু দেওয়ালে বর্শামুখ লোহার পাঁচিল বেষ্টনী, খাঁ-খাঁ মাঠ, ঘাস, লতা কম। বড়ো গাছগুলোতে পাতা নেই, বিবর্ণ ফ্যাকাসে ডালপালা, মানুষের হাড়ের মতো। প্রায়শ মনে হতো সকলে যেন অবিচার করেছে আমার ওপর। আমার দেশ, মৃত বাবা, জীবিত মা, দাদা, গভর্ণমেন্ট, দলের নেতা, এমন কি মঞ্জরী পর্যন্ত। দিন সাতেক বাদে এই চিন্তাটা ফিকে হয়ে এলো। শরীরের মধ্যে কি এক অস্বস্তি খোঁচা মারে। আমাদের দলের অনেক লোক ছিল ভেতরে। একসঙ্গে কাগজ পড়া, আলোচনা, মিটিং, আড্ডা সবই হতো। কিন্তু তার মধ্যে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেতুম। মাথায় জমে থাকতো পাথরের মতো ভারী এক শূন্যতা। অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে ছটফট করতুম। মঞ্জরীর কথা মনে পড়তো। ভারতরক্ষা আইনে ধরেছিল আমাকে। সুতরাং তাড়া-তাড়ি ছাড়া পাওয়ার আশা ছিল না। দীর্ঘ মেয়াদী হাজতের কথা ভেবে কষ্টটা আরো টাটিয়ে উঠতো।

মঞ্জরীর সঙ্গে আলাপের কথা মনে পড়ে। তখন আমার কাঁচ বয়েস, বুদ্ধি কম, প্রেম করার বেপরোয়া তাগিদ ছিল। এখন মনে হয়, ওটা কি সাচ্চা প্রেম? শুনেছি প্রেমে পড়লে বুকের মধ্যে কেমন আনচান করে, কান্না পায়, বদলে যায় দিন রাতের রং। আমার কিন্তু সেসব কিছুই হলো না। বরং, সাত দিনের দিন মনে হলো চুমু খাওয়ার নাম প্রেম। সুতরাং চুমু খেলুম। কিন্তু নাস্পে সুখ-মস্তি। শুধু চুমুতে সুখ নেই। আরো চাই। আরো। আরো। শরীরের নেশায় ডুবে গেলুম আমি।

মঞ্জরী কিন্তু বেশী দূর এগোতে দেয়নি। বলেছে—'এটা রেস্টুরেন্ট মনে রেখো।' কিংবা 'শরীরটা তবলা নয়, সেতার। বিয়ে হোক, বুঝতে পারবে।'

আমি যুক্তি দেখাই নি। জোরও করিনি। শুধু একটা জ্বলন্ত আগুন পিংপং বলের মতো আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত লাফিয়ে বেড়িয়েছে।

জেলে আসার দিন সাতেক বাদে মঞ্জরীর একটা চিঠি পেলুম। গভীর অনুরাগ ছিল চিঠিটায়। ও লিখেছিল—'শরীরের যত্ন নিও, দুশ্চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মঞ্জরীর চিঠিটা পড়ে আমার কেমন লজ্জা করে। ওর আন্তরিকতার পাশে আমার নিজেকে খুব খেলো মনে হয়। মঞ্জরীকে অবহেলা করার, দুঃখ দেওয়ার নানা স্মৃতি মনে আসে। মঞ্জরীর মতো একটা নিষ্পাপ, সরল মেয়েকে আমি বোধ-হয় ঠকাচ্ছি। এক কণ্টকময় পাপবোধে আমি ভুগতে থাকি। মঞ্জরীকে একবার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। অন্ধকার কুঠরিতে নিঃশব্দে চীৎকার করি—আমার বুকে একটু প্রেম দাও।

মনের সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা আমি এখন ভাবতে থাকি। মেয়েদের শরীর ফুলের মতো। জোর করে পাপড়ি খোলা যায় না। অনেক চমৎকার সংলাপ ফুলের তোড়ার মতো মঞ্জরীর জন্যে আমি বেঁধে রাখি। মঞ্জরীর দুঃখ, অভিমান আমি বুঝতে পারি। আমি একটা গর্দভ। কার-বাইড দিয়ে প্রেম পাকে না।

আমার সেলের বন্ধ গরাদের সামনে রাতের পাহারাদার বিড়ি টানে। আড়চোখে আমাকে দেখে। হাতের লম্বা লাঠিটা বারান্দার থামে হেলিয়ে রাখে। ওই সরু লাঠিটার ওপর কাত হয়ে ও ঘন্টার পর ঘন্টা মেজাজে ঘুমোয়। জেলের পেটা ঘড়িতে রাত দুটো বাজে। অন্ধকারে একটা পেঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়। আমার ঘুম আসে না।

জেলের মধ্যে আমার মনমরা ভাবটা অনেকের চোখে পড়ে। কেউ জিজ্ঞেস করে—শরীর খারাপ নাকি? ঠাট্টা করে অনেকে।

দিন শেষ হয়ে এলে পশ্চিম আকাশে খুন-খারাপির রং লাগে। বিরাট নিমগাছটার নীচে বসে থাকি। সামান্য ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। শান্তিপুরের মনুদা এসে পাশে বসে। আকাশের দিকে তাকায়। আমাকে বলে—মন খারাপ করিস না। বিয়ের সাতদিন পর থেকে আমি ঘরছাড়া। এক বছর লুকিয়ে ছিলাম। তারপর ধরা পড়ে যাই।

মনুদার দিকে অবাক চোখে তাকাই। মনুদা হাসে, যোগ করে—অথচ কল্যাণীর সঙ্গে দশ বছর ধরে আমার ভালোবাসা। বিয়ের পর কোথায় যাবো, কি করবো, এই সব নিয়ে বাঃ, সাধ ছিল। মোহ কাটাতে হবে। মনুদা যেন এখন নিজের সঙ্গে কথা বলে। কিছু বাদে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। হেঁটে চলে চৌকোর দিকে। মনুদা আমাদের চৌকোর ম্যানেজার। ভালো রাঁধতে পারে।

কি যেন একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। এটা প্রায় ভাবি। বড়ো হেলাফেলা করে ওপর ওপর দেখেছি জীবনটা। আজকাল গভীরতর অন্য এক জীবনের ইঙ্গিত পাই। কিন্তু সেটা এখনও অস্পষ্ট, ভাসাভাসা। পরিষ্কার করে ভাবতে বা বুঝতে গেলে বুদ্ধিটা কেমন ঘুলিয়ে যায়।

শুনলাম, কনিকার বুদ্ধিও ঘুলিয়ে গেছে। দিন তিনেক আগে বিশু খবরটা পড়েছে। ও দিল খবরটা! কনিকার মাথাটা বিগড়ে গেছে। কোন এক তান্ত্রিকের কাছে যাচ্ছিল কিছুদিন। মঞ্জরীকে মারণ বান মারার জন্যে। হাতের বটুয়ায় একটা ধারালো ছুরি রাখতো সবসময়। শেষ পর্যন্ত ও নাকি তান্ত্রিকের ভৈরবী হয়ে গেছল। দিন-রাত পড়ে থাকতো তান্ত্রিকের ডেরায়। করোটিতে ভয়ে কারণ খেত। বাড়ির লোকেরা দিন কয়েক আগে রাঁচির পাগলা গারদে দিয়ে এসেছে ওকে। কনিকার জন্যে কষ্ট হয়।

কনিকা ব্যাগে ছুরি নিয়ে ঘুরতো কেন? ও কি মঞ্জরীকে খুন করতে চেয়ে-ছিল? অথবা ওর নিজের খুন হওয়ার ভয় ছিল? কনিকার সঙ্গে দেখা হলে হয়তো জানা যাবে। ভয়ের কথায় বাবার মুখ মনে পড়ে।

আমি তখন সবে স্কুল শেষ করেছি। বাবা মারা গেল। সেই রাত বাবার মুখ, ফুল, কান্না—গোটা ছবিটা আজকাল বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাবা শেষদিকে কেমন যেন হয়ে গেল। অফিস থেকে হঠাৎ হঠাৎ দুপুরে ফিরে আসতো। চোখ-মুখে ছড়িয়ে থাকতো ভয়, আতঙ্ক।

'ছেলেমেয়েরা সব ভালো তো'—জিজ্ঞেস করতো বাবা।

'যতো সব অলুক্ষণে কাণ্ড—মা রেগে যেত।

বাবা খানিক অপ্রস্তুত, বলে—না, হঠাৎ আমার কেমন যেন মনে হলো।'

এ ঘটনা অন্তত বার দশেক হয়েছে।

'আমি যদি ফট করে মরে যাই, তবে আমার ছেলেমেয়েগুলোর কি হবে—নিজের মনে বিড়বিড় করতো বাবা।

ছোট বোন মিনু তখন বেশ বড়ো হয়েছে। বাবা ওকে সব সময় বুকে জড়িয়ে রাখতে চাইতো। হাত বোলাতো মাথায়। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে বুঝতুম আমার মাথায়, বুকে বাবা হাত বোলাচ্ছে। কোন কোন সন্ধ্যাতে আমার পড়ার বই-গুলো নিয়ে বাবা দেখতো। বলতো—'সব ভাবে থাকবে। ক্ষতি করবে না কারো। তাহলে তোমারও কোন ক্ষতি হবে না। জীবনটা ভীষণ দামী।'

সব কথা ঠিক বুঝতুম না।

এক বুক মায়া নিয়ে বড়ো অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবাকে মরতে হলো। মৃত্যুর পরও
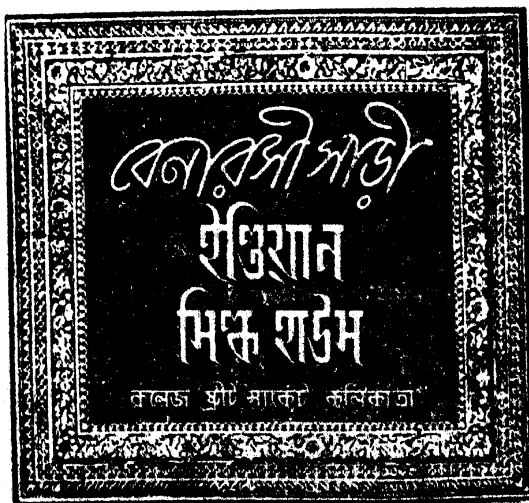
শরীর অসাড়, কথা ছিল না মুখে। জ্ঞান ছিল। আমরা চার ভাই-বোন দাঁড়িয়েছিলুম বাবার সামনে। বাবা তাকিয়েছিল আমাদের দিকে। চোখ থেকে অঝোরে জল পড়ছিল। মারা যাওয়ার পরও দু চোখ পলকহীন। চোখের কোলে শুকনো জল। তুলসীপাতা দিয়ে চোখ ঢাকা হয়েছিল।

বাবার কথামতো আমি ঠিক করেছিলুম সৎ থাকবো, ক্ষতি করবো না কারো। জীবনটা কেন মূল্যবান, এই রহস্য উদ্ধার করতে গিয়েই গণ্ডগোল বেঁধে গেল। আস্তে আস্তে মা, দাদা, আত্মীয়-স্বজন থেকে আমি দূরে সরে যেতে থাকলুম। আমার চাল-চলন চোখ-মুখের রং বদলে গেল।

দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায়। জেলের লোহার গরাদে চাঁদের হাল্কা আলো লেগে থকে। রকের থামে লাঠিতে ঠেস দিয়ে সিপাই ঘুমোয়। নিমগাছের পাতা হাওয়ায় কাঁপে। নিঃসঙ্গতার চাপে মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসে। হপ্তায় একদিন বাড়ির লোকেরা দেখা করতে পারে। মা বা দুই দাদার কেউ আসে। মঞ্জরীর সঙ্গে একবার দেখা করার জন্যে দারুণ অস্থিরতা জাগে। বিকেলবেলার ইন্টারভ্যুর সময়ে একবুক প্রত্যাশা নিয়ে প্রতিদিন বসে থাকি। রোজ মনে হয়, আজ মঞ্জরী আসবে। জেল গেট থেকে চিরকুট হাতে কোনো মেটকে আসতে দেখলে বুক গুড়-গুড় করে। নিশ্চয়ই ডাক পড়বে আমার। মঞ্জরী এসেছে। মঞ্জরী আসে না। আমার অন্তরাত্মায় কি এক কান্না মুচড়ে ওঠে।

মঞ্জরীর চোখ দুটো এখন সব সময় মনের মধ্যে ভাসে। ওর চোখে কি এক দুঃখ আছে। কারুণ্য কাজলের মতো। মেয়েদের চোখকে সুন্দর করে। দু মাস কেটে গেল।

মরা গাছগুলোয় কুয়াশার মতো কচি পাতা ধরেছে। অদ্ভুত এক হাওয়া বইছে আজকাল। রক্ত চনমন করে। এর মধ্যে সেই পুরোনো খিদে বা যন্ত্রণা নেই। কি এক স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকি।

যতো দিন মঞ্জরীর কাছাকাছি ছিলুম, ওকে ভালো করে দেখিনি, বুঝিনি। নিজের কাজে ডুবে ছিলুম। আজ এই কয়েদখানায় বসে তার জন্যে অনুতাপ করি। সহবন্দীরা নানা প্রশ্ন আলোচনা করে, তর্কবিতর্ক জুড়ে দেয়। আমি কোনো রস পাই না। বুকের পাঁজরটা হঠাৎ যেন ফুটো হয়ে গেছে। জ্যোৎস্নায় ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগে। মনে হয়, একবার যদি এখন বাইরে যেতে পারতুম, ময়দানের নরম, সবুজ ঘাসে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকতে পারতুম কিছু সময়। আর মঞ্জরী যদি থাকতো আমার পাশে।

পাশের সেল থেকে মনুদা চীৎকার করে —বামাদা কেমন চাঁদ উঠেছে দেখছেন? বৌদির কথা মনে পড়ছে নাকি।' বামাদার বয়েস বছর ষাটেক। ত্রিশ বছর আগে, বিয়ের ছ' মাস বাদে স্ত্রী মারা গিয়েছিল। বামাদা তখন জেলে। মনুদার প্রশ্নে বামাদা হা হা করে হাসে। বলে, না হে, আমি ভাবছি, বাটির মাংসগুলো রোজ কে খেয়ে যায়?'

প্রত্যেকের ঘরে রাতের খাবার বিকেল থেকে ঢাকা দেওয়া থাকে। মনুদা বলে—বেড়াল বোধহয়। বামাদা জবাব দেয়—সাংঘাতিক বেড়াল। ঢাকা খুলে মাংস খায়। হাড়গুলো আবার ঝোলে ডুবিয়ে রাখে।'

বিকেলে একজন মেট এসে আমার নাম ধরে হাঁক দেয়। হৃৎপিণ্ড ধক করে ওঠে। গায়ে জামা চাপিয়ে জেল অফিসে হাজির হই। মঞ্জরী বসে আছে। নিভৃত ঝর্ণার মতো কি এক সুখ আমার বুকে বইতে থাকে। কি ঠাণ্ডা তার জল। ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌ শব্দ হয়। সেতার বাজে। অবাক চোখে মঞ্জরীকে দেখি। আমরা দুজনে মুখোমুখি বসি। মঞ্জরী কয়েক প্যাকেট সিগারেট দেয় আমাকে। সাদা পোশাকের একজন পুলিশ অফিসার নজর রাখে। মঞ্জরীর চোখে খুশীর ঝিলিক, মেঘ রোদ্দুর খেলা করে।

'দেখা করা কম ঝামেলা'—মঞ্জরী বলে—'গত দু মাসে পারমিশনের জন্যে কমপক্ষে দশবার ধর্ণা দিয়েছি।' মঞ্জরী হাসে। আমার কথা আটকে যায়। বলতে ইচ্ছে করে—তুমি না এলে আমি হয়তো মরে যেতুম।'

মঞ্জরী কথা বলে যায়। ওর সুরেলা গলায় সেতার বাজে। আমি চুপচাপ শুনতে থাকি।

'তুমি বড়ো গম্ভীর হয়ে গেছো—মঞ্জরী জানায়—তোমার শরীরটা শুকনো। খেতে দেয় ঠিক মতো?'

পুলিশ অফিসার গলা খাঁকারি দেয়। মঞ্জরী চমকে ওঠে। আমি হাসি। মঞ্জরী নরম চুলে একটু হাত বোলাতে ইচ্ছে করে। পারি না। অফিসারটা টিকটিকির মতো ড্যাবাড্যাবা চোখে তাকিয়ে থাকে।

আমি বলি—বেশ আছি। এবার বোধহয় ছেড়ে দেবে। সব কথাই বানানো। তবু মঞ্জরীর মুখে খুশির রংটা ছড়িয়ে থাকুক। বাইরের অনেকের কথা জিজ্ঞেস করি। মঞ্জরীও নানা খবর দেয়। শুধু কণিকার প্রসঙ্গ আমরা তুলি না। এড়িয়ে যাওয়াটা দুজনেই বুঝতে পারি।

একসময় অফিসার বলে—সময় হয়ে গেছে।'

মঞ্জরী উঠে দাঁড়ায়। আমি জেল গেটের দিকে এগিয়ে চলি। মঞ্জরী দেখছে আমাকে। আমার পেছনে তাকাতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ঘাড় ফেরাই না। বুকের ভেতরকার ঠাণ্ডা জলের সেই ঝর্ণাটা হয়তো চোখের কোণায় লাফিয়ে উঠবে। বিশাল নিমগাছটার তলায় এসে হঠাৎ মনে হয়, মঞ্জরীকে অনেক কথা বলার ছিল। কিছুই হলো না।

ছ' মাস বাদে ছাড়া পেলুম জেল থেকে। বন্ধুদের ভীড় লেগে গেল বাড়ীতে। নেতারা ঘনঘন তলব পাঠাতে লাগলো। মঞ্জরীকে নিয়ে এক সন্ধ্যেবেলায় ময়দানের সবুজ ঘাসে বসলুম। ভিজে হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি হবে হয়তো। আকাশে তারা জ্বলছে কয়েকটা। মঞ্জরীর শাড়ী আমার কনুই ছুঁয়ে থাকে। ওর শরীর আর চুল থেকে মিষ্টি গন্ধ ওড়ে। জেলখানার অন্ধকার ধূপসি ঘরগুলোর কথা মনে এলে গা ছিম ছিম করে। মঞ্জরী বলে—কি ভাবছো?'

'কিছু না।'

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকায়। মঞ্জরী বলে—চলো, ওঠা যাক, বৃষ্টি আসবে।'

পাশাপাশি দুজনে হাঁটি। মেট্রোর কাছাকাছি পোঁছোতেই তুমুল বর্ষণ শুরু হলো। আশ্রয়ের খোঁজে মানুষজন পড়িমরি দৌড় লাগায়। একটা রিকসায় উঠি আমরা। বৃষ্টির ছাট থেকে বাঁচাবার জন্যে রিকসাওয়ালা সামনের পর্দা ফেলে দেয়। রাস্তা ফাঁকা, অঝোর বৃষ্টি। রিকসাওয়ালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃষ্টিও ছুটে চলেছে আমাদের সঙ্গে। ফাঁক-ফোকর দিয়ে জলের মিহি গুঁড়ো উড়ে আসে। রাস্তার আলোগুলো অসহায়ের মতো জলে ভেজে। মঞ্জরী আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁট ছোঁয়ায়। মিষ্টি, ঘন, নরম স্পর্শ। আমি আপ্লুত হয়ে যাই।

এর মধ্যে রাজনীতিতে ঝড় ওঠে। দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। আমাকে শিখণ্ডি খাড়া করে নেতারা অধিকাংশ ছাত্র, যুব, তরুণ কর্মীকে দল থেকে তাড়াতে শুরু করে। কিছু বয়স্ক কর্মীও ছাঁটাই হয়। বিতাড়িত লোকের সংখ্যা বাড়ে। তাদের পেছনেও সমর্থকদের ভীড় হয়। খেলা জমে ওঠে। আমাদের নামে ভয়ংকর সব অভিযোগ চাপা গলায় কানে কানে ছড়িয়ে পড়ে। দারুণ আশংকায় দিন কাটে। মঞ্জরীর সঙ্গে এক সন্ধেতে দেখা হয়। কি সব শুনছি?—' মঞ্জরী জিজ্ঞেস করে।

'ঠিক শুনেছো—আমি বলি—আমরা কাউকে ছাড়বো না। ওই ভণ্ড নেতাগুলোকেও নয়।'

মঞ্জরীর চোখে বিষণ্ণতা নামে। ও জেনেছে, আজকাল আমার রক্তের ভয় কেটে গেছে। তার মানে আমার স্বাধীনতা শেষ, আয়ু শেষ।

আমি ওকে সাহস দিই—ঘাবড়িও না। এরকম হয়।' আমরা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকি। চিংড়ির কাটলেট আর চা খাই। আমি চাইছিলুম, আমার বিশ্বাস, কাজকর্ম নিয়ে মঞ্জরী প্রশ্ন তুলুক, তর্ক করুক আমার সঙ্গে। মঞ্জরী সে সবের ধার দিয়ে গেল না। চুপ করে বসে রইলো কিছু সময়। তারপর বললো—চলো, আমার সঙ্গে কোলকাতার বাইরে।'

আমি অবাক চোখে তাকাই।

মঞ্জরী পরিষ্কার করে—বর্ধমানের একটা স্কুলে কাজ পেয়েছি। তুমিও যাবে।

আমার কেমন রোমাঞ্চ হয়। ওর একটা হাত জড়িয়ে ধরি। 'সত্যি—আমি বলি—কিন্তু এভাবে গেলে লোকে কি বলবে?'

মঞ্জরী কথা শেষ করতে দেয় না। নীচু গলায় ফিসফিস করে—যেভাবে গেলে হয়, তার ব্যবস্থা করো।' বেয়ারা বিল নিয়ে আসে। দাম দিতে গিয়ে দেখি টাকা কম।

আমার পকেট, মঞ্জরীর ব্যাগ ঝেড়েও দেখা গেল দশ পয়সা কমই থেকে যাচ্ছে। মঞ্জরী হাসে। ঘটনাটাকে যেন ও গুরুত্ব দিতে চায় না। কিন্তু ওর মুখটা লাল দেখায়। আমারও লজ্জা করে। মঞ্জরী রোজ দাম দেয়।

বেয়ারা এসে হাজির হয়। দুটো টাকা আর একগাদা খুচরো পয়সা ওকে গুণে বুঝিয়ে দিই। খাবারের দাম ছাড়াও পঁচিশ পয়সা টিপস্ ও বুঝে নেয়। আমার চালাকিটা ও ধরতে পারে না। প্রায় একদৌড়ে দুজনে রাস্তায় নামি। মঞ্জরী হাঁপাচ্ছে। রাস্তার ভীড়ে মিশেও বারবার ও পেছনে তাকায়। ভয়, বেয়ারাটা হয়তো এখনি তাড়া করবে। 'অনেকটা দূর এসে ও বলে—তুমি কি গো? আমি হাসি। জবাব দিই—পয়সা গোনার সময় বেয়ারাটা তোমার মুখের দিকে যে হাঁ করে তাকিয়েছিল। তাই তো ঠকাতে পারলুম।' মঞ্জরী আমরা পিঠে একটা জোর কিল লাগালো।

দিন তিনেক বাদে গভীর রাতে পুলিশ এলো বাড়ীতে। গোটা পৃথিবী তখন ঘুমে অসাড়। কড়া নাড়ার জোরালো কর্কশ শব্দে আমার ঘুম ভেঙেছিল। আগে থেকেই জানতুম, এরকম কিছু ঘটবে। বাড়ীর পেছনের দরজা খুলে পালাবার ব্যবস্থা করা ছিল। দাদা গেল সদর খুলতে। আমি ঘুম চোখে পেছনের দরজা খুলে অন্ধকার চোরা গলিতে মিলিয়ে গেলুম।

ছমাস হলো আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার বেশীর ভাগ বন্ধু এখন জেলে। আমি নিজেও বার দুই ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। একদিন দুপুরে মঞ্জরীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাদা পোশাকের দুজন পুলিশের একেবারে মুখোমুখি। সন্দেহ-ক্রমে ওরা নজর রেখেছিল ওখানে। কিন্তু আচমকা আমাকে সামনে দেখবে, এটা ওরা ভাবেনি। বরাত জোরে ঠিক তখনই মঞ্জরীর মাসতুতো দাদা সেখানে এসেছিল এক ট্যাক্সি নিয়ে। কোনো মতে বেঁচে গিয়েছিলুম সে যাত্রা।

দ্বিতীয় দফায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসের সামনে থেকে পালাতে হলো। মঞ্জরী ব্যবস্থা করেছিল তিন আইনে চটপট বিয়েটা চুকিয়ে ফেলার। আর দেরি করাও সম্ভব ছিল না। দূরে থেকে বাড়ীটা দেখে আমার মাথার মধ্যে অদৃশ্য রাডারটা নড়ে উঠলো। বুঝলুম, খবর হয়ে গেছে। রেজি-স্ট্রারের অফিসে তিন বন্ধু সমেত মঞ্জরী আগেই পৌঁছেছিল। আমি পারলুম না। মাসখানেকও হয়নি এই ঘটনা।

দু মাস আগের সেই দুপুরের ঋণ শোধ করছি। আজকের মতো সেদিনও ঝলসানো রোদ নিজর্নতা, কাকের ডাক। স্রেফ একটা বই পড়ে অথবা আর কোনো অজ্ঞাত কারণে আমার আত্মদমন, সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। মঞ্জরীর গর্ভে এখন আমার সন্তান। মঞ্জরীর শুকনো মুখ, চোখ দুটো সামান্য বসে গেছে। ঠোঁট টিপে খবরটা ও দিয়েছিল আমাকে। তারপরেই ওই ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অফিসের দুর্ঘটনা। আমার বুকের মধ্যে সেই ঝর্ণাটার কুলকুল শব্দ আর শুনি না। দুটো চোখ নিদারুণ রুক্ষতায় জ্বালা করে। হপ্তাখানেক আগে মঞ্জরীর সঙ্গে শেষ দেখা। প্রণবও ছিল তখন। ঠিক হয়েছে আজ এই বাড়ীতে রেজিস্ট্রারকে এনে সই-সাবুদের কাজ শেষ হবে। অনেক খরচ। তবু উপায় নেই। প্রণব চারটে নাগাদ রেজিস্ট্রারকে নিয়ে হাজির হবে। মঞ্জরীর দুপুরেই আসার কথা।

নীচে রাস্তায় পরপর বাস চলে যায়। ধুলোয় ঢেকে থাকে চারপাশ। আমি ভাবি, ধরা পড়ে গেলে কি হবে? কে দেখবে মঞ্জরীকে? যে শিশু পৃথিবীতে আসছে কি হবে তার পরিচয়? মঞ্জরীকে আমি যেন এক রসাতলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। চারপাশে কলঙ্ক, কুৎসিত কথাবার্তা। দুর্গন্ধ আর পাঁক। দেওয়ালে মাথা ঠুকে রক্ত ঝরাতে ইচ্ছে করে। ঘরের মধ্যে দাপাদাপি করি। নিজের মনে চেঁচিয়ে উঠি—আর একটা দিন আমাকে সময় দাও।'

আবার একটা বাস থামে। মঞ্জরী নামে না। বিছানায় বসি। মাথা ঝিমঝিম করে। ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসে চোখ। ঘুম পায়। হাই তুলি। সজাগ থাকার চেষ্টা করি। রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো বুজে আসে।

দরজার লোহার কড়ায় হঠাৎ তীব্র ঝনৎকার। একনাগাড়ে কলিং বেল বাজতে থাকে। বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠি। জানলা দিয়ে নীচে তাকাতেই একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে চোখ মেলে। মঞ্জরীর কথা, যেন বেজে যায়।

দরজা খুলি। পালোয়ান গোছের একজন লোক আমার কোমরে দড়ি, হাতে শেকল লাগায়। সামনে পেছনে পুলিশ নিয়ে নীচে নামি। রাস্তায় ভীড়। লোকে দেখছে আমাকে। আমার বুকের ঝর্ণাটা আকাশ-চুম্বী উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়তে চায়। আকাশের দিকে তাকাই। দিগন্তে এক বালতি গাঢ় রক্তের মতো টলমল সূর্য। পুলিশ ভ্যানে ওঠার আগে মঞ্জরীকে দেখি। ও এগিয়ে আসে। বেপরোয়া ঝলসানো মূর্তি।

আমার হাত ধরে বলে—দুশ্চিন্তা করো না, ভয় পেও না, তোমার বাচ্চা বেঁচে থাকবে।'

ঝর্ণার জোয়ার আসে। ঠাণ্ডা নরম জলে আমার বুক ভেসে যায়।

বোম্বাইয়ে চিত্রলোকে বাঙালী গল্পকার

শক্তিপদ রাজগুরু

দমদম বিমানবন্দর আর হাওড়া স্টেশনের ধাত এক রকমই, তবে ঠাট-ঠমক আলাদা। হাওড়ার ভিড় আরও বেশী—আর পাঁচমেশালি ভিড়ের চরিত্রটা আলাদা, দমদম বিমান বন্দরের ভিড় তার তুলনায় মার্জিত আর সংযত। কিন্তু যাত্রীদের মানসিক অবস্থা এক রকমই—কেউ ঘরে ফিরছে দূর থেকে, কেউ ঘর ছেড়ে চলেছে অজানার অজানা পথে।

সেদিন দমদম বিমান বন্দরে সকালে অনেক অসংখ্য মানুষ আর গাড়ির ভিড়। কলকাতা দলের নেতারা দিল্লী থেকে ফিরছেন প্রফুল্ল সেন, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র আরও অনেকেই সকালের এয়ার বাসে দিল্লী থেকে ফিরছেন কলকাতা আর ওই এয়ার বাস-এর যাত্রী হয়ে আমাকে যেতে হচ্ছে বোম্বাই-এর সান্তাক্রুজ বন্দরে।

লাউঞ্জে জমেছে অসংখ্য মানুষের ভিড়—ওদের হাতে মালা, মুখে চোখে আগ্রহ জানি কখন প্লেন ল্যান্ড করবে। বাইরে পুলিশ জনতার ভিড়, সামলাতে ব্যস্ত। শান্ত সংযত জনতার সামনে কোন নেতা বক্তৃতা করে চলেছেন।

আকাশের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে নামলো বিরাট প্লেনখানা।

...ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ বোম্বাই-দিল্লী-কলকাতা-মাদ্রাজ রুটে নোতুন ধরনের এই ঢাউস প্লেন চালু করেছেন। সাধারণ বোয়িং ৭৩৭-এ বসবার আসন প্রায় দেড়শো আর এয়ার বাসের আসন সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি। একদিকে দুটো—অন্য দিকে দুটো—মাঝখানে চারটা সিট। আর বসার জায়গাগুলোও একটু প্রশস্থ। জাম্বো জেট আর বোয়িং ৭৩৭-এর মাঝামাঝি গোছের এই বিরাট প্লেনটা। এর উচ্চতাও বেশী টেলউইংগেট-এর সিঁড়ি দিয়ে ঢোকার সময় প্রায় দেড় তলারও বেশী উঁচুতে উঠতে হয়। ফলে এই প্লেন ছোটখাটো এয়ারপোর্টে যদি নেমে পড়ে যাত্রীদের কিন্তু প্লেন থেকে বেরুনো অসম্ভব। কারণ সব এয়ারপোর্টে—এত উঁচু সিঁড়ি নেই।

কয়েকবারই বোম্বাই পাড়ি দিতে হয়েছে, আর থাকতে হয়েছে মাসাবধিকাল। বিচিত্র সেই সমাজ জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করেছি। কাছ থেকে দূরের সেই স্বপ্ন জগতের মানুষ—তাদের জীবনযাত্রাকে—তাদের কর্মধারাকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। সব মিলিয়ে সেই জগৎ কর্মমুখর—আর বহু বিচিত্র।

আবার যেতে হচ্ছে শক্তি ফিল্মস-এর কর্ণধার শক্তি সামন্তের ডাকে। আমার 'অনুসন্ধান' উপন্যাস অবলম্বনে তিনি বাংলা হিন্দীতে ছবি করতে চান, তারই চিত্রনাট্যের ব্যাপারে কাজ শেষ করতে হবে, আর যে হিন্দী সাহিত্যিক সেই চিত্রনাট্য হিন্দীতে অনুবাদ করবেন তার সঙ্গে বসতে হবে।

কর্মব্যস্ত মানুষ শক্তি সামন্ত নিজের ব্যানারে চলছে এখন শেক্সপীয়রের ডাক্তার-এর দ্বিভাষী চিত্রগ্রহণের কাজ। পাশাপাশি করছেন শাস্ত্রীজীর ছবি 'গ্রেট গ্যাম্বলার' অন্য একটা ছবি গুলশান নন্দার কাহিনী নিয়ে 'মহাগুরু' তারপরে শুরু করতে হবে মুশির রিয়াজের নতুন গল্প। একটা পাঞ্জাবী ছোট গল্পকে পূর্ণাঙ্গ বিস্তার করে চরিত্র সংলাপ এ-সব তৈরী করতে হবে। এছাড়া আরও দু-তিনখানা ছবির পরিকল্পনা রয়েছে। আমার উপন্যাস 'অনুসন্ধান'-এর চূড়ান্ত চিত্রনাট্যরূপ শেষ করার পর ওই ছোট গল্পটাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য অনুরোধ করেছেন আমাকে, তার একটা খসড়াও করেছি।

এটাচিখানা খুলে দমদম এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসার শুধু ওই ফাইল আর লেখার বান্ডিল দেখে চাইলেন। কাগজের বোঝাই বয়ে নিয়ে চলেছি কলকাতা থেকে বোম্বাই-এর চিত্রজগতে।

....বাংলা সাহিত্যের গল্প উপন্যাসের কদর এখনও সেখানে আছে। কথাটা বলেছিলেন সেবার বোম্বাই-এর অমুখানন্দ

ডাক্তারের দৃশ্যে শর্মিলা/উত্তম

হলো বোম্বাই এর লায়ন্স ক্লাবের একজন কর্মকর্তা।

ওরা প্রতি বৎসর চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ কলাকুশলী - অভিনেতা - কাহিনীকারদের সম্মানিত করেন। সেবার ওদের শ্রেষ্ঠ কাহিনী হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছিল 'অমানুষ'।

ওরা তখনই বলেছিলেন—হরলাল টাই টুফি কলকাতাকে চলো যাত্রা হায় বোম্বাই সে।

তার আগের বছর এ পুরস্কার পেয়েছিলেন সাহিত্যিক বন্ধু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কোবা কাগজ' কাহিনীর জন্য। সাত পাকে বাঁধা উপন্যাস-এর চিত্ররূপ। তার আগে এই পুরস্কার পেয়েছেন সুবোধ ঘোষ, রাজেন মিত্র। শরৎচন্দ্রের কাহিনীই এখনও বোম্বাইয়ে সবচেয়ে বেশী আদৃত। তার চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধ এত আধুনিকতার ভিড়ে বিন্দুমাত্র হারায় নি। সারা ভারতবর্ষের জনমানসে সেই আবেদন আজ বরং বেড়েছে।

...টেক অফ করেছে বিরাট প্লেনটা। নীল আকাশে ভেসে চলেছে আরব সমুদ্রের তীরের সেই শহরের দিকে। ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার লাল রুক্ষ সীমানা দেখা যায়, প্রকৃতি এখানে নিষ্ঠুরা। অনেক আকাশ জুড়ে আগামী মৌসুমী মেঘের আনাগোনা, প্লেনটা ওই মেঘের ভিতরে হারিয়ে যায়, ওঠা নামাও করছে। নেহাৎ আজকের কালের বিরাট প্লেন, নইলে ওই এয়ার পকেট—মেঘের উৎপাতে ছোট প্লেনগুলোকে বেশ নাকাল হতে হয়।

নো স্মোকিং—ফাসন ইয়োর সিট বেল্ট। সাইন জ্বলে উঠেছে। প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দও বদলেছে। এবার নামছে প্লেনটা—প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ফিট থেকে নীচের দিকে নামছে, দূরে দেখা যায় আরব সমুদ্রের নীল সীমারেখা—ভারতের শেষ সীমানা। ঝকঝকে দিনের আলোয় সমুদ্রে যেন আগুন ধরেছে। প্লেনটা বৃহত্তর বোম্বাই শহরের মাথায় পাক দিয়ে এবার ছোঁ মেরেছে নীচের দিকে।

ভারতের সব থেকে কর্মব্যস্ত এয়ারপোর্ট এই সান্তাক্রুজ। দিল্লীর পালাম এয়ারপোর্টও ব্যস্ত, কিন্তু দেখে মনে হয় বোম্বাই-এর নামডাকই বেশী। সারা পশ্চিমী দুনিয়া থেকে ভারতে আসার সিংহদ্বার এই বোম্বাই। তাই পশ্চিমী সভ্যতা—তাদের সব সুখ সুবিধার সিংহ ভাগ পেয়েছে বোম্বাই, আর দিল্লী পেয়েছে পদমর্যাদার খাতিরে। কলকাতা পেয়েছে তাদের তুলনায় অনেক কম, ছিটে ফোঁটা মাত্র।

সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টের এদিক-ওদিকে দেখা যায় রাশিয়ান এয়ার ফ্লোট, জার্মান লুফৎহানসা—আমস্টারডাম এর কে এল-এম, লণ্ডনের ব্রিটিশ এয়ার-ওয়েজ, আমেরিকার প্যান-এম, ফ্রান্স-এর [illegible]—আরব মুলুকের অনেক [illegible] নানান প্লেনগুলো দাঁড়িয়ে [illegible] সারা পৃথিবীর মিলন মেলা গড়ে উঠেছে বোম্বাই এয়ারপোর্টে।

আগে থেকে জানিয়ে দিয়েছিলাম আমার যাবার কথা শক্তি সামন্ত-এর অফিসে। ইতিপূর্বে যখন গেছি শক্তি সামন্ত মশাই বোম্বাই-এ ছিলেন, এবার তিনি ইউনিট নিয়ে গেছেন 'মহাবদলা' এর স্যুটিং করতে গেছেন গোয়ায়। ফিরবার কথা ছিল গতকাল, তাই তাকে না পেয়ে ওর অফিসেই জানিয়েছি আমার যাবার কথা।

প্রথমবার 'অমানুষ'-এর ব্যাপারে যখন বোম্বাই যাই তখন ইউনিটের ক্লাবে

চিনতাম না, ওখানে নেমে দেখি শক্তিবাবু নিজেই এসেছেন এয়ারপোর্টে। ভীষণ কর্মব্যস্ত মানুষ ওঁকে দেখে তাই অবাক হই—আপনি নিজে এসেছেন ?

হাসলেন তিনি—চলে এলাম। এরা তো কেউ আপনাকে চেনে না।

এবার তাঁকে পাবো কিনা জানি না। বাউঞ্জে দেখা হল ওঁর প্রডাকশন চিফ মনোজ অধিকারীর সঙ্গে। গাড়ি নিয়ে এসেছেন আমাকে নিতে। উনিই বলেন—

—কাল শক্তিদা ফিরছেন।

মালটা নিতে হবে। কনভেয়ার বেল্টের পাশে দাঁড়িয়ে আছি দুজনে প্লেন থেকে স্যুটকেশ - প্যাটবাগুলো এনে কনভেয়ার বেল্টে ফেলা হচ্ছে, ঘূর্ণায়মান বেল্ট থেকে যে যার লগেজ তুলে নিয়ে টিকিটের নাম্বার মিলিয়ে খালাস করে নেয়।

হঠাৎ কার হাতের ছোঁয়ায় ফিরে চাইলাম।

ওই ভিড়ের মধ্যে শক্তি সামন্ত এবারও নিজে এসেছেন এয়ারপোর্টে; একটু কুণ্ঠিতভাবেই জানান।

—বোম্বাই গেছলাম ডেন্টিস্টের কাছে। দেরী হয়ে গেল।

আমি বলি—মনোজবাবু তো এসেছেন। আবার আপনি এতটা পথ উজিয়ে এলেন—

বলে ওঠেন শক্তিবাবু—স্যুটিং আছে। হোটেলে রেস্ট নিয়ে চলে আসুন স্টুডিওতে। সন্ধ্যা অবধি আছি।

শক্তিবাবু চলে গেলেন, ওদিকে চেনা গলা আর বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা শুনে চাইলাম, প্রখ্যাত কন্ঠশিল্পী সঙ্গীত পরিচালক শ্যামল মিত্র এগিয়ে আসছে।

—আপনি!

শ্যামলবাবু বলেন, এই প্লেনেই তো এলাম। দেরীতে এসেছি তাই দেখা হয়নি।

মালপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠলাম এক সঙ্গে।

বোম্বাই-এ যাতায়াত করতে হয়েছে বেশ কয়েকবার শক্তি সামন্তের অতিথি হয়ে। বোম্বাই শহরটা অনেকটা ছড়ানো-ছিটানো। আর চিত্রজগতের বেশীর ভাগ রথী-মহারথী—কর্মীদের আস্তানা বান্দ্রা-খার-সান্তাক্রুজ—এই এলাকা জুড়ে! সাধারণ বাঙালীরাও এইসব এলাকাতে রয়েছেন অনেকে। তাই খার মার্কেটে দেখা যায় তামাম বাঙালীদের 'মাছ'-এর বাজার। ওখানের মেছুনীরা অবধি বাংলা জানে, আর 'বেনারসী'র মিষ্টির দোকানে পাবেন কলকাতার মতই রসগোল্লা - দানাদার নকমারি সন্দেশ, মায় কড়াপাক অবধি।

শক্তিবাবুর 'কিংস ইনটারন্যাশন্যাল' হোটেলে পাঁচতলার উপর একটা টু-রুম স্যুট আছে অতিথিদের জন্য। সব আয়োজনও আছে সেখানে। কিন্তু সেটা জুহুবীচ ছাড়িয়ে বোম্বাই এর একপ্রান্তে। পাশাপাশি ওখানে 'স্যান ও স্যান্ডস' 'হোটেল হোরাইজন'—আর ওসব হোটেলপাড়া, সমুদ্রের ধারে।

এই নির্জনে—দূরে থেকে সন্ধ্যাকাজ করা অসুবিধাজনক। তাছাড়া হিন্দী অনুবাদক ও বসবেন আমার সঙ্গে, শক্তিবাবুকেও আসতে হবে তখন। সবদিক ভেবে আমি খার অঞ্চলের একটা হোটেলেই ওঠার কথা ভাবি। এই জায়গায় সকলের আসার সুবিধে আর এর আগেও ওখানে কয়েকবার উঠে মাসকয়েক কাটিয়ে গেছি। ম্যানেজমেণ্টও আমাকে চেনেন—আর সাহিত্যিক বলে একটু অন্য চোখে দেখেন।

এবারও ওই হোটেল [illegible] প্যালেসেই ওঠার কথা বলেছিলাম। ওর ওপাশেই থাকতেন শচীন দেববর্মন, কাছেই, প্রথমবার এসে তাকে দেখেছিলাম, কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়েছিল, এবার তিনি আর নেই। রাহুল দেববর্মন ওখানেই মায়ের কাছে থাকেন সেই বাড়িতে।

শচীনকর্তা রোজ সকালে মর্নিংওয়াক করতে বের হতেন জিমখানার মাঠে। কাছেই পার্কটা, আমিও সঙ্গী হতাম—ভোরের মিষ্ট আলোয় গাছগাছালি ভরে উঠেছে, বোম্বাই শহরের তখনও ঘুম ভাঙেনি, আমরা দুজনে পাক দিচ্ছি সবুজ ঘাস ঢাকা মাঠে। শচীনকর্তা বলতেন—ওই যে বাড়িটা দেখছো ওখানে প্রথম যখন এলাম তখন চারপাশে বন-জঙ্গল, শিয়াল ডাকতে শুনেছি।

অবাক হই ক'বছরে এই রূপ বদল দেখে, আজ বোম্বাইএর খার লিংকিং রোডের ঐদিকটার চেহারা বদলে গেছে, আমাদের চৌরঙ্গী এলাকার মতই রূপ নিয়েছে। এবার গিয়ে দেখি আকাশছোয়া বাড়ির ভিড়। বোম্বাই যেন সোনারকাঠির ছোঁয়ায় কোন যাদু নগরীতে পরিনত হয়েছে, আর রাজ্যের সম্পদ এসে জমেছে এখানে।

....শচীনকর্তা আজ নেই—তাঁর সুর থেমে গেছে। লিংকিং রোডের ওদিকে ছোট 'নকেট' আজও সবুজ গাছ-গাছালির ছোঁয়া মেখে তারই ধ্যানমগ্ন।

আর এদিকে আমায় হোটেলে পৌঁছে দিয়ে মনোজবাবু শ্যামলবাবুকে পৌঁছে দিতে গেলেন। শ্যামলবাবু এখন বোম্বাইএর খার অঞ্চলে একটা আস্তানা গেড়েছেন, কারন 'অমানুষ' ছবির পর এখন হাতে বেশ কয়েকটা কাজই রয়েছে। শক্তি-বাবুর 'অনুরোধ' করেছেন, দ্বিভাষী ছবি আনন্দ-আশ্রম আর ডাকভারও করছেন, হাতে রয়েছে নিবেদনবন্দী (দ্বিভাষী) ছবির সঙ্গীত পরিচালনা। আর নিজেও কবি সুকান্তের উপর একটা ছবি করছেন 'অসমাপ্ত কবিতা' নিজে অন্যতম প্রযোজক আর সুরকার। পরিচালনা করছেন বাসু ভট্টাচার্য।

হোটেলে ঢোকার মুখেই দেখা হয়ে গেল চিত্রপরিচালক বাসু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বোম্বাইএর বাঙালী পরিচালকদের মধ্যে উনি অন্যতম। বেশ কিছু ভালো ছবি ইনি করেছেন—[illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible] পেয়েছেন।

[illegible] আছেন ?

সদাহাস্যময় বাসুবাবু। এর আগে গত বছরই দিল্লীর ফিল্ম ক্লাব-এর পুরস্কার আনতে গিয়ে এক সঙ্গে হোটেল কাতুর-এ বাস করেছিলাম, তালকাটোরা গার্ডেন্‌স্-এ পুরস্কার নিয়ে পরদিন সকালের ফ্লাইটে দিল্লী থেকে বোম্বাই-এ এসেছিলাম। বলে উঠি—

—মাথার চুল যে সব পেকে গেল ?

বয়সের তুলনায় চুলগুলো সাদা হয়ে গেলেও এখন বেশ কর্মঠ আর শক্ত-পোক্ত মানুষ। দিল্লীর কোন পত্রিকার সম্পাদক বন্ধু রয়েছেন এই হোটেলে তাঁকে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। একটু হেসে জানান—পরে দেখা হবে।

বাসুবাবু বের হয়ে গেলেন। আমিও হোটেলের ঘরে গিয়ে স্নান আহারপর্ব সারার ব্যবস্থায় মন দিলাম। বেলা হয়ে গেছে।

চৈত্রের শেষ। কলকাতায় কাঠ-ফাটা গরম—আর ঘেমে নেয়ে উঠতে হয়। তার তুলনায় বোম্বাই-এর গরমটা অনেক সহনীয়। কারণ এর তিন দিকেই সমুদ্র। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে—এলোপাথাড়ি হাওয়া। অবশ্য হোটেলের ঘরগুলো এয়ার-কনডিশনড। বাইরেও তত গরম হয় না ওই সমুদ্রের দৌলতে।

...বোম্বাই-এর চিত্রজগতে বাঙালীদের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। অবশ্য বাঙালী-আনা পুরোপুরি সর্বভারতীয় স্তরের ছবিতে আনা যায় না। কারণ সারা ভারতবর্ষের সুদূর কেরল থেকে পাঞ্জাব—কাশ্মীর এদিকে রাজস্থান - অন্ধ্র - বিহার আসাম সব প্রদেশের কথাই ভাবতে হয় তাদের। তবু কিছু বৈশিষ্ট্য—ভাবপ্রবণতা আবেদন এগুলো এসে যায় যা বাংলার নিজস্ব।

অতীতে বোম্বে টকীজের কর্মকর্তারাও ছিলেন বাঙালীই। হিমাংশু রায় ছিলেন অন্যতম কর্ণধার, অশোককুমারও এদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, জড়িত ছিলেন বোম্বাই-এর মুখার্জি পরিবারও। আজও এরা সেই চিত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। ফিল্মালয় স্টুডিও এঁদেরই।

তারপর এসেছেন বিমল রায়, তিনিও নিজের চারিদিকে কিছু প্রতিভাবান বাঙালীকে এনেছিলেন, শুধু বাঙালীই নয়, অবাঙালী বেশ কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি এঁর সঙ্গে এসেছেন চিত্রজগতে।

ঋত্বিক ঘটক ও বিমলবাবুর সঙ্গে চিত্রনাট্য - গল্প রচনার কাজ করেছেন। আর শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিহারের মুঙ্গের শহর থেকে এসে বোম্বে টকিজেই যোগ দেন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ছায়াছবির জগতের একটি শ্রদ্ধেয় কৃতি গল্প - চিত্রনাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন। এরই উপন্যাস 'ঝিন্দের বন্দী' বর্তমানে 'বন্দী' নাম নিয়ে বাংলা হিন্দীতে উঠছে। উত্তমবাবু এর অন্যতম প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন।

হৃষিকেশবাবুও বিমল রায় মশায়ের সমসাময়িক প্রায়। হৃষিকেশবাবু প্রথমে প্রধানতঃ সম্পাদনার কাজ নিয়ে থাকেন—তারপর নিজেই পরিচালনাও শুরু করেন। বোম্বের চিত্রজগতে তিনিও একজন বহুজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। এঁকে ঘিরে হিন্দী ছায়াছবির একটা নতুন দিকের কিছু তরুণ এসেছেন। গুলজার - শ্যাম বেনেগল - সুজাষ ঘাই - বাসু ভট্টাচার্য প্রভৃতি সেই নতুন পথে কিছু ছবি করেছেন।

নুসলি ওয়াদিয়ার কাছে পুরস্কার নিচ্ছেন শক্তিপদ রাজগুরু

....তা শক্তি সামন্ত আর একজন—যিনি শুধু কৃতি এবং খ্যাতিমান পরিচালকই নন, প্রযোজক—শক্তি ফিল্মস্-এর প্রতিষ্ঠাতা। শক্তি রাজ ফিল্মস্ নামে পরিবেশন সংস্থার অন্যতম স্বত্বাধিকারী, নটরাজ স্টুডিওর অন্যতম ডিরেক্টর, কালার লেবরেটরীর অন্যতম কর্মকর্তা—প্রতিষ্ঠাতা, তাছাড়া নিজের প্রতিষ্ঠানে রয়েছে একাধিক ক্যামেরা সাউন্ড — রেকর্ডিং ইউনিট।

নিজের সহকারী পরিচালকবৃন্দ—সব মিলিয়ে নিজেই একটি সর্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তাঁর ছবি করার রীতি পদ্ধতিও আলাদা। বর্তমান বোম্বাই-এর চিত্রজগত শক্তি সামন্ত একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন নিজের অধ্যবসায়-অমায়িক ব্যবহার আর শিল্পী-সত্তার সার্থক প্রকাশের মাধ্যমে। তাছাড়া পরিচালকদের মধ্যে রয়েছেন বাসু চ্যাটার্জি, দুলাল গুহ, জয় মুখার্জি, অনিল গাঙ্গুলী, অনিল মিত্র, অসিত সেন, হীরেন নাগ, বিভূতি মিত্র, আলো সরকার, অরবিন্দ সেন, কমল মজুমদার, আরও অনেকে। কৃতি ক্যামেরাম্যান বলতে রাধু কর্মকার, আলোক দাশগুপ্ত, নন্দু ভট্টাচার্য, রতনবাবু, দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় আরও অনেকে। তাছাড়া চিত্র সম্পাদক, সহকারী চিত্রপরিচালক, কলা-কুশলী অনেকেই আছেন বিভিন্ন স্টুডিওতে বহু কর্মীই কাজ করেন। কারণ বোম্বাই চলচ্চিত্র একটা ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। সেখানে তিন শিফটে কলাকুশলী, শিল্পীদের কাজ করতে হয় কারখানার মতই। বোম্বাই শহরে রাজকাপুর স্টুডিও, ভি-শান্তারামের রাজকমল, মেহবুব স্টুডিও, মোহন স্টুডিও, ফিল্মালয়, নটরাজ স্টুডিও ছাড়া আরও দু-একটা স্টুডিওতে সকাল ছটা থেকে বেলা দুটো, দুটো থেকে রাত্রি দশটা, আর দশটা থেকে ভোর অবধি তিন সিফটে স্যুটিং চলে। এছাড়াও বহু স্যুটিং হয় চান্দিভ্যালি আউটডোর স্টুডিওতে। বোম্বাই এর উপকণ্ঠে কাছাড় ঘেরা নিরিবিলি জায়গা এই চান্দিভ্যালি এখানে বেশ খানিকটা এলাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, ভিতরে বাগান, ঝিল, গ্রাম্যরাস্তা ফাঁকা জায়গা সবই আছে। সেই ঘেরা মাঠে সেট তৈরী করে

অনেকেই স্যুটিং করেন। এছাড়া বাইরে আউটডোর স্যুটিং তো আছেই।

আর গানের রেকর্ডিং-এর জন্য ফিল্ম সেন্টার, ফেমাস সিনে ল্যাব, আরও বেশ কিছু রেকর্ডিং সেন্টার আছে। সব মিলিয়ে একটা বিরাট কর্মকান্ড চলেছে বোম্বাই চিত্রজগতে। অনেক টাকার কারবার, কারণ এঁদের ছবি শুধু সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই বাণিজ্য করে না, ভারতের বাইরে মিডল ইস্ট, ফার ইস্ট, মিশর সাউথ আফ্রিকা, ইউরোপের ফ্রান্স, ইতালী, পর্তুগাল, স্পেন, যুগো-স্লোভিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, রাশিয়া, ইউ-কে ছাড়াও এদিকে মরিসাস, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ল্যাটিন আমেরিকার কিছু দেশ ফিলিপাইন্স, মালয়েশিয়া আরও অনেক জায়গাতেই ভালো চলে। এবং বিদেশী মুদ্রাও অর্জন করে আনে। তাই একে ও একটা ইন্ডাস্ট্রির পর্যায়েই ফেলা হয়। তাই চিত্রজগতকে ঘিরে এত রবরবা। রাজা-উজীর-শাহানশা-বেগমদের দফা রফা। আর খোদার বান্দা মশামাছি হুকোবরদার নফর-দের ভিড় তো থাকবেই। এত আলো-রোশনীর বাহার, তাই তার নীচেই কোথাও কোথাও চিরন্তন বেদনা বঞ্চনার জমাট দীর্ঘশ্বাসভরা আঁধারও রয়ে গেছে।

বসন্তের শেষ—গ্রীষ্মের ধুলিঝড়ের সংকেত সুরু হয়েছে। দেবদারু নারকেল গাছের বুকে ঝড়ো বাতাস বইছে, দূরে সমুদ্র, বীচের শূন্যতার পর দেখা যায় সমুদ্রের বিস্তার। গাড়িটা চলেছে আন্ধেরীর নটরাজ স্টুডিওর দিকে।

এতবড় চিত্রজগতের কর্মকাণ্ডের মূলে ছবির গল্প, চরিত্র এবং চিত্রনাট্য—

যার উপর এই ছবির ইমারত গড়ে উঠবে। সেই ব্যাপারটা নিয়ে এখানে অনেক ফাটকা অনেক কিছু কর্মকাণ্ড গড়ে ওঠে। আর আর জট পাকায় নানা জটিলতা।

সারা ভারতের সব প্রদেশের মানুষই রয়েছেন এজগতে, তাই সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য, ছায়াছবির কিছু খবর এঁরা রাখেন, বাংলা সাহিত্য, মালয়ালম সাহিত্য, মারাঠী সাহিত্য, হিন্দী, উর্দু সাহিত্যের অনেক কাহিনীর বাচবিচার করে এরা উচ্চমানের ছবির কাহিনী কিছু নেন।

আর কিছু ছবির জন্য সোজা ইংরাজী সাহিত্যের স্মরণাপন্ন তো হবই। এখানে অনেক কাহিনীকার আছেন যাঁরা মাঝে মঝে বিদেশে যান আর হালফিল ছবি দেখেন সেখানের নোতুন বইপত্র আনেন আর তাই থেকে টাটকা তরতাজা গল্পের আমদানীও হয়, অবশ্য সেই গল্প লেখকরা তার জন্য যা পান সেটা অবিশ্বাস্য ধরণেরই।

আর একটা ব্যাপার আছে এই খানের চিত্রজগতে। কাহিনী-সংলাপ লেখক, এমনকি সঙ্গীত পরিচালকদের মধ্যেও দেখা যায় এরা যুগলবন্দী হয়ে কাজ করেন। লেখকদের মধ্যে বোম্বাইএ এখন সুপরিচিত সেলিম জাভেদ, এঁরা দুজন ব্যক্তি, শুনেছি বিহারের লোক। এদের লেখা দীবার-সোলে আরও অনেক হিট ছবি রয়েছে। তাছাড়া গুলসান নন্দাও হিন্দীতে নামকরা লেখক ওরও সহকারী আছেন। কমলেশ্বরজীও হিন্দীসাহিত্যে নোতুন আঙ্গিকের অন্যতম প্রবক্তা। টাইমস অব ইন্ডিয়ার—সারিকা সাহিত্যপত্রের সম্পাদক। ফিরভি-আঁধি, ছোটি সে বাত, ডাকবাংলো এইসব ছবির কাহিনীকার। আমার 'অমানুষ' এর হিন্দী সংলাপ লিখেছেন তিনিই, অনুসন্ধান এর হিন্দী ভার্সান করবেন তিনি, তাঁকেও দেখছি দুজন সহকারী লেখককে নিয়ে কাজ করতে। এছাড়া আমার বিশেষ পরিচিত হিন্দী কাহিনীকার রয়েছেন সুজেন্দ্র গৌড়। এরা ওইভাবে সহকারী নিয়ে কাজ করেন। বাংলাসাহিত্যে বা ছবির চিত্রনাট্যের ব্যাপারে সেভাবে কাজ করার রেওয়াজ নেই।

মনেহয় এঁরা অত্যন্ত কর্মব্যস্ত তার কাজও অনেক। তাই একজন মোটামুটি লেখাটাকে ছকে আনেন অন্যজন তার উপর আবার ভালো ভাবে শান পালিশের কাজ, অলংকরণের কাজ করেন। দুজনের সমবেত চেষ্টায় একটা নোতুন কিছু রূপ নেয় জিনিষটা।

এছাড়া আর এক ধরনের গরমমশলা-দার কাহিনী, ক্রাইম স্টোরি, ফাইটিং পিকচারের নকসাও তৈরি হয়। তাতে গল্পের মাথামুণ্ডু, চরিত্রের সঙ্গতি, ঘটনার ধারাপ্রবাহ, পরিণতি—এসব রাখার চেষ্টা করা হয় মাত্র, আর সেগুলো যথাযথভাবে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তাতে ফাইটিং, চেজিং, কার চেজিং, বন্ধ নিয়ে ধাওয়া, ক্যাইমেক্স, কিছু নাচ-গান-মশলা—এসব দিয়ে কিছু একটা তৈরি হয়।

এ-ছবির জন্য নগদ বিদায় নিয়েই খুশি হন প্রযোজক-পরিচালক। তার জন্য অবশ্য লিখিয়ে কেউ থাকেন কিন্তু সেখানে প্রযোজক, পরিচালকের ভূমিকাই বেশি।

সাহিত্যধর্মী, ভাবাদর্শময় কোন কাহিনীর সঙ্গে তার গঠনশৈলীও স্বতন্ত্র ধরনের। সব মিলিয়ে কিছু লেখক অবশ্য আছেন এ-জগতে।

তবে বেশির ভাগ বাইরের কাহিনীর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের কিছুটা স্বীকৃতি এখনও রয়েছে। কিন্তু স্বীকৃতি দিয়েই নেওয়া হয়, কিছু বা একটু রদবদল করে অন্য নামে। ইদানীং নামকরা ছবি 'গীত গাতা চল'-এর কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের অতিথি কাহিনীর প্রচুর সাদৃশ্য আছে কেবল শেষ পরিণতিটুকু ছাড়া। অতিথি ছবির নায়ক যেখানে পলাতক—এ-ছবির নায়ক সেখানে ঘরবাসী সংসারী। অর্থাৎ হিন্দী দর্শকদের কাছে একটা সুষ্ঠু পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া দরকার বোধ করেন কর্মকর্তারা।

মনোজ বসুর বিখ্যাত ছোটগল্প 'আংটি চাটুয্যের ভাই' নিয়ে গড়ে উঠেছিল বাংলা ভাষায় অন্যতম জনপ্রিয় ছবি 'পলাতক', যার হিন্দী রূপ দেওয়া হল 'রাহগীর' নামে। বাংলার দর্শকসাধারণ যাকে এতবড় স্বীকৃতি দিয়েছিল, হিন্দী দর্শক তাকে এককথায় নাকচ করে দিল। বাঙালীর ভাবমানস যেখানে বাউলতত্ত্বকে মেনে নেয়, ওদের দর্শনরা তাকে বলে পলায়নী মনোবৃত্তি। দু'-একজন হিন্দী কাহিনীকারকে কারণটা জিজ্ঞাসা করতে তাঁরা জবাব দেন: আরে ভাই ক্যা হ্যায়, উ সেফ ভাগতা হ্যায়? যোয়ান লেড়কা, কাম ধান্দা করো, পয়সা কামাও, মৌজ করো, লেকিন কাম ক্যা চক্কর তো জরুর করনা, কামাই করনা। নেহি তো সিরফ ভাগতা হ্যায়। ক্যা পিকচার হোগা ইস কাহিনীমে।

ওরা তাই বোধহয় চরিত্রের সুষ্ঠু পরিণতি চায়, অসমাপ্ত বেদনার করুণ রেশটুকুকে ধরতে সময় ধৈর্য মানসিকতা হিন্দী দর্শকদের নেই হয়তো।

তবু শরৎচন্দ্র, শরদিন্দুবাবু, পরবর্তী কালে সুবোধ ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, গজেন মিত্র, সমরেশ বসু, আশুতোষ

মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, মহাশ্বেতা দেবীর কাহিনী কিছু কিছু পৌঁচেছে আরব সমুদ্রের তীরে। ওখানে রয়েছেন নবেন্দু ঘোষ, শচীন ভৌমিক, বিমল দত্ত, রঞ্জন বোস—আরও অনেকে।

তাছাড়া গেছেন উর্দু থেকে কিষণ চন্দর, হিন্দী থেকে মুন্সী প্রেমচাঁদ, পরবর্তীকালে ফনীশ্বর রেণু, কমলেশ্বর, সুলতানপুরী-গুলজার আরও অনেকে।

হৃষিকেশবাবুর 'মিলি'র কাহিনী এসেছে মালয়ালি সাহিত্য থেকে, মৃণালবাবু 'মৃগয়া'র কাহিনী নিয়েছেন ওড়িয়া সাহিত্য থেকে। ইদানীং নবেন্দুবাবু করছেন তাঁর ছবি 'ডাক্তারবাবু'-এর কাহিনী এসেছে হিন্দী সাহিত্যিক ফনীশ্বর রেণুর 'ময়লা আঁচল' উপন্যাস থেকে। সর্বভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের এই স্বীকৃতিকে বহাল রাখার দায়িত্ব আজকের কথা-সাহিত্যিকদেরও।

কথাটা বলেন শক্তি সামন্তও।

—বিতর্ক, সমস্যা, জীবনযন্ত্রণা থাকবেই, কিন্তু রসোত্তীর্ণতা, সর্বজনীনতাও বড় কথা। মানবিক আবেদনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য কি সম্পূর্ণ হতে পারে?

ওর নটরাজ স্টুডিওর চেম্বারে আড্ডা জমেছে। এসে জুটেছেন হিন্দী কথা-সাহিত্যিক গুলসান নন্দাজী। সহজ সরল মানুষ। ছবির জগতে একটি নামী ব্যক্তি। আর তার জন্যই বোম্বাই শহরে নিজের বাংলো, গাড়ি, টি ভি, ফোন সবই রয়েছে। দিল্লিতেও ডেরা আছে। আসলে পশ্চিম পাঞ্জাবের লোক, দেশবিভাগের সময় এদিকে এসেছেন, তারপর দিল্লিতে, পরে বোম্বাই-এ এসে হাজির হন।

এখনও হারানো সেই গ্রাম-ঘর, সেই পরিবেশের কথা ভোলেননি। বলেন—এবার লিখছি নোতুন একটা বই—আমার ঘর। আজ পর্যন্ত কত জায়গায় ঘরের ঠিকানা খুঁজেছি জানি না। মানুষ বোধহয় জন্ম-যাযাবর, ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতেই একদিন বেঠিকানা হয়ে ফেরার হয়ে যায়। আর ফেরে না।

শক্তিবাবুর স্টুডিওর নিজের অফিসটা এয়ারকণ্ডিশণ্ড। ওঁদের ঠাণ্ডা-ঘরে থাকা অভ্যাস—যার বাড়িতেও তাই, গাড়িও এয়ারকণ্ডিশণ্ড—ওই ঠাণ্ডাটা বেশ কনকনে বোধহয়। কফিসহযোগে আড্ডাটা জমে উঠেছে। কাল 'মহাগুরু' বইটার চিত্রনাট্য-কাহিনী নিয়ে আলোচনা হবে। তাই নন্দাজী বলেন,

—আপভি রহিয়ে দাদাজী। ডিসকাশন তো করনে হোগা।

ওঁরা ছবির চিত্রনাট্যের ব্যাপারে আইডিয়া আর ডিসকাশন—এ-দুটোর উপর জোর দেন। কারণ, কাহিনীর নিটোল পূর্ণতা, আর চিত্রনাট্যের গতি সহজ ভাবটা যাচাই করা দরকার।

শ্যামল মিত্র, গীতিকার ইন্দিবরজীও এসেছেন। আজ আনন্দ আশ্রমের প্রজেকশন আছে। শক্তিবাবু বলেন,

—চলুন, ছবি দেখবেন।

ইতিমধ্যে কমলেশ্বরজীকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা হচ্ছে। শক্তিবাবুর বড় ছেলে অসীম সামন্ত কর্মঠ, উৎসাহী তরুণ, সবে কলেজের গণ্ডী পার হয়ে ব্যবসায় এসেছে। মধু-বিনয়ী ছেলেটিকে দেখেছি আগেও। এখন দেখছি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রুচিবান মন নিয়ে।

অসীমই খবর দেয়—কমলেশ্বরজীকে লাইনে পেয়েছি। বন্ধু লোক, আমার আসার খবর আগেই জানেন, ফোনেই সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন—কাল সকালে হোটেলে দেখা হবে।

কর্মব্যস্ত লোক। ওঁর ওই পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়া নিজের লেখাপত্র আছে, টি ভি-র প্রোগ্রাম—তাছাড়া একসঙ্গে নাকি ৪।৫ খানা ছবির সংলাপের কাজ রয়েছে। তবু আমাকে বলেন,

—আপনার সঙ্গে কালই দেখা করে কাজ নিয়ে বসবো।

জানাই—আমাকে ছুটি দেবার মালিক আপনিই। হাসছেন কমলেশ্বরজী, শক্তি সামন্তের উপর তাঁরও অপরিসীম শ্রদ্ধা রয়েছে। তাই বলে—ওঁর কাজ করতে হবে আগে। আপনার ভাবনা নেই।

ইন্দিবরজী চমৎকার লোক। বর্তমানে গীতরচয়িতাদের মধ্যে আনন্দ বক্সীর পরেই ইন্দিবরের নাম করা যেতে পারে। এর আগে ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল 'অমানুষ'-এর সময়। হিন্দী অমানুষ-এর গান লিখেছিলেন উনি। দেখা হতে এবার জড়িয়ে ধরেন।

—আ গিয়া দাদাজী। খবর সব ঠিক হ্যায়?

হিন্দী আনন্দ আশ্রমের গীতরচয়িতা উনিই আর সুরকার শ্যামল মিত্র, তাই দুজনে প্রজেকশান দেখতে এসেছেন, পরের একটা গান-এর জন্য ছবিটার 'রাশ' দেখা দরকার।

নটরাজ স্টুডিওর অন্যতম ম্যানেজিং ডিরেক্টর শক্তি সামন্ত। পাশাপাশি অফিস রয়েছে রামানন্দ সাগর, প্রযোজক এন সি সিপ্পি আত্মারামজীর। সাজানো-গোছানো স্টুডিও, তিন-চারটে ফ্লোর—প্রজেকশন থিয়েটার সবই আছে। আর নারকেল আমগাছে ছায়াঘন, একটা কদম-গাছও বাংলার সবুজ স্মৃতিকে যেন সজীব করে রেখেছে। আমও রয়েছে [illegible] তবে মাঝে মাঝে আম পাড়ার [illegible] লেগে যায় দেখলাম।

শক্তিবাবুর ইউনিটের সহকারী পরিচালক কাঁপিলজী, তরুণ সহকারী [illegible] বোস, জ্যোতি রায়—ক্যামেরার রবীন (ওরা ডাকে রবিনসন) আরও [illegible] অনেকে ভিড় করে আসে। প্রভাত-জ্যোতি-রবীন শুধোয়—নোতুন বই কিছু এনেছেন?

হোটেলে কখন যাবো?

মনোজ অধিকারী কর্মকর্তা [illegible] হোটেলে এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে [illegible] আগেভাগে ক'খানা বই নিয়ে গেছে। প্রভাত বলে—হোটেলেই হামলা হবে [illegible]। মনোজদা কি একাই পড়তে আনে?

হাসছি ওদের কথায়। [illegible] কর্মঠ ছেলের দল, দূরে বাংলাদেশ [illegible] প্রবাসে এসে কাজের মধ্যে ডুবে [illegible] জ্যোতি নদীয়ার [illegible] থেকে [illegible] এসেছে, প্রভাত এসেছে ব্যারাকপুর [illegible] আর রবীন সোনারপুরের ছেলে। [illegible] অধিকারী বরানগরের। এখানে ওরা [illegible] মিশে গেছে—মরাঠী বলিল [illegible] মিকড়ে-রোকড়েও শিখেছে, হিন্দী [illegible] লিখতেই পারে ওরা। শক্তি [illegible] নিজে অবশ্য বাঁকুড়া কলেজের ছাত্র, [illegible] থেকে বি এস সি পাশ করে [illegible] যান, বেশির ভাগ সময় কেটেছে [illegible]। তাই হিন্দী লেখেন চমৎকার। [illegible] অধিকাংশ সংলাপ ওঁরই লেখা, তাছাড়া [illegible] ছবির সংলাপের উপরও ওঁর [illegible] বেশি।

প্রজেকশান থিয়েটারও এয়ারকণ্ডিশণ্ড। পুরু কার্পেট পাতা—[illegible] চেয়ারগুলোতে গা এলিয়ে [illegible] দেখাই নয়, নিখুঁতভাবে [illegible] এখানে। ছবি তৈরির [illegible] বলা যেতে পারে। প্রত্যেক [illegible] এটা রাখতে হয়। লেখক [illegible] লেখাটা পড়ে নিয়ে আবার পরের [illegible] লেখায় আসেন, কোন উপন্যাস [illegible] চিত্রজগতের বেলাতেও [illegible] দরকার। একবার নয়—বারবারই [illegible] হয় তাঁদের। আনন্দ আশ্রম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন মাত্র দশ-বারোদিনের [illegible] বাকি। তবু দেখার, কাটার [illegible]।

(ক্রমশঃ)

।। আঠার ।।

আসলে আকাশের চেহারাটাই আজ অন্য রকম। কখন, কোন ফাঁকে যে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছিল কেউ লক্ষ্য করে নি। দিনের বেলা খটখটে রোদ গেছে বলে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে মেঘ ছেয়ে যাবে। শীতকালে এ-রকম বড় একটা হয় না, কিন্তু আজ বিশেষ দিন, আজ ভূমিকম্প হলেও বলার কিছু নেই।

জলভরা বাতাসের একটু ঝাপটা গায়ে লাগতেই রজনী চমকে উঠল। আকাশের দিকে তাকাল, একটা নক্ষত্রও দেখা যাচ্ছে না, চাঁদও ওঠে নি। চাঁদ ওঠে নি বলেই ওর সন্দেহ হল, আর আকাশে মেঘের আগমন, জলভরা বাতাসই জানিয়ে দিয়ে গেল।

রাতে যদি সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামে, দুর্দশার আর সীমা থাকবে না। প্রথমত তাড়াহুড়ো করে যে কাঠুরে ডেরা বানান হয়েছে, সেগুলো ঝড়ে জলে কতটা যে মজবুত এখনো তা পরীক্ষা হয় নি। দ্বিতীয়তঃ সারা জঙ্গলেই প্যাচপেচে কাদা, সেই মাত্রা আরো বাড়বে। কাদা ঘাঁটতে ঘাঁটতে পায়ের আঙুলগুলো ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছে কিনা কে জানে।

রজনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আকাশটাকে পরীক্ষা করল। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই স্পষ্টত চিনতে পারল না। এমনিতেই সকাল থেকে আজ দুশ্চিন্তার শেষ নেই, তার উপর আবার আকাশের ভাবসাব ওর মেজাজটাকে তুঙ্গে তুলে রাখল।

চারপাশের তদারকি ছেড়ে রজনী কাছারির উঠোনে এসে দেখল, খোকাদের দোকায় চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। উঠোনের এক-পাশে খুঁটি পুঁতে হরিণটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। হরিণকে ঘিরে তখনো জটলা ভাঙে নি। ভূতের মতো কালো, কালো চেহারার লোকগুলির উপরই রাগটা আছড়ে পড়ল।

রজনী হাঁক ছাড়ল, তোদের হরিণ দেখা শেষ হবে না? জীবনে কখনো হরিণ দেখিস নি?

লোকগুলি মুখ ঘুরিয়ে রজনীকে একবার দেখল। গলা আছে, চেঁচাচ্ছে, গ্রাহ্য করল না।

দুটো একটা কুপি জ্বলছে কুলি ডেরায়। কাছারি ঘরের বারান্দায় একটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। হ্যাজাকের আলোয় অন্ধকার কমার বদলে আরো যেন দাঁত কামড়ে চেপে বসেছে।

ঈশান এখনো ফেরে নি। নদীর ঘাটে নৌকোয় গিয়ে ঢুকে বসেছে। ভগবানই জানে, কি অত কথা থাকতে পারে ওদের। ঈশান ফিরে না আসা পর্যন্ত রজনীর অস্থিরতা আজ কমবার নয়।

এপাশে ওপাশে কিছুক্ষণ পায়চারি করল রজনী। হরিণটাকে নিয়ে কি সব ছাইপাঁশ তর্ক জুড়েছে ওরা। চট করে আবার রক্ত উঠে এল মাথায়। দুপ-দাপ করে রজনী এগিয়ে এল, তোদের কি আর কিছু করার নেই? এদিকে বৃষ্টি আসতে পারে খেয়াল আছে?

কেউ কেউ আকাশের দিকে চোখ পাতল। বৃষ্টি যদি আসেই, কি করতে পারে ওরা। বৃষ্টিকে তো আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, মাথা গরম করে লাভ নেই।

রজনী বলল, তাড়াতাড়ি রান্না-বান্না সেরে খাওয়ার পাট তো চুকিয়ে ফেলা যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত আর গজল্লা করবি শুনি?

কে একজন হি হি করে হেসে উঠল, তা যা বলেছ, ঘাটে এসে পেত্নী উপস্থিত হয়েছে। কখন কার ঘাড় মটকে দেবে, তার আর খাওয়াই হবে না।

আর একজন কে সরলভাবে প্রশ্ন করল, তা, ঐ মেয়েটার সঙ্গে ঈশানের কি ব্যাপার গো রজনী ভাই?

—ঈশানই জানে, কি ব্যাপার। ও হারামজাদা নবাব হয়ে গেছে। নবাব আলিবর্দী খাঁ।

উত্তরটা খুব জুতসই লাগল না। ঘষা পাথরের মতো ভোঁতা চোখ তুলে কেউ কেউ তাকিয়ে থাকল।

রজনী বলল, সেবার আমাদের সর্বনাশ ঐ মেয়েটাই করে গিয়েছিল। আবার যদি সে রকম কিছু হয়, আমি ঈশানের ছাল চামড়া তুলে নেব। আমি নরমের নরম, শক্তের শক্ত।

—কি সর্বনাশ করতে পারে শুনি?

—যখন করবে, তখনই টের পাবি। যাক গে ও-সব কথা ছাড়, আজ তোরা আগুন জ্বালাবি না কেউ? বিনা আগুনেই আজ রাত কাটাবি?

আগুন জ্বালাবার কথাই কারো মনে আসে নি এতক্ষণ।

—দুটো চারটে যদি আগুন না জ্বালিয়ে রাখিস, বেঘোরে মরবি। আমার কথা শুনছিস না, ঠিক হাতে হাতে ফল পাবি, দেখিস।

আগুন জ্বালাবার দায়িত্ব যাদের ওপর তাদের কয়েকজনকে দেখা গেল আর এক কোণে। গাঁজার কলকে নিয়ে বসেছে। শুকদেবই আজ ওদের মধ্যমণি। শুকদেবকে দেখা গেল, কোমর পাছা দুলিয়ে প্রলয় নৃত্য নাচতে শুরু করেছে। রজনী জানে গেঁজেলদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। ফলে গেঁজেলদের দিকে ও এগোল না। যারা হরিণের কাছে বসে গুলতানি করছিল, তাদেরই তাড়া লাগাল, যানা বাসু, চটপট অন্তত আগুন কটা লাগিয়ে আয়।

—আগুন লাগিয়ে লাভ আছে? যদি বৃষ্টি নামে?

রজনী আবার আকাশের দিকে তাকাল। কেন যে আজ হঠাৎ আকাশটা এমন হয়ে গেল কে জানে। মেয়েটাই কি সঙ্গে করে মেঘ নিয়ে এল। অসম্ভব নয়। সব পারে ওরা।

রজনী বলল, বৃষ্টি যে আসবেই এমন কোন কথা নেই। কিন্তু আমাদের কাজটুকু আমরা করব না কেন! যা না বাপু, চটপট দু-চারটে আগুন জ্বালিয়ে চলে আয়।

কয়েকজনের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আগুন জ্বালাতে পাঠিয়ে দিল রজনী। পরে আরো একটু এপাশ ওপাশ ঘুর ঘুর করে মকবুলের কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। একটা তেলের ডিবে জ্বলছে ওখানে। মকবুল কম্বল জড়িয়ে অসুস্থ রুগীর মতো শুয়ে আছে।

রজনী ধীরে ধীরে ডাকল, মকবুল ঘুমুলি?

মকবুল তাকাল।

—আকাশের চেহারাটা একদম ভাল দেখাচ্ছে না রে মকবুল। বৃষ্টি হতে পারে।

মকবুল একটু কাত হয়ে উঠে বসল। কোমরের ব্যথাটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। এত কষ্টের মধ্যেও রজনীকে ও আশ্বাস দিল, শীতকালের মেঘ, দু-এক পশলা যদি নামেও ক্ষতি হবে না।

—ক্ষতি হবে না কি রকম! রজনীর গলা থেকে একটু ঝাঁঝ ছিটকে এল। সব তো নবাব বাদশা নিয়ে কারবার আমার। এমনিতেই কেউ কাজ করতে চায় না, বৃষ্টি

ভুলে সারাদিন কেমন বসে বসে গাঁজা টানবে।

মকবুল কিছুক্ষণ শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকল, রজনীর এত দুশ্চিন্তার কোন কারণ খুঁজে পায় না ও। তবু সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে বলল, অত ভাবছ কেন, বুঝতে পারি না। যা হবার তা হবেই। ঈশান ফিরেছে ?

রজনী এই প্রশ্নটা শোনার জন্যই যেন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল, ক্রোধ উগরে ফেলল, ও ব্যাটাকে এখান থেকে বিদেয় না করলে কারো মঙ্গল নেই। অত করে বলে দিলাম, যাবি আর চলে আসবি। তা শুনলে তো।

মকবুল রসিকতা করল, তাহলে একটা কাজ কর না, মেয়েটার সঙ্গে ওর সাদি দিয়ে দাও। আপদ চুকে যাক। ও ব্যাটার এখন মেয়েছেলে দরকার।

—না না, ঠাট্টার সময় নয় রে মকবুল। চারদিক থেকে আবার যে একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। ফের যদি আগের বারের মতো এখান থেকে আমাদের পালাতে হয়, কি করে মুখ দেখাব বল তো!

মকবুল তাচ্ছিল্য দেখাল, না না পালাব কেন! কিচ্ছু হবে না, দেখে নিও। সেবার অন্য ব্যাপার ছিল।

—কি ব্যাপার!

—সেবার ওর গায়ে মায়ের দয়া ছিল।

—এবার ও কিসের দয়া নিয়ে এসেছে কে জানে!

মকবুল বলল, আমার একটা কথা শুনবে ?

—কি ?

—আমি বলি, এখানে যত মেয়েছেলে আসবে সবাইকে ধরে রাখ। মেয়েছেলে না থাকলে মনে ফূর্তি থাকে কারো। ঘুমিয়ে, জেগে সারাক্ষণ কেবল ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া পুরুষের মুখ।

রজনী কিছুক্ষণ থমকে রইল। পরে গম্ভীর গলায় বলল, মেয়েছেলে আসলে সব ব্যাটা জঙ্গলের কাজ ফেলে এঁটুলির মতো ওদের গায়ে লেগে থাকবে। সোনায় সোহাগা হবে তাহলে।

—তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু সত্যি নয় রজনী ভাই। মেয়েছেলের সঙ্গে একটু ফুর্তিফার্তা করতে পারলে দেখবে দশজনের কাজ একজন করছে।

—তার আগেই ছোটকর্তার কাছে খবর পৌঁছে যাবে। ছোট কর্তা তার খরচ জোগাবেন কেন ? টাকা তো আর খোলামকুচি নয়।

—তাহলে এই যা কাজ পড়ছে, এ-রকমই হবে রজনী ভাই। মানুষের মনে ফূর্তি না থাকলে কাজ হয় ?

রজনী দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল, বাইরে অন্ধকার। পাতলা একটু বাতাসের শব্দ ওর কানে এল।

—অন্ধকারবেলা বোজ আগুন জ্বালাধার কথা, কিন্তু তাড়া না লাগালে কেউ আগুন লাগায় না। আর একদিন যখন কাউকে তুলে নিয়ে যাবে যাবে তখন টের পাবে সবাই।

মকবুল আর কথা বাড়াল না।

—তাছাড়া ছোটকর্তার মনোভাব তোরা জানিস না। আমি জানি।

—কি মনোভাব ? মকবুল উৎসাহে তাকাল।

—ছোটকর্তার ইচ্ছে, সেই দয়াল ঘোষকেই আবার এখানে পাঠিয়ে আমাদের মাথার ওপর বসিয়ে দেন। দয়াল ঘোষ এলে কার ভাল হবে ? এত স্বাধীনতা কে পাবে শুনি ?

—কেন, দয়াল ঘোষকে পাঠাবেন কেন ?

—বুঝিস না কেন। আমরা এসে আসার পর দয়াল ঘোষ তো আর চুপ করে বসে থাকার লোক নয়, ও নির্ঘাৎ ছোটকর্তার কানে মন্ত্র ঢালছে।

মকবুল এসব কথা কখনো ভেবে দেখে নি। এখানে মাথার ওপর রজনীই থাকুক আর দয়াল ঘোষই থাকুক ওর কিছু যায় আসে না। কিন্তু রজনীর যে এর জন্য একটা উৎকণ্ঠা থাকতে পারে, এটা ওর মাথায় আসে নি কোনদিন। ফলে হাওয়া বুঝে ও বলল, উড়ে এসে আর কেউ এখানে জুড়ে বসতে পারবে না রজনী ভাই। মিছি-মিছি তুমি ভাবনা করছ।

—তুই তো বলে খালাস। এলে ঠেকাতে পারবি ?

—আসবেই না।

—যদি আসে ?

—ঠিক আছে, যদি আসে তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

—কি ব্যবস্থা ?

রজনীর মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে দেখায়। মকবুলের মায়া হয়। বলে, আমার কাছে অষুধ আছে। যদি দরকার হয়, দেব।

—কি অষুধ ?

মকবুল বলল, সে সব সময় মতো দেওয়া যাবে। আর দুশ্চিন্তা কোরো না দেখি। ঈশান এল কিনা একবার খোঁজ নাও।

—বল না বাপু! কি অষুধ, জেনে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।

মকবুল একটু থমকে রইল। পরে বলল, আমাদের মধ্যে রসিকলাল আছে। ওকে দিয়েই তুকতাক করাব। এমন বাণ মারাব সে দয়াল ঘোষ মুখে রক্ত তুলে তুলে মারা যাবে।

রজনী কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ল, ধুৎ। ও বেটার ঘটে কিছু নেই। বাঘবন্দী নিয়ে কি করল দেখলি না।

—ওর মধ্যে কি আছে না আছে আমি টের পেয়ে গেছি রজনী ভাই। দেখো সময় মতো ঠিক কাজে লাগাব ওকে।

পাশ ফিরতে গিয়ে মকবুল কোমরে হাত রাখল, ওরে বাপ হাড়গুলো বোধহয় গুঁড়োই হয়ে গেছে।

রজনী বলল, মালিশ করিয়ে নে না। কাউকে ডাকব ?

মকবুল হাসল, না, দরকার হবে না। শুধু একটু নিশ্চিন্ত হও তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আরো কিছুক্ষণ বসে রইল রজনী। তারপর বলল, ঠিক আছে। তুই ঘুমো। তবে দরকারের সময় যেন সজাগ থাকিস মকবুল। বিদেশ বিভূঁইয়ে তুইও যা আমিও তা। ভুলে যাস না যেন।

মকবুল চোখ বুজল। ঠিক আছে: এখন যাও।

রজনী ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। বাইরে ততক্ষণে তিন চারটে [illegible] আগুন জ্বলাতে শুরু করেছে। এপাশ ওপাশ খোঁজ নিয়ে জানল, ঈশান এখনো ফেরে নি। ঈশানটা যে আবার একটা বিপদ ডেকে আনতে চাইছে তাতে সন্দেহ নেই। রজনী অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকল জেটির দিকে।

ঈশান জেটি ডিঙিয়ে আরো নিচে গৌরীর নৌকায় ততক্ষণে উঠে বসেছে। গৌরীকে যে দু চোখ ভরে আবার কোনদিন ও দেখতে পাবে কে ভেবেছিল। নিজের চোখকেই যেন ও বিশ্বাস করতে পারছে না। হ্যাঁ অবিকল সেই চোখ, হুবহু সেই মুখ। তফাৎ কেবল সেদিন ঐ চোখ দুটো ছিল সজল, যন্ত্রণায় কাতর, আর আজ কত উজ্জ্বল। কত খুশী খুশী দেখাচ্ছে আজ গৌরীকে। এই রকম একটা পরিবেশ ছেড়ে আবার বাড়ির দিকে ফিরে যাওয়ার কথা মনেই এল না ওর।

ঈশান আপজনের মতো গুছিয়ে ওদের সঙ্গে নৌকায় গিয়ে বসে পড়ল। কিন্তু গৌরীর সঙ্গে এই নতুন মানুষটা যে কে বুঝতে পারছে না ঈশান। কোথেকে যে এই লোকটা ওর সঙ্গে জুড়ে বসেছে আর একটু পরিষ্কারভাবে না জানা পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই। অথচ খোলাখুলিভাবে গৌরীকে এ ব্যাপারে প্রশ্নও করা যাচ্ছে না। লোকটা এঁটুলির মতো সঙ্গে লেগে আছে গৌরীর। প্রথম থেকে লোকটা এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন গৌরী ওর বউ। আর তাই যদি হবে, কপালে সিঁদুর নেই কেন গৌরীর। খ্রীস্টান হলে কি কপালে সিঁদুর দেওয়া বারণ. ঠিক ধরতে পারে না ও।

চারপাশে এখন ঝিমঝিমে রাত। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, নদীর জলে ফসফরাস জ্বলছে। সাপের মতো আঁকাবাঁকা ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে ফসফরাস। আগুনের টুকরোগুলি বুদবুদ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার ঝকঝক করে জ্বলে উঠছে। এ এক অদ্ভুত খেলা নদীর।

গৌরী রান্নার জোগাড় করে নিয়েছিল নৌকাতেই। ঈশানকে ওরা নেমতন্ন করে বসল। আজ কিন্তু আমাদের সঙ্গে খেয়ে যেতে হবে ঈশান ভাই। সামান্য নুন ভাত তবে গরম গরম খাওয়া যাবে, এই যা।

ঈশান এক কথাতেই রাজি। নুন ভাতই অমৃত। কাল বরং দু-এক মুঠো ডাল জোগাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করব: এখানে যদি মাছ ধরা যায়, চেষ্টা করে দেখব।

উনোনে বাতাস করতে করতে চোখ মুখ লাল করে ফেলেছিল গৌরী। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মিষ্টি করে হাসল, সত্যি সত্যি তুমি আমার দাদার মতো। তোমার সঙ্গে আবার যে একদিন দেখা করতে পারব স্বপ্নেও ভাবি নি। কী ভালো যে আজ লাগছে কি বলব তোমাকে।

ঈশানের সারা গায়ে সুখের কাঁটা দিয়ে উঠল। নিজের কানকেই যেন ও বিশ্বাস করতে পারছে না। মেয়েটা অকৃতজ্ঞ হলে নির্ঘাৎ ওকে ভুলে যেত। ওর দুর্দিনে এমন কিছুই করতে পারে নি ঈশান। কোন কিছু করাও সম্ভব ছিল না, তবু যে ভুলে যায় নি ওকে এই তো যথেষ্ট।

ঈশান উনোনের দিকে তাকিয়ে থাকল। কার মুখ দেখে যে আজ উঠেছিলাম!

—কি ভাবছ? প্রশ্ন করল গৌরী।

ঈশান চমকে উঠল কৈ কিছু না তো। কিছু না!

লক্ষ্মণ কিছুটা রসিকতা করার চেষ্টা করল এ সময়, বাবুর বিয়ে থা হয় নি, এই বয়সে বিয়ে-থা না হলে একটু উদাস উদাস ভাব থাকবেই।

ঈশান কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল, না না, সে সব না।

—সে সব না মানে! আমরা শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখেই চিনতে পারি।

—সাইরী বলছি, সে সব না। এই জঙ্গলে সাপ বাঘের সঙ্গে বাস করে বিয়ে করার কথা ভাবাই যায় না। কবে আছি কবে নেই কে বলবে!

ওরে বাস! এ যে সন্নোসীর মতো কথা বলে গো। হা হা করে হাসল লক্ষ্মণ।

—বিশ্বাস হলো না তো! কয়েকদিন আগে আমাদের একজনকে বাঘে নিয়ে গেছে জানো। ক'দিন পরে লোকটাকে যখন খুঁজে বার করলাম, তখন চেনাই যায় না। বাঘ তো আমাকেও নিয়ে যেতে পারত।

গৌরী উনুনের দিক থেকে চোখ ফেরাল। এই রাত করে বুঝি ওসব কথা বলতে আছে।

—বিশ্বাস কর, একটুও বানিয়ে বলছি না। এক নৌকো বোঝাই লোকের ভিতর থেকে টুক করে একজনকে ঠিক তুলে নিয়ে গিয়েছিল বাঘে।

—ফের ঐ কথা। দোহাই ঈশানদা, খারাপ কথা আর একদম শুনতে ভাল লাগে না। এবার অন্য কথা বলো।

লক্ষ্মণ টিপ্পনি কাটল, বাঘ কিন্তু মানুষ চেনে। সবাইকে ছোঁয় না।

ঈশানের হাত-পা কেমন নিশপিশ করে উঠল। লোকটার চোয়াল জুড়ে একটা ঘুষি চালিয়ে দিলে যেন শান্তি হয়। বলল, রাতে দুবার একবার বাঘের ডাক শোনা গেলেই বোঝা যাবে হিম্মত কত!

গৌরী মাটির হাঁড়ির ঢাকনা খুলল, ভাত উথলেছে কিনা দেখার জন্য হাতা ডোবাল।

ঈশান আবার প্রশ্ন করল, তোমাদের ঘোষবনে বাঘ পড়ে না কখনো?

গৌরী হাসল, ঘোষবনটা আমার নয়, ওদের। ওরাই ওখানকার মানুষ। আমার বাড়ি বিদ্যাপুরীতে।

লক্ষ্মণ একটা বিড়ি ধরাল বাঘ পড়েছে বলে কখনো দেখি নি। তবে আমাদের পাদরিপাড়ায় যদি ভুলে বাঘ ঢুকে পড়ে আমরা তাকে খ্রীস্টান বানিয়ে ছাড়ব।

—তা অবশ্য তোমরা পারো। গৌরী হাসতে হাসতে বলল, তোমরা যাকে ছোঁবে, সেই শেষ পর্যন্ত খ্রীস্টান হয়ে ফিরে আসবে।

কথাটার মধ্যে কিছুটা শ্লেষ মেশানো ছিল। লক্ষ্মণ সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা দিল খ্রীস্টান তো আর খারাপ কিছু না, তুমি যে খ্রীস্টান হয়েছ, এতে তোমার লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে?

—বুঝতে পারি না। কেমন অসহায় ভঙ্গিতে তাকাল গৌরী।

লক্ষ্মণ থ হয়ে তাকিয়ে থাকল। পাদরি-পাড়া থেকে বেরিয়ে এসেই বলছ, বুঝতে পার না। অথচ ঐ পাদরিপাড়ার জন্যই তোমার জীবন বেঁচেছে। এখনো তোমার

বুকে যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ আঁকা লকেটটা চকচক করছে।

নিজের অজান্তেই বোধ হয় লকেটের উপর আঙুল উঠে এল গৌরীর। কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ও।

লক্ষ্মণ যেন আরো কিছু কথা শোনাতে পারলে খুশী হয়, বলল, ভাগ্যিস তুমি দুর্লভজাদুর মতো মানুষের হাতে পড়েছিলে! ভাগ্যিস ভগবান যীশু তোমার উপর সদয় ছিলেন, নইলে কে তোমায় বাঁচাত বলো দেখি।

—দুর্লভজার মতো মানুষ হয় না। বিড় বিড় করে বলল গৌরী।

—আর ফাদার?

—ফাদারও খুব ভালো। তুলনা হয় না।

ঈশান চুপ করে বসে থাকে। বুঝতে পারে ওর এক্তিয়ার বহির্ভূত কথা হচ্ছে। ফলে নীরব হয়েই থাকতে হয় ওকে।

লক্ষ্মণ পরিস্থিতিটা সহজ করার জন্য বলল, ঠিক আছে, ঈশান ভাইকে একবার পাদরিপাড়া দেখিয়ে আনব, তা হলেই হবে।

ঈশান বলল, আমার কিন্তু সত্যি সত্যি একবার দেখে আসতে ইচ্ছে করছে। এই জঙ্গলের ভিতর দিনের পর দিন আর ভাল লাগে না।

লক্ষ্মণ বলল, ঠিক আছে, আমরা বিদ্যাপুরী থেকে ফেরার পথে না হয় তোমাকে তুলে নিয়ে যাব এখান থেকে। কি বলো গৌরী, সেটাই ভাল হবে না?

গৌরী বলল, এখনই ওকে নিয়ে যাওয়া যায়। মা ওকে দেখলে খুব খুশী হবে।

লক্ষ্মণ বলল, বিদ্যাপুরী গেলে তোমার মা সে আমাদের ভাল চোখে দেখবে, এমন নাও হতে পারে। তার উপর আবার তুমি খৃস্টান হয়ে গেছ।

গৌরী বলল, তাতে কি?

—তাতে কি মানে! তোমাদের ওটা হচ্ছে হিন্দু গাঁ। সত্যই বলো বাপু আমাদের ভালো চোখে দেখার কথা নয়।

গৌরী বলল, মা আমাকে দেখলে খুব খুশী হবে। আর তোমরা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছ জানলে তোমাদের ওপরও খুশী হবে।

—হলেই ভাল। তবে ঈশান ভাইকে আবার এই ঝামেলার মধ্যে না টানাই ভালো। আমরা ওখান থেকে ফেরার পথেই বরং ওকে পাদরিপাড়ায় নিয়ে যাব।

ঈশানের বলতে ইচ্ছে হল, না না, আমিও সঙ্গে যাব তোমাদের। বিপদ হয় আমারও হোক। কিন্তু বলতে পারল না। ওরা না চাইলে গায় পড়ে যাওয়াটাও উচিত নয়। পর মুহূর্তেই ওর মনে হল, এই লক্ষ্মণই ওদের মাঝখানে জুটে গিয়ে সব কিছু ভণ্ডুল করে দিতে চাইছে। গৌরীর ইচ্ছে থাকলেও লক্ষ্মণই আপত্তি তুলেছে ওকে সঙ্গে নেওয়ার। লোকটার মতলব যে কি কে জানে।

লক্ষ্মণ বলল, আমরা কষ্ট পাই ঝাঁটা লাথি খাই, কিছু যায় আসে না। কিন্তু ঈশান ভাইকে তার মধ্যে মিছিমিছি না জড়ানোই ভালো।

গৌরী আর তর্ক করতে চাইল না। এই মাস দুই ও মা ছাড়া। কি কুক্ষণেই যে ও বেরিয়ে পড়েছিল! মায়ের জন্য যে একদিন এমন করে ওর মন পুড়বে কে ভাবতে পেরেছিল। মাও নিশ্চয়ই গৌরীর জন্য সারাদিন সারারাত আকুল হয়ে কাঁদে! যাকে তো কোনদিন দেখে নি একা, চিনবে কি করে! বুঝবে কি করে মায়ের কষ্ট। গৌরী বাড়ি ফেরায় গ্রামের লোকগুলি যদি ঝগড়া করতে আসে! গ্রামের লোকগুলো মা হিংসুটে, সত্যি সত্যি ওরা যদি টিকতে না দেয় ওকে, চলে আসবে গৌরী। চাই কি আবার পাদরিপাড়াতেই ফিরে যাবে। ফাদারকে গিয়ে সব কিছু খুলে বলবে গৌরী।

কি হল? চুপ করে গেলে যে? লক্ষ্মণ প্রশ্ন করল।

গৌরী বলল, কি বলব?

—বলব মানে, আমি তোমাকে এখনো সব কিছু ভেবে দেখতে বলছি গৌরী। বিদ্যাপুরী গেলে কপালে কি আছে তা ভাল করে ভেবে দেখা দরকার।

গৌরী বলল, আমরা পাদরিপাড়া ছেড়েছি বিদ্যাপুরী যাব বলে। তুমি না যেতে চাও আমি ঈশানদাকে বলব আমাকে নিয়ে যেতে।

লক্ষ্মণ ঈশানের দিকে তাকাল। শোন কথা আমি কি যাব না বলেছি নাকি? আমি কেবল খারাপ দিকগুলো মনে করিয়ে দিলাম। যাক গে ওসব কথা থাক।

গৌরী বলল, আমার কাছে ভালও যা খারাপও তা।

ঈশান বলল, দরকার হয় আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি গৌরী। আমার তো সারাক্ষণ বিপদ নিয়ে বেঁচে থাকা, আমার ক্ষতি হবে না।

—না না, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না ঈশান ভাই। পাদরিপাড়া ছেড়ে যখন বেরিয়ে পড়েছি তখন আমিই পারব। পরমুহূর্তেই লক্ষ্মণের মনে হল এসব আলোচনা এ সময় না করাই ভালো। শত হোক ঈশান বাইরের লোক। দুজনের মধ্যে ঈশান এসে জুড়ে বসবে এটাও ঠিক উচিত নয়। হেসে প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য বলল, আমরা এবং দুএকদিন এখানে থেকে বিশ্রাম করে যেতে পারি। কি? আপত্তি নেই তো ঈশান ভাই?

ঈশান বলল, দুদিন কেন, যতদিন ইচ্ছা থাক না, তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না।

লক্ষ্মণ বলল, তা ছাড়া বিদ্যাপুরী [illegible] [illegible] জেনে কয়ে নেওয়া দরকার। [illegible] কোথায় কেউ জানে কিনা আগে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

গৌরী বলল, এখান থেকে দিন তিনেকের পথ। আগেরবার তিনদিনের মধ্যেই এখানে এসে হাজির হয়েছিলাম।

—চেনা থাকলে তিনদিনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসা যায়, চেনা নেই বলেই ঝামেলা।

—পাদরিপাড়া থেকেই খোঁজখবর করে বেরোন উচিত ছিল তোমাদের। আমাদের এখানকার কেউ এসব অঞ্চলের খুব একটা খোঁজ রাখে না।

গৌরীর চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে এল, পাদরিপাড়ায় খোঁজ নেওয়ার কোন উপায় ছিল না ঈশানদা। আমরা কিভাবে বেরিয়েছি, তা আমরাই জানি।

—কেন, আসতে দিচ্ছিল না বুঝি?

—সে সব কথা এখন থাক ঈশানদা। ভাত নেমে গেল, এবার খেয়ে নাও দেখি। কাল বরং তোমাকে সব বলব। হঠাৎ জলের কুঁজোয় চোখ পড়তে গৌরী বলল, এই রে জল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কাল কিন্তু এক কুঁজো জল দিতে হবে ঈশানদা।

ঈশান একটা পাতা বিছিয়ে বসে পড়ল, নিশ্চয়ই দেব। আমাদের মিষ্টি জলের গড় আছে। ওখানেই কাল তোমরা স্নান টান সেরে নিতে পার। আমি যতক্ষণ আছি এ জায়গাটাকে নিজেদের মত করে ভেবে নিও।

লক্ষ্মণ রসিকতা করার চেষ্টা করল তার মানে এখানেই আমরা পাকাপোক্ত ঘরবাড়ি বানিয়ে বসে পড়তে পারি আর কি, কি বল!

গৌরী থ' হয়ে তাকিয়ে থাকল।

ঈশান বলল, আপত্তি নেই।

কিন্তু বুকের ভেতর একটা কাঁটার মতো বিঁধতে শুরু করল, এই শালা লক্ষ্মণ লোকটাকে যে কিভাবে জোগাড় করল গৌরী কে জানে! ওরা কি স্বামী-স্ত্রী! গৌরীর সিঁথিতে আর একবার চোখ পড়ল ঈশানের, না বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই।

সিঁথিতে বোধ হয় কোনদিনই সিঁদুর পড়ে নি ওর।

(চলবে)

সামসুল হকের কবিতা

পাপপুণ্য : ৪৫

স্থির লক্ষ্যে সামনে যাওয়া
ভালো
রুস্তু আছে হিশেবমতো
বলে রাখি প্রসঙ্গত
লক্ষ্যটুকুই শুধু তোমার
দেখার
একটা ফুল কি একটা পাখি
কিংবা একটা জীবনধারি
কিংবা স্থিতি আর ঐখানেই
ইতি
সামনে যাওয়া এইরকমের
ভালো
নাকি ক্রমবৃত্তে ঘোরা
ভালো
ঘুমের রুস্তু খুলতে খুলতে
ছাই-বোস্টুমী পাড়া-বুলতে

রোদ্দুরহীন ঊষার যেমন
বেরোয়
কার উঠোনে মাকড়শা জাল
বৌয়ের পায়ে একটা মাতাল
একটা রাখাল পাঁচটা গোরুর
রাজা
ছিন্নভিন্ন শিশুর মড়া
নাকি ভাসে লক্ষ্মীসরা
বৃত্তে আসে তোমার ছায়া
আমি
বৃত্তে পড়ে তোমার ছায়া
আমি
বৃত্তে পড়ে তোমার ছায়া
ছায়ার নৌকো থেকে নামে
কোন বেহুলার স্বামী

জীবনানন্দ

শব্দটি কি ঠিক ষষ্ঠী তৎপুরুষ নাকি কর্মধারয় অথবা বহুব্রীহি
নচিকেতা জানে না কেবল জানে সে যার অতিথি
সেই গৃহস্থের বিপরীত
শব্দটি কি ঠিক ষষ্ঠী তৎপুরুষ নাকি কর্মধারয় অথবা বহুব্রীহি
বুদ্ধ জানে না তা শুধু জানে সুজাতার অবগাহনের
একক সঙ্ঘের সরোবর

বেশি মানুষের দিকে বেশি মানুষেরা থাকে তাই
নচিকেতা নই
তাই সেই বিপরীত গৃহস্থের ভাঙাচোরা ছেঁড়াখোঁড়া সব্জীর বাগানে
নিজের-চামড়ার-ভিস্তি-ভরা জল ঢেলে সারা বেলা বহে যায়
না জানি না ঐ গৃহস্থ আমার বেগার খাটে কিংবা
আমি গৃহস্থের

বেশি মানুষের দিকে বেশি মানুষেরা থাকে তাই
বুদ্ধের প্রতীক নই আমি
তাই গেঁয়ো ভিখিরির ছানিপড়া চোখের ভিতরে ঢুকে গিয়ে
সুজাতার অবগাহনের সেই সরোবর খুঁজে-খুঁজে বেলা বহে যায়
না জানি না সে আমার একক সঙ্ঘের অন্বেষণ
কিংবা আমি সেই সরোবরের পিপাসা

শব্দটি ভাঙলেই দুটো পৃথক শব্দের বক্ষ মানুষের দিকে ছুটে আসে
দুটোতেই পৃথক নিজস্ব দ্বন্দ্ব থাকে
আবার দুজনে
পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতে উঠে মানুষকে স্বর্গের খেলায় নিয়ে যায়
ও তবে শুধুই দ্বন্দ্ব আর কিছু নয়

পেশা—শিক্ষকতা জন্ম—১৯৩৬

রাতে, হাওয়ায় যখন মদ আর নুন—দুই-ই ছিল, কাকদ্বীপের একটি অনির্ভর-যোগ্য দোতলার ঘরে সামসুল অগণিত পদ্য পড়ে শুনিয়েছিল আমাকে। দীর্ঘকাল সমুদ্রের বড় কাছে আছে অনেকগুলি কাব্য-গ্রন্থের প্রণেতা আমার অন্যতম প্রিয় কবি সামসুল—তার ক্ষ্যাপাটে জোয়ার আছে ওর স্বভাবে ও কবিতায়। মরদের মত লেখে এই কালো রোগা মানুষটি, অজস্র টাঁকশাল মত ছড়িয়ে দেয় সেগুলি শহরে-গঞ্জে। কিন্তু আপাত-এলোমেলো ঝড়ের গভীরে একটা কেন্দ্র আছে তার কবিতার। শব্দ, ছন্দ, গ্রামারের কঠিন শৃঙ্খলাকে সে মানে। এবং মানে বলেই হঠাৎ হঠাৎ স্বৈরাচারী হওয়া তাকে ভারী মানায়। সামসুলের পদ্য কখনো নতজানু হয় না। জোর করে জায়গা করে নেয়। তার কবিতার অভিমান: সমর্থ পুরুষেরই অভিমান।

সনৎ করের ছাব

সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবেই নয়, ক্যালকাটা গ্রুপের পর যাঁরা ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে বাঙালী চিত্রকর হিসেবে প্রথম সারির, সনৎ কর তাঁদের অন্যতম। তেলরঙে দীর্ঘদিন ছবি এঁকে ইদানিং ছাপের ছবি নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করছেন বিভিন্ন প্রদর্শনীতে। যে কোন শিল্পীর কাজে নিষ্ঠা অন্যতম সহায়ক হলেও সনৎ করের নিষ্ঠা যা তাঁর ছাপের ছবিতে দেখা যায় তা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। যথেষ্ট কারিগরী সরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও তাঁর ছবির প্রতিটি ছাপ অত্যন্ত নিখুঁত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় একক প্রদর্শনী ছাড়া আন্তর্জাতিক বহু প্রদর্শনীতে নিয়মিত অংশ নিয়ে থাকেন। বর্তমানে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত আছেন।

সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি জাগল
ধৈরয লাজ মান
জীবন রহত সন্দেহ ।। গোবিন্দ দাস—

না হলে ভালই

গৌতম গুহ

আমি এখনো রাগ করে গুরু গুরু শব্দে উঠে আসি
লোকে বলে বাঘের মতন
জঙ্গলে হাল্লুম পছন্দ করি না তবু
বেগুনী রঙের শাড়ি পর তুমি, বন্ধু খাঁকি প্যান্ট
হাওয়াজলের মতো আমোদ আহ্লাদে ভেজো
ছেপে নাও সূর্যাস্তের রঙে
যুগ্ম কাঁচুলি।

আমার এই বুকজুড়ে বয়ে যাক খোলামেলা
সমুদ্রের বায়ু
মুক্তি চাই, মুক্ত থাকি যতটা সম্ভব
যথাটে দেয়াল শুধু মাঝে মাঝে বায়ু রোধ করে

না হলে ভালই থাকি, না হলে ভালই—

প্রতিক্রিয়া

উজ্জ্বল সিংহ

একজন কবি, সে যুবা, শ্মশানভূমির থেকে দীর্ঘরাত
হিম অনুভবে জেনেছিলো জীবন-বিক্রিয়া,
কুসুম পতনে তার দু'নয়নে শীত ঘন হয়ে আসে
প্রকৃত অনীহা তার অধ্যাত্মপানীয়ে, ঘোরের ভিতর
শুধু তার অর্ধস্ফুট স্বর শোনা যায়, ঋণী আমি ঋণী।
সেসময় কিশোরীনদীটি তার সলজ্জ জামার মায়া ছাড়ে
একমাত্র সে-ই বুঝি জানে, ভোরবেলা
ঐ কবি কিভাবে ব্যবহার করেছে তার যৌবন-বিষাদ
শবদহনের পর মানুষের বাস্তুভিটেয় শীতল বাতাস বহে শুধু।

যাবার সময়

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়

মোটামুটি এই ছিল যাবার সময়
ঝড় উঠেছিল ঝড়
খসে খসে পড়েছিল পাতা
ভাঙা ডালপালা
উড়েছিল ধুলোবালি ঝড়
এই এমনই হয় যাবার সময়।

কোন কিছু রেখে যাওয়া ছিল না জরুরি
এখানে সেখানে তবু চিহ্ন ভূরি ভূরি
এলোমেলো স্মৃতি ও বিস্ময়
এই এমনই হয় যাবার সময়।

চিরদিনের মৌরীকে

সুরজিৎ ঘোষ

সন্ধ্যার পাণ্ডুর রঙ হাওড়ার সন্ধ্যাবাজারে নেমে এলো
মাথার প্রবল বৃষ্টি দুর্গা-বাড়ীর ঢাক বাজায়
অজস্র ঘোলাটে জল দু'পায়ের পাশ দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে
এলোমেলো, শব্দের আনন্দে কিছু ধ্বনি-দেবত্ব হ'য়ে।

রাত বাড়ছে অন্তঃশীল চাঁদ ঢাকছে মেঘের জটিল আস্তরণ
মায়ের আশীর্বাদ অভ্রের গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে পড়ছে মাথার উপরে
টিনের দোকানঘর কুটো ক'রে ছোট ছোট জলবিন্দু হ'য়ে।
কিছু তার চিবুকে লেগেছে তাই মুখের কোমল ভোল
অভিমানে কেঁপে ওঠা থামিয়ে এখন সংহত প্রতিষ্ঠায় স্থির;
সময়ের রূপো লেগে এতদিনে মায়াবী শরীর অলৌকিক
হয়ে গেছে তবু জানলার ঘষা-কাঁচে গলির দোকান-ঘরে

আমাদের এক রাত পুজোর বর্ষণ বেঁচে আছে।

(১০)

১৯১৮ সালটির বিশ্বের ইতিহাসে একটা বিশেষ মূল্য আছে। মনে হয় ঐ সময় থেকেই রাজাদের যুগ ক্রমে শেষ হয়ে, জনযুগের সূচনা হয়েছিল। তবে পাহাড়ের ওপরে ঐ সুন্দর জায়গাটির অবস্থান ছিল রাজনীতির বাইরে। ঐ বছর দিদির আমার নিশ্চিন্ত শৈব হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়ে, দায়িত্বপূর্ণ কৈশর আরম্ভ হল। বছরের শেষে শুনলাম বিশ্বযুদ্ধও যেমন শেষ হয়েছে, তেমনি আমাদের ডবল প্রমোশন দিয়ে ষষ্ঠ স্ট্যান্ডার্ডে তুলে দেওয়া হয়েছে। মা গেছিলেন স্কুলে, মাদার মার্গারিটা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন; মায়ের কোনো আপত্তি নেই তো? বছরের শেষে কিন্তু প্রিলিমিনারি কেম্ব্রিজ পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে হবে। বলা বাহুল্য মা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে এলেন। আমরা একটু ঘাবড়ে গেলাম। আমার তখনো এগারো পূর্ণ হয়নি, অনেক বিষয় বড্ড ছেলেমানুষ ছিলাম, কিন্তু পড়াশুনোকে ভয় পেতাম না। বেশ তো, তাই দেওয়া যাবে।

যুদ্ধ শেষ হলে সরকারি খরচে আনন্দোৎসব হল। স্কুলের ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো-দাওয়ানো, খেলাধুলো, নাচগান; জনসাধারণের জন্য মিলিটারি টাট্টু ইত্যাদি কত কি হল। ঘরে ঘরে মোমবাতির আর তেলের পিদিমের সারি বসানো হল। আমাদের স্কুল ততদিনে বন্ধ হয়ে গেছিল, কাজেই দলের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ থেকে বাদ পড়ে গেলাম। তবু জনসাধারণের সঙ্গে দাঁড়িয়ে খুব মজা দেখলাম। ডাক্তারবাবু না কে যেন আমাদের দেখতে পেয়ে, ধরে নিয়ে গিয়ে, খাস্তা নিমকি, গজা, মতিচুর খাওয়ালেন। ফলে খুব জল তেষ্টা পেল। তখন আবার লেমোনেড খাওয়ালেন। সেকালের লেমোনেডের বোতলের মুখটা একটা কাচের মার্বেল দিয়ে আঁটা থাকত। মার্বেলটাকে একটা ছোট যন্ত্রের চাপ দিয়ে নামিয়ে দিলে, তবে বোতলের মুখ খুলত। সুখের বিষয় বোতল না ভেঙে মার্বেল বের করার উপায় ছিল না। কম চেষ্টা করিনি।

ছুটির পর স্কুল খুললে বন্ধুদের কাউকে কাউকে দেখতে পেলাম না। সেলাই, বোনা, হাতের কাজ, ছবি আঁকা ইত্যাদির ক্লাস কমে গিয়ে, বই পড়ার ক্লাস অনেক বেড়ে গেল। এখন বুঝতে পারি ও'দের ইংরিজি শেখাবার নিয়মটা বড় ভালো ছিল। এর আগে পর্যন্ত আলাদা গ্রামারের বই পড়িনি। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামারে যাবতীয় শিক্ষণীয় অংশ সব একেবারে পাখি-পড়া হয়ে গেছিল। গ্রামারটাকে কোনো দিনও পাঠ্যাংশ থেকে আলাদা করে দেখিনি। ফলে শুধু আমাদের নয়, আমাদের স্কুলের সকলের ধাপে-ধাপে গ্রামার সরগড় হয়ে গেছিল। ঐ ষষ্ঠ স্ট্যান্ডার্ডে উঠে যখন আমাদের হাতে নেসফীল্ড-এর গ্রামার দেওয়া হল, খুলে দেখলাম সমস্তই জানা বিষয়, শুধু আরেকটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা। তাই গ্রামার কখনো একটা সমস্যা বলেই মনে হয়নি। এখনকার বিদ্যা-দিগ্‌গজরা যদি ঐ নিয়মে নিচের ক্লাস থেকে ইংরিজি গ্রামার আর বাংলা ব্যাকরণের আলাদা বই মুখস্থ না করিয়ে, পাঠের সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে সরগড় করিয়ে দেবার কথা ভাবতেন, তাহলে কি ভালোই না হত।

মোটা মোটা গোটা দুই ফ্রেঞ্চ বইও ছিল। মাদার হায়াসিন্থ, যিনি আমাদের নিচের ক্লাসে মুখে মুখে ফ্রেঞ্চ শেখাতেন এবং সেলাইয়ের ক্লাসও নিতেন, তিনি এবার আমাদের ছেড়ে দিলেন। সেলাই শেখা বন্ধ হল, ফ্রেঞ্চ পড়াতেন মাদার ক্যামিলা। তিনি অনেক পাস-টাস করেছিলেন, বিদ্যে অনেক ছিল, কিন্তু ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ করতেন ঠিক ইংরিজির মতো। আমরা ফরাসী নামের কাছে পাঁচ বছর ফ্রেঞ্চ পড়েছি, আমাদের বেজায় হাসি পেত। মাদার ক্যামিলা আমাদের পরীক্ষার জন্য তৈরি করতেন, মাদার হায়াসিন্থ আমাদের মগজের মধ্যে ফ্রেঞ্চ ভাষা একটু একটু করে ঢেলে দিতেন। আজ পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ ভুলতে পারিনি।

চমৎকার শেখাতেন মাদার হায়াসিন্থ; খারাপ কাজ করে কখনো পার পাওয়া যেত না। একটা সায়ার সমস্ত তলাটা হয়তো কেউ 'হেম' করেছে, মাঝখানে কয়েকটা বাঁকা ফোঁড় দিয়েছে। সেটাকে আর খুলে শুধরোয়নি। মাদার হায়াসিন্থের ছিল বাজপাখির মতো চোখ, অমনি ভুলটি ধরেছেন। একবার দুষ্কৃতকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে, কুচ করে কাঁচি দিয়ে অকুস্থলের সুতোটি কেটে সবটা টেনে বের করে আনতেন। অপরাধীকে চার-পাঁচটি ফোঁড় না শুধরিয়ে, ফাঁকি দেবার খেসারত দিতে হত গোটা লাইন আরেকবার সেলাই করে। উল বোনার বেলাও তাই। ছোট্ট একটা ভুল করে হয়তো পাঁচ-ছয় ইঞ্চি বুনে গেছি, ভাবছি মাদার লক্ষ করবেন না। মাদার একবার তাকিয়ে দেখে, বোনার কাঁটা দুটি টেনে বের করে এনে ফড় ফড় করে উল টেনে ভুল জায়গা পর্যন্ত সবটা খুলে দিলেন! পরে অবিশ্যি আমাকে হাতে ধরে শিখিয়ে দিয়েছিলেন ভুল বুনে তারপর অনেকখানি বুনে গেলেন, সেই কটি ঘর কি করে খুলে নামিয়ে আবার বুনে তুলতে হয়। মানুষটা ছিলেন পারফেকশনিস্ট, ভালো গুরু অমনি হয়। খুঁত তারা বরদাস্ত করে না।

এসব কথা ভাবতে গেলে মনে হয়, কাজের কত শক্ত গাঁথুনি তৈরি করে দেবার চেষ্টা করতেন তাঁরা, যাতে তার ওপর ভবিষ্যতের প্রাসাদ গড়া যায়। এখন মনে হয় ভিত গড়বার সময় না দিয়ে ছেলেমেয়েদের ওপর বড় বড় বোঝা চাপাবার চেষ্টা হয়।

সে যাই হক, যুদ্ধ তার কালো ডানা গুটিয়ে নিলে দেখা গেল খুব একটা তফাৎ চোখে পড়ছে না। আমরা পড়াশুনো নিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে তখনো গাছেটাছে চড়ি। ছোট বোনটার দেড় বছর বয়স হল। আমার বেজায় ন্যাওটা। স্কুল ছুটি হলেই বড় বড় পা ফেলে বাড়ি চলি, বড় বড় চোখ করে সে আমার পথ চেয়ে থাকে। এমন সময় শোনা গেল বাবা আসছে বছর কলকাতায় হেড আপিসে বদলি হয়ে যাবেন। আমাদের শিলং-এর পাট ফুরোল। প্রিলিমিনারি কেম্ব্রিজ পরীক্ষা শেষ হবে ডিসেম্বরে, আমরা শিলং-এর বাড়ি তুলে দিয়ে, বড়দিনের সময় কলকাতা চলে যাব। সেখানকার স্কুলের নতুন ক্লাস শুরু হয় জানুয়ারি থেকে; বাবাকে আরো ছয় মাস শিলং-এ থাকতে হবে।

খবরটা শুনে অবধি পা কাঁপছিল। এতকাল আমরা উদগ্রীব হয়ে ছিলাম কবে কলকাতা যাব। এখন কলকাতা যাবার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এ বাড়ি, এ বাগান, এই ফলের গাছ, ফুলের গাছ, তরকারির বাগান ছেড়ে যাব কি করে? আর কখনো আসব না? পাশের বাড়ির কাগুমাজির ঘোড়া ছেলের সঙ্গে আমাদের আজন্মের শত্রুতা, তাকে ছেড়ে থাকব কি করে? আলু গাছ আমরা নিজের হাতে করে পুঁতেছি, সে আলু তোলা অবধিও থাকব না?

মন প্রস্তুত করতে অনেকটা সময় পেয়েছিলাম। হঠাৎ প্রিলিমিনারি কেম্ব্রিজ পরীক্ষা তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল। মা বললেন, "কলকাতায় গিয়ে তোদের ডায়োসেসান

স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানকার নানদের লেখা হয়েছে। বাঙালীর মেয়ে, তোদের বাংলা শেখা দরকার।"

কেমন যেন সবটা অবাস্তব মনে হতে লাগল। ডায়োসেসানের মেয়েরা কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিত না, ম্যাট্রিকুলেশন দিত। হঠাৎ ছাড়ার মুহূর্তে ঐ যে স্কুলটাতে ছয় বছর পড়েছি, কিন্তু কখনো একান্ত আপনার বলে মনে হয়নি, তার ওপর মায়া পড়ে গেল। মনে হল, কই, অনেক দিন তো কেউ আমাদের নেটিভ বলে ঘেন্না করেনি। ওপরের ক্লাসের টিচারদের বেশির ভাগই নান্, খাঁটি মেম তাঁরা। তাঁরা কেউ কালো মানুষদের ঘৃণা করতেন না। তাঁদের কাছ থেকে কত যত্ন, কত স্নেহও পেয়েছি। সব কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। তারি মধ্যে ঠেসে পড়াশুনো করি। সত্যি কথা বলতে কি ঐ পড়াশুনো আমাদের একটুও কঠিন মনে হত না। কি সুন্দর সব বই। ইতিহাস, ভূগোল, জীব-বিজ্ঞান, সব গল্পের মতো সরস করে লেখা। কত ছবি, কত চার্ট, কত মডেল।

এখনো মনে আছে সৌর-মন্ডলের মডেল ছিল। মধ্যিখানে সূর্যের জায়গায় একটা মোমবাতি জ্বালাতে হত। তলায় একটা হাতল ছিল, সেটি ঘোরালে গ্রহ-মন্ডলী নিজ নিজ অক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরত। তখনি লক্ষ্য করেছিলাম পৃথিবীটা অক্ষ-তলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, অক্ষ-দন্ড একটু বাঁকা। তার ফলে ডিম্বাকারে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে যখন আর নিজেও পাক খেতে থাকে, কখনো কখনো দিন কেমন বড় হয়, কখনো ছোট হয়। এ-সব জিনিস একবার মগজে ঢুকে গেলে আর ভোলা যায় না। পরে বি-এ ক্লাসে যখন অ্যাস্ট্রনমি পড়েছিলাম, ঐ মডেলগুলোর কথা মনে করে অনেক সুবিধা হয়ে গেছিল। কোনো দিশী স্কুলে বা কলেজে সে-রকম মডেল আনা হয়েছে বলে তো শুনিনি।

যখন ঐ স্কুল ছেড়েছিলাম আমার বারো বছর পূর্ণ হয়নি, কিন্তু মন এতদিন কাদার দল ছিল, এতকাল ধরে যে ছাপগুলি পড়েছিল, সারাজীবনের ওপর তার চিহ্ন থেকে গেছে। ডায়োসেসান স্কুলে কলেজে আট বছর পড়েছিলাম, সে-রকম কোনো প্রভাব অনুভব করিনি। তখন মনন, মানস, মন, যাই বলা যাক না কেন, সে অনেকখানি তৈরি হয়ে গেছিল।

কনভেন্টের মেয়েরা আর নিচের ক্লাসের টিচাররা রোমান ক্যাথলিক ছাড়া আর কাউকে বোধ হয় খৃষ্টান মনে করতেন না। তাই মুসলমান-হিন্দু-ব্রাহ্ম মেয়েদের ওরা বলত প্রটেস্টান্ট। এখন আমরা কলকাতায় গিয়ে প্রটেস্টান্ট স্কুলে পড়ব শুনে, সকলের কি দুঃখ। "তাহলে মরে গেলে আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। প্রটেস্টান্টরা তো অনন্তকাল পার্গেটরিতে বাস করে, তবে যদি পাপ কমে, অর্থাৎ যদি রোমান ক্যাথলিক হয়, তবে স্বর্গে যেতে পারে।" এর উত্তরে স্বর্গবাসের ওপর আমাদের সে-রকম আগ্রহ নেই শুনে ওরা বেজায় আশ্চর্য হয়ে যেত। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে স্কুল বন্ধ হতেই এইসব মেয়েরা সমতল ভূমিতে নেমে গেল। বলে গেল, "তোমরা খুব 'লাকি' যে এই বিশ্রী 'ডাল' জায়গাতে বছরের পর বছর পড়ে থাকতে হবে না। এখানে আছে কি ? না একটা ভালো বায়োস্কোপ, না ভালো দেকন-পট। দেখবে কলকাতা কত ভালো।"

কথাটা খচ্ করে মনে লেগেছিল। ছিল তো একটা হল, সেখানে মাঝে মাঝে বায়াস্কোপ আসত। আমরা দেখিনি অবিশ্যি। আর কি ভালো দোকান জামাৎ-উল্লার আর গোলাম-হাইদারের! খেলনা, টুপি, জুতো, পোষাক, বাসন-কোসন, কেক-বিস্কুট, কি না পাওয়া যায় সেখানে। কক্ষনো কলকাতার কোনো দোকান এদের চাইতে ভালো হতে পারে না' মনটা ভারি হয়ে গেল। যাবার আগে সব জায়গায় একবার ভালো করে দেখে আসতে হবে। মা বললেন, "সবাই মিলে দেখে আসব। আর হয়তো দেখা হবে না।" মার কথা শুনে আমার কাটা টনসিলে সে কি দারুণ ব্যথা !

স্কুল বন্ধ হয়ে যেতেই পরীক্ষার্থিনীরা ছাড়া আর সকলে তো চলে গেল। অমনি স্কুলের আবহাওয়া বদলে গেল। কেমন একটা কোমল অন্তরঙ্গতা আপনা থেকেই গড়ে উঠল। ওখানকার শীতের রোদ বড় মিষ্টি। নানেরো আমাদের রোদ্দুরে বসিয়ে পরীক্ষার জন্য তৈরি করতে লাগলেন। বুঝতে পারতাম যে আমাদের দুজনার ওপর তাঁদের অনেক ভরসা, ভালো করে পাস্ করব, স্কুলের সুনাম হবে। আমাদের মন থেকে কিন্তু পরীক্ষার গুরুত্ব লোপ পেয়েছিল, যতটা আগ্রহ থাকা উচিত ছিল, ততটা ছিল না। অনেক মাস পরে কলকাতায় বসে ঐ পরীক্ষার ফল জেনেছিলাম। ভালোই পাস্ করেছিলাম, কিন্তু খুব ভালো কিছু নয়। খবর শুনে নিজেদের মনের নির্লিপ্ত ভাবে নিজেরাই অবাক হয়ে গেছিলাম।

যে সময়ের কথা বলছি সে-সময়ে আমরা শিলংএ-ই ছিলাম। স্কুলের কাছেই সেন্ট এডমান্ডস্ স্কুল, সেখানে গিয়ে পরীক্ষা দিলাম। স্কুল থেকে আমাদের টিফিনের ব্যবস্থা হল, কত যত্ন করে ওঁরা আমাদের খাওয়াতেন। বুঝতে পারলাম ছাড়াছাড়ির সময় মায়া কত গভীর হয়।

স্কুলের একটা জানলা থেকে গৌহাটি যাবার রাস্তাটির একটুখানি দেখা যেত। একদিন সেখান থেকে দেখতে পেলাম বড় বড় দুটো মোটর নামছে। মনটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ভয়ঙ্কর একটা উত্তেজনা হল। কত নতুন জায়গা দেখব, নতুন মানুষ দেখব, বড় বড় দোকান দেখব, গড়ের মাঠ, যাদুঘর, বায়োস্কোপ, নিউ মার্কেট, যে-সব জায়গার শুধু গল্পই শুনে এসেছি এতকাল। এবার সে সমস্তই চোখে দেখব। বিদায় ব্যথার চাইতে নতুনের ডাকটাই মনের মধ্যে সেই মুহূর্তে বেশি করে অনুভব করলাম।

অন্য বছর শীতকালের আগেই বাবা ট্যুরে যেতেন, সে বছর গেলেন না। শুনলাম এখন তিনি বড় অফিসার হয়ে গেছেন আর তাঁকে বনে যেতে হবে না। আশ্চর্যের বিষয় শিলং ছেড়ে এসে অবধি বাবার সেই অনর্গল গল্পের স্রোত-ও কেমন কমে এল। সন্দেশে বাবার 'বনের খবর' বেরুত, বাবার বনে বনে ঘোরার গল্প। এমন চমৎকার সরস গল্প বাংলায় খুব বেশি নেই। ঝিরঝিরে সহজ ভাষা; বন-জঙ্গল জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে কত অভিজ্ঞতা। অনেক বছর পরে সিগনেট প্রেস বাবার 'বনের খবর' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। বাবা তখন ইহলোকে ছিলেন না। আজ পর্যন্ত অমন বই আর চোখে পড়ল না। তবে একটা কথা মনে হত; এ যেন আমাদের ঘরোয়া বাবার চাইতে আরো উজ্জ্বল, আরো রোমাঞ্চময় আরেকটা বাবার গল্প। অথচ একটি কথাও বাড়ানো বা বানানো ছিল না, ছোটবেলায় বাবার কাছে যেমন শুনেছিলাম, হুবহু তাই। শুধু তার গায়ে সাহিত্যের সোনার আলো লেগে গেছে ; সাহিত্য যে কি দিয়ে তৈরি হয় তাই বা কে বলতে পারে। বনের খবরের ঘটনাবলী বাবার পুরনো ডাইরি থেকে নেওয়া। বাবা যেমন

করে রেখেছিলেন, অবসর নেবার পর গুলিকে খাতায় লিখেছিলেন। পরে কুলে' একবার কিছু বেরিয়েছিল। নো সন্দেশেও সবটা বেরোয় নি। আমি র হাতে লেখা খাতা সিগনেট প্রেসকে য়ছিলাম। ও'রা তার থেকে নকল করে য়, খাতা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রর ঘাম আর রক্ত আর 'প্রাণের ফুর্তি' য় লেখা জিনিসকে কি কথনো 'ঘরোয়া' দেওয়া যায়? নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপারেও দু লেগে যায়। এই 'মনের খবর' অনেক রে পুনর্মুদ্রিত হয়নি, আশা করছি হয়তো বার আবার প্রকাশিত হবে। বই পড়ে তের বাবাকে চিনতে হবে এ যেন ল্টো কথার মতো শোনায়। কিন্তু ঐ ইতে বাবার একটা না দেখা দিক রে বারে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যদি তাম সে দিনের সেই শিলংটাকে তার ত আলো হাওয়া মাধুর্য সুদ্ধ ধরে দতাম। পরীক্ষার পর সব পুরনো প্রিয় জায়গাগুলোকে আরেকবার দেখলাম। এসব য়গায় কত চড়িভাতি করেছি, তার কত তি মনে জড়িয়ে আছে। এই সেই 'সেভেন লস' সাতটি জলের ধারা নেমেছে। কুচি চি জল-কণায় রোদ পড়ে এখানে রামধনু তৈরি হয়। ঐ পাহাড়ের গায়ে একবার দুটো গলকে খেলা করতে দেখেছিলাম। এক-নের শিং-এর ওপর আরেকজন শিং বাগিয়ে ঝিয়ে পড়ছিল, আর খটাং-খটাং শব্দের ন উঠছিল।

পৃথিবীর ভালোবাসার জায়গাগুলো অর্ধেক মাটি দিয়ে গড়া আর অর্ধেক মন-জা। পঁচিশ বছর পরে, সে জায়গায় গিয়েও, কে খুঁজে পেলাম না।

মনে আছে পরীক্ষার আগে যেদিন স্কুল ধ হল, সেদিন পুরস্কার বিতরণ হল। ই ছোটবেলায় প্রথম বছর একটা জন্তু-নোয়ারের বই আর একটা ব্যাট-বল পেয়ে- ম, তারপর আর পুরস্কার পাইনি। পের ছবি দেওয়া কার্ড পেয়েই খুশী লাম। এবার বার্ষিক পরীক্ষাই দিইনি তো আবার পুরস্কার! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঠাৎ শুনি আমার নাম ডাকছে। একটা খামে টটি টাকা দিল আমার হাতে! আমি মনি অবাক তেমনি খুশী। এর আগে উ আমাকে কথনো এক সংগে এতগুলো কা দেয়নি। তাই দিয়ে কি করেছিলাম ন নেই।

সব চাইতে বেদনার স্মৃতির কথা বলা ল না। মাকে জিজ্ঞাসা করা হল কলকাতায় য়ে কালামানিক কোথায় থাকবে? সেখানে ড়িতে বাগান থাকে না।' মা একটুক্ষণ র মুখে চুপ করে রইলেন। আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠলাম, 'কিছু বলছ না কেন? ওখানে তো গড়ের মাঠে চরতে পারবে।'

মা বললেন, 'বাবাকে আর জংগলের কাজ করতে হবে না, ঘোড়া রাখার দরকার হবে না। কলকাতায় ঘোড়া পোষার অনেক অসু-বিধা।'

'তাহলে ওর কি হবে? এইখানে একা ফেলে রেখে যাবে?'

মা বললেন, 'তোরা কি পাগল হয়েছিস? তোদের কাঞ্জিলাল জ্যাঠার বদলে যিনি এসেছেন, তিনি ওকে নিচ্ছেন। ও'রা জন্তু-জানোয়ার ভালোবাসেন, পমুকেও রেখে নিচ্ছেন, কালামানিকের কোনো কষ্ট হবে না।'

আমি বললাম, "ও-ও জানে?" মা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমাদের মনে হল বুক ফেটে যাচ্ছে, পেট কামড়াতে লাগল, কাটা টনসিলে ব্যথা করতে লাগল। আর কোনো-দিন আমরা কেউ কালামানিকের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। ছেলেবেলার দুঃখগুলো যে কি প্রচণ্ড, কি অসহনীয়, যাদের ছোটবেলার কথা মনে আছে তারাই জানে।

মাঝখানে দুটি বাড়ি, তার পরেই কাঞ্জিলাল জ্যাঠার বাড়ি। পাড়ার মধ্যেই থাকবে কালামানিক। যেদিন সে আমাদের বাড়ি থেকে চলে গেল, আমরা সকলে তখন স্কুলে, ওর যাওয়াটা কাউকে দেখতে হয়নি। ওর আস্তাবলের দিকেও যাইনি, ওর নাম করিনি কেউ। আমার ঘুম ভেঙে যেত, শুনতে পেতাম আস্তাবলের কাঠের মেঝেতে কালা-মানিক পা ঠুকছে। বেজায় ভালো লাগত। সে রাতটা ছিল নিঃসাড়, নিঃশব্দ, ভয়ংকর: ওকে আর আমরা দেখতেও যাইনি। বাবা বলেছিলেন তাতে ওর কষ্ট হবে।

চলে আসার আগের দিন বিকেলে আর থাকতে না পেরে, আমরা সবাই মিলে কাঞ্জিলাল জ্যাঠার বাড়ির বেড়ার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কালামানিক যে বেড়ার ও ধরেই বাঁধা ছিল বুঝতে পারিনি। হঠাৎ বেড়ার ওপর দিয়ে চোখো-চোখি। ওর চোখ দুটো যেন অতল কালো দুটি দীঘি। এক দৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে রইল, গলার কাছে একটা শিরা চিড়িক-চিড়িক করতে লাগল। পমুও সেখানে ছিল। সে বলল "হু-হু-হু!" বলে কালামানিকের কপালে হাত রাখল। আর কি আমরা সেখানে থাকি! কাঁদতে কাঁদতে দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি এ তখে থামলাম। সেদিন হাঁস পেরু আমাদের ঠুকরে দিয়েছিল কি না তাও টের পেলাম না।

(চলবে)

বীরভূম

বীরভূমের কবিতা বলে কিছু হয় না। কোন কবি বীরভূমে বসবাস করলেই তিনি বীরভূমের কবি হয়ে যাবেন—এরকম শ্রেণী-নির্দেশ ভুল। রেনে গী কাদু জীবনে মাত্র একবার প্যারিসে এসেছিলেন। সম্পূর্ণ জীবন তিনি কাটিয়েছিলেন এক নির্জন পল্লীতে। কিন্তু, তিনি কি ফরাসী কবি নন? এখানে, অন্য কোনো শব্দ না-পেয়ে আমি যাঁদের বীরভূমের কবি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আশাকরি তাঁরা আমাকে ক্ষমা করবেন। এ'রা কতজন? এ-প্রসঙ্গে সম্রাট বাবরের আত্মজীবনীতে বর্ণিত সেকালের একটা কবিসভার কথা মনে পড়ছে। বাবরের উপস্থিতিতে কাবুলে এক বিরাট কবিসভার আয়োজন হয়েছে। দূর-দূর গ্রাম ও শহর থেকেও অনেক কবি এসেছেন। এরকম একজন বহিরাগত কবি দীর্ঘক্ষণ একইভাবে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে থাকার পর পায়ে ঝিম্-ধরার জন্য, অথবা মফঃস্বলীয় চঞ্চলতা হেতুও হতে পারে, ফরাসের ওপর একটু পা ছড়িয়ে বসেছেন। আর ঘটনাক্রমে সেই পা গিয়ে লাগে একজন কাবুলের কবির পশ্চাদ্দেশে। স্বভাবতঃই তিনি একটু রেগে যান ও বহিরাগত কবিটিকে পা-বিষয়ে সতর্ক হতে বলেন। মফঃস্বলের কবি ক্ষমা চেয়ে, পরে বিস্ময় প্রকাশ করে, বলেন, 'কাবুলে এতো কবি যে পা-ছড়ালেই কবির পশ্চাৎ-দেশে ধাক্কা লাগে!'

না, বীরভূমে পা-ছড়ালে কবির পিছনে ধাক্কা-লাগার আশংকাটা বাস্তবিকই কম। কবিদের সংখ্যা বৃদ্ধিটা এখানে মোটেই অপরিকল্পিত নয়। এ'দের সঙ্গে গল্প-লেখক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ইত্যাদিদের টানলেও সংখ্যার হের-ফের হয় সামান্যই। শোনা যায়, মোট বীরভূমবাসীর সংখ্যা নাকি উনিশ লক্ষ। তাহলে বলতেই হবে যে, বীরভূমে লাখে একজন বা দুজনমাত্র লেখা-লেখির ব্যাপারে জড়িত। এবং এ'রা সারা বীরভূমময় ছড়িয়ে রয়েছেন। তবে আড্ডা-গুলোর সীমানা শহর ছাড়িয়ে গ্রামে ঢুকতে এখনো পারে নি। ফলে, গ্রাম থেকে শহরের দিকে কাউকে কাউকে যেতেও হয়, শুধুমাত্র আড্ডামারার জন্য। কিছু বয়স্ক কবি সাহিত্যিকের বাড়িতেও আড্ডা জমে কখনো। যেমন, সিউড়িতে সুধীর করণ ও কবিরুল ইসলাম। কিন্তু এপ্রসঙ্গে এ'দের কথা কিছুই বলা যাচ্ছে না। কারণ, রাস্তাঘাটে আড্ডা-মারার বয়স এ'দের পেরিয়ে গেছে। একটা খুবই লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, বীরভূমের কবিদের ঘোরাফেরা, পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি প্রধানতঃ সিউড়ি ও দুবরাজপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য, এর বাইরেও প্রচুর পত্র-পত্রিকা রয়েছে ও ছিল। কিন্তু মূল আবর্ত-টুকু এই দুই জায়গাকে ঘিরেই।

কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত অধিকাংশ তরুণ কবিদের ঘোরাফেরা ছিল সিউড়ির বিদেশী পাড়ায় দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। এই সেদিন সিউড়ি গিয়ে দেখলুম, বাজার পাড়ার গোলকের চায়ের দোকানও উঠে গেছে। পরিবর্তে এক চা-পাতার দোকান এসে হাজির সেখানে। ঐ পাড়ার ছেলে দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এখন ভাগ্যিস কলকাতায়; তা না-হলে গোলকের দোকানের মধ্যে হা-হুতাশ করেই কাটিয়ে দিতেন সাত মাস। তারপর আবার উঠে পড়ে পদ্য লেখার দিকে এগিয়ে আসতেন। এবং এই ব্যাপারেই উনি প্রায় দশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত। একাদিক্রমে ছ'সাত বছর ধরে তাঁকে কফিহাউসে দেখা যায়। ঐ একই পাড়ার আড্ডা মারেন ও থাকেন অমর দে, যিনি সাত-আট বছর আগে 'অনা দে' নামে লেখা শুরু করেছিলেন। 'সমীক্ষা' নামে একটি পত্রিকা, যা উনি কয়েক সংখ্যা বের করেছিলেন, প্রকাশের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে এখন কলকাতার পত্রিকায় লেখা পাঠাচ্ছেন। সিউড়িতে অমর দে তরুণতম কবিদের একটি প্রতিষ্ঠানের মতোই এখন বসবাস করছেন, বলা যায়। এবং প্রভাত সাহা। ওষুধের অজস্র শিশি-বোতলের ফাঁকফোকর দিয়ে তাঁকে অনবরত ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। সিউড়ির অন্যতম প্রধান ওষুধের দোকানটি এ'দেরই। কবিতা লেখা ও থামে ভরে কলকাতার দিকে ছুঁড়ে-মারাই হলো এ'র একটি প্রধান পরিচয়। কলকাতায়, বর্তমানে, তরুণ কবিদের প্রধান পত্রিকা 'আত্মপ্রকাশে' এ'দের লেখা নিয়মিত দেখা যায়। এছাড়া সিউড়িতে 'যুগোস' নামে একটি পত্রিকা রয়েছে, যার সম্পূর্ণ নাম 'যুব সাহিত্য সংসদ'। এ'রা বছর দুয়েক আগে, সিউড়িতে একটি বিরাট কবি সম্মেলনের আয়োজন করে বেশ আলোচিত হন। এ'দের প্রধান চরিত্র দুটির নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ও পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়। প্রথম-জন, কবিতায় একেবারেই নতুন ও দ্বিতীয়-জন ভিন্ন ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ কর্মে লিপ্ত।

খুব স্বাভাবিকভাবেই, এ'দের সামনে-পিছনে রয়েছেন কিছু অত্যাধুনিক ও একগুঁয়ে পাঠক, যাঁরা কাজ করতে করতে আড্ডা দেন ও আড্ডা দিতে দিতে কাজ করেন। বলা যেতে পারে, রাতে খাবার পর ও ঘুমোবার আগে তাঁদের নির্জন পড়ার সময়টুকু ছাড়া তাঁরা পারতপক্ষে আর কিছু করেন না। অথচ, সিউড়িতে আড্ডা মারার এতোসব চমৎকার জায়গা থাকতেও এ'রা বেছে নিয়েছেন দত্তপুকুরের শান-বাঁধানো একটি পুরোনো ঘাট, দু-একটি রাস্তার মোড় ও কারো কারো বাড়ী। মাঝে মাঝে, 'হাঁক সু' পরে 'চল রে, গ্রামবাংলার দিকে একটু ঘুরে আসি' বলে এ'রা একটু দূরের ক্যানেল পাড় ধরে বিকেলবেলাটুকু এলোমেলোভাবে হেঁটে পার হয়ে যান। গির্জার মাঠের দিকে বা তিলপাড়া ব্যারেজের দিকে এ'দের কখনো দেখা যায় না। সেখানে কিছু শৌখিন সান্ধ্যভ্রমণরত প্রাণী দূরের পাহাড়রেখার দিকে মুখ করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক একবার আড়চোখে নিঃসংশয় হয়ে নেন, তাঁর সাইকেলটি ঠিক জায়গায় আছে তো!

দুবরাজপুরের ছোট্ট অথচ ঘিঞ্জি জন-পদের চারিদিকেই রয়েছে আশ্চর্য সব জায়গা। শালবন, লালপ্রান্তর, পাথর আর পাথরে ভর্তি পাহাড়েশ্বরে-ঘেরা এই জায়গাটি, কেন জানি না, তরুণ কবিদের একটি গোপন ঘাঁটি। অনুপম দত্ত, জয়ন্ত চক্রবর্তী, সুভাষ দত্ত, সমরেশ মণ্ডল, তাপস ওঝা প্রভৃতি কয়েকজন তরুণ এই শহরটিকে একটি দ্রষ্টব্য স্থানের মহিমা দান করেছেন। কয়েক বছর ধরে এ'দের সংগ্রাম চলছে নানাভাবে। 'মানসলোক' নামে একটি সুন্দর পত্রিকা এ'রা বের করেন। সম্পাদক—জয়ন্ত চক্রবর্তী। কিছুদিন হলো তাপস ওঝা বের করছেন 'অমিতাভ' নামে আর একটি পত্রিকা। বলা বহুল্য, এগুলো প্রধানতঃ কবিতারই পত্রিকা। এ'দের মধ্যে অনুপম দত্ত শান্ত ও সংযতভাবে কবিতায় ধরা দেন এবং এ'র একটি কাব্যগ্রন্থও রয়েছে। বীরভূমের আদি মানুষেদের কথ্যভাষায় লেখা 'আমি মাদল লি আইছি' নামক একটি কাব্যগ্রন্থের কবি সুভাষ দত্ত। মাঝে-মাঝে এখানে-ওখানে উদ্ভ্রান্ত জয়ন্ত চক্রবর্তীকে দেখা যায়। বিবাহিত, কিন্তু ঘরছাড়া এই তরুণটির যন্ত্রণা ঠিক কোথায়, তা বুঝতে পারলে এ'কে কিছু চেনা যেতে পারে। কয়েক মাস আগে এখানে সারা বাংলা গ্রামীণ সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল। উপযুক্ত জায়গা পেয়ে সম্মেলন খুবই জমজমাট হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য এই যে, এ'রা সকলেই দুবরাজ-পুরের বাসিন্দা না-ও হতে পারেন, কিন্তু এ'দের কেন্দ্রস্থল দুবরাজপুরই।

দুবরাজপুর থেকে পাঁচরাস্তায় এক ঘন্টা বাসে চড়ে আসা যায় উঁচু টিলার ওপর খয়রাশোলে। সেখান থেকে লাল-মোরাম রাস্তায় অবিরাম উঁচু-নিচু টিলা ও শাল-জঙ্গলে আরো এক ঘন্টা কাটালে বাস আসে সগড়ভাঙ্গায়। তারপর এক মাইল হেঁটে পাওয়া যায় বাতাসপুর গ্রাম এতোসব করে এখান থেকে লিয়াকত আলি এখন পৌঁছেছেন কলকাতায়। কবিতায় একেবারে নতুন ও অনভিজ্ঞ এই ছেলেটির দারিদ্র বর্তমানে কফিহাউস কিছু পরিমাণে নিয়েছে। এ'র সম্পর্কে এখন এটুকুই বলা যায়।

এতোক্ষণে, পাঠক, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, আমি শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে এখনও একটি কথাও বলিনি। বলিনি, তার কারণ হচ্ছে, শান্তিকেতন একটা দ্বীপের মতোই বীরভূমে ভেসে আছে বলে আমার মনে হয়। আশপাশের কয়েকটি গ্রাম ও বোলপুর ছাড়া বীরভূমের আর কোথাও শান্তিনিকেতনের ছায়া বিন্দুমাত্র নেই। বলা যায় বীরভূম আছে বীরভূমের মধ্যে আর শান্তিনিকেতন শুধু শান্তিনিকেতনেই। 'কোনো যোগাযোগ নেই, সেতু নেই।' শুধু পরিচয়টুকু আছে পরস্পরের মধ্যে। বরং কলকাতার সঙ্গেই এর সম্পর্ক রক্তের। তা যদি না-ই হবে, তবে মাত্র উড়িন্ন [illegible]

রেই জন্মের পর থেকে তেইশ বছর অব্দি
াটালাম, কই, পৌষমেলা ও বসন্তোৎসব
হায়ার সেকেণ্ডারী দেওয়ার পর জেনেছি)
ড়া আর কিছুর কথা তো কখনো শুনিনি।
হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই শুনেছি এবং সেই
ছোটবেলাতেই। ব্যাস, এইটুকুনই। এখন
কলকাতা থেকে আমরা কয়েকজন বন্ধু হৈ-চৈ
করে শান্তিনিকেতনের মেলা-উৎসবগুলিতে
গিয়ে পত্র-পত্রিকা বিক্রি করি। এবং তৎসহ
যথেষ্ট পরিমাণে ইত্যাদি ইত্যাদি-ও করে
থাকি। এতেই সবই বোঝা যায়, কেন শান্তি-
নিকেতনের কথা বীরভূম প্রসঙ্গে আসে না।

তবে, সিউড়ি ও দুবরাজপুর ছাড়াও
রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, আহম্মদপুর,
চৌহট্টা ও বোলপুর থেকে কিছু কিছু
পত্রিকা বের হয়। যেমন, পল্লীশ্রী,
নিরিবিলি, শান্তিনিকেতন, পত্রপুট
ইত্যাদি। কিন্তু সম্পাদক ছাড়া আর কাউকে
এ শহরগুলোতে ঘোরাফেরা করতে দেখা
যায় না।

বীরভূমের এই সমস্ত পত্রিকার কথা
উঠলেই, যার নাম এক ঝলকে মনে পড়ে,
তিনি অরূপ চৌধুরী। এঁর আঁকা প্রচ্ছদ
বীরভূমের পত্রিকাগুলোর একটা শোভা
বিশেষ। শান্ত, নিশ্চুপ ও গম্ভীর এই
মানুষটি সিউড়িতে বসে নিজেকে জাগিয়ে
রেখেছেন সচেতনভাবে। শোনা গেল, তাঁর
ছবির একটি প্রদর্শনী হতে চলেছে অ্যাকাদেমি
অব্ ফাইন আর্টসে।

এই যে সব উজ্জ্বল তরুণ, যারা
কলকাতার সাহিত্যের মূল স্রোত থেকে
এতো দূরে রয়েছেন, এঁদের খাদ্য কি?
খুবই আশ্চর্যের কথা যে এঁদের মধ্যে কেউ
কেউ হয়তো কলকাতার সাহিত্যিক আড্ডায়
একদিনও বসতে যান নি। কী স্বচ্ছন্দ,
কী স্বাভাবিক এঁদের এই মফঃস্বলীয় চলা-
চলা। যেন কলকাতা নামক একটি শহরের
অস্তিত্বেই এঁদের বিশ্বাস নেই। অথচ,
কলকাতা একটা বিশাল হাঙরের মতো হাঁ করে
এঁদেরকে গিলে ফেলছে আপাতভাবে। সে-
কারণে, কখনো কখনো কফি হাউসের টেবিলে
অত্যন্ত মলিনভাবে উদ্বাস্তুর মতো
চেহারায় এঁদের কাউকে বসে থাকতে দেখা
যায়। চুলে লেগে থাকে পথশ্রমের ক্লান্তি
ও কয়লার গুঁড়ো। বাড়ি ফেরার সময়
হাওড়া স্টেশনে যে ট্রেনটিতে এঁরা চড়েন
সেটা আসলে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ের
একটি দীর্ঘ মন্থর ট্রেন, যা তাঁকে পৌঁছে
দেবে দুর্গম ও জনহীন এক প্রান্তরের
প্রত্যন্ত আঁধারে। আবারো কলকাতায় আসা
হবে কি—এই সংশয়ে চুরমার হতে হতে
বর্ধমান পেরিয়ে তিনি চলে যান লুপ-
লাইনের দিকে। একতারা হাতে সুধীর দাস
বাউল উঠে পড়েন ও বোলপুরের বিখ্যাত
চানাচুর বিক্রি শুরু হয়ে যায়। তারপর
কোনো এক স্টেশনে রাশি রাশি ক্লান্তি
নিয়ে নেমে একটু হেঁটে গেলেই দেখতে
পাওয়া যায় অর্জুন গাছের ছায়ায় পাড়ার
ক্লাবের মুখ।

বসিরহাট

বসিরহাট কোথায়? শ্যামবাজার থেকে
৭১নং বাসে এক টাকা সাঁইত্রিশ। পৌনে তিন
ঘণ্টা লাগে। এক্সপ্রেস বাসে তিন টাকা
পঁয়ত্রিশ এসপ্ল্যানেড থেকে। দু' ঘণ্টার
পথ।

এই মহকুমার রাজনীতি-স্ফুলিঙ্গ
সারা বাংলায় যেমন দাবানল সৃষ্টি করেছে,
সাংস্কৃতিক প্রয়াস ঠিক ততোখানি মিয়মাণ।
এ-কথা বলছি না, বসিরহাটে সাংস্কৃতিক
চেতনাসম্পন্ন মানুষের অভাব। অনেক
মনীষী এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের
যশ বা খ্যাতি আজও অম্লান।

বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা হরিচরণ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই ধরুন। কজন
বাঙালী জানে তাঁর বাড়ি ছিল বসিরহাট
মহকুমার যশাইকাটিতে? সন্দেহ নেই,
ঠিক তেমনিভাবেই অনেকে জানে না, রস-
রাজ অমৃতলাল বসু, সাংবাদিক সত্যেন্দ্র-
নাথ বসু, মুর্শিদাবাদ খ্যাত ঐতিহাসিক
নিখিলনাথ রায়কে। এঁরা সকলেই মহকুমার
কৃতি সন্তান। ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ শহীদুল্লাহ
যে ৭।১১।১৯১৯ থেকে ৬।১২।১৯২১
পর্যন্ত বসিরহাট পৌরসভার ভাইস-
চেয়ারম্যান ছিলেন।

মহকুমার মানুষ এই জেনে সান্ত্বনা
পান, বিভূতিভূষণের কৈশোর কেটেছে
সীমান্ত গ্রাম পানিতরে। প্রথম শ্বশুর-
বাড়ীও এখানে। প্রথমা স্ত্রী গৌরী দেবী
জীবিতকালে তিনি প্রায়ই এখানে আসতেন।
কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলোতে বসির-
হাটের চিত্রকল্প অনুপস্থিত। বনগাঁ আর
ব্যারাকপুরের প্রকৃতি ছিল তাঁর প্রধান
আকর্ষণ।

কবি রাম বসুর জন্ম তো বসিরহাটে।
বসিরহাটের সাংস্কৃতিক জীবনের
প্রধান হোতা কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।
মহকুমার মাটির সঙ্গে তিনি আত্মীয়তা
বজায় রেখেছিলেন আজীবন। প্রথম জীবনে
কর্মোপলক্ষে জলপাইগুড়িতে গেলেও, তাঁর
কাব্য এখানকার জলবায়ুতেই আদৃত।
বসিরহাটের নিষ্কম্প প্রকৃতি তাঁকে বৈষ্ণব
প্রেমে দীক্ষিত করেছিল।

শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বন্ধুদের
সাহায্যে ভুজঙ্গধর বাণী-সম্মিলন নামে
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন।
বন্ধুদের মধ্যে রাধিকাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, কবি
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও পরবর্তীকালে
কবি বিজয়মাধব মণ্ডলের নাম উল্লেখযোগ্য।
অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিখিলনাথ
রায়, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি স্বনামধন্য
ব্যক্তিরা আসতেন আমন্ত্রিত হয়ে।
সাহিত্য-আলোচনা, কবিতা পাঠ ও সৌহার্দ
বিনিময় ছিল অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ।
'বাণী-সম্মিলন' থেকে 'পল্লীবাণী' নামে
একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ পেতো। কবি
ভুজঙ্গধর ছিলেন তার সম্পাদক।

১৯৭২ সালে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেন বসিরহাটের কবি-সাহিত্যিকরা।

বাণী-সম্মিলনের মৃত্যু ঘটলে বসিরহাটের সাংস্কৃতিক জীবনে নেমে আসে ঘন-ঘনোট অন্ধকার। প্রায় আড়াই দশক পরে ১৯৫৫ সালে 'বসিরহাট সাংস্কৃতিক সংঘ স্থাপিত হয় ঔপন্যাসিক পরেশ ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। টাউন হলে বা কারোর বাড়িতে আসর বসতো শনিবার বা রবিবারে। আলোচনা, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পাঠ ছিল আসরের অঙ্গ। 'ইঙ্গিত' নামে একটি হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশ পেতো সংঘ থেকে। পত্রিকার অঙ্গসজ্জা, প্রচ্ছদ প্রভৃতির দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল শিল্পী অবনী হালদারের ওপর।

'বিপ্লবী ভিয়েৎনাম' এর নাট্যকার দেবেন্দ্রনাথ নাথ স্থাপন করেছিলেন 'বসির-হাট কলাকেন্দ্র'। বসিরহাট সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে কলাকেন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট না হলেও তাৎক্ষণিক কিছু পরিচয় ছিলো। সংঘ দুটি স্বাভাবিক কারণে খুব বেশী দিন টিকে থাকেনি।

১৯৬৭ সালে 'বাতায়ন' পত্রিকার প্রকাশ। প্রথম সংখ্যা এর জন্ম ও সাময়িক মৃত্যু ঘোষিত হলেও, বসিরহাটের সংস্কৃতিকে জোর ধাক্কা দিয়েছিল। তারই ফলে আর্ট এন্ড কালচারাল সোসাইটি জন্ম গ্রহণ করে অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সোসাইটির স্থায়ী ঘরে নিয়মিত সাহিত্য আলোচনা, চিত্র অংকন এবং গান-বাজনা প্রভৃতি ছিল যৌবনের প্রতীক।

১৯৬৮ সালে সোসাইটির মুখপত্র 'স্ফুলিঙ্গ' প্রকাশ পায় শারদীয় সংখ্যারূপে। প্রথম আবির্ভাবে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি না করলেও পরবর্তী ছয় সাত বছর স্ফুলিঙ্গগোষ্ঠী ছিল বসিরহাটের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা-স্ফুলিঙ্গ পরবর্তী-কালে 'ফল্গু' নামে প্রকাশিত হতো নিয়মিত এবং স্ফীত আকারে। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ফল্গু বন্ধ হয়ে যায় এবং সোসাইটিও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়।

সত্তর দশকের প্রারম্ভে বসিরহাটে পত্রিকার জোয়ার। প্রথম শহর থেকে পরে মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। মফস্বলে বিজ্ঞাপন সংগ্রহে মন্দা, প্রেসে মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই মহকুমা থেকে ১৫।২০ খানা লিটিল ম্যাগাজিনের প্রকাশ রীতিমত চমক সৃষ্টি করল। বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে 'সংকেত' (ছোট মোল্লাখালি), ফাল্গুনী (হিঙ্গল-গঞ্জ), সুন্দরবন (আতাপুর পাড়া বসির-হাট) প্রভৃতি তিন-চারটি পত্রিকার প্রকাশ এই অঞ্চলে সাহিত্য আবহাওয়া সৃষ্টি করে-ছিল। হিঙ্গলগঞ্জ থেকে ছোটদের পত্রিকা 'হাতেখড়ি' এখনও অনিয়মিত প্রকাশ পাচ্ছে।

কিন্তু পত্রিকাগুলো অধিকাংশই স্বল্পায়ু। শিল্পী পান্নালাল মল্লিকের সম্পাদিত স্বদেশ কবিতাপত্র। সুন্দর সৌষ্ঠবে নিয়মিত প্রকাশ আকর্ষণীয়। আটুলিয়া থেকে 'সীমান্তর' সম্পাদনা খুবই দুর্বল। 'ইছামতীর ইতিহাস' পরিবেশনের ত্রুটি থাকলেও মহকুমার একটি দলিল। পত্রিকাটি অনিয়মিত হলেও বছরে তিন-চারটি সংখ্যা প্রকাশ পায়ই। তরঙ্গ, সাগরিকা ও বহ্নিশিখা ৮৩ সালে নতুন ফসল। 'তরঙ্গ' প্রগতির ধুনোগন্ধে আচ্ছন্ন। সাগরিকা ও বহ্নিশিখা এখনও শিশু বয়েস। তবে সম্পাদকত্রয়ের প্রচেষ্টা আন্তরিক।

পত্রিকার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সভা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রঘুনাথপুরের সাংস্কৃতিক সংঘ প্রায়ই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে খোলাপোতার হিমাচল সংঘ সাহিত্য-সভা ডাকে। অনিয়মিত। সাহিত্য মূল্যায়ন অপেক্ষা কবিতা পাঠের প্রাধান্য বেশী। সাহিত্যকল্প দুটি অনুষ্ঠান করেছে। শহর বসিরহাটে সাম্প্রতিককালে প্রথম সাহিত্য-সভা।

কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে ১৯৭৫ সালে গঠিত হলো বসিরহাট সাহিত্য পরিষদ। কমিটির কার্যকাল এক বছর, সংবিধান প্রস্তুত হলো। কবি-সাহিত্যিকরা অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। কিন্তু পরিষদ তিন মাসের বেশী বাঁচলো না। কমিটির ভিতরে ছিল কিছু বিষাক্ত বাতাস। ১৯৭৬ সালে আবার নতুন কমিটি। স্বপন ভট্টাচার্য নতুন সম্পাদক। তিনি স্টিম-রোলার চালিয়ে পরিষদ বাঁচিয়ে রাখবেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরিষদ সাহিত্য সভার আয়োজন করেছে, রবীন্দ্রস্মরণ সংখ্যাও প্রকাশ করেছে একটি; তবু পরিষদের অপমৃত্যু রোধ করা যায়নি।

কয়েকটা ছোট ছোট পকেট গড়ে উঠেছে সাহিত্য আসর। সমরেশ বসুর আগমনে আসর বসেছিল মনোজ দাসের বাড়িতে। ঘরোয়া অনুষ্ঠান হলেও কবি-সাহিত্যিকরা কম জড়ো হননি সেখানে।

এ ছাড়া আছে রবীন্দ্র সৈকতে সাহিত্য আড্ডা। বিশেষ করে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়। সামনে ইছামতীর তিরতির স্রোত। কোন ষোড়শী যুবতীর মঙ্গল শংখধ্বনি ভেসে আসে ইছামতী পার হয়ে। আড্ডাও জমে ওঠে তখন।

কফি-হাউসের দ্বিতীয় সংস্করণ মতিদার চায়ের দোকান, সাহিত্যের অ্যানা-র্কিস্টদের আড্ডা।

কার্তিক ঘোষ

শিলিগুড়ি

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার পরই ব্যস্ততম শহর শিলিগুড়ি। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিঙ জেলার একমাত্র সমতল-মহকুমা, উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র এই শহর কোন পরি-কল্পনা ছাড়াই এলোমেলোভাবে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে বেড়ে উঠেছে এবং প্রতিনিয়ত বাড়ছে। শুধু জনসংখ্যার দিক দিয়েই নয়, ব্যবসা বাণিজ্য ও সামরিক প্রয়োজনের তাগি-দায় এই শহরটি নামে মহকুমা শহর হলেও যে কোন জেলা সদরের চেয়ে অনেক বড় এবং কর্মব্যস্ত। বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, আইন কলেজ, চা নীলাম কেন্দ্র, আকাশবাণী প্রতিষ্ঠিত হবার পর শহরের কৌলিন্য বেড়েছে। পরিবহনের দিক থেকে বিশেষ সুবিধা রয়েছে। তিনটি রেলস্টেশন, জাতীয় সড়ক এবং বিমানপোত থাকায় বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে বিহার, আসাম, সিকিম, নেপাল, বাঙলাদেশ, ভুটান যাতায়াত করা সহজ। স্বভাবতঃই পূর্বাঞ্চলের অন্যতম ব্যস্ত এবং প্রয়োজনীয় শহর শিলিগুড়ি।

শহরের অন্যতম গৌরব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পাঠাগার। কয়েকজন প্রবীণ সংস্কৃতিসচেতন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এটি গঠিত হয়। ১৯৫১ সালের তেরোই নভেম্বর এর সৃষ্টি। অধ্যাপক তরণীকান্ত ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রজত সেনগুপ্ত, শালীবাক্ষ মুখোপাধ্যায় এবং স্বর্গত সুরেন্দ্র সুরের উৎসাহ ও উদ্যমে গঠিত এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে মহকুমা গ্রন্থাগারের মর্যাদা পেয়েছে, সরকারি অনুদান লাভ করছে। সাধারণ গল্প, কবিতা, উপন্যাসের সংগ্রহ ছাড়া মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থের বিপুল সংগ্রহ গবেষকদের সাহায্য করে। দুষ্প্রাপ্য পান্ডুলিপি ও প্রাচীন দলিলও সংরক্ষিত। এর কাছেই পৌরসভা পরিচালিত তরাই হরসুন্দর লাইব্রেরী সাধারণ পাঠকের সাহিত্য পাঠতৃষ্ণা মেটায়। দেশবন্ধু পাড়ার আর্য সমিতিতে নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ পাঠা-গার অধ্যাপক তাপসকান্তি দাসের প্রচেষ্টায় ক্রমশঃ সমৃদ্ধি লাভ করছে।

তুলনামূলক বিচারে, সাধারণ পাঠা-গারের সংখ্যা খুবই কম। পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার হওয়া প্রয়োজন। সাহিত্য পাঠকের বৃদ্ধির সঙ্গে সংস্কৃতি প্রসারের যোগ রয়েছে।

সবচেয়ে দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয়, সাহিত্যক্ষেত্রে শিলিগুড়ি অনেক পিছিয়ে আছে। অথচ তা হবার কথা নয়। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসচেতন নাগরিকের অভাব নেই এই শহরে। এই শহর অত্যন্ত ব্যস্ত, কর্ম চঞ্চল, প্রধানতঃ বাণিজ্যনগরী হবার জন্যেই বোধহয় এই অবস্থা। নিয়মিত একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের কাজ অনেকদূর এগিয়েও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে অনায়াসে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে পারে। নিয়মিত কোন সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয় না। অথচ পত্রিকা প্রকাশের মূল সহায়ক বিজ্ঞাপন এখানে প্রচুর মেলে। পুজোর সময় দশবারোটি

ভেনির প্রকাশিত হয়, এক একটিতে পাঁচ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন থাকে। সেই সঙ্গে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ আলোচনা। এই সুদৃশ্য, সুসজ্জিত স্যুভেনিরগুলি চমক সৃষ্টি করে। কিন্তু আশ্চর্য! নিয়মিত সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয় না।

অন্যান্য শহরের মত এখানেও দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর লিটল ম্যাগাজিন বেরিয়েছে এবং অনিয়মিত অকালমৃত্যু বরণ করেছে। দুই যুগ আগে তরুণকুমার মৈত্রের সম্পাদনায় উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা মহানন্দা প্রকাশিত হয়। এর পরমায়ু ছিল বছর দুই। তারপর স্বল্পায়ু পত্রিকার মধ্যে নাম করা যায়— সংযোগ, আজকাল, অগ্রবাণী, জাহ্নবী, চলতি কথা, দুর্মুখ, মা ও মেয়ে, হিমাচল, অধিকার, মর্মবাণী, প্রান্তিক। 'কথা ও কলম' কয়েক বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে জনমনে ছাপ রাখতে সমর্থ হয়। দিলীপ বাগচীর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাটির প্রধান ছিলেন প্রতাপ চক্রবর্তী, বিজন চৌধুরী। তারপর নাম করতে হয় অরবিন্দ কর সম্পাদিত 'সৈকতের'। প্রায় পাঁচ বছর এটি প্রকাশিত হয়েছে। মিলেমিশের মুখপত্র উত্তরা এবং উত্তর সরণী অল্পকালেই খ্যাতি অর্জন করেছিল। সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক কালিদাস চক্রবর্তী। মূলতঃ উৎসাহী উদ্যোক্তাদের কর্মোপলক্ষে স্থানান্তর গমনের জন্যে উপরোক্ত পত্রিকাগুলির অকালমৃত্যু হয়েছে। হাল ধরার যোগ্য লোকের অভাব। সংবাদ সাময়িকীগুলির স্থায়িত্ব আছে। শিলিগুড়ি পত্রিকা, সংঘর্ষ, দৈনিক অনেকদিন ধরে চলছে। আর্যাবর্ত ও দর্পণ অনিয়মিত।

কিছুকাল বিরতির পর স্থানীয় কয়েকজন তরুণ সাহিত্যসেবীর প্রচেষ্টায় শ্যামল চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল পত্রপুট। অজ্ঞাত কারণে এটি বন্ধ হয়ে যায়। মফঃস্বলের পত্রিকা সম্পাদক এবং উদ্যোক্তাদের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় সম্ভাবনাময় কবি ও গল্পকারের চেয়ে কলকাতার নবীন প্রবীণ লেখকদের লেখা ছাপাবার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ। প্রায়শঃ ভাল লেখা পাওয়া যায় না, মুদ্রিত বর্ণে মোড়া তবু এই ঝোঁক আছে।

ভুবন রায় সরস্বতী ও কমলেশ সরকার বার করলেন বিচিত্র। অল্পদিন পর বন্ধ হয়ে গেল। ফণি আচার্যর 'নির্ঝর' আশার সঞ্চার করেছিল। বন্ধ হয়ে গেল। নির্মল চক্রবর্তী বার করলেন 'বালুকা'; অনিয়মিত। দেবপ্রসাদ ঘোষের 'স্বর্ণা'র একটিমাত্র সংখ্যা বেরিয়েছে। রতন বিশ্বাসের প্রান্তরেখাও বাঁচেনি। নারায়ণ ভট্টাচার্যের আসমুদ্র হিমাচল মাঝে মাঝে বেরোয়। কোন ছাপ রাখতে পারেনি। কিছুকাল অনিয়মিত প্রকাশের পর সুধীরকুমার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত স্বপন বিশ্বাস সম্পাদিত উত্তরবাংলা বর্তমানে নিয়মিত প্রকাশিত হলেও এর মধ্যে বৈশ্যমনোবৃত্তিই প্রধান। মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জায় এদের দৃষ্টি নেই। এর মধ্যে অনেকটি সংবাদ সাময়িকী বেরিয়েছে ও বন্ধ হয়েছে। যুবচিন্তা, সজাগ, কালান্তর, পরিবর্তন স্বল্পায়ু। যুবচিন্তা জনমনে ছাপ ফেলেছিল। বিশেষ সংখ্যাগুলি উল্লেখযোগ্য। এরি মধ্যে আধুনিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নিষ্ঠাবান কয়েকজন তরুণ সাহিত্যসেবীর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হল পাহারতলি। বক্তব্যে, আঙ্গিকে, রচনা সৌকর্যে পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক নিখিল বসু প্রতিশ্রুতিবান কবি ও গল্পকার। কিন্তু অনিয়মিত প্রকাশের জন্যে আশা পূরণ করতে পারেনি।

সমরেশ রায়, সঞ্জয় দত্ত, সম্প্রীতি চক্রবর্তী উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা 'কথকতা' প্রকাশ করেছিলেন। এটিও চোখে পড়ছে না ইদানীং। দীর্ঘদিন ধরে একমাত্র সাহিত্য পত্রিকা 'ঝিনুক' প্রকাশিত হচ্ছে রঞ্জন বিশ্বাসের সম্পাদনায়। এই পত্রিকার নবীন প্রবীণ, স্থানীয়, বহিরাগত সকলের ঠাঁই আছে। মুদ্রণ পারিপাট্যে, অঙ্গসজ্জায়, বিষয়বস্তুতে উজ্জ্বল এই পত্রিকাটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ঝিনুক গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় হরেন ঘোষের সম্পাদনায় কবিতা ও প্রবন্ধবিষয়ক পত্রিকা 'ঋক' প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ ও খ্যাত প্রধান সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক অনেকে আছেন শিলিগুড়িতে। বিশেষতঃ নাম করতে হয় অভ্রকুমার সিকদারের। আর আছেন বিমলকুমার ঘোষ, যিনি বর্তমানে 'চোমংলামা' ছদ্মনামে লিখছেন। চোমংলামার উপন্যাস মধ্যদিনের মঞ্জরী স্থানীয় বাণী প্রেসের কর্মকর্তা নিতাই সাহার কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে। কলকাতার বাইরে প্রকাশ সংস্থা গঠন করা যায় কিনা নিতাই সাহা সেই চেষ্টা করছেন। এটি নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

স্থানীয় কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্যামল চৌধুরী। তবে ইনি অত্যন্ত অলস এবং খেয়ালি। এঁর ক্ষমতা বা প্রতিভার বিকাশ ঘটছে না, এজন্যে ইনি নিজেই দায়ী। তরুণদের মধ্যে শক্তিশালী কবি ষষ্ঠী বাগচী। যতটা সময় দেওয়া উচিত তা ইনি দিচ্ছেন না। নিয়মিত কবিতা লিখছেন রঞ্জন বিশ্বাস, শুভ্রা চক্রবর্তী এবং রতন বিশ্বাস। সম্প্রতি ষষ্ঠী বাগচী, শুভ্রা চক্রবর্তী ও রঞ্জন বিশ্বাসের কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নের জলে জোনাকি' বেরিয়েছে।

দিলীপ বাগচী এককালে ভাল গল্প লিখতেন। ইদানীং সরে গিয়েছেন সাহিত্য জগৎ থেকে। কবিতার ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় নিখিল বসু, অশোক বাগচী, অঞ্জু জোয়ারদার, গীতাংশু কর, অরুণ মজুমদার, অরুণ দাস, সঞ্জয় দত্ত, সমীরণ ঘোষ ও অমল মজুমদারের। ব্যঙ্গ রচনায় সানু মিত্র কুণ্ডুধার। বিপ্লব তালুকদার, ভাস্কর নন্দী নিষ্ঠাবান লেখক।

প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, দল বেঁধে সাহিত্য হয় না, সভাসমিতি করে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। সাহিত্য নিভৃত একক মনের সৃষ্টি। এ সত্য স্বীকার করলেও মনে হয় সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে আড্ডা চাই, অবকাশ চাই, কাজের জগৎ থেকে পালিয়ে এসে ছুটি উপভোগ করা চাই। আর চাই, নিষ্ঠা, কল্পনা এবং প্রতিভা। এই শহরের তরুণ কবি সাহিত্যিকরা যদি বিভেদ ভুলে গোষ্ঠীবদ্ধ হন, একে অপকে অবজ্ঞা না করে যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দেন তাহলে নিশ্চয় উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। যার যা ক্ষমতা এবং প্রতিভা অনুযায়ী সৃষ্টি করবেন। তার জন্যে চাই নিয়মিত আড্ডা, সভা সমিতির মাধ্যমে ভাববিনিময়, তর্কবিতর্ক, আলোচনা। তা সে আড্ডা চায়ের দোকানে, গাছতলায় বা কারো বাড়িতে যেখানেই হোক না কেন। তাহলেই প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হবে, জোয়ার আসবে, জলস্রোতে ভাটার জমাট পলি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মরা গাঙে বান ডাকাবার ভার নিতে হবে তরুণ গোষ্ঠীকে।

শিলিগুড়ি শহরে অনেক সম্ভাবনা। ভারতের নানা প্রান্তরের অধিবাসী, নানা ধর্ম ভাষা সংস্কৃতি, রীতিনীতির পরিচয় এখানে মেলে। বিশেষতঃ নেপালী সমাজ এখানে সক্রিয়। তাদের নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি প্রসারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিয়মিতভাবে একাধিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করে এরা। 'দেওকোটা সংঘ' এবং 'নেপালী ভাষা প্রচার সমিতি' খুবই সক্রিয়।

সেই তুলনায় স্থানীয় আদিবাসী রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এদিকে কারো তেমন দৃষ্টি নেই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 'নেপালী একাডেমী' গঠন করেছেন, রাজবংশী সংস্কৃতি চর্চার উদ্যোগ এরা নিতে পারেন।

বাণিজ্য নগরী শিলিগুড়ির যেমন শিল্পনগরীতে রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন তেমনি একই সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও উন্নয়ন প্রয়োজন।

হরেন ঘোষ

কঠোর শাসন ও নিয়মানুবর্তিতার জীবনের মধ্যে একদিন তাঁর নিয়ন্ত্রণ বশীর ঘুম ভেঙে গেল। মাথার ওপরে নিদ্রাহীন গুরুর হাত। গুরু মৃদুস্বরে শংকরাচার্যের বাণী আবৃত্তি করে চলেছেন শিষ্যের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে।

১৯১১ সালে সদানন্দ ও নিবেদিতা দুজনেই দেহরক্ষা করলেন অল্পদিনের ব্যবধানে। অনেকে (মঠের সন্ন্যাসীরাও) মনে করলেন সেন-ভাই দুটি এবারে বুঝি ভেসে যাবে। ৮নং বাড়ির ভার বহন করতেন নিবেদিতা। এবারে কে করবে? কিন্তু না। সদানন্দের আনন্দকে মূলধন করে জীবনের পথে এগিয়ে চললেন বশী সেন। নিবেদিতা বশীকে লেখাপড়া ইত্যাদি ও অন্যান্য ব্যয় বহন করবার জন্য মাসে কুড়ি টাকা দিতেন। নিবেদিতাই বশীকে জগদীশচন্দ্র বোসের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন। এবারে জগদীশচন্দ্র বশী সেনকে ২০ টাকা বেতনে তাঁর গবেষণাগারে নিযুক্ত করলেন।

১৯২৩ খৃঃ গ্লেন ওভারটন পারের কাণ্ডারী হয়ে দেখা দিলেন। ইনি ভারতে এসেছিলেন জগদীশচন্দ্র বোসের পরিচিত কোন বিদেশী বন্ধুর পরিচিতি-পত্র নিয়ে। চিঠি নিয়ে গিয়ে তিনি সরাসরি উপস্থিত হন বসুর গবেষণাগারে। বসু অনুপস্থিত ছিলেন, তাই পত্রটি দিলেন কর্মরত যুবকটির হাতে। চিঠিতে লেখা ছিল 'সদাহাস্যময় বশী সেনের মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত হলাম....ইত্যাদি।' যুবকটি উচ্চকিত হাসি হেসে উঠলেন। গ্লেনকে জানালেন—আমি সেই মৃত ব্যক্তি। পত্রলেখকটি এমন খাঁটি সংবাদটি কোন্ বিশ্বস্ত সূত্রে পেলেন জানি না, কিন্তু আমার বড় আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুতে এমন সব ব্যক্তিরা দুঃখজ্ঞাপন করবেন।' আরও একচোট হেসে অপ্রস্তুত গ্লেনকেও হাসিয়ে দিলেন।

এরপর বসুর সঙ্গে গ্লেন ওভারটনের পরিচয় হল। ওভারটন বসুর গবেষণার কাজ দেখতে চাইলেন। বসু জানালেন, সেদিন কোন কারণে ওভারটনকে এসব দেখানো সম্ভব হবে না। তিনি যেন পরেরদিন আসেন। ওভারটনের মুখে পরিষ্কার হতাশার ছায়া। দেখলেন কর্মরত বশী সেন। বসু সরে গেলে ওভারটনকে বশী সেন জিজ্ঞাসা করলেন—"কাল আসবেন তাহলে?

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন

প্রণতা দে

ওভারটন ক্ষুণ্ণস্বরে বল্লেন "কী আর করি!" সেন বল্লেন "আর কিছু দেখতে চান?" ওভারটন তখনও ক্ষুণ্ণ। বল্লেন, "কী দেখাবেন?" সেন বল্লেন "রামকৃষ্ণ মিশনের মঠ দেখবেন?" গ্লেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বিবেকানন্দের নাম আমেরিকাতে বসে যথেষ্ট শুনেছেন। আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বশী সেনের সঙ্গে মঠে গেলেন। গ্লেন-সেনের নিবিড় বন্ধুত্বের গোড়াপত্তন হল।

এরপর ওভারটন সেনকে সঙ্গে করে আমেরিকায় নিয়ে গেলেন। বসু বিরক্ত, ক্রুদ্ধ। কিন্তু বশী সেনের জীবনের রুদ্ধদ্বার খোলবার সময় এসে গেছে।' কার সাধ্য রোধে তার গতি। বলেছিলেন 'জাগ্রত থাকো।" সদাজাগ্রত বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে বিজ্ঞান সাধনার অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিলেন বসুর ২০ টাকার কাজে পদত্যাগের দরখাস্ত দিয়ে।

গ্লেন ওভারটন জাতিতে আমেরিকান। চাষবাস করতেন কিন্তু পরে চাষবাস ত্যাগ করে দুধের ব্যবসা শুরু করেন। ১[illegible] সালে সস্ত্রীক ভারতে এসে সেন মহাশয়ের (এবং রামকৃষ্ণ মিশনের) সঙ্গে যে যোগাযোগ হয় সে সম্পর্ক আজীবন ছিল। [illegible] মহাশয়ের ল্যাবরেটরীর জন্য এবং ক্রিস্টিনের জন্য মাসিক

ডলার আর্থিক সাহায্য পাঠাতেন। সেন মহাশয় বরাবর কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করতেন "গ্লেন ওভারটন আমাকে বোস ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ধার করেছিলেন। গ্লেন ছিলেন স্বামীজীর দূত।" সেন মহাশয়ের চেয়ে গ্লেন ২।১ বছরের বড় ছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ ১৯৭৪-৭৬ সালের কোন এক সময় মারা যান। সঠিক সাল জানা যায় নি। ১৯২৮ সালে শেষবার যখন সেন মহাশয়ের সঙ্গে ক্রিস্টিন আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন মিসিগানে ওভারটনের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন।

৪ঠা জুলাই, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ, শহর দার্জিলিং, অবিরাম বর্ষণ। এরই মাঝে বশী সেন ঘোষণা করলেন তাঁর একক প্রচেষ্টায় বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরীকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিজের ব[illegible] একটি কপর্দকও ছিল না। বন্ধুরা নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন

এখন পাগলামী করো না। বেশ তো ছিলে বোস ইন্সটিটিউটে! কেন মিথ্যে সেখানকার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এলে?

বশী সেন অনুভব করেছিলেন বিজ্ঞানের জগতে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশের অনেক পেছনে পড়ে আছে। কেবলমাত্র বড় বড় শহরে বিরাট আয়তনের গুটি কয়েক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-পিপাসাকে জাগিয়ে তোলা যায় না। আধুনিক জগতের বিজ্ঞানের সঙ্গে যদি ভারতবর্ষ পা ফেলে এগিয়ে যেতে চায় তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞান-সাধনার ছোট ছোট গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার।

বশী সেনের কাজের সরঞ্জামের একান্ত অভাব। কিন্তু তিনি সেজন্য থেমে থাকবেন না। বৃষ্টির জল ধরে তার থেকে পি এইচ গ্রহণ করবার বিকল্প প্রথা অবলম্বন করলেন।

এই সময় স্বামী বিবেকানন্দের (যাঁকে উনি কখনও দেখেননি; কিন্তু জীবনের আদর্শ পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করছেন) সঙ্গে ওঁর একটা গোপন চুক্তি হয়েছিল। স্বামীজীর উদ্দেশে তিনি বলতেন "নিজেকে সর্বোত্তভাবে আমি কাজে নিয়োগ করব: কিন্তু এক শর্তে—তুমি আমাকে সব কিছু দেবে-যা আমার পক্ষে ভালো।"

বশী সেনের মৃত্যুর বছর তিনেক বাদে তাঁর কাগজপত্রের ফাইল ইত্যাদির মাঝখানে তাঁর হস্তাক্ষরে একটি কাগজ পাওয়া গেছে—যেন একটি চিঠি। লেখা ছিল—

স্বামীজী মহারাজ, আমি এই সংস্থার সঙ্গে আপনার নাম যুক্ত করেছি। আপনি জানেন আমি কী করতে পারি আর কী পারি না। আপনার মত গুরুর কাছে প্রার্থনা জানাই যে, আপনার সুনাম যেন আমার দ্বারা কখনো ক্ষুণ্ণ না হয়। তার আগেই যেন আপনি আমাকে ধ্বংস করে দেন। ওঁরা বলেন, আপনি আর্তের বন্ধু। আমাকে এই সংস্থার বন্ধু করে নিন। আমি যেন আপনাকে ভালবাসতে পারি আর আপনার কাছে শেখা প্রার্থনায় যেন বিশ্বাস রাখতে পারি। প্রণাম ও সৎসঙ্গ। বশী।'

দার্জিলিং থেকে ফিরে এসেই শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সাহায্য এসে পড়তে লাগল বিভিন্ন জায়গা থেকে। যথা—আমেরিকা থেকে পেলেন ওভারটন, ইংরাজ-বন্ধু লিয়োনার্ড এলমহার্স্ট ও তাঁর আমেরিকান পত্নী ডরোথি, রাশিয়ান শিল্পি নিকোলাস রোরিখ, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড (ট্যান্টিন), আর্ল অফ স্যান্ডুইচ এবং একটি ভারতীয় বন্ধু যিনি অনুরোধ করে-ছিলেন তাঁর নাম যেন প্রকাশ না হয়। ইংলন্ডের রয়্যাল সোসাইটি থেকে সত্তর পাউন্ড গ্র্যান্ট এল যন্ত্রপাতি কেনবার জন্য।

শ্রীযুক্ত সেনের ভাষায়—'মনে হল বিবেকানন্দ একাজে সফল হতে চলেছেন, আর বশী সেনও অনির্বাণ উৎসাহে তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন।'

এই বিজ্ঞানমন্দিরের গোড়াপত্তন প্রথমে হয় তাঁর ৮নং বোসপাড়া লেনের রান্নাঘরে। সদানন্দ তখন ইহলোকে নেই। তাঁর দোতলার ঘরখানি তখন মন্দিরের মত সাজিয়ে রাখা হয়। তাই বশীর গবেষণা কখনও রান্নাঘরের একপাশে, কখনও উঠোনের এক কোণায় শুরু হল। এরপর বিদেশ থেকে অর্থাগম যত বাড়তে লাগল তিনি আলমোড়া-কলকাতায় (গ্রীষ্মে আলমোড়া, শীতে কলকাতা) কাজ শুরু করলেন। এই সময় (১৯২৬-২৮) ক্রিস্টিনও তাঁর সঙ্গে আলমোড়া-কলকাতা করছিলেন।

বিবেকানন্দ গবেষণাগার গড়ে তোলবার মূলে ছিল বশী সেনের নিজের সদানন্দময় উৎসাহী প্রকৃতি যার দরুন তিনি বহু দেশী-বিদেশী ব্যক্তির বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর ছিল সংক্ষে্য রসবোধ, উপকারী বা সাহায্যকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, বন্ধুদের প্রতি গভীর ভালবাসা, দরিদ্রের প্রতি দয়া, কঠোর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা।

অর্থলাভের পর এগিয়ে এল যশ, স্বীকৃতি এবং পরিপূর্ণ সফলতা। পেলেন পদ্মভূষণ, ওয়াটুমল অ্যাওয়ার্ড, মেক্সিকো থেকে ডক্টরেট।

বশী সেনের মৃত্যুর পর সংবাদপত্রের সংবাদ: সুপরিচিত উদ্ভিদ ও শারীরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বশী সেন আজ রাণীক্ষেতের সামরিক হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। ভারতীয় কৃষিতে অনন্য অবদানের জন্য অধ্যাপক সেনকে পদ্মভূষণ ও ওয়াটুমল পুরস্কার দেওয়া হয়। বিবেকানন্দ গবেষণাগার ভারতে কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ সংস্থা। আলমোড়ার গবেষণাগারেই ভারতে প্রথম সংকর উদ্ভিদ উৎপাদনের কাজ হয়। ভুট্টা (১৯৪৮) পিঁয়াজ (১৯৫৫) জওয়ার (১৯৫৯) ও বাজরার (১৯৬০) সংকর উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক সেনই প্রথম ভারতীয় বৈজ্ঞানিক যিনি ১৯৫৫ সালে ওকরীজ-এ আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের প্রথম পাঠক্রমে যোগদানের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বেশ কয়েকবার আন্তর্জাতিক শারীরতত্ত্ব ও উদ্ভিদবিদ্যা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সের ফেলো এবং বৃটেনের ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটির সদস্য ও ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানেরও সদস্য ছিলেন।

বশী সেন স্বামীজীর মহাসমাধির দিনটিকে বেছে নিলেন স্বামীজীর নামে প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠার দিন হিসেবে ৪ঠা জুলাই। ওই দিনটি প্রতি বছর পালন করতেন ল্যাবরেটরীর সকলকে জিলিপি ও আম খাইয়ে। আমরাও নিমন্ত্রিত হতাম, বৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত হতাম গবেষণাগারের সভায়। একবার অসম্ভব বৃষ্টিতে বাড়ি থেকে বেরুতে পারছিলাম না। দেরি হল পৌঁছতে, গিয়ে দেখি বৃদ্ধ দম্পতি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন নগণ্য নিমন্ত্রিত দম্পতির পথ চেয়ে। সদা আনন্দময়ের মুখে খুশির হাসি 'আসবে, ঠিক আসবে, আমি জানতাম।'

মনে পড়ছে একবার আলমোড়ায় বর্ষা নামছে না। শস্যের ভবিষ্যৎ ভেবে বশীদা চিন্তিত। আমরা গিয়েছি একদিন বিকেলে, বললেন—'ভগবানের কাণ্ড দেখেছ? বৃষ্টি দেবে না! লোকটার বুদ্ধি নেই। লেখাপড়া তো শেখেনি। লেখাপড়া না শিখলে কী বুদ্ধি খোলে। হুঃ!' সদা আনন্দময় সদানন্দের শিষ্য চিন্তা ভুলে হেসে ফেললেন ভগবান নামক নিরক্ষর নির্বোধ ব্যক্তিটিকে দোষারোপ করে।

আর একবার মনে পড়ে, আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—'জপতপ করো?' সুবুদ্ধি না থাকলেও কুবুদ্ধি আছে। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, 'আমার মা আমার হয়ে প্রক্সি দিয়ে দেন।'

সদানন্দ-মুখ ঈষৎ গম্ভীর হল। বললেন—'বুঝেছি। দু'পাতা ইংরিজী পড়ে মেমসাহেব হয়ে গেছ।'

ওঁর নিজের মেমসাহেবটি তখন সামনে বসে চা ঢাল-ছিলেন। আমার সৌভাগ্য তিনি আমাদের স্বা-মীর বাংলাভাষা বুঝতে পারলেন না। ওঁর মেমসাহেবটি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী। গল্পের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গল্পের উদাহরণ দিয়ে আমাদের কত কথা বুঝিয়ে দেন। প্রতিদিন মালা জপ করেন। এ-জপমালা স্বামীজীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন মিসেস ওলি বুল। তারপর লেডি অফ স্যান্ডুইচ এবং তাঁর কাছ থেকে মিসেস বশী সেন। মিসেস বশী সেন এটি মিসেস মেরী

লুই বার্ককে দেবেন মনস্থ করেছেন। বললেন—'ভেবে দেখলাম আমেরিকান মহিলা পরম্পরায় মালাটি থাক। তাছাড়া মেরী লুই বার্ক আজ পঁচিশ বছর ধরে স্বামীজীর ওপরে গবেষণা-কাজ চালাচ্ছে। দু-ভল্যুম বই লিখেছে স্বামীজীর ওপরে। স্বামীজীর সমরকার খবরের কাগজ, পত্রিকা সমস্ত আমেরিকাময় ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছে। স্বামীজীর জপমালা পাবার যোগ্যতা ওরই।

মনে পড়ছে কলকাতায় নিবেদিতা শতবার্ষিকী উৎসবের পর ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেন-দম্পতি ফিরে গেলেন আলমোড়াতে। কলকাতায় থাকতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, ফিরে গিয়ে আবার পড়লেন। ডাক পড়ল স্থানীয় সিভিল সার্জেনের। তিনি তখন ট্যুরে। আমাকে দেখে চোখে জল। তুমি একা এসেছ? ডাক্তার কোথায়? আমাকে ভাল করে দেবে কে?

১৯৭০ সালে আবার অসুস্থ হলেন। আমরা তখন নৈনিতালে। শ্রীযুক্তা সেনের ফোন এল—'বশী বড় অসুস্থ, তোমার চিকিৎসা চান। বলছেন সেবারেও ও সারিয়ে দিয়েছিল, এবারেও ও করবে—ডাকো ওকে।' তখনই আমরা ছুটলাম আলমোড়াতে।

দু'দিন ডাক্তার মুখ কালো করে থাকলেন। তৃতীয় দিনে ডাক্তার হেসে বললেন—'আর আমার থাকবার কোন দরকার নেই। আজ ফিরে যাবো।' বশীদার চোখে জল। বললেন—'যাবে? যাও! আমাকে ভাল করে দিতে এসেছিলে—মা তোমার মঙ্গল করুন'...আর বলতে পারলেন না।

১৯৭১ সালে আমরা মোরাদাবাদে। সস্ত্রীক এলেন মার্চ মাসে। শেষ দেখা। অগাস্ট মাসে অসুস্থ হলেন। শ্রীযুক্তা সেনের মনে হয়েছিল বীরেনকে ডাকলে হয়। শেষে সংকোচ হল—কেন তাকে অতদূর থেকে ডেকে আনা! অসুখ আরও একটু বাড়ল। রোগীকে নিয়ে যাওয়া হল আলমোড়া মিলিটারী হাসপাতালে। সেখানেই ৮৪ বছর বয়সে ৩১ অগাস্ট শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শেষ দু'দিন জ্ঞান ছিল না। যাবার ঘণ্টা কয়েক আগে একটি মাত্র কথা বলেছিলেন এবং এইটিই শেষ কথা—'আসছি মা।'

মায়ের কাছেই বুঝি গেলেন? কোন সংবাদপত্র সে-সংবাদ দিতে পারে?

ক্রিস্টিনের চিঠি

(১৪)

কে/অফ মিসেস লি রয়
গ্রাণ্ড আইল, ভারমণ্ট, বুধবার
৪-৩০ (তারিখ নেই)

(তোমাদের উভয়ের জন্য)
আমার প্রিয়রা,

তোমাদের কথা চিন্তা করছি। তোমাদের সমস্ত বিশদভাবে—তোমাদের মধুরতা, এবং আন্তরিক ভালবাসার কথা। এতদিনে আমাদের ছোট্ট অ্যামি হয়ত আইল্যাণ্ডে ফিরে এসেছে। কী ভাল ও ছিল। ও না হলে আমি কী কিছু করতে পারতাম? এমন আত্মত্যাগী, সুবিবেচক এবং স্নেহশীল মেয়েটি!

ক্যাথারিনের মতে আমার চেহারার উন্নতি হয়েছে। বারবার বলছে কথাটা। আমি ওকে বলছি—তোমাদের সঙ্গে দেখা হবার দরুন এই উন্নতি। কথাটা অবিসংবাদী সত্য। আমি অবাক হয়ে ভাবি কটা দিনে কী আশ্চর্যভাবে এমন হল! ভাল জল হাওয়া, খাদ্য এবং ভালবাসা—বিশেষ করে শেষের কথাটি—এই হল আসল কারণ।

আমরা মিসেস লি রয়ের প্রতীক্ষায় আছি! অতএব চিঠিটা আচমকা যদি শেষ করি তো তোমরা বুঝবে তার কারণ। দুই কার ভর্তি হয়ে ওরা আসছে—মিসেস লি রয় তাঁর ছেলে এবং জিমি একটা গাড়ীতে। অন্য গাড়ীতে মিঃ ও মিসেস হ্যামিলটন, মিস অ্যাণ্ডারসন এবং জন। জানি না আগামী ২।১ দিনের মধ্যে আমার বিশ্রাম সম্ভব কিনা। মিসেস লীরা শুক্রবারে সম্ভবতঃ চলে যাবেন—পুরো গ্রীষ্মকালটির মত! তারপর আমি যতটা সম্ভব চুপচাপ থাকব। অন্যরা সপ্তাহ দুই থকবে।

অ্যামি, তুমি আমাকে গাড়ীর 'বার্থে' বসিয়ে দিয়ে গেলে পর আমি ঘণ্টা কয়েক একেবারে নর্ড়ান পর্যন্ত; ফলে বেশ ভাল বোধ করছিলাম। ছটা নাগাদ ডাইনিং গাড়ী থেকে ওয়েটর আমাকে কফি ও টোস্ট-মাখন দিয়ে গেল। পোর্টার এসে জিজ্ঞাসা করে গেল আমি কেমন বোধ করছি। মন্ট্রিল পর্যন্ত ও দয়ার সঙ্গে আমাকে দেখাশুনো করেছে।.....সে আমাকে বলল শরীর ভাল বোধকরা সত্ত্বেও আমার একটা চেয়ার নেওয়া ভাল কারণ রাস্তাটা লম্বা! ওরা আমাকে একটা ট্যাক্সিতে নিয়ে গেল। রাটল্যাণ্ড ট্রেন আর একটা স্টেশন ছাড়িয়ে গেল। পরের স্টেশনে এসে পৌঁছলাম ৯টা নাগাদ। ৯-১০ মিঃ আমার গাড়ী ছাড়ল। ভারী আরামের পথ ছিল। গ্রাণ্ড আইলসে আমরা দুপুর নাগাদ পৌঁছলাম এবং কে তার উষ্ণ স্বাগত-অভ্যর্থনা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। লাঞ্চ থেকে আমি তিন ঘণ্টা ঘুমলাম। কার্টারকে আমার ভালবাসা ও প্যাটসিকে একটা চুমু দিও। আর তোমরা দুটি প্রিয় আমার আরও ভালবাসা জানবে।

ক্রিস্টিনা।

কে/অফ মিসেস লি রয়
গ্রাণ্ড আইলস, ভেরমণ্ট
জুলাই আঠাশ, ১৯২৯

ডার্লিং প্রিয় আমার,

তোমাকে লিখব লিখব ভাবি; কিন্তু লেখবার উৎসাহ পাই না, কারণ শরীরটা ভাল নেই। বুঝতে পারছি না এর কারণ কী! যতদূর সম্ভব আরাম, বিলাসিতা—সবই পাচ্ছি তবুও চব্বিশ ঘণ্টা অসুস্থ; যাক, এসব কথার ইতি করি।

তোমরা সবাই কেমন আছ? তুমি, লেটি, কার্টার, প্যাট্রিসিয়া? সবই কী যথাপূর্বং? এখনও কী মশা আছে? 'প্রাচ্য-দর্শন' পড়তে চেষ্টা করছি। ভেবেছিলাম অল্প একটু পড়ে বইটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু বইটা আমার কাছ থেকে অন্য কেউ নিয়েছে। সকলেই বইটা পড়তে চায়। অতএব আমার সন্দেহ আগামী গ্রীষ্মের শেষের আগে বইখানির চেহারা আমি দেখতে পাবো কিনা। যদিও আমি ওদের বলেছি বইটা ধার দিতে পারব না। সেদিন বইটা খুলতেই বুদ্ধদেবের একটি উক্তি চোখে পড়ল। বইটি খুব সম্পূর্ণ। আমি চাই বইটা তোমাকে এই গ্রীষ্মেই পাঠাতে। বশী সপ্তাহখানেকের জন্য এখানে আসছে। অগাস্ট নাগাদ আসবে! আমাদের পরিকল্পনা প্রতিদিনই বদলাচ্ছে। তাই ও নিয়ে ভাবা বন্ধ করেছি। এখানে আমরা এখনও জনবারো আছি। দুজন মঙ্গলবারে যাচ্ছে, কিন্তু পরিবর্তে ৩।৪ জন আরও আসছে!......

তোমার পাম্প ঠিক হয়েছে? সব খবর জানিও! তোমরা সবকটি প্রিয় আমার ভালবাসা জানবে।

ক্রিস্টিনা।

(চলবে)

বাঙলাদেশের মিনি শহর পাটনা

একটা সময় ছিল, যখন বিহার বলতে হাজারীবাগ, রাঁচী, ছোটনাগপুর, মধুপুর, গিরিডি, মুঙ্গের, শিমুলতলা, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, মজঃফরপুর, বাঁকীপুর বোঝাতো। এসব স্থানে কলকাতার বনেদী-বাবুদের ২।১টা আউট হাউস থাকতো, বছরে এক-আধবার সপরিবারে রান্নার সাজ-সরঞ্জামসহ হাওয়া খেতে যেতেন। বাবস্থা সংক্রান্ত কেউ কেউ আবার এসব স্থানে যেতেন। তাছাড়া কয়েকটা স্থানে বাঙালীরা ওকালতি, ডাক্তারী, শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। বিহার প্রদেশ জন্ম নিতে কিছু কিছু বাঙালী সেসব স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অধিকাংশ শহরে ডাক্তারী, ওকালতি পেশা সেখানেই সুবিধে। ছোটনাগপুর, রাঁচী, ধানবাদ অঞ্চলে কাঠ, কয়লার ব্যবসায়ে জুটে এসেছিল।

পাটনার আদিনাম পাটলিপুত্র। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমল থেকে এর বনেদীআনা। এখন পাটনা শহর যার উপর দাঁড়িয়ে তার সাবেকী নাম ছিল বাঁকীপুর। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তে এই বাঁকীপুরের উল্লেখ আছে। পাটনা সিটিই ছিল তখন পাটনা শহর। নতুন শহর গড়তে গিয়ে শহরকে পশ্চিম দিকে টেনে নিয়ে যেতে হল। সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, জি পি ও, প্রেস এসব গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাটনায় বাঙালীদের আগমন শুরু হয়। সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্টে অধিকাংশ কর্মচারী ছিলেন বাঙালী। গর্দানীবাগ, ওয়াটার টাওয়ার, আর ব্লক—এইসব কোয়াটার এলাকায় প্রায় 'বাঙাল' কলোনী' গড়ে উঠেছিল। এবং, তারপর যা হয়—অর্থাৎ গর্দানিবাগে স্থাপিত হয় কালীবাড়ি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বহু অফিস কলকাতা থেকে উঠে আসার ফলে, পাটনায় বাঙালীর সংখ্যা বেড়ে যায়। হাইকোর্ট স্থাপিত হওয়ার পর বহু ব্যবহারজীবীও প্র্যাকটিশ শুরু করেন। এখন তাঁরা এখানকার বাসিন্দা। ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ডি-এস অফিস দানাপুরে স্থাপনার পর খগৌল পুরোপুরি বাঙালীপাড়া হয়ে উঠেছিল। এখানকার রেলওয়ে সিনেমা হলে নিয়মিত বাংলা ছবি প্রদর্শিত হত। বাঁকীপুর থেকেও অনেকে বিকেলে ট্রেনে গিয়ে সিনেমা দেখে রাত্রে ট্রেনে ফিরে আসতেন। তখনকার রেলওয়ে কলোনী ছিল বাঙলা দেশের মিনিশহর।

একথা বললে নিশ্চয়ই প্রগলভ হয়ে না—পাটনাকে গড়ে তুলতে বাঙালীর অবদান প্রচুর। প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা ব্যবস্থা—সর্বত্র বাঙালীর গৌরবজনক ভূমিকা আছে।

হাইকোর্টে বহু বাঙালী ব্যারিস্টার ও উকিল তাঁদের কীর্তি রেখে গেছেন। চিত্তরঞ্জন দাশের ভ্রাতা প্রফুল্লরঞ্জন দাশ এই পাটনা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করতেন। হাসপাতাল ছাড়াও বহু নামকরা ডাক্তার পাটনায় প্র্যাকটিশ করতেন।

সবচেয়ে পুরনো স্কুল টি কে ঘোষ আকাদমী—নয়াটোলার কাছে। এরই উল্টোদিকে বিখ্যাত খুদাবক্স খাঁ লাইব্রেরী যেখানে বসে রামমোহন রায় ফারসী চর্চা করেছিলেন। মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে টীঘোষের উল্লেখ আছে। এই স্কুলেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পড়েছেন। তারপরে যে দুটি স্কুল স্থাপিত হয় পূর্ণেন্দুনারায়ণ অ্যাংলো-সংস্কৃত হাই স্কুল এবং রামমোহন রায় সেমিনারী—বাঙালীর তৈরী। মসল্লাপুর হাটের দিকে সৈদপুরে পুরনো বাঙালীদের বাস। এঁদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদ থেকে আগত। পাটনায় তখন সেখানে একটিমাত্র পাকাবাড়ী ছিল বলে নাম হয় পাককাবাড়ি। এই পাককাবাড়িতেই একমাত্র বাসন্তীপুজো হয়, এখনও। বাঁকীপুর গার্লস স্কুল শুরু করেন ডাঃ বিধানচন্দ্রের মা অঘোরকামিনী দেবী। পরে তাঁর বাড়ী থেকে উঠে আসে গঙ্গার ধারে, গোলঘরের কাছে। পিতামাতার স্মরণে 'অঘোরকামিনী শিল্পবিদ্যালয়'—আছে বুদ্ধমার্গে। সাবেকী নাম পাটনা-গয়া রোড।

সব্জীবাগে একদা যেখানে 'টমটম পড়াও ছিল—তার কিছুটা এগিয়ে 'বাঁকীপুর হরিসভা'। বহু পুরনো। নানাবিধ উৎসবাদি হয়। জক্কনপুরে আছে গৌড়ীয় মঠ। এও পুরনো। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্থাপিত হয় অনেক পরে। লঙ্গরটোলির গলিপথে যাতায়াত ছিল প্রথম দিকে। এখন নালা রোডে, পোশাকী-নাম আর কে এভেন্যু।

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে রবীন্দ্র পরিষদ স্থাপনা করেছিলেন। স্টেশান রোডের (রাজেন্দ্র পথ) একটি বাড়ী ছিল এর ঠিকানা। পরে, রবীন্দ্র ভবন নির্মিত হয় গার্ডিনার রোডে। এই রবীন্দ্রভবনে নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রায় হয়ে থাকে। কলকাতা থেকে শিল্পী, নাট্যদল গিয়ে অংশগ্রহণ করে থাকেন। হেমচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সুহৃদ পরিষদ পাটনায় সম্ভবতঃ প্রাচীনতম সংস্থা। লঙ্গরটোলীতে এই সুহৃদ পরিষদ কর্তৃক 'নারায়ণ' সম্পাদক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল এর সামনেই বাঁকীপুর শুরোদ্যান। পুজোর সময় বাঙালীদের ভিড় জমে ওঠে দেখার মত।

দেশ বিভাগের পর বাঙালীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। জীবিকার প্রতিটি শাখায় এখন বাঙালী বর্তমান। আগে পাটনায় বাঙালীর গোনাগুনতি কয়েকটি সর্বজনীন পুজোপুজো হত। গর্দানিবাগ, আদালত গঞ্জ, শুরোদ্যান, মিঠাপুর, আর ব্লক, পি ডাবলু ডি। এখন এর সংখ্যা প্রায় দশ গুণ। পাটনায় কয়েকটি এলাকা একেবারে বাঙালীদের নিজস্ব এলাকা। বাঙালীর সংখ্যা পাটনার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ। সিনেমা হলে আগে যত বাংলা ছায়াছবি দেখানো হত, এখন তার চেয়ে অনেক বেশী দেখানো হয়। বাঙালীদের উৎসবে বোঝা যায় পাটনায় কত বাঙালী।

সুবিমল বসাক

অবাঙালীদের আন্তরিকতার অভাব নেই

সরকারি কাজে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে নতুন দেশ জব্বলপুরের মাটিতে পা রাখলাম, প্রথম দর্শনেই একে ভালবেসে ফেলেছিলাম—এমন কথা বলব না, তবে ক্রমে ক্রমে ভাল লাগতে শুরু করেছিল। রুক্ষ ধূসর পাথুরে মাটির দেশ জব্বলপুর। আর শ্যামল কোমল মাটির মানুষ বাঙালী—তার অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। রুক্ষতার মধ্যেও শ্যামলশ্রী ফুটিয়ে তুলতে এগিয়ে এল জব্বলপুরের বাঙালী সমাজ। এঁদের মধ্যে স্বর্গত রায়বাহাদুর শ্রী পি সি বোস, দেবেন্দ্রনাথ দেব, ডাক্তার সত্যচরণ বরাট প্রমুখ বাঙালীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-ভূমিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে সিটি বেঙ্গলি ক্লাব, দেবেন্দ্র বেঙ্গলি ক্লাব, কালিবাড়ী, ভোহকেল এস্টেটের বিবেক, খামারিয়ার শিল্পশ্রী; 'প্রবাসী বঙ্গীয় সংসদ' প্রভৃতি অনেক শাখা-প্রশাখা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এক শক্তিশালী শাখা জব্বলপুরেই অবস্থিত।

সরকারি মহলের অনেক উচ্চপদে আছেন বাঙালী। জব্বলপুরের বাঙালীর সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ তার সাহিত্যের সমারোহ। এখানকার তিনপুরুষের বাসিন্দা শ্রদ্ধেয়া কবি হেনা হালদারের নেতৃত্বাধীনে যে 'বিচিত্রা সাহিত্য বাসর' প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ছত্রছায়াতলে স্থানীয় সাহিত্যরসিকদের অধিকাংশই জড়ো হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কবি অতুল রায়, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, সুমন মিশ্র, রমাব্রত ভট্টাচার্য, উৎসাহী কর্মী রমেন দত্ত প্রমুখ

নাম উল্লেখযোগ্য। বিচিত্রা সাহিত্য বাসরের উৎসাহদাতা জ্যোতির্ময় সেনশর্মা, অজিত দাশগুপ্ত কুসুমবিহারী চৌধুরী প্রমুখ বিদগ্ধ বাঙালীর উৎসাহ ও প্রেরণায় জব্বলপুরের রুক্ষ শুষ্ক পাথরের বুক চিরে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করা সম্ভব হয়েছে।

কবি অতুল রায়ের উৎসাহ ও উদ্যোগে ভেহিকল এস্টেটে তাঁরই বাসায় প্রথম সাহিত্য-বাসর অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানের স্থানীয় বাঙালী সংস্থা তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র গ্রন্থাগার থেকে বাংলা সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বিভিন্ন শাখায় পল্লবিত হতে পেরেছে। দুর্গাপুজো উপলক্ষে এখান থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'যাত্রী'; **'শারদ সাহিত্য স্মরণিকা'**; **'সাতপুরা'**; **'বিবেক'** আধ্যাত্মিকতার স্বাদে পরিপূর্ণ হাতেলেখা পত্রিকা আস্পৃহা সাহিত্যমানের দিক থেকে কলকাতার সাহিত্য পত্রিকাগুলির তুলনায় কোন অংশেই নিরস নয়।

নজরুল, রবীন্দ্রনাথের গন্ধমাখা মাটির দেশ থেকে অনেক দূরে বসেও এখানকার বাঙালী সমাজ তাঁদেরই গানের নিরলস চর্চায় মগ্ন। দেবেন্দ্র বেঙ্গলি ক্লাব আয়োজিত প্রতি বছর রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিযোগিতার আসরের সঙ্গে **'নজরুলসন্ধ্যা'**; **'রবীন্দ্রসন্ধ্যা'** প্রভৃতি তারই প্রমাণ। কলকাতার যাত্রা ও থিয়েটারদলের বিপ্লব জব্বলপুরের সংস্কৃতির আবহাওয়াকেও গরম করে তোলে বৈকি। প্রতি বছর দেবেন্দ্র বেঙ্গলি ক্লাব, প্রবাসী বঙ্গীয় সংসদ, নাট্যসংস্থা অশনি প্রভৃতি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত নাট্য-প্রতিযোগিতা কলকাতার শিল্প-স্বাদের আমেজ পৌঁছে দেয় জব্বলপুরের বাঙ্গালী হৃদয়ে। শ্রীমতী সুমিতা দত্ত, অশ্রু রায়, শুভা ঘোষ (বোস) প্রমুখের পরিচালনায় এখানে প্রতি বছরই নৃত্য বা সঙ্গীতের আসরে নতুন প্রতিভাকে মুকুলিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। এখানেও রবীন্দ্র-জয়ন্তী, নেতাজী জয়ন্তী, শরৎ-শতবার্ষিকী বাংলার মতই মহাসমারোহে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়।

খেলাধুলো, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়েও জব্বলপুরের বাঙালী পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীই তার প্রমাণ। জব্বলপুরে আনুমানিক ৬০-৭০ হাজারেরও অধিক বাঙালীর প্রায় তিন-শতাধিক দুর্গাপুজো মহাসমরোহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অবাঙালী শ্রেণীর প্রতি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বাঙালীর কৃষ্টি-মূলক অনুষ্ঠানে অনেক অবাঙালীকে আন্তরিক আগ্রহ ও একাগ্রতাসহকারে যোগ দিতে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। মনে পড়েছে কবির ভাষায়—'আ মরি বাংলা ভাষা!'

এলা রায়

সেন মহাশয়কে বিদেশে নিয়ে যান

১লা জুলাই অমৃততে শ্রীযুক্ত অনিল সোম মহাশয়ের অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিনের সমালোচনা পড়লাম। ভগিনী নিবেদিতাকে ও সেনমহাশয়কে কেবলমাত্র 'নিবেদিতা' ও 'সেন' উল্লেখ করে অশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছি জেনে মার্জনা চাইছি। সভয়ে জানাচ্ছি, স্বামী বিবেকানন্দ বা ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধীয় একাধিক গ্রন্থে (ইংরাজী ও বাংলা) তাঁদের সম্বন্ধে শুধু 'বিবেকানন্দ, নরেন্দ্র, বসু (জগদীশ-চন্দ্র বসু), গোখলে, নিবেদিতা' এরূপ উল্লেখ পেয়েছি। তবে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বা জ্ঞানী লেখকদের পক্ষে যা শোভন আমার পক্ষে তা অশিষ্টতা, নিশ্চয় স্বীকার করছি। শ্রীযুক্তা সেন আলমোড়াতে মিসেস বশী সেন নামে উল্লেখিতা এবং পরিচিতা। তিনি নিজেও অনেক সময় নিজের নাম মিসেস বশী সেন লেখেন। পত্রলেখক আর কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকলে সিরিজের শেষদিকে শ্রী ও শ্রীযুক্তা সেনের কিছু বিস্তারিত পরিচিতি পেতেন। (যদিও পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়)। প্রথম সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে শুরু করা হয়েছিল। শ্রীযুক্তা সেন এমনিতেই প্রচারবিমুখ মহিলা। তিনি আমাকে ধমকে উঠেছিলেন, 'হোয়াট এ ফলিশ আইডিয়া টু পলিশ মি আপ অ্যাজ এ নিউজপেপার স্টোরি'। পরবর্তী সংখ্যায় জীবনী বেরুলে পাঠকরা খুশী হবেন কিনা জানি না তবে তাঁর কাছ থেকে কিছু 'তাড়না'র জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

হ্যাঁ, এই রচনা প্রকাকালে প্রথমদিকে অজস্র ছাপার ভুল লক্ষিত হয় (যথা হেড্ড ইয়েট এ হোয়াইল-কে হোড ইয়েট এ কোলি বা কলকাতাকে ক্যানাডা ইত্যাদি)। যাই হোক সমস্ত ভ্রম আজ থেকে তিন মাস আগে অর্থাৎ ৮ এপ্রিল অর্থাৎ ২৫ চৈত্রের (২৬ সংখ্যা) অমৃতের ৫১ পৃষ্ঠার সংশোধন রূপে **দেওয়া হয়েছে। পত্রলেখক অনুগ্রহ করে সংখ্যাটি দেখলে বাধিত হব।** উক্ত সংখ্যায় জানানো হয়েছে সেনমহাশয়কে বিদেশে নিয়ে যান গেলান ওভারটন, গোডিস নয়। উক্ত সংখ্যার ৫০ পৃষ্ঠায় গোডিশের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে। এই রচনায় উল্লিখিত বিভিন্ন ব্যক্তির যথা গেলান ওভারটন, গুরুদাস (অর্থাৎ স্বামী অতুলানন্দ), মেরী লুই বার্ক—প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাণ্ডু-লিপির সঙ্গে অমৃতের কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্য করেছি মেরী লুই বার্ক ছাড়া আর কারো পরিচিত প্রকাশ করা হয় নি। শ্রীমতী বার্কের পরিচিতিও অন্য একটি সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে। যেখানে তাঁর উল্লেখ, সেখানে নয়। জানি না কেন। হয়ত সেখানে স্থানাভাব ছিল। সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে তার্নিতন বা টার্ন্টিনের (মিস জোসেফিন ম্যাকলয়েড জো-জয়া) কথা বিস্তারিত দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনি। বিবেকানন্দ-সাহিত্যে বা আলোচনায় তিনি ভগিনী নিবেদিতা বা মিসেস ওলিবুলের (সারামতা) মতই পরিচিতা বললে অত্যুক্তি হবে না বোধহয়। যাঁরা বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়েছেন, তাঁরা জোকে লেখা স্বামীজীর অসংখ্য পত্রাবলী পড়েছেন মনে করি। তবুও নিজের ত্রুটির জন্য মার্জনা চাইছি। কেবল মিসেস স্টারলিং ওর-এর কোনো পরিচিতি শত ইচ্ছা সত্ত্বেও দিতে পারিনি। শ্রীযুক্তা সেন জানান 'শ্রী ও শ্রীমতী ওর মিসেস ওলিবুল-এর আত্মীয় ছিলেন। বিশদ আমি জানি না।' হয়ত প্রবুদ্ধ ভারত জানতে পারেন। হয়ত মিসেস বার্ক জানেন। তাঁদের লিখলে হয়ত জানতে পারতাম। লেখা হয়নি। ক্রিস্টিনের আমেরিকা থাককালীন জীবন সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারিনি। মায়াবতীতে থাকাকালীন জীবন সম্বন্ধে কিছু জানতে চেষ্টা করছিলাম। জানতে পারিনি। আশা করি আগামী দিনের গবেষক-পণ্ডিত-নিষ্ঠাবান লেখকরা আমার এই ত্রুটির ওপরে আলোকপাত করে ক্রিস্টিনাকে আরও উজ্জ্বলভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরবেন। কিছুদিন আগে অমৃত পত্রিকার থেকে তাঁদের ছাপার ভুল (বা পংক্তি পড়ে যাওয়া, যথা স্বামীজীর ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ রিজলিম্যানর থেকে কবিতার শিরোনাম 'টু হিজ ওন সোল' ছাপাই হয়নি; অথবা একই লাইন দুবার ছাপা ইত্যাদি) সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি এই পত্রিকাতেই ছিল। অতএব আর কী বলা যায়?

৬ নং পত্রের লেখক গোবিন্দচন্দ্র রায়কে অনুরোধ করি ৮ এপ্রিলের ৫১ পৃষ্ঠায় দেখুন—ভুল 'খীরেশ্বরকে' সঠিক 'অভীশ্বর' করা হয়েছে। ডাঃ দনেশ্বর সেনের সঙ্গে আমার ১৯৭০ সালে আলমোড়াতে পরিচয় হয়েছিল। তখন তিনি দিল্লিতে ছিলেন এবং এখনও সেখানেই আছেন মনে করি। দিদি সেনমহাশয়ের সম্পর্কীয়া নন, 'আপন' এ তথ্য জানিয়ে শ্রীগোবিন্দ রায় মহাশয় আমার ধন্যবাদার্হ। —**প্রণতা দে, লখনৌ।**

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি 'অমৃত'তে প্রকাশিত তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি সুচিন্তিত ও আন্তরিকতার ছোঁয়ায় ধন্য লেখা 'সরপুরিয়ার দেশে' ও 'রাজার সঙ্গে দেখা' পড়ে সত্যিই খুব খুশী হয়েছি। আমরা প্রবাসী বাঙালী হলেও কৃষ্ণনগরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ গভীর। সত্যিই এবার কৃষ্ণনগর গিয়ে সেই প্রাচীন বটগাছটির অকাল নিধন দেখে মনে-প্রাণে দারুণভাবে আহত হয়েছিলাম। তারাদাসবাবু অত্যন্ত অন্তরিকতার সঙ্গে বেদনাহত মন নিয়ে তাঁর প্রতিবাদ করেছেন দেখে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—তারাদা আমরাও আপনার সঙ্গে একমত। সত্যিই কবে বন্ধ হবে সরকারী আমলাদের এই বুর্জোয়া খেয়ালীপনা? এই প্রাচীন গাছটি অনেক স্মৃতির নীরব সাক্ষী হয়ে আজীবন মানুষকে ছায়াদানই করে গেছে, আমাদের মনে হয় সে কোনোদিনই কারও অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি, তবে কেন এই সজীব প্রাণে নির্মম কুঠারাঘাত? শুধুমাত্র মামুলী কৃত্রিম সৌন্দর্য বাড়াতে ফোয়ারা সৃষ্টির জন্য? এমার্জেন্সীর প্রকোপ থেকে বেচারা বৃদ্ধ বটগাছটিও বাদ গেল না!

তারাদাসবাবুর সঙ্গে আমরাও এভাবে বৃক্ষ ছেদনের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ভালো লাগলো সৌমেন, শরীফ মোহিতবাবু ও প্রসূনবাবুদের অকৃপণ সহযোগিতার জন্য। এঁরা সবাই আমাদের পরিচিত। শুধু কৃষ্ণনগরই নয় নদীয়া জেলার শিল্প ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে এদের অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। ওঁরা মাটি কামড়ে আজও পড়ে আছেন একটা কিছু করতে হবে এই প্রতিজ্ঞা ও প্রতীক্ষা নিয়ে—আমরা রুটি ও রুজির চিন্তায় অনেক আগেই ঘর ছেড়েছি। আরও ভালো লাগলো 'রাজার সঙ্গে দেখা' লেখাটি। সংগীত গুরু অমিয়নাথ সান্যালকে নিয়ে লিখে তারাদাসবাবু শুধু কৃষ্ণনগরবাসীরই ধন্যবাদার্হ হননি, সারা ভারতবর্ষের সংগীতপ্রেমীদের কাছে তিনি এক মরমী সংগীতসাধকের উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরেছেন মর্মস্পর্শী ভাষায়।

ইদানীং অমৃতের প্রচ্ছদ, অঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সর্বাঙ্গীন উন্নতিও চোখে পড়ছে। ভালো লাগছে বৈকুণ্ঠ পাঠকের লেখা, চাণক্য সেনের কলম এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার শ্রদ্ধেয় কাহিনীকারদের কাহিনীর বঙ্গানুবাদ। আমরা অমৃতের কাছে আরও বেশী প্রত্যাশী। জ্যোতিপ্রকাশ রায়, সুকান্ত, মালাকার, মনমিত্র বিশ্বাস, সন্তাক্রুজ, বোম্বাই-৫৫।

(২)

২২শে এপ্রিল 'অমৃত' পত্রিকায় তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখা 'ইস্কাপনের বিবি' সম্বন্ধে বলছি।

মহাশয়, আপনি আপনার লেখা গল্প ইস্কাপনের বিবিতে কয়েকটা অলৌকিক ঘটনার কথা বলছেন। আপনি বলেছেন যে, যেখানেই আপনি এ গল্প বলেছেন সেখানেই কোন না কোন ঘটনা ঘটেছে। তা হলে আপনি যে এই গল্প 'অমৃত'তে লিখেছেন তার জন্য অমৃতের বা অমৃত পাঠক-পাঠিকার কোন ক্ষতির আশংকা আছে কি? শুভাশীষ রায়; কোচবিহার।

(৩)

গত ১৮ চৈত্র শুক্রবারের সংখ্যা 'অমৃত'-এ প্রকাশিত ডিজেলের গন্ধ, পাখির গান সম্পর্কে আমার এই লেখা।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নিয়ে গেছেন বারাকপুর ও তার চারপাশের গ্রামের শান্তির রাজ্যে আর বারাকপুরের ঐতিহাসিক পটভূমিকায়। তাঁরই লেখাতে নতুন করে উপলব্ধি করলাম পাখিদের গান যেন আর আগের মত শোনা যায় না। ডিজেলের গন্ধে চারিদিক ভরে তো গেছেই, সেই সঙ্গে আছে ট্রাকের কান ফাটানো আওয়াজ। বারাকপুরের ছোট বড় সব রাস্তা যেন বাস্ত, ট্রাক, বাস, টেম্পো, রিক্সার প্রতিযোগিতা। স্টেশন থেকে কোর্ট পর্যন্ত যে রাস্তাটি গেছে—নাম সুরেন্দ্রনাথের নামে। 'চম্পা' সিনেমা হাউসের পর থেকেই সেই বড় বড় আকাশ ছোঁয়া গাছে ঢাকা ছায়াসুনিবিড় রাস্তাটি কোথায় হারিয়ে গেল? শীতের শুরুতে যে রাস্তার দুপাশের গাছগুলো হলদে ফুলে (স্যার্বনাম) ভরে যেত।

কলকাতার ব্যস্ততা, কোলাহল, চিরকালই ছিল, কিন্তু তারই কাছে যে এমনি এক নিবিড় শান্তির রাজ্য ছিল সেটা ইংরাজ ভদ্রলোকরা আবিষ্কার করেছিলেন সন্দেহ নেই। সারাদিন কোলকাতার কোলাহলে কাটিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন বারাকপুরের নীড়ে। পার্ক রোড, মিডল রোড, রিভার সাইড রোড এমনি সব রাস্তার ধারের বাড়ীগুলো ফুলে ফলে সেজে থাকত আর দেবদারু, কাঁটালী চাঁপা আরও কত উঁচু গাছ বাড়ীগুলোকে ছায়ায় ঢেকে রাখত।

বারাকপুর নাম যে কারণেই হয়ে থাকুক সেনানিবাস (ব্যারাক) হিসাবেই যে তার নাম প্রসিদ্ধ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেই মঙ্গল সিং এর সময় থেকেই তার নাম (বারাকপুর) ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। এয়ার ফোর্সের এরিয়ার হাতায় ঢুকতে গিয়েই 'ফাঁসি তালাও' নামে যে পুকুরটি আছে, তার নাম বোধ হয় বর্তমানের মানুষ ভুলেই গেছে। তার চারি পাশে জেট প্লেনের সশব্দ আনাগোনা, তাছাড়া সামরিক ট্রাকে আসা যাওয়া, সাধারণ মানুষের আসতে যেতে মানা। কিন্তু ঐখানেই ধু ধু প্রান্তরে যেখানে ২।১টি বাবলা গাছ দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে একা দাঁড়ানো একটি আম গাছে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল মঙ্গল সিং-এর দুজন সঙ্গীর যাঁরা নাকি মঙ্গলের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর যুদ্ধের প্রয়োজনে সে সব গাছ ধরাশায়ী হোল। সেই দুই নাম না জানা সিপাহীর অস্তিত্বও মুছে গেল। ইছাপুরের রাস্তাটি ছিল সেই পুরানো দিনের রেসের মাঠের পাশ দিয়ে সোজা সেই নবাবগঞ্জের গঙ্গার ধার পেরিয়ে। এই রাস্তাটিরও দুপাশে ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে ছিল দীর্ঘ গাছগুলো। এখন সেই রাস্তার অস্তিত্ব নেই। নবাবগঞ্জের প্রসিদ্ধ ছিল ঝুলন মেলা। এক মাস ধরে চলত সেই মেলা। সেই সোদপুর, খড়দা, ওদিকে নৈহাটী জগদ্দল থেকে আসতো কাতারে কাতারে লোক। এক মাস লোকের যাওয়া আসার বিরাম থাকত না। সারাদিন, মধ্যরাত পর্যন্ত দেশোয়ালী গান গেয়ে চলত তাদের আসা যাওয়া, একটা যেন বাৎসরিক উৎসব। তখন ছিল না প্লাস্টিকের যুগ। কৃষ্ণনগরের পুতুল, পাথরের বাসন, কাঁসা পিতলের বাসন, কাঠের খেলনা—সে সব দেখে দেখে আমাদের আশ মিটত না। আরও কত বিচিত্র জিনিস—কাটা মুন্ডুর কথা বলা, জোড়া মেয়ের নাচ এমনি কত জিনিস। মানুষ প্রমাণ মাটির পুতুল দিয়ে দেখানো হোত দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ, দুঃশাসনের রক্ত পান, প্রকাণ্ড পাখী গরুড়কে যুদ্ধে হারিয়ে সীতাকে নিয়ে রাবণের পলায়ন। কী বিস্ময়, কী উত্তেজনা আমাদের মত শিশুদের মনে ছিল। এখন তো চিড়িয়া মোড়ের সান্ধ্য বাজার (শান্তি বাজার) সেই আগের মেলার জৌলুষকে হার মানিয়ে দিচ্ছে—রয়েছে মাইক, সিনেমা, টি, ভি, আর কী চাই। আলোয় আলোয় ঝলমলে। আর একটি বহু পুরানো সমাধিক্ষেত্র আছে, পুরানো রেসকোর্সের খুব কাছেই। এখানেও দেবদারু, শিরীষ ও কত নাম না জানা গাছ উঠে গেছে উর্ধ্ব মুখে, আর ছায়া মেলে পরম স্নেহে ঢেকে রয়েছে তাদের, যারা ঘুমিয়ে আছে মাটির নিচে। এটা বোধ হয় ১৭০০ সালে হবে। সারা বছর এই সমাধি ক্ষেত্র ফুলে ভরে থাকত, শীতের সময় মরশুমী ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকত—বড় দিনে ফলকগুলো সাদা রং-এ সাজত। জ্যোৎস্না রাতে যেন তাদের অস্তিত্ব বেশী করে জানান দিত। তখনকার শাসকদের হোমরা চোমরা কেউ এখানে এসে হয়ত প্রিয়জন কাউকে রেখে যেতেন, তাঁর স্থান হোত ঐ সমাধিক্ষেত্রেরই মাটিতে। সবগুলো ঠিক মনে নেই কিন্তু ছোট্ট একটি সমাধি

আছে, আর কথা বাড়িল দি। বড় করুণ ভাষায় লেখা আছে ওয়ালীংডম (১৭৯৬—১৮০০-র মধ্যে) শাসকের শিশু পুত্রের আড়ম্বরহীন সমাধি, যেটা দর্শকের মন উদাস করে দেয়।

আবার আমরা ফিরে আসছি শব্দ-মুখরিত আর ডিজেলের গন্ধে ভরা সুরেন্দ্রনাথ রোডে—এই রাস্তার ধারেই কোথাও আছে এখনও সেই পুরানো দিনের রাজ্ঞেশখানা, (মাফ করবেন, সন তারিখ ঠিক স্মরণ নেই) আর একটু এগিয়ে ভিতরে গেলে চাঁদমারি।

তারপর রয়েছে নিশান ঘাট (এখান থেকে কী কিছু নিশানা দেওয়া হোত?) ধোবি ঘাট, ওদিকে তালপুকুর, সেখানে আছে প্রসিদ্ধ অন্নপূর্ণার মন্দির ও শিব মন্দির—এটা নাকি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অনুকরণে তৈরী এবং করিয়েছিলেন রাণী রাসমণীর কন্যা। জব চার্নকের স্মৃতিও রয়েছে—স্টেশন থেকে সোজা রাস্তা ধরে এলেই ৪।৫ ফার্লং এর মধ্যে। জব চার্নকের স্বর্গের মত কুটি, যার নাম 'চার্নক ভিলা'। শোনা যায় এই কুঠিতে বিশ্রাম নিতে আসতেন চার্নক—পরবর্তীকালে কুঠি কন্যাকে দিয়েছিলেন। অমৃতের পাতায় যে চিড়িয়াখানার ছবি ছাপা হয়েছে, ঠিক সেই ছবি মত চিড়িয়াখানা না দেখে থাকলেও, খুব শিশুকালে আকর্ষণ ছিল বারাকপুরের প্রসিদ্ধ লাট বাগানের কোনও জায়গায় রাখা প্রচুর ছোট বড় নানা জাতের হরিণ, বাঁদর জাতীয় পশু আর ময়ূর, কাকাতুয়াও আমাদের মন কেড়ে নিত তখন।

লেখক উল্লেখ করেছেন যে মুর্তাজা মিস্ত্রীর—তার যেখানে আনা গোনা, বাস স্ট্যান্ড, পেট্রোল পাম্প, শান্তি বাজারের কোলাহল, সেই চৌহদ্দিতে ছিল একটি প্রকান্ড বটগাছ আর পিলখানা অর্থাৎ হাতীশালা। উঁচু উঁচু খিলান ঘর, তার ভেতর হাতি থাকত, আর তাদের বাঁধবার মোটা মোটা শিকল, শিকলের খুঁটি। তখন সব ঘরই প্রায় খালি ছিল, ২।১টি হাতি দেখেও ছিলাম, সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল একটি শিশু-হাতী। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল তারা! ভেঙেগ পড়ল উঁচু খিলান দেওয়া প্রাসাদ (পিলখানা)।

তারাদাসবাবু যে রাহাজানির বর্ণনা দিয়েছেন সেটা সেকালেও (১৯২৫।২৬ সাল) ছিল। সূর্য ডুবলেই স্টেশন থেকে আসার রাস্তাটি নীরব জনশূন্য হয়ে পড়ত, অন্ধকার নামলে ওখান দিয়ে আসতে গা ছমছম করত। রাস্তার দুপাশে গভীর জঙ্গল, দূরে দূরে ২।১টি বাড়ী, দোকান পসার কিছুই নেই। স্টেশন থেকে জানলা দরজা বন্ধ করা পাল্কি গাড়ী (ঘোড়ার গাড়ী) চড়ে আসতে গেলে, নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ী থেকে ২।৩জন লোক লাঠি বল্লম নিয়ে আগে আগে স্টেশন থেকে পাহারা দিয়ে গাড়ী নিয়ে আসত। বেশীরভাগ সময় কিন্তু রাহাজানি চালাতো 'টমিরা' হয়তো বেচারীদের পকেটমানিতে টান পড়ত।

আমি এখানে যা লিখলাম সবটাই চোখে দেখা আর স্মৃতির ওপর নির্ভর করে, হয়ত সময় বা স্থানের একটু ভুলচুক হতে পারে, সেজন্য তারাদাসবাবু ক্ষমা করবেন। তবে অলীক স্বপ্নের ওপর নির্ভর করিনি। তারাদাসবাবুর লেখায় যেন সেই শিশুকালের, কিশোরকালের স্মৃতিগুলো আবার নতুন করে ফিরে এল। তারাদাসবাবুর লেখাতেই এই সামান্য লেখাটুকু সাজাতে অনুপ্রাণিত হলাম। যূথিকা বসু, কলিকাতা-২৯।

(৪)

প্রদীপ নাগ বাবুর সমালোচনা পড়ে বেশ অবাক হলাম। অবাক হলাম এই কারণে যে, উনি তারাদাসের মতন লেখকের লেখাকে 'ন্যাকামি মার্কা' বলেছেন। উঠতি, আধুনিক তরুণ লেখকদের মধ্যে তারাদাসের মতন সুন্দর, স্বচ্ছ, সাবলীল, শ্লীল লেখা আমরা আর পাইনি। ওনার লেখার স্টাইল, বাচনভঙ্গী, ভাষা, আদর্শবোধ দেখে মনে হয় উনি পরে একজন বলিষ্ঠ লেখক হবেন। ওনার গল্পে ঘটনা থাকে, অকারণ পাতা বাড়ানোর দিকে মন দেন না। প্রদীপবাবুর তারাদাসের গল্প ভালো লাগে না যখন, তখন উনি তাঁর লেখা না পড়লেই পারেন, কিন্তু শুধু ওনার জন্য আমরা অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা তারাদাসের গল্পের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব কন?

বোধান গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় সাংসারিক সত্য বেশ ভালো। আসলে 'অমৃত' পত্রিকাই ভালো। শুধু গল্প আর কবিতা দিয়েই পাতা ভরায় না, অন্যান্য সুন্দর সুন্দর ফিচার দিয়ে বৈচিত্র্য এনেছে। আর আমাদের অনেক অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত করার জন্য মনে হয় অমৃত পত্রিকার আন্তরিক প্রচেষ্টা আছে। সম্পাদক মহাশয়ের কাছে আমাদের অনুরোধ অমৃত পত্রিকা যেন আরো উন্নত-মানের হয় ও বহুমুখী হয়। অমৃত যেন অমৃতই হয়। মিহির বিশ্বাস মলয়া বিশ্বাস, কলকাতা-৬৫।

বিজয়ার কবিতা

অনেকদিন যাবৎই 'অমৃত'-এর মোহিনী-রূপ, বিষয়বৈচিত্র্য নজরে পড়েছে। তাতে বাঙালীপনা সন্দেহে অন্যদৃষ্টিতে 'ব্যবসায়িক সাফল্য'-রূপ অভিব্যক্তিও নজরে পড়েছে। 'অমৃত'র অঙ্গসজ্জা বা অভিনবত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষিত ও বিচিত্র অভিমত জানিয়ে 'অমৃতে' প্রকাশিত বহু চিঠিপত্রও পড়েছি। কিন্তু তাতে মন ভরেনি। কোথায় যেন একটা দোটানা ভাব। কিন্তু অমৃতর ২৪ জুন সংখ্যায় বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবি-পরিচিতি বা সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে অমিতাভবাবু এবং সেইসঙ্গে অমৃতর এ কোন সুর? 'মহিলা কবি'র প্রথম দিককার কবিতা সম্পর্কে বা সাম্প্রতিককালের প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থের নাম প্রসঙ্গে তিনি যেমন স্পষ্ট সমালোচনা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এবং পত্রিকা-সম্পাদক তুষারবাবু তা প্রকাশ করে যে আভিজাত্যের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। সমালোচনার ক্ষেত্রে সততা এবং নির্ভীক মনোভাব যে অলিখিত নিয়ম তা যেন সমালোচকরা ভুলতে বসেছেন। প্রায় অর্ধশতাধিক সাহিত্য-পত্রিকা নিয়মিত পড়ি। কিন্তু সর্বপ্রথম এই যথার্থ সমালোচনা চোখে পড়ল। অন্য কিছু বিরূপ সমালোচনা চোখে পড়লেও মূলত তা আক্রমণাত্মক। কিন্তু 'অমৃত'র এই স্পষ্টোক্তি আমাকে যারপরনাই বিস্মিত করেছে। এই নিরপেক্ষ বলিষ্ঠ সমালোচনার বাহবা দিয়ে দপ্তরে কটা চিঠি পৌঁছবে জানি না তবে সচেতন পাঠকদের একটা বড় অংশের নজর যে ঐ সংখ্যার ঐ আট-দশ সংখ্যক লাইনের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। নিরীক্ষামূলক প্রয়োগবাদী সৃষ্টিশীল ঐ সুর অবশ্যই পাঠক দরবারে আবেদন তুলতে সক্ষম হবে। এর তুল্যমূল্য নির্ণয় আজ সম্ভব না হলেও মহাকালের দরবারে সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'অমৃত' নিশ্চিত আসন সংরক্ষণে সমর্থ হবে। শুধু 'নতুন মুখ'ই নয় নতুন মুখের আকর্ষণ থাকা চাই। পথ সুগম না হলেও আদর্শ বা উদ্দেশ্য মহান হলে 'অমৃত' তবেই ঔজ্জ্বল্য, স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট রক্ষায় সক্ষম হবে। 'অমৃত'র উচিত পাঠকের দরবারে মহিমাময় ভাস্বর রূপ নিয়ে হাজির হওয়া। নতুনত্ব মানে নবীন নয়, দৃষ্টিভঙ্গীর নবত্ব। পাঠক দরবারে 'অমৃত' অভিনন্দিত হোক। এ কোন সুর? মূর্ছনা যার মহাকালব্যাপী। —'অতনু ঋত্বিক', রবীন্দ্র সরণী, বাঁকুড়া।

(২)

২৪ জুন তারিখের অমৃত পত্রিকায় বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে অমিতাভ দাশগুপ্ত যে কবি-পরিচিতি দিয়েছেন তা উল্লিখিত কবির কবিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন, ভ্রান্তিপূর্ণ এবং অমনোযোগী রচনা। মেয়েরা যাঁরা 'লেখালেখি' করেন, শুধু তাদের মধ্যে নয়, আধুনিক কবিদের মধ্যে বিজয়ার কবিতা মৌল কবিত্বে, শিক্ষিত শব্দব্যবহারে, আধুনিক বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। প্রকাশিত কবিতাদুটি তাঁর প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা নয়, তাঁর কবিতার বহু সার্থক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে কলকাতার অজস্র লিটল ম্যাগাজিনে। বিবেকের পাশ থেকে বিশ্বস্ত কণ্ঠকে কবিতায় এমন সার্থকভাবে পাঠকের হাতে আবিষ্কারের মতো আর কেউ তুলে দিতে পারেন কিনা সাম্প্রতিককালে, আমার জানা নেই। অথচ অভিজাত, রসবোধযুক্ত এবং পরিবেশ সচেতন এই কবি নিজেকে কখনও নির্লজ্জভাবে জাহির করেন না। 'ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম' নামক বিজয়ার সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থটি আধুনিক বাংলাকাব্য ভাণ্ডারে একটি উল্লেখযোগ্য চিরকালীন সংযোজন। —ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-২৯।

খিদিরপুর / মোহনবাগান

শারীরিক সক্ষমতা না বাড়ালে স্কিলে ঘাটতি থাকবেই

কিছুদিন আগের কথা। কলকাতায় আই-এফ-এ শীল্ডে খেলতে এসেছিল একটি বিদেশী দল। দলটি কলকাতায় আসার পর, তাদের প্রথম ম্যাচের আগে একদিন প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল মোহনবাগান মাঠে। প্র্যাকটিসের কিছু আগে দলের কোচ আর ম্যানেজার দেখতে এলেন সব ব্যবস্থা-পত্র। সবুজ ঘাসে ঢাকা মোহনবাগান মাঠ দেখে তো কোচ ভদ্রলোক মহাখুশী। মাটিতে আঙুল টিপে পরীক্ষা করলেন জমি নরম না শক্ত। তারপর, হঠাৎই আই-এফ-এ প্রতিনিধিকে জিজ্ঞেস করলেন,—এখানে প্লেয়ার্স জিমন্যাসিয়ামটা কোথায়? আই-এফ-এ প্রতিনিধির তো মাথায় হাত! জিমন্যাসিয়াম? সে তো জিমন্যাস্টিক যেখানে হয় সেখানে থাকে। কলকাতার ফুটবল মাঠে জিমন্যাসিয়ামের ব্যবস্থা তো কোথায়ও নেই। কোচকে বলা হলো সে কথা। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'ব্যাড, ভেরি ব্যাড: প্রতিটি ফুটবল ক্লাবের সংগে একটি করে মিনিয়েচার জিমন্যাসিয়াম অন্তত থাকা উচিত। খেলোয়াড়দের দৈহিক পটুতার ওপর তো সবকিছু নির্ভর করে।'

গল্পটা এখানে শোনাতাম না। কিন্তু দিন কয়েক আগে একজন বাঙ্গালী প্রাক্তন ওলিম্পিক ফুটবল খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল কলকাতার ফুটবল নিয়ে (মাপ করবেন, তাঁর নামটি আমি বলতে পারবো না। আলোচনার আগেই তিনি অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছেন যে তাঁর নাম প্রকাশিত হবে না)। আলোচনা প্রসংগেই তিনি সখেদে বললেন,—'এখন শুনতে পাই কলকাতার বড় বড় ক্লাবগুলো নাকি চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ফুটবলার কেনে। কিন্তু কই একটি ক্লাবও তো এগিয়ে আসে না ঐ টাকার সামান্য অংশ ব্যয় করে ফুটবলের উন্নতির জন্য কতগুলো প্রাথমিক ব্যবস্থা নেবার কাজে।' ওলিম্পিক খেলোয়াড়ের মুখেই শুনলাম বিদেশের সব ভালো ভালো ক্লাবেই নাকি জিমন্যাসিয়াম, স্পোর্টস লাইব্রেরী আর স্পোর্টস মেডিসিনের ব্যবস্থা আছে। কলকাতায় অন্তত পক্ষে বড় ক্লাবগুলি যাদের ফুটবল বাজেট বছর প্রতি দু-তিন লাখ, তারা কি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারেন না?

এ বছর কলকাতার ফুটবল কেমন দেখছেন? আমার এই প্রশ্নটির উত্তরে প্রাক্তন তারকা খেলোয়াড়টি কোন মন্তব্য করতে রাজী হননি। তাঁর অভিযোগ শুধু একটিই—কলকাতার খেলোয়াড়দের ফিজিক্যাল ফিটনেস ক্রমশঃ কমছে, তাই স্কিলেও ঘাটতি আসছে. এ ব্যাপারে এখনই অনুসন্ধান আরম্ভ করা উচিত। উচিত তাদের দৈহিক পটুতা এবং সামর্থ্য বাড়াবার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থা নেওয়া। এ কাজে বড় ক্লাবগুলিকে তিনি এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। বড় ক্লাবগুলির টাকা আছে। তাঁরাই পারেন এই সমস্যার সমাধানের পথ দেখাতে।

সত্যি কথা বলতে কি ফুটবল লীগের খেলা দেখতে বসলে খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতার অভাবটা যেন বড় বেশী চোখে পড়ে। ছোট দলগুলির তো বটেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় দলের নামী দামী খেলোয়াড়রাও যেন সত্তর মিনিটের খেলায় বেদম হয়ে যান। শুধু দমের অভাবই নয়, খেলার শেষ দিকে অনেকটা 'গো অ্যাজ ইউ লাইকের' মতই যেমন ইচ্ছা তেমন খেলার প্রবণতা এসে যায়। তখন, খেলা দেখে মনে হয় ফুটবলাররা যেন রেফারীর শেষ বাঁশীর অপেক্ষায় 'দিনগত পাপক্ষয়' চালিয়ে যাচ্ছেন। বড় ক্লাবের বিরুদ্ধে ছোট ছোট দলগুলির শেষদিকে ভেঙে পড়ার কারণও এটাই। জানি যে শারীরিক সক্ষমতার অভাব কেন সে সম্পর্কে অনুসন্ধান আরম্ভ হলে অনেক কারণ বের হবে। বহুবার জানা—বহুবার শোনা কিছু কথা। তবু অনুসন্ধান হওয়া উচিত। শুধু অনুসন্ধানেই শেষ নয় প্রতিকারের ব্যবস্থাগুলিও যাতে কার্যকরী হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখার সময় এসেছে। জয়ন্ত চক্রবর্তী

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহের ৯ জুলাই ইস্টবেঙ্গল পরিষ্কার ২-০ গোলে গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগানকে হারিয়ে ১৯৭৭ সালের লীগ জয়ের লক্ষ্যে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে। বর্তমানে ইস্টবেঙ্গলের ১০টা খেলায় ২০ পয়েন্ট উঠেছে। অপর দিকে মোহনবাগান ১২টা খেলায় ২২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। ইস্ট-বেঙ্গলের কাছে এই পরাজয় চলতি মরশুমের লীগের খেলায় মোহনবাগানের প্রথম পরাজয়। তাছাড়া মোহনবাগানের বিপক্ষে চলতি মরশুমে প্রথম গোল করার কৃতিত্বও ইস্টবেঙ্গলের। এই নিয়ে প্রথম বিভাগের লীগে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে যে ৮৮বার খেলা হল তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গলের জয় ৩৪, মোহন-বাগানের জয় ২৫ এবং খেলা ড্র ২৯। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মোহনবাগান ১৫ বার (রেকর্ড) এবং ইস্টবেঙ্গল ১৪ বার। প্রথম বিভাগের লীগে উপর্যুপরি, সর্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ইস্টবেঙ্গল (১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সাল)।

চলতি ফুটবল মরশুমে খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনের ফলে মোহনবাগানই বেশী লাভবান হয়েছে। কাগজে-কলমে মোহনবাগান আজ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দল। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গলকে বেশীর ভাগ তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে দল তৈরী করতে হয়েছে। তাদের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় এবছর মোহনবাগানে যোগ দিয়েছে। মোহনবাগানের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গলের এই লীগের খেলাটা ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। ইস্ট-বেঙ্গলের তরুণ খেলোয়াড়রা এই খেলার ফলাফলের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছে প্রবল শক্তিমান দলকেও তরুণদের শক্তি, নিষ্ঠা এবং মনোবলের কাছে সময়ে সময়ে হার স্বীকার করতে হয়। তবে আলোচ্য খেলাটা একতরফা হয়নি। খেলা সমানে সমানে হয়েছে। আরও বলতে হয়, ইস্টবেঙ্গলের থেকে মোহনবাগান গোল করার সহজ সুযোগ বেশী পেয়েছিল। দলের খেলোয়াড়দের মারাত্মক ভুল খেলার দরুণ মোহনবাগান যেমন গোল দিতে পারেনি তেমনি সেই দোষেই গোল খেয়েছে। তাছাড়া ইস্টবেঙ্গলের তরুণ গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলী এই দিন অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে খেলে কয়েকবার দলের অবধারিত পতন রোধ করেছিলেন। খেলায় মোহনবাগান গোটা সাতেক কর্নার পায়। প্রথমার্ধের খেলায় যেখানে মোহনবাগান চারটে কর্নার পায় সেখানে ইস্টবেঙ্গল একটাও পায়নি।

প্রথমার্ধের খেলার প্রথম আট মিনিটের মধ্যে মোহনবাগান গোল করার দুটি সহজ সুযোগ পেয়েছিল। খেলার ৮ মিনিটের মাথায় ইস্টবেঙ্গলের গোল মুখে হাবিব যখন বল নিয়ে যায় তখন গোলরক্ষক ছাড়া বিপক্ষের অপর কোন খেলোয়াড় ছিল না। এবং গোল ছিল হাবিবের থেকে মাত্র ৮ গজ দূরত্বে। সুতরাং গোল অবধারিত। কিন্তু হাবিব বলটি সোজা গোলরক্ষকের হাতে তুলে দেন।

ইস্টবেঙ্গল প্রথম গোল দেয় প্রথমার্ধের খেলার ১৫ মিনিটে এবং দ্বিতীয় গোল প্রথম গোলের পাঁচ মিনিট পরে। এই দুটি গোলের জন্যে মোহনবাগান দলত্যাগী সমরেশ চৌধুরীর অবদান যথেষ্ট। প্রায় মাঝ মাঠ থেকে সমরেশ যে ফ্রি-কিক করেন সুরজিৎ তাতে হেড দিয়ে বলটা দলের খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে পাঠান। মিহির বসু চোখের পলকে সেই বলে বাঁ-পায়ে ভলি মেরে দলের প্রথম গোল করেন। এই অতর্কিত দর্শনীয় গোলে সারা মাঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। এর পাঁচ মিনিট পর সমরেশ ৩০ গজ দূরে থেকে ফ্রি-কিক করে দলের দ্বিতীয় গোল দেন। সমরেশের বলটি ইনসুইং করে মোহনবাগান গোলে প্রবেশ করে। ইস্টবেঙ্গল দলত্যাগী বিশ্বজিৎ বলের ফ্ল্যাইট বুঝতে পারেননি। তিনি অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোল খেয়েছিলেন। এর জন্য তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী।

প্রথমার্ধের খেলার ৮ম মিনিটে হাবিব অবধারিত গোলের সুযোগ হেলায় নষ্ট না করলে খেলায় ফলাফল হয়ত অন্য রকম হত।

ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা অনেক বেশী সঙ্ঘবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে নিখুঁত বোঝাপড়া ছিল। মোহনবাগানের আক্রমণ ভাগে একমাত্র বিদেশ বসু বাদে নামী খেলোয়াড়রা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন। মোহনবাগানের দুই প্রখ্যাত লিংক-ম্যান প্রসূন ব্যানার্জি এবং গৌতম সরকার তাঁদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেননি। ফলে দলের আক্রমণ ভাগ দুর্বল হয়ে পড়ে। মোহনবাগান ক্লাবের কোচ পি কে ব্যানার্জির আচরণ এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা বিরূপ মন্তব্য হয়েছে। তিনি নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে খেলা শেষের অনেক আগে থেকেই মাঠে ফুঁপিয়ে কেঁদেছেন। যেখানে দলের বিপর্যয়ের সময় কোচের মুখ থেকে উৎসাহবাণীর একান্ত প্রয়োজন ছিল সেখানে খেলোয়াড়রা কি পেলেন? দেখলেন দলের কোচ কাঁদছেন। ফলে যা হয়, খেলোয়াড়রা হতাশায় আরও বেশী ভেঙ্গে পড়লেন। কোচের নির্দেশে প্রথমার্ধের খেলার ২৫ মিনিটে সুভাষ ভৌমিকের জায়গায় শ্যাম থাপা খেলতে নামেন। আবার দ্বিতীয়ার্ধের ৫০ মিনিটে শ্যামকে বসিয়ে তার জায়গায় আনা হল রক্ষণভাগের বাতিল খেলোয়াড় ক্যাপটেন দস্তুরকে। এই খেলোয়াড় পরিবর্তন মোটেই ফলপ্রসূ হয়নি।

ইস্টবেঙ্গলের কাছে মোহনবাগানের পরাজয়ের ফলে প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় বর্তমানে অপরাজিত রইলো এই তিনটি দল—ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং এবং বি এন আর। লীগের ২৩টি দলের মধ্যে এখনও কোন পয়েন্ট নষ্ট করেনি একমাত্র ইস্টবেঙ্গল—১০টা খেলায় ২০ পয়েন্ট। মহামেডান স্পোর্টিং এ পর্যন্ত তিনটে পয়েন্ট নষ্ট করেছে। তারা শেষ লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৬৭ সালে।

লীগের খেলায় উল্লেখযোগ্য গোলদাতা—আকবর (মোহনবাগান) ৯ গোল, শেখর চক্রবর্তী (চন্দ্রমেমোরিয়াল) ৮ গোল, রঞ্জিৎ মুখার্জি (ইস্টবেঙ্গল) ৭ গোল এবং প্রদীপ ভট্টাচার্য (পোর্ট ট্রাস্ট) ৭ গোল।

এ পর্যন্ত হ্যাটট্রিক করেছেন এই তিন-জন—পোর্ট ট্রাস্টের প্রদীপ ভট্টাচার্য (বিপক্ষে কালিঘাট), চন্দ্রমেমোরিয়ালের শেখর চক্রবর্তী (বিপক্ষে কুমারটুলি) এবং ইস্টার্ন কম্যান্ড দলের অধীপ মজুমদার (বিপক্ষে টালিগঞ্জ অগ্রগামী)।

দর্শক

৬লা ছবির গঙ্গাযাত্রা

ঋত্বিক ঘটক এখন কলকাতায়।
জীবিতকালে তিনি যে কাজটি অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন, স্বর্গ থেকে ডেপুটেশনে তিনি এসেছেন সেই অসম্পূর্ণ কাজটি করতে।

বাংলা ছবির অকাল মৃত্যু হয়েছে।
ঋত্বিক ঘটক মৃতের পারলৌকিক কাজ-সম্পাদন করতেই এসেছেন। সে জন্যই শব শোভাযাত্রার সবার আগে।
টালিগঞ্জের ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিও থেকে বেরিয়ে ছিল শব শোভাযাত্রাটি সকাল টা নাগাদ। নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর টেকনিশিয়ানস্ আর টালীগঞ্জ ট্রাম ডিপোর সামনে ইন্দ্রপুরীকে বাড়ি ছুঁয়ে এখন শব শোভাযাত্রাটি শ্যামাপ্রসাদ-আশুতোষ মুখার্জি রোড ধরে ধর্মতলার পথে।

কে একজন শোভাযাত্রী ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করছিল 'আনোয়ার শা রোডের দু নম্বর স্টুডিওয় যাওয়া হবে না নাকি?' কেনো উত্তর পায়নি সে।

বাংলা ছবির শবদেহ কাঁধে নিয়ে তখন পূর্ণেন্দু পত্রী, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, রাজেন তরফদার, হরিসাধন দাশগুপ্ত ও আরও সবাই। তার কদম এগিয়ে চলেছেন তরুণ মজুমদার, অজয় কর প্রমুখ একেবারে সামনে, শোভাযাত্রাটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঋত্বিক ঘটক। দীর্ঘ-শীর্ণ চেহারা তাঁর, পরনে সেই ময়লা পাজামা পাঞ্জাবী। হাতে প্রিয় বস্তুটিই নেই; সম্ভবতঃ স্বর্গে রেখে এসেছেন।

কয়েক হাজার কলাকুশলীও নীরবে অনুসরণ করছেন শব শোভাযাত্রাটি।
আশ্চর্যজনকভাবে এই শোভাযাত্রায় সত্যজিৎ-মৃণাল-তপন সিংহ অনুপস্থিত। কে যেন বলল—মৃণালবাবু তো এখন মস্কোয়। মৃগয়া' নিয়ে প্রতিযোগিতা করছেন।'

আর সত্যজিৎ রায়?
তিনি তো ক'দিন আগেই আকাশবানিকে বাংলা ছবির মৃত্যুসংবাদ চিঠি মারফৎ জানিয়ে দিয়েছেন।

তপন সিংহ কয়েক মাস ধরে নাকি অসুস্থ।

প্রিয় শিল্পীরাও কেউ নেই শব শোভাযাত্রায়। একজন সহকারী পরিচালক বলে উঠলেন—'উত্তমকুমার এখন হিন্দী ছবির নায়ক হয়েছেন তো!'
দ্রুত পদক্ষেপে অথচ বেশ নীরবে এগিয়ে চলেছে বাংলা ছবির শবদেহ। চন্দন কাঠের খাটে শয়ান প্রাণহীন মরদেহটি। ফুল দিয়ে, দেশী বিদেশী কয়েক শ' সম্মানপত্র দিয়ে দেহটি ঢাকা। মুখের ওপর চাপানো আছে কান উৎসবে পাওয়া 'পথের পাঁচালী'র স্বর্ণপদকটি। সোনা রূপোর মেডেলগুলো শোভাযাত্রীদের হাতে হাতে।

সম্ভবতঃ ওগুলোরও সৎকার হবে।
নীরব দীর্ঘ এই শোভাযাত্রা স্বভাবতঃই পথযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কলকাতা শহরে এমন দৃশ্য বিরল। সব নিয়ে বেলেল্লাপনা এই শহরের চরিত্র। কিন্তু এই শব শোভাযাত্রার সবাই নীরব, শোকে মূহ্যমান।

জনৈক পথচারী সাহসভরে এগিয়ে এল শোভাযাত্রার কাছে। জিজ্ঞেস করল—'কে মারা গেল দাদা?'
শোক-ভেজানো গলায় জবাব এল 'বাংলা ছবি।'
—কবে?
১৬ দিন।
—কি অসুখ হয়েছিল?
অ্যাড ভ্যালোরেম
—সেটা আবার কি রোগ দাদা?
গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয় জানেন তো?
হ্যাঁ তা তো জানি।
এটাও সেই রোগ, তবে খুবই বিষাক্ত এই বিষফোঁড়াটি? তাই বাঁচানো গেলো না আর।
পথযাত্রীটি আবার মিশে গেলেন পথের ভিড়ে।

বসুশ্রী-বিজলী-ইন্দিরা-ভারতী-পূর্ণ পেরিয়ে বাংলা ছবির শোভাযাত্রা এখন আরও গতি পেয়েছে। কাঁধও বদল করেছেন কেউ কেউ। তাছাড়া ঐ হলগুলোর সামনে দর্শকের দীর্ঘ লাইন দেখে সবাই-ই একটু উত্তেজিত। কারণ কোন হলেই আর বাংলা ছবি চলছে না।
হাঁপাতে হাঁপাতে শববাহী যাত্রীরা বারবেলায় এসে হাজির হলেন এসপ্ল্যানেডে ই আই এম পি এ'র দপ্তরে, ছোটগলিটি তখন ভীড়ে ভিড়াক্কার। ইম্পার সকল সদস্যরা এসেছেন বাংলা ছবির প্রতি তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। কি কারণে বোঝা গেল গেল না প্রদর্শক-সদস্যদের সংখ্যা অনেক কম। সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় এসেছেন প্রযোজকরা। পরিবেশক সদস্যরাও আছেন।

সংস্থার সভাপতি শ্রীজালান সাহেব শ্রদ্ধা নিবেদন পর্বের উদ্বোধন করলেন বাংলা ছবির শবদেহে সাদা পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। তারপর এলেন সহ-সভাপতি কোষাধ্যক্ষ এবং একে একে বাকি সবাই।
শব-শোভাযাত্রার নেতা ঋত্বিক ঘটক রাস্তার উল্টোদিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে স্থির চোখ, আগুন জ্বলছে যেন তাঁর চোখে। সব ক্রিয়াকলাপ তিনি দেখছেন—দেখছেন—করার কিছু নেই।
একটু বাদেই শব শোভাযাত্রার মুখ ঘুরল উল্টোদিকে। এবার গন্তব্যস্থল কেওড়াতলার শ্মশানঘাট। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে শবদেহটি দাহ করা হবে। শোভাযাত্রার আয়তন এখন বেড়েছে একটু। ইম্পার সদস্যরাও যোগ দিয়েছেন।

সন্ধ্যের পর বাংলা ছবির শব দাহ হল। মেডেলগুলোও। অতঃপর পবিত্র পূত ভস্মরাশি একটি ঠোঙায় ভর্তি করে ঋত্বিক ঘটকের হাতে তুলে দিয়ে ঘাটবাবু বললেন, 'এটা নয়াদিল্লিতে অর্থমন্ত্রক এবং তথ্য ও বেতারমন্ত্রকে দিয়ে আসুন। এটুকুই বাংলা ছবির শেষ চিহ্ন। যদি অসম্ভব না হয় দক্ষিণ আর পশ্চিম ভারতে এগুলো ছড়িয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে বলবেন ও'দের।'

ঋত্বিক ঘাটবাবুর কথা মানতে পারলেন না। পবিত্র পূতভস্মরাশির ঠোঙাটি হাতে নিয়ে তিনি পাড়ি দিলেন স্বর্গের পথে।
তাঁর চশমার ফাঁকে জল। মুখে হাসি। কেন ঠিক বোঝা গেল না।

নি, ব,

দস্যু রত্নাকর ছবিতে রেহানা সুলতান

[illegible] ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বরে কাপ এগিয়ে দিল। তারপর মেয়েটির কাপের চিনি গুলতে গুলতে কাপটি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে খুশী খুশী হাসি হাসি মুখে—

ফ্যাকশন অফ্ফা সেকেন্ড, মেয়েটি ছোট্ট চীৎকার আর্তনাদ করে সবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার গায়ে গরম কফি তখনও চিড়বিড় করছে, টিটোর মুখে অপ্রস্তুতি-ম্লান-অনিচ্ছা কৃত ত্রুটিজনিত অপরাধ, ভীতি—সব একসঙ্গে মুভি ক্যামেরার মত ছুটোর খুলছে আর বন্ধ করছে, মৃণাল —হয়ে—এঃ বলে লাফিয়ে উঠে ফিট হয়ে গিয়েছে, দুজন বেয়ারা ছুটতে ছুটতে এল কাপ ডিশ বাঁচাতে—

দীপঙ্কর তখনও বলে চলেছে—সরি সরি হঠাৎ পড়ে গেল, কী জ্বালা করছে নাকি? এ হে-হে, ইয়ে করুন এখুনি বাড়ী চলে যান, বার্নল লাগিয়ে দিলে জ্বালা কমে যাবে মানে ইয়ে আর খুব, মৃণাল একটু হেল্প করো ওকে, একটা ট্যাকসি অন্তত ডেকে দাও…

রঞ্জন মজুমদার

বাংলা ছবির যোগ্য পরিচালক নেই

১৯৭৫এ কলকাতায় ২৬টি বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছিল। তার মধ্যে ৫।৬টি ছাড়া বাকী সবগুলোই ব্যর্থ। সে ব্যবসায়িকভাবেও এবং ছবি হিসেবেও। '৭৬এও সেই এক অবস্থা। '৭৭এর এই জুন, আজ সেই ট্র্যাডিশনের কোন পরিবর্তন দেখছি না। বাংলা ছবি এখন দর্শক আকর্ষণে ভয়ংকর-ভাবে ব্যর্থ। এভাবে যদি আরো কিছুদিন যায়, তাহলে সীমিত যে কটি স্টুডিও এখনো টিকে আছে, তা ক্রমশঃ গুদামঘরের রূপ নেবে। দুঃখের বিষয় আজো অবধি এই ব্যর্থতা [illegible] করার অনেক প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। মূলতঃ সেই ব্যর্থতা কেন তার সঠিক অনুসন্ধান হয়নি বলেই। শুধু একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছেন। কখনো দায়ী করা হয় ছবির প্রদর্শককে, কখনো সরকারকে, কখনো বা হিন্দী সিনেমাকে।

চলচ্চিত্র নির্মাণে যে দুজনের দায়িত্ব প্রধান, তাঁদের একজন প্রযোজক। একটা প্রযোজক-সংস্থা তাঁদের ছবির দ্বারা দর্শক রুচি তৈরিতে প্রচুরভাবে সাহায্য করেন। ছবি নির্মাণই তাঁদের উদ্দেশ্য, তাঁদের কাজ। তাই এই ছবির মাধ্যমেই দর্শক ও তাঁদের মধ্যে এক অলক্ষ্য যোগাযোগ তৈরি হয়। স্বাভাবিকভাবে ফিল্ম মাধ্যমটির প্রতি তাঁদের ভালবাসা ও আকর্ষণ থাকে। অথচ কলকাতায় নিউ থিয়েটার্সের পরে আর কোন উল্লেখ-যোগ্য প্রযোজনাসংস্থা গড়ে ওঠেনি। ইদানীং খুব কম প্রযোজক আছেন যাঁরা একবারের বেশী ছবি করেছেন। মুখ্যতঃ চলচ্চিত্রে আসা তাঁদের একটা সাময়িক খেয়াল বা শখ। কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা ছবি করতে আসেন না। বেশীর ভাগই আসেন নারীসঙ্গ পেতে, কালো টাকা সাদা করতে। তাঁদের দ্বারা বাংলা ছবি ভাল হবে, এ আশা বৃথা।

প্রযোজক ছাড়া আর যাঁর প্রধান দায়িত্ব, তিনি পরিচালক। ছবির মূল কর্ণধার। তাঁর পরিকল্পনা, পদ্ধতি অনুযায়ী গল্প সিনেমায় রূপ পায়। বাংলা ছবি প্রধানতঃ সাহিত্য-নির্ভর। সাধারণতঃ কোন জনপ্রিয় গল্প বা উপন্যাস নিয়ে পরিচালক নিজের রুচিমতো তাকে দুমড়ে মুচড়ে ছবির ফর্মে রূপ দেন। তাই অনেকেই ছবির ব্যর্থতাকে পুরোপুরি সাহিত্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মন্তব্য করেন, ভাল গল্প নেই, তাই ভাল ছবি হচ্ছে না। আমার মতে এ অত্যন্ত গৌণ কারণ।

ধরা যাক কোন একটি গল্প, পরিচালক তাঁর মনোমত তাকে ঢালাই করলেন। গল্পের পরিবর্তনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পরিচালকের

আছে। কিন্তু সেই পরিবর্তন কতটা যুক্তি-যুক্ত। পরিচালকের যদি প্রকৃত শিল্পবোধ না থাকে, সামাজিক চেতনা না থাকে, সাহিত্য ও সিনেমা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে তাঁর সৃষ্ট চিত্রনাট্য কখনোই ভাল ছবির যোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। ইন্দ্র মিত্রের গল্পটিকে মৃণাল সেন নিজের ইচ্ছেমতো 'ইনটারভিউ'তে রূপান্তরিত করেছেন। অন্যদিকে পূর্ণেন্দু পত্রী নিজের খুশীমতো 'ছেঁড়া তমসুক'কে ছবিতে এনেছেন। দুটিই ছোটগল্প। এবং দুজন পরিচালকই গল্পের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু ছবির জন্য তাঁদের গল্পের যে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে হয়েছে, সেখানে কে কতটা সার্থক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেতে' ও সত্যজিতের 'অশনি সংকেতের' মধ্যে পার্থক্য অনেক। এই পার্থক্য স্বাভাবিক। সত্যজিৎ তাঁর ছবি যেখানে শেষ করেছেন, বিভূতিভূষণ তার পরেও অনেক কথা বলেছেন। যেহেতু বিভূতিভূষণের যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য দুর্ভিক্ষের সময়ে দারিদ্র্য, কষ্ট ইত্যাদির কথা, সত্যজিৎ সেখানে জোর দিয়েছেন মানুষের মূল্যবোধের ওপর। অন্যদিকে লেখকের লেখাকে হুবহু অনুসরণ করেও ভাল ছবি করা যায়। তরুণ মজুমদার তাঁর 'বালিকা বধূ' ছবিতে সে দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে লেখকের লেখার প্রতি আনুগত্য রেখেও পরিচালক নিজের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় এর পরিবর্তন আনতে পারেন, আবার নাও পারেন। এবং এসব তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি ফিল্ম মাধ্যম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

অথচ এখন যাঁরা চলচ্চিত্র নির্মাণে যুক্ত, তাঁদের চিত্রনাট্য গল্পের অনুসরণও নয়, অনুকরণও নয়। ছবি নির্মাণের পেছনে তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য, কিভাবে দর্শকদের পকেট থেকে বেশী পয়সা বের করানো যায়। কিন্তু রিলিজের পরে দেখা যায় দর্শক সেই ছবি নিচ্ছে না। আসলে এই সমস্ত পরিচালকরা জানেন না, কেন ছবি করছেন, কোন দর্শকের জন্য ছবি করছেন, কি ছবি করছেন। তাঁরা শুধু জানেন একটা ফর্মুলা। দুটো বেডরুম সীন, চার-পাঁচটা গান, তিনটে ফাইটিং, স্টার ... এমনি কিছু অনুপান।

কলকাতার চার-পাঁচজন পরিচালক ছাড়া কেউ চিত্রনাট্য নিজে করেন না। এসব করার জন্য যাঁরা আছেন তাঁরা শুধু অর্ডার সাপ্লায়ার্স। ছবির ভাল-খারাপ বিষয়ে তাঁদের কোন দায়দায়িত্ব নেই। প্রযোজক, পরিচালক যেভাবে চান তাঁরা সেইভাবে সাপ্লাই করেন। এই চিত্রনাট্যেরও পরিবর্তন হয়। কিন্তু তা ছবির জন্য নয়। পরিচালকের কোন অনুগৃহীত বা গৃহীতার জন্য একটি চরিত্র দরকার। অতএব তিনি চিত্রনাট্যে যে কোনভাবেই তাকে স্থান করে দিলেন। প্রযোজকের খেয়াল চাপল যে নায়িকার একটা স্নানের দৃশ্য রাখতে হবে। ব্যস এসে গেল স্নান-দৃশ্য। নায়ক চাইলেন তাঁকে গাড়ীতে করে গান গাইতে দিতে হবে। নায়িকা চাইলেন একটা স্বপ্ন দৃশ্য। এভাবে সকলের চাহিদা মিটিয়ে যখন ছবিটি পর্দায় ছাড়া হল, দেখা গেল তা দর্শকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে না।

কলকাতায় যেসব পরিচালক ছবি করেন, তাঁদের মধ্যে ৬/৭ জন ছাড়া বাকীদের পরিচালক আখ্যা দেওয়া কষ্টকর। যে গুণ, ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব থাকলে একজন পরিচালক প্রকৃত পরিচালক, তাঁদের তা নেই। তাঁদের বড়জোর ছবির সংগঠক বলা যেতে পারে। কলকাতায় 'পরিচালক' হতে গেলে দুটো গুণ থাকা প্রয়োজন। এক ব্লাফ দেওয়ার ক্ষমতা, দুই, মোসাহেবী করার অভিজ্ঞতা। ছবি নির্মাণে চিত্রনাট্য, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, অভিনয় ইত্যাদি ছাড়া বাকী সব ব্যাপারে তাঁদের পরিচালনা অত্যন্ত সবল। এইসব তথাকথিত পরিচালকদের না আছে একস-পোজার জ্ঞান, না আছে অভিনয় সম্পর্কে দক্ষতা, না কোন পরিবেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। ক্যামেরাম্যান যদি কখনো কোন ফোকাস ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, বা কোন শিল্পী যদি কিভাবে অভিনয় করবেন জিজ্ঞেস করেন, তাঁরা চোখ দুটো উদাস করে এক কথা থেকে আরেক কথায় চলে যান। শেষে ছবির রাশ যখন সম্পাদকের কাছে যায়, সম্পাদককে গল্পটি বলে জানিয়ে দেন কটা ক্লোজ-আপ, কটা নাচ, সীনারি ইত্যাদি ছবিতে রাখতে হবে। এখানেই পরিচালকের দায়িত্ব শেষ। তাই এঁদের দ্বারা সার্থক চিত্রসৃষ্টি কি সম্ভব?

একজন সম্পূর্ণ পরিচালকের চিত্রনাট্য ও সংলাপ লেখার অভিজ্ঞতা চাই, ফটোগ্রাফী এডিটিং সাউণ্ড, অ্যাকটিং ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট দখল থাকা চাই, চাই সাহিত্য ও শিল্প বোধ। বাংলা সিনেমা যতদিন এরকম পরিচালক না পাবে, ততদিন তার দুর্দশা চলতেই থাকবে।

বিকাশ জানা

নান্দীকারের ফুটবল

আমরা এই অস্থির যুগ, তার মানুষ, পরিবেশ এবং সেই পরিবেশের শিকার ইত্যাদি নিয়ে সরব আলোচনা করি, রুচি চর্চা করি, গলা চড়িয়ে শিকারীদের তীব্র সমালোচনা করি, কিন্তু প্রতিবিম্বে নিজেদের বর্তমান এবং আসল চেহারাটা দেখি না। দেখি না, তার কারণ সেই দেখার পেছনে আত্মসমালোচনার ভীতি রয়ে গেছে। এবং বোধহয় দেখি না বলেই গলা চড়িয়ে বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পাদের যুগকে নিয়ে অনায়াসেই 'উচ্ছন্নে' গেছে বলে সরোষে সমালোচনা করি।

অথচ স্বাধীনতার পরও তিন তিনটে দশক কেটে গেছে, যুদ্ধ বোমা আর ডিজেলের গন্ধ সরে গেছে, আজও কলকাতা তথা বাংলাদেশে এমন একটি সামাজিক অবস্থা তৈরী হল না—যা একটি সত্যের মানুষকে (ব্যাপক অর্থে) সুস্থভাবে বাঁচার প্রেরণা দিতে পারে।

একদিকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিনয়) অন্যদিকে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (কালী), মাঝখানে হরি নামক একটি ফুটবল। জীবনের দুটি গোলপোস্টের ঠিক মধ্যবর্তী সীমারেখার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে।

বিনয় গেরস্ত মানুষ, সে বোঝে জীবনে সিকিউরিটি, চার দেওয়ালের গন্ডীর মধ্যেকার নিরাপত্তা। বৌকে প্রেম-পর্বে খুব মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে তাক করে দিয়ে মজিয়েছে, কিন্তু বিয়ের পরই তাকে ঘরের মধ্যে বেঁধে ফেলেছে। তাই নিয়ে বৌর খেদ থাকলেও সে কিন্তু খুশী। গোটা জীবনটাকেই সে সিন্দুকের মধ্যে পুরে ফেলতে চায়। এবং তার মধ্যেই সে বেঁচে থাকায় বিশ্বাসী। হরিকেও সে সেই নিরাপদ জীবনে ফিরে আসতে বলে।

কিন্তু কালী তার বিপরীত মেরুর মানুষ। সে বোঝে মুক্ত, অস্থির জীবন। তাই সে চিরতারুণ্যের মধ্যে, গন্ডীছাড়া জীবনের মধ্যে বেঁচে থাকায় বিশ্বাসী। ফুটবল খেলাটা তার কাছে প্রতীক। সংসার এবং ফুটবলের ঘেরা মাঠে গ্ল্যাডিয়েটরের ভূমিকা তার কাছে দূরে থেকে দেখে শুধুই আনন্দ পাওয়া। সেই আনন্দ, জীবনের প্রতি তার সেই নিস্তর ঔদাসীন্য এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই তুল তার অনুসারীদের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে চায়। সে যেন ছকে বাঁধা গন্ডীবদ্ধ জীবনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

নান্দীকারের ফুটবল নাটকের দৃশ্য

হরি এই দুই বিপরীত মেরুর তীব্র আকর্ষণের শিকার। তাই সে উদ্‌ভ্রান্ত।

মোড়কের সেই জীবন, যে জীবনকে বলা যায় শুধুমাত্র বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর প্রয়াস, যেখানে আছে একদিকে ভোঁতা অন্যদিকে যন্ত্রণাময় সামাজিক নামক খোলাটে জীবন, যেখানে স্থূল প্রেম উঁকি মেরে বিভ্রান্ত করে, দেহের আকাঙ্ক্ষা বড় বেশী উগ্র অথচ বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়, যেখানকার মানুষগুলি আবহমানকাল ধরেই এক এবং অভিন্নরস, হরির সে জীবনের প্রতি ক্ষণিক মোহ জন্মালেও সেই গন্ডীর সীমানার বাইরে থাকতে চায়।

এর মধ্যে আছে তার প্রতিপালক মাসীর মত যন্ত্রণাময় গোপন জীবন, হেড মাস্টারের মত পুরনো আদর্শে চিড় খাওয়া মানুষ, অন্যদিকে ফণী, অরুণ মামা, বরুণ মামা নামক মাসীর গোপন জীবনের নায়ক, সীতার মত পুরুষে পাল্টানো নায়িকা (যাকে ঘিরে কিছুদিন সে ঘর সংসার পাতার স্বপন দেখেছিল)। হরি এদের সবার মধ্যেই ঘড়ির পেন্ডুলামের মত শুধুই দুলে দুলে আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। কিন্তু সময়কে সে হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারেনি। সব জীবনই তার কাছে মরীচিকা হয়ে গেছে, সে বয়ে গেছে স্রোতের কুটোর মত, তারপর হঠাৎ এক সময় নিজের অজানিতেই অদৃশ্য তারের জালে আটকে গেছে, কিন্তু তখনও রূঢ় বাস্তব জীবন তাকে গ্রাস করতে পারেনি, তারুণ্যের বল্‌গা ছাড়া হরিণ তার মনের মধ্যে, ইচ্ছার মধ্যে ছুটে ছুটে মাথা কুটে মরেছে।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নির্দেশিত (নাটক এবং আবহও তাঁরই) এ নাটকে (মূল নাটক পিটার টার্সন) যেন এ যুগের একটা সময়, তার মানসিকতা ও কুশী-লবেরা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ঘন্টা তিনেক নাটমঞ্চের পাদপ্রদীপে। যে সময়কে দেখতে দেখতে চমকে উঠতে হয়, যার আশ্চর্য ধারালো অর্থবহ সংলাপ দর্শকের মনে অদৃশ্য ভাবে রক্তক্ষরণ ঘটায়। এমন অসাধারণ ঋজু বক্তব্য, তীব্র শ্লেষাত্মক সংলাপ, আর তার বিস্ময়কর প্রয়োগ একালে নিশ্চিত দুর্লভ। এ নাটকে এমন অনেক সংলাপ আছে যা আপাতে অশোভন, খট করে কানে বাজে, নিছক আধুনিক চমক বলে মনে হয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? একটু তলিয়ে দেখলেই তার অর্থ এবং প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন নাট্যকারের স্পর্ধায় অবাক হতে হয়। আজকের নাটকে এমন খাপ খোলা চাবুকের বা অন্যভাবে বলা যায় মানসিকতার উন্মোচনে সেটার প্রয়োজন আছে।

এবং সেই অর্থেই 'ফুটবল' শুধুমাত্র একটি খেলাই নয়, যুগের অস্থিরতা পরিমাপের ব্যারোমিটারই নয়, এই 'ফুটবল' বৃহত্তর ইঙ্গিতের সহায়কও বটে। তাই এমন একটি বিষয়বস্তু উপহার দেবার জন্যে নান্দীকার-কে সাবাশ জানাতে হয়। সঠিক অর্থে নান্দীকারের সাহস আছে।

কারণ এই নাটকে একটা সমাজ, বাঙালী নামক একটা গোটা জাত দ্রুত কোন্ পথে দৌড়চ্ছে তার প্রামাণিক হদিস পাওয়া যায়। তাই এই ফুটবলের সমর্থক ইস্টবেঙ্গল না হয়ে মোহনবাগান হলেও আবেদন বা বক্তব্য একই থাকত।

অজিতেশবাবু এ নাটকের আপাত হালকা চরিত্র, তিনি তাই সর্বক্ষণ বিনয় হয়েই থেকেছেন, এবং টিপিক্যাল বাঙালী গেরস্ত। কাজল চৌধুরীর মাসী শেষের দিকে হঠাৎ যেন চমকে দেন। সুমোহিনীর আচার্যর হেড মাস্টার, পরিমল মুখার্জির ফণী অসাধারণ চরিত্রসৃষ্টি।

রাধারমণ তপাদার, সুধীন মুখার্জি, গন্ধেশ্বরী ঘোষ, অচিন্ত্য দত্ত, রবীন মুখার্জি ও সন্ধ্যা দে এবং সেই সঙ্গে অজিত কুণ্ডু, সিদ্ধার্থ ব্যানার্জি, বিশ্বজিৎ বাকা ও দেবব্রত বিশ্বাস যেন বাস্তব চরিত্র হয়েই মঞ্চে ধরা দিয়েছে।

আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হল, খেলার মাঠের ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক দর্শক-দের ভূমিকা। মনে হচ্ছিল যেন খেলার মাঠের অপর দিকে বসে আমরা তাদের তারুণ্যের ট্রু রিপ্রেজেন্টেশন লক্ষ্য করছি। এমন বাস্তব তাদের গাঁজখিঁচ। এক কথায়

সেই দর্শক ছেলেমেয়েদের বোধহয় তুলনা হয় না। আর অতগুলি চরিত্রকে স্টেজে ছেড়ে দিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার মুন্সীয়ানারও বুঝি তুলনা নেই।

প্রতীকী নাচের দৃশ্যটি দেখে 'ভালোমানুষ' এর সেই আট ঘোড়ার নাচের কথা মনে পড়ে। তত পরিশ্রম সাপেক্ষ না হলেও নাচটি সুন্দরই।

ছন্দা ঘোষের সীতা বেশ ভাল এবং স্ত্রী। কিন্তু হরি (রণজিৎ চক্রবর্তী)? রুদ্রবাবু যে কত বড় দক্ষ রূপকার এই চরিত্র তার উজ্জ্বল প্রমাণ। রুদ্রবাবু ছাড়া এ নাটকে হরির বুঝি জুড়ি নেই। দৃশ্যে দৃশ্যে সে নতুনী, আরেক মানুষ। বিশেষ করে সারল্য, কান্না ও যন্ত্রণার অভিব্যক্তিতে।

রুদ্রবাবুর এ নাটকে দুটো চরিত্র। একজন সূত্রধার অন্যজন বোম্বাওয়ালী। অননুকরণীয় আর অ-সাধারণ বাচনভঙ্গী, চলাবলা ও চোখেমুখে অভিনয়, তাঁদের অভিব্যক্তিতে চরিত্রকে বাস্তবে রূপ দেওয়া তাঁর সহজাত প্রতিভা। তিনি কখনোই তাই অভিনয় করেন না, অভিনীত চরিত্র তার মধ্যে প্রাণ পায়। 'কুটবল' নাটকে তিনি তাই সর্বদাই অনন্য হয়ে থেকেছেন—এমনকি নাচে, গানে, তারুণ্যে পর্যন্ত। (এ নাটকের গানের কথা ও সুরে রীতিমত মাত্রায় তেমনি তারিফ করার মত মগ্ন)।

আর সব মিলিয়ে একটি স্পষ্ট কথা, 'ফুটবল' না দেখার অভাব অন্য কোন নাটক দিয়েই পূরণ করা সম্ভব নয়। খেদ থেকে যাবেই। যেমন খেদ থেকে যাবেই এ নাটকে এবং আর কোন নাটকেই কেয়া চক্রবর্তীকে আমরা আর কোন দিনই দেখতে পাবো না বলে। নাটক দেখতে বসে এবং পরে সেদিন যে চিন্তা আমাকে প্রতিনিয়ত যন্ত্রণা দিয়েছে।

শান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জি
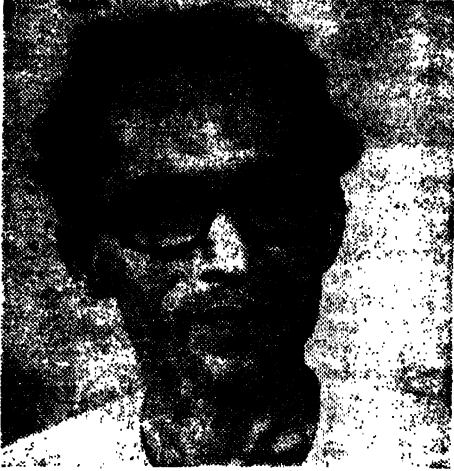
তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ

তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

রাইটার্স। তিনতলায় পূর্বদিকের কোণে। একটি এয়ার-কনডিশনড ঘর। মাঝারি সাইজের অর্ধ বৃত্তাকার টেবিলের টেবিলের ওপর এলোমেলোভাবে ছড়ানো কিছু সরকারী ফাইল ও কাগজপত্র। যার এপাশে আমি। আর ওপাশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নতুন দপ্তর পাবার পরই যাঁর নতুন চিন্তা সিনেমার ওপর একসাইজ লেভী।

বুদ্ধদেবের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বয়সও বেশী নয়। প্রশ্নের জন্য আমাকে সময় দিলেন পনের মিনিট। এবং আগেভাগেই জানিয়ে রাখলেন যে সিনেমা, যাত্রা এবং থিয়েটার শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার কথা তাঁর সরকার ইতিমধ্যেই চিন্তা করছেন। তবে সবকিছু বুঝে নিতে একটু সময় লাগবে। তাই আগস্টের আগে কোনো প্রতি-শ্রুতি নেই। কোনো বাণীও নেই।

দেখতে দেখতে মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। এর পরেই এল পরপর দুটো টেলি-ফোন। আরও কিছু সময় গেল। সময় এগোচ্ছে থাকলে পরীক্ষার্থীর যেরকম অবস্থা হয়, তখন আমার অবস্থাও অনেকটা সেই-রকম। মনে মনে কিছু প্রশ্ন বাদ দিয়ে দিলাম। টেলিফোন শেষ হল।

জানতে চাইলাম লেভী সম্পর্কে তাঁর কি অভিমত।

তাঁর উত্তর—এই নতুন লেভী সিনেমা শিল্পের মৃত্যুর পরোয়ানা। কম খরচের বাংলা ছবির ওপর এই লেভী চাপানো হলে আর কেউ নতুন করে ছবি তুলতে চাইবেন না। ফলে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য কলাকুশলী, কর্মী, অভিনেতা সবাই বেকার হবেন।

এর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলনে নামছেন কি?

আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে লেভী তুলে নেবার জন্য লিখেছি। তবে সমস্যাটা সর্বভারতীয়। আন্দোলন করতে হলে সব ফিল্ম-ইন্ডাস্ট্রীকে একসঙ্গে করতে হবে।

[আবার একটা এক মিনিটের টেলি-ফোন। এবং একজনের প্রবেশ। কিছু কথা-বার্তা। প্রস্থান]

আপনি নিজে একজন শিল্পী। দৌলতে অভিনয়ও করেছেন অনেক। কি ধরনের নাটক আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়? আজকাল বিভিন্ন থিয়েটার গ্রুপগুলোর বিদেশী নাটক বা ঘটনাকে মঞ্চস্থ করার দিকে বেশী ঝোঁক। এ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

মঙ্গলজনক, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক সুস্থ এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারার সব নাটকই গ্রহণীয়। লেনিন কি বিদেশী? তবে তাঁর জীবন মঞ্চস্থ করতে আপত্তি কোথায়?

সিনেমা, থিয়েটার এবং যাত্রা শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আপনার সরকার নতুন কিছু ভাবছেন কি?

আমরা এখনই কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে চাই না। কারণ জনগণের ধারণা হয়ে গেছে যে সরকারের তরফ থেকে উন্নতি-মূলক কাজের কথা শুধু বলাই হয়ে থাকে, কাজের কাজ কিছু হয় না। তাই আমরা সেটুকুই বলব, যেটুকু করতে পারব।

শুনে ভাল লাগল। আশা করি সময়ই এসবের প্রমাণ দেবে। আচ্ছা? এই শিল্পগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যে আপনারা কিভাবে এগিয়ে আসবেন?

এঁদের সমস্যাগুলো জানতে হবে। তবে বর্তমান সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যে সমস্ত কর্মী, অভিনেতা ও টেকনিসিয়ান্স সংগ্রাম করে চলেছেন, আমাদের সরকার তাঁদের পেছনে আছেন ও থাকবেন।

টেলিফোন বেজে উঠল। জরুরী মিটিং-এর তলব। বুঝলাম, আর কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে আসব এমন সময় হঠাৎ তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন—আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা কোনটা বলুন ত?

উত্তরের আশায় চেয়ে রইলাম। বুদ্ধ-দেব গলা নামিয়ে বললেন—পশ্চিমবঙ্গে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। একে রুখতেই হবে। বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচাতেই হবে। নমস্কার।

অনিরুদ্ধ মিত্র

বিচিত্রা

ৃতিভারে

বাড়িটা এখন এক বিষণ্ণ ধ্বংস-
প মাত্র! স্মৃতিভারে ন্যুব্জদেহে পড়ে
ছ। এটুকু গেলে আত্মবিস্মৃত
ত্পর বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক অনু-
নে ব্যস্ত হবে। কিন্তু সে তো আর
কলঙ্কের ইতিহাস। অথচ এখানে
তেন এক সম্রাট। ঊনবিংশ শতকের
র জনক ও সাহিত্যের সম্রাট—
দর্শন'-এর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-
ধ্যায়। হাওড়ায় ডি-এম থাকাকালীন
তাঁদার এই বাড়িতে সপরিবারে
নের শেষ সাতটি বছর কাটিয়েছিলেন।
ভিতরে দেয়ালের গায়ে নামের
ফলকটি ছাড়া এখন আর কিছু
ই। বাইরে থেকে মনে হয় ভূতুড়ে
ড়ি, কিন্তু এ বাড়ি ভূতদেরও এখন
বাসযোগ্য। কারণ, ছাদ নামক বস্তুটি
র যে মাটির বুকে মিশে গেছে তা
হয়ে ভূতদেরও মনে নেই।

পাড়ার ছেলেদের খেলার মাঠের বড়
ভাব ছিল। বছর কয়েক আগে ওরা
সে বাড়িটার অন্দরমহল বলতে যা
এখন তা ঘন জঙ্গলের
কোথাও মাটির ঢিবি, তার মধ্যে
প-খোপের নিরাপদ আস্তানা। জঙ্গল
ফ করে, সাপ নিধন করে বঙ্কিম-
দের অন্দরমহলকে ওরা খেলার মাঠে
রিণত করলো। ওরা দেখালো মাথার
পর পাকা ছাদের বদলে স্বচ্ছ নীল
কাশ। কিছু ইতস্ততঃ পরগাছার
কড়ও বুলছে শূন্যে। 'রায় বঙ্কিম-
দ্র চ্যাটার্জি বাহাদুর'-এর নামের
লক ওদের নজরেই পড়ে না। কলকাতা-
সীরাই বা কজনে জানেন পটলডাঙার
নম্বর প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনের
তিহাসিক বঙ্কিমভবনের কথা? স্মৃ-
গীরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত বাড়িটার
সামনে দাঁড়িয়ে বারবার স্তম্ভিত হয়ে-
ছেন। অথচ বঙ্কিমের শেষ-প্রহরের
রিশীলিত মেধার স্ফুরণ এখানেই ঘটে-
ছে। সীতারাম, কৃষ্ণচরিত্র, ইন্দিরা,
ধারানী, রাজসিংহ ইত্যাদি এবাড়ির
ার্থক সাহিত্য-কর্ম। এখানেই তাঁর
মামন্ত্রিত পদসঞ্চার ঘটেছিল সমসাময়িক
হ, নবীন-প্রবীণ সাহিত্যিক ও চিন্তা-
বদের। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ দীনেশ-
দ্র সেন, সুরেশ সমাজপতি, স্বর্ণ-
মারী দেবী আর রবীন্দ্রনাথ।

স্মৃতিভারে ভগ্নজীর্ণ ভবনটির
আজ যেটুকু পড়ে আছে তার সংস্কার
এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধ হিসেবে রক্ষার
জন্য ঋষি বঙ্কিম সংস্কৃতি পরিষদ
বহুদিন ধরে সরকারের কাছে আবেদন-
নিবেদন করে আসছেন। গত ২৬ ২৭ ২৮
জুন এই পরিষদ বঙ্কিমচন্দ্রের ১৩৯তম
জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদর্শনী ও
আলোচনার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে
৮৪ বছর বয়স্ক স্বাধীনতা সংগ্রামী
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও বীণা দাস
ভৌমিক ঋষি বঙ্কিমের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-
ঞ্জলি দিতে গিয়ে দুঃখ করে বলেছেন,
আজও যে ঐতিহাসিক বঙ্কিম-ভবনের
কোনো সংস্কার হয়নি সেটা বাঙালীর
দুর্ভাগ্য। অন্যান্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত
বিচারপতি, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তা-
বিদরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এই
বঙ্কিমতীর্থ ইতিমধ্যেই জাতীয় স্মারক-
রূপে রক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। আর
যার ন্যায্যভাবে ঋষি বঙ্কিম সংস্কৃতি
পরিষদের সদস্যরা দাবী করেছেন—
সংস্কারের পর এখানে গড়ে উঠুক
ভারতীয় ভাষাগুলোর গবেষণাকেন্দ্র,
স্থাপিত হোক যাদুঘর, সাহিত্য সম্রাটের
নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপক পদ
সৃষ্টি হোক।

নির্মল কর

বড় ঘর নাম ডাক শ্রোতা কম

রবীন্দ্র সদনে সর্বানী সঙ্গীত
সমাজ ৭ মে সন্ধ্যায় তাঁদের দ্বিতীয়
মিলন সভার আয়োজন করেছিলেন।
তেমন শ্রোতা ছিল না, আসর শুরুর
শিল্পী দীপালি নাগের শুদ্ধ্রী গৌরী
রাগের বিন্যাস প্রশংসনীয়। শ্রীমতী নাগ
বিশুদ্ধ খেয়ালী ঘরানায় এ রাগে
বিলম্বিত বিস্তারে নিষ্ঠার ছাপ রাখলে
কি হবে, তার কন্ঠ মন্দার। সপ্তকের
সাত সিঁড়ির উঁচু ধাপে ক্লান্ত তান ও
ছিটকে সরে গিয়ে সুর স্খলনে চকিত।
পাড়াদায়ক সুব্রত রায়চৌধুরী ও টি ডি
যোগের সেতার - বেহালার দেশরাগে
এলোমেলো যুগলবন্দী। কোনো
বোঝাপড়া নেই। বিস্তার স্বরবিকাশহীন
নিজ নিজ কেরামতির ঝনঝন লড়ন-

সেই পরিত্যক্ত বাড়ি
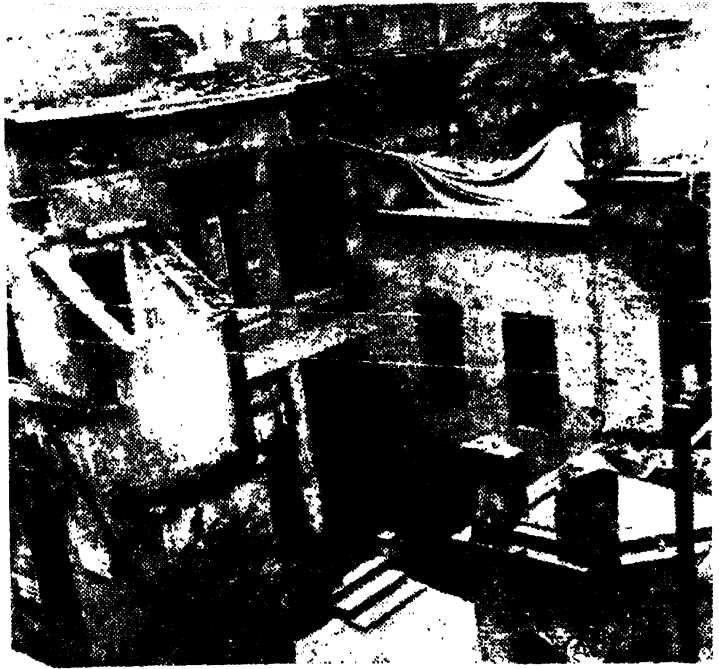
পড়ম। মধ্য সপ্তকে দেশ রাগে 'সা'রে মা ধা পা'র বারংবার পুনরাবৃত্তি অশাস্ত্রীয়। আমরা জানি তীব্র নি দিয়ে সারে মা পা নি সা ও কোমল নি দিয়ে অবরোহণ—এটাই বহুশ্রুত। এই বিশৃংখল যুগলবন্দী মহাপুরুষের সঙ্গতকে যান্ত্রিক বেকায়দায় বন্দী করতে বাধ্য করেছিল।

সুনন্দা পট্টনায়কের বহুখ্যাত চন্দ্র-কোষ সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। মহাপুরুষের সাথসঙ্গতে তীক্ষ্ণ লয়-কার ও উজ্জ্বল। উচ্চকণ্ঠী সুনন্দা যতদিন নাটকীয় স্বর ক্ষেপণে সবলা থাকবেন ততদিন অবশ্যই অনন্যা। কিন্তু ত্রিসপ্তকের উল্লম্ফন সুর বিদ্যুতের ঝলসানি যেদিন ম্লান হবে? সেদিন থাকবে তাঁর শান্ত রসের ভজনগুলি, যার অনেকগুলি তাঁর সুর সমৃদ্ধ নিজের রচনা। এদিনের ভজনও তাঁর স্বরচিত। এদিন রাতের চন্দ্রকোষে সুনন্দা কিছু দুরূহ তানকারি লয়ফেরতা গমকে নতুন তুলির টান দেখালেন। সর্বাণী উপস্থাপনায় অযোগ্য হোন। প্রচেষ্টা অবশ্যই সাধু।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

হাতের রেখার ভাষা

জ্যোতিষীরা মানুষের হাতের রেখায় তার ভাগ্য পাঠ করে থাকেন। তার জীবনে অতীতে কী ঘটেছিল, বর্তমানে কী ঘটছে বা ঘটতে চলেছে, ভবিষ্যতে কী ঘটবে, সবই তাঁরা বলেন তার হাতের তালুতে কোন কোন রেখা কিভাবে ফুটে উঠেছে তাই দেখে। অবশ্য জ্যোতিষীদের নির্ভর শুধু এই হাতের রেখা নয়, জন্ম লগ্নের রাশি ইত্যাদিও। পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় যে সাপ্তাহিক ভাগ্য গণনার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তা জন্ম লগ্নের রাশি অবলম্বনে। মানুষ স্বভাবতই বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহী।

বিজ্ঞানীরা হাতের রেখা নিয়ে কখনো মাথা ঘামান নি, তা নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি শাখার নাম ডার্মাটোলজি-চর্মের চিকিৎসা। আর চর্মের বাড়-বৃদ্ধি বিকলন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা চলে ডার্মাটো ফিজিক্স-এর আওতায়। এই ডার্মাটো ফিজিক্স-এ হাতের তালুর রেখা নিয়ে প্রচুর গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, হাতের তালুর রেখায় প্রকৃতই মানুষ ভাগ্য পাঠ করা যেতে পারে।

কোনো কোনো মানুষের শরীরে গড়নগত বিকৃতি বা অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। অর্থাৎ, স্বাভাবিক

শরীর যেমনটি হয়ে থাকে তা থেকে গুরুতর রকমের ভিন্ন। এই বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান চালানোর বিদ্যাকে ইংরেজিতে বলা হয় টেরাটোলজি। বিদ্যাটি মেডিক্যাল প্রজননবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের মিনস্ক মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে এই টেরাটোলজি ও মেডিক্যাল প্রজননবিদ্যায় গবেষণা চালানোর জন্য একটি ল্যাবরেটরি আছে। সেখানে একদল বাইলোরুশী বিজ্ঞানী মানুষের ত্রুটির উদ্ভব নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, মানুষের হাতের রেখা প্রকৃতির নিছক খামখেয়াল নয়, মানুষের হাতের রেখায় প্রকাশ পায় জীবদেহ গড়ে তোলার মূলে রয়েছে যে জীবকোষ তার সূত্রবদ্ধ সংকেত। বহু জন্মগত রোগ সম্পর্কে হদিশ পাওয়া যেতে পারে হাতের এই সমস্ত রেখা থেকে।

বাইলোরুশী প্রজননবিজ্ঞানীরা বংশগতির রহস্য অনুধাবন করার জন্য সর্বাঙ্গীণ অনুশীলন করছেন এবং মিনস্ক মেডিকেল ইনস্টিটিউটের এ[illegible] গবেষক বিজ্ঞানী জন্মগত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের হাতের ছাপ প্রস্তুত করছেন। এই সমস্ত ছাপ কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করা হবে।

পরীক্ষানিরীক্ষা [illegible]চ্ছেন। তার ফলে তাঁরা জন্মগত রোগের লক্ষণ ও [illegible] সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। জন্মগত ত্রুটিগুলো, তাঁরা যে-ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

গবেষণার এই ফললাভকে ইতি-মধ্যেই বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত হয়েছে মেডিক্যাল প্রজননবিদ্যার একটি নিরীক্ষণ কক্ষ। সেখানে জন্মগত পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের হাতের রেখার ছাপ নেওয়া হচ্ছে এবং কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। অতঃপর এই কম্পিউটারের সাহায্যেই যে-কোনো মানুষের হাতের রেখা পাঠ করা যাবে ও তার 'ভাগ্য' সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে।

অমল দাশগুপ্ত

শহীদুল্লাহ

রবীন্দ্রনাথের কোন একটি লেখার ভাষা ব্যবহার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং শহীদুল্লাহ'র কথা হচ্ছিল। বোধহয় শব্দপ্রয়োগ কিংবা বানান অথবা খাঁটি ব্যাকরণগত দিক থেকে এই কথোপকথনের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন: ক্ষমা করবেন ভাষাতত্ত্বের ব্যাপারটি আপনার আর সুনীতিবাবুর—এর ভেতর আমাকে টানবেন না—এই-রকম একটি গল্প আমরা শুনে আসছি। ঘটনা কতখানি সত্যি, আমাদের জানা নেই, তবে বিশ্বাসযোগ্য।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রবীন্দ্রনাথের চব্বিশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করলেও, তিনি, একই সত্তায় দুই শতকের বুদ্ধিযোগী বাঙালী।

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন, তখন, শহীদুল্লাহকে তিনি উপদেষ্টা কমিটিতে থাকবার জন্যে চিঠি লিখে বিশেষ আমন্ত্রণ জানান। শহীদুল্লাহ এই মহৎ প্রস্তাবে রাজী হননি। বিনীতভাবে উত্তর লিখেছেন, 'আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন এতেই আমি ধন্য, গর্বিত, ভাগ্যবান। কিন্তু নিজেকে অতখানি যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করি না যে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবো।'

সন্দেহ নেই, শহীদুল্লাহর এই বিনীত ভাষণ রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। পরবর্তীকালে, শহীদুল্লাহ রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। শহীদুল্লাহ যতখানি বিনীত, তার চেয়েও উদ্ধত। 'উদ্ধত' শব্দটি আমি এই কারণে ব্যবহার করছি যে তিনি যা বুঝবেন, তাই তাঁর শেষ কথা। অবশ্য তার জন্যে অজস্র যুক্তি প্রদর্শন করতেও ক্লান্তিবোধ করতেন না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা ইতিবৃত্ত নিয়ে পণ্ডিত মহলে যে বিস্তর আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল, সেখানে অন্য কারুর মতামত অগ্রাহ্য করেন নি, তবে তলিয়ে দেখে অবশ্যই নিজের যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর যুক্তির ভুবন ছিল পাণ্ডিত্য এবং সেখানে কোন ছিদ্র থাকতো না।

শহীদুল্লাহ ধম্মপদী তথা বিশ্ব-সাহিত্য যেমন আত্মস্থ করেছিলেন, তেমনি করেছিলেন এদেশীয় সংস্কৃতি। আঠারটি ভাষায় একই সঙ্গে লিখতে পড়তে বলতে পারতেন। কিন্তু সাহিত্য চর্চা করেছেন প্রধানত বাংলাতে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৫ খৃঃ ১০ জুলাই, পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার পেয়ারা-বাগ গ্রামে।

প্রাজ্ঞ এই পণ্ডিতের কাছে আমাদের চাহিদা ছিল অপরিসীম। আজীবন সাহিত্য সেবা করেছেন বটে, কিন্তু শেষ বয়সের দিকে মৌলিক কাজ থেকে দূরে পড়েছিলেন। তার বদলে তিনি ধর্মীয় 'পুস্তক' লেখায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ধর্মীয় গবেষণায় মেতে থাকলে এবং এ সম্পর্কে মহৎ কোন বই পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারলে, অন্ততঃ আমরা উপকৃত হতাম। বাংলাভাষা ও সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রথম, দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বিদ্যাপতি শতক, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (সম্পাদনা পরিষদের প্রধান ছিলেন) ইত্যাদি গ্রন্থ যেমন আমাদের নিত্যপ্রয়োজনে আসে, জ্ঞান-খোরাক মেটায়, অন্যান্য বইগুলো তেমন ব্যবহৃত নয়। শহীদুল্লাহ ইচ্ছা করলে, বাংলা ভাষাকে, দশ পনের বছর আগেই নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারতেন। তিনি বাংলাকে বিশ্বের প্রথম কয়েকটি ভাষার মধ্যে স্থান দিতে পারতেন, সে ক্ষমতা তাঁর ছিল। যদিও মানছি, একাধিক কাজে নিজেকে জড়িয়ে, পরবর্তীকালে ভাষা সাহিত্য গবেষণা ও রচনার দুয়ার থেকে সরে আসছিলেন, তথাপি এগুলো তাঁর কাছেই পাবো বলে আমাদের বিশ্বাস ছিল। প্রথম যৌবনে যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, পরে কেন যে বিরত থাকলেন, সে রহস্য অবশ্য আমার জানা নেই। যুক্তি এখানে একটিই, বয়সের দোহাই।

শহীদুল্লাহ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের জন্যে যে অবদান রেখেছেন, কোন প্রকারেই তা যথেষ্ট নয়। মানছি, তিনি ক্লান্তিহীন অধ্যয়নে নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত রাখলেও, সাহিত্য ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি গ্রন্থ রচনা ছাড়া তেমন কিছু আর রেখে যাননি। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, শহীদুল্লাহর কাছ থেকে এবং পাঠকদের জন্যে, মোটেই এগুলো যথেষ্ট নয়।

হাফিজ, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ প্রিয় কবি হলেও, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন নি। আমরা ভেবে অবাক হই, তাঁর এই নির্লিপ্ততা দেখে। অবশ্য এখানে তর্ক উঠতে পারে। শহীদুল্লাহ কবিতা, গল্প উপন্যাস নিয়ে তেমন আলোচনা প্রবন্ধ কখনোই লেখেন নি, কিন্তু এতে আমাদের মন সায় দেয় না। যদিও শহীদুল্লাহ প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতি

ভাষা নিয়ে কাজ করেছেন এবং তাঁর কাছে ওটাই ছিল মৌলিক। শুরুতে বলতে চেষ্টা করেছি, তিনি দুই শতকের বুদ্ধি-যোগী। তাঁর যোগাযোগ ছিল প্রাচীন এবং একাল। কিন্তু একাল নিয়ে যত-টুকু তার রচনা, তাতে ক্ষিদে মেটায় না।

শহীদুল্লাহর অনুবাদের ক্ষেত্রে ওমর খৈয়াম, হাফিজে যতখানি উল্লেখ-যোগ্য তার চেয়ে বেশি প্রশংসার দাবী রাখেন ইকবালের শিকওয়াহ ও জওয়ার-ই শিকওয়াহ-তে অবশ্য এখানে বলা দরকার, তিনি কখনোই কবি ছিলেন না। ছন্দের লিরিক তাঁর হাতে ভুলেও ধরা দিত না। কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন মাত্র। ব্যর্থ হয়ে অনুবাদে হাত দিয়ে-ছেন। কিন্তু সেখানেও কোন বৈশিষ্ট্য রাখতে পারেন নি। কবিতার ক্ষেত্রে যে সংবেদনশীল মনের প্রয়োজন, শহী-দুল্লাহর ছিল না। তার চেয়ে যদি তিনি প্রাচীন বিদেশী সাহিত্য আমাদের সামনে তুলে ধরতেন, নিশ্চিত আরো বেশি উপকৃত হতাম। দাউদ হায়দার

নবোকভ নেই

যে উপন্যাস নিয়ে পৃথিবী জুড়ে ঝড় উঠেছিল, লেখকের কপালে জুটে-ছিল শুধুই সমালোচনা আর নিন্দার তুফান, সেই বিখ্যাত সাহিত্যকীর্তি 'লোলিটা'র সৃষ্টিকর্তা ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরোভিচ নবোকভ আর আমাদের মধ্যে নেই। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর এক সুইস হাসপাতালে গত সোমবার (৪ জুলাই) তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল মাত্র ৭৮। পৃথিবীতে যে অল্প সংখ্যক লেখক নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় লিখে জগৎজোড়া পরিচিতি পেয়েছেন নবোকভ তাঁদের অন্যতম।

নবোকভের জন্ম ১৮৯৯ সালে, রাশিয়ায়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় নবোকভ পরিবার ধনী ও কসমোপলিটান ছিলেন, বহু জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছেন ওঁরা। বালক ভ্লাদিমির ইংরেজ গভর্নেস ও ফরাসী শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখেছেন। ১৯১৯ সালেতিনি দেশ ছেড়ে চলে আসেন ইংলন্ডে। এখানে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে তিনি ফরাসী ও রুশ সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। এরপর বেশ কিছুদিন বার্লিন ও প্যারিসে কাটিয়ে আমেরিকায় চলে আসেন। এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। লেখক হওয়ার আগে তিনি মুষ্টিযুদ্ধ, টেনিস নিয়ে মেতে ওঠেন। ভাষাশিক্ষাও করেছেন। ওঁর প্রথম প্রকাশনা শব্দ-ছক।

১৯৪২-৪৮ সালে ভ্লাদিমির নবোকভ আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গবেষক ছিলেন। ১৯৪৯-৫৯ সালে তিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশ সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সে সময়ে ইংরেজীতে তিনি লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম রচনা 'দি রিয়েল লাইফ অফ সেবাস্টিয়ান নাইট'। এছাড়া তিনি লিখেছেন 'ইনভিটেশন টু আ বিহেডিং', 'পেল ফায়ার', 'কনক্লুসিভ এভিডেন্স' আরও কত কি!

নবোকভ রুশ ভাষতেও সাহিত্য-রচনার লোভ ছাড়েন নি। ভি সিরিন এই ছদ্মনামে তিনি বিস্তর কবিতা লিখে-ছেন চুটিয়ে। কিন্তু সেসব রচনা সমা-লোচকদের তেমন নজর কাড়েনি। পাঠক-মহলে সমাদৃত হয়েছে।

নবোকভ বিশেষভাবে পরিচিত তাঁর বহুবিতর্কিত উপন্যাস 'লোলিটা'র জন্যে। এই উপন্যাসেই তাঁর তুমুল খ্যাতি-অখ্যাতির মধ্যে ঠেলে দেয়। উপ-ন্যাসের বিষয়বস্তু, একজন চল্লিশ বছরের লোকের নিজেরই ১২ বছরের সৎ মেয়ের সঙ্গে প্রেম। উপন্যাসটি এতই আলোড়ন উদ্রেককারী যে আমেরিকার মতো অগ্রণী দেশেও কোনও প্রকাশক এটি ছাপতে রাজী হননি। প্যারিস থেকে 'লোলিটা' প্রথম ছাপা হয়ে বেরোয়। উপন্যাসটি ইংরেজীতে লেখা। বেশ প্রাঞ্জল ভাষা।

১৯৫৫ সালে প্যারিসে 'লোলিটা' প্রকাশিত হলে নবোকভ রাতারাতি খ্যাতি-মান হয়ে ওঠেন। চারিদিক থেকে সমা-লোচনা ধেয়ে আসে। শোনা যায়, এই বই ফ্রান্সে কয়েকবছর নিষিদ্ধ ছিল। কোনও কোনও সমালোচকের ধারণা 'লোলিটা' ২,৫০,০০০০ কপি বিক্রি হয়েছে। এটি জেমস জয়েস, এফ স্কট, ফিট জেরাল্ড বা প্রাউস্টের একটি প্যারডি।

নবোকভের আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচান 'আদা'। এটি ১৯৭৫ সালে ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত হয়। সমালোচকরা এই বইকে প্রাউস্ট বা চ্যাটিউব্রিয়ান্ডের ধরনের লেখা বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, 'আদা' নবোকভের আরেকটি সেরা সাহিত্যকীর্তি। 'টাইর‍্যান্ট ডেস্ট্রয়েড' নামে নবোকভের একটি গল্প সংকলন বাজারে বেরিয়েছে গত বসন্তে। গল্প-গুলি অধিকাংশই পুরনো। ১৯২৪—১৯৩৯ সালের মধ্যে লেখা। নবোকভের লেখায় সমাজ প্রতিফলিত হয় না। চরিত্রও বড় হয়ে ওঠেনি কখনও। তিনি আইডিয়া নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভাল-বাসেন। বড় বেশি কল্পনাপ্রবণ।

মানুষের প্রেম ভালোবাসাকে যিনি সবার ওপরে ঠাঁই দিয়েছিলেন সেই মানুষটা হঠাৎ চলে গেলেন। তাঁর প্রেয়সী স্ত্রী ভেরা নবোকভের জন্য আমাদের সমবেদনা তোলা রইল। নবো-কভ নেই। 'লোলিটা' আছে। প্রিয়দর্শী

ভকতের জাত

দাদার ঘরে ঢুকে একটা বড় হনুমানজীর ছবি দেখে আশ্চর্য হয়ে বৌদিকে কারণ জিজ্ঞেস করলাম। বৌদি 'হনুমানজী' কথাটাতে আপত্তি করে বলল, মহাবীরের মতন জাগ্রত দেবতা আর নেই। দাদার নতুন চাকরি নাকি মহাবীরের কাছে বৌদির মানসিক ধর্ণার ফল। অতএব আমি চুপ।

কি আশ্চর্য। দাদার হাতে শিবু-পতির আংটি। ইনিই নাকি ভারত-বর্ষের সবচেয়ে জাগ্রত দেবতা।

কি জানি কে জাগ্রত। দেবতারা আমার মতন পাপীদের কথায় কর্ণপাত করেন না। তা না হলে, আমি এত করে ডেকেও শিব-কালী-দুর্গা কারো কোন সহায়তা পাইনা কেন? পরীক্ষার হলে ঠিক মূল পয়েণ্টটাই ভুলে বসে থাকি।

বাঙালীদের নাকি বারো মাসে তের পার্বণ, আচার-বিচারের চোটে অতিষ্ঠ। তেত্রিশ কোটি দেবতা সবাই পুজো—তবু আমাদের কুলোয় না।

আজকাল আরও একজন দেবী বাঙালীর ঘরে ঘরে পুজো পান। এ'র নাম প্রচারের মাধ্যম হোল একটা হিট-করা হিন্দী ছবি। ইনি সন্তোষী মা। মূলতঃ ইনি উত্তরপ্রদেশের দেবী। গুড়-ছোলা এসব উপাচারে এ'র পুজো

হয়। তবে কোনকালে বাঙালী মিষ্টি ফল, চাল এসব ছাড়া পুজো করেছে ? কিন্তু বাঙালী দেবতাদের টেবিলে ফাইল এত বেশি জমে গেছে, আর তাঁরা এত বেশি ব্যস্ত থাকেন যে, সর্বদা ভক্তের ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। আর ইনি 'ভেতো বাঙালী' নন বলে হয়ত এঁর এফি-সিয়েন্সিও বেশি। এখন পাড়ায় পাড়ায় সন্তোষী মা-র পুজো। ইনি দেখতে কেমন ? হিন্দী ছবির সন্তোষী মা-র মতন মুখের আদল, কাপড় পরার ঢঙ আধুনিক বম্বে স্টাইলে। তা দেবী-দেরও মাঝে মাঝে ফ্যাশানের পুরোধা হতে হয় বইকি। নইলে অস্তিত্ব কি থাকবে নিরাপদ ? বিশেষতঃ আধুনিক কলেজ-ইউনিভার্সিটির মেয়েরা যখন তাঁর পুজো করবে ? আমরা সত্যিই প্রগতিশীলা হয়ে উঠেছি।

পুজো-আচার আড়ম্বরটা বড় বেড়েছে। আপনি যদি কলকাতা বা উপকণ্ঠের বাসিন্দা হন, তাহলে বাবা ভোলানাথের 'ভোলে বাবা' এই ডাক-নামটির সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত। শ্রাবণ মাসের প্রতিটি শনিবার ভোলা-নাথ ভক্তদের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয় কোলকাতায় আর শহরতলীতে, ভোলা-নাথের নন্দী ভৃঙ্গীরা অবশ্য চিরকালই ভূতের নৃত্যে অভ্যস্ত। তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল দেওয়ার রীতি কবে ছিল না ? কিন্তু এমন মাইক বাজিয়ে, রাস্তার ধারে ধারে হল্টিং স্টেশন তৈরি করে কে কবে পুণ্যার্জন করতে দেখেছে ? এখন সবটাই একটু বেশি করব। এতে পুণ্য কি বেশি হয় ? ভোলে বাবাই জানেন। তবে পুণ্য বেশি হোক আর নাই হোক, হুল্লোড় ত হয়। তাই বা মন্দ কি। ধর্মের নামে পানাহারসহ একটু মস্ত হওয়াও ত উৎসব। কি বলেন ?

শিবরাত্রি এতকাল ধরে জানতাম একটা ব্রতের নাম। এখন শিবরাত্রিতে শিবের মাটির মূর্তি বানিয়ে পুজো হয়—চাঁদা তোলা হয়—মাইক বাজে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাছাড়া আগে দুর্গাপুজোটাই ছিল শুধু চারদিনব্যাপী। দুর্গাপুজোর অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা ছিল এই ব্যাপ্তি। এখন সেসব উঠে গেছে। আমাদের পাড়ায় দেখি সাতদিন ধরে শীতলা পুজো হয়। শীতলা যে কবে এত ইমপরট্যাণ্ট হলেন ! কালী, লক্ষ্মী সরস্বতী, গণেশ সবাই এখন একাধিক দিন ধরে পুজো পান। সেই সঙ্গে অকথ্য মাইকের যন্ত্রণা ভোগ করেন। দেবতারা নিশ্চয়ই কালা নন। আমার সন্দেহ হয় এত জোরে মাইক বাজিয়ে তাঁদের কালা করে দেওয়া হয়েছে। আর তাই বাঙালী দেব-দেবীরা কোন ডাকেই সাড়া দেন না।

কাগজে দেখবেন বিদ্যুৎ ঘাটতি। আপনি যদি কালীপুজোয় কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে অথবা জগদ্ধাত্রী পুজোয় বাগ-বাজারে বা চন্দননগরে যান, মনে হবে স্বপ্নের দেশে এসেছেন এত উজ্জ্বলতা। আমরা যে সত্যি সত্যি ভক্তের জাত হয়ে উঠেছি সন্দেহ নেই।

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

গাছের পাতা থেকে

কোন দেশ জেগে ওঠে তখনই, যখন সে দেশ কৃষিতে শিল্পতে নানা-দিক দিয়ে আয়োজনের পরিপূর্ণতায় হয়ে ওঠে টৈটুম্বুর। কেবলমাত্র তখনই দেখা দেয় জাতির জীবনে উন্নতির জৌলুস। সে সমস্ত আয়োজনের মূলে রয়েছে খাদ্যের প্রচুর ব্যবস্থা, কিন্তু তা তো আর এমনি এমনি হবে না, তার জন্য চাই আয়োজন, সেচের সুব্যবস্থা করে জলের ধারা ছড়িয়ে দিতে হবে দিকে দিকে; উদ্ভিদের জন্য চাই পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান; আর চাই শক্ত মজবুত হাতে মনপ্রাণ ঢেলে জমি চাষ করা। তবেই না আরও বেশী ফসল ফলবে জমিতে, মানুষের মুখে ফুটে উঠবে হাসির রেখা।

আমরা পড়েছি ও রোজগার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি ভাল ভাল খাবার খেলে আমাদের শরীরটা ভাল থাকে, ও মনটাও কেমন খুশি খুশি হয়ে ওঠে। উদ্ভিদের বেলাতেও তাই। পুষ্টিকর আহার না জুটলে আমাদেরই মত মরবার অনেক আগেই মরতে শুরু করবে, অর্থাৎ শুকিয়ে যাবে, বুড়িয়ে-যাবে, ফলবে না, জীবনে কোন সার্থকতাই আসবে না তার। অসংখ্য অপুষ্ট মানুষের মত উদ্ভিদও ব্যর্থ জীবনের ক্লান্ত প্রহরগুলি কাটিয়ে দিয়ে বিদায় নেবে পৃথিবী থেকে। যেমন আমরা চাই না একটি মানুষও খাদ্যের অভাবে ব্যর্থ হোক, তেমনি একটি উদ্ভিদও পুষ্টির অভাবে অকালে ঝরে যাক এটাও কামনা করি না। তাই বিজ্ঞান পরীক্ষা করে উদ্ভিদের পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছে।

যেমন শস্য, দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি আমাদের প্রধান খাদ্য, এসব থেকে পাই আমরা 'শ্বেতসার' 'আমিষ' স্নেহ, এবং খাদ্যপ্রাণ আর খনিজ পদার্থ। এসব কিন্তু সবুজ রংএর উদ্ভিদেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দান। আমরা পেয়েছি আমাদের পুষ্টিসাধনের উপযোগী খাদ্য; তাই বুদ্ধি খাটিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে তার সদ্ব্যবহার করে আসছি। কিন্তু উদ্ভিদ ? তার তো আমাদের মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করবার ক্ষমতা নাই। তাকেও তো খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে বাঁচতে হবে ? তাই উদ্ভিদও খাদ্য গ্রহণ করে বিচিত্র এক বিশিষ্ট উপায়ে। প্রকৃতির সন্তান উদ্ভিদ প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে আসে তার জীবনের উপাদান।

সবুজ রংয়ের উদ্ভিদ আর ছত্রাক ও বীজানু প্রভৃতি সবুজ রংহীন উদ্ভিদের খাদ্য গ্রহণের রীতি কিন্তু একেবারেই আলাদা ধরনের। এইসব সবুজ রংএর উদ্ভিদ এবং আমাদের খাদ্য গ্রহণের প্রণালীর অনেকটা মিল আছে। কারণ আমরা খাই জৈব খাদ্য—প্রকৃতির তৈরী খাদ্য। সবুজ উদ্ভিদকে কিন্তু তার খাদ্য তৈরী করে নিতে হয়, তার পাতার সাহায্যে। তার পাতাই হল রান্নাঘর। ঐ রান্নাঘরে কার্বনডাই অকসাইড, জল আর সূর্যের কিরণে বিশেষ উপায়ে তৈরী হয় শ্বেতসার। উদ্ভিদের পাতায় আছে একরকমের ছোট ছোট ছিদ্র। এর মধ্য দিয়ে বায়ু থেকে কার্বনডাই অকসাইড প্রবেশ করে গাছের পাতায়, তারপর আর পাঁচটার সাথে মিশে রান্নার কাজ চলে নিখুঁতভাবেই।

গাছের পাতার সবুজ শোভা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু কে দিল এই সবুজ রং ছড়িয়ে ?—দিল 'ক্লোরোফিল'। ক্লোরোফিল না থাকলে সবুজের রেখা যেত মুছে। এই ক্লোরোফিলই পাতার সবুজত্ব যেমন বাঁচিয়ে রাখে, তেমন সূর্যরশ্মি কার্বনডাই অকসাইডের সাথে মিশে শ্বেতসার তৈরীতে সাহায্য করে। করে। সূর্যের কিরণে পাতার মধ্যে এই যে নূতন সৃষ্টির ধারা চলে, বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলা হয় 'ফটোসিন্থেসিস'।

এই যে এত করে চলল খাদ্য তৈরি কাজ তাতে জল এনে দেবে কে ? গাছের তো হাত নেই তাই হাতের ব্যবহারের কথা ওঠেই না। কিন্তু তার শিকড় তো আছে। তাই দিয়ে মাটি থেকে জল সংগ্রহ করে নেয় গাছ আর সে জলে রয়েছে নানা রকমের খনিজ পদার্থ। এই সব নানা উপাদানে তৈরী হয় গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য। বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন গাছের পুষ্টির জন্য অনেক কিছু জিনিসের প্রয়োজন হয়। প্রয়ো-জনের তালিকাটি মোটেই ছোট নয়, প্রায় ষোল-আঠারো রকম উপাদান নিয়ে উদ্ভিদের খাদ্য তালিকা প্রস্তুত হয়েছে যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, পটাশ, ম্যাগনে-সিয়াম, আয়রণ, বোরোণ, জিংক, কপার ম্যাঙ্গানিজ, সোডিয়াম, সিলিকা ও মলিবডেনাম এবং ফসফরাস আর ক্লোরিন। এই উপাদানগুলির কোন কোনটি বেশী পরিমাণে দরকার হয়, কোন কোনটির প্রয়োজন পড়ে অল্প। কিন্তু বাদ দিলে চলে না। জীবনের প্রকাণ্ড সাধারণ

নিয়মেই সবার জীবন শক্তি এক হয় না, খাদ্যের প্রয়োজনও এক নয়, উদ্ভিদ শ্রেণীর রকম, মাটি জলের অবস্থা, আবহাওয়া প্রভৃতির অবস্থা ভেদে তাদের নানা জিনিসের প্রয়োজন হয়।

গাছের পক্ষে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ হল প্রোটিন। এই প্রোটিনে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ফসফরাস এবং কখনও কখনও সালফারের অংশ। উদ্ভিদ সাধারণত এই নাইট্রোজেন ও ফসফরাস জমি থেকে নাইট্রেট ও ফসফেট রূপেই পায়। আবার এ্যামোনিয়া রূপেও গাছ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃতির ভান্ডারে সব কিছুই জমা আছে। কিন্তু সব জায়গায় সব জমিতে সমানভাবে তা সঞ্চিত নাই। যে মাটিতে বিশেষ কোনও গাছ—তার যা প্রয়োজন তা সেখানে নাও থাকতে পারে যদি তা না থাকে, বিশেষ করে প্রয়োজন অনুসারে নাইট্রোজেন ফসফেট বা পটাশের অভাব কম বা বেশী থাকে তাহলে গাছের কাছে আমাদের সবচেয়ে বড় যে আশা তা পূর্ণ হবে না। আশানুরূপ ফসল ফলবে না।

কাজেই যে গাছের যেমন প্রয়োজন তাকে তেমন ভাবেই সার দিতে হবে, সাথে সাথে মেটাতে হবে অন্য চাহিদা। সুষ্ঠভাবে উন্নত চাষ পদ্ধতির সকল নিয়ম মেনে চলতে হবে। বাঁচাতে হবে গাছকে নানা রোগ পোকা রিপুর হাত থেকে।

শুঁটি জাতীয় গাছের পুষ্টি সাধনের ধারায় কিন্তু একটু বিশেষত্ব আছে। রাইজোবিয়াম নামে এক প্রকার জীবাণু ছোট ছোট গুটি বাঁধে এই গাছের শিকড়ে গুটি গুলিকে বলা হয় নডিউল. জীবাণুরা চটপট বেড়ে যায় গুটির মধ্যে। বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে প্রোটিন তৈরী করার এক বিশেষ ক্ষমতা আছে এই জীবাণুদের: তারা ঐ শক্তি দিয়ে প্রোটিন তৈরি করে এই প্রোটিনের উৎস থেকে গাছের প্রয়োজন পূর্ণ হয়। ঐ সব গাছের পাতায় কান্ডেও শিকড়ে প্রোটিন থাকে প্রচুর পরিমাণে তাতে গরু ভেড়া প্রভৃতি তৃণ-ভোজী পশুদের পুষ্টি সাধন হয়ে থাকে।

শুঁটি জাতীয় এইসব গাছ থেকে আমরা পাই নানা রকমের ডাল, আমাদের প্রোটিন খাদ্যের এক অপূর্ব আয়োজন। এই সব গাছের চাষ করলে জমির নাইট্রোজেনও যায় প্রচুর বেড়ে।

বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহের ব্যাপারে আরও একটি জীবাণু ও অগ্রণী। তাদের নাম এজোটো বেকটর ও ক্লাষ্টিডিয়াম। এরাও রাইজোবিয়ামদের মত বায়ু থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে প্রোটিন তৈরি করে। যে মাটিতে ঐসব জাতীয় জীবাণু সংখ্যায় যত বেশী, বেশী নাইট্রোজেনও ততবেশী বর্তমান। এছাড়া ধানের জমিতে এক প্রকার শ্যাওলাও জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ায়। নাইট্রোজেন বৃদ্ধির কাজে এবং তাকে সরল করে গাছের সহজলভ্য করতে এই সব জীবাণুদের দান অনেকটা এবং জমিতে এ সবের থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে।

এই সব জীবাণুদের মধ্যে কতক-গুলি জমির নাইট্রেটকে নাইট্রাইট করে এ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত করে, আর অন্যগুলি এ্যামোনিয়াকে শেষ পর্যন্ত নাইট্রেটে পরিবর্তিত করে। গাছ জমি থেকে এ্যামোনিয়া বা নাইট্রেটরূপে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। তাছাড়া এরা জমি থেকে গাছের অন্যান্য খাদ্য গ্রহণেও সাহায্য করে। এই জনাই জমিতে এসব জীবাণুগুলি থাকা একান্ত দরকার, এরা বেঁচে থেকে কাজ করে যায়—আর জমিও বেঁচে থাকে প্রাণের স্পন্দনে।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে গাছ এবং প্রাণীরা বায়ু থেকে অক্সিজেন নিয়ে বায়ুতে কার্বনডাই অক্সাইড ছেড়ে দেয়। চলতে থাকে ক্রমাগত বায়ুতে অক্সিজেনের কমতি আর কার্বনডাই-অক্সাইডের বাড়তি। তাছাড়া শিল্প ও সভ্যতার দানতো আছেই। ঘরে ঘরে জলছে খাদ্যের প্রস্তুতিতে কাঠ ও কয়লা নানা শিল্প প্রতিষ্ঠানের চিমনি থেকে ক্রমাগত বের হচ্ছে ধোঁয়ার কুন্ডলি। এরা সব বায়ুতে কার্বনডাই-অক্সাইড মিশিয়ে নির্মল বায়ুকে করে দিচ্ছে বিষাক্ত। উদ্ভিদ এল আমাদের পরিত্রাণে ফটোসিনথেসিসের কাজ করার সময় এরা পাতার ছিদ্র পথে দিয়ে দেয় কার্বনডাই-অক্সাইড আর বায়ুতে দিয়ে দেয় অক্সিজেন এইভাবেই হয় বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্বনডাই অক্সাইডের সমতা রক্ষা। আর আমরাও বেঁচে থাকি।

শুধু কি তাই? রোদের প্রচণ্ড তাপে গাছের ছায়ায় এলে একটু শান্তি পাই। এরা শুধু ছাউনীর কাজেই করে না বাতাসকে করে শীতল. দিনের বেলায় পাতার ছিদ্র পথে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প এরা নির্গত করে। আর এই জলই বাতাসকে করে শীতল আমরা পাই - স্বস্তি, নদী-নালার, পুকুর, সাগর, মহাসাগরের বুক থেকে ক্রমাগত যে জলীয় বাষ্প উঠছে তার সাথে গাছের ঐ জলীয় বাষ্পও মিশে আকাশে জমে দেয় মেঘের সৃষ্টি। আর তার বর্ষণেই পৃথিবীতে আসে শান্তি, সৃষ্টি থাকে বেঁচে।

গাছের পাতা থেকে ঐ জলীয় বাষ্প নির্গমের ফলে মাটি থেকে শিকড়ের ভিতর দিয়ে চলে জলের এক ক্রম প্রবাহ। আর এই জল প্রবাহের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু চলে যায় গাছের সব দেহে, সমস্ত অংশে, তাইতো গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে তার গোড়ায় প্রয়োজন হয় জল দেবার। না হলে যে গাছ শুকিয়ে যাবে।

আমরা প্রচণ্ড রোদের তাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠি, কখনও বা ঘেমে নেয়ে উঠি, কিন্তু দিবালোক আর তাপ ছাড়া তো বাঁচতে পারিনা। উদ্ভিদের বেলাও কিন্তু তাই। বিভিন্ন গাছের চাহিদা অনুযায়ী তাকে সজীব রাখার জন্যও চাই দিনের আলো আর উত্তাপ। বিভিন্ন গাছের দৈহিক গঠন, বৃদ্ধি ও পুষ্পোদ্যামের জন্য অবশ্য আলো এবং তাপের মাত্রা ও অবস্থিতির চাহিদা পৃথক ধরনের। গ্রীষ্মকালে বছরের দিনগুলি হয় বড়, আবহাওয়া হয় গরম আবার শীতকালের দিনগুলি হয় ছোট, সূর্যের তাপও হয় কম। তাইতো আমরা শীতকালে বোরো ও রবি এবং গ্রীষ্ম-কালে খরিফ শস্যের চাষ করি। বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে গাছের পুষ্পোদ্গমের উপর দিনের আকার ও তাপের মাত্রাও অবস্থিতির প্রভাব হয় অনেক, বিশেষ করে বিভিন্ন জাতীয় আমন ধান, পাট রবি মরশুমে বোরো ধান, আলু [illegible] শস্য প্রভৃতি অনেক ফসলে।

এইভাবে আরও কত কিছুর দরকার একটি উদ্ভিদের পুষ্টি সাধনের জন্য, তার জীবন সার্থক করে তুলবার জন্য। আর গাছের দেহের প্রতিরোধ শক্তির ও সৌন্দর্যের সঞ্চার করবার জন্য। গাছের এই সব বিষয়ের ধারণা থাকলেই তো আমরা পারব ভালভাবে আমাদের মাঠে ফসল উৎপাদন করতে। তাই সরকারের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হল, গাছের দেহের গঠন দৈহিক ক্রিয়া, পুষ্টি সাধন ও মাটিকে ঠিকমত চেনার সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আমাদের ওয়াকিবহাল করে তোলা।

বিজয় অধিকারী

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ২১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

উষারই আছে
সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পাখা

তার প্রমাণ

উষা টেবিল পাখার গঠন সবচেয়ে আধুনিক ধরণের—এর সুগঠিত পার্ট, নিখুঁত গড়নের ব্লেড, পিয়ানোর মত অপরূপ বোতাম, আর একেবারে প্রান্তভাগ পর্যন্ত সুষমভাবে লাগানো রং-এর প্রলেপ। উষা টেবিল পাখাগুলি অতি মসৃণ ও চকচকে এবং যে কোনো ঘরের সাজসজ্জার সঙ্গে মানান-সই নানা নয়নাভিরাম রঙে পাওয়া যায়। আর আপনার কাছে পৌঁছোবার আগে এই পাখাকে কঠোর কোয়ালিটি কনট্রোল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

সত্যিই উষা পাখা সবচেয়ে আধুনিক রুচি-সম্মত। কি গঠনে, কি কার্যক্ষমতায়, কি রঙের বাহারে।

১৭ বর্ষ ১২ সংখ্যা
১৩ শ্রাবণ ১৩৮৪
29 JULY 1977

আগামী সংখ্যায়

[illegible]দ কাহিনী
[illegible]থ পরিবার আজও সম্ভব ?
লিখেছেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সৌরেন মিত্রের গল্প
সুব্রত চক্রবর্তীর কবিতা
সলিল ভট্টাচার্যের ছবি

এ সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন ধ্রুব রায়
ভিতরের ছবি এঁকেছেন
সুবোধ দাশগুপ্ত / ধ্রুব রায়

দাম কিন্তু বেড়েই চলেছে

বাজার দামের উদ্দামগতিতে কেন্দ্রেরও টনক নড়েছে। তাঁরা মন্ত্রীসভার এক ঘরোয়া আলোচনায় স্থির করেছেন, রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের এক সভা ডেকে আলোচনা করবেন কীভাবে বাজার দরকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায়।

এর আগে কেন্দ্রীয় নেতারা চোরাকারবারী ও অসাধু ব্যবসাদারকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে বলেছিলেন কিন্তু বাজারদর অসহনীয় রকম বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও কাউকে তার জন্যে খুব একটা শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে বলে শোনা যায় নি। কাজেই অন্য রাস্তা নেওয়া ছাড়া এখন আর উপায়ই বা কী!

অবশ্য বাণিজ্যমন্ত্রী মোহন ধারিয়া বেশি করে সরবরাহ বাড়িয়ে দাম কমানোর কথা বলেছেন। কিন্তু সরবরাহ বাড়লেই যে দাম কমবে তার গ্যারাণ্টি কী ? মজুত করলে যে দাম বাড়ে দোকানদাররা তা ভালোই জানেন। কাজেই জোগান বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রির ব্যাপারেও নজর রাখা দরকার।

এক সংবাদ ভাষ্যে বলা হয়েছে, বাজার দর যা বেড়েছে তার বেশিরভাগই ঘটেছে আগের বছরে, মার্চ মাসের পর থেকে দাম বাড়ছে খুবই ধীরে ধীরে। হিসাবে কিন্তু দেখা গেছে মার্চ শেষ থেকে সারা ভারতে মূল্য সূচী বেড়ে ছ পয়েণ্ট। এ খবর কি খুব আশ্বস্ত হবার মতো ?

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অন্তত প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় অন্যরকমই দেখছেন। সরষের তেলের দাম চোখের ওপর হু হু করে বেড়ে চলেছে। ডাল ও মশলাও একই পথের পথিক। বলা হয় যে অন্য রাজ্য থেকে চালান আসে না বলেই নাকি এমনটা ঘটছে। তাই কি ঠিক ? খবরেই তো দেখা যাচ্ছে, সরষে তেল প্রতিদিন আট ওয়াগন করে আনা যায়, আগে তা আসছিলও, হঠাৎ সেটা আধাআধি কমিয়ে চার ওয়াগন করা হয়েছে। কেন ? সেকি কিলো প্রতি এক টাকা করে দাম বাড়ানোর জন্যেই নয় ? চা-এরও তো শোনা যায় ভালো উৎপাদন হয়েছে, সরকারও রপ্তানীর হার কমিয়ে দিয়েছেন। বাজারে চায়ের দাম কি খুব একটা কমেছে ? কমলেও সে চা কি মুখে তোলা যায়? আসলে চোরা না মানে ধর্মের কাহিনী—পুরনো হলেও একথা সেকেলে হয়ে যায় নি। খারাপ লোকের জন্যে চিরদিনই কঠিন ব্যবস্থা আছে।

•

কেন্দ্রের মন্ত্রীসভা মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কী স্থির করেন, গোটা দেশই তা জানার জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমরা যেরকম

প্রিয় বৈকুণ্ঠ,

অনেকদিন তোমার কোন খবর পাইনি। লোকমুখে শুনলাম—তুমি নাকি ইদানীং একটি সাপ্তাহিক কাগজে কলম লেখো। এ দুর্বুদ্ধি তোমার কেন হোল জানি না। বেশ তো গৃহস্থের জীবন কাটাচ্ছিলে—তার ভেতর এমন দুর্মতি কেন হোল তোমার। আমি সব শুনে খুব চিন্তায় আছি।

আমি যতদূর জানি—তুমি কোন বিষয়েই কিছু জানো না। যেটুকু জানো—তা হোল—তোমার নিজের কথা। সেসব কথা নিয়েই তো এককালে কিছু গল্প উপন্যাস লিখেছিলে। লেখাগুলো উতরোয়নি। তবু চেষ্টা ছিল।

গুরুগম্ভীর সাহিত্য বিষয়ে লিখতে গিয়ে তুমি নাকি খুব বিপাকে পড়েছো। লোকে গালাগালি দিচ্ছে। আপত্তি করছে। দুচারজন তোমারই মত আছেন। তাঁরা নাকি দু-এক লাইন প্রশংসা করেছেন। কিন্তু গালাগালই বেশি।

আমি তো জানি—তুমি একদা বেকার ছিলে। যেমন যেকোন বাঙালী জীবনের এক সময়টায় থাকেন। তুমি প্রেমিক ছিলে। যেমন সবাই থাকেন। গল্প লিখতে। যেমন অনেকে লেখেন। তারপর পিতা এবং গৃহস্থ হয়েছো। এইভাবেই তো লোক—লোক হয়।

আধুনিক গল্প, উপন্যাস, শিল্পীর স্বাধীনতা, বিশ্বাস, মনীষীর কারিগর ইত্যাদি তোমার অজানা বিষয় নিয়ে লিখে ভদ্র, সুশিক্ষিত জনের বিরাগভাজন হতে গেলে কেন ?

বেশতো ছিলে। যেসব বিষয়ে কোন দখল নেই—সেসব বিষয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছো। এ লাইনে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি। একদিন রাস্তার মোড়ে ধরে লোকে তোমায় খুব মারবে। তখন ব্যথা পাবে।

সন্তান, জনক, স্বামী ও মানুষ হিসাবে তোমাকে কিছুটা জানি। এই চার ভূমিকার থেকে তুমি একদা এই জগতের রস সংগ্রহ করতে। শৈশবে গাছপালা, নদী, মেঘ ও শিবমন্দির তোমার মনে স্বপ্ন দিয়েছিল। মাতৃমূর্তি, অনাহার, মৃত্যু, দুঃখ তোমাকে শিক্ষিত করে তুলেছিল। সংসর্গ, মিথ্যে কথা, অহংকার, পরাজয়—এ-সবই তোমাকে জ্ঞানী করেছে।

জীবনযাপন, ধানচাষ, ছায় রাজ-নীতি, ইঁটখোলা, মাছ ধরতে গিয়ে আন্দাজে কেউটে প্যাকড়াও করে ফেলে তুমি কি কিছু শিক্ষা পাওনি। তোমার সারে তুমি ম্যাট্রিকুলেশনে লাস্ট হয়েছিলে। এটাও কি তোমার কম শিক্ষা নয় ? তোমারই তো পিতৃদেব শনিবার দেশের বাড়ি ফেরার পথে ভেতরে জায়গা না পেয়ে বাসের ছাদে দড়ি বাঁধা চেয়ারে বসে ধুলোর ভেতর পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করেন। তোমারই মা তো সাত-শিকার ওল আর বড় চিংড়ি মাছ দিয়ে ডালনা রাঁধতেন। একদা তুমি কি তিরিশ টনের ওপেন হার্থ ফার্নেসে খালাশি ছিলে না ? তবে ?

তবে ওসব কলম লিখতে যাওয়া কেন? তুমিই তো একজন বড়মানুষকে একবার তেল দিতে গিয়ে মাঝপথে ধরা পড়ে গিয়েছিলে। বলেছিলে—তখন তুমি সাঁকোর মাঝামাঝি। এগোতে পারছো না। পিছোতেও পারছো না।

কলকাতায় সন্ধ্যার আলোর খোসা খুলে ফেলে ভেতরকার নীল আলো তুমি তো আজ দশ বারো বছর হোল দেখতে শিখেছো। গর্বিত মানুষ কোথায় নিরুপায়, নিঃসঙ্গ তা জানতে পেরে তুমি তাকে মায়া করতে শিখেছো। দুর্বলের বল নেই জেনেও আঘাত করার স্পৃহা ত্যাগ করতে পারো।

এখন তো তুমি প্রেমে আচ্ছন্ন হবার ইচ্ছে নিয়েও প্রেমে পড়তে পারো না। কারণ, তুমি জানো, তোমার জন্যে বয়স বয়ে গেছে। আর আর সময় নেই। যাঁরা রাগ করছেন—তাঁদের সঙ্গে তোমার কোন বিরোধ নেই। পার্থক্য যা হোল—তা হোল দৃষ্টিভঙ্গীর।

চরম গাম্ভীর্যে এক চিলতে হাসি লুকিয়ে থাকে। আমরা সবাই কোন না কোনভাবে এক একটি কমিক, আমাদের বীরপুরুষেরা আসলে এক একজন ছবির অরণ্যদেব মাত্র—এও তো তুমিই বলেছিলে। নায়ক আসলে পিচবোর্ড ডি ফিল-এর প্রতিনিধি অ্যানেকডোট-সংগ্রাহক, নায়িকা মানে কিছু স্বপ্নের সমাহার। এ তো তোমারই বাণী।

ঘি খেতে কেমন লাগে ? একথা ভাষায় লেখা যায় ? অসম্ভব ! অভিমান কথাটি ইংরাজি ডিকসনারিতে নেই। কল্পবৃক্ষ এবং ভালবাসা কেনা যায় না। ভিক্ষাও করা যায় না। পেয়ে যেতে হয়। এ সব কথা তো তোমারই। তবে ?

লোকে বাড়ি করার সময় ভালো সিমেন্ট খোঁজে। বিজ্ঞান বলে খাঁটি সিমেন্ট শক্ত হয়ে গাঁথুনিকে জমাট করে ধরতে ধরতে দেড়শো বছর চলে যায়। তারপর দেড়শো বছর শক্ত থাকে খুব। তারপরের দেড়শো বছর যায়—সেই সিমেন্ট নরম হতে। এসব জেনেও যদি কেউ বাড়ি তৈরির জন্যে খাঁটি সিমেন্ট খোঁজেন—তাহলে বুঝতে হবে তার লংজিভিটি হাজার বছর। তার বাড়ি বুড়ো হতে হতে ইতিহাস, ভাষা, রুচি এবং ভূগোল পঞ্চাশবার ড্রেস পাল্টাবে। এ কথা তো তুমিই বলেছিলে। মনে পড়ছে ?

অনেকে গ্রন্থাবলীর জন্যে আলমারি কিনছেন। পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি ছাপা হয়েছে—রেশন কার্ড। ২ কোটি ৮৫ লক্ষ। তারপর পঞ্জিকা। গীতা। ধরাপাত। বর্ণ পরিচয়। ডিকসোনারি। এইভাবে কমতে কমতে আমরা গিয়ে হয়তো কোন উপন্যাস বা কবিতার বইতে পেঁছিতে পারি। এর মাঝে অবশ্য মেডইজি, ব্যাকরণ কৌমুদি ইত্যাদি আছে।

তবে কেন যশোলিপ্সা ? কলকাতার বিশ মাইলের ভেতর বহু চাষী আজও রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেন নি। বহু চাষী বউ আনন্দমঠের গল্পটাও জানেন না। বেতার, টি-ভি, টেলিফোন, খবরের কাগজ ছাড়াই বুদ্ধদেব ভায়া কোরিয়া, ভায়া চীন হয়ে জাপানে পেঁছেছেন। সমুদ্র গুপ্তের সময়ে তখনকার ইউরোপে কি লোক গাছে চড়তো। কলকাতার জঞ্জালে কয়েক অর্বুদ আরসোলার বাস। রাতে আলো নিভলে তারা বাথরুমে দেখা দেয়। সূর্য সারা জীবন এই পৃথিবীকে সেঁক দিয়ে যাচ্ছে। তবে আর বৈকুণ্ঠ এসব কেন ? কার জন্যে ? ছোট রাগ। বড় রাগ। ছোট প্রশংসা। বড় প্রশংসা। সবই কি সমান নয়। যারা দুশো বছর আগে এই পৃথিবীতে দাপাদাপি করেছিল—সব কারণ ও যুক্তি সমেত তারা জায়গা ছেড়ে চলে গেছে।

তবে আর ওসব লেখা কেন ? তার চেয়ে তোমার দেখা মানুষ আর তোমার সঙ্গে বেড়ে ওঠা এই গাছপালা, পশু-পাখি, নদী-পাহাড়, বাতাস-আগুনের কথা লেখো না কেন ?

ইতি—
শুভানুধ্যায়ী
বৈকুণ্ঠ পাঠক

শুদ্ধশীল বসু

গত ২৪ জুনের 'অমৃতে' প্রকাশিত শুদ্ধশীল বসুর 'আমি সম্পূর্ণ কবি সম্মেলনের বিরোধী' শীর্ষক নিবন্ধটি মনোযোগের সঙ্গে পড়লাম। শ্রীবসুর লেখাটি পড়ে অমৃতের প্রত্যেক অনুরাগী, সাহিত্য-পাঠক ও লেখকরা ইতিমধ্যে হয়তো সামান্য আন্দোলিত হয়েছেন (?) 'সাহিত্যসভা' থেকে 'কবি-সম্মেলন' নামে রূপান্তরিত উপগ্রহটি সম্মেলন বিরোধীদের হতাশ করতে পারে, কিন্তু, আমার আদৌ মনে হয় না যে সম্মেলন-প্রেমিক শ্রোতা ও অনুরাগীরা (যদিও সকলেই নন) বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মাঝে মাঝে নতুন প্রাণের স্পর্শ ও উত্তাপ পান না। শ্রীবসু মহাশয়ের কয়েকটি কথার সঙ্গে আমি আন্তরিকভাবে একমত এবং এগুলি তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন বলে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। যেমন আজকের কবি-সম্মেলন অধিকাংশ পর্যায়েই এক-ঘেঁয়েও গতানুগতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। সেখানে 'আজকের যুগ চেতনা', অত্যাধুনিকদের সাহিত্যের নামে বেসাতি', সেক্সপীয়র, বার্নার্ড শ'র উদ্ধৃতি শ্রুতিকটু এবং মিথ্যা 'অহং' বোধের প্রেরণা জোগায়। কিংবা কবি সম্মেলনের শুরুতেই নজরুল, অতুলপ্রসাদ, কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নাজিম হিকমৎ-এর কবিতা গানের আকারে বিকট সুর-তরঙ্গ তুলে কবি ও কবিতা অনুরাগীদের হিপটোনাইজ করে দিলো, এমন অস্বস্তিকর পরিবেশও সৃষ্টি হয় প্রায়ই। এ ছাড়া কবিতাকে হতে হবে 'ঋজু', 'অহংকারী' ও 'গভীর' এই শব্দ-ত্রয় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে ইচ্ছে করে। আর একটি বিষয়ে একমত, যখন মঞ্চে কবিতা পাঠের সময় প্রণবেন্দু, শঙ্খ, আলোকরঞ্জনের মত পরিশীলিত রুচির কবিদের শব্দের ধাক্কায় বসিয়ে দেওয়া হয়। —তখনই আমাদের প্রতিবাদ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

কিন্তু নিবন্ধটির যেখানে তিনি, আজকের কবিতা একধরনের 'অভিধান-বহির্ভূত এক ভাষা' কিংবা 'অব্যয় কস্তুরির মত' (উপহাসার্থে) কথাগুলি লিখেছেন—তা বেশ আপত্তিজনক। আজকের কবিতা বলতে তিনি এই সময়ের অর্থাৎ পঞ্চাশ ও পরবর্তী কবিদের কবিতাকে লক্ষ্য করেই ব্যক্তিগত তীরটি ছুঁড়েছেন নিশ্চয়ই। আমি শ্রীবসুকে প্রতি উত্তরে জানাচ্ছি যে, আজকের সব কবির কবিতাই বিধিবন্ধ রেশনের মাল কিংবা তেঁতুলের আঁটির চাটনি এমন কথা বুকে ও মুখ ঠুকে বলতে পারবেন কি? সব কবিতাই কবিতা হয়ে উঠবে এমন কোন মাথার দিব্যি কেউ কি প্রথম থেকেই দিয়ে রেখেছেন? কবিতায় বিশেষ একটি-দুটি লাইন কিংবা সম্পূর্ণরূপেই কিছু কবিতা মাঝে মাঝে লেখা হয়,—কেমন করে যেন হয়ে যায়, পাঠকরা বোধের বুকে ফেলে তা উপলব্ধি করেন। তাছাড়া কবিতার একটা প্রবাহ যা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোন না কোন ভূমিকা পালন করে, ভুয়া দশক-বাদের ঊর্ধ্বে তা মানবিক মূল্যবোধের নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'কবিতার অস্থির মধ্যে চাই ইতিহাসচেতনা আর তার মর্মে চাই পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। এই জ্ঞানেই উজ্জয়িনীর সময় মিলে যায় মিশর বা গ্রীসের সঙ্গে, এই চেতনাতেই এক নিশ্বাসে বাঁধা পড়ে উর্বশী ও আর্টেমিস'। কিন্তু সব কবিতায় সেই 'ইতিহাস-চেতনা', 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান', অথবা 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ধরা দেবে এমন কথা কেউ হলফ করে বলতে পারেন কিনা আমার জানা নেই।

শ্রীবসু সমগ্র নিবন্ধটিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কবি ও কবিতার উপর ব্যক্তিগত ধারণার হিসাব-নিকাশ চাপিয়ে দিয়েছেন বলে আমার ধারণা। কিছু কিছু কবি-সম্মেলন না অনুষ্ঠিত হলেও যেমন কবিতা আন্দোলনের কোন ক্ষতি হবে না তেমনি, প্রাণের টানে গ্রাম-গ্রামান্তরের এক অংশ থেকে অন্য অংশে বছরের একদিন কি দুদিন ছুটে এসে পরস্পরের কাছাকাছি, মুখোমুখি দাঁড়ানো এবং কোন দুঃখ, রোগাক্রান্ত, নিপীড়িত কবির কিছু বলিষ্ঠ কবিতা শোনার জন্যও কবি সম্মেলনের প্রয়োজন আছে মনে করি। আর একটি বিষয়ে শ্রীবসুর মত শ্রদ্ধেয় মানুষের, তরুণ কবি ও 'তারকা-কবিদের' কবি সম্মেলনে মদ্যপান বিষয়ে আপত্তিজনক অভিমত আমাকে এবং আমার সহযোগী তরুণ কবি বন্ধুদের খুব বেশী আহত করেছে। 'তারকা-কবি'রা বিভিন্ন সম্মেলনে গিয়ে 'স্থানীয় ভাইদের' 'মদ্যপান ছাড়া কবিতা লেখা যায় না'উপদেশ দেন—এমন কথা তো প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশী কবি-সম্মেলনে গিয়ে 'আঁচ' করতে পারিনি। 'তারকা কবিদের ছত্রতলে স্থানীয় কবিরা কবিতা পড়ে যান'—কথাটির দ্বারা স্থানীয় কবিদের যথেষ্ট হেয় করা হয়েছে বলে আমার ধারণা। তিনি কি পরোক্ষে বলতে চেয়েছেন, যে স্থানীয় কবিরা আদৌ কবিতা লিখতে জানেন না?। শোভন মহাপাত্র, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর।

কেউ কেউ কবি

২৪ জুনের 'অমৃতে' প্রকাশিত শুদ্ধশীল বসুর 'আমি সম্পূর্ণ কবি-সম্মেলন বিরোধী' শীর্ষক রচনাটি পড়ে অবাক হলাম।

জীবনানন্দ বলেছিলেন, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' তারই জের টেনে বলা যায় যে, কোনো কবির সব কবিতাই কবি-সম্মেলনে পাঠযোগ্য না হয়ে বিশেষ কিছু কবিতাই জোর-গলায় বা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ার মতো হতে পারে। তাঁর অন্য কবিতাগুলি ঘরোয়া বৈঠকে বা পাঠক আপনমনে পড়লে হয়তো ভালো লাগবে।

দ্বিতীয়ত, যেমন সব কৃতী ছাত্রই অধ্যাপনায় সাফল্যলাভ করেন না, তেমনি, ভালো কবিতা যাঁরাই লিখতে পারেন, তাঁরা সবাই, স্বলিখিত হলেও, কবিতা ভালোভাবে পড়তে পারেন না। ভালো কবিতা লেখা আর কবিতা ভালোভাবে পড়া এই লেখা-পড়ার মধ্যে একটা ব্যবধান আছে।

কবি-সম্মেলন আজ শুধু পশ্চিম-বঙ্গের সিউড়ি, বর্ধমান, শিলিগুড়ি বা বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। বাংলার বাইরেও হচ্ছে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলা প্রয়োজন (শুদ্ধশীল বসুর ভাষায়) 'কলকাতার দু' একজন কবি-তারকাকে ফার্স্ট ক্যাশ ভাড়া ও সন্ধ্যের পর কারণ-বারির আশ্বাস দিয়ে' আনা না-হলেও, সে-সব কবি-সম্মেলনে জনসমাগম হয় এবং অখ্যাতজনের উপযুক্ত কবিতাও, পড়ার গুণে, শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে ও তাঁদের বাংলা কবিতা সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে।

আসল প্রশ্ন হলো : কবি-সম্মেলনের উদ্যোক্তারা কবিতা পড়তে পারেন এমন সব কবিদেরই আনলেন কিনা এবং আমন্ত্রিত কবিরাও বৃহত্তর জনসমাবেশে পাঠের উপযোগী কবিতা নির্বাচন করলেন কিনা ?

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যে-কবিতা নিজে পড়ে বা নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে আলোচনা করে বুঝতে পারিনি, সেই কবিতাই, কবি-সম্মেলনে কবির স্বকণ্ঠে শুনে, পড়বার গুণে, বোধগম্য হয়েছে। শুধু আমার নয়, উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকেরই। শুভেন্দু পালিত, পাটনা-১।

বিস্মিত ও বিমর্ষ

২৪ জুন, অমৃতে শুদ্ধশীল বসুর 'আমি সম্পূর্ণ কবি সম্মেলন বিরোধী' শীর্ষক অপরিণত রচনাটি পড়ে আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও বিমর্ষ হলাম।

শ্রীবসু নিবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে বলতে চাইছেন, কবি সম্মেলন যতদিন কলকাতার বুকে অনুষ্ঠিত হয়েছে ততদিন তার একটা সুস্থ স্থিরচিত্র দেখতে পেয়েছেন। যখনি এটা ছড়িয়ে গ্রামবাংলার আনাচে কানাচে তরুণ কবিমণ্ডল দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনুষ্ঠান হতে দেখেছেন, তখনি তাঁর ভেতর 'গেল গেল' ভাব বুক কাঁপিয়ে তুলেছে। যেহেতু মফঃস্বলে অনুষ্ঠানের সভাপতি কোন শিক্ষা বিভাগ থেকে নিয়ে করা হয়, তখন তিনি যে কবি হতে পারেন, সে ধারণা শ্রীবসুর নেই। কিংবা গ্রামবাংলা বলতে হয়তো তাঁর ভেতর একটা নাক সিঁটকানো ভাব সর্বদা কাজ করে। 'বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি' যে বিষয়টির কথা হেঁয়ালীভরে উল্লেখ করেছেন, তাতে তিনি গ্রামবাংলার কবিদের এমনই নির্মম কটাক্ষ করেছেন যে, তাঁরা কোনক্রমে কোনদিনই এই জটিল বিষয়-বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হননি বা পরিচিত হবার যোগ্যতাও তাঁদের নেই। চর্চা, কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে মফঃস্বলের তরুণ তাজা কবিরাও যে একদিন সাহিত্যের প্রথম পংক্তিতে আসতে পারেন তা তিনি বিশ্বাস করেন না। কারণ হয়তো তাঁর নিজের জন্ম কলকাতা শহরেই এবং যাঁরা কবিতার প্রথম পংক্তিতে আছেন তাঁরা সকলেই কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে বসবাস করছেন। তাঁর এই সমীক্ষা যে কতটা ভ্রান্ত এক এক করে উদাহরণ দিলে প্রায় সব কবিকেই গ্রামবাংলায় বসবাসকারী কবি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে তাঁরা হয় কর্মসূত্রে নয়তো বা পারিবারিক কারণে শহরের বুকে রয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের চিহ্নিত (৩)-এ তিনি বলেছেন, 'আলোচকবৃন্দ অনামী লেখকসহ'—এটা কি তাঁর অবজ্ঞা, কুণ্ঠা, না অনামী লেখকদের নামী লেখকদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করায় ঈর্ষা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি কবিতাকে অন্তরের উপলব্ধি বলে স্বীকার করেছেন, অথচ তিনি কবিতা পাঠ বা পাঠককে স্বীকার করেন নি। যেহেতু কবিতা ভেতরের জিনিস গোপনতার জিনিস, সেই হেতু তিনি বিশ্বাস করেন, কবির উচিত কবিতার সঙ্গে একা থাকার। তাঁর এই স্বভাবসুলভ হালকা কথা শ্রবণে এমনই পীড়াদায়ক যে পাঠক হতে হলে শ্রীবসুর এরকম রচনার পাঠক হওয়া দরকার।

তিনি কি করে ভাবলেন, কবিতা পাঠ করলেই কবিতা কবি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়! আমাদের তো মনে হয়, কবিতা যত বেশী পাঠ করা যাবে, তত বেশী অন্তঃস্থলে নাড়া দেবে—শেকড়ের টান এখানেই। এরই জের টেনে তিনি আরেক জায়গায় বলেছেন, 'কবিতা আজকাল লেখা হয়, তার পদশব্দ অতি মৃদু, ফ্রি-ভার্স-এ বা জটিল পয়ারে সন্নিবিষ্ট অভিজ্ঞান, সংহত, আবৃত্তিকারের ডামাডোল এড়িয়ে সে আসে বুকের ভেতর—শব্দ লেখা 'মন দিয়ে' গড়া এটা—অতি ব্যক্তিগত ব্যাপার'। এই যেখানে অবস্থা সেখানে কবি সম্মেলন আসে কি করে? তিনি ফ্রি-ভার্সের কথা উল্লেখ করেছেন অথচ তিনি 'কান'কে মানেন নি। ফ্রি-ভার্স যেখানে 'কান'-টাই সেখানে আসল। এই 'কান' তৈরী হয় পাঠে এবং পাঠকের অনুষঙ্গে। কবিতায় অন্ত্যমিল যেখানে বহুদিন আগেই দূরীভূত সেখানে গদ্য ছন্দকে স্বীকার করতেই হয়। এই গদ্যছন্দে কবিতা লিখতে গিয়ে কবি অতিমাত্রায় সচেতন বলেই বারবার কবিতা পাঠে 'কান' তৈরী করে নেন। এই 'কানে'-র ভেতর দিয়েই মরমে পশে যে ছন্দকে সংহত সুবিন্যস্ত করতে সাহায্য করে সেখানে কবি সম্মেলনে কবির উপস্থিত হওয়ায় বাধাকোথায়! সম্মেলনে প্রচুর লোক সমাগমে উপস্থিত থেকেও কবি নিরন্তর একাই, কবিতাই তাঁর একমাত্র সঙ্গী। নিবন্ধকার যে কবির কথা এখানে বলতে চাইছেন, আমাদের মনে হয় তিনি কবি নামধেয় অপর কোন ব্যক্তি।

সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ যেটা করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি, তা হচ্ছে কলকাতার থেকে যাঁরা মফঃস্বলে কবি সম্মেলনে উপস্থিত হন, তাঁদের প্রতি কটাক্ষপাত। আমরা প্রায় প্রতি বছরই এই রকম অনুষ্ঠান করে থাকি এবং এই সুবাদে কলকাতার অনেক প্রথিতযশা কবিরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু তাঁদের মুখ থেকে কাউকে বলতে শোনা যায়নি, 'মদ্যপান ছাড়া কবিতা লেখা হয় না'। রণজিৎ দেব, সমীর চট্টোপাধ্যায়, ত্রিবৃত্ত সরণি, কুচবিহার।

লজ্জিত

২৪ জুনের অমৃতে শুদ্ধশীল বসুর স্পর্ধাভরা উক্তি 'আমি সম্পূর্ণ কবি-সম্মেলন বিরোধী' পড়ে বাংলা সাহিত্য-রসিক ও কবিমনোভাবাপন্ন মানুষ মাত্রেই বিস্মতই শুধু নয়, ব্যথিত ও লজ্জিত বোধ করবে।

শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নয় বাঙালী ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তেই একত্রিত হোক না কেন তার সাহিত্যকৃষ্টির ঐতিহ্য সুরক্ষা করে আসছে শত অসুবিধার মধ্যেও। এ সত্য শ্রীবসুর উক্তিতেও সীমিতভাবে স্বীকৃত, —'গত কয়েক বছরে এই বস্তুটির (কবি সম্মেলন) প্রসার সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে।' দুঃখের বিষয় শ্রীবসু এখনও অজ্ঞাত, যে এই সাহিত্য-কৃষ্টির চর্চা ও প্রসারলাভের জন্য প্রবাসী বাঙালীরাও সারাভারতের নানা প্রান্তে সাহিত্য সম্মেলন ও কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে থাকে। এবং এর জন্য ত্রুটি-বিচ্যুতির চেয়ে গৌরবের দাবিটাই সিংহভাগ।

সাহিত্যসভার ঐতিহ্য সম্বন্ধেও যে ছকটি শ্রীবসু আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাও নেহাত তাঁর মনগড়া ব্যাখ্যান মাত্র। শেষাংশে লিখছেন,...'একটা দুটো ছোকরা লেখক বক্তার সঙ্গে তর্কও করে—এবং সেই সময়েই সভাপতি স্পীকার টাইপ ক্ষমতাবলে গানের অর্ডার দিয়ে দেন এবং একটি তরুণী হারমোনিয়াম সহযোগে নজরুল বা অতুলপ্রসাদের একটি গান ভয়াবহ সুরে লাগিয়ে দেয়।' এমন টাইপ সাহিত্য-সভা তিনি কোথায় হতে দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন আমাদের জানা নেই। তবে শ্রীবসুর সেরকম সদিচ্ছা থাকলে না হয় দু-একটা সাহিত্যসভা বা কবি সম্মেলনে নিয়ে গিয়ে

ভয় ভাঙানোর চেষ্টা করা যেত। কবি সম্মেলন সম্বন্ধে তাঁর ভুলো ধারণার সম-মূল্যে সকলকে শিক্ষিত করেও তুলতে চেয়েছেন,—ব্যাপারটা কিছু নয়, কয়েকজন কবি একত্র হন এবং মাইকে এক এক করে নাম ঘোষণা করা হয়। কেউ উদাত্ত বা কেউ মিনমিনে কণ্ঠে কবিতা পড়ে নেমে আসেন।

কবি যখন তার বুকের অনুভূতির রস নিংড়ে এটক একটি পংক্তি লিখে এক একটি কবিতা সৃষ্টি করেন তার এক একটি বিশেষ রূপ রস ও ভাবমূর্তি সৃষ্ট হয়ে যায়, যার মৌল অভিব্যক্তি সার্থকভাবে বিধৃত হয়ে থাকে সেই কবিরই অন্তঃস্থলে। এবং তার যথার্থ প্রকাশ একমাত্র সেই কবির স্বরাই সম্ভব। কোন সার্থক আবৃত্তিকার হয়তো সেই মৌল অভিব্যক্তির চেয়েও পরিশীলিত কলাকৌশল প্রকাশ সম্ভব করে তুলতে পারেন। তবে তাকে তখন আর অকৃত্রিম বলার অধিকার থাকে না। কবিতার এই মৌল প্রকৃতিটিকে প্রত্যক্ষ করার তাগিদেই শ্রোতা কবির স্বরচিত কবিতা পাঠ শুনতে এত আগ্রহী। 'কবি সম্মেলন' এই স্পৃহার তাগিদ মেটাতে সক্ষম। এই কারণেই আমরা এখন রবীন্দ্রনাথের ভগ্নকণ্ঠের আবৃত্তি পরম আগ্রহে শুনে থাকি।

যখন কবিতাকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত জীবনের চেয়ে বড় বলে অনুভব করতে শিখেছে, যখন কবিতা 'গ্রামে গঞ্জে মাঠে ঘাটে অলিতে গলিতে' পরিব্যাপ্ত, সেই সময়ই শ্রীবসু কবিতার সংজ্ঞাটি ভারী দুর্জ্ঞেয় চটকদার ভাষায় পরিবেশন করেছেন —'কবিতা অভিধান বহির্ভূত এক ভাষা যা মনের শিকড়ে বাকড়ে বেশ করে 'অবায় কস্তুরীর মত—তাতে স্বাদ গন্ধ সব থাকলেও অনিঃশেষ, অনশ্বর।' জানি না, শ্রীবসু কোন ভাষার কবিতা পড়েছেন যে ভাষার শব্দপদ বা অর্থ কোন অভিধানেই নেই, কবিতার ধর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—'কবিতার ধর্ম এখন প্রতীক এবং তা বারংবার পাঠে দ্রৌপদীর শাড়ীর মত অন্তহীন অর্থবহ।'

যেহেতু 'কবিতা এখন গোপন, প্রেমের মত নিবিড়। আপনি একা কবিতা একা'—সেইহেতু, শ্রীবসুর মতে 'এখন মোহগ্রস্ত আবৃত্তিকার' বা 'ব্যাফসোড' দরকার নেই।' অর্থাৎ 'বিশ শতকের সায়াহ্নে কবি সম্মেলন' কি শ্রীবসুর মতে 'মোহগ্রস্ত আবৃত্তিকার-দের জটলা মাত্র ?

স্মার্টনেস বা ভাল আবৃত্তির অভি-ব্যক্তি না থাকাই যদি সৎকবির আসল গুণ বিবেচিত হয়, তবে বলা বাহুল্য আর তর্কের কিছু থাকে না। আর যদি কোন সার্থক কবি শুধু আন্ স্মার্টনেসের জন্য অনাদৃত হয়ে থাকেন তার জন্য বাঙালীমাত্রই দুঃখবোধ করবে। তবে সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠানেও যে কিছু অমার্জিত রুচির মানুষের সমাবেশ ঘটে এবং তাদের নির্বুদ্ধিতার ফলশ্রুতি হিসাবে 'কবি সম্মেলন' এর প্রসারকে রুখে দাঁড়াবার মতবাদকেও রুচিকর কৃষ্টিসম্পন্ন বলে গ্রহণ করা যায় কি ? আর যে কবিরা স্বভাবগত কারণে ভাল কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে ভাল আবৃত্তির মাধ্যমে সার্থক অভি-ব্যক্তি শ্রোতার সামনে উপহার দেন, সেখানেও কিছু অগৌরব আছে বলে মনে করা সুরুচির পরিচায়ক নয়।

শ্রীবসুর টিপ্পনী অনুসারে আজকাল-কার কবিতা ফ্রি-ভার্সে বা জটিল পয়ারে যাতেই লেখা হোক না কেন, তার পদশব্দ মৃদু অথবা গম্ভীর এবং আকার সংহত বা ছোট যাই হোক না কেন তাতে ক্ষতি কি ? প্রত্যেক যুগই তার যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কবিতা পায়। —অতুল রায়, ভইকেল এস্টেট, জব্বলপুর।

ভাল লাগলো

২৪ জুন সংখ্যার শুদ্ধশীল বসুর এই লেখাটি আমার ভাল লাগল। লেখাটি পড়ার পর মফঃস্বলের কবিসভার একটি সাধারণ চিত্র আমার চোখে ভাসছে। চিত্রটি যদি শুদ্ধশীল বসুর লেখার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেত তবে যেন লেখাটি আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠত।

আগে ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতরেও গিয়ে হাজির হতাম কবিসভায়। সাধারণ দৃশ্য-গুলি পবিত্রতার নামে চালিয়ে নিতে পারতাম, কেননা বয়সটা ছিল কম।

এখন কবিসভার খবর পেলে বাধ্য না হলে যাই না। গেলে যা দৃশ্য চোখে পড়ে তা এই রকম। একটি হলঘর। নিমন্ত্রণ কার্ডে সূচিত সময়ের ১ ঘণ্টা পর গেলে সভাপতিবরণ টা চোখে পড়ে। আর যদি এই শুরু মান্দ্য রোগ থাকে তবে দেড়ঘণ্টা পর যাওয়াই ভাল। আপ্যায়নের অভাব নেই সেখানে। কেউ না কেউ আপনাকে হাত ধরে সখার মতো নিয়ে যাবেন আসরের মধ্যিখানে, পাঠশালার শ্রেণীকক্ষে।

তখন কবিতা পড়ছেন মাইক্রোফোনের সামনে কোন এক কবি। হলের ভিতর মাইক্রোফোনের ক্ষমতাকেও দাবিয়ে রেখেছে অপেক্ষমান কবিদের আলাপ আলোচনার স্বর। কেউ ডাইরীর পাতা চিবুচ্ছেন। একজন কবি একজনকে বলছেন : সভাপতি তো আমাদের স্যার, এই অশ্লীল কবিতাটি কি পড়া যাবে ?

একজন বলছেন : হাত পাখা থাকলে ভাল হত। অন্যজন বলছেন, ও ভাই, জল দাও না একটু, খাই। এইসব বাক্যালাপ সংলাপ, বর্তমানে মাইক্রোফোনের সামনের পঠিত কবিতারই অংশবিশেষ রূপ ধারণ করে সঙ্গীতের মতো হয়ে উঠতে চাইছে যেন। সভাপতির কানে সবই যাচ্ছে, উনি চোখ বুজে কবিতা শুনছেন নাকি ঘুমায় চোখ বুজেছেন বোঝা যায় না।

এতক্ষণে যে কবির পড়া শেষ হল উনি কবিদের আসনে ফিরে এসে কেমন পড়া হল উনি কবিদের আসনে ফিরে এসে কেমন লাগল, কেমন পড়া হল জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। সকলেরই সভাপতির দিকে চোখ, হয়তো এবার তাঁকেই ডাকছেন কবিতা পড়ার জন্য এই অবস্থায় সেই কবিটির প্রশ্নে অনামনস্ক বললেন, 'দারুণ পড়া হয়েছে দাদা, দারুণ।'

হলঘরের ভিতরে কবিতা তখন কবিতা শুনছেন না। নিজের কোন কবিতাটি পড়া যায়, কখন তাঁকে ডাকবেন ইত্যাদিতে তিনি মশগুল।

এসব দেখেশুনে আমরা প্রতি বছর ১৪ অকটোবর একটি কবি সম্মেলন করি যাতে অংশ নেয় শুধু আমার বন্ধুরা। সেখানে কবিতা পাঠ গুরুত্ব পায় না। আমরা বন্ধুরা মিলে শুধু সেদিন ব্যক্তিগত গল্পগুজব করি। আমরা এই-দিনের জন্য সারা বছর ধরে কাঙাল।

আর অন্যান্য কবিসভার ডাক পেলে পারতপক্ষে শুদ্ধশীল বসুর মতই বলতে চেষ্টা করি : আমি সম্পূর্ণ কবি সম্মেলনের বিরোধী। জয়ন্ত চক্রবর্তী, দুবরাজপুর, বীরভূম।

অতুল বসু

প্রশান্ত দাঁ

প্রতিকৃতি অঙ্কনে একটি যুগের অবসান হল। গঙ্গাধর দে, প্রমথনাথ মিত্র থেকে শশি হেস এবং তারপর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন মজুমদার প্রমুখ শিল্পীরা প্রতিকৃতি রচনায় যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন বোধকরি শিল্পী অতুল বসু তার শেষ রূপকার। তাঁর মৃত্যুতে ঐতিহাসিকে এই শিল্পধারার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল।

সমকালীন প্রতিকৃতি রচয়িতাদের মধ্যে অতুল বসু শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকৃত। সারা জীবন তিনি অসংখ্য প্রতিকৃতি এঁকেছেন। এগুলো সার্থক শিল্প নিদর্শন হিসেবে ভারত শিল্প ভাণ্ডারে চিরকাল এক অমূল্য সম্পদ হয়েই থাকবে।

শিল্পীর অনুকৃতিগুলির মধ্যে প্রথমেই স্মরণে আসে বাংলার বাঘ। এটি চারকোলের কাজ। স্যার আশুতোষের চেহারা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এমন জীবন্ত করে সাদা কাগজের পাতায় মূর্ত করে তুলেছিলেন যে আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরু-প্রসন্ন স্কলারসিপ দিয়ে (১৯২৩ সালে) এই যুবককে বিলেতে শিল্প শিক্ষণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধী, নন্দলাল, রাজা রামমোহন, চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল নেহেরু প্রমুখের শিল্পী-অংকিত প্রতিকৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে—ভিকটোরিয়া মেমোরিয়েল হল, অ্যাসেম্বলী হাউস, পার্লামেন্ট হাউস, মহাজাতি সদন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি নানা স্থানে।

রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর সবচেয়ে প্রিয় কবি। কথায় কথায় ছিন্ন পত্রাবলী কিংবা গীতাঞ্জলী থেকে কবিতার লাইন উদ্ধৃত করে কথা বলতেন। তাঁর হাতে শেষ ছবি ঐ কবিগুরুরই। গত বছর (১৯৭৫) পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে এঁকেছিলেন কবির একটি প্যাস্টেল স্কেচ।

একবার পড়ন্ত এক বিকেলে শিল্পীর বংশুল রোডের বাড়ির নীচের তলায় স্টুডিও ঘরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ছোট্ট একটি মুখাবয়ব। এক বিদেশীর মুখ। খুবই ছোট তৈলচিত্র। একেবারে কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ করলে মনে হয় ক্যানভাসের ওপর অপরিকল্পিত কিছু ছড়ানো ছেটানো রঙের প্রলেপ। তেমন কোন সুপরিকল্পিত রেখা বিন্যাস চোখে পড়ে না। অথচ একটু দূরত্ব থেকে ভিনদেশী বৃদ্ধের মুখ রক্ত মাংস দিয়ে গড়া সজীব বলে বোধ হয়। সারা মুখে বার্ধক্যের ছায়া নেমেছে। ছানি পড়া চোখের করুণ দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত। যেন এ জগতের সীমানা পেরিয়ে আর এক জগতে

প্রতিকৃতির নাম জানতে চাইলে অতুলবাবু বললেন—১৯৩০ সালে ভারত সরকারের কমিশনে বিলেতে গিয়েছিলাম কুইন মেরী ও সপ্তম এডওয়ার্ডের ছবি কপি করতে। বাকিংহাম প্যালেসে ঐ বৃদ্ধ রাজভৃত্য আমাকে সাহায্য করার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিল। মূল প্রতিকৃতি থেকে রাজা-রানীর ছবি কপি করার কাজ শেষ হলে ঐ ছবিটি আঁকি। যাইহোক, রাজা-রানীর অরিজিন্যাল ছবির শিল্পী রয়াল অ্যাকাডেমির প্রেসিডেন্ট স্বয়ং। এবং তার অনুমোদনের ওপরই সব কিছু নির্ভর। ছবি দেখে তিনি বললেন খুব উঁচু দরের হয়েছে। আমি আশ্চর্য হলাম। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কারণ অরিজিন্যাল ছবি থেকে কপি করা যে কি দুরূহ কাজ তা বলে বোঝান যায় না। বিশেষতঃ অন্য এক শিল্পী অঙ্কিত ছবির টোন, খুঁটিনাটি এবং সামগ্রিক ভাব আনা বেশ শক্ত।

এই বিলেত যাত্রার পেছনের কাহিনী বলি। মহাত্মা গান্ধী ও আরউইন চুক্তির সদিচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ ভাইসরয়েস হাউস সাজাবার জন্যে এবং লণ্ডনের বাকিং-

শিল্পীর একটি স্টাডি
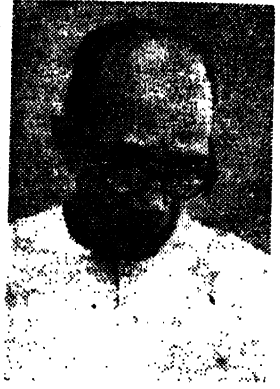
হাম প্যালেসে ও উইন্ডসর ক্যাসেল-এ রাজা-রানীর ছবির অনুকৃতির জন্য সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে কয়জন শিল্পীকে বিলেতে পাঠান হয়েছিল অতুল বসু ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এটি ছিল তার দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রা। বৃটিশ রাজত্বে রাজধানীতে ভাইসরয়ের আবাসে লর্ড ও লেডী উইলিংডনের শিল্পীকৃত অনুকৃতিও যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল সেকালে।

তেলরঙের জমাটি ন্যুড স্টাডিগুলোও সুধর্ক এবং শিল্পরসাসৃত। রূপান্তরে কোথাও জড়তা বা অতিরঞ্জন নেই। বাস্তবের যথার্থ রূপারোপে শিল্পগুণ সমৃদ্ধ। এমনকি প্রতিকৃতির ক্ষেত্রেও অঙ্কিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব আরোপ এতই জীবন্ত যে মনে হয় স্পর্শ করলে রক্ত মাংসর ভেতর থেকে বুঝি হৃৎস্পন্দন শোনা যাবে।

অতুল বসুর চিত্রকল্পে প্রত্যক্ষ প্রকৃতি ও জীবনের দ্বৈত সংবেদন রয়েছে। একদিকে খেটে খাওয়া নিপীড়িত সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের সুখদুঃখময় জীবন-কথা ভাষা পেয়েছে—সাথী, ঝড়ে একলা-মাঝি, [illegible] সাধারণ মেয়ে, টিবেটান, টিটাবিট, [illegible], কমরেড, ইত্যাদি চিত্রে। আর আশা [illegible]র—১৯২১ সালে অঙ্কিত 'ধ্বংসের ডাক' দীর্ঘকাল রসিকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আবার অন্যদিকে লিওনারদো দা ভিঞ্চির মত অন্তরঙ্গ প্রকৃতিপ্রেম চিত্রলেখার প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে গ্রামাঞ্চলের দৃশ্যাবলী, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও পদ্মাবক্ষের ওপর অঙ্কিত চিত্রমালা উল্লেখ্য। ১৯৩৪ সালে পিতৃ বিয়োগের পর শোকাহত শিল্পী রঙ তুলি ব্যাগে পুরে দার্জিলিংএ যান। এবং সেখানে বসেই অনিন্দ্যসুন্দর তুষারশুভ্র দেবাদিদেব হিমালয়ের বিভিন্ন রূপ ধরেন কাঞ্চনজংঘা সিরিজের চিত্রাবলীতে। ১৯১৮ সালে আঁকা 'থ্রু মাই উইন্ডো'—মেঘলা দিনের একটি সজল ছবি—এখনও আমাদের মনকে আসন্ন-বরষা বিরহে ব্যাকুল করে তোলে। আরও অজস্র ছবি শিল্পীর তুলিতে প্রাণ পেয়েছে। তার সব নাম উল্লেখ্য এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত ব্যর্থ ক্লান্ত মানুষের দুঃখময় দিকটাই অতুল বসুর শিল্পলোকে যেন বেশি মাত্রায় আলোকিত। তাঁর স্টুডিও ঘরের প্রবেশ-পথের সামনের দেওয়ালে একাংশ জুড়ে সজ্জিত সেই বিশাল (৪৮"×৬০") তৈলচিত্রটির কথা ধরা যাক। সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে মৃতা মা পথের ধারে পড়ে। হাড় জিরজিরে কয়েকটি মানুষ মৃতদেহকে ঘিরে। তাদের শুকনো বিবশ মুখে অসহায়তা ও উৎকণ্ঠা। কোটরাগত দৃষ্টিতে নিশ্চিত মৃত্যুকে ঘিরে এক করুণ জিজ্ঞাসা। ছবিতে শিল্পী যেন প্রত্যক্ষ অনুভূতির সব শোক উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। আবার বৃহৎ বৃক্ষরাজির পল্লবিত শাখা-প্রশাখার ফাঁক দিয়ে বিচ্ছুরিত সূর্যালোকের ভিতর দিয়ে তিনি নতুন করে বাঁচার আশায়ও প্রদীপ্ত হয়েছেন।

চিত্রটির বিষয়-বস্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিল্পী বলেছিলেন—সেটা ১৯৪৩ সাল। সারা দেশ জুড়ে মন্বন্তর। মাগো ভিক্ষা দাও, ফ্যান দাও বলে, মানুষ চিৎকার করে ফিরছে দুয়ারে দুয়ারে। সেই সব ক্ষীণ করুণ কণ্ঠের ধ্বনি আমায় আঘাত দিত প্রতিনিয়ত। অস্থিসার সেই সব মানুষের অনেক ছবি এঁকেছি। কিন্তু একদিনের একটি দৃশ্য আমার সমগ্র উপলব্ধির মূলে সজোরে আঘাত হানল। সকালবেলায় থলি হাতে বেরিয়েছি বাজারের পথে। ক্যানভাসের দিকে অঙ্গুলি তুলে বললেন—বাড়ির অদূরে চোখ ঐ দৃশ্য। স্থির থাকতে পারলাম না। বাড়ি ফিরে এসে ক্যানভাসের বুকে ফুটিয়ে তুললাম সে বেদনার ছবি। ছবিটির নাম—'পাছে ভুলে যাই'।

অতুলবাবু বাস্তববাদী শিল্পী। চোখে দেখা হুবহু বাস্তবতা স্থান পেয়েছে সৃজনে। স্বপ্ন কল্পনার রঙীন বিলাস স্পর্শ বিরল। আলো ছায়া সঘন সত্যের রূপারোপ দিনের আলোর মত স্পষ্ট। সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ রীতিতে রচিত চিত্র কিন্তু কোথাও কখনও স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাকটস বা ফটোগ্রাফি হয়ে ওঠেনি। এখানেই অতুল বসুর স্বকীয় মুন্সীয়ানা। সার্থকতা। সাদৃশ্য ধর্মী হয়েও ছবির মত ছবি করা যায় এই বিশ্বাসে সংস্কার বিমুক্ত হয়ে প্রত্যক্ষ রূপ রহস্যকে চিত্রায়ণের সাধনায় আজীবন ব্রতী ছিলেন। বস্তুতঃ ওঁর খ্যাতিসম্পন্ন বেশির ভাগ ছবি এই পদ্ধতিতেই দু এক ঘন্টার মধ্যে আঁকা। এ অর্থে অতুলবাবু দৃষ্ট প্রতিরূপের চিত্রকর।

ছবির আঙ্গিক পাশ্চাত্যরীতির অনুসারী। সম্পূর্ণ প্রথাগত ব্যাকরণ সম্মত উপায়ে ছবি আঁকতেন। সে সময়ে এটা একটা দুঃসাহস ছিল বলা যায়। কারণ তখন অবনীন্দ্রনাথ 'অনুসৃত নব্য বঙ্গীয় চিত্রশৈলীর প্রভাব এতই ব্যাপক এবং গভীর যে অন্য পন্থা অবলম্বনের কথা তখন অলীক স্বপ্নের ক্ষিতীন মজুমদার প্রমুখ অবনীন্দ্র অনুসারীরা তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। একমাত্র যামিনী রায় এই প্রভাব বিমুক্ত হয়ে লোকশিল্পকে মূলধন করে পথ পরিক্রমা শুরু করেছিলেন। আর অন্যদিকে অতুল-বসু যাত্রা করেছিলেন বিদেশী চিত্রাঙ্কন ধারাকে অবলম্বন করে। এজন্যে সারা জীবন তাঁকে বিরুদ্ধ সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীকে বলেছিলেন—আমার কাছে তুমি বিধর্মী হতে পার। অধার্মিক নও।

বিজয়া বিশিষ্ট কবি

চব্বিশে জুনের অমৃতে কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের ছবিসহ কবিতা ও কবি-পরিচিতি দেখলাম। অমিতাভ দাশগুপ্তের লেখা কবি পরিচিতি পড়ে আশ্চর্য হলাম। বিজয়া মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট আধুনিক মহিলা কবি। কিন্তু পরিচিতিতে কবির প্রায় কোন বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরা হয়নি, এমনকি প্রকাশিত কবিতা দুটি সম্পর্কেও না। লেখিকা আগে যেহেতু দাশগুপ্ত ছিলেন সেই কারণে অমিতাভবাবুর কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই তো? অথবা আজকাল মহিলারাও বেশ ভালো লিখছেন—এই কারণেই কি তাঁর ওই দায়সারা লেখা? —নির্মাল্য চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-১৯।

একটাও কবিতা নয়

ইদানীং 'অমৃত' নতুন কবিদের দিকে নেকনজর দিচ্ছে, এ নিয়ে বিস্তর প্রশংসা-পত্র-টত্র দেখতে পাচ্ছি। খুব ভাল কথা—অমৃতে নতুনদের নিয়ে ভাবছে-টাবছে—শুনেও আনন্দ। সম্প্রতি দু-একজন কবির ছবি-টবি ছাপিয়ে পরিচয়নামা প্রকাশ করে সেতো এলাহি কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। কথা সেটা নয়। ব্যাপার হচ্ছে যেসব কবিতা বেরুচ্ছে তার কটা কবিতা? এ সংখ্যায় যথারীতি বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের ছবি, পরিচয়সহ দুটি কবিতা উপহার পেলাম। 'এমনি করেই লেখো' এবং 'কোনদিকে' এর একটাও কবিতা নয়। প্রথম কবিতাটি 'উপদেশামৃত'। 'কোন দিকে' লিখতে গিয়ে কবি কবিতা ছাড়িয়ে যে কোন দিকে ছুটেছেন—বোঝা যাচ্ছে না। এটির খণ্ড খণ্ড লাইনগুলি যোগ দিলে নিঃসন্দেহে তৃতীয় শ্রেণীর কোনও প্রবন্ধের লাইন হতে পারতো। নাকি যেহেতু লেখাটা বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের, তাই কবিতা হোক চাই না হোক—ছাপতেই হবে।—কমল কুমার দত্ত, ফকির চক্রবর্তী লেন, কলিকাতা—৭০০০০৬।

মিসা ১৯৭৩

শ্যামল রায়

হরিদাসবাবু বাইরে গেলেন। আমার যাবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আর প্রবৃত্তি হলো না। আমি বসে থাকি। একটি ছেলে আমার দিকে এগিয়ে এল। 'কি কথা বলছ ওর সংগে'।

'এই গল্প করছিলাম।'

'এখানে মুখ খুলবে না। লোক থাকে।'

বাইরে একটা বাস্ততা একটা বুটের আওয়াজ এগিয়ে আসে আমাদের দিকে। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি এক মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা লক আপের ওপর আছড়ে পড়েন। পাশে একটি তরুণ ছেলে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একজন অফিসার বললেন, 'দেখুন, ছেলে ভিতরে আছে কিনা।' ভদ্রমহিলা উদভ্রান্ত। কাঁচা পাকা চুল সবাতে তাঁর চোখ দুটো দেখলাম। ভাসা আয়ত দুটি চোখে দৃষ্টি নেই। একটা বিহ্বলতা নড়ছে চড়ছে, লক আপের ভিতর কি খুঁজছে। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অফিসারটি বললেন, 'এবার চলুন আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন। আমার মায়ের বয়স এখন ৬৫।

তরুণ ছেলেটিকে নিয়ে মহিলাটি চলে গেলেন। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, পুলিশেরা ধাক্কায় হয়তো ভদ্রমহিলাকে লক আপের ওপর আছড়ে ফেলেছে। কিন্তু এখন দেখলাম, না! কে ওকে ঠেলে দিল? কে ওকে আছড়ে ফেলে দিল মাটিতে? হরিদাসবাবু ফিরে এলেন। মাথা ভেজা, গায়ে কিছু জল লেগে আছে। বুঝলাম, আমাদের চিরুনী, গামছা, সাবান বা আয়নার কোন বালাই নেই। ভিতরে ঢুকেই বললেন, 'কি ব্যাপার'?

আমি বললাম, এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন তাঁর ছেলেকে খুঁজতে।

হরিদাসবাবু ম্লান হাসলেন। 'সে কি তার আছে! এ নিত্যকার দৃশ্য মশাই। থাকুন, সব দেখতে পাবেন।'

বড় রাস্তা দিয়ে একটা দমকল ছুটে যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে। মাইকে হিন্দী ফিল্মী গান ঘুলঘুলি দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ছে। হরিদাসবাবু বললেন, 'মাথাটা ধুয়ে এলাম মশাই। গায়ে জলটল দিয়ে এলাম আর তো হবে না। আপনি এবার উঠুন।'

আমি বললাম, 'থাক!'

'কষ্ট হবে'।

'ও আমার অভ্যাস আছে।'

আবার একটা হই হই চীৎকার। কনেষ্টবল ছুটে এসে লক আপের কাছে দাঁড়াল। একটি ছেলেকে ধরাধরি করে আনা হচ্ছে। ওরা লক আপের মুখে আসতেই দরজা খুলে গেল। একটি কুড়ি বাইশ বছরের ছেলেকে ওরা ভিতরে শুইয়ে দিয়ে গেল। ছেলেটির নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। হাত ও পায়ের কোথাও কোথাও ফেটে গিয়ে ঘা হয়ে আছে। ফুটে গিয়ে টানটান হয়ে আছে মুখ। লক আপের ভিতরের সবাই ছুটে এসে ওঁকে ঘিরে ধরল।

॥ ২ ॥

ওদের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, 'সরে যান একটু বাতাস লাগুক।' ছেলেটি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। নড়াচড়া করবার শক্তি নেই। ওর মুখে জল দেওয়া হচ্ছিল। কয়েকজন ছেলেটির হাত-পা ঢেনেটুনে দিচ্ছিল। ওতে ছেলেটির আরাম বোধ হচ্ছিল বলে আমার মনে হল না। মাঝে মাঝে কঁকড়ে উঠছে। ওর মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ হচ্ছিল, ও কিছু বলতে চাইছে। বলার আছে কিছু। আমার মনে হচ্ছিল, এখানে আমরা যারা আছি, কেউ চোর নয়। পকেটমার নয়। বেশ্যার দালাল নয়, সবাই কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। লক-আপ খোলার শব্দ হল। দুজন কনেষ্টবল নিয়ে ও-সি ঢুকলেন। সবাই একটু সরে দাঁড়াল। ওরা ছেলেটিকে তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল। লক-আপের ভিতর সবাই চুপ। মৃত্যুর মুখোমুখি সবাই নিজের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি এক কোণে গিয়ে বসলাম। হরিবাবু আমার পাশে এসে বসলেন।

'কি ব্যাপার বলুন তো মশাই।'

আমি বললাম, 'ছেলেটি কে?'

'আরে আমাদেরই ছেলে, কাল এই লক-আপে ছিল।'

'আমাদের মানে।'

'মানে এই লক-আপের।

'এখানে ছিল।'

'হ্যাঁ। কাল রাতে দুটোর সময় নিয়ে গেছে আমার সঙ্গে কত গল্প করেছে। দু মাসের ওপর থানায় থানায় ঘুরছে। এক এক লক-আপে এক এক নাম। কেউ খবর পায়নি। ধরা পড়ার পর বাড়ির কারো মুখ দেখেনি। কি অদ্ভুত ব্যাপার বলুনতো।'

কি করে ছেলেটি?

'পড়াশোনা করে—কি একটা কলেজের নাম বলেছিল।'

'[illegible]'

'এন্টালী—আমার মনে হয় কি জানেন।'

'কি?'

'ছেলেটি আপনাদের পার্টির।'

'হতে পারে।'

'এরকম একটা কেস দেখেছিলাম, একান্তরে।

ছেলেটির শরীরের কোথাও হাত দেবার জায়গা ছিল না।

'আপনি একাত্তরে ধরা প— ছিলেন?'

না হলে বলছি কি?'

ধরা পড়েছিলেন কেন?

সে এক অন্য কেস।

কি কেন?

গাঁজা। সামাল দিতে পারিনি।

'কতবার ধরা পড়েছেন—'

'বহুবার। কালা কোন আইন নেই, যা খাটিনি।

'ঠিক আছে। যা বলছিলেন বলুন।'

'সেই ছেলেটির সমস্ত শরীর ফুলে গিয়েছিল। ভিতরে হয়তো অনেক হাড় ভেঙ্গে ছিল। সে কিছুই করতে পারতো না। মাথার চুল জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। হাতে পায়ের নোখ ছিল না। ঠোঁটে কপালে পোড়া ঊল্কি।'

আমি বললাম, 'থাক। আর বলতে হবে না।'

আবার লক-আপ খোলার শব্দ হল। কাল যে ইনস্পেকটর আমাকে এখানে রেখে গিয়েছিল তাকে — । উনি লক-আপের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'— স্যার চলুন।' বলে আমাকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। হরিবাবু বললেন, 'আজই আপনার প্রথমদিন।'

আমি হেসে মাথা নাড়ি। আনকোরা বলে নিজেরই লজ্জা হচ্ছিল।

'যান। দেখুন কি হয়।'

আ— জামা আর সেই — জুতো জোড়া এককোণে রেখেছিলাম। সেটা আনতে যেতেই। ইনস্পেকটর বললেন, 'ওদিকে কি?'

'চটি নেবো।'

'চটি ছাড়।....চটি নেবো।'

— পরে সেই ইনস্পেকটর আবার ধমকে উঠলেন। 'প—'

'কি হয়েছে!'

'ঠিক আছে—আইন— ব্যবস্থা হচ্ছে।'

আমি তার দিকে এগিয়ে যাই। ইনস্পেকটর আমার গায়ে হাত বোলাতে থাকেন। 'চটি ছাড়া হাটতে পারো না.......(ছাপার অযোগ্য) 'বিপ্লবী'। দুটো কনেস্টবল — কো— দড়ি বাঁধতে থাকে। দড়ির একদিকে গোল করে ছেলে দাঁড়া এটা কি ভালো দেখাচ্ছে? কি দরকার ছিল বাবা দেশ উদ্ধারের।'

আমি চুপ করে থাকি। দড়ি বাঁধা শেষ হলো। ওরা আমাকে — বলো। আমি — পাশাপাশি — অফিস ঘরে চলে আসি। ওরা কাগজপত্রে কি সব সইটই করে। কাজ শেষ হলো। আমরা থানা থেকে বেরিয়ে আসি। বাইরে মুক্ত বাতাস। বুক ভরে নিশ্বাস নেই। থানার বাগানে ফুল ফুটেছে। রাস্তায় পথচারী। অফিস যাত্রীরা বেরিয়েছে। ট্রামে-বাসে ভিড়। কয়েকটি ছোট্ট মেয়ে দূরের মাঠে খেলছিল। রাস্তার ওপর একটা এম্বাসেডার দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভার বসে আছে ভিতরে। সামনের দিকে ইনস্পেকটর উঠলেন। পেছনের দিকে প্রথমে একজন কনস্টেবল উঠে বসল। তারপর আমি। তারপর দ্বিতীয় কনস্টবল। গাড়ি ছেড়ে দিল। সে কথায় পরে পরে আসছি।

একটু আগে জাঙিয়া টেনে খুলে ওকে উলঙ্গ করা হয়েছে। ছেলেটি উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চশমা পরা ছেলেটি চেয়ারে বসে। কনেস্টবল আর আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। মাথার ওপর পাখ ঘুরছে। নির্জন স্তব্ধতা। হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে গেল। ইনস্পেকটর ব্যস্তভাবে ঢুকলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার! আপনি দাঁড়িয়ে কেন—বসুন।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

'ঠিক আছে কি মশাই, বসুন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

আমি বললাম, 'ওকে বসতে দিন।'

'কাকে?'

—'যাকে উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।'

'ও নিশ্চয়ই। আরে তুমি দাঁড়িয়ে কেন বসো।'

কনেস্টবল বলল, 'কোথায় বসবে স্যার।'

'দুটো চেয়ার নিয়ে এসো।'

কনেস্টবলটি বেরিয়ে গেল। বুঝতে পারলো না ছেলেটি কি করে উলঙ্গ অবস্থায় চেয়ারে বসে চা খাবে।

ইনস্পেকটর বললেন, আপনাদের চাটা খাওয়া হয়েছে তো!' আমরা চুপ করে থাকি। 'হয়নি, এরা যে কি করে।... দাঁড়ান ও আসুক।' আমি বললাম, ওকে কিছু একটা পরতে দিন।'

'কাকে।'

'আমি উলঙ্গ ছেলেটিকে দেখিয়ে দিলাম। ইনস্পেকটর টেবিল চাপড়ে হেসে উঠলেন। 'কেন খারাপ লাগছে। ওতে কি আছে মশাই। ও আমার—আপনার সবার আছে। দেখি না, বেশ লাগছে।'

আমি বললাম, 'তা হোক। ওকে কিছু পরতে দিন।'

'দেবো দেবো। ব্যস্ত হবেন না দেবো।'
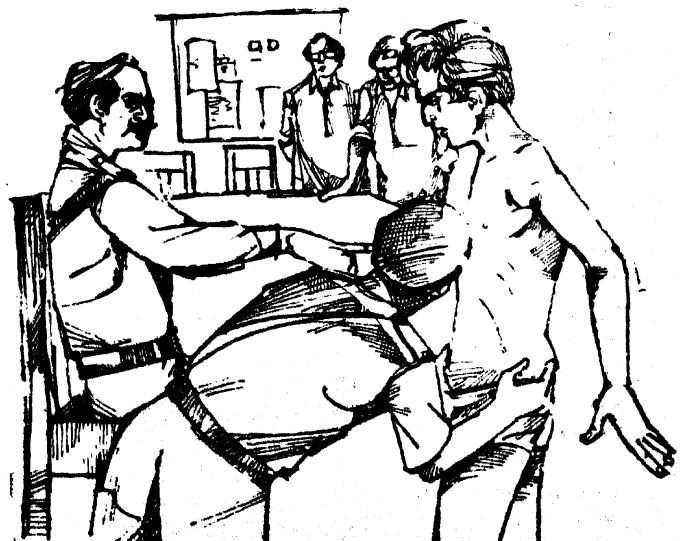
কনেষ্টবল দুটো চেয়ার নিয়ে এল। আমরা তিনজন চেয়ারে বসলাম। আমি ইনস্পেকটর আর উলঙ্গ ছেলেটি। এই সময় একজন অফিসার ঘরে এলেন। বললেন, 'কি ব্যাপার ? কি হচছে ? এরা চাটা খেয়েছে।' কনেষ্টবলটি বলল, 'না স্যার ?' 'নিয়ে এসো। শোন কিছু খাবার নিয়ে আসবে। এরা কখন থেকে বসে আছে, খিদে পেয়ে গেছে।....কি, পাচছে না ?

আমরা চুপ করে থাকি। কনেষ্টবলটি বেরিয়ে যাচ্ছিল। অফিসারটি বললেন, 'একটা চেয়ার দিয়ে যা।' অফিসার আমাদের দেখতে লাগলেন। ভুরু নাচালেন।

উলঙ্গ ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন লাগছে ?'

ছেলেটি মাথা নীচু করলো। এক পা দিয়ে অন্য পা ঘষতে থাকলো। এবার আমি লক্ষ্য করলাম। ও স্বাভাবিকভাবে পা দুটো নাড়াতে পারছে না। বসতে পারছে না। জায়গায় জায়গায় ফেটে গিয়ে কালো হয়ে আছে। শুকনো রক্তের একটা কালো দাগ ওপর দিক থেকে পা বেয়ে নীচের দিকে নেমে এসেছে। গোড়ালির কাছে কিছুটা জমে শেষ হয়েছে।

অফিসার বললেন, 'আমরা জানি. ও'র কাছে একটা থ্রি-এইট আছে। কিছুতেই বলছে না। কথাই বলে না। কি অবস্থা দেখুন। আপনারা একটু বুঝিয়ে বলুন। না হলে তো ওকে ছাড়বে না।

চা সিঙ্গাড়া এলো। অফিসারটি টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিতে বললেন। 'খান। ওকে আরো দুটো দাও।' বলে উলঙ্গ ছেলেটিকে দেখিয়ে দিলেন। কনেষ্টবল তাই দিল। আমরা খেতে শুরু করলাম।

'দেখুন, এখানে এলে যে যা জানে বলতে হবে....এটাই নিয়ম। না বললে বলাবো। যে করেই হোক বলাবো। কেন তবে কষ্ট পাওয়া। যে যা জানেন বলবেন কিছু আর্মস পাইয়ে দিন। কিছু ছেলে ধরে দিন।....খালাস। এই পরিষ্কার কথা আপনারা কেন বোঝেন না। বলে হাওয়াই সার্টের বুক থেকে চারমিনারের প্যাকেট বার করলেন। একটা সিগারেট টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, 'আপনাদের নেতারা এই ব্যাপারটা ভালো বোঝে।

সাধন সরকার তো সব বলেছেন। তাছাড়া চারুবাবুও কিছু লুকোননি। আসলে কি জানেন, শিক্ষার একটা মূল্য আছে ...যে যাই বলুক মশাই। উনি এবার প্যাকেটটা আলতো করে আমাদের দিকে ছুড়ে দিলেন। 'খান।'

আমি আর চশমা পরা ছেলেটি সিগারেট তুলে নিলাম। অফিসারটি দেশলাই জ্বালিয়ে আমাদের সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। নিজে ধরালেন।

'আপনারা তো সিগারেট লক-আপে পান না।'

'না।'

'লুকিয়ে খেতে হয় ?'

'হ্যাঁ।'

'দেখতে পেলে কি করে ?'

'জানা নেই।'

অফিসারটি এবার ইনস্পেকটরকে বললেন—'নিন। এবার ওকে নিয়ে শুরু করুন।'

ইনস্পেকটর কাগজপত্র ঠিক করতে লাগলেন। তাঁর পর ছেলেটিকে বললেন. 'আর কি হবে—এবার বলে ফেলুন। দু-চার শব্দের একটি কথা। কোথায় আছে ? কার কাছে আছে ?'

উলঙ্গ ছেলেটি চুপ করে বসে রইল। চোখ দুটো ভেতর দিকে ঢুকে আছে। মাথার চুল জট খাওয়া। একমুখ দাড়ি। গায়ে পলি মাটির মত আস্তরণ নিয়ে বসে রইল।

'বলুন কোথায় ?'

ছেলেটি বসে রইল।

অফিসারটি বললেন ওকে তুলে নিন। ইনস্পেকটর বললেন, 'উঠে আয়।'

ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো। তার পরে একটা চীৎকার। বসে পড়ল। আস্তে আস্তে শরীর এলিয়ে দিল মাটিতে।

অফিসারটি বললেন, 'ও নকসা। তুলুন,' ইনস্পেকটর আর কনেষ্টবল গিয়ে ওকে তুললো।

ছেলেটি দাঁড়াতে পারছিল না। ওকে ওরা দেয়ালের দিকে নিয়ে গেল। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ওকে দাঁড় করিয়ে দিতে চেষ্টা করলো। অফিসারটি ইনস্পেকটরকে ডেকে কি বললেন। ইনস্পেকটর বাইরে চলে যেতেই একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেলেন। হাতের নাড়ি দেখলেন। চোখ দেখলেন তারপর ঘর থেকে বারিয়ে গেলেন।

'দেখলেন। এসবের কোন মানে হয়। ওর দাঁড়াতে না পারায় কি হয়েছে.... কিরে ? কি হয়েছে তোর।'

ছেলেটি আস্তে আস্তে উপুর হলো। কি রকম একটা শব্দ হচছে ওর মুখ দিয়ে। চশমা পরা ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। অফিসার বললেন, 'আপনি বসুন। কিছু হয়নি ওর...শুরু থেকেই এ রকম করছে।

দরজা খুলে গেল। ইনস্পেকটর এলেন। সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক। বেঁটে, ফর্সা, মুখে শিশুর মত হাসি। ইনস্পেকটর অফিসারকে কি বললেন। অফিসার হাসলেন। ইনস্পেকটর কনেষ্টবল আর নতুন ভদ্রলোক ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেল। হাত-পা ধরে ওকে তুলে নিয়ে এসে বসালো চেয়ারে। ছেলেটি চেয়ারে বসে সামনের দিকে একবার তাকালো। চোখে সেই ঘোলাটে দৃষ্টি। একটা হাত ওপরে তুলে জল চাইল।

'মুখে বল।'

'ছেলেটি হাত তুলল।'

'মুখে বল—পাবি।'

'ছেলেটি হাত তুলল।'

অফিসার কনেষ্টবলকে বললেন, পাখাটা বন্ধ করে দিতে। পাখা বন্ধ হয়ে গেল। এবার নতুন ভদ্রলোকটি ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেলেন। মুখে সেই হাসি। তারপর চুলের মুঠি ধরে একবার দুলিয়ে নিয়ে একটা টান দিলেন। কিছু চুল তার হাতে উঠে এল। আবার। কিছু চুল উঠে এলো। ছেলেটি টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল।

চশমা পরা ছেলেটিকে বললেন, 'ওকে তুলুন। ছেলেটি ছুটে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। অফিসারটি আমাকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন।

চশমা পরা ছেলেটি ওকে টেনে তুলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। অফিসারটি বললেন, 'থাক। ওরে থাক। এবার একটা কাজ কর। ওকে বলতে বল 'কোথায় আছে, কার কাছে আছে।'

চশমা পরা ছেলেটি ওর মুখের কাছে মুখ নিতেই ইনস্পেকটর এক লাথি মেরে ওকে দূরে সরিয়ে দিল। ছেলেটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। চশমাটা ছিটকে পড়ল দূরে। ছেলেটি ধীরে ধীরে চশমাটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'কি বলছিলি ওকে ?'

'কিছু নয়।'

'ওর মুখের কাছে মুখ নিয়েছিলি কেন ?'

'ছেলেটি চুপ করে রইল।'

'বল।' বলেই ওর তলপেটে একটা লাথি মেরে চেয়ার সমেত উল্টে ফেলে দিল।

ওর কপাল আর চিবুক কেটে রক্ত পড়ছিল। চশমাটা ভেঙে গেছে। জামাগুড়ি

দয়ে সেটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল ও।

'কি বলছিলি?'

'কিছু নয়। ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। মুখ দিয়ে।'

'তাতে তোর কি? তুই মরলে ও বাঁচাবে? তোদের সব দাদারা গেল কোথায়? বাঁচাচ্ছে?

ছেলেটি চুপ করে থাকে।

তোদের আমরা মারতে পারি, কাটতে পারি।

হাওয়ায় মিলিয়ে দিতে পারি।...পারি কিনা?'

অফিসারটি চশমা পরা ছেলেটিকে বললেন, 'নিজেরটা আগে সামলান—পরের ভাবনা পরে ভাববেন। এতদিন তো ভাবলেন, হলটা কি?' তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিছু হয় না।'

উলঙ্গ ছেলেটি পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। ইনস্পেকটর পা দিয়ে ওকে চিৎকরে শুইয়ে দিলেন। নতুন ভদ্রলোকটির মুখে হাঁস লেগেই আছে। কি সুন্দর মুখ। অফিসারটি বললেন, 'ঝোলাও।'

কনস্টেবলটি বাইরে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর একটা টেবিল দুজনে ধরাধরি করে ঘরে ঢুকলো। টেবিলের উপর কিছু দাঁড় একটা রড। ঘরের ভিতরে যে টেবিলটা ছিল তার পাশে সমান ব্যবধানে টেবিলটাকে রাখা হল। কনেস্টবল আর নতুন লোকটি ছেলেটির দুই হাতের কব্জিতে শক্ত করে দড়ি বাঁধলো। পা দুটো জড়ো করে গোড়ালির ওপরে বেঁধে নিল। তারপর দুই হাতের মাঝখান দিয়ে জোড়া হাঁটুর ঢুকিয়ে নিল। জোড়া হাতের ওপর দিয়ে, জোড়া হাঁটুর নীচ দিয়ে একটা রড ঢুকিয়ে দিল। নিটোল পরিপাটি ব্যবস্থা। রডের দুই দিক দুই টেবিলের ওপর রাখা হল। ছেলেটি ঘুরে উল্টে গেল। তার দু পায়ের তলের দিকটা ওপরের দিকে উঠে গেল। মাথাটা নীচের দিকে। ছেলেটা ঝুলতে থাকে। ওরাও একটু দুলিয়ে দিল। উলঙ্গ ছেলেটা দুলতে লাগলো।

(চলবে)

কাপ্তেন মোনা

রেড রোড দিয়ে জুড়িগাড়ির ঘোড়া ছুটে চলেছে ঝড়ো হাওয়ার মত। লাগাম ধরে গুনগুন করে গান গাইছে মনোরমা--'ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি উড়ে গেল আর এল না।' মাথার চুলগুলো কালোমেঘের মত পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে। চৈত্রের বিকেলের হাওয়ায় অবাধ্য চুলের রাশি মুখ-চোখ ঢেকে দিচ্ছে। পড়ন্ত রোদের আলোয় মনোরমার গলার হীরের হার বিদ্যুৎ ছড়াচ্ছে। বেনারসীর আঁচলা আর পাড়ের জরী চিকমিক করছে। জুড়ির তেজী ওয়েলারের খুরের নীচে চকমকির আগুনের ঝিলিক। মনোরমার পাশে প্রাপ গায়ের ওপর গা এলিয়ে ক্যারেটের নেশায় বুঁদ হয়ে বসে আছে তার মনের মানুষ। সেদিনের রঙ্গমঞ্চের এক দুর্ধর্ষ নায়ক। ঘোড়ার খুরের ছন্দোবন্ধ আওয়াজে এই মুহূর্তে নায়কের মনে হচ্ছে জীবনটা একটা বিরাট শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের কলকাতা। জুড়ি গাড়ির লাগাম ধরে উড়ে চলেছে অভিনেত্রী মনোরমা। আদুরে নাম কাপ্তেন মোনা। গাড়ির সওয়ার কর্ণার্জুনের দুঃশাসন, আলম-[illegible]। মনোরমার জীবননাট্যের একমাত্র নায়ক।

জুড়ি গাড়ির পাক্ষিরাজ দুটো ছুটছে। ওদের চওড়া চোয়ালের দুপাশ বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। মোনার বকুনি খেয়ে বাধ্য ওয়েলার ছুটে চলেছে রেড রোড ধরে আউটরামের দিকে। গড়ের মাঠে সায়েবদের ছেলে-মেয়েরা খেলা ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে উদ্ধত অভিনেত্রী কাপ্তেন মোনার দিকে। রেড রোডের প্রায় শেষ বরাবর এসে লাগাম টেনে ধরল মোনা। সামনেই গোরা সান্ত্রীর পোস্টিং। সান্ত্রীও এগিয়ে আসছে। গাড়ি থামিয়ে মোনা বাঁ হাতে লাগামের রাশ টেনে রেখে পাশে বসানো কাঠের ছোট বাক্সটা খুলে কয়েকখানা নোট বের করে সান্ত্রীর হাতে দিল। এটাই ছিল তখনকার দিনের ইংরেজ সরকারের আইন। রেড রোড ছিল তখন শুধুমাত্র সায়েবদের হাওয়া খাওয়ার জায়গা। নেটিভদের প্রবেশ সেখানে ছিল নিষিদ্ধ। ঢুকলেই জরিমানা দিতে হয়। কিন্তু [illegible] কথাই আলাদা। সে তো কাপ্তেন। তাই জরিমানা দিয়েই [illegible] গাড়ি চড়ে নায়ককে নিয়ে সে হাওয়া খেতে যেত নিষিদ্ধ [illegible] রোডে। জরিমানার টাকা দিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত নায়কের গায়ের ওপর। এ খেলায় একটা অদ্ভুত আনন্দ পেতো মোনা।

সরলা ভূমিকায় মনোরমা

মনোরমার জন্ম হয়েছিল বাদুড়বাগান অঞ্চলে আঠারো শো সালের শেষদিকে। পারিবারিক সূত্রে মনোরমা যা পেয়েছিল তা হল গান-বাজনা আর নাচের নেশা আর জীবনটাকে ধুলোর মত উড়িয়ে দেবার একটা অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা। মামার বাড়ির অবস্থা ছিল দারুণ ভাল। দিদিমা ছিলেন বহু অনাসৃষ্টির নায়িকা। স্বভাবে-চরিত্রে সম্পূর্ণ উড়োনচণ্ডী। বিরাট সম্পত্তির শেষ খান ইটখানা পর্যন্ত তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন ফূর্তির ফোয়ারায়। মোনাকে নাচ-গান শিখিয়ে একটা জবরদস্ত বাঈজী করে তোলার ইচ্ছেটাও দিদিমারই। তাই নেপা বোসের কাছে মোনাকে নাচ শেখানোর ব্যবস্থা হল। মাইফেলী নাচের জন্য রাখা হল সীতারামকে। মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক ছিলেন তখন নরেন সরকার। গিরীশ ঘোষও ছিলেন মিনার্ভায়। নেপা বোস মোনাকে নিয়ে একদিন হাজির হলেন গিরীশবাবুর কাছে। সুন্দর ছোট্ট মেয়েটাকে দেখে গিরীশ ঘোষের পছন্দ হল। থিয়েটারের ছোটছেলের ভূমিকায় অভিনয় করতে লাগল মোনা। সখী নৃত্যের মেয়েদের সঙ্গে নাচও শুরু হল মঞ্চে। মনোরমার মঞ্চজীবন শুরু হল এইভাবে।

কিছুদিন পরে গিরীশ ঘোষ মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেলেন। মোনা অবশ্য রয়েই গেল। ১৯০৪ সালে মনোমোহন গোস্বামীর 'সংসার' নাটকে জীবনের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্য দেখাল মোনা। এরপর 'প্রফুল্ল' নাটকে যাদব আর 'বিল্বমঙ্গলে' রাখালছেলের ভূমিকায় সকলকে অবাক করল মোনা। ইতিমধ্যে মিনার্ভা মঞ্চ হাতবদল হয়ে এসেছে মনোমোহন পাঁড়ের হাতে। গিরীশ ঘোষ-অর্ধেন্দুশেখরও আবার ফিরে এসেছেন মিনার্ভায়। ১৯০৫ সালের ৮ এপ্রিল মঞ্চস্থ হল 'বলিদান'। এ নাটকে মনোরমা প্রথম অভিনয় করল একটি পুরোপুরি ভূমিকায়। জ্যোতির্ময়ীর চরিত্র রূপায়ণে অনন্য অভিনয় প্রশংসা পেল গিরীশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখরের। মিনার্ভা মঞ্চের নিয়মিত অভিনেত্রী তখন সুশীলাবালা, হিঙ্গনবালা, তারাসুন্দরী।

১৯০৭ সালে মনোরমা যোগ দিল কোহিনুর থিয়েটারে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি' নাটকে বাহাদুর চরিত্রে সেদিন তার অভিনয়ের কাছে নীরদা সুন্দরীও দাঁড়াতে পারেন নি। কিন্তু কিসের একটা নেশা যেন বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে মনোরমাকে। অভিনয় ভাল লাগে। কিন্তু এই ভাল লাগাটাই যেন সব নয়। সবকিছু উড়িয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে সর্বনাশের নেশার আনন্দ নেই অভিনয়ে। তাই মঞ্চ আর মনোরমাকে ধরে রাখতে পারল না। নাচ আর গানের মদির জগতে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে গেল মোনা। সীতারাম এলেন মাইফেলী নাচের তালিম দিতে। গান শেখানো শুরু করলেন বাজকরাম ওস্তাদ। মজিদ খাঁ, জমিরুদ্দীন খাঁ আর বৈজু ওস্তাদের কাছে একনাগাড়ে
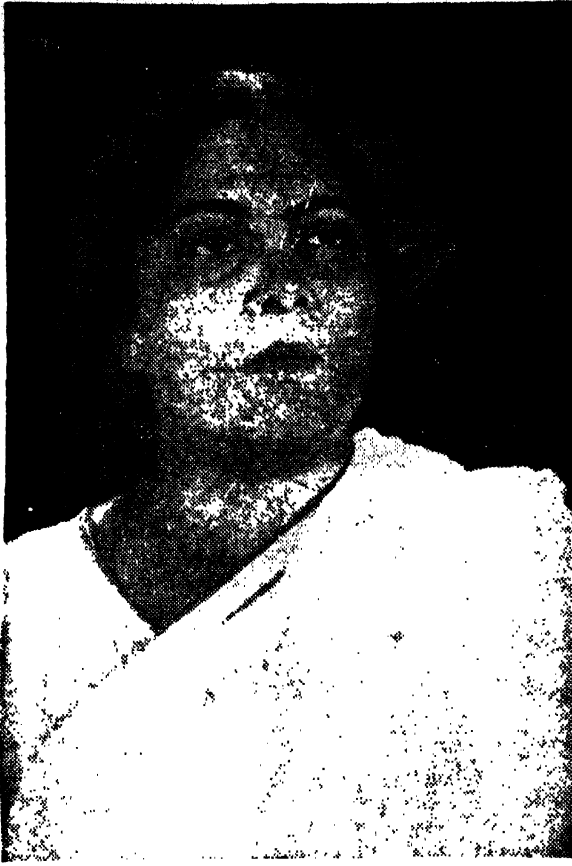
শিখতে লাগল খেয়াল ঠুংরী। কিন্তু অভিনয়ের নেশাটাও কাটিয়ে উঠতে পারছে না মোনা। এখানে-ওখানে থিয়েটার দেখে আর ভাবে এরা কী নিষ্প্রাণ অভিনয় করে। আমাকে অভিনেত্রী হতেই হবে। তবে নিয়মের শেকলে বাঁধা জীবন নয়। অবাধে ডানা মেলে যে জীবনে উড়ে যাওয়া যায় সেই জীবন চাই। এই আকাঙ্ক্ষাই মনোরমাকে টেনে নিয়ে এল ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের দল রয়্যাল ড্রামাটিক ক্লাবে। এই দলের ম্যানেজার বিজয় মুখোপাধ্যায় মনোরমার মত একজন নাচিয়ে-গাইয়ে অভিনেত্রীকে আদর করে ডেকে নিলেন। দল গেল যশোরে অভিনয় করতে। অ্যাটর্নী সুরেন সেনের বাড়িতে তিনখানা পূর্ণাঙ্গ নাটক আর তার সঙ্গে তিনখানা প্রহসন অভিনীত হল। সব কটাতেই মনোরমা প্রশংসা পেল দর্শকদের। সবচেয়ে ভাল অভিনয় হল 'আলিবাবা'র মর্জিনার ভূমিকায়। নাচে-গানে, হাস্যে-লাস্যে মঞ্চে আলোড়ন আনল মোনা।

কলকাতার ভার্সেল থিয়েটারও নানা জায়গায় 'ভ্যারাইটি শো' করে নাম করেছে। মোনা এল এই দলে। এখানেও মোনার মর্জিনা মুগ্ধ করল সকলকে। কিন্তু বাঁধন চায় না মোনা। কিছুদিন এক জায়গায় থেকেই মনে হয়—ভাল লাগছে না। কী এই একঘেয়ে অভিনয় করব রং চং মেখে! সব যেন কেমন নকল, কেন প্রাণহীন। এর চেয়ে অনেক ভাল মাইফেলে চৈতি কিংবা কাজরীর সুরে নাচতে নাচতে বেহুঁশ পুরুষগুলোকে আরও বেহুঁশ, বেবাক করে [illegible] করল। এক রাতে টাকার বান্ডিল এসে পড়তে লাগল মোনা বাঈ-এর পায়ের কাছে। খানা-পিনা আর মদের বন্যা বইতে লাগল।

প্রথমেই বাড়ি কিনল মোনা। রেড লাইট এরিয়ার মনিরুদ্দীন লেনে ঢোকার মুখেই তিনতলা বিরাট মোজাইক করা বাড়ি। মোনা উঠল সেই বাড়িতে। নায়ক এল। পরেশ, দুর্গা চাটুজ্জে, হকিস সায়েবের মত অনেক বড় বড় খানদানী বাবু আসতে লাগল। রেসের মাঠে মোনা নোটের হরিরলুঠ ছড়াতে লাগল। মনিরুদ্দীন লেনের বাড়িতে ফুর্তির ফোয়ারা চলল অবিশ্রাম। টাকার পাহাড় জমে উঠেছে। নায়কের কথায় মোনা তিলজলায় একটা বিরাট বাগান-বাড়ি কিনে ফেলল। মাঝে মধ্যে সেখানে গিয়ে প্রাণঢালা ফুর্তির আসর জমাতে লাগল মোনা। আরও একখানা বাড়ি কিনলে দুর্গা-চরণ মিত্র স্ট্রীটে। নায়কের টাকার দরকার। বাজারে অনেক দেনা। মদ আর রেসে অনেক অর্থ চলে গেছে। কথাটা মোনার কানে যেতেই মোনা ঠিক করে ফেললে মনিরুদ্দীন লেনের বাড়িটা বেচে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে খদ্দের ঠিক হল। বাড়িও বিক্রি হয়ে গেল। সব টাকাটা গোছা করে নায়কের হাতে তুলে দিয়ে অবলীলায় হাসতে হাসতে বললে মোনা—'টাকা কম পড়লে বলো। লজ্জা করো না।' এরপর মোনা চোদ্দ নম্বর মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের বাড়িটা কিনল।

চোদ্দ নম্বর বাড়িতে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ঘুড়ি ওড়াতো মোনা। বিরাট আয়োজন। আগের রাত্রে মাংস এনে রাখা হত। মদ আসত কয়েক পেটি। ভোর থেকেই বড় বড় ডেকচি চড়ত উঠোনের উনুনে। ঠাকুর আসত চার-পাঁচজন। নডবজার থেকে মিষ্টি আসত। মোনাদির ঘুড়ি কাটার জন্যে সমস্ত তল্লাট জুড়ে একটা বিরাট উত্তেজনা দেখা দিত। বড় বড় নাউস ঘুড়িতে একশো টাকার নোট আটকে ওড়াতো মোনা। ঘুড়ির ওপর লেখা থাকত 'যে কাটবে টাকা তার'। হৈ হৈ পড়ে যেত মোনাদির ঘুড়ি কাটার জন্যে। ছাদে আসত বন্ধু-বান্ধব ইয়ার-ফুর্তিবাজের দল। সন্দেশ-রসগোল্লা মদ মাংসের ছড়াছড়ি। দামী বেনারসীতে গাছকোমর বেঁধে ঘুড়ি ওড়াতো মোনা। একটা করে ঘুড়ি কাটত আর মুখের মধ্যে আঙুল পুরে সিটি দিত মোনা। ঘুড়ি উড়ত, কাপ্তেন মোনাও উড়ত তার সঙ্গে।

মোনার সখ-সৌখীনতা ছিল বিচিত্র ধরনের। বেনারসী শাড়ি ছাড়া অন্য কোনও শাড়ি পরত না। আসল জরীর শলমা-চুমকির কাজ করা বিলিতি ব্রোকেডের ব্লাউজ পরত। ছাদে দড়ি টাঙিয়ে বেনারসী শুকোতে দিত জলে কেচে। টাকা ছিল ওর কাছে খোলামকুচির মত। তাই চোদ্দ নম্বর বাড়িতে ভীড়ও হত খুব। মাইফেল বসত রোজ রাত্রে। মক্ষিরানী মোনা। জাজিম, তাকিয়া আর ডিকেন্টারের ছড়াছড়ি। মেঝের ওপর পাতা ব্রসেলস কার্পেটে মাংসের ঝোল আর অ্যালকোহলের দাগ। শম্ভু চাকর ঘনঘন নিয়ে আসছে সোডা-লেমনেড আর ভাজা মাংস। রামবাগান থেকে পরীকে আনা হয়েছে। সে গান গাইছে 'পেতেছি ভাতার ধরার ফাঁদ'। হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে আংটিবাবু। দশ আঙুলে দশটা আংটি। পরীর গান শেষ হতেই ফুর্তিবাজদের মধ্যে একজন উঠে বললে এবার কাপ্তেনের গান হোক আর তার সঙ্গে নাচ। হৈ হৈ করে সায় দিয়ে উঠল মাইফেলের সবাই। মোনা শুরু করলে হোরি ঠুংরী 'মৎ মারো শ্যাম পিচকারী'। ওর গলার সাতনরী মুক্তোর নীচে হীরের লকেটে ঝাড়লণ্ঠনের আলো পড়ে বিদ্যুৎ খেলছে। নেশায় চুর হয়ে তাকিয়া জড়িয়ে শুয়ে আছে ফুর্তিবাজ ইয়ারের দল। এমন এক-একটা রাতে মোনার রোজগার হত দশ হাজার টাকা। কখনো কখনো তারও বেশি।

সখের অন্ত ছিল না মোনার। নিজে ঘোড়ার গাড়ি চালাবে বলে রেসের মাঠ থেকে দুটো ওয়েলার ঘোড়া কিনে ফিটনে জুতে দিয়েছিল। ঘোড়া দুটো ছিল লেসলি সায়েবের। আকাশছোঁওয়া দর হেঁকেছিল লেসলি। কিন্তু মোনা তখন বেপরোয়া। ঘোড়া তার চাই-ই। তাই টাকার কাঁড়ি খরচ করে ফিটনের ঘোড়া দুটো কিনেছিল! রোজ বিকেলে রাজরানীর মত সেজেগুজে রেড রোডে হাওয়া খেতে যেত মোনা ফিটনে চড়ে। নিজেই লাগাম ধরে চাবুক হাতে নিয়ে গাড়ি চালাত। পাশে আধশোওয়া হয়ে ঝিমোতো নায়ক। সেকালের নাট্যজগতের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তিও বলেছেন—মোনার স্বভাব ছিল উড়ো পাখির মত। চরিত্তির বলতে কিচ্ছু ছিল না। খোলা রাস্তায় ফিটনে বসেই বাবুদের সঙ্গে ঢলাঢলি করত। সকালে ছাদের মেঝের নোট শুকোতে দিত। কিন্তু অভিনয়? তার কোনও জবাব নেই। অমন প্রাণঢালা অভিনয় খুব কমই দেখা যায়। তাছাড়া এ লাইনে ধোওয়া তুলসী পাতাই বা কজন আছে বল? সবাই রেখে ঢেকে করে গেছে আর মোনা ছিল বেপরোয়া। ওর স্বভাবটাই ছিল ঝড়ের মত দুরন্ত। তাই যা করত সকলের সামনেই করত। শিস দিয়ে খেমটা গানের সুর ভাঁজত। টাকা ওড়াতো খোলামকুচির মত। কেউ বারণ করলে বলত—'টাকা কী সঙ্গে নিয়ে যাব?'

চোদ্দ নম্বর বাড়ির ফুর্তি বেশি দিন টিকল না। টাকার দরকার মোনার। অনেক টাকা চাই। তাই ও বাড়িটাও বেচে দিল। ৩৬ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে শ্রীমানীদের বাড়ির দোতলাটা ভাড়া নিয়ে সেখানে এসে উঠল মোনা। মাইফেল বন্ধ রইল না। নাচে গানে আর মদে মাতাল মনোরমা। যৌবনের ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে চলেছে কাপ্তেন মোনা। বর্কাস, দুর্গা চাটুজ্যে আর পরেশের মত মধুকরেরা গুঞ্জন করছে। মুজরোয় টাকা আসছে। সর্বনাশের খেলায় মেতে উঠেছে মোনা।

বর্কাস সায়েব একদিন মোনার ঘরে আকণ্ঠ মদ্যপান করে রিক্লাইন চেয়ারটায় শুয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—'কাপ্তেন, আমি কখনো ভালবাসা পাইনি। তুমি আমার সেই অভাবটা পূরণ কর। আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি তোমায়। চল আমরা বিয়ে করে সংসারী হই।' কাট গ্লাসের ডিকেণ্টারে যেটুকু হুইস্কি ছিল একসঙ্গে সবটা গলায় ঢেলে দিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে হাসতে মোনা বললে, 'বর্কাস সায়েব তুমি আর একটু মদ দাও। তাহলে আর এসব কথা বলতে ইচ্ছে যাবে না।' বর্কাস টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে মোনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—'নাও, এবার ভালবাসবে তো? নোটের তাড়াটা হাতে ধরে টেবিলের ওপর থেকে দেশলাইটা নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে মোনা বললে, 'এই দ্যাখো, কত ভালবাসি টাকাকে।' নিমেষের মধ্যে হাজার চারেক টাকা ছাই হয়ে গেল। দু হাতে মুখ ঢেকে উঠে চলে গেল বর্কাস। আর কখনো তাকে মোনার বাড়িতে আসতে দেখা যায় নি।

ধীরেন গাঙ্গুলী পরিচালিত পথভুলে ছবির পোস্টার। এই ছবিতে মনোরমা শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছিলেন।

এমন ঘটনা আরও আছে। চোদ্দ নম্বর বাড়িতে পরেশ আসত মাইফেলে। মোনা তখন সবে মোটর কিনেছে। একদিন কথায় কথায় পরেশ বললে—মোনা, তোমার মত একটা মোটর থাকলে প্রাণঢালা ফুর্তি করতে পারতুম। মোনা কিছু না বলে একটু হাসল। পরের দিন পরেশ সকালে উঠে চা খাচ্ছে, সেই সময় চাকরটা এসে বললে—বাবু, কাপ্তেনদিদি এসেছেন!' পরেশ তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল।

বাইরের ঘরে মোনা সোফার ওপর বসে। পরনে চওড়া লাল পাড় গরদ। কপালে মস্তবড় সিঁদুরের টিপ আগুনের মত জ্বলছে। গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরছে মোনা। পরেশ আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার জন্যে গাড়িটা রেখে গেলুম।' সোফারটাকে এইমাত্তর বিদেয় করে দিয়েছি।' হতভম্ব পরেশ বললে—না, না, মানে, কাল আমি ঠাট্টা করেছিলুম মোনা। আমার গাড়ি চাই না।' মোনা একটু হেসে বললে—'তুমি গাড়িটা না নিলে আমার খুব কষ্ট হবে জীবনভর? আমি কিছুতেই শান্তি পাব না।' কর্ণার্জুনের [illegible] সেই সুস্পষ্ট ভঙ্গী। এবার পরেশ আর না বলতে পারল না। একটা রিকশা ডেকে মোনা তাতে উঠে চলে গেল। বিস্ময়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পরেশ। বাড়ির সামনে মোনার ঝকঝকে নতুন গাড়িটা যেন তাকে বিদ্রূপ করছে।

কাপ্তেনী আর ফূর্তিতে সব খুইয়ে ছিল মোনা। বাবুরাও ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে এল। বেঁচে থাকার তাগিদে মোনা আবার ফিরে এল আর্ট থিয়েটারে। ১৯২৩ সালে আবার কর্ণার্জুনের কুন্তীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করল মোনা। এখানেই চন্দ্রগুপ্তে মুরা, পাণ্ডব গৌরবে উর্বশী, রাজসিংহে উদিপুরী, আবু হোসেনে উন্দাই সখীর ভূমিকায় মনোরমাকে দেখা গেল। এরপর আবার মিনার্ভায়। 'বাঙালী' নাটকে ফ্লোরা, সত্যভামায় রুক্মিনী প্রভৃতি চরিত্রে মনোরমা প্রশংসা পেল। কিন্তু সেই একই ঘটনা। কিসের একটা আকর্ষণ আবার মোনাকে হাতছানি দিতে থাকে। মিনার্ভা একঘেয়ে হয়ে উঠল। মোনা এল মিত্র থিয়েটারে। এখানে আলিবাবার মর্জিনা, বিল্বমঙ্গলে চিন্তামণি, জয়দেবে বিমলা। কিন্তু বাঁধন সয় না। তাই মোনা আবার গেল মিনার্ভায়। সেখান থেকে আবার মিত্র-থিয়েটারে। আবার আর্ট থিয়েটারে। ১৯৩৬ সালে মনোরমা এল নাট্যনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'য় বরদাসুন্দরী, কেদার রায়ে রাণী সুনন্দা। এতেও মন টিঁকল না। স্বাধীনভাবে একটা কিছু করতে হবে এই চিন্তায় পাগল হয়ে উঠল মোনা। শেষ পর্যন্ত শুধু মেয়েদের নিয়ে গড়ে তুলল একটা ভ্রাম্যমান নাট্য-সম্প্রদায়। উত্তর বাংলার বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে অভিনীত হল 'আলিবাবা', 'হীরার ফুল'। এই সময় প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী গহর জানকে মনোরমাই মঞ্চে নিয়ে আসে। অবশ্য এই দল বেশি দিন থাকেনি। মনোরমাও আর পেশাদার মঞ্চে ফিরে যায়নি।

চলচ্চিত্রে নির্বাক যুগে মনোরমার প্রথম অভিনয় জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জয়দেব' চিত্রে সুমতির ভূমিকায়। ১৯২৬ সালের ২৫ জানুয়ারি ছবিটি কাউনে মুক্তিলাভ করে। এরপর নির্বাক চণ্ডীদাসে চাঁপা, রাজসিংহে উদিপুরী, চাষার মেয়ে ছবিতে মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করে মনোরমা।

'বাঙলার মেয়ে' ছবিতে মনোরমা—বাঁদিকে দাঁড়িয়ে প্রথম। সামনে ছবি বিশ্বাস। বসে বাঁদিকে [illegible], ডানদিকে ইন্দিরা

…ইতিমধ্যে বাংলা চলচ্চিত্র কথা বলতে শিখেছে। তেত্রিশ …ন নিউ থিয়েটার্স-এর সীতা ছবিতে কৌশল্যা চরিত্রে দেখা গেল …রমাকে' ছবিটির পরিচালক ছিলেন শিশির ভাদুড়ি। …রমা অভিনীত অন্যান্য ছবি হল—মা, দিদি অভিজ্ঞান, পথের …র, বাঙালী, কাশীনাথ, পথিক, পদস্থলে, রাজকুমারের নির্বাসন, …, আলেয়া, পাষাণ দেবতা, পোষ্যপুত্র, এইতো জীবন, মাতৃহারা, …শুল, সাহেব বিবি গোলাম, মাটির ঘর, শুভদা, শুভযাত্রা প্রভৃতি। …স তলোয়ারের কয়েকটি হিন্দি ছবিতেও মনোরমার অভিনয় …ংসনীয়। কিন্তু পয়সা সে কখনোই রাখতে পারেনি। যা …য়েছে সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছে। অভাবে পড়ে কেউ দশ টাকা …লে তাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলেছে—দরকার হলেই এস। …া করো না।'

মোনার শেষ দিকের জীবন নিদারুণ কষ্টের। ভয়ঙ্কর …র্থকৃচ্ছতা আর নিদারুন অভাবে দিন কেটেছে। কর্নওয়ালিস …ীটের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিল ১৩ নম্বর মসজিদ বাড়ি …্রীটের একখানা অন্ধকার ঘরে। দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে …পাত্ত হয়ে গেছে। ছোট বীণাপাণি (কালো); সেও চলে গেছে …থায়। কখনো কখনো অফিসের থিয়েটারে সস্তা আর্টিস্ট …সেবে অভিনয় করে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা পাওয়া যেত। সেটাও …খন আর নেই। কেউ আর ডাকে না। রূপ নেই, যৌবন নেই, …ই ডাকও নেই। রোজ গঙ্গাস্নান করে মন্দিরে প্রণাম সেরে ঘরে …সে ঢোকে মোনা। পাড়ার মেয়েরা দু-চার টাকা করে দেয়। …তে চলে না।

একজন জিজ্ঞেস করেছিল—কাপ্তেনদিদি তুমি পয়সা জমিয়ে রাখনি কেন? মোনা বলেছিল—'খবরদার আমায় কাপ্তেন বলবিনি। আমি এখন ভিখিরি। বলবি ভিখিরিদিদি।'

পেটের ভেতর একটা অসহ্য যন্ত্রণা হত। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল চারুমোসী। ক্যান্সার হয়েছে ওর পেটে। হাসপাতালেই শুয়ে রইল মোনা। খাওয়া-দাওয়া নেই; মাঝে মধ্যে পাড়ার দু-একজন মেয়ে আসে। মোনা জিগ্যেস করে হ্যাঁরে, তেরো নম্বর বাড়িটা এখনও তেমনি আছে? কখনোবা কুন্তীর স্বগতোক্তি করে চলে এক নাগাড়ে। পেটের যন্ত্রণাটা ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে।

শেষে একদিন সন্ধে হয় হয়। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল মোনা। রিহার্সালে যেতে হবে। না হলে ভাদুড়ী মশাই খুব বকবেন। ওয়েলার দুটো ছুটছে রেড রোড দিয়ে..। ভো..মু মারা..। মোনাদির ঘুঁড়ি কেটে গেছে। বর্কাস সায়েব—তুমি আর একটু মদ খাও..। কালপ্রবাহ চলে ধীরে...ধীরে...। তুলসী নেই, পেসেন্স কুপার নেই, শিশিরবাবু নেই। বর্কাস, পরেশ সব্বাই উধাও। অন্ধকার...শুধু অন্ধকার...মাঝে মাঝে নীহারের গলায় গানটা শোনা যাচ্ছে কালপ্রবাহ চলে ধীরে...।

পাড়ার মেয়েরা চাঁদা তুলে খাট কিনে আনল। ছেলের দল হাসপাতাল থেকে কাপ্তেনকে নিয়ে চলল শেষ বিদায় জানাতে।

কাজল মিত্র

কালীশ মুখোপাধ্যায়

বারবিলাসীর বিলাস

তরুণকান্তি রায়

শহর কলকাতায় পতিতার সংখ্যা কী কমে যাচ্ছে? সেন্সাস রিপোর্ট অন্তত তাই বলছে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুততার সঙ্গে অত্যন্ত অসমভাবে এ-শহরে একবাক্যে যাদের পতিতা বলা যায়, তাদের সংখ্যা আশ্চর্য রকম কমে যাচ্ছে। অথচ, পাশাপাশি মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখলে আরও অবাক হতে হয়, মেডিক্যাল রিপোর্ট বলছে শহরে যৌনরোগাক্রান্ত নাগরিকের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে তো বাড়ছেই। যৌনরোগ বলতে, প্রধানতঃ সিফিলিস ও গনোরিয়াকেই রিপোর্টে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নীচে এই উভয় রিপোর্ট দেওয়া হল। তা হলেই বিষয়টা বোঝা যাবে।

১৯১১-এ মোট নাগরিক ৮,৯৬,০৬৭। সেখানে পতিতার সংখ্যা ১৪,৮৬৯।

১৯২১-এ মোট নাগরিকের সংখ্যা যখন ৯,০৭,৮৫১ তখন পতিতার মোট সংখ্যা ৮৮৭৭।

১৯৩১-এ মোট নাগরিকের সংখ্যা যেখানে ১১,৬৩,৭৭১ তখন পতিতার সংখ্যা ৭৪৪০।

১৯৬১-এ মোট নাগরিক ২৯,২৭,২৮৯। পতিতা ৬০৪৯।

১৯৭১-এ মোট নাগরিক ৩১,৪৮,৭৪৬। পতিতা ৫০০০।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, মোট নাগরিকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অথচ, আশ্চর্য রকমভাবে পতিতার সংখ্যা তুলনায় কমেই চলেছে।

সেনসাস কমিটির এ রিপোর্টের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় মেডিক্যাল রিপোর্ট। এই রিপোর্ট বলছে, শহরে ক্রমাগত আশঙ্কা-জনক হারে যৌনরোগাক্রান্ত নাগরিক বেড়েই চলেছে। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬১ সালে কলকাতার মোট জনসংখ্যা যেখানে ছিল ২৯,২৭,২৮৯ সেখানে এই ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১,১৭,০৮০। দশ বছরে এই উভয় সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ১৯৭১-এ মোট বাসিন্দা (পৌর এলাকার হিসাবানুযায়ী) যেখানে ৩১,৪৮,৭৪৬ জন সেখানে এই রোগীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে ২,২০,৩৬০, অর্থাৎ? দশ বছরে জনসংখ্যা যেখানে বেড়েছে ২,২১,৪৫৭ জন, সেখানে এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়েছে ১,০৩,২৮০। এরপরও বলতে হবে, সেনসাস কমিটির রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য? কিম্বা সমাজের দুষ্টক্ষত শুধু ঐ রিপোর্টের স্তোকবাক্যেই দূরীভূত হয়ে যাবে?

তা যে যাবে না সেকথা বলাই বাহুল্য। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে বক্তব্য বিষয়টুকু। লক্ষণীয়, বৃটিশ আমলে যত সংখ্যক পতিতা ছিল, সেটা ছিল পরাধীন ভারতে স্বাধীন ভারতে তার চেয়ে কম। এখানে হিসেবের একটা ফাঁক রয়ে গেছে। বৃটিশ আমলের হিসেবে 'প্রস্টিটিউট এ্যান্ড দেয়ার কালেকটরস্' (অর্থাৎ পতিতা ও তাদের সংগ্রাহক) বলে আলাদা একটা গ্রুপ করে হিসাব করা হত। স্বাধীনতার পর এই প্রথা বর্জন করা হয়েছে। সেই জায়গায় এসেছে নতুন একটি নাম—'বেগার, ভ্যাগাবণ্ড এ্যান্ড আদারস।' অর্থাৎ ভিখারী ভবঘুরে ও অন্যান্য। এই আলাদা গ্রুপটি দিয়ে বেশ কিছু নিয়মিত কিম্বা অনিয়মিত পতিতাদের সংখ্যাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত চিত্রটিকে বিকৃত করে ও যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে এক ধরনের প্রহসনকে রিপোর্টের মাধ্যমে সাধারণ্যে হাজির করা হয়েছে। কেননা, একথা কেনা জানে সিফিলিস কিম্বা গনোরিয়ার মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ রোগ ৮০ শতাংশ নাগরিক বয়ে আনছে ঐ পতিতালয় থেকেই? দেশে পতিতাই যদি কমে যাবে, রোগের উৎস তবে এত বেশী কেন? ব্যাপারটা একটু তলিয়ে ভাবা যাক। ধরা যাক একটি পতিতালয়ে ৫০ জন পতিতা। তাদের ৪০ জন রোগাক্রান্ত। দফায় দফায় ২ বার সেই ৪০ জনের কাছ থেকে অন্তত ৮০ জন নীরোগ ব্যক্তি নিজেদের দেহে এই রোগ বয়ে আনল। আবার পাশাপাশি থাকায় ঐ ৪০ জনের সংখ্যাও ক্রমে নির্দিষ্ট ৫০কে ছুঁতে চেষ্টা করবে—এ আশঙ্কাও নেহাৎ অমূলক নয়। এখন এই উদাহরণের হিসাবে যদি আমরা ২,২০,৩৬০ জন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ২ দিয়ে ভাগ করি, তাহলে এদের রোগের কারণ হিসেবে পাই ১,১০,১৮০ জনকে,

ঐ বছরের সেন্সাস রিপোর্ট বলছে, পতিতার মোট সংখ্যা ৫০০০। সুতরাং? অবিশ্যি, এটাকে শুধু উদাহরণ হিসেবেই বলা হলো। এরচেয়েও বেশী, অনেকগুণ অনেক বেশী এরকম সংখ্যাহীন গণনা-হীন পতিতা ছড়িয়ে আছে এই শহরে এবং শহরতলীর চারপাশে।

কোথায় নিবাস?

কোথায় নেই? উত্তরের সোনাগাছি এখনও বর্তমান। যদিও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নেমেছে। এই সোনাগাছিকে ঘিরে আছে ১০।১২টি রাস্তা। এগুলির মধ্যে রবীন্দ্র সরণী, গ্রে স্ট্রীট, বিডন স্ট্রীট ও যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, এই চারটি রাস্তা এই এলাকার চার পাশের দেওয়াল বলা চলে। এ ছাড়াও এই এলাকার মধ্যে রয়েছে মসজিদবাড়ি স্ট্রীট, গৌরীশংকর লেন, অবিনাশ কবিরাজ লেন, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, জয় মিত্র স্ট্রীট, গরাণহাটা লেন, সোনাগাছি লেন, গরাণহাটা স্ট্রীট, ইমামবক্স লেন, রামজয় শীল লেন, রামচাঁদ ঘোষ লেন, নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, ফকির চক্রবর্তী লেন প্রভৃতি অ-খ্যাত কিম্বা স্বল্পখ্যাত অথবা একেবারে কুখ্যাত রাস্তা। রাস্তা না বলে গলিপথ বলাই বোধকরি ভালো হবে। বলা হয়েছে শুধু উত্তরের কথা, যদিও রয়ে গেছে অনেক বাকি। এই উত্তরেরই সোনাগাছির প্রতিবেশী হলো রামবাগান, দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। এর আওতায় বিডন স্ট্রীট, রমেশ দত্ত স্ট্রীটের কিছু অংশ এবং শেঠবাগান, কচুরি গলি ইত্যাদি রাস্তা ও অঞ্চল রয়েছে। শ্যামবাজারের বিখ্যাত বহুবিশ্রুত এলাকা 'নন্দনবাগান'। এই নন্দনতত্ত্বের ক্রিয়াকলাপ চলে হরিশার মার্কেটের উল্টোদিকে।

এবার দক্ষিণ। কালীঘাটের নামই প্রথমে মনে আসে। হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট থেকে শুরু করে কালীঘাট রোড এবং সেই আদিগঙ্গার খাল পর্যন্ত বারবধূদের এলাকা। এগুলি ছাড়াও অন্ধকারের এই বৃন্দাবন লীলা চলে মুন্সীগঞ্জ রোড, ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীট থেকে প্রখ্যাত প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে ও কুখ্যাত হাড়কাটা গলিতে পর্যন্ত।

বে-আইনী

এ-পর্যন্ত যে হিসেব দেওয়া গেল, সেগুলি মোটামুটি আইনসম্মত। এ ছাড়াও আইনের চোখে ধুলো দিয়ে বেশ কিছু 'বে-আইনী' কারবার গড়ে উঠছে পার্ক স্ট্রীট ও তালতলার মধ্যবর্তী কয়েকটি এলাকায়। সন্ধ্যার কিছু পরে ময়দানে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে, শহীদ মিনারের সামনে, চৌরঙ্গীর বিভিন্ন ফ্যাশানদুরস্ত দোকানের সামনের ফুটপাথে, রেড রোডে যেসব ম্যাক্সি-মিনিস্কার্ট ও বেলবটস্ পরিহিতা অতি আধুনিকাদের সন্দেহজনকভাবে দাঁড়াতে অথবা ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় ও'রাও আইনের গা বাঁচিয়েই চলেন। চৌরঙ্গীতে মেট্রো কিম্বা লাইটহাউসের সামনে, লিন্ডসে স্ট্রীটে যাদের দেখা যায়, তারাও, বলা বাহুল্য, একই দলে। এদের 'কলগার্ল' বলা হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ মেয়ে বয়সে ১৫ থেকে ২৫ এর মধ্যে। অধিকাংশই আসে ভদ্র ও মধ্যবিত্ত কিম্বা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। কেন এরা আসে? পুলিশের মতে প্রধাণতঃ হাইসোসাইটিতে নাগরিকের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবন-যাপনের ব্যাপারে একটা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব আছে। সেই মনোভাবকে বাস্তবে রূপায়ণ করতে চাই অনেক, অনেক টাকা। সৎপথে হয়তো সব সময় অত টাকা আনা সম্ভব নয়। তাই এইরকম ঘণ্টা দুয়েক ঘোরাফেরা করে টাকা রোজগারের ধান্দা। আর তাই দিয়ে ইচ্ছামত শাড়ী-গয়নার জেল্লা দিয়ে প্রতিবেশীকে তাক্ লাগিয়ে দেওয়া। এতো গেল একটি কারণ। অন্য একটি কারণ হতে পারে, কোনো কোনো মেয়ের সেক্স-থার্স্টের একটা প্রবল ভাব আছে। এক্ষেত্রে তারা একটু কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। এরকম শাক দিয়ে মাছ ঢাকা সাহচর্যে নিজের শরীরের ক্ষিধেও মিটল, টাকার প্রয়োজনও পূরণ হলো। ব্যাপারটা এইরকম।

চেহারা : প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তের' পতিতা কিম্বা শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' এর পতিতারা এখন আর নেই। সেসব পঞ্চাশ বছরের পুরনো কথা। এখন ওদের কোনো কাহিনী নেই। কেমন করে এ পথে এল তার কোনো ইতিহাস নেই। এই ইতিহাস জানার জন্য কলেজের পড়ুয়ারা, উড়নচণ্ডী কবি-লেখকরা, সাংবাদিকরা ওদের পেছনে প্রচুর টাকা ঢালে। ওরাও বলে দেয় মনগড়া, রীতিমত সিনেমার উপযোগী রগরগে একটা গপ্পো। আবার কখনও কখনও এরা বলে আমার দিদিমা এ কাজ করেছে, আমার মা করেছে, আমি করছি। আমার মেয়েও করবে। নইলে বুড়ো হলে খাওয়াবে কে?

হ্যাঁ, এখন আর ওদের কোনো কাহিনী নেই। কোনো ইতিহাস নেই। ওরা তিনপুরুষ ধরে এই কারবার চালিয়ে এসেছে। দশজনের মধ্যে আটজন শরৎচন্দ্রের নাম শোনেনি, বাকী দুজন শুনেছে, কিন্তু কোনো বই পড়েনি। রবি ঠাকুরের নাম সবাই জানে। দশজনের সবাই হিন্দী সিনেমার প্রেমিকা। হেমামালিনীর অন্ধ ভক্ত। ছজনের ফেভারিট হিরো উত্তমকুমার, চারজনের

অমিতাভ বাচ্চন। হপ্তায় তিনটে অন্তত সিনেমা দেখা চাই। একেবারে লেটেস্ট ফ্যাশনের পোশাক চাই। এবং চাই রোজ সন্ধ্যায় তরল পানীয়।

বানানো গল্প : কোনো কলেজ পড়ুয়া কিম্বা উটতিকবি যদি এদের প্রশ্ন করে কী করে এ-লাইনে এলে, তখন তাদের মনস্তুষ্টির জন্য এদের একটা বানানো গল্প থাকে। গল্পটি মোটামুটি এইরকম :

গ্রামের সরলা অবোধ মেয়ে। গ্রামে এল এক শহুরেবাবু। মেয়ে তাকে দেখে মজল। তারপর বাড়িতে এল বাবু। দুজনে প্ল্যান ঠাউরে পালিয়ে এল কলকাতায়। দু' একদিন একসঙ্গে রাত কাটাল দুজনে। তারপরে এল এক অচেনা লোক। সেই লোককে ঘরে ঢুকিয়ে স্বামী বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল। বাস্। সেই হলো সূত্রপাত।

সব গল্পই যে এইরকম হয় তা নয়। ব্যক্তিবিশেষে রকমফেরও হয়ে থাকে। এটা হলো পুরনো ছক। কোনো কোনো পতিতা এই ছক ভালোবাসে না। তারা আবার প্যাটার্নটাকে আধুনিক ছাঁচে ঢেলে বলে। তাতে গল্পের বিশেষত্ব থাকে। গুরুত্ব বাড়ে। গল্পটা একই। মেয়ে সবক্ষেত্রেই সেই সরলা-অবোধ-অবুঝ মেয়ে। তাকে ঠকিয়েছে কোনো ঠক। গল্প বলার ভঙ্গী অতি চমৎকার। এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয়। যে কোনো খ্যাত-নাম্নী কথকের সঙ্গে একহাত বাজী লড়তে পারে এরা। অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গীতে গল্প বলে এরা। গল্প বলার আগে একটু গোছ-গাছ করে বসে। লক্ষ্যণীয়, গল্প বলার সময় বা আগে এরা মদ খাবে না। দিলেও না! খাবে গল্প বলার পরে। এবং তখন যদি শ্রোতা একটু ধৈর্য ধরে বসে থাকে, তবে প্রকৃত কাহিনীটি আর একটু পরেই শুনতে পাবে। গলায় যখন পানীয় নামবে, সামান্য দু' একবার হিক্কা উঠবে, তখন গড় গড় করে বেরিয়ে আসবে কথা। সেসব কথার অশ্লীল অংশগুলি বাদ দিলে এইটুকু উদ্ধার করা যায় যে, তারা গত তিন পুরুষ ধরে (দিদিমা, মা ও সে) এই ব্যবসা চালিয়ে আসছে।

এই কাহিনীই আসল। এখন ওদের কোনো ইতিহাস নেই। বারো বছর বয়সের পর থেকে, পাঁকের মধ্যেও যখন সে পদ্মের মতন একটু একটু করে ফুটে উঠছে, তখনই দেখছে তার মা কেমন। মনোবিদ্‌রা বলেই থাকেন, শিশুদের যৌবনোন্মেষকালে তার চারপাশের পরিবেশ তার মনে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। এবং সেই পরিবেশই তার ভালো কিম্বা খারাপ পথে গড়ে ওঠার

কারণ। চোদ্দ কিম্বা পনেরোতেই, কিছুটা 'অবৈধ' সাহচর্যের (যদিও ওখানে 'অবৈধ' শব্দটি বহু ব্যবহারে জীর্ণপ্রায়, এখন ঐ নামে ওখানে কোনো শব্দ নেই) গুণে, কিছুটা ওষুধ, টনিক ও খাদ্যাখাদ্যের গুণে এরা হু হু করে বেড়ে ওঠে। এবং তখনই এদের লাইনে দাঁড়াতে হয়। সমস্ত ছলাকলাই ততদিনে এদের রপ্ত হয়ে যায়। আর, যে কোনো পল্লীতে এদের চাহিদাই সর্বাধিক। কেননা, বাবুরা এদেরই 'আনটাচড্' মনে করে এবং বেশী টাকায় কেনে।

পার্ক স্ট্রীটের রশ্মির ঘরে ঢুকেই দেখা গেল একটা ডাবলবেডেড ডানলোপিলো, পালঙ্কের ওপর মদের বোতল। শুধু বিলিতিই নয়, দিশীও আছে। এইসব ঘরে দরজায় পর্দা নেই, কিন্তু জানলায় আছে। পর্দার ছবি নৃত্যরতা নগ্না নর্তকী। দেওয়ালে প্লাস্টার আছে এবং তার রঙ সাদা। সাদা কী পবিত্রতার ইঙ্গিত? ঐ পবিত্র দেওয়াল যে ঘরের মদ-মাংস-চাটের গন্ধ থেকে তার ঘ্রানেন্দ্রিয়কে আড়াল করে—এমন ভাবার কিছু কারণ নেই। কিম্বা, নগ্না পতিতাদের অঙ্গভঙ্গী, এবং আদিম লীলার লোভনীয় দৃশ্য দেখার লোভ সম্বরণ করে তার চোখ সরিয়ে নেয়—তাও ভাবার কারণ নেই।

রশ্মির ঘরের অর্ধেক জুড়ে আছে পালঙ্ক। নিভাঁজ, সাদা ফুলের মতন শয্যা। ঐ সাদা শয্যায় একটু পরেই ফুটবে কামনার লাল রক্তিম ফুল। এখন সবে সন্ধ্যা। দু'তিনটে সোফার মতন গদীআঁটা চেয়ার। বিছানায় দুখানা বালিশ, বিছানার পাশে টুল। টুলের ওপর বোতল, গ্লাস, সোডা। অনেক খদ্দের এসে ছবি তুলতে চায়। তার জন্যে মুভী ক্যামেরাও রেখেছে রশ্মি। এক একটা ছবি পিছু চার্জ দুশো টাকা। রশ্মির একঘণ্টা সময় কিনতে হয় পঞ্চাশ টাকায়।

প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি, রশ্মির এই ঘর স্থায়ী নয়। দিনের বেলা এই ঘর বন্ধ থাকে। এইরকম সাজানো অবস্থায়। তখন রশ্মি কোনো হোটেলের এনটারটেইনার। কিম্বা তা যদি না জোটে কোনো বান্ধবীর বাড়িতে কাটিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় ফিরে আসে। দিনের বেলা পার্টি ঠিক করে। ফোনে কিম্বা চিঠিতে। রাতে বসে 'মাইফেল'। এই অঞ্চল রীতিমত অভিজাত। রশ্মি এখন আসরোব বসন্তে মাতোয়ারা। বাইরে ট্যাক্সির পোঁ—পোঁ শব্দ। ট্রামের ঘরঘর। তাছাড়া স্বাভাবিক পল্লীর পরিবেশ নয়। ওর এই 'মাইফেল' বসার আস্তানা স্থায়ী নয়। এখানে এভাবে দিন তিনেক চলবে। পুলিশ এসব এলাকার ফাঁকা বাড়ি ও নতুন ভাড়াটেদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখে। সন্দেহজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবার আগেই রশ্মি এখান থেকে পাততাড়ি গুটোবে। যাবে অন্য প্রসঙ্গত, রশ্মি নামটাও ওর আসল নয়। এবং স্থায়ী তো অবশ্যই নয়! এখানে এবং এখন ও রশ্মি, অন্যত্র হয়তো বিউটি, কিম্বা মলি, কিম্বা রীটা। মান্ধাতার আমলের পুরনো নাম ওর একদম পছন্দ নয়। ওর 'মাসী' নামক কোনো গার্জিয়ান নেই। নিজেই নিজের গার্জিয়ান, স্বাধীন। যা রোজগার করে, একাই খরচ করে। ওকে ঠিক প্রস্‌টিটিউট বা একবাক্যে পতিতা বলা যায় না। বরং কলগার্ল কিম্বা এ-পি অর্থাত কিনা অ্যারিস্টোক্র্যাট প্রসটিটিউট বলা যায়।

অন্যত্র

সাধারণ 'বেশ্যাপল্লী' বলতে যা বোঝায় সেখানে ছবিটা একটু অন্যরকম। কালিঘাটে কিছুটা নিম্নশ্রেণীর খদ্দেরের যাতায়াত। তাদের পণ্যা নারীরাও খুব উঁচু মানের খানদানী নয়। সেখানে বাতাসে ভেসে বেড়ায় চোলাই মদের গন্ধ, চাট, কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুনের টাটকা ও বাসী গন্ধ। আর ভেসে বেড়ায় খিলখিল হাসি, উন্মত্ত প্রলাপ, হৈ-হুল্লোড়ের ছড়্‌রা এবং অশ্লীল কথাবার্তা। টাটকা বেলফুলের সুঘ্রানও নাকে আসে। সত্বর ঘরের বাইরে আরও নানান শব্দ। বাইরে মাতালের প্রলাপ, মাসীর গালাগাল ও অভিসম্পাত, পুলিশের তর্জন গর্জন, মস্তানদের

শাসানী, ভাড়াটে গুণ্ডাদের সমবেত ঐকতান 'ইয়ারী হ্যায় ইমান মেরা ইয়ার মেরী জিন্দগী'। সত্যর ঘর আশ্চর্য শান্ত। মাটির দেওয়াল রঙ করা। ঘরের কোণে সস্তা ট্রানজিস্টার ও প্রসাধন-সামগ্রী। দিশী মদের বোতল। বিলাসিতার চিহ্ন যে একেবারে নেই—তা নয়। দেওয়ালে মদালসা ভঙ্গীতে নগ্না ও অর্ধনগ্না ছবি কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো। ঘরে বিছানা পাতা খাট। বিছানায় চাকচিক্যের জৌলুস নেই, কিন্তু নোংরা নয়। কোনো দরজা জানলাতেই পর্দা নেই।

আইন ও ব্যবস্থা

ভারতে পতিতাদের সম্পর্কে প্রথম আইন পাশ হয় ১৯৩০ সালে। মাদ্রাজে।ম্যাড্রাস সাপ্রেশন অব ইমমরাল ট্র্যাফিক অ্যাকট। এর পরে দ্বিতীয় আইন পাশ হয় বাংলায়। ১৯৩৩ সালে। তারপর সুদূর হায়দ্রাবাদে ১৯৫৯ সালে। ১৯৫৩-এ এই আইন প্রচলিত হলো বিহারে। তারপর পর্যায়ক্রমে বম্বে, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহীশূর, আজমীঢ়, পাতিয়ালা ও সবশেষে জম্মু ও কাশ্মীরে এই একই আইন চালু হয়।

নাবালিকা, কিশোরী ও বালিকাদের এই ব্যবসার হাত থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে নতুন আইন প্রণয়ন হলো। এই নতুন আইনের অন্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় কারণে বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করা। এই আইন প্রথম চালু হয় বম্বেতে। ১৯৩৪ সালের এই নবপ্রণীত আইনের নাম 'বম্বে দেবদাসী প্রোটেকশন অ্যাকট'। তিন বছর পরে, ১৯৩৭ সালে প্রণীত হয় 'ম্যাড্রাস দেবদাসী প্রিভেনশন অব ডেডিকেশন অ্যাকট'। এই আইনদুটির আরও কিছু আগে প্রণীত হয়েছিল প্রায় সমউদ্দেশ্যের একটি আইন। ১৯২৯ সালের এই আইনটি 'ইউ, পি, নায়েক গার্লস প্রোটেকশন অ্যাকট' বলে পরিচিত। সর্বশেষ আইন প্রণীত হয় ১৯৫৬ সালে। স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় এই আইনের নাম 'সাপ্রেশন অব ইমমরাল ট্র্যাফিক ইন উইমেন এণ্ড গার্লস অ্যাকট'।

আইন তো হলো! কিন্তু ব্যবস্থা কিছু নেওয়া হয়েছে কী? '৭৪ সালের এক পুলিশ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ১৯৪৭ সালে অর্থাৎ স্বাধীনতার বছরে এই আইনানুযায়ী গ্রেপ্তার হয়েছে ১৫২৮ জন। শাস্তি পেয়েছে ১৬১৯ জন। অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় ছাড়া পায় ১১১ জন। পাশাপাশি, ১৯৭২ সালে এই আইনে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৯৯ জন মাত্র। শাস্তি হয়েছে দশজনের। আট-জনের নামে চার্জশীট ঝুলছে। বাকি ৮১ জনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

এ ব্যাপারে সাম্প্রতিকতম কোনো রিপোর্ট এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। গেলে ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা যেত।

কেন্দ্রীয় আইনে বলা হয়েছে, (ক) আইন বজায় রাখতে হবে, (খ) শাস্তি দিতে হবে এবং (গ) সংশোধন এবং পুনর্বাসনের সুযোগ দিতে হবে—যেখানে যতখানি সম্ভব। এই আইনে বেশ্যা-বৃত্তিকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু বেশ্যালয়ে উচ্ছৃংখলতার জন্য অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু শাস্তি যে-কেউ দিতে পারে না, বা যে-কেউ দোষীদের গ্রেপ্তার করতে পারে না। আইনে বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনাররাই কিম্বা তাঁদের স্বাক্ষরিত অনুমতি নিয়ে কোনো অফিসার গ্রেপ্তার করতে পারবেন। অর্থাৎ এই ব্যাপারটি থানার ও-সি কিম্বা ইন্সপেকটরের এক্তিয়ারে নেই। গ্রেপ্তারের সময় দুজন 'সম্মানিত' সাক্ষী উপস্থিতি আবশ্যক। এই দুজনের একজন মহিলা হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনের এই শর্ত মেনে চলা সম্ভব হয়ে ওঠে না, কেননা গভীর রাতে চহ্যাত বেশ্যাপল্লীতে কোনো সম্মানিত ভদ্রলোক কিম্বা ভদ্রমহিলা ঘুম থেকে উঠে এসে সাক্ষী হতে চাইবেন না। এখন যা হয় তাকে 'রেইড' বলা যেতে পারে। মাঝে মাঝে এমন 'রেইড' করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন আদালতে ১০।১৫ টাকা ফাইন। ফাইনে

ছাড়া পেলেও একরাত্রি হাজতবাস এবং ছাড়া না পেলে খুব বেশী হলে তিন মাস কারাবাস।

সেনসাস কমিটির রিপোর্ট বিশ্বাস্য নয়—একথা আগেই বলেছি। পুলিশ আলাদাভাবে বেশ্যার সংখ্যা পরিমাপ করার জন্য একটি সংস্থা গঠন করেছে। ১৯৫৬ সালের ঐ কেন্দ্রীয় আইনানু-যায়ী এই পৃথক সংস্থার নাম 'অনৈতিক কাজ-কারবার'। এই দপ্তর পরিচালনা করেন পুলিশের গোয়েন্দারা। এই দপ্তর পরিচালনা করেন উচ্চ ও নিম্ন পদস্থ পুলিশসহ মোট ৩৫ জন। এই সুবৃহৎ মহানগরীর বুকে যাবতীয় 'অনৈতিক কাজ-কারবার' এঁরা বন্ধ করবেন—কথাটা সোনার পাথরবাটির মতন শোনায়। তবুও এঁরা থেমে নেই। কিছু কিছু কাজ নিশ্চয়ই এঁরা করেছেন। এই গ্রুপে আছেন—

ডেপুটি কমিশনার অব ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট (ইনি গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি, ইনি আছেন সর্বশীর্ষে)

অফিসার ইনচার্জ (১ জন)
সাব-ইন্সপেকটর (৮ জন)
অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেকটর (৪ জন)
কনস্টেবল ২০ জন)

মোট ৩৫ জন

এই ৩৫ জনের সংখ্যা ইতিমধ্যে বেড়ে যেতে পারে। কেননা এই হিসাব ১৯৭৫ সালের।

সে যুগে

সে যুগের বহুখ্যাত পতিতালয়গুলি বর্তমানে অবলুপ্তির পথে। কালীঘাট ও সোনাগাছির পতিতারা অবশ্য পুরনো ট্র্যাডি-শনের ধারা বয়ে নিয়ে চলেছে। এ দুটি ছাড়া প্রাচীন এলাকা বলতে প্রায় কিছুই নেই। পরিবর্তে গজিয়ে উঠেছে (এবং এখনও উঠছে) অনেক নতুন নতুন পল্লীই সেই যুগের সেই কুখ্যাত কিম্বা বিখ্যাত 'মধ্যারমাঠ' আজ কোথায়? কোথায় ধুকুরিয়া বাগান, কোথায় সেই ক্ষীরোদ ঘোষের বস্তি? বাঈজীদের একচেটিয়া কারবার চলত যে বৌবাজারে, সেই বৌবাজারের প্রদীপও নিভু নিভু।

দু-এক ঘর বাঈজী এখন একটু একটু করে ধ্বংসের দিন গুনছে। ধুঁকতে ধুঁকতে কোনো রকমে টিঁকে আছে।

প্রাচীন যুগে পতিতাদের অধিকাংশকেই দেখা গেছে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গুপ্তচর হিসেবে। সম্রাট অশোক, চন্দ্রগুপ্ত থেকে শুরু করে আকবর, হুমায়ুন ও শাহ-আলমের রাজত্বেও দেখা গেছে গুপ্তচর-পতিতা। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে এই বৃত্তিকে একটি ভারী চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, এই বৃত্তিটি একটি 'প্রয়োজনীয় পাপ'। প্রাচীন পুরাণ ঘাঁটলেও সামান্য পরিমাণে এই বৃত্তির হদিশ পাওয়া যাবে। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থেও এদের দেখা পাওয়া যায়।

ঃ কলকাতায় ঃ

কলকাতায় সে আমলের বিখ্যাত বেশ্যাপল্লী হল সোনাগাছির 'নন্দরাণীর ফ্ল্যাট'। এ-ছাড়াও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে এই ব্যবসা ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তরের রামবাগান, শেঠবাগান প্রভৃতি এলাকায়। তখন বৃটিশ আমল। খদ্দেরদের সিংহভাগ ছিল ইংরাজ-তনয়। এদের কেউ কেউ ছিল বণিক কেউ কেউ কোম্পানীর কর্মচারী। কর্নওয়ালিশের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ঘোষিত হবার পরে রমরমা এল। এই রমরমা ভাব এল প্রধানতঃ শ্রীমন্ত জমিদার সম্প্রদায়ের ব্যাকগ্রাউণ্ড পৃষ্ঠপোষকতায়। এই ঘটনার প্রমাণ ও বিবরণ পাওয়া গেছে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকসায়।

১৬৯০ সালে জব চার্নক সুতানুটি গ্রামের মাটিতে পা রাখেন। তখন থেকে ১৯৩৯ সাল, অর্থাৎ প্রাক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই সুদীর্ঘ প্রায় আড়াইশো বছর (২৪৯ বছর) এই ব্যবসা প্রধানতঃ উত্তর কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কলকাতার বুকে এল প্রচুর মিলিটারির সদম্ভ পদক্ষেপ। এরা আমদানি হয়েছে আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে। এদের রাতের ক্ষিধে মেটাতে উত্তরের হাওয়া কলকাতার দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম ও মধ্য—সমস্ত অঞ্চলেই দ্রুত বয়ে গেল। এই সময়েই গড়ে উঠল কুখ্যাত হাড়কাটা গলি। পাশাপাশি মাথা গজাল কালীঘাটের পল্লী, ধুকুকুড়িয়া বাগান (তালতলা), কড়োয়া ও ফ্রিস্কুল স্ট্রীটের রূপের হাট। বেশ্যাপল্লীর সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল নারী ধর্ষণের ঘটনা। এবং ফাঁকাবাড়িগুলির রাতারাতি ভর্তি হয়ে যাওয়ার ঘটনা। সৈন্যরা তো ছিলই। যুদ্ধের দৌলতে লোহা, ধাতু ও ঠিকাদারী ব্যবসায় ফুলে-ফেঁপে লাল হয়ে উঠল বাঙালীবাবুরা। হঠাৎ টাকার গরবে এরা তখন ত্রিভুবন জয় করার আনন্দে মাতোয়ারা। এঁরা তখন পেশাদারী বেশ্যাদের পছন্দ করলেন না। চাই ভদ্রঘরের মেয়ে। ইতিহাসে চাটুকার ও দালালের অভাব নেই। দালাল লেগে গেল। শহর, মফঃস্বল শহর ও পল্লীগ্রাম থেকে কুমারী-কিশোরী, যুবতী ও বধূদের নানা প্রলোভনে এনে হাজির করা হলো এইসব 'বাবু'দের অঙ্কে। শুধু বাংলাই নয়, বিহার, আসাম, ভুটান, উৎকল, তিব্বত, নেপাল—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল দালালগোষ্ঠী। এবং এরা সবাই এসে ভিড় করতে লাগল কলকাতায়। সেই জন্যই রাতারাতি ভরে যেতে লাগল নগরীর ফাঁকা বাড়িগুলি।

যুদ্ধ মিটল। এল দেশবিভাগ। পরের বছরেরই ঘটনা। যুদ্ধ শেষ হয়েছে ১৯৪৫-৪৬ নাগাদ, দেশবিভাগ হয়েছে '৪৭ সালে। হু হু করে আসতে শুরু করল ওপার বাংলার উদ্বাস্তুরা। সংখ্যায় ষাট লক্ষেরও বেশী। এই উদ্বাস্তুদের কলোনী ও ক্যাম্পে ঘোরাফেরা করতে লাগল দালালরা। 'বাবু'দের নিত্যনতুন সাপ্লাই চাই। এই দালালদের এখন নানান পরিচয়। তবে এরা বেশীরভাগ টোপ ফেলেছে সিনেমা-থিয়েটারে নামার চান্স দেওয়া, প্রসাধন কোম্পানীতে চাকরী দেবার নাম করে। সফলও হয়েছে বেশী এই দুটি টোপে। প্রধানতঃ সিনেমায় চান্স করে দেবার ব্যাপারে। তখন প্রচুর চেষ্টা চলছে 'সাপ্লাই'এর সংখ্যা বাড়ানোর। টোপ হিসেবে বেছে নেওয়া হলো কাগজের 'ব্যক্তিগত' ও 'পাত্রপাত্রী' কলমে বিজ্ঞাপন দেওয়া। সুন্দরী পাত্রী চাই, লেডি টাইপিস্ট চাই, পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (পি-এ) চাই, বাড়ঘরদোর দেখাশোনার জন্য কমবয়সী মেয়ে চাই, হোটেলের রিসেপসনিস্ট চাই- ইত্যাদি কত রকমের বিজ্ঞাপন! এছাড়া 'বাংলা ছবিতে অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী চাই' তো ছিলই! যুদ্ধের ফলে মানুষের নৈরাশ্য ও দারিদ্র্য যেমন বাড়ছিল, তেমনি বাড়ছিল আর্থিক নিরাপত্তার আশ্বাসে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসা মেয়ের সংখ্যা। উদ্বাস্তু মেয়েরা এসেছে প্রধানতঃ ধুবুলিয়া, দমদম, শিয়ালদা স্টেশন ও হাওড়ার কলোনী থেকে।

সবাই-ই যে ঠকে এসেছে এই লাইনে, এমন নয়। কলেজে ও স্কুলে পড়ুয়া স্বল্প শিক্ষিতা মেয়েরা এসেছে স্বেচ্ছায়। কেননা, তাদের মগজে অল্প সময়ে, বিনা পরিশ্রমে, স্বাধীনভাবে এত বেশী টাকা রোজগার করার আর কোনো পথ নেই! এদের এক-রাতের রোজগার ২০০ থেকে ২০০০-এর মধ্যে ওঠানামা করে। ভাবা যায়? সেনসাসের রিপোর্টে কলগার্লদের ধরা হয়নি। ফলে প্রচুর দেহপসারিণী এই হিসাবের আওতার বাইরে থেকে গেছে।

খরচ-খরচা ঃ

সাধারণ একখানা ঘরের মাসিক ভাড়া (যেগুলো নিম্নমানের) ২৫০ থেকে ৭৫০ টাকা পর্যন্ত। ফাঁকা ফ্ল্যাটগুলিতে হাজারের কমে কোনো ঘর নেই। দিশীই হোক, বিলিতিই হোক—তার খরচ বহন করে অতিথিরা। কালীঘাটের সতুর এক ঘণ্টার পারিশ্রমিক পনেরো টাকা। এই পনেরোর পাঁচ একদিনের ঘর ভাড়া, মাসীর প্রাপ্য পাঁচ, সতুর হাতে থাকবে বাকি পাঁচ টাকা। অর্থাৎ ওয়ান-থার্ড মাসীর প্রাপ্য। এক-রাতে সতুর সর্বোচ্চ আয় ১১০ টাকা। মোটামুটি এক-রাতে রোজগার হয় ৭৫ থেকে ৯০ টাকা। এর মধ্যে যত দফায় অতিথি আসবে, পাঁচ দফায় এলে পাঁচ-দ্বিগুণে দশ টাকা যাবে দালালের পকেটে। ওয়ান-থার্ড পাবে মাসী। বাকিটা নিজের পোশাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়া ও সিনেমা দেখা, বেড়ানো বাবদ। অনেকে আবার এর থেকে বাড়ীতে টাকাও পাঠায়। কারুর কারুর ছেলে-মেয়ে (কেউ কেউ সন্তান সম্পর্কে উচ্চাভিলাষী) বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে, তার খরচ পাঠাতে হয় ঐ নিজের টাকা থেকেই। সতুর আরও কয়েকটি খরচ আছে। অহেতুক পুলিশী হুজ্জতি ঠেকাবার জন্য ১০-১২ জন মিলে অগ্রিম ৪০০-৫০০ টাকা থানায় জমা দিয়ে আসতে হয়। পুলিশী হুজ্জতির ভয়ে খদ্দের আসতে চায় না।

আর একটি খরচ ডাক্তারের পেছনে। সতুর ভীষণ বদনামের ভয়। যদি একবার বদনাম রটে যায় যে তার দেহ থেকে রোগ ছড়াচ্ছে, তাহলে চিরতরে তার রুজি বন্ধ হয়ে যাবে। একজন ডাক্তার ধরাবাঁধা আছে সতুর। ফী-মাসে গোটা চারেক পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন নেয় সতু অগ্রিম নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে। এইজন্য সতুকে প্রত্যেকটি ইঞ্জেকশনের পেছনে খরচ করতে হয় পাঁচ টাকা করে। এই এলাকার অনেকেই ঐ ডাক্তারের রুগী।

বিভিন্ন অঞ্চলের দরদাম ঃ

কলকাতার পতিতাদের স্বভাবতই দাম একটু বেশী হবেই। তুলনায় মফঃস্বলে খুব কম। টিটাগড় থেকে নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়া, ওদিকে চুঁচড়ো চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, রিষড়া, প্রভৃতি এলাকায় প্রত্যেক ঘণ্টার দাম পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে একটা অনির্দিষ্ট অঙ্কে ঘোরাফেরা করে। কলকাতার অভিজাত রইস এলাকায় পার্ক স্ট্রীট কিম্বা ফ্রিস্কুল স্ট্রীটের ফাঁকা বাড়িতে শুরু হবে চল্লিশ থেকে,

থামাবে দেড়শ বা পৌনে দুশোর অংকে গিয়ে। এই অংক প্রতি ঘন্টার দাম। তুলনায়, কালীঘাট, সোনাগাছি, চেতলা, টালিগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার পল্লীগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও বিত্তহীনের। এখানে খুব বেশী হলে এক-ঘন্টার দাম কুড়ি টাকা পর্যন্ত ওঠে।

নাম শুনে চমকে ওঠার কোন কারণ নেই। মেয়েদের ক্রমবর্ধমান হারের সঙ্গে সঙ্গে এরাও পাল্লা দিয়ে উঠছে ক্রমশঃ। এদের ইংরাজীতে 'জিগোলো' বলা যেতে পারে। এই পুরুষ পতিতাদের মধ্যে রয়েছে একশ্রেণীর কিশোর ও কিছু মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। এদের দেখা পাওয়া যাবে সন্ধ্যার পরে ময়দানে, ময়দানে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কাছাকাছি, ধর্মতলার এদিক-ওদিকে ও সদর স্ট্রীটে। এদের খদ্দের শুধু কিছু সমকামী পুরুষ। ধনী কিছু বড়লোকের কামুক স্ত্রীরাও এই কিশোর ও উঠতি তরুণদের খদ্দের হয়েছে। সেনসাস রিপোর্টে এই পুরুষ-পতিতাদের সংখ্যা ঠাঁই পায়নি। অথচ, পুলিশের হিসেব প্রায় ২।৩ হাজার পুরুষ-পতিতা এই নগরীর বুকে ছড়িয়ে। এদের আয় রমণীর থেকে বেশী। এক-রাতে এরা ঘন্টা-তিনেক দেহ ভাড়া খাটিয়ে প্রায় দেড়শ' থেকে আড়াইশ পর্যন্ত। বয়স বারো থেকে সতেরো। এরা আসে সমাজের অভিজাত এলাকা থেকে। মাঝে মাঝে ব্যাপক হারে ধরাও পড়ে!

তখন এদের ছাড়িয়ে আনতে যান সরকারী কর্মচারী, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, উকিল থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত। মাঝে মাঝে ওদের সামনে একটি ট্যাক্সি এসে থামে। তার থেকে নামে কুরূপা বা সুরূপারা। এরাও সব ধনীর দুলালী। পঞ্চদশী থেকে পঁচিশ পর্যন্ত। এরা উপযুক্ত টাকায় নিয়ে যায় নির্দিষ্ট কোনো হোটেলে। তারপর এই কিশোরদের দিয়ে মিটিয়ে নেয় নিজেদের অদম্য যৌনতৃষ্ণা।

এইসব অন্ধকারের জীবদের আলোয় ফিরিয়ে আনার জন্য, তাদের সংশোধনের সুযোগ দেওয়া, উপযুক্ত আর্থিক নিরাপত্তার আশ্বাসে তাদের পুনর্বাসনে সাহায্য করার জন্য সবচেয়ে বেশী অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের। কিন্তু খুবই দুঃখের কথা, উভয় সরকারই এ ব্যাপারে আশ্চর্যরকম উদাসীন। বেশীদিন নয়, কয়েক মাস আগেও কলকাতার একটি বাংলা দৈনিকে এই ধরনের একটি সংবাদ পাওয়া গেছে। কোনো এক পুলিশদাইকে পুনর্বাসনের আশ্বাস দিয়ে জৈনক প্রাক্তন মন্ত্রী কথা রাখেননি। সেই আশাহত মেয়েটি সারাদিন বৃথাই মহাকরণের সামনে ঘোরাঘুরি করেছে। তারপর আবার ফিরে গেছে পুরনো জীবিকায়।

মেয়েদের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ এবং আর্থিক নিরাপত্তার আশ্বাস অথবা স্থায়ী কোনো চাকরীর ব্যবস্থা করে দেওয়া। কলকাতায় এই সম্পর্কিত আঙ্গুলে গোনা যায় এমন কয়েকটি পাঁচটিকতক বেসরকারী সংস্থা আছে। সরকারী সাহায্য এঁদের কাছে চাঁদে হাত দেবার সামিল। তবে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কিছু সরকারী অনুদান পান। কিন্তু যা পান, তাতে তাঁদের মোট খরচের এক-চতুর্থাংশও ওঠে না। তবু এঁরা থামেননি। কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৬৫ সালে স্থাপিত এমন একটি সংস্থা নাকতলায় গড়ে উঠেছে যার নাম অ্যাসোসিয়েশন ফর সোস্যাল হেলথ ইন ইন্ডিয়া।

১৯৭৪ সালের বার্ষিক রিপোর্টে এঁরা দাবী করেছেন এঁদের স্বল্প সময়ের প্রোটেকটিভ হোমে ভর্তি হয়েছেন ৩৫৬ জন। নানান কাজের মাধ্যমে ১০২ জনের পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছে। এঁদের হাতে, শুধুমাত্র এঁদেরই নয়, এঁদের মতন অন্যান্য সংস্থাগুলির হাতে বহু দায়িত্ব। পুলিশও বিভিন্ন বেশ্যাপল্লী থেকে নাবালিকাদের ধরে এনে এঁদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। প্রতিদিন বিভিন্ন সমস্যার বিবরণ সহ প্রচুর চিঠি পান এঁরা।

সমাজে দুষ্ট ক্ষতের মতো ছড়িয়ে পড়ছে পতিতার চিন্তনীয় রকমের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তার পাশাপাশি যৌনরোগ। এর পেছনে বর্তমান দশকের মানুষের নৈতিকমূল্যবোধের অভাব, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, সামাজিক অবক্ষয়, আদর্শের মৃত্যু, দারিদ্র্য, আর্থিক অনটন, হঠাৎ কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বহু কারণ আছে।

এই ক্রমবর্ধমান দুষ্ট ক্ষতকে নিরাময় করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন, বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যাঁরা অবিচল থেকে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, কোনোরকম বাধার কাছেই যাঁরা মাথা নত করছেন না, ভবিষ্যতে এক সুস্থ ও সুস্বাস্থ্যের সবল সমাজ গঠনের স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন ও সেই স্বপ্নকে রূপায়ন করছেন—সরকারী সহযোগিতার হাত তাঁদের প্রতি একটু বেশী করে প্রসারিত হওয়া উচিত নয় কী?

আলোকচিত্র : চন্ডী ঘোষ

অমিয়র দাদা চা খেতে লাগলেন। খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন। মাঝে মাঝে কিছু লিখতে লাগলেন।

'আমার কথাটা শোনো। বড় বিপদ।' অমিয় বললে।

'দাঁড়া।'

'দাঁড়ালে হবে না।'

'বোস।'

'বসলে হবে না।'
'কি এমন কাজ।'

'কথা আছে। জরুরি কথা।'

'বলে যা। আমি শুনছি।'

'এভাবে শুনলে হবে না। কাগজ পরে পড়বে।'

তিনি মুখ তুললেন। চায়ে শেষ চুমুক দিলেন। পেনটা রাখলেন। সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়লেন। বললেন, 'কাগজ আমি পড়ছি না। কোনদিনই পড়ি না। সামনে বিছিয়ে রাখি। এটা তোদের জেনে রাখা ভালো। আমি চা খাচ্ছি। কাগজ পড়ছি। সিগারেট টানছি। দেখে তাই মনে হয়। আসলে এর কোনটাই করছি না। এসব দিয়ে আমি মনটাকে ঠিক করি। আর সঙ্গে সঙ্গে কাজের লিস্ট তৈরি করি। সারাদিন কি কি করব। কখন কোনটা করব। কোথায় কোথায় যাব। কার কার সঙ্গে দেখা করব। কি কি কথা বলব। কি কি কাজ করব। কখন, কোথায়, কি কি—'

'আচ্ছা আচ্ছা। এখন আমার কথাটা শোনো।'

'আমি শুনছি। বলে যা।'

'এভাবে শুনলে হবে না। লিস্ট পরে করবে।'

'এখন এটাই আসল কাজ। আরও তিন মিনিট বাকী। তুই বলে যা। আমি শুনছি।'

'এখন আমার কথা শোনাটাকেই আসল কাজ করো, বিপদ আসছে।'

'বিপদ। বিপদকে আমি ভয় করি? বিপদের ভয়ে আমি রুটিনের কাজ বন্ধ রাখি না।' তিনি আবার একটু লিখলেন। পেন বন্ধ করলেন। বললেন, 'আমার লিস্ট তৈরি হয়ে গেল। এবার বল। আর দু মিনিট। তারপর থেকেই লিস্ট অনু-যায়ী দিনের কাজ শুরু করব। তখন আর শুনব না। শুনতে পারব না। দু'মিনিটের মধ্যে বলতে হবে। দু'মিনিটের বেশি শুনতে পারব না। তবে দু'মিনিট তোর কথা শুনব। ভালো করে শুনব। অন্য কোন কাজ করব না। অন্য কিছু ভাবব না। এখন বল। দু'মিনিট। আর মাত্র দু'মিনিট। তারপর থেকেই লিস্টের কাজ শুরু করব। তখন আর শুনব না। শুনতে পারব না। তোর বিপদের কথাও না। বিপদের ভয়ে বসে থাকব না। এবার বল। আর দু'মিনিট। তারপরেই আমি দাঁত মাজতে আরম্ভ করব। লিস্টের প্রথম কাজ। সারাদিনের রুটিনের শুরু। এখানে একটু দেরি হলেই সব গেল। সব কাজ ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সারাদিনের রুটিন। সারাদিনের কাজ। তখন আর সামলাতে পারব না। এখন আমি দাঁত মাজতে আরম্ভ করব। দাঁত মাজতে মাজতে কলতলায় যাব। কলতলা থেকে এসে তেল মাখব। তেল মেখেই স্নান করতে

খাব। স্নান করে এসেই খেতে বসব। খেয়ে উঠেই জামা-কাপড় পরব। জামা-কাপড় পরেই—এই যাঃ, দুর্মিনিট শেষ। কাল শুনব। তোর কথা শোনাটাকে কাল লিস্টে রাখব। কাল বলিস। বিপদের কথা! বিপদে ভয় কি। আমি তো আছি।

অমিয় অফিস থেকে ফোন করল। সন্তোষ রায়ের অফিসে।

'আপনি কে বলছেন?'

'আমি অমিয় সেন।'

'কাকে চান?'

'সন্তোষ রায় আছেন?'

'আছেন। যদিও এখন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, তবুও বলতে পারি তিনি আছেন।'

'দয়া করে একটু—'

'ইচ্ছে থাকলেও ঐ ক্ষমতা আমার নেই। এই চারতলা বাড়ির সবটা জুড়ে আমাদের অফিস। এক তলাটা একটা হল-ঘর। সেখানে এক পলকে সবাইকে দেখা যায়। কিন্তু দোতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত যত ওপরে ওঠা যায় ঘরের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। ঘরগুলি ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে। করিডরের সংখ্যাও ক্রমশ বেড়ে গিয়েছে। সন্তোষবাবু কখনও এক জায়গায় থাকেন না। থাকতে পারেন না। এখন কোন ঘরে বা করিডরে তিনি আছেন, বলা শক্ত। তবে তিনি আছেন এটুকু বলতে পারি।'

'দেখুন আমার বড় দরকার। জরুরি দরকার। এখুনি দরকার। আমার বড় বিপদ। দয়া করে একবার—'

'শুনুন, বিপদটা আমার নিজের হলেও আমি এখান থেকে উঠতে পারতাম না। আমার কাজটাই এরকম। আমি চেয়ারে বসে আছি। এই চেয়ার থেকে আমার ওঠার উপায় নেই। তবে এই চেয়ারে বসে থেকে আপনার জন্যে কিছু করা গেলে আমি করতে পারি। সন্তোষবাবু এত বড় বাড়িটাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যে-কোন ঘরে। যে-কোন করিডরে। যখন-তখন। তাঁর গলাও মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি। আপনি লাইন ধরে থাকুন। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেটে দিচ্ছে ধরে থাকুন। আমার সামনে একটা টেবিল। টেবিলের সামনে দরজা। দরজার সামনে করিডর। এদিকে এসে আমি সন্তোষবাবুকে ডেকে দেব। যদি তিনি আচমকা এঘরে ঢুকে পড়েন। অথবা সামনের করিডর দিয়ে হেঁটে যান। অথবা কাছে পিঠে কোথাও থেকে তাঁর গলা শুনতে পাই। চেয়ারে বসে বসে যা যা করা যায় আমি করব। অবশ্য একাজও আমি করতে পারি না। এভাবে লাইন আটকে রাখার অধিকার আমার নেই। তবুও এটুকু আমি করতে পারি। আপনার বিপদের কথা চিন্তা করে এটুকু নিশ্চয়ই করব। আচ্ছা আমি টেবিলের ওপর রিসিভার রেখে দিচ্ছি। আপনি ধরে থাকুন। যতক্ষণ পর্যন্ত—'

অমিয় বড় সাহেবের ঘরে ঢুকল। ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল। টেবিলের সামনে। দাঁড়িয়েই রইল। এক সময়ে তিনি বললেন, 'বসুন।' অমিয় বসল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পায়চারি করতে লাগলেন। পায়চারি করতে করতে সিগারেট টানতে লাগলেন। সিগারেট টানতে টানতে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। আবার বসে পড়লেন। বললেন, 'আমি বড় ব্যস্ত অমিয়বাবু।'

'তাহলে পরে আসব।'

'জরুরি কিছু?'

'হ্যাঁ।'

'বলুন।'

'সকালবেলা একটা খবর পেলাম। খবরটা—'

'খবর।'

'হ্যাঁ।'

'ব্যক্তিগত?'

'হ্যাঁ।'

'একটু বসুন।'

তিনি ঘড়ি দেখলেন। কতকগুলি কাগজ টেনে নিলেন। কাগজ ওল্টাতে লাগলেন। কিছু লিখতে লাগলেন। কাগজে সই করতে লাগলেন। কিছু লিখতে লাগলেন। আবার উঠে দাঁড়ালেন। সিগারেট ধরালেন। পায়চারি করতে লাগলেন। সিগারেট টানতে লাগলেন। পায়চারি করতে লাগলেন। ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। পায়চারি করতে লাগলেন। আবার বসে পড়লেন। বললেন, 'আমি বড় ব্যস্ত অমিয়বাবু।'

'তাহলে পরে আসব।'

'আপনার ব্যাপারটা ব্যক্তিগত।'

'হ্যাঁ।'

'অফিসিয়েল নয়।'

'না।'

'জরুরি।'

'হ্যাঁ।'

'ব্যক্তিগত অথচ জরুরি।'

'হ্যাঁ।'

'অফিসিয়েল নয় অথচ জরুরি।'

'খবরটা থেকে বুঝলাম আমার একটা নতুন রকমের বিপদ—'

'বিপদ?'

'বড় বিপদ।'

'বিপদকে ভয় করলে চলে?'

তিনি টেলিফোন করলেন। টেলিফোনে কথা বলতে লাগলেন। কেবল কথা বলতে লাগলেন। হঠাৎ কথা বন্ধ করলেন। রিসিভার রেখে দিলেন। উঠে দাঁড়ালেন। বেল বাজালেন। বেয়ারা ছুটে এল। 'এগুলি নিয়ে যাও।' কাগজগুলির দিকে হাত দেখা-লেন। ফাইলগুলির দিকে হাত দেখালেন। বেয়ারা কাগজগুলি নিয়ে গেল। 'আপনার বড় বিপদ অমিয়বাবু।' বেয়ারা ফাইলগুলি নিয়ে গেল। 'বিপদকে কখনও ভয় করবেন না।' আবার বেল বাজালেন। বেয়ারা ছুটে এল। 'জল।' বেয়ারা গ্লাস নিয়ে গেল। জল নিয়ে এল। 'বিপদকে ভয় করলে চলে?' তিনি জল খেলেন। 'আমারও বিপদ এসেছে।' তিনি মুখ মুছলেন। 'অনেক-বারই বিপদ এসেছে।' তিনি ব্যাগের মধ্যে কাগজ ঢোকাতে লাগলেন। 'আমি বার বার বিপদের মুখোমুখি হয়েছি।' তিনি ব্যাগ বন্ধ করতে লাগলেন। বিপদকে আমি ভয় পাই নি।' তিনি বেল বাজালেন। বেয়ারা ছুটে এল। তিনি শব্দ করে চেয়ার সরালেন। 'চলো।' বেয়ারা ব্যাগটা নিয়ে গেল। 'এবারেও বিপদের মুখোমুখি হব।' তিনি দরজার দিকে পা বাড়ালেন। 'আপনার বিপদের চেয়ে আমার বিপদ বড়।' তিনি পর্দা ফাঁক করলেন। 'আমার বিপদ অফি-সিয়েল।' তিনি করিডরে পা দিলেন। 'আপনার বিপদ ব্যক্তিগত।' করিডর দিয়ে তাঁর দ্রুত হেঁটে যাওয়ার শব্দ ঘরে বসে শুনতে লাগল।

অফিস ছুটির একটু আগে সন্তোষ রায় এ্যাটাচি দোলাতে দোলাতে ঢুকল।

'বোস।' অমিয় বলল।

'বসব না।' সন্তোষ ঘড়ি দেখল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ্যাটাচি দোলাতে লাগল।

'একটু বসতে হবে।'

'বসার সময় নেই।'

'দাঁড়াবার?'

'তাও নেই। তাড়াতাড়ি বল।' সন্তোষ এ্যাটাচিটা এক হাত থেকে আরেক হাতে নিল।

'আমার বড় বিপদ।'

'বিপদ।' সন্তোষ বসে পড়ল।

'সামনেই বড় বিপদ। তোকে তা দরকার। ব্যাপারটা একটু শোন।'

ক্রমশঃ

'কিসের বিপদ তোর?' সন্তোষ সিগারেট ধরাল। প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল। 'আমি যা যা দরকার সব করব। কি দরকার তোর?' সন্তোষ এ্যাটাচিটা খুলল। একটা ছাপান কাগজ বের করল। 'আজকেই একটা সত্তর হাজার টাকার অর্ডার। এই মাত্র। দ্যাখ না।' সন্তোষ কাগজটা এ্যাটাচির ভেতর ঢোকাতে লাগল।

'আমার ব্যাপারটা কি ধরনের সেটা একটু—'

'একটু কেন। পুরোটাই শুনব।' সন্তোষ এ্যাটাচিটা বন্ধ করল। 'আমি যা যা দরকার সব করব। কি দরকার তোর? টাকা? এম এল এ?' সন্তোষ এ্যাটাচিটা খুলল। ডায়েরি বই বের করল। 'কত এম এল এ চাই?' সন্তোষ ডায়েরির পাতা ওল্টাল। 'এই দ্যাখ সব ঠিকানা। ফোন নাম্বার। এখুনি যোগাযোগ করতে পারি। সবাই আমাকে চেনেন। তোর যা যা দরকার সব করব। কি দরকার তোর? টাকা? এম এল এ? মন্ত্রী?' সন্তোষ ডায়েরির পাতা ওল্টাল। এই দ্যাখ ফোন নাম্বার। ঠিকানা। এখুনি যোগাযোগ করতে পারি। সবাই আমাকে চেনেন। ভালোভাবে চেনেন।' সন্তোষ এ্যাটাচিটা বন্ধ করতে লাগল।

'আমার বিপদ কতটা মারাত্মক সেটা তুই একবার—'

'কিসের বিপদ তোর? বিপদে এমন মুষড়ে পড়লে চলে? আমি তো আছি। এই তো কালকে আমার এক বিপদ ঘটে গেল।' সন্তোষ এ্যাটাচিটা খুলল। একটা কাগজ বের করল। 'এই দ্যাখ, একটা অর্ডার সাপ্লাই করে সতেরো হাজার টাকা লোক-সান। তাতে কি?' আবার আগেকার কাগজটা বের করল। 'আজই একটা সত্তর হাজার টাকার অর্ডার। পঁচিশ হাজার টাকার মার্জিন।' সন্তোষ কাগজটা ঢুকিয়ে রাখল। এ্যাটাচিটা বন্ধ করল। 'বিপদে এমন মুষড়ে পড়ছিস কেন? আমি তো আছি, ভয় কি। আমি যা যা দরকার সব করব। কি দরকার তোর? মন্ত্রী? এম এল এ? টাকা? এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এখুনি ফোন করে দিচ্ছি। এখুনি চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

সন্তোষ আবার সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়ল। উঠে দাঁড়াল।

'তুই কি চলে যাচ্ছিস?'

'আমার যাওয়া দরকার। এই মুহূর্তে জরুরি কাজ।' সন্তোষ এ্যাটাচিটা হাতে নিল। 'গেলেই যা। যখন খুশি আমাকে পাবি। ফোন করিস।' সন্তোষ দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'বিপদে এমন মুষড়ে পড়লে চলে? ভয় কি। আমি তো আছি। তোর যা যা দরকার সব করব। কি দরকার তোর? টাকা? আজই একটা সত্তর হাজার টাকার অর্ডার। পঁচিশ হাজার টাকার মার্জিন।' সন্তোষ দরজার দিকে পা বাড়াল। চলতে চলতে ঘাড় ফেরাল। 'কি চাই তোর? এম এল এ? এম এল এ-র চিঠি? এখুনি যোগাযোগ করতে পারি। চিঠি লিখে দিচ্ছি। মন্ত্রী? মন্ত্রীর সুপারিশ? এখুনি যোগা-যোগ করতে পারি। ফোন করে দিচ্ছি। বিপদে এমন মুষড়ে পড়লে চলে? একটা অর্ডার সাপ্লাই করে সতেরো হাজার টাকা লোকসান। তাতে কি? আজই আবার একটা সত্তর হাজার টাকার অর্ডার। পঁচিশ হাজার টাকার মার্জিন।' সন্তোষ দরজার বাইরে পা দিল। 'আমি যা যা দরকার..... বিপদে এমন মুষড়ে........।'

'কি ব্যাপার।' নবনী ব্যাগ দোলাতে দোলাতে বলল।

'কথা আছে।' অমিয় বলল।

'এই রাস্তায়।' নবনী রুমাল বের করল।

'ক্ষতি কি।'

'এই ফুটপাতে।' নবনী মুখ মুছতে লাগল।

'এখানেই বলব।'

'কতক্ষণ লাগবে?' নবনী ব্যাগটাকে ডানহাত থেকে বাঁহাতে নিল।

'সময় লাগবে।'

'সন্ধের আগে ফিরতে হবে।' নবনী বাঁহাত থেকে ব্যাগটা ডানহাতে নিল।

'যদি বলা শেষ না হয়।'

'তাড়াতাড়ি বলো।' নবনী রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে লাগল।

'আমার বড় বিপদ।'

'তোমার আবার কি বিপদ।' নবনী বাঁহাতের রুমালটা ডানহাতে নিল। ডান-হাতের ব্যাগটা বাঁহাতে নিল।

'ভালো করে শোনো। বড় বিপদ। বিপদটা এখনও—'

'ভূমিকা ছাড়ো। বিপদটা কি? ঐ গাড়িবারান্দার নীচে চলো।' নবীন বাঁহাতের ব্যাগটা ডানহাতে ডানহাতের রুমালটা বাঁহাতে নিয়ে পা বাড়াল।

'ছটফট করো না।' গাড়িবারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে অমিয় বলল।

'তাড়াতাড়ি বলো। বাড়ি ফিরতে হবে।' নবনী ব্যাগ দোলাতে দোলাতে বলল।

'চুপ করে শোনো। আমার বড় বিপদ। বিপদটা এখনও আসেনি। আসবেই তার কোনো মানে—'

'কি বিপদ। আবার ভূমিকা। ঐ গাছটার নীচে চলো।' নবনী বাঁহাতের রুমালটা ডানহাতে ডানহাতের ব্যাগটা বাঁহাতে নিয়ে পা বাড়াল।

'ছটফট করছ কেন।' গাছের নীচে দাঁড়িয়ে অমিয় বলল।

'সন্ধের আগে ফিরতে হবে। তাড়াতাড়ি বলো।' নবনী রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল।

'স্থির হয়ে শোনো। আমার বড় বিপদ। বিপদটা এখনও আসেনি আসবেই তার কোনো মানে নেই। তবে—'

'কেবল ভূমিকা। বিপদটা কি? ঐ থামটার পাশে চলো। নবনী ব্যাগ আর রুমাল বাঁহাতে নিয়ে ডানহাত তুলে বাঁ-পা বাড়াল।

'ছটফট করো না।' থামের পাশে দাঁড়িয়ে অমিয় বলল।

'তাড়াতাড়ি বলো। বাড়ি ফিরতে হবে।' নবীন ব্যাগ দোলাতে দোলাতে বলল :

'ভালো করে শোনো। আমার বড় বিপদ। বিপদটা এখনও আসেনি। আসবেই তার কোনো মানে নেই। তবে আসতেও পারে। কখন আসবে—'

'বলি বিপদটা কি? ভূমিকা ছাড়ো। ঐ বাসস্টপে চলো।' নবনী রুমাল আর ব্যাগ বাঁহাত থেকে ডানহাতে নিয়ে বাঁহাত তুলে ডান পা বাড়াল।

'ছটফট করছ কেন।' বাসস্টপে দাঁড়িয়ে অমিয় বলল।

সন্ধের আগে ফিরতে হবে। তাড়াতাড়ি বলো।' নবনী, রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল।

'চুপ করে শোনো। আমার বড় বিপদ। বিপদটা এখনও আসেনি। আসবেই তার কোনো মানে নেই। তবে আসতেও পারে। কখন আসবে তারও ঠিক নেই। তবে এলে খুব তাড়াতাড়িই আসবে। বড় বিপদ। তবে কতটা বড় তাও—'

'ভূমিকা ভূমিকা ভূমিকা, কেবল ভূমিকা। বলি বিপদটা কি, কি বিপদ, বিপদটা বিপদটা বিপদটা, কি বিপদ। 'নবনী ব্যাগটা ডানহাত থেকে বাঁহাতে নিয়ে বলতে লাগল, 'বলছি তাড়াতাড়ি বলো, ভূমিকা ছাড়ো, বাড়ি ফিরতে হবে, সন্ধে হয়ে গেল।' নবনী রুমালটা ডানহাত থেকে বাঁহাতে ব্যাগটা বাঁহাত থেকে ডানহাতে নিল, একবার ডানহাত তুলল আবার বাঁহাত তুলল, একবার বাঁপা বাড়াল আবার ডান পা বাড়াল— প্রকাণ্ড এক ভবল ডেকার, অমিয়র মুখের সামনে।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

।। উনিশ ।।

রাত্রি তখন কয়েক প্রহর অতিক্রান্ত। নৌকার চতুর্দিকে প্রচণ্ড এক স্তব্ধতা বিরাজ করছে। ঈশান ডিঙি অলস ভঙ্গিতে নেমে কাছারি বাড়ির দিকে চলে গেছে বহুক্ষণ আগে। যতক্ষণ এখানে বসে গল্প করে গেছে, গৌরী নিশ্চিন্ত ছিল। ঈশান চলে যাওয়ার পর গৌরী মনে করতে পারল, আজ দ্বিতীয় রাত। গতকাল সন্ধ্যার পর পাদরিপাড়া থেকে গোপনে নৌকায় এসে উঠেছিল ওরা। শরীরে তখন প্রচণ্ড এক অবসাদ। তারপর দিন আবার কোন এক অনিশ্চয়তার দিকে গা ভাসাতে হল। ভয়ে আতংকে সারা রাত ওর বিভীষিকার মধ্যে কেটেছে। ভোরে উঠে ছইয়ের এক পাশে কম্বল চাপা দিয়ে জবুথবু হয়ে বসে পড়েছিল গৌরী। ঐ অবস্থায় সারাটা রাত বসে বসেই কেটেছে। বসে বসে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে শরীরের অবসাদ যতটা পারল কাটিয়ে নিল। লক্ষ্মণ অতি আগ্রহে কতবার এগিয়ে এসেছে, গৌরী অজানা এক উত্তেজনায় ভাল করে কথাও বলতে পারে নি ওর সঙ্গে।

লক্ষ্মণ বলেছে, শুয়ে পড় না গৌরী। বেরিয়ে যখন পড়েছি আর তো ফেরার উপায় নেই। এখন আর ভাবনা করে লাভ কি।

গৌরী বলেছে, আমার ঘুম পায় নি। ঘুম পেলেই আমি শোব। পরক্ষণেই বলেছে ফাদার নিশ্চয়ই এতক্ষণ আমাদের খোঁজ করে দিয়েছেন, তাই না লক্ষ্মণদা?

লক্ষ্মণ নৌকো বাইতে বাইতে বলেছে, পাদরি পাড়ার জন্য যদি এতই চিন্তা তাহলে বেরুলে কেন? তোমরা মেয়েরা কখন কি ভাব, কিছুই বুঝতে পারি না।

গৌরী বলেছে, ফাদারকে কষ্ট দিতে কি ভাল লাগে?

—তবে বেরুলে কেন? আমি তো কতবার তোমাকে বলেছিলাম, আর কিছুদিন কাটিয়ে ফাদারকে জানিয়ে শুনিয়েই সব কিছু করা যেত।

ফাদার যে কিছুতেই গৌরীকে পাদরিপাড়া ছাড়তে দেবেন না, এটা গৌরী বুঝতে পারে। বলেছিল, কি করা যেত? ফাদার রাজি হতেন বুঝি?

লক্ষ্মণ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসে-ছিল, নিশ্চয়ই রাজি হতেন। আমরা দুজনে যদি একসঙ্গে গিয়ে ফাদারকে বলতাম, ফাদার আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি, নিশ্চয়ই উনি বাধা দিতেন না।

গৌরী কেমন বিরক্ত হয়েছিল মনে মনে, এখন ভালবাসাবাসির কথা কে ভাবছে! বিয়ে করতে হলে পাদরিপাড়া থেকে পালা-বার দরকার ছিল না, গৌরী জানে। কিন্তু গৌরী পালিয়ে এসে নৌকায় উঠেছে একটি মাত্র কারণে, তা হচ্ছে মায়ের দেখা পাওয়া, বিদ্যাপুরীতে ফিরে যাওয়া। নিমাইয়ের সঙ্গে বিদ্যাপুরী থেকে পালিয়ে যে অন্যায় করেছিল ও, সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করা।

গৌরী পরিষ্কার বলেছিল, তুমি কিছু মনে করো না লক্ষ্মণদা, ওসব কথা এখন আমি একদম ভাবছি না। বিদ্যাপুরীতে মায়ের কাছে ফেরার পর মা যা বলবে তাই হবে।

লক্ষ্মণের মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল. এরকমই যদি ইচ্ছে তা হলে আমাকে বার করে আনলে কেন? তোমার মা যদি আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে রাজি না হন?

—কেন, রাজি হবে না কেন?

—নাও তো হতে পারেন। আমার সম্পর্কে উনি কিছুই জানেন না। তাছাড়া আমি তো আর হিন্দু নই। আমি খৃীষ্টান।

—আমিও খৃীষ্টান।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লক্ষ্মণ বলে-ছিল, কি জানি, হিন্দু খৃীষ্টান তো গায়ে লেখা থাকে না, তুমি যদি অস্বীকার করো! শেষ পর্যন্ত আমিই একটা বিপদের মধ্যে পড়ে গেলাম।

—না গো, না। গৌরী সান্ত্বনা দিয়েছিল, তেমন কিছু হবে না দেখ। মা মাকে আমি ঠিক রাজি করিয়ে নেব। মা যদি রাজি না হয়, তখন তুমি যা বলবে তাই করব।

রাতে বার কয়েক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে গৌরীকে আদর করার জন্য এগিয়ে এসেছিল লক্ষ্মণ। প্রতিবার ফুঁপিয়ে উঠেছিল গৌরী। না লক্ষ্মণদা, তোমার পায়ে পড়ি।

—কেন? লক্ষ্মণ ফুঁসে উঠেছিল মাঝে মাঝে, তার মানে তুমি আমাকে চাও না। আমাকে তুমি বিশ্বাসই কর না। অথচ বিদ্যাপুরী থেকে যখন তুমি পালিয়ে এসেছিলে সঙ্গে তোমার নিমাই ছিল।

—হ্যাঁ ছিল। নিমাইদা আমাকে কল-কাতা দেখাবার লোভ দেখিয়েছিল। কিন্তু নিমাইদা কখনো তোমার মতো এরকম করে নি।

—অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না।

—তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মণদা। বিশ্বাস করো, নিমাইদা আমাকে বোনের মতো দেখত। নিমাইদা আমাকে বলেছিল, কালিঘাটে নিয়ে যাবে। সেখানে মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে আমি যদি ইচ্ছে করি, তবেই আমাদের বিয়ে হবে।

একটুক্ষণ নীরব থেকে গৌরী বলল, কিন্তু একটা রাত পেরতে না পেরতেই আমার জ্বর হল। জ্বরে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়লাম। আমার সারা গায়ে গুটি বেরল। আমার যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখি, নিমাইদা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি একা। মানুষকে আমি আর বিশ্বাস করি না লক্ষ্মণদা।

—তার মানে আমাকেও তুমি বিশ্বাস কর না?

গৌরী ভেজা গলায় বলেছিল, না লক্ষ্মণদা, তোমাকে আমি অনেক বেশি চিনি। নিমাইদাকে আমি তেমন করে জানতাম না। কলকাতা থেকে হঠাৎ ও এল, ওর গল্প শুনতে শুনতে আমার কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। তখন ভাববার অবসর ছিল না, নিমাইদা কতটা আসল, আর কতটা নকল।

—আমি কিন্তু একদম নকল নই গৌরী। বিশ্বাস করো, তোমাকে ছাড়া আর আমি বাঁচতেই পারব না। তোমাকে দেখার পর থেকেই জীবনটা আমার অন্যরকম হয়ে গেছে।

গৌরী বলেছিল, লক্ষ্মণদা, তোমাকে আমি কোনদিন কষ্ট দেব না, শুধু একবার আমাকে বিদ্যাপুরীতে নিয়ে চল। তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মণদা, একটা দিন আমাকে একা থাকতে দাও। তোমার পায়ে পড়ি।

লক্ষ্মণ আর বিরক্ত করে নি ওকে। শুধু বলেছে, তুমি ঘুমুচ্ছ না, তোমার শরীর খারাপ লাগবে।

গৌরী সারা রাত ঠায় বসে কাটিয়েছে কাল। সারা রাত ছলছল জলের শব্দ, সারা রাত প্রচণ্ড হিমের আক্রমণ। চোখ জুড়ে এসেছিল মাঝে মাঝে, আচ্ছন্নের মতো রাত্রিটা ওর কেটে গেছে।

আজ ঈশান চলে যাওয়ার পর মনে হল আবার একটা ভয়ানক রাত্রি এল। ছইয়ের ভেতর একটা লন্ঠন জ্বলছে। অত্যন্ত স্তিমিত করে দেওয়া হয়েছে আলো। তেল ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে লক্ষ্মণ ওটাকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল, গৌরীই সাহস পায়নি আলো নেভাতে।

আজও গৌরী ছইয়ের এক কোণে পা ছড়িয়ে সারা দেহে কম্বল জড়িয়ে বসল। সারাদিনের উত্তেজনা আর গতকালের রাত্রি জাগরণে শরীরে এখন প্রচণ্ড ক্লান্তি। পা ছড়িয়ে ছইয়ের গায়ে পিঠটাকে এলিয়ে রাখার চেষ্টা করল গৌরী। সামনেই লক্ষ্মণ চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে। অন্যদিকে [illegible] গৌরীর দিকে [illegible] আছে [illegible]

গৌরী হাঁটুর মধ্যে মাথা এলিয়ে দিল। লক্ষ্মণ না ঘুমোন অবধি এইভাবেই ওকে বসে কাটাতে হবে। লক্ষ্মণের চোখ দুটো এখন অসম্ভব ধারালো, ওদিকে তাকাতে সাহস হল না গৌরীর।

স্তব্ধভাবে আরো বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

লক্ষ্মণ শব্দ করে পাশ ফিরল, তারপর কি খেয়াল হওয়ায় আবার উঠে বসল।

—তা হলে সত্যি সত্যি তুমি শোবে না? এইভাবে বসে থাকলে কার ভাল লাগে?

গৌরী উত্তর করল না। যেন শুনতেই পায়নি, এমন ভাব করল।

—কি বল? সারা রাত এইভাবে বসে কাটাবে? আমাকে যদি এতই ভয়, তা হলে না বেরুলেই হত!

—তুমি ঘুমোও না। আমার ঘুম এলেই আমি শুয়ে পড়ব।

লক্ষ্মণের গলায় বিরক্তি ঝরে পড়ল, ছেলেমানুষীর একটা সীমা থাকা দরকার। তুমি এইভাবে বসে বসে কষ্ট পেলে আমি ঘুমোই কি করে। হঠাৎ একটা হাত গৌরীর দিকে এগিয়ে দিল লক্ষ্মণ।

বুকের ভিতর প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়ল যেন। হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল গৌরী।

—কি হল? লক্ষ্মণের চোখ দুটো যেন জ্বলছে। শুয়ে পড়বে কিনা? আবার হাতটাকে এগিয়ে দিল লক্ষ্মণ।

আবার হাতটাকে ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল গৌরী। বসতেও দেবে না দেখছি তুমি শোও না।

—না। আমি শোব না। লক্ষ্মণ আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করল।

গৌরী নিজেকে আরো গুটিয়ে ধরল, তুমি মিথ্যে কথা বলেছ কেন? সরাসরি এবার আক্রমণ করল গৌরী।

—মিথ্যে কথা! কখন, কোথায়? কেমন একটু হকচকিয়ে গেল লক্ষ্মণ, মিথ্যে কথা বলেছি?

—বিদ্যাপুরী কোথায় তুমি জান না, অথচ এই সত্যি কথাটা কেন বলনি আমাকে? কেন?

—উরে ব্বাস! এই জন্য এত রাগ। বিদ্যাপুরী তোমায় পৌঁছে দিলেই তো হল!

—তুমি বলেছিলে দুদিনের মধ্যে আমাকে বিদ্যাপুরী পৌঁছে দেবে। অথচ—

—দুদিনের জায়গায় না হয় তিন দিন হবে। বিদ্যাপুরী ঠিক আমি চিনে নেবই আর তোমাকেও পৌঁছে দেবই।

—বিদ্যাপুরী না পৌঁছন অবধি তুমি আমায় ছোঁবে না। আরো ছোট হয়ে বসার চেষ্টা করে গৌরী।

লক্ষ্মণ পাথরের মূর্তির মতো তাকিয়ে থাকে গৌরীর দিকে। তারপর বলে, বেশ ছোঁব না। আমি বরং বাইরে হিমের মধ্যে গিয়ে শুয়ে থাকি।

গৌরী কোন উত্তর করল না।

—আসলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না। অথচ যীশুর নামে তুমি প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছ, মনে আছে?

—তোমাকে আমি হিমের মধ্যে যেতে বলিনি। এখানে আমার বসে থাকায় যদি তোমার অসুবিধা হয়, আমিই বরং বাইরে গিয়ে বসি।

লক্ষ্মণ জোড় হাত করল, ঠিক আছে তুমি বোস। আর তোমাকে বিরক্ত করব না। বলতে বলতে লক্ষ্মণ পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল, নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকল। এবং এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

ছইয়ের বাইরে থেকে প্রবহমান নদীর জলের শব্দ এসে যেন ঘুমপাড়ানি আমেজ সৃষ্টি করছে এখন। গৌরী আলতো করে চোখ বুজে বসেছিল, বিন্দু বিন্দু অসংখ্য আলোর বুদবুদ ওর চোখের সামনে ফুলঝুরির মতো উড়ে এসে দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎটাকে ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করছিল। পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে অসম্ভব এক ক্লান্তি গড়াচ্ছে। বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল ওর।

কিন্তু আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল গৌরী, তারপর ধীরে ধীরে দেহটাকে ভাঁজ করে কাঠের পাটাতনে নামিয়ে দিল।

রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হতে শুরু করল।

ওদিকে বোধহয় একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল ঈশানের। হঠাৎ চমকে উঠল। মাতাল শুকদেবটা কি পা ছুঁড়ে দিয়েছে ওর গায়ে? না, তাতো নয়! তা হলে! আরো একটুক্ষণ সতর্কভাবে ও অপেক্ষা করল। না কিছুই না।

অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে উপরে গোলপাতার ছাউনীর দিকে তাকিয়ে থাকল ঈশান। আজ সারাটি দিনই ওর কী ভীষণ এক উত্তেজনার ভিতর দিয়ে কেটে গেল। জীবনে যে আবার কখনো গৌরীর সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই পারেনি ও। কিন্তু আজ সেই গৌরীর সঙ্গেই ওর দেখা হয়ে গেল! কেবল দেখা নয় গৌরীর নৌকোয় বসে খাওয়া-দাওয়া অবধি।

নৌকো থেকে যখন ফিরে এল ঈশান, হাজার রকম প্রশ্নের মুখোমুখি পড়তে হয়েছিল ওকে। ঈশান জানত, সবাই ওকে ছেঁকে ধরবে, প্রস্তুত হয়েই এসেছিল ও। গৌরীর হয়ে অনেক কথা বলার চেষ্টা করল ঈশান, বলল, না জেনে-শুনে মানুষ সম্পর্কে অনেক কথাই রটানো যায়, আমি কিন্তু হলপ করে বলতে পারি গৌরী ওরকম নয়।

—রজনীভাই তা হলে রাগ করছে কেন? রজনীভাই কি তাহলে মিথ্যে বলছে?

—মিথ্যে ছাড়া কি! অসুখ বিশুখ কার না হয়, অসুখ হলেই যে ডাইনী হয়ে যাবে এমন কথা নয়।

—কিন্তু সেবার তো ওর জন্যই—

কথা শেষ করতে দিল না ঈশান, থামো কথা। তা ছাড়া, সেবার না হয় অসুখ ছড়িয়ে গিয়েছিল, এবার কি ছড়াবে

যে তর্ক করছিল সে থেমে গেল।

ঈশান বলল, তা ছাড়া আমি তো এতক্ষণ ওর সঙ্গে বসে গল্প করে কাটিয়ে এলাম, ওর রান্না করা ভাতও খেয়ে এলাম, তোরাই দেখ না, যদি কিছু হয় আমার হবে।

একথা শোনার পর অনেকেই কেমন ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেল। মেয়েটা খারাপ না ভাল সে প্রশ্নের বিচার করবে কে?

কে একজন বলল, মেয়েটার চেহারা দেখে কিন্তু ডাইনী বলে মনে হয় না, কিন্তু ওর চোখের চাউনিটা ভাই অন্য রকম।

—কি রকম?

—তখন কেমনভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল, দেখিস নি?

ঈশান প্রতিবাদ করতে পারত, কিন্তু ঝামেলা বাড়াতে চাইল না। বেশ রাত হয়ে গেছে। ঘোর অন্ধকার হয়ে আছে আকাশটা। সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত বাদলা নামবে কিনা কে জানে। এই অসময়ে বৃষ্টি হলে আবার হয়তো ঝামেলায় পড়তে হবে।

হরিণটার কাছাকাছি এগিয়ে এসে ঈশান দেখল, পায়ে চুন হলুদ লাগিয়ে পটি বাধা হয়ে গেছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল ও।

হরিণটাকে আবার ও জড়িয়ে ধরে আদর করল। আদর করতে করতে ওর মনে হয়েছিল ও যেন সারাক্ষণ ধরে কাঁদছে। ওর চোখ দুটো বড় করুণ।

—এই বোকা, কাঁদছিস কেন? গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল ঈশান। নরম ভেলভেটের মতো গা, হাতের ছোঁয়ায় শিরশির করে উঠে। পায়ের দিকে ঝুঁকে আরো খানিকটা পরীক্ষা করে নিয়েছিল, পাটা কি দুর্বল হয়ে পড়েছে ওর। বিকেলে তো ঐ চোট খাওয়া পায়েই লাফাচ্ছিল। কী জানি শেষ পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে যাবে কিনা।

হরিণের গলার কাছে হাত বোলাতে বোলাতে কাল্পনিক কিছু সংলাপ শুরু করে দিয়েছিল ঈশান, জানিস, আজ আমার কত বড় আনন্দের দিন। আজ গৌরী এসেছে নদীর ঘাটে। তখন দেখলি না, সবাই ছুটোছুটি করছিল ঘাটের দিকে। কেউ কি ভাবতে পেরেছিল গৌরী আবার ফিরে আসবে। এক রজনীই কেবল গোলমাল পাকাতে চাইছে ওর আসার জন্য। খবরদার তুই কিন্তু রজনীর কথা একদম বিশ্বাস করিস না। রজনী কিন্তু তোকে একা পেলে মেরেও ফেলতে পারে। ও না পারে [illegible] কাজ নেই।

কি ? শুনছিস তো ! ঈশান জড়িয়ে ধরে আদর করল, আবেগে একটা চুমুও খেয়ে বসল হরিণটাকে। তারপর আর কিছু করার নেই দেখে ধীরে ধীরে ঘরের দিকে ফিরে এল।

শুকদেবটা আজ অনেক রাত ধরে আবোল-তাবোল বকেছে। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়েছে। শুকদেবের পাশেই শোয়ার জায়গা ঈশানের।

ঈশান অন্ধকারে একবার শুকদেবের শোয়ার ভঙ্গিটা দেখার জন্য চোখ নামাল। দেখা যায় না। কেবল জোরে জোরে শ্বাস টানার শব্দ পেল ঈশান। নাহ্, আজ বোধহয় সারাটা রাতই জাগতে হল ঈশানকে। এত উত্তেজনায় কখনো ঘুম আসে।

ঈশান অনুমান করার চেষ্টা করল, গৌরী কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আর সঙ্গের ঐ লোকটা। ঐ লোকটার সঙ্গে কী সম্পর্ক গৌরীর। কেন ওরা অমনভাবে নৌকো করে এল। ওরা কি স্বামী-স্ত্রী। নাহ্, ওরা যে স্বামী-স্ত্রী নয় এটুকু বোঝার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে ঈশানের। তা হলে এই রাত্রি করে ওরা এক নৌকোয় পাশাপাশি কাটাচ্ছে কি করে। নিশ্চয়ই গৌরীরও সমর্থন আছে এ ব্যাপারে নইলে সাহস পাচ্ছে কি করে লোকটা। গৌরী যদি মুখ খুলে একবার লোকটা সম্পর্কে বলত, ঈশান ওকে শোয়ার জন্য আলাদা জায়গা করে দিতে পারত। কাল সকালে কি সরাসরি গৌরীকে জিজ্ঞেস করব। এমনও তো হতে পারে গৌরীকে বিদ্যাপুরীর নাম করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাবার ফন্দি আছে লোকটার।

নাহ্, বেশ কিছুক্ষণ অস্বস্তি বোধ করল ঈশান। কাল সকালেই একটা হেস্ত-নেস্ত করতে হবে। কাল সকালেই। আবার ও পাশ ফিরেছিল। কিছুক্ষণ পর বোধহয় একটু তন্দ্রা মতনই এসেছিল।

কিন্তু হঠাৎ ওর তন্দ্রার রেশটা কেটে গেল কেন। তবে কি হরিণটারই কিছু হল। বাইরে দাওয়ায় ওকে বেঁধে রাখা হয়েছে। হরিণটা কি পায়ের যন্ত্রণায় এখন ছটফট করছে। ঈশান আর শুয়ে থাকতে পারল না। উঠে অন্ধকারে কুড়াল হাতড়াতে শুরু করল। শুকদেবকে ডাকার প্রয়োজন মনে করল না। হ্যাঁ, কুড়ালটা পাওয়া গেছে। ঈশান ঘরের ঝাঁপ খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

ঐ তো, ঐ তো হরিণটা। কিন্তু অমন করছে কেন ওটা। লাফিয়ে দড়ি ছিঁড়ে যেন বেরিয়ে পড়তে চাইছে। কেন, অমন করছে, কে।

চারপাশে তাকাল ঈশান। তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। অন্যান্য দিনের তুলনায় কুয়াশা কিছু কম। জঙ্গলের দিকটা ঘোর কালো। আলকাতরার মতো কালো। কেমন দমচাপা স্তব্ধতা লুকিয়ে আছে ওদিকে। অন্ধকার আর জঙ্গলটাকে জীবন্ত মনে হল ঈশানের। মনে হল ভীষণ হিংস্র একটা জীব যেন কিছুদূরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। একটু সুযোগ বুঝলেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের উপর। গাটা কেমন ছমছম করে উঠল ঈশানের।

হাতের কুড়ালটাকে ও চেপে ধরল। কিন্তু সামান্য এই কুড়াল দিয়ে কি ঐ অন্ধকার দৈত্যটাকে ঠেকানো যাবে। কুড়াল সমেত হাতটা ওর থরথর করে কেঁপে উঠল। আকাশটা অনেক পরিষ্কার মনে হল। দুটি একটি নক্ষত্রও যেন ফুটে উঠেছে। ওগুলো নক্ষত্রই তো, নাকি দূরে ঐ যে আগুনের কুন্ডলী জ্বলছে তার ফুল উড়ে আকাশে ভাসছে, ঠিক ধরতে পারল না ঈশান কি ওগুলো।

আগুনের কুন্ডলীগুলো থেকে গল গল করে ধোঁয়া উড়ছে। অসংখ্য পোকা এসে ঘিরে ধরেছে ঐ আগুনকে। আলোর পোকা আর ধোঁয়ায় এখন মাখামাখি।

হরিণটার কাছে এগিয়ে এল ঈশান। গায়ে হাত রাখল, শিরশির করা হরিণের কাঁপুনি ওর সারা গায়ে বিঁধিয়ে পড়ল।

—আহ্, আহ্। কী হয়েছে রে ? কী দেখেছিস ? অমন করছিস কেন ?

দড়ি খুলে হরিণটাকে আলগা করে দিল ঈশান। হরিণটা ঈশানের গায় গায় সেঁটে এসে দাঁড়াল। কৌতুকে ঈশান ওকে আরো কাছে টেনে নিল।

—কি হয়েছে বল না ? ভয় পাচ্ছিস ? আচ্ছা ঠিক আছে, আয় তোকে ঘরে নিয়ে যাই, আয়।

হরিণটাকে পাঁজা কোলে করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল ঈশান। ঝাঁপটাকে পায়ে ঠেলে বন্ধ করে হরিণটাকে এক পাশে নামিয়ে রাখল।

—বোস এখানে। আহ্, দাঁড়া না।

আর একটু হলে হরিণের ধাক্কায় শুকদেবের ওপরই পড়ে যাচ্ছিল ও। সামলে নিয়ে এক পাশে টেনে সরিয়ে আনল হরিণটাকে, তারপর দড়িটাকে শক্ত করে বেড়ার খুঁটির সঙ্গে বাঁধল। বোস। ভয় নেই ঘুমো।

হরিণের পিঠে হাত বুলিয়ে ঈশান ফিরে এল নিজের শোবার জায়গায়, পুরু খড়ের গদির ওপর একটা কম্বল বিছানো, ঈশান হাত পা ছড়িয়ে তার উপর শুয়ে পড়ল। এবার যদি ঘুমোন যায়।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা শোরগোল উঠল, বাঘ বাঘ!

—কোথায় বাঘ, কোথায় ?

লাঠি, কুড়াল, খন্তা যে যা পারল হাতে নিয়ে ছুটে এল উঠোনে, কোথায়? কোথায় বাঘ?

চারপাশে তখন থমকে থাকা কুয়াশা। দূরের জঙ্গলে পাখপাখালির কলরব। রাতের মতো জঙ্গলটা এখন আর অত ভয়াল নয়। বরং সবুজ সতেজ গাছপালার চেহারা দেখে এখন অন্য রকমই অনুভূতি হয়। কোথায় বাঘ!

উঠোনের নরম মাটিতে কয়েকটা বড় বড় ছাপ। ছাপগুলো ঘিরে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ। নির্ঘাৎ বাঘের পা। বাঘ এসেছিল রাতে।

ঈশানও কৌতুকে দেখল, হ্যাঁ বাঘেরই পায়ের ছাপ ওগুলো। রাতে তাহলে সে সময় বাঘই এসেছিল। হরিণটা কি তাই অত ছট-ফট করে দড়ি ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করছিল।

হরিণটাকে যখন ঘরে তুলে নিয়ে এলাম, তখনো কি বাঘটা ধারে কাছেই ছিল। কি জানি কিছুই বুঝতে পারল না ঈশান।

চকিতে ভেড়ির দিকে তাকাল। ওদিকে এখন ভিন্ন চেহারা। ভেড়ির মাটি সপসপ করছে ভেজাভেজা। বৃষ্টি হয় নি তবু রাতের কুয়াশাতেই ভিজে অমন হয়ে আছে মাটি। ও মাটির ওপর দিয়ে হাঁটলে পায়ের তলায় চাপ চাপ মাটির চলটা উঠে আসবে।

ঈশান রূপোলি পাতের মতো ভেড়ির মাটির দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কি ভাবল, তারপর কাউকে কিছু না বলেই ছুটতে শুরু করল ওদিকে। গৌরী ভাল আছে তো!

চলবে

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরীর কবিতা

উদ্বাস্তু

দূরে ঐ আমার চৌয়ারি।
অনেক গাছের মধ্যে লালচূড়া জেগে আছে :
চতুর্দিকে সোনা-রূপা—কদমের ডালে
চিত্রার্পিত নীল ঘুড়ি, যেন ব্রোচ, পাতায় আটকানো,
একসারি পাম গাছ—গুঁড়ির বোতলে উপচে পড়ে প্রাণরস
পুকুরের জলে নুয়ে লোলচর্ম প্রাচীন বকুল,
আমাদের পূর্বপুরুষ—হয়তো বা বালারুণ
সত্য যুগ ত্রেতা যুগে সে-ও ছিলো, উল্লেখ দেখেছি রামায়ণে—
ঐ চাষপাখি উড়ে গেলো, ভালো নাম নীলকণ্ঠ;
ভুশ করে ভেসে ওঠে চাকমাছ, কূর্ম অবতার;
ছড়ার মটুকপরা ঐ টিয়া, তকমা-আঁটা বুক—
চাঁদের মতোই সে-ও সুগীতিত।
ক্রমে দিন শেষ হয়ে আসে।
এইবার ফুটে ওঠে শেষ দৃশ্য :
তুর্কি এসে খুলে নেয় আমার চৌয়ারি থেকে তামা,
সেই ঘর উবে যায়।।

কুটুমবাড়ি

চাকা ডোবার আগেই আমি পৌঁছে যাবো।
লাঠির আগায়
পুঁটুলি-বাঁধা কাগজপত্র, টগরবাগিয়ে নদীর তীরে
আঁজলা ভরে মিষ্টি জল তুলে খেলাম, পায়ের গা
চুকচুকিয়ে, খেই হারালুম গহিন এক বনের মধ্যে,
রাঙা ফলটি, ভীষণ টক, পেড়ে খেলাম, একটু পরে
কুটুম-পাখির সঙ্গে দেখা, শেয়াল গেলো শূন্য মাঠ
পাড়ি দিলেম কোনাকুনি, ঢালু বেয়ে নেমে আসতে
আমার চাকা দু-ভাগ হলো বিশাল হাঁ-এ ডোবার আগেই
এক পুঁটুলি কাগজপত্র হাতে নিয়ে গাঁয়ের কবি
কুটুমবাড়ি পৌঁছে গেলাম।।

শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের ছবি

শুভাপ্রসন্নর জন্ম ১৯৪৭ সালে কলকাতায়। গত তিন দশক একটার পর একটা ঘটনা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ভীষণ রকম নাড়া দিয়ে গেছে, শুভপ্রসন্ন তার মধ্যেই কৈশোর থেকে যৌবনে এসে পৌঁচেছেন। তার মনের ক্যানভাসে সেই সব ব্যথাবেদনা আশা-নিরাশা ছাপ রেখে গেছে।

শুভাপ্রসন্নর ছবিতে বিষয়বস্তু হিসেবে মন্বন্তরই মানুষ প্রাধান্য পেয়েছে। সেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অসহায় মানুষ ভীষণ একা। আবার মানুষের আশা-আকাঙ্খার ছবিও আছে। অশুভ ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে শুভা নিপুণ হাতে প্রাচীন ভারতের মাঙ্গলিক প্রতিক ব্যবহার করেছেন।

মোটকথা শুভপ্রসন্ন বাস্তবকে পাশ কাটিয়ে শুধু কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করেননি বরং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তার মুখোমুখি হবার চেষ্টা করেছেন।

জারের আমলে রুশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ

অমিতাভ গুপ্ত

১৯১৫ খৃঃ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকের প্রচ্ছদ

РАБИНДРАНАТЪ ТАГОРЪ

ПОЧТА

রবীন্দ্রনাথ যদিও তাঁর সতেরো বছর বয়স থেকে শুরু করে বার বার বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন, ইউরোপ সফর করেছেন বহু বার, তবুও তিনি রুশ দেশে প্রথম গিয়েছিলেন ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন তিনি প্রায় বার্ধক্যে উপনীত। তখন তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি এবং এবারই ছিল কবির শেষ ইউরোপ সফর।

রবীন্দ্রনাথের মস্কো ভ্রমণের মাত্র তেরো বছর আগে ১৯১৭ সালে লেনিনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ঐতিহাসিক রুশ-বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে। কবি যখন মস্কোয় এলেন, তখন সারা রুশ-দেশ-জুড়ে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চলছে যা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে লিখে ছিলেন : 'আপাতত রাশিয়ায় এসেছি, না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয় কি অসম্ভব সাহস।.. এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে সেটা দেখে আমি সবচেয়ে বেশী বিস্মিত হয়েছি।.... দেখতে পাচ্ছি বহু দূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নতুন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে।'

রবীন্দ্রনাথ নিজেও রুশ দেশে সর্ব-শ্রেণীর মানুষের মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'র মাধ্যমে যেভাবে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার অসংখ্য জটিল-সমস্যাকীর্ণ জনসাধারণের দেশ-গঠনের নিরলস প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে-ছিলেন, তাঁদের উৎসাহিত করেছিলেন সে জন্য সারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কোটি কোটি নরনারী এখনও সশ্রদ্ধ চিত্তে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতার কথা স্বীকার করেন। এ ছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদির জনপ্রিয়তা সোভিয়েত দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক। আমি সম্প্রতি মস্কোর নভোস্তি প্রেস এজেন্সির আমন্ত্রণে সোভিয়েত ভূমিতে ব্যাপক সফরের সময় নিজে দেখে এসেছি যে সে বিশাল দেশের যেখানেই আমার যাবার সুযোগ হয়েছিল—মস্কো থেকে শুরু করে সোভিয়েত দেশের এশীয় অঞ্চল আর্মেনিয়া ও উজবেকিস্তান পর্যন্ত—সর্বত্র স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে কল-কারখানার শ্রমিকরা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে চেনেন, জানেন ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে পরি-চিত, যদিও সে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নানা জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর বাস। এক কথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোভিয়েত দেশে একটি ঘরোয়া নাম এবং সে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় প্রতিটি পরিবারে রুশ বা স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের লেখা কিছু বই-র সন্ধান পাওয়া যাবেই। তাই বর্তমান সর্বোচ্চ সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক ব্রেজনেভ ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভারত সফরে এসে কলকাতায় জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান দর্শন করে তাঁর দেশবাসীর মনোভাবের প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন : 'বাংলার কৃতী সন্তান, মহান লেখক ও জননেতা রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় আসতে পারায় আমি আনন্দিত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অকপট ও প্রকৃত বন্ধু। তাঁর রচনাবলী সোভিয়েত দেশে অতিসমাদৃত।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর ১৯৩০-এর রুশ সফরের আগে তো বটেই এমন কি ১৯১৭ সালের ঐতিহাসিক রুশ বিপ্লবের পূর্বেও সে দেশে সুপরিচিত ছিলেন তার প্রচুর নিদর্শন আমি এবার নিজে দেখে এলাম আমার সোভিয়েত দেশ সফরের সময়।

প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত দেশে রবীন্দ্র-নাথ প্রথম পরিচিত হন এই শতাব্দীর প্রথম দিকে, যদিও প্রাক-বিপ্লব জার-শাসিত রুশ দেশে সে সময় সংঘাত, ষড়যন্ত্র ও সংঘর্ষ-জর্জরিত এক অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে মস্কোয় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'গীতাঞ্জলি' ও ছোট গল্প বিচারক ও 'সুভা'র রুশ অনুবাদ। সে ১৯১৩ সালের কথা যে বছর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এর পর মস্কোতে রবীন্দ্র রচনার অনুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে যাকে প্রকাশকরা আখ্যা দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পূর্ণ রচনাবলী।

1913... Russia discovers Tagore

Tagore's poems became widely popular in Russia, as they did in Europe

আমি সম্প্রতি যখন মস্কো শহরে রবীন্দ্রনাথের ১৯৩০ সালের রুশ দেশ সফর সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলাম তখন এক রবীন্দ্র-অনুরাগী রুশ-অধ্যাপক ১৯১৫ অর্থাৎ ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের দু-বছর আগে মস্কোতে ছাপা রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের রুশ অনুবাদ পোসটা-র একটি দুষ্প্রাপ্য কপি উপহার দিলেন (প্রসঙ্গত, এই অধ্যাপকের নাম স্নাতুক দানিলচুক, বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত)। নিঃসন্দেহে এটি একটি অতি দুর্লভ পুস্তক। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘরে'র এই দুষ্প্রাপ্য রুশ অনুবাদটির মলাটের ও অন্যান্য কয়েকটি পৃষ্ঠার আলোক-প্রতিলিপি এই সঙ্গে দিলাম। এ থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ১৯১৩ থেকে ১৯১৫ এই দু বছরের মধ্যে নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনার রুশ-অনুবাদ মস্কোয় প্রকাশিত হয়েছিল,—এদের কয়েক-টির দ্বিতীয় সংস্করণও হয়েছিল। এর প্রতিটিই ছিল উপরে উল্লেখিত রুশ-ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের 'সম্পূর্ণ রচনাবলী'র অন্তর্ভুক্ত।

বাম দিকে রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর ১৯১৫ খৃঃ এবং দক্ষিণে গীতাঞ্জলি ১৯১৪ খৃঃ মস্কোয় প্রকাশিত হয়েছিল। [বিশ্বভারতীর সৌজন্যে]

১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে রুশ-ভাষায় অনূদিত ও মস্কো থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার তালিকা :

প্রথম খণ্ড : 'গীতাঞ্জলি'র রুশ অনুবাদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

দ্বিতীয় খণ্ড : 'গার্ডেনার'-এর রুশ অনুবাদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

['গার্ডেনার' রবীন্দ্রনাথের পাঁচ-মিশালী লিরিকের সংগ্রহের ইংরেজী-অনুবাদ। ১৯১৩ সালের অকটোবর মাসে লণ্ডনে প্রথম প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ 'গার্ডেনার' উৎসর্গ করেছিলেন কবি য়েটসকে। 'গীতাঞ্জলি' পড়ে লোকের মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ বুঝি একজন প্রাচ্য দেশীয় মিস্টিক। পাছে মানুষের মনে এই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়, সে জন্য 'গার্ডেনারে'র মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি মূলত একজন কবি। 'গার্ডেনারে'র প্রথম কবিতা 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'-এর ইংরেজী অনুবাদ। এই সময় কয়েকটি চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ বার বার লিখেছিলেন যে তিনি গুরু নন, তিনি কবি। সম্ভবত তাঁর এই কবি খ্যাতি তাঁর বিদেশী অনুরাগীদের কাছে নতুন করে তুলে ধরার জন্য ইংরেজী ভাষায় 'গার্ডেনার' প্রকাশ করেছিলেন।

তৃতীয় খণ্ড : 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এর রুশ অনুবাদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

[সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কাব্য 'দি ক্রেসেণ্ট মুন' রবীন্দ্রনাথের শিশু-কাব্যখণ্ডের কয়েকটি কবিতার তর্জমা। অধিকাংশ অনুবাদই 'শিশু' থেকে, যদিও 'গীতিমাল্য', 'কড়ি ও কোমল' এবং 'সোনার-তরী' থেকে কিছু কবিতার ইংরেজী তর্জমা 'ক্রেসেন্ট মুন'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ইংরেজী পুস্তকটি ১৯১৩ সালে লণ্ডনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এটি উৎসর্গ করেছিলেন ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিক টমাস স্টারজ মুরকে।

চতুর্থ খণ্ড : 'চিত্রা'র রুশ অনুবাদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

['চিত্রাঙ্গদার' ইংরেজী অনুবাদ 'চিত্রা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে লণ্ডনে।]

পঞ্চম খণ্ড : পোসতা [রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের রুশ অনুবাদ। 'ডাক-ঘরের ইংরেজী তর্জমা 'পোস্ট অফিস' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল লণ্ডনে।]

ষষ্ঠ খণ্ড : 'কিং অফ ডার্ক চেম্বার'-এর রুশ অনুবাদ। ['রাজা' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ 'কিং অফ ডার্ক চেম্বার' লণ্ডনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৪ সালে।]

সপ্তম খণ্ড : 'গ্লিম্পসেস অফ বেঙ্গল লাইফ'-এর রুশ অনুবাদ।

[রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে-র কয়েকটি গল্পের ইংরেজী অনুবাদের সংকলন 'গ্লিম্পসেস অফ বেঙ্গল লাইফ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মাদ্রাজে ১৯১৩ সালে প্রকাশক : মাদ্রাজের জি. এ. নটেসান কোম্পানী। এই সংকলনের গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম কাবুলিওয়ালা, সুভা, শুভ-দৃষ্টি, অনধিকার প্রবেশ, কঙ্কাল, শাস্তি, প্রায়শ্চিত্ত, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি]

অষ্টম খণ্ড : ওয়ান হানড্রেড পোয়েমস্ অফ কবীর-এর রুশ-অনুবাদ।

[১৯১৪ সালে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন কবীরের দোহা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে বাংলায় অনুবাদ করেন এবং অধ্যাপক সেনের তর্জমা অব-লম্বনে অজিতকুমার চক্রবর্তী শতাধিক কবিরের শ্রেষ্ঠ দোহা ইংরাজীতে অনুবাদ

করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুবাদ-গুলি বাছাই করে প্রয়োজনমত অদল-বদল করে ওয়াল হানডেডে পোয়েমস অফ কবীর শীর্ষক পুস্তকে প্রকাশ করেন।

প্রথম খণ্ড : 'চোখের বালি'-র রুশ অনুবাদ।

দশম খণ্ড : 'সাধনা'-র রুশ অনুবাদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

[আমেরিকা ও লন্ডনে রবীন্দ্রনাথ যে সব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সেগুলি পুস্তকাকারে ১৯১৩ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। কবি 'সাধনা' উৎসর্গ করেছিলেন সাহিত্যিক আরনেস্ট রিহ্‌স্‌-কে। ইউরোপ আধুনিক ভারতের চিন্তা-*ধারার সন্ধান পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। প্রাচীন ভারতের ধর্মের কথা ইউরোপ শুনল 'সাধনা'র বক্তৃতামালা* থেকে যার মধ্যে অন্যতম : (১) দি রিলেশন অফ দি ইনডিভিজুয়াল টু দি ইউনিভার্স, (২) দি প্রব্লেম অফ সেলফ, (৩) দি রিয়ালাইজেশন অফ দি ইনফিনিট, (৪) দি প্রব্লেম অফ সেলফ ইত্যাদি।]

রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' (বা পোস্ট অফিস) নাটকের রুশ-অনুবাদ পোস্টা-র এই সংস্করণটির প্রচ্ছদে কবির যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি তা কিশোর রবীন্দ্রনাথের। এই ছবিটি ১৮৭৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে) গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁকেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-অংকিত একটি পেনসিল-স্কেচ অবলম্বনে।

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পূর্ণ রচনাবলী
পঞ্চম খণ্ড
ডাকঘর নাটক
ভ্যালেনতিন পর্তুগালভ্‌ কর্তৃক ১৯১৫ খৃঃ
মস্কোয় প্রকাশিত
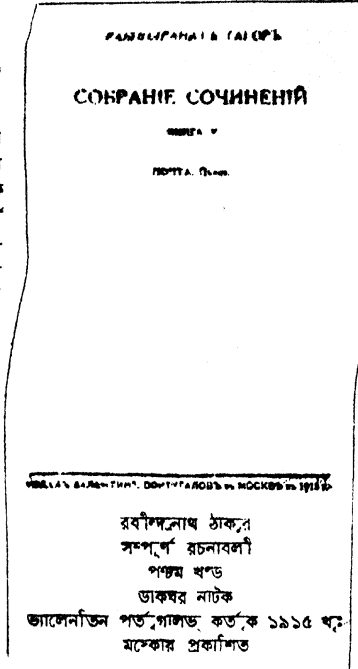
(রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি গ্রন্থের প্রথম ছবিই এটি)। সম্ভবতই ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশী-প্রকাশকরা যখন মস্কো-তে *রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকের রুশ-অনুবাদ* প্রকাশিত করলেন তখন ৩৮ বছর আগে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অংকিত কিশোর রবীন্দ্রনাথের (বয়স ষোল) ছবিটি তাঁদের সংগ্রহে এসেছিল।

'পোস্‌তা'র প্রচ্ছদের পরবর্তী পৃষ্ঠা (যার একটি আলোক-প্রতিলিপি এখানে দেওয়া হোল) থেকে দেখতে পাচ্ছি যে রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের অর্থাৎ পোস্ট অফিসের রুশ-অনুবাদ পোস্‌তা ১৯১৫ সালে অর্থাৎ লেনিনের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক রুশ-বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার দু-বছর আগে মস্‌কো-তে প্রকাশ করেছিলেন ভ্যালেনটিন পর্তুগালভ্‌।

কেবল রুশ ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকারই নয়, সোভিয়েত দেশের (সে-সময় জারের রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের) অন্যান্য বহু জাতি-গোষ্ঠীর মানুষরাও ১৯১৩/১৯১৪ সাল নাগাদ ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, যদিও এসব রাজ্যের অধিকাংশই ছিল শিক্ষাতে অত্যন্ত পিছিয়ে, অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ এবং জীবন-ধারণের নানা জটিল সমস্যায় ক্লিষ্ট।

উদাহরণ-স্বরূপ, অনগ্রসর লাতভিয়া রাজ্যে রবীন্দ্র-কাব্যের অনুবাদ প্রথম

তাসখন্দে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মালা দিচ্ছেন সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক ব্রেজনেভ—১৯৬১ খৃঃ।

হয়েছিল ১৯১৩ সালের শেষে ও
সালের প্রথম দিকে। রবীন্দ্রনাথের
সালের মস্কো সফরের সময় তাঁর
সালে লাতভিয়ার খ্যাতিমান লেখক
নকুলিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।
পরে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্ম-
র্তীর সময় নিকুলিন সাহেব তাঁর
প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'যদিও কবি
নাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমার প্রথম
১৯৩০ সালে মস্কোতে, তবুও
ন লেখকের সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে
পরিচয় তার দীর্ঘকাল আগে থেকে।
সালে আমার যৌবনের প্রারম্ভে
প্রথম রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র
পাঠ করি। এখনও বেশ মনে
দীর্ঘদিন ধরে 'গীতাঞ্জলি'র
মায়াবী প্রভাব আমার মন-প্রাণকে
করে রেখেছিল।'

রাজ্যের পাঠক-সমাজ জর্জিয়ান
গীতাঞ্জলির প্রথম আস্বাদ পেয়েছিল
সালের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ রুশ
র প্রায় চার বছর আগে।

আর্মেনিয়া রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের
লি ও ক্রেসেন্ট মুন-এর আর্মে-
অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে
ও ১৯১৬ সালে অর্থাৎ বিপ্লব-পূর্ব
ও দেশে। (এবার সোভিয়েত-দেশ
সময় আমি আর্মেনিয়া রাজ্যের
ইয়েরেভানে চার-দিন অবস্থান
ম। সে সময় আর্মেনিয়ান ভাষায়
'গীতাঞ্জলি' ও ক্রেসেন্ট মুন-এর
সংস্করণের দুটি কপি আমাকে
হয়েছিল)। রবীন্দ্র-রচনা-
সঙ্গে আর্মেনীয়ান জনগণের প্রথম
পরিচয় দেন এ. তুমানিয়ান, ডি.
নি, ও ডি. তেরিয়ানের মত
আর্মেনীয় কবি ও লেখকরা।
সালে রুশ-বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার
স আগে আর্মেনিয়ার বহুল-
সাহিত্য-পত্রিকা 'গোর্তজ'-এ
নাথের অনেকগুলি কবিতা ও ছোট-
অনুবাদে প্রকাশিত হয়। কবিতা-
অনুবাদ করেন কবি পাপাজিয়ান ও
পর তর্জমা করেছিলেন তেরিয়ান।
নীন ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের
লির যে ভূমিকা পাপাজিয়ান
লেন তাতে তিনি বলেছিলেন :
রতীয় কবির সুগভীর অনুভূতি
কান্তিক হৃদয়াবেগ—এবং সেই সঙ্গে
মৃদু বিষণ্ণতা—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই
র দেশও সমগ্র সাহিত্য-জগতের
আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
যে অপূর্ব ভারতীয় মনের স্পর্শ
সেটা পাশ্চাত্যের কাছে খুব নতুন।
তাঁর রচনার মৌলিকতা-র উৎসটি
গভীর। রবীন্দ্রনাথের রচনায় আমরা
উচ্চ মনের পরিচয় পাই এবং
একটি প্রশান্তির সান্নিধ্যে আসি।
মৌলিকতা এখানেই।' প্রসঙ্গত
নার'-এর পূর্ণাঙ্গ আর্মেনীয় অনুবাদ
ত হয় ১৯১৮ সালে রুশ-
র পর কয়েক মাসের মধ্যেই।

Собраніе сочиненій

РАБИНДРАНАТА ТАГОРА

Книга I Гитанджали. Жертвопѣсни. Переводъ подъ редакціей Ю. Балтрушайтиса. Второе изданіе. Ц. 60 к.

Книга II Садовникъ. Лирика любви и жизни. Переводъ В. Г. Тардова. Второе изданіе. Ц. 75 к.

Книга III Лунный серпъ. Поэмы о дѣтствѣ. Переводъ М. Ликіардопуло. Второе изданіе. Ц. 60 к.

Книга IV Читра. Драматическая поэма. Переводъ М. Подгоричани. Второе изданіе. Ц. 30 к.

Книга V Почта. Пьеса. Переводъ М. Родонъ. Ц. 30 к.

Книга VI Царь темнаго чертога. Переводъ И. Журина, Б. Лепковскаго М. Родонъ. Ц. 75 к.

Книга VII Изъ жизни Бенгаліи. Разсказы. Переводъ А. И. и А. Θ. Слудскихъ. Ц. 1 р. 50 к.

Книга VIII Поэмы Кабира. (Печатается)

Книга IX Маленькая язва. Романъ, (Печатается).

Книга X Садхана. Постиженіе жизни. Переводъ В. Погосскаго. Второе изданіе. Ц. 1 р.

Отпечатано въ типографіи И. Люндорфъ. Срѣтенскія вор., д. 1

সম্পূর্ণ রচনাবলী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম খণ্ড : গীতাঞ্জলি—নিবেদন-সংগীত — ইউ বালট্রুশিটি কর্তৃক অনূদিত—দ্বিতীয় সংস্করণ....মূল্য : ৬০ কোপেক।

দ্বিতীয় খণ্ড : গার্ডেনার—প্রেম ও জীবনের সংগীত—ভি জি তারদভ কর্তৃক অনূদিত—দ্বিতীয় সংস্করণ....মূল্য : ৭৫ কোপেক।

তৃতীয় খণ্ড :ক্রেসেন্ট মুন—শিশু-কাল — এম্ লাইকিআরদোপুলো কর্তৃক অনূদিত দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য : ৩০ কোপেক।

চতুর্থ খণ্ড : চিত্রা—নাট্য-গীতি—এম পোডগোরিচানি দ্বারা অনূদিত—দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য : ৩০ কোপেক।

পঞ্চম খণ্ড : পোস্টা....নাটক....এম্ রডন কর্তৃক অনূদিত....মূল্য : ৩০ কোপেক।

ষষ্ঠ খণ্ড : কিং অফ ডার্ক চেম্বার....ই জুরিন, বি লেপকোভস্কি ও এম রডন দ্বারা অনূদিত....মূল্য ৭৫ কোপেক।

সপ্তম খণ্ড : স্টোরিজ ফ্রম দি লাইফ অফ বেঙ্গল....ছোট গল্প....এ ই এ এফ স্লুডস্কি দ্বারা অনূদিত....মূল্য : এক রুবল পঞ্চাশ কোপেক।

অষ্টম খণ্ড : পোয়েমস অব কবির....কবীরের কবিতা....(ছাপা হচ্ছে)....

নবম খণ্ড : চোখের বালি ..উপন্যাস (ছাপা হচ্ছে)।

দশম খণ্ড : সাধনা....জীবনের উপলব্ধি....ভি পগোস্কি দ্বারা অনূদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ....মূল্য এক রুবল।

সোভিয়েত-বিপ্লবের আগে তাতার ভূমি ছিল মধ্য এশিয়ার একটি অতি পশ্চাৎ-পদ এলাকা, কিন্তু তাতার-রাজ্যের অরেনবার্গ শহর থেকে তাতার-ভাষায় প্রকাশিত 'শূরো' (উপদেশ) নামে একটি পাক্ষিক-পত্রিকায় ১৯১৩ সালে প্রকাশিত একটি সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—হিন্দু শায়ীর' (ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও কাব্য-প্রতিভার কথা বর্ণনা করে তাঁর সাহিত্য-কর্মের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লবের ঠিক এক বছরের মধ্যেই ১৯১৮ সালে তাতার-ভাষায় নির্বাচিত রবীন্দ্র-কাব্য ও সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংকলনটির ভূমিকায় প্রকাশকবৃন্দ নিবেদন করেছিলেন : 'কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসন্দেহে প্রাচ্যের একজন মহান সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি। কবি তাঁর বিশাল প্রতিভাকে তাঁর পরাধীন দেশের জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক সাম্য অর্জনের সংগ্রামে নিয়োজিত করেছেন।'

প্রখ্যাত তাতার কবি আবদুল্লাহ শাগিদি—যিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা তাতার-ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন—কবির বিষয়ে লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ তাতার-বাসীর এত প্রিয়, কারণ তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে যে নিরলস সংগ্রাম করেছেন তা তাতারভূমি-র বিপ্লবে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছে।'

১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লব ও তার পরবর্তী গৃহযুদ্ধের সময়ও সোভিয়েত দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ শিথিল হয়নি, যদিও তখন সে দেশের জনগণের সব শক্তি ও সকল চিন্তাভাবনা নিবদ্ধ এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তোলার সংগ্রামে। এই সময়ে প্রকাশিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হোল 'ন্যাশনালিসম্' যা ১৯১৯ সালে অর্থাৎ রুশ-বিপ্লবের পর দেড় বছরের মধ্যে রুশ-ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। প্রখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিক লেভ নিকুলিন—যাঁর সঙ্গে মস্কোতে ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল—লিখেছেন : সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যখন রাশিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের বিপ্লবকে নির্মূল করতে চেয়েছিল তখন সংগ্রামরত সোভিয়েত জন-গণের কাছে 'ন্যাশনালিসম্' গ্রন্থখানির আবেদন ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই গ্রন্থের আদ্যন্ত স্বাধিকার ও স্বাধীনতার বলিষ্ঠ ভাবধারা।'

রুশ-বিপ্লবের আগে সোভিয়েত পাঠক-সমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় ছিল মুখ্যত কবি ও সাংস্কৃতিক নাটকের লেখক হিসেবে, কিন্তু বিপ্লবের যুগে তাঁর গদ্য-সাহিত্যেরও সমাদর শুরু হোল। ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে সোভিয়েত দেশে হয়েছিল 'নৌকাডুবি', ঘরে-বাইরে, গোরা ও চতুরঙ্গের অনুবাদ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রুশ-বিপ্লবের আগে ও অব্যবহিত পরে সোভিয়েত দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী রুশ ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে মূল রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ থেকে। সর্বপ্রথম ১৯২৩ সালে বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত অধ্যাপক এম্. তুবিয়ানস্কি মূল বাংলা থেকে 'গীতাঞ্জলি' রুশ ভাষায় অনুবাদ করলেন।

আরও উল্লেখনীয় যে ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবের পর প্রথম দশকে অর্থাৎ ১৯১৭ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে সোভিয়েত-দেশে রুশ অনুবাদে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মোট মুদ্রণ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল দুই-লক্ষাধিক। এস্তোনিয়ান, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান, তাতার, লাতভিয়ান ইত্যাদি প্রদেশিক ভাষায় অনূদিত তো ছিলই। অতএব, ১৯৩০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত দেশ সফরের সময় সে দেশের পাঠক-সমাজে ইতিমধ্যেই তাঁর সাহিত্য-কীর্তির সঙ্গে ছিলেন সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথকে সোভিয়েত-ভূমিতে স্বাগত জানিয়ে সে দেশের বুদ্ধিজীবীরা বলেছিলেন : 'মহান কবি ও চিন্তানায়কদের সৃষ্টি ভূগোলের সীমা জানে না, জানে না কালের ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথ এই সব কালজয়ী প্রতিভার অন্যতম। আমাদের দেশে জাতি ও ভাষা নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে রবীন্দ্র-রচনাবলী অকুণ্ঠ সমাদর লাভ করেছে।'

আমার সাম্প্রতিক সোভিয়েত-দেশ সফরের সময় ইউক্রাইন রাজ্যের প্রধান ...

লেনিনও রবীন্দ্রনাথ

১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লবের মহানায়ক লেনিন ১৯২৪ সালে অর্থাৎ ১৯৩০-এ রবীন্দ্রনাথের মস্কো সফরের ছ' বছর আগেই পরলোক-গমন করেন,—অতএব লেনিনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনদিন সাক্ষাৎ হয়নি। লেনিনের রচনাবলীর মধ্যে কোথাও রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ নেই; কিন্তু লেনিন যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কীর্তির কথা জানতেন এবং কবির কিছু কিছু রচনা পাঠ করেছিলেন তার কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

প্রখ্যাত সোভিয়েত বিপ্লবী, বিজ্ঞানী, লেখক ও অ্যাকাডেমিসিয়ান অধ্যাপক ফিওদোর নিকালোভিচ পেত্রোভ রুশ-বিপ্লবে লেনিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন,—আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মস্কো-সফরের সময় পেত্রোভ ছিলেন কবির নিত্য-সহচর এবং হয়ে উঠেছিলেন একান্ত রবীন্দ্র অনুরাগী।

১৯৬১ সালে পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ ফিওদোর পেত্রোভ মস্কোতে মহা-সমারোহে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী পালনের আয়োজন করেছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রবীন্দ্র-অনুধ্যান করে গেছেন। ১৯৭৩ সালে ৯৭ বছর বয়সে পেত্রোভ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সোভিয়েত-দেশের রবীন্দ্র-ভক্তরা লেনিনের অত্যন্ত কাছের-মানুষ অধ্যাপক ফিওদোর নিকালোভিচ পেত্রোভ-কে প্রায়ই প্রশ্ন করতেন : 'আচ্ছা লেনিন কি রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়েছেন?'

পেত্রোভ বলতেন : 'হ্যাঁ, লেনিন রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়েছেন। আমার বেশ মনে আছে আমি লেনিনের পাশে বসে আছি। লুনাচার্স্কিও আছেন। ভারতের মহান কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের কথা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেনিনের উচ্চ ধারণা ছিল। লেনিন বললেন যে, তাঁর পত্নী ক্রুপস্কায়া শিক্ষার সমস্যাবলী নিয়ে একটি বই লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পর্কীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টি অধ্যয়ন করেছিলেন। লেনিন সপ্রশংস কণ্ঠে আরও বললেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন-এর কথা—যেখানে কৃষকদের লেখাপড়া, চিকিৎসা, কুটির-শিল্প ও চাষবাসের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে—জানেন'। (প্রসঙ্গত লেনিন-জায়া ক্রুপস্কায়া ও লেনিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী লুনাচারস্কি রুশ-বিপ্লবের পর সোভিয়েত দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা প্রসারে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন)।

বোম্বাইয়ের চিত্রলোকে বাঙালী গল্পকার

শান্তিপদ রাজগুরু

শৈলজানন্দের [illegible] ছোটগল্প [illegible] শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকার, তার থেকে সেকালে [illegible] ছবি। [illegible] পশুপতি মল্লিক [illegible]-প্রকাশ [illegible] নিয়ে আর [illegible] মল্লিক [illegible] হয়েছিলেন। সে অনেকদিন আগেকার ঘটনা।

সেদিনের নিউ থিয়েটার্স কলকাতা থেকে সর্বভারতীয় ছবি [illegible] হিন্দী জগতে, আর সে-ছবিগুলোই ছিল দিক-দর্শনের মত। বোম্বাই-এ তৈরি হতো স্টান্ট পিকচারই বেশি। ভি শান্তারাম আর প্রভাত টকিজের কিছু ছবির জাত ছিল আলাদা। ধোন্দে টকিজে ক্রমশঃ গিয়ে যোগ দেন কলকাতার নিউ থিয়েটার্স-এর কিছু পরিচালক, ফণী মজুমদার তাঁদেরই একজন। আর শক্তি সামন্ত তাঁর সেই পরবর্তীকালে ধোন্দে টকিজে যোগ দেন থার্ড এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার হয়ে। কিন্তু নিউ থিয়েটার্স-এর ছবির প্রভাব তাঁদের মনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। চিত্রনাট্য, পরিচালনা, মায় গানের সুর অবধি।

আজও তাঁর 'অনুরোধ' ছবির একটি গানের সুরে দেখা যায় নিউ থিয়েটার্স-এর একটি জনপ্রিয় গানের সুরের প্রভাব।

দো নয়না মাতোয়ালে—হমপর জুলুম করে।

তাঁর অনুরোধে রয়েছে আর্পিক অনুরোধ যে হম এ গানা গাতা হুঁ।

আমি অনুপ্রাণিত হবার কথাই বলছি। আজও প্রমথেশ বড়ুয়ার দেবদাস-এর অভিনয়-চিত্রনাট্য সব টুকু সব শক্তিবাবুর মুখস্থ, সে-কথায় পরে আসবো।

'ডাক্তার' ছবি রি-মেক করার ইচ্ছা তাঁর ছিল, তাই এর মধ্যে কলকাতা এসে নিউ থিয়েটার্স-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যান, কারণ ডাক্তার-এর চিত্রস্বত্ব ছিল তাদের। শৈলজানন্দদার কোন চিত্রস্বত্ব আর ছিল না।

এই সময় পার্ক হোটেলে বসে তিনি শৈলজাদার টালার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে নেন, তার বাড়ির একটু এপাশেই শক্তিবাবুর এক নিকট আত্মীয়ের বাড়ি। তাই সঠিক অবস্থান জানতে অসুবিধা হয়নি।

পরদিন সকালেই তিনি নিজে শৈলজাদার বাড়িতে গিয়ে হাজির। শৈলজাদা তখন দীর্ঘদিন রোগশয্যায় শায়িত। তিনিও ওঁকে দেখে অবাক হন। আর্থিক অসুবিধাতেও রয়েছেন—বহু খরচ হচ্ছে। এ-সময় শক্তিবাবু ওঁকে প্রণাম করে জানান,

—আমি আপনার 'ডাক্তার' ছবি করছি, তাই আপনার আশীর্বাদ নিতে এলাম।

ওঁর পায়ে নামিয়ে দেন পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক।

শৈলজাদা জানতেন চুক্তির ব্যাপার, তাই তিনিও জানান, তোমাকে পারমিশন নিতে হবে নিউ থিয়েটার্স-এর কাছে। শক্তিবাবু বলেন, ওসব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

শৈলজানন্দ ওঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। শক্তিবাবুও পরদিন তাঁর চিকিৎসার জন্য আরও কিছু পাঠিয়েছিলেন বলে শুনেছিলাম। এ-খবর কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ মহলেও নিজে কোনদিন প্রকাশ করেননি।

এই ঘটনার পর একসঙ্গে আমরা খাণ্ডালার 'অলতাজ' হোটেলে রয়েছি চিত্রনাট্য লেখার ব্যাপারে, সেই পার্বত্য শহরের ছায়াময় পরিবেশে কথায়, ওঁকে শুধোতে তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে শুধোন,

এ-খবর জানলেন কি করে?

এর বেশি এ প্রসঙ্গে আর জানাতে চাননি, তবে বলেছিলেন,

প্রণাম জানিয়ে এসেছি তাঁকে। তাঁর গল্প করছি।....এই স্বীকৃতিটুকু স্রষ্টাকে তিনি দিয়েছেন।

..ডাক্তার প্রথম যৌবনের স্মৃতি-বিজড়িত ছবি। তার সঙ্গে আগেকার শান্ত উচ্ছল যৌবনের টুকরো কতো অনুভূতির স্বাদ জড়ানো, আজ তাকে আবার নতুন করে দেখাচ্ছে নতুনরূপে। কিছু কিছু রদবদল করা হয়েছে চিত্রনাট্যে, কিন্তু দেখেছি নিউ থিয়েটার্স-এর সেই চিত্রনাট্যের মূল কপিও তিনি রেখেছেন সঙ্গে, সেটাকে মুখ্যতঃ বজায় রেখে গতিবেগ, কিছু ঘটনা সংস্থাপন করেছেন। অভিনয় করেছেন অশোককুমার, উত্তমকুমার এবং বোম্বাই-এর একটি তরুণ রাকেশ রোশন। স্ত্রী-ভূমিকায় আছেন শর্মিলা ঠাকুর আর

মৌসুমী। উৎপল দত্তের একটি চরিত্র রয়েছে। গ্রাম-বাংলার পরিবেশ গড়ার জন্য তিনি পুরো ইউনিট নিয়ে এখানে এসে ঘটকপুকুর, ভাঙ্গড়, মীনাখাঁ, তুষখালি, জেলিয়াখালি প্রভৃতি গ্রামে স্যুটিং করে গেছেন।

এঁদের রাশ প্রিণ্টে কালার থাকে না। সাদা-কালোর ছবি—সব গানগুলোর পিকচারাইজ করা হয়নি।

রি-রেকর্ডিং, ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকও বসানো হয়নি। শুধু মাত্র স্যুট-করা ফিল্মগুলোকে প্রাথমিক পর্যায়ে দৃশ্যের পর দৃশ্যের একটা ধারাবাহিকতা রেখে সাজানো হয়েছে মাত্র, তাও মধ্যে কিছুদিনের কাজ বাকি।

কিন্তু তার থেকেই মনে হয়, এ-ছবি আগেকার যুগের 'ডাকতার'-এর মতই সার্থক হবে—আর কাহিনীর চিরন্তন আবেদনটিকে সুন্দরতররূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। অশোককুমার, উত্তমবাবুর অভিনয় এ-ছবির অন্যতম সম্পদ। উত্তম-বাবুর পরিণত বয়সের অভিনয়সৌকর্য একটা নতুন পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।

উত্তমকুমারের বোম্বাই চিত্রজগতে এই প্রদীপ্ত প্রতিষ্ঠার মূল শক্তি সামন্ত।

তন্ময় হয়ে ছবি দেখছি, হঠাৎ একটা ঝনঝন শব্দে চমকে উঠি। শক্তিবাবুর খাস বেয়ারা 'সবেরা' ট্রে-তে করে চা নিয়ে ঢুকছিল, অন্ধকারে বন্ধ দরজায় লেগে ট্রে সমেত কাপ-প্লেটগুলো ছিটকে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

প্রভাত বলে ওঠে—তুইও পর্দার দিকে চেয়েছিলি ?

অন্ধকারে শক্তিবাবুর গলা শোনা যায় —ঠিক আছে। তুইও বসে যা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বোম্বাই-এ সন্ধ্যা হয় একটু দেরিতে। ঘণ্টাখানেকের বেশি পরে। সূর্য অস্ত যায় গ্রীষ্মকালে প্রায় সাতটা নাগাদ। ছবি দেখে বের হলাম। মনের উপর একটা রেখাপাত করে এ-ছবি। বাঙালীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পরিচিত করানোর সার্থক প্রচেষ্টা এতে আছে, আবেগমধ্য আবেগময় কাহিনীকে যথাযথরূপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা তিনি করেছেন।

শিল্পী, চিত্রনাট্যকার, সহকর্মীদের নিয়ে একটা সুন্দর টিমওয়ার্ক দিয়েই তবে সার্থক সৃষ্টি করে তোলা যায়, শক্তি সামন্ত তাই সব কাজের সঙ্গেই নিজেকে জড়িয়ে রাখেন।

হিন্দী আনন্দ আশ্রমের গান একটা লেখা হচ্ছে—সুর দেওয়া হচ্ছে ইন্দি-বরের বাড়িতে, ওরা চলে গেছে। অফিসের কাজ সেরে শক্তিবাবু বলেন।

—চলুন, হোটেলে ফিরে কি করবেন এখন।

ওর ডারসন গাড়ি ছুটে চলেছে—লিং কিং রোড ছাড়িয়ে আন্তার সমুদ্রতীর ধরে বান্দ্রার দিকে। একদিকে বোম্বাই শহরের বিলাসবহুল আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো অন্যদিকে মুক্ত সমুদ্রের বিস্তার। ভাটার সময় জল দূরে সরে গেছে, পাথরের বুকে কাদার দাগ—দূরে একটা বয়ার মাথার লাল আলোটা সাবধানী চাহনি মেলে জ্বলছে নিভছে। ঝড়োবাতাসে নারকেলকুঞ্জ উদ্বেল। কার্টার রোড চলে গেছে বান্দ্রার সমুদ্রের ধার ঘেঁসে, এর উপরই প্রথম অভি ভট্টাচার্য, ওদিকে রাজেশ খান্না, তার আগে হৃষিকেশ মুখার্জির বাড়ি, পিছনে মাথা তুলেছে বোম্বাই-এর অন্যতম 'পশ্' এলাকা। এক নম্বর 'পশ্' এলাকা হল মালাবার হিল। তাবড় ব্যক্তিদের, তখনকার কালের রাজা-মহারাজাদের প্রাসাদ এলাকা, এখন শিল্প-পতিদের এলাকা, তারপর পেডার রোড, ওয়ার্ডেন রোড, বীচ ক্যাণ্ডি হাসপাতাল এরিয়া। তারপর নামকরা যেতে পারে 'পালি হিল', এখানে পাহাড়ের উপর উঠেছে স্কাই স্ক্র্যাপার বাড়িগুলো। দিলীপকুমার, সায়রাবানু, দুলাল গুহ, শচীন ভৌমিক, হিতেন চৌধুরী আরও অনেকেই এখানে থাকেন। মীনাকুমারী, গুরুদত্ত, গীতা দত্তরা এখানেই থাকতেন। গুরুদত্তের এতদিনের সবুজ বাংলোর কোন চিহ্নই আজ নেই। সেখানে গড়ে উঠেছে বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ি।

বান্দ্রার সমুদ্রতীরে সুন্দর একটা ফ্ল্যাট বাড়ি—নাম 'ওশেনিয়া'। এইখানে ইন্দীবরের আস্তানা। বেল টিপতে বয় দরজা খুলে দিল, কানে আসে এক ঝলক সুরের গমক। হারমোনিয়মে সুর তুলে চলেছে শ্যামল মিত্র, আর ইন্দীবর তন্ময় হয়ে সঞ্চারীর দুটো লাইন নিয়ে গুন গুন করছে মেজেতে উবু হয়ে বসে।

আমাদের দেখে হাঁক পাড়ে—আ যাও দাদা। বৈঠো—আরাম করো। আরাম জিনিসটা ওদের কর্মব্যস্ত জীবনে করার মত একটা কাজ সেটা করতেও একটু প্রস্তুতির দরকার।

ঘর জোড়া ডানলোপিলোর গদি, গাদা-গাদা এল-পি রেকর্ড। স্টিরিও রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ রেকর্ডার ওদিকে এয়ারকুলার মেসিন চলেছে। সব মিলিয়ে শিল্পীর ঘরই। তবে ভুখা পিড়ী অর্থাৎ বুভুক্ষু লেখক কবি শিল্পী এরা নয়। দামী ফ্ল্যাট, টি-ভি, ফোন সবই মজুত।

শুধুমাত্র গান লিখে এইভাবে থাকা যায় বোম্বাই-এ। আনন্দ বকসী তো শুনেছি বহু রোজগার করেন। হিন্দী ছবির গান লেখার ক্ষেত্রে তার প্রতিভাও সুপরিচিত।

গানের সুর হচ্ছে—টেপকরা হচ্ছে। শক্তিবাবু শুনেছেন—দু'একটা সাজেশানও রাখছেন। ওরা শুধু সুর তো বটেই—তাকে ছবিতে কিভাবে সার্থক রূপায়ণ করা যাবে সেই সটগুলোও মনে মনে ভেবে নিয়ে একটু বিরতি, ইনটারলিউড মিউজিক এসবের কথাও বলছেন। আর ইন্দীবরজীও তন্ময় হয়ে গানের মুখড়া, অন্তরা অস্থায়ীর পদগুলো গুনগুনিয়ে চলেছে। দরকার হয় দু'একটা লাইনও বদলাচ্ছে। আবার সুরে ফেলা হচ্ছে, তাকে রেকর্ড করে শোনা হচ্ছে।

কাফ কাজ এসে গেছে।

গানের সুরের প্রসঙ্গে এসে যায় অতীত দিনের কথা। তখন বোম্বাই রয়েছেন অনিল বিশ্বাস, পরে এসেছেন শচীন দেববর্মন। শচীন দেববর্মন প্রতিটি বাঙালীর কাছে একটি প্রিয় নাম। ত্রিপুরা রাজ-পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, ওর বাবা নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মনই ছিলেন তখনকার ত্রিপুরা রাজ্যের সিংহাসনের দাবীদার। তাই নিয়ে মামলাও চলে হাইকোর্টে, কিন্তু তিনি সিংহাসন পান নি। পেলে বোধহয় বাঙালী শচীন দেববর্মনকে পেতো না, তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের মানিক্যবাহাদুর হয়ে রাজ্যশাসন কাজেই থাকতেন। তবু রাজপরিবারের নিকট-তম আত্মীয়ের পদবী 'কর্তা' তাদের বলা হোত, শচীন দেববর্মনের ওই 'শচীন কর্তা' নামটা পিতৃপুরুষের রাজ-সম্মানের শেষ পরিচয় হয়ে টিকেছিল। আজ আগরতলা শহরের মধ্যে রবীন্দ্রভবন যেখানে গড়ে উঠেছে—রাজপরিবারের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে, সেই বিশাল জায়গাটাই ছিল শচীন কর্তার পিতৃভূমি, জন্মস্থান।

আগরতলা কেন ত্রিপুরা রাজ্যের সংস্কৃতিক পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে সেটা আজকের দিনে।

তবু শচীন কর্তা বেঁচে আছেন তাঁর সুরের রাজ্যে।

অনিল বিশ্বাস, শচীন দেববর্মণ হিন্দী সুরে এনেছিলেন প্রভূত বৈচিত্র্য, বাংলা তথা ভারতের মাটির বিচিত্র সুর। আজ বিদেশী-পপ, হাওয়াই, রুম্বা সাম্বা, ওয়েস্টার্ন, স্প্যানিশ সুরের খিচুড়ির মধ্যে তাই ওদের সুরগুলো কি এক নতুন স্বাদ আনে। সেগুলোই যেন ঘুরে ফিরে এসে পড়ছে আবার।

শক্তি সামন্ত এককালে ভালো গান গাইতে পারতেন, এখন চর্চা নেই—তবু গানের অভ্যাসটা রয়ে গেছে। কথায় কথায় নিজের অতীতের দিনে ফিরে আসেন। অনিল বিশ্বাসের সুর দেওয়া একটা ভাব-সঙ্গীত গেয়ে শোনান কিছুটা। বলেন,

এ গানটার সঙ্গে আমার একটা করুণ স্মৃতি মিশিয়ে আছে। দেরাদুন থেকে বাড়িতে না বলে বের হয়ে পড়ে একটি তরুণ। ছেলেবেলা থেকেই ডানপিটে। কলেজ জীবনে ছিলেন ক্রিকেট টিমের ক্যাপটেন, আর রোজ সকালে একসবা ছোলা ভিজে খেয়ে বাঁকুড়া কলেজ ক্যামপাসের মধ্যে আমাদের লালদিঘীর চেয়েও বড় কলেজ ট্যাংক এপার ওপার করাতেন কয়েকবার। এ ছিল নিত্যকার প্রোগ্রাম।

সেই ডানপিটে তরুণ এসে হাজির হল মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি জেলার ছোট্ট শহরের একটি মিশনারি স্কুলে শিক্ষকতা নিয়ে। কয়েক মাসের মধ্যেই ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি।

কিন্তু তাঁর মন টানছে বোম্বাই, বোম্বে টকীজের সঙ্গে যোগাযোগও হয়েছে। ছবির জগতের স্বপ্ন তাঁর মনে। প্রিয় ছাত্রদের কাছ থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হবে। সেই বিদায় সভায় তিনি তখন এই গানটা

গেয়ে শুনিয়েছিলেন। দূর পথের পথিককে বিদায় দেবার বেদনাভরা একটি গান।

আজও সেই বিদায় বেলার স্মৃতি বহু পিছন থেকে তাঁর মন ভারাক্রান্ত করে তোলে একটি উদাস মুহূর্তের জন্য। শক্তিবাবু বলেন—এ পথে এসে কি পেয়েছি, কি দিতে পেরেছি জানি না। কিন্তু একটা সুন্দর মাধুর্য ভরা জীবনের অনেক মুহূর্তগুলোকে হারিয়েছি এটা অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই।

স্তব্ধতা নেমেছে ঘরে, এয়ারকুলারের হিম হাওয়া কনকনানি ভাব আনে। শ্যামলবাবু গুন গুন সুর তুলেছেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত্রি প্রায় এগারোটা। শক্তিবাবু বাড়িতে ফোন করছেন মিসেসকে। তিনি ফোন ধরতেই সরস রসিকতার সুরে বলেন শক্তিবাবু। —আই ওয়াজ ট্রায়িং টু কনট্যাকট সাম গার্ল ফ্রেণ্ডস অব মাইন, প্রথমেই তোমার কথা মনে পড়লো তাই রিং করছি। মিসেসও ওদিক থেকে জানান ধন্যবাদ। শক্তিবাবু জানান—বাড়ি যাচ্ছি, সঙ্গে দু-একজন অতিথি রয়েছেন, কি খাওয়াবে ?

মেনুটা আওড়ে যান শক্তিবাবু—ওদিকের প্রশ্নের জবাব দেন—না, দেরি হবে না। এখানে কে কে রয়েছে জানতে চাইছো ? আমরা চারটি ষাঁড় এখানে সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়েছি। ইন্দীবর, শ্যামল মিত্র, শক্তিপদ রাজগুরু আর এই অধম শক্তি সামন্ত। খাবার রেডি করতে বলো, গিয়ে পড়ছি।

আমাকে বলেন—চলুন। হোটেলের খাবার তো আছেই, আজ প্রথম বোম্বাই শহরে পা দিয়ে বাড়িতেই খাবেন।

এর আগেও দেখেছি ওদের পরিবারের আতিথেয়তা। ওর স্ত্রীর পিতৃভূমি বাঁকুড়া জেলা, অবশ্য ওরা কোদরমায় অভ্রখনির ব্যবসা উপলক্ষে প্রায় সেখানেই থাকেন। প্রবন্ধকার গবেষক সত্যকিংকর সাহানাদের পরিবারের মেয়ে উনি। তাই এই বাঁকুড়াবাসীকে পেট পুরে খাওয়াতে হয়তো ভালোবাসেন। তাছাড়া বোম্বাইএ সব মেলে, কিন্তু দিশী বাঙালী ডাল ভাত চচ্চড়ি শুক্তো মাছের ঝোল ওই এলাকায় মেলে না। হোটেলের খাবার বলতে পাঞ্জাবী মশলাদার রান্না, না হয় চাইনীজ খাবার। তাই সময় থাকলে খাবার পর্বটা ওখানে সারতে হয়। স্টুডিওতে কাজ থাকলে দেখি ঢাউস একটা টিফিন কেরিয়ারে করে বাঙালী খাবার যায়, অবশ্য বোম্বাই প্রবাসী বাঙালীদের অনেকেই দুপুরে দুখানা চাপাটি তারপর ভাত খায়, সবই মজুত থাকে বেশ কয়েকজনের জন্য ওই টিফিন কেরিয়ারে। আমাদেরও ভূরি ভোজ হয়ে যায়।

মিসেস সামন্তও অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। হাতমুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে গেলাম। চাপাটি—তরকারী, ঝালকা মুরগীর স্টু—শেষ পাতে বেশ কয়েকটা সন্দেশ। শুধোই—এ সন্দেশ পেলেন কোথায় ?

মিসেস সামন্ত জানান—বেনারসীর দোকানের সন্দেশ। কলকাতার কারিগর দিয়ে করানো।

ঘড়ির কাটা বারোটার দাগ ছুঁয়েছে। ড্রাইভার দুজনকে ছুটি করে দিয়েছেন আগেই, সারাদিনের কাযের পর শক্তিবাবু নিজেই গাড়ি নিয়ে বের হলেন সান্তাক্রুজ থেকে আমাকে খারে পেঁছে দেবার জন্য। আমি বলি—ট্যাক্সি নিয়ে নোব, আপনি আবার যাবেন ?

একটু ঘোরা হবে। চলুন।

বোম্বাইএর সন্ধ্যা হয় সাতটার পর আর সকাল হয় সাতটা নাগাদ, অবশ্য ফরসা হয়ে যায় আগেই। আর খার-বান্দ্রা-সান্তাক্রুজ এলাকায় কেন বোম্বের অনেক বাড়িই বেশ খোলামেলা—বাংলো প্যাটার্নের। গাছ গাছালি আছে, রাস্তাগুলো ঝকঝকে বসন্তের শেষ হলেও এখানে বসন্তের শুরু। কৃষ্ণচূড়া-সোঁদাল গাছে এসেছে ফুলের বাশি, দেওদার গাছগুলোর নতুন পাতার চমক। সকালের নির্জন পথে বেশ খানিকটা হাঁটতে ভালো লাগে, অনেকেই বের হয় মর্নিং ওয়াক করতে। একটু দূরেই বোম্বাইএর রামকৃষ্ণ মিশন—ছায়াসবুজ সুন্দর পরিবেশ, বিশাল এলাকা জুড়ে মন্দির সন্ন্যাসীদের আশ্রম একদিকে, অন্যদিকে হাসপাতাল, বিরাট লাইব্রেরী সেবা বিভাগ, প্রকাশন বিভাগ।

জায়গাটা শান্ত আর সকালের শান্ত পরিবেশে রামকৃষ্ণস্তব পাঠএর সুর ওঠে।

বোম্বাই প্রবাসের দিনগুলোয় সকালে একবার এখানে এসে প্রণাম জানানো আমার নিত্যকর্তব্য হয়ে উঠেছিল।

হোটেলগুলোর রীতিকানুন নাকি কনটিনেন্টাল স্টাইলের। অর্থাৎ এরা চার্জ করেন দৈনিক হারে, তার মধ্যে দেবেন থাকার আশ্রয় বিছানা আর ব্রেকফাস্ট। বেডটি, লাঞ্চ বৈকালের চা, ডিনার এসব আলাদা। একপট চায়ের জন্য চার্জ করেন একটাকা ষাট পয়সা, আর এক গ্লাস দুধ (অবশ্য খাঁটি) তিন টাকা—এইসব দর। সকালের ব্রেকফাস্টে দেন দুটো ডিম, কর্নফ্লেক, দুধ—টোস্ট কলা আর চা কিম্বা কফি।

কমলেশ্বর এসে পড়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন ওঁর সহকর্মী একজন উর্দু লেখক। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার অধীনে অনেক পত্র-পত্রিকা রয়েছে।

দৈনিক, সান্ধ্য দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক কিশোর পত্র-পত্রিকা, তাই এদের লেখকগোষ্ঠী অনেক বিস্তৃত। ইংরাজী হিন্দী উর্দু পত্র-পত্রিকাও রয়েছে।

এলাহাবাদের লোক কমলেশ্বর। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে দু বছর লণ্ডনে বি বি সিতে ছিলেন, সেখান থেকেই টাইমস্ অব ইণ্ডিয়াতে এসেছেন। ছাত্র অবস্থাতেই দু চারটে ছোট গল্প লেখার পর থেকে নিজস্ব রীতি গড়ে তোলেন, হিন্দী সাহিত্যে সেটা ছিল নোতুন রীতি। তার ছোট গল্প কিছু উপন্যাস বেশ সুনাম অর্জন করেছে।

বাংলা ভালো বলতে পারেন না। কিন্তু বোঝেন। কারণ চিত্রনাট্যটা আমি বাংলাতেই তাকে শোনালাম। এর আগে শক্তিবাবু ওঁকে উপন্যাসের মূল কাহিনীটা শুনিয়েছিলেন, তাই আমার চিত্রনাট্যও শুনোতে অসুবিধা হয় না তাঁর। দু একটা দৃশ্য দুবার করে পড়তে হয়—মন দিয়ে শুনছেন। মাঝে মাঝে দু একটা কথার অর্থ হিন্দীতে শোনাচ্ছি—উনি বলেন সমঝ গিয়া।

ঘণ্টা দুয়েক কাজ করার পর চিত্রনাট্যের সমস্তটা বুঝে নিয়ে কমলেশ্বরজী বলেন—আমি বুঝে নিয়েছি। ঠিকই আছে। তবে আমাকে হিন্দীতে এবার ওই মেজাজ-ঢং-আদলটা আনতে হবে। প্রাথমিক অনুবাদটা করার জন্য গিরীশকে পাঠাবো। কলকাতায় অনেকদিন ছিল, বাংলা ভালো জানে। ওই হিন্দীতে প্রথম অনুবাদটা করে দিতে পারবে চার পাঁচ দিনের মধ্যে, তারপর বসা যাবে আবার ওটা নিয়ে।

স্টুডিও যাবার পথে শক্তিবাবুও এসেছেন হোটেলে, দু একটা দৃশ্য সম্বন্ধে তারও সাজেশন শুনতে হয়। এ ব্যাপার দেখেছি হিন্দী ছায়াছবির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শক্তি সামন্তর ব্যাপারে। চিত্রনাট্যকে ওরা বার বার লেখান, আর ঘসে মেজে ওর একটা নিটোল চূড়ান্ত রূপ দেন। হিন্দী চিত্রনাট্যকেও সেইভাবে করান, কারণ ওইটাই ছবির মূলকথা। তার জন্য সময় অর্থ সবই ব্যয় করেন। ওর উপরই ছবির বাজেট—সুটিং ডেট প্ল্যানিং সব কিছু নির্ভর করে। তাই 'অমানুষ' ডবল ভার্সান ছবিতে ওর সুটিং ডেট লেগেছিল ষাট দিন, আনন্দ আশ্রমও শেষ করছেন ওই সময়ের মধ্যে।

শক্তিবাবুও বলেন—আপনি এই সিনগুলো রিভাইজ করে নিন, আর সন্ধ্যায় গিরীশবাবু এলে কথাবার্তা বলে নিন—কাল থেকেই যাতে কাজে বসতে পারেন।

প্রাথমিক হিন্দী অনুবাদ শেষ হলে ওটা পুরো টাইপ করানো হবে। তারপর আমি, শক্তিবাবু, কমলেশ্বরজী বসবো ওঁর লেখা চিত্রনাট্য নিয়ে। এটার কাজ শেষ করে বসতে হবে রিয়াজ সাহেবের গল্প নিয়ে।

...তি বন্দরে আনন্দ আশ্রমের একটি দৃশ্য। পরিচালক শক্তি সামন্ত, উত্তমকুমার ও শর্মিলার সঙ্গে।

ই আমিও চাই এটার কাজে এগিয়ে নিতে। ...কে জানাই।

—আজ দুপুরে এগুলো ঠিক করে ...ই।

দুপুরে হোটেলে এসেছেন কমল মজুমদার। ওর পরিচালিত 'লুকোচুরি' ছবি নাম পেয়েছিল অতীতে। হিন্দী ছবির চিত্রনাট্য করেন, বি-আর-চোপরার প্রডাকশনের সঙ্গে জড়িত। গজেন মিত্রের কাহিনী নিয়ে মুক্তি, আর 'পাও নাই পরিচয়' উপন্যাস অবলম্বনে করম ছবির সঙ্গে যুক্ত। উনি বর্তমানে ওর চিত্র পরিচালক বন্ধু নারু ভট্টাচার্য এর জন্য আমার মেঘে ঢাকা তারা-র ব্যাপারে এগিয়েছেন। কিন্তু, আমারও দুর্ভাগ্য মেঘে ঢাকা তারা-র মেঘ আমি মুক্ত করতে পারিনি, রাহুগ্রাসে তলিয়ে গেছে। কবে দুর্যোগের সেই মেঘ মুক্ত হবে জানি না। তবু ওঁরা আশা ছাড়েননি। হয়তো হয়ে যাবে। সদালাপী সজ্জন ব্যক্তি। বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করে গেলেন অন্য একটা গল্পের ব্যাপারে।

গিরীশবাবু বিহারের ছেলে, বহুকাল কলকাতায় ছিলেন সত্যজিৎবাবুর সহকারী পরিচালক হয়ে তরুণবাবুর সঙ্গেও ছিলেন বালিকাবধূতে, পরে হিন্দী বালিকাবধূ [illegible] বোম্বেতে যান। ওখানে নিজের ...কড়ু নিয়ে আর কিছু ফাইনান্স এর টাকায় করেছিলেন হিন্দীতে অন্য পথের ছবি ডাকবাংলো। একটি নারীর জীবনে একাধিক পুরুষ আসে, এ যেন ডাকবাংলো, সরাইখানা। দুর্দিনের মুশাফির আসে আবার হারিয়ে যায়। তার জীবনে প্রেম ভালোবাসা যার হাপিত্যেশ যার জন্য সে কাঙাল তারও কোন ঠাঁই নেই। জীবন তার কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করেছে। কমলেশ্বরজীর বলিষ্ঠ একটি ছোট গল্প, ট্রিটমেন্ট করেছিলেন তিনি। কিন্তু সে ছবি চলেনি। আর গিরীশবাবু মাথায় আকাশভোর দেনা নিয়ে ঘুরছেন। ছোট প্রযোজকদের হিন্দী বাজারেও এমনি দুরাবস্থা। বরং বিপদ আরো বেশীই। বাংলা ছবি মার খেলে দু তিন লাখের উপর দিয়ে যায়, এদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে আট দশ লাখে দাঁড়ায় সেটা—অনেক ক্ষেত্রে তারও অনেক বেশী। বড় প্রযোজকরা তবু অন্য ছবিতে সেটা সামলে নিতে পারেন, কিন্তু যার এক তরকারী নুনে পোড়া—তার দুঃখ অশেষ।

গিরীশবাবু আবার লেখার জগতেই ফিরে এসেছেন, হিন্দী পত্র-পত্রিকায় লেখেন আর ছবির চিত্রনাট্যে সহকারী কাজ করে চলেছেন, নিজের নামে কোন কাজ বাইরে করার সুযোগ আসেনি এখনও। কারণ নামী প্রযোজকরা তাদের হিন্দী বাজারে নাম এটার নামও বলতে পারেন।

সন্ধ্যায় এসে হাজির হয়েছে হোটেলে সাহিত্যিক বন্ধু পরিতোষ মজুমদার, তাঁর স্ত্রী কল্যাণী ওঁদের ছোট্ট ছেলে রাজাকে নিয়ে। বোম্বাই প্রবাসী বাঙালী সমাজে পরিতোষবাবু সুপরিচিত। ওয়েস্ট জার্মানীর থেকে ইনজিনিয়ারিং পাশ করে দেশে ফিরে বাংলা মুলুককে কোন সুরাহা করতে পারেন নি।

চাকরি করতে থাকেন। নিজের কিছু স্কিম ছিল কাটিং টুলস লাইনে, মহারাষ্ট্র সরকার সেগুলো দেখে তাকে দিয়ে থানার কাছে ডম্বুভ্যালিতে কারখানা করেন। পরিতোষবাবু এখন সেই কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। নিজের হাতে সেই কারখানা গড়ে তুলেছেন আর নাম প্রসারও করেছেন। তবু সাহিত্যকে ভোলেননি। তার কিছু বইও আছে। দূর প্রবাসে ইনজিনিয়ারিং নিয়ে ডুবে আছেন, তাই ওখানে গেলে সন্ধ্যার আড্ডা জমাতে হয় আর কল্যাণীও দিশী তরকারী রান্না না খাইয়ে ছাড়ে না। আমিও বলি—শক্তি ফিল্মসের খুব চাচ্ছো তোমরা।

ওরা হাসে।

(ক্রমশঃ)

(১১)

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে, সহ-পাঠিনীরা বলল, তোমরা চলে যাচ্ছ, আমাদের 'পার্টিং প্রেজেন্ট' দেবে না?' আমি মনে মনে ভাবলাম, তোমরাও তো চলে যাচ্ছ, তোমরা কিছু দেবে না? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কেউ কাউকে কিছু দিলাম না। স্কুল থেকে বাড়ি যাবার পথটির প্রত্যেকটি গাছ-পাথর-ঝোপ-ঝাড় আমাদের চেনা ছিল। পাহাড়ের গায়ে কাটা রাস্তা, আরেকটু নিচে পাহাড়ের গা বেয়ে যে-জল নামত, সেই জল যাবার সরু খাল। তার পাশে ঘোড়ায় চড়ে যাবার পথ। আরো নিচে খানিকটা সমতল জায়গা, সেখানে ধান-ক্ষেত ছিল। জায়গাটার নামও ছিল ধান-ক্ষেতি। এখন সেখানে ঘিঞ্জি বাড়িঘর। ধান-ক্ষেতির পর আবার পাহাড় উঠেছে। সেই পাহাড়ের তলা দিয়ে যে নদী বয়ে গেছে, সেই এঁকেবেঁকে আমাদের বাড়ির নিচে দিয়ে গেছে। তারপর কত বাঁক নিয়ে, কত জল-প্রপাত পার হয়ে, কত অন্য নদীর সঙ্গে মিশে, ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে, মোটরের রাস্তার পাশে পাশে সমতলভূমিতে নেমে গেছে। তারি নাম বড়-পানি। এখনকার বড়-পানির হ্রদ মানুষের তৈরি, সেকালে সে ছিল না।

সব জায়গার সঙ্গে জীবনটা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ঐ ঘোড়ায় চড়ার পথ যেখানে শুরু হয়েছিল, সেখানে ফিকে বেগনী বুনো ভায়োলেট হত। অনেক দিন আগে ওখানে দল বেঁধে বেড়াতে গিয়ে মলি মেলোনি বলে একটা সুন্দর দেখতে মেয়ে দিদির আমার সংগ্রহ করা সব ভায়োলেট নিয়ে নিয়েছিল। বলেছিল, 'দুঃখ কর না। বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে আমার পার্সেল আসবে, তোমাদের ভাগ দেব।' বলা বাহুল্য পার্সেল এসেছিল কি না জানি না, তবে ভাগটাগ দেয়নি। হেসে বলেছিল, 'ও মাই! তোমরা ঠাট্টাও বোঝ না!'

ঐখানে বাঁকের কাছে পাথরের দেয়ালের গায়ে আমার নতুন ছাতা ঠেকিয়ে রেখে, সুতুদির ছাতা খুলে দিয়ে, তারপর নিজের ছাতা ফেলে চলে গেছিলাম। তখুনি ফিরে গিয়ে আর পাইনি।

ঐ পাহাড়ের বাঁশ-ঝাড়ের পাশে স্কুলের পিকনিক হয়েছিল, মিস মার্টিনের জন্মদিন

কেক খেতে দিয়ে মিস মার্টিন বলেছিলেন, 'এটা আমার জিনিস। বাকি সব স্কুলের।' দুঃখের বিষয় তখন আর কিছু খাবার আমার ক্ষমতা ছিল না। রুমালে জড়িয়ে বাড়ি না এনে, ঐখানে পেনসিল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রেখেছিলাম। খুঁড়লে হয়তো তখনো পাওয়া যেত।

ঐ নিচে খুরুত পাগল থাকত। সবাইকে গাল দিত, আমাদের একদিন রাঙা আলু খেতে দিয়েছিল। কি আর বলব, স্কুল থেকে ঐ শেষ বাড়ি ফেরার দিনটিতে, সমস্ত বনভূমি আমাদের হাত-পা ধরে টেনেছিল। বাড়ি এসে দেখলাম তাক থেকে জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে, খাটের তলা থেকে বাকস-প্যাঁটরা টেনে বার করা হচ্ছে। কি তার উত্তেজনা।

মা বললেন, 'শুধু সেই সব জিনিস নিয়ে যাওয়া হবে যা আমাদের ওখানে গিয়ে কাজে লাগবে। আর যার যা আদরের জিনিস। বাকি সব গরীবদের দিয়ে দেওয়া হবে।'

বলা বাহুল্য দুটি কাঠের বাকসের একটিতে বাসনপত্র আর একটিতে বই ভরা হল। কাঁচের বাসন সব যারা বাড়িতে কাজ করত তাদের দেওয়া হল। বই আর ছবি সব নেওয়া হল। তখন দিদির আমার পুতুল-খেলার শখ চলে গেছিল, তবু এলেবেলেদের সবাইকে তাদর খুদে খুদে খাটপালঙ্ক, বাসনপত্র সহ পুঁটলি বেঁধে নেওয়া হল। আমরা না। খেলি, ছোট বোনটা আরেকটু বড় হলেই খেলতে পারবে তো।

আসবাবপত্র সব বাড়িওয়ালার। কাপড়-চোপড় আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনের বেশি ছিল না। তবে লেপ-কম্বল-তোশক-বালিশ নিয়ে নেহাৎ কম মালপত্র হল না। বাবার আপিসের লোকের হেপাজতে সে-সব মালপত্রর ট্রাকে করে গোহাটি গেল। সেখান থেকে বাবা লগেজ-ভ্যানে তোলাবার ব্যবস্থা করলেন। আমরা সে-বিষয়ে কোনো চিন্তাই করিনি।

বন্ধুরা অনেকেই শীত পড়তেই নেমে গেছিল, কাজেই তাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার দরকার হয়নি। দিদিমার দুই মেয়ের কলকাতায় বিয়ে হবে, তাঁরাও চলে গেছিলেন। কলকাতায় আমরা বিয়ে দেখতে

এগারো বছর বয়স অবধি কারো দেখিনি, মরা দেখিনি।

ঠিক যাবার মুহূর্তে মনটা কেমন হয়ে গেল। ভোরে উঠে হেঁটে মোটর আপিসে। সঙ্গে যে সামান্য গেল, কুলি-মেয়েরা সেগুলি পিঠে নিল। এত দিন যারা আমাদের কাজ করত, যাদের কাছে আমরা এত শুনেছি, এত যত্ন পেয়েছি, তারা কান্নাকাটি করল না। অনেকে বলত বড় নির্বিকার হয়, যত দিন কাজ খুব ভালো করেই করল, কিন্তু কারো বা কিছুর ওপর এতটুকু টান জন্মায় জন্মালেও কখনো প্রকাশ করত না। পড়ে ইলবন ছাড়া কেউ আমাদের সঙ্গে করত না, হাসি ঠাট্টা করত না। আমাদের না। আমাদেরো ওদের জন্য পরে মন করত না।

একবার যাত্রা শুরু হলে আর খারাপ করার অবকাশই রইল না। বছরের মধ্যে নদীর বাঁকে যেখানে ওধারে ময়দার কল জলের স্রোতে তার পরে কি আছে দেখতে যাইনি। ছাড়াও দেখবার অনেক জায়গা ছিল। পীক থেকে পরিষ্কার দিনে সিলেটের ঘর দেখা যেত। আমি অবিশ্যি দেখি আমাদের বাড়ির সামনে একটা জায়গায় দাঁড়ালে হিমালয় দেখা দিগন্তের কাছে মেঘের পরদা, তার নীল আকাশে রুপোলী রংয়ে আঁকা ছবির মতো হিমালয় দেখেছিলাম। পাহাড় বলে মনে হত না। ভেবে লাগত যে দাদামশাই পায়ে হেঁটে ঐ পার হয়ে তিব্বত গিয়ে মানস-সরোবর এসেছিলেন। দাদামশায়ের মুখে কিছু কিছু শুনেছিলেন, আমাদের গল্প করেছিলেন। দুঃখের বিষয় সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' প্রকাশিত 'হিমারণ্য' দাদামশায়ের ভ্রমণকাহিনীর কপি রাখার কথা কারো মনে হয়নি। আজ পর্যন্ত হিমা ছবি দেখলে, হিমালয়ের বর্ণনা হিমালয়ের নাম শুনলে পর্যন্ত, অদেখা দাদামশায়ের কথা মনে পড়ে। যদি আর ছটা বছর বাঁচতেন, তার আমার দেখা হত।

হিমালয়ের প্রতি আমার মনের যাই হক, সেদিন মহাখুশি হয়ে আমরা পাহাড় আর হিমালয় দর্শন ছেড়ে এসেছিলাম। মন-কেমন-করার পালা হয়েছিল কলকাতার নতুনত্ব কেটে যাবার রাতে শিলং-এর বাড়িঘর, পাহাড়, ঝরনা, ফুলগাছ, ফলগাছ, সরল-বনের দেখতাম। কাটা টনসিলে ব্যথা করত।

সেদিন শুধু দু ধারের বনভূমির অপূর্ব দৃশ্য দেখে উচ্চকিত, উচ্ছ্বসিত হয়ে ছিলাম। একেবারে নিরাপদে গৌহাটি পৌঁছইনি। মাঝপথে নংপো। সেখানে ওপরের গাড়ি, নিচের গাড়ি পার করানো হত। একটা চা খাবার জায়গা আর বিশ্রাম-ঘর ছিল

দুধ গরম করার চেষ্টায় গেলেন। সঙ্গে ছিল বাবার ক্যাম্পে ব্যবহারের ছোট্ট স্পিরিট-ল্যাম্প। বাবা নিজে সব করতে ভালোবাসতেন, তাই চায়ের ঘরে না বলে স্পিরিট ল্যাম্প জেলে দুধ গরম করতে গেলেন। স্পিরিট-ল্যাম্প ফেটে গেল। দুধ নষ্ট হল। বাবার ভুরু পুড়ল, মেজাজ খিঁচড়ে গেল। চায়ের ঘর থেকে দুধ এনে লতিকাকে খাওয়ানো হল। খাবলা খাবলা ভুরু পুড়ে যাওয়াতে বাবাকে বেশ মজার দেখাচ্ছিল। বেজায় হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু হাসবার, কিম্বা অন্যদের দিকে তাকাবার সাহস পাচ্ছিলাম না। দুপুরে নিশ্চয় কিছু খেয়েছি।

বিকেলের আগে পাহাড়তলীতে পৌঁছলাম। দু-পাশের নিচু পাহাড়গুলো সরে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে লাল টিনের ছাদ দেওয়া সুন্দর সুন্দর বাংলো-বাড়ি, দূরে দূরে চা-বাগান। তখন পৌষ মাস, এখানেও বেশ শীত আর শরীরের মধ্যে করে শীত বেঁধে নিয়ে এসেছি আমরা, গরম বোধ করার অবকাশও ছিল না।

ক্রমে চ্যাপটা পরটার মতো হয়ে গেল জমিটা। মাঝে মাঝে অপূর্ব সুন্দর একটা নদীর আভাসও পাওয়া গেল। তারপর মোটর অপিসে নামলাম। গোহাটিতে আমরা নিতান্ত নির্বান্ধব ছিলাম না, আমদের নিতে লোক এসেছিল। রাজুমামা, জিৎ, কিডি। বলা বাহুল্য রাজুমামা কিন্তু আমাদের নিজেদের মামা ছিলেন না। মা-বাবার বন্ধু এঁরা। রাজুমামা তখন কটন কলেজের প্রফেসার পরে বোধ হয় অধ্যক্ষও হয়েছিলেন। কিডির নাম সুজাতা, অনেক পরে যে সুজাতা চৌধুরী লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তিনিই আমার আদরের কিডি, একটা পালকের মতো হালকা মিষ্টি মেয়ে। শিলং-এ ওরা ছুটি কাটাত, বাড়ি ভাড়া নিয়ে অনেক দিন থাকত, রোজ রোজ দেখাশুনো হত। রাজুমামা হলেন কটকের নামকরা ক্ষীরোদ রায়চৌধুরীর বড় ছেলে। সুখে-দুঃখে দুই পরিবারের দেখাশুনো। নিজের মামা আবার কাকে বলে।

রাত কাটানো হবে রাজুমামার বাড়িতে, পরদিন সকালে অবার যাত্রা। মনে আছে মামীমা আমাদের জন্য বাড়ির সামনের চওড়া বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। তারপর গরম জল, হাত-মুখ ধোয়া, কাপড় ছাড়া, কাপড় ছেড়ে সবাই মিলে বারান্দায় জলযোগ। তার পর একসঙ্গে জ্ঞান বড়ুয়াদের বাড়ি যাওয়া। তাঁরাও আমাদের চেনা বন্ধু। জ্ঞান বড়ুয়ার স্ত্রী লালিতা-মাসি বোধ হয় অরু ঠাকুরের মেয়ে, মায়ের বন্ধু। তাঁদের ছেলেরা মনোভিরাম, নয়নাভিরাম, দেখতে রাজপুত্রের মতো সুন্দর, আমাদের খেলার সাথী। লালিতা-মাসি নাম-করা চিত্র-তারকা শর্মিলা ঠাকুরের দিদিমা. তাদের বাড়িতেও কত গল্প, কত হাসি। সাইকেল করে দোকানে গিয়ে জিৎ খুব ভালো ভালো বিস্কুট কিনে আনল। তারপর রাজুমামা উঠে পড়ে বললেন, 'আর দেরি নয়, রাতে হাতি শিকারে যাব ভুলে গেলে নাকি?' হাতি শিকার শুনে আমার বুকের রক্ত হিম। যেটাকে শিকার করা হবে সেটা ক্ষ্যাপা হাতি কিনা জিজ্ঞাসা করিনি, অত বড় অমন সুন্দর জানোয়ারটাকে কেউ গুলি করে মারবে শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। রাজুমামা সেটা লক্ষ্য করে বললেন, 'কি হল? হাতি শিকারের নাম শুনেই মুখ গম্ভীর? হাতির পায়ের নরম মাংস কাল যখন রেঁধে তোমাদের সঙ্গে দেওয়া হবে, তখন কিন্তু অন্য রকম মনে হবে। হাতির নখসুদ্ধ পা দিয়ে চমৎকার ছাতা-লাঠি রাখার স্ট্যান্ড হয়। মন থেকে সব খুশি দূরে হয়ে গেল।

বাড়ি এসে মাংস ভাত খেয়ে তাড়াতাড়ি শোয়া হল। রাজুমামার দল কখন এল, কখন গেলেন টের পেলাম না। শুয়ে শুয়ে কেবলি বলতে লাগলাম, 'ভগবান, তুমি হাতিটাকে তাড়িয়ে দিও, ওরা যেন মারতে না পারে। তাড়িয়ে দিও ভগবান!' কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, জানি না। ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, আমাদের জিনিসপত্র গোছানো হচ্ছে আর রাজুমামা বেজার মুখ করে বলছেন, 'নাঃ সব পণ্ডশ্রম, ব্যাটা কোথায় যে জঙ্গলে বোধ
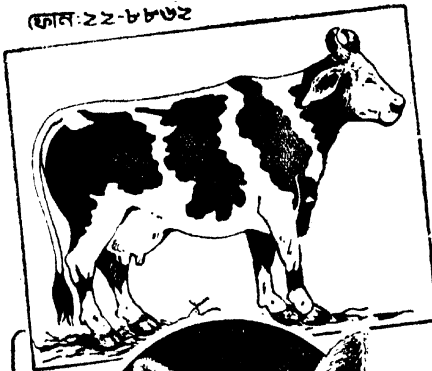
গেল না। উঃফ। কি যে খুশী হলাম। মনে মনে বললাম, 'ভগবান তুমি বড্ড ভালো। আমি যা চাইলাম তাই দিলে!' এতদিনে উপাসনা-টুপাসনায় আমার মন না থাকলেও, ভগবানের ওপর আমার বেজায় আস্থা। স্কুলে নানদের মুখেও শুনতাম, চাইলেই পাবে, দ্বারে করাঘাত করলেই দ্বার খুলবে। বড় ভালো লাগত। এখন দেখলাম সত্যিই তাই। পরে অবিশ্যি অনেক সময়ই মনে হয়েছে ভগবানের ওপর ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজে নিশ্চেষ্ট থাকলে কিছুই হয় না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও উঠে পড়ে লেগে যেতে হবে। বাস্তববাদী বন্ধু ঢের আছে, তাঁরা বলেন ঐটেই আসল কথা, ঐ উঠে-পড়ে লাগাটা। বাকিটা হল মনের দুর্বলতা, মনকে স্তোক দেওয়া। সে যাই হক, সেদিন যে আমি গিয়ে হাতি তাড়াইনি, সেটা ঠিক।

পিছনের বারান্দায় একটা মরা বন-মোরগ পড়ে ছিল। ছিট ছিট গা ল্যাজে ময়ূরের পালকের মতো চোখ, মুরগির মতো বড়। তাড়াতাড়ি চলে এলাম। পাখিটা যদি কদাকার হত তাহলে আমার অত দুঃখ হত না। শুনলাম ওটাকে রোস্ট করে আমাদের সঙ্গে দেওয়া হবে, দুপুরে খাবার জন্য।

গৌহাটিতে ট্রেনে চড়লাম পান্ডুঘাটে নামলাম। সেখানে ব্রহ্মপুত্রের ওপর জাহাজ বাঁধা ছিল। জাহাজ নয় ফ্ল্যাট। দোতলা চমৎকার একটা জাহাজের মত, কিন্তু তার এঞ্জিন নেই, অন্য জাহাজে টেনে নিয়ে যায়। সে জাহাজটার মাপ এর অর্ধেক। কি সুন্দর নদী এ ব্রহ্মপুত্র, ঢেউ তুলে, জল ছিটিয়ে, ছুটে চলেছে। আমরা দোতলার ডেকে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম। মনে হল দূরে নদীর বুক থেকে এক পাহাড় উঠেছে। একজন বুড়ো ভদ্রলোক ছিলেন, বললেন ঐ উমানন্দ, ওখানে শিবমন্দির আছে। জায়গাটা ভারি বিপজ্জনক, মস্ত ঘূর্ণি জল আছে। পরে দাদামশায়ের লেখা 'উদাসী সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ' নামক বইতে ঐ সব জায়গার বিষয়ে পড়েছিলাম। সেদিন তার চেয়েও চিত্তাকর্ষক জিনিস দেখে আর চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।

নদীর বুকে শুশুক-মাছরা খেলা করছিল। মাছ বললাম বটে, কিন্তু তারা মাছ নয়, জলের জানোয়ার। চোখ দুটি কৌতুকে ভরা, এই জলে ডুব দিল, পিঠখানি শুধু ভেসে রইল, মোলায়েম, মেটে, চকচকে। তারপরেই এক লাফে জল থেকে পাঁচ হাত উঠে পড়ল, গা থেকে টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল, রোদ পড়ে মনে হতে লাগল যেন সোনার তৈরি। এমন অপরূপ দৃশ্য আমি কম দেখেছি। মনে আছে জাহাজে আমরা চা আর কেক খেয়েছিলাম। দুধ হয়ত পাওয়া যায় নি। শিলং-এ আমরা ৩/৪ পেয়ালা দুধে ১/৩ পেয়ালা চা দেওয়া হত, আমরা ভাবতাম খুব চা খাচ্ছি। এখানে সত্যিকার চা দিল, খুব একটা ভাল লাগল না।

এপারে আমিনগাঁওতে জাহাজ থেকে নেমে আমরা আবার ট্রেনে চড়েছিলাম। সারা রাত ঐ ট্রেনে কাটল। রাতে একটা দারুণ দুর্ঘটনা হতে হতে হল না। সেকালে ও দিককার গাড়ির দরজা বাইরের দিকে খুলত। বাংকে শুয়ে একবার মনে হল কোন স্টেশনে ট্রেন থেমেছে, একটা লোক দরজা ঠেলে মাথা ঢোকাল, জায়গা নেই দেখে আবার দরজা বন্ধ করে চলে গেল। দরজাটা বোধ হয় ভাল করে বন্ধ হয় নি, ভিতর থেকে তো লক করা হয়ইনি।

আমার সব চাইতে ছোট ভাই যতি, বাবাকে ডেকে তুলে একবার বাথরুমে গেল। ওর জায়গা দরজার মুখোমুখি। গাড়িটা একবার জোরে ঝাঁকি দিয়ে থাকবে, ফলে দরজা আবার হাঁ হয়ে খুলে গেল আর যতিও ছিটকে বাইরে পড়ল। ওর তখন তিন বছর বয়স। স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে ওর ভীত মা-মা চিৎকার শুনে বাবা চেয়ে দেখেন গাড়িতে যতি নেই। চিৎকারটা বাইরে থেকে আসছে। ব্যস আরব বলা-কওয়া নেই, বাবাও খোলা দরজা দিয়ে লাফ দিলেন। যতি বাঁধের নীচে ধানক্ষেতে পড়ে তখনও চেঁচাচ্ছিল, গাড়ি থেকে আলো পড়ছিল, বাবা ছুটে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন।। যতি বলছিল, মাকো পাস। মাকো পাস! মা প্রায়ই বলতেন রাখে হরি, মারে কে। এ-ও দেখলাম ঠিক তাই। আমি প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। দাদা জেগে গিয়ে দেখতে পেয়ে, এমনি হট্টগোল লাগাল যে আমার ভাই সরোজ ছাড়া গাড়িশুদ্ধ সকলে উঠে বসল। চেন টানা হল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেমে গেল। হৈ-চৈ, হাঁক-ডাক। আমরা স্তম্ভিত। হঠাৎ বাবার গলা শুনলাম, বোধ হয় ফিরিঙ্গি গার্ডকে ইংরিজিতে বলছেন, ঠিক আছে, এই ছেলেটা পড়ে গেছিল।

তারপরই বাবা যতিকে কোলে নিয়ে গাড়িতে এসে উঠলেন। মায়ের ফর্সা মুখ বরফের মত সাদা হয়ে গেছিল। মুখে একটিও কথা বলেন নি। সেইখানে মিনিট কুড়ি দেরি হল। তারপর যখন আবার গাড়ি চলতে আরম্ভ করল, ভগবানকে বললাম, তুমি বড় ভাল, ভগবান। কাল হাতী তাড়ালে, আজ আবার যতিকে বাঁচালে।

যতদূর মনে পড়ে বেলা ১১টা নাগাদ আমরা শিয়ালদা পেঁছিলাম। স্টেশনে চাঁদের হাট। ছোট জ্যাঠামশাই এসেছেন, বড়দা এসেছেন, মণিদা এসেছেন, আরো কারা কারা যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব হচ্ছিল। গাড়ি থেকে নেমেও মনে হচ্ছিল পায়ের তলার মাটিটা দুলছে, চলছে; কানে তালা লেগে যাচ্ছিল।

তিন-চারটে ঠিকে গাড়ি করে আমরা ১০০নং গড়পার রোডে গেলাম। প্রায় ৫০ বছর ঐ বাড়ির কাছে যাই নি, কিন্তু সে দিনের সেই প্রথম দেখার ছবিখানি মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। তার মাত্র পাঁচ-ছয় বছর আগে বাড়ি তৈরি হয়েছিল। আমরা ছোটবেলায় এসে জ্যাঠাইমার সঙ্গে গিয়ে জমি দেখে এসেছিলাম। এক পাশে কালা-বোবাদের স্কুল, অন্য পাশে এথিনিয়ম ইন্সটিটিউশন বলে ছেলেদের স্কুল, মধ্যিখানে সাদা ধবধবে বাড়িটি। সামনেটাতে বোধ হয় একটু ফিকে গোলাপী ভাব ছিল, তার ওপর সাদা একটা পদ্মফুল আঁকা। আছে হয়ত এখনো। নাকি স্বপ্নে দেখেছিলাম?

বাড়ির সামনের দিকটাতে একতলায়, দোতলায় ছাপাখানা ইউ রায় অ্যান্ড সন্সের কার্যালয়। আমরা পাশের ছোট দরজা দিয়ে ঢুকে, গলি পার হয়ে, খাবার ঘরের পাশে, দোতলায় উঠবার সিঁড়ির সামনে পেঁছিলাম। সেই সিঁড়ি তিনতলা অবধি উঠে গেছিল। ধুপধাপ করে কত উঠেছি, নেমেছি, বকুনি খেয়েছি। সিঁড়ির আকর্ষণ অভ্যাস হতে বেশ কিছু দিন সময় লেগেছিল।

দোতলায় জ্যাঠাইমা আর বৌঠান ছিলেন, মণিদার স্ত্রী মেজ-বৌদিও নেমে এলেন। জ্যাঠাইমাকে চিনতে পারছিলাম না। থান-পরা পাকা-চুল, দুঃখী-মুখ, ছোটখাটো এই মানুষটিই কি আমাদের সেই জ্যেঠিমা, যিনি আমার মাকে মানুষ করেছিলেন? চার বছর হল জ্যাঠামশাই চোখ বুজেছেন, এই সময়টুকুর মধ্যে জ্যাঠাইমা অন্য মানুষ হয়ে গেছিলেন। সংসার থেকে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আর তিনি এ-বাড়ির কর্ত্রী ছিলেন না। সংসারের দায়িত্ব দুই বৌয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলে। নিজের মধ্যে গুটিয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছিলেন।

এখন ভাবলে দুঃখ হয় যে জ্যাঠাইমার বয়স তখন বড়জোর ৫২-৫৩ বছর বুড়ো হবার বয়স-ই নয় সেটা। কিন্তু একটা মানুষের অভাবে তাঁর জীবনের কাজ ফুরিয়ে গেছিল। যদি পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকতে পারতেন, যদি শিলং-এর দিদিমার মত স্কুলের মেয়েদের পড়াতেন, কিম্বা নিজের বিমাতা কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর মতো ডাক্তারি করতেন, কিম্বা স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমার জ্যাঠাইমার জীবন এত শীঘ্র এমনভাবে নষ্ট হয়ে যেত না। যে মানুষটি নিজের এবং পরের এক বাড়ি ছেলেমেয়ে নিয়ে এত বড় সংসারটা একা হাতে দক্ষভাবে চালাতেন, তাঁর কপালের এই ব্যর্থতার কথা ভাবলেও কষ্ট হয়। কি চমৎকার রাঁধতেন, কত রকম কাজ জানতেন। পরবর্তী কালে আমার মাকে, আমার বড়দি সুখলতাকে, আমার মেজদি পুণ্যলতাকে দেখে বুঝতে পারি কি অসাধারণ কাজের মানুষের কাছে তাঁরা মানুষ হয়েছিলো।

(চলবে)

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন

প্রণতা দে

শ্রীমতী গারট্রুড এমার্সন সেন

নামটি ভারতীয় সাহিত্যে খুব পরিচিত নয়। কারণ লেখিকা জন্মসূত্রে বিদেশী (আমেরিকান), পরিণয়সূত্রে ভারতীয়। বরং বলব বাঙালী। শ্রীমতী সেন সাহিত্যরচনা এখন আর বড় একটা করেন না। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন সমাজের (চিন্তাশীল তথা রাজনৈতিক) বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ইনি যথেষ্ট পরিচিতা। দীর্ঘ-জীবনের নানাবিধ কর্মক্ষেত্রে ইনি মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নেহেরু, স্যার শ্রীরাম, প্রভৃতি ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। শ্রীমতী সেনের কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণীটি কাগজে দেবার অনুমতি পেতে আমাকে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছে। প্রচার-বিমুখ মহিলা আমাকে তেড়ে উঠলেন—'হোয়াট এ ফুলিস আইডিয়া টু অ্যাটেম্পট্ টু পোলিস মি আপ অ্যাজ এ নিউজপেপার স্টোরি।'

শ্রীমতী সেনের জন্ম শিকাগোর নিকটস্থ ইলিনয়েস অন্তর্গত লেক ফরেস্ট নামক স্থানে। জন্ম সাল জানতে চান? এটি পাবেন না। শ্রীমতী সেন হয় কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবেন, নয় গম্ভীর মুখে বলবেন, 'একশো বছর আগে।' তবে ছবি দেখে এবং রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রভৃতির সংস্পর্শে যিনি এসেছেন তাঁর বয়স হয়ত খানিকটা আন্দাজ করতে পারবেন। কিন্তু সত্যিই কী পারবেন? নাঃ। পারা মুস্কিল। খাড়াই পাহাড়ী পথে ওঁকে স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে প্রায় আশী ছোঁয়া বয়সে অনায়াসে উঠতে দেখেছি, অন্ততঃ ১৫০ ফিট উঁচুতে। সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে সাহায্য নিতে অস্বীকার করে আমাকে অপ্রস্তুত করেছেন 'আই অ্যাম লাইক এ হিল গোট।'

শ্রীমতী সেনের সাহিত্য চর্চার পেছনে আছে এঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের অবদান। বিখ্যাত পণ্ডিত দার্শনিক-লেখক রালফ ওয়ালডো এমার্সন এঁর ঠাকুরদার 'কাজিন' এবং বাবা ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তী জীবনে শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের ক্লাসিকাল সেকশনের কিউরেটর পদে ছিলেন। শ্রীমতী সেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ নিয়ে ইংরাজী ভাষায় সম্মানের সঙ্গে ডিগ্রি পরীক্ষা পাশ করেন ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। গ্র্যাজুয়েট হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইনি বছর খানেকের জন্য জাপানে যাবার সুযোগ পান। সেখানে জাপানী সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে ইনি জাপানী কবিতা, থিয়েটার, ফুল সাজানো ইত্যাদি বিষয়ে আমেরিকার পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। প্রসঙ্গত উত্থাপন করছি, এঁর পরিবারের অনেকেই ব্যবসা বা সাংবাদিকতার কাজে অথবা কূটনীতি বিভাগের চাকুরীসূত্রে জাপানে অবস্থান করছিলেন ঐ সময়।

১৯১৫-১৬ সালে শ্রীমতী সেন দ্বিতীয়বার জাপানে যান। এইবার তিনি কোরিয়া এবং চীনও ভ্রমণ করেছিলেন এবং আমেরিকান পত্রিকায় এইসব দেশের বিষয়ে যথেষ্ট প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। দেশে (আমেরিকা) ফিরেই তিনি নিউ ইয়র্কের 'এশিয়া' পত্রিকার সম্পাদনার কাজ পান (একাধিক সম্পাদকের একজন) এবং সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই কাজে থাকাকালীন পত্রিকার তরফ থেকে ১৯২০-২২ সালে তাঁকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। উনি পূর্ব জাপান, চীন, মালয়েশিয়া, বর্মা, ইন্দোচায়না,

ইন্দোনেশিয়া, ভারত, মধ্য এশিয়া এবং আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ ঘুরে ঘুরে তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম, সামাজিক আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন ও 'এশিয়া' পত্রিকাতে পাঠাতেন।

১৯২৬-২৮ সালে দু বছরের ছুটি নিয়ে তিনি ভারতে বেড়াতে এসেছিলেন। ভারতের প্রাণ যে গ্রাম, নগর নয়, সেটা বুঝেছিলেন। তাই ভারতকে যথার্থভাবে জানবার জন্য ভারতের এক নগণ্য গ্রাম,—উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা জেলায় 'পাঁচপেড়ুয়া' (পাঁচটি গাছসমন্বিত) গ্রামে এসে খড়ের চালের ঘর বাঁধলেন। ঘরের থাম বাঁশের, মেঝে মাটির। এইখানে বছরখানেক থেকে তিনি রচনা করলেন ভয়েসলেস ইণ্ডিয়া—নীরব ভারত। যে ভারত দারিদ্র্য, অনাহার, বৈষম্য, কুসংস্কার—সব নিয়ে নীরব থাকে। যে ভারত নিঃশব্দে অন্য শক্তির কাছে মার খায়। বইখানির ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও পার্লবাক।

১৯৩২ সালে গার্ট্রুড এমারসন বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী (জগদীশচন্দ্র বোসের ছাত্র) আলমোড়াস্থিত বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরীর ভূতপূর্ব ডাইরেক্টর 'বশীশ্বর সেন (পদ্মভূষণ) মহাশয়ের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সেই হেতু ১৯৩২-'৪৯ সাল পর্যন্ত ইনি এশিয়া পত্রিকার অ্যাডভাইসরি এডিটর ফর ইন্ডিয়া পদে ছিলেন। ১৯৪৯ সালে এশিয়া পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এক বছর বাদে মূল মালিকের কাছ থেকে নিয়ে পত্রিকাটিকে নতুন করে শুরু করেছিলেন শ্রীমতী পার্ল বাক্।

শ্রীমতী সেনের অন্যান্য গ্রন্থ কালচারাল ইউনিটি অফ ইন্ডিয়া, এবং পেজেন্ট অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। শেষোক্ত বইটি প্রথমে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পরিবর্তিত সংস্করণ ভারত থেকে হয়। নাম হয় দি স্টোরি অফ আর্লি ইন্ডিয়ান সিভিলিজেশন।

১৯৭৬ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে শ্রীমতী সেন পদ্মশ্রী লাভ করেছেন। উক্ত বছরেই নারীবর্ষ উপলক্ষে আরও একটি পুরস্কার লাভ করেন 'ভারতের বিশিষ্ট কাজে বা সেবায় বিদেশী মহিলা'। এই উপলক্ষে চার ভল্যুম দি স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া বই উপহার পান এবং সেই সঙ্গে ছোট একটি রুপো দিয়ে এনামেল করা কৌটো।

মহাত্মা গান্ধীর জীবদ্দশায় ইনি শবরমতী আশ্রমে কিছুদিন বাস করেছিলেন। ঐ সময় থেকেই জহরলাল নেহেরু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। মনে পড়ছে শ্রীমতী সেন একবার কথায় কথায় গল্প করেছিলেন আলমোড়া জেল থেকে ছাড়া পাবার আগে নেহেরু চিঠি ১ লিখেছিলেন 'অমুক তারিখে জেল থেকে বেরিয়ে তোমাদের কাছে গিয়ে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সমাধা করব.... ইত্যাদি'। নেহরু নামক ব্রিটিশ বিরোধী এই দুর্জনটিকে নিমন্ত্রণ করে শ্রীমতী সেন স্থানীয় ব্রিটিশ কালেক্টর (সম্ভবত নাম ছিল জেমস্) সাহেবের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। শ্রীমতী সেন দুর্বুদ্ধিবশতঃ (?) সস্ত্রীক কালেক্টর সাহেবকেও এই দ্বিপ্রাহরিক ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন! সাহেব এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, নিজের স্ত্রীকেও যোগ দিতে দেন নি। এবং সেইদিন থেকে সেন দম্পতির সঙ্গে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক ত্যাগ করে 'গার্ট্রুড' সম্বোধনকে 'মিসেস সেন' সম্বোধনে পরিবর্তিত করেন।

সেন দম্পতি ইউনিভার্সাল 'বশীদা' ও 'বৌদি'। শ্রীযুক্তা সেন নাম সই করেন 'শ্রীমতী বশী সেন'। একমাত্র বিদেশীদের মুখে তিনি 'গার্ট্রুড'।

বনস্পতির ছায়ায় ঘেরা 'কুন্দন-হাউস' বারোমাস 'বান্ধব মহল'। দেশী, বিদেশী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, শিখ ধর্মনির্বিশেষে দাদা-বৌদির আতিথ্য। শ্রী ও শ্রীমতী সেন নিঃসন্তান হলেও নির্বান্ধব নন। বার্ধক্যজনোচিত নৈরাশ্য কখনও দেখিনি এই দম্পতির মধ্যে। বৌদি শুধু ছিল গোটের মত পাহাড় বেয়ে উঠতেই পটু নন, সাধারণ গল্পগুজবেও অসাধারণ পটু। সতেজ, কৌতুকপরায়ণা ও তারুণ্যময়।

কুন্দন-হাউসের একদিকে বশীদার গবেষণাগারের শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান। কাঁচের ঘরে, খড়ের ছায়ায় গবেষণার চারা শিশুরা বেড়ে উঠছে আগামী দিনের ভারতের সম্পদ হিসেবে। অন্যদিকে ফুলের রাজ্য--বৌদির বিভাগ। বৈজ্ঞানিক বশীদা শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের ভক্ত। প্রতিদিন বাগানের শ্রেষ্ঠ ফুলগুলি (বৌদির অনুমতি নিয়ে) ঠাকুরকে নিবেদন করবেন। বাগানের ফুল কেউ শুঁকতে পাবে না। ঠাকুরের সেবার জন্য তারা। যখনই কুন্দন-হাউসে যাবেন দেখবেন ক্ষীণাঙ্গী, ছোটখাটো বৌদি ঘুরে ঘুরে বাগানের তত্ত্বাবধান করছেন। শুকনো পাতা বা ঝরে-যাওয়া ফুলের অংশগুলি নিজে হাতে ছিঁড়ে দিচ্ছেন। ঐ ফাঁকে দেখে নিচ্ছেন স্ট্রবেরীতে বেশী রোদ লাগছে কিনা। বৃদ্ধ স্বামী গলাবন্ধ কোটের সবকটি বোতাম এঁটেছেন কিনা। অথবা পাখীদের জলখাবার বাসনে জল আছে কিনা।

বৌদি বৃহৎ গ্রন্থ আর না লিখলেও পাঠ্যাভ্যাস ছাড়েন নি। আর তাঁর চিঠিগুলিই তো তাঁর সাহিত্যচর্চার উৎকৃষ্ট নমুনা। স্থান সংক্ষেপের হেতু তাঁর পত্রাবলী এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একটি উদাহরণ না-দিয়ে পারছি না।

গল্প করছিলেন বৌদি নিজেই 'জানো গত বিশ্বযুদ্ধের সময় একবার দিল্লিতে কোন একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম। ব্রিটিশ যুগের ভি আই পিদের পার্টি। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (ব্রিটিশ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন

'আপনিই মিসেস সেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার গৃহভৃত্যের নাম'—?

'হ্যাঁ'। ভয় পেলুম। কেনরে বাপু, কী করল সে? ঐ সময় জানো, সামান্য একটু কিছু হলেই ধরপাকড় চলত। একটু সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করি, 'কেন বলুন তো?'

'আপনি বাড়ীতে (আমেরিকাতে) প্রায়ই চিঠি লেখেন?'

'হ্যাঁ, লিখি।' আমি জানতাম ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা আমার চিঠি সেন্সর করে; কারণ আমি আমেরিকান। অসাবধানতাবশত কী লিখেছি চিঠিতে মনে করতে পারলাম না! মনের মধ্যে খুব চিন্তিত অস্বস্তি। প্রশ্নকর্তা এবারে হেসে বললে, 'আপনার গৃহভৃত্যের নাম এবং তার ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির বর্ণনা পড়েছি। শুধু পড়েছি নয়, আপনার চিঠি 'পাস' করবার আগে কিছু কিছু প্যারাগ্রাফ আমি কপি করে নিয়েছি। ওগুলো পিস অফ লিটারেচার।'

বৌদির মনে পড়ল হ্যাঁ, অল্প দিন আগে আলমোড়ার কাছারির কাছে একটা কুমায়ুঁ বাঘ দেখা দিয়েছিল দিনদুপুরে। সমস্ত কাছারি, এবং মহল্লা তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল ভয়ে এবং উত্তেজনায়। অতঃপর আবিষ্কার হল ওটি বাঘ নয়, একটি শেয়াল! এই তোলপাড় ব্যাপারে ওঁর গৃহভৃত্য বেশ সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। ঘটনাটি উনি সবিস্তারে ভাইকে জানিয়েছিলেন চিঠিতে। কে জানত সেন্সর বিভাগের মত শুষ্ক এবং নিষ্করুণ বিভাগেও সাহিত্যরসিক থাকে? মরুভূমির মধ্যেও গোলাপ জন্মায়?

মনে পড়ছে প্রথম পরিচয়ের দিনটি! বিকেলের দিকে গিয়ে দেখি ক্ষীণাঙ্গী বৃদ্ধা একটি যুবকের সঙ্গে বাগানে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। আলোচনার বিষয়বস্তু একটু 'সিরিয়স' মনে হল। জানলাম সেদিন খানিকক্ষণ আগে বাগানে মুমূর্ষু অবস্থায় একটি 'শেয়াল-শাবক' পাওয়া গেছে। আলোচনারত ছেলেটির নাম 'কেশব', ওঁদের পালিতপুত্রের মত? পাখীটিকে কী ভাবে বাঁচানো যায় সেই আলোচনা হচ্ছিল! হাতের কাছে ডাক্তার পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। বললে, 'ওকে কিছু খাওয়ানো যাচ্ছে না। আলুসেদ্ধ দুধে লয়ে তার সঙ্গে দুটো মাছি চটকে (প্রোটিনের তাগিদে,—অবশ্য ঠ্যাংগুলি বাদ দিয়ে, বেচারার শক্ত লাগতে পারে তো?) ওকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু খাচ্ছে না। আর কী দেওয়া যায় বল ত ডকটর?'

ডাক্তার বিদেশ ঘুরে সার্জারীতে উচ্চশিক্ষা লাভ করে এসেছেন; কিন্তু অসহায়ভাবে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করলেন,—জানালেন এর চেয়ে ভাল প্রেসক্রিপশন তিনি জানেন না।

পাখীটি বাঁচেনি।

শ্রীযুক্তা সেন পরে বলেছিলেন, 'আমাদের ডায়েটটা বোধ হয় ঠিক ছিল না, ডকটর!'

(ক্রমশঃ)

---

১ উক্ত চিঠিটি শ্রীমতী সেন লেখিকাকে দেখিয়েছিলেন।

প্রবাসী বাঙালীর প্রথম সাহিত্য পত্রিকা

বাঙালীর জাতীয় ঐতিহ্যের অন্যতম হচ্ছে সাহিত্যপ্রীতি। বাঙালী মাত্রেই তাই কম বেশী সাহিত্যরসিক।

ইতিহাসের কদাচিৎ কোন কাহিনী যাই বলুক না কেন, আসলে বাঙালী একান্তই ঘর-কুনো জাত। ইংরেজী বিদ্যে আর ইংরেজের চাকরিই বাঙালীকে প্রথম ঘর ছাড়া করল। ব্রহ্মদেশ থেকে আফগানিস্থান পর্যন্ত তারা ইংরেজের তল্পীবাহক হয়ে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। চাকরি হল তাদের পেশা। কিন্তু সাহিত্য হল তাদের নেশা। এইভাবেই প্রথম প্রবাসী বাঙালী সমাজের সৃষ্টি হল। এবং আজও অসংখ্য বাঙালী সেই ঐতিহ্যের ধারক বাহক হিসেবে বিভিন্ন প্রদেশে প্রবাসজীবন যাপন করছেন। পিতা-মহদের কাছ থেকে তাঁদের মধ্যেও সেই সাহিত্যপ্রীতি সঞ্চারিত হয়েছে যার ফলে অসংখ্য দুঃখ কষ্ট বাধা বিপত্তির মধ্যেও তাঁরা সর্বদাই একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের স্বপ্ন দেখেন। প্রকাশের পথে বাধার অন্ত নেই। তবুও পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নবজাতককে ঘিরে আনন্দের হুলুধ্বনি ওঠে কিন্তু বড় সত্য হল যে এ জগতে শিশুমৃত্যুর হার বড় বেশী। প্রবাসী বাঙালীরা তবুও হার মানেন না।

এ প্রায় ষাট বছর আগের কাহিনী। বাংলা ১৩২৭ সালে কাশী থেকে প্রথম বাংলা মাসিক বেরোল। নাম হল 'প্রবাস জ্যোতি'। শুনেছি প্রথমে সম্পাদক ছিলেন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে তার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং উত্তর-কালে 'উত্তরা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী। প্রথম প্রকাশের ব্যাপারে লখনৌ-এর অতুলপ্রসাদ সেন গ্রাহক সংগ্রহ থেকে শুরু করে বহুভাবে পত্রিকাটিকে সাহায্য করেছিলেন। ওদিকে কলকাতায় বাংলা সাহিত্য জগতে তখন মাসিক পত্রিকার স্বর্ণযুগ। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, ভারতী, নারায়ণ, সবুজপত্র ইত্যাদি সব একসারে। 'প্রবাস জ্যোতি' কিন্তু এক বছরের বেশী আয়ু পেল না। ১৩২৮-এর ফাল্গুনে ওই সুরেশ চক্রবর্তীই আবার বার করলেন নতুন পত্রিকা। তার নাম দিলেন 'অলকা'। 'বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে'—রবীন্দ্রনাথের এই গানখানি আশীর্বাদস্বরূপ নিয়ে এর প্রকাশ হল। কিন্তু এরও অকাল তিরোধান ঘটল। কিন্তু সুরেশবাবু হারবার পাত্রই নন। উনি আবার বার করলেন পাক্ষিক পত্রিকা 'প্রবাসী বাঙালী'। যেখানে মাসিকই চলে না সেখানে — পত্রিকা। সুরেশবাবু তাঁর অদম্য সাহস ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিলেন বটে, কিন্তু ও কাগজও টিঁকল না।

১৩২৮-২৯এ কানপুরে অতুলপ্রসাদের নেতৃত্বে 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' হয়। ১৩২৯ এ কাশীতে এই সম্মেলন-এর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৩৩০এ অধিবেশন বসল এলাহাবাদে। তখন ওর নতুন নাম রাখা হল 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'। প্রস্তাবক ছিলেন মাননীয় বিচারপতি লালগোপাল মুখোপাধ্যায়। ১৩৩১এ সম্মেলনের অধিবেশন বসল লখনৌতে। সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সরলা দেবী। এতদিনে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র পঞ্চাশ ষাট জনে! তখনও পর্যন্ত বাংলা দেশের সাহিত্যিক গোষ্ঠি ও মাসিকপত্রগুলি এই সম্মেলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে একান্তই উদাসীন ছিলেন। এই সম্মেলনেই অতুলপ্রসাদ প্রস্তাব করলেন যে প্রবাসী বাঙালীদের একটি ভাল মাসিক পত্রিকার একান্ত আবশ্যক। তিনি বললেন, উত্তর ভারতে খ্যাতনামা বাঙালী চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক বা প্রাবন্ধিকের বিশেষ অভাব নেই। চিত্রশিল্পীদের মধ্যে তিনি নাম করলেন, অসিত হালদার, সারদা উকিল ইত্যাদির। এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখ করলেন, ধূর্জটিপ্রসাদ, রাধাকমল, রবিকুসুম প্রমুখ ব্যক্তিদের। সরলা দেবীকে নেত্রী করে তৈরী হল 'পত্রিকা সমিতি'। হিসেব করে দেখা গেল মাসিক পত্রিকা চালাতে গেলে অন্ততঃপক্ষে বছরে ৩,৬০০ (তিন হাজার ছ'শো) টাকা-র প্রয়োজন। ঠিক হল টাকা তোলা হবে তিন-ভাবে। প্রথম এককালীন দান—দ্বিতীয় মাসিক চাঁদা—তৃতীয় গ্রাহক সংগ্রহ। বিজ্ঞাপনের কথাটা যে কেন কেউ তখন ভাবেন নি, ভাবলে অবাক লাগে। পরে অবশ্যই তাঁরা ও সম্বন্ধে ভেবেছিলেন এবং কাজও করেছিলেন। সভাতেই লখনৌ কানপুর ও এলাহাবাদের প্রতিনিধিরা যথাক্রমে তিনশ দুশ' ও দুশ' টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেখানে দিল্লী বা লাহোরের প্রতিনিধিদের কোন উল্লেখ দেখি না।

সবই ত হল, এখন এই নতুন পত্রিকার নাম কি হবে? ঝটিতি অতুলপ্রসাদ বললেন, 'উত্তরা'। সম্পাদক হলেন ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও অতুলপ্রসাদ সেন। সহ-সম্পাদক হলেন আমাদের বহু পরিচিত সেই সুরেশ চক্রবর্তী। উপদেশকমণ্ডলীও বসানো হল নামী সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে। এঁদের মধ্যে ছিলেন—সরলা দেবী, ডঃ রাধাকুমুদ, সুরেন্দ্র মজুমদার, ডঃ মেঘনাদ সাহা, গোপীনাথ কবিরাজ, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। প্রচ্ছদপট আঁকতে অনুরোধ করা হল রবীন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয় প্রখ্যাত শিল্পী অসিত হালদারকে। তাঁকে শিল্প সম্বন্ধে লিখতেও অনুরোধ করলেন অতুলপ্রসাদ। ঠিক হল পত্রিকাটি ছাপানো হবে এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের কাশীর নতুন শাখা ছাপাখানায়। রেট বারো টাকা ফর্মা।

ছুটিতে সিমলা বেড়াতে যাওয়ার পথে সেখানে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয় হল অবিনাশচন্দ্র মজুমদার নামে এক বাঙালী ভদ্রলোকের। জানা গেল তিনি গুরুমুখী ভাষা ও শিখ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। গুরু তেগ্-বাহাদুরের বাণীর অনুবাদ করেছেন বাংলায়। অতুলপ্রসাদ 'উত্তরা'য় প্রকাশের জন্য সেই লেখা সংগ্রহ করে আনলেন। একদিন সহাস্যে সুরেশবাবুকে বললেন, এই নাও রবিবাবু কবিতা পাঠিয়েছেন, নাম 'আশীর্বাদ'। তার শেষ দু লাইন হচ্ছে—

দীন বঙ্গবীণাপাণি অতুলপ্রসাদ
চিত্ত জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।

সবাই বললেন, আশীর্বাদটা 'উত্তরা'কে না অতুলপ্রসাদকে?

১৩৩২-এর আশ্বিন মাসের শুভ মহালয়ায় 'উত্তরা'র আবির্ভাব। আসলে প্রবাসী বাঙালীর প্রথম সার্থক সাহিত্য পত্রিকা এই 'উত্তরা'ই।

কাশী 'উত্তরা'র জনয়িত্রী আর পালয়িত্রী হল দক্ষিণাবর্তী, যার অন্য নাম লখনৌ। উত্তরার দপ্তর অতুলপ্রসাদের ব্যাংক রোডের বাড়ি থেকে স্থানান্তরিত করা হল লাটুশ রোডে, মডেল বুক ডিপোর দোকানে। উত্তরার জয়ধ্বনি বাংলার সাহিত্য গগনেও অনুরণন তুলল। রবীন্দ্রনাথ সোনার কলম দিয়ে অসিতকুমারকে লিখছেন—'উত্তরা উত্তমা হয়েছে।' কল্লোলের পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন, 'হ্যাঁ, কাগজ বার করতে হয় ত এমন কাগজই বার করা উচিত। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে লেখকের অভাব কোনও দিনই নেই, হবেও না। ...বাংলার কোন কাগজই একে প্রবন্ধ সম্পদে এড়িয়ে যেতে পারবে না।'

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লখনৌ-এর সাংস্কৃতিক জীবনধারা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতকে আচ্ছন্ন করে প্রবল বেগে বয়ে চলেছিল। বাংলা দেশের সংস্কৃতির একটা ভাগ যেন তুলে আনা হয়েছে এ নগরীতে। সঙ্গীতে অতুলপ্রসাদ, সাহিত্যে ও মনীষায় ধূর্জটিপ্রসাদ, উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী, ডঃ রাধাকুমুদ ও ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডঃ নির্মল সিদ্ধান্ত, বিনয় দাশগুপ্ত, শিল্পে অসিতকুমার, বীরেশ্বর সেন প্রভৃতি লখনৌ-এর আকাশ আলো করে আছেন।

এক বছরেই 'উত্তরা' সাহিত্য পত্রিকার শিরোপা পেল। 'উত্তরা'র আভিজাত্য ছিল কিন্তু অহংকার ছিল না। কিন্তু প্রবাসী বাঙালীর বড় গর্বের, বড় আনন্দের বড় প্রিয় 'উত্তরা' বুঝি বন্ধ হয়ে যায়। প্রেস

জানিয়েছে তাদের পাওনা ২,৩০০্ (তেইশ শ') টাকা অবিলম্বে না দিলে তারা পত্রিকা ছাপা বন্ধ করে দেবে। কিন্তু 'উত্তরা'র কোষাধ্যক্ষের হাতে টাকা নেই। প্রতিশ্রুতির টাকা অনেকেই দেননি।

এদিকে অতুলপ্রসাদ এই ত সেদিনও ৫০০্ (পাঁচশ') টাকা দিলেন। তিনি একা আর কত দেবেন। কিন্তু আর কেউ ত আঙুলও নাড়ছেন না। অতুলপ্রসাদ আবারও ৫০০্ (পাঁচশ') টাকা দিলেন। ওদিকে প্রেস এভাবে টাকা নিতে রাজী নয়। তারা অন্যায় করে অতুলপ্রসাদকে টাকার জন্য দায়ী করে চিঠি দিল। ন্যায়তঃ বা আইনতঃ অতুলপ্রসাদের ওই টাকার জন্য কোন দায়িত্বই ছিল না। দায়িত্ব ছিল সম্মেলনের পত্রিকা কমিটির। অতুলপ্রসাদ তাই অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, এ অন্যায়। মুমূর্ষু 'উত্তরা'কে বাঁচাতে তখনোও অতুলপ্রসাদের বাড়িতে মিটিং ডাকা হল। হিসেব খতিয়ে দেখা গেল যে শুধু প্রেসই টাকা পায় না, সহ-সম্পাদক ও সব কাজের কাজী সুরেশ চক্রবর্তীকেও আজ পর্যন্ত দেয় বেতনের এক পয়সাও দেওয়া হয়নি। কথা অনেক হল, কিন্তু কাজ কিছুই হল না। আর কেউই অতুলপ্রসাদের মত মুক্ত হস্ত হতে রাজী নন। নিরুপায় হয়ে ঠিক হল, তা হলে কাগজ বন্ধ করেই দেওয়া হোক। সুরেশবাবু বললেন, প্রবাসী বাঙালীরা হয়ত বা আমাদের সংকট বুঝবে। কিন্তু বাংলা দেশেও ত আমাদের বহু গ্রাহক রয়েছেন, তাঁরা কি বুঝতে চাইবেন? দ্বিতীয় বছরে মীটিং-এর সময় পর্যন্ত তখন মাত্র তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছে। পরের সংখ্যাগুলি না পেলে তাঁরা কি আমাদের ক্ষমা করবেন? এ প্রশ্নের কেউই কোন জবাব দিতে পারলেন না। এমন অবস্থায় সুরেশবাবু একটি অভাবনীয় কাজ করলেন। তিনি সবাইকে বললেন, 'উত্তরা'কে বাঁচানোর জন্য আমাকে একটা শেষ সুযোগ দিন। বাকি ন'মাস কাগজ চালানোর ভার আমাকে দিন। কর্তৃপক্ষ—যাঁরা নিজেরা কিছুই করতে প্রস্তুত ছিলেন না—তাঁরা একটি সতর্ক বহু কণ্টকিত চুক্তিপত্রে সই করে সব ভার সুরেশবাবুকেই দিয়ে দিলেন।

পর দিন সুরেশবাবু আবার এলেন সেই অতুলপ্রসাদের কাছেই। বললেন—'উত্তরা' ত আপনারই মানস-কন্যা। এর জন্যে অনেক ত্যাগই ত করেছেন। আরও কিছু করুন। এই শেষবারের মত আমাকে ৫০০্ (পাঁচশ') টাকা দিন। এখন ত সব দায়িত্বই আমি নিয়েছি। দিলেন পাঁচশ টাকার চেক কিন্তু চিঠিতে স্পষ্ট লিখলেন—আর নয়, এই শেষ। এটা ১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারীর কথা।

একথা আমরা সকলেই জানি যে এর পর দীর্ঘকাল ধরেই 'উত্তরা' সগৌরবে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি কাশীবাসী কোন বন্ধুর সৌজন্যে ১৩৬১ সালের (ইংরেজী ১৯৫৫) রবীন্দ্র সংখ্যা 'উত্তরা' লেখকের হাতে এসেছে। তাতে দেখি ওটি 'উত্তরা'র অষ্টবিংশতি বর্ষ'!! এবং গর্বের সংগে এ-ও লক্ষ্য করেছি যে পত্রিকাটি 'উত্তরা'র নিজস্ব ছাপাখানা 'উত্তরা প্রেস', ভোলপুরা, কাশী থেকে ছাপা হচ্ছে। প্রাচীন কাশীবাসী বন্ধুদের কাছে শুনেছি যে ১৯৬৫ সালে পত্রের মৃত্যুর পর সুরেশবাবু পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করেন। এত দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্য পত্রিকার কথা আমাদের জানা নেই। খাস কলকাতায়ই বা কটা পত্রিকা এত দীর্ঘ আয়ু পেয়েছে?

এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে 'উত্তরা'ই প্রথম বাংলা সাহিত্য পত্রিকা যার মাধ্যমে আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতির রস আস্বাদন করতে পেরেছি। তাঁরা জানতেন প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের শুধু বাংলা সাহিত্য নিয়ে থাকলেই চলবে না। বিভিন্ন প্রদেশবাসী বাঙালীদের সেই সেই প্রদেশ ও প্রতিবেশী প্রাদেশিক সাহিত্যের সংগে পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক যাতে করে অনুবাদের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের সাহিত্যরস উপভোগ করতে পারেন।

সম্প্রতিকালে দিল্লীর বেংগল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত 'দিগন্ত' পত্রিকা এ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

সুরেশচন্দ্র আজ নেই। কিন্তু আজও আমাদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ এবং সুরেশচন্দ্রের প্রকৃত উত্তরসূরীরাই সেই সাংস্কৃতিক ধারা বহন করে চলেছেন। তাই বার বার অসংখ্য মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে আজও প্রবাসী বাঙালীরা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

বিঃ দ্রঃ—এই প্রবন্ধের তথ্যের জন্যে সুরেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত—অতুলপ্রসাদ জন্মশত বার্ষিকী স্মরণ গ্রন্থের কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

সুশান্তকুমার হালদার

শহরতলী / মফঃস্বল

অনাদরে অবহেলায়

খুব বেশী দূরত্বের ব্যবধান নয়। কলকাতা থেকে মাত্র চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটারের পথ। গভীর সবুজ বনানীর মধ্যে কাঞ্চনপল্লী গ্রাম। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে এই বাংলার সুপ্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাঞ্চনপল্লীতেই জন্মগ্রহণ করেন। কাঞ্চনপল্লীর অধুনা নাম কাঁচরাপাড়া।

হুগলী নদীর তীরে এই কাঞ্চনপল্লী। শুধু কবির জন্মস্থান হিসেবে নয়, শিল্প সাহিত্য আর সাংস্কৃতিক দিক থেকে কাঞ্চনপল্লী একটি সুপরিচিত নাম।

আজ সেখানে প্রায় একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে কবির বসত ভিটে এবং তাঁর স্মৃতিস্তম্ভটি অনাদরে অবহেলায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। বসত ভিটেটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সরু ইঁটের গাঁথা একটি ভাঙা খিলান বেশ কিছু সভাগুল্মে জড়িয়ে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাঁর স্মৃতিস্তম্ভটি বসত ভিটের অনতিদূরে জঙ্গলের মধ্যে প্রায় ধ্বংসের মুখে। আশে-পাশে মানুষের বসবাস নেই বললেই চলে। আরও পরিতাপের বিষয় হলো কবির বসত ভিটের চারপাশ ঘিরে আছে ঝোপঝাড়। সেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে কিংবা সন্ধ্যার অন্ধকারে চলে অসামাজিক মানুষের অবাধ আনাগোনা। শোনা গেছে গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে তাড়ি মদ আর জুয়ার মজলিস বসে।

কবির পক্ষে সময়টা বড় দুঃসময়। কারণ তাঁর জন্ম শতবর্ষ অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। কাজেই বর্তমানে সরকারের সেদিকে নজর পড়বে সে আশাও কম। তবুও আমার নিবেদন, বাঙালী হারিয়েছে অনেক কিছুই। শত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও আঁকড়ে ধরে আছে তাঁর কাব্য সাহিত্য আর শিল্পকে। সুতরাং সরকার এগিয়ে না এলেও পুণ্য-স্মৃতি রক্ষা করবার ভার নিতে হবে নিরন্ন বাঙালীকেই।

সবচাইতে আশ্চর্য লাগে—কবির জন্মস্থান ও তাঁর স্মৃতিস্তম্ভটি সম্পর্কে কোন পথ-নির্দেশিকাও নেই। ফলে পশ্চিম বাংলার এদিক সেদিক থেকে যে সমস্ত কবি অনুরাগীরা আসেন পরিবেশে তারা বিষণ্ণ হয়ে চোখের জল ফেলে ফিরে যান। এতটুকু সুনজর সহযোগিতা পেলে কবির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হতো। বিশেষ করে স্থানীয় কবি অনুরাগীরা সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে আছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগ যদি এ দায়িত্ব নেন, তাহলে কবির মর্যাদা আর তাঁর বসত ভিটার অংশ এবং স্মৃতিস্তম্ভটি রক্ষা পায়।

শুধু তাই নয়, সরকারী সহযোগিতা পরিণতির দিকে এগুলে কবি অনুরাগীদের ফিরে যাবার আর কোন কারণই থাকবে না। কবির মর্যাদা গৌরব আবার প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সকলের গৌরব বাড়বে।

অনুপম মিত্র

পেলে অনুরাগীদের রাতের ঘুম চলে যাবে

এখন যদি আমি বলি যে আগামী সেপ্টেম্বরে অ্যাডশন আরাণ্টোস দা ন্যাসিমন্টো নামে এক ফুটবলার কলকাতায় আসছেন খেলতে এবং তাঁকে শুধু চোখের দেখা দেখার জন্য সারা ভারতের ফুটবল-অনুরাগীদের রাতের ঘুম চলে যাবে, তাহলে হয়তো অনেকেই ভ্রু কোঁচকাবেন....কে এই অ্যাডশন অ্যারান্টোস ইত্যাদি ইত্যাদি? কিন্তু যদি বলি ফুটবলের কিংবদন্তী পেলের নামই অ্যাডশন আরান্টোস দা ন্যাসিমন্টো। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সমস্ত প্রশ্ন শিকেয় তুলে রেখে আপনি বলবেন— পেলের জন্য শুধু রাতের ঘুম নয়, আরো বেশী ত্যাগ স্বীকার করতেও পিছুপা নই। পেলেকে দেখতে পাওয়া, ফুটবলের যাদুকরকে চর্মচক্ষে দেখা কি যে-সে ব্যাপার ?

হ্যাঁ, পেলে কলকাতায় আসছেন। আসছেন আগামী সেপ্টেম্বর মাসে। সম্ভবত ২৫ সেপ্টেম্বর সর্বকালের ফুটবল মহানায়ক পেলেকে কলকাতার ইডেন উদ্যানে খেলতে দেখা যাবে। মোহনবাগান ক্লাবের আমন্ত্রণে নিউইয়র্কের কসমস ক্লাব কলকাতায় আসছে কয়েকটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে। পেলে এখন কসমস ক্লাবে খেলছেন। কলকাতায় অবশ্য শুধু পেলে আসছেন না। আর এক বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার ফ্যানৎস বেকেন-বেয়ারও সম্ভবত আসছেন। এছাড়া নিউ-ইয়র্কের কসমস ক্লাবের নামী-দামী খেলোয়াড়রা তো আছেনই। কসমস ক্লাবকে কলকাতায় আনতে খরচ হচ্ছে আকাশ-ছোঁয়া অর্থ। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই পাঁচ হাজার ডলার বিদেশী মুদ্রার অনুমোদন দিয়েছেন।

ফুটবলের যাদুকর পেলে এখন আন্ত-র্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন। তবু পেলে পেলেই! তাই ১৯৭৫ সালে নিউইয়র্কের কসমস ক্লাব যখন আকর্ষণীয় এক চুক্তিতে পেলেকে নিজেদের সঙ্গে টেনে নিলেন তখন কেউই অবাক হননি। কিন্তু কসমস ক্লাবের সঙ্গে পেলের কি চুক্তি হয়েছিল ? ১৯৭৫ সালের কয়েক মাস এবং ৭৬ ও ৭৭ সালের জন্য পেলে পাবেন ট্যাকস ফ্রি চার কোটি টাকা। শুধু টাকাতেই শেষ নয়। কসমস ক্লাব 'নিউইয়র্ক' শহরে পেলেকে দিলেন অতি আধুনিক মাল্টি স্টোরিড একটি বাড়ি এবং আমেরিকার পরিক্রমায় ভ্রমণের জন্য জেট চালিত একটি প্রমোদতরী। আমেরিকায় ফুটবল তেমন জনপ্রিয় নয়। কিন্তু পেলে কসমসে খেলতে আসার পরই যেন ম্যাজিক স্পর্শনের যাদুতে মার্কিনীরা ফুটবলপ্রেমী হয়ে উঠলো।

[illegible] একটা

দারুণ ব্যাপারই হয়ে গেল। নিউইয়র্কে আসার পর পেলে সেদিন হোয়াইট হাউসে গেছেন তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে দেখা করতে। কি করে যেন খবরটা রটে গেল। হোয়াইট হাউসের সামনে নিমেষের মধ্যে তৈরী হয়ে গেল এক বিশাল জন-অরণ্য। পেলেকে না দেখে কেউ এক পা সরবে না। বাধ্য হয়ে পেলে এবং প্রেসিডেন্ট ফোর্ড এলেন ওদের সামনে। হাজার হাজার অটোগ্রাফ খাতা বেরোলো। না, প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের অটোগ্রাফ কেউ চায় না। সবাই চায় পেলের স্বাক্ষর। জেরাল্ড ফোর্ড হেসে সেদিন বলেছিলেন—'আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেও, জনপ্রিয়তায় তুমি আমাকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছ।'

ব্রেজিলের মিনাস জেরিয়াসের ট্রেস-কোরাকোসে অতি সাধারণ একটি পরিবারে ফুটবলের এই বিরাট চরিত্রটির জন্ম। তারিখটি ছিল ২৩ অকটোবর, সাল ১৯৪০। পেলে ছোটবেলা থেকেই ছিলেন খুব দুরন্ত। মজার কথা এই যে একদিন ফুটবলের যিনি সম্রাট হবেন তাঁর কিন্তু বালক বয়সে খেলার জন্য একটি ফুটবলও জোটেনি। পুরনো মোজার বান্ডিল জড়িয়ে ফুটবল অনুশীলন করতেন পেলে। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে রাস্তায়, গলিতে আবার কখনো-সখনো মাঠে ফুটবল খেলতেন পেলে। সেদিনকার পেলে জানতেন না একটি লোক ছায়ার মত সবসময় অনুসরণ করে তাঁকে। লোকটি আর কেউ নয়, ১৯৩৪ সালে বিশ্ব কাপ দলে ব্রেজিলের খেলোয়াড় এবং স্থানীয় দ্বিতীয় ডিভিসনের একটি ক্লাবের ম্যানেজার ভ্যাল্ডেমার দ্য ব্রিটো। জহুরীর সাচচা চোখ দিয়ে ব্রিটো সেই বালক পেলের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন ফুটবলের এক তারকাকে। ব্রিটোর পরামর্শে বালক পেলে যোগদান করলেন দ্বিতীয় ডিভিসনের বাউরো ক্লাবে। বাউরো ক্লাবে কয়েক বছর খেলার পর, পেলের বয়স যখন পনেরো, ব্রিটোর কথাতেই পেলে সই করলেন ব্রেজিলের নামজাদা দল স্যান্টোসে।

প্রথমে পেলেকে নেওয়া হল স্যান্টোসের তিন নম্বর দল স্যান্টোস অ্যামেচারে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অচিরেই বুঝলেন সহজাত প্রতিভায় পেলে ভাস্বর। এক নম্বর দলে জায়গা পেতে পেলের অসুবিধা হল না। ১৯৫৭ সাল কোপারোকা কাপের খেলায় আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ব্রেজিলের জাতীয় দলে স্থান পেলেন পেলে এবং প্রথম খেলাতেই গোল করলেন তিনি। ব্যাস, এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি পেলেকে। ১৯৫৮ সালে বিশ্ব কাপ ফুটবলের আসরে পেলের আবির্ভাব: হাঁটুতে চোট থাকায় প্রথম দুটি ম্যাচ খেলতে পারলেন না পেলে। তৃতীয় ম্যাচে রাশিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামলেন তিনি। পেলের সটে পরাস্ত হলেন বিশ্বশ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক লেভ ইয়াসিন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, পেলের বল বারে লেগে ফিরে এল। ১৯৫৮ সালের আসরেই পেলের ভিনি, ভিডি ভিসি। এলেন—দেখলেন—জয় করলেন। বিশ্ববাসী জেনে গেল ফুটবলের এক শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেছেন।

তারপর, ১৯৫৮—৭০ শুধু রেকর্ড রেকর্ড আর রেকর্ড। বিশ্ব ফুটবলে চললো নিরবিচ্ছিন্ন পেলে যুগ। ১৯৭০-এ তিনবার বিশ্বকাপ জয়ের সূত্রে জুলেরিমে কাপটি চিরতরে অধিকার করে ব্রেজিল যে অনন্য রেকর্ডটি করলো তার জন্য পেলের অবদানই সর্বাধিক। ব্রেজিলও পেলেকে দিয়েছে অভূতপূর্ব সম্মান। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল থেকে পেলে অবসর নেওয়ার পর ব্রেজিল এবং স্যান্টোস ঘোষণা করে যে দশ নম্বর জার্সি পরে এরপর থেকে তাদের দলের কেউ মাঠে নামবে না। কারণ পেলে ওই জার্সি পরতেন।

ব্রেজিলিয়ানদের দেওয়া আদরের নাম ব্ল্যাকপার্ল, তার থেকে পেলে। ইতালীতে পেলে দি কিং। চিলিতে এল পেলি গ্রো। ফ্রান্স পেলেকে আদর করে ডাকে ব্ল্যাক টিউলিপ নামে। এছাড়াও স্বদেশে-বিদেশে পেলে কোথাও দি নভেলটি আবার কোথাও বা সকার কিং। এখন তাঁর ফুটবল জীবনের অন্তিম লগ্নে সেই পেলে কলকাতায় আসছেন।

আমরা কি ফুটবলের সম্রাটকে নিজেদের দেওয়া একটি নামে ডাকতে পারি না? জানি পেলে আমাদের ভাষা বুঝবেন না। কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে যে ডাক ওঠে আসবে, পেলে কি তাতে সাড়া দেবেন না?

জয়ন্ত চক্রবর্তী

ফুটবল জগতে অগ্নিমান্দ্য— 'অর্জুন' নেই

সম্প্রতি আমি একজন পরিসংখ্যানবিদের কাছে গিয়েছিলাম চারটি প্রশ্ন নিয়ে। আমার জানার কৌতূহল ছিল—(এক) আমাদের একশো বছর বয়সী ফুটবল বুড়োকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কতজন খেলোয়াড় লাথালাথি করেছেন, (দুই) ফুটবল সম্পর্কে অদ্যাবধি কত লক্ষ কোটি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে, (তিন) সেই শব্দসমষ্টি মহাকাশ থেকে ফিরে এলে পৃথিবী চৌচির হয়ে যাবে কিনা, এবং (চার) ফুটবল নিয়ে বাঙালীর গর্বের গম্বুজটি উচ্চতায় কত হতে পারে। পরিসংখ্যানবিদ বিজ্ঞানী কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেননি।

আমার এই অনুসন্ধিৎসার চাঁদমারিটা ছিল ভারত সরকারের একটি ঘোষণাপত্র—যাতে পঁচাত্তর সালের অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের নাম এবছর প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন খেলাধুলায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য মোট উনিশজন স্পোর্টসম্যানকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু তার মধ্যে কোন ফুটবলারের নাম খুঁজে পাইনি।

প্রথমেই জানিয়ে রাখি, অর্জুন পুরস্কারটি কেন দেওয়া হয়, এবং কোন খেলোয়াড় এটা পাওয়ার যোগ্য। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের একটি পুস্তিকা ঘেঁটে দেখলাম, বলা হয়েছে—'বছরের সেরা খেলোয়াড়দের সম্মান প্রদানের জন্য উনিশ শো একষট্টি সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তর। সর্বভারতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলি—কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য খেলোয়াড়দের নাম পাঠান। নামগুলি অনুমোদন করেন নিখিল ভারত ক্রীড়া পর্ষদ, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করেন পুরস্কার দেওয়ার জন্য।'

'অর্জুন পুরস্কার পাওয়ার জন্য খেলোয়াড়টিকে অন্তত তিন বছর উঁচু মানের ক্রীড়া দক্ষতা দেখাতে হবে। সেই সঙ্গে ক্রীড়াঙ্গনে এবং বাইরেও শালীনতা ও খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে।'

আজ পর্যন্ত 'অর্জুন' হয়েছেন মোট একশো তিরাশিজন খেলোয়াড়, (এভারেস্ট-বিজয়ী কুড়ি জনের দলটি ছাড়া)—আঠারো জন অ্যাথলীট, দশজন ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়, বাস্কেটবলার নয়জন, বিলিয়ার্ডস, ব্যাডমিন্টন এবং পোলোতে চারজন করে, দাবায় ও সাইক্লিংয়ে একজন করে, তেরোজন ক্রিকেটে, ছয়জন করে খো খো এবং গলফে, পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে হকিতে বাইশজন, লন টেনিসে এবং সুটিংয়ে পাঁচজন করে, টেবিল টেনিসে আটজন, দুজন করে স্কোয়াশ রাকেট এবং জিমন্যাস্টিকসে, ভলিবলে সাতজন, সাঁতার ও ডাইভিং মিলিয়ে দশজন, ওয়েট লিফটিংয়ে ও কুস্তিতে এগারোজন করে, ইয়টিং, অশ্বারোহণ এবং কাবাডিতে দুইজন করে এবং বক্সিংয়ে সাতজনই। সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবলে 'অর্জুন' হয়েছেন এগারো জন এবং পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মোট পনের বছর ধরে।

পুরস্কারপ্রাপ্ত ফুটবলারদের তালিকাটি খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে কয়েকটা তথ্য আবিষ্কার করলাম: এক, মোট এগারোজন ফুটবলার-অর্জুনের মধ্যে পাঁচজন পেয়েছেন বাংলা থেকে। দুই, তাঁর মধ্যে মাত্র একজন বাঙালী, তিনি চুনী গোস্বামী। তিন, আরো দুজন বাঙ্গালী ফুটবলার অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন বটে, তবে তাঁরা বাংলার হয়ে নয়—রেলওয়েজের হয়ে, তারা হলেন—প্রদীপ ব্যানার্জী ও অরুণ ঘোষ। চার, একষট্টি সাল থেকে সাতষট্টি পর্যন্ত পুরস্কার দেবার মতো ফুটবলার পাওয়া গিয়েছিল একনাগাড়ে তারপরই ফুটবল জগতে অগ্নিমান্দ্য শুরু হয়। ফুটবলে তারপর যেসব বছরে অর্জুন দেবার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি সেই বছরগুলো হলো—আটষট্টি, বাহাত্তর, তিয়াত্তর এবং পঁচাত্তর সাল।

একথা ঠিক যে আজ পর্যন্ত যাঁরা ফুটবলে অর্জুন হয়েছেন তাঁদের যোগ্যতা

র্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।
প ব্যানার্জি, বলরাম, চুনী গোস্বামী,
র্জ সিং, অরুণ ঘোষ, ইউসুফ খান,
রাজ, ইন্দার সিং, নাঈমুদ্দিন, চন্দ্রেশ্বর
দ এবং মগন সিং—এঁরা যে কৃতী
লোয়াড় তাতে কারোরই সন্দেহ থাকতে
র না। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে—ষাট
ং সত্তরের দশকে যে বছরগুলোতে ফুট-
ন 'অর্জুন' দেওয়া হয়নি সেই সময়ে কি
তাই দক্ষ ফুটবলার খুঁজে পাওয়া যায়নি?

এ বছরেও পুরস্কারের তালিকায় কোন
টবলারের নাম না দেখে প্রশ্ন করেছিলাম
ইজন 'অর্জুন'কে, এসম্পর্কে তাঁদের মত
। ফুটবলে সপ্তম অর্জুন পিটার থঙ্গ-
জের সঙ্গে কথা হয়েছিল কলকাতায় মহা-
ডান স্পোর্টিংয়ের তাঁবুতে বসে। পুর-
রটি উনি হাতিয়ে ছিলেন সাতষট্টি সালে।
লেন, 'অর্জুন পুরস্কার পাওয়া একজন
টবলারের জীবনে চরম সম্মান। শুধু ভালো
দলেই যে এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য
ল ধরে নিতে হবে তার কোনো মানে নেই।
ত মাঠে এবং মাঠের বাইরেও ফুটবলার-
র আচরণ খুঁটিয়ে বিচার করা হয়। কয়েক
র আগে একবার আমাকে অর্জুন পুর-
রের নির্বাচক করা হয়েছিল। অন্ধ্রনিবাসী
থচ কলকাতায় খেলেন এমন একজন ফুট-
লারের নাম আমি সুপারিশ করেছিলাম।
ল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সম্মতিও
ল তাতে। সব ঠিকঠাক যেদিন পুরস্কার
ষণা করা হবে সেদিন দিল্লির খবরের
াজগুলোতে একটা রিপোর্ট বেরোলো যে
ফুটবলারটি কলকাতার সিনিয়র ডিভিসন
লের একটি খেলায় রেফারীর সঙ্গে বাজে
বহার করেছেন। মিটিংয়ে ঐ রিপোর্ট
খালেন একজন, ব্যস সেই ফুটবলারের
মটি তক্ষুনি কেটে দেওয়া হলো।'

ফুটবলে প্রথম অর্জুন প্রদীপ ব্যানার্জি
ন্ত খানিকটা সহানুভূতি নিয়ে
ললেন—'কোন ফুটবলারকে এই পুরস্কার
ওয়ার জন্য পাওয়া যাচ্ছে না, এটা আমি
শ্বাস করি না। আমি যেবার অর্জুন পেলাম
 গ্রাঞ্জার সেবার। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ডঃ
াধাকৃষ্ণনের হাত থেকে এ্যাওয়ার্ড নিয়ে-
লাম। আমার বছরে পেয়েছিল ভারতের
রা স্পোর্টসম্যানরা—রামনাথন কৃষ্ণন, নান্দু
টেকর, সেলিম ডুরানী, পৃথিপাল সিং-
 নিয়ে কুড়িজন। সে দিনের কথা ভোলা
য় না।'

'ঠিক এই মুহূর্তে কোন কোন ফুট-
লারকে এই পুরস্কার দেওয়া যেতে পারত?'
-আমি প্রশ্ন করেছিলাম বাধা দিয়ে।

উনি যেন মুখিয়েই ছিলেন, বললেন—
কন সুধীর কর্মকার বা হাবিব। সুধীরের
তো ব্যাক সত্তর দশকে জন্মায়নি। ওর
তো ভদ্র ও নম্র ছেলেও ফুটবল মাঠে বিরল।
ার হাবিবও বহু বছর ইন্ডিয়াকে সার্ভিস
য়েছে। তবে এদের নাম সুপারিশ করবে
রা— সেই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডা-
শন-ই যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে তাহলে
র কি করা যেতে পারে, বলুন।'

রূপক সাহা

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে জিতে ১৯৭৭ সালের টেস্ট সিরিজে ১-০ খেলায় এগিয়ে গেছে। লর্ডস মাঠে চলতি টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল। এখনও এই দুই দেশের চলতি সিরিজের তিনটে টেস্ট খেলা বাকি।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করেন। অস্ট্রেলিয়ার ১৪০ রাণের মাথায় ৫ম উইকেট পড়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার রাণ ছিল লাঞ্চের সময় ৮০ (২ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৬২ (৫ উইকেটে)। ৬ষ্ঠ উইকেট জুটি ওয়াল্টার্স এবং মার্শ ৯৮ রাণ তুলে দলের কিছুটা মুখ রক্ষা করেছিলেন। প্রথম দিনের খেলার শেষ ২০ মিনিটে ইংল্যাণ্ডের অফ-স্পিনার জিওফ মিলার অস্ট্রেলিয়ার ওয়াল্টার্স এবং মার্শকে আউট করে ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে খেলার গতি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের রাণ দাঁড়ায় ২৪৭ (৭ উইকেটে)।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ২৯৭ রাণের মাথায় শেষ হলে ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের তিনটে উইকেট খুইয়ে ২০৬ রাণ সংগ্রহ করেছিল। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা মোটেই সুবিধার হয়নি—১৯ রাণের মাথায় ১ম এবং ২৩ রাণের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। দলের পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে তৃতীয় উইকেট জুটি বব উলমার এবং ডেরেক র‍্যাণ্ডাল প্রায় তিন ঘন্টার খেলায় ১৪২ রাণ তুলে দেন। র‍্যাণ্ডাল ৭৯ রাণ করে আউট হন। এবং উলমার ৮২ রাণে অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের রাণ দাঁড়ায় ৪৩৬ (৯ উইকেটে)। ফলে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ২৯৭ রাণের থেকে ইংল্যাণ্ড ১৩৯ রাণে এগিয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডের বব উলমার সেঞ্চুরী (১৩৭ রাণ) করেন। তাঁর ১৩৭ রাণে ছিল ২২টা বাউণ্ডারী। এখানে উল্লেখ্য, তিনি লর্ডস মাঠের প্রথম টেস্টেও সেঞ্চুরী (১২০ রাণ) করেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই নিয়ে উলমার তিনটে সেঞ্চুরী করলেন—সবই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। টেস্টের এক ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ রাণ ১৪৯ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ওভাল, ১৯৭৫)।

আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের মূলে উলমারের অবদান যথেষ্ট ছিল। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী ছাড়া র‍্যাণ্ডেলের সহযোগিতায় ৩য় উইকেটের জুটিতে ১৪২ রাণ এবং টনি গ্রেগের সঙ্গে ৪র্থ উইকেটের জুটিতে মূল্যবান ১৬০ রাণ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। গ্রেগ তাঁর চার ঘন্টার খেলায় ৭৬ রাণে এগারটা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৪৩৭ রাণের মাথায় শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া ১৪০ রাণের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। মাত্র ২১৮ রাণের মাথায় তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার এই শোচনীয় ব্যর্থতার মূলে ছিল ডেরেক আণ্ডারউডের বোলিং। আণ্ডারউড ৬৬ রাণে ৬টা উইকেট নিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল দলকে পরাজয় থেকে রক্ষার জন্য একাই লড়ে সেঞ্চুরী (১১২ রাণ) করেন। তিনি দলের ২০২ রাণের মাথায় আউট হন। তাঁর ১১২ রাণে ছিল ১৫টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই নিয়ে গ্রেগ চ্যাপেল ১৪টা সেঞ্চুরী করলেন—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৬, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৪, নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২ এবং পাকিস্থানের বিপক্ষে ২। তিনি ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কোন টেস্ট ম্যাচ খেলেন নি।

ইংল্যাণ্ড খেলায় জয়লাভের জন্যে ৭৯ রাণ তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং কোন উইকেট না-খুইয়ে চতুর্থ দিনে ৮ রাণ সংগ্রহ করেছিল।

খেলার শেষ পঞ্চম দিনে ইংল্যাণ্ড ৯৫ মিনিট খেলে একটা উইকেট খুইয়ে ৮২ রাণ করে ৯ উইকেটে জয়ী হয়। ১ম উইকেটের জুটিতে মাইক বিয়ারলি (৪৪ রাণ) এবং ডেনিস অ্যামিস (নটআউট ২৮) দলের ৭৫ রাণ সংগ্রহ করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ২৯৭ রাণ (ওয়াল্টার্স ৮৮ এবং গ্রেগ চ্যাপেল ৪৪ রাণ। লেভার ৬০ রাণে ৩, মিলার ১৮ রাণে ২ এবং উইলিস ৪৫ রাণে ২ উইকেট)

ও ২১৮ রাণ (গ্রেগ চ্যাপেল ১১২ রাণ এবং ওকিফ ২৪ নটআউট। আণ্ডারউড ৬৬ রাণে ৬ এবং উইলিস ৪৬ রাণে ২ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ৪৩৭ রাণ (উলমার ১৩৭, র‍্যাণ্ডাল ৭৯ এবং টনি গ্রেগ ৭৬ রাণ। টমসন ৭৩ রাণে ৩, ওয়াকার ১৩১ রাণে ৩ এবং ব্রাইট ৬৯ রাণে ৩ উইকেট)

ও ৮২ রাণ (১ উইকেটে। অ্যামিস নটআউট ২৮ এবং বিয়ারলি ৪৪ রাণ)

বিশ্ব যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা

আফ্রিকার তিউনিসিয়াতে ও প্রথম বিশ্ব যুব ফুটবল প্রতিযে ফাইনালে রাশিয়া টাইভাঙ্গার প মেকসিকোকে ৯—৮ গোলে হারিয়ে কোলা ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ ব নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলায় দুই দুটো করে গোল দিলে খেলা ২—২ অমীমাংসিত থাকে। ফলে টাইভাঙ্গার সাহায্যে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। টাইভাঙ্গা পদ্ধতির দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে দুটো সিরিজে মোট ২০টা পেনাল্টি পর খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হ

প্রথম সিরিজের পেনাল্টি কিক রাশিয়া এবং মেকসিকো চারটে করে করে। দুই দলই একটা করে পেনাল্টি থেকে গোল দিতে পারেনি। ফলে ৪—৪ গোলে ড্র যায়। দ্বিতীয় সি পেনাল্টি কিকের ফলাফল একসময় ৪—৪ ছিল—দুই দলেরই চারটে গোল। দ্বিতীয় সিরিজের নবম পে কিকটা রাশিয়ার গোলকিপার আটকে এবং রাশিয়ার কাপলুন দ্বিতীয় সি শেষ দশম পেনাল্টি কিক থেকে জয় গোল দিয়ে স্বদেশকে জয়যুক্ত করেন।

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশ চারটে গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে প্রথায় খেলেছিল এবং মূলে প্রতিযো সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল প্রতি গ্রুপের লীগ চ্যাম্পি দল। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল—ইউরোপের দক্ষিণ আমেরিকার ৩, আফ্রিকার ৩, আমেরিকার ২ এবং এশিয়ার ২টি (ইরাণ এবং ইরাক)।

লীগ খেলার তালিকা

ষোলটি দেশ নিয়ে লীগ খে তালিকা এইভাবে তৈরী হয়েছিল :

এ গ্রুপ : মেকসিকো (চ্যাম্পিয়ান), তিউনিসিয়া এবং ফ্রান্স

বি গ্রুপ : উরুগুয়ে (চ্যাম্পিয়ান), হাঙ্গ মরক্কো এবং হন্ডুরাস

সি গ্রুপ : ব্রাজিল (চ্যাম্পিয়ান), ইতা ইরাণ এবং আইভরিকোস্ট

ডি গ্রুপ : রাশিয়া (চ্যাম্পিয়ান), প্যারাগু অস্ট্রিয়া এবং ইরাক

সেমি-ফাইনাল

সেমি-ফাইনালে চারটি দেশের মা ছিল দক্ষিণ আমেরিকার দুটি (ব্রেজিল এ উরুগুয়া), ইউরোপের একটি (রাশিয়া) এ উত্তর আমেরিকার একটি (মেকসিকো)।

সেমি-ফাইনাল খেলায় রাশি হারিয়েছিল উরুগুয়াকে এবং ব্রেজি হেরেছিল মেকসিকোর কাছে।

তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান নির্ধারণী খেলায় ব্রেজিল ৪—০ গোলে উরুগুয়াকে পরাজিত করে।

বর্ষার কলকাতায় বার্গম্যান

এবার বর্ষার কলকাতায় উদ্দীপনা জাগিয়েছে বৃষ্টির সঙ্গে আছে ইঙ্গমার বার্গম্যান। পুরোনো চারটি ছবি সব ফিল্ম [illegible] থেকে একে একে দেখানো হচ্ছে। ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ (১৯৫৭), সেভেনথ সীল (১৯৫৭), দি ভার্জিন স্প্রিং (১৯৬০) দি সাইলেন্স (১৯৬৩)।

বার্গম্যান কথা বলেন ক্যামেরায়, শব্দে বলা যায়, তার থেকে অনেক বেশি বলেন। সংলাপ ও সংলাপহীনতা, আলো-আঁধারি, কখনো কখনো টানা নৈঃশব্দ্য—তিনি ব্যবহার করেন কথা বলার জন্য। আশ্চর্য নিপুণ এক দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেন।

বৃদ্ধ, সঙ্গহীন, বিষণ্ণ প্রফেসর আইজাক বর্গ (ভিক্টর যাসএস্-স্বপ্নে ও [illegible]তে একটি ঘড়ি দেখেন যার সময়ের কাঁটাগুলি নেই। অতীত-বর্তমান বলে যে বস্তু হয় না, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অথচ সম্বন্ধ ধারাবাহিকতাই যে জীবন, সেই মুহূর্তগুলির স্মৃতিই যে জীবনকে অর্থবহ করে রাখে, প্রুস্তের এই বিশ্বাসকে বার্গম্যান কত সহজে বলে ফেলেন। ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ শুধু ছোট ছোট ফলের নাম নয়, আইজাকের এক একটি প্রিয় স্মৃতির নাম, যা স্ট্রবেরি ফলের মত ছোট কিন্তু মিষ্টি। অন্য পুরুষকে তার অনিচ্ছুক সংযোগ দিতে বাধ্য হলে, সারার (বিবি এন্ডারসন) প্রাণ কিভাবে কেঁদে ওঠে, আইজাক এখনো তা দেখতে পায়। মেরিয়ানও (ইনগ্রিড থুলিন) আসলে একা। তার স্বামী (গুনার জর্নস্ট্র্যান্ড) মেরিয়ানের গর্ভস্থ সন্তানকে চায় না। পৃথিবী কি একজন নতুন মানুষ আশা করে? করে না। দ্বিতীয় স্বপ্নদৃশ্যে আলমানের প্রশ্নে বিধ্বস্ত বর্গ একজন যুবতীকে মৃত বলে ডায়াগনোসিস করলে যুবতী প্রথমে মৃদু হেসে ওঠে, পরে ক্রমশঃ অট্টহাসিতে ভেঙে পড়তে থাকে। হাড় হিম হয়ে যায় আইজাকের। আমাদেরও। আলমান সাদা কাগজে কি লিখে রাখে—যাই ডার্ডকট্টু। লোনলিনেস?—বর্গের উদ্বিগ্ন প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর—প্রিসাইসলি।

ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজেই একমাত্র বার্গম্যান এতগুলি ফ্ল্যাশব্যাক ও স্বপ্নদৃশ্য রেখেছেন যার একটিও অসঙ্গত নয়, বরং ছবির সামঞ্জস্য আরো নিবিড় করেছে।

সেভেনথ সীলের সময়সীমা মধ্যযুগ। নাইট অ্যানটোনিয়াস ব্লক (ম্যাক্স ভন সাইডো) ক্রুসেড থেকে ফিরে এসেছে দশ দশ বছর পরে, সঙ্গে তার সহচর জন্স (গুনার জনস্ট্যান্ড)। দেশের কাছে এসে সমুদ্রতীরে ব্লক দেখেন অপেক্ষায় আছে পোশাকের চুলদাড়িহীন একজন নিষ্ঠুর পুরুষ, সে মৃত্যু (বেন্ট্ একরোট্)। গুনার ফিশারের ক্যামেরায় তাকে সত্যিই মূর্তিমান মৃত্যুর মত লাগে। অথচ ব্লক তার ঈশ্বর বিশ্বাসে অটল। মৃত্যুর কাছে পরাজয় অনিবার্য জেনেও ব্লক মৃত্যুকে দাবা খেলায় ডাকে। সমুদ্রতীরে শুরু হয় খেলা। ওদিকে গ্রামে কুমারী পোড়ানো, [illegible] অভিশাপ, নামী ছাত্র চোর হয়ে গেছে। সর্বত্র প্লেগ।

শুধু এক ভ্রাম্যমান অভিনেতা পরিবার,-জোসেফ ও মিয়া মিল্স্ পপ্ ও বিবি এন্ডারসন ছাড়া যাদের কল্পনা করা এখন সম্ভব নয়—অ্যান্টোনিয়াসকে দিয়েছিল দু-দণ্ড শান্তি। নিজের কাসেলে ফিরে এলে স্ত্রী তাকে অভিষেক জানাতে গিয়ে সাড়া পায় না, বলে—তুমি আর আগের মত নেই। জীবন তাকে ক্লান্ত ও রিক্ত করেছে। সে জেনেছে, মানুষের একমাত্র আশ্রয় ঈশ্বরও আসলে নীরব। তবু সে ছদ্ম ক্রোধে উল্টে দেয় দাবার ছক, বিলম্বিত করে অন্তিমকে, যোসেফ ও মিয়াকে কালো মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়। দুর্যোগের শেষে যোসেফ যখন, ব্লকের দলবলকে মৃত্যুর কালো দেশে চলে যাওয়ার ভিশনটি দেখছে—সেই দৃশ্যটি ভুলতে পারি না আমরা।

অজানাকে, আয়ত্ত—অতীতকে মানুষের বড় ভয়। সে বাঁচতে চায় আরো জানতে চায় ব্লক। এই জানতে চাওয়াই আসলে বেঁচে থাকা। জানার বাসনা অনন্ত বলে আমরা মৃত্যুকে পিছিয়ে দিতে চাই। অ্যান্টোনিয়াস ব্লকের সঙ্গে এভাবে, যে কোনো প্যাশনেট মানুষের কোনো তফাৎ থাকে না।

চতুর্দশ শতাব্দীর একটি লিজেন্ড থেকে দি ভার্জিন স্প্রিং-এর স্ক্রিপ্ট করেছেন উলা ইসাকসন। সেভেন নাইক্-ভিস্টের ক্যামেরায় নির্মমভাবে ধরা পড়েছে মধ্যযুগীয় জীবন। গান্ডিলা ইংগেরির (গুনেল লিন্ডব্লম) সদাক্ষিপ্ত, হিংসু চলাফেরা, তার রাগ, অতৃপ্ত, বার্গম্যানের হাতে এক নিষ্ঠুর বাস্তব চেহারা পেয়েছে।

নিষ্পাপ, কুসুমস্বভাবী কুমারী কারিন (ব্রার্গিটা পিটারসন) ভার্জিনস ক্যান্ডেল নিয়ে যাবে দূর চার্চে, যেতে হয়, কুমারী বসন্তের দিনে। কারিনের পিতা টোর (ম্যাকস ভন সাইডো), মা মারেটা (ব্রার্গিটা ভ্যালবার্গ)—সকলেই মনেপ্রাণে ধর্মভীরু, সদাচারী।

তিন মেষপালক কারিনের কুমারীত্ব লুণ্ঠন করে ও তার বহুমূল্য পোশাক খুলে নিয়ে তার পিতৃগৃহেই আশ্রয় সন্ধানে যায়। পায় আশ্রয়, আহার্য ও মৃত্যু। পোশাকগুলি দেখে সব বুঝতে পেরে টোর সূর্যোদয়ের সাজে সঙ্গে নৃশংসভাবে হত্যা করেন তাদের। হত্যার পরে বলে ওঠেন, ঈশ্বর আমাকে আমার কাজের জন্যে ক্ষমা করবেন। কারিনের মৃতদেহের কাছে সবাইকে নিয়ে যায় ইংগেরি—অরণ্যের আড়াল থেকে যে পুরো ধর্ষণ দৃশ্যটি প্রতিবাদ ক্ষমতাহীন শুধু দেখেছিল। তার আর্তনাদ, অক্ষমতা তাকে টেনে নেয় অনুতাপের দহনে; সে তার রাগ হিংসা ক্ষোভ ভুলে যায়। পিতা টোর দু-হাত আকাশে তুলে বলে ওঠেন—আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, হে ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান। মৃত কারিনকে কোলে নিয়ে টোর প্রতিশ্রুতি দেন, কারিনের নামে তিনি সেখানে নির্মাণ করবেন একটি চার্চ। কারিনের মুখ তখনো নিষ্পাপ, অভিযোগহীন, তার চারপাশে তখনো কুমারী বসন্ত। তার শরীর যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে ফুটে ওঠে ঝর্ণাধারা। ভার্জিন স্প্রিং।

বার্গম্যান অনুভব করেন ঈশ্বর মানুষের মন ও পরিবেশকে প্রভাবিত করে রাখেন। এই জীবন, এই বাতাস, এই আলো ঈশ্বরের ভালোবাসার দান। পৃথিবীর নিষ্ঠুর মেষ পালকেরা সত্য নয়; তারা ভুল, তারা নিশ্চিহ্ন হবে বার বার; তারা মানুষকে আরো বেশি ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবে শুধু।

নৈঃশব্দ্য ও সংলাপহীনতা মাঝে মাঝে কত বাঙ্ময় হয়ে হয়ে উঠতে পারে, সাইলেন্স ছবিতে নিপুণ সংযমের সঙ্গে বার্গম্যান তা প্রমাণ করেছেন।

পিতার মৃত্যুর পর পুরুষহীন ইস্টারের জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। অনুবাদের কাজ ছাড়া সে আঁকড়ে থাকতে চায় বোন অ্যানাকে, যার উপেক্ষা অসহ্য হয়ে উঠলে নিজেকে ঠেলে দেয় অবিরাম মদ্যপান ও ধ্বংসের দিকে। ইস্টারের এই নিজেকে নিঃশেষ করে ভালোবাসতে চাওয়ার চেষ্টাকে লেসবিয়ান বললে অপমান করা হবে। যুবতী অ্যানা যৌবনের উত্তাপ পেতে চায় অচেনা এক হোটেল-ওয়েটারের কাছে। বাধা দিতে এলে সে ঈশ্বরের ওপর ফেটে পড়ে—তুমি নিজেকে ও পৃথিবীকে ঘৃণা করো। তুমি আসলে বাঁচতেই জানো না। কেন বেঁচে আছো তুমি? আমার জন্য? আমার ছেলে জোহানের জন্যে? নাকি কোনো কিছুর জন্যেই নয়? ইস্টার তখনো জানাতে চায় সে অ্যানাকে ভালোবাসে। উপেক্ষায় অ্যানা তার অচেনা পুরুষটিকে ডেকে নেয় ইস্টারের সামনেই। পালিয়ে আসে ইস্টার। মৃত্যুপথ-যাত্রী ইস্টারকে ফেলে চলে যায় অ্যানা, জোহানকে নিয়ে। তার [illegible] স্বামীর কাছে।

সারা ছবিতে দাপিয়ে অভিনয় করেছেন গুনেল লিন্ডব্লম—অ্যানা। কিন্তু শেষ দিকে, একটি স্যাক্সোফোনের দৃশ্যে, ইনগ্রিড থুলিনের ইস্টার তাকে ছাড়িয়ে গেছে। কিশোর অর্গেন লিন্ডস্টমের জোহান, এক কথায়—অসাধারণ।

বার্গম্যানের আর কোনো ছবিতে এত গভীর ইঙ্গিতময়তা নেই। ভালোবাসার মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়ার আর্তি নেই। বার্গম্যান নিজেই অন্যত্র বলেছেন—লাভ ইজ দি বিগিনিং অফ ডেথ।'

সোমক দাস

হরিসাধন দাশগুপ্ত আর কতদিন নীরব থাকবেন ?

লন্ডনের দি টাইমস পত্রিকার ৫ আগস্ট ১৯৬৭র সংখ্যায় এডিনবরা চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হরিসাধন দাশগুপ্তের 'একই অঙ্গে এত রূপ' ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল—'....আরও কয়েক-জন তরুণ চিত্রপরিচালক রয়েছেন যাঁরা বাধ্য করেন তাঁদের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে। সত্যজিৎ রায়ের শস্যধার ফসল তাঁরা নন, কিংবা প্রকরণেও তাঁরা শ্রীরায়ের কাছে ঋণী নন....হরিসাধন দাশগুপ্ত আরেক ব্যক্তি যাঁর প্রয়োগশৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন-তর। বিশিষ্ট কিছু প্রামাণিক চিত্র তৈরির পর তিনি অতি সম্প্রতি কাহিনীচিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর 'একই অঙ্গে এত রূপ' সুসঙ্গতিপূর্ণ অনুভবশীল ছবি. এই ছবি আরও প্রশংসা ও দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী করে.......'

দুর্ভাগ্য হরিসাধনবাবুর, বিলেতে পাঠানো সেই সাব-টাইটেলযুক্ত প্রিন্টখানি এখনও ফেরত আসেনি তাঁর কাছে। অন্যান্য একাধিক উৎসবে আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও ছবিটিকে তিনি আর কোথাও পাঠাতে পারেন নি। কারণ আবার সাব-টাইটেল করার খরচ তখন তাঁর ছিল না।

টালিগঞ্জের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হবার সম্ভাবনা নিয়ে উল্কার মত হাজির হয়েছিলেন তিনি প্রায় বছর পঁচিশ আগে। 'একই অঙ্গে এত রূপ' তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। কিন্তু, শেষরক্ষা হলো না কেন ? প্রায় ছাই হতে বসেছেন, কে নজর দেবে তাঁর দিকে ?

আরভিং মিচেল-জাঁ রেনোঁয়ার কাছে শেখা ফিল্মের বিদ্যে নিয়ে ঝড়ের মত হরিসাধনবাবু এসেছিলেন ডকুমেন্টারী ছবি করতে। বার্মাশেলের হয়ে 'পাঁচ থুপি' ছবিটি এখনও কেউ ভুলতে পেরেছেন কি ? কিংবা টাটা স্টিলের জন্য তোলা দুটি ছবি?

ডকুমেন্টারী ছবিকে অন্য চরিত্র দিয়েছিলেন তিনি, শিল্পের পোশাক পরিয়েছিলেন তার গায়ে। আর আজ ? স্রষ্টাই আবরণহীন, প্রায় বেকার।

হয়তো বা এমনটি হতো না, যদি সেই প্রথমেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে 'ঘরে বাইরে' করার প্ল্যানটা মেটিরিয়ালাইজ করতো। হরিসাধনবাবু দুঃখ করে বললেন, 'আসলে ভাই আমি ফিচার ফিল্ম করার লোক। ডকুমেন্টারী করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেল সব।

আমাদের বিশ্বাস, তা হয়নি। বরং তিনি জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ হয়েছেন, বোধের গভীরে তিনি আত্মস্থ হচ্ছেন, আদর্শ আর মতবাদের ভিতটা শক্ত হয়েছে এখন। ভালো ছবি করার এইতো পক্ত সময়।

কিন্তু সময় এলেও অর্থ কই, সামর্থ্য কই।

প্রথম ছবির ধার শুধতে তাঁকে হুণ্ডি কেটে টাকা ধার করতে হোল—আর সেই টাকা শোধবার জন্য করতে হোল ডকুমেন্টারী ছবি। সুদে-আসলে দেনা তখন চতুর্গুণ।

পরের ছবি 'কমললতা'। সম্পূর্ণ নিজের মত করে তৈরি যদিও এ ছবি নয়. কিন্তু উত্তম-সুচিত্রা-শরৎচন্দ্র—এই তিন-জনের ওপর আস্থা রেখেই ছবিটি করে-ছিলেন। দুর্ভাগ্যের প্রকোপে এ ছবিও তাঁকে সম্মান দিল বটে, অর্থ দিল না।

সুতরাং আবার হরিসাধনবাবুকে ফিরে আসতে হোল জীবনের প্রয়োজনে ডকু-মেন্টারীর দরজায়। 'কমললতা'র অসাফল্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা—'তখন সারা পশ্চিম-বাংলায় সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলন চলছিল। ভালো হাউস না পেয়ে ছবিটা রিলিজ হোল রূপালী আর জেম-এ। বোঝো অবস্থাটা। উত্তম-সুচিত্রাও ছবি বাঁচাতে পারলেন না।'

ভবিষ্যতের অনেক আশায় তিনি বুক বেঁধেছিলেন, কিন্তু সব হলো নিষ্

হরিসাধন দাশগুপ্তের ক্ষমতা, কব্জির জোর সম্পর্কে সন্দেহ নেই কা কিন্তু এখন শারীরিক ও মানসিক বিধ্বস্ত তিনি। নিজেই বললেন—'ড মেন্টারীও নিজের মনের মত করে ক পারছি না। মনটাও ভেঙ্গে যাচ্ছে ধ ধীরে।'

কিছুদিন আগে নাকি এফ সি-র কাছে ঋণ চেয়েছিলে সেই ঋণ মঞ্জুর হলেও তাঁর চিত্রনা নাকি 'মরবিড' অজুহাতে এফ এফ সি সিনারিও কমিটি বাতিল করেছেন। ন গল্প দিতে বলা হয়েছে তাঁকে। দে কিনা জিজ্ঞেস করতে বললেন—ভা কিছু।

তবে তিনি এটা ভাবছেন যে, র সরকার যদি ঋণ দেন তাহলে আর এফ সি-র কাছে হাত পাতবেন না। কলকা বসে কলকাতার পয়সাতেই ছবি করবে ডকুমেন্টারী ছবি করার জন্য 'ইঁদুর দৌ আর তিনি নামবেন না।

কিন্তু সেই 'গোডোটে'র অপেক্ষ আর কতদিন বসে থাকতে হবে তাঁরে ঈশ্বরবাবু—অর্থ কবে আসবে তাঁর কাছে অপেক্ষায় অপেক্ষায় শীর্ণ জীর্ণ হলে আর প্রয়োজন?

নির্মল

আলাপ ও লয়পত

হিন্দী ছবির জগতে হৃষী মুখার্জীর একটি আলাদা অবস্থান আছে তিনি চলচ্চিত্রস্রষ্টা নন হয়তো, কি ঈষৎ রুচিসম্পন্ন পরিচালক। সাধারণ বোম্বাই চিত্রজগতের যা নিয়ম, অথ সংগীত পরিচালক গান ঠিক করবে অভিনেতা অভিনয় করবেন, আলোকচি ক্যামেরা চালাবেন এবং পরিচালক শ জুড়বেন অথবা কাটবেন, হৃষীবাবু সেখা একটু অনিয়শ্চ। তাঁর ... অন্ততঃ কি নিয়ন্ত্রণ আছে, ফলে একটি সুরুচিসহভা উপভোগ্য বাণিজ্যিক ছবি আশা করা যায় আলাপ বহুলাংশে সে আশা পূর্ণও করে

বহুলাংশে কিন্তু, সর্বাংশে ন কেননা ঠিক বোঝা গেল না শ্রীমুখোপাধ্যায়ে প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। পিতা (ওম প্রকাশ এবং পুত্র (অমিতাভ বচ্চন) যে বিরো রচনা করে তা কেন ? অনেকে হয়ত বলবে দুটি প্রজন্মের তফাৎ অথবা দুই যুগের দু মূল্য বোধের। এই দাবি টিকলে ভাবে হত। টেকে না। আলাপ-এর স্বন্দ্ব শুধু ধনী, উদ্ধত ও গোঁয়ার বাবার সঙ্গে সংগীত প্রেমিক ছেলের স্বন্দ্ব। এমনকি দু মেজাজের তফাৎও ঠিক পরিচ্ছন্ন নয় যেহেতু বিবাহ-উত্তর জীবনে অমিতাভ যতখানি টাকাওয়ালা ততখানি শিল্পী নয়।

তবে পরিচালক দর্শকদের মানসিকতা সঙ্গে দীর্ঘদিন পরিচিত। সেজন্য নায়কে স্বচ্ছন্দসাধন ও নানা উক্তি হয়ত দর্শকদের আবেগে স্যাৎসেতে করে। শরৎচন্দ্রই যে ভদ

...র্সের প্রথম ও শেষ সম্বল এটা হৃষীকেশ ...র্জীর চাইতে আর ভালো বুঝবে। ...তরাং আলাপ চলছে। অনেকদিন চলবেও। ...নার সুযোগ পেলেই হল। কেউ তো ...র আসমুদ্র হিমাচলে প্রশ্ন করছে না ...গীত সাধনার সঙ্গে টাঙ্গা চালানোর সম্পর্ক ...থায় ? অহংকারী বাবাকে যোগ্য জবাব ...ওয়ার জন্য টাঙ্গাওয়ালার বোন (রেখা)কে ...য়ে করতে হবে কেন ?

সংগীত শিক্ষয়িত্রী প্রবীণা সরসুবাঈ ...র ভূমিকায় ছায়াদেবীর অভিনয়ে মাত্রজ্ঞান ...াছে। তাঁর অভিজাত গুণগ্রাহীর ভূমিকা ...নয়েছেন সঞ্জীবকুমার। কেন্দ্রীয় চরিত্রে ...মিতাভ দর্শকদের সহানুভূতি পান।

ছবির সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগে সংহত ...া হলেও সংগীত প্রয়োগ বেশ ভালো।

মোটকথা, হৃষীকেশ মুখার্জীর এই ...বি অ্যাভারেজ দেশজ বাণিজ্যের চাইতে ...উঁচুদরের একথা মেনে নেওয়ার পর ...স্বচ্ছন্দে বলা যায় হৃষীবাবুর অ্যাভারেজ ...বির চাইতে আলাপ খারাপ ছবি।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

আলজিরিয় ছবির উৎসব

সরকারী ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত উৎসবে মোট সাতটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এবং সাতটি তথ্য-চিত্র দেখানো হয়। 'সাউথ উইণ্ড' এবং কিছু অংশে 'প্যান আফ্রিকান ফেস্টিভেল' ছাড়া বাকি সব কটি ছবিরই বিষয়বস্তু বিপ্লব ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। তার মধ্যে 'ওপিয়াম এ্যাণ্ড দি ব্যাটন' এবং 'দি স্প্যারো' নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ছবি।

'ওপিয়াম এ্যাণ্ড দি বেটন'-এর পটভূমি যুদ্ধকালীন আলজিরিয়ার একটি গ্রাম। যুদ্ধের চাপে পড়ে একটি গ্রামে কি করে বিপ্লবের সূচনা হোলো এ ছবিতে তারই দুঃসাহসিক দিকটা দেখানো হয়েছে। ছবির চিত্রনাট্য, অভিনয় ও ক্যামেরার কাজ অসাধারণ। ছবিটি রঙীন. পরিচালক এম মাম্মেরী ও এ রসেদী।

'দি স্প্যারো'র ঘটনাকাল ১৯৬৭ সাল। ৯ জুন নাসেরের একটি উক্তির প্রতিবাদে বিহারা নামক একজন সাধারণ নারী তীব্র আক্রোশে রাস্তায় নেমে যে জনমত গড়ে তুলেছিল, ছবির শেষাংশে তাই দেখানো হয়েছে।

'নউয়া' ছবিতে ১৩০ বছরের কলোনিয়া-লিজম-এর চাপে পড়ে কিভাবে গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা শোষকের শিকার হয়েছে. তারই বাঁধ ভাঙ্গার ইঙ্গিত রয়েছে। এ ছবির পরি-[illegible]

পরিচয় ছবিতে রমা গুহঠাকুরতা

'ক্রনিকল অফ দি ইয়ার্স'-এর কাহিনীর সময়কাল ১৯৩৯ সালের প্রারম্ভ কাল থেকে ১৯৫৪ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত। এই ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে ১৯৫৪ সালের ১লা নভেম্বর কি ঘটনাবলী পেরিয়ে এসে প্রথম আলজিরিয়ায় বিপ্লবের পটভূমি তৈরি হোলো।

'দি ডন অফ দি কনডেমড্'-এ আফ্রিকার সত্যিকারের মানসিকতা ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতার জন্য আফ্রিকানদের সংগ্রাম এ ছবির উপজীব্য। এ রাসেদ পরিচালিত এই ছবিটি ১৯৬৫ সালে লাইপজেগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব পীস পুরস্কারে ভূষিত হয়।

'প্যান আফ্রিকন ফেস্টিভেল' আপাতে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান সাংস্কৃতিক মিলন উৎসবের ছবি হলেও এর মধ্যে একটা মহৎ বক্তব্য রয়ে গেছে।

মহম্মদ স্লিম রিয়াদ পরিচালিত 'সাউথ উইণ্ড' সংস্কার ভাঙ্গার ছবি। শিক্ষার সংগে রুচির কি ভাবে পরিবর্তন হয়. একটি গ্রাম ও তার এক স্বচ্ছল পরিবারকে ঘিরে তাই দেখানো হয়েছে। সুন্দর ছবি।

সব কটি ছবি মিলিয়ে আমাকে যে ব্যাপারগুলি সর্বাধিক অবাক করেছে তা হল আলজিরিয়ার ছবিতে স্পষ্ট স্বাজাত্য বোধ, কোন পবিত্র কাজ করার ক্ষেত্রে সংস্কারে বিশ্বাস (ভেড়া কোরবানী ও মেয়েদের উলু দিয়ে একান্ত হয়ে বিপ্লবের ডাক দ্রষ্টব্য) এবং অতীতের ভয়াবহ দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আর একটি বিস্ময় আলজিরিয়ার চলচ্চিত্র শিল্প খুব বেশীদিনের নয়, তা সত্ত্বেও কি অসাধারণ তাঁদের নিষ্ঠা ও যোগ্যতা। এখানে যেন কেউ অভিনয় করেন নি এবং ক্যামেরা কথা বলেছে। সেই সংগে সর্বত্র স্বদেশী সঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতের প্রয়াস।

তবু একটা কথা. এই উৎসবের কোন ছবিই তাঁদের 'ওয়াজস অফ ক্রেক'কে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি।

বনবাসর ছবিতে সন্তু, মহুয়া

এ নাটকের একটা বড় দুটি ছোটগল্পকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে গিয়ে শ্লথগতি করে তোলা। সময় আর একটু কম নিলে নাটক বোধহয় দানা বাঁধত। দুই. ভাই ফোঁটা তিনবার দেওয়া হয়, ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করা হয় এবং ফোঁটা দিয়ে যমের দুয়ারে কাঁটা দেবার কথাটা মন্ত্রের মত উচ্চারণ করতে হয়।

নাট্য যোজনার ক্ষেত্রে গন্ধর্বর পুরনো ঐতিহ্য আছে। নির্দেশক দেবকুমার ভট্টাচার্য্যর সাহস আছে বলেই একথা বলা।

শান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জি

বদনাম

শোনা যায় বিপ্লবী আন্দোলন অর্থাৎ সেকালের সশস্ত্র বিপ্লব ও সেই আদর্শে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের নিয়ে স্পষ্ট করে সমর্থনসূচক তেমন কিছু লেখেন নি, এমন একটা সখেদ অনুযোগের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'বদনাথ' নামক আসাধরণ ছোট গল্পটি লেখেন। গল্পের কেন্দ্র চরিত্র সৌদামিনী ও তার স্বামীর দেশাত্মবোধ দু ভাবে গল্পে দেখানো হয়েছে।

গল্পে একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। পুলিশ অফিসার বিপ্লবী অনিলের খোঁজে যখন চারদিক তোলপাড় করছে, অনিল তখন তারই ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে সৌদামিনী নামক দিদিটির কাছে। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ একটি আলাদা কথাও বলতে চেয়েছেন। যেটা আইনকে ব্যঙ্গ হতে পারে, ভারতীয় নারীর সেই শ্বাসত মাতৃত্ব ও মমত্ববোধের প্রকাশও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে সেটা ফল্গু ধারার মত এবং অনিলের প্রতি সৌদামিনীর মমত্ববোধ গোটা গল্পে ছড়িয়ে থাকলেও এবং স্বামী সেটা জানলেও তার মাঝে একটা আড়াল দেয়া ছিল, যেটা শেষ দৃশ্যে প্রকাশ হয়। গন্ধর্বর 'বদনাম' নাটকে (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত) কিন্তু সেই সাসপেন্স অনুপস্থিত।

তব, এমন একটি সহজ সরল সুস্থ চিন্তার নাটক উপহার দেবার জন্য গন্ধর্বকে ধন্যবাদ।

স্বাভাবিক নিয়মে রবীন্দ্রনাথের গল্পের যে নাট্যরূপ দেখে আমরা অভ্যস্ত, সেই নিয়মের আগল ভাঙার একটা সক্রিয় প্রবণতা এ নাটকে দেখা যায়। তাই নিয়ে কিছু সমালোচনাও রবীন্দ্র অনুসারী দর্শকদের মুখে শোনা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সেই পুরনো রীতিতেই ব্যবহার করা হবে এমন কোন নিয়ম বা নির্দেশ আছে কি?

তবে গন্ধর্ব তাঁদের 'বদনাম' নাটকটির পরিবেশনে যে রীতি অর্থাৎ যে সিরিও কমিক ভঙ্গীটির আশ্রয় নিয়েছেন তাতেও আমার কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাস্য আছে। এর মাধ্যমে তাঁরা কি বলতে চেয়েছেন? হালকা চালে গল্প বলা এক এবং গভীর বক্তব্য ও অনুভূতিসম্পন্ন গল্পকে রমণীয় করার প্রচেষ্টা আর এক।

বদনামে সৌদামিনী আগাগোড়াই সেই চিরায়ত স্নেহপ্রবণ নারী। কিন্তু তার স্বামী পুলিশ অফিসার মঞ্চে সর্বক্ষণই হালকা কমিক চরিত্র। এক হতে পারে রবীন্দ্রনাথ সেকালের পুলিশী চরিত্রকে ব্যঙ্গ করেছেন দ্বিতীয়ত এটা তার বহিরঙ্গের খোলস। কিন্তু দোর্দণ্ড ব্রিটিশ এমন চরিত্র পুষতেন বলে সন্দেহ হয়।

তাই পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় মুকুর ভট্টাচার্য অভিনয়ে আন্তরিক হয়েও অতিরিক্ত তারল্যের জন্য দৃষ্টিকটু।

সেদিক থেকে কল্পনা মুখার্জির সৌদামিনী অনেক আন্তরিক ও বিশ্বাস্য।

জগন্নাথ হালদারের বিপ্লবীও আন্তরিক। কিন্তু বিপ্লবীর সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা তার মধ্যে অনুপস্থিত। তাছাড়া 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর মত বহুরূপে তার আবির্ভাবের ব্যাপারটাও মনে দাগ কাটে না।

দিলীপ ব্যানার্জি ও সুধাংশু মৈত্রের অভিনয় মোটামুটি।

নিতাই ও ছেদিলাল এ নাটকের দুটি টাইপ চরিত্র। মিনু চৌধুরী ও শিবাজী সেন তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

পৃথ্বিশ গাঙ্গুলীর মঞ্চ পরিকল্পনা চমৎকার। আলোর কাজ মোটামুটি।

রজনী

গোড়াতেই বলে দেওয়া হয়েছিলো সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে 'রজনী'। অভিনয় করলেন 'লাইফ থিয়েটার গ্রুপ' গত ১৫ জুন মুক্ত অঙ্গন রঙ্গমঞ্চে। শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘোষণার বড় বড় বিশেষণের মতই বজ্রগম্ভীর সংলাপ লাফিয়ে পড়ল। 'হৃদয়বিদারক', 'মর্মস্পর্শী' ইত্যাদি শুনতে শুনতে ক্রমশই জবুথবু হয়ে যাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত হতামও যদি না জাগিয়ে রাখবার মত কিছু পরিণত, বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় আর অনাড়ম্বর অথচ সহজ মঞ্চবিন্যাস থাকত সারাক্ষণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীকে নাট্যরূপায়িত করার আগে নাটকের ভাষা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত ছিল। প্রথমত বঙ্কিম নিজে রজনীকে নাটক হিসাবে লেখেননি, দ্বিতীয়ত, সেই যুগেও কথ্য সংলাপে বঙ্কিমের লিখিত ভাষা স্বাভাবিক ছিল না। তাছাড়া বর্তমান নাট্যকার (দেবব্রত বসু) রজনীকে যথেষ্ট সমসাময়িক করতেই তো চেষ্টা করেছেন। এ-নাটকের রজনী মনে মনে মনুমেণ্টকে বিয়ে করে এমনকি টালার ট্যাংককেও বিয়ে করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। এ-সবের পাশাপাশি ধ্রুপদী উপন্যাসের ভাষাকে সংলাপ বানিয়ে নাটকের স্বাভাবিক গতিকে প্রচণ্ড ব্যাহত করা হয়েছে। নয়তো নাট্যরূপ ভালোই ছিল। মঞ্চ পরিকল্পনায় বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করায় এক সেটেই সব কুলিয়ে গেছে, উপরন্তু নদীতীর বা রজনীর বাসাকে সংকেতময় করা গেছে। তাছাড়া এর ফলে দৃশ্য বদলাতে সময়ও লেগেছে খুব কম।

সেদিনের নাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিলো অভিনয়। ভারী ভারী সংলাপের বোঝা নিয়েও সাবলীল অভিনয় করে গেছেন গৌতম বসু (রামসদয়), ঝুলন করচৌধুরী (মাঝি), অজিত মিত্র (রাজচন্দ্র), ইতি চক্রবর্তী (লবঙ্গলতা) এবং বুলবুল চৌধুরী (রজনী)। ভৃত্যের ভূমিকায় অমল মান্না খুবই স্বাভাবিক। পরিচালক দেবব্রত বসুর হীরালাল চরিত্র বড় বেশি ম্যানারিজমদুষ্ট, তবে নিপুণ। অমরনাথের ভূমিকায় রমেন চক্রবর্তী নিজেকে চেষ্টাকৃত ভিলেন বানিয়েছেন

ঢ়ানো এবং বাচনভঙ্গীতে, এ-নাটকে ন দরকার ছিলো না। রামসদয়ের য় গৌতম বসুকে ভালো মানায়নি চলাফেরা ও বাচনভঙ্গীতে সেটা তিনি নিয়েছেন। তবে সুন্দর কন্ঠস্বরের তাকে ছাড়তে হবে এ-চরিত্র অভিনয় হলে। অজিত মিত্র ও ইতি চক্র- ও যথেষ্ট প্রাণবন্ত। তবে প্রধান চরিত্র র অন্ধতত্ত্বকে বুলবুল চৌধুরী পুরো- বিশ্বাস্য করে তুলেছেন। তাঁর য়ে সারল্য ও অধ্যবসায় দুয়েরই তবে নৈপুণ্য বা ধার কিছুটা কম , যার জন্য দীপঙ্কর দের (শচীন্দ্র), ট অভিনয়ও বহুলাংশে দায়ী।

বঙ্কিমের প্রিয় সন্ন্যাসী এপিসোড গিয়ে নাটকের ভালোই হয়েছে। আরো া হত অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত র অথচ অবান্তর সঙ্গীত অংশ বাদ । ভালো কথা, এ-নাটকের মঞ্চ- াপক রজনীর বাসার ঠাকুরের পটকে ক্ষণ উল্টো করে বসিয়ে রেখেছিলেন ?

সুরজিৎ ঘোষ

ময়না ছবিতে রণজিৎ মল্লিক/সুমিত্রা মুখার্জি

...প্লে ব্যাকে মৃণাল চক্রবর্তী ...প্রা বসুর ডুয়েট

িলকিলিকে লাউডগা সাপের মত র চারধারে ইলেকট্রিকের তার ছড়ানো। পেরিয়ে সুটিং জোনের কাছে একটু নেই যেতে হয়, নইলে কোন সাপের ক পা জড়িয়ে হুড়মুড় করে কয়েক কিলো ভাঙতে হবে ঠিক নেই।

...কেসের খেলা পার হয়ে আলোর এসে দেখি সন্তু মুখার্জি গেরুয়া বি পরে বসে আছে একটি তক্তপোশে। গানের মাস্টারের চেহারা। সামনে একটি ারী ঝরনা রয়েছে। ঝরনার খিল খিল আর চঞ্চল চাউনিতে উচ্ছলতার স। সন্তু কিছুটা গম্ভীর হয়ে মাস্টার- মাস্টারমশাই ভাবটা আনার চেষ্টা । আসছে না কিছুতেই। পুকুরফাটা গরমে সকলের সারা গায়ে তখন জ্বলন। এয়ার সার্কুলেটারের হাওয়া গায়ে লাগছে না যেন।

ক্যামেরাম্যান বিজয় দে তক্তপোশের সমান্তরালে প্রায় বিশ ফুটের একটা ট্রলি লাইন বসিয়েছেন। ক্যামেরা এখন সেই ট্রলির ওপর। কপালের ঘাম মাটিতে ফেলে পরি- চালক সুখেন দাস থাঁটি নাটক করার মত ভঙ্গিতে সন্তু আর সেই খিলখিল ঝরনাকে বোঝাচ্ছেন ক্যামেরা কখন কোথায় থাকবে আর ওদের পজিশনইবা কখন কিরকম দরকার।

বোঝানোর পালা শেষ। এবার শুরু হবে অভিনয়।

টেক শট নয়,—তাই সহকারী তপন ভট্টাচার্য আগেভাগেই ক্ল্যাপস্টিক দিয়ে রাখ- লেন। দেখলাম কালো কাঠটায় লেখা রয়েছে 'মান-অভিমান'—শট এত—টেক এত।

প্লেব্যাকে মৃণাল চক্রবর্তী আর শিপ্রা বসুর ডুয়েট গানটি শুরু হোল। 'স্টার্ট ক্যামেরা' বলতেই সন্তু আর সেই খিল খিল ঝরনা শুরু করলো গান। গান বলি কেন, মৃদু স্বরে গানের কথাগুলো সুরে সুরে মিলিয়ে উচ্চারণ। বিজয়বাবুর ক্যামেরাও ট্রলি করতে শুরু করেছে। বাঁ থেকে কখন যে ডাইনে চলে এসেছে খেয়াল করিনি।

'কাট।'

সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সন্তু বললো 'পা-টায় আমার ঝিনঝিন ধরে গেলো যে!'

খিলখিল ঝরনা দ্রুতগতিতে বয়ে এলো আমার কাছে। 'চামেলী মেমসাহেব'এর সুটিংয়ে গিয়েছিলেন না আপনি!' বিস্মিত আমি।

ওঁর পরের কথা—'আমার নাম সংহিতা ব্যানার্জি।'

বয়স অল্প। তাই ঝরনা এখনও উচ্ছল। ওদিকে সন্তুর পা-এর ঝিনঝিনানি থামতে তক্তপোশ থেকে নামলো সে। স্বভাবের ব্যতি- ক্রম না ঘটিয়ে তরতর করে এগিয়ে এলো সুটিং জোনের বাইরে। এয়ার সার্কুলেটরের সামনে মুখ রেখে দাঁড়াল। চুলগুলো এলো- মেলো হয়ে যাচ্ছে, উড়ছে। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। মান-অভিমান থেকে প্রতিমা থেকে তারা তিনজন থেকে আরও এগিয়ে চলেছেন সন্তু। সন্তু টালিগঞ্জ পাড়ায় এমনি তর তর করেই এগুচ্ছেন। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

মান-অভিমান :: সন্তু মুখার্জি ও সংহিতা ব্যানার্জি

অমিতাভ দাশগুপ্ত পরিচালিত 'আবি- র্ভাব' ছবিটি এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়। সাগর সেন সুরারোপিত এ ছবিতে আছেন তরুণ- কুমার, শমিতা বিশ্বাস, রবি ঘোষ, বিকাশ রায়, অতীন ভট্টাচার্য, শ্যামল রায়চৌধুরী প্রভৃতি।

বিচিত্রা

পৃথিবীর ষষ্ঠ মহাদেশ

আয়তন ১৯ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার (ভারতের আয়তন প্রায় ৩৩ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার)। গোটা এলাকা পুরু বরফে ঢাকা, কোথাও কোথাও চার কিলো-মিটার পুরু। তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে (সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ) উপকূলভাগে ০ ডিগ্রীর কাছাকাছি, ভিতরে মাইনাস ২০ ডিগ্রী (যে তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হয়, অর্থাৎ হিমাঙ্ক, তার চেয়েও ২০ ডিগ্রী নিচে) থেকে মাইনাস ৩৫ ডিগ্রী, শীতকালে (মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর) উপ-কূলভাগে মাইনাস ২০ ডিগ্রী থেকে মাইনাস ৩০ ডিগ্রী, ভিতরে মাইনাস ৪০ ডিগ্রী থেকে মাইনাস ৭০ ডিগ্রী। কোনো কোনো এলাকায় ছ-মাস ধরে একটানা দিন, ছ-মাস ধরে একটানা রাত্রি। এই হচ্ছে পৃথিবীর ষষ্ঠ মহাদেশ কুমেরু। গোটা এলাকায় জনবসতি বলতে কিছু নেই। আছে শুধু ৪০টি গবেষণা স্টেশন আর কয়েকশো বিজ্ঞানী। আর আছে পেঙ্গুইন, মানুষের মতো ভঙ্গিতে যাদের চলাফেরা। বিজ্ঞানীরা কোনো এক-দেশের নন। তাঁরা এসেছেন পৃথিবীর ১২টি দেশ থেকে—সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, চিলি, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, বেলজিয়াম, নরওয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

গবেষণামূলক কাজ শুরু হয়েছিল আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষে, ১৯৫৭ সালে (আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষের কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে ১নং স্পুৎনিক সে-বছর আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল)। তারপরে বিজ্ঞানীরা নিজেরাই অনুভব করলেন আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষের কর্মসূচী ১৯৫৮ সালে বন্ধ করা চলে না, ১৯৫৮ সালের পরেও চালিয়ে যাওয়া উচিত। তাঁরা আরো অনুভব করলেন, এই মহাদেশে কোনো দেশের পক্ষ থেকে কোনো এলাকা দাবি করা চলবে না। তাতে বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম ব্যাহত হবার আশঙ্কা। তারপরে ১৯৫৯ সালে বারোটি দেশের বিজ্ঞানীরা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে বলা হয় যে এই মহাদেশ কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হবে এবং যে-কোনো দেশের বিজ্ঞানী এসে এখানে অবাধে কাজ করতে পারবেন। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত চুক্তি বলবৎ থাকবে। চুক্তি অনুসারে গোটা এলাকায় পারমাণবিক পরীক্ষাকার্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কুমেরু আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮২১ সালে, একজন রুশ অভিযাত্রীর কৃতিত্বে। তবে আন্টার্কটিকা (কুমেরু) নামটি দিয়েছিলেন আমেরিকান অভি-যাত্রী চার্লস উইলকিস, ১৮৩৮ সালে। পরবর্তীকালে বিখ্যাত সব অভিযাত্রী কুমেরুতে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিজ্ঞানীরাও। এই বিজ্ঞানীরাই দক্ষিণ ভূ-মেরু ও দক্ষিণ চৌম্বক মেরুর হদিশ বার করেন এবং জানান যে এই দুই মেরুর অবস্থান দুই বিভিন্ন স্থানে।

এই কুমেরুতেই সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে অতীতের কোনো এক সময়ে, আজ থেকে প্রায় ৪৪ কোটি বছর আগে, দক্ষিণের কয়েকটি মহাদেশ—এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও কুমেরু—সংযুক্ত ছিল। সেই অখণ্ড ভূখণ্ডের নাম দেওয়া হয়েছে গোন্ডয়ানাল্যান্ড। এত ভাঙচুরের পরে আজও দেখা যায় আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলকে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলের সঙ্গে জোড়া লাগানো চলে, এমনকি দক্ষিণ-আফ্রিকা ভারত ও অস্ট্রেলিয়াকে কুমেরুর সঙ্গে। এক-কালের অখণ্ডতার সবচেয়ে বড়ো সাক্ষ্য কুমেরু থেকে পাওয়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর ফসিল। এইসব ফসিলের সঙ্গে অন্যান্য মহাদেশের ট্রপিক এলাকা থেকে পাওয়া ফসিলের আশ্চর্য মিল। তেমনি মিল শিলার ধরনেও। এককালে অখণ্ড না থাকলে এমনটি কিছুতেই হতে পারে না।
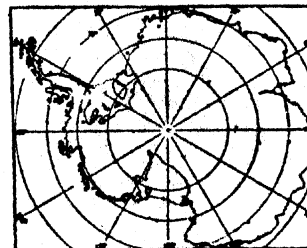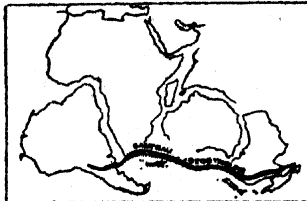
বিজ্ঞানীদের ধারণা, গোন্ডয়ানা-ল্যান্ডের সঞ্চরণ শুরু হয়েছিল ৪০ কোটি বছর আগে, ভাঙন শুরু হয়েছিল ৭ কোটি বছর আগে। তারপর থেকেই পৃথক পৃথক মহাদেশ—অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা ও কুমেরু। সম্ভবত আড়াই কোটি বছর আগে কুমেরু বর্তমান অবস্থানে সরে আসে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর অতীত আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে হলে, বর্তমান আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা করতে হলে, ভবিষ্যৎ আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বাভাস পেতে হলে কুমেরুর বরফে গভীর অনুসন্ধান চালানো দরকার। বাড়তি লাভ হিসেবে খনিজ সম্পদ, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও তৈলসম্পদ অবশ্যই মিলতে পারে।

মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে পৃথিবীর উত্তর মেরুতে রয়েছে সমুদ্র—উত্তর মহাসাগর। সেখানে মেরুর সবচেয়ে কাছের ভূখণ্ড হচ্ছে গ্রীনল্যান্ড। কিন্তু দক্ষিণ মেরুতে অনেকখানি এলাকা জুড়ে রয়েছে বরফে ঢাকা ভূখণ্ড, তাকে ঘিরে দক্ষিণ মহাসাগর। ভূপৃষ্ঠে যতো বরফ আছে তার ১০ শতাংশ রয়েছে গ্রীনল্যান্ডে ও কুমেরুতে। কুমেরুতে বরফ হয়ে আবদ্ধ আছে পৃথিবীর মোট টাটকা জলের ১৫ শতাংশ।

কুমেরু কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, কোনো দেশের উপনিবেশও নয়। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক কাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রভূমি। পৃথিবীর অন্য অংশে যখন স্থানীয় যুদ্ধ চলে তখনো এই কুমেরুতেই বিজ্ঞানীরা অবাধে যাতায়াত করেন, অবাধে মত-বিনিময় করেন ও পরস্পরের দিকে আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

কুমেরুর বায়ুমণ্ডল এখনো পর্যন্ত নিষ্কলুষ। পৃথিবীর অন্যত্র বায়ুমণ্ডল কতটা দূষিত হয়েছে তার একটা মাপ পাওয়া যেতে পারে কুমেরুর বায়ু-মণ্ডলকে নিরিখ হিসেবে ধরলে।

তবে আমেরিকান পর্যটকরা নাকি কুমেরুতেও আসতে শুরু করেছেন। খরচ হাজার তিনেক ডলার। আমেরিকান পর্যটকদের কাছে কিছুই নয়। কিন্তু তারপরে কুমেরুর বায়ুমণ্ডল কতদিন নিষ্কলুষ থাকবে বলা শক্ত।

অমল দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের গান মানেই বর্ষার গান

১৯৬২'র আগে অব্দি 'মালঞ্চ' জামশেদপুর জয় করেই সন্তুষ্ট ছিল। ১৯৬৪ থেকে '৬৭ অব্দি কলকাতা ও কলকাতার বাইরে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান করে তারা রসিকজনের মনোহরণ করে।

গত ১০ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রবীন্দ্র সদনে 'মালঞ্চ' রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ও রবীন্দ্রনাথের 'শ্রাবণগাথা' নিবেদন করেন।

শোভন ও সুষ্ঠ এই নিবেদনে সুপর্ণা চৌধুরী ও জয়শ্রী রায়ের গান সম্পর্কে স্তব্ধ করে রেখেছিল। শ্রীমতী চৌধুরীর 'আমার একটি কথা বাঁশি জানে' এবং শ্রীমতী রায়ের 'কেন জাগে না জাগে না'—গান দুটি গায়কীর গুণে সবাইকে একাগ্র করে তুলেছিল। জয়শ্রী রায়ের গলা চড়ায় কী সুন্দর খেলে।

চব্বিশখানি গান আর তার সঙ্গে সমতালে নাচ—প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে রাজা, নটরাজ ও সভাকবির সংলাপ মিশিয়ে যে বিপুল কান্ডের নাম 'শ্রাবণ গাথা' মঞ্চে তা কখনই ঢিলে ঢালা হয়ে পড়েনি। বরং বলা যায়—এত সুন্দর গানের গঙ্গা, ছয় উইংসের গভীর মঞ্চ কী করে ভরাট করে রেখে-ছিল—তা ভাববার বিষয়।

সমগ্র নির্দেশনায় ছিলেন অজিত রায়। তিনিই আবার নটরাজ। বসার ভঙ্গিতে মঞ্চ দখলের দাপট পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। 'রাজা' হিসেবে পার্থ ঘোষের কণ্ঠ ছিল রাজকীয়। ভাস্কর বসু আধুনিক কবির প্রতিনিধি হিসাবে পরিষ্কার গলায় কথা বলেছেন। শুধু একবার 'পানীয়'কে পনীয় বলে ফেলেছেন। সঙ্গীতে ও নৃত্যে জয়শ্রী রায় ও সুনীত বসুর পরিচালন প্রয়াস কোথাও প্রকট হয়ে পড়েনি। নির্মল ভট্টাচার্যের মঞ্চ রীতিমত গভীর। রাজার পেছনে চালি, নটরাজের পাশে কুহেলী আর শ্রাবণ বোমাতে তিন পাপড়ি মেঘ রীতিমত প্রশংসনীয়। নাচের দলের সাজসজ্জা শ্রাবণের গাম্ভীর্য ও ঝিলিকের সঙ্গে মিশে গেছে।

শ্রাবণ পূর্ণিমার লুকোচুরি মিতা দস্তিদারের সুন্দর গানে আর সুনন্দা চৌধুরীর নাচে তীব্র ও ব্যঞ্জনাময় মনে হয়েছে। 'আবার দেখা না দেখার মেশা হে' গানটির সঙ্গে সুনীত বসু ও সুনন্দা চৌধুরী পুরোপুরি মিশে যেতে পেরেছিলেন। কয়েকটি সমবেত নৃত্য রীতিমত উজ্জ্বল। জয়শ্রী রায়ের কণ্ঠে 'মম মন উপবনে চলে অভিসারে' গানের সঙ্গে নন্দীতা সিনা সারা মঞ্চে গানের অর্থটি তুলে ধরতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণা নন্দীর 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' দুর্দান্ত। 'ওরা অকারণে চঞ্চল ও হা-রে-রে-রে' গানে ছোটদের নাচ সঙ্গত কারণেই হাত-তালি কুড়িয়েছে। বিশাখা চৌধুরীর কণ্ঠে 'ভেবেছিলেন আসবে ফিরে' এবং জয়শ্রী রায়ের কণ্ঠে 'ঝরে ঝর ঝর' পুরোপুরি রাবীন্দ্রিক। দামী গাইয়ে না হয়েও তাঁদের গায়নভঙ্গী স্মরণীয়। তাছাড়া কোরাস গান (যা কলকাতায় কদাচিৎ শোনা যায়) পরিচালনায় জয়শ্রী রায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অজানা এত সুকণ্ঠ কলকাতায় আছে কে জানত। নৃত্য পরিচালনায় সুনীত বসু সংযম ও রুচির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নেচেছেনও ভাল। তাছাড়া প্রশংসনীয় নাচিয়েদের সাজসজ্জা। কলকাতার মঞ্চে এমনটি তো সচরাচর দেখা যায় না। **শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়**

দক্ষিণীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

'এ দেশের সর্বপ্রকার সঙ্গীতের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতই সর্বাপেক্ষা সহজ-লভ্য—ব্যাপকভাবে স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের ফলেই এই পরিস্থিতি উদ্ভূত। সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসার ও প্রচার নিয়ে দুর্ভাবনার দিনও অতিক্রান্ত। কিন্তু স্বরলিপি গ্রন্থে গানের লয় ও গায়কীর নির্দেশ থাকে না—এটাই স্বরলিপির সাহায্যে সঙ্গীতশিক্ষার পথে এক এক একমাত্র অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট সঙ্গীতের সুর নির্ভুল ও অবিকৃতভাবে শিক্ষাদান ও পরিবেশন করাই হবে যথাক্রমে শিক্ষক ও শিল্পীর প্রাথমিক ও অন্যতম কাজ। এই প্রসঙ্গের অবতারণার এই কারণে যে অধুনা এই ধরণের মারাত্মক ত্রুটি শিল্পী বা শিক্ষক উভয়ের ক্ষেত্রেই একাধিকবার লক্ষ্য করা গেছে।

'দক্ষিণী'র কর্মাধ্যক্ষ শ্রীসুদেব গুহঠাকুরতা এই ঐতিহ্যপূর্ণ রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কলামন্দিরে ১৫ মে তারিখে তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা ও প্রচারসংক্রান্ত যে সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন তা মূল্যবান। কিন্তু সঙ্গীতের মত প্রবাহশীল শিল্পের বিশুদ্ধতা কত-দিন কতটা কী পরিমাণে রক্ষা করা যাবে তা বিচার্য। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গান সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের সুর সৃষ্টিতে অক্ষত, এর খতিয়ান হয়েছে কি? স্বরলিপি কি কবির স্বহস্ত রচিত? রবীন্দ্রনাথ গায়ক ছিলেন অবশ্যই তবে কতটা ব্যাপকভাবে তাও ভাববার বিষয়? স্বরলিপি রচনার জন্য কণ্ঠ ও যন্ত্রনিঃসৃত সুরের যুগপৎ মুদ্রণে আবশ্যক—কবির গান রচনার আবেগময় দুরন্ত সৃজন মুহূর্তে তাঁর সহকারী স্বরলিপিকার ও গায়ক-গায়িকায়া কি সর্বদাই সতর্ক ও মনো-যোগী ছিলেন? আমাদের আকারমাত্রিক স্বরলিপি কি অত বৈজ্ঞানিক? টপপা অংগের মুক্ত ছন্দের গানে কতটা স্বর-লিপি চিত্রণের স্বচ্ছতা সম্ভব হয়? এসব অনেক প্রশ্ন সরিয়ে শুধু বলা যায় মুদ্রিত স্বরলিপি, অদ্যাপি সক্রিয় সক্ষম রবীন্দ্রসঙ্গীতাচার্য রবীন্দ্রশিষ্য-দের বিশুদ্ধ শিক্ষাদানের চেষ্টা চলুক, বিকৃতি যদি ঘটে তবে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটবে শ্রোতার কানে যখন তিনি ভ্রূ-কুঞ্চন করবেন অরুচিকর অপটু রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর বেয়াড়া স্বরক্ষেপণ রচনবিন্যাস ও বেখাপ্পা বদ অভ্যাসার্জনিত গায়নরীতি শুনে।

দক্ষিণী শিল্পীবৃন্দ একক গানের চেয়ে, মঞ্চ ঝলমল ষাট-সত্তরজন গায়ক-গায়িকার সম্মেলনে এক আশ্চর্য সুরাবহ সৃষ্টি করলেন। 'প্রভু খেলেছি অনেক খেলা', 'দাঁড়াও মম অনন্ত ব্রহ্মান্ড মাঝে', 'হৃদয় শশী হৃদি গগনে', 'সদা থাক আনন্দে' প্রভৃতি গানের ধ্রুপদাঙ্গিক বিশুদ্ধ সুরের সরণি বেয়ে চলে যেতে হয়েছিল দূর অতীতের ব্রহ্মবাদী শুভ্রবেশী ব্রহ্ম দেবালয়ের আঙিনায়, সেই গোরাসুচরিতা পরেশ-বাবুদের যুগে। রণো গুহঠাকুরতা স্বরবিকার ও কৃত্রিম অভিব্যক্তি সংযত করলে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রসাদ পাবেন। ঋতু গুহর 'কখন দিলে পরায়ে' অনবদ্য ভাবাবিষ্ট।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

বরযাত্রীদের সেকাল একাল

বরযাত্রীদের কথা উঠলেই যজ্ঞে-শ্বরকে মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের সেই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। করজোড়ে বার বার বরের সঙ্গীদের অনুরোধ করছেন তাঁদের তান্ডবলীলাটা থামাতে। অবশেষে ত্রাণকর্তারূপে স্বয়ং বরের রণক্ষেত্রে আবির্ভাব ও উদ্ধার। যুগটা তখন এই রকমই ছিল। পান থেকে চুণ খসলেই বরযাত্রীরা রাগে অগ্নি-শর্মা। আপ্যায়ণের ব্যাপারটাতো ছিলই। তাছাড়া দেনা-পাওনার ব্যাপারে উপরি কিছু হাতানোর আশায় অনেক সময় বরকর্তা কিছু কিছু ডাকসাইটে লোক নিয়ে যেতেন। এইসব ডাকসাইটে বর-যাত্রীরা যেন-তেন-প্রকারেণ একটা গন্ড-গোল লাগাতে চাইতেন। বিয়ে পন্ড হয় হয়। নিরুপায় কন্যার পিতার সামনে তখন একটা পথই খোলা। বরকর্তার কিছু কিছু অন্যায় আব্দার মেনে নেওয়া। বেশীর ভাগ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তাই রাজী হতেন। বিয়ের পিঁড়িতে বসা মেয়েকে তো আর কেউ বিয়ে করবে না। ঘরে রাখাও বিস্তর অসুবিধা। রক্ষণ-শীল সমাজের বিধিনিষেধ।

ওই ডাঁ'দরেল বরযাত্রীরা কিন্তু সবাই আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব নন। কেউ কেউ ছিলেন অনেকটা পেশাদার গোছের।

এখানে ওখানে বিয়েতে যাওয়াটাই ছিল ও'দের অবসর বিনোদন। হাজার কাজ থাকলেও সব কিছু ফেলে যাওয়া চাই। কে কতগুলো বিয়েতে গন্ডগোল করেছেন আর কজন কন্যার অসহায় পিতাকে হেনস্থা করেছেন সেটাই ছিল তাঁদের যোগ্যতার মাপকাঠি। তার অসন্তুষ্ট পিতারাও ও'দের দারুণ তোয়াজ করে নিয়ে যেতেন। এটা যেন দেমাক আর আভিজাত্যের একটা লক্ষণ। কন্যার দায়গ্রস্ত পিতার ওপর বরযাত্রীদের নির্মম রসিকতা (ওটা অত্যাচারেরই সামিল) যেন বিয়েরই একটা অঙ্গ ছিল। বর উঠিয়ে নিয়ে যাওয়াতো সহজ। আবার বিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু মেয়ের!

আরো আগে আঠারো শতকের শেষ দিকে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম ছিল না। বরের সাথে বরের লোকজনরা আসতেন। খাওয়া-দাওয়া করতেন। সাধামত আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হত। গন্ডগোল করাটা ছিল চিন্তার বাইরে। অবশ্য কারণও ছিল। তখন মেয়ের বাবারা মেয়েকে পার করার জন্য পরবর্তীকালের বাবাদের মত অমন আর্থিক কষ্টে পড়তেন না। উল্টে পাত্রপক্ষরাই টাকা দিতেন। রাজী হওয়া বা না হওয়াটা নির্ভর করত কনের পিতার মর্জির ওপর। বরযাত্রীদের দেমাক দেখাবার জোরটা আর রইল কোথায়? সেজেগুজে দিব্বি ভাল মানুষের ছেলের মতন খেয়েদেয়ে যেতেন। সুখ্যাতিটা সামনাসামনি করতেন আর নিন্দেটা আড়ালে।

সে সময় বরযাত্রীরা আর তাঁদের জাঁকজমক ছিল দারুণ দর্শনীয় বস্তু। খবর ছাপা হত সংবাদপত্রে। পয়সাওয়ালা কন্যাপক্ষরা গভর্ণমেন্ট গেজেটে ইস্তাহার দিতেন। তখনকার এক বিখ্যাত কাগজে বাবু রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রীর বিয়েতে যে বরযাত্রীরা এসেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে বিবরণ দিতে গিয়ে এক জায়গায় লিখছে, 'বরও বরযাত্রী যাত্রা করিলে কৃত্রিম পাহাড় কোটা বাগান নৌকা প্রভৃতি নানাবিধ ছবি সঙ্গে গিয়াছিল ও ইস্তক কাশীপুর নাগাদ মহারাজার বাটী আন্দাজ দুই ক্রোশ পথ সমান রোশনাই হইয়াছিল।'

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে হাওয়া আবার উল্টোদিকে বইতে শুরু করে। বরের সাথে সাথে শুরু হল বরানুগমনকারীদেরও আধিপত্য। কারণ ওই বরপণের জোয়ার। আর বরের নিকট আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবরাই তো বরযাত্রী হয়ে যান। হৈ-হুল্লোড় করে, কন্যাপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে সময় বেশ ভালই যাচ্ছিল। এই বিংশ শতাব্দীর ষাট সাল পর্যন্ত এর কোন হেরফের হয়নি। কিন্তু তারপরই মন্দার শুরু— কলেবর, আন্তরিকতা, অভ্যর্থনা, এমন কি দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থাতেও। অবশ্য এই হালের জন্য শুধু যে কন্যার পিতারাই দায়ী তা নয়, দায়ী সরকারী
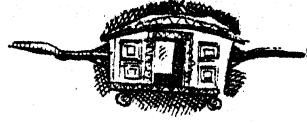
নিয়ন্ত্রণ আর আমরাও। মফঃস্বল কিংবা গ্রামের দিকে অতিথি নিয়ন্ত্রণের সরকারী কড়াকড়ি না থাকলেও খাওয়া-দাওয়ায় আগের জৌলুষ আর নেই। শুধু কি ভোজন? আপ্যায়ন আন্তরিকতায় আগের সম্পর্কও আর নেই। বাসে বা মিনি বাসে চেপে ঘনিষ্ট আত্মীয় আর গুটি কয়েক বন্ধুবান্ধব হাজির বরের সাথে। না আছে জাঁকজমকে চেকনাই, না সংখ্যায়।

তবু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরা, এখনো বরযাত্রী ব্যবস্থাকে মোটামুটি চালু রেখেছেন। পুরোনো প্রাণ আর না হয় নাই রইল। পোশাকে সাবেক বাঙালী বেশ ধুতি-পাঞ্জাবী অদ্যাপি বর্তমান। যতই কেতাদুরস্ত সাহেবীয়ানা ভর করুক না কেন ওই দিন পাট ভাঙ্গা ধুতি-পাঞ্জাবীতে হাজির হওয়া চাই। ইদানীং কোট প্যান্ট যে চোখে পড়ছে না তা নয়। কিন্তু ওতে ফ্যাশনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেও ধুতি আর শাড়ীর মেলায় দিশী সাহেবদের বেমানানজনিত অস্বস্তিতে ভুগতে হবে। বরযাত্রী ঠকানো রেওয়াজটাও এখন আর নেই বললেই চলে। সরবতের মধ্যে নুন, পানের ভেতর চুন বা কৃষ্ণনগরের মাটির সন্দেশ বিস্কুট দিয়ে কনেবাড়ীর তরুণী কিশোরীদের অভ্যর্থনা আজ এক দুর্লভ বস্তু।

এখন ব্যাপারটা অনেক যান্ত্রিক। সেজেগুজে বরানুগমন। নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করে আর না হয় চুপচাপ সময় কাটিয়ে ভোজন পর্ব সমাপন। অতঃপর নিঃশব্দ প্রস্থান। সত্যি কথা, দু-চারজন খুব নিকট আত্মীয় ছাড়া বাকীদের ওপর মেয়ের বাড়ীর লোকেদের এখন আর খুব একটা মনোযোগ নেই। বরের সাথে কাজ, বরকে নিয়েই ব্যস্ত। বরযাত্রীদের তোয়াজ করার সময় কোথায়।

তরুণ বরযাত্রীদের মন তবু এখনো অন্য কোন আশায় ফেরে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে প্রাপ্তিযোগ। বরযাত্রীদলের কোন অবিবাহিত সুযোগ্য পাত্রের সাথে বিয়ে বাড়ীতে উপস্থিত কোন যোগ্য পাত্রীর শুভ সাক্ষাৎ আজও ঘটছে। প্রথমে মন নিবেদন, পরে গাঁটছড়া বাঁধা। এ ধরণের ঘটনার সঠিক কোন সংখ্যার হিসেব না থাকলেও অন্তত এইটুকু বলা যায়

হৃদয়-ঘটিত বিশেষ কোন কারণ ঘটেনি। ব্যাপারটার অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। বরানুগমনে গেলেই যে কেউ কণেগৃহে তাঁর মনের মানুষ খুঁজে পাবেন তেমন কোন নিশ্চয়তা নেই। মন তাও মানে না। তরুণ বরযাত্রীরা এখনও এবিষয়ে মনে মনে ভীষণ রোম্যান্টিক। বরযাত্রী যেতে দারুণ উৎসাহী। অপেক্ষা শুধু নিমন্ত্রণের। কিন্তু ওই নিমন্ত্রণ পাওয়াটা কোন যেমন তেমন ব্যাপার নয়। আর কদিন পরে হয়তো ভাগ্যকেই টেনে আনতে হবে। নিখরচায় ভ্রমণ ও ভোজনের উৎকৃষ্টতম উপলক্ষ্য হলেও পোড় ও বৃদ্ধারা কিন্তু হালফিল বরযাত্রী যেতে খুব একটা উৎসাহ বোধ করেন না। কারণ ওই আন্তরিকতা আর আপ্যায়নের অভাবের অভিযোগ। ও'দের আবার ঘাতিটা চট করে চোখে পড়ে যায়। আগের কালের আদর যত্ন পেয়েছেন। একালের নিস্পৃহ ঠান্ডা অভ্যর্থনায় প্রতিক্রিয়াটি তাই খুব একটা সুখকর নয়। অনীহা স্বাভাবিক কারণে বাড়বেই।

ইদানিং বরযাত্রীদের দাপটও আর নেই বললে চলে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের ঘটনাতো এখন ভাবাই যায় না। তবু যে দুচারটা ওরকম ঘটনা ঘটছে না এমন নয়। অবশ্য সেসব জায়গায় উল্টে বরযাত্রীরাই হেনস্থা হয়েছেন। প্রথমে কণে বাড়ীর দাপটের যুগে বা তারপরে নিজেদের প্রাধান্যের সময়ে বরযাত্রীরা বিপাকে পড়েন নি। কিন্তু হায় সময়। বরযাত্রীদের শারীরিক, মানসিক সব দুর্ভাবনার শুরু ওই ২য় মহাযুদ্ধের পর থেকেই। ইদানীং এসব ঘটলেও ঘটছে মফঃস্বলের দিকে। খাস কলকাতায় বরযাত্রী যাওয়া রেওয়াজটাই কমে আসছে। একে তো অতিথি নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি। তার উপর রেজিষ্ট্রী বিয়ের উঠতি বাজার। আজকাল অনেকেই বিয়েটা ছিমছাম সারতে চাইছেন। চার চোখের মিলনে আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির ব্যবস্থা থাকলেও সরলীকরণের ধাক্কা পড়ছে বরযাত্রী প্রথাটার ওপর। মেয়ের বাড়ীর নিমন্ত্রিতেরা ছাড়া পাত্রপক্ষের নির্দিষ্ট কিছু লোকজন। সাহেবী কায়দায় বুফে ডিনারের ব্যবস্থা। নামও বরযাত্রী নয়, ম্যারেজ পার্টি।

বরযাত্রী দলে আমরা সবাই পড়ি। ঈশ্বর না করুন, এ অবস্থা যদি শহর কলকাতার গন্ডী ছেড়ে মফঃস্বলের দিকে পা বাড়ায় তাহলে প্রথাটাই তো উঠে যাবে। কলকাতাতেও এর বিস্তার না ঘটুক। সনাতন এক প্রথা যাতে আমরা সবাই এক দিন না একদিন ভাগ নিয়েছি লোপ পেতে শুরু করলে কার না দুঃখ হয়। আজকালকার ছেলেমেয়েরা অবশ্য তেমন দুঃখিত হবেন না (বিশ শতকের শুরু থেকে মেয়েদের বরানুগমণের শুরু। প্রথমে ছিলেন লোকচক্ষের

আড়ালে, পরে যেতেন পাল্কীতে চেপে। আর এখন। সংখ্যায় তাঁরা সমান না হলেও যাচ্ছেন একসাথে এবং সমান মেজাজে)। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান দেখেই তারা অভ্যস্ত। অনভ্যস্ত প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধরাই। সেদিনের হয়ত দেরী নেই যখন লেখক লিখে বসবেন, 'হায় বরযাত্রিগণ! আপনাদের দিন গত হইয়াছে।' কিন্তু স্মৃতিধর আর অতীত সচেতনরা তখন কি করবেন? রোমন্থন করে শুধুই দুঃখ পাওয়া। জ্বালাতো তাঁদের সেখানে।

পার্থসারথি কর

শিকল তখন দৃঢ় ছিল

আমাদের মন্দিরা যখন পাকাপাকিভাবে বাপের বাড়ীতে চলে এল, তখন নানাজনের জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলী-দৃষ্টি ওকে উত্যক্ত করে মেরেছে। তারও কিছুদিন পরে যখন আইনসম্মতভাবে ও ওর স্বামী ছাড়ার ছাড়পত্র পেয়ে গেল, তখনও ও রেহাই পায়নি। আইন মেনে নিলেও, সামাজিক একটা ছাপ পড়ে গেছে। ও যেখানে গেছে, কিংবা ওর বাড়ীতে যিনি এসেছেন, তাঁর সরব অথবা নীরব দৃষ্টি ওকে তাড়া করে ফিরেছে। সর্বত্র ভাবটা এই রকম—"আর পাঁচটা মেয়ে যা পারে, তুমি তা পার না, তুমি অযোগ্য—আর পাঁচজনের মত মানিয়ে সুখী হওয়ার যোগ্যতা তোমার নেই।" মন্দিরা এসব গ্রাহ্য করে না—বাচ্চাদের একটা স্কুল সে করেছে, তার পিছনেই দিনরাত পরিশ্রম করে।

মন্দিরার মা-দিদিমা যে কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না, কাজে পরিণত করতে মন্দিরা তাতে দ্বিধাবোধ করে নি। সামাজিক অনুশাসন নিঃসন্দেহে শিথিল হয়েছে। অনেক মেয়েই আজকাল আর একভাবে স্বামী-সংসার নিয়ে গতানুগতিক জীবনের সুখকে জীবনের একমাত্র সুখ মনে করছেন না। অন্যত্রও যে জীবনের অর্থ পাওয়া যেতে পারে, তার সন্ধান করেন। আগেকার দিনে মেয়েরা প্রতিবাদের চরম দৃষ্টান্ত রাখতেন আত্মহত্যায়। এখনকার মেয়েরাও যে আত্মহননের প্রবণতা যুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে উত্তরণ করতে পেরেছেন, এমন নয়। তবু এখনবুঝতে চেষ্টা করেন, হাজার বছরের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে চান। জীবনের একদিকের ব্যর্থতাকে চরম মনে করেন না।

তার প্রথম কারণ, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। সব মেয়েই স্বনির্ভর—এ'কথাও ঠিক নয়। কিন্তু, নিজের পায়ে দাঁড়াবার সচেষ্ট ইচ্ছে থাকলে একটা উপায় হবেই—এমনটা মনে করেন। কিছু মেয়ের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অনেক মেয়ের মনে আশার সঞ্চার করেছে। তাঁরাও যে পুরুষদের মতন করে জীবনযাপন করতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত পেয়েছেন। স্বামীর কাছে যখন খাওয়া-পরা বাঁধা ছিল, মেয়েদের শিকল তখন তত বেশী দৃঢ় ছিল। প্রথম জীবনে বাবা, তার পর স্বামী এবং শেষ জীবনে সন্তান—এইভাবে খাওয়া-পরার ছকটা সম্পূর্ণ করা হয়েছিল—ফলে মেয়েরা নিজেদের স্বাধীন-সত্তার কথা চিন্তা করতে পারতেন না। এখন, অনেকটা অবসান হয়েছে সেদিনের। অবিশ্বাসী অথবা অত্যাচারী স্বামীর, সংসারের বোঝা তাই অনেক মেয়েই কাঁধে তুলে নিতে চান না। জীবনকে বাঁচার মতন সুন্দর করে তুলতে চান।

এই স্বাধীন-সত্তার জন্ম হয়, প্রতিবাদের ক্ষমতা অর্জিত হয় শিক্ষার ভেতর থেকে। সূর্য স্পর্শ পেয়ে যে সব মেয়ে নিজেদের মানসিকতাকে স্বাধীনভাবে দৃঢ় করে গড়ে নিতে পেরেছেন, তাঁরাই সমাজের প্রগতির গতি নির্ধারক।

কিন্তু এ-কথা ঠিক, আইন মেনে নিলেও, সমাজ যেমন মেয়েদের সমান অধিকার, সমান্তরাল জীবন যাপনে বিশ্বাস করে না, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে এই স্বাধীন মানসিকতার অপব্যবহার করা হয়। বিচ্ছেদের আইন চালু হবার একটা সুস্থ দিক আছে, কিন্তু কোন সময়েই স্বামী-স্ত্রীর সামাজিক ভূমিকা ভুলে গিয়ে আইনকে কাজে লাগানো ঠিক নয়। সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। যেখানে দ্বন্দ্ব মেটাবার মতন সেখানে যাঁরা মেটান না, আইনের সুযোগের অপব্যবহার করেন তাঁরা। তাছাড়া মায়েদের আরও একটা চিন্তার বিষয় — 'সন্তান'। ছেলেমেয়ের মানসিকতার ওপর বাবা মায়ের বিচ্ছেদ বড় ভয়ংকর ঘটনা। তারা হারিয়ে ফেলে পায়ের তলার শিকড়—মাথার ওপরকার ভরসা। সন্তান শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত নয়। সন্তান ভবিষ্যত সমাজেরও। ফলে, দায়িত্ব অনেক বেশী থেকে যায় এ-ক্ষেত্রে। তাই বলছিলাম যে অধিকার মেয়েরা পেয়েছেন—তার যেন অপব্যবহার না হয়। তবু এ-কথাও ঠিক বিষাক্ত মন নিয়ে পাশাপাশি থেকে সন্তানের মনে বিষ-সঞ্চার করার চেয়ে দূরে দূরে থাকা অনেক স্বাস্থ্যকর। তবে, এটা নির্ভর করে ঘটনায় বিশেষত্বের ওপর।

[illegible] গঙ্গোপাধ্যায়

গরুতেও আম খায় না

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি মালদা জেলায় গিয়েছিলাম। এ বছর মালদায় সব চেয়ে বড়ো খবর আম। মানিকচক থেকে কালিয়াচক অথবা রতুয়া থেকে ইংলিশবাজার পর্যন্ত ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেও গাছে প্রচুর পরিমাণে আম ঝুলছে। হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগণা বা নদীয়াতে আম প্রায় নেই বললেই চলে। যা-ও বা হয়েছিল খরা, ঝড় এবং শিলাবৃষ্টিতে শেষ।

আম পাড়ার কাজ শেষ হয়নি মালদায়। আগে কাঁচা আম পেড়ে প্যাক দিয়ে ট্রেণ বা ট্রাকে আমের চালান পাঠান হত কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। এখন কাঁচা আম ভাঙ্গা হয় কম। পাড়া হয় তৈরি আম। বাগান থেকে সোজা চালান যায় কাহা কাহা মুলুক।

আমে যখন পাক ধরেছে বা প্রায় তৈরি হবার মুখে পড়ল ইলেকশন। জেলার ট্রাকগুলি রিক্যুইজিশান করে পাঠান হল বিধানসভার মাননীয় সদস্যদের নির্বাচনের জন্য। ফজলি ছাড়া আর সব আম মার খেল। সময়মতো চালান দেওয়া গেল না আমের প্রধান বাজার কলকাতায়। চালানিয়াদের আম চালান না দিতে পারার দুঃখে কেউ বুঝলেন না। কলকাতা শহর এবং শহরতলীর মানুষেরা মালদই, খিরসাপাতি বা ল্যাংড়ার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হলেন।

স্বাদ এবার ফজলিতেও নেই। মে-মাসের মাঝামাঝি সেই যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তার আর বিরাম নেই। চড়া রোদ আর গরম না পেলে আমের স্বাদ ভাল হতে পারে না। জেলা কৃষি দপ্তরে আম-খবর নিতে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় দপ্তরের বড় কর্তার সারথী জানালেন, 'আম এখন গরুতেও খায় না'। অবাক হয়েছিলাম তাঁর কথায়। ছেলেবেলা থেকে ফজলি আমের ওপর আমার নেক নজর একটু বেশি। ভৈরব [illegible]

নদীতে গয়নার নৌকো ভরতি অর্ফলি আম খুলনায় যেত। একটা আম কেটে ভাইবোনে ভাগ করে খেয়ে কী তৃপ্তিই না পেতাম। যার ভাগে আঁটি জুটতো সে তো রীতিমত ভাগ্যবান। অন্যেরা করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে দেখত। সেই আম,—খাস মালদার ফজলি আম 'এখন গরুতেও খায় না' শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। যে কারণেই হোক দুদিন মালদায় কাটান সত্বেও আমার কপালে আম খাওয়া জোটেনি। মুখ ফুটে কাউকে বলতেও পারিনি, আম কই?

কৃষি দপ্তরের কর্তা বললেন, গত দশ বছরের মধ্যে এত বেশি আমের ফলন তিনি দেখেননি। ৪৫ হাজার একরে আম বাগিচা রয়েছে মালদা জেলায়। একরে গড়ে ১৮।২০টি গাছ। গাছ পিছু দেড়-দু হাজার আম ফলেছে।

তাঁর কথার সমর্থন মিলল মালদার আম ব্যবসায়ী সমিতির এক কর্মকর্তার কাছ থেকে। ১৯৭৫ সনে নরম্যাল ক্রপ হয়েছিল। প্রায় সাড়ে চার লাখ কুইন্টাল আম বাইরে চালান গিয়েছিল। এবছর ও'রা আশা করছেন

ছয় লাখ কুইন্টালের বেশি মাল চালান যাবে। হাজার আমের পাইকারি দর কম-বেশি ২৫০ টাকা। কলকাতা পৌছুতে কুইন্টাল পিছু খরচ গড়ে ১৬—১৮ টাকা। শতকরা ২৫ ভাগ আম নষ্ট হচ্ছে। বাজার দর কম। ফলে ডাহা লোকসান। এ হিসাব জুন মাসের শেষ এবং জুলাইয়ের প্রথমে নেওয়া।

বাগিচা মালিকেরা কিন্তু লোকসানের কথা স্বীকার করতে নারাজ। যে আমের আন্দাজে বাগিচা কেনা বেচা হয়েছে তার তুলনায় ফলন অনেক, অনেক বেশি হওয়ায় না পোষাবার কথা নয়। লক্ষ্মীপুর গ্রামের মনিরুদ্দিন আমেদ আম গাছে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে উপকার পেয়েছেন। বাড়তি ফলনের এটাও অন্যতম একটা কারণ বলে তাঁর ধারণা।

ফজলি আমের গাছে মাচা বা ঠেকা দিতে হয়। কিন্তু নাজিরপুরের নলিনী সরকারের বাগিচায় ল্যাংড়া আম গাছেও ঠেকা বা মাচা দিতে হয়েছে। আমের আকার যথেষ্ট বড়ো হওয়াতেই তা করতে হয়েছে। সরকার মশাই ১০৫টি গাছে সুপারিশ মতো সার, কীটনাশক এবং হরমোন ব্যবহার করেছিলেন।

কালিয়া চকের ওয়াহেদ আলির কথাও তাই। যত্ন পরিচর্যা করার ফলে এবছর আমের সাইজ ভাল। কম ঝরেছে এবং রং ভাল হয়েছে।

ব্যাপক যত্ন পরিচর্যার মূলে রয়েছে ভারতীয় সার সংস্থা, ফার্টি-লাইজার এ্যাসোসিয়েশান এবং হরমোন সরবরাহকারী কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সকলের মিলিত উদ্যোগে আমের ফলন যথেষ্ট বাড়লেও 'মালদায় এখন গরুতেও আম খায় না' শুনে মন খারাপ হল। আর কলকাতা ফিরে পাঁচ সিকে জোড়া দর দিয়ে আম কিনে খেয়ে দেখলাম সেই আগেকার মতো স্বাদ আর ফজলির নেই।

স্বাদ থাক বা নাই থাক মালদা জেলায় আমের মরশুমে তিন মাস মানুষের কাজের অন্ত থাকে না। আম পাড়া, ঝুড়ি তৈরি করা, মাল বোঝাই, বাগান পাহারা, লরি ভাড়া দোকান পসারে কেনাবেচা, জ্যামজেলি তৈরি, আমসত্ত্ব ইত্যাদি হাজারো রকম কাজ। পাকা আম খাওয়ার সুযোগ পান। এটাই মস্ত বড়ো লাভ।

সুভাষ রায়চৌধুরী

রাজনীতির ছবি

অবশেষে সেই চাঞ্চল্যকর মার্কিন ছবিটি, যার নাম 'অল দি প্রেসিডেন্টস মেন', কলকাতার রাজনীতিসচেতন বুদ্ধিজীবী দর্শকদের সামনে উপস্থিত হল।

এ ছবির বিষয়বস্তু সেই চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারীর রহস্য উন্মোচন। যার ধাক্কায় তৎকালীন আমেরিকার দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রেসিডেন্ট নিকসনই জনমতের চাপে পড়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ওয়াশিংটন পোস্ট নামক পত্রিকার বব উডওয়ার্ড এবং কার্ল বার্ণস্টেইন নামক দুজন সাংবাদিক হঠাৎ ছোট্ট একটা রহস্য সংবাদের সূত্র ধরে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী রহস্য ও প্রেসিডেন্ট নিক-সনের গোপন যোগসাজস কিভাবে ফাঁস দিল ছবিতে সেই ঘটনাই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপকরূপে উপস্থিত করা হয়েছে।

সঠিক অর্থে এই ছবি সাধারণ দর্শকের জন্য নয়। পৃথিবীর রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ এবং পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদেরই বেশী ভাল লাগবে ছবিটি। অবশ্য রাজনীতিসচেতন ব্যক্তিরা এবং যাঁরা ওয়াশিংটন পোস্টের ঐ দুজন সাংবাদিকের লেখা বইটি পড়ার সুযোগ পেয়েছেন (ইতি-মধ্যেই বইটি ২,৩০০,০০০ কপি বিক্রি হয়ে গেছে এবং পুলিৎজার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে) তাঁরাও ছবিটি দেখে কিছুটা খুশী হবেন। তবে মূল বইটি পড়ার স্বাদ পূর্ণমাত্রায় ছবিতে নেই সেটা বলাই বাহুল্য। বরং অনেকটা নিরাশই হবেন। কিন্তু পরিচালক এলান জে পাকুলার প্রশংসা করবেন তাঁর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা এবং ছবিটিকে তথ্যবহুল ও বাস্তবানুগ করে তোলার জন্য।

এ ছবিতে বেশ একটা চাপা উত্তেজনা ও রহস্যের ছোঁয়া আছে। খানিকা ক্রাইম ডিটেকশন ছবির মত। দুজন সাংবাদিককে তাই ডিটেকটিভ মনে হতে পারে।

এ ছবির বড় সম্পদ এর অভিনয়। বিশেষ করে সাংবাদিক দুজনের। বব উডওয়ার্ড ও কার্ল বার্ণস্টেইনের ভূমিকায় যথাক্রমে রবার্ট রেডফোর্ড ও ডাস্টিন হফম্যানের অভিনয় এ ছবির সম্পদ। এ দেশের অনেক দুঃসাহসিক সাংবাদিক ঐ দুটি চরিত্রের মধ্যে নিজে-দের খুঁজে পেলেও পেতে পারেন।

কিন্তু ওয়ার্নার ব্রাদার্স এই ছবিটি সম্পর্কে যতটা ঢাক পিটিয়ে ছিলেন, ছবি দেখার পর তাতে অনেকটাই প্রচার বলে মনে হতে পারে।

শান্তি চট্টোপাধ্যায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

সব সময়ে প্রাণোচ্ছল এই পরিবার—ডাঁটা নেই সব সময়েই আনে প্রাণের জোয়ার...

ভিনকোলা-১২

ভিটামিন বি-১২যুক্ত আয়রন টনিক সক্রিয় ও সুস্থ থাকতে হ'লে

স্বাস্থ্য ভাল করুন, জীবন আনন্দে ভরিয়ে তুলুন।
রোজ ভিনকোলা-১২ নিন।

ভিনকোলা-১২ আপনার শরীরে দ্বিগুণ শক্তি যোগায়।
কারণ এতে শরীর স্বাস্থ্য ভাল করার উপাদান রয়েছে—সুষম মাত্রায় আয়রন ও ভিটামিন বি-১২ ছাড়াও গ্লিসারোফ-সফেটস্।
প্রতি বিন্দু ভিনকোলা-১২'য় র'য়েছে শক্তির জোয়ার।
এইজন্যে আপনিও অমল পালেকরের পরিবারের মত আপনার পরিবারকেও ভিনকোলা-১২ দিন আর তাঁদের সক্রিয় ও সুস্থ রাখুন।

Standard

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ

Shilpi-SPL-1a/77 ben

১৭ বর্ষ ১৩ সংখ্যা
২০ শ্রাবণ ১৩৮৪
5 August, 1977

প্রচ্ছদ কাহিনী

আগামী সংখ্যা

সাহিত্য ও স্বাধীনতা সংখ্যা

এ সংখ্যার প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি
এঁকেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত

পরিবহন ও পরিকল্পনা

কলকাতায় যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। ট্রাম-বাসের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বরাবরই কম। ইদানীং রাস্তাগুলি খানাখন্দে দুর্গম হয়ে ওঠায় গোণাগুণতি সেই বাসের সংসারেও মড়ক লেগেছে। পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, সম্প্রতি একটি দিনের হিসাবে দেখা গেছে, রাস্তায় বার করা ৫০০ বাসের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগই বিকল হয়ে গেছে যাতায়াতের মাঝপথে।

এর প্রধান কারণ দুটি। এক, দীর্ঘদিন মেরামত না করা। আর দুই, রাস্তাগুলির মারাত্মক রকম খারাপ অবস্থা। এরই ফলে সচল বাসগুলিও টায়ার ফুটো হয়ে বা যন্ত্রপাতি ভেঙে গিয়ে অকেজো হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু রাস্তাঘাট যে অচিরেই ভালো হয়ে যাবে এমন মনে করার কারণ নেই। পৌরসভার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এখানে-ওখানে গর্ত বুজিয়ে কোনো স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। বর্ষাকাল পার না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ীভাবে পথ সংস্কারের কাজ শুরু করা যাবে না।

পৌরমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্থায়ী মেরামতের জন্যে দরকার হবে বছরে ৫ কোটি টাকা। এইভাবে কয়েক বছর ধরে মেরামতীর কাজ চললে তবেই রাস্তাগুলি নতুন জীবন ফিরে পেতে পারে। এর মধ্যে পৌরসভা থেকে আড়াই কোটি টাকার মতো খরচ করা হবে। বাকি টাকা সংগ্রহ করতে হবে অন্য সূত্রে। ইতিমধ্যে অবশ্য চলতি বাজেটের টাকা দিয়েই কাজ শুরু করা হয়েছে। পরিবহণমন্ত্রী সম্প্রতি পৌরমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই কথা।

সমস্ত মিলিয়ে পরিস্থিতি যে খুব আশাপ্রদ তা মনে করা শক্ত। কেননা, এখন যা চলছে তা খুচরো কাজ, এবং তাও মোটে ৭০টি রাস্তায়। অথচ কলকাতায় রাস্তার সংখ্যা ১৯০০, এদের প্রায় সবগুলিই দাগী আসামীর তালিকায়।
কিন্তু বিশাল এই মহানগরীর জীবনপ্রবাহ তো তাই বলে থেমে থাকবে না। রুজির তাগিদে এবং কাজের তাড়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে পথে বেরোতে হয়, যাতায়াত করতে হয়। পরিবহণমন্ত্রী তাই একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং আরেকটি স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।
কিন্তু স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাব অনেকটা প্রাথমিক চিকিৎসার মতো। দুরারোগ্য এই পরিবহণ ব্যাধির পুনরাক্রমণহীন নিরাময় না ঘটলে কলকাতার মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্ত বোধ করা কঠিন। সেজন্যে দরকার, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনারই দ্রুত রূপায়ণ।

কাঁচা বাজার

এই গল্পটা কেউ লিখবেন না।

একজন যুবক বি-কম পাশ করে কবিতা লেখেন। চাকরি পান নি। বাড়িতে অপমানের অন্ন। প্রেমে পড়তে পারেন নি—কারণ, এ অবস্থায় ওসবে তার যাওয়া সাজে না। স্বাস্থ্য মোটামুটি। নীরবে সবার লেখা পড়েন তিনি। পড়ে — মনে মনে একটা আন্দাজ করেন। সব ন্যায়ের তিনি সমর্থক। সব অন্যায়ের প্রতিবাদী। তবে কোনটাই সোচ্চার নয়। সবই মনে মনে।

জানা-শুনো প্রতিষ্ঠিত মানুষদের মানুষদের জন্যে গ্যারেজ সমেত ভাড়া বাড়ি খুঁজে দিয়ে তিনি তাঁদের কৃতজ্ঞ করে রাখেন। মুখ ফুটে কোন সাহায্য চান না। ভাবেন—আমার অসুবিধা বুঝে উনি নিজেই আমার জন্যে কিছু করবেন। কিন্তু কেউ কিছু করেন নি।

এমন বেকার এই কবি জীবনানন্দ পড়েন। পড়েন শংখ, শক্তি, প্রণবেন্দু, সুনীল, পবিত্র, সুব্রত চক্রবর্তীকে। মনে মনে তাঁদের কবিতার গুণ খুঁজে পাওয়ার আনন্দে মশগুল থাকেন। পাশাপাশি নিজের কবিতাকে দাঁড় করাতে লজ্জা পান।

একা একা তিনি পথ হাঁটেন। কলকাতায় বৃষ্টি, শীত, বসন্ত—তাঁর চোখে ছবি হয়ে দেখা দেয়। ন মাসে ছ মাসে কবিতা ছাপা হলে যা পান—তাতে সিগারেটও হবার কথা নয়। অনেকের কবিতা বই হয়ে বেরুলো। সুন্দর সমালোচনা বেরুলো। কাগজেও সভা-সমিতির বিবরণে বেরুতে থাকল—অমুক কবি তকুম কথা বলেন। ইত্যাদি।

এইভাবে একদিন সেই বি-কম পাশ কবি দেখলেন—তিনি অনেকগুলো টিউশনি করছেন। বাড়ির একতলায় কলতলায় নিজের জামা-কাপড় নিজেই কেচে মেলে দিচ্ছেন। সকালের কাগজখানা সন্ধ্যেবেলা চেয়ে এনে পড়ে নিচ্ছেন। চঞ্চল পাইস হোটেলের তিনি তখন পুরনো খদ্দের। খাবার সময় একখানা লেবু নিয়ে বসেন।

জীবিকা তাঁকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করে নি। বয়স উনচল্লিশ। বিয়ে করা হয় নি। টিউশনিতে পেনশন নেই। পি এফ কিংবা গ্র্যাচুইটি—কোনটাই নেই। এখনকার কবিতা তিনি কিছুই বোঝেন না। তবে কবিতার বইয়ের সংগ্রহ তাঁর দেখবার মত—দেখাবার মত। সেগুলো আজকাল আর ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে না।

তার চেয়ে বরং রাস্তা পেরিয়ে কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়িটার গেটের ভেতরে বুড়ো দাদুর সঙ্গে ফুফফুটে ৬।৭ বছরের নাতির খেলাধুলো, বাসের আয়নার যাত্রিণীর বিষণ্ণ চোখ অথবা আশাবাদী বেপরোয়া তরুণ কবির কুচপরোয়া ভঙ্গীতে তিনি এখন পদ্যের সন্ধান পান। জানলার নিচে কে তাঁকে রোজ ডাকে।

বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় কম।

এখন তাঁর হাতে একখানা কবিতার বই নতুন এসে পড়েছে। গীতা। ভাষ্য-সহকারে পড়েন। রোজই তার ভেতরে অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন। বড় টাইট বাঁধুনির পদ্য। তা পেছনে তাকাতে সাহায্য করে। সামনেও দেখতে উপকারে আসে।

তখন একদিন তাঁর মনে হল—আমি তাহলে এতদিন কি করলাম?

সামন্য ২।১ জনের কবিতা ভাল লাগে। নয়তো বাকি সব তো কাঁচা বাজার। রেঁধে খেয়ে না ফেললে ওবেলা পচে যাবে। আমি তাহলে কি করলাম?

হাতের গীতাখানা বন্ধ করে তিনি ভাদ্র মাসের বিকেলে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালেন। ট্রাম-বাস রাস্তা দিয়ে কলকাতা উপচে পড়ছে। আমি কতকাল এই নদীর সঙ্গে কোন যোগ রাখি নি। পদ্যের পায়ে মাথা খুঁড়েছি।

আমার সমসাময়িক যারা লোকমুখে কবি খেতাব পেল—যার মানে স্বীকৃতি—তারাই বা কি পেল? এজন্যে এত অভিমান। দুঃখ। ঈর্ষা। রাত জাগা। আমার যদি একজন সাধারণ বউ থাকতো—সে তো ডালে কাঁটা দিতে দিতে ভাবতো—আমার স্বামী ভদ্রলোকটি কি বোকা। পদ্যকে সময় দিতে গিয়ে আমায় দিতে পারলো না। বুড়ো হলে ওই পদ্য কি ওকে আমার চেয়ে বেশি সঙ্গ দিতে পারবে?. আমি জ্যান্ত মানুষ। পদ্য আসলে কিছু ভাবনা। মাথায় গোলমাল না হলে যা বেরোয় না।

তিনি নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন। ভাগ্যিস আমি কোন বিয়ে করিনি।

এই সব ভেবে তিনি সোজা গিয়ে পেট্রোল পাম্পের সামনে বেলুনওয়ালার কাছ থেকে ছটা গ্যাস বেলুন কিনলেন। তারপর সেগুলো এমনভাবেই ছাড়লেন—যাতে কিনা একগুচ্ছ রঙীন বেলুন মোড়ের মাথায় ট্রামের তারের জটে গিয়ে আটকে যায়। তাই দেখে একটি শিশু মায়ের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তাকিয়ে থাকল—বাসের জানলায় প্রবীণ চশমাধারী একখানি মুখ।

পুরো এই ব্যাপারটা গল্প করে লিখতে হলে ওই শেষ দৃশ্যটা থেকেই শুরু করা ভাল। তারপর কখনও পেছনে—কখনও সামনে এগিয়ে দেখতে দেখতে লিখতে হবে। কবির নাম ধরা যাক—তরুণমাধব বসু। তরুণ লাউশাক খেতে ভালবাসে। বৃষ্টির দিন বারান্দায় বসে পাশের বাড়ির রেডিওতে দেবব্রত তার প্রিয়। তার বিছানার মাদুরটা একটু ছেঁড়া হলেও চলবে। টুথব্রাশ আর সেভিংব্রাশ একটা কাঁচের গ্লাশে দাঁড় করান থাকবে। ঘরের সবেধন ক্যালেণ্ডারে রামকৃষ্ণ। রাস্তায় বন্দী মুক্তির দাবিতে মিছিল। হলুদ পাতায় ছাপা সকালের কাগজ। বউয়ের শেষ দুখানি চিঠি লুমুম্বার হাতে আর পৌঁছয় নি।

এ সবই তুলে ধরতে হবে সে গল্পে। সাবধান ১৯৬৭, ১৯৭২ কিংবা ১৯৭৭—কোন বিশেষ সাল যেন তাতে উঁকি না আসে। অথচ সব কটা বছরই থাকবে। নয়ত কাঁচা বাজারের দশা হতে পারে। কোন নারী নেই। ..ওঠা-পড়া বোঝা যায় এমন কোন বড় ঘটনা নেই। কবিতার জন্যে অনুসন্ধান। একটি জীবন দিয়ে তার ঋণ শোধ। তারপর একদিন সন্ধ্যায় কলকাতা উপচে-পড়া সেই নদীর সঙ্গে দেখা। তাতে কবি নিজের ছায়া দেখতে পেয়ে বেলুন ওড়ালেন। কলকাতায় কেউ কর্মহীন নন। তবু ওরই ভেতর একজন প্রবীণ আর একজন শিশু উড়ন্ত বেলুনকে মনোযোগ দিল। কবিতার বইগুলো অনেক দিন খোলা হয় নি।

গল্পটি লেখবার সময় শুধু খেয়াল রাখতে হবে—কাঁচা বাজারের জিনিসপত্র যেন এসে না পড়ে। এলে কিন্তু ওবেলাতেই সব পচে যাবে।—বৈকুণ্ঠ পাঠক।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

কি করলেন দেশটাকে ?

প্রিয় শ্যামলবাবু,

২২ জুলাই অমৃতে আপনার মিসা লেখাটি পড়লাম। খুব ভাল লাগল। খুব অন্তরঙ্গ লেখা। হয়ত 'মস্ত সাহিত্য' নয় কিন্তু খুব ভাল জিনিস। সেই সময়কার কথাগুলো আমাদের অমৃতর মাধ্যমে জানান। আমারো বিশ্বাস ছিল কম্যুনিস্টরা খুন করে না। অযথা। কিন্তু বিভ্রান্ত হচ্ছিলাম। যে সব খুনগুলো হচ্ছিল—সেগুলো অযথা খুন। আপনার ঐ হোটেলওয়ালার মত আমি এবং আমার মত অনেকেই বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, 'কি করলেন বলুন তো, কি করলেন দেশটাকে ?' অ্যামবাসাডার গাড়িতে বোরখা-পরা এজেন্টরাই ভুল লাইন দিয়ে অন্য দিকে ভাল ভাল ছেলেদের সত্যিকারের দেশ-প্রেমিকদের বড় ভ্যানে তুলে নিতে পুলিশকে সাহায্য করেছে। সমস্ত আন্দো-লনটাকে ভুল পথে চালিত করে সর্বনাশ করেছে। এই আমাদের বিশ্বাস। অমৃত সম্পাদক যদি এ চিঠি প্রকাশ করেন, আমার আপত্তি নেই। আপনার চিঠি পেলে খুশি হব।

তরুণকুমার চক্রবর্তী
হাজারীবাগ

পিঠ চুলকানো সমিতি

আজ ষোল বছর হল আমি এবং আমার পরিবারের সদস্যরা অমৃতের পাঠক তালিকাভুক্ত। বহির্বঙ্গে যে কয়টি বাংলা সাহিত্য পত্রিকা মেলে, নিঃসন্দেহে অমৃত তার মধ্যে অন্যতম। ধরতে পারেন, জন্মলগ্ন থেকেই অমৃতকে আমি নাড়াচাড়া করছি। অমৃতের বাল্যাবস্থায় দেখেছি বাংলা সাহিত্যের দিকপাল লেখক ও সমালোচকবৃন্দ তাঁদের বিভিন্ন স্বাদের রচনাসম্ভার দ্বারা এই পত্রিকাকে পুষ্ট করতেন। কি ছোট গল্প, কি ধারাবাহিক উপন্যাস, কি প্রবন্ধ, কি ফিচার রচনা—প্রত্যেকটি লেখাই কেবল সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হত না, জোগাত চিন্তার খোরাকও। এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক-মণ্ডলীর ভেতর সম্ভবত ছিলেন সর্বশ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, পরিমল গোস্বামী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্র মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, পশুপতি চট্টো-পাধ্যায় এবং অজয় বসু প্রভৃতি। এঁদেরই নিরলস প্রচেষ্টায় অমৃত পত্রিকা আজ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে বাংলায় তো বটেই বাংলার বাইরেও বাঙালী ও অবাঙালী সকলের কাছেই সমভাবে আদৃত। শুধু তাই-ই নয়, কলকাতার এক নামী সাপ্তাহিকের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে অমৃত আজও তার জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। যতিহীন এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ইদানীং অমৃতের পটপরিবর্তন হয়েছে। লক্ষ্য করছি, এই পত্রিকার ওপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল যে সন্তোষজনক হচ্ছে না তা অনেক পাঠকের চিঠিতে প্রতিফলিত হচ্ছে। ক্ষোভের সঙ্গে জানাই, যে তরুণ লেখক-গোষ্ঠীর হাতে বর্তমানে অমৃত পত্রিকা পরিচালিত হচ্ছে তাঁরা সবাই 'পিঠ চুল-কানো সমিতির' সদস্য। এঁদের ভেতর বৈকুণ্ঠ পাঠক নামধারী এক অপরিণত মস্তিষ্কের লেখক হলেন দলের পাণ্ডা। ফি হপ্তায় অমৃতে ফিচার সাহিত্য নামে ইনি যা পরিবেশন করেন তাকে একমাত্র বটতলা-মার্কা রচনার বেশি সম্মান দেওয়া যায় না। এঁর প্রায় রচনাই পুনরাবৃত্তির দোষে

দুষণীয়। অধিকাংশ রচনাতেই ইনি বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য কীর্তির কথা প্রচার করেন এবং হাবে-ভাবে বলতে চান, বাঙালী পাঠক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনেন না কিংবা তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত নন। জানি না, এই প্রচার বিভূতি-পুত্র তারা-দাসের কাছ থেকে লেখা আদায়ের ফিকির কিনা। এছাড়া, তিনি আবার বিশেষ কয়েকজন তরুণ লেখককে তাঁর ফিচারে এমন তোয়াজ মাঝে মাঝে করেন, যা নিছক ভাঁড়ামির পর্যায়ে পড়ে। এ বিষয়ে অমৃতের অনেক পাঠক পত্রাঘাত করেছেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠবাবু নির্বিকার। এ স্থলে উল্লেখ করলে বোধ হয় অসমীচীন হবে না যে, এই অমৃত পত্রিকাতে আমরা জৈমিনি এবং অন্যান্য লেখকের ফিচার পড়েছি। কিন্তু সেই সব ফিচারের সঙ্গে বৈকুণ্ঠ পাঠকের ফিচারের কোন তুলনা করা যায় কি? অমৃতের বনেদি পাঠকরা তার বিচার করুন।

সম্পাদক মহাশয়, পরিশেষে অনুরোধ করছি, আপনি এই বৈকুণ্ঠ পাঠককে সংযত করুন। এঁর লেখাগুলোকে কঠোরভাবে সম্পাদনা করুন। তা না হলে আশঙ্কা হচ্ছে, 'অমৃতের জয়যাত্রার ব্যাঘাত ঘটবে, পাঠক-সংখ্যা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হবে এবং এই পত্রিকার শেষের সেদিন হবে ভয়ংকর। জানি, এ চিঠি প্রকাশের সৎ সাহস আপনার 'পিঠ চুলকানো সমিতির' সদস্যদের হবে না। তবে অমৃতের প্রতি নস্টালজিক মনোভাবের তাগিদই এই চিঠি লেখার প্রেরণা আমাকে যুগিয়েছে।

প্রমথেশ ভট্টাচার্য
ভুবনেশ্বর, ওড়িশা

ভালো লাগছে

গত দু মাস থেকে অমৃতের যে বিস্ময়কর পরিবর্তন, তাতে আমরা সত্যিই লাভবান। চাওয়ার ইচ্ছায় যদি ঐকান্তি-কতার অভাব না থাকে তাহলে মানুষ বোধ হয় কিছু পায়। আমরা, পাঠকরা, সাহিত্য-প্রেমীরা অমৃতের কাছে অনেক কিছু চেয়ে-ছিলাম—চাওয়ার মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। তাই আমরা, তরুণেরা আনন্দিত। অমৃত নানা তথ্য, নানা রসের রচনা প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি অনুবাদ গল্প প্রকাশ করে আপনি আমাদের অন্য ভাষার স্বাদ পেতে সাহায্য করেছেন। আপনাকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ।

ধীরেন্দ্রনাথ গরাই
কেন্দুয়াবাজার, কুলটি, বর্ধমান।

পরিতৃপ্ত

গত কয়েক সংখ্যা ধরেই অমৃত নিত্য নতুন স্বাদের আস্বাদ নিয়ে আসছে। অমৃতের পাঠক হিসেবে এটুকু পরিবর্তন ভাল লাগছে। কিছু সংখ্যক পাঠক অমৃতের ছাপার গণ্ডগোলের কথা বলেছেন। আমি নিজেও একথা ভেবেছি। ভীষণ অস্পষ্ট ছাপা। লাইনগুলো বেঁকা, খুব খারাপ লাগত। কিন্তু গত কয়েক সংখ্যাতে সে গণ্ডগোলের সংখ্যা একটু একটু করে কমেছে। অর্থাৎ সব দিকেই পরিবর্তন।

গত ৮ জুলাই সংখ্যা অমৃত অমৃতের স্বাদ দিয়েছে। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা। বৈকুণ্ঠ পাঠকের সাহিত্য বিভাগ। সন্দীপ মুখোর্জির গল্প। সুশান্তকুমার মিত্রের প্রবন্ধ। সবই সুন্দর। সবই ভাল।

এটুকু বলতে পারি, এবার অমৃত পড়ে আমি একজন পাঠক হিসেবে পরিতৃপ্ত এবং পরিপূর্ণ।

প্রবীর ভট্টাচার্য
কুলটি।

চেষ্টা করে দেখতে পারি

আপনি অমৃত পত্রিকাটিকে নতুন রূপদানের প্রয়াসে এমন একটি স্তরে এনে ফেলেছেন যে, প্রত্যেক সপ্তাহে অমৃত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পাঠক-পাঠিকা শপথ করে ফেলেন 'আর অমৃত পড়ব না'।

আপনার বোধ হয় ধারণা জন্মেছে যে, অভিনব একটি গল্পের নাম (ততোধিক অভিনব লেখকের নাম) এবং তার সঙ্গে লেখার মধ্যে দুর্বোধ্য কিছু এলোমেলো চিন্তার বহিঃপ্রকাশের নাম আধুনিকতা।

৮ জুলাই ১৯৭৭-এর সংখ্যায় 'কবিতা লিখতে লিখতে' কবিতাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না — শুধু এইটুকু বুঝলাম কবিতা লিখতে লিখতে কবি শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী কবিতা নামক বস্তুটির প্রথম অংশে 'খয়েরি', 'আকাশ', 'জানলা', 'হাঁড়িকাঠ', 'লক্ষ লক্ষ মুখ' এবং দ্বিতীয় অংশে 'আগুন', 'সঙ্গীত', 'শহর', 'কবিতা', 'আক্রোশ', 'প্রকৃতি' এই কটি শব্দ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যতবার লেখা যায় ততবার লিখেছেন। প্রথম অংশে যখন কবি দেখলেন যে 'খয়েরী', 'হাঁড়িকাঠ', 'আকাশ' প্রভৃতি শব্দের কম্বিনেশন দ্বারা আর কোন নতুন লাইন রচনা করা সম্ভব নয় অথচ কবিতাটি মাত্র আধ পাতা হয়েছে তখন তিনি নতুন কতকগুলি শব্দ (যেমন দ্বিতীয় অংশের 'আগুন', 'প্রকৃতি', 'শহর' 'কবিতা' 'আক্রোশ' ইত্যাদি) চয়ন করে তাদের মধ্যে দিয়ে নতুন কতকগুলি লাইন তৈরি করলেন এবং সেই সঙ্গে তৈরি হল একটি আধুনিকতম কবিতা। আপনারা কি কবিদের নির্দেশ দিয়েছেন যে এক পাতা কবিতা না হলে ছাপা হবে না।

আপনার অমৃত পত্রিকা পড়ে সাহিত্যের সংজ্ঞা দেওয়া যায় 'সাহস করে যা-লেখা যায় তাই সাহিত্য'—আর কোথাও ছাপা হোক না হোক আধুনিকতম অমৃত পত্রিকা নিশ্চয়ই ছাপবে—অতএব মাভৈঃ—যা খুশী হয় লেখ। কিছু না পাও গুণী সাহিত্যিকের বিভিন্ন সময়ের অসংলগ্ন কতকগুলো স্বপ্নের কথা পর পর লিখে যাও—তাও চলে যাবে।

আপনি কি এখন দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বসেন? কোন কোন ওজনের লেখার কি কি রেট যদি পরের বারে পত্রিকায় একটা লিস্ট দিয়ে দেন তাহলে আমরাও একটু গল্প লেখার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

জনৈক পাঠিকা

ভুল ডায়াগনসিস

আমি অমৃত পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকাটিকে বড় ভালবাসি। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এই পত্রিকাটির সিলেকশন আমার মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। অনেক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, ও মাসিক পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের বাজারে প্রতিদিন ভিড় করছে। তাদের উন্নত ও আধুনিক প্রথার সিলেকশন দেখলে বড় আনন্দ হয়, আর ঠিক তার উল্টো অমৃতের সিলেকশন যা দেখলে মনটা বেদনায় ভরে ওঠে। মনে হয় আপনাদের সিলেকশন অথরিটি অতি আদিম যুগের মানুষ। যখন সবাই এগোচ্ছেন তখন আপনারা পিছিয়ে যাচ্ছেন। অমৃতের শুরুতে যে জয়যাত্রা দেখেছি বর্তমানে সেটা পরাজয়ের গ্লানিতে ক্লান্ত। আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অমৃতকে নতুন সাজে সজ্জিত করে আনতে হবে। তার জন্য চাই প্রকৃত অর্থে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রাজনৈতিক নেতাদের মতামত, সিনেমা, ফিচার, সম্পাদকীয় মন্তব্যে সুস্পষ্ট বক্তব্য কোন পক্ষ না নিয়ে। বর্তমান সব কিছুই অত্যন্ত নীচু স্তরের এবং অর্থহীন বিষয়-বস্তুতে ভর্তি হয়ে আছে।

বৈকুণ্ঠ পাঠককে আমার অনুরোধ প্রশংসায় ফেটে পড়বার মত এমন কিছু আহামরি ব্যাপার হচ্ছে না যা নিয়ে পাড়া মাথায় করছেন। বেশী চিৎকার করবেন না, ওতে চিঁড়ে ভিজবে না—বুঝলেন মশাই! সাহিত্যিক হিসাবে যা দায়িত্ব তাই পালন করলে আমরা বাধিত হব। শ্রীতারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন দাস, ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় আমার নাম হোলচু, 'পাগলদের কথা শ্রীমতী বোলান গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কে আপনার অতি পরিচিত। এই সমস্ত লেখক যা খুশি লিখছেন আর আপনি এঁদের হয়ে প্রশংসায় ফেটে পড়ছেন। আচ্ছা আপনারা সম্পাদকীয় মন্তব্য অমৃতের পড়েন? ওই মন্তব্যগুলি কি দশম মানের নয়? আপনার টেস্ট আসলে আধুনিক সাহিত্য পত্রিকা করার পক্ষে নয়। যে গল্প ও প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলি পড়ার উপযুক্ত নয়। আসলে আপনাকে স্পেশালিস্ট দিয়ে দেখাতে হবে। আগে যে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন, তিনি ভুল ডায়াগনসিস করছেন: কবিদের ছবি দিয়ে জীবনী যেভাবে প্রচার করছেন তাতে ওই সব কবি আপনার সাহায্য পেয়ে কালে কালে মহাকবি হয়ে যাবেন। ওঁদের বইও প্রচুর বিক্রী হবে, বলুন! কবি কালিদাসের কথা মনে আছে যে ডালে বসেছিলেন সেই ডালটিই কাটছিলেন এত পণ্ডিত ছিলেন। আপনিও তাই। অদ্ভুত আপনার আবিষ্কার।

কুমারী তটিনী রায়,
মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

ভালো লেখা চাই

১৩ মে প্রকাশিত বৈকুণ্ঠ পাঠকের মহাকাল মেলের প্যাসেঞ্জার লেখাটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা নিশ্চই এত নাবালক নন যে, মনভোলানো রঙীন চকচকে কাগজে মোড়া টফির মত অফসেটে ছাপা খাদ্য (অখাদ্য) হাতে তুলে দিলেই খুশী হবেন?

আসলে ভাল লেখা চাই। মনের মত লেখা। নবীন-প্রবীণে মিলিয়ে সুষম লেখা ও রেখায় সমৃদ্ধ 'অমৃত' পাঠকদের সে মনোবাসনা পূর্ণ করেছে।

অতএব, তাতে যদি কিছু ছাপার ভুল থাকে হোক না তা ছিমছাম সাদামাটা.. ক্ষতি কি?

সুশান্তশঙ্কর দাস,
সালকিয়া, হাওড়া-৬।
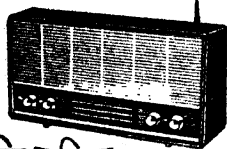
সমালোচনা

সম্পাদক কি করে লেখক হন ?

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে 'প্রবন্ধ' যে দুর্বলতম শাখা তাতে কোনোই সংশয় নেই। তার দুটি কারণ। প্রথম কারণ, বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের দেরি, যার ফলে গদ্যজাত মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিতেও দেরি ঘটে যায়। আর, মৌলিক সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদির জন্ম না-হলে, আলোচনার জন্ম হতে পাবে না। দ্বিতীয় কারণ, নবজাগরণের উষালগ্নে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যতটা থাকে, আলোচনা-সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা নিশ্চয়ই ততটা থাকে না। বিশেষত যে-দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম এবং যথার্থ শিক্ষিত আরো কম, সে-দেশে মৌলিক সাহিত্যের নগদ বিদায়ের অঙ্ক যে আলোচনা-সাহিত্য থেকে অনেকগুণ বেশি হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ক্ষমতাবান লেখক অর্থের কাঙাল যদি-বা না হন, যশের তো বটেই। অতএব প্রবন্ধ সাহিত্যের দারিদ্র্যের স্বাভাবিক কারণ কল্পনীয়। অবশ্য এ-দুটি ছাড়াও আর একটি অপ্রিয় সত্য কারণ আছে। বাঙালীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে বড় লোভ, তাই ইংরেজীতে লিখে নাম কিনতে গিয়ে অনেকেই না পেয়েছেন আকাংক্ষিত যশ, না বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সমৃদ্ধি।

এতৎ সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে রামমোহন থেকে স্বর্ণকুমারী দেবী পর্যন্ত অনেক সুসাহিত্যিক ও সুপণ্ডিত লেখক আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে প্রবন্ধ সাহিত্যের অনুশীলন ও চর্চা করে গেছেন। এই অনুশীলন ও চর্চার ক্ষেত্রে সুনাম ও সুযশ লাভের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা একটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে যুক্তি পরম্পরায় সহজ ও সরল প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর তাগিদই ছিল বেশি।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযোজনায় শ্রীনীলরতন সেন বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথম যুগের কতগুলি প্রবন্ধ সংকলিত করেছেন 'বাংলা প্রবন্ধ সংকলন' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি মূলতঃ সাহিত্য ও ধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধের উপরই জোর দিয়েছেন বেশি। যদিও লিখিতভাবে বলেছেন 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক' প্রবন্ধ। সংস্কৃতি কথাটার অর্থ ব্যাপক। ধর্ম অবশ্যই এর মধ্যে পড়ে। তবে ধর্ম যদি পরিমাণে বেশি থাকে, তাকে ধর্ম বলাই ভাল। সংস্কৃতির নাম দিয়ে অযথা ধোঁয়া সৃষ্টি করবার মানে হয় না। বিশেষত যখন সংকলনের 'সংস্কৃতি বিষয়ক' অংশে 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' 'হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তি' 'রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম বিষয়ক মত' 'ধর্ম ব্যাখ্যা' ইত্যাদি নামে বিখ্যাত লেখকদের লেখা রয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এককালে অমরেন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সমালোচনা সাহিত্যের প্রবন্ধ সংকলন বেরিয়েছে। এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবনত অবস্থা। বাংলার নবীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লুপ্ত খ্যাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রকাশনার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে পারেন, বাঙালী হিসেবে অবশ্যই সেই বিশ্ববিদ্যালয় ও সম্পাদকের জন্য গর্ব অনুভব করবার বিষয় আছে।

সাহিত্য বিষয়ক প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুলিখিত ও মৌলিক চিন্তাজাত। আজকের দিনে ইংরেজি 'কোটেশান' কণ্টকিত প্রবন্ধের লেখকদের রোগ নির্ণয় ও আরোগ্য লাভের উপায় এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে নিহিত আছে। এই অর্থে কৌতূহলী পাঠক এবং উন্নতিকামী প্রাবন্ধিকের এই লেখাগুলি একাধিকবার পড়ার প্রয়োজন আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' যদিও যথার্থ অর্থে প্রবন্ধ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না, তবু সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির পক্ষে এমন অপরিহার্য রচনা আজো বাংলা ভাষায় লিখিত হয়নি। বাক্য গঠনের নিপুণতা ও শব্দ ব্যবহারের অনিবার্যতা লক্ষ্য করে যে-কোন আধুনিক লেখক এখনও মাথা নোয়াবেন।

দীনবন্ধু সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাঁর বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র দুটি অভাবিত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এক, সমালোচনা করতে বসে বন্ধুর ঢাক পেটাননি। দুই, সমসাময়িক একজন লেখক সম্পর্কে এতটুকু সাবজেক্টিভ হননি, বিন্দুমাত্র ঈর্ষা-কাতরতার মেঘ দেখা যায়নি। আশ্চর্য নির্লিপ্তি নিয়ে লিখেছেন 'দীনবন্ধুর এই দুটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল ও স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি ... আমি ইহাও বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে।' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা প্রায় একশ' বছর বাদেও দীনবন্ধুর বিচারে এর অধিক কিছুই বলতে পারেননি।

রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' যখন থেকে সংকলিত (সেকাল) সামাজিক পরিচয় সূত্রের এক অসাধারণ রচনা। যেমন অসাধারণ রচনা ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 'এক অপরিজ্ঞাত কবি'। বিহারীলালের দুর্বোধ্যতাকে তিনি অবশ্যই খণ্ডন করতে পেরেছেন। পনেরটি সাহিত্য আলোচনা বিষয়ক রচনা ও সতেরটি সংস্কৃতি বিষয়ক রচনার ঐশ্বর্যে গ্রন্থটি যে মূল্যবান হয়ে উঠেছে, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। তবে, দুটি ত্রুটি ভীষণভাবে চোখে লেগেছে। (১) গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্যে অযত্ন লক্ষিত হয়েছে দুদিক থেকে। প্রথমত, খুব বেশি ছাপার ভুল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে এটা অমার্জনীয়। দ্বিতীয়ত অন্য সংকলনে স্থান পেয়েছে এমন দু'তিনটি প্রবন্ধের পুনঃ সংস্থান। সম্পাদক কি বলতে চান যে ১৮০০ থেকে ১৯০০ মধ্যে অপ্রকাশিত ভাল কোনো প্রবন্ধের সন্ধানই তিনি পেলেন না ?

অথবা বইটা প্রকাশে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত লুপ্ত হয়েছিল। তাই তিনি বইটির 'লেখক' না 'সম্পাদক' নিজেই তা স্থির করতে

পারেননি। যতদূর মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্পাদনার ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠায় আমাদের কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছেন গ্রন্থটির 'লেখক' হিসেবে। তা না হলে কি করে 'লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ'—এইরকম বড় হরফের ছাপার তলে নিজের লেখা বই-গুলোর নাম দিতে পারলেন?

যিনি 'লেখক' ও 'সম্পাদক'-এর পার্থক্য বোঝেন না, তিনি যত কম সম্পাদনা করেন ততই মঙ্গল।

অমল মুখোপাধ্যায়

বাংলা প্রবন্ধ সংকলন (প্রথম খণ্ড)। সম্পাদক : নীলরতন সেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। দাম পঁচিশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের গান

রবীন্দ্রনাথের গানের সুরবিকৃতি থেকে মাঝে মাঝেই প্রশ্ন ওঠে। আর তখন এ সব ব্যাপারে 'পণ্ডিত ব্যক্তিরা' কলম যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সাধারণ পাঠক, যাঁরা রবীন্দ্র সঙ্গীতের শ্রোতাও বটে, তাঁরা এই সব বিতর্কে কতটা কি পান, সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। তাছাড়া যে কোন শিল্পকর্মে ব্যাকরণ আবশ্যিক হলেও স্তরভেদে শেষ পর্যন্ত ব্যাকরণের তত্ত্বজালই একমাত্র সত্য নয়। কোন একটি গানে সুরের চলনে পর্দা ঠিক ঠিক লাগছে কিনা, রসের বিচারে তা কি অতি আবশ্যিক বিচার্য বিষয়? মনে হয় না। আসলে গানটি শ্রোতার মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো, আদৌ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারল কিনা, বিচারের ভারটা গিয়ে পড়ে তার উপর।

রবীন্দ্রনাথের এক একটি গানের একাধিক স্বরলিপির অবস্থিতিই বিতর্কের সূচনা করেছে—কোনটি প্রামাণ্য? এই নিয়েই কিরণশশী দে তাঁর 'রবীন্দ্র সঙ্গীতে প্রামাণ্য সুর প্রসঙ্গ' বইটিতে আলোচনা করেছেন। বইটির নানা পর্ব। গোড়ায় ৩০ পৃষ্ঠা ধরে আছে প্রকাশকের বক্তব্য, অবতরণিকা, লেখকের নিবেদন। এই সব পার হয়ে এলে আবার প্রস্তাবনা এবং তার পর সূচীপত্রের নানা অধ্যায়, শেষে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্রের সারসংক্ষেপ অবশেষে পাদটীকা। এইভাবে বইটির সামনে ও পেছনে বিস্তর তথ্য। মাঝখানেও ঘটনার ঘনঘটা ১৩৭৪ সাল থেকে ১৩৭৭ সাল পর্যন্ত। খুব জটিল ব্যাপার। এই জটিলতার মধ্যে গেলে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সহজ সৌন্দর্য আর কতটুকু সহজে মিলবে? সেই জন্যই বলছিলাম, বইটি সাধারণের জন্য নয়। বাদ-প্রতিবাদ, নানা জনের মত-অমত কত কী সুন্দরভাবে এই বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, লেখক কিরণবাবু আসলে উত্তম সম্পাদক। সম্পাদনার কাজে তাঁর কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথের গানের সুর নিয়ে বিকৃতি চলছে। বিশ্বভারতীর অপরাধ তাতে কম নয়। কিন্তু কিরণবাবু কি বলতে চান? তিনি বলতে চান, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং কবি অনুমোদিত স্বরলিপিই প্রামাণ্য, 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রামাণ্য সুরের জন্য আমাদের সব সময় রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রামাণ্য স্বরলিপিটিই সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু ভেজাল স্বরলিপি নয়।' এই সত্য? আর এর জন্য এত তর্কজাল?

অমিতাভ চক্রবর্তী

রবীন্দ্র সঙ্গীতে প্রামাণ্য সুর প্রসঙ্গ : কিরণশশী দে। গান্ধর্বী। ছ' টাকা।

ভ্রমণ

বইটি নির্ভেজাল ভ্রমণকাহিনী—এটা নিশ্চিত। কেননা হালের রেওয়াজ অনুযায়ী—কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এক-জন সুন্দরী নায়িকার আমদানী করে ভ্রমণকারী ওরফে নায়কের সঙ্গে পথিমধ্যে মিলন ঘটিয়ে, জমিয়ে দিয়ে ভ্রমণকাহিনীকে ভ্রমণোপন্যাসে পরিণত করার লোভটা লেখক সামলাতে পেরেছেন। তবু ভ্রমণকাহিনীর কাহিনী ভাগের সরসতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। বিভিন্ন দিকে হালের জাপানকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন লেখক, আকর্ষণীয়ভাবেই। আর মাঝেমধ্যেই বর্তমানের মধ্যে এসেছে ইতিহাস। জাপানের ইতিহাস। এবং তাও হাজির করেছেন লেখক যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সঙ্গেই।

উদয় সূর্যের দেশ নিপ্পন—শঙ্করপ্রসাদ রায়। ইলোরা প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স। কলকাতা—১৯। দশ টাকা।

কবিতা

চুয়াল্লিশটি কবিতার সংকলন। সবগুলো নয়, তবে বেশ কয়েকটাই—'পড়তে ভালো লাগাটাকে পুরো অক্ষুণ্ণ রেখেই একা একা একটানা মৃদু-আবৃত্তিতে পড়ে যেতে পারা যায়। আমি পেরেছিলাম। দুম্ করে এইটা মুড়ে রাখতে হয়নি।—এটা হয় সোজা কবিতাগুলির মূলগত সরল, [illegible] সবল স্বাদের জন্যেই। (তোমার বাড়ি, কেমন করে, বাতিল...)। কয়েকটি কবিতার সামান্য প্রতীকির মধ্যে দিয়ে মানুষের মনের গভীর-তর গভীরতম প্রদেশকে উপস্থাপনা, কিছুটা হয়ত বিস্মিত করে। (আর একবার, সবল কর—)। —' আর একটা 'ক' লিখে দিবি? ম্যাগো দেখিস এবার আমি কিছুতে আর ঘাবড়াবো না।' এরকম 'টাচি' উজ্জ্বল সব লাইন অনেক কবিতাতেই ছড়িয়ে থেকে কবিতাগুলোকে 'ভালো কবিতা' হতে সাহায্য করেছে। তবে কয়েকটি কবিতা একেই 'কাবিক সারহীন' বলে মনে হয় ওগুলোকে এ সংকলনে ঠাঁই না দিলেই তো হত!

গৌতম ভট্টাচার্য

জোনাক জ্বলে—ভক্তি দেবী। শঙ্খ প্রকাশনী। পাঁচ টাকা।

মতান্তর

বিমলানন্দ শাসমল

একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার 'মতান্তর' কলমে সম্প্রতি শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছেন তা থেকে বোঝা যায় আমাদের দেশের কিছু তথাকথিত বিদগ্ধ লোক কিভাবে বিকৃত মতবাদের প্রচার করে বিকৃত মনোবৃত্তির সৃষ্টি করছেন। বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রটি এইসব বিকৃত মতবাদ প্রচারে সহায়তা করছে কারণ আমার সবিস্তার প্রতিবাদপত্র তাঁরা ছাপতে অস্বীকার করেছেন।

নীরদবাবুর বক্তব্য এই যে, আজ যে পশ্চিম বাংলায় মার্কসবাদী সরকার গঠিত হয়েছে তার মূলে আছে উত্তরাপথ ও বাঙালীর মধ্যে চিরাচরিত শত্রুতা এবং এই সূত্র ধরে নীরদবাবু বহু বিকৃত ও অসত্য তথ্য পেশ করে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

নীরদবাবু ভুলে গেছেন যে, আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিতেরা নেশন-বাদের শিক্ষা পেয়েছেন ইংরেজের লেখা বই পড়ে। সামাজিক বিবর্তনের স্বাভাবিক পথে এই নেশন-বাদ এদেশে গড়ে ওঠেনি যেমনটি উঠেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে। সেই কারণে ইংরেজ শাসনে দেশ সংগঠিত হবার পর শুধু উত্তরাপথ ও বাঙালীর নয়—উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্য, এমনকি দাক্ষিণাত্যও উত্তরাপথ এবং একদিকে বাঙালী অন্যদিকে ওড়িয়া, বিহারী ও আসামবাসীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব ছিল। শুধু উত্তরাপথ ও বাঙালীর মধ্যেই দ্বন্দ্ব ছিল আর ভারতের অন্য প্রদেশগুলি 'এক জাতি, এক প্রাণ, একতা'য় বাঁধা হয়ে চিরদিন বাস করতেন একথা ভাবা ভুল, লেখা আরও ভুল।

নীরদবাবু লিখেছেন গান্ধীজী ও বাঙালীর নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে বৈরিতা ছিল এবং চিত্তরঞ্জন হঠাৎ মারা না গেলে কংগ্রেসের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক কি দাঁড়াতো বলা শক্ত। এর কিছুই সত্য নয়। চিত্তরঞ্জন প্রথমে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে পরে অসহযোগে যোগ দেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তা অনেকেই জানেন না। চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্য ছিল গান্ধীজীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে দেশে গণ-আন্দোলন করালেই চৌরি-চৌরার মতন ঘটনা ঘটবে তাই কাউন্সিলে গিয়ে সাংবিধানিক পথে সংগ্রাম করাই বিধেয়। গান্ধীজীও অচিরেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে কি করে নিজের মুখ রক্ষা করে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া যায় সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগটা করে দিলেন তখনকার গভর্নর লর্ড লিটন। ১৯২৪ সালের ২৪ অকটোবর তিনি সুভাষচন্দ্র, অনিলবরণ রায়, সত্যেন্দ্র মিত্র এবং আরও একশত বিপ্লববাদী কর্মীকে গ্রেপ্তার করলেন। খবর পেয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই গান্ধীজী কলকাতায় চিত্তরঞ্জনের কাছে ছুটে এলেন। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে কয়েকদিন আলোচনা চলল। এক জনসভায় গান্ধীজী ঘোষণা করলেন : 'আমি ভরসা দিচ্ছি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু শীঘ্রই ফিরে এসে কর্পোরেশনের কার্যভার গ্রহণ করবেন।' (ইংরেজীর অনুবাদ)

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আলোচনার পর ৬ নভেম্বর এক যুক্ত ঘোষণায় গান্ধীজী অসহযোগের ত্রি-বর্জন নীতি প্রত্যাহার করে নিলেন। ত্রি-বর্জন নীতি ছিল আইন-সভা, আদালত ও সরকারী স্কুল-কলেজের বিরুদ্ধে। চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে, আদেশ বললেও ভুল হবে না, এই ঘোষণায় গান্ধীজী একটি অসত্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। অসত্যটি এই : ঐ ঘোষণায় গান্ধীজী লিখেছিলেন : 'বর্তমানের সরকারী দমন-নীতি কোনো হিংসাপন্থী সংগঠনকে ধ্বংস করবার জন্য নয় পরন্তু স্বরাজ্য দলের বৈধ ও সাংবিধানিক আন্দোলনকে ধ্বংস করবার জনাই প্রযুক্ত হয়েছে।' (ইংরেজীর অনুবাদ) অথচ, সকলেই জানেন, সুভাষচন্দ্র তাঁর কর্পোরেশনের মাইনের মাসিক দেড় হাজার টাকা থেকে অর্ধেক টাকা একটি বিশেষ বিপ্লবীদলকে সাহায্য করতেন এবং কর্পোরেশনের চাকুরী ও কন্ট্রাকট ইত্যাদি দিয়ে বহু বিপ্লববাদী কর্মীর জীবনসংস্থানের ব্যবস্থা করতেন। [illegible] দলের আর্থিক সাহায্যের স্রোত [illegible] রুদ্ধ করে দেবার জন্যই লর্ড লিটনের [illegible] সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে [illegible] মান্দালয়ে পাঠিয়ে দেন। অন্যান্য [illegible] সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সেদিন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই বিপ্লববাদী দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অসত্যটি এই : গান্ধীজী ওই ঘোষণায় লিখেছিলেন যে, কংগ্রেস ও রাজনৈতিক সম্মেলন সমেত অন্যান্য উপলক্ষে খদ্দর ব্যবহারের প্রয়োজন নেই এবং যাঁরা চরকা কাটার বিরোধী তাঁরা অপরের হাতে-কাটা ২000 গজ সুতো কংগ্রেস অফিসে জমা দিলেই সেটা তাঁদের দেয় মাসিক চাঁদা হিসাবে গ্রহণ করা হবে।; এটা চিত্তরঞ্জনের পক্ষে মিথ্যা ছিল না কারণ, প্রথমতঃ রাজনীতিতে তাঁর কাছে দুর্নীতি বলে কিছু ছিল না এবং দ্বিতীয়ত তিনি চরকা ও খদ্দরের ঘোর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে ছিলেন। এই ঘোষণায় গান্ধীজী আরও বলেছিলেন : ' দেশের যোগ্যতম ব্যক্তিরা যখন আইন-সভার মাধ্যমে দেশের প্রগতি আনতে চান তখন আইন-সভাগুলিকে কার্যকরী করে তোলাই আমাদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।'
(ইংরেজীর অনুবাদ)

এই ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন উত্তরাপথের দুই দিকপাল—উত্তরপ্রদেশের মতিলাল নেহরু ও গুজরাটের বিঠলভাই প্যাটেলকে

নিজের বশে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বরাজ্যদল প্রতিষ্ঠা করে চিত্তরঞ্জন হলেন সভাপতি এবং মতিলাল ও বিঠলভাই তাঁর অধীনে সম্পাদক। নীরদবাবুর প্রতিপাদ্য উত্তরাপথের সঙ্গে বাঙালীর চিরবৈরিতা সত্ত্বেও উত্তরাপথের এই দুই দিকপাল বাঙালী চিত্তরঞ্জনকে নেতা বলে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেন নি।

১৯২৫-এর ২ মে ফরিদপুরে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন: 'পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদার হয়ে স্বরাজলাভের (অর্থাৎ ডোমিনিয়ন স্টেটাসের) আদর্শ আমার কাছে মহত্তর বলে মনে হয়।' (ইংরেজীর অনুবাদ)! এবং এই সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন দুটি শর্তে: সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে এবং গভর্নরের শাসনাধীন বিষয়গুলি মন্ত্রিদের শাসনাধীন করে দিতে হবে। কিন্তু এতে বিপ্লববাদী কর্মীরা চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তাঁকে সভা-মণ্ডপ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তখনকার কংগ্রেস সভাপতি গান্ধীজী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন: 'চিত্তরঞ্জনের অভিমতই কংগ্রেসের অভিমত' (ইংরেজীর অনুবাদ)। The Bengalee লিখেছিলেন,

> "But for the presence of Mr. Gandhi Faridpur would have been the political grave of Mr. C. R. Das."

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর ১৯২৫-এর ১৯ জুলাই গান্ধীজী স্বরাজ্য দলের নতুন সভাপতি মতিলাল নেহরুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন: 'চিত্তরঞ্জন প্রদর্শিত স্বরাজ্য দলের কর্মপন্থাই কংগ্রেস পুরোপুরি গ্রহণ করবে' (ইংরেজীর অনুবাদ)। উত্তরাপথ ও বাঙালীর মধ্যে চিরাচরিত এক অলীক দ্বন্দ্বের কথা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নীরদবাবু গান্ধীজী ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে যে বৈরিতার কথা বলতে চেয়েছেন তা তাঁর নিজের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত।

নীরদবাবু লিখেছেন, তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে ও সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করেন। নীরদবাবু বহুদিন শরৎ বসুর সেক্রেটারী ছিলেন, কাজেই সুভাষচন্দ্র যে গান্ধীজীকে অবজ্ঞা করতেন সেকথা নীরদবাবুই ভালো জানেন। কিন্তু গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে অবজ্ঞা করতেন একথা অসত্য। গান্ধীজী বহুবার লিখেছেন: "Subhas Babu is a born leader" আগেই বলেছি, ১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হবার পরই গান্ধীজী কলকাতায় ছুটে আসেন এবং গভর্নমেন্টের দমননীতির সঙ্গে লড়াই করবার জন্য অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে আইন-সভার মাধ্যমে সম্মিলিত সংগ্রামের জন্য চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন।

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সামরিক পোশাককে ব্যঙ্গ করে গান্ধীজী একটি বিলিতি সার্কাসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন বলে নীরদবাবু যা লিখেছেন তা সর্বতোভাবে অসত্য। গান্ধীজী অবশ্য লিখেছিলেন: 'স্বেচ্ছা-সেবকদের বিদেশী পোশাক খুব দৃষ্টিকটু লেগেছে' (ইংরেজী থেকে), কিন্তু যেজন্য তিনি ২৮-এর কলকাতা কংগ্রেস Pillars Circus -এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন সেটা এই যে, কংগ্রেস মণ্ডপের পাশেই আমোদ অনুষ্ঠানের জন্য এক বায়বহুল রঙ-মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল এবং তার জন্য দায়ী ছিলেন গান্ধীজীর দুই বিশেষ প্রিয়পাত্র, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সম্পাদক বিধান রায়। সুভাষচন্দ্রের নামে নীরদবাবু এর মধ্যে মিথ্যে টেনে এনেছেন। তবে গান্ধীজীর চটবার আসল কারণ গান্ধীজী নিজেই ব্যক্ত করে ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: 'এই কংগ্রেসে ডেলিগেট নির্বাচন পদ্ধতিটি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল। ডেলিগেটরা সকলেই ছিলেন স্ব-নির্বাচিত। এক টাকার ডেলিগেট টিকিট পোনেরো টাকায় বিক্রী করা হচ্ছে ছিল।' (ইংরেজী থেকে)।

গান্ধীজী যে জওহরলালকে এত ভাল-বাসতেন তার কারণ প্রথমে অনেক কিছু বলেও শেষে গান্ধীজীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতেন। ১৯৩৮-এ সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি করার পর গান্ধীজী ভেবেছিলেন সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় জওহরলাল হবেন। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি হবার পর সুভাষচন্দ্র দাবী করলেন, ইংরেজ সরকারকে ছ' মাসের চরমপত্র দেওয়া হোক ভারত পরি-ত্যাগ করবার জন্য এবং ইংরেজ রাজী না হলে আন্দোলন আরম্ভ করা হোক। ৪২-এ গান্ধীজী এই চরমপত্রই দিয়েছিলেন। কিন্তু ৩৮-৩৯এ গান্ধীজীর অনুচরেরা সুভাষ-চন্দ্রের বিরোধিতা করেন, কারণ, তাঁদের মতে, দেশময় স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা গান্ধীজী ছাড়া আর কারও থাকতে পারে এ তাঁরা ভাবতে পারেন নি। আসলে ওটা ছিল বাপুক্রেসির সঙ্গে বাপুক্রেসির ঝগড়া—দুই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ। এখানে উত্তরাপথ ও বাঙালীর শত্রুতার কথা টেনে আনা ভুল। সুভাষচন্দ্র বাঙালী না হয়ে অন্য কোনো প্রদেশের নেতা হলে তাঁর সম্বন্ধে গান্ধীজীর অনুচরেরা একই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

নীরদবাবুর মতে গান্ধীজীর বাঙালী বিদ্বেষের আসল কারণ হচ্ছে বাঙালীরা চিরদিন armed rebellion -এর ভক্ত। পাঞ্জাবে গদর পার্টি ও মহারাষ্ট্রের বহু নেতা ও কর্মী সশস্ত্র বিদ্রোহের আদর্শকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছিলেন—একমাত্র বাঙালীরাই armed rebellion -এর স্বপ্ন দেখতেন একথা সত্য নয়। বাঙালী হিংসাপন্থী কর্মীদের বিদ্বেষ না করে গান্ধীজী তাঁদের কত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন তার দুটি উদাহরণ দেবো। ৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহের সময়ে মেদিনীপুরের দাসপুরে 'সত্যাগ্রহী'রা বোমা-পিস্তল ব্যবহার না করে থানার দারোগাকে খড়ের গাদায় পুরে আগুন দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। গান্ধীজী কখনও কোথাও এর নিন্দা করেন নি। ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কর্তারা ৬৫টি নরহত্যা করেছিলেন। তমলুকের বিভিন্ন জায়গায় এই ৬৫জনকে হত্যা করা হয়েছিল জাতীয় সরকারের বিরোধিতা করা বা ইংরেজ সরকারের পক্ষে কাজ করার জন্য নয়। ধনী ব্যক্তিদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হোতো, এবং তাঁদের মুক্তি দাবী করে প্রচুর অর্থ চাওয়া হোতো। টাকা পেলে মুক্তি দেওয়া হোতো, না পেলে হত্যা করা হোতো। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে গান্ধীজী মহিষাদল সফরে গেলে হত ব্যক্তিদের আত্মীয়রা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি যেন এই পাইকারী নরহত্যার নিন্দা করে তাঁদের একটু সান্ত্বনা দান করে যান। কিন্তু গান্ধীজী এই পাই-কারী নরহত্যার নিন্দা করতে অস্বীকার করেন। বক্তৃতায় বলেছিলেন

> "The people have shown great bravery although there was some highhandedness amongst them."

(অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩১-১২-৪৫)

গান্ধীজী যে বাংলায় কংগ্রেস ও প্রজাপার্টির কোয়ালিশন হতে দেননি তার

কারণ, নীরদবাবুর মতে, গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে ধ্বংস করা। এখানেও নীরদবাবু সত্যকে বিকৃত করেছেন। বাংলার নেতা শরৎ বসু, ফজলুল হকের প্রজাপার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন করবার একটি অকংগ্রেসী ও অবাস্তব প্রস্তাব করেছিলেন। কংগ্রেস চিরদিন ছিল ধনতন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রের সমর্থক। আগেকার দিনে বিশেষ করে গান্ধীযুগ শুরু হবার পর থেকেই জমিদারের ছেলে না হলে বা প্রচুর নগদ টাকা যোগাড় করবার বা খরচ করবার সামর্থ্য না থাকলে কাউকে কংগ্রেসের দায়িত্বশীল পদে বসানো হোতো না।

এর একটি উদাহরণ দেবো। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মেদিনীপুরের সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের ছেলে ছিলেন এবং ব্যারিস্টারীতে দু পয়সা রোজগার করতেন। তিনি যখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন তখন চিত্তরঞ্জন তাঁকে ডেকে এনে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক করলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বীরেন্দ্রনাথ যখন কপর্দকহীন হয়ে পড়লেন তখন চিত্তরঞ্জন তাঁকে কংগ্রেসের সকল দায়িত্বশীল পদ থেকে এমনকি কার্যনির্বাহক সমিতি থেকেও সরিয়ে দেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পঞ্চশিষ্য—বিধান রায়, শরৎ বসু, নলিনী সরকার, নির্মল চন্দ্র ও তুলসী গোস্বামী তাঁর সঙ্গে শত্রুতাবশত তিনি যেন প্রাদেশিক আইন সভাতেও ঢুকতে না পারেন তার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস মনোনয়ন দিয়ে প্রার্থী দাঁড় করান নাড়াজোলের ধনী কিন্তু অর্ধ-শিক্ষিত জমিদার দেবেন্দ্রলাল খাঁকে এবং নির্বাচনে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করেন। অথচ এই দেবেন্দ্রলাল খাঁ তখন লর্ড লিটনের মনোনীত মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সরকারী চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছিলেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ শাসমল যখন আবার ব্যারিস্টারী আরম্ভ করে কলকাতায় বাড়ি গাড়ি করতে সক্ষম হলেন তখন তাঁর পুরাতন শত্রু বিধান রায় তাঁর প্রতিনিধি নলিনী সরকার, তুলসী গোস্বামী, কিরণশংকর রায়কে বীরেন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে প্রস্তাব করেছিলেন যে কংগ্রেস এখন তাঁকে মনোনয়ন দিতে প্রস্তুত।

প্রজাপার্টির সকলেই ছিলেন দরিদ্র পরিবারের ছেলে—নেতা ফজলুল হক দুবারের দেউলিয়া। জমিদারতন্ত্রের সমর্থক কংগ্রেসের সঙ্গে দরিদ্রজনের প্রজাপার্টির কোয়ালিশন কি করে সফল হোতো এবং এই কোয়ালিশন কি করে বাঙালীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতো নীরদবাবু তা ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু গান্ধীজী বুঝেছিলেন তেলে জলে যেমন মিশ খায় না তেমনই জমিদারতন্ত্রের সমর্থক কংগ্রেসের নেতা শরৎ বসুর সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের সমর্থকদের কোয়ালিশন অচিরেই ভেঙ্গে যাবে। আসামে স্যার মহম্মদ সাদুল্লার সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন সম্ভব হয়েছিল কারণ স্যার সাদুল্লা ধনী জমিদার ছিলেন।

সত্য কথা বলতে কি এ ব্যাপারে গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র সকলেই এক সূত্রে গাঁথা ছিলেন। ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন পাশ করবার জন্য সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিধান রায় প্রভৃতি ৪২ বার গভর্নমেন্টের পক্ষে খানু ইংরেজ আই সি এস-দের সঙ্গে একযোগে ভোট দিয়েছিলেন। তাঁদের সমর্থনে পাশ করা এই আইনে চাষী-বর্গাদারদের চিরদিনের জন্য জমিদারদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল।

নীরদবাবুর উল্লিখিত যে-তিনজন লোকের অভিমত নিয়ে গান্ধীজী প্রজাপার্টির সঙ্গে কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিড়লা ছিলেন ভারতের ধনতন্ত্রের ও পুঁজিবাদের অন্যতম ধারকবাহক, নলিনী সরকার পুঁজিবাদের আজন্ম দালাল আর আবুল কালাম আজাদ, বিড়লার অর্থসাহায্যে যাঁর ভরণপোষণ চলতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো। আগাগোড়া জমিদারতন্ত্রের সমর্থক কংগ্রেসের সঙ্গে প্রজাদলের পার্টির অবাস্তব কোয়ালিশন বাধা দিয়ে গান্ধীজী বাঙালী ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছিলেন একথা বলা কতখানি নির্বুদ্ধিতার কাজ তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারতের নারী আঁতোয়ানেৎ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ। তিনি এমার্জেন্সির প্রাবল্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের হাত থেকে রাজনৈতিক তুলাদণ্ডটি কেড়ে নিয়ে সেটি তুলে দিয়েছেন দেশের চাষী-শ্রমিক খেটে-খাওয়া মানুষের হাতে। পশ্চিম বাংলার চাষী শ্রমিক খেটে-খাওয়া মানুষ আজ মার্কসবাদীদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে এইজন্য যে কংগ্রেসের (দুই কংগ্রেসের) নিকট থেকে তারা এতদিন পেয়েছে শুধু ভাঁওতা। পশ্চিম বাংলা ও ভরতের ভবিষ্যৎ এই চাষী শ্রমিক খেটে-খাওয়া মানুষের হাতে। চাষী-শ্রমিক খেটে-খাওয়া মানুষের কাছে উত্তরাপথ ও বাঙালীর দ্বন্দ্ব নেই। উত্তরাপথ-বাঙালীর মধ্যে তথাকথিত দ্বন্দ্বের ভাঁওতায় দেশের সাধারণ মানুষ পড়বে না এইটাই ভরসা।

শ্যামল রায়

মিসা ১৯৭৩

॥ ৩ ॥

শিশুর মত হাসিমুখের সেই ভদ্রলোক বললেন, 'কিছুক্ষণ ঝুলুক।' উলঙ্গ ছেলেটি আকাশের দিকে পা, মাটির দিকে মুখ নিয়ে ঝুলতে লাগলো। অফিসারটি নড়ে-চড়ে বসলেন। হাই তুললেন। 'এভাবে হবে না। নিয়ে এসো।' কনেস্টবল আর তার সঙ্গের লোকটি বাইরে বেরিয়ে গেল। ইন্সপেকটর চশমা-পরা ছেলেটিকে বলল,—কি বল তো ?

—জানি না।

—একটু অপেক্ষা কর দেখতে পাবি।

একজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে কনেস্টবলটি ঘরে ঢুকলো। তার হাতে দুটো মোটা বেতের লাঠি। লাঠি দুটোর একদিক লাল চামড়া দিয়ে উচু করে বাঁধানো। বেশ দেখতে। নতুন অফিসারটি উলঙ্গ ছেলেটির কাছাকাছি চলে এলেন। দোলা তখন বন্ধ হয়েছে। মায়েরা যেভাবে সন্তানকে দোল দেয়, হাসিমুখের ভদ্রলোকটি ছেলেটিকে সেইভাবে আবার দুলিয়ে দিল। ছেলেটি যেন ঘুমিয়ে আছে। নিশ্চিন্তে দোল খাচ্ছে মায়ের। একবারও জাগছে না। আমি লক্ষ করলাম ওর গুহ্যদ্বার ফুলে আছে। রক্তে ঢেকে আছে মুখ। আমি চীৎকার করে উঠলাম।

—কি হল।

আমি চীৎকার করে উঠলাম। কে যেন বলল,—ওকে বাইরে নিয়ে যান। আমি ঘরের কোন দেয়াল দেখতে পারছিলাম না। মাটির নীচ আর আকাশের সীমার কোন ব্যবধান আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সামনের সব-কিছু দুলছে। অস্পষ্ট প্রচ্ছায়ার মত দুলছে। মানুষ কি কোথাও বেঁচে নেই ? আমাকে কয়েকজন এসে ধরল। নতুন অফি-সারটি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমাকে এক গ্লাস জল দেওয়া হল। আমি জল মুখে নিয়ে খেতে পারলাম না। ফেলে দিলাম। অফিসারটি বললেন, খেতে না পারলে থাক। এদিকে তাকান। আমি তার দিকে তাকালাম। বললেন,

—দেখেই নেশা ধরে গেল ?

আমি তার দিকে আবার তাকালাম। অফিসার একটা ইঙ্গিত করলেন। ওরা আমাকে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর পাশের ঘরে। বেশ বড় ঘর। চারখানা বড় বড় টেবিল, বেশ কিছু চেয়ার শূন্য হয়ে পড়ে আছে। ঘরে কেউ নেই। পাখা ঘুরছে হু-হু করে। আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হল। আমি বসে রইলাম। যে দুজন আমাকে ধরে নিয়ে এসেছিল, তারা পাশাপাশি আমার কাছে বসল। কিছু বলল না। বসে রইল। একজন বেশ মোটা, ময়লা, মাথায় টাক। বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ। পরনে শার্ট আর একটা ধুতি। পায়ে ছেঁড়া চপ্পল। দেখে মনে হল, পৃথিবীতে এসে তিনি খুব বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আর একজন মাঝারি, বেঁটে, ফর্সা। আনুমানিক ত্রিশ বছর বয়স। একটা বুশশার্ট আর চোঙাপ্যান্ট পরে আছে। পায়ে সাধারণ জুতো। কয়েক বার ঘার ডাইনে বাঁয়ে নাড়িয়ে আমার দিকে একবার তাকালো। ঘড়ি দেখলো। ক্লান্তি আর কর্তব্যের যুগল ছায়া তার মুখে খেলা করতে থাকে।

পাশের ঘরে কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম না। কিছুক্ষণ পর একবার চেয়ার টানার শব্দ হল। একজন চশমা পরা ছেলেটিকে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলো। নতুন লোক। একে আগে কখনো দেখিনি। ছেলেটিকে আমার পাশে বসিয়ে একটা চিরকুট ওদের কাছে দিয়ে সে চলে গেল। ওরা দুজনেই চির-কুটটা দেখলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সময় কত হয়েছে। ঘড়ি-পরা ছেলেটি বলল,—

—সময় দিয়ে কি হবে ?

—কিছু নয়।

—চুপ করে বসে থাকুন।

আমি চুপ করে বসে থাকি। চশমা-পরা ছেলেটি আমার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসে। পাশের ঘরে চীৎকার শুনতে পাই। তারপর কিছু শব্দ। হাত-পা ছাটিয়ে ফেলার শব্দ। একবার চীৎকারের মধ্যে সে শব্দ ডুবে যায়। আবার সেই শব্দের মধ্যে চীৎকার ডুবে যেতে থাকে। একটানা সাইরেন বাজতে থাকে বুকের ভিতর। আমি চোখ বুজে সেই শব্দ শুনতে থাকি। উলঙ্গ ছেলেটা দুলছে। বৃষ্টির মত লাঠি পড়ছে। ছেলেটা বাঁচবে তো ? চশমা-পরা ছেলেটি আমার একটা হাত ধরে আছে। শক্ত নির্মম হাত। চীৎকারের মধ্যে শব্দ ডুবে যেতে থাকে। আমার মনে হয়, কোথায় যেন ঘণ্টা বাজছে। বিলম্বিত লয়ের ঘণ্টা। বুকের ভিতর সাইরেন থেমে যায়। সেই মতন ভদ্রলোকটি আমাদের ঘরে ঢুকলেন। বললেন, আপনারা ওই ঘরে চলুন। আমরা উঠে দাঁড়াই তারপর হাঁটতে থাকি। পাশের ঘরে ঢুকেই আমার মনে হল, এ-ঘরে কেউ নেই। যে যার মত নিশ্চুপ পাথর হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই অফিসারটি বললেন,

—কোথায় ছিলেন।

—পাশের ঘরে।

—শব্দ শুনেছেন ?

—হ্যাঁ।

—কি মনে হল ?

আমি চুপ করে থাকি।

অফিসারটি এবার চশমা-পরা ছেলে-টিকে ডাকলেন। উলঙ্গ ছেলেটিকে দেখিয়ে বললেন,

—ওর চুল ছেঁড়।

আমি ছেলেটিকে দেখছিলাম। ওকে নীচে নামানো হয়েছে। হাতের পায়ের বাঁধন খোলা হয়েছে। টানটান হয়ে শুয়ে আছে মেঝের ওপর। কিন্তু সারা শরীরে কোন রক্ত নেই। ছেঁড়াফাটা শরীর নিয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু রক্ত নেই। অফিসারটি আবার বললেন,

—ওর চুল ছেঁড়।

চশমা-পরা ছেলেটি দাঁড়িয়ে থাকে।

—ছিঁড়বি না, তবে দেখ।—বলে হাসি-মুখের ভদ্রলোকটিকে বললেন,—দেখিয়ে দিন। হাসি নিয়ে ভদ্রলোক ছেলেটির দিকে এগিয়ে যায়।

ছেলেটি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। হাসি-মুখের ভদ্রলোকটি বললেন,—গলার জোর অনেক বাড়িয়েছিস। এবার আমাদের সঙ্গে দু-একটা কথা বল। কিরে বলবি না।

ছেলেটি চীৎ হয়ে শুয়ে থাকে। ঘরের চারদিকে আমি তাকালাম। অফিসারটি চেয়ারে বসে আছে। ইন্সপেকটর তার পাশে দাঁড়িয়ে। নতুন অফিসার একটু দূরের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। দুজন কনস্টেবল পিছনে হাত রেখে, ঘাড় গুঁজো করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথার ঠিক ওপরে গান্ধীজীর ছবি। হাসি-মুখ। নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত দুটো মুখের কাছে তুলে আছেন। ছবির পাশে কয়েকটি রেপ্রেক্সের দাগ। কাঠাল-ধরা দেয়াল। জান-

দিকে কোণের কিছু অংশ ভিজে আছে। হাসি-মুখের ভদ্রলোক উলঙ্গ ছেলেটির চুলের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর তুলে আনলেন। ছেলেটি নড়ে উঠলো। চোখ তুলে তাকাল।

—কি রে বল। কথা বল।

ছেলেটি তাকিয়ে আছে। অর্থহীন দৃষ্টি। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো কে কোথায় আছে। চোখ দুটো শুকিয়ে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে নিজেকে খুব অসহায় বলে মনে হল। কি করতে পারি আমি। —কি ?

চশমা-পরা ছেলেটি আমার মুখের দিকে চোখ তুলে নামিয়ে নিল। বৃষ্টি-ভেজা কাঁচের নীচে আগুন যেভাবে খেলা করে, সেইভাবে খেলছিল ওর চোখ। আমার চোখ দুটো জ্বালা করছিল, বুকের ভিতর থেকে কি যেন সরে যাচ্ছে।

একজন নতুন লোক ঘরে ঢুকলেন। হাতে একটা চিরকুট। তিনি অফিসারটির হাতে চিরকুটটি দিলেন। অফিসার দেখলেন। ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

—কি রে বল। মুখে সেই হাসি। নিপুণ হাতে তিনি চুল তুলছেন। ছেলেটি নড়ছে-চড়ছে। ওপরে পাখা ঘুরছে। কোথাও কোন শব্দ নেই।

অফিসারটি ফিরে এলেন। হাতে একটা ফাইল। তিনি খুঁজেপেতে কিসব দেখলেন। কিছু কাগজ আলতো করে আলাদাভাবে রাখলেন। উলঙ্গ ছেলেটি চোখ বন্ধ করে আছে। কোন সাড়া নেই। ইনস্পেকটর এগিয়ে এলেন। বসলেন। হাসি-মুখের ভদ্র-লোকটিকে কি-যেন বললেন। তারপর দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। অফিসারের সঙ্গে ওঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নতুন অফিসারটি বসে রইলেন। দাঁড়িয়ে রইল দুই কনেস্টবল। চশমা-পরা ছেলেটি এতক্ষণ আমার হাত ধরে ছিল। ছাড়ল।

—বসুন। দাঁড়িয়ে কেন ? নতুন অফিসারটি বললেন।

—কাকে বলছেন ?

—আপনাদের।

আমি বললাম—ও।

—ও কি, বসুন।

আমি উলঙ্গ ছেলেটির দিকে তাকাই। নতুন অফিসারটিকে বলি,—ও ওইভাবে শুয়ে আছে কেন ?

—দেখলেন কি এতক্ষণ ?

—কিছু দেখিনি। ও ওইভাবে শুয়ে আছে কেন ?

—ঘুমোচ্ছে।

আমি মনে মনে ভাবি। এ কোন্ ঘুম ! যে ঘুমে কেউ জেগে ওঠে না। যে ঘুমের পর কেউ ঘুমোয় না। সুখ দুঃখ জীবন ছেড়ে যে ঘুম ঘুমাতে থাকে। সেই ঘুম।

এইভাবে সময় চলে যায়। অফিসারটি পা নাড়তে থাকেন। সময় চলে যায়। কিছু-ক্ষণ পর হাতে একটি বোতল নিয়ে একটি লোক এল। অফিসারটি যে টেবিলে বসে আছেন, তাঁর ওপরে রাখলো। একটা রঙিন লেবেল-আঁটা মদের বোতল।

নতুন অফিসারটি কনেস্টবল দুটিকে বললেন,

—খাইয়ে দাও।

—কাকে, স্যার ?

—আমাকে।

কনেস্টবল দুটির মুখে লজ্জায় হাসি ফুটে উঠলো। বোতলটি নিয়ে এগিয়ে গেল উলঙ্গ ছেলেটির দিকে। একজন মুখ হাঁ করে ধরল। অপরজন ঢেলে দিল খানিকটা। ছেলেটির মুখ থেকে মদ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। আমার মনে হল, এদের সব আছে। হাসি, লজ্জা, রাগ, মদের বোতল। অসীম আনুগত্য আর কর্তব্য বোধ।

নতুন অফিসারটি বললেন,—থাক। চলে এসো।

কনেস্টবল দুটি উঠে এল।

—কোথায় রাখবো স্যার ?

—আমার মাথায়।

একজন কনেস্টবল টেবিলের ওপর বোতল রাখে। অফিসারটি বোতলের গায়ে হাত বোলাতে থাকেন।

—চলে নাকি ? আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, —কি চলে ?

বললাম—না।

—তাহলে এর কি হবে ? বলে, বোতলটি শূন্যে তুলে ধরলেন। দোলাতে লাগলেন। আমি উলঙ্গ ছেলেটির দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

—রাখো ওই কোণে। দেখো ভাঙে না যেন।

কনেস্টবলদের নড়াচড়ার শব্দ পাই। একজন উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসে। জুতোর শব্দ। বোতল রাখার শব্দ শুনতে পাই।

অফিসার ঘরে এলেন। কনেস্টবল দুটিকে বললেন,—ওদের বাইরে নিয়ে যাও। আমি পা ফেলি। উলঙ্গ ছেলেটির দিকে একবার তাকাই। চশমা-পরা ছেলেটি দাঁড়িয়ে থাকে।

—দাঁড়িয়ে কেন ? ওদের সঙ্গে যান।

আমরা হাঁটতে থাকি। ঘরের দরজা পেরিয়ে যাই। আমরা পাশের ঘরে চলে আসি। এ সেই ঘর যেখানে আমরা কিছুক্ষণ ছিলাম।

—বসুন ওখানে। একজন কনেস্টবল চেয়ার দেখিয়ে দিল। আমরা বসলাম। ওরা দাঁড়িয়ে রইল। একজন বিড়ি বার করল। আর একজনকে দিল। যে নিল, সে আগুন জ্বালালো। যে দিল সে আগুন নিল। সমস্ত ব্যাপারটাই খুব ছন্দবদ্ধ—সুরেলা। এদের কাজে ছন্দ পতন হয় না। সুর কাটে না। কবিতা বা সংগীতের, সংযম বা বিস্তার এদের সব কাজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমরা চারজন চার ঘন্টা বসেছিলাম। নতুন কিছু ঘটেনি। সেই মেয়েটি আর উলঙ্গ ছেলেটিকে আমরা আর দেখিনি। যা ঘটে, তা সুখে বা দুঃখে দেখা যায়। শোনা যায়। কিন্তু যা এখনো ঘটেনি তাকে দেখতে পাওয়া, শুনতে পাওয়ার মত মর্মান্তিক সুখ আর দুঃখ অন্য কিছুতে নেই। এখন অন্য কিছু আর কি হতে পারে ? অন্য কিছু বলে, এখন আর কিছু নেই। আমরা কিছুক্ষণ আগে ফিরেছি। লক-আপের ভিতর যে যার মত শুয়ে আছে। বসে আছে। অনেক পরিচিত মুখ নেই। অপরিচিত মুখ দেখতে পাচ্ছি। হরিবাবু শুয়ে আছেন এক কোণে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। হাত দুটো অসহায়ভাবে দু পাশে তোলা। আমি হাসলাম—গাঁজার ব্যাপারী। সমস্ত দিক একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। অস্পষ্ট আলো। ঝিমুনি
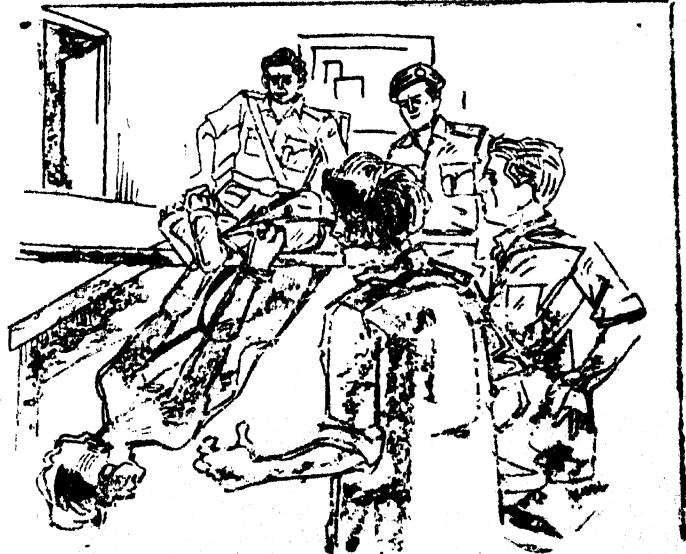
আসে। দেয়াল ঘিরে কি সব ঘুরে বেড়ায়। ওপরের ঘুলঘুলিতে জাল জমেছে। হাওয়ায় ফেটে গিয়ে এক অংশ ছিঁড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। পাশের বাড়ির আলো ঘুলঘুলি দিয়ে ঢুকে সারা ঘরময় ছড়িয়ে যাচ্ছে। কোথায় দূরে, কে ডেকে উঠলো। পাশের বাড়িতে সুখী গৃহস্থ খেয়ে উঠে ঢেকুর তুললেন। একটা বাসনপত্র পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। রাত এখন কত? আমি জামা খুলে মাথায় দিয়ে খালি মেঝের ওপর শুয়ে পড়লাম। কোথা থেকে যেন ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। আমার শীত শীত করছিল।

বুকের কাছে হাত নিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করি। ঘুম আসে না। চশমা-পরা ছেলেটি শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা বোঝা গেল না। হয়তো নয়। ওর বুকে এখন অনেক ক্ষত। রক্ত ঝরছে সবগুলো থেকে। আমি নিজের ক্ষতে হাত দিয়ে ভিজাতে থাকি। ঘুম আসে না। কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে উঠে পড়ি। লক আপের বাইরে তাকাই। একজন কনেস্টবল ভারী বুট নিয়ে ঘুরছে। আজ সারাদিন কিছু খাইনি। সেই ওখানে যা খেয়েছিলাম। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে পেট নেই। খেতে চাইতে সংকোচে বাধে, দ্বিধা হয়।

লক-আপের ভিতর একটু দূরে, কোণে কি একটা কাগজ পড়ে ছিল। আমি উঠে গিয়ে সেটা তুলে নি। সিনেমা পত্রিকার টুকরো কাগজ। একদিকে একজন অভিনেত্রীর ছবি। অপর দিকে কিছু লেখা। কোন উপন্যাসের অংশ। আমি অংশটুকু পড়ে ফেলি। ভালো লাগে। কয়েকবার পড়তে থাকি। ভালো লাগে। অভিনেত্রীর মুখ দেখি। ভালো লাগে। আমি কাগজটা সযত্নে মুড়ে হাতের মুঠোয় ধরে থাকি। দূর থেকে ট্রেনের হুইসেল ভেসে আসে। শান্টিং-এর শব্দ ঘুরতে থাকে দেয়ালে দেয়ালে। লক-আপের কাছে কার ছায়া দেখতে পাই। কে একজন এসে দাঁড়ালো। হাতের মোড়ানো কাগজ লক-আপের দিকে ঢুকে বাজাল।

'হেই!'

আমি বললাম....'কে?'

'এখানে কেউ এসেছে?'

'কখন?'

'কিছুক্ষণ আগে?'

হ্যাঁ। আমরা।

খাওয়া হয়েছে?

বললাম, না।

লোকটা লক-আপের ওপর কাগজের একটা গুঁতো মেরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এল।

'ক-জন?'

দু-জন। আমি বললাম।

'আগে বলেন নি কেন?'

'জানা ছিল না।'

'এ-সব জানতে হয়। এখন খাবার পাবেন কিনা বলতে পারছি না। চেষ্টা করবো।' বলে, সে চলে গেল। লোকটিকে খুব সহানুভূতিশীল বলে মনে হল। এত রাতে একের বেশী শব্দ কেউ উচ্চারণ করে না। ও অনেক শব্দ বলেছে। আমাদের জন্য। খাবার আসছে শুনে বেশ লাগছে। ভাবলাম চশমা পরা ছেলেটিকে ডেকে দি। ওর দিকে তাকিয়ে হাত উঠলো না। ঘুমিয়ে আছে। ঠিক যেভাবে উলঙ্গ ছেলেটিকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছিলাম, সেইভাবে ঘুমিয়ে আছে। হরিবাবু পাশ ফিরে শুলেন। কিছুক্ষণ পা চুলকে উঠে বসলেন। দু-হাতে কাপড়ের সামনের দিকটা আলগা করে ধরে উঠে গেলেন ঘরের কোণের দিকটায়। একটু বিচলিত হয়ে তিনি উঠে গেলেন।

আমি মুখ ফিরিয়ে নি বাইরের দিকে। উঠে গিয়ে বসি লক-আপের গায়ে গা লাগিয়ে। আমাদের উল্টো দিকে, একটু পাশে মেয়েদের লক-আপ। ওখানে আলো একটু বেশী। লক-আপ ফুঁড়ে আলো বাইরে এসে ঠিকরে পড়েছে। বারান্দার ওপর লক-আপের ছায়া জ্যামিতিক আকারে বিমূর্ত রূপ নিয়েছে। কে যেন পায়চারি করছে ভিতরে। বারান্দার ওপর আলোর বিমূর্ত রূপ সে ভেঙে দিচ্ছিল। ডিউটির কনেস্টবল ছুটে এল। আমি ওপরে চোখ তুলে তার মুখের দিকে তাকালাম।

'এখানে কি?'

'বসে আছি।'

'এখানে কেন? ভিতরে, ভিতরে।' বলে, তার রাইফেল ঠুকে দিল মেঝেতে। ঠক্ করে একটা শব্দ হল। আমি উঠে ভিতরে গিয়ে বসি। হরিবাবু বললেন, 'কখন ফিরলেন?'

'কিছুক্ষণ আগে।'

'হাত পা দেখি।'

আমি দেখালাম।

'কিছু হয় নি তো?'

বললাম—'না।'

আমার লজ্জা করছিল। এখানে অক্ষত হয়ে ফিরে আসা যেন অপরাধ সেইভাবে মুখ তুলে তাকালেন হরিবাবু।

'তবে এতক্ষণ কি করছিলেন?'

'বসেছিলাম। দেখছিলাম।'

'কাকে দেখছিলেন?'

'আপনার সেই একান্তবের ছেলেটিকে।'

'সে তো মরে গেছে।'

আমি বললাম—'হ্যাঁ।'

হরিবাবু আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকালেন। 'তবে আপনি দেখলেন কি করে?'

আবার সেই লোকটি এল। 'হেই'

আমি বললাম, 'কে?'

সে বলল, 'নেই।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

হরিবাবু বললেন, 'কি ঠিক আছে?'

'আজ খাবো না তাই।'

'রাতে আপনি খান নি?'

'না।'

'সকালেও তো খেতে যান নি। আপনি চলে যাবার পর হোটেলের ছোকরা এসে ফিরে গেছে। এ-সব নিজেদের ব্যবস্থা করতে হয়। আপনি তো এখানে জামাই নয়।'

'হোটেলের ছোকরা মানে ?'

'যে আমাদের খাবার দেয়।'

'পয়সা কে দেবে ?'

হরিবাবু হাসলেন, 'আমন দেখে। আপনি মশাই কিছুই নন্। কি করে যে বেঁচে আছেন এতদিন।'

আমি হাসি। বলি, 'ঠিক তাই। কি করে যে বেঁচে আছি।'

'নিন্। এখন জল খেয়ে শুয়ে পড়ুন।' উনি নিজের জামা দিয়ে দু-জনের শোবার মত জায়গা পরিষ্কার করলেন। দু'দিকে হাত ঝাড়লেন।

আমি জল খেতে উঠে গেলাম। টিনের অনেক নীচে জল ছিল। সম্ভবত ময়লা। অন্ধকারে ময়লা দেখা যায় না। পরিষ্কার স্বচ্ছ জল মনে করে আমি টিন তুললাম। সবটা জল খেয়ে নিলাম। গলা থেকে বুক বেয়ে নীচের দিকে কি একটা হড়হড়িয়ে নেমে গেল।

'হল ?'

'হ্যাঁ।'

'ছিল জল।'

'হ্যাঁ।'

'আমি তো পাই নি।'

'কেন টিনে ?'

'ওতে জল ছিল না।'

'তবে ?'

'তবে যা ছিল শুনে কাজ নেই। আসুন শুয়ে পড়ি। আজ বেঁচে গেছেন। কাল কি কপালে আছে কে জানে ? শুয়ে পড়ুন।'

আমি শুয়ে পড়ি। কি খেলাম বুঝতে চেষ্টা করি না। ভুলে যেতে চাই। কিন্তু আমার সমস্ত শরীর গুলিয়ে ওঠে। আমি উঠে দাঁড়াই। দাঁড়ানো অবস্থায়ই বমি করে ফেলি। বমি ছিটকে এসে পায়ে লাগে। মুখ, গলা, পায়ের অংশ জ্বালা করতে থাকে। আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাই। হরিবাবু ছুটে এলেন। আশে-পাশের কেউ উঠে আসছে বলে মনে হয়। ভারী বুটের আওয়াজ শুনতে পেলাম।

একজন কে বলে উঠলো, 'ডাক্তার।' লক-আপের ভিতর একটা গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়। আমার দৃষ্টি অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। সমস্ত শব্দ আর কোলাহল থেকে যেন অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। পায়ের নীচে সব কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। শরীর যেন ভেসে উঠছে ওপর দিকে। আমি কিছু ধরতে চেষ্টা করি। হারিয়ে যায়। সমস্ত দৃশ্য, শব্দ, স্পর্শ আমি হারিয়ে ফেলতে থাকি।

(চলবে)

যৌথ পরিবার আজও সম্ভব ?

অমরেন্দু চক্রবর্তী

ছটা নারকেল গাছে জ্যোৎস্না ঘাই দিচ্ছে। আমার ঠাকুরদার বাড়ির এই জ্যোৎস্না আমি চিনি। একুশ বছর বয়েস পর্যন্ত বছর-ভর এই এক পূর্ণিমাই আমি দেখেছি।

জ্যোৎস্নায়-চকচকে পেতলের গাড়ুটা দোতলার চৌবাচ্চার গা-ঘেঁষে তেমনি আছে। আমার ঠাকুরদা ওই গাড়ু নিয়ে পায়খানা যেতেন। শেষ রাতে। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস।

বড় জ্যাঠাবাবুর গাড়ু গোলগাল। এখন বৈদ্যবাটিতে তাঁর নিজের বাড়িতে। যদিও তিনি বা তাঁর ছেলেরা আর গাড়ু নেন না, বাথরুমে জলের ট্যাপ আছে। তাঁর পাঁচটিই ছেলে। একজন বিদেশে, একজন হলদিয়ায়, একজন পুণায় ক্যামেরা ঘোরানো শেখে। বাকি দুজন এখনো বউ নিয়ে পৈতৃক ভিটেয়।

মেজো জ্যাঠা চন্দননগরে বাড়ি করে উঠে গেছেন।

আমি সেজোজনের একমাত্র ছেলে। গোল পার্কে ওয়ান বেডরুমের ফ্ল্যাটে স্ত্রী ও এক মেয়ে নিয়ে নির্জনবাস করি। বাবা-মা উত্তরপাড়ায় একতলা ভাড়া দিয়ে অর্ধেক-তোলা দোতলায় আকাশ ধরে ঝুলে আছেন।

ন'কাকা যাত্রার পার্ট করতেন। ঠাকুরদা মারা গেলে কাকা-জ্যাঠারা আজ ইনি কাল উনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান। ন'কাকা প্রৌঢ় বয়েসে কাকিমা ও তিন মেয়ে নিয়ে বর্ধমানে এক প্রাক্তন জমিদারের পুকুর-জমি তদারকির কাজ জুটিয়ে চলে গেছেন।

রাঙাকাকা স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক। শ্রীরামপুরেই রেল লাইনের ওপারে বাড়ি তুলেছেন। বিরাট বৈঠকখানা। তাতে একসঙ্গে অনেক ছাত্র পড়ানোর সুবিধে।

নতুন কাকাকে আমার ছেলেবেলায় পুজো-প্যান্ডেলে আফ্রিকা ও পৃথিবী আবৃত্তি করতে শুনেছি। তারপর রেলের চাকরি। ঠাকুরদার পরে খালি ঘরে তালা দিয়ে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে যান।

এগারো বছর পর আমি শ্রীরামপুরে এসেছি। ছেলেবেলার বাড়িতে। ছেলেবেলার বাড়ি মানে আমার ঠাকুরদা ও তাঁর আট ছেলের বাড়ি। ঠাকুরদার লম্বাটে গড়নের গাড়ুটা দেখলাম মণিকাকা ব্যবহার করছেন। পোস্টাপিশের কেরানি, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পৈতৃক বাড়িতেই রয়ে গেছেন। পাশেই আরেকটা গাড়ু, কমন। এখন ছোটকাকা ও তাঁর স্ত্রীর হেপাজতে। আমূল স্প্রের রংবরা টিনটা নতুন। কার লাগে ? ছোটকাকার মেয়ের ?

বড় জ্যাঠাবাবুদের পাশাপাশি দুটো ঘরেও তালা। ঝুল বারান্দায় মরা মাধবী লতার শুকনো শিরা-উপশিরা আজও দড়ি বেঁধে টেনে রাখা আছে।

সাত ঘর ছোঁয়া রাজপথের মতন যে বিরাট বারান্দায় আমরা আঠারো-কুড়িটি বালক-বালিকা দুবেলা পাঠশালা জুড়তাম, সেটার কোণে-কোণে এখন মাকড়শা-আরশোলার কলোনি। ওয়্যারিং ঝুলে গেছে। সন্ধে থেকে অন্ধকার।

একতলার বারান্দায়, ঠিক এটারই নিচে, একসঙ্গে আটাশ-তিরিশটা পাত পড়তো। এখন একটা মাত্র জিরো পাওয়ার টিম-টিম করে, না-হলে ঘরের দরজা খুঁজে পাওয়া যায় না।

এক পাশে ঝুনো নারকেলের স্তূপ। ছটা গাছের সারা বছরের নারকেল। বাগদিপাড়ার গয়ানাথ এসে নিয়ে যাবে। নারকেল-বেচা টাকা থেকে নিজেদের দু-ভাগ কেটে রেখে মণিকাকা ছ'-ভাইয়ের নামে-নামে মণি অর্ডার পাঠাবেন। প্রতি বছর পাঠান।

কিছু নারকেল আর কিছু জ্যোৎস্না নিয়ে ওই গাছ-কটাই যা আগের মতন। আর সব বদলেছে। এই বাড়ি কি সেই বাড়ি ? বাসিন্দার সংখ্যাও সাড়ে তিন। মণিকাকা, ছোটকাকা, তাঁর স্ত্রী ও একটি মেয়ে। অত বড় বাড়িতে একটি মাত্র শিশু।

আমার ঠাকুরদার নাম সূর্যকান্ত কাব্যতীর্থ। আসল পদবী চক্রবর্তী। ও রকম শুদ্ধ উচ্চারণ, স্বাস্থ্যবান হেড পণ্ডিত আমি দ্বিতীয় দেখি নি। সং হয়েও তিনি ইস্কুল থেকে রিটায়ার করে একতলাকে দোতলা করেছেন। সকাল থেকে সন্ধে

নিজে মিস্ত্রিদের সঙ্গে থেকেছেন, এক মুঠো বালি থেকে এক কণা সিমেন্ট খসতে দেন নি।

শুধু বাড়ি তৈরির ব্যাপারেই নয়, বাড়ির সব কাজেই তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান সুপারভাইজার। সব দিকে তাঁর নজর। তাঁর শাসনে তাঁর পুত্রবধূরা একটি সরষে দানার অপচয়েও সন্ত্রস্ত থাকতেন। তিলেক অপচয় তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

ঠাকুরদার একটা জেদ ছিল। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কোন ছেলের আলাদা বাড়ি তো দূরের কথা, আলাদা হেঁসেলও চলবে না। যৌথ পরিবারের লোকবলের দিকটা তাঁর কাছে খুব বড় ব্যাপার ছিল। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্ররা বংশানুক্রমে এই বাড়িতেই জীবন কাটাবে। কোন প্রতিবেশীর বাড়িতে কোন ছেলে বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে শুনলে দীর্ঘ বারান্দায় তাঁর খড়ম পায়ে পায়চারি শোনা যেত অনেকক্ষণ। তিনি তিনতলার ভিত দিয়েছিলেন।

ঠাকুমার শ্রাদ্ধে ধূপধূনোর ধোঁয়ার মধ্যে আমার বাবা-কাকা-জ্যাঠাদের আটটি মুণ্ডিত মস্তককে উদ্দেশ্য করে ঠাকুরদা বলেছিলেন আমার শ্রাদ্ধেও আমি পরলোক থেকে তোমাদের এই রকম একত্রিত দেখতে চাই। লোকবলই শ্রেষ্ঠ বল।

বলে তিনি পুত্রবধূদের দিকে একবার বিরূপ চোখে তাকিয়েছিলেন।

ভোরবেলা গরু বের করা ছিল মণিকাকার কাজ। গোয়াল ঘর থেকে বাইরের চাতালে। বাতাবিতলায়। ভোরে ঠাকুরদার সংস্কৃত মন্ত্রের সঙ্গে হাম্বা-হাম্বা আমার এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে জামাইষষ্ঠীতে এক রাতের জন্যেও মামার বাড়িতে থাকতে আমার একটু অসুবিধে হত।

মণিকাকা নিজে খড় কাটতেন, খোল ভেজাতেন। চাতালের বাঁধানো মাটির গামলায় গরুর জাবনা দিয়ে দাঁতন মুখে সোজা গঙ্গায়। তারপর বড় জ্যাঠাইমার রান্না ভাত ডাল আছের ঝোল ও মেজজ্যাঠাইমার সাজা পান খেয়ে পোস্টাপিসে।

বড়দের আপিস, ছোটদের ইস্কুল, অতএব রান্না শুরু হত শেষ রাতে। বড় জ্যাঠাইমা উনুনে ভাত চড়িয়ে রান্নাঘরের মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতেন। ভাত ফোটার শব্দে ঠিক তাঁর ঘুম ভেঙে যেত।

আলো ফুটলে তিনি রাঙাকাকার হাতে বাজারের থলে ধরিয়ে কানে ফর্দ পড়িয়ে দিতেন। রাঙাকাকা ঠাকুরদার কাছ থেকে বরাদ্দ টাকা নিয়ে বাজারে যেতেন। বাজার এলে অন্য বউয়েরা বঁটি শিলনোড়া নিয়ে বসে যেতেন। গয়লা এসে গরু দুইয়ে দিত।

জলখাবার আপিসের ভাত, ইস্কুলের ভাত, ছেলেদের টিফিন, নিজেদের খাওয়া—সব শেষ হতে-হতে বেলা আড়াইটে তিনটে।

ওবেলার রান্নার দায়িত্ব একেক দিন একেক জনের পালা করে। তখন বড় জ্যাঠাইমার ছুটি। সন্ধ্যা হতেই তিনি আমাদের আঠারো-কুড়িজনকে ডেকে নিয়ে পড়াতে বসতেন বারান্দায়। আমার ছোট দু' কাকাকে তিনিই কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। আমার মা আমাদের সকলকে ছবি আঁকা শেখাতেন তাঁর আঁকার হাত ছিল চমৎকার। হাতের লেখা সুন্দর করতে আমরা তাঁর কাছেই শিখেছি। আমার বড়দার (বড় জ্যাঠাবাবুর বড় ছেলে) ও কেতকীর (মেজো জ্যাঠার মেয়ে) হাতের লেখা দেখিয়ে আমার মা তাঁর জায়েদের কাছে গর্ব করতেন।

অসুখে বিসুখে সেবা করতে নকাকিমার জুড়ি ছিল না। শুধু তাঁর সেবা যত্নের লোভে আমি ছেলেবেলায় অনেক দিন মনে-মনে জ্বর চেয়েছি। নকাকার চাকরি ভাল লাগত না, তিনি তিনবার চাকরি ছেড়েছেন। যাত্রা করতেন বলে কাকিমাকে অনেক দুঃখ সইতে হত। বিশেষ করে ঠাকুরদাকে লুকিয়ে রিষড়ায় কি ভদ্রেশ্বরে সারারাত যাত্রা করে এসে যেদিন তিনি ভোরে ঠাকুরদার কাছে ধরা পড়ে যেতেন, সেদিন তাঁর ও কাকিমার লাঞ্ছনার শেষ থাকত না। ঠাকুরদার বকুনি তো মেঘগর্জন, শুনে আমরা ছোটর দল যে যার বিছানায় ঘুম ভেঙে ভয়ে ও উত্তেজনায় উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম। ঠাকুরদা কাকিমাকেও বকতেন, কেন তিনি আগেই ঠাকুরদাকে জানিয়ে দেন নি।

একদিন, সে-ও ভোরবেলা, ঠাকুরদা প্রাতঃকৃত্য সেরে, শুচি বসনে, পূবমুখো আসনে, উদাত্ত স্বরে স্তোত্র পাঠ করছেন, এমন সময় নিচে আরো উদাত্ত, আরো জলদ কাবুলির গলা শোনা গেল। নীলকণ্ঠবাবুকে ডাকছে। নীলকণ্ঠ ন'কাকার নাম।

ঠাকুরদা পড়েই চলেছেন, তবে খুব দ্রুত, কাবুলিটাও উত্তরোত্তর গলা চড়াচ্ছে, হঠাৎ খিড়কির দরজা দিয়ে নকাকাকে পালাতে দেখে স্তোত্র পাঠ থেমে যায়। পঁচাত্তর বছরের ঠাকুরদা সাত লাফে সিঁড়ি ভেঙে বাঘের থাবায় নকাকার ঘাড় ধরলেন।

বাড়িতে কাবলি কেন?

নকাকা ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চোখে ঠাকুরদার দিকে শুধু চেয়ে আছেন।

—টাকা নিয়ে কী করেছিস? টাকার তোর দরকার পড়ল কিসে?

নকাকার মুখে কথা নেই।

—তোর বাবা বেঁচে নেই? রোজগারে দাদারা নেই। তুই গেছিস কাবলির কাছে টাকা নিতে?

বাঁ হাতে চুলের মুঠি ধরে ডান হাতে তিনি নকাকার গালে ঠাশ-ঠাশ চড় কষাতে লাগলেন। সেদিন বড় জ্যাঠাবাবু, মেজ জ্যাঠা, আমার বাবা ও রাঙাকাকাও ঠাকুরদার চড় ঘুঁষি খেয়েছিলেন। তাঁরা নকাকাকে বাঁচাতে এসেছিলেন। মণিকাকা গরুর জাবনা মাখা হাতে ছুটে এসেছিলেন, ঠাকুরদার চড় থেকে মুখ বাঁচাতে তাঁর সারা মুখে খোল-ভুষি লেপে যায়।

নকাকা কাকিমাকে রূপোর মল কিনে দিয়েছিলেন। সে দায়িত্ব তাঁর নয়।

এমার্জেন্সি ভাণ্ডার থেকে ঠাকুরদা সেদিন কাবলির টাকা মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

নানা খাতে ঠাকুরদা আলাদা-আলাদা টাকা রাখতেন। ওষুধ ডাক্তার, অতিথি অভ্যাগত, রোববারের মাংস ও বাড়তি বাজার ইত্যাদি। সংসার খরচের জন্যে তিনি শুধুমাত্র রোজগেরে ছেলেদের কাছ থেকে তাদের আয়ের মাত্র ২৫ শতাংশ নিতেন। তাছাড়া প্রত্যেক মাসে মাথাপিছু পাঁচ টাকা নিয়ে পোস্টাপিসের ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনে রাখতেন, ভবিষ্যতে কোন নাতনির বিয়ের খরচ কম পড়লে ওই টাকা থেকে কাজ চালান যাবে। তাঁর নিজের শ্রাদ্ধের খরচ পোস্টাপিসে সুদে বাড়ছিল।

রোববার বা যে কোন ছুটির দিনে খাবার বারান্দাকে মনে হত নেমন্তন্ন বাড়ি। সেদিন বাড়ির সব বউ একসঙ্গে পরিবেশন করতেন। বড় জ্যাঠাইমা রান্নাঘরে বসে গামলায় একেকটি পদ তুলে দিতেন, আর মাছি তাড়াতেন। রাঙাকাকিমার তেমন কাজে খ্যাতি ছিল না। একটু কুঁড়েও ছিলেন। সাজতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর গানের গলা ছিল। বিয়ের আগে নাকি দুয়েক বার রেডিয়োয় অতুলপ্রসাদ গেয়েছিলেন। তিনি শুধু লেবুটা নুনটা নিয়ে যেতেন। খুব বেশি হলে জলের গ্লাস। নতুন কাকা একদিন খাবার পাতে কাঁচা রসহীন লেবু পেয়ে খাওয়া ছেড়ে উঠে যান। খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর খুব খুঁতখুঁতে মন ছিল। পরে একদিন ওই রাঙাকাকিমার হাতেই তাঁর সর্ষে দিয়ে শাক ছিঁড়ে যাওয়ায় তিনি রাঙাকাকিমাকে খোঁটা দিয়ে কথা বলেন। সেই থেকে রাঙাকাকাদের সঙ্গে তাঁর কথা বন্ধ। যেদিন রেলের চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছেন, আমি তাঁর ব্যাগ, সুটকেশ রিকসায় তুলে দিচ্ছি,

রাঙাকাকিমা তাঁর জানলা থেকে আমাকে হাতছানি দিলেন। কাছে যেতে বললেন, ও কোথায় যাচ্ছে রে?

—তুমি জানো না?

—আমাকে কিছু বলে, না জানায়। সুটকেশ-টুটকেশ নিয়ে কোথায় চলল?

—রেলের চাকরি পেয়েছে, শিলিগুড়ি যাচ্ছে।

ততোদিনে আরো অনেকেই বাড়ি ছেড়েছেন। বড় জ্যাঠাবাবু বৈদ্যবাটিতে। মেজো চন্দননগরে। আমার বাবা উত্তরপাড়ায় জানলা বসাচ্ছেন। তখনও ঠাকুরদার শ্রাদ্ধের পর বছর ঘোরে নি।

নতুনকাকা পরের বছর এসে বউ-ছেলেকে নিয়ে যান।

এই নতুনকাকাই যেদিন কাগজে তাঁর আই এস সির রেজাল্ট দেখে এসে ছোট বৈঠকখানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে উঠেছিলেন, সেদিন তাঁর সব বৌদি মিলে যেভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন তার কোন তুলনা হয় না। অনেকটা রামায়ণ-মহাভারতের যুগের মতন। ঠাকুরদা তাঁর এই আদরের ছেলেটিকে বেকার অবস্থায় বিয়ে দিয়েছিলেন, হাত খরচের টাকাও বরাদ্দ করেছিলেন, কিন্তু নতুন বউয়ের মনে বেকার স্বামীর জন্যে কোন গ্লানি জমতে দেন নি তাঁর বৌদিরাই। কোন ইন্টারভিউয়ের পর বাড়িতে পিওন এলে সবাই লাফিয়ে উঠেছেন, বুঝি নতুন ঠাকুরপোর চাকরি হলো!

সেই মন, সেই যুগ একদিন ঝরে যায়। ঠাকুরদার শেষ ক বছর ভাইয়ে-ভাইয়ে, বউয়ে-বউয়ে তিক্ততা, হাজারো খিটিমিটি রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সামান্য দুধের ভাগ নিয়েও ঈর্ষা দেখেছি। মেজো নিশ্চয়ই ওর ছেলের জন্যে আজ এক পো দুধ বেশি সরিয়েছে।—এই সন্দেহও শুনেছি। আমি কি সারা জীবন শুধু হেঁসেল নিয়েই পড়ে থাকবো। কেন, মেজো কি একদিন উনুনে দাঁড়াতেও পারে না? একবেলা বাসন মাজলে সেজোর কি ছবি আঁকার আঙুল নষ্ট হয়ে যাবে? রাঙা কী অতো গানের গলা দেখায়! দিন-ভর ছেলেদের পেছনে এমন গলা ফাটাতে হলে বেতো। বড়রই বা অত গুমর কিসের? বাবা তো দেখছি সব এই একে-একে ওর আঁচলেই বাঁধছেন। ভিমরতি।

তারপর শুরু হয় এঘরে হর্লিকস ওঘরে মাখন, সেঘরে জ্যাম-জেলি আলাদা-আলাদা বিশেষ-বিশেষ ব্যবস্থা।

ও কেন এতো কম টাকা দেবে? সে কেন বসে বসে খাবে? ও কেন সারা রাত আলো জেবলে রাখে? সে কেন সারা সন্ধ্যে বন্ধু নিয়ে বৈঠকখানা আটকে রাখে? ও কেন অত ভোরে বেরোয়, সে কেন অত রাত করে ফেরে, আমার বউয়ের অন্য কাজ নেই? এক ধরনের হীনতায় বাড়ি ম-ম করে। অশান্তিতে বাড়ি থম মেরে থাকে।

বড় জ্যাঠাবাবু একদিন ঠাকুরদাকে বললেন, আপনি এ সব বুঝতে চান না, কিন্তু ছেলেরা বড় হয়েছে, রোজ-রোজ এত অশান্তি ওরা সহ্য করবে কেন?

রাঙাকাকা একদিন বললেন, আপনি চোখ বুজে থাকেন, কিন্তু এরকম পরিবেশে মেয়েদের মানুষ করা শক্ত।

নতুনকাকা বললেন, বাবা! আপনি যদি সম্মতি দেন, আমি রেণুকে নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিই, বাড়ির সবাই যখন তা-ই চাইছে!

ছোটকাকা অনার্সে গোল্ড মেডেল পেয়ে সংস্কৃতে এম-এ পড়ছিলেন, বললেন, বস্তিতে থেকে সংস্কৃত চর্চা হয় না। তার চেয়ে পড়াশুনো ছেড়ে দোকানে খাতা লেখাও ভালো। বড়দা-মেজদারারও তো চায়, পড়া ছেড়ে যা-হোক একটা চাকরি করি। লেখাপড়া তো শুধু ওদের ছেলেদের জন্যে। বেশ, তা-ই হবে!

শেষ দিকে ঠাকুরদাও আর তেমন দাবাধাপা ছিলেন না। তাঁর পেশী শিথিল, মন ঝিমোনো, বেশির ভাগ সময় একা চুপ-চাপ বসে-বসে শুধু ভাবেন। কখনো খড়মের খট-খট শোনা যায়ব, ঘন্টার পর ঘন্টা। আগের মতোই শেষ রাতে ওঠেন, কাপড়ের খুট গায়ে দিয়ে পায়খানা যান, শুচি বসনে পূবমুখো হয়ে সংস্কৃত স্তোত্র পড়েন, বাজারের টাকা বের করে দেন। কারও বাড়ি ফিরতে দেরি হলে যথারীতি বার বার উঠে এসে খোঁজ নেন, ফিরেছে কি-না।

তাঁর ঘুম কমে গিয়েছিল। মাঝ রাতে উঠে ঘরের সামনের জ্যোৎস্না ভেঙে চৌবাচ্চার দিকে যেতে-যেতে আমি অনেক দিন শুনেছি, তিনি একা ঘরে কার সঙ্গে কথা বলছেন! অতো রাতে, একা, কার সঙ্গে? ঠাকুমার সঙ্গে কি?

ছেলেদের অনুনয় করেন, আমি বেঁচে থাকতে তোরা আলাদা হোস নি। আর তো কদিন।

তারপর খড়মের খট-খট।

মারা যাবার আগে তিনি উইল করে যান, বাড়ির কোন অংশ ভাড়া দেয়া যাবে না। বিক্রি করা যাবে না। প্যার্টিশান তোলা যাবে না।

সময়ের উলটো স্রোতে তিনি তাঁর স্বপ্নের খেয়া বাইতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন এইসব শর্তের দড়ি-দড়ায় ছেলেদের এক জায়গায় বেঁধে রাখবেন।

ওই সময়টা ঠাকুরদা ঘন-ঘন নস্যি নিতেন। ওটিই তাঁর বড় নেশা, আর দু-বেলা দু-খিলি পান। শেষ দিকে দাঁত ছিল না, নতুন কাকিমা পান থেঁতো করে দিতেন।

অতিকায় ফ্যামিলি কোথায় গেল

তখন সময়টা খারাপ যাচ্ছিল। সকাল থেকে উঠেই তাই লাট্টুর মত চারদিকে পাক খাচ্ছি। একে ওকে ধরছি—যদি একটা চাকরি কোথাও জুটিয়ে নিতে পারা যায়। কিন্তু হচ্ছিল না। মানে জুটছিল না আর কি। যাকেই ধরি ধানাই পানাই করে অনেক কথাই বুঝিয়ে দেয়; কেউ বা মিথ্যে স্তোক বাক্য দিয়ে কেটে পড়ে। তখন বুঝতে পারছিলাম, না এভাবে হবে না। এমনি কারও দয়া-দাক্ষিণ্য উড়ে এসে আমার ভাগ্যের সঙ্গে জুড়িয়ে যেতে পারে না। অগত্যা আর উপায় কি। শুরু হল উঞ্ছবৃত্তি। যা কোনদিন করিনি শেষ পর্যন্ত তাই করতে হ'ল। সকালে বিকেলে দু'দুটো ট্যুইশানি জুটিয়ে নিলাম।

সকালে যাই একটি মেয়েকে পড়াতে। মেয়েটি শান্ত এবং বিনয়ী, তাই কোন অসুবিধে হত না। কিন্তু গোলমালটা বাধল বিকেলের ট্যুইশানি নিয়ে। গোলমাল মানে ছেলেটি প্রচন্ড দুরন্ত এবং সবার আদরের। সুতরাং যা হয়—ওকে কনেট্রাল করাই মুশকিল।

করব কি, বাড়িতে গুর এক সেট গার্জিয়ান। বাবা, জেঠা মশাই, দুই কাকা, জেঠিমা, মা, দুই কাকীমা আর জেঠ-তুতো, খুড়তুতো ভাইবোনে মিলে মোটামুটি একটি সার্থক যৌথ পরিবারের ছবি। বাড়িটাও চমৎকার। কলকাতার ভিড়-ভাট্টা থেকে অনেকটা মুক্ত হয়ে একটু শহরতলীর দিকে একটা ছবির মত বাড়ি। রঙটা ইয়েলো। সামনে খানিকটা জমির উপরে ছোট বাগান। নানারকম হাইব্রীড জাতীয় গোলাপ আছে, আছে চন্দ্রমল্লিকা, জুঁই, চামেলি আর বোগেনভিলিয়ার রঙচঙে বাহার।

বাড়ির সর্বময় কর্তা অর্থাৎ জেঠা-মশাই, তিনিই ও-বাড়ির সবার উপরে। পুরুষ মহলের যে-কোন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা বা কোন প্রবলেম এরাইজ করলে তিনিই সেসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তার সিদ্ধান্তে বাড়ির অন্য কারও মনে কোন দ্বিধা বা সন্দেহ জাগে না। এমন কি দেখেছি অন্যান্য ভাইয়েরা বেশ খুশী মনেই তার মতা-মতকে গ্রহণ করেন। এমনিতে গুরু-গম্ভীর দেখালেও ব্যবহারে তিনি শান্ত। যেকোন ব্যাপারেই খুব মন দিয়ে কাউকে কোন আঘাত না দিয়ে সিদ্ধান্তে যেতে পারেন। সকালে বিকেলে বাগানের পরিচর্যা ছাড়াও মাঝখানে দুপুরের দিকে তাকে তার চাকরিটা সেরে আসতে হয় একবার। এছাড়া তিনি আর কিছু করেন না। বাকী অন্যান্য কাজের ভাগ করে দেওয়া আছে অন্য ভাইদের উপরে। যেমন কেউ বাজার, কেউ ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, কেউ বা অন্যান্য ব্যাপারের দায়িত্বে আছেন। এবং তারা তাদের মত ঠিকই ঠিকই দায়-দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই তাদের ভয়-ভক্তি করে। কোথাও যেতে হলে পারমিশান নিয়ে যেতে হয়। অবশ্য না বলে কোথাও যাবার কথা তাদের মনে আসে না। তার কারণ এই পরিবারের জেঠিমা।

আমরা যাকে অন্তঃপুর বলে জানি—সেই মহিলা-মহলের সর্বেসর্বা তিনিই। সংসারের চাবিটি তাঁর আঁচলের কোণায় সবসময় ঝুলছে। কোনটা ভাঁড়ারের, কোনটা আলমারীর, কোনটা বা আবার সিন্দুকের। হ্যাঁ টাকাপয়সা আজকাল ব্যাঙ্কে রাখা হলেও একটি যৌথ পরিবারের একটি মাসের খরচখরচার জন্য নগদ টাকাকড়ি কিন্তু তিনি সেই সিন্দুকেই রাখেন। যাতে হঠাৎ কোন অসুবিধে না হয়।

পড়াতে পড়াতে লক্ষ্য করেছি জেঠিমা বলছেন, ওরে ওটা নিয়ে আয়। কই রে শেপু তোর স্কুল থেকে ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন? তিনি যাকে বলছেন সে হয়ত তখন মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কথা নেই। কথা বলবে কি, জেঠিমার সামনে কথা বলার সাহস আছে কারও। না নেই। জেঠিমার পরামর্শ মত সংসারের খুঁটি-নাটি নিত্যকার প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সবাই তাঁকে জিজ্ঞেস করে যচ্ছে। আর হাঁটু মুড়ে বাইরে শীতল পাটি বিছিয়ে দোক্তা, জর্দা আর পানের খিলি নিয়ে জেঠিমা তখন সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে যাচ্ছেন। কোথায় হেঁসেলে কি হচ্ছে, কে স্কুল থেকে ঠিকমত ফিরছে না, কার কোন মেয়ে বড় হচ্ছে, এবার তার বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার ইত্যাদি।

শুধু তাই নয় সন্ধ্যের পরে কোন ঘরে মাস্টার মশাই পড়াচ্ছেন তাও তিনি ঠিক ঠিক চোখে রেখে যাচ্ছেন।

এমনি আমি কতদিন তার মুখো-মুখি পড়ে গেছি। তিনি আমার সুখ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ছেলে পড়ছে কিনা অথবা আমি পড়ালে আমার কথামত পড়ে কিনা সেসব ব্যাপারেও দেখেছি তাঁর চোখ এড়ায়নি। সবদিকেই উৎসাহ তার, দৃষ্টি সমান। যেমন এসব দিকে তেমনি সংসারের শোক-দুঃখ আনন্দ, বেদনায়ও দেখছি জেঠিমা সবার আগে-ভাগে দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গেই হাত মিলিয়ে সব দুঃখকে নিজের বলে মেনে নিয়েছেন। সবাইকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। দেখেছি তাতেই সংসারে হাসিমুখও ফিরিয়ে এনেছেন।

শচীন দাশ

বাড়িতে চা হতো কোনো অতিথি, কি বাড়ির কোনো জামাই এলে। সারা বাড়িতে অতোজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, আমি কোনোদিন কাউকে সিগারেট খেতে দেখিনি।

আমরা, ছোটোরো একদিন সিগারেট খেয়ে মনিকাকার কাছে শাস্তি পাই। দল বেঁধে মাহেশে রথের মেলায় গিয়েছিলাম, সেখানে ইস্কুলের কালীচরণের প্ররোচনায় দুটো কাঁচি কিনে আমরা আঠেরো-জন একটা করে টান দিয়ে খুব কেশেছিলাম। বড়োদের চেনা-জানা কেউ দেখে থাকবে, বাড়ি ফিরতেই মনিকাকার মুখোমুখি। তিনি ওৎ পেতে ছিলেন। শাস্তি ঠিক হয়, পরদিন ইস্কুল থেকে ফিরে ছাদে আমাদের বল-খেলা বন্ধ।

গরুর চাতালের বাতাবি লেবু দিয়ে ছাদে ফুটবল খেলা আমাদের বিকেলের সবচেয়ে বড়ো আনন্দ ছিলো। এখন মনে হয়, বিকেলের বিরাট ছাদটাই ছিলো আসল আকর্ষণ। এই ছাদ থেকে কতোদিন রামধনু দেখেছি। ছাদের এক কোণে মঞ্চ বেঁধে আমরা বাড়ির ছেলেরা অবাক জলপান, লক্ষণের শক্তিশেল করেছি। বড়োরা আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কাকি-জেঠিরা আমাদের সাজিয়ে দিয়েছেন। ন'কাকা হতেন প্রমপটার।

ছাদ বলতে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে পৌষসংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানো। শ্রীরামপুরে ওটাই ছিলো ঘুড়ি ওড়ানোর বড়োদিন। আকাশ ঘুড়িতে-ঘুড়িতে ছেয়ে যেতো। ঘুড়ি ওড়ানোয় বাড়ির বড়োদের উৎসাহ ছোটোদের চেয়েও বেশি ছিলো। ঘুড়ি ওড়ানো, প্যাঁচ খেলা, ঘুড়ি দিয়ে কাটা-ঘুড়ি লটকে আনার রীতি-পদ্ধতি নিয়ে তাঁদের চিন্তা, গাম্ভীর্য, নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ পুরো ব্যাপারটাকে আমাদের চোখে বেশ মর্যাদাবান করে তুলতো।

পৌষসংক্রান্তির ক'দিন আগে থেকে বাড়িতে লাটাই পালিশ করা, ঘুড়ি বানানো, সুতো কেনার হিড়িক পড়ে যেতো। তার ওপর ছিলো ছাদজোড়া সুতো মাঞ্জা দেয়ার উত্তেজনা। সবুজ বোতল গুঁড়িয়ে মিহি করা, শিরীষ ভেজানো, এইসব আয়োজনে বড়োদের সঙ্গে সারাক্ষণ আমরা সেঁটে থাকতাম। সে এক রোমাঞ্চ।

তারপর পৌষের শেষ দিনটিতে ভোর থেকে আমরা পাখি হয়ে সারা আকাশ চক্কর দিয়ে ফিরতাম। মাঝে-মাঝে নিচে নেমে নলেন গুড় দিয়ে গরম-গরম চিতুই পিঠে খেয়ে আবার আকাশে। কখনো পুলিপিঠে, কখনো পাটিসাপটাও হাত ছোঁয়ে তুলে দিয়েছি।

মা-কাকি-জ্যাঠাইমাদের সেদিন চুলে চিরুনি বোলানোর সময় হতো না। আগের রাত থেকেই শুরু হয়ে যেতো চাল বাটা, নারকেল কোরানো, রাঙা আলু সেদ্ধ করা, হরেক কাজ।

সারাদিন খড়মের খট খট তুলে সকলের পিঠে খাওয়া তদারক করে বেড়াতেন ঠাকুরদা।

খড়মের খট খট শব্দে আরেকটা বার্ষিক আনন্দের কথা মনে পড়ে। খড়ম সেখানে হারিয়ে বিষাদ ডেকে আনতো। আমাদের বাড়িতে কালীপুজোয় বাজি পোড়ানো হতো ধুম করে। বাজি মানে শুধু তুবড়ি। কাকারা প্রতি বছর তুবড়ির আরো ভালো ফর্মুলা বার করতেন। বসন তুবড়ি, উড়ন তুবড়িতে তাঁদের হাত যশ অন্য পাড়াতেও রটেছিল। মুস্কিল বাধতো ছুঁচোবাজি নিয়ে। ঠাকুরদার কড়া নিষেধ ছিলো, ছুঁচোবাজি বানানো চলবে না। কাকারা লুকিয়ে বানাতেন। আমাদের কাজ ছিলো, খড়মের খট খট শুনলেই খবরের কাগজ দিয়ে ছুঁচোর মশলা ঢেকে গা দিয়ে আড়াল করে বসা। ছুঁচো পোড়ানোও হতো লুকিয়ে-চুরিয়ে।

সন্ধে হতেই বাড়ির উঠোনে, ছাদে পর পর অনেকগুলো তুবড়ি জ্বালানো হতো। চারদিক আলোয় অলংকৃত হয়ে উঠতো। তারপর কাকারা ব্যাগে বাছাই-করা তুবড়ি নিয়ে আশপাশের প্রতি-বেশীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জ্বালাতেন। আমরা ছোটোরাও সঙ্গে যেতাম। সেই আলোর ফুলকি আমি এখনো চোখ বুজলে দেখতে পাই। বুকের চামড়ায় ছ্যাঁকা দেয়।

ভোর রাতে স্তোত্র পড়তে পড়তে ঠাকুরদা হঠাৎ থেমে যান। বাড়ির সবাই জেগে উঠে দেখেন, তাঁর মাথা পুবমুখো প্রণামের ভঙ্গিতে মাটিতে ঠেকে রয়েছে। গা ঠাণ্ডা।

তাঁর আট ছেলেকে এক ছাদের নিচে থাকার দায় থেকে মুক্তি দিয়ে ওই শেষবার তিনি আটটি মুণ্ডিত মস্তক একত্রিত দেখেছিলেন।

ধূপধুনোর ধোঁয়ায় ছোটোকাকার চোখে জল এসেছিল, পুরোহিতের উচ্চারণ শুধরে দিয়ে বললেন, আমার বাবার শ্রাদ্ধে ভুল সংস্কৃত আমি সহ্য করতে পারবো না। সময় নিয়ে মন্ত্র পড়ুন।

ছোটোকাকা এখন ওখানকার সবচেয়ে প্রাচীন বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক। কানাডায় অধ্যাপনার ডাক এসেছিল, তিনি যাননি। পৈতৃক বাড়ির বেশিটাই জরা ও উইয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে ছোটো একটা অংশে তাঁরা দুভাই থাকেন। তিনি, তাঁর স্ত্রী ও এক মেয়ে। ঠাকুরদারঘরে চিরকুমার মনিকাকা। দুজনেরই সামান্য আয়, বাড়ি সারানো স্বপ্ন দেখা ছেড়েছেন। আর কেউ তো খোঁজ নেন না।

আমি এসেছিলাম আমার মেয়েটাকে দেখাশোনা করার যদি একটা লোক পাওয়া যায়। আশপাশের চেনা-জানা কাউকে পেলে ভালো। বিশ্বাসী, নিজের লোকের মতন থাকবে। মেয়ে দেখবে। বাড়ি পাহারা দেবে। ঝি-চাকরের ওপর একটু চোখ রাখবে। আমার স্ত্রী সামনের মাস থেকে কলকাতা টি-ভিতে খবর পড়ার কাজ পেয়েছেন একা বাড়িতে বাচ্চা রেখে কাজে যাওয়া সম্ভব নয়, আবার এই দুর্মূল্যের বাজারে একার আয়ে সংসার চালানোও অসম্ভব।

ছোটোকাকা বললেন, এখানে চলে আয়।

—তা-ই কি হয়?

বলে আমি বাইরে এসে সিগারেট ধরাই। কাকাদের সামনে অনেকক্ষণ সিগারেট খেতে পারিনি।

লোকবলের বিকল্প নেই

আমার ঠাকুরদা যে তাঁর সংসারটাকে চিরকাল অখণ্ড দেখতে চেয়েছিলেন, বুক দিয়ে সব সময় ভাঙন ঠেকাতেন, তার কারণ, তিনি ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা খুব বেশি ভাবতেন। তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন। তাঁর সংসার ছিলো বিরাট, ছোটো-খাটো একটা গ্রাম বলা যায়। তাঁর ঘরে তিনি ঘরোয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংস্কৃতের পণ্ডিত, মার্কস পড়েননি, শুধু ছেলেদের প্রতি স্নেহবশে শুধু হৃদয়ের টানে সাম্যবাদকে পরিবারের ভিত্তি করেছিলেন। কম আয়, কম আহার, গরিবের এই পোড়াকপাল নিয়তি তিনি মানতে পারেননি। আয় যা-ই হোক, সকলের সমান আহার, এই ছিলো তাঁর সংসার পরিচালনায় মূল নীতি। বাড়ির শুধু আহারে নয়, সব ব্যাপারেই ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বাড়ির সকলের সমান সুযোগ। সংসার খরচ হিসেবে তিনি বড়ো জ্যাঠাবাবুর কাছ থেকে আড়াইশো টাকা নিতেন, তাঁর মাসিক আয় ছিলো এক হাজার। মনিকাকার কাছ থেকে নিতেন আঠেরো টাকা, তাঁর মাইনে বাহাত্তর। নকাকা ও নতুনকাকা যেহেতু বেকার ছিলেন, কিছুই দিতেন না। ঠাকুরদাই তাঁদের হাত খরচের টাকা দিতেন। সেটা কিন্তু বেকারভাতা নয়। শ্রমের বিনিময়ে নতুনকাকা বাড়ির উঁচুক্লাশের ছেলেমেয়েদের অঙ্কের কোচ দিতেন, আবৃত্তি শেখাতেন। নকাকা শুধু ছাদের থিয়েটারের প্রমপটারই ছিলেন না, সকালের পারিবারিক পাঠশালার তিনিই ছিলেন প্রধান গুরুমশাই। মণিকাকাকে একবার তাঁর পোস্টমাস্টার একটু কড়া ক

বলেছিলেন, প্রতিবাদে তিনি চাকরি ছেড়ে দেবেন ভেবেছিলেন। চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে সেবার তাঁর সবচেয়ে বড়ো উৎসাহদাতা ছিলেন ঠাকুরদা। তিনি বলেছিলেন, দুটো পাটনাই গাই মাসে বাহাত্তর টাকার বেশি দুধ দেবে। তোর দিশিগুলোর সঙ্গে দুটো পাটনাই পালতে পারবি না? বলিস তো খবর পাঠাই।

চাকরি অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হয়নি। পোস্ট-মাস্টারমশাই বাড়িতে এসে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

রোগব্যাধিতে টাকার অভাবে ডাক্তার ডাকা যাচ্ছে না, ওষুধ-পথ্য পড়ছে না, এটা ঠাকুরদার রাষ্ট্রে ভাবা যেতো না। ইস্কুলের মাইনে দিতে পারছে না বলে লেখাপড়া বন্ধ, ঠাকুরদার গরিব রাষ্ট্রে এমন কখনো হয়নি। তিনি গরিব হটাননি, গরিবী হটিয়েছিলেন। তাঁর সংসারে সকলেরই কম-বেশি সঞ্চয় ছিলো। ভবিষ্যতের জন্যে। এমনকী ছোটোকাকাও আমাদের সংস্কৃত পড়িয়ে মাসে পাঁচ টাকা পেতেন। চা-সিগ্রেট খেতেন না বলে পোস্টাপিশে নিজের আকাউন্টে তাঁর বার্ষিক ষাট টাকা জমতো। প্লাস সুদ। তাঁর কলেজ-ইউনিভার্সিটির খরচ চলতো স্কলারশিপের টাকায়। থাকা-খাওয়া ফ্রি, যেহেতু ছাত্র।

পুজোর কেনাকাটা? বাড়িতে ধুতি-শাড়ির গাঁটরি আসতো। শার্ট-পাঞ্জাবির ছিট, লংক্লথ, ব্লাউজের কাপড়। বচ্ছরকার গামছা। মাদুর-শিতলপাটি। পাইকাররাই বয়ে আনতো। ক'দিন এবেলা-ওবেলা বাইরের উঠোনে হাট বসে যেতো। বাছাবাছি, ফর্দ মিলিয়ে কেনা-কাটা শেষ হলে ঠাকুরদা টাকা দিয়ে দিতেন। ওই খাতের বরাদ্দ মিলিয়ে। তাঁর পারিবারিক বাজেট অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদের রচনা। বর্ষা পড়ার আগে ছাদ সারানোর খরচ, কি কালীপুজোর পরই ধুনুরির খরচটুকুও তিনি ঘরে রাখতেন। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বৌয়েদের সাধভক্ষণ, নবান্ন, বাজি পোড়ানো, পৌষের পিঠেপুলি, তাঁর বাজেট থেকে কিছুই বাদ পড়তো না।

তাঁর মৃত্যুর পরে একটি সচ্ছল সংসার অনেকগুলো অসচ্ছল সংসার হয়ে বৈদ্যবাটিতে, চন্দননগরে, উত্তরপাড়ায়, কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুরে, মুর্শিদাবাদ, বাংলার গ্রামে-গ্রামে, শহরে, সদরে এখন হাজার-হাজার টুকরো-টুকরো সংসার। বড়ো সংসার ভেঙে ছোটো সংসার। সকলের সংসার ছিঁড়ে একলার সংসার।

আমার জ্যাঠা-কাকা-বাবাদের আর কোনো বেকার ভাইকে খাওয়াতে হয় না। ইতিমধ্যে তাঁদের আয়ও বেড়েছে দু-তিন গুণ। তবু শুনতে পাই, মাসের শেষে তাঁদের ধার করতে হয়। শুধু প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকেই নয়, কাবলিওয়ালা ও অফিসের দরোয়ানও তাঁদের মহাজন।

তার ওপর শুনলাম মেজো জ্যাঠার বাড়িতে বড়ো ধরনের চুরি হয়ে গেছে। সেই ধাক্কা তিনি আর সামলে উঠতে পারবেন, মনে হয় না।

চুরির কথায় ছেলেবেলার একদল চোরের কথা মনে পড়লো। সেই প্রথম আমি নিজের চোখে, অতো কাছ থেকে চোর দেখি। চোরকেও হুবহু মানুষের মতন দেখতে হয় জেনে আমি সেদিন খুব অবাক হয়েছিলাম। গোয়ালঘরে তাদের বেঁধে রাখা হয়েছিল। পরদিন ঠাকুরদা নিজে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে সংস্কৃত ভাষায় বলেছিলেন, লোকবলের বিকল্প নেই।

নববধূদের চীফ ট্রেনিং অফিসার, মায়েদের স্নেহ

বড়ো জ্যাঠাইমা আমার ঠাকুরদার সংসারে বউ হয়ে এসেছিলেন তেরো বছর বয়েসে। মেজো জ্যাঠাইমা ষোলোয়। আমার মা শ্বশুরঘর শুরু করেন আঠেরোয়। নকাকিমাও তা-ই।

সবাই তেরো-ষোলো-আঠেরোর অনভিজ্ঞা মেয়ে। এসেছেন নতুন বউ হয়ে। সংসারটাও নতুন। কতো তার দায়-দায়িত্ব, রীতি-নীতি, প্রথা-পার্বণ। কতোরকম কাজ। আনাড়ী একটি মেয়ে সেখানে হিমসিম খায়, পদে-পদে ভুল করে। কে তাকে শিখিয়ে দেবে?

আর কে, শাশুড়ি। নতুন সংসারের কাজে নতুন বউয়ের হাতেখড়ি তাঁরই কাছে তাঁরই গৃহিণী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তিনি চীফ ট্রেনিং অফিসার। নববধূ তাঁরই অধীনে হাতে-কলমে কাজ শিখতে-শিখতে একদিন নিজেও পাকা গৃহিণী হয়ে ওঠেন। রান্নাবান্না, ঘরগুছোনো, টুকিটাকি হিসেব রাখাই শুধু নয়, বাচ্চা মানুষ করার মতন জটিল, সূক্ষ্ম, অভিনব গুরুভার বইতেও তিনি আস্তে আস্তে সক্ষম হন। অজানা বিপদ? হাতের কাছে সর্বজ্ঞ, পরম অভিজ্ঞা শাশুড়িই তো আছেন! তাঁর মতন চাইল্ড স্পেশালিস্ট থাকতে নতুন মায়ের আর চিন্তা কী! শুধু নবজাতকের বাবা নয়, বাড়ির আট-দশটি পুরুষ তো তাঁরই হাতে নির্বিঘ্নে দিব্যি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে। আমার ঠাকুমা তাঁর আট ছেলে তিন মেয়েকে মানুষ করে গর্ভধারণে, শিশুপালনে এম আর সি ও জি, এম আর সি পি, এফ আর সি এস, হয়েছিলেন।

বড়ো জ্যাঠাইমার দুধের শিশু মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে চিল চিৎকার জুড়েছে, কিছুতেই তাকে থামানো যাচ্ছে না। তিনি সদ্য মা হয়েছেন, কী করবেন, কোনদিকে যাবেন, দিশে পাচ্ছেন না। কান্না শুনে ঠাকুমা ছুটে এলেন। বাচ্চার পায়ের আঙুল কান্নার সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে দেখেই তিনি বললেন, পেটব্যথা করছে। অল্প-গরম সরষে তেল বাচ্চার নাভিতে দিতেই সব ঠিক হয়ে গেলো।

কার্তিকের শুরুতেই বাচ্চার কাশি। মেজো জ্যাঠাইমা সারারাত জেগে বসে থাকেন। ঠাকুমাই তাকে বাসকপাতার রস খাইয়ে তার ও তার মা-বাবার নিশ্চিন্ত নিদ্রার ব্যবস্থা করে দেন।

ওষুধ বাতলাতেন, বাচ্চাকে রোদে তেল মাখানোর প্রণালী বুঝিয়ে দিতেন, প্রত্যেক নাতি-নাতনির কাঁথার প্রতিটি ফোঁড়ও তারই হাতের। পুরোনো ধুতি-শাড়ি ছিঁড়ে সারাদুপুর তিনি উবু হয়ে বসে ফোঁড় তুলতেন। রাঙাকাকা, নতুনকাকা, ছোটোকাকাদের বিয়ে তিনি দেখে যাননি, কিন্তু তাঁদের বাচ্চাদের জন্যেও ঠাকুমা আগাম কাঁথা সেলাই করে রেখে দিয়েছিলেন। মনিকাকা বিয়েই করলেন না, তাঁর চির অজাত শিশুর জন্যেও ঠাকুমা কাঁথা সিইয়েছিলেন। অন্য শিশুর কাজে লেগেছে।

শেষ জীবনে ঠাকুমা বৌদের ওপর সংসারের ভার দিয়ে নিজে কাটাতেন বাচ্চাদের সঙ্গে। বাচ্চাদের খেলা দিতেন শুধু নয়, নিজেও খেলতেন। ঘুঘুসই বাতাসই করতেন। মুখে-মুখে ছড়া শেখাতেন, অ-আ শেখাতেন। রূপকথা, রামায়ণ-মহাভারত তো ছিলোই। আজীবন শিশু চরিয়ে শিশু মনোরঞ্জনের সমস্ত ঘাতঘোঁত তিনি জানতেন। তিনি একাই ছিলেন বাচ্চাদের প্রিয় লাল বল, খেলার পুতুল, প্লাস্টিকের টিয়া ও বিড়ালছানা, ছবির বই। ঠাকুমাকে পেলে তাঁর আক্ষেপ নাতি-নাতনিরা আর কিছুই চায় না।

বাচ্চার মায়ের পক্ষে পক্ষে এরচেয়ে বড়ো মুক্তি, বেশি আরাম আর কী? শাশুড়ি তাঁদের কাছে এক অতি উপকারী জীব। পরম নির্ভরযোগ্য ক্রেশ।

নববধূ পাঠিকারা আমাকে একচক্ষু হরিণ বলে গাল পাড়ছেন জানি। না, আমি শাশুড়ি-বৌয়ের ঝগড়ার কথা ভুলিনি। কিন্তু সে দুঃখ তো অর্জন-করা, দু-পক্ষের দোষত্রুটির সন্তান। তার দায় বাংলার চিরকালের শাশুড়ি কি বউয়ের নয়। পরিবারের যৌথ কাঠামোর নয়। সে-দায় কোনো কুশাশুড়ি কি কুবধূর। কারো কুমতির দায় সাংসারিক কাঠামোর ওপর চাপানো হবে কেন?

আমার ঠাকুমার সংসারে আমি দেখেছি, তাঁর কোনো বৌমার অসুখে তিনি বার্লি জ্বাল দিচ্ছেন, কপালে জলপট্টি দিচ্ছেন বা পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত সেবাব্যবস্থার তদারক করছেন। নিজের অসুখে তিনি তাঁর সব বৌমার হাতের সেবা নেবার পালা শেষ করে তবেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

নারী-পুরুষ, একটি শিশু

আমার মেজোজ্যাঠার বড়ো ছেলে সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ে আটতলায় থাকে। কম্পানির ভাড়া-করা চমৎকার ফ্ল্যাট। টু-বেডরুম, ডাবল বাথ, ডাইনিং-কাম-ড্রইং হল। সাদা জালি পর্দা দিয়ে আলাদা করা। বাথরুমে ঠান্ডা-গরম দুরকম জলের ব্যবস্থা। তুষারের মতন শাদা বাথটব।

একটিঘরে শোয় স্বামী-স্ত্রী। আরেকটিতে পাঁচ বছরের টোটনকে নিয়ে মারাঠি আয়া। মেজোজ্যাঠা-মেজোজ্যাঠাইমা কালে-ভদ্রে ছেলের বাড়ি এলে রাতেই তাঁদের চন্দননগরের ট্রেন ধরতে হয়। বাড়তি বিছানা ফ্ল্যাটটির শান্ত, শীতল সৌন্দর্যের পক্ষে বেমানান।

তার সংসার বলতে তারা আড়াইজন, একটি আয়া, একটি রাঁধুনি, শেয়ারের সুইপার। একটি ফ্রিজ, একটি রেডিওগ্রাম, টিভি সেট। মাসে একটি কি দুটি ট্যালকম, একটি ফাউন্ডেশন, এক প্যাকেট স্যানিটারি ন্যাপকিন, একপাতা লিবানিয়ল। ছুটির দিনে সিনেমার দুটি অ্যাডভান্স টিকিট, পাঁচতারার ডিনার। বছরে একবার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির উৎসব, বাচ্চার জন্যে ডজন-ডজন বই, খাতা, বলপেনসিল। স্কুলের বাসভাড়া, বেতন, এ-ফী, ও-ফী মিলিয়ে শ-দুই টাকার চেক কাটা। তাছাড়া জন্মদিনের বেলুন, কেক ও মোমবাতি।

মাসিক দুশো টাকায় টোটন অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। ঠাকুরদার নাম ভুলেছে, হাম্পটি ডাম্পটি মুখস্থ বলে, সে কাঁদেও ইংরেজিতে। ছেলেকে স্কুল বাসে তুলে দেয়া ছাড়া তার মায়ের আর একটি মাত্র কাজ, বাড়িতে কেউ এলে ছেলের ফটা-ফট ইংরেজি ছড়াশুনিয়ে নিজেই আরেকবার মুগ্ধ হওয়া। দম-দেয়া উড়ো-জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটরগাড়িতে তারা ছেলের ঘর ভরে দিয়েছে।

বড় জ্যাঠাবাবুর মেজো ছেলে থাকে হলদিয়ায়। সরকারি কোয়ার্টার। স্বামী-স্ত্রী, একটি মেয়ে। আমি এক রবিবারে গিয়ে-ছিলাম। সারা দিনে বৌদি সতেরো বার শোনাল, সাত বছরের দস্যি মেয়ে সামলাতে তার জীবন জের-বার হবার জোগাড়। টিভি কিছু জৌলুস আর কিছু সুখ-সুবিধা ছাড়া সাদার্ন অ্যাভেনিউর আটতলার সঙ্গে খুব একটা তফাৎ দেখলাম না। তবে বৈদ্যবাটিতে এলে ওরা কলকাতাটা ঘুরে যায়। মেয়েকে শাশুড়ির জিম্মায় রেখে সিনেমা দ্যাখে, রিডাকশানে জুতো ও শাড়ি কেনে, বড় গায়নো-কলজিস্টের কাছে স্ত্রীকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যায়। তার ফর-সেফ বেবি হয়েছিল। সেলাই পেকে যায়। সেই থেকে কোন-না-কোন গন্ডগোল লেগেই আছে।

সুনীতির শাসন, হাসি-খুশি ছেলের দল

একটি কি দুটি শিশুর সংসার। খুব বেশি হলে ভাই-বোন মিলিয়ে তিনজন। আমি বেশি সন্তানের পক্ষে ওকালতি করছি না। কিন্তু সেকালের যৌথ পরিবারে প্রত্যেকের দুটি-একটি শিশু থাকলেই বাড়িতে শিশুমেলার কলকলি শোনা যেত। বাড়ির মধ্যেই ছোটদের প্রাণের বন্ধুদল। হাসি-খুশি ছেলের দল নিঃসঙ্গতা জানত না। আমার মনে আছে। বিজয়া দশমীর বিকেলে ঠাকুরদা আমাদের, এই ছেলে-মেয়েদের বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে কালীবাবুর ঘাটে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসতেন। ঘাটে বসে আমরা সারা সন্ধ্যে গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতাম। আগে থেকেই গিয়ে বসতে হত, না হলে জায়গা পাওয়া যেত না।

বাড়ি ফিরে বড়দের প্রণাম করে আমরা মাথায় ধান-দূর্বার আশীর্বাদ নিতাম। তারপর মুঠো ভরা নাড়ু।

একদিকে এই। উৎসব, খুশি, বন্ধুদল। আরেকদিকে সুনীতির শাসন।

ছোটকাকা-মণিকাকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় সিগারেট খেয়ে আমি রাঙাকাকার বাড়ি যাই। রেল লাইনের ওপারেই তাঁর চমৎকার দোতলা বাড়ি। রাঙাকাকার স্বাস্থ্য দেখলাম ভেঙে গেছে। রাঙাকাকিমার গলা তাঁর অজান্তেই একটু কর্কশ হয়েছে। তিনি এক সময় গান গাইতেন, বিশ্বাস হয় না। কুঁড়ে ছিলেন, বিশ্বাস হয় না। দেখলাম তাঁর বিশ্রামের সময় নেই।

আমার জন্যে দোকান থেকে জলখাবার ও মিষ্টি মিলিয়ে প্রচুর খাবার আনা হল। খাব কী, আমি চোখ তুলে কথা বলতে পারছিলাম না। আমার সামনেই তাঁদের মেজো ও ছোট মেয়ের পাতলা পাঞ্জাবি ও টিশার্ট-পরা অর্ধেক বুক-খোলা নারীত্ব। আমি ওদের দাদা, কথা বলতে বার-বার আকাশে চিল খুঁজতে হচ্ছিল।

চলে আসছি, তখন বড় মেয়ে ফিরল। গিয়েছিল বন্ধুর বাড়িতে। কোথায়, কার বাড়ি? ওর মা-বাবা জানেন না। চার ইঞ্চি ব্লাউজ, শাড়ি নাভির নিচে। চুল শ্যাম্পু-করা। হাজার-হাজার লোককে দিব্য শরীর দেখিয়ে ঘুরে এল। আর কদিন পর সংসার করবে। ভবিষ্যতের মানুষ জন্মাবে এরই গর্ভে। হায়, আজ আর কোন মাহেশের রথের মেলায় কাকা-জ্যাঠাদের চেনা-জানা কেউ মেয়েটার এই পোশাক দেখে বাড়িতে এসে বলে দেবে না। কোন মণিকাকা ওকে শাস্তি দেবার জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকবে না।

তেরো বছরের ছেলেও এখন নির্ভয়ে পথে-ঘাটে লক্ষ-লক্ষ কাকা-জ্যাঠাদের মুখের ওপর সিগারেটের রিং করতে পারে।

ভাল নাম ভুলে গেছি। ডাকনাম বিলু। মেজো জ্যাঠার ছোট ছেলে। পূরবী সিনেমার সামনে বন্ধুদের সঙ্গে রিং করছিল। থাকে চন্দননগরে, কলকাতায় বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে এসেছে? আমি ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিই।

বার্ধক্যের আশ্রয়

একটি পুরুষ, একটি নারী, একটি শিশু। ভবিষ্যতের একটি বুড়ো, একটি বুড়ি, একটি যুবক কিংবা যুবতী। যুবক বিয়ে করে উঠে যাবে তার সংসারে। যুবতী বিয়ে করে চলে যাবে তার নিজের সংসারে। তখন শুধু দুজন। এক বাড়িতে এক জোড়া তারুণ্য। আরেক বাড়িতে এক জোড়া বার্ধক্য। বার্ধক্যের জোড়াও একদিন ভেঙে যাবে। তখন সেই একলা, ভয়াবহ বার্ধক্য আর কে? আর কী? ঠাকুরদা কি নিজেরই সেই ভবিষ্যৎ ভেবে সংসারের ভাঙন ঠেকাতেন? আজ বুঝতে পারি, পুত্র-পুত্রবধূ সেবিত আমার ঠাকুমার মৃত্যু-সুখের তুলনা হয় না।

কার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন

এই লেখা পড়ে চাইলে সূর্যকান্ত কাব্যতীর্থের জন্যে আপনারা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারেন। যে যাঁর নিজের জন্যেও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ুন, আপত্তি নেই। বিগত যুগের জন্যেও আপনার দীর্ঘশ্বাস পড়তে পারে। কিন্তু পাঠক, অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর জন্যে কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন না। এই নামেই আমি পুরো কাহিনী বিবৃত করেছি, কিন্তু এটা আমার আসল নাম নয়। আসল নাম জানালাম না। কে আর স্বনামে সংসারের হাঁড়ির খবর লেখে। সেদিক থেকে এই বৃত্তান্ত অমরেন্দ্রর তিন পুরুষের বৃত্তান্ত নয়। কার? হয়ত আপনার আমার সকলের। হয়ত একটি সময়ের।

ছবি এঁকেছেন : নিতাই ঘোষ

অন্য হরিশ্চন্দ্র

সৌরেন মিত্র

টিনের দোর ঠেলে মগারাম ঘর ঢোকে। ঘরের সামনেই এক চিলতে জমি। ঘরটা টালির। জমির এককোণে একটা সজনে গাছ। ফাগুনে ফলে ভালই। চারধারে বুনো লতাপাতা ঝোপঝাড়। গরমের রাত্তিরে খাটিয়া পেতে মগা এখানটায় শোয়।

ঘরে ওর বৌ আছে। তটিনী। আর আর চার বছরের পাঁজর বেরুনো একটা ছেলে। ভাল করে হাঁটতে পারে না। পা ভাল নয়। এরকম একটা সংসার মগারাম চায়নি। এটা যেন ওর ওপর বর্তেছে। দিন-পাঁচ টাকায় এক ঠিকাদারের কাছেও কাজ করে, এসব ব্যাপারে আফসোষও কম নয়। কিন্তু, কী আর করা যাবে—সংসারতো আর ফেলা যায় না। তবু যদি বৌটা একটু নরম-সরম মানুষ হতো। তা-না। সে যেন বৃন্দাবন ময়রার উনুনের মত দিনরাত খাই খাই করছে। নিভতে জানে না।

ঘরে ঢোকার আগেই মগার কেমন সন্দেহ হয়েছিল, বৌ-এর গলার আওয়াজ শোনা যায়নি বলে। হবারই কথা। তটিনী কখনও মুখ বন্ধ করে না। মানুষ মনের মধ্যে হরেক ভাবনা ভাবে, আর তা মনেই রেখে দেয়। সে রকমটা তটিনী নয়। মনে যা ভাবে মুখেও তাই বলে বলে যায়। যেমন আপন মনে বকতে বকতে হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেললে ওমনি বলে ওঠে মুতভেবি কী ভাবছিলুম ভুলে গেলুম।

গলা বন্ধের কারণটা মগারাম বুঝতে পারলো ঘরে ঢুকে। একটু আশ্চর্যও হয়ে গেল। অন্ধকারে প্রথমটায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তারপর চোখ পড়লো ঘরে এককোণে মায়ে ব্যাটায় চাপাচুপি দিয়ে শুয়ে আছে। পায়ের শব্দেও জাগলোনা যে বড়। ইচ্ছে করে দু-একবার ও শব্দ করলো। কী রে বাবা। সন্ধেবেলায় মায়ে ব্যাটায় এমন কমপিটিশান করে ঘুমের মানে। বেঁচে আছে তো। নির্ঘাৎ সাপে কেটেছে দুজনকে। এঘরে মনসারা মাঝে মাঝে দর্শন দেন তো। এই তো কিছুদিন আগে গায়ে নকশা কাটা ইয়া পেল্লায় এক মা মনসা আর একটু হলেই মগাকে সন্তাবান বানিয়ে ছাড়ছিল। তা সে যাত্রায় তটিনীর সিঁদুরের জোরে বেঁচে গেল। মরলে কী চলে বাবা বাপ হতে হবে না।

মগা বৌ-এর পাশে বসে তার কপালে একবার হাত রাখলো। শরীর বেশ তাপ ছাড়ছে। তবে ছেলেটা এমনি ঘুমুচ্ছে। জন্ম থেকেই ও জিনিসটা ও দারুন শিখেছে। একবারে বসানো রাজপুত্তুর।

কপালে হাত দেওয়াতে টের পেয়েছে তাঁটনী। একটু নড়েচড়ে উঠলো। মগা তাক থেকে তেলের কুপি পেড়ে জ্বাললো। আলোটা শিয়রে এনে একবার ভাল করে দেখলো, জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে রে বৌ।

আর যায় কোথায়। ধড়মড় করে উঠে বসলো তাঁটনী—হয়েছে আমার মরণ। কানা নাকি? দেখতে পাচ্ছ না জ্বরে গা-গতর ফেটে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একটু পেছিয়ে বসলে মগা। বললে—আহা শো তুই। জ্বরের গতর ফাটা কেউ কী আর চোখে দেখতে পায় বৌ। চটচিস কেন।

তাঁটনী সঙ্গে সঙ্গে ধমকের আওয়াজ তোলে—আমি কিন্তু আর আর রাঁধতে পারবো না বলে দিলুম।

মগা খুব সমীহ করে বৌকে বললে—রাঁধতে কী বলেছি তুই শো। শরীর থাকলে রোগ হবে, সেটা কী তোর দোষ। কদিন পর জ্বর হল বলোদিকি। তাঁটনী শুয়ে শুয়ে ফোঁপাতে বেরুবে না। বাড়িতে থাকবে।

—নারে এরকম অসুখ দেখে বাড়িতে কী বসে থাকা যায়? ভবতারণ ডাক্তারের কাছে গিয়ে একবার বলি।

—ওহ কী একবারে দরদ। আমি বুঝি না ভেবেছ? গাঁজার আড্ডায় না গেলে ঘুম হবে!

মগা তাঁটনীর গায়ে হাত দিয়ে বললে—মাইরি বলছি এই তোর গা ছুঁয়ে, আড্ডায় যাবো না। ওষুধ নিয়েই ফিরে আসবো।

—যাও যাহান্নমে জেগে যাও। বকিও না।

আজ আর তাঁটনী বেশি কিছু বলতে পারলো না। অনেকদিন পরে আজকে চুপ করে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

তেলের কুপিটা মাথার শিয়রে রেখে মগা পায়ে চটি গলিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

বাইরে অন্ধকার। মধুর নতুন শালী গান ধরেছে। মগা দু পা এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলো মধুর বাড়ির জানলার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে। হাতের আঙুলে এক বিন্দু আগুন। আরও দু-পা যেতেই বুঝতে পারলো—মানুষটা মধুই। শালীর গান শুনতে শুনতে বিড়ি টানছে। মধু মানুষটি বেশ সরল। এক ঝোঁকে অনেক কথা বলে ফেলে। বয়সে মগার চেয়ে ছোট। ওর সামনে এসে মগা বললে—শালীর গান শুনছো বুঝি? তা বাইরে কেন, ভেতরে পাশে বসে শুনলে কী হতো?

—চুপ। অন্ধকারে মধু চাপা গলায় বললে। মগাকে একধারে সরিয়ে নিয়ে আসে—কী আর বলবো মগাদা বৌ সন্দেহ করে শালীকে নিয়ে।

—অবিশ্বাস। এর মধ্যে? কদিনই বা বিয়ে হয়েছে?

মধু বিষণ্ন হাসে, বলে—কদিনই হক অন্য কারো দিকে আমাকে তাকাতে দেয় না। নিজের বোনের দিকেও না। অথচ জানোতে আমি গানের কিরকম প্রেমী। নিজের ত গলা নেই বলে হল না। অতুল মাস্টার বললে ওসব তোর জন্যে নয়।

—তা আর কী করবে বল মধু।

—গান শোনাটা কী অপরাধ, তুমিই বল মগাদা। একই মায়ের গর্ভে দুটো মেয়ে দু রকমের কী করে হয়? একজনের অমন গানে গলা আর একজন ঢ্যাড়স। একজনের হাঁ-গালটি এই এতটুকু, আর তোমার বৌমায়ের—এঁটো মুখে হাসলে কান পর্যন্ত আঁচাতে হয়। আগে জানলে শালীকেই বে করতাম।

মগা হাসে, বলে—ঐতো সোমসারের রীতিগিচ্ছিরি নিয়ম, মনের মতনটা পাবে মনের মতনটা হবে না। আমার কথাই ভাবো না একবার। কত ডাক সাইডে মটর গাড়ি চেপে বাড়াচ্ছে আর আমি ভ্যারেন্ডা ভাজছি। কোথায় রাজা হব।

মুচকি হাসে মধু—রাজা তুমি একদিন হবেই

—কপালে আছে যে ভাই। যোগেন ঠাকুরের বাকি মিথ্যে হয়। আচ্ছা তুমি গান শোন। তোমার বৌদির জ্বর ডাক্তারের কাছে যাবো।

ছেলেবেলায় মগারামকে হাত দেখে ওর বাপের কাছে যোগেন ঠাকুর বলেছিল—তোমার ছেলের হাতে রাজযোগ আছে হে। তখন ওর বয়স বছর বারো। তা কথাটা যেন তরুপনের আগায় বসে ওর মগজে ঢুকে ছিল। রাস্তা পায়নি বেরুবার। মাথাতেই বেড়ায়। মগার বাবা শুনে হেসেছিল। তিনি দেখে যেতে পারেননি মগা রাজাসিংহাসনে বসে আছে। অবশ্য মগা জানে রাজার এখন আর নেই। পয়সাওয়ালা লোকেদেরই ত লোকে রাজা কয়। পাঁচটা লোক মান্যিগণ্যি করবে। মুখ নাড়তে না নাড়তেই ওঠ-বোস করবে। এক হাঁকে গ্রাম শহরের কানুন পালটে যাবে। এই আর কী। যোগেন ঠাকুরের বাকি কী মিথ্যে হবার?

মগার জীবনটা টানা বাঁধা নয়। বড় ছেঁড়া খোঁড়া জীবন। অকালে বাপটা খসে যেতেই জীবন সুরু করতে হল চায়ের দোকানের বয় হয়ে। তারপর চৌধুরী বাড়ির চাকর। তারই মধ্যে একদিন উড়ে এলো তাঁটনী। চৌধুরী বাড়ির সামনে ছিল সরকারদের বাড়ি। তাঁটনী ছিল সে বাড়ির ঝি। যৌবনে মগারামকে দেখতে শুনতে ভালই ছিল। তাঁটনীও তখন ভরা যৌবন নিয়ে বেশ ডাগরটি। অতএব দুজনেই দুজনকে দেখে গড়াতে গড়াতে একেবারে সংসারে। বিয়ের প্রায় দশ বছর পরে তাঁটনীর কোলে ছেলে এলো। খুব দুবলা। ভাল করে এখনও হাঁটতে পারে না। এত সবের মধ্যে থেকেও রাজা হবার ব্যাপারটা মগারাম ভোলেনি আজও।

বৃন্দাবন ময়রার দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ালো মগা। দোকানের দুদিকে দুটো হ্যাজাক খাঁ-খাঁ করে জ্বলছে। একধারে গনগনে উনুনটার ওপর বড় কড়াই চাপিয়ে একটা নতুন ছোকরা বড় কাঠের খোন্তা দিয়ে ছানা কাটাচ্ছে। পুরোনো কারিগর পরাণ বোধহয় দেশে গেছে। শো-কেসের ওপর সিঙ্গাড়া নিমকির চুপোড়। তার পাশে বড় থালায় গোল করে সাজানো জিলিপির পিলার উঠেছে। খাবার দেখলে খিদে বড় তিলিয়ে ওঠে। বিকেল সন্ধে কেটে গেল পেটে কিছু নেই। খিদেটা পেটের নাড়িভুঁড়ি ধরে অনেকক্ষণ খাঁকাচ্ছে পকেটে হাত দিয়ে ও দেখলো মাত্তর আনা বারো পয়সা পড়ে আছে। হপ্তা পেতে এখনও দু-দুটো দিন বাকি। অন্তত দুটো জ্যান্ত টাকা পকেটে না থাকলে নয়। ওদিকে জ্বর আবার কোন দিকে গোঁত খাবে কে জানে।

দোকানে ঢুকে পড়লো মগা। বৃন্দাবন মানুষটা এমনিতে ঠান্ডা। দয়ামায়া আছে। কালোকুলো বৃন্দাবনের ভুঁড়ি শুধু ওজন অনেক। ওপর থেকে দেখলে বোঝা যায় না মানুষটা নরম। কিন্তু দোকানে ঢুকে মগা দেখলো মানুষটা এখন বড় একটা মান্ডা নেই। ছানাওয়ালার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। কালকের ছানা নাকি টকে গিয়েছিল। একটা বেঞ্চিতে মগা চুপচাপ বসে রইলো। বেশ কিছুক্ষণ ওদের কথা কাটাকাটি চললো। কাঁড়ি কেতো গোঁফ নিয়ে বৃন্দাবনদার কথা বলতে বেশ যেন অসুবিধে। কিছুক্ষণ পর ছানাওয়ালাটা বেশ গরম হয়ে বেরিয়ে গেল। বৃন্দাবনও পেছু পেছু দোকান থেকে নেমে গেল।

শ্রীনাথ একধারে বসে বাজভোগের মাথায় কিসমিস সাঁটছিল। মগার দিকে চোখ পড়াতে বললে—আরে মগা রাজা যে তারপর?

—এই এসেছিলুম বৃন্দাবনদার কাছে। বৌ-এর জ্বরের সঙ্গে প্যাল্পিটিশান হচ্ছে।

—কী পিটিশান? শ্রীনাথ চোখ ছোট করলো।

—ঐ যে বৃন্দাবনদার যা হয়েছিল। বড় ডাক্তার এসেছিল।

—ওব্বাবা বলকি। সেতো বেশ খরচের ধাক্কা।

—যা বলেছ ভাই। জ্বরকে পার আছে; কিন্তু প্যাল্পিটিশানকে যাবার রাস্তা বেশ ভাল মতই দিতে হবে।

শ্রীনাথ বললে—বড় খারাপ রোগ ভাই। কর্তা দেখনা কেমন রোগা হয়ে গেছে। নিজের মিষ্টির কারবার অথচ ডাক্তার জিবে ঠেকাতে বারণ করেছে। আলুও না।

—কপাল ভাই।

এমন সময় বৃন্দাবন ফিরে এলো। ধীরে সুস্থে মগা কাছে গিয়ে বসলো। বৃন্দাবন গামছা দিয়ে থলথলে শরীরটা মুছতে মুছতে বললে—কী হে খবর কী?

যথা সম্ভব মুখে হাসি টানলো মগা—এ্যাই তোমার কাছে এলাম। বৌয়ের কষ্ট দেখে বাড়িতে আর থাকা গেল না।

—কেন? কথাটা বলেই বৃন্দাবন একবার নাক সেঁটকালো।

—কী জ্বর দাদা। অমন গরম মেজাজও এখন গায়ের গরমের নাগাল পাচ্ছে

না। একেবারে চুপ। ডাক্তার দেখাতে হবে, যদি দুটো টাকা....।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবন যেন লাফিয়ে উঠলো। পোড়া ছানার গন্ধে দোকান তখন ভরপুর। বৃন্দাবন চেঁচিয়ে উঠলো—গেল গেল সব গেল। ছুটে গেল উনুনের দিকে। নতুন কারিগর সন্দেশের পাক ধরিয়ে ফেলেছে। হ্যাজাকের আলোয় ছানার শরীর দেখে, চোখ বৃন্দাবনের কপালে উঠে দাঁড়িয়েছে। আরে এ কি করেছ। এই জন্যে বলে নতুনদের দিয়ে ...ওরে ও শ্রীনাথ দেখে যা কোন জঙ্গল থেকে ব্যাটাকে ধরে এনেছিলি।

শ্রীনাথ রাজভোগ ফেলে ছুটে গেল। মগা একবার রাজভোগের থালাটার দিকে তাকালো। ভারি পাগোল্লা চেহারা। যেন লাল মুকুট মাথায় রাজা আর কি। থালাটার দিকে ঘেঁসে আসতে আসতে ও একবার চার ধার দেখে নিল। আসপাশে কেউ নেই। সবাই সন্দেশের ডেও বাড়ির কাছে। ও কয়েক পা সরে এলো। গুনে দেখলো এক দুই তিন—আঠারোটা। টপ করে একটা তুলে মুখে পুরে দিল। গাল ভরে উঠলো ছানাতে রসেতে। তোফা। আবার একটা।

দোকান থেকে বেরিয়ে এলো মগা। রাজার মত যেমন মানুষ নেই, রাজভোগের মত তেমনি জিনিস নেই। প্রাণ ভরে যায়। কিন্তু ঐ যা, টাকাটাতো নেওয়া হল না। যাগগে। এখন তার মেজাজের ঠিক নেই। সাদা সন্দেশ অমন তামাটে বরণ ধরলে কার মেজাজের ঠিক থাকে? দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে, পরে দেখা যাবে। ঠাণ্ডা হক। একটু দূরেই একটা টিউব কল। দু আঁচলা জল রাজভোগের ওপর চাপাতেই মনে হল খিদেটা গলা ধাক্কা খেয়ে বিদায় হয়েছে।

বৃন্দাবন ময়রার দোকানের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা রেল লাইনের দিকে চলে গেছে। রেল লাইন পেরুলে একটা বিরাট জলা। জলা শেষে কুণ্ডের বাজার। জলার ধারে কোন লোক বসতি নেই। ছোট-খাটো একটা ঘন জঙ্গল। ভবতারণের ডাক্তারখানা কুণ্ডের বাজারে।

রেল লাইনের কাছ বরাবর পদ্মচরনের গাঁজার আড্ডা। একটা ছিটে বেড়ার ঘর। আজ আর ওদিকে তাকাবে না মগা। বৌ পই পই করে বারন করেছে। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। অত জ্বর। মগা হাটনের ওপর জোর দিয়ে জায়গাটা পেরুবার চেষ্টা করলে। কিন্তু নিতাই পরামানিক দেখতে পেয়েছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি পাকাচ্ছিল সে। মগাকে দেখেই ডাকলো—আরে রাস্তা ভুল করে ওদিকে কোথায় যাচ্ছ।

কী রকম পা দুটো আটকে গেল মগার। —আজ আর না, নিতাই। বৌয়ের অসুখ করেছে।

নিতাই হেসে উঠলো—বল কী হে রাজা। ধোঁয়ায় মুক্তি নেই।

—তা-না। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে যে—

—তাই বল। নিতাই নেমে এসে মগার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল—গোটা দুয়েক টান দিয়ে চলে যাও।

পদ্মচরণকে ঘিরে কুণ্ডলী পাকিয়ে গোল হয়ে বসে আছে। একটা তেলের আলো জ্বলছে। ঢুলু ঢুলু চোখে সবাই মগার দিকে তাকালো। নিতাই বললে—পদ্ম-দা রাজা আজ ছোড়কে যাচ্ছিল। ধরে আনলুম। রানীর অসুখ।

পদ্ম চোখ টেনে তাকালো—কার অসুখ।

মগা বললে—বৌ-এর। যাচ্ছিলুম ভবতারণ ডাক্তারের কাছে।

অর্জুনলাল হা-হা করে হেসে উঠলো, বললে—বোসো বোসো ধন। এই এক ফোঁক ধোঁ পেটে পড়লেই বারো-দশ টাটা মারসেডিজ। তারপর গড়গড়িয়ে চলে যাও ডাক্তারের কাছে।

অর্জুনলালের হাত থেকে কলকেটা নিল মগা। না নিলে মুশকিল। যা ডাইভারি মেজাজ। এ পর্যন্ত গোটা আষ্টেকাকে লরির নিচে মাড়িয়েছে। এখানে মগা রোজ না হলেও হপ্তায় দু-তিনটে দিন আসে। কারণ ধোঁয়াটার সত্যি গুন আছে। পেটে গেলেই রাজা মেজাজ।

হাতের চেটোয় ফেটা মুড়ে কলকে বসিয়ে ও প্রথম টানেই ধোঁয়াটাকে একেবারে নাই কুণ্ডলে পাঠিয়ে দিল।

একটু পরেই দুনিয়া পাল্টাচ্ছে। কত রং। এই ঘরেই এমন রাতের বেলা একটা রামধনু উঠে দাঁড়াচ্ছে। কে যেন পেছন দিক থেকে একটা সিংহাসন ঠেসে ধরছে। —এই পিঁড়িটায় বোসো মগাদা। রাজা মানুষ। রামু একটা পিঁড়ি পেছন থেকে গুঁজে দিল।

পাশেই বসে ছিল পাঁইছা টিকি। ঘুরে ঘুরে কলকেটা এখন তার হাতে। জোরসে দুটো টান দিয়ে সেটা মগার হাতে দিয়ে বললে—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে মগাদা। ক'দিন থেকেই বলবো বলবো করছি। এবার দেশে গিয়ে সেটা দেখে ভাবলুম, আর না বললে নয়। কে কখন সাবড়ে দেবে।

মগা কলকেটা বার দুয়েক টান দিয়ে অর্জুনের হাতে দিয়ে বললে—কী কথা পাঁইছা।

—তাই তো কী কথা বলতো? ভুলে গেলুম যে ছাই। দাঁড়াও মনে করি।

কলকেটা হাতে হাতে ঘুরছে। বাইরে গুড়গুড় করে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন বনগাঁর দিকে উড়ে গেল। মগা আবার জিজ্ঞেস করলে—কী কথা বলবে বলছিলে পাঁইছা।

পদ্মচরণ বললে—যে কথা মনে পড়ে না সে কথা বলিস কেন।

—ও মনে পড়েছে এবার। পাঁইছা বললে। —যা বলছিলুম। তোমার ও' রাজা হবার সাধ। একবার চল না কেন আমার দেশে। একটা গুপ্তধন মাটির নিচে বেবাক পড়ে আছে। তুমি যাবে আর নিয়ে আসবে। সবাই তো পাবে না, তোমার হাতে রাজযোগ আছে তাই বলছিলুম।

মগা চোখ টেনে জিজ্ঞেস করে বল কি হে। কোনখানটায়?

হাতের চেটোয় নিভন্ত কলকেটা ধরে পাঁইছা বললে—বললুম না আমার দেশে কাটুলি পাড়ায়।

ইতিমধ্যে গাঁজা ফুরিয়ে যেতে নিতাই সকলের কাছ থেকে চাঁদা চাইলো। মগার শেষ সম্বল বারো আনাও তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। পাঁইছা নিভন্ত কলকেটা রেখে দিয়ে বললে—সেখানে একটা ঢিবি আছে, বুঝলে।

—তা ঢিবি দিয়ে আমি কী করবো।

—ধেৎ। কথার মধ্যে বড় বাগড়া দাও। আগে শোনো। সেই যে রাজা হয়েছিল হরিশচন্দ্র। ওটা সেই হরিশচন্দ্রের ঢিবি। বহরমপুর ইস্টিশানে নেমে কোস তিনেক হাঁটা।

তেলের কুপির আলোতে মগাদাদার মুখ আরও লাল হয়ে উঠেছে, বললে—কী আছে সেখানে?

—একটা ঢিবি।

—ঢিবি নিয়ে আমি কী করবো। রাখবো কোথায়? বাড়িতে জায়গা নেই।

—এতো আচ্ছা অগামারা লোক। আগে সবটা শোন। সেটা হল রাজা হরিশচন্দ্রের ঢিবি। তাঁর যত মণি-মুক্তো তার ভিতরে। তবে আর বলছি কী। তবে হ্যাঁ, কাজটা শক্ত। বড় বদমাইস সব সাপ আছে তার মধ্যে। তারা সেই দৌলত পাহারা দিচ্ছে। খবর খন আর কি। ইংরেজেরা একবার খুঁড়তে গেছিলো। সাপগুলো এমন ফোঁস ফুঁসেছিল যে তিন তিনটে হনুমান সাহেব একেবারে কাত।

নিতাই এসে কলকে সাজিয়ে দিয়েছে। পদ্মচরণ প্রথম টান দিয়ে বললে কী বললি পাঁইছা কার সম্পত্তি?

—রাজা হরিশ্চন্দ্রের। পাঁইছাটিকি বললে।

কলকেটা অর্জুনের হাতে দিয়ে পদ্দ বললে—হরিশ্চন্দ্রের? সে তো শুনেছি সব বিশ্বামিত্তির মুণিকে দে গেছলো।

—পাঁইছা বললে—আরে আবার বিশ্বামিত্তির সব ফিইরে দিলো না? সেদিন রাণী অপেরার যাত্রায় কী তবে দেখলে—। সেটা মনে নেই? বিশ্বামিত্তির সব ফিইরে দিলো না? রাজা তো রাজত্ব দিয়ে চন্ডাল হয়ে দু-চার আনা পয়সার জন্যে শ্মশানে মশানে ঘুরছে। পেট চালাতে হবে তো। এদিকে রাজার রাণী তো প্রায় কি ভিখিরি। কেমন। তারপর ওদের ছেলেটাকে তো সাপে কাটলো। মরে গেল। ভিখিরি রাণী মরা ছেলে নিয়ে শ্মশানে এলো। হাতে পোড়াবার টাকা নেই। মনে পড়ছে? তারপর হল কি সেই চন্ডাল রাজা তখন সেই শ্মশানেই ডিউটি দিচ্ছিল। সেদিন আবার ঝড় জলে চারদিক অন্ধকার। রাজা রাণীকে চিনতে না পেরে পোড়াবার খরচের জন্যে নেই আঁকড়েমী করছে। রাণী দিতে পারে না। বোঝো ব্যাপার।

রামু ফস করে বললে—রাজাটা মহা হারামী তো।

পদ্দ ধমকে উঠলো—থাম তো। শুনেছি তো চিনতে পারে নি।

পাঁইছা কলকেটা মগার হাতে দিয়ে বললে—শাস্তর আলোচনার সময় অমন বখার মত কথা বলিস না। চুপ করে শোন। হ্যাঁ, তা যা বলছিলুম। এমন সময় বিদ্যুৎ চমকাতে রাজা রাণীকে চিনতে পারলো। তখন খুব হা-হুতাশ করছে দুজনে। সেই সময় বিশ্বামিত্তির মুণি এলেন। হাতে কমন্ডলু। ইয়া লম্বা সাদা দাড়ি। সব দেখে শুনে মুনির দয়া হল। তিনি সব ফিইরে দিলেন। মায় ছেলের জীবন শুদ্ধু।

সবাই শুনছিল। অর্জুন বললে—বুড়োটা ভারি খচ্চর ছিল তো।

পদ্দচরণ ধমকে উঠলো—আহ দেবতা না। তা পাঁইছা, সে রাজার সম্পত্তি তোর দেশে গেল কী করে।

—আমি তার কী করে জানবো—ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, দেখে আসছি তাই মগাদাকে বললুম। ওর রাজ-যোগ আছে, যদি পারে তো খুঁড়ে-খাঁড়ে নিক। এমন কি বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনটাও নাকি ঢিবির মধ্যে আছে।

রামু হঠাৎ দাবড়ে উঠলো—তোর শাস্তর জ্ঞান তো খুব পাঁইছা। বত্রিশ পুতুলের সিংহাসন তো রাজা বিক্রমাদিত্যের। আমার ছেলেকে কী মাস্টারে ভুল পড়ায়।

পাঁইছা ঘাবড়ে যায়। চোখ টেনে বলে—অঃ। আচ্ছা তবে পুতুলগুলো বাদ দে। তারপর মগার দিকে তাকায়—কী যাবে নাকি মগাদা।

মগারাম বললে—বড্ড দূরে যে, কাছাকাছি কোথাও নেই।

নিতাই এবার মগাকে তেড়ে এলো—আ মোলো। এদিকে রাজা হবার শখ তোমার ষোল-আঠারো আনা। বড্ড দূরে। পাঁইছা ঠিক মগার কাঁধে হাত তুলে বলে—শেয়ালদা থেকে রেতের গয়া প্যাসেঞ্জারে গেলে ভোর ভোর বহরামপুর। আর ঐটুক তো হাঁটা।

—কিন্তু খুঁড়বো কী দিয়ে? ঝুড়ি চাই, কোদাল চাই।

রামু প্রায় নিভন্ত কোলকেটা একটা কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছিল, বললে—তুমি রেডি হও, ও-সব আমি দেবো।

মগার চোখ তখন একেবারে বুঁজে আসছে। জোর করে রামুর দিকে চোখ টেনে তাকালো, বললে—তা না হয় বুঝলুম, তুমি দিলে। কিন্তু অত মাটি ফেলবো কোথায়? সেটা বল।

এবার মগার মাথায় একটা জোরালো চাঁটি পড়লো। মারলো অর্জুন,—তখন থেকে যেগুডবাই। আমার লরিটা আছে কী করতে?

অর্জুনকে মগা ভয় পায়, চট করে বললে—যাবো, যাবো। যাবো না তো বলি নি ভাই। বোয়ের অসুখটা সেরে গেলেই—। ওহো দেখেছ বোয়ের ওষুধ আনতে হবে ভুলে গেছি। মগা উঠে দাঁড়ালো—চলি ভাই অর্জুনদা।

জঙ্গলের ওপরে জঙ্গলের মাথায় একটা কানা ভাঙা চাঁদ ঝুলছে। মগা বেরিয়ে সেটা দেখতে পেলো। এত রাতে! সন্ধ্যে থেকে দেখি নি তো বাবা। ছিলো কোথায়। মাথার ভেতরটা হালকা ফকফক করছে। ওজনে একশো গ্রামও উঠবে না। কাঁধের ওপর অমন জিনিসটার কোন ভারই নেই। তবে হ্যাঁ মগা এখন মেজাজে রাজা। চাঁদটা বেশ লাগছে। সামনে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে রেল লাইন। মগা তার ঘাড়ে পা তুলে দিল।

লাইন টপকাতেই জলা। চার ধারে যমদূতের মত দাঁড়ানো বড় বড় গাছ। বাপ্ বেশ থমথমে। কটা হল মগার খেয়াল নেই। একটা বিড়ি ধরিয়ে ও হাঁটতে লাগলো। একটা প্যাঁচা আচমকা চিৎকার করতে মগার মনে হল, এখন কত রাত। এটা আবার কোন শ্মশান।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পর খেয়াল হলো পকেট ও ময়দান। ডাক্তার কী মুখ দেখে ওষুধ দেবে। তার চেয়ে কাল সকালেই যা হয় হবে। এখন গিয়ে বৌটার মাথার কাছে বসা যাক।

মগা এবার হাঁটা আরম্ভ করলো বাড়ির দিকে। বৌটা একা আছে বাড়িতে। বুঝিয়ে বললেই হবে ঝুড়ি কোদালের দরুন সব পয়সা জমা দিতে হয়েছে। ঢিবি খোঁড়ার পর আর ভাবনা কী। কলকাতার ইয়া বড় ডাক্তার সুড় সুড় করে আসবে। তখন বড় বাড়ির দাওয়ায় সিংহাসন পেতে ওটিনাকে বসিয়ে রাখা যাবে। এ-রকম পরিষ্কার চাঁদের বুনো আলোয় ওর তখন গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছে যাচ্ছে। ও থমকে দাঁড়িয়ে

চালঘরটা একবার দেখলো। তলপেটটা জলের চাপে অনেকক্ষণ ধরে কটকট করছে। জলার কাছ বরাবর একটা জায়গায় ও বসে পড়লো। তারপর উঠতে গিয়ে হাত দশেক দূরে মগা দেখলে একটা বেতের বড় বাকসো। চোখের পাতা দুটো ভাল করে টানলো। বাক্সোই তো বটে। কী করে এলো এখানে। কাছে এসে দাঁড়ালো। কোন ভুল নেই একটা বড় কালো ট্রাংক। আবি ব্বাস। বুকের ভেতরটা নেচে উঠলো। যোগেন ঠাকুরের বাক্যি বাবা, যাবে কোথায়! বাকসোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে গিয়েই ও চমকে উঠে দাঁড়ালো। খুব জোর বেঁচে গেছে। হাত দুয়েক দূরেই চাঁদের আলোয় চকচক করছে একজন চন্দ্রবোড়ার পেছল শরীর। হাত কয়েক পেছিয়ে এসে ও ফিক করে হাসলো। ঠিক জায়গায় যুৎসই জিনিস। তা ভাল। যেখানে দৌলত, সেখানেই এনারা। মগা এগুলো না। ছুঁলেই সত্যবান। ও তখন খুঁজে পেতে একটা মোটা গোছের গাছের ডাল নিয়ে এলো। এ সময় একটা যুদ্ধ হয়। কবে কোথায় বিনা যুদ্ধে ধনরত্ন আসে বাবা। রাক্ষস সাপ দৈত্য না মেরেই দৌলত? তা কী হয়!

কিন্তু সাপটা গেল কোথায়। যুদ্ধ না করেই হাওয়া। এমন তো হয় না। মগা সাপটাকে এদিক ওদিক খুঁজলো কোথাও যদি সাপটি মেরে বসে থাকে। কিন্তু না। কোথাও নেই।

ও তখন বাকসোটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। ডালাটা টানতেই ফস করে খুলে গেল। চক্ষুস্থির মগার। কাটা কাটা একটা মেয়েমানুষের শরীর। ওপরেই মুন্ডুটা। সিঁথি জোড়া সিঁদুর। ডালা খুলতে দু' চোখে যেন আকাশের চাঁদটাকে গিলছে। সে চোখ বেশ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। রক্তে মাখামাখি বাকসো। মগা একবার ভাল করে দেখলো, ফর্সা। সুন্দর। বয়সটাও কম। আহা এ বয়সে কে তোকে মৃত্যুদন্ড দিল। কে সে? বড় কষ্ট মেয়েমানুষদের এ সংসারে। ব্যাটাছেলের কথা না শুনলেই কচাং। ডালা বন্ধ করতে গিয়েও আবার খুলে দিল। জামা দিয়ে মুন্ডটার মুখ চোখ মুছিয়ে দিল। দেখুক চাঁদ দেখুক। বাকসোটা ছেড়ে ও উঠে দাঁড়ালো।

মগা এবার বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। যাও বা অ্যাদ্দিন পরে একটা বেওয়ারিশ বাকসো মিললো তাও শালা ভুতুড়ে।

চাঁদটা অনেকটা মাথার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। আর একটু দাঁড়িয়ে জলার নিচে। মেয়েটা চাঁদের আলো খেতে খেতে গান গেয়ে উঠবে না তো। আসলে মগারই ইচ্ছে হচ্ছে এই জোৎস্নায় একটা গান ধরবার। এমন আলো। এমন ফাঁকা নিস্তব্ধ জায়গা। ধোঁয়ার কৃপায় মেজাজটাও চড়ে বসে।

লাইন পেরুবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ লোকালটা চলে গেল। তাহলে রাত বেশ হয়েছে।

বৃন্দাবন ময়রার দোকানের সামনে বসে শ্রীনাথ বিড়ি টানছিল। মগাকে দেখতে পেয়েই তেড়ে এসে খপ করে ওর জামার কলার ধরলো—ধরেছি ব্যাটাকে। মগা কোন রকমে চোখ টেনে দেখলো, শ্রীনাথ। ফস করে বলে ফেললো আমি তো খাই নি ভাই।

—বাহ্। ঠাকুর ঘরে কে আমি তো কলা খাই নি। শ্রীনাথ ওকে দু-চারবার ঝাঁকুনি দিল,—খাই নি। গোনাগুনতি মিষ্টি, দুটো নিয়ে সটকাও নি তুমি? কে ছিল ওখানে তুমি ছাড়া।

—বিশ্বাস কর ভাই শ্রীনাথ। তুমি কতদিনের চেনা। বৃন্দাবনদা কতদিনের....।

—থাম ব্যাটা গাঁজাখোর। এক চড়ে তোর...। শ্রীনাথ একটা চড় তুলে নিল গাল বরাবর হাঁকাবে বলে। চড়টা পেছন থেকে বৃন্দাবন ধরে ফেললো। খেয়েদেয়ে দোকানের পেছনে মুখ ধুচ্ছিল, শ্রীনাথের গলার আওয়াজে ছুটে এসেছে। খুব মোলায়েম গলায় বৃন্দাবন বললে—ছেড়ে দে শ্রীনাথ দুটো রাজভোগ বই তো নয়। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবন আঁৎকে উঠলো—এ কী করেছিস শ্রীনাথ? মেরে একেবারে রক্ত বার করে দিয়েছিস!

শ্রীনাথ অবাক হয়ে মগাকে ছেড়ে দিল—আমি তো মারি নি কর্তা, শুধু ধরেছি। সত্যিই মগার জামার নিচের দিকটা রক্তে ভিজে। মগাও একবার দেখলো। নিশ্চয়ই সেই বাকসো ছুঁড়ির রক্ত। শ্রীনাথ দু-পা পেছিয়ে দাঁড়ালো। মারের আগেই রক্ত কী রে বাবা। বৃন্দাবন বললে—তুই বাড়ি যা মগা। সন্ধের বোধহয় টাকার কথা বলেছিলি, সন্দেশ নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম, কাল এসে নিয়ে যাস। কিন্তু জামায় রক্ত কী করে এলো?

মগা টেনে টেনে চোখ বুজেই হাসলো, বললে—মাইরি বলছি যুদ্ধে যাই নি। মগার কথা শুনে বৃন্দাবন আর শ্রীনাথ হাঁ হয়ে গেল।

বাড়ির কাছ বরাবর মধুর জানলার কাছে মগা থমকে দাঁড়ালো। মধুর ঘরে শব্দ হচ্ছে যেন। কে যেন কাকে পেটাচ্ছে। ও কান পাতলো। —মধুর নতুন বৌ চ্যাঁচাচ্ছে, আর একটা কিছু ঘন ঘন মধুর পিঠে পড়ছে। এবার মধুর চাপা মিনতি ভেসে এলো—আজকের মত ছেড়ে দাও রমা, স্বামীকে জুতো মারতে নেই। আর কোনদিন লুকিয়ে তোমার বোনের গান শুনবো না। আইবাস। জলার জলার পারে কাটা ছুঁড়িটাকে দেখে মনে হয়েছিল সংসারে মেয়েরা বড় কষ্টে আছে। এখন দেখছি ব্যাটাছেলেদের সংসারে বড় কষ্ট।

ঠক করে জানলা দিয়ে কী যেন একটা পড়ে গেল। মগা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখলো,—একটা বেশ দামী মেয়েদের স্যান্ডেল। বোধহয় মধুর বোয়ের। সঙ্গে সঙ্গে মধুর বৌ চেঁচিয়ে উঠলো—ফেলে দিলে যে বড়। কুড়িয়ে আনো।

মগা সেটা হাতে নিয়ে ঘাড় তুলে ডাকলো—মধু ও মধু। সঙ্গে সঙ্গে গোলমালটাও থেমে গেল।

মধু উঁকি মারলো—কে? ও মগাদা। তা এত রাতে? আগুন নিভেছে তো? অনেক জল ঢেলেছি।

কী সব বকছে মধু। বোয়ের ধোলাই-এ মাথার ঠিক নেই নাকি। আগুন তো জ্বলছে ওর ঘরে। মগা বললে—এই স্যান্ডেলটা—

মধু খপ করে স্যান্ডেলটা হাতে নিল, বললে—দেখেছ কখন পড়ে গেছে। জলে ভিজে গিয়েছিল বলে শুকুতে দিয়েছিলুম। আপনার বৌমাও গিয়েছিল কিনা আগুন নেভাতে।

—কী সব বলছো মধু, কোথায় আগুন?

—কেন, তোমার বাড়িতে জানো না? এই ফিরছো বুঝি! আচ্ছা আক্কেল দাদা তোমার। জেনারো মানুষের মাথার কাছে কেউ লমফো জেলে যায়। বৌদি জ্বরের ঘোরে কখন হাত ছুঁড়েছে, আর পড়বি তো পড় বিছানায়। দাউ দাউ করে সব জ্বলে উঠেছে। বৌদির চিৎকার শুনেই তো ছুটে আমরা গেলুম। ছেলেটার হাতটা সামান্য পুড়ে গেছে বুঝলে। তা তোমার বৌমা আলু ছেঁচে লাগিয়ে দিয়েছে। তোমার বৌমাটা খুব ভাল—

মগা আর দাঁড়ালো না। কে যেন গালে থাপ্পড় মেরে নেশাটা ছিনিয়ে নিচ্ছে। ঘরে ঢুকতেই একটা পোড়া গন্ধ পেলো। এক কোণে তেলের কুপিটা জ্বলছে। বিছানা পোড়া। বালিস পোড়া ভিজে জবজবে চার ধার। তারই মধ্যে একটু শুকনো জায়গায় ছেলেটা শুয়ে। বোধহয় ঘুমোচ্ছে। সামনে উপু হয়ে বসে তটিনী। মগা একবার তটিনীর দিকে তাকালো। বৌ যেন মরা ছেলে নিয়ে চিতার ধারে বসে আছে। পোড়াবার ট্যাকা নেই বোধহয়।

তটিনী একবার মগার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। একটা কথাও বললে না। মগার মুখেও কোন কথা এলো না। ও একটু এগিয়ে এসে কোমরে হাত রেখে বেশ রাজসিক একটা ভঙ্গিতে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। এইবার যেন সেই লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা বুড়োটা কমন্ডুল হাতে ঘরে উঠে এসে সব ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

(ক্রমশ)

মুখগুলি থমথমে হয়ে ওঠে। আবার নতুন করে সবাই ভাবনায় পড়ে। ভাসানকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন বাঘের সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি। সারাক্ষণ বাঘের ভয় থাকলেও ব্যাপারটা ক্রমশ সহজ হয়ে এসেছিল। আতঙ্ক কিছুটা কমে এসেছিল. কিন্তু সবাই জানত, মানুষের স্বাদ পাওয়া বাঘ কোন না কোন সময়ে আবার আসবেই, আবার কাউকে না কাউকে তুলে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। গতকাল রাতে বাঘ যদি এই উঠোন অবধি এসে থাকে তাহলে বুঝতে হবে, বাঘ আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় একটাই মাত্র উপায় আছে. তা হচ্ছে বাঘটাকে খতম করে ফেলা।

রজনীই হাঁক ডাক করে সবাইকে জড় করল. প্রস্তাব দিল, এখানেই যখন থাকতে হবে জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, তখন আর মিন মিন করলে চলবে না, বাঘ শিকারে যদি কারো অভিজ্ঞতা থাকে, তার উচিত এখন এগিয়ে আসা।

এ ওর মুখের দিকে তাকায়। বাঘের মুখে পড়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচে আসা এক জিনিস, আর বাঘ শিকার করা আর এক জিনিস। ঠিক শিকারি বলতে যাকে বোঝায় এমন কেউ যে এখানে আছে, তা মনে হল না।

মকবুলও কোমরের চোট নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘর থেকে দাওয়ায় এসে খুঁটি ধরে বসে পড়ে। রজনীর কথায় সমর্থন জানায়, বড়ে মিঞার সঙ্গে রফা চলে না গো। কেউ যদি বাঘ শিকারের সাহস রাখ তো বল ?

জগন্নাথ বলল, জঙ্গলে কাজ করতে এসেছি, অথচ দু একজন শিকারী আনার কথা কেউ ভাবলাম না। এখন ছাগল দিয়ে লাঙল চাষ করাও।

মকবুল বলল, যা হয় নি, হয় নি। এখন কি করা যায় সেটা ভাবো।

রসিকলাল বলল, রাতে পাহারা দেবার ব্যবস্থা কর। আমরা না হয় পালা করে করে এবার থেকে রাত জাগব।

প্রস্তাবটা খারাপ না। কিন্তু বাঘ শীকার করতে হলে আর একটু অন্যভাবে ভাবা দরকার। রজনী বলল, জঙ্গলের মধ্যে মাচা বানিয়ে সেখানে বসে পাহারা দিলে কিন্তু ফল পাওয়া যেতে পারে। কি বলিস ?

রসিক বলল, বন্দুক নিয়ে জাগতে হবে।

—সবাই বন্দুক চালাতে জানে না।

—যারা জানে তেমন কাউকে কাউকে থাকতে হবে।

জগন্নাথ বলল, তোমরা মাচায় বসে থাকবে আর বড়ে মিঞা তোমাদের গুঁজি খাওয়ার জন্য কাছে আসবে, তাই না। বোঝা গেল, জগন্নাথ এই ঝামেলায় যেতে চাইছে না।

—আসতেও তো পারে। মকবুল বলল, তুমি ব্যবস্থা কর দেখি রজনী ভাই। আমার কোমর ভাল থাকলে আমি রোজ মাচায় বসতাম।

এমন সময় শুকদেবকে দেখা গেল, গায়ে শুকনো খড়ি-মাটির মতো চকচক করছে নুন। মাথা ভর্তি ঝাকড়া পাখির বাসার মত চুল। এখানে এসে অবধি কোনদিন ও জলে গা ডুবিয়েছে কিনা কে জানে।

শুকদেবের মুখ দেখে মনে হল না ও ভয় পেয়েছে। ভয়ের কি। রাখে কৃষ্ণ মারে কে ! শুকদেব সহজ ভঙ্গিতেই বলল, একবার একটা গান শুনেছিলাম, শুনবা শোন—

আমরা সবাই পোলাপান
গাজি আছে নিখাবান।

—থুৎ। তুই থামবি ? ধমক লাগল রজনী। কাজের কথা যা হচ্ছিল, তাই হোক।

শুকদেব এত সহজে থামার পাত্র নয় রজনীর ধমক খেয়ে যেন আরো উৎসাহ ওর বেড়ে গেল, বাঁচতে যদি চাও, তাহলে আমার সঙ্গে গান গাও রজনীভাই—

আমরা আজি পোলাপান
গাজি আছে নিখাবান।

মকবুল বলল, ওর কথায় কান না দিয়ে তুমি রজনীভাই, জঙ্গলের মধ্যে দু-চার জায়গায় মাচা বানাবার বন্দোবস্ত কর দেখি, ও শালার ফুর্তি একদিন বেরুবে।

এমন সময় দীননাথের গলা পাওয়া গেল, শীকার করতে হলে টোপ দরকার। কেবল মাচায় বসে থাকলেই হবে না। কাছাকাছি যদি একটা টোপ রাখা যায়, সেই টোপের লোভে বাঘ আসবে, আর তখন তাকে—

—বুদ্ধিটা খারাপ নয়। কিন্তু কি টোপ ?

—বাঘের টোপ আর কি হতে পারে। একটা জন্তু জানোয়ার হলেই ভালো হয়।

রজনী চোখে চট করে ভেসে উঠল ঈশানের ধরে আনা হরিণটা। ওটাকেই চমৎকার টোপ বানান যেতে পারে। কিন্তু কথাটা এখনই জানাজানি হওয়ায় বিপদ আছে। রজনী বলল, ঠিক আছে, টোপ একটা জোগাড় করে নেওয়া যাবে। সে দায়িত্ব আমার। এখন কোথায় মাচা হবে সেটা ভাব।

—জঙ্গলে না ঢুকলে বুঝবে কি করে, কোথায় হবে। চল না বেলাবেলিই কাজটা সেরে নি।

জগন্নাথ বলল, মাচা বানান দু মিনিটের কাজ। কিন্তু তুমি কোথা থেকে টোপ জোগাড় করবে শুনি ?

রজনী বলল, জোগাড় করতে হবে না। কাছেই আছে।

—'কাছেই আছে' কথাটা আরো রহস্যময়, ভেঙে বল না ? অত গোপন গোপন ভাব করলে চলে কখনো ?

রজনী জগন্নাথের দিকে তাকাল, তারপর দাওয়ায় বাঁধা হরিণটাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। ওটা চমৎকার টোপ হতে পারবে।

—তার আগে দুটো একটা মাথা নেমে যাবে। ঈশান ওটাকে পুষবে বলে রেখেছে।

রজনী বলল, ঈশানের সঙ্গে আমি কথা বলব। কোথায় ও ?

ঈশান ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গেছে নদীর পাড়ে। আজ সারাদিন ওকে পেলে তো!

রজনী বলল, ওকে এবার আমি বিদেয় করব। ছোটকর্তার কাছে আজই আমি খবর পাঠাব। সেবার ওর জন্যই আমরা মরেছিলাম, এবারও মরব।

মকবুল ঈশানের প্রসঙ্গে আলোচনা বাড়াতে চায় না। বলল আকাশটা যেমন থমথমে হয়ে আসছে, বৃষ্টিও নেমে বসতে পারে। তোমরা কাজটা আগেভাগেই সেরে এসো রজনীভাই।

আবার শুকদেবের গলা পাওয়া গেল,

আমরা সবাই পোলাপান
গাজি আছে নিখাবান।

শুকদেবের এক হাতে একটা কুড়াল। জঙ্গল কাটার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়েছে ও। যাত্রা দলের পরশুরামের মতো ভঙ্গি করে শুকদেব এগিয়ে এল, চল, কোথায় মাচা বানাতে হবে চল।

মকবুল বলল, যাও না হে, তোমরা দাঁড়িয়ে কেন ? দা কুড়োল নিয়ে বেরিয়ে পড়।

রজনী ততক্ষণে তার বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। চল চল! আর দেরি নয়। ফিরে এসে কথা বলব, চল।

জনাতিরিশেক লোক তৈরি হয়ে গেল। হাতে হাতে দা কুড়াল লাঠি। হৈ হৈ করে শব্দ করে বনের দিকে ছুটল। বাঘ তো বাঘ, বাঘের বাবাও আসার সাহস পাবে না এ-সময়।

শ' পাঁচেক হাত দূরে জঙ্গলের দিকে এখন সবুজ একটা আভা। সারারাত শিশিরে ধুয়ে মুছে গাছ-গাছালি এখন চমৎকার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। তবু তো আজ রোদ ওঠে নি। রোদ উঠলে মনে হত গাছ-গুলোকে যেন রঙের বালতিতে চুবিয়ে চুবিয়ে আবার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। টলটলে ঐ কাঁচা রঙের ফোঁটা টুপ টুপ করে বৃষ্টির ফোঁটার মতো গড়িয়ে পড়ছে নিচে। সবুজের আভায় জঙ্গলের মাটিও হয়ে উঠত সবুজ।

পাঁচশ হাত নির্মূল করা জঙ্গল এখন ফাঁকা মাঠের মতো। রজনী বোধহয় আজই প্রথম লক্ষ করল, এই জমিটুকুর উপর দিয়ে সরু সিঁথির মতো পায়ে চলা কয়েকটা রাস্তা হয়ে গেছে। বাকি অংশে গাছের গুঁড়ি আর আবর্জনার অন্ত নেই। গাছের গুঁড়িগুলো মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে তুলে ফেলতে হবে। চাষবাস করার মতো জমি তৈরি করতে এখনো ঢের সময় লেগে যাবে ওদের।

হৈ হৈ করে পুরো দলটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভেজা নরম মাটি পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে উঠে আসছে। ঝাঁকি দিয়ে পায়ের মাটি ঝাড়তে হচ্ছিল মাঝে মাঝে।

জঙ্গলের মুখে এসে রজনী থমকে দাঁড়াল। বুনো লতাপাতার গন্ধ এসে নাকে লাগছে। বাঁদিকে বড় বড় কয়েকটা ঝোপ অনেকখানি জায়গা জুড়ে রহস্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ রকম ঝোপের দিকেই বেশি করে নজরটা রাখা দরকার। কে জানে, ওরই মধ্যে বাঘটা এখন লুকিয়ে আছে কি না! গা ছম ছম করে উঠল রজনীর। কিন্তু দুর্বলতা প্রকাশ না করে রজনী চেঁচিয়ে বলল, আগে ঐ ঝোপগুলো উড়িয়ে দে দেখি।

দু-চারজন এলোপাথারি কাটারি চালাতে চালাতে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাকিরা এগিয়ে এল ডান দিকে। যতদূর চোখ যায় সামনের দিকে নিরেট জঙ্গল। শক্ত মোটা মোটা বেশ কিছু তেজিয়ান গাছ। রজনী লক্ষ্য করল বনের ভিতর ওরা ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ অনেক ঝাঁক পাখি লাফিয়ে উঠেছে। পাখি-গুলো অমন চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠার মধ্যে যেন কোন অশুভ ইঙ্গিত মেশানো রয়েছে। গা ছম ছম করে উঠল রজনীর। আজ বড্ড বেশি গা ছমছম করছে ওর। এ-কদিন একা একাই বনের ভিতর অনেক দূর অবধি চলে ফিরে বেড়িয়েছে ও, অথচ আজকের মতো এমন অনুভূতি ওর কোন দিন হয় নি। মানুষ অনেক সময় রহস্য-জনকভাবেই তার বিপদের কথা টের পেয়ে যায়। আজও কি সেই রকম কিছু ঘটতে চলেছে। তবে কি বাঘটা সত্যি সত্যি ধারে-কাছে কোথাও অপেক্ষা করছে। বাঘটা কি পালের গোদা হিসেবে রজনীকেই তাক করে অন্ধি-সন্ধি খুঁজছে। এ অবস্থায় হাতের বন্দুকটা যে কিছুই নয় বুঝতে অসুবিধা হয় না। বাঘের মুখোমুখি যদি পড়েই যায় রজনী, গুলি ছোঁড়ার সময় পাবে তো! কি জানি, আজ এমন হচ্ছে কেন!

জগন্নাথ এমন সময় রজনীর পাশটিতে এসে দাঁড়াল, বেশি ভিতরে না ঢুকে এখানেই কোন গাছে মাচা বানিয়ে ফিরে যাই চল। আকাশের চেহারা ভাল নয়।

রজনী এক পলক আকাশের দিকে তাকাল, বেশ মেঘলা দেখাচ্ছে আকাশ। শীতকালেও এমন ঘটা করে মেঘ জমতে পারে, এ দৃশ্য বড় একটা দেখা যায় না। আজ সব কিছুই সৃষ্টি ছাড়া।

দীননাথ এগিয়ে এল, আর একটু ভেতরে ঢুকলে হয় না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গাছগুলি পরীক্ষা করতে করতে বলল, এটা বড় কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে, দু-তিন দিনের মধ্যেই এ গাছগুলো কাটা শুরু হয়ে যাবে, তখন আবার ভেতরে ঢুকে মাচা বানাতে হবে।

রজনী বলল, তোরা যা ভাল মনে করিস, তাই কর। আমার আর কিছু বলার নেই।

—তুমি বড্ড ঘাবড়ে গেছ রজনী ভাই। জগন্নাথ বোঝাতে চেষ্টা করল, অত ঘাবড়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

রজনীর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা স্পষ্টই ধরা পড়েছিল, রজনী বলল, ঘাবড়ে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। একটা জিনিস তোরা লক্ষ্য করেছিস; কাল বিকেল থেকেই যত সব অঘটন ঘটতে শুরু করেছে।

সবাই তাকিয়ে থাকে। ওদিকে যারা ঝোপ পরিষ্কার করছিল তারা নির্বিকার। তাদের লাফালাফি দেখে বোঝার উপায় নেই দুশ্চিন্তার কিছু ঘটেছে।

—কি অঘটন? বাঘের পায়ের ছাপের জন্য বলছ?

—বাঘের পায়ের ছাপ তো আছেই। জঙ্গলে বাঘ আছে, তার পায়ের ছাপ যে কোন সময়ই দেখা যেতে পারে, সেটা বড় কথা নয়।

রজনীকে বেশ খানিকটা ভীত মনে হল জগন্নাথের। আর ভয় জিনিসটা ছোঁয়াচে রোগের মতো। জগন্নাথের বুকের ভিতরও শিরশির করে উঠল। বাঘের চেয়েও আরো সাংঘাতিক বিপদজনক কিছু যে অপেক্ষা করে আছে ওদের জন্য একথাটা এতক্ষণ কেউই ঠিক তেমন করে ভেবে দেখেনি।

রজনী বলল, আসলে বিপদ-টিপদ কিছু আসার আগেই আমি কেমন যেন তা বুঝতে পারি। কিছু কিছু লক্ষণ আছে, যা আমি চট করে ধরে ফেলতে পারি।

—কি লক্ষণ? দীননাথ গুটিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল।

রজনী হাসল, নাহ্ কিছু না মিছিমিছি তোদের ভয় পাওয়াচ্ছি। চল, কোথায় মাচা বানাতে হবে চল।

—বল না কি লক্ষণ? এই যে আধখানা কথা বল বাপু—

রজনী বলবে কি বলবে না করেও বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিল। তারপর না বলে পারল না। বলল, আসলে কাল বিকেলে যে ঐ মেয়েটা এসে ঘাটে ভিড়ল তখন থেকেই আমাদের ঝামেলা শুরু হয়েছে। ঐ মেয়েটাই আমাদের ঘাড়ে এক-গাদা বিপদ চাপিয়ে দিয়ে চলে যাবে দেখিস।

সবাই স্তব্ধ হয়ে আরো কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করে।

রজনী বলে, সেবার এই মেয়েটাই এসেছিল, আমাদের এখান থেকে উৎখাত করে দিয়ে তবে রেহাই দিয়েছিল। এবারও সে আমাদের অমঙ্গল করবে না বলি কি করে!

—কি খারাপ করবে আমাদের?

—দেখতে পাচ্ছিস না। কাল থেকে আকাশের চেহারাই পালটে গেছে। সকালে বাঘের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। এখন তো সবে শুরু, আরো কত কি হবে দেখতে পাবি। আমার কথা তো কেউ শোনে না, বুঝবে। সবাই বুঝবে।

একটুক্ষণ থমকে থাকে জগন্নাথ। মেয়েটার মুখ দেখে কিন্তু কিচ্ছুটি বোঝার উপায় নেই।

—মুখ দেখে সব সময় সব কিছু বোঝা যায় না। কিছু কিছু লোকই আছে ওরকম, ওদের নিশ্বাস গায়ে লাগলেই অমঙ্গল হয়।

দীননাথ বলল, ওদের তাড়িয়ে দিলেই ঝামেলা যায়!

—দে না। ঈশান কেমন মারতে আসবে দেখিস। ও হারামজাদাই তো গতবার গোলমাল পাকিয়েছিল, এবারও। ঘুম থেকে উঠতে না-উঠতেই বেটা নৌকোয় গিয়ে বসেছে। আমরা এদিকে [illegible] চিন্তায় অস্থির, ওর হুঁশ থাকলে তো!

—ঈশান কিন্তু অন্য কথা বলে।

—কি বলে?

—ও বলে, তুমি নাকি মিছিমিছি একটা মেয়ের নামে কেবল বদনাম দিচ্ছ।

রাগে রজনীর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে, হারামজাদাকে যদি আমি এখান থেকে না তাড়িয়েছি তা হলে আমার নাম পালটে নাম রাখিস। ওর বাহাদুরি আমি বার করবই। নিশি তো আজই কলকাতা যাবে, ওর হাতেই আমি ছোটকর্তার কাছে চিঠি পাঠাব। হয় ঈশান এখানে থাকবে, নয় আমরা থাকব।

ওদিকে যারা ঝোপ পরিষ্কার করছিল তারাও এগিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। রজনী বলল, বশ করা জানিস, মেয়েটা ওকে বশ করেছে। রসিকলাল তো কিছুটা খাজুরফুক

জানে, ওকে জিজ্ঞেস করিস, ওই তোদের বুঝিয়ে দেবে।

লোকগুলো হাঁ করে দাঁড়িয়ে কথা গেলে রজনীর। রজনী অবস্থা বুঝে বলল, ঠিক আছে চল, কোন গাছে মাচা বাঁধবি ঠিক কর। আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

রজনীই দলনেতার মতো জঙ্গলের মধ্যে আরো গভীরে যাওয়ার জন্য এগোতে শুরু করে। জগন্নাথ আর দীননাথও ওর পাশে পাশে এগোয়। শুলো কাঁটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে পা ফেলে ওরা।

বেশ খানিকটা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ায়।

—কি হল ?

রজনী বলল, এখানেই একটা গাছ বেছে নে। আর ভেতরে ঢুকে লাভ নেই।

চারপাশেই এখন ঘন জঙ্গল। বুনো গাছ-গাছালির গন্ধে শ্বাস-প্রশ্বাস কেমন ভারি হয়ে আসে সবার। রোদ ওঠেনি বলে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ভাবটা গায়ে গায়ে যেন জড়িয়ে থাকে।

জগন্নাথ বলল, ঠিক আছে, ঐ যে গাছটা দেখছ রজনীভাই, ওটাতেই উঠি।

গোটা পাঁচ-সাত গাছের মধ্যে একটাকে ধরে তরতর করে উঠে যেতে শুরু করে জগন্নাথ। ঝুর ঝুর করে ভেজা পাতা থেকে এক রাশ জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। কাটের পাটাতে রামদা ধার দেওয়ার মতো খাসর খাসর শব্দ ওঠে। দীননাথ কোমরে কাটারি গুঁজে কাঁধে দড়ি ফেলে উঠবার জন্য তৈরি হয়।

রজনী সাবধান করে, দেখিস বাপু। গাছ কিন্তু ভেজা, সাবধানে উঠিস। হাতের বন্দুকটাকে লাঠির মতো তুলে ধরে ওপর দিকে তাকায় রজনী।

জগন্নাথ তরতর করে অনেক উপরে উঠে এল। উঠে নিচে একবার তাকিয়ে দেখল, হ্যাঁ, এ জায়গাটাই ভালো। এখান থেকে নিচে অনেকখানি জায়গা দেখা যায়, আবার দূরের কাছারি বাড়িটাকেও একটু একটু নজরে আসে। ওপাশে ডোবাটাকেও খানিক খানিক দেখা যাচ্ছে। অনেকটা টিক টিলটো ত এর মতো ডোবাটা বাঁক নিয়েছে দেখতে পেল জগন্নাথ। আরো খানিকটা উপরেও ওঠা যায়, কিন্তু তাতে রাতের অন্ধকারে নিচে কতটা পরিষ্কার দেখাবে কে জানে। এ জায়গাটাই ওর পছন্দ হল।

দীননাথ ততক্ষণে ওর কাছটিতে উঠে এসেছে। দীননাথের হাত থেকে কাটারিটা তুলে নিয়ে বেশ কয়েকটা ডাল ছেঁটে ফেলল জগন্নাথ। দড়ি গাছি দীননাথের কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে ও শক্ত করে গাছের ডালে বাঁধতে শুরু করল। দীননাথের দিকে তাকাল, ওপাশটা পরিষ্কার কর দীনু। এখানেই দু-তিনজন লোক আরাম করে বসে রাত কাটাতে পারবে, কি বলিস ?

দীননাথ মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, এখানেই ভাল হবে।

জগন্নাথ বলল, ঐ কোণের দিকে হরিণটাকে টোপ হিসেবে বেঁধে রাখা যাবে।

যেদিকে আঙুল তুলে দেখাল জগন্নাথ, সেদিক অনেক দূর অবধি ছড়ান গোল পাতার জঙ্গল। মাকড়শার জালের মতো ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে জায়গাটা।

রজনী নিচ থেকে চেঁচিয়ে বলল, আর একটু উপরে উঠবি না ? ও জায়গাটা কি ভাল হবে ?

জগন্নাথ দড়ি বাঁধা থামিয়ে বলল, আর উপরে উঠলে নিচে ভাল দেখাবে না।

দীননাথও জগন্নাথের কথায় সায় দিল। এখানেই ভালো। এখান থেকে ভালো দেখাচ্ছে।

ভালো তো ভালো। রজনী আর কথা বাড়াল না। শক্ত করে বাঁধিস কিন্তু। শেষ পর্যন্ত যেন ভেঙে না পড়ে কেউ।

দীননাথ গাছের ডাল কাটার জন্য নিচে হাঁকডাক শুরু করে দেয়। মাচা বানাতে বেশ কিছু লাঠির দরকার। নিচে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা হাই হাই করে গাছ উপড়ে উপড়ে ছেটে কেটে লাঠি বানাতে শুরু করে।

রজনীর কোমর ধরে এসেছিল। একটু বসে জিরিয়ে নিতে পারলে হত। কিন্তু বসবে কোথায়। চারপাশে জবজবে কাদা। ভেজা। পা দুটোয় কাদা জেবড়ে এমনিতেই বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। গাছের গায়ে ঘষে কাদা ছাড়িয়েও স্বস্তি নেই। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকল।*

মনে হল, বাতাস যেন ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছে। কিছু একটা ঘটনা যেন ঘটতে চলেছে এমন স্তব্ধতা চারপাশে। জঙ্গলের পাখিগুলো গেল কোথায়! আকাশের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল, ঘন কালো চেহারা ধরেছে আকাশের। তারই গায়ে ক্ষুদে ক্ষুদে বিন্দুর মতো পাখিগুলো উড়ছে।

রজনী তাড়া লাগালো, তাড়াতাড়ি হাতে চালা বাপু। মেলাই কাজ পড়ে আছে। তিন-চারজন গাছে উঠে পড়েছিল। রজনী দেখল, লোকগুলোর চাবুকের মতো শরীর যেভাবে সরু সরু ডালে ঘোরাফেরা করছে, তাকাতেই ভয় হয়। নিচে পড়ে গেলে শূলে বিঁধে যাবে। আবার তাড়া লাগাল রজনী সাবধানে হে। বেশি বাহাদুরি করা ভাল নয়।

গরান ডালের শক্ত শক্ত ডাল বেঁধে বেঁধে চমৎকার একটা মাচাই প্রায় বানিয়ে তুলেছে জগন্নাথ। কিন্তু এমন সময় সমস্ত বনভূমি যেন জেগে উঠে দৈত্যের মতো হঠাৎ মাথা ঝাঁকি দিয়ে উঠল। ঘটনাটা যে কী বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল ওদের। খই ফোটার মতো অসংখ্য শব্দ চারপাশে। নিজের কানকে অবিশ্বাস করা যায় না। শব্দটা ক্রমশ যেন বাড়ছে। কী শব্দ রে বাবা। যারা গাছে উঠেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন তরতর করে নেমে এল।

চারপাশে তাকিয়ে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে এল সবার।

ওদিকে বনের মুখোমুখি যারা জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে নেমেছিল তাদের চিৎকার এসময় কানে এল রজনীর।

কিন্তু কেন ? এমন হচ্ছে কেন ? হাতের বন্দুক হাতেই রয়ে গেল রজনীর। ওপর দিকে তাকাল। জগন্নাথ গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়েছে। পা হড়কে গেছে বোধ হয়।

ওদিকে দীননাথের এক অদ্ভুত অবস্থা। শব্দটা ক্রমশই বাড়ছে। গাছের পাতায় পাতায় যেন সহস্র তালি বাজতে শুরু করেছে। একসঙ্গে এক কাট্টা হয়ে সমস্ত বনভূমি যেন হেলায় ফেলায় অস্ত্র ছুঁড়ে দিয়েছে ওদের দিকে, কি হল এসো, কত বড় হিম্মত তোমাদের দেখি। কই হে পালের গোদা, কোথায় গেলে ? এসো না। হা হা হা হা...

আরো অনেকক্ষণ পর রজনী অবস্থাটা বুঝতে পেরে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। বুঝতে পারল বৃষ্টি। বৃষ্টি নেমেছে বনের মাথায়। গাছের ডালপালা ভেদ করে সেই বৃষ্টির ফোঁটা নিচে নেমে আসতে এতক্ষণ সময় লাগল।

ফলে আর দাঁড়ান নয়। জগন্নাথ নেমে পড়তেই রজনী বলল, পালা। এই ঠাণ্ডায় মধ্যে ভিজলে আর রক্ষা থাকবে না।

বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সেই সিঁথির মতো রাস্তা ধরে ওরা ছুটতে শুরু করল কাছারির দিকে। কাদায় পা পিছলে যাচ্ছে। পুরোপুরি কাদা থাকলে বোধ হয় এত কষ্ট হত না। কিন্তু এ বৃষ্টিতে ওপরের স্তরটাই কেবল পেছল। পা পিছলে যাচ্ছে।

হা হা... বনভূমি অট্টহাসি করে লাফিয়ে উঠছে। হা হা... হি হি... হো হো...

পেছনে তাকান সম্ভব ছিল না। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটায় ভিজে একশা হয়ে গেল রজনী। বৃষ্টির কণা যেন ছুঁচের মতো ওর গায়ে পিঠে বিঁধে যাচ্ছে। হাতের বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিল। ছুটে চলা অসম্ভব। ভিজতে ভিজতেই এগোতে শুরু করল ও।

আর কাছারি বাড়ির উঠোনে এসে বিস্ময় ওর চরমে উঠল। কে ? কে ও ?

থমকে দাঁড়াল রজনী। গৌরী ওর কাছারি বাড়ির বারান্দায় এসে টুলের ওপর একা একা বসে আছে। আর খানিকটা তফাতে খুঁটিতে সেই হরিণ।

আশ্চর্য, মেয়েটা এখানে এল কী করে। কে ওকে এখানে এনে বসিয়ে রেখেছে, কে ? কার এমন সাহস।

বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভিজতে থাকল রজনী।

(চলবে)

সুব্রত চক্রবর্তীর কবিতা

মুখোশ

আমাদের সেই সব রঙিন মুখোশগুলি
পড়ে আছে অনাদরে—রোদে জলে, পাথর ছায়ায় —
একদিন কেউ-না-কেউ তুলে নেবে, এই ভেবে
আজ, দূরে থেকে
ঐ সব মুখোশের গভীর রগড় শুধু লক্ষ করি,
বেলা পড়ে আসে।

মুখোশ মায়ার দেশে একদিন আমাদেরও ঘুম ভেঙেছিল,
একদিন আমাদেরও চলাফেরা ছিল না কি ভোরের অপ্রেমে!
পাখি-পাখালির ডাকে একদিন আমাদেরও মনে হয়েছিল
মুখোশের চোখ নাক ভুরু ঠোঁট, কপালের ভাঁজ,
এই সব আমাদেরই, এই সব আমাদেরই। ভুল।

আজ, বহু দূরে থেকে চেয়ে দেখি রঙিন মুখোশগুলি
কেঁপে উঠছে হিমে ও হাওয়ায়....
একদিন কেউ-না-কেউ তুলে নেবে;
পরে নেবে, ঐ সব মুখোশের চং, প্রতারণা—
এই ভেবে, এক মুখোশের টান ছিঁড়ে-ফেড়ে,
তছনছ করে, একা
হেঁটে যাই অন্য এক মুখোশের দিকে।

মানুষ

মানুষের পাশের চেয়ার থেকে উঠে যায়
স্বল্পকুট একজন মানুষ।
আমি ঐ উঠে-যাওয়া মানুষের দিকে
দূরে থেকে চেয়ে থাকি; ইচ্ছে হয়, ঐ মানুষের
গভীর অসুখে আমি নিয়ে যাবো কমলালেবু,
কয়েকটি আপেল.
আমি ওর আরোগ্যের দিনে
কিছু বই আর ফুল নিয়ে যাবো—
কাছে ডেকে, কাঁধে হাত রেখে
খুব আস্তে বলবো, 'তুমি কেন
মানুষের পাশের চেয়ার থেকে চিরদিন উঠে যাও,
নিরিবিলি ক'রে চলে যাও
মানুষের চারিদিক, মানুষের সব সুখসাধ!'

মানুষের পাশের চেয়ারে ঐ দৌড়ে এসে বসে পড়লো
একজন আখুটে মানুষ।
দূরে থেকে ওকে দেখে, ইচ্ছে হয়, ওর জন্মদিনে
রঙিন পাঞ্জাবি প'রে হাসাহাসি করে আসবো;
ভাবি, ওর বিবাহ-উৎসবে
উপহার নিয়ে যাবো বাহারে নেকটাই, আর
কাছে ডেকে, ওকে শুধোবো না,
'তুমি কেন চিরদিন মানুষের পাশের শূন্যতা
নষ্ট করো—ধ্বংস করো মানুষের নীরবতা,
মানুষের দূরদূরান্তর!'

সলিল ভট্টাচার্যের ছবি

মাঝে মাঝে সলিল ভট্টাচার্যের আবির্ভাব ঘটে তাঁর শিল্প-সামগ্রী নিয়ে। সে কারণে কলকাতার দর্শক তাঁর ছবির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে যেতে পারেন না। কিন্তু তাঁর আবির্ভাব যখনই ঘটুক না কেন আসলে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশে তিনি অপারগ নন। রেখার ওপর তাঁর দখল অনস্বীকার্য। আগে তাঁর কিছু কিছু কাজে রেখার প্রাবল্য ছিল—যা তাঁর চিত্র-ভাষাকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করত। পরবর্তীকালে রেখার প্রতি তাঁর মমত্ব যে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে তাঁর সাম্প্রতিক কিছু খসড়া চিত্রে তা ধরা পড়ে। এখানে মুদ্রিত চিত্রটিতেও রেখার ব্যবহার সীমিত।

১৯৩১ সালে জন্ম। কলকাতায় সরকারী আর্ট কলেজে শিল্পশিক্ষা করেছেন। শিল্প জগতের মামুলী পরিবেশে না থেকে একান্ত আত্মগতভাবে শিল্পচর্চা করে যান। বর্তমানে সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুলে শিল্প-শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত।

বোম্বাইয়ের চিত্রলোকে বাঙালী গল্পকার

শক্তিপদ রাজগুরু

কল্যাণী তাড়া দেয়—ঢের কাজ হয়েছে। স্নান করে চলুন এবার। ভাবলাম কালই যাবেন।

হোটেলের কাছেই ওদের বাসা। খার এ। ওই বাড়িতেই থাকতেন উর্দু সাহিত্যিক কৃষাণ চন্দর। আর বর্তমানে বাংলার সাহিত্যিক শংকরএর বোম্বাইএর আস্তানা ওই বাড়ির দোতলার একটা ফ্ল্যাটে।

পরিতোষবাবু বলেন—ওর্লি থেকে ডঃ দত্ত, মিসেস গাঙ্গুলী ওরাও খবর নিচ্ছিলেন। একদিন যেতে হবে।

বোম্বাই প্রবাসী বাঙালী সমাজের বোম্বাই শহরে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শিবাজী পার্কে বেঙ্গলী ক্লাব, তাদের পাঠাগার, দাদার বাঙালী সমিতি খার, গোরে গাঁও, অম্বরনাথ, ওর্লি এখান ওখানে অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ওর্লি থেকে এরা একটা পত্রিকাও বের করেন, বোম্বাই বিচিত্রা নাম দিয়ে। এদের শারদীয়া সংখ্যা-অন্যান্য সংখ্যাগুলোয় বঙ্গ সংস্কৃতি বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি মারাঠি গুজরাটি সাহিত্যও প্রকাশ করেন। এছাড়া বেশ কয়েকটি দুর্গাপুজোও হয়, শিবাজী পার্ক, বান্দ্রায় সার্বজনীন, সান্তাক্রুজে, অম্বরনাথে, চেম্বুরেও পুজো হয়। পুজোর প্রতিমা গড়তে যান কলকাতার মৃৎশিল্পীরা। বোম্বাইএর ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার ওখানে নাকি মূর্তি কয়েকটা গড়া হয়। মাটি আনতে হয় দূর থেকে ট্রাকে করে, কারণ বোম্বাইএর লালচে বালি মাটিতে কোন মূর্তি হয় না। বোম্বাইএর বাঙালী সমাজের কিছু আত্মীয়তার পরিচয় পেয়েছিলাম ওর্লি সি ফেস বাঙালীদের পাড়ায়। জানাই পরিতোষবাবুকে,

—নিশ্চয়ই জাবো। সম্ভব হলে এই রবিবার সন্ধ্যায় হতে পারে। স্নান করে বের হচ্ছি হোটেল থেকে। ওপাশেই একটা বাড়ির একতলাকে সাজানো হয়েছে আলো দিয়ে। গেটে লোকজন গাড়ির ভিড় দেখা যায়, রোশনী জেলে ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ বাজিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা আসছে। ঝকমকে পোশাক পরা সুন্দরী আধুনিকা মেয়েদের দল রয়েছে, স্যুটপরা তরুণ বয়স্ক পাঞ্জাবীও রয়েছে অনেক। সাজানো ঘোড়ার পিঠে দুলোগদর হাতে চলেছে বর, আর রয়েছে অর্গান পাঞ্জাবী ঢোলক আর সানাইএর মত যন্ত্র, ঢাকবার সুর বাজছে, তার সঙ্গে উদ্দাম ঢেকরা নৃত্যে সামিল হয়েছে স্যুট বুট পরা সর্দারজী, যায় আধুনিকা সর্দারণীরাও। প্রকাশ্য রাজপথে উদ্দাম বেগে ভাকরা নেচে চলেছে।

—বোলো বোলো বোলো—উ-র-র-র! হুই-হুই সারা দেহ কাঁপছে নাচের চোটে লাফিয়ে উঠছে মাটি ছেড়ে দুই পা, সর্দারনীরাও নেচে চলেছে।

একটু অবাক হই ব্যাপার দেখে। কল্যাণীকে বলি, .

—কি ব্যাপার !

আমাদের হোটেল ম্যানেজার মাঝবয়সী লাজপৎ সিংজী বলে ওঠে,

—রাজগুরুজী, এ বেঙ্গলী সুভ্ নট্, যবরগেট টেগোর সং, আউর কোই সর্দারকা বাচ্চা কভি ভাগরা নেহি ভুলেগা।

খুশীর চোটে ওই পেল্লায় কড়ালায়ের দাদির সঙ্গে সিংজীও চককর মেরে একপাক ঘুরে নিয়ে চিনচিনে গলার হাক পাড়েন

—আরে বোলে বোলে বোলে—

হাসতে থাকি।

কল্যাণী গলা নামিয়ে বলে,

—ওদের মেয়েদের নাচ দেখে বলছেন তো? আর দুর্গাপুজোর বিজয়ার দিন বোম্বাইএর রাস্তায় বাঙালী মেয়েদের নাচ দেখেছেন? থ হয়ে যাবেন। ওই শক্তিবাবুই তো বান্দ্রার বেঙ্গলী ক্লাবের পুজোর চেয়ারম্যান, ওঁকেই শুধোবেন।

কথাটা অবশ্য পরে শুনেছিলাম রামকৃষ্ণ মিশনের কোন মহারাজের কাছেও। একটু অখুশী হয়েই কথাটা বলেছিলেন তিনি।

আমি শুনেছি পুজোর সময় বহু দুর্গোৎসবের প্যাণ্ডেলে বাংলার অনেক কিছু নিয়ে প্রদর্শনী করে থাকেন। বইএর স্টলও দিতে যান এখান থেকে অনেকে। নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে, এককথায় প্রবাসী বাঙালীরা এখনও নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে ভোলেনি। সেদিন নন্দজীর গুরুপ্রসাদ স্টুডিওতে গেছি। 'মহাগুরু' ছবির কাহিনী চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনায়

ব্যাপারে। নটরাজ স্টুডিওতে কোন একটা ছবির মহরৎ চলছে। ফুল মালা দিয়ে স্টুডিওর গেট থেকে ভিতর অবধি সাজানো। শিল্পীদের অনেকেই এসেছেন।

এদের দূর থেকে ছায়াছবির জগতে দেখা যায় তারকা হিসেবে, কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায় এরাও মানুষ। তবে বোম্বাই-এর নামকরা হিরো বা অন্য অভিনেতাদের হাতে এত কাজ যে তাদের নিজস্ব সময় বলতে কিছুই প্রায় নেই। মেসিনের মত কাজ করে চলেছেন, সারাদিন রাতে হয়তো চারটে পাঁচটা বইও স্যুটিং করছেন। তাই কোন চরিত্রের কতটুকু গুরুত্ব, কার কি বৈশিষ্ট্য সেটুকু মনে রাখার সময়ও এদের নেই।

তবু সামাজিকতার অনুষ্ঠানে অনেকেই আসেন দেখলাম। সেবার দিল্লী ফিল্ম এ্যাওয়ার্ড আনতে গিয়ে এক হোটেলে বাস করেছিলাম এঁদের অনেকের সঙ্গে। ধর্মেন্দ্র, হেমামালিনী, সুলক্ষণা পণ্ডিত, হেলেন, বিন্দু, নিরুপা রায়, দেবেন বর্মা, শচীন, আমজাদ খাঁ, প্রাণ, প্রেমানারায়ণ। পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন শক্তি সামন্ত, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, দুলাল গুহ, বাসু চ্যাটার্জি। সঙ্গীত পরিচালক শ্যামল মিত্র ও আরও অনেকে।

শচীন, আমজাদ খান আর আমি এক গাড়িতেই ঘুরতাম, আর প্রাণকে দেখেছি, তিনি বিদগ্ধ কবি। শায়ের আবৃত্তি করেন অত্যন্ত দরদ দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে।

এই রকম একটা কবি মন নিয়ে ছবিতে কি করে ভিলেনের অভিনয় করেন বুঝতে পারি না। ওকে প্রশ্ন করেছিলাম, উনি হেসে জবাব দেন—নসীব।

আমজাদ খাঁয়ের সঙ্গে বাচ্চা শচীনের খুব ভাব। আমজাদ খান বলেন—ওই আমার গার্জেন।

প্লেনে দিল্লী থেকে ফিরছি বোম্বাই। বোয়িং প্লেন, এক সঙ্গে তিনটে সিট, আমি শচীন আর আমজাদ খান বসেছি। গত রাত্রে পার্টি ছিল অশোকা হোটেলে। ওদের ফিরতে রাত হয়েছে। আমজাদ খান এর মাথা ধরে আছে, এয়ার হোস্টেসকে বলে আমাদের তিনজনের জন্য তিনটে এ্যাসপ্রো আনানো হল। ওকে অনুরোধ করে শচীন। আমি বসি।

—কাল আমি তো পার্টি থেকে ঢুকেই বের হয়েছিলাম, রাত এগারোটার মধ্যে শুয়ে পড়েছি। মাথা ফাতা ধরেনি।

শচীন বলে—আমজাদ ভাই-এর এক দুটো ট্যাবলেট কিছু হবে না। পুরো কোয়ার্টার ডজন চাই। তাই তিনজনের কোটাই হয়ে নিলাম। আরও অবাক হই খান সাহেবও তিনটে ট্যাবলেট খেয়ে প্লেনের জানলার ঢাকনা বন্ধ করে ঘুমুতে চেষ্টা করলেন।

দেবেন বর্মা বর্তমানে হিন্দী ছবির অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা। বেশ ফূর্তিবাজ লোক। সহজ সরল আর চাল নেই। ব্যক্তিগত জীবনে উনি অশোক কুমারের জামাই। কটা দিন একাই জমিয়ে রেখেছিলেন।

দেখেছি আসরানীকে। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র। শক্তি সামন্তের 'অনুরোধে' এক পাঞ্জাবী গ্যারেজওয়ালার চরিত্র অভিনয় করেছেন, অপূর্ব অভিনয়। পাঞ্জাবী ম্যানারিজমকে পুরোপুরি বজায় রেখেছেন। আসরানীও বেশ আড্ডাবাজ ছেলে।

জনপ্রিয় রাজেশ খান্না-সঞ্জীবকুমার একটু রাশভারি ধরনের মানুষ। কিন্তু তাদের আড্ডায় তাঁরাও সহজ খোলামেলা হয়ে ওঠেন। মানুষ যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন তাকে কোথাও না কোথাও নিজেকে

মহকুমা পুরগণার ঘুটিয়াপুকুরের কাছে শক্তিবাবুর একটি ছবির শুটিং চলছে

একটি অনুষ্ঠানে ডাঃ বিশ্বনাথ রায় শক্তি সামন্ত, প্রণব বসু এবং শক্তিপদ রাজগুরু

মেলে ধরতেই হয়, সমাজবদ্ধ জীব সে-ও।

বোম্বাই-এর ওই নামী দামী হিরোদের সারা দিনে কয়েক সিপ্টে বিভিন্ন স্টুডিওতে কাজ করতে হয়। ওদের অনেকেরই বিদেশী ছোট ভ্যান আছে, সেটা পুরোপুরি এয়ার-কন্ডিশন্ড আর তাতে বিশ্রামের জন্য বিছানা --সোফাসেট, মেকআপের ব্যবস্থাও রয়েছে। পুরু কাচ---তাতে পর্দা লাগানো 'ভোকস ওয়াগন' গাড়ি। ওতে করেই ওরা এখান থেকে ওখানে যান, এক সাজ ছেড়ে অন্য সাজ পরে অভিনয় করে আবার অন্য স্টুডিওতে দৌড়ান অন্য চরিত্রের মেক-আপ নতে নিতে।

হিরোইনদেরও অবস্থা তাই। তাদের সঙ্গে থাকে নিজেদের হেয়ার ড্রেসার সহ-কারিণীও।

তবু সময় করে সামাজিকতা রক্ষা করতে আসেন। সেদিন স্টুডিওতে তাই মহরৎ-এর অনেককেই দেখা গেল। ইমপোর্টেড বিদেশী গাড়ির সারি লেগেছিল।

...দুপুরের পর ওদের গল্প নিয়ে বসেছি। বোম্বাই ফিল্ম জগতে যে ক'জন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আছেন তাদের মধ্যে নাম করা যায় শচীন কত্তার, আর একজনের নাম করা যায় তিনি অশোককুমার, দাদামণি নামেই পরিচিত। শক্তি সামন্তের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনেক কাছের। শক্তিবাবুর সব বই-এ তিনি আছেন, আর শক্তিবাবু তাঁর জন্য স্টুডিওতে একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশ্রাম নেবার জন্য ঘরও করে রেখেছেন। পুরু কার্পেট পাতা—ডানলোপিলোর গদি---লাগোয়া বাথরুম। আর বাথরুমের দরজায় রসিকতা করে সুন্দর হাতে নোটিশ লিখে রেখেছে---অ্যাডাল্টস ওনলি, বিওয়্যার অফ সেকেস স্ক্যান্ডেলস্।

অশোককুমারও রসিক ব্যক্তি। ওইসব রসিকতা বেশ উপভোগ করেন মুচকি হেসে। ও-ঘরেই আজ বসেছি আমরা। এখানে বিনা আহ্বানে কেউ আসবেন না এইটাই রেওয়াজ। কারণ, দেখেছি শক্তি সামন্তের স্টুডিওর অফিসে বহু মানুষের আনাগোনা। নানা কাজে তাঁরা দূর-দুরান্ত থেকে আসেন। তছাড়া অফিসের নানা কাজও রয়েছে, আর আসেন বহুজন অনেক দাবী নিয়ে। শক্তি সামন্ত সকলের সঙ্গেই দেখা করেন—কথা বলেন। আর চিঠিপত্র যা আসে তার জন্য দৈনিক আধ ঘণ্টা বরাদ্দ। নিজে পড়ে দেখবেন--দরকার হলে নিজের হাতেই চিঠির জবাব দেবেন ঃ সেক্রেটারী-টাইপিস্ট থাকা সত্ত্বেও জরুরী চিঠি—ব্যক্তিগত চিঠি নিজেই বেশীর ভাগ লেখেন। তাই কাজের ফাঁক থেকে মাঝে মাঝে এভাবে সরে আসতে হয় অন্য কাজে। 'মহাগুরু' ছবির কিছুটা 'রাশ প্রিন্ট' আমি দেখেছি। শক্তিবাবু পশ্চিমবাংলা থেকে কয়েকজন অভিনেতাদের নিয়েছিলেন 'অমানুষ'এ, তাদের মধ্যে অনিল চাটুয্যেও বোম্বাই-এ নাম করেছেন, আর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন উত্তমকুমার। আজ সেখানে কর্মব্যস্ত অভিনেতা তিনি। আর নিজের অভিনয়ের দাপটে সেখানে আসর জুড়ে বসেছেন উৎপল দত্ত।

সেদিন কথাটা বলেছিলাম উৎপল দত্তের বোম্বাই-এর ফ্ল্যাটের গৃহ প্রবেশের সন্ধ্যায়। জহুতারা রোডে সমুদ্রের ধারে একটা ফ্ল্যাট কিনে সেখানেও একটা আস্তানা গড়েছেন উৎপলবাবু, ছোট্ট একটি ঘরোয়া বন্ধুগোষ্ঠীর আসর বসেছে সেখানে। তখন আমিও বোম্বাই-এ রয়েছি। শক্তিবাবুর ভাই গিরিজা সামন্তের গাড়িতে ওখানে গিয়ে দেখি শক্তি-বাবুরা এসে গেছেন ... উৎপলবাবুর প্রতিবেশী এক তরুণ মারাঠি ইঞ্জিনীয়ার আর যাদবপুরের বাঙ্গালী ছাত্রী ওই ইঞ্জি-নিয়ারের স্ত্রী। ছোট সুখী পরিবার। শোভা-দেবীর নজর সব দিকে। খাওয়া-দাওয়ার সময় কথাটা মনে হয়। উৎপলবাবু এখন বোম্বের ছবির জগতে অন্যতম শক্তিশালী কর্মব্যস্ত অভিনেতা। আরও সাবাস দিই তাঁকে, সমানে কোলকাতা-বোম্বাই-এর তাল সামলে চলেছেন, তাছাড়া মঞ্চও রয়েছে এখানে।

'মহাগুরু'তে ওর অভিনয় আমি দেখেছি। এক জেলফেরৎ বৃদ্ধের চরিত্র, ও'র অভিনয় দেখে মনে হয় আশপাশের অভি-নেতাদের তিনি যেন কোণঠাসা করে দিয়ে-ছেন। তেমনি আর একটি দুরূহ ভিলেনের চরিত্র করেছেন 'গ্রেট গ্যাম্বলার'-এ। এ ছবির 'রাশ' দেখেছি।

শক্তিবাবুর এ এক বিচিত্র ধরনের ছবি। এর পটভূমিকা ভারতবর্ষ, সারা ইউরোপ জুড়ে। ইতালি, ফ্রান্স, পর্তুগাল, সুইজার-ল্যান্ড জুড়ে এর পরিসর। আর বহু কষ্টে প্রভূত অর্থব্যয়ে ইউরোপ টহল দিয়ে এ ছবি তুলেছেন। ভিনিস-এর আউটডোর এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ। শেষ পর্যায়ের সুটিং-এর জন্য আবার মে মাসে তিনি দল-বল নিয়ে ইউরোপ যাচ্ছেন।

এই ছবিতে গোয়ায় সুটিং করার আগে আমজাদ খানের একটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার কথা ছিল, গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন তিনি, পানাজির প্রায় আশি মাইল দূরে তাঁর গাড়ি এ্যাকসিডেন্ট করে তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকেন।

ফলে ওই চরিত্রটি এসে পড়ে উৎপল-বাবুর ঘাড়ে। একটা আন্তর্জাতিক গ্যাং-এর দলনেতার চরিত্র। কুটিল, ভয়ানক হিংস্র একটা চরিত্র। কিন্তু তার যা রূপারোপ করেছেন উৎপলবাবু সেটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। সে যখন সাংঘাতিক একটা সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে গান গায় গুনগুনিয়ে। তার ওই সুরের আলাপ শুনলেই দর্শকবৃন্দ শিউরে উঠবেন। দারুণ কন্ট্রাস্ট ... গভীরতা ফুটে উঠেছে ওই চরিত্রের মধ্যে।

...যা বলছিলাম, 'মহাগুরু'র চিত্রনাট্যের কথা। গুলসান নন্দা পড়ে চলেছেন। ঘটনা-গুলোকে সাজিয়েছেন সুন্দরভাবে। পথের মানুষের যাযাবর জীবন থেকে পায়ের নীচে মাটি পাবার স্বপ্ন। শেষের দিকে এসে একটু দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে। আর ঘটনাস্রোতও জড়িয়ে গেছে। তবু পাকা লিখিয়ে তিনি সেই জালগুলো গুটিয়ে তুলেছেন।

শক্তিবাবু বলেন, ওভাবে নয়, শেষ দিকটা নন্দাজী স্রেফ চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাগুলোকে সাজান, যাতে ঘটনার পর ঘটনাই বড় না হয়ে উঠে, আমার চরিত্রের পরিণতি আর পূর্ণ রূপায়ণের জন্যই ঘটনাগুলো এসে যায়।

অনেক হিন্দী গল্পলেখক ছবির জন্য ...ধ্যে ঘটনার পর ঘটনার ভিড় জমান, ফলে ...ানুষের সুখ-দুঃখ—তার পরিণতির চেয়ে ...টনার তোড়ই বেশী হয়ে গল্পটা ছড়িয়ে ...য়, হারিয়ে যায় মূল লক্ষ্য। ওরা ভাবেন ...-চারটে ক্লাইমেক্স সিন—সেগুলোকেই ...ফুটিয়ে তুলতে চান সুন্দরভাবে। গুলসান ...ন্দা বলেন, ঠিকই বলেছেন।

সাহিত্যিক তিনি। তাই তাঁরও এতে ...মত। শক্তিবাবুর কথায় তিনিও সায় দেন—...ারা বই-এ কিছু ভালো সিনই সম্পদ নয়। ...ল্পের চরিত্রের সামগ্রিক পরিণতি আর ...ার নিটোল রূপই বড় কথা। ওগুলো সেই-...ত ঠিক হয়ে যাবে। ওরা চিত্রনাট্য নিয়ে ...বই খাটেন। আর রাশ প্রিন্ট দেখে দরকার ...লে আবার ঘসামাজা করেন সেটাকে। আর ...কজনের উপরই সেই ভারটা দেওয়া হয় ...া। দু তিনজন লেখককে বসিয়ে 'রাশ প্রিন্ট ...দেখিয়ে তাঁরা যাচাই করে নেন, তাদেরও আলোচনা শোনেন। আর এ-কাজ নিষ্ঠার ...ঙ্গেই করেন।

তার তুলনায় আমাদের বাংলা ছবির চিত্রনাট্যের দিকটা অনেক ক্ষেত্রে অনেক অনা-দৃত বলেই মনে হয়। এখানে খড়্গসাহেব ...নেছি চিত্রনাট্যের উপর মুখ্যতঃ জোর দিতেন। তখন নিউথিয়েটার্স-এর চিত্রনাট্য বিভাগ আলাদা ছিল। শৈলজানন্দবাবু, বিনয় চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও সুলেখক দীনেশ-রঞ্জন দাস, কিছুকাল নৃপেন চট্টোপাধ্যায়ও জড়িত ছিলেন।

পরবর্তীকালে নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, নিতাই ভট্টাচার্য অনেক ভালো চিত্রনাট্য লিখেছেন। নৃপেনবাবুর 'হারানো সুর' কালিপ্রসাদবাবুর 'বিদ্যাসাগর' ইত্যাদি সেকালের ভালো ছবি উঠেছিল চিত্রনাট্যের জন্যই, অভিনয় তো তার উপরই। সত্যজিৎ বাবু-ঋত্বিক ঘটক-মৃণাল সেন-তরুণ মজুম-দার তপন সিংহ-রাজেন তরফদার-পূর্ণেন্দু পাত্রী-চিত্ত বোস-অজয় কর-অরবিন্দ মুখো-পাধ্যায় প্রমুখ এঁরা চিত্রনাট্যটাকে নিজেরাই দেখেশুনে নেন। তাই এদের ছবির জাত আলাদা।

বিশেষ করে ঋত্বিকের সঙ্গে কাজ করে দেখেছি—লেখাটা ছিল তার সহজাত প্রতিভা। ছবিটাকে সহজেই চোখের সামনে দেখতে পেতো। আর নিজস্ব রীতিতে চিত্রনাট্যকে সাজিয়ে নিতো।

মনে হয় আমাদের প্রধান বাধা আর্থিক অসচ্ছলতা, চিত্রনাট্যের জন্য যে সময় ব্যয় এবং পরিশ্রম করা উচিত অনেক সময় সেটা হয়ে ওঠে না।

ওঁরা অনেকে বলেন, বাংলা ছবির গতি অনেক মন্থর।

ও-কথাটা আমি মানতে চাই না। ওদের অনেককে জানিয়েছিলাম—মনের গভীরে প্রবেশ করতে গেলে প্রস্তুতি চাই। আর ...ন্নেমা, না হয় সহজ জীবনের মর্মের বেদনাকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে মনের ছোঁয়াও দরকার। বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে সময় লাগে না কিন্তু ভালোবাসতে সময় লাগে। তোমাদের অঙ্কুর-অনুভব-অমর প্রেম ছবির কথা ভেবে দেখো। যে গল্প যেভাবে ট্রিট-মেণ্ট করা দরকার বাংলায় পরিচালকরা সেটা বোঝেন, তাই আমাদের ছোট্ট পরিধির মধ্যে ঘরোয়া—সাধারণ মানুষের গল্পই বেছে নেন। সহজভাবে সহজ কথাটা জানাতে চেষ্টা করেন তাঁরা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শক্তিবাবুর আজ 'গেস্ট গ্যাম্বলারে'র সামান্য সুটিং আছে 'প্রেসিডেন্ট' হোটেলের বেসমেন্টে।

শক্তিবাবু বলেন, রাত দশটার মধ্যেই সুটিং হয়ে যাবে। এক সঙ্গেই ফিরবো। দিনভোর তো কাজই করছেন, চলুন।

ওদের ইউনিট যেন যন্ত্রের মত চলে। এর আগেই সহকারীরা জিনিসপত্র-ক্যামেরা-আলো-সাউণ্ড মেসিন সব নিয়ে চলে গেছেন। শক্তিবাবুর গাড়িতে আমি, ক্যামেরাম্যান আলোকবাবু আর শক্তিবাবু চলেছি। ওর সারথী পুরোনো ড্রাইভার বাহাদুর সিং।

বোম্বাই-এর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। সন্ধ্যা নেমেছে। সমুদ্রের ধারে ধারে আকাশ-ছোঁয়া বাড়িগুলোয় আলো জ্বলছে, সারবন্দী আলো। যেন ম্যানহটন-নিউ ইয়র্কের স্কাই-লাইন। কর্মব্যস্ত শহর—আর গাড়ি ছুটে চলেছে সত্তর-আশি কিলোমিটার বেগে। পথে পড়ে যশলোক হাসপাতালের বিরাট বাড়িগুলো—মেরিনড্রাইভ ছেড়ে সচিবালয়ের সামনে দিয়ে চলেছে গাড়ি।

বোম্বের আশপাশের সমুদ্রের উপর পড়েছে মানুষের লোভী হাতটা—খাড়ির অনেকটা করে ঘিরে 'ব্যাক বে রিক্লামেশন স্কিমে' জমি বের করছে আর সেখানে পাতালে পাইলিং করে গড়ে তুলছে পনেরো বিশতলা বাড়িগুলো। অতীতে যেখানে ছিল জলাভূমি আজ সেগুলোকে বুজিয়ে মজিয়ে গড়ে উঠছে শহর—বান্দ্রা ইস্ট-মাহিম ক্রিকের ধারপাশ-সায়নের নীচের জলাভূমি, চেম্বুর ছাড়িয়ে ক্রিকের আশপাশে সবই দখল করে নিচ্ছে মানুষ।

সমুদ্রের ধারে বোম্বাই শহরের এক প্রান্তে নতুন গড়েওঠা এই 'পশ' এলাকা, দূরে দেখা যায় ওবেরয় সেরাটন-এর প্রাসাদ—এদিকে উঠেছে নতুন স্কাই স্ক্র্যাপারের সারি। দূরে রাস্তার পারে মাথা তুলেছে নারকেল কুঞ্জ, এদিকে বড় গাছপালা একটাও নেই। অর্থাৎ ওই নারকেল বীথি অবধি ছিল পুরনো জায়গা—এদিকটা ছিল সমুদ্র।

'হোটেল প্রেসিডেন্ট' গড়ে উঠেছে সেখানেই। বিরাট প্রাসাদ, বিলাসবহুল বহু তারকা সমন্বিত হোটেল। বোম্বাই-এ দেখা যায় নতুন আগন্তুক এক শ্রেণীর ভিড়। পেট্রলের দাম বাড়ার পর থেকে তামাম আরব দুনিয়া, পারসিয়ান গালফ—ওদিকের ছোট-খাটো বহু দেশের মানুষের হাতে এসেছে কোটি কোটি টাকা। তাই তারাও দল বেঁধে বের হয়ে পড়ে দেশ ভ্রমণে, সেই টাকার কিছুটা ব্যয় করতে।

বোম্বাই শহর ওদের কাছ থেকেও বেশ কিছু পায়। শুনলাম শহরের তাবড় হোটেলের বহু স্যুট ওদের দখলে থাকে, যশ-লোক হাসপাতাল, বীচ ক্যাণ্ডি হাসপাতালের বহু সিট রয়েছে ওদেরই চিকিৎসার জন্য; আর দোকান বাজারেও শাঁসালো খদ্দের ওরাই। মাথায় সাদা চাদর ঢাকা-কালো রসি প্যাঁচানো—দামী গাড়ি, না হয় ট্যাক্সিতেই ঘুরছে আর অনেকে এসেছে সপরিবারে বাচ্চাকাচ্চা সমেত, অনেকের আবার একাধিক পরিবারও রয়েছে। যেন এক-একটি খুদে হারেমই সঙ্গে নিয়ে চলেছে তারা বাদশাদের মত।

এই হোটেলে, আশপাশের বহু দামী ফ্ল্যাটেও তারা রয়েছেন, অন্যত্রও তাদের ভিড় দেখেছি।

চাকচিক্য বাহার এর সর্বাঙ্গে। বিরাট লাউঞ্জ—ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট, টি-ভি—ইণ্টার কম ফোন—লাউঞ্জের বহু ঝকঝকে দোকান সবই রয়েছে। দেয়াল জোড়া ফ্রেসকো। আর দিশীবিদেশী বিদেশিনীর ভিড় সবই মেলে এখানে।

নীচের বেসমেন্টে সুটিং চলছে।

ওখানে এয়ার কণ্ডিশনড নয়, দারুণ গরম। দামী বিদেশী গাড়ির ভিড়—ওটা গ্যারেজ গোছের। সটটা হচ্ছে—হোটেলের বেসমেন্টে হিরো আর তার সঙ্গিনী গাড়ি থেকে নেমে উঠে যাবে—ওদিক থেকে দুর্বৃত্তের দল তাদের মরীয়া হয়ে তাড়া করেছে, তাড়া করে দূর থেকে ওদের টেলি-স্কোপ রাইফেলের রেঞ্জে পেয়ে গুলি করেছে ওই সঙ্গিনীকে। ওই মহিলা তাদের বিশ্বাস-ঘাতকতা করে হিরোর সঙ্গে চলে যাচ্ছে কিছু মূল্যবান গুপ্ত খবর নিয়ে। গুলিটা মহিলাকে লাগে—ছিটকে পড়ে সে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে।

হিরো হঠাৎ গুলির শব্দে সচকিত হয়ে দৌড়লো আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্যে।

অমিতাভ বচ্চন আর হেলেন রয়েছে অভিনয়ে—আর ওদিক থেকে গুলি করেছে যারা তাদের দলবল আর দুচারজন স্টাণ্ট-ম্যান।

শট এ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে—শক্তি-বাবু অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন আমাকে। নতুন ছবির গল্পটাও ওকে বোধহয় আগে শুনিয়েছেন শক্তিবাবু, তাই নিয়েই কথা হচ্ছে। এর আগে কলকাতায় বেশ কিছুদিন চাকরি করে গেছেন—আর স্ত্রীও বাঙালী। সাহিত্যিক সাংবাদিক 'অভিশপ্ত চম্বলের' লেখক তরুণ ভাদুড়ীর মেয়ে জয়া ভাদুড়িকে বিয়ে করেছেন। বাংলা বুঝতে পারেন—কিছু কিছু বলতেও পারেন জানান।

—এই নিয়ে আজ ফোর্থ সিফটে কাজ করছি।

দেখেও মনে হয় ক্লান্ত অবসন্ন। তবু বয়সে তরুণ—আর পেটা স্বাস্থ্য, তাই সটগুলো ঠিক হয়ে দিতে অসুবিধা হল না।

(চলবে)

(১২)

অত বড় বাড়িটা একেবারে গমগম করত। এতে তো একতলার ছাপাখানার এক-টানা একটা ঝমঝম শব্দ সারাদিন শোনা যেত, প্রেসের লোকরা সমস্তক্ষণ সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করত, তার ওপর বাইরের বন্ধু-বান্ধব অনবরত আসা-যাওয়া করতেন। আমরা আটটা ভাই-বোন আর মা যে তার মধ্যে কেমন অনায়াসে মিলে গেলাম, এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। আমাদের আগমনে কারো কারো নিশ্চয়ই অসুবিধা হয়েছিল—কিন্তু সুখের বিষয় সেটা টের পাবার বা সন্দেহ করবার বয়স আমাদের হয়নি।

একতলায় সিঁড়ির পাশে খাবার ঘর, তার পেছনে একটা শোবার ঘর সেখানে ছোট জ্যাঠামশাই শুতেন আর লেখাপড়া করতেন। বড় জ্যাঠামশায়ের ছোট ছেলে নানকুদাও ঐ ঘরে বসে মোটা মোটা বই পড়ত। সে ইতিহাসে এম-এ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ফরসা, বেঁটে বোগা মানুষটা, বাবু-খেয়ালে মাথাটি ঠাসা, আমাদের অনেক দিনের বন্ধু, পড়াশুনায় ঘরই ওটা। ছোট জ্যাঠা ছোটদের উপযুক্ত করে ইংরিজি থেকে নাম করা সব বই বাংলায় অনুবাদ করতেন। এত ভালো অনুবাদ খুব বেশি দেখিনি। আর কি সব বই, কোনান ডয়েলের শার্লক হোমসের বিচিত্র কীর্তি-কাহিনী বাস্কার ভিলের কুকুর, জুল ভের্নের আশ্চর্য দ্বীপ ইত্যাদি সত্য সব রোমাঞ্চময় কাহিনী। তার লেখা দেশী বিদেশী পৌরাণিক গল্পের কথা তো আগেই বলেছি। ঝরঝরে সহজ কিন্তু বিশুদ্ধ বাংলা, মূল গ্রন্থের সমস্ত রসটি বজায় করে নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। সে বাংলা এখন কেউ লেখে না কেন? তার ওপর সরকারি আর্ট স্কুল থেকে পাশ করা শিল্পীও ছিলেন। নিজের হাতে প্রায় প্রমাণ মাপের ফটো এনলার্জমেন্ট করে, তাতে রং দিতেন। অনেক বিখ্যাত মানুষের প্রতিকৃতি করেছিলেন, যতদূর মনে পড়ে তার মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছবিও ছিল। আশুতোষ জ্যাঠামশাইকে খুব স্নেহ করতেন। তেমনি করতেন নাটোরের বুড়ো মহারাজা। জ্যাঠামশাই নাম করা ক্রিকেটার ছিলেন, নাটোরের দলেও খেলতেন।

তবে ঐ সমস্ত সর্বজনস্বীকৃত গুণের জন্য আমরা ছোট জ্যাঠামশাইকে এত ভালোবাসতাম না, তাঁর ওপর এত রাগও করতাম না। আসলে জ্যাঠামশাই তাঁর সব ভাই-বোনদের ছেলেমেয়েদের আপনার বলে জ্ঞান করতেন। কাজেই তাদের গুণ দেখে যেমনি খুশী হয়ে পাঁচ জায়গায় বলে বেড়াতেন, তাদের দোষ দেখলে তেমনি চটে গিয়ে বকেঝকে ভূত ভাগিয়ে দিতেন। বেজায় মাছ ধরার শখ ছিল, তাঁর কাছে কত যে গল্প শুনতাম তার ঠিক নেই।

তবে কলকাতায় পৌঁছবার পর দিনই তাঁর স্বভাবের যে-দিকটা প্রকাশ পেয়েছিল, এখন সেটার কথা ভেবে যতটা আশ্চর্য হই, তখন মোটেই হইনি। আমরা এসে পৌঁছে-ছিলাম বোধ হয় বড়দিনের আগের দিন, ১৯১৯ সালের ২৩শে কি ২৪শে ডিসেম্বর। জ্যাঠামশাই বিকেলে জলখাবারের সময় বলে গেলেন, 'কাল বেলা তিনটের সময় ঐ ছোটটা বাদে বাকি সবকটাকে নিউ মার্কেট দেখাতে নিয়ে যাব। বড়দিনের নিউ মার্কেট একটা দেখবার জিনিস।'

চোদ্দ থেকে সাড়ে তিন বছর বয়সের, আরেকজনের সাতটা আনাড়ি ছেলেমেয়ে নিয়ে বড়দিনের ভিড়ে ট্রামে করে নিউ মার্কেট বেড়াতে যাওয়াকে আমি দুঃসাহসিক অভিযান বলি এবং যে করে তাকে আমি বীর পুরুষ বলি। জ্যাঠামশাই বীরপুরুষ ছিলেন, বেঁটে-খাটো তামাটে গায়ের রং, গায়ে এক কাঁচচাও মেদ ছিল না, ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত রোদে জলে ঘুরে ঘুরে করে সারা শহর চষে বেড়াতেন, সকলকের খোঁজ নিতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষটি, পরিপাটি বেশভূষা, নিজের জুতো নিজে চকচকে করে পালিশ করাতেন। বাবার চাইতে তিন-চার বছরের বড় হয়তো, কিন্তু বাবাকে বেজায় ভয় পেতেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত ছোট ভায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে সিগারেট খেতেন। লোকজন ভালোবাসতেন, গান-বাজনা ভালোবাসতেন। কার ছেলের গলা ভালো, তার জন্য গানের মাস্টার রাখা উচিত, কে আঁকে ভালো, তাকে শেখানো দরকার। এইসব নিয়ে ছিল তাঁর ভাবনা। যেমনি ভালোবাসতাম তেমনি রাগে গা জ্বলে যেত। সকলের সব খবর রাখতেন এক ফোঁটাই গোপন করতেন না। কারো কিছু ভালো হলে আহ্লাদে আটখানা হতেন যেন ওঁরই কোনো সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। এমনি ছিলেন আমার ছোট জ্যাঠামশাই।

পরদিন তিনটের সময় বেরিয়ে সুকিয়া স্ট্রীট দিয়ে হাঁটিয়ে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে ট্রামে চড়ালেন। এসপ্লানেডে নামিয়ে বললেন, ঐ দ্যাখ ঐ দিকে হাইকোর্ট! বলে কেন জানি একটু মুচকি হাসলেন। হাইকোর্ট দেখতে পেলাম না। তবে লাট সাহেবের বাড়ির ফটক, গম্বুজওয়ালা বাড়ি দেখে অবাক হলাম। আরেকটা আশ্চর্য জিনিসও দেখালেন, এস রায় অ্যাণ্ড সন্স সাইন বোর্ড লেখা একটা দোকান। নাকি বড় জ্যাঠামশায়ের দোকান, খেলার সরঞ্জাম বিক্রি হয়। আগেও শুনেছিলাম এর কথা, এখন চোখে দেখে কৃতার্থ হলাম।

আগের ট্রামে যাত্রীদের লম্বা লম্বা বেঞ্চিতে মুখোমুখি বসতে হত, কণ্ডাকটর পাদানিতে ঝুলে ঝুলে চলা-ফেরা করত। চৌরঙ্গীর ট্রাম অনেকটা আজকালকার ট্রামের মতো। এই পাড়ায় আমার জীবনের বেশির ভাগটাই কাটল, কিন্তু সেই প্রথম দেখাটি এখনো চোখে লেগে আছে। তখন কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথঘাট পুকুরের ধারে ফুলগাছ ফুটপাথে কৃষ্ণচূড়োর সারি, ভারি ছিমছাম বড়লোকি ভাব একটা। মোড়েই সেকালের বিখ্যাত হোয়াইট-অ্যাওয়ে-লেডল'র মস্ত দোকান। এখন যার একতলায় ইউ এস আই এস হয়েছে।

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, গ্র্যাণ্ড হোটেল, কন্টিনেন্টাল হোটেল। ফার্পোর রেস্তোরাঁ সাহেবী ব্যাপার সব, দু-একজন বেজায় বড়লোক বিশিষ্ট খদ্দের ছাড়া দোতলায় উঠতে হলে ডিনার স্যুট পরতে হত। রাজাদের, বড় লোকদের আর সাহেবদের ব্যবস্থা এখানে। আজকাল তার কিছুই নেই। দোকানদাররাই আজকাল রাজা বড়লোক সাহেব। সে যাই হক গে, সত্যি কথা বলতে কি ওতে আমার কিছু এসে যায় না, কারণ আমি যাদের পছন্দ করি তাদের বেশির ভাগই নাচে গায় নাটক করে ছবি আঁকে আর লেখে। বড়লোক কোথায় পাব?

লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে গুনে গুনে সাতটাকে তো নামালেন। তারপর রাস্তা পার করিয়ে, হাঁটিয়ে নিয়ে চললেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চললাম। এত ঐশ্বর্য স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এখনকার তুলনায় যানবাহন খুব কম ছিল, তাই বাঁচোয়া। নিউ মার্কেটে ঢুকে হক-চকিয়ে গেলাম। এ কি পরীদের দেশ? প্রায় বারো বছর বয়স ইংরিজি সাহিত্যের মেলা বই পড়ে ফেলেছি কিন্তু কাপড় গয়নার চোখ ফোটেনি। শুধু একটি প্যাসেজই মনে পড়ে। তার সঙ্গে স্বর্গের কোনো তফাৎ নেই। নাহুম ইত্যাদির দোকানের সামনে দিয়ে যে পথ গেছে, সেকালে তার দু-ধারে সারি সারি কেক প্যাস্টির দোকান ছিল। বাস্তবিক দেখবার জিনিস।

বড়দিন উপলক্ষে তারা দোকানের বাইরে নিচু নিচু টেবিলে চিত্র আর

বাদামের তৈরি সাজ দেওয়া কেক পেস্টি আর চকোলেট সাজিয়ে রেখেছিল। শিলং-এ মোরেলোর কেকের দোকান ছিল অভিজাত ব্যাপার। খুব ভালো কেক পেস্টি হত। এখনকার ফ্লুরি টিংকার চাইতে ভালো বই মন্দ না। কিন্তু এভাবে ঢালাও সাজানো থাকত না। দেখেও মনে কেমন বেপরোয়া ভাব জাগছিল। এবং শুধু আমাদের নয়, ছোট জ্যাঠামশায়েরও। বললেন, কোনটা চাই বল। তারপর সাদা সাদা বাকসে ভরে আমরা যা চাইতে লাগলাম, তাই কিনে কিনে আমাদের হাতে দিতে লাগলেন। তখন অবিশ্যি নিউ মার্কেটের কেকের দাম ছিল বারো আনা এক টাকা পাউণ্ড, আবার তেমনি ছোট জ্যাঠামশায়ের বেশি টাকা-কড়ির বালাই ছিল না। কিন্তু হৃদয় এবং হাত ছিল উদার।

লজঞ্জুস খেলাম, চকোলেট খেলাম, জীবনে এই প্রথম আইস-ক্রীম খেলাম। তখনো এবং এখনো ভাবি এমন জিনিস হয় না। তারপর বোধ হয় সব নেতিয়ে পড়তে লাগলাম। কারণ দাঁতকে জ্যাঠামশায় কোলে নিলেন। দাদা সারোজের হাত ধরল বাকিরা খেতে খেতে চললাম।

বাবা হঠাৎ একবারেক করে ভূত জাগিয়ে দিতেন অবিশ্যি এতগুলোকে নিয়ে মার্কেটে বেড়াতে আসতে রাজিই হতেন না তাও সত্যি। জ্যাঠামশাই একবারো বিরক্ত হলেন না। বেরিয়ে এসে একটা ফিটন গাড়ি ডেকে, পাশাপাশি করে আমাদের তুলে, ১০০নং গড়পার নিয়ে গেলেন। অর্ধনিদ্রিত মুখে চক-চকে চোখে সেখানে যখন নামলাম, মনে হল স্বপ্ন থেকে জাগলাম। তারপর ৫৭ বছর কেটে গেছে, সেই স্বর্গের মিষ্টি মার্কেটটাকে আর খুঁজে পাইনি। এখন আমরা সেখানে গিয়ে মাছ মাংস ডিম তরকারি আর রান্নার তেল কিনি, রাগে গজগজ করতে করতে ফিরি। বলেছি না কোনো জায়গা কোনো মানুষ পুরোপুরি মাটি দিয়ে গড়া হয় না, খানিকটা করে মন-গড়াও বটে।

গড়পারের বাড়ির খাবার ঘরের ওপরেই বসবার ঘর। সেখানে বড়মার বৌঠানের কাছে কারা আসতেন ভাবতে তাক লাগে। কালিদাস নাগ, কালিদাস রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে কেদার চট্টোপাধ্যায়—কি যে সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর, হাঁ করে দেখতাম। আরো আসতেন শিশিরকুমার দত্ত, অমল হোম, কত নাম করব। আমাদের সঙ্গে তো আর কারো আলাপ করিয়ে দেওয়া হত না। বরং বড়দের রোমাঞ্চময় কথা শুনবার আশায় যদি বা কাছাকাছি ঘুর ঘুর করে বেড়াতাম, পত্রপাঠ আমাদের তিনতলায় পাঠিয়ে দেওয়া হত।

তিনতলায় তিনটি ঘর, একটা ছোট ছাদ আর একটা মস্ত ছাদ। একটা ঘরে মণিদা, অর্থাৎ সুবিনয় আর মেজবৌদি আর তাঁদের সুন্দর ছেলে ধন থাকত। একটা বড় ঘর খালি পড়ে থাকত। খালি পড়ে থাকত বলা ঠিক নয়, সেখানে বড় বৌঠানের বোন কনক দাস, অর্থাৎ কনক বিশ্বাস ও মেজদিদির চারজন সুন্দরী অনূঢ়া বোন, সবার ছোটটি আমাদের বয়সী ছিল, তার নাম ছিল নেলি। ভারি সুন্দর চেহারা তার, পরে তার ভক্তরা বলত সুইট নেল অফ ওল্ড ড্রুরি। তাকে দেখতে আমাদের ভারি ভালো লাগত, একটুও হিংসে হত না, যেমন ছোটবেলায় নোটনকে দেখে হত। কারণ এখন আর কেউ আমাদের কালো বলত না, আর সত্যি কথা বলতে কি সেরকম কালো ছিলামও না। কিন্তু নোটনের পাশে দাঁড়ালে শতকরা নব্বুইজন মেয়েকেই কালো কুচ্ছিৎ দেখাত। এই সত্যটা মেনে নিয়েছিলাম। চেহারা নিয়ে আর কখনো মনে কষ্ট পাইনি তবে এখনো মাঝে মাঝে ভাবি মা ফরসা ছিল, দিদিমা ফরসা ছিল, ঠাকুমার বেশ পরিষ্কার রং ছিল, ঠাকুরদা নাকি ধবধবে ফরসা ছিলেন—তাহলে দিদিকে আমাকেও ফরসা করতে ভগবানের কি এমন অসুবিধা হত। এসব কথা বললে মা রেগে যেতেন, বলতেন তোমাদেরি বা কি এমন অসুবিধাটা হচ্ছে? বলতেন বটে, কিন্তু আমাদের জন্য কাপড় কিনতে গেলে গোলাপী, গেরুয়া, ফিকে হলুদ, ঘি রং, ফিকে বেগুনী ছাড়া কিনতেন না। বলতেন মানাবে না। তবে আরেকটু বড় হয়েই বাবার সঙ্গে গিয়ে নীল, সবুজ, যা খুশি কিনে আনতাম।

আমাদের পিসতুতো দিদি মালতী, যার অপূর্ব গানের গলা এখন পর্যন্ত টসকায় নি এবং যাকে সবাই মালতী ঘোষাল বলে জানে—সেও ছিল ওদের সমবয়সী বন্ধু, সে-ও মাঝে মাঝে এসে ২-১ দিন কাটিয়ে যেত। তখন তিন তলার বড় ঘরে ওদের জন্য মাটিতে মস্ত বিছানা পাতা হত। আমাদের চাইতে সব ৫-৭ বছরের বড়, কলেজে পড়ে, ইয়াং-ম্যানদের গল্প করে। ওরাও আমাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিত না। বলত, 'দেখেছ, জ্যাঠা জ্যাঠা হচ্ছে।'

অগত্যা তিন তলায় বাকি ঘরটায় আশ্রয় নিতাম। সেখানে মানকুদা শুত আর ছোট জ্যাঠামশাই বড় ইজেলে বড়ো এনলার্জমেন্টে রঙ দিতেন। দেয়াল আল-মারিতে বই ঠাসা ছিল। সে যে কত রকম বই সে আর কি বলব। মানকুদা কিম্বা ছোট জ্যাঠামশাই কখনো আমাদের তাড়িয়ে দিতেন না। বরং মনে হত খুশীই হতেন। কত যে গল্প হত তার ঠিক নেই।

একবার ঝড়ের রাতে একটা প্যাঁচার বাচ্চা ডানা ভেঙে বড় ছাদে পড়ল। কারো অসুখ করলে, ব্যথা লাগলে, মানকুদা অন্য মানুষ হয়ে যেত। অমনি প্যাঁচাটাকে তুলতে গেল। প্যাঁচা বড় বড় চোখ পাকিয়ে ঠোঁট বাগিয়ে, নখ উঁচিয়ে, ফ্যাঁশ-ফ্যাঁশ শব্দ করতে লাগল। বোঝাই যাচ্ছিল ডানা জখম হয়েছে, উড়তে পারছে না। সাহায্য না পেলে মরেই যাবে।

আমরা সবাই ব্যাকুল হয়ে উঠলাম, তাহলে কি করা যায়? কাউকে তো কাছে যেতে দিচ্ছে না। মানকুদা সাত পাঁচ ভেবে, একতলায় নেমে গিয়ে বাগান থেকে লম্বা একটা কাঠি নিয়ে এল। আমরা একটু দূরত্ব রেখে, গোল হয়ে দেখতে লাগলাম। কাঠি দিয়ে মানকুদা প্যাঁচার গলায় সুড়সুড়ি দিতে লাগল। একটু পরে দেখা গেল আরামে প্যাঁচার চোখ বুঁজে আসছে, গলা পেতে দিচ্ছে, ঠোঁট বন্ধ করেছে, নখ নামিয়েছে।

পরে যখন মানকুদা ওকে কোলে নিয়ে চুন-হলুদ লাগিয়ে ডানা ব্যাণ্ডেজ করে দিল, প্যাঁচা কিচ্ছু বলল না। একটা বড় জুতোর বাক্সে তার বিছানা করা হল। পরদিন আরো খানিকটা সুড়সুড়ি দিয়ে, ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে দিয়ে, আবার চুন-হলুদ লাগানো হল। তিন দিন ছিল প্যাঁচাটা, কিন্তু কিচ্ছু খেত না। বোধহয়

[illegible] জানলার ছাড়া ওরা খায় না। রাতে খোলা জানলার পাশে রাখা হত। চতুর্থ দিন সকালে দেখা গেল পাখি উড়ে গেছে।

এর অনেক বছর পরে হাজারিবাগে নানকুদার মেজদি পুণ্যলতা চক্রবর্তী, যাঁর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' বইখানির মতো ভালো বই বাংলায় কম আছে—তাঁর বাড়িতে ছুটি কাটাতে গিয়ে, এই ধরনের আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। রেলের বাঁধের ওপর বেড়াতে গিয়ে নানকুদা দেখে একজন গরীব লোক লাইনের পাশে বসে কাঁদছে।

কি ব্যাপার? না, ওর পায়ে কেউটে সাপে কামড়েছে। কখন কামড়েছে? না, এক্ষুনি। নানকুদার বেড়ানো মাথায় উঠল। তৎক্ষণাৎ রুমাল দিয়ে সাপের কামড়ের জায়গার ওপর এঁটে বেঁধে রক্ত চলাচল বন্ধ করল। তারপর বাঁধের নিচে মেজদির বাড়ি নিয়ে গিয়ে পেনসিল কাটা ছুরি আগুনে পুড়িয়ে তাই দিয়ে কামড়ের দাগের ওপর চিরে, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট লাগিয়ে, ব্যান্ডেজ করে, টাঙায় চাপিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানকার ডাক্তার সব ব্যাপার শুনে বললেন, 'সবাই যদি আপনার মতো হত মশাই, আমাদের ব্যবসা উঠে যেত!'

এই রকম মানুষ ছিল নানকুদা, অথচ ওদিকে নিজের শরীর নিয়ে সে কি খুঁতখুঁতে, বাপ্! আমরা খুব বকতাম।
ঐ তিন তলায় বড় ঘরে যারা পড়ত তাদের দেখা পাবার আশায়, বসবার ঘরে কম-বয়সী ভদ্রলোকের অতিথিও ঘুর ঘুর করত। তারা কেউ কেউ বেঁচে আছে বলে তার নাম করলাম না। এটা বুঝতেও আমাদের দেরি লাগল না। কারণ শিলং-এর কনভেন্টের ফিরিঙ্গি সহ-পাঠিনীরা এ-বিষয়ে আমাদের সযত্নে পাঠ দিয়েছিল। এরা গোড়ায় হয়তো এসেছিল বড়দার টানে, তারপর আবিষ্কার করেছিল যে এ-বাড়িতে অন্য আকর্ষণীয় বস্তুও আছে। তবে সেকালের ব্যাপার তো, একটু হাসি, দুটো কথা পর্যন্ত দৌড়, এক সঙ্গে বেরুবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। রঙ্গমঞ্চে নামবার অধিকার না পেলেও, উইংস থেকে আমরা মজা দেখতাম। এরা সবাই নিতান্ত অযোগ্যও ছিল না। পরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ছোট ভাই প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ, আমাদের বড় আদরের বুলাদা, ছোট জ্যাঠামশায়ের বড় মেয়ে মাধুরীলতাকে বিয়ে করেছিল। চোদ্দ বছর আগে ৬৩ বছর বয়সে বুলাদার মৃত্যু হলে আমরা একজন প্রকৃত ভালোবাসার মানুষকে হারালাম।

দোতলায় বসবার ঘরের পাশে বড়দার ঘর, তাছাড়া তার সামনে আরো দুটি ঘর। একটিতে জ্যাঠাইমা থাকতেন, আরেকটিকে ড্রেসিং-রুম হিসাবে ব্যবহার করা হত। এই দুটি ঘরে আমরাও জায়গা পেয়েছিলাম।

তবে খুব বেশি দিন দিদি আর আমি থাকি নি ওখানে। দাদা, কল্যাণ অমনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল। সেখানে যে বেজায় ভালো পড়ানো হত সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। ওরা গড়পার থেকে হেঁটে স্কুলে যেত। বাবাকে ততদিনে শিলং-এ ফিরে যেতে হয়েছিল, যামিনীদা প্রথম দিন দুই ওদের পৌঁছে দিয়েছিল, তারপর ওরা কলকাতার ছেলে হয়ে গেল। পড়াশুনোর সুযোগই খুব ভালো ছিল।

মার শরীর ভালো যাচ্ছিল না। কিডনি স্টোন হয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। আমাদের বড় জ্যাঠামশাই সারদারঞ্জন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। বাস্তবিক একাধারে গণিতে ও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি বেশি দেখা যায় না। জ্যাঠামশাই আয়ুর্বেদীয় ওষুধ দিয়ে মায়ের কিডনি স্টোন গলিয়ে দিয়েছিলেন। আর কখনো মাকে ঐ নিয়ে কষ্ট পেতে হয় নি।

কথা ছিল আমরা ভবানীপুরে বাড়ি ভাড়া করে থাকব। দাদা ওপরের ক্লাসে পড়ে, ও হেয়ার স্কুলেই থেকে যাবে। বাকিরা ভবানীপুরের কোনো স্কুলে পড়বে। দিদি আমি তো ডায়োসেসানে ভর্তি হয়েই গেছি। স্কুল খুলবে জানুয়ারি ১০-১২ই।
মায়ের অসুখের জন্য এই ব্যবস্থার কিছু দেরি হল। দিদিকে আমাকে ডায়োসেসানের বোর্ডিং-এ তিন মাস থাকতে হয়েছিল। মনে আছে খুব কষ্ট হয়েছিল, একেবারে নতুন পরিবেশ। [illegible] ঐ স্কুলে বাঙালী শিক্ষিকাই বেশি হলেও তাঁরা প্রায় সকলেই প্রোটেস্টান্ট খৃশ্চান, তবে মিশনারি স্কুল, পরিচালনা করেন নানরা। তাঁরা রোমান ক্যাথলিকদের ওপর হাড়ে চটা, কনভেন্ট থেকে কেউ এসে ভর্তি হলে কথায় কথায় খোঁটা দিতে ছাড়েন না।
পরে এই স্কুলে কলেজে আমার কৈশোর ও প্রথম যৌবন কত সুখে কেটেছিল সে আর বলতে পারি না। কত বন্ধু-বান্ধব সত্যিকার জ্ঞানী কত শিক্ষিকা। কনভেন্টে দু-তিনজন নান ছাড়া সত্যিকার জ্ঞানী কাউকে পাই নি। এখানে কত ভালো অঙ্ক শেখানো হত, তবে বাবার মতো কেউ না।

বোর্ডিং-এ একটা জিনিস একেবারে অন্তর পর্যন্ত পীড়া দিত, সেটা হল সব সময় চারদিকে লোক। নিরিবিলি এক মুহূর্তও পেতাম না। স্নানের ঘরে ছাড়া সব সময় আমাদের ওপর লোকের চোখ। খাওয়া ভালো ছিল না, তাতে কোনোই কষ্ট হত না। শনি-রবি গড়পারে গিয়ে ভালো-মন্দ খেতাম। কিন্তু ঐ সারাক্ষণ অচেনা লোক দিয়ে বেষ্টিত থাকার যে কি জ্বালা, সে আর কি বলব। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম অনেকেরি এতে কোনো অসুবিধা হত না। দিদি অনেক দিন পরে আবার ওর পুরনো অভ্যাসের শরণ নিল। থেকে থেকেই চোখ মুছত। অবিশ্যি ফোঁৎ-ফোঁৎ করত না।

আরেকটা অসুবিধাও ছিল। জীবনে এই প্রথম ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করলাম না। ওখানে মাঝে মাঝে রিপোর্ট দিত। ক্লাসের কাজে রোজ নম্বর দিত, মাঝে মাঝে টেস্ট হত। সব বিষয়ে ভালো ছিলাম, শুধু বাংলায় চল্লিশের ঘরে। আমি যে ছয় বছর বয়স থেকে মনে মনে জানি বাংলায় লেখা ছাড়া আমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না, তাকে কিনা পণ্ডিতমশাই বললেন, 'কি বিলেত থেকে এয়েছ?'
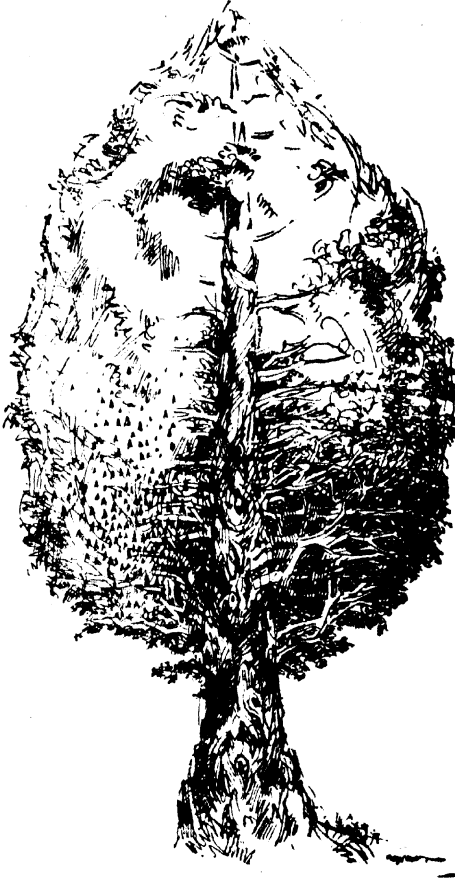
হে অর্জুন

পরিতোষ সেন

ঢাকা জেলায় আমাদের গ্রামের কথা মনে এলেই চোখের সামনে একটা অ্যাবস্ট্রাকট্ ছবি ফুটে ওঠে। আগাগোড়া সবুজ রঙ্ দিয়ে আঁকা। নানারকমের সবুজ পাশাপাশি থাকে সাজানো। অনেকটা নামকরা আধুনিক মার্কিনী আর্টিস্ট মার্ক রথকোর আঁকা ছবির মত। এক কথায় বলা যায় একটা সবুজের সমুদ্র। ভরা বর্ষায় আর বসন্তে মনে হত যেন সারা গ্রামটা এই মাত্র সবুজ জলের পুকুরে ডুব দিয়ে উঠেছে। সব কিছু যেন একটা সবুজ কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখছি, যেন সব কিছু সবুজ সেলোফেনে মোড়া। কোনো কোনো অচেতন মুহূর্তে মনে হত যেন সূর্যটাও সবুজ, রোদের রঙটাও সবুজ। চারদিকে এমনই সবুজের ছড়াছড়ি। আকাশের নীলের তলায় গাছপালার সবুজ, তার তলায় জলের নীল-সবুজ, পলি-মাটির ছাই রং-এর ওপর ঘাসের সবুজ, শ্যাওলার সবুজ, কচুরিপানার সবুজ কচু-পাতার সবুজ—কালো-সবুজ, নীল-সবুজ, গাঢ়-সবুজ, তাজা-সবুজ, হলদে-সবুজ, এমারেল্ড সবুজ, ওনিক্স সবুজ, টার্কোয়াজ সবুজ, চীনা জেডি সবুজ, সবুজ, সবুজ, আরও সবুজ—বিরাট এক সবুজের সিমফনি। আঃ সব ইন্দ্রিয়গুলো যেন সবুজের সংগীতে ঘুমিয়ে পড়ে।

আমাদের বাড়ীর চৌসীমানার মধ্যে নানা-রকম গাছপালায়ও এই সবুজের ছড়াছড়ি। আম-জাম-কাঁঠালে, জারুল-জিয়লে, জামরুলে আর তেঁতুলে, গাব-কদম-ডুমুরে, চালতা আর ফলসায়, কণকচাঁপা-কাঁঠালচাঁপা আর ডালিমে, সুপুরি আর নারকেলে—আরও যে কত অসংখ্য লতায়পাতায় তার হিসেব করা কঠিন। কিন্তু এদের সবাইকে বামন বানিয়ে ছাপিয়ে উঠেছিল আমাদের পুকুরের উত্তর-পূব কোণে একটা অর্জুন গাছ। জাতে ছিল সে বনস্পতি। এতবড় আর বিশাল, যে সে ছিল একাই একশো, একাই একটা বন।

জীবজগতের মত গাছপালার জগতেও বোধহয় পুরুষ আর স্ত্রী আছে—কতগুলো গাছ আছে যার ডাল-পাতায় সজ্জা, ফুলের চেহারা, গন্ধ, রঙ, সব মিলিয়ে খুব সাজগোজ করা সুন্দরী মেয়েদের কথা মনে করিয়ে দেয়। একটু হাওয়া লাগলেই কিরকম নাচের তালে দুলতে থাকে। ভরা যৌবনা মেয়েরা যেমন নিজের স্তনের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, এধরনের গাছগুলোও তাদের ফল ফুলের সম্ভারে তেমনি নুয়ে পড়ে। ওইতো। আমার ছাদে রক্তকরবীটা বসন্তের হাওয়ায় কিরকম নাচছে আর ফুলের ভারে কিরকম ঝুঁকে পড়েছে! প্রায় ছাদ ছোঁয় আর কি। আরও ওই যে কলকে ফুলের গাছটা! সাদা সাদা ফুলের ছাপ দেওয়া সবুজ শাড়ীর ঘোমটা মাথায় লজ্জাবতী নতুন বউ-এর মত মাথা নীচু করে আছে! আর চালতা গাছের পাতাগুলোই বা কী বাহারের। কে যেন একটা একটা করে ফুলের তোড়ার মত সাজিয়ে রেখেছে। কী সুন্দর ইস্ত্রি করা পাতার ভাজ। তেমনি তার শিরদাড়াগুলোর নিখুঁত সিমেট্রি। আর পাতার রঙটাই বা কি চমৎকার—একেবারে খাঁটি ভ্যাট্-সিকস্‌টিনাইন্ বোতলের মত গাঢ় সবুজ। আজারবাইজান্ নর্তকির ফিনফিনে ওড়নার মত কচি কলাপাতায় কিম্বা নিম্ পাতার ভেতর দিয়ে ভোরবেলার শরতের মোলায়েম সোনালি আলো চুঁইয়ে আসে, একটু হাওয়া লাগলেই কি চমৎকার সবুজ-হলদে ঝাড়-লণ্ঠনের মত আলো ঠিকরে পড়ে যত খুসী তাকিয়ে থাকি কিছুতেই ক্লান্তি আসে না।

আর ওই যে দূরে হলদে রঙ-এর বাড়ীটার পাশে নারকেল গাছটা দেখা যাচ্ছে, তার পাশে ঠিক ওইরকম আর একটি ছিল। হাওয়ার সাথে ছন্দ রেখে নাচ দেখাতে ওর জুড়ি এই সহরে খুব কমই ছিল। কাল-বৈশাখীর জন্যে সারা বছর যেন বসে থাকত। যেই না ঝড় ওঠা তাকে আর ধরে রাখে কে? একবার, এমনি এক ঝড়ের সন্ধ্যায় সামনে, পেছনে, নুয়ে-নুয়ে দোল খেতে খেতে মটাশ্ করে হঠাৎ [illegible] ভেঙে দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেল। ছেলেবেলায় আমাদের দাই জমিলার মা'র কাছে তখনকার ঢাকার সবচেয়ে নামকরা বাঈজি সুরত্ বাইর আশ্চর্য নাচের গল্প শুনেছি। ময়ূরীর গলার মত সরু আর তেমনি নিটোল তার শরীর। হরিণীর মত চঞ্চল আর তেমনি ছিল তার চলন। হাড়-গোড় বলতে কিছুই ছিল না শরীরটাকে যেমন খুসী বাঁকাতে পারত। একবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সহরের বিখ্যাত [illegible] নিমাইচাঁদ বাবুর

[illegible]বাই আস্তে আস্তে [illegible] কোমর[illegible] নিয়ে গেল। ঠিক যেন একটি [illegible]

মজলিসে জয়সালামিরের কোনো নামকরা বাঈজিকে ডাকা হয়েছিল। গোটা ঢাকা শহরে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। তাই শুনে সুমন্তবাই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। একই আসরে দু'জনকে নাচবার দাওয়াত দেওয়া হল। সুমন্তবাই কিছুতেই রাজী হয় না, নানারকম নখরাবাজি করে। তারপর যখন নাচের আসরে কুর্নিশ করতে করতে ঢুকলো, পায়ে রাশি রাশি ঘুঙুর পরা। সত্ত্বেও একটা ঘুঙুরেরও আওয়াজ শোনা গেল না। যেন হাওয়ার ওপরে পা ফেলছে, একই সঙ্গে, নাটকীয়ভাবে সারেঙ্গী, তবলা আর ঘুঙুর ঝমঝম করে বেজে উঠল। নাচতে নাচতে তবলার বোলের সঙ্গে সুমন্তবাই নিজেও মুখে বোল বলে আর সেই বোল পায়ে তোলে—

ধারি কিট্ ধারি কিট্, তুন্ তুন্ ধারি
বেঁধে নেটে, মেরে কেটে
জগমগ জগজগ

তেরে কিট্ মেরে চিট্
ধা ধরিজা, তা ফারিক্ থুন্ গা
কিট্‌কিট্ তাক্ তাক্
থারিক থারিক, চিট্-পিট্ থাক্ থাক্
ঝিন্ কিট্ ফাঁকা ধালগা তাকা থেই

ষোল মাত্রার বোল—তাকে চারবার বিপিট্ করে চৌষট্টি মাত্রায় তোলে।

নাচিয়ে শুরুতে প্রথম লয়ে, তারপর মধ্যমে, শেষে ধীরে ধীরে দ্রুতলয়ের দিকে এগুতে থাকে। নিজের উরুতে তাল বাজিয়ে তবলচিকে ইঙ্গিত করে লয় বাড়াতে। তবলচির আঙুল থেকে ফুলঝুরির মত যেমন বোলের বৃষ্টি নামে তেমনি নামে নাচিয়ের পা'এ। সুমন্তবাই আঙুল দিয়ে তুড়ী বাজিয়ে বাদ্যকরদের আবার ইশারা করে বলে, "লয় আউরভি বাড়াইয়ে'। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। সভাশুদ্ধ লোকের চোখ ছানাবড়া। নাচঘরটা যেন এক বিরাট পেতলের কাঁসা। সঙ্গীতের আওয়াজ তার ভেতর থেকে গমগম করে বেরুচ্ছে। তারই স্পন্দনে ঝাড়লণ্ঠনের স্ফটিকগুলোও নড়েচড়ে, আর টুং-টাং বেজে ওঠে। সুর আর লয় দ্রুততর হতে হতে এক সাংঘাতিক চরমে উঠল। সুমন্তবাই তার সাপের মত শরীরটাকে আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বাঁকাতে থাকে। এ অবস্থায়ই ছোট একজোড় পাকা বাতাবি লেবুর মত সুন্দর, মোলায়েম বক্ষস্থলকে একনাগাড়ে নাচাতে থাকে যেন ঝড়ে কচি বাঁশপাতা কাঁপছে। ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে। ভেতর থেকে যেন কিছু উছলে পড়তে চাইছে। একচুল, দু'চুল করে বাঁকাতে মাথাটা এসে নিতম্বে ঠেকে আর কি! ঠিক যেন একটা বকফুল। সদ্য তা-দেয়া ঢাকের চামড়ার মতই। পেটে আর কোমরে জবরদস্ত টান পড়েছে। বেদম হাততালি আর, 'বাহ্‌বাঃ, বাহ্‌বাঃ, কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ, মুকর্‌রর' চিৎকারে নাচঘর ফেটে পড়ল। কানে তালা লেগে যায় আর কি। অত্যাধিক মিড়ের টানে সেতারের জোয়ারির তার যেমন ঝনাৎ করে ছিঁড়ে যায়, তেমনি কোমর থেকে নাচিয়ের শরীরটা হঠাৎ দু'টুকরো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ওই নারকেল গাছটার মত সুমন্তবাইও আর কোনোদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

হ্যাঁ, কি বলছিলাম! সেই অর্জুন গাছটার কথা! গ্রামের বাইরে—দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে, পুবে—যতদূরেই যাইনা কেন আমাদের বাড়ীর দিকে তাকালেই দেখি দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজের মধ্যে তার মাথা ঠিক উঁচিয়ে আছে। ওই গাছটার দিকে তাকিয়ে আমার মনে কেমন একটা পাঁচমিশালি আবেগ আসে। একদিকে শান্তি আর আনন্দ, অন্যদিকে তেমন বিস্ময় আর ভয়। তার আশ্চর্য গড়ন আর ঋজু কাঠামো দেখে মনে হয় কোনো ওস্তাদ ইন্‌জিনিয়ারের হাতের সৃষ্টি। বাইরের এবং ভেতরকার খাড়া ও সমান্তরাল রেখার কী নিখুঁত সমন্বয়। তেমনই নিখুঁত তার ব্যালেন্স। সমস্ত গাছটাতেই, আপাদমস্তক ওজনের এমনই চমৎকার বিভাজন যে ম্যানহাটানের একশো আশি তলার বাড়ীর মত যত ইচ্ছে আকাশের দিকে বাড়িয়ে যাও। ঝড়-বৃষ্টি, ভূমিকম্প, এসব কিছুই তার গায়ে এতটুকু আঁচড়ও কাটতে পারবে না। মার কাছে গল্প শুনেছি যে ১৩২৫ সালে প্রলয়ের মত এক সাংঘাতিক ঝড় উঠেছিল। সে ঝড়ে ঢাকা জেলার বেশীর ভাগ গ্রামই নাকি মরুভূমির মত উজাড় হয়ে যায়। কিন্তু অর্জুন গাছটা যেমন ছিল তেমনিই রইল দাঁড়িয়ে—পাহাড়ের মত সোজা আর নিশ্চল। এমনই তার স্থিতি আর গঠন সৌকার্য। এমনই তার আসুরিক শক্তি। অনেককাল আগে কিং-কং-এর সিনেমা দেখেছিলাম। দেখে যেমন ভয় পেয়েছিলাম, তেমন হয়েছিলাম অবাক। কি বিরাট তার দেহ যেন দশ-বিশটা মেশিনের একসঙ্গে হয়েছে। তাকে মারবার জন্যে কতরকম ফন্দি-ফিকিরই না আঁটা হয়েছে—কামান বন্দুক এরোপ্লেন, আরও কত কি। কিং-কং নিরুদ্বেগ, নির্বিকার। মশা মাছির মতই সামান্য বিরক্তিকর ভেবে সেগুলোকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে পিষে ফেলছে। নিজের নিজের শক্তি এবং আয়তন সম্বন্ধে সে এতই সচেতন, এতই নিশ্চিন্ত, এতই দাম্ভিক, যে চারিদিকে যত ওলট-পালটই হোক না কেন তাতে তার কিছু এসে যায় না।

এইত গেল গাছটার শক্তির কথা। এবার বলি তার রূপ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। শাস্ত্রে বলে 'রূপস্ত ষোরশবিধম'। অর্থাৎ রূপের আকার প্রকার হল ষোলরকম। সেভাবে এ গাছের রূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক পাতা ফুরিয়ে যাবে। সোজা কথায় বলি। যে কোনো জিনিষের রূপের একটা প্রধান নিয়ম হল তার মাপজোখ। অর্থাৎ যাকে আমরা বলি প্রোপোরশান্। তাও এক এক দেশের এক এক নিয়ম। মানুষের বেলায় ত সোজা নিয়ম আছে। তার নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত লম্বা, নিজের মুখ-মণ্ডল তারই নিজের এক বিঘত। সব মানুষের পক্ষেই মোটামুটিভাবে এই নিয়ম চলে। কিন্তু অর্জুন গাছটার বেলায় কি

করি? গাছের মাপজোকতো জানা নেই। তবুও দূরে থেকে যখন গাছটাকে দেখি মনে হয় যেন শ্রবণবেলগোলার গগণচুম্বি সেই বিরাট দিগম্বর মূর্তির মতই নিখুঁত সুন্দর। যে মাপজোক ওই মূর্তি তৈরী হয়েছে, মনে প্রশ্ন জাগে, সে পরিমাপেই কি বিধাতা একেও সৃষ্টি করেছেন? না কি নানা রঙ, নানা ডৌলের সংমিশ্রনে এই রূপ-জগতকে সৃষ্টি করেছেন?

শাস্ত্রে এও বলে যে মূর্তির গুণ তিন রকমের। উষার গোলাপী আলো যখন গাছের চূড়ায় এসে লাগে মনে হয় যেন বিরাট এক সাত্ত্বিক পুরুষ সটান হয়ে যোগে বসেছেন। হাতে বরাভয়। বসন্তে সেই আলো বর্শার ফলকের মত কাঁচা, কাঁচ পাতায় লেগে একটা স্বচ্ছ, সবুজ, দিব্যজ্যোতি মহাযোগীর মুখমন্ডলের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে হাল্কা হয়ে আকারে নীলের সঙ্গে মিশে যায়। কতগুলো বুনো পায়রা তাঁর চারদিকে নানারকম ছন্দে উড়ে উড়ে চক্কর কাটে। যেন প্রভাতের বন্দনা করছে। গাছের গোড়ায় শিশিরভেজা সাদা আকন্দগুচ্ছ এই আলোর স্পর্শে ঝলমল করে। যোগীর শ্রীচরণে যেন ভক্তদের পুষ্পাঞ্জলী। বিকেলের পড়ন্ত আলোতে তাঁকে মনে হয় রাজসিক—যেন তার রঙ-বেরঙের, নানারকম কারুকার্য করা বাহনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমের দিকে ছুটেছে। আর কড়া চোখধাঁধান আলো যখন তাঁর মাথার ওপরে আসে তখন ফুটে ওঠে তাঁর প্রচন্ড উগ্র তামসিক মূর্তি—শুম্ভ, নিশুম্ভ, হিড়িম্ব, পুলোমা, বকাসুর—আকাশ, পাতাল, মর্তের সব রাক্ষস—দৈত্যদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছে।

"সম্বর্ণং মনোরমা"—অর্থাৎ

যে মূর্তির প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশী সরুও নয়, আবার বেশী মোটাও নয়। বেশী লম্বাও নয়, আবার বেশী খাটোও নয়। কেবল এমনই শাস্ত্রমান সম্পন্ন মূর্তিকেই নাকি 'রম্য' বলা যায়। দশ লাখে মাত্র একটি এমন চোখে পড়ে। 'তং গুণনম্ হৃদ্' হৃদয়কে জয় করে এমন জিনিষ মনোরম হতে পারে কিন্তু সত্যিকারের 'অনুপম' হতে হলে তাকে 'শাস্ত্রমান' হতে হবে। 'বাক্যম রসাত্মকম্ কাব্যম্'। —অর্থাৎ শিল্প তখনই সৃষ্ট হয় যখন সৃষ্ট মূর্তিতে 'রস' তার আত্মারূপে প্রবেশ করে। অর্জুন গাছটাকে দেখে এমন কত কথাই যে মনে আসে তা কোনদিন বলে শেষ করতে পারব না।

দেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, যে শিল্পের মানদন্ডেই বিচার করি না কেন, তাতেও গাছটার সৌন্দর্যের কোনো ঘাটতি দেখি না। রিয়্যালিস্টিক অর্থাৎ বাস্তবধর্মী স্কাল্‌চার ওপর থেকে পড়া আলোতেই তো সব চাইতে ভালো দেখায়, তার শরীরের বহিরেখা, অর্থাৎ আমরা যাকে কন্‌টুর বলি—তার কাঠামোর, তার মাংসপেশীর সূক্ষ্ম মোলায়েম উত্থান-পতন,

গাছের ভেতরকার এবং বাইরের গড়ন প্রণালী
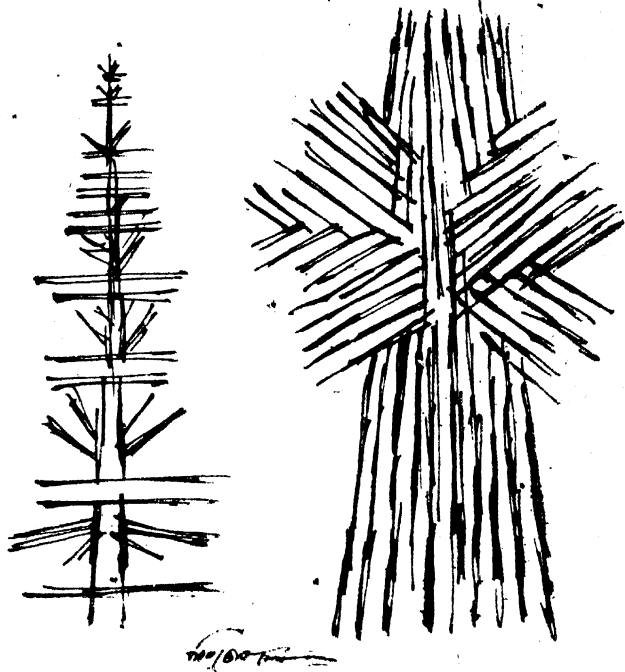
তার ডালপালায় ছন্দের যে খেলা আর দাঁড়াবার ভঙ্গী, তার ত্রিমাত্রিকতা—সব কিছু মিলিয়ে যেন রেনেসাঁস যুগের ভাস্কর্যের চরম উৎকর্ষ মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর 'ডেভিড'। বিশ্বকর্মা এই মহীরুহকে গড়না দিয়েছেন সকল রকমে, সকলভাবে, নানা উপায়ে—আলোছায়া দিয়ে, রঙ-বেরঙ মিলিয়ে, কঠোর-কোমলে একত্র বেঁধে। বড় বড় শক্ত পাথরের ওপর দিয়ে পাহাড়ি স্রোত কি রকম গড়িয়ে গড়িয়ে যায়। নিছক কাঁড় আর নিছক কোমল দিয়ে কি আর সেতার বাজে? জীবন-মরন, আলো-অন্ধকার—এ সবই এক সঙ্গে থাকবে তবেই ত বাজবে একোর সুর সারা সংসারে। একেই ত আমরা বলি ইউনিটি। এর সূত্রেই ত সারা বিশ্বব্রহ্মান্ড বাঁধা।

কে জানে কত যুগ ধরে পুকুরের উত্তর-পূব কোণে অর্জুন গাছটা দাঁড়িয়ে আছে? কেউ কি তার বয়স জানে? পংক স্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্যের যেদিন প্রথম মর্মরধ্বনি উঠেছিল সেদিন থেকেই তার আবির্ভাব পূর্বনির্ধারিত হয়েছিল? নুবিয়ার মরুভূমিতে নীল-নদের ধারে যেদিন মিশরের সব ওস্তাদ রূপদক্ষেরা আবুসিম্বালের মন্দিরের গায়ে দ্বিতীয় রামেসিসের পর্বতপ্রমাণ মূর্তি খোদাই করেছিল হয়ত সেদিন এই মহীরুহেরও জন্ম হয়েছিল। দুইই যেন সৃষ্টির আদিকাল থেকে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালের পথে অগ্রগামী এই গাছটাকে যেন আকাশের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব। পুরোনো বট-অশ্বত্থ দেখলেও ঠিক একই কথা মনে আসে। কিন্তু অর্জুনের সঙ্গে তাদের মিল এখানেই শেষ। বট-অশ্বত্থেরা পৃথিবীর মত নিরাসক্ত, শ্রান্ত জীবদের তাদের ঠান্ডা ছায়ার কোলে টেনে নেয়, যেমন করে নিত গভীর অরণ্যের প্রাচীন, শাদা জটাজুটধারি, মুনি-ঋষিদের অবারিত দ্বারের আশ্রম। বট-অশ্বত্থের ধর্ম হচ্ছে করুণা; অর্জুন তার নিজের বিশালতায়, নিজের শক্তিতে এমনই তন্ময়, যে দৈব জগতের উপকারে সে এল কিনা, তাই নিয়ে সে একটুকুও মাথা ঘামায় না। এতই তার দম্ভ, এতই তার নির্লিপ্ত। আপাতঃ-দৃষ্টিতে এ কথাগুলো যতোই সত্যি মনে হোক না কেন আসলে কিন্তু ঠিক তা নয়। সেকথায় পরে আসছি।

আমাদের পুকুরের ওই উত্তর-পূব কোণটা নিজের মাপে যেমন বড় না হলেও

বাড়ীর অন্যান্য অংশের চাইতে বেশ দূরে মনে হত। একটা কারণ হয়ত এই যে পুরুষদের হাল্কা হবার জায়গাটা তখনকার বাড়ীর নকসায় সবচেয়ে দূরে ঠেলে দেওয়াই নিয়ম ছিল। সকালবেলা ছাড়া আমরা সাধারণতঃ ঐ দিকটা তেমন মাড়াতাম না। দিনে-দুপুরে গেলেও কি রকম গা-ছমছম করত। কত রকম সাপখোপ পোকা মাকড় আর পাখীদের আড্ডাই যে ওই গাছটায় ছিল তার ইয়ত্তা নেই। এক কথায় একটা জন্ত চিড়িয়াখানা।

প্রত্যেক জাতের জীবেরই নিজেদের, অদৃশ্য হলেও, নির্ধারিত সীমানা টানা থাকে। এক একদিন ওই সীমানা নিয়ে প্রথমটায় শুধু কলরব, তারপর ঝগড়া, শেষটায় তুমুল দাঙ্গা—রীতিমত রক্তা-রক্তি হয়ে যেত। এমন চিৎকার চেঁচামেচি—নিখর কিচ্, নিখর কিচ্, ক্কিররররর — মিররররর. উইটি উইটি বিটর-বিট্ বিটর-বিট বিরররর, প্রইচি-প্রহাচ-প্রইচি চিরি চিরি ঢিড়ড়ড়ড়, কুচিক্ক কুচিক্ক কুইটুং, পি প্রি পি ইকুইচুং চুড়ড়ডডড ডড়ড় টুইয়া টুইয়া টুইয়া—আরও যে কত রকমের ক্যাকা-ফোনি, কার সাধ্য তা বোঝে। কান ঝালা পালা হয়ে যায়। ছোটবেলায় কড়াই থেকে ঝিনুক দিয়ে পায়েশের চাছি তুলবার সময় তার খ্যাচঙ্ খ্যাচঙ্ তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজে সারা শরীরটা কি রকম শিরশির করত। পাখীদের ও ক্যাচর-ব্যাচর শুনে মনে হত যেন পৃথিবীর সব ঠিকা ঝিদের লাইন করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কড়াই মাজতে। কী ভীষণ ব্যাপার।

একদিন ভোরে প্রচণ্ড একটা গোলমালে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি অর্জুন গাছটাকে ঘিরে ছোট বড় অসংখ্য পাখী পাগলের মত উড়ছে আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। দল ভারী করবার জন্যে বেপাড়ার পাখীরাও এসে জুটেছে। শুনেই মনে হল এ চেঁচামেচি অন্য ধরনের। একদিকে ভয়ানক বিপদের আশংকার চিৎকার, অন্যদিকে রণক্ষেত্রের চিৎকার। গাছটার দিকে এগুতেই দেখলাম কোত্থেকে দুটো হনুমান গাছের অজস্র ডালপালার মধ্যে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। কখনও ওস্তাদ ট্র্যাপিজ খেলোয়াড়দের মত ডালে ল্যাজ পেঁচিয়ে দোলা খেতে খেতে তিড়িং করে এক লাফে দূরের আর একটা ডালকে ল্যাজ দিয়ে ধরে ফেলছে। আবার কখনও মোটা মোটা লতাগুলো ধরে ঝুলে টার্জানের মত শাঁই করে এক লাফে চলে যাচ্ছে গাছের আর এক প্রান্তে। কী দারুণ ফুর্তি আর আনন্দ। গাছটা যেন একটা সার্কাসের তাবু—নানা রকম তামাসার জায়গা। নিছক, নির্ভেজাল আনন্দের এমন লীলা-ক্ষেত্র কি আর কোথাও আছে? গাছটাকে দখল করে নিলে কেমন হয়? হয়ত এই ভেবেই হনুমান দুটো হঠাৎ এক তাণ্ডব-নৃত্যে মেতে উঠল। পাখীদের যত বাসা ছিল টান মেরে একে একে সবগুলোকে ভেঙে ছুড়ে ফেলতে আরম্ভ করল। গোটা ঘটনাটাই ঘটছে গাছের মাঝামাঝি আর নীচের অংশে। (বলা বাহুল্য ডগার দিকে, অর্থাৎ যেখানে চিল, বাজ পাখী আর শকুন শকুনীদের আড্ডা ছিল, বাঁদর দুটো সেদিকটায় যাওয়া একেবারেই

[illegible]

নিরাপদ মনে করেনি)। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব তছনছ হয়ে গেল। সাধারণ নিয়মে হনুমান দুটোরই জয় হবার কথা। কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ একটা নাটকীয় মোড় নিল। অনেকটা এ্যালফ্রেড হিচ্‌ককের 'দি বার্ড' ফিল্মের শেষাংশের মত। আপাতঃদৃষ্টিতে নিরীহ পাখীদের মত জীবেরাও যে কী ভয়ংকর রকম হিংস্র হতে পারে সেদিন সকালের সেই দৃশ্য দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। যেমন করেই হোক, নিজেদের ভিটে-মাটি-জান বাঁচাতে হবে এই ইনস্টিংক্ট-এর তাড়নায় প্রায় হাজারখানেক পাখী—এমন কি ফিঙে, টুনটুনি চড়ুইও —একজোট হয়ে 'মারো মারো৷ কাটো কাটো, ছিঁড়ে ফেলো' এই হুংকারে ভয়ংকর একটা কালো মেঘের মত হনুমান দুটোর ওপর বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে এক কুরুক্ষেত্র। চারদিকে রক্তারক্তি বেগতিক দেখে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ক্ষত বিক্ষত হয়ে বিদ্যুৎ বেগে লাফাতে লাফাতে বানর দুটো পাখীদের নাগালের বাইরে চলে গেল। গাছতলায় পড়ে রইল চেনা-অচেনা অনেক পাখীর মৃতদেহ।

বানরদের মধ্যে শুধু শুধু ধ্বংস করবার একটা প্রবৃত্তি এর আগেও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সেই তুলনায় মানুষের মধ্যে ত এই পশু-প্রবৃত্তি হাজার গুণে বেশী। নিছক হত্যায় আনন্দ পাবার দুর্বার লোভেই হোক, কিম্বা ব্যবসার লালচেই হোক এ দুই এর ফলে পৃথিবীর বুক থেকে আজ একশ কুড়ি রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী আর দুশ পঁচিশ রকমের পাখী, মানুষের শিকার হয়ে একেবারেই লোপ পেয়ে গেছে। শোনা যায় আরও ছয়শ পঞ্চাশ রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখীদের লোপ নাকি অনিবার্য।

হিংস্রতায় অবশ্য পাখীরা বাঘ ভাল্লুক মানুষ কারোর চাইতে কম যায় না। একবার পুজোর সময় চুরি করে অনেকগুলো বিচিকলা খেয়ে ফেলেছিলাম। ফলে পর পর বেশ কয়েকবার আমাকে অর্জুনতলায় ছুটতে হয়। সেখানে ঢুকেই দেখি ফুট-ফুটে অথচ রক্তাক্ত একটা শালিক পাখী এক কোণে বসে ধুঁকছে। আমার ধারণা, চিৎকার-চেঁচামেচি করে ঝগড়া করতে শালিকের কোনো জুড়ি নেই। সাধে কি আমাদের পাড়ার বি-এ পাশ করা বাঁকা মুদি দজ্জাল বউ-এর সঙ্গে ঝগড়ায় না পেরে উঠে নাকি সুরে বিড়বিড় করে বলত, 'বৌটি, মেয়েমানুষ না ত' যেন শালিক পাখী।' সে যাকগে। হাজার

ছোলা, কেঁচো আর ফড়িং-এর ঘন্ট খেয়ে শালিকটা কয়েক দিনের মধ্যে বেশ তরতাজা হয়ে উঠল
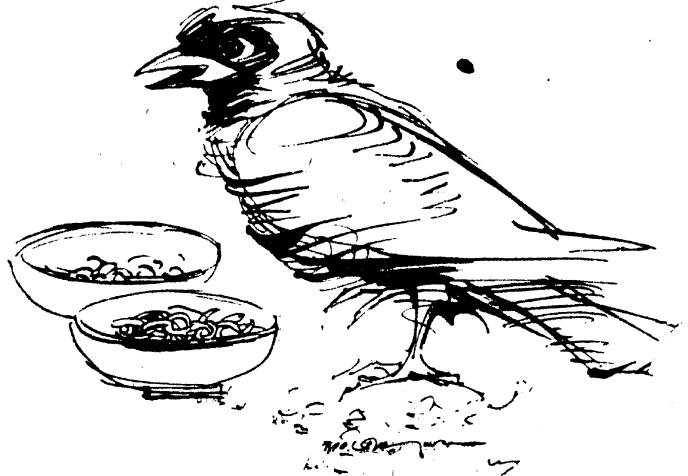
হোক৷ আমি কবিরাজের ছেলে। তাকে ধুতির খোঁটে আলতো করে জড়িয়ে এনে গাঁদা পাতার রস দিয়ে ধুয়ে মুছে, হলুদ-চুন দিয়ে বেঁধে দিলাম। তিন-চারদিন ছোলার সঙ্গে কেঁচো আর ফড়িঙ-এর ঘণ্ট খেয়ে সে এমনই তরতাজা হয়ে উঠল যে পালাবার জন্যে ছটফট করে। আমারই সঙ্গে তাকে রাখি পায়ে সুতো বেঁধে। অনিত্য এই সংসারে মায়া বাড়িয়ে আর লাভ কি। এই মনে করে শালিকটাকে যেই না অর্জুন গাছটার কাছে নিয়ে গেলাম মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যে সে ডালপালা আর পাতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল আর তাকে কোনোদিন দেখিনি।

পশুপাখীর জগতেই হোক, আর মানুষের জগতেই হোক, সীমানা নিয়ে ঝগড়া আজকাল অনেক দূর গড়িয়েছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলতেন যে, 'মানুষ ধন-দৌলত, জমি নিয়ে ঝগড়াঝাটি করে৷ কই আকাশ নিয়ে ত কেউ ঝগড়া করে না। আজকের যুগের মানুষ হলে তিনি নিশ্চয়ই একথা বলতেন না। আজ আকাশ বাতাস-জল, সর্বত্রই এই সীমানা নিয়ে লড়াই দেখা যায়। জমিতে যে ফসল ফলছে তাতে করে বর্ধমান মানুষের আর কুলোচ্ছে কোথায়। জলের তলায় যে মৎস্য এবং অন্যান্য খাদ্যসম্পদ রয়েছে তাই নিয়েও কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। তাছাড়া সমুদ্রের মেঝের তলায় কোথায় কখন তরল সোনা বেরুবে তাই বা কে বলতে পারে? তাই জমির মতই মহাসমুদ্রেও সীমানা নিয়ে লড়াই চলেছে। অদৃশ্য হলেও৷ আকাশের ওপর দিয়েও ওইরকমই সীমানা টানা আছে। বিনা অনুমতিতে পেরিয়েছ ত তার ঘোরতর ফলাফল হতে পারে। এমনকি, রাতারাতি যুদ্ধও লেগে যেতে পারে। আকাশ-বাতাস-জল যেদিকেই তাকাও এ নিয়ে গোলমাল। গাছের ডাল পালাও তার ব্যতিক্রম নয়।

আমাদের ওই অর্জুন গাছটার সঙ্গে আজকালকার গগণচুম্বি ফ্ল্যাটবাড়ীর একটা আশ্চর্য মিল দেখি। যাদের আর্থিক সামর্থ্য তুলনামূলকভাবে কম, তাঁরা সাধারণতঃ এই ধরনের বাড়ীতে তলার এবং পেছনের দিকে স্থান পায়। যে অনুপাতে মালিকদের অবস্থা বাড়তির দিকে যায়, সে অনুপাতে তার ক্ষমতাও। আর সে অনুপাতে তাদের স্থানও ক্রমশঃই ওপরের দিকে। তাছাড়া রোদ-বাতাসের অংশটাও তাঁরা ভোগ করেন বেশী। গোড়ার দিকে গর্তগুলোতে সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর ইত্যাদির আশ্রয়। তার ঠিক ওপরের স্তরে কোটরগুলোতে কাঠ-ঠোকরা, মাছরাঙা, টিয়ে পাখী, শালিক, বুলবুল আরও কত কি। গাছের পেছনের দিকটা, অর্থাৎ যে দিকটায় শীতকাল ছাড়া তেমন রোদ লাগত না, তারই মাঝামাঝি উচ্চতায় কয়েকশ বাদুরের একটা ঘন বসতি ছিল। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় যে গাছের ওই জায়গাটাকে কে যেন পুড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই কাছাকাছি ছিল কয়েকটা বড় বড় হুতোম প্যাঁচা ওই পেছনের দিকের ডালপালা-পাতা এবং গাছতলার রঙটা বাদুরগুলো বিশ্রীরকমের সাদা করে রেখেছে। ফ্ল্যাটবাড়ীতে চুনকাম যতই বাড়ী শোভা বাড়ায় মহীরুহের গাছে এখানে সাদায় পোঁছ তত‍ই [illegible]

আমাদের 'মেজোপিসির মতো রোগা-পটকা এক বুড়ী অদ্ভুত দেখতে একটা মাছ কাটছে

ওপরে, সামনের দিকে থাকত একদল বক। এদের ওপরের স্তরে ছিল গাঙচিল আর শঙ্খচিলেরা। মাঝে মাঝে দু'একটা বাজ-পাখীও দেখেছি। গ্রীষ্মের দুপুরে পাতার তলায় বসে ঝিমছে। আর সবাইর ওপরে ছিল শকুন-শকুনিদের লাকসারি ফ্ল্যাট। মানুষের রাজ্যেও যেমন শ্রেণীভেদ বর্ণভেদ পশুপাখী, কীটপতঙ্গের জগতেও দেখছি এর কোনো ব্যতিক্রম নেই।

আগেই বলেছি যে অর্জুন গাছটার ধারকাছ দিয়ে ঘেঁষতে দিনের বেলায়ই আমাদের হৃৎপিন্ড কি রকম ধড়ফড় করে উঠত। রাত্রিবেলায় নাকি যত রাজ্যের ভূত-পেত্নীরা এসে ওখানে আড্ডা জমাত। গাছ-টাকে রীতিমত নাকি ক্লাবঘর বানিয়ে ফেলেছিল। শুনেছি যে চারপাশের গ্রামের যত অপমৃত্যু ঘটত, তাঁদের প্রেতাত্মারা নাকি ওই গাছটায় বাসা বেঁধেছিল। তাছাড়া আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছেন, তাঁরাও নাকি অন্তত বছর-খানেক এই গাছটার চারপাশ দিয়ে ঘোরা-ফেরা করতেন।

একদিন আমরা সবাই হা-ডু-ডু খেলছি। হঠাৎ দেখি আমাদের মাইনে করা কাঠুরে কার্তিকচাঁদ ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে আর টুঁ-শব্দটি বেরুচ্ছে না। ভয়ে যেন জমে গেছে। অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করবার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল যে বড়কর্তা ওখান দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে কার্তিক, ভাল আছিস তো? অনেকদিন পর তোকে দেখলুম।' ব্যাপারটা হল, বড়কর্তা, অর্থাৎ আমাদের বাবা, মাসখানেক আগেই মারা গিয়েছিলেন।

আর একবার কালীপুজোর রাত্তিরে আমাদের এক খুড়তুতো ভাই বাজি ধরে দিস্তে পাঁচ-ছয়, লুচি, সের দুই নারকেল কুঁচি দেওয়া ছোলার ডাল, বিশ-পঁচিশখানা বড় সাইজের বেগুনভাজা, তিন-চার গন্ডা পোড়া লাল লংকা ডলে খেয়ে ফেললেন। এর ওপর দিলেন ঘন সরপড়া পাঁচ-ছয় বাটি পায়েস সাফ করে। যা অনিবার্য তাই ঘটল। ঘোর অমাবশ্যার আলকাতরার মত ঘন অন্ধকারে বেরুতে হল লোটা হাতে। শরতের শেষের হাল্কা নীল একটা কুয়াশার জাল এই অন্ধকারকে ঘিরে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। পুকুরধারে মস্ত বড় বড় হাত-পাখার মত দেখতে কচুপাতার জঙ্গলের ঠিক ওপরেই অনেকগুলো জোনাকি একই সঙ্গে জ্বলছে আর নিভছে, শিশির ভেজা পাকা-ধান, পচা পাতা আর পচা পাটের গন্ধ কাদা-মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে চারদিকের আব-হাওয়ায় কেমন যেন একটা ভারী, থমথমে ভাব সৃষ্টি করেছে। হাওয়ার লেশমাত্র নেই। লণ্ঠন হাতে খুড়তুতো ভাই আস্তে আস্তে সরুপথ দিয়ে অর্জুনতলার দিকে এগুতে থাকল। দূর থেকে হঠাৎ গাছটার দিকে চোখ পড়তেই দেখা গেল তার একেবারে অন্য এক মূর্তি। যেন রামপ্রসাদী শ্যামা এলো-চুলে শ্মশান কালীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। চারিদেকে সুনসান। ছপ্ করে জলের মধ্যে কী একটা লাফিয়ে পড়ল। হয়ত এটা কোলাব্যাঙ। কিম্বা হয়ত একটা বড় মাছ পুকুরে জলের ওপরের দিকটায় হাওয়া খেতে এসে গোত্তা মেরে গভীরে লুকিয়ে পড়ল। ওকি! ওটা কি! কুয়াশার ভেতর দিয়ে আবছা আবছা ওটা কি দেখা যাচ্ছে! খুড়তুতো ভাই একটুকুও দমবার পাত্র নয়। আমাদের বাড়ীতে ওর মতো আশ্চর্য সাহস আর কাউরও ছিল না। লণ্ঠনটার শলতে বাড়িয়ে দিয়ে একটু উঁচু করে ধরে দেখতে গিয়েই হাত-পা চোখ সব 'ফ্রিজ' করে গেল। আমাদের পোষা 'ভোলা' কুকুরটা বিশ্রী কান্নার সুরে থেকে থেকে ডাকতে আরম্ভ করল। কি যেন একটা বলতে চাইছে। পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বাঁশ বনটায় থেকে কতগুলো শেয়ালও তেমনই একটা বিশ্রী চিৎকারে দ্বৈত সংগীত জুড়ে দিল। ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলোও তাদের সপ্তমে চড়াল। সবাই যেন সমস্বরে বলছে 'পালাও, পালাও'। কর অদৃশ্য এক তর্জনির সংকেতে এক মুহূর্তে সব কিছু গেল থেমে। কী ঠুনকো নিস্তব্ধতা। আঙ্গুলের টোকা মারলেই যেন ভেনিশিয়ান ওয়াইন গ্লাসের মত ঠং-ঠাং আওয়াজে হাজার টুকরো হয়ে যাবে। কুয়াশাটা আস্তে আস্তে বাঁশ বনটার দিকে সরে গেল। লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল যে দেশলাই কাঠির মত শুকনো রোগাপটকা—অনেকটা আমাদের 'সেজোপিসির মত দেখতে এক বিধবা বুড়ী, ছিপ হাতে পুকুর ধারে মাছ ধরতে বসেছে। ভাসুর দেখে ছোটপিসি যেমন আড়াই হাত এক ঘোমটা টানতেন, তেমনি মাথার ওপরে এক বিরাট ঘোমটা টানা। ঐ অবস্থাতেই মাথাটা খুড়তুতো ভাই-এর দিকে ঘোরাতে আবছা আলোতে পরিষ্কার দেখা গেল ঘোমটার তলায় মাথা নেই। বড়শির ফাৎনার ডগায় লাইট-হাউসের আলোর মতই একটা নীল-সবুজ আলো চারদিকে ঘুরে যাচ্ছে। বুড়ির ঐ কাঠির মত হাতের এক হ্যাঁচকা টানে হাত পনেরো লম্বা—পেটের কাছটা বেল্টপরা মেমসাহেবের কোমরের মতই সরু, একটার জায়গায় তিনটে করে মাথা আর তিনটে করে ল্যাজ, নীচের দিকটা দু'হাত পর পরই কিরকম গাঁট গাঁট বাঁধা যেন অনেকগুলো আনারস একসঙ্গে জোড়া হয়েছে অ্যাল্-সেশিয়ান কুকুরের মত, মস্ত বড় লাল টকটকে জিভ লক্-লক্ করছে, মাথার ওপরে গন্ডারের মত ধারাল শিং, আর ওয়ালরাসের মত গোঁফ। চোখ দুটোর থেকে বিয়ে বাড়ীর উনুনের মত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে, আবার বিনা কারণে

নিভে যাচ্ছে। আবার জ্বলছে, আবার নিভে যাচ্ছে—এমন একটা অদ্ভুত দেখতে মাছ পুকুর পাড়ে আছড়ে পড়ল। মাটিটা থর-থরিয়ে কেঁপে উঠল। গুজরাটি এক ধরনের কাপড়-চোপড়ে যেমন ছোট ছোট কাচ বসান থাকে, মাছটার সারা গায়ে তেমনি কাচের মোজাইক বসান। লণ্ঠনের আলো পড়তেই মাছের আঁশগুলো এক একটা আরশির মত ঝলমল করে উঠল। মাছটা যেমন তড়পাচ্ছে, তেমনি যেন শত শত আলিশান বঁটিদা শুকনো পাতার মত ভাসতে ভাসতে এসে ঠিক বুড়ীর সামনে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে ভেসে এল তেমনি মানানসই দুটো পেতলের পরাত। একি অর্জুন গাছটার চারপাশে কি নিভছে আর জ্বলছে। দেখতে না দেখতেই হঠাৎ জিরো গ্র্যাভিটি নেমে এল? বুড়ো হাতে খানিকটা মাটি মেখে যেই না মাছের গর্দানটা বঁটিতে ছোঁয়াল, অমনি ফিনকি দিয়ে টাটকা রক্তের স্রোত হেমন্তের পুকুরটাকে আনাচে কানাচে ভরিয়ে দিল. খানিকটা এসে খুড়তুতো ভাইর ফুটো হাতকাটা গেঞ্জিটাকেও ভিজিয়ে দিল। এ্যাঁ! পায়ের ফাঁক দিয়ে ওটা কি বেরিয়ে গেল? ইঁদুর না বেজি? শুকনো পাতাগুলোর মধ্যে কী খচমচ করছে? একটা চামচিকে শাঁই করে কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। একটা উচ্চিংড়ে এসে ঠং করে কপালে এমন জোরে ধাক্কা খেল যে দাদা প্রায় চিৎপটাঙ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। এসব কাণ্ডকারখানা দেখে দাদা পালাতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ইয়াঁর চেয়ে একটা বরফের মত ঠাণ্ডা হাত কাঁধের ওপর রেখে কানের কাছে ফিসফিস করে কে শুধালো, 'জান, আমাদের আজ চড়ুইভাতি হচ্ছে? কি মেনু জান? মাছের বিরিয়ানি, পাতুড়ী, কোর্মা আর মুড়িঘণ্ট। রান্না কে করছে জান? সেই ডাক্তারবাড়ীর পল্টু ডাক্তারের প্রথম স্ত্রী। আমাদের সঙ্গে খাবে ত?' পরিষ্কার বাংলা। একটুকুও খুঁত নেই। কিন্তু র এর উচ্চারণটা ড়-এর মত কেন? লোকটা তামিলনাড়ুতে বাংলা শিখেছে?

পরদিন আমাদের পুরুত মশাই, অভ্যেসমত খুব ভোরে প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে এসে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেলেন। মুখ দিয়ে নাকি ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মত ভকভক করে গরম ফেনা বেরুচ্ছিল।

আর একবার আমাদের গ্রামের নামকরা যোগেশ ভাটিয়াল এরকমই এক অমাবশ্যার রাতে মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে অর্জুন গাছটার পেছনের বিলের ধার ঘেঁষে ডিঙি বেয়ে যাচ্ছিল। নসিমপুর গ্রাম থেকে যাত্রার পার্ট করে ফিরছিল নাকি। যেই না গাছটার তলায় আসা, ব্যাস, তার গান গেল থেমে। তারপর থেকে সে নিখোঁজ। এখনও নাকি মাঝে মাঝে অনেক গভীর রাতে গাছটার মগডাল থেকে তার গান ভেসে আসে। সেই থেকে গ্রামে রাত্রিবেলা শোবার সময় সবাই কানে তুলো গুঁজে শোয়। সেই গান যার যার কানে পৌঁছয় তার দিন নাকি আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসে।

হে তরুবর! আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী তোমাকে দেখিনি। আজ তুমি পরদেশী। তুমি এখনও আছ কি নেই, কে জানে? জন বিস্ফোরণের চাপে, মানুষের প্রয়োজনে, তুমি হয়ত হয়েছে বিসর্জিত। তোমার পাদ-পীঠের ওপর দিয়ে হয়ত তৈরী হয়েছে নতুন রাজপথ। একদিন তৈরী হবে কলকার-খানাও। ভোরের সোনালি আলোয় যেখানে দেখেছি তোমার মণিমুকুট, সেখান উঁচিয়ে থাকবে একদিন দৈত্যের মত তার বিরাট চিমনি। কালো কালো. বিষাক্ত সাপের মত অনর্গল ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে লাপিস-লাজুলির মত স্বচ্ছ নীল আকাশটাকে করে দেবে অন্ধকার।

কবে কোন দারচিনি দ্বীপ থেকে বসন্তের এক দিনের শেষে সুদূর সাইবেরিয়াগামী একটি বেগুনি রংয়ের বেলেহাঁস আমাদের এই পুকুর পাড়ের নরম ঘাসে দু-দন্ড বিশ্রাম করতে নেমে অকস্মাৎ একটি বীজ ফেলে গিয়েছিল। তোমার জন্মের সেই শুভ মুহূর্তে, স্বাতী, রেবতী, অরুন্ধতী—সব নক্ষত্রেরা শঙ্খধ্বনি করে তোমার আগমন ঘোষণা করেছিল। সেদিন ছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমা। সেদিন প্রকৃতি তোমার সৃষ্টির কল্পনায় মশগুল। সে কল্পনায় ছিল দূর ভবিষ্যতে নতুন বিস্ময়ের আবির্ভাব, নতুন নতুন সৌন্দর্যের জন্ম, নতুন নতুন প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত। চরক, সুশ্রুত, বাণভট্ট, চক্রদত্ত, আর্যাবর্তের সব মুনি-ঋষিরা কত ধুমধাম করে তোমার নামকরণ উৎসব করেছিলেন। চমৎকার সব নাম রেখে তাঁরা তোমার মহিমা গাইলেন। যেমনই ধ্বনি তেমনই তার মাধুরী—গাণ্ডীবী, কিরীটী, কর্ণারী, অর্জুন, শম্বর, পৃথজ, কৌন্তেয়, ধনঞ্জয়, ককুভ—আরও কত কি। তুমি ছিলে কোটিতে একটি, সহস্র গুণের আধার। তোমার গুণে কত দুরারোগ্য রোগ থেকে হাজার হাজার মানুষ মুক্তি পেয়েছে, পেয়েছে নতুন জীবন। তোমার একাধিক নাম হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? তুমিই প্রেম, তুমিই সৌন্দর্য, তুমিই শিল্প। তুমিই ভাবুকতা, তুমিই অনুকম্পা। তুমিই সৌন্দর্য পিপাসু প্রকৃত রসিকদের অনুভূতি ও আনন্দের উৎস। কীট-পতঙ্গ, পশুপাখী, মানুষ সবাইকে তুমি প্রাণ দিয়ে ভালো-বেসেছ। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছ নিঃশেষে। তাই তোমার কপালে আঁকা আছে প্রেমের জয়তিলক, প্রেমের উজ্জ্বল বর্তিকা।

হে তরুরাজ, ঘনকালো কত অমাবস্যার অন্ধকারে তোমাকে দেখেছি যেন এক রহস্য-ময় স্বপ্নবন্দর। কবে শুক্লপক্ষের ফালিচাঁদ উঠে তোমার চারদিকের ছায়া ও আসন্ন প্রদোষের গম্ভীর অন্ধকার দূর করবে, দেখেছি তুমি তারই প্রতীক্ষায় কত রাত চুপ করে ছিলে দাঁড়িয়ে। গ্রীষ্মের কত অলস দুপুরে তোমার শীতল ছায়ায় শুনেছি পাখীর কুজন। কতদিন স্বপ্নে ভেবেছি তোমার ঐ উঁচু চূড়ায় দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে নীল আকাশটাকে ছোঁব, ওপর থেকে পৃথিবীটাকে দেখব, যেমন করে দেখে চিলেরা। শীতে তোমার পাতাঝরা রুক্ষ, কর্কশমূর্তি দেখেছি। দেখেছি তোমার চকচকে তামাকে রং-এর নতুন পাতাগুলো ফাল্গুনের গরম আলোতে ঝিলমিল করছে। কী অপূর্ব সে দৃশ্য। যেন ওমর খৈয়ামের দেশের কোন ওস্তাদ কারিগরের তৈরী অনুপম একটি আকাশজোড়া কাচের সুরাপাত্র খোরাসানি বেদানার সরবতে টইটুম্বুর। তোমার চূড়ায় ধাক্কা লেগে বর্ষার প্রথম মেঘ তোমাকে করেছে সিঞ্চিত। শালিক, মাছরাঙ্গা, বুল-বুল, টিয়াপাখীরা ডালে ডালে সারি সারি বসে শুকোয় তাদের ভেজা পালক। আহা! ডালপালায় যেন রং-বেরংয়ের, নানা নকসার খুড়ির দোকান বসেছে। আবার ভরা বসন্তে দেখেছি তোমায় মসৃন সবুজ মখমলের কুর্তায়। মাথায় ছোট্ট ছোট মাখন-রংয়ের ফুলের স্তবকের মুকুট। তোমার হৃদয় স্পন্দন আজও আমি নিজের রক্তের মধ্যে অনুভব করি। কলকাতার মত এই জনাকীর্ণ, কোলা-হলমুখর, ব্যস্ত, পচা, নোংরা, ভাঙ্গাচোরা শহরে বাস করেও তোমাকে কোনো দিন ভুলিনি। জীবনানন্দের যে অমৃতবাণী তুমি আমায় শুনিয়েছিলে, তার কথা মনে এলে আমি আজও কিরকম ছন্নছাড়া হয়ে যাই—যেন চলে গেছি অনেক দূরে, এক জনহীন অজ্ঞাত জনপদের, উদাস, অপরূপ এক বুনো সৌন্দর্যের মধ্যে, সেখানে জীবন এনে দেয় এক মুক্তির স্বাদ আর আনন্দের অনুভূতি।

'হে সময়, হে সূর্য, হে মাঘ-নিশীথের কোকিল/হে স্মৃতি হে হিম হাওয়া, আমাকে জাগাতে চাও কেন।'

মনে পড়ছে ১৯৭১ সালে। বশীদা মেকসিকো থেকে ডক্টরেট পেলেন। অনুষ্ঠান হল পন্থনগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে কার-এ দিল্লি গেলেন। আমরা তখন মোরদাবাদে। জানালেন 'তোমাদের কাছে লাঞ্চ সারব পথে।' ফিরতি পথেও সেই কথা। কিন্তু দিল্লি থেকে এলেন যখন দেখি বৌদি পথে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গেস্টরুমে শুইয়ে কোন ডাক্তারকে ফোন করলাম, কারণ ডাঃ দে তখন আউটস্টেশন, ডাক্তার আসতে দেরী করছেন, বুঝ বশীদার কী দুশ্চিন্তা। ডাক্তার এলেন, ইনজেকশন দিলেন। খানিকক্ষণ বাদে ও'রা রওনা হয়ে গেলেন। কে জানত দুশ্চিন্তার পাল্লা মাত্র ক' মাসের মধ্যে অন্যদিকে ঝুঁকে যাবে? কে জানত বশীদাকে এই শেষ দেখা! (মার্চ ১৯৭১)।

১৯৭১ সালের ৩১শে আগস্ট রানীক্ষেতের মিলিটারী হাসপাতালে বশীদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। টেলিগ্রাম পেলাম 'মাই বশি ডায়েড'। তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম পাঠালাম 'আলমোড়ায় আসছি।' না। যেতে পারলাম না। রোডওয়েজ থেকে খবর পেলাম বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধ্বস নেমেছে—কাঠগোদাম থেকে বাস, ট্যাকসি কিছু যাচ্ছে না।

এরপরে কানপুরে বদলীর খবর এল। সংসার গুটিয়ে তোলার পালা। এরই মাঝে আলমোড়া থেকে ট্রাঙ্ক কল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ক্লান্ত কণ্ঠস্বর 'ডিয়ার তোমরা তো এলে না! আমি যে পথ চেয়ে বসে আছি!'

চমকে উঠলাম! আজ যে দুর্গাষষ্ঠী!! বশীদার জন্মতিথি!!! মাত্র একমাস আরও থাকলে বশীদা চুরাশী বছর পূর্ণ হতেন! জানালাম 'প্যাকিং নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি! কিন্তু যাবো। নিশ্চয় যাবো।' মালপত্র কানপুরে রওনা করে দিয়ে গেলাম কুমায়ুন অভিমুখে। বৃষ্টিতে ভিজে সদ্য মেরামত করা ভাঙ্গা রাস্তায় গাড়ী চলতে সময় নিল দ্বিগুণেরও বেশী! পৌঁছলাম গিয়ে সন্ধ্যার মুখে!

সেই বাড়ী, সেই বিশাল দেওদার পাইন, সেই বারান্দায় হ্যাজাক ঝুলছে, সেই কাচে ঘেরা শিশুচারাদের ঘর—তবু সেই নয়

প্রণতা দে

সবাই নেই,—নেই এদের প্রতিষ্ঠাতা, পিতা, প্রাণ! বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে পা আটকে যাচ্ছে। বাইরের ঘরে নিজস্ব কোণার ডিভানটিতে বৌদি আমাদের অপেক্ষায় বসেছিলেন। সামনের সেই নির্দিষ্ট চেয়ারটি, সদানন্দের সদাহাস্যময় শিষ্যের চেয়ারটি শূন্য। বৌদি খুব স্বাভাবিক স্বরে কথা বলবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু স্বর স্বাভাবিক ছিল না। নিঃশব্দে ভেতরে চলে গেলেন! শোবার ঘরের দিক থেকে বেরিয়ে এলেন হাতে একটা কোট। বশীদার কোট। ডাক্তারের মুখের দিকে না তাকিয়ে, অন্যদিকে তাকিয়ে যন্ত্রচালিতের মত বল্লেন 'ভিজে গেছ। বদলে এসো!' এরপর দু'চার কথার পর বৌদির বাঁধ ভেঙে গেল। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন। মনে পড়ল আমাকে একবার বলেছিলেন 'আমি কাঁদতে পারি না। তুমি কাঁদো?'

আমি তৎক্ষণাৎ নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি করেছিলাম 'হ্যাঁ'। দেখলাম বৌদিও আমার মত সাধারণ! অনেক দেশ ঘুরেছেন, অনেক লেখাপড়া শিখেছেন, অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন, কিন্তু তিনিও নারী। সদ্যপতিহারা, বশী-হীন 'মিসেস বশী সেন' তিনি!

পরদিন সকালে পুজোর ঘর থেকে পরিচিত স্বর ভেসে আসছিল 'ওং হ্রীং ঋতং......রামকৃষ্ণায় নমঃ!' বশীদার স্বর!!

বশীদা যাবার পর থেকে প্রতিদিন বৌদির ধ্যান-উপাসনার পর টেপ রেকর্ডে বশীদার স্বর বাজে। এইভাবেই বৌদির সকাল শুরু হয়।

বৌদির টেবিলের ওপরে অনেকগুলি শোক-লিপি—দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের, অখ্যাত বন্ধুদের, দুস্থ উপকৃতদের। আর্জেন্টাইন থেকে একজন পাঠিয়েছেন কবিতায় শোক জ্ঞাপন করে। দেখলাম কবিতার ওপরে বৌদির কলমে কারেকশন করা! এশিয়া পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদিকা শোকলিপির ভুল ইংরাজী সংশোধন না করে পারেন নি। মনে পড়ল আগের বছর ১৯৭০ জুন-জুলাই আমরা তখন নৈনিতালে, মিস এ্যালিসবোনার (ইনি উদয়শঙ্করকে প্রতিষ্ঠিত হতে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছিলেন। নিজে সংস্কৃতজ্ঞ,

ভারতীয় কৃষ্টি, ভাস্কর্য শিল্প নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, ভারত সরকার থেকে পদ্মশ্রী পেয়েছেন, জাতিতে সুইস, (বেনারসবাসিনী) এসেছিলেন নৈনিতালে। ছিলেন সুইস হোটেলে, আমাদের ডেকেছিলেন দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে। ঘরময় কাগজ ছড়ানো, টাইপরাইটার খোলা। বল্লেন 'লেখাটা শেষ করছি তাড়াতাড়ি করে। আলমোড়ায় গিয়ে গার্ট্রুডকে দিয়ে একবার ইংরাজীটা সংশোধন করিয়ে নেব' ওর মত ইংরাজী তো জানি না।

বশীদা যাবার কিছুদিন বাদেই বৌদির কঠিন অসুখ হল' বৌদি স্থির। শান্তভাবে বলেন 'বশী থাকতেই টের পেয়েছিলাম একটু; কিন্তু বলিনি বশী ব্যস্ত হবে ভেবে।'

ব্লাড প্রেসার বাড়ছে আজকাল খুবই। বৌদি নির্বিকার। 'বাড়ুক না' কী এসে যায়।'

ইদানীং চিঠি পাই গেস্টরা আসে যায়। হাসি, কথা বলি, কিন্তু মনের মধ্যে সর্বদাই শূন্যতা—বশী নেই।'

এই ভাঙ্গা মন ও অসুস্থ শরীর নিয়েই সেনমহাশয়ের নামে একটি ক্লক-টাওয়ার করালেন আলমোড়ার মিউনিসিপ্যাল বাগানের সামনে। করালেন বশীদার আদিবাড়ী বিষ্ণুপুরে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর নামে একটি স্কুল, আর বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল হলের (যেটি সেনমহাশয়ের সঙ্গে যুগ্ম প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে) জন্য এখনও কাজ করে চলেছেন।

আলমোড়াতে এসে যে স্থানটিতে স্বামীজী অনাহারে, ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন—সেই পবিত্র স্থানটিতে গড়ে উঠল বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল 'হল'—পথচলা ক্লান্ত পথিকের বিশ্রামস্থান। আর যে মুসলমান কৃষকটি মূর্ছিতপ্রায় অজ্ঞাত হিন্দু সন্ন্যাসীকে নিজের ক্ষেতের সামান্য একটি শশা খাইয়ে সুস্থ করে তুলেছিল তার পৌত্রকে নিযুক্ত করা হল ঐ মেমোরিয়াল হলের চৌকীদার।

আলমোড়া ছেড়ে কোথাও যাবেন না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা আলমোড়া। নিউইয়র্ক? কক্ষণও না!! বশীর কাজ, বশীর ল্যাবরেটরী, বশীর স্মৃতিমাখা আলমোড়া। ঐ আলমোড়াতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে চান বশী-হারা মিসেস বশী সেন। যে কোন দিন তেমন খবর পেতে পারি। তারপর থেকে সূর্যের আলো পাহাড়ের মাথায় উঠলেও ও বাড়ী থেকে ওং হ্রীং স্তব আর শোনা যাবে না। কোনার ডিভানটির পাশে লাল সেডের আলোটি জ্বলবে না, পাখীগুলোর জলের বাসন শুকিয়ে থাকবে; কিন্তু কুন্দন হাউসের স্মৃতি তো মুছে যাবে না।

জগদীশচন্দ্র বসুর চিঠি

ডাঃ জগদীশচন্দ্র বোসের ক্রিস্টিনকে লেখা পত্র (হাতে লেখা)

(১)

On this Christmas day our thoughts are with you. Strange that you should be in your country, we in yours! But it is all one! Last night there were many superstitious ceremonies in which someone delights in, the cradle, the shepherd, ending in sprinkling in Ganges water (?) You can imagine all the rest. But it did bring back vividly the beloved country from which we are now away.

How little can one say. I think when things ale a little dark than we realise the few blessings which are ours. The little world with staunch and true friends, will be always ours.

Let the coming year bring all blessings to you and yours.

Cambridge X'mas—1908.

এই কাগজের উল্টোপিঠে অবলা বসুর লেখা ক্রিস্টিনকে চিঠি :—

How good your sister is. She sent us such a hearty invitation to Detloit! And you may be sure we will not hesitate to see the 'Heaven in Earth'. So we have gladly accepted and when fe go tc Ann Arbor in Feb., we expect to visit her and all your sisters. Won't that be great fun! We only wish you were here too. Do you know whenever I go out I make it a point to have icecleam even in this cold. The snow is on the ground and everything is beautiful with bright sunshine.
Still I miss you very much. With love.

এই সময় ক্রিস্টিন ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে ছিলেন।

(২)

8th Jan. 1909.

I think by this time I have seen various types of the charming Americans, but I hold the opinion that a countrymen of mine had a taste which could not be equalled! Of course I admire, but it was not necessary to cross the seven seas to be converted.
You will be glad that I had great success before dry men of science. We expect to be at Detroit soon . . . . present at a lecture when a great patient (she patient) was so distracted that she could not listen to a word but kept on gazing. The result is a portrait which is wonderfully life like, and charming. This is carrying coal to New Castle with a vengence.
We have been planning various things for the school in the lane. They all admire the poetry of the lane—the inhabitants thereof. Everyone envies the Saints and Madonnas. The....staircase, but of substantial help there is little. As a good omen to start with, I asked at a place when I lectured for a subscription to school instead of paying expense, they gave 10 dollars ....Altogether there will be about 100 £—not so bad after all. The only hopeful things is if connections could be made with magazines which pay well. There is some chance in the direction. I do wish that the little place which always lemaini a centre of work and shelter. How welcome sympathy is and one ever forgets to inquire whether it is merely professional. Heard with mixed feeling with numerous visitors. What are the fellows doing there? I don't think the twin-cherry has been round. I am glad however that the gentleman who has particularly to visit.... ..finds time sometimes to call on his way. How empty and dreary things are, but it is well that we should have known a few who are steady and true. What else matters? The Secretary is still undaunted, though not so impulsive, far more reasonable now. Poor thing expectations from some, this side to whom various virtues had been imputed turned out to be worthwhile, but nothing so bad as the person N. I hope you are keeping well. Mrs. Sevier must be with you now.
How the happy times came back to me—those journeys.

Happy New Year to you.

স্কুল অফ ফাইন আর্টস্

লক্ষ্ণৌ

চিত্রশিল্পী ন্যাথালিয়েল হার্ড 'স্কুল অব ডিজাইন' নামে ছোট একটি শিল্পকলার স্কুল খুলেছিলেন লখনৌ শহরে ১৯১১ সালে। তাঁর নিজের সৃষ্টিই যে ভূত হয়ে একদিন তাঁর ঘাড় মটকাবে এ কল্পনা কী তিনি কখনও করতে পেরেছিলেন? নিশ্চয় নয়! যাক, ভূতের কথা এখন মুলতুবী থাক। বছর কয়েক পরে স্কুলটি বৃহত্তর আকার নিয়ে নাম পাল্টালো—স্কুল অব ফাইন আর্টস। এই স্কুলের (পরে কলেজের) চারটি প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ালেন চার বাঙালী (১৯২৪-২৬-এর মধ্যে এঁরা এসেছিলেন লখনৌতে) অসিত হালদার, হিরণ্ময় রায়চৌধুরী, বীরেশ্বর সেন এবং ললিতমোহন সেন। সুধীর খাস্তগীর মহাশয় এদের অনেক পরে এলেন। উপরোক্ত চারদিকপালের মধ্যে ললিতমোহন অবশ্য বহিরাগত নন। ইনি ঐ স্কুলের অর্থাৎ ন্যাথিয়েলের প্রথম ছাত্র এবং পরে অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠা পান। ললিতমোহন এবং হিরণ্ময় দুজনেই ছিলেন অ্যাসোসিয়েট রয়েল কাউন্সিল অফ আর্টসের সদস্য। ভাস্কর্যশিল্পী হিরণ্ময় এসেছিলেন জয়পুর থেকে। সুধীর খাস্তগীর এঁর কাছে কাজ শেখেন। প্রদোষ দাশগুপ্তও প্রথমে হিরণ্ময় ও পরে দেবীপ্রসন্নের কাছে কাজ শিখে-ছিলেন।

লখনৌ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সামনে ভাতখণ্ডজীর যে মূর্তিটি আছে সেটি রায়চৌধুরীর তৈরি। একদিন ভাত-খণ্ডেজীকে সামনে বসিয়ে রায়চৌধুরী মূর্তিটি গড়তে লাগলেন। পঁচিশ মিনিট আন্দাজ কাজ করবার পর ভাতখণ্ডেজী জানালেন 'আজ আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে, আপনাকে আর একদিন সিটিং দেব।' মেনে নিলেন রায়চৌধুরী। কে জানত চিরকালের মত ঐ মূর্তির কাজ থেকে গেল। এই ঘটনার কদিন পরেই ভাতখণ্ডেজীর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। ভাতখণ্ডেজী আজও মূর্ত হয়ে আছেন ঐ পঁচিশ মিনিটের সিটিংএ।

কথা হচ্ছিল হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর শিল্পী-পুত্র সুদেব রায়চৌধুরীর সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম "আপনাদের কলেজে এখন বাঙালীর সংখ্যা কত—স্টাফ এবং ছাত্রছাত্রী নিয়ে?" বিষাদের হাসিতে মাথা নাড়লেন রায়চৌধুরী। ছাত্রছাত্রী নেই। স্টাফে সবেধন নীলমণি দুই টিমটিমে শিখা—আমি ও সুরেশ্বর (বীরেশ্বর সেনের পুত্র)। সুরেশ্বর ও সুদেব দুজনেই এই কলেজের ছাত্র। সুদেববাবু এখন ক্রাফট বিভাগে এবং সুরেশ্বরবাবু আর্ট মাস্টারস ট্রেনিং-এ। সুরেশ্বর জাপান থেকে স্ক্রীনপেন্টিংএ স্পেশালাইজ করে এসেছেন। সুদেব বিদেশে যাবার সুযোগ পেয়েও সুযোগ হারিয়েছেন। ইনি শান্তি-নিকেতনে ছিলেন কিছুদিন, বয়ন-কাজ শেখবার জন্য। সুদেব ১৯৫২ সালে স্থানীয় আর্টস কলেজ থেকে পাশ, থাকেন মহানগরে, মৃদুভাষী, শাদা চুল ও দাড়ি সহ চেহারায় বৈশিষ্ট্যের ছাপ।

প্রশ্ন: "আপনাদের বিভাগ কতগুলি?"

সগর্ব উত্তর: 'এত বিভাগ বোধহয় আপনি আর কোন আর্টস কলেজে পাবেন না। —ফাইন আর্টস, কমার্শিয়াল আর্টস, ভাস্কর্য, আর্টমাস্টারস ট্রেনিং, হোমআর্টস ও হোমক্র্যাফটস, ডিজাইন রিচার্সসেকশন, লিথোগ্রাফি, ফোটোমেকানিক্যাল ব্লক প্রসেস, পটারী (সেরামিক), ক্র্যাফট (অর্থাৎ পেতলের শৌখিন জিনিসের কাজ), এমবসিং। আগে জুয়েলারীর কাজও হোত, এখন বন্ধ হয়ে গেছে।'

বাঙালী দিকপালদের সঙ্গে এক উড়িষ্যাবাসী দিকপালও ছিলেন—শ্রীধর মহাপাত্র। ইনি সোপস্টোন, হার্ডস্টোন এবং কাঠের ওপর খোদাই কাজ করতেন। তবে সোপস্টোনেই বেশী। এখন রিটায়ার করেছেন। তাঁর পুত্র রঘুনাথ এখন ওর কাজ করছেন এবং ভাই নিত্যানন্দ ফাইন আর্টস ট্রেনিং বিভাগে আছেন। পরিচয় হল শ্রীধর মহাপাত্র মহাশয়ের সঙ্গে। জানলাম অবসরপ্রাপ্ত জীবনে নিষ্কর্মা হয়ে বসে নেই। কিছু কিছু কাজ করেন শিল্পমনের তাগিদে। বাইরে থেকে লোক এসে কিনে নিয়ে যায়। দেবদেবীর মূর্তি, বিশেষ করে সরস্বতী তাঁর প্রিয়। বিমূর্ত আর্টের বিপক্ষে। বললেন, 'এই জন আমার ওপরে মডার্নরা চটা!'

বললাম, "আপনার মূর্তির ছবিটবি যদি থাকে কিছু দেবেন?"

বললেন, বেশী নেই। অনেক ছবি লোকে নিয়ে ফেরত দেয় নি। অনেক মূর্তি বিদেশে চলে গেছে,

সুদেব রায়চৌধুরীর জলরঙের কাজ লক্ষ্ণৌ দিলখুশবাগ।

ছবি তুলে রাখিনি। বিভিন্ন ভাষার (হিন্দি, ইংরাজী, বাংলা, ওড়িয়া, গুজরাঠী) পত্রিকায় আমার কাজের সমালোচনা সহ ছবি বেরিয়েছে, লোকে পড়তে নিয়ে গিয়েছে—আর ফেরত দেয়নি।'

বললাম, 'আমাকে নিশ্চিন্ত মনে দিতে পারেন, সব ফেরত পাবেন। বললেন, 'বেশ তো। আসবেন একদিন আমার বাড়িতে। অ্যালবাম দেখাবো।'

ন্যাথিয়েলের পরে এখানে সাময়িকভাবে অধ্যক্ষ হন বসন্ত ঘোষাল। ইনি শিল্পী ছিলেন না, সরকারী আমলা ছিলেন। তারপর অসিত ও ললিত যথাক্রমে। পরবর্তী যুগে খাস্তগীর। হিরণ্ময় ও বীরেশ্বর দুজনেই ছিলেন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল।

বিষণ্ণ হাসিতে মাথা নাড়েন সুদেববাবু, "বাঙালী শেষ।" এখনকার অধ্যক্ষ আর এস ভিস্ট মহাশয় এখানকারই ছাত্র। ১৯৫৪-৫৫তে পাশ। এককালে ল্যান্ডস্কেপ ও ওয়াশের কাজে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন; কিন্তু এখন মন দিয়েছেন বিমূর্ত শিল্পে।

প্রশ্ন : 'আধুনিক জীবনের সমস্যা বা সমাজচেতনার ছাপ এখানকার শিল্পীদের চিত্রে পাওয়া যায় কী?"

ওল্টে প্রশ্ন করেন সুদেববাবু "মানে?"

"বলতে চাই, ধরুন—দেশে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, মিছিল, মূল্যবৃদ্ধি, জন-অসন্তোষ, সেসব কী সমাজ থেকে সংগ্রহ করে ক্যানভাসে তুলে ধরা হয়?"

মাথা নাড়েন রায়চৌধুরী "না। ঠিক সে ধরনের কাজ এখানকার শিল্পীদের মধ্যে দেখা যায় না। সে হিসেবে কলকাতা অনেক অ্যাডভান্সড বা সচেতন।"

অতীতের স্মৃতি মন্থন করেন সুদেববাবু—ললিতমোহন ধীরেনকৃষ্ণ বর্মণ, বরদা উকীল, সুধাংশু রায়চৌধুরী সবাই লণ্ডনে গিয়ে (সম্ভবতঃ ১৯৩০-৩২ সাল) রথেনস্টাইনের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

শ্রীধর মহাপাত্র
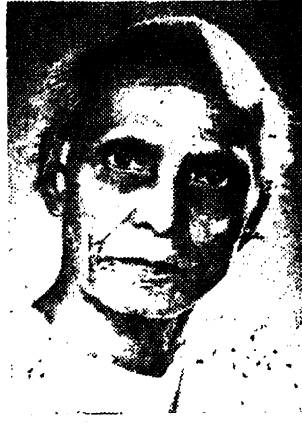
হিরণ্ময় রায়চৌধুরী, সারদা কেনালের মডেল তৈরি করে দিয়েছিলেন। টেকনিক্যাল লোক নন, শিল্পী মানুষ! সরকারী কর্তৃপক্ষ সন্দিহান হলেন 'পারবেন?' আত্মবিশ্বাসে আস্থাবান শিল্পীর নিশ্চিন্ত উত্তর 'পারব।'

কলকাতার ঘড়ির দোকান থেকে ছোট ছোট ঘড়ির চাকা আনিয়ে কেনালের স্লুইস গেট এবং নিজেদের জুয়েলারী বিভাগ থেকে নানারকম পাথর নিয়ে কেনালের বিশিষ্ট জায়গাগুলি চিহ্নিত করেছিলেন। এঁরা ছিলেন জাতশিল্পী! আজ যাঁরা আছেন শিল্প তাঁদের জীবিকা, জীবন নয়। দুঃখ করেন সুদেববাবু "আমার ছোটভাইও এই আর্ট কলেজের স্নাতক। কিন্তু জীবিকার তাগিদে কাজ নিলো সরকারী সুগার ইণ্ডাস্ট্রিতে! সেখানে শিল্পের স্থান কোথায়, শিল্পীর পক্ষে নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ কোনখানে? সেখানে একমাত্র দাম কমার্শিয়াল আর্টের। আজকের শিল্প তাই প্রাণহীন! এখনকার ছাত্ররা ওয়াস টেকনিক কাকে বলে জানে না। চারিদিকে বিমূর্ত শিল্প—পাশ্চাত্যের নকল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই আর্টের চর্চা করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ প্রাচ্যের আবরণে ও আভরণে ভারতীয় রূপ দিয়েছিলেন। গগনেন্দ্রর কিউবিজম সম্বন্ধেও সেই কথা। অবনীন্দ্র তাঁর পুত্রসম ছাত্রদের ওয়াস টেকনিক শিখিয়ে বলেছিলেন, 'এবার যা, বিজয়ের পালা তোদের।' সেইসব ছাত্রের দল নিজেদের পালা শেষ করে বিদায় নিয়েছেন—সেসব টেকনিক এখন ওয়াস আউট হয়ে গেছে: মর্ডান যুগে আছে শুধু মর্ডান আর্ট—যা আর্টের চেয়ে আর্টিফিসিয়াল বেশী।"

হ্যাঁ, শুরুতে কী বলছিলাম—একটা ভূতের কথা! ন্যাথালিয়েল হার্ডের জমানায় আর্ট কলেজের ক্যাশ বিভাগের এক কর্মী বহুল পরিমাণে ক্যাশের তছরূপ করলেন! এনকোয়্যারীর সময় কর্মী অম্লান বদনে দোষারোপ করলেন আর্ট কলেজের প্রাণ, পিতা, প্রতিষ্ঠাতা ন্যাথালিয়েল হার্ডকে। ন্যাথালিয়েলকে তলব করলেন তৎকালীন সরকার। ন্যাথালিয়েল একথায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত টাকা দিতে হবে বলুন!' উত্তর : 'পঁচাত্তর হাজার টাকা।' ন্যাথালিয়েল তৎক্ষণাৎ পঁচাত্তর হাজার টাকার খেসারত দিয়ে, কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে সুপ্রীমকোর্টে কেস ঠুকলেন ইউনাইটেড প্রভিন্স সরকারের বিরুদ্ধে। ভূতের ভৌতিক লীলায় ইউ-পি সরকারকে টাকা ফেরত দিতে হল ন্যাথালিয়েলকে। এদেশের সরকার ন্যাথালিয়েলকে আবার ডেকে পাঠালেন পূর্বপদে আসীন হবার জন্য। কিন্তু ন্যাথালিয়েল স্পষ্ট জানালেন "হোথা নহে আর।"

ন্যাথালিয়েল এলেন না, কিন্তু রেখে গেলেন চার দিকপালকে। তাঁরা কেউ নেই! সুধীর খাস্তগীরও নেই! আছেন বাঙালীর বেলা শেষের গান সুদেব ও সুরেশ্বর।

লক্ষনাবতী

আবার একজন রবীন্দ্রনাথ চাই

অমৃত ৬ মে সংখ্যার সাহিত্য স্তম্ভে 'আবার একজন রবীন্দ্রনাথ চাই' সম্পর্কিত বৈকুণ্ঠ পাঠকের কালোচিত মন্তব্যে আমাদের আত্মসমীক্ষা জরুরি হয়ে উঠেছে।

যিনি আমাদের প্রতিটি উচ্চারণে প্রবলভাবে উপস্থিত আছেন ও থাকবেন, যাঁকে আমরা, বাঙালীরা পরম ভাগ্যে পেয়েছি সেই সার্বিক ঐশ্বর্যবান রবীন্দ্রনাথকে আমাদের প্রকৃত ও সমগ্র জীবনে ভুলতে বসে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছি।

আমরা তথাকথিত প্রতীচ্য শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকৃতিতে ও অন্যান্য অপ-সংস্কৃতির ঝাঁঝালো নেশায় বুঁদ হয়ে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষিয়ে তুলছি। তাই খোদ শান্তিনিকেতনেই আজ ভ্রান্তি-বিলাসের খেলা বেশ জমে উঠেছে।

যাঁকে আমাদের জীবন থেকে সরিয়ে দিয়ে বছরে মাত্র দুটি হৃদয়হীন অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ ও নিজেদের মানে ছোট করে নিয়ে নিজেদেরই চরম ক্ষতি করছি তাঁকেই অবিকল আমাদের জীবনে গ্রহণ করার আন্তরিক চেষ্টায় আমাদের এই মানসিক অবক্ষয় এড়াতে হবে, তাহলেই আমাদের বর্তমান দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি অনিবার্য হয়ে উঠবে।

আমাদের গভীর আত্মবিশ্লেষণে যখন এই উপলব্ধির আশীর্বাদ লাভ করি কিভাবে বাঙালী জাতির জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছেয়ে আছেন, সম্পৃক্ত হয়ে আছেন, আর এর জন্য অনিবার্যভাবে রবীন্দ্র জীবনী ও সৃষ্টিতে আমাদের সম্পূর্ণ নিমজ্জন ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

মদনমোহন বিশ্বাস,
রাণাপুর
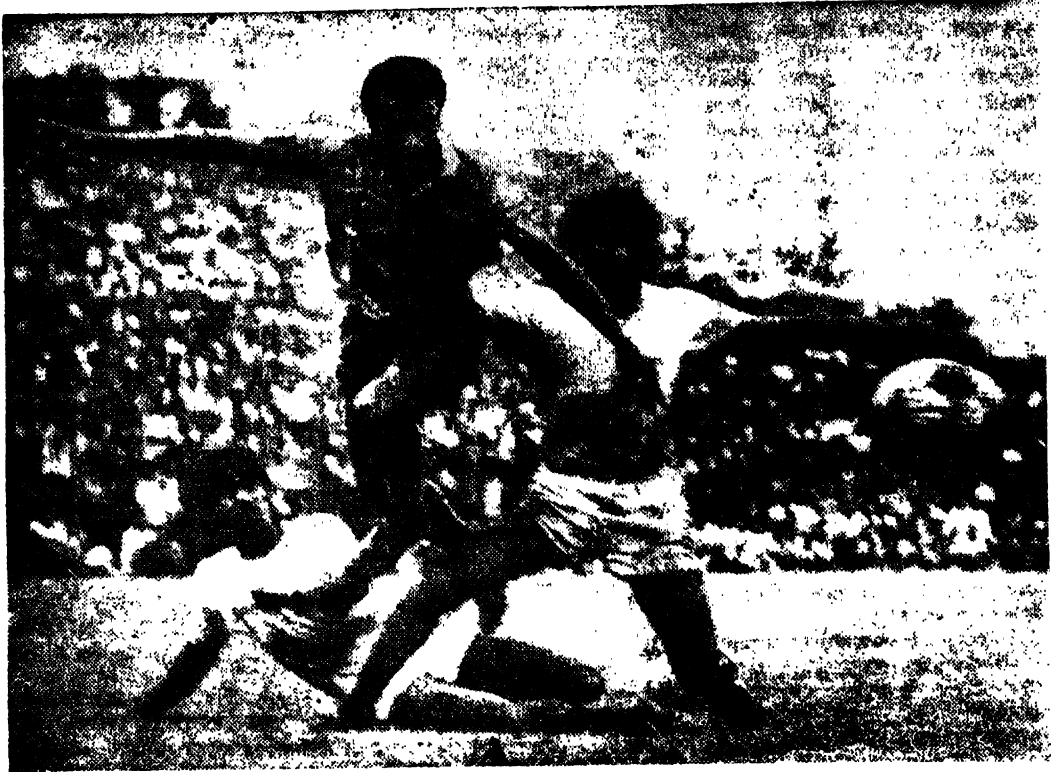
ইস্টবেঙ্গল / (টের খেলা

কলকাতায় ফুটবল রাগবি বল দিয়ে শুরু হয়েছিল

কলকাতার ফুটবলের একশো বছর পূর্ণ হল এই উনিশশো সাতাত্তর সালে। আই এফ এ-কে ধন্যবাদ তাঁরা বাঙালীদের ফুটবল জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপনের অঙ্গীকার নিয়ে একটি পবিত্র কর্তব্য পালন করলেন। আজ যে ফুটবলকে কেন্দ্র করে বাঙালীর রক্তে ডমরু বাজে সেই ফুটবলের পত্তন করেছিলেন নগেন্দ্রপ্রসাদই। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে কেন্দ্র করে আজ বাঙালীর মনের ব্যারোমিটার ওঠা-নামা করে, উত্তেজনার কলগানে আগুনে নিজেদের জ্বালিয়ে আমরা শিহরণ অনুভব করি, ফুটবল আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু হায়! নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী [illegible] চলে গেছেন বিস্মৃতির অতলান্ত অন্ধকারে।

মজার কথা, বাঙালীর ছেলেরা যে বলটি দিয়ে প্রথম কলকাতায় ফুটবল খেলা শুরু করেছিল সেটি কিন্তু ছিল আসলে একটি রাগবি বল। তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফোর্ট উইলিয়ামের ইংরেজ গোরা সৈন্যরা কেল্লার সংলগ্ন মাঠে ফুটবল খেলতেন নিছক অবসর বিনোদনের জন্য। বাঙালীরা দূরে থেকে সেই খেলা দেখতেন। উপভোগ করতেন। কিন্তু তখন, সেই ইংরেজ প্রভুত্বের সময় গোরাদের কাছে যাবার সাহস তাঁদের ছিল না। একদিন কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটলো। কিশোর নগেন্দ্রপ্রসাদ প্রতিদিন সকালে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে মার সঙ্গে বাবুঘাটে আসতেন গঙ্গা স্নান করতে। রোজই গাড়ীতে যেতে যেতে 'গড়ের মাঠে' নগেন্দ্রপ্রসাদ দেখতেন গোরা সৈন্যদের এই ফুটবল খেলা। ভালো লাগতো তাঁর। গাড়ি থামাবার জন্য মার কাছে বায়না করতেন বালক নগেন্দ্রপ্রসাদ। কিন্তু গোরারা গো-মাংস খায়, ম্লেচ্ছ জাত, তাদের কাছাকাছি গাড়ি থামাতে রাজী হতেন না নগেন্দ্রপ্রসাদ জননী। একদিন কিন্তু ওজর আপত্তি শুনলেন না নগেন্দ্রপ্রসাদ। শেষ অস্ত্র কান্না জুড়ে দিলেন। বাধ্য হয়ে মা রাজী হলেন। তবে শর্ত সাপেক্ষে। কি শর্ত? গাড়ি অনেক দূরে দাঁড়াবে। নগেন্দ্রপ্রসাদকে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে খেলা দেখতে হবে। এক কথায় রাজী নগেন্দ্রপ্রসাদ। গাড়ি থেকে [illegible] এক ছুটে মাঠের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। খেলা চলছে। বিহ্বলভাবে দেখছেন নগেন্দ্রপ্রসাদ। রেফারীর বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে নিয়মকানুনগুলিও খুঁটিয়ে দেখছেন তিনি। এক রকম হঠাৎই বলটা চলে এল নগেন্দ্রপ্রসাদের কাছে। হাত দিয়ে বলটা তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন নগেন্দ্রপ্রসাদ। চামড়ার তৈরী গোলকের একটা জিনিস। বেশ হাল্কা। ওদিকে গোরারা তো অবাক। একটা নেটিভ বাচ্চা ছেলের এত সাহস? তাদের কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না যেখানে নেটিভ অভিজাতরা। খুশী হয়ে এক খেলোয়াড় নগেন্দ্রপ্রসাদকে বললেন,—'তুমি বলটা কিক করে আমাকে দাও।'

হেয়ার স্কুলের ভালো ছাত্র নগেন্দ্রপ্রসাদ। ইংরাজী বুঝতে অসুবিধা হলো না। একটু আগে দেখা গোরাদের লম্বা লম্বা শটের অনুকরণে নগেন্দ্রপ্রসাদ বলটিকে লাথি মেরে পাঠিয়ে দিলেন মাঠের মাঝখানে। গোরারা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালো বালক বীরকে।

হেয়ার স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে সেদিন দারুণ উত্তেজনা। বক্তা একা নগেন্দ্র-

প্রসাদই। শ্রোতা অসংখ্য ছাত্রের দল, 'গোরাদের ওই খেলাটা খুব সহজ, মজারও বটে, আমাদের ওই খেলা খেলতে হবে. ছাত্ররা নগেন্দ্রপ্রসাদকেই নেতা বানালো। ঠিক হল চামড়ার ঐ গোল জিনিসটা তাকেই যোগাড় করতে হবে। এবার চিন্তিত হলেন কিশোর নগেন্দ্রপ্রসাদ—ওই জিনিস কোথায় পাওয়া যায় তার হদিশ তো জানা নেই। মুস্কিল আসান করলেন বন্ধু সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র হরিদাস শীল। হরিদাসের স্কুলের শিক্ষকরা সাহেব। তাঁদের কাছ থেকে জেনে এসে তিনি নগেন্দ্রপ্রসাদকে খবর দিলেন চৌরঙ্গীর সাহেবদের দোকান ম্যান্টন অ্যান্ড কোম্পানীতে ওই জিনিস পাওয়া যায়। সহপাঠীদের নিয়ে ছুটলেন নগেন্দ্রপ্রসাদ ম্যান্টন অ্যান্ড কোম্পানীতে। দোকানের গোরা মালিক তো এতগুলো নেটিভ বালক দেখে অবাক। সাহস করে নগেন্দ্রপ্রসাদই তাঁকে বললেন,—'কেল্লার মাঠে গোরারা যে গোল মত জিনিসটা দিয়ে খেলা করে তাই চাই আমরা।'

সাহেব বুঝলেন ছেলেরা ফুটবল চাইছে। কিন্তু দোকানে তখন একটিও ফুটবল নেই। উৎসাহী ছেলেদের নিরাশ করতে মন চাইলো না সাহেবের। তিনি একটি রাগবি বল এনে দেখালেন ওদের। বল দেখে মহাখুশী ছেলের দল। নগেন্দ্রপ্রসাদও হই হই করে উঠলেন,—'এই সেই জিনিস! এটাই চাই আমাদের।'

ফ্যাসাদ বাধলো দাম নিয়ে। ছেলেদের চাঁদা উঠেছে কুড়ি টাকা। বলের দাম বত্রিশ টাকা। তবে কি বল কেনা হবে না? নগেন্দ্রপ্রসাদ ও সাথ-সঙ্গীদের মলিন মুখ দেখে দয়া হলো ম্যান্টন কোম্পানীর মালিকের। কুড়ি টাকাতেই রাগবি বলটি বেচলেন তিনি প্রথম বাঙালী ফুটবল অনুরাগীদের।

এরপর হেয়ার স্কুলের মাঠে বাঙালীদের প্রথম ফুটবল খেলা শুরু হলো একটি রাগবি বল দিয়ে। ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ বাঙালীর রক্তে যে নেশা ঢোকালেন আজ প্রায় একশো বছর পরেও সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে. চলবে আরো হাজার হাজার বছর।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

এশীয় অপেশাদার গল্‌ফ প্রতিযোগিতা

কোয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ৮ম এশীয় অপেশাদার গলফ প্রতিযোগিতায় তাইওয়ান চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে তৃতীয়-বার 'নোমুরা ট্রফি' জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এর আগে তাইওয়ান চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে। আলোচ্য ৮ম এশীয় অপেশাদার গলফ প্রতিযোগিতায় দশটি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল। এপর্যন্ত চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে 'নোমুরা ট্রফি' জয়ী হয়েছে এই তিনটি দেশ : জাপান ৪ বার (১৯৬৩, ১৯৬৫, ১৯৭১ ও ১৯৭৫ সালে), তাইওয়ান ৩ বার (১৯৬৭, ১৯৬৯ ও ১৯৭৭ সালে) এবং ভারত ১ বার (১৯৭৩ সালে)। এশীয় অপেশাদার গলফ প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৬৩ সালে। প্রতি দ্বিতীয় বছরে প্রতিযোগিতার আসর বসে। পরবর্তী ৯ম প্রতিযোগিতার আসর বসবে সিঙ্গাপুরে ১৯৭৯ সালে।

১৯৭৭ সালের প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম তাইওয়ান (৮৬৫ পয়েন্ট); ২য় ফিলিপাইন (৮৮৭); ৩য় মালয়েশিয়া (৮৮৮); ৪র্থ জাপান (৯০৪) এবং ৫ম ভারত (৯১৫)। গতবারের '১৯৭৬ সালের) চ্যাম্পিয়ান জাপান ৪র্থ স্থানে নেমে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

বিশ্ব অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা

আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিম জার্মানীর ডুসেলডর্ফে প্রথম বিশ্ব কাপ অ্যাথলেটিকসের আসর বসছে। এশীয় অ্যাথলেটিক দলে যে ৪৬ জন অ্যাথলীট স্থান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র এই পাঁচজন ভারতীয় আছেন—শ্রীরাম সিং (৮০০ মিটার দৌড়); উদয় প্রভু (৪০০ মিটার দৌড়); প্রভীন কুমার (ডিসকাস); বাহাদুর সিং (সটপুট) এবং কুমারী অনুসুয়া বাঈ (৪×১০০ রীলে)। এশীয় দলে আরও কয়েকজন ভারতীয় অ্যাথলীটকে স্থান দেওয়া উচিত ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। ১৯৭৬ সালের মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসে ভারতের কয়েকজন অ্যাথলীট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসের আসরে, প্রথম আবির্ভাবে হরিচাঁদ ১০,০০০ মিটার দৌড় ২৯ মিনিটের কম সময়ে শেষ করেছিলেন। ২৯ মিনিটের কম সময় ১০,০০০ মিটার দৌড় শেষ করার মত দক্ষতা খুবই কম এশীয় অ্যাথলীটের আছে। মন্ট্রিল অলিম্পিকের ম্যারাথন দৌড়ে ভারতের শিবনাথ সিং ১১শ স্থান পেয়েছিলেন এবং তিনি ৫,০০০ মিটার এবং ১০,০০০ মিটার দৌড়ের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান। সুতরাং শিবনাথ সিংকে ৫,০০০ মিটার এবং ১০,০০০ মিটার দৌড়ের জন্যে এশীয় অ্যাথলীট দলে স্থান দেওয়া উচিত ছিল। এইরকম কয়েকজন ভারতীয় অ্যাথলীটের দল-ভুক্তির যোগ্যতা উপেক্ষা করা হয়েছে। এশীয় অ্যাথলীট দল গঠন ব্যাপারে ভারত প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, ১৯৭৫ সালে সিওলে অনুষ্ঠিত এশীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার ফলাফল মাপকাঠি হিসাবে ধরলে আরও বেশী ভারতীয় অ্যাথলীট বিশ্ব এশীয় অ্যাথলেটিকস দলে স্থান পেতেন। এ ব্যাপারে এশীয় অপেশাদার অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মরিস নিকোলাসের বকতব্য হল, পরবর্তী দু-বছরে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অ্যাথলেটিকসের ক্রীড়া-মান অনেক উন্নত হয়েছে। আলোচ্য এশীয় অ্যাথলেটিকস দলে জাপানের প্রতিনিধি বেশী স্থান পেয়েছেন—মোট ১৫ জন।

খবরে প্রকাশ, প্রথম বিশ্ব কাপ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় আফ্রিকা যোগদান করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আফ্রিকা দলে অ্যাথলীট সংখ্যা হবে ১২০ জন। আফ্রিকার যোগদান নিয়ে এক সময় গুরুতর সংশয় দেখা দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসের আসরে আজ চারটি প্রধান দেশ—আমেরিকা, রাশিয়া, পূর্ব জার্মানী এবং আফ্রিকা।

১৯৭৬ সালের মন্ট্রিল অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসের ফলাফল এইরকম দাঁড়িয়েছিল : পুরুষ বিভাগে ১ম আমেরিকা (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ৬ ও ব্রোঞ্জ ৭); ২য় রাশিয়া (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ৬) এবং ৩য় পূর্ব জার্মানী (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ৩ ও ব্রোঞ্জ ৩)। মহিলা বিভাগে ১ম পূর্ব জার্মানী (স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ৪ ও ব্রোঞ্জ ৫); ২য় রাশিয়া (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ৩ ও ব্রোঞ্জ ৪) এবং ৩য় পশ্চিম জার্মানী (স্বর্ণ রৌপ্য ৩ ও ব্রোঞ্জ ১)। মেয়েদের বিভাগে আমেরিকা পেয়েছিল ৩টি পদক (স্বর্ণ ০, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ১)। আফ্রিকা ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক গেমস বয়কট করেছিল।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৭৭ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় ইস্টবেঙ্গল অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে লীগ তালিকায় শীর্ষস্থানে আছে ইস্টবেঙ্গল—১৪টা খেলায় ২৮ পয়েন্ট। প্রথম বিভাগের লীগের ২৩ দলের মধ্যে একমাত্র ইস্টবেঙ্গল এখনও পর্যন্ত লীগের খেলায় কোন পয়েন্ট নষ্ট করেনি. আলোচ্য সপ্তাহে (জুলাই ১৮—২৪ ইস্টবেঙ্গল ৩—০ গোলে ইস্টার্ণ কম্যান্ড এবং ১—০ গোলে রাজস্থানকে হারিয়েছে। লীগ তালিকার ২য় স্থানে আছে গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান (১৫টা খেলায় ২৭ পয়েন্ট), ৩য় স্থানে মহমেডান স্পোর্টিং (১৪টা খেলায় —পয়েন্ট) এবং ৪র্থ স্থানে বি এন আর (১৫টা খেলায় ২১ পয়েন্ট)।

লীগ তালিকার সর্বশেষ স্থান নিয়ে বর্তমানে কুমারটুলী, সালকিয়া ফ্রেন্ডস এবং কাস্টমসের মধ্যে খুব জোর আত্মরক্ষার লড়াই চলেছে। আলোচ্য সপ্তাহে কাস্টমস ১—০ গোলে রাজস্থান এবং ২—০ গোলে ভ্রাতৃসংঘকে হারিয়ে অতি মূল্যবান ৪ পয়েন্ট লাভের সূত্রে অবস্থার অনেকটা উন্নতি করেছে। এখন তাদের অবস্থা ১৬টা খেলায় ৯ পয়েন্ট (জয় ২, ড্র ৫ ও হার ৯)। অপরদিকে সালকিয়া ফ্রেন্ডস ০—৩ গোলে মোহনবাগানের কাছে হেরেছে (১৪টা খেলায় ৬ পয়েন্ট) এবং কুমারটুলী ১—০ গোলে ইস্টার্ন রেল দলকে পরাজিত করেছে (১৪টা খেলায় ৯ পয়েন্ট)। লীগের খেলায় কুমারটুলীর এটা প্রথম জয়।

শ্রীদর্শক

[illegible]।৭।৭৭

ব্রায়াণ বার্ণস

ব্রায়ান বার্নস্‌ এই নিয়ে তিনবার কলকাতায় এলেন। ব্রায়ান নিজেকে একক থিয়েটার' বলে বর্ণনা করে থাকেন। ছ-সাত বছর আগে ব্রায়ান প্রথম কলকাতায় আসেন, আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে কল-কাতার গ্রীষ্মে ঝলসানো হাফ প্যান্ট পরা সাহেবকে দেখে প্রথমে তেমন ভক্তি হয়নি। পাঁচ-দশ মিনিট কথা বলেই সঙ্গেই রেকর্ডিং রুমে ঢুকলাম। প্রথমে কিছু প্রশ্ন থিয়েটার নিয়ে, বিশেষ করে ব্রায়ানের একক থিয়েটার নিয়ে। তারপর এডওয়ার্ড লীয়রের দুটি কবিতা শোনালেন ব্রায়ান। আবৃত্তি নয়, তাঁর কবিতার উচ্চারণেই অভিনয়। সেদিন ব্রায়ানের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যায় যাই লা মার্টিনিয়ার স্কুলে। অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা করবার আগে ব্রায়ান স্কুলের সাঁতারের পুলে ঝাঁপাঝাঁপি করে কলকাতার গ্রীষ্মের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেললেন। স্কুলের ছেলেদের জন্য অনুষ্ঠানে ব্রায়ান সেদিন অভিনয় করে শুনিয়েছিলেন এড-ওয়ার্ড লীয়রের মজার কবিতা, ব্রাউনিঙের লেখা হ্যামেলনের বাঁশিওয়ালার কাহিনী, লিউইস ক্যারলের আজব দেশে আলিসের অংশবিশেষ। লম্বা হাতার শাদা শার্ট ও কালো ট্রাউজার্স, একটু আঁট, এই একই পোশাক, রূপসজ্জায়ও কোন পরিবর্তন নেই। মঞ্চপ্রকরণ বলতে একটি টেবিল, ব্রায়ান কখনও তার উপর উঠে দাঁড়ান, কখনও বা তার উপর উবু হয়ে বসেন। লিউইস ক্যারলের গল্পের বেড়াল হয়ে তিনি টেবিলের উপর বসে থাকতে থাকতেই অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকেন, অর্থাৎ ধীরে ধীরে টেবিলের ওপাশে লুকিয়ে পড়তে থাকেন। কিন্তু লিউইস ক্যারলের অনবদ্য বর্ণনায় বেড়ালের বাকিটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও তার আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি আরো খানিকক্ষণ থেকে যায়। ব্রায়ান টেবিলের আড়ালে ধীরে ধীরে বসে পড়তে পড়তে যখন কেবল তাঁর মুখটুকুই টেবিলের উপর জেগে যায় শুধু সেই আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি, ঠোঁট জুড়ে। হাঁটার ভঙ্গিতে, স্বরের বৈশিষ্ট্যের তারতম্যে তিনি একাই অসংখ্য চরিত্রে মঞ্চ ভরিয়ে ফেলেন, বিশেষত ওয়েলস কবি ডিলান টমাসের বেতারনাট্য 'আন্ডার মিল্ক উডের' পরিবেশনায়। পরের বার ব্রায়ান যখন কলকাতায় আসেন তখন তিনি তৈরি করে এনেছিলেন ইংরেজ লেখক অস্কার ওয়াইল্ড সম্পর্কে একটি একক অনুষ্ঠান। অস্কার ওয়াইল্ড সাজেপোশাকে চালচলনে তাঁর জীবনযাত্রাকেও যেন সাহিত্য করে তুলেছিলেন। তাঁর প্রত্যহের কথোপ-কথনেও ছিল বুদ্ধির প্রখর দীপ্তি। ওয়াইল্ড-এরই এক বন্ধু যেন তাঁর জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করছেন, তার নাটকের অংশ, কবিতার অংশ উদ্ধৃত করছেন। এই কাঠামো অবলম্বন করে ব্রায়ান ওয়াইল্ডকে উপস্থিত করেন।

ব্রায়ান বার্ণস এবার এনেছিলেন চার্লস ডিকেন্সের 'পিকউইক পেপার্স' অবলম্বনে একটি অনুষ্ঠান। মধ্যবয়সী টাকমাথা মোটা-সোটা গম্ভীরমনস্ক মিস্টার পিকউইক ও তাঁর তিন বন্ধুর কান্ডকারখানা শতাধিক বছর ধরে পাঠকদের আমোদিত করেছে। ঘরকুনো চার ভদ্রলোক সেকালের সামাজিক আমোদ-প্রমোদে মাততে গিয়ে বারবার জেরবার হন, ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে নাস্তানাবুদ হন, পাখি মারতে গিয়ে বন্ধুর বাহুতেই ছররা বিঁধিয়ে বসেন, এবং ইংরেজী রসিকতার সেই সার্বিক লক্ষ্যস্থল বয়স্কা কুমারীর সঙ্গে প্রসারে। প্রেমে তরুণদেরও হাস্যাস্পদ হন। মুলত কণ্ঠস্বরের পরিমিত বৈচিত্র্যে ও অতিনাটকীয় মুহূর্তগুলির স্বাভাবিক অতিশয়তায় বার্ণস মজা করেন আবার কখনও বা প্রেমের ভীরু আকর্ষণে একটি হাতের উপর আরেকটি হাতের আলতো চাপে বিদ্যুৎ উত্তেজনার সঞ্চার দেখান। একক অভিনয়ে অভিনেতা যেন সব সময়েই ভয় পান, দর্শক একই মানুষকে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। তাই প্রাণপণে চেষ্টা মজা, আরো মজা, বৈচিত্র্য, আরো বৈচিত্র্যের সন্ধান, কারণে অকারণে চমক লাগানো। সেই ভয় হয়ত বার্ণসেরও ছিল, কিন্তু তাঁর সহায় ছিল ডিকেনসের ভাষায়, যে ভাষায় কৌতুক আসে নিতান্ত শব্দবন্ধেই। বার্ণস কোন শব্দে ঈষৎ ঝোঁক লাগিয়ে কোথাও মাপাজোকা একটু থেকে ভাষার কৌতুককে অবলীলায় পরিস্ফুট করেন। বারবার তাঁর উচ্চারণেই হাসির রোল ওঠে।

তবুও এত হাসির মধ্যেও আরেক অভিনেতাকে মনে পড়ে। ১৯৬৫ সালে ডিকেন্স-এর কাহিনী নিয়েই কলকাতায় এসেছিলেন এমলিন উইলিয়মস্‌। নিয়েছিলেন ডিকেন্সেরই রূপসজ্জা, যে ডিকেন্স অভাবের দায়ে শেষ জীবনে নিজের উপন্যাসের অংশবিশেষ পাঠ করতেন সমবেত শ্রোতাদের কাছে। সংসারের দায়দায়িত্ব ও তরুণী অভিনেত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের জ্বালায় বিপর্যস্ত ডিকেন্স কি যেন এক অদ্ভুত মুক্তি পেতেন মৃত্যু কিংবা হত্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাঠে। তাই নিজের লেখা পড়তে গিয়ে তিনি বেছে নিতেন বীভৎস দম আটকানো এক একটা পর্ব। তিল তিল করে মৃত্যু কিংবা অতর্কিতে বিনাশ তাঁর উচ্চারণে যেন আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। সেই অভিজ্ঞতায় প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন কখনও বা অজ্ঞান হয়ে যেতেন ডিকেন্স নিজে। তবু না পড়েও পারতেন না। ডিকেন্স-এর সেই অনুরূপ ছিল এমলিন উইলিয়মস্‌-এর অভিনয়ে উঁচু টেবিলের সামনে ডিকেন্স পড়ছেন, টেবিলে খোলা বই, পড়তে পড়তে স্বাভাবিক ক্লান্তি, কখনও চোখে হাত, মাথায় হাত, মুখের কুঞ্চনে কখনও চাপা উত্তেজনা। কোথায় অভিনয়? ঘটনা আপনিই মূর্ত হয়, কেবল উচ্চারণেই। আমরা যেন দেখি লেখকের কল্পনার অনন্ত স্বর্গনরক। এমলিন উইলিয়মস্‌-এর ডিকেন্স একটা জলজ্যান্ত বিভ্রান্ত আলোড়িত মানুষ। ব্রায়ান বার্ণসের ডিকেন্স ছেলে-ভুলনো বুড়োভুলনো ওস্তাদ এক গল্পকার। কিন্তু কেন নমন এত মজা ভালো লাগে না, সহ্য হয় না, এত সহজ সারল্য অসত্য লাগে। সেই জন্য ডিকেন্সকে আবার ফিরে পেতে ইচ্ছে হয়।

অপ্রিয় ভট্টাচার্য

কিন্তু, বাংলা ছবি?

না।

বাংলা ছবির মৃত্যু হল না।

গঙ্গাযাত্রার পথ থেকে তাকে আবার বাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে।

এখনও বেঁচে আছে বাংলা ছবি।

শুধু ধুকপুকে প্রাইটুকু নিয়ে, হাড় আছে—গায়ে মাংস নেই। জরাজীর্ণ চেহারা।

আর্থিক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধের উপসর্গ তো ছিলই উপরন্তু, পরিচালক প্রযোজকরা তেমন দামী ওষুধ খাওয়াতে পারছিলেন না। পথ্যও পড়েনি বহুদিন।

দর্শকরাও সেবা শুশ্রূষায় তেমন যত্নবান ছিল না।

সপ্তাহে একটা দিনও সময় করে দেখতে যাননি তাঁকে রোগীটিকে এই মরণোন্মুখ রোগীটির প্রতি এমন অবহেলার প্রসঙ্গ স্থানীয় নামী-দামী ডাক্তার পরি-চালক প্রযোজকদের কাছে তুললে তাঁরা বলেন—'কি করব বলুন! একে এই আপনার দেশ! ভালো ওষুধই পাচ্ছি না, তাস আবার বিলিতি ওষুধ—পাবো কোথায়?'

সুতরাং ভেজাল ওষুধ খাঁটি দিশী অনুপানে খাওয়ানো হচ্ছে গত ছ-সাত বছর ধরে।

তেমন কাজ হচ্ছে না।

ছোঁপো রোগীর মত বেঁচে আছে কোনরকমে।

মাঝে মধ্যে সত্যজিৎ-মৃণাল মস্কো-বার্লিন-আমেরিকা থেকে কয়েক বাক্স খাঁটি ওষুধ নিয়ে আসেন, তাইতেই চলে কিছুদিন।

কিন্তু তা আর কদিনই ভিটামিনশূন্যে বাংলা ছবির চেহারা দিনকে দিন রুগ্ন থেকে রুগ্নতর হয়েছে।

আর টালিগঞ্জের কিছু হাতুড়ে ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে দু-তিন বছ যাবৎ বাংলা ছবির এই গেল এই গেল অবস্থা।

এঁরা না পারছেন রোগীর রো ডায়াগোনাইস করতে, না করছেন চিকিৎসা ডাক্তারবাবুরা যখন মুগোদে কুলোচ্ছে না ছেড়ে দিন না রোগীটিকে। যার থিয়েটার রয়েছে, রসময়ে যাত্রায় দেখা হচ্ছে না, সেখানে গিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করুন।

সত্যজিৎ - মৃণাল— অনুনয়া ডায়লোসিস্ দিয়ে কদিন আর এই কিডনীর রোগীকে বাঁচাতে পারবেন ?

পার্থপ্রতিম, পূর্ণেন্দু, হরিসাধন দাশগুপ্তর মত তরুণ অভিজ্ঞ ডাক্তররা কদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন এই মুমূর্ষু রোগীকে সেটাই দেখতে হবে এখন।

আর না বাঁচাতে পারলে হয়তো বা মনের দুঃখে রোগের জ্বালায় নিজেই না আত্মঘাতী হয়ে বসে বাংলা ছবি।

নিঃ ধঃ

ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না

বহুদিন পরে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীদের কথা আবার শোনা গেল। সরকার যেই সিনেমার ওপর লেভি বসিয়েছেন, অমনি চারদিক থেকে চলচ্চিত্রের কর্মীদের জন্য কান্না শুরু হয়ে গেল। প্রযোজক, পরিচালক, প্রদর্শক সবাই বলতে লাগলেন, লেভির ফলে চলচ্চিত্র কর্মীরা ভীষণ দুর্দশায় পড়বেন। যেন লেভির আগে ওরা কতই না সুখে ছিলেন। কিছুদিন আগে একটি বিশেষ ছবির প্রমোদকর মুক্তির সময়েও এইসব কর্মীদের কথা বলা হয়েছিল। ছবিটি ভালই ব্যবসা করেছে, কিন্তু তারপর তার লভ্যাংশ কোন কর্মী পেয়েছেন কিনা সে খবর আমার কাছে আপাতত নেই।

সরকার তো এবার মোটামুটিভাবে লেভি তুলে নিয়েছেন, তাহলে এবার আশা করতে দোষ নেই যে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীরা নিশ্চয়ই ভালভাবে থাকবেন। আসলে মোদ্দা কথা হচ্ছে এঁদের সামনে রেখে বড় বড় বাবুরা তাঁদের আখের গুছিয়ে নেন। এই ঘটনা তারই একটি। কলাকুশলী বলতে আমরা পরিচালক, সম্পাদক বা চিত্রগ্রাহক প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর মানুষদের কথা বলছি না, বলছি সেই সব সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কথা, যাঁরা স্টুডিওতে ল্যাবরেটরী টেকনিসিয়ান্স ইলেকট্রিসিয়ান্স, সেটিংস ও কার্পেন্টার এর কর্মী পেইন্টারস, প্রোডাকশান এ্যাসিসট্যান্ট ইত্যাদি নামে পরিচিত। এঁদের মাথায় কেউ ছাতা ধরে না, এঁদের জন্য পাখা থাকে না, জল থাকে না, যেহেতু এঁদের কোন গ্ল্যামার নেই যেহেতু পর্দায় এঁদের মুখ দেখা যায় না।

চলচ্চিত্র এখন সম্পূর্ণ গ্ল্যামার সর্বস্ব। আমাদের দর্শকদের কাছে এটা একটা ঝলমলে বিষয়। আমরা নায়ক নায়িকাদের বিলাসী জীবনের খোঁজ রাখি প্রযোজক পরিচালকদের নানা গোপন সংবাদে [illegible] পাই কিন্তু ঐ সব কলাকুশলীদের কোন খোঁজই রাখি না যাঁদের সমবেত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় একটা ছবি পূর্ণতা পায়। কোন সুপারহিট ছবিতে এঁরা যে শ্রম ও আন্তরিকতা প্রয়োগ করেন, কোন ফ্লপ ছবিতেও সেই একই ভাবনা কাজ করে।

চলচ্চিত্র একটি যৌথ শিল্পকর্ম। এক পরিচালক বা নায়ক তাঁদের কাজে যতটা কুশলী এক প্রোডাকশান এ্যাসিস্টেন্টকেও তাঁর কাজে ঠিক ততটা গুরুত্ব দিতে হয়। কেননা সমস্ত বিভাগীয় সমীর পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া চলচ্চিত্র সার্থক রূপায়িত হতে পারে না।

অথচ এইসব কলাকুশলীরা আজ ভীষণভাবে অবহেলিত। কলকাতার কোন ছবির নায়ক-নায়িকা যেখানে পান প্রায় ষাট হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা, পরিচালক পান কমপক্ষে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা, সেখানে তাঁর সহকারী বা অন্যান্য বিভাগীয় কলাকুশলীরা পান মাসে তিন-চার শ টাকা। লাভবান হন তাঁরাই, যাঁদের নাম পর্দায় বড় অক্ষরে লেখা থাকে। কিন্তু যাঁরা মঞ্চে আসরেও অন্যান্যদের ভিড়ে মিশে থাকেন তাদের কথা কেউ ভাবেন না।

এই ই এখানকার ব্যবস্থা। এবং তা চলে আসছে। এই সব কর্মীরা অনেকে আজ অসুস্থ হয়ে না খেতে পেয়ে ধুঁকছেন। এঁদের বেশীর ভাগের হয় আলসার নয়তো টি-বি। অত্যন্ত পরিশ্রম, খাদ্যাভাব, ধুলো ইত্যাদির সঙ্গে কাজ এঁদের এইসব রোগ হতে সাহায্য করে। অনেক ইলেকট্রিসিয়ান্সকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে দেখেছি, অনেকে পড়ে হাত-পা ভেঙেছেন। কিন্তু এজন্য তাঁদের যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তা এতই সামান্য যে শুনলে পাগলেও হাসবে। যাঁরা এখানে কাজ করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁদের জন্য কোন ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেই। এখানে এঁদের জীবনের নিরাপত্তাও নিশ্চিন্ত প্রায় নেই বললেই চলে। এঁদের জীবনধারণের মান এতই নিম্নগামী যে সেখানে দাঁড়িয়েও যে এঁরা কাজ করছেন, সেটাই আশ্চর্যের। অনেক কলাকুশলীদের দেখেছি, যাঁরা দিনের পর দিন না খেয়ে স্টুডিওতে এসেছেন। কারুর বাড়িতে ছেলেমেয়ের অসুখ, ডাক্তার ডাকতে হবে, কিন্তু শুটিং আছে, তাই ডাক্তারের কাছে না গিয়ে সোজা স্টুডিওতে চলে এসেছেন আর তার ফল পেয়েছেন দিনের শেষে হয়তো দশ-বারটা টাকা যেখানে সেই ছবির নায়ক এর চেয়ে বেশী টাকার সিগারেট খরচ করেছেন। অনেককে চার-পাঁচ ডিগ্রী জ্বর নিয়েও শুটিংয়ে আসতে দেখেছি সবাই জেনেছেন তাঁর অসুখ, কিন্তু তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়নি, অথচ সেখানে যদি কোন বিখ্যাত শিল্পীর কুকুরও সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়ত, তাহলে সেই মুহূর্তে তা সংবাদ হয়ে দাঁড়াত।

একটা শুটিং-এর সময় আমি এক টেকনিসিয়ানকে বমি করতে দেখেছিলাম। সেই দৃশ্যের কোন অভিনেত্রী তখন হেসে বলেছিলেন, এ অতিরিক্ত মদ পানের ফল। পরে জানা গেছিল তাঁর এই অবস্থা কদিন কিছু না খাওয়ার পরে আর হঠাৎই এক গ্লাস জল খাওয়ার পরিণতি। আমার খুব আশ্চর্য লেগেছিল এই ভেবে যে এঁরা একই সঙ্গে কাজ করেন, অথচ একশ্রেণী আরেক শ্রেণীর কোন খোঁজই রাখেন না। অথচ দুজনেই মানুষ।

এক দুপুরে একটি স্টুডিওয় হাজির হয়ে দেখলাম, সবাই তখন খেতে ব্যস্ত। একজন এক্সট্রা তাঁর খাওয়ার অর্ধেক খেয়ে বাকীটা ব্যাগে রাখছিলেন। ওঁকে আমি চিনতাম। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতেই তিনি গ্লাস দুই-তিন জল খাওয়ার ফাঁকে বলেছিলেন, এ বাড়ির জন্য রেখে দিলেন। আর বিশ্বাস করুন তার আধঘন্টা পরেই আমি যখন বড় শিল্পী কলাকুশলী প্রযোজকদের খাওয়ার টেবিলে হাজির হলাম, দেখলাম তাঁদের টেবিলে অভুক্ত যা পড়ে আছে, তার খুব সামান্যই ঐ এক্সট্রা আর্টিস্ট তাঁর ঝোলায় কত যত্নেই না ভরে রেখেছেন।

কয়েক মাস আগে একটি ছবির মুক্তি উপলক্ষে যখন এক বড় হোটেলে বিরাট পার্টির আয়োজন হয়েছিল, তখন ঠিক সেই রাতেই সেই ছবির এক টেকনিসিয়ান্স যে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছিলেন, তার খবরই বা কজন রাখেন।

এঁদের ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো স্কুলে যেতে পারে না, জামাকাপড় পায় না, রুটির সঙ্গে তরকারিও এঁদের কাছে বিলাসিতা। যে শিল্পের জাঁকজমকের এত প্রচার, যে শিল্পে এত টাকা লেনদেন হয়, যার বিলাসবহুল রূপে আমাদের দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, যেখান থেকে সরকার, প্রদর্শক পরিবেশক, প্রযোজকরা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লোটেন, তার কর্মীদের আজ এই অবস্থা।

যে শিল্প তার সংশ্লিষ্ট কর্মীদের যথাযোগ্য আশ্রয় ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিতে না পারে, তা যদি দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য সম্মান ও কীর্তিও আনে, সেসব খ্যাতির কতটুকু দাম ?

বিকাশ জানা

আম্রপালীর নিবেদন

আম্রপালীর প্রথম নিবেদনের সকাল বয়েজ অন লাইব্রেরীর মুষ্টিমেয় দর্শকদের মোটামুটি প্রত্যাশা-পূরক হয়েছিল, বলা চলে। অবশ্য শিল্পীদের অধিকাংশই বছর কয়েক আগে এই মঞ্চেই একই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম প্রেক্ষাগৃহ অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন। সেই অর্থেই এদের বোধহয় সম্পূর্ণ নতুন বলা চলে না।

কিন্তু অনুষ্ঠানের সামগ্রিক বিচারে, শৈল্পিক উত্তরণ যতই থাক না কেন, সেই অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হিসেবে মঞ্চ, আলো

ইত্যাদি বিষয়ক পরিণতি কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

অনুষ্ঠানের প্রথম দুই উপস্থাপনা নটরাজ বন্দনা এবং বর্ষামঙ্গল; মোটামুটি উত্তীর্ণ। যদিও নাচের ব্যাপারে সেই 'উত্তীর্ণ' কথাটার উচ্চারণ সম্ভবতঃ সত্যের অপলাপ করা। এরই মধ্যে ছোট্ট ব্যাপ্তিতে বেবী পালের নাচ (মোর ভাবনারে সঙ্গে) যথেষ্ট পরিণত। অবশ্য গানগুলো প্রায় সবই সংগীত ও সুচ্ছন্দিত। বিশেষভাবে মনে পড়ে স্বপন সোমের 'অশ্রুভরা বেদনা', দীর্ঘ লয়ের গাম্ভীর্যে যার বেশ প্রেক্ষাগৃহকে খানিকক্ষণ আবিষ্ট করে রেখেছিল। [illegible] সঙ্গীতাংশের পুরো কৃতিত্বের অনেক খানিই কিন্তু দাবী করে যেতেন বাগচী এবং সুমিতা বাগচী। [illegible] সুনির্বাচিত [illegible] সুসংগঠিত সঙ্গীতাংশ পুরো অনুষ্ঠানে একটি আলাদা মাত্রা আরোপ করতে পেরেছে [illegible] দর্শকদের ভালো লাগার ইচ্ছেকে কখনও অবহেলা করে নি।

অনুষ্ঠানের শেষ অংশে নটীর পূজো [illegible] নাটক হিসেবে [illegible]। [illegible] কখনও উচ্চমানে পৌঁছাতে পারে নি [illegible] এই মধ্যে ভালো লাগে মালতী [illegible] শ্রীমতী [illegible] অনুষ্ঠানে [illegible] সবকার [illegible] থেকে মুক্ত হতে [illegible] চরিত্রের ভূমিকায় [illegible] হয়।

পরিকল্পনায় সমগ্র অনুষ্ঠানকে আরেক-[illegible] প্রশ্ন করি, [illegible] একমাত্র রবীন্দ্রনাথের [illegible] থেকে যাবে, আর কতকাল থাকতে হবে সংকীর্ণতার প্রত্যাশায়।

অমিত ভৌমিক

রাখে হরি (রাম) মারে কে ?

ভাগ্যিস ঈশ্বর সচরাচর চক্ষু কর্ণের অতীত। না হলে তাঁর ওপর ভরসা রেখে এতসব বিচিত্র কীর্তিত্ব সম্ভব হত কি বোম্বেতে? এই যে দেখুন, নিটোল আলুভাতের মতন মুখ ও সমানুপাতিক বুদ্ধি নিয়ে রণধীর কাপুর পেয়ে গেলেন রূপসী রেখাকে, আপনার না মেনে উপায় নেই সবই রাম ভরোসে। তাছাড়া অপরাধী দুজনের হৃদয় পরিবর্তন হল। পুলিশ ও সরকার তাঁদের আগেকার জীবন নিয়ে প্রশ্নে কালক্ষয়ণ করল না, একটি মাতাল ও একটি বোদি-পালকে দেওর দমন করল সেই স্মাগলিং র‍্যাকেট বিদেশেও যাদের জাল পাতা আছে—সুতরাং, আমাদের কোন সন্দেহ নেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যাদের নিয়ে [illegible] [illegible]

বাঁশরী ছবিতে সুস্মিতা মুখার্জি ও মিঠুন চক্রবর্তী

[illegible] শ্রীরামচন্দ্র সাহেবের ব্যবসা সফল। অতএব রাম ভরোসে।

কিন্তু, শ্রীরামচন্দ্রের এই মুহূর্তে ধরাধামে অবতরণের কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং ছবিতে একেক রামভক্ত হনুমান এসেছেন। ইনিই শ্রীরণধীর কাপুর ওরফে রামলাল। আর হিন্দী ছবির পরিচালকদের যেহেতু ধারণা পাপ-পুণ্যের সহাবস্থান ও দ্বন্দ্ব বিষয়ে একটি বুনিয়াদি ধারণা জনগণের থাকা উচিৎ, সেহেতু রামের দাদাই ভানুপ্রতাপ (আমজাদ খাঁ), দেশের শত্রু কোন চোরাকারবারী চক্রের বিশ্বস্ত অনুচর। সুখের কথা এই পরিবারের বধূটি (কানন কৌশল) বিশেষ ঝামেলা বাড়ান নি।

রণধীর যথারীতি প্রথম দিকে আমাদের হাসাচ্ছিলেন, মানে চেষ্টা করছিলেন। টেনে গুরুত্বপূর্ণ ফিল্মটির দায়িত্ব পেয়ে বোঝেন নায়ককে একটু সিরিয়াস হতে হয়। এর পর থেকে তিনি সব্যসাচী প্রেমিক অর্থাৎ নারী প্রেম ও দেশ-প্রেমে যুগপৎ অসামান্যভাবে তৎপর।

রেখার জন্য একটু মমতা হয়। পুরাকালে মেনকা বিশ্বামিত্রের মতন মহা-যোগীরও ধ্যান ভঙ্গ করেছিলেন অথচ এই ছবির পরিচালক প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেক্সপ্লয়টেশন, বাংলায় বলা যেতে পারে যৌন-শোষণ, ঘটাতে পারলেন না। অবশ্য ছবির [illegible]

[illegible] রেখাকে [illegible] আমাদের ভালই লাগে। সে শুধুই অবশ্য মোহময়ী নয়, শেষ পর্যন্ত বিবেকময়ী ও সংগ্রামশীলা। এর থেকে বেশী অন্তত কিউ নিয়ে সিনেমার নায়িকাদের যা চলাফেরা করাটাই স্বাভাবিক।

ভানুপ্রতাপের ভূমিকায় আমজাদ কর্তব্যনিষ্ঠ ও স্বল্পভাষী। তাঁর শীতল অভিব্যক্তিগুলি, প্রদর্শন কক্ষ থেকে পাওয়া উল্লাস থেকে মনে হয়, দর্শকদের মনে ধরেছে। আপোষহীন দেশসেবকের ভূমিকায় দারা সিং একবার পেশী বিন্যাস দেখায় ও দুবার দেশাত্ববোধক উক্তি করে।

দুষ্ট চক্রটিকে গঠন করেছেন মদন পুরি। শৈলেশকুমার, সুজিতকুমার প্রমুখ। এরা সকলেই নির্বিবেক ভিলেন ও গতানু-গতিক।

কয়েকটি ঘটনার মনে হল পরিচালক 'এন্টার দি ড্রাগন' ছবিটিকে মনে রেখেছেন। সঙ্গীতে রবীন্দ্র জৈন কৃতিত্বের সঙ্গে সফল। বিশেষতঃ 'রাম ভরোসে' শীর্ষক গানটি জনপ্রিয় হবে। অন্যান্য ব্যাপারে আর নতুন কি বলার আছে? হিন্দী ছবিতে ক্যামেরা, রঙ ইত্যাদি ভালোই হয় আজকাল। এডিটিং-এর অস্তিত্ব থাকে না। এখানেও সম্পাদনার কাজ অসম্পন্ন রেখে দেওয়া হয়েছে [illegible] সুযোগ:

[illegible]

শিলপী গড়ার কারখানা

আমাদের দেশে নাটকের প্রতি যতটা দৃষ্টি দেওয়া হয় ততটা বোধহয় শিল্পীদের শারীরিক সক্ষমতার দিকে নজর দেওয়া হয় না।

নাটকের এই অতি প্রগতি বা অতি সচেতনতার যুগেও একথা সমান সত্য। এখনও অভিনয় দক্ষতা ও অভিনয় অনুশীলনের প্রতিই নাট্য নির্দেশকরা বেশী দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। শারীরিক সক্ষমতার দিকটা শিল্পীদের ওপরই ছেড়ে দেন। যার ফলে অনেক শিল্পীকেই শারীরিক কারণে মাঝ পথে থেমে দাঁড়াতে হয়। মুষ্টিমেয় কিছু শিল্পী এর ব্যতিক্রম। আসলে অভিনয় কুশলতার অনেকখানিই যে এই ব্যাপারটার ওপর নির্ভরশীল সেটাই হয়তো শিল্পীকে সঠিকভাবে বোঝাবার তেমন রেওয়াজ নেই। স্কুলিং-এর ব্যাপারটা তো বহু দূরে। শরীর উপযুক্ত রাখার জন্য শিল্পীরা যেটা করেন সেটা বেশীর ভাগই নিজের প্রচেষ্টায়।

কিন্তু সেটা যদি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও ফর্মুলা মাফিক (ব্যায়ামের ক্ষেত্রে) হোত তাহলে তা শিল্পীর পক্ষে সহায়কই হোত। কারণ অভিনয় কুশলতার অনেকখানিই এই শারীরিক পটুতার ওপর নির্ভরশীল।

নাটকের ক্ষেত্রে উন্নত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আজ এই বিষয়টির ওপরই সর্বাধিক জোর দেওয়া হচ্ছে।

এই বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়েই সম্প্রতি কলকাতায় একটি এমনি ওয়ার্কশপ গড়ে তোলা হয়েছে, যার প্রধান কাজ শিল্পীকে গড়ে পিটে শিল্পীর পর্যায়ে উন্নীত করা। সেই শিল্পী গড়ার কারখানার নাম 'এপিক' কারিগর দেবেশ চক্রবর্তী। লেক স্টেডিয়ামের একটি ঘরে সাধকের মত নিষ্ঠায় তিনি এখন শিল্পীর দৈহিক পটুতা গড়ে তোলায় নিমগ্ন।

আপাতে দেখলে মনে হবে অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ ব্যায়াম। কিন্তু তার মাধ্যমেই শিল্পী হবার জন্য যা যা প্রয়োজন—সক্ষম শরীর গড়ে তোলা ছাড়া বডি মুভমেন্ট, কণ্ঠস্বরের বৈজ্ঞানিক চর্চা, কথা বলার ভঙ্গী বা এক্সপ্রেশন, অ্যাকটিং ডিভাইস ইত্যাদি বহু ব্যাপার শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ক্লাস হয় নিয়মিত। এবং সেই ক্লাসে শিক্ষার্থী হিসেবে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই আছে।

দেবেশবাবু এ সম্পর্কে প্রথম অনুপ্রাণিত হন এন. টি. জিতে অভিনয় করার সময় ১৯৫৬ সালে। তখনই তাঁর হঠাৎ মনে হয় একজন শিল্পীর বিকাশ ঘটাতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শরীরকে নিজের অধিকারে রাখা।

তিনি বলেন এ-ব্যাপারে আমি আরো বেশী উৎসাহিত হই প্রখ্যাত নাট্যকার পরিচালক ও অভিনেতা মিঃ শেখলারের শিক্ষা পদ্ধতি দেখে। তিনি এব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বিখ্যাত জেরজী গ্রটস্কীর শিক্ষাদান পদ্ধতি থেকে। মজা হোল, গ্রটস্কী যে পদ্ধতিতে এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন সেটা সম্পূর্ণই ভারত থেকে নেওয়া। আমাদের কথাকলি নাচ দেখেই আইডিয়াটা তার মাথায় আসে। কথাকলি নাচের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ, তার মুদ্রা, প্রকাশভঙ্গী, চোখের একসপ্রেশন ও ব্যায়াম, সর্বোপরি তার নিয়মানুবর্তিতা তাঁকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। অথচ দেখুন, বিশেষ করে মঞ্চশিল্পীদের কাছে এই পদ্ধতিতে অনুশীলন যে কত প্রয়োজনীয় তা তার আগে কোন ভারতীয়েরও মাথায় আসে নি।...আমি এর সঙ্গে আরো কিছু যোগ করেছি। যেমন আসন। এটা ভারতের বহু প্রাচীন সম্পদ। মুনি ঋষিরা এই আসন করেই দীর্ঘজীবী হয়েছেন শরীর অটুট রেখে। যেমন প্রাণায়াম হঠযোগের অঙ্গ। আমি সেই প্রাণায়াম থেকেই উদ্বুদ্ধ হই। হঠযোগকে আমি ব্যবহার করেছি কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা আনবার জন্যে। অনেক যোগী পুরুষের সুমিষ্ট অথচ ভরাট কণ্ঠস্বর আমি লক্ষ্য করেছি।

তাই আমার এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন হোলো যোগ—যেমন হলাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, যোগমুদ্রা, সবাসন, অন্যদিকে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না (শিরদাঁড়ার নাড়ি), শঙ্খিনী, উৎস্য, কুহু—পাঁচটা নাড়ির নাম কুলকুণ্ডলী। আমার এই শিক্ষাধারার প্রথম পর্যায়ে বডি একসটেন্ডিং (প্রসারণ), লাফানো বা জাম্পিং, দেহ দোলানো বা সুইঙ্গিলিং, তারপরে দেহের উর্ধাংশ সঞ্চালন বা রোলিং। শেষেরটা আমি নাচ থেকে নিয়েছি।

এর সবগুলি এক সঙ্গে প্রয়োগ করতে যেমন সময় লাগে, তেমনি পরিশ্রম সাপেক্ষও। কিন্তু নিয়মমত একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত রেগুলার পদ্ধতি মিলিয়ে অর্থাৎ ব্যায়ামের মাধ্যমে করে গেলে একজন শিল্পীর শারীরিক সক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গী, স্বচ্ছন্দ বডি মুভমেন্ট, সুস্থ মানসিকতা, স্থিতধী, একাগ্রতা, চরিত্র চিত্রণের স্বাভাবিক ক্ষমতা ইত্যাদি গড়ে উঠবে। অর্থাৎ শিল্পীর যে যে ব্যাপারগুলি সবার আগে প্রয়োজন, তার উপযুক্ত হয়ে উঠবে সে।

এরপর তিনি তাঁর সেই বিস্ময়কর শিক্ষা ব্যবস্থার ডেমনেস্টেশন দিয়ে দেখান তাঁর নতুন ও পুরনো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। ব্যাপারটা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি দর্শনীয়।

দেবেশবাবু ইতিমধ্যে কলকাতা এবং বাইরে একাধিকবার তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ডেমনেস্ট্রেশন দিয়ে এসেছেন এবং প্রচুর প্রশংসাও কুড়িয়েছেন।

শান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জি

নতুন নায়িকা গায়ত্রী

বোম্বের সবচেয়ে কম বয়সী নায়িকা গায়ত্রীর প্রথম উল্লেখযোগ্য ছবি হল অনিল গাঙ্গুলী পরিচালিত এবং রাজশ্রী পিকচার্স প্রযোজিত 'তপস্যা।' ছবিতে গায়ত্রীর অপূর্ব অভিনয় দেখে, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, কাহিনীকার তপন সিনহা ওঁর তৃতীয় হিন্দী ছবি 'সফেদ হাতী' (পূর্বনাম পুরস্কার')-এর অন্যতম নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে আমন্ত্রণ জানান, 'সফেদ হাতী' ছবির বহির্দৃশ্য উড়িষ্যা ও ভারতে গৃহীত হবার পর কলকাতায় গায়ত্রীর কিছু অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'সফেদ হাতী' ছবিতে ওঁর অভিনয়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে গায়ত্রীর অভিমত জানা যায়।

প্রত্যেকটি দৃশ্য, আঙ্গিক এবং অভিনয়ের সব কিছুতেই পরিচালক তপন সিনহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং প্রত্যেকটি দৃশ্য গ্রহণের আগে যেভাবে গায়ত্রীকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, অভিনয়ের ক্ষেত্রে গায়ত্রীর কাছে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। এই শিশুচিত্রে ওঁকে সাধু মেহের, বিজয় অরোরা, ভাস্কর চৌধুরী এবং কলকাতার কল্যাণ চ্যাটার্জির সঙ্গে অভিনয় করতে হয়েছে। ষোড়শী গায়ত্রীর চলচ্চিত্র অভিনয় শুরু ছেলেবেলা থেকেই। তখনকার প্রথম ছবি হল—এল বি প্রসাদ পরিচালিত 'জীনে কী রাহে' ছবির নায়ক-নায়িকা জিতেন্দ্র ও তনুজা. ওঁর বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। পরবর্তীকালে কে পি আত্মারাম 'বচপন' ছবিতে শচীন ও জুনিয়ার মেহমুদের সঙ্গে, হীরেন বসু পরিচালিত 'হীনমুন' ছবিতে নায়িকা লীনা চন্দ্রাভারকারের ছেলেবেলার ভূমিকায় এবং বিজে-এর 'ভিকটোরিয়া ২০৪' ছবিতে নায়িকা সায়রা বানুর কনিষ্ঠ বোনের চরিত্রে গায়ত্রী ভাল অভিনয় করলেও, পরবর্তীকালে তাঁকে কোন বিশিষ্ট প্রযোজক বা পরিচালকই অভিনয়ের জন্যে আমন্ত্রণ জানান নি। সম্ভবত পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের স্নাতকদের তখন অধিকাংশ ছবিতে অভিনয়ের ব্যাপারকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছিল। অগত্যা গায়ত্রীর মা শ্রীমতী রোশনী শর্মা রাজশ্রী পিকচার্সের কর্ণধার শ্রীতারাচাঁদ বারজাতিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন তাঁর অভিনয়ের ব্যাপারে। 'রাজশ্রী' সংস্থা চিরদিনই নবাগত শিল্পীদের সুযোগ দিয়ে এসেছেন। 'হীনমুন' ছবিতে ওঁর অভিনয় দেখে ওদের পরবর্তী সামাজিক ছবি 'তপস্যা'তে অভিনয়ের ব্যাপারে পরিচালক অনিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। পরিচালক অনিল গাঙ্গুলী গায়ত্রীকে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অর্থাৎ স্ক্রীন টেস্ট নিয়ে 'তপস্যা' একটি বলিষ্ঠ চরিত্রের জন্যে নির্বাচিত করেন। এইভাবে ষোড়শী নায়িকা গায়ত্রী তাঁর সুন্দর অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে অন্যান্য **প্রযোজক ও পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ**

করে 'তপস্যা' যখন মুক্তি পায় তখন ও'র বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। তার আগে অবশ্য গায়ত্রীকে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন বিষয়ক ছবিতে অভিনয় করতে হয়। বিজ্ঞাপন চিত্রগুলির প্রযোজক ছিলেন যথাক্রমে জে ডি মাদারাম, নিকোলাস, শলাস্কো প্রভৃতি সংস্থা। বর্তমানে বিজ্ঞাপন চিত্রে অভিনয় করা খুব একটা নিন্দনীয় নয়। একদা বিদ্যা সিনহার মত এবং বর্তমানে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের স্নাতক বেঞ্জামিন গিলানীর মত বুদ্ধিদীপ্ত শিল্পীকেও নিয়মিত বিজ্ঞাপন চিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। কবীর বেদী ও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নন।

তপন সিনহার 'সফেদ হাতী' ছবিতে অভিনয়ের পর থেকে কলকাতার হিন্দী ছবিতে অভিনয় করার ব্যাপারে ও'র আগ্রহ বেড়েছে। যদিও কলকাতা বা মাদ্রাজের কোন প্রযোজক, এখনও পর্যন্ত গায়ত্রীর কাছে অভিনয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন নি। এজন্যে ভাষাটা পুরোপুরি রপ্ত না করতে পারলেও, ভাল ভূমিকা পেলে গায়ত্রী বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে আগ্রহী। ও'রা ধারণা 'সফেদ হাতী' ছবিটি মুক্তি পেলে, কলকাতার ও মাদ্রাজের প্রযোজক, পরিচালকরা ও'র অভিনয়ে আগ্রহ প্রকাশ করবেন।

গায়ত্রী স্কুলের পড়া শেষ করার পর পুরোপুরি চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় কলেজে ভর্তি না হয়ে তথাকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে স্নাতক হবার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে চলচ্চিত্র জগতে ও'র অনুপ্রেরণা ও'র মা। ইতিপূর্বে যিনি বিশিষ্ট নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। কে জানে সামান্য শিশুচিত্র 'সফেদ হাতী'তে ও'র সুন্দর অভিনয়ের জন্যে কোন সাংস্কৃতিক কিংবা চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংস্থা কোন পুরস্কার দেবেন কিনা?

বর্তমানে গায়ত্রীর হাতে প্রায় হাফ ডজন অর্থাৎ ছটি ছবি। ছবিগুলি হলো—জাহির হুসেনের দ্বিভাষিক ছবি 'ফির জনম লেঙ্গে হাম' (হিন্দী ও গুজরাটী ভাষায় গৃহীত), দেবেন্দ্র গোয়েঙ্কার 'আদমী সাদক কা', অরবিন্দ সেনের 'অতিথি' (প্রফুল্ল রায়ের এখানে পিঞ্জর) অবলম্বনে রচিত, এ ছবির নায়ক ও নায়িকা হলেন শশী কাপুর, বিদ্যা সিনহা ও পরভিন বাবী। 'অতিথি' ছবিতে অভিনয়ের ব্যাপারে গায়ত্রী অরবিন্দ সেনের স্ত্রী শ্রীমতী অনিতা সেনের কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ। উনি 'তপস্যা' ছবিতে ও'র অপূর্ব অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে ও'কে 'অতিথি'র জন্যে নির্বাচিত করেন।

রবিকান্তের 'চম্বল কী কসম' ছবিতে মহেন্দ্র সাধুরূপী দস্যু সর্দারের বিপরীতে এবং মোহন কর্বিকার 'অভিষার' ছবিতে অমল পালেকরের বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় গায়ত্রী অভিনয় করছে। মোহন কবিকার 'জান না জানা' পরবর্তী

মান্তু ছবিতে সংহিতা ব্যানার্জি ও পরিচালক দুর্গা ভট্টাচার্য
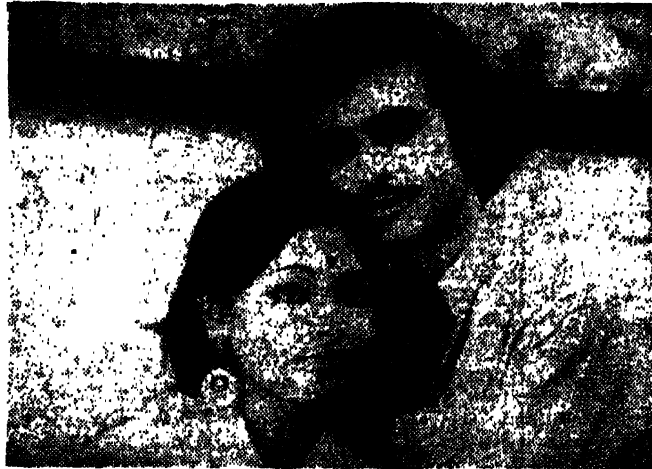
ছবির নায়িকাও। গায়ত্রীর ইচ্ছা প্রবীণ পরিচালক প্রভাত মুখার্জির পরবর্তী হিন্দী ছবি 'তুষারতীর্থ অমরনাথ' অবলম্বনে রচিত ভ্রমণ কাহিনী কেন্দ্রিক রঙীন ছবিতে অভিনয় করবার। সত্যজিৎ রায় বা মৃণাল সেনের ছবিতে যে কোন চরিত্রে অভিনয় করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে গায়ত্রী। সুদূর বোম্বেতে থাকলেও নিয়মিত বাংলা ছবি দেখে। ইতিমধ্যে গায়ত্রী তপন সিনহার 'হারমোনিয়াম', তরুণ মজুমদারের বাংলা 'বালিকা বধূ' এবং শক্তি সামন্তের বাংলা 'অমানুষ' দেখেছে। তপন সিনহা সুরোপিত 'হারমোনিয়াম' এবং শ্যামল মিত্র সুর সংযোজিত 'অমানুষ' ব্যতীত রবীন্দ্র জৈন সুরোপিত 'গীত

গায়ত্রী

গাতা চল' এবং লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল সুরোপিত 'ধর্ম' ছবির গান খুব ভাল লেগেছে।

স্টুডিওতে ও'র প্রথম ছবি 'তপস্যায়' অভিনয় করতে গিয়ে তেমন কোন অসুবিধা বোধ করেন নি, যতটা এল ভি প্রসাদের 'জীনে কী রাহে' ছবিতে অসুবিধা বোধ করেছিল। 'তপস্যা' ছবি দেখতে গিয়ে অন্যান্য সাধারণ দর্শকের মত হৃদয়বিদারক দৃশ্যগুলিতে কেঁদে ফেলেছে। ছেলেবেলা থেকেই মরমী অভিনেত্রী মীনা কুমারীর অভিনয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ও'র প্রিয় নায়ক সঞ্জীব কুমার এবং নায়িকা রাখী, শাবানা আজমী ও জয়া ভাদুড়ী ও সারিকা। প্রিয় পরিচালক তপন সিনহা, অরবিন্দ সেন, অনিল গাঙ্গুলী। প্রযোজকদের মধ্যে গায়ত্রীর অগাধ শ্রদ্ধা প্রবীণ তারাচাঁদ বারজাত্যার উপর। যিনি ও'কে 'তপস্যা' ছবিতে সুন্দর অভিনয় করার সুযোগ দেন। হিন্দী ছবির যৌনাবেদনমূলক কিম্বা শয্যা দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা গায়ত্রীর নেই। বিশেষ কোন টাইপ চরিত্রে অভিনয় করতেও ইচ্ছুক নয়। সব রকমের চরিত্রে—হাস্যকৌতুক, প্রাণচঞ্চল হোক, আধুনিকার চরিত্রেই হোক অথবা নায়কের স্নেহময়ী বোনের চরিত্রে, ট্র্যাজিক দুরূহ ভূমিকায় অভিনয় করতে গায়ত্রী সমান আগ্রহী।

বোম্বের নবাগতা শিল্পীদের পক্ষে আজ প্রধান বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের স্নাতকদের নিয়ে। ওখানকার অন্যান্য কোন একাডেমীর উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের কোন স্থান নেই বোম্বের চলচ্চিত্র জগতে। সম্ভবত এজন্যে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাপ নিয়ে শ্রীমতী ক্যান্ডীর মত গ্ল্যামারাস তরুণীও হিন্দী ছবির নায়িকা হচ্ছেন। এর প্রধান কারণ তৎকালীন বেতার ও তথ্যমন্ত্রী শ্রীশুক্লা এবং জি পি সিপ্পীর মত জনপ্রিয় প্রযোজককে গডফাদার হিসাবে পাওয়ায়। সুতরাং গায়ত্রীর [illegible]

ভাই না থাকায় গায়ত্রীর মত ট্যালেন্টেড শিল্পীরা বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ কোন গুণী পরিচালক ওদের মত শিল্পীকে অভিনয় করার সুযোগ দিলে বম্বের বানের জলের মত ভেসে আসা নায়িকা কিছু কমবে এবং সত্যিকার বুদ্ধিদীপ্ত কিছু শিল্পীর আগমন ঘটবে, ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাপনা নিয়েও রাখী ওয়াহিদা রেহমান, বিদ্যা সিনহা, রেখা, হেমামালিনী, আশা পারেখ, জীনৎ আমনের মত শিল্পীও বহু হিন্দী ছবিতে অভিনয় করছেন। যতদিন কেবল স্টারের পশ্চাৎধাবন না করে শিল্পীর গুণের আদর না হবে ততদিন চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি হবে না।

অশোক মজুমদার

সামনে সূর্য

মিঃ রায় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। একমাত্র নেশা প্রতিষ্ঠা ও অর্থের। ছেলে মনীশ। আদর্শবাদী ডাক্তার।

বিজয়বাবু—ছোট প্রেস মালিক। ছেলে উদয়ন। খবরের কাগজ বের করে যে সমাজের উঁচুতলার মানুষ হতে চায়। মেয়ে সোমা। ভুজঙ্গ—রাজনীতিক এবং ব্যবসায়ী। মেয়ে কাকলী। আদর্শ প্রেমিকা। নায়িকা বা অন্যতম নায়িকা। স্বাভাবিকভাবেই সুন্দরী।

উদয়নকে কাকলী ভালোবেসে তাকে লোভের হাত থেকে বাঁচাতে চায়, যদিও সে লোভের ইন্ধন জোগায় ভুজঙ্গ। মনীশ বিয়ে করতে চায় তার মায়ের কথা দিয়ে যাওয়া পাত্রী সোমাকে। তার বাবার মনোনীত অভিজাত কন্যা পাত্রীকে অগ্রাহ্য করে। বিজয় নাটকের এক দারুন ভালো মানুষ। তার সংস্পর্শে এসে পাড়ার মস্তানরা ভালো হয়ে যায়। বিজয়ের নেতৃত্বে শেষদিকে সবাই ভালো মানুষ টাইপস হয়ে যায়। এইসব চরিত্র ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসেছে আরও অনেক চরিত্র। নাট্যকারের 'বিভ্রান্ত অসৎ বর্তমান সমাজ-জীবনকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা স্বরূপ' বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

—নাটকটি সংলাপের মধ্যে জোর ও ধারটারের ব্যাপারটা ভালো মতই আছে। সব মিলিয়ে বলা যায় বাংলা নাটকের চলতি মানের বিচারে এ নাটকটিকে (সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) একটি জোরালো টোরালো এমন একটা কিছু বলে দেওয়া যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই অভিনেতা অভিনেত্রীরা দর্শকদের বাহ আদায়ের ব্যাপারে নাট্যকারের ইয়া নাটকের সহায়তা পুরোপুরিই পেয়েছেন এই সহায়তা দিয়ে এবং অভিনয়ে চোখ কেড়েছেন—অরুণ লাহিড়ি (বিজয়), সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মিঃ রায়)। মলয় রায়চৌধুরী (উদয়ন), ভবানী মন্ডল (গজেন্দ্র), গোষ্ঠ ঘাটা (হরিবাবু), সোমনাথ ভট্টাচার্য (নেপাল), দীপক ঘোষ (প্রাণকৃষ্ণ), বাসন্তী চ্যাটার্জী (কাকলি), সবিতা মুখার্জি (যশোদা) ললিতা মুখার্জি (সোমা)।

গণেশওয়ালা মিস বনানী ভাট প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্রের অভিনয়ে অতি নাটকীয়তা ও কৃত্রিমতা এসেছে কিছুটা। তবে এগুলো জোরালো টিম-ওয়ার্কে অনেকখানিই চাপা পড়ে গেছে।

টোট্যাল প্রোডাকসন হিসেবে বিচার করলে স্বচ্ছন্দেই বলা যায় স্টার থিয়েটারে ২ মে মঞ্চস্থ এই নাটকটি দি রেডিয়েন্ট প্রসেস রিক্রিয়েশন ক্লাবের একটি সফল উপস্থাপন। এবং এর জন্যে উল্লেখযোগ্যভাবেই দায়ী পরিচালক (মৃণাল মুখোপাধ্যায়)।

গৌতম ভট্টাচার্য

সীজার আসছেন

আরেক বিলিতি সাহেব আসছেন ভারতে। ছবি করতে নয়, অভিনয় করতে। কলকাতায় নয়, বম্বেতে। রিচার্ড অ্যাটেনবরোর মত তাঁরও খ্যাতি কম নয় বোধহয় একটু বেশীই। হলিউডে এক সময় তিনি ছিলেন সম্মানের রাজমুকুট পরে। অস্কারে পুরস্কারে সম্মানিত তিনি।

ভদ্রলোকের নাম রেক্স হ্যারিসন। মনে পড়ে কি 'মাই ফেয়ার লেডি'র সুরেলা গলায় গান গেয়ে ওঠা হেনরি হিগিনস্ কে? কিম্বা 'ক্লিওপেট্রার' দুর্ধর্ষ সীজারকে? 'ইয়েলো রোমান বয়েসে'র সেই কৌতুকপ্রদ নায়কের কথাও নিশ্চয়ই মন থেকে মুছতে পারেন নি এখনও।

সেই রেক্স হ্যারিসন সেপ্টেম্বর মাসে শুটিং করতে সান্তাক্রুজে নামছেন। অবশ্য শুটিং হবে ব্যাঙ্গালোরে।

ছবির নাম 'শালিমার।' পরিচালক—আমেরিকাবাসী ভারতীয় কৃষ্ণ শাহ। প্রযোজনা করছেন বম্বের লক্ষ্মী প্রোডাকসন ও নিউ ইয়র্কের জুডসন কোম্পানী। ভারত আমেরিকার যুগ্ম প্রযোজনা এটি।

সম্প্রতি রাহুল দেববর্মণের সুরে পপ্ গাইয়ে উষা আয়ার গান রেকর্ড করলেন মেহবুব স্টুডিওতে। হাত-পা নাচানো মন দুলে ওঠা সুরে উষা কয়েক বছর বাদে আবার ফিল্মের জন্য গাইলেন। লতা আর কিশোরের গানও রেকর্ড করা হয়েছে। কৃষ্ণ শাহ'র কাছ থেকে নির্দেশ নেবার অপেক্ষায় ধর্মেন্দ্র জীনত আমন প্রেমনাথরা এখন প্রস্তুত।

কানাকানি

একদা জনপ্রিয় এখন নিভু নিভু টালিগঞ্জের নায়ক কিছুদিন আগে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের এক শৈলশহরে ছবির আউটডোর শুটিংয়ে, কাজ কি হয়েছে খবরটা আসেনি, কিন্তু কানে কানে এই খবরটা এসেছে যে, সেই নায়ক নাকি দিনের অনেকটা সময়ই ব্যস্ত থাকতেন নায়িকাচর্চ্চায়। নতুন-তরুণী নায়িকার প্রতি তাঁর এই অতিরিক্ত আগ্রহের দরুন প্রযোজক বেচারীকে নাকি বাজেটের দ্বিগুণ খরচ করতে হয়েছে? সত্যি নাকি। ছবিটি তাহলে পর্দার মুখ দেখবে তো?

* * *

'মৃগয়া'র মিনুয়া এখন বম্বে শহরে নায়িকা শিকারে বুঝি ব্যস্ত। কলকাতায় তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকা নৃত্যশিল্পী এখন মুখ-গোমড়া করে আছেন। কয়েক মাস আগেও মিনুয়ার কলকাতার ঠিকানা ছিল এই প্রেমিকার বাড়ি। আর এখন? নৃত্যশিল্পীকে মিনুয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেই নাকি জবাব দেন—'ও'র খবর ঠিক জানি না, এখন আর দেখাই হয় না'।

* * *

সম্প্রতি এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জনৈক পুরস্কৃত নায়ক ভাষণের শুরুতেই শ্রীঅরবিন্দের বাণী স্মরণ করেন। বলেন : কথা কম কাজ বেশী। কিন্তু তাঁর নিজের বক্তৃতাটিই স্থায়ী হয়েছিল পনের মিনিটের বেশী। তাও আবার শূন্যগর্ভ আলোচনায় এবং তাঁর বিদ্যেবুদ্ধির বহরে শোনার উপযুক্তও ছিল না। বাংলা ছবির দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে কি প্রসঙ্গে যে তিনি বাইরের ছবির কথা তুললেন তা বোধহয় অনেকে অনুমান করতে পারেন নি, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিলেন। বেনহুর আর দি অ্যাপার্টমেন্ট ছবির পরিচালক একই ব্যক্তি এই তথ্য নায়ক মহোদয় কোন্ ফিল্ম এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে পেয়েছেন—জানাবেন কি?

বিচিত্রা

ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখেছি—

ইয়েতি : একটা কিছু আছে, কারণ তার পায়ের ছাপ দেখেছি, ক্যামেরায় তুলেছি। মানুষের চোখ ভুল করতে পারে, ক্যামেরা ভুল করে না।

বলছিলেন বিশ্বময় বিশ্বাস, ভারতের অন্যতম পশু-পাখী বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই বিজ্ঞানী এখন কলকাতা যাদুঘরের প্রাণীতত্ত্ব বিভাগে উঁচুপদে বসেছেন। পশু-পক্ষী বিষয়ে তাঁর জ্ঞান সর্বজন-স্বীকৃত। ইয়েতির পায়ের ছাপ—ঠিক মানুষের মতো নয়। অনেকটা পাহাড়ি ভালুকের মতো। তফাৎটা রয়েছে বুড়ো আঙুলে। বুড়ো আঙুলটা আর চারটে আঙুল থেকে আলাদা। আঙুলের মাথাটা থ্যাবড়া আর গোল। আমার মনে হয়, সপ্রমাণ করতে হয়তো পারবো না—মনে হয়েছে বিশেষ করে এই জন্যে, হিমালয় হল বানরগোষ্ঠীর কেন্দ্র। এখান থেকেই বানরগোষ্ঠী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং এমন কোনো একটা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী দুর্গম পাহাড়ে রয়ে গেছে যাদের সন্ধান পাচ্ছি না। হয়তো এরাই ইয়েতি হতে পারে। তবে, ঐ যে বললাম, এটা আমার অনুমান, ষোল আনা প্রমাণ দিতে পারব না।

আচ্ছা, আপনার জুলোজিতে আকর্ষণ জন্মালো কি করে?

ডাক্তার হবার শখ ছিলো, ভর্তি হলাম কারমাইকেলে। জুলোজি ভালো লেগে গেলো। এদিকে এলাম।

একটু থেমে বললেন—এদিকে এসে বোধহয় ভালোই করেছি।

কেন?—ডাক্তারি পড়লে একটি 'জন্তু' নিয়ে কাজ করা যায়। এখানে বহু।

ডঃ বিশ্বাস এম-এস-সি পাশ করার পর জুলোজিক্যাল সার্ভেতে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। শেষ হবার আগে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ইংলন্ড চলে গেলেন। বিটিশ মিউজিয়ামে দু বছর, আমেরিকার মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টিতে ন' মাস কাজ করেছেন। দেশে ফিরে এসে জুলজিক্যাল সার্ভেতে যোগ দিয়েছেন। তখন থেকে এখানেই আছেন।

প্রধান আকর্ষণ মানে কোন্ প্রাণী-জগৎ আপনাকে বেশী টানে?

প্রথমে পাখি, তারপর স্তন্যপায়ী। ছাত্র ছিলাম যখন, তখন কাজ করেছি পাখিদের রক্ত সংবহন তন্ত্র নিয়ে। গবেষণা করার সময় পাখিদের অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করে আনন্দ পেয়েছি। পাখিই আমার মুখ্য কাজ। নানা বন-জঙ্গলে কাজ করার সময় স্তন্যপায়ী জীবের দিকে আকৃষ্ট হই। প্রাকৃতিক পরিবেশে পাখি বেশী আকর্ষণ করে। প্রাণীকুল কিভাবে রয়েছে, কোন কোন পরিবেশে কিভাবে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে রয়েছে—এই অভিযোজনগুলো কেমন করে হয়েছে, ওইটাই আমাকে বারবার আকর্ষণ করেছে। এখন আগেই আন্দাজ করতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেবো।

কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন?

—আমার গবেষণার সীমানা হলো নেপাল - ভুটান - সিকিম দার্জিলিঙ। ৪৭-এ নেপাল গেছি প্রথম। হিমালয়ের পাখি নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করি। ভারতে প্রথম পাখীদের দেহে রিং দিয়ে তাদের যাতায়াত লক্ষ্য করি। তখনই পাখি বা হিমালয় আমাকে আকৃষ্ট করে। সে তাকে ছাড়তে পারবে না কোনোদিন। একান্ন-বাহান্ন সালে সিকিম গেছি, চুয়ান্নতে এভারেস্ট অঞ্চলে গিয়ে-

পরি—এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে এ ধরনের প্রাণী রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিলে যায়।
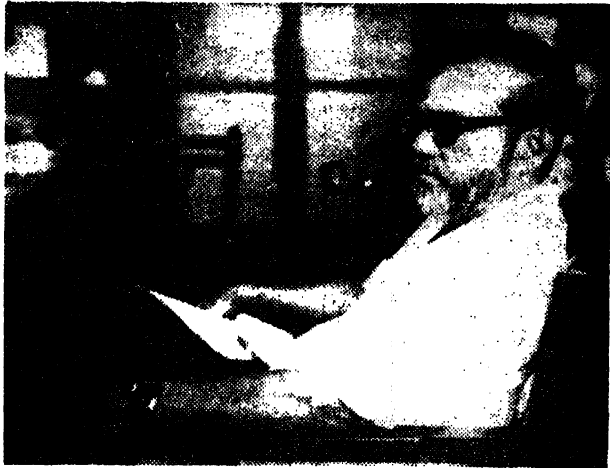
আচ্ছা, কোন্ কোন্ প্রাণী ভারতবর্ষ থেকে নির্মূলে হয়ে যাচ্ছে এখন? সিংহ, গন্ডার, বাঘ, চিতা—এসব আটচল্লিশ সাল থেকে চলে গেছে। বন্যবিড়াল জাতের (বনবিড়াল, সোনালী বিড়াল, পাঁশুটে চিতা, বাঘ ডাঁশ) লুপ্ত হয়ে যাবার অবস্থায় এসেছে। গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড (হুকনা) লুপ্তির মুখে। বিচিত্র রঙের পাহাড়ী কোরেল নেই বললেই চলে।

গত বছর লাদাকের দুর্গম অঞ্চলে আপনি আর সালিম আলি গিয়েছিলেন কেন? শুনেছিলাম প্রাণীতাত্ত্বিক কাজে গিয়েছেন? —উদ্দেশ্য ছিলো তিব্বতি কালোগলার সারস এবং রাজহাঁস (বাদি হাঁস) আর অন্যসব তথাকথিত শিকারী প্রাণীরা কি অবস্থায় আছে সে সম্বন্ধে ছিলাম। উনিশ হাজার ফিট পর্যন্ত উঠেছি লন্ডনের ডেলিমেল এক্স-পিডিসান গ্রুপ-এর সঙ্গে প্রাণী বিজ্ঞানী হয়ে তুষারমানব ইয়েতির সন্ধানে।

পড়াশুনা করেন নিয়মিত। পাঠ্য-তালিকায় যেমন প্রাণী বিজ্ঞান আছে, তেমনি সাহিত্য। বললেন বই কেনা চাই-ই, প্রতি মাসে অন্তত পঞ্চাশ টাকার।

জীবনে ও'র বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পাহাড়ে পাহাড়ে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। উনিশশ ছেষট্টি সাল থেকে ভুটানের পশুপক্ষী নিয়ে গবেষণা করছেন। পূর্ব হিমালয়ের এমন জায়গা নেই যেখানে যাননি। স্বদেশে বিদেশে বিশিষ্ট পক্ষী-বিদ বলে পরিচিত। ভারতে প্রাণী-তাত্ত্বিক সমস্যা উঠলে ও'কে রেফার করা হয়। বিখ্যাত সালিম আলির পরেই ও'র স্থান।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবদেব।

উত্তরবঙ্গের মুখ্য দেবতা শিব হলেও, এখানকার পুজোপার্বণ গড়ে উঠেছে কৃষিকে কেন্দ্র করে। জীবন-ধারণ কৃষির উপর নির্ভরশীল বলেই পুজো-উৎসব ও উৎসবকেন্দ্রিক গান কৃষিভিত্তিক। যেমন তিস্তাবুড়ি, গচিবুনা, ডাকলক্ষ্মী, বুড়াবুড়ি, বৈশাখী, আষাঢ়ীসেবা, আমাতি, ধানের ফুল আনা, যাত্রাপুজো, ভান্ডাণী, শিয়াল-ঠাকুর, ব্যাঙের বিয়াও, নয়া খৈ, পুষুনা, গোরখনাথ, গমীরাঠাকুর প্রভৃতি। এইসব কৃষিকেন্দ্রিক পুজোর মধ্যে অলৌকিক কিছু কিছু ঘটনা কাহিনী হিসাবে প্রচলিত। বিশ্বাসের দ্বারা তা স্বীকৃত। নারী-পুরুষ সব্বাই এই সকল পুজোয় অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই সকল পুজোর মধ্যে বিভিন্ন গান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আর একরকম পুজো এই উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত, তা হচ্ছে বনাঞ্চলে ঘেরা উত্তরবঙ্গের স্থানীয় মানুষের জীবজন্তুর ভীতি থেকে। মহাকাল ঠাকুর, ভান্ডাণী, শালেশ্বরী ঠাকুরাণী, বিষহরি, শিয়ালঠাকুর, বিশুয়া প্রভৃতি পুজোর প্রচলন দেখা যায়। শিয়াল-ঠাকুরের পুজো হয় নবান্ন উৎসবের সময় এবং তার পুজো না হলে শিয়াল-ঠাকুর সবংশে নিধন করেন মানুষদের—এইরূপ বিশ্বাস থেকেই এই পুজোর আবির্ভাব।

এ ভিন্ন আছে কালীপুজোর প্রচলন। মালদহের বামনগোলা, গাজল, খরবা, মানিকচক, ইংরেজবাজার হবিবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তারাকালী, মশান-কালী, রক্ষাকালী, বুড়িকালী, ঝাপড়ী-কালী, রটন্তীকালী, জহরাকালী, রাখাল কালী দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিম দিনাজপুরের ইটাহার, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, কুমারগঞ্জ, কুশমন্ডী, ফরিদপুর, পতিরাম প্রভৃতি অঞ্চলে শ্যাম-কালী, পাঁচকালী, বয়রাকালী, মাটিয়া-কালী, চামরকালী, পাগলীকালী, সুর-কালী, মড়ককালী, কাঞ্চনকালী প্রভৃতির পুজো হয়। দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলে ধুম মাদারকালী, কাঁচাকালী, নঙ্গাকালী, জটিয়াকালী, হাওয়াকালী, রাঙ্গিয়াকালী, মেছেনীকালী, বাঁওকালী, ডাহেনকালী, আমাতিকালী ও নাংটাকালীর পুজো। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি, বেঙকান্দি গ্রামে পেটকাটিকালী, পান্ডা-পাড়ার কালী বহুদিন থেকে পুজিত হয়ে আসছে। কুচবিহার জেলায় ভদ্র-কালী, শ্যামাকালী, শ্মশানকালী কাঁচাকালীর পুজোই বেশি। জলপাই-গুড়ি জেলাতেও এই সকল কালীর পুজো সময় সময় হতে দেখা যায়।

এখানে মাশান, যখা প্রভৃতি অপ-দেবতা হিসাবে পুজিত হয়। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় মাশানের সংখ্যা বেশি। অনেক প্রকার মাশান এই জেলাগুলিতে দেখা যায়। যেমন নাঙ্গা মাশান, কুহুলীরা মাশান, কাল মাশান, বহিতা মাশান প্রভৃতি।

হিংস্র জন্তুর অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হলে মহাকাল ঠাকুরের স্মরণ নেওয়া অলিখিত বিধি। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ারের অন্তর্গত চোপানী গ্রামে এবং কুচবিহার সদর মহকুমার ভেটাগুড়ি অঞ্চলে মহাকালের পুজো হয়। এই দেবতা মাটির তৈরি তাঁর দেহ এবং মাথার অর্ধেক অংশ কাল রঙ, অর্ধেক সাদা। মূর্তি শিবাসনে উপবিষ্ট।

দিনহাটা মহকুমার হোকদহ গ্রামে একটি যখাঠাকুরের মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। তাতে মাটির তৈরি যখা ও যখানীর মূর্তি আছে। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে কেউ কেউ শিব বিশ্বাসে পুজো করে থাকেন। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে 'মহারাজ' নামক পুজোর প্রচলন আছে। এই পুজোও কৃষির দেবতা হিসাবে পুজিত হয়। এই পুজো দেখা যায় জলপাইগুড়ির বেরুবাড়ি অঞ্চলেও। জলপাইগুড়ি জেলার সন্ন্যাসীকাটা হাটে আছে সন্ন্যাসী পুজোর মন্দির। কুচবিহার, দার্জিলিং-এ এই পুজোর প্রচলন আছে। লৌকিক ভাষার মন্ত্রের সাহায্যে স্থানীয়দের নিজস্ব পুরোহিত 'দেউসি' এই পুজো করে থাকেন। কুচবিহারের মেখলিগঞ্জে যে মূর্তিটি আছে, সেই মূর্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, বাহু ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, দুই পাশে সাপ, মাথায় জটা এবং উদ্যতফণা সাপ। শিশুদের সর্দিকাশি হলে 'বুড়া ঠাকুরের পুজো' দেওয়া হয়ে থাকে। এই বুড়া ঠাকুরের পুজো জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমায় চিকলী গ্রামে হতে দেখা যায়। এই জেলাতেই ময়নাগুড়ির কাঁঠালবাড়ি গ্রামে আছে ধুমবাবার মন্দির। শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তির জটিল ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য এই পুজোর প্রচলন। কুচবিহার জেলায় থানছিরি পুজো হয়ে থাকে বন্ধনের দেবতা হিসাবে। একটি বাঁশের অংশকে মাটিতে পুঁতে তাকে থানছিরি হিসাবে পুজো করা হয়। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার শাল-বাগানের জন্য বিশেষভাবে খ্যাত। এই ঘন অরণ্যসংকুল পরিবেশের জন্য অরণ্যদেবতা হিসাবে এই শালশিরি পুজোর প্রচলন। শালবাগানের মধ্যে কোনও একটি শালগাছের নীচে মাটি দিয়ে থান তৈরি করে পুজো করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলায় জুভাবান্ধা ঠাকুরের পুজো হতে দেখা যায়। কুচবিহারে এর নাম ঢিল-খাওয়া দেবতা। ঢিল-খাওয়া দেবতার পুজো হয়ে থকে মাটির ঢেলা দিয়ে। তেঁতুল, শেওড়া, পাকুড়-গাছেই এই ঠাকুরের আশ্রয়। পথিকরা যাবার সময় পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে একটি ঢিল কুড়িয়ে এনে ঐ গাছের নীচে নিক্ষেপ করেন এবং পরে সেই স্থান পরিত্যাগ করেন।

উত্তরবাংলার স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হলে পেত্তানী হয়। এই পেত্তানী নিকটবর্তী কোনও বাঁশবাগান, কলা-বাগান অথবা শেওড়াগাছে আশ্রয় নেয়। কোনও শিশু যদি মাতৃদুগ্ধ পান না করে কিংবা কোনও যুবক-যুবতী যদি রাত্রিকালে অধিক পরিমাণে মৈথুনের স্বপ্ন দেখতে থাকে এবং ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে, তবে ধরা হবে পেত্তানী ধরেছে। ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁক এবং পুজো করে এই পেত্তানী ছাড়ানো হয়।

মৃতদেহ সৎকারের যাবতীয় দায়িত্ব থাকে কীর্তনীয়াদের। জীবচালান, গৃহ-শুদ্ধি যাবতীয় কাজ কীর্তনীয়ারাই করে থাকেন। ভূত প্রেত ইত্যাদির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবার জন্য ওঝার প্রয়োজন হয়। সাপে কামড়ালে বা ভূত-পেত্নী ধরলে এই ওঝারা মন্ত্রবলে সেগুলি দূর করেন।

রণজিৎ দেব

শক্তি চট্টোপাধ্যায় | সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় | দাউদ হায়দার

ওপার বাংলার কবি এপার বাংলার গলায়

কাঁটাতারের ওপারে বাংলাভাষার খবরাখবর, লেখালেখির একাল, কবিতার নতুন কথা কতোটুকুই বা জানতে পাই আমরা? রবীন্দ্রসদনে বাংলাদেশের কবিতাসন্ধ্যায় খানিকটা তবু জানা গেল। সন্ধেটি কলকাতা অনেকদিন মনে রাখবে। কলকাতার কবিদের গলাকে ধন্যবাদ। অভিজ্ঞ আবৃত্তিকাররাও যে যার ঢঙে পড়লেন। যাঁদের কবিতা পড়া হলো, ধরে নিচ্ছি, সকলেই ভালো কবি। তাহলে কবিতা বাছাইয়ে বোধহয় আরো একটু মাথা ঘামানো যেতো। শংখ ঘোষ বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচন, কি আরো কারো-কারো, অনবদ্য: আগাগোড়াই ওই রকম আশা করেছিলাম। শংখ ঘোষের কণ্ঠস্বর তাঁরই উপার্জন, ক'জন বাঙালীই বা এপর্যন্ত তাঁর কবিতা পড়া শুনেছেন? শহীদ কাদরীর 'টাকাগুলো কবে পাবো। কবে? কবে?' ছুঁড়ে মারছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ওটাই তাঁর ধরণ, কবিতাটি ঝড়জলে জলপায়রার মতন হুটোপাটি খাচ্ছিল। সন্ধেটা প্রায় তিনিই জিতে নেন। অসুস্থ গৌরকিশোর ঘোষ তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাস ফেলে এসেছিলেন, স্পষ্টবাদিতার মতন পড়লেন শামসুর রহমানের একটি সময়োচিত কবিতা। তাঁর আরেকটি কবিতা 'শান্তি নাই' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গলায় দিব্যি ঠাঁই পেয়ে গেল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চারণেও শামসুর মনে হলো মাথা উঁচু করেই লেখেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাজল চৌধুরী পড়ছিলেন আবুল হাসানের কবিতা, শুনবো কি, ওর কবিতা-বইয়ের নাম শুনে আমি চমকে উঠি— রাজা যায়, রাজা আসে। কবি-পরিচিতিতে বইয়ের নামটি শোনালেন নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। পরলোকগত জসিমউদ্দিন থেকে সদ্য তরুণ কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পড়ে শোনাতে রুদ্রপ্রসাদ নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের নতুন নজির তৈরি করলেন। গোটা অনুষ্ঠানে দাউদ হায়দারই বাংলাদেশের একমাত্র কবি, নিজের গলায় নিজের কবিতা পড়লেন। একটু হুড়মুড়িয়ে। ফলে কয়েকটি ভালো কবিতাও ভালো শোনা গেল না। ইনি উদ্যোক্তাদের একজন, কলকাতার ছাত্র।

হাজার হাজার মেহেন্দি গ্রাম কবে হবে

মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি শুনেছিলাম কালুরঘাটে। রায়গঞ্জের কাছে ছোট্ট একটি গ্রাম, নাম তার মেহেন্দি গ্রাম, সেখানে সবাই মিলেমিশে চাষবাসের আধুনিক কলা-কৌশল কাজে লাগিয়ে অবস্থার দারুণ পরিবর্তন করে ফেলেছেন। রায়গঞ্জ থেকে কর্ণজোড়া ছাড়িয়ে বাঁদিকে মাইল দুয়েক গেলেই মেহেন্দিগ্রাম। চাষের জমি মাত্র ৪৮০ একর। ৫ থেকে ১০ একর জমির মালিক ২২ জন। ২ থেকে

৫ একর জমি আছে ৩৪টি পরিবারের হাতে। এবং দু একর পর্যন্ত জমির মালিক ৫৭টি পরিবার। ৮৫টি পরিবারের হাতে চাষের জমি নেই। তাঁত আছে ৫৪টি পরিবারের। ওপার বাংলার মানুষেরা ওখানে জমি কিনে চাষবাস করছেন। তাঁত বুনে সংসার প্রতিপালন করেন। বেশ কয়েক ঘর মুসলমান এবং স্থানীয় কিছু বাসিন্দার উপজীবিকা চাষবাস।

দুবছর আগেও অনেকের সংসারে দুবেলা পাত পড়ত না। তার আগে জমির দর ছিল জলের দরের মতো। এখন কিন্তু মেহেন্দিগ্রামে দেড় দু হাজার টাকার কম এক বিঘে জমি পাওয়া যাবে না।

এই সাফল্যের মূলে কথা হল মাত্র ১৮টি শ্যালো আর একটা ডিপ। এগুলি সরকারী। ব্যক্তিগতভাবে শ্যালো বসিয়েছেন তিনজন চাষী।

আম গাছ তলায় বসে পাটের দড়ি পাকাচ্ছিলেন ৬৮ বছরের সেখ ছমিরুদ্দিন। চাষবাসের আধুনিক কলা-কৌশল প্রয়োগের নানান পরামর্শ নিয়ে যখন গ্রাম সেবক নীরেন ভট্টাচার্য এসেছিলেন তখন গাঁয়ের ছেলেরা তাঁকে আমল দিতে চাননি। বুড়ো ছমিরুদ্দিন কিন্তু ঠিকই বুঝেছিলেন। বললেন, মেস্তা বা আউশ ধান আর কলাই বুনে বছরে কতই বা আয় হয়। তার চেয়ে সেচের সুযোগ পেলে বছরে দু-তিনবার চাষ করা যাবে। সরকার যখন এগিয়ে এসেছেন তখন ছেলেদের ডেকে বললেন, আমার জমিতে যৌথ বীজতলা করা হোক। এভাবেই পত্তন হল আধুনিক চাষবাসের।

গেল বছর গম চাষ করে বিঘা পিছু ১৪।১৫ মণ ফলন পেয়েছেন অনেক চাষী। গমের পরে শুরু হয়েছে পাট ও আউশ বোনার পালা। ৫০ একরে উন্নত জাতের পাট বীজ বোনা হয়েছে লাইনে। বাকি জমিতে আউশ হিসাবে সি এন এম ২৫ ১২৩৩ জাতের ধান। যৌথ বীজতলায় রায়গঞ্জের মডেল ফার্ম থেকে বীজ এনে এঁরা বুনেছিলেন। ২২ থেকে ২৫ দিনের চারা রোয়ার কাজও শেষ।

ওপার বাংলার নিবারণ দেবনাথ দু-বিঘায় বাসুদেব পাটের চাষ করেছেন। জামাউদ্দিন করেছেন এক বিঘায়। নইমুদ্দিন চাষ করেছেন ৫০ শতকে। সবই লাইনে।

মহম্মদ ঈদ্রিসের চার বিঘে জমিতে ধান রোয়ার কাজ শেষ। ছমিরুদ্দিনের ৫ বিঘায় রোয়া শেষ হয়েছে। ফণীভূষণ দেবনাথ ৭ বিঘায় রোয়ার কাজ শেষ করেছেন। যোগীন্দ্র শর্মার রোয়ার কাজ চলছে। বাড়ির সকলে মিলেমিশে বীজ টানছেন। চারদিকেই কাজের ব্যস্ততা।

মাত্র দু-বিঘে জমির মালিক যতীন দেবনাথ। পাঁচজন পুষ্যি। দুখানা তাঁত। রোজ ৮।১০ খানা গামছা তৈরি করেন। ৪৩ শতকে ১৫ মণ গম পেয়েছিলেন তাতেই বেঁচে আছেন। এখন ধান রোয়ার কাজ চলছে। কাঁঠাল গাছে অসংখ্য ফল। এমন কাঁঠাল গাছ মেহেন্দিগ্রামে অজস্র।

চাষের কাজে পরামর্শ দিতে গ্রাম সেবক আসেন। এইও শ্যামনারায়ণ সিং আসেন। মহকুমা কৃষি অফিসার স্বপন সরকারও মাঝে মাঝে আসেন। মাঝে একবার জেলার পি এ ও জীতেশচন্দ্র ধরের সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের সম্প্রসারণ কর্তা ড্যানিয়েল বেনোর এসেছিলেন। সাধারণ চাষীবাসীরা যেভাবে চাষবাসের নতুন নতুন কলাকৌশল কাজে লাগিয়ে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তা দেখে বেনোর সাহেবের তাক লেগে গেছে। এত তাড়াতাড়ি প্রায় নিরক্ষর চাষীবাসীরা যত বেশি উন্নতি করেছেন তা যে কোন উন্নত দেশের পক্ষেও গর্বের।

আগে গ্রামের মানুষেরা যেতেন আশপাশের গাঁয়ে অথবা শহরে কাজ করতে। এখন বাইরে থেকে মুনিশ বা জনমজুর আসেন এখানে কাজ করার জন্য। হবে নাই বা কেন? বার মাস কাজ চলছে। মাঠে সবুজের সমারোহ। উন্নত পদ্ধতির চাষবাসে আয় হচ্ছেও ভাল।

মানুষের আর্থিক সঙ্গতি কতটা বেড়েছে তা অবশ্য গাঁয়ের কুঁড়ে ঘরগুলো দেখে বোঝা যাবে না। সে প্রশ্ন করতে ঈদ্রিশ আলি বললেন, পাকা দালানকোঠা করা যায়,—ডাকাতের ভয়ে সাহস পাই না। ফোকলা দাঁতে হেসে ছমিরুদ্দিন বললেন, হবে। আগামী শীতের ফসল তোলার পরেই আমরা বাড়িঘর নতুন করে গড়বো। অনেকেই ইতিমধ্যে টিনের চাল লাগাতে শুরু করেছেন।

এমন হাজার হাজার মেহেন্দিগ্রাম গড়ে তোলা যাচ্ছে না কেন তার জবাব অবশ্য কেউ দিতে পারেন নি।

সুভাষ রায়চৌধুরী

সরকার জুনিয়র

স্টেজের আবছা আলোয় সরকারের গায়ে জড়ানো ঝলমলে কাপড়টা ক্রমশঃ সরু হয়ে নাচতে লাগল। মুহূর্তেই সর্বকিছু ভ্যানিশ। নিউ এম্পায়ারের তিনতলা থেকে হঠাৎ কে যেন চিৎকার

করে উঠলেন—আই এ্যাম হিয়ার আই এ্যাম হিয়ার। দর্শকেরা শেষবারের মত মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন বিশ্বের সেরা যাদুকর স্বর্গত পি সি সরকারকে। কারণ, এটাই ছিল সিনিয়র সরকার প্রদর্শিত ইন্দ্রজালের শো আইটেম।

দৃশ্যটা উল্টে যায়। মহাজাতি সদনে ইন্দ্রজালের প্রথম আইটেম। পর্দা সরতেই চোখে পড়ে লাল আর সবুজ বিশাল দুটো মূর্তি। আস্তে আস্তে খুলে যায় অনেকটা যেন আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। চোখের পলকেই শুরু একটি পাকানো দড়ির ঝলমলে নাচ। দাড় আস্তে আস্তে নিউ এম্পায়ারের সেই ঝলমলে কাপড়ে যেন রূপান্তরিত হয়। আর তখনই আড়াল থেকে মুহূর্তে বেরিয়ে আসেন পিতার আশীর্বাদধন্য বর্তমান বিশ্বের সেরা যাদুকর পি সি সরকার (প্রদীপ) জুনিয়র। হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ে। এরপর আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে চমকের পর চমক। অনুসন্ধান করার কোনো উপায় থাকে না। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখতে হয় যাদুর পর্দা কিভাবে একটি দেহ হয় দ্বিখণ্ডিত। শূন্যে কুমারী হয় অদৃশ্য। এয়ারপোর্ট থেকে বেরোয় অফুরন্ত সামগ্রী। কাপড়ের আড়াল কোথা থেকে চলে আসে এক জোড়া ঘোড়া। লম্বা লোক হয় বামন। এছাড়াও রয়েছে ইলাস্টিক লেডি, তাসের ইন্দ্রজাল—সিক্রেট কার্ড রিপোর্ট, পেপার টিয়ারিং, জগৎবিখ্যাত খেলা ওয়াটার অব ইন্ডিয়া, একস্-রে আই এবং আরো কত কী। দেখতে দেখতে মনে হয়, ম্যাজিকই যেন শোম্যান শো-বিজনেস। আর প্রদীপ তার সেরা শো-ম্যান।

অমিতবরণ মিত্র

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা ॥ ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য